## বৈশাখ—আশ্বিন, ১৩৪৭ ; ২৫শ বর্ষ

### ষাণ্মাষিক বিষয়-সূচী : লেখকের নামানুক্রমিক

# চিত্র-সূচী

## মাসানুক্রমিক

### বৈশাখ



### জ্যৈষ্ঠ



### আষাঢ়



### শ্রাবণ



### ভাদ্র



### আশ্বিন

## কার্ত্তিক—চৈত্র, ১৩৪৭ : ২৫শ বর্ষ

### ষাণ্মাসিক বিষয়-সূচী : বর্ণানুক্রমে লেখকের নামানুক্রমিক

# চিত্রসূচী

( মাসানুক্রমিক )

পঞ্চবিংশ বর্ষ
১৩৪৭ সাল

বৈশাখ

প্রথম খণ্ড
১ম সংখ্যা

# রজত-জয়ন্তী

"প্রবর্ত্তক" পঞ্চবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিল। বিগত চতুর্বিংশতি বৎসর সে চলিয়াছে অবাধে, নির্ভয়ে। 'প্রবর্ত্তক' দৈন্যের কষাঘাতে প্রভাহীন অথবা ঐশ্বর্য্যের আতিশয্যে আত্মবিস্মৃত হয় নাই! "প্রবর্ত্তক" আত্ম-ধর্ম্ম অব্যর্থ লক্ষ্যে রাখিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়াছে। আমি 'প্রবর্ত্তকের" প্রধান সেবকরূপে যে অধিকার পাইয়াছিলাম, এই দীর্ঘ দিন কোন কারণে তাহা হইতে এক দিনও বিচলিত হই নাই; এই জন্য "প্রবর্ত্তককে" উপলক্ষ করিয়া আমি সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের জয় কীর্ত্তন করি।

"প্রবর্ত্তকে"র রজত-জয়ন্তী উৎসব তাহার একনিষ্ঠ সেবকের পূর্ণার্ঘ্য দিবার শুভক্ষণ। "প্রবর্ত্তকে"র স্বপ্ন আজও সফল হয় নাই—হইবার নহে। ভবিষ্যতের হাতেই সে ভার তুলিয়া দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইব। অব্যক্ত বেদনায় যে ভাষা অন্তরে আজও গুমরিয়া মরে, তাহা এই বৎসরে যদি প্রকাশ করিতে পারি, নিজেকে দায়মুক্ত মনে করিব।

"প্রবর্ত্তকের" বাধা সহজ বাধা ছিল না, সর্ব্বপ্রকার বৃহত্তর বাধার সম্মুখে সে নতিসহকারেই দাঁড়াইয়াছে এবং নতিই তাহাকে অগ্রগতি দিয়াছে। বাধাকে সে দেখিয়াছে ঈশ্বর-সঙ্কেতের ন্যায়; সহায়কেও সে লইয়াছে ঈশ্বরপ্রসাদরূপে। অনুকূল ও প্রতিকূল কোন অবস্থায় 'প্রবর্ত্তক" উচ্ছ্বসিত অথবা ক্ষুণ্ণতায় ম্রিয়মাণ হয় নাই। সকল অবস্থায় তুল্যভাবে ঈশ্বরাজ্ঞাপালনই তার ছিল একমাত্র কর্ম্ম। সে কর্ম্ম সে সিদ্ধ করিয়াছে।

"প্রবর্ত্তকের" বাণী মন্ত্রশক্তি। যোগ-বীর্য্য এই শক্তির আশ্রয়। এই শক্তি নাম লইয়াছে, রূপ লইয়াছে "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে"। "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ" যুগের হাওয়ায় ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ায় নাই, তার এক নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। তার যাত্রা এই হেতু সম্পদে বিপদে, অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থায় এই এক অমোঘ লক্ষ্যের পথে। সে লক্ষ্য—বাংলায় নব-জাতিগঠনের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা।

"প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের" রাষ্ট্রসাধনা আছে। সে সাধনার লক্ষ্য পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। ইহা হিংস বা অহিংস প্রতিবাদাত্মক নহে; আত্মসংগঠনই তাহার একমাত্র নীতি। যেটুকু সংগঠন সিদ্ধ হইলে, একটা জাতি গড়িয়া উঠে আর যে সংগঠনের ছন্দে স্বাধীনতা স্বতঃস্ফুরিত হয়, "প্রবর্ত্তক" সেই সংগঠনই তাহার রাষ্ট্র-কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সংগঠনের পরিমাণানুসারেই জাতি স্বাধীনতার সত্য অধিকার অর্জ্জন করিতে পারে।

"প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের" সমাজজীবন আছে, সে জীবন আত্ম-চৈতন্যের প্রকাশ-ভঙ্গী। সে ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হয়। বর্জ্জনে ও গ্রহণে তাহারও সাবলীল ছন্দঃ আছে। এই নব-জাতির যে সমাজ-চিত্র, তাহাও অন্তর-সাধনারই

চিন্ময়ী মূর্ত্তির আত্মপ্রকাশের সীমা গণ্ডীবদ্ধ রাখা যায় না। কখন কাহার ললাটে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, কখন কাহার কণ্ঠে নব ঋক্ ঝঙ্কার দিয়া উঠিবে, কে জানে? কখন কাহার হৃদয়-বীণা প্রেমের মূর্চ্ছনা তুলিবে, কাহার প্রাণের তারে সঞ্চয়প্রবৃত্তির দীপক-রাগিণী বাজিবে, কাহার শিরায় শিরায় সেবার মন্দাকিনী ঝরিয়া পড়িবে কে জানে? তাই আমরা প্রত্যেকের জীবন-যন্ত্রশালার, তোরণদ্বার মুক্ত রাখিয়াই চলিয়াছি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চাতুর্ব্বর্ণ্য মানুষের বন্ধন-দশা নহে, ঈশ্বর-প্রকাশ। এই হেতু "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের" সমাজ বিধান চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রকাশ-ছন্দে লীলায়িত হইলেও, নিষ্ঠুর ভেদের প্রস্তরপ্রাচীরে উহা ছিন্ন, ভিন্ন, খণ্ডীকৃত নহে। জাতিকে আমরা পুরুষোত্তমতীর্থে ডাকিয়া আনিতেছি—এখানে প্রেম ও ঐশ্বর্য্যের লীলা-মাধুর্য্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন না হয়, নরনারায়ণ অবজ্ঞাত না হয়, সে দিকেই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি।

"প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের" ধর্ম্ম আছে, সে ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন। ভারত তার প্রসূতি, বেদ তার ভাষা। কর্ম্ম তার সাধন। "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ" নিষ্কলঙ্কা সতীমূর্ত্তি ভারতীকে মা বলিয়াছে—ভারতীর বীণায় ত্রয়ীর ঝঙ্কার শুনিয়াছে। সে স্বীকার করিয়াছে, বিশ্বস্রষ্টা নারায়ণকে, আর নারায়ণের চরণে উৎসর্গ করিয়াছে সর্ব্বকর্ম্ম। জীবন তার কর্ম্মময়। তাই জীবনের উৎসর্গই হইয়াছে তাহার ধর্ম্ম। আত্ম-সমর্পণের মন্ত্র অনাহত ধ্বনি তুলিয়াছে তাহাকে ঘিরিয়া। সে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া ভগবানের সহিত যুক্তিপ্রার্থী। এই তার ধর্ম্ম, এই তার জীবন।

"প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে" আজিও আত্মসমর্পণের মন্ত্র-জপই চলিয়াছে; ঈশ্বরে যুক্তি পাওয়ার পথেই সে চলিয়াছে। এ পথের যাত্রী যারা, তারা কেহ সন্ন্যাসী, কেহ ব্রতচারী। ব্রহ্মচর্য্য তাদের জীবনের ভিত্তি। ঈশ্বর-প্রাপ্তির অমৃত আহরণ করাই তাহাদের লক্ষ্য। আজ এই সঙ্ঘ-চক্রে গৃহি-গণও সংযুক্ত হইয়া সঙ্ঘের অনুসরণ শুরু করিয়াছে। সঙ্ঘের ব্রতধারী ব্রহ্মচারীদের সহিত তাহাদের আচারগত পার্থক্য থাকিলেও, অবস্থা-ভেদ স্বীকার করিয়া সমকণ্ঠে একই মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে মণ্ডলে মণ্ডলে। যাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত গতি আমাদের ক্ষিপ্র হইবে, অথচ গতি ক্ষিপ্র করার জন্য সংহতির পুষ্টি আমরা চাহি না। ঈশ্বর-জীবন লক্ষ্যে রাখিয়া যে জীবন উদ্বুদ্ধ, তাহাকেই আমরা নিত্য সঙ্গী বলিয়া দুর্গম পথে যাত্রা করিয়াছি। "এ যৌবন জল-তরঙ্গ" বিংশতি বর্ষকাল ক্রমোচ্ছ্বসিত হইয়া ব্যাপ্তির পথেই আমাদের লইয়া চলিয়াছে। সুদূর লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইবে—ধৈর্য্যই সহায় হইয়াছে।

এই অসাধারণ জীবন-সাধনার জন্য সত্য আমাদের আশ্রয়। জীবনে একটী কেন্দ্রতীর্থ স্থির করিতে হইয়াছে, যেখানে মিথ্যা মূর্চ্ছিত হইয়া মরে, সত্য মূর্ত্ত হয়। আর আশ্রয় হইয়াছে সংযম। দেহ ও মনকে একাগ্র করিয়া আমরা প্রাকৃতভোগ-বিরত হইয়াছি—ইহাই আমাদের শক্তি ও স্বাস্থ্য, ধৃতি ও বীর্য্য। গৃহীদের পরদার ও পর-পুরুষ-বিরতিই সংযম—ইহাই তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য।

আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বশেষ আশ্রয় ভগবান। আমার সহিত আমার ইষ্টের অভেদ-সম্বন্ধই আমার জীবন। এই সম্বন্ধ অনাহত রাখার জন্য ত্রিসন্ধ্যা উপাসনার আয়োজন। যথানিয়মে ও সময়ে সমবেত উপাসনার মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে ঈশ্বর-সম্বন্ধের অনাবিল অমৃতে প্রতি দিনই হৃদয় আমাদের অভিষিক্ত হয়। প্রতিদিন আমরা নবজন্মলাভ করি।

গৃহে গৃহে পিতামাতা, পতিপত্নী, ভ্রাতাভগ্নী, আত্মীয়-স্বজন এই একই নিয়মে সমবেত উপাসনার মন্ত্র উচ্চারণ করে। ধর্ম্মের ভিত্তির উপর জাতি যদি গড়িয়া উঠে, এই সত্য, সংযম ও সম্বন্ধের আচার আশ্রয় করিয়াই তাহা সম্ভব হইবে।

"প্রবর্ত্তকের" রজত-জয়ন্তী উৎসব-বর্ষে জাতি-গঠনের অপ্রাকৃত অমৃত পরিবেশন করার জন্য আমরা শ্রীভগবানের করুণা-প্রসাদ ভিক্ষা করিতেছি। এই দুর্গতির দিনে, বিজাতীয় শিক্ষা-সভ্যতায় পরানুকরণ-প্রেরণতায় আমরা উৎসন্নের পথে—জীবনের দায়ে আলেয়ার অনুসরণ-রত। জাতির জীবনে ভারতের পবিত্র ভাব-ধারা বহিয়া আনিয়া, নব-যুগের ভগীরথের মত "প্রবর্ত্তক" পতিতপাবনী গঙ্গোত্রী-ধারাকে বিজয়শঙ্খ বাজাইয়া ডাকিয়া আনিতেছে। ভারতের নরনারী, ঘরে ঘরে এই বৈরাগীকে, এই নব অতিথিকে বরণ করিয়া লও—নবজন্ম লাভ করিবে—নবজাতিগঠনের সিদ্ধ মন্ত্রই "প্রবর্ত্তক" উচ্চারণ করিবে।

## নববর্ষ

১৩৪৬ সালের ৩১শে চৈত্র এক দণ্ড ২৯ পলে মহাবিষুব সংক্রান্তি সংঘটিত হইয়াছে। রাশিচক্রে দেখা যায়—গ্রহাধিপতি রবি শনিগ্রহ সহ মেষ রাশিতে অবস্থান করিতেছেন, দৈত্যগুরু শুক্রদেব বৃষরাশিতে মঙ্গল-গ্রহ-যুক্ত, চন্দ্রদেব মিথুনে প্রবেশোদ্যত, কন্যারাশিতে রাহু ও ইহারই সপ্তমে মীন রাশিতে কেতুযুক্ত বৃহস্পতি বুধগ্রহ সহ বিরাজ করিতেছেন।

১লা বৈশাখ ৩৮ দণ্ড ৩২ পলে বৃহস্পতি মেষ রাশিতে উপস্থিত হইলেন। বৃহস্পতি শনিযুক্ত হওয়ায়, এই বৎসর ভারতের প্রতিভাশালী ব্যক্তিবর্গ লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত হইবেন, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। প্রবল দৈত্যগুরু শুক্র স্বগৃহে থাকিলেও, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দেবসেনাপতি মঙ্গল গ্রহের ঘোরতর শত্রুতায় যথারীতি দেশ ও জাতির শ্রেয়োবিধানে পরাঙ্মুখ হইবেন। কিন্তু কন্যারাশিতে রাহু অবস্থিত থাকায়, ভারতের শত্রুতাসাধনে উদ্যত-শক্তি পরাভূত হইবেই। এ বৎসর প্রতিভা ও আধ্যাত্মিকতার সম্মান ভারতে নাই। রাষ্ট্র-সাধনার প্রবল মূর্ত্তি অশেষ প্রকার বাধা পাইয়াও, সাফল্যের পথে অগ্রসর হইবে।

ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়াছেন সৌম্য শান্তমূর্ত্তি চন্দ্রদেব। আর মন্ত্রী হইয়াছেন দেবগুরু বৃহস্পতি। সম্পূর্ণ সুফল প্রদানে ইহারা বাধা প্রাপ্ত হইলেও, ভারতবর্ষ শস্যশালিনী হইবে। ভারতে সুবৃষ্টি হইবে। ভারতবাসী ব্যাধিমুক্ত থাকিবে। ভারতের স্বাস্থ্য এবার ভালই হইবে। চিকিৎসকেরা সুনাম অর্জ্জন করিবেন। এ বৎসর শীতের অপেক্ষা গ্রীষ্মাধিক্য হইবে। দেশে ধনবৃদ্ধি হইবে। রাষ্ট্রসাধনা পূর্ব্বাপেক্ষা গ্লানিমুক্ত হইবে। এই বৎসরে ভারতকে নানা ক্ষেত্রে অত্যধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উৎপীড়নের মধ্য দিয়াই প্রতিষ্ঠা ও যশোলাভ করিতে হইবে। এ বৎসর উদ্যমশীল ব্যক্তি মাত্রেই শ্রেয়োলাভ করিবেন। ভাগ্য-নির্ভরশীল অদৃষ্টবাদীর পক্ষে এই বৎসরটী শুভ নহে।

আমরা ১৩৪৭ সালকে অভিনন্দিত করি। কর্ম্মের সহিত কালের অকাট্য যুক্তি আছে। কালের প্রতি পদ-সঞ্চালনে আমাদের প্রারব্ধ-ক্ষয় হয়, কালের সাহায্যেই পুনঃ প্রাক্তন সৃজন করি। অনাগত দুঃখকে আমরা সুখে পরিণত করিতে পারি কালের আনুকূল্যে; তাই মহাকালকে আমরা প্রতি বর্ষে ধূপ-দীপ, পুষ্পমাল্যে অর্চ্চনা করি। শুভবর্ষ জাতিকে আশীর্ব্বাদ-পূত করুক। আমরা মহাকালের চরণে সভক্তি প্রণিপাত করি।

## "প্রবর্ত্তকের" বৈশিষ্ট্য ও পাঠকপাঠিকা

নববর্ষে "প্রবর্ত্তকের" অনুরাগী বন্ধুদের আমরা অভিবাদন করিয়া পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিলাম। "প্রবর্ত্তক" শুধু একখানি মাসিক পত্রিকাই নহে, "প্রবর্ত্তকের" ভাবধারার সহিত বাংলার বহু নরনারীর জীবন সংজড়িত হইয়া এক সংহতির সৃষ্টি হইয়াছে; "প্রবর্ত্তক" এই সমষ্টি-প্রাণের অভিব্যক্তি দেয়। এই সঙ্ঘপ্রাণ জাতিরই অবিভাজ্য অঙ্গ; এই জন্য "প্রবর্ত্তকের" সঙ্কেত ও ভাষা জাতিরই শ্রেয়ঃপথ নির্দ্দেশ করে। "প্রবর্ত্তক" বাংলার কাগজ। বাঙ্গালীর চিত্তে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা হিল্লোলিত হইয়া উঠে, তাহাই সে প্রকাশ করে। "প্রবর্ত্তকের" ভাষা অনেকে দুর্ব্বোধ্য মনে করেন; ইহার জন্য আমরাও যেমন ইহার কারণনির্ণয়ে সতত আগ্রহশীল, পাঠক-পাঠিকাকেও বলিব—আমাদের মর্ম্মকথা কি কারণ তাঁহাদের নিকট অস্পষ্ট জটিল মনে হয়, সে দিকেও তাঁহারা দৃষ্টি রাখিবেন।

আমরা স্বভাবতঃ যে অবস্থায় থাকি, সেই অবস্থার অনুকূল কথার অর্থ আমরা যত সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, সেই অবস্থার উপরের কথা যখন আমাদের কর্ণগোচর

হয়, তখন অনাবশ্যক বোধে ঐ কথা জটিল ও অবোধ্য বলিয়া আমরা ঠেলিয়া রাখি। দেশ ও সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাই আমাদের কথা হৃদয়গত না হওয়ার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কারণ, এবং ইহার জন্য আমাদের অপ্রাঞ্জল ভাষাও হয় তো কতক পরিমাণে দায়ী। আমরা এই দিকে এ বৎসর বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য রাখিব। পাঠকদিগের নিকট আমাদের আন্তরিক আকুতি—সুলভ ও সহজবোধ্য কথা ও কাহিনীর মত মনে করিয়া "প্রবর্ত্তকের" ভাব ও ভাষা তাঁহারা যেন অবধারণ না করেন। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার বর্ণনা সহজবোধ্য, সুখপাঠ্য বটে; কেন না, যে অবস্থায় থাকা যায়, উহা অভিনীত হইতেছে তো চক্ষের সম্মুখে, উহা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষভাবে কর্ণগতও করিতেছি; সেই সকল কথা সংবাদপত্রে বা মাসিক সাহিত্যে বিনাইয়া বিনাইয়া বর্ণিত হইলে, উহা বুঝিবার জন্য কোন প্রকার কসরৎ নাই। কাজেই চক্ষের আরামের সহিত মনের আরামও মিলে। অবকাশ বড় সুখের; সেই অবকাশ সাহিত্যের কশাঘাতে বিঘ্নিত হইলে, উহা বিরক্তিকর মনে হইবে, এ কথা অস্বাভাবিক নহে।

দৃষ্টান্তচ্ছলে বলিব—কোন প্রদর্শনীতে গিয়া যদি আমরা চিরপরিচিত রঙ্গ-কৌতুকের সমাবেশ দেখি, সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে প্রতি দিনের ঘটনাগুলির পুনরুক্তি হইতেছে দেখি, নিজের ছায়াচিত্রখানি দেখিতে দেখিতে যে একটা স্বভাব-তৃপ্তি, ইহাও কি সেই প্রকারের অন্তর-প্রসাদ নহে? দর্পণে নিজের মুখ দেখিয়া আনন্দপ্রাপ্তি অতি সহজেই হইয়া থাকে; কিন্তু যাহা অজ্ঞাত, অপ্রাপ্ত, তাহাকে রূপ দেওয়ার যে সাধনা, জীবনের সার্থকতা যে ইহাতেই, ইহা বোধ হয় না বলিলেও চলিবে

কলিকাতায় ধাঙড়দের ধর্ম্মঘটের ফলে সঞ্চিত আবর্জ্জনা-রাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া যে বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল, লক্ষ লক্ষ নরনারী ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, দুর্গন্ধের দায়ে নাসিকা বন্ধ করিয়া পথ চলিয়াছে, তবুও এই ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত আবর্জ্জনার বর্ণনা-কাহিনী সংবাদপত্রের দীর্ঘস্থান জুড়িয়া যদি প্রকাশিত হয়, তাহা পড়িতে সময় ও শক্তির অপব্যয় মনে হয় না। এমনই পথে, ঘাটে, রেলে, ষ্টীমারে, সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে তরুণ-তরুণীঘটিত যে সকল ঘটনা প্রত্যহ পরিদৃষ্ট হয়, গল্পে, উপন্যাসে তাহারই অনুবৃত্তি আমরা সাহলাদে পাঠ করি। মস্তিষ্ককোষের একটী অণুও ইহাতে পীড়িত হয় না। কিন্তু এইরূপে আমাদের অন্তরবৃত্তি কত লঘু ও পল্‌কা হইয়া পড়িতেছে, সমাজ-জীবনে শক্ত চরিত্রের মানুষের অভাব দেখিয়া উহা কি বুঝিতে বাকী থাকে? রাষ্ট্র-সাধনার ক্ষেত্রেও ঘাত-প্রতিঘাতের নিষ্ঠুর গ্লানিজনক যে চিত্র ফুটিয়া উঠে, সাহিত্যে তাহারই প্রতিলিপি যখন আমরা দেখি, কোন আয়াস করিতে হয় না; অতি কৌতুকে এই সকল লইয়াই আমরা মস্তিষ্ককে ক্রমেই অকেজো করিতেছি। মস্তিষ্কের অনুশীলনাভাবে বাঙ্গালীর প্রতিভা ম্লান হইয়া পড়িতেছে।

ঘটনার বিবৃতি আমরা অপাঠ্য বলিতেছি না। দৈনিক সংবাদপত্র হইতে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক সাহিত্য ইহার জন্য প্রচুর সংখ্যায় বাহির হয়; "প্রবর্ত্তক" ধীর ও মন্থর গমনে ইহার মধ্যে একটী অভিনব জীবনচ্ছন্দঃ আবিষ্কার করিতে চাহে। সে ছন্দে প্রাণ আছে, পূর্ণ আয়ুঃ আছে, শ্রী আছে, সম্পদ্ ও আনন্দ আছে। একটা জাতির মাথা উঁচু করিয়া বাঁচার প্রেরণা তাহাতে আছে। "প্রবর্ত্তক" প্রলাপ বকে নাই, অসার কথায় জাতিকে সম্মোহিত করে নাই। সে যাহা বলিয়াছে, নিজের জীবনে তাহা ফলাইয়া তুলিতে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছে। উপদেষ্টার আসনে বসিয়া গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা সে উচ্চারণ করে নাই; যাহা সাধ্য, যাহা মঙ্গলময়, এমন ফলপ্রদ জীবননীতিই বিগত ২৫ বৎসর ধরিয়া সে ব্যক্ত করিয়াছে। রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অর্থক্ষেত্র—কোথাও কি "প্রবর্ত্তক" যাহা বলিয়াছে, সঙ্ঘ তাহা কার্য্যকরী করায় বিমুখ হইয়াছে? কর্ম্মক্ষেত্রে, ধর্ম্ম-সাধনায়, রাষ্ট্র-চর্চ্চায়, শিক্ষানুশীলনে, বাণিজ্যবিস্তারে, সংহতি-রচনায় "প্রবর্ত্তক" অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে সর্ব্বত্যাগী হইয়া। "প্রবর্ত্তকের" তপস্যা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘও" সর্ব্বহারা হইয়াছে। সঙ্ঘের মানুষ পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজনের মমতা-বন্ধন ছিঁড়িয়াছে, সময় ও শক্তির প্রচুর অপচয় করিয়াছে। অর্থক্ষতি, এমন কি প্রাণবলি দিতেও তাহারা কুণ্ঠা করে নাই। সকল ক্ষয়ের পূরণ হয়; কিন্তু

"প্রবর্ত্তকের" সহিদ যাঁহারা, তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতি ভরসা ও উৎসাহ দেয় মাত্র- তাঁহাদের স্থান তো পূর্ণ হয় না। তাই বলিতেছিলাম—"প্রবর্ত্তকের" ভাষা অস্পষ্ট কেন হইবে? যাহা সে বলিতেছে, তাহার প্রমাণক্ষেত্রও তো "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ" রচনা করিয়াছে। এই জন্য উদীয়মান জাতিকে আমাদের কথাগুলি শুনিবার জন্য এতটা আকূতি প্রকাশ করিতেছি

আজ যেখানে ধন আছে, সেখানে শান্তি নাই। যেখানে শক্তি আছে; কর্ত্তব্য নাই। মানুষ আছে, সংহতি নাই। বিপুল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, খাঁটি জ্ঞান নাই। বাণী আছে, বীর্য্য নাই। ভাষা আছে, প্রাণ নাই। ধর্ম্ম আছে, আশ্রয় নাই। রাষ্ট্রহারা, দৃষ্টিহীন, নির্ধন, দুর্ভাগা জাতি শনৈঃ শনৈঃ মরে। তাহাকে বাঁচার মন্ত্রে দীক্ষা লইতে হইবে। কোন এক অবস্থা-সৃষ্টির উপরই এই বাঁচা নির্ভর করে না। বাঁচিলে তদুপযোগী অবস্থাদির সৃষ্টি হয়। যে বৃক্ষ প্রাণহীন, সে কুসুমিত পল্লবিত হইলে বাঁচিবে, এমন কথা বাতুলের। বৃক্ষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিলে, বাঁচার স্বভাবে সে সুশোভিত হইবে। এ জাতি যদি বাঁচে, তবেই তাহার রাষ্ট্র, সমাজ, তাহার শিক্ষা সাধনা, তাহার বাণিজ্য, কৃষি। জীবন্ত জাতির এইগুলি অনিবার্য্য শোভা ও শ্রী। শোভা ও শ্রীর আদর্শে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিলে, এখন তার যে-টুকু প্রাণ আছে, তাহাও নিপীড়িত হইবে। স্ফুলিঙ্গের ন্যায় যে প্রাণবিন্দু এখনও জাতির অস্থিকঙ্কালে ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছে, মন্ত্রশক্তির ফুৎকারে তাহা সমুজ্জ্বল দীপ্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। এই প্রদীপ্ত জীবনের গরিমায় আমরা সব কিছুই সুগঠিত মূর্ত্তি দিতে পারিব। আমরা সেই প্রাণের মন্ত্রই সদৃষ্টান্ত দিয়াছি। একটা সংহতি যে মন্ত্রে বিগত ২৫ বৎসর ধরিয়া ধর্ম্মের, রাষ্ট্রের, অর্থের গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা অতিক্রম করিয়া শনৈঃ শনৈঃ পদ-সঞ্চারে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, দেশের প্রতি গৃহস্থ-পরিবার সেই মন্ত্রশক্তির প্রভাবেই সুখী হইবে, শ্রীসম্পন্ন হইবে। দেশের বৃহত্তর সংহতি সেই নীতি আশ্রয় করিয়াই জাতিকে মুক্তির আস্বাদ দিবে। আমরা অখণ্ড বাংলার প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে চাহি। জাগ্রত প্রাণের পরিচয়-স্বরূপ ফুটাইয়া তুলিতে চাহি তাহার রাষ্ট্রজীবন, সমাজ জীবন, ধর্ম্মজীবন। "প্রবর্ত্তকের" পাঠক-পাঠিকা সকলেরই তাহাতে আমরা সহযোগিতা চাই। তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা আন্দোলনের সাড়া তুলিতে চাই। ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র-সংস্কারের আন্দোলন আছে আর জাতির মুমূর্ষু প্রাণ উদ্বুদ্ধ করার আন্দোলন নাই?

জাতির অভ্যুত্থান ও মুক্তিকামনায় দেশমাতার সর্ব্বত্যাগী পুত্রকন্যাদের আমরা আজ আহ্বান করি। জাতিজীবনের এই আপদ্-কালে মানবপ্রেমের শুই বৈরাগ্যপ্রদীপ্ত সন্তানসন্ততি পরিত্রাণের কারণ হইবে। "প্রবর্ত্তক" উদাত্ত কণ্ঠে আজও বলিতেছে "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত"।

## সঙ্ঘ সম্বন্ধে অনুযোগ ও উত্তর

সঙ্ঘের সূচনাযুগে সমাজ-জীবনের সহিত প্রতিষ্ঠানের যে ব্যবধান ঘটিয়াছিল, তাহার কর্ম্মবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহা ক্রমে সংযুক্ত হইয়া যাইতেছে। ইহার অর্থ এমন নহে যে, নিঃসঙ্গ সঙ্ঘধর্ম্মী সমাজ-জীবনে মিশিয়া যাইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এক একজন সঙ্ঘ-ধর্ম্মীকে আশ্রয় করিয়া সমাজজীবন অংশে অংশে নূতন মূর্ত্তি লইতে চলিয়াছে। হয়ত উভয় পক্ষই এই ঈশ্বরবিধান সম্বন্ধে আজ সম্যক সচেতন নহে। সঙ্ঘধর্ম্মী বৈরাগী। সন্ন্যাস তাহার রূপ। সমাজধর্ম্মী গৃহী। পুত্র-পরিজনাদি ভোগ ও আসক্তির ক্ষেত্রেই তাহার জীবন লীলায়িত আশ্রয় ও আশ্রিত বোধের মধ্যে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, কোথাও আছে গরিমা, কোথাও আছে দৈন্য। ইহা গতিপথে সাময়িক অবস্থা মাত্র। কিন্তু কোন সত্য অবস্থাই কেহই উপেক্ষা করিতে পারে না। একজন সঙ্ঘসেবী গৃহীর অনুযোগ এইরূপ এক অবস্থার প্রমাণ। উভয় পক্ষকেই অবস্থাবিশেষের পরিচয় রাখিয়া চলিতে হইবে। ধর্ম্মের ভিত্তির উপর সঙ্ঘের সমাজ-প্রতিষ্ঠা এবং এই সমাজের জাতি-রূপে অভ্যুত্থান তবেই সম্ভব

হইবে। অনুযোগ-পূর্ণ পত্রখানির প্রয়োজনীয় অংশটা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"জগতে সবাই এক কাজের জন্য আসে না। আপনার লেখার ভিতর দিয়ে যে রূপ আমার চোখে পড়েছে, তা' কোন সঙ্কীর্ণ মতের পরিপোষক ব'লে মনে হয় না। সংসারী আমি, আমাকে জগতের প্রয়োজন আছে; আমারও কর্ম্ম আছে। জগতের কাজ মানুষ নিয়ে, সমাজ নিয়ে। মানুষের অধিকার আছে, দাবী আছে। সেই দাবী পূরণ করাই কি মানবতা নয়? সেইটাই কি ভাগবত কর্ম্ম নয়?······আমি ভগবানকে মানুষের বাইরে দেখি না, প্রয়োজনও বোধ করি না। আধার-ভেদে তাঁর প্রকাশের তারতম্য। যে আধারে তাঁর প্রকাশ অধিক, তাহা নমস্য ও পূজ্য। যেখানে তাঁর প্রকাশ অল্প, তাহা কি অবজ্ঞার বস্তু? সেখানেও কি ভগবানের পূর্ণ সম্ভাবনা নাই? এই সম্ভাবনাকে সুযোগ দেওয়াই আপনার মহত্তর কাজ। মানুষের দেবত্ব এইখানে।

সমাজের সৃষ্টি মানুষের পূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে। ব্যষ্টি যদি সমাজের শাসনে মুমূর্ষু হয়, সমাজের ধ্বংস অনিবার্য্য। কিন্তু সমাজ ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বাভিমানকেই যদি প্রশ্রয় দেয়, তখন সে সমাজ আত্মঘাতীই বলিব।······ব্যষ্টি ও সমষ্টি পরস্পর উন্নতিসাপেক্ষ; তবেই জাতির অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

এখন 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ' যদি সমাজ চায়, দেশ জুড়ে' বিস্তৃতির স্বপ্ন যদি তার থাকে, তবে তার আশ্রিত যারা তারা শুধুই কর্ম্মসূত্রে জড়িত অথবা 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের' তারা অঙ্গ বিশেষ—এই প্রশ্নই আপনাকে করছি। যদি সঙ্ঘের আমরা অঙ্গ না হই, কোন কথা নাই। কিন্তু যদি সঙ্ঘের পদাঙ্গুলির স্তরেও আমাদের সত্যস্থান থাকে, তবে সঙ্ঘের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কি পোষণ নাই?······সঙ্ঘের আশ্রয়ে বহু সমস্যার কথা মনে উঠে। মীমাংসার সুযোগ হয় না। আমাদের সঙ্ঘের সহিত সংযুক্ত করিয়া লওয়ার দরদ সঙ্ঘের কোথা? সঙ্ঘ এমন শক্ত আবরণে মণ্ডিত, তাহা ভেদ করে' ভিতরের শাঁস ও স্নিগ্ধ পানীয়ের নাগাল পাওয়া সম্ভব হয় না। যারা সঙ্ঘই একমাত্র আশ্রয় করতে পারেনি, সঙ্ঘধর্ম্মীরা হয় তাহাদের অপাঙ্‌ক্তেয় মনে করেন, নয় বিরোধী ভাবেন।······ইহাতে লাভের চেয়েও ক্ষতির অঙ্ক বাড়ে না কি?

কত ব্যথা নিয়ে, প্রশ্ন নিয়ে ইচ্ছা হয় আপনার কাছে ছুটে যাই, কিন্তু আপনার সহচর্য্য সুলভ নয়। মনের প্রশ্ন মনেই মিলায়। যদি সুযোগ পাই, উহা দুর্ল্লভতা বশতঃ স্নিগ্ধ চিত্তেই ফিরে আসি, প্রশ্ন উত্থাপন করা আর হয় না।······"

উত্তর উপরেই দিয়াছি, এবং পত্রলেখক নিজেই এক প্রকার দিয়াছেন। আধার-ভেদে প্রকাশের তারতম্য অবজ্ঞেয় নয়, কিন্তু প্রকাশগতক্ষুন্নতার ক্ষেত্রে সম্বন্ধের নিবিড়তা সমতুল্য হইতে পারে কি? যে ফুল সূর্য্য কিরণ অধিক আকর্ষণ করে আর যে ফুলের আকর্ষণশক্তি কম, উভয়ের বর্ণ-তারতম্য কি অমোঘ স্বভাবনীতি নহে? পত্রপ্রেরক এ কথা বুঝিবেন।

তাঁর বড় প্রশ্ন—'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের' কর্ম্মসূত্রে যাঁহারা সঙ্ঘধর্ম্মীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কি সঙ্ঘেরই অবিভাজ্য অঙ্গ? ইহা যদি হয়, সে এক কথা। যদি না হয়, তাহার উপর আর কথা নাই। পত্রদাতা এ কথা নিজেও বলিয়াছেন।

সর্ব্বপ্রথমে 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের' স্বরূপ কি, এই কথাটী বুঝিতে হইবে। সঙ্ঘ কি কোন উদ্দেশ্য লইয়া উদ্ভূত হইয়াছে? যদি তাহাই হয়, তবে সে উদ্দেশ্য কি, তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে।

উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি আমি বিশ্বাস করি না। কর্ম্ম যদি সৃষ্টি হয়, তবে তাহার মূলে অভীষ্ট আছে। এই অভীষ্ট কর্ত্তার সঙ্কীর্ণতা-বশতঃ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হইতে পারে। সঙ্ঘধর্ম্মী সৃষ্টির মৌলিক প্রেরণায় আপনাকে মেলিয়া ধরিতে চাহে; ইহার জন্য যে নীতি সে আশ্রয় করিয়াছে, তাহারই নাম সে দিয়াছে আত্মসমর্পণ।

পত্রপ্রেরক মানুষের বাহিরে ভগবানকে দেখেন নাই। তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই। ভগবান সর্ব্বভূতেশ্বর, অতএব মানুষের মধ্যেও তিনি বিদ্যমান আছেন। আত্মসমর্পণ এই ভগবানের কাছেই করিতে হইবে। সে নিজের মধ্যে অথবা অন্যের কাছেও হইতে পারে। পরন্তু যেখানে আত্মনিবেদন করিলে সঙ্কীর্ণ সৃষ্টির মোহ দূর হয়,

তাহাই করা চাই। সমর্পণের ক্রম-ভেদে অবস্থার প্রকাশ-তারতম্য হউক, সমর্পণের লক্ষ্য কিন্তু ক্ষুদ্রতা নহে। উহা উদার ও বৃহৎ। ভূমার পথেই আত্মসমর্পণযোগীর যাত্রা।

সঙ্ঘের সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা এই পথেই চলিয়াছে। তাহাদের নিজের বলিয়া কিছু নাই। পরকে আপন করার জীবনই তাহাদের প্রকাশ পাইতেছে। শক্ত আবরণ পত্রপ্রেরক যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের অন্ধতা বা গোঁড়ামী নহে। সঙ্কীর্ণতার মোহ ও সংস্কার-মুক্ত হওয়ায় মৃত্যুপণ সঙ্কল্প লইয়া তাহাদের প্রতিপদ আগাইয়া চলিতে হইয়াছে। এক মুহূর্ত্ত আত্মবিস্মৃত হইলে, সঙ্ঘকেন্দ্রের প্রতি যে কোন কৃতী সভ্যেরও বিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা আছে। সঙ্ঘধর্ম্মীর হইয়া এইরূপ অসতর্কতার ফলে সঙ্ঘের অর্থপ্রতিষ্ঠানে অথবা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেককে ব্যক্তিগত খ্যাতি ও সুখের আবষ্টনে গিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। সঙ্ঘের ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা সুচিত্রিত আছে, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অতএব আত্মসমর্পণ সঙ্ঘধর্ম্মীর শুধু ভাবময় নহে। ব্যক্তির যোগ্যতার উৎসর্গে সঙ্ঘের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্ঘের আশ্রয়ে যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া সঙ্কীর্ণ স্বার্থের আকর্ষণে যাহারা স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে, তাহাদের দায়িত্ব এক প্রকার; আর যাহারা যোগ্যতার পর যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া সঙ্ঘের উদ্দেশ্যসিদ্ধিই জীবন-স্বরূপ করিয়াছে, তাহাদের সত্যরক্ষার দায় কত বড় এবং কত বড় সংযমী হইলে, কত সুমহান্ চরিত্র লাভ করিলে এই ক্ষেত্রে অটলপ্রতিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরপ্রসাদলাভ হয়, তাহা বুঝিলে পত্রপ্রেরক সঙ্ঘধর্ম্মীদের শক্ত আচরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধিগম্য করিবেন।

সঙ্ঘের কর্ম্মসূত্রে সুবিধাবাদীর সংখ্যাই অধিক। হয়ত কেহ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবারও শক্তি ধরে না; সঙ্ঘ তাহাকে পুষ্টি দিয়া যোগ্য করিয়া তুলে। তাহার সঙ্কীর্ণ জীবন-গতির জন্য সঙ্ঘধর্ম্মী আপত্তি করে না। যাহারা যোগ্যতা লইয়া সঙ্ঘের কর্ম্মসূত্রে জড়িত, সঙ্ঘ তাহাদের যোগ্যতার মূল্য যথাসাধ্য দিয়া থাকে। কিন্তু কোন মানুষ যদি আত্মসমর্পণমন্ত্র-দীক্ষিত বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করেন এবং নিজেকে সঙ্ঘের অবিভাজ্য অঙ্গ বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের মধ্যেই কি এই প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছেন—প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ তাঁহার যোগ্যতার যে মূল্য দিতেছে এবং কাহাকেও বা যোগ্য করার জন্য যে সময়, শক্তি ও অর্থব্যয় করিতেছে, সুবিধা পাইলেও তিনি সঙ্ঘের অবিভাজ্য অঙ্গরূপেই থাকিয়া যাইবেন? আর সত্যই অঙ্গাঙ্গী বলিয়া যে কোন অবস্থারই মানুষ যদি সত্য অনুভূতি লাভ করে, কোন প্রলোভনে সঙ্ঘচক্র অতিক্রম করায় তাহার তো অভিলাষ জন্মিবে না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—কাহাকেও যোগ্য করার জন্য সঙ্ঘের যে শ্রম ও অধ্যবসায়, উহা নিছক পরোপকার-প্রবৃত্তি। সঙ্ঘের নিকট জাতি-প্রাণের এইরূপ আশা অসঙ্গত নহে। আমরাও তাহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করি। কিন্তু যোগ্যতার মূল্য সঙ্ঘের পক্ষে যথাসাধ্য হইলেও, যোগ্য ব্যক্তির পক্ষে তাহা অপ্রতুল; এই জন্য সুবিধার পথ সঙ্ঘাশ্রিত কোন ব্যক্তি অবরুদ্ধ রাখিতে পারে না। এইরূপ মনোভাব থাকিতে কেহ আর সঙ্ঘের সহিত নিজেকে অবিভাজ্য বলিয়া দাবী করিতে পারে না। এ কথা পত্র-প্রেরক নিশ্চয় বুঝিবেন। কিন্তু যে ক্ষেত্রে এইরূপ হইবে না অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে সঙ্ঘের অঙ্গ-হিসাবেই কর্ম্মীর আত্মদান এবং সঙ্ঘ-সন্ন্যাসীর অপেক্ষা তিনি গৃহধর্ম্মী বলিয়া তাঁর প্রয়োজনাধিক্যবশতঃ শ্রমের মূল্য লইতে বাধ্য হন, সে ক্ষেত্রে কোনই কথা নাই। যোগ্যতার মূল্য কম হইতেছে, এ কথাও সেখানে প্রযুজ্য নহে, শ্রমের পরিমাণ মূল্য সঞ্চয় করে। পরিমাণ-জ্ঞান না থাকায়, অভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা শক্তি ও শ্রমের বিনিময়ে অধিক দাবী করিতে বাধ্য হই। যোগ্যতার মূল্য স্বতঃই আদায় হয়, উপলক্ষস্বরূপ নানা আশ্রয় লক্ষ্যে পড়ে। কোন যোগ্য ব্যক্তি সঙ্ঘের সহিত অভেদাঙ্গ হইলে, সঙ্ঘের কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে তাহার অবস্থিতি হইলেও, সঙ্ঘের সহিত তাহার পরিচয় ক্ষুণ্ণ হইবে না। সঙ্ঘ-ধর্ম্মের মহিমাও ইহাতে বৃদ্ধি পাইবে, হ্রাস পাইবে না।

উপসংহারে আমার কথা—সঙ্ঘকেন্দ্রের সহিত সংযুক্তি-প্রার্থী গৃহী অথবা সন্ন্যাসী সঙ্ঘসত্তার চক্ষে অভেদরূপেই প্রতীত হয়, অন্তরভেদ থাকিতে এই কল্যাণ-দৃষ্টি

অনুভূত হয় না। সঙ্ঘধর্ম্মীরা বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া অর্থ-ক্ষেত্রে উপনীত, অর্থসঞ্চয়ের উদ্দেশ্য লইয়া নহে। প্রবর্ত্তিত বিশাল সমাজে নূতন প্রাণ ও প্রেরণা সঞ্চার করার উদ্দেশ্যই তাঁহাদিগকে এই সম্পূর্ণ অভিনব কঠোর জীবন-পথে চালিত করিয়াছে। বিপুল সমাজ-প্রাণ ইহাদের আত্মদানের ভিতর দিয়া যদি নব জন্ম গ্রহণ করে, তবে সঙ্ঘের জাতি গড়ার স্বপ্ন সফল হইবে। আমরা কর্ম্মসূত্রে সন্নিবদ্ধ গৃহীদের সঙ্ঘের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দিকে অনুরাগী হইতে দেখিলে, পত্র-প্রেরকের ন্যায় অনেকের অন্তরক্ষুণ্ণতা দূর করিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

## পরলোকে মহিমচন্দ্র দাস

চট্টলের দেশবরণীয় পুত্র, একচ্ছত্র প্রবীণ নায়ক মহিমচন্দ্রকে আর আমরা দেখিব না। তিনি ধরাধাম ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। ২১শে চৈত্র বুধবার সন্ধ্যায় জাতীয় বঙ্গের একটী চূড়া খসিয়া পড়িয়াছে।

মহিমচন্দ্র ব্যবহারজীবী ছিলেন, প্রচুর উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৯২১ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জনের কণ্ঠে যুগের ভেরী বাজিয়া উঠিলে, তিনি দেশের মুক্তিকামনায় স্ব-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগদান করেন।

দেশবন্ধুর পতাকাতলে দাঁড়াইয়া তিনি ছয় মাস কারা-যন্ত্রণা হাসিমুখে বরণ করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম-ঘোষণায় তিনি তাঁর সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া পুনরায় কারাবরণ করিয়াছিলেন। তিনি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের উপদেষ্টা ছিলেন, পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সহকর্ম্মী ছিলেন। আসাম বেঙ্গল রেলের ধর্ম্মঘটে তাঁর অকাতর শ্রম দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি, তিনি নূতন শাসনসংস্কারে বঙ্গীয় সভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতিনিধি পদে নির্ব্বাচিত হন।

চট্টলের মত বাংলার সুদূর প্রান্তে উদিত হইয়া উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় স্ব-প্রতিভায় তিনি সারা বাংলায় আলোক বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহার দৈনিক "জ্যোতিঃ" চট্টলের সম্পদ্ হইয়াছিল। "জ্যোতিঃ" বন্ধ হইলে, তদীয় ভ্রাতা অম্বিকাচরণকে পার্থরূপে সম্মুখে রাখিয়া তিনি "পাঞ্চজন্যে" ফুৎকার দিয়াছেন। চট্টলের উপর বিপ্লবযুগের ঝটিকাবর্ত্ত উপস্থিত হইলে, "পাঞ্চজন্যের" নির্ভীক লেখনী কর্ত্তৃপক্ষদের এমন বিরক্তির কারণ হইয়াছিল যে, জঙ্গী পুলিস-বাহিনী "পাঞ্চজন্য" প্রেসে হানা দিয়া প্রেসের প্রভূত ক্ষতি ঘটায়। মহিমবাবু অদম্য নির্ভীক প্রাণ লইয়া "পাঞ্চজন্য" তবুও বন্ধ করেন নাই। "পাঞ্চজন্যে"র প্রাণ ছিলেন মহিমবাবু।

মহিমচন্দ্র চট্টলের রাষ্ট্রপুরোহিত ছিলেন। অমিশ্র সংগঠন-কর্ম্মে তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধা আমাদের মুগ্ধ করিয়াছিল। চট্টলের 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ' মহিমবাবুর নিকট কত যে ঋণী, তাহা আর বলিবার নহে। তিনি চট্টল প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের শৈশবকাল হইতে আজিকার পরিণতি পর্য্যন্ত ইহার সম-ব্যথী ছিলেন, পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাকে আমরা 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের' বলিতেও কুণ্ঠা করিতাম না।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে নিখিল বঙ্গ প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ-সম্মিলনীর অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি হইয়া তিনি যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা "প্রবর্ত্তকের"ই বাণী। 'প্রবর্ত্তকের' প্রতিনিধি অতিথিদিগের প্রতি তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা ভুলিবার নহে। তিনি শুধু প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘেরই সখা, সুহৃৎ, সহায় ছিলেন না, চট্টলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হিতকামী মিত্র ছিলেন। তাঁহার স্থান পূর্ণ করার দ্বিতীয় ব্যক্তি আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

গত বৎসর অক্ষয়তৃতীয়া উৎসবে তিনি চন্দননগরে পৌরোহিত্য করিতে আসিয়াছিলেন। সভা শেষ হইতে না হইতে কালবৈশাখীর প্রবল ঝঞ্জায় আমরা সকলেই তাঁহার জন্য যখন ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম, শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি মহিমবাবু কোন অসুবিধাই আমলে আনিলেন না। সেই দুর্য্যোগরজনীতে হাসিমুখে বিদায় লইলেন। তাহার দুই দিন পরে, সদলবলে আসিয়া আমাদের আতিথ্যের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া গেলেন। তাঁর সে অমায়িকতার কথা তো ভুলিবার নহে।

আমরা শুনিয়াছি—মহিমবাবু স্বাধীনতাকামী হইয়া এ যাবৎ গৃহত্যাগী হইয়াই ছিলেন। ভিক্ষুকের ন্যায়

যত্র তত্র পান-ভোজন সারিতেন। স্বাধীনতার কামনা সত্য বীর্য্যরূপে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। সুসন্তান দিন পূর্ণ হইলে ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। আমরা বলিব—তুমি আবার আসিও।

মহিমবাবুর পরিবারমণ্ডলীর সহিত আমাদের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সুনিবিড় আত্মীয়তা। আমরা তাই মহিমবাবুর ভ্রাতৃদ্বয় ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সহিত সমব্যথী হইয়া শোকাশ্রু বর্ষণ করিতেছি। পরলোকগত আত্মার শুভ হউক।

## প্রবর্ত্তকের প্রচ্ছদ-পট

২৫ বৎসরের "প্রবর্ত্তক"-পরিচালনার শক্তি প্রার্থনা করিতেছি। "প্রবর্ত্তক"-সম্পাদনার কাল পূর্ণ হওয়ায় ধ্যাননেত্রে প্রচ্ছদপটের যে চিত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, ভারতশিল্পী সাধক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহা রেখায় ও রঙে অতুল করিয়া আঁকিয়াছেন।

গত বৎসরের "প্রবর্ত্তকে" যে ছবি প্রচ্ছদপটে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নাকি শুভসূচক নহে। শিল্পীর হাত দিয়া আমার হৃদয়চ্ছবিই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পক্ষাঘাতরোগীর মত একাঙ্গের অক্ষমতা লইয়া অর্দ্ধ স্বরূপের শক্তিপ্রয়োগে "প্রবর্ত্তকে"র পরিচালনা করিয়াছি। সঙ্ঘের কর্ম্মভার বহিয়াছি। কর্ম্মক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহ-যন্ত্র আজ প্রতিপদে অবাধ্য হইতে চাহে। কিন্তু তবুও তাহার এখনও কিছুদিন বাঁচিবার সাধ আছে।

দোল-পূর্ণিমায় অখণ্ড চন্দ্র-জ্যোৎস্নায় আশ্রম-ভূমি পুলকিত উচ্ছ্বসিত, সঙ্ঘের শত শত নারী-পুরুষ সমবেত হইয়া প্রার্থনানিরত। সঙ্গীতের সপ্তস্বরে বায়ুমণ্ডল মুখরিত। ঊর্দ্ধে বরণীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া কে যেন বসুধারা বর্ষণ সুরু করিল। সে স্নিগ্ধ অমৃত-ঝরণায় সঙ্ঘধর্ম্মী সকলেই উদ্বুদ্ধ ও আনন্দিত হইলেন। অনেক দিন পরে আবার দেখিলাম—অন্তরীক্ষে জ্যোৎস্নাবিজড়িত দখিনা বাতাসে আন্দোলিত এক বিশাল পতাকা। শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত চারি বর্ণে রঞ্জিত ধ্বজদণ্ড ধরিয়া এক নারীমূর্ত্তি। জ্ঞানে, বীর্য্যে, প্রেমে, সেবায় সে পতাকা হিন্দোলিত হইয়া উৎসাহের বিদ্যুৎ-বর্ষণ করিতেছিল। প্রমোদবাবু সম্মুখে নারীপ্রতিমার হাতেই এই পতাকা স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের এই জাতীয় পতাকা শুধু তো নারীর হাতেই উড়িবে না। তাই অর্দ্ধনারীশ্বরের মহিমাময় মূর্ত্তি আঁকিয়া সঙ্ঘের স্বপ্নকে তিনি রূপ দিয়াছেন। যশস্বী শিল্পীকে আমরা অভিনন্দিত করি। তিনি জ্ঞানের মন্ত্র দিয়াছেন প্রণব, বীর্য্যের অস্ত্র, প্রেমের কৃষি ও বাণিজ্য, সেবার অর্ঘ্য পূর্ণ কলসী ও বদ্ধাঞ্জলী।

আজ এ পতাকার মর্ম্ম কেহ না বুঝিলেও, দিন আসিলে বাঙ্গালীর মর্ম্মাকাশে যে জাতীয় পতাকা আজ ফুটিয়া উঠিয়াছে, সুধী-বাঙ্গালী শিল্পীর হাতে যে পতাকা রূপে রঙে চারু শোভা ধরিয়াছে, তাহা ভারতের জাতীয় পতাকারূপে একদিন স্বীকৃত হইবে। জ্ঞানের, শক্তির, প্রেমের, সেবার মর্য্যাদা মানব মাত্রেই দিবে। মানবতার এই জয়-ধ্বজা ভারতকে গ্রহণ করিতেই হইবে। মর্ম্ম-স্ফুরিত বাণী উচ্চারণ করিয়া এই পুণ্য পতাকাকে সম্বোধন করিয়া বলি—আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ কর—শুভ দাও, জয় দাও। ওঁ স্বস্তি, ওঁ হরি ওঁ।

# পদশব্দ

( গল্প )

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

সন ১২৯৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ২২শে তারিখে দক্ষিণ কলিকাতা ব্যায়াম-সমিতির যে পাঁচজন উৎসাহী সভ্য পদব্রজে পেশোয়ার যাত্রা করিয়াছিল, তাহারা সেখানে পৌঁছে নাই। দেড়শ' মাইল না যাইতেই যে কারণে অকস্মাৎ উদ্যম হারাইয়া তাহাদের ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল, তাহা যেমন শোচনীয়, তেমনি ভয়াবহ, আর তেমনি আশ্চর্য্য।

এখন নিত্যই খবর পাওয়া যায়, দ্বিচক্রযানে, হাওয়া-গাড়ীতে, উড়োজাহাজে, এমন কি ডিঙিতে চাপিয়া, কত কত লোক কত ভূমি আর কত জলধি উত্তীর্ণ হইয়া যাতায়াত করিতেছে; সাঁতার কাটিয়া সুবিস্তীর্ণ কত জলরাশি অতিক্রম করিতেছে—এমন কি, পায়ে হাঁটিয়াই মানুষ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে··· কাহিনী শুনিয়া বিস্ময়ের সীমা থাকে না—মানুষ কত কষ্টসহিষ্ণু, কত নির্ভীক!

কিন্তু পায়ে হাঁটিয়া দূরত্বকে জয় করার মানুষের যে চেষ্টা, তার অগ্রদূত উহারাই—ঐ পাঁচজন। তার আগে হাঁটিয়া দুর্গমকে আয়ত্ত করিবার লোভ আর উদ্যম আর কাহারো প্রাণে এমন দুরন্ত হইয়া উঠে নাই। কিন্তু যে দুর্দ্দৈববশতঃ তাহাদের সেই সাগ্রহ মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই, তেমনটি মানুষের অদৃষ্টে ক্বচিৎ ঘটে—এবং তাহাই, সেই অশুভ অদৃষ্টের কথাই, বলিতে বসিয়াছি। সমবয়সী ওরা পাঁচজন বাহির হইয়াছিল শুভক্ষণ দেখিয়াই; কিন্তু অদৃষ্টের লিখনের কাছে পত্রিকার লিখন অচিরেই পরাস্ত হইয়া গেল।

ভাই-ভাই ভাব পাঁচ জনের—অকপট আর গাঢ়। শ'দুশো লোক দাঁড়াইয়া তাহাদের দেহশ্রী, বিদেশযাত্রা আর মুখের তৃপ্তি অবাক্ হইয়া দেখিল—শঙ্খের কুহরে মানুষের বুকের আনন্দ আর জয়লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ ঘোষিত হইল। সেই ক্ষণটি শুভার্থী অনেকের মনে আজও নিধির মূল্যে অমর হইয়া আছে।

অবাধ গতি আর স্বচ্ছন্দ বিরামের এবং দৈব বিঘ্নগুলির হিসাব রাখিয়া চলিতে চলিতে তাহারা একদিন দেড়শ' মাইলের মাথায় যে-স্থানে আসিয়া পৌঁছিল, সে-স্থানটীর বার-আনা বন আর বাগান, চার-আনা লোকালয়।

লোকালয় যেখানেই থাক্, কিন্তু সম্মুখেই। রাস্তার ধারে দেখা গেল একটা মুদির দোকান—নিতান্তই ক্ষুদ্র আর গ্রাম্য। দোকানের সম্মুখেই চৌকা একটু স্থান—এই স্থানটুকু দূর্ব্বার আবরণে সুকোমল আর মসৃণ। আর যেন মৈত্রীর সুস্পষ্ট আহ্বানের মত মনোহর...

স্থানটির দিকে চোখ পড়িতেই উহাদের বসিতে ইচ্ছা হইল—এখানে উহাদের থামিবার কথা নয়, কিন্তু তাহারা আসিতেছে জানিয়াই কে যেন সস্নেহে হাত বুলাইয়া এই স্থানটিকে তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে! সময়টিও স্নিগ্ধ অপরাহ্ন।

বারীশ সর্ব্বাগ্রে চলিতেছিল—সে দাঁড়াইয়া বলিল, এখানে একটু বসলে হয়।

—বেশ'। বলিয়া পাঁচ জনে একত্র হইয়া এবং দোকানীর অনুমতি লইয়া আর ঘাড়ের বোঝা নামাইয়া সেই ঘাসের উপর গা ছাড়িয়া দিয়া বসিল।

বারীশ সকলেরই মুখের দিকে একবার চাহিয়া লইতে যাইয়া, রমেশের চোখের উপর চোখ পড়িতেই চম্‌কিয়া উঠিল; উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি রে?

রমেশ একটু বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিল,—বুঝি জ্বর এল। বলিয়াই সে মাথার নীচে হাত দিয়া ঘাসের উপর শুইয়া পড়িল···

উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হইয়া চারিজনেই তার মুদিত চক্ষুর দিকে চাহিয়া এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, বলিস্ কি!

রমেশ কথা কহিল না, কিন্তু সে মিথ্যা বলে নাই। প্রয়োজনে লাগিতে পারে, মনে করিয়া, লঘুভার যত দ্রব্য সঙ্গে আনা হইয়াছিল, তাহার ভিতর থার্ম্মোমিটারও ছিল। যন্ত্র লাগাইয়া দেখা গেল, জ্বর "বুঝি এল" নয়, আসিয়াছে—উত্তাপ প্রায় দুই।

আকস্মিক এই বিপদের সম্মুখে কিছুক্ষণ কাহারো মুখে কথা সরিল না।···আরো দু'মাইল যাইতে পারিলে

তবে সহর; সেখানে রাত্রিযাপনের স্থান ঠিক করা আছে; দু' মাইল পথ যাইবার মত বেলাও আছে—কিন্তু রমেশ শুইয়া পড়িয়াছে এমন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে যে, চোখ খুলিতে পারিতেছে না—নিঃশ্বাস অতিশয় উত্তপ্ত আর দ্রুত—পিপাসাও খুব...

দোকানীর নিকট হইতে জলের ঘটি সহিয়া লইয়া ললিত রোগীর মুখে পুনঃ পুনঃ জল দিতে লাগিল, এবং একটি বিষয়ে কাহারো সন্দেহ রহিল না যে, রোগীকে এখন দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করা অসম্ভবই...

ভরসা এই দোকানী—

এবং দোকানীও দয়ালু। আগে বিশেষ সাড়া-শব্দ দিয়া উৎসাহ না দেখাইলেও, বিপদের সময়ে সে অগ্রসর হইয়া আসিল···অত্যন্ত বিনীত প্রস্তাবের উত্তরে সে একটি রাত্রির জন্য রোগীকে দোকান-ঘরেই স্থান দিতে সম্মত হইল, এবং উত্তম লোক বলিয়াই বোধহয় বখ্শিসের কথায় রাগিয়া গেল; বলিল—কথাটা কি ন্যায্য হ'ল মশাই?

বারীশ ভারি কুণ্ঠিত হইয়া গেল; বলিল,—অন্যায়ই হয়েছে—মনে কিছু করো না, ভাই।

রোগীর আশ্রয় আর শুশ্রূষার ভরসা মিলিল, কিন্তু আর চারজন!

হরেন বলিল,—একটা পাকা তেতলা বাড়ী দেখে এলাম, রাস্তার ধারে, কাছেই—সেখানে কে থাকে?

দোকানী বলিল,—কেউ থাকে না। বিশ পঁচিশ বছর অমনি পড়ে' আছে।...তারপর বলিল, ভূতের বাড়ী।

শুনিয়া পদার্থবিজ্ঞানে পরিপক্ক ললিত হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, বলো কি! কেমন ধারা ভূত? —জিজ্ঞাসা করিয়া দোকানীর দিকে সে সকৌতুকে চাহিয়া রহিল।

দোকানী আসিয়া তাহাদের কাছেই বসিয়াছিল—হাসি দেখিয়া বিরক্তিভরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—শুনি যা' তা'-ই বল্লাম। দেখিনি কোনদিন যে আপনার কথার জবাব দেব সে কেমনধারা ভূত! সন্ধ্যের পর ওদিকে কেউ যায় না। আর শুনি...বলিয়া দোকানী আসিল।

মহিম জিজ্ঞাসা করিল,—কি শোনো?

—একটিকে সে নেয়।

—তার মানে?

—একজন একলা ঢুক্‌লে, সে ফেরে না। একজনের বেশী গেলে একজনকে রেখে আস্‌তেই হয়।

—তা-ই নাকি? কেউ গেছে?

—হ্যাঁ। শেষ যায় এক ক্ষ্যাপা ভিখিরী। থামের সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে সে মরে' ছিল।

—ইচ্ছাপূর্ব্বক গলায় দড়ি দিয়ে মরতেই সে গিয়েছিল; সাক্ষাৎ ভূতের হাতে সে মরেনি' বোঝা যাচ্ছে। কবে সে?

—বছর সাতেক আগে।

শুনিয়া ললিত বলিল,—গুজবটা এখনো টাট্‌কা আছে দেখে' বিস্মিত হ'লাম। পরে সে ব্যক্তির মৃত্যুবিবরণ কিছু জানা যায়নি'?

কিন্তু যথেষ্ট হইয়াছে—দোকানী সে কথার জবাবই দিল না। খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া থাকিয়া জানিতে চাহিল, —আপনারা কি ঐ-বাড়ীতে রাত কাটাবেন ভাব্‌ছেন?

দোকানীর প্রশ্নে নিষেধের সুর স্পষ্ট বুঝা গেল।

মহিম বলিল,—তা' বৈ কোথায় যাব বলো! বাড়ী ঘর যা' চোখে পড়ল' তা' একটি নয় দু'টি নয়, চারিটি অতিথিকে স্থান দেবার মতো নয়; আর দিলেও নি' কিনা সন্দেহ; বৃক্ষতল তার চাইতে ভালো, স্বাস্থ্যকর ত' বটেই।

দোকানী আবারো নিষেধ করিল; বলিল,—যাবেন না। আপনারা বিদেশী লোক, ভদ্দর লোক, তা'-ই বল্‌ছি।

কেবল তাহাকে চুপ করাইতেই বারীশ বলিল,— আচ্ছা, দেখি।

দোকানী তাহাদের দিকে খানিক্ ভ্রূভঙ্গী করিয়া চাহিয়া থাকিয়া প্রস্থান করিল।

তারপর উহাদের কথাবার্ত্তা সলা পরামর্শ যাহা হইল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, যদিও সহরে যাইয়া সেখানে আরামে রাত্রি কাটাইয়া সকাল বেলা পুনরায় এখানে আসিয়া রোগীকে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে, তবু অশিক্ষিত দোকানীর মুখে ভূতের গল্প শুনিয়া ভূতের ভয়ে পলায়ন করিয়া এতটা পথ উজান বাহিবার দরকারটা

কি! দ্বিতীয়তঃ, রুগ্ন সহচরকে অপরিচিত এক দোকানীর জিম্মায় রাখিয়া একেবারেই স্থানত্যাগ করিলে নিদারুণ অন্যায় এবং নির্ম্মমতার কাজ হইবে। দুইয়ে দুইয়ে ভাগ হইয়া এক ভাগ থাকিতে এবং অন্যভাগ যাইতে পারে; কিন্তু তথাকথিত ভূতের আশ্রয়েই যদি যাইতে হয়, তবে দলবদ্ধ হইয়াই যাইতে হইবে ...

রোগী রমেশেরও সেই মত—সে হঠাৎ চোখ খুলিয়া ঐ মত্ই প্রকাশ করিল; এবং বলিল,—আমি পড়ে' থাক্‌লাম—বড় দুঃখ রয়ে গেল।

তারপর, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ভূতের ভয় কাহারো আছে, কাহারো নাই; যার আছে সে-ও সঙ্গগুণে নির্ভীক হইয়া উঠিবে নিশ্চয়, কারণ, তারা প্রত্যেকেই ব্যায়াম-বীর। তৃতীয়তঃ, এই ভ্রমণ সম্বন্ধে যে 'নোট' লিপিবদ্ধ করা হইতেছে তাহাকে বিস্তৃত করিয়া এবং 'পদব্রজে পেশোয়ার' নাম দিয়া যখন মাসিক পত্রিকায় ভ্রমণ-কাহিনী ছাপানো হইবে, তখন এই ঘটনাটি পাঠকমণ্ডলীর পক্ষে খুব কৌতূহলপ্রদ হইবে—পাঠিকারা শিহরিয়া উঠিবেন—বলিবেন, 'মাগো'। এই 'এপিসোড্'টা একটা নূতন কিছু হইবে, এবং নিশ্চয় হাসির কথাই হইবে। বর্ত্তমান রুটিনের একটু পরিবর্ত্তন করার দরকার হইবে—তা' হউক শেষে শুধ্‌রাইয়া লইলেই চলিবে।

এই পরামর্শ স্থির করিয়া রমেশকে তাহারা দোকান-ঘরে তুলিল; সামান্য জলযোগ করিয়া লইল; তারপর দোকানীকে একটু সজাগ হইয়া ঘুমাইতে, এবং রোগী যদি দরকার মনে করে, তবে তাহাদের খবর দিতে তাহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া যখন তাহারা গাত্রোত্থান করিল, তখন রাত্রি হইয়াছে......

রমেশ বলিল,—আমি ভাল আছি; তোম্‌রা ভেব' না।

রমেশের কপালে হাত দিয়া উত্তাপ অনুভব করিয়া ললিত বলিল, জ্বর কমে' আসছে।......ওখানকার দরজা খোলা পাব ত'? তোমাকে বল্‌ছি। বলিয়া সে উত্তরের জন্য দোকানীর দিকে তাকাইল।

দোকানী একটা কেরোসিনের বাক্সের উপর বসিয়া তার ঝুলানো লণ্ঠনটির দিকে চাহিয়াছিল; চোখ না ফিরাইয়াই সে যেন অসুখীর মত উত্তর করিল, যদি যান তবে পাবেন—দরজা বন্ধ করবার কেউ সেখানে নেই।... একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে পুনরায় বলিল,—আচ্ছা, আসুন।

মহিম হাসিয়া বলিল,—তাড়াচ্ছ যে হে!

দোকানী নিরুত্তর আর গম্ভীর হইয়া রহিল।

ললিত বলিল,—আসি, ভাই, রমেশ।

রমেশ বলিল,—এস।

মোমবাতি তিনটি, দিয়াশলাই দু'টি, জল এক ফ্লাস্ক এবং সিগারেট ও কম্বল লইয়া চারি বন্ধু সেই অট্টালিকার উদ্দেশে নামিয়া পড়িল ..দক্ষিণমুখে খানিক দূর যাইয়াই বারীশ পিছন ফিরিয়া দেখিল, দোকানী ঝাঁপ ফেলিয়া দিয়াছে—যেখানে আলো ছিল, সেখানে এখন আলো নাই; দেখিয়া হঠাৎ একটি মুহূর্ত্তের জন্য সে পা বাড়াইতে ভুলিয়াই চলিতে সুরু করিল।

রাত্রি অন্ধকার—আকাশে মেঘ আছে। কুটীরবাসীরা আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে—দূরে কোথায় একটি আলো অবশিষ্ট ছিল—তাহাদের চোখের সম্মুখে সেটি, সেই সকলের শেষটিও, নিবিয়া গেল।

আকাশে নক্ষত্র নাই—নিম্নে সকল আলো নির্ব্বাপিত—নিদ্রায় নিমজ্জিত পৃথিবী যেন তাহাদের ভূগর্ভে নির্ব্বাসিত করিয়া স্বতন্ত্র হইয়া আছে ..নিবিড় নিঃশব্দতার ভিতর হইতে যে সির্‌সির্ শব্দ একটা কাণে আসিতেছে, তাহা যেন নিপীড়িত আর অসহিষ্ণু নীরবতারই শ্বাস-স্পন্দন…অস্ফুট ভীতস্বরে যেন একটা মর্ম্মন্তুদ দুঃখের শ্লোক আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে…বড় বড় গাছের পাতায় পাতায় একটা শব্দ উঠিয়াছে, যেন কেহ ঘর্ষণ করিয়া অন্ধকারের নিরেট দেহে পথ প্রস্তুত করিতেছে...

চারিজনের কাহারো মুখেই কথা নাই—

কাহার গৃহ-প্রাঙ্গণে একটা নিদ্রিত কুকুর বোধ হয় তাহাদেরই পদশব্দে গোঙাইয়া উঠিয়াই চুপ করিল।

মহিম বলিল,—না গেলেও চলে। এস ফিরি।

বারীশ বলিল,—যা' হোক্, এতক্ষণে বল্‌বার কিছু পেয়েছ! আমি ত' অবাক্ হ'য়ে ভাবছিলাম, ঐ দোকান

থেকেই ভূত আমাদের ঘাড়ে না চাপুক, গলায় চেপেছে বুঝি! বলিয়া সে একটু হাসিল।

হরেন বলিল,—কেউ আমাদের দেখলে ভাবতে পারে, আমরা চুরি করতে চলেছি। বলিয়া দিয়াশলাই জ্বালিয়া মুখের নির্ব্বাপিত সিগারেটটা সে ধরাইল।

মহিম বলিল,—কিন্তু একটা কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের বিশ্রাম করা দরকার—সেইটে হবে না। ভূত দেখি না দেখি, তাকে ভেবে স্নায়বিক যে চাঞ্চল্য ঘটবে তা'-ও বড় কঠিন। ঘুম হবে না।

ললিত বলিল,—তুমি শুয়ে থেকো, ঘুমিও; আমরা জাগ্‌ব' সেই উপকথার রাজপুরীতে রাজপুত্রদের মতো। প্রহরে প্রহরে কে যেন এসে বল্‌বে, কে জাগে? যে জেগে' থাক্‌বে, সে গর্জ্জে' সাড়া দেবে। আর, ভূত হোক্‌, প্রেত হোক্‌, রাক্ষসখোক্কস যে-ই হোক্‌, সেই নাম শুনেই পালাবে। বলিয়া সে কলরব করিয়া হাসিতে লাগিল। এবং এম্‌নি করিয়া কলরব করিতে করিতেই তাহারা সেই বাড়ীর বাহিরের ফটকে আসিয়া দাঁড়াইল…

সদর রাস্তা হইতে বাড়ীটা কিছু দূরে; প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা; বুঝা কঠিন নয় যে, প্রস্তুত করিতে পয়সা খরচ হইয়াছিল যথেষ্ট, কিন্তু বাড়ীর কোনো শ্রী নাই—ইষ্টকস্তূপ আড়ষ্টভাবে খাড়া হইয়া উচ্চে উঠিয়া গেছে—কিছুমাত্র অলঙ্কার বা বাহুল্য সজ্জা নাই। কাল যেন ইহার সর্ব্বাঙ্গে কালি মাখাইয়া দিয়াছে—ইহাকে সে অদৃশ্য করিতে চায়। লক্ষ্য করা গেল যে, তিনটি তলায় তিন পঙ্‌ক্তি জানালা—কালোর ভিতর আরো কালো।

হরেন বলিল,—আলকাতরার রাজ্য…

মহিম বলিল,—খুনের গুদোম্‌।

ললিত বলিল,—নেহাৎ সেকেলে রুচি—কেবল স্থান চেয়েছে—সৌন্দর্য্য চায়নি। এ বাড়ীতে লোক এলে সে অম্‌নিই পালাবে, তাড়াতে ভূত লাগাতে হবে না।

—চুপ্‌।

—কি রে? বলিয়া ললিত হরেনের দিকে ফিরিল।

হরেন বলিল—নাম কুর্ত্তিস্‌নে রেতের বেলায়।

ঠাট্টা না সত্যি! কিন্তু কি করবে, যদি কথা হয়? সরজমিনে দেখা করতে এসেছি, আর নাম নিলেই যত অপরাধ! কুটুম্বিতের রকম ভালো!

এ-কথায় সকলেই হাসিল।

বারীশ বলিল—কিন্‌লে বোধ হয় এ-বাড়ী জলের দামে পাওয়া যায়—ইষ্টকালয়ের এমন হাল প্রায় দেখা যায় না।

বাস্তবিকই তা-ই।

মূল অট্টালিকা চোখে দেখিয়া কেহ আকৃষ্ট হইবে না, ইহা নিশ্চয়; চারিদিক্‌কার অনুচ্চ প্রাচীর ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে; ফটকের দুইটি স্তম্ভের একটির আধখানা মাত্র বজায় আছে; আগাছা আর লতাগুল্ম যেন অজগরের একাগ্রতা আর অনিবার্য্য লোলুপতা লইয়া বাড়ীটার দিকে অগ্রসর হইতেছে, এম্‌নি তাদের বাড়াবাড়ি। একটি কাঁকরের রাস্তা ফটক হইতে অট্টালিকার দ্বার পর্য্যন্ত গেছে—রাস্তার দু' পাশে মেহেদির বেড়া—অবাধে শাখা-পল্লব মেলিতে পাইয়া দু' পাশের ডালে ডালে পাতায় পাতায় মেশামিশি হইয়া রাস্তাটা যেমন দুর্গম তেমনি অন্ধকার।

ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পড়িয়া উহারা গৃহ এবং তার চারিদিককার শ্রীহীন আর ভয়ঙ্কর দুর্গত অবস্থার আলোচনা করিতেছিল—

হরেন হঠাৎ হইয়া অগ্রসর হইয়া গেল; বলিল,—বিলম্বেন অলম্‌। এস…

সকলে চলিতে সুরু করিল, হরেন সর্ব্বাগ্রে, তার পশ্চাতে ললিত, তারপর মহিম, তারপর বারীশ…

—ইস্‌।

শুনিয়া কেহ দাঁড়াইল না—

বারীশ জিজ্ঞাসা করিল—ললিত না কি? কি হ'ল তোমার?

ললিত বলিল,—কাঁটার আঁচড় লাগল পায়ে। তোমরা দেখে' এস।

মহিম বলিল,—চল ফিরে যাই। বুঝতে পারছি, ভূতের ভয় আমার আছে।

হরেন বলিল,—নির্ব্বোধের মত কথা বলিস্‌নে।

কষ্টে-স্বষ্টে মেহেদি-আচ্ছন্ন পথটা অতিক্রম করিয়া উহারা প্রবেশের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল—দাঁড়াইয়াই

হরেন দুয়ারের উপর ঘোরতর শব্দে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল...ঊর্দ্ধদিকে মুখ তুলিয়া চেঁচাইয়া বলিল,—কে আছ এখানে, দরজা খোলো ; বিপন্ন পথিক আমরা।... দরজায় একটা ঠেলা দিয়া বলিল,—দোকানী বল্লে, দরজা খোলাই থাকে ; কিন্তু বন্ধ আছে দেখ্‌ছি ! এখান থেকেও ফিরতে হবে না কি ! বলিতে বলিতে কাঁধ লাগাইয়া জোরে একটা ঠেলা দিতেই দরজা হঠাৎ খুলিয়া যাইয়া সে হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িতে পড়িতে সাম্‌লাইয়া লইল...

হরেনের মুখে একটু হাসি ছিল—সেটা নিবিয়া গেল ; যথেষ্ট বিস্মিত হইয়া বলিল,—দরজা খোলাই ছিল !

ললিত বলিল,—না, কেউ খুলে দিয়েছে ? আমিও ত' ঠেলে দেখেছি !

হরেন বলিল,—ধ্যেৎ, পাগল ! বাতি জাল্‌।

সকলে দরজার সম্মুখে উঠিয়া গেল—বাতি জ্বালা হইলে দেখা গেল, দুইটী দেওয়ালের মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ একটা গলিপথ ভিতর পর্য্যন্ত গিয়াছে—কিন্তু কতদূর গিয়াছে' তা দেখা গেল না।

বারীশ বলিল,—খুব সাবধান—সাপের লেজে পা দিও না যেন।

চারিজনেই চৌকাঠ ডিঙাইয়া দরজার ও-পাশে যাইয়া দাঁড়াইল...চলিতে চলিতে হরেন বলিল,—দরজাটা বন্ধ করে' দাও কেউ—বাতি নিব্‌ল'।

মহিম ছিল সকলের পিছনে—সে মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া বলিল,—দরজা বন্ধই আছে।

—কে বন্ধ করলে ? শেষে এসেছে কে ?

—আমি।

ঐ একটী কথা উচ্চারণ করিতেই মহিমের মনে হইল, তার গলা যেন শুকাইয়া উঠিয়াছে !

হরেন বলিল,—করেছ, মনে নেই।

মহিম বলিল—তা' হবে। কিন্তু তার শরীরে হঠাৎ রোমাঞ্চ দেখা দিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইতেই বাঁ দিকে দোতালায় উঠিবার সিঁড়ি পাওয়া গেল ; আলো নিবিবার ভয়ে পা টিপিয়া টিপিয়া উহারা অগ্রসর হইতে লাগিল... ক্ষুদ্র দীপশিখাটি অন্ধকার হরণ করিয়াছে সামান্যই—সুদূঢ় বিস্তৃত অন্ধকারের মাঝে অশক্ত আলোক কেবল সম্মুখে হ্রস্ব একটু পথ দেখাইয়া যেন প্রাণভয়ে কাঁপিতেছে—আর সঞ্চরণশীল কয়েকটি ছায়ার সৃষ্টি করিয়া দে'য়ালে দে'য়ালে তাহাদের ছায়ামূর্ত্তিগুলিকে নাচাইয়া তুলিয়াছে।

হরেন সিঁড়িতে পা দিতেই ললিত বলিল,—সাবধান ; সিঁড়ি ভাঙা থাকৃতে পারে।

বলিল বটে, কিন্তু স্বর ভাল করিয়া ফুটিল না।

ধীরে ধীরে চারজন উঠিতে লাগিল...কাঠের সিঁড়ি দু'বার মোড় ফিরিয়া দোতলার বারান্দায় শেষ হইয়াছে ; সুদীর্ঘ বারন্দা—তার বাঁ দিকে কক্ষশ্রেণী ; ডাণ দিকে হাত দুই অন্তর একটা করিয়া গোল থাম, রেলিং দ্বারা সংযুক্ত ; দেখা গেল, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় থামের মধ্যবর্ত্তী রেলিংটা ভাঙা।

হরেন হাসিয়া বলিল,—এই থামের সঙ্গেই বোধ হয় সেই ক্ষ্যাপা ভিখিরী...

মহিম বলিল,—বল্‌তেই হবে, ভাই, তোমার হাসি আমার কষ্ট লাগ্‌ছে।

—তবে থাক্‌।

ক্রমশঃ দেখা গেল, বাহির হইতে বাড়ীটাকে যেমন কুরূপ আর বাসের অযোগ্য মনে হইয়াছিল, বাস্তবিক তা' নয়। চারিদিকেই সুপ্রশস্ত বারান্দা ; কক্ষও অনেকগুলি—দু'টি কক্ষ পাশাপাশি পরস্পর সংলগ্ন—একজোড়ার মাঝখান দিয়া বারান্দা ; যে-কোনো কক্ষ হইতে বাহির হইয়া সমস্ত বাড়ীটা ঘুরিয়া আসা যাইতে পারে ; রাস্তা হইতে বাড়ীর পিছনটা চোখে পড়ে ; ছাদ পর্য্যন্ত প্রাচীর তুলিয়া ভিতরটাকে আড়াল করিয়া রাখা হইয়াছে—তাহারই তিন সারি জানালা বাহির হইতে দেখা যায় ; আলো এবং বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা উপযুক্তভাবেই করা হইয়াছে—কিন্তু অমন করিয়া সমস্তটাকে আড়ালে রাখিবার উদ্দেশ্য অনুমান করা গেল না।

দোতলার সমুদয়টি ভ্রমণ এবং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহারা তেতলায় উঠিল ; তেতলায় উঠিবার সিঁড়ি সুরু হইয়াছে দোতলার কেন্দ্র হইতে, কিন্তু শেষ হইয়াছে উপরের এক প্রান্তে। ইহা ছাড়া কক্ষ-সন্নিবেশে দোতলা তেতলায় কোন পার্থক্য নাই।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া হরেন বলিল,—বস্‌বার ঘর একটা দেখে নেওয়া যাক্‌, উরি মধ্যে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন…

দেখিয়া শুনিয়া দোতলার শেষ ঘরটা পছন্দ হইল।

জানালা দরজা সব খুলিয়া দিয়া চারিদিকে যখন ওরা তাকাইল তখন কারো মনেই হইল না যে, তাহারা ভূত দেখিতে আসিয়াছে—অনুভব করিল, যেন তারা অত্যন্ত পরিচিত আর সুখদ গৃহে প্রবেশ করিয়াছে—নিঃশঙ্ক চিত্তে আরাম করা যাইবে।

খোলা গা-আল্‌মারীর তাকের উপর হরেন বাতিটাকে গলিত মোমে আবদ্ধ করিতেই তার অচঞ্চল আলোক আবহাওয়াটা উহাদের এত ভাল লাগিল যে, তা বলিবার নয়…

হরেন বলিল,—আমাদের রুটিন্‌ কি?

বারীশ আগাইয়া আসিয়া বলিল দাঁড়াও, কম্বলটা বিছিয়ে নি আগে। বলিয়া সে ঘটা করিয়া মেঝের উপর কম্বল বিছাইল।

ললিত বলিল,—তাস খেলব।

মহিম বলিল,—কিন্তু আমার, ভাই, জোরে তাড়ে একবার চেঁচিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে।

—কি উদ্দেশ্যে?

—যদি কেউ থাকে, তবে সাড়া দেবে।

মহিমের ফুর্ত্তি দেখিয়া আনন্দ বেশ সহজ হইয়া উঠিল…

কিন্তু মহিমই হঠাৎ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সত্যি কথা শোনো, ভাই, আমার খুব ভাল লাগ্‌ছে না। তাস খেলার কথা বল্‌ছ' বটে, কিন্তু আমি যেন চুপ করে' থাক্‌তে পাচ্ছি নে। ছোটখাট শব্দগুলো—

হরেন হাত তুলিয়া তাহাকে নিঃশব্দ হইতে সঙ্কেত করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল…

—কি?

—মনে হ'ল নীচে কে দরজা খুললে!

—চলো যাই; এ তামাসা ভাল হচ্ছে না; আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে দিয়ে উঠছে। বলিয়া মহিম যেন উঠিবারই উদ্যোগ করিল…

হরেন বলিল,—ও কিছু নয়; আমারই মনের ভুল। তোরাই আরো মাটি কর্‌ছিস্‌ আমাকে। সিগারেট ধরব—আমি ততক্ষণ তাস বাঁটি। কে কে বস্‌বে?

সবাই একটু পিছনে সরিয়া সরিয়া বসিল।

—যেমন বসে আছি, তেমনি বসা যাক্‌। বলিয়া বারীশ সিগারেট ধরাইল।

সিগারেটের সৌরভে ঘর ভরিয়া উঠিল—এবং তাস খেলা সুরু হইতেই সবারই মুখে একটু একটু করিয়া হাসি ফুটিতে লাগিল…কলরব করিয়া তাস কুড়াইতে লাগিল, এ উহার প্রবঞ্চনা ধরিয়া ফেলিয়া ঝগড়া করিতে লাগিল, ভুলের দরুণ ভর্ৎসনা এবং উপহাস করিতে লাগিল…

কিন্তু সহজ এই উল্লাস ক্ষুণ্ণ হইল ললিতের একটি কথায়। খানিক খেলার পর ললিত বলিল,—দরজাটা বন্ধ করে' দি'; আমাদের গলার আওয়াজ এত বড় শূন্য বাড়ীর কোথায় গিয়ে মরছে তা' জানিনে—যেন কোথায় একটা খবর পৌঁছচ্ছে। বলিয়া সে হাতের তাস উপুড় করিয়া রাখিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া আসিয়া বসিতেই, প্রাণ চম্‌কানো এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল—বাতিটা হঠাৎ নিবিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা আর্ত্তনাদ করিয়া বারীশ লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তার সঙ্গে ভয় পাইয়া ওরাও; কিন্তু পরক্ষণেই বারীশ হাসিয়া উঠিল; বলিল, —মোমবাতিটা ঠিক্‌ করে' মাথায় পড়েছে।

শুনিয়া ওরাও হাসিতে লাগিল; হরেন বলিল,—বাতিটা বসেনি' ভাল করে'। বলিয়া কাঠি জ্বালিল।

বারীশ বলিল—কিন্তু এতক্ষণ ত' ছিল! ধাক্কা না পেলে ঠিক্‌রে পড়বে কেমন করে'?

—তর্ক করিস্‌নে। বলিয়া বারীশের তর্কোদ্যম থামাইয়া দিয়া হরেন বাতিটাকে মজবুত করিয়া বসাইয়া দিয়া তাস লইয়া বসিল।

কিন্তু তাস হাতে রহিল—

ললিত জিজ্ঞাসা করিল—কি বল্‌ছিলে?

মহিম চকিত হইয়া তার মুখের দিকে তাকাইল; দেখা গেল, ললিতের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া আছে…

বলিল—কই, কিছু বলিনি ত! ক'টা বাজ্‌ল' দেখ।

—পৌনে—

—চুপ। কে যেন হাস্‌লে কোথায়···

বারীশ বলিল—শুনেছি। আমি বলি, থাক্—আর নয়, যাওয়া যাক্। যা' শুনেছি, হ'তে পারে তা' মনের ভুল, অভিভূত মস্তিষ্কের প্রবঞ্চনা, কিন্তু বড় অস্বস্তিকর। বলিয়া সে মনে মনে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল—মনে হইল, এই কক্ষের বাহিরে যেখান হইতে অন্ধকার সুরু হইয়াছে আর অন্ধকার ব্যাপ্ত হইয়া যতদূর গিয়াছে, সমুদয় স্থানটাই এমন অজ্ঞাত আর তীব্র যে, ভাবিতে গেলে ভাবনায় কুলায় না···

হরেন হাসিবার চেষ্টা করিল—বলিল, তুমি যাও; যাবার সময়ে তোমার তাসের হাতটা সেই ভিখিরীকে দিয়ে যেও। বলিয়াই আর তিনজনের মুখের দিকে চাহিয়া সে অপ্রতিভ হইয়া গেল—সেখানে কিছুমাত্র অনুকম্পন নাই।

ললিত হঠাৎ তাস রাখিয়া উঠিয়া যাইয়া বন্ধ দরজার কাছে প্রাণপণে কাণ পাতিয়া কেন দাঁড়াইল, তাহা সে-ই জানে—

মহিম বলিল,—যাও না বাইরে; দেখে' এস কি ঘট্‌ছে কোথায়! সদর দরজা পর্য্যন্ত একবার যদি ঘুরে আস্‌তে পারো, তবে বিশ টাকা বাজি।

কিন্তু মহিমেরও এই হাল্‌কা কথা কাহারো কাণে গেল না। ললিত নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়া মোমবাতির শিখায় সিগারেট্ ধরাইয়া যখন বসিল, তখন তার মুখের পেশীগুলি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে···

বলিল—আমাদের এই ছট্‌ফটানি অন্যায় দুর্ব্বলতা। স্পষ্ট কিছু না ঘটা পর্য্যন্ত আমাদের নিশ্চেষ্ট আর নির্ব্বিকার থাকাই উচিত। একটু থামিয়া পরক্ষণেই বলিল,—বুঝ্‌ছি সবই, কি সঙ্গত, কি অসঙ্গত; তবু স্নায়ু কেন জমাট্ হ'য়ে আস্‌ছে জানিনে।···আমার তাস কই? এই যে। বলিয়া তাস তুলিয়া লইল, তাসের বল পরীক্ষা করিতে করিতে বলিল—তোমার খেলা, বারীশ।

কিন্তু বারীশ অকস্মাৎ দেয়ালে পিঠ দিয়া অবশ মাথাটা সাম্‌নের দিকে ঝুলাইয়া দিয়াছে—তাহার সাড়া পাওয়া গেল না।

মহিম বলিল—ঘুমিয়ে পড়েছে। আচ্ছা ঘুম ত'! ওঠ্, ওঠ্···

বলিয়া সে বারীশের গায়ে প্রথমে আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়া, তারপর তার দুই কাঁধ ধরিয়া এ-ধার ও-ধার করিয়া বারকতক ঝাঁকাইয়া দিল এমন প্রাণপণ বেগে যে, অল্পশক্তি দেহের পক্ষে সে-বেগ সহ্য করা কঠিন; কিন্তু বারীশের ঘুম তাহাতে ভাঙ্গিল না···

মহিম যেন অসহায়ের মত সরিয়া দাঁড়াইল—

- আমি দেখ্‌ছি। বলিয়া হরেন আগাইয়া গেল, এবং বারীশের কাণের উপর মুখ রাখিয়া যে পরিমাণ শব্দ আর বায়ু তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়া দিল, কপট নিদ্রিতকে অস্থির করিয়া দিতে কিংবা নিদ্রিতের নিদ্রা ভাঙিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট—কিন্তু বারীশের কোনো অঙ্গ একটুও নড়িল না।

বারীশের কানের উপর হইতে মুখ তুলিয়া হরেন বিমূঢ়ের মত আর দু'জনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল; বলিল, এ কেমন ঘুম! ঘুমের যে পার নেই!

—তা'-ই বটে। কিন্তু যদি ঘুম না হয়, যদি...

বলিতে বলিতে থামিয়া যাইয়া ত্রাস-বিহ্বল দৃষ্টিতে হরেনের দিকে চাহিয়া ললিত কাঁপিতে লাগিল···

—কি? কি?

—কিছু নয়।

—কিছু নয়। জাগাও ও-কে যেমন করে' হোক্। বারীশ? বারীশ?

মহিম বলিল,—বৃথা। এ ঘুমে গোল আছে—মানুষের সহজ নিদ্রা এ নয়।

হরেন লাফাইয়া উঠিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল, নন্‌সেন্স্। ক্লান্তি বৈ আর কিছু হ'তে পারে না। তবু যেতে হবে —তিনজনে ধরাধরি করে' ওকে···

বলিতে বলিতে হরেন নত হইতেছিল, হঠাৎ তাড়াতাড়ি দরজার দিকে মুখ তুলিয়া বলিল—কে ওখানে? কে যেন দরজায় টোকা দিলে!···তোল ওকে। মহিম? মহিম?

বলিতে না বলিতে মহিমও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল···

—এখন?

কিন্তু ললিতের সেই চরম ইর্ত্তাশ প্রশ্নের উত্তর হরেন

দিল না ; নিদ্রিত বন্ধু দু'টির দিকে নিস্পলক চক্ষে চাহিয়া জাগ্রত দুই বন্ধু অজ্ঞানের মত দাঁড়াইয়া রহিল···

—এখনো বোধ হয় পালানো যায়। বলিয়া ললিত আকুল হইয়া হরেনের হাত চাপিয়া ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল, এস।

হরেন হাত ছাড়াইয়া লইল ; বলিল—এদের ফেলে' কি যাওয়া যায় ? তা' যাব না।

—যেতেই হবে, এস। তুমিও যদি ঘুমিয়ে পড়ো তবে...

বুকের প্রাণান্তকর ধড়্ফড়ানির ধাক্কায় চিবুক বার দুই ওঠা-নামা করিয়া ললিতের কণ্ঠ বুজিয়া গেল।

—দেখি এখনো এদের জাগা'তে পারি কিনা। বলিয়া বসিয়া পড়িয়া হরেন তাহাদের জাগাইতে উদ্যত হইবার পূর্ব্বেই একটা খস্‌খস্ শব্দে চম্‌কিয়া ঘুরিয়া বসিয়া দেখিল, ললিতও ঘুমাইয়াছে···

জাগিয়া রহিল হরেন একা—

সহসা একটি মুহূর্ত্তেই এই জনশূন্য পুরী নির্জ্জনতার অতলে ডুবিয়া যেন পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল—এই নির্জ্জনতা এমন যে, তার বিপুলতা হরেনের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে স্থান পাইল না, কেবল তাহার অনুভূতি আর চেতনাকে মুহুর্মুহুঃ বিদ্ধ আর শিহরিত করিয়া তা' তীক্ষ্ণ স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল···

কক্ষের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র দীপশিখাটি তেম্‌নি জ্বলিতেছে ; কিন্তু কোথায় যেন তারও একটা চরম ভাবান্তর ঘটিয়া গেছে ; তাহার নিস্তেজ স্তিমিত আলোকে অস্বাভাবিক নিদ্রায় অচেতন তিনটি দেহের বিকৃত শয়নভঙ্গীই কি ভয়ঙ্কর ! ওরাও যেন এ-পৃথিবীর লোক নয়···

রক্তস্রোত ধমনীতে অবরুদ্ধ হইয়া হরেনের সর্ব্বাঙ্গ হিম করিয়া আনিতে লাগিল···ভিতরে এই নিশ্চলতা, কিন্তু বাহিরে, বন্ধ দরজার ওদিকে কোথায় যেন অতি গুপ্ত একটা গতি অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে—তার বিরাম নাই। ···হরেন হঠাৎ শিস্ দিতে গেল ; কিন্তু জিহ্বা শুকাইয়া আড়ষ্ট হইয়া গেছে—ঠোঁট নড়িল না। নত হইয়া সে ছড়ানো তাসগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিতে লাগিল ; তুলিতে তুলিতে থামিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল...মনে হইল, বাহিরের সচলতা আর অশান্তি যেন বাড়িয়াছে—একটা অস্ফুট সির্-সির্ শব্দে বাতাস উগ্র হইয়া উঠিয়াছে—একটা টানাটানি চলিতেছে—কে যেন কাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, ভিতরে আসিতে দিতেছে না···

দূরে সিঁড়িতে একবার খর্‌খর্ শব্দ উঠিল ; হরেন প্রাণপণ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল—কেমন করিয়া তার স্বর ফুটিল কে জানে—দরজার দিকে দৃষ্টি মেলিয়া সে হাঁকিল, কে ?

শব্দ অসাড়ে নির্গত হইয়া যাইতেই তার বুক দ্বিগুণ বেগে ধড়ফড় করিতে লাগিল—যদি কেউ কোথাও হইতে সাড়া দেয়—বলে, আমি !

কিন্তু সাড়া কেহ দিল না—বাহিরের শব্দ থামিয়া গেল।

যেখানে সে দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া, দরজার কাছে আসিল ; আস্তে আস্তে টানিয়া কপাট খুলিল, এবং খুলিয়া একটা অন্যমনস্কতা-বশতঃ হঠাৎ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই তার এত ত্রাস এক নিমেষে নিঃশেষে ঘুচিয়া গেল—চীৎকার করিয়া বলিল,—যে যেখানে আছ, এস তোমরা এগিয়ে—আমি এসে দাঁড়িয়েছি—পিছিও না। বলিতে বলিতে হরেন অগ্রসর হইতে লাগিল···

ঘরের ভিতর ললিত নিদ্রার ভাণ ত্যাগ করিয়া আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়া বসিল—কাণ পাতিয়া রহিল··· হরেনের পদশব্দ ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হইয়া শেষ হইল···

সর্ব্বনাশ ! ললিত লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; ডাকিল, —বারীশ ? মহিম ? ওঠো, ওঠো ঢের ঘুমিয়েছ। হরেন পাগল হয়ে গেছে—কোথায় সে গেল দেখ। শুনছ ?

কিন্তু ওরা কেউ শোনে নাই।

অভিমান করিয়া ললিত বলিল,—বেশ, ভাই। কিন্তু তোমরা সত্যিই ঘুমিয়েছ মনে করে' আমি আর ভয় পাচ্ছিনে।

বেপরোয়া বলিয়া গেল বটে, কিন্তু একটা সহসা সঞ্জাত বিহ্বলতায় তার কণ্ঠস্বর শেষ দিকটায় কাঁপিয়া গেল।

তারপর ললিত নির্ভয়ে দরজার কাছে আগাইয়া গেল,

বাহিরে মুখ এবং একখানা পা বাড়াইয়াই সে ফিরিয়া আসিল—দেখিল, ওরা নড়েও নাই। নিদ্রিতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় অন্ধ হইয়া সে এক নিষ্ঠুর কাজ করিয়া বসিল—হাত বাড়াইয়া বাতিটা টানিয়া লইয়া তার শিখার উপর মহিমের আঙুল একটা তুলিয়া ধরিল...আঙুল ঝলসিয়া গেল, কিন্তু অচেতন দেহে সংজ্ঞার লক্ষণ দেখা গেল না—

চমকিয়া যেন মর্ম্মস্থলে ঘা খাইয়া, ললিত উঠিয়া দাঁড়াইল—বুদ্ধি এবার ঘুলাইয়া উঠিল···তার মনে হইল, অন্ধকারচারী মূর্ত্তিটা যেন এই অবসরে কোথায় নড়িয়া উঠিয়াছে—এখনি ছুটিবে···

সত্যই পদশব্দ শুনা যাইতে লাগিল—বর্ত্তিকা হস্তে আড়ষ্ট দেহে দাঁড়াইয়া সে পদশব্দ শুনিতে লাগিল—কোথাকার কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া যেন শব্দটা উঠিতেছে··· ললিত দরজায় যাইয়া দাঁড়াইতেই পদশব্দ থামিয়া গেল; পদশব্দ যার, সে যেন তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে। ললিত বারান্দায় আসিয়া একটু অগ্রসর হইতেই পদশব্দ দ্রুততর হইয়া তর্‌তর্‌ করিয়া নামিয়া গেল—তারপর নীচে হইতে গুরু-মন্থর পদধ্বনিই আসিতে লাগিল...

রেলিং-এর উপর হাত রাখিয়া অল্প একটু ঝুঁকিয়া ললিত নীচের অন্ধকারের ভিতর একবার দৃষ্টি প্রেরণ করিল, কিন্তু নীরন্ধ্র অন্ধকারপুঞ্জ ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য হইল না—

চীৎকার করিয়া ডাকিল, হরেন, কোথায় তুমি?

কোনো উত্তর আসিল না—কেবল বাতাস যেন বাজিয়া উঠিল; বাধার পর বাধায় ধাক্কা খাইতে খাইতে ঝঙ্কারের শেষ যখন হইল, তখন সে নিজেরই কণ্ঠস্বরের ঘুর্ণীর মাঝে কাঁপিতেছে...

ঘরের ভিতর বাহির সমান—ভিতরের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই একটা বেগ অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল—দাঁড়াইয়া থাকা সহিতেছে না—বাতি হাতে করিয়া সে চলিতে লাগিল; কিন্তু আলো তখন অনাবশ্যক — তাহার হাতের আলো তাহারই চোখে পড়িতেছে না।

অত শীঘ্র, কোন্ পথে আর কেমন করিয়া সে তেতলায় উঠিল তাহা সে জানে না—দুইটি কক্ষের মধ্যবর্ত্তী সরু গলিটা পার হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই তার সম্মুখের অন্ধকারে পদশব্দ পুনরায় সচল হইয়া উঠিল··· থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়াই তার চোখে পড়িল, সম্মুখেই যে দরজাটা খোলা ছিল তাহা বন্ধ হইয়া গেল। "হরেন?" বলিয়া ডাক দিয়া ললিত ছুটিয়া যাইয়া দরজা ঠেলিয়া খুলিতেই বাতাসের ক্ষিপ্র একটা ঝাপ্‌টা লাগিল তার মুখে-চোখে এবং হাতের দীপ নিবিয়া গেল...তখন যে অন্ধকার দেখা দিল তাহা যেন ঠাণ্ডা—এক-পা পিছাইয়া দাঁড়াইয়া তার মনে হইতে লাগিল, সে তলাইয়া যাইতেছে, অদৃশ্য মুখের শীতল ফুৎকার দীপের প্রাণটিকে যেখানে লইয়া গেছে সেই দিকে···

—হরেন, আমি ললিত, বাঁচাও আমায়, কথা কও। বলিয়াই তার মনে হইল, এ আকুতি বৃথা।

আকাশপাতালব্যাপী অন্ধকারের ওপারে কি রহিয়াছে; এবং তাহার অভ্যন্তরে কি, উপরে কি, নিম্নে কি, চতুর্দ্দিকে কি, তাহা যেমন অজ্ঞাত, তেমনি তাহার কূল নাই—নিঃশব্দ ক্ষিপ্ত জীবন আর নিঃশব্দ ক্ষিপ্ত মৃত্যু যেন সেই অন্ধকারে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—একেবারে স্পর্শের সীমার ভিতর হইতে মৃত্যুর অনুভূতি আসিতেছে···

ললিত ঘুরিয়া দাঁড়াইল—ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই তার চোখে পড়িল, একটি মূর্ত্তি বারান্দার মোড়ে অন্তর্হিত হইয়া গেল...যেন একটা নেশার ঘোরে আত্মবিস্মৃত হইয়া ললিত তার পিছু নিল—সিঁড়িতে সে পা দিতেই পদশব্দ মাথার উপর ছাদে ঘুরিতে লাগিল...ছাদের দু'টি সিঁড়ি না উঠিতেই শব্দটা তাহার পাশ দিয়া ছুটিয়া নামিল···

ললিতও নামিয়া আসিল—

মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে না, কিন্তু সে কাছেই আছে—সম্মুখে চলিতেছে—ললিত তাহার সঙ্গ লইল...শব্দ সম্মুখ হইতে পশ্চাতে গেল—ললিত তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল ···চলিতে চলিতে একটা ঘরের সম্মুখে আসিতেই সে দেখিল, ওদিক্‌কার খোলা জানালার তরল আলোকে একটা অস্পষ্ট মূর্ত্তি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে...

ললিত ডাকিল, হরেন?

বুকের রুদ্ধ বায়ু বাহির হইয়া আসিল, কিন্তু সে বায়ু উত্তপ্ত—ললিতের কণ্ঠনালী জ্বালা করিতে লাগিল।

মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া তাহার চলচ্ছক্তি অবশ হইয়া রহিল...মনে হইল, এ হরেন নয়; যে তাহাকে লইয়া এই খেলা খেলিতেছে, সে বন্ধু হরেন নয়। ইহার হাত হইতে নিস্তার নাই—সকল এসে উত্তেজনার উপর মৃত্যুর ধারণা বদ্ধমূল হইয়া একটা অনিবার্য্য দুস্তর মোহের সৃষ্টি করিল—সেই মূর্ত্তির উপর হইতে দৃষ্টি তুলিবার শক্তি তাহার রহিল না ..

মূর্ত্তি নড়িয়া উঠিল—পা বাড়াইল—তাহারই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল—সেইখানে দাঁড়াইয়াই সে চীৎকার করিতে লাগিল,—কে? কে? কে তুমি?

যে-ই হোক্ সে উত্তর দিল না, চীৎকারে ভ্রূক্ষেপও করিল না—অতিশয় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল··· ললিতের বুক সহসা অজেয় সাহসে ভরিয়া উঠিল—মনে হইল, আসুক; কিন্তু এ-দীপন মুহূর্ত্তের—পরক্ষণেই আবিষ্টতা ভাঙিয়া, ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া পলায়ন করিল···

উপরে নীচে অসংখ্য বালিপথ গোলকধাঁধার মত ঘরগুলিকে ঘিরিয়া আছে—

হাত্‌ড়াইয়া নয়, থামিয়া থামিয়া নয়, উদ্‌ভ্রান্ত বায়ুবেগে সেই গোলকধাঁধার ভিতর দিয়া সে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল...

দম্ লইতে একবার বুকে হাত চাপিয়া সে দাঁড়াইল··· পদশব্দ অবিশ্রান্ত চলিতেছে—বাড়ীময়, উপরে, নীচে, এ-সিঁড়ি, ও-সিঁড়ি, এ-কোণ, সে-কোণ করিয়া শব্দ শশব্যস্ত হইয়া যেন শিকার অন্বেষণ করিতেছে···

শুষ্ক দ্রুত নিঃশ্বাসে ললিতের গলা চিরিয়া যেন গরম রক্তে রুদ্ধ হইয়া গেল।

শব্দ এই দিকেই আসিতেছে—

চট্ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া ললিত দরজার পাশে দাঁড়াইল—পদশব্দ একেবারে তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল।

ঘরের ভিতর আরো কঠিন—প্রাণ যেন ফাটিয়া বাহির হইতে চায়; ঘরের বাহিরে আসিয়া সে বিপরীত দিকে ছুটিতেই পদশব্দ তার পিছু লইল···

সে-ধাবনের শেষ নাই—

শব্দ যেন তার নাগাল পাইল—এখনই ধরিয়া ফেলিবে। তবু ললিত ছুটিতে লাগিল, এবং পশ্চাতে ধাবমান পদশব্দের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে ছুটিতে একবার সে পদশব্দকে পাশ কাটাইতেই তার পায়ের নীচেকার কঠিন স্পর্শটা হঠাৎ বিলুপ্ত হইয়া গেল।

ঘুম ভাঙিয়া বারীশ দেখিল, ঘরের ভিতর সূর্য্যালোক প্রবেশ করিয়াছে, এবং মহিম উঠিয়া বসিয়া তার একটা আঙুলের দিকে আতুর চক্ষে চাহিয়া আছে।

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, আর দু'জন কোথায়?

বারীশ বলিল,—পালিয়েছে বুঝি! আমরা কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?

—না, অজ্ঞান হয়ে পড়ে' ছিলাম! বলিয়া মহিম উঠিয়া দাঁড়াইল—আড়ষ্ট হাত পা টানটান্ করিয়া গিঁঠের খিল ছাড়াইল; তারপর আস্তে আস্তে বারান্দায় আসিল—বারীশ তার পশ্চাতে।

বারান্দার অপর প্রান্তে আর একজন ঘুম ভাঙিয়া তখনই উঠিয়া বসিল—সে হরেন। হরেন বলিল,—এখানে এসেছি কখন, কেমন করে', আর ঘুমোলামই বা কি করে'! রেতের কথা কিছু মনে পড়ছে তোমাদের?

মহিম হাসিয়া বলিল,—পড়ছে কতক। কিন্তু আমার আঙুল পুড়্‌ল' কি করে' তা' কেউ জানো?

—না। ললিত ঘুমুচ্ছে কোথায়?

—তাকে খুঁজে' বার করতে হবে, আর শীগ্‌গির এখান থেকে বেরুতে হবে; রমেশ বেচারা...বলিতে বলিতে ভাঙা রেলিং-এর ধারে আসিয়াই বারীশ আর্ত্তনাদ করিয়া পিছাইয়া আসিল—

হরেন ও মহিম ছুটিয়া যাইয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, ললিতের নিষ্পলক চক্ষু ঊর্দ্ধে যেন তাহাদেরই দিকে চাহিয়া আছে।*

---

* বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে।

# ইউরোপের কুরুক্ষেত্র

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

গত মহাযুদ্ধ শেষ হবার ঠিক অব্যবহিত পরেই ইউরোপের একজন শান্তিবাদী (Pacifist) নেতা ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন, সমরসজ্জার ও সংখ্যালঘু জাতিদের প্রশ্ন নিয়ে ইউরোপে আবার এক গুরুতর সংঘর্ষ দেখা দেবে। বিগত মহাসমরের প্রায় ২৫ বৎসর পরে আজ আবার আমরা একটা আন্তর্জাতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছি এবং কে বলতে পারে ভয়াবহতা ও নিষ্ঠুরতার ইতিহাসে বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ হয়তো বিশ্বস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গত মহাযুদ্ধের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভার্সেইয়ে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের যে বৈঠক বসেছিল, সেখানে ছোট ছোট জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে ইউরোপীয় কূটনীতিকবৃন্দের জল্পনাকল্পনার আর অন্ত ছিল না। বিশেষ করে' মধ্য-ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্রয় নিয়ে সেখনে যথেষ্ট বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। 'One nation, one state'—'একজাতি, এক রাষ্ট্র', এই মতবাদের ধুয়া তখনই উরোপের রাষ্ট্রমঞ্চ মুখরিত করে' তুলেছিল এবং প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নেতৃত্বে রাষ্ট্র-সঙ্ঘ (League of Nations) এই সংখ্যালঘু জাতিদের প্রশ্ন নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধশেষের সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ীর কলকোলাহল ও পরাজিতের নিশ্চেষ্টতার সুযোগ নিয়ে ইউরোপে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হল, তার মূলে রয়ে গেল আর একটি মহাযুদ্ধের প্রলয়ঙ্করী সম্ভাবনা! পোলাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার ইতিহাস আমাদের চিরকাল একথা স্মরণ করিয়ে দেবে যে, সংস্কৃতি, জাতি, ভাষা ও ঐতিহ্যের পার্থক্যকে স্বীকার করে' নিয়ে যে রাষ্ট্রের ভিত্তিস্থাপন করা হয়, সেখানে কোন সবল, স্বাস্থ্যবান্ জাতি গড়ে উঠতে পারে না! কৃত্রিম রাষ্ট্রীয় চতুঃসীমার অন্তরালে বিভিন্ন বিবদমান জাতির অস্তিত্ব শুধু যে সেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক শিথিলমূল করে' তোলে তা'ই নয়, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে এই বিবাদের বিষবাষ্প সমস্ত মহাদেশের আন্তর্জাতিক আবহাওয়াকে পর্য্যন্ত কলুষিত করে' তোলে। পোলাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে আমরা তাই-ই প্রত্যক্ষ করেছি। মহাযুদ্ধের পরে পোলাণ্ডকে নূতন করে' গড়ে' তোলা হল; ফলে জার্ম্মাণী ও রাশিয়ার একটা বড় অংশ এই নবগঠিত পোলাণ্ডের মধ্যে রয়ে গেল। ভার্সাই সন্ধিতে যে কার্জ্জন লাইন পোলাণ্ডের পূর্ব্বসীমা নির্দ্দিষ্ট করে' দিয়েছিল, পরবর্ত্তী রিগা-চুক্তিতে তা' আরও সরিয়ে দেওয়া হল। এর ফলে রুশ-অধ্যুষিত খানিকটা অঞ্চল পোলাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তারপর জার্ম্মাণীকে দ্বিধাবিভক্ত করে' তার মধ্য দিয়ে ডানজিগ করিডারের সৃষ্টি করা হ'ল। অষ্ট্রো-হাঙ্গারিয়েন ইউনিয়নের বিলোপ, স্বাধীন রাষ্ট্র চেকোশ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার সৃষ্টি, তুর্কির অঙ্গচ্ছেদ ও আলবেনিয়ার সৃষ্টি—সমস্তই আজ ইউরোপের আধুনিক ইতিহাসের অন্তর্গত। চুক্তি দ্বারা কোন জাতি গঠিত হয় না, ইউরোপের ধুরন্ধর রাজনীতিকেরা সেদিন একথা ভুলে' গেলেন। গত পঁচিশ বছর ধরে' ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে অসন্তোষের যে আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল, আজ তা' চরম কদর্য্যতায় আত্ম-প্রকাশ করেছে। এতে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই। প্রথম আঘাতেই এই সব তাসের প্রাসাদ ভেঙ্গে' পড়েছে। জার্ম্মাণ অংশ আজ জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, রুষের ভাগ রুষ ফিরে পেয়েছে। চেক ও পোল জাতির ভাগ্য আজ জার্ম্মাণ ডিক্টেটরের অঙ্গুলীনির্দ্দেশে চালিত হচ্ছে। সীমানা-সমস্যা চিরকাল ইউরোপীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে এবং এই সীমানা-সমস্যাই আজ এই আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ফিণ্ল্যাণ্ডের যুদ্ধেও এই সীমানার প্রশ্ন কি অনর্থ ও রক্তপাতের সৃষ্টি করেছে, তা' আমরা দেখেছি।

বর্ত্তমানে ইউরোপের সামরিক কলাকৌশলের (strategy) বড় কথা এই যে, মহাদেশ বা সমুদ্রের ব্যবধানে যে সমস্ত ষ্টেট, তাদের মধ্যে আশু সামরিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। তাই ইংলণ্ডের সঙ্গে জাপানের

প্রত্যক্ষ সামরিক সংঘর্ষের আশঙ্কা যতটা কম, জার্ম্মাণীর সঙ্গে ফ্রান্সের সংঘর্ষের সম্ভাবনা ঠিক ততটাই বেশী। ইংলণ্ডের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্যসংক্রান্ত বিরোধ ও প্রতিযোগিতা যতই প্রবল হয়ে উঠুক না কেন, সেখানে প্রত্যক্ষ অস্ত্রধারণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে কোন পক্ষই রাজী নয়। অথচ চীন-জাপান, জাপান-সোভিয়েট বিরোধ নিত্যকারই ঘটনা। আজ মধ্য-ইউরোপকে যে একটা জার্ম্মাণীর মধ্যে পোলাণ্ডের ভাগবাঁটোয়ারা সম্ভব হল। ইটালী ও ফ্রান্সের মধ্যেও এই সীমানার প্রশ্ন হয়তো অচির ভবিষ্যতে আরও ঘোরাল হয়ে উঠবে।

রুষ-জার্ম্মাণ চুক্তি বর্ত্তমান যুদ্ধের সব চেয়ে স্মরণীয় কূটনৈতিক ঘটনা। গত বৎসর ২৩শে আগষ্ট তারিখে মস্কো সহরে রুশিয়া ও জার্ম্মাণীর মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই ঐতিহাসিক চুক্তির কিছুকাল আগে থেকেই

ইউরোপের কুরুক্ষেত্র

বারুদের কারখানা বলা হয়, তার মূলে ঐ একই সত্য নিহিত। আসল কথা, আজ পৃথিবীতে যত বিরোধ ও হানাহানি, তার গোড়ার কথা সীমানা-সমস্যা। 'বর্ত্তমানে ও বহু শতাব্দী ধরে' মধ্য ইউরোপের এই যে সীমানা-সমস্যা —তার সুষ্ঠু সমাধান আজও সম্ভব হল না অথচ মধ্য-ইউরোপের এই জটিল প্রশ্ন নিয়েই চিরকাল রক্তস্রোত বয়ে গেছে। আজ এই boundary-র অজুহাতেই রাশিয়া ও একদিকে ইংরেজ-ফরাসী ও অন্যদিকে রাশিয়ার মধ্যে একটা পরস্পর সাহায্যমূলক চুক্তির কথাবার্ত্তা চলছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, রুষো-জার্ম্মাণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সময়েই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিরা মস্কোতে উপস্থিত ছিলেন। পৃথিবীর এত বড় দু'টো শক্তির কবল থেকে রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার মধ্যে জার্ম্মাণীর যে কূটনৈতিক বিজয় ঘোষিত হয়েছে, তাতে সমস্ত জগৎ বিস্মিত হয়ে গেছে।

রুষো-জার্ম্মাণ চুক্তির সমস্ত তথ্য সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়নি। এই চুক্তির সামরিক তাৎপর্য্য কি বা ইটালীর পররাষ্ট্রনীতিতে এই চুক্তি কি প্রভাব বিস্তার করবে, এখনও তা' সাধারণের জল্পনাকল্পনার বিষয়। কিন্তু তথাপি হিটলার-ষ্টালিন-মিলনের ফলে ইউরোপের রাষ্ট্রনীতির পট-পরিবর্ত্তন হয়েছে, একথা অনেকেই স্বীকার করেন। অনেকে আশ্চর্য্য হন যে, শান্তিকামী সোভিয়েটের সঙ্গে হিটলারের আকাশস্পর্শী সাম্রাজ্যলিপ্সার কি করে' আপোষ সম্ভব হল। ষ্টালিন কি আজ কম্যুনিজমের মূলমন্ত্র বিস্মৃত হলেন? এই প্রশ্ন অনেকের মনে আজ একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। রাশিয়া কর্ত্তৃক ফিণল্যাণ্ড-আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েটের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে বিলাতি পত্রিকাগুলিতে যথেষ্ট বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। সমস্ত ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিক নেতৃবৃন্দ এই বাদানুবাদে কেউ বা রাশিয়ার পক্ষ নিয়েছিলেন, কেউ বা সোভিয়েটের পররাষ্ট্রনীতিতে পেয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদের গন্ধ। এই বাদানুবাদ থেকে ভারতও মুক্ত থাকতে পারেনি। রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি কোন পথে অগ্রসর হয়েছে, এই প্রশ্ন নিয়ে ভারতের পত্রিকাগুলিতে এই সেদিনও এক তুমুল বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। পণ্ডিত জওহরলাল যখন প্রকাশ্যে "ন্যাশন্যাল হেরাল্ড" পত্রিকায় সোভিয়েটের পররাষ্ট্রনীতিকে সাম্রাজ্যবাদী বলে' নিন্দা করেন, তখন থেকেই ভারতের পত্রিকাগুলিতে এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে।

অনেক রাষ্ট্রনীতিক পণ্ডিতের মতে সোভিয়েট রাশিয়ার বর্ত্তমান কার্য্যকলাপের মূলে আছে একটি মাত্র নীতি "Reciprocity", সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতিক মূলমন্ত্র 'Treat others as they treat you'—এই নীতি। এই নীতির অনুবর্ত্তী হয়ে আজ রুষ ও জার্ম্মাণীর মধ্যে চুক্তি সম্ভব হয়েছে। অনেক পাশ্চাত্য কূটনীতিজ্ঞ রুষ-জার্ম্মাণ চুক্তির আকস্মিকতায় হতবাক্ হয়ে গেছেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু রাশিয়ার সমর্থকেরা বলে থাকেন—এই চুক্তি পরস্পর সাহায্য ও সদিচ্ছার গণ্ডী অতিক্রম করবে না এবং এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই চুক্তি সত্ত্বেও রুশিয়া ও জার্ম্মাণীর মধ্যে কোন প্রকার সামরিক সহযোগিতা সম্ভবপর হয়নি। তবে এটাও বিবেচনা করতে হবে যে, সোভিয়েটের ফিণল্যাণ্ড-অভিযান তাকে রুষ-জার্ম্মান চুক্তির সামরিক প্রতিশ্রুতিপালনে অসমর্থ করেছিল। এখন ফিণ্ল্যাণ্ডের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে—এই অবসরে সোভিয়েটের পররাষ্ট্রনীতি জার্ম্মাণীর প্রতি কোন মনোভাব অবলম্বন করে, সারা জগৎ তা' আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করবে। ফিণল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধে রুশিয়াকে যেমন একদিক দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়েছে, অপর দিকে তেমনি রাশিয়ান পত্রিকাগুলিতে বৃটেনের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। রাশিয়া মনে করে বৃটেনের—পরোক্ষ চাপের ফলেই ফিণল্যাণ্ড রাশিয়ার চুক্তিপত্র গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়নি এবং সোভিয়েটের কোন কোন পত্রিকায় একথাও প্রচারিত হয়েছে যে, ফিণিশ যুদ্ধে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিকে নামাতেও যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে, অন্ততঃ ফিণ্ল্যাণ্ডকে যাতে তারা সামরিক সাহায্য দিতে স্বীকৃত হয়, বৃটেনের সে দিকে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এ কথা বুঝতে আজ কষ্ট হয় না যে, সোভিয়েটের পররাষ্ট্রনীতিতে আজ গুরুতর পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতি আজ মিত্রশক্তিকে সন্দেহের চক্ষে দেখে এবং ইটালী-সোভিয়েট-জার্ম্মাণ-আঁতাৎ-সংঘটনের পক্ষে যে একটা বড় রকম প্রচেষ্টা চলেছে, ইউরোপের আব্হাওয়ায় তার একটা প্রতিধ্বনি দেখা দিয়েছে। এই রকম চুক্তি যদি সম্ভবপর হয়, তা' হলে সেটা যে পরস্পর সাহায্যমূলক হবে, তারও আভাষ পাওয়া গেছে। আসল কথা, মধ্য-ইউরোপ ও বল্কান অঞ্চলে মিত্রপক্ষের প্রভাব খর্ব্ব করবার একটা ষড়যন্ত্র অলক্ষিতে অগ্রসর হয়েছে। ইটালীর পররাষ্ট্রনীতি আজ এক রহস্যময় গোপনীয়তার অন্তরালে আশ্রয় নিয়েছে। সম্প্রতি হিটার-মুসোলিনীর গোপন সাক্ষাৎকারে অর্থ কি—এই নিয়ে ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিক মহলে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

ভূতপূর্ব্ব সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব মসিয়ে লিটভিনফের পদত্যাগ ও মসিয় মলোটভের পররাষ্ট্রবিভাগের নেতৃত্ব-গ্রহণ সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতিতে গুরুতর পরিবর্ত্তনের সূচনা করে। বর্ত্তমানে রাশিয়া লিথুনিয়া, লাটভিয়া, এস্তোনিয়া ও ফিণ্ল্যাণ্ডের উপর তার প্রভুত্ব কায়েম করেছে।

রাশিয়া নিজ নিবিবিঘ্নতা-রক্ষার জন্য এই সব রাষ্ট্রের বন্দর-সমূহে ও অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৈন্য, বিমান ও নৌঘাঁটি স্থাপান করতে সচেষ্ট হয়েছে। লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়া এ প্রস্তাবে সহজেই রাজি হয়েছিল; এছাড়া এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তিনটির হয়তো উপায়ান্তর ছিল না।

এইবার ফিণ্ল্যাণ্ডের প্রসঙ্গে আসা যাক। গত মহাসমরের সঙ্গে সঙ্গেই ফিণ্ল্যাণ্ডের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। ১৯১৭ সালে যে রুষবিপ্লব ঘটে, তার ফলে ১৯১৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর—সমস্ত জাতির মুখপাত্রস্বরূপ ফিণিশ ডায়েট স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং পরে ১৯১৯ সালের ১৭ই জুলাই ফিণ্ল্যাণ্ডে রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠা হয়। ক্রমে ক্রমে ইউরোপের সমস্ত রাষ্ট্র ফিণ্ল্যাণ্ডকে স্বাধীন ষ্টেট বলে' স্বীকার করে' নেয় এবং ফিণ্ল্যাণ্ডকে 'লীগ অফ নেশনস্'-এর সভ্যপদ লাভ করে। গত ১৯৩২ সালে সোভিয়েট-ফিণিশ অনাক্রমণ-চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং এই চুক্তির মেয়াদ ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত বলবৎ থাকবে, মেনে নেওয়া হয়। এই চুক্তি বাতিল হলে পরস্পরকে ছয় মাসের নোটিস দিতে হবে, একথাও স্বীকৃত হয়। গত বৎসর ৩০শে নবেম্বর রাশিয়া ফিণ্ল্যাণ্ড আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে রুষ-ফিণিশ-অনাক্রমণচুক্তি বাতিল হয়ে যায়। অথচ এই চুক্তি বাতিল হবার আগে ফিণ্ল্যাণ্ড যে ছয় মাসের নোটিস দাবী করে, পরে সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ তা মেনে নেন নি। সোভিয়েটের অতর্কিত আক্রমণের ফলে সমস্ত ফিণ্ল্যাণ্ডের যে দুর্দ্দশা হয়েছিল, তা' মাত্র এই সেদিনের কথা। শত দিবসব্যাপী যুদ্ধের পর গত ১২ মার্চ্চ ফিণিশপ্রতিনিধিদল ক্রেমলিন প্রাসাদে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেছে। এই সন্ধিপত্রের স্বরূপ সেদিন দু'টি দেশের সাধারণ লোকের কাছেও প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। লেনিনগ্রাডে সেদিন বিজয়োল্লাসের অন্ত ছিল না। সমস্ত দিবসব্যাপী লেনিনগ্রাডের পথে পথে রণোন্মত্ত বিজয়ী সোভিয়েট সেনাবাহিনীর আনন্দ-কোলাহল সেদিন পরাজিতের আর্ত্ত কণ্ঠস্বর বিলুপ্ত করেছিল। হেলসিঙ্কিতে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দেখা গেছিল—সমস্ত রাজধানীর উপর বিষাদের কৃষ্ণচ্ছায়া একটা কালো যবনিকা টেনে দিয়েছিল। ফিণ্ল্যাণ্ডের এই অবসাদ ও নিরুৎসাহের মূলে ছিল পরাজিতের বেদনা। যে স্বার্থত্যাগের মূলে এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তাতে স্বাধীন ফিণিশ জাতির অন্তরের সায় ছিল না। এই চুক্তির ফলে ফিণ্ল্যাণ্ড রাশিয়াকে অর্থনীতিক দিক্ দিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছেড়ে দিয়েছে। এই স্থানগুলির ব্যাপকতা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে, যখন দেখা যায়—সমস্ত দেশের জনসংখ্যার ছয় ভাগের এক ভাগ এই অংশগুলিতে বাস করে। শুধু এই নয়, এই সন্ধিপত্রের দ্বারা ফিণ্ল্যাণ্ড তার উল্লেখযোগ্য সমস্ত সামরিক ঘাঁটি সোভিয়েটকে অর্পণ করেছে। কি জলভাগে, কি স্থলভাগে, সমস্ত জায়গায় ফিণ্ল্যাণ্ড তার দেশরক্ষার জন্য অপরিহার্য্য সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি সোভিয়েটের কবলে বিসর্জ্জন দিয়েছে। এছাড়া অর্থনীতিক দিক্ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি তো আছেই। ক্যারেলিয়ান যোজক ও ভিবর্গ বর্ত্তমানে সোভিয়েট গ্রাস করেছে। সোভিয়েটের সৈন্য, বিমান ও নৌঘাঁটিস্থাপনের জন্য ফিণ্ল্যাণ্ডকে হাঙ্গো ছেড়ে দিতে হয়েছে। লেক ল্যাডোগার সমস্ত তীরভূমি আজ সোভিয়েটের কবলে। পেসামো ভূভাগ নিরস্ত্রীকৃত হয়েছে (de-militarised)। পূর্ব্ব ফিণ্ল্যাণ্ডের কতকাংশ রাশিয়া দখল করেছে। ফিণ্ল্যাণ্ডের সীমান্তে রেলপথনির্ম্মাণের দাবী স্বীকৃত হয়েছে। ফিশারম্যান উপদ্বীপও রাশিয়ার হস্তগত হয়েছে। বর্ত্তমান সন্ধির ফলে ফিণ্ল্যাণ্ডকে কতকটা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, এ থেকে বোঝা যাবে। আজ হাঙ্গোতে সোভিয়েটের অনলবর্ষী কামানশ্রেণী সমস্ত বৈদেশিক জাহাজের গমনাগমনের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখ্ছে।

এই পরিপূর্ণ বিজয়ের মধ্যেও একটি প্রশ্ন আজ সাধারণের মনে ওঠা স্বাভাবিক। ফিণিশ যুদ্ধে সোভিয়েট রাতারাতি একটি গবর্ণমেণ্ট সৃষ্টি করেছিল—সেই কুসিনিন গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব আজ কোথায়? এই দিক্ দিয়ে সোভিয়েটকে অন্ততঃ পক্ষে কিছু হার স্বীকার করতে হয়েছে। প্রায় তিনমাস ধরে' মস্কো প্রেস ও রেডিও কুসিনিন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিরলস প্রচারকার্য্য চালিয়েছিল অথচ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার সময়ে এই

তাঁবেদার গবর্ণমেণ্টের কথা সোভিয়েট সম্পূর্ণরূপে ভুলে' গেছে, দেখা যায়।

মস্কো-ফিনিশ শান্তি-চুক্তির উদ্দেশ্য বুঝতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না; কিন্তু তথাপি মিত্রশক্তির সাহায্য সত্ত্বেও ফিণল্যাণ্ডের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ বোঝা শক্ত হয়ে ওঠে। সোভিয়েট কূটনীতির এই সাফল্য এককভাবে সম্ভব হয়নি, এ কথা আজ ক্রমশঃ বোঝা যাচ্ছে। কোন শক্তিশালী পক্ষের কাছ থেকে সোভিয়েট যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিল এবং এই শক্তিশালী পক্ষ যে জার্ম্মাণী, সে কথা আজ জানা গেছে। গত ১১ই মার্চ্চ তারিখে হেলসিংকির জার্ম্মাণ-মন্ত্রী হের ব্লুচার ফিনিশ পররাষ্ট্র-মন্ত্রী ট্যানারের সহিত সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং এ কথা তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, ফিণল্যাণ্ড যদি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর না করে, তা' হলে জার্ম্মাণী অবিলম্বে রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে' যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। একখানি সুইডিস পত্রিকায় এই খবর বেরিয়েছিল যে, ডান্‌জিগ ও গিডনিয়াতে সশস্ত্র জার্ম্মাণবাহিনী প্রস্তুত হয়েই আছে এবং তারা যে কোন এক অতর্কিত মুহূর্ত্তে ফিণল্যাণ্ড আক্রমণ করতে পারে। ফিনিশ যুদ্ধে জার্ম্মাণীর প্রধান কাজ ছিল সুইডেনের উপর চাপ দেওয়া, যাতে সুইডেন মিত্রশক্তির সমস্ত সাহায্যে বাধা দিতে পারে। কেন ফিণল্যাণ্ড মিত্রশক্তির প্রত্যক্ষ সাহায্য গ্রহণ করেনি, তার কারণ এই যে, সে ক্ষেত্রে জার্ম্মাণী, নরওয়ে ও সুইডেন রাশিয়ার পক্ষে যোগদান করত। ফিণল্যাণ্ডের যুদ্ধে জার্ম্মাণ কূট নীতির বিজয় ঘোষিত হয়েছে, এ কথা জার্ম্মানী বলে' থাকে এবং এই ফিনিশ যুদ্ধের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই হিটলার ইউরোপের বর্ত্তমান মনোভাব ও পরিস্থিতির সুযোগ নিতে সচেষ্ট হয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, জার্ম্মানীর তরফ থেকে শান্তি-স্থাপনের প্রস্তাব সুরু হয়েছে। মুসোলিনীর সহিত হিটলারের সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকার এবং রিবেনট্রপ ও পোপের কথাবার্ত্তা এ সম্বন্ধে খুবই উল্লেখযোগ্য। মিঃ সামনার ওয়েলস-এর মধ্যবর্ত্তিতায় জার্ম্মাণী ও রাশিয়া উভয়েই যে একটি শান্তি প্রস্তাব করেছে, তা বোঝা গেছে। শান্তির সর্ত্ত মোটের উপর নরম হবার সম্ভাবনাই বেশী। সম্ভবতঃ এই রকম প্রস্তাবে মুসোলিনী ও পোপের সমর্থন আছে। কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মারফৎ জার্ম্মাণীর এই শান্তিপ্রস্তাব অগ্রাহ্য হলে, জার্ম্মাণী একটি রুষ-জাপান-জার্ম্মান মৈত্রীর চেষ্টা করবে এবং ব্যাপক আক্রমণ সুরু করবে। মিত্রশক্তির পক্ষে এখন জার্ম্মাণীর শান্তি প্রস্তাব স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ তা' হলে তার অর্থ হবে, মিত্র পক্ষের পরাজয় ও জার্ম্মানীর জয়। কাজেই মিত্র শক্তি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে বাধ্য হবে। জার্ম্মাণীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে এবং জার্ম্মাণী সেই সুযোগে বৃটেন ও ফ্রান্সের শ্রমিকগণের মধ্যে একটা অসন্তোষসৃষ্টির চেষ্টা করবে। জনসাধারণের সমর্থন ছাড়া চেম্বারলেন গবর্ণমেণ্ট এই রকম শান্তিপ্রস্তাবে প্রবৃত্ত হতে সাহসী হবে না। কোন নীতির অনুবর্ত্তী হয়ে বর্ত্তমানে দালাদিয়ার গবর্ণমেণ্টের পতন ও রেণো মন্ত্রিত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হল, তাও আজ অত্যন্ত কৌতুহলের সৃষ্টি করেছে।

শুধু এই নয়, ইতিমধ্যেই ইটালী ও রাশিয়ার সহ-যোগিতায় জার্ম্মাণী বল্কান অঞ্চলে অর্থনৈতিক সংগঠন সুরু করে' দিয়েছে। যে কোন প্রকারেই হোক, বল্কান অঞ্চল থেকে মিত্রশক্তির প্রভাব দূর করতে হবে, এই হল জার্ম্মাণীর সঙ্কল্প। কিছু দিন আগে জার্ম্মাণী এ কথা প্রচার করে' দিয়েছিল যে, রাশিয়া রুমেনিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করতে রাজি হয়েছে। এর উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—রুমানিয়াকে মিত্রশক্তির কবল থেকে মুক্ত করা এবং তার নিঃসঙ্গ অবস্থায় অপর্য্যাপ্ত তেল ও গমের সুযোগ নেওয়া। অপর পক্ষে মিত্রশক্তি তুর্কির সহিত রাজনৈতিক ও সামরিক বন্ধন দৃঢ়তর করে' তুলছে। বর্ত্তমানে হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে যে শান্তির কথাবার্ত্তা হচ্ছে রাশিয়ার তাতে পূর্ণ সমর্থন আছে। কারণ পশ্চিমে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত ঘাঁটি দখল করার ফলে রাশিয়ার যুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণা হওয়াই স্বাভাবিক। কৃষ্ণ-সাগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্রগুলিতে যদি আজ যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে, তাতে রাশিয়ার বিপদের সম্ভাবনাই বেশী।

# প্রতীচ্যে অতিপ্রাকৃত রূপ-সাধনা

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

এক সময়ে ইউরোপ ছিল বাস্তবতার ভক্ত। সাহিত্যে চোখের জলের বর্ণনা থাকলে সকলে জান্‌তে চাইত—বাস্তবিক চোখের জল পড়েছে কিনা? ঘটনাপর্য্যায়কে মৃতদেহবিশ্লেষণের মত তন্ন তন্ন করে' খুঁজে, পরখ করে' বাস্তবতার দাবী রক্ষা করা হ'ত। রম্যকলাতেও সামনে মডেল রেখে চুলচেরা খুঁটিনাটিকে উপস্থিত করা হ'ত ঐন্দ্রিয়িক সত্যপ্রিয়তার খাতিরে।

এই একান্ত স্থূল বহিরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তিদায়ক সত্যে ক্রমশঃ ইউরোপের মন তিক্ত হয়ে উঠে। অনুভূতির নূতন ও বিচিত্র সত্যের পথে প্রয়াণের জন্য ইউরোপ উৎসুক হয়ে উঠে।

জাপানী চিত্রকর হোকুসাই ও হিরোসিগের চিত্রকলা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপকে মুগ্ধ করে। তা'তে হুবহু রচনা মুখ্য ছিল না। একটা রেখার মুগ্ধকর লীলা বা বর্ণের ইন্দ্রজাল উপস্থিত করে' শিল্পী সকলের মনোরঞ্জন করেছে। এর ভিতর বিষয়-বস্তু ছিল উপলক্ষ্য এবং এই কাল্যোয়াতিই ছিল মুখ্য বস্তু।

ক্যাপ্টেন কুকের জলযাত্রা
শিল্পী : রোলাণ্ড পিরোস

মাতা
শিল্পী : হেন্‌রী মুর

দৈববাণী
শিল্পী : চিরিকো

এরই সংস্পর্শে ইউরোপ আভাসপন্থী (Impressionist) রূপচক্র স্থাপন করে। এই চক্র দেখ্‌তে পায় যে, গাছের পাতা প্রভৃতির খুঁটিনাটি কারও চোখে পড়ে না—সব কিছুই অস্পষ্ট বর্ণের স্তরের মতই দেখায় এবং আলোকের বিভিন্নতায় বা ব্যতিক্রমে সে সবের চেহারা বদ্‌লে যায়। কাজেই প্রত্যেকটি ডাল বা পাতাকে আঁকতে যাওয়া ভুল। আভাষপন্থীদের পরবর্ত্তী চক্র ইংলণ্ডের Grafton Galleryতে ১৯৩০ সালে একটা প্রদর্শনী খোলে। তা'তে তারা স্পষ্টভাবে বলে—আভাষপন্থীদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আর্টের ক্ষতি হয়েছে। তাদের মতে "Art is not truth—it is not nature; it is a pattern or rhythm or design that we impose on nature."

ইংলণ্ডের Augustus John আভাষপন্থীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহবাদ উপস্থিত করে। অপরদিকে Cezanneও প্রাকৃতিক অসামঞ্জস্যের বিষয় উল্লেখ করে' বল্‌লে Natureএ সামঞ্জস্যবিধানের কাজ হ'ল শিল্পীর।

Cezanne প্রতিটি ছবিকে নক্সায় পরিণত করে: "He made all pictures like patterns।" গোগ্যাঁ একটা নব্য সামঞ্জস্যের পক্ষপাতী হ'ল। স্বাধীনভাবে বর্ণ ও আলুলায়িত রেখা ব্যবহার করে' বিরোধমূলক রচনাতে এই শিল্পী নূতন সুর প্রয়োগ করলে। একটি ছবিতে ঘোড়ার রঙ হল্‌দে, জলের রঙ লাল, মাটির রঙ নীল দিতে গোগ্যাঁ ইতস্ততঃ করেনি। কারণ complementary colour বা সামঞ্জস্যমূলক বর্ণ হিসেবে বর্ণের প্রয়োগ প্রয়োজনীয়। এই রকম করতে গেলে Abstract form ও বর্ণের রহস্যসৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী হয়। বুদ্ধির পরিধির ভিতর সীমা রচনা না করে'—বুদ্ধিবাদকে বিসর্জ্জন দিয়ে সৌন্দর্য্যের পুরীতে উপনীত হ'তে হয়। এমনি করে' আদিম ও আরণ্যক আরণ্যে উপস্থিত হ'ল ইউরোপের চিত্র-রচনার অধ্যায়। ফলে Negro ভাস্কর্য্য ইউরোপের রুচিতে মনোহর বোধ হ'ল।

মাতিস্ এমনিভাবে abstract form বা নিরুপাধি রূপ খুঁজে চিত্রে প্রকৃতির সহিত সকলে রকমের সাদৃশ্য বর্জ্জন করলে। মাতিসের রচনায় হুবহু ধর্ম্ম চিত্র হ'তে একেবারে নির্ব্বাসিত হয়।

১৯০৮ সালে প্যারীতে যে প্রদর্শনী হয়, তা'তে Cubist চিত্রকলা বা ঘনপন্থী চক্রের রচনা উপস্থাপিত করা হয়। Roger Tryএর মতে এটা হ'ল "a purely abstract language of form—a visual music"। পিকাসো এই রকমের রচনার আদিগুরু। পিকাসোর স্বরচিত নিজের চিত্র এই রকম চিত্রকলার নমুনাস্থানীয়।

Marinettiর ভবিষ্যবাদী চিত্র (Futurist painting গতিমূলক (dynamic) ঘটনাকে উপস্থিত করতে চেষ্টা করে; কারণ জাগতিক সৃষ্টি মাত্রই গতিমূলক, স্থিতিমূলক নয়। কাজেই গতিকে চিত্রন্যস্ত করতে না পারলে, চিত্র মিথ্যার প্রবর্ত্তক হয় মাত্র। Giacomo Ballaর "centrifugal force" বা উৎকেন্দ্র শক্তি-প্রবাহ একটা তাক্‌লাগান দৃষ্টি। Epsteinএর Rock-drill চিত্র vorticist চিত্রকলার নমুনাস্থানীয়—তা'তে Cubism ও Futurismএর সমন্বয় আছে। আধুনিক যান্ত্রিক যুগের বিশ্বগ্রাসী প্রেরণাকে এই চিত্র উন্মুক্ত করেছে। এক্ষেত্রে বিখ্যাত Mestrovicএর রচনার উল্লেখ করতে হয়। এ শিল্পীকে জীবিত ভাস্করগণের

স্বতঃস্ফূর্ত আঁকা - [শিল্পী: আরপ

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। Charls Holmes এঁকে বলেন "A Michael Angelo of another race, who makes Alfred Stevens look like an electic and Rodin a Parisian"। মেষ্ট্রভিক চাষার ছেলে। —১৮৮৩ খ্রীঃ মেষ্ট্রভিকের জন্ম হয়। অসাধারণ শক্তিকে রূপগ্রাহী করার প্রতিভা এ শিল্পীর আছে। শিল্পীর মাতৃমূর্ত্তি একটা উৎকৃষ্ট রচনা, তাতে নকলনবিশী নেই। Leon Underwood নিগ্রোআদর্শে এই রকমে মূর্ত্তি রচনা করে' বিস্ময় জন্মায়। বস্তুতঃ কিছুকাল এই রকম রূপ নিয়ে ইউরোপের আন্দোলন চলে।

এরকম রচনাকে Expressionist বলা হয়। অন্তরে উপলব্ধ সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা দেওয়া হ'ল এর লক্ষ্য। এরা বাইরের সাদৃশ্য বর্জ্জন করে' একটা বলিষ্ঠতা-সৃষ্টির সূচনা করে। এদের ভিতর Fauvist বা আরণ্য শিল্পীরা (wild men) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এপষ্টিন্ প্রভৃতি এই শ্রেণীর শিল্পী। এপষ্টিনের মাতৃমূর্ত্তিতে একটা অসীম আরণ্য মাতৃত্বের দৃঢ়ত্ব ও সরল ব্যক্ত হয়েছে। বিংশ শতাব্দী তরল, লঘু ভাবের পরিবর্ত্তে দৃঢ় অতিপ্রাকৃত আদর্শের সূত্রপাত করেছে। Henry Moore-এর মাতৃমূর্ত্তিতে মায়ের অসীম স্থিরতা এবং বিরাট্ মহত্ত্বের আহ্বান মুকুরিত হয়েছে—মাংসের সুকোমল লালিত্য একেবারে বর্জ্জিত হয়েছে।

এমনি করে' ইউরোপ নব্যতর ও গভীরতর সত্যে উপনীত হয়েছে।

রক্ত দণ্ড — শিল্পী : পিটার হুইস্

সত্যের সন্ধানে ইউরোপের বহু মরীচিকা-সঙ্গম হয়েছে। 'নেতি' 'নেতি' বলে' ইউরোপের অশান্ত আত্মা চিত্তমন্দির প্রদক্ষিণ করে'ও পরম বিগ্রহকে চক্ষুগোচর করতে পারেনি। Realism, impressionism, Cubism, Enpressionism, Vorticism, Futurism প্রভৃতির পথে ইউরোপ একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তি খুঁজেছে — কিন্তু তা' পায়নি। কাজেই সত্যের বিস্তৃত দেবযান পথে এসেছে 'মারের' বিভীষিকা। তবুও এ পরিক্রমার ভিতর ইউরোপকে কোথাও শ্রান্ত দেখা যায়নি।

Epstein-এর Rock drill-এ আছে এ যুগের রুদ্ধ উৎসাহের স্মৃতিফলক। যন্ত্রযুগের নির্ম্মম প্রতীক, জনতার বিরাট্ জটলা, মানবীয় দানবত্বের প্রতিমা, জড়যুগের নিষ্পেষণমূলক ভার—সব কিছুই এই অতিপ্রাকৃত মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান। কোন লেখক বলেন :—

'It might have been called 'War-God', the spirit of machinery, 'Voice of the crowd' 'Brute, wealth'. It was an idol representing any or all of their blind and callous forces.—the tyranny of materialism and its products."

মাতৃ মূর্ত্তি—শিল্পী : ইভান মেষ্ট্রোভিক্

বস্তুতঃ ইউরোপে এই রকম অবস্তুতন্ত্র ধারার মূলে আছে চাক্ষুষ সত্যের প্রতি বিরাগ। ইদানীং Psycho-analysis প্রভৃতি শাস্ত্র মনের অবরুদ্ধ অঙ্গনে একটা বিরাট্ লোকের সন্ধান পেয়েছে। বর্ব্বরতার নৈসর্গিক প্রেরণাতেও বুদ্ধিবাদ (Intellectual philosophy) প্রচুর কাজ করেছে। কাজেই নিগ্রো ভাস্কর্য্য বা মাতিসের তাহিতীয় (Tahitian) সৌন্দর্য্যের মূলেও আয়োজন, সংযম ও মৎলব আছে। তাহা সহজে বিগলিত রূপ-কল্পনার মর্য্যাদা রক্ষা করেনি। আধুনিক শিল্পীরা তাই বাহির হ'তে মনের গূঢ় অন্তঃপুরে প্রবেশের জন্য উৎসুক হ'ল। হৃদয়সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা উন্মুক্ত, অবাধ ও স্বচ্ছ। সেখানে প্রেরণা আছে, শাসন নেই—উচ্ছ্বাস আছে, বল্গা রবার যন্ত্র নেই। তাই বুদ্ধিবাদে ক্লিষ্ট, বাস্তবতার বিশুষ্ক আহ্বানে পীড়িত পশ্চিম মনের অন্তরালে গিয়ে দেখ্‌ল আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের রাজ্য—তার চেয়ে সহস্র গুণে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সঙ্গম। তারা মনে করল শেষ সত্য এখানে। কারণ জ্ঞানের নেতিমূলক বাদপ্রতিবাদ, ন্যায়শাস্ত্রের চুলচেরা তর্ক সেখানে নেই। সেখানে সৌন্দর্য্যের ঝড় প্রবাহিত হচ্ছে অবিরত। যা' নৈসর্গিক সংস্কার ও সৌন্দর্য্যে রচিত, তাতেই সৌন্দর্য্যের চরম বাণী আছে। মানুষ বাইরের ব্যবহারে ভদ্র, মার্জ্জিত, সংহত ও শৃঙ্খলিত। সমাজ, সভ্যতা ও আবেষ্টনের প্রভাবে মানুষ অতি সংযত ভাবে নিজের ক্রিয়াকর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করে। কাজেই অন্তরের বাস্তব বার্ত্তা বাইরের ব্যবহারে পাওয়া যায় না। এজন্য ইউরোপ সুগুপ্ত সৌন্দর্য্যপ্রেরণায় অতিপ্রাকৃত (sur-real) জগতের প্রতি আকৃষ্ট হল। ফলে ইউরোপের শেষ ও নব্যতম সাধনার ফলরূপে sur-real বা অতিপ্রাকৃত কলা জন্মলাভ করে। এই চিত্র-কলা ইউরোপে অবাস্তব সমগ্র চিত্রকলার সমসাময়িক বল্‌তে হবে। কাজেই আনুষঙ্গিক সমগ্র উদ্যম ও সাধনার প্রসঙ্গ উত্থাপন না করলে, sur-real কা'কে বলে' বোঝা যাবে না। Chirico হচ্ছে অতিপ্রাকৃত রচনার প্রবর্ত্তক। ১৯১৪ সালে রচিত চিরিকোর "The oracle" একটা অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সমস্ত অবয়বে লঘু বাস্তবতা নেই—শিল্পী একটা চিরন্তন সত্যকে রূপ দান করেছে বাস্তবতার আবেষ্টনের সমগ্র আবর্জ্জনা ছেড়ে।

এ ক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন—পূর্ব্ববর্ত্তী শিল্পীরা বাস্তবকে বর্জ্জন করেছে অন্যভাবে। অতি-আধুনিক Stanley Spencer-এর "ক্রুশবাহী খৃষ্ট" একটা অবাস্তব নক্সা।

তা'তে লোকগুলি চলাফেরা করছে ভূতযোনির মত; মানুষের বাস্তব বা প্রকৃত সীমা (outline) এঁকে ছবিখানিকে কোন রকমে realist করা হয়নি। অস্পষ্টতার কুয়াসার ভিতর একটা কল্পনার ক্রীড়া প্রতিপাদন করা হ'ল শিল্পীর লক্ষ্য।

অপর দিকে বিংশতাব্দীর abstract বা নিরুপাধি আর্টিষ্ট "The Char' নামক চিত্রে একটা দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্যকে একেবারে একটা সাদাকালো নক্সায় পরিণত করেছে। এটা একেবারে abstraction-এ পরিণত হয়েছে। এই রকমের Expressive modernism ও Sur-realism-এ তফাৎ আছে। Giacomo Balla 'centrifugal force' নামক বিষয় নিয়েও এই শ্রেণীর চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেছে।

অতিপ্রাকৃত চিত্র-কলার ভিতর এ রকমের কোন বিশিষ্ট প্রেরণা নেই। শিল্পী আরপ্‌ যে ছবি এঁকেছেন তা' একেবারে স্পষ্ট। মনের লীলার বৃন্তে মানুষ, পাখী, মাছ, ফুল কি করে' এক হয়ে যায়, তা' শিল্পী দেখিয়েছে। শিল্পী Roland Penrose—"Captain Cook's voyage" নামক চিত্রে এক অদ্ভুতপূর্ব্ব রচনা সম্ভব করেছে। 'Carnival' নামক চিত্রে মানুষ, পাখী, সাধু, পিপে প্রভৃতি নানা আয়োজনে এক অপূর্ব্ব অতিপ্রাকৃত ব্যাপার সৃষ্ট হয়েছে।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অতিপ্রাকৃত চিত্রকলার এক প্রদর্শনী হয় লণ্ডন সহরে। বস্তুত: চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যে যে অবাস্তবতার (abstraction) রীতি বহু কাল ইউরোপকে প্রেরণা দান করেছে—আধুনিক অতিপ্রাকৃত কলা তার ভিতরকার শেষ দান। Subconscious-কে মূর্ত্তি দান করার এই চেষ্টা ইউরোপের মনের গতি প্রকাশ করেছে, সন্দেহ নেই। এ রকমের চিত্রকলা সকল রকমের চিত্রকলা-চর্চ্চার সমাধিস্থানীয় হয়েছে।

---

# দুঃসহ দুঃখে

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

জীবনের শেষভাগে, লীলাময় বুঝিনু তোমায়!
সংসারে আবদ্ধ করি' কেন কর বিষাক্ত জীবন!
জ্বলিয়া গিয়াছে চিত্ত, প্রভু, আর সহে না যাতন!
রোগ, শোক, মায়া, মোহে গণা দিন বৃথা চ'লে যায়!

অশান্তি মূরতি ধরি' মোরে ঘেরি' নাচিতেছে হায়!
বুদ্ধিনাশী ঈর্ষ্যা সদা কেড়ে নিতে চাহিছে চেতন!
যেদিকে ফিরাই আঁখি শুধু দেখি বিষাদ ভীষণ!
এখন আঁধার-রাত্রি, বসে' অশ্রু ফেলি নিরালায়!

এমনি আঁধার-রাতে একদিন সিদ্ধার্থ নিমাই
ছিন্ন করি' মায়া-পাশ যায়নি কি ছাড়িয়া সংসার?
শুদ্ধোধন মহামায়া বধূগোপা কেঁদেছে বৃথাই,
বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাতা কেঁদে কেঁদে হয়েছে অসার!

এই দণ্ডে অন্ধকারে মন করে পালাই পালাই!
জীব-যুদ্ধে জয়ী হ'তে পালাব না, কলঙ্ক অপার!

# ঋণ-তত্ত্ব

শ্রীমতিলাল দাশ

যারা ভাবুক, যারা কল্পনাপ্রিয়, তারা অতীতের স্বপ্ন-ছবি দেখে, ভাবে সত্য যুগ ছিল আনন্দের যুগ, প্রাচুর্য্যের যুগ। কিন্তু কল্পনা যদি ত্যাগ করি, তবে দেখি—অতি প্রাচীন কাল ও বর্ত্তমান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ঋক্‌-বেদের যুগের সমস্যা আর বর্ত্তমানের সমস্যা একই।

সংসারে থাকিতে গেলে স্বাচ্ছল্য সকলের ভাগ্যে মেলে না। যখন দুঃখ ও বিপদ্‌ আসে, যখন সঞ্চয়ের ভাণ্ডার শেষ হয়, তখন হাত পাতিতে হয় বন্ধুর দ্বারে ও প্রতিবেশীর কাছে। বন্ধুত্বের হাওলাত সে যুগেও ছিল, সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তার নাম দিয়াছিলেন যাচিতক। যাচিতক নিয়াও লোকের কলহ হইত, তজ্জন্য বিধানের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাই স্মৃতিতে তার বিধি বর্ত্তমান।

কিন্তু অমনি অমনি কতবার হাত পাতা যায়, তাই ধার করিতে হয়। ধার করিতে গেলে নিয়মকানুনের প্রয়োজন—প্রথমে যা ছিল সহজ, সমাজ ও ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার মাঝে জটিলতা আসিল। ধার নেওয়া-দেওয়ার আইন হিন্দু ব্যবহারের একটা বড় অংশ।

যাঁরা প্রাচীন হিন্দু-কৃষ্টিকে ভালবাসেন—অতীতের হিন্দুদের কেবল সন্ন্যাসী কৌপীনধারী মনে করেন না, তাঁরা ঋণ-তত্ত্বে হিন্দুর গভীর বৈষয়িক বুদ্ধি এবং সংসার-চাতুর্য্যের পরিচয় পাইবেন।

বর্ত্তমানে ঋণ-সমস্যা লইয়া দেশে আন্দোলন চলিতেছে—নূতন নূতন বিধি ও বিধানের রচনা হইতেছে—বিধান-রচনার ভার যাঁদের, তাঁরা অতীতের আইন-কানুন জানিলে নিজেদের দায় সুচারুভাবে নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। ব্যস্ত জীবন, ব্যস্ত পরিবেশ; শক্তি ও সময় অল্প, সাধনার অবসর নাই, কাজেই কেহ হয়ত পড়িবেন না, তবু ভবভূতির দম্ভ সমস্ত লেখকের মনের কথা—কোথাও না কোথাও কেহ আছেন, যিনি এই আলোচনায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সন্ধান পাবেন।

হয়ত অহঙ্কারের মত শুনাইল, সেইজন্য একটু বাহুল্য বলিতেছি। হিন্দুর ব্যবহার হিন্দুধর্ম্মের অংশ—ওটা জানিলে অর্থের সম্ভাবনা আছে—কাব্য-শাস্ত্র-বিনোদনের কামনা চরিতার্থ হবে—আর ধর্ম্মের অনুসরণ মোক্ষের পথ, একথা শাস্ত্রকারেরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন।

বিবাদ-পদকে পণ্ডিতেরা ১৮ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মনুতে নামগুলি পাই—মনুর সংস্কৃত-শ্লোক তুলিতেছি :—

> তেষামাদ্যমৃণাদানং নিক্ষেপোঽস্বামিবিক্রয়ঃ।
> সম্ভূয় চ সমুত্থানং দত্তস্যানপকর্ম্ম চ ॥
> বেতনস্যৈব চাদানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ।
> ক্রয়বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদ স্বামিপালয়োঃ ॥
> সীমাবিবাদ ধর্ম্মশ্চ পারুষ্যে দণ্ডবাচিকে।
> স্তেয়ং চ সাহসং চৈব স্ত্রীসংগ্রহণমেব চ ॥
> স্ত্রীপুংধর্ম্মো বিভাগশ্চ দ্যূতমাহ্বয় এব চ।
> এতান্যষ্টাদশৈতানি ব্যবহারস্থিতাবিহ ॥

এই আঠারোটির আদ্য ঋণাদান এবং তার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য।

পৃথিবীর সকলের চেয়ে পুরাতন গ্রন্থ বেদ। উহার বয়স-নির্ণয় প্রহেলিকা—"পণ্ডিতে বুঝিতে নারে মূর্খে লাগে ধন্দ।" অতএব সে হেঁয়ালীর সমাধানে আমাদের মত মূর্খের কি প্রয়োজন?

তবে জগতের এই আদি গ্রন্থেই দেখি যে, মানুষের দেনার প্রয়োজন এবং সেকালের মানুষও দেনাদারকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে ত্রুটি ধরিতেন না। সেকালের মহাজনও ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ছিলেন না।

আমাদের বৈদিক ঋষিরা দ্যূতক্রীড়া খুব ভাল-বাসিতেন; আর দ্যূতক্রীড়ার নেশায় পাইলে, ধর্ম্মপুত্রেরও জ্ঞান থাকে না—অপরের কি কথা? কাজেই তখন ধার করিয়া খেলা চলিত।

বরুণ তখনকার দিনের মস্ত দেবতা ছিলেন। ঋগ্বেদের ভক্তির পরাকাষ্ঠা বরুণের স্তোত্রেই মেলে। ঋণকে বৈদিক যুগের মানুষ অভিশাপ বলিয়া মনে করিত। কারণ বিশ্বাস ছিল, ঋণশোধ না হইলে, পরজন্মে ভৃত্য হইয়া জন্মিয়া উত্তমর্ণের দেনা শোধ করিতে হইবে। ঋক্‌টী এই :—

পর ঋণা সাবীরধ মৎকৃতানি মাহং রাজন্নন্যকৃতেন ভোজম্।
অব্যুষ্টা ইন্নু ভূয়সীরুষাসে আ নো জীবান্বরুণ তাসু শাধি ॥
বরুণকে প্রার্থনা করি—"হে বরুণ, তুমি পূর্ব্বপুরুষের ঋণ-শোধ করিয়ে দাও; আমিও যে ধার করেছি, তাও শোধ কর, হে রাজন্! আমি যেন অন্যের উপার্জ্জিত অর্থে ভোজন না করি—অনেক উষা এসেছে, কিন্তু তখন ঋণ-জর্জ্জর আমার কাছে তারা যেন জাগেনি—তুমি উপায় কর যেন আমি সজীব মানুষের মত উষার অভিনন্দন করি।" অল্প কথায় অধমর্ণের কি ভাবব্যঞ্জনাময় অর্থ-বিচিত্র বর্ণনা — যে ঋণী, সময়চক্রের গতি তার কাছে আনন্দ আনে না — প্রতিদিন প্রভাতে যে লীলোৎসব, তাতে তার যোগ নেই—তাই দেনদার প্রার্থনা করিতেছে—সে যেন এখন মানুষের মতন মানুষ হইয়া, উষার আগমন দেখিতে পায়।

বৈদিক যুগের বেনিয়াদের নাম ছিল পণি—এই সব পণ্যাজীবেরা অত্যন্ত সুদখোর ছিল। বেদের নানা স্থানে এদের নির্দ্দয় ও নির্ম্মম ব্যবহারের কথা পড়ি। এরা অনেক চড়া সুদে টাকাকড়ির কারবার করিত।

ইন্দ্র এই কুসীদজীবী বণিকদের—বেকনাট এবং পণিদের জয় করেন। বেকনাটের সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি মেলে না—পণ্ডিতেরা বলেন, ওটা হয় আদিম জাতিদের ভাষা—কিম্বা ব্যাবীলনীয়দের ভাষা। Hillebrandt নামক পণ্ডিত বলেন, এটা বিকানীর দেশের পুরাতন নাম। মাড়োয়ারীরা অনেকেইত বিকানীরের লোক—তবে কি ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সেকালের পণি? প্রত্নতাত্ত্বিক সে মীমাংসা করিবেন।

অধমর্ণের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয় ছিল—দেনা শোধ না করিলে, মহাজন দায়িককে ক্রীতদাস করিতে পারিতেন। তাহা ছাড়া দ্রুপদে বাঁধা আর এক চরম শাস্তি ছিল। দ্রুপদগাছের পায়া—তার সঙ্গে দেনদারকে বাঁধিয়া রাখা হইত। তস্কর ও দস্যুর সঙ্গে তাকে একই দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইত।

স্তম্ভ হইতে প্রাকৃতে থম্ভ, তথা হইতে বাংলায় থাম পাইয়াছি—বাঙ্গলা সাহিত্যে থামের প্রতিশব্দ বুঝাইতে দ্রুপদের পুনরুদ্ধার করিতে পারি।

দ্যূতক্রীড়ায় হারিয়া একজন ক্রীড়কের স্বগতোক্তি শুনাইতেছি—

"আমি দেখি, দ্যূত-ক্রীড়ায় পরাজিত ব্যক্তি পুরাতন ঘোড়ার মতই বাজারে বিকায় না। পাশায় তার স্থাবর কাড়িয়া নেয়—অপরে তার স্ত্রী হরণ করে—এমন কি তার পিতামাতা এবং ভ্রাতা তাকে অস্বীকার করে, বলে ওকে চিনি না—ওকে বন্দী করিয়া নিয়া যাও।"

এই শোচনীয় অবস্থার কথা পড়িয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, ঋণের উৎপত্তি চুক্তির ব্যাপার নয়। তাঁরা বলেন, প্রাচীন কালে মানুষ যখন অসভ্য ছিল, তখন শত্রুকে জয় করিয়া বন্দী করিয়া আনা হইত। এই সব শত্রুকে অর্থ নিয়া ছাড়া হইত—এই বিনিময় মূল্যকে বৈরদেয় বলিত।

বিলাতী সমাজেও এই অবস্থার কথা পাওয়া যায়। বিলাতে বৈরদেয়কে বলে weigeld—বৈরদেয় অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত। কালে কেহ কোনও অপরাধ করিলে, তাহাকে শাস্তি না দিয়া অর্থ লওয়া হইত—ইহাকেও বৈরদেয় বলিত। ঋণ প্রথমে ছিল বৈরদেয়—পাপের এই প্রায়শ্চিত্ত আদায়ের উপর বৈরপক্ষের সম্মান ও গৌরব নির্ভর করিত; কাজেই ইহা আদায় করিতে যে কোনও নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিতে কাহারও কোথাও বাধিত না।

হিন্দুর চিত্ত দয়াপ্রবণ—দয়া আমাদের স্বধর্ম্ম। শিবিরাজার দানের কাহিনী, কর্ণের আত্মত্যাগ, এগুলি শুধুই আদর্শ ছিল না—সমাজে দয়ার বিপুল প্রতিষ্ঠা ছিল। কিন্তু তবু ঋণীকে দয়া করিবার কথা মনে উঠিত না।

ইহা হইতে এই পণ্ডিতী গবেষণা গ্রহণে আপত্তি দেখি না। পণ্ডিতের প্রতি অশ্রদ্ধা লেখকের নাই—তাঁদের গবেষণার প্রতি স্থানে স্থানে আছে। কারণ একজন বিখ্যাত সাংবাদিক একবার বলিয়াছিলেন—কুকুর মানুষকে কামড়িয়েছে, এটা খবর নয়; মানুষ কুকুরকে কামড়িয়েছে, এটাই খবর। গবেষণায় এই মনোবৃত্তি দেখি। যত্র তত্র অদ্ভুত ও অপূর্ব্বের অবতারণা করিয়া তাঁরা যে সৌধ গড়েন, তাহা যুক্তির দ্রুপদে স্থাপিত নয় বলিয়া মানুষের কাজে

আসে না—অজ্ঞানের চিকিৎসা করিয়া এই সব বৈদ্যরাজগণ যে অমৃত আবিষ্কার করেন, তার ফলে খাতা, কাগজ ও কলমের সর্ব্বনাশ হয় এবং বিশ্ববিদ্যার চতুষ্পাঠীতে দুষ্পাচ্য জিনিষ সংগৃহীত হয়। আশু ফল—'ডাক্তার' উপাধি-লাভ এবং পদগৌরব—কিন্তু মূর্খ সাধারণ যে তিমিরে, সে তিমিরেই থাকে।

অপ্রাসঙ্গিক এবং অপ্রিয় কথা—বলা ভুল এবং অন্যায়, কাজেই ক্ষমা ভিক্ষা করি।

হত্যাকারীকে হত্যা করাই ছিল প্রথম বৈরনীতি; কিন্তু মানুষ যখন বুঝিল যে, blood-feud বা হত্যাপ্রতিযোগিতায় দুই কুলেরই সমূহ সর্ব্বনাশ হওয়ার সম্ভাবনা, তখন হত্যাকারীকে মৃতের জন্য অর্থমূল্য দিলে অব্যাহতি দেওয়া হইত। ঋগ্বেদে একটি মানুষের হত্যার মূল্যকে শতদায় বলিয়াছে, অর্থাৎ তৎকালপ্রচলিত সর্ব্বোচ্চ মুদ্রার একুশটি দিলে হত্যাকারী মুক্তি পাইত। পরে বৈরদেয়ের বদলে বৈরই wergeld-এর পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হইত—আপস্তম্ব এবং বৌধায়ন সূত্রে 'বৈর' এই অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে।

ধার নিলে সুদ দিতে হইত। সুদকে কি ভাবে নেওয়া হইত, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। ঋগ্বেদের একস্থানে পাই যে, অষ্টমাংশ সুদ নেওয়া হইত। কিন্তু এখানে অর্থ নিয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক আছে—কেহ বলেন, এটা কিস্তির কথা। আট কিস্তিতে টাকাটি শোধ দিবার কথা বলা হইয়াছে।

অধমর্ণ মরিলেই পুত্রেরা বলিতে পারিত না যে, আমরা দেনার ধার ধারি না—তাহাদিগকে পিতৃ-ঋণ শোধ দিতে হইত। কিন্তু পুত্রেরা যদি দায়াদ হইত, যদি পিতৃধনের অধিকারী হইত, তবেই দিতে হইত; নচেৎ নয়। কিন্তু সমস্ত ঋণই পরিশোধনীয় ছিল না। সে কথা পরে বলিব।

ঋগ্বেদের যুগে মুদ্রার প্রচলন ছিল না বলিলেই হয়। গো-ই ছিল বিনিময়-প্রতীক। আজকাল যাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত করেন, তাঁহারা পুরোহিতকে গো মূল্য কাঞ্চন দান করেন। এইজন্যই সাধারণতঃ শস্য ঋণ নেওয়া হইত এবং তাহাই কড়ি দিয়া শোধ করিতে হইত।

ভারতবাসী অতিশয় শাস্ত্রদাস এবং প্রথাদাস (conservative)—এই বৈদিক প্রথা আজিও বাংলার সমাজে অবাধ রাজত্ব করিতেছে।

ঋগ্বেদে সমাজের যে চিত্র পাই, তাহা অতি উন্নত, শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজের চিত্র। বৈর কথাটি চলিলেও, আমরা দেখি, ঋগ্বেদেই চুক্তির গোড়া-পত্তন হইয়াছে। পোলক তাঁর কন্‌ট্রাক্ট গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

"The specific mark of contract is the creation of right not to a thing but to another man's conduct in future and a developed society cannot but recognise the relations that arise between human beings which arise out of agreement, out of their life together in society."

সমুন্নত বৈদিক আর্য্যেরাও সমাজে গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া বাস করিতেন—সেই সমাজজীবনে পরস্পরের আর্থিক এবং সামাজিক যোগ হইত—এই যোগাযোগের ফলে তাহাদের পরস্পরের কার্য্যপ্রণালী ভবিষ্যতে পরিবর্ত্তিত হইত। এই স্বাভাবিক কার্য্যক্রমের পরিচালনার জন্য এবং বাদ-বিসংবাদ দূর করিবার জন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। বেদেই এই ব্যবস্থার পরিচয় পাই। মানুষের বাক্য অমোঘ হউক। প্রতিজ্ঞা অনিষ্ফলা হউক—ইহাই চুক্তির মূলমন্ত্র।

ঋগ্বেদে পাই—যদি কেউ বেশী দামের কোনও জিনিষ অল্প দামে বেচে এবং পরে বলে যে, আমায় বেশী দাম দাও, আগের দামে আমি বেচিব না, তখন তার সে আস্ফালন শোনা হইত না—মানুষ এই সব ব্যাপারে তাদের চুক্তি মানিয়া চলিবে, ইহাই ছিল বৈদিক বিধান।

কক্ষীবান্ এবং ভবযাব্য যে চুক্তি করেন, বারান্তরে সে গল্প বলিব। তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় ঋষিরা চুক্তির স্বরূপ ভাল ভাবে জানিতেন। চুক্তির সাধারণ নাম ছিল ব্যবহার। আইনকে তাঁরা চুক্তি বলিয়াই দেখিতেন এবং চুক্তিকে গৌরব দেওয়ার জন্যই তাঁহারা লিখিয়াছেন যে আইনই ব্যবহার। অথচ গৌরের মত পণ্ডিতও দেখেন যে, হিন্দু আইন একটা জগা-খিচুড়ি—ধর্ম্ম, নীতি এবং আইনের ছাঁচড়া। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের চর্ব্বিত চর্ব্বণে অপর কি আশা করা যায়?

# বাংলার অভিনব আদি লিপিতত্ত্ব

শ্রীহরিদাস পালিত বিদ্যাবিনোদ

ভারতে সর্ব্বাদি লিপি প্রবর্ত্তন-যুগে, প্রথমে এক বা একাধিক ক্ষুদ্র দণ্ড বা সমতল রেখা দ্বারা লিপি-বিস্তার সূচনা হইয়াছিল। কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা বিভিন্ন ধ্বনির প্রতীকরূপে ব্যবহার হইত। ইহাই ভারতীয় সর্ব্বাদ্য-লিপি। উক্ত রেখা-লিপির সন্ধান পাই, প্রাচীন লিপিলিখিত 'বাংলা-নিবিদ্' মন্ত্রে এবং সৈন্ধবী মুদ্রা-লিপিতে। সেই রেখা-লিপির সাধারণতঃ তিন প্রকারে শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। এক প্রকার ক্ষুদ্র দণ্ড-রেখা। দ্বিতীয় অর্দ্ধশায়িত রেখা। তৃতীয় সমতল (শায়িত) রেখা। এইরূপ রেখাগুলিকে কেহ-র, কেহ-ন এবং কেহ সংখ্যাবাচক চিহ্ন বলিয়া ব্যাখ্যান করেন। র, ই-কার, আকারাদি চিহ্ন ক্ষুদ্র রেখামাত্র। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২য় শতকে একটি ক্ষুদ্র সমতল রেখা দ্বারা এক সংখ্যা বুঝাইত, দুই রেখা দ্বারা ২ সংখ্যা বিজ্ঞাপিত করিত, এইরূপ সংখ্যা-লিখনপদ্ধতি খ্রীঃ ১ম—২য় শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। অশোক কালে ঢেরা চিহ্ন দ্বারা ৪ সংখ্যা বুঝাইত। একটি দাঁড়ি দ্বারা 'র' বুঝাইত। ক্ষুদ্র একটি দণ্ডরেখা দ্বারা ই-কার, এবং একটি সমতল ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা আ-কার বুঝিতে হইত। এই প্রকার রেখা দ্বারা যখন উক্ত প্রকার ভাব ব্যক্ত করা হইত, সম্ভব ইহার পূর্বে কেবল রেখা দ্বারা লেখমালার কার্য্যও প্রচলিত ছিল। সে কালটি সৈন্ধবী সভ্যতার গোড়াপত্তনের বহু পূর্বের, সম্ভব খ্রীঃ পূঃ ৮ বা ৯ হাজার বৎসর পূর্বের ঘটনা। প্রথমে কেবল ক্ষুদ্র রেখা-বিশেষ দ্বারা লিপিবর্ণ প্রচলিত না থাকিলে, হঠাৎ সৈন্ধবী মুদ্রায় এবং রাঢ়ী-বাংলা-নিবিদে, 'রেখা-লিপি' থাকা সম্ভব হইত না। সম্পূর্ণ রেখা-লিপির পরিচয় ভারতে পাই না। এ প্রকার লিখনপদ্ধতি, এত প্রাচীন যে—সামান্য কতিপয় চিহ্ন ছাড়া, প্রায় সকল ধ্বনি-লিপি লোপ পাইয়াছে, সৈন্ধবী-মুদ্রা এবং বাংলা-নিবিদ্ লিপির সন্ধান না পাইলে, রেখা-লিপির কথাই উঠাইতে পারা যাইত না। মূলতঃ ভারতে প্রথমে রেখা লিপির কিছুকাল প্রচলন ছিল।

তথাকথিত যুগে, বৃহত্তর ভারত হইতে যে সকল জনগণ অভারতীয় জনপদে (য়ুরোপাদি দেশে) গিয়া বসবাস করিয়াছিল, তাহারা ভারতীয় রেখা-লিপি এবং সেই কালে প্রচলিত ধাতু-ভাষা, তাহাদের প্রবাসভূমে প্রচার করিয়াছিল। এই প্রকারে ভারত হইতে, তিনবার তিন প্রকার লিপি ও ভাষা য়ুরোপে প্রচারিত হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য দেশের নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, আদিম আইরিশ, গ্রীক, কেলিক এবং টিউটোনিক জনগণ মূলতঃ এক আদি মানববংশীয়। সেই মূল আদিমানবেরা অতি পূর্বকালে পূর্বদেশ হইতে আসিয়াছিল। এই পূর্ব দেশটি খুব সম্ভব বৃহত্তর-ভারত (আদিম ভারত—হড়মোশিয়া দ্বীপ, কালদিয়া, বাবিলোনিয়া, উর ইত্যাদি জনপদ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল, তখন ভারত নাম ছিল না, অন্য কোন নাম ছিল, সম্ভব জম্বুদ্বীপ নাম ছিল)। পূর্ব দেশের সভ্য মানবেরা য়ুরোপের অধিকাংশ ভূভাগে বাস করে। ইংরেজ স্কন্দনাভীয়, জারমানদের পূর্বপুরুষেরা উত্তরাংশ অধিকার করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। উক্ত আদিমানবদের অন্যান্য শাখার লোকেরা দক্ষিণ খণ্ডের গ্রীস, ইতালী এবং স্পেন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তাহারাই যথাকালে য়ুরোপের অধিবাসী হইয়া যায়।

পূর্বদেশ (ভারত) হইতে যাহারা গিয়াছিল, তাহারা য়ুরোপের বর্তমান অধিবাসী। সম্ভবতঃ তথাকালে এক প্রকার খর্বাকৃতি অসভ্য শ্বেতমানব য়ুরোপের আদিম অধিবাসী ছিল, সেই বংশধারা এখন বিদ্যমান রহিয়াছে।

স্পেন দেশের বাস্ক প্রদেশে, আয়রলণ্ডের হাইলাণ্ড-সমূহে যে খর্বাকৃতি মানব দৃষ্ট হয়, পণ্ডিতগণ বলেন—কেল্‌ট জাতির পূর্বে তাহারা তথাকথিত দেশে বাস করিত। তাহার পরে কেল্‌ট জাতির আবির্ভাব হয়। সাধারণতঃ তথাকথিত খর্বাকার শ্বেত মানবদিগকে আইবিরিয়ান বলা হয়।

কোন কোন নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত তাহাদিগকে সিলিউরিয়ান, য়ুস্করিয়ান, বাস্ক ( বর্বর ? ) নাম দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাহারাও প্রকৃত য়ুরোপীয় মানব নহে। তথাকথিত দেশে প্রথমে মানববসতি ছিল না। পূর্বদেশ হইতে মানবগণ তথায় গিয়া বাস করিয়াছিল।

স্পেনদেশে আইবিরিয়ানগণ প্রথমে বাস করে। তাহার পরে, পূর্বদেশ ( বৃহত্তর ভারত ) হইতে যাঁহারা স্পেনদেশে বাস করে, তাহারা ইংরেজ, স্কন্দনাভীয়, জারমান, গ্রীক, ইতালী এবং স্পেনীয়দের আদিপুরুষ।

ভারতের লোকে অতি প্রাচীনকাল হইতে, মৃতের সমাধি দিত এবং তদুপরি পাষাণস্তূপ নির্মাণ করিত, সেই স্তূপকে এদেশে 'এডুক' বলিত, য়ুরোপে ইহারই নামান্তর 'ডলমান'। প্রায় ৬০-৭০ বৎসর পূর্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিতেন, ডলমানের নির্মাতা কেল্‌ট জাতি ; কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত হয় যে, ইহা সত্য নয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হৌয়ার্থ, হাচিসন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন—কেল্‌টদের পূর্বে অন্য এক বলবান জাতি বাস করিত—তাহারা ড্রুইড[১] জাতি। এই বলবান্ জাতি কেল্‌টগণের পূর্বে য়ুরোপে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা সম্ভব পূর্বদেশবাসী ছিল। প্রথমে আমাদের ভারতবর্ষেই সমাধিস্তূপ নির্মিত হয়, তখন ভূমণ্ডলের কোথাও এইরূপ সমাধি-প্রথা ছিল না। এডুক-নির্মাতাদের মধ্যে শবদাহ প্রথাও প্রচলিত ছিল, এই প্রথা আদি ভারতীয় প্রথা। এডুক মধ্যে শ্মশান-ভস্মাধার পাওয়া গিয়াছে।

পণ্ডিত বনষ্টেটেন বলিয়াছেন—এই এডুকনির্মাতা যাহারাই হউক না কেন, ইহারা ভারতের মালাবর উপকূল হইতে য়ুরোপে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহারা ( একদল ) গ্রীস, সিরিয়া, ইতালী, কর্সিকায় বাস করে এবং অন্য দল বৃটেনী, নরমাণ্ডী ও বৃটিশ দ্বীপসকল অধিকার করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, ইহারাই স্পেন ও পর্তুগালে ছড়াইয়া পড়ে। বনষ্টেটেনের এই মত সর্বথা পরিগৃহীত হয় নাই। তথাকথিত জনপদে প্রচুর এডুক দৃষ্টিগোচর হয়।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অতি প্রাচীনকালে পূর্বদেশ হইতে যাহারা য়ুরোপে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারাই তথাকথিত দেশের সভ্য মানব—ইংলণ্ড, স্পেন, গ্রীস ইত্যাদি জনপদের বর্তমান অধিবাসী। সুতরাং এই পূর্বদেশ যে বৃহত্তর ভারত, ইহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কিছু নাই।

কাপ্তেন মেডোটেলার ভারতের দাক্ষিণাত্যে অন্যূন ২১২৯টি এডুকের বিবরণ দিয়াছেন। বর্তমান কোন জাতিদের মধ্যে এখনও একরূপ এডুক প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। নীলগিরি প্রদেশে এখনও একাধিক এডুক বিদ্যমান রহিয়াছে। লেখক স্বয়ং গ্রামে পারসাকমুণ্ডিতে এবং মহেন্দ্রগিরিতে একাধিক এডুক বিশেষ দেখিয়াছেন।

যাহাই হউক, প্রাচীনকালে য়ুরোপের প্রায় সর্বত্র পূর্ব দেশের জনগণ অধিকার বিস্তার করিয়া বাস করিয়াছিল, তাহাদেরই বংশধরগণ বর্তমান য়ুরোপের সভ্য অধিবাসী। কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক বলেন—সেই আদিম জাতিরা লিখিতে জানিত না বা চিত্র-লেখাও[২] অবগত ছিল না। বাস্তবিক এ কথার বিশেষ মূল্য নাই। যেহেতু তাহাদের সমাধিস্তম্ভে ( এডুকগাত্রে ) কোন না কোন প্রকার চিত্র বা বর্ণমালা খোদিত দেখা যায়। কুঠার ও এক প্রকার অর্দ্ধ চন্দ্রাকার চিহ্ন 'অক্ষর' তন্মধ্যে প্রধান। ভারতের বিন্ধ্যপর্বতের গুহাবিশেষে গিরিমাটি-চিত্রিত চিত্র দেখা গিয়াছে। কামাখ্যামন্দিরপ্রাঙ্গণে এক খণ্ড চতুষ্কোণ কৃষ্ণ প্রস্তর গাঁথা আছে, তাহাতে অর্দ্ধচন্দ্রাকার, চতুষ্কোণ লিপি খোদিত আছে। এই প্রকারের একখণ্ড ভগ্নপ্রস্তর উত্তর দিকের ইষ্টক-পাষাণ-স্তূপেও দেখা গিয়াছে। আসামে ও খাশিয়া পাহাড়ে একাধিক এডুক (ডলমেন ?) তুল্য পাষাণ-স্তম্ভ দৃষ্ট হয় ( গোইটন আসাম )।

যে পূর্বদেশ ( বৃহত্তর ভারত ? ) হইতে লোকেরা য়ুরোপের মধ্যে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল, তাহারা লিপিবিদ্যা অবগত ছিল, তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইবে। আদিম রুণিক[৩] এবং ওগম[৪] লিপি সম্বন্ধে কিছু আলোচিত হইতেছে।

১। ড্রুইড জাতি দ্রাবিড় জাতি বলিয়া ধারণা হয়, এখনও ইহার মীমাংসা হয় নাই, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ মীমাংসা করিবেন কিনা সন্দেহ।

২ Picture writing.

৩ Runic alphabets.

৪ Primitive Ogam alphabets.

### ওগম-লিপি.

এই রেখা-লিপি আদিম বৃটিশ ও আইরিশ বর্ণমালা-বিশেষ। এই রেখা-লিপিকে ব্রিটেনী ও আইরিশ জাতি প্রথমে ব্যবহার করিত। পূর্বদেশ (বৃহত্তর ভারত?) হইতে যে আদিপুরুষেরা য়ুরোপে গিয়া বাস করিয়াছিল, তাহারাই এই লিপি-মালা পূর্বদেশ হইতে লইয়া গিয়াছিল। ভারতে তথাকালে উক্ত প্রকার রেখা-লিপি প্রচলিত ছিল, ভারতীয় তথা আদ্য-লিপির লুপ্তপ্রায় চিত্র সৈন্ধবী মুদ্রায় এবং রাঢ়ীয় কপালী চিত্রে আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। এ কথা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। বৃটিশ ও আইরিশেরা ইহার বিশেষ ব্যবহারী ছিল।

আদিম ওগম*-লিপি, প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা—

| ┼ | ╫ | ||| | |||| | ||||| |
|---|---|---|---|---|
| এ, | ও, | য়(যে?), | ই, | ই (আই) |
| T | Π | ΠΙ | ΠΙΙ | ΠΙΙΙ |
| ব, | ল, | ভ, | স, | ন, |
| ⊥ | ⊥⊥ | ⊥⊥⊥ | ⊥⊥⊥⊥ | ⊥⊥⊥⊥⊥ |
| হ, | ট, | থ(ড), | ক, | কো (কিউ?) |
| / | // | /// | //// | ///// |
| ম, | গ, | ঙ(ন্গ), | জ, | র |
| ✳ | ◇ | ⌑ | ✕ | ■ |
| ই, | উ, | থ | ই | |

ইত্যাদি-ইত্যাদি।

ইংরেজী ভাষান্তরিত ব্যাপারে উক্ত লিপিগুলি ইংরেজী বর্ণমালায় অভিব্যক্ত করা হইয়াছে। শেষ ছত্রের রেখা-লিপির উচ্চারণ-ভেদও আছে। এক্ষণে ভারতীয় সর্বাদি প্রাচীন রেখা-লিপির সহিত সাদৃশ্য বিচার করিলে দেখা যাইবে, যে—উক্ত রেখা দ্বারা বর্ণনির্দেশ করা হইত, ইহার আদর্শ সৈন্ধবী-মুদ্রায় সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং রাঢ়ীয় দ্বার-কপালি-চিত্রে অদ্যাপি চিত্রিত হইয়া থাকে।

সৈন্ধবী মুদ্রা সং ১৪, দুটি দাঁড়ি চিত্র ৫ম চিত্র। ২২ মুদ্রায় ৪র্থ চিত্র। ১৬৮ সং ২য় চিত্রে ৩টি দাঁড়ি। সং ১৬৩ও ২য় চিত্রে ৩টি দাঁড়ি। ১৬ সং ২য় চিত্রে ৪টি, ও ৫৩৭ সং ৮ম চিত্রে ৪টি। ১৬৮ সং ২য় চিত্রে ৩টি, ও ৪র্থে একটি দাঁড়ি।

আলোচ্য লিপির ৪র্থ শ্রেণীর মত হেলায়িত দাঁড়ি-চিত্রের অনুরূপ চিত্র, ৫১১ সং মুদ্রার ২য় চিত্রটি ২টি হেলায়িত দাঁড়ি। এই প্রকারে একাধিক প্রমাণ দেখান যাইতে পারে। অতিরিক্ত পাঁচের অধিক দাঁড়ির ব্যবহার একাধিক মুদ্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। তদুপরি নিম্নরেখ দাঁড়ি-চিত্রও একাধিক আছে। উপর হইতে নিম্নে সজ্জিত একাধিক দাঁড়ি পরপর লিখিত হইত—২১৯ সং ২য় চিত্র। সাতটি দাঁড়ি—নিম্নে একটি সমতল রেখায় যুক্ত হইয়াছে এবং উহার নিম্নে অন্য চিত্র লিপি আছে, এমন উদাহরণ ৩৮২ সং দ্রষ্টব্য। ৫ম শ্রেণীর মত চিত্র সৈন্ধবী মুদ্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

রাঢ়দেশের "বাংলা-নিবিদ" লিপিতে, দাঁড়ি-লিপি একাধিক বিদ্যমান। অদ্যাপি চিত্রিত হয়। অতএব অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, স্মরণাতীত কালে 'রেখা-লিপির' ব্যবহার ভারতের সভ্য জনপদে প্রথমে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। সৈন্ধবী বা রাঢ়ী লেখমালার পাঠ উদ্ধার ব্যপদেশে, এদেশ লুপ্ত রেখালিপির শাব্দিক রূপ কীদৃশ ছিল, তাহা ওগম আদ্য-লিপি পাঠ হইতে হয়ত নির্ণয় করা সম্ভব হইবে। যদিও ওগম-লিপির শব্দরূপ যথাকালে অনুরূপ হইয়াছে।

আদ্য রেখা-লিপির দিক্ হইতে অনুমান করিতে পারি যে, সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ৮ম-৯ম সহস্র বৎসর কালে, পূর্বদেশ-বাসী, ভারতীয়গণ 'রেখা-লিপি' লইয়া য়ুরোপে বাস করিয়াছিল। বৃটিশ ও আইরিশ জাতির আদি পূর্ব-পুরুষেরা এই পূর্বদেশ ভারত হইতে দিগ্বিজয়ে য়ুরোপে প্রবেশপূর্বক প্রায় সমগ্র য়ুরোপ অধিকার করিয়া রাজত্ব করিয়াছিল। ওগম-লিপি মূলতঃ ভারতীয় আদ্য-লিপি-বিশেষ। এই লিপি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ এ প্রবন্ধের উপযুক্ত নয় বলিয়া দিলাম না।

### রুণিক-লিপি

এই লিপি প্রাচীন আইরিশ বর্ণমালা। এই আইরিশ, গ্রীক, কেল্টিক (কেলিক?), ইংলিশ ইত্যাদি দেশের

* ওগম লিপিচিত্র জড় ইংলিশ পুস্তকের ৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সুপ্রাচীন বর্ণমালাবিশেষ। যে জাতি পূর্বদেশ (বৃহত্তর ভারত?) হইতে গিয়া, প্রায় সমগ্র য়ুরোপ অধিকারপূর্বক বাস করিয়াছিল,—সেই লিপিমালাই রুণিক-লিপি, ইহাতে সন্দেহ নাই। মালবার ও রণ-কচ্ছ দেশের আদিম অধিবাসীরা এড়ুক-চিহ্ন রাখিয়া প্রায় সমগ্র য়ুরোপ অধিকার করিয়া বাস করিয়াছিল। এই অভিযানকে ভারতীয়দের দ্বিতীয় দিগ্বিজয় বলা চলিতে পারে। প্রথম অভিযানকারীরা সংগে লইয়া গিয়াছিল 'ওগম' (রেখা-লিপি?) বর্ণমালা। দ্বিতীয় দল য়ুরোপ-দিগ্বিজয়-কালে, সভ্যতার আদর্শ স্বরূপ—রুণিক-লিপি (রণ-লিপি?) লইয়া গিয়াছিল। তখন য়ুরোপ বর্বরের দেশ ছিল (তখন আইবিরিয়ানরা সে দেশে বাস করিত?)। তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পূর্বদেশীরা রাজত্ব করিয়াছিল; সেই পূর্ব-দেশীদেরই বংশধরগণ য়ুরোপের সভ্যজাতি। রুণিক-লিপি ২১টি মাত্র। তথাকালে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ বিভাগ ছিল না, মিশ্ররূপে ছিল। পশ্চিমের বর্ণমালা এখন মিশ্ররূপেই বিদ্যমান রহিয়াছে। আদি ভারতেও তদ্রূপ ছিল।

F, B, Þ, H, M, F, X, Ħ, I, h,
অ, ব, চ, দ-(ড?) ই, ফ, গ, হ র(?), ক

Ϸ, M, X, Ʀ, Σ, R, Ч, T,
ল, স, ন, ও, প, র, স, ট

Þ, h, Æ
থ, য(?) উ (ঙ?)

বৈদেশিক বর্ণপাঠে ধ্বনিপ্রভেদ হইয়াছে। উপরের লিপি-চিত্রগুলি পূর্বদেশীদের প্রবর্ত্তিত লেখমালা। এই লিপিকে বর্ত্তমানে আদিম রুণিক-লিপি বলা হয়। ভারতীয় নাগ-লিপির (খরোষ্টীর পূর্বরূপ?) সহিত রুণিক-লিপির কোন কোন লিপির সুন্দর সুদৃশ্য আছে। রুণিক-প এবং নাগ-প প্রায় সমান। নাগীয় ক এবং রুণিক ক-তে কোন প্রভেদ নাই। এই প্রকারে দেখা যায়—একাধিক রুণিক-লিপি ও ভারতের নাগ-লিপি প্রায় একরূপ এবং কোন কোনটির চিত্রে সামান্য ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সৈন্ধবী মুদ্রালিপি এবং রাঢ়ী নিবিদ্ লিপির সহিত প্রায় এবং কতক পরিমাণে সমসাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। এস্থলে প্রতি বর্ণ লইয়া আলোচনার স্থান নাই এবং এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও নয়। তত্রাচ অ, চ, দ, গ, র, ক, ল, স, ন, ও *, প *, স, ট ইত্যাদি রুণিক-বর্ণচিত্র তুল্য চিত্র সৈন্ধবী মুদ্রায় দৃষ্ট হয়। বিশেষ ও এবং প উল্লেখযোগ্য। সৈন্ধবী মুদ্রার সং ১৩৫, ১৫০, ৪৭৯, ১৫৮, ৩৫০, ৪১৭, ২৫৮ ইত্যাদি মুদ্রার লিপি-বিশেষের সহিত ও এবং প-বর্ণের যৌগিক চিত্রের সুন্দর সাদৃশ্য-রূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

রাঢ়ী কপালী লেখমালার বর্ণবিশেষের সহিত, সৈন্ধবী মুদ্রার ১, ২৪, ১০ ইত্যাদির যৌগিক বর্ণচিত্রে কোন প্রভেদ নাই। উভয় চিত্র দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, এমন সৌসাদৃশ্য সমলিপি ব্যতীত হইতে পারে না। একাধিক রাঢ়ী-লিপি ও সৈন্ধবী-লিপি এক প্রকার। সৈন্ধবী মুদ্রা লেখমালাপাঠের বিশেষ সাহায্য করিবে রাঢ়ী-লিপি।

প্রাচীন ভারতীয় সংখ্যাবিজ্ঞাপক চিত্রগুলি মূলতঃ আক্ষরিক চিত্রবিশেষ। যথা (খ্রীঃ ১ম ও ২য় শতকের) ৫ সংখ্যা একাধিক প্রকার নাগীয় 'ক' লিপির সমান। এবং এই চিত্রের সহিত রুণিক 'ক' চিত্র একেবারে একাকার। সৈন্ধবী মুদ্রায় ৭০ চিত্রটি রুণিক-ন। রুণিক-ট-বর্ণটি, নাগীয় ব-তুল্য। রুণিক স-টি নাগীয় দ বর্ণ-বিশেষের তুল্য। এবং বংভীর বিপরীত সংস্থিত ষ-তুল্য। +

তৃতীয় প্রকার ভারতীয় লিপি রুণিক-লিপির পরবর্তী-কালে পূর্বদেশীরা (ভারতীয়গণ) সমগ্র য়ুরোপে প্রচার করিয়াছিল। সেই সৈন্ধবী ও রাঢ়ী-লিপির আদর্শ য়ুরোপের প্রায় বিশেষ বিশেষ স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কিছু বিবরণ বঙ্গীয় মহাকোষের অক্ষর-তত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবাসীরা তৃতীয়বার য়ুরোপে দিগ্বিজয়ে গিয়া দেশ অধিকারপূর্বক বাসকালে, সৈন্ধবী ও

---

* এই চিত্রলিপি গুড ইংলিশ পুস্তকের ৭৪।৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। উক্ত পুস্তক হইতে গৃহীত।

+ 'বাংলা ভাষা ও লিপির ক্রমবিকাশ' নামক পুস্তকে বিশেষ আলোচিত হইয়াছে (যন্ত্রস্থ)

রাড়ী লিপির প্রবর্ত্তন করিয়াছিল এবং তথাকালের ভারতীয় ভাষা (ধাতু-ভাষা বিশেষ?) প্রচার করে। আমরা লিপি-সাহায্যে, ভারতীয়দের তিনবার য়ুরোপ-বিজয়ে যাইতে দেখি। খ্রীষ্টপূর্ব অনুমান অষ্টম সহস্র অব্দ হইতে, খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ বা ৫ম সহস্র অব্দের মধ্যে ভারতীয়গণ তিনবার (আক্ষরিক তত্ত্ব হিসাবে) য়ুরোপবিজয় করিয়াছিল। য়ুরোপকে সভ্যতা দান করিয়াছিল পূর্বদেশী ভারতীয়গণ। লিপির দিক্ দিয়া ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। এই দীর্ঘকাল মধ্যে অভারত হইতে এরিয়ন আগমন ব্যাপার একেবারে কথা-পুরুষীয় উপাখ্যান মাত্র। কেহ কেহ বলেন, নিবিদ্ নামক সূক্ত এরিয়নরা ভারতে প্রবেশের পূর্বে রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিবিদ্-বিশেষে রথ ও রথীর উল্লেখ আছে (সম্ভবতঃ ধাতবযুগ), তথাকালে কি এরিয়নগণ রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিতেন? দেখা যায় নিবিদ্ মন্ত্রের প্রত্যেক শব্দ পদাদি ভারতীয় আদ্য প্রাকৃত শব্দবিশেষ (ধাতু) দ্বারা গঠিত। লিপির দিক্ দিয়া, ভাষার দিক্ দিয়া দেখিতে পাই, পূর্বদেশবাসী ভারতীয়গণই য়ুরোপকে সভ্যতা শিক্ষা দিয়াছিল, লিপি-বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিল এবং ভাষাও শিক্ষা দিয়াছিল।

এলামাইট * এবং মিনোয়ান † লিপি—ভারতীয় রাড়ী লিপির বিকৃত রূপ মাত্র। আমাদের বিশ্বাস, পূর্বদেশী ভারতীয়গণই য়ুরোপকে লিখিতে, পড়িতে, সুষ্ঠভাষা বলিতে শিক্ষা দিয়াছিল। প্রবাসী ভারতীয়গণই মধ্যে মধ্যে দলে দলে ভারতে পুনরাগমন করিয়াছিল। এই ঘটনা-বলম্বনে, এরিয়ন আগমনমূলক কথা-পুরুষীয় উপাখ্যান রচিত হইয়াছে।

* Elamite (proto Elamite inscription
† Minoan (inscription)

---

# মধুসূদন

শ্রীগঙ্গাধর রায়চৌধুরী এম-এ

তুমি এসেছিলে এই বঙ্গের অঙ্গনে
ভাবের মুরলী করে; নিপুণ বাদনে
রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার তুলিলে বিচিত্র সুর
করুণ কোমল, মরি, উদার মধুর।

স্রষ্টা ছিলে তুমি; কাব্য রচি' নব ছন্দে
অর্ঘ্য দিলে বঙ্গ-বাণী-পদ-কোকনদে;
দেখাইলে নব্য পথ কাব্য-রচনার
নবীন লেখক-দলে—সরল শোভার।

চয়ন করিলে তুমি দূরপশ্চিমের
ভাব-পুষ্প-রাজি; মিলাইয়া ভারতের
ফুলে গাঁথিলে অনিন্দ্য মালা সুনিপুণ
মালাকার তুমি; মুগ্ধ হ'ল গৌড়জন।

আঁকি' দিল বুঝি তাই, হে বাণী-সেবক
তব ভালে বঙ্গ-মাতা গৌরব-তিলক।

# গ্রহ-চক্র

( একাঙ্ক নাটিকা )

শ্রীমতিলাল রায়

## নাট্যোল্লিখিত পাত্রপাত্রীগণ

পাত্র

শ্রীবৎস—প্রাগ্‌দেশপতি, বাহুরাজ, শনি—গ্রহদেবতা, সেনাপতি, প্রধান সচিব।

দৈবজ্ঞ, পুরোহিত, সওদাগর, দুইজন চোর, প্রভাত-ফেরীর দল, ধীবর, নাবিক, বিদ্রোহী প্রজাগণ, পথিক, প্রহরী ও সৈনিক।

পাত্রী

চিন্তা—শ্রীবৎসের পত্নী, ভদ্রা—বাহুরাজ-কন্যা, লক্ষ্মীদেবী।

পূজারিণী ও কাঠুরিয়া রমণী।

## প্রথম দৃশ্য

স্থান :—শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দির। সময়—গভীর রাত্রি। মন্দিরাভ্যন্তরে বিগ্রহের পদতলে পূজা-শেষের ফুলগুলি ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। এক পার্শ্বে একটি প্রদীপ। প্রদীপের শিখা ক্ষীণ হইয়া জ্বলিতেছে। পূজার নৈবেদ্য ব্যতীত শঙ্খ, ঘণ্টা, কাংস্য প্রভৃতি সবই আছে। দুইজন চোর দেবীর অঙ্গ ভূষিত রত্নালঙ্কারাদির প্রতি চৌর্য্য-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে।

১ম চোর—আরে ছ্যাঃ, এখনও তোর হাত সাফাই হয়নি! এদিকে রাত পুইয়ে এল। পূর্ব্বদিক ফরসা, আর ভরসায় কুলোয় না; কচ্ছিস্ কি বল দিকিনি?

২য় চোর—ঠাকুরের সোণা-জহরতের যত গহনা একেবারে গায়ে গায়ে গাঁথা, খুলব কি বল, রগড়া-রগড়ি করে' একছটাক সোণাও উঠ্‌ল না—মণি, মুক্তো, পান্না এমনই আঁটা, ছেনী হাতুড়ি না হলে ছাড়াবার যো নেই।

১ম চোর—এতক্ষণ ধরে' তোর এই জ্ঞান হ'ল, আগে বল্লেই তো হ'ত; এখন দেখছি পাক ঘাঁটাই সার হ'ল, মাছ আর ধরাতে জুটল না। যদি সোণা-দানা ঠাকুরের গায়ে গাঁথা, তবে বসে' বসে' করছিস্ কি? ঠাকুরের অঙ্গসেবায় লেগে' গেলি না কি?

২য় চোর—সত্যি বলেছিস্—ঠাকুরের অঙ্গ-ছুঁতে, গা উঠেছিল শিউরে। চুরি বিদ্যে—ধর্ম্ম-কর্ম্ম গোল্লায় যায়; তবুও গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে ঠাকুরের পায়ের নূপুরে হাত দিয়েছি আর ছ্যাঁৎ করে' কি যেন সর্ব্বশরীরে ঢুকে' গেল। হাত দুটো সারা অঙ্গে ঘুরে' মরে, যেন জড়িয়ে যায়। হাত ছাড়াতে পারি না।

১ম চোর—ব্যাটা মরেছে! এই সহজ কাজটা তোর দ্বারা হ'ল না। চারিদিকে ঘুরি, কারও পায়ের আওয়াজ পাই তো চোঁ-চাঁ দৌড় দিতে হবে। একদিকে কাণ খাড়া আর চোখের দৃষ্টি ঘুরছে লাটিমের মত বন্-বন্ ক'রে। শান্ত্রীপাহারার কড়া নজর এড়িয়ে ঢুকেছি কত কায়দায়, বেরোবারও ফিকির চাই, যা পারিস্ দু'হাতে নে। ঐ কারা আসে—আমি সট্‌কাই—।

২য় চোর—দোহাই খুড়ো, আমায় একটু টান দে। হাত ছাড়াতে পারছি না; ক্রমেই জড়িয়ে যায় ঠাকুরের পায়। ঐরে প্রভাতফেরীর গলা; হ'ল ভোর। মানুষকে ভূতে পায়, আমাকে বুঝি দেবতায় পেলে বাবা! আমায় একটা হেঁচ্‌কা দিয়ে তোল্।

১ম চোর—ব্যাটা ভারী আনাড়ী তো! নেশার ঘোর কাটেনি। শুধু হাতেই ফিরতে হ'ল। আয় ব্যাটা আহাম্মক্, বাইরে গিয়ে মজাটা দেখাব। (হ্যাঁচকা দিয়া দ্বিতীয় চোরকে লইয়া প্রস্থান)

পথে প্রভাতফেরীর দল

গান

ধীর সমীরে প্রভাত আওল
অলিকুল দুলল কুসুম পরাগে।
আগে জাগে প্রভুপদযাত্রী
সুর-কণ্ঠে পুরবাসী জাগে।

(প্রভাত ফেরীর দলের প্রস্থান)

(চোরদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

১ম চোর—দোস্ত, দেখি বেটা কি ফ্যাসাদেই ফেল্লি! শান্ত্রী-প্রহরী দৈনী মল্‌ছে, ডাঁলিমের মত চোখগুলো,

—ফটক জুড়ে' পাইচারী করছে, এখন বেরুই কি করে'?

২য় চোর—বেরিয়ে আর কাজ নেই খুড়ো, পেটের খোরাক লক্ষীর প্রসাদেই মিটবে। চুরি বিদ্যে বড় বেয়াড়া কাজ। গা ছম্ ছম্, আর পেটের পিলের চমক্, ভূত কি মানুষ, বুঝতেই দেয় না।

১ম চোর—এত বড় কাজটা বেটা বেল্লিককে এনে' পণ্ড হ'ল। শুধু হাতে ফেরা হবে না, চিল পড়লে কুটা নেয়। রূপোর কোশাকুশি আর ঐ পুষ্পপাত্রখানা ছাড়া হবে না, নে বেটা বগলে পুরে, আয় ঝট্ করে'; যাত্রীর দল আস্‌বে রাস্তা জুড়ে', সেই ফাঁকে সট্‌কে গিয়ে পড়ব।

(উভয়ের প্রস্থান)

(পূজারিণীগণের প্রবেশ)

গান

জয়দে জলধিজা, লোকমাতা ভার্গবী
কান্তি-কীর্ত্তি-ঋদ্ধিদায়িনী
বিষ্ণুপ্রিয়া মহাদেবী।
জয় ত্রৈলোক্য-পূজিতে, বিষ্ণুবল্লভে,
জয় ক্ষীরোদ সিন্ধু কন্যা
সর্ব্বমঙ্গলসাধিকে—
নারায়ণী বরদায়িনী
পরমানন্দ উৎসবে।
জয় শ্যামা মৃগাক্ষী
পূজি রক্তচরণ-করবী।

[ পটক্ষেপণ ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—অন্তঃপুর। সময় প্রভাত। রাজমহিষী চিন্তাদেবীর সুবর্ণ পালঙ্ক, তারই পার্শ্বে একটি রৌপ্যনির্ম্মিত ধূপাধারে ধূপের সুরভি ধূম্ররাশি উড়িতেছে।

(দৈবজ্ঞের প্রবেশ)

দৈবজ্ঞ— রাণী মা কোথা? রাণী মা কোথা?

(চিন্তার প্রবেশ ও প্রণাম)

শুন মাতঃ, অশুভ বারতা,
আজি নিশাশেষে
শনির প্রকাশ রাজদেহে,
অমঙ্গল দেখিনু গণিয়া।
মিথুন, কর্কট, বৃষ, কন্যা, কুম্ভ,
শুভ ফল শুভ চন্দ্রে।
মিথুন, বৃশ্চিক,
সিংহ, তুলা, মেষ নাহি চন্দ্রশুদ্ধি;
গোচর অশুদ্ধি—
অতীব অশুভ ফল।
তাই আসি ছুটি',
গগনে তপন উদয় না হতে
অশুভ শনির দান করাতে তোমায়।
ডাকি' গ্রহবিপ্র জনে—দাও মাগো
তৈল, তিল, বস্ত্র, ভোজ্য আদি।
স্বর্ণ, লৌহ, নীলকান্ত মণি।
মহিষ অভাবে স্বর্ণমূল্য কর দান।
রাজার কল্যাণ-কাম সতত আমার।
সাধ্বী তুমি, গ্রহশান্তি নিশ্চয় হইবে।

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরোহিত— রাজরানি! অভয় কর মা দান।
পূজার মন্দিরে প্রবেশিয়া তস্কর অধম
হরিয়াছে পূজার বাসন।
কি জানি কি হবে—
অপবিত্র দেবীর প্রতিমা!
বিনা অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্ত
পূজা বন্ধ অবশ্য রহিবে।

চিন্তা— একি সর্ব্বনাশ! কমলার পূজা বন্ধ হবে?
কুস্বপন দেখিনু ভীষণ,
নিদ্রা নাহি যাই আর।
দক্ষিণ নয়ন করিছে নর্ত্তন সদা।
শুষ্ক-মন, সরে না বচন—
চিন্তানল উদ্ধ শিখা ধরে।
কি হবে, কি হবে!
রাজার মঙ্গল কিসে রবে!
দৈবজ্ঞ-প্রধান, শুন মোর বাণী—
শুন রাজপুরোহিত,

রাজকোষ রবে মুক্ত।
রাজার কল্যাণ কর।
আয়োজন যেবা প্রয়োজন।
রাখ মান কমলার, রাখ সবে
রাজার সম্মান ; দেবতা প্রসন্ন কর।

(চোরকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী— রাজরাণি, প্রণমি চরণে।
প্রভাত না হ'তে
কমলার মন্দিরদুয়ারে,
দুই ব্যক্তি বাহিরে যাইতে চাহে।
পরিচিত নহে ভাবি,
আদেশ করিনু অপেক্ষিতে।
একজন পলাইল দ্রুত,
পশ্চাৎ-ধাবন প্রহরীরা করে।
এই ব্যক্তি নারিল পলাতে—
ধৃত করিয়াছি এরে। সঙ্গে হেরি
পূজার বাসন। তস্কর দুর্জ্জন—
রাজদ্বারে প্রেরণের আজ্ঞা চাহি মাতা।

চিন্তা— অতি দুর্লক্ষণ।
শুনরে প্রহরী!
অর্থাভাব, অন্নাভাব রাজ্যে যদি হয়,
দস্যু-তস্করের ভয়, প্রজাকুল
আতঙ্কিত হয় অতি।
লক্ষ্মীর মন্দির ঘেরি' আমার নগরী—
তবু কেন তস্করের ভয়!
কেন হীনমতি দেবধন করিল হরণ ;
কত পাপ নাহি জানে!
রাজদ্বারে করিলে প্রেরণ,
দীর্ঘ কারাদণ্ড হবে কঠোর বিচারে।
আছে পিতা, আছে মাতা,
আছে দারা, পুত্র, সুতা—
অশ্রুময় হইবে সংসার।
যে সামগ্রী করেছে হরণ—
দেবপূজা তাহে নাহি হবে আর।
শুনরে তস্কর, পরধন
হরণ না কর আর।
লহ মোর মুক্তাহার—
পাবে ধন বিনিময়ে বহু।

চোর—রাণীমা! ঠাকুরের বাসন ঠাকুরের থাক্‌। রাজরাণীর গলার হার সইবে না আমার। সাপের মত কামড়াবে, জ্বলে' মরব। প্রণাম করে' যাই ; আজ এই রেহাই— চিরদিন মনে থাকবে। চুরি-বিদ্যে এইখানেই শেষ করে' যাই। আমার প্রণাম নাও মা।

(চোরের প্রণামান্তে প্রস্থান)

চিন্তার গান

জয়দে করুণাময়ী,
কমলা, কর মা করুণা ;
তুমি চির চঞ্চলা,
আমারে কভু মা ছেড়ো না।
ওমা রমা, রমেশ-রমণী,
দিও মা আশ্রয়,
তব চরণ দুখানি।
ওমা ও কমলপাণি!
থাক মা চির অচলা।

(শ্রীবৎসের প্রবেশ)

শ্রীবৎস— রাণি! রাণি!

চিন্তা— কেন মহারাজ, অসময়ে শ্রীমন্দিরে?

শ্রীবৎস— রাণি, স্থির নহে মন।
অলক্ষণ হেরি চারিদিকে।
আজি উষা হ'লে আগমন—
শোভন বরণ নাহি হেরি,
যেন রাজ্যময় শোণিত বর্ষণ করে—
নানা ভয় প্রেতমূর্ত্তি ধরি'
করে নৃত্য তাণ্ডব ভীষণ।
আরও মনে হয়, ছাড়ি' আনুগত্য
রাজ-কর্ম্মচারী যত, দারুণ বিপ্লবরত—
রাজরক্ত হেরিবারে চাহে।
স্নানাগারে হেরিলাম
সারমেয় পরম অদ্ভুত ;
গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ লোম,
রক্তবর্ণ ঘুরিছে নয়ন, জিহ্বার মেলনে

অগ্নিশিখা উঠে জ্বলি'।
স্নানপাত্রে সুবাসিত জল
চুমুকে নিঃশেষ করি'
নাড়িয়া লাঙ্গুল অবহেলে গেল চলি'।
শিহরিল আতঙ্কে পরাণ।

চিন্তা— হে নরশার্দ্দূল! বিক্রমে তোমার
কাঁপে ধরা, অরিকুল আতঙ্কিত সদা।
কেন তুচ্ছ ঘটনায়
হৃদয় সশঙ্ক তব প্রাণনাথ!

শ্রীবৎস— প্রতিদিন সহজ ঘটনা যাহা—
আজ তাহা অরিষ্ট-লক্ষণ মনে হয়।
আরো শোন রাণি!
চারণ গাহিয়া গেল—
প্রতিধ্বনি উঠিল গগনে
অতীব বিকৃত শব্দে, অর্থসচিবের
মরম করিল ভঙ্গ। দৈববাণী সম
কে যেন হাঁকিল—
বিকল হইবে অঙ্গ। দারা, পুত্র
ত্যজিবে তোমায়। অর্থ, বন্ধু,
রাজ্যনাশ অবশ্য হইবে।

চিন্তা— শঙ্কা কর দূর। বুঝি রাত্রে নিদ্রা
নাহি হয়। গুরুতর রাজকার্য্য—
সচিবেরা শ্রম তব না করে লাঘব?

শ্রীবৎস— না, না রাণি! ভয় মোর নহে অকারণ।
শুন আরও দুর্লক্ষণ।
ব্রাহ্মণের স্বস্তিবাণী
নাহি দিল শান্তি বুকে।
তবু রাজ-সিংহাসনে,
যথারীতি লইনু আসন।
অপরূপ প্রথম বিচার।
এক নারী অনিন্দ্যমাধুরী,
করুণ নয়নে চাহি' যাচিল প্রার্থনা।
দেখাইয়া কৃষ্ণমূর্ত্তি
অজ্ঞাত ব্রাহ্মণ এক—
কেবা উচ্চ, কেবা নীচ
বিচারে জানাতে কহে।
উন্মাদিনী ভাবি' ধাইল প্রহরীদল।
কিন্তু সে রমণী
আঁখির ঝিলিক তুলি' যেন
অচল করিল সবে।
কহিল গম্ভীর নিখাদ সু-স্বরে—
শুন রাজা, 'আমি বিষ্ণুপ্রিয়া কমলা স্বয়ং।
রবিসুত এই শনিদেব।
ত্রিদিবে বচসা হয়—কেবা বড়, ছোট।'
সহসা হাঁকিল বজ্র। কৃষ্ণকান্তি
ব্রাহ্মণ কহিল—'আসিয়াছি
বিচার প্রার্থনা করি'।
তুমি নীতিবিৎ, ধর্ম্মপ্রাণ মহীপতি,
আমি শনি বিদিত ভুবনে।
জান তুমি—যে করে কমলা-সেবা
অসার সংসারে ডুবিয়া সে মরে সুখে।
কেহ ছাড়ে পুত্র, সহোদরে।
কেহ হত্যা করে আপন জনকে।
কেহ করে মাতৃ-নির্য্যাতন।
পতি সতী ছাড়ে।
পত্নী প্রত্যাখ্যান করে পতি।
আমি শুধু অনিত্য এ ভবে—
ধর্ম্মে মতি দিই নরে হরি' অর্থ,
হরি' যশঃ, অপহরি' অনিত্য দেহের কান্তি।
তুচ্ছ নয় কৃপায় আমার
মোক্ষ লাভ করে অনায়াসে।
হের ত্রিভুবনে গুরুমূর্ত্তি
আমি সবাকার। কৃপায় আমার
দারিদ্র্য, দুর্গতি, দুঃখ; কিন্তু
মহাজ্ঞান নাশ নাহি পায়।
অনিত্য বন্ধন করিতে মোচন,
হৃদয় করুণাভরা।
যেথায় আসক্তি, সেথায় বিপত্তি।
মোহমুগ্ধ মানুষ না বুঝে। কৃপায় আমার
অনাসক্তি, মহাশক্তি পায় লোকে;

মুক্তির অমৃতে মর্ত্ত্য ধন্য চির যুগ।
মহারাজ! শ্রেষ্ঠ কেবা,
বিচার ত্বরায় কর।

চিন্তা— তারপর নরনাথ?

শ্রীবৎস— শুন প্রিয়ে। নিরুত্তর নাহি
রহে বালা। ভ্রুকুটি-কটাক্ষে
কহে উপেক্ষায়—'আহা, শনি বড় কৃপাময়!
শিবের তনয় হারাইল শির
করুণাময়ের দৃষ্টিগুণে!
বিধাতা পরায় ঠুলি, নয়ন রুধিয়া রাখে,
নহে সৃষ্টি হয় ছারখার।
তবু যেথা চরণ-সঞ্চার,
হাহাকার উঠে তথা। সলিল শুখায়,
রাজ্যহারা হয় রাজা। মহাগুরু যারে
করে দয়া, কায়া-জ্ঞান যায় তার।
ভ্রমে একা ছায়া হয়ে। কেহ জীর্ণ
মহারোগে, বিকৃত মস্তিষ্ক কেহ।
কেহ বৃথা চোর অপবাদে, কারাক্লেশে
যাপে দিন। আহা দয়াময়!
কত দয়া সর্ব্বজন জানে।'

চিন্তা— শ্রেষ্ঠস্থান বিচারে কে পায় রাজা?

শ্রীবৎস— জানতো মহিষি! দক্ষিণে ব্রাহ্মণবর্গ
রত্নাসনে করেন আসন। বামে
রৌপ্য সিংহাসন সচিবমণ্ডলীতরে।
ইতস্ততঃ কিছুক্ষণ করি'
উঠি ছাড়ি' কনক-আসন আপনার,
উভয়েরে যাচিনু শ্রদ্ধায়—সমাসীন
হতে সুখে। ধীরে বলি—
'বিচারিব ভাবিয়া চিন্তিয়া।'
কিন্তু ভস্মাবৃত অগ্নিমূর্ত্তি শনি হাঁকি' কহে—
'রহ তুমি মহারাজ নিজাসনে;
তব দুই পার্শ্বে বসিতেছি মোঁহে মোরা।'
রমণী বসিলা বামে।
ব্রাহ্মণ কহিল ত্বরা—'বিষ্ণুপ্রিয়া
লক্ষ্মী মহাদেবী, নররাজ শ্রীবৎসের
বামে ভাগে তাঁহারে না শোভে।'
কমলা হাসিয়া ত্বরা দক্ষিণে বসিলা।
বিপ্র বসে বামে রৌপ্যাসনে।
সভাসদ্ উচ্চহাস্য করিল সহসা।
ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ কহিল—
'কর রাজা, কি তব বিচার।'
আমি কহি—'বিচারের নাহি প্রয়োজন।
কেবা উচ্চ, কেবা নীচ নিরূপণ তার ব্যবহারে।
স্বর্ণ-রৌপ্য তুলনা সুস্পষ্ট—
রৌপ্য হতে স্বর্ণ শ্রেষ্ঠ কেবা না বলিবে!'

চিন্তা— ধর্ম্ম রক্ষা করেছেন নর-নাথ।
শুনি—শনি পাপগ্রহ।
নারায়ণ হৃদয়-রতন রমা।
শ্রেষ্ঠাসন কমলার সর্ব্বত্র নিশ্চয়।

শ্রীবৎস— কিন্তু মহাভয়! কোপে বিপ্র
লইল বিদায়। মাথার উপরে
হেমছত্র অকস্মাৎ উঠিল জ্বলিয়া।
রাজপথে উঠে হাহাকার।
ব্রাহ্মণের অনল-নিশ্বাস ঘরে ঘরে ফিরে,
বিশৃঙ্খল ঘটে চারিধারে।
কারাগার হয় রক্ষিহীন।
মুক্ত দুর্ব্বৃত্তের দল বিপণি লুটিয়া লয়।
কোটাল বিহ্বল, সচিবের দল করে ছুটাছুটী।
শনি রুষ্ট। মস্তক ঘুরিয়া পড়ে,
জ্বলে শিরে তীব্র অগ্নিশিখা।
কাঁপে হিয়া দুরু-দুরু। কি জানি কি হবে—
যেন রাজ্য যাবে রাণি,
তোমাকে ছাড়তে হবে।
হা-হা, হা-হা অন্তরীক্ষে উঠে কলরব!
বুঝিবে না কি যন্ত্রণা পলকে পলকে সহি।
ঐ আসে প্রধানসচিব।
বিপদ্ বারতা বুঝি আনে!

(প্রধান সচিবের প্রবেশ)

প্রধান সচিব—মহারাজ, অতি অনস্তব। হাট-বাট,
বিপণি, বাজার দস্যুগণ লয় লুটে।

দুর্গে দুর্গে বিপ্লব-অনল জ্বলে।
প্রধান কোটাল হত।
রাজভক্ত সেনাপতি তূর্য্যধ্বনি করি'
সশস্ত্র সেনানী ডাকে—
কেহ কার আজ্ঞা নাহি মানে। জনে জনে
স্বার্থসিদ্ধি চাহে অরাজক রাজ্যমাঝে।

শ্রীবৎস— শুন রাণি, অকস্মাৎ বিপদ্ ঘনায়ে এল,
সত্য, রন্ধ্রগত শনি।
হের ভূকম্পনে নাচিছে ধরণী।
হের অট্টালিকা ভূশায়ী হইবে ত্বরা।
ঐ যে নগরী, হর্ম্যশোভা অপরূপ—
বনভূমি হবে আচম্বিতে।
কোন পথ নাই আর।
রাজশক্তি যেন অপহৃত।
কিন্তু রাণি, হতভাগ্য নহি আমি,
ভাগ্যবতী ঘরণী আমার। শুন,
বিপ্লবদমন হেতু ধরি' বজ্রদৃঢ় করে
এই যুদ্ধ-অসি, সমরে বিজয়ী হব।
শনিগ্রহে অবশ্য নাশিব॥
বাহুবলে রাজ্যরক্ষা হইবে নিশ্চয়।

(চোরের প্রবেশ)

চোর—কোথা যাবে রাজা? তোমার প্রধান সেনাপতি বিদ্রোহী সেনাদের হাতে নিহত হল। যত চোর, যত দস্যু রাজপ্রসাদ লুটে' নিতে ছোটে। দ্বিতীয় সেনাপতি রাজমুকুট মাথায় পরে', চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে ছুটে আসে এই দিকেই। মহারাজ, পালাও, পালাও। প্রাণরক্ষা কর মহারাণি।

(প্রস্থান)

চিন্তা— সর্ব্বনাশ সম্মুখে আমার! ওরে প্রাণ,
পতি তোর শনিগ্রস্ত, বিপন্ন কাতর।
শান্ত হও, যদি পুণ্য কিছু থাকে মোর।
মোর পতিসেবা ধর্ম্ম হয়।
যদি ধর্ম্ম মহাভয়-নাশের কারণ,
শুন গ্রহরাজ, রোধিব তোমায়।
কমলাকৃপায় অজেয় হইবে নৃপ।
মহারাজ, ক্ষান্ত হও।
ভাগ্যবতী আমি—
কোষ-রুদ্ধ কর অসি।
এ আহবে বৃথা প্রাণ যাবে।
অভাগিনী কর না আমারে। চল গুপ্তদ্বারে—
পতিভিক্ষা যাচে চিন্তা তব।

(রক্তাক্ত সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক— মহারাজ, রাজপুরী শ্মশান হইল।
মাত্র শত রাজভক্ত সেনা, একে একে দেয় প্রাণ
সহস্র সহস্র বিপ্লবীর সনে করি' রণ।
প্রাণ লয়ে আসিয়াছি নর নাথ;
রাজরক্ত-রক্ষার কারণ।

(দূরে কোলাহল)

ঐ আসে বিপ্লবীর দল।
যত ক্ষণ প্রাণ, রক্ষিব তোরণদ্বার।
কিন্তু মহারাজ, আত্মরক্ষা বিহিত এখন।

(প্রস্থান)

(চোরের পুনঃপ্রবেশ)

চোর—মহারাণি, রাজার হাত থেকে ঐ লক-লকে তরবারিটা আমায় দাও। দুটো বিদ্রোহীর মাথা কেটেও যদি মর্‌তে পারি, মায়ের মান-রক্ষা হবে।

শ্রীবৎস— রাণি! ভীরু নহি আমি।
পরাজয়-বাণী
অন্তর আলোড়ি' তুলে।
ভাবি শুধু—কি উপায় হবে তব!

চিন্তা— মহারাজ! গ্রহকোপ-নিবারণ নহে যতক্ষণ,
রণে তব নাহি জয়।
এমন দশায় ক্ষেত্রত্যাগ রাজধর্ম্ম।
পতি তুমি, সতী হই যদি,
ফিরিয়া আসিব দোঁহে।
জয়চ্ছত্র উড়িবে গগনে
না হইতে বৎসর পূরণ।
ফেল অসি। (চোরের প্রতি) লহ বৎস,
রাজকার্য্য করহ সাধন—(চোরের প্রস্থান)
গ্রহকোপে ভিখারী স্বামীর

ভিখারিণী সহচরী আজি!
কমলার রেখেছ সম্মান।
পাপগ্রহ চিরদিন না রহিবে।
যথা লক্ষ্মী, তথা নারায়ণ—
সুপ্রভাত পুনরায় আসিবে নিশ্চয়।
এস রাজা, ভাগ্যবতী দাসী।
তোমার আমার মাঝে
নাহি আজ কোন ব্যবধান।
নাহি রাজ্য, নাহি ভোগ,
খ্যাতি, যশঃ কিছু নাই আর।

(হস্ত ধরিয়া উভয়ের প্রস্থান)

[পটক্ষেপণ]

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান :—গভীর অরণ্য। সময় প্রাতঃকাল। অরণ্যের বক্ষে পড়িয়াছে পথিকের পথ। সেই পথে রাজা শ্রীবৎস ও তদীয় রাজ্ঞী চিন্তাদেবী চলিয়াছেন।

শ্রীবৎস— ফের, ফের রাণি। পতি আর নাহি তোর—
স্বার্থপর পথের ভিক্ষুক আমি। ক্ষুধিতের
কত জ্বালা বুঝি নাই এত দিন; পাই যদি
সুখাদ্য সম্মুখে, মনে হয়
বঞ্চিব তোমায়, নিজের
জঠরজ্বালা করিতে পূরণ।
ওঃ, কত রক্ত চরণে তোমার!
কণ্টকপ্রহারে, কি যন্ত্রণা সহ স্বামী সনে!
ভাবি—বনভূমি অতিক্রম করি' পাব গ্রাম,
জুড়াইব জঠরযন্ত্রণা।
সম্মুখে বিশাল নদী! দুর্ব্বল চরণ, ফিরিবার
সাধ্য নাহি আর। ফের তুমি রাণি।
শনিগ্রস্ত আমি, চন্দ্রমুখি,
তুমি কেন সহিবে যন্ত্রণা!

চিন্তা। প্রাণেশ্বর! অবলার ধর্ম্ম তুমি।
তুমি কায়া, আমি ছায়া তব। তুমি তরু,
আমি শোভা কুসুমিত লতাসম।
তোমার বিহনে এ জীবনে
কিবা প্রয়োজন নাথ?
তুমি দুর্লঙ্ঘ্য হিমাদ্রি,
আশ্রয়ে তোমার সুশীতল তটিনীর ন্যায়,
তব সঙ্গে সুখ-বিচরণ। তুমি নাই,
আমি নাই প্রিয়। শুন মোর পরম দেবতা।
আমা হেতু চিন্তা বৃথা;
যেথা তুমি, সেথা আমি জীবনে মরণে।

শ্রীবৎস— একি পাপ! তোমার বচন বৃশ্চিক-দংশন
সম; যাও, যাও, একা আমি
এ বিশ্ব সংসারে। শৌর্য্য, বীর্য্য
কিছু নাহি মোর। গেছে রাজ্য,
গেছে খ্যাতি, মান।
কি হেতু রহিবে তুমি? শুন চিন্তা,
কঠোর কুলিশ-বাণী। কথা মাত্র শুনি,
কে বা কহে খুঁজিয়া না পাই!
পলকে হারাই আপনাকে; যেন
হাওয়া হয়ে শূন্যে শূন্যে চলি।

চিন্তা— হায় মা বরদা! শনির ছলনা—
পতি মোর সতীরে ত্যজিতে চাহে।
বর দে মা! পতির চরণতলে
র'হি চিরদিন, পতিসেবা
করিবারে পারি যেন।

শ্রীবৎস— নিদাঘ গগনে জলদখণ্ডের ন্যায়
ক্ষুদ্র এক তরণী আসিছে।
বুঝি পার করে পথিকেরে।
ওরে ও নাবিক, আয় ত্বরা,
ক্ষুধার্ত্ত আমরা, ও পারে কি
আছে হাটবাট!

(তরী লইয়া নাবিকের প্রবেশ)

নাবিক— ইস্, গায়ের ঝাপ্পি ঝুপ্পি
হীরে জহরতে জোড়া। একটু
জলে নৌকা রাখি, জলে নাব্‌লে
ভিজে যাবে জামাজোড়া; তখন
খুলিয়ে নিয়ে পোষাকপরিচ্ছদ,
টেনে দেব পাড়ি।

(প্রকাশ্যে)

পারে যাবে তো আগাম চাই দু'কুড়ি কড়ি—
তবে নৌকা ঘাটে ভিড়ি।

শ্রীবৎস— ওরে মাঝি, কড়ি নাই, করুণা তোমার,
পার ক'রে দে রে ত্বরা। পথের ভিক্ষুক মোরা।
এই পুণ্যে স্বর্গলাভ হবে তোর।

চিন্তা— রাজ্যেশ্বর পথের ভিখারী!
দু'নয়নে আঁখিনীর রোধিতে না পারি;
ফাটে বুক, এ মরম-দুঃখ
সহিতে পারি না আর।

শ্রীবৎস— চিন্তা, চিন্তা! এখন অনেক বাকি।
কত অশ্রু আছে তোর চোখে!
ক্রমে সব শুখাইবে, কঠিন প্রস্তর হবে
নয়নের তারা দুটী।
পদ্মনেত্রে! এখনও নিকটে আছ,
হেরি' মুখ পাই সুখ; বুঝি
অচিরে হারায়ে যাবে।
অহো, ভাবিতে বিদরে বুক,
বল, বল চিন্তা—
সাথী তুমি রবে চিরদিন?

চিন্তা— নাথ! নাথ! চরণের ধূলি আমি।
কোথা যাব তোমারে ছাড়িয়া?
কোন শঙ্কা নাহি প্রিয়তম।
জলদে ঢেকেছে রবি,
দিনমণি পুনঃ প্রকাশিবে।
দুর্দ্দিন না রবে চিরদিন।

নাবিক—কপোত-কপোতীর মত দু'জনে বকর বকর করে যে। বলি ও-পথিক! নৌকা ভিড়াব না তীরে। হাঁটু-ভোর জলে, পোষাকপরিচ্ছদ যাবে ভিজে, জামা-জোড়া খোল, বয়ে রাখি তরণীতে; কড়ি না দাও, ধর্ম্ম আছে।

(শ্রীবৎস গাত্রাবরণ মোচন করিয়া নাবিকের হস্তে দিল, নাবিক উহা লইয়া নৌকাসহ প্রস্থান করিল)

শ্রীবৎস— হের প্রিয়ে, কলির ছলনা।
ছোটে তরী তীরবেগে, উলঙ্গ হইল অবয়ব।
দুরাচার শনি,
কোপে তার রাম-বনবাস।
দশানন হরে জানকীরে।
দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণ ত্যজে।
হের সূচনায় দুঃখের অবধি নাই।
দিনে দিনে আর কিবা হবে!
যদি প্রাণ যায়, কি হবে তোমার প্রিয়ে?

চিন্তা— কোন ভয় নাই, চল হেথা হতে।
ক্ষুধাতুর তুমি; বনফল যদি কিছু পাই,
কিম্বা তৃণশীষ করিয়া রন্ধন—
দিনপাত আজিকার মত হবে।

শ্রীবৎস— হায়, হায়, কত সহি আর;
অতি দীন, অপদার্থ আমি—
অনাহারী নহি একা আমি,
তিন দিন আছ অন্নহীন। শুন প্রিয়ে,
সত্য কহি, আছে পিতা, আছে মাতা,
দুঃখ কেন সহিবে অযথা?
চল রেখে' আসি পিতৃগৃহে।

চিন্তা— হায় ভাগ্য! পেটের জ্বালায়
ত্যজিব তোমায়? তুমি বনবাসে রবে—
আমি রব পিতার প্রাসাদে?
একথা তোমার মুখে, শনির ছলনা গণি।
ভেদ চাহে পতি-পত্নী মাঝে। জেন নাথ,
যেথা পতি, সেথা রহে সতী—
হেথা পাপগ্রহ মানে পরাজয়।
আসিছে পথিক ঐ, জিজ্ঞাসহ
নিকটে কি আছে কোন গ্রাম?

(জনৈক পথিকের প্রবেশ)

শ্রীবৎস— শুনহে পথিক, লোকালয় আছে কি নিকটে!
ক্ষুধাতুর মোরা, অন্নপানি
মিলিবে কি হেথা?

পথিক— মাগীর হাতে কঙ্কন, গলায় গজমুক্তার মালা,
একলা কেড়ে নিতে পারব কি?
দোসর ডাকতে ভেগে যায় যদি।
দেখি একটু চালাক ক'রে।

(প্রকাশ্যে)
লোকালয় নেই বাপু! আছে এক
বেণের বাড়ী, থাকে যদি টাকাকড়ি,
খাদ্যদ্রব্য মিলতে পারে।

শ্রীবৎস— পথের ভিখারী মোরা,
কপর্দ্দক নাহিক সম্বল।
ভিক্ষা যাচি ক্ষুধার জ্বালায়।

চিন্তা— ধর নাথ! স্বর্ণ কঙ্কন, মুক্তাহার
অলঙ্কার মম। বণিকেরে করিলে বিক্রয়,
কিছু অর্থ হইবে সঞ্চয়।
এই দুঃসময় দূর যদি হয়, সুদিন উদয়ে
দিও পুনঃ দিব্য অলঙ্কার।

শ্রীবৎস— বিদরে পরাণ—
নিরলঙ্কারা হবে তুমি?

চিন্তা— বনবাসী মোরা, কুটীর বাঁধিব;
তব সনে সুখে দিন যাবে।
এ দুর্দ্দশা নহে চিরদিন।
লহ নাথ, ধর অলঙ্কার।
(শ্রীবৎস অলঙ্কার লইয়া)

শ্রীবৎস— হায় ভাগ্য, এও ছিল ললাটে লিখন!
ভাল প্রিয়ে! রহ ক্ষণকাল—
শীঘ্র আমি ফিরিয়া আসিব।
(প্রস্থান)

চিন্তা— দীননাথ! রাজ্যেশ্বরে
করিলে ভিখারী। জগতের জীবে
নিত্য দাও আহার প্রচুর! ভূপালে রাখিলে
অনশনে? কত ক্ষুদ্র জন—
লয়ে পরিজন সুখে করে দিনপাত;
মহীপতি অন্নহীন আজি!
বিড়ম্বনা বিধাতার।
(জেলের প্রবেশ)

গান

চিড়্‌বিড়িয়ে খৈ ফুটে যায়
চিংড়ি পুঁটী কাতলা—
ধরেছি এক খ্যাপ্‌লা জালে
মস্ত রুই পিঠে ন্যাংলা।
বর্ষায় চলে সারবন্দী কৈ,
খাই দিয়ে বোয়াল পালায় ঐ—
পোলো চেপে সোল মাছ ধরি
জাল আমার খুব পাতলা।
কুঁচে কাঁকড়া, ঝিনুক, গুগ্‌লী
ভাগা দিয়ে বেচি, কড়ি পাই
পুঁটলা পুঁটলী,
জল শুখোল, বরাত ভাঙ্গলো
বাঁশের বদলে পাই
বাঁশের চোথ্‌লা॥

চিন্তা— তিনদিন উপবাসী রাজা।
ভাগ্যবলে মৎস্য মিলে;
কিন্তু কি দিয়ে খরিদ করি?
আছে অঙ্গুরীয়।
ওরে ও জেলে!

জেলে— ডাকে কি কেউ কড়ি নিয়ে?

চিন্তা— এই আমার আংটি নিয়ে, ঐ তোর
রুই মাছটা যাবি দিয়ে?

জেলে— এযে সোণার আংটী! গিন্নী পেলে
আনন্দে যাবে দাঁত-কপাটী।
নাও রুই, দাও আংটী।
(আংটী লইয়া জেলে গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল)

গান

টুকটুকে বোয়ের ঠোঁট দু'খানি
হাতে সাদা শাঁখা।
আঙ্গুলে তার সোণার আংটী
নাচবে কোলে খোকা।
(প্রস্থান)

(শ্রীবৎসের প্রবেশ)

শ্রীবৎস— ওহো প্রিয়ে! প্রাণ নিয়ে আসি ফিরে
শুধু তোর তরে। তোর তরে শনির তাড়না
সহি' তাই আজ রাখি প্রাণ।
দস্যু নিল কাড়িয়া সকলি।
বিকল হইয়া ফিরি।

চিন্তা— প্রাণেশ্বর! বিষম শনির কোপ।
তবু নাহি ডরি, সদয়া শঙ্করী—

প্রাণ নিয়ে এসেছ ভূপাল।
কর স্নান নদীনীরে। ক্ষণকাল
করহ বিশ্রাম হেথা। ক্লান্ত তুমি
অতিশয়। মৎস্য এই করিয়াছি
ক্রয়। শুষ্ক তৃণ অদূরে নেহারি,
দগ্ধি মৎস্য ফিরিব ত্বরায়।

(চিন্তার প্রস্থান)

শ্রীবৎস— ক্ষুধায় আকুল, কত ক্লেশ,
চিন্তার না জানি। চিন্তা! চিন্তা!
তুমিও তো ক্ষুধাতুরা! ওহো বেদনায়
বিদরে পরাণ। এস নিদ্রা,
ক্ষণকাল যাতনা বিস্মরি।

(পোড়া মৎস্য লইয়া চিন্তার প্রবেশ)

চিন্তা— রাজ্যেশ্বর ধরাসনে তৃণশায়ী হেরিলাম।
বিধাতার এই ছিল মনে।
দয়াময় বৈকুণ্ঠের পতি,
করযোড়ে জানাই মিনতি,
যদি হই সতী,
সুসময় আনিও পতির।
আজি এই প্রাণের কালিমা
সেই দিন মুছিবারে পারি—
এই ভিক্ষা দিও দীননাথ।
নিদ্রাতুর নরপতি—
পোড়া মৎস্যে লাগিয়াছে ক্ষার!
ধুয়ে দিব রাজার গোচর।
তিন দিন উপবাসী, পোড়া মৎস্য
আহার করিবে রাজা। ওহো দুঃখ!—

(জলে অবতরণ)

একি হল, পোড়া মৎস্য পালাল অবাধে!
ফাটে প্রাণ—হা ভগবান,
কত সহে নারীর পরাণে!

শ্রীবৎস— চিন্তা! চিন্তা! ক্ষুধাতুর নহি আমি।
বল, বল কোথা তুমি!
কি বিপদ্ হইল তোমার!

চিন্তা— যাও প্রাণ, আর না সহিতে পারি।
পোড়া মাছ পালাল সলিলে।
একি ব্যথা, উপবাসী পতি—
এ দুঃখ রাখিব কোথা?

শ্রীবৎস— কেঁদো না, কেঁদো না প্রিয়ে!
গ্রহ-বিড়ম্বনা। গ্রহফেরে
হয় রাজ্যনাশ, গ্রহ মোরে
দেয় দীন বেশ। গ্রহ ধরি' দস্যুমূর্ত্তি
করে অলঙ্কারহীনা তোরে।
গ্রহ মৎস্য দেয়, পুনঃ কেড়ে নেয়,
ক্ষুধার জ্বালায় দু'জনায়
করে অপমান। তুমি পতিব্রতা,
পাও মনোব্যথা, এখনো অনেক বাকী।
তাই পুনঃ কহি, চল প্রিয়ে,
পিতৃগৃহে; এ লাঞ্ছনা সহিতে নারিব।

চিন্তা— দিও না দুঃখের আগুনে ঘৃত।
তরুতলে করহ বিশ্রাম ক্ষণকাল।
বনফল করিগো সন্ধান।

শ্রীবৎস— একা আর নাহি ছেড়ে দেব,
চল দু'জনায় যদি কিছু পাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

(কাঠুরিয়া বেশে এক রমণীর প্রবেশ)

গান

শুকনো বনে ফোটাব ফুল,
অমানিশায় উঠবে চাঁদ—
ছড়িয়ে দেব বিমল আলো
পেতে রাখব সোণার ফাঁদ।
অনুরাগ যার আছে বুকে
রাখব তারে পরম সুখে।
চোখের জলে আজ যে ভাসে,
পুরাব তার সকল সাধ।
প্রেমের ঝরণা, সত্যের ঢেউ,
তারে বাধা না দেয় কেউ—
বাধা হয়ে দাঁড়ায় যে বা
তারই ভাগ্যে পরমাদ।
তারাই আমার চোখের আলো,
তারাই আমার চির ভাল;
আচার-বিচার মেনে' চলে,
শোনে না আর কোন বাদ।

( চিন্তার প্রবেশ )

চিন্তা— কে মা তুমি বিপিনবাসিনী ?
বীণারব কণ্ঠধ্বনি তব।
সুর-রঙ্গে সুখের সংবাদ দাও।

রমণীর গান

চেন না আমায় তুমি,
তোমার সনেই ভ্রমি বনে।
নীরবে প্রাণের ব্যথা রেখে চলি
প্রাণে প্রাণে।
কেউ যদি সই, ব্যথা বহে,
সে ব্যথা না প্রাণে সহে ;
ব্যথা হরি, যত্ন করি,
সান্ত্বনা দিই ব্যথিত জনে।
যে আমারে মনে রাখে,
আমার মনে সে নিত্য থাকে,
দেখি তাকে আড়াল থেকে,
প্রাণ চলে সই তারই সনে !

চিন্তা— আহা কি মিষ্টি গলা, কিন্তু মা,
বড় অভাগিনী আমি।

কাঠুরিয়াণী—ওকি কথা গো ; সীঁথায় সিঁদুর
ঊষার আলো, লালের এমন লীলা,
তুমি অভাগিনী হবে কেন ?

চিন্তা— মা, ভিখারিণী আমি ; তিন দিন
উপবাসী পতি। বনফল খুঁজিনু বিস্তর,
কষা, তিক্ত কিছু না মিলিল।
ভেবে মরি, কি হবে উপায় মাতঃ !

কাঠুরিয়াণী—উপায় হবে। যখন যেমন দশা, তখন তায় তেমন ব্যবস্থা। শনির দশা যখন পড়ে, তখন রাজাও পথের ভিখারী হয়। বর্ষার বাদল নিত্য তো নয়। সতী যদি হও, পতির দুঃখ দু'দিন। সুদিন আস্‌বেই আস্‌বে। খাও আর না খাও, আচার রেখো মা। স্বামী তোমার দেহ, স্বামীর হিতবাণী তোমার বাক্য। আর মা, সূয্যি না হ'তে উঠবে ; গাছতলায় থাক, তাও ঝাঁট দিয়ে নারায়ণের নাম নেবে—দুঃখ তোমার থাক্‌বে না। সুখের দিন আস্‌বেই আস্‌বে। আমার দাঁড়াবার যো নেই মা। ঘোরাঘুরি কম নয়। এই যাচ্ছি বনে, আবার ছুট্‌তে হবে গ্রামে, নগরে। কাঠ বেচি কিনা, খদ্দের আমার অনেক।

চিন্তা—আমার একটা উপায় করে' যাও মা, তোমায় দেখে আমার মনে আশার উদয় হচ্ছে। কে তুই মা ?

কাঠুরিয়াণী—আমি কাঠুরিয়ার ঘরণী। মিন্সে কাঠ কাটে, আমি বেচি। ঐ দূরে কাঠুরিয়াপাড়া। এখন যেমন দশা, দু'দিন ঐ পাড়ায় গিয়ে আশ্রয় নাও ; পেটের দায় ঘুচ্‌বে।

( প্রস্থান )

চিন্তা— কত দূর যেতে হবে ? ক্লান্ত পতি
তরুতলে নিদ্রাতুর ; ক্ষুধাতুর অতি।
কে জানিত অনশনে যাবে প্রাণ !
পুনরায় কে বা আসে বনে, করে পদশব্দ যেন।
দিনমণি চলে অস্তাচলে।
ঘোর রাত্রি ধীরে ধীরে নামে।
কি হবে, কি হবে,
প্রাণনাথে কেমনে রক্ষিব !

( চোরের প্রবেশ )

চোর—এই যে রাণীমা ! চোখ-মুখ শুকিয়ে যেন বেগুন-পোড়া হয়েছে। চারি দেশ ঘুরে' মরি, শেষে এই বিজন বনে দেখা। এই এক ঝাঁকা ফল-ফুলারী এনেছি, সন্ধ্যা হয়,—ঐ কাঠুরিয়াপাড়ায় চল দিয়ে আসি।

চিন্তা—কে তুমি ভদ্র ?

চোর—ভুলে' গেলে মা ? আমি সেই চোর। যাকে রেহাই দিয়ে শনির দশা তোর। যদি বাঁচি, তবে একটা প্রতিকার হবেই হবে। এখন চোরের সর্দ্দার আমি। চুরী বিদ্যে নয়—চোরের দল নিয়ে বাধা লড়াই, এই রাজার অসি ··· সে কথা এখন নয় আঁধার ঘনিয়ে আসে, চল কাঠুরিয়াপাড়ায় যাই।

( রাত্রি-চরের প্রবেশ )

গান

ঝুম্‌ ঝুম্‌ ঝুম্‌ নিঝুম রজনী—
ঘুঘুরের ধ্বনি বাজে বনে।
কাল বাদুড়েরা চলে দলে দলে,
ঐ ডানা মেলে ওড়ে গগনে।

পেচক-শাবক কোটর বাহিরে
চ্যা-চ্যা করে' কাঁদি'
ডাকিছে মায়েরে—
ক্ষুধার আকুল, কাঁদিয়া ব্যাকুল,
মা এসে খাওয়ায় যতনে।
ঝিঁঝিঁ পোকা যত, মহোৎসবে রত,
উড়ে চামচিকা, ডাকে ঘণ্টাপোকা—
শিয়ালের দল প্রহরে প্রহরে
রজনীর করে ঘোষণা।
আকাশের চাঁদ নিভ-নিভ হয়,
তারকা মিশায় গগনের গায়;
ঐ উষারাগে পূরব ভাসায়
জলে থলে ফুটে রঙের আলিপনা।
পালায়, পালায়, রজনী পালায়;
ভাসিবে ধরণী আলোয় ছটায়;
গাছে গাছে পাখী, সমকণ্ঠে ডাকি'
করিবে প্রভাতী বন্দনা।

( নৌকা লইয়া মাঝিগণের প্রবেশ )

১ম মাঝি — সারারাত্রি হেঁইচড়াহেঁইচড়ি — নৌকা আর চলে না কর্ত্তামশাই, এইখানে রইল। আকাশে বর্ষা যদি নামে, জল নাব্‌বে ঢল দিয়ে—নৌকোও ছুটবে হু-হু করে'।

সদাগর—বলিস্ কিরে বেটা? এই গহন বনে আমার বোঝাই তরী থাক্‌বে পড়ে'? সওদাগরী করে' যা পাই, নিয়ে চলি ঘরে, শেষে চোরে লুটে খাবে? গিন্নী আছে হাঁ করে', এবার পুজোয় তাবিজ যশম পর্‌বে হাত জুড়ে'। ছেলেটাও আছে হাঁ করে', শান্তিপুরের ধুতি, আর মেয়েকে দিতে হবে ফরেসডাঙ্গার কস্তা-পেড়ে শাড়ী; সামনে পুজো। টান বেটারা, কাছি ধরে' টান। রাতের আঁধারে, বালির চরে নৌকো টেনে আন্‌লি, জলে ভেড়া তরী, তা' না হলে পিঠে পড়্‌বে বাড়ি।

( গণৎকারের প্রবেশ )

গণৎকার— ফ্যাসাদ ভারী—এবার
যাবে সওদাগরী। যদি পাই ধনকড়ি,
নৌকো চলার পথ বাৎলাতে পারি।

সওদাগর—ঠাকুর বুঝি গণৎকার?

গণৎকার—মালুম কিবা হয়? খড়ি পাতি,
ছেলে কি মেয়ে প্রসব কর্‌বে পোয়াতী—
এক কথায় বলে' দিতে পারি।
গুনে-গেঁথে দেখলুম ভাই,
টানাটানিতে পাবে না রেহাই।
ঐ দূরে কাঠুরিয়াপাড়া,
এক মাগী আছে নিখুঁৎ চেহারা।
সতী বলে' পরিচয়, সে যদি নৌকা
পরশয়, চলে নৌকা সরাসর।
বলে' গেলুম চরম কথা,
খোঁজ করে' দেখ—নারী কোথা।
পতি তার গেছে বনে, কাঠ কাটতে
কাঠুরে সনে—এই বেলা দেখ্,
পারিস্ যদি বেণে।

( প্রস্থান )

সওদাগর—কোন দেবতা হবে নিশ্চয়। আমি দেখি, নিশ্চয় পাব এই সতীর পরিচয়।

( নৌকা হইতে নামিয়া প্রস্থান )

মাঝি—সারারাত কাছি টানি, নৌকার তলায় নেই এক ফোঁটা পানি। হেঁচড়া-হেঁচড়ি, নড়া দুটো ছিঁড়ে গেল। এক কল্‌কে তামুক সাজি। বেণে বেটা ভারি পাজি। ( তামাক সাজিতে বসিল )

( দুইজন রমণীকে লইয়া সওদাগরের পুনঃ প্রবেশ )

মাঝি—ব্যাটা ভারী চৌকোশ! ঠিক ধরেছে এক মাগী। উঃ, আগুনের ফুল্‌কী। সতী বটে!

সওদাগর—পরোপকার, পরোপকার—এক ঠাকুর সকাল বেলায় বলে' গেল বড় গলায়—ঐ কাঠুরিয়াপাড়ায় তোমার মত সুন্দরী আর কেউ নেই, নাওখানি পরশ কর, হবে ভারী উপকার। না নেবে ধন-সোণা, তাতে আমার নাই কোন মানা; ধর্ম্ম আছে, সুখে থাক্‌বে।

সহচরী—ওটী হবে না, নৌকা যদি চলে—ধন দিতে হবে দুহাত তুলে'।

সওদাগর—এ মাগী ছিনে জোঁক। আচ্ছা—হবে, হবে। নৌকো আমার বানচাল; যদি চলে, যা' পারি, দেব' দু'হাত তুলে'।

চিন্তা— কি জানি, পুনঃ শনি কি করে ছলনা!
কত দুঃখ সহি, হেরি প্রতি প্রাতে,
চলে পতি কুঠার লইয়া হাতে;
দিন দুঃখে যায়, তবু সুখ পাই,
পতি সনে বঞ্চি দিন।
স্বামিসেবা অতুল জগতে।
বিলম্বের নাহি প্রয়োজন—
পরশনে যদি নৌকা চলে,
কিবা বাধা তাহে আর!

সওদাগর—এস, এস, এইখানে তোমার পদ্মহস্ত স্পর্শ কর। ওরে মাঝি, ওরে মোল্লা, জল আসে কল্‌কলিয়ে, ছাড়্ নৌকা, দে পাল তুলে। কি জানি, নৌকা যদি আবার বাধে, কোথায় পাব এমন সতী? বাবা আর কি ছাড়ি! যেমন রূপ, তেমন গুণ; এও আমার সওদাগরী। (চিন্তাকে নৌকায় টানিয়া তুলিল)!

চিন্তা— কি সর্ব্বনাশ হ'ল, ছেড়ে' দে রে নরাধম!
স্বকার্য্য-সাধন তোর; বন্দী কেন
কর মোরে? হায়, হায়, কি করিনু—
প্রাণনাথে কারে দিয়ে গেনু?
কাষ্ঠ লয়ে দাঁড়াবেন কুটীরদুয়ারে যবে,
শ্রমজল কে মুছায়ে দেবে?
কোথা চিন্তা, কোথা চিন্তা বলি'
ডাকিবে কাতরে, উত্তর কে দিবে তার?
কে সেবিবে রাজ্যেশ্বরে?
হা, হা নিষ্ঠুর বিধাতা! হা ভগবান!

সওদাগর—হাঁকা, হাঁকা, চেলাকাঠ নিয়ে আস্‌বে কাঠুরেরা —প্রাণ যাবে এইখানে।

(নৌকার অন্তর্দ্ধান)

সহচরী—ও ভোঁদার মা, বেগুন পিসি, ফুলুর মা, ছুটে আয়, ছুটে আয়, সীতেহরণ হয়। ও কাদু দিদি, রাঙা দাদা! ঐ নৌকো যায়, হায়, হায় কি হ'ল!

[ পটক্ষেপণ ]

(আগামী বারে সমাপ্য)

---

# কবি ও কবিতা

শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

ফুলের কোমল বুকে সৃজিয়াছি সুস্নিগ্ধ সৌরভ,
অরণ্য-বিহগে আমি শিখায়েছি প্রেম-ভালবাসা;
আকাশে দিয়াছি আলো, তারকার মুখে মৌনভাষা
ধূলিকীর্ণ রচিয়াছি ধরণীতে আনন্দ-উৎসব।
শোকতাপ করি' দূর—পুলক-রহস্যে অভিনব!
সমুদ্রে দিয়াছি আমি দিগন্তের অশ্রান্ত পিপাসা;
মর্ত্ত্যের মানুষে দেছি বাঁচিবার চিরন্তন আশা,
সৌন্দর্য্যপূজারী আমি, এ আমার একান্ত গৌরব।

আমি কবি কল্পনায় সৃজিয়াছি নূতন জগৎ,
আমার ভাষারে আমি দানিয়াছি পরিপূর্ণ প্রাণ;
জানি আমি সুনিশ্চিত—কবি আমি,
নহি শক্তিমান্!
তোমার আলয়ে মোর বাণী হয় মন্ত্রমুগ্ধবৎ।
প্রকাশ হারায়ে যায়—অন্ধকারে নাহি পায় পথ;
তোমার পূজার অর্ঘ্য নাহি পাই
দীপ্ত স্তবগান!

# "প্রবর্ত্তকে"র প্রেরণা ও ইতিহাস

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

১

বাংলার জাগ্রত মহাশক্তিকে সুসংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন অনুভব করিয়াই সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ১৫ই ভাদ্র ১৩২২ বঙ্গাব্দ, ইংরাজী ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে "প্রবর্ত্তক" সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিয়াছিল। সেদিন ছিল দেশের ঘনঘোর সঙ্কট-কাল। বিশেষতঃ, বাংলা ও বাঙালীর জীবন সেদিন এমন আতঙ্কে ও নৈরাশ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, যাহা স্মরণ করিতেও আজ বিষাদের ছায়া মনকে ঘিরিয়া ধরে। বাংলার মুক্তিকামী উদীয়মান যৌবন সেদিন রাজরোষে নিপতিত—অবরুদ্ধ তার কর্ম্ম-শক্তি, নিষ্ঠুর নিপীড়নে অন্তরের মুক্তি-পিপাসা বিকৃত পথ বাছিয়া লইয়া গোপনে, আঁধারে ষড়যন্ত্ররত। একটা সঙ্কোচ ও অস্পষ্টতার কুহেলিকায় বাঙালীর চিন্তা ও গতি—এমন কি দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পর্য্যন্ত আড়ষ্ট ও কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল। সংশয় ও গোপননীতির সেই সন্ধি-পর্ব্বে "প্রবর্ত্তক" ভগীরথের ন্যায় মঙ্গল-শঙ্খধ্বনি করিয়া বাহির হইল—একটা নূতন আলোকময়ী প্রেরণার মত। দেশের তরুণ খুঁজিয়া পাইল তাহার মধ্যে জয়-যাত্রার নূতন সঙ্কেত—প্রবীণও শুনিল অভিনব আশার বাণী। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে জাতি-গঠনের এই শক্তিময়ী প্রেরণাই "প্রবর্ত্তকের" প্রথম আবির্ভাবের কারণ—ইহাকেই তাহার জন্ম-প্রেরণা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

"প্রবর্ত্তকের" প্রাথমিক অনুষ্ঠান-পত্রে সেদিন এই কথাগুলি বড় মর্ম্মপূর্ণ হইয়াই বাহির হইয়াছিল—আজ তাহার সেই জন্মদিনের বাণী গভীর মর্ম্ম দিয়াই আমাদের পুনঃ স্মরণ ও মনন করা রজত-জয়ন্তী বর্ষের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। "প্রবর্ত্তকের" অতীত ও অনাগত জীবন-পথে ইহাই তো ধ্রুব-নক্ষত্রের মত আমাদের চিরদিন গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে ও করিবে।

সেদিন নিজেরই ব্রত বা মিশন নিরাকরণচ্ছলে "প্রবর্ত্তক" লিখিয়াছিল :—

"ক্ষুদ্র 'প্রবর্ত্তক' কি করিবে? নূতন ভাবের ভাবুক করিবে—নূতন চিন্তা করিতে শিক্ষা দিবে—নূতন মন্ত্রে দীক্ষা দিবে। যাহা না থাকিলে রাজা প্রজার মর্য্যাদা রাখে না, প্রজা রাজবিদ্বেষী হয়—যাহা না থাকিলে প্রজায় প্রজায় সহানুভূতি থাকে না, ঘরে ঘরে হাহাকার উঠে—যাহা না থাকিলে মানুষ স্বার্থপর হয়, বিষের জ্বালা অনুভব করে—'প্রবর্ত্তক' সেই অমূল্যবস্তু-গঠনের সহায়তা করিবে।

সেটী কি? চরিত্র। এই চরিত্রের অভাবেই আমরা এতটা নীচ হইয়া পড়িয়াছি—ভাবের ঘরে চুরি করিতে শিখিয়াছি। আমরা উপরে সাধু, ভিতরে চোর—উপরে দেশহিতৈষী, ভিতরে নিজের পায়ে কুড়ুল মরিতে বসিয়াছি। এই চরিত্রের অভাববশতঃই গুণীর আদর নাই, সর্ব্বত্যাগীর সম্মান নাই, উপযুক্ত লোকের কর্ম্মক্ষেত্র নাই। এই চরিত্র দেবচরিত্র। বাঙালী দেবচরিত্র লাভ করিবে। ইহা সাধনার সামগ্রী—তাই হিন্দুর সর্ব্বকর্ম্ম ধর্ম্মসাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুর চরিত্র পূর্ণাঙ্গ। বাঙালীকে এই দেব দুর্ল্লভ পরিপূর্ণ চরিত্র লাভ করিতে হইবে। বাঙালীর যাহা আছে, তাহার উপর দাগরাজী করিয়া কিম্বা তাহাকে একটু মাজিয়া ঘষিয়া দাঁড় করাইলে চলিবে না। একেবারে পুরাতন বনীয়াদ তুলিয়া ফেলিতে হইবে—সম্পূর্ণ নূতন ভাবে, নূতন বনীয়াদ হইতে তাহার এই সুমহান্ চরিত্র পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহা হইলেই বাংলার বিচ্ছিন্ন মহাশক্তি কেন্দ্রগত হইয়া সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধন করিবে।"

"প্রবর্ত্তক" যে উদ্দেশ্য লইয়া একটা নবজাতির জয়-পতাকারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা নিছক সাহিত্য-সেবা নয়, তাহা বাঙালীর শক্তি-সাধনারই অঙ্গীভূত। "প্রবর্ত্তক" বহন করিয়া আসিয়াছে—সাধনার বাণী, ভিতর হইতে জাতির অন্তর্দ্দেবতার পরিচয় লাভ করিয়া, তাঁহারই সহিত যুক্তির সূত্রে নব-জীবনের নির্দ্দেশ দিতে—সাহিত্য-সাধনা ইহারই উপায়। "প্রবর্ত্তকে"র মন্ত্রশক্তি অমোঘ বীর্য্যে জাতির জীবনে কার্য্য করিয়াছে।

"প্রবর্ত্তক" যাহার নাম, "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ" তাহারই রূপ—মন্ত্রের বিগ্রহ। সঙ্ঘের সৃষ্টি ও বিকাশ বাংলার অভ্যুদয়েতিহাসে "প্রবর্ত্তকে"রই জাগ্রত কীর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে। একটী ফুটন্ত চাউল যেমন পাত্রস্থিত অন্নের পক্ব অবস্থার পরিচয় দেয়, তেমনি "প্রবর্ত্তকের" নির্ম্মাণ-

মন্ত্র যে বাঙ্গালী জাতি মর্ম্ম দিয়া গ্রহণ করিয়াছে, 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘই তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ। এই জন্য ইহা লইয়া আমরা অধিক কথা বলিব না—"প্রবর্ত্তক" পঁচিশ বৎসর তাহার ব্রত পালন করিয়াছে। ব্রত পূর্ণ আজও হয় নাই—কারণ, একটা সমষ্টিজীবন "প্রবর্ত্তকের" মন্ত্রবীর্য্যে গড়িয়া উঠিলেও, জাতির ব্যাপক জীবনে সেই মন্ত্রশক্তি ছড়াইবার নিগূঢ় প্রেরণা এখনও তাহার আশানুরূপ সফল হয় নাই। এই আশাকে রূপ দিবার জন্য "প্রবর্ত্তকের" প্রাণশক্তি কি করিতেছে, কি করিতে চাহে, তাহা আজ স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার দিন। রজত-জয়ন্তীযুগের সারা বর্ষকাল ধরিয়া এই সকল কথাই আমরা বুঝিবার ও বলিবার প্রয়াস করিব। "প্রবর্ত্তকের" যাঁহারা অনুরাগী বন্ধু ও সহায়, যাঁহারা "প্রবর্ত্তক"কে ভালবাসেন, তাঁহাদের সকলেরই প্রীতি ও শুভচিন্তা আমাদের অনুক্ষণ শক্তিদান করুক।

বলিয়াছি, "প্রবর্ত্তক" একটা মন্ত্রশক্তি। ইহা অভিনব ভাব-সমষ্টি। প্রচ্ছদহীন হরিদ্রাবর্ণ বহির্বেশে শীর্ণকায়া এই পত্রিকাখানি যখন পাক্ষিকরূপে প্রথম চন্দননগরে বাহির হইয়াছিল, সেদিন ছিল না তার কোন আর্থিক সম্বল, ৫৲ টাকা মাত্র উৎসর্গের দান লইয়া পরকীয় মুদ্রাযন্ত্র হইতে তাহার মুদ্রণ ও শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়কের সম্পাদকত্বে ছদ্ম-নামে তাহার প্রকাশ আমাদের তদানীন্তন অবস্থা ও অস্ফুটন্ত প্রাণশক্তিরই পরিচয় দেয়। ইহার তখন বার্ষিক মূল্য ছিল ২৲ টাকা ও প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল ০/০ আনা মাত্র। প্রবর্ত্তক কার্য্যালয়টী তখন ছিল চন্দননগরে শ্রীমতিলাল রায়ের বাটীতেই অবস্থিত। দেবনাগরী হরফে

কাল-কাল "প্রবর্ত্তক" নামটী বুকে লইয়া এই "পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন" যে ভাবধারা প্রচার করিতে লাগিল, তাহার পাঠক-সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয় অগ্নিযুগের তরুণ—ইহারাই "প্রবর্ত্তকে" নবজীবনের মন্ত্রধ্বনি বুঝি শুনিতে পাইয়াছিল ও পরম উৎসাহে তাহা অনুসরণ করিত। দেশের সর্ব্বসাধারণ তখন ছিল রাজরোষের বিভীষিকায় আতঙ্কিত—"প্রবর্ত্তকের" ভাব ও ভাষায় উভয়েই তাঁরা হইতেন সংশয়িত। সংশয়ের কথঞ্চিৎ অপনোদনের জন্যই বুঝি পাক্ষিকের দ্বিতীয় বর্ষে মলাটে নামের নীচে "চন্দননগরের গভর্ণর বাহাদুরের অনুমোদন অনুসারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত"—এইটুকু সংযোজিত হইয়াছিল। "প্রবর্ত্তকের" নাম শুনিলে অনেকেই তখন গ্রাহক হওয়া দূরে থাকুক, সভয়ে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া পড়িত। "প্রবর্ত্তকের" বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে "অরবিন্দের পত্র" "Yogic Sadhan" "বিবেকানন্দপ্রসঙ্গ" এমনি কয়েকটী নিজেদেরই অনাড়ম্বর বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছুই বড় একটা মিলিত না। ইহার উপর আবার ইহাই ইউরোপের মহাযুদ্ধ-যুগ হওয়ায়, সেন্সারের দরুণ চন্দননগরের রাজ-দপ্তর হইতে আগাগোড়া পত্রিকাখানি ফরাসীতে তর্জ্জমা হইয়া বাহির হইতে বিলম্ব ঘটিত বলিয়া মাঝে মাঝে সেই ত্রুটির কৈফিয়ৎ দিয়া নিবেদন প্রকাশ করিয়া মুষ্টিমেয় পাঠক-মণ্ডলীকে আশ্বস্ত রাখিতে হইত।

"প্রবর্ত্তকের" ভাব-সমষ্টি লেখক-লেখিকার নাম-পরিচয়-বর্জ্জিত হইয়াই বাহির হইত। ভাবই যে "প্রবর্ত্তকের" প্রাণ—মানুষ তাহার যন্ত্র বা প্রকাশের করণ মাত্র। এই বিশ্বাসের সাধনা ও তপস্যা প্রচার করিতেই "প্রবর্ত্তক" আবির্ভূত হইয়াছিল। "প্রবর্ত্তকের" ৩য় বর্ষে তাহার এই জ্বলন্ত বিশ্বাসের মর্ম্মসূত্র এই ভাবে সংক্ষেপে লেখা হইয়াছিল :—

"আমরা সর্ব্বাগ্রে জানিতে চাই, বুঝিতে চাই আমাদের অন্তর্দ্দেবতাটীকে—আমাদের আধারযন্ত্রটীকে তিনি কোন উদ্দেশ্যে পরিচালিত করিবেন। আমাদের আশা ও আকাঙ্খা অনেক সময়ে বিকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে, কিন্তু ভাগবত ইচ্ছার পথে কোন বিঘ্নই উপস্থিত হইতে পারে না এবং আমরা যদি এই ভাগবত বিধানেরই অনুবর্ত্তী করিয়া আমাদের আধারটীকে চালিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের জীবনের পথ খুব সরল ও সহজ হইয়া পড়িবে।

ইহাই আমাদের তপস্যা। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্যই আমাদের সাধনা। আমাদের সমস্ত জীবনটাই একটা সাধনা, তপস্যার বিগ্রহ-মূর্ত্তি। জাতির জীবনে সর্ব্বপ্রথম এই তপস্যার মূর্ত্তিটাকেই জাগ্রত করিয়া ধরিতে চাই। ইহাই হইতেছে আমাদের মূলমন্ত্র।"

"প্রবর্ত্তকের" জীবন-পথ বিঘ্নহীন কোন দিনই নহে।

দুরভিসন্ধিপরায়ণ যাহারা রটাইত "প্রবর্ত্তক" রাজ-বিদ্বেষ প্রচার করে, তাহাদের অপচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, আমাদের মনে পড়ে, শ্রদ্ধেয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কুতুবদিয়ার অন্তরীণ-ঘটিত মামলায় "প্রবর্ত্তকের" প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন—তাহাতে "প্রবর্ত্তকের" উদ্দেশ্য দেশ ও রাজশক্তি, উভয়েরই কাছে কিছু স্পষ্ট হইয়া উঠে।

"প্রবর্ত্তকের" ৪র্থ বর্ষে সেই টাউনহলের রাক্ষসীসভায় মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জী তাঁহার বক্তৃতাশেষে যখন একখানি "প্রবর্ত্তক" পত্রিকা হাতে তুলিয়া আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলেন—

"এই কাগজখানির নাম 'প্রবর্ত্তক', বাংলায় এমন কাগজ আর একখানিও নাই—আমি ইহার বহুল প্রচার কামনা করি"

এবং তাহার পরে যখন ভারতরক্ষা আইনটী চিরস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনায় "প্রবর্ত্তকে" তৎ-প্রতিবাদ এবং রাজনৈতিক বন্দী ও অপরাধীদের মুক্তিকামনা পূর্ব্বক যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন, তখন সভাস্থলে যেন একটা বিদ্যুদ্বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। বাংলার জটিল অন্তরীণ-সমস্যার সমাধানে সে যুগে "প্রবর্ত্তক" ও "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের" প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা যে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা করিতেছিলেন, তাহারই পরিচয় সেদিন ব্যারিষ্টার চ্যাটার্জ্জীর মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাঁহারই মুখে আমরা ইহাও শুনিয়াছিলাম যে, ব্যারিষ্টার মিঃ পিউগ বিলাতে পার্লামেণ্টের মহাসভায় "প্রবর্ত্তকে"র কথা তুলিয়া উচ্চতম রাজকর্ম্মচারীদের দৃষ্টি এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানির প্রতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই সকল মনীষী, বন্ধু ও সুধীজনের উদ্দেশে "প্রবর্ত্তকের" কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতে আমরা আজও ভুলিতে পারি না। বিপ্লবযুগের ঘনঘটাচ্ছন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সংশয় ও জটিলতা বিদীর্ণ করিয়া, জাতির আত্মপ্রকাশের একটা শুদ্ধ, ঋজু ও দিব্য পথ আবিষ্কার করিতেই 'প্রবর্ত্তক" সেদিন তন্ময় হইয়াছিল—উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিল

"ভারতের তপস্যা—ত্যাগ নয়, ভোগ নয়—নির্ম্মাণ।"

এই নির্ম্মাণ—জাতির আত্মগঠন। অধ্যাত্ম-জাগরণের উপরেই ইহা সিদ্ধ হইতে পারে—এ আবিষ্কার "প্রবর্ত্তকের" মন্ত্রদাতা ঋষির, "প্রবর্ত্তকের" পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে এই সংগঠনের মহাবার্ত্তা নানারূপে ঝঙ্কারিত হইতে লাগিল।

৫ম বর্ষারম্ভে "প্রবর্ত্তক" জাতীয় সাধনার চতুরঙ্গ নীতি বিশ্লেষণ করিয়া লিখিল—

"আত্মা অমর। সুতরাং আমাদের বাঁচিতে হইবে। সে জীবন ভিক্ষান্ন পুষ্ট হইবে না, স্বাধীন উপজীবিকাই আমাদের অবলম্বনীয়। তাহার জন্য ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া শস্য উৎপাদন করিব, শিল্প-বাণিজ্য বিস্তার করিব। জীবনের জন্য বাহিরের এই প্রকাশ অবধারিত।

আত্মরক্ষার জন্য অন্তরকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিব। বাহিরের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহা এইভাবে রাখিতে চাই—মুক্তিই আমাদের লক্ষ্য, এ কথা গোপন করিব না। এই মুক্তি অন্তরের, বাহিরের সহিত বিরোধ আমাদের ধর্ম্ম নহে।

যেখানে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশে বাধা পাইব, সেই ক্ষেত্রে আমরা কোন সহায়তা করিব না, নিরপেক্ষ থাকিব।

সত্যপ্রকাশে সাহসহীন, কার্য্যে কখন পৌরুষ-বর্জ্জিত হইব না। আপনার ও অপরের মধ্যে যে পুরুষ বিরাজ করিতেছেন, এতদুভয়ের কাহারও অপমান করিয়া সাধনভ্রষ্ট হইব না। শক্তি ও সম্পৎশালী লোকের সম্মান রক্ষা করিব—আপনাকে কুণ্ঠিত ও ক্ষুদ্র করিয়া নহে, আপনার সত্য ও বৃহৎকে সমানভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া।

পরিশেষে, বর্ত্তমান রাজশক্তির সহিত আমাদের আচরণ কিরূপ হইবে, তাহারও একটা ইঙ্গিত প্রদান করিব।

রাজশক্তি স্বেচ্ছায় যাহা দিবেন, তাহা ভাগবত দান বলিয়া মাথা পাতিয়া লইব। লঘুচিত্তের মত ক্ষুদ্রকে বৃহৎজ্ঞানে আত্মহারা হইব না; আপনহারা হইয়া কাঁচমূল্যে কাঞ্চন দিব না। যাহা পাইব, তাহার অন্য মূল্য দিতে কোনদিনই কুণ্ঠা বোধ করিব না।

বর্ত্তমান রাজশক্তি বিধাতারই হস্তস্বরূপ আমাদের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে, "সে কর্তৃত্ব অনন্ত কালের জন্য আমাদের হীন ও দুর্ব্বল করিয়া রাখিবার জন্য নহে, ইহার ভিতর থাকিয়াই আমাদের সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান করিতে হইবে। ইতিমধ্যে অন্য কোনও বৈদেশিক শক্তি ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে, আমরা রাজশক্তিরই সহায়তা করিব—কেন না, ইহাতে আমাদের মুক্তিপথই সুরক্ষিত হইয়া উঠিবে।"

সেদিনের এই চতুরঙ্গ জাতীয় নীতি বাঙালীরই সাধ্যরূপে "প্রবর্ত্তক" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তাহার দৃঢ় ধারণা—

"বাংলাদেশেই জাতিচক্রের নাভিকেন্দ্র সংস্থিত হইবে, বাঙালীকে সর্ব্বাগ্রে জাতিরূপে প্রকাশ পাইতে হইবে।"

বলা বাহুল্য, "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ" "প্রবর্ত্তকের" ঘোষিত এই অমোঘ নীতিগুলির আজন্ম অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে।

ইহা সত্যই তৃতীয় পন্থা। বিরোধ নহে, প্রতিবাদ প্রতিবিধিৎসা নহে, অন্তরের প্রকাশেই বাহিরকে মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ করিয়া তুলিবার ভারতেরই ইহা সিদ্ধ জাতীয় বিধান। "প্রবর্ত্তক" সেদিন বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—কাহারও অকল্যাণের জন্য নহে, মানবাত্মার শ্রেয়োবিধানের জন্য—সে জীবনসমস্যার মীমাংসা করিতে বলিয়াছে পশুবলে নহে, মানবাত্মাকে জাগ্রত করিয়া। তাই বড় স্পষ্ট করিয়াই "প্রবর্ত্তক" তখন ভারতীয় মর্ম্মবীণায় নব মনস্তত্ত্বের মূর্চ্ছনা তুলিয়াছিল—

"অস্ত্রবলে জীবনসমস্যা মীমাংসিত হয় না; ভারতবর্ষ পশুশক্তিহীন। পশুবল আহরণপরায়ণ হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী যথেষ্টই বিদ্যমান—বিশ্বের অকল্যাণকারী সমস্ত দানবীয় শক্তি ইহার প্রতিরোধী হইয়া দাঁড়াইবে। বিজয়ী হইয়া থাকিবার জন্য নহে, আত্মবিষে জর্জ্জরিত হইয়া ইহারাও যে প্রতিকার চাহে, শান্তি চাহে—অমঙ্গল আরও অমঙ্গল চাহে না—মিথ্যা, সে আজ কুণ্ঠিত, লজ্জিত, প্রায়শ্চিত্ত চাহে। জগতের ইহা আজ অন্তরের কথা। সেই জন্যই তো আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। জগৎ চাহে একটা তৃতীয় পন্থা।"

৪র্থ বর্ষের গোড়া হইতেই "প্রবর্ত্তকের" মলাটে প্রচ্ছদ-পট শোভা পাইয়াছিল—কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ—জীবনযুদ্ধে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মহাগীতারই ইহা নব প্রতীক।

৫ম বর্ষের ১১শ সংখ্যায় এই প্রতীকের তলে ফুটিয়া উঠিল শ্রীঅরবিন্দের অভাবনীয় আশীষমন্ত্র—

"......প্রবর্ত্তক আমাদেরই কাগজ। আমি স্বহস্তে লিখি বা না লিখি, আমারই through দিয়ে ভগবান......কে শক্তি দিয়ে লেখাচ্ছেন। Spiritual হিসাবে আমারই লেখা।......

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ"

২২শ সংখ্যার "প্রবর্ত্তকে" বাহির হইল—অন্ধ্র দেশের "জন্মভূমি"-সম্পাদকের টিপ্পনীর প্রত্যুত্তরে শ্রীঅরবিন্দেরই আদেশে তাঁহার এই ইংরাজী মর্ম্মলিপি—

"I have not stated to any one that full responsible self-government completely independent of British control or any other purely political object is the goal to the attainment of which I intend to devote my efforts and I have not made any rhetorical prophecy of a collossal success of the non-cooperation movement. As you well know, I am identifying myself with only one kind of work or propaganda as regards India, the endeavour *to reconstitute her cultural, social and economic life within larger and freer lines than the past on a spiritual basis.*"

বলা বাহুল্য, এই পত্রখানি শ্রীমতিলাল রায়কেই শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত আশীষলিপির উহ্য অংশে "ভগবান মতিকে শক্তি দিয়ে &c." এই কথাই লেখা ছিল। সে যাহা হউক, "প্রবর্ত্তক" অতঃপর ইহারই ভাষান্তর—শিক্ষা, সঙ্ঘ ও অর্থপ্রতিষ্ঠান, এই ত্রি-মন্ত্রের সাধনে ও প্রচারে ত্রিস্রোতা তটিনীর ন্যায় ত্রিধারায় দেশ ও জাতিকে অভিষিক্ত করিতে ছুটিয়া চলিল।

"প্রবর্ত্তকের" দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ হইল—৬ষ্ঠ বর্ষে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে খরবেগে তখন কর্ম্মস্রোতঃ অবতরণ করিয়াছে। মরা জাতিকে বাঁচাইবার ভার লইল সঙ্ঘশক্তি—তাহারই "কাজের ছক" লইয়া ৬ষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যা "প্রবর্ত্তক" বাহির হইল। পাক্ষিক হইলেও, পত্রিকাখানি তখন অর্দ্ধ মাসিকের একটু বৃহত্তর আকার গ্রহণ করিয়াছে। প্রচ্ছদপটেও নূতন ছবি স্থান পাইয়াছে। সে ছবি—জাতির প্রোথিত জীবন-রথচক্রের উদ্ধারের চেষ্টার দ্যোতনাপূর্ণ। "প্রবর্ত্তক" লিখিল—

"প্রথম অর্থ প্রতিষ্ঠান—তার পর শিক্ষার ব্যবস্থা—পরিশেষে জাতির জীবনপ্রতিষ্ঠা। জাতির প্রাণ এখন অসাড় হইয়া আছে—যথেষ্ট খাদ্যের অভাবে শরীর যেমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, মনের অবস্থাও তেমনি শোচনীয় হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমেই এই লক্ষ্মীছাড়া জাতির অন্নসংস্থানের উপায় দেখিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে পল্লীজীবনের উন্নতিকল্পে অতি অল্পব্যয়ে গ্রামবাসীদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।"

সঙ্ঘের এই সিদ্ধ গঠননীতি ব্যাপকভাবে দেশে প্রবর্ত্তন করিবার জন্য "প্রবর্ত্তক" সেদিন চাহিয়াছিল দেশপ্রাণ পাঠকবর্গ ও সর্ব্বসাধারণের নিকট এক লক্ষ টাকা ঋণ—শতকরা ৯৲ টাকা হার সুদে। লেখা হইয়াছিল—

"আমরা এই বৎসরে হাজার লোকের নিকট হইতে অন্ততঃ ১০০৲ টাকা করিয়া কর্জ্জ চাহিতেছি। হাজার হাজার দেশভক্তের

নিকট দেশের নূতন নির্ম্মাণকল্পে এই সামান্য সাহায্য অতি অকিঞ্চিৎকর। ইহা দান নহে—মাত্র ১০০৲ টাকা জনে জনে কর্জ্জ দিয়া হাজার কর্ম্মীর কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া দিউন—অচিরে ইহার উত্তম ফল দেশবাসীর করতলগত হইবে।"

"প্রবর্ত্তকের" সেদিনকার স্বপ্ন ব্যর্থ হয় নাই। নানা বাধা-বিপত্তি, অভাবনীয় বিপৎসমুদ্রের মধ্য দিয়া তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সঙ্ঘশক্তিই সিদ্ধ করিয়াছে—দেশসেবার এই অভূতপূর্ব্ব দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মবিধানকে হাতে কলমে অনুষ্ঠান করিয়া সঙ্ঘ আজ যে সংগঠনের অটল ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা যে দেশের কতখানি কল্যাণ ও আশার উৎস, ইহা আজ বাঙালীর অগোচর নহে।

"প্রবর্ত্তক" চিরদিন কোন কিছু না ভাঙ্গিয়া গড়িতেই চাহিয়াছে। ১৩২৮, ইং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে, শিক্ষার ক্ষেত্রে যখন রুদ্র ভৈরবের ডাকে ভাঙ্গার জোয়ার বহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে সে তারস্বরে বলিয়াছে—

"আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদিগকেই করিতে হইবে। কিন্তু দেশে যে সকল বিদ্যাশিক্ষার প্রতিষ্ঠান আছে, তাহা দেশের তুলনায় প্রচুর নহে এবং ইহার পরিবর্ত্তে আমরা যখন কিছুই নির্ম্মাণ করিতে পারি নাই, তখন এইগুলি না ভাঙ্গিয়া নূতনভাবে শিক্ষামন্দিরপ্রতিষ্ঠাই যোগ্যতার পরিচয়।......আমরা আমাদের ক্ষুদ্রশক্তি অনুসারে বাংলার নূতন প্রণালীতে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছি।"

"প্রবর্ত্তকের" এই ঘোষণাও নিরর্থক হয় নাই। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, শ্রীপঞ্চমীর পুণ্য তিথিতে চন্দননগর ভাগীরথীতীরে শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে যে প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠের সূচনা হয়, তাহা ক্রমবিকশিত হইয়া শুধু স্থানীয় বর্ত্তমান শিক্ষামন্দিরে পরিণত হয় নাই, এই শিক্ষানীতি অনুবর্ত্তন করিয়া প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ দিকে দিকে বহু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিয়া চলিয়াছে।

কি শিক্ষাপ্রচার, কি কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের মধ্য দিয়া অন্ন ও অর্থপ্রতিষ্ঠানরচনা—সকল কর্ম্মই "প্রবর্ত্তক" সাধনারই অভিব্যক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

"কর্ম্মের মধ্যেই ভগবান রূপে রসে আপনাকে ফুটাইয়া ফলাইয়া তুলিতেছেন, তাই মানুষের ধর্ম্ম নৈষ্কর্ম্ম্য নয়—কর্ম্মের মাঝেই সে আপনাকে উপরে তুলিয়া ধরিতেছে।"

এই বাণী "প্রবর্ত্তকেরই"; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে "প্রবর্ত্তক" এই কথাও জানাইয়াছে—

"কর্ম্মের চেয়ে কর্ম্মী যদি আপন আপন অন্তরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলেন, তাহা হইলেই এই মহাযজ্ঞ নিষ্ফল হইবে না।"

এই পথেই অবধারিত সঙ্ঘ গড়িবার নির্দ্দেশও "প্রবর্ত্তক" তাই অকুণ্ঠ কণ্ঠে দিয়াছে। সঙ্ঘ-সাধনার সেই অভিনব বেদমন্ত্র আজও আমাদের কাণে অনাহত সুরে বাজিতেছে—

"কাজ গৌণ—মূল কথা ঐক্য। অহঙ্কারকে গুঁড়া করিয়া দাও। অসংখ্য অহঙ্কারের রাসায়নিক শোধনে ও সংমিশ্রণে এক বিরাট্ ঐক্য-সঙ্ঘ নির্ম্মাণ কর। মিলনের পথে যদি আসিয়া দাঁড়াও, জানিয়া রাখ—আত্মপ্রকৃতির মধ্যে অনেক কিছু অনৈক্য রাখিয়াই আমরা সাধন আরম্ভ করিয়াছি আর এই অনৈক্যের মৌলিক কারণও যথেষ্ট আছে; তবে লক্ষ্য আমাদের এক হওয়া চাই। জাতিগত উত্থানের দিনে আমাদের মিলনই চাই। তাই প্রতিপদে হৃদয়ের সবখানি শক্তি দিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে, স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে—আমরা এক, আমরা অভেদ। বিঘ্ন অনেক, বাধার সহিত সংগ্রাম করিয়াই আমাদের জয়কে অধিকার করিতে হইবে। পরাজয় মানিলে চলিবে না।"

সঙ্ঘের সৃষ্টি ও পুষ্টির এই মর্ম্মরাগিণী আজও প্রতি সঙ্ঘসাধকের গভীর ভাবে অনুধাবনের যোগ্য—

"স্বার্থপরতার কোন ছলনায় আমরা বিমুগ্ধ হইব না। হৃদয় রক্তাক্ত হইবে। নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইবে। পরস্পর পরস্পরকে পরম শত্রু জ্ঞান করিবে। তবুও আমাকে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে হইবে—আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমার, তোমার যথাসর্ব্বস্ব আমার। কখনও তুমি তিরস্কার করিবে, আমি পাষাণ-বুক বিছাইয়া সহ্য করিব; আবার কখনও বা আমি হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে তীব্র বাক্যে তোমায় মর্ম্মাহত করিব, তুমিও তাহা হাসিমুখে আমার বলিয়াই গ্রহণ করিব। আমাদের কর্ম্ম হইবে এইরূপ সাধনার ক্ষেত্র-বিশেষ। ভাবের ঘরে ঐ সাধনা চলে না, তাই এই কর্ম্মক্ষেত্র নির্ম্মাণ করা। এইরূপ সাধনার ক্ষেত্র চারিদিকেই নির্ম্মিত হউক। যে ভীরু, যে লোভী, তাহার পতন চিরদিন হইবে, বীরের জয় সর্ব্বত্র। অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র হউক, সর্ব্বত্র মিলনের এই মধুর আলাপ যেন আমরা শুনিতে পাই। এই সুরই সান্ত্বনার সুর, আনন্দের ঝঙ্কার, শক্তির রাগিণী।"

৭ম বর্ষে "প্রবর্ত্তক" রীতিমত মাসিকে পরিণত হইল। সম্পাদকের "কানাইলাল" ও "চণ্ডীদাস"—রাষ্ট্রসেবা ও সাধনমূলক রস-সাহিত্যে অভিনব অবদানের ডালি যোগাইয়া বাঙালীর জাতি-প্রাণকে ছোঁয়া দিল।

১৩২৯ বঙ্গাব্দে ৮ম বর্ষের "প্রবর্ত্তকে" বাংলার কবির বীণার সুর প্রথম পত্রেই ধ্বনিয়া উঠিল—

"তোর গোপন প্রাণে একলা মানুষ যে
তারে কাজের পাকে জড়িয়ে রাখিস্ নে।
তার একলা ঘরের ব্যথা হতে
উঠুক না গান নানা স্রোতে,
তার আপন সুরের ভুবন মাঝে
তারে থাকতে দে।
তোর প্রাণের মাঝে একলা মানুষ যে
তারে দশের ভীড়ে ভিড়িয়ে রাখিস্ নে।"

—রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু "প্রবর্ত্তক" এবার দেশাত্মার টানে, অনিবার্য্যক্রমে দশের ভীড়েই ভিড়িতে সুরু করিল। একই "প্রবর্ত্তকের" দুই ভাগে—এক দিকে দশের কথা, অন্য দিকে তার নিজের মর্ম্মবাণী—এই রূপেই পত্রিকা মিশ্রভাব লইয়া বাহির হইতে লাগিল। "প্রবর্ত্তকের" ভাব জগতে সেদিন প্রচণ্ড মহাবিপ্লব দেখা দিয়াছে। ভূকম্পে যেন হিমালয় খসিয়া পড়িল। বিধাতার তর্জ্জনীহেলনে শ্রীঅরবিন্দের বিপুল আশ্রয় হইতে "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ" বঞ্চিত হইল। "প্রবর্ত্তকের" অঙ্গ হইতেও তাঁর নামের দাগ মুছিয়া গেল।

আরোপ ছাড়িয়া স্বরূপে ফিরিবার এই সুদুস্তর সন্ধি-যুগ "প্রবর্ত্তকেও" চিহ্ন রাখিয়াছে। সে বিসর্জ্জনের পর প্রতিষ্ঠার করুণ রাগিণী সম্পাদকের মর্ম্মবীণায় কি ঝঙ্কার তুলিয়াছিল, তাহা না পড়িলে বর্ণিত হয় না—তবুও এক-আধ ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

"......দিব কি? বাঙালীর আছে কি? হে আমার দেবতা, যাহা আছে, সেটুকু ছাড়িতে বড় সংশয় হয়, আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি।

আছে দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা—স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। ব্যক্তিগত নয়, জাতিগত। তুরীয় নয়, বস্তুতন্ত্র। জাতির সে মুক্তিপতাকা উল্লাসে গগন চুম্বন করিয়া কি উড়িবে না? উৎসবের পুলকে পথের ধুলায় কি আকাশ আচ্ছন্ন হইবে না? ভারত কি শুধুই কামধেনু হইয়া রহিবে? ভারতের জাতি-সত্তার কি বৈশিষ্ট্য নাই? স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নাই? সংশয় বিষের ঘাত বুকে জ্বালাইয়া দেয়। চাই শুধু সান্ত্বনা। অন্তরতম সত্তার তপস্যায় যে আঁচ স্পর্শ দেয়, ইহা জগদীশ্বরের ব্যাপক চাওয়া—ভারতের চাওয়া কি ব্যর্থ হইবে?"

এই স্বরূপ-সাধনার যুগেই "প্রবর্ত্তক" খুঁজিয়া বাহির করিল বাংলার অমিশ্র আপন সাধন-তত্ত্ব। বেদনার উল্লাসে সে গাহিল—

"তপস্যায় হয় নির্ম্মাণ। আত্মহারা যে, তার দীক্ষা নাই, সাধনাও নাই। আমরা আত্মঘাতীর দল—অন্ধের মত মৃত্যুর অভিসারে ছুটেছি। সৃষ্টির কথা, গঠনের কথা আমাদের স্বপ্ন। তাই এই পথে কাউকে অগ্রসর হতে দেখলে আঁৎকে উঠি, অশ্রাব্য ভাষায় গাল পাড়ি। ভগবানের ডাক শুনে কেউ যদি জাগে, জমাট তমিস্রার চাপে তাকে আবার নুয়ে পড়তে হয়; তবুও যদি কোন গতিকে কেউ মাটীর উপর ভর করে' মাথা তুলে উঠে, অতীতে ও বর্ত্তমানের দূষিত বাতাসে জীবন তার বিষাক্ত হয়ে উঠে, কর্ম্মক্ষেত্রে উঠা-নামার তুফান তাই নিত্য প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু একেবারেই কি আমরা নিরুপায়? হাজার বাধা ঠেলে কেউ কি এই মরণসমুদ্র সাঁতরে পার হবে না?

সেই আশার গান গেয়েই ত বেঁচে আছি। এই যে একটা সুর এখনও মাথার ভিতর অনাহত প্রতিধ্বনি তুলে রেখেছে, এইটাই জাতির জীবন-মন্ত্র। অতীতের ঐশ্বর্য্যসম্পদ্, শক্তিবীর্য্য সব আমরা হারিয়েছি—কেবল হারাই নি বাংলার সাধন-তত্ত্ব। বাঙালী বেদ-পুরাণের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়নি, জীবনসাধনার বীণ বাজিয়ে সে এমন রহস্যময় নূতন বেদ গেয়েছে, যার ধ্বনি মর্ম্মে মর্ম্মে নিত্য সুর হয়ে বাজছে। সেই সুরের রেশ ধরে'ই বাঙালী নূতন শিক্ষার প্রবর্ত্তন করবে, নূতন দীক্ষায় জাতি-নির্ম্মাণের অব্যর্থ পথ পরিষ্কার করবে। সে সাধনা বাঙালীর তন্ত্র, সহজিয়া।"

এই বাংলার সিদ্ধ সাধনালোকে "প্রবর্ত্তক" ব্রহ্মচর্য্যের নূতন ব্যাখ্যা উদীয়মান জাতির সম্মুখে ধরিল—

"ব্রহ্মচর্য্যসাধনের আসল সত্য—তরল প্রাণ-শক্তিকে বিদ্যুদ্বীর্য্যে পরিণত করে' ওজঃ-স্বরূপ ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থির রাখা। ওজঃই ঈশ্বরের মূর্ত্ত রূপ। বাঙালীর শিক্ষা এই ওজঃ-সাধনারই তপস্যা।"

"প্রবর্ত্তক" স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ দিল—

"বাংলায় আজ অসংখ্য সন্ন্যাসী চাই, ব্রহ্মচারিণী নারী চাই। কিন্তু এই অবস্থা জীবনের লক্ষ্য নয়। ধর্ম্মে উন্নীত করে' একটা জাতির মধ্যে তার সতকে জাগাতে এমনই এক দল লোকের প্রয়োজন হয়েছে। গার্হস্থ্যজীবন যদি এই দেবকার্য্যে উৎসর্গ করা সম্ভব হয়, তবে তা' কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে অনুকূল হবে। কিন্তু অবস্থা সঙ্কট বলে'ই আমরা নারী ও পুরুষের যে অনিবার্য্য মিলনতত্ত্ব, তা' আশু ফলসিদ্ধির জন্য দূরে রেখেই জাতিকে উঠে দাঁড়াতে বলছি। এতদ্দ্বারা যে জাতিপ্রতিষ্ঠা হবে, তার ভিত্তি অপূর্ব্ব সংযমের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠবে। জাতির মূলে এইরূপ দিব্য সংযমের বনীয়াদ গড়ে' তুলতে পারলেই প্রবৃত্তির টানে ভবিষ্যতে এ জাতি আর অধোগামী হবে না।"

প্রবন্ধে, প্রবন্ধে অমৃতনির্ঝরিণীর ন্যায় সাধনার অপূর্ব্ব তত্ত্ব ও রহস্য "প্রবর্ত্তক" পরিবেশন করিল—

"প্রবর্ত্তকে"র
প্রচ্ছদপটের
ক্রমবিকাশ
চিত্রাবলী:
১৩২২
হইতে
১৩৪৬

"প্রবর্ত্তকে"র
প্রচ্ছদপটের
ক্রমবিকাশ
চিত্রাবলী:
১৩২২
হইতে
১৩৪৬
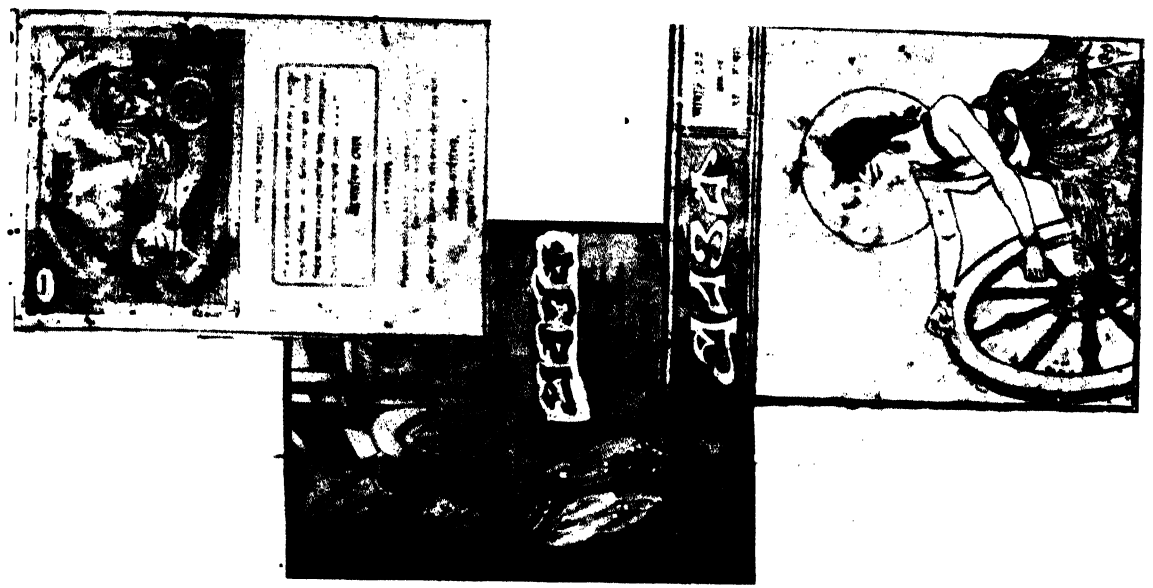
"অধ্যাত্মযোগীর শুদ্ধির বিধি কি? সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববৃত্তিকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া রাখা, সকল রূপ স্বরূপে মিলাইয়া ভাবের ভাবনায় ডুবিয়া থাকা। ইহার মূল শরণ। শরণ—সত্তের। সে সৎ—গুরু, ঈশ্বর। এই সৎ-সঙ্গ যদি ভাঙ্গে, দুর্গতির সীমা থাকে না।

বাঙালীর সাধনা পূরণাত্মক। আত্মস্বরূপের পূর্ণ প্রকাশ—আশ্রয়ে আপনার সবখানি আরোপের উপরই নির্ভর করে। আত্মসমর্পণেই প্রেমের উৎপত্তি।

সকল বৃত্তি আশ্রয়ে উঠাইয়া দাও। কোন বৃত্তিই মায়া নয়, মিথ্যা নয়, সবই স্বরূপের রূপ—তবে তাহাকে জীবনের স্রোতে না নামাইয়া উর্দ্ধে দেবতার আসনে পাঠাও। রোধও নয়, ভোগও নয়, আবার ত্যাগও নয়—ঈশ্বরে অর্পণ। এইরূপে চিত্তে অসংখ্য বৃত্তির জাগরণের পথরোধে ঐশ্বর্য্যহীন হইতে হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না উপরের দিকে তাহাদের সহজগতি সৃষ্টি হয়—সাধকের কার্য্য ইহাই। প্রবর্ত্তদশায় এইরূপ অন্তর-সাধনার ফলে সিদ্ধ অবস্থায় এই অসংখ্য উর্দ্ধযাত্রী বৃত্তি অমৃতপ্রস্রবনের মত অবতরণ করে, জীবন তখন মধুময় হয়।

সাধনার তিনটী পর্য্যায়। প্রবর্ত্তদশায় সাধককে উপরে উঠিতে হয়, ভাগবত স্বরূপে আপনাকে ডুবাইয়া দিতে হয়; তারপর রসপ্রবাহে ভাসিয়া রূপের জগতে অবতরণ করিতে হয়—প্রেম ও আনন্দভোগই জীবনের লক্ষ্য। ইহা যখন নিত্যরূপে মর্ত্ত্যে ফুটে, তাহাই জাতির সিদ্ধমূর্ত্তি।"

বাংলার সাধনতত্ত্ব—জাতিগঠনেরই সিদ্ধ তন্ত্র। ৯ম বর্ষে এই নিগূঢ় জীবনবিজ্ঞান আরও পূর্ণ প্রবাহে উচ্ছ্বসিত হইয়া চলিল। উদাত্ত কণ্ঠে মর্ম্ম নিঙড়াইয়া কত বড় আশার বাণী "প্রবর্ত্তক" জাতিকে শুনাইল—

"এই শরীর, প্রাণ, মনের মন্থনে সাধ্যের উৎপত্তি। সাধ্য বস্তুই ঈশ্বর-প্রাপ্তির সাধনা করে।......সেই সাধ্য, সে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিরূপা, প্রেমরূপা মহাকালী, মহারাধা যদি নাচে এই বুকে, এই হৃদয়ের রাস-মন্দিরে, তবেই তো সিদ্ধি, তবেই তো জীবন কৈলাস, গোলকে পরিণত হইবে। জীব সামান্য, কিন্তু গুরুর আশ্রয়েই আপনার মধ্যে দিব্য প্রকৃতির সন্ধান পায়; সাধ্যরূপে এই প্রকৃতি যেদিন জীবনকে কেন্দ্র করিয়া ভাগবত লালসায় উদ্বুদ্ধা হন, তখন মর্ত্ত্যের বুকে হাজার গৌরাঙ্গ, হাজার রামকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে।......যেখানে সহজে ইহা সিদ্ধ হয়, সেইখানেই ইহার চতুর্ব্বর্গ ফল মিলে।"

সাধনার কথা "প্রবর্ত্তকে" শুধু ভাষা হইয়াই রহিল না—যোগপথে মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের প্রতীকরূপেই "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের" একদিকে স্নিগ্ধশ্যাম আশ্রম, অন্যদিকে গগনচুম্বী মন্দিরতীর্থ গড়িয়া উঠিল। শ্রীমন্দির ১৩২৯ সালের শুভ অক্ষয়তৃতীয়ায় ৺বিপিনচন্দ্র পালের পৌরোহিত্যে শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠোৎসবের পর সেই মন্দিরদেবতাকে ঘেরিয়াই আবার এক অক্ষয়া তৃতীয়ায় যে জাতীয় মেলা ও প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই মহোৎসব কত রূপে, কত ছন্দে বর্ষে বর্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে—তাহার সমাহার করিলে বাংলা ও বাঙালীর অভ্যুদয়েতিহাসের অমূল্য উপাদান সংগৃহীত হইবে।

এই ৯ম বর্ষ অর্থাৎ ১৩৩১ সালেই পূজার সংখ্যা "প্রবর্ত্তকে" প্রকাশিত "শত বর্ষের বাংলা"র পরিচয়—বাঙালীর ধর্ম্ম ও কর্ম্মযুগের এক নূতন রামায়ণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। "নবযুগ" উপন্যাসেও এই জাতি-গঠনেরই অগ্নিসঙ্কেত। রাজসিক যুগের প্রবল উত্তেজনা ও বৈপ্লবিক অস্পষ্টতা উত্তীর্ণ করিয়া, জাতীয় সত্তার সুমঙ্গল মূর্ত্তি আবিষ্কার—এই সময়ে "প্রবর্ত্তকের" অতি বড় শুভ কর্ম্ম। উদীয়মান জাতির ইহা নব যুগেরই আয়োজন-পর্ব্ব বলা যায়। সেই সন্ধিপর্ব্বে "প্রবর্ত্তক" জলদমন্দ্রে প্রচার করিতেছে—

'আজ রাষ্ট্রবিপ্লবের চেয়ে জাতির মস্তিষ্কে মহাবিপ্লবের তরঙ্গ তুলিয়া একটা নূতন জাতি গড়িয়া তুলিতে হইবে।

এই জন্য চাই সর্ব্বাগ্রে এমন একটী কেন্দ্র গড়িয়া তোলা, যে কেন্দ্রের শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা জাতির জীবনে বিপ্লবের তরঙ্গ তুলিবে। সে বিপ্লবের আঘাতে পুরাতন বুদ্ধি চূর্ণবিচূর্ণ হইবে—শুধু ভাবে নয়, বস্তুতন্ত্র জীবনেও জাতীয়তার উদার নীতি ফুটিয়া উঠিবে। আমরা এই পথের প্রথম যাত্রী।'

শুধু প্রচার নহে, সাধনার মন্ত্রবীর্য্যে যে বস্তুতন্ত্র শক্তিকেন্দ্র সেদিন জীবনক্ষেত্রে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাকে রাজচক্ষে ও লোকচক্ষে স্পষ্ট করিয়া ধরিতেও তাহার কি সে আকূতি! "প্রবর্ত্তক" বার বার ফুকারিয়া বলিতেছে—

"প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকে তাঁহারা একটী সমিতি মাত্র মনে করেন বা আশ্রম রূপে দেখেন তাঁহারা ইহার পরিচয় জানেন না—প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ একটী মিশন—সম্পূর্ণ গোত্রান্তরিত নারীপুরুষের সাধনতীর্থ।

এতদিন মিশনের কাহারা, তাহাদের বাছাই করিতেই কাটিয়াছে, সে বাছাই শেষ হইল—এক্ষণে 'প্রবর্ত্তক' জাতিগঠনে উদ্যোগী। সে জাতি ভারতজাতি—হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খৃষ্টান নয়, ভারতকে মা বলিয়া স্বীকার করেন যিনি, তিনিই এই নব জাতির একজন। জাতিভেদ, বর্ণভেদ, যৌনভেদ না রাখিয়া, অখণ্ড ভারতজাতির মধ্যেই আমরা নূতন সমাজগঠনে উদ্যত হইয়াছি। এই মিশন কেবল সন্ন্যাসীর

জন্যও নহে, আবার গৃহীর জন্যও নহে—ঈশ্বরের বিধান যেখানে যেরূপ ভাবে ফুটিয়া উঠে, তাহা ধরিয়াই আমাদের চলিতে হয়। ভারতের নব সমাজ বর্ণ, গোত্র, জাতিনির্ব্বিশেষে এক।

নির্ম্মাণের ইহাই আদিসূত্র। নির্ম্মাণ অর্থে—জাতিনির্ম্মাণ। কৃষক-সমবায় নহে, ভোটযুদ্ধে জয়লাভের জন্য সংহতিগঠন নহে—জাতির জীবনের আমূল রূপান্তর। আমরা এই জাতি-নির্ম্মাণের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া দারুণ সঙ্কট মাথা পাতিয়া লইয়াছি।"

সঙ্কট রুদ্র মূর্ত্তিতেই দেখা দিল—একেবারে বজ্রের মত মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল।

"প্রবর্ত্তকের" বর্ষ-শেষে এই সঙ্কটের হিসাব-নিকাশ প্রকাশ করাও সম্ভব হইল না। ১৩৩১ সালের পৌষ মাসে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট রাজনৈতিক সংশয়েই "প্রবর্ত্তক" পত্রিকা তিন মাসের জন্য "সাস্‌পেণ্ড্‌" করিলেন এবং এই দণ্ডপর্ব্ব উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই, শুধু "প্রবর্ত্তক" পত্রিকা নয়, "প্রবর্ত্তক"-সম্পাদক ও "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের" উপর ফরাসী ও ইংরেজ, উভয় রাজশক্তির দিক্‌ হইতে উপর্য্যুপরি যে আঘাত আসিল, তাহাতে "প্রবর্ত্তকের" নাম ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া দিবারই বিভীষিকা ছিল—কিন্তু "প্রবর্ত্তকের" প্রাণ ভারতের অমর, সনাতন ধর্ম্মবীর্য্য; তাহা তো মানুষের, প্রকৃতির বজ্রে ধ্বংস হইবার নহে। অগ্নিপরীক্ষায় কষিত কাঞ্চনের ন্যায় "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ" গুরুতর ব্যাপক মূর্ত্তি লইয়াই আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। সঙ্ঘের বীরবৃন্দ নব জীবনের প্রতীক "প্রবর্ত্তকের" জয়পতাকা হস্তে ফরাসী চন্দননগর হইতে মহানগরী কলিকাতার বুকে আসিয়া নবীন কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিলেন।

৬৬নং মানিকতলা ষ্ট্রীটে প্রবর্ত্তকের বিশাল মুদ্রাযন্ত্র উঠিয়া আসিল। ২৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে নূতন পাব্লিশিং হাউস খোলা হইল। এই সকলই কলিকাতায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক সূচনা বলা যাইতে পারে। ১৩৩২ সালের বৈশাখে এইখান হইতে নব পর্য্যায়ের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় "প্রবর্ত্তকের" এই পুনর্জন্ম সে যুগে সত্যই বিস্ময়কর, ইহাতে সন্দেহ নাই। প্রথম সংখ্যায় মর্ম্মবাণী—

"বোঝাবুঝির অভাবে, শুধু রাষ্ট্র নয়, সর্ব্ব স্তরেই আমাদের নির্য্যাতন সহিতে হইতেছে। নির্য্যাতনের যন্ত্রণা যতই নিদারুণ হউক, অন্তর্যামীর নিকট বড় খাঁটি আছি—মিথ্যার ভান, আত্মপ্রসাদের চাতুরী নাই—জয় তাই অবশ্যম্ভাবী। 'প্রবর্ত্তকের' জন্মান্তর জাতিরই নব-পর্য্যায়।"

প্রচ্ছদ-পটে সেদিন ঋষিকল্প জাতীয় শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-দীক্ষাদায়িনী ভারতমাতার অপূর্ব্ব কল্পমূর্ত্তি—প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের চতুরঙ্গ সংগঠন-সাধনারই যেন ইহা বিশিষ্ট রূপপ্রতীক হইয়াছিল।

১৩৩২ সালে "প্রবর্ত্তকে"র দুইটী বিশেষ সংখ্যা—পূজার "শক্তি-সাধন-রহস্য" ও পৌষের "যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ" সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল ও মরমী জনের হৃদয়ে গভীর তৃপ্তি দিয়াছিল। শেষোক্ত সন্দর্ভটী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি ও সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী শ্রদ্ধেয় স্বামী শিবানন্দ মহারাজ "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকে" এই আশীর্ব্বাণী প্রেরণ করেন—

"স্বামীজির আদর্শ ও উপদেশানুযায়ী জীবন আপনার গঠন করুন এবং দেশবাসীকে যুগাচার্য্যের বাণী শুনাইয়া তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করুন, শ্রীভগবৎপাদপদ্মে সতত এই প্রার্থনা করিতেছি।"

অতঃপর "প্রবর্ত্তকের" জয়যাত্রা সঙ্ঘের জয়যাত্রার সঙ্গে সকলেরই চক্ষের সম্মুখে ঘটিয়া চলিয়াছে। সঙ্ঘের সে ঘটনাবহুল জীবনের সকল কথাই "প্রবর্ত্তকের" বুকে ভাষার অক্ষরে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে—এক কথায়, "প্রবর্ত্তক"কে এই হিসাবে "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘেরই" বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। "প্রবর্ত্তক" সঙ্ঘেরই আক্ষরিক ইতিহাস—শব্দময়ী প্রতিচ্ছবি। সেই সঙ্গে সঙ্ঘের দৃষ্টিপটে জাতির যে জীবনগতির আলোক-চিত্র ধরা পড়িয়াছে, তারও অবিকৃত রূপরেখা বিচিত্র আলো ও ছায়ায় চিরদিন স্থান পাইয়াছে। সঙ্ঘের অনাহত সুরে ও ছন্দেই জাতির জীবনকে বাঁধিয়া দিবার চিন্তা ও চেষ্টা ধারাবাহিক ভাবেই সে করিয়াছে—কত ছলে, কত ভঙ্গীতে বলিয়াছে

"আমরা জাতিজীবনে ভাগবত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা চাহি—আমরা বাংলার সাধনাকে রূপ দিব জাতির মধ্যে। বাঙালী শুধু গান গাহিবে না, ভগবানকে সর্ব্ব আচারেই যে আরাধনা করা যায়—ভোজনে ভগবানের আহুতি, ভ্রমণে ভগবানের প্রদক্ষিণ, শয়নে প্রণাম, নিদ্রায় ধ্যান, কর্ণে যত ধ্বনি, সবই ভগবানের নাম—এই বোধ সর্ব্ব কর্ম্মে প্রতিষ্ঠা করিবে।"

বুকের অগ্নিময়ী বিশ্বাস ঢালিয়াই সে ঘোষণা করিয়াছে—

"এই চেতনার স্তরে জাতিকে উন্নীত করার জন্য আমরা মাঠে গিয়া দাঁড়াইব। এই চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই আমরা শ্রম-শিল্পের ক্ষেত্রে আত্মদান করিব। এই চেতনার উদ্গান সাড়ে চার কোটী বাঙালীর কণ্ঠে ধ্বনি তুলিবে। এই ঈশ্বরবিশ্বাসের জয় দিতে নূতন ঘর, নূতন সমাজ, নূতন জাতি নির্ম্মাণ করিব। এ পথে বাধা যদি পাই, বুকের খুন ঢালিয়া বিশ্বাসের জয় দিব।"

সঙ্ঘের জীবন-নীতি সুস্পষ্ট চিত্রের ন্যায় দেখাইবার জন্য "প্রবর্ত্তক"ই তাহা এইরূপ স্তরে স্তরে বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছে :—

"ভারতে দিব্য জাতি-গঠনের প্রেরণা আমাদের অভ্রান্ত। এইজন্য

(১) জাতির মধ্যে ভাগবতে চৈতন্য জাগাইয়া, প্রেম ও ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(২) এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার চিহ্নিত নারীপুরুষদের আত্মা, হৃদয়, দেশ, জাতি, ধর্ম্ম এক হইবে।

(৩) তাহারা এক পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিবে। কাহারও স্বতন্ত্র অর্থভাণ্ডার থাকিবে না, নিজস্ব সম্পত্তি থাকিবে না।

(৪) ইহার জন্য সন্ন্যাসী, গৃহী, ব্রহ্মচারী সকলেই অধিকারী। সকলেই সংযমপরায়ণ হইবে। সাধনার বীজভূমি আশ্রমে গৃহীকেও ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে হইবে।

(৫) সঙ্ঘধর্ম্মে যাহারা দীক্ষিত হইবে, ইষ্টসঙ্ঘই তাহাদের জীবনের মূলমন্ত্র। এই সাধনার ক্ষেত্রে কোনও আশা ও প্রলোভনের স্থান থাকিবে না।

(৬) সঙ্ঘধর্ম্মী হিংসা ও পরবিদ্বেষ পোষণ করিবে না। সত্যনিষ্ঠ ও শান্তিপ্রিয় হইবে। পাপ ও অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য গোপন ষড়যন্ত্র নহে, বিশুদ্ধ নীতিই আশ্রয় করিবে।

(৭) সঙ্ঘের প্রত্যেকেই প্রত্যহ যথারীতি উপাসনায় যোগ দিবে।

"প্রবর্ত্তকের" তৃতীয় যুগ আজও চলিতেছে। সঙ্ঘ আজ নবজীবনের পথে। সঙ্ঘের এই রূপান্তর জাতি-জীবনেরই পরম সিদ্ধির জন্য। সে কথা আজ নয়, "প্রবর্ত্তক"ই আবার বলিবে। রূপান্তরের সন্ধিযুগে "প্রবর্ত্তকের" জাগ্রত দেবতাকে আমরা ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রণতি জ্ঞাপন করি। ওঁ স্বস্তি।

---

# পদাবলী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

একখানি মহাকাব্য একদা জীবন্ত রূপ
করিয়া ধারণ
হয়েছিল অবতীর্ণ, অদ্বৈত রচিল যার
মঙ্গলাচরণ।

পেয়ে এই ধরণীতে অপ্রাকৃত মহাকাব্য
প্রেম মূর্ত্তিমান্।
করেছিল উপভোগ অলৌকিক রসধারা
যত ভাগ্যবান্।

সেই মহাকাব্যখানি সহস্র সহস্র অংশে
হইয়া খণ্ডিত,
সহস্র সহস্র গীতে করিয়াছে গৌড়ভূমি
রস-বিমণ্ডিত।

প্রেমের গগনে কবে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র
হল সমুজ্জ্বল,
এ বঙ্গের রসসিন্ধু হল তাই নৃত্যরত
তরঙ্গে উচ্ছল।

সে ইন্দুর পূর্ণ বিম্ব সহস্র সহস্র খণ্ডে
ভাঙ্গি' গেল তায়।
অশ্রুময় ক্ষারসিন্ধু হল তার ক্ষীরসিন্ধু
রজত আভায়।

অস্তমিত পূর্ণচন্দ্র খণ্ড বিম্বগুলি বাজে
করে ঝলমল,
ইন্দুহারা সিন্ধুবুকে পুণ্য পদাবলীরূপে
তাঁহাই সম্বল।

# ঝড়ের সঙ্কেত

## শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল

[ এই গল্পের নায়ক সমাজের তথাকথিত দুর্নীতি ও অপরাধের প্রতীক ছিল। বিচার বিবেচনাহীন মূঢ়তা ও আত্মাবমাননায় তাহার আনন্দ হইত। একদা তাহাদেরই গ্রামের একটি মেয়ের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। মেয়েটির কুলপরিচয় লজ্জাজনক হইলেও হৃদয় ছিল মহৎ, মেয়েটি বিপ্লবী ও দেশের দলে কাজ করিত। দানবীয়তার সহিত প্রেমের সংগ্রাম বাধিল—পুরুষের হৃদয়-বেদনা ও প্রত্যাখানে রক্তাক্ত হইয়া উঠিল। অবশেষে মেয়েটি তাহাকে জনগণসমুদ্রের তটে আনিয়া হাজির করিল। দুরু দুরু দুঃসাহস আর নব আদর্শের আলোড়নে পুরুষের বুকে ঝড় উঠিল। লেঃ ]

### দশ

যে-জগত আমার পরিচিত, সেখান হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া কোন্ অজানা জগতে যেন ছিটকাইয়া পড়িলাম। এখানকার সমাজ, চিন্তাধারা, জীবনযাত্রা ও আদর্শের অলিগলি পথ আমার চেনা নাই, সেই জন্য কোনো দিক্ হইতেই যেন বেশ আল্‌গা হইয়া হাত-পা ছড়াইয়া কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না।

কিন্তু ওইটি আমার পক্ষে স্মরণীয় মুহূর্ত্ত। যে-মৃন্ময়ীকে আমি উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দীর্ঘ এক বৎসরকাল লক্ষ্য করিয়া আসিলাম, যাহার প্রতিটি নিশ্বাস, প্রতিটি রক্ত-বিন্দুর ইতিহাস আমি আয়ত্ব করিয়াছি, যাহাকে সম্পূর্ণ-রূপে গ্রাস করিয়া একান্তভাবে পরিপাক করিয়াছি, সহসা সে যেন পুনরায় বিস্ময়রূপে দেখা দিল। মন বস্তুটি যে বিচিত্র ইহাতে আর সন্দেহ কি? খুঁড়িতে খুঁড়িতে অগাধে তলাইয়া ইহার আকর হইতে কত যে অদ্ভুত মণি-রত্ন আহরণ করি তাহার ইয়ত্তা নাই। মৃন্ময়ী একদিন আমাকে বলিয়াছিল, তুমি ছোট নও, তুমি অনেক বড়। ইতর জীবনযাত্রায় তোমার মৃত্যু ঘটে নাই, কারণ মানুষের ভিতরে যে আসল মানুষ তাহার গায়ে কাদা লাগে না, সে তার সমস্ত মালিন্যকে অস্বীকার ক'রে মাথা তুলে দাঁড়ায়। প্রাণের যে দেবতা তাঁর হোমাগ্নি অনির্ব্বাণ উজ্জ্বল, সেই আগুনে বারে বারে আমাদের সকল অন্যায় পুড়ে ছারখার হচ্ছে। মৃন্ময়ী সেদিন সত্য বলিয়াছিল কিনা জানি না কিন্তু তাহার সেই বাণী শুনিয়া আমার মাৎসর্য্যময় অর্ব্বাচীন মন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। নিজের প্রতি কেমন যেন শ্রদ্ধা বাড়িল। আজ আমার ভিতরে যে ঝড় উঠিয়াছে তাহাতে যেন অনেক অপরিচিত উড়ো চিন্তার টুকরা দেখিতে পাইলাম। একথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইব না যে, স্ত্রীলোকের নিকট আমি অনেক শিক্ষা পাইয়াছি। তাহারা আমাকে পাপ করিতে শিখাইল, বিদ্বেষ, হিংসা ও কলঙ্ক কাহাকে বলে জানাইল, নীচে টানিয়া নামাইল, ঘৃণা ভয় ও অসম্মানের পথ দেখাইয়া দিল,—আজ আবার তাহারাই সন্ধান দিতেছে সেই পথের, যে-পথ মহিমা ও অমরত্বের দিকে গিয়াছে; ভালোবাসার অপেক্ষাও যাহা বড়, সেই বৃহত্তের কল্যাণ পথের সন্ধান দিতেছে।

মলিনাদির পাশে বসিয়া মৃন্ময়ীর মুখে যাহা শুনিলাম, সেটি যেন অগ্নিমন্ত্র; অমন করিয়া কোনো কথাই আগে আমি শুনি নাই। কয়েকটি শব্দবিন্যাসের ভিতরে কেবল যে অগ্নিই ছিল তাহাই নয়—অপরিমেয় শক্তি, যাহা বজ্রের কাঠিন্য দিয়া প্রস্তুত,—সেই শক্তিও ছিল। ওইটি আমার স্মরণীয় মুহূর্ত্ত। ওই মুহূর্ত্তে যে বিদ্যুজ্জালা জ্বলিয়া গেল, সেই প্রলয়ের আলোয় কেবল যে মৃন্ময়ীর মুখের চেহারায় অগ্নিরূপিণী নারীকে দেখিলাম তাহাই নয়, সেই আলোয় নিজেকেও প্রকাশিত হইতে দেখিলাম। চোখের সম্মুখে দেখিলাম, ভালোবাসার সহিত দেশের সেবাকে মিলাইয়া সে দেখিবে ইহাই তাহার সাধনা। প্রেমকে সে ছোট করিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবে না; দেশের দুর্গমের দিকে, রাজনৈতিক লাঞ্ছনা ও দুঃসাহসিক দেশসেবার পথে প্রেমকে সে প্রসারিত করিয়া দিবে। নইলে ভালোবাসা তাহার মিথ্যা, জীবন তাহার তুচ্ছ।

একটি সম্পূর্ণ বৎসর মৃন্ময়ীকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলাম। শৈশবকালে তাহাকে ভালোবাসিতাম ক্রীড়নকের মতো। যেদিন হইতে তাহাকে দেখিলাম না, সেইদিন অবধি নূতন

খেলা পাইয়া মাতিয়া উঠিলাম, তাহার জন্ম কোনো উদ্বেগই অনুভব করি নাই। প্রকাণ্ড এই সংসারে কোথায় সে হারাইয়া গেল। আজিও সে অনাদৃত। মাতৃকুলের কলঙ্ক বহন করিয়া পথে পথে সে ঘুরিয়া বেড়ায়। জাত্যাভিমানের সংস্কার সে রাখে নাই, সকল জাতির কাছেই পাত পাতিয়া সে খাইয়া বেড়ায়। সামাজিক পরিচয় তাহার নাই, বড় একটা গাছের ছায়ায় থাকিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিবার মতোও কিছু তাহার নাই, তাহার ঐশ্বর্য্য নাই, অর্থ নাই—তাহার জন্য কাঁদিবার অথবা ভাবিবার মানুষও আজ অবধি দেখিলাম না। পথে পথেই তাহার বাসা; পথে পথেই তাহার নিত্য যাওয়া আসা। তাহার সম্বলের মধ্যে ছোট একটা সুটকেস, দু'চারটি শাড়ী অথবা জামা, হয়ত গোটা দুই টাকা, হয়ত বা একখানা মাথার চিরুণী—কিন্তু এই তাহার অনেক, ইহার বেশি থাকা সে প্রয়োজন মনে করে নাই, ইহার অতিরিক্ত কিছু রাখা সে দৈন্য মনে করিয়াছে। আজ যদি বা আমাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার অবস্থান্তর ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, সে তাহার বজ্রকঠিন স্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। সচ্ছন্দ সংসার, সচ্ছল জীবন, নিরুদ্বেগ প্রত্যহের সুখযাপন, নিশ্চিন্ত দিবারাত্রির নিভৃত বিলাস ও সম্ভোগ—ইহা তাহার গতিশীল জীবনের পক্ষে প্রকাণ্ড একটা অবরোধ,—এগুলির মধ্যে সে বন্দীযন্ত্রণা অনুভব করিবে। তাহার কল্পনা ও কামনা অনেক বড়, অনেক বড় কাজ তাহার বাকি,—এই দৈব ক্ষুধা মিটিবার পূর্ব্বে তাহার শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই। দেশের কাজ লক্ষ্মীছাড়ার কাজ, কিন্তু তাহাতেই মৃন্ময়ীর আনন্দ। জন্তুর মতো আত্মগোপন করিয়া থাকা, নিত্য লাঞ্ছনার শঙ্কায় শঙ্কিত মন, দারুণ অভাবের মধ্যে নিজেরই অশ্রু অঞ্জলী ভরিয়া পান করা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করা বৈরাগী জীবন, স্থান হইতে স্থানান্তরে বিতাড়িত হইয়া আনন্দ পাওয়া,—এই সকল ব্যাপারেই তাহার মন উল্লসিত হইয়া উঠে। কেহ কোথাও একটা স্বপ্ন লইয়া মাতিয়াছে, কেহ ঘর ভাঙিয়া দুরন্ত খেলা খেলিতেছে, কেহ সর্ব্বস্ব ফেলিয়া দুর্গম মেরুপথের মৃত্যুর দিকে ধাবিত হইয়াছে, কেহ কোনো একটা কাল্পনিক আদর্শের জন্য পড়িয়া পড়িয়া মার খাইতেছে—ইহাতে বুকের রক্ত তরঙ্গে তরঙ্গে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। আমার সংস্কারবদ্ধ মন এক এক সময় তাহার মনের চেহারা দেখিয়া ভয় পায়—যেমন অন্ধকারে উত্তাল-তরঙ্গ সমুদ্র দেখিলে অন্তর ধক ধক করিতে থাকে। বুদ্ধির সীমানার মধ্যে, যুক্তির শাসনের মধ্যে আমি তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারি না। যে সমস্যা ও প্রশ্ন লইয়া পৃথিবীর সকলে বৈষয়িক সাফল্যের দিকে ছুটিতেছে, মৃন্ময়ীর একটি ছোট হাসিতে তাহা যেন ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

চৈত্রের দুপুরে একদিন আমি তাহাকে লইয়া বাহির হইলাম। মলিনাদির কাছে সে অধুনা বাসা বাঁধিয়াছে, সুতরাং আপাতত আশ্রয়ের সমস্যা তাহার নাই। কয়েকদিন একটু যত্ন পাইয়া তাহার স্বাস্থ্যের চিক্কণ ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার সুন্দর দেহের কঠিন নিটোল গঠন আমার মনে পথ চলিবার উৎসাহ আনিতেছিল। রৌদ্র খরতর, পথ জনবিরল, যানবাহনের গতি মন্থর,—আমাদের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার অথবা ঔৎসুক্য বোধ করিবার মতো জনতা পথে কোথাও ছিল না।

প্রণয় ও বন্ধুত্বকে প্রগাঢ় করিয়া তুলিবার যে অবকাশের প্রয়োজন, সে-প্রয়োজন আমাদের আর ছিল না। ভালোবাসা লইয়া যে-চৌর্য্যবৃত্তি, যে হাস্যকর লুকোচুরি, যে সঙ্গোপন ইতরবৃত্তি—তাহা হইতে মন সরিয়া গেছে, তাহার অলীক চেহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া লোকচক্ষু এড়াইয়া চলিবার রুচি আর নাই, এখন জীবনের উত্থান-পতনের সমস্যা নিষ্পত্তি করিবার সময় আসিয়াছে। রসায়ন শাস্ত্রের কথা শুনিয়াছি। এক পদার্থের সহিত আর এক পদার্থ মিশ্রিত করিলে তৃতীয় রসের উৎপন্ন হয়। কেমন যেন একটা জারক রসে ফেলিয়া আমাকে একদিকে যেমন কলঙ্কমুক্ত করা হইতেছে, অন্যদিকে তেমনই একটা নূতন ধাতু গড়িয়া উঠিতেছিল। নিজের ক্রমোপরিণতি দেখিয়া আমি নিজেই বিস্ময়মুগ্ধ হইতেছিলাম।

চলিতে চলিতে বলিলাম, মীনু, এমন একটা পথে এগিয়ে যাচ্ছি যেখানকার রাস্তাঘাট আমার কিছু জানা নেই।

মৃন্ময়ী বলিল, যদি ভয় করে ফিরে যাও। যেদিন

জানবে কোনো বাধা আর ভয় তোমার মধ্যে নেই সেদিন আবার কাজের ভার তুলে নিয়ো।

কিন্তু ফিরে যাবার ত আর উপায় নেই। ফিরে যাবো কোথায়? সেই জীবনে? তার চেহারা ত দেখে নেওয়া গেছে। অসচ্চরিত্রে আনন্দ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্ষতি অনেক বেশি। ফিরে যেতে আর আমাকে বলো না, মৃন্ময়ী। ফিরে গেলেই আমি তলিয়ে যাবো। এতদিন পরে নিজের মধ্যে যে-শক্তির সন্ধান পেয়েছি, সে যদি আমাকে ওপর দিকে না তুলতে পারে তবে তার প্রচণ্ড আকর্ষণে আমি অগাধ নিচে তলিয়ে যাবো।

আমি অসহায় বোধ করিতেছিলাম তাহা মৃন্ময়ী বেশ বুঝিতে পারিল। হাত ধরিয়া কহিল, নিজের ওপর সন্দেহ তোমার আজো ঘোচেনি। জগতের নীতিশাস্ত্রের বিচারে যা মন্দ তা তুমি অনেক করেছ, কিন্তু তাতে আনন্দ যে পাওনি তার প্রমাণ তোমার এই সন্দেহের দোলা, তুমি সুখী নও, তুমি শান্ত নও। তোমার মুখে চোখে অপরাধীর অস্বস্তির ছায়া, তাই যতদিন তোমার জীবন ততদিন এই ভূতের উপদ্রব থাকবে তোমার মনে।

বলিলাম, কিন্তু দেশোদ্ধারের পথও ত অনির্দ্দিষ্ট।

দেশোদ্ধারের পথ ত বলিনি, বলেছি মানুষের পথ।

মানুষের পথ কা'কে বলছ?

চৈত্রের বাতাসে ঝরাপাতা উড়িয়া চলিতেছিল। গাছের ছায়ায় ছায়ায় মাঠের প্রান্ত দিয়া চলিয়াছি, কপাল বাহিয়া আমাদের ঘামের ফোঁটা নামিয়া আসিয়াছে। খরসূর্য্যরশ্মির দিকে একবার মুখ তুলিয়া মৃন্ময়ী কহিল, মানুষের পথ তাই যাতে মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়। এই ধরো মানুষের নিঃস্বার্থ সেবা।

বলিলাম, মৃন্ময়ী, কথাটা শুনতে ভালো, মানুষের সেবা। সেবার কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞা বললে না। তুমি জানো ব্যক্তি বিশেষের সেবা সহজ, সমষ্টির সেবা সাধারণ নয়।

মৃন্ময়ী আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, যারা দলিত, বঞ্চিত, ক্ষুধিত—সেই সব মানুষের দলকে কি তুমি খুঁজে পাওনা?

বলিলাম, না, চোখে তাদের কখনো দেখিনি।

যদি তাদের মাঝখানে তুমি গিয়ে দাঁড়াও, তাদের কি তুমি আপন ক'রে নিতে পারবে?

তাদের মনুষ্যত্বের অবশেষ যদি কিছু থাকে হয় ত পারতেও পারি।

আছে—মৃন্ময়ী কহিল, নিশ্চয়ই আছে। সেই পথটি জানা দরকার, যে পথ সোজা গিয়ে তাদের অন্তরে ঢুকেছে। আমরা তাদের উপকার করতে যাই, সেবা করতে যাইনে, তাই তারা দূরে ঠেলে দেয়, আত্মীয় বলে কাছে টেনে নেয় না। চলো, আমি তোমাকে নিয়ে যাবো তাদের কাছে।

একটি দিন মৃন্ময়ীকে না দেখিলে সেই দিনটি আমার নিকট দুঃসহ হইয়া উঠিত। আমি যেন তাহারই নিশ্বাসে নিশ্বাস লইতেছিলাম, আমার কল্পনার আকাশ যেন তাহারই দুইটি দৃষ্টির মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। রাত্রি ভরিয়া স্বপ্নের মতো সে আমার চোখের তন্দ্রায় লাগিয়া থাকে, সমস্ত দিনমান ভরিয়া তাহারই আবেশে আমি বিভোর থাকিতাম।

পারিবারিক জীবন আমার শিথিল হইয়া আসিতেছে। যে-ঘরটি আমার অতি প্রিয়, যে সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমের জন্য আমি এত অর্থ ব্যয় করিয়া এত হইতে 'কিউরিয়ো' সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার মূল্য যেন আর খুঁজিয়া পাই না। ভাবিলাম, কবে এই ঘর ভাঙিবে, কবে আমি মুক্তি পাইব? ভবিষ্যতের অত্যুগ্র আলোটা আমার চোখের উপর পড়িতেছিল, সেই আলোতে আমি দিশাহারা হইতেছিলাম। দূর হইতে সমুদ্রের গর্জ্জন শুনিতেছি সেখানে আমাকে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে হইবে। অতীত জীবনের আমার সকল ইতিহাস মুছিয়া যাইতেছে, নূতন পাতায় নূতন করিয়া লাভ ক্ষতি আর সুখ দুঃখের কাহিনী লিখিতে হইবে। ভাবিলাম, এখনও সময় আছে, মৃন্ময়ীকে ছাড়িয়া আমি কোনো দূর দেশে পলাইয়া যাই, প্রান্তরে পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়াইব, আর কখনো তাহার কাছে আসিব না। জানি সে আমাকে বাঁধে নাই, আমি চিরকালের জন্য মুক্তি চাহিলেও সে আমাকে বাধা দিবে না, কিন্তু হায়, তাহা সম্ভব নয়, কেমন একটা অচ্ছেদ্য আকর্ষণে সে আমাকে

টানিয়া লইতেছে। চাহিয়া দেখিলাম ইহা যেন আমার জীবনের একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, আমার ভিতরে প্রথম হইতে কোথায় একটা ভাবপ্রবণ দুর্ব্বল মানুষ আত্মগোপন করিয়াছিল, আজ মৃন্ময়ীর বারম্বার খোঁচা খাইয়া সে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। হিংসা, কাপট্য, স্বার্থপরতা, নিম্নাভিমুখীনতা, লাম্পট্য,—সমস্ত অতিক্রম করিয়া আমার সেই ভিতরের মানুষ আজ বাহিরের আলোয় আসিয়া তাহারও বাণী প্রকাশ করিতে চায়।

সেদিন একটা নূতন জগতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। কয়েকদিন হইতে কলিকাতায় ও সহরতলীতে একটা মজুর ধর্ম্মঘট চলিতেছিল। আজ বাইশ দিন হইল তাহারা কাজে যোগ দেয় না। শ্রমিক নেতাদের সহিত সরকার পক্ষ ও মালিকদের একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। কিছু কিছু সর্ত্ত পূরণ হইলে তবে ধর্ম্মঘট ভাঙিবে। তাহাদের বেতন বৃদ্ধি ও জীবন যাত্রার সুব্যবস্থা না হইলে তাহারা কিছুতেই কাজে যোগ দিবে না।

আমার সঙ্গে মোটর ছিল। মলিনাদি, মৃন্ময়ী আর দুইজন শ্রমিক নেতাকে লইয়া আমরা মেটিয়াবুরুজের দিকে চলিলাম। ধর্ম্মঘটের চেহারা বর্ণনা করা অথবা শ্রমিক আন্দোলনের প্রচার কার্য্য করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সেখানে গিয়া যাহা দেখিলাম, পৃথিবীর আর কোথাও অনুরূপ দৃশ্য আছে বলিয়া বিশ্বাস করিলাম না। মৃন্ময়ীর সহিত যতবার যেখানে গিয়াছি, সেখানেই দেখিয়াছি নিরপরাধ মানবাত্মার উৎপীড়ন, দেখিয়াছি মানুষের ভিতরকার ভগবান সেখানে পঙ্কে, দুর্গন্ধে, দারিদ্র্যে, অনাহারে, নিরাশ্রয়ে, অপমানে নতমস্তক; দেখিলাম এই নির্ব্বোধ, হিংস্র, লোভ আর লালসাজর্জ্জর ক্ষুধার্ত্ত শ্রমিক জগতের ভয়াবহ রূপ।

মলিনাদি নোংরা বস্তির ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে বলিলেন, এরাই দেশের মানুষ, রাজেনবাবু।

আলোবায়ুহীন বস্তির ভিতরকার দুর্গন্ধে আর অন্ধকারে অসংখ্য জানোয়ার যেন বাসা বাঁধিয়া আছে। মলিনাদির কথার উত্তর দিলাম না, কেবল মনে মনে প্রতিবাদ করিলাম। বলিলাম, ইহারা দেশের মানুষ নহে। লোভী আর বর্ব্বরের কুৎসিত স্বভাবের ভিতরে যে বিকার আর ধিক্কার, যে পুতিগন্ধময় মালিন্য ইহারা তাহারই প্রতিরূপ। এই অসংখ্য শ্রমিকদের দুরবস্থা দেখিয়া ইহাদের জন্য কাঁদিব অথবা ইহাদের টানিয়া যাহারা নিচের দিকে নামাইয়াছে তাহাদের জন্য চোখের জল ফেলিব? যাহারা সমাজপতি, শাসক, ধনতান্ত্রিক, সভ্যতা প্রচার লইয়া যাহারা গর্ব্ব করে ইহারা যেন তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা কদর্য্য লোভ আর লালসার সাক্ষ্য লইয়া জীবনযাপন করিতেছে। আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মলিনাদি একজন নেত্রী। যাহারা ধর্ম্মঘট করিয়াছে এমন শত শত লোক তাঁহাকে দেখিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কোনো দল জয়গান ঘোষণা করিল, কোনো দল তাহাদের অভাব অভিযোগের কথা জানাইতে আসিল। দীর্ঘকাল ধর্ম্মঘট করিয়া তাহাদের দিন চলিতেছে না, আশ পাশের মহল্লায় চুরি-ডাকাতি বাড়িয়াছে; শোভাযাত্রা করিতে বাহির হইয়া পুলিশের সহিত সংঘর্ষে অনেকেই আহত হইয়াছে, শ্রমিক সঙ্ঘ হইতে যে সাহায্য আসিতেছে তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে। দেখিতে দেখিতে দরিদ্র, ক্ষুধাতুর, উৎপীড়িত জনারণ্যে আমাদের বাহির হইবার পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। আপাততঃ মলিনাদি ও তাহার সঙ্গী দুইজনকে উহারা বাহির হইতে দিবে না।

সেই অন্ধকার আঁস্তাকুড়ের ধারে আমি নতমস্তকে দাঁড়াইয়াছিলাম। আমাকে কেহ কিছু প্রশ্ন করিল না, কিন্তু একবার উপরের কালো আকাশের দিকে চাহিয়া আমি প্রশ্ন করিলাম, বিপ্লব আর কতদূর? এই যুগে আমাদের জীবিতকালে কি তাহা সম্ভব হইবে? পথ যাহাদের রুদ্ধ, বাঁচিবার অধিকার যাহারা পাইতেছে না, অশ্রুজলে সিক্ত যাহাদের অন্নের গ্রাস, নূতন সমাজ ও নবতর জীবনযাত্রাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাহারা বাধা পাইতেছে,—তাহাদের রক্তে আগুন ধরিবার সময় কি এখনও হয় নাই? আমরা যাহারা ভদ্র ও শিক্ষিত বলিয়া কথিত, যাহারা মধ্যবিত্ত, যাহারা পৃথিবীর অগ্রসর চিন্তাধারাকে স্বাধীন কর্ম্মপ্রতিভায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না,—তাহারা কি চিরদিন পদানত হইয়া থাকিবে? কোথায় সেই বিপ্লব, যে-বিপ্লব এই প্রচলন ও অস্বাভাবিক অনিয়মের ভিত্তি চূর্ণ করিবে? কবে আসিবে সেদিন?

আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিলাম। মৃন্ময়ী আমাকে চিনিত, সে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে আনিল। মলিনাদিকে উহারা ছাড়িবে না, তিনি উহাদের মাঝখানে রহিয়া গেলেন। আমরা ভিড়ের ভিতর দিয়া পথ কাটিয়া মাঠের ধারে আসিয়া পড়িলাম। চারিদিকে আস-শ্যাওড়া ও কাঁটালতার গাছ, আশে পাশে দুর্গন্ধ,—তাহাদেরই ভিতর দিয়া একটা সঙ্কীর্ণ পথ পশ্চিম দিকে গিয়াছে। আমরা সেই পথ ধরিলাম।

মৃন্ময়ী কহিল, অত সহজে তোমার উত্তেজনা আসে, শরীর বোধহয় ভালো নেই।

বলিলাম, এদের তোমরা সহ্য করো মৃন্ময়ী, দম আটকায় না?

সে কহিল, ওদের মাঝখানে থাকলেই ওরা আপন ক'রে নেয়।

কিন্তু আপন হওয়া যায় কি?

মৃন্ময়ী কহিল, উচ্চশিক্ষায় মনের জটিলতা বাড়িয়ে দেয়। ওদের মন শিক্ষার পালিশে ঢাকা। ওরা আমাদের মা বলে, আমাদের সম্মানের জন্য ওরা বুকের রক্ত দিতে পারে,—যদি আমাদের ওপর ওদের লোভ থাকতো, তবে ওদের দলবদ্ধ পাশব অত্যাচারে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতুম। আধুনিক মনস্তত্ত্বের আবহাওয়ায় ওরা পৌঁছায়নি তাই ওদের মহত্ত্ব আর বর্ব্বরতা এখনো সতেজ রয়েছে। ওরা আমাদের আপন ক'রে নেয় সহজে, ছুড়ে ফেলে দেয় অনায়াসে।

বলিলাম, ওদের ধর্ম্মঘট করালে তোমরা, কিন্তু ওদের দায়িত্ব কি নিচ্ছ তোমরা?

মৃন্ময়ী কহিল, না, ওদের সাহায্য করব, দায়িত্ব নেবো না। ওদের শিক্ষিত করে তোলা, স্বাধিকার বুদ্ধি জাগ্রত করা, ওদের জীবনে বড় অসন্তোষ জাগিয়ে দেওয়া, শাসন ক্ষমতার দিকে ওদের মনকে প্রলুব্ধ করা—এই আমাদের কাজ। নিজের মূল্য ওরা যেদিন বুঝবে, নিজের দায়িত্বও সেদিন থেকে ওরা নেবে।

বলিলাম, কিন্তু গণদেবতাকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলার পরিণাম জানো ত, মৃন্ময়ী?

জানি—বলিয়া মৃন্ময়ী হাসিল। পথের আলোয় তাহার অধরের সেই বিদ্যুজ্জ্বালা দেখিয়া আমি কিছু বিস্ময় বোধ করিলাম। বোধ করি সে আমার চোখের দোষ, নচেৎ সহসা তাহার চেহারায় একটা ধ্বংসাত্মিকা ভয়ভীষণার চেহারা দেখিব কেন? তাহার কল্যাণী রূপ দেখিয়াছি, দেখিয়াছি তাহার চোখে মুখে মধুরের তন্দ্রাবেশ, শুনিয়াছি তাহার কণ্ঠে জগদ্ধাত্রীর আশীর্ব্বাদ,—কিন্তু এই পাশবতা কখনও দেখি নাই। যেন তাহার মুখে ভাবী ভারতের সর্ব্বনাশা বিপ্লবের চেহারা দেখিলাম,—যেন রক্ততৃষাতুরা, প্রতিহিংসাময়ী করালী কালিকার মতো সে আমার দিকে চাহিল। বলিল, জানি গো জানি, মরণে ভয় পাও কেন? গণদানবের পায়ের তলায় একদিন চূর্ণ হবো আমরা মধ্যবিত্ত, আমাদের বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না। কী অদ্ভুত দেশ তুমি ভাবো দেখি? শতকরা নব্বইজন চাষী—যারা আমাদের প্রাণধারণের খাদ্য জোগায় তাদের অন্নবস্ত্র নেই,—আর বাকি দশজনের হাতে ধনসম্পত্তি, তারা নব্বইজনকে রেখেছে পায়ের তলায়। এ কখনো সইবে? কোনো দেশে সহ্য হয় নি।

বলিলাম, কিন্তু তা'তে আমরাও ত ধ্বংস হয়ে যাবো।

মৃন্ময়ী বলিল, সেই আমাদের স্বপ্ন। যে-বিপ্লব একদিন ওরা আনবে সেই তরঙ্গে আমরা তলিয়ে যাবো, সেই হবে একমাত্র আনন্দের দিন। তোমাকে আমাকে সেইদিনের জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে।

চলিতে চলিতে গঙ্গার ধারে আসিয়া পড়িলাম। চাহিয়া দেখিলাম গঙ্গার পশ্চিম প্রান্তে শুক্ল-চতুর্থীর চন্দ্র হেলিয়া পড়িয়াছে। নদীর দুই পারে দীপমালা জ্বলিতেছে। বসন্ত-বাতাস হু-হু করিয়া বহিতেছিল। বলিলাম, দূরে ষ্টীমারের জেঠি দেখা যাচ্ছে, চলো আমরা ষ্টীমারে ক'রে ফিরে যাই।

নদীর চেহারা দেখিয়া মৃন্ময়ী সব কথা ভুলিয়া গেল, উৎসাহিত হইয়া কহিল, চলো, বেশ লাগবে। নৌকো করলে না কেন? ঢেউয়ের দোলা লাগতো?

কিন্তু নৌকা পাওয়া গেল না, সুতরাং টিকেট কিনিয়া ষ্টীমারের জন্য অপেক্ষা করিলাম। ষ্টীমার আসিয়া জেঠিতে লাগিলে তাহাতেই গিয়া চড়িলাম।

প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। শ্রমিক আন্দোলন লইয়া যতই বক্তৃতা করি না কেন, বসন্ত-বাতাসে নিরিবিলি গঙ্গার বক্ষে তরুণী সমভিব্যাহারে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করিবার আনন্দ ও আরাম গণতন্ত্রের জন্য ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি। দেশের জন্য প্রাণ পরে দিলেও চলিবে, শ্রমিকদের শাসনাধিকার পাইতে ঘণ্টা দুই দেরী হইলে ক্ষতি নাই এবং অন্তকার এমন অপরূপ সন্ধ্যাটিতে যদি দেশের স্বরাজ ও স্বাধীনতা না পাই, তবে বিশেষ ক্ষতি মনে করিব না। আপাততঃ শ্রমিক নেত্রী শ্রীমতী মৃন্ময়ীকে এতই সুন্দর দেখাইতেছে যে, আমি একরূপ দেশের কথা ভুলিয়া নিজের প্রাণের কথাই আরম্ভ করিয়া দিলাম।

বাতাস লাগিয়া সমস্ত প্রাণ জুড়াইয়া গেল। নদীর শোভা, আকাশের উজ্জ্বল তারকাদি ও পরস্পরের নিবিড় সাহচর্য্যে আমাদের আগেকার আলোচনাটা ঘুরিয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক হইয়া উঠিল। যেন উপলব্ধি করিলাম আমাদের দুইজনের জীবন এই মুহূর্ত্তটিতে পৌঁছিয়া কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা দুইজনে—অন্ততঃ আমি জানিয়াছিলাম আমাদের আর বিচ্ছেদ নাই, আমরা পরস্পর চিরদিনের জন্য উভয়ের নিকট বাঁধা পড়িয়াছি। মৃন্ময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনার পর সে বড় শ্রান্ত, অবসন্ন—গঙ্গার মধুর হাওয়ায় তাহার চোখে যেন সুখতন্দ্রার নেশা লাগিতেছে। তাহার সহিত আমার চোখাচোখি হইতেই সে মৃদু হাসিয়া একান্ত নির্ভরশীলা বালিকার ন্যায় আরও কাছে সরিয়া আসিয়া আমার হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিল।

প্রথম শ্রেণীর এই দিকে বসিলে কোথাও হইতে দেখা যায় না। ষ্টীমার নদীর জল কাটিয়া কাটিয়া চলিতেছিল। আজ আমার হাতখানা কিছুতেই আর সংযত হইতে চাহিল না, তাহার গলা বেড়িয়া পিঠের উপর দিয়া হাতখানা জড়াইয়া কহিলাম, এত' শ্রমিক নেত্রীর উপযুক্ত নয়, মৃন্ময়ী?

ঘুমজড়ানো কণ্ঠে মৃন্ময়ী কহিল, কথা বলো না, চুপ ক'রে থাকো।

বলিলাম, এত বড় একটা অবৈধ ব্যাপার ঘটবে মা-গঙ্গার বুকের ওপর, আর আমি কথা বলবো না?

অবৈধ কোথায় হোলো? মৃন্ময়ী বিস্ময় প্রকাশ করিল।

বিবাহের দ্বারা যে-ভালবাসা সিদ্ধ নয়, তাই ত' অবৈধ।

মৃন্ময়ী সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। একরূপ চাপা অস্বাভাবিক-কণ্ঠে কহিল, মনে থাকে না!

আমি উত্তর দিলাম না, কিন্তু সে পুনরায় কহিল, তুমি কাছে না থাকলে শক্তি আর স্বাতন্ত্র্য থাকে, তোমাকে দেখলে দুর্ব্বল হই, মনটা যেন আশ্রয় চাইতে থাকে।—তাহার চোখ দুইটি ঝাপসা হইয়া আসিল।

বলিলাম, মৃন্ময়ী, তুমি জানো, তুমি একান্ত একা?

জানি।

তোমার দুর্দ্দিনে, দুর্ভাগ্যে, তোমার জনসাধারণের সেবার কাজে তোমার পাশে আপন জন কেউ নেই, এ কথাও কি জানো?

তাহার চোখে অশ্রুর ফোঁটা জমিয়া উঠিল। কহিল, জানি। তুমিও কি থাকবে না?

বলিলাম, কেন থাকবো? না দিলে তুমি অধিকার, না পেলাম শাস্ত্রের সম্মতি। কোন্ দাবি নিয়ে তোমার পাশে আমি দাঁড়াবো?

মৃন্ময়ী কহিল, যদি অবৈধই হয় তুমি কি সহ্য করবে না? তুমি ত' অনেক অন্যায় করেছ জীবনে।

উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, অন্যায় আমি অনেক করেছি কিন্তু তোমার এই অন্ধতা কেন? যা নীতিবিরোধী, শাস্ত্রবিরোধী, সমাজবিরোধী, তার ওপর তোমার এত মমতা কেন, মৃন্ময়ী?

মৃন্ময়ী সোজা হইয়া বসিল। কহিল, আমি যে স্বাধীনতা চাই—কঠিন, নিষ্ঠুর স্বাধীনতা। কৈফিয়ৎ দেবার, পেছন দিকে চাইবার, মোহগ্রস্ত হবার, সংসারের দিকে আকর্ষণ করবার—মানুষ যেন কোথাও না থাকে। কাজের মধ্যে, ওদের দুঃখের মধ্যে তলিয়ে থাকতে চাই সারা দিনরাত—সমস্তক্ষণ, সমস্ত জীবন। কেবল ক্লান্তি আর কান্নার দিনে যেন তোমাকে খুঁজে পাই, যেন তোমার পায়ে মাথা রেখে আমি কোনো কোনো সময় নিশ্চিন্ত ঘুমোতে পারি।

অভিমান করিয়া কহিলাম, কিন্তু আমাকে তখন কেন, মৃন্ময়ী?

তোমাকেই তখন দরকার, তুমি আমার নতুন সৃষ্টি। তোমাকে নতুন জীবনের ছাঁচে ঢেলেছি, সেই আমার গৌরব। সব কাজের শেষে যেন তোমারই কাছে আশ্রয় পাই।

বলিলাম, এতে কি তুমি শান্তি পাবে?

মৃন্ময়ী কহিল, হয়ত পাবো না, তবু জানাতে পারবো ভগবানের কাছে যে, সুখের নেশা আমি ত্যাগ করেছি। আমার ভাইবোনরা, আমার সন্তানরা—তারা যেন জানতে পারে আমি তাদের ছাড়া আর কারো নই, আমার দুই হাত যেন চিরদিন তাদেরই সেবার জন্য মুক্ত থাকতে পারে। আমাকে কি তুমি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করতে বলো?

কিন্তু অনেকদিন হইতে যাহা বলিব ভাবিতেছিলাম তাহাই এইবার আমি প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, মৃন্ময়ী, তুমি স্বাধীন, তুমি সর্ব্ববাধাহীন—তোমার কোনো কাজে, কোনো চিন্তায়, কোনো আদর্শে আমি কখনো বাধা দেবো না, আপত্তি তুলবো না,—কিন্তু আমাকে আজ নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার কাজের মাঝখানে ঝাঁপ দিতে দাও। আমি তোমাকে বিয়ে করবো, মীনু।

বিয়ে!—মৃন্ময়ী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। আমার একখানা হাত সে তখনও ধরিয়াছিল, কিন্তু সেই হাত তাহার শিথিল হইয়া আসিল। এক সময় কহিল, না, সে সম্ভব নয়, তুমি দুঃখ করো না।

হয়ত আমার তেজস্বিনী জননীর কথা সে ভাবিল, হয়ত ভাবিল, আমাদের পরিবারের সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা, হয়ত ভাবিল আমার অপেক্ষা জাতিতে সে ছোট। কী যে সে সহসা ভাবিল, বুঝিলাম না। আমি ব্যাকুল হইয়া কহিলাম, কেন সম্ভব নয় বললে না ত?

সে সহজ কণ্ঠে কহিল, তুমি টাকার মানুষ, তুমি অগাধ সম্পত্তির মালিক। নিশ্চিন্ত আরাম, পরম সুখ, অবাধ ভোগ আর বিলাস, অতুল ঐশ্বর্য্য—এদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালে অপমানে যে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে? দরিদ্র দুর্ভাগা সন্তানদল আর সর্ব্বত্যাগী ভাইবোনদের আদর্শবাদের ভয়ে আমি ছুটে পালাবো সুখের গুহাগহ্বরে? ভগবান কি আমাকে ক্ষমা করবেন? এই পাপে কি তোমার কল্যাণ হবে?

কিন্তু যদি সবাই তোমার সঙ্গে থাকে?

কেমন ক'রে?

বলিলাম, আমার জীবনমরণ যার হাতে দিলুম সে আমার সামান্য সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করবে না?

মৃন্ময়ী আমার মুখের দিকে চাহিল, কহিল, আমাকে সব তুমি দান করবে?

দান কোথায়, মৃন্ময়ী? তোমারই ত সব।

সে উত্তর দিল না, অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। ষ্টীমার হাঁস ফাঁস করিয়া তরঙ্গ কাটিতে কাটিতে উত্তর দিকে চলিয়াছে। পথ আর বাকি নাই। নিশ্বাস ফেলিয়া এক সময় মৃন্ময়ী কহিল, ওই দরিদ্র পল্লীর মাঝখানে গিয়ে সামান্য শিক্ষকের জীবনযাপন করা, পরিশ্রমের দ্বারা অর্জ্জন করা অন্নে দিন চালানো—পারবে তুমি? দুর্য্যোগ, দারিদ্র্যে, অবজ্ঞায় ক্ষুদ্র হয়ে থাকা,—বলো, পারবে তুমি?

কম্পিত কণ্ঠে কহিলাম, তুমি আমাকে আজো চিনতে পারোনি, তার চেয়েও বড় কাজ আমি পারবো।

মৃন্ময়ী কহিল, তুমি ত মেয়েদের কোনোদিন সম্মান দাওনি, আমার মান তুমি রাখবে কেমন ক'রে?

আমাকে তুমি নতুন জীবনের ছাঁচে ঢেলেছ, এখন ত আর ও-প্রশ্ন ওঠে না?

কিন্তু যদি আমার এই রূপটুকু নষ্ট হয় কোনো কঠিন অসুখে?

বলিলাম, ক্ষতি মনে করবো না, কারণ চোখ দিয়ে তোমাকে পাইনি মৃন্ময়ী, পেয়েছি মন দিয়ে। রূপের সন্ধান আমাকে অনেকেই দিয়েছে, বড় আদর্শের সন্ধান কেবল তোমারই কাছে পেলুম। এই গঙ্গার বুকের ওপর ব'সে বলছি,—পবিত্র জন্মভূমির শপথ নিয়ে তোমাকে জানাচ্ছি, আমার সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে পথের ভিখিরী ক'রে দাও তুমি—সেই হবে আমার সকল অহঙ্কার আর আত্মাভিমান থেকে মুক্তি!

নিজের চোখে জল আসিয়াছে অনুভব করিলাম, মৃন্ময়ীর গাল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে দেখিলাম। সে আমার শেষ কথা শুনিয়া হেঁট হইয়া আমার পায়ের ধুলা

লইল। কহিল, এতদিনে জানলুম কী আমি চেয়েছিলুম, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়, এর চেয়ে বড় কিছু নয়। আজ নিঃসঙ্কোচে তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করলুম। তুমি আমার স্বামী।

চাঁদপাল ঘাটে আসিয়া ষ্টীমার ধরিল। আমরা পৃথিবীকে ভুলিয়াছিলাম, আজ যেন নূতন জগতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। দূর হইতে নূতন এক জীবন যেন আমাদের হাত বাড়াইয়া ডাকিল। দুইজনে নির্ভয় হাসিমুখে হাত ধরাধরি করিয়া সেইদিকে চলিলাম। উপরে কালবৈশাখীর আকাশ ঘন হইয়া উঠিয়াছে।

সমাপ্ত

# গ্রাম্য দেবতা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তোমরা গ্রামের আদিম অধিবাসী
রাজার রাজা, গ্রামের গোষ্ঠীপতি,
সেবক তোমার, আমরা ত যাই আসি,
যাতায়াতে জানায়ে যাই নতি।

তোমরা গ্রামকে তীর্থ করে' রাখো,
মর্ত্ত্য এবং স্বর্গে মিলন করি'।
পার্থিবেতে অপার্থিবে ডাকো
দীন মাটিতে উপনিবেশ গড়ি।

এত কুসুম ফোটায় গ্রামের বন,
তোমাদেরি নিত্য পূজার লাগি';
ক্ষুদ্র গ্রামের ধান্য এবং ধন—
তোমাদেরি—আমরা প্রসাদ মাগি।

সরোবর আর তড়াগ, নদ-নদী—
শুদ্ধ হয়ে যোগায় ফুল-জল,
ফসল লাগে তোমার ভোগে যদি
তবেই সফল, নইলে ত নিষ্ফল!

তোমাদিকে বিহগ শুনায় গান,
তাইত মধুর প্রসাদী সঙ্গীত।
জলে করি' চরণ-উদক পান—
ভোগেতে পাই ত্যাগেরি ইঙ্গিত।

হাওয়া, জলে মাখা পবিত্রতা,
স্নিগ্ধশুচি পুণ্য দেহ মন,
বার মাসই পূজার ব্রত-কথা,
তোমাদেরি উৎসব পার্ব্বণ।

পুণ্যময়ী এই যে পরিস্থিতি
জীবন এবং জীবকে করে প্রিয়,
দেবসকাশে এই যে বসত নিতি
আনন্দ দেয় অনির্ব্বচনীয়।

গ্রাম ত তোমার পূজারীদের বাসা,
সকল হৃদে ভক্তি অনুরাগ;
সবার চেয়ে আমরা আছি খাসা
পল্লী কোথা? এই ত দেবপ্রয়াগ।

অন্যে ভাবে আমরা থাকি একা
বিপদে আর রোগে নিরাশ্রয়,
নিত্য যাদের দেবতা সাথে দেখা
তাদের আবার অন্য কিসের ভয়?

মাতা, পিতা, অভিভাবক, গুরু,
সখা, সুহৃদ্ অধিক কি চাই আর?
পৃথিবীতেই স্বর্গ মোদের সুরু,
এমন জীবন কাঙ্ক্ষিত নয় কার?

# কাশীতে দিন দশ

শ্রীমতিলাল রায়

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের গোড়াতেই পরম বন্ধু শিবপ্রসাদের নিমন্ত্রণে যখন কাশী গিয়াছিলাম, তখন ভাবি নাই, কাশীতে আমার পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়কে প্রণতি না দিয়া আসাটা একটা অপরাধের কারণ হইবে। সুনিবিড় আত্মীয়তার বন্ধন আজ যে আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত আচরণের জন্যই শিথিল হইয়া পড়ে—শ্রদ্ধেয় পঞ্চানন তর্করত্নের পত্রাঘাতে তাহা মালুম করাইয়া দিল। তাঁর বয়স-সুলভ তিরস্কারের কটুভাষা আমায়

সারনাথে সঙ্গীসহ লেখক

সারনাথের গুহাদ্বার

পীড়িত করিল না; বরং একজন পরমাত্মীয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়াও তাঁহাকে না দেখিয়া আসার অভিযোগ তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ ও সৌহৃদ্যের অমৃত স্পর্শই দিল। 'যাই, যাই' করিয়া কাজের আর ফাঁক মিলে না; অবশেষে ৮ই নভেম্বর বুধবার পাঞ্জাব মেলে কাশী যাত্রা করিলাম।

এবার সঙ্গে ছিল—সঙ্ঘ সম্পাদক শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র আর তাহার পত্নী শ্রীমতী অমিয়প্রসূন। সোদরা স্বরূপা পট্টরাণী ও আমার ধাত্রী-রূপিনী স্নেহময়ী নির্ম্মলা। যাত্রার প্রধান সাথী ছিল, সঙ্ঘ-সন্ন্যাসী স্বামী অমৃতানন্দ। একপ্রকার উৎসব-যাত্রা।

ট্রেণ যখন মোগলসরাই পৌছিল, একে আমি একটু রাগী লোক, প্রাতঃকৃত্যের ব্যবস্থা না হওয়ায় মেজাজ ভাল ছিল না; তার উপর আমার দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় লাহোর কলেজের ভূতপূর্ব্বক অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষীয় একজন। তাঁদের উভয়ের প্রশ্নোত্তরে বকাবকিও হইয়াছিল অনেক। কাশীতে পৌছিয়া মেজাজ আরও রুক্ষ হইয়া উঠিল। আমাদের থাকিবার স্থান পূর্ব্ব হইতেই জমিদার শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের আবাসে স্থির হইয়াছিল। ফাঁকা হইতে একটী ছোট একতলা বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই বাড়ীটা যেন প্রথমেই গিলিতে আসিল; মেজাজের দোষেই এইরূপ হইয়াছিল। নির্ম্মলার সুকৌশল পরিচর্য্যায় শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইলাম; কিন্তু শান্তি পাইলাম না। একটা অস্বস্তির আব্‌হাওয়ায় অন্তর গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। এক প্রকার স্থিরই করিলাম—এই বাড়ীতে থাকা হইবে না। কার্য্য সারিয়া কালই বিন্ধ্যাচলে যাইব। শান্তি চাই—ছুটীর একটানা বিশ্রাম—দেহ-মনের ক্লান্তি দূর করার জন্য প্রয়োজন ছিল।

সন্ধ্যার পর দশাশ্বমেধ ঘাটে। সম্মুখে শীর্ণকায়া জাহ্নবী। দূরে দূরে মন্দিরে মৃদঙ্গ-শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি। অসংখ্য নরনারীর কণ্ঠে উঠিয়াছে ভজনের মূর্চ্ছনা। অসংখ্য লোক, কেহ পদচারণা করিতেছে; কাহারও বা মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া আলাপ সুরু করিয়াছে। কোথাও বা প্রিয়জন সঙ্গে কেহ কেহ মনের গোপন কথা প্রকাশ করিতেছে। কেহ ধ্যান-রত। কেহ বা একতারা বাজাইয়া গান গাহিতেছে। প্রাচীন ভারতের মহাতীর্থ দশাশ্বমেধ ঘাট — অতীতের কত গৌরব-স্মৃতি বুকে লইয়া হিন্দুর মরা-প্রাণে আজিও জোয়ার আনে। হিন্দুত্বের মহিম্ন-স্তুতি এখানকার আকাশে বাতাসে মুখরিত; আমরাও উপাসনার মন্ত্র-ধ্বনি তুলিলাম। বুকে শান্তি-প্রলেপ পড়িল।

রাত্রি কিন্তু বড় অস্বস্তিতে কাটিল। অস্ফুট ক্রন্দনের গুঞ্জন মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙ্গায়। ভোরের স্বপ্নে অরুণ উঠিল চীৎকার করিয়া, সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে এক করুণ রমণী মূর্ত্তি। প্রাতঃকৃত্যাদির পর পঞ্চতীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলাম। অসি, দশাশ্বমেধ, মনিকর্ণিকা, পঞ্চগঙ্গা আর বরুণা ঘুরিয়া আসিলাম। চক্ষু থাকিতে কিন্তু অন্ধ। চস্‌মা আনিতে ভুলিয়াছি। বরুণার আদি কেশবের চরণে প্রণাম জানাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। সন্ধ্যায় বিশ্বনাথের টানে মন্দির পথে চলিলাম। আরতির আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে, মন্দিরে লোকারণ্য। এক পাণ্ডা আসিয়া অমিয়প্রসূনের হাত ধরিয়া টানিতে সে জিদ্‌ ধরিল—বিশ্বনাথ দেখিবে না। কাজেই অন্নপূর্ণার মন্দিরে সেদিন সোণার প্রতিমা ও দেব-প্রদর্শনী দেখিয়াই বাড়ী ফিরিলাম।

বাড়ীর দ্বারবান্‌ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শুক্ল। তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—এ ঘরে কি কেহ পরলোকগমন করিয়াছে? তাহার মুখেই শুনিলাম—হাঁ, গৃহিণীর অন্তিমশয্যা এই গৃহেই হইয়াছিল। উপাসনার মন্ত্রে অশরীরিণী মূর্ত্তি বুঝি প্রসন্ন হইলেন, সান্ত্বনা পাইলেন। সারা বাড়ী ভরিয়া উঠিল শান্তি ও আনন্দে।

তিনটী জিনিষ আমার বড় প্রিয়। লেখা, কথা কওয়া আর পথ চলা। পূর্ব্বোক্ত দুটী বিষয়ের অবাধ ক্ষেত্র মিলিয়াছে। শেষের সাধটী কলিকাতা ও চন্দননগরের পথে সুবিধা হয় না। এখানে পরদিন প্রভাতে গঙ্গা পার হইয়া বালুময় চরে গিয়া উঠিলাম। মরুভূমির ন্যায় সুদূর-প্রসারী বালুময় প্রান্তর। রাত্রির শিশিরে তার বক্ষ তুষার-শীতল হইয়াছে। নগ্নপদে ছুটিতে ছুটিতে কতদূর গিয়াছি বালুস্তরে হাঁটু ডুবিয়া যায়, কাহারও মানা শুনি না। বহুদূরে গিয়া শুনিলাম—আর অর্দ্ধ মাইল দূরে রামনগরের পাকা পথের ধারে এক দেহাদ আছে। নাম কটেশ্বর। সঙ্গীরা বালুক্ষেত্র অতিক্রম করিতে চাহে না, কিন্তু আমার পায়ে সুড়সুড়ী লাগিয়াছে, আমি আর ফিরি না; কাজেই সকলে আমার অনুসরণে, বালুক্ষেত্র ছাড়াইয়া শ্যামশ্রী পল্লী চক্ষে পড়িল। মাঠে রবিশস্যের অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে। মাথায় বোঝা লইয়া চলিয়াছে দলে দলে নারী পুরুষ কাশীতে বেসাতি করিতে। হাতে দুধের বাল্‌তি মাথায় দধি-ভাণ্ড, যেন সব বৃন্দাবনের যাত্রী।

ক্ষেত পার হইয়াই গ্রাম—আম, কাঁঠাল, তাল, নারিকেল, কুলের বাগান আর পগার-ঘেরা পল্লী-গৃহ। ইঁদারায় জল লইতে নারী পুরুষের ভীড়। কেহ জল তুলিতেছে, কেহ বাসন মাজিতেছে, কেহ বা জলপূর্ণ কলসী মাথায় লইয়া ঘরে ফিরিতেছে। সুস্থ সবল পল্লীশ্রী।

পথের ধারে গো, মহিষ বাঁধা। মেয়েরা পড়

দশাশ্বমেধ ঘাট

মণিকর্ণিকার ঘাট

কাটিতেছে; রূপার চুড়ি ঠুন্‌ ঠুন্‌ শব্দ তুলিয়াছে। যুবকেরা জটলা পাকাইয়া বসিয়াছে স্থানে স্থানে সকলেরই সকৌতুক দৃষ্টি আমাদের দিকে।

একটা প্রাচীন ইঁদারায় জল লইতে আসিয়াছে গ্রাম্য-নারীরা। অমিয়প্রসূন তাহাদের সহিত আলাপ করিতে গেল; সব নারী শিহরিয়া উঠিল। হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও, তাহারা বলিল "ছুঁয়ো না, তোমরা বাঙ্গালী"। বাঙ্গালী বিদ্বেষ এই সুদূর পল্লীতেও প্রবেশ করিয়াছে। গ্রামে বিদ্যালয় আছে, মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। ছেলেরা পড়ে মধ্য-ইংরাজী, হিন্দী শিক্ষার প্রচলন নাই, উর্দ্দু ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। গ্রামে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। কিন্তু এখন মাইনরটীর যুগ।

সেদিন অপরাহ্ণে পণ্ডিত তর্করত্নকে দেখিতে গেলাম। শয্যাশায়ী রুগ্ন তিনি, কিন্তু বিমল মুখশ্রী। আমাদের দেখিয়া বড় প্রীত হইলেন। তাঁহার "শক্তি ভাষ্যের" কথা উঠিল। স্মৃতিশাস্ত্রে সন্ন্যাসের সমর্থন নাই। কিন্তু শঙ্করকেও তো বাদ দেওয়া যায় না। শাস্ত্রের সমর্থন না পাইয়া, পণ্ডিতজী জগদম্বার শরণ লইলেন। জাবাল-শ্রুতির সূত্র বাহির করিয়া সমস্যার সমাধান করিলেন। ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে ভাষ্য রচনার কত কথা তাঁহার মুখে শুনিলাম। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাজ এখনও ফুরায় নাই। সঙ্গে যারা ছিল তাহাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পণ্ডিতবর বলিলেন—"আনন্দ লাভ কর।" আমার দিকে

গুরু পরিবার

চাহিয়া বলিলেন—"সৎ শিষ্য সঙ্গে, সত্ত্ব শ্রেয়ঃ লাভ করুক।"

বাহিরে আসিয়া দেখি—কালীপ্রতিমার বিসর্জ্জন বাদ্য উঠিয়াছে। চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট হইতে দশাশ্বমেধ ঘাট পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য। শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণের সঙ্গে দেখা। তাঁর প্রীতিপূর্ণ আলাপের পরিচয় এই নূতন নয়।

তার পরদিন সারনাথে। বৌদ্ধকীর্ত্তি আবার নূতন রূপ লইয়া এখানে ফুটিয়া উঠিতেছে। ধ্বংসস্তূপ খুঁড়িয়া শ্রমণদের গৃহগুলি বাহির করা হইয়াছে।

সারনাথ রেভারেণ্ড ধর্ম্মপালের কীর্ত্তি। স্মৃতি সমুজ্জ্বল হইয়া রক্ষা করিতেছে। সারনাথের বৌদ্ধমূর্ত্তি, মিউজিয়াম, ধনকুবের বিড়লার ধর্ম্মশালা দেখিয়া চক্ষু তৃপ্তি পাইল।

তারপর রামনগরের কথা। ইহা কাশী-নরেশ চৈতসিংহের স্মৃতি-বিজড়িত ঐতিহাসিক স্থান। কাশী রাজের রাজ্য সীমা ছিল ৮টী পরগণা, বিদ্রোহী চৈতসিংহের শাস্তিস্বরূপ উহা এক্ষণে দুইটী পরগণায় দাঁড়াইয়াছে। রামনগরের রাজপ্রাসাদ, দুর্গমধ্যে দরবার-গৃহ, পূজা-গৃহ —সব কিছু দেখিয়া আমরা বিখ্যাত দুর্গা বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলাম। দুর্গা বাটী নির্ম্মাণ-চাতুর্য্যে ভারতে অদ্বিতীয় বলিয়া খ্যাত। তারপর ব্যাসকাশীর পথে। ইদের দিনে মুসলমান পল্লীতে আনন্দের ক্ষীণরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুসলমান রমণীরা নানা বেশ ভুষায় সজ্জিত হইয়া হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, ভোজন করিতেছে। তাহারা গোরস্থানের উপরে বেনারসী শাড়ী বিছাইয়া দিয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে সুশ্যাম তালবৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া মেঠো পথ ধরিয়া, একাযোগে চলিয়াছি, একবার উঠি ঊর্দ্ধে আবার পাতালে পড়িয়া যাই। ঝাঁকুনি খাইয়া হাড়গোড় যেন গুঁড়া নাড়া হইয়া যায়। পিলে, লিভার, নাড়ী, ভুঁড়ী, কিড্নী সব যেন তাল পাকাইয়া গেল। মেয়েরা একবার হাসিয়া খুন হয়, আর আমায় জড়াইয়া ধরে—পতনের আশঙ্কায়। ব্যাসকাশী অষ্টাদশ পুরাণ-রচনার তীর্থ। বেদব্যাস এইখানেই নাকি এই মহাযজ্ঞ সমাপন করিয়াছিলেন। প্রসন্নমূর্ত্তি শিব মাটী ফুঁড়িয়া দেখা দিয়াছিলেন। আমরা সব দেখা সাঙ্গ করিয়া, বৃক্ষতলে প্রাতঃরাশ সমাপন করিলাম। পুঁটু এইখানেই ভাই-ফোঁটার পর্ব্ব সারিয়া লইল।

৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার বেড়াইতে বেড়াইতে শিব-প্রসাদের বাড়ী গিয়া উঠিলাম। তাঁহার সেবা-উপবন উপভোগ্য। অসংখ্য বৃক্ষলতাপরিপূর্ণ উপবন ফলে ফুলে সার্থক করিয়াছে। এই অকৃত্রিম সুহৃদের আতিথেয়তা ভুলিবার নহে। তিনি আমাদের আতিথ্য হইতে এবার বঞ্চিত হইয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু ঋণ-শোধ দিতে হইল। তাঁর অনুরোধে 'বহিন্ লোক'—অমিয়প্রসুন, নির্ম্মলা ও পুঁটু ষোড়শোপচারে তাঁহারই গৃহে অন্নব্যঞ্জনাদির ব্যবস্থা করিল। শিবপ্রসাদ সপরিবারে আমাদের সহিত একত্র ভোজন করিলেন।

দেবেন্ বাবুর এক প্রবীণ কর্ম্মচারী আমাদের পরিচর্য্যার

জন্য নিয়োজিত হইয়াছিলেন। আর তাঁর কাশীর বাড়ীর এক ৮৪ বৎসরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাদের তদ্বির করিতেন। কিন্তু উৎসবের ধুম পড়িয়াছিল, ব্রাহ্মণ ভৃত্য শুক্ল পরিবারের মধ্যে। শুক্লের তৃতীয় পক্ষের পত্নী, দুইটী অনূঢ়া কিশোরী, এক বালক পুত্র, আর এক শিশু কন্যা। আমি হইয়াছি তাহাদের বড় বাবা, সন্ন্যাসী অমৃতানন্দজী ছোট বাবা। বালক পুত্র গোবরাজ স্বামিজীর গলা ধরিয়া দোল খায়। ছোট মেয়ে বুতার ছুটাছুটী করিয়া আমায় প্রদক্ষিণ করে। বড় মেয়ে শঙ্করী, তার কোলে যশোধরা। এ বাড়ীতে প্রভু-ভৃত্যের ভেদ রহিল না, আমরা এক পরিবারভুক্ত হইয়া গেলাম।

কিন্তু বাঙ্গালী নায়েব, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ইহা ভাল চক্ষে দেখিলেন না। তিনি নির্ম্মলার মুখে শুনিয়া লইলেন—আমাদের সঙ্ঘে জাতি-বিচার নাই। শুক্লের মনে জাতি নাশের ভয় জাগাইলেন। সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিল স্বামিজী। শেষে শুক্ল-গৃহিণী হাতের কঙ্কন বাজাইয়া জোর গলায় বলিয়া দিলেন "বাবালোকের হাতে আমরা খাবই; জাতি যায়, ভয় করিব না।" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মানে মানে নীরব হইয়া গেলেন।

বিদায়কালে পণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ করিয়া আসি। শিবপ্রসাদের বাড়ী হইতে মেয়েরা একরাশ গোলাপ ফুল আনিয়া দিল, উহার কয়েকটা বাছিয়া লইলাম। কিছু বেদানা কিনিয়া সন্ধ্যার সময়ে পণ্ডিতজীর দরজায় উপনীত হইলাম। তিনি পরমানন্দে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। পণ্ডিতজী হিন্দু ধর্ম্মের মহিমাকীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হইলেন। তাঁর "সর্ব্বমঙ্গলোদয়ম" কাব্যখানির দ্বিতীয় সংস্করণ কত বাধা ঠেলিয়া যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। পরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন "হিন্দু-ধর্ম্ম মরিবে না, সারা বিশ্বকে এই ধর্ম্ম বরণ করিয়া লইতে হইবে।" তাঁহার মুখের দীপ্তি দেখিয়া আমার মনেও এই বিশ্বাস দৃঢ় হইল। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের এই ব্যাপ্তি বর্ত্তমানের সীমার মধ্যে থাকিবে না—অন্য রূপ পরিগ্রহ করিবে কিনা, কে জানে?

তারপর আশীর্ব্বাদের কণ্ঠ কর্ণে মধু বর্ষণ করিল। হঠাৎ কুণ্ঠিত স্বরে, ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"কিন্তু একটা কথা, তোমার সঙ্ঘে মেয়ে-পুরুষ এক সঙ্গে থাকে; সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দুশ্চিন্তা হয়।" আমি হাসিয়া বলিলাম "এ খবর সত্য নয়, আমি এদিকে বড় সতর্ক। সঙ্ঘে মেয়ে-পুরুষ স্বতন্ত্রই থাকে। এক সঙ্গে থাকার অবকাশ রাখিনি।" পুলকিত হইয়া বলিলেন "অভীষ্ট পূর্ণ হোক, সার্থক হও। এদেরও আশীর্ব্বাদ করি। এদের উপরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।"
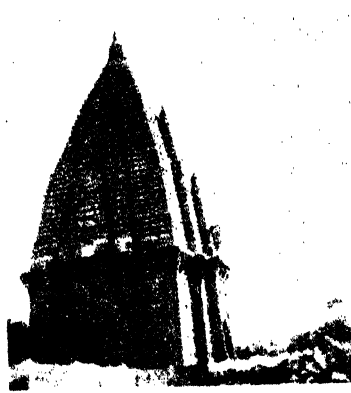
গঙ্গাতীরে মন্দির
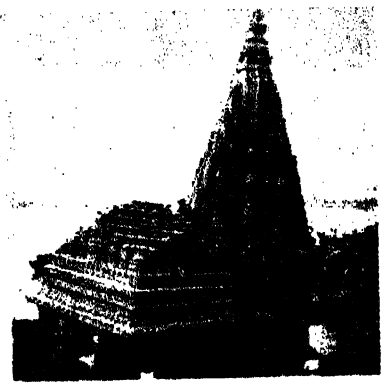
রামনগর দুর্গাবাড়ী

তারপর শ্রীমন্দিরের কথা উঠিল। তিনি বলিলেন "উহা একটী সিদ্ধ-পীঠ। যদি ঠিকভাবে চল, তুমি দর্শন পাবে।"

এই সনাতনী ব্রাহ্মণের কণ্ঠ চিরিয়া সেদিন যে আশীর্ব্বাদ উঠিল, তাহা ভারতের ব্রহ্মণ্য শক্তির, আমাদের প্রতি প্রসন্নতাই জ্ঞাপন করিল। অতিশয় দুর্ব্বলতা-বশতঃ ক্লান্তি অপনোদনের জন্য উপাধানে তাঁহার মাথা রাখিলেন; ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ভারতীয় ভাবধারায় অভিষিক্ত হইয়া তাঁহাকে আমরা সভক্তি প্রণতি জ্ঞাপন করিলাম।

বাড়ী ফিরিলাম। বাসায় আসিয়া দেখি এক পাত্র মিষ্টান্ন লইয়া পরম সুহৃৎ শিবপ্রসাদ উপস্থিত। সান্ধ্য-উপাসনার পর চারিদিকে চাহিয়া অতি দরদীর মত তিনি বলিলেন "এবার আতিথ্য গ্রহণে আপনি কৃপণতা করিলেন

কেন ?" তাঁর সহৃদয় আলাপে এই সান্ধ্য সময়টী মধুময় হইয়া উঠিল। শিবপ্রসাদ ভূলুণ্ঠিত প্রণতিজ্ঞাপন করিয়া আত্মীয়তার সুনিবিড় অনুভূতিকে আরও জাগাইয়া তুলিলেন।

এবার কাশী আসিয়া স্বচ্ছন্দ স্বভাবগতিতে সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম। কাশীর পবিত্র স্মৃতি বুকে নূতন রেখাপাত করিল। এবার কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবপ্রসাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের সহিত মণিকর্ণিকা, বেণীমাধবের ধ্বজা, বিশ্বনাথের মন্দিরে অন্নকূট, ধর্ম্মকর্ম্ম,

শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গুপ্ত

অতীত-বর্ত্তমান বিজড়িত হইয়া এক অপূর্ব্ব উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হর্ম্ম্য রচনা করিল। বেণীমাধবের ধ্বজায় দাঁড়াইয়া কেবল মনে হইল—হিন্দু ভারতের জয় ধ্বজা, এই স্মৃতিস্তম্ভ হিন্দু বিশ্বাসীর বুকে কিন্তু আজ আর সান্ত্বনা দেয় না, গৌরববুদ্ধি সঞ্চার করে না। এই কাশীর মর্ম্ম ক্ষেত্রে ইসলামের এই জয় গর্ব্ব হিন্দু জাতির প্রাণে কলঙ্কেরই মসীলেপন করিতেছে।

বিদায় বেলায় অতি নিকট পরিজনের ন্যায় শুকুল-পরিবার বিচ্ছেদ-ব্যথায় ধূলায় গড়াগড়ি দিল। বিদায় যেন একটী বিয়োগান্ত নাটকের মত অশ্রুময় হইয়া উঠিল। শুকুল বলে "আমি কিছু চাহি না, আমার দেবতা দর্শন হইল।" বড় মেয়েটী বিহ্বল, প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। যশোধরা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "বাবুজী, আমায় সঙ্গে নিয়ে চলুন।" আর গোবরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে ভাঙ্গা গলায় বলিল "এ বাবা, আবার এসো"। শুকুল-পত্নী বিগলিত নয়নে কেবল বলিতে লাগিল "কেমন করিয়া সে এ বাড়ীতে আর থাকিবে ?"

এ বিদায়-স্মৃতি ভুলিবার নহে! এইখানে সাম্যবাদের অকাট্য পরিচয় পাইলাম। ভারতের দেব-দেবী আমাদের দেবতা। ভারতের ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল আমাদের ভাই। শুকুল-পরিবার আমাদের আভিজাত্যের আতঙ্কে প্রথম দূরে দূরেই থাকিত, সে হৃদয়ের আকর্ষণে ক্রমে নিকটবন্ধুরূপে ভেদের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিল। আমাদের পরমাত্মীয়রূপেই তাহারা এই কয়দিনে আমাদের পরিবার-ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। শুকুল-পত্নীকে বলিয়া আসিলাম "তোমার বড় মেয়ে শঙ্করীর বয়স হইয়াছে, সাদির সময়ে আমায় জানাইও"। কাশী ছাড়িয়া আসি, সেই বেণীমাধবের ধ্বজা, সেই জাহ্নবী তীরে স্বপ্নপুরী, সেই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি উত্তরবাহিনী গঙ্গা। আর এক অপূর্ব্ব স্মৃতি বজরায় উলঙ্গ মৌন মূর্ত্তি হরিহর বাবা। এই বৈরাগী এখন জীবন্ত বিশ্বনাথের সমতুল্য পূজা পান। নমস্কার কাশী! তোমার বক্ষপঞ্জরে জাতির জয় সঙ্কেত আজিও নিহিত। জাতির জীবনে তোমার সঞ্চিত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হউক! বিশ্বনাথ অমূর্ত্তের একটী প্রতীত চিহ্ন। সর্ব্বজন পূজ্য হে নির্ব্বিশেষ মহাদেব, ভারতকে রক্ষা কর। ভারত যদি ধর্ম্মপূত হয় বিশ্বকে শান্তি ও আনন্দ ভারতই দিবে। ভারতের তীর্থ কাশী। ভারত জগতের তীর্থে পরিণত হইবে।

[ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য-কথা শুনিবার দাবী আমাদেরই। সঙ্ঘের আরাধ্যা মাতৃশক্তি ভারতের বিমল সতী-বিগ্রহ। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রত্যেক সাধক-সাধিকার জীবন-সাধনায় পবিত্রতার অগ্নিসঞ্চার তাঁহার উত্তুঙ্গ সতী-মহিমার জ্যোতিঃস্পর্শে—তাঁর চিরনির্ঝরিণী স্নেহ ও করুণার ধারা আমাদের প্রাণে সঞ্জীবনী সুধাবৃষ্টি করে—লক্ষ্যে অলক্ষ্যে তাহাই আমাদিগকে জীবন-ধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করে' তোলে। এই পুণ্য-কাহিনী তাই সঙ্ঘের অমৃত-রসায়ণ। কিন্তু শুধু সঙ্ঘ বা সঙ্ঘের অনুরাগী বন্ধুগণ নহেন, বাংলার জাতি-দেবতার উপাসক, বাণী-মন্দিরের পূজারী অনেকেই একবাক্যে এই শুভ প্রসঙ্গ শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাই "জীবন-সঙ্গিনী"র প্রথম খণ্ডের পর দ্বিতীয় খণ্ডের অবতারণা গত বর্ষে করা হইয়াছিল। আজ রজত-জয়ন্তী বর্ষেও "জীবন সঙ্গিনী"র অনুবৃত্তি গত চৈত্র পর্য্যন্ত "প্রবর্ত্তকে" প্রকাশিত অংশের পর হইতে আবার সুরু হইল। যাঁহারা পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশগুলির মর্ম্ম অবগত হইতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য দ্বাদশ মাসের সংক্ষিপ্ত সূচিটুকু মাত্র নিম্নে দেওয়া সম্ভব হইল। "জীবন-সঙ্গিনী"র প্রথম খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ হইলে, উহা গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত হইবে।

**সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ-সূচী—**

বৈশাখ—"জীবন-সঙ্গিনী"র শ্রদ্ধের লেখকের পারিবারিক জীবন সহিল না, অগ্রজের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইল। নূতন ঘর বাঁধার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের উপদিষ্ট আত্মসমর্পণযোগ জমিয়া উঠিল। ১২৲ টাকা মাত্র বন্ধুর দানে সঙ্ঘ-সংসারের সূচনা। আবিষ্ট লিপিনির্দ্দেশ—"Wait, all will come." জ্যৈষ্ঠ—পণ্ডিচেরীর নির্ব্বাচনোপলক্ষে ফরাসী রাষ্ট্রসাধনায় লেখককে শ্রীঅরবিন্দের দীক্ষাদান। শ্রীঅরবিন্দের অর্থসমস্যা—তাঁহার দাবীপূরণের বিচিত্র বিধান—বিপ্লবযুগের গতিপরিবর্ত্তনে শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশ—সহধর্ম্মিণীর অভয়বাণী। আষাঢ়—শ্রীঅরবিন্দের পত্রে নব-জাতীয়তার নির্দ্দেশ—মায়ের সর্ব্বহারা সঙ্কল্প—লেখকের পিতৃদেবের মৃত্যু। শ্রাবণ—গুরুভাবের প্রকাশ, প্রথম শিষ্যা মেজ-বউ—গুপ্ত পুলিসকাহিনী—জাতি-সাধনায় তন্ত্র ও বেদান্তের স্বতন্ত্রীকরণের জন্য শ্রীঅরবিন্দের পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ। ভাদ্র—স্বাবলম্বন-ব্রত-গ্রহণে প্রথম সঙ্ঘ-ব্যবসায়ের সূচনা—জন্মোৎসব—"প্রবর্ত্তকের" প্রতিষ্ঠা। আশ্বিন—বিপ্লব-যুগের জের—কয়েকটী জটিল ঘটনা। কার্ত্তিক—বিশেষ সংখ্যা। অগ্রহায়ণ—বিপ্লবি সংসর্গে—ইউরোপের মহাযুদ্ধে চন্দননগরের স্বেচ্ছাসেনাপ্রেরণ। পৌষ—পতী-পত্নীর ব্রহ্মচর্য্যব্রত—পতির নবজন্ম-সাধনে অমৃতময়ী সতীশক্তি। মাঘ—লেখকের অধ্যাত্মজীবনে যুগ-পুরুষগণের আবেশ ও বিচিত্র অনুভূতি—প্রতিবেশিনী কুলনারীর আকর্ষণ। ফাল্গুন—প্রাকৃতাপ্রাকৃত প্রেমের আকর্ষণে আত্মসমর্পণ-যোগীর অন্তর-দ্বন্দ্ব—অলৌকিক দর্শন। চৈত্র—পল্লী-বধূর পুনরাগমন ও অভিনব অগ্নি পরীক্ষা।]

"প্রবর্ত্তক" পরিচালক ]

## ১২

অন্য দিনের ন্যায় সে দিনও প্রভাত যথাসময়ে আসিল। ভোরে উঠিয়া গৃহদেবীর অজ্ঞাতে যদি বাহির হইয়া যাইতাম, সে দিন তাঁর মুখে হাসি ও কথা, দুইই থাকিত না। আমারও দম বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইত। সারা দিনের কর্ম্মে তিনিও শৃঙ্খলারক্ষা করিতে পারিতেন না। তাহার কারণ বলিবার মত কথা নহে; না বলিলেও তাঁহার মৌন নীরব চরিত্রটী অপরিজ্ঞাত থাকিয়া যায়। কথা আর কিছু নহে, রাত্রির অন্ধকার অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে আলোর ঝরণা যখন প্রথম নামিয়া আসিত, তাঁহারও দিবারম্ভের প্রথম দৃষ্টিটী আমাকেই

অভিষিক্ত করিত। এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার জীবন-নীতির মধ্যে এই নীতিটী তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত অটুট ছিল।

যদি এমন হইত, ঔদাসীন্য অথবা কোন জরুরী কর্ম্ম-বশতঃ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বে আমায় বাহির হইতে হইয়াছে, তাহার জন্য নিজেকে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করা রূপ শাস্তি লইতে হইত। আমার এই অপরাধের জন্য তিনিই কিন্তু অধিক শাস্তি সহিতেন; কেননা, প্রতিদিন প্রভাতে আমাকে না দেখিয়া অন্য কিছুর দিকে তিনি চাহিবেন না, ইহা ছিল তাঁর আত্মকৃত ব্রত। এই ব্রত-ভঙ্গ না হওয়ার জন্য এইরূপ অবস্থায় তাঁহাকে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া গৃহমধ্যে অনেক বেলা পর্য্যন্ত নত শিরে পায়চারী করিতে দেখিয়াছি। গৃহকর্ম্ম অধিক বেলা পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকার জন্য তাঁহার ক্ষোভ ও রোষ, দুইই হইত; কিন্তু আমি যখন সলজ্জে আমার ঔদাসীন্যের জন্য ত্রুটি স্বীকার করিতাম, তিনি কখন কখন সজল নীরব নয়নে ঘরের বাহিরে গিয়া বহুক্ষণ পূর্ব্বে যে কর্ম্ম সাধ্য ছিল, তাড়াতাড়ি তাহা সারিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। কখনও বা বিষন্ন হইয়া বলিতেন—"এমন হয় কেন? আমারই বা এমন অসঙ্গত জিদ্ কেন? অপরাধী তুমি নহ, আমি।"

এ বাণী অভিমানপ্রসূত। এই ব্রত লইয়া চোর-দায়ে ধরা পড়ার ন্যায় দায়ী যে শুধু তিনি নহেন, তাঁর এই পবিত্র ব্রতরক্ষার জন্য স্বামীরও যে একটা দায়িত্ব আছে, এ কথা তিনি খোলসা করিয়া না বলিলেও, তাঁর আচরণে ও বাক্যে এই ভাবটাই আমায় পীড়িত করিত। ক্রমে যত প্রত্যুষেই গাত্রোত্থান করি, তাঁহার নিদ্রিত অবস্থায় ললাটে করস্পর্শ করিয়া আমি যে বাহিরে যাইতেছি, এই কথা বলা অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। তিনিও নিদ্রা-নিমীলিত আঁখি ধীরে উন্মীলিত করিয়া প্রতি প্রভাতে দৃষ্টিসুধাবর্ষণে আমার মধ্যে নবশক্তি সঞ্চার করিতেন। তাঁহার নয়নে নিদ্রাপ্রীতির নির্ঝর ঝরিত। অন্তরের বন্ধন প্রতিদিনই দৃঢ় হইত। নিঃসঙ্গ পতি-পত্নীর প্রেমের সম্বন্ধ অপ্রাকৃত ক্ষেত্রে নূতন মূর্ত্তি ধরিতেছিল। দেহভোগের বহু দূরে দাঁড়াইয়া শুধু বাণী আর নয়নের দৃষ্টি অমৃতের ন্যায় উপভোগ্য ছিল। কিন্তু পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনায় হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। আজ আর প্রভাতে প্রথম আলো সহ্য করিতে পারিলাম না। তাঁহার ললাট স্পর্শ করিয়া প্রতিদিনের ন্যায় আজিও তাঁহাকে অভিনন্দিত করার সাহস হইল না। এক প্রকার তাঁহাকে এড়াইবার জন্যই বাহির হইয়া পড়িলাম।

আজিকার ব্যবহার খুবই অসঙ্গতিপূর্ণ হইয়াছিল। প্রাত্যহিক কর্ম্মে কোন বিশেষ ঘটনা না হইলে, সহজে ব্যত্যয় হইত না। চিরদিনই আমার জীবন নিয়মবদ্ধ হইয়াই চলিয়াছে; এবং সেই নিয়ম রক্ষা করার জন্য গৃহ-দেবীরও যত্নের সীমা ছিল না। আত্মসমর্পণের সাধন যে জমিয়া উঠিতেছিল, তাহার মধ্যে তাঁহার সহযোগিতা কম ছিল না।

বহুক্ষণ বাহিরে থাকা সম্ভব হইল না। গৃহে ফিরিয়া এই অবস্থায় যাহা হয়, তাহাই দেখিলাম। গৃহের দুয়ার বন্ধ। অতি প্রত্যুষে প্রতিদিন গৃহপ্রাঙ্গণ পরিষ্কৃত হয়, আজ তাহা হয় নাই। রাত্রির পর্য্যুষিত খাদ্যদ্রব্য লইয়া বায়সেরা উৎসব আরম্ভ করিয়াছে। অনেকেই মনে করিয়াছে—হয় তো ছোট-বৌ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে; ইতস্ততঃ পরিবারমণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ কাণাঘুষাও চলিতেছে। এই অবস্থায় আমি মুক্ত বাতায়নপথে গিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া দুয়ার খুলিয়া কাজে লাগিলেন। সকলেই বুঝিল—ছোট-বৌ অসুস্থ নহে, একার সংসার—নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছে।

আমার স্বস্তি ছিল না। গুরুতর দ্বন্দ্ব বুকে ঢেঁকির পাড় পড়িতেছিল। মনে হইতেছিল—ইহা কি সাধনা? যাহা কিছু হয়, ভগবান কি তার জন্য দায়ী? যদি তাহাই হইবে, অনুশোচনা কেন? মনের দুর্ব্বলতা বলিব কি? বিবেক তাহাতে সায় দেয় না। সকালের অপরাধ এক কথায় মিটিয়া যাইত; কিন্তু ভোরে তাঁহাকে না জানাইয়া বাহির হইয়া যাওয়াটাই তো অপরাধ নহে। পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনা যদি অপরাধ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সে বড় গুরুতর অপরাধ।

সারাদিন মনে ঝড় বহিল। গৃহদেবী প্রথমটা ক্ষোভে, অভিমানে নীরব ছিলেন। কিন্তু আমার গাম্ভীর্য্যের মাত্রা

গুরুতর দেখিয়া, তিনি দুশ্চিন্তাকাতর হইলেন। অপরাহ্ণ হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত তিনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—আমার কি হইয়াছে? তাঁর অভিমান করাটাই যেন অপরাধের বলিয়া তিনি তাহার জন্য মার্জ্জনা চাহিতে লাগিলেন। আমার যদি বাধা হয়, এমন ব্রত তিনি ছাড়িয়া দিবেন, এ কথাও তিনি জানাইলেন। স্বার্থপর পুরুষ—নারী তাহার মুখ চাহিয়া থাকিবে, অনুগ্রহ-প্রার্থিনী হইবে, এ সুখের অধিকার সে ছাড়িবে কেন? পত্নীর পতি-নিষ্ঠা অন্তরে যে গৌরব-বোধ জাগ্রত করে, তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে কোন পুরুষই চাহে না। নারীর একপতিত্বের আদর্শ নারী অপেক্ষা পুরুষকে অধিক জয়ী করে। পুরুষের একপত্নীত্বের দাবী ধর্ম্মতঃ রক্ষা করিতে হয়; কিন্তু কয় জন পুরুষ একনিষ্ঠ পত্নী-প্রীতি রক্ষা করে?

নারীর স্বভাব আমি যতদূর পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি, তাহাতে আমার মনে হইয়াছে—নারীর আশ্রয়-তত্ত্বে চিত্তের যে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা, পুরুষ তাহার প্রতিদানে দিয়াছে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা। ক্ষত-বিক্ষত নারীহৃদয় ঐকান্তিক চিত্তে আত্মনিবেদন করিয়া শেষ হয়। পুরুষের চিত্তবৃত্তি এরূপ একাগ্র নহে। উগ্র প্রবৃত্তির দায় না থাকিলেও, ধর্ম্ম ও আদর্শের দায়ে সে হয় উন্মার্গগামী। গার্হস্থ্যজীবনে অমোঘ শান্তি ও আনন্দের প্রতিষ্ঠা এই-জন্যই ক্ষুণ্ণ হয়। পতি-পত্নী যদি একাগ্র চিত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ভজনা করিত, এই দুঃখের সংসার-সমুদ্রে অমৃত উৎসৃত হইত।

আমার রক্ত-মাংসের ক্ষুধা ছিল না। আবাল্য নৈষ্ঠিক আত্মসাধনায় উগ্র প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার স্বভাব হইতে মুক্তি পাইয়াছিলাম। হৃদয়কে আপাত পাপ হইতে বিরত রাখার সাধ্যলাভ হইয়াছিল। কিন্তু এই পাপ ছদ্মবেশ ধরিয়া যদি প্রেমের অপ্রাকৃত সম্বন্ধের আকৃতি প্রকাশ করিত, আমি আর আত্মস্থ থাকিতে পারিতাম না, বন্ধন-হারা হইয়া এই ক্ষেত্রে হৃদয় আমার উধাও হইয়া ছুটিত। হৃদয়ের এই শৈথিল্যে ক্ষতির সঙ্গে লাভের কিছু যে পাই নাই, তাহা নহে; কিন্তু এই পথে যে দুরারোগ্য ক্ষতসৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নিরাময় করার জন্য নিজের অনেকখানি আয়ুঃ শেষ করিয়াছি; আমাকে যে অকপটে ভালবাসিয়াছে, তাহাকেও দুঃখ দিয়াছি। দুঃখের পাথারে আমি সাঁতার কাটিয়া পার হইয়াছি। অন্যে হয়তো ডুবিয়া মরিয়াছে। আত্মসমর্পণের নাম ও ভাব আমায় উদ্বুদ্ধ করিয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া দিত। তাহার জন্য নিজের অন্তর্দ্দাহ সাধনার অঙ্গ বলিয়া সান্ত্বনালাভ করিতাম; কিন্তু অন্যের প্রতি ইহা অত্যাচার বলিয়া মনে হইলে, স্থির থাকিতে পারিতাম না। আত্মবলি দিলেও যদি সে ত্রুটির পরিশোধ হয়, তাহাতে কুণ্ঠা করিতাম না। দিবারাত্রি কেবল এই চিন্তাই হইল। সকলের অসাক্ষাতে নির্জ্জন রাত্রে একজন কুলনারীর সঙ্কেতে ঈশ্বরে নামে আমি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহার বাড়ীতে উপনীত হইলাম—এই ঘটনা এই পর্য্যন্ত গিয়াই সমাপ্ত হইয়াছে। মূলে আর কোন উদ্দেশ্যও নাই। চরিত্রের এই খেয়াল যদি ঈশ্বর-কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে ইহা তো গোপন রাখার প্রয়োজন নাই। আবার ভাবি, নিজের জন্য এই প্রয়োজন থাকিতে না পারে; কিন্তু এ কথা প্রকাশ পাইলে, কুলাঙ্গনার লাঞ্ছনার যে সীমা থাকিবে না। অপরাধিনী সে যদি একাই হইত, কোন কথা ছিল না। কিন্তু আমিও তো তাহাকে প্রশ্রয় দিয়াছি। শাস্তির সবখানি এই অবস্থায় আমি মাথায় বহিতে চাহিলেও, তাহা সম্ভব হইবে না। দুই দিন কি যে অন্তর্দ্দাহ ভোগ করিলাম, তাহা মনে রাখিবার মত ঘটনা নিজেই সৃষ্টি করিয়াছিলাম। ঈশ্বরেরই চক্রান্ত; যন্ত্রকে যন্ত্রী এমনভাবেই বাঁধিয়া লইতে-ছিলেন। যন্ত্রী নির্ব্বিকার; কিন্তু যন্ত্র-চৈতন্যের দুঃখ অবর্ণনীয়।

সকল সাধনার একটা সার্ব্বজনীন বিধি ও পথ আছে। আমি যে যোগের পথে পা বাড়াইয়াছিলাম এবং অশেষ অশুদ্ধি ক্ষয় করিয়া আজ তাহাতে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা হইতে বলিতে পারি—এই সাধনা আধার-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে চালিত হয়। একে অন্যের অনুসারী ও শ্রেয়ঃ দেখিয়া যদি অন্যের পথ অনুসরণ করে, তবে তাহার দুর্গতির সীমা থাকিবে না। সমর্পণের মন্ত্র এক ও অদ্বয়। কিন্তু প্রকাশের ছন্দঃ প্রত্যেকের প্রকৃতিগত হইবে। এক যে ছন্দে সিদ্ধির পথে চলে, অন্যের ছন্দঃ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের হইবে। সিদ্ধযোগী

ভিন্ন আত্মসমর্পণের পথিককে কেহই আশা ও উৎসাহ দিতে পারে না।

আত্মসমর্পণযোগ দেহীর অধ্যাত্মসাধনা। বাহ্যতঃ কোন নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান লক্ষিত না হইলেও, অন্তর্যোগের ছন্দটী সাধকের ব্যাপক জীবন কর্ম্মে প্রকাশিত হয়। অন্তর্দ্দর্শী ভিন্ন আত্মসমর্পণযোগীর জীবন-রহস্য অন্যে ধরিতে পারে না।

যোগসিদ্ধ জীবনের যে সকল লক্ষণ প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে কথিত হইয়াছে, আত্মসমর্পণযোগীর জীবনে তাহা অবধারিত ফলিবে। আত্মসমর্পণযোগীর সাধন বড় দুর্জ্ঞেয় নীতি ধরিয়া পরিচালিত হয়। নিজের দুর্ব্বলতা ঢাকিয়া রাখিবার যতই সতর্কতা অবলম্বন করা হউক, উহা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। আত্মসমর্পণযোগী সত্যকে গোপন রাখিতে পারে না। নিজের খ্যাতি ও সম্মানরক্ষার জন্য তাহার কোনই সতর্কতা নাই, অধ্যবসায় নাই। ভগবানে অনন্যচিত্ত হওয়ার আকুল আগ্রহ যে ক্ষেত্রে হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে, প্রকৃতির জন্মার্জ্জিত অসংখ্য কদর্য্য সংস্কার তাহাতে পুড়িয়া ছাই হয়, যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ধিক্কারজনক সঞ্চিত প্রবৃত্তিরাশি বীভৎস মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতে থাকে। সাধক চায় আত্মখ্যাতির আবরণে সব কিছু মানে মানে মিটাইতে। কিন্তু আত্মসমর্পণের মন্ত্রশক্তি অহঙ্কারের আবরণ বিদীর্ণ করিয়া যে স্তরের যে মূর্ত্তি, তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। সাধক কখনও হতমান হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে মাথা নত করে; কখনও ঈশ্বরপ্রসাদে আনন্দবিগলিতচিত্ত হইয়া উন্নতশিরে ঈশ্বরের জয় দেয়। "উঠা নামা প্রেমের তুফানে"—এ টান কোথায় লইয়া চলে, সাধনার কালে তাহার নিরাকরণ চলে না।

আমি ভাবিলাম—যাহা হইয়াছে, তাহার জন্য নিশ্চয়ই আমি দায়ী নই। যখন ঈশ্বর দায়ী, তখন অহিত কর্ম্ম কি কারণ হইবে? এবং তাহা ঘোষণা করিতেই বা দোষ কি? এই উক্তি কাহার? ঈশ্বরের—না অহঙ্কারের? এই দ্বন্দ্ব বিচার-বুদ্ধিতে যায় না। আমি এক অমোঘ নীতি আশ্রয় করিয়াছিলাম। আজও সেই নীতি অধিকতর মূল্যবান্ হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। এই নীতি হইতেছে—যাহা হয়, তাহা ঈশ্বরেচ্ছা না হইলে হইতে পারে না। উহার নাম যদি পাপ ও অন্যায় হয়, তাহা অনিবার্য্য। কেননা, ঈশ্বরের যন্ত্র কর্ম্ম প্রকাশ করিবেই। যন্ত্র যদি অনির্ম্মল হয়, বিশুদ্ধ কর্ম্মপ্রকাশ কেমন করিয়া হইবে? আর বিশুদ্ধ কর্ম্মপ্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত যন্ত্র কর্ম্ম বন্ধ করিয়া থাকিবে, এমনও হইতে পারে না। ঈশ্বরের হাতে ইহা চলিতে চলিতেই বিশুদ্ধ কর্ম্মপ্রকাশের উপযোগী হইবে। অতএব যাহা হইয়াছে, তাহার কর্ত্তা ঈশ্বর। কর্ম্মের রূপ যন্ত্রের অশুদ্ধিতে হয়তো অশুদ্ধ কদর্য্য মূর্ত্তি লইয়াছে। হৃদয়-দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তির উপায়—অন্ততঃ যাহা হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করিয়া যন্ত্রকে অনুশোচনার যাতনা হইতে মুক্ত করিতে হইবে, নতুবা জীবনের স্বচ্ছতা থাকে না।

ঈশ্বরের নিকট ভাল মন্দ নিবেদন তো নিত্য করা হয়। তাঁহার গ্রহণের কোন লক্ষণ তো অনুভূত হয় না। নিবেদনের মন্ত্রটা একটু উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিতে দোষ কি? এই আবৃত্তি কাহার কাছে করিব? নির্দ্দেশ সঙ্গে সঙ্গেই পাইলাম। যাহাকে ভালবাস, যে তোমায় ভালবাসে—যাহাকে প্রত্যয় কর বা যে তোমায় প্রত্যয় করে। এমন মানুষ আমি তখন দুইজন পাইয়াছিলাম। অন্ততঃ আমার ইহাই মনে হইত। এক শ্রীঅরবিন্দ, আর এক আমার ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী রাধারাণী। শ্রীঅরবিন্দকে পরে বলিব—তিনি বহু দূরে। শ্রীমতীর কাছেই ঘোষণাটা করিয়া ফেলি। অন্তর্দ্দাহ সহ্য হইতেছিল না।

কথাটা বলি-বলি করিয়া দিনমান কাটিয়া গেল। শয়নকালে কথা পাড়িলাম। নানা কথার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিয়া হৃদয়ভার লঘু করিলাম। ইহার পরিণাম যে এতখানি হইবে, তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই। প্রথমটা তিনি সব কথাগুলি স্থিরভাবে শুনিয়া লইলেন। তারপর নিষ্ঠুর জেরা আরম্ভ হইল। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক আমি বলিয়াছি কিনা, এই সংশয় তাঁহার জেরার মধ্যে নিহিত ছিল। আমি অকপটে সকল কথা বলা সত্বেও, তিনি আমায় সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এত বড়

গর্হিতকর্ম্ম আমি কেমন করিয়া করিতে পারি, এইভাবে তিনি জেরা করিতে করিতে কটু ভর্ৎসনা সুরু করিলেন। তারপর তাঁহার অধরোষ্ঠ স্ফুরিত হইতে লাগিল। হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তিনি নিজের বুকে বার বার আঘাত করিতে লাগিলেন—সে কি করুণ মূর্ত্তি, তাহা ভুলিতে পারিব না। সারা রাত্রি তিনি কাঁদিয়াই কাটাইলেন। পরদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিলেন না। এই তুচ্ছ ঘটনায় তাঁহার প্রাণে যে এত ব্যথা লাগিতে পারে, তাহা যদি বুঝিতাম, কথা গোপন রাখাই শ্রেয়ঃ মনে করিতাম।

সমাজে পতি-পত্নীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা কি পুরুষের অথবা নারীর এইরূপ আচরণে ব্যাহত হয়। ঘটনাটী উল্টাইয়া ধরিয়া তাঁহার অন্তর-ব্যথার কথা অনুভব করিতে চেষ্টা করিলাম। কোন গভীর রাত্রে আমার অজ্ঞাতে আমার প্রিয়া যদি কোন মহৎ উদ্দেশ্যেও কাহারও অনুসরণ করিয়া রাত্রিযাপন করিয়া আইসে, অন্যের হস্তে হস্ত রাখিয়া নির্জ্জনে আলাপ করে, অভিসন্ধি যতই মহৎ হউক, স্ত্রীর এ আচরণ পুরুষ কি মার্জ্জনা করিবে? স্বামীর অজ্ঞাতসারে পত্নীর এইরূপ আচরণের মধ্যে দুরভিসন্ধির সন্ধান কি পুরুষ করিবে না? এতটা ভাবিয়া তো কাজ হয় না? আমি যদি আমার হইতাম, হয়তো বিচারবুদ্ধি এমন করিয়া লোপ পাইত না। ঈশ্বরের কাছেই করজোড়ে প্রার্থনা করিলাম—প্রভু! এই দুর্গতি হইতে আমায় রক্ষা কর।

দেহভোগই একমাত্র পাপ নয়। যাহা আপনার জনকে লুকাইয়া করা হয়, তাহাই পাপ। প্রেম শরীরগত হইলে, কামের আকার ধরে; মনকে আচ্ছন্ন করিলে, তাহাও কি কাম নহে? যদি সে রাত্রির কর্ম্ম পাপ না হইবে, এই পতিপ্রাণা নারীর প্রাণে ব্যথা বাজিবে কেন? আমিই বা অসহায়ের ন্যায় দুই চক্ষে অন্ধকার দেখি কেন?

সারা দিনরাত্রি তিনি আর শয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন না, আমার মুখের দিকে চাহিলেনও না। মনের অন্ধকার সমস্ত বাড়ীখানিকে ঘিরিয়া ধরিল। দুঃখের পাষাণভারে হৃদয় আমার যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। তিনি অসুস্থ হইয়াছেন বলিয়া, কলঙ্কের দায় হইতে নিজেকে রক্ষা করিলাম। কিন্তু যেখানে নিজেকে আড়াল করিয়া সাধু সাজি, সেইখানেই অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠে। নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইল।

আমার মনে হয়—আঘাতে আঘাতে তাঁহার হৃদয় বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সারা দিন-রাত্রি উপবাসে হৃদয়কে তিনি বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিলেন। কেননা, প্রভাতে উঠিয়াই বিনা বাক্যে তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার সুগম্ভীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মুখে কথা বাহির হইল না। মনে হইল—দুঃখে ও কষ্টে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু তাহা নহে; শ্রীভগবান তাঁহার ভিতর দিয়া আমার উলঙ্গ মূর্ত্তি সেদিন লোকসমাজে প্রকাশ করিয়া দিলেন। আমি দেখিলাম—তিনি সেই মহিলার বাড়ী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এই গোপন ঘটনার কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া আসিলেন। প্রতিবিধিৎসার অগ্নিশিখা যেন তাঁহার নয়নে জ্বলিতেছিল। তিনি বাড়ী ফিরিয়া যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, আমার কুকীর্ত্তির কথা অবাধে প্রচার করিলেন। স্ত্রী হইয়া স্বামীকে লোকচক্ষে এতখানি হেয় করার প্রবৃত্তি তাঁহার কোথা হইতে আসিল? তিনি তো কোনদিন আমার অশুভ যাহাতে হয়, এমন কর্ম্ম দূরে থাক, এমন চিন্তা করিতেও শিহরিয়া উঠিতেন। আজ এমন কটু প্রবৃত্তি তিনি কোথা হইতে পাইলেন? স্ত্রীর প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি পুঞ্জীভূত হইয়া অন্তরে গরিমাবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার কথা কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ বিশ্বাস করিল না। কেহ বা ঘটনা অতিরঞ্জিত করিয়া আমার চরিত্রে মসী লেপন করিল। মানুষের চরিত্র কখনও তির্য্যক্ কখনও ঋজু রেখায় চলে। কত ঘটনাবিজড়িত হইয়া মানুষের জীবন কত বৈচিত্র্যময় হয়। কত মিথ্যা, কত সত্য পরস্পর সংমিশ্রণে কত রূপ ধরে—তাহা কে নিরূপণ করিবে? আমার জীবনের একটী মুহূর্ত্তও যে অপ্রকাশ থাকে না। যাহা গোপন রাখিলে সুনাম হয়, তাহা হয়তো গোপনই থাকিয়া যায়; আর যাহা প্রকাশ পাইলে, দুর্নাম রটে, তাহা গোপন রাখিতে পারি না, প্রকাশ হইয়া পড়ে। জমাখরচের খাতায় লোকসমাজে সুনামের অঙ্কই

বশী ছিল। এই ঘটনায় তাহা কাটাকুটী হইয়া, সুনাম কাজিল হইয়া গেল, মিত্রপক্ষের মাথা নীচু হইল, শত্রুপক্ষ উচ্চহাস্তে পাড়া মাথায় করিল। ধন্ত সেই মহীয়সী নারী —এই অপবাদের মসীলাঞ্ছিতা সেই পল্লীবধূ আপন পরিজনের নিকট ঘটনার প্রতি কথাটি লিখিতভাবে উপস্থাপিত করিলেন। ইহাতে এই ফল দাঁড়াইল— যাহারা আমার এইরূপ কর্ম্মে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া আমার স্ত্রীর আচরণ হঠকারিতা মনে করিয়াছিল, তাহারাও বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম—মহিলার একটী ছত্রও অতিরঞ্জিত নহে; এবং তাঁহার মনোভাবের একবিন্দুও গোপন রাখেন নাই। আমার প্রতি তাঁর এইরূপ আকর্ষণের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া তিনি যে এক প্রকার অবশেন্দ্রিয় হইয়া অভিসারিকার বেশে আমার কাছে উপনীতা হইয়াছিলেন এবং আমার আচরণের প্রতি ভঙ্গীটা তিনি যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন—যদি পাপ হইয়া থাকে, যে কোন শাস্তিই তিনি লইতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি নারী বলিয়া তাঁহার এই ইষ্টবোধ বিকৃত করিয়া গৃহীত হইলে, তাঁহার প্রতি অন্যায় করা হইবে। আমি আজিও এই নারীর আকুতির অকপটতা অনুভব করি। সে বহুদিনের কথা, রক্ত-মাংসের মনুষ্যের স্বভাব সেদিনও হয়তো নিঃশেষ হয় নাই, সেদিনের আচরণ অধিকতর সংযত হওয়া উচিত ছিল। আমি কিন্তু ঈশ্বরের নিকট এই মহীয়সী মহিলার চিরদিন শুভ কামনা করিব। তিনি শ্রীভগবানের বিগ্রহ লাভ করিয়া পরম প্রেমের অধিকারিণী হউন, এই প্রার্থনাই আমি করিব।

এই ঘটনায় বুঝিলাম—নারী ও পুরুষের মধ্যে বিধাতৃ-কৃত যে ব্যবধান, তাহা উল্লঙ্ঘন করা কাহারও পক্ষে উচিত নহে। আরও বুঝিলাম—মানুষ যে ঘোষণা লইয়া লোকসমাজে পরিচিত, উগ্র কামনার দায়ে অথবা অধ্যাত্ম-সাধনার নামে সে ঘোষণার বিপরীত কর্ম্ম সে যেন না করে। নারী যেখানে একপতিত্বের জয়সিন্দুর সীমন্তে ধরিয়াছে, সেও যেন পর-পুরুষের সংসর্গ হইতে নিজেকে সতর্ক রাখে; আর যে পুরুষ এক নারী গ্রহণ করিয়া সমাজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, পর-নারীর গোপন সঙ্গ হইতে সেও যেন বিরত থাকে। এই কথা অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর পক্ষেও প্রযুজ্য। বিধবা বিপত্নীকেরও যাহা ঘোষণা, তাহার বিপরীত কর্ম্ম সে ক্ষেত্রেও না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শুধু গৃহের শান্তি নহে, সমাজ ও জাতির শ্রী ও বীর্য্য এই সত্যরক্ষার মধ্যে নিহিত।

আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত-সৃষ্টির প্রবৃত্তি, উহাও অসংস্কৃত চিত্তবৃত্তির পরিচয়। সর্পের লাঙ্গুলে অসাবধান পথিকের পদস্পর্শে উন্নতফণা ভুজঙ্গ আঘাতকারীকে দংশন করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই ঘটনায় গৃহদেবীর অবস্থাও তদনুরূপ হইল। নিদারুণ প্রতিক্রিয়ায় তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। আমাকে শাস্তি দিয়া, তিনিও তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে ছাড়িলেন না। আমার অন্যায় তিনি মার্জ্জনা করিলেন। তাঁহার অন্যায়ের মার্জ্জনা তিনি চাহিলেন না। বুঝি তাঁর অপরাধের মার্জ্জনা করার আমার সাধ্যও ছিল না। তিনি যাহা করিলেন, অপরাধীকে দণ্ড দিয়া তাহাকে পুনঃ মুক্তি দেওয়া, তার জন্য তাঁহাকে আমি দোষী করি না। কিন্তু স্বামীকে অপরাধী প্রমাণ করিয়া তিনি শান্তি পাইলেন না। স্বামীর আচরণ নির্দ্বন্দ্বচিত্তে সহিয়া অন্য কোন সদুপায় আবিষ্কার করার পথ ছাড়িয়া সাধারণের ন্যায় অতি স্থূল নীতি আশ্রয় করার অনুতাপে তাঁর চিত্ত আচ্ছন্ন হইল। আমার আচরণ তাঁহাকে গুরুতর আঘাত দিয়াছিল। তার উপর তাঁর নিজের আচরণ তাঁহাকে অতিশয় পীড়িত করিল। যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে অহিত কিছু করিতে দেখিলে নিজের হৃদয় বলি দিয়াই তো সে কর্ম্ম হইতে তাহাকে বিরত করিতে হইবে। তাহাকে শাস্তি দিবার নীতি তো প্রেমের নহে। তিনি এই ঘটনার পর আপনাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া শেষ করিতে চাহিলেন। তাঁহার মৃত্যুপণ, আর আমার তাঁহাকে ধরিয়া রাখার আকুতি। সে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে দুই জনেই নিরুপায় হইলাম। দুই জনের চোখের জল একত্র হইয়া বিশাল নদী সৃষ্টি করিল। কে কাহাকে সান্ত্বনা দিবে? তিন দিন অনাহারের পর আমার মিনতি তিনি শুনিলেন, কিন্তু স্নায়বিক উত্তেজনায় তাঁর সর্ব্বশরীর এমন বিকল হইয়া

গিয়াছিল যে, একবিন্দু জলও তিনি মুখে দিতে পারিলেন না।. যাহা তিনি গ্রহণ করেন, তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া যায়। ডাক্তার আসিল, কবিরাজ আসিল—রোগের প্রতিকার হইল না। সে কি ব্যথার অশ্রু উভয়েরই নয়নে! সাতদিন অতিবাহিত হইল। তিনি হতাশ হইলেন, আমিও এক প্রকার তাঁহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিলাম।

নারী আর পুরুষ। প্রেম অপার্থিব স্বর্গের অমৃত। প্রেম-বন্ধন যেখানে দুটী হিয়া যুক্ত করে, সেখানে অপার্থিব আচরণ সত্য সুস্পষ্ট হইলেও, নারী কি তার প্রিয়তম অন্যার প্রতি আকৃষ্টচিত্ত হয়—এরূপ চাহে? পুরুষও বোধ হয় ইহা চাহিবে না। প্রেম কি এমনই সঙ্কীর্ণ? না, প্রেম সঙ্কীর্ণ নহে। আচরণবিকৃতি চিত্ত ক্ষুণ্ণ করে। প্রেম যে পুষ্টি ও বৃদ্ধি হৃদয়কে দেয়, হৃদয়ের তাহা বিতরণ-ছন্দঃ দিব্য যদি হয়, বোধ হয় নারী-পুরুষের প্রেমবন্ধন তাহাতে শিথিল হয় না; সে প্রমাণও জীবনেই পাইয়াছি। সে কথা এখন নহে।

মুমূর্ষ পত্নী শয্যাপার্শ্বে। কত বার তাঁহার মুখে পানীয় প্রদান করিলাম, কিন্তু একবারও উদরে কিছু তলাইল না। বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় যাহা কিছু গলধঃকরণ করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা বমন হইয়া যায়। বড় উৎক্ষিপ্তচিত্ত; ঈশ্বরেচ্ছা সেই চরম যদি হয়; কেন এই চিত্তদৌর্ব্বল্য? তাঁর শীর্ণ মুখখানির দিকে চাহিয়া সে রাত্রি বিদায়ের বাণী কণ্ঠে জড়াইয়া উঠিতেছিল। তিনিও অপলকে আমার দিকে চাহিয়া বিদায়প্রার্থনাই জানাইতেছিলেন। এমনই কাল-রাত্রি সেদিন আমাদের সম্মুখে।

মাথায় লঘু করসঞ্চালন করিতে করিতে তিনি তন্দ্রাতুরা হইলেন। আমি নিঃশব্দে প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া বসিলাম। মুক্ত বাতায়নপথে কৃষ্ণবর্ণ আকাশ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। কয়েকটা উজ্জ্বল তারকা ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। প্রাণ স্তব্ধ। শ্বাস বোধ হয় রুদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। কুণ্ডলিনী উৎসর্গের থালি শিরে লইয়া, রন্ধ্র বাহিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছিলেন। প্রসন্ন বিস্ফারিত নয়নের সম্মুখে কি দেখিলাম? সেই মসীমাখা ঘন মেঘের গায়ে একটা তারকা যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া আলো লেপিয়া দিল অন্ধকার-পটে, আর দেখিলাম —এক ছায়াময় মূর্ত্তি জানালার লোহার গরাদ উভয় হস্তে বিস্ফারিত করিয়া গবাক্ষ-পথ দিয়া গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। স্থির অবিচল দৃষ্টিতে সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পরে সে ধীর পদ-বিক্ষেপে আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই বিপুল ছায়ামূর্ত্তি যত নিকটে আগাইয়া আসে, ততই শরীর শিহরিয়া উঠে; আর তো ব্যবধান নাই; শয্যাধার যে এইবার স্পর্শ করিল। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। অতি ভয়ঙ্কর উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তুমি?" সে বজ্রধ্বনি নিঝুম রাত্রির আকাশে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলিল। আত্মীয়-স্বজন জাগিয়া উঠিলেন, দুই একজন নিকট প্রতিবেশীও সাড়া লইলেন। ভ্রম বুঝিলাম। সকলকে জানাইলাম—"স্বপ্ন, ভয় নাই।"

বিস্ময়ের কথা! তার পরদিন প্রভাতে গৃহলক্ষ্মীর প্রসন্ন মূর্ত্তি নয়নে ও হৃদয়ে আনন্দের প্রলেপ মাখাইয়া দিল। অলৌকিক রহস্য! সাতদিন পরে তিনি সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় অন্ন গ্রহণ করিলেন। ইহার পর যে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিকশিত হইল, তাহা আর অতীতের নহে। এইদিন হইতে তাঁহার মুখে একটা অপূর্ব্ব শ্রী ও লাবণ্য বিকশিত হইয়াছিল।

# গীতার কর্ম্মবাদ

শ্রীমতিলাল রায়

গীতায় ভগবান বলিতেছেন—

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥৪৯॥
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥৫০

সর্ব্বত্র সঙ্গশূন্যবুদ্ধি, জিতাত্মা, বিগতস্পৃহ সন্ন্যাসের দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি-লাভ হইয়া থাকে।

হে কৌন্তেয়, সিদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া যেরূপে ব্রহ্মলাভ হয়, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট হইতে অবগত হও। জ্ঞানের যে পরম নিষ্ঠা, তাহাও শ্রবণ কর।

বর্ত্তমান অধ্যায়ের ৪৬শ শ্লোকে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে "স্ব-কর্ম্মণা" অর্থাৎ স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা পরমেশ্বরকে আরাধনা করিয়া মানুষ সিদ্ধিলাভ করে। বর্ত্তমান শ্লোকে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির কথা বলা হইতেছে। সঙ্গ-ত্যাগ করিয়া, যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করার কথাই আমরা গীতায় পাইয়াছি। অবশ্য যজ্ঞার্থেই কর্ম্ম-বিধি গীতায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভব" আর সেই ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত; অতএব কর্ম্মত্যাগ গীতাবিরোধী ধর্ম্ম। অষ্টাদশ অধ্যায়ের গোড়াতেই কাম্যকর্ম্মত্যাগের কথা ও কর্ম্মফলত্যাগের কথা আছে, নৈষ্কর্ম্ম্যের কথা নাই। উপরোক্ত প্রথম সূত্রে অসক্তবুদ্ধি জিতাত্মাদের সন্ন্যাসের দ্বারা নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধিই উক্ত হইল। গীতা স্বভাবতঃ নানা কথায় আমাদের বুদ্ধিভ্রান্তি আনয়ন করে। শ্রোতা পার্থ এইজন্য বলিয়াছিলেন "ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন" (৩য় অঃ ২য় শ্লোক) অর্থাৎ 'মিশ্র বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধি ঘুলাইয়া দিতেছ। যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, তাহাই বল।'

আমরা কিন্তু এক্ষণে বহু দূর অগ্রসর হইয়াছি। আমাদের শীঘ্রই বলিতে হইবে "নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা"। এই হেতু গীতার উপসংহার অধ্যায়ের এই শেষাংশটুকু আমাদের অতিশয় সতর্কতার সহিত বুঝিয়া লইতে হইবে।

কর্ত্তার সহিত যুক্তির জন্য কর্ম্মসূত্রই ধরিতে হয়, সেই কর্ম্ম কর্ত্তার নিকট আমাদের পৌছাইয়া দিবার প্রথমে আশ্রয় মাত্র। তারপর কর্ত্তাকে পাইলেও, তাঁর নিত্য কর্ম্ম-চক্র হইতে আমাদের নিষ্কৃতিলাভ সম্ভব নহে; তাই কর্ম্ম-নিষ্কৃতির কথা গীতায় নাই। তবে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির কথা এই শ্লোকে উত্থাপিত হইল কেন? প্রথম "সর্ব্বত্র" শব্দের অর্থ 'পুত্রদারাদিতে' কোন কোন আচার্য্য করিয়াছেন। নৈষ্কর্ম্য লক্ষ্যে রাখিলে, পুত্রাদি বিষয়ে আসক্তি উহার অন্তরায় মনে হয়। তাই বৈরাগ্য শব্দের অর্থই হইয়াছে জীবনধর্ম্মের পরিহার। অথচ বক্তা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এইরূপ বৈরাগী নহেন। আদর্শবাদের দায় মহাপুরুষদেরও অন্ধ করে। এই 'সর্ব্বত্র' শব্দের অর্থ আচার্য্য রামানুজ "ফলাদিষ্বসক্তচিত্তঃ", আর আচার্য্য বলদেবও বলেন "আত্মাতিরিক্তেষ্বসক্তবুদ্ধিঃ"—এই অর্থই গ্রহণীয়। গীতা যে আগাগোড়া আমাদের গুণাতীত হইতে বলিতেছেন, যজ্ঞের জন্য নিত্যযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন, সে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া? করণকে না কর্ত্তাকে? "নৈব-কিঞ্চিৎ করোমীতি" বা "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য" প্রভৃতি সূত্রে কর্ম্মবিজ্ঞানের যে নব নীতি প্রণীত হইয়াছে, তাহা কি এই গুণবন্ধনদুষ্ট দেহাদি করণের জন্য? করণ গুণাদি ভূত। এই করণের কর্ত্তা আমাদের আত্মা। আত্মা স্বয়ং 'নিত্যসত্ত্বস্থ', মুক্ত, অবিনাশী হইয়াও দেহাত্মবোধে কর্ম্মশ্রান্তি অনুভব করে, ব্যাধি-মৃত্যুর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। সর্ব্বনিয়ন্তার সহিত জীবের এই যে মোহবশতঃ ভেদ, তাহারই দূরীকরণের জন্য গীতার অমৃত পরিবেশিত হইয়াছে।

অতএব সন্ন্যাসের দ্বারা "নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির" স্পষ্টার্থ শ্লোকেই নিহিত রহিয়াছে। জিতাত্মা হইলে, বিগত-স্পৃহ হওয়া যায়। এইরূপ হইলে যে সন্ন্যাস, তাহা সর্ব্ব-কর্ম্মপরিত্যাগ নহে। কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় করণের দ্বারা। কর্ত্তা অনুমন্তা মাত্র। করণগুলি স্ব স্ব কর্ম্ম করিয়া চলে। এই অবস্থায় আত্মার নৈষ্কর্ম্য প্রতিপাদিত হয় না, কর্ত্তার স্বরূপ-ধর্ম্ম ইহাই।

যাহার যাহা স্বরূপ-ধর্ম্ম, তাহা সুনিশ্চিত আছে। অর্থাৎ

একের কর্ম্ম অন্যে অন্বিত না হইলে, কর্ম্মচক্রের ছন্দঃ দিব্য মূর্ত্তি ধরে। সে যে কোন আশ্রমধর্ম্মীই হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। পুত্রপরিজন লইয়া যে জীবনধর্ম্ম, তাহার মধ্যেও জীব কর্ম্ম ও করণের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া যদি আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে, তবে এই জিতাত্মা পুরুষ নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করিয়াছে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যোগারূঢ় দশায় আত্মা অসক্তচিত্ত হয়, জিতাত্মা হয়, বিগতস্পৃহ হয়, তখন ঈশ্বরেচ্ছায় তাহার যে আশ্রম-লক্ষণই জীবনে প্রকাশিত হউক না কেন, "ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু" কর্ম্ম হয় এবং সেই ব্রাহ্মীস্থিত পুরুষই কিছু পাইয়াও "নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি" এবং সেই পুরুষই "শান্তিং অধিগচ্ছতি" বা "নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ"—গীতার এই বাণী সফল করে।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "সদোষমপি কর্ম্ম" পরিত্যাগ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কর্ম্মসূত্র ধরিয়াই যখন আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, তখন তো তাহা দোষযুক্ত হইবেই। প্রথমেই কেহ কর্ম্মনিহিত কামনা ত্যাগ করিতে পারে না এবং কর্ম্মফলেও অনাসক্ত-চিত্ত হয় না। আত্মার স্বরূপ-লাভ তখনই হইবে, যখনই কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মসূত্র কামনা ও আসক্তির বর্ণমুক্ত হইবে। ৫৯শ শ্লোক পূর্ব্ব শ্লোকেরই পরিপূরক।

নৈষ্কর্ম্যপ্রাপ্ত বিশুদ্ধ আত্মা পরমাত্মার সহিত কি প্রকারে যুক্তিলাভ করে এবং কি জ্ঞাননিষ্ঠার ভিত্তির উপর আত্মা এই অবস্থায় নির্লিপ্ত হইয়া উঠে, তাহা পরবর্ত্তী তিনটী শ্লোকে সুস্পষ্ট হইয়াছে।

> বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
> শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥৫১॥
> বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
> ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২॥
> অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
> বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩॥

বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা অন্বিত, ধৈর্য্যের দ্বারা আপনাকে নিয়ন্ত্রিত, শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহকে ত্যাগ করিয়া ও রাগদ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিবিক্তসেবী, মিতভোজী সাধক কায়-মনোবাক্যে সর্ব্বদা ধ্যানযোগনিষ্ঠ ও বৈরাগ্যকে সম্যক্ প্রকারে আশ্রয় করিয়া অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ হইতে মুক্ত হইয়া শান্ত-ব্রহ্মত্বলাভে সমর্থ হয়।

বর্ত্তমান অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে—দেহধারী ব্যক্তি নিঃশেষে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না। যে কর্ম্মফলত্যাগী, সেই ত্যাগী। এই কথাটী যেমন স্মরণে রাখিতে হইবে, সেইরূপ আমাদের আরও মনে রাখিতে হইবে যে, কর্ম্ম নিষ্পাদ্য হয় পাঁচটী বিষয় লইয়া। কর্ম্মের জন্য প্রথম দায়ী কর্ত্তা। কর্ম্মের আশ্রয় বা অধিকরণ এই দেহ। করণ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম। করণ চালনের চেষ্টা আমাদের প্রাণশক্তি। এবং শেষে এই কর্ম্মের জন্য অলক্ষিত তৃতীয় শক্তির প্রেরণা। ১৮শ অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোকে কর্ম্মসম্পাদনের এই পাঁচটী উপায়ের কথা কথিত হইয়াছে। কর্ম্ম যদি জীবনশুদ্ধির অদ্বিতীয় উপায় হয়, কর্ম্মনিষ্পাদনের সনাতন ছন্দটী আমাদের উপলব্ধিগম্য করিতে হইবে।

আমাদের কর্ম্মকে কামনাশূন্য করিতে হইবে। কর্ম্ম-যজ্ঞের ইহাই সর্ব্বপ্রধান শোধন-মন্ত্র এবং দ্বিতীয় ও উপসংহার-মন্ত্র—কর্ম্মফলে নিরাসক্ত হইতে হইবে। কর্ম্ম-প্রেরণা অনির্ম্মল নহে। কেননা, উহা সঙ্কীর্ণক্ষেত্রজাত নহে। উর্দ্ধলোক হইতে নির্ম্মল কর্ম্মসূত্রে নিত্যবিধৃত হইয়া জীবকে যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত করিতেছে। জীবের অহঙ্কার এই দিব্য ছন্দঃ বিম্নিত করে। বিকৃত ছন্দে কর্ম্মের অধিষ্ঠানক্ষেত্র যে শরীর, তাহাও বিকৃত হয়। ইন্দ্রিয়াদি করণ, প্রাণের প্রচেষ্টা, সবই অবিশুদ্ধ মূর্ত্তি ধরে। জীব অহঙ্কারমুক্ত হইলে, ক্ষেত্রাদি সবই বিশুদ্ধ হইবে। ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। অতএব বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয়গণকে ধৈর্য্যসহকারে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেই জীব নিষ্কাম ও নিরাসক্ত হইতে পারে। আত্মা কর্ম্ম করে; কেন না, সে কর্ত্তা। কিন্তু তাহার কর্ম্মছন্দঃ আজ্ঞা মাত্র। এই আজ্ঞাও তাহাতে স্বতঃস্ফুরিত হইলেও, ইহার উৎস শরীরাধিষ্ঠিত জীব নহে, সর্ব্বভূতেশ্বর বিরাট্ পুরুষ। সকল কর্ম্মই ঈশ্বরের; কিন্তু জীবচৈতন্য দেহাদিতেই মোহযুক্ত, দেহাত্মবোধে অভিভূত, তাই বিশুদ্ধ কর্ম্মপ্রেরণা অমলিন হয় না। বুদ্ধির দ্বারা তাহার স্বভাব ও স্বধর্ম্ম যে ঈশ্বর-যুক্তি, তাহাতেই যখন সে অভিনিবিষ্ট হয়, তখনই আধারে

ঈশ্বরকর্ম্ম প্রকাশ পায়। ইহাই কর্ম্মের স্বরূপ। এইজন্য তাহাকে ধৈর্য্যের আশ্রয় লইতে হয়। পূর্ব্বস্বভাববশতঃ শরীর, মন ও ইন্দ্রিয় এইরূপ কর্ম্ম করায় অভ্যস্ত নহে, উহারা প্রতিপদে প্রতিবাদী হয়। উহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করা অর্থে বশীকৃত করা; ইহার জন্য ধৈর্য্যেরই প্রয়োজন। এই বশীভূত অধিষ্ঠান ও করণাদি বিষয়াদির আসক্তি হইতে সহজেই মুক্তিলাভ করে। বিষয়াসক্তি না থাকায়, রাগদ্বেষের প্রকাশ হয় না। তখনই জীব জীবাধারকেও দিব্য করিয়া লয়, সে হয় বিবিক্তসেবী ও মিতাহারী। এইরূপ দেহীর কায়, মন ও বাক্ আত্মার সহিত ধ্যান-যোগনিষ্ঠ হইয়া সংযত মূর্ত্তি ধরে। বিষয়তৃষ্ণা ছাড়িয়া তাহারা অমৃত-পিয়াসী হয়। ইহাতে অহঙ্কারাদি অশুদ্ধির প্রকাশ না হইয়া, সবখানি ব্রহ্মভাবনাযুক্ত হয়। ভারতে বৈরাগ্য-প্রদীপ্ত, ইহবিমুখ সন্ন্যাসীরা এই যুক্তির মানবকে অরণ্যে, পর্ব্বতে, গিরিগুহায় আহ্বান করিয়াছেন। তাই বিবিক্ত-সেবীর অর্থ অধিকাংশ আচার্য্য এইরূপই গ্রহণ করিয়াছেন। বিবিক্ত শব্দের অর্থ বিজন বটে; কিন্তু ইহার অর্থ অসম্পৃক্তও হয়। চিত্ত যদি আমাদের বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরযুক্তি-সাধনের কর্ম্ম পায়, তবে বিবিক্তসেবীর অর্থ আচার্য্য শ্রীধরের মতানুযায়ী 'শুচিদেশাবস্থায়ী', ইহা আমরা গ্রহণীয় মনে করি।

দেহাত্মবোধ ছাড়িয়া দেহী ঈশ্বরযুক্তি লাভ করিলে যেরূপ কর্ম্মলক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা পর পর তিনটী শ্লোকে বলা হইয়াছে।

> ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
> সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪॥
> ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
> ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫॥
> সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
> মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥৫৬॥

ব্রহ্মপ্রাপ্ত প্রসন্নাত্মা শোক করেন না, কামনা করেন না; সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হইয়া উৎকৃষ্ট ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন।

আমি যেরূপ যে পুরুষ হই, ভক্তির দ্বারা তাহা তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন, অনন্তর তত্ত্বতঃ আমাকে জানিয়া তাহার পর আমাকে লাভ করেন।

সর্ব্বদা সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও, আমাকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়া আমার প্রসাদে তাঁহারা শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মযুক্ত জীব আত্মপ্রসাদ লাভ করে বলিয়া তাহার শোক নাই, কামনা নাই। জগৎ বিধৃত ব্রহ্মে; এই হেতু ব্রহ্মযুক্তি যে লাভ করে, সর্ব্বভূতেই তাহার ব্রহ্মদর্শন হয়। এইরূপ হইলে, চিত্তে যে রসোল্লাস হয়, তাহার নামই ভক্তি। এই ভক্তি চিত্তের স্বরূপবৃত্তি। ইহার দ্বারাই ব্রহ্মকে তত্ত্বের দ্বারা জানিতে পারা যায়। ১১শ অধ্যায়ের ৫৪শ শ্লোকে এই কথাই উক্ত হইয়াছে। "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ"—চিত্ত একাগ্র না হইলে, ভক্তিলাভ হয় না। একাগ্র-চিত্তই ব্রহ্মকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে। ব্রহ্মের নানা বিশেষণ। কেহ বলেন "শাব্দং ব্রহ্ম বপুর্দ্দধৎ" অর্থাৎ ব্রহ্ম শব্দময় দেহধারী। গীতায় ৯ম অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকে আছে, "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্"—ইহা হইতে বুঝা যায়, সচ্চিদানন্দময় ভগবান মনুষ্যদেহধারীও হইতে পারেন। ব্রহ্ম শব্দের এমন কত অর্থ শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায়। শ্রুতি-কীর্ত্তিত ব্রহ্মজ্ঞান শব্দমাত্রই কর্ণগোচর হয়। কিন্তু ভক্তি এমন বস্তু, যাহার দ্বারা ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপটী অবধৃত হয়। এই ব্রহ্মাবধারণ যথাযথ ভাবে লব্ধ হইলে, ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। অতএব আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই—কর্ম্ম-সূত্র ধরিয়া ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয় এবং তাহার পর ব্রহ্মকে ভক্তির দ্বারা তত্ত্বতঃ জানিতে পারা যায়। তদনন্তর ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির একের পর আর একের প্রয়োজন অনুসরণ করিয়া যে আমরা শাশ্বত অব্যয় পদ লাভ করি, ঠিক তাহা নহে। নিষ্কাম ও নিরাসক্ত কর্ম্মই জ্ঞানাকার ধারণ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের সম্মুখীন হয় এবং এই কর্ম্ম ও জ্ঞানের পরিণতি হয় ভক্তিতে। এই ভক্তির দ্বারাই অনন্তর ব্রহ্মযুক্তিলাভ হইয়া থাকে। কর্ম্ম তাই ঈশ্বরপ্রাপ্তির বীজ। কর্ম্মের পরিস্ফুরণে জ্ঞান ও ভক্তি বিকশিত হয়। তাই ৫৬শ শ্লোকে সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, সতত সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও ঈশ্বরযুক্ত পুরুষ ঈশ্বরপ্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ লাভ করে। ঈশ্বরলাভ হইলে কর্ম্ম থাকে না, ইহা জড়বুদ্ধির অহেতুক

কল্পনা। এই জন্য গীতায় অহোরাত্রবিৎ হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। অহোরাত্রবিৎ যাঁহারা, তাঁহারা জানেন—এ বিশ্বের একটা ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট পরমায়ুঃ আছে। সহস্র যুগ পরিমিত কাল সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার একদিন এবং তাদৃশ কালে তাঁহার এক রাত্রি হয়। এই রাত্রিকালে দিবা-বির্ভাবে যে ভূতগ্রামের প্রকাশ, তাহার পুনঃ লয় হয়। এই যুগসহস্র কাল মনুষ্যগণনায় বহুকোটী বৎসর। এই লয়ও আত্যন্তিক লয় নহে, প্রাকৃতিক লয়ও নহে, নৈমিত্তিক লয় মাত্র। সৃষ্টিবীজ স্ব-স্ব-কারণে লীন হয় মাত্র। কারণের কারণ যে আদ্যা প্রকৃতি, তাহাতেও সৃষ্টিসত্তা বিলুপ্ত হয় না। গীতার ৮ম অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোকে তাই স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে "ভূতগ্রামঃ স এবায়ম্ ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে"। বেদান্তের ৪র্থ অধ্যায় ১ম পাদ ১২শ সূত্রে এইরূপ আছে "আপ্রয়াণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্" 'আপ্রয়াণ' শব্দের অর্থ প্রয়াণকাল 'পর্য্যন্ত অর্থাৎ মোক্ষ পর্য্যন্ত। অর্থাৎ এই সূত্রে স্পষ্টই বুঝাইতেছে—মোক্ষ হইলেও, ভক্তি অনুবর্ত্তন করে। ভক্তির ধর্ম্মই হইতেছে, একবার উহা সমুদিত হইলে, ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। সিতামিশ্রে যাহাদের পিত্ত নষ্ট হয়, তাহাদের রসনায় মিষ্টত্বের আস্বাদ ক্রমবর্দ্ধিত হয়, ইহা প্রবাদ নহে, গুণগত পরীক্ষায় অভিজ্ঞেরা অবগত হইয়াছেন।

ভক্তি থাকিবে, কর্ম্ম থাকিবে না—এমন অসঙ্গত কল্পনা দেহাত্মবাদিগণ করিতে পারেন। ১৮শ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে কর্ম্মত্যাগের হেতুর কিঞ্চিৎ আভাস আছে। "কায়ক্লেশভয়াৎ"—কর্ম্মটা দুঃখেরই হয়। জড়বাদী যদি ধর্ম্মাশ্রয়ী হয়, তারই মোক্ষ কর্ম্মবিমুখতা। গীতা তাহাদের জন্য নহে। তাই ৫৬শ শ্লোকে "সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণ" সুস্পষ্ট করিয়া বলা হইল।

পরবর্ত্তী ৫টী শ্লোক কর্ম্মের আনন্তর্য্য সপ্রমাণ করিতেছে। কর্ম্মবাদ গীতার আদর্শবাদ নহে, ইহাই মানব-ধর্ম্ম। আমরা পর পর ৫টী শ্লোক পাঠকদের অনুধাবন করিতে বলি।

> চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
> বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥
> মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
> অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥৫৮॥
> যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
> মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি॥৫৯॥
> স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
> কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥৬০॥
> ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
> ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥৬১॥

বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া, মদাশ্রিত বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা আমাতে সমাহিতচিত্ত হও।

তুমি মচ্চিত্ত, এই হেতু মদনুগ্রহে সকল দুঃখ অতিক্রম করিবে। যদি অহঙ্কারহেতু আমার কথা না শ্রবণ কর, বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

তুমি অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া, "যুদ্ধ করিব না", এইরূপ যাহা মনে করিতেছ, তোমার এই নিশ্চয়ত্ব মিথ্যাই; কেননা, স্বভাব তোমাকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবে।

হে কৌন্তেয়, স্বভাবজ কর্ম্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত তুমি মোহ হেতু যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না পরবশ হইয়া তাহাই করিতে হইবে।

হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর মায়ার দ্বারা যন্ত্রারূঢ় সর্ব্বভূতকে চালিত করিতেছেন। সর্ব্বভূতের হৃদয়ে তিনি অবস্থান করিতেছেন।

পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সকল কর্ম্ম ঈশ্বরস্মরণে করার নির্দ্দেশ দিয়াছেন; তাহা কিরূপ করিতে হইবে, প্রথমে তাহাই বলিতেছি। ৩য় অধ্যায়ের ৩০শ শ্লোকে "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্ম-চেতসা"—এই বাণী আমরা শ্রবণ করিয়াছি। সেই কথার প্রতিধ্বনি ৫৭শ শ্লোকে শুনিলাম মাত্র। "সতত মচ্চিত্ত" হইলে, অন্যাশ্রয়ী হওয়ার অবকাশ থাকে না। এইরূপ অবস্থায় যে কর্ম্ম, তাহা "যৎ করোষি যদশ্নাসি" মন্ত্র সফল করে। ৪র্থ অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকে কর্ম্মাবজ্ঞানের অকাট্য সূত্র "ব্রহ্মার্পণম্ ব্রহ্মহবিঃ" উপরোক্ত ৫৭শ শ্লোকে সপ্রমাণ করার উক্তি মাত্র। মচ্চিত্ত ব্যক্তি ঈশ্বরপ্রসাদে সর্ব্বদুঃখ অতিক্রম করিবেই। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র ঈশ্বর হইতে নিজেকে পৃথক্-

বোধে কর্ম্ম করা অজ্ঞতা বলিয়াছেন। এইরূপ যে করে, তাহার শ্রেয়ঃ নাই, উপরন্তু বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

অর্জ্জুন এইরূপ ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যুদ্ধরূপ ভীষণ কর্ম্মে যদি নিয়োজিত হইতে না চাহেন, তিনি দ্বন্দ্বই ভোগ করিবেন। কেননা, ঈশ্বর ভিন্ন কর্ত্তা অন্যে নহেন। ঈশ্বর-বিধান-লঙ্ঘনকারী কালে বাধ্য হইয়া তাহার স্বতন্ত্র ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়, তাহার কারণ অন্য কিছু নহে—শাস্ত্র বলে "একোদেবো সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" "অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বম্।"

ব্রহ্মভূত ব্যক্তি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। তাহার কারণ, ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে অবস্থান করেন। এইরূপ সমদর্শী হইয়া যন্ত্রণাদায়ক অস্ত্রাঘাতে এক অন্যকে আঘাত করিবে, ইহা কি অসদৃশ কথা নহে?

টীকাকারেরা ৫৯তম শ্লোকে "প্রকৃতিং ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি" এই শব্দের অর্থ করিয়াছেন—অর্জ্জুনের ক্ষাত্রস্বভাববশতঃ তাঁহাকে যুদ্ধে নিযুক্ত হইতে হইবে। আমাদের জিজ্ঞাস্য—স্বভাবজ ক্ষাত্রধর্ম্মীর তবে কি সর্ব্বভূতে ঈশ্বরদর্শনের অধিকার নাই? তাহা যদি না থাকিবে, অর্জ্জুনের প্রতি ব্রহ্মপদ পাওয়ার এত সদুপদেশ নিরর্থক নহে কি?

৬০তম শ্লোকে "স্বেন কর্ম্মণা" অর্থাৎ নিজের কর্ম্মের দ্বারা নিবদ্ধ, এইরূপ একটা কথা আছে। এই কর্ম্মবিজ্ঞান অবগত হইতে না পারিলে, গীতার মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারিব না।

কর্ম্ম বিশ্বসৃষ্টির বীজ। এই বীজ হইতে বহু প্রকার কর্ম্মপ্রকাশ হইয়াছে। কর্ম্মের পশ্চাতে কর্ত্তার বহুমুখী প্রেরণা এইরূপ বিচিত্র প্রকাশের হেতুস্বরূপ। এই হেতু কর্ম্ম ঈশ্বরার্পিত হইলে, কর্ম্ম-নিয়ন্তার মৌলিক ইচ্ছা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। কর্ম্মবীজের মধ্যে কেহ সখা, সুহৃৎ, কেহ বা শত্রু; এইরূপ সুনির্দ্দিষ্ট বিধান অনাদি যুগ হইতে প্রবর্ত্তিত। গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে কর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে, আমরা তাহার আর পুনরুক্তি করিব না। ২য় অধ্যায়ে আত্মার অমরত্ব বুঝাইতে গিয়া ১৯শ শ্লোকে বলা হইয়াছে—যে আত্মাকে হত্যাকারী মনে করে এবং যে ইহাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই ইহাকে জানে না। কেহ কাহাকে হত্যাও করে না, কেহ হতও হয় না। ঈশ্বর-সত্তা এইরূপ শাশ্বত তত্ত্ব। এই সত্তা সৃষ্টিবৈচিত্র্যে শত্রু-মিত্র-ভেদে কর্ম্মদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছে মর্ত্ত্যে। ইহার মধ্যে এক প্রকার ভূতগ্রাম অধ্যাত্মচেতনহীন। অন্য আর এক ভূতশ্রেণী মায়াভিভূত। ঈশ্বরপ্রসাদে ব্রহ্মভূত হইবার অধিকার সকলেরই আছে। কল্পারম্ভে এই সৃষ্টি-নৈপুণ্য স্থির হইয়া গিয়াছে। জগতে যাঁহারা সাম্যবাদী, তাঁহারা আদর্শবাদী, ঈশ্বরবাদী নহেন। এই ক্ষেত্রে স্বভাবজ শব্দের অর্থ যে যে কার্য্যের বীজ লইয়া জন্মিয়াছে, তাহাই বুঝিতে হইবে। পার্থ ক্ষাত্রধর্ম্মী, তাঁহাকে এখনই বন্ধু-বান্ধব নিধনে অস্ত্রসম্পাত করিতে হইবে, এই হেতু তিনি সর্ব্বভূতে ঈশ্বরদর্শনের অধিকারী নহেন। এইরূপ সঙ্কীর্ণবুদ্ধিবশতঃ অন্তরের পরম সাম্য নষ্ট করিয়া বাহ্যতঃ সাম্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা অসঙ্গতি টানিয়া আনা। অহঙ্কার যুদ্ধ-বিরতি চাহিতে পারে, আবার যুদ্ধরত হইবারও প্রয়াস করিতে পারে, ঈশ্বরেচ্ছা পরিণামে যাহার যে কাজ, প্রকৃতির দ্বারা তাহাই সিদ্ধ করিবে। অর্থাৎ যে যুদ্ধ চাহে না, তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ তাহাকে যুদ্ধ করিতে হইতে পারে। আবার যে যুদ্ধ করিতে চাহে, মূলে ঈশ্বরেচ্ছা না থাকিলে তাহাকে তাহা হইতে স্বভাব-নিয়ন্ত্রিত হইয়াই বিমুখ হইতে হইবে—এ রহস্য আমাদের সম্মুখে নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে।

গীতার ভগবান ঈশ্বরকোটীর থাক চাহিয়াছেন। এখনও তাঁর ধর্ম্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠা হয় নাই। সে রাজ্য-প্রতিষ্ঠার মানুষ অহংকারে দৃপ্ত, বিদ্বেষী, পরশ্রীকাতর হইলে, তাহার তো ব্রহ্মভূত হওয়া সম্ভব হইবে না।

ব্রহ্মভূত ব্যক্তি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে, ঈশ্বর-নির্দ্দেশ সমাহিত চিত্তে পালন করিবে। এই নির্দ্দেশ যে নিশ্চয় সে লাভ করিয়াছে, ইহা বুঝিবার উপায়—ভগবানে কর্ম্মসন্ন্যাস। সর্ব্বভূতে একই ঈশ্বর আছেন। কিন্তু যে সর্প শিরোত্তোলন করিয়া দংশন করিতে আসে, তাহার মধ্যে ঈশ্বরদর্শন করিলেও ঐ সর্পাবয়বের নিধন ঈশ্বরনিধন নহে। ইহাই তো 'অধ্যাত্মচেতসা' হইয়া কর্ম্মনীতি। গীতার এই সর্ব্বজয়ী ধর্ম্ম কল্পনাবাদীর জন্য নহে। ইহা জীবনব্রতীর ধর্ম্ম—শাশ্বত, সনাতন ধর্ম্ম। ইহাই ভারত-ধর্ম্ম নামে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ হইয়া আজও নিগূঢ়ে অবস্থিত। যেখানে পার্থ, সেইখানেই এই ধর্ম্ম। সেইখানেই এই কর্ম্মবাদ ও জীবনবাদ। এ কথা আমরা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখেই শুনিতে পাইব। *

* "গীতার যোগে"র (১৮শ অধ্যায়) অনুবৃত্তি.: ২য় খণ্ড, সঙ্কলন পরিচ্ছেদ।
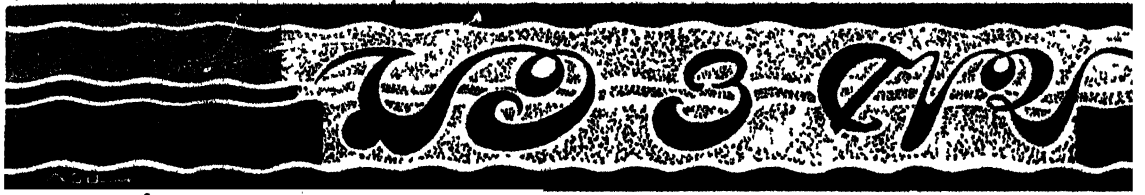
## আসন্ন সংগ্রাম

কংগ্রেসের রাষ্ট্রসাধনা আজিকার নহে। ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে এই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের পথে দুইটী দল দেখা দেয়—ধীরপন্থী ও চরমপন্থী। ধীরপন্থী দল "প্রার্থনা-প্রীতি-প্রতিবাদ" এই ত্রি-নীতির অনুসরণে দীর্ঘদিন ধরিয়া যে আন্দোলন করিতেছিলেন, বঙ্গভঙ্গের পর, "লাল-বাল-পাল" অর্থাৎ তিলক, বিপিনচন্দ্র ও লালা লাজপত রায় প্রমুখ চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ সেই আন্দোলনের স্রোতঃ ত্যাগ তপস্যার খাতে প্রবাহিত করিয়া, কংগ্রেসে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করেন। চরমপন্থী জাতীয় নীতি ছিল মূলতঃ চতুরঙ্গ—স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা ও নিরস্ত্র সংগ্রাম। বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে জাতীয় পক্ষ যখন এইভাবে মুক্তিসংগ্রামের জন্য বাংলাকে প্রস্তুত করিতেছিলেন, তখন একদিকে কঠোর দমননীতি ও অপরদিকে রক্তপন্থী বিপ্লববাদী দলের আবির্ভাবে জাতীয়তার সাধনা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে—জাতীয় পক্ষ ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। ১৯০৯ হইতে ১৯১৯ পর্য্যন্ত বিপ্লব-যুগের রক্তাধ্যায় নিঃশেষ হইয়া, ১৯২০ সালে একদিকে বঙ্গে সংগঠনশক্তির উৎপত্তি, অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে নিখিল ভারতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯২০ হইতে ১৯৪০, এই বিশ বৎসর কাল এই উভয় শক্তির ক্রিয়াই আমরা ভারতের জাতীয় জীবনে নানা ছন্দে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ সংগঠনশক্তি বরণ করিয়া লইয়াছে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতেই। শ্রীঅরবিন্দের কারামুক্তির পর, জাতীয়তার সাধনা অভিনব অধ্যাত্মভিত্তি আবিষ্কার করিতে আরম্ভ হয়। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব "স্বরাজগড়" গড়িবার জন্য মুক্তিসাধক দেশবাসীকে নিজের "কোটে" ফিরিবার যে নির্দ্দেশ আকুল কণ্ঠে দিয়া গিয়াছিলেন, শ্রীঅরবিন্দের মধ্য দিয়া সেই সাধনার বীর্য্য প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে সঞ্চারিত হয় ও এইখানেই তাহা বিশুদ্ধ গঠন-যজ্ঞ রূপে প্রথম রূপ গ্রহণ করে। বাংলার এই সংগঠন-সাধনা আজ দৃঢ় বেদী নির্ম্মাণ করিয়াছে শুধু প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে নহে, বিভিন্ন ধর্ম্মগুরু ও কর্ম্মগুরুর নেতৃত্বে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে। মুক্তিসাধনার ইহা এক অভিনব রূপভঙ্গী। অন্য পক্ষে, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের রাষ্ট্রসাধনা বার বার পরীক্ষান্তে, পুনরায় অহিংস অসহযোগ সংগ্রামের চরম পর্য্যায়—আইন অমান্য আন্দোলনের সম্মুখীন হইয়াছে। গত রামগড় কংগ্রেসে এই রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের প্রধান সেনাপতিরূপে মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করিয়াছেন—"প্রত্যেক কংগ্রেস কমিটী অতঃপর সত্যাগ্রহ কমিটীতে পরিণত হউক।" এবং এই সত্যাগ্রহ কমিটী সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বিধিনির্দ্দেশও তিনি প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার এই ঘোষণা রণসজ্জারই পূর্ব্বাভাষ, ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে।

রামগড় কংগ্রেসের সমসাময়িক আপোষ-বিরোধী সম্মেলনেও আসন্ন সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গিয়াছে। ৬ই এপ্রিল হইতে জাতীয় সপ্তাহে এই অহিংস সমরের জন্য উভয় পক্ষেই সামরিক প্রস্তুতি চলিবে। কংগ্রেসের মধ্যে যে দক্ষিণ-বাম দ্বন্দ্ব, তাহা উদ্যোগ-পর্ব্বের কর্ম্মপদ্ধতি ও গতির সম্বেগ লইয়াই। বামপক্ষ যে সংশয় করিতেছেন, মহাত্মা গান্ধীজির কঠোর নির্দ্দেশের অন্তরালে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসিগণ সংগ্রামকে এড়াইবারই চেষ্টায় আছেন, ইহা নিছক মনের কল্পনা। মহাত্মা গান্ধীজি আপোষের দুয়ার খুলিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার সংগ্রামের মনোবৃত্তি নাই—ইহা মনে করার কোন সঙ্গত হেতুই নাই। তাঁহার স্বভাবে বৈশ্যধর্ম্মের সহিত ক্ষাত্রধর্ম্ম চির-মিশ্রিত—বিশ বৎসর যিনি কংগ্রেসকে সংগ্রামের পথে চালনা করিয়া, আজও অক্লান্ত দেহে, অদম্য তেজে দধীচির অস্থিকঙ্কাল কয়খানি লইয়া জাতিকে আহবে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার অভিসন্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা নিষ্ঠুর অবিচার, ইহা

আমরা জোর করিয়াই বলিব। মহাত্মা আসন্ন সংগ্রামের জন্যই অন্তরে বাহিরে প্রস্তুত হইতেছেন।

## দেশ কি প্রস্তুত?

সংগ্রাম আসন্ন বটে, কিন্তু তাহার জন্য দেশ কতখানি প্রস্তুত, ইহাই বিচার্য্য। মহাত্মা আজ অতীতের অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়াইয়া গভীর বিচার ও ভূয়োদর্শনের আলোকেই প্রশ্ন করিয়াছেন "I know that we are not ready And knowing this, how can I ask you to fight? I know that with such as you I can only have defeat"—"আমি জানি যে, আমরা প্রস্তুত নহি। আর ইহা জানিয়া, কেমন করিয়া আমি আপনাদিগকে যুদ্ধ করিতে বলিব? আমি জানি যে, এই ভাবে আপনাদের লইয়া (সংগ্রামে নামিলে) নিশ্চয়ই পরাজয় লাভ করিব।"

তাঁহার এই প্রশ্ন অতি বড় দায়িত্বের বোধ হইতেই উৎসৃত, ইহা কে না স্বীকার করিবে? যে পক্ষ বলিতেছেন দেশ প্রস্তুত, নেতারাই প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদের সে কথা প্রমাণ করার ভার মহাত্মাজীর উপর নহে, তাঁহাদিগকেই কার্য্যক্ষেত্রে তাহা প্রমাণিত করিতে হইবে। ইহা সুনিশ্চিত যে, মহাত্মাজী কখনও ইঁহাদের সাধনায় বাধা প্রদান করিবেন না। ১৯২১ সালের অহিংস অসহযোগ সংগ্রাম কিম্বা ১৯২৯ সালের দাণ্ডী রণযাত্রার প্রাক্কালেও দেশ এইরূপই প্রস্তুত থাকে নাই, ইহা সত্য কথা, কিন্তু সেই উভয় অভিযানই শেষ পর্য্যন্ত সফল হয় নাই, ইহাও ভুলিলে চলিবে না। মহাত্মার সংগ্রাম নীতি জগতে সত্যই অভিনব। হিংসামূলক মনোবৃত্তি দ্বারা যে সংগ্রাম-নীতি অনুশাসিত, তাহার সহিত অহিংস সংগ্রাম নীতির পার্থক্য অনুল্লঙ্ঘনীয়। নীতি অসাধারণ বলিয়া, তাহার মূলে অসাধারণ মনের প্রস্তুতিও অপরিহার্য্য। ইহা না বুঝিয়া যদি মহাত্মাজীকে নেতৃরূপে সংগ্রামে টানিয়া আনার চেষ্টা করা হয়, সে চেষ্টা অজ্ঞতারই পরিচয়। কার্য্যক্ষেত্রেও এরূপ নীতি অচল।

মহাত্মাজীর নির্দ্দেশ—মূলতঃ নৈতিক; সংহতিগত শৃঙ্খলারক্ষার জন্যও তাহার প্রয়োজনীয়তা অপরিমেয়। যে কোনও সংগ্রামে জয় অথবা পরাজয় নির্ভর করে সংগ্রামশীল পক্ষের নৈতিক বল ও সংহত্তি বলের উপরে। যেখানে জড় অস্ত্র ব্যবহার্য্য, সেখানেও নৈতিক ও সংহতি-শক্তি উপেক্ষণীয় নহে; আর যেখানে জড় অস্ত্রের ধারণই নাই, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র সংগ্রাম, সেখানে একমাত্র সম্বলই ত নীতি-বল ও সংহতি-শক্তি। সুতরাং মহাত্মাজীর প্রস্তুতির নির্দ্দেশ যতই অন্যের চক্ষে কঠোর ও দুঃসাধ্য মনে হউক, তাঁহার পক্ষে সেই নির্দ্দেশ দেওয়া ও সেইরূপ প্রস্তুতি তাঁহার অনুবর্ত্তী দেশবাসীর নিকট হইতে চাওয়া আদৌ অসঙ্গত নহে, তাঁহার এ-দাবী সম্পূর্ণ সমীচিন। এই বিষয়ে রামগড় কংগ্রেসে ও "হরিজন" পত্রে তাঁহার উত্থাপিত যুক্তিগুলি সত্যই অকাট্য। মহাত্মাজীর প্রতিভা-প্রসূত সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম-নীতি অন্য কেহ আশ্রয় করিলে, তিনি মহাত্মার অনুরূপ দাবী উত্থাপন না করিয়াও যদি যুদ্ধ পরিচালনা করিতে পারেন, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই, কিন্তু ইহা প্রমাণ-সাপেক্ষ। হায়দ্রাবাদের সত্যাগ্রহ আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে উল্লেখ করিতে পারি। সেখানে মহাত্মার প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব ব্যতিরেকেও, এমন কি কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ নিষেধ সত্ত্বেও সত্যাগ্রহ সংগ্রাম নীতি ও শৃঙ্খলার দিক্ দিয়া অনিন্দনীয়ই হইয়াছিল। সে আন্দোলন জয়শ্রীমণ্ডিতও হইয়াছিল। প্রস্তুতির নিরিখ মহাত্মার যাহা, অন্যের ঠিক তাহাই নহে। এইখানেই গোল বাধিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে মহাত্মাকে সেনাপতি-রূপে চাহিলে, তাঁহার নির্দ্দেশ মানিতে হয়, নতুবা তাঁহাকে ছাড়িয়াই সংগ্রাম চালাইতে হয়। সুভাষ-চন্দ্রের নেতৃত্বে বঙ্গীয় বি-পি-সি সি এই শেষোক্ত পথই বাছিয়া লইয়াছেন ও আপোষ-বিরোধী সম্মেলনের সিদ্ধান্তানুযায়ী স্থানীয় সংগ্রামের জন্য জাতীয় সপ্তাহ ৮ দিন ব্যাপী কার্য্যতালিকা স্থির করিয়াছেন। যাঁহার যে রাষ্ট্রীয় প্রেরণা, তাহা নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করার শক্তি থাকিলে, অন্যের তাহাতে কিছু বলিবার থাকে না—সাফল্যই কার্য্যপ্রণালীর উপযোগিতা প্রমাণ করে, ইহার জন্য পরস্পর মর্ম্মে বা কূর্ম্মে আঘাত দেওয়ারও প্রয়োজন হয় না।

## রাষ্ট্র-সংগ্রাম ও জীবন-সংগ্রাম

প্রস্তুতির মাপকাঠি যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে—এই রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের পরিচালনা মুষ্টিমেয় বিশ্বাসীর সংহতির উপরেই নির্ভর করিতেছে। যে সংহতি যত শুদ্ধ হইবে, আদর্শনিষ্ঠ হইবে, একপ্রাণ হইবে, সে সংহতি ততই দুর্জ্জয় হইবে—কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার প্রসার তত দূরপ্রসারী হইবে। এই দিক্ দিয়া, মহাত্মা গান্ধীর অগ্নি পরীক্ষিত সেনানী-মণ্ডলী ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে অসাধারণ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। মহাত্মাজী এই দুর্জ্জয় সমষ্টিকে আরও বিশুদ্ধ করিবার জন্ম অহিংসা মন্ত্রের সাধনার উপরে এতখানি জোর দিয়াছেন। জাতির মুক্তিসাধনার ইহা একটী দিক্ বলিয়াই আমরা মনে করি। রাষ্ট্রীয় মুক্তির জন্ম প্রস্তুতি রাষ্ট্রসাধকগণেরই প্রয়োজন আছে, কিন্তু জাতির ব্যাপক সমষ্টিকে বাঁচিবার জন্মই দিবানিশি সংগ্রাম করিতে হইতেছে। এই জীবন-সংগ্রাম রাষ্ট্র-সংগ্রামের চেয়ে বিরাট্ ও ব্যাপক। জীবন-সংগ্রামের যথেষ্ট শক্তি অর্জ্জন করিতে না পারিলে, সে জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যায়, অন্ততঃ অন্ম জাতির ভোজ্য-স্বরূপ হইয়া জগতে কোণঠাসা হইয়া থাকে। এই জীবন-সংগ্রামের সাধনায় আজ ভারতের রাষ্ট্রনেতৃগণের তেমন দৃষ্টি দেখা যায় না। যেটুকু দৃষ্টি তাঁহাদের পড়ে, তাহা রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যের দিকে চাহিয়া। অর্থাৎ বাঁচার চেয়ে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা তাঁহাদের প্রধান। পক্ষান্তরে, ভারতের জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে আজ মূলসূত্র ধরিয়া আছেন ইংরাজ। এই সূত্র যাহাদের হাতে, তাহারাই জাতির জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তি ও অধিকার পায়। ইংরাজ নিজের বাঁচিবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। তাহার রাষ্ট্রশক্তি এই প্রেরণারই অনুশাসনে পরিচালিত। তাহার রাষ্ট্র জাতি-হিসাবে বাঁচিবার জন্মই। আজও মহাযুদ্ধে তাহার অবতরণ—জাতির বাঁচিবার পথে প্রধান বিঘ্ন অপসারিত করিবার জন্ম। আমরা বৃটেনের করধৃত রাষ্ট্রযন্ত্র দেখিয়া উহাকেই চক্ষের সম্মুখে রাখিয়াছি—মনে করিতেছি, এই শাসন-যন্ত্র অধিকার করিলেই আমরা বাঁচিবার মুক্ত পথ পাইব অর্থাৎ জীবন-শাসনের অধিকারও আমাদের ফিরিয়া আসিবে। ইহা ঘোড়ার অভাবে চাবুকের দ্বারা গাড়ী চালাইবার চেষ্টা। আশা কুহকিনী—তাই আমরা জীবন-সংগ্রামে জয়ী না হইয়া, রাষ্ট্রীয় মুক্তির অধিকারী হইবার আশা রাখি। পরাধীন জাতির স্বাধীনতাই কাম্য; কিন্তু যে জীবন-সংগ্রামে হটিয়াই আমরা পরাধীন, তাহার দিকে উদাসীন থাকিয়া কেমন করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতার্জ্জনের আমরা যোগ্যতা অর্জ্জন করিব? জলে না নামিয়া কুলে সাঁতার শেখা যায় না; কিন্তু আমাদের জীবনের দায় প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদিগকে পীড়ন করিতেছে। সংহতিবদ্ধ ভাবে বাঁচিবার প্রাণ জাগাইতে না পারিলে, জীবনে হটিয়াছি, আজও হটিতে হইবে। ইউরোপের যুদ্ধে বীর জাতি বাঁচিবার জন্ম লড়িতেছে, সে তাহার সমস্ত প্রয়োজনীয় রসদ ছিনিয়া খুঁড়িয়া আহরণ করিবে—ভারত হইতেও লইবে মানুষ, অর্থ, রসদ। রাষ্ট্রনেতৃগণ প্রতিবাদ করিয়া, অসহযোগ করিয়াও তাহা রোধ করিতে পারিবেন না। এখানে নৈতিক জয়ই একমাত্র কথা নহে। বাঁচিবার ক্ষমতা যাহার, সেই বাঁচিবে। আমাদের বাঁচিবার ক্ষমতা আজ আমাদের হাত-ছাড়া হইয়াছে কেন, ইহাই তো ভাবিবার বিষয়।

পরাধীন রাষ্ট্রেও তো ব্যক্তিগত যোগ্যতা বিকশিত করিয়া কেহ কেহ বাঁচিতেছি—সমষ্টি-প্রাণের বাঁচার যোগ্যতা কি আমরা এই অবস্থায়ও আহরণ করিতে পারি না? বাঁচার শক্তি আত্মার তপস্যা, তাই আত্মা জাগিলে সে শক্তি দুর্ব্বার হয়, অপ্রতিহত গতিলাভ করে। বাধা থাকিলেও, তাহা জাগিতে পারে; আত্মা না জাগিলে, বাহিরের বাধা দূর করাই যায় না। এই জাগরণের একমাত্র অন্তরের বাধা অজ্ঞান।

তাই জ্ঞানশক্তি ও কর্ম্মশক্তি উদ্যত করিয়াই জাতির আত্মাকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। ভারতের জীবন-সংগ্রামে জয়ী হওয়ার ইহাই প্রকৃষ্ট বিধান।

## হিন্দু মুসলমান কি স্বতন্ত্র জাতি?

মিঃ জিন্না ভারতের মুসলমান জাতির স্বার্থের দিকে চাহিয়া, স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্র চাহিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী ইহার সুচিন্তিত প্রতিবাদ করিয়াছেন।—"হরিজন" পত্রে। তিনি বলেন—ভারতের ৮.৯ কোটী মুসলমান ইহারা স্বতন্ত্র

জাতিই নহে—আরব বা তুর্কিস্থান হইতে ইহারা ত আসে নাই, মুসলমান বলিয়া আজ যাহারা পরিচিত, তাহাদের অধিকাংশই ধর্ম্মান্তরিত হিন্দু। ইহারা ভারতবাসী ছাড়া কিছুই নহে। মহাত্মা গান্ধীজির এই যুক্তি যে তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, আশা করি, স্বয়ং মিঃ জিন্নাও তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

আমরাও এই কথা "প্রবর্ত্তকে" গোড়া হইতে বলিয়া আসিতেছি—রক্তের সম্পর্কে হিন্দু মুসলমান ভিন্ন নয়, ভাই। চিরকাল তারা একই জাতির শোণিতধারা বহিয়া আসিয়াছে, ধর্ম্মভেদ তাহাদের অন্তর সংস্কারের পরিবর্ত্তন মাত্র। জাতির মূল ধাতু যদি রক্ত হয়, তাহা হইলে ভারতের অধিকাংশ মুসলমান ধর্ম্মেই মুসলমান, রক্তে নহে। রক্তের নিরিখে তাহারা হিন্দুরই ন্যায় ভারতবাসী। মহাত্মা এই সম্পর্কে বাংলার মুসলমান জাতির কথা তুলিয়াছেন। বাংলার ২॥০ কোটী মুসলমানের রক্তে তাতার বা আরবের রক্ত-কণিকাতুল্য বলিলে বোধ হয় ঐতিহাসিক অত্যুক্তি হয় না।' শুধু বাংলা কেন, ভারতের সকল প্রদেশেই অল্প বিস্তর তাই। এমন কি, মুসলমানবিজয়ের প্রথম লীলাভূমি পঞ্জাবের সেন্সাস অনুযায়ী মুসলমানী শোণিত শত করা ১৫ অংশ খাঁটি হজের রক্ত পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সুতরাং জিন্না সাহেবের থিসিসের গোড়ায় গলদ থাকিয়া যাইতেছে।

রক্ত সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমান-ভেদ অবাস্তর; কিন্তু কৃষ্টি-হিসাবে ইহাই মুখ্য। মিঃ জিন্নার উক্তির এই সত্যতা তাই আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, হিন্দুর যেমন কৃষ্টিগত স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রয়োজন আছে, তেমনি মুসলমানেরও আছে। এই কৃষ্টিই আবার জাতীয়তার অধ্যাত্ম-উপাদান। ভারতের জাতীয় সাধনায় তাই রক্ত ও কৃষ্টি, উভয় দিক্ দিয়া যে অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে, তাহা দূর করার কি উপায়, তাহাই চিন্তাশীলগণের অনুধ্যেয়। মিঃ জিন্না সে সমস্যা ভারতকে রাষ্ট্রতঃ দ্বিখণ্ডিত করিয়া সমাধান করিতে চাহেন। মহাত্মা গান্ধীজি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস তাহা সম্মিলিত সহযোগিতায় দূর হইবে, ইহাই বিশ্বাস করেন। মানুষের চিন্তা, চেষ্টা অনেক সময়ে যেখানে সমস্যা ঘোরাল করে, প্রকৃতির বিধান সেখানে অব্যর্থ ভাবেই কার্য্য করিয়া একটা পরিণতি লইয়া আসে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সকল ভারতবাসীরই প্রাকৃতিক জীবন-যাত্রার সমস্যা আজ মূলতঃ একই দাঁড়াইয়া যাইতেছে। এই জীবন-সমস্যার মীমাংসাই রক্ত ও কৃষ্টিগত ভেদাভেদ স্বীকার করিয়াও জাতীয় জীবন সিদ্ধ করিবে। জীবন অর্থে শিক্ষা, দীক্ষা, অন্ন, সম্পদ্—যাহা কিছু বাঁচিবার জন্য প্রয়োজনীয়। যদি ভারতের আত্মাই আমাদের বরণীয় হয়, আমরা ভারতের মাটীকেই মা বলিয়া স্বীকার করিব—ভারতের স্বার্থকেই সকল স্বার্থের উপরে স্থান দিব। ভারতের আত্মা যাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে, তাহাদের সকলেরই প্রয়োজন আছে। সেই আত্মার ইচ্ছা ও আনুকূল্যে জীবনকে সংগঠিত করিয়া তোলাই ভারতের জাতীয় সাধনা।

## জাতীয়তা কি বৃটিনের দান?

ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী সরস্বতী-বিধৌত পুণ্যভূমি অখণ্ড ভারতের পরিকল্পনা লইয়া প্রায়ই আলোচনা করিয়া থাকেন। এই আলোচনাগুলি চিন্তায় ও তথ্যে পূর্ণ। ভারতের অখণ্ড জাতীয়তা বৃটিশের দান নহে। ভারতের সংগঠন প্রকৃতির বিধানেই ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে—এখানে মানুষের হাত অতি অল্প। প্রাচীন দ্রাবিড় ও আর্য্য জাতির এই অখণ্ড ভারতের ধারণা ছিল, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। কখনও ভারত, কখনও হিন্দুস্থান, কখনও বা ইন্দুদেশ অথবা ইণ্ডিয়া এ ভাষাভেদে নামান্তর অবান্তর, কিন্তু একটী অখণ্ড সাংস্কৃতিক প্রভাব এই প্রকৃতির আব্‌হাওয়ায় গড়িয়া উঠিয়াছে। মুসলমান যুগেও এই অখণ্ডতার পরিকল্পনা ব্যাহত হয় নাই। শুধু রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ইংরাজ বা বৃটিশ যুগেও তাহাই আর একবার ঘটিয়া চলিয়াছে মাত্র। একটী অখণ্ড দেশাত্মা যুগে যুগে, কল্পে কল্পে যেন আপনাকে নানা দিগ্দেশাগত সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপাদানে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করিয়া, অনাগত বৃহৎ পরিণাম লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে। ভারতের বিবর্ত্তনের ছেদ নাই, অন্ত নাই। তাহার আত্মা এখনও সম্যক্ রূপায়িত হইয়া উঠে নাই।

ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের সন্দর্ভগুলি এই দেশাত্মার আত্ম-পরিচয়ে সহায়তা করুক—উদীয়মান তরুণ জাতির স্বদেশ ও স্বজাতিকে জানিবার কৌতূহল বর্দ্ধিত করিয়া তুলুক, ইহাই আমাদের কামনা।

## লাল-ভারত ও হরিদ্রা-ভারত

নবনগরের মহারাজা ও নৃপতিমণ্ডলের চ্যান্সেলার জাম সাহেব হিন্দু মহাসভার এক সম্বর্দ্ধনাসভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এই—

"রাজপুতদের ইতিহাস আর যাহাই হউক, তাহারা ধর্ম্মকেই চিরদিন পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছে। আমরা হিন্দু এবং যখনই হিন্দুধর্ম্ম বিপন্ন হয়, আমি বা আমার সহতীর্থ রাজন্যবৃন্দ কেহই শেষ মানুষটি পর্য্যন্ত আত্মবলি দিয়া তাহা রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হইতে পারি না।"

তারপর, যাঁহারা বলেন যে, ভারতের রাজন্যবৃন্দ বৃটিশ সঙ্গীনের সৃষ্টি, তাঁহাদের কথার প্রতিবাদে তিনি বলেন—"ইহার উল্টা কথাই বরং সত্য। নাম হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, বৃটিশ ভারতই বৃটেনের সৃষ্টি। আমরা মানচিত্রের এক অংশে ভারতকে হরিদ্রাবর্ণ রাখিয়াছি। আপনারা কেন তাহাকে লাল করিয়া তুলিতে চাহেন? আমি নিশ্চয় জানি আপনারা লাল রঙ ভালবাসেন না—কারণ উহা বলশেভিজমের প্রতীক চিহ্ন। আসুন, আমরা নিখিল ভারতকেই হরিদ্রারঞ্জিত করিয়া তুলি।"

ভারতের রাজন্যমণ্ডল এখনও ভারতীয় ক্ষাত্রবীর্য্য বুকে বহন করিতেছেন, ইহা সত্যই গৌরবের বিষয়। পৃথিবীর বর্ত্তমান পরিবেশে, বৃটনের সাম্রাজ্যশক্তির ছত্রতলে তাঁহাদের আজ স্থান গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের অন্তরের ক্ষুধা সারা ভারতকে জাতীয় রাষ্ট্রেই পরিণত করিতে চাহে, ইহা শুনিলেও আমরা উল্লাস অনুভব করি। পঞ্চনদ-সিংহ রঞ্জিতসিংহের ভবিষ্যদ্বাণী—"সব লাল হো যায়গা"—সে লাল অবশ্য বলশেভিক রঙ নয়, বৃটনের। বৃটিশ ভারতের চেয়ে ভারতীয় ভারত আজ কোন্ দিক্ দিয়া বরণীয়, ইহা জাম সাহেব বাহাদুরের মুখে শুনিলে আমরা আরও সুখী হইতাম। ভারতের ক্ষাত্রশক্তি রাষ্ট্র-নীতির উত্তরাধিকারসূত্রে ভারতসাম্রাজ্যে যে দাবী করিতেছেন, তাহার জন্য তাঁহাদের ঐতিহাসিক নজীর ছাড়া অন্য যোগ্যতা কোথায়? ধর্ম্মের অনুশাসন যেমন হিন্দু রাজশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিত, তেমনি সেই রাজশক্তিরও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম ছিল স্বজাতি ও স্বধর্ম্মকে রক্ষা ও পালন করা। এই ধর্ম্মই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিত অর্থাৎ স্বপদে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিত। ভারতের রাজশক্তি আজ এই ধর্ম্মব্রত পালন করিয়াই স্ব-স্ব অস্তিত্ব বজায় রাখিবার স্পর্দ্ধা রাখেন কি? যদি তাহাই হয়, তবেই আমরা তাঁহার এই ঘোষণার সত্যতায় নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া মানিতে পারিব—"Indian rulers have existed and God willing, would continue to exist We think we have passed our worst."—"ভারতীয় রাজন্যবৃন্দ টিকিয়া আছেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে, টিকিয়াও থাকিবেন। আমরা মনে করি, আমাদের সবচেয়ে খারাপ অবস্থাটা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি।"

আমরা গণতন্ত্রের ধুয়া এখানে তুলিতেছি না। রাজশক্তি—রাজশক্তিই, তাহা যে তন্ত্রমূলক হউক না কেন! ইহা না হইলে, সে রাজশক্তি পৃথিবীতে অচল হইবে। অর্থাৎ বাহুবল, কূটনীতি, ধর্ম্মনীতি, এই ত্রয়ীর সমন্বয় তাহাতে থাকা চাই। তাহা না থাকিলে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। ভারতের রাজন্যমণ্ডল বাহুবলে হীন বলিতে পারি না। কূটনীতির ক্ষেত্রেও তাঁহারা একেবারে ভুয়া হইয়া যান নাই—রাজকোটের ঠাকুর-সাহেব-গান্ধীঘটিত ঘটনাই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। কিন্তু কোথায় তাঁহারা সত্যই হীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন এবং দিন দিন আরও হইয়া পড়িতেছেন? ইহা শেষোক্ত ধর্ম্মনীতির অভাব, আমরা বলিব। সত্য বটে, জাম সাহেবের ন্যায় একজন ধুরন্ধর রাজ্যেশ্বর গর্ব্বকণ্ঠে বলিতেছেন—"আজ হিন্দুধর্ম্ম ভারতে দেশীয় রাজাগুলির ন্যায়ই অন্তরে বাহিরে আক্রান্ত। কিন্তু রাজন্যবৃন্দ আত্মত্যাগ করিয়া এই প্রবাহ রোধ করিবেন। আমরাও কালের সহিত অগ্রসর হইব।" ক্ষত্রিয় রাজন্যবৃন্দের ধর্ম্মরক্ষার এই আকূতি সত্য হউক। ভারতে ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাহা হইলে সার্থক হইবে না।
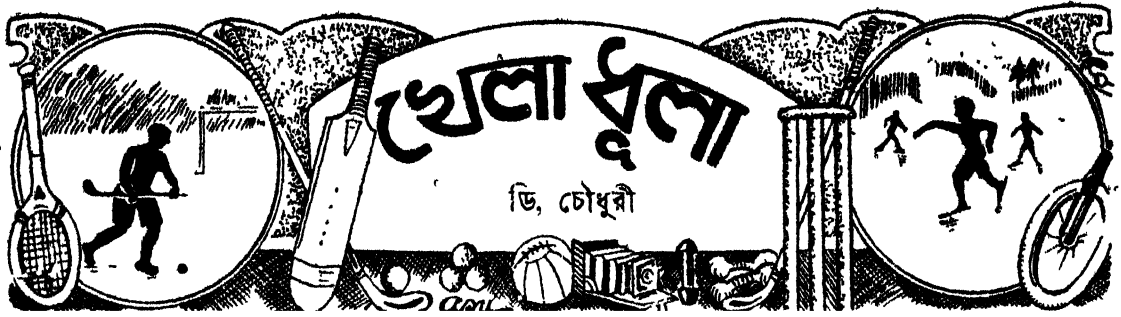
### কলিকাতা হকি লীগ প্রতিযোগিতা—

কলিকাতা হকি লীগ প্রতিযোগিতায় প্রথম বিভাগের খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এইবার বি, জি, প্রেস দলই লীগে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, আশা করা যায়। দ্বিতীয় স্থানের জন্য মিলিটারী মেডিক্যালস ও কাষ্টমসের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে; তবে মিলিটারী মেডিক্যালের দ্বিতীয় স্থান দখল করার সম্ভাবনাই বেশী। বি, জি, প্রেস দলের কৃতিত্ব এই যে, এই দল এই বৎসর লীগ

লাম্‌সডেন্‌ জার্ডিন এরশাদ
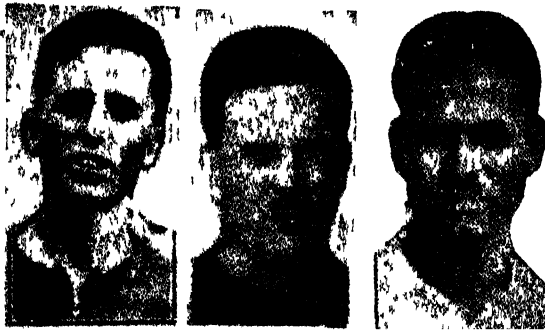
প্রতিযোগিতার কোন খেলায় এ পর্য্যন্ত পরাজিত হয় নাই। অবশিষ্ট যে কয়েকটী খেলা বাকী আছে, তাহাতেও তাহাদের পরাজিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অপরাজিত থাকিয়া বি, জি, প্রেসের এই কৃতিত্বলাভের জন্য আমরা আনন্দ অনুভব করিতেছি।

হাওড়া ইনষ্টিটিউট দলকে এই বৎসর মাত্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া এই বৎসরই এই বিভাগ হইতে বিদায় লইতে হইল। ইহাদের সহিত সেণ্ট জোসেফ দলেরই দ্বিতীয় বিভাগে নামিবার সম্ভাবনা বেশী। সেণ্ট জোসেফ দল তরুণ স্কুল-ছাত্র লইয়া গঠিত। তাহাদের সহিত অভিজ্ঞ জ্যাভেরিয়ান্সের জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। সেণ্ট জোসেফকেই শেষ পর্য্যন্ত হাওড়া ইনষ্টিটিউটের সঙ্গে দ্বিতীয় বিভাগে নামিতে হইবে।

এইবারকার লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান দলের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হয়; কারণ, প্রথম বিভাগে তাহাদের স্থান অটুট থাকিবে জানিয়া তাহারা যেন খেলায় যথেষ্ট শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছেন। খেলায় ক্রমশঃ উন্নততর ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করা প্রত্যেক খেলোয়াড়ের লক্ষ্য হওয়া উচিত। উহাতে দলেরও সম্মান বৃদ্ধি পায়, নিজেও প্রশংসা অর্জ্জন করিতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার সম্ভাবনা না থাকিলে, বা নিম্ন বিভাগে নামিয়া যাইবার ভয় না থাকিলে সব দলই খেলায় শৈথিল্য প্রকাশ করে। ইহা খেলোয়াড় মনোবৃত্তি নহে। এইবার লীগ প্রতিযোগিতায় ইহাই বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

### কলিকাতায় ফুটবল বিরোধের মীমাংসা—

এইবার কলিকাতায় ফুটবল খেলার মরসুম আরম্ভ হইবে; গত বৎসরের শেষ দিকে আই এফ এ'র সহিত প্রথম বিভাগের তিনটি ক্লাবের সহিত বিরোধ হওয়ায় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। মহামেডান স্পোর্টিং ইষ্ট বেঙ্গল ও কালিঘাট এই বিশিষ্ট তিনটী ক্লাব আর কয়েকটী অখ্যাতনামা ক্লাব লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী বি, এফ, এ গঠন করে এবং একটি শীল্ড খেলারও ব্যবস্থা করে। ইহার পর উভয় পক্ষের কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে কতকগুলি বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী বিরোধাবসানের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। উভয় পক্ষই স্বীয় আত্মসম্মান-রক্ষা করিয়া কি ভাবে এই অচল অবস্থার অবসান ঘটে, তাহার জন্য খসড়া তৈরী ও পরীক্ষা

লইয়া ব্যস্ত আছেন। এইজন্য আই এফ এর সাধারণ বার্ষিক সভাও ক্রমাগত পিছাইয়া দেওয়া হইতেছে। শুনা যাইতেছে যে, আই, এফ, এর কার্য্যকরী সমিতিতে এবার ৪৫টি আসন থাকিবে এবং যাহাতে সকল বিশিষ্ট ক্লাব ও এসোসিয়েশন এই সমিতে স্থান পায়, তাহার চেষ্টা চলিতেছে এবং সেজন্য সভ্যসংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইতেছে। গুজব রটিয়াছে যে, মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব মুসলমানদের জন্য ৫টী সভ্য পদ দাবী করিয়াছেন। এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদের এইটুকু বলিবার আছে যে, ক্লাব ও এসোসিয়েশনের মর্য্যাদানুযায়ী যেন সভ্যপদ-বন্টন হয়। খেলায় যেন রাজনীতির মত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আসন দিবার ব্যবস্থা না হয়। একবার খেলার মাঠে এই বীজ উপ্ত হইলে, ভবিষ্যতে রাজনীতির মত খেলার আসল মনোবৃত্তি চলিয়া গিয়া সম্প্রদায়গত প্রাধান্যরক্ষার বাস্তুতায় খেলার মাঠ কলুষিত হইয়া পড়িবে। যাহা হউক, মরসুমের পূর্ব্বে শীঘ্র উভয় দল একটা সুষ্ঠু মীমাংসায় উপনীত হইলে, আমরা সুখী হইব।

**বেটন হকি কাপ প্রতিযোগিতা**—বেটন হকি কাপ প্রতিযোগিতা হকি খেলায় সারা ভারতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতাটী এই বৎসর খুবই আকর্ষণীয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়। একমাত্র জি, আই, পি, রেল দল ছাড়া ভারতের সকল বিখ্যাত হকি দলগুলি কলিকাতায় খেলিতে দেখা যাইবে। ৪৭টী দল এইবারকার প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে ঝান্সী হিরোস, করাচীর ক্রীসেন্ট ক্লাব, এন, ডব্লিউ রেলওয়ে, লাহোরের কারসন ইনষ্টিটিউট, বোম্বাই-এর সেন্টজেভিয়ার কলেজ, ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স ও ত্রিকমগড়ের ভগবন্ত ক্লাবের নাম উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার বাহির হইতে ২১টী দল যোগদান করিয়াছে। গত বৎসরের বিজয়ী খড়্গপুর দল এবারও যথেষ্ট শক্তিশালী, তা'ছাড়া কলিকাতার বি, জি, প্রেস, মিলিটারী মেডিকেল কাষ্টমস্ ও পোর্টকমিশনার্স দলও প্রতিযোগিতায় ভাল করিবে, আশা করা যায়। আগামী ১০ই এপ্রিল হইতে খেলা আরম্ভ হইবে। ক্রীড়ামোদিগণ এবার কলিকাতায় খুব উচ্চাঙ্গের হকি খেলা দেখিতে পাইবেন। ঝান্সী হিরোসে হকি যাদুকর ধ্যানচাঁদ ও তাঁহার ভ্রাতা রূপসিংহের খেলা দেখিবার জন্য ক্রীড়ামোদিগণ উৎসুক থাকিবে।

**চীনা ফুটবল দল**—আগামী জুলাই মাসের প্রথমেই চীনা ফুটবল দল বোম্বাইতে এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলা খেলিতে আসিবে। এই সম্পর্কে পশ্চিম ভারত ফুটবল এসোসিয়েশন চীনা দলের সহিত পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়াছেন। উক্ত খেলায় যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহার প্রায় তিন চতুর্থাংশ চীনা দল খরচা বাবদ লইবে। পশ্চিম ভারত ফুটবল এসোসিয়েশন ইহাতে নাকি রাজী হইয়াছেন।

**পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা**—পৃথিবীর হেভি-ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা জো লুইস এবারও অনায়াসে বিজয়ী হইয়াছেন। প্রতিযোগিতা দুই রাউণ্ডে শেষ হইয়া যায়। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী জনী পেচেক যে এত সহজে পরাভূত হইবেন, তাহা তাঁহার শরীরের

জো লুইস

গঠন দেখিয়া কেহই অনুভব করিতে পারে নাই। অধিকন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া জো লুইস যেরূপ সহজে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, এবার অন্ততঃ পেচেক তাঁহার সহিত ভাল রকম জুঝিবেন, ইহা অনেকেই আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম রাউণ্ডের শেষেই পেচেককে অসহায় অবস্থায় আসন গ্রহণ করিতে হয় এবং তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে অবিরত রক্তধারা নির্গত হইতে থাকে। দ্বিতীয় রাউণ্ডে পেচেক তিন তিন বার ভূপতিত হন। পেচেকের

দুরবস্থা দেখিয়া রেফারী প্রতিযোগিতা বন্ধ করিতে বাধ্য হন ও জো লুইসকে বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করেন।

**আন্তঃ-রেলওয়ে স্পোর্টস্**—এবার নয়া-দিল্লীতে দ্বাদশ বার্ষিক আন্তঃ-রেলওয়ে এথেলেটিক স্পোর্টস্ বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সিনিয়র বিভাগে এন ডব্লিউ রেলওয়ে উইলিংডন চ্যালেঞ্জ কাপ ও জুনিয়র বিভাগে বিকানীর ষ্টেটস্ রেলওয়ে জুনিয়র রেলওয়ে চ্যালেঞ্জ কাপ পাইয়া প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। হাতুড়ী নিক্ষেপে ই-বি-আর-এর কে ডবলিউ পেরেট ১৩৫ ফুট ৮½ ইঞ্চি দূরে নিক্ষেপ করিয়া নিজ রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া ভারতীয় নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন।

**কলিকাতায় ফুটবল মরসুম**—আই, এফ এ'র নিয়মানুযায়ী এবারও প্রতি বৎসরের ন্যায় ফুটবল খেলোয়াড়গণ তাহাদের পুরাতন ক্লাব পরিত্যাগ করিয়া নূতন ক্লাবে যোগ দিবার জন্য আই, এফ এ'র অফিসে তাহাদের সমর্থকদের সহিত ভীড় করে। কিন্তু এবার অন্যান্য বারের মত ক্লাব পরিবর্ত্তনে তেমন উত্তেজনা পরিলক্ষিত না হইলেও, প্রায় ১১০জন আবেদন করিয়াছেন। এই বৎসর প্রথম বিভাগের দলগুলির মধ্যে বিশেষ খেলোয়াড়-পরিবর্ত্তন হয় নাই। বহু ক্লাবের আর্থিক অবস্থা তত ভাল নহে বলিয়া নাকি এবার খেলোয়াড়-পরিবর্ত্তন কম হইয়াছে এবং বাহির হইতে নামজাদা খেলোয়াড় আনার হিড়িকও কমিয়াছে।

মহামেডান স্পোর্টিং হইতে কোন খেলোয়াড় ক্লাব-পরিবর্ত্তন করিবার আবেদন করে নাই। প্রথম বিভাগে নবাগত স্পোর্টিং ইউনিয়নে কালিঘাটের রবি রায় ব্যতীত কোন নামজাদা খেলোয়াড় যোগদান করেন নাই। মোহন-বাগানের ব্যাক পি চক্রবর্ত্তী ইষ্টবেঙ্গলে যোগদান করিয়াছেন। এরিয়ান্সের তারা ব্যানার্জ্জি ও এন মুখার্জ্জি মোহনবাগানে যোগ দিয়াছেন। ই-বি-আরের আর ভট্টাচার্য্য ও এরিয়ান্সের পুরাতন সভ্য এস মজুমদার পুনরায় এরিয়ান্সে যোগ দিয়াছেন। মোহনবাগানের এস দে, ধীরাজ দাস ও মোহিনী ব্যানার্জ্জি কালিঘাটে যোগদান করিয়াছেন।

এবার যুদ্ধের জন্য ইউরোপীয়ান দলগুলি বিশেষ শক্তিশালী হইবে না। অধিকন্তু শীল্ড খেলায় বাহিরের মিলিটারী দলগুলির খুবই কম যোগদান করিবে এবং লীগ খেলাও উত্তেজনাবিহীন হইবে মনে হয়। ক্যালকাটা ক্লাবকে যদি দ্বিতীয় বিভাগে খেলিতে হয়, ইহা খুবই দুঃখের বিষয় হইবে। তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব ও কলিকাতা ফুটবল খেলায় তাঁহাদের অবদানের কথা স্মরণ করিয়া ক্যালকাটা ক্লাব যাহাতে প্রথম বিভাগে থাকেন, তাহার চেষ্টা করা উচিত।

গতবারের লীগ ও শীল্ড খেলা মোটেই উচ্চাঙ্গের হয় নাই। এবার মহমেডান, ইষ্ট বেঙ্গল ও কালিঘাট ক্লাব যোগ দিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছু বাড়িবে সত্য; কিন্তু ফুটবল খেলায় যে অবনতি হইয়াছে, তাহার বিশেষ উন্নতি আশা করা যায় না। তবে বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিলে, ক্রমশঃ উন্নততর খেলা আশা করা যায়।

ফুটবল খেলায় রেফারিং লইয়া গত কয়েক বৎসর খুবই গোলমাল চলিতেছে। ক্যালকাটা রেফারি এসোসিয়েশন রেফারিং-এ যথেষ্ট উন্নতি প্রদর্শন করিলেও, ক্রীড়ামোদিগণ তাহাদের কাছ থেকে আরও উচ্চাঙ্গের রেফারিং আশা করেন। ক্লাবগুলি ও তাহাদের সমর্থকদের খেলার সময়ে সহযোগিতার অভাবই অনেকটা ইহার জন্য দায়ী। অনেক ক্ষেত্রে খেলার সময়ে খেলোয়াড়েরা অখেলোয়াড়োচিত মনোবৃত্তি প্রদর্শন করিয়া, নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষা না করিয়া রেফারির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে এবং তাহাদের সমর্থকগণ এই সুযোগ লইয়া অনর্থক গোলমালের সৃষ্টি করে। এই দিক্ দিয়া খেলোয়াড় ও তাহাদের সমর্থকদেরও একটা কর্ত্তব্য আছে। অন্যদিকে রেফারিগণ যেন পক্ষপাত-দোষে দোষী বলিয়া অভিহিত না হন, তার জন্য সি আর এ যেন দৃষ্টি দেন।

# সাময়িকী

## অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল

১৬ই মার্চ্চ বাঙ্গালার আর এক বরপুত্র আকস্মিক ভাবে পরলোকগমন করিলেন—অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আসানসোলের নিকটবর্ত্তী ফরিয়াপুর গ্রামে মোটর দুর্ঘটনায় গুরুতর রূপে আহত হন, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর হৃৎপিণ্ড বন্ধ হইয়া যায়।

অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল দেশভক্ত, বাগ্মী, সৎসাহসী ছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম্‌-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিলাতে পড়িবার জন্য বৃত্তি দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু মাতার অনুরোধে তিনি বিলাত যাইতে সম্মত হন নাই।

প্রথমে তিনি ঢাকা ও রাজসাহী কলেজে ইংরাজী অধ্যাপক হন। সরকারী চাকুরী বৃত্তি তাঁহার স্বভাবে ছিল না। উহা পরিত্যাগ করিয়া দেশ-সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিবার জন্য রিপণ কলেজে দেশনেতা সুরেন্দ্র-নাথের সহিত সম্পর্ক আসিয়া অধ্যাপনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। স্বদেশী যুগে, তাঁর কেশরীগর্জ্জন যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই দেশের বীরপুত্র জিতেন্দ্রলালের পরিচয় পাইয়াছেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি কারাবরণ করেন, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দেও রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা করার অভিযোগে তাঁর দ্বিতীয়বার কারাভোগ হয়। তিনি নির্ভীক বক্তা ছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁর যুক্তিপূর্ণ উক্তি দেশবাসী ভুলিবে না।

অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম স্মৃতি-বিগ্রহরূপে দেশবাসীর পূজ্যস্বরূপ ছিলেন। তাঁর অন্তর্দ্ধানে যে ক্ষতি হইল, তাহা পূরণ হইবে না। তাঁর বিধবা মাতা আজিও বর্ত্তমান। আমরা তাঁহার সহিত শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি।

## মহামতি দীনবন্ধু এণ্ডুজ

আর এক শোচনীয় দুর্ঘটনা কালের ইতিহাসে খোদিত রহিল। দীনবন্ধু সি, এফ, এণ্ডুজ আর ইহলোকে নাই। ভারতের আকাশে বাতাসে তাঁর মানবপ্রেমের করুণ কণ্ঠ শুনা যাইবে না, তিনি ২২শে চৈত্র বৃহস্পতিবার ১—৩০ মিনিটে কলিকাতা মুবার্কান হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন।
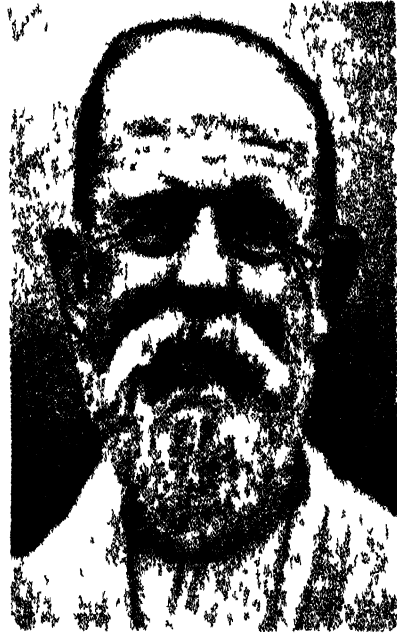
মহামতি দীনবন্ধু এণ্ডুজ

৩৬ বৎসর হইল মিঃ এণ্ডুজ ভারতে আগমন করেন। প্রথমে তিনি দিল্লীর সেণ্ট ষ্টীফেন কলেজে অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। তারপর ধীরে ধীরে ভারতের সহিত তাঁর পরিচয় দৃঢ় হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে, প্রথমে মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁর নিবিড় ঘনিষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয়। ইহার পর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত সম্মিলিত হইয়া, তিনি দীর্ঘদিন শান্তিনিকেতনে অবস্থান করিয়া, বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি অত্যাচার-

কাহিনী তাঁহার মন পীড়িত করে। প্রতিকারের চেষ্টায় তিনি তথায় আপ্রাণ শ্রম করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৯ মাত্র হইয়াছিল। আমরা এই মহাপ্রাণ বান্ধবের মৃত্যুতে শোককাতর হইয়াছি। ভগবান তাঁর অমরাত্মার উন্নতি বিধান করুন।

## পরলোকে মহিমচন্দ্র

চট্টলের নেতা শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস ৬৯ বৎসর বয়সে কলিকাতায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁর অসাধারণ চরিত্র ও ত্যাগপ্রভাবে চট্টলবাসী শুধু নয়, বাঙ্গালী মাত্রেই তাঁর অনুরাগী ছিল। তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

৺মহিমচন্দ্র দাস

ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে তিনিও যোগদান করিয়া কারাক্লেশ ভোগ করেন। চট্টলের আদালতে তাঁর ব্যবহারজীবী বলিয়া খ্যাতি ও প্রসার দুই ছিল। তিনি দেশের ডাকে সে বৃত্তি পরিত্যাগ করেন। তাঁর পরলোকগমনে সারা বাংলা দেশ আজ রোরুদ্যমান। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারমণ্ডলীর সহিত আমরা সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁর পরলোকগত আত্মা পরম শান্তি লাভ করুক।

## কলিকাতা কর্পোরেশন নির্ব্বাচন

মহাড়ম্বরে কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব শেষ হইয়াছে। নূতন আইনে এবার কলিকাতার শতকরা ৭৫ জন হিন্দু করদাতা হইলেও, মুসলমান সদস্যসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য ৮৫টী সদস্য সংখ্যার মধ্যে মাত্র ৪৭টী সাধারণ সভ্যপদ নির্ণীত হইয়াছেন। ইহার মধ্য হইতে আবার দুই তিনটী সাহেবী অঞ্চলে যাইবার ব্যবস্থা আছে। অতএব এবার সাধারণ সভ্যপদ লইয়া কংগ্রেস ও হিন্দু সভার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইহাও বিভক্ত হইল। ২১ জন কংগ্রেসী সভ্য ও ১৫ জন হিন্দু সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, ১৮ জন লীগ সভ্য ১৩ জন স্বতন্ত্র অবশিষ্ট

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১৩ জন ইউরোপীয়ান ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—ইহা হইতে কলিকাতায় কর্পোরেশনের ভাগ্য সূচিত হয়।

কর্পোরেশনে দেশবন্ধুর যুগ হইতে কংগ্রেসের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সরকারী আইনে ও দলাদলির ফলে এই কর্ত্তৃত্ব ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইতে থাকে। এবার হিন্দু সভার অভ্যুত্থানে কংগ্রেসের যেটুকু কর্ত্তৃত্ব কর্পোরেশনে অবশিষ্ট ছিল, তাহা ক্ষুণ্ণ হইল।

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের অধীনে কর্পোরেশনকে সুরক্ষিত করার যথেষ্ট প্রয়াস করেন। হিন্দু সভার পক্ষ হইতে হিন্দুর 'স্বার্থরক্ষার জন্য ইহার' প্রতিবাদে ঘোরতর

প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। উভয় পক্ষেই দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু সভা নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব এই নূতন। তবুও তাঁহাদের এই জয় হিন্দু মহাসভার প্রতি কলিকাতা-বাসীর অনুরাগবৃদ্ধিহেতু, উহা বলিতে হইবে। আর শ্যামাপ্রসাদবাবুর এই নির্ব্বাচনে আন্তরিকতাপূর্ণ শ্রমও ইহার জন্য দায়ী। ভাল মন্দ ভবিষ্যতের হস্তে। নানা কারণে পৌরকর্ম্মে হিন্দু স্বার্থের প্রতি ঔদাসীন্য ও অবিচার অধিক প্রশ্রয় পাইতেছিল, শ্যামাপ্রসাদের এই প্রচেষ্টা তাই প্রশংসার্হ।

## রামগড়ে কংগ্রেস ও বিরোধী সম্মেলন

গত ১৩ই মার্চ্চ রামগড়ে কংগ্রেসের ৫৩ তম অধিবেশন সম্পন্ন হইয়া গেল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইহার সভাপতি-পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার পথে আপোষনীতি আশ্রয় করার

মহাত্মা গান্ধী

সম্ভাবনা আছে, এই আশঙ্কা করিয়া, দেশবরেণ্য নেতা সুভাষচন্দ্র বিহারের সহজানন্দ সরস্বতীর সহিত সংযুক্ত হইয়া কংগ্রেসের পাশেই আপোষ-বিরোধী সম্মেলনের আয়োজন করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা কতকটা প্রতিক্রিয়া-পরায়ণ মনোবৃত্তির অভিব্যক্তি। কংগ্রেস ইহা আমলে আনিতে চাহে নাই। পূর্ণ স্বাধীনতার জয়ধ্বজা ধরিয়া রামগড় কংগ্রেস জাতিকে অধিকভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করার

রাষ্ট্রপতি আবুল কালাম আজাদ

প্রয়াস করিয়াছে। স্বাধীনতাসংগ্রামের জন্য কংগ্রেস নিজেদের প্রস্তুত করার সাধনাই লইয়াছে। মহাত্মা

দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র

গান্ধীকে কংগ্রেস একনায়কত্বই দিয়াছে। সংগ্রামকালে এ নীতি নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

কংগ্রেস অধিবেশন ব্যর্থ করার অশুভেচ্ছা প্রাকৃতিক দুর্য্যোগরূপে দেখা দেয়। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আকাশ প্রবল বারিবর্ষণে অধিবেশনের সাফল্য আনিতে দেয় নাই। কিন্তু অধিবেশনই কংগ্রেসের প্রাণ নয়, ইহার প্রাণশক্তি অব্যর্থ চরণে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে চলিবে, স্থির করিয়াছে। সহস্র সহস্র কংগ্রেসসেবী এই দুর্যোগ মাথায় লইয়া দুর্গম পথে যাত্রা করার সঙ্কল্প লইয়াছে। জাতীয় পতাকা বেষ্টন করিয়া করযোড়ে মহাত্মার জনসেবার আন্তরিকতা দর্শকদের চিত্ত উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। রাষ্ট্রপতি আজাদের স্থির ও শান্ত অভিভাষণ বৈচিত্র্যময় নহে, তবে হিন্দু-মুসলমান সংযুক্তজাতির প্রতীক যে কংগ্রেস, ইহা ইহারই অভিব্যক্তি দেয়।

## পারিতোষিক-বিতরণ

গত ২২শে মার্চ্চ রবিবার প্রবর্ত্তক আশ্রমে প্রবর্ত্তক-নারী-মন্দিরের পারিতোষিকবিতরণসভা হয়। সভানেত্রী ছিলেন—শ্রীমৃণালিনী সেন। মিসেস্ এস আর দাশ, মিসেস্ আর সি গুপ্ত ও মিসেস্ খাস্তগীর এই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

নারী-মন্দিরের সম্পাদিকা শ্রীমতী অমিয়প্রসূন দত্ত, ব্যাকরণতীর্থা বিবরণী পাঠ করেন। উহা হইতে বুঝা যায়—নারী-মন্দিরের ছাত্রীসংখ্যা ১৩০জন এবং বর্ত্তমান যুগশিক্ষার সহিত ভারতীয় ভাব ধারা রক্ষা করিয়া মেয়েদের শিক্ষিতা করার বিশেষ ব্যবস্থা এই প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য।

সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ-বাণী প্রদান করেন। সত্য, সংযম ও সম্বন্ধের সাধনায় নারীর মাতৃত্বপ্রতিষ্ঠার আদর্শ ই তিনি বিশদ করিয়া বলেন। এই মাতৃত্ব কেবল সন্তানজননী হওয়া নহে, মাতৃহৃদয়ের বিকাশের কথায় তিনি জোর দেন। কুমারী, বিধবা, সকল অবস্থার নারীই মাতৃহৃদয় লইয়া সমাজে স্থান করিবে। তাঁর কথায় সমবেত মহিলাবৃন্দ আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন।

সভানেত্রী মহোদয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারা বিশ্লেষণ করেন। তিনি স্বয়ং বিলাতে দীর্ঘদিন ছিলেন; ভারতের প্রগতিযুগের নারীও তিনি লক্ষ্য করিতেছেন। পাশ্চাত্যের শ্রেয়ঃ যাহা, তাহা বর্ত্তমান যুগের নারী না লইয়া বাহিরের ঔজ্জ্বল্যে দিগ্‌ভ্রান্ত হইতেছে, ইহা বিশেষ করিয়া তিনি বর্ণনা করেন। তিনি নারীকে ঘরে ফিরিতে বলেন ও ভারতের ভাব ও আদর্শে নারীর বিশিষ্ট স্থান করিয়া লওয়ার জন্য আকুতি প্রকাশ করেন। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের নারীচরিত্রের ভূয়সী প্রশংসাও তাঁহার কথায় ব্যক্ত হয়। ইহার পর ছাত্রীদের সঙ্গীত ও আবৃত্তি হয়। পরিশেষে "প্রবর্ত্তকে" সদ্যপ্রকাশিত "গোপাল-তীর্থ" নাটিকাখানি ছাত্রীরা যোগ্যতার সহিত অভিনয় করে। মিসেস্ খাস্তগীর পারিতোষিক বিতরণ করেন। সভায় প্রায় আড়াই হাজার ভদ্র পুরুষ ও মহিলার সমাবেশ হইয়াছিল।

## গোটাপাড়ায় পল্লীসভা

খুলনা জেলায় প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের ভাব ও আদর্শানুযায়ী পল্লী সংগঠনের সূচনার জন্য গত বর্ষে পূজার সময়ে সঙ্ঘের ভক্ত-কর্মী শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসুর উদ্যোগে বাগেরহাট গোটাপাড়ায় একটী পল্লী-সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্মিলনীর প্রতি পূর্ণিমায় অধিবেশন হয়। সম্প্রতি গত ১২ই চৈত্র ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন বাগেরহাট কলেজের প্রিন্সিপাল, ত্যাগবীর শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সভারম্ভে শ্রীললিতকুমার ঘোষ অধ্যাপক নৃপেন্দ্রবাবুকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ও কয়েকটী বালক বালিকা কবিতাবৃত্তি করিলে পর, গোটাপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীনরেন্দ্রনাথ হালদার, বাগেরহাট স্যানিটেরী ইন্‌স্পেক্টর শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার, শ্রীঅক্ষয় কুমার বসু, শ্রীশশিভূষণ হালদার ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু, পল্লীবাসিগণের স্বাস্থ্য, মিলন ও সহযোগিতা প্রভৃতি বিষয় লইয়া আলোচনা করেন। খেলার মাঠ ও লাঠী খেলার ব্যবস্থা করার প্রস্তাবও আলোচিত হয়। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় একটী মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতায় সঙ্ঘের সংগঠন-নীতির আন্তরিক সমর্থন করিয়া, গ্রামবাসী নরনারীর আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সঙ্ঘ-প্রবর্ত্তিত উপাসনা-পদ্ধতির ব্যাপকভাবে প্রচার করিবার নির্দ্দেশ দেন। সভায় বহু

সম্ভ্রান্ত মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। একটী মহিলা-সমিতি, তরুণদের জন্য একটী ব্যায়াম-সমিতি এবং সম্মিলনীর কার্য্যকরী সমিতিও এই অধিবেশনে গঠিত হয়।

## শিলাইদহে পল্লীসাহিত্য-সম্মেলন

গত ১০ই ও ১১ই চৈত্র চারণ-কবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে নিখিল বঙ্গ-পল্লীসাহিত্য সম্মেলন হয়। অধিবেশনের পূর্ব্বাহ্নে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পুষ্পশোভিত প্রতিকৃতি লইয়া একটী বিপুল শোভাযাত্রা কবীন্দ্রের পুরাতন পল্লীভবন "কুঠীবাড়ী"তে উপস্থিত হয় ও সকলে প্রতিকৃতির পদতলে পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করেন। "সোণার বাংলা" গান ও একটী কবিতাবৃত্তিও হয়।

রবীন্দ্র-ভবন পরিক্রমণান্তে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীবামাচরণ কর্ম্মকারের "বন্দেমাতরম" সঙ্গীত ও সভাপতি-বরণ হইলে পর, অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সরস্বতী একটী প্রবন্ধে রবীন্দ্রসাহিত্যে শিলাইদহের বিশেষত্ব ও পল্লীকবিগণের মরমী সাহিত্য সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। অতঃপর শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী "শিলাইদহ প্রশস্তি" ও তৎপরে কবিশেখর শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার, শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় প্রমুখ লেখকগণ বিভিন্ন কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরিশেষে সভাপতি উদ্দীপনাময়ী ভাষায় পল্লীসাহিত্যের উদার-তত্ত্ব ও মাধুর্য্য বিশ্লেষণ করেন। সভায় কবীন্দ্রের একটী আশীর্ব্বাণী পঠিত হয়।

দ্বিতীয় দিন পাবনার প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে ১১টী কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত এবং তিনটী প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব-ত্রয়ে কবি-কুঞ্জ শিলাইদহ কুঠীবাড়ীর রক্ষা, মরমী ফকির লালন সাঁই-এর সমাধিস্থানের সংস্কার ও বাঙালার সাহিত্যসেবিগণের আর্থিক দুরবস্থার প্রতিকার সম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। উভয় দিবস, বাউল ফকির খোদাবক্স প্রভৃতির মুর্শিদাগান ও বলরাম দাসের সরস হাস্যকৌতুক সহস্রাধিক পল্লীবাসীর মনোরঞ্জন করিয়াছিল।

## প্রবর্ত্তক জুট মিলস্ লিমিটেড

### ৫ম ষাণ্মাসিক সাধারণ সভা

গত ২৫শে মাঘ সোমবার অপরাহ্ণ ৪৷৷০ ঘটিকায় উক্ত কোম্পানীর ডিরেক্টর ও অংশীদারগণের পঞ্চম ষাণ্মাসিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন কামারহাটীতে মিলের নবনির্ম্মিত বিরাট ভবনক্ষেত্রেই আহূত হইয়াছিল। স্থায়ী চেয়ারম্যান শ্রীমতিলাল রায় মহাশয় উহার সভাপতিত্ব করেন। সভায় চন্দননগর ও কলিকাতা হইতে শ্রীহরিহর শেঠ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে, ডাঃ যজ্ঞেশ্বর শ্রীমানী, শ্রীসতীশচন্দ্র কর, ডাঃ গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ জ্যোতিঃপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর যথারীতি ষাণ্মাষিক রিপোর্ট উপস্থাপন করিলে, সভায় কার্য্যকরী প্রস্তাবগুলির আলোচনা হয়। অতঃপর সভাপতি মহাশয় মিলের বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও আশু অগ্রগতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করেন। তিনি বলেন—মিলের অধিকাংশ মেশিনারী বিলাত হইতে আসিয়া পড়িয়াছে; যাহা বাকী আছে, তাহাও শীঘ্রই আনা হইবে। সঙ্ঘের বিরাট্ স্বপ্ন আজ সিদ্ধির পথে। বাঙালী ধনিকগণ যেখানে অবদান ব্যর্থ হইবে না, সেখানে মুক্ত হস্তে সহযোগিতা করিলে বাঙালীর এই উদ্যম অচিরেই সার্থক হইবে। তিনি আশা করেন— বাংলার ধনকুবের ও জনসাধারণ কোম্পানীর সাধারণ ও প্রেফারেন্স শেয়ার গ্রহণ করিয়া আগামী মাসের মধ্যেই মিলটীকে খুলিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

ধন্যবাদান্তে সভাভঙ্গ হইলে পর, উপস্থিত সকলকেই জলযোগ করান হয়। মিলের ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন:—

শ্রীমতিলাল রায়
মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী এম-এল-এ
শ্রীশরৎচন্দ্র বসু, এম-এল-এ
রায় বাহাদুর হরিপ্রসাদ ব্যানার্জ্জী
ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত শ্রীভোলানাথ নন্দী
শ্রীবিনোদবিহারী ঘোষ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী
শ্রীসতীশচন্দ্র কর

## প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক

### দশম সাধারণ সভা

গত ৬ই এপ্রিল শনিবার অপরাহ্নে ৫ ঘটিকায় কলিকাতায় প্রবর্ত্তক ভবনে প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের দশম সাধারণ অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে ব্যাঙ্কের স্থায়ী সভাপতি শ্রীমতিলাল রায় মহাশয় সভাপতিত্ব করেন।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় সমবেত অংশীদারগণের সমক্ষে হিসাবপরীক্ষক কর্ত্তৃক যথারীতি অনুমোদিত ১৯৩৯ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের আয়ব্যয়ের হিসাব ও ডিরেক্টরবর্গের মুদ্রিত রিপোর্ট উপস্থাপিত করেন। আয়ব্যয়ের হিসাব পর্য্যালোচনা করিয়া এ বৎসরও অংশীদারগণকে শতকরা ৫৲ টাকা লভ্যাংশ দিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ব্যাঙ্কের ধারাবাহিক উন্নতিতে অংশীদারগণ আনন্দ প্রকাশ করেন।

এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের কর্ম্ম-বিস্তৃতির জন্য ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান মূলধন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া শীঘ্রই ব্যাঙ্কটীকে একটী পাব্‌লিক লিমিটেড কোম্পানী করার ব্যবস্থা হইতেছে।

এ বৎসর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ড গঠিত হইয়াছে :—

শ্রীমতিলাল রায়—স্থায়ী চেয়ারম্যান
শ্রীনেপালচন্দ্র রায়
শ্রীতুলসীচরণ রায়
শ্রীসুধীরকুমার লাহিড়ী
রায় সাহেব ইন্দ্রকুমার বসু
শ্রীকিষণচাঁদ বড়াল
শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

# সমালোচনা

**অসমাপ্ত**—শ্রীনন্দদুলাল সান্যাল, বি, এ। প্রকাশক: শ্রীঅমৃতকুমার সান্যাল; প্রভা-স্মৃতি-সজ্ঘ; ৩৭।বি কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—প্রভা-স্মৃতি-সজ্ঘ; বরেন্দ্র লাইব্রেরী, শ্রীগুরু লাইব্রেরী; ডি, এম্ লাইব্রেরী; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ ইত্যাদি। মূল্য আড়াই টাকা। ৩২৬ পৃষ্ঠা। প্রকাশ-কাল—কোজাগরী লক্ষ্মী-পূর্ণিমা, ১৩৭৬।

ক্ষণস্থায়ী এই মানব জীবন; কিন্তু আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সন্দেহ-সংঘাত, আকস্মিকতা, দীর্ঘসূত্রতা সুচিরস্থায়ী। তাই অনন্ত মানব-জীবন-স্রোতঃ তরঙ্গায়িত গতিমুখরতায় অন্তরের কল-কাকলী ও কলরবে সার্থক ও বৈচিত্র্যময় হইয়া উঠে। প্রশ্ন এই—এই সার্থকতায় আসে কি পরিপূর্ণতা, আসে কি পরিসমাপ্তি। যে জীবন গতি-ধর্মের চাঞ্চল্যে, বিচিত্রতার আবেষ্টনীতে, প্রেমাবেশের ধ্রুব তারকায় চায় তার লক্ষ্য-নির্দেশ, চলমান বেগবত্তার মাঝেই হয় তার স্বতঃপ্রকাশ। নিষ্করুণ বাস্তবতার অভিধানে ইহাকেই বলা হয় 'অসমাপ্ত।'

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের ত্রিবেণী-সঙ্গমে মানব-দেহকে আশ্রয় করিয়া যে বিরাট মনোময় সত্তা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানব মনকে পরিচালনা করিতেছে তাহা নিজেও যেমন অনন্ত, তাহাহার পরিপ্রকাশও তেমনই অসমাপ্ত। সতীশবাবু ঠিকই বলিয়াছেন—"দূর থেকে বিশ্বের যাত্রী যাবার ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে অসীমা। এই দিক্‌টাই থেকে গেল অসমাপ্ত—অসমাপ্ত।", (পৃঃ ২৯১) মানব-জীবনের এই সত্য শুধু যে চরমতম তাহা নহে, পরমতমও বটে।

এই জীবনের কলরবে যোগ দিয়াছিল অরুণ-অসীমা-সুশান্ত, সুশান্ত-কল্পনা অরুণ, মীরা-শেখর। সুশান্তের মৃত্যুতেও অরুণের প্রেমের বাস্তব সমাপ্তি আসিল না; আবার মীরা-শেখরের বিবাহে বাস্তব সমাপ্তি আসিলেও, আন্তর সমাপ্তি আসিল কি। সতীশবাবুর মৃত্যু-কালীন শেষের কথায় মানবের অসমাপ্ত অভিযানই সঙ্কেতিত হইয়াছে। বিদেশী কন্যার উদ্দেশে বৃদ্ধ বিজয়বাবুর বাৎসল্যরসও দেখি অনিবৃত্ত, অসমাপ্ত। অসমাপ্তির বোঝা বহিয়া বেড়ানোই মানব-জীবনের কার্য্য। এই পরমতম সত্যই গল্পের গতিশীলতায়, বর্ণনার বিচিত্রতায় চরিত্র-বিশ্লেষণের নিপুণতায়, বার্ত্তালাপের সৌষ্ঠবে, ভাষার সারল্যে লেখকের বলিষ্ঠ পর্যবেক্ষণশক্তিকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত চলচ্চিত্রোপযোগী উপকরণ-প্রাচুর্যে গল্পের গতি রস-ঘন ও প্রকাশ-মধুর হইয়া উঠিয়াছে।

সাহিত্যের আসরে গ্রন্থকারের এই প্রথম আগমন। আধুনিক উপন্যাসে অসমান, অযত্নজাত আতিশয্য দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে, জীবনের গভীর, ব্যাপক ধারণা ও ধৃতি বুঝি বা মানুষে ভুলিতে বসিয়াছে; কিন্তু এই নবাগত লেখকের গ্রন্থপাঠে আশার সঞ্চার হইল। অধুনাতম কালের উপন্যাস সাহিত্যে নন্দদুলালের 'অসমাপ্ত' স্বকীয় বিশিষ্টতায়, প্রাণতায় ও প্রতিভায় প্রথম শ্রেণীর যে কোনও উপন্যাসের পার্শ্বে অনায়াসে ও নিঃসংশয়ে স্থান পাইতে পারে।

উপন্যাসখানি কিঞ্চিদধিক আয়তন সম্পন্ন হইলেও, বার্ত্তালাপের ঘাত প্রতিঘাতে ও ঘটনার সন্নিবেশনে পাঠকের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসাকে সদাজাগ্রত ও প্রশ্ন পর রাখিয়াছে।

গ্রন্থকার তাঁহার 'কৈফিয়তে' মুদ্রাকর-প্রমাদের জন্য ত্রুটি স্বীকার করিলেও, বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, সমালোচনার তীব্রতা ইহাতে কমে না। পরবর্ত্তী গ্রন্থে গ্রন্থকার যেন এই বিষয়ে অবহিত থাকেন।

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার

**মহাদুঃসাহসের কাহিনী**—ছোটদের চিত্রবহুল উপন্যাস, লেখক—শ্রীরবীন্দ্র কুমার বসু, প্রকাশক—শ্রীসত্যরঞ্জন ঘোষ, ৫৭।এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—নয় আনা মাত্র।

ছেলেদের সচিত্র গল্পের বই। উহার মধ্যে বেঁটে গোবিন্দ, অরিন্দম, গিরিধারীলাল, মেড়া ও কড়কড়ী দৈত্য—এই চরিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। গল্পে সাহসের দৃষ্টান্ত ও হাসির উপাদান দুই-ই মিলিয়া ছেলেদের আনন্দ দান করিবে। ছাপা, বাঁধাই ভাল।

**বাংলার ব্যাঙ্কিং**—শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ এম-এস-সি, পি-এচ-ডি-এফ-এস্ এস্ প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য লেখা নাই।

সম্পাদকীয় বিভাগ ইচ্ছা করিয়াই বইখানির সমালোচনার ভার বিশেষজ্ঞের হাতে না দিয়া আমার ন্যায় অর্থশাস্ত্রে আনাড়ীর হাতে দিয়াছেন—তাহার কারণ, বইখানির সাফল্য বা অসাফল্যের প্রমাণ ইহা অনভিজ্ঞের কাছে অর্থশাস্ত্রের ন্যায় কঠিন বিষয়কে সরল ও পরিষ্কার করিয়া তোলে কি না। বইখানি পাঠ করিয়া আমি বলিতে পারি—লেখকের এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে। বাংলায় ব্যাঙ্কিং তথা অর্থনীতি সংক্রান্ত অনেক তত্ত্ব ও তথ্য গ্রন্থকার সাধারণ জিজ্ঞাসু পাঠকের উপযোগী করিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইতে পারিয়াছেন—তজ্জন্য বিশেষজ্ঞ নয়, সর্ব্বসাধারণের পক্ষ থেকেই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। বাংলায় অর্থ-বিজ্ঞানসংক্রান্ত আলোচনাগ্রন্থ খুব কমই আছে—"বাংলায় ব্যাঙ্কিং" এই দারিদ্র্য কিছু মোচন করিবে।

বইখানিতে আটটী পরিচ্ছেদে যথাক্রমে সেকালের ঋণদান প্রথা, একালের ব্যাঙ্কিং, ব্যাঙ্কের ব্যালান্সশীট, আমানত ও কর্জ্জ দাদন, টাকার

বাজার, বাণিজ্য-ব্যাঙ্কিং, বিভিন্ন ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান ও বাংলার বিশিষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থা ও তদ্বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রত্যেকটী পরিচ্ছেদই প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। গ্রন্থকারের ভাষাও শুধু সহজ নয়, সরস। একটু পরিচয় দিই—

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥

এই নীতিবাক্যের বর্ত্তমান যুগোপযোগী তরজমা এই যে, যাঁরা বহুদিন বেঁচে থাকবেন মনে করেছেন, তাঁরা প্রভিডেন্ট ফণ্ডে টাকা রাখুন; আর যাঁরা 'ঐ মরণ এল' ভাবছেন, তাঁরা জীবনবীমা করুন।"

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও ইন্‌সিওরেন্সের এমন চমৎকার বিশ্লেষণ আমি আর কোথাও পড়ি নাই।

বইখানি বাংলার আর্থিক সাহিত্যের সমৃদ্ধিবৃদ্ধির সঙ্গে বাঙালীকে ব্যাপক অর্থসাধনার জ্ঞান ও প্রেরণা দান করুক—ইহাই কামনা করি।

**পণ্ডিচেরীর সাগরতীরে**—শ্রীমৃণাল ঘোষ এম. এ প্রণীত। 'নূতন-পত্র'—পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত, দাম—॥০ আনা মাত্র।

সচিত্র সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। বর্ণনার ভাষা সুন্দর। "বাংলা যেন সদ্যস্নাতা গ্রীণপাড়ীপরা অপরূপ এক কিশোরী—আর মাদ্রাজ দেশ শুষ্ক, রুক্ষ, গৈরিকবেশধারী তপস্বী"—পড়িতে বেশ লাগিল।

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

---

# চিত্র-পরিচয়

"প্রবর্ত্তকের" প্রচ্ছদপটের বিবর্ত্তন স্বতন্ত্র চিত্রাবলীতে দেওয়া হইয়াছে। নূতন রজত জয়ন্তী বর্ষের চতুর্ব্বর্ণ প্রচ্ছদ-পটখানি শিল্পী শ্রীপ্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায় আঁকিয়াছেন। এই চিত্রখানির ভাব ও পরিকল্পনা স্বয়ং সম্পাদক মহাশয় সম্পাদকীয় স্তম্ভে দিয়াছেন—সুতরাং উহার আর স্বতন্ত্র পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

ত্রিবর্ণ চিত্রখানি শিল্পী শ্রীযামিনী রায়ের তুলিকার দান। শ্রদ্ধেয় মনীষী শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই-সি-এস ইহা মনোনীত করিয়াছেন। যত দূর সম্ভব তাঁহারই বর্ণিত ভাষায় ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই—

ছবিখানি বাংলার কারিকরের প্রতীক-মূর্ত্তি। শ্রমের পূজারী—বলিষ্ঠ বাহু, দৃঢ় সমর্থ মাংসপেশী—শ্রম-সাধনার যন্ত্রপাতি লইয়া অভিনিবিষ্ট—কিন্তু তবুও চক্ষের দৃষ্টি কোন ঊর্দ্ধচারী চৈতন্যের ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ। বাঙালী আসলে ভাবপ্রবণ অর্থাৎ কল্পলোকেরই মানুষ। সে কর্ম্মী হইলেও ভাবুক, কর্ম্মনিষ্ঠা তার কোন গভীর নিগূঢ় অধ্যাত্ম-উৎস হইতেই অভিব্যক্ত। শ্রমিকের গলার কণ্ঠী—বৈষ্ণবোচিত সাধ্য-সাধনেরই পরিচয় দেয়। শিল্পী সুকৌশলে এই সঙ্কেতের মধ্য দিয়া জানাইয়াছেন—ভবিষ্য বাঙালীর কর্ম্ম ও সৃষ্টিপ্রেরণা তার অন্তরের প্রেম ও আধ্যাত্মিকতার স্বপ্নকেই পৃথিবীতে মূর্ত্ত ও বস্তুতন্ত্র করিয়া তুলিবার জন্য। পৃথিবীকেই সে সুন্দর করিবে সেবা দিয়া, শ্রম দিয়া; কর্ম্ম করিয়াও সে জগৎকে ভালবাসিবে। জড়কে এমনই উপরের, কল্পলোকের সৌন্দর্য্যে সুষমায় সঞ্জীবিত ও প্রাণময় করাই তাহার জাতীয় প্রেরণার লক্ষ্য। নিছক অধ্যাত্মপ্রেরণা ভিন্ন অন্য কোনও দিক্ দিয়াই বাঙালীর বাস্তব জাগরণ সম্ভব নহে—ইহাই বুঝি শিল্পীর এই শিল্পরচনার তাৎপর্য্য। "প্রবর্ত্তকের" কর্ম্মৈষণার সহিত শিল্পী যামিনীবাবুর রূপ-সৃষ্টির সত্যই আন্তরিক মিল আছে—ইহা আমরা আনন্দসহকারে বলিতে পারি। ছবিখানি জাতির প্রাণে ভাবঘন কর্ম্মপ্রেরণাই সঞ্চার করুক।

—পরিচালক "প্রবর্ত্তক"
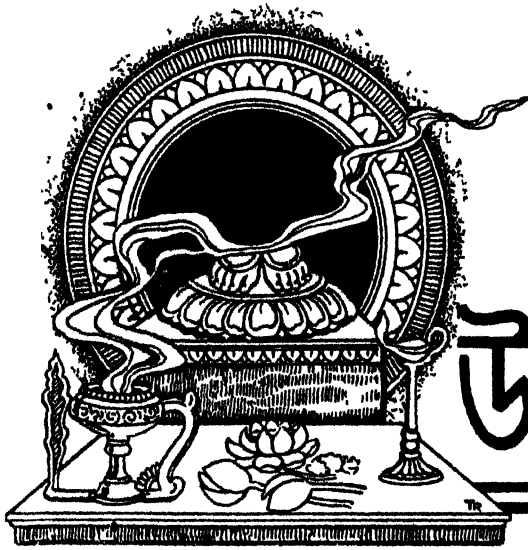
## সঙ্ঘ-বাণী

মন্ত্র যেখানে মূর্ত্ত হয়, সে ক্ষেত্র তীর্থ। ইহা কম ভাগ্য নয়। "প্রবর্ত্তক" মূর্ত্তি নিয়েছে। সে মূর্ত্তি যতই কঠোর হউক, হয়ত তা' অতি কঠোর তপোমূর্ত্তি—কিন্তু তার উৎপত্তি মন্ত্র থেকেই।

ধর্ম্মের জন্য আমাদের জীবন, ভোগের জন্য নয়। যারা ঐশ্বর্য্য-মুগ্ধ, তাদের ভোগ-সংস্কার আছে, তারা' পেছিয়ে পড়ে। যারা ঈশ্বর লক্ষ্যে রেখে সঙ্ঘবদ্ধ, তারা ঈশ্বরই পাবে—তাদের মনের মত নয়, ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপে। সংশয় নয়, সেই কর্ম্মকঠোর বিশ্বমূর্ত্তির রেখাচিত্রই আমাদের সম্মুখে। সংস্কার ও আসক্তিমুক্ত চিত্তে ইহা উপলব্ধিগম্য হবেই হবে।

কর্ম্ম আশ্রয়, লক্ষ্য নয়। আশ্রয়-মাহাত্ম্যও অল্প নয়। যে আশ্রয় লক্ষ্য সিদ্ধ করে, সে আশ্রয় অমৃত। সে-আশ্রয় অমিশ্র আনন্দ। কর্ম্ম তাই এত প্রিয়, এত মধুময়। ক্লান্তি দেহের, মনের—তাহা প্রমাণ করে এদের সীমা আছে।

মানবজাতির শ্রেয়ঃ লক্ষ্যে "প্রবর্ত্তকে"র জীবনারম্ভ। এই ইষ্ট লক্ষ্যেই সঙ্ঘের আবির্ভাব। আজ ইহা যতই অসম্পূর্ণ হউক, সে লক্ষ্য হারান যায় না। সেই বৃহতের দিকে দৃষ্টি রেখে' আমাদের চলা। ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, ব্যর্থতা, পরাজয়ের ব্যথা চিন্তার বিষয় নয়। চলতে হবে—এখনও অনেক দূর।

ভগবান মাথায়। কোথাও বা প্রাণে, মনে। তিনি অন্তর-তীর্থে। কর্ম্ম হাতের। যেখানে কর্ম্ম, সেখানে হিসাব। মাথা যদি ঈশ্বরময় হয়, সংশয়, ক্ষুদ্রতা, ব্যর্থতা আমাদের আঘাত দিবে না। মাথায় কর্ম্ম রাখা নয়—এই চৈতন্যই শক্তির উৎস।

সঙ্ঘধর্ম্মী—ঈশ্বরযাত্রী। ঐক্য ও প্রেম যেখানে নাই, সেখানে কর্ম্মে আসক্তি বা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বিষয়ে টান আছে বুঝতে হবে। সঙ্ঘমণ্ডলে সঙ্ঘধর্ম্মীর চেয়ে আপন কেউ নেই আর। মাথায় ভগবান না থাকলে, দুষ্ট কল্পনায় আত্মবিচ্ছেদের বিষবর্ষণ হয় প্রেতলোক থেকে। অমৃতের পুত্র আমরা ব্যর্থ হব না। নিজেদের মধ্যে প্রত্যয় রক্ষা করব—প্রেম ও ঐক্য রক্ষা করব—ইহাই আমাদের সঙ্কল্প।'

---

# রজত-জয়ন্তী উৎসবে

## শুভেচ্ছা
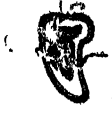
'UTTARAYAN'
SANTINIKETAN BENGAL

ওঁ

"প্রবর্ত্তক" তাহার যাত্রাপথে
নব নব কল্যাণতীর্থে উত্তীর্ণ হউক
এই কামনা করি। ইতি ২৭ চৈত্র ১৩৪৬

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চন্দননগর
২২শে চৈত্র, ১৩৪৬
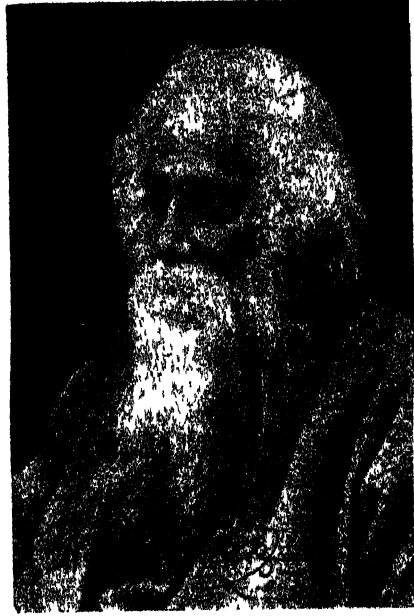
শ্রীতিভাজনেষু

মতিবাবু আমার নমস্কার লইবেন,—

চৈত্রের "প্রবর্ত্তক"খানি হাতে নিয়েই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল রক্তাক্ষরে লেখা "প্রবর্ত্তকের রজত জয়ন্তী।" পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের সেই ১৬ পৃষ্ঠার পুস্তিকাকারে অথবা দেবনাগরী অক্ষরে নাম লেখা দুই বা চারি পৃষ্ঠার পাক্ষিক প্রবর্ত্তকের দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত বহু ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া ইহার জীবনধারা কি ভাবে চলেছে সেই সব কথা যখন একে একে মনে আসিতেছিল, তখন…ভাই এসে বল্‌লে 'প্রবর্ত্তকের' রজত জয়ন্তী উপলক্ষে একটু আশীর্ব্বাণী চাই। আশীর্ব্বাদ করিতে পারি সে ক্ষমতা আমার নাই। শুভেচ্ছা যা সর্ব্বদাই হৃদয়ে পোষণ করে থাকি, তা জ্ঞাপন করার অধিকার আছে, সর্ব্বান্তঃকরণে আজ তাহাই এই শুভদিনে আমি আপনাদের জানাচ্ছি। আর যাঁর আশীর্ব্বাদে সামান্য পর্ণকুটীর থেকে "প্রবর্ত্তক" আজ আভিজাত্যের সকল সম্পদে, সকল গৌরবে গৌরবান্বিত, প্রার্থনা করি, তাঁর এই আশীর্ব্বাদ শাশ্বত হউক।

অকুন্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সঙ্গে সঙ্গে 'প্রবর্ত্তক' যে অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে আজ যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তা বোধ হয় বাঙ্গলার বর্ত্তমানের কোন মাসিক বা অন্য কোন সাময়িকের জীবনে ঘটে নাই। মাতৃক্রোড়ে রূপার ঝিনুকে দুধ খেয়ে শেষে জলবিন্দুর অভাবে জীবন দিতে হয়, ইহাই যেখানে সাধারণ নিয়ম, সেখানে প্রবর্ত্তকের এতাদৃশ উন্নতি সত্যই অভাবনীয়। সাময়িক সাহিত্যক্ষেত্রে 'প্রবর্ত্তকের' স্থান সর্ব্বশীর্ষে একথা বলিতে পারি না পারি, ইহা যে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত, একথা বল্‌লে বোধ হয় অত্যুক্তি দোষ হবে না। আরও একটী সুন্দর কথা, দুই যুগ পূর্ব্বে ইহার প্রথম প্রকাশকালে অনুষ্ঠানপত্রে বর্ণিত 'যে ধারা ধরে', যে মন্ত্রে দীক্ষা লয়ে এর জীবন আরম্ভ হয়েছিল, বহু শাখার মধ্যেও আজও

থেকে বিচ্যুত হয় নাই। ইহাও বড় একটা দেখা যায় না। ভগবান 'প্রবর্ত্তককে' অধিকতর শ্রীসম্পন্ন করুন, বাঙ্গলার মাসিক-সাহিত্যাকাশের মধ্যমণি হউক ও তাহার জ্যোতিঃতে চন্দননগরেরও মুখোজ্জ্বল হউক, এই প্রার্থনা করি। ইতি

শ্রীহরিহর শেঠ

বারুণী, ২২শে চৈত্র

"প্রবর্ত্তক" মাসিক পত্রের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে আমি অতি আনন্দের সহিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমি কয়েক বৎসর ধরিয়া এই মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম; এই জন্য এই মাসিক পত্রিকার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় আমি ইহার উন্নতি ও প্রসারণ জন্য বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। আমি ঐকান্তিক ভাবে ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, ভবিষ্যতে এই মাসিক পত্রিকা যেন বিশেষ উন্নতি, বিস্তৃতি ও স্থায়িত্ব লাভ করে এবং বঙ্গদেশে এক বিশেষ মাসিক পত্রিকা বলিয়া পরিগণিত হয়।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

"প্রবর্ত্তকে"র একটী নিজস্ব চিন্তাধারা আছে। প্রবর্ত্তক যে চিন্তা বা ভাবরাশি দেশের নিকট উপস্থাপিত করেন, তাহার মূলে আছে সঙ্ঘের সাধনা—ত্যাগ ও তপস্যা। প্রবর্ত্তকের বাসনা, সাধনা জয়যুক্ত হউক, ইহাই আমার কামনা। ভারতবাসীকে তাহার সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন করাই হইতেছে প্রবর্ত্তকের সাধনা। আশা করি, তাহার সে সাধনা ব্যর্থকাম হইবে না।

২২শে চৈত্র। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

শুভক্ষণে বিশ্বনিয়ন্তার প্রেরণায় শ্রদ্ধেয় মতিলাল রায় মহাশয় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছিলেন। আর তাঁহার সাহিত্যের মুখপত্র এই "প্রবর্ত্তক" পত্রখানি প্রচার করিয়াছিলেন। এই কর্ম্মভূমি পৃথিবীতে মতভেদের, কথা কাটাকাটির সৃষ্টি না করিয়া যাহাতে মানুষেরা কর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, কর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম-নিয়ন্তাকে চিনিতে পারে, আর সেই পরিচয়ে সারা বিশ্বকে সৌহার্দ্দ্যের সূত্রে বাঁধিতে পারে, ইহাই এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। সেই জন্যে একেবারে শয্যাগত থাকিয়াও, এই পত্রিকাখানি হাতে পাইলে ইহার সার উক্তিগুলি একবার আদর করিয়া শুনিয়া নিই। দেশে এই প্রবর্ত্তক পত্রিকাখানির আর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বাণী এই ২৫ বৎসরে তেমন প্রচারিত হয় নাই—যেমন হওয়া উচিত। আশা আছে—এই জাগরণের দিনে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের বাণী দেশময় যথেষ্ট প্রচারিত হইবে আর তাঁহার সহকর্ম্মিগণ নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়া নিজেরা ধন্য হইবেন ও দেশকে ধন্য করিবেন।

২৬শে চৈত্র, শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

"প্রবর্ত্তক" মাসিক পত্রের "রজত জয়ন্তী" উপলক্ষ্যে ইহার কল্যাণ কামনা করিতেছি।

২৬শে চৈত্র, ১৩৪৬। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১লা বৈশাখ "প্রবর্ত্তকের" রজত জয়ন্তী উৎসব। অনেক বাধা বিঘ্নের মধ্যে "প্রবর্ত্তকের" ২৫ বৎসর কাটিয়া গেল। ধর্ম্মভিত্তির উপর জাতি ও সমাজগঠন "প্রবর্ত্তকের" প্রধান উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য রাখিয়া "প্রবর্ত্তক" বরাবর চালিত হইয়াছে। অধুনা ধর্ম্মের প্রভাব কম হইলেও, বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলে ধর্ম্মের আসন দৃঢ়তর হইয়াছে। সুতরাং বেদান্তের পথও সুগম হইয়াছে। আশা করি, "প্রবর্ত্তক" চতুর্গুণ উৎসাহের সঙ্গে ইহার মত ও পথ প্রচার করিবে এবং ভবিষ্যত কর্ম্মজগতে আরও সফলতা লাভ করিবে।

২৭শে চৈত্র, ১৩৪৬। শ্রীসত্যানন্দ বসু

পঁচিশ বৎসর কাল প্রবর্ত্তক যে উদ্যমের সহিত পরিচালিত হইয়াছে, তাহাতে পরিচালকগণের অন্তরের সাধনা ও তাঁহাদের আদর্শের মধ্যে যে সঞ্জীবনী শক্তি আছে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে হইলে সার্ব্বাঙ্গীন প্রসার আবশ্যক, তাহা প্রবর্ত্তক ভুলিয়া যায় নাই। মানবজীবন পূর্ণ শক্তিশালী করিবার জন্য শিক্ষা, দীক্ষা, অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি যে উপাদান-গুলির অত্যন্ত আবশ্যক ও যাহার পরিহার অসম্ভব, প্রবর্ত্তক সে বিষয়ে কখনও উদাসীন হয় নাই। যে সঙ্ঘ

প্রবর্ত্তক আজ চব্বিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীজাতির সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালাদেশের সাময়িক পত্রের পক্ষে এ গৌরব দুর্লভ। আজ তাহার পঞ্চবিংশতিতম বর্ষের কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে তাহার বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত সাধনার সাফল্যোৎসবের দিনে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার মঙ্গল কামনা করি।

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর

প্রবর্ত্তক-এর রজত জয়ন্তী উপলক্ষে আমি দুই ছত্র লিখে পাঠাতে অনুরুদ্ধ হয়েছি। বেশী কথা লেখা অশোভন হবে, কারণ আমি অন্তরে সঙ্ঘেরই মানুষ। তবু সর্ব্বান্তঃকরণে পত্রিকার মঙ্গল কামনা করছি। শুধু একটি সূচনা আমার করবার আছে। প্রবর্ত্তক পত্রিকা সাধারণ পত্রিকার মতন নয়, হলেও দুঃখের কথা হবে। সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতার যে প্রেরণা, মূলতঃ পত্রিকা তারই বাহন হবে এতে অর্থহীন গল্প বা কবিতার স্থান পাওয়া উচিত নয়। আমি কোন রচনা বা লেখকের উপর কটাক্ষ করে' এ কথা বলছি না।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ আমাদের জাতীয় জীবনের এক মহা-সঙ্কটে নূতন পথের সন্ধানে নব নব কর্ম্মী গঠন করিয়াছিলেন সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায় মহাশয়ের প্রেরণায়। গত মহাযুদ্ধের রক্তবন্যার মধ্যে সঙ্ঘের মুখপত্র "প্রবর্ত্তক" নূতন সাধন-পদ্ধতির আভাষ দিতে আরম্ভ করেন। পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে পত্রিকার রজত-জয়ন্তী পড়িল আর এক ভীষণ ধ্বংসলীলার মধ্যে। "প্রবর্ত্তকের" মঙ্গল-শঙ্খ শুধু সুখে নয়, দারুণ দুঃখ-বিপ্লবের মধ্যেও বিশ্ব-মানবের প্রাণে আনুক ভরসা, আনুক বিশ্বাস ও শান্তি—সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই প্রার্থনা করি। ইতি

২৯শে চৈত্র, ১৩৪৬ শ্রীকালিদাস নাগ

তাহার পশ্চাতে আছে, সে সঙ্ঘ তাহাকে সে বিষয়ে সর্ব্বদা উদ্বুদ্ধ রাখিয়াছে। দেশবাসীর ও স্বজাতির যাহাতে সার্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ হয়, প্রবর্ত্তকের সে চেষ্টা ভবিষ্যতে যেন ক্ষীণ না হয়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু

২৭শে চৈত্র, ৯. ৪. ৪০.

লুব্ধ প্রজাপতি জ্বলন্ত পাবকশিখার মধ্যে আগুনের রূপ-রস পান করিতে ইচ্ছুক হইয়া তন্মধ্যে নিজেকে সমাহিত করিয়া অনন্ত আশার কুহকে পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে। আমাদের মধ্যে বহু লোক সম্পাদক হইবার লোভে, কোন পদবী দাখিল করিবার আশায় পত্রিকা বাহির করিতে ইচ্ছুক হন, কিন্তু সেই সকল প্রলুব্ধ মক্ষিকাদের মতই তাঁহাদের সে আশা বৃথাই জ্বলিয়া ভস্মীভূত হয়। পত্রিকাগুলি পোকার মত দুদিনের তরে আসিয়া আবার কোথায় অন্তর্দ্ধান করে। এ সকল দুঃখের কথাই বটে। কিন্তু আমরা যদি কোন পত্রিকাকে ২৫ বৎসর ও ততোধিক সুচারুরূপে কার্য্য করিতে দেখি, তাহা সত্য সত্যই প্রশংসার পাত্র হইবে। যে পত্রিকা বহু সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ, কাব্য, কাহিনী এবং দেশের ও দেশের কথা বলিয়া আমাদের নূতন ভাবে, নূতন কাজে ও কথায় অনুপ্রাণিত করে, তাহা চমৎকার বিষয়। এই সকল গুণ "প্রবর্ত্তকের" মধ্যে থাকার প্রথমতঃ প্রধান কারণ এই যে, ইহার কার্য্যকরী সমিতির লেখক ও পাঠক সকলেই আন্তরিক হৃদয়ের সহিত এই কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন। ইহাতে কি সুন্দর সম্বন্ধ পরস্পরের সহিত গাঁথা নয়? ইহা কি এক মধুর সঙ্গীতের ঝঙ্কার নয়? দেশ ও জনতা উহার লাভ অবশ্যই পাইবে।

ঈশ্বরের নিকট আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, এই প্রবর্ত্তক পত্রিকা আরও দীর্ঘজীবী হউক ও দেশের মঙ্গল সাধনা করুক!

সুন্দর শর্ম্মা

পরিচালক ও প্রকাশক: শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রবর্তক

# রজত-জয়ন্তী

## প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের লক্ষ্য ও জীবননীতি

পঁচিশ বৎসর ধরিয়া প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কথা প্রচার করিয়াছি। "প্রবর্ত্তকের" নিয়মিত পাঠক যাঁহারা, তাঁহারা আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শের কথা অবধারণ করিয়াছেন। "প্রবর্ত্তকের" নূতন গ্রাহক ও কেবল "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের" কর্ম্ম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহাদের পক্ষে "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ" সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা নাই। তাই এই সম্বন্ধে অনেক অবাস্তব প্রশ্ন আমার নিকট উপস্থিত হয়; বহু পত্রপ্রেরক সঙ্ঘস্থ হইয়া কাজকর্ম্ম করিবার জন্যও আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। কাহারও প্রশ্ন—সংসারে থাকিয়া সঙ্ঘভুক্ত হইতে হইলে, তাহাদের কি করিতে হইবে? আমি সাধারণের স্পষ্টতার জন্যই "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ" সম্বন্ধে যতটুকু বলা সম্ভব জানাইতেছি।

"প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ" কিন্তু কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিল, সংক্ষেপে সেই কথাটী বলিতে হইলে, আমার ব্যক্তিগত জীবনের কথা কিছু বলিতে হইবে। সঙ্ঘের ভাবধারা বিশদ করার পক্ষে ইহার প্রয়োজন যখন আছে, তাই এই বিষয়ে আমি কুণ্ঠা করিব না।

ছয় বৎসর বয়সে এক অশরীরী দেবতার দর্শন পাই। উহা আমার জন্মান্তর-যুগের কথা। মৃত্যুর দুয়ারে গিয়া ফিরিয়া আসার এই হেতুটি আমার চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। এই বয়স হইতে দেবতার পূজায় ও আরাধনায় আপনাকে নিয়োজিত করি। ধর্ম্মজীবনের আকুলতায় সমস্ত যৌবনটাই অভিভূত হয়। অসংখ্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দীক্ষায় ও সাধনায় বিবিধ প্রকারের অধ্যাত্মানুভূতি সঞ্চিত হইয়াছিল। তারপর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী যুগের আগমনে দেশ-প্রেমে অভিষিক্ত হইয়া জাতির মুক্তিকামনায় তনু-মনোপ্রাণ উদ্যত করি। এই যুগে দক্ষিণেশ্বরের প্রভাবই সমস্ত জীবনকে অভিভূত করিয়া রাখে। তারপর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের আগমন। সাধনায় নূতন সঙ্কেত পাইয়া অতীতের ধর্ম্মসাধনার প্রণালীগুলি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যক্ত হয়। দেশসাধনার রুদ্রনীতি সাধনপ্রণালীরই হইয়া যায়। কিন্তু অন্তরপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ১৯১৫ ব্দ হইতে "প্রবর্ত্তক" লিখিতে আরম্ভ করি। এই সময়েই অভাবনীয় ভাবে তৃতীয় শক্তির সঙ্কেতে পূর্ব্বপরিবার হইতে বিযুক্ত হই। "প্রবর্ত্তকের" ভাবধারায় অনুপ্রাণিত তরুণেরা আমার নূতন সংসারে আসিতে আরম্ভ করে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এমন কয়েকজন "প্রবর্ত্তকের" মন্ত্রদীক্ষিত তরুণ—আত্মীয়, স্বজন, পিতা, মাতা, গৃহ, ধর্ম্ম, সমাজ, সব পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত একত্র হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমি বিযুক্ত হইয়া পড়ি। এই

সময়ের পর হইতেই গৃহহীন, নিঃস্ব, সর্ব্বত্যাগী শত শত তরুণ ও কয়েকটী কুমারী আমার এই নূতন সংসারভুক্ত হয়। সকলেরই নিঃস্ব অবস্থা। কাজেই এই নবগৃহরচনা ও ইহার বিস্তৃতির জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। এই সব নব যুগের মানুষের সহিত সংযুক্ত হইয়া আমায় অর্থোপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই নূতন সংসারভুক্ত মানুষেরা একটা সমষ্টির জন্যই শ্রমসাধ্য কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে। কেহ বংশগত অর্থ এই সমষ্টি-রচনায় প্রথমে আনিতে পারে নাই। সঙ্ঘের দৃঢ় ভিত্তি তাহাদের নিষ্কাম কর্ম্মশক্তির দ্বারাই গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বিনা চিন্তায় ও কল্পনায় যাহা বিগ্রহরূপে স্বতঃই দেখা দিল, তাহার গুণ-কর্ম্ম বিচার করিয়া সঙ্ঘভুক্ত হওয়ার নিয়ম স্বতঃই প্রবর্ত্তিত হইল। অর্থাৎ "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের" সহিত কেহ যদি সংযুক্তি চাহেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে গোত্রান্তরিত হইতে হইবে। তাহার অতীত থাকিবে না। সঙ্ঘক্ষেত্রে তাহাকে নবজন্মে দীক্ষা লইতে হইবে। সঙ্ঘভুক্ত হওয়ার ইহাই সর্ব্বপ্রথম নীতি।

দ্বিতীয় নীতি—সঙ্ঘের এক অখণ্ড অন্নক্ষেত্র হইবে। কাহারও ব্যক্তিগত স্বার্থ বা অর্থভাণ্ডার থাকিবে না। প্রত্যেককে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। কর্ম্মহীন হইয়া সঙ্ঘে কেহ স্থান পাইবে না। অর্থাৎ প্রত্যেককে কর্ম্ম করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, সঙ্ঘভুক্ত হইতে হইলে, কি পুরুষ, কি নারী, বিবাহিত অথবা অবিবাহিত, সকলকেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে এবং সঙ্ঘ-প্রবর্ত্তিত উপাসনানীতি সমষ্টিভাবে পালন করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, প্রত্যেক সঙ্ঘধর্ম্মীকে সত্য, সংযম ও সম্বন্ধের অধ্যাত্মসাধনায় সতত নিরত থাকিতে হইবে। কায়মনোবাক্যে সঙ্ঘক্ষেত্রে প্রত্যেকে সত্য পালন করিবে, আসক্তি ও কামনার সহিত সতত সংগ্রামে ইন্দ্রিয়জয়ী হইবে এবং ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন সম্বন্ধ রাখিতে পারিবে না।

সঙ্ঘভুক্ত হওয়ার এই কঠোর নীতি যাহারা পালন করিতে পারিবে, তাহাদের জন্য সঙ্ঘের তোরণদ্বার সতত মুক্ত থাকে। এইজন্য কপট সুবিধাবাদীর সংখ্যাধিক্য সঙ্ঘক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্ঘ-শক্তিই ইহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। সঙ্ঘধর্ম্মের উক্ত নীতি গোড়া হইতে সমানভাবেই চলিয়াছে। যাহারা সঙ্ঘধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহারাও ইহা জানিয়াই সঙ্ঘে প্রবেশ করে। অসমর্থও যেমন বিদায় লয়, কপট ধূর্ত্তও তেমনি সঙ্ঘের কিছু অপচয় করিলেও বাহির হইতে বাধ্য হয়, এ অবস্থা অনিবার্য্য। সঙ্ঘশক্তি এই উভয় শ্রেণীকেই ক্ষমার যোগ্য বলিয়া মনে করে, সঙ্ঘত্যাগীদের প্রতি বিন্দুমাত্র ঈর্ষ্যাবোধ করে না। সঙ্ঘধর্ম্মের লক্ষণ বলা হইল। এক্ষণে লক্ষ্য কি, তাহাই বলিতেছি।

জীবনের পরিচয় কর্ম্মে। জীবন ভাগবত হইলে, কর্ম্মও দিব্য হয়। দিব্য কর্ম্মই ঈশ্বর-কর্ম্ম।

কর্ম্মযন্ত্র—মস্তিষ্ক, হৃদয়, প্রাণ আর শরীর। একবুদ্ধি, অনন্য-চিত্ত, যুক্ত-প্রাণ ও নিষ্কাম কায়িক শ্রম ও সেবা যন্ত্রশুদ্ধির হেতু। যন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ হইলে, জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে ও সেবায় ঈশ্বরের চাওয়াই জীবনে অভিব্যক্ত হইবে। এই অগ্নিময়ী আকাঙ্ক্ষা যাহাদের জন্মগত স্বভাব, তাহারাই এই দিব্যপথের যাত্রী। এই পথে যাত্রীসমষ্টি "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ"। ইহা বৈরাগীর সমষ্টি, সন্ন্যাসীর সমষ্টি—যাহাদের ঈশ্বর ভিন্ন বস্তু নাই, তাহাদের সমষ্টি। এই ঈশ্বরযুক্ত সমষ্টির লক্ষ্য ঈশ্বরের অভীষ্টসিদ্ধি। অতএব সঙ্ঘধর্ম্মীর লক্ষ্য—শ্রীভগবান। জ্ঞানে, প্রাণে, মনে, দেহে ভগবৎ-যুক্তির সাধনাই অভিব্যক্ত হয়।

সঙ্ঘধর্ম্মীর লক্ষ্য সুনির্দ্দিষ্ট; সাধন—অন্তর্যামী নারায়ণের উপরই নির্ভর করিয়া জীবনের উৎসর্গ। সঙ্ঘের ধর্ম্ম—ভগবানে আত্মসমর্পণ। লক্ষ্য ঈশ্বরের। তাই সঙ্ঘ ঈশ্বর-যন্ত্র। তাহার মধ্য দিয়া শ্রীভগবানেরই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

## কর্ম্ম-বিজ্ঞান

কর্ম্ম কি আমাদের লক্ষ্য? আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলিব—না। লক্ষ্য—ভগবান। কর্ম্ম আশ্রয়। যেমন কাশী লক্ষ্য, রেলগাড়ী আশ্রয়।

কর্ম্ম তবে পথ? ত্রিমার্গের মধ্যে ইহা অন্যতম। আমি বলি—না, তাহাও নহে। কর্ম্মের একীভূত মূর্ত্তি মার্গত্রয়। ত্রিমার্গ কর্ম্মের বিচার-ফল। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি একাত্মক। কর্ম্ম ভক্তি অথবা জ্ঞান হইতে পৃথক্ হয় না। কর্ম্মের মর্ম্মাবধারণের জন্য কর্ম্মবিশ্লেষণে ভক্তি ও জ্ঞানের অনুভূতি-লাভ হয়। পরন্তু ঈশ্বর-লক্ষ্যে এক মার্গই বিহিত। উহা কর্ম্ম।

কর্ম্ম তাই অতিশয় রহস্যময়। কর্ম্মের গতি এই জন্যই গহন বলিয়া গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা সেই সকল দার্শনিক যুক্তির অবতারণা করিব না।

কর্ম্ম হইতে সৃষ্টি। সৃষ্টি দেখিয়া কর্ত্তার অনুভূতি। কর্ম্মসূত্র ধরিয়া কর্ত্তার সহিত জীব যুক্তি পায়। সাধনার ইহা অমোঘ নীতি। কর্ম্ম-মাহাত্ম্য ভারতে তাই চির-কীর্ত্তিত। কর্ম্মবৈরাগ্য ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া যে দিন এ জাতি স্বীকার করিয়াছে, সেই দিন হইতেই ইহার ক্লীবত্ব, এবং ধর্ম্মও হইয়াছে অলৌকিক ইন্দ্রজাল।

অনেকে বলেন—ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় প্রেম। কিন্তু বিনা সেবায়, বিনা অর্চ্চনায় প্রেমলাভও হয় না। অতএব ঈশ্বর-যুক্তির জন্য যে প্রেম প্রয়োজন, তাহাও কর্ম্মার্জ্জিত। প্রশ্ন—কর্ম্মের পর প্রেমলাভ এবং প্রেমের দ্বারা ঈশ্বর-সম্বন্ধ দৃঢ় হইলে, কর্ম্মসমাপ্তি হয় কিনা?

ইহার উত্তরে বলিব—কর্ম্ম ভক্তির পরিণতি। ভক্তি যদি কর্ম্মে নিহিত হয়, তবে কর্ম্মই প্রেমের বীজ এবং কর্ম্মই যথাক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। সুতরাং কর্ম্ম হইতে প্রেম পৃথক্ না হওয়ায়, কর্ম্মের অনাহত স্রোতেই থাকিয়া যায়। প্রেম কর্ম্মেরই রূপান্তর।

জ্ঞানের প্রসঙ্গেও এই একই ন্যায় প্রযুজ্য হইবে। আমরা বলিতে চাই—মানবতার ধর্ম্ম কর্ম্মকে ছাড়িয়া নহে। কর্ম্মবিমুখতা যে মুহূর্ত্তে আসিবে, সেই মুহূর্ত্তে বুঝিবে—মানুষ ভূতাবিষ্ট হইয়াছে। খ্যাতি তার যে আকারেই প্রচারিত হউক, কেহ ধর্ম্মের ভূত, কেহ অধর্ম্মের ভূত। কর্ম্মহীন জীবন মানবের প্রেতমূর্ত্তি।

কর্ম্মের চতুরঙ্গ লীলা। কোন অবস্থায় মানুষ কর্ম্মহীন নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এইরূপ হইলে তাহাকে বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া মানবধর্ম্ম উপেক্ষা করিবে। শৈশবে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে, বার্দ্ধক্যে কর্ম্মবিমুখ কেহ নহে। কর্ম্মের যে চতুরঙ্গ লীলা, তাহার ভিতর দিয়াই অতি বড় দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তিও ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করে। মানুষের যন্ত্রচতুষ্টয়ে যুগপৎ ক্রিয়ালক্ষণ প্রকাশ পায়। যে কর্ম্ম ঈশ্বর-যুক্তির পথ, সেই কর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই ভগবান প্রকাশিত হন। হিন্দুশাস্ত্র তাই বলেন—যে কর্ম্ম বন্ধনের নিমিত্ত নহে, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম। বিদ্যাও বিমুক্তির হেতু যদি হয়, তাহাই বিদ্যা। অপর কর্ম্ম অপর বিদ্যা শিল্পনৈপুণ্য মাত্র।

ঈশ্বর-যুক্তির জন্য কর্ম্ম ঈশ্বর-লক্ষ্যে লইয়া চলে। অন্য কর্ম্ম কামনাপূর্ত্তির হেতু। মানুষ জন্মিয়াছে কামনাসিদ্ধির জন্য নহে। ঈশ্বর-প্রাপ্তিই তাহার লক্ষ্য। অতএব ঈশ্বর-যুক্তির জন্য যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্মই বিধেয় বলিতে হইবে। চতুরঙ্গ কর্ম্মের কথা বলিয়াছি। জ্ঞান-ক্রিয়া বুদ্ধির ধর্ম্ম। প্রেম-ক্রিয়া হৃদয়ের ধর্ম্ম। শক্তি-ক্রিয়া প্রাণের। সেবা শরীর-ক্রিয়া। ঈশ্বর-লক্ষ্যে যন্ত্র চতুষ্টয়ের যে কর্ম্ম, তাহাই প্রেম ও জ্ঞানে আপনাকে রূপান্তরিত করিয়া লয় এবং ইহা যখন ত্রয়ী মূর্ত্তি ধরে, তখনই উহা উৎসর্গের অর্ঘ্য-স্বরূপ হয়। এই অবস্থায় কর্ম্মের পূর্ণাহুতি দিবার যুগ উপস্থিত বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইহার পর মস্তিষ্কে, হৃদয়ে, প্রাণে ও শরীরে যে কর্ম্ম প্রকাশ পায়, তাহা ঈশ্বর-ক্রিয়া। সমাধির পর এই অপার্থিব জীবনলক্ষণ প্রকাশ পায়।

মানব-মস্তিষ্ক লইয়া ঈশ্বর যখন চিন্তা করেন, তখন মানবের কণ্ঠে অপৌরুষেয় ঋক্ উচ্চারিত হয়। তাহাতে জগজ্জন ধন্য হয়। তিনি যখন প্রেমরূপে হৃদয়ে প্রকাশিত হন, মানব-হিয়ার মধ্য দিয়া ঈশ্বর-প্রেমের অমৃতনির্ঝর তখনই ঝরিয়া থাকে। প্রাণে ঈশ্বর-শক্তির প্রকাশে দিব্য ঐশ্বর্য্য ও সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে। ঈশ্বর যখন শরীর-ক্রিয়ায় লীলায়িত হন, তখনই সেবার অমৃতে মানবসমাজ সুখ ও শান্তি অনুভব করে। মানুষের ভিতর দিয়াই ভগবান এই জ্ঞানপ্রকাশ করেন—প্রেম, শক্তি ও সেবা প্রকাশ করেন। এই কর্ম্ম—তাঁহাকে প্রকাশ হইতে দেওয়ার জন্য কর্ম্মযন্ত্রগুলিকে উপযোগী করা; অন্য কর্ম্ম—উপযোগী যন্ত্রে ঈশ্বরের প্রকাশ হওয়া। ইহাই মানব-ধর্ম্ম। নব যুগের তান্ত্রিকদের আমরা বলিব—ইহার অন্যথা যেখানে দেখিবে, তাহা ইন্দ্রজাল বলিয়া পরিহার করিও। কর্ম্ম অনাদি আশ্রয়, অনন্ত তার রূপ। শ্রী, সম্পদ্, বীর্য্য, রাজ্য বন্ধন নহে, ঈশ্বরপ্রকাশ। যে জাতি এই কর্ম্মবাদ অস্বীকার করে, সে জাতি পতনোন্মুখী। সনাতন ধর্ম্ম আমাদের শিরোভূষণ হউক। চরণ হউক প্রগতিশীল। জীবন ঈশ্বরমহিমার বৈজয়ন্তী। শির তাই কোথাও অবনমিত হইবে না। জাতিকে উন্নত শিরে কর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিতে বলি।

## প্রবাসীর পত্রোত্তর

জাপানের "ভারত জাতীয় সমিতির" সাধারণ সম্পাদক ও 'জাপান যুবকসঙ্ঘের" সভাপতির একখানি পত্রের প্রয়োজনীয় অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া, তদুত্তরে যাহা বলিবার লিখিতেছি। তিনি লিখিতেছেন—"ছাত্রজীবনে দেশব্যাপী জাতীয়তা-বোধের স্রোতে জাগরণের সাড়া পেয়েছিলাম। সব সময়েই তখন মনে হ'ত বাঙ্গালী কোথায় গিয়া পৌছিবে। তখন আপনার সুচিন্তিত বাণী আমাদের শান্তি দিত। আঁধারে আলোর সন্ধান পেতাম। আপনি চির পরিচিত।

দূর হতেই দর্শন করেছি। সাক্ষাৎ পরিচয়ের ভাগ্য হয়নি। কিন্তু পূজারীর শ্রদ্ধার্ঘ্য ব্যর্থ হয় না। তাহা পুণ্য-স্বরূপ ফিরে এসে আমাদের কৃতার্থ করেছে। পাঁচ হাজার মাইল দূরে দাঁড়িয়ে হৃদয় চায় আপনার আশ্রয়। আজ এই দুর্দ্দিনে সোণার বাংলা শ্মশানে পরিণত হয়। ভাবি কোন মহাপুরুষ এই অবনত জাতির অভ্যুত্থান আনবে, আপনার কথাই মনে পড়ে। জাতিকে প্রাণ দিন। সত্যধর্ম্মে দীক্ষা দিন।

একটী প্রার্থনা। প্রাচ্যের গরিমা ভারতের সভ্যতা ও স্বপ্ন সবই যেন ব্যর্থ হয়েছে। স্বাধীনতা হারালে এমনই হয়। ধর্ম্মও জাল ধর্ম্ম হয়ে জাতিকে ছেয়ে ফেলে। প্রাচ্য ভারতের যখন এই দুর্দ্দশা, তখন জাপানের দিকে চেয়ে দেখি—কি তার পৌরুষ! আত্মবৈশিষ্ট্য রাখার কি তার জিদ! সমস্ত প্রাচ্যখণ্ডে এই জাতিটাই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমার বিশ্বাস, এদের চরিত্র ও আদর্শ আমাদের অনুসরণীয়। এদের কিছু গুণও যদি আমরা আয়ত্ত করতে পারি, আমরা ভিতর হতে প্রাণ পাব, অনুপ্রেরণা পাব।

কিন্তু ইহার জন্য যে প্রাণ ও প্রতিভার প্রয়োজন, তাহা সাধারণ মানুষের কাজ নয়। ভারতের বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম্ম বজায় রেখেই জাপানের সভ্যতা ও পৌরুষের আলোচনা করতে হবে। ভারতীয় জাতীয়তার বৈশিষ্ট্য এদের কাছে জ্ঞাপন করে'ই এদের অনেক গুণ আয়ত্তে আনতে হবে। এ কাজ আপনার। আমাদের প্রার্থনা—আপনার সহস্র কাজের মধ্যেই এই কাজটীও আপনার সাধনার অঙ্গ ক'রে নিন। জাপানীরা জানতে চায় সত্য ভারতকে। বিশ্ব-বিদ্যালয় ও নানা সমিতির দিক্ হতে ভারতীয় শিক্ষা ও আদর্শপ্রচারের জন্য অনেক তাগিদ আমরা পাই। সে তাগিদ এখনও কেউ পূর্ণ করে নাই। ভারতের পরিচয় জাপান যদি পায়, আর আপনি যদি সে ভার গ্রহণ করেন, আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব।"

ডাক লোভনীয়। কিন্তু আমার চিন্তাধারা বড় অন্তর্ম্মুখী। প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেডের সম্পাদক শ্রীমান্ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের মুখে জাপানের কথা শুনিয়া, আমি পুলকিত হইয়াছি। জাপানীরা কাঁদিতে জানে না। দৃঢ় চরিত্র গড়ার এই পরিণতি আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। জাপানী সময়ের অপব্যয় করে না। জাপানের নারীশক্তি

দেশের জাগ্রত অর্দ্ধেক প্রাণশক্তি। জাপানীরা শ্রম সংক্ষেপ করিয়া বৃহত্তর কর্ম্ম সম্পাদন করে। কৃষিতে, গৃহ-শ্রমে, ফেরীর কাজে তার সময়-ব্যয় হয় না, এমন অদ্ভুত সময়সঙ্কোচের ব্যবস্থা একটী দৃষ্টান্তেই দেখা যায়।

সাধারণ রাস্তার ধারে হকারেরা কাগজ সাজাইয়া রাখে। পথিক রুচিমত কাগজ উঠাইয়া লয়, মূল্য যথা-রীতি কৌটায় দিয়া যায়। হকার অন্য কাজ সারিয়া কাগজের সংখ্যার সহিত উহার মূল্য মিলাইয়া লয় মাত্র। একটা জাতির সততা থাকিলে কত প্রকারের শ্রম লাঘব হয়, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। জাপানের পুরুষেরা চীনবিজয়ে চলিয়াছে। জাপানের নারীশক্তি ট্রামে, বাসে, রেলে, হোটেলে দেশের অর্দ্ধেক কাজ সারিতেছে আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছে—জাপানের জয়, বিশ্বে তার দিগ্বিজয়ী শক্তির অভ্যুত্থান। এই জাগ্রত জাতির কাছে ভারতের দিবার আছে যাহা, তাহা যে আমরাই আয়ত্ত করিতে পারি নাই। এই অবস্থায় একটা স্বাধীন জাতিকে কিছু দিতে যাওয়া আমাদের দিক্ দিয়া অতি লঘু আত্মপ্রসাদ, অন্যের পক্ষে সুবিনয়-সৌজন্য। এই সৌজন্যের আবার একটা সীমা আছে। তাই দেখা যায়—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও জাপানের কবির কাছে তিরস্কৃত হইয়াছেন। আমরা আত্মশ্লাঘা লইয়া থাকিতে পারি, বিশ্বের বীর জাতির নিকট ভারত আজ হাস্যাস্পদ জাতি।

জাপানের খাওয়ার সময় ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সুনির্দ্দিষ্ট। তাহার উপাসনার সময় আছে। কর্ম্মের, শয্যা-ত্যাগের, খেলার, আমোদের যথানির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। নিয়মপালনে যে জাতি উদাসীন নহে, সে জাতির সংযম-সাধনা স্বতঃই হয়। সংযত জীবনই ধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তি। যাহারা জাপানকে, বৃটনকে, ফ্রান্সকে, জার্ম্মানীকে উচ্চ আদর্শ ও কৃষ্টির অনধিকারী মনে করে, তাহাদের আমি কূপমণ্ডুক মনে করি।

ভারতের আজ ধর্ম্ম নাই। কৃষ্টি, সংস্কৃতি নাই। শুধু স্মৃতি আছে। উহা আভ্যন্তরীণ শক্তি। ঐ শক্তির স্থূল-মূর্ত্তি যে শক্ত আধারে প্রকাশিত হইতে পারে, তাহা আমরা হারাইয়াছি। ভারতের এই অতীত স্মৃতির পূজা বিশ্বজাতি দিবে। কিন্তু বর্ত্তমান জীবনের শক্তি-হীনতার পরিচয় কোন জাতি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে না। বিবেকানন্দের আমেরিকায় অভিযান কাঙ্গালের ধনের মত আমরা যত বড় করিয়াই দেখি, উহারা ঠিক তত বড় করিয়া দেখে না। সকল দেশেই একটা করিয়া ক্লীব ও নপুংসক জাতি থাকে। নূতন আদর্শবাদে এই জাতিটাই বিভ্রান্ত হয়। বীর জাতির আসল অংশ স্মৃতি-মূলক আদর্শবাদে অভিভূত হয় না। আদর্শের সহিত চাই তার শক্তির প্রকাশ। নতুবা প্রচার ব্যর্থ হয়।

আমরা একটা প্রাচীন জাতি। আমাদের কি আছে? শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ লইয়া কত গর্ব্ব আর করিব? যে নীতি অনুসরণ করিলে আমরা মাথা তুলিয়া দাড়াইতে পারি, বিগত ১২ শত বৎসরের ইতিহাস অনুসরণ করিয়া দেখি—সে দিকে আমরা এক পাও অগ্রসর হই নাই। ভেতো ধর্ম্মের রং মাখিয়া আমরা যোগী, মহাপুরুষ। ভারতের স্মৃতিমূলক ধর্ম্ম যদি আয়ত্তে আনিতে পারিতাম, রাষ্ট্রে ও সমাজে এত ক্লীবের সংখ্যা বাড়িবে কেন?

ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি যদি বিদ্যুদ্বীর্য্যময় হয় আর তাহা যদি অমৃত হয়, তবে তাহার সাধনায় আমি প্রথমে ব্যক্তিগত ভাবে নিয়ম ও সংযমের ভিতর দিয়া আপনাকে সর্ব্বতোভাবে নিরলস জাগ্রত জ্বলন্ত বিগ্রহ করিয়া তুলিতে চাহি। তারপর এইরূপ সমষ্টি লইয়া জাতির সর্ব্বাঙ্গীন শ্রী ও উন্নতি যদি সাধিত হয়, আর জাতি যদি কখনও পর মুখাপেক্ষী না হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী হয়, সেইদিনই ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি-প্রচারের সত্য দিন বলিয়া মনে করিব। আজ জাপান যাহা করে, রুষ, জার্ম্মাণী যাহা করে, ফ্রান্স, বৃটন যাহা করে, তাহা অন্যায় ও অধর্ম্ম বলিয়া যখন আমাদের কাহাকেও ভুয়া চীৎকার করিতে শুনি, তখন নতশির হইয়া ভাবি—দীর্ঘ পরাধীনতার পীড়নে আমরা ভারতধর্ম্ম বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছি। আজ ভারতের বীর-ধর্ম্মই ঐ সকল বীর জাতির অনুসরণীয় হইয়াছে। পঙ্গু ক্লীবের ক্ষমা-ধর্ম্মের ন্যায় একটা পতিত দুর্ব্বল জাতির প্রেম ও শান্তির প্রচার অতিশয় ঘৃণার্হ। ভারতের দিবার আজ কিছুই নাই, হওয়ার আছে। এই হওয়ার পথেই আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। অন্য সকল প্রলোভন সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

# ভারত সভ্যতার প্রাচীনতা

বিশ্বমানবজাতির সভ্যতার ইতিহাস, অনুসন্ধান করিলে, আমরা ইহার জন্য যে কয়েক সহস্র বৎসর অঙ্গুলী-সঙ্কেতে পাইয়া থাকি, তাহা আমাদের নিকট অতিশয় লঘু সংখ্যা বলিয়াই মনে হয়। প্রাচীন বাইবেলে আদিম মানুষের জন্মকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৪ হাজার বৎসর মাত্র ধরিয়া ভারতের স্বায়ম্ভুব মনুর যুগ যখন এই হিসাবে নির্দ্ধারিত হইতেছিল, তখন ভারতের আত্মা আর্ত্তনাদ করিয়া বুঝি বলিতেছিল—এই মাত্র ৫।৬ হাজার বৎসরের বেদাদি শাস্ত্র-রচনার কাল—জগৎসভ্যতার আদি ঋষিরাও কি এই কয়েক সহস্র বৎসরের মানুষ?

অতি অল্প দিন হইল, ইজিপ্টের পাষাণস্তূপ প্রত্নতত্ত্ব-বিদেরা খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ হাজার বৎসরের বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। চাল্‌ডিয়ার সভ্যতার ইতিহাসও নাকি খৃষ্টপূর্ব্ব দশহাজার বৎসরের। মনীষী এইচ, জি, ওয়েলস্ সাহেব বলিতেছেন—মানবসভ্যতার ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে। নৃতত্ত্ববিদেরা মৃত্তিকাগর্ভ হইতে যে সকল কঙ্কাল ও মাথার খুলি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা হইতেও নাকি প্রমাণিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান মানুষের মত মানুষ খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ছিল। কে বলিতে পারে, ভূমধ্য সাগর ও ভারতসমুদ্র যদি কখন শুষ্ক হইয়া যায়, উহার বালুস্তর বিদীর্ণ করিয়া লক্ষ বৎসরের মানবকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইবে কি না?

প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা ভারতের সভ্যতার ইতিহাস যাচাই করিয়া গ্রহণ করি। কিন্তু প্রমাণ কি শুধুই প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে? আনু-মানিক ও শাব্দিক প্রমাণ কি একেবারেই ভিত্তিহীন? শ্রুতি-স্মৃতির শব্দমন্ত্রে ভারতের ইতিবৃত্ত এখনও কি ঝঙ্কৃত হইতেছে না? ভারতের পুরাণ-সংহিতার মধ্যে যে বাণী সুলিখিত, তাহার মূল্য কি কপর্দ্দক মাত্র নহে?

পুরাণ ও সংহিতায় সৃষ্টির যে ইতিহাস লিখিত হইয়া-ছিল, ভূতত্ত্ববিদেরা প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যেই তাহার সন্নিহিত হইয়াছেন। মানবসভ্যতার ইতিহাস আমাদের বেদ সংহিতা ও পুরাণাদিতে যেরূপ লিখিত আছে, একদিন অর্ব্বাচীন যুগের পাণ্ডতেরা তাহাও স্বীকার করিয়া লইবেন। আমরা বস্তুতন্ত্র প্রমাণসংগ্রহের শক্তি ও অধিকার হারাইয়াছি। আমরা প্রাচীন ঋষিমণ্ডলীর বাণীর উপরই আস্থা স্থাপন করিব। সে বাণী মিথ্যা হইবে না বলিয়াই আমরা মনে করি।

খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মানুষ ছিল, কিন্তু সে মানুষের মুখের বাণী তখনও পরিস্ফুট হয় নাই। ঘর বাঁধিয়া বাস করিতে তাহারা শিখে নাই। সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ-সংহতি-রচনার জ্ঞান তাহাদের ছিল না। তাহারা বনের ফলমূল আর পশুর আমমাংস ভক্ষণ করিয়াই দিন যাপন করিত। ভারতেতর জাতির পক্ষে একথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু ভারতের নরনারী ইহা স্বীকার করিবে কেমন করিয়া? ভারতের জীবনবৃত্তান্ত বেদবিধৃত হইয়া সুদূর অতীতকে যে জাগত রাখিয়াছে, আমরা বস্তুতন্ত্র সত্য প্রমাণের খাতিরে শব্দ-শাস্ত্রের সেপ্রমাণকে কি উপেক্ষা করিব? আমাদের ঋষিরা বিশ্বসৃষ্টির যে কাল নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কুরুক্ষেত্র পূর্ব্ব ১৯৬ কোটী বৎসর পূর্ব্বে। উহার প্রায় ১৫০ কোটী বৎসর পরে মানবমূর্ত্তি মর্ত্ত্য পৃষ্ঠে জন্ম গ্রহণ করে। কুরুক্ষেত্র-পূর্ব্ব ১৯৮ কোটী বৎসর পূর্ব্ব হইতে শনৈঃ শনৈঃ মানবজাতি উন্নীত হইয়া কুরুক্ষেত্রপূর্ব্ব প্রায় ৪৫ হাজার বৎসরেও মানবতার জয়কেতন উড়াইয়াছে।

আমরা এই হিসাব আমাদের সংহিতা-পুরাণাদিতে পাইয়া থাকি। ভারতীয় পুরাণে সৃষ্টি ও রাষ্ট্র, দুইয়ের গণনায় মন্বন্তর, কল্প, যুগনিরূপণে বিভিন্ন সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সৃষ্টি-গণনায় যুগকাল অতি-দীর্ঘ। মানবসভ্যতার ইতিহাসের কালগণনায় এই সৃষ্টিনির্ণয়ের দীর্ঘ গণনার নীতি গ্রহণীয় নহে। এই হেতু রাষ্ট্র-গণনায় পুরাণ বর্ণিত যুগ-সংখ্যা কোথাও সৌর, কোথাও বা চান্দ্র বৎসরানুযায়ী হিসাবে স্থির হইয়াছে। ইহাতেও অতি দীর্ঘ বৎসর-সংখ্যা হওয়ায়, যুগকে ৫ বৎসর ধরিয়াও ভারতের রাষ্ট্রেতিহাসের সময় নিরূপণ করা হইয়াছে।

অতি দীর্ঘ গণনাসংখ্যার ন্যায় এই লঘু সংখ্যাগণনা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব ৪১৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বের নিবিথ নির্ণয় করে। ভারতের ইতিহাস ইহাপেক্ষা প্রাচীনতম ইতিহাস। আমরা তাই সপ্তর্ষি-যুগ ধরিয়া মন্বন্তর-গণনার পক্ষপাতী। সপ্তর্ষিমণ্ডলী এক এক নক্ষত্রে শত বর্ষ অবস্থান করে। এই সপ্তর্ষি যুগ ধরিয়া গণনা করিলে, প্রত্যেক মন্বন্তর ৭১০০ বৎসর হয়। কেননা, পুরাণ ৭১ যুগে এক মন্বন্তরের হিসাব দিয়াছে। ১০০ বৎসর যুগ ধরিলে, পূর্ব্বোক্ত বৎসর সংখ্যা প্রত্যেক মন্বন্তরের কাল বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

বৈবস্বত মন্বন্তর ২৭ যুগ অতীত হইলে, কুরুক্ষেত্র সংগ্রাম সংঘটিত হয়। ইহার পূর্ব্বে ৬টী মন্বন্তর শেষ হইয়াছিল। তাহা হইলে দেখা যায়—কুরুক্ষেত্র-পূর্ব্ব ৪২ হাজার ৬ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতকে ঘিরিয়া মানবসভ্যতার ইতিহাস সূচিত হয়। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর বৎসর-গণনা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ভারত-রাষ্ট্রে আর্য্য-সভ্যতার অধঃপতনযুগ বৈবস্বত মনুর শেষ অংশেই সংসাধিত হইয়াছে। মনুসংহিতায় ৭টী মনুর রাজত্বকালের কথাই উক্ত হইয়াছে। এই ৭টী মন্বন্তরই ভারতের আর্য্য-সভ্যতার আয়ুষ্কাল। আমরা পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের পরীক্ষার কষ্টিপাথরে ভারতসভ্যতার ঘন ঘন পরিবর্ত্তনশীল যাচাই অপেক্ষা আত্মসম্বিৎ স্থির করিয়া ভারতের ঋষিপ্রবর্ত্তিত গণনাপদ্ধতিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বাধীন রাখিতে বলিব। কিছুর অনুগত করিতে গিয়া প্রাচীনকে বর্ত্তমানের যুক্তির মধ্যে নিপীড়িত করিলে, আমরা সত্যভ্রষ্ট হইব। ভারতের বৈদিক যুগ অন্ততঃ বর্ত্তমান কাল হইতে ৫০ হাজার বৎসরের প্রাচীন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

## অবান্তর প্রশ্ন

ভারত, ইরাণ ও গ্রীস—এই তিন দেশে প্রাচীন প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা ঈশ্বরতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রাণি-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণালব্ধ বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গ্রীক দার্শনিকদের সর্ব্ব প্রথম স্থান নির্দ্দেশ করেন, তারপর ইরাণীয়দের কথা কথঞ্চিৎ মূল্য দিতে অস্বীকৃত হন না, কিন্তু ভারতীয় প্রাচীন মনীষিদের কথা তাঁহারা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। অবশ্য এক শ্রেণীর মনীষী প্রাচ্যে বর্ত্তমানে দেখা দিয়াছেন, যাহারা ভারতের প্রাচীন ঋষিদের চিন্তাধারা শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিয়া গ্রহণীয় মনে করিতেছেন, কিন্তু ইঁহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

অর্ব্বাচীন যুগে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর প্রতিভা-বান্ মনীষী পূর্ব্বোক্ত বিদেশী পণ্ডিতদের মতবাদে সায় দিয়া ভারতের প্রাচীন তথ্যগুলি অপরিণত মস্তিষ্কের সৃষ্টি বলিয়া উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আর এক শ্রেণীর দরদী লোক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অভিমত অংশতঃ গ্রহণ করিয়া প্রাচীনদের দার্শনিক পরিকল্পনার সত্যতা-প্রমাণে উদ্যোগী হইয়াছেন। ভারতে আর এক তৃতীয় শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন, যাঁহাদিগকে সনাতনী বলিয়া বিদ্বৎসমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখা হইয়াছে। তাঁহারা প্রাচীন ঋষিদের দার্শনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞান শিরো-ধার্য্য করিয়া বসিয়া আছেন। প্রগতিশীল জগতে এইরূপ রক্ষণশীল স্বভাবের প্রয়োজন তখনই অনুভূত হয়, যখন বিচার ও অনুশীলনের ক্রম অতিক্রম করিয়া অর্ব্বাচীন সনাতনীর নিকটবর্ত্তী হয়। ভারতের কি অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, কি বস্তুবিজ্ঞান, অনেক ক্ষেত্রে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

বিশ্বের ইতিহাস বাহির করিতে গিয়া ভারতের বেদ, পুরাণ, মনু, পরাশর অবজ্ঞেয় হইয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর থেল্‌স্ অফ মিলেটাস যুগ হইতে এম, পি, ডোকলে, তারপর সপ্তদশ শতাব্দীর ক্যাণ্ট পর্য্যন্ত বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে চিন্তাধারার পরিপুষ্টি দেখিয়া ভারতের ঋষি-যুগের চিন্তার সহিত ইহারা যে একদিন সমপর্য্যায়ে উপনীত হইবেন, এইরূপ অনায়াসে মনে করা যায়। বর্ত্তমান Cosmogony-র আলোকে ভারতীয় পুরাণতত্ত্বের আলোচনা সুরু হইয়াছে। ভারতের আধুনিক পণ্ডিত-মণ্ডলী বেদব্যাসের পুরাণ ও ভাষ্য লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন।

আমরা এই বর্ষে অক্ষয়তৃতীয়া উৎসবে বিশ্ব-সৃষ্টির কাল ও ...ত লইয়া সাধ্যমত কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা করিয়াছি। এই অবস্থায় প্রাচীন পুরাণাদি লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতবাদের সহিত পরিচয় করিতে হইতেছে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হয়, এখনও অনেকেই বিজ্ঞান-বুদ্ধির মাপকাটিতে পুরাণ-বর্ণিত তথ্যকে মাপিয়া লোকগ্রাহ্য করার প্রচেষ্টা করিতেছেন। পুরাতনের দান কাটিয়া ছাঁটিয়া সংস্কার করিয়া লওয়ার প্রয়োজন নাই। ইহাতে অতীত চিন্তা-বৃত্তির একটী ক্রমকে বিকৃত করা হয়। উহা সত্য হউক, মিথ্যা হউক, বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাস-রক্ষার জন্য যথাযথ-ভাবে রক্ষা করা উচিত। অনুমানের রঙে আধুনিকতার উপযোগী করার আব্দার প্রাচীন ঋষিদের নাই। আমরা যদি নূতন কিছু আবিষ্কার করিতে পারি, তাহাই আমাদের শ্রেয়ঃ সাধন করিবে। ইহার প্রয়োজন আছে, একথা আজ বুঝাইয়া লাভ নাই।

উপরোক্ত কর্ম্মের জন্য ১৩৩৬ সালের আশ্বিন সংখ্যায় আমাদের শ্রদ্ধেয় লেখক শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগীর একটী লেখাও চক্ষে পড়িল। তিনি "প্রবর্ত্তকে" মিশরের ইতিহাস, বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া ভারতের প্রাচীনত্বের গৌরব-রক্ষায় যত্নবান্ হইয়াছেন এবং বাংলাকে আর্য্যসভ্যতার ধাত্রীরূপে প্রমাণ করার সাধু প্রয়াস করিয়াছেন। তাঁহার এই চেষ্টা প্রশংসাহ, সন্দেহ নাই। কিন্তু তবুও আমরা তাঁহাকে একটী অবান্তর প্রশ্ন করিব। তিনি মনুসংহিতাবর্ণিত ব্রহ্মাবর্ত্তের বিবরণ দিয়াছেন। এই ব্রহ্মাবর্ত্তের উত্তরেও ব্রহ্মাণী নদী এবং দক্ষিণেও ব্রহ্মাণী। একটী সাঁওতাল পরগণাও মুর্শিদাবাদে, আর একটী উড়িষ্যায়। ইহাই আদি মনুর । তাই তিনি ইহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত, এইরূপ লিখিয়াছেন। আমরা মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় অষ্টম শ্লোকে পাই "সরস্বতী ও দৃশদ্বতী, এই দুই দেব-নদীর মধ্যে যে প্রদেশ আছে, পণ্ডিতেরা সেই দেব-নির্ম্মিত দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত কহেন।" নিয়োগী মহাশয় কি উড়িষ্যা ও মুর্শিদাবাদের ক্ষীণকায়া ব্রহ্মাণী নদীদ্বয়ের একটী সরস্বতী ও অন্যটীকে দৃশদ্বতী বলিয়াছেন? তিনি এইরূপ বলার একটী যুক্তি দিয়াছেন। উত্তর ব্রহ্মাণীর নামান্তর সরস্বতী, ইহা প্রসিদ্ধ। দৃশদ্বতী সরস্বতীর অর্থ নহে, নামান্তর, তিনি ইহা বলিয়াছেন; ইহা কি তাঁহার কল্পনা? অথবা শাস্ত্র-যুক্তিসঙ্গত?

সরস্বতী ব্রহ্মাণীর নামান্তর যদি আমাদের অনুমান সত্য হয়, ইহা তিনি মৎস্য পুরাণের তৃতীয় অধ্যায় হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু মৎস্য পুরাণে উহাকে তো নদী বলা হয় নাই। উহা "স্ত্রীরূপমর্দ্ধমকরোদর্দ্ধং পুরুষ-রূপবৎ", এই ব্রহ্মাণী শুধু সরস্বতীর নামান্তর নহে, "সা খ্যাতা সাবিত্রী গায়ত্রীচ"। কিন্তু ব্রহ্মাণীর নামান্তর বলিয়া সরস্বতী ধরিলেও, তিনি দৃশদ্বতী কোথায় পাইলেন, আমাদের জানাইবেন কি? যে নদীর নাম সরস্বতী, তাহার পরিস্থিতি আমরা মহাভারতে পাই। বেদব্যাসের উক্তির উপর নিয়োগী মহাশয়ের যুক্তি থাকিলে, আমরা গৌরব অনুভব করিব। শল্যপর্ব্বে সরস্বতী নদীর নামান্তর আছে এবং উহার পরিস্থিতিও দেওয়া হইয়াছে। সেই পরিস্থিতির মধ্যে উড়িষ্যা বা মুর্শিদাবাদ নাই। রাজ-নির্ঘণ্টে সরস্বতী নদীর নয়টী নামান্তর আছে। ব্রহ্মাণী নাম মহাভারতেও নাই, রাজনির্ঘণ্টেও নাই।

দৃশদ্বতী আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব সীমায় প্রবাহিত ছিল এবং দৃশদ্বতীর নামান্তর ব্রহ্মাণী বলিয়া কোথাও দেখিলাম না। নিয়োগী মহাশয় আমাদের কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থ করিলে, আমরা সুখী হইব।

## ৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

গত সংখ্যার "প্রবর্ত্তকে" আমাদের পরম সুহৃদ্ ৺মহিম চন্দ্র দাসের মহাপ্রয়াণের সংবাদ পত্রস্থ করিতে হইয়াছে। দ্বিতীয় সংখ্যায় পুনরায় আর এক আমাদের নিকট বন্ধুর অকাল প্রয়াণের কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইল। অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ গত ২৩শে এপ্রেল মঙ্গলবার তাঁহার ঘাটশিলার ভবনে অকস্মাৎ হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘদিন যকৃৎ ও হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। কিছুদিন হইল কিছু সুস্থ হওয়ায়

চিকিৎসকগণের পরামর্শে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য ঘাটশিলায় গমন করেন এবং এইখানেই তাঁহার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় মাত্র ৬৩ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যে বাংলা দেশ আলোকিত হইয়াছিল। তাহার সর্ব্বতোমুখী কর্ম্ম-প্রেরণাও তাঁহার অসাধারণ জীবনের পরিচয় দিত। তিনি ছিলেন একখানি জীবন্ত এন্সাইক্লোপিডিয়া।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় কাশীধামে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া উপাধিভূষিত হন, কিন্তু কায়স্থ বলিয়া "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি তাঁহাকে প্রদান করা হয় নাই। তিনি ভারতীয় ও বিদেশীয় ২৬টী ভাষায় সুপণ্ডিত হন। পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা অবর্ণনীয়। ভাষা-বিজ্ঞানের সহিত ইতিহাসের প্রত্নতত্ত্বে তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্যের সহিত তাঁর কর্ম্মপ্রেরণারও অন্ত ছিল না। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে নানা ভাষায় পত্রাদি অনুবাদিত করার জন্য তিনি এক অনুবাদ-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর কলেজে তিনি অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। বঙ্গীয় পরিষৎ, এসিয়াটিক্ সোসাইটি প্রভৃতি দেশের বহু কৃষ্টি ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি একাধিক মাসিক পত্রিকার সম্পাদন করিয়াছেন। সম্প্রতিও "শ্রীভারতী" তাঁহারই বিপুল উদ্যমে বাহির হইতেছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "বঙ্গীয় মহাকোষ"-রচনায় আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সে কর্ম্ম সমাপ্ত করার জন্য তিনি শক্তি ও সম্পদ্ তুচ্ছ করিয়াছিলেন। দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে ইহার জন্য তাঁহাকে যাচ্ঞা করিতে দেখিয়াছি। বিদ্যানুরাগী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বিদ্যার দায়ে পরম সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন, আবার এই বিদ্যার দায়েই তিনি দৈন্যের মসীচিহ্ন ললাটে ধরিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ মহাকোষ সমাপ্ত করিবার সুব্যবস্থা যদি বাঙালী জাতি করে, তবেই তাহার পরলোকগত আত্মা শান্তি লাভ করিবেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পাণ্ডিত্যাভিমান ছিল না। তিনি বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। যেখানে তাঁহার ডাক আসিয়াছে, তিনি গললগ্নীকৃতবাস হইয়া সেইখানে গিয়াই উপস্থিত হইয়াছেন। পণ্ডিত বিদ্যাভূষণের সহিত আমাদের কেবল সাহিত্য-ক্ষেত্রেই পরিচয় নয়, "প্রবর্ত্তকে" তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া "সরস্বতী" শীর্ষক গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাবলী লিখিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করেন। পরে এই প্রবন্ধ তিনি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। তিনি অক্ষয়া তৃতীয়া উৎসবে প্রায় প্রতি বৎসর উপস্থিত থাকিয়া, ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি আলোচনা করিয়া সুধীজনকে তৃপ্তি দিয়াছেন। "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের" তিনি একজন পরম অনুরাগী বন্ধু ছিলেন। তাঁর বিদ্যাচর্চ্চার সংক্ষিপ্ত সূচীলেখমালা আমাদের দেখাইয়া তিনি বলিতেন "এই সকল ব্যবহার করার লোক পাইলাম না, মরিবার আগে এইগুলি সব আপনাদের দিয়া যাইব। কিছু না হোক, আপনারা ইহা রক্ষা করিতে পারিবেন।" আমরা সবিস্ময়ে তাঁহার প্রকাণ্ড খাতাগুলি উল্টাইয়া দেখিতাম—তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জটিল জ্ঞানভাণ্ডারের অসংখ্য তথ্য ও তত্ত্বের সাঙ্কেতিক সন্ধান শুধু লিপিবদ্ধ করেন নাই, যাবতীয় সাময়িক ও মাসিক সাহিত্যের বিষয়সূচিও ইহাতে সঙ্কলিত রহিয়াছে। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে কিছু পড়িলে, তাহা আর উপেক্ষিত হইত না। তাঁহার গৃহ-মন্দিরে অতি যত্নের সহিত উহা সুরক্ষিত হইত। কি অসাধারণ মস্তিষ্কের শ্রম তিনি করিয়াছেন, তাহা বুঝাইবার ভাষা আমাদের নাই। বাংলায় পণ্ডিত অমূল্য বিদ্যাভূষণের মনীষার তুলনা বুঝি মিলিবে না। তাঁহার স্থান আর পূর্ণ হইবে না। বাংলার আর একটী উৎসব প্রদীপ অকালে নির্ব্বাপিত হইল। আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারমণ্ডলীর সহিত সমব্যথী। "প্রবর্ত্তকে" আমাদের অশ্রুকণা এই পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিতেছি।' তাঁহার আত্মা পরম শ্রেয়ঃ লাভ করুন।

# সাধনার কথা

তুমি আর সে—জীব আর ভগবান—মাঝে কিছু নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে—ইহাই যুক্তির কথা। যোগের আশ্রয় ভক্তি। ভক্তি দুই প্রকার—মিশ্রা ও অমিশ্রা, মুখ্য আর গৌণ। গৌণ—বেদাশ্রয়। মুখ্য—প্রেমাশ্রয়।

প্রথম সাধন—আনুগত্য। আচার—সেবা। রোগের শুশ্রূষা, দরিদ্রকে দান—এ সেবা গৌণ। মুখ্য সেবা—জাতিকে ঐশ্বর্য্যে, জ্ঞানে বড় করা। ইহার কৌশল—শিক্ষা আর অর্থ-সাধনা।

আনুগত্য, সেবায় অন্তর-শুদ্ধি হয়। শুদ্ধ অন্তঃকরণেই দীক্ষার বীর্য্যলাভ হয়। যাঁর অনুগত, তিনি নেতা। দীক্ষাদাতা গুরু। গুরু-বিগ্রহ একাঙ্গ আশ্রয়। ভগবান বিরাট—তাঁর বহু ভাব, বহু অঙ্গ। শক্তির অনুরূপ সাধনাঙ্গ। যে একাঙ্গ সাধে, তার বহু অঙ্গও যথাকালে সিদ্ধ হয় ভক্তিবলের আতিশয্যে।

ভক্তিই রাগোৎপত্তির হেতু। রাগ পঞ্চবিধ। যেখানে ভক্তি, সেখানে রাগ। সংহতি-সৃষ্টি রাগের প্রথম লক্ষণ। সাধু-সংহতিই ভক্ত-সঙ্ঘ। এখানে অনৈক্য নাই, বিদ্বেষ নাই। দীক্ষিত জীবন-সমষ্টির স্বতঃপ্রকাশ প্রেম ও ঐক্যের ক্ষেত্র।

রাগের দ্বিতীয় লক্ষণ—ভজন। মানুষ সবার উপর—পরম তত্ত্ব। এই তত্ত্বে যার প্রীতি, তার ভোগত্যাগ অনিবার্য্য। শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-বৃত্তির পরমানন্দ ইষ্টমূর্ত্তির দর্শনে, স্পর্শনে, বাণীশ্রবণে, ইষ্টসেবায়। অন্য স্মৃতি, অন্য সংস্কার তত্ত্বকে ভুলাইয়া দেয়। সর্ব্বার্থসিদ্ধি তাই লয়যোগে। ইহাই পরম পুরুষার্থ। অনর্থনিবৃত্তি ইহার অন্য নাম। রাগের ইহা তৃতীয় লক্ষণ।

গুরু-তীর্থে বাস চতুর্থ। প্রীতি যার চিত্তে ঘনিমায় ভরিয়া উঠে, তার তত্ত্বের তীর্থে সতত নিবাস। গুরুধামই তার ইষ্টধাম। পরম ইষ্টধামপ্রাপ্তির কথা এই ক্ষেত্রে সিদ্ধ হয়। ভক্তি-নিষ্ঠার অটল ভিত্তির উপর সাধকের প্রতিষ্ঠা এই অবস্থায়।

পঞ্চমাঙ্গ সাধন—শ্রীমূর্ত্তির ধ্যানে শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি প্রজ্ঞার উদয়। ইহাই পরিপূর্ণ নবজন্ম। আদর্শের মোহে সে মানুষ আর প্রলুব্ধ নয়, নব-রতির উদয়ে তার হৃদয় পরিতৃপ্ত। এই রতির উদয়েই নব যুগধর্ম্মে রুচির আশ্রয়ে আসক্তি গাঢ় হয়। যাহা ছিল ভাব, তাহা হয় রস বস্তু। জীবন হয় ভাবসিদ্ধ অর্থাৎ রসঘন প্রেম-বিগ্রহ। সেই পরম সিদ্ধকেই চাহেন শ্রীভগবান।

অসংখ্য কর্ম্মের মাঝে বিচার কর সাধু যে জ্ঞান বিজ্ঞান—পরম সাধন তোমার সঙ্গী কিনা। বিচিত্র সাধনায়—সাধন-বিগ্রহ-রচনায় নবযুগের প্রবর্ত্তক হও। অন্তরঙ্গ সাধনরঙ্গে সাধনার সিদ্ধ-মূর্ত্তি যদি গড়িয়া উঠে, সে নব-তীর্থ-মন্দিরের গগনচুম্বী চূড়া সন্দর্শন করিতে অসংখ্য তীর্থযাত্রীর সমাগম হইবে। এই নূতন ধামের তাহারাই হইবে অধিবাসী।
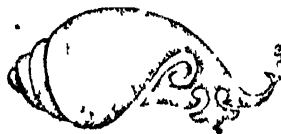
# বর্ত্তমান যুদ্ধের ত্রিমূর্ত্তি

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

ইউরোপে একটি সামরিক প্রবাদ প্রচলিত আছে—"Generals who start a war never finish it." বিগত মহাযুদ্ধে এই বাক্যের সত্যতা অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক-ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। গত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণবাহিনী যখন বেলজিয়মের উপর দিয়ে ঝটিকার গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন জার্ম্মাণীর পক্ষে সমরপরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন বিখ্যাত Count Helmuth Von Moltke, ফরাসীর পক্ষে ছিলেন General Joseph Jasques Joffre এবং বৃটিশের পক্ষে General John French. জার্ম্মাণীর ভাগ্যে Moltke-এর সমরকর্ত্তৃত্ব বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। মার্ণের (Marne) দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণ-বাহিনীর কর্তৃত্ব তাঁর হস্তচ্যুত হয় এবং যুদ্ধ শেষ হবার অনেক আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯১৫ সালে 'লুস' (Loos) রণক্ষেত্রে যে বিরাট্ ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান হয়, তারপরেই বৃটিশ সমর-নায়ক French-কে অবসর গ্রহণ করতে হয়। ফরাসী পক্ষে Joffre সেনানায়ক হিসাবে যদিও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন, তথাপি ভার্দুনের (Verdun) বিখ্যাত সংঘর্ষের পর তাঁকে কেউ প্রত্যক্ষ সংগ্রামপরিচালনায় কর্তৃত্ব করতে দেখেনি। এত বড় সেনানায়কের ভাগ্যেও অনিচ্ছাকৃত অপরাধের গুরুভার নিদারুণ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কারণ হয়ে উঠেছিল।

আবার আমরা এক ইউরোপীয় সঙ্কটের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছি। এবারেও বিগত মহাসমরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনটী মহারথ জাতির ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে অগ্রসর হয়েছেন। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণ পক্ষে সমর-পরিচালনা করছেন Colonel General Walther Von Brauchitsch, ফরাসী পক্ষে বিখ্যাত সমরবিশেষজ্ঞ General Marie Gustave Gamelin যুদ্ধ পরি-চালনার ভার গ্রহণ করেছেন। বৃটিশের পক্ষে আছেন Viscount Gort. বৃটিশ ফিল্ড-ফোর্সের ইনি সর্ব্বাধ্যক্ষ। ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ফলে এঁদের মধ্যে যে-কেউ হয়তো এক অতর্কিত মুহূর্ত্তে ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের অন্তরালে আত্মগোপন করতে বাধ্য হবেন। সে সম্ভাবনা সত্ত্বেও, বর্ত্তমান মহাসমরের এই ত্রিমূর্ত্তির পরিচয় জন-সাধারণের আগ্রহকে সজীব রাখবে, সন্দেহ নেই।

১৯৩৮ সালে Colonel General Walther Von Brauchitsch যখন জার্ম্মাণ-বাহিনীর কর্ণধার পদে উন্নীত হন, তখন ইউরোপের সামরিক মহলে যথেষ্ট বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। আমেরিকার একজন সামরিক বিশেষজ্ঞ সেই সময়ে এই মন্তব্য করেছিলেন—"a military mediocrity had been selected for the post." বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সেনা-নায়কের এই অসাধারণ ভাগ্যোন্নতির পশ্চাতে আছে সামরিক বিভাগে তাঁর অনলস কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও দীর্ঘস্থায়ী অভিজ্ঞতা। যদিও তিনি একজন নাৎসী নন, তথাপি নাৎসী গবর্ণমেণ্টের ভাবধারা তিনি সহজেই মেনে নিতে পারেন—তাঁর স্বভাবের এই দিকটাও তাঁর অসাধারণ ভাগ্যোন্নতির পক্ষে কম সহায়ক ছিল না। ১৯৩৮ সালে যখন জেনারেল ব্রাউসিচ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের সম্মান লাভ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৬ বৎসর। প্রাসিয়ায় তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা এবং ১৯০০ সাল থেকেই তিনি সামরিক বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। বিগত মহাসমরের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি 'ক্যাপ্টেন' পদে উন্নীত হয়েছিলেন এবং যুদ্ধ-শেষের সঙ্গে সঙ্গে 'মেজর' উপাধিতে ভূষিত হন। গত মহাযুদ্ধের অবসানে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে জার্ম্মাণ-বাহিনীর অস্তিত্ব প্রায় লোপ পায়। এই সময়ে তিনি সামরিক বিভাগে অনলস কর্ম্ম-প্রচেষ্টার পরিচয় দেন। ফলে তাঁকে পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ ইউরোপের সামরিক সমস্যাগুলির বিশেষজ্ঞ হিসাবে সম্মানিত করা হয়। ১৯৩৮ সালে জেনারেল ব্রাউসিচের কর্ম্মোন্নতির মূলে ছিল পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ ইউরোপের সামরিক সমস্যা সম্বন্ধে অগাধ অভিজ্ঞতা।

তাঁর এই অভিজ্ঞতা নাৎসী কর্ত্তৃপক্ষ পূরা মাত্রায় কাজে লাগিয়েছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণে। পোলাণ্ড-আক্রমণেও জার্ম্মাণ সেনানায়কের এই অভিজ্ঞতা যথেষ্ট কার্য্যকরী হয়েছিল। পোলাণ্ড আক্রমণের প্রথম দশ-দিনের সাফল্যে নাৎসী কর্ত্তৃপক্ষ এতদূর উৎসাহিত হয়েছিলেন যে, এই সময়ে তাঁরা জেনারেল ব্রাউশিচকে জার্ম্মাণ জাতির অন্যতম সামরিক প্রতিভা হিসাবে সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছিলেন। ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান যুদ্ধের (Franco-Prussian War) খ্যাতনামা বীর Moltke ও জগদ্বিখ্যাত Hindenburg এর ত্যক্ত আসনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী মনে করে' জার্ম্মান নরনারী তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন। কিন্তু জেনারেল ব্রাউশিচ কোনদিনই জনতার কোলাহলের সামনে আসতে সাহসী হননি। ব্যক্তিগত প্রচারের বিপক্ষে তিনি চিরদিন। চিরকাল তাঁর জীবন কেটেছে জনকোলাহলের বাইরে। আজ যদি সমস্ত জার্ম্মাণ জাতি তাঁকে শ্রেষ্ঠ সামরিক প্রতিভা হিসাবে পূজাও করে, তথাপি তিনি চিরদিন সৈনিক থাকতেই পছন্দ করবেন, এর চেয়ে বেশী উচ্চাশা তাঁর নেই।

প্রায় পঁচিশ বছর আগে বর্ত্তমান ফরাসী সেনানায়ক Gamelin বিখ্যাত ফরাসী বীর Joffre-এর অধীনে মেজরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ। সেই সময়েই প্রতিভাশালী অফিসার হিসাবে তিনি যথেষ্ট সুনাম করেছিলেন। মার্ণের (Marne) যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তিনিই সর্ব্বপ্রথম জার্ম্মাণ-বাহিনীর দুর্ব্বলতা কোথায়, তা' আবিষ্কার করেন। জেনারেল গ্যামেলিন খর্ব্বকায়, সেনানীসুলভ পরুষতার অভাব তাঁর চোখে মুখে; ব্যবহারে অমায়িক, আগন্তুক নিমন্ত্রিতের সঙ্গে তিনি রণকৌশল থেকে বার্গস-এর দার্শনিক থিয়োরী পর্য্যন্ত আলোচনা করতে পারেন। জেনারেল গ্যামেলিন যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, ফরাসী দেশে সেই পরিবারের বহু যুগ ধরে' সামরিক খ্যাতি আছে। ১৮৯৩ সালে তিনি গ্র্যাজুয়েট হন। এই সময় থেকে মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত তাঁর গতানুগতিক সামরিক জীবনে কোন বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। মহাযুদ্ধের সময়েই তিনি সত্য-কারের সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। নেপোলিয়নের সমর-কৌশলের প্রধান tactics ছিল শত্রুকে বহুধা বিচ্ছিন্ন করা এবং এই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অংশ একত্র হবার পূর্ব্বেই তাদের ধ্বংস করা। Joffre-এর নেতৃত্বে গ্যামেলিন এ কথা ভাল করে' বুঝেছিলেন যে, বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধে নেপোলিয়নের এই ঐতিহাসিক সমর-কৌশল সকল ক্ষেত্রে ফলপ্রদ হয় না। ১৯১৭ সালে গ্যামেলিন জেনারেলের পদ লাভ করেন। ১৯৩১ সালে তাঁকে জেনারেল ষ্টাফের অধ্যক্ষরূপে দেখা যায়। এই ঘটনার চার বছর পরে তিনি সামরিক জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ফরাসী বাহিনীর কম্যাণ্ডার ইন-চীফ পদে উন্নীত হন। গত বৎসর বসন্ত কালে তিনি যাবতীয় সৈন্যবিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বর্ত্তমান যুদ্ধে তার স্থান কতকটা Marshal Foch-এর অনুরূপ।

বিখ্যাত ইংরাজ সমরনায়ক Viscount Gort. সামান্য সৈনিকরূপে তার জীবন আরম্ভ করেন। ১৯১৪ সালে বেলজিয়মের উপর জার্ম্মাণ সৈন্যের গতিরোধ করবার জন্য যে এক লক্ষ বৃটিশ সৈন্য ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে প্রেরিত হয়েছিল, ভাইকাউণ্ট গর্ট ছিলেন তাহাদেরই একজন। তখন তিনি ক্যাপ্টেনের পদে কাজ করছিলেন। পঁচিশ বছর পরে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে আবার তিনি ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন। তফাৎ এই যে, এবার তিনি সমগ্র বৃটিশ সৈন্যের পুরোভাগে, সামরিক জীবনের সমস্ত মর্য্যাদা ও সম্মানে ভূষিত হয়ে অগ্রসর হয়েছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের সমরনায়কগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বকনিষ্ঠ, তাঁর বয়স বর্ত্তমানে ৫৩ বৎসর। বৃটেনের অভিজাত বংশে তাঁর জন্ম। একটু লাজুক প্রকৃতি, নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি কোনদিনই প্রচারশীল নন। গত মহাযুদ্ধে তিনি নানা সামরিক ব্যাজে ভূষিত হয়েছেন। লর্ড শ্রেণীর মধ্যে একমাত্র তিনিই "Victoria Cross"-এর সম্মান লাভ করেছিলেন। হ্যারো ও স্যাণ্ডহার্ষ্টে পড়াশুনা করবার পর তিনি ১৯০৫ সালে "সেকেণ্ড লেফ টেন্যাণ্ট" হিসাবে সৈনিক-জীবন আরম্ভ করেন। এই ঘটনার ২১ বৎসর পরে কর্ণেল রূপে তিনি ভারতবর্ষ ও চীনে সামরিক কার্য্যে যোগদান করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি ইম্পিরিয়াল জেনারেল-ষ্টাফের অধ্যক্ষ-পদে উন্নীত

হন। প্রায় ৩২ জন প্রবীণ জেনারেলের দাবী অতিক্রম করে' তিনি এই সম্মান লাভ করেন। এই সময়ে গর্ট তাঁর প্রতিযোগিদের মধ্যে ছিলেন সর্ব্বকনিষ্ঠ। এই ব্যাপারে তাঁর সহযোগী জেনারেলদের মধ্যে যথেষ্ট অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সমরবিশারদগণ তাঁর উন্নতিতে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। এই সময়ে Sir Ian Hamilton বলেছিলেন—"Thank God we are now under a proper soldier and shall not be shot sitting."

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কয়েক মাস পূর্ব্ব থেকেই তিনি ফরাসী সেনানায়ক গ্যামেলার সঙ্গে ইঙ্গ-ফরাসী যোগাযোগের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে এই দুই সমরনায়কের মিলিত অভিজ্ঞতা মিত্রপক্ষের অমূল্য সম্পদ, সন্দেহ নেই।

# যে তোমারে নিয়েছে শরণ!

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ধেয়ানের তপোবনে সুন্দর পথিকে হেরি' তপোভঙ্গে তন্বী ওঠে জেগে,
বকুলবনের ছায়া দুলে ওঠে পুষ্পসাজে যৌবনের পেয়ে আমন্ত্রণী;
বসন্তের মধুচ্ছন্দে অস্ফুট বাসনা-কলি কাঁপিতেছে অসহ আবেগে,
নীরব জ্যোৎস্নানিশি—জীবনের নদীবক্ষে শোনা যায় কলহাস্যধ্বনি।
নিঃশব্দে নিভৃতে আসি' কামনার রঙে রঙে সম্মোহিত আমি একা বহি,
কোথা কোন দূর পথে কেমনে ডাকিছে কারে! প্রতিধ্বনি শোনা যায় তার।
রাখিল প্রণতি-প্রেম প্রাণের আবেগে তন্বী যৌবনের উপচার বহি'
সুন্দর পথিক-পদে—প্রথম মিলনসুখে রসোচ্ছ্বাসে করিছে শীৎকার।

রজনীর ছায়াপথে চক্রের ঘর্ঘর তুলি' অতনুর চলে পুষ্পরথ,
মিলন-ব্যাকুল বিশ্বে সুদূরের প্রতিধ্বনি বাসনায় করে আত্মহারা।
প্রণয়-পিয়াসী পাখী অন্তর-আকাশ পানে খুঁজিতেছে চিত্ত-সুধাপথ,
শীধুপের সম আসে দক্ষিণের সমীরণ সাথে নিয়া মদমত্তধারা।
স্পন্দিত হৃদয় আজি। শোনা যায় প্রেমিকার রুণু রুণু নূপুরশিঞ্জন,
সুর যত সুপ্ত ছিল ত্রিদিবের তন্ত্রীমাঝে, জাগে তারা প্রেমের বিন্যাসে।
গগন অঙ্গন ভরি' তারকাকুসুমশ্রেণী শোভিতেছে স্নিগ্ধ নিরঞ্জন,
মন্দার-মঞ্জরী নিয়া দেবতার আশীর্ব্বাদ নিখিলের জ্যোতিঃস্রোতে ভাসে।

বসন্ত এসেছে মম। করো না বঞ্চিত মোরে, সঙ্গসুখে কর উজ্জীবন,
দেহের রোমাঞ্চে প্রিয় অলক্ষ্য দেবতা এস পান করি প্রেমসুধা নব।
সরম রাখিতে নারি, সহিতে পারি না আর যৌবনের তীব্র উদ্দীপন,
আলোড়নে আন্দোলনে মোর মৌন বিম্বাধর অভিসারে মাগে ওষ্ঠ তব।
নির্জ্জনে শবরী গাঁথে অন্তরের মাল্য তার নিরন্তর তব প্রতীক্ষায়,
পাষাণ-সমাধি বক্ষে চেয়ে দেখ অহল্যার চিত্ত চাহে তোমারি চরণ!
শ্রীমতী চাহিয়া রহে কুঞ্জের দুয়ার খুলি'—অশ্রু তার ঝরে মৃত্তিকায়,
মীরার মৃদঙ্গ কাঁদে, কেমনে ভুলিলে বন্ধু! যে তোমারে নিয়েছে শরণ!

# এমনি হয়

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

ধনাঢ্য এবং প্রথিতনামা ডাক্তার সত্যজিৎ দত্ত কলে বেরিয়েছে, এখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেনি। আর স্ত্রী সুধা অথবা মিসেস্ দত্ত শয়নকক্ষের ক্লকটার পানে চেয়ে দেখলে—রাত্রি হয়েছে অনেক। এত রাত্রি পর্য্যন্ত ডাক্তার তো আজকাল বাইরে থাকে না!

সিঁড়ি বেয়ে কে যেন উঠছে। পায়ের শব্দ পেয়ে মিসেস্ দত্ত এসে দাঁড়াল। দেখলে ওর স্বামীই।

ঘরে প্রবেশ ক'রে ডাক্তার দত্ত টুপিটা বিছানার উপর ছুঁড়ে দিয়ে চেয়ারে ব'সে প'ড়ল। ব'ল্লে, ভারী টায়ার্ড সুধা!

—টায়ার্ড তো তুমি রোজই।

ডাক্তার নেকটাই খুলতে খুলতে ব'ল্লে, আজ বড় বেশী পরিশ্রম হ'য়েছে। তোমাকে বিয়ে করবার পর, এই প্রথম আমার এত পরিশ্রম।

সুধা স্বামীর টুপিটা যথাস্থানে তুলে রেখে ওর পাশে এসে দাঁড়াল। ব'ল্লে, এত পরিশ্রম করা ঠিক নয় কিন্তু।

—কি করি বল? একে ডাক্তার, তার ওপর আবার বন্ধুর কেস্। ফেলে আসতে তো পারি নে।

সুধা স্বামীর গা' থেকে কোটটা খুলে নিতে নিতে ব'ল্লে, বন্ধু তো তোমার দেশশুদ্ধু সবাই। কিন্তু নিজের শরীর ভাঙলে তারা দেখবে?

ডাক্তার দত্ত সহাস্যে ব'ল্লে, না গো মহারাণি, সে বন্ধু আমার নয়। একবার আমার জীবন সে রক্ষা ক'রেছিল। নইলে, আজ তুমি এই স্বামী-দেবতাটিকে পেতে না। ভগবান এতদিনে বোধ করি, আমাকে ঋণশোধ করবার অবসর দিলেন।

—তোমার এমন বন্ধুও আছে?

—নেই—বল কি?

—কে সে—কে?

ডাক্তার দত্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। একটা সিগারেট্ ধরিয়ে ব'ল্লে, সেও মানুষ, নাম নলিনী সান্যাল। এখানে প্রফেসারী করে। ভারী গরীব ছিল আগে—এখন অবস্থাও কিছু বদলেছে। বিয়ে-থা করে নি। ক'রবে ব'লে আশাও নেই। একগুঁয়ে। কিন্তু সত্যিকারের মানুষ। আমি জানি, মানুষ হ'লে, শুধু মানুষের চেহারাটা থাকলেই হয় না। মানুষের চেহারাটাই মানুষের মনুষ্যত্বের আসল পরিচয় নয়। মনুষ্যত্বের আসল মাপকাঠি যা', তা' ওর মধ্যেই আছে। এবং তা' দিয়েই আমি ওকে চিনেছি।

আজ এতকাল পরে আবার এই নাম—নলিন সান্যাল। গরীব ছিল আগে, প্রফেসারী করে' অবস্থা এখন বদলেছে। বিয়ে-থা' করেনি। কর'বে ব'লে আশাও নেই। মিসেস্ দত্ত এই ভাবছে - অন্যমনস্ক হ'য়ে।

ডাক্তার দত্ত কাঁধ থেকে বাঁ হাত দিয়ে গ্যালিস্ নামাতে নামাতে ব'ল্লে, চমৎকার চেহারা, একেবারে অ্যাপোলো। গায়ে জোর অসীম। হাত ধরলে হাত যেন গুঁড়িয়ে যায়। পুরুষ বটে!

* * * *

প্রফেসার নলিনী সান্যাল সুধার মুখের দিকে চেয়ে ব'ল্লে, ব'স্‌তে পারি। কিন্তু আপনাকে একটু সাহায্য ক'রতে হবে। বালিশ দু'টো উঁচু ক'রে পিঠের দিকে দেবেন?

কথাটা যাকে উদ্দেশ ক'রে বলা হ'ল, সেই মানুষটি অনুরোধমত কাজ ক'রে এদিকটায় দাঁড়াল।

—আজ ভাল আছেন, না?

—অনেকটা। যা' আপনাদের সেবা আর শুশ্রূষার ঘটা! এতে যমেও ভয় পায়।

—উনি বলেন, আপনি একদিন ওঁর জীবন রক্ষা ক'রেছিলেন। সেই ঋণ শোধ দিতে গেলে সে, এর চেয়ে বেশী সেবা-যত্ন দরকার।

—সে-কথা ওর এখনও মনে আছে?

—থাকবে না? একি কেউ ভোলে, নলিনী বাবু?

—ভোলে—কিন্তু যারা ভোলে, তারা ডাক্তারের অনেক নীচুতে।

ঘড়িটার পানে চেয়ে সুধা ব'ল্লে, ওষুধ খাওয়াবার সময় হ'ল। যে আপনার বন্ধু—বাবা, একটু এদিক্ ওদিক্ হ'লেই রসাতল ক'রবেন।

ব'ল্‌তে ব'লতে ও ঔষধের শিশি এবং কাঁচের গ্লাস আনতে ওদিক্‌টায় চলে গেল।

এরই কিছুক্ষণ পরে ঔষধসেবনান্তে নলিনী ব'ল্লে, আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে, ভাবিনি। সুধা হাতের নখ খুঁট্‌তে খুঁটতে ব'ল্লে আপনার অসুখই এর জন্যে দায়ী। নইলে জীবনে হয়তো আর দেখা হ'ত না।

—সেই ভাল হ'ত। আপনি ডাক্তারের গৃহিণী হ'য়ে মনের সুখে দিন কাটাতেন, আর আমি এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়াতেম। কেউ কারুর মুখ দেখতে পর্য্যন্ত পেত না।

—তাহ'লে আপনি সুখী হ'তেন?

—হ'তেম বৈ কি।

—সুখী হ'তেন?

—ব'ল্লেম তো। শুধু সুখী নয়, মনে মনে অনাবিল সান্ত্বনাও পেতেম।

সুধা কিছুক্ষণ নীরব হ'য়ে রইল। এক সময়ে নলিনীর পায়ের কাছে ব'সে পড়ে' ওর পায়ের দিকে চেয়েই ব'ল্লে, আপনার মনে পড়ে, একদিন আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেম, আর আসবেন না?

নলিনী পা' গুটিয়ে নিয়ে ব'ল্লে, পড়ে। কিন্তু সেকথা আজ আবার কেন? ব'লেই হাত বাড়িয়ে বিছানার এক দিক থেকে একখানা বই তুলে নিলে।

—আজ আমিই আপনার কাছে, নলিনী বাবু। আমার স্বামীর টাকার অন্ত নেই, যশের অভাব নেই, স্নেহ-ভালবাসাও আছে। কিন্তু—কিন্তু সে তো ভালবাসেন ব'লে ভালবাসা নয়—সে যে ভালবাসতে হয় ব'লে ভালবাসা। এ দু'য়েরও কি প্রভেদ নেই আপনার কাছে?

নলিনী বাবু বইখানার পাতা উল্টাতে উল্টাতে ব'ল্লে, আমার বন্ধুর নামে এ-কুৎসা আমার কাণে না তোলাই ভাল।

সুধা একটু উত্তেজিতভাবে ব'ল্লে, আপনার বন্ধু, আমার স্বামী। তাঁর ব্যক্তিত্বের গলদ্ আপনাকে যতটাই দুঃখ দিক না কেন, তার চেয়ে অনেক বেশী আমাকে দেয়। এমনিই আমাদের হিন্দুধর্ম্মের বিয়ের মাদকতা। বইয়ে প'ড়েছি—মানুষ যখন মাদক দ্রব্যের সাহায্য নেয়, তখন তার নিজেকে সাহায্য করবার ক্ষমতা লোপ পায়। সেই দ্রব্যই তাকে পেয়ে বসে। কিন্তু যখন নেশা ছুটে যায়, তখন সে নিজেকে ফিরে পায়।

নলিনী সহসা এ-কথার কোন জবাব দিতে পারলে না। কি যে ও ব'ল্‌তে চায়, তাও ভাল ক'রে বুঝতে পারলে না। বইখানা পাশে রেখে ওর মুখের পানে চেয়ে ব'ল্লে, তার মানে?

সুধা সেইভাবেই ব'ল্লে, মানে যদি বুঝ্‌তে না পেরে থাকেন, তাতে আমার দুঃখ নেই, নলিনী বাবু! কিন্তু একদিন আসবেই, যখন এই কথার মানে বুঝতে গিয়ে আপনার চক্ষের দৃষ্টি অসম্মানিত হবে। তখন কিন্তু আমারও দুঃখের সীমা থাকবে না।

নলিনী বালিশটা মাথায় দিয়ে শুয়ে প'ড়ল। ব'ল্লে, আপনি যান। আজ আপনি বড্ড উতলা হ'য়েছেন।

সুধা বিছানা ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়াল। ব'ল্লে, আমি তো যাবই নলিনী বাবু। আপনার কাছে সমস্ত রাত্রি কাটাব না—এ জ্ঞান আমার আছে। কিন্তু নিজের দিকে একবার চেয়ে দেখুন তো, আপনার অন্তরটা কি আমার চেয়েও অস্থির হ'য়ে ওঠেনি?

নলিনী ওর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে ব'ল্লে, আমাকে ভুল বুঝ্‌বেন না, মিসেস দত্ত, আমি বিশ্বাসঘাতক নই।

সুধার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরুতে লাগ্‌ল। আজ ওর মাথার ঠিক নেই নিশ্চয়ই। ও ব'ল্‌তে লাগল, বিশ্বাসঘাতক নন? আপনি জানতেন না, আপনার ঐ দুঃখ-দারিদ্র্যকে বরণ ক'রে নেবার জন্যে একজন ঐশ্বর্য্য-শালিনী তার সমস্ত ত্যাগ ক'রতে চেয়েছিল? তার অন্তরের আহ্বান আপনি নিষ্ঠুরের মতই পদদলিত ক'রে চ'লে গিয়েছিলেন!

—আমি তো আপনাকে পদদলিত ক'রিনি, মিসেস্

দত্ত। আপনি শান্ত হোন। আমার অনেক কথা বলার ছিল। কিন্তু এখন আমি অত্যন্ত অসুস্থতা অনুভব ক'রছি। আপনি দয়া ক'রে থামুন।

—থা'মব? কিছুতেই না। আপনি আমার সমস্ত জীবনটাই ব্যর্থ ক'রে দিলেন।

সুধার কণ্ঠস্বর অশ্রু-আবেগে পূর্ণ।

—কিন্তু আপনি ভুলে' যাচ্ছেন মিসেস্ দত্ত, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে। আপনার মত একটা কাণ্ডজ্ঞানহীনা অব্রাহ্মণ মেয়েকে বিয়ে ক'রে সমাজের বাইরে যেতে পারি নে। কিন্তু আর নয়। অন্ততঃ, আমার এই অসুস্থতার দিকে চেয়ে একটু দয়া করুন।

ব'লতে ব'লতে নলিনী উপুড় হ'য়ে বালিশে মুখ গুঁজে' শুল।

সুধা এবার সত্যই কেঁদে ফেল্লে। ওর গাল বেয়ে চোখের জল ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে ঝরে' প'ড়তে লা'গল। ও সহসা নলিনীর পদদ্বয়ের উপরে মুখ গুঁজে বারম্বার শুধু এই কথাই ব'লতে লাগল—কেন আমার সুমুখে প'ড়লেন,—কেন আমি আবার এখানে এলেম।

ডাক্তার দত্ত'র বাড়ীর গেটে প্রফেসার সান্ন্যাল দেখলে, পাশের ঘরের মধ্যে অনেকগুলি ইলেক্‌ট্রিক্ লাইটের ঝাড্ জ্বলছে এবং ঘরের মধ্য থেকে অর্গানের ও নারীকণ্ঠস্বর এক সাথে মিশ্রিত হ'য়ে বাইরে বিস্তারিত হ'য়ে প'ড়েছে। গায়িকাটিকে ঘরের বাইরে থেকে দেখা যায় না, বাদ্যযন্ত্রটিও না। নলিনী ধীরে ধীরে প্রবেশ করে একটা নমস্কার ক'রলে।

গীত ও বাদ্য এক সঙ্গেই সহসা থেমে গেল। মিসেস্ দত্ত প্রতি নমস্কার ক'রে চেয়ার ছেড়ে' দাঁড়াল। ব'ল্লে, বসুন, এত দেরী কর'লেন যে?

নলিনী একখানা কৌচে ব'সে ব'ল্লে, কলেজ থেকে ফিরতে আজ দেরী হয়েছিল। একটুও leisure আজ পাইনি। কিন্তু আপনি তো চমৎকার গাইতে পারেন, এত দিন তো জানতেম না। গান 'বন্ধ ক'রবেন না—চলুক না!

—কোকিল সামনে এলে কাকের গান বন্ধ হ'য়ে যায় প্রফেসর।

ব'লতে ব'লতে ডাক্তার দত্ত পাশের পথ দিয়ে ঘরে প্রবেশ ক'রল। হাস্‌তে হাসতে ব'ল্লে, সুধার গানের প্রশংসা তোমার মুখেই শুনলেম। সকলেই বলে, কিছু না—তাল নেই, লয় নেই—কখনও বাড়ে, কখনও কমে। কণ্ঠস্বর? ওটাও আবার নাকি-সুরে ভরা। দূর থেকে শুনলে মনে হয়—কারুর প্রিয়জন ইহলোকের সমস্ত দেনা-পাওনা চুকিয়েছে বুঝি।

সাহেবী কায়দায় খাবার আয়োজন।...প্রফেসরকে লক্ষ্য ক'রে ডাক্তার ব'ল্লে, পোলাওটা বেড়ে হয়েছে হে, প্রফেসর। ওটা আর একটু খাও না।

প্রফেসর ব'ল্লে, না, ভাল জিনিষের কমটুকুই ভাল।

ফোন বেজে উঠল। ডাক্তার উঠে' পড়ে' বল্লে, আমায় উঠতে হ'ল।

একটু পরেই ফিরে এসে ব'ল্লে, তোমাদের ভোজে যোগ দেওয়া ভাগ্যে নেই। কল্ এসেছে—এখুনি যেতে হবে।

সুধা ব'ল্লে আসুকগে কল। খেয়ে যাও আগে।

ডাক্তার তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে ব'ল্লে, Impossible.

ডাক্তার বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরে প্রফেসর ব'ল্লে, মুখের গ্রাস ফেলে যেতে হ'ল!

সুধা ব'ল্লে, এমনি অর্দ্ধেক দিন হয়। ডাক্তারী করার সুখ দেখেছেন।

—তাইতো।

—শুধু তাইতো নয়, নলিনীবাবু! রাত্রে ঘুমিয়ে আছি—হঠাৎ ফোন বেজে' উঠল। শীত হোক, বর্ষা হোক, আমি মরি বাঁচি, সে দিকে লক্ষ্য নেই। চল্‌লেন রুগী দেখতে। মা'সের মধ্যে অন্ততঃ দিন পনের এমনি হয়—আমাকে রাত্রি কাটাতে হয় একা।

প্রফেসর একটা চপ্ ভেঙ্গে গালে ফেল্‌' দিলে। চিবতে চিবতে ব'ল্লে, ডাক্তারী পড়েছিল বটে! যেমনি শিক্ষা—

তেমনি হাত-যশঃ। ওর হাতে রুগী যেন মরতেই জানে না।

সুধা একটু চুপ ক'রে থেকে ব'ল্লে, বন্ধুর প্রশংসায় আপনি দেখছি পঞ্চমুখ। কিন্তু আপনার বিপদ্ যে এই বন্ধুটিকেই উপলক্ষ্য ক'রে আসতে পারে, নলিনীবাবু!

প্রফেসর জলপান ক'রে ব'ল্লে, তা' যদি আসে, আসুক। কিন্তু তাই ব'লে যে সত্যিই প্রশংসার পাত্র, তাকে প্রশংসা ক'রব না? নির্ম্মল আকাশে যখন চাঁদ উঠে সমস্ত ধরণীকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নামালায় ভাসিয়ে দেয়, তখন কি কেউ ঘন-মেঘাবৃত অমাবস্যার রাত্রির কথা ভাবে?

সুধা এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে বল্লে, নিজেকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে ভুলবেন না, নলিনীবাবু। সেই দিনের কথা মনে করুন, যে দিন আপনি নিজের মুখ দিয়ে ব'লেছিলেন, আমার মত একটা কাণ্ডজ্ঞানহীনা অব্রাহ্মণ মেয়েকে বিয়ে ক'রে আপনি সমাজের বাইরে যেতে পারেন না। সে তো অমাবস্যার রাত্রির কথা ভেবেই ব'লেছিলেন।

প্রফেসর একথার প্রত্যুত্তরে কিছু বল্লে না। চেয়ার ছেড়ে ও উঠে' দাঁড়াল। সুধাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। ব'ল্লে, রাগ ক'রলেন? আপনি যে দেখছি কিছুই খেলেন না।

—না, রাগ ক'রব কেন?

—তবে উঠে পড়লেন যে? ভয় ক'রছে আমাকে?

—ভয়? হয় বৈকি একটু!

—আমাকে ভয় করেন?

—ব'ল্লেম তো।

—তবে এলেন কেন? না আসলেই তো হ'ত।

—বেশ, এবার থেকে আর নেমন্তন্ন ক'রলেও আ'সব না।

সুধা অপ্রতিভ হয়ে নতমুখে বল্লে, মাপ করুন, নলিনী বাবু। ওকথা আর আমার জিবে আসবে না।

প্রফেসর হাসতে হাসতে বল্লে, এত মাপ ক'রলে, আমার অস্তিত্বই যে থাকে না।

* * *

ডাক্তার দত্ত হাতের তাসগুলি সক্রোধে টেবিলের উপর ছুঁড়ে' ফেলে দিয়ে ব'ল্লে, "Thieves, all of you are thieves"; ব'লতে ব'লতে ডাক্তার দত্ত পকেট থেকে এক গাদা নোট টেবিলটা লক্ষ্য করে' ছুঁড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বাড়ী এসে দেখলে, সেখানে মিসেস্ দত্ত নেই। দ্বারোয়ানকে প্রশ্ন ক'রে বুঝলে, একটু পূর্ব্বে ওর স্ত্রী সোফারকে ডাকিয়ে, গ্যারেজ থেকে গাড়ী বার করিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। কোথায় গিয়েছে, তা' ব'লে যায় নি।

কিন্তু ডাক্তার ধরতে পারলে, ও কোথায় গিয়েছে। ডাক্তারের অন্তরে সমুদ্রের তুফান বইতে লা'গল। যেখানেই যাক ও, একবার পূর্ব্বে ব'লে যাওয়া উচিত ছিল বৈকি।

ওদিকে মিসেস দত্তের মনের অবস্থাও বড় সুবিধাজনক নয়। ডাক্তারের সম্বন্ধে অনেক কুৎসা অনেক দিন থেকেই নীরবে শুনে আসছে। ডাক্তার যে জুয়াখেলায় অজস্র অর্থ নষ্ট ক'রছে, এ সংবাদটা সে প্রফেসারের মুখ থেকেই পেয়েছে।

মিসেস্ দত্ত যখন গাড়ী থেকে নেমে উপরে উ'ঠছিল, এমনি সময়ে প্রফেসর সান্যাল নীচে না'মছিল। সহসা ওকে দেখে ব'ল্লে, হঠাৎ এই অসময়ে?

মিসেস্ দত্ত সিঁড়ির একটা ধাপে দাঁড়িয়ে ব'ল্লে, বিশেষ দরকার আপনাকে।

—কি ব'লুন তো? ডাক্তার গাড়ীতেই ব'সে রইল নাকি?

—না, আমি একাই সোফারকে নিয়ে চলে' এসেছি।

—একাই?

মিসেস্ দত্ত সে কথার প্রত্যুত্তরে কিছু না বলে' একটু চুপ ক'রে থেকে ব'ল্লে, ওপরে চলুন।

প্রফেসর ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রতে লা'গল। সহসা এক সময়ে মিসেস্ দত্তের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে ব'ল্লে—কি ক'রে জানলেন, আজ ও ক্লাশ খেলতে গিয়েছে? সে তো নিজের কলেও বেরুতে পারে।

মিসেস্ দত্ত ব'ল্লে, না কলে বেরয়ই নি। ড্রয়ারের মধ্যে আজ দুপুরে আমি ওর কাছ থেকে এক রকম জোর ক'রে, ঝগড়া ক'রে, দু'হাজার টাকা লুকিয়ে রেখেছিলেম।

আপনার বন্ধু বেরিয়ে যাবার প্রায় ঘণ্টাখানেক পর আমার হঠাৎ কেমন সন্দেহ হওয়াতে ড্রয়ার খলে' দেখলেম—একটা আধলা পর্য্যন্ত নেই। সব নিয়ে গিয়েছে। কলে বেরবার সময় টাকা নিয়ে কখনও যায় না, এ আমি জানি।

—অন্য কাজে নিতে পারে তো।

প্রফেসর একটু ভেবে ব'ল্লে।

—না, তাও নয়, নলিনী বাবু।

মিসেস্ দত্ত তৎক্ষণাৎ ব'ল্লে।

প্রফেসর চিন্তা ক'রে ব'ল্লে, আচ্ছা, আপনি আজ বাড়ী যান। আপনি মেয়েছেলে, সেখানে গিয়ে কি ক'রবেন?

—ওর স্ত্রী এসেছে ব'লে, ওদের যদি দয়া হয়—তাই।

—আপনি ক্ষেপেছেন, মিসেস্ দত্ত? ওর যদি নিজের ইচ্ছে না হয়, তা'হলে জোর ক'রে, ওকে বিরত করা যাবে না—তারাও কিছু ক'রতে পারবে ব'লে আদৌ মনে হয় না।

মিসেস্ দত্ত কাঁদ কাঁদ হ'য়ে ব'ল্লে, তবে—তবে কি হবে নলিনী বাবু? আমার চোখের সামনে এমনি ক'রে আমার স্বামী নষ্ট হয়ে যাবে, আমি চুপ ক'রে ব'সে থাকব?

প্রফেসর সে কথায় কাণ না দিয়ে কি যেন ভাবছিল। ব'ল্লে, এমনি ভাবে আমার কাছে স্বামীর বিনা অনুমতিতে চ'লে আসা অত্যন্ত অশোভন হ'য়েছে। আপনি এখুনি বাড়ী ফিরে' যান।

মিসেস্ দত্তের দু'চক্ষুর কোণ বেয়ে অশ্রুবিন্দু ঝ'রে প'ড়তে লা'গল। অশ্রু মুছতে মুছতে সে ব'ল্লে, নলিনীবাবু, আপনি নিজের দিক্‌টাই সব চেয়ে বড় ক'রে দে'খছেন। ভা'বছেন, আপনার এই নিঃসঙ্গ অবিবাহিত জীবনটার মধ্যে একটা বিবাহিতা নারী আজ এমনি সময়ে ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হয়ে আপনার নির্ম্মল চরিত্রে কলুষতার ছাপ দিয়ে যাবে। এত বড় আপনার স্বার্থ! কিন্তু এক বারও ভেবে দেখলেন-না যে কি উৎকণ্ঠা, কি ব্যাকুলতা নিয়েই না আজ আপনার কাছে এসেছি! আগে ভেবেছিলেন, আমার স্বামীর দুর্ব্বলতা আমার চোখের সুমুখে উন্মোচন করলে, আপনার জয় হতে পারে। তাই দিনে দিনে আমার স্বামীর, আপনার বন্ধুর চরিত্র সম্বন্ধে আপনি বড় বেশী উৎসুক হ'য়ে উঠেছিলেন।

প্রফেসর সান্ন্যাল স্তম্ভিত, বিস্মিত, নীরব। সে শুধু নিষ্পলক চক্ষে সুধার মুখের পানে চেয়ে রইল। এবং ও ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার উপক্রম করছিল, সেই সময়ে প্রফেসর তার কাছে এসে ব'ল্লে, দেখুন মিসেস্ দত্ত, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি আপনাদের অহিতকর কিছু ক'রব না। আপনি রাগ ক'রে আমার আশ্রয় থেকে যাবেন না।

মিসেস দত্ত একথার প্রত্যুত্তরে কিছু ব'ল্লে না বটে, তবে ও সত্যই রাগ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মাঘমাসের বাইশ-তেইশ তারিখ। গত দু'দিন শীতের প্রভাবটা একেবারে কমে' গিয়ে ফাল্গুনের মাঝামাঝি দখিনে হাওয়া দিচ্ছিল। কিন্তু আজ প্রত্যুষ হ'তেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে এবং পুনরায় শীতের বাতাস সুরু হয়েছে।

মিসেস দত্ত গায়ে একটা হাতে-বোনা গরম মাফ্‌লার জড়িয়ে যখন প্রফেসর সান্ন্যালের পাশে এসে দাঁড়াল, তখন ও একখানা ইংরেজি বই পড়ছিল খুব মনোযোগ দিয়েই। সুতরাং এর আগমন সে টের পেলে না।

সহসা হাতের বইখানা উধাও হ'ল। প্রফেসর ঘাড় ফিরিয়ে চাইতেই মিসেস্ দত্ত হেসে ফেল্লে, ব'ল্লে, ভারী পড়ায় মন যে। একটা লোক ঘরে ঢু'কল, তা' মশাই দেখতেই পেলেন না।

বল্‌তে বল্‌তে সে এদিকে এগিয়ে এল।

প্রফেসর সে কথার জবাব না দিয়ে ওর মুখপানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ব'ল্লে, আপনার শরীর যে বড় খারাপ দেখছি।

মিসেস দত্ত বিছানার এক প্রান্তে ব'সে ব'ল্লে, বেশ আছি তো—খু-উ-ব ভাল আছি। দিব্যি মটর গাড়ী চ'ড়ছি, টাকার তোড়া নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রছি, দামী দামী গয়না গায়ে উঠছে—আর কি চাই?

প্রফেসর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে টেবিলটার উপর অকারণেই আঙুলের টোকা মারতে মারতে বল্লে, দু'তিন

রাত্রি বিনা নিদ্রায় কাটালে যেমন চেহারা হয়, আপনারও ঠিক্ সেই রকম হয়েছে। কিন্তু ডাক্তারের গৃহিণী হ'য়ে আপনার এসব অত্যাচার কেন?

মিসেস দত্ত হাতের বইখানার পাতা উল্‌টাতে উলটাতে ব'ল্লে, চমৎকার আপনার প্রশ্ন, নলিনীবাবু! ডাক্তারের বাড়ীতে সবচেয়ে বেশী শরীরের অযত্ন হয়, তা' বুঝি জানেন না?

প্রফেসর ক্ষণকাল মৌন হ'য়ে রইল। তারপর এক সময়ে ব'ল্লে, না না, এ অতীব অন্যায়, মিসেস্ দত্ত। বাঁচতে গেলে শরীরকে অযথা কষ্ট দিলে চ'ল্‌বে কেন?

—আমার বেঁচে থাকবার সাধ নেই, নলিনীবাবু।

—সে কি মিসেস্ দত্ত? আপনার এত ঐশ্বর্য্য, স্বামীর সম্মান, যশ, খ্যাতি এতদ্‌সত্ত্বেও আপনার বাঁচতে সাধ নেই?

—না নেই, নলিনীবাবু। যে সব জিনিসকে ধরতে ছুঁতে পারা যায়—সেই হ'ল আপনার সব চেয়ে বড় জিনিষ—আর যে মন, যা' এ সবের অনেক উচুতে—যার গতি কত দূর কেউ ব'ল্‌তে পারে না, তাকে বরাবরই তুচ্ছ ক'রে গেলেন। নিজের মনকে সম্মান ক'রতে শিখলেন না। বরাবরই এটাকে একটা সংযমের আবরণ দিয়ে ঢেকে' রেখে দিলেন—একবার উন্মোচন ক'রে দেখবারও বাসনা নেই কি—যে, এই ঈশ্বরের দেওয়া অপার্থিব জিনিষটা ম'রে আছে, না বেঁচে আছে?

একটু পরেই প্রফেসরকে উত্তর দেবার অবসর না দিয়ে সে আবার ব'ল্লে, আচ্ছা আপনিই ব'লুন না, আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকি? পড়ার সখ ছিল। তাও পোড়া বিয়ে ক'রে মিটল না। একটা ছেলেমেয়েও নেই যে, দু'দণ্ড নিয়ে ভুলে' থাকি। আচ্ছা নলিনীবাবু, আপনি আমাকে রোজ এক ঘণ্টা ক'রে পড়াবেন?

—সে আর বেশী কথা কি। কিন্তু মেয়েদের আই-এ পর্য্যন্ত পাস করাই যথেষ্ট। আর কেন?

মিসেস্ দত্ত বিছানা ত্যাগ ক'রে মাটিতে দাঁড়াল। এর একটু পরেই ঘরের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে ব'ল্লে, আপনারা বড় স্বার্থপর। নিজেদের গলদ চাপা দেবার মতলবে মেয়েদের শিক্ষাটাকে ঘৃণা করেন।

প্রফেসর ব'ল্লে, ঘৃণা করার কথা ওঠেনি। আমি ব'লেছি, আর বেশীদূর এগোনো দরকার নেই। একটু পরে ব'ল্লে, আর স্বার্থপরতার কথা যখন উ'ঠল, তখন আমিও ব'লি যে, আপনারাই বা কম কি? লেখাপড়ার দিক দিয়ে নাই ধরলেন—কিন্তু অন্য দিক্ দিয়ে আপনাদের স্বার্থপরতা উপেক্ষা করবার বস্তু নয়।

মিসেস্ দত্ত এতক্ষণ খোলা জানালাটার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। প্রফেসরের ঐ কথাগুলি কানে যেতেই ও এদিকে ফিরে চাইলে, ব'ল্লে তার মানে?

—আমার বলার দরকার করে না। নিজেই বুঝতে পারছেন।

মিসেস্ দত্ত প্রফেসরের অত্যন্ত সন্নিকটে এসে ব'ল্লে, বুঝেছি। আপনার কাছে যে ছুটে' আসি, সেটা আমারই স্বার্থপরতা, কিন্তু......

এই পর্য্যন্ত ব'লে ও একটু চুপ্ ক'রে রইল। ব'ল্লে, কিন্তু এর গোড়ায় যে স্বার্থত্যাগ আছে, সেটাকে তো চিনলেন না, নলিনীবাবু। কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে যে অস্থির হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়, তার মনের শুধু কলুষতাই আপনাদের চোখে পড়ে, আর কিছু দেখতে আপনাদের ভাল লাগে না, ইচ্ছেও হয় না। ওতেই আপনারা তুষ্ট হন, না?

—তুষ্ট হই নে, দুঃখ হয়। আমার কথা আপনার ভুলে' যাওয়া উচিত ছিল। আপনি এখন আমার বন্ধু পত্নী। তাকে ভালবেসে আপনি আমাকে এখন বিস্মৃত হ'ন, এই আমার অনুরোধ।

মিসেস্ দত্ত পুনরায় শয্যার একপার্শ্বে ব'সে ব'ল্লে, আপনি কি চান নলিনীবাবু, যে স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসি ব'লে থিয়েটারের অভিনেত্রীর মত ছলনা ক'রে ওর মন ভোলাব'? সে আমি পারব না।

প্রফেসর মৌন হ'য়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর এক সময়ে মুখ তুলে' ব'ল্লে, আপনি কোনদিন ডাক্তার দত্তকে বাধা দিয়েছিলেন?

মিসেস্ দত্ত এবার সহসা বিছানা পরিত্যাগ ক'রে উঠে মাটিতে দাঁড়াল এবং এক মিনিটের মধ্যেই গায়ের ব্লাউজটার

পিঠের অংশটা ঈষৎ নীচু ক'রে বাঁ হাত দিয়ে একটু উপর দিকে তুলে' ব'ল্লে, এই দেখুন তার চিহ্ন, নলিনীবাবু।

প্রফেসর বিস্মিত হ'য়ে ব'ল্লে, কি ক'রে হ'ল ?

মিসেস দত্ত ব্লাউজটা নামিয়ে হাসতে হাসতে ব'ল্লে, আপনার গুণধর বন্ধুর কীর্ত্তি—বেতের বাড়ি সেদিন রাত্রে মেরেছিল।

—মেরেছিল, আপনাকে ?

মিসেস দত্ত সেই ভাবেই ব'ল্লে, না মারেনি। রামচন্দ্র যেমন আদর ক'রে কাঠবেড়ালীর গায়ে হাত বুলিয়ে চিহ্ন রেখে দিয়েছিল, আপনার বন্ধুও তাই ক'রেছে। এ তার প্রেমের নিদর্শন।

এত বড় নিষ্ঠুর এবং অকাট্য প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রফেসর কোন যুক্তিই খুঁজে পেলে না। সে শুধু মিসেস দত্তের মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে চেয়ে কিসের যেন সন্ধান ক'রতে লা'গল।

সকাল থেকেই আজ সমস্ত আকাশ থম্‌থম ক'রছে। যেমন সদ্য বিবাহিতা কন্যা আজন্ম পিতার আলয়ে লালিত পালিতা হ'য়ে শ্বশুরবাড়ী যাবার পূর্ব্বে সমস্ত মুখখানা অশ্রুবেগে থম্‌থমে ক'রে তোলে, অনেকটা সেই রকম আজ আকাশের অবস্থা।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বৃষ্টি নামল ঝম্‌ঝম্‌ ক'রে। এক সঙ্গে ঝড়েরও গতি প্রবলভাবেই চ'লতে লা'গল। যেন, ওরা দু'টিতে প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে।

এমনি যখন প্রাকৃতিক অবস্থা, তখন ঘরের ভিতরে ডাক্তার দত্ত আর প্রফেসর সান্যাল মুখোমুখী দু'খানা চেয়ারে ব'সে কথা কাটাকাটি ক'রছিল। সহসা এক সময়ে ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে চলাফেরা ক'রতে লাগল। মুখে তার পাইপ্‌। সেটাকে বাঁ হাতের সাহায্যে মুখ থেকে নামিয়ে প্রফেসরের দিকে চেয়ে ব'ল্লে, 'You love my wife': তুমি আমার স্ত্রীকে ভালবাস। কিন্তু তুমি জান না, আজ এই মুহূর্ত্তেই তোমার মাথার খুলি চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিতে পারি।

ব'লতে ব'লতে ডাক্তার টেবিলের ড্রয়ার টেনে, একটা অস্ত্র হাতে তুলে' নিলে। বৈদ্যুতিক আলোকে সেটা ঝক্‌মক্‌ ক'রে উঠ্‌ল।

প্রফেসর ওটার পানে একবার চেয়েই ডাক্তারের মুখের দিকে দৃষ্টি ফেরালে। কিন্তু নির্ভীকভাবেই ব'ল্লে, ডাক্তার, একদিন তোমাকেই আমি জীবন দিয়েছিলেম। সে কথা একবার স্মরণ কর। সেই পাড়াগাঁয়ের নির্জ্জন পথ দিয়ে রাত্রে যখন তোমাতে আমাতে পায়ে হেঁটে আসছিলেম, তখন তোমার 'পর হঠাৎ চারজন লোক লাফিয়ে প'ড়েছিল তোমার অর্থের প্রাচুর্য্য তোমার সর্ব্বাঙ্গে লেপে ছিল তোমাকে মেরে' তারা যে সামগ্রী পেত, তার মূল্য বোধ করি এক্‌খানা বর্দ্ধিষ্ণু গাঁয়ের পাঁচ-সাতগুণ হ'ত। কিন্তু সেই চার জন শক্তিশালী দুর্ব্বৃত্তের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল এই দু'খানা হাত। ডাক্তার, এখনও এর শক্তি যায়নি। তোমার এ বিজ্ঞানটাকে যদি ভয় ক'রতেম, তা' হ'লে আজ আমার অগ্নিপরীক্ষা জেনেও স্বেচ্ছায় তোমার কাছে আ'সতেম না।

ডাক্তার পাইপটা টেবিলের উপর রেখে ব'ল্লে, তুমি এত অস্ত্রকে ভয় কর না নলিনী ?

নলিনী হাসতে হাসতে ব'ল্লে, কিছুমাত্র নয়, ডাক্তার। ওর [illegible] ব্যবহার তো তোমারই হাতে। ডাক্তার, পেছন দিকে চেয়ে দেখ, তোমার স্ত্রী এসেছেন।

—কে সুধা ?

ব'লতে ব'লতে ডাক্তার ঘাড় ফিরিয়ে চাইলে।

—তুমি এখানে, কেন ? তুমি এখানে কেন ?

ডাক্তার ব'ল্লে, উত্তেজিতভাবে।

সুধা সে কথার প্রত্যুত্তরে কিছু ব'ললে না। কেবল ধীরে ধীরে এগিয়ে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর প্রফেসরের মুখের পানে চেয়ে ব'ল্লে, আপনি যান এখান থেকে। জেনেশুনে কেন অপমান হ'তে এসেছেন ?

প্রফেসর উঠে দাঁড়িয়ে ব'ল্লে, অপমান হ'তে আসেনি। আপনার স্বামী আমাকে খুন ক'রবে ব'লে আহ্বান ক'রে এনেছে। দেখছেন না, হাতে ওর কি অস্ত্রটা রয়েছে।

সুধা ব'ল্লে, দেখেছি। যাঁদের দৈহিক শক্তির অপব্যবহার হয়, যাদের শক্তি থাকে না, তারাই অস্ত্রের সাহায্য

নেয়। কিন্তু এও আমি ব'লছি—অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাদেরই দমান যায়, যারা অস্ত্র নিয়ে পরকে ভয় দেখায়।

ডাক্তার ধীরে ধীরে নত মস্তকে রিভলভারটা যথাস্থানে রেখে', টেবিলের উপর থেকে পাইপটা তুলে' নিয়ে ধূম নির্গত ক'রতে লা'গল। এবং এক সময়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে প্রফেসরের একখানা হাত চেপে ধ'রে ব'লে, Excuse me, Nalini.

প্রফেসর হাত ছাড়িয়ে শুধু হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কোন কথা ব'ল্লে না।

আজ মধ্যাহ্নে যাবার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। প্রফেসর বইগুলি গুছাচ্ছে ব্যস্ত। এমন সময়ে সিঁড়ি থেকে জুতার শব্দ উঠে ক্রমশঃ তার ঘরের দিকে এগিয়ে আ'সতে লা'গল। প্রফেসর ঘরের বাইরে আ'সতেই দেখলে, এ আর কেউ নয়—স্বয়ং মিসেস্ দত্ত।

মিসেস দত্ত ওর পাশ দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রেই থমকে দাঁড়াল। প্রফেসরের মুখের উপর চোখ তুলে' ব'ল্লে, একি, নলিনীবাবু?

প্রফেসর ঘরের মধ্যে এসে ব'ল্লে, আর কি—কলকাতার অন্নজল আমার উ'ঠল।

—মানে?

—আজ চ'ললেম।

—চ'ললেন, কোথায়?

—পাটনা।

মিসেস দত্ত একখানা টুলের উপর বসে' পরে ব'ল্লে, পাটনা? পাটনা কেন?

প্রফেসর স্যুটকেশটায় চাবী দিতে দিতে উত্তর দিলে, চাকরীর চেষ্টায়।

—ক'লকাতায় তো ক'রছেন।

—ছেড়ে দিয়েছি। এখন আর ক'রি না।

—ছেড়ে দিয়েছেন?

—হুঁ।

—কেন?

—ভাল লা'গল না।

মিসেস্ দত্ত শুনে ক্ষণকাল নীরব হয়ে রইল। তারপর এক সময়ে ব'ল্লে, বুঝেছি, নলিনীবাবু, আমাকে ফাঁকি দেওয়াই আপনার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি ছা'ড়ব না, আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

প্রফেসর ওর দিকে ফিরে দাঁড়াল, ব'ল্লে, সে কি, মিসেস্ দত্ত? আমার সঙ্গে যাবেন কি? তাও কি কখনও হয়?

—খুব হয়। রামচন্দ্রকে সীতা অনুগমন ক'রেছিল।

—কিন্তু সীতা রামচন্দ্রেরই ছিল। আপনি ডাক্তার দত্তের

মিসেস দত্ত উঠে' দাঁড়াল। কণ্ঠস্বরে অসম্ভব দৃঢ়তা এনে ব'ল্লে, না-না নলিনীবাবু—ডাক্তার দত্তের আমি নই।

প্রফেসর একটু চুপ ক'রে থেকে ব'ল্লে, ছি! মিসেস দত্ত, ও-কথা মুখ দিয়ে বের করাও আপনার পাপ।

—পাপ? ব'লতে ব'লতে মিসেস দত্ত একেবারে সিধে হ'য়ে দাড়াল। ব'ল্লে, পাপ? আমার মনের কথা মুখ দিয়ে বের ক'রলেই হ'ল পাপ? আর আপনি আমার মন দিয়ে আমাকে উপেক্ষা ক'রে, বঞ্চনা ক'রে নিজেকে বাঁচাতে যে স'রে প'ড়ছেন, সেটা হ'ল মহা-পুণ্যের কাজ?

প্রফেসর ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ব'ল্লে, পথে ঘাটে চ'লতে অনেক মেয়েরই মন পাওয়া যায়। তাই ব'লে কি সবাইকে মনের পরিবর্ত্তে মন দিতে হবে?

মিসেস্ দত্ত কুল্-কুল্ ক'রে ঘা'মতে লা'গল। ওর অত্যন্ত ফর্সা মুখখানা সিঁদুরের মত টক্‌টকে লাল হয়ে উঠেছে। গ্রীবা উন্নত ক'রে সে প্রফেসারের অত্যন্ত কাছে এগিয়ে এল। এত কাছে এল যে, প্রফেসর ওর উষ্ণ নিশ্বাস মুখের উপর অনুভব ক'রলে।

ব'ল্লে, শুনুন নলিনীবাবু। আজ আমি স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে এসেছি। উনি আমায় মুক্তি দিয়েছেন। এখন আপনি আমার একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র ভরসা একমাত্র সম্বল। আপনি আমার ব্যবস্থা না ক'রলে, পথের কুকুরের মত আমাকে ঘুরে' বেড়াতে হবে।

প্রফেসর অত্যন্ত উষ্ণ হ'য়ে ব'ল্লে তোমার মত মেয়ের কুকুরের মত মরা উচিত, ঘুরে' বেড়ান কি? যে

তার স্বামীকে ত্যাগ ক'রে পরপুরুষের সঙ্গ পেতে চায়, তাকে আমি পদাঘাত করি।

মিসেস্ দত্তের চোখ থেকে আগুন ঠিক্‌রে বেরুতে লা'গল। ব'ল্লে, নলিনীবাবু, একদিন বিষ খেয়ে মরতে গিয়েছিলেম। কিন্তু সে দিন মরা হয়নি। তাই আজ ঠিক্ ক'রেই এসেছি, হয় আমাকে নিতে হবে, আর নয় তো·

ব'লেই সে ব্লাউজের ভিতর থেকে হঠাৎ একটা পিস্তল বার ক'রলে। সেটা প্রফেসরের বুকের দিকে লক্ষ্য ক'রে ব'ল্লে, ভেবেছেন একটা নারীর মনকে নষ্ট ক'রে দিয়ে রেহাই পেয়ে যাবেন, আরও কতকগুলো নারীর মনকে নষ্ট ক'রতে? কিন্তু সে আর হ'ল না, প্রফেসর। এই পিস্তল তোমাকে আগে শেষ ক'রবে, তারপর আমি। সে কী মজা হবে প্রফেসর! রোমিও-জুলিয়েট যেমন মুখোমুখি হ'য়ে মরেছিল, তেমনি আমরাও মরব। হি হি-হি! সে কী আনন্দ, সে কী সুখ, প্রফেসর।

প্রফেসর একটুও ন'ড়ল না, একটুও স'রে দাঁড়াল না। মিসেস্ দত্তের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে ব'ল্লে, আমার ইচ্ছে না থাকলেও, প্রাণের ভয় দেখিয়ে আমার ইচ্ছেকে টেনে আন্‌বেন?

মিসেস্ দত্ত সেইভাবেই পিস্তল ওর দিকে লক্ষ্য ক'রে ব'ল্লে, পিস্তলের ভয় তুমি কর না, তা' জানি। কিন্তু একটা নারী যদি তার সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে তোমার এতটুকু প্রেম প্রার্থনা ক'রে অপমানিতা, লাঞ্ছিতা হয়, তবে সে যদি এই পিস্তলের গুলি নিজের বুকের মধ্যে প্রবেশ করায়, তাতেও কি তুমি ভীত হও না, প্রফেসর?

—তোমার মরাই মঙ্গল। আমার বন্ধুর তোমার মত স্ত্রী না থাকাই শ্রেয়ঃ।

মিসেস্ দত্তের দুই চক্ষু অশ্রুতে এবার পরিপূর্ণ হ'য়ে উ'ঠল। শুভ্র গণ্ডের উপর দিয়ে অশ্রুবিন্দু যখন ঝ'রে প'ড়তে লা'গল, তখন সে সহসা পিস্তলটা নিজের দিকে ফিরিয়ে ব'ল্লে, তবে তাই হোক, নলিনীবাবু। কিন্তু এ জন্মের যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যাচ্ছি, আর জন্মে ··

কথা শেষ হ'ল না। প্রফেসর ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে এসে' মিসেস্ দত্তের হাতটা চেপে ধরে' পিস্তলটা মোচড় দিয়ে কেড়ে নিলে। ব'ল্লে, সর্ব্বনাশ ক'রেছিলেন আর কি।

মিসেস্ দত্ত মাটির দিকে মুখ ক'রে রইল। ওর দু' চক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝ'রে প'ড়তে লা'গল মেঝেতে। একটু পরে ব'ল্লে, আমার নিজের জীবনের 'পর মায়া না থাকলে, আপনার কী অধিকার আছে তাতে বাধা দেবার?

প্রফেসর পিস্তলটার 'দিকে চেয়ে ব'ল্লে, আপনার জীবনের 'পর আমার কোন অধিকার নেই, সে কথা সত্যি মিসেস দত্ত। কিন্তু আমার বন্ধুর 'পর আমার দাবী আছে। তার জন্যেই আপনার এভাবে জীবন শেষ ক'রতে কোন মতেই দেওয়া যায় না।

মিসেস্ দত্ত মেঝেতে ব'সে প'ড়ে হাঁটুর ভিতর মুখ ঢেকে কাঁদতে লা'গল। কিছুক্ষণ এইভাবে গত হ'লে ও মুখ তুলে ব'ল্লে, তিনি তো আমায় মুক্তি দিয়েছেন। আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন। কিন্তু, কিন্তু প্রফেসর তোমার জন্যেই স্বাধীনতা পেলেম, আবার তোমার কাছেই কত অধীন আমি, কত ঘৃণ্য আমি—আমার উপায় কী হবে প্রফেসর?

এমনি কত সঙ্গত অসঙ্গত কথা ও ব'লে যেতে লা'গল। ব'লতে ব'লতে একসময়ে সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে সে উঠে দাঁড়াল এবং পরক্ষণেই প্রফেসরের দিকে এগিয়ে এসে', খপ্ ক'রে ওর একখানা হাত নিজের বুকের উপর চেপে ধ'রল। হাঁপাতে হাঁপাতে ব'ল্লে, প্রফেসর, দেখছ আমার বুকের ভেতরটা কি রকম অসম্ভব দুর্-দুর্ ক'রছে? আমি পাগল হয়ে যাব, নলিনীবাবু, এভাবে বেঁচে থাকা আমার অসহ্য।

নলিনী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে স'রে গেল ওদিক্‌টায়। ওর মুখে ঘনান্ধকারের ছায়া।

মিসেস্ দত্ত ব'ল্লে, নলিনীবাবু, আপনার হাতে পিস্তল। আপনি গুলি করুন, স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকব, টুঁ শব্দও বের হবে না। আপনি মারুন।

ব'লতে ব'লতে ও প্রফেসরের পায়ের উপর আছাড় খেয়ে প'ড়ল। সংজ্ঞাহারা তার দেহখানি কোন রকমে তুলে' প্রফেসর শয্যায় শুইয়ে দিলে।

"দাও, পায়ের ধুলো দাও। তুমি আজ আমার শুধু জীবনদাতা বন্ধু নও, তুমি আমার নব জন্মদাতা গুরু—তোমায় প্রণাম করি।" ডাক্তার হেঁট হয়ে পা ছুঁতে গেলে, প্রফেসর সহাস্যে পেছিয়ে গেল। সম্মুখে রোগশয্যায় মিসেস্ দত্ত—আজ এক মাস পরে নলিনীর প্রাণপণ তদ্বির ও শুশ্রূষায় তাকে একটু সুস্থ মনে হচ্ছে। শীর্ণমুখে বালিকার নির্ভরতা। যেন অনেক দিনের একটা দুর্বিসহ অন্তরসংগ্রামের পর রণক্লান্তি শান্তির প্রলেপ মাখিয়ে দিয়েছে বিষণ্ণ মুখে ও চোখের উপর—ম্লান জ্যোৎস্নার মত তাতে আছে অবসন্নতার ছায়া, কিন্তু নেই ব্যথা, নেই ব্যর্থতার অভিমান।

ডাক্তার দত্তেরও এই এক মাস যে ভীষণ ঝড় বয়ে গেছে অন্তরে বাহিরে জীবনের উপর দিয়ে, তা' তার চোখে, মুখে প্রস্ফুট। ব্যগ্র-ব্যাকুল অনুশোচনার সুরে সে বল্লে—তোমায় সংশয় করেছি নলিনী, করেছি অবিশ্বাস—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। আজ আমার সর্বস্ব এনেছি তোমার পায়ে—আমায় মুক্তি দাও, সবহারাকে দাও শেষ চরম সান্ত্বনা।

নলিনী আবার স্মিতহাস্যে শয্যালীনা সুধার সর্বাঙ্গে স্নেহ-দৃষ্টি বুলিয়ে বল্লে—দুঃখ করো না ভাই, সংশয়ের আগুনে না কষে' ভালবাসার মুক্তি হয় না—এ পৃথিবীর তা' বিধান নয়। তোমার সংশয়ই সত্যের সন্ধান দিয়েছে, আপনাকে হারিয়েই আজ ফিরে পেলে স্বর্গের অমৃত—সুধার অখণ্ড ভালবাসা। দেহের, মনের দাবীর মধ্য দিয়ে নয়, অধিকারের বিসর্জ্জনেই তো প্রেমের যথার্থ প্রতিষ্ঠা। তোমরা উভয়েই আজ সেই বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকারী হও—এই আমার অকুণ্ঠ আশীর্ব্বাদ। বল্‌তে বল্‌তে নলিনীর চোখ দুটি কারুণ্যে উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ মহিমময় হয়ে উঠেছিল। সুধার চোখে তখন দুই বিন্দু অশ্রু করছিল টল্‌-টল্‌—আর ডাক্তার।

ডাক্তার সত্যজিতের অন্তর আজ কিসের প্রাপ্তিতে যেন সবখানি ভ'রে উঠেছে - শূন্য বুকখানা কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে গেছে, এতটুকু ব্যথা, এতটুকু দ্বিধার লেশ সেখানে যেন কিছুতেই ঠাঁই পায় না। সুধার মুখে তারই হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি দেখে সত্যজিৎ আজ শান্ত, প্রকৃতিস্থ, যেন যোগীরই ন্যায় আপনার আনন্দে সমাহিত।

প্রফেসর সুধার একখানি হাত তুলে' ডাক্তারের হাতে মিলিয়ে ধ্যানস্তিমিতনেত্রে তখন এই আশীর্ব্বচনই উচ্চারণ করছে—"আমি উপলক্ষ—ওগো গুরুর গুরু, তোমার পরম প্রেমের অভিষেকে এই সর্বহারা হৃদয় দু'খানিকে চির-মিলনের সান্ত্বনা দাও, সার্থক কর।"

# গান

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সরকার

পাখীর গীতালি থেমে গেছে হায়
কাননে ছেয়েছে নীরবতা,
হিমেল পরশে রিক্ত শাখায়
বিরাজে করুণ শিথিলতা।

বাতাস বহিছে সৌরভ-হারা,
জীবনে সে আজ পায় না সাড়া;
পলে পলে শুধু পড়ে মনে তার
বিগত দিনের কত কথা

বনের ঝিয়ারী চেতনাহীনা,
হারায়ে গিয়াছে হাতের বীণা
চারিদিকে আজ কুহেলি-ভরা
রূপের দেউলে মলিনতা।

# প্রাচীন চীনের সামাজিক ভিত্তি

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি

চীনের বিষয় আলোচনা করিবার কালে ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, এই দেশ এসিয়ার একটি অতি প্রাচীন দেশ। আজ পর্য্যন্ত ইহার ইতিহাসের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে পশ্চিম এসিয়ার সভ্যতা দ্বারা পূর্ব্বকালে চীন যে বিশেষভাবে অভিভূত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহা সত্য যে, ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম চীনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে এবং ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমার "গান্ধার চারুকলা" (Gandhara Art) এবং তোখারিস্থানের (বর্ত্তমানকালের চীন তুর্কিস্থান) ইউচি (ভারতে ইহারা কুষাণ বলিয়া পরিচিত) জাতি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যে সভ্যতা বিবর্ত্তিত করে, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যবর্ত্তিতায় চীনের ও জাপানের চারুকলার উপর প্রভাব স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু চীনের রাষ্ট্র ও সমাজসংগঠন কর্ম্মের উপর পশ্চিম এসিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

চীনবাসীরা গর্ব্ব করেন যে, তাঁহাদের প্রাচীন সভ্যতা তাঁহাদের স্বদেশজাত এবং গর্ব্বভরে তাঁহাদের দেশকে "স্বর্গীয় রাজ্য" (Celestial Kingdom) এবং বহির্জগতের লোকদের "বাহিরের বর্ব্বর" (Outer Barbarians) বলেন। পশ্চিম এসিয়ার সহিত তাহাদের মূল-জাতিগত কোন সম্পর্ক নাই, এসিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে বাস করিয়া আত্ম-নির্ভরশীল হইয়া তাঁহারা নিজেদের সভ্যতা বিবর্ত্তিত করিয়াছেন।* কিন্তু চীন ও জাপানের অধিকাংশ রাজ-নৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস এখনও বৈদেশিকদের নিকট অজ্ঞাত রহিয়াছে বলিয়া এই দুই দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিবর্ত্তনের গতির সম্যক অনুসরণ করা দুরূহ।

* উপস্থিত সময়ে জাতিতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে Elliot Smith এর Diffusion of Culture মত বলবৎ। এই মত বলে যে, বিভিন্ন দেশে পৃথকভাবে সভ্যতার উদ্ভব হয় নাই। সংস্কৃতি এক জাতি থেকে অপর জাতি গ্রহণ করিয়া তাহা চতুর্দ্দিকে বিস্তার করে। চীনের বিষয়ে কি তাহা প্রযুজ্য নহে?...যদিও এ বিষয়ে কোন সঠিক ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

## চীনের জাতি-তত্ত্ব

চীনের অধিবাসীদের চলিত নৃতাত্ত্বিক ভাষায় "মঙ্গোলীয়" বা "পীত"-জাতীয় লোক বলা হয়। নৃতাত্ত্বিক শারীরিক লক্ষণ বিষয়ে ইহাদের গড় পড়তায় মাথার ইনডেক্স ৭৯.৩ ৮০.২ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ইহারা মধ্যমাকৃতি মস্তকবিশিষ্ট, নাসিকার ইনডেক্স গড়পড়তায় ৭২.৯ পর্য্যন্ত অর্থাৎ মধ্যমাকৃতি নাসিকাবিশিষ্ট, দৈর্ঘ্যে ১.৬১২—১.৬৭৬ মিটার অর্থাৎ মধ্যমাকৃতিবিশিষ্ট [১]।

চীনতত্ত্ব বিশারদ (Sinologues) বস, গাইলস্, হির্থ বলেন, চীনজাতি ও তাহার সভ্যতা চীনের জমি হইতেই উদ্ভূত [২]। আসল কথা এই, যখন চীনের ইতিহাস আরম্ভ হয়, তখন চীনজাতি পীত (হোয়াংহো) নদীর কিনারায় বসবাস করিয়াছিল এবং পূর্ব্ব এসিয়ার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা উন্নততর সভ্যতা বিবর্ত্তিত করিয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টশত হইতে খৃষ্টীয় অষ্ট শতকের চীনের সর্ব্বপ্রাচীন ইতিহাস "সুচি" (ইতিহাসপুস্তক) প্রাচীন দলিলাদি হইতে উদ্ধার করিয়া চীন দার্শনিক কনফুসিয়ুস দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে। কিন্তু এই ইতিহাসের যে সংস্করণ বর্ত্তমানকালে প্রচলিত আছে, তাহা এমন সব লোকদের দ্বারা সংকলিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়, যাঁহারা নিজেদের বাণীর বৈশিষ্ট্য ও গৌরব বাড়াইবার জন্য প্রাচীন নজীরসমূহকে রূপান্তরিত করিয়া বা নূতন সৃষ্টি করিয়া নিজেদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিষয়ের মতের প্রতিপোষকতার নজির তন্মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান চীন পণ্ডিতদের অনুসন্ধানের ফলে ইহা

১। Haddon—"The Races of Man" p 87

২। T'ang Leang-Li—"The Foundation of Modern China" p 1

প্রমাণিত হইয়াছে যে, হানবংশীয়দের রাজত্বকালের (খৃঃ পূঃ ২০৬-২১১ খৃঃ) পণ্ডিতেরা এইসব ঐতিহাসিক প্রমাণ জাল করিয়াছেন[১]। তাঁহাদের নিজেদের মত ও আদর্শকে প্রাচীনতার দাবী করিয়া সাধারণের নিকট খাড়া করিবার জন্য এই সব জাল ইতিহাস লিখিত হয়।* কনফুসিউস্ নিজেই তাঁহার সামাজিক মতসমূহকে দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপিত করিবার জন্য কল্পিত 'স্বর্ণযুগে'র অবতারণা করেন। লিয়াং-লি বলেন,[২] কনফুসিয়ুস, চীনের একজন উপদেষ্টা ছিলেন বলিয়া আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, তিনি ও তাঁহার শিষ্যেরা অর্থাৎ যাঁহারা কনফুসিয় ক্লাসিক লিখিয়াছিলেন এবং যেসব বৈদেশিক ঐতিহাসিক এইগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই চীনের প্রাচীন ইতিহাস জাল করার অপরাধে দায়ী![§] ইঁহার মতে, চীনের সভ্যতার ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান অংশ এখনও লিখিত হয় নাই।[৩]

চীনের সঠিক ঐতিহাসিক তারিখ খৃঃ পূঃ ৭৭৬ সূর্য্যগ্রহণকাল হইতে আরম্ভ হয়। সিকিংএর একটি কবিতাতে ইহা উল্লিখিত আছে। অবশ্য ঐতিহাসিক যুগ ইহারও পূর্ব্বে ধরা যাইতে পারে, যদিচ তাহাদের সঠিক তারিখ নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু চীন ঐতিহাসিকেরা নিজেদের দেশের প্রাচীনত্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য অতীতের বহু মিলিয়ম (১০ লক্ষ) বৎসর পর্য্যন্ত জনশ্রুতিকে টানিয়াছেন। চীনের জনশ্রুতির ইতিহাস সুইঁজেন হইতে আরম্ভ হয়। ইনি প্রাগৈতিহাসিক যুগে আবির্ভূত হন। স্বর্গীয় এবং পাঁচজন 'রাজা' নামে অভিহিত শাসকদের পর্য্যায়ে ইনি সর্ব্বপ্রথম ছিলেন। দ্বিতীয় স্বর্গীয় রাজা ফুহসি (জনশ্রুতির তারিখ ২৮৬২-২৭৩৮ খৃঃ পূঃ) চীনের কৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া গণ্য হন। ইনি লোকদের প্রথম সমাজবন্ধনে আবদ্ধ করেন। এই রাজাদের চীনের সভ্যতার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের কাল্পনিক প্রতীক বলিয়া অনুমান করা হয়।

চউবংশের অধিষ্ঠানের সময়ে (১১২২-২৫০ খৃঃ পূঃ) চীনের যথার্থ ইতিহাস আরব্ধ হয়। এই সময়ে চীনের জীবন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থায়ীরূপ ধারণ করিয়াছে। চীনের সভ্যতা সেই সময়ে যে লক্ষণসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত চীনের জাতীয় জীবনে পরিলক্ষিত হয়। ইহা কৃষি-সভ্যতা এবং প্যাট্রিয়ার্কাল বংশের উপর স্থাপিত। এই কৃষি-সভ্যতাতে সমানাধিকার বিবর্ত্তিত করিবার বিশেষ সুযোগ ছিল না এবং বংশের কর্ত্তার ক্ষমতাকে অপসারিত করিয়া সামরিক সর্দ্দারে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিবারও সুযোগ ছিল না। চীনের বিশিষ্ট বীরেরা সামরিক নেতা অপেক্ষা কৃষ্টিরই উদ্ভাবক ছিলেন।

চীনে প্রথমে এক একটি বংশ এক একখানি গ্রামে বাস করিতে থাকেন এবং গ্রামগুলি তাঁহাদের (বংশের) নাম প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে কেহ বাস করিত না। লোকে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিত এবং সেখান হইতে নিজেদের জমি চাষ করিতে যাইত। পরে বিভিন্ন রক্তের লোক লইয়া সমষ্টি একত্র হইতে লাগিল। তাহারা কৃত্রিম কৌমে সংগঠিত হইয়া, নিজেদের নির্ব্বাচিত মোড়লদের অধীনে বাস করিতে লাগিল। এই প্রকারে একটি সমষ্টি রাজনীতিক জ্ঞান পাইয়া রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিবর্ত্তিত করে এবং মণ্ডলী হইতে ভূমি পাইয়া তার জন্য মন্দির স্থাপন করে। এই মন্দিরগুলিই তাহাদের এক প্রকারের আলোচনার স্থল (forum) হয়। এই প্রকারে চীনে গ্রাম্য গভর্ণমেণ্ট উদ্ভূত হইয়াছে, যাহা আজ পর্য্যন্ত স্থায়ী আছে[১]।

এই প্যাট্রিয়ার্কাল বংশগুলি কালক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এইগুলি সর্দ্দারের অধীনে অর্দ্ধ

১। James Legge—"The Chinese Classics"; P 1861—62 ; Vol IV ; P 320.

* পার্জিটারের মতে ব্রাহ্মণদের দ্বারা লিখিত পুস্তকসমূহ এই শ্রেণীস্বার্থদোষে দুষ্ট।

২। Leang—Li—P 2

§ ভারতেও এই প্রকার ঐতিহাসিক নজির জাল করা হইয়াছে। রঘুনন্দনের বেদে সতীদাহের ব্যবস্থা ও স্মৃতিতে কলিযুগে কেবল দুই বর্ণ আছে, এইরূপ ব্যবস্থা ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৩। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়েও এই কথা প্রযুজ্য।

১। Gowen and Hall P 59

নির্ব্বাচনপদ্ধতিতে সঙ্ঘবদ্ধ হইত। এই সর্দ্দারেরা এক সঙ্গে তাঁহাদের পিতৃস্থানীয় হইয়া পুরোহিতের কর্ম্ম করিত। কিন্তু বিচারকালে কৌমের বাণী সভ্যদের পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হইত। হুয়াংটির কল্পিত রাজত্বকালে এই সমস্ত কৌমগুলি একটি সঙ্ঘে সম্মিলিত হয়; এবং ইনি ইহার প্রথম পুরোহিত হন। এইযুগে রাজগদী বংশপরম্পরায় কেহ অধিকার করিতে পারিত না; সাধারণের দ্বারা বুদ্ধিমান্ লোককে নির্ব্বাচিত করা হইত। রাজা ইয়ুয়ের সময় হইতে রাজপদ পুত্র পাইতে আরম্ভ করে। কিন্তু ইনবংশের সময়ে সম্রাট্ ইহাকে তাঁহার রাজশক্তিগত অধিকার বলিয়া সমর্থন করেন এবং তজ্জন্য সাধারণের অভিসম্পাতের ভাজন হন[১]।

প্রথম যুগের সম্রাটেরা বংশের কর্ত্তাদের সহিত পরামর্শ করিয়া শাসনকার্য্যাদি করিতেন। পরে, রাজ্যবৃদ্ধি হইলে চোউ সম্রাটেরা কৌম সমূহ হইতে যাহারা জাতির শাসনকার্য্যে সহায়তা করিবে, এমন পণ্ডিত ও সৎলোক পাইবার জন্য এই সব গোষ্ঠীপতিদের জিজ্ঞাসা করিতেন। এই মনোনীত লোকগুলি অধিবাসীর সংখ্যার অনুপাতে নির্দ্ধারিত হইত। কিন্তু সুইবংশের রাজত্বকালে (৬৮৯-৬১৪ সাল) প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা কর্ম্মচারীদের নিয়োগপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এই পরীক্ষা কনফুসীয় ক্লাসিকের উপরই গ্রহণ করা হইত! এই প্রকারে চীন কর্ম্মচারীতন্ত্রের প্রতিযোগিতামূলক লক্ষণ প্রচলিত হয়, যদিচ নির্ব্বাচনের ডেমোক্রাটিক ভিত্তি রক্ষিত হয়। সর্ব্বপ্রকারের বংশ ও সর্ব্বশ্রেণী হইতে রাজকর্ম্মচারী সংগৃহীত হইত এবং এই পদ কখন পুরুষানুক্রমিক হয় নাই, যদিচ তাহারা বিশিষ্ট শ্রেণীর অধিকারের বড়াই করিত।

## সামন্ততান্ত্রিক যুগ

চোউবংশের শাসনকালে চীনে সামন্ততন্ত্র বিবর্ত্তিত হয়। চীনের ইতিহাসের প্রথম যুগে আদিম-অধিবাসীদের মধ্যে উপনিবেশস্থাপন-প্রচেষ্টার ফলে সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। জনশ্রুতির হিসিয়া এবং ইনবংশের কালে এই পদ্ধতি বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু চৌয়েরাই ভূস্বামীশ্রেণীয় অভিজাতদের মধ্যে ডিউক, মারকুইস, আর্ল, ভাইকাউন্ট এবং ব্যারণ* প্রভৃতি পাঁচটি স্তর সৃষ্টি করিয়া সামন্ততান্ত্রিক স্তরভেদ পাকা করে। ইহারা সাধারণ লোক, যাহারা আসল চীনাদের দ্বারা বিজিত আদিম-অধিবাসীদের বংশধর হইতে পৃথক্।

সাধারণ লোক কতকগুলি Penal Sanctionএর অধীন ছিল। তাহারা সামাজিক মর্য্যাদানুসারে চারিভাগে বিভক্ত ছিল:—যথা, পণ্ডিত, কৃষক, শিল্পী এবং ব্যবসায়ী। কেবল পণ্ডিতেরাই রাষ্ট্রের কর্ম্মচারী হইতে পারিত। তাহারা সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের সঙ্গে মিলিত হইয়া সম্পত্তিশালী শ্রেণী সংগঠন করে। ইহারা "লি" পদ্ধতি দ্বারা শাসিত হইত,[১] কাহার কি কর্ত্তব্য, তাহা "লি" "শিক্ষা প্রদান করিত"। ইহা সম্মান-প্রদর্শনের আইন (Code of Honour)—কতক আদব-কায়দার আইন, যাহা শ্রেণীসমূহের পরস্পরের মধ্যে আচারব্যবহারপদ্ধতি শিক্ষা দিত। ইহার প্রতি কোন Penal sanctions প্রযুজ্য হইত না।[২] কিন্তু একটা কথা এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, চীনের সামন্ততন্ত্র পূর্ণ সামন্ততন্ত্র ছিল না।

চৌউদের সামন্ততন্ত্রীয়[৩] পুরুষানুক্রমিক রাজ্যশাসন-প্রবর্ত্তনের সঙ্গে তাহার অন্যান্য আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান আসিয়া জোটে! রাজগৃহে খোজা ও উপপত্নী রাখার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়।

এই যুগে শ্রেণীবিভাগ ব্যতীত আর একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিবর্ত্তিত হয়—উহা হইতেছে "গিল্ড পদ্ধতি"। ইহা পরিবারের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত এবং ইহা ব্যবসায়ী বা শিল্পীদের সহিত তাহাদের শিক্ষানবীশদের একটা কৃত্রিম পারিবারিক সম্পর্করূপে প্রবর্ত্তিত হয়। প্রথমে ইহা একজন মনিব ও কারবারের "পুত্রদের" লইয়াই সংগঠিত

১। Leang-Li, 170; Gowen and Hall—"An Outline History of China" PXIX

* এইগুলি চীনভাষায় আভিজাত শ্রেণীসমূহের উপাধির ইংরেজী পরিভাষা মাত্র।

১। Leang-Li—P 8.

২। Leang-Li—P 8—9.

৩। Leang-Li—P 9

হয়, পরে সহরে যাহারা এক প্রকারের পণ্য বিক্রয় করিত বা উৎপাদন করিত তাহাদের লইয়া গঠিত হয়। সহরগুলি যখন শ্রমশিল্প ও ব্যবসায়ের কেন্দ্র হইয়া উঠে, তখনই 'গিল্ড'গুলি সংগঠিত হইতে আরম্ভ হয়, এবং গিল্ডের কর্ত্তারা গ্রামের মোড়লদের স্থানাধিকার করিয়া সহরে সমাজের কার্য্যপরিচালনা করিতে থাকে।

শ্রমশিল্প নয় ভাগে বিভক্ত[১] হইয়া প্রত্যেক ভাগ একজন দায়িত্বপূর্ণ নেতার অধীনে থাকার ব্যবস্থার সঙ্গে গিল্ডপদ্ধতি উদ্ভূত হয়। আবার পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতদের লইয়া যে কর্ম্মচারিতন্ত্র গঠিত হয়, যাহা "মাণ্ডারিন"* আমলাতন্ত্র বলিয়া বিখ্যাত, তাহা এই যুগেই সংগঠিত হয়। পূর্ব্বোক্ত সামাজিক স্তরভেদের মধ্যে "মাণ্ডারিন" শ্রেণী উদ্ভূত হয়।

এই সামন্ততান্ত্রিক যুগে সামন্তেরা প্রায়ই সম্রাটের বিপক্ষে বিদ্রোহাচরণ করিত। এই সময়ে চীনের সীমা উত্তরে বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল, কোনের নেতারা "স্বর্গের পুত্র" (সম্রাট্) হইতে দূরে থাকিত, কাজেই সম্রাটের নিকট তাহাদের বশ্যতা প্রায়ই ছিল না। এই সব সীমান্ত সামন্তদের যাহারা সময়ে স্বাধীন শাসক হয়, তাহাদের পুরুষানুক্রমিক খেতাব দিয়া সম্রাট্ তাহাদের নাম মাত্র কর্তৃত্ব স্থাপিত করিবার চেষ্টা করে। সম্রাট্ তাহাদের উপর দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরের সীমা বর্ব্বর জাতিদের আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিবার ভার ন্যস্ত করে। কিন্তু তাহারা শীঘ্রই পরস্পর আত্মকলহে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে এবং প্রায়ই সম্রাট্‌কে আক্রমণ করিত। ফলে, খৃঃ পূঃ ৭৫০—২৫০ সময়ে সম্রাটের ক্ষমতার সম্মান খুবই হ্রাস পায়।

কিন্তু চীনের কৃষিকর্ম্মের বৈচিত্র্য ও তজ্জন্য বিশিষ্ট ভাবে খাল কাটা পদ্ধতির উন্নতির জন্য একটি কেন্দ্রীভূত শাসনের প্রয়োজন হওয়ায়, উহাই শেষে সামন্ততন্ত্রের পতনের মূল হয়। এই সময়ে কৃষিসমস্যা বিশেষভাবে দেখা দেয়।

এই সমস্যা প্রথমে, চীন (Chin') রাষ্ট্রে পূরণ হয়। ৩৫০ খৃঃ পূঃ এইস্থলে সামন্ততন্ত্র প্রথা এবং এই সঙ্গে জমি মধ্যে মধ্যে বাঁটোয়ারা করিবার প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হয়। এই জমি বিলির প্রথানুযায়ী, রাজাই জমির যথার্থ মালিক ছিলেন। যে বিশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইত, তাহাকে জমি বিলি করা হইত, তাহার ষাট বৎসর পূর্ণ হইলে, জমি আবার রাজাকে প্রত্যার্পণ করা হইত। বিক্রয় বা অন্য প্রকারে হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ ছিল। চৌউ বংশের যুগে, লোকসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায়, উৎপাদন-প্রণালীরূপে এই প্রথা নিষ্ফল হয়। ইতিমধ্যে জমিতে ব্যক্তিগত অধিকার প্রথা এখানে সেখানে উদ্ভূত হইয়াছে। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে চীন রাষ্ট্র ইহাকে মানিয়া লয় এবং এই প্রথা লোকপ্রিয় হয়। এই সংস্কারের সঙ্গে জলসেচন-প্রণালীর উন্নতি হওয়ায়, জমির উর্ব্বরাশক্তি অত্যধিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা এই স্থানের লোকের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায়, সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের সহিত ইহার বৈসদৃশ্য প্রকট হয়। এইজন্য বাকী স্থানের কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ-প্রকাশ, তৎপরে সামন্তদের মধ্যে বহুকালব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে সমস্ত জলসেচনপ্রণালী—যাহা কৃষিকর্ম্মের প্রধান ভিত্তি—নষ্ট হইয়া যায়। অবশেষে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ বিদ্রোহের নেতৃত্ব চীনের রাজা চীম চেঙ্গের স্কন্ধে ন্যস্ত হয়। ইনি সমস্ত স্বাধীন খণ্ড রাজ্যগুলি জয় করেন। ২২১ খৃঃ পূঃ ইনি চীন সিহুয়াং টি (প্রথম সম্রাট্) খেতাব ধারণ করেন। এতদ্দ্বারা ইনি "হুয়াং" ও "টি" নামক দুই খেতাব—যাহা প্রাচীন দেবতা-শাসক দেরছিল—তাহাও গ্রহণ করেন। ইনি আমলাতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমস্ত সাম্রাজ্যকে এক শাসনাধীন করেন। যদিও খৃঃ পূঃ ২০৯ সালে ইহার মৃত্যুর পর সামন্ততন্ত্র কিছু দিনের জন্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তত্রাচ বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শাসনপ্রণালী বর্ত্তমান ছিল।[১]

## একচ্ছত্র সাম্রাজ্য

নূতন চীন সাম্রাট্ হুয়াং টিংঙ্গের নামানুসারে সমগ্র সাম্রাজ্যের নাম "চীন" হইয়াছে। ইহাকে চীনের

১। Gowen and Hall—P 59

* গাওয়েন ও হল বলেন—"মাণ্ডারিন" শব্দটি চীন ভাষার নয়। ইহা হয় পর্টুগিস "Mandai" to command শব্দ থেকে আসিয়াছে, না হয় সংস্কৃত "মন্ত্রিন্" শব্দ হইতে খুব সম্ভব উদ্ভূত হইয়াছে।

১। Liang-Li—P 9

নেপোলিয়ন বলা হয়। ইনিই বিখ্যাত চীনের প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন এবং অতীতের সহিত চীনকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কনফুসীয় ক্লাসিক পুস্তকসমূহ দেশ মধ্যে পুড়াইবার এবং পণ্ডিতদের নির্য্যাতন করিবার জন্য অনুজ্ঞা প্রদান করেন। কনফুসীয় পুস্তকাগার ধ্বংস করিবার বিশিষ্ট কারণ অজ্ঞাত; তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, 'এই সম্রাটের পূর্ব্বে চীনে কেহ কোন মহৎ কর্ম্ম করেন নাই—এই তথ্য ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য প্রচলিত পুস্তকসমূহ ইনি ধ্বংস করেন। আবার কেহ বলেন, দেশের উন্নতির জন্য প্রাচীনের চিহ্ন বিলুপ্ত করিতে হইবে—এই মন্ত্রণা কোন মন্ত্রী দিলে, সম্রাট তাহা কার্য্যে পরিণত করেন। এই সম্ভবপর তথ্যটি চীন ঐতিহাসিক সুমাচিয়েন প্রদান করিয়াছেন [১]। ইহা বেশ প্রতীত হয় যে, কনফুসিয়ুসের ডেমোক্রাটিক মতসমূহ চীন সম্রাটের সাম্রাজ্যবাদীয় আদর্শের সহিত খাপ খাইত না, জ্ঞানী এবং "আদর্শ সম্রাটদের" "মৃতহস্ত" (dead hand) বা "ভূত" তাহার স্কন্ধ হইতে নামাইবার জন্য এই দুষ্কর্ম্ম হুয়াং টিং করিয়াছিলেন।

এই মহা-শক্তিমান বীরপুরুষ, যিনি সমগ্র চীনকে এক শাসনাধীন করেন, তাঁহার জন্ম সম্পর্কে নানা গল্প প্রচলিত আছে। কেহ কেহ তাঁহাকে 'জারজ' (bastard) বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার জাতি লইয়া মহাসমস্যা আছে। কেহ কেহ ইঁহাকে ভারতের মৌর্য্যবংশীয়দের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু এই বিষয়ের বিশেষ কোন প্রমাণ নাই [২]। এই সময়েই মহারাজ অশোক* ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য করিতেছিলেন। অশোক ভারতের জন্য যাহা করিতেছিলেন, হুয়াং টিং চীনের জন্য তাহাই করেন। এমন কি, ধর্ম্মবিপ্লব করিবার পর্য্যন্ত তিনি চেষ্টা করেন *।

হুয়াংটিং সামন্ততন্ত্র ভাঙ্গিয়া নূতন জমি বিলির ব্যবস্থা করেন বটে; কিন্তু জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রবর্ত্তিত হইলে, এতদ্দ্বারা বড় বড় জমিদারী প্রথার সৃষ্টি হইতে থাকে। ফলে, পুরাতন জমি বিলির পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য প্রায় এক হাজার বৎসর ক্রমাগত চেষ্টা হয়।

অযোগ্য হস্তে চীনবংশের রাজদণ্ড ন্যস্ত হইলে, তাহা তাহাদের হাত হইতে পতিত হয় এবং "হান" বংশ (খৃঃ পূঃ ২০৬-২২০ খৃঃ) তাহা কাড়িয়া লয়। এই বংশের সাম্রাজ্যকালে চীন মধ্য এসিয়ার পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং রোম-সাম্রাজ্যের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। চীনের ইতিহাসে এই বংশের রাজত্বকাল অতি গৌরবময় যুগ। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম মধ্য এসিয়া হইতে আমদানী করা হয় এবং শেষে এই ধর্ম্ম চীনের কৃষ্টির উপর বিশিষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এই যুগের চীন ঐতিহাসিক—যাঁহাকে চীনের "হিরোডোটাস" বলা হয়—তিনি বলিয়াছেন যে, এই বংশের রাজত্বকালে চীন অতি সমৃদ্ধিশালী হয়। গ্রামের জ্যেষ্ঠগণ (মোড়লেরা) মাংস খাইত ও মদ্য পান করিত। ক্ষুদ্র সরকারী কেরাণীগিরি প্রভৃতি পুরুষানুক্রমিকভাবে পিতার পর পুত্রগণ পাইত। রাষ্ট্রের উচ্চ পদগুলি পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায় বিবেচিত হইত। অবশেষে, আইনের অনুজ্ঞা শিথিল হইয়া পড়িলে, ধনীরা তাহাদের ধন, অহংকার, ব্যক্তিগত সুবিধা এবং দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যয়িত করিত। সম্রাট্ বংশের লোকেরা জমি পাইতেন। আর অতি উচ্চ হইতে সর্ব্ব নিম্নের লোক বাহ্যাড়ম্বরের জন্য আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিত।

১। Liang-Li—PP 9—10

২। Gowen and Hall—P 88

* ঐতিহাসিক জয়চন্দ্র নারঙ্গ তাঁহার "ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের রূপরেখা" নামক হিন্দী পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন, অশোকের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুণালকে অন্ধ করিবার ষড়যন্ত্রে যেসব তক্ষশীলার নাগরিক লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদের তিনি মধ্য এসিয়ার বাহ্লীক প্রদেশে নির্ব্বাসিত করেন এবং এই সময় হইতে মধ্য এশিয়ায় হিন্দুসভ্যতাপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। বর্ত্তমানের তুর্কান, যাহাকে পূর্ব্বে চীন তুর্কীস্থান বলিত এবং এক্ষণে সিংকিয়াং প্রদেশ বলা হয়—তথায় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভাষাপ্রতিষ্ঠার বহুল প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কে জানে এই ভারতীয় উপনিবেশের সংস্কৃতির ঢেউ চীনে তখন লাগে নাই।

* Gowen and Hall—P 85

# ইংলণ্ডের শিল্প ও শিল্পী

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

বিলাতের পুরাতন ভাল নামকরা ছবিগুলির মধ্যে ইংলণ্ডের কোন আর্টিষ্টের নাম বিশেষ পাওয়া যায় না। তার কারণ সাধারণ সভ্যতা ও শ্রীবৃদ্ধি বৃটিশ দ্বীপে উপস্থিত হইতে বিলম্ব ঘটিয়াছিল বলিয়া। ইউরোপের চিত্রকলা যখন প্রথম renaissance-এর যুগে লিওনার্দো, দা ভিঞ্চি বা র‍্যাফেল প্রভৃতি মনীষির অভ্যুদয়ে চরম উৎকর্ষ লাভ করিতেছিল, তখন বৃটিশ জাতি রসশিল্পে বা চারুকলাক্ষেত্রে অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছিল।

মাত্র সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরাজরা প্রথম ভাল চিত্রের কদর বুঝিতে থাকে। অথচ ইতিমধ্যে ফরাসী জাতি নিকোলাস পুসিন, ওয়াটিউ প্রভৃতি উচ্চ দরের চিত্র-শিল্পীদের জন্ম দিয়া ফরাসী আর্টকে উন্নত করিয়া লইয়াছে। স্পেনেও এল গ্রেকো, ভেলাজকেজ প্রভৃতি চিত্রকরের সাধনার ফলে উন্নত চিত্রকলার প্রবর্তন হইয়াছিল। ইংলণ্ড পশ্চাতে পড়িয়া ফরাসী আর্টের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতেছিল। ইংরাজ নৃপতিগণ সপ্তদশ শতাব্দীতে ভাল চিত্র-শিল্পীর অভাব বোধ করায়, বেলজিয়ামের অ্যাণ্টওয়ার্প হইতে পিটারপল রুবেন্‌স, অ্যাণ্টনী ভ্যানডাইক্ প্রভৃতি ফ্লেমিশ শিল্পিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন, নাইট্-উপাধি ভূষণে সম্মান দিয়া রাজদরবার অলঙ্কৃত করিতেন। ভ্যান্‌ডাইক্‌কে ইংরেজরা নিজেদের শিল্পী বলিয়া দাবী করেন, যেহেতু তিনি লণ্ডনেই বরাবর বাস করিতেন এবং কোন বৃটিশ লর্ড পরিবারের কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া লণ্ডনের উচ্চতম সুধী সমাজে ভাল ভাল পোর্ট্রেট আঁকিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

এঁর পূর্বে একজন মাত্র ভাল শিল্পীর নাম পাই, তিনি হইলেন হান্স্ হল্‌বিন (১৪৯৭-১৫৪০) শেষ জীবনে লণ্ডনে আসিয়া তিনি বাস করিয়াছিলেন—অষ্টম হেনরীর সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল এবং বহু মুখাবয়ব বা মানবপ্রতিকৃতি (portrait) অঙ্কন করিয়া তিনি ইংলণ্ডের দুর্নাম কিছু ঘুচাইয়াছিলেন। কিন্তু ভ্যানডাইকের সময়ে বৃটেন প্রথম বুঝিতে পারিল যে, পরদেশের শিল্পীদের এবং তাঁহাদের ছবির শুধু সমাদর করিলে চলিবে না, নিজের দেশের উন্নত চিত্র-শিল্পীর প্রয়োজন।
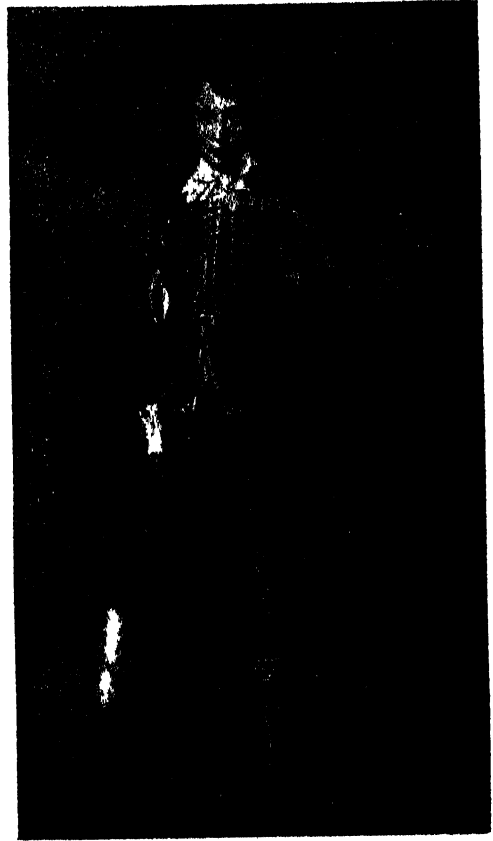
ব্লু বয়—শিল্পী: গেইন্‌স্‌বরো

ভ্যানডাইকই প্রকৃতপক্ষে লণ্ডনে চিত্রকলা প্রবিষ্ট করাইলেন তিনি ডব্‌সন, জেমসন, কুপার প্রভৃতি কয়েকজনকে রীতিমত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহারই ন্যায় তাঁহার অভিজাত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, আর এক জন অন্য দেশীয় শিল্পী ইংলণ্ডে আসিলেন। তিনি জাতিতে ডাচ; কিন্তু ইংরাজ বলিয়াই এক প্রকার পরিচিত—ইনি সার পিটার লিলি।

সত্যকার প্রথম ইংরাজ চিত্রকর হইলেন হোগার্থ (১৬৯৭-১৮৬৪)। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই প্রকৃত ইংরাজ চিত্রকলার যুগ আরম্ভ হয়। হোগার্থ ছিলেন মূলতঃ খোদাই-শিল্পী (engraver), কিন্তু চিত্রাঙ্কনেও তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। হোগার্থের পর এলেন উইলসন,

দু'টী মেয়ে—শিল্পী: গেইন্‌স্‌বরো

রেণল্ডস্, গেইন্‌স্‌বরো, জর্জ রোম্‌নে, রেবার্ণ, লরেন্স, ব্লেক, টার্ণার প্রভৃতি পর পর অনেকগুলি নামকরা চিত্র শিল্পী অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রথম লণ্ডনে রয়াল একাডেমী স্থাপিত হয়। উপরোক্ত শিল্পীদের মধ্যে সত্যকার মনীষা ছিল দুইটী লোকের—উইলসন এবং গেইনস-বিরোর—বৃটিশ চিত্রকলায় ল্যাণ্ডস্কেপ পেন্টিং-এর প্রবর্ত্তক হইলেন এই দুইজন। উপরন্তু গেইন্‌স্‌বরো পোর্ট্রেট-পেন্টিংএও যে প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার সহিত অন্য কাহারও তুলনা হয় না।

রয়াল একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সভাপতি ছিলেন যশুয়া রেণল্ডস্—উইলসন এবং টমাস গেইন্‌স্‌বরো ছিলেন প্রথম সভ্যগোষ্ঠীর মধ্যে, এঁরা উভয়েই মৌলিক-ভাবে ল্যাণ্ডস্কেপ-চিত্রাঙ্কনে ইংরাজদের গৌরববৃদ্ধি করেন। এতদিন রুবেন্‌সেরই ল্যাণ্ডস্কেপ লইয়াই অভাব-পূরণ হইতেছিল, কিন্তু গেইন্‌সবরোর ছবি বাহির হইবার পর হইতে আর দুঃখ রহিল না। টমাস প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের ল্যাণ্ডস্কেপ-চিত্রাঙ্কনে নিজস্ব এক ধারার প্রবর্ত্তন করেন, তাহাতে ফরাসী আর্টের বা রুবেন্‌স্ স্কুলের কোন ছাপ ছিল না অথচ তাহারই মধ্যে সবুজ ও নীল রঙের চাপে একটা নিজস্ব মৌলিক ষ্টাইল প্রকাশ পাইত।

উইলসনও পোর্ট্রেট আঁকিতেন। কিন্তু অর্থের জন্য টমাস গেইনস্‌বরোকে বহু পোর্ট্রেট আঁকিতে হইয়াছিল ইংলণ্ডের রাজার পৃষ্ঠপোষকতায়। মানবপ্রতিকৃতির অঙ্কনে টমাস ভ্যানডাইকের ছবি অনুসরণ করিতেন, পরে রঙের বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া নিজস্ব ধারানুবর্ত্তন করেন। তিনি এক প্রকার রূপবাদী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, ভ্যানডাইকের
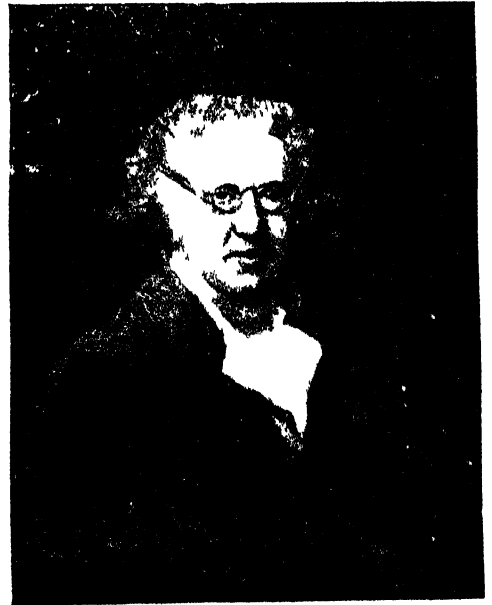
শিল্পী রেণল্ডস্

ছবির অপেক্ষায় তাঁহার ছবিগুলি বেশী স্পষ্ট ও সুন্দর হইত, তবে ভাবের খোরাক ছিল না বলিয়াই ভ্যানডাইককে ছাড়াইতে পারেন নাই।

সার যশুয়া রেণল্ডস্ অভিজাত উচ্চ দরের পোর্ট্রেট পেণ্টার হইলেও, তাহার নিজস্ব শিল্প কিছু ছিল না।

ইতালীতে যাইয়া বড় বড় শিল্পীদের ছবি প্রণিধান করিয়া ও অনুকরণ করিয়া তিনি হাত পাকাইয়াছিলেন। তিনি কয়েকখানি নিজস্ব পরিকল্পনায় ভাল ভাল ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে "বিমল বয়স" (age of innocence) একখানি।

চিত্রশিল্পী হিসাবে রেণল্ডস সর্ব্বপ্রথমশ্রেণীরই ঠিক পশ্চাতে স্থান পাইবার যোগ্য। রেণল্ডসের ছবিগুলিতে টিশিয়ান, রেম্ব্রাণ্ট্, রুবেন্স, ভ্যানডাইক, মায় র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলোর ছাপ পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয়।

রেণল্ডসের শিষ্য স্কচ চিত্রশিল্পী স্যার হেনরী রেবার্ণ এবং উইলিয়াম টার্ণার (ইনি ওঁহার শিষ্য নহেন) ইঁহাদের পরে সত্যকার মনীষা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের প্রচার কম বলিয়াই বোধ হয় সাধারণের নিকট অপরিচিত। টার্ণারের প্রতিভা ছিল অসামান্য। ১৫ বৎসর বয়সে তিনি ছবির প্রদর্শনীতে যশঃ অর্জন করেন। রয়েল একাডেমীতে শিক্ষালাভ করিয়া যৌবনে টার্ণার কয়েকখানি অতি উচ্চ দরের আলেখ্য অঙ্কন করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন এবং রয়েল একাডেমীর সভ্য

বিমল বয়স—শিল্পী: রেণল্ডস

ভেনাসের প্রতিচ্ছায়া—শিল্পী: বার্ণ জোন্‌স্

হন। তিনি পোর্ট্রেট ছবি অপেক্ষা ল্যাণ্ডস্কেপে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। টার্ণার ছিলেন একজন ভাল জলরঙের (water-colourist) চিত্রশিল্পী—তাহা ছাড়া তাঁহার চিত্রগুলিতে পরিকল্পনা বিষয়ে এমন এক তত্ত্বের সমাবেশ থাকিত, যাহাতে তাঁহার নিজস্ব মৌলিক এক ষ্টাইলের বা ভাববৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় পাওয়া যাইত।

দু'টী মেয়ে—শিল্পী রেণল্ডস্

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে কয়েক জন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পীর আবির্ভাবে এক নূতন দলের সৃষ্টি হইয়া থাকে—এই দলের নাম প্রাক্-র‍্যাফেলাইট (pre-raphelite) দল। ইঁহারা র‍্যাফেলের পূর্ব্ববর্ত্তী যে কয় জন শ্রেষ্ঠ চিত্র শিল্পী আছেন, তাঁহাদের ধারায় ছবি আঁকিতেন। উদ্দেশ্য—প্রথম যুগের ইতালীয় শিল্পীদের বাস্তবতাকে রূপায়িত করিবার যে ঢেউ চলিতেছিল, তাহা ফিরাইয়া আনা।

এই নূতন দলের তিন জন বিখ্যাত ইংরাজ শিল্পী গ্যাব্রিয়েল রসেটী (ইনি ইতালীয় হইলেও, লণ্ডনের অধিবাসী), ওয়াট্‌স্ এবং বার্ণজোন্‌স্। হান্ট্ ও মিলে—রসেটীর সহিত প্রথম এই দলের সূত্রপাত করেন। রসেটীর "দান্তের স্বপ্ন" এবং মিলের "ওফেলিয়া" র‍্যাফেলাইটদের প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে।

ওয়াট্‌স্ ও বার্ণ জোন্‌স্ বলিয়াছি এই দলের, ইঁহাদের ছবিতে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বা মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্রাঙ্কনধারা বিশেষভাবে লক্ষিত। বৃটিশ চিত্র-কলায় উচ্চ ভাবের উপাদান প্রথম আনিয়া দিলেন জর্জ ওয়াট্‌স্—সত্য বলিতে কি, ইংরাজী চিত্রকে উচ্চ ধাপে পৌঁছাইতে সর্ব্বপ্রথম ওয়াট্‌স্‌ই পারিয়াছিলেন—তারপর আসিলেন রসেটি, তারপর বার্ণজোনস (১৮৩৩-১৮৯৮)।

ওয়াটসের অভ্যুদয় ইংরাজী চিত্র-কলায় একটা স্মরণীয় ঘটনা। তিনি খুব ভাল পোর্ট্রেট আঁকিতেন—তাঁহার কার্লাইল, ব্রাউনিং, সুইনবার্ণ, টেনিসন প্রভৃতির ছবি অতি সুন্দর। অন্যান্য ছবিগুলির মধ্যে কি যে এক

টমাস গেইনস্‌বরো
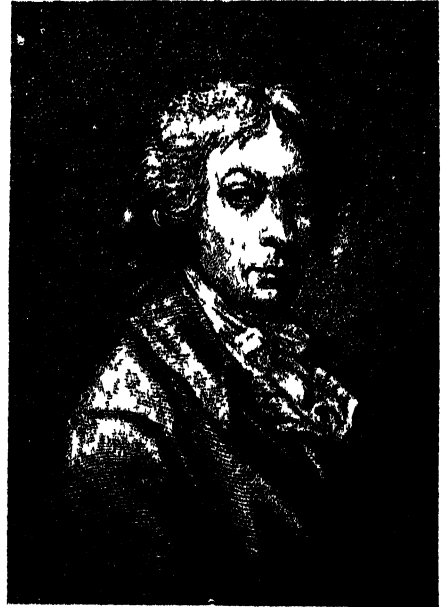
কল্পনা এবং কাব্য লুক্কায়িত রাখিতেন যে, তাঁহার ছবি দর্শকের মনে অতুলনীয় ছাপ রাখিয়া যায়। বার্ণ জোনস এক প্রকার রসেটির প্রভাবেই উন্নতি লাভ করেন, সে জন্য তিনি রীতিমত প্রাক্-র‍্যাফেলাইট হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার পোর্ট্রেটেরও ইউরোপে যথেষ্ট আদর হইয়াছিল।

# গ্রহ-চক্র

( একাঙ্ক নাটিকা )

শ্রীমতিলাল রায়

## তৃতীয় দৃশ্য*

স্থান—সমুদ্রতীরে সুরভির আশ্রম। সময়—অপরাহ্ন। আশ্রম-পথ কুটীর-দ্বারে পৌঁছিয়াছে। শ্রীবৎস একা চিন্তা করিতে করিতে কুটীরাভিমুখে চলিয়াছেন। কুটীরের প্রাচীরগাত্র স্বর্ণ ইষ্টকে মণ্ডিত।

শ্রীবৎস— চিন্তা! চিন্তা! কোথা চিন্তা!
সে চিন্তা চলিয়া গেছে।
চিন্তাজ্বরে জর্জ্জরিত তনু,
চিন্তানলে দহে প্রাণ।
সে চিন্তা শীতল ছিল,
এ চিন্তা দহন।
ওরে শনি!
হরি' রাজ্য দিলি দুঃখ,
মনোসাধ তবু না পুরিল।
বনবাসে অনশনে রই,
প্রতিবাদ নাহি করি।
চিন্তা-ধনে হরিলি পাপিষ্ঠ!
নহ মর্ত্ত্যজীব,
তাই ত্রাণ লভ দেবাধম।
চিন্তা! চিন্তা! প্রেয়সী আমার!
কত সাধ ছিল মনে—
সেবিবে দুঃখের দিনে;
স্বয়ং বিধাতা সে সাধে সাধিল বাদ।
কেন নৌকা ছুঁতে গেলে,—
বালুক্ষেত্রে উঠে জল,
বুঝিলে না কলির কৌশল।
কোথায় প্রেয়সী মোর!
কলির নিগ্রহ অতি ভয়াবহ—
তাই কি আস না কাছে?
তাই কি ত্যজিয়া গেলে প্রাণেশ্বরি!—
সতি, তবু তব দৃষ্টি মম প্রতি!
কে দিয়াছে এই ধেনুধন!—
দুগ্ধদান করে নিত্য,
যত পারি, করি পান।
ক্ষীরধারে ভাসে ক্ষিতি।
স্বর্ণমূর্ত্তি ধরে মাটী
রচি' সুবর্ণ প্রাচীর চারি ভিতে।
শুনি দৈববাণী—
শনি-ভয় সুরভির স্থানে নাই;
তাই হই স্বার্থপর,
স্থানত্যাগ করিবারে নারি;
চিন্তার সংবাদ নাহি লই।
আয় নিদ্রা! বিস্মৃতি আনিয়া দে—
তুল্য হোক দিবস-রজনী।
আত্মহত্যা মহাপাপ—
নিদ্রারে করেছি মিত্র তাই।
আয় ঘুম, আয়, আয়—
ঘুমঘোরে রহি অচেতন।

( কুটীরমধ্যে প্রবেশ )

( সওদাগরের নৌকাসহ প্রবেশ )

সওদাগর—ওরে দেখ্, দেখ্। সোণার ইট—কি সুন্দর, কি সুন্দর! ওহে কে আছ কুটীরে?

শ্রীবৎস— না, না, স্বার্থপর হইব কেমনে!
নিদ্রা নাহি আসে।
চন্দ্রাননী পরের পীড়ন সহে কোথা—
আমি হেথা নিশ্চিন্ত রহিব?
একে একে পড়ে মনে—
লক্ষ্মীর মন্দির ছাড়ি'
বাহিরিনু যবে,
সহচরী সতী মোর।
বনে বনে কণ্টকে ছিঁড়িল কলেবর—
মলিন বদনে তবু হাসি,
ব্যথা মোর হরিবার তরে।

* গত সংখ্যায় "গ্রহ-চক্রে"র দ্বিতীয় দৃশ্যটী প্রথম দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে। অতএব তৃতীয় দৃশ্যটী দ্বিতীয় দৃশ্য হইবে

অগ্নিময়ী বাণী
ভরসা জাগাত বুকে।
পোড়া মৎস্য পলাইল যবে—
সে কি ব্যথা, কি লজ্জা বদনে।
কাঠ কাটি' ফিরিতাম যবে,
কি সেবা আপনহারা
তুষিতে আমারে—
নিজ দুঃখ রাখিত লুকায়ে।
হেথা নাহি শনি।
গো-মাতা সুরভি দেবি,
যদি দেবী থাকিত নিকটে,
সুখে দিন যেত,
কে চাহিত রাজ্যধন।
শূন্য এ হৃদয়,
কার তরে বেঁচে থাকা।
দেবি। গোমাতা সুরভি।
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি—
প্রণমি চরণে,
বিদায় জননি—
বাহিরিব প্রেয়সী সন্ধানে।
যায় প্রাণ যাবে,
জপি' চন্তা মন্ত্র
তেয়াগিব নশ্বর জীবন।
চিন্তাহারা বাঁচিব কেমনে।

সওদাগর—ঐ মালিক বুঝি। বেটা সোণার কদর বোঝে না। ওহে ও মুরুব্বি।

শ্রীবৎস— চমৎকার তরী।
অধিকারী করে সম্বোধন।
কি বলেন মহাশয়?

সওদাগর—বলি, ও প্রাচীরের ইট কি সোণার?

শ্রীবৎস—আজ্ঞা, হাঁ।

সওদাগর—বলি, বেচ্‌বে?

শ্রীবৎস—বেচ্‌ব। কোন নগরে নিয়ে যাবে? আমায় নিয়ে যাবে?

সওদাগর—নিশ্চয়। চলেছে বৃহস্পতির দশা, ধুলো-মুটী সোণা মুটী হয়। এস, এস—যেখানে যাবে, নামিয়ে দেব। ওরে মাঝি, শীগ্‌গির, শীগ্‌গির কিনারায় ভেড়া। দাঁড়াও বাপু, নৌকা ভেড়াচ্ছি।

শ্রীবৎস— এও কি শনির ছল?
কিবা ভয় তায়।
চিন্তাহারা—প্রাণ তার
কিবা প্রয়োজন।
জলে ঝাঁপ দিব,
এ জন্ম ত্যজিব,
অশরীরী হব
চিন্তা-ধ্যানে হয়ে রত।
শনি সেথা প্রবেশিতে
কভু না পারিবে।

(নৌকা ভিড়িল)

সওদাগর—ইস্, হাজার সোণার ইট। তোল, তোল্, বাঃ-বাঃ বেশ ইট, বেশ ইট। খাঁটী সোণা। তোমার ভাবনা কি? রাজা হবে, রাজা হবে। অনেক কড়ি পাবে।

শ্রীবৎস— দিও প্রয়োজন মত।
বিনিময়ে রেখো সাথী করে।
দেশে দেশে যাব।
চিন্তারে খুঁজিব।
প্রাণ যদি যায়,
ভাসাইয়া দিও নদীনীরে—
চিন্ত-নাম বক্ষেতে লিখয়া।

সওদাগর—বেশ, বেশ, উঠে এস, উঠে এস। দে, দে, নৌকো ছেড়ে' দে। হাঁ, এইবার বাপধন, কার পাল্লায় পড়েছ বোঝ। বাঁধ্ হাত, বাঁধ্ পা। দে জলে ঠেলে' ফেলে সোণার ইট তোমার কপালে? দে, দে, দে ঠেলে'।

শ্রীবৎস— ওরে মৃত্যু, নাহি ভয়।
কিন্তু চিন্তা, চিন্তা।
দেখা তো হ'ল না আরবার।

(শ্রীবৎসকে জলে নিক্ষেপ)

( নৌকার ভিতর হইতে চিন্তা ছুটিয়া আসিল )

চিন্তা— কার কণ্ঠস্বর।
এ যে মোর প্রাণের বীণায়
তুলিল ঝঙ্কার,
অতি পরিচিত স্বর।
প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর।
ঐ যে ডু বল জলে,
ঐ যে ভাসিল পুনর্ব্বার,
প্রাণনাথ। প্রাণনাথ, তুমি। তুমি?

শ্রীবৎস— চিন্তা। চিন্তা। অন্ধদৃষ্টি—
ডাক আরবার—
মরণে সান্ত্বনা পাই।

চিন্তা— ঐ ঐ প্রাণনাথ। কৈ। কৈ?
সলিলে গ্রাসিল, আর না উঠিল—
বিধি তোর এত মনে ছিল।
ওরে দুরাচার। ছাড়্, ছাড়্—।

সওদাগর—থাক্ নৌকায় লুটোপুটি, বেটা না খেয়ে খেয়ে কি কদাকারই না হয়েছে। বাড়ী গিয়ে বামন দিদির হাতে দেবো, খেয়ে পরে' চক্‌চকে হবে, তারপর দেখে নেবো। জোর চালা নৌকো।

( পটক্ষেপণ )

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—রাজোদ্যান। সময়—প্রাতঃকাল। পুষ্পাস্তীর্ণ কুঞ্জবাটিকায় দীনবেশী রাজা শ্রীবৎস শায়িত। পার্শ্বে রাজকন্যা ভদ্রাদেবী উপবিষ্টা—সেবারতা।

ভদ্রা— হস্তপদবদ্ধ তুমি
মৃতপ্রায় অচেতন ছিলে।
মিলি' সখীগণ
কোলাকুলি করি' তুলিনু তোমায়।
রাজোদ্যান মাঝে এ পুরী আমার,
পুরুষের প্রবেশনিষেধ।
রেখেছি গোপনে, যতনে, আদরে।
মনে ছিল, নীরবে প্রাণের খেলা
হেরিব নীরবে,
নীরব প্রাণের বীণে
বাজিবে নীরব ভাষা।
নীরবে তু'লব ফুল,
নীরবে গাঁথিব মালা,
তুলে' দিব তোমা'র গলায়;
নীরব রাখিব প্রেম।
কিন্তু বিধাতা হইল বাম।
কথা বটে, পিতা মোর শুনেছে ঘটনা।
শুধায়েছে—সত্য কি সংবাদ?
প্রত্যুত্তর দিই নাই।
নৃপতি আসিবে ত্বরা,
কোন ভয় নাহি মোর,
শুধু প্রশ্ন—তুমি কি আমার হবে?

শ্রীবৎস— অপরাধী আমি বালা।
প্রাণের আসক্তি
দোষী করে পদে পদে।
রাজার কুমারী তুমি,
শুন মোর জীবনের ইতিহাস।
ধনবান্ পিতা মোর।
ঐশ্বর্য্য-গরিমা
চিত্ত মোর করিল চঞ্চল,
পিতৃকোপে ছাড়ি' ভোগ,
হইনু ভিক্ষুক।
কিন্তু এক অপরূপা নারী,
কি তার মাধুরী,
তারে না ছাড়িতে পারি।
এমনই বিহ্বল,
রহি তার অঞ্চল ধরিয়া।
আসক্তি ছাড়িতে নারি—
সে ধনও তাই হরিল দুর্জ্জন।
পথে পথে ফিরি,
অকস্মাৎ কাঞ্চনে হইল লোভ।
রচিলাম আসক্তি-বন্ধন।
সঞ্চিনু রতনমণি।
সদয় বিধাতা—

তাই শনি-কোপ নিবারণ নাহি মানে।
দস্যুরূপে নিল সব কাড়ি'
সিন্ধুগর্ভে নিক্ষেপিল মোরে।
পুনঃ হেরি, রাজার ঝিয়ারী—
প্রেমের বন্ধনে আমারে বাঁধিতে চাহে।
আসক্তির নাহি শেষ।

ভদ্রা— বলিও না নিষ্ঠুর বচন আর।
শুন গুণমণি,
যবে তুমি জলশায়ী,
কন্দর্পে হেরিনু আমি,
বহিতে না পারি,
বুকে করে' তুলে' আনি
নিভৃত প্রাসাদে।
সেই হতে প্রাণপতি তুমি।
যদি ত্যাগ কর,
মরণ অধিক দুঃখ
হইবে আমার।

শ্রীবৎস— শুন বালা! সুবিচার
কর মোর প্রতি।
করিয়াছি স্থির—
এ মর্ত্ত্যের দুঃখাগারে
বন্দী সেই, আসক্তিরে
যে করে আশ্রয়।
নিরাসক্ত জন—
অধীন ভুবন তার কাছে।
ছাড়িয়াছি রাজ্যের আসক্তি,
নারী আর নহে প্রাণধন।
অর্থেরে অনর্থ ভাবি'
করিয়াছি বিসর্জ্জন।
এ দেহ ভুলিতে চাই,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা কিছু নাই;
কিছু না রাখিব চেতনায়।
আজ সবিস্ময়ে হেরি,
দুঃখ কিছু নাহি আর,
আনন্দ অবধিহীন,
মুক্ত, মুক্ত আমি,
বন্ধন স্ব-সৃষ্টি মানবের!

ভদ্রা— অপূর্ব্ব ভাষণ তব!
কিন্তু প্রিয়তম,
পৃথিবীতে জন্মে নর
ভুঞ্জিবার তরে।
রাজ্য-ধন নহে তো বিষয়,
প্রণয় অমূল্য ধন।
এ অমৃত না পায় যে জন
বৃথাই জীবন তার।
তুমি সুধী! গুণের বারিধি!
প্রেমাঙ্কুর তোমার কারণ।
তুমি যদি হও বাম,
জীবন বিফল হবে।
মরুময় প্রাণ
রাখিব না কোনমতে।
ধরিনু চরণ,
প্রাণভিক্ষা দাও প্রাণনাথ।

(বৃক্ষান্তরাল হইতে রাজার প্রবেশ)

রাজা— ভ্রম নহে, স্বপ্ন নহে, সত্যই দর্শন!
আরে বাহুরাজ-বালা, এত হীন,
এত তুচ্ছ জীবন তোমার?
ইন্দ্র যাচে যার পাণি করিতে গ্রহণ,
সূর্য্য ফিরে যার রূপ করিতে দর্শন,
অনাঘ্রাত বাহুরাজ-সুতা!
কি কলঙ্ক লেপিলি ললাটে মোর!
নাহি ক্ষমা। প্রহরী! প্রহরী!

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী— মহারাজ!

রাজা— বাঁধ ত্বরা দুই জনে—
বন্দী রাখ কারাগারে।
রাজরক্ত কলঙ্কিত যদি হয়,
রাজ্যের শাসনশক্তি সেথা নাহি রয়।
রাজধর্ম্ম পরম পবিত্র।

(মহিষীর প্রবেশ)

মহিষী— মহারাজ, ক্ষান্ত হও।

মন্ত্রী লিপি পাঠালেন ত্বরা,
অপূর্ব্ব ঘটনা রাজ-দ্বারে।
অনুমতি চাহে মন্ত্রী—
নিকটে আসিয়া তত্ত্ব করে বিশ্লেষণ।

রাজা— রাজদরবারে হবে—
অন্তঃপুরোদ্যানে কিবা কাজ?

মহিষী— মন্ত্রী যাচে নিভৃত মন্ত্রণা,
নিভৃতে বিচার সবাকার—
এই লিপি ধর নরনাথ।

(রাজা লিপি পাঠ করিয়া)

রাজা— অপূর্ব্ব ঘটনা বটে!
প্রহরী, ত্বরায় যাও,
মন্ত্রীরে আসিতে বল—
সকলেরে সঙ্গে লয়ে।

(প্রহরীর প্রস্থান)

হের রাণি! বীভৎস আচার।
রাজ-রক্ত দুহিতার দেহে—
রাজার সম্মান সে যদি না রাখে,
প্রায়শ্চিত্ত কিবা তার?
আর ঐ নরাধম, কুক্কুরে খাইবে মাংস—
নাহি জানি শাস্তি কি ভীষণ!

(শনি, কমলা, সওদাগর, চিন্তা, মন্ত্রী ও চোরের প্রবেশ)

চিন্তা— একি হেরি সম্মুখে আমার!
তুমি! তুমি! বেঁচে আছ প্রিয়তম?
নাথ! নাথ! দাসীরে চরণে লহ।

(চিন্তার মূর্চ্ছিত হইয়া শ্রীবৎসের পদতলে পতন)

বাহুরাজ— মূর্চ্ছিতা রমণী!
ভদ্রা, সযতনে লয়ে যাও কক্ষান্তরে।
শুশ্রূষায় পাইবে চেতনা।

(ভদ্রার দাসী ডাকিয়া চিন্তাকে লইয়া প্রস্থান)

চোর— বাহুরাজ! সকল সংবাদ
সচিবপ্রধান জানে।
নরাধম সদাগর তব প্রজা—
বাণিজ্যতরণীযোগে
নানা দেশ করে পর্য্যটন।
নারী এক করিয়া হরণ
বন্দিনী করিয়া রাখে।
বহু মতে করি' অন্বেষণ
সচিবেরে করি নিবেদন;
সপ্রমাণ কোটাল ধরিল তারে।
সুবিচার কর নরনাথ।

রাজা— ধর্ম্মাধিকরণ আছে তার তরে।
বল হে সচিব,
রাজ-অন্তঃপুর
বিচারের স্থান নহে।

সচিব— মহারাজ! শুন তবে অপূর্ব্ব রহস্যকথা।
নগর-তোরণদ্বারে অক্ষৌহিণী সেনা
প্রতীক্ষায় আছে নরনাথ, তব আজ্ঞা হেতু।
তাদের নায়ক ইনি—
হের হাতে স্বর্ণ মুকুট,
কহে বার্ত্তা—নির্ব্বাসিত শ্রীবৎস ভূপাল
আশ্রয় লয়েছে রাজপুরে,
পরায়ে মুকুট শিরে—
সেনাসহ স্বীয় রাজ্যে করিবে গমন।

বাহুরাজ— একি এ বিচিত্র বারতা!
কি প্রমাণ—
মহীপতি শ্রীবৎস নিবাসে হেথা?

ব্রাহ্মণ— হে ভূপাল! আমি সাক্ষী তার।

কমলা— নরনাথ! আমি বাক্য করি সমর্থন।

বাহুরাজ— কে তোমরা?

ব্রাহ্মণ— গ্রহরাজ রবির তনয়,
লোকময় খ্যাত শনি নাম।
বিষ্ণুপ্রিয়া কমলা আমার সনে।

বাহুরাজ— সফল জনম এতদিনে।
গ্রহপতি, চরণে প্রণতি।
জলধিজে, চিরাশীষ রেখ মাতঃ।

(প্রণাম)

শ্রীবৎস রাজন্! শুনিয়াছি—
গ্রহকোপে রাজ্যভ্রষ্ট তুমি।
বিদ্রোহী হয়েছে প্রজা।
রাজ্যহারা ভ্রম দেশে দেশে

ধন্য মোর করিয়াছ পুরী—
কত অপরাধী আমি!
ভদ্রে! ভদ্রে!

(ভদ্রার প্রবেশ)

বড় ভাগ্যবতী তুমি!
নহে এ অতিথি তুচ্ছ ক্ষুদ্র জন,
শ্রীবৎস ভূপতি!
নিজগুণে এসেছেন অধীনের সেবা নিতে
হে রাজন্! ক্ষম অপরাধ।
নন্দিনী আমার
তব করে করিব অর্পণ।

শ্রীবৎস— গৃহপতি! জলধিনন্দিনি!
পরম সুহৃৎ বান্ধবাজ!
আমি আর নহি তো আমার।
নহি রাজা নহি গ্রহকোপে
রাজ্যভ্রষ্ট আমি।
মোহ মোর হইয়াছে দূর।
আমার আমার করি'
যায় রাজ্য, যায় ধন, মান।
প্রিয়া পত্নী হয় বিসর্জ্জিতা।
যেখানে আমার কিছু
বিধাতার বজ্র সেথা পড়ে।
শূন্য তাই হয়ে রই
যতক্ষণ প্রাণ, প্রাণ মাত্র
স্মরণ আমার।
স্মরণে স্মরণে মহাপ্রাণ
অনুভূত হয়।
ঊর্দ্ধ-শির জাগে কুণ্ডলিনী,
অমৃত ঝরিয়া পড়ে,
ব্রহ্মানন্দে অবশ অন্তর।
কিবা প্রয়োজন রাজ্যধনে?
বামা মোর কিবা প্রয়োজন?
অনিকেতঃ আমি।
আছি আজ হেথা, কাল যাব কোথা—
কিছু নাহি জানি।
আঁখি-তারকায় আঁকা ছবি এক
মুছিতে না পারি,
আজি সুপ্রভাতে নয়নে নয়নে
সে ছবি মিলিল—
অন্তরে পাইনু তারে।
আর ভেদ কিছু নাহি ভবে।
আমি নর, আমি নারী,
আমি রাজা,
প্রজার বিগ্রহ,
সুখ দুঃখ সমান সকলি।
কিছুতে না ডরি আর।
বিস্মরি' অতীত, স্মরি নিত্য ধন;
মুক্তির অমৃত
অভিষিক্ত করে মোরে।
কৃতজ্ঞতা রহিল সর্ব্বজনে।—
আদেশ পাইলে,
বিদায় লইতে পারি।

ব্রাহ্মণ— হের বরাননে!
হের মোর অতুল প্রভাব।
ত্রিসংসারে তুমি আমি
কিছু নহি আর—
ধর্ম্মে মতি হয় যার।
তোমার কৃপায় ধন, মান, বন্ধন ঘটায়।
আমার কৃপায় দিব্যজ্ঞান পায় লোকে।
প্রবৃত্তি বাসনা রৌরব-সৃজন হেতু।
সে আসক্তি দূর করি,
মোক্ষপথে ধায় নর,
সে কি নহে করুণা আমার?

কমলা— সর্ব্বজন এই জ্ঞান-ধন
যদি পেত তোমার কৃপায়,
শুন ওহে ছায়ার তনয়,
তোমার গৌরব তাহে বাড়িত নিশ্চয়।
তেমনি আমার কৃপা
সর্ব্বজন সমভাবে না লয় কখন।
কেহ অন্ধ ধনগর্ব্বে, কেহ অনাচারী,

কেহ হত্যাকারী হয় ভাগ্যদোষে।
কিন্তু জেন, দিব্য ক্ষেত্র হয় যদি,
আমার প্রসাদ মর্ত্ত্যে করে
স্বর্গের সৃজন।
গ্রহরাজ, কলহের নাহি প্রয়োজন।
রেখ মনে—ব্রহ্মানন্দে
নূতন জনম যেবা পায়,
যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
কিম্বা ইন্দ্র, যম, বরুণ, পবন, গ্রহগণ
তার প্রতি প্রভাব করিতে নারে।
শ্রীবৎস নৃপতি মায়ামুক্ত আজি,
স্বরূপচেতনে তুমি আমি
অভেদ হইয়া রহি।
জ্ঞান-ঘন স্বরূপ তোমার,
ঈশ্বর প্রসাদ মম আশীর্ব্বাদ,
শ্রীবৎসে স্বরূপ-ধন সঞ্চারি' যতনে,
স্ব-স্ব ধামে করিব গমন।
কলহ কারণ এই আত্মজ্ঞান দিতে।
শুন ওহে শ্রীবৎস রাজন্!
আসক্তির নিরসন করিয়াছ তুমি।
এবে রাজসিংহাসন
নহে তব ভোগের কারণ।
নারায়ণ মহিমা সকলই।
তুমি বিভু, বিশ্ব তার মহিমা-প্রচার।
কর এই তত্ত্বের আচার,
বিশ্বজন শ্রীহরি-চরণ
লইলে শরণ,
কল্প পূর্ণ হবে বিধাতার।
এই হেতু বিশ্বের শাসন—
সে ভার গ্রহণ
তোমাতে সম্ভবে পুত্র!

চোর—তাইতো বলি, সংসারটা কি শুধু ছায়াবাজী? সবই দেবতাদের কারসাজী? তা' না হলে চোরের ঘাড়ে চড়ে' এ কাজ করায় কে? (একটু চিন্তা করিয়া) দেবতারা থাকতে থাকতেই কাজটা শেষ করি। তা' না হলে রাজা যে রকম বেগোড় গাওনা সুরু করেছেন, একটা ঋষি-টিষি হয়ে না সটকায়! (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আমি চোর। কিন্তু আজ বিদ্রোহীদের দমন করে' এই রাজমুকুট আপনার মাথায় পরাতে এসেছি। এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে আপনি স্বরাজ্যে গমন করুন। আমি আবার যেমন ছিলুম তেমন হই, চুরি বিদ্যেই ভাল; তবে এবার যে সে চুরি নয়, ঠাকুর-চুরি শ্রেয়ঃ করব। লক্ষ্মীর মন্দির থাকবে আমার জিম্মায়।

(রাজাকে মুকুট পরাইতে গেল)

শ্রীবৎস— পরম সুহৃৎ তুমি,
করিয়াছ বিদ্রোহ দমন।
গড়িয়াছ নব সেনাদল!
রাজচ্ছত্র তব প্রাপ্য—
ধর শিরে রাজার মুকুট।

চোর—এমনও হয়! বলি মন, কোথা থেকে কোথায় একবার বুঝে দেখ্! বিগ্রহের চরণ ছুঁয়েই এই—শ্রীহরির হৃদয়রতন হৃদয়ে ধারণ করে' থাকলে কি হয়, একবার ভেবে দেখিস্ মন! (প্রকাশ্যে) শুন রাজা, তোমার ছিল অনেক ধন, অনেক প্রজা। খ্যাতি, প্রতিপত্তি পাহাড় সমান। শনি দেবতার অনুগ্রহের মাত্রা ঠিক তেমনই। আমার ক্ষুদ্র প্রাণ—নিগ্রহ অনুগ্রহ দুই'ই সমান। ধর মুকুট, চল রাজ্যে; প্রজাপালন কর সুখে—রাণীমাকে সঙ্গে নিয়ে।

শ্রীবৎস— তুচ্ছ করিয়াছি সব।
অসার সংসার, কেহ নহে কার;
এই যে শরীর, ইহাও রে নহে আপনার।
ধূলায় মিশাবে, শূন্যে শূন্য হবে;
রাজ্য-ধন নাহি চাই।
বল ভাই, বল প্রাণ ভরে',
আনন্দেরে যেন সবে পায়,
ভোগ নহে তাহার কারণ।

কমলা— শনি নহে পূর্ণ অবতার।
দেবতার এক অঙ্গ পেয়েছ রাজন্,
বৈরাগ্যের হোমটীকা ললাটে তোমার।
গ্রহপতি, দাও দীক্ষা পূর্ণ ধর্ম্মে।

নব হোক বিষ্ণুব বিগ্রহ।
জ্ঞান, প্রেম, কর্ম্ম, সেবা,
চতুরঙ্গ মর্ত্ত্য প্রাণ।
চতুর্ব্যূহ নাবায়ণ
ধর্ম্মামৃত-বিতরণ হেতু।
ধর্ম্ম-রাজ্য স্বপ্নকল্প তাঁব।
শ্রীবৎস বাজন্‌!
ভারত ঈশ্বর হবে,
নিখিল পৃথিবী সুশাসনে রবে,
ধর্ম্মপ্রাণ জাগিবে মরতে।
অমৃত লুটিতে দেবগণ
স্বর্গ হতে আসিবে ধরায়।
মহীপতি ধর বর!
রাজ্যেশ্বব ধর্ম্মের কাবণ।

শনি— সম্বৎসবে করিয়াছ অতিক্রম মোরে।
জ্ঞানঘন ব্রহ্মেব বিগ্রহ হেরি তোমা।
তোমার ভিতবে সার্থক হয়েছি আমি।
শুন নরপাল! সুবর্ণ মুকুট
শোভে না তোমার আব।
ধব শিবে গৈবিক ভূষণ
ধর্ম্ম-রাজ্য করহ স্থাপন।

কমলা— জয়তু! জয়তু! ধন্যা ধবা, ধন্যা তুমি।

(উভয়ের প্রস্থান)

বাহুরাজা— মহারাজ! ধন্য এত দিনে,
মম সাধ, ভদ্রারে গ্রহণ কব।

শ্রীবৎস— মর্ত্ত্যপ্রাণ বিসর্জ্জনে,
লভিয়াছি নূতন জীবন,
দেবতার আয়ুঃ বহি বুকে।
ধর্ম্মপত্নী চিন্তা সুবদনী,
ধর্ম্মকার্য্যে সহায় সে চিরদিন।
নরপাল, যোগ্যপাত্রে
ভদ্রারে অর্পণ কর।

ভদ্রা— ওহো বজ্র কি হেতু না পড়ে শিরে!

শ্রীবৎস— চিন্তা! চিন্তা!

(চিন্তার প্রবেশ)

চিন্তা— কেন নবনাথ?
আনন্দে বিহ্বল হিয়া,
আনন্দে বিহ্বল অঙ্গ,
শুনিনু, হেরিনু সব।
মহোৎসব আজি রাজা।
শুন কথা, ভদ্রা যে বেসেছে ভাল—
গুণমণি! কিবা তাহে অকুশল?
দেবব্রতী আজি হতে হও।
দেবকার্য্য করিতে সাধন
প্রয়োজন ভদ্রাব জীবন,
তারে তুমি সঙ্গে কবি' লও।
কাটিয়াছ আসক্তি বন্ধন,
ব্রহ্মানন্দে অনিন্দ্য জীবন
আমি পত্নী স্মৃতি হয়ে রই।
তুমি কায়া, আমি ছায়া,
তুমি-আমি অভেদ রাজন।
অপাথিব তোমাব জীবন,
অপ্রাকৃত আচবণ,
নিখিল প্রকৃতি তব সাথী,
এখানে বিক্ষোভ নাই,
দ্বন্দ্ব-ব্যথা কিছু নাই,
এস ভদ্রে! দেবকার্য্য কবিবে সাধনা।
নারায়ণ স্বামী তোব,
চিত্ত প্রেমে হোক ভোর,
নাবীজন্ম বক্ত মাংসে নহে।
প্রেম আশে চন্দ্রমুখি,
কামতনু কর লয়,
প্রেমময় তত্ত্বে সঁপ প্রাণ
এস বুকে প্রেমময়ি,
দিব তোরে পরম আশ্রয়।

(যবনিকা)

# গণসাহিত্যে পল্লী-নৃত্যগীতের স্থান

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় মৌলিক

বাংলা আজ উন্নতির যুগান্তরের পথে যাত্রা করিয়াছে কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু যে পথ লক্ষ্য করিয়া চলিলে পরিবর্ত্তনোদয়ের মধ্য দিয়া অগ্রগতির অস্তাচলে উপনীত হইতে পারিবে, বাংলা আজ সেই পথের পথচারী। বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত বাংলার ইতিহাসের পাতাগুলি ঘাঁটিলে দেখা যাইবে যে, তাহার ক্রমোন্নতির ধারা একটা বিশিষ্ট পথে যাত্রা করিয়াছে। তাহার শিল্প-চর্চ্চা বাড়িয়াছে, সঙ্গীতকলার প্রসার চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, দর্শনের সূক্ষ্ম মীমাংসাগুলি আর টোলের পণ্ডিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। তাহার ঢেউ বাংলার সীমা ছাড়াইয়া সাগরপারে গিয়াও সজোরে ধাক্কা দিতেছে। ধনবৈজ্ঞানিকেরাও ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের মধ্য দিয়া দেশের অর্থসমস্যার মুক্তির স্বপ্ন দেখিতেছেন—যাহাকে বিনয়কুমার বলিয়াছেন "বাড়তির পথে বাঙ্গালা।"

আজ এই যে সকল দিক্ হইতে একটা রাজ্যজোড়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, ইহার মূলে রহিয়াছে জাতি-গঠনের বিপুল প্রেরণা এবং এই সত্যটাই আজ আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে শিখিয়াছি যে, আমাদের যাহা কিছু আছে. তাহাদের উপরেই করিতে হইবে জাতীয়তার ভিত্তিগঠন। আর একবার গোড়াপত্তন যদি দৃঢ় হইয়া উঠে,. তবে তাহাতে রং-ফলানোর জন্য বিদেশ হইতে উপাদান আমদানী করিলেও, তার দৃঢ়তার হ্রাস ঘটিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। যে আবেষ্টনীর মধ্যে আমরা প্রতিপালিত হইয়া উঠিয়াছি, যে আলো-বাতাসের মধ্যে আমরা আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করি এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে যে সত্য পরিস্ফুট রূপে দেখিতে পাই, ইহাদেরই মূলে রহিয়াছে জাতীয়তার গোড়াপত্তনের অপূর্ব্ব কৌশল। ইহা লইয়া বহু মহলে বহু তর্কের উত্থাপনা চলিয়াছে, এবং,.এই মূল মন্ত্রের উত্থাপনায় আরও হরেক রকমের অনুশীলনের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের প্রশ্ন উঠিয়াছে। তাহা লইয়া দুর্ভাবনার প্রয়োজন নাই। সাঁতার শিখিবার প্রথম অবস্থায় অনেক রকমের সাহায্যের প্রয়োজন থাকিতে পারে, কিন্তু একবার দক্ষ হইয়া উঠিলে, তাহার আর.প্রয়োজন হয় না। ইহাও অনেকটা তাই। আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলিতে পারি যে, ভাত জুটিলে পিঁড়ির অভাব হয় না। কোন এক বিখ্যাত কবি বলিয়াছিলেন যে, আজ যাহাকে তোমরা বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে কর, কালও তাহার প্রয়োজন থাকা অসম্ভব নয়; কিন্তু সে দিনের কথাও আমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়, যেদিন পূর্ব্বেকার দিনগুলির প্রয়োজনীয়তার কোনই আবশ্যকতা রহিবে না। যাক্ সে কথা। সেই গোড়া-পত্তন আজ অতি মৃদুভাবেই সংস্থাপিত হইয়াছে, কারণ তাহার প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু আমাদের জাতীয়তার পূর্ণত্বলাভের পথে রহিয়াছে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাবিঘ্নের অস্তিত্ব। তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া অগ্রগতির পথে যাত্রা করাও আমাদের সীমার বাহিরে নয়, এ কথা পরিস্ফুটরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে এবং এই জাতীয়তাগঠনের পথ-নির্দ্দেশ বহু মনীষী বহু ভাবের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহার সকল বিষয়-বস্তুগুলিই আমাদের আলোচনার গণ্ডীর ভিতরে নয়। কেবল গণশিক্ষা-বিস্তারের আয়োজনকল্পে কয়েকটি কথার আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব মাত্র।

শুনিয়াছি শিক্ষাই নাকি জাতীয়তার মেরুদণ্ড এবং শিক্ষাকে কেন্দ্র করিয়াই জাতির ভবিষ্যৎ ইতিহাস সমুজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়। কিন্তু আমাদের দেশে লোকশিক্ষা-প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্যে য়ুরোপীয় পদ্ধতির সূত্র অবলম্বন করিলে সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই। কারণ চিন্তা-ধারার রসবৈচিত্র্য যেখানে মর্ম্মাহত, সেখানে জীবনের সাড়ার মাহাত্ম্য খুঁজিয়া মিলিবার উপায় থাকিবে না। কাজেই গণশিক্ষার বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে আমাদের

অন্নজলে বঞ্চিত গণসাহিত্য-সৃষ্টির পরিকল্পনা অবশ্যম্ভাবী। এই লোকসাহিত্যের দিকে নজর না ফেলিলে জনগণের আত্মা, 'জাতীয়' চেতনা ইত্যাদি আবিষ্কার করা অসম্ভব। গণসাহিত্যের সঠিক সীমারেখা অঙ্কিত করা আমাদের সামর্থ্যের বাহিরে। কিন্তু বিনয়কুমার এক স্থানে বলিয়াছিলেন "জনসাধারণ যে সকল কিচ্ছা-কাহিনী এবং নৃত্যগীতে আনন্দ পায়, সেই সবই হইল লোকসাহিত্য।' ইহাকেই যদি সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বাংলার যে সমুদয় পল্লী-নৃত্যগীত অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের পুনরুদ্ধার করিয়া বাংলার গণ-সাহিত্যের মন্দিরের পূজার বেদীমূলে অর্ঘ্য রচনা করিলে, তাহার অমর্য্যাদা ঘটিবার সম্ভাবনা অতি অল্পই থাকিবে বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালী চরিত্রের যাহা সনাতন বৈশিষ্ট্য, তাহার কিছু রূপ ইহাদের উপরেও প্রতিফলিত। আর কোন জাতির যদি মনের খোঁজ তলাইয়া দেখিতে যাই, তাহা হইলে হয়ত দেখিতে পাইব যে, সমচিন্তার অভাব কোন জাতিকেই উন্নতির পথ হইতে ক্ষুন্ন করিয়া রাখে নাই। কিন্তু যে সংস্কারাবদ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে তাহারা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার কিছু না কিছু তাহাদের মনের কোথাও একটা গভীর ছাপ আঁকিয়া দিয়াছে, এবং ইহারই মূলে রহিয়াছে বিভিন্ন দেশের জাতীয়ত্বের অনৈক্য। আর এই বৈশিষ্ট্য যাহাদের মন হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, কেহ কেহ তাহাদের অভিহিত করিয়াছেন 'জিপ্‌সি' নাম দিয়া। বাহিরে না হইলেও, অন্তরে অন্তরে ত ইহার আভাস মিলিতেই পারে। "সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি" ছাড়া বঙ্গদেশের আর কোন কল্পনাই আমাদের মনে জাগিয়া উঠুক, শিহরিয়া উঠিব সন্দেহ নাই। কাজেই গণশিক্ষাবিস্তার-কল্পেও ইহা বিশেষভাবে প্রযুজ্য।

এখন এ প্রশ্ন উঠা অসম্ভব নয় যে, গণসঙ্গীত এবং গণনৃত্যের পুনরুদ্ধার সম্ভব হইলেও, উহা নিরক্ষর বঙ্গবাসীর চিত্তবৃত্তিকে কতখানি এবং কোন বিশিষ্ট ভাবধারায় উন্নত করিতে সমর্থ হইবে। একটু তলাইয়া দেখিলেই এ প্রশ্নের মীমাংসা পাওয়া যাইতে পারে। প্রথমে আমরা গণ-সঙ্গীতের কথাই বলিব। বাংলার গণ-সঙ্গীত বলিতে বাউল, ভাটিয়াল, কীর্ত্তন, জারি, কবি প্রভৃতি সকলকেই বুঝিতে আমরা অভ্যস্ত। বাংলার বাউল গান আগাগোড়া আধ্যাত্মিক রসে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বকালে চারণ-চারণীদের গানে যে আধ্যাত্মিক ভাব ফুটিয়া উঠিত, তাহাই বাংলায় আসিয়া বাউল হইয়া দেখা দিয়াছিল। একতারার সুরে সুর মিলাইয়া বাউলের গান যে মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করিত, তাহা পল্লী বাংলার অন্তরে অন্তরে এক অভিনব উদাস ভাবের আলোড়ন উপস্থিত করিত। জীবলীলার শেষ পরিণতি এবং ইহার চরম অবিনশ্বরতার যে মর্ম্মবাণী বাউলের গান ফুটাইয়া তুলিত, তাহা নিরক্ষর গ্রাম্যকবির মুখে যে কিরূপ অত্যাশ্চর্য্যভাবে দেখা দিয়াছে, তাহার একটী নমুনা—

ব'সে ভাবছ কি মন, নদীর কুলে হবে রে শেষ বিয়া।
মুকুট ছাড়া হ'বে বিয়া, গায় মাথায় এক কাপড় দিয়া,
জনমের মত থাকবি রে তুই শুইয়া।
ও তোর অধিবাসের স্নান করাবে সাত কলস জল দিয়া।
তোর শ্বশুরবাড়ী জালালপুরী, বাইর বাড়ী ভূতের কাছাড়ী,
ভূতগণে নাচবে তোরে পাইয়া।
তখন মহাদেবে গান করিবে ডম্বরা বাজাইয়া।
তখন শিয়াল কুকুরে নাচবে তোর বিয়ার খাওয়ন খাইয়া॥

দৃষ্টান্তস্বরূপ, এরূপ বহু গান দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন হইবে না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা অসম্ভব নয় যে, এরূপ মহৎ অর্থপূর্ণ অথচ এরূপ সহজ সরল ভাষায় গান গাহিয়া বেড়ানো যদি বাউলদের শুধু জীবিকা-নির্ব্বাহের উপরই ন্যস্ত থাকিত, তাহা হইলে তাহা যে ভাবেই হউক না কেন, আজ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিবার সুযোগ জুটিত না এবং এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া বাউল-গান রচনা করিবার মোহ কতদিন একভাবে চলিয়া আসিত, তাহা বলা দুষ্কর। এমন দুই একটা স্পষ্ট প্রমাণ আজকাল পাওয়া যাইতেছে যে, সরল মনের উপর আধ্যাত্মিক শিক্ষার মূলনীতির একটা স্থূল ছাপ লাগাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব্বেকার নৃপতিজাতীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁহাদের নিজেদের বাউল-গানের রচয়িতা এবং গায়ক রাখিতেন, এবং এই ছাপটা একবার গভীর হইয়া গেলে, তাহাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মনের উপর খেলা করিয়া, অন্তরে একটা বিরাট বৈরাগ্যের সৃষ্টি করিত। কিন্তু ইহা হইতে যেন এটা না বুঝ

যে, তাহারা একেবারে বিবাগী হইয়া ঘর-সংসার ছাড়িয়া, বিষয়-কর্ম্ম পরিপূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া, লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া পথে ঘাটে বাহির হইয়া পড়িত। বরঞ্চ তুচ্ছ স্বার্থ ভুলিয়া, সংসারের অনিত্যতার কল্পনা করিয়া দেশকে, দশকে তারা ভালবাসিতে শিখিত। ফলে সমচিন্তার সমন্বয়ে দেশের সকলের সাথেই একটা নিকটতর সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইত। ইহাই বাউল গানের গোড়ার কথা। ভাটিয়ালি গানের আবশ্যকতা বিচার করিতে যাইয়াও আমরা প্রায় একই সুরের আভাষ পাইয়া থাকি। আমাদের বাল্য, কৈশোর ও যৌবন পল্লীগ্রামের যে উন্মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে কাটিয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি বস্তুর সাথেই আমাদের মনের গোপন মিলন রহিয়া গিয়াছে। পশুপক্ষী, ফুলফল, বৃক্ষলতা, নদী, মাঠ, বন প্রভৃতি সকলই প্রিয়জনের মতই আমাদের নিকট পরম আত্মীয়। ইহাদের ছাড়া যেন আমাদের বাঁচিবার উপায় নাই। পথ চলা যেন আরও দুর্গম। যখনই ইহাদের সাথে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, তখনই আমরা পাইয়াছি ভাটিয়াল গানের মর্ম্মকথা। কার্য্যোপলক্ষে কেহ বিদেশে যাইতে বাধ্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু মন পড়িয়া রহিয়াছে তাহার পল্লীগ্রামে, তাহার ক্ষুদ্র গৃহকোণে প্রণয়িনীর কাছে। তাহাকে প্রবোধ দিবার কেহ নাই, সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই; তাই ভাটির টানে নৌকাখানি ভাসাইয়া আপন বিরহের গাথা গাহিতে গাহিতে সে চলিয়া যাইতেছে। এদিকে বিরহিণী জল আনিবার ছলনায় নদীর ধারে যাইয়া ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে—প্রিয় কখন আসিবে, এই আশায়। এই যে বিরহ-মিলনের কাহিনী এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রতি সস্নেহ ভাব, যাহা ভাটিয়াল গানে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, গণশিক্ষাবিস্তারে ইহা লোকসাহিত্যের অঙ্গীভূত হওয়া অসম্ভব নয়। উপরোক্ত গানগুলির যদি লোক-সাহিত্যের দলভুক্ত হওয়ার সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে, তাহা হইলে জারি, কবি, যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি বিভিন্ন গানগুলিও দূরে সরাইয়া রাখিবার সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।

আজ এই পল্লীগানের ধ্বংসের কারণ খুঁজিতে গিয়া দেখি যে, যে কারণে আমাদের সকল আনন্দের হাটগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সে সকল কারণ এ স্থলেও বিদ্যমান। প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণ। লোকের আর্থিক অবস্থার বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনের ক্ষুধা হইতে দেহের ক্ষুধাই ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহারই সংস্থান করিতে যাইয়া সমস্ত জীবন কাটিয়া গিয়াছে, ফলে অন্য কিছুর দিকেই নজর দিবার সময় ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ইহা সত্য হইলেও, সম্পূর্ণ সত্য নহে—কেবল আংশকরূপে প্রযুজ্য হইতে পারে। কারণ যখন গ্রামে গ্রামে থিয়েটারের ষ্টেজ ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতে পারে এবং বিদেশী গ্রামোফোন কোম্পানীর শত শত টাকার রেকর্ড বিক্রয় পল্লীগ্রামে পল্লীগ্রামে সম্ভব হইতে পারে, তখন এই ধরণের আনন্দোৎসবগুলির জন্য যৎকিঞ্চিৎ খরচ হওয়ার সময়েই অর্থের অভাব অনুভব করি কেন? ফলতঃ দেখা যাইতেছে যে, ইহার মধ্যে আরও দুই একটা প্রচ্ছন্ন সত্য আছে। তাহা আমাদের সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত আন্তরিকতার অভাব। আমরা ইহাদের মূল্য দিতে শিখি নাই এবং ইহাদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম। দেশের সকল বিষয় হইতে আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া তাহা ন্যস্ত করিয়াছিলাম বিদেশীদের করুণার উপর, তাই আজ এই রাজ্যজোড়া অভাব আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। দেশের মধ্য হইতে যদি আমরা মনকে দূরে সরাইয়া রাখি এবং সনাতন অভাবগুলির প্রতি সচেতন না হই, তাহা হইলে যে কেবল আমাদের দুরবস্থা ক্রমেই ভীষণ হইয়া উঠিবে এমন নহে, আমাদের আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়া আমাদের দাবী পড়িবে অপাত্রের হাতে। ক্রমে আমাদের অবহেলা ও ঔদাসীন্য ইহাদের প্রতিদিন ধ্বংসের পথে আগাইয়া দিয়াছে। কবিবর জসীম্ উদ্দীন এই প্রসঙ্গে অপর একটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিদেশী সভ্যতাই আমাদের সকল ঐশ্বর্য্যকে গ্রাস করিয়াছে। বিদেশী সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে নগরকে কেন্দ্র করিয়া। আমাদের দেশের প্রধান নগরগুলিও বিদেশীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং ইহাদের উপরেও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব পুরাদমে লক্ষিত হয়। বিদেশী পণ্য ও বিলাসদ্রব্যের আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীর চিত্তবৃত্তিগুলিও আমাদের

সহরে আমদানী হইতেছে। ক্রমে তাহা পল্লীগ্রামেও ছড়াইয়া পড়িতেছে। পল্লীর সরল মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেও ইহাদের বিলম্বের প্রয়োজন ঘটে নাই। কিন্তু সহরকে পল্লীর যাহা দিবার ছিল, তাহা আমরা অকাতরে গ্রহণ করি নাই। ফলে পল্লী ক্রমশঃই সহরমুখী হইতেছে, কিন্তু সহরে গ্রামের আবহাওয়া ফুটিয়া উঠিতেছে না। এইরূপে পল্লীর সমুদয় ঐশ্বর্য্যগুলিই হেলায় নষ্ট হইয়াছে।

বাংলার পল্লীগানের পুনরুদ্ধারকল্পে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় কবি অতুলপ্রসাদ সেনের নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ করা যাইতে পারে। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক, গান-রচনায়ও তেমনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বাউল-গানের মূল নীতির অনুসরণ করিয়া তিনি আজীবন যে কবিতাগাথা গাহিয়া গিয়াছেন, তাহা গণসাহিত্যের ভাণ্ডারে চিরদিনের জন্য অমূল্য সম্পদ্ হইয়া থাকিবে। অতুলপ্রসাদ অন্তরে অন্তরে ছিলেন ভক্ত-সাধক, ভক্ত-সাধকের হৃদয়-বেদনা তাঁহার সঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতুলপ্রসাদের পরেও অন্য গীতিকারগণ বাউলগান রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কিন্তু গ্রাম্যকবিগণ কর্ত্তৃক যে গানগুলি রচিত হইয়াছিল, যাহা আজ প্রায় সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; সেই গানগুলির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা আজিও তেমন বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয় নাই। এখন হইতে ইহার প্রতি আন্দোলন না চালাইলে ভবিষ্যতে ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশী হইবে, সন্দেহ নাই। ভাটিয়ালি গানের বিষয়ে কিছু বলিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে কবি জসীম্ উদ্দীনের কথা। পল্লী-বাংলার আড়ম্বরহীন সুখ-দুঃখের সরল চিত্র তাঁহার গানে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রচিত "বালুচর", "নক্সী কাঁথার মাঠ" প্রভৃতি কাব্যসঙ্গীতগুলি ইহারই পরিচায়ক। তিনি তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলিকে কেবল মাত্র ভাবনিষ্ঠ করিয়া তোলেন নাই, বস্তুতন্ত্রের ভিতর দিয়াও তাঁহার প্রতিভা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সেই কারণেই আজ আমরা পল্লীকবি বলিতে জসীম্ উদ্দীনকে বুঝিতে অভ্যস্ত। জসীম্ উদ্দীনের পরে নজরুল ইস্লাম, অজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, মুক্তারঞ্জন বস্থ প্রভৃতি অন্যান্য গীতিকারগণকেও ভাটিয়ালি গান রচনায় নজর দিতে দেখা গিয়াছে। কীর্ত্তনের বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিবার নাই, কারণ কীর্ত্তনের আদর এখনও কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি ভক্ত কবিগণ কীর্ত্তনগানের ভাণ্ডার চিরদিনের জন্য পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। 'যাত্রা', 'কবি' প্রভৃতির সমাদর পল্লীগ্রামে কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। "এইরূপে জাতীয় সঙ্গীতের পুনরুদ্ধার করিয়া এবং ইহাদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি মত প্রকাশ করিয়া 'হার্ডার' গেটে-যুগের জার্ম্মান সমাজে জাতীয়তার ভিত্তি কায়েম করিয়া গিয়াছেন।"

এইবার পল্লী-নৃত্যের বিষয়ে দুই একটা কথা বলিব। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, কেবল লীলায়িত অঙ্গভঙ্গী করিয়া সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিবার জন্যই ভারতীয় নৃত্যকলার সৃষ্টি হয় নাই। বরঞ্চ আত্মানুভূতির অভিব্যক্তির অভিপ্রায়েই ভারত করিয়াছে নৃত্যের সৃষ্টি। ইহা আত্মার অভিনব কৌশল এবং অতি নীরবেই তাহা সংগঠিত করিয়া লইয়াছে। ভারতীয় নৃত্যকলার আরও একটা দিক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অন্যান্য কলাবিদ্যার মতই ধর্ম্মের সহিত অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রথিত। কিন্তু গণনৃত্যকে অন্যান্য প্রকার নৃত্যাবলী হইতে বিভিন্ন রূপে দেখিতে হইবে। অন্যান্য নৃত্যগুলি শুধু রূপ সৃষ্টি করিয়াই খালাস; কিন্তু গণনৃত্যের আদর্শ উহা হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্নরূপে সংস্থাপিত।

দেহ এবং মনের উৎকর্ষসাধনই গণ-নৃত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ, মনের উন্নতির জন্য রহিয়াছে ব্রত-পালন এবং যোগাভ্যাসের ব্যবস্থা। কর্ম্মকে শৃঙ্খলিত করিতে না পারিলে, ব্রতোদযাপন অসম্ভব। অথচ যোগহীন কর্ম্মেরও কোন সার্থকতা নাই। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, একটা ছাড়া অন্যটা চলিতে অক্ষম। কিন্তু এই ব্রত এবং কর্ম্ম, উভয়েরই অত্যাশ্চর্য্য সম্মেলন দেখিতে পাই গণ-নৃত্যে। ইহাতে একদিকে যেমন সংযমশিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে, তেমনি অন্যদিকেও ব্রতোদযাপনের ফলে পরিণামে সুখ-শান্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে প্রচুর। ব্রত-পালনের প্রথম সম্বল হইতেছে চরিত্রগঠন করা এবং চরিত্রগঠনের জন্য যে সমুদয় ব্রতাচরণের প্রয়োজন

তাহার প্রায় সকলগুলিকে লইয়াই গণনৃত্যের সৃষ্টি। তাহার মধ্যে জ্ঞান, সত্য, শ্রমাভ্যাস, একতা, আনন্দলাভ প্রভৃতি—এইগুলিই প্রধান। কিন্তু যেমন বাষ্প না হইলে ইঞ্জিন চলা দুঃসাধ্য, হাজার লোকের চেষ্টা উহা স্থানচ্যুত করিতে অসমর্থ, তেমনি বিভিন্ন ইতর সাধারণের চরিত্রবান্ হওয়ার চেষ্টায় সমাজোন্নতির আদর্শ ভুলিয়া গেলে মহৎ প্রাণের আবির্ভাব তেমনই দুঃসাধ্য এবং দুর্ল্লভ হইয়া পড়িবে। কারণ ইঞ্জিনের সহিত বাষ্পের যেরূপ নিকটতর সম্বন্ধ, সমাজের সহিতও জনসাধারণের সেইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। গণনৃত্যের সৃষ্টিকর্ত্তাদের এই ধারণা মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই তাঁহারা এই আদর্শকে গণনৃত্যের অঙ্গীভূত করিয়া গিয়াছেন। তাই বাংলার ব্রতচারীরা সমস্বরে গাহিয়া উঠিয়াছে "আমরা বাংলাকে ভালবাসিব, বাংলার সমাজকে উন্নত করিব, বাংলার সেবা করিব।" যদিও বাংলার উজ্জ্বল মুখশ্রী দেখা বাঙ্গালী ব্রতচারীর একান্ত ধর্ম্ম, তবুও বিশ্বসমাজের সহিত বাংলার আত্মীয়তা ঘটান ব্রতচারীদের কামনার বাহিরে নয় কিংবা তাহারা বিশ্ব-সমাজের হিতকামী হইতে নিশ্চেষ্ট বা পরাঙ্মুখ নয়। দেহের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও, গণনৃত্যের আবশ্যকতা কম নয়। ক্রমাগত অঙ্গচালনার ফলে মাংসপেশী সকল সুদৃঢ়, সুগঠিত হয় এবং শরীরে বলবৃদ্ধি হয়। ফলে সকল কার্য্যেরই একটা নিবিড় আকাঙ্ক্ষা এবং উৎসাহ বাড়িয়া যায়। অলসভাবে নিরানন্দ দিন কাটাইবার ইচ্ছা সংযত হয়। এখন দেখা যাইতেছে যে, এই গণনৃত্য এবং এতদ্বিষয়ক রচনাবলী লোক-সাহিত্যের অঙ্গীভূত হওয়া অসম্ভব নয় এবং ইহার ভাবধারাগুলিকে লোক-সাহিত্যের উপযোগী করিতে পারিলে, তাহা ইহাকে প্রতিদিনই উর্ব্বর এবং সরস করিয়া রাখিতেও সমর্থ হইবে।

বাংলাদেশে যে সমুদয় পল্লীনৃত্য অধুনা প্রায় সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং যাহা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের মধ্যে "রায়বেশে নৃত্য", "ঢালানৃত্য" "ঝুমুরের নৃত্য" "কাঠিনৃত্য" প্রভৃতি এইগুলিই প্রধান। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে "রায়বেশে নৃত্যই" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। এই নৃত্য প্রাচীন বাংলার সামরিক নৃত্যরূপে পরিগণিত হইত এবং সাধারণের মধ্যে এই নৃত্যের প্রচলন ছিল না বটে, কিন্তু নগণ্য পদাতিক হইতে সেনাপতি পর্য্যন্ত এই নৃত্য বাধ্যতামূলক বলিয়া গণ্য হইত। কোন একপ্রকার বিশিষ্ট বংশদণ্ড লইয়া এই নৃত্য করিতে হইত। এই নৃত্যের ভিতর দিয়া তাৎকালীন সামরিক কলাকৌশল প্রভৃতি শিক্ষাপ্রদানের পদ্ধতি ছিল। তাই মাঝে মাঝে আমাদের মনে এই ভাবেরই উদয় হয় যে, প্রাচীন বঙ্গবাসীর অপূর্ব্ব সমরকৌশলের যে সমুজ্জ্বল চিত্র আমরা দেখিতে পাই, তাহার অন্যতম কারণ হয়ত ছিল এই নৃত্য। এই সম্বন্ধে একটি সুপ্রচলিত প্রবাদ আছে। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন এবং উত্তর ভারতের প্রায় সমুদয় রাজ্য অধিকার করিয়াও বাংলা আক্রমণের অভিলাষ প্রকাশ করেন, তখন তিনি "গাঙ্গরাঢ়ী"দের নাম শুনিয়া সেই মতলব ত্যাগ করেন। এই গাঙ্গরাঢ়ীরা—যাহাদের শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা আলেকজণ্ডার পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন, তাহারা প্রাচীন বঙ্গবাসী ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঢালী নৃত্যের প্রথম প্রচলন দেখিতে পাই প্রতাপাদিত্য এবং ঈশা খাঁর আমল হইতে। তাঁহারাই তাঁহাদের ঢালী সৈন্যদিগের মধ্যে এই নৃত্য প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। ঢাল এবং তলোয়ার এই নৃত্যের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। প্রতাপাদিত্যের পরেও প্রায় দেড়শত শতাব্দী পর্য্যন্ত এই ঢালী নৃত্যের সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য হইতেই ইহার হ্রাস ঘটে। ঝুমুরের নৃত্যাদি আমাদের শুভ উৎসব-গুলিকে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিত; তাই দেশের প্রাচীন উৎসবকলার ধ্বংসের সাথে সাথে ইহারাও দিনে দিনে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এই লুপ্ত গণনৃত্যের পুনরুদ্ধারের আবশ্যকতার প্রতি যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে সচেতন হইয়াছেন এবং দেশের ইতর সাধারণকে এই ভাবাপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রদ্ধেয় গুরুসদয় দত্তের নাম প্রথমে উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান ব্রতচারী আন্দোলনের তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক। তিনি ইহার সত্যিকার মূল্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই অসংখ্য বাধাবিপত্তিকে জয় করিয়া নিজেকে, স্বদেশবাসীর প্রভূত মঙ্গলকামনায় নিয়োজিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যদি বাংলার সুদিন

কোন'দন ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে অন্যান্য বরেণ্যবর্গ হইতে গুরুসদয়ের নিকটেও বাংলার ঋণ কম থাকিবে না। তিনি বীরভূম জেলায় এই নৃত্যাদি প্রথম দেখিতে পান। তথা হইতে এতদ্বিষয়ক সমস্ত খুঁটিনাটি সংগ্রহ করিতে থাকেন। পরে বিভিন্ন প্রকার গণনৃত্যকে একই আদর্শের অন্তর্গত করিয়া, প্রয়োজনীয় সঙ্গীতাবলী রচনা করিয়া এবং এই নৃত্যসেবীদের 'ব্রতচারী' এই আখ্যা দিয়া জেলাবোর্ড প্রভৃতি জনহিতকর সমিতির সাহায্যে স্কুল, কলেজের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে ইহার প্রথম প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন।

পরিশেষে এই কথা বলিতে চাই যে, যে আন্দোলন আজ আমাদের দোরগোড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যদি আমরা তাহাদের সহিত মনের সহযোগ চালাইতে অভ্যস্ত হইতে পারি, তাহা হইলে হয়ত মনীষিদের বাক্য একদিন সফল ক'রয়া তুলিতে পারা যাইবে।

## ওগো বন্ধুবর

শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

সুপ্তিভাঙ্গা পাখীর ডাকে
বিশ্ব যখন জাগে,
রঙীন যবে পূর্ব্ব-আকাশ
রক্ত-অরুণ-রাগে,
ভোরের বেলা ফুল ফুটায়ে
হাল্কা হাওয়া হাতটি গায়ে
ধীরে যখন যায় বুলায়ে
এমনি যেন লাগে—
তুমি এসে আছ ব'সে
আমার জাগার আগে

নিত্য তুমি এমনি ক'রে
এস আমার ঘরে,
চেয়ে থাক এমনিধারা
আমার আঁখি 'পরে।
নিয়ে যেতে তোমার সাথে
ব'সে থাক নিত্য প্রাতে
জাগরণের প্রতীক্ষাতে
আমার শয্যা 'পরে;
সঙ্গী থাক চলার পথে—
আস্‌তে ফিরে ঘরে।

রুদ্রতাপে ধরা যখন
দগ্ধ হ'তে থাকে—
নিবিড় তব পরশখানি
স্নিগ্ধ শীতল লাগে;
জ্বালা দিতে আসে যা'রা
তোমার কাছে শক্তিহারা,
পরাজয়ের লাজে তা'রা
মুখ লুকায়ে রাখে;
তুমি আমার থাকলে কাছে
ভয় করি বা কা'কে?

সাঁঝের বেলা উঠ্‌লে শশী
নীলাকাশের পর,
তোমায় হেরি' বুঝতে নারি.
কোনটি সুধাকর;
অমানিশার তমঃ নাশি'
ঢেলে তরল আলোকরাশি,
ফুটিয়ে তোল পৌর্ণমাসী—
ফুল্ল চরাচর;
কখন দে' যাও ঘুম পাড়ায়ে
ওগো বন্ধুবর।

# কুয়াশা

## জগদীশচন্দ্র পাল

আমরা ছাব্বিশ জন; ছাব্বিশজন যন্ত্রচালিত জীব মাটীর নীচে স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার ঘরে সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত ময়দার তাল পাকাই রুটির নেচির জন্য। আমাদের এই ঘরটির জানালা দিয়া দেখা যায়, একটি শান-বাঁধানো প্রাঙ্গন, ভিজা থাকে বলিয়া আর্দ্র শ্যাওলায় আচ্ছন্ন। জানালাটীকে ঝাঁঝ্‌রি বলিলে কোন দোষ হয় না: ঘন-ঘন শিক বসানো; সূর্য্যের সোণালী আলো এই ময়দার গুঁড়া মাখান শিকের বদ্ধ পথ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে কই?

আমাদের মত যারা গরীব, বেকার ও ক্ষুধার্ত্ত, তাদের কিংবা রাস্তার ভিখারীদের যাতে একটুকরা রুটিও না দিতে পারি, তারি জন্য আমাদের মালিক এই জানালার সুমুখটা ঘেরাও করিয়া দিয়াছেন। তিনি তো আমাদেরকে ধাপ্পাবাজ আর জুয়াচ্চোর ছাড়া অন্য কিছু ভাবিতেও পারেন না। তাই দুপুরবেলা, আমাদের আহারের সময় বিশ্রীভাবে রান্না করা সস্তা পচা মাংস আসে।

মাটির নীচে এই সঙ্কীর্ণ পাথরের ঘর, তার মধ্যে শ্রান্ত ক্লান্ত, গরমে আমরা হাঁপাইয়া উঠি। মাথার উপরেই ঝুল-কালিময়, মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন, গম্ভীর, ভারী সিলিং। আমাদের জীবন এই পুরু, অপরিষ্কার, ছাতাধরা দেয়ালের মধ্যে দিনে দিনে জীর্ণ ও স্তিমিত হইয়া আসিতেছে।

ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিতে হয় আমাদের পাঁচটা বাজিতেই। নাই নতুন উৎসাহ—নতুন দিনের কর্ম্মশক্তি সেই সকালবেলাতেই যেন নিঃশেষিত হইয়া যায়! অবসন্ন দেহ লইয়া টেবিলে বসিয়া পড়ি ময়দা বেলিতে। ওদিকে কেট্‌লির জল ফুটিতেছে অবিশ্রান্ত, জলের সেই ক্ষীণ শব্দ করুণ বিলাপের মত শোনায়। প্রকাণ্ড চুল্লিটার আর বিশ্রাম নাই—ক্লান্ত, কর্কশ শব্দ আসে কাণে। সকাল সন্ধ্যা চুলাতে জ্বলে কাঠ, আগুনের উদ্ধত রক্তশিখা দীপ্তরূপে আমাদের বিদ্রূপ করে বুঝি। রূপকথার বীভৎসাকৃতি দৈত্যের মত চুলা। লেলিহান জিহ্বা তার, আর তার উত্তপ্ত নিশ্বাস আমাদের রক্ত শুষিয়া লইতেছে দিনের পর দিন! চুলাতে বাতাস যাইবার ছিদ্রপথ দু'টি দৈত্যের নির্দ্দয় চোখের মতই ভয়ঙ্কর, আমাদের দিকে তাকাইয়া আছে যেন। যেন এই চিরন্তন দাসবৃত্তির মধ্যে মনুষ্যত্বের বিন্দুমাত্রও নাই জানিয়াছে। তাই চাহিয়া আছে নীরব অবজ্ঞায়, জ্ঞানীর মত।

দিনের পর কাদায়, ধূলায় বদ্ধ বিষাক্ত বাতাসে আমরা ময়দা মাখি। মানুষের খাদ্যে মানুষের কত উত্তপ্ত ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে। একটা লম্বা টেবিলের দু'ধারে সার ধরিয়া যন্ত্রচালিতের মত কাজ করিয়া সারাদিন, শ্রান্ত, ক্লান্ত—এই একঘেয়ে কাজে আজকাল এত অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি আমরা যে, মনোযোগ বড় একটা দিতে হয় না। ক্লান্তিকর অবসাদ নামিয়া কর্ম্মজীবনটাকে এমন বৈচিত্র্যহীন করিয়া দিয়াছে।

সঙ্গীদের চেহারার মধ্যেও নতুন কিছু পাই না। মুখের শীর্ণ রেখাগুলির মধ্যে পর্য্যন্ত নতুন কোন আভাস পাওয়া যায় না। কথা কওয়ার মনোও বৈচিত্র্যহীন ক্লান্তি নামিয়াছে, অধিকাংশ সময়েই তাই আমাদের নীরবে যাপন করিতে হয়। একজনকে নিয়া একটু হাসাহাসি বা কৌতুকে মাতিব, তেমন কোন কারণও সন্ধানে আসে না। মরার মত আছি, দোষ দেখানোর হীন প্রবৃত্তিটিও সঙ্গে সঙ্গে মরিয়াছে। জীবনে আর প্রাণস্পন্দন অনুভব করিতে পাই না। আত্মা আমাদের ক্লান্তিকর জীবন-যাত্রায় একান্তই মুমূর্ষু। কিন্তু এই ভয়াবহ নির্জ্জনতা তাদের কাছে ভীষণ দুঃসহ, যারা কোন কথা কহিতেই বাকি রাখে নাই একদিন!

কখন-কখন গাই আমরা। কার ক্ষুদ্ধ বুক হইতে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল হয় তো, তখন আপনা হইতে কার কণ্ঠে জাগিল গান—গানের সেই করুণ সুর-মূর্চ্ছনা, জীবনের ব্যথা-বেদনার মর্ম্মান্তিক ব্যর্থতার অভিব্যক্তি যেন। প্রথমে একা-একাই গান চলিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত কাতর সেই সুরের আর্ত্তনাদ

শুনি, ক্ষীণস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে মিলাইয়া যায় অন্ধকার ঘরের থমথমে আবহাওয়ার মধ্যে, যেন শীতের বাতে ক্ষীণ অগ্নিশিখা, কুয়াশায় মলিন আকাশ বিষণ্ণ মুখে পৃথিবীর উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

এক সময়ে শ্রোতাদের মধ্যে একজন প্রথম গায়কের সঙ্গে যোগ দেয়। সঙ্কীর্ণ ঘরখানির বিষণ্ণ ভাব তখন অনেকখানি কাটিয়া যায়। হঠাৎ সবলেব কণ্ঠস্বব সম্মিলিত হয় এক সময়ে। সমুদ্রতরঙ্গেব মত সুরের লীলা উচ্ছল হইয়া ওঠে, সমুদ্রগর্জ্জনের মতই ভীষণ তাব শব্দ। তখন মনে হয় আমাদের, কঠিন পাথরের ড্যাম্প্ দেওয়ালগুলি যেন দূরে সরিয়া গিয়াছে, বদ্ধ ঘব ভবিয়া উঠিয়াছে স্বর্গীয় মুক্তিতে। মিলিত কণ্ঠের সঙ্গীত সুর-সমন্বয়ে সারা সেলাবটি ভবিয়া তোলে। বাহিরে বহুদূর পর্য্যন্ত সেই সুর কাঁপিয়া ফিরে। দেয়ালে-দেয়ালে তাব প্রতিধ্বনি বিলাপেব মত করুণ, দীর্ঘশ্বাসেব মত অসহায়। তখন নিরাশায় বেদনায়, পুরাতন ক্ষতেব জ্বালায় আব ব্যর্থ কামনায় আমবা বিবশ।

বুক যখন দীর্ঘশ্বাসমথিত, তখনও গান চলে আমাদেব। কেহ থামিয়া যায় কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য, সকলেব সম্মিলত সুব মোহাবিষ্টের মত শোনে আব আপনার অজ্ঞাতে ভাসিয়া যায় সুরেব জোয়ারে। রুদ্ধকণ্ঠে কেহ হয় তো বলিয়া ওঠে হতাশাব কোন অস্ফুট বাণী, এই সুবেব তরঙ্গ বুঝি তাকে সোনালী বৌদ্রোজ্জ্বল প্রশস্ত পথ দেখাইবে, কল্পনার সাহায্যে যেখানে সে অশান্ত মনে ভ্রমণ করিয়াছে।

কিন্তু চুলাব আগুন সতেজে জ্বলিয়া ওঠে আবাব। রুটি সেকওয়ালার প্রকাণ্ড খুন্তীব শব্দ অবিশ্রান্ত শোনাই যায়। কেট্‌লিতে জল ফুটিয়া ওঠে উত্তপ্ত হইয়া, আর আমরা পরেব বাঁধা গান গাহিয়া আমাদের বোবা মনের ব্যথা মুখব কবিয়া তুলি: আমবা সূর্য্যালোক বঞ্চিত, আমাদের মেরুদণ্ড অবনত গুরুভাব দাসত্বেব ভারে।

এই ভাবেই তো জীবন বহিতেছে আমাদেব, ভূগর্ভেব এই অন্ধকার ঘরে, ঝুঁকিয়া-পড়া সিলিং-এর নীচে। ক্ষণে ক্ষণে আমাদের মনে হয়, এই তিনতলা বাড়ীর সমস্ত কাঠ-পাথর রহিয়াছে আমাদেরই কাঁধের উপরে।

সূর্য্যালোকবঞ্চিত এই অন্ধকার ঘরে গান ছাড়াও অন্য কিছু আমাদের আছে বইকি। তাই আমাদের সূর্য্যের আলো।

দোতলায় সূচিশিল্পের দোকান। সেখানে অন্যান্য শিল্পী মেয়েদেব সঙ্গে থাকে তানিয়া, বয়স তার ষোল হইবে। প্রত্যেকদিন প্রত্যূষে সুন্দর একটি গোলাপী মুখ, দু'টি উৎফুল্ল সোণালী চোখ কাচের দ্বার দিয়া উঁকি দেয়, আর তাব কোমল ধ্বনিময় কণ্ঠস্ববে শোনা যায়: 'এই আমার জন্যে বিস্কুট রেখেছ ?'

সুস্পষ্ট, সুপরিচিত স্বর বাজিয়া ওঠে, শুভ্র সুকোমল মুখখানিব দিকে ব্যস্ত হয়ে ফিরে তাকাই। সবল আনন্দে তাব মুখটি উদ্ভাসিত, অর্দ্ধোন্মোচিত ঠোঁটের মধ্যে ঝকঝকে দাঁতে কি আনন্দই না জানি আছে। তার জন্য দবজা খুলিতে গিয়া একজন আবেক জনেব 'পবে লাফাইয়া পড়ি। মেয়েটি আনন্দিত মুখে মধুর দীপ্তি ফুটাইয়া তুলিয়া ঘরে প্রবেশ করে। অপরূপ ভঙ্গীতে মাথা হেলায় সে, কী মিষ্টি সে হাসিতে পারে। হাসিতে হাসিতে গাউনেব প্রান্ত আগাইয়া ধবে বিস্কুটেব আশায়।

তার ঘন বাদামী চুল শুভ্র বুকেব 'পবে আসিয়া লোটে। আর আমবা কুৎসিৎ, বিকৃত, নোঙ্‌রা, বাণীহীন বন্দনা জানাই তাকে তাব দিকে চাহিয়া। তাকে দেখিলে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা যোগায় আমাদেব মুখে, সেগুলো বুঝি শুধু তাবই জন্য সঞ্চয় কবিয়া রাখা। কেন জানি না আমাদের কর্কশ কণ্ঠস্বর কোমল হইয়া আসে তাব কাছে, আমাদেব কৌতুক হয় স্বচ্ছ ও হাল্কা। সবই নেয় তার কাছে অন্যরূপ।

বেকার প্যাভেল কতকগুলি ভাল ভাল বিস্কুট ছুঁড়িয়া দিল তানিয়ার আঁচলে: 'এবাব ভেগে পড়ো তো তাড়াতাড়ি, ধবা পড়ে' শেষে একটা কেলেঙ্কারী ঘটাবে দেখছি!'

প্রত্যেক বারই আমবা তাকে সাবধান করিয়া দিই, কিন্তু সে সাবধানের কথা তার কাণেও যায় না। সেদিনও সে ধূর্ত্ত লোভীর মত হাসিয়া উঠিল; অত্যন্ত খুশী হইয়া বলিল: 'এই কয়েদীরা, এই, আমি তবে, হ্যাঁ?' উত্তরেব অপেক্ষা না করিয়াই সে ইঁদুবের মত অদৃশ্য হইল অন্য দিনকার মতই।

এই তো সব! কিন্তু এই সব নয়। সে চলিয়া যাইবার পর আমরা পরস্পর আলোচনা করি তাহাকে লইয়া, সেই আলোচনায় কি উৎসাহ আর কি আনন্দ আমাদের! আলোচনা মানে, একই কথার পুনরাবৃত্তি—কাল, পরশু যে সব কথা বলিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই সব কথা।

মানুষের জীবন মর্মান্তিক দুঃসহ হয় তখনই, যখন তার জীবনে বৈচিত্র্যের, পরিবর্ত্তনের সন্ধান পায় না সে। আর, এইভাবে জীবন যাপন করিয়া গেলে মানুষ এক সময়ে হইয়া পড়ে জীর্ণ, স্তিমিত। একটানা একঘেয়েমিতে তো তা' হইবারই কথা।

মেয়েদের নিয়াই আমাদের যত আলোচনা। কি মুখরোচকই না সেই পুরাণো কথাগুলি। তাদের সম্বন্ধে এমন সব নোঙরা, নির্লজ্জ কথা উচ্চারণ করি আমরা, সময়ে সময়ে যা' নিজেদের কাণেই বাজে। কিন্তু তানিয়া যেন সমস্ত নারীজাতি হইতে স্বতন্ত্র। কাহারও সাহস হয় না উলঙ্গ পরিহাস করিবার। হয় তো কয়েক মুহূর্ত্তের সান্নিধ্যে আসিয়াছে সে, উল্কার মতই সে চোখ ঝলসাইয়া দিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, অপরূপ সুন্দরী তন্বী সে, এই জন্যই হয় তো। ওই সৌন্দর্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্চিত আছে রুক্ষ, অমার্জ্জিত মানুষের বুকেও।

আমরা কতকগুলি হৃদয়হীন পশুর মত—পাপের শাস্তি এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, মানুষের সব রক্ত শোষণ করিয়া নিতেছে, আমরা আর মানুষ নই! তবু তানিয়াকে মনে মনে পূজা না করিয়া আমরা যেন পারি না! আর কাহাকেও ভালবাসিবার মত কেই বা আছে; কেহ তো ফিরিয়াও চায় না আমাদের দিকে। তাই আমাদের মনে হয়, প্রতিদিন বিস্কুট দিয়া যার প্রীতি কামনা করি, সে একান্তই আমাদের, একান্তই সে আমাদের জন্য। তার সহিত আমাদের হৃদ্যতা দিন দিন ঘনীভূত হইয়াই উঠিতেছে। প্রতিদিন কত উপদেশই না দিই তাকে—উপদেশের বন্যা বলা চলে। 'গরম জামা কাপড় পর না কেন?' 'সিঁড়ি দিয়ে অত তাড়াতাড়ি উঠতে আছে?' 'ভারী কাঠের বোঝা বয়ো না কখনো, শুনলে?'

মিষ্টি একটি হাসি ফুটাইয়া সে শোনে সবই, উত্তর দেয় উচ্চ হাসিতে আমাদেরকে অপ্রকৃতিস্থ করিয়া। কোনদিন যে সে আমাদের উপদেশ মানিয়াছে, এমন তো মনে হয় না; তবু অসন্তুষ্ট আমরা হই নাই এইজন্য। আমাদের ভালবাসা শুধু ব্যাকুল হইয়া ওঠে তাকে জানাইয়া দিতে 'আমরা ভালবাসি'।

আর, কত রকমের অনুরোধই না শুনি তার মুখে! ভাঁড়ারের দরজা খুলিয়া দিতে বলে, 'এই কাঠগুলো কেটে দাও তো', 'এটা কর, ওটা কর'; আমরা আনন্দ-মিশ্রিত গর্ব্ব অনুভব করিয়া তার অনুরোধ রক্ষা করি। কিন্তু একদিন যখন আমাদেরই মধ্যে একজন তার সার্টটা সেলাই করিয়া দিতে বলিল একটু, তখন সে উত্তর পাইল বিদ্রূপভরা হাসিতে, তানিয়া বলিয়াছে: 'এইটুকুই, আর কিছু না?'

সেই দুঃসাহসী বন্ধুটিকে লইয়া আমাদের সে কি হাস্য-পরিহাস। এর পরে আর কোন অনুরোধ সে করে নাই অবশ্য। তবু তানিয়াকে কোন কাজের ফরমাস করা দুঃসাহস ছাড়া কি হইতে পারে। তানিয়াকে আমরা ভালবাসি, এই একটি কথাতেই তো হৃদয়ের পুঞ্জীভূত কথা বলা হইয়া গেল।

মানুষ তার প্রেমনিবেদন করে যাকে, তার সঙ্গে তার কলহ-দ্বন্দ্ব, মান-অভিমানের পালা। তার জীবন সে বিষাইয়াও তুলিতে পারে। কারণ, সে ভালবাসে অন্ধ হইয়া, শ্রদ্ধা সেখানে থাকে না।

'ঐ মেয়েটাকে যে কেন এতখানি এ—করো! কি দেখলুম আমরা ওর মধ্যে, যাঁ্যা? ওকে নিয়ে কি ক্ষ্যাপামীটা না আমাদের সুরু হয়েছে!'

যে মানুষটি এই সব কথা কহিতে পারিল, আমাদের দল হইতে তাকেও নির্দ্দয়ভাবে বাদ দিতে পারিলাম আমরা। আমরা ভালবাসিতে চাই, ভালবাসা আমাদের আশ্রয় চায়, ভালবাসা তা পাইয়াছে। যে প্রেমকে পূজার মত পবিত্র ভাবিয়াছি আমরা, তার বিরুদ্ধে কার কি বলিবার থাকিতে পারে? যে বলিবে, সে আমাদের শত্রু। প্রেম আমাদের কাছে পবিত্র, প্রেম আমাদের একান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন,

তোমাদের ঘৃণা আর বিদ্বেষ তোমাদের প্রেমের মতই চিত্তরঞ্জক!

তাঁরা বলেন 'চিত্তরঞ্জক', কিন্তু থাকেন দূরে।

আমাদের এই বিভাগটি ছাড়াও আরেকটি বিভাগ—সেখানে রুটি তৈয়ারী হয়। একই বাড়ীতে, তবে দেয়াল দিয়া আলাদা করা। ওদিক্‌কার ওরা (চার জন) আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করে না, আমাদের কাজটা তাঁদের তুলনায় নাকি একটু নিম্ন স্তরের, সেই জন্যই মান-সম্মানের দিক্ দিয়া এক স্তর উপরে তারা। এই অন্ধকার ঘরে আসিবার প্রয়োজন তাদের হয় না, আঙিনায় দৈবাৎ দেখা হইয়া গেলে বিদ্রূপের হাসি হাসে। দেখিতে অবশ্য আমরাও যাই না তাদের, কর্ত্তার বারণ আছে। গরীব কিনা আমরা, দামী দামী রুটি চুরি করিয়া ফেলিতে পারি তো? বিশ্বাস কি? এজন্য তাদেরকেও সুনজরে দেখিতে পারি না আমরা—ঈর্ষ্যাই করি। কম পরিশ্রমের হাল্কা কাজ তাদের, খায়-দায় ভাল, ঘরটাও আমাদেরটার চেয়ে ঢের বেশী প্রশস্ত। আলো আছে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—আমাদের ঘরটার মত অস্বাস্থ্যকর নয়। আর এই সব সুখ-সুবিধার জন্যই তাদের উপরে বিদ্বেষের আর অন্ত নাই আমাদের।

আমাদের মুখ-চোখ হলদে ফ্যাকাসে, আবার তিনজন ভুগিতেছে সিফিলিসে, চর্ম্মরোগ আছে কয়েক জনার, একজন তো আমবাতে একেবারেই পঙ্গু। আর ওদিক্‌কার ওরা ছুটির দিনে বেড়ায় জ্যাকেট্ পরিয়া, পায়ে জুতা আর তার মশ্-মশ্ শব্দ। গানবাজনাতেও ওদের দু'-একজন বেশ। সহরের পার্কে ওরা বেড়াইতে যায়। আর আমরা পরি ময়লা কাপড়চোপড়, দোয়ালীয়ালা খড়ম আমাদের পায়ে, নয় তো বড় জোর তালি-দেয়া জুতা। পার্কে ঢুকিবার অধিকার আমাদের নাই, পুলিস আসিয়া গেটে দাঁড়ায়। এত দুঃখে যারা থাকে, সুখীদেরকে তারা ঈর্ষ্যা করিবে না কেন?

একদিন জানিতে পারিলাম, 'বেকারী'দের একজন মদ খাইয়া মাতলামী করিয়াছে এবং প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সে পাইয়াছে চাকরীতে জবাব। একজন সৈনিক আসিল তার বদলে, গায়ে ওয়েষ্ট-কোট চাপাইয়া আর তাতে সোণার চেন ঝুলাইয়া। এমন একজন ফুলবাবুর জন্য আমরা রীতিমত কৌতূহল বোধ করিলাম। যদি বা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি, এই আশা নিয়া আঙিনায় ছুটাছুটিও করিলাম খুব। একদিন কিন্তু সে নিজেই আসিল আমাদের ঘরে, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। ঈষদুন্মুক্ত দরজায় দাঁড়াইয়া সে ঈষৎ হাসিয়া কহিল: গুড-মর্ণিং মেট্‌স্।

হিমেল হাওয়ার স্রোতঃ উন্মুক্ত দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল। ভিতরে আসিয়া সে আমাদের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইল। বড় বড় হলদে দাঁতগুলি ঝক্-ঝক্ করিতেছিল তার গোঁপের নীচে। ওয়েষ্ট কোট্‌টি তার সত্যই একটু অসাধারণ ধরণের—নীল ফুল আঁকা আর চক্‌চকে লাল বোতামে তা' অদ্ভুত উজ্জ্বল। ঘড়ির চেনটিও তাতে বাদ নাই। বেশ সুন্দর চেহারাই বলিতে হইবে। দীর্ঘাকৃতি, স্বাস্থ্যবান্, গাল দুটি স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে গোলাপী, আর নির্ম্মল চোখে তার বন্ধুত্বময়, উৎফুল্ল দৃষ্টি। মাথায় তার সাদা টুপি আর ধব্‌ধবে পাজামার নীচে চক্‌চকে কালো বার্ণিশ করা ফ্যাশনেবল্ সুচালো গোড়ালি দেখা যায়।

আমাদের সেঁকওয়ালা বিনীত কণ্ঠস্বরে দরজাটা বন্ধ করিতে বলিল তাকে। কোনরকম ব্যস্ততা না দেখাইয়া, মালিক সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করিতে করিতে সে দরজা বন্ধ করিল। নানাভাবে আমরা তাকে জানাইয়া দিলাম, মালিকটি একটি হৃদয়হীন পশু, অত্যাচারী ছোট-লোক, অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে, প্রভুদের সম্বন্ধে চাকররা যত রকমের গালভরা গালাগালি দিতে পারে এবং যা' দেওয়া উচিত, তার একটাও বাকী রাখিলাম না, উৎসাহপূর্ণ আবৃত্তি করিয়া নিরস্ত হইলাম। সে সব কথাগুলি এখানে লেখা চলে না।

আমাদের সব কথাই শুনিল সৈনিকটি। তার উদার দৃষ্টিতে আমাদের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি ফুটিয়া উঠিয়াছে, দেখিলাম।

—'হ্যাঁ হে, এখানে অনেক মেয়ে আছে তো, না?'

হঠাৎ সে অসংলগ্ন একটা প্রশ্ন করিল আমাদের। আমাদের মধ্যে কয়েক জন সসম্ভ্রমে হাসিয়া উঠিল তার প্রশ্নের আকস্মিকতায়। আবার কেহ কেহ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে করিল চাওয়া-চাওয়ি। আর একজন তো বলিয়াই বসিল: 'আট-দশটা, হ্যাঁ আট-দশটা মেয়ে আছে এখানে।'

'ওদের সঙ্গে খাতির-টাতির আছে তো, না কি?' সৈনিকটি লুব্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

সচকিত হইয়া হাসিয়া উঠিলাম আমরা—সশব্দে নয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই তাকে দেখাইতে চাহিয়াছিল, আমরাও কম যাই না মেয়ে-সংক্রান্ত ব্যাপারে, কিন্তু এখানে তা' হইবার উপায় নাই। ক্ষীণ অস্পষ্টস্বরে একজন জানাইয়া দিল তাকে, 'আমাদের মধ্যে এসব পাবে না তুমি।'

—'না না, ওতে তোমাদের এমন তো কিছু ক্ষতি হচ্ছে না হে।' সে স্থির বিশ্বাসে বলিয়া চলিল: 'তোমাদের চোখে-মুখে কেমন একটা—কেমন একটা তৃষ্ণার ভাব। মানে, তোমাদের খুশী দেখাচ্ছে না। একি চেহারা তোমাদের? মেয়েরা কখনও পছন্দ করে এসব চেহারা? দেহখানা হবে সবল, আর নির্ভীকতার দীপ্তি থাকবে তাতে। মেয়েরা চায় সেরা জিনিষ, এই জন্যেই তো সবলের প্রতি ওরা এতখানি অনুরক্ত। দুর্ব্বলদের ভালবাসবে কি করতে? করুণা করতে পারে। এই রকম একখানা লোহার মত হাত চায় তারা।'

বলিয়াই ডাণ হাতটি সে খুলিয়া দেখাইল আমাদের। সত্যই একটি সুদৃঢ় বাহু উগ্র রকমের ফর্সা আর সোণালী লোমে তা' আচ্ছন্ন।

—'বুক, হাত পা—সবি বেশ মজবুত হবে, তবে তো! আর পোষাক করবে হাল-ফ্যাশানের, অতি সহজে যাতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। যে কোন মেয়ে আমার দিকে এইজন্যেই একবার না তাকিয়ে পারে না। আমাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি লেগে যায় ওদের, ইসারা ইঙ্গিতের দরকার আমার হয় না।'

একটা ময়দার বস্তার উপরে বসিয়া দীর্ঘ একটা বিবরণ দিল সে আমাদের, কি করিয়া সে নারী-হৃদয় অবলীলায় জয় করিয়াছে এবং এই গৌরবের গোড়ায় যে অসামান্য নির্ভীকতাই বেশী কাজ করিয়াছে, তারি বিস্তারিত বর্ণনা শুনিলাম।

সে চলিয়া যাইবার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সকলেই নীরব। নীরবে আমরা ভাবিয়াছি তাকে আর তার কথাগুলি। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া গেল এক সময়ে। স্পষ্টই বোঝা গেল, সৈনিকের উপরে আমরা সকলেই সন্তুষ্ট। সত্যই, ভাবী ভাল লাগিয়াছে তাকে। এতটুকু অহঙ্কার নাই—বসিয়া-বসিয়া কত গল্প করিয়া গেল! বেশ দিল-খোলা লোকটি। এত নিবিড়ভাবে আমাদের সঙ্গে আর কেহ মিশিয়াছে, এমন তো মনে পড়ে না। তাকে লইয়া অনেক আলোচনা হইল আমাদের। মনে মনে ভাবিলাম: 'দেখা যাবে এবার, মেয়েগুলোর যে অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না বড়। আমাদের দিকে ফিরেও যদি তাকাত একটু! আমরা যেন হাওয়ায় মিশে গেছি, এমনি ভাব।'

কিন্তু এত অহঙ্কার সত্ত্বেও ওদের স্তব করিয়া আসিয়াছি আমরা: কি বসন্তে, কি শীতে, সিঁড়িতে কি আঙিনায়, যখন যেখানে দেখিয়াছি। ওদের সম্পর্কে যত কথা বলিয়াছি আমরা, সেগুলি যদি কোনক্রমে শুনিতে পাইত ওরা, তবে লজ্জায় আর রাগে পাগল হইয়া যাইত নিশ্চয়ই।

—'ওদের যত গর্ব্ব ধুলা হউক, শুধু আমাদের তানিয়া থাক এদের বাইরে।' ব্যাকুলকণ্ঠে বেকার বলিয়া উঠিল। কথা কয়টি শোনা অবধি অস্বস্তি আর দুর্ভাবনার অন্ত রহিল না আমাদের। তানিয়াকে আমরা এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিলাম প্রায়। সৈনিকের সুদৃঢ় শরীরের কাছে তনুদেহা তানিয়া বুঝি ম্লান হইয়া গিয়াছিল কয়েক মুহূর্ত্ত।

ইহার পর উত্তেজনাপূর্ণ একটা আলোচনা চলিল। একদল বলিল: 'রাখো হে, তানিয়াকে অত এ ভেবো না—ও যাবে কেন নীচে নামতে? তেমন মেয়েই নয় তানিয়া।' ওদিকে আবার কয়েক জন বিমর্ষ হইয়া বলিল: 'ভরসাও নেই বড়, ওরও বুঝি রক্ষা নেই এবার!' তৃতীয় দল কোন রকমের 'ধর্ষি-জাতীয়' কথা না বলিয়া প্রস্তাব করিল। বসিল: 'তানিয়াকে ঐ সৈনিকটা কোন রকমের

জুলুম করে শুনি, তা' হলে আর আস্ত রাখব না, আচ্ছা করে' উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা করব।' শেষ পর্যন্ত স্থির হইল : নজরবন্দী করিয়া রাখিতে হইবে দু'জনকেই। আর সৈনিকটিকে একটু সাবধান করিয়া দেওয়াই ভাল।

তারপর কাটিয়া গেল চার সপ্তাহ। দামী রুটি তৈয়ারী করিয়াছে সৈনিকটি, অবসর কালে বেড়াইয়াছে মেয়েদের সঙ্গে, আমাদের এখানেও অনেকদিন আসিয়াছে সে। কিন্তু নারী-হৃদয় জয় করিবার কথা আর শুনি নাই তার মুখে। সে শুধু বসিয়া বসিয়া গোঁপে চাড়া দিয়াছে আর ঠোঁটে ফুটাইয়া তুলিয়াছে একটা কামাসক্ত ভাব।

তানিয়া আগেকার মতই দরজায় আসিয়া দাঁড়ায়, বিস্কুটের জন্য লুব্ধ হইয়া ওঠে। আগেকার মতই তার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব রহিয়াছে অক্ষুণ্ণ, তেমনি আনন্দিত সুন্দর মুখ তার। দু'-একবার তার কাছে সৈনিকটির কথা বলিতেই কৌতুকে হাসিয়া উঠিয়া বলিয়াছে : 'ওঃ! সেই ঠুলিপড়া বাচ্চা ষাঁড়টার কথা বলছো তোমরা?'

বুকের মধ্যে অশান্ত আন্দোলন মুহূর্ত্তে স্থির, শান্ত হইয়া গেল। তানিয়াকে নিয়া আমাদের গর্ব্বও হইল খুব। অন্য মেয়েদের মত সে স্থূল নয়, খুব ভদ্র সে—আমরা তার আচরণে যথেষ্ট সম্মানিত বোধ করিলাম। ভাবিলাম আমরাও তানিয়ার মত হইব, সৈনিকটিকে প্রশ্রয় দিব না মোটে। তানিয়া হইয়া উঠিল প্রিয়তর, প্রতিদিন প্রত্যূষে সে আমাদের অভ্যর্থনা পাইতে লাগিল গভীর বন্ধুত্বে, সুকোমল হৃদ্যতায়।

একদিন সৈনিকটী আসিল আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে, সেদিন সে নিষিদ্ধ পানীয় পান করিয়াছে। বসিয়া পড়িয়াই সে অবিশ্রান্ত হাসিয়া চলিল; কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইলাম :

'কেন? ওরা দু'জনে, মানে লীড্‌কা আর গ্রুস্কা আমাকে নিয়ে সাঙ্ঘাতিক ঝগড়া সুরু করে' দিয়েছে। আরে ভাই, তোমরা যদি দেখতে একবার ওদের ঝগড়ার অস্ত্র-শস্ত্র! চুলে ধরে' একজন তো আরেকজনকে ফেলেছে মেঝেতে। বুকের ওপর চেপে 'বসে' সে' তার কি হিংস্রতা! নোখের আঁচড়ে ওদের মুখের ক্ষত-বিক্ষত চেহারাটা যদি দেখতে হে তোমরা! আমি তো স্রেফ্‌ হেসেই বাঁচি নে, ওঃ। মেয়েদের মারামারি করবার কি অদ্ভুত কায়দা! এক ফোঁটা বীরত্ব নেই ওতে। ও রকম করে কেন ওরা?—যাঁ?'

বলিয়াই প্রাণখোলা পরিপূর্ণ হাসিতে সে ভাঙিয়া পড়িল প্রায়। দেহে সতেজ স্বাস্থ্য আর খুশীতে যেন সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এমন হাসিতে লাগিল সে! আমরা বিস্ময়ে নীরব। এবার আমাদের মনে তার সম্বন্ধে কেমন একটু অন্যরকম ধারণা জন্মাইল।

'কি কপালটা আমার বল দেখি, যাঁ? মেয়েরা আমাকে নিয়ে এতও মেতে উঠতে পারে! আমি নিজেই তো অবাক্‌। হাস্‌তে-হাস্‌তে আর পারি না, বাপ্‌! আর কি আশ্চর্য্য দেখো : একটু চোখের ইঙ্গিত, একটু অভিনয় ভালবাসার, বাস্‌, সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদ যায় থেমে! যাঁ, আশ্চর্য্যের না?'

ফর্সা, পেশল হাত দুটি উপরের দিকে তুলিয়া হাঁটুর উপরে ছাড়িয়া দিল সে, আর চোখে তার ফুটিয়া উঠিল নগ্ন বিস্ময়, নিজের ভাগ্যে সে নিজেই অতিমাত্রায় বিস্মিত। আমাদের বেকার চুলার উপরে সজোরে খুন্তি চালাইল। সে যে রাগিয়া গিয়াছে, তারই প্রতিক্রিয়া, তারই প্রতিধ্বনি তার খুন্তির কর্কশ শব্দে। হঠাৎ সে তপ্ত বিদ্রূপে বলিল : 'চারাগাছ অমন সবাই উপড়ে থাকে।'

—'মানে, কি বলতে চাও তুমি?'

—'না কিছু না, এমনি।'

—'এমনি? না, তোমায় বলতেই হবে। কি বলছিলে বল। বলবে না?'

উত্তর সে পাইল না বেকারের কাছে—সশব্দে সে খুন্তি চালাইতেছিল। আর এমন ব্যস্ততার ভাণ করিল সে, যেন কথার উত্তর চাওয়াও তখন অপরাধ। কিন্তু ভীষণ অস্বস্তি বোধ করিতেছিল সৈনিকটি। চুলার দিকে সে আগাইয়া আসিল।

—'না, বলতেই হবে, কে সে। রীতিমত অপমান করেছ আমাকে, জানো? আমাকে অস্বীকার করতে পারে, এমন মেয়েও আছে! কে সে বলতে হবে তোমাকে।' কথাটায় সে আঘাত পাইয়াছে সত্যই। নারীজয়ের যে একটা দুর্লভ গর্ব্ব, তা' সে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না।

হয় তো ইহা ছাড়া অন্য কোনও অসামান্য গুণ তার নাই। ইহাই তার জীবনের একমাত্র গর্ব্ব, যা' নিয়া সে মাতিয়া উঠিতে পারে।

পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে, যারা দেহ কিংবা মনের একটা বিকার, একটা ব্যাধিকেই অমূল্য জিনিষ হিসাবে গণ্য করে এবং ইহারই উন্মত্ততায় সারা জীবন তারা কাটাইয়া দেয়। দুর্ভোগ ভোগ করে অনেক, তবু জীবন হইতে তা' বাদ দিতে পারে না। ইহারই মধ্যে নিজেকে আচ্ছন্ন রাখিয়া বন্ধুবান্ধব দশজনকে তা জানায়, এবং জানাইয়া নিজের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু এই ব্যাধি, এই বিকার ব্যতীত জীবন তাদের কাছে একেবারেই নিরর্থক। তখন ক্লান্তি আসে তাদের জীবনে, নিতান্ত অসহায় হইয়া যায় তারা, জীবনটাকে ভয়ানক শূন্য ঠেকে। এমনও দেখা যায় যে, ব্যভিচারের মূল্য দিতে প্রবৃত্তি তাদের ঠেলিয়া দেয় সেই দিকে। ইহা ছাড়া বাঁচিতে তারা পারে না।

ক্রোধান্ধ সৈনিক গর্জ্জিয়া উঠিল 'না বল'তেই হবে তোমাকে, কে সে?'

'বলতেই হবে?' হঠাৎ বেকার ফিরিয়া দাঁড়াইল তার দিকে।

'হ্যাঁ, হবে।'

'তানিয়াকে জান?'

'জানি।'

'দেখো তবে চেষ্টা করে।'

'আচ্ছা দেখ, পারি কিনা।'

'সে কখ্‌খনো—'

'বেশ তো, সে আমি দেখব'খন, ঠিক এক মাস সময়, বাস্!'

'মুখে মুখে যুদ্ধ জয় করে অনেকেই, তুমিও তাই।'

'পনের দিন সময় নিলাম। বেশ তো, দেখে' নিও, প্রমাণ করে' দেব।'

'বেরিয়ে যাও বলছি' ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল আমাদের বেকার। তলোয়ারের মত খুন্তিটা উর্দ্ধে উদ্যত করিল সে; সৈনিকটি তখন টলিতে'টলিতে সরিয়া গেল বিস্ময়ে, ভয়ে। মিনিট খানেক তাকাইয়া বলিল: 'বেশ তো, দেখতেই পাবি তোরা, কেমন না পারি।'

তার পরেই সে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

তাদের এই বাদানুবাদের সময়ে আমরা নীরবে বসিয়াছিলাম হতবুদ্ধিতে। সৈনিকটি যখন চলিয়া গিয়াছে, ব্যাকুল কথাবার্ত্তায়, উত্তেজনাপূর্ণ কোলাহলের সৃষ্টি হইল আমাদের মধ্যে। বেকারকে একজন বলিল: 'কেন ওসব বলতে গেলে প্যাভেল?'

প্যাভেল তখন বন্য হইয়া উঠিয়াছে, বলিল: 'যে যার কাজ কর' যাও, পরের কথায় তোমার এত এ কিসের?'

আমরা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলাম। সত্যই তা' হইলে বিপদ ঘনাইয়া আসিল তানিয়ার? আমরা সে বিপদ শারীরিক বেদনার মত অনুভব করিলাম, কিন্তু কি ভীষণ এক দুর্নিবার কৌতুহল আমাদেরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

তানিয়া পারিবে না নিজেকে রক্ষা করিতে? সকলেই প্রায় এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলাম—'আমরা সুনিশ্চিত জানি: তানিয়া? তানিয়াকে কেউ বশেও আনবে কোনদিন। রেখে দাও। ওকে নিয়ে অমন যা' তা' বলো না তোমরা।'

তবু অধীর প্রতীক্ষায় দিন গণিতে লাগিলাম আমরা, প্রতিটি মুহূর্ত্ত পার হইল আশঙ্কায়, উৎকণ্ঠায়। কিন্তু সন্দেহ করিবার সামান্য অবকাশটুকুও না রাখিয়া সমস্বরে পরস্পর পরস্পরকে জানাইয়া দিলাম: 'আমাদের যে দেবী না, সে বড় সাঙ্ঘাতিক দেবী হে, অগ্নি-পরীক্ষায় তার চুল স্পর্শ করে, এমন ক্ষমতা নাই কোন শিখার!'

একবার মনে হইল, সৈনিকটা হয় তো এই ঝগড়ার কথা ভুলিয়াই যাইবে। আরও ভাল করিয়া ওর স্পর্দ্ধাটাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে হইবে। তারপর দেখা যাইবে জয়-পরাজয়।

সেদিন হইতে আমাদের জীবনধারা সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী হইল। আমরা সকলে তখন হতবুদ্ধি, মানসিক উত্তেজনায় ক্ষুব্ধ জীবন আমাদের। সারাদিন তো এই সব আলোচনাতেই ভরিয়া তুলিতেছি; বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে নানা দিক্ হইতে তা' পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

সয়তানের সঙ্গে জুয়াখেলায় মাতিয়াছি যেন আমরা, জুয়ার বাজী আমাদের আরাধ্যা তানিয়া! যেদিন শুনিলাম সৈনিকটি তানিয়ার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে, আমাদের বুকের মধ্য দিয়া একটা উষ্ণ স্রোতঃ বহিয়া গেল, তীব্র উত্তেজনার, ভীষণ ভয়ের। এই উন্মত্ততায় পড়িয়া আমাদের কাজের সময় যে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাও লক্ষ্য করি নাই। এখন যেন কাজে আর ক্লান্তি নাই আমাদের! সারাদিনই তানিয়ার নাম আমাদের মুখে মুখে উচ্চারিত হইয়া ফিরিল। বিশেষ অধৈর্য্য সহকারে তাকে পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। কত কল্পনাই না তাকে নিয়া করিয়াছি! আগের মত সবল সহজ হয় তো থাকিবে না সে, অনেক পরিবর্ত্তন আসিবে তার চরিত্রে। কিন্তু আমাদের এসব আশঙ্কার আভাসও সে কোনদিন পায় নাই। আমাদের স্নেহ ও ভালবাসা হইতে তাকে বঞ্চিত করি যাই আমরা। কিন্তু ইস্পাতের অস্ত্রের মত তীক্ষ্ণ কৌতূহলের খোঁচায় আমরা সময়ে সময়ে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি।

'ওহে, আজই কিন্তু শেষদিন!' একদিন সকালে প্যাভেলের আমরা এই সংবাদটি শুনিতে পাইলাম। দিনটি আমাদের বহু-প্রতীক্ষিত এবং আমাদের মনে ছিল, তবু প্যাভেল যখন স্মরণ করাইয়া দিল, উত্তেজনায় শিহরিয়া উঠিলাম।

'এক্ষুনি আসবে সে এখানে' প্যাভেল বলিল।

'এলই বা! সব কিছুই কি চোখে দেখা যায় নাকি?'

আবার একটা উন্মত্ত কোলাহলের সৃষ্টি হইল। আজ দেখা যাইবে, এতদিন যার বন্দনা গাহিয়া আসিলাম, সে কতখানি শুভ্র, কতখানি অনিন্দিতা! আজ সকালবেলা ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই মনে হইতেছে আমাদের, আমরা ভীষণ খেলায় মাতিয়াছি: একজনের হীন দাবীর সফলতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এতদিনকার অকলঙ্ক সুন্দর প্রতিমা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

অনেক অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছে সৈনিকটি আমাদের ঐ তানিয়ার জন্য। তানিয়াকে সে কেমন ব্যবহার করে, আমরা তা' জিজ্ঞাসা করি নাই। 'আগের মতই মিষ্টি হাসিয়া বিস্কুট চায় সে, আর বিস্কুট নিয়া আগের মত খুশী হইয়া চলিয়া যায়।

আজ সকালেও সে আসিল। বাহিরে তার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম আমরা।

'এই কয়েদিরা, এই আমি এসেছি গো।'

দরজা খুলিয়া দিতে সে ঘরে প্রবেশ করিল, তাকে ঘিরিয়া আমরা অস্বাভাবিক নীরব। নির্নিমেষে তার দিকে চাহিয়াই আছি, মুখে ভাষা নাই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার। আজিকার এই অসুন্দর সম্বর্দ্ধনার শৈত্যে সে বিস্মিত হইল। তার মুখখানা বিবর্ণ শাদা, অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল সে। ধরা গলায় বলিল: 'তোমরা ও রকম করছ কেন?'

'আর তুমি? তুমি ও রকম করছ কেন?' প্যাভেল তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে জবাব দিল। তার তীব্র দৃষ্টি তানিয়ার চোখের উপরে নিষ্পলক।

'আমি কি?—'

'না, তুমি কি আবার?'

'বিস্কুট দেবে তো দাও, নয় তো চলে' যাই।' আর কোনদিন আজিকার মত ব্যস্ততা সে দেখায় নাই।

'অত তাড়াতাড়ি কিসের গো!' তানিয়ার উপরে চোখ রাখিয়াই প্যাভেল শ্লেষ হানিয়া বলিল, তার চোখে আর মুখের রেখায় পাষাণের নির্মম কাঠিন্য।

হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল তানিয়া, দরজা পার হইয়া সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চুলার লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে চাহিয়া প্যাভেল শান্তভাবেই বলিল: 'সবই তো দেখলে! শেষ পর্য্যন্ত একটা সৈনিকের সঙ্গে? একটা বর্ব্বর, ঘৃণ্য পশু, রাস্তার খেঁকি কুত্তা, ম্যাঁ!'

এক পাল ভেড়ার মত আমরা টেবিলের চারপাশে ভীড় করিয়া নীরবে কাজ করিয়া গেলাম। একজন কি যেন প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল তানিয়ার অধঃপতন সম্বন্ধে, প্যাভেল ক্রুদ্ধ চীৎকারে থামাইয়া দিল তাকে। প্যাভেলকে আমরা জানিতাম সকলেই; সে কখনও ভুল বুঝিতে পারে না। তার কণ্ঠে অপরিচিত স্বর শুনিয়া বুঝিলাম, শেষ পর্য্যন্ত সৈনিকটিই হইয়াছে জয়ী। দুঃখে, ক্ষোভে হতাশ হইয়া পড়িলাম।

বেলা তখন বারটা হইবে। আহারে বসিয়াছি, এমন

সময়ে প্রবেশ করিল সৈনিকটি, আগের মতই সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং স্বাভাবিক দৃষ্টি তার চোখে। তার দিকে তাকাইয়া আমরা রহিলাম নির্ব্বোধের মত।

'ও মশাইরা, দেখবে তো এস একবার।' গর্ব্বিত ভঙ্গীতে মৃদু মৃদু হাসিল সে। 'ঐ যে গলিটার ফাঁক দিয়ে দেখ না গিয়ে।'

স্পন্দিত আন্দোলিত বুকে আমরা ভীড় করিয়া দাঁড়াইলাম সেই রাস্তায়। কাঠের পার্টিশানের ফাঁক দিয়া বাহিরের আঙিনা দেখা যায়। বেশীক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হইল না আমাদের। চিন্তাক্লিষ্ট মুখে ত্রস্ত পা ফেলিয়া তানিয়া আঙিনা পার হইয়া গেল জল কাদার উপর দিয়াই। তারপর অদৃশ্য হইয়া গেল অন্ধকার ষ্টোর-সেলারে। আর মৃদু শীষ্ দিতে দিতে সৈনিকটি চলিল সেইদিকে, পকেটে হাত রাখিয়া, এতটুকু ব্যস্ততাও নাই তার।

বৃষ্টি পড়িতেছিল। আঙিনার ওখানে-সেখানে জল জমিয়াছে, বৃষ্টি-বিন্দুতে সেই জলে শিহরণ জাগিতেছিল। শ্বাস রুদ্ধ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। ঠাণ্ডা মলিন দিন, বাড়ীর ছাদের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বিবর্ণ কুয়াশা, পথে বিশ্রী কাদা। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল, সেই বৃষ্টি-পতনের শব্দে ক্লান্ত বিষণ্ণতা। শীত করিতেছিল ভীষণ, আমরা অধীর হইয়া উঠিলাম।

ষ্টোর সেলার হইতে সৈনিকটিই বাহিরে আসিল প্রথম। পকেটে হাত রাখিয়া ধীরমন্থর পদক্ষেপে সে আঙিনা পার হইয়া গেল। তানিয়াও বাহিরে আসিল একটু পরে। চোখ তার সুখ আর আনন্দে উজ্জ্বল। পাত্‌লা ঠোটে তার তখনও হাসির রেশ ছিল। এলোমেলো পা ফেলিয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছিল সে, স্বপ্নচারিণীর মত।

আমাদের তা' দুঃসহ বোধ হইল। উন্মত্তের মত ছুটিয়া গেলাম দরজার দিকে, লাফাইয়া পড়িলাম উঠানেতে, বিদ্রূপ আর কুৎসিৎ তিরস্কার করিলাম মনুষ্যত্বহীনের মত। আমাদের আচরণে সচকিত হইল তানিয়া, স্থাণুর মত সে দাঁড়াইয়া রহিল, পা দুটি এত ভারী লাগিতেছিল তার। সকলে তাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলাম, জঘন্য গালাগালি আর কত অশ্লীল কথা কুৎসিৎভাবে উচ্চারণ করিয়া গেলাম তাকে লক্ষ্য করিয়া, এতটুকু সংযমও রহিল না আমাদের।

আমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া অসহায়ের মত এদিক্-ওদিকে চাহিল সে, সমস্ত অপমান আর হীনোক্তি তার উপরে বর্ষিত হইল অজস্রধারে। মুখে তার সজীবতা ছিল না, ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল। তার নির্ম্মল নীল চোখে ছিল মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আনন্দের ঔজ্জ্বল্য, সুখে বিস্ফারিত। এবার তার ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল, বুক ওঠানামা করিল ক্ষোভে, অপমানে। কি দুর্ম্মূল্য সম্পদ্ই না সে আমাদের চুরি করিয়াছে যেন, আমরা হিংস্রতায় দুর্ব্বার হইয়া উঠিলাম। তাকে ঘিরিয়া আমাদের জীবনের সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত কল্পনা। আমরা নিঃস্ব হইলেও, ভালবাসায় আমরা কৃপণতা করি নাই। প্রাণ ভরিয়া অপমান করিলাম তাকে, সে কিন্তু তেমনি নীরবে রহিল, উদ্‌ভ্রান্ত বন্য দৃষ্টি মেলিয়া চাহিল আমাদের দিকে, তার ক্ষীণ শরীর কাঁপিয়া উঠিল তখন।

উন্মাদের মত কত হাসিলাম, গর্জ্জন করিলাম বন্যজীবের মত, আর একজন তার জামার স্লীভ্ ধরিয়া টানিয়া বসিল। হঠাৎ তানিয়ার চোখ তীব্র ভাবে জ্বলিয়া উঠিল, নরম হাত দুটি মাথার দিকে তুলিয়া কেশগুচ্ছ ঊর্দ্ধগামী করিল সে শান্ত সুগম্ভীর স্বরে মুখোমুখি বলিল আমাদের: 'হায় রে হতভাগারা।' বলিয়াই সে আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল। এমন ভাবে গেল, আমরা যেন তার পথ রোধ করি নাই। কেহ বাধাও দিল না তাকে, তানিয়া চঞ্চল পায়ে চলিতে চলিতে অবজ্ঞাভরা কণ্ঠস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল: 'যত সব জানোয়ারের দল।'

আঙিনার জলকাদার মধ্যে কে যেন আমাদের পরিত্যাগ করিয়াছে, আকাশের ধূসরতার তলে কুয়াশা ও তুষারবর্ষণের নীচে। সূর্য্যহীন আকাশের তল হইতে ফিরিয়া গেলাম পরাজিতের মত সেই অন্ধকার ও স্যাঁৎসেঁতে সেলারে। আবার চলিল পুরাণো জীবনযাত্রার পুনরাবৃত্তি—ময়দার গুঁড়া মাখানো, ঘন ঘন শিক বসানো জানলা দিয়া সূর্য্যের আলো আজিও প্রবেশ করে না, এই ঈশ্বরবর্জ্জিত ঘরে তানিয়াও আর আসে নাই।*

* ম্যাক্সিম গোর্কির মূল হইতে।

# গীতার উপসংহার

শ্রীমতিলাল রায়

"একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়োঃ" অথবা "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্নাত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যময়তি"—তিনি দূরে নহেন, কাজেই তাঁহাকে অতি নিকটেই পাওয়া যাইবে। গীতা শান্তি ও শাশ্বত সুখের পথ ঈশ্বর যুক্তি ব্যতীত আর কিছু বলে নাই। ঈশ্বর-প্রাপ্তিই পরমপদ। জীব আনন্দের অধিকারী ইহাতেই হইতে পারে। গীতা আমাদের এই পথেই চালিত করিয়াছে। সাধনার পথ একটুও জটিল নহে। শান্তিপ্রার্থী, মুক্তিপ্রার্থী প্রশ্ন তুলিয়াছে "কঃ পন্থাঃ" ? অন্তর্য্যামী উত্তর দিতেছেন "এস, সর্ব্বতোভাবে আমার সহিত সংযুক্ত হও। আমার অনুগ্রহে তুমি অভীষ্টলাভ করিবে।" এই আমিই সর্ব্বেশ্বর।

গীতা হুবহু এই কথা বলিয়াছে। গীতার উপসংহারে এই কথাই সমধিক সুস্পষ্ট হইয়াছে।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

হে ভারত, তাঁহাকেই সর্ব্বান্তঃকরণে আশ্রয় কর। তাঁহার প্রসাদেই পরম শান্তি ও শাশ্বত-স্থান প্রাপ্ত হইবে।

কথাটী সহজ। কিন্তু তবুও ইহা অতিশয় গুহ্য। পরবর্ত্তী শ্লোকে আছে—

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩

এই তোমাকে গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান আমা কর্ত্তৃক কথিত হইল। ইহা অশেষ প্রকারে আলোচনা করিয়া, যাহা ইচ্ছা তাহা তুমি কর।

বলিবার আর কিছু নাই। প্রথম ষট্‌কে কর্ম্মসূত্র ধরিয়া কর্ত্তার সন্ধান মিলে; কর্ম্ম বিজ্ঞান ইহাতে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ৭ম অধ্যায় হইতে ১২শ অধ্যায় পর্য্যন্ত যোগ-তত্ত্ব, ব্রহ্ম-তত্ত্ব, বিভূতি-তত্ত্ব, গুরু-তত্ত্ব ও ভক্তি-তত্ত্ব সবই বলা হইয়াছে। তৃতীয় ষট্‌কে শাস্ত্রমর্ম্ম বিশদ করিয়া উক্ত হইল। এখন যদি কেহ বলেন—ঈশ্বর-যুক্তির জন্য আমি কি করিব? তাঁহার আর উত্তর নাই। বলিতে হয়, অতঃপর তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। মানুষের ক্ষোভ মিটাইতে তবুও আর তিনটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ পথের নির্দ্দেশ সুস্পষ্ট করিতেছেন। এই শ্লোক গীতার যোগের উপসংহার-বাক্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥৬৪॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥৬৫॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥৬৬॥

আমার নিকট হইতে সর্ব্বগুহ্যতম পরম বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর। আমার একনিষ্ঠ ভক্ত বলিয়া তোমায় শ্রেয়ঃ বলিতেছি।

মচ্চিত্ত, মদ্ভক্ত, মদ্‌যাজী হও। আমাকে নমস্কার কর। তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি—আমাকে লাভ করিবে। তুমি আমার প্রিয়।

সকল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দাও। এক আমাকে শরণ লও, অনুসরণ কর; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব; শোক করিও না।

অতিশয় সহজ ও সরল কথা। গুহ্যতম রহস্য ইহার মধ্যে কি আছে? ক্ষর ও অক্ষর তত্ত্বের উপর পুরুষোত্তম পরম ব্রহ্মে এক-মন, এক-ভক্তিবিশিষ্ট হইয়া সাধনপরায়ণ হইলে, মানুষ মুক্তি পায়, শান্তি পায়। আর এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে হইলে, অনন্যচিত্ত হইয়া অপর সব ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হইবে। ইহা আর গোপনতম কথা কি?

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥৬৭॥

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥৬৮॥

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥ ৬৯॥

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥ ৭০॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্॥৭১॥

তপঃ-রহিতকে, অভক্তকে, সেবাবিহীনকে, আমাকে যে দ্বেষ করে তাহাকে তোমা কর্তৃক ইহা কদাচ বক্তব্য নহে।

পরম গুহ্য এই গীতাশাস্ত্র। আমার ভক্ত-সমীপে যে উপদেশ করিবে, আমাতে পরাভক্তি লাভ করিয়া সে নিঃসংশয়ে আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

মনুষ্য মধ্যে গীতার ব্যাখ্যাতা হইতে আমার প্রিয় কর্ম্মী আর কেহ নাই। তাহাপেক্ষা পৃথিবীতে অন্য কেহ প্রিয়তরও হইবে না।

যে আমাদের এই ধর্ম্ম-সংবাদ পাঠ করিবে, তাহার সেই জ্ঞানযোগের দ্বারা আমি ইষ্টরূপেই পূজিত হইব। ইহাই আমার অভিমত।

শ্রদ্ধাসম্পন্ন, অসূয়াশূন্য যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করে, সেও মুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মীদের শুভ লোক লাভ করিয়া থাকে।

চারি শ্রেণীর লোককে গীতাকার এই গীতাশাস্ত্র বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। প্রথম দেহাত্মবোধীকে। কেন না, দেহাত্মাভিমানী কায়ক্লেশরূপ তপস্যা গ্রহণ করিতে পারে না। তিনি অভক্তকেও এই গীতার যোগ বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। ভক্তিহীনের হৃদয় বিশুদ্ধ হয় না। সেবাবিমুখ লোকেদেরও গীতাশ্রবণের অধিকার নাই বলা হইয়াছে। সেবাবৃত্তি না থাকিলে, অহংকার হইতে মুক্তি হয় না। আর বিদ্বেষীকেও গীতার অধিকার দেওয়া হয় নাই। বিদ্বেষী স্বতঃই প্রত্যয়হীন হয়।

গীতার দেবতা কর্ম্মসূত্র ধরিয়া "ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা" জ্ঞানে সমুচ্চিত হইতে বলিয়াছেন এবং পরে "মন্মনা ভব মদ্ভক্ত" হইয়া পরম পদ লাভ করিতে বলিলেন।

এই গীতাপ্রচারকারী পরাভক্তি লাভ করে এবং ক্রমে সংশয়শূন্য হয়। উপরন্তু এইরূপ কর্ম্মকারী অপেক্ষা তাঁহার প্রিয়তম পৃথিবীতে কেহ আর হইবে না। আর এই গীতার ধর্ম্ম আলোচিত হইলে, শ্রোতারও জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবে; এবং সে যাবতীয় পুণ্যানুষ্ঠানকারীর সর্ব্ব প্রকার শ্রেয়ঃলাভ করিতে পারিবে।

একটা মতবাদপ্রচারের এই আকৃতি অনুভবনীয়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, এই তত্ত্ব কেন গুহ্যতম।

প্রতি মানুষের মধ্যে শাশ্বত নারায়ণ বিরাজ করিতেছেন। ইহা প্রতি আস্তিক্যপরায়ণ ব্যক্তির অবিসংবাদী অভিমত। এই আত্মস্বরূপ পুরুষের সহিত জীবের স্বতন্ত্র চৈতন্য ঐক্য পাইলে, মানুষ ঈশ্বরযুক্তি পাইবে, আত্মস্থ বা নিত্যসত্ত্বস্থ হইতে পারিবে। সাধন-বিজ্ঞানের এই অকাট্য নীতি কেহই অস্বীকার করিবেন না। ইহা ব্যতীত এই নশ্বর সৃষ্টি এবং ইহার পশ্চাতে যে অবিনশ্বর চৈতন্য, তাহা হইতেও যে পরচৈতন্য তুরীয় সত্তা, তাহাই জীবের সাধ্য। গীতায় এই সকল কথা নানা ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে।

জীবাধারে অন্তর্য্যামী নারায়ণ অথবা ক্ষরাক্ষরাতিরিক্তি পুরুষোত্তম-তত্ত্ব—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে; এক দেহাদিতে পরিব্যক্ত; অন্য অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য। দেহধারী জীবের পক্ষে ব্যক্ত মনুষ্যদেহধারীকে ইষ্টরূপে গ্রহণ করা সহজ, এই সঙ্কেত গীতা দিয়াছে। অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ এই সাধনায় দীক্ষা দিতেই এত কথার অবতারণা করিয়াছেন। একজন নরদেহধারী ব্যক্তির পক্ষে অন্য দেহধারীকে আপনাতে সর্ব্বতোভাবে অনন্যচিত্ত হইয়া, সর্ব্বপ্রকার অতীত ও বর্ত্তমান ধর্ম্মসংস্কার হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য উপদেশ দেওয়া অমানুষিক ভরসার কথা বলিতে হইবে।

যে যুগে ভারত বেদ-মন্ত্র মুখরিত—জ্ঞান-তপস্যাপূত, ঋষিকুলশাসিত আর্য্যসমাজ শ্রুতি-স্মৃতির অনুসরণ করিয়া শান্তিধামের পথে জাতিকে অধ্যাত্মসাধনায় পরিচালিত করিতেছেন, সে যুগে এক জন মানবদেহধারী ক্ষত্রিয়নেতা পাণ্ডুবংশাবতংশ পার্থের কাছে আপনাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণের দাবী করিতেছেন। ইহা গুহ্য, গুহ্যতর শুধু নহে, গুহ্যতম তত্ত্ব, ইহা অস্বীকার করিলে চলে না।

কত শত-সহস্র, হয়তো কোটী বৎসরের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি শৈবালপল্লববিজড়িত অসংস্কৃত হ্রদের ন্যায় ভারতে জটিল ও অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহার পরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি দিতে নিজের উপর, গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া নিজেকে পুরুষোত্তমরূপে ভারতের কৃষ্টি ও সাধনার নব-জন্মানয়নের জন্য উদ্যত হইয়াছেন। যাহা ধ্যানগম্য অভিধেয়

মাত্র ছিল, তিনি তাহার বস্তুতন্ত্র অনুবাদ প্রদর্শন করিতেছেন—এই নরোত্তম গুহ্যতম বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সর্ব্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বেদ-প্রতিপাদিত। কৃষ্ণচন্দ্রে ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠার ঘোষণা তাই সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। অনন্যচিত্ত হইয়া কেহ যদি ঈশ্বরবোধে অন্যে মুক্তি পায়, মুক্তিপন্থীর তাহা বিপথ নহে। সাধনা তুল্যই হইবে। কিন্তু লক্ষ্য বিভিন্ন। এক তুরীয় অব্যক্ত, অন্য মূর্ত্ত অনুবাদিত। সাধককে এই মূর্ত্ত ভগবানে মুক্তি লইতে হইলেও, ব্যক্তিগত সর্ব্বপ্রকার সংস্কার ও আসক্তি হইতে মুক্তি লইতে হইবে। অহঙ্কার ও আসক্তি চৈতন্যের আবরণ; আশ্রয়-তত্ত্বে আত্মসমর্পণের সাধনায় উহা যত দূর হইবে, ততই আত্ম-চৈতন্যের স্বরূপ প্রকাশ পাইবে। অতএব আশ্রয় ব্যক্ত হওয়ায়, জীবের ঈশ্বরত্ব-লাভের পথ বিঘ্নিত হইতেছে না, এবং দেহধারী সাধকের পক্ষে এই পথ অধিকতর সুগম ও সরল। অহঙ্কার হইতে মুক্তির নানা প্রকার আনুমানিক কল্পিত সাধনপথ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের সোজাসুজি প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ মুক্তিপ্রার্থীকে অধিক উদ্বুদ্ধ করে। তবুও মানুষ মানুষকে নিঃসংশয়ে ঈশ্বরবোধে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। গীতাকার তাহা জানিতেন, এবং এই জন্যই অসূয়াশূন্য হইয়া অব্যভিচারী নিষ্ঠার সহিত অনন্যচিত্তে এই পথে অগ্রসর হওয়ার সদুপদেশ তিনি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়াছেন।

এই যোগ নাকি বৈবস্বত মনু হইতে ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি রাজর্ষিরা পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হইলেও, কালে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; আর এই যোগ বিনষ্ট হওয়ার ফলেই ভারত হয়তো আত্মকৃষ্টি ও সংস্কৃতিরক্ষায় অসমর্থ হইয়াছিল। ধর্ম্মের পতন ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখিয়াই কৃষ্ণচন্দ্র যোগের ভিত্তির উপর রাজ্যপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নে তাৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ও প্রতিভাশালী পুরুষের সহিত যুক্তিপ্রার্থী হইয়াছিলেন এবং পার্থের ন্যায় ভক্তি, নিষ্ঠা ও প্রেম যাহাদের আছে, তাহাদের নিকট এই গীতা প্রচার করিয়া, এক-নায়কত্ব-প্রতিষ্ঠার জন্য কোন এক চৈতন্যময় পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া জাতিগঠনের সঙ্কেত দিয়াছেন। 'এই নীতি আশ্রয় করিয়া দেশে খণ্ড খণ্ড বহু যোগ-সংহতি গড়িয়া উঠিতে পারে, ইহাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিদিত ছিল না। সপ্তম অধ্যায় ১৯শ শ্লোকে তিনি তাই বলিয়াছেন—বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যপ্রভাবেই আমার ভজনপরায়ণ মানুষ জন্মে। ঈদৃশ মহাত্মা সুদুর্ল্লভ। কামনাপ্রাবল্যে মানবগণ স্ব-স্ব ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের পূজাও করিয়া থাকে। এইরূপ হীনবুদ্ধিগণ সেই সেই কেন্দ্রে গমন করিবে; আমার ভক্ত আমাতেই সম্মিলিত হইবে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই সাধনতত্ত্ব সার্ব্বজনীন হইলেও, কামনাপ্রযুক্ত মানুষ কামনানুসরণ করিয়াই এক অন্যে সংযুক্ত হইয়া সংহতি গড়িয়া তুলিবে। কামনার তারতম্যে এই বিচিত্র সংহতি কামনানুরূপ ফলই প্রসব করিবে। নির্ম্মম নিরাসক্ত আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রেই শক্তিশালী ব্যূহ গড়িয়া উঠিবে। যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কল্প এই ক্ষেত্রে যুক্ত হইতে পারে। পার্থ ও কৃষ্ণচন্দ্রের এই প্রসঙ্গ যথার্থভাবে যেখানে আলোচিত হয়, সে ক্ষেত্র এই অপূর্ব্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অনুশীলনতীর্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আর এই হেতুই এই সাধনতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ গুহ্যতম তত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোতা বীর্য্যবান্ পার্থ। কিন্তু ইহার মর্ম্ম অবধারণ করিতেছেন আর একজন। তিনি সঞ্জয়। সংহতির তিন প্রয়োজন ইহাতে সিদ্ধ হইতেছে। ভক্ত, ভগবান ও ভাগবত, এই তিনের সমবায়ে জাতি গড়ে। সঞ্জয় এখানে ভাগবত গ্রন্থের বিগ্রহ-মূর্ত্তি হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশেষ শ্লোকে উচ্চারণ করিলেন—

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

হে পার্থ, একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার কথা শুনিয়াছ কি? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানসম্মোহ বিনষ্ট হইয়াছে কি?

সম্মুখে বিশাল কুরুক্ষেত্র। মদগর্ব্বস্ফীত, স্বার্থদুষ্টচিত্ত দুর্য্যোধনাদির সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করিয়া ভারতে নব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে নব-রাজ্যপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় দেবকীনন্দন কুন্তী-পুত্রের সহিত একচিত্ত একাত্মা হইতে চাহিতেছেন। যে বীর্য্যসত্তা অত্যাচারী কংসকে নিধন করিয়া মথুরায় রাজ্যবিস্তারে জরাসন্ধ, কালযবন প্রভৃতির বাধায় অকৃতকার্য্য হইয়া, ভারতের সুদূর পশ্চিমে দ্বারকায় আত্মরক্ষা করার পর, বীরপুত্র পাণ্ডবদের সন্ধান পাইয়া

স্বকার্য্যসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, ভারতের সেই সর্ব্বোত্তম শক্তিধর পুরুষ পার্থের সহিত পরিপূর্ণ যুক্তি-কামনায় আজ, তিনি উদ্‌বুদ্ধ। একের স্বপ্ন অন্যকে উন্মাদ করে তখনই, যখন এক অন্যে সর্ব্বতোভাবে অন্বিত হয়। পরকে আপন করার মন্ত্রসিদ্ধির উপরই জাতির অমোঘ ভিত্তি গড়িয়া উঠে। এই যুক্তি যদি সিদ্ধ হয়, তবে সমগ্র জাতিকে তিনি যুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া আত্মিক বল-প্রয়োগে ভারতে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন করিতে পারিবেন। তাই তাঁর উপসংহারবাক্য করুণ আকূতিপূর্ণ। পার্থের দিকে চাহিয়া গদগদ কণ্ঠে তিনি বলিতেছেন "বুঝিলে কি? তোমার মোহ দূর হইল কি? এইবার আমার স্বপ্ন তোমার স্বপ্ন। আমার কাজ তোমার বলিয়া অনুভূত হইবে কি? আমি যে "বহুস্যাং প্রজায়েয়" বলিয়া এমন বিচিত্র হইলাম, এই বৈচিত্র্যের মাঝে আবার দুইয়ের মধ্যে ঐক্যের অমৃতাস্বাদ হইল কি? বহুর মধ্যে এই ঐক্যচেতনার পরিস্ফুরণ না হইলে, সৃষ্টির উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হইবে না। স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে এই একের বৈশিষ্ট্য ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দায়েই তো আমি তোমার সখা। বৃন্দাবনে শ্রীরাধার শ্যাম-ধন। এই দায়েই তো যশোদার বন্ধন, নন্দের বাধা মাথায় বহিয়াছি। ভৃগুর পদচিহ্ন বুকে ধরিয়াছি। এই অনন্য-প্রেমামৃতের সন্ধানে পতি-পত্নী, পিতা-পুত্র, প্রভু ভৃত্য, সখা-সুহৃৎ, ভক্ত-ভগবান। কিন্তু সকল সম্বন্ধ-রসের ঊর্দ্ধে অপ্রাকৃত যোগ-রসই যে বিশ্বের বীর্য্য, জগতের ঐশ্বর্য্য। এই যোগযুক্তিই ভারতের সঙ্ঘতত্ত্ব। এই সঙ্ঘ-শক্তিই যে কলিযুগে ঈশ্বরচৈতন্যরক্ষার অমোঘ বীর্য্য।" এই করুণাপ্লুত প্রশ্নের উত্তরে ভক্ত যেন বাধ্য হইয়াই বলিলেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥৭৩॥

অর্জ্জুন বলিলেন—"হে অচ্যুত! মোহ নষ্ট হইয়াছে। তোমার প্রসাদে আমার স্মৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে। আমি সংশয়মুক্ত হইয়াছি। আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিব।"

শ্রুতি বলেন "স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাম্ বিমোক্ষঃ"। মানুষ মহতের আকুল চাওয়ার উত্তরে সর্ব্বকাল যুগেই সমর্থন-সূচক ইঙ্গিত করে। আমরা কিন্তু পার্থকে জিজ্ঞাসা করিব— স্বরূপ পাইয়া যুক্তি পাইয়া, কি তাঁর এই উত্তর? সত্যই কি নষ্টমোহ হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন?

মোহ যখন দূর হয়, স্মৃতি তখন ফিরিয়া আসে। সংশয়ও তখন অপগত হয়। এই সবই হয় ঈশ্বরপ্রসাদে। ঈশ্বর-প্রসাদ কে ফিরাইয়া দিতে পারে? ইহাই যে তৃপ্তি ও আনন্দের হেতু। কিন্তু গীতার পর এই পাঁচ হাজার বৎসরের ইতিহাস লক্ষ্যে রাখিয়া আমরা বলি— ঈশ্বর-প্রসাদ যেন আমাদের অভিভূত না করে, ইহা যেন স্মৃতি-প্রকাশের কারণ না হয়।

মোহ যদি নষ্টই হইয়াছিল, তবে কৃষ্ণচন্দ্রের ধর্ম্মরাজ্য জীবনে সফল হইল কৈ? শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালনের সঙ্কল্প কুরুক্ষেত্রসংগ্রামেই কি সম্পূর্ণ হইল? জীবন-সংগ্রামের যবনিকা পড়িল যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পার্থের অনুগমনে। অর্জ্জুন সেই যে কুলক্ষয় ও স্বজনবধে কাতর হইয়া গাণ্ডীব ত্যাগ করিয়াছিলেন, কুরুক্ষেত্রসংগ্রামের পরও তাঁর সেই স্বজন-প্রীতি আরও দৃঢ় ও বৃহৎ মূর্ত্তি ধরিয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্রে তিনি যে যুক্তি পাইয়াছিলেন, তাহা সাময়িক। কুরুক্ষেত্রের পর আর উহা যোগের জয়চ্ছত্র উড়াইল না, হৃদয়ের দায়ই বড় হইয়া উঠিল। কৃষ্ণচন্দ্র স্বজনঘাতী হইয়া, নির্ম্মম চরিত্রের পরিচয় দিলেন; আর পার্থ স্বজন-সঙ্গেই শেষ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া আসক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। স্বর্গ-রাজ্যের স্বপ্ন—স্বপ্ন হইয়াই রহিল। তারপর এই পাঁচ হাজার বৎসর কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্য "ম্যাঁ ভুখা হুঁ" বাণী তুলিয়া ভারতের আকাশ-বাতাস আজও মুখরিত করিতেছে। এই যুক্তির আহ্বান কুল ও বংশের ব্যবধান রাখিলে পালন করা যায় না। এই যুক্তি মানব-হৃদয়ের সর্ব্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। এই যুক্তি শান্ত-সখ্যাদি পঞ্চ রসের ঊর্দ্ধে ব্রহ্মযুক্তি। এই যুক্তি লাভ করিয়া জীব শ্রুতিবচন সিদ্ধ করিবে। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি"—এই ব্রহ্ম-সংহতিই ভারতের স্বপ্ন সিদ্ধ করিতে পারে। স্বজনযুক্তি রাখিয়া ইহা সম্ভব হইবে না। আত্মসমর্পণের পাঞ্চজন্য অনাহত বাজিতেছে, আজ আর সেই পার্থ নহে। আজ নব-যুগের পার্থ চাই— যাহার যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতা থাকিবে না, সুভদ্রাদি পত্নী,

অভিমন্যাদি আত্মীয়-স্বজন কেহই থাকিবে না। থাকিবে শুধু পার্থ আর কৃষ্ণ। দুইয়ে এক, একে দুই। এই যুক্তিই গীতার সন্ন্যাস। ইহাই গুণান্বিত হইয়া মহাশক্তি প্রকাশ করিবে। জীবন মৃত্যু প্রকৃতির চির বন্ধ। যুক্তির অমৃতে উহা সত্যই পায়ের ভৃত্য। উহা হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা—পতঙ্গের। উৎসর্গের কঠোর মন্ত্র-ধ্বনি আজও বাজিতেছে, কোথাও কি হোমানল জ্বলিয়া উঠিল? সঙ্ঘের শতদল ফুটাইতে নব-যুগের বিশ্বকর্ম্মা কি নবজন্ম গ্রহণ করিলেন? সে নূতন যুগ-প্রভাত গীতার মন্ত্রে মন্ত্রে অভিনন্দিত হয়, কত দিন আর এ আহ্বান অপূর্ণ থাকিবে?

হে প্রাচীন, তুমি শুনিয়াছ গীতার বাণী। এই বিস্ময়-জনক বার্ত্তায় আনন্দে তুমি অভিভূত। তুমি বলিতে পার—এমন মিলন যদি কোথাও হয়, সেইখানেই রাজলক্ষ্মী, বিজয়শ্রী রূপ লইবে, মূর্ত্ত হইবে? ভারতের স্বপ্ন সফল হইবে? পাঠক! সঞ্জয়ের আর পাঁচটী শ্লোক উপহার দিয়া বিদায় লইব। 'প্রবর্ত্তকে'র বিগ্রহ অঘোর পর অর্ঘ্য দাবী করিয়া এই গীতাঞ্জলির অর্পণে আমায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। আমি এই মূর্ত্ত বিগ্রহের চরণকমলে আমার এই পূত অর্ঘ্য সমর্পণ করিয়া স্বস্তি-মন্ত্র উচ্চারণ করি।

সঞ্জয় বলিলেন—

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥৭৪॥
ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥৭৫
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥৭৬॥
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥৭৮॥

ওঁ হরি, ওঁ স্বস্তি*

* "গীতার যোগে"র (১৮শ অধ্যায়) অনুবৃত্তি: ২য় খণ্ড, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ—সমাপ্ত।

# মিনতি

শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর

বাঁচাও, বাঁচাও দেব, আজ মোরে এ ঘোর দুর্দ্দিনে,
কামনার পঙ্ককুণ্ডে ক্ষণে ক্ষণে মগ্ন হয় মন,
ক্ষুদ্র সুখ তুচ্ছ ভোগ-লালসায় অন্ধ এ অন্তর,
কোথায় ভেঙেছে তপঃ, বৈরাগ্যের কঠোর সাধন!

একি প্রভু! কোথায় চ'লেছ নিয়ে মত্ত অন্ধকারে,
কোথা তুমি? এই মোহ, এই লোভ, একি তব রূপ?
কোন্ পথ দিতে যেতে কখন কোথায় অজানিতে
কোন্ মন্ত্রে দুর্গম সুড়ঙ্গ-পথে চলিয়াছি চুপ?

আমার বলিতে কিছু এ ধরায় হারা'ল যখন,
তখন আছিল শান্তি, মৌন তৃপ্তি, পবিত্র সংযম,
আমারে ফিরালে কেন গলিত এ বাসনা-নরকে
পলে পলে নিজহাতে লভিতে এ মরণ চরম?

এই তব অভিলাষ, নিয়মের একি তব নাথ?
এই যদি হবে তবে, কেন তা'র দিলে না আভাষ?
কেন মন ক্ষুন্ন হয়, মানিতে পারে না এই যোগ—
অপরিচয়ের দুঃখে স্বর্গবাসে মানে যে প্রবাস?

কণ্টকে বিক্ষত চিত্ত—ধিক্কারে, লজ্জায়, অনুশোকে
আপন রুধির-পান করে প্রাণ ছিন্নমস্তা সম,
খুঁজিছে শীতল শান্তি বহ্নিবক্ষ আলেয়ার প্রায়,
তিলে তিলে ডুবিতে দিও না তারে ওগো প্রিয়তম!

করো না নিষ্ঠুর খেলা—ক্লিষ্টপ্রাণে করি' ক্রীড়ণক,
মনে আর পরিবেশে ঘটায়ো না অমিত্র অমিল;
দাও ধৈর্য্য অবিশ্রাম—তমিস্রায় খুঁজে নিতে পথ,
আবর্ত্ত তলায়ে যাক, অনুগামী বহুক অনিল!

## ভারতীয় কৃষ্টির উপাদান

যে দিন বিশাল জলধিগর্ভ হইতে বরাহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধরিত্রী ভাসিয়া উঠিল, সে দিন সূর্য্যকরোজ্জ্বলা সদ্যস্নাতা ধরণীর সেই পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া ঊর্দ্ধলোক হইতে অশরীরী দেবগণ জয়ধ্বনি করিয়াছিলেন। সমুদ্র-গর্ভোত্থিত সহ্যাদ্রি এই বিপুল ভূভার আড়াল করিয়া দাঁড়াইল, এই বিশাল মর্ত্ত্যকে উত্তাল সাগরোর্ম্মি হইতে রক্ষা করার ইহাই ছিল বিধাতার সঙ্কেত। সুদূর পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত শৃঙ্খলিত গিরি-সঙ্কট আশ্রয় করিয়া নিরাপদে গড়িয়া উঠিল সুবিপুল মহাদেশ। প্রাচীনেরা ইহার নাম দিলেন অশ্বক্রান্তা। দেশের আকার অশ্বের ন্যায় ছিল বলিয়াই সম্ভবতঃ এইরূপ নামকরণ হইল। সেই স্মরণাতীত কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এই মহাদেশ এশিয়া নামে পরিচিত। আদিমানবের জন্মভূমি এশিয়া মহাদেশের বন্দনা জগদ্বাসীকে চিরযুগ করিতে হইবে।

তারপর কত শত সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে, হিমগিরির ক্রোড়ভূমি সাগর কুক্ষি হইতে স্বর্ণকান্তির ন্যায় প্রকাশ পাইল। কত নদ-নদী, বনভূমি, গিরিমালা ইহার শোভা সৃষ্টি করিল। সুশ্যাম বনস্পতিকুঞ্জে কত বিচিত্র বিহগের কূজন-ধ্বনি উঠিল। কত বনচর প্রাণী বিচরণ করিতে লাগিল। গিরিপথ ধরিয়া আদিমানবেরা প্রথম পর্ব্বতে, তারপর সুশ্যাম সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া আবাস নির্ম্মাণ করিল। প্রাগৈতিহাসিক এই অভিনব দেশের বিচিত্র কাহিনী কল্পনার রঙীন তুলি দিয়া মানস-পটে আঁকিয়া লইতে হয়। কত যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের কণ্ঠে বিশ্বস্রষ্টার স্তুতিবন্দনা যে উচ্চারিত হইয়াছে, তাহারও কি ইয়ত্তা আছে? মানুষ যত আপনার পরিচয় পাইয়াছে, স্রষ্টার সহিত যুক্তিপ্রার্থনায় ততই মুখর কণ্ঠে কত ঋক্ যে সে উচ্চারণ করিয়াছে, তাহারও সংখ্যা হয় না। কত দেশ উঠিল, লয় পাইল। কত জাতি জন্মিল, মরিল। কিন্তু অন্তহীন সৃষ্টিপ্রবাহ কোন দিন রুদ্ধ হয় নাই। মানুষের আদিম গতি প্রবাহের পর প্রবাহে মানুষের কণ্ঠে ক্রমিক ছন্দে শ্রুতি-বচনরূপে উচ্চারিত হইয়াছে। কত কোটী বৎসরের স্মৃতি-বিজড়িত যে সে শ্রুতি, তাহা নির্ণয় করা আজিও দুঃসাধ্য হইয়া রহিল। মানুষ তার ক্ষুদ্র প্রতিভায় সুপ্রাচীন যুগের কালনির্ণয় করিতে চাহে, উহা সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদের ন্যায় অতি নগণ্য প্রচেষ্টা।

আর্য্যসভ্যতার নিকেতন গড়িয়া উঠিল—উত্তরে সাগর ও দক্ষিণে সমুদ্রসীমার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে। সে সভ্যতার ইতিহাস বিশ্বসৃষ্টির সুমহান্ কালের তুলনায় কয়েক সহস্র বৎসর মাত্র। আমরা ভারতে সর্ব্বপ্রথম আর্য্যসভ্যতার সাম্রাজ্যবিস্তার বৈরাজ-বংশের সূত্র ধরিয়া হইতে দেখি। তাহা বর্ত্তমান কাল হইতে আনুমানিক পঞ্চদশ সহস্র বৎসর মাত্র। এই যুগে ভারতের আর্য্য-জাতির কণ্ঠে যে সকল ঋক্ উচ্চারিত হইত, তাহার সবগুলি তাঁহাদের সমসাময়িক কালের রচনা নহে। বহু প্রাচীন যুগের বহু শ্রুতি ইহাদের কণ্ঠে পুনরুচ্চারিত হইত। সে সকল বাণীর অর্থ খুবই দুর্বোধ্য, কিন্তু উহাতে যে অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে সেই অজ্ঞাত অতিপ্রাচীন মানবেরা যে অতি উচ্চ আদর্শ ও সংস্কৃতির অধিকারী হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। পরবর্ত্তী হিন্দুসভ্যতার যুগ তাহার তুলনায় ধাপের পর ধাপ ক্রমেই যেন নামিয়া আসিয়াছে মনে হয়। আমরা ইতিহাসের যে গৌরবময় যুগের পরিচয় অতি ক্লেশ-সাধ্য পর্য্যালোচনার দ্বারা উপলব্ধিগম্য করি, তাহার সহিত তুলনা করিয়া বর্ত্তমান শিক্ষা-সভ্যতার ধারা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারি না। যদি পূর্ব্বপুরুষেরা ফিরিয়া আসিতেন, তবে তাঁহারা দেখিতে পাইতেন যে, আমরা আর তাঁহাদের বংশধর নহি, চলমান

কঙ্কালের ন্যায় নিকৃষ্ট প্রেতজাতিতে পরিণত হইয়াছি। তাঁহাদের উদার ধর্ম্মভাব আমরা আর অবধারণ করিতে পারি না। তাঁহাদের সুনিপুণ সমাজ রক্ষার ব্যবস্থা আমরা আর রক্ষা করি না। সে মেধা নাই। সে শক্তি ও বীর্য্য আমাদের লোপ পাইয়াছে। ভারতের আর্য্যরক্ত এমন নিস্তেজ নিষ্প্রভ হইল কেন, তাহার কারণ অন্বেষণ করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। সেই আদিম মহা-মানবজাতির রক্তধারা জগতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্বত্র প্রাচীনের জীবনচ্ছন্দঃ অধিকতর গতিশীল ও শক্তিশালী হইয়া প্রকাশিত হইতেছে—কূপমণ্ডুক আমরা তাহা দেখি না; বরং বিপরীত দর্শন করি। ভারত-ভারতীর বীণায় বাজিতেছে ক্ষীণ স্বরে শিবসুন্দরের ভুয়া বাণীমন্ত্র। তাহাতে না আছে ওজঃ, না আছে সৃজনের মহিমা।

ভারতের সর্ব্বপ্রথম বৈরাজ রাজবংশের তৃতীয় পুরুষ সর্ব্বজনখ্যাত মনু মহারাজ। পুরাণাদিতে যে বিবরণ পাই, তাহা হইতে অনুমান করা যায়—তিনি মাত্র ৩০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই ৩০ বৎসরের মধ্যে তাঁহার শাসনশক্তি মিশর হইতে ইউরোপ, ইউরোপ হইতে সুদূর চীন পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে জীবন-নীতি আর্য্যসভ্যতা ও আদর্শ রক্ষার ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ দিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা ভুলিয়াছি, কিন্তু ইউরোপ আজ তাহারই অনুসরণ করিতেছে।

বৈরাজ রাজবংশ ভারতের ঐতিহাসিক সীমায় ধরা পড়িলেও, উহার পশ্চাতে এখনও যে অজ্ঞাত ইতিহাস রহিয়া গিয়াছে, তাহা অধিকতর মহান্ ও অমূল্য সম্পদ্। প্রাচীন মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূলে সুপ্রাচীন মহামানবের দানই নিহিত আছে, সে ইতিহাস আর পাওয়া যাইবে না। মনু অতীতের পুনরুক্তি করিয়াছেন এবং কালানুযায়ী নূতন নীতি ও সংস্কার করিয়াছেন। অতীতের অনেক কিছু হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি—অতীত আমাদের এক প্রকার হারাইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। সৌভাগ্যের বিষয়, শ্রুতি আমরা হারাই নাই, স্মৃতিও আমরা সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিতে পারি নাই। এই জন্ত আমাদের আশা—সেই সুমহান্ অতীতের সহিত যোগসূত্রও আমরা পুনঃপ্রাপ্ত হইব। এই অতীতের সূত্র ধরিয়াই আবার সগৌরবে মাথা তুলিবার সঙ্কেত পাই। আমাদের দেশে অধুনা এক শ্রেণীর মনীষী যেভাবে শ্রুতি ও স্মৃতির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেছেন, অর্ব্বাচীন যুগের প্রভাবে অন্ধ হইয়া আত্মঘাতী হইতেছেন, জাতিকেও বিভ্রান্ত করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। এই দিকে উদাসীন থাকিলে, ঘরের শত্রু বিভীষণেরাই আমাদের সর্ব্বনাশ করিবে। আমরা যুগ-ধর্ম্মের দান গ্রহণ করিব, নতুবা জাতি প্রগতিবিমুখ হইয়া মরিবে, কিন্তু বিনা পরীক্ষায় আমরা যেন নিজেদের মৃত্যুবাণ না ঘরে তুলি। এই পরীক্ষা নিজের ক্ষুদ্র বিচার-বুদ্ধির কষ্টি-পাথরে হইলে চলিবে না। কোন অলৌকিক শক্তির আশ্রয়েও ইহার মূল্যনির্দ্ধারণ কাজের হইবে না। আমাদের সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ হইয়া, সেই যে আদি-যুগ হইতে জীবনের সর্ব্বপ্রধান সুররূপে বেদধ্বনির অনাহত ঝঙ্কার শুনা যাইতেছে, তাহার সহিত প্রাণের সুর মিলাইয়াই আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে হইবে। উদ্দাম, উত্তেজনাপূর্ণ, বেসুরা সঙ্গীতে আমাদের উদ্বুদ্ধ হইলে চলিবে না। আমরা স্থিরচিত্তে সেই ব্রহ্ম বীণার সুগভীর প্রশান্ত মধু-মূর্চ্ছনাই কাণ পাতিয়া শুনিতে শুনিতে শ্রেয়ঃকে বরণ করিব। আত্মশ্রদ্ধা অটুট রাখিয়া নূতনকে গ্রহণ করাই সুবিধি মনে করি। ইহার অভাবে নব নব ধর্ম্মে জাতি পঙ্গুই হইতেছে। এই পঙ্গুত্বই আত্মগৌরবের হেতু মনে হইতেছে, তাহার কারণ—বিভ্রান্ত নারী-পুরুষের কৌতূহলদৃষ্টি ভিত্তিহীন ধর্ম্মের খ্যাতিস্বরূপ হয়। রাষ্ট্রেও ইহার অভাবেই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া আমরা উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া চলি। যত অসংযমী, অপ্রকৃতিস্থ, অপরিণামদর্শী হই, ততই নিজেকে রাষ্ট্রবীর বলিয়া আমরা মনে করি, আর অধিকতর অধঃপতনের সূচনা করে কাণ্ডজ্ঞানহীন সর্ব্বসাধারণের করতালি। সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াও দেখি, এই একই কারণে অন্ধতা প্রযুক্ত সংস্কারের নামে দেশবাসীকে অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারপরায়ণ করিয়া তুলি—অধোগতির পথই ইহাতে সমধিক প্রশস্ত হয়। মানবের সর্ব্বপ্রধান গুণ ধর্ম্ম ও

ঈশ্বরবিশ্বাস; তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া অগুণের আশ্রয়ে সর্ব্বত্র পরাজয়ের পর পরাজয়ই স্বীকার করিয়া লইতেছি। এই সঙ্গে জাতির অতীত ভিত্তি ভঙ্গ করিয়া স্বেচ্ছাচার-তন্ত্রে আত্মপ্রচেষ্টার ভূমি রচনা করিতে গিয়া, পরাজয়ের মাত্রাই বাড়াইতেছি। আমরা আত্মনাশী, স্বদেশদ্রোহী হইয়া উঠিতেছি।

ধর্ম্মবীর্য্য নাই, রাষ্ট্রপ্রাণ নাই, সমাজ-সংহতি নাই। মানুষের মত দাঁড়াইতে হইলে যাহা না থাকিলে চলে না, তাহারই অভাব হইয়াছে। তাই ভাবি—এ জাতি কি সেই জাতির বংশধর, যে জাতি একাধারে ব্রাহ্মণ, ক্ষাত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চাতুর্ব্বর্ণ্যের গুণাবলীর অনুশীলনে ঈশ্বরের বিগ্রহরূপে সসাগরা ধরার অধীশ্বর হইয়াছিল! কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা আজ তাহাও ভুলাইয়া দেয়। শ্রুতি ছিল বলিয়াই এখনও অতীতের গৌরবস্মরণে উদ্বুদ্ধ হই, কিন্তু সে আশ্রয়ও অস্বীকারে তলাইয়া যায়। বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আজও মনে পড়ে—এই জাতির অধিকৃত ভূভাগের এক প্রান্ত ছয় মাস অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিত, অন্য অংশ প্রতিদিন সূর্য্যকরোজ্জ্বল হইত। ইহা কল্পনা নহে, এ স্মৃতিরক্ষার বাণী যিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাঁর আর পরিচয় পাওয়া যায় না এবং ইহার রচনাকালও কেহ এখন আর নিরূপণ করিতে পারে না। এই প্রাচীন ঋক্ই আমাদের অতীত গৌরব কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়—যুগ যুগ জাতিকে ভুলিতে দেয় না তাহার আত্মমহিমার সুপ্রাচীন ইতিবৃত্ত। তাই বেদকে আমরা মাথায় করিয়া রাখি। ভারতের পর্ব্বত ও অরণ্যের অসংখ্য দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে যে জাতি বশীভূত করিয়া চির প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে, সে জাতির বংশধর আমরা, তাহাদের স্মৃতিকথা স্মরণে রাখার গুরু দায়িত্ব আমাদের আছে, ইহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। সেই প্রাচীন জাতির রক্তধারা শিরায় শিরায় অনুভব করিয়া আর্য্যভূমির মহিমোদ্ধারে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ নব তান্ত্রিকদের সম্মুখে সুপ্রচুর কত বাধা, তাহা আর বলিবার নহে। এ বাধা শারীরিক বলে দূর হইবে না। বাধা আজ বিজাতীয় তত নহে, যত স্বজাতির মধ্যেই। এখানে বিরোধ ও সংঘর্ষের সম্ভাবনাই লক্ষ্যে পড়ে। দেশবাসী অনেক পরিমাণে মুক্তিকামী হইয়াছেন; কিন্তু যাহা না হইলে, মুক্তি কুজ্ঝটিকার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, তাহা কেহ অবধারণ করিতেছেন না। খুব সঙ্কট-যুগ আমাদের সম্মুখে।

ভারতের রাষ্ট্রবল, ধর্ম্মবল, জ্ঞানবল যদি উদ্ধার করিতে হয়, সমস্ত বাধাই উপেক্ষা করিতে হইবে। কে এই কর্ম্ম করিবে? ভারতীয় ভাব-প্রবাহে অভিষিক্ত হইয়াই জাতি সংগঠিত হইতে পারে। আমরা এই জন্য অন্ততঃ এক শ্রেণীর নরনারীকেও ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে দেখিলে সুখী হইব। ভাবপ্রবণতার সীমা ছাড়াইয়া, ইহাদের জগৎ-সৃষ্টির কাল হইতে আজিকার দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষার প্রকৃত ধারা তুল্যভাবে উপলব্ধিগম্য করিতে হইবে। ব্রহ্মচারী অথবা গৃহী যে অবস্থায়ই হউক, স্ব-স্ব সত্য অবিকৃতভাবে তাহাদের রক্ষা করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে জাত-কর্ম্মাদি হইতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পর্য্যন্ত অভিন্ন আচার প্রবর্ত্তিত হওয়া চাই। প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহিত হইবে। তাহারা কর্ম্মসমূহের দোষ-গুণ-পরীক্ষায় সমদৃষ্টি রাখিবে, দেশ-ধর্ম্ম, জাতি-ধর্ম্ম, সমাজ-ধর্ম্ম প্রেম ও ঐক্যবদ্ধ হইয়া সমশক্তি-সহকারে পালন করিবে। তাহারা একাত্মবুদ্ধি হইয়া সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখিবে এবং নিষ্কাম সেবাদানে সংহতিকে নিত্য গতিশীল করিয়া তুলিবে।

ভারতের জাতি-গঠনের উপাদান স্তরে স্তরে জড় পঙ্গুর ন্যায় অবস্থান করিতেছে। শবকে সচল করার সাবলীল প্রাণ আমাদের কি আজ নাই? যে জাতির অতীত এমন গৌরবময়, সে জাতি মরিবে না—এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া জাতি দাঁড়াইলেই তাহাদের স্বভূমি, স্বরাজ্য আবিষ্কৃত হইবে। কিন্তু স্বজাতির সৃষ্টিসর্ব্বাগ্রে চাই। এই জাতি-গঠনের ভিত্তিস্থাপন আমাদের আসন্ন কর্ম্ম হইয়াছে।

কর্ম্মই ইহার ব্রহ্মাস্ত্র। কর্ম্মে অভিভূত হইলে চলিবে না। কর্ম্মকে সর্ব্বদা অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধশির হইয়া থাকিতে হইবে। এই নব জাতির প্রতি মুহূর্ত্ত চাই গতি। গতি বন্ধ হইলে, এত বড় বিপুল কর্ম্ম সংসিদ্ধ হইবে না। যে সকল মানুষ এই সচল জীবনের দীক্ষাপ্রার্থী, তাহাদের মনে রাখিতে হইবে—অসংখ্য প্রাণ লইয়াই আমাদের

জাতি। অসংখ্য প্রকার প্রবৃত্তি লইয়া নানা দিকে মানুষ যাত্রা করিয়াছে। জাতিগঠনের প্রেরণা যাঁহারা অনুভব করেন, মানব-ধর্ম্ম, মানবসমাজ, মানবজাতির শুভকামনায় যাঁহাদের রাষ্ট্র, ধর্ম্ম প্রভৃতি শক্তি অর্জ্জন করা অনিবার্য্য বলিয়া মনে হয়, তাঁহাদিগকেই আমরা নিঃসংশয়ে আমাদের সহযাত্রী হইতে বলিব এবং এই যাত্রাপথে অনেক প্রশ্ন উঠে—অনেক দ্বন্দ্ব ও সংশয় জীবন-নীতির বিঘ্নস্বরূপ উপস্থিত হইবে। আমাদের পাঠকপাঠিকাদিগকে তাহা নিঃসঙ্কোচে আমাদের নিকট প্রেরণ করিতে বলি—"প্রবর্ত্তকের" স্তম্ভে তাহার মীমাংসার চেষ্টা করা হইবে। এইরূপ প্রশ্নের উত্তরপ্রত্যুত্তর বহু জিজ্ঞাসুকে সচেতন করিয়া তুলিবে। আমরা এই স্তম্ভে এই বিষয়ের আলোচনা করিব—"প্রবর্ত্তকের" পাঠকপাঠিকাদের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রাখিলাম।

## ছিন্ন মুকুল

( একটি শিশুর মৃত্যুতে )

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

বৃহৎ নহে, মহৎ নহে,
হয়ত হ'ত বৃহৎ, মহৎ।
জগৎ তারে চিন্‌ত নাকো,
হয়ত উজল কর্‌ত জগৎ।

সৌরভে তার ভরেনি দিক্,
হয়ত তাহার বুকের সুবাস
বন্ধু-জনে, দেশের জনে
তৃপ্তি দিতে আশা-উছাস।
আজ জননীর কণ্ঠ হ'তে
পুত্র-ফুলের মাল্য দ'লে
ক্রূর নিয়তি নিল যে ফুল,—
দূরেই সে কি গেল চ'লে?

কি বা হারায় এই জগতে?
ঝরা পাতা ধরায় থাকে;
জল শুকায়ে মেঘ হ'য়ে রয়,
লুপ্ত তড়িৎ আকাশ রাখে।
এই যে হেরি শুক্‌না তৃণ,—
মাটীর আগার পূর্ণ করে;
কণ্ঠে যে-গান গেল থেমে,
রবে তাহা বায়ুর ঘরে।

এই শিশু কি হারিয়ে গেল?
না, না,—তাহার সচল সে প্রাণ
অপর অসীম বিশ্ব-প্রাণে
যুক্ত হ'য়ে আজ বেগবান্।
এই যে মোরা স্মরণ করি
তাহার খেলা, তাহার হাসি,
তাই দেখে সে হাস্‌ছে হের।
বিরাট্ আকাশ-বক্ষে ভাসি'।

# অযোধ্যা

শ্রীমতিলাল রায়

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, পুরাণাদি হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায়—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামচন্দ্র বৈবস্বত মনু হইতে ৬৫ পুরুষ পর্য্যায়ে পড়েন। আমরা ৩০ বৎসর প্রত্যেক নরপতির রাজ্যকাল ধরিয়া মনু হইতে ১৯৫০ বৎসর পরে, রামচন্দ্রের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিতে পারি। ইহার ৭।৮ শত বৎসর পরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব। যদি এই সময়ে কুরুক্ষেত্র-সংগ্রাম হইয়া থাকে, আর আজ পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকাল যদি কম-বেশী ৫০০০ বৎসর কাল হয়, তাহা হইলে আমরা অনুমান করিতে পারি, প্রায় ৫৭০০।৫৮০০ বৎসর পূর্ব্বে অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র ভারতে বিরাজ করিয়াছিলেন।

তিনি ত্রেতা যুগের অবতার। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র লইয়া যে যুগ, তাহা সৃষ্টি-গণনার যুগের সহিত সমতুল্য নহে। যুগ-গণনার নানা পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে পরিলক্ষিত হয়। আমরা সৌর ও চান্দ্রগণনা ছাড়িয়া সপ্তর্ষির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, শতাব্দীকে যদি যুগ আখ্যা দিই, তবে দেখা যায় যে, বৈবস্বত মনুর উনবিংশ শতাব্দীর ত্রেতা-যুগেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শতাব্দীকে সত্য-ত্রেতাদি চারি ভাগে বিভক্ত করিলে, উহা ৪০, ৩০, ২০ ও ১০ যথাক্রমে গণিত হয়। আমাদের এ যুগের ঋতু-গণনার ন্যায় প্রাচীনকালে যুগ-গণনার নীতি প্রচলিত ছিল। এ যুগে যেমন আমরা শীতের শেষে অথবা প্রাবৃটের প্রথম দিনে কোন ঘটনার সূচনা লিখি, সে যুগে কৃত যুগে, ত্রেতায় অথবা কলির শেষে এইরূপ বিবরণ দিয়া ঘটনারাজী লিখিত হইত। এই হিসাবে রামচন্দ্র বৈবস্বত মনুর গণনার অন্তর্বর্ত্তী কোন এক ত্রেতাযুগেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এই সকল ঐতিহাসিক কাল-নির্ণয় বর্ত্তমান প্রবন্ধে অবান্তর বলিয়া ইহার বিশদ আলোচনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। আমি অযোধ্যার ভূমি স্পর্শ করিয়া যে অনুভূতি পাইয়াছি, সেই কথাই বলিব। ভারতের ইক্ষ্বাকুবংশের সহিত আমার জন্মগত সম্পর্কের কথা আবাল্য শুনিয়া আসিয়াছি। নিজেকে ময়ানপুরের ছেত্রী, চৌহান ঠাকুর,
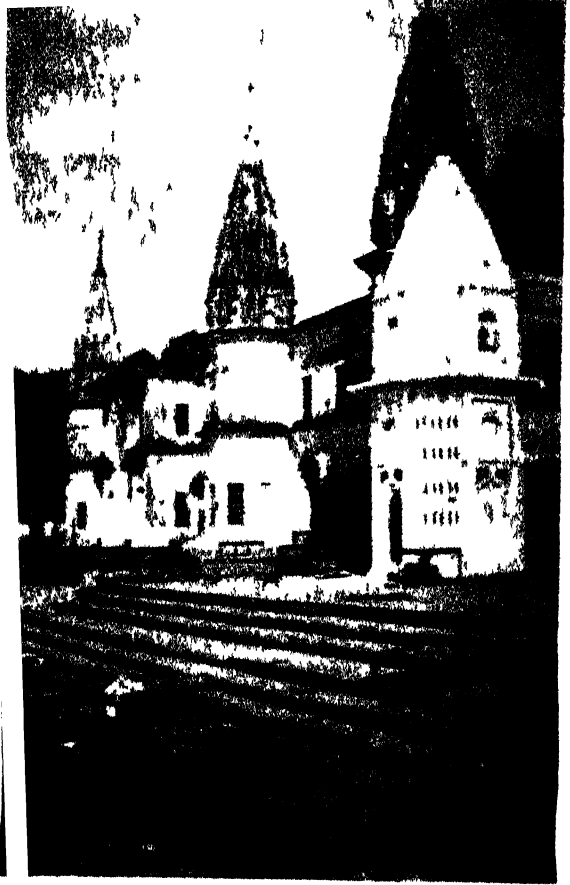
হনুমানগড

বীরাজা প্রভৃতি কুলজী উল্লেখ করিয়া সূর্য্যবংশধর বলিয়া ল্যকাল হইতে এক অভূতপূর্ব্ব গর্ব্ব অনুভব করিতাম। লের ধারে জোনপুর ষ্টেশন দেখিয়া, ময়ানপুর দেখার বড় আকুল করিত। মাটীর উপর এমনই একটা কর্ষণ সংস্কারগত হওয়ায়, আমার চিন্তাজগতে অতীত

কীর্ত্তিমান সূর্য্যবংশীয় রাজন্যবৃন্দের প্রতি হৃদয় অভাবনীয় শ্রদ্ধায় আজিও অভিষিক্ত হয়। আমি তাই সে বার অযোধ্যানগরার স্মৃতি পূজা দিতে তীর্থযাত্রা করিলাম।

মাঘের শেষে অপরাহ্ণের প্রথম ভাগে অযোধ্যা ষ্টেশনে রেলগাড়ী থামিতেই দেখা গেল—শ্রীরামচন্দ্রের কপিসৈন্যে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্ম ছাইয়া গিয়াছে। রেলযাত্রীদের কৌতুকের সীমা নাই। গাড়ীর জানালা দিয়া খাদ্যদ্রব্যাদি তাঁহারা নিক্ষেপ করিতেছেন। বানরদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইতেছে। কোন কোন সাহসী বানর গাড়ীর দরজা খোলা পাইলে, যাত্রীদের নিকট উপস্থিত হইয়া খাদ্যাদি প্রার্থনা করিতেছে। এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। গাড়ী

গুপ্তঘাট

রামঘাট

ছাড়িয়া দিল, অসংখ্য বানর প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম ছাড়িয়া নগরীর দিকে ছুটিয়া চলিল। রেলগাড়ীর সহিত এই সকল জীবের দৈনন্দিন সম্বন্ধটা বছরের পর বছর সে কতকাল কেহ নির্ণয় করিতে পারে না।

রাজপথে গিয়া দাঁড়াইলাম। বানরের মেলা বসিয়া গিয়াছে। নারীপুরুষের হাতে দীর্ঘ যষ্টিখণ্ড, তাহা না হইলে, পথ চলা নিরাপদ্ নহে। দোকানী পশারী সদাই সন্ত্রস্ত। একজন লাঠী ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে; আর একজন বেসাতি করে। একটু অন্যমনস্ক হইলে আর রক্ষা নাই, রাহাজানী না হইয়া আর যায় না।

এক্কা বিস্তীর্ণ রাজপথের উপর দিয়া যতই ছুটিয়া চলে। অযোধ্যা রাজনগরীর স্মৃতি ততই চক্ষে জড়াইয়া ধরে। এই সেই স্ফীত জনপদ, প্রভূত ধন ধান্যবান, সরযূতীরনিবিষ্ট মহাপুরী অযোধ্যানগরী স্বয়ং মানবেন্দ্র বিবস্বানের জন্মভূমি। দশ ও দ্বি-যোজন আয়ত, সুবিভক্ত, বিস্তীর্ণ-রাজমার্গশোভিত, পুষ্পাবকীর্ণ-জলসিক্ত, হর্ম্ম্যরাজী-পরিমণ্ডিত, ইন্দ্রালয়কে তুচ্ছ করিয়া শোভাশালিনী অযোধ্যা আমার মনসপটে স্বপ্নপুরী রচনা করিতেছিল। উচ্চ ধ্বজপতি অট্টালিকা, মহতী আম্রবন-শোভা, শাল-মেখলা, গভীরপরিখাবেষ্টিত দুরাসাদ্য দুর্গ, বাজি, বারণ, গাভী, উষ্ট্রশালা, সামন্তরাজনিবাসশ্রেণী, নানাদেশাগত বণিকের বিপণিমালা, বিকৃত পর্ব্বতসদৃশ সর্ব্বরত্ন-সমাকীর্ণ প্রাসাদ, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা, পণব-নাদিত রাজপুরী এই সেই অযোধ্যা মহাতেজা, পৌর জনপ্রিয়, ধর্ম্মব্রত, মহারাষ্ট্রপতি, দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি। কল্পনেত্রে অযোধ্যার অতীত গৌরব-চিত্র অবলোকন করিতে করিতে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বাসভবনের সম্মুখে গিয়া দ্বিচক্রযান থামিয়া পড়িল।

কাশীর প্রখ্যাত রাজা মতিচাঁদের প্রাসাদোপম ঠাকুর বাড়ীতে অযোধ্যাবাসের স্থান নিরূপিত হইয়াছিল। প্রশস্ত প্রাঙ্গণপার্শ্বে সমুচ্চ দেবমন্দির। সিংহাসনে ভ্রাতৃগণ সঙ্গে রামসীতাবিগ্রহ। আর তাহারই পার্শ্বে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি। বর্ত্তমান অযোধ্যানগরী এইরূপ সহস্র সহস্র দেবতার মন্দির লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। অপরাহ্ণের শেষে, প্রাণহীন বিগ্রহের দিকে চাহিয়া মনে হইল—এই

চতুর্ব্বাহু ঈশ্বর-বিগ্রহ মহাশক্তি সীতাসহ যেদিন অযোধ্যা-নগরীর কীর্ত্তি ও শ্রী ছিলেন, সে স্মৃতি তীর্থ-মহিমার জীবন্ত রূপে আমার নয়ন কি সার্থক করিবে না? সে নবদূর্ব্বাদল শ্যামঘন অপরূপ নর-তনুর পার্শ্বে সূর্য্যকরোজ্জ্বল দ্যুতিমতী সীতামূর্ত্তি দর্শন করিয়া জীবন কি ধন্য হইবে না?

দেবপ্রাসাদের চূড়ায় দাঁড়াইয়া অযোধ্যার শ্রী সন্দর্শন করিলাম। অদূরে বালুময় চরের কোলে বিস্তৃত রজত-মূর্ত্তি সরযূ প্রবাহ লক্ষ্যে পড়িল। সান্ধ্য উপাসনা সারিয়া, শুভ্র চন্দ্রালোকবিধৌত রাজপথ বাহিয়া সরযূ দর্শনে ছুটিলাম। উভয় তীরে বিস্তীর্ণ বালুচর বিদীর্ণ করিয়া, অতীতের স্মৃতিময়ী সরযূ কৌমুদী-কণা বক্ষে ধরিয়া টলমল করিতেছে। তাহার বুকে জগদ্দল পাথরের ন্যায় ভাসা পুল পড়িয়াছে, অযোধ্যা হইতে উত্তর বঙ্গের বেলগাড়ীর যাত্রী এই সেতুর উপর দিয়া গমনাগমন করে। এই সেতু-পথের উপর দিয়া সরযূর অপর প্রান্তে দাড়াইয়া, অযোধ্যানগরীর দিকে চাহিয়া প্রণতি জ্ঞাপন করিলাম। সে রাম নাই, সে অযোধ্যা নাই। এই স্মৃতিরক্ষাটুকুও যে ক্রমে মহার্ঘ্য হইয়া উঠে। প্রগতির স্রোতে বুঝি রামের সহিত অযোধ্যাও ভাসিয়া যায়। সে অযোধ্যা হারাইয়াছে, জাতির প্রাণশক্তি কিন্তু ইহার স্মৃতিরক্ষার জন্য অপূর্ব্ব মন্দির ও নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছে। সহস্র সহস্র হর্ম্ম্যপুরী নির্ম্মাণ করিয়া যে জয়কেতন সে উড়াইয়াছে, ইঁহা ভাসাইয়া দিতে দিতে অতীতের ন্যায় আজিকার প্রগতিও আয়ু: হারাইবে। সরযূর তীরে দাঁড়াইয়া এই ভরসার বাণী অন্তরে প্রতিধ্বনি তুলিল।

ভারতে যে সকল প্রবল রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, কোশল-রাজ্য তাহাদের অন্যতম। কোশলরাজ্যের রাজধানী এই অযোধ্যা। সূর্য্যবংশীয় নরপতিবৃন্দের গৌরব-গাথা এইখানের মৃত্তিকার সহিত সংজড়িত হইয়া আছে। সুমিত্র অযোধ্যার শেষ নরপতি। তাহার পর শ্রাবস্তীর নরপতিবৃন্দ কোশলরাজ্য শাসন করেন। তারপর বৌদ্ধ যুগ। হিন্দুর দুর্দ্দিন এইদিন হইতে আরম্ভ হয়। অযোধ্যার অসংখ্য কীর্ত্তিমন্দির বৌদ্ধগণের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। রামচন্দ্রের কীর্ত্তিস্তম্ভ বিদলিত করিয়া সম্রাট্ অশোক বৌদ্ধ-মহিমারক্ষায় যত্নবান হন, কিন্তু অজেয় হিন্দুবীর্য্য রাজা বিক্রমজিতের অভ্যুত্থানে বৌদ্ধ প্রভাব পরাভূত করিয়া অযোধ্যায় পুনঃ হিন্দুকীর্ত্তির জয়ধ্বজা উড়ায়। তারপর প্রায় ৬॥ শত বৎসর পালবংশীয় নৃপতিবৃন্দের অধীনে থাকার পর পুনরায় অযোধ্যা আশ্রয়হীন হইয়া বনভূমিতে পরিণত হয়। শতাধিক বৎসর বনাকীর্ণ অযোধ্যা অসভ্য থাড়ু জাতির বাসভূমি হইয়া থাকে। অতি সহজেই তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া, জৈনধর্ম্মী রাজন্যবৃন্দ অযোধ্যার উপর অধিকার বিস্তার করেন। প্রায় ১১ শত খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জাধিপতি চন্দ্রদেব অযোধ্যা অধিকার করেন। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী কান্যকুব্জ জয় করিয়া অযোধ্যা অধিকার করিয়া লন। অযোধ্যা আবার শ্রীহারা
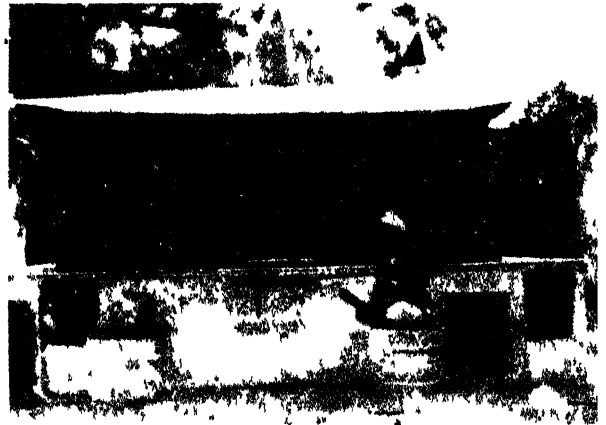
শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি

হইল। সে অযোধ্যা হয় তো ধরিত্রী গ্রাস করিয়াছেন! এই অযোধ্যা হয় তো সেই অযোধ্যার ছায়ামূর্ত্তি। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের অধিকৃত হইয়া হিন্দু জাতির পুণ্য-স্মৃতিতীর্থরূপে এই অযোধ্যা বিরাজ করিতেছে।

অযোধ্যার স্বপ্ন দেখিয়াই রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রাতে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান দেখিতে বাহির হইলাম। এক প্রকাণ্ড উচ্চ ভূমির উপর উঠিয়া সবিস্ময়ে দেখিলাম সমুচ্চ মস্‌জিদ—ইহারই প্রবেশদ্বারের পার্শ্বে ৫।৬ হাত দীর্ঘ প্রস্থ একটী ইষ্টক-বেদী শ্রীরামচন্দ্রের জন্মক্ষেত্রের স্মৃতি-রক্ষা করিতেছে। রামসীতার মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তীর্থ-বাসীরা কৃতার্থ হয়। আমি হতভম্ব হইয়া মস্‌জিদের দিকে

চাহিয়া রহিলাম। এক বৃদ্ধ বলিলেন, অযোধ্যার গৌরব এই রামচন্দ্র। তাঁর স্মৃতি মুছিয়া দিবার জন্যই মহম্মদ ঘোরীর পর এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমানের যে দাঙ্গা হয়, তাহাতে অযোধ্যার মহারাজা এক রাত্রে মস্‌জিদ ভূমিসাৎ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম-ক্ষেত্রটুকুর উপর এই ক্ষুদ্র বেদী রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজের বিচারে মুসলমান মস্‌জিদ ফিরিয়া পাইয়াছে। মস্‌জিদ-চত্বরে রামচন্দ্রের এই স্মৃতি-মন্দিরটীও হিন্দুর তীর্থক্ষেত্র বলিয়া মুসলমানেরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বলিলেন, সীতার রন্ধনশালাটীও এক সন্ন্যাসী উদ্ধার করিয়াছেন। আমি অতি বিমনা হইয়াই

সীতার রন্ধনশালা

তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মস্‌জিদের এক পার্শ্বে একটী পাতাল-গৃহে অবতরণ করিলাম। সেখানে রন্ধনের জন্য উনুন ও রুটী বেলার চাকী ও বেলুন পড়িয়া আছে। শ্রীরামচন্দ্রের সূতিকা-গৃহ এক অপ্রশস্ত ক্ষেত্রে পুষ্পমাল্যবিভূষিত হইয়া দৈন্য প্রকাশ করিতেছে। স্থানটী পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইবার পক্ষে অনুকূল হইয়াছে। ধর্ম্মবিরোধের নিষ্ঠুর চিহ্ন দৃষ্টি-কটু মনে হয়। ব্যথায় হৃদয় ভারী হইয়া উঠে। আমি শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে একটী মর্ম্মভেদী নিঃশ্বাস ফেলিয়া অতি দ্রুত স্থানত্যাগ করিলাম।

অযোধ্যার নাগেশ্বরনাথ মন্দির, মণিপর্ব্বত, কুবের পর্ব্বত, মানমন্দির, হনুমানগড় প্রভৃতি স্থান দর্শনীয়। বিশেষতঃ হনুমানগড় কপি-সৈন্যের দুর্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তীর্থযাত্রীদের ইহারা অতিষ্ঠ করিয়া তুলে। কিছু খাদ্যদ্রব্য না দিয়া এই তীর্থ হইতে বাহির হওয়া সম্ভব নহে। শুনিলাম, অযোধ্যার কনক-ভবন রাজা দশরথের কৃত ভিত্তির উপর নূতন মূর্ত্তি ধরিয়াছে। মহারাজা কুশ এই নষ্টকীর্ত্তি প্রথম উদ্ধার করেন। দ্বাপরে মহারাজা ঋষভ মন্দির পুনঃনির্ম্মাণ করেন। কলিযুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অযোধ্যাসন্দর্শনে আসিয়াছিলেন — সেই হইতে মন্দিরে মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি পূজা পাইতেছে। ২৪৩১ যুধিষ্ঠিরাব্দে মহারাজা বিক্রমাদিত্যও নাকি এই মন্দিরের পুনঃনির্ম্মাণে প্রচুর ধনব্যয় করেন। তারপর সমুদ্রগুপ্তের সময়ে মন্দিরটী ধ্বংসাবস্থা হইতে পুনঃ রক্ষিত হয়। এইরূপে যুগের পর যুগ ভারতের রাজন্যবৃন্দ কর্ত্তৃক কনক-ভবনের ধারাবাহিকতা রক্ষা পাইয়াছে। মহারাজা মহেন্দ্র, শ্রীপ্রতাপ সিংহ, উড়িষ্যা রাজ কর্ত্তৃক এই মন্দিরের পুনর্নির্ম্মাণ হয় এবং সর্ব্বশেষে মহারাণী গণেশ কানোয়ারী এই মন্দিরকে কনকভূষণে সজ্জিত করিয়া ইহাকে সুরক্ষিত করিয়াছেন।

মৃতদেহ বিচিত্র বসনভূষণে শোভিত হইয়া বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে, কিন্তু তাহাতে দর্শন-সুখ জন্মায় না। অযোধ্যার মন্দিরে মন্দিরে হিন্দু ভারতের হাহাকার-ধ্বনি প্রাণে বিষাদ সৃষ্টি করে। অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম। স্মৃতি কাঁদিয়া উঠিল রামরাজ্যের পরিণাম দেখিয়া। ইহাই কালের বিচিত্র গতি। পৃথিবীতে স্থায়ী কিছু নহে। জীবনের খ্যাতি ও সৌরভ থাকিয়া যায়; তাহার ধারাবাহিকতা রক্ষার জিদ ও আকৃতি সঙ্কীর্ণ অহমিকার স্বভাব। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কালস্রোতে ভাসিয়া আসে, কালস্রোতেই অন্তর্হিত হয়।

সেদিন রাত্রে অযোধ্যা ত্যাগ করি। মধ্যাহ্নভোজনের সময়ে একটী বানর আমার গৃহের পশ্চাদ্ভাগের গবাক্ষ-দ্বারে উঁকি মারিতেছিল; সে সঙ্গীশূন্য, একা। অতিথিকে সাদর অভ্যর্থনা করিলাম। সে গবাক্ষপথে স্থির হইয়া বসিল। অন্নথালী তাহার সম্মুখে ধরিলাম। এত আদর সে অতি বিস্ময়ের সহিত অনুভব করিল। একবার আমার মুখের দিকে চাহে, আর সতৃষ্ণ নয়নে অন্নথালীর দিকে

াত করে। আমি তাহাকে অনুনয় করিয়াই বলিলাম "খাও, ভয় নাই, অতীতের পূজারী আমি, তোমার সেবায় সেই প্রাচীন স্মৃতি ফিরিয়া পাই, খাও।" বানরের অন্ন-সেবা দেখিয়া চরিতার্থ হইলাম। সে মানুষের মতই অন্ন-পাত্র হইতে যাথারীতি খাদ্য গ্রহণ করিয়া, আমার সেবাবৃত্তি চরিতার্থ করিল।

শ্রীরামচন্দ্র লোকপ্রিয় হওয়ার খ্যাতি বড় করিয়াছিলেন। রামরাজ্য বলিয়া তদানীন্তন প্রজারাই তাহার মহিমা-কীর্ত্তন করিত না, আজিও প্রজাবাৎসল্য কোথাও লক্ষিত হইলে, রামরাজ্যের সহিত তাহার তুলনা করিয়া থাকে। জনমত পোষণ করিতে গিয়া তিনি সাধ্বী পত্নীর দারুণ দুর্দ্দশা করিয়াছিলেন। স্বয়ং সতীহারা শিব সাজিয়াছিলেন। লোকমতের মর্য্যাদা দিতেই তিনি অনুজ লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রিয়জনবিরহ সহিতে না পারিয়া রাজ্যেশ্বর আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন সরযূবক্ষে। স্বর্গদ্বার বা রামঘাট বলিয়া সেই তীর্থ আজিও পরিচিত। কেহ কেহ ইহাকে গুপ্তঘাট বলিয়াও আখ্যা দেয়। অযোধ্যায় আসিয়া এই শ্মশান ক্ষেত্র না দেখিয়া অযোধ্যাত্যাগ সম্ভব নহে। সেই প্রখর মধ্যাহ্নে গুপ্তঘাটের দিকে যাত্রা করিলাম। অশ্বপুঙ্গব উদ্ধশ্বাসে ছুটিল। প্রশস্ত রাজপথ ফয়জাবাদের দিকে চলিয়াছে। ফয়জাবাদের সৈন্য ছাউনী অতিক্রম করিয়া দ্বিচক্র রথ গুপ্তঘাটে গিয়া থামিল। বিস্তীর্ণবক্ষ সরযূ সূর্য্য-কিরণে ঝলসিয়া উঠিয়াছে। তীরে উন্নতশীর্ষ রাজপ্রাসাদ নিস্তব্ধ জনহীন। গুপ্তঘাটের সন্ধান করিয়া শুনিলাম —সরযূতীরে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরগর্ভে শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাপূজা হয়। সবই দেখিয়াছি। অযোধ্যার রাজপথ, দশরথের স্ফটিকপ্রাসাদ, রামচন্দ্রের জন্মস্থান, কিন্তু কিছুতেই স্মৃতির তৃপ্তি মিলে নাই। তৃপ্তি পাইলাম স্বর্গদ্বারে দাঁড়াইয়া। অপরাহ্নশেষে অস্তাচলাবলম্বী সূর্য্য-কিরণের রক্তবর্ণ আভায় সরযূ যেন শোকার্ত্তা হইয়া মূক-বধিরের ন্যায় নীরব ভাষায় বলিতেছে—এইখানে, এইখানে, এই কালপ্রবাহের বুকে তোমার রামের সঙ্গে সঙ্গ অযোধ্যা গিয়াছে, আমি তার একমাত্র সাক্ষী আছি।

সত্যই কঙ্খলের দক্ষপুরী নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, নীল সরস্বতীর বুকে সতীর স্মৃতিচিহ্ন আঁকা আছে। বৃন্দাবন ধরাগর্ভে লয় পাইয়াছে, যমুনায় কৃষ্ণকান্তির ছায়া আজিও অবধৃত আছে। ভারতের গিরি-নদী অতীতের স্মৃতি ধারণ করিয়া বর্ত্তমানকে সচেতন করে। ভবিষ্যৎকেও তাহা উদ্বুদ্ধ করে। তাই হিমগিরি, বিন্ধ্যাচল, ভারত-কীর্ত্তির স্মৃতিস্তম্ভ, তোমাদের নমস্কার করিয়া আসিয়াছি। ভাগীরথি, গোদাবরি, নর্ম্মদে। তোমাদের পুণ্যবারি স্পর্শ করিয়া অতীতের স্পর্শ পাইয়াছি। পূতবারি সরযূ, তাই তোমার সলিলে অবগাহিত হইয়া আমার এত তৃপ্তি। আমি

সরযূবক্ষে সূর্য্যাস্ত

আসিয়াছি অযোধ্যার তটাধ্যুষিতা তোমারই মনোমোহিনী পবিত্র সৌন্দর্য্যসুষমা সন্দর্শন করিতে।

স্বর্গঘাটে দাঁড়াইয়া সান্ধ্য-সমীর-সঞ্চালিত আধ-আলো আধ ছায়ায় নৃত্যশীলা সরযূকে করজোড়ে প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে বাসায় ফিরিলাম। তারপর নিঃশব্দেই অযোধ্যা ছাড়িয়া ফয়জাবাদে গাড়ী ধরিলাম। অযোধ্যা সূর্য্য-বংশের কীর্ত্তিস্মৃতিময় নহে; প্রবাহিনী সরযূ অতীতের মহিমা বরণ করিয়া আজিও প্রবাহিতা। ঘাট, পথ অট্টালিকা, দেব-মন্দির অল্পায়ুঃ—ভারতের পুণ্যতোয়া প্রবাহিণি, চিরায়ুঃ হও। তটিনীর তীরে তীরে সুপ্রাচীন মহিমস্মৃতির প্রতিধ্বনি কলনাদিনীর কণ্ঠধ্বনির ন্যায় আমার কাছে বড় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। সরযূর স্মৃতি আজিও ভুলিতে পারি নাই।

# "প্রবর্ত্তক" রজত জয়ন্তী

## উদ্বোধনোৎসব

[ আশ্রমী ]

১লা বৈশাখ—নব বর্ষের নূতন প্রভাত। ভোরের পাখী বুক চিরিয়া সুরু করিল আলোর কীর্ত্তন। সঙ্ঘের মাতৃক্ষেত্র—আশ্রমতীর্থ মুখরিত হইয়া উঠিল উৎসব-দেবতার আরাধনাসঙ্গীতে। নারীকণ্ঠে বর্ষমঙ্গল—তার পর সঙ্ঘগুরুর মর্ম্মস্পর্শী যুগবাণী। প্রাক্-দর্শনে যতখানি দেখা যায়, কালের দৃশ্যপট রেখা-চিত্রে আঁকিয়া উঠিল—সঙ্ঘের ও নব জাতির। জাতির নববর্ষোৎসবের সঙ্গে সঙ্ঘেরও আজ উৎসব-কলরোল। এ যে সমষ্টি-প্রাণের জয়-যাত্রা। আজ আবার সঙ্ঘ-পত্র "প্রবর্ত্তকের"ও "রজত-জয়ন্তী"।

"প্রবর্ত্তক" সঙ্ঘের বিজয় বৈজয়ন্তী। শুধু তাই নয়, আমরা বলিব, ইহা নবজাতিরই যুগ প্রতীক। রাম না হইতেই যেমন রামায়ণ, "প্রবর্ত্তক" তেমনি যখন ফুটিয়া উঠিয়াছিল সঙ্ঘ-স্রষ্টারই সৃষ্টি-কল্পে, সঙ্ঘ তখনও অজ্ঞাত ভ্রূণ-মূর্ত্তি। সেই যেদিন জাতির জীবন-সঙ্গীত কণ্ঠে লইয়া "প্রবর্ত্তক" বাহির হইয়াছিল, আজ ২৫ বৎসর ধরিয়া তার সে অনন্ত সুর ফুরায় নাই। সত্যই "প্রবর্ত্তকের" ভাবধারা ভারতের সনাতন সত্যের নির্ঝর। "প্রবর্ত্তক" বহিয়া চলিয়াছে অনর্গল অবারিত প্রবাহে—বাধা আসিয়াছে প্রচুর, অসংখ্য, কিন্তু "প্রবর্ত্তক" কোন বাধাই মানে নাই। পূত ভাগীরথী-ধারার ন্যায় "প্রবর্ত্তক" চলিয়াছে তার লক্ষ্যতীর্থ সাগর-সঙ্গমে—সে লক্ষ্য জাতির অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্—মুক্তি ও কল্যাণ। "প্রবর্ত্তক" যে নব মন্ত্রের উপাসক, তাহা সৃজনেরই মহাবীর্য্য। নবজাতিগঠনের ইহা অমৃত রসায়ন। "প্রবর্ত্তকের" রজতজয়ন্তী—এই মন্ত্রবীর্য্যেরই জয়োৎসব। এ ভাষা মানুষের ভাষা বটে, কিন্তু ইহার পিছনে আছে যে মহাশক্তির গতিবেগ, যে দিব্য-প্রেরণার স্তুতিছন্দঃ, তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম না করিলে এ উৎসবেরও মর্ম্ম আমরা ঠিক বুঝিব না। "প্রবর্ত্তকের" বাণী—বাঙালীরই জীবনবাণী। এ বাণী জীবনে মরণে সাধিবার, যে নাম মরমে গাঁথা, তাহা বিপদের নিষ্পেষণেও যেমন সাধক ভুলে না, তেমনি সম্পদের প্রলোভনেও নয়। অবস্থার দায়ে "প্রবর্ত্তক" তাই কোনদিন বিকৃত সুর তুলে নাই। "প্রহার কর, কণ্ঠ চাপিয়া ধর, নাম ভুলিব না—এই সুরেই যে জীবন ভরিয়া আছে"—এ সঙ্কল্প ছিল "প্রবর্ত্তকের" মূলে, তাই বিদেশরাজের দণ্ড সহিয়াও "প্রবর্ত্তক" বীর দর্পে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল—"রসনা উপাড়িয়া দাও, শ্বাসে প্রশ্বাসে সে বাণীই ঘোষণা করিবে—মরণের যন্ত্রে জীবন চূর্ণ কর, জীবনের দায় ঘুচিয়া যাইবে, বিশ্বাত্মার দরবারে এ করুণ কান্না বড় মর্ম্মান্তিক সুরে ঝঙ্কার দিবে—এ গান বন্ধ হইবার নয়।"

"রজত জয়ন্তী উৎসবে" এই সকল কথাই মনে পড়িতেছিল।

বৈশাখী মধ্যাহ্নের খর-করজ্বালা একটু প্রশমিত হইয়া আসিলে, অপরাহ্নের স্নেহচ্ছায়ায় নারীবিদ্যাভবনে জয়ন্তী-উদ্বোধন-সভার অনুষ্ঠান হয়। চন্দননগরেই এই উদ্বোধন-সভা—কেননা, চন্দননগরই "প্রবর্ত্তকে"র জন্মতীর্থ। সভার পৌরোহিত্য-ভার ছিল—চন্দননগরের গৌরব-মণি, দরদী সঙ্ঘবন্ধু শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয়ের উপর। এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন—চন্দননগরের প্রাণস্বরূপ প্রায় অর্দ্ধশত বিশিষ্ট সুধীমণ্ডলী। তাঁহাদের কয়েক জনের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল—চন্দননগরের মেয়র শ্রীতুলসীচরণ রক্ষিত, ফরাসী চন্দননগরের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে, হিতবাদীর ভূতপূর্ব্ব সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন ভড়, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস, ডাঃ জ্যোতিঃপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র আঢ্য।

সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী অমৃতানন্দজী কর্ত্তৃক একটী প্রশস্তি-মন্ত্র উদ্গীত হইবার পর, সঙ্ঘ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত সভাপতি বরণ করেন। অতঃপর "প্রবর্ত্তক নারী-মন্দির" কর্ত্তৃক উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হইলে, সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতির নির্দ্দেশক্রমে "প্রবর্ত্তকে"র জন্মদাতা ও সম্পাদক শ্রীমতিলাল রায় মহাশয় প্রাণস্পর্শী

ভাষায় "প্রবর্ত্তকে"র অপূর্ব্ব ঘটনাবহুল ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—"প্রবর্ত্তক" এই নামটী আমার কাছে নবজাতিগঠনের মন্ত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। এই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক, বহুপ্রকার নিষ্পেষণের মধ্য দিয়া ইহাকে চলিতে হইয়াছে। এমন কি, এক সময়ে ইংরাজ ও ফরাসী উভয় গভর্ণমেণ্টের দমন-যন্ত্র হইতে আত্মরক্ষার জন্য "প্রবর্ত্তক" নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "নির্ম্মাণ" নাম দিবার চেষ্টা হইয়াছিল—কিন্তু বিধাতার নিগূঢ় ইচ্ছায়, সে চেষ্টা ব্যর্থই হইয়াছিল। "প্রবর্ত্তক"কে হত্যা করার ভিতর ও বাহির হইতে সকল আয়োজনই এইরূপে নিষ্ফল হইয়াছে। "প্রবর্ত্তক" নিজ মহিমা অক্ষুন্ন রাখিয়াই সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জাতি-গঠনের অমোঘ মন্ত্র প্রচার করিয়াছে—এখন পর্য্যন্ত অক্লান্ত উদ্যমে সেই অমৃত-তত্ত্বই পরিবেশন করিতেছে।"

প্রসঙ্গক্রমে, "প্রবর্ত্তকে"র জাগ্রত কীর্ত্তি-স্বরূপ প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের বহুমুখী প্রকাশকে লক্ষ্য করিয়া তিনি আরও বলেন—"'প্রবর্ত্তক' চাহিয়াছে ধর্ম্মের উপর জীবনকে প্রতিষ্ঠা করিতে। খণ্ড, সাময়িক অবস্থাধীন জীবন নহে, চতুঃশক্তিসমন্বিত একটী পরিপূর্ণ জীবনের প্রেরণাই "প্রবর্ত্তক" বাঙালীকে দিয়া আসিতেছে। "প্রবর্ত্তকে"র রজত জয়ন্তী বর্ষের যে নূতন প্রচ্ছদ-পট, তাহা জাতির এই সর্ব্বাঙ্গ জাতীয়তারই প্রতীক্-স্বরূপ। "প্রবর্ত্তকে"র কল্প-স্বপ্ন ভবিষ্যজ্জাতিই সিদ্ধ করিবে।" শ্রীযুক্ত মতিবাবু তাঁহার এই ইচ্ছাও ব্যক্ত করেন যে, "প্রবর্ত্তকে"র এই জয়ন্তী উৎসব শুধু চন্দননগরেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, এই বর্ষের প্রতি মাসের প্রথমেই বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রে জয়ন্তী সভা আহ্বান করা হইবে এবং এইরূপে জাতি-সাধনার বাণীমন্ত্র "প্রবর্ত্তক" বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিবে।

শ্রীযুক্ত মতিবাবুর পর ধুরন্ধর সাহিত্যসেবক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন—

"আপনারা আমাকে এই শুভ জয়ন্তী উপলক্ষে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া সংবাদপত্রের সহিত সংযুক্ত ছিলাম, সেই জন্য সংবাদপত্রের সেবক হিসাবে দুই চারিটি কথা বলিব। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের পরিচালনা যে কত কঠিন, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি। বর্ত্তমান শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে কত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র জলবুদ্বুদের ন্যায় আবির্ভূত হইয়া কিছুদিন পরেই কালসাগরে বিলীন হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই অকাল মৃত্যুর দেশে "প্রবর্ত্তক" যে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল জীবিত আছে—কেবল জীবিত থাকিয়া নহে, উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া ইদানীং বঙ্গদেশে প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, ইহা "প্রবর্ত্তকের" পক্ষে সামান্য শ্লাঘা ও প্রশংসার কথা নহে। বাঙ্গালীর ব্যবসায় যে কারণে দীর্ঘজীবী হয় না, আমার মনে হয়, ঠিক সেই কারণেই বাঙ্গালা সংবাদপত্র দীর্ঘজীবী হয় না। আমার মতে, যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা পরিচালনার অভাবই ইহার একমাত্র কারণ না হইলেও, প্রধান কারণ। বাঙ্গালী ব্যবসায়ী হয়ত নিজের পরিশ্রম, প্রতিভা ও একাগ্রতার বলে একটা ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন এবং যতদিন সম্ভব সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করিলেন; কিন্তু তাঁহার অবর্ত্তমানে সেই প্রতিষ্ঠানকে সুপরিচালিত করিবার ভার যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে না দিয়া স্বীয় পুত্র-পৌত্রাদির উপর ন্যস্ত করেন। সেই পুত্র বা পৌত্রের ব্যবসায়পরিচালনার যোগ্যতা নাও থাকিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সেই ব্যবসায়ের ধ্বংস অনিবার্য্য। সংবাদপত্র হিসাবেও ঠিক এই কথা বলা যাইতে পারে। ইউরোপীয়দিগের এক একটা ব্যবসায় একশত, দেড়শত বৎসর স্থায়ী হইয়া আছে, তাহার কারণ, যিনি সেই ব্যবসায়ের সূত্রপাত করেন, তিনি বাহিরের যে সকল লোককে সহকারী কর্ম্মচারিরূপে গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তিকে সেই ব্যবসায়ের অংশী করিয়া লয়েন। এইরূপ ব্যবস্থা থাকায়, সকল কর্ম্মচারীই মনে করেন যে, কার্য্যে দক্ষতা দেখাইতে পারিলে তিনি ভবিষ্যতে সেই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হইয়া প্রতিষ্ঠানে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবেন। ইউরোপীয়দিগের এরূপ বহু প্রতিষ্ঠান আছে, যে প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার প্রতিষ্ঠাতার বংশাবলীর কোনই সম্বন্ধ নাই। এইরূপ বাহিরের লোককে আপনার করিয়া লইবার, তাহাকে কার্য্যক্ষম করিয়া লইবার মত উদারতা বাঙ্গালীর নাই। যাহা হউক, মতিবাবু তাঁহার বহু শাখায় প্রশাখায় বিভক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক বিভাগের ভার যোগ্য ব্যক্তির উপর অর্পণ করিয়াছেন বলিয়াই "প্রবর্ত্তকের" রজত জয়ন্তী সম্ভবপর হইয়াছে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি মতিবাবুকে দীর্ঘজীবী করিয়া "প্রবর্ত্তকের" সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের সুযোগ প্রদান করুন। সে উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আমরা না থাকিলেও, আমাদের পরবর্ত্তীগণ যেন "প্রবর্ত্তকের" সুবর্ণ-জয়ন্তীতে যোগদান করিবার সুযোগ লাভ করেন।"

সঙ্ঘের অকৃত্রিম সুহৃদ্, চন্দননগরের শিক্ষা-বিভাগের পরিচালক ও স্থানীয় রাষ্ট্রনেতা শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে বলেন—

"আজকের উৎসব-সভা বক্তৃতার স্থান নয়, আমিও বক্তা নই। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মুখপত্র আজ পঁচিশ বৎসর পূর্ণ করেছে। এই পঁচিশ

বৎসর সঙ্ঘের মুখপত্র সঙ্ঘের কার্য্যে কত যে সহায়ক হয়েছে, তা প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় মতিবাবুর মুখে শুনলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবর্ত্তক যে কার্য্য করেছে, তাহাও যথেষ্ট গর্ব্বের কথা। প্রবর্ত্তক যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছে, প্রবর্ত্তককে কেন্দ্র করে' যে সাহিত্যিক সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে—তাঁদের দান সাহিত্যকে শুধু সমৃদ্ধ করে নাই, নূতন আলোকের ইঙ্গিত দিয়েছে। চন্দননগরে এবার সাহিত্যসম্মিলনের আয়োজন করবার সময়ে সেই সাহিত্যিকসঙ্ঘের সহিত আমাদের পরিচয়ের সুযোগ হয়—তাঁদের সহযোগিতা সম্মিলনের সার্থকতার দিকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। প্রবর্ত্তকের দীর্ঘজীবনের কারণ মতিবাবু সকল কার্য্যের ভার স্বহস্তে না রেখে যোগ্য হস্তে দিয়েছেন বলে' যোগেন্দ্রবাবু উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আরও একটি কথা আছে। মাসিক পত্রের উদ্দেশ্য নিছক সাহিত্য সেবা নহে জাতি-জীবন গঠনের সত্য সাধনা যার পশ্চাতে আছে, তার মৃত্যু নাই। যে জয়-পতাকা নিয়ে প্রবর্ত্তক কার্য্যে অগ্রসর হয়েছে, তা' অমর। রজত জয়ন্তীর পর সুবর্ণ জয়ন্তী তার আসবেই আসবে। সে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের আনন্দভোগ আজকের আমাদের না ঘটতে পারে কিন্তু যে পরিকল্পনা মতিবাবু দিলেন, তাতে প্রতি মাসে বাংলার বিভিন্ন জেলায় অধিবেশন হয়ে বৎসরের শেষে এই ভাবের উৎসব আমরা প্রতি বৎসর আশা করিতে পারি।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ চন্দননগরে, প্রবর্ত্তক পত্রের জন্মস্থানও চন্দননগরে। বর্ত্তমান চন্দননগরের গৌরব করবার যাহা কিছু, তাহা চন্দননগরের দু'জন মনীষীকে উপলক্ষ্য করে'। একজন আমাদের আজকের সভার সভাপতি ও অন্যজন শ্রদ্ধেয় মতিবাবু। বাংলার বাইরে গিয়ে দেখেছি—চন্দননগরের কথা উঠ্‌লে, তাঁরা হরিহরবাবু ও মতিবাবু ও তাঁর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কথা জান্‌তে চান। চন্দননগরের গৌরব বৃদ্ধি করে মতিবাবু চন্দননগরবাসী মাত্রেরই বরেণ্য। আজকের এই শুভদিনে আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—মতিবাবু দীর্ঘজীবন লাভ করে' তাঁর সাধনা জয়যুক্ত করুন। ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।"

অনন্তর তেলিনীপাড়ার তরুণ ভূম্যধিকারী শ্রীসত্য-বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

"আমার মত সামান্য লোক তো তুচ্ছ, এমন কি রাজার ঐশ্বর্য্য, যোদ্ধৃর শৌর্য্য, আত্মম্ভরীর আত্মগরিমা সমস্তই আশ্রম সীমা-রেখায় এসে মৌন হ'য়ে যায়, হ'য়ে রয় নিষ্ক্রিয়, স্তব্ধ। পরহিতব্রতী, লোক-কল্যাণ কামী, ব্রহ্মবিদ্যাপ্রার্থী মুনিপুত্রদের দেবার বা শেখাবার ক্ষমতা সাধারণের থাকে না, আশ্রম-আচার্য্য সমক্ষে সে স্পর্দ্ধা নি'য়ে এখানে প্রবেশ অধিকারও কাহারও নাই। সঙ্ঘে উপদেশ, আশীর্ব্বাদ, শান্তি ও সান্ত্বনার বাণীগ্রহণের সৌভাগ্যলাভের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়েই গৃহাশ্রমীরা সমবেত হন।

দেবার ক্ষমতা আমার অণুমাত্র নাই, কিন্তু সর্ব্ববাঞ্ছাপূর্ণকারী, সর্ব্বমঙ্গলময়ের কাছে প্রার্থনা করবার অধিকার আমার আছে ও তাহারই বলে এই পূত যজ্ঞস্থলে নতজানু হ'য়ে তাঁহারই কাছে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি, যেন বারে, বারে, বহুবার, বহুদিন, বহু বর্ষ, বহু যুগ ধরে' আজকের এই শুভদিনের ন্যায়, সুধীজনমণ্ডলী, আশ্রম তাপসবৃন্দ ও তাপসগুরুসমক্ষে বহু শুভ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়।

অধ্যাপক প্রমোদরঞ্জন ভড় বলেন :—

"প্রবর্ত্তকের" রজত জয়ন্তী উৎসবসভায় বেশী কিছু বলা আমার দিক্ থেকে হয় ত বেশ শোভন হবে না, যেহেতু মোটামুটি হিসাবে আমি 'প্রবর্ত্তকেরই" সমবয়সী। ভয় হয়, নানা কথার অবতারণা বুঝি বা শেষ পর্য্যন্ত বাচালতায় পর্য্যবসিত হবে।

দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের স্রোতঃ বেয়ে 'প্রবর্ত্তক" আজ জয়ন্তী উৎসব প্রাঙ্গণে উপনীত। যে দেশে পত্রিকার পর পত্রিকা জলবুদ্বুদের মত উঠছে আর নাম্‌ছে, সেই অভাগা দেশে যে কোন পত্রিকার পক্ষে এ এক অভাবনীয় কীর্ত্তি। 'প্রবর্ত্তকের" অতি উজ্জ্বল বর্ত্তমানের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতিচ্ছবি আজকের এই চিত্তহারী সভাস্থল,—বর্ত্তমানের স্বতন্ত্র পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচীন বক্তাগণের কণ্ঠনিঃসৃত বাণীর মধ্যে স্পষ্টাকারে ফুটে উঠেছে প্রবর্ত্তকের অতীত পঁচিশ বৎসরের কাহিনী, নূতন করে অতীতের কথা বলতে যাওয়ায় শুধু পুনরাবৃত্তিই হয়। অতএব বর্ত্তমান বা অতীতের উল্লেখ না করে' আমি আজ কিছু বলতে চাই অনাগত পঁচিশ বৎসরের ওপার থেকে। আমি দেখেছি, পঁচিশ বৎসরের পরপারে দাঁড়িয়ে দেখছি, অবিচলিত পদক্ষেপে 'প্রবর্ত্তক এগিয়ে চলেছে তার লক্ষ্যপথে, বক্ষে তার অমিত তেজঃ, নয়নে অনির্ব্বাণ দীপ্তি। বিগত পঁচিশ বৎসর ধরে বারে বারে মৃত্যুকে পরাজিত করে' তার হিম শীতল স্পর্শ হতে সতত সে আপনাকে মুক্ত রাখতে সমর্থ হয়েছে, অনাগত পঁচিশ বৎসরের প্রান্তেও অভ্রান্তভাবে তাকে দেখছি মৃত্যুঞ্জয় বেশে। 'প্রবর্ত্তক' যদি পত্রিকা মাত্র হত, যে কোনও সময়ে তার আকস্মিক অন্তর্দ্ধান হয় ত অস্বাভাবিক হত না। কিন্তু এই পত্রিকা শুধু পত্রিকা নয়, এর পিছনে রয়েছে অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ, সঙ্ঘের পিছনে সদা জাগ্রত রয়েছেন অপূর্ব্ব এক-পুরুষ, আর সেই পুরুষের অন্তর্লোক নিত্য প্রবাহিত হয়ে চলেছে যে অসামান্য শক্তিস্রোত", তার গোপন উৎসের সন্ধান মেলে রহস্যের অবগুণ্ঠনে আবৃত নিখিল বিশ্বের গভীরতম অন্তর্দ্দেশে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ যদি গঠিত হ'ত তুচ্ছ কর্ম্মের প্রয়োজনে, নিঃসন্দিগ্ধভাবে তাকে বিলুপ্ত হ'তে হ'ত ক্ষণিক জীবনের অবসানে। যেহেতু সঙ্ঘের স্রষ্টা বিশ্বের মূলীভূত শক্তির রুদ্ধ স্রোতঃ প্রবাহিত করেছেন তাঁর সৃষ্টির অনালোকিত অন্তরে পঁচিশ বৎসরের ওপার থেকে আমি দেখছি, সঙ্ঘের মুখপত্র "প্রবর্ত্তক' অমরত্বের দিব্য স্পর্শ লাভ করে' চির জ্যোতির্ম্ময়রূপে প্রতিষ্ঠিত দেখছি আমার অনাগত কালের সত্তা অনাগত কালের প্রবর্ত্তক হ'তে বিচ্ছুরিত শক্তির আস্বাদনে পুলক-চঞ্চল।"

অনন্তর চুঁচুঁড়াবাসীর পক্ষ হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র আঢ্য "প্রবর্ত্তকে"র মঙ্গল-কামনা করিয়া সংক্ষেপে বলেন—

"প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের একটি বৈশিষ্ট্য—ধর্ম্মের উপর জাতীয় জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এই লক্ষ্য ও আদর্শই ভারতের চিরন্তন লক্ষ্য ও আদর্শ। "প্রবর্ত্তক" এই বাণী প্রচার করিবার ভার লইয়াছে আর এই পঁচিশ বৎসর ধরিয়া সেই ব্রত একনিষ্ঠভাবে পালন করিতেছে। ইহা বড় কম গৌরবের কথা নয়। আমি এই প্রতিষ্ঠানের তথা "প্রবর্ত্তক" পত্রিকার সর্ব্বান্তঃকরণে শুভ কামনা করিতেছি।"

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করেন।

## সভাপতির অভিভাষণ

"আজ নববর্ষের সুপ্রভাতের সহিত "প্রবর্ত্তকে"র রজত-জয়ন্তী বর্ষের উদ্বোধন। চন্দননগরের "প্রবর্ত্তক"—তার জীবনের এই বিশেষ দিনে রজত জয়ন্তী বর্ষোৎসব উদ্বোধন অনুষ্ঠানপরিচালনায় একজন চন্দননগরবাসীকে খুঁজিতে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, ইহা যে আমার পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ ও শ্লাঘার কথা, ইহা বোধ হয় বলাই বাহুল্য। দেশ-কালের দিকে চাহিয়া এই সভা কথঞ্চিৎ অনাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইলেও, ইহা প্রবর্ত্তকের একটা ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান নহে। আজ সত্যই একটা উৎসবের দিন, প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন।

যখন আমরা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের জয়ন্তী উৎসব করিয়া থাকি, তখন ইহা কতকটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাহার বিগত জীবনে নিশ্চয়ই দেশ, জাতি বা জনসাধারণের কিছু বিশেষ রকম সেবায় লাগিয়াছে। পঁচিশ বৎসর একখানি সাময়িক পত্রিকার জীবনে খুব বেশী সময় না হইলেও, আমাদের দেশে খুব কমও নহে। এই সময়ের মধ্যে "প্রবর্ত্তক" কি করিয়াছে, নবযুগের বার্ত্তা জাতির কাছে কি ভাবে কতটা বহিয়া আনিয়া দিতে পারিয়াছে; জাতি-গঠন ও যুগপ্রতিষ্ঠা কার্য্যে কিরূপ আত্মনিয়োগে সমর্থ হইয়াছে; সে সকল বিষয়ের বিশেষ পরিচয় দিতে পারি, আমার সে ক্ষমতা নাই। সে বিচারের ভার দেশের মনীষিবৃন্দের, তাঁহারাই তাহার হিসাবনিকাশ করিবেন। আমি শুধু এই বলিতে পারি, "প্রবর্ত্তক" তাহার যাত্রার
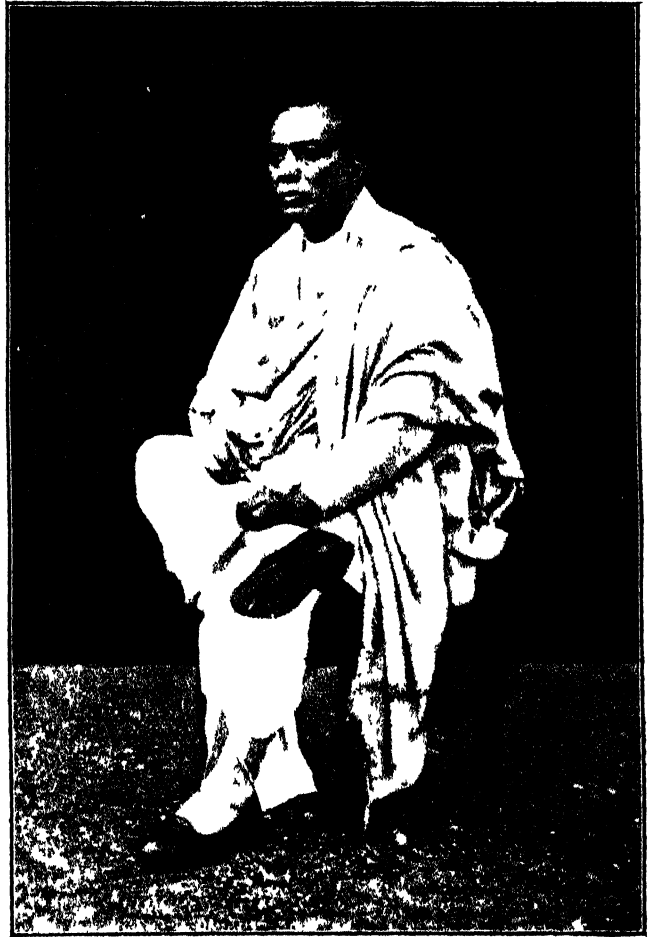
শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ

প্রথম দিন হইতে যে গন্তব্য পথ ধরিয়াছে, আজিও সেই পথেই চলিয়াছে। সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই "প্রবর্ত্তক" তার যে মর্ম্মবাণী উচ্চারণ করিয়াছে, সঙ্ঘের কার্য্যের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টায় কোনদিনই উদাসীন থাকে নাই। এক কথায় ইহা নিঃসংশয় চিত্তেই বলা যায়, "প্রবর্ত্তকে"র এই নাম গ্রহণ করা ব্যর্থ হয় নাই।

সেই পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এখন পাক্ষিক আকারে মাত্র ষোলখানি পৃষ্ঠায় "প্রবর্ত্তক' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, সেই-দিন হইতে আজি পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ইহার জীবনের উপর দিয়া কত ঝঞ্ঝা, কত ঘাত-প্রতিঘাত গিয়াছে, কত অপ্রত্যাশিত বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহা আজ মনে পড়িতেছে। "প্রবর্ত্তক" সে সব ভ্রূক্ষেপ করে নাই, সে তাহার কর্ত্তব্যপথ বলিয়া যাহা গ্রহণ করিয়াছে, যাহাকে তাহার জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছে, শত বাধাতেও তাহা হইতে তাহাকে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। তাহার সেই বৈভবহীন দৈন্যের দিনে জাতিগঠনের যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা লইয়া জাতির হৃদয়ে সে প্রেরণা আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এখন সম্পদের দিনে নানা আভরণে ভূষিত হইয়াও ফলাফলের দিকে না চাহিয়া সেই লক্ষ্য ধরিয়াই চলিয়াছে। এতটা আত্মবিশ্বাস, এতটা ধৈর্য্য অন্যত্র খুব কমই দেখা যায়। নিদ্দিষ্ট অতি সামান্য অবস্থা হইতে "প্রবর্ত্তক" আজ উৎকর্ষের যে সীমায় আসিয়াছে, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মুখপত্ররূপে যে গুরু দায়িত্বভার বহন করিতে হইতেছে, বাঙ্গালা সাময়িকের ইতিহাসে সে দৃষ্টান্তও বিরল। বরং বিপরীত উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়।

আজ "প্রবর্ত্তক" সারা বাঙ্গলায় সমাদৃত, **বাঙ্গালীর জাতীয় পত্রিকা।** এখন তাহার কর্ম্মধারা বা কাজের পরিচয় দিবার জন্য কাহারও মুখ চাহিয়া থাকিতে হয় না। কিন্তু মনে পড়ে "প্রবর্ত্তকে'র জন্মক্ষেত্র চন্দননগরে যে সময়টায় সংবাদপত্র বলিতে অন্য কোন কাগজ ছিল না, তখন বর্ত্তমান "প্রবর্ত্তকে"র উদ্ভবেরও পূর্ব্বে সেই দেবনাগরী অক্ষরের "প্রবর্ত্তক" এই শিরোভূষণ ধারণ করিয়া পক্ষের পর পক্ষ দুই চারি পৃষ্ঠার অতি ক্ষুদ্র "প্রবর্ত্তক" যে কাজ করিয়াছে, তাহা এখনকার যুবকবৃন্দের কাছে অজ্ঞাত নহে।

আজিকার এই বহু শাখাপ্রশাখাবিস্তৃত প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের কর্ম্মবহুল বহুমুখী প্রচেষ্টার "প্রবর্ত্তক'ই যদি উৎস-মুখ বলা যায়, বোধ হয় তাহাতে কোন ভুল হয় না। সঙ্ঘের বা সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতার মর্ম্মকথা প্রথম সপ্রকাশ হয় এই "প্রবর্ত্তকে"। সুতরাং সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতাদের কাছে "প্রবর্ত্তক" যে বিশেষ আদর ও গৌরবের বস্তু, তাহাতে সন্দেহ নাই। চন্দননগরবাসীর কাছেও ইহা কম আদরের নয়, অন্ততঃ হওয়া উচিত নহে। বর্ত্তমান সময়ে বাহিরের লোকের কাছে যাঁহাদের পরিচয়ে চন্দননগরের পরিচয়, যাঁহাদের গৌরবে চন্দননগরের গৌরব, তন্মধ্যে "প্রবর্ত্তক যে অন্যতম, একথা বোধহয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমি অপর সাধারণ হিতৈষিবর্গের সহিত ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করি, "প্রবর্ত্তক' দীর্ঘজীবন লইয়া দেশের ও জাতির অগ্রগমনের পথের, কল্যাণের পথের সহায় হউক, আর সেই সঙ্গে চন্দননগরের মুখ উজ্জ্বল করুক। তাহার প্রথম যুগে যে আশার বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, —'আমরা মানুষের মনুষ্যত্বের ভিতর দিয়া, তাহার কর্ম্মের, ভোগের, জ্ঞানের উদযাপনের মধ্য দিয়া মানুষের দুঃখ হইতে মুক্তির উপায়, মানুষের অমৃতত্বের পথ খুঁজিয়া বাহির করিব। আমরা মানুষকে খর্ব্ব করিতে পারিব না, ভিখারী করিতে পারিব না, গুণহীন করিতে পারিব না। আমরা মানুষের মধ্যের অনন্ত গুণকে মহীয়ান গরীয়ান্ করিয়া তুলিয়া ভগবানের মানুষ সৃষ্টিকে সার্থক করিব—আর মানুষের এই মনুষ্যধর্ম্মের ভিতর দিয়া বাহির করিব দুঃখ হইতে মুক্তির পন্থা। ইহাই আমাদের আশা।" শ্রীভগবান যিনি এই অতি উচ্চ আশা হৃদয়ে আনিয়া দিয়াছিলেন, তিনিই ইহা পূর্ণ করুন, বিশ্বে এক নবজাতির উদ্ভব হউক।"

সভার কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, এই শুভ উৎসব-ক্ষণে দেশগৌরব হরিহরবাবুকে 'দেশশ্রী' এবং পরম শ্রদ্ধেয় মতিবাবুকে 'দেশাত্মা' এই উপাধিতে ভূষিত করা হউক। শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন ভড় ইহা সমর্থন করিলে, মেয়র প্রমুখ উপস্থিত সকলেই ইহা আনন্দের সহিত অনুমোদন করেন।

অতঃপর নলিনচন্দ্র দত্ত সভাপতি ও উপস্থিত সুহৃদ্-গণকে ধন্যবাদ প্রসঙ্গে বলেন—

'প্রবর্ত্তকে'র এই উৎসবে আজ শুধু সাহিত্যের দিক্ দিয়া নহে, "প্রবর্ত্তকে'র অন্তর্নিহিত ভাব ও আদর্শ মন্ত্রকে ভালবাসিয়া আজ যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত সঙ্ঘের একটা অধ্যাত্মপরিচয় ও সম্বন্ধেরই অনুভূতি হইতেছে। এই অনুভূতির মূল্য বড় অল্প নহে। ইহা সঙ্ঘের প্রতি দেশবাসীর আন্তরিক প্রেম ও সহানুভূতিরই সূচনা করে।'

অতঃপর প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন অতিথিগণকে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগান্তে এই শুচিসুন্দর অনুষ্ঠানটীর মধুরেণ সমাপয়েৎ করা হয়।

১৩

সংসার-পথে যাত্রা। পথের পরিচয়ে আমি, তুমি, সে—সকলে। পরিচয় ঘনাইয়া উঠে যেখানে, স্বর্গ সেখানে অবতরণ করে। সম্বন্ধের নিবিড়তায় মানুষ অমৃত আস্বাদ করে। সংসারে রস-সৃষ্টি এই সম্বন্ধের বন্ধনে।

বাল্যকাল হইতে স্বভাব-ঔদাসীন্যে আপনার জন বলিয়া পরিচয় হইয়াছে অতি অল্প ক্ষেত্রে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু চক্ষের দেখা মাত্র। হৃদয়ের গ্রন্থি কোথাও পড়ে নাই। পরকে আপন করার স্বভাবধর্মে নানা ঘটনার সৃজনে জীবন বৈচিত্র্যময় হইয়াছে। আশা পূর্ণ কোথাও হয় নাই।

হৃদয়ের আবেগে সম্বন্ধ সৃজনের সঙ্কেতে অবিচারে অনুসরণ করে, কোথাও বাধা মানে না। কেহ তাহা লক্ষ্য করে না। কিন্তু একজনের হৃদয়ে প্রতি পদে টান ধরে। আমার হৃদয়ের অনুধাবনে একজনের প্রাণে বেদনার সঞ্চার করে। এত বড় আঘাতে সেই কথাটাই ভাল করিয়া বুঝিয়া লইলাম। কিন্তু মানুষ কি জন্মিয়াছে কোন এক সঙ্কীর্ণ বন্ধনের আবেষ্টনে গলরজ্জু-বদ্ধ হইয়া স্থির থাকিবার জন্য? তার জীবনের প্রচণ্ড গতি কি সহস্র সহস্র আশ্রয়ে সম্বন্ধের পদচিহ্ন স্থাপন করিবে না? অন্তরের এইরূপ প্রগতিশীল প্রেম, বাহিরে কিন্তু বৃন্দাবনচন্দ্রের মত আমাকে সেদিন স্বীকার করিয়া লইতে হইল, "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি"।

পৃথিবীতে সকল সম্বন্ধের সার কান্তা-প্রেম। সে প্রেমের সাধনা বৈষ্ণব কবিগণের ভাষায় অপূর্ব্ব বর্ণনে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তবুও পুরুষকে নারী বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। "আপন বঁধুয়া আন্ বাড়ী যায়", মাটীতে পড়িয়া লুটায় কান্তা। সে অশ্রু মুছাইয়া সান্ত্বনা দিবার ভাষা তো জগতে মিলিল না। সে যুগ এ যুগের মত হইলে, কি হইত বলা যায় না। পুরুষের চিত্ত মত্ত তুরঙ্গের মত ইতস্ততঃ বিচলিত বিক্ষিপ্ত হয়। নারীর একাগ্র চিত্ত ক্ষত-বিক্ষত রুধিরাক্ত হইয়া অবসন্ন হয়, এ প্রমাণ এক বার, দুই বার নয়, বহুবার পাইয়াছি। কিন্তু তবুও বাঁধন স্বীকার করিবার মত হৃদয়ের নতি হইল না। কেন এমন হয় সে বিচারের শেষ হইতেছিল না।

যে পুরুষ কামকন্দুকের ন্যায় নারীর ক্রীড়নক, আমি তাহার কথা বলিতেছি না। পুরুষ হৃদয়ের প্রেরণা যেখানে "অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়"—সে আপনাকে কোন এক সুনির্দ্দিষ্ট আশ্রয়ক্ষেত্রে চির বন্দী করিয়া রাখিতে পারে কি? নারী পুরুষের প্রতি অনন্যচিত্তা হয়, পুরুষের পক্ষে তার যথার্থ প্রতিদান অনন্যচিত্তে এক নারীরই ভজনা করা। এই ঔচিত্যবোধকে আমি সশ্রদ্ধায় অভিনন্দিত করি। আমি সমাজ-জীবনে ইহাই শ্রেয়ঃ ও শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দ বলিয়া স্বীকার করিব। আমার প্রকৃতি কিন্তু অন্যরূপ। আমি পত্নীর প্রতি অকপট হইয়াও, বহুর আকর্ষণকে উপেক্ষা করিতে পারি নাই। অসংখ্য পুরুষকে আপনার করার ন্যায়, অসংখ্য নারীকেও আপনার করার তীব্র আকুলতা আমায় উদ্বুদ্ধ করিত। পুরুষের সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধ দৃঢ়বদ্ধ করার আচার ও রীতি নারীকে আপন করার ন্যায় নহে। উহা কার্য্যকরীও হয় নাই, বরং তাহা ব্যর্থই হয়।

নারী আপন হয় স্বতন্ত্র বিধি ও ভঙ্গীতে। নারীর জীবনচ্ছন্দঃ পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ধরণের। কাজেই তদনুকূল আচার করিতে গিয়া হয়তো অনেক ক্ষেত্রে অশোভন ব্যবহার প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহা কতকটা দৃষ্টিকটুও বটে। কিন্তু নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, নারীকে আপন করার আচার স্বতন্ত্র ধরণের হইলেও, উহা সঙ্কীর্ণ ভোগ-কামনা-দুষ্ট নহে। ভোগই বন্ধন। যে সম্বন্ধে মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়, তাহা বেদনা সৃষ্টি করিবে কেন? দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় এ প্রশ্নের উত্তর অবধারণ করিয়াছি।

ঘর পর করিয়াছি। পর আপন হইয়াছে। স্বপ্নে নয়, কল্পনায় নয়—ইহা জীবনে বস্তুতন্ত্র মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষের ন্যায় নারীও নূতন নগরে ঘর বাঁধিয়াছে—পুরাতন পড়সী ছাড়িয়া নূতন পড়সী পাইয়াছে। কিন্তু ইহা সিদ্ধ হইয়াছে একজনের রক্তাক্ত আত্মদানে। ইহার জন্য নিজেকে উপযোগী করিয়া লইতে গৃহদেবীকে প্রাণান্ত হইতে হইয়াছে, ইহা আমায় বলিতেই হইবে। যে ঘর আত্মতর্পণের ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে, সে গৃহ নিঃসঙ্গ বৈরাগ্যপ্রদীপ্ত পুরুষেরই নহে। নিষ্কাম চিত্ত নারীর অবদানও সেখানে নির্ভয়ে আশ্রয় পায়। এই যুগ-নারীর সংহতিসৃজনের উদ্যোগপর্ব্বে হৃদয়ের টানাটানি অবশ্যম্ভাবী। দুঃসহ যন্ত্রণায় এই জন্য উভয়কে বেশ নিপীড়িত হইতে হইয়াছে।

নারী-পুরুষ অতি সঙ্কীর্ণ স্থান আশ্রয় করিয়া তৃপ্তি পায়, রসানুভব করে। নারীহৃদয়ের বিস্তৃতি পুরুষের চক্ষুশূল। কিন্তু নারীর পক্ষেও কি তদ্রূপ নহে? কোন্ পুরুষ চাহে নিজ পত্নীর প্রসারিত হৃদয়ে অন্য পুরুষের আশ্রয়, নারীও কি চাহে তাহার স্বামীর মনের নিভৃত কোণে অন্য নারীর স্থান? ইহার ব্যত্যয় হয় যেখানে অথচ যেখানে ঝঞ্ঝা উপদ্রব নাই, সেখানে বুঝিতে হইবে, হয় দুইজনেই হৃদয়ের জুয়াচুরী করে, নতুবা উভয়ে উভয়েরই মনের খবর রাখে না। ব্যবহারিক জগতে নারী পুরুষের মিলন গভীর অনুভূতির রাজ্যে প্রায় ঘটে না, তাই মিলনের মধ্যে দরদীর সূক্ষ্মানুভূতি যে কি বস্তু, তাহা অনেকে বুঝিবে না।

এমনই অনন্যহৃদয় দিয়া তিনি আমায় পাইতে চাহিয়াছিলেন। আমিও অনন্য হইয়া তাঁহাকে যে পাই নাই বা পাইতে চাহি নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। তবে আমার দরদপ্রকাশের ভঙ্গী ঔদাসীন্যব্যঞ্জক ছিল। তিনি দরদী হৃদয়ের অভিব্যক্তি দিতেন সুগভীর আকৃতিতে। আমার দরদ তুলনায় ক্ষুদ্র না হইলেও, তাঁর মত অমন সুকরুণ আকৃতি আমার ব্যবহারে প্রকাশ পাইত না। তিনি তাহা বুঝিতেন। তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা আমার হৃদয়ে তুল্যভাবেই বেদনা সৃজন করে, তাহা তিনি অনুভব করিতেন। অন্তরের দরদ গোপন করিয়া বাহ্যতঃ আমার এই ঔদাসীন্য তিনি পুরুষের ধর্ম্ম বলিয়াই মনে করিতেন। পতি তাঁহার শ্লাঘার বিষয় ছিল। কেবল একটী ক্ষেত্রে তিনি আমায় বুঝিতেন না। আমার স্বভাব ও স্বধর্ম্ম অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া—এই আকর্ষণের মধ্যে সংহতিসৃষ্টির কল্পমন্ত্র ছিল, ইহা তিনি অনুভব করিতেন না।

আমি যখন পীড়িত হইয়াছি, তাঁহার হৃদয়ের কাতর অভিব্যক্তি আমার পীড়া উপশম করিয়াছে। তিনি যখন পীড়িতা হইয়াছেন, আমার ঔদাসীন্যই তাঁহাকে শক্তি দিয়াছে, স্বাস্থ্য দিয়াছে। কিন্তু আমায় যখনই কোন নারীর ভক্তির আতিশয্যে আকর্ষিত হইতে দেখিয়াছেন, সেখানে তিনি ভীমা রুদ্রাণী বেশে আমায় শাসন করিয়াছেন। সে শাসন সর্ব্বত্র স্বীকার করিতে পারিতাম না—এই জন্যই নিদারুণ ব্যথায় তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িতেন, ইহার প্রতিকার করার সাধ্য আমারও ছিল না। এইখানে আমার নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য তাহাকে সান্ত্বনা দিত না। এইখানেই তিনি মৃত্যুদেবতাকে শনৈঃ শনৈঃ ডাকিয়া আনিতেন। কিন্তু আমাকে প্রত্যাঘাত করার প্রতিবিধিৎসা তাঁহার অন্তরে একদিনের জন্যও ঠাই পায় নাই। এই অলৌকিক অপার্থিব গুণে মৃত্যুর মূল্য দিয়া তিনি আমায় চিরদিনের জন্য জয় করিয়া লইয়াছেন। এক-নারীত্বের অলৌকিক স্বর্গীয় সাধনা কি কঠোর তপঃসাধ্য, তাহা অনাঘ্রাতা নারীর উৎসর্গ যে পুরুষ লাভ করে নাই, সে বুঝিবে না। নারী সতীমূর্ত্তির বিগ্রহ হইয়াছে যুগে যুগে। পুরুষ সত্য সুন্দরের সাধনা করিয়াছে। তার সে সিদ্ধ রূপ বৈরাগ্যের উত্তরীয় উড়াইয়া বিঘোষিত হইয়াছে। সংসারে, সমাজে সতীনারীর ন্যায় এমন অনাঘ্রাত সৎ-পুরুষের আবির্ভাব আমি অতিশয় দুর্ল্লভ বলিয়াই মনে করি।

সত্যই কি নারী প্রেমকে সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ করিয়াই রাখিতে চাহে? কাম ও আসক্তির আবর্ত্তে সাঁতার যে একেবারে না কাটিয়াছি, এমন নহে—তবে সতীর শুভদৃষ্টি আমায় এই সম্বন্ধে এক নূতন অভিজ্ঞতা দান করিয়াছে। অসংখ্য পুরুষের মধ্যে অকাতর হৃদয় বিতরণ করিয়া যে আত্মীয়তার বন্ধন, নারীকে কি তিনি ইহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন? না, ইহা হইলে ভক্তিময়ী মেজ-বৌকে

লইয়া তিনি নূতন সমাজ-সৃষ্টির অপার্থিব স্বপ্ন দেখিলেন কি প্রকারে? তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা পরিবারকে স্বপরিবারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন মেজবৌয়েব প্রতি আমার অকৃত্রিম অনুরাগ আশ্রয় কবিয়াই। আমবা এক শয্যাধাবে উপবেশন করিয়া কত প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছি। এক পাত্রে মেজবৌয়ের সহিত পরমানন্দে তিনি ভোজ্য গ্রহণ কবিয়া জাতিভেদ ঘুচাইয়াছেন। দুই পরিবারের অর্থ-ভাণ্ডার একত্র করিয়া, তিনি সমস্বার্থে পরস্পব দুইটী স্বতন্ত্র পরিবাবকে একান্নবর্ত্তী কবিয়াছেন। নিজের অলঙ্কার তিনি মেজবৌয়ের অঙ্গভূষণ করিয়াছেন। মেজ-বৌয়ের অলঙ্কার নিজ অঙ্গে ধারণ কবিয়া আপনার ও পর, এই ভেদ রাখেন নাই। এই সকল সামাজিক ব্যবহার হইলে, কথা ছিল না। মেজবৌয়েব অলঙ্কাব প্রয়াণকাল পর্য্যন্ত তাঁর অঙ্গে ছিল। মেজবৌ ছোটদিদিব কণ্ঠহার গলায় দোলাইয়া মহাযাত্রা কবিল। এই ক্ষেত্রে আমার প্রণয় এমন অকুণ্ঠচিত্তে আমাবই মত অখণ্ডামুভবে তিনি গ্রহণ করিলেন কি প্রকাবে? ভাবিয়া দেখিয়াছি।

নারী হৃদয় সঙ্কীর্ণ নয়। পুরুষের হৃদয় বিস্তৃতিব সে প্রতিবন্ধক নয়। পুরুষের চেয়ে নারীর এই ক্ষেত্রে ঔদার্য্য অনির্ব্বচনীয়। নাবী পুরুষকে ভালবাসে—সে ভালবাসা পুরুষকে আশ্রয় করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাবাবি-বর্ষণের ন্যায় প্রেমেরই সাধনা। প্রেমের সাধনায় প্রেমই লক্ষ্য। সতী-স্ত্রী কামেব দুর্গন্ধ সহিতে পাবে না। পুরুষের প্রেম কামগন্ধহীন হইলেও, ইহা যে ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়, সেই ক্ষেত্রে যদি কামচাঞ্চল্য ঘটে—সতীনারী পতিব এ প্রেমক্ষয় সহিতে পারে না। সাধ্বী পত্নীব স্বামী এই জন্য 'পর্ব্বতের চূড়া' বলিয়া প্রখ্যাত। সতীর পতি বীর্য্যক্ষয়ে বাধা পায়। ভারতের নারী এই জন্য পতির শয্যাসঙ্গিনী নহেন, ধর্ম্মপত্নী। 'তিনি' আমার বীর্য্যক্ষয় বোধ কবিয়া ছিলেন, প্রেমক্ষয়ের পথে অন্তরায় হইয়াছিলেন। নাবী প্রেম নিজের জন্যই প্রার্থনা করে না, জগৎপালিনী মাতৃশক্তিরূপে নারী এই প্রেমের মন্দাকিনী-ধাবায় ধরা অভিষিক্ত করিতে চাহে। কাম কুক্কুর পুরুষ নারীর প্রতিবন্ধকতায় বিক্ষুব্ধ বিরক্ত হয়। সতী তাহাতে বিচলিতা নয়। পতি-পত্নীর অপার্থিব সম্বন্ধই সৃষ্টিকে অমৃতে পরিণত করে।

আলো ও শান্তির আবহাওয়ায় দিন অতি স্বচ্ছন্দেই অতিবাহিত হইতেছিল। উৎসব ও আনন্দে গৃহ সতত মুখবিত থাকিত। সূর্য্যোদয়েব সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত, আবাব রাত্রি সমাগম হইতে রাত্রিপ্রভাত পর্য্যন্ত নিয়মিত জীবনযাত্রা সুচ্ছন্দে ও শান্তির নির্ঝর সৃষ্টি করিয়াছিল। মনে হইত—মর্ত্ত্য-জীবনে এত আনন্দ আর কোথাও নাই।

পুত্রপরিজনহীন আমি। দাসদাসীপরিবৃত নহি। কিন্তু দিবারাত্রি মনের মানুষ লইয়া উৎসবময় জীবন কত যে তৃপ্তির ঝরণায় আমাদের দুইজনকে অভিষিক্ত কবিত, তাহা স্মরণ করিলে আজিকার এই নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রার মধ্যে অসংখ্য প্রকাব কর্ম্মের ভীড়ে আপনাকে হারাইয়া আছি বলিয়াই মনে হয়। সে সুখের নির্ঝর শুকাইয়াছে, আছে কঠোর কর্ত্তব্যপালনের জাগ্রত বিবেক। আজ মস্তিষ্ক পাইয়াছি, কিন্তু হৃদয় খুঁজিয়া পাই না। সেদিন পদে পদে বিপদ্ সম্ভাবনা ছিল, তবুও নিজের নিরাপত্তি সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার অবকাশ ছিল না। বিপদ বহিবাব সামর্থ্য অর্জ্জন কবিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্নীতি সহিতে পারিতাম না। অসতর্ক হইয়া নিজেব ত্রুটিও আমায় লঘু কবিত না। অন্যের দুর্নীতি অসহ্য বোধ হইত। এমনই একটী গুরুতর দুর্নীতির পঙ্কিল স্মৃতি এই সুখেব দিনে আমাব অন্তরে ক্ষত সৃষ্টি কবিয়াছিল। সে ক্ষত তাঁহাকেও পীড়িত করিয়াছিল। সে এক বৈপ্লবিকেব কলঙ্কময় জীবন কাহিনী। অতি দুঃখের সহিত সে কাহিনী আমায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। কোন প্রসিদ্ধ বিপ্লব-সমিতিব প্রধান নেতা বন্দী হইলে, আমার এক বন্ধু ও সহযোগী দেশকর্ম্মী ইহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে বাজাবাজাব বোমাব মামলার আসামী শ্রীঅমৃতলাল হাজবা আমার নিকট উপস্থিত হন। সমিতিব নেতা আমায় অনুজের ন্যায় স্নেহ করিতেন, আবার অন্য দিকে শ্রদ্ধা ও প্রীতিব অর্ঘ্যে আমার হৃদয় উদ্বুদ্ধ কবিতেন। যে কোন কারণেই হউক, তিনি উক্ত সমিতিব সহিত বিযুক্তসম্পর্ক হইলে, সেই সমিতিব কয়েক জন তরুণ কর্ম্মী আমাব প্রতি প্রীতিপরায়ণ হন। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী,

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র আচার্য্য প্রভৃতি ইঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বৈপ্লবিক কর্ম্মে আমার পূর্ণ সহায়তা না থাকিলেও, আমার সঙ্গ তাঁহারা ভালবাসিতেন এবং ভারতরক্ষা আইনের শাসনে এই সকল কর্ম্মী নিজেদের বিপন্ন বোধ করিলে, আমার আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিরাপদ্ ক্ষেত্রে স্থান করিয়া দিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় এক অপরিচিত আগন্তুক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার বেশভূষা ও আকৃতি-প্রকৃতি আমার ভাল লাগিল না। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম—ইনিও বৈপ্লবিক সমিতির একজন নায়ক। পরিচিত বন্ধুগণের অনুরোধে তাঁহাকেও আশ্রয় দিতে হইল। ইহার জন্য একটা নূতন স্থান সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। এই কর্ম্মটি আমার জীবন বিপ্লবযুগের ইতিহাসে একটা কলঙ্ক চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

আমার সকল পরিচিত ক্ষেত্রেই পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এই হেতু আমার এক বেপারী বন্ধু বংশীধরের সহিত ব্যবস্থা করিয়া, তাহার আশ্রয়ে এই ব্যক্তির স্থান করিয়া দিই। অকস্মাৎ একদিন রাত্রে বংশীধর আসিয়া আমায় সংবাদ দিল—তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাহার রোরুদ্যমান কণ্ঠ চাপা দিবার নহে। তাহার করুণ ক্রন্দন স্বর শুনিয়া আমার স্ত্রী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা দুই জনেই তাহার কাতরোক্তি শুনিলাম। সেই দুরাচার আশ্রিত ব্যক্তি বংশীধরের অনুপস্থিতিতে তাহার পত্নীর প্রতি নাকি অবৈধ অত্যাচার করিয়াছে। বংশীধরের পত্নী আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত, প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া সে কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

উন্নতফণা ভুজঙ্গিনীর মত গ্রীবা উত্তোলন করিয়া সাধ্বী সগর্জ্জনে বলিলেন "এ কি দেশের কাজ? এ কি স্বাধীনতার সাধনা?"

ক্রোধে তাঁহার অধর স্ফুরিত হইতেছিল। এই ঘটনার অনেক দিন পরে কোন কোন তরুণের মুখে শুনিয়াছি—স্বাধীনতার কামনা-সিদ্ধির সহিত চরিত্রের সম্পর্ক নাই। এমন ধারণা আমার সে দিনও ছিল না, আজিও নাই। স্ত্রীর ক্রুদ্ধ স্ফুরিত অধরে অভিসম্পাতের বজ্র উচ্চারিত হওয়ার উপক্রম হইতেছিল, আমি তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বংশীধরকে সান্ত্বনা দিলাম। পরদিন সমস্ত সংবাদ লইয়া বুঝিলাম—দুরাচারের বলপ্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় নাই, কিন্তু ইহা কি অকথ্য বিশ্বাসঘাতকতা নহে? পবিত্র আশ্রয়ের প্রতি গুরুতর অত্যাচার নহে? স্বাধীনতাকামী তরুণদের মধ্যে এইরূপ চরিত্র কি নিন্দার্হ, ঘৃণার্হ নহে? অপরাধ প্রমাণিত হইলে, বন্ধুরা এই দুর্ব্বৃত্তের বধাজ্ঞাই দিলেন। বিচারের ভার নিজের হাতে লওয়ার সাধ্য অথবা বিবেকের সায় আমার ছিল না। একদিকে সহধর্ম্মিণীর অনুযোগ, অন্য দিকে অকৃত্রিম সুহৃদের প্রতি এই অন্যায় আচরণ আমাকে অতিশয় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। কথাটা প্রচারের বস্তুও নহে, কেবল মনে হইল—দেশ কি স্বাধীন হইবে শুধু পশুবল প্রয়োগে, চরিত্রের নৈতিক শক্তিই কি স্বাধীনতার প্রধান ভিত্তি নহে? সংযমহারা, পশুবলদৃপ্ত জাতি দস্যুতা করিতে পারে, বিপ্লব আনিতে পারে, কিন্তু ভারতের ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাহারা কখনও সফল করিতে পারিবে না।

ঈশ্বরে সমর্পিত চিত্ত হইয়া আমি প্রতিদিন যে জ্ঞান সঞ্চয় করিতেছিলাম, তাহাতে এই ধারণাই হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতেছিল—ফুল ফোটে, সৌন্দর্য্য বিকাশ করে, সৌরভ বিলায়, ইহা ফুলের কর্ম্ম নয়, বৃক্ষের জীবনীশক্তিরই অনিবার্য্য প্রকাশ। জীবন যদি সৌন্দর্য্যের সৌরভে পূর্ণ হয়, তার প্রকাশ স্বর্ণময় হইবে, অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবে। ভারতের স্বাধীনতা ভারতের জাতিগত চরিত্রের অনিবার্য্য অভিব্যক্তি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই জাতি যদি পবিত্রতা ও মহত্ত্বের ভিত্তিতে গড়িয়া না উঠে, তাহার অর্জ্জিত স্বাধীনতার গৌরব ভারতের আত্মাকে তৃপ্ত ও সার্থক করিবে না। এই ঘটনায় জীবনের গতি আমার নিঃসংশয়ে ভিন্নমুখী হইল। অতঃপর যে পথে গতি নিয়ন্ত্রিত হইল, সে পথে বিন্দুমাত্র সংশয় অথবা ইতস্ততঃ ভাব আর আমার রহিল না।

আমি অপরাধীকে বিদায় দিলাম। বিপ্লবক্ষেত্র হইতেও সেই দিন চিরবিদায় লইলাম। সূর্য্যাস্তের পর পশ্চিম গগন হইতে অস্তগামী রবির রক্তকিরণ ভাগীরথী বক্ষে রেখায় রেখায় বিচিত্র রূপ ধরিয়াছে। বালুচরের উপর দিয়া গঙ্গা গর্ভে শ্রীমান্ অরুণচন্দ্রের সহিত চিন্তাপর

চিত্তে ভ্রমণ করিতে করিতে ব্যথার কথা বলিতেছিলাম। ভাবের মুক্তিকামনায় অন্তরে যে সৃষ্টি-প্রেরণা ঐ গঙ্গা-বক্ষে সুলিখিত লোহিত কিরণাঙ্কিত চিত্রের ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল—তাহাই বলিতেছিলাম। অকস্মাৎ দুইজন তরুণ সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইল। তাহারা নবদ্বীপ হইতে আসিতেছে, আশ্রয়হীন—দেশের মুক্তি-কামনায় উদ্বুদ্ধ। এই দুই তরুণের উৎকণ্ঠিত বিবর্ণ মুখ দেখিয়া করুণায় হৃদয় ভরিয়া গেল। কিন্তু এ স্রোতঃ আজ না হয় কাল তো বন্ধ করিতেই হইবে। যে পথে তরুণেরা চলিয়াছে, সে পথ তো মুক্তির পথ নহে। এ পথের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আজ এ কথা কেহ বুঝিবে না। বুঝাইতে চাহিলেও, কেহ শুনিতে চাহিবে না। যাহারা দেশকে ভালবাসিয়াছে, দেশের ভাল বলিয়া যাহা তাহারা বুঝিয়াছে, তাহা হইতে তাহাদের বিমুখ করার সাধ্য আমার নাই। আমার যদি কেহ ভালবাসিয়া থাকে, আমার হৃদয় দিয়া কেহ যদি দেশ ও জাতির প্রতি দরদের অনুভূতি চাহে, আমি সেইখানেই সুস্পষ্ট বিশদ করিয়া মুক্তির সুনির্দিষ্ট পথের কথা বলিতে পারি। আমার জীবনে কেহ কি জন্ম লইতে চাহে? সকলের এই অভিনব নীতি আমি কি কাহাকেও বুঝাইতে পারিব? এই দুই জন আত্মগোপনকারী করুণ দেশপ্রেমিকের আমি কেহ নহি। বাহিরের প্রয়োজন যাহাদের মত পরস্পরকে সংযুক্ত করে। এ তাগিদ ফুরাইবে—আমরা আজিও যেমন পরস্পরের মধ্যে কেহ কাহারও নাই, সেদিনও তাহাই হইবে। অন্তর প্রেরণা আর তাই ক্ষুণ্ণ করিব না। আমি ব্যথিত কাতর হৃদয়কে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া, তাহাদের সে দিন প্রত্যাখ্যান করিলাম। এই ঘটনা বিকৃত হইয়া আমার বিপ্লবী বন্ধুদের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে এক গ্লানিকর কাহিনী রচনা করিয়াছিল, সে সাময়িক বিক্ষোভ ও ক্ষুণ্ণতা সত্যের সম্পর্কশূন্য। উহা সুস্থ ও সুচিন্তিত মনোবৃত্তিকে মসীময় করিয়া রাখিতে পারে নাই। তাই সে যুগের পরিচিত বিপ্লবী বন্ধুদের প্রীতিময় স্মৃতি হইতে বোধ হয় আমি আজও মুছিয়া যাই নাই।

ইহার কিছু দিন পর নৈদাঘ প্রভাতে যথারীতি বাহির হইতে গিয়া দেখি—শুধুই আমার বাড়ীখানি নহে, সারা পল্লীটা ঘিরিয়া গোরাসৈন্য বিরাজ করিতেছে। নানা কথাই কানে আসিয়া পৌঁছিল। চন্দননগরের প্রত্যেক আশ্রয়ক্ষেত্র পুলিসের আগমনে শান্তি হারাইয়াছে। তারপর যথাকালে অনেক মাননীয় অতিথি আমার ভবনটাকে অধ্যুষিত করিলেন। আমার সহাস্য অভিনন্দন তাঁহারা কিছু বক্র হাসির সহিত গ্রহণ করিয়া, খানাতল্লাসী সুরু করিলেন। স্যার চার্লস টেগার্ট আমায় নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। মিঃ করবেট, মিঃ ডিক্সান, হুগলী ও চব্বিশপরগণার জিলা ম্যাজিস্ট্রেটদ্বয় এই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ফরাসী পুলিস কমিশনর মঁসিয়ে পমেজ আমার সম্মানহানি যাহাতে না হয়, তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। অধুনা কলিকাতার পুলিস কমিশনর মহামান্য মিঃ কল্সনও এই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। যুগান্ত পরে তাহার সহিত আমার আবার দেখা হইয়াছিল। সেদিন যিনি আমার ভবনে আসিয়াছিলেন সংশয়ী, প্রতিপক্ষের বেশে—পরে তাঁহারই ভবনে সুহৃদের মতই আমি অভিনন্দিত হইয়াছিলাম, ইহাই ভাগ্যচক্র।

টেগার্ট সাহেবের প্রশ্নবাণে আমি জর্জরিত হইলাম। বুঝিলাম প্রশ্নচ্ছলে তিনি আমার চরিত্র-চিত্র তৈয়ারী করিয়া লইতেছেন। আমার বিদ্যা বুদ্ধি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, বন্ধু বান্ধব, কৃষ্টি ও আদর্শ তাঁহার প্রশ্নে কিছুই বাদ পড়িতেছিল না। তারপর "যুগান্তরের" যুগ হইতে সেই-দিনের বৈপ্লবিক প্রতি ঘটনার সহিত আমার যুক্তি-প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন ও পরিচিত অপরিচিত আমার বৈপ্লবিক বন্ধুদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের হেতু—এমন কত সওয়াল জবাব তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন। মঁসিয়ে পমেজ ফরাসী নাগরিকের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অতিশয় সতর্কতার সহিত আমাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন।

অবশেষে টেগার্ট সাহেব হতাশাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"চন্দননগর বলিয়া রেহাই পাইবেন না, হাতে না পারি, ভাতে মারিব।"

আমি হাসিয়া বলিলাম "সবই করিতে পারেন। কিন্তু মনে রাখিবেন—ঈশ্বরেচ্ছা না হইলে, কিছুই হয় না।"

সাহেব মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন "ধর্ম্মটা আপনার ছদ্মবেশ। আসলে আপনি রাষ্ট্রবিপ্লবী।"

এমন সময়ে ঘরের বাহিরে প্রাঙ্গণে কিছু কড়া কর্কশ কথা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। মঁসিয়ে পমেজ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন; আমরাও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। ঘটনাটী বিশেষ কিছু নহে; মিঃ ডিকসনের সহিত রামেশ্বর বচসা করিতেছিল। আমি ত্রুটি স্বীকার করিয়া তাঁহাদের সান্ত্বনা দিলাম।

টেগার্ট সাহেব বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাকে দরজা দেখাইয়া দিলাম। তিনি কিছু দূর অগ্রসর হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আড়াল হইতে দেখিলাম—অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা আমার স্ত্রী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছেন। আমার স্ত্রী স্বভাবতঃ ভীরু প্রকৃতির ছিলেন। বিশেষ পুলিসকে তিনি বড় ভয়ের চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু আজ তাঁহার একি মূর্ত্তি দেখিলাম! সীমন্তের সিন্দুর অগ্নিশিখার ন্যায় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। তিনি সরল ঋজু হইয়া অতিশয় তেজস্বিনী রমণীর ন্যায় বিস্ফারিত নয়নে পথ আগুলিয়া বলিতেছেন "আপনি এই ঘরে প্রবেশ করিবেন না। ইহা আমার পবিত্র রন্ধন-গৃহ।"

আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম—দীর্ঘকায় স্যার চার্লস্ টেগার্ট অবনত শিরে তাঁহাকে সম্ভ্রমসূচক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া, অন্যদিকে ধীর পদবিক্ষেপে চলিয়া গেলেন। তিনি কিছুক্ষণ এদিক্ ওদিক্ করিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন "ঐ মহিলাটী আপনার কে হয়?"

আমার উত্তর শুনিয়া, হাত বাড়াইয়া করমর্দ্দনপূর্ব্বক সহাস্যে বলিলেন "গুড্‌বাই মতিবাবু"।

ইহার কিছুদিন পরে আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম—রংপুরের পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের এক বড় রকমের ফার্নিচারের অর্ডার আসিয়াছে। তবে কি স্যার চার্লস টেগার্ট আমার সহিত কথোপকথনে অন্তরে প্রসন্ন হইয়াছিলেন? এতদিন আমার কাঠের কারবার প্রায় অচল হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু এই সময় হইতে বাহিরের বাধা অপসারিত হইল। ভাবিলাম, ঈশ্বরপ্রসাদ কেমন করিয়া কোনদিক্ হইতে আসে, মানুষ তাহা বুঝিতে সমর্থ নহে।

যাহারা আমায় শত্রু মনে করিয়া আসিয়াছিলেন, সাক্ষাৎ আলাপে, আমায় কি তাঁহারা মানবতার সেবক বলিয়াই ভালবাসিলেন?

( ক্রমশঃ )

# চিত্ত-চাতকী

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

করকা বরষে, তবুও হরষে, মাথা পাতি' লয় বাজ
চিত্ত-চাতকী মিত্র কাঙাল, নাহি ভয়, নাহি লাজ।
এতটুকু পায়,
কভু তা'ও হায়,—
না পাইয়া মরে ফিরে—
নদ, নদী, জল
করে ঢল ঢল,
অতলান্ত নীরে।
মণিকাঞ্চনে করে চঞ্চল গণ্ডূষশফরী রে—
টলাতে না পারে অগাধ হৃদয় অব্যভিচারিণী রে।
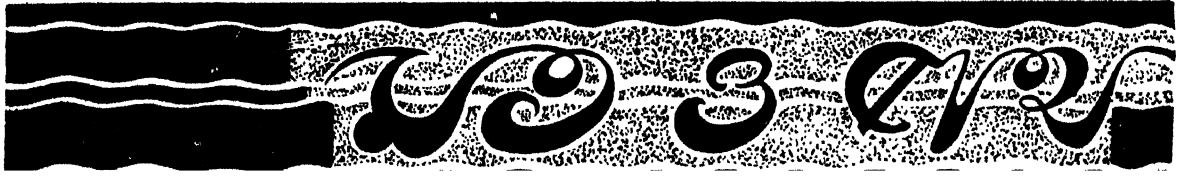
## চিন্তাশীলতার অভাব

বাংলায় আজ গভীর চিন্তাশীলতার অভাব দেখা যায়। শুধু বাংলা কেন, জগতের সর্ব্বত্রই আজ ইহাই পরিলক্ষিত হয়। তবে বাংলায় যেন কিছু বেশী—তাহার কারণ, বাঙালীর বুদ্ধিবৃত্তি এক শতাব্দীর পাশ্চাত্য আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া, আজ যেন ক্লান্ত, অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই শতাব্দীর প্রতিভায় ছিল না মৌলিক প্রজ্ঞার দীপ্তি, ইহা ছিল ধার-করা আলো—তাই ঋণের অর্থে যেমন চিরদিন স্বচ্ছন্দে নিরাপদে কাটান যায় না, তেমনি এই ধার-করা বুদ্ধির আলোকেও আমরা আর সম্মুখের পথ হাতড়াইয়া পাইতেছি না। বাঙালীর ভবিষ্যৎ আজ যেন ঘোর ঘনতমসাচ্ছন্ন। আমরা নিজের অবস্থা নিজেই বুঝিতে পারিতেছি না। যে নিজের মৌলিক চিন্তাশক্তি হারাইয়াছে, তাহার মস্তিষ্কে যত জ্ঞানের নির্দ্দেশই যত দিক্ দিয়া প্রক্ষিপ্ত হউক, উহা অন্তরবৃত্তির উন্মেষ নহে বলিয়া প্রকৃত পথ দেখাইতে পারে না। ফলে, জীবন-ক্ষেত্রের অন্ধকারে বাঙালী আজ কি করিবে, কেমন করিয়া ঘর সামলাইবে, আপনাকে ও স্বজাতিকে বাঁচাইবে, তাহার কুলকিনারার সন্ধান পাইতেছে না।

বাঙালীর এই চিন্তাশীলতার অভাব সর্ব্বত্রই প্রকট। রাষ্ট্রে, সমাজে, শিক্ষায়, সাহিত্যে, অর্থক্ষেত্রে—বাঙালী নিজে ভাবে না, স্বাধীন চিন্তা ও সাধনার অনুশীলন নাই। রাষ্ট্রক্ষেত্রে বাঙালীর চিন্তাহীনতা শোচনীয় কলঙ্কের ইতিহাস রচনা করিয়া চলিয়াছে। সমাজ-সাধনায় বাঙালী অগতি ও প্রগতির দ্বন্দ্বে হয় তটস্থ, নয় বিপর্য্যস্ত। বাঙালী ছেলেমেয়েরা যে শিক্ষা পায়, তাহা তাহাদের দেহ, মন, আত্মা কোন অংশকেই স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দেয় না। সাহিত্যে মৌলিক গবেষণা ও স্বাস্থ্যকর সৃজনকল্পনার প্রচেষ্টা খুব বিরল। অর্থক্ষেত্রে জাতি-হিসাবে গর্ব্ব ও গৌরব করার কিছু দূরে থাকুক, খাইয়া-পরিয়া বাঁচিবার সঙ্গতিটুকুও বুঝি আজ আমাদের নাই। আমাদের এই অবস্থা যে কত শোচনীয়, তাহা নিজের চক্ষে দেখিবার, বুঝিবার সামর্থ্যটুকুও লুপ্তপ্রায়। আত্মচিন্তায় উদাসীন জাতি দায়ে ঠেকিয়া জীবনযাপন করে। বাঙালী আজ শুধু আত্ম-বিস্মৃত নহে, আত্মঘাতী।

## আদম সুমারীর পরিচয়

গত আদমসুমারীর গণনানুযায়ী দেখা যায় বাংলার মোট জন-সংখ্যা ৫ কোটী ১০ লক্ষ—তন্মধ্যে ১৷৷০ কোটী মাত্র উপার্জ্জন করিয়া খায়; বাকী প্রায় ৩৷৷০ কোটী লোক ঐ এক কোটীর আশ্রিত বা পোষ্য। ইহাদের মধ্যে ১ কোটী চাষের কাজে, ১০ লক্ষ কলকারখানায়, ১লক্ষ ব্যবসা-বাণিজ্যে, ৫০ হাজার সরকারী চাকুরী, ২ লক্ষ ৮০ হাজার চিকিৎসাদি ভদ্রবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। চাষের মজুর ও সাধারণ মুটিয়ার কাজ করে যথাক্রমে ৮০ লক্ষ ও ৩ লক্ষ লোক। কৃষকদের মধ্যে নিজের জমীতে চাষ করে ৬০ লক্ষ ও ভাগে চাষ বা অন্যের জমীতে চাষ করে ২৭ লক্ষের কিছু বেশী।

বাংলা দেশের মোট বার্ষিক আয় মাত্র ৩৮ কোটী টাকা। তাহারও মাত্র ১৩ কোটী টাকা বাংলার জন্য খরচ হয়—বাকী ২৫ কোটী টাকা কেন্দ্র-গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন সারা ভারতের জন্য। বাংলার সমস্ত আয়-করও ভারত-গভর্ণমেণ্টের তহবিলেই যায়। বাংলার ন্যায় বোম্বাই গভর্ণমেণ্টও ব্যয় করেন ১৩ কোটী টাকা—কিন্তু তুলনায় বাংলার লোকসংখ্যা বোম্বাই-এর প্রায় ৩ গুণ। শিক্ষার জন্য বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট যেখানে ব্যয় করেন জন পিছু বার্ষিক ১৲ টাকা, সেখানে বাংলা গভর্ণমেণ্টের খরচ ।০ আনার বেশী নহে। স্বাস্থ্যের জন্য বোম্বাই-এ যেখানে ৷৷০, বাংলার সেখানে খরচ হয় মাত্র ⁄১০ আনা।

আর্থিক পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকে, খাদ্যসমস্যার পরিচয় যদি না এক সঙ্গে ধরা যায়। বাঙালীর প্রধান খাদ্য ভাত। ৫ কোটী বাঙালীর জন্য চাউল লাগে বৎসরে ১ কোটী লক্ষ

টন, কিন্তু ইহার মধ্যে বাঙালী উৎপাদন করে ৯৬ লক্ষ টন—বাকী তাহাকে কিনিয়া খাইতে হয় বিদেশ হইতে চাউল আমদানী করিয়া। অবশ্য বাংলায় উৎপন্ন কিছু চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াও যায়।

সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি নিজের ৫ কোটী সন্তানকে পেট ভরিয়া খাইতে দিতে পারে না, ইহা বিশ্বাস হয় না। বাংলার চেয়ে কোন দেশের আবাদী জমি অধিক উৎকৃষ্ট? কিন্তু বাংলায় যেখানে একর প্রতি ধান জন্মে ১০৫৫ পাউণ্ড, সেস্থলে মিশরে উৎপন্ন হয় ২৭১০, জাপানে ৩৩৫০, ইতালীতে ৩৯৫০ ও স্পেনে ৫৭৩০ পাউণ্ড। অথচ বাংলায় আবাদযোগ্য জমির পরিমাণও কম নহে—৫ কোটী লোকের জন্য ২ কোটী ৯০ লক্ষ একর জমী এখানে অনায়াসেই মিলিতে পারে অর্থাৎ জন পিছু গড়ে প্রায় ২॥০ বিঘা জমী। বিঘা প্রতি ৬ মণ বৎসরে ধান জন্মিলেও, একজনের স্বচ্ছন্দে সারা বৎসরের খোরাক উঠিয়া যায়। বিঘায় ১২ মণ ধান্যসৃষ্টি আজ উপাখ্যানের মত শুনাইলেও, বাংলায় ৬ মণ ধানও কি প্রতি বিঘায় আর জন্মে না? কিন্তু নিজের ভাত নিজের মায়ের নিকট হইতে লওয়ার দাবীটুকুও বাঙালী খোওয়াইয়াছে। ইহার জন্য বৈজ্ঞানিকের শরণাপন্ন হওয়ারও প্রয়োজন হয় না। বাংলায় চাষীর সংখ্যা কমিতেছে অথবা চাষের সমস্ত জমী আর আবাদই হয় না—ইহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। আসলে আমাদের মনে হয়, চাষের শ্রমে চাষীর আর পোষায় না। তাই কৃষিকার্য্যে তাহাদের উৎসাহ দিন দিন কমিয়াই আসিতেছে। ডাঃ রাধাকমল পশ্চিম ও মধ্য বাংলার নদীগুলির দুরবস্থার কথা বহুবার দেখাইয়াছেন। নদীমাতৃক বাংলায় কৃষকের জীবন যদি রসাভাবে শুকায়, সমগ্র জাতির মেরুদণ্ডই ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমাদের গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে উদাসীন—নেতৃগণ আত্মকলহে প্রমত্ত। বাঁচিবার বস্তুতন্ত্র সাধনা—এমন কি, সুচিন্তিত মৌলিক পরিকল্পনাও কাহারও নাই।

## বাংলার গো-ধন

বাঙালী ভাতও পায় না, যথেষ্ট দুধও পায় না। নিজেদেরই খোরাক জুটাইতে পারি না, দুগ্ধবতী গাভীগুলিও বংশপরম্পরাক্রমে ভাল খাইতে না পাইয়া দুগ্ধহীনা হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের খোরাক যোগাইবার কোন ব্যবস্থাই দীর্ঘদিন ধরিয়া এ দেশে নাই। শুধু দুগ্ধদান নয়, দেশের চাষবাস, পল্লীপথে যানবাহন, জমিতে সারবৃদ্ধির জন্যও সবল, কর্ম্মঠ গো-সম্পদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু বাংলার গোজাতি দিন দিন দুর্ব্বল, রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। প্রায় ২॥০ কোটী গরু, বাছুর, ষাঁড় বাংলায় আছে, ইহার বার্ষিক মূল্য মোট ১২০ ক্রোড় টাকা। ব্যবস্থা ও পরিচর্য্যার অভাবে এই সম্পদ্ ক্রমশঃ হীনতর হইতেছে। কিন্তু গোধন-রক্ষা ও পুষ্টির জন্য গো জাতির সুপরিচর্য্যা—ভাল গোচারণভূমি, নেপিয়ার ঘাসের চাষ, ভুট্টা প্রভৃতি জোয়াল খাদ্যশস্যের ব্যবস্থা চাই। উৎকৃষ্ট ষাঁড় আনাইয়া বাংলার গোজাতির উন্নতির চেষ্টা বড় লাট লর্ড লিন্‌লিথগো আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে চেষ্টাও হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে।

## বিলাতী কাপড়

গত ১৭ই এপ্রিল হইতে বিলাতী কাপড়ের উপর আমদানী শুল্ক কমিয়াছে। ভারতের সহিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ইতিপূর্ব্বে যে বাণিজ্য-চুক্তি হইয়াছিল, তদনুসারে ল্যাঙ্কাশায়ারের সুবিধার জন্য ভারতে আমদানী বিলাতী বস্ত্রের কিছু শুল্ক হ্রাস করা হইয়াছিল। চুক্তির অন্যতম সর্ত্ত ছিল—কোন বৎসর ৩৫ কোটী গজের বেশী কাপড় বিলাত হইতে ভারতে না আসিলে, পর বৎসরে আরও শতকরা ২॥০ টাকা আমদানী শুল্ক কমান হইবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থা এই সর্ত্তানুসারেই হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্টের হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এ দেশে আমদানী কাপড়ের পরিমাণ ৩৫ কোটী গজ অতিক্রম করে নাই। ভারতে বিলাতী কাপড় এত কম কাটিলে, ল্যাঙ্কাশায়ার রক্ষা পায় না। কাজেই শুল্ক-বৃদ্ধি অনিবার্য্য। বিশেষতঃ, বিলাতে যখন যুদ্ধ বাধিয়াছে, তখন বৃটিশ জাতির আয়বৃদ্ধি না করিলে চলে না। সুতরাং ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড় আরও বেশী যে কোন

প্রকারে কাটাইতেই হইবে। ইহারই জন্য ১৭ই এপ্রিলের ব্যবস্থা—ইহা বুঝিতে কারও কষ্ট হয় না।

প্রশ্ন উঠে—এই বৃটিশ-ভারত বাণিজ্যচুক্তিতে কি ভারতবাসীর সায় আছে? ইহা কি ভারতের অনুমোদন লইয়া হইয়াছে? সে প্রশ্ন এখন নিরর্থক—কারণ ভারত-গভর্ণমেণ্ট যাহা করিতেছেন, তাহাতে ভারতবাসীর আন্তরিক অনুমোদনের কথা কোন ব্যাপারেই উঠে না। যাঁহাদের হাতে ক্ষমতা আছে, তাঁহারা ভারতের বাজার নিজ অনুকূলেই নিয়ন্ত্রিত করিবেন, ভারতবাসী সেখানে কিছু বলিলেও, তাহা মূল্যহীন। তবু আন্তস্বরে ভারতবর্ষ জিজ্ঞাসা করিবে—এই যুদ্ধকালে ভারতীয় শিল্পের পোষণ ও প্রসার ভারত গভর্ণমেণ্টের অন্যতম নীতি বলিয়া বারম্বার ঘোষণা করা হইয়াছে, সে নীতির মর্য্যাদাও কি এই ব্যবস্থায় রক্ষিত হইয়াছে?

## সুজাতা সরকারের মামলা

সুজাতা সরকারের মামলার রায় বাহির হইয়াছে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আপীলের রায় প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন—প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়ে নাই, কিন্তু "ঐ লোকই সুজাতার গর্ভ সঞ্চার করিয়াছিল এবং তাহার পর আপনাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ঊষা নলিনীকে আহ্বান করিয়াছিল।"

বাঙালী জিজ্ঞাসা করিবে—এইরূপ গুরুতর অপরাধের অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ও তাহাকে আদর্শ দণ্ডে দণ্ডিত করিবার কোনও ব্যবস্থাই কি বাংলা গভর্ণমেণ্টের হাতে নাই? ঊষানলিনীকে হাইকোর্ট মৃদুতম শাস্তি দিয়াছেন সম্ভবতঃ সে স্ত্রীলোক বলিয়াই। আমরা এই ক্ষেত্রে দণ্ডবৃদ্ধির অজুহাত তাই তুলিব না। কিন্তু ঊষানলিনী যখন এই ব্যাপারে সত্যই জড়িতা বলিয়া প্রমাণিত হইল, তখন সে যে প্রকৃত অপরাধী সম্বন্ধে কিছুই জানে না, ইহা কাহারও মনে হইবে না। তাহার নিকট হইতে যথার্থ আসামীকে খুঁজিয়া বাহির করার কি কোনও হদিস পাওয়া সম্ভব ছিল না? আসামী যেই হউক, সে যে ধনী ও প্রভাবশালী, ইহা হাইকোর্টের বিচারপতিও স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তি এত বড় গুরুতর ও জঘন্য অপরাধ করিয়াও সমাজের মধ্যে বেপরোয়াভাবে বাস করিবার সুযোগ পাইল—সম্ভবতঃ আরও এরূপ অপরাধ করারও ভবিষ্যতে সম্ভাবনা রহিয়া গেল—ইহা কি গভর্ণমেণ্ট ও বিচারবিভাগ কেহই দেখিবেন না? সর্ব্বোপরি, বাংলার শিক্ষিত সমাজকে আমরা আগেও বলিয়াছি, এখনও বলিব—যে প্রগতির গুণে সুজাতা সরকারের ন্যায় শিক্ষিতা কুমারীর শোচনীয় পরিণতি অসম্ভব হয় না, সে প্রগতি সম্বন্ধে সতর্ক হওয়ার খুবই প্রয়োজন আছে। এখনও সময় আছে। সমাজ-জীবনে যে বিষ সঞ্চারিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে যদি এখনও আমরা সজাগ না হই, ইহা কত দূরে গভীর নিরয়ে আমাদিগকে লইয়া ফেলিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। ব্যাধি প্রতিকারের অতীত হওয়ার পূর্ব্বেই জাগরণ বাঞ্ছনীয়।

## কর্পোরেশনের কর্তৃ নির্ব্বাচন

কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নির্ব্বাচন এবং মেয়র ও ডেপুটী মেয়রের পদগ্রহণ শেষ হইয়াছে। এই ব্যাপারে কলিকাতার পৌর মনোবৃত্তির উপর যে অভাবনীয় আঘাত পড়িয়াছে, তাহার জন্য অনেকেই কল্পনায় পর্য্যন্ত প্রস্তুত ছিলেন না। বসু ও লীগ চুক্তিই ইহার মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়জনক ব্যাপার। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রকে বাংলার রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বভাবতঃ অনেকেই যে সমুচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন, মনে হয়, এই ঘটনার পর তাঁহাদের পক্ষে সেই মনোভাব রক্ষা করা কঠিন হইবে। অন্ততঃ কলিকাতাবাসী বাঙ্গালী হিন্দুগণ এই চুক্তি কখনও তুষ্ট চিত্তে অভিনন্দন করিতে পারিবেন না। সুভাষচন্দ্র এ সম্বন্ধে যে সকল বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা পড়িয়াও হিন্দু জনসাধারণের এ সংশয় ঘুচিবে না যে, এ বসু-লীগ চুক্তি ছাড়া হিন্দু বাঙালীর তথা কলিকাতাবাসীর প্রকৃত স্বার্থ-রক্ষার আর কোন উপায়ই ছিল না। পরন্তু হিন্দু মহা-সভার প্রতিনিধিবৃন্দকে লইয়া সুভাষচন্দ্র যদি যুক্ত দল গড়িয়া তুলিতেন, তাঁহারা শুধু সংখ্যাধিক্যে বিজয়ী হইতেন না, সেই যুক্ত দলের উপর বাঙালী হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই ইহার অধিক আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেন।

আমরা দৃঢ় স্বরেই বলিতে পারি, অন্য ক্ষেত্রের ন্যায় এই ক্ষেত্রেও মুসলেম লীগ বাংলার জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের যথার্থ প্রতিনিধি নহেন বলিয়া তাঁহাদেরও আস্থাভাজন হইতে পারেন না। সুভাষচন্দ্রই কি বলিতে পারেন যে, মিঃ সিদ্দিকি অথবা মিঃ ইস্পাহানি বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রকৃত আস্থাভাজন?

অবশ্য যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার উপর আর হাত নাই। ইহার ফলাফল কিন্তু এইখানেই নিঃশেষিত হইলে কথা ছিল না। আমাদের আশঙ্কা হয়, কর্পোরেশনের কমিটীগুলির নির্ব্বাচনের সময়েই এই প্যাক্টের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা অচিরাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। কমিটীর সদস্যনির্ব্বাচনে বাঙালী মুসলমান ঠাঁই না পাইলে, তাঁহারা ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইবেন। সুভাষচন্দ্রের দলও হয়ত আরও আত্মদানের মূল্য না দিয়া তাহাতে উপযুক্ত স্থান পাইবেন না। এইরূপে বর্ত্তমান প্যাক্টে যে ভাঙ্গন ধরিবে, তাহা আর কোন মতেই জোড়া লাগিবার নহে। আমরা বলিব—সুভাষচন্দ্র যদি হিন্দু মহাসভার সহিত মৈত্রীবদ্ধ হইতেন, লীগের সহিত মিলনের সম্ভাবনা তাহাতেও ব্যাহত হইত না। বরং তখন মুসলিম লীগের সহিত এই সম্মিলিত রাষ্ট্রদল অধিকতর সম্মানকর চুক্তি করিবারই সুযোগ লাভ করিতেন। আমরা এই ব্যাপারে মুসলিম লীগের দৃঢ়তাদর্শনে বরং তাঁহাদেরই অকুণ্ঠ প্রশংসা করিব। তাঁহাদের আত্মনিষ্ঠাই তাঁহাদিগকে এই জয়দান করিয়াছে। মিঃ সিদ্দিকীর উপর আমাদের কোনও ব্যক্তিগত অনাস্থা নাই। তিনি দৃঢ়স্থির ও আত্মবিশ্বাসী মুসলিম নেতা। বাংলার ভাব, ভাষা, স্বার্থের সহিত যদি তিনি মমত্বপূর্ণ পরিচয় স্থাপন করিতে পারেন ও অতঃপর ইহাই তাঁহার পৌরকার্য্যের সাধ্যস্বরূপ হইয়া উঠে, তিনি সহরের প্রধান নাগরিক-পদ কৃতিত্ব ও গৌরবের সহিত অলঙ্কৃত করিতে পারিবেন—এই আন্তরিক বিশ্বাস লইয়াই আমরা প্রতীক্ষা করিব।

## পাকিস্থান

মিঃ জিন্নার পাকিস্থান পরিকল্পনাটী মুসলমান সমাজেই আমল পাইতেছে না। লীগের বাহিরের ও ভিতরে কেহই এ সম্বন্ধে একমত নহেন। লীগের বাহিরে যাঁহারা, তাঁহারা 'পাকিস্থানদিবসের' প্রতিবাদে 'হিন্দুস্থান দিবস' ঘোষণা করেন। এই হিন্দুস্থান-দিবসের সাফল্যে বিরোধী দলেরই প্রবলতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। কাশ্মীরের জননেতা শেখ আবদুল্লা বলিয়াছেন—"কাশ্মীরের প্রতি যে নীতি প্রয়োগ করা হইবে, হায়দ্রাবাদের প্রতিও সেই নীতি অবশ্যপ্রযুজ্য।" ইহার অর্থ, মুসলমানপ্রধান কাশ্মীরে যদি হিন্দুরাজ্যের উচ্ছেদে মুসলিমরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে হিন্দুপ্রধান হায়দ্রাবাদেও মুসলমান রাজ্যের অবসানে হিন্দুরাজ্যস্থাপন অবশ্যকরণীয়। মিঃ জিন্না কি এই ব্যবস্থায় সম্মত আছেন? তিনি মিঃ শেখ আবদুল্লার প্রশ্নের উত্তর দেন নাই—উত্তর দিবার মত কোনও যুক্তিই তাঁহার তূণে সম্ভবতঃ নাই। মুসলমান-প্রধান সীমান্ত প্রদেশ হইতেও জননায়ক খাঁ আবদুল কোয়ায়েম অমৃতসরে জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনে দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছেন—"হিন্দু বা শিখ সমাজের পাকিস্থান প্রস্তাব লইয়া উদ্বিগ্ন হইবার কোনই কারণ নাই। পাঠানেরাই এই প্রস্তাব ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিবে।"

এদিকে মুসলীমলীগ নেতা সিন্ধুবাসী স্যার আবদুল্লা হারুণও এতদিন পরে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতের মুসলমানসম্প্রদায়ের শতকরা ৯০ জন মূলতঃ হিন্দুরক্ত-সম্ভূত। সুতরাং ভারতকে মাতৃভূমি বলিয়া দাবী করার মৌলিক অধিকার বর্ত্তমান হিন্দুদেরই একচেটিয়া নহে। এই কথাই তো মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া, জাতীয়তাবাদী হিন্দুমুসলমান সকলেই বলিয়া আসিতেছেন। শতকরা ৯০ জন যদি হিন্দুবংশোদ্ভব বলিয়া ভারতকে মাতৃভূমিরূপে স্বেচ্ছায় বরণ করে, তবে শতকরা বাকী ১০ জন মুসলমানের অনিচ্ছাসত্ত্বেও হিন্দুস্থানকেই ধর্ম্মমাতা বলিয়া গ্রহণ করা ছাড়া শ্রেয়ঃ নাই, ইহাও তাঁহাদের বুঝা উচিত। আমরা আশা করি, অতঃপর যুক্তি, প্রমাণ ও অন্তরের সাধু ইচ্ছা সম্মিলিত করিয়া পাকিস্থান প্রস্তাব স্বয়ং মুসলমান জনসাধারণ ও সুবুদ্ধি নেতৃগণই চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া জলাঞ্জলী দিবেন। কংগ্রেস অথবা লর্ড জেটল্যাণ্ড কাহারও এই দুঃস্বপ্ন লইয়া আর মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হইবে না।

# রজত-জয়ন্তী উৎসবে

## শুভেচ্ছা

পত্র পাইলাম, সাড়ে তিন বৎসর ক্রমশঃ একেবারেই দৃষ্টিহীন হইয়াছিলাম। গত ডিসেম্বরে একটা চক্ষে অস্ত্রোপচার হইয়া আবার পৃথিবীর আলো দেখিতে, এমন কি একটু লেখাপড়াও করিতে পারিতেছি। প্রবর্ত্তক বহুদিন পরে দেখিলাম। আমার এই নূতন দৃষ্টিতে সকলই সুন্দর লাগিতেছে। যাহা প্রকৃতই সুন্দর তাহা সুন্দরতরই ঠেকিবে, ইহা অসঙ্গত নয়। প্রবর্ত্তকের 'রজত জয়ন্তী'তে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি। এক সুদূর দিনে ইহার স্বর্ণ জয়ন্তী হইবে, এমন স্বপ্নও দর্শন করিলাম। আমার শুভাশীর্ব্বাদ সেদিনের জন্যও প্রবর্ত্তকের ভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিল। ইতি—৫।১।৪৭

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

স্বস্তি শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মণঃ পরম শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপনমেতৎ—

আয়ুষ্মন্। স্বয়ং লিখিতে পারিলাম না। প্রবর্ত্তকের রজত জয়ন্তীর উপহার শ্রীমান্ সঞ্জীব দ্বারা প্রেরণ করিলাম। আশীর্ব্বাদ করি—প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ শাস্ত্রানুগতভাবে সুনিয়ন্ত্রিত সুগঠিত হইয়া বঙ্গভূমির কল্যাণ সাধন করুক।·· প্রবর্ত্তকে লিখিবার সামর্থ্য এখন আমার নাই। মাসখানেক হয়ত জীবিত আর থাকিব। শাক্তবাদ-প্রচারই এখন আমার কার্য্য। সঙ্ঘসহ আপনাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিতেছি।

আপনার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা 'গ্রহচক্র' অপূর্ব্ব হইয়াছে। ৭ই বৈশাখ।

প্রবর্ত্তকের রজত জয়ন্তী বর্ষের প্রথম সংখ্যা পত্রিকা ও তৎসঙ্গে আপনার চিঠিখানা পাইয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। প্রবর্ত্তকের এই রজত জয়ন্তী বর্ষের আরম্ভে সঙ্ঘ, সঙ্ঘ-নেতা, সঙ্ঘবাণীরূপা পত্রিকা এবং সঙ্ঘকর্ম্মিবৃন্দকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

প্রবর্ত্তক মাসিক পত্রকে আমরা বাংলার আধুনিক বহু সংখ্যক মাসিক পত্রের মধ্যে সাধারণ একখানা মাসিক পত্র বলিয়া গ্রহণ করি না—জাতীয় জীবনে ইহা একটা অনন্য-সাধারণ স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। অন্যান্য পত্রিকার ন্যায় প্রবর্ত্তক কোন একটা বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্যামোদীদের অবসর বিনোদন বা বিলাসের ক্ষেত্র নয়, কিংবা ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় কোন একটা বিশেষ মতবাদের বাহকও নয়, অথবা সাময়িক বিচিত্র রুচির রসদ যোগাইবার জন্য একটা ব্যবসাও নয়।

প্রবর্ত্তক ভারতীয় প্রাণের যুগোপযোগী একটা বিশেষ অভিব্যক্তি। ভারতীয় প্রাণ স্বভাবতঃ অধ্যাত্মনিষ্ঠ। অধ্যাত্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া বিশ্বাত্মভাবে অকুণ্ঠ প্রতিষ্ঠা লাভ করাই—ব্যষ্টিজীবনে সমষ্টি আত্মার অখণ্ড পূর্ণতা উপলব্ধি করাই তাহার স্বভাব-নিহিত আদর্শ। এই স্বভাবকে ভিত্তি করিয়া, এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া, এই সাধনাকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের সুস্থ অবস্থায় পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবন গঠিত হয়, অর্থ-সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা হয়, সামাজিক মর্য্যাদা নিরূপিত হয়, রাষ্ট্রের গঠন-তন্ত্র নির্দ্ধারিত হয়, যুগ সন্ধির ঘূর্ণিপাকে, বিজাতীয় ভারতবর্ষের প্রচণ্ড আঘাতে, রাষ্ট্রিক পরাধীনতার নিষ্পেষণে এবং সমাজাভ্যন্তরে আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতির প্রাবল্য, ভারতের প্রাণ মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত ও আপাততঃ স্বভাব বিচ্যুত হইলেও, এই প্রাণের যেমন মৃত্যু নাই, ইহার স্বভাবের তেমনি বিনাশ নাই। ইহার স্বভাবে যখনই গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই ইহার মধ্যে নূতন শক্তির আবির্ভাব দৃষ্ট হয়, তখনই যেন আপনাকে আপনি নূতন-রূপে উপলব্ধিগোচর ও স্বপ্ন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এই অমর প্রাণ বিশেষ বিশেষ শক্তিশালী সাধনসম্পৎসম্পন্ন মহাপুরুষরূপে দেহ পরিগ্রহ করে, বিশেষ বিশেষ সঙ্ঘের

ভিতর দিয়া আপনার স্বরূপটী উজ্জ্বলরূপে প্রকটিত করে, বিশেষ বিশেষ মন্ত্র বা বাণীরূপে আপনার স্বভাবনিহিত আদর্শটাকে লোকবুদ্ধির সম্মুখে উপস্থাপিত করে। বর্ত্তমান যুগসন্ধির ঘূর্ণিবায়ুর আবর্ত্তনের মধ্যেও সনাতনী ভারতীয় প্রাণশক্তি পুনরায় স্ব-স্ব রূপে প্রতিষ্ঠালাভের নিমিত্ত রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ, অরবিন্দ প্রমুখ মহাপুরুষগণের অধ্যাত্মসাধনসমুজ্জ্বল অসাধারণ মহিমমণ্ডিত জীবনের ভিতরে বিশেষভাবে আত্মপ্রকট করিয়াছে। সেই প্রাণশক্তিই শ্রীমতিলালের প্রাণকে অনুপ্রাণিত করিয়া প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মধ্যে একটা বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সেই প্রাণেরই বাণী প্রবর্ত্তক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ভাষাময়ী মূর্ত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠকবর্গের হৃদয়ে সেই মহান্ আদর্শের প্রেরণা জাগাইয়া থাকে।

মানবীয় সাধনায় কোন বিভাগই ইহার দৃষ্টি হইতে বাদ পড়ে না। রাষ্ট্র ও সমাজ, শক্তি ও সম্পদ্, কৃষি ও কৃষ্টি, শিল্প ও বাণিজ্য, লৌকিক কর্ম্ম ও উপাসনা, লৌকিক জ্ঞান ও তাত্ত্বিক জ্ঞান, সর্ব্ববিধ সাধনারই প্রবর্ত্তনা প্রবর্ত্তকের বাণী হইতে লব্ধ হইয়া থাকে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সঙ্ঘবদ্ধ সাধনার ধারাও বিচিত্র শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু অধ্যাত্মনিষ্ঠাই সর্ব্ববিধ সাধনার ভিত্তিস্বরূপ, আধ্যাত্মিক প্রেরণাই সকল কর্ম্মের প্রাণস্বরূপ, আধ্যাত্মিক শক্তিই সকল কর্ম্মশক্তির উৎস-স্বরূপ। জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগের সাধনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রবর্ত্তক যেমন সজাগ, তেমনি প্রত্যেক বিভাগের সাধনাকে অধ্যাত্মসাধনার অঙ্গীভূত এবং আধ্যাত্মিক আদর্শ দ্বারা সঞ্জীবিত ও যোগযুক্ত করিয়া লইবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও তাহার দৃষ্টি অবিচলিত—ইহাই প্রবর্ত্তকের বৈশিষ্ট্য। প্রবর্ত্তক ২৫ বৎসর যাবৎ এই সাধনা করিয়া আসিতেছে এবং সমাজকে এই বাণী শুনাইয়া আসিতেছে। আরও সুদীর্ঘকাল সুনিয়তভাবে এই মহতী সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া প্রবর্ত্তক ভারতীয় প্রাণের পূর্ণ স্বরূপটী জাতীয় সাধনাক্ষেত্রে সমুজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করুক, ভারত ও বিশ্বের প্রাণদেবতার নিকট ইহাই প্রার্থনা করি। ৯ই বৈশাখ।৫০।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মৃতি লইয়াই যখন মানবলীলা এবং স্মৃতির জাগরণেই যখন মানবজীবন রক্ষা করা সম্ভব, তখন স্মৃতির পূজাই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য ও করণীয়। প্রবর্ত্তকের রজত জয়ন্তী প্রথম সংখ্যা সাদরে গ্রহণ করিলাম। আপনি আমার সহৃদয় এক ছত্র বাণী প্রার্থনা করিয়াছেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে বাণীর প্রচার বিশেষ সম্ভবপর নহে। পরন্তু আপনার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করার সামর্থ্যও আমার নাই। এই বাণী পাঠাইতেছি যে, আপনি যে মহৎ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন এবং যে কার্য্যে আপনি নিজ উৎসাহ ও উদাহরণ দ্বারা কর্ম্মিবৃন্দ গঠিত করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা আপনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া সঙ্ঘের জ্যোতিঃ বিকাশ করুন। ইতি—১২ই বৈশাখ।

শ্রীবিজয়চাঁদ মহাতব

মহারাজাধিরাজা, বর্দ্ধমান।

'প্রবর্ত্তক' পত্রিকার 'রজত জয়ন্তী' উৎসব উপলক্ষ্যে প্রবর্ত্তকের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে অভিনন্দন করিতেছি। প্রবর্ত্তক আজ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া নানা ভাবে সাহিত্যের ও ধর্ম্মের সেবা করিতেছে। যাহারা প্রবর্ত্তক নিয়মিত ভাবে পাঠ করেন তাঁহারা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন—ঐ সেবা অনেক অংশে সফল ও সার্থক হইয়াছে। আমি প্রবর্ত্তকের দীর্ঘজীবন ও প্রচুরতর সাফল্য কামনা করি। ইতি—২২ ৪. ৪০

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বব্যাপী অশান্তির মূল কারণ কর্ম্ম ও ধর্ম্মের বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ দূরীকরণ কল্পেই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। "প্রবর্ত্তক" পত্রিকা এই উচ্চ আদর্শের মুখপত্র বলিয়া আমি ইহাকে অতি সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকি। তাই "প্রবর্ত্তক" পত্রিকার জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে আমার হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। "প্রবর্ত্তক", সত্যই জয়ন্তী উৎসবের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে; কারণ ইহা আজীবন কর্ম্ম ও ধর্ম্মের, দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের উচ্চ আদর্শের প্রবর্ত্তনেই আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছে। সুতরাং "প্রবর্ত্তক" জয়ন্তী উৎসব

সত্যের, কর্ম্ম ও ধর্ম্মের জয়ন্তী উৎসব, প্রেমের ও সেবার জয়ন্তী উৎসব।

আমার আত্মার মিলন ও আনন্দ অভিবাণী এই উৎসবের পূর্ণতায় অঙ্গীভূত হউক। উৎসব সফল হউক, সার্থক হউক! "প্রবর্ত্তকে"র বিজয় অভিযানের নবপ্রেরণা সঞ্চার করুক! ইতি—

জয় সোণার বাংলার! জয় সোণার ভারতের! জয় সোণার ভুবনের! ১০ই বৈশাখ '৪৭।

গুরুসদয় দত্ত

প্রবর্ত্তকের সাধনা ও লক্ষ্য সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা আমাদের যতই বাড়িয়া উঠিবে, ততই ভগবদ্বিশ্বাসের ভিত্তিতে সত্যাশ্রয়ী বীর্য্যবন্ত মানুষ হিসাবে আমাদের মর্য্যাদা হইবে। যে চরিত্রগঠনের ভিত্তিতে সঙ্ঘের স্থাপন, তাহার অভাব যে আমাদের সমাজে, প্রতিষ্ঠানে ও পারিবারিক জীবনে বিশৃঙ্খলা আনিয়াছে তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। "প্রবর্ত্তক" এর রজত জয়ন্তী স্মরণ করাইয়া দিল যে, মেঘসমাবেশের পশ্চাতেও দীপ্তির আভাষ রহিয়াছে।

যে দেশে প্রবর্ত্তকের বহুমুখী সাধনা সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, সে দেশের সম্পর্কে নৈরাশ্য যুক্তিহীন।

নব যুগের স্বপ্ন দেখা এক কথা—সে যুগের উপযোগী জীবনগঠন ও জাগ্রত চেতনা অন্য জিনিষ। আমরা কল্পনা-বিলাসী কার্য্যক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়া পড়ি, আদর্শচ্যুতিকে নানা অজুহাতে সমর্থন করি। "প্রবর্ত্তক"-এর মধ্য দিয়া এই ক্লৈব্যের, উচ্ছৃঙ্খলতায়, অসংযমের ও স্বধর্ম্মবিমুখতার বিরুদ্ধে যে সমাহিত কণ্ঠ ধ্বনিত হয় তাহাকে অভিবাদন করি। সে বাণী যেন আমাদের মর্ম্মকে শুধু স্পর্শ নয়, হিল্লোলিত করিয়া তুলে। ২২।৪।৪০

শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবর্ত্তকের রজত জয়ন্তী প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। "প্রবর্ত্তক", হিন্দু কৃষ্টির নব দ্যোতনার বাহক; এই হিন্দু কৃষ্টিতে নরনারীর সমান স্থান এবং সকল শ্রেণী, ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা শত শত শতাব্দী ধরিয়া পরিস্ফুট। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ ও প্রবর্ত্তকের কর্ম্মিবৃন্দ আমার প্রাণের বন্ধু, তাঁহাদের সর্ব্ববিধ কার্য্যের প্রতি আমার আধ্যাত্মিক অনুরাগ আছে। প্রবর্ত্তকের বহুল প্রসার কামনা করি, কারণ ভারতীয় সাধনায় বৃদ্ধি, ত্যাগ ও নিষ্ঠা দ্বারায় নব প্রতিষ্ঠা না হইলে, ভারতের স্বাধীন-সত্তা পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে না। অলমতিবিস্তরেণেতি। ২৩ ৪ ৪০।

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবর্ত্তকের রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে পত্রিকার সম্পাদক ও প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দু জাতিকে স্বগৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার বাণী প্রবর্ত্তকের মধ্য দিয়া তিনি বাঙালী জাতিকে শুনাইয়া আসিতেছেন এবং সংহতি গঠন করিয়া সেই বাণীর রূপ দিয়া তিনি বাঙালী হিন্দু মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রবর্ত্তকের উন্নতি ও সমৃদ্ধি প্রার্থনা করি। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের সাধনা জয়যুক্ত হউক। ইতি ১২ই বৈশাখ।

শ্রীশশিকান্ত আচার্য্য
মহারাজা ময়মনসিংহ।

প্রবর্ত্তকের জয়ন্তী উৎসবে আমি আমার অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সামান্য আরম্ভ থেকে প্রবর্ত্তক কতদূর আজ অগ্রসর হয়েছে, তার বিবরণ থেকেই সঙ্ঘ ও সম্পাদক যথেষ্ট উৎসাহ ও আশার উপাদান পাবেন, যাঁরা এর হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁরাও তৃপ্তির সহিত এর উজ্জ্বল হ'তে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের আশা ও প্রতীক্ষায় আনন্দ লাভ করবেন। আমার মত সামান্য লোকের শুভাকাঙ্ক্ষা তাঁদের উৎসাহবৃদ্ধির সহায়তা করবে কি না জানি না; কিন্তু আমার অন্তরের আনন্দ ও অভিনন্দন জানিয়ে আমি নিজে অশেষ তৃপ্তিলাভ করছি। ইতি—
২৪—৪—৪০।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

'প্রবর্ত্তকের' জয়ন্তীটা অনেক বাঙালীর পক্ষেই জয়ন্তী। এই বছর পঁচিশেকের ভিতর যুবক বাংলা নির্ম্মাণদক্ষতায় অনেকখানি বাড়িয়েছে। দেশবিদেশের নানা কর্ম্মক্ষেত্রে ও চিন্তাক্ষেত্রে বাংলার নরনারী নিজের ঠিকানা কায়েম করিতে পারিয়াছে। ঠিকানাগুলো নিরেট, ও মজবুত ইমারতের উপরই বসানো হইতেছে। বাঙালী জাতের এই সব কৃতিত্বের ভিতর "প্রবর্ত্তকের" ইসারা আর ইঙ্গিতও বেশ মালুম হয়। ২৭. ৪ ৪০

বিনয় সরকার

প্রবর্ত্তক রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। কেবল মাত্র আপনাদের পত্রিকার নহে, আপনাদের সঙ্ঘ, শক্তি ও সাধনার আমি একজন ভক্ত এবং সেই হিসাবে এই আনন্দ-উৎসবে বিশেষ করিয়া উৎসাহ বোধ করিতেছি।

সাধারণভাবে আমি বহুদিন হইতেই আপনাদের পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক এবং আপনাদের প্রবর্ত্তিত নানা অনুষ্ঠানের সহিত আমার অন্তরের সহানুভূতি আছে। সাধ্যশক্তি অনুসারে মধ্যে মধ্যে আপনাদের পত্রিকায় কিছু কিঞ্চিৎ লিখিয়াও থাকি এবং একাধিকবার একাধিক-ভাবে আপনাদের চন্দননগরের পুণ্য-অনুষ্ঠানে যোগদানও করিয়াছি। এই সুদীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় ভারতীয় সংস্কৃতি-সাধনা ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি আপনাদের অবিচলিত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আপনাদের বিপুল কল্পনা, বিচিত্র কর্ম্মশক্তি ও বিরাট্ রাষ্ট্র-সাধনা আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার সামগ্রী। ২৭. ৪. ৪০

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

রাজনৈতিক দলাদলি, ব্যক্তিগত বিদ্বেষজনক গালাগালি ও অর্থনৈতিক কড়াকড়ির বিষাক্ত আব্‌হাওয়ার ঊর্দ্ধে থাকিয়া, "প্রবর্ত্তক" সত্য ও শিবকে পুরোভাগে রাখিয়া সৌন্দর্য্যের যে সাধনা করিতেছে, তাহাতেও ক্ষুদ্র হইলেও, অন্তরশক্তিতে মহীয়ান্ 'এই শক্তিশালী সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছে। "প্রবর্ত্তকের" লেখক ও পাঠকগণের যুক্ত সাধনায় আমাদের দেশ ও সমাজ সকল প্রকার অত্যাচারের নিষ্পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হউক—ইহাই প্রার্থনা। ২৭. ৪. ৪০

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

সম্প্রতি 'প্রবর্ত্তকের' রজত জয়ন্তী উৎসব সুসম্পন্ন হওয়ার সংবাদে যারপরনাই আনন্দিত হইলাম। আমি 'প্রবর্ত্তকের' শুভানুধ্যায়ী—'প্রবর্ত্তক' এবং প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকি এবং আন্তরিক ভালবাসি। সুতরাং আমার পক্ষে 'প্রবর্ত্তকের' রজত জয়ন্তীতে আনন্দিত হওয়া বিচিত্র নহে।

বাংলার জল-বায়ুর দোষে বা যে কোনও কারণেও হউক, বাংলার মাসিক পত্র দীর্ঘায়ুঃ হয় না। 'বঙ্গদর্শন', 'আর্য্যদর্শন', 'নবজীবন', 'ভারতী', 'নব্য ভারত', 'প্রচার' 'সাধনা' ও 'সাহিত্য' প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রের অকালে তিরোভাব তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'প্রবর্ত্তক' যে পঁচিশ বৎসরকাল সগৌরবে টিকিয়া আছে এবং একনিষ্ঠ-ভাবে আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিয়া দেশের ও দশের সেবা করিয়া আসিতেছে, ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। 'প্রবর্ত্তক' ধর্ম্মকে কোণঠাসা করিয়া কোন দিন রাখে নাই। ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মই ইহার রক্ষা-কবচ। কেবল পঁচিশ বৎসর কেন, আরও কত পঁচিশ বৎসর কাটিয়া যাইবে, বয়োবৃদ্ধির সহিত জরার পরিবর্ত্তে কর্ম্ম-শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহা দেশবাসীকে কল্যাণের পথে আগাইয়া দিবে, ইহাই আমার বিশ্বাস।

বাংলার জাতিগঠনে মতিবাবুর দান অতুলনীয়। সঙ্ঘের মুলপত্ররূপে 'প্রবর্ত্তক' সঙ্ঘের আদর্শবাদ এবং ধর্ম্ম ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়প্রচার দ্বারা দেশ ও দশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। ইহাদের কর্ম্মপন্থা দেখিয়া মনে হয়—দেশ আবার ধর্ম্মে ও কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হইবে এবং বিশ্ব দরবারে সম্মানের স্থান অধিকার করিয়া সুখ-সম্পদে গরীয়ান্‌ও নব-গৌরবে গৌরবান্বিত হইবে। 'প্রবর্ত্তকে'র তথা সঙ্ঘের সুমহান্ উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হউক—মতিবাবু দীর্ঘায়ুঃ হউন। ১৯শে বৈশাখ।

কুমার শ্রীমুনীন্দ্র দেবরায়-মহাশয়

# সমালোচনা

**সদ্‌গুরু-সঙ্গে—কুলদানন্দ।** শ্রীব্যোমকেশ কোঙার বি-এ প্রণীত। মূল্য—১।০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভস্মে ঢাকা অগ্নিকুণ্ড ছিলেন। তাঁহার মর্ম্ম-সংগোপিত তপস্যার বীর্য্য জাতির অভ্যুদয়-পথে অন্যতম প্রধান সহায়। এ গোপন মর্ম্ম এখনও সম্যক্ উদ্ঘাটিত হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন—"The truth which Goswami Vijoykrishna hid within himself has not yet revealed itself—it is not even understood." এ গুপ্ত অগ্নিকুণ্ডের একটা জ্বলন্ত কণিকা—ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ। ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীকে বুঝিলে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের জীবনের একটা দিক্ হয়ত কতকটা বুঝা যাইতে পারে। ব্রহ্মচারীর স্বলিখিত কয়েক খণ্ড আত্মচরিত "শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। আলোচ্য গ্রন্থ উক্ত রত্নভাণ্ডার হইতে সঙ্কলিত এবং এই সঙ্কলন অতি উপাদেয় হইয়াছে। লেখক শ্রদ্ধার সহিত ব্রহ্মচারীর পুণ্য জীবনী অধ্যয়ন করিয়াছেন—শ্রদ্ধার সহিত চিন্তাশীলতা, সুনিপুণ বিশ্লেষণ-ক্ষমতার মিশ্রণে এই চরিত-গ্রন্থ ধর্ম্মপিপাসুজনের চিত্ততৃপ্তির সঙ্গে সাধক ও সাধন সম্বন্ধীয় জ্ঞান বৃদ্ধিও করিবে। আমরা বইখানি পড়িয়া বিশেষ তৃপ্তি পাইয়াছি। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী যেমন স্বচ্ছ, তেমনি ভাষা ও রচনাভঙ্গীও সাবলীল, প্রাঞ্জলতাপূর্ণ। ইহা তরুণদের অবশ্য পাঠ্য ধর্ম্মগ্রন্থ হওয়া উচিত।

**শক্তিবাদ**—(রাজনীতি সম্বন্ধে শক্তিশালী মতবাদ) ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ প্রণীত। মূল্য—॥০ আনা মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক ইতিপূর্ব্বে "ক্রমবিকাশের পথে" লিখিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

মানুষের অন্তর্নিহিত দৈববৃত্তিগুলির উন্মেষ সাধন করিয়া উহারই বিকাশের অনুকূল ও ক্রমোন্নতির সহায়ক সমাজ, রাষ্ট্র, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন—ইহাই গ্রন্থকারের উদ্দিষ্ট শক্তিবাদ এবং ৫১টী অনুচ্ছেদে তিনি তাঁহার দার্শনিক আদর্শ বিশদীকৃত করিয়াছেন। তারপর তাঁহার এই দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে তাঁহার শক্তিবাদের সহিত গান্ধীবাদ সোশ্যালিজম, ফ্যাসিজমের তুলনায় বৈষম্য, ভারতের সহিত বৃটেনের সম্পর্ক ও ভারতের স্বাধীনতা, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, কমিউন্যাল এওয়ার্ড প্রভৃতি বিভিন্ন প্রচলিত সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। নারী সম্বন্ধে লেখকের কথা "প্রত্যেকটী নারীর পিছনে কেন্দ্রীয় শক্তির এতটা শক্তি কেন্দ্রীভূত থাকিবে যে, দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত একজন নারী একা বিচরণ করিতে থাকিলেও, কোথাও তাহার উপর অমর্য্যাদার ব্যবহার করিতে কেহই সাহস করিবে না।" তিনি নারীজাতির পর্দ্দাপ্রথার সমর্থন করেন না, ইহা ভারতীয় কৃষ্টির বিরোধী। আবার সহশিক্ষারও তিনি বিরোধী—যদিও রাষ্ট্রজীবনে পুরুষের সহিত নারীর সমান মর্য্যাদা তিনি স্বীকার করেন। আমরা এই সকল প্রায়শঃ সমর্থনযোগ্য মনে করি।

মোটের উপর, যাঁহারা গ্রন্থকারের উদ্ভাবিত ১৬শ কলা মানব মস্তিষ্কের সংগঠন তত্ত্বের বিষয় এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সেই তত্ত্বের প্রয়োগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইবেন, তাঁহারা প্রচুর চিন্তার খোরাক এই ছোট বইখানির মধ্যে পাইবেন। এই মতবাদ অভিনব হইলেও, চিন্তাকর্ষক।

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

**কালীপূজা চিত্রাবলী**—শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত। ৯ ফর্ম্মা, আর্ট পেপারে মুদ্রিত।

পুস্তকখানির ছাপা, বাঁধাই পরিষ্কার। ভাবব্যঞ্জক ৩৪টী সংক্ষিপ্ত লিখন, প্রত্যেকটী লিখনের ডানদিকের পাতায় তাহাই যথাযথ অভিব্যক্তি লইয়াছে রেখাঙ্ক-চিত্রে।

মানুষের অন্তরে জন্মাবধি যে একটা অহেতুক ভয় জন্মিয়া থাকে, জ্ঞানের উন্মেষে ক্রমশঃ তাহা কাটিয়া গেলে জীবনের পরশে সে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। জীবনের সত্যস্বরূপের সন্ধান পাইয়া তখন সে দেখিতে পায়—তারই ভিতরে অনন্ত জীবনের প্রবাহরূপ অসীম শিবের অবস্থিতি, আর সেই নিত্যস্থির শিবের বুকের উপর অতীত বিধ্বংসিনী, বর্ত্তমান পালিনী, ভবিষ্যৎ সৃজনকারিণী, শক্তিরূপিণী কালী চিরকাল ধরিয়া নাচিয়া চলিয়াছেন। জীবনের এই সত্যস্বরূপ মানুষের উপলব্ধিগম্য হইলে, তখন তার সমস্ত ভেদজ্ঞান দূর হইয়া যায়। এই আদর্শকে জীবনে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার জন্যই ভাবসাধনার প্রতীকরূপে কালীমূর্ত্তিকে হিন্দুর মন্দিরে মন্দিরে স্থাপনা করা হইয়াছে।

অধ্যাত্মসাধনার অন্তর্নিহিত এই সঙ্কেতটী গ্রন্থকারদ্বয় পর পর ৩৪টী চিত্রে সুন্দর রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং চিত্রগুলির ঠিক পাশে পাশেই সরলভাষায় অল্প কথায় সেইগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অহেতুক ভয়কে হৃদয়ে স্থান না দিয়া জীবনের স্পর্শে সঞ্জীবিত হইবার এবং পরিপূর্ণ আনন্দলাভ করিবার পথের সঙ্কেত দিতে গ্রন্থকারদ্বয় প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

এই ধর্ম্মসঙ্করযুগে হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্বকে সহজ সরলভাবে ও চিত্তাকর্ষক চিত্র সহযোগে সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

**শাশ্বতী**—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীঅচিন্ত্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ৭নং মুক্তারাম ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১৷৹ সিকা।

আলোচ্য পুস্তকটি কবিতার বই। একান্নটি সুপাঠ্য কবিতা ও গানের সমাবেশ ইহাতে আছে। কবিতাগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, ইহার অধিকাংশ কবিতাই ভাবাবেগে পরিপূর্ণ এবং সে ভাবধারা কবির অন্তর্লোকবিহারী পরম সুন্দরকেই উদ্দেশ করিয়া নিবেদিত হইয়াছে।

এই পুস্তকের প্রণেতা যে একজন সুনিপুণ ভাববিলাসী কবি—সে পরিচয় এতদিন আমরা পাই নাই। চলচ্চিত্র-জগতের হাস্যরসিক অভিনেতারূপেই এতদিন আমরা তাঁহাকে জানিতাম। কবিতাগুলির মধ্যে 'নির্ভরতা' 'মরণে', 'শেষ সাধ', 'ব্যর্থ সাধ', 'চিরন্তনী' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রচয়িতার সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম অবদান হিসাবে পুস্তকের দোষত্রুটী সর্ব্বাংশে পরিমার্জ্জিত হয় নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে নির্ম্মলবাবু যশস্বী হইবেন, ইহা সুনিশ্চিতরূপে আশা করা যায়।

ছাপা ও বাঁধাই আধুনিক রুচিকে লঙ্ঘন করে নাই।

**আলাহিয়া**—শ্রীপ্রসাদ বসু কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—আর, বি, দাস, ৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৶৹ আনা।

'সঙ্গীত-সরণি' ক্রমিক-পুস্তক-প্রণেতা সঙ্গীতাভিজ্ঞ প্রসাদবাবু একমাত্র আলাহিয়া রাগের উপর এই পুস্তকটি প্রণয়ন করিয়াছেন। আলাহিয়া রাগের কয়েকটি গান, সরগম, বিস্তার, লক্ষণ-গীত ও উপপত্তিক বিষয় শাস্ত্রসম্মতভাবে প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া রচিত হওয়ায় প্রসাদবাবু সঙ্গীতসুধীসমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

**মর্ম্ম-মুকুর**—মৃণাল সর্ব্বাধিকারী। প্রকাশক—এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা। পৃষ্ঠা—ছ'ত্রিশ।

এই নিখিল বিশ্বে বিভিন্ন মানব, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন আচার-বিচার, বিভিন্ন ভাবাভাব রহিয়াছে। কিন্তু এই অনন্ত মানব-স্রোত নর-নারীর বৈশিষ্ট্যগত মিলন-বিরহের রস-তরঙ্গে নিত্যকাল ধরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া চলিয়াছে! দয়িতাকে পাবার ব্যাকুলতা, দয়িতার সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়, তাহার সহিত নিবিড় মিলন, বিরহ, অভিমান, তাহার মৃত্যুতে প্রেমিকের মনে অসহ্য বেদনা ও অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে দয়িতার সঙ্গে প্রেমিকের অচ্ছেদ্য মহা-মিলন—রস-জগতের এই শাশ্বত সত্য মর্ম্ম-মুকুরের চতুর্দ্দশপদী কবিতা-পরম্পরার মধ্য দিয়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

এই কাব্যখানির নাম-কবিতাটি, 'আজ মৃত্যু আসি তব দাঁড়ায়েছে দ্বারে—' 'বিসর্জ্জন দিয়ে এনু প্রেম প্রতিমারে—' 'প্রতিদিন রজনীতে, কৃষ্ণ অন্ধকারে—', 'জন্ম সত্য, মৃত্যু সত্য, সত্য এ ধরণী—', প্রভৃতি কয়েকটি কবিতার মধ্যে ভাব কাব্যদেহাশ্রয়ে দ্যোতনাময় হইয়া উঠিয়াছে।

কয়েকটি স্থানে মুদ্রাঙ্কনের ত্রুটিবশতঃ ছন্দ-পতন হইয়াছে! পুস্তিকাখানির মূল্য কিঞ্চিৎ বেশী হইলেও, ছাপা, কাগজ, প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

অধ্যাপক শ্রীবিনয় সরকার

**শীশ্-মহল**—সচিত্র মাসিক। বৈশাখে শীশ্-মহল দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। মুসলমান সমাজ হইতে পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইলেও, ইহার আদর্শ অখণ্ড জাতীয়তা। হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত বাঙালীজাতির ঐক্য, ভাষা, সাহিত্য ও কৃষ্টির উপর ভিত্তি করিয়া বাংলার মঙ্গল, উন্নতি ও গৌরব সাধনাই শীশ্-মহলের লক্ষ্য বলিয়া 'আমাদের কথা' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রকাশ। সুখের বিষয়, এই সুমহান্ উদ্দেশ্য লক্ষ্যে রাখিয়া পত্রিকাখানি যে পরিচালিত—তাহা উহার যে কোন সংখ্যা পাঠ করিলেই বুঝা যায়। এজন্য শীশ্-মহলের কর্ত্তৃপক্ষ ও সম্পাদক ধন্যবাদার্হ। আজিকার দিনে এইরূপ জাতীয়তামূলক পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। আমরা আশা করি, এই সাহিত্য-পত্রিকাখানি হিন্দু-মুসলমান উভয়ের নিকট সমাদৃত হইবে। প্রতি সংখ্যা তিন আনা, বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৹ আনা। ২১নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

**The Calcutta Municipal Gazette**—Eleventh Health Number, Price 8 annas.

মিউনিসিপ্যাল গেজেটের একাদশ বিশেষ স্বাস্থ্য-সংখ্যা তার পূর্ব্ব গৌরবকে শুধু অক্ষুন্ন রাখেনি, ক্রমশঃ উন্নতির পথে চলিয়াছে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিচিত্র চিত্রসম্পদ এবং দেশবিদেশের অভিজ্ঞ মনীষীর অবদানমণ্ডিত হইয়া সংখ্যাখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। মনোজ্ঞ প্রচ্ছদপটখানি সারল্যের প্রতীক। পত্রিকাখানি হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিলেই মন খুশীতে ভরিয়া উঠে। এইরূপ একখানি পত্রিকা সম্পাদনের জন্য গেজেটের সম্পাদক অমল হোম ও কর্ত্তৃপক্ষ প্রশংসার্হ।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

**বেটন হকি কাপ প্রতিযোগিতা**—ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স দল শেষ গণ্ডীর খেলায় টিকমগড়ের ভগবন্ত ক্লাব দলকে একটী পিনাল্টি গোলে পরাজিত করিয়া বিজয়ী কাপ লাভ করিয়াছে। খেলা হিসাবে ভগবন্ত ক্লাবই ভাল খেলিয়াছে ও উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে। ভূপাল দল যেন-তেন-প্রকারেণ দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া ভগবন্ত ক্লাবকে ঠেকাইতেছিল মাত্র। ভাগ্যক্রমে খেলায় শেষ সময় পেনাল্টি বুলিতে গোল দিয়া ভূপাল বিজয়ী সম্মান লাভ করিয়াছে। দর্শকদের অনেকের ধারণা ক্রীড়া পরিচালনার মারাত্মক ত্রুটীর জন্যই ভগবন্ত ক্লাব এই সম্মান হইতে বঞ্চিত হইল। খেলার শেষ অবস্থায় সন্দেহজনক পিনাল্টি বুলির নির্দ্দেশ বাঙ্গলার ক্রীড়া পরিচালনার সুনাম অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করিয়াছে মনে হয়।

গলিবন্দি

এলেন

ধ্যানচাঁদ

ট্যাপসেল

ভূপাল দল ইতিপূর্ব্বে ১৯৩৭ সালে বেটন কাপের শেষ গণ্ডীর খেলায় বি এন আর দলের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। এই ভগবন্ত ক্লাবকে ১৯৩৯ সালে আগা খাঁ কাপ খেলার শেষ গণ্ডীর খেলায় ভূপাল দল পরাজিত করিয়া গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল। বেটন কাপের ৪৫ বৎসরের খেলার মধ্যে মাত্র ১১ বার বাংলার বাহিরের দল বিজয়ী হইয়াছে, এবং ১৯১৪ ও ১৯২০ সালে এই দুই বৎসর মাত্র এবারকার মত বাংলার বাহিরের দুইটী দল ফাইনেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এবার শেষ গণ্ডীর খেলার পূর্ব্ব খেলায় ভূপাল কাষ্টমস্‌কে পরাজিত করে ও ভগবন্ত ক্লাব গত বৎসরের বিজয়ী বি, এন, আর দলকে পরাজিত করিয়াও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে।

**প্রদর্শনী হকি খেলা**—নিখিল ভারত বনাম অবশিষ্ট দলের সঙ্গে ভারতীয় হকি ফেডারেশন কলিকাতায় বেটন কাপের খেলার সময় একটী প্রদর্শনী হকি খেলার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উক্ত খেলার বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিখিল ভারতীয় ফেডারেশনের তহবিলে মজুত থাকিবে এবং ভবিষ্যতে নিখিল ভারতীয় টিমের ভ্রমণের জন্য ব্যয়িত হইবে। হকি যাদুকর ধ্যানচাঁদ নিখিল ভারতীয় টিমের অধিনায়কত্ব করেন ও অলিম্পিক খ্যাতিসম্পন্ন পিটার ফার্ণাণ্ডেজ অবশিষ্ট দলের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হন। ভারতীয় দলের রক্ষণভাগে হজেস, গ্যালিবার্ডি ও এলেনের সমকক্ষ খেলোয়াড় অবশিষ্ট দলের রক্ষণ ভাগে না থাকায় তাহারা ৪ ২ গোলে পরাজিত হইয়াছে। খেলা খুব উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল এবং খেলার উৎকর্ষতা হিসাবে কলিকাতার অন্যান্য যে সব প্রদর্শনী হকি খেলা হইয়াছে এইবারে পূর্ব্বেকার সব খেলার চেয়ে উন্নততর খেলা হইয়াছে।

প্রথম ডিভিশন হকি লীগ বিজয়ী—বি জি প্রেসদল

উভয় দলের সুনিয়ন্ত্রিত আক্রমণ প্রণালী, তীব্র প্রতিযোগীতা ক্রীড়ামোদিদের সজীব করিয়া তুলিয়াছিল। বহুদিন ক্রীড়ামোদিগণ এইরূপ খেলা দেখেন নাই। ভারতীয় আক্রমণ ভাগে ধ্যানচাঁদের খেলা অতুলনীয় ও মনোরম হইয়াছিল। তিনি যে ভাবে তাহার দলকে পরিচালিত করিয়াছেন ও খেলাইয়াছেন সত্যই তাহা দর্শনযোগ্য। আক্রমণ ভাগে আর কার ও চিরঞ্জিতও তাঁদের

সুনাম রক্ষা করিয়াছেন। অবশিষ্ট দলের খেলোয়াড়দেব মধ্যে আক্রমণভাগে ভূপাল দলেব মুনির ও রক্ষণভাগে দিল্লী দলের মুস্তাকের নাম উল্লেখ করিতে হয়। দর্শকগণ মুনিরের অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের কথা শীঘ্র ভুলিতে পারিবেন না এবং মুস্তাকের সমকক্ষ ব্যাক ঐ দিন মাঠে কেহ ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

**হকি লীগ জয়ী**- প্রথম ডিভিসন লীগ জয়ী হওয়ার সম্মান লাভ করিয়াছে এবার বি জি প্রেস। ১৯৩৭ সালে বি জি প্রেস একবার লীগ পাওয়ার সুযোগ হারাইয়াছিল। এই বৎসরেই সর্ব্বপ্রথম তাহারা এই কৃতিত্ব অর্জ্জন করিল। এইবার লীগ খেলায় অপরাজিত থাকিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ তাহাদের গৌরব আরও বৰ্দ্ধিত করিয়াছে। মিলিটারী মেডিক্যাল দল এবার লীগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। এই দলের ডি সেনা লীগে সবচেয়ে অধিক গোল করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। এবার লীগে কাষ্টমস দল মোটেই সুবিধা করিতে পারে নাই। হকি লীগে কাষ্টমস দলের খ্যাতি এইবার অনেকাংশে ক্ষুন্ন হইয়াছে। কাষ্টমস দলকে বোধ হয় কোন বার লীগে এবারকার মত পাঁচটি খেলায় পরাজিত হইতে হয় নাই। এবার পোর্ট কমিশনার দল বেশ পুষ্ট ছিল তাহারা তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে, তাদের পর কাষ্টমসের স্থান হইয়াছে। নিম্নে লীগ কোঠায় কাহার কিরূপ স্থান দেওয়া হইল :—

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | জয়াঙ্ক |
|---|---|---|---|---|---|
| বি জি প্রেস | ১৮ | ১৩ | ৫ | | [illegible] |
| মিঃ মেডিক্যালস | ১৮ | ১২ | ৫ | | ২৯ |
| পোর্ট কমিশনার্স | ১৮ | ১১ | ৩ | ৪ | ২৫ |
| কাষ্টমস | ১৮ | ১২ | ১ | ৫ | ২৫ |
| রেঞ্জার্স | ১৮ | ১০ | ৪ | ৪ | ২৪ |
| ইষ্টবেঙ্গল | ১৮ | ৮ | ৭ | ৩ | ২৩ |
| পুলিশ | ১৮ | ৯ | ৪ | ৫ | ২২ |
| মেসারার্স | ১৭ | ৯ | ২ | ৬ | ২০ |
| লিলুয়া | ১৮ | ৯ | ২ | ৭ | ২০ |
| মহামেডান স্পোর্টিং | ১৮ | ৮ | ৩ | ৭ | ১৯ |
| আর্ম্মেনিয়ান্স | ১৮ | ৮ | ৩ | ৭ | ১৯ |
| গ্রীয়ার | ১৮ | ৭ | ৩ | ৮ | ১৭ |
| ই বি আর | ১৮ | ৫ | ৬ | ৭ | ১৬ |
| মোহনবাগান | ১৮ | ৪ | ৫ | ৯ | ১৩ |
| ক্যালকাটা | ১৮ | ৫ | ২ | ১১ | ১২ |
| জ্যাভেরিয়ান্স | ১৮ | ৩ | ৩ | ১২ | ৯ |
| সেণ্ট জোসেফ | ১৮ | ৩ | ২ | ১৩ | ৮ |
| পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট | ১৭ | ১ | ৩ | ১৩ | |
| হাওড়া ইনষ্টিটিউট | ১৮ | ০ | ৩ | ১৫ | |

# সাময়িকী

## কর্পোরেশন নির্ব্বাচন

এবার কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পূর্ব্বে মুস্‌লীম লীগ ও বসু দলের মধ্যে এক চুক্তি সম্পন্ন হয়। তদনুযায়ী লীগ ও কংগ্রেস সদস্যদের সমর্থনে মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র যথাক্রমে মিঃ আবদুর
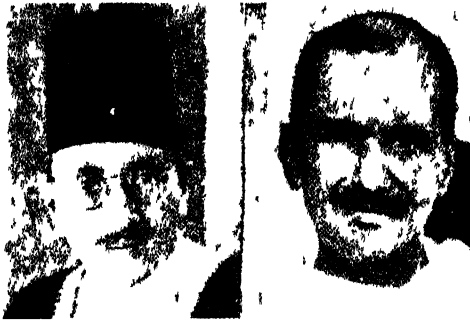
মেয়র এ. আর. সিদ্দিকি   ডেঃ মেয়র শ্রীফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম

রহমান সিদ্দিকী (লীগ) ও শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম (কংগ্রেস) নির্ব্বাচিত হন এবং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর, মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জী, মিঃ তাজ মহম্মদ ও মিঃ আদম ওসমান অল্ডারম্যান নির্ব্বাচিত হন। এই নির্ব্বাচন উপলক্ষে সব চেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা হইতেছে মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জীর হিন্দু মহাসভার পদত্যাগ এবং বসুদলে যোগদান। মিঃ চ্যাটার্জ্জী প্রকাশ্য নির্ব্বাচন - দ্বন্দ্বে অল্পের জন্য সাফল্যলাভ করিতে না পারিলেও, অল্ডারম্যান নির্ব্বাচনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পান।

দল হিসাবে এবারকার অধিবেশন কাউন্সিল এইভাবে বিভক্ত:

কংগ্রেস দল ২৬, মুস্‌লীম লীগ ১৮, হিন্দু মহাসভা ১৫, স্বতন্ত্র ১৩, সাহেব ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ১৩, মোট এই ৮৫ জন নির্ব্বাচিত।

অল্ডারম্যান ৫ (তন্মধ্যে কংগ্রেস তিনজন ও ২ জন লীগ) এবং মনোনীত ৮ জন, সর্ব্বমোট ৯৮ জন।

এক'ক দল হিসাবে কংগ্রেসই এবার কাউন্সিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইলেও নিরপেক্ষভাবে উহা যথেষ্ট নহে।

## 'ট্রাষ্ট হাউস' প্রতিষ্ঠোৎসব

বাঙালী ব্যবসায়ী মহলে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহার জীবনাদর্শ অনুকরণীয়। জীবনের অতি নগণ্য আরম্ভ স্বীয় সততা, অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের বলে এক গৌরবময় পরিণতি লাভ করে। নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যে 'রান্নার বামুনের কাজে', 'কলিকাতার ফেরিওয়ালারূপে' এবং দীর্ঘকাল ঘাটে বাটে মাঠে ঘুরিয়া অবশেষে যোগেশবাবুর কর্ম্ম-সাধনা সিদ্ধরূপ লইয়াছে এই বিরাট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ট্রাষ্ট হাউস প্রতিষ্ঠায়। তাঁহার পরিচালনাধীন 'দি ষ্ট্যাণ্ডার্ড

ট্রাষ্ট হাউসের উদ্বোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ

কেবিনেট কোং', 'দি ক্যালকাটা বিল্ডার্স ষ্টোরস্ লিঃ' এবং 'দি ক্যালকাটা ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিঃ' ব্যবসা-জগতে সুবিদিত। এই সকলেরই সমবায় এই ট্রাষ্ট হাউসের উদ্বোধন কার্য্য বিগত ১৯শে এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক সুসম্পাদিত হইয়াছে। বরিশাল শঙ্কর মঠের শ্রীশ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী মহারাজ যোগেশবাবুকে দীক্ষা দিবার সময়ে 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্' মহামন্ত্র সমন্বিত গৈরিক উত্তরীয়াঞ্চল প্রদান পূর্ব্বক দেশের ও দশের কাজে তাঁহাকে

নবনির্ম্মিত ট্রাষ্ট হাউস

ব্রতী করান। বিপুল লোভনীয় কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও সিদ্ধিতেও যোগেশবাবু যে "দেশের এবং দশের সেবা করার মহান্ আদর্শ" বিস্মৃত হন নাই তাহা তাঁহার ত্যাগ-বৈরাগ্যের প্রতীক গৈরিক পতাকা উড্ডীন হইতেই বুঝা যায়। কর্ম্ম ও ধর্ম্ম যে সামঞ্জস্যহীন নয়, ইহা যদি যোগেশবাবু তাঁহার জীবন ও আচরণের মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন তবে এই ইহবিমুখ জাতিটার মহদুপকার তিনি করিতে পারিবেন। আমরা তাঁহার এই ক্ষুরধার কর্ম্মপন্থায় আন্তরিক সহানুভূতিসম্পন্ন।

## পরলোকে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দীর্ঘকাল রোগভোগের পর বিগত ২০শে বৈশাখ শুক্রবার রাত্রিতে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোকগমন করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ স্বনামধন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র। জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব তাঁহার স্বভাবের উপর গভীর ছাপ রাখিয়া যায়। যিনি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই তাঁহার পাণ্ডিত্য, ন্যায়নিষ্ঠা, মার্জ্জিত রুচি ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইতেন। হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গৌরবময় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অনেকখানি দায়ী। উক্ত কোম্পানীর কর্ণধাররূপে বীমা ব্যবসায় পরিচালনে তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন বাঙালীর মধ্যে তাহা বিরলই বলিতে হয়। সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির প্রতিও তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। আমাদের সহিত সুরেন্দ্রনাথ অতি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সঙ্ঘের একজন অকপট অনুরাগী বন্ধু আমরা হারাইলাম। বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

## মৌলবী মুজীবর রহমান

জাতীয়তাবাদী, সত্যসন্ধ সাংবাদিক মৌলবী মুজীবর রহমান ৭১ বৎসর বয়সে গত ১৩ই বৈশাখ, শুক্রবার রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকায় দুরারোগ্য পক্ষাঘাত ব্যাধিতে অন্তিম-শয্যায় লীন হইয়াছেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণার অন্তর্গত নেহালপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার এগারো বৎসর বয়সে পিতা মুন্সী এলাহি বক্সের মৃত্যু হয়। স্বীয় জ্ঞান-পিপাসার তীব্রতা হেতু গ্রামের বিদ্যালয় হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে আই-এ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। এই সময়েই বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের নব জাগরণে দেশপ্রেমিক তরুণ মুজীবরের হৃদয় দেশপ্রেমের বন্যায় আলোড়িত হইল। মৌলভী আবুল কাশেম, মৌলভী আবদুর রসুল, মিঃ আবদুল হালিম গজনবী (বর্ত্তমান স্যার গজনবী), মৌলানা মোহম্মদ

আক্রাম খাঁ প্রভৃতির সহিত তিনিও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবাদ-পরিকল্পনানুযায়ী মুজীবরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ৬ই ডিসেম্বরে সাপ্তাহিক "দি মুসলমান" প্রকাশিত হয়। তিনিই ছিলেন এই পত্রিকার প্রাণ—তিনি ছিলেন একাধারে পরিচালক ও সম্পাদক।

পত্রিকা-সম্পাদনার গুরু-দায়িত্ব ও সত্যপ্রিয়তাকে তদানীন্তন বাংলা গভর্ণমেণ্ট বহু প্রকার ব্যাহত ও আহত করিবার চেষ্টা করিলেও, সাংবাদিকের প্রসারিত সত্য-দৃষ্টি তেজস্বী মুজীবরকে নব নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সারা ভারতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যে স্বদেশী আন্দোলন বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাতে দেশ-প্রেমিক মুজীবরও যোগদান ও এক বৎসর তিন মাস কারাবরণ করেন।

অতঃপর বঙ্গীয় খিলাফৎ কমিটি, নিখিল ভারত মুসলীম লীগ, কলিকাতা কর্পোরেশন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষরূপে সম্পর্কিত ছিলেন।

তাঁর পত্রিকা-সম্পাদনা-ব্যাপারে আরও দুইখানি পত্রিকার নাম করা যাইতে পারে—'খাদেম' ও 'দি কম্‌রেড্'। আমরা এই বিশিষ্ট সাংবাদিক ও দেশপ্রেমিক মুজীবরের আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

## বেকার-বান্ধব সমিতি

এই সমিতির ১৯৩৮-৩৯ সালের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, বিগত ৭ বৎসর ধরিয়া সমিতি সাফল্যের সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছে। সমিতির উদ্দেশ্য বেকার সমস্যার প্রতিকার এবং কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তার সাধন। এই লক্ষ্যে সমিতির পরিচালিত অবৈতনিক বিদ্যালয়ে বই-বাঁধাই, দরজীর কাজ, নানাবিধ কেমিক্যাল দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী, গো-পালন ইত্যাদি কাজ হাতে-কলমে শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে। শ্রীদ্বিজেন্দ্র-কুমার প্রামাণিক এই সমিতির প্রাণ ও প্রতিষ্ঠাতা। সহৃদয় দেশবাসীর সাহায্য পাইলে সমিতি বেকার সমস্যা সমাধানে অদূর ভবিষ্যতে সফলকাম হইতে পারে।

## রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মোৎসব

২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অশীতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর গৌরব। তিনি শুধু বাঙালীরই নন, বিশ্বমানবের। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার অবদান মানব-সভ্যতার ভাণ্ডারের অমূল্য সঞ্চয়। বাঙালা সাহিত্যকে তিনি বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে
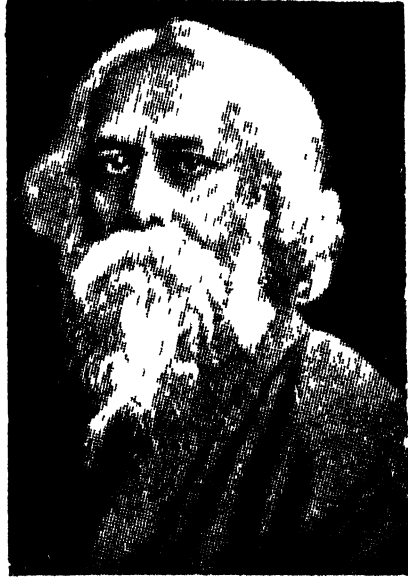
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

সম্মানিত করিয়াছেন। সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া তিনি বাঙালীর সর্ব্বতোমুখী উন্নতিকামী। বার্দ্ধক্যপীড়িত দেহ হইলেও তাঁর চির-সবুজ মনের স্নিগ্ধালোকে আজও বাঙালী উৎসাহ ও ভরসা পায়। এই শুভক্ষণে আমরা তাঁর শতায়ু কামনা করি।

## চক্ষু চিকিৎসায় নব গবেষণা

বিভিন্ন লোকহিতকরী বিষয়ে বিশেষত্ব অর্জ্জন করা জাতীয় স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ভারতের মধ্যে বাঙালী এদিকে অগ্রণী। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে চক্ষু চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য ডাক্তার শরদিন্দু সান্যাল এম্-বি মহাশয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে তাঁর এই গবেষণা কার্য্য বিশেষভাবে প্রশংসিত এবং

পত্রিকা ও পুস্তকে সসম্মানে স্থান পাইয়াছে। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চক্ষু চিকিৎক Sir W. Dinkeelder প্রণীত Text Book of opthalmology পুস্তকে ডাঃ সান্যালের এইরূপ একটি গবেষণা Sannyal's Conjunctivitis নামে স্থান পাইয়াছে। বোধ হয় ইনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় যিনি এই সম্মান লাভ করিয়াছেন।

## স্মৃতিপূজা

চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাটের নিকটবর্ত্তী ধান্যকুড়িয়া গ্রামের জমিদার স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ সাউ গ্রামের

৺উপেন্দ্রনাথ সাউ

উন্নতির জন্য রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ ও সংস্কার, জলাশয় খনন, মন্দির প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয় স্থাপন ও চতুষ্পাঠী স্থাপন, মসজিদ সংস্কার, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জনহিতকর অসংখ্য সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। একবার উক্ত জেলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি প্রতিদিন তিন হাজার নিরন্ন ব্যক্তিকে অন্নদান করিয়াছিলেন। প্রায় ছয় মাস ধরিয়া এই অন্নদানের কাজ চলিয়াছিল। গ্রামের সেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাঠের ব্যবসায়ে তখনকার কাঠ ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই দানবীরের পঞ্চবিংশতি স্মৃতি-উৎসব সম্প্রতি ধান্যকুড়িয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বাংলার এই বিশিষ্ট পল্লীসেবক ও ব্যবসায়ীর আদর্শ অনুসরণীয়।

## নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও সম্মেলন

সঙ্গীতে ক্রমবর্দ্ধমান লোকপ্রিয়তা লক্ষ্য করিবার। চন্দননগরে বিগত ছয় বৎসর ধরিয়া নিঃ বঃ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এবারকার ৭ম বার্ষিক অনুষ্ঠানে সমগ্র বাংলার শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ যোগদান করিয়া অনুষ্ঠানটিকে বিশেষ মর্য্যাদাদান

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

করেন। বাংলার বিভিন্ন দেশাগত সঙ্গীতকলার শ্রেষ্ঠ পূজারীবৃন্দের দিন চতুষ্টয়ব্যাপী সুরমূর্চ্ছনায় ক্ষুদ্র নগরী মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছিল। সম্মেলনের মূল সভাপতিত্ব করেন ময়মনসিংহ গৌরীপুরের কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে ডাঃ হীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মৃণালকান্তি ঘোষ। মূল সভাপতির সঙ্গীত সম্বন্ধীয় অভিভাষণ বিশেষ সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছিল।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

পরিচালক ও প্রকাশক: শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রান্তিক
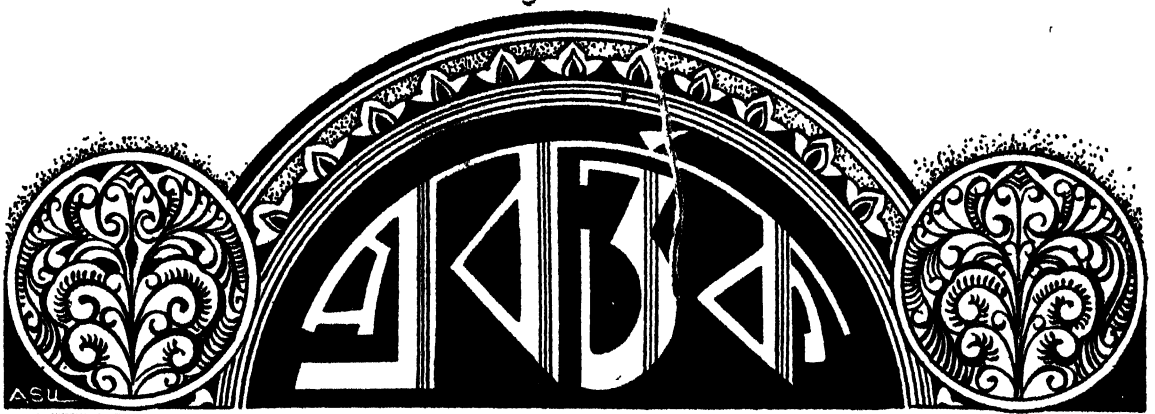
পঞ্চবিংশ বর্ষ
১৩৪৭ সাল

আষাঢ়

প্রথম খণ্ড
৩য় সংখ্যা

# প্রবর্ত্তক জয়ন্তী

## প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের ত্যাগধর্ম্ম

"প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে" নারী-পুরুষ যাহারা আত্মদান করিয়াছে, তাহাদের ত্যাগ ও তপস্যার কিছু অভিনবত্ব আছে। ত্যাগ ও ভোগ, দুইই মানুষের স্বভাব-ধর্ম্ম, এই দুই বৃত্তির মধ্যে মুখ্যতঃ কোন ভেদ আছে বলিয়া মনে হয় না। কেন না, একে যাহা ত্যাগ করে, তাহা অন্যের কাছে হয়তো ত্যাগ; কিন্তু যে ত্যাগী, সে ত্যাগের মধ্যে কিছু ভোগের আনন্দ না পাইলে, ত্যাগ করিবে কেন? কষ্ট করিয়া, দুঃখ করিয়া মানুষের কয় দিন চলে? এই ২৫ বৎসর ধরিয়া প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে যে ত্যাগের সাধনা—সঙ্ঘধর্ম্মী তাহার মধ্যে অবশ্যই ভুক্তির সামগ্রী পাইয়াছে, নতুবা তাহাদের এই স্থৈর্য্য, এই তপঃসাধ্য কর্ম্মপরতা সম্ভব হইত না।

আমি ত্যাগের অভিনবত্বের কথা বলিয়াছি। ভারতবর্ষে সুমহান্ লক্ষ্য ও আদর্শের পথে যুগে যুগে মানুষ পিতা, মাতা, পতি, পত্নী, আত্মীয়, স্বজন, ধন-দৌলত ছাড়িয়াছে, এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আদিম যুগ হইতে মানুষ অন্তর-নির্দ্দেশে অথবা অপ্রাকৃত স্বভাববশে সাধারণ জীবনযাপননীতির প্রতি বিমুখ হইয়া অসাধারণ জীবন-যাত্রায় বাহির হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তার সর্ব্বপ্রথম মানস-সন্তানেরা ভোগবিমুখ হইয়া প্রজাবৃদ্ধি করে নাই; একথা প্রাচীনেরা পুরাণে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। শুক-সনকাদির বৈরাগ্য, ভারতের প্রাচীন রাজপুত্রগণের ইহবিমুখতা, মহীপতি ঋষভের রাজ্যত্যাগ; তারপর বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীগৌরাঙ্গ, বিবেকানন্দ—আজিও গৈরিক পতাকা উড়াইয়া ভারতের নগরে, গ্রামে, তীর্থে, অরণ্যে, পর্ব্বতে, নদীতীরে অসংখ্য সন্ন্যাসীর জীবনযাত্রা আমাদের লক্ষ্যে পড়ে। একটা ভোগের লক্ষ্যে এই অসাধারণ বৈরাগ্য-প্রদীপ্ত জীবন, একথা কে অস্বীকার করিবে।

"প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে"র ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার দিনে এমনই ত্যাগ-বীর্য্যের অধিকার লইয়া এক দল নারীপুরুষের আবির্ভাব আমি লক্ষ্য করিয়াছি। নিজেও যে সর্ব্বহারা গৃহহীন হইয়া একখণ্ড বস্ত্র কটিতটে জড়াইয়াছি, এই ত্যাগের মধ্যে ভোগের আনন্দানুভূতি উপলব্ধিগম্য করিয়াই আমি বলিয়াছি—প্রত্যেক ত্যাগশীল জীবনের অন্তঃস্থলে এমন এক ভোগের নির্ম্মল নির্ঝর নিশ্চয়ই বহিয়াছে, যাহাতে অভিষিক্ত না হইলে, এই অসাধারণ অস্বাভাবিক জীবন যাত্রা অশান্তি-পূর্ণ, দুঃখময় হইত।

সাময়িক উত্তেজনায় ও ভাবপ্রবণতায় সঙ্ঘে অনেক

পুরুষকেই আমি ত্যাগ-ধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু এই ত্যাগের সাধনায় অপার্থিব ভোগের অমৃত তাহাদের লক্ষ্যপথে না পড়ায়, 'সঙ্ঘে' তাদের জীবনভাব দুর্ব্বিসহ মনে হইয়াছে, এবং 'সঙ্ঘও' তাহাতে বিব্রত হইয়াছে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর আমি তাই নিঃসংশয়ে বলিতে পারি—সর্ব্বত্যাগী হইয়া কোন এক লক্ষ্য ও আদর্শ সিদ্ধ করার জন্য যে প্রাণ, সে প্রাণ অসাধারণ তো বটেই, কিন্তু আনন্দপ্লুত হওয়ার সঙ্কেত সঙ্গে সঙ্গে না পাইলে ত্যাগের হোমানল কেহ দীর্ঘদিন প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিতে পারে না।

'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ' যে আদর্শে ও লক্ষ্যে জাতিকে জাগাইতে চাহে, বাঁচাইতে চাহে, তাহার জন্য তাহারা সর্ব্বস্ব পণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গড়িয়াছে একটি কেন্দ্রতীর্থ। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত দেশবাসীকে নূতন প্রাণ-সঞ্চয়ের জন্য এই তীর্থক্ষেত্রে উপনীত হইতেই হইবে। এই জাতিতীর্থরচনায় ভাবে, ভাষায় ও কর্ম্মে সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়াছে, জাতিসাধনায় কত দীর্ঘদিন যে যাইবে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

'সঙ্ঘে'র বাণীপ্রেরণায় মানুষ সমবেত হইল হিসাবের অঙ্ক কষিয়া নহে, তাহার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল সুখের সংসার, পিতা, মাতা ও স্বজনগণের স্নেহ প্রীতির বন্ধন। কেহ বা অসহায়, দীন, পূর্ব্ব সংসারের একমাত্র আশা-প্রদীপ হইয়াও, বিধবা মাতা, নাবালক ভাই, অনূঢ়া ভগ্নী প্রভৃতির প্রতি আপন কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া 'সঙ্ঘ'-পতাকার তলে ভূনত শিরে দীক্ষাপ্রার্থী হইল। কত মাতা কাঁদিল। কত পিতার বজ্র অভিসম্পাত মাথায় পড়িল, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়জনের হিতবাণী ব্যর্থ হইল, এই সর্ব্বহারার দল এক সোণার স্বপ্নে বিভোর হইয়া পরমানন্দে অতীতকে নিঃসংশয়েই বিদায় দিল—এক অভিনব সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিল। তাহারা পূর্ব্ব গোত্র পরিত্যাগ করিল। তাহারা জাতি ভুলিল, অতীত শিক্ষার গরিমা গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিল। সকলে প্রেম ও ঐক্যের সাধনায় গড়িয়া তুলিল এক অভিনব তীর্থ। লোকচক্ষে ত্যাগের বিদ্যুৎপ্রদীপ্ত এই জীবন-বেদী হইলেও, 'যেমন আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি যায়ন্তে', তেমনই এই ত্যাগের সৃষ্টিসৌধ আনন্দহিল্লোলেই গড়িয়া উঠিল। সঙ্ঘের অন্তর্নিহিত মর্ম্মকথা ইহার বিশ্বকর্ম্মা যাহারা তাহারাই বুঝিবে, অন্যের নিকট এই জীবন সত্যই দুর্ব্বোধ্য।

অতীতের কষ্টিপাথরে ত্যাগের যাচাই হইয়া যে রূপের পরিচয় লোক পাইয়াছে, যে মূর্ত্তি লোকগ্রাহ্য হইয়াছে, জাতির সমর্থন পাইয়াছে, প্রবর্ত্তকের ত্যাগমূর্ত্তি তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের, এবং এইরূপ ত্যাগময় জীবনের আদর্শের প্রথম প্রবর্ত্তক "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘই"। ইহা একবিন্দু অত্যুক্তি নহে। ব্রহ্মসূত্রে মন্ত্র-ঝঙ্কার উঠিয়াছে "তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষঃ"—অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মোক্ষ-শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। মোক্ষ-শব্দের অর্থ জীবনের দৃষ্টান্তে এদেশে এমনই পরিস্ফুট যাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের তো কথাই নাই, লীলাবাদী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ও ইষ্টসামীপ্য প্রাপ্ত হইতে চাহিয়াছেন কর্ম্ম-বন্ধন ঘুচাইয়া। ভারতের ত্যাগবৈরাগ্য ইহবিমুখতা ভিন্ন আর কিছু নহে। এই ত্যাগের ফলই মোক্ষ।

'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ' ঐহিক ভোগ হইতে বিরক্ত হইয়াছে "জগদ্ধিতায় বহুজনহিতায় চ"। মানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি ও শ্রী তাহাদের কাম্য। তবে 'দেবায় জন্মনে' এই আদর্শে জাতিকে অনুপ্রাণিত করিতে না পারিলে, তাহাদের অন্তর-প্রেরণা পূর্ণ হয় না। 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ' তথাকথিত মোক্ষবাদীর আদর্শে সন্ন্যাস লয় নাই। ঈশ্বরনিষ্ঠ হইতে গিয়া তাহাকে উৎসর্গ করিতে হইয়াছে বুদ্ধি, হৃদয়, প্রাণ ও দেহের স্বভাবধর্ম্ম। নিষ্কাম কর্ম্মের জন্য সে বন্ধনের আতঙ্কে স্বাবলম্বনের সাধনায় বিমুখ হয় নাই। প্রয়োজনের তাগিদে ধর্ম্মকর্ম্মের নামে যাচ্ঞাকে তাহারা প্রশ্রয় দেয় নাই। নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দুই হাতে সে সঞ্চয় করিতে চাহিয়াছে ঋতময় ঐশ্বর্য্য। জাতি যদি গড়ে, এই দুই হাতের সাহায্যেই তাহা গড়িয়া তুলিতে হইবে—আর এই দুই হাতেই গড়িয়া উঠিবে ভারতের ধর্ম্মরাজ্য। মনে রাখিতে হইবে—এই ধর্ম্মরাজ্য স্বর্গরাজ্যের নামান্তর নহে। স্বর্গরাজ্য স্বপ্নের। ধর্ম্মরাজ্য এই মর্ত্ত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই মর্ত্ত্যপ্রাণই রূপান্তরিত হইয়া ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি গড়িয়া তুলিবে।

বাঙ্গালী জাতি এই অভিনব ঈশ্বরপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল জাতির জাগরণযুগে। আর এই ২৫ বৎসর 'প্রবর্ত্তকে' এই বাণীমন্ত্রই উচ্চারিত হইতেছে। মন্ত্রকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেছে বা লাবই পুণ্য-পীঠে। তাই 'প্রবর্ত্তকে'র সাধক গ্রাসাচ্ছাদনের অন্ন ও লজ্জানিবারণের বস্ত্র সম্বল করিয়া যে নিষ্কাম কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, সে কর্ম্ম এখনও শত সন্ন্যাসীর সংযুক্ত জীবন লক্ষ্যে পড়ে না। বহ অর্থক্ষেত্রে কত সন্ন্যাসীকে প্রলোভনমুগ্ধ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখিলাম। কাননার ক্ষেত্রে স্বভাব ধর্ম্মেই তাহারা প্রবর্ত্তিত হইল। 'সঙ্ঘপ্রাণ' ধূর্জ্জটীর ন্যায় যে নিষ্কাম কর্ম্মক্ষেত্র সৃজন করিয়াছে, তাহা কৃষি ও বাণিজ্য ক্ষেত্র; সঙ্ঘ সন্ন্যাসীর নিষ্কাম জীবনের পরিচয় দিবার ইহাই যোগ্য ক্ষেত্র। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বাণিজ্য - দুর্গ - প্রাসাদের উপর গৈরিক পতাকা উড়াইবার বীর্য্যপ্রকাশ নবযুগের সন্ন্যাসী শক্তিপরীক্ষার পরিচয় মনে করিতেছে। 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে'র সন্ন্যাসীর এই অভিযান অভিনব। ত্যাগও অভিনব। বাঙ্গালী এই নব সন্ন্যাসের দীক্ষার মর্ম্ম বুঝিবে কি?

---

# "প্রবর্ত্তক"

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নূতন পথেতে আমাদের আনাগোনা,
নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আসি,
মোদের পরশে লৌহ যে হয় সোণা,
এ সাজিতে নাই একটাও ফুল বাসি।
যে গান কেহই গাহেনি, তাহাই গাবো।
না শোনো, যে পথে এসেছি ফিরিয়া যাবো।

উষর মরুরে সহসা শ্যামল করি,
অশনির মোরা সঞ্চার করি মেঘে,
পুরাতনে পুনঃ নূতন করিয়া গড়ি,
শুষ্ক তটিনী ভরে' উঠে জল বেগে।
যাহা করি করো, যাহা ভাবি ভাবো,
নাহি শোন কথা, এসেছি ফিরিয়া যাবো।

অবসাদক্ষীণ প্রাচীন চিন্তাধারা,
অতি মন্থর জীর্ণ জীবনগতি;
বিচিত্রতার মিলে না যেখানে সাড়া,
পরিবর্ত্তন সেথা আনি দ্রুত অতি।
ডাক দিই মোরা, ভাবি ঠিক সাড়া পাবো,
নাহি দাও সাড়া, এসেছি ফিরিয়া যাবো।

নূতন প্রণালী, নিয়ে আসি নব প্রথা,
নবীন শক্তি, নবীন উন্মাদনা,
প্রতিভার বীজ, সম্ভাবনার কথা
নব নব আশা, নব নব আলোচনা।
ডাক দিই সবে, ভাবি ঠিক সাড়া পাবো;
নাহি দাও সাড়া, এসেছি ফিরিয়া যাবো।

এসেছি আমরা ক্ষণের অতিথি মত
বিদ্যুৎগতি বিরাটের জয়রথে,
উন্নত করা, বিশুদ্ধ করা ব্রত—
ভাবগঙ্গার বন্যা বহাই পথে,
যাহা করি কর, যাহা ভাবি তাই ভাবো,
নাহি শোন কথা, এসেছি ফিরিয়া যাবো।
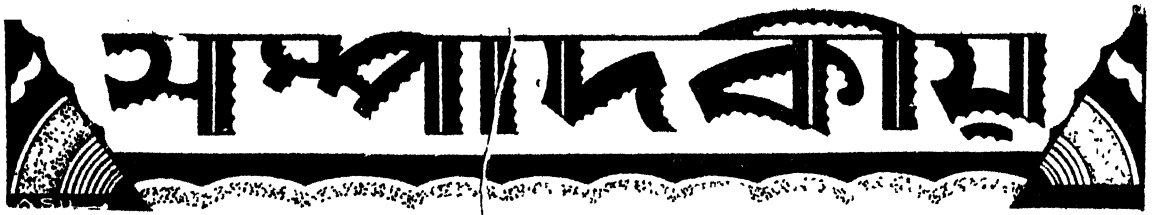
## ইউরোপের সংগ্রামে ভারতের প্রাণ কি চায়?

আজ ইউরোপের রণডঙ্কা কাণের এত নিকটে বাজিতেছে, তাহা উপেক্ষা করা দুঃসাধ্য। 'মনকে চোখ-ঠারার' ন্যায় প্রবঞ্চনাও বলা যায়। রণোন্মত্ত জাতি-সঙ্ঘের প্রতিদিনের দুঃসংবাদ আমাদের হৃৎকম্প সৃষ্টি করে। সেদিন যেদিন পৃষ্ঠে তূণ, হস্তে কার্ম্মুক, কটিতটে লম্বিত তরবারি ঝুলাইয়া এ জাতিও দিগ্বিজয়ে বাহির হইত। বৈর-নির্য্যাতন ছিল ধর্ম্ম, রাজ্যজয় ছিল আনন্দ। ছিল সেদিন, যেদিন বকের ন্যায় এ জাতিও অর্থসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত থাকিত, সিংহের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিত, শার্দ্দুলের ন্যায় শীকারান্বেষণে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিত। কিন্তু সে যুগ এ জাতির নিকট স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছু নয়।

ধর্ম্মের নামে এ জাতি পঙ্গু হইল যুগে যুগে। পতনের ইতিবৃত্ত আমাদের পুরাণ ও কিম্বদন্তী। ঋষভের রাজ্য-ত্যাগ ধর্ম্ম নহে, অধর্ম্ম, অগ্নীধ্রের যে পুত্রগণ ইহবিমুখ হইয়া অরণ্যবাসী হইল, তাহাও ধর্ম্ম নহে, অধর্ম্মেরই অনুসরণ। ধর্ম্ম মানুষের কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা ঘটায়, আর বিশুদ্ধ চৈতন্যানুভূতির জন্য অন্তর বাহির প্রস্তুত করে। মানুষ মুক্তি পায় অনন্তের সঙ্গে। প্রথমে সে অনুভব করে নিজেকে ঈশ্বরযন্ত্র-রূপে; তারপর সে ইরম্মদ-গর্জ্জনে বলে "অহম্ ব্রহ্মাস্মি"। অর্থাৎ জীবনের সবখানি দিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কেন্দ্রমূলের সহিত মানুষ যুক্তি পাইয়া দিব্যায়ুধ হস্তে ঘোষণা করে—আমি স্রষ্টা, আমি ঋতময় সত্যের রক্ষাকর্ত্তা, আমি অহিত ও মিথ্যার বিনাশকারী মহারুদ্র। মানব-বিগ্রহে দেবত্বের এই পরম বিকাশই ছিল ভারতের লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যসাধনের জন্যই এ দেশের আকাশে বাতাসে বেদমন্ত্র মুখরিত হইয়াছিল।

কোথায় গেল সেই ধর্ম্ম? কোথায় গেল সেই আত্মশক্তি-অনুশীলনের শীল ও আচার? কোথায় গেল সেই আত্ম-গরিমার বৃদ্ধেঃ অপ্রাকৃত অস্মিতা? মানুষ আজ শুধু রাষ্ট্রশক্তির অধীন নহে, সে চলিতে ফিরিতে পরাশ্রয়ী। দুই বেলা সে খাইয়া আঁচায়, প্রভুর জয় দেয়। কেরাণীগিরি মিলিলে সে ঈশ্বরদয়া বলিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরে, রোগমুক্ত হইলে সত্যপীরের সিন্নি দেয়, এমন কি ইলেকৃশনে জয়-লাভ করিলে মহাপুরুষের কৃপা বলিয়া গদগদ কণ্ঠ হয়। বলিহারী জাতিকে। আত্মবিশ্বাস হারা এই অধঃপতিত জাতির দুর্দ্দশার সীমা আর কত দূরে? আজ ইউরোপের মহাসংগ্রামে পৃথিবীর ভাগ্য-পরিবর্ত্তন-যুগ! সে যুগের ইতিহাসে পৃথিবীর সকল দেশের বিদ্যা, বুদ্ধি ও উদ্যমের বিবরণ লিখিত হয়, ভারতের অস্তিত্ব নাই। সে মরিয়াছে বলিয়াই শকুনি-গৃধিণী তাহার শিথিল অচেতন দেহ লইয়া সদ্ব্যবহার করে। বিশ্বপৃষ্ঠে রাঘবের বাণ খাইয়া তাড়কা রাক্ষসী শত যোজন জুড়িয়া ভূশায়ী হইয়াছিল। বিধাতার বাণ খাইয়া বিপুলকায় ভারত বিশ্বপৃষ্ঠে সহস্র সহস্র যোজন ব্যাপিয়া শয্যাশায়ী। এমন বীভৎস দুর্ঘটনা পৃথিবীর অন্য কোন দেশের ভাগ্যে বিধাতা লিখিতে বোধ হয় সাহস করেন নাই।

মহাশ্মশান এই ভারতের ভাগ্যবিধাতা সমুদ্র-সন্ততিগণ আজ আত্মরক্ষার দায়ে শ্মশানরক্ষায় নাকি অসমর্থ। ভস্মস্তূপ নাড়া দিয়া অর্দ্ধদগ্ধ বংশদণ্ডের খোঁচায় তাঁহাদের এই ভর্ৎসনা-বাক্যই ভারতের প্রেতমূর্ত্তি শুনিতে পায়—ওরে ওঠ্, আত্মরক্ষা কর, তোদের ভার আজ আমাদের অসহ্য হইয়াছে।

প্রেতের দল আমরা এমন পরিহাস-বাণী কখন শুনি নাই। বিগলিতদন্ত নরকঙ্কালের দল খল-খল হাস্যে অস্থিসার করতালির ধ্বনি তুলিয়া বলে, অন্ধকে জাগাইয়া লাভ নাই। তার রাত্রি দিন সমান। আমরা মরিয়াছি, সে অতি দীর্ঘদিন। আজ আর বাঁচার সাধ নাই। প্রাণ বহুদূরে অন্তর্হিত; উহা আর ফিরিয়া আসিবে না।

মহাশ্মশানের হিমালয়ের ন্যায় ভস্মস্তূপের অন্তরালে ক্ষীণ-প্রবাহে ভারতের যে অমর আত্মা এখনও অলক্ষ্যে বৃংহিতেছে,

বিশ্বব্যাপী কলরবে ক্ষীণকণ্ঠে আহ্বানকারীর মর্ম্মভেদ করিয়া সে বলে, সত্যই কি এই মহাশ্মশানের দিব্য শ্রী বিশ্বের প্রয়োজনে বিকশিত হওয়ার যুগ আসিয়াছে? ভারত অনাদি যুগ ধরিয়া বসুন্ধরা অবাধে ভোগ করিয়াছে; জীবন-বৈচিত্র্যে, লীলা-মাধুর্য্যে জীবনের আস্বাদ নানা ভাবে গ্রহণ করিয়া, বৈরাগ্যের চিতানল সাজাইয়া সে পুড়িয়া মরিয়াছে, এবার যদি বাঁচিতে হয়, আত্মপ্রয়োজনে নয়। বৃত্রের নিধনে দধীচির অস্থিরই প্রয়োজন হইয়াছিল; আজ কি দেবতার জয়-প্রার্থনায় ভারতের প্রাণের প্রয়োজন আছে? যদি তাহা হয়, অকপট নিঃসঙ্কোচ কণ্ঠে হে শ্মশান-রক্ষক! সুস্পষ্ট করিয়া বল, নিঃস্বার্থ চিত্তে তুমি এই মহা-শ্মশানের অন্তরপ্রবাহী অমৃতময়ীর শুভেচ্ছাপ্রার্থী।

হিসাবনিকাশের অঙ্ক বাহিরেই হিজিবিজি কাটুক, যাচকের বিশোধিত অন্তরপ্রদেশের চাওয়াই এই পুণ্য-ধরিত্রী উপেক্ষা করিবেন না। মানুষের দান-প্রতিদানের প্রতিশ্রুতির মূল্য কতটুকু? কিন্তু প্রতি জাতির অন্তর-দেবতার আকূতি যে নূতন সৃষ্টিশক্তি আহ্বান করিয়া আনে, তাহা অভাবনীয়কে, মানুষের অকল্পিত সৌভাগ্যকে ফিরাইয়া আনে। আজ ভারতের শুভেচ্ছা জাগ্রত করার সিদ্ধ ঋক্ যদি উচ্চারিত হয়, ভারতের পরিচ্ছন্ন প্রাণ এ আহবে উন্নতশিরে আগাইয়া দাড়াইবে। ভারতের এই অসংখ্য নরকঙ্কালের দল মদিরামত্ত কুঞ্জরের ন্যায় রণাঙ্গনে অভিযান করিবে—সত্যকে, শান্তিকে, শ্রেয়ঃকে, কল্যাণকে রূপ দিবে—সহযোগীর হৃদয়ে সাহস ও উৎসাহ সঞ্চার করিয়া তাহাকে বিজয়ী করিয়া তুলিবে। বুদ্ধির হিসাব ছাড়িয়া, ডাকার মত ডাক কে দিবে? ভারতের সত্তা হিন্দুও নহে, মুসলমানও নহে; দেশীয় রাজন্যবৃন্দও নহে; লীগ্ নহে, শিখ-ক্রিশ্চান নহে; বিরাট্ ভারত-সত্তার পদরেণুর ন্যায় এই সব পরিলক্ষিত বিভূতি দৃষ্টি অন্ধ করে ভারত-রক্ষকদের। ভারতের মাহাত্ম্যবোধ যদি অনুভূত হয়, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলি, হে বিপন্ন বীরের জাতি! যদি বিশ্বহিতকল্পে আজ ভারতের প্রাণ সত্যই প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, তবে একবার ডাকার মত ডাক দাও, দেখিবে—ভারতের মৃত্তিকা-স্তর বিদীর্ণ করিয়া অসংখ্য রুদ্রের আবির্ভাব—যাহাদের চিত্তে ঘাতপ্রতিঘাতে বিরক্তি বিদ্বেষ-প্রতিবিধিৎসার বিন্দুমাত্র মালিন্য নাই, সত্য ও ঋত-রক্ষার এই দেবসেনানীর আবির্ভাবে জগতের এই তাণ্ডব লীলার অবসান হইবে। ভারতের শুভেচ্ছা এক পক্ষকে কতখানি বীর্য্য দিতে পারে, তাহা মনীষিবর্গ আজও যদি বুঝিয়া উঠিতে পারেন, ভারতের সহিত সত্যকামী জাতি-সঙ্ঘের আসন্ন শুভ আমাদের সম্মুখে; অব্যর্থ জয় অতি সন্নিকটে।

## রাজধর্ম্মের আদর্শ

স্ব-ধর্ম্ম আর পর-ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মভেদের কথা ভারতে চির প্রসিদ্ধ, তাই আমরা ধর্ম্মসমন্বয় স্বীকার করি না। কোন মহাপুরুষ ঠিক এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। ধর্ম্মসমন্বয় কথাটা অর্ব্বাচীন-যুগের বিকৃতমস্তিষ্কের একটা খিচুড়ি। ধর্ম্মের সমন্বয় হয় না, ধর্ম্ম চিরবৈচিত্র্যময়। যতদিন সৃষ্টি, ততদিন এই ধর্ম্ম স্থায়ী থাকিবে। স্থাবর জঙ্গম, দেব, দৈত্য, দানব, যক্ষ, কিন্নর, নর, রাক্ষস প্রত্যেক শ্রেণীর স্বভাব-স্বধর্ম্ম তো আছেই; উপরন্তু প্রত্যেক ব্যষ্টির ধর্ম্মস্বাতন্ত্র্য ও স্বভাবস্বাতন্ত্র্য লইয়া তার অস্তিত্ব। তবু যদি কোন মহাপুরুষ ধর্ম্মসমন্বয়ের কথা বলিয়া থাকেন, তবে সে ধর্ম্মের অর্থ প্রকৃতিগত নয়। অর্থটা আর্ষ প্রয়োগের ন্যায় করিতে হইয়াছে। সমন্বয় তত্ত্বেরই হয়, ধর্ম্মের নয়। ব্রহ্মসূত্রেও 'তত্তু সমন্বয়াৎ' সূত্র রচিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-সমন্বয়ের কথা কোথাও নাই।

সমন্বয় শব্দটা—'থিসিস্', তারপর 'এ্যাণ্টিথিসিস্' উপসংহারে 'সিন্থিসিস্', এইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়াছে। তত্ত্ব এক, ধর্ম্ম অন্য। এই দুইয়ের মীমাংসা স্বতন্ত্র ভাবেই ঋষিরা করিয়া গিয়াছেন। এই বিচার লইয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ করিব না।

আসল কথা, যাহার যে ধর্ম্ম সে যদি তাহা না করে, পৃথিবীতে সে একটা বিষব্রণের ন্যায় বেদনাই সৃষ্টি করে। ধর্ম্ম চিরদিনই ক্রিয়াসাধ্য। ক্রিয়া যন্ত্রসাপেক্ষ। মানুষের মস্তিষ্কযন্ত্র, হৃদযন্ত্র, প্রাণযন্ত্র আর দেহযন্ত্র—প্রধানতঃ এই

চারিটী। সব যন্ত্রগুলি পূর্ণমাত্রায় চলিলে, তাহাকে অতি-মানুষ বলা যায়। প্রায় দেখা যায়, মস্তিষ্কযন্ত্রের যতই প্রাধান্য হউক, হৃদয়, প্রাণ ও দেহ যন্ত্রের অপরিস্ফুট প্রকাশে সে এক শ্রেণীর জীব। পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম বিগ্রহ সে নহে। এইরূপ কাহার হৃদ্‌যন্ত্র প্রবল, প্রাণাদি যন্ত্র অপ্রবল। এক যে অন্যকে চাহে, তাহা এই ভাবাভাবপ্রযুক্ত। ভারতের বর্ণাশ্রম এই বিজ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বহু প্রাচীন অভিজ্ঞতার উপর মানবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, মানুষের মধ্যে এই ধর্ম্মপ্রেরণাই ক্রমে বড় হইয়া উঠিতেছে যে, তাহার যন্ত্রগুলি সব যুগপৎ পরিপূর্ণভাবে বর্দ্ধোন্মত হইবে। ধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গতাই অতিমানবত্ব নামে আখ্যাত হয়। জগতের ক্রমোন্নতির পরিচয় তখনই আমরা পাইব, যখন আমরা অতিমানবের জাতি দেখিব। ইহাই হইবে পুরাণ বর্ণিত বাসুদেবের জাতি।

ভারত এই অতিমানবকে সম্রাটের আসনে আরূঢ় দেখিতে চাহিয়াছিল। সে মানবের মধ্যে বজ্রধর ইন্দ্রের বীর্য্য, সূর্য্যের তেজঃ, পবনের গতি প্রভৃতি সদ্‌গুণের প্রকাশ স্বতঃই হইবে—এই স্বপ্নই শুধু দেখিত না, এমন দিগ্বিজয়ী বীরকে ঈশ্বর-বিগ্রহ বলিয়া ভারতের ব্রাহ্মণও পূজা দিত। ধর্ম্ম ছিল এ জাতির বীরত্বের সাধনা। বীর্য্যময়ী প্রতিভা, বলদৃপ্ত হৃদয়, তেজোময় প্রাণ, শক্তিশালী দেহ—ইহাই ছিল বীরত্বের লক্ষণ। মোক্ষপ্রার্থী জাতি এই ধর্ম্মকে কোন দিন উপেক্ষা করে নাই, বরং এইরূপ প্রকৃতির পূজা দিতে দিতেই মানুষ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইত। "প্রবর্ত্তকে"র পাঠকগণ স্মরণে রাখিবেন, এই মোক্ষ-শব্দের অর্থ আমরা কোনদিন লয় মনে করি না, দিব্য ভুক্তির অধিকার বলিয়া দীর্ঘদিন প্রচার করিতেছি।

জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম। রাজা প্রকৃতিপুঞ্জের রক্ষক। প্রজাকুলে কাহারও প্রতিভা প্রবল, কাহারও বা প্রাণশক্তি প্রবল। কেহ শক্তিশালী শরীরধর্ম্মে। এই সর্ব্বপ্রকার খণ্ডধর্ম্মী প্রজাপুঞ্জের রক্ষক যিনি, তাঁহাকে ঈশ্বর বিগ্রহরূপে দেখার নীতি মানুষকে স্বতঃই স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

মানুষের ধর্ম্ম পূর্ণাঙ্গ হওয়া দুঃসাধ্য জানিয়াই সে চিরদিন আশ্রয়প্রার্থী, নির্দ্দেশপ্রার্থী এবং ধর্ম্মপ্রার্থী। একমাত্র রাজশক্তি ইহা দিতে পারেন। সেই রাজধর্ম্ম মোক্ষমার্গ বলিয়া কীর্ত্তিত। রাজা অপরাজিত রাজ্যগুলিকে সতত অধিকারে আনার জন্য উদ্যত থাকিবেন, এইজন্য সেনা-বাহিনীদের নিরলস রাখিবেন। রাজা পুরুষত্বপ্রদর্শনে সতত শত্রু দমন করিবেন, যে মুহূর্ত্তে রাজশক্তি প্রভাবহীন হইবে সেই মুহূর্ত্তে তাহা হইতে দিব্যশক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, রাজাই প্রজাপুঞ্জের সমষ্টিবিগ্রহ। আমরা এই জন্য আমাদের রাজশক্তিকে অনধিকৃত রাজ্যজয়ে উদ্বুদ্ধ দেখিলে উল্লসিত হইব। যে দেশে এইরূপ ক্ষেত্রে প্রতিবাদের কণ্ঠ উঠে, সে দেশের রাজশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে বুঝিতে হইবে। সন্ধি-বিগ্রহ, অভিযান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয়, এই ষড়বিধ গুণ ব্যবহার করিয়া রাজাকে দিগ্বিজয়ী হইতে হইবে, বিশ্বজয়ী হইতে হইবে। প্রজারক্ষণের সহিত রাজস্ব বর্দ্ধনে কুণ্ঠা করিলে চলিবে না। রাজশক্তির বিরুদ্ধ জনগণের মধ্যে গুপ্তচরনিয়োগে ভেদ সংসাধন করিতে হইবে। শত্রুভাবাপন্ন রাজাদের মধ্যে দূতগণের সাহায্যে যদি মৈত্রীস্থাপন অসম্ভব হয়, অবিলম্বে শত্রুর উপর ভীম আক্রমণ চালাইতে হইবে। যুদ্ধনিবৃত্ত হইয়া শান্তি প্রার্থী হওয়া রাজধর্ম্ম নহে, ইহা মানবধর্ম্ম। রাজধর্ম্ম অতিমানবের। রাজা অনধিকৃত ভূমি ও বস্ত্রাদি অধিকার করার জন্য সতত রণোদ্যত থাকিবেন এবং যেখানে জয় না হইলে সম্মানরক্ষা হয় না, সেখানে বর্ষাধারার ন্যায় অসংখ্য সৈন্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া শত্রুজয়ে অগ্রসর হইবেন। এই রাজ-ধর্ম্ম হইতে যে মুহূর্ত্তে রাজা বিরত হন, সেই মুহূর্ত্তে অতিমানবতার মহাগুণ হইতে তিনি বঞ্চিত, ইহা বুঝিতে হইবে। দুর্ব্বল অলস লোক-সঙ্ঘ ধর্ম্মের নামে রাজধর্ম্মকে লঘু করিতে চাহে। রাজশক্তি বিসর্জ্জনও যদি দিতে হয়, প্রজাপুঞ্জের এইরূপ মতবাদের প্রতিবাদ শ্রেয়ঃ, তবুও কোন ক্ষেত্রে প্রশ্রয় বাঞ্ছনীয় নহে। ভারতের এইরূপ রাজধর্ম্মের পরিণাম স্বর্গাদি সুখভোগের ঊর্দ্ধে মোক্ষপদপ্রাপ্তির কারণ বলা হইয়াছে।

সবল সুস্থমস্তিষ্ক প্রজাপুঞ্জ শক্তিশালী রাজাই চাহে। দুর্ভাগ্যপীড়িত, পদদলিত, বিপন্ন প্রজার সংখ্যা যে দেশে

অধিক হয়, তাহা রাজশক্তির অতিমানব-ধর্ম্মের ক্ষুণ্ণতা-বশতঃ ঘটিয়া থাকে। আমরা পৃথিবীতে প্রবল শক্তিশালী রাজার আবির্ভাব দেখিতে চাই। যে রাজ্যে অতিমানব ধর্ম্মের সাধনা অবাধ হইবে, সেই রাজ্যেরই প্রজা হইতে দেবতারাও কামনা করেন। আমাদের এই দেশ ৪০ কোটী নরনারী কর্ত্তৃক অধ্যুষিত আর রাজশক্তি ৮৪ কোটী প্রজার অধীশ্বর। রাজা যদি প্রজার রক্ষণ ও পোষণ শক্তিধারণ করেন, প্রজা রাজার বর্ণবিচার, জাতিবিচার করিবে না। ভারত সেই রাজ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করার জন্য আজ অবধারণ করিতে বিরত হইবে না, যদি রাজশক্তি ভারত-ধর্ম্ম পূর্ণাঙ্গ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হন, রাজশক্তির সহিত ভারতের যে গ্রন্থিবদ্ধ পরিচয়, তাহার মধ্য দিয়া রাজধর্ম্ম পূর্ণাঙ্গ হউক, রাজশক্তি বিশুদ্ধ মূর্ত্তি ধরিয়া সর্ব্বজয়ী হউক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

## বৈবস্বত মন্বন্তর কি শেষ হইয়াছে ?

পৃথিবীব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত হওয়ার আশঙ্কা হইতেছে, এ আগুন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দেই জ্বলিয়াছিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সে প্রলয়াগ্নি রাজনৈতিক কূটকৌশলে চাপা ছিল, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সেই দাবানল পুনরায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে. ইহা হঠাৎ নির্ব্বাপিত হইবে বলিয়া আশা করা যায় না, যদি রাষ্ট্রবিদ্‌গণের কূটকৌশলে সংগ্রাম অপরিণত অবস্থায় বন্ধ হয়, পুনঃ সুযোগে আবার ভীম বেগে ভবিষ্যতে ইহা প্রজ্বলিত হইবে।

ইউরোপের রাষ্ট্র সজ্ঘ বর্ত্তমান সংগ্রামের নিমিত্ত মাত্র। এমন ভীষণ করাল রণমূর্ত্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা যায় নাই। নেপোলিয়নের হুঙ্কার গর্জ্জনে ইউরোপ সশঙ্ক হইয়াছিল। আজিকার রণদেবতা যে বিপুল সংঘর্ষ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে ভূভারত বিদারিত বিভক্ত হইয়া যাইবে বলিয়া দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে। আটলান্টিক মহাসাগর-পারে, আমেরিকায়ও সাজ-সাজ রব উঠিয়াছে। ব্যাপারটী আমরা অন্য একদিক্ দিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব। ভারতে সৃষ্টির কালগণনার সঙ্গে রাষ্ট্রবিবর্ত্তনের কাল-গণনাও পুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ আছে। ঋষিরা পৃথিবীর আয়ুষ্কাল গণনার দ্বারা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। মুহূর্ত্ত, প্রহর, দিন, বৎসর, যুগ, মন্বন্তর প্রভৃতি এই কালের ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থির সংজ্ঞা আছে। রাষ্ট্রের কালগণনাও এই একই নীতির অনুসরণ করিয়া স্থিরীকৃত হইতে পারে, বৎসর, যুগ, মন্বন্তর ও কল্প—কালগণনার এইগুলি প্রধান প্রধান নিরিখ। কত বৎসরে যুগ, কত যুগে মন্বন্তর সৃষ্টিগণনায় ইহার যেমন সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবহার আছে, রাষ্ট্র-গণনায়ও তদনুরূপ একটী-সুনিয়ন্ত্রিত বিধান আছে। আমরা প্রতি মন্বন্তরেই দেবতাদের নামের সঙ্গে সপ্তর্ষির নামও পাইয়া থাকি। ইহার সাহায্যেই আমরা রাষ্ট্রগণনার কাল নির্ণয় করিতে পারি। সপ্তর্ষি প্রতি নক্ষত্রে শত বর্ষ থাকেন, অতএব প্রতি শত বর্ষ এক যুগ বলিয়া ধরিলে দোষের হইবে না। রাষ্ট্র কাল নির্ণয়ে এইরূপ গণনা-পদ্ধতি যুক্তিযুক্ত। কেননা, সৃষ্টিকালের গোড়া হইতেই মানব জন্মে নাই এবং মানব-সভ্যতাও প্রকাশ পায় নাই। সৃষ্টিযুগ গণনার পদ্ধতি রাষ্ট্রযুগ-গণনায় গ্রহণীয় নহে। পরীক্ষিতের রাজ্যকাল এই সপ্তর্ষি গণনা আশ্রয় করিয়াই নির্ণয় করা হইয়াছে। এই হিসাবে আমরা দেখি, বিবস্বান হইতে ধারাবাহিক বংশধারা ধরিয়া যে বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ৯৭ পুরুষ-রূপে গণিত হন। আমরা গড়পড়তায় প্রত্যেকের ২৮ বৎসর রাজ্যকাল ধরিয়া বৈবস্বত মনু হইতে কুরুক্ষেত্র সংগ্রামকাল পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক ২৮০০ বৎসর পাই। ১০০ বৎসর যুগ ধরিলে ৭১ যুগে মন্বন্তর, ইহা সর্ব্বজনস্বীকৃত কথা। অতএব বৈবস্বত মনুর রাষ্ট্রকাল ৭১০০ বৎসর হয়। বিশেষ গণনার দ্বারা মনীষীরা স্থির করিয়াছেন—প্রায় ২৪০০ খৃষ্টপূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র সংগ্রাম হইয়াছিল। তারপর ১৯০০ বৎসর বৈবস্বত মনু হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যোগ দিলে ৭১০০ বৎসর হয়। অতএব এই গণনায় বৈবস্বত মনুর কাল শেষ হইয়া পৃথিবীর রাষ্ট্রে সাবর্ণি মনুর যুগ পড়িয়াছে বলিতে হইবে। বর্ত্তমান শতাব্দী নূতন মনুর সন্ধি কাল। আমরা এই শতাব্দীতেই বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রপরিবর্ত্তন অনিবার্য্য বলিয়াই মনে করি। এই জন্যই বলিয়াছি বর্ত্তমান রণকোলাহল অবস্থার পীড়নে কিছুদিনের জন্য ক্ষান্ত

হইলেও, বর্ত্তমান শতাব্দীতে নিখিল বিশ্বের রাষ্ট্রশক্তির একটা মহাবিবর্ত্তন কোন মতে প্রতিহত হইবে না। ইহাতে ভারতেরও ভাগ্যপরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাহা সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য, তাহা আমাদের আত্ম-গঠনের মাত্রা নিরূপণ করিয়াই বুঝিতে হইবে রাষ্ট্র এক মহাভোগ। এই ভোগ বীরেরই করায়ত্ত হয়; বিশ্বের বীরজাতির একটা নবজন্ম-যুগ। আমরা এই বিংশ শতাব্দী হইতে সাবর্ণি মনুর রাষ্ট্রযুগের সূচনা বলিয়া অবশ্যই গ্রহণ করিব, যদি বিশ্বের যুগবিবর্ত্তন বর্ত্তমান শতাব্দীতেই ঘটিয়া যায়।

## মিত্রশক্তির রণনীতি

জার্ম্মাণীর রণহুঙ্কার বৃটন ড্যাঞ্জিগে তেমন করিয়া শুনে নাই। অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশে জার্ম্মাণীর আস্ফালনে বৃটিশ সিংহ একটু কাণ পাতিয়াছিল; বৃটন স্থিরচিত্তে জার্ম্মাণীর অভ্যুত্থান লক্ষ্যে রাখিতে চাহিয়াছে, কোথাও উপর-পড়া হইয়া তাহার জাগরণপথে বাধা দেয় নাই। জার্ম্মাণী তারপর পোলাণ্ড গ্রাস করিল; রুশ তাহাতে ভাগ বসাইল। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বাধীনতালোপের এই অপপ্রচেষ্টা ভ্রূভঙ্গী করিয়াই বৃটন দেখিয়াছিল, কিন্তু জার্ম্মাণীর নরওয়ে আক্রমণে আর সে উদাসীন রহিল না, বিরক্তি প্রকাশ করিয়াই বৃটন ক্ষান্ত থাকিল না, এইখানেই সে দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মাণীর সম্মুখে ব্রহ্মাস্ত্র হস্তে আগাইয়া দাঁড়াইল। বৃটনের সঙ্গী ফরাসী। এই মিত্র-শক্তি যে রণনীতি আশ্রয় করিল, তাহা আত্মরক্ষণ মাত্র, কোথাও আক্রমণ-মূলক নহে। জার্ম্মাণীর রণকৌশল কিন্তু গোড়া হইতেই আক্রমণমূলক, পোলাণ্ডের পর নরওয়ে-ডেনমার্ক, তারপর হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম্, ফ্রান্সের উত্তরাংশ, ইহার পর ইংলণ্ড আক্রমণের উদ্যোগ-পর্ব্ব ও প্যারিস অধিকারের তোড়জোড় চলিয়াছে। বিগত ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে জার্ম্মাণরাজ কাইজারও এই নীতিই আশ্রয় করিয়াছিলেন। হিটলার সেই পূর্ব্ব নীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। আক্রমণ-নীতি অত্যুত্তম রাষ্ট্রবলের উপর নির্ভর করে; শুনা যাইতেছে জার্ম্মানী সে শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে। আত্মরক্ষণনীতি একটা বলশালী জাতির আক্রমণ হইতে রক্ষার পক্ষে কিছু অল্প শক্তি হইলেও চলিতে পারে বটে; কিন্তু আক্রমণবেগের অনুপাতে তাহার যথার্থ পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা চাই। সমরকৌশলী মিত্রশক্তি সেদিকেও সচেতন হইয়াছেন। জার্ম্মাণী একাই মহাসংগ্রামে এখন আগাইয়া চলিয়াছেন। রুশের ও ইটালীর আচরণ এখনও দুর্বোধ্য; ইহারা বর্ত্তমানে মিত্রশক্তির সহিত যুদ্ধবিরত থাকিলেও, তাঁহাদের মনোভাব কোন পক্ষে ঝুঁকিবে, তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বলা এখনও সম্ভব নহে। তবুও মিত্রশক্তি যে রণনীতি গোড়ায় আশ্রয় করিয়াছেন তাহা হইতে এক পদও বিচলিত নহেন। কোথাও তাঁহারা অযথা আক্রমণে শক্তিক্ষয় করিতে চাহেন নাই। আক্রমিত হইলে আত্মরক্ষা করিবেন, তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন ফ্লান্দার্সে ইহার ফল বিষময় হইয়াছে।

এক বৃটনেরই ৫০টী উপনিবেশ আর তার প্রজাসংখ্যা ৬০ কোটী। অতএব স্থির চিত্তে বৃটেনের আত্মরক্ষণ-নীতির মূলে, যে অফুরন্ত শক্তি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে জার্ম্মানীর বিজয়াভিযান আর কিছুদূর গিয়া রুদ্ধ হইবে, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায় জার্ম্মানীর জয়স্পৃহা কেবল ভীম আক্রমণেই সফল হইবে না। এই রণনীতির জন্য তাহাকে বিপুল ক্ষয়ের ও সময়সংক্ষেপের হিসাব রাখিতে হইবে, প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধের অবসাদ ও আঘাত, দুইই অতিক্রম করিতে হইবে, ইহা যে কতখানি শক্তিসাপেক্ষ, তাহা মিত্রশক্তির সহিত তুলনা করিলে হিসাবে কুলায় না। আক্রমণ-নীতির প্রচণ্ডতা আছে, উত্তেজনাসৃষ্টির গুজব আছে; মোহ আছে; আত্মরক্ষণনীতি স্থির ও সুস্থ মস্তিষ্কে অতিশয় ধৈর্য্য সহকারে চালাইয়া যাইতে হয়। এইক্ষেত্রে আসন্ন জয়ের বড় কথা নহে। প্রতিপক্ষের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের অপেক্ষমাণ অবস্থাই রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। মিত্রপক্ষ এই ক্ষেত্রে খুবই সচেতন। আমরা এইজন্য জার্ম্মাণীর জয়াশা অপেক্ষা মিত্রশক্তির জয়-সম্ভাবনাই আশা করি। এই যুদ্ধের পরিণাম হিটলারের ঘোষণা-বাণীর অনুকূল হইবে, এমন কোন কথা নাই। ফরাসী ও

বৃটনের ঐক্যবদ্ধ আত্মরক্ষণনীতি জার্মানীর ন্যায় আরও দুই চারিটী রাষ্ট্রশক্তির আক্রমণ ব্যর্থ করার পক্ষে এখনও যথেষ্ট—যদি মিত্রশক্তির সমগ্র শক্তি অতি শীঘ্র নিয়ন্ত্রিত হয়। জার্মাণীর গতি মিত্রশক্তি আরও কিছুদিন কোন এক ক্ষেত্রে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলে মিত্রশক্তি আত্মশক্তি-সংগঠনে অতিশয় সুবিধা পাইবে এবং আক্রমণমূলক অভিযান কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারিবে। এইরূপ অবস্থায় মিত্রশক্তির জয় বিলম্বিত হইলেও অসম্ভব হইবে না।

## ব্রহ্মচারীর জীবন-নীতি

অনেক প্রকার দুর্গতিময় জীবনের করুণ কাহিনী আমার নিকট উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান বাংলায় দারিদ্র্য-দুঃখের প্রতিকারপ্রার্থী পত্রপ্রেরকদের নিবেদনের উত্তর দিতে ক্লান্তি অনুভব করি। জাতির সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত; ঔষধপ্রয়োগের আর স্থান নাই। প্রতিকার ক্রমেই অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে।

এক ২৬ বৎসর বয়সের পত্রপ্রেরকের চির পুরাতন দুঃখের কথা উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিতেছেন "আমি বড় অসুখী জীবন-যাপন করিতেছি, কারণ আমি অব্রহ্মচারী। গত ১২ বৎসর নানা চেষ্টায় ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হই নাই। ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণের শিক্ষাও কেহ আমাকে দেয় নাই। ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার এই প্রচেষ্টার মধ্যে কোন প্রণালী বা শিক্ষাও নাই। ক্রমেই হতাশ হইতেছি। শৈশবে কালকূট সেবন করিয়াছি, তাহা হইতে আর মুক্তি নাই। জীবনের সঙ্গী যাহারা, তাহাদের নিকট হইতে কোন সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করার নির্দ্দেশ পাইলে ধন্য হইব। আমি কাঙ্গাল, আশীর্ব্বাদপ্রার্থী। অধমকে আশ্রয় দিয়া কৃতার্থ করুন......।"

সঙ্ঘধর্ম্মীদের অনুরোধে ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার নূতন পথের কথা "প্রবর্ত্তকে" লিখিয়াছি এবং তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিতও হইয়াছে। পত্রপ্রেরক তাহা পাঠ করিতে পারেন।

ব্রহ্মচর্য্যপালনের নীতি ও বিধি ভারতশাস্ত্রে যত বিশদ করিয়া বর্ণিত আছে, এ বিষয় লইয়া কোন জাতিই বোধ হয় এত গভীর গবেষণা করেন নাই। ব্রহ্মচর্য্য-সংক্রান্ত পুস্তকেরও অভাব নাই। কিন্তু এদেশের মত অনাচারী যুবক বোধ হয় আর কোন দেশে নাই।

আমি ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষার শাস্ত্রীয় বিধি অথবা ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষার শিক্ষা ও বিজ্ঞানের কথা লইয়া আমার বক্তব্য শুরু করিব না। কেবল একটা কথা বলিতে চাই। আমাদের দেশের পিতা, মাতা সন্তানদের লেখাপড়া শিখাইবার জন্য যত ব্যস্ত; কিন্তু ইহাদের ভবিষ্যৎজীবন গঠনের শক্তভিত্তি যে বীর্য্যরক্ষা, সেদিকে তত সতর্ক নহেন বরং এমনই উদাসীন, যাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

জীব রিরংসাজাত। রিরংসা জীবের স্বভাব। এই স্বভাবধর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করার জন্য কৈশোরে ব্রহ্মচর্য্যনীতি-পালন করার শিক্ষা প্রয়োজন। কৈশোরে স্বভাবরিরংসায় বীর্য্যক্ষয় যে ক্ষেত্রে যত অধিক হয়, ভবিষ্যতে সেই ক্ষেত্রে তত অন্ধকার ঘনাইয়া উঠে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, পিতামাতার ঔদাসীন্যই শুধু ইহার জন্য দায়ী নহে, বর্ত্তমান শিক্ষা-নীতির মধ্যে বীর্য্যরক্ষার শিক্ষাই বাদ পড়িয়াছে। ভারতবর্ষ বীর্য্যকে ব্রহ্ম বলিয়াই স্বীকার করে, তাহাদের রক্তধারায় এই সংস্কৃতির প্রভাব আছে। অজ্ঞানতঃ শৈশবের কুশিক্ষায়, ভবিষ্যৎ জীবনে ভারতীয় ভাবের পীড়নে নিজেকে যখন অসহায় মনে হয়, তখন আর ধিক্কৃত জীবনভার বহিতে সাধ যায় না। প্রথমে মানুষ কোন সাধু পুরুষের আশ্রয়প্রার্থী হয়। অতি অল্প সুকৃতিবান্ মানুষই এইক্ষেত্রে পথের সন্ধান পায়; নতুবা অতীতের কুকর্ম্মের দায়ে অনেকেই হতাশ হয়। যাঁহারা অধিক বয়সে ব্রহ্মচর্য্যরক্ষায় যত্নবান্, আমি তাঁহাদের জন্যই এই সন্দর্ভে দুই একটা কথা বলিব। আমার কথা শাস্ত্রের অনুবৃত্তি নহে, অভিজ্ঞতাপ্রসূত। পত্রপ্রেরককে সম্মুখে রাখিয়া আমি এই শ্রেণীর সকলের প্রতি আমার কথা প্রযুজ্য হইবে বলিয়া মনে করি।

প্রথমতঃ, এই শ্রেণীর ব্রহ্মচর্য্যলাভের প্রয়াসীজনেরা বিবাহিত কি অবিবাহিত, ইহাই স্থির করিতে হইবে। দুইয়ের পক্ষেই ব্রহ্মচর্য্যের তুল্য প্রয়োজন। পত্রপ্রেরক বিবাহিত কি অবিবাহিত, পত্রে তাহা বিজ্ঞাপিত করুন,

নাই। আমি বয়ঃস্থ অবিবাহিতদের কথাই বলিতেছি। অবিবাহিত প্রত্যেক পুরুষ অথবা নারী ব্রহ্মচর্য্যরক্ষা যদি প্রয়োজন মনে করেন, তবে তো আর কথাই নাই। ব্রহ্মচর্য্যপালনের সর্ব্বপ্রথম নীতি এই প্রয়োজনবোধের মধ্যেই নিহিত। আমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব ; এই সঙ্কল্প-বাক্য জাগ্রত অবস্থায় বার বার এমন ভাবে স্মরণে রাখিতে হইবে, যাহাতে নিদ্রার মধ্যেও যেন এই স্মৃতি লুপ্ত না হয়। ইহা দুই এক দিনের কর্ম্ম নয়, সঙ্কল্প জাগ্রত জীবনে যত দৃঢ়তর হইবে, নিদ্রিত অবস্থায়ও তাহা তত ফলপ্রদ হইবে।

সঙ্কল্প স্থির হইলে, ভাবের ঘরে চুরি হইবে না, ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্কল্প মুখের কথা নহে, অন্তরতম ইচ্ছা। এই ইচ্ছাই সঙ্কল্প দৃঢ় করে, এবং সঙ্কল্পপরায়ণ ব্যক্তি বীর্য্যক্ষয়ের জন্য সর্ব্বপ্রকার জুলুম পরিত্যাগ করিবে। এই জুলুম অর্থে দৈহিক অত্যাচার বুঝিতে হইবে। এক প্রকার জুলুম—সংস্কার ও অভ্যাসের প্রভাবে বীর্য্যক্ষয়ে সচেষ্ট হওয়া। আর এক প্রকার জুলুম—যাহাতে বীর্য্যক্ষয় হয়, তদনুকূল আচরণপ্রিয়তা।

অভ্যাসপ্রভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বীর্য্যস্খলনের চেষ্টা ত্যাগ করার আর এক উপায় সর্ব্বদা নির্জ্জন-বাসবিমুখতা এবং প্রকাশ্য ক্ষেত্রে বহুজনসমক্ষে অবস্থানের ব্যবস্থা। মল-মূত্রত্যাগ ও শয়নকালের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যব্রতী আত্মসঙ্কল্প স্মরণ করিবে। বলপূর্ব্বক বীর্য্যস্খলন হইতে মুক্তিলাভ হইলে, তার পর নিদ্রিত অবস্থায় বীর্য্যস্খলনের প্রতিকারের পথ নিজেকেই আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। তাহাও শক্ত নহে।

আমি ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে চাহি। অতএব যে সংসর্গে রস ও রক্তের বিকৃতি ঘটে, সে সংসর্গ ত্যাগ করিব। রিরংসার কথা ও চিত্র অতর্কিতে শরীরস্থ রস ও রক্ত বিকৃত করে ; এইরূপ অবস্থায় বীর্য্যস্খলন অনিবার্য্য হয়। বীর্য্যরক্ষা করার সঙ্কল্প দৃঢ় হইলে, আহারাদির দিকেও দৃষ্টি পড়িবে। খাদ্যগ্রহণাদি ব্যাপার স্বাস্থ্য ও আয়ুর জন্য। যে প্রকার খাদ্যদ্রব্য কেবলই মুখরোচক রূপে গৃহীত হয়, তাহা প্রায় ক্ষতিই করে। ব্রহ্মচারী খাদ্যের রুচি না রাখিয়া, যাহা সহজে পরিপাক করা যায়, যাহা গ্রহণ করিলে উদরে বায়ুসঞ্চয় না হয়, পরিপাক-যন্ত্র উত্তেজিত না হয়, এইরূপ আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ করিবে। সর্ব্বোপরি, ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার পক্ষে নিয়মিত জীবনযাত্রার বিশেষ প্রয়োজন। এই একমাত্র নীতি সম্বৎসর পালিত হইলে, নষ্ট-বীর্য্য ব্যক্তিও পুনঃ বীর্য্যসঞ্চয়ে শক্তিশালী ও মেধাবী হইতে পারিবেন। নিয়মই ইন্দ্রিয়জয়ী হওয়ার দৃঢ় ভিত্তি। প্রথম নিয়ম—প্রাতরুত্থান। সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিতে হইবে। আমরা রাত্রি চারিটার সময়ে ব্রহ্মচর্য্যব্রতীদের শয্যাত্যাগের উপদেশ দিই। প্রাতর্নিদ্রা ইন্দ্রিয়শৈথিল্য আনয়ন করে। শয্যাত্যাগের পর শাস্ত্রাদি হইতে স্তোত্রাদি আবৃত্তি করা ভাল। প্রাতঃ-শৌচাদি সমাপন করিয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ধ্যান ও উপাসনা-বিধি অবশ্যপালনীয়। আহারাদির নিয়মও কোন মতে ব্যতিক্রম করিতে নাই। সূর্য্য যেমন যথানিয়মে উদিত হন ও অস্ত যান, মানুষও তেমনি শয্যাত্যাগ হইতে পুনঃ শয্যাগ্রহণ পর্য্যন্ত নিয়মের বশবর্ত্তী হইবে। সূর্য্যাস্তকালে, তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিতে হইবে। ঠিক রাত্রি এক প্রহর শেষ হইলে, হস্ত-পদ-শিশ্নাদি শীতল জলসিঞ্চনে ধৌত করিয়া, শয্যায় মাতৃমন্ত্র জপ ও জননীমূর্ত্তি অনুধ্যান করিতে করিতে নিদ্রিত হইবে। রাত্রিজাগরণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কালবিভাগ করিয়া যথানিয়মে শয়ন, ভোজন, কর্ম্ম, সকল প্রকার আচার নিয়মিত করিলে স্বাস্থ্য ও বলবৃদ্ধি হইবে। বীর্য্যরক্ষার সহিত স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ জীবন সুন্দর করিয়া তুলিবে।

উপসংহারে বড় কথা এই—মানুষের স্বভাবের মধ্যে এই তিনটী বিশেষ ভাব নিহিত আছে। মানুষ সততই আশ্রয়-প্রার্থী, উৎসর্গপরায়ণ ও ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী। এই ভাব-স্ফুরণের জন্য সজ্জনের সঙ্গ। সজ্জনের আনুগত্য ও সাধু-প্রসঙ্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়। বীর্য্য ব্রহ্মস্বরূপ। বীর্য্যরক্ষার জন্য ব্রহ্মমূর্ত্তি নেতা বা উপদেষ্টা অথবা গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র চক্ষের সম্মুখে রাখিতে পারিলে, যে নিয়ম ও আচার পালন করিলে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয়, তাহা সুগম ও সুখসাধ্য হয়। যে বীর্য্য লাভ করে, তার ব্রহ্মলাভ হয়। শাস্ত্রে এই পুরুষকেই বলিয়াছে 'ব্রহ্মৈব ভবতি', 'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।"

# বিতন্ত্রিক বার্ত্তা বা 'বেতার'

শ্রীসত্যরঞ্জন বিশ্বাস এম্, এস্‌সি

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোঁড়া হ'তেই বিজ্ঞানের জগতে একটা সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল। শুধু বিজ্ঞানে কেন, সকল দিক্ হ'তেই মানুষের মনে জান্‌বার একটা ইচ্ছে বলবতী হয়ে উঠেছিল। সেই জন্যে সেই সময়টা য়ুরোপের রেঁনেশাঁস্ যুগ বলা হয়। বিজ্ঞানের যা কিছু উন্নতি, তা প্রায় সবই এই যুগের মধ্যেই পড়ে। তার মধ্যে আবার শেষের দিক্‌টা অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের ভাগে আর বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক্‌টা আমাদের নতুন ক'রে দেখ্‌তে হবে। এটাকে এক কথায়, বিজ্ঞানের নব যুগ বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানের মনোজগতে এই সময়টা হ'তে একটা নতুন হাওয়া বইতে সুরু করেছে। আর সেই হাওয়া এতদিনকার এত কষ্টে আহরিত সুন্দর সুবিন্যস্ত তথ্যগুলোকে ভেঙ্গে চুরে' একটা ওলটপালট এনে দিয়েছে। বহু পরীক্ষা ও গণনা দ্বারাই যাদের সত্যতা দৃঢ় স্থাপিত ব'লে মনে করা হ'ত, এখন সূক্ষ্মতর পরীক্ষা ও সূক্ষ্মতর যন্ত্রের আবিষ্কার ও গভীর অন্তর্দর্শনের ফলে তাদের মধ্যে নতুন আলোর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। যা'র সত্যতা সম্বন্ধে এতদিন কারও সন্দেহের কোন কথাই উঠতে পারেনি, তাদের সত্যতা নির্ণয় কর্‌বার জন্যে গবেষণাগারের দ্বার নতুন ক'রে উন্মুক্ত ক'রে দেওয়া হয়েছে। একশ' বছর আগে মানুষ যে সকল বিষয় স্বপ্নেও কল্পনা কর্‌তে পারেনি, এমন সব বিষয় এখন শুধু আবিষ্কৃতই হয়নি, সেগুলোকে মানুষের দৈনন্দিন কাজে লাগাবার বন্দোবস্তও করা হয়েছে।

এই সকল নবাবিষ্কৃত তথ্যগুলোর দু'টো দিক্ আছে। একটা শুদ্ধ জ্ঞানের দিক্ ও আর একটা ব্যবহারের দিক্। প্রথমটাকে এক কথায় বস্তুতান্ত্রিক দর্শন বলা যেতে পারে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরীক্ষার দ্বারা জগতের স্থূল ধর্ম্ম হ'তে ক্রমে পদার্থের ইন্দ্রিয়াতীত ধর্ম্মগুলোর অনুশীলন কর্‌তে কর্‌তে আরও সূক্ষ্ম যে তার সত্তা তাকে জান্‌বার প্রচেষ্টা। আর দ্বিতীয় দিক্‌টার উদ্দেশ্য—যে প্রকৃতিকে ভালভাবে জান্‌তে পার্‌লে, তার গোপন স্বভাব ও লুকোনো ধন-সম্পত্তি বা'র করতে পার্‌লে, সেগুলো দিয়ে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য কি ক'রে বাড়ান যেতে পারে, তাই দেখা। এই শেষের দিক্‌টাই সাধারণ লোকের বেশী দরকার। তাই এই দিক্‌টার মধ্যে দিয়ে অনেকগুলো বড় বড় বৈজ্ঞানিক তথ্য সাধারণের কাছে বেশ প্রসারতা লাভ করেছে। এদের মধ্যে খুব বেশী লোকপ্রিয় হয়েছে বেতার। আজকাল এমন লোক খুব কমই আছেন, বিশেষতঃ সহরে, যাঁরা বেতারের কথা কিছু না কিছু না জানেন। বেতারের কথা আজকাল পথে ঘাটে—ভাল্‌ভসেট্, ক্রিষ্টাল সেট্, লঙ্ ওয়েভ, সর্ট ওয়েভ, প্রভৃতি দুর্ম্মূল্য বৈজ্ঞানিক কথাগুলো আজকাল বিজ্ঞানকাবার (Laboratory) দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ক'রে পথে ঘাটে ছড়িয়ে পড়েছে—ছাত্রমহলে, শিক্ষকমহলে, যুবকমহলে, বৃদ্ধমহলে, এমন কি স্ত্রীমহলে পর্য্যন্ত বেশ আসর জম্‌কিয়ে বস্‌তে ছাড়েনি। কোন্ সাত সমুদ্র তের নদী পারের অপ্সরোবিনিন্দিত কণ্ঠের সঙ্গীত-সুধা যদি কোন এক সুদূর পল্লীর ঘরের কোণে বসে অন্তঃপুরিকাগণবেষ্টিত হ'য়ে উপভোগ করা সম্ভব হয়, তবে কয়জন সৌখীন যুবক সে সুবিধা আদায় কর্‌তে অনিচ্ছুক? এতদিন তাঁরা 'কলের গান' বা গ্রামোফোন এই নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন; কিন্তু বেতারের আকস্মিক আবির্ভাবে 'কলের গানের' আদর কোথায় উড়ে গেল! কতকগুলো পুরাণো কবেকার-গাওয়া-গানের পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া কলের গানের আর কোন ক্ষমতা নাই। নিত্য নতুনের যে আনন্দ তা' সে দিতে পারে না। বেতার দেবে সেইখানে আন্‌কোরা নতুন জিনিষ। দেশ বিদেশ হতে শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকাগণকে নিয়ে এসে তারা নিত্য নতুন যে গান গাবে, সেই গানকে সে নিয়ে যাবে তখনকার তখনই শ্রোতৃগণের ঘরের দ্বারে।

শুধু কি তাই! এতো গেল আমোদপ্রমোদের কথা, তা'ছাড়া বেতারকে দিয়ে কত কাজই যে করান হচ্ছে

তা' ভাবলেও অবাক্ হয়ে যেতে হয়। সংবাদ-প্রেরণের কত সুবিধাই না সে করেছে! আগে এ কাজ হ'ত মোটা মোটা তামার তারের মধ্য দিয়ে তাড়িতপ্রবাহ নিয়ে গিয়ে। বহুদূরব্যাপী সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এই কাজের জন্য নতুন রকমে তৈরী করা তার নিয়ে যাওয়া' ছিল. এক ভয়ানক ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, তা' ছাড়া আরও অনেক অসুবিধাই ছিল। সমুদ্রের মধ্যকার জাহাজ বা আকাশের উড়ো জাহাজের সংবাদ পাঠাবারও কোন উপায়ই ছিল না। আর এখন বেতারের সাহায্যে কোন এক স্থান হ'তে সংবাদ পাঠালে, তাহা পৃথিবীর যে কোন স্থান হতে বা আকাশের যে কোন স্থান হ'তে অনায়াসে গ্রহণ করা যেতে পারে। শুধু গ্রহণ করা নয়, সঙ্গে সঙ্গে বলে' দেওয়া যেতে পারে যে কোন দিক হতে ও কত দূর হ'তে সংবাদ আসছে। এই কারণে আজকাল জাহাজচালনা ও বিমানপোত-চালনা বেতার দিয়েই করা হয়ে থাকে। পথভ্রষ্ট জাহাজকে পথ দেখাবার জন্য পূর্ব্বে সমুদ্রতীরে ও সমুদ্র-মধ্যস্থ দ্বীপে প্রকাণ্ড আলোক-গৃহ স্থাপন করা থাকৃত। ঐ সকল আলোক-গৃহ হ'তে ষ্টীমারের আলোর মত কতকগুলো আলোকরশ্মি চারিদিকে ছড়ান হ'ত, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আলোকটীকে ক্রমাগত ঘুরান হ'ত। তার ফলে সমুদ্র-মধ্যে যে কোন স্থানে ঐ আলোকরশ্মিগুলি একটীর পর একটী কিয়ৎক্ষণ অন্তর অন্তর আসতে থাকৃত ও তদ্দ্বারা পথভ্রষ্ট অর্ণবপোত তাহার স্থাননির্ণয় করতে সমর্থ হত। এখন সেই কাজ করা হচ্ছে বেতার দিয়ে; রশ্মি বেতার-প্রণালী (Beam wireless system) আবিষ্কার হওয়ায় বেতারকেও ষ্টীমারের আলোর মত একই দিকে চালিত করা যাচ্ছে। আর সেই কারণে অল্প খরচেই অনেক দূরে সঙ্কেত পাঠান সম্ভব হয়েছে। বেতারের আলোক-গৃহ-গুলোতেও ঠিক এই প্রকারে চারিদিকে বেতার-রশ্মি পাঠান হয়ে থাকে ও তা' হতেই পথভ্রষ্ট অর্ণবপোত পথ খুঁজে পায়। এ ছাড়া সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ যখন বিপদ্গ্রস্ত হয়, তখন সাহায্য ভিক্ষা করবার জন্যে বেতার ছাড়া আর কাকেও পাঠান যেতে পারে না। আর সেই বেতার-সঙ্কেত থেকে দূরের গ্রাহক যন্ত্রাগারগুলি (receiving stations) শুধু এই জাহাজের বিপদের কথাই জানে না, কিন্তু উহার দিক্ নির্ণয় করে' কোথায় ঐ জাহাজ আছে তাহাও বা'র করে।

তারপর বিমান-পোতের কথা। আজকাল জার্ম্মাণীতে রাত্রিতেও নিয়মিতরূপে বিমানপোতচালনার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। কিন্তু তার অসুবিধা অনেক; কারণ রাত্রিতে আকাশে কিছুই দেখা যায় না, আর অত উঁচু থেকে অত দ্রুতগামী বিমানপোতের পক্ষে নিজের আলো দিয়ে পথ খুঁজে যাওয়া সম্ভবপর নয়। ফলে উচ্চ পাহাড় প্রভৃতির সহিত সংঘর্ষ হবার সম্ভাবনাও খুব বেশী। সেই কারণে দুই রকম উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে। প্রথমটী হচ্ছে আলো দিয়ে। অর্থাৎ যে পথে পোতটী যা'বে, তাহার নীচে বহু সংখ্যক আলোক-গৃহ নির্ম্মাণ করে' আর সেগুলো হতে রশ্মির আকারে উপর দিকে আলো পাঠিয়ে। এর জন্যে আলোগুলোর যে শক্তির দরকার, তাহার পরিমাণও ভয়ানক। লক্ষ মোম বাতির সমান আলো ছাড়া ত হতেই পারে না। আর এই আলো তৈরী করবার জন্যে যে তড়িৎপ্রবাহযন্ত্রের প্রয়োজন, তাহার আকার ও শক্তি বড় কম নহে। এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর উপায় হচ্ছে বেতার দিয়ে। এর জন্য সারা জার্ম্মাণীর উপর জালের মত বহু-সংখ্যক বেতারযন্ত্রাগার নির্ম্মাণ করা হচ্ছে। এই যন্ত্রগুলি রেডিও ফেয়ারের মতই রশ্মি দ্বারা বিমানপোতকে পথ দেখিয়ে দেয়। তা' ছাড়া উক্ত বিমানপোতও সংবাদ পাঠাতে থাকে, আর সেই সংবাদ থেকে নীচের যন্ত্রাগারগুলি উক্ত পোত কোনখানে আছে, তা' নির্ণয় করতেও সমর্থ হয়। তাদের মানচিত্রের উপর উক্ত বিমানপোত যে পথে যাচ্ছে, তাহা অঙ্কিত হতে থাকে। আর একটু বিপথে যা'চ্ছে দেখলেই, তারা 'বেতারসঙ্কেত দ্বারা তাকে সাবধান ক'রে দেয়। সুতরাং বেতার এই সকল ব্যাপার অত্যন্ত সোজা করে' ফেলেছে। যেন সবই হাতের কাছেই ঘটছে—সবই যেন আমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির ভেতরে।

মহাসমরে বেতার কি কাজই না করেছে! যুদ্ধের আগে হতেই জার্ম্মাণীর গুপ্তচরে শত্রুপক্ষের দেশ ছেয়ে গিয়ে-ছিল। তারা থাকৃত নানা রকমের ছদ্মবেশে। চাকর, কুলি, ব্যবসায়ী, ছাত্র প্রভৃতির বেশে, আর খবরগুলো পাঠাত

লুকানো ছোট ছোট বেতারযন্ত্রের সাহায্যে। যুদ্ধের সময়ে অনেক এই রকমের লুকানো যন্ত্র ধরা পড়েছিল। জেপলিন্‌গুলো আকাশ থেকে কাজ করত আর দেশের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইত বেতারে। আবার শত্রুপক্ষীয়েরাও সেই সঙ্কেতগুলো ধরে' প্রত্যেক জেপলিনের গতি-বিধি অবিকল মানচিত্রের উপর এঁকে ফেল্‌ত ও নিজেরা সেই-মত কাজ কর্‌ত। অবশ্য তাদের কথাগুলো বুঝতে পারত না, কারণ সেগুলোও গুপ্ত সঙ্কেতেই হ'ত। যুদ্ধের সময়ে তারেব মধ্যে দিয়ে কথাবার্ত্তা কওয়া প্রায়ই সুবিধাজনক হয় না, কারণ এক দেশ হ'তে অন্য দেশে যে তাব যায়, তা' অধিকাংশ সময়েই শত্রুপক্ষীয়েরা কেটে দেয়। সেই জন্যে আজকাল যুদ্ধেব সময়ে বেতার ছাড়া এক দণ্ডও চলে না।

আজকাল বৈজ্ঞানিকদের গবেষণাগাবে বেতাবের আর এক নতুন অধ্যায় আবম্ভ হয়েছে, অবশ্য তাকে পরীক্ষাগারেব বাইরে আজও আনা হয়নি, কাবণ এখনও সে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় নি। সেটার নাম হচ্ছে টেলিভিশন বা দূরদর্শন। অর্থাৎ এ যন্ত্র দিয়ে শুধু দূবের লোকেব কথাই শুনা যাবে না, কিন্তু তাকে দেখতেও পাওয়া যাবে। মনে হবে সে যেন আমার কাছে এসে কথা কইছে, সে যেমনটী কবছে, অবিকল তেমনটীই তাকে দেখা যাবে। সুতবাং এটা হলে, আত্মীয়স্বজনের অসুখ কর্‌লে তাকে দেখবার জন্যে আর বিদেশে ছুটতে হবে না। ঘরে বসে তাকে দেখতেও পাওয়া যাবে, তার কথাও শুনা যাবে। বায়স্কোপ থিয়েটার দেখবার জন্যে আর ষ্টেজে যাবাব দরকার হবে না, কংগ্রেসের বক্তৃতা শুন্‌বাব জন্যেও আর কংগ্রেসে যাবার দরকার হবে না, ঘরের ভেতর একখানি পর্দ্দা টাঙিয়ে তার কাছে যন্ত্রটী ঠিক করে' রাখলেই হ'ল। সব শুন্‌তেও পাওয়া যাবে, দেখতেও পাওয়া যাবে।

এইবার আমরা বেতারের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করব।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌স্‌ওয়েল নামক ইংলণ্ডের একজন গণিতবিৎ কতকগুলো গণিতের সমীকরণ তৈরী করে' দেখলেন যে, তড়িতের ক্ষেত্রে এগুলো প্রয়োগ কর্‌লে এই দাঁড়ায় যে, যদি একটী তারের মধ্যে একটী তাড়িত প্রবাহ উৎপন্ন করা হয় আর যদি ঐ প্রবাহের পরিমাণ ও দিক্ অতি দ্রুতহারে পরিবর্ত্তিত করা যায়, তা' হ'লে ঐ প্রবাহের শক্তির খানিকটা অংশ উক্ত তার ছেড়ে বাইরের আকাশে ছড়িয়ে পড়ে ও ঢেউএর আকারে চারিদিকে প্রবাহিত হয়। এই ঢেউগুলোকে তাড়িত-তরঙ্গ বলা হয়। এই তরঙ্গের গতির বেগও তিনি গণনা করে' বলে' দিলেন। আলোকের গতির বেগ, যা' পরীক্ষা দ্বারা বার করা হয়েছে, তা' এই বেগেব সঙ্গে মিলে গেল। এই দেখে বৈজ্ঞানিকগণ সন্দেহ কর্‌লেন যে, আলোকও তা'হলে এক প্রকারের তাড়িত-তবঙ্গ আর এগুলো তা'হলে আস্‌ছে, আলো দিচ্ছে যে পদার্থ তার পরমাণুগুলির মধ্যেকার তড়িৎ থেকে। পরে অনেক রকম পরীক্ষা থেকে তাঁদের এই সন্দেহ সত্যি বলেই প্রমাণিত হয়েছে। যা'হউক, আমরা এখন আলোর কথা ছেড়ে দিয়ে তড়িৎ-তরঙ্গের কথাই বল্‌ব। ম্যাক্‌স্‌ওয়েল কাগজে কলমে বলে' দিলেও কিন্তু অনেকদিন ধরে' অনেক বৈজ্ঞানিক বহু চেষ্টাতেও তাড়িত-তবঙ্গের অস্তিত্ব পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করতে পার্‌লেন না। ১৮ বৎসর পরে হার্টজ নামক একজন বৈজ্ঞানিক এই কাজ প্রথম কর্‌লেন। তিনি সত্যসত্যই তাড়িত-প্রবাহ থেকে তাড়িত-তরঙ্গ উৎপাদন করে' খানিক দূরে ঐ তরঙ্গেব অস্তিত্ব পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়ে দিলেন। সুতরাং প্রথম বেতারযন্ত্রনির্ম্মাণ করেছেন ইনিই। তারপর অনেক-দিন ধরে' অনেকেই এই তাড়িত-তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁদের মধ্যে আচার্য্য জগদীশের নাম উল্লেখ-যোগ্য। এই সম্বন্ধে তিনি অনেক মূল্যবান্ কাজ করে' ছিলেন। এই হার্টজীয় তরঙ্গ কত অল্প তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (wave-length) করা যায়, তা' দেখতে গিয়ে তিনি অর্দ্ধ সেন্টিমিটারেরও কম দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ উৎপাদন করেছিলেন ও উহা যে আলোকের মত ব্যবহার করে, তাহাও দেখিয়ে-ছিলেন। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত বেতার বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারের বাইরে আসবার কল্পনাও কর্‌তে পারে নাই। তখনকার বেতার-তরঙ্গোৎপাদনের যন্ত্রগুলোকে তাড়িত-প্রবাহের সমস্ত শক্তির এত অল্প অংশই বাইরে তরঙ্গের আকারে আস্‌ত যে, তা' দিয়ে দূরে সংবাদ পাঠাবার কল্পনা ছিল সুদূরপরাহত। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে'

বেতার-তরঙ্গপ্রেরণও চিন্তার অতীত ছিল ও অনেকে গণিতের দ্বারাও দেখিয়েছিলেন যে, সেটা অসম্ভব। বেতারকে পরীক্ষাগারের বাইরে আন্‌লেন যিনি, তার সমস্ত অসুবিধার মীমাংসা করে' দিলেন যিনি, তাঁর নাম মার্কনী। ইতালীতে এঁর বাড়ী। তিনি তাঁর আকাশ-তারটীকে (areal) (তড়িৎ-প্রবাহের শক্তি বেতার থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে) নিম্নপ্রান্ত ভূমির সহিত সংযুক্ত করে' দিয়ে দেখলেন যে, এতে সমস্ত শক্তির যে অংশ তার হতে এসে বাইরে তরঙ্গের আকারে ছড়িয়ে পড়ে, তা' ভয়ঙ্কর রকম বেড়ে যায়। আর তিনি এই করে' তাঁর বেতার-তরঙ্গকে পৃথিবীর চারিদিকে দুই তিনবার ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন। বেতারকে প্রথম মানুষের কাজে লাগালেনও মার্কনী। সুতরাং বেতারের জন্ম ম্যাক্‌সওয়েল ও হার্টজএর থেকে হলেও, তাকে লালন পালন করে' এত বড় করে' গড়ে তুলতে হয়েছে প্রধানতঃ মার্কনীকেই—অবশ্য অনেকের দান না হলে কোন বড় জিনিষই গড়ে উঠে না। বেতারেও বহু মনীষীর বহু প্রকারের মূল্যবান্ দান রয়েছে। আজও অনেক বিজ্ঞানের উপাসক তাঁদের সমস্ত শক্তিই বেতারের জন্যে ব্যয় করে' যাচ্ছেন। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে মার্কনীর এই বেতারপ্রেরণ কি করে' সম্ভব হয়েছে, তাই দেখতে গিয়ে কেনেলী ও হেভী সাইড পৃথিবীর উর্দ্ধে এক অভিনব তাড়িত-লোকের আবিষ্কার করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতারবিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীশিশির-কুমার মিত্র মহাশয় এই অভিনব তাড়িতলোক সম্বন্ধে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন ও অনেক মূল্যবান্ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গত সূর্য্যগ্রহণের সময়ে এই তাড়িতলোকের অনেক গুপ্ত রহস্য তাঁর গবেষণাগার জগৎকে দেখিয়েছে। বারান্তরে আমরা এ বিষয়ের কিছু আলোচনা করব।

এই গেল বেতারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এখন দেখা যাক্—কি করে' এই বেতার-বার্ত্তা সম্ভব হয়েছে। এক স্থান হতে অন্য কোন স্থানে সংবাদ পাঠাতে হলে, সকল সময়েই সেটা সম্ভব হয় শক্তির সাহায্যে। অর্থাৎ খানিকটা শক্তিকে প্রথম স্থান হতে দ্বিতীয় স্থানে পাঠিয়ে। এই পাঠান কাজটা কত রকমে হতে পারে, অনেকদিন ধরে' বৈজ্ঞানিকগণ এই কথাটাই ভেবেছিলেন। তাঁরা দেখলেন যে, শক্তিকে পাঠান যেতে পারে দুই রকমে। প্রথমতঃ ঢিলের মত কোন কিছুকে খানিকটা শক্তি দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে—সেটা যখন গন্তব্য স্থানে যাবে, তখন তার সঙ্গে শক্তিকেও দিয়ে যাবে। যেমন 'ক' যদি 'খ'কে ঢিল ছুঁড়ে আঘাত করে, তবে সে ঢিলটীর সাহায্যে তার শক্তি 'খ'এর কাছে নিয়ে যায়। তাড়িত-বার্ত্তাবহ বা টেলিগ্রাফের যন্ত্রে কতকগুলো তাড়িত-কণা (electron)-কে খানিকটা শক্তি দিয়ে পাঠান হয় গন্তব্য স্থানে; আর তাদেরই যাবার সুবিধার জন্য তামার বা লোহার তারের একটা পথ করে' দেওয়া হয়। সঙ্কেত যদি পাঠান হয় আলো দিয়ে, আর যদি আলো এই প্রথানুসারেই যায়, তা'হলে বুঝতে হবে যে, জ্যোতিষ্মান্ পদার্থটী কতকগুলো আলোর ঢেলাকে খানিকটা করে' শক্তি দিয়ে ছুঁড়ে ফেল্‌ছে—আর সেই ঢেলাগুলো সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে গিয়ে গন্তব্যস্থানের লোকটীকে চক্ষুর রেটিনা নামক স্নায়ুমণ্ডলে আঘাত করে' তাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, সঙ্কেত আস্‌ছে। সেইরূপ শব্দ যদি এই নিয়মে যায়, তা'হলে বুঝতে হবে যে, শব্দেরও ঢেলা আছে। কোন শব্দকারী পদার্থকে আঘাত করলেই এই ঢেলাগুলো খানিকটা খানিকটা করে' শক্তি নিয়ে ছোটে আর লোকের কাণের মধ্যে ঢুকে পর্দ্দাকে আঘাত করে' জানিয়ে দেয় যে, শব্দ আসছে। শক্তি পাঠাবার দ্বিতীয় প্রথা হচ্ছে এই যে, যার কাছে শক্তি পাঠান হবে আর যে পাঠাবে, উভয়ের মধ্যে যদি কোন একটা নিরবচ্ছিন্ন বাহক পদার্থ (medium) থাকে, তা'হলে শক্তি পাঠান যেতে পারে ঐ বাহকের সাহায্যে অর্থাৎ শক্তিকে দেওয়া হবে বাহকের একটা অণুকে, সে দেবে তার পাশের অণুকে, সে তার পাশেরটীকে—এমনি করে' শক্তি চলে' যাবে তার গন্তব্য স্থানে। এই প্রকারে শক্তি পাঠাবার নাম 'তরঙ্গ' বা ঢেউ। জলের মধ্যে যখন ঢেউ তোলা হয়, তখন খানিকটা শক্তি দেওয়া হয় ঐখানকার জলের অণুগুলোতে; শক্তি পেয়ে সেগুলা কম্পিত হতে থাকে, অমনি পাশের অণু-গুলিও তাদের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে কাঁপতে থাকে—এমনি করে' একটী কম্পনের স্রোতঃ চলে' যায় একস্থান হতে চারিদিকে। শক্তিও এমনি করে' চারিদিকে ছড়িয়ে

পড়ে। তরঙ্গের উপর ভাস্‌ছে এমন কিছু একটা, ভাল করে' দেখলেই বেশ সহজেই বোঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে জল একস্থান হ'তে অন্য স্থানে যাচ্ছে না, যাচ্ছে মাত্র একটা কম্পন। এখন ইহা প্রমাণিত হয়েছে যে, শব্দ ও আলোক, এই দ্বিতীয় প্রথা অনুসারেই যায়। প্রথমে দেখা যাক্‌, শব্দ কি করে' হয় ও শুনা যায়। যখন কোন শব্দকারী পদার্থকে আঘাত করা যায়, তখন উহার অণুগুলি কম্পিত হ'তে থাকে; তার ফলে পার্শ্ববর্ত্তী বাতাসের অণুগুলিও ওদের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে কম্পিত হ'তে থাকে, তাদের কাছ থেকে পরের অণুগুলি এমনি করে' বাতাসের মধ্যে একটা ঢেউএর সৃষ্টি হয়। এই ঢেউ গিয়ে আঘাত করে আমাদের কর্ণের মধ্যকার পর্দ্দাকে আর তার ফলে পর্দ্দাটীও কম্পিত হ'তে থাকে। সেখানকার স্নায়ুগুলি সেই কম্পন নিয়ে যায় মস্তিষ্কে ও তা' থেকেই আমাদের শব্দের অনুভূতি হয়। বাতাসের মত জলের মধ্য দিয়ে, কাঠের মধ্য দিয়ে বা কোন ধাতুর মধ্য দিয়েও শব্দের তরঙ্গ যেতে পারে, কিন্তু কোন একটা কিছু বাহক থাকা চাই। একটা শব্দকারী বৈদ্যুতিক ঘণ্টাকে যদি একটা কাঁচের বর্ত্তুলের মধ্যে রেখে উহার মধ্যকার বাতাস দম-কল (pump) দিয়ে বা'র করে নেওয়া হয়, তা'হলে আর শব্দ শুনা যাবে না। আলোক যে এক প্রকারের তরঙ্গ, সে কথাও বেতারের ইতিহাস বল্‌বার সময়েই বলা হয়ে গিয়েছে। ম্যাক্‌স্‌ওয়েলের গণনা থেকে ও পরবর্ত্তী বহুবিধ পরীক্ষা থেকে এক্ষণে ইহা প্রমাণিত হয়েছে যে, আলোক ও বেতার-সঙ্কেত, উভয়েই একই প্রকারের তরঙ্গ দ্বারা বিকীর্ণ হয়। উভয় তরঙ্গই তাড়িত-তরঙ্গ, উভয়েরই গতির বেগ সমান ও উভয়েই একই নিয়মের বশবর্ত্তী। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল মাত্র 'তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের' পরিমাণে। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (wave-length) বল্‌তে পর পর দুইটী ঢেউয়ের মাথার (crest) মধ্যেকার দূরত্ব বুঝতে হবে। তাহার প্রত্যেক বিন্দু সেকেণ্ডে যত বার কম্পিত হয়, তাকে বিন্দুগুলোর কম্পনসংখ্যা বলা হয়। সহজেই বুঝা যাবে যে, এই কম্পন-সংখ্যা তরঙ্গোৎপাদনকারী পদার্থের কম্পন-সংখ্যার সঙ্গে সমান, আর যেহেতু কম্পন-সংখ্যার বা পৌনঃপুনঃ সমান সংখ্যক তরঙ্গই প্রতি সেকেণ্ডে উৎপন্ন হচ্ছে, সুতরাং তরঙ্গের গতির বেগ কম্পন-সংখ্যা ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের গুণফলের সঙ্গে সমান।

$$\text{বেগ} = ১৮৬০০০ \text{ মাইল (সেকেণ্ডে)} = ৩\times১০^{৮} \text{ মিটার} = \text{তরঙ্গ দৈর্ঘ্য} \times \text{পৌনঃপুনঃ}।$$

তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (wave length)

$$= \frac{\text{বেগ (velocity)}}{\text{পৌনঃপুন্যঃ (frequency)}} = \frac{৩\times১০^{৮}}{f}$$

সুতরাং তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও পৌনঃপুনঃ ইহাদের একটী জানা থাকলে, অন্যটি বার করতে পারা যায়। এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিভিন্নতার জন্যেই তাড়িততরঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। যখন তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব বড়, কয়েক সহস্র মিটার হ'তে কয়েক সেণ্টিমিটার পর্য্যন্ত, তখনই উক্ত তরঙ্গকে বেতারের তরঙ্গ বা হার্টজীয় তরঙ্গ (Hertzian wave) বলা হয়। এই তরঙ্গ প্রেরণ-যন্ত্রে (transmitter) তাড়িতপ্রবাহ হ'তে উৎপন্ন করা যায় ও বেতারসংবাদ-প্রেরণে ব্যবহৃত হয়। এদের মধ্যে আবার যে সকল তরঙ্গের দৈর্ঘ্য উপরের দিকে, অর্থাৎ নিম্নতম কয়েক শত মিটার পর্য্যন্ত, তাদের বলা হয় দীর্ঘ-তরঙ্গ বেতার (long wave wireless), আর ওদ্ভিন্নের তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বেতারকে ক্ষুদ্র তরঙ্গ বেতার (short-wave wireless) বলা হয়। উত্তাপ বিকীরণের (thermal radiation) তরঙ্গদৈর্ঘ্য এই হার্টজীয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হ'তে ক্ষুদ্র হ'লেও, আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য হ'তে বৃহৎ। আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্যেরও পরিমাণ-পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের জন্যে আলোকের বর্ণভেদ হয়ে থাকে। সব চেয়ে বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো হচ্ছে লাল, আর সবচেয়ে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো হচ্ছে বেগুণীয়া। রামধনুর বর্ণচ্ছত্র (spectrum) এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পর্য্যায়ক্রমেই সাজান থাকে। বেগুণীয়ার চেয়েও ছোট যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য সেই অদৃশ্য আলোকে দেখতে পাওয়া না গেলেও, ফটো তোলা যায়—তাকে বলা হয় অতি বেগুণীয়া আলো (ultra-violet light)।

রঞ্জনরশ্মিও এক প্রকারের তাড়িত-তরঙ্গ, আর এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য অতি বেগুণীয়া আলোর চেয়েও ছোট। রেডিয়াম্, ইউরেনীয়াম প্রভৃতি কয়েকটী ধাতু আছে, সেগুলো হ'তে সকল সময়েই কতকগুলি অদৃশ্য রশ্মি বা'র হচ্ছে। এই রশ্মিগুলোর মধ্যে এক প্রকারের রশ্মি আছে, উহা এক প্রকারের তাড়িত তরঙ্গ বলে' প্রমাণিত হয়েছে। এগুলিকে Y-রশ্মি (গামা রশ্মি) বলা হয়। ইহাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য রঞ্জনরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য হতেও ক্ষুদ্র। গামা রশ্মি হ'তেও ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকের অস্তিত্ব অল্পদিন হ'ল আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলো নাকি আস্ছে আকাশের সুদূর প্রান্ত হ'তে, নক্ষত্র ও নীহারিকা হ'তেও অনেক দূরে—সেখানে নাকি জগতের সৃষ্টি হচ্ছে—পদার্থের পরমাণুর সৃষ্টি হচ্ছে—তাড়িতকণা (electron) ও প্রটনের (proton) সম্মিলনে। এই অত্যাশ্চর্য্য আলোকের নাম দেওয়া হয়েছে নভঃ-রশ্মি (cosmic rays)। যেহেতু কসমস্ বা বিশ্বকর্ম্মার কারখানা—অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন কারণ-সমুদ্র থেকেই এর উৎপত্তি।

উপরে বলা হয়েছে যে, তরঙ্গের সাহায্যে শক্তি পাঠাতে হ'লে, একটা বাহক পদার্থের (medium) দরকার। বাহক ব্যতিরেকে তরঙ্গ উৎপন্ন হ'তে পারে না। শব্দের ব্যবধান বাতাস, জল প্রভৃতি; কিন্তু পৃথিবীর উপরে কয়েক মাইল পরে আর বাতাস বা অন্য কোন পদার্থ নেই—আছে শুধু অনন্ত শূন্য; আর সেই অনন্তকাল শূন্যের মধ্যে ঘুরে' বেড়াচ্ছে অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র—অনন্ত থেকে। সেই শূন্য ভেদ করে' শব্দ আস্তে পারে না, তাই বোধ হয় বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্রের কত অজ্ঞাত প্রলয়-নিনাদ, তাদের ঘাত-প্রতিঘাতের শব্দ আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ কর্তে পারে না। কিন্তু তাদের আলো এই অনন্ত শূন্য ভেদ করে'ই আমাদের কাছে আস্ছে। সুতরাং শূন্যের মধ্য দিয়েও আলো এবং বেতারতরঙ্গও আস্তে পারে। অথচ আমরা জানি, ব্যবধান ভিন্ন তরঙ্গ আস্তে পারে না। এই পরস্পরবিরোধী মতের সামঞ্জস্য করবার জন্যেই তাঁদের কল্পনা কর্তে হ'ল, যে সমগ্র শূন্য ব্যাপ্ত করে আছে একটী অখণ্ডনীয় পদার্থ, যার সীমা নেই, অন্ত নেই, যার এক কণিকাও কোন স্থান হ'তে অপসারণ করা যায় না। ইহার নাম দেওয়া হ'ল ইথার (ether)। আমরা একে আকাশ বলব। সুতরাং শক্তি যখন এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে যায়, তখন তাকে বহন করে আকাশ—আর নিয়ে যায় আকাশের তরঙ্গ। কোন পদার্থকে উচ্চে রাখ্বার জন্যে উহার যে শক্তি সুপ্তভাবে অবস্থান করে এবং যাহার দ্বারা পদার্থটী পরে কাজ করতে সমর্থ হয়, তাকে স্থিতিশক্তি (potential energy) বলে। কিন্তু এই শক্তি ঐ পদার্থে থাকে না—থাকে উহার পার্শ্বস্থিত আকাশে।

এখন আমরা দেখলাম যে, বেতারতরঙ্গ (wireless radiation) একপ্রকার তাড়িত-তরঙ্গ এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে আলোকেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ। আমরা আরও দেখলাম যে, এই তরঙ্গ উৎপাদন করতে হ'লে (ম্যাক্সওয়েলের গণনা ও হার্টজের পরীক্ষা হ'তে) কোন একটী তারের মধ্যে (আকাশ-তার) অতি দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল প্রবাহ অর্থাৎ অতি উচ্চ পৌনঃপুনের পৌনঃপুনিক প্রবাহ উৎপন্ন কর্তে হবে। মার্কণী দেখাইয়াছেন যে, এই আকাশ-তারটাকে অর্থাৎ যে তারটীর প্রবাহ হ'তে তাড়িত-তরঙ্গ উৎপন্ন হবে, তাকে যদি বিস্তৃত করে রাখা হয়, তবেই শক্তির বৃহত্তম অংশ তরঙ্গাকারে বিকীর্ণ হয়। এইরূপে তরঙ্গ উৎপন্ন হবার পর উহা সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হয় ও দূরের গ্রাহকযন্ত্রের (receiver) আকাশতারে গিয়ে উহাতে অনুরূপ তড়িৎ-কম্পন সৃষ্টি করে। গ্রাহক যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ এই তাড়িতকম্পনকে তাড়িতপ্রবাহ ও তারপরে শব্দে পরিণত করে।

# ডাকাতে দশভুজা

( জনপ্রবাদমূলক গল্প )

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

১

অন্যূন তিন শত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। হুগলী জেলায়, বর্ত্তমান মানকুণ্ড ষ্টেশনের পশ্চিম দিকে সরস্বতী নদীর পূর্ব্ব পার্শ্বে গভীর অরণ্যমধ্যে এক স্থানে, প্রায় কুড়ি পঁচিশ জন লোক সমবেত হইয়া ধূমপান ও নানা প্রকার গল্প করিতেছিল। তাহাদিগকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারা সকলেই দস্যু। সকলের শরীরই মাংসপেশী-বহুল, সুদৃঢ়, বলশালী, দেহের বর্ণ গাঢ়-কৃষ্ণ। সকলেরই মাথায় কাঁধ পর্য্যন্ত কুঞ্চিত কেশ। পরিধানে অল্প-পরিসর মলিন ধুতি। তাহাদের বয়স বাইশ তেইশ বৎসর হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত।

দলের মধ্যে ছাব্বিশ, সাতাশ বৎসর বয়স্ক রামা চাঁড়াল ( নমঃশূদ্রগণ ক্ষমা করিবেন, আমি নমঃশূদ্রগণের কথা বলিতেছি না, সেকালে যাহারা চাঁড়াল বা চণ্ডাল সংজ্ঞায় অভিহিত হইত, আমি তাহাদের কথা বলিতেছি ) বলিল, “সর্দ্দার, আর চুপ চাপ বসে থাকতে ভাল লাগচে না।”

দলের সর্দ্দার রঘুনাথ বলিল, “বসে থাকতে ভাল না লাগে ত এইখানে দুটো দিগ্‌বাজি খা, না হয় মাথা নীচু করে’ ঐ তাল গাছটার উপরে চড়্‌গে যা।”

সর্দ্দারের কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল ; রামাও সে হাসিতে যোগ দিল।

রঘুনাথ বলিল, “রেমো, চার বুঝে টোপ ফেলতে হয়, তবে ত রুই-কাৎলা গাঁথ্‌তে পারা যায় ; যেখানে সেখানে কি টোপ ফেলতে আছে? চুনো পুঁটি মেরে রঘু সর্দ্দার হাত আঁশ করে না। আরও দু’চার বছর বয়স বাড়ুক, তখন বুঝতে পারবি।”

যদু ডোম বলিল, “শ্যামবাটীর রামু ঘোষের বাড়ীতে একদিন জাল ফেললে হয় না? লোকে বলে সে নাকি অনেক টাকা কড়ি করেছে।”

যদুর কথায় বাধা দিয়া সর্দ্দার বলিল, “রাম বল, ও কথা মুখে আন্‌তে আছে?. রামু ঘোষ যে আমার গুরুভাই। আমার ওস্তাদের কাছে আমরা দু’জনে যে এক সঙ্গে লাঠী-তলোয়ার খেলতে শিখেছি। ওস্তাদজী বলত—‘রোঘো, তোর গায়ে জোর বেশী হলে কি হবে, রামু তোকে লাঠী-খেলা তলোয়ার-খেলা শিখিয়ে দিতে পারে।’ সে কথা আমি একশ’ বার মানি। সে অল্প বয়সে নবাবের ফৌজে গিয়ে নাম লেখালে, তাই আমি ওস্তাদের কাছ থেকে অনেক কায়দা অনেক প্যাঁচ আদায় করে’ নিয়ে তোদের সর্দ্দার হয়ে বসেছি। রামু থাকলে আমি কি সহজে কল্কে পেতুম?”

নিধিরাম দুলে বলিল “রামু ঘোষ নবাবের ফৌজে জটুল কেমন করে?”

সর্দ্দার বলিল, “সে অনেক কথা। এখন ত রামুর বয়স দু’কুড়ি হ’তে চল্ল, তখন তার বয়স এক কুড়িও হয়নি। মহারাজ মানসিং শ্যামবাটীতে এসে ছাউনি করেছিল। একদিন রাজার সখের ঘোড়া সন্ধ্যেকালে ঝড় বিষ্টিতে বনের মাঝে ছুটে পালিয়ে যায়। কেউ ঘোড়ার সন্ধান পায় না, রাজার মনে বড় লাগ্‌ল। তার পরদিন সকাল বেলা রামু বন থেকে সেই ঘোড়া ধরে এনে রাজাকে দিতে রাজা খুসী হয়ে, নিজের গলা থেকে হার খুলে রামুর গলায় পরিয়ে দিলে আর যাবার সময়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে নবাবের ফৌজে ভর্ত্তি করে দিলে। রামু হাজার হোক ভদ্দর ঘরের ছেলে, মা সরস্বতীর দয়ায় পেটেও কিছু বিদ্যে আছে। তার কপাল ভাল, দু’তিন বছরের মধ্যে হাজার ফৌজের কর্ত্তা হ’ল, নবাব সরকার থেকে জাইগীর পেলে। এখন আর রামু ঘোষ নয়, নবাব মজুমদার করে’ দিয়েছে।”

রামা বলিল “এখন সে বোধ হয় তোমাকে আর চিন্‌তে পারে না?”

রঘু জিভ কাটিয়া বলিল “ও কথা বলিস্‌নি, জিভ্‌ খসে যাবে। দিল্লী থেকে এসেই সে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। আমি যেতে বল্লে রঘু, ‘বাদ্‌শা আমাকে

ফৌজের দল গড়তে হুকুম করেছে। বাদশার ফৌজে ঢুকবে? আখেরে ভাল হবে।' আমি হেসে বল্লেম, 'না ভাই, আর সোণার শেকল পায়ে পরিয়ে খাঁচার পুর' না। আমি বনের পাখী, বনে বনেই পোকটা মাকড়টা ধরে' খাব।' আমার কথা শুনে বললে 'ফৌজে এলে কিন্তু ভাল করতে। যদি একান্তই না এস, তবে আমাকে একটা কথা দাও যে আমি যে পাঁচটা মৌজা জায়গীর পেয়েছি, তার মধ্যে যেন পোকা মাকড় খুঁটতে এস না।' আমি বল্লেম, 'তুমি ভাল ভেবেই আমায় ডেকেছিলে, আমিই রাজি হচ্ছি না। আমি দেবতা বামুনের নামে তোমায় কথা দিচ্ছি, তোমার এলাকার মধ্যে একটা গাছের পাতাও ছিঁড়ব না। তোমার এলাকার বাইরে কিছু করলে কিন্তু আমার দিকে নজর দিয়ো না।"

যদু ডোম বলিল, "তবে রামু ঘোষের মৌজর কথা ছেড়ে দাও, বরং চল বাইরে কোথাও জাল ফেলা যাক।"

রঘু বলিল, "আসছে আমাবস্যায় মাকালীর পূজ দিয়ে যেদিকে হক বেরিয়ে পড়া যাবে।" হ্যারে রামা, তোর হাত দিয়ে সেই কাণা বুড়ীকে যে পাঁচ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিনু, তা বুড়ীকে দিয়েছিস্ ত? টাকা পেয়ে বুড়ী কি বল্লে?"

রামা বলিল, "টাকা সেইদিনই দিয়ে এসিছি। বুড়ী চোখেও দেখতে পায় না, কাণেও শুনতে পায় না। আমি গিয়ে খুব চেঁচিয়ে ডাকতে বল্লে 'কে গা তুমি?' আমি বল্লেম 'রঘু সর্দ্দারের সাকরেদ আমি।' বুড়ী বল্লে 'মধু সরকারের ভাগ্নের মামী আবার কে?' শেষে বুড়ীর কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে দিলুম। সর্দ্দার, সে বুড়ী তোমার কেউ হয় নাকি?"

"আমার আবার কে হবে? আমি হলুম কৈবর্ত্ত, সে হ'ল বাগদী। আমার সাতপুরুষের কুটুম্ব।"

রামা বলিল "তবে তার উপর এত দয়া হ'ল যে?"

"কেন? আমার দয়া-ধম্ম নেই নাকি? ডাকাতি করি বলে' কি তোরা আমায় অমানুষ মনে করিস্ নাকি? যা বলি, মনে রাখিস্, গরীব দুঃখীকে দয়া করিস্, মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দিসনি, আর কেউ যদি বিপদ আপদে পড়ে' তোকে এসে ধরে, প্রাণ দিয়ে তাকে রক্ষে করবি। মা কালীর চরণে মতি রাখিস্, সব বিপদ কেটে যাবে। রঘু সর্দ্দারের এই কথা কখনও ভুলিস্ নি। চল্, এখন বেলা হয়ে গেল, আসছে মঙ্গলবার আমাবস্যে, মা কালীর পূজোর পর সবাই এইখানে এসে জড়ো হবি।"

এই বলিয়া রঘু সর্দ্দার উঠিয়া দাঁড়াইল, সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং জঙ্গলের মধ্য হইতে সকলেই এক জোড়া করিয়া "রণ্‌পা" ও একটা করিয়া লাঠী বাহির করিল। রঘু রণ্‌পায় উঠিবা মাত্র সকলেই রণ্‌পায় উঠিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে গভীর অরণ্য মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

"রণ্‌পা" জিনিষটা এখনকার দিনে অজ্ঞাত বলিলেই হয়। এখনবার একশত বৎসর পূর্ব্বেও পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বত্র রণ্‌পার প্রচলন ছিল। উহা আর কিছুই নহে, প্রায় সাত হাত দীর্ঘ এক জোড়া বাঁশ বা কাঠের লাঠী, প্রত্যেক লাঠীর তলদেশ হইতে সাড়ে তিন হাত বা চার হাত উপরে পা রাখিবার জন্য একটা স্থান বা ব্র্যাকেট থাকে। রণ্‌পা পায়ে দিয়া চলিবার সময়ে লোকে সেই ব্র্যাকেটের উপর পা রাখিয়া, দুই হাতে দুই গাছা রণ্‌পা ধরিয়া চলাফেরা করিতে পারে। কিছুদিন ধরিয়া অভ্যাস না করিলে উহাতে উঠিয়া লোকে যাতায়াত করিতে পারিত না। রণ্‌পার সাহায্যে লোকে এক ঘণ্টায় অনায়াসে দশ পনর মাইল যাইতে পারিত। সেকালে দস্যুরা রণ্‌পায় উঠিয়া, দশ বার ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামে ডাকাতি করিয়া রজনীপ্রভাতের পূর্ব্বেই স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিতে পারিত, এমন কি লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার, লাঠী, তরবারি প্রভৃতি লইয়া তাহারা অনায়াসে রণ্‌পায় উঠিয়া যাতায়াত করিতে পারিত। অনেক স্থানে রণ্‌পাকে "জাঙ্গি"ও বলিত।

## ২

যে অরণ্যমধ্যে দস্যু দলপতি রঘু তাহার অধীন দস্যুদিগের সহিত গোপনে মিলিত হইত, সেই অরণ্যের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার তীরে গোন্দল-পাড়া পর্য্যন্ত লোকের বাস ছিল। বর্ত্তমান কালে যে পল্লী বারাসত এবং মানকুণ্ডু নামে পরিচিত, সে সময়ে উহা শ্যামবাটী নামে পরিচিত ছিল। এই শ্যামবাটীর একাংশে

বাবু রাম রাম মজুমদারের প্রকাণ্ড অট্টালিকা চতুষ্পার্শ্বের গৃহাবলীর মধ্যে সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। রাম রাম মজুমদার জাতিতে সদ্‌গোপ, তাঁহাদের কৌলিক পদবী ঘোষ। তিনি কিরূপে মজুমদার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। রাম রাম মহারাজ মানসিংহের প্রসাদে কিরূপে বাদ্‌সাহের সামরিক বিভাগে উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও পাঠকগণ দস্যুপতি রঘুনাথের মুখে অবগত হইয়াছেন। দেবদ্বিজে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, ধর্ম্মার্থে তিনি অর্থ ব্যয় করিয়া জনসাধারণের নিকট দ্বিতীয় দাতাকর্ণ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার বাগানের ফল, পুষ্করিণীর মৎস্য প্রত্যহ কোন না কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে প্রেরিত হইত।

অরণ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত হরিনাথ ঠাকুর মজুমদার মহাশয়ের একান্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, কারণ, ব্রাহ্মণ ধার্ম্মিক ও নির্লোভ ছিলেন। নিজের দারিদ্র্যের জন্য একদিনও তিনি কাহারও নিকটে ক্ষোভ প্রকাশ বা সাহায্য প্রার্থনা করিতেন না; যখন যাহা জুটিত, তাহাই মা দুর্গার আশীর্ব্বাদ বলিয়া হাসিমুখে গ্রহণ করিতেন। সেদিন রাম রাম মজুমদারের বাটী হইতে একটা প্রায় তিন সের কাৎলা মাছও কিছু তরি-তরকারী হরিনাথ ঠাকুরের বাটীতে প্রেরিত হইয়াছিল। ঠাকুরের ব্রাহ্মণী পদ্মাবতী দেবী পতির প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ছিলেন। কাহারও নিকট হইতে কোনরূপ খাদ্য দ্রব্য পাইলে, তিনি আপনাদের জন্য সামান্য অংশ রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ প্রতিবেশিনীদিগের মধ্যে বিতরণ করিতেন। সেদিনকার কাৎলা মাছের সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা হইল। পদ্মাবতী আপনাদের জন্য একসের আন্দাজ রাখিয়া অবশিষ্ট দুইসের মাছ বিতরণ করিলেন এবং নিজেদের জন্য রক্ষিত মাছ কাটিয়া ধুইবার জন্য খিড়কীর পুষ্করিণীতে গমন করিলেন, খিড়কীর পুষ্করিণীর একদিকে তাঁহাদের গৃহ, অপর তিনদিকে বাঁশঝাড়, কদলী ও আম-জাম-কাঁঠাল প্রভৃতির গাছ। বাঁশঝাড় এত ঘন যে, তাহার অন্তরালে কেহ লুকাইয়া থাকিলে, পুষ্করিণীর ঘাট হইতে তাহাকে সহজে দেখিতে পাওয়া যাইত না। ব্রাহ্মণী মাছ ধুইবার জন্য এক হাঁটু জলে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রায় দশ মিনিট কাল ধরিয়া মাছগুলিকে বেশ করিয়া, ধৌত করিলেন। পরে সেই স্থান হইতে একপার্শ্বে কিছু দূরে সরিয়া গিয়া আর মাছগুলি ধৌত করিয়া সেই স্থান হইতে এক গণ্ডুষ জল লইয়া আঘ্রাণ পূর্ব্বক আবার মাছগুলি ধৌত করিয়া জলের আঘ্রাণ লইলেন। এইরূপে তিন চারিবার আঘ্রাণ লইবার পর তিনি মাছ লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তিনি জানিতে পারিলেন না যে, বাঁশঝাড়ের অন্তরালে থাকিয়া এক ব্যক্তি তাঁহার কার্য্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য করিতেছিল।

পদ্মাবতী বাটীতে আসিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। হরিনাথ ঠাকুর দাওয়ায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। সহসা সদর দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে?"

দ্বারের বাহির হইতে উত্তর আসিল—"অতিথ।"

"অতিথ" শুনিয়াই ব্রাহ্মণ বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে গিয়া দেখিলেন, একজন শ্যামবর্ণ, বলিষ্ঠদেহ প্রৌঢ় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার পরিধানে অল্পপরিসর অর্দ্ধমলিন একখানি ধুতি, স্কন্ধে গামোছা, মাথায় স্কন্ধ পর্য্যন্ত বাব্‌রি চুল, হাতে তৈলপক্ক বাঁশের লাঠী। হরিনাথ ঠাকুরকে দেখিবামাত্র আগন্তুক তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে বলিল, "ঠাকুর মশাই, আমাকে আপনার পাতের চাট্টি প্রসাদ দিতে হবে।"

হরিনাথ প্রসন্নমুখে বলিলেন 'বেশ বাবা, বস। পাকের একটু বিলম্ব আছে। স্নান করবে? তোমরা আপনারা?"

"আমরা কৈবর্ত্ত। চান্ করবো। আপনাদের সেবা হোক্, আমি ততক্ষণ গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি। দয়া করে আমার হাতে একটু তেল দেবেন।"

ব্রাহ্মণ বাটীর মধ্য হইতে একটু সর্ষপ তৈল আনিয়া আগন্তুকের হাতে ঢালিয়া দিলে, সে খানিকটা তৈল মাথায় দিয়া, অবশিষ্ট তৈল বক্ষে ও দুই বাহুতে মাখিয়া লাঠী গাছটিতে বেশ করিয়া তৈল মাখাইয়া স্নান করিতে গেল।

গঙ্গাস্নান করিয়া গামোছা পরিধানপূর্ব্বক আগন্তুক যখন হরিনাথ ঠাকুরের বাটীতে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার সিক্ত বস্ত্র শুকাইয়া গিয়াছে। সে প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল এবং চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ার একপার্শ্বে

উপবেশন করিল। আগন্তুক স্নান করিয়া ফিরিয়াছে কিনা দেখিবার জন্য হরিনাথ বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, আগন্তুক স্নান করিয়া আসিয়া বসিয়া আছে। তিনি অতিথিকে দেখিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কিছু পরে প্রায় এক কাঠা মুড়ি, এক পোয়া আন্দাজ পাটালি গুড় ও একটা বড় পিত্তলের ঘটীতে এক ঘটী জল আনিয়া বলিলেন, "বাবা, ততক্ষণ চাট্টি মুড়ি খাও, পাক ও শেষ হয়ে এসেছে।" এই বলিয়া আগন্তুকের কোঁচায় মুড়ি ও গুড় দিয়া আবার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বেলা প্রায় দুইটার সময়ে হরিনাথ অতিথিকে বাটীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেলেন এবং আগন্তুককে একখানা কলাপাতা দিয়া ঢেঁকিশালের একপার্শ্বে বসিতে বলিলেন। অতিথি পাতা পাতিয়া উপবেশন করিলে, পদ্মাবতী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী হইয়া এক থালা ভাত আনিয়া কলাপাতার উপর ঢালিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণী ঢেঁকিশালের নিকটে উপস্থিত হইবা মাত্র অতিথি উঠিয়া তাঁহাকেও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে বলিল, "মা ঠাকরুণ, বাবা ঠাকুরকে আগে দিন, আগে ঠাকুরের সেবা না হ'লে কি আমি বসতে পারি?"

পদ্মাবতী বলিল "বাবা তুমি অতিথ নারায়ণ, তাতে দোষ নেই। ওঁকেও দিচ্ছি, উনি রসুই ঘরের দাওয়াতে বসেছেন। তুমিও বস বাবা।"

আহারাদি শেষ হইলে, অতিথি পদ্মাবতীকে বলিলেন, "মা, আমার একটা নিবেদন আছে, যদি দয়া করেন।"

পদ্মাবতী বলিলেন "কি বলবে বাবা, বল?"

অতিথি বলিল "মা ঠাকরুণ, আপুনি যখন পুকুরে মাছ ধুচ্ছিলেন, তখন আমি পুকুর পাড়ে বাঁশ ঝাড়ের আড়াল দিয়ে যেতে যেতে দেখলুম, আপুনি মাছ ধুতে ধুতে বার বার জল নিয়ে নাকের কাছে ধরছিলেন। আপুনি জল শুঁকছিলেন কেন, আমি ঠাওর কত্তে পারিনি।

পদ্মাবতী বলিলেন "বাবা, আমাদের মেয়েমহলে কথা আছে—

'চালের যাবে চেলুনি
মাছের যাবে এঁশুনি
তবে হয় রাঁধুনী।'

ভাতের চাল এমন করে' ধুতে হয় যে, চালে যেন একটু কুঁড়ো না থাকে; মাছ এমন করে' ধুতে হয় যে, শেষের ধোওয়া জলে যেন আঁশ গন্ধ না থাকে। তাই মাছ ধুতে ধুতে মাছ ধোওয়া জল শুঁকে দেখছিলুম যে, জলে আঁশ গন্ধ আছে কি না।"

অতিথি আর কিছু না বলিয়া পদ্মাবতীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল এবং দাওয়ার উপর ধূমপানরত হরিনাথ ঠাকুরকে প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

অতিথি প্রস্থান করিলে পদ্মাবতী বলিলেন "অতিথ মিন্সের চেহারা দেখলে ভয় করে, যেন ডাকাত!"

হরিনাথ সহাস্যে বলিলেন "সবাই কি আর আমার মত ময়ূর-ছাড়া কার্ত্তিক হয়!"

পরবর্ত্তী শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া বৃহস্পতিবার খুব প্রত্যুষকালে এক ব্যক্তি হরিনাথ ঠাকুরের সদর দ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিল—"ঠাকুর মশাই, গা তুলেছেন?"

হরিনাথ প্রত্যহ খুব প্রত্যুষেই শয্যাত্যাগ করিতেন। যখন আগন্তুক দ্বারে করাঘাত করিয়া তাঁহাকে ডাকিল, তখন তিনি মুখ হাত ধুইয়া দাওয়ায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন, এবং তাঁহার গৃহিণী প্রাঙ্গণে গোময়ের লেপ দিতেছিলেন। তখনও দিবালোক বেশ প্রখর হয় নাই, বনে-জঙ্গলে তখনও অন্ধকার বোধ হইতেছিল। আগন্তুকের আহ্বান শুনিয়া হরিনাথ—"কে হে দাঁড়াও, যাচ্ছি" বলিয়া ধূমপান করিতে করিতে গিয়া দ্বারোন্মোচন করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আগন্তুক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে হরিনাথ দেখিলেন—সেদিনকার সেই অতিথি। তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, তুমি? এত ভোরে? খবর কি?"

আগন্তুক করযোড়ে বলিল—"খবর একটু আছে। আজ আপুনি চান করবার সময়ে আপনার খিড়কীর পুকুরের দখিন পাড়ে আমগাছ বরাবর এক উরু জল পর্য্যন্ত বেশ করে' দেখবেন, আমি এখন বিদায় হই—" এই বলিয়া প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে, হরিনাথ বাধা দিয়া বলিলেন, "দাঁড়াও, একটা কথা আছে। সেদিন

তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করি নাই, কারণ অতিথির পরিচয় লইতে নাই। আজ ত তুমি আমার অতিথ নও, আজ পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে দোষ নাই, তোমার নিবাস ?"

আগন্তুক বলিল "আমার নিবাস! আমার আবার পোরচয়! আমরা পাখী-পক্ষীর জাত, আজ এখানে, কাল বদ্ধমানে, পরশু মেদনীপুরে—এমনই করে' উড়ে' উড়ে' বেড়াই। বনের পাখী, বনে থাকি, বনেই চরে' খাই। কাল কোথায় থাকব, মা কালীই বলতে পারেন।—"

বাধা দিয়া হরিনাথ বলিলেন "তবু, তোমার নামটা কি শুনি!"

"আমার নাম শুনে আর কি হবে? হয় ত এ জন্মে আর আপনার চরণদর্শনহ হবে না, তবু যখন জিজ্ঞেস করছেন, বলি, আমার নাম রঘুনাথ সদ্দার।" এই বলিয়াই রঘুনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া দ্রুতপদে অরণ্যের দিকে প্রস্থান করিল ও মুহূর্ত্ত মধ্যে গভীর অরণ্যের অন্তরালে অন্তহিত হইল।

যে নাম হরিনাথ শ্রবণ করিলেন, সে নাম শুনিলে হৃৎকম্প না হইত, এরূপ লোক ও অঞ্চলে বিরল ছিল। দেবী চৌধুরাণী সাগরের পিত্রালয়ে গিয়া আত্মপ্রকাশ করিলে সাগরের দাসীর যে অবস্থা হইয়াছিল, হরিনাথ ঠাকুরের কতকটা সেইরূপ অবস্থা হইল। সাগরের দাসীর হাত হইতে পানের বাটা পড়িয়া গিয়াছিল, একথা বঙ্কিম-বাবু বলিয়াছেন। হরিনাথের হাত হইতে হুঁকা পড়িয়া গিয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানি না, তবে রঘুনাথ সদ্দার ওরফে রোঘো ডাকাতের নামে যে সেকালে বাঁকুড়া হইতে চব্বিশ পরগণা এবং বীরভূম হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত বিশেষতঃ হুগলী জেলা থরহরি কম্পান্বিত হইত, তাহা জনপ্রবাদ-রূপে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গে এখনও বিদ্যমান আছে। উৎপীড়কের শত্রু, দুর্ব্বলের আশ্রয়, পরস্বাপহারী অথচ দানে মুক্তহস্ত, নির্ম্মম কঠোর অথচ দয়ালু, একাধারে এইরূপ বিপরীত প্রকৃতি বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না।

নাম শুনিয়া হরিনাথ ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ, রঘুনাথের নাম সকলে শুনিলেও তাহাকে কেহ চর্ম্মচক্ষে দেখে নাই। অনেকেরই ধারণা ছিল যে, রঘুনাথ মন্ত্রসিদ্ধ। কেহ বলিত—কালীর বরপুত্র, আবার কেহ বা তাহাকে পিশাচসিদ্ধ বলিয়া মনে করিত। রঘুনাথ ইচ্ছামাত্রই অদৃশ্য হইতে পারিত, পশুপক্ষীর রূপ ধারণ করিতে পারিত, জলে ডুব দিয়া তিন চারি দিন থাকিতে পারিত, পুষ্করিণীতে ডুবিয়া গঙ্গায় গিয়া ভাসিয়া উঠিতে পারিত, এইরূপ কত কথা তাহার সম্বন্ধে প্রচলিত ছিল। হরিনাথের সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলে, তিনি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণীর কাছে সকল কথা প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া পদ্মাবতীও ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "রঘু আমাকে মা বলেছে, আমাদের নুণ খেয়েছে, আমাদের আবার ভয় কি? চল, পুকুরে গিয়ে দেখি কি আছে।"

হরিনাথ মাথায় তেল দিয়া, গামোছা লইয়া পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইলেন, পদ্মাবতীও গিয়া ঘাটের উপরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। স্নানান্তে হরিনাথ রঘুনাথের নির্দ্দেশমত, আম্রবৃক্ষের নিকটে জলমধ্যে অন্বেষণ করিতে করিতে প্রায় এক কোমর জলে একটা ভারী বস্তুর সন্ধান পাইলেন। তিনি জল হইতে তুলিয়া দেখিলেন—উহা চটে মোড়া একটা অনতিবৃহৎ পুঁটুলী। তিনি পুঁটুলীর গাত্রলগ্ন পঙ্ক ধৌত করিয়া সযত্নে তাহা বাটীতে লইয়া আসিলেন।

পুঁটুলীটি খুলিয়া দেখিলেন, উহার মধ্যে কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার, কুড়িখানি মোহর এবং অষ্টধাতুনির্ম্মিত একটি অনতিবৃহৎ দশভুজা প্রতিমা। হরিনাথ বুঝিলেন যে, রঘুনাথ কোনও ধনবানের বাটী লুণ্ঠন পূর্ব্বক ঐ সকল দ্রব্য আনিয়া হরিনাথকে দিয়া গিয়াছে। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। পদ্মাবতী বলিলেন, "মা যখন স্বয়ং এই গরীবের কুটীরে এসেছেন, তখন মায়ের পূজার বন্দোবস্ত কর। সোণাদানায় আমাদের দরকার নাই ও যেমন আছে, তেমনই থাকুক্। ডাকাতে এই ঠাকুর দিয়েছে, এ কথা প্রকাশ না করে', স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পেয়ে পুকুরে মাকে পেয়েছি, এই কথা প্রচার করে' দাও।"

পদ্মাবতীর পরামর্শই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইল। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই প্রতিবেশীরা শুনিয়া বিস্মিত হইল যে,

হরি ঠাকুর স্বপ্নে প্রত্যাদেশে পুষ্করিণীমধ্যে দেবী দশভুজাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। দলে দলে নরনারী, বালকবালিকা পূজার উপকরণ লইয়া হরিনাথ ঠাকুরের বাটীতে ঠাকুরদর্শনে আসিতে লাগিল।

এইভাবে প্রায় ছয়মাস কাটিয়া গেল। তাহার পর একদিন রাত্রিকালে হরিনাথ স্বপ্নে দেখিলেন যে, যেন দশভুজা তাঁহার শিয়রে বসিয়া বলিতেছেন "হরিনাথ, আমি মন্দিরে ছিলাম, তোমার পর্ণকুটীরে থাকিতে আমার অস্বস্তি বোধ হইতেছে, আমাকে মন্দিরমধ্যে রাখিয়া দাও।" এই বলিয়াই দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

হরিনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, উষা সমাগত। তিনি পত্নীকে স্বপ্ন বিবরণ বলিলেন। পদ্মাবতী বলিলেন "আমরা গরীব মানুষ, তাই মা মন্দির তৈয়ারীর খরচ নিয়ে আমাদের বাড়ীতে এসেছেন। ভাবনা কি? ঐ দিয়ে একটা ছোট মন্দির করে' দাও।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, এমন সময়ে সদর দ্বারে করাঘাতের সহিত কাহার আহ্বান শুনিতে পাওয়া গেল। হরিনাথ তাড়াতাড়ি গিয়া সদর দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখিলেন—শ্যামবাটীর রামরাম মজুমদার তাঁহার দ্বারে দণ্ডায়মান। হরিনাথকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া মজুমদার মহাশয় বলিলেন, "ঠাকুর আমি ভিক্ষার্থী, আমি আপনার কাছে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।"

হরিনাথ সবিস্ময়ে বলিলেন "আমি নিজেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, আপনি আমার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছেন? বড় অদ্ভুত কথা!"

রামরাম বলিলেন, "কথা আরও অদ্ভুত। পথে দাঁড়াইয়া সে কথা বলিবার নহে।"

হরিনাথ রামরামকে সঙ্গে লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং শয়নগৃহের দাওয়ায় একখানা মাদুর পাতিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিয়া স্বয়ং একখানি পৃথক্ আসনে উপবেশন করিলেন। তখন রামরাম গলদশ্রুলোচনে বলিলেন "আজ শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন জগদম্বা দশভুজা মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন, 'রামরাম, আমি অনেকদিন মন্দিরে বাস করিয়া এখন হরিনাথের পর্ণকুটীরে থাকিতে অস্বস্তি বোধ করিতেছি। তুমি আমাকে মন্দিরমধ্যে প্রতিষ্ঠা কর।' দেবীর আদেশে আমি দেবীকেই আপনার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি।"

রামরামের কথা শুনিতে শুনিতে হরিনাথের নয়ন হইতে অবিরল অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন, "মজুমদার মহাশয়, আমিও আজ ভোর বেলা ঠিক ঐ স্বপ্নই দেখিয়াছি। মায়ের ইচ্ছা মা নিজেই পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মন্দির নির্ম্মিত হইলে আপনি দেবীকে লইয়া গিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করুন। একটা কথা আপনাকে বলি, প্রকাশ করিবেন না।"

এই বলিয়া তিনি রঘুনাথের আতিথ্য গ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সহিত শেষ সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন। প্রতিমার সহিত যে মোহর ও গহনা পাইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন "সেই মোহর ও গহনা আপনি লইয়া গিয়া মন্দির-নির্ম্মাণে ব্যয় করুন।"

রামরাম বলিলেন "মা আমাকে মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিয়াছেন, সে ব্যয়ভার আমিই বহন করিব। মায়ের টাকা এখন মায়ের কাছেই থাকুক, পরে উহাতে মায়ের সিংহাসন ও গহনা গড়াইয়া দিলেই হইবে।"

অচিরে মন্দিরনির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইল। শত শত সুদক্ষ শিল্পীর পরিশ্রমে ও রামরামের অজস্র অর্থ ব্যয়ে একটি সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইলে, রামরাম শুভদিনে দেবী দশভুজাকে লইয়া গিয়া মহাসমারোহে দেবতা প্রতিষ্ঠা করিলেন।

দুর্গোৎসবের প্রায় একমাস পূর্ব্বে রামরামের মনে একটা প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল—শারদীয়া পূজার কিরূপ ব্যবস্থা হইবে? তাঁহার বাটীতে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা হইত। অতঃপর কি দুই স্থানে যুগপৎ পূজার ব্যবস্থা হইবে? যেদিন তাঁহার মনে এই প্রশ্ন উত্থিত হইল, সেইদিন রাত্রেই রামরাম স্বপ্ন দেখিলেন যেন দেবী বলিতেছেন যে, দুর্গোৎসবের কয়দিন তাঁহার বাটীতে যে প্রতিমার পূজা হয়, সেই মৃণ্ময়ী প্রতিমার ক্রোড়ে ধাতুময়ী প্রতিমাকে স্থাপন করিয়া পূজা করিতে হইবে, দুই স্থানে পূজার প্রয়োজন নাই।

দেবীর আদেশানুসারে সেইরূপ প্রতিমার ক্রোড়ে প্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজার ব্যবস্থা হইল।

সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত দশভুজার মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে, এখনও দেবীর নিত্য পূজা হইয়া থাকে। রামরাম মজুমদারের সুবৃহৎ অট্টালিকা বহুদিন হইল বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কাদায় গাঁথা ইষ্টকনির্ম্মিত এই মন্দির ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, ঝড় ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করিয়া উন্নতশীর্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেবী দশভুজার মহিমা এবং পরম ভক্ত রামরাম মজুমদারের কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে।

# সংস্কৃত ভাষা ও তাহার বৈশিষ্ট্য

শ্রীরজনীমোহন আয়ন্ দত্ত, কাব্যতীর্থ

মানুষ যে কথা বলিয়া বা লিখিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করে, তাহার নাম ভাষা। লিখন-প্রণালীর উদ্ভাবন হইবার পূর্ব্বে, কেবল ধ্বনি দ্বারাই ভাবের বিনিময় হইত। এই ধ্বনিই 'শব্দ' বা "নিত্য বেদ" নামে অভিহিত। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম-নিঃশ্বসিতং বেদা বেদেভ্যোঽপখিলং জগৎ" ইত্যাদি।

বেদ সকল ব্রহ্মের নিঃশ্বাস হইতে নির্গত; এই বেদ হইতেই ভগবান্ সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। বেদই শ্রুতি, শ্রুতি হইতে স্মৃতি, পুরাণ, সংহিতা ইত্যাদির উৎপত্তি। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে — বেদবিহিত কর্ম্মের নাম 'ধর্ম্ম' এবং তদ্বিপরীত কর্ম্মের নাম 'অধর্ম্ম'—বেদ প্রণিহিতো-ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। কেবল তাহাই নহে, মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, ধর্ম্ম-নির্ণয় বিষয়ে বেদ বাক্যই প্রামাণ্য (তদ্বচনাদাম্নায়স্যপ্রামাণ্যম্। ১ অ।১ আ।৩ সূ-বৈশেষিক।)। মহর্ষি জৈমিনী বলিয়াছেন, "বেদ যে সকল কর্ম্ম করিতে মানবকে প্রেরণা করিয়াছেন অর্থাৎ উপদেশ দিয়াছেন, তাহারই নাম ধর্ম্ম (চোদনালক্ষণো ধর্ম্মঃ। ২ সূ।১ পা ১ অ।)। এইরূপ সমস্ত শাস্ত্রেই বেদবিহিত কর্ম্মকে ধর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্মকে অধর্ম্ম বলা হইয়াছে। সৃষ্টির প্রথমাবধি বেদের কথা শুনা যাইতেছে, কিন্তু কেহ কখনও তাহা রচনা করিতে দেখেন নাই, এইজন্য ইহার নাম শ্রুতি (শ্রূয়তে ন ক্রিয়তে ইতি শ্রুতিঃ—শ্রু+কর্ম্মণি বাচ্যে+ক্তিঃ।) মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক বেদার্থ-স্মরণই স্মৃতি নামে আখ্যাত (মহর্ষিভির্বেদার্থ স্মরণং স্মৃতিঃ, স্মরন্তি বেদমনয়া বা।) দুরূহ বেদার্থ জনসাধারণের বোধগম্য নয় বলিয়া স্মৃতি, সংহিতা প্রভৃতি পুস্তকাকারে সঙ্কলিত হওয়ার প্রয়োজন হইল। এই বেদভাষাই দেবভাষা সংস্কৃত (বিশুদ্ধ)। ইহার বিশুদ্ধতার উপরই জীবশ্রেষ্ঠ মানবের ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করে। মোক্ষদাত্রী বেদমূলক এই সংস্কৃত ভাষা বিশুদ্ধ হওয়া উচিত বলিয়া উহা নির্দ্দোষ ও সংস্কৃত অবস্থায়ই জনসমাজে প্রচারিত হইল। কেননা, ইহার উচ্চারণ-বৈষম্যে বিবিধ অনর্থ উৎপাদিত হয়। শাস্ত্রে আছে—মন্ত্রাদিতে স্বরের উচ্চারণ-পার্থক্যে সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। (মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা—মিথ্যা-প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্র শত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ। নারদীয় শিক্ষা।) স্বর-বশতঃই হউক, আর বর্ণ-বশতঃই হউক, যদি মন্ত্রের ঠিক ঠিক উচ্চারণ না হয়, তবে অশুদ্ধ প্রয়োগ হেতু, সেই মন্ত্র আর সেই অর্থ প্রকাশ করে না। সেই অশুদ্ধ উচ্চারিত বাক্যরূপ বজ্র যজমানকেই সংহার করে। যেমন ইন্দ্রের শত্রু বৃত্রাসুরকে স্বরের অপরাধে নিহত হইতে হইয়াছিল। ইন্দ্র-বধার্থে কৃতযজ্ঞে, বৃত্রের পুরোহিত 'ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব' মন্ত্রে অন্তঃস্বর উদাত্ত উচ্চারণ না করিয়া আদি স্বর উদাত্ত উচ্চারণ করিয়াছিলেন, অন্তঃস্বর উচ্চারণ করিলে ষষ্ঠী-তৎপুরুষ বা বহুব্রীহি সমাস হয়। তাহাতে অর্থ হয়—'ইন্দ্রস্য শত্রুঃ' অর্থাৎ ইন্দ্রের শত্রু অথবা 'ইন্দ্র এব শত্রুর্যস্য' অর্থাৎ ইন্দ্র শত্রু যা'র সেই বৃত্রাসুরের বৃদ্ধি, কিন্তু সেই অন্তঃস্বর উদাত্তের স্থানে আদি স্বর পাঠ করাতে 'ইন্দ্রশ্চাসৌ শত্রুশ্চেতি' অর্থাৎ 'ইন্দ্র যে শত্রু' এইরূপ অর্থ হইয়া ইন্দ্রেরই বৃদ্ধি এবং বৃত্রাসুরের মৃত্যু হইল। অক্ষরের পার্থক্য হইলে যে বিপরীত অর্থ হয়, ইহা এত সাধারণ যে, তাহার বোধ হয় উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার আবশ্যকতা

নাই। স্বরের পার্থক্য হইলেও যে অর্থের পার্থক্য হয়, তাহা কেবল সংস্কৃতে নহে, বাংলাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন একজন বলিল, একটী জিনিষকে 'বড়া' করিয়া ভাজিতে (যেন চিবাইতে মচ্ মচ্ শব্দ হয়), তুমি একখানি লোহার 'কড়া' করিয়া ভাজিতে লাগিলে। একজনকে তুমি 'চড়াইয়া' (ভাত চড়িয়ে) দিতে বলিলে সে তোমাকে 'চড়াইয়া' (গালে চড় মারিয়া) দিল। এইরূপ 'কই' বলিতে—'মাছ', 'কোথায়' ও 'কথা বলি' এই তিন রকমের অর্থ বুঝায়। পশ্চিম বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—

"আশীর্ব্বাদং ন গৃহ্ণীয়াৎ বঙ্গদেশ-নিবাসিনঃ।
শতায়ুরিতি বক্তব্যে হতায়ুর্বদতি যতঃ॥"

পূর্ব্ববঙ্গনিবাসীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে নাই, যেহেতু তাহারা 'শতায়ুঃ' বলিতে 'হতায়ুঃ' বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ শত বৎসর আয়ুর স্থলে, আয়ুঃ বিনষ্টই অর্থ হয়। পূর্ব্ববঙ্গে 'শ'কে 'হ' বলার কারণ—ইহা মুসলমানপ্রধান স্থান, এখানে মুসলমানদের পারসিক ভাষার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায়ও পারসিক ভাষা যুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গবাসী জনসাধারণ 'শালা'কে 'হালা', 'শুন'কে 'হুন' বলিয়া থাকেন। অবশ্য শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে এরূপ নয়। পারসিক প্রাচীনগ্রন্থ আবেস্তা, গোরেস্তায়—'শ'কে 'হ' বলা হয়। এইরূপ পশ্চিম বঙ্গেও 'কৃষ্ণ'কে 'কেষ্ট' ও 'বিষ্ণু'কে 'বিষ্টু' বলিয়া মন্ত্র পাঠ করাইতে শুনিয়াছি। ইহাতেও যে কেন মন্ত্র অশুদ্ধ হইবে না, বুঝিতে পারি না।

বর্ত্তমানকালে আমরা উচ্চারণ বিষয়ে বড়ই অসাবধান। দুইটী 'ব'এর, দুইটী 'ন'এর, তিনটী 'শ'এর পৃথক্ উচ্চারণ অধিকাংশ লোকই করেন না। এমন কি পণ্ডিতগণের মধ্যেও তেমন লোক বিরল, কেহ বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে চাহিলেও, হাসি ঠাট্টার ভয়ে উচ্চারণ করিতে সাহস পা'ন না। অথচ 'ক' এ 'ষ' এ মিলিলে (ক্ষ'র স্থলে) 'খ্য' উচ্চারণ করিতে কোনও শাস্ত্রেই বিধান নাই।

পতঞ্জলিকৃত পাণিনির মহাভাষ্যের প্রথমাহ্নিকে ধৃত বেদবচন—

"বিহীনঃ স্বরবর্ণাভ্যাং যো বিমন্ত্রঃ প্রযুজ্যতে।
যজ্ঞেষু যজমানস্ত রুষ্যায়ুঃ প্রজাঃ পশূন্॥"

।৬ শ্লো। ১ অ—নারদীয় শিক্ষা।

স্বর ও বর্ণ বিকৃত করিয়া যে যজ্ঞে মন্ত্রপ্রয়োগ হয়, তাহা যজমানের আয়ুঃ, পুত্র ও পশুসমূহ বিনষ্ট করে। ইংরেজীতেও এইরূপ 'conduct' শব্দের first syllableএ accent দিলে অর্থ হয়—আচরণ, ব্যবহার (personal department, demeonour, behaviour) এবং second syllableএ accent দিলে অর্থ হয়—পরিচালনা করা (to lead), এই প্রকার উদাহরণের অভাব নাই। তাই জীবশ্রেষ্ঠ মানবের ভাষা—কি ধর্ম্মোন্নতি, কি সামাজিক উন্নতি কিংবা সাহিত্যের উন্নতির জন্যও সংস্কৃত (বিশুদ্ধ) হওয়া উচিত। এক্ষণে 'সংস্কৃতে'র অর্থ কি, তাহাই বলা যাইতেছে।

'সংস্কৃত' শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে সুসম্পন্ন আছে যাহা। (সম্ + কৃ অতীতকালে ক্ত = সংস্কৃত)। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা পূর্ব্বে অসংস্কৃত ছিল, পরে সংস্কার করিয়া বিশুদ্ধ (সংস্কৃত) করা হইয়াছে। তাঁহাদের ভাবা উচিত যে, তাহা হইলে 'অভূততদ্ভাবে চ্বি প্রত্যয়' করিয়া "সংস্কারীকৃত" পদ হইত। ("কৃভ্বস্তি বিকারাচ্চ্বি অভূততদ্ভাবে"—ইতি পাণিনিঃ), কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল 'সংস্কৃত' নাম রাখাতে, যাহা নিয়তই বিশুদ্ধ, তাহারই নাম 'সংস্কৃত' বলিয়া বুঝিতে হইবে। (ভূতে।৩।২।৮৪ পাণিনি। অর্থাৎ অতীতকালে) এই সূত্রাধিকারে 'নিষ্ঠা'—২।৩।২।১০১ পাণিনিসূত্রানুসারে (ক্ত ক্তবতু নিষ্ঠা।১।১।২৬ পাণিনি অর্থাৎ ক্ত এবং ক্তবতু প্রত্যয়ের নাম 'নিষ্ঠা') অতীতকালে হইয়া থাকে। সুতরাং 'সংস্কৃত' শব্দ যে নিয়ত সংস্কার-বিশিষ্ট, তাহাই প্রমাণিত হইল। পৃথিবীতে যত ভাষা আছে, সেই সকল ভাষাই প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিজাত। এই প্রাকৃত ভাষা দুইটী উপায়ে উৎপন্ন। একটী উপায়, কালবশে শক্তির অল্পতা হেতু বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে না পারিয়া, শব্দকে বিকৃত করিয়া লওয়ায়, আর একটী দেশের জলবায়ুর অনুযায়ী শব্দ উৎপন্ন হওয়ায়, এই প্রাকৃত ভাষা কতক সংস্কৃত শব্দরাশি লইয়া, আর কতক পশুপক্ষী প্রভৃতি ভিন্ন জীবের অনুকরণে অনেক শব্দ লইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাও আবার অনেক প্রাকৃত ভাষায় সংস্কৃত অধিক, আবার অনেক ভাষায় জীবজ শব্দ অধিক। একমাত্র ভারতেই স্থূলতঃ ৪৮ প্রকার ভাষা প্রচলিত।

গ্রীসের ভাষা গ্রীক্‌, লাটিনের (ইটালীর অন্তর্গত প্রাচীন নগরবিশেষের) ভাষা লাটিন, ইংলণ্ডের ভাষা ইংরেজী, আরবের ভাষা আরবী, হিন্দুস্থানের ভাষা হিন্দী, বঙ্গদেশের ভাষা বাংলা ইত্যাদি। তন্মধ্যে আবার পূর্ব্ব-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গ ভেদে ভাষায় অনেক পার্থক্য আছে। ইহাকে প্রচলিত কথায় বলে যে, "যোজনান্তর ভাষা"। সংস্কৃত—'রবং ন করোতি', বাংলায়—'রব করে না', পূর্ব্ব-বঙ্গে—'রাও করে না';—মেদিনীপুরে—'লা কারে নি।' তন্মধ্যে আবার উচ্চ ও নীচ জাতিভেদে—অলাবু, লাউ, নাউ; লৌহ, লোহা, নোয়া, নো; নবতি, নব্বই, নব্বুই, লব্বুই; কূপ, কুয়া, কো, পুষ্করিণী, পুকুর, পুকুরি ইত্যাদি বহু শব্দভেদ তো রহিয়াছেই, পরন্তু চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি জেলার খাঁটী বাঙ্গালী তাহাদের নিজেদের জেলার কথা বলিলে অনেক কথা বুঝাই যাইবে না। শ্রীহট্ট জেলারও অনেক স্থানের লোকের কথা প্রায় বুঝা যায় না। দৃষ্টান্ত :—একজন বিদেশাগত পথিক একজন পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী শ্রীহট্টবাসীকে কোথাও যাইবার জন্য পথ দেখাইয়া দিতে বলিলেন,—'ভাই, কোন্ পথে যাব?' তদুত্তরে সে বলিল,—"হৌ ছড়াভায়গী, হৌ গা'র পেটুলাঘাইয়া বাইও।" এই ছড়া (ঝরণা-যাহা হেমন্তকালে শুখাইয়া যায়—পথের মত দেখায়) দিয়া যাইয়া ঐ (পুরোবর্ত্তী) গ্রামের পাশ দিয়া যাইও ইত্যাদি। বোধহয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সুবিস্তৃত নদী-তীরবর্ত্তী (যথা পদ্মা) জেলেদের কথায়, বড় বড় বিল বা হাওরের নিকটবর্ত্তী ও পর্ব্বত বা পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী লোকদের কথা প্লুত-স্বর-বহুল এবং কোন্ কোন স্থানে 'মহাপ্রাণ' স্থলে 'অল্পপ্রাণ' প্রয়োগ-বহুল। যথা—পদ্মা নদীর বা অন্য কোন নদীর তীরবর্ত্তী জেলে তাহার সঙ্গী ভাইকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে—"গাঙে দী একটা মাজ্‌ যায়"—গাঙে (নদী) দিয়া একটা মাছ যায়; "দাদী দরে বোহুঁত" (দাদাকে পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী চাষা উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিতেছে)। "ভাত খাবে কি?" স্থলে "বাৎ খাইতায় নী?"—"ভাল ত" স্থলে "বাল ত" ইত্যাদি। প্রাচীন বাংলায় আর নবীন বাংলায়ও দিন দিনই ভাষার পরিবর্ত্তন হইতেছে। বিদ্যাপতির (মৈথিলী হইলেও বঙ্গভাষায় চলিত)

"কতি হুঁ মদন তনু দহসি হমারি—
হাম্ নহুঁ শঙ্কর, হুঁ বর নারী।"

ভারতচন্দ্রের—"ঈশাক্ষের উষর্বুধে মারা গেল মার।
'নাকেতে নির্জরগণ করে হাহাকার॥"

গোবিন্দদাসের—"মনহিঁ আপনা সঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত॥
মুরলীক কল-বোলনি।"

জ্ঞানদাসের—"পহিলহি পিরীতি নাহিক পরকাশ।
দোতী সুতায়ায় উনহিক পাশ॥"

চণ্ডীদাসের—হাসিতে আমরা বরিখে ভাল,
নাসাকর 'পর বেসর আর;
মুকুতা নিঃশ্বাসে দুলিছে ভাল
দেখ হরে কত ভালিয়া॥"

রামদাস—"আকাশে ফেলিতে ছেপ এসে গায় পড়ে।
বাড়া কিবা কহিব বথায় কথা বাড়ে॥"

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর—
"উরয কচ্ছপগুলা, শশা হেন মশাগুলা—
জলোকা গজের শুণ্ডাকার।"

"অবিরত-বিগলিত জলধারাকুললোচনে কাতর বচনে" —ইত্যাদি বিদ্যাসাগরীয় ভাষা ত বর্ত্তমানে নিন্দিত। বঙ্কিমের প্রাণ ওষ্ঠাগত। ইংরাজী ভাষারও এইরূপ অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বাইবেলের ইংরাজী বুঝিতে স্বতন্ত্র স্কুলের প্রয়োজন। বাইবেলে, hath, art, gav, আর এখন গদ্যে চলে না। Shakespeare ও Tennyson-এর ভাষা এখন আর চলে না। পৃথিবীতে যত ভাষা আছে, সর্ব্বত্রই দেশের নামানুসারে ভাষার নাম হইয়াছে। একমাত্র সংস্কৃত ভাষাই কোন দেশজ নহে। অন্য ভাষার সহিত এই ভাষার পার্থক্য এই যে, অন্য ভাষাভাষিগণ নানা ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া নিজের নিজের ভাষার উন্নতি বিধান করেন—একটী বিজাতীয় শব্দ স্বীয় ভাষায় প্রবেশ করাইতে পারিলে গৌরব ও আনন্দ অনুভব করেন। একদল লোক আছেন, যাঁহারা বাংলা ভাষায় ইংরেজী, উর্দ্দু, পারসী যোগ করিয়া কথা না বলিলে

পাছে লোকে তাহাদিগকে কম বিদ্বান্ বলিবে—এই মনে করিয়াই হউক কিংবা সংসর্গদোষে কদভ্যাসবশতঃই হউক—"আমার wife আপনাকে request করেছেন kindly একবারটী আমাদের বাড়ী যাবেন" ইত্যাদি মিশ্রভাষার কথা বলিয়া থাকেন। আজকাল মুসলমানগণ বাঙালী হইয়াও "ফজরে উজু করিয়া বাহির হইবেন'—এইরূপ ভাষা বাংলায় প্রয়োগ ইচ্ছা করেন; "প্রাতে উপাসনা করিয়া বাহির হইবেন" বলিতে যেন অপমান বোধ করেন। পক্ষান্তরে, সংস্কৃত ভাষা তাহাতে অপমানিতা ও দূষিতা হন, এবং কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্তের দেহপুষ্টি বিনাশের হেতু মনে করিয়া প্রাণপণে তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। আর সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রধান আবশ্যকতাই হইল এই যে, সে সর্ব্বদা তরবারি বা সম্মার্জনী হস্তে দাঁড়াইয়া আছে যে, তাহার দেহে কোনও অশুদ্ধ ভাষা প্রবেশ করিয়া যেন তাহাকে কলুষিত করিতে না পারে। সংস্কৃতজ্ঞ, আচারনিষ্ঠ, ধার্ম্মিক পণ্ডিতগণ যেমন তাঁহাদের সংখ্যাহ্রাসের ভয়ে ভীত হইয়া অধার্ম্মিক ও অনাচার লোককে সমাজে স্থান দিতে অনিচ্ছুক, সংস্কৃত ভাষাও ঠিক সেইরূপ। এই নিমিত্ত পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি যেমন তাহাদের অস্তিত্ব ধরাবক্ষে বর্ত্তমান রাখিতে সমর্থ হয় নাই, সেইরূপ অন্য কোন ভাষাও তাহাদের সৃষ্টি অবধি আজ পর্য্যন্ত অবিকৃত রাখিতে পারে নাই। সংস্কৃত ভাষা এখন লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত না থাকিলেও, দেবকার্য্যে উহার ব্যবহার থাকাতে তাহা আজও লোপ পাইতে পারে নাই। আর ব্যবসার, খনি, কৃষি, ধাতুঘটিত এবং রাজনীতি প্রভৃতি ব্যাপারে, কাজ চালাইবার জন্য ব্যবহারিক ভাষা-সমূহের পরিবর্ত্তন হইলেও ক্ষতি নাই, বরং লাভই আছে। কারণ বিভিন্ন জাতির এক বা একরূপ ভাষা করিতে পারিলে পরস্পর কাজ কর্ম্মের বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু অনন্তকালের অনন্ত কল্যাণ, স্বর্গ-মোক্ষাদিপ্রদ সংস্কৃত ভাষা বিনষ্ট হইলে, সমগ্র মানবজাতির সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে — মানবের মানবত্বরক্ষক বেদ অবোধ্য হইবে। আর তাহা হইলে, তাহার আদেশ-পালন-রূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে না পারায়, মানব পশুতে পরিণত হইবে। ভোগোন্মত্ত জাতি-বিশেষের ন্যায় মানুষ আকারে মানুষ থাকিবে মাত্র, আচারে নহে। শাস্ত্রকারগণ বলেন—

"আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ-
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনা পশুভিঃ সমানাঃ॥"

—আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন—পশু এবং মানব উভয় মধ্যেই রহিয়াছে। ধর্ম্ম বলিয়া একটা বিশেষ বস্তু আছে, যাহা মানুষেই আছে, পশুতে নাই। সেই ধর্ম্মহীন মানুষ পশুর সমান। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত চারিটী ব্যাপারে মানুষ অপেক্ষা পশুকে এক হিসাবে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে; কেন না, পূর্ব্বোক্ত চারিটী বিষয়ে পশুর কালাকাল নির্দ্ধারিত আছে; কিন্তু সত্য বলিতে কি, মানুষের তাহাও নাই। আমরা গলা ফাটাইয়া প্রাণপণে চীৎকার করিলেও, আমাদের বংশধরগণ কিছুতেই আমাদের কথা শুনিবেন না, কিন্তু পাশ্চাত্য-জগৎ যখন তাহাদের ভোগের শেষে ইহার মহিমা বুঝিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে ইহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবে, আমাদের মনে হয় তখন আবার ইহারা ফিরিবে। এখন হইতেই আমাদের দেশের কোন পিতৃ-পিতামহের প্রতি ভক্তিমান্ মহাশয় ব্যক্তি পাশ্চাত্য-কণ্ঠ-নিঃসৃত প্রশংসাবাক্য শুনিয়া সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতেছেন।

তাহারা পাশ্চাত্য গোল্ড্ষ্টুকার, বাট্‌লি, ম্যাক্‌স্‌মুলার, কাওয়েল, হিগেল প্রভৃতির নিকট সংস্কৃতের প্রশংসা শুনিয়া আনন্দিত ও মুগ্ধ হন। ফ্রেডরিক্ স্লিগল্ বলেন যে, "গ্রীক্ দর্শনের যুক্তিতর্ক ভারতীয় দর্শনের যুক্তি-তর্কের নিকট সূর্য্যালোকের সমীপে প্রদীপের ন্যায় হীনপ্রভ"।

ভিক্টর কোজিন বলেন, "উপনিষদ অধ্যয়নে যখন জীবিতাবস্থায়ই এত শান্তি, তখন মৃত্যুতেও ইহা আমাকে শান্তি দিবে।" ম্যাক্‌স্‌মুলার বলেন, "যদি জ্ঞানের চরম শিক্ষা কিছুতে থাকে, তবে তাহা বেদেই আছে। জ্ঞান সম্বন্ধে বেদ অপেক্ষা বড় কথা কেহ কখনও বলিতে পারে নাই, পারিবেও না। কারণ, তাহা থাকিতেই পারে না।"

গোল্ড্ষ্টুকার বলেন, "সংস্কৃত ভাষা বাস্তবিকই সংস্কৃত। এইরূপ বৈজ্ঞানিক ভাষা পৃথিবীতে আর নাই।"

বাট্‌লিং বলেন, "পাণিনির ব্যাকরণ পড়িলে মনে হয়

যে, ইহা কোন মনুষ্যকৃত নহে; বাস্তবিকই যেন শিবকৃত।"

কাশীধামের কুইন্‌স্ কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মিঃ ভিনিস্ বলেন, "আমি এক আনা দামের—"তর্কসংগ্রহ" (ন্যায়ের একখানি প্রথম গ্রন্থ) পাঠ করিয়া দর্শনশাস্ত্রে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছি, সমস্ত ইউরোপীয়ান্ দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়াও সে জ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই।"

ইংরেজী প্রথম অক্ষর A, দ্বিতীয় B, তৃতীয় অক্ষর C। প্রথমটী কণ্ঠতালু, দ্বিতীয়টী ওষ্ঠ ও তৃতীয়টী তালব্য; A, E, I, O, U, এই স্বরবর্ণ পাঁচটীও ব্যঞ্জনের সহিত সংপ্রবিষ্ট হইয়াছে।

আরবী, পারসীও ঐরূপ। 'আলিফ্', 'বে', 'তে', ইত্যাদি। তাহাতেও 'আলিফ্', 'আয়েন', 'ইয়ে'—এই স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনেরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। জবর, জের ও পেশ, এই তিনটী স্বরবর্ণ দ্বারাই সমস্ত স্বরের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। এই ভাষার বিশেষত্ব এই যে, আগে অর্থ জানিয়া পরে অক্ষর চিনিতে হয়। নতুবা অক্ষর চিনিবার উপায় নাই। কারণ ই, ঈ, এ, ঐ এই চারিটী স্বরের কার্য্য যখন একমাত্র "জের" দ্বারাই সারিতে হয়, তখন 'কাফ'এ 'পেশ' দিয়া কু, কো বা কৌ যাহা খুসী পড়িতে পারি। অর্থ জানিলে কোথায় কি পড়া সঙ্গত, তাহা বুঝিয়া বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারিব; নতুবা নহে।

এই সকল বালাই সংস্কৃত ভাষায় নাই বলিয়া আমরা সংস্কৃতকে বিশুদ্ধ, বৈজ্ঞানিক ও পূর্ণ ভাষা বলি। যদিও ইংরেজির f, v, z, প্রভৃতি বর্ণ ও আরবীর কাফ, গাফ, খে প্রভৃতি বর্ণ সংস্কৃত ভাষায় দুর্ল্লভ বটে; কিন্তু এই দেবভাষায় উহা অনাবশ্যক বলিয়া অগ্রাহ্য ও পরিত্যক্ত। ভ্রষ্টবর্ণ 'সংস্কৃতে' প্রবেশিত করিয়া সংস্কৃতকে অসংস্কৃত ও কলুষিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। আর তাহা করিতে হইলে অগণিত পশুপক্ষীর ধ্বনির অনুকরণে অসংখ্য অক্ষরের সৃষ্টি করিতে হয়। কিন্তু তাহা মনুষ্যব্যবহৃত পৃথিবীর কোন ভাষায়ই সুলভ নহে। পৃথিবীতে যতগুলি ভাষা আছে, তন্মধ্যে 'সংস্কৃতেরই' বরং বর্ণ-সংখ্যা সর্ব্বাধিক অর্থাৎ চৌষট্টিটী, তাহাতে আবার উদাত্তাদি উচ্চারণভেদ ধরিতে গেলে এক 'অ'কারই ত্রিশ প্রকার।

ইহাতেও যদি বর্ণ-সংখ্যা কম হয়, তবে অন্ত বর্ণের সৃষ্টির প্রয়োজন। যদিও চীনা ভাষায় আশী হাজার বর্ণ ও জাপানী ভাষায় সাত হাজার বর্ণ আছে, তথাপি তাহাদের সমস্তগুলিকে বর্ণ বলা যায় না। আমাদের দুই, তিন, চারি বর্ণ যোগ করিয়া এক একটী বর্ণ করা হইয়াছে। কোন কোন বর্ণে আমাদের চৌদ্দটী পর্য্যন্ত বর্ণ আছে। মোট কথা, আমাদের বর্ণ ও শব্দ মিলিয়া চীনাদের এক একটী বর্ণ। বর্ত্তমানে তাহারা অসুবিধা বুঝিতে পারিয়া বর্ণ-সংখ্যা অনেক কমাইয়া ফেলিয়াছে এবং ক্রমেই কমাইতে চেষ্টা করিতেছে। জাপানীরাও তাহাই করিতেছে। 'সংস্কৃতে' এইরূপ অনাবশ্যক গৌরব শাস্ত্রকারগণ কখনও সমর্থন করেন না। আর করিবার উপায়ও নাই, কারণ সংস্কৃত বর্ণমালার পরিমাণ মনুষ্যকৃত নহে—নিত্যসিদ্ধ।

('সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ' ইতি কলাপঃ)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভাষান্তরের লৌকিক প্রয়োজন-সিদ্ধি উদ্দেশ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু দেবভাষা সংস্কৃতের উদ্দেশ্য তাহা নহে। জপ, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, সংস্কার ও পূজাদি দ্বারা বিবিধ পারলৌকিক কল্যাণ-সাধনই সংস্কৃত ভাষার উদ্দেশ্য। এমন কি, অনন্ত সুখপ্রদ মোক্ষ-লাভও এই ভাষার সাহায্যে হইয়া থাকে। ব্রহ্মকে জানিতে হইলে, গুরুর নিকটে ব্রহ্মের সত্তা ও স্বরূপাদি সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিতে হয়। বর্ণজ্ঞান ব্যতীত শব্দজ্ঞান হয় না, সুতরাং উপদেশলাভও হয় না। স্বর্গ-মোক্ষাদি ইষ্টলাভের জন্য এবং সংক্ষেপে জ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকরণাদিতে সেই উপদেশ করা হইয়াছে। ক্ষণস্থায়ী লৌকিক জ্ঞান লাভ মাত্র সর্ব্বোন্নত সংস্কৃত ভাষার লক্ষ্য হইতে পারে না। দেবগণ সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহাদের ভাষাও পূর্ণ হওয়া আবশ্যক—এই সকল কারণেই আমার সংস্কৃত বেদভাষাকে দেবভাষা বলিয়া থাকি। যেহেতু পৃথিবীর আস্তিক (ঈশ্বরবিশ্বাসী) সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের লোকই—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" 'ঈশ্বর এক ভিন্ন দুই নহেন'—এই বৈদান্তিক সত্য স্বীকার করিয়া থাকেন, কাজেই এই সত্যলাভের সহায়ক সংস্কৃতভাষা মানব মাত্রেরই পাঠ্য।

# সুমাত্রা

স্বামী সদানন্দ গিরি

সুমাত্রা শব্দটির উৎপত্তি "সমুদ্র—সুমুদ্র—সুমুদ্র—সুমাত্রা" হইতে। কোন কোন মনীষীর মতে ইন্দো-নেশিয়াতে ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টিপ্রসারের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল সুমাত্রা (জাভা নহে)। কিন্তু আবার অনেকের মতে মলয় রাজ্যের অন্তর্গত "জয়-শ্রীবিজয়" ইন্দোনেশিয়ান কৃষ্টির প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল।

প্রকৃতই নবম শতাব্দীতে জাভা, সুমাত্রা ও মলয় রাজ্যের উপর যে ভারতীয় কৃষ্টির ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহার রাজনীতিক ও কৃষ্টির কেন্দ্রস্থল ছিল সুমাত্রা অথবা দক্ষিণ শ্যামে অবস্থিত ইতিহাসবিখ্যাত শ্রীবিজয়ের শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য।

সুমাত্রায় শ্রীবুদ্ধের একনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দ শৈলেন্দ্র নৃপতিগণ রাজ্য পরিচালনা করিবার পূর্ব্বে সুমাত্রার যে কাহিনী আমরা চীন দেশের "মংওলিয়াং" জাতির ইতিহাসের মধ্যে পাইয়া থাকি তাহা সত্যই উপভোগ্য। সুমাত্রা হইতে চীনে যে রাজদূত প্রেরণ করা হয়, সেই সম্পর্কে যে রেকর্ড আছে তাহাতে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে সুমাত্রার নৃপতিরা হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন, কারণ তাঁহাদের নাম ও আচারব্যবহার হিন্দু ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ছিল। এইরূপ একটি রেকর্ড হইতে জানা যায় যে "সং" নৃপতিদের রাজ্যকালে সম্রাট্ হিয়া-উর নিকট (৭৫৪-৪৬৪) সুমাত্রার রাজা চি-পো-লো-না-লিয়েনটো (শ্রীভব-নরেন্দ্র) চৌ লিউ-টো (রুদ্র ভারতীয়) নামক একজন পদস্থ কর্ম্মচারী মারফৎ স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত উপঢৌকন প্রেরণ করেন। এই রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পি-য়ি পো-মো (বিজয়বর্ম্মণ) চীনদেশে পি-ইয়ান-পো-মো (বিজয় বর্ম্মণ?) নামে তাঁহার এক রাজদূত প্রেরণ করেন। এই সময়ে সুমাত্রার কিয়দংশ কান্দারী বা কান্দালী (চীনা ভাষায় কান-তো-লি) নামে পরিচিত ছিল।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে ইন্দোনেশিয়ায় প্রথম যে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার বিস্তার হয়, তাহা হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কার দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল, তবে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে উহা বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়।

৪১৩ খৃষ্টাব্দে ফা-হিয়েন যখন জাভায় (যবদ্বীপ) পরিভ্রমণ করিতে যান, তখন তথায় তিনি এত অল্প সংখ্যক বৌদ্ধধর্ম্মমতাবলম্বীদের দেখিতে পান যে, তিনি তাঁহার

অমিতাভ—শ্রীবিজয়ে (সুমাত্রা) প্রাপ্ত

পুস্তকে উহা উল্লেখযোগ্য নহে বলিয়া বিবেচনা করিয়া উহার উল্লেখ করিতে বিরত হন। স্বদেশ হইতে বিতাড়িত কাশ্মীরের রাজকুমার গুণবর্ম্মণ ৪২৪ খৃষ্টাব্দে যখন, জাভায় যান তখন হইতে জাভা, সুমাত্রা ও অন্যান্য স্থলে বৌদ্ধ কৃষ্টির প্রভাব বিস্তারিত হইতে থাকে। সুতরাং শ্রীবিজয়ের রাজ্যকালে (৬৭১ ৬৭২) যখন ই-সিং

শ্রীবিজয়ের রাজ্যে আসেন, তখন তথায় বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজকদিগকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হন এবং সত্য সত্যই কয়েক বৎসরের মধ্যে সুমাত্রা বৌদ্ধধর্ম্ম ও শিক্ষার একটি বিখ্যাত কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠে। এই স্থানের বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে সবিশেষ সকল

শিব ব্রহ্মা

-শ্রীবিজয়ে ( সুমাত্রা ) প্রাপ্ত

—শ্রীবিজয়ে ( সুমাত্রা ) প্রাপ্ত

সংবাদ জানা না থাকিলে, কোনও বৌদ্ধধর্ম্ম-যাজকের বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে সকল শিক্ষা পূর্ণ হয় না। বিহারের বিক্রমশীলা মঠের বিখ্যাত ভিক্ষু অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সুমাত্রার সুবর্ণ দ্বীপের প্রধান ধর্ম্মযাজক আচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তির অধীনে দশ বৎসর "সরকস্তিবাদীন" সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন।

প্রকৃতই বহু শতাব্দীব্যাপী ভারত ও সুমাত্রার মধ্যে একটি গভীর পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল। এবং প্রাচীনকালের ভারত ও সুমাত্রার কৃষ্টিগত ঐক্য সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে বর্ত্তমানে সুমাত্রার প্রাচীন ঐতিহাসিক কীর্ত্তিস্থলগুলি হইতে এবং চীন দেশের সংরক্ষিত ঐতিহাসিক রেকর্ডগুলি হইতে উহার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

# উত্তরবঙ্গের ঢেনা ও বাউদিয়ার গান

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

উত্তরবঙ্গে "ঢেনা ও বাউদিয়ার* গান" নামে বহু গান প্রচলিত আছে। "ঢেনা" শব্দের মূলগত অর্থ মন্দ—যে "ঢন্ ঢন্" করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। "বাউদিয়া" শব্দ "বেদে" শব্দের অপভ্রংশমাত্র, অর্থাৎ যাহার স্থিতি একস্থানে নহে। উভয় "শব্দই" উদাসী অর্থের পরিপোষক। তাহাদের উভয়কে উপলক্ষ্য করিয়া রঙ্গপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলার পল্লী অঞ্চলে অনেক গান গীত হইয়া থাকে।

"ঢেনা"র গানের মধ্যে নবাহু ঢেনার গানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গানটি অনেকদিনের। নর-নারীর প্রেমের ব্যর্থতার চিরন্তন সুর ইহার মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছে। যৌবনের ভালবাসায় যে অভিশাপ আছে, তাহাও ইহার মধ্যে আংশিকভাবে দেখান হইয়াছে।

"নবাহু" নামে এক যুবকের বহুদিন হইতে বিবাহ হয় নাই, কেহ তাহার বিবাহের জন্য বিশেষ চেষ্টা করে নাই। পিতামাতার নিকট প্রস্তাব উথাপন করিয়াও সে নিরাশ হইয়াছে। একদিন সে রাগ করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গেল। পথে "পারই নামে এক ধনী কৃষকের সহিত তাহার দেখা। "পারই" তাহাকে বিবাহ দিবার প্রলোভন দেখাইয়া নিজের বাড়ীতে রাখিয়া দিল। "পারই"এর বাড়ীতে কাজ করিয়া সে দিন চালাইতে লাগিল। কিন্তু "পারই" তাহার আসল সমস্যার কোনরূপ সমাধান করিতে চেষ্টা করে না দেখিয়া একদিন সে "পারই"কে বলিয়া "পিষার" বাড়ীতে উপস্থিত হইল। "পিষা" তাহাকে দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইল এবং তাহার যত্ন করিবার জন্য কন্যা "সুখসরি"কে আদেশ করিল।

সুখ সরি তোর দাদা আইসাছে,
তোর ভাইও আইসাছে।
চট্ করিয়া শীতল পাটি আনিয়াছে॥

সুখসরির সেবাযত্নে নবাহু বিশেষ প্রীত হইল। সেস্থানে একদিন থাকিয়া "পারই'র বাড়ী উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত তাহার নিকট নিবেদন করিল। সুখসরিকে সে বিবাহ করিতে চাহে, কিন্তু পারই তাহাতে সম্মত নহে। আর একদিন নবাহু তাহার পিষার বাড়ী গমন করিল। পিষার মেয়ে সুখসরিকে তাহার মনে লাগিয়াছে। সুখসরিকে তাহার বাড়ী লইয়া যাইবে, তাহার জন্য কত জিনিষ কিনিয়া রাখিয়াছে।

ও কি ও, সুখসরি যাইস হামার বাড়ী রে যাইস হামার বাড়ী।
তোর বাদে কিনিয়া থুচু অং বাহারের খাড়ী॥

কিন্তু সুখসরি নবাহুর বাড়ী যাইতে রাজী নহে। যদি তাহাকে শাড়ী দিবার একান্ত ইচ্ছা থাকে, তবে যেন সে তাহা সুখসরির নিকট পৌছাইয়া দেয়।

ও কি ও দাদা, হাটসা যদি হইস রে দাদা আসিয়া যদি হইস।
অং বাহারের খাড়ী রে দাদা বাড়ী আনিয়া দেইস।

তারপর, সুখসরিকে সঙ্গে লইয়া সে বিলের মধ্যে মাছ মারিতে গেল। মাছ আনিয়া পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন করিয়া আবার "পারই"র বাড়ী পৌছিল। পার-ই তাহাকে অনেক কটুবাক্য বলিল—পরিশেষে নবাহুর সরলতায় মুগ্ধ হইয়া তাহার জন্য পাত্রী দেখিতে স্বীকৃত হইল। এদিকে সুখসরির সহিত শ্যাম ভ্যালসার ছেলে বুদারুর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নবাহু সে সংবাদ পাইয়া আর একদিন সুখসরির নিকট উপস্থিত হইল। জানিতে পারিল যে, সুখসরি সে বিবাহে সুখী নহে। বুদারুর "জইল।" রোগ আছে, তাহাকে তাঁহার পছন্দ হয় নাই। তাহার পিতামাতা টাকার লোভে তাহাকে বিক্রী করিয়াছে। নবাহুকে সে ভালবাসে, তাহার সহিত মিলিত হইবার তাহার একান্ত ইচ্ছা ছিল,

---

* ঢেনা—"টন্‌টনে" শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। "ধ্যান" শব্দ হইতে উদ্ভব, মতান্তরে থাকিতে পারে। বাউদিয়া—বেদিয়া, বাদুয়া—বাউদিয়া। 'বাউড়িয়া হইয়াছে' অর্থে গ্রামবাসীরা পাগল হইয়া বা মত্ত হইয়াছে এরূপ ধারণা করে।

কিন্তু বিধি সে সুখে বাদ সাধিল। তাই, সুখসরি দুঃখ করিয়া বলিতেছে—

ও অসিক ঢেনারে—ঢেনা।
চালত কলে চাল কুমুড়া রে
ঝাঙ্গিত কলে রে কদু।*
বাচ্চা হাতে পালন করলু—
ও ঢেনা, পরে খাইলে মধু॥
ও অসিক ঢেনারে—ঢেনা।
মাছের বসন্তকালে খেলায় উজান ভাটি।
নারীর বসন্তকালে পুরুষ গলার কাঠি॥

সুখসরি তাহার মনের মত মানুষ পায় নাই। কিন্তু তাহার বিশ্বাস আছে, একদিন সে নবানুকে লাভ করিবে। আর বেশীদিন অপেক্ষা করিতে হইল না। নবানু তাহাকে না পাইয়া যেন পাগলের মত ঘুরিতেছে। বাঁশবাগানের মধ্যে মশার কামড়ে কত বিনিদ্র রজনী সে কাটাইয়া দিয়াছে। ঘটনাক্রমে, সেস্থানে নবানুর নিকট সুখসরির গোপন অভিসার ধরা পড়িয়া গেল। নবানুকে সকলে বাঁধিয়া লইয়া গেল, তাহার একমাত্র দুঃখ যে, এমন সময়ে সুখসরি তাহার কাছে নাই।

ও তুই মোক্ ছাড়িয়া পালালু রে ও মাই কালো চেঙ্গেরী
দাঁতে মিশি সদায় হাসি অন্তরের তুই সুন্দরী॥

তারপর হইতে সুখসরির আর খোঁজ নাই। সে কোথায় গিয়াছে, কে জানে!

গানের মধ্যে কবিত্ব বেশী না থাকিলেও, প্রেমের মর্ম্মকথা ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। বাল্যকালের ভালবাসায় যে অভিশাপ আছে এবং সংসারে যে যাহাকে চায়, সাধারণতঃ তাহাকে পায় না, তাহাই দেখান হইয়াছে।

উত্তরবঙ্গের "ভাওয়া গাইয়া গানের" মধ্যে ঢেনার গান অনেক আছে। এস্থলে একটি উল্লেখ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। কবিত্বপূর্ণ অংশ ইহার মধ্যে পাওয়া যায়।

কোন ঢেনার সহিত এক নারীর পিরীতি জন্মিয়াছিল। ক্রমে, সে বাপমায়ের আবাস ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত ভিন্ন দেশে গমন করিয়াছিল। সে স্থান তাহার আর ভাল লাগে না, বাপ-মায়ের কথা তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে। তাই সে দুঃখ করিয়া বলিতেছে

ও অসিক(১) ঢেনারে—ঢেনা।
(আজি) ধরিয়া চালের বাতা,
, নিরলে(২) কইব কথা,
মরব ঢেনা গরল বিষ খাআ রে॥
(আজি) নুতন পিরীতি কইরে
বাপ ভাই আইলাম ছাইড়ে,
আরও ছাড়লাম এনা দ্যাশের মজারে(৩)॥
ও অসিক ঢেনা রে ঢেনা—
(আজি) পন্থে যেমন বালুরে চিকণ,
ঐ মতন ঢেনা মোর নারীর জীবন,
মরব ঢেনা জলে ঝম্প দিয়া॥
আগাতে চড়াইয়ারে হাড়ী,
আঘির জলে ভেজে খাড়ী—
মরব ঢেনা আস্তান ঝম্প দিয়া॥ ইত্যাদি।

বাউদিয়ার গানের মধ্যে "বৈষ্টম বাউদিয়ার গান"টি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সাধারণ কথাবার্ত্তা প্রসঙ্গে" ইহার মধ্য হইতে অনেক তত্ত্বকথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

এক বৈষ্ণব চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন "ঘুটু" নামে এক ভক্তের নিটক উপস্থিত হইল। ঘুটু তাহার যথাসাধ্য সেবা-শুশ্রূষা করিল। পরে তাহার কন্যা নয়নসরির সহিত তাহার পরিচয় করিয়া দিল। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মেয়েদের নামের স্থলে নয়নসরি, প্রাণসরি, চানসরি, সুখসরি, খিরণসরি, ইত্যাদি নাম উত্তরবঙ্গের অনেক গানের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়—এ সমস্ত গানের উপর যেন গ্রাম্যকবির একটা মোহ আছে। যাহা হউক, নয়নসরিকে যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য বৈষ্ণব চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু নয়নসরি সোজা মেয়ে নয়। বৈষ্ণবকে সে পূর্ব্বে পরীক্ষা করিবে, তারপর তাহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিলে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। নয়নসরি বলিল যে, একা সে কেমন করিয়া যুগল মন্ত্র গ্রহণ করিবে। বৈষ্ণব ঠকিবার পাত্র নয়। সে বলিল, যে, একাই তাহা করা চলিবে।

* কদু—লাউ, বাচ্চা হাতে—শিশুকাল হইতে। ঝাঙ্গিত—ঝাঙ্গিতে—৭মী স্থানে ত ব্যবহৃত হইয়াছে।

১। অসিক—রসিক ২। নিরলে—নিরালায় ৩। মজা—মায়া।

এ জগতে এক ছাড়া দুই নাই। নয়নসরি তাহা স্বীকার করে না। দুই ভিন্ন জগতে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, হস্তপদ ইত্যাদি উল্লেখ করা যাইতে পারে। দুই হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। বৈষ্ণব বলিল যে, তাহা কেবল চলিত কথা মাত্র। বস্তুতঃ, মূলে সবই এক।

—"যেই গুরু সেই হরি—যেই আল্লা সেই খোদা,
যেই জল, সেই পানি, এক বেভিত দুই নাই।
নয়ন ভরিয়া দেখিলে হৃদয় মন্দিরে পাওয়া যায়॥"

একই নানা বিভূতিতে জগতে আত্মপ্রকাশ করে। নারদ একদিন হরিকে খুঁজিতে খুঁজিতে এক কাষ্ঠখণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলে, নারদ তাহাকে হরির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কাষ্ঠখণ্ড বলিল যে, হরি তাহার সঙ্গে আছে।

রাম অবতারে রামের ধনুক, কৃষ্ণ অবতারে বাঁশী।
আর প্রান্তককালে * তোরে† কান্ধে চরি আমি॥

নয়নসরি এ কথার সারবত্ত বুঝিতে পারিল না। বৈষ্ণব কোরাণ ও পুরাণের দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল।

নয়নসরি! হেন্দুলোকে বৈলে থাকে রাজা দশরথ।
মুছলমানে বৈলে থাকে আল্লি চক্ররথ॥
হিন্দুলোকে বৈলে থাকে শ্রীরাম লক্ষণ।
মুছলমানে বৈলে থাকে হাসেন হুসেন॥
হিন্দু লোকে বৈলে থাকে চণ্ডী আর দেবী।
মুছলমানে বৈলে থাকে ফতেমা আর বিবি॥

সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ইহা হইতে অনেক কিছু শিখিবার পাইবেন।

ক্রমে নয়নসরি বৈষ্ণবের নিকট গুরুর তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করিল। বৈষ্ণব বলিল যে, এদিক্ দিয়া দেখিলে চারের মহিমা উপলব্ধি করা চলে। চার গুরু, চার অবতার, চার কালের কথা আমরা শুনিয়াছি। গুরুর বিষয়ে বলা চলে—

আগে গুরু পিতামাতা,
দ্বিতীয়া গুরু মন্ত্রদাতা,
তৃতীয়া গুরু প্রেমের আলয়।
চতুর্থ গুরু ভাব আশ্রয়॥ ইত্যাদি।

* প্রান্তককালে—প্রত্যেক কালে।
† তোরে—তোমারই।

কোরাণের মধ্যে চারের মহিমা বিবৃত আছে।

—"নয়নসরি দেখ কোরাণের মধ্যে কি আছে।
আথ, আতস, থাগ বাই॥
আথেতে জন্মিল আল্লা, আতসে জন্মিল যত দেবগণ.
থাকতে জন্মিল খেতি তৃণগণ॥
বাতেতে জন্মিল যত বেয়াদিগণ,
এইরূপ আল্লা সৃষ্টি করিল ধারণ॥

নয়নসরি বলিল যে, ইহাও সত্য নহে। চারের বাহিরেও অনেক জিনিষ আছে।

ভবনদীর ঘাট খেওয়া বাঞ্ছাকল্পতরু।
সেইখানে ছাড়িয়া যাবে শিক্ষাদীক্ষার গুরু॥
হরিনামে নৌকাখানি, স্ত্রী গুরু কাণ্ডারী।
দুবাহু পাসরি ডাকে আইস প্রাণনাথ পার করি॥

ইত্যাদি—

নয়নসরি বৈষ্ণবকে আপন করিয়া পাইতে চাহে। দীক্ষা-গুরুর স্থলে সে তাহাকে প্রেমগুরু করিবে। বৈষ্ণব কিন্তু স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করে না। তাই সে স্ত্রীলোকের অনেক নিন্দা করিল। স্ত্রীলোকের মোহে পড়িলে, তাহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে হইবে। সে তাহা কিছুতেই পারিবে না।

নয়নসরি জানাইল যে, স্ত্রীলোক ভিন্ন জগতের সৃষ্টি পর্য্যন্ত সম্ভব নহে। প্রকৃতিকে বাদ দিয়া পুরুষ চলিতে পারে না। স্ত্রীলোকের নিন্দা কথা কোন শাস্ত্রে নাই।

মাইয়া হয় তোর পিতামাতা,
মাইয়া হয় তোর জন্মদাতা,
মাইয়া হইতে দেখয়ে দুনিয়া
মাইয়ার নিন্দা কোন শাস্ত্রে লেখে না॥

ক্রমে সৃষ্টিতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতে করিতে অনেক শাস্ত্র-পুরাণের কথা আসিয়া পড়িল। যাহাই হউক না কেন, নয়নসরি প্রমাণ করিতে পারে যে পিরীতি বিষয়ে বৈষ্ণব ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই। পিরীতির তত্ত্ব বুঝিলে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্ম্মকথা বাহির হইয়া পড়ে।

ব্রহ্মা হইতে সৃষ্টির পত্তন কৈরাছে গোসাঞি।
পিরীতি সম্বন্ধে বৈষ্ণব ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই॥

নয়নসরির সহিত তর্কে "বৈষ্ণব বাউদিয়া" কো। ক্রমেই আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। শেষে তাহার নিকট

পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। "ডোর কপিন" পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব নয়নসরির সহিত যুক্ত হইয়া যুগল মন্ত্র গ্রহণ করিল। তাহাকে স্বীকার করিতে হইল—

নয়নসরি, তুমি তীর্থ, তুমি নিত্য, তুমি বৃন্দাবন।
তোমা বিনে না হবে আমার যুগল সাধন॥

অধুনা সুমারু বাউদিয়া, সীতানাথ বাউদিয়া, মুজাম বাউদিয়া প্রভৃতি বহু গান গাহিতে শোনা যায়। সারা রাত ধরিয়া গান হয়; কিন্তু তাহার মধ্যে কবিত্ব এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। শুধু সুর ধরিয়া গান চলিতে থাকে।

উত্তরবঙ্গের "ভাওয়াইয়া গানের" মধ্যেও বাউদিয়া গান অনেক আছে। সাধারণ গায়েনরা মাঠের মধ্যে এই সমস্ত গান গাহিয়া থাকে। এ স্থলে কয়েকটি গান উল্লেখ করা যাইতেছে।

এক বাউদিয়ার সহিত কোন নারীর প্রেম হইবার পর কার্য্যের উদ্দেশ্যে সে তাহাকে ছাড়িয়া "রাণীর গঞ্জে" চলিয়া গিয়াছে। সেখানে সে দোকান করিয়াছে। সেই নারীর কথা তাহার বোধ করি মনে নাই। নারী সেই বাউদিয়ার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে—তাহার মনে হয়—বুঝি আজ সে আসিবে। কিন্তু কতদিন চলিয়া গেল, তাহার দেখা নাই। যে দিকে সে তাকাইতেছে, সেই দিকই তাহার নিকট অন্ধকার বলিয়া মনে হইতেছে।

আজি অঞ্চলে বান্দিয়া গুয়া
যে দিকে দেখোঁ সে দিকে ধুয়ারে (১)
আজি প্রাণের বাউদিয়া আইসে কিনা আইসে।

* * * *

তিস্তা নদীর চিকণ বালা,
চাঁন (২) বাউদিয়া মোর গলার মালা
দিয়ার বাউদিয়া আইসে কি না আইসে।
আর চুয়ার (৩) গোড়ত (৪) জলের ঘড়া,
মন করেছে রে মোর তোলাপাড়া,
ও প্রাণের বাউদিয়া আইসে কিনা আইসে॥ ইত্যাদি

বাউদিয়াকে উপলক্ষ্য করিয়া উত্তরবঙ্গের নাথ-সম্প্রদায় অনেক গান গাহিয়া থাকে। এতে একরকম অপূর্ব্ব শব্দ-যন্ত্রের সাহায্যে তাহারা গান করে। তাহাকে দোতারা বলে। গানের মধ্যে অনেক রঙ্গ-রসের কথা আছে।

এক সৌখিন বাউদিয়াকে দেখিয়া এক নারীর মন যেন মজিয়া গিয়াছে। সে রঙ্গ করিয়া বলিতেছে যে, এরকম বাউদিয়াকে পাইলে সে তাহাকে লইয়া দূর দেশে পলায়ন করে। তাহার রুগ্ন স্বামীর প্রতি তাহার মন বসে না॥

কুত্তি (৫) কোনা যায়ছেন রে সেতা পাড়া বাউদিয়া।
তোর সিতাপাড়ির দেখিয়া রে বাপই
মনটা কয়ছে পালাঙ্ ধরিয়া॥
এলা দুক্কের কথা কইম (৬) বা কাক্ (৭)।
কাহিলা পড়া (৮) মোর ভাতার ইত্যাদি।

বয়সের একটা ধর্ম্ম আছে। যৌবন বয়সে মানুষ কত রঙীন স্বপ্ন দেখে—অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য যেন এই বয়সের মানুষ সাজিয়া বেড়ায়। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ করা হইয়াছে।

ও বাই এবার মিলাইছু রে চক্ চক্যা বাউদিয়া।
মোর বাউদিয়াক্ দেখিস্ নাই,
দেখিবু যদি চল হাট যাই
পান সেকেরেট দিয়াসলাই
সঙ্গে ছাড়া নাই॥

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইবে বলিয়া এ বিষয়ে অধিক আলোচনা স্থগিত রাখিলাম। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই সব গানের মধ্যে অনেক আছে। দেশপ্রীতিকে কেন্দ্র করিয়া পল্লীগীতিকার লুপ্তপ্রায় সম্পদ্ পুনরুদ্ধারে যত্নবান্ হইলে কেহ বোধ করি, হতাশ হইবেন না।

১। ধুয়া=অন্ধকার।
২। চাঁদ অর্থে ব্যবহৃত। ৩। চুয়া=কূপ বাঙ্গালার কোন কোন অঞ্চলে ইহাকে "কুয়া" বলে। ৪। গোড়ত=নিকটে।

৫। কুত্তি=কোথায়। ৬। কইম=কহিব। ৭। কাক্=কাহাকে। ৮। কাহিলা পড়া=অসুখে পড়া, রোগযুক্ত।

# বাজীকর

শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

জগতে মানুষ আসে এবং চলিয়া যায়—কেবল মাত্র নির্দ্দিষ্ট কটা দিন একটা ভূমিকা লইয়া অভিনয় করিয়া যায় শুধু; হাসি গান, সুখ দুঃখের ভূমিকা, তাহার ভাগ্যে যাহা জোটে। সেইজন্য কবিরা জগৎকে বৃহৎ রঙ্গমঞ্চ বলিয়াছেন এবং প্রত্যেক মানুষকেই অভিনেতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, আমাদের পঞ্চানন কয়ালেরও সেই মত।

পঞ্চাননের বয়স প্রায় শেষের অঙ্কে পৌছাইয়াছে। দেহের শক্তি গিয়াছে কমিয়া, গায়ের চামড়া ঢিলা হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তবু তাকে দেখিলেই মনে হয় এককালে পঞ্চানন বেশ বলবান্ পুরুষ ছিল, এখনো তাহার শক্তি কমিয়া গেলেও, চক্ষের জ্যোতিঃ নিষ্প্রভ হয় নাই, ছুঁচের সুতা পরাইতে বেশ পারে, বই পড়িতে চশমা লাগে না; হাঁটিবার সময়ও লাঠির প্রয়োজন ঘটে না। দেড় ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা ধরিয়া একটানা বক্তৃতা করিয়া লোকদের ভুলাইয়া রাখিবার ক্ষমতা তাহার আজো আছে, বিশ তিরিশ সের জিনিষ মাথায় লইয়া অনায়াসে দু' দশ ক্রোশ হাঁটিয়া যাইতে পারে। বাজীকর সে, খেলা দেখাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইয়া আসিয়াছিল এতদিন; এখনও বাজী দেখাইবার ক্ষমতা তাহার কমে নাই। কমে নাই বলিলে ভুল হইবে; কমিয়াছে সত্য, কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত এবং নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই।

পঞ্চাননের সংসারে কেহ নাই। পত্নী ছিল, বছর তিন হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। মরিয়াছে 'পুত্র পুত্র' করিয়া। বিবাহিত জীবনে পঞ্চানন পত্নীকে সুখী করিতে পারে নাই। সংসারে তাদের অর্থাভাব ছিল না, কিন্তু সন্তানের অভাবে কালীতারা পাগলের মত হইয়া থাকিত সর্ব্বদা, ব্যথায় ম্রিয়মাণ। কতবার স্বামীকে অনুযোগ জানাইয়াছে—যাওনা একবার বাবা তারকেশ্বরের মোহান্তের কাছ থেকে একটি মাদুলী আনো। যশোরের কালী বাড়ীর পাণ্ডার দেওয়া মাদুলীতে কোন ফল হ'ল না, গৌহাটীতে একবার যেও, সেই সন্ন্যাসীর কাছে সেই ওষুধ…

পঞ্চানন ছুটিয়াছে তারকেশ্বর, গিয়াছে গৌহাটী; শুধু তারকেশ্বর গৌহাটী নয়; অমন কতস্থানে ছুটিতে হইয়াছে মাদুলীর জন্য, ঔষধের জন্য। দুইবার পুত্রেষ্টি যজ্ঞও করিতে হইয়াছে ধুমধাম করিয়া। কিন্তু কিছুতে কিছু হয় নাই। উপবাসে আর টোটকা ঔষধ খাইয়া স্বাস্থ্য ইদানীং নষ্ট হইয়া গিয়াছিল কালীতারার। পত্নীর প্রতি চাহিয়া পঞ্চাননের বড় মায়া হইত। পঞ্চাননকে দেখিলেই কালীতারাও ক্ষুণ্ণ হইত, বিষণ্ণ হইয়া কত কি বলিত—সব দুঃখের কথা; জীবনটা যে এভাবে বিষময় হইয়া উঠিবে, বিবাহের পূর্ব্বে কে জানিত! দোষ কাহারও নাই। ভাগ্য কালীতারার এমনই মন্দ। পঞ্চানন সান্ত্বনা দিত, কিন্তু কালীতারা প্রবোধ মানিত না, বন্ধ্যা নারীর বুকখানা শূন্য হইয়া থাকিত সর্ব্বদা—মাতৃত্ব ছিল বক্ষে, কিন্তু প্রকাশের সুযোগ ঘটিল না জীবনে।

একবার এক সাধু বাবাকে ধরিয়া পঞ্চানন এক মাদুলী সংগ্রহ করিয়া আনিল; বাঁধিয়া দিল কালীতারার হাতে লাল সুতা দিয়া; নিত্য সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া মাদুলী ধোওয়া জল পান করিতে হইবে তিনবার, শাক আর অম্বল খাওয়া নিষেধ, পবিত্র মনে আচরণ বিচরণ করিতে হইবে সকল সময়ে। অব্যর্থ নাকি এই মাদুলী।

কালীতারা থাকিত একখানি ছোট কুটীর রচনা করিয়া। ছোট্ট বটে, পরিপাটীতে কম নয়; মাটি লেপিয়া, ঘর ধুইয়া মুছিয়া ঝরঝরে করিয়া রাখিত। অবসর সময়ে বুনিত ছোট কাঁথা, শিশুর সম্ভাবনা না থাকুক এখন, কিন্তু অনাগত যুগের কথা কে বলিতে পারে? কালীতারা একা মানুষ সংসারে। এখন হইতে ভবিষ্যতের কাজ কিছু না করিলে চলিবে কেন? স্বামীটি তাহার হরবোলা, একটি কাজ করিতে বলিলে অন্যটি করিয়া কার্য্যের সুসার করা দূরে থাকুক, কার্য্য বাড়াইয়া তুলিতে পারে। সকল

দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে একা তাহার। সংসারে ত দ্বিতীয় জন আর নাই।

কিন্তু স্বপ্ন আর সফল হইল না। মনের আশা কি সকল মানুষের পূরণ হয় নাকি? একদিন পঞ্চানন আসিয়াই কালীতারার হাত হইতে ঐ মাদুলী টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, বলিল—না কালী, আমাদের ছেলে হয়ে কাজ নেই।

কালীতারা কিছু বলিতে পারিল না। স্বামীর এই আচরণ তাহাকে ভীত এবং বিস্মিত করিয়া তুলিতেছিল। এইরূপ মূর্ত্তি পঞ্চাননের কোনওদিন দেখে নাই কালীতারা, তাহার উপর এই অদ্ভুত আচরণ। কালীতারা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল কি একটা, পঞ্চানন কহিল—'ছেলে-ছেলে' আর করবি না কালী, আমাদেব ছেলে হয়ে লাভ নেই। আমাদেব ছেলে ত আমাদেরই মত ঘৃণা আর অনাদর পাবে সকলের কাছে।

বোবা বেদনায় কালীতারা কাতর হইয়া উঠিল।

জিজ্ঞাসুনেত্রে পঞ্চাননের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল কতক্ষণ, পঞ্চানন বলিয়া চলিল—শ্যামবাবুর ছোট খোকাকে কোলে নিয়েছিলুম বলে' কি লাঞ্ছনা আর অপমান পেয়েছি জানিস্ না কালী। বল্লে—তুমি বাপু আমাদের ছেলে টেলে ধরো না। তোমাব বউ একে বাঁঝা, তার ওপর তুমি বাজীকর; কখন কি গুণজ্ঞান করবে কে জানে! ওসব তুকতাকে আমাদের বড় ভয়। এই বলে' কোল থেকে ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে গেল কালী। আর বিস্কুট কিনে দিয়েছিলুম, সেগুলো দিলে ফেলে।

কালীতারা শুনিল সব কথা। স্বামী তাহার অপমানিত হইয়া আসিয়াছে। শ্যামবাবুর দোষ কি! পঞ্চানন তার ছেলেকে কোন অধিকারে কোলে তুলিয়া স্নেহ জানাইতে গিয়াছিল? পঞ্চাননের ঐ একটি দোষ। পরের ছেলেকে ভালবাসিবে এমন ভাবে নিজের ছেলের মত করিয়া, কোলে তুলিয়া, মাথায় চড়াইয়া—খেলনা খাবার কিনিয়া দিয়া, একেবারে অতুলনীয়। সন্দেহ লোকের হইতে কতক্ষণ। মানুষের মন একে দুর্ব্বল। তাহার উপর সংস্কারের প্রভাব বড় কম নয়। বন্ধ্যা নারীর প্রবাদ আছে ডাইনী বলিয়া, তাহার উপর স্বামী তাহার যাদুকর। চোখের ধাঁধা লাগাইয়া হাতের সাফাই দেখাইয়া কত কি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখায়, লোকে ভাবে মন্ত্রতন্ত্র জানে। কিন্তু আসলে কিছুই নয়। এরূপ ডাইনীর স্বামীকে লোকে যে সন্দেহের চোখে দেখিবে, তাহাতে বিচিত্র কি! কিন্তু পঞ্চানন তবু কেন অবুঝ হয়। কালীতারা ভাবিয়া উঠিতে পারে না।

এমন করিয়া সংসার যতদিন ছিল, শেষ হইয়া গিয়াছে এক রকম।

সংসার ধর্ম্ম এখন আর নাই। খেলা দেখানোও কমিয়া গিয়াছে পঞ্চাননের। অর্থের তাগিদ নাই আর তেমন, খাটিবার শক্তিও নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে, এখন বুড়া বয়সে পঞ্চাননের অবসরের প্রয়োজন। সারা জীবনে অবকাশ মেলে নাই এতটুকু, এখন বসিয়া বসিয়া দু'চার দণ্ড হরিব নাম জপ করিলে পরকালের কার্য্য হইবে। সময় আছে, কিন্তু সুযোগ ঘটে না।

ছোট্ট কুঁড়েখানা আছে তেমনই, আগের মত পরিচ্ছন্ন নয়; কালীতারা নাই, পরিষ্কার আর করিবে কে? কোথাও মেলা টেলা হইলে পঞ্চানন সাজ পোষাক পরিয়া পোঁটলা নিয়া রওনা হয়, পঞ্চুর খেলা বাংলা দেশের বিখ্যাত মেলাগুলিতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে খুব। রয়াল্ এসিয়াটীক সার্কাস পার্টির লোক তাহার ভোজবাজী এবং হাতের ভেল্কি দেখিয়া মাস মাহিনায় রাখিতে চাহিয়াছিল তাহাকে, কালীতারা কেবল যাইতে দেয় নাই। কান্না সুরু করিয়া দিয়াছিল;—বলিয়াছিল, পয়সায় আমাদের কাজ কি! তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না বলে' রাখছি।

সত্য কথা। কালীতারা থাকিতেও পারিত না একদণ্ড। সকালে উঠিয়াই হাতমুখ ধোয়াইয়া দিবে, স্নান করাইয়া জলপান কিছু না করাইলে কালীতারা শান্তি পায় না। খাওয়ানো, শোয়ানো, সকল ব্যাপারেই কালীতারার হস্তক্ষেপ করা চাই। স্বামীকে শ্রদ্ধা করিত খুব, শেষের জীবনে মাতৃত্বের স্নেহ দেখা দিয়াছিল পত্নীর মধ্যে। পঞ্চানন উপলব্ধি করিত তাহা। রয়াল এসিয়াটীক সার্কাসে গিয়া কালীতারাকে অযথা কষ্ট দিয়া লাভ নাই।

আর নিজের স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যাইবে না তাহা

হইলে? বাঁধাধরা রুটিনের মধ্যে জীবনকে ধরা দিলে মনের শক্তি যায় কমিয়া। এ কথা সত্য। পঞ্চানন বাজী দেখাইত বটে; কিন্তু কোথাও নিজের ইচ্ছাব বিরুদ্ধে কাজ করে নাই কোনও।

রথের মেলায় এবার কুলীনগ্রামে যাইতে হইবে।. বার কয়েক দোলের এবং রথের মেলায় গিয়া বাজী দেখাইয়া আসিয়াছে সেখানে। গোপীনাথদেবের আস্থানা আছে। বর্দ্ধমান জেলার জৌগ্রামে নামিয়া পূর্ব্বদিকে যাইতে হয় কয়েক মাইল,—কুলীনগ্রামে ভগবানের মন্দির। পাশে বিরাট্ মাঠ। সেই মাঠে মেলা বসে দোল এবং রথের সময়। কত দূরদেশ হইতে দোকানীরা আসে, বিকিকিনি চলে; সার্কাস হয়, হোগলার ম্যারাপ বাঁধিয়া টকি বায়স্কোপে কত গান কত কথা হয়, আর ডুগডুগি বাজাইয়া পঞ্চানন দেখায় খেলা। উপর দিকে বল ছুঁড়িয়া দিল চারটি, দুইহাতে লুফিয়া লয় কৌশলে, আবার হাতে না আসিতেই দুইটা ছুঁড়িয়া দেয় উপরে, হাতের কৌশলে লোক মুগ্ধ, আর চোখে ধাঁধা লাগাইয়া খেলা দেখাইলে মনে করে সকলে, বুড়া তন্ত্রমন্ত্র জানে নিশ্চয়। কত লোক কত সময়ে খেলার শেষে পঞ্চাননের পায়ে জড়াইয়া পড়িয়াছে। ব্যর্থ প্রেমিকের দল বলে—বশীকরণের মন্ত্র আমাকে দিতে হবে; যত টাকা লাগে দেব। কোন ব্যাকুল মাতা হয়ত কাঁদিয়া কাটিয়া পড়িয়াছে—আমার ছোট ছেলেটি বড় ভুগছে বাবা তিন মাস হ'ল, হাওয়া বাতাস লেগেছে বোধ হয়, একবার ঝাড়ফুঁক করে' দাও। গ্রহকুপিত হইয়াছে বলিয়া গ্রহশান্তি কবচের তাগাদা দিয়াছে কেহ। কেহ কেহ মোকর্দ্দমায় জিতিবার জন্য মাদুলী চাহিয়াছে, পুত্রের জন্য কত বন্ধ্যানারী তাহার পায়ের ধূলা লইয়া গিয়াছে। পঞ্চানন ব্যথিত হইয়া উঠে মনে মনে, করণীয় তাহার কিছুই থাকেনা। লোক ঠকাইবার মনোবৃত্তি নাই তাহার। কলিকালে লোককে প্রবঞ্চনা করা যতই প্রচলিত হোক, ধর্ম্মভীরুতা তাহার ছিল। অনেকে বলে প্রবঞ্চনা না করিলে জগতে কেহ উন্নতি করিতে পারে না। পঞ্চানন কিন্তু তাহা বিশ্বাসই করিতে পারে না।

কুলীনগ্রামে মেলা বসিয়াছে রথোপলক্ষে। পঞ্চাননের পৌছাইতে বিলম্ব হইয়া গেল একদিন। এবার খেলা দেখাইতে আরও দু'একজন আসিয়াছে। ভীড় করিয়া চেঁচাইতেছে একজন। হাতে একজোড়া তাস, ম্যাজিক দেখাইতেছে বোধ হয়। খেলা যত না দেখাক, লোকটি বকিয়া যাইতেছে খুব। বকিয়া বকিয়া সমবেত জনতার মনোযোগ হরণ করিতেছে বুদ্ধি করিয়া, অথচ লোকে বোকার মত বাজে কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছে শুধু, আসল দৃষ্টি হইতে মনোযোগ অপসারিত হইয়া গেল, তাসের খেলায় লোকটি বিস্মিত করিয়া দিল সকলকে। পঞ্চানন আশ্চর্য্য হইল না শুধু। ভাবিল—জগতে ফাঁকাই ত চলিতেছে সর্ব্বত্র। মানুষের সংসারে যত কিছু আয়োজন, সমারোহ সকল কিছুরই পিছনে আছে ফাঁকা। ফাঁকা মানে শূন্যতা নয়, প্রবঞ্চনা। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়, মানুষ বুঝিতে পারে সে প্রবঞ্চিত হইতেছে, কিন্তু তবুও সে প্রবঞ্চিত হয়, মন্ত্রমুগ্ধের মত, স্বপ্নাভিভূত যন্ত্রচালিতের মত সে যেন নিজের সত্ত্বা হারাইয়া ফেলে, ধীরে ধীরে হয় প্রতারিত। মানুষের এই করুণ অবস্থার প্রতি পঞ্চাননের দরদ জাগে।

দুলাল এবারও দোকান দিয়াছে মেলায়। জামা কাপড়ের দোকান। হোগলা ঘিরিয়া, চাদর পাতিয়া, রবারের বেলুন ঝুলাইয়া দোকান জমাইয়া তুলিয়াছে বেশ। পঞ্চানন গিয়া দোকানে হাজির হইল। পোঁট্‌লা রাখিয়া কহিল—কিরে কেমন আছিস্?

দুলাল পঞ্চাননের পায়ের ধূলা লইয়া উত্তর করিল—এক রকম চলে' যাচ্ছে জ্যাঠামশায়। তারপর আপনার শরীর কেমন?

—আমার শরীর? পঞ্চানন হো-হো করিয়া হাসিয়া নিল একচোট; আমার শরীর ভালই আছেরে! ঈশ্বরের এমনই করুণা যে, তোর জ্যাঠাইমা মারা যাবার পর থেকে আর অসুখ বিসুখ করে নি!

জ্যাঠাইমার কথা উঠিতেই দুলাল চুপ করিয়া গেল। পঞ্চাননের বেদনা শুধু পত্নীকে কেন্দ্র করিয়া, দুলাল তাহা জানে; সেইজন্য সে প্রসঙ্গ বদল করিয়া কহিল—বর্ষা এবার হল না, আর হবে বলে' মনেও হয় না জ্যাঠামশাই, দেশে চাষবাসের অবস্থা বড় খারাপ হয়ে উঠেছে এ বছর।

দুলাল পঞ্চাননকে জ্যাঠামশায় বলিয়া ডাকে। দুলালের

বাবা এক মিথ্যা মামলায় জড়াইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্চানন কোর্টে বসিয়া খেলা দেখাইতেছিল একদিন। দুলালকে সঙ্গে লইয়া তারিণী আসিয়া দাঁড়াইল খেলা দেখিতে; মুখ বিষণ্ণ, উদ্বেগের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। খেলার শেষে পঞ্চাননকে ডাকিয়া তারিণী কহিল—দাদাকে একটা কথা বলব। মহা বিপদে পড়েছি আমি। আপনি যদি কোন কবচ দিতে পারেন আমাকে, অন্ততঃ আর কয়েক দিনের জন্যে, বড় ভাল হয় দাদা, আমি আপনার মজুরী দেব। আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি তন্ত্রমন্ত্র জানেন নিশ্চয়ই।

তারিণীর কাতরতায় পঞ্চাননের করুণা হইল কেমন যেন, কহিল—ব্যাপার কি শুনিয়া আগে, কবচ কি জন্যে চাও!

তারিণী লম্বা একটি ঘটনা বলিয়া গেল। মিথ্যা করিয়া ভিন্ন গ্রামের সুরেশ্বর ঘোড়ল তাহাকে এক মামলায় জড়াইয়া দিয়াছে। এখন তাহার অবস্থা বিশেষ বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সে নাকি সুরেশ্বরের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে লোহার এক ডাণ্ডা দিয়া, সুরেশ্বর এবং তাহার সাক্ষীরা তাহাই বলিয়াছে। অথচ তারিণী এসব কিছুই করে নাই। ওদের গ্রামের বারোয়ারী শীতলা পূজায় চাঁদা দেয় নাই শুধু, অপরাধ তাহার এই। এইজন্য সুরেশ্বর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়া দিয়াছে, তারিণীর আর ভাবনা চিন্তার অন্ত নাই।

পঞ্চানন নিজে তন্ত্রমন্ত্র দিয়া কোন কবচ রচনা করিতে পারে না সত্য, কিন্তু তাহার গুরুদেব প্রদত্ত মহাবল কবচ তাহার দক্ষিণহস্তে ছিল, সেটা খুলিয়া তারিণীকে দিয়া কহিল—আমার নিজের হাতের কবচই দিলাম ভাই, আশা করি, এতে সত্যের জয় হবে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

সেই হইতে তারিণী তাহার ছোট ভাই। সে যাত্রায় তারিণী বাঁচিয়া গিয়াছিল, পঞ্চাননের প্রতিও শ্রদ্ধাভক্তি বাড়িয়া গিয়াছিল অসম্ভব রকমের। সেই সম্পর্কে দুলাল পঞ্চাননকে জ্যাঠামশায় বলিয়া ডাকে।

দুলাল আরও বলিল—মেলায় বাজী দেখাচ্ছেন ত এবার জ্যাঠামশায়? জমিদার বাড়ীর বাবুরা জিজ্ঞাসা করছিলেন আপনার কথা। মেলার শেষে আপনাকে ওখানে যেতে বলেছেন।

নির্ব্বিকার ভাবে পঞ্চানন উত্তর করিল—এবার তো দেখছি অন্য দু'চারজন এসেছে খেলা দেখাতে। তারা ত শুধু বকেই মরছে হর্‌দম; হাত পায়ের কসরৎ বোধ হয় কিছুই জানে না।

দুলাল কহিল—চীনাদের সার্কাস পার্টি এসেছে, তারা নাকি খুব সুন্দর কসরৎ দেখাতে পারে, ঠিক আপনার মত। মানে ঠিক আপনার মত নয় অবশ্য, আপনার থেকে একটু কম।

দুলালের কথা শুনিয়া পঞ্চানন উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, কহিল—জ্যাঠার মন রাখাও চাই, আবার তাদের প্রশংসা করাও চাই। দেখ দুলাল, দোকানে আমার এই পোঁটলা পুঁটলী রইল, মেলাটা আমি একবার ঘুরে' দেখে আসি; কাল থেকে সুরু করা যাবে কাজ। জায়গাটা ঠিক করেও ফেলি।

দুলাল কোন কথা না বলিয়া জ্যাঠামহাশয়ের মালপত্র গুছাইয়া রাখিল, পঞ্চানন বাহির হইয়া গেল দোকান হইতে। মেলা বসিয়াছে, রথের মেলা। চারিদিকে লোকজন গম্‌গম করিতেছে। দোকান-পাতি বসিয়াছে কত। এখন বৃষ্টি না নামিলেই রক্ষা! আকাশ দেবতার যে শত্রুতা মানুষের সঙ্গে, বলা কিছুই যায় না। দুলাল ভাবিল—বর্ষার অভাবে মাঠ-ঘাট গিয়াছে শুকাইয়া, দেশে উঠিয়াছে চাতকের সুর; এতদিন বৃষ্টি হয় নাই। এই মেলার মাঝেই হয়ত বৃষ্টি হইয়া যাইতে পারে ঝর্‌ঝর করিয়া। ঈশ্বরের ঈর্ষ্যা আছে মানুষের কার্য্যে।

একটা লোক হারমোনিয়াম বাজাইয়া, সং সাজিয়া গান করিতেছে। চিন্তামণি দাঁতের মাজন বেচিতেছে সুর করিয়া। গানের কথাগুলি পঞ্চাননের ভালই লাগিল। দু'চারিটা পয়সা উপার্জ্জনের জন্য মানুষকে কত ফিকির ফন্দীর আশ্রয়ই না গ্রহণ করিতে হয়। লোকটার প্রতি করুণা জাগিল কিঞ্চিৎ। পাশে একজন অন্ধ হাঁড়ী বাজাইয়া গান করিতেছে 'অন্ধ হয়ে ভাই, কত কষ্ট পাই, কিয়ারে জানাব, জানেন ভগবান'।

পত্নীর মৃত্যুর পর হইতে মেলায় আসিলেই পঞ্চাননের

মনের মধ্যে কত কষ্ট বাজিতে থাকে একটার পর একটা করিয়া। অস্বস্তিকর একটা গ্লানিতে তাহার সমস্ত অন্তর পীড়িত হইয়া উঠে,—এই সব দুঃখ-দারিদ্র্যের মূর্ত্তি দেখিয়া, জীবন্ত আর্ত্ত যেন ইহারা। সংসারে সকল কিছুরই উপর আসিয়া যায় বিতৃষ্ণা, বিতৃষ্ণা হয় নিজের উপর বেশী, নিজের কৌশল করিয়া বাজী দেখানোর উপর। মনের উত্তাপে পঞ্চানন ধীরে ধীরে রুক্ষ হইয়া উঠে, ধীরে ধীরে রহস্যময় গভীরতায় ডুব দিয়া হারাইয়া ফেলে নিজেকে। কর্ম্মমুখর জীবনের অধ্যায় তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে বহুদিন, কিন্তু আজও সে আসিয়াছে মেলায় খেলা দেখাইতে। পয়সা উপার্জ্জনের জন্য নয়, পয়সার ভাবনা এই বার্দ্ধক্যে তারিণী ত ভাবিতে দিবে না বলিয়াছিল তবুও আসিয়াছে নেশার আকর্ষণে, অভ্যাসের বশে। জীবিকার জন্য সে ভাবে না। এত বড় বিশাল দেশ, ধরণী মায়ের প্রসারিত বক্ষ হইতে স্তন্যপায়ী শিশুর মত সে রস সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহাতে বিশ্রাম মিলিবে বৈকি! কর্ম্মময় ক্লান্ত জীবনে একটা অবসাদের ছায়া জাগিতেছে ধীরে ধীরে, একটু বিশ্রামের প্রয়োজন, ভিতর হইতে কেমন একটা অস্বস্তিকর দুঃখময় অবস্থা সে অনুভব করে মাঝে মাঝে, কিন্তু এই বেদনার কারণ নির্ণয় করিতে সে পারে না। মনে করে বিশ্রামের প্রয়োজন, অবশিষ্ট কয়েকটা বছর অবকাশের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিতে পারিলে মন্দ হয় না। পরক্ষণেই কিন্তু আবার শান্ত জীবনের স্বাভাবিক গতিপথে ফিরিয়া আসে পঞ্চানন, মনের উপর সংযতি তাহার আছে, কিন্তু আত্মাকে নিজের অধীনে আনিবার ক্ষমতা তাহার কমিয়া গিয়াছে বহু মাত্রায়।

মেলা দেখিয়া ফিরিয়া আসিল পঞ্চানন। দুলাল বাড়ী লইয়া গেল। বাড়ী তাহাদের কাছেই। হাতমুখ ধুইয়া আহারাদির পর তারিণীর সহিত সুখ দুঃখের কথা সুরু হইল। দুলাল সরিয়া গেল অন্যত্র।

পরদিন। খাওয়াদাওয়া সারিয়া ঠিক আছে খেলা দেখাইতে বাহির হইবে পঞ্চানন, প্রতি ঘণ্টায় একবার করিয়া দুলাল গিয়া তদারক করিবে। তারিণী মাঠের কাজ সারিয়া আসিয়া একবার দাদার খেলা দেখিয়া আসিবে সন্ধ্যার পূর্ব্বে, পয়সা কিন্তু দিতে পারিবে না বলিয়া রাখিয়াছে। পঞ্চাননও কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য লইয়া বলিয়াছে—বিনা পয়সায় কাহাকেও খেলা দেখাইতে সে পারিবে না।

তারিণী দুলালকে কহিল—যা তোর জ্যাঠার সরঞ্জামগুলো দোকান থেকে নিয়ে আয়, দেরী হয়ে যাবে আবার।

পঞ্চানন রোয়াকে বসিয়া তামাক টানিতেছিল আহারের পর। বহুদিন পরে আবার সুরু করিতে হইবে ভোজবাজী। হাতের ফক্কিকারী। চোখের ধাঁধা লাগাইয়া কত ভড়ং করিতে হইবে জনতার সম্মুখে। আজে বাজে কথা অবশ্য সে বেশী বকে না, কিন্তু তবুও নীরব থাকিয়া খেলা দেখানো চলে না, একরূপ অসম্ভব বটে। বাঁধা বাঁধা বুলি আছে, পাখীর মত মুখস্থ, আওড়াইয়া যাইতে হইবে একটার পর একটা, দিনের পর দিন। দীর্ঘদিন সে এই-ই শুধু করিয়া আসিতেছে জীবনে। বুলিগুলো একেবারে মনের মধ্যে জমিয়া বসিয়া গিয়াছে। একটা অক্ষরও বিস্মৃতি হয় নাই পঞ্চানন। জীবনের কত রঙীন, কত সুখময় অনন্ত মুহূর্ত্ত, জীবনে যাহারা একান্ত বিরল, তাহাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছে সে, কিন্তু বাজী দেখাইবার কৌশলকে সে পরম যত্ন ভরে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, আকাশস্পর্শী বিরাট পর্ব্বতশৃঙ্গের মত করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে বিস্মৃতির সমুদ্র হইতে। সেইজন্য জীবনের সকল কথাই যখন বিস্মৃতির অতল অন্ধকারের মধ্যে হারাইয়া যায়, শুধু ঝরিয়া পড়ে এই স্মৃতি একে একে। বাজীর এই ভণ্ডামীকে সে বাঁচাইয়া রাখে অতিশয় স্নেহে; মহিমান্বিত মূর্ত্তিতে আজও তাহারা তাই মাথা তুলিয়া প্রতিষ্ঠিত আছে গর্ব্বভরে, গৌরবের সহিত।

দুলালের কিন্তু ফিরিবার নাম নাই। তারিণী চঞ্চল হইয়া উঠিল। পঞ্চানন কহিল—আমিই এগিয়ে দেখছি ভাই, ব্যস্ত হয়ো না।

তারিণী আহারে বসিয়াছিল, তথাপি হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল—আপনি যাবেন কোথায়, আমিই যাচ্ছি—হতচ্ছাড়াকে ধরে' আনি।

পঞ্চানন মৃদু হাসিয়া কহিল—কোন দরকার হবে না তার, আমি পথ তো চিনি, আমি নিজেই যাচ্ছি। তুমি ব্যস্ত হয়ো না। ছেলে বয়সে ওই রকম হয় একটু।

সোজা পথ ধরিয়া পঞ্চানন মেলার ধারে আসিল। মেলা জমিয়া উঠিয়াছে বেশ, লোকজন কেনাবেচা করিতেছে। সার্কাসপার্টির ঘণ্টা বাজিতেছে টুং টুং করিয়া, গতকল্যকার সেই লোকটি তাসের খেলা দেখাইতে সুরু করিয়া দিয়াছে আজও। পঞ্চাননের একেই দেরী হইয়া গিয়াছিল, দুলালও আবার দেরী করিয়া দিল। মনে মনে পঞ্চাননের অসন্তোষ হইল একটু। কিন্তু কোথায় দুলাল? তাহাদের দোকানে গিয়া দেখিল কারিকর বটকৃষ্ণ বসিয়া। বটকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিতে সে কহিল—ও, আপনার পোঁটলা? দুলাল তো নিয়ে গেছে বহুক্ষণ, একঘণ্টাটাক হবে। বাড়ী যায় নি? বলেন কি! তবে দেখুন, ওই বেহারীদার দোকানে দাবার আড্ডায় জমেছে কিনা।

বেহারীর দোকান পঞ্চানন চিনিত। পান বিড়ির দোকান, ডাব সরবতও পাওয়া যায় গ্রীষ্মকালে। কুলীন গ্রামের বন্ধু এই বেহারী। তারিণীর মধ্যস্থতায় আলাপ হইয়াছিল। দুলালের উপর চটিয়া পঞ্চানন বেহারীর দোকানে গেল।

দাবা খেলার নেশা দুলালের আছে। এই নেশার জন্য বহু কার্য্য সে পণ্ড করিয়া দিয়াছে। পঞ্চানন জানে না একথা।

দুলাল দাবাই খেলিতেছে সত্য—একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সহিত। দু'পাঁচজনের ভীড় হইয়াছে বেশ। পঞ্চানন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, কহিল—তোদের কি দায়িত্বজ্ঞান বলে কোনও জিনিষ নেইরে দুলাল, আমার কত ক্ষতি হচ্ছে জানিস্—আমার সব জিনিষগুলো তুই এখানে আটকে বসে' আছিস আর—আরে এ কি করেছিস্, ঘোড়া দিয়ে এই বড়েটা মার শীগ্‌গির। নইলে মাত হয়ে যাবি এখুনি।

দুলাল পঞ্চাননের মুখের দিকে তাকাইল, পঞ্চানন কহিল—বল একটা দিতেই হবেরে—নইলে মাৎ সারে না। দাবার কিস্তি দিলে তুই কোথায় যাবি শুনি? ওপরের ওই একটা ঘরে তো! ওখানে গেলে সেই কোণের নৌকো টেনে এনে কিস্তি দেবেন। তখন? ঢেলে সাজা ছাড়া আর উপায় থাকবে না।

দুলাল ঘোড়া দিয়া সেই বড়েটি মারিল।

অপরপক্ষ চাল দিলে পঞ্চানন আবার চাল বলিয়া দিল, দুলাল ঘুঁটী চালিয়া দিল কথামত। বেহারী পঞ্চাননকে দেখিতে পাইয়া আপ্যায়ন আরম্ভ করিয়াছিল; সম্ভাষণের পর কহিল, একবাজী বসো দাদা, বহুদিন তোমার খেলা দেখিনি। আজ খেলতেই হবে।

পঞ্চানন কাজের অজুহাত দিল; লোকে শুনিল না, বেহারীও নয়। তাহাকে বসিতেই হইল এক বাজী। এক বাজীর পর আর এক বাজী, তাহার পর আর এক বাজী। এমনি করিয়া বাজীর পর বাজী চলিতে চলিতে কখন যে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল, পঞ্চানন বুঝিতে পারিল না। তারিণী না ডাকিতে আসিলে, চৈতন্ত কখনও জাগিত কিনা কে জানে!

পঞ্চানন কহিল—কথায় বলে তাস, দাবা, পাশা এ তিন কর্ম্ম বুদ্ধি নাশা! সেই জন্যে আর খেলি না এসব, কাজ-কর্ম্মের বড় ক্ষতি হয়।

তারিণী মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, কোন কথা কহিল না। পঞ্চানন আবার কহিল—আজকের শরীরটাও তেমন সুবিধের নেই তারিণী, কাল থেকে খেলা দেখানো আরম্ভ করা যাবে কি বল?

তারিণী বলিল—যা আপনার ইচ্ছে। শরীর খারাপ থাকলে অবশ্য অন্য কথা। আর তো মাত্র চারদিন মেলা থাকবে।

পঞ্চানন কহিল—এখনও চারদিন থাকবে আজ ছাড়া? আমার দিন দুই বেরোলেই চলে যাবে, তার ওপর জমিদার বাড়ীতে ডাক আছে।

তারিণী আর কোনও কথা বলিল না। পঞ্চানন বুঝিতে পারিল না—তারিণী এমন গম্ভীর হইয়া গেল কেন। রাগ করিয়াছে নিশ্চয়ই। কিন্তু অযথা ক্ষুণ্ণ হইবার বা ক্রোধ পোষণ করিবার হেতু কি! আজ পঞ্চানন পয়সা উপার্জ্জন করিতে হেলা করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তারিণীর তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু তো নাই! পঞ্চাননের অর্থ তাহারা লইবে না, অভাবে পড়িলে পঞ্চাননও তাহাদের পয়সা গ্রহণ করে না। তবুও কোন ব্যাপারে কিছু লোকসান হইয়া গেল, তারিণীর মনের মধ্যে বেদনা এবং ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তারিণী

জগৎকে বড় সঙ্কীর্ণ বলিয়া ভাবে নিশ্চয়, অর্থের কাছে সে তাহার নিজস্বতাকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছে, তাই সামান্য ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করিতে পারে না সে ; জাগতিক বিহ্বলতায় সে একান্ত কাতর।

পঞ্চানন তবু বলে—টাকা উপায় হল না বলে' যদি রাগ করে' থাক তারিণী, তোমার তবে এ অন্যায়। জীবন শুধু পয়সা রোজগারের জন্যে শেষ হয়ে যাবে, তার সাধ আহ্লাদ থাকবে না, তা' আমি পছন্দ করি না।

তারিণী বিনীতভাবে বলিল—রাগ আমি করিনি আপনার ওপর। দুলালের আক্কেলের কথা ভাবছি।

পঞ্চাননের এলোমেলো কত কথা মনে হইতেছিল তখন। ধাক্কা কোথাও এতটুকু পাইলে মনটা হয় উদাস, আজে বাজে কথা আসিয়া হাজির হয় কেবল। কালীতারার মৃত্যুর পর হইতে মন তাহার এমন উদাস হইয়া যায় মাঝে মাঝে। বিশৃঙ্খল বাজে কথাগুলি বাসা বাঁধে মনের মধ্যে, জট্ পাকাইয়া যায় অসতর্কে। তারিণীর আজ এই ব্যবহারে পঞ্চানন বিমনা হইয়া গেল একটু। কথা কত মনে পড়িতে লাগিল, কোন এক মেলায় গিয়াছিল ভোজবাজী দেখাইতে, সেখান হইতে এক সভায় যে সকল সে শুনিয়াছিল, সেই সব কথা। শক্তিমান্ সহিষ্ণু চরিত্র আমাদের নাই। সামান্য লোভ এবং লোকসানকে সহ্য করিতে পারি না আমরা, তুচ্ছ ক্ষয় ক্ষতিতে মুষ্ড়াইয়া পড়ি, ভাঙিয়া যাই একেবারে। আমরা সব উপরে সাধু, ভিতরে চোর। লোককে দেখাই পরোপকারী, কিন্তু আসলে আমরা স্বার্থপর। তারিণীর আজকার ব্যবহার যেন কেমন ধারা সন্দেহজনক। অবশ্য এ সব কথা তাহার বিরুদ্ধে বক্তব্য নয় পঞ্চাননের। মনে তাহার অমনি উদয় হইয়াছে, চট্ করিয়া মনে পড়িয়া গেল—অর্থহীন ভাবে। কিন্তু তারিণী যদি শুনিতে পারিত এসব কথা, হয়ত ভাবিবে তাহাকেই উপলক্ষ্য করা হইতেছে। ক্ষুণ্ণ হইবে খুব।

এমনধারা কত কথাই তো তাহার মনে জাগে। নীচ জাতি বলিয়া মনের প্রসারতা তাহার কম নয়। কম দেশে তো ঘোরে নাই। সভার ঐ সব কথাগুলি লইয়া কত সে তোলপাড় করিয়াছে, প্রতিটি কথা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে। তাহার মনেও ঐ সকল কথা জাগিয়াছে কতবার, কিন্তু গুছাইয়া সে বলিতে পারে না। সে উপলব্ধি করিয়াছে ফাঁকী এবং জুয়াচুরি, স্বার্থপরতা আর লোভ, ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ, ঘৃণা এবং নীচতা—উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে মানুষের মন হইতে আগাছার মত। সামান্য লোকসান এবং ক্ষতিকে বড় করিয়া দেখিয়া জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যকে বিনষ্ট করিতে নাই কখনও।

এসব চিন্তা তাহার খেয়াল মাত্র। সামান্য লোক হইয়া এসব কথা বলিলে লোকে উন্মাদ বলিবে পঞ্চাননকে। ভাল বাজীকর বলিয়া যে খ্যাতিটুকু সে আজ লাভ করিয়াছে, তাহা তো নষ্ট হইয়া যাইবেই, লোকে আরও বলিবে শেষ বয়সে পাগল হইয়াছে পঞ্চানন। সেইজন্য সে চুপ করিয়া থাকে।

রাত্রে তারিণীর সঙ্গে দু' চারিটা কথা যে না হয় এ সম্বন্ধে, তাহা নয়। তবে তারিণী পয়সা চিনিয়াছে খুব। পরকাল, বৃহত্তর মানব সমাজ—এ সবের মূল্য এবং অস্তিত্ব তাহার নিকট নাই। সঙ্কীর্ণ মত তাহার। বৃহত্তর জগৎ এবং জীবনের আস্বাদ সে পায় নাই। পঞ্চাননের মত উদার সে নয়।

পরদিন পঞ্চানন খেলা দেখাইতে সুরু করিল। লোক জমিয়াছে বেশ। উপায় মন্দ হইবে না। কিন্তু পঞ্চাননের যেন উৎসাহ বিশেষ নাই। ভিতর হইতে সেই অস্বস্তিকর অবসাদের প্রভাব ধীরে ধীরে জাগিতেছে। সমস্ত প্রাণ-মন হাহাকার করিয়া উঠে শুধু, এতটুকু বিশ্রামের জন্য অন্তরাত্মা ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠে যেন। হাতের বল লুফিতে পঞ্চাননের দৌর্ব্বল্য জাগে। এতদিনকার সাধনা তাহার : আজীবন প্রচেষ্টায় যে শিক্ষা সে লাভ করিয়াছিল, নিজেকে এবং নিজের দুঃখপূর্ণ অবস্থাকে যে ভাবে সে সান্ত্বনা জানাইয়া আসিতেছিল এতদিন, আজ তাহার সে শক্তি গিয়াছে চলিয়া। সত্যকার মৃত্যু তাহার এইখানে। আত্মিক অপমরণ ঘটিয়াছে এইবার ; আসল জীবনের শেষ বায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে, সে এখন পঞ্চানন নয়, পঞ্চাননের প্রেতাত্মা মাত্র। শুধু কঙ্কাল। অথচ কাল পরশু তো তাহার এ দৌর্ব্বল্য ছিল না। অবচেতন মনের অতলে ফিরিয়া গেলে সে এসব তো কিছু উপলব্ধি করিতে

পারে নাই। হয়ত ভাঙন তাহার ধরিয়াছে বহুদিন, খেলা দেখাইবার সময়ে উৎকট হইয়া জাগিয়াছে মাত্র।

খেলা দেখানো সে শেষ করিয়াছিল। দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাহার সমস্ত প্রাণ মন উঠিল কাঁদিয়া। দুঃখ-দারিদ্র্য, লোভ-স্বার্থপরতা-মোহ এই সকলের ভার হইতে নিজেকে সে মুক্ত করিয়া ফেলিয়া ধরিত এই খেলার ভিতর দিয়া, এই খেলার ভিতর দিয়াই লাভ করিয়াছে সে প্রাণের বিমল আনন্দ, নির্ম্মল পবিত্রতা। ইহার মধ্য দিয়া তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাইয়াছে, নিজেকে দিয়াছে হারাইয়া সকলের কাছে বিলাইয়া। কিন্তু তাহার একি শোচনীয় দুর্দ্দশা আজ! বাঁধা বুলিগুলি ভুলিয়া গেল কি করিয়া? এত যত্নে এবং এরূপ পরম স্নেহে সেগুলিকে ডুবিতে দেয় নাই বিস্মৃতির অতলে, মনের আড়াল করে নাই একদণ্ড—অথচ তাহারা মনের অবচেতন কোটরে হারাইয়া গিয়াছে; শুধু অস্পষ্ট ছায়া জাগে মনে। এইখানেই তাহার পরাজয়। নিজের আত্মা তাহাকে ঠকাইয়াছে। আজ সে প্রবঞ্চিত, নিজের সকল সম্পদ্ হইতে তাহার স্বীয় মন তাহাকে করিয়াছে প্রতারিত, উপায়হীনভাবে। দুই চোখ তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। বল ছুঁড়িতে তাহার হাত কাঁপে, ছোরার খেলা দেখাইতে মনে জাগে শঙ্কা, কথা বলিতে লাগে সঙ্কোচ। সে কাঁদিয়া উঠিল সকলের সম্মুখে। মানসিক যন্ত্রণায় মুখখানি তাহার বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। পঞ্চানন নাই, আজ আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। একটু একটু করিয়া ক্ষয়িয়া গিয়াছে সে, ঝরিয়া হইয়া গিয়াছে নিঃশেষ, হারাইয়া ফেলিয়াছে সে তাহার সব কিছু। পঞ্চানন গিয়াছে মরিয়া।

তারিণীকে পঞ্চানন বলিল—মুক্তি আমাকে দাও ভাই। আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে। তীর্থে তীর্থে ঘুরে' এবার আমি শেষ বয়েসটা কাটিয়ে দিই। তোমার বৌদিও তাই আদেশ দিয়ে গেছেন আমাকে মরবার সময়।

সান্ত্বনা তারিণী দেয় নাই, দিতে যাওয়া মূর্খতা বলিয়া নয়, সান্ত্বনা দিতে জানে না বলিয়া। দুলাল হতাশায় বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছে কেবল, তাহার বন্ধুবান্ধবদের কাছে জ্যাঠামশায়ের সম্বন্ধে বড় বড় কত কথা বলিয়াছিল সে; প্রত্যক্ষ করিতে প্রত্যেককে অনুরোধ করিয়াছিল তাহার ভোজবাজী, কিন্তু তাহাদের কাছে তাহার সম্মান কিছু অংশে ক্ষুণ্ণ হইবে বৈকি!

মেলায় পঞ্চাননকে পরমানন্দ স্বামী ডাকিয়া অনেক উপদেশ দিয়াছেন। ঈশ্বরের আরাধনায় শেষের কটা দিন কাটাইয়া দিতে বলিয়াছেন তিনি। মানুষের আসল জীবন' ধর্ম্মময় পবিত্র জীবন। অধর্ম্ম করিয়া বাহিরে বড় হওয়া যায়, জুয়াচুরি করিয়া ক্ষণিকের শান্তি মিলিতে পারে, নিতান্ত খেলো সুখ পাওয়া যায় তাহাতে, কিন্তু আত্মাকে সন্তোষ দান করা যায় না আদৌ। মনের ঐশী শক্তির পূর্ণ বিকাশে যে তৃপ্তি, সত্যকার ধার্ম্মিক না হইলে, এ সবের অর্থ বুঝিবে কে? পঞ্চাননও মনে মনে স্থির করিয়াছে—তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে এইবার। যেমন করিয়া হউক।

এবং একদিন সত্যই সে বাহির হইয়া পড়িল তীর্থে, তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে। সুন্দর সংসার, স্বচ্ছল জীবনযাত্রা, নিরুদ্বেগ প্রাত্যহিকতার কারা হইতে ঈশ্বর তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহার বাধা নাই কোথাও। নিজের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সে ভাসাইয়া দিতে পারিয়াছে, যাযাবর জীবন তাহার মন্দ লাগিবে না। একস্থান হইতে অন্য স্থানে ভাসিয়া যাওয়ার—এক তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে গিয়া আস্তানা পাতিয়া কয়েকদিন কাটাইয়া দেওয়ার হর্ষে সে উল্লসিত হইতে পারিবে। এ তাহার জীবনের নূতন অধ্যায়। তাহার অর্থ নাই, ঐশ্বর্য্য আছে। বাজীর সরঞ্জামগুলি তাহার সুখ এবং সম্পদ্। প্রাণ থাকিতেও এইগুলি সে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। জীবনে আর কোনও স্বপ্ন সে রাখে নাই, কোনও আশা, কোনও কল্পনা সে করে নাই আর। কালীতারার চিতাভস্মে তাহার মনের রোমাঞ্চকর অনুভূতিকে সে মুছিয়া দিয়াছে, বিলাসের রঙীন মূর্ত্তিগুলিকে একাকার করিয়া দিয়াছে সে সেই ভস্ম দিয়া। শূন্যে ভাসিয়া মেঘের মত এখন সে উচ্ছল এবং লঘু গতি; ইচ্ছামত তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতে অবকাশ পাইয়াছে সে। জীবনের সত্যকার আস্বাদ ইহাই। জীবন এখানে কর্ম্মময় বটে, কিন্তু অবসন্নতা নাই এতটুকু।

কাশী হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চানন সকল স্থানেই

ঘুরিতে লাগিল, এক এক করিয়া, বিনা টিকিটে। বহুবার লাঞ্ছনা এবং অপমান জুটিয়াছে বরাতে, কিন্তু গতি তাহার রোধ করিতে পারে নাই কেহ। কাশী হইতে মেদিনীপুরের কর্ণগড়ে গিয়াছে—সেখান হইতে সীতাকুণ্ডে। পঞ্চানন যেন অন্য জগতের মানুষ হইয়া গিয়াছে। কেহ কোথায় একটি স্বপ্ন লইয়া মাতিয়াছে, কেহ নূতন ঘর বাঁধিয়া খেলা সুরু করিয়া দিয়াছে সংসারের খেলা, কেহ বা হতাশায় গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, আবার হয়ত কেহ ঈর্ষ্যার আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া হইতেছে খাক্—এ সবের দিকে পঞ্চাননের চোখ পড়ে না। এই সকল অনুভূতির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে সে।

তথাপি এখনও পঞ্চাননের মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ থাকিয়া গিয়াছে। কেবল বিভিন্ন দেবতাদর্শনই সে করিয়া যাইতেছে, প্রাণ-মন ভরিয়া ডাকিতে পায় নাই একদিনও। কামরূপ, প্রয়াগ, বৃন্দাবন করিলে চোখের তৃপ্তি ঘটে সত্য, কিন্তু মনের রিক্ততা ঘোচে কই? পঞ্চাননের ঈশ্বরের আরাধনা করিবার ইচ্ছা থাকিলে কি হয়, মন সংহত এবং সংযত নয়। কালীতারা মরিয়া গিয়া তাহার মনকে এমনই একটা ঔদাসীন্য দিয়া গিয়াছে। মনের এই ঔদাসীন্যই তাহার বাজীকরের জীবনের অবসান ঘটাইয়াছে—পঞ্চানন বিশ্বাস করে তাহা।

বিঠুরের ব্রহ্মাবর্ত্তে আসিয়া পঞ্চানন বাল্মীকির মহাদেবের মন্দির দেখিয়া বড় আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কত লোক সারাদিন এখানে বসিয়া ভজন সাধন করিতেছে ঈশ্বরের, কত সাধু আর সন্ন্যাসী, পূজারী, পবিত্র নর এবং নারী—সকলেই আসিয়া জড়ো হইয়াছে এখানে। কেহ কীর্ত্তন করিতেছে, কেহ করিতেছে স্তবপাঠ, আভূমি প্রণত হইয়া প্রণাম দিতেছে কেহ। সকলেই ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করিতেছে এখানে। একদিন স্বয়ং ব্রহ্মা এখানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মাবর্ত্তে আজ মানুষেরা ব্রহ্মার অনুগামী হইয়াছে। পঞ্চাননের বেশ লাগিল মন্দিরটি। সাধু-সন্ন্যাসীদের মঠ রহিয়াছে ঠিক মন্দিরের গায়েই। মঠের সম্মুখে নাটমন্দির এবং নাটমন্দিরের পাশে ধর্ম্মশালা। ধর্ম্মশালাটি বেশ বড়, অতিথিদের একাদিক্রমে দুই সপ্তাহের বেশী নিয়ম নাই থাকিবার।

নাট-মন্দিরে অসম্ভব জনতার সমাবেশ। সকলে ঈশ্বরের স্তবগান করিতেছে। দেখিলে সার্ব্বজনীন বিশ্ব প্রেমের একটা ভাব জাগিয়া উঠে মনে; সংসারে সংসারে যে হিংসা-দ্বেষ চলিতেছে, মারামারি, কাঁড়াকাড়ি যে সব চলিতেছে জগৎ ব্যাপিয়া—লেশ মাত্র তাহার এখানে নাই। এখানে বাল্মীকীশ্বরের করুণা যেন সত্যই বিরাজমান, প্রত্যক্ষ করা যায় চক্ষে, মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয় দিয়া উপলব্ধি করা যায় ভালরূপে। পঞ্চানন একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

মঠের অধ্যক্ষ শ্রীসত্যানন্দ স্বামী। সদাশয় মানুষ তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কয়টা পরীক্ষায় পাশ করিয়া তিনি উচ্চ সত্যের সন্ধানে বাহির হন, ঘুরিতে ঘুরিতে এখানে আসিয়া পড়েন, মঠের তথাকালীন অধ্যক্ষ তাঁহাকে ছাড়েন নাই, তিনি দেহরক্ষা করিলে সত্যানন্দ স্বামী এখন তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে করিতে নাকি তাঁহার এই বৈরাগ্য-দশা উপস্থিত হয়—লোকে এই কথা বলে।

সন্ধ্যা হইলে মন্দিরের ভীড় কমিয়া যায়, লোকেরা চলিয়া যায় যে যাহার নীড়ে, একা শূন্যতা বিরাজ করে মন্দিরে, নাট-মন্দিরে। সারা দিনমানের কোলাহলময়তার প্রতিগুঞ্জন শুনিতে পাওয়া যায় যেন দেওয়ালে দেওয়ালে—মৃদু এবং আবেশময়; বাল্মীকীশ্বরের সম্মুখে তৈলাধার প্রদীপ জ্বলিতে থাকে একটি—মহাদেব যেন নিদ্রিত হইয়া পড়েন। সন্ধ্যার সময়ে পঞ্চানন এই মূর্ত্তি বহুদিন দেখিয়াছে লুকাইয়া।

সন্ধ্যার পর মন্দিরে এবং নাট-মন্দিরে কাহারও প্রবেশ করিতে সত্যানন্দ স্বামীর নিষেধ আছে। মহাদেব তখন নন্দীভৃঙ্গীকে নিয়া বেড়াইতে বাহির হন নাকি—সেখানে জনরব তাই। বহু পুণ্যাত্মাগণ দেখিয়াছেন বলিয়া শোনা যায়। মহাদেব যখন বাহির হইয়া যান, মন্দিরে তাঁহার আসন শূন্য হইয়া থাকে তখন। সেই শূন্য আসন দেখিলে নাকি দর্শকের সর্ব্বনাশ হয়, বাল্মীকীশ্বরের এই অভিশাপ। স্বপ্নে তিনি জানাইয়া দিয়াছেন এ কথা। পঞ্চানন শুনিয়াছে এই সব।

তাহার মনে হইয়াছে—একবার ঈশ্বরের পূজা দিতে

হইবে। অথচ সম্বল তাহার কিছু নাই। সহসা বাজীর সরঞ্জামগুলির কথা তাহার মনে পড়ে। তার মনে হয় যখন সে নিঃস্ব, তখনই তাহার বাজীর ঐ সরঞ্জামগুলির কথা স্মরণে আসে। আজও তাই আসিল। এই দিয়াই সে ঈশ্বরের আরাধনা করিবে। মহাদেব অন্তর্যামী, তাহার মনের ব্যাকুলতা পৌঁছিবে তাঁহার কাছে; সারা জীবনের সাধনার ধন দিয়া সে পূজা দিবে—সে অর্ঘ্য গৃহীত হইবে নিশ্চয়। পঞ্চানন বুড়া হইলে কি হয়, সে বিশ্বাস তাহার আছে। বার্দ্ধক্যের দৌর্ব্বল্য আছে তাহার মনে; কিন্তু কুসংস্কারের বীজ উপ্ত হয় নাই সেখানে। পঞ্চানন ঐ ভাবেই অর্ঘ্য নিবেদন করিবে বাল্মীকীশ্বরের চরণে!

গহন রাত্রি। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। চারিদিক জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। যেন সকল প্রকৃতি খল্-খল্ করিয়া হাসিতেছে। পঞ্চানন ধর্ম্মশালা হইতে বাহির হইয়া আসিল মুক্ত প্রাঙ্গণে, হাতে ভোজবাজীর সকল সরঞ্জাম। বিহারবাসী একজন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে বৈকালে আজ চন্দন চাহিয়া রাখিয়াছিল একটুখানি, জল দিয়া ঘষিয়া এখন কপালে লাগাইয়াছে তাহা। মনে তাহার উত্তেজনা জাগিয়াছে ভীষণ, ভয়মিশ্রিত কেমন একটা মাদকতা। ঠাকুর যদি বেড়াইতে বাহির হন এখন নন্দী ভৃঙ্গীর সহিত, শূন্য আসন যদি পঞ্চানন দেখে মন্দিরে, অকল্যাণ হইবে তাহার। অকল্যাণ? ভাবিতেও পঞ্চাননের হাসি আসে। ঈশ্বরের দেওয়া অকল্যাণই ত তাহার মুক্তি। 'পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বহারা যাহারা, তাহাদের অকল্যাণ আর কি? মৃত্যু? মানসিক মৃত্যু তাহার হইয়া গিয়াছে, এখন দৈহিক মৃত্যু? সেই ত মুক্তি। পঞ্চানন তাহাই চায়।'

মঠের কোন এক সন্ন্যাসী অধ্যক্ষ সত্যানন্দ স্বামীকে ডাকিলেন, ডাকিয়া কহিলেন—মন্দিরে কিসের শব্দ হ'চ্ছে দুপ্‌দাপ্ করে; মনে হচ্ছে কে যেন লাফাচ্ছে! চোর ডাকাত নয় ত? এই রাত্রে—

শব্দ কাণে আসিতেছিল সত্য। বিড়-বিড়্ করিয়া কি সব কথাও শোনা যায় অল্প অল্প। অন্যান্য সাধুরাও জাগিয়া উঠিলেন। অধ্যক্ষ কহিলেন—একবার মন্দিরে গিয়ে দেখে আসি চল।

মন্দিরে বসিয়া আছেন বাল্মীকীশ্বর। বেড়াইতে বাহির হন নাই এখনও—আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন নিত্যকার সেই বোমভোলা আশুতোষ মূর্ত্তি লইয়া। গাম্ভীর্য্য আছে মুখে; কিন্তু লঘু হাস্যে সে গাম্ভীর্য্য মধুর ও কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সেই সহাস্য গম্ভীর মহাদেবের সম্মুখে দেখা গেল পঞ্চাননকে। আমাদের সেই বুড়া পঞ্চানন, মেলায় মেলায় যাদুখেলা দেখাইতে গিয়া যে শক্তিহীন হইয়া, অসহায় আর্ত্ততায় উঠিয়াছিল কাঁদিয়া—সেই পঞ্চানন। আজ সে খেলা দেখাইতেছে ঈশ্বরকে। প্রাণ-মন খুলিয়া, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া। নিজের চেতনা হারাইয়া স্বর্গীয় পরিতৃপ্তিতে খেলা দেখাইতেছে সে কত। হাতের বল ঘুরাইয়া, ছুরি লুকিয়া কত কৌশলই সে নীরবে দেখাইয়া যাইতেছে। আজ মনে শঙ্কা নাই, সঙ্কোচও জাগে না এতটুকু। শুধু দুই চোখ ভরিয়া জল; আকুলতায় আর আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে হৃদয়, চক্ষু ছাপাইয়া এ তো তাহারই বন্যা!

সাধু-সন্ন্যাসীরা দেখিলেন সকলে। তাহাদের মধ্যে একজন কহিলেন—বাধা দিই ওকে, বলে' দিই পাগলামীর জায়গা এটা নয়।

সত্যানন্দ স্বামী ইসারায় তাহাকে ক্ষান্ত করিলেন। তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন খুব—লোকটার এই অদ্ভুত আচরণে। বুড়া মানুষ, বাজীকর; কিন্তু অসীম শক্তি ও সাহস আছে তাহার মনে। লোকটি কর্ম্মতত্ত্বের কিছু জানে কিনা, স্বামীজী বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহার এ কর্ম্ম সত্যকার সাধনা, তাহার ঈশ্বরসেবা সার্থক। কর্ম্ম তো নিষ্পন্ন হয় করণে। কর্ত্তা কেবল অনুমন্তা। করণগুলি তাহাদের নিজ নিজ কার্য্য সারিয়া চলে মাত্র। লোকটির এই কর্ম্ম করণজাত। এই করণ আবেগজাত কিনা জানা যায় না। আবেগজাত কর্ম্ম হইলেই বা দোষ কি? সকল কর্ম্মই ঈশ্বরের। বিশুদ্ধ কর্ম্ম তো কখনও অমলিন হয় না, হইবার নহে। সাধু-সন্ন্যাসীরা অত কথা তলাইয়া বুঝিলেন না, তাঁহারা গুরুদেবের মুখের প্রতি তাকাইলেন। সত্যানন্দ স্বামী তাঁহাদের মনের ক্রোধ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, একটু দূরে ডাকিয়া আনিয়া তিনি কহিলেন, লোকটি যেই হোক, ঈশ্বরের সত্যকার সেবা সে

করছে। মানুষ যে ভাবেই ঈশ্বরের পূজা করুক, ভগবান্ স্বয়ং সে পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করেন। লোকটি আসল পূজারী। এমন আকুলতা এবং হর্ষভরে আমরাও তো কই ঈশ্বরকে ডাকতে পারি না!

পঞ্চানন অশ্রুপ্লাবিত নয়নে তাকাইয়া আছে ঈশ্বরের মুখের প্রতি, হাতে দেখাইতেছে কসরৎ। লাঠী, ছুরি, বলের খেলা; কত যাদু, আর তন্ত্র-মন্ত্রের নাম করিয়া চোখের ধাঁধা! পঞ্চানন আজ পবিত্র এবং আত্মসমাহিত। তাহাকে দেখিলে মনে হয় না সে মরিয়া গিয়াছে, ঝরিয়া হইয়া গিয়াছে শেষ; মনে হয় সূচনান্তে এই তাহার নূতন জীবনের প্রথম অধ্যায়ের সুরু। পঞ্চানন মরে নাই। পঞ্চানন নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। সে শিশু, সরল এবং চঞ্চল।*

* বিদেশী গল্পের অনুভাবে।

# ভারতধর্ম ও ভারতীয়তা

ব্রহ্মচারী বিজয়কৃষ্ণ

ধর্মের দু'টী দিক আছে,—আধ্যাত্মিক দিক্ ও জাতীয় দিক্। হিন্দুধর্ম আধ্যাত্মিক সম্পদে শ্রেষ্ঠ। এই ধর্ম জগতের সকল ধর্মমতের আধ্যাত্মিক সম্পদের সমষ্টি। কিন্তু, শুধু তাই নয়,—তার সাথে আরও অনেক নূতন বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সমাহার। এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ক'রতে বা বুঝ্‌তে যদি কেউ চান, তাঁকে তাই মোটেই বেগ পেতে হয় না।

তুমি খৃষ্টান, ব'লছ তোমার মত শ্রেষ্ঠ; তুমি মুসলমানও ব'লছো তোমার মত শ্রেষ্ঠ। শুধু তাই নয়, —আরও ব'লছ যে, তোমাদের বিশিষ্ট একটি ধর্মমত বাদে আর সবই ভুল। কিন্তু, এমন একটা ধর্মমত যদি থাকে, যা' সহস্র সহস্র হজরত মহম্মদ ও যীশুখৃষ্ট সদৃশ মহাপুরুষ ও অবতারের লব্ধ ভাগবত-জ্ঞানের সমাহার,— যাতে তোমার খৃষ্টানের আধ্যাত্মিক সম্পদ আছে, মুসলমানের আধ্যাত্মিক সম্পদ্ যা' তা'ও আছে,—আরও আছে বহু অভিনব গভীরতর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, তবে তাকে সহজেই শ্রেষ্ঠ বলে সকলেই, অত্যন্ত যাঁরা গোঁড়া নন্, মানবেন বলে' ধরে নেওয়া যায়। অন্ততঃ না-মানার পক্ষে কোনও যুক্তি নেই।

ধর্মের একটা জাতীয় দিক্ আছে। ধর্মকে আশ্রয় করে ধর্মের একটা স্বাভাবিক বিকাশ সেই ধর্মের দেশে তার লোক-সমাজের ভিতর হয়। তাকে সভ্যতা, সংস্কৃতি বলা যায়। সভ্যতা ধার্মিক লোক-সমাজের জাতীয় জাগতিক বিকাশ।

এই ধর্মকে বাদ দিলে সভ্যতার প্রাণহানি করা হয়,— কেননা ঐ ধর্মই ঐ সভ্যতার প্রাণ। আবার সভ্যতাকে বাদ দিলে ধর্মের অঙ্গহানি হয়, কেননা সভ্যতা ধর্মের আধার, তার জাতীয় রূপ। একটা সমগ্র ধর্মকে বুঝতে হলে তার আধ্যাত্মিকতার সাথে সাথে তার সভ্যতা-সংস্কৃতিও বোঝা চাই।

ধর্ম আর জাতীয়তায় পূর্বদেশবাসীরা, আর্যেরা তফাৎ ক'রতে পারে না। তাদের কাছে ধর্ম ও জাতীয়তা অবিভাজ্য। ভারতের ধর্মের সাথে ভারতকেও এমন করে বাঁধা হয়েছে যে, এককে অন্য থেকে পৃথক্ করা চলে না। ভারত ছাড়া হিন্দুত্ব বা হিন্দুত্ব ছাড়া ভারত কল্পনা করা যায় না। ভারতজননীর প্রতি অঙ্গকে হিন্দুর তীর্থস্থান করে সমগ্র ভারতকেই ধর্মদাত্রীর আসনে বসানো হয়েছে। হিন্দুর কাছে ভারতের প্রতি দেশ, নদনদী, গিরি, বন-উপবন পুণ্যময় তীর্থ।

হিন্দুর ধর্ম এবং ধর্মের প্রত্যেক ঋষি, মহাপুরুষ, অবতার, ধর্মোপদেষ্টা হিন্দুস্থানের নিজস্ব। হিন্দুধর্ম

ভারতের নিজস্ব স্বাভাবিক ধর্ম,—এবং এই দিক্ দিয়ে ভারতের জাতীয় ধর্ম।

এই বিচারে খৃষ্টান ধর্ম ইউরোপের বিজাতীয় ধর্ম। ইউরোপের প্রাচীন স্বাভাবিক জাতীয় আর্যধর্মের শ্মশানের উপর এর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম ভারতবাসীর পক্ষে বিজাতীয় ধর্ম—এদেশের ধর্ম ও সভ্যতার ধ্বংসের উপরই এর প্রতিষ্ঠা হ'তে যাচ্ছে। এর প্রতিষ্ঠা ভারতের জাতীয়তার বিনাশ সাধন ক'রবে।

ইউরোপে এক রকমের জাতীয়তা গড়ে উঠেছে,—কিন্তু সেটা সম্ভব হয়েছে,—তারা আগে ইউরোপীয়ান এবং পরে খৃষ্টান বলে', ইউরোপীয় সভ্যতা ঠিক খৃষ্টান সভ্যতা নয় বলে। ধর্মকে সভ্যতাকে আমল না দিয়ে এই জাতীয়তা। ধর্মকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও রাশিয়াতে জাতীয়তাকে গড়ার চেষ্টা ( experiment ) চল্‌ছে। এইসব জাতীয়তাকে জাতীয়তা না বলে' রাষ্ট্র বলা সঙ্গত। রাষ্ট্র (State, Political Unit ) হয়ত গড়া যায়, কিন্তু জাতীয়তা (Nationalism) সৃষ্টি করা যায় না।

আমি ভারতীয়—আমার ধর্মগুরু বলে' মান্য ক'রব একজন অভারতীয়কে — একজন আরবীয় বা ইউরোপীয়কে—ধর্মস্থান বলে' শ্রেষ্ঠ সম্মান দেব, শ্রদ্ধা দেব, মক্কাকে বা প্যালেষ্টাইনকে! আমার ধর্মকার্য হবে আরবীয় ভাষায়—এটা আমার সভ্যতা - সংস্কৃতির, জাতীয়তার (Nationalism) বিরোধী, আমার দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে এই ধর্মের যোগ নেই বলে।

মুস্তাফা কামালপাশা আরবীয় কোরাণ বর্জন করে' দেশীয় ভাষায় কোরাণের অনুবাদ করে' চালিয়েছেন, হের হিটলার গীর্জায় বাইবেলের বদলে 'মেইন ক্যাম্প' ও ক্রুশের বদলে স্বস্তিক - চিহ্ন স্থাপন ক'রছেন,—প্যালেষ্টাইনের অধীনতা থেকে জার্মাণীকে মুক্ত ক'রবার প্রথম ধাপ (step) হিসেবে।

ভারতীয় সভ্যতা হিন্দুসভ্যতা। হিন্দু সংস্কৃতিতে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, স্থাপত্যে যাঁরা গৌরব বোধ না ক'রবেন—তাঁরা ঠিক ঠিক ভারতীয় হ'তে পারেন কি করে? তাঁদের ভারতের সাথে অন্তরের যোগ কোথায়? পরাধীনতার জ্বালাবোধ তাঁদের থাক্‌তে পারে—কিন্তু ভারতের জাতীয়তাবোধ তাঁদের হতে পারে কি করে? হিন্দু যাঁরা নন, তাঁরা ভারতবাসী হলেও অন্তরে ভারতীয় (Indian National) নন্—অভারতীয়।

গ্রীস আজ নাই—তার ধর্ম-সভ্যতার ধ্বংসের সাথে সাথে গ্রীসেরও ধ্বংস হয়েছে। এখন যে স্বাধীন গ্রীস, সে গ্রীস নামের কলঙ্ক মাত্র। গ্রীস আজ বেঁচে আছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, মিউজিয়ামে। বেঁচে আছে তার দর্শনে, সাহিত্যে। ইজিপ্টেরও সেই দশা। খৃষ্টান ধর্ম ও নব্য ইউরোপীয় 'খিচুড়ী' সভ্যতা গ্রীসকে হত্যা করেছে। গ্রীকদিগকেও হত্যা করেছে।

হিন্দু ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি নাই—গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-গোদাবরী আর পবিত্রতা দিচ্ছেন না, বদরিকাশ্রম-হরিদ্বার-বারাণসী-পুরী-অযোধ্যা-মথুরা-গয়া আর ধর্মের প্রেরণা যোগাচ্ছে না, বেদ-বেদান্ত-রামায়ণ-মহাভারত-ধর্মপদ আর ধর্মের নির্দেশক নয়, রাজর্ষি জনক-শ্রীরামচন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির, ব্যাস - বশিষ্ঠ-বাল্মীকি - শাক্যমুনি - শ্রীগৌরাঙ্গের স্মৃতিতে গৌরব বোধ হয় না, অর্জ্জুন-অভিমন্যু-প্রতাপসিংহ-শিবাজীর স্মৃতিতে ধমনীতে বিদ্যুৎ খেলে না—এমন একটি ভারতবর্ষ কল্পনা করুন। সেই সাথে আরও কল্পনা করুন—স্বাধীন ভারতবাসীকে ধর্ম-চরিত্র শিক্ষা দিচ্ছে বাইবেল আর কোরাণ, ধর্মের প্রেরণা জাগাচ্ছে মক্কা মদিনা আর প্যালেষ্টাইন; স্থাপত্যের গৌরব দিচ্ছে আড়াই-দিনকা-ঝোপড়া, বেণীমাধবের ধ্বজা, তাজমহল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আর রোমান ক্যাথলিক গীর্জা; পবিত্রতা দিচ্ছে জমজমের আর জর্ডনের জল, বীরত্বের গৌরব জাগাচ্ছে নেপোলিয়ান, আলাকজান্ডার, কামালপাশা, হের হিটলার, মুসোলিনী, শান্তির বার্ত্তা ঘোষণা করেছেন মিঃ চেম্বারলেন ও মঃ দালাদিয়ে—আপনি কোন ভারতবর্ষ চান? হিন্দুত্বের সম্পর্ক-বিবর্জিত স্বাধীন ভারত কোনও ভারতীয়ের কাম্য হতে পারে না।

তাজমহল, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ, পর্তুগীজ-গীর্জা যত সুন্দরই হোক না কেন, ভারতে খৃষ্টানের মুসলমানের সংখ্যা যত বেশীই হোক না কেন,—এ-সবই ভারতের কলঙ্কের নিদর্শন, পরাধীনতার নিদর্শন, অক্ষমতার, হীনতার নিদর্শন—গৌরবের নয়।

মুসলমান খৃষ্টানদের নিয়ে ভারতে রাষ্ট্রগঠনের চেষ্টা (experiment) চ'লছে। কিন্তু তা কি সম্ভব? মুসলমান খৃষ্টানও ভারতবাসী তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু তাদের ধর্মে, চরিত্রে, সভ্যতায়, শিক্ষা-দীক্ষায় ভারতীয় জাতীয়তার বীজ কোথায়? তাদের আচারে-ব্যবহারে, সাহিত্যে, স্থাপত্যে, শিল্পে ভারতীয়তার স্থান আছে কি? পাদরী-মৌলভীদের দোষ দিয়ে লাভ নাই। তাঁদের ধর্ম-সভ্যতার অনুশাসন সত্যই শুধু অভারতীয় নয়—ভারতীয় জাতীয়তার বিরোধী।

মূর্খ বা ধর্মান্ধ খৃষ্টান মুসলমানের কথা ছেড়ে দিলাম, —ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সাথে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তাঁদের কথাই ধরা যাক্। তাঁরা ধার্মিক, সত্যনিষ্ঠ, কর্মবীর, স্বাধীনতাকামী—সবই সত্য হতে পারে; কিন্তু তাঁদের মধ্যে ভারতীয়তা কোথায়? থাক্‌লেও কতটুকু? ভারতের স্বাধীনতা-কামী হলেও, জাতীয়তার দিক্ দিয়ে তাঁরা ইউরোপীয় ও আরবীয়।

ভারতীয় জাতীয় মহাসভা প্রকৃতপক্ষে ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভা। ভারতের জাতীয়তা (Nationalism) নিরপেক্ষ রাষ্ট্র (State) গঠনের উদ্দেশ্য। ভারতে স্বাধীনতা এর কাম্য। আরবীয় বা ইউরোপীয় অথবা মিশ্র জাতীয়তার ভিত্তিতেই যদি সে স্বাধীনতা সৌধ গড়ে ওঠে, উঠুক—তাতে কংগ্রেসের আপত্তি নেই। ভারতীয় কংগ্রেস ভারতীয়তাকে, ভারতের জাতীয়তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই অগ্রসর হচ্ছে।

স্বাধীনতালাভের পরও এই রাষ্ট্রীয় মহাসভার মত একটি অসম-জাতীয়তা-গঠিত রাষ্ট্রীয় সভাই রাজ্য শাসন করবে—সুতরাং ভারতীয়তার উপর তাঁদের দৃষ্টি থাকবে না, যেমন এখন কংগ্রেসের নাই। ভারতে এক ভারতীয় জাতীয়তাগঠন হয়ত কংগ্রেস অসম্ভব মনে করেন। বিদেশীয় ধর্ম ও জাতীয়তার অভিযান যে-ভাবে অগ্রসর হচ্ছে, যদি সেই গতিরোধের চেষ্টা না হয়, তবে স্বাধীন ভারতে ভারতীয়তার স্থান হবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এবং মিউজিয়ামে আর স্থান হবে রক্ষিত ভারতীয় সৌধে (Protected Monuments)।

প্রশ্ন হতে পারে—তবে কি খৃষ্টান-মুসলমানকে ভারত থেকে বিতাড়িত করে' জাতীয়তা রক্ষা করতে হবে? এর উত্তর অতি রূঢ় শোনাবে—কিন্তু তবুও বলতে হয়,—ভারতের জাতীয়তা রক্ষা করতে হলে তাই ক'রতে হবে। যে-ভাবে জার্মাণী থেকে ইহুদী বিতাড়ন হচ্ছে, সেই ভাবে, সমূলে। শেষ ইহুদী যীশুখৃষ্ট পর্য্যন্ত। রাষ্ট্রপতি শিবাজীর স্বপ্ন ছিল তাই—'এক ধর্ম-রাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি।'

আর এক উপায় হতে পারে। সে-স্বপ্ন ভারতের বর্তমান অবস্থাতেই একদিন দেখেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ভারতমাতাকে দাঁড়াতে দেখেছিলেন তাঁর ধর্ম-সংস্কৃতি সব অক্ষুন্ন রেখে ঐশ্লামিক দেহের উপর ভর করে'—'With Vedantic Brain and Islam body.'

অন্তরে ভারতীয় প্রাণ-শক্তি সঞ্চার করে', ভারতীয় ছাঁচে ঢেলে কিছু কিছু অভারতীয় জিনিসকে ভারতীয় করে নেওয়া হয়েছে;—কোন কোনও সময়ে তার বাহ্যিক রূপ কিছুটা ঠিক রেখেও। হিন্দু-ধর্মের বা ভারতধর্মের বিশালতা, উদারতা ও বাহ্যিক মত-বিভিন্নতা খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মকে এর অন্তর্গত করে' নেওয়ার পক্ষে সহায়ক—যদি খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মকে ইউরোপ ও আরবের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে' তা'তে ভারতীয় প্রাণ-ধারা সঞ্চার করেও তাকে ভারতভূমে সঞ্জীবিত রাখা যায়।

খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজে সমষ্টি-জীবনে, সমাজ-জীবনে মানুষের যে-স্বাধীনতা আছে, ভারতধর্মে ব্যষ্টি-জীবনে ধার্মিক চিন্তাধারার স্বাধীনতা আছে তার চেয়ে অনেক বেশী। এই ধার্মিক চিন্তাধারার স্বাধীনতা যদি খৃষ্টান-মুসলমান ধর্মের অনুশাসনে স্বীকার করে' নেওয়া হয়—তবেই বোধ হয় খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মকে ভারতীয়তাদানের পক্ষে বাধা দূর হতে পারে।

হিন্দুসমাজের বা ভারতীয় সমাজের এমন কিছু কিছু বাঁধন-কষণ আছে, এমনভাবে আছে, যা এই জাতীয়তা-গঠনের পক্ষে অন্তরায় হতে পারে। যুগের প্রয়োজনে জ্ঞাতসারে সেগুলোকে শিথিল না করার ফলে নানাভাবে অজ্ঞাতসারে সেগুলো শিথিল হয়ে আসছে। এবং অজ্ঞাতসারে আসছে বলে' 'কতকটা' হয়ত প্রয়োজনের

অতিরিক্তও শিথিল হচ্ছে। এই শিথিলতা এযুগে আস্‌বেই, যুগোপযোগী সংস্কার কিছু আস্‌বেই, তার গতিরোধ করা কঠিন বা অসম্ভব। যদি সমাজের চিন্তাশীল সুধীজন এই শিথিলতার বা সংস্কারের নির্দেশ দেন—তবে তার গতির উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ন্ত্রিত হয়ে ভারতীয় ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রেখেই তা' আস্‌তে পারে।

এই গতি সুনিয়ন্ত্রিত করলে তা' সমাজের ও জাতীয়তার সহায়ক হয়ে আস্‌বে,—নতুবা তার উচ্ছৃঙ্খল গতিতে হয়ত এমন কিছু কিছু আস্‌বে যা ভারতীয় নয়, যা ভারতীয়তার বিরোধী।

সমগ্র ভারতীয় সমাজের যাঁরা নেতা এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি, তাঁদের এ বিষয়ে চিন্তা ক'রতে এবং আলোচনা করতে অনুরোধ করি।

মুসলমান বা খৃষ্টান ধর্ম বা সমাজের প্রতি কোনও বিদ্বেষ থেকে একথা লিখ্‌ছি না,—ভারতীয় হিসাবে, ভারতধর্ম ও ভারতীয়তাব একজন সেবক হিসাবে বলা উচিত মনে করে'ই লিখ্‌ছি।

* * * *

উপসংহারে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করে দিতে চাই।

হিন্দুধর্ম, হিন্দু সভ্যতা নিয়েই ভারত—ভারত। এই ধর্ম-সভ্যতা পৃথক্ করে', এই দেশ বা এই দেশ ও ভাবতীয়তা থেকে পৃথক্ করে এই ধর্ম কল্পনা করা যায় না। যেমন আরবীয়তা থেকে পৃথক করে' মুসলমান ধর্ম কল্পনা করা যায় না। মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম-সভ্যতা ভারতের পক্ষে বিদেশীয় ও বিজাতীয়। শুধু তাই নয়,—ভারতীয়তার বিরোধী। খৃষ্টান-মুসলমানের সমবায়ে বর্তমান অবস্থায় ভারতের জাতীয়তা কল্পনা করা ভুল, কেননা ভারতের ধর্ম-সভ্যতাই ভারতের জাতীয়তার ভিত্তি করে' রাষ্ট্র গড়ার চেষ্টা (experiment, কেননা এর সম্ভাব্যতার নিদর্শন কোথাও নাই) যদি জয়যুক্ত হয়ই—তবেও সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জীবনেব গতির সম্পূর্ণ বিভিন্নতা (difference in the very out-look of life) থাকার জন্য হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-মিলন স্বাধীন ভারতেও স্থায়ী হতে পারে না। খৃষ্টান-মুসলমানের নিজেদের ধর্ম-সংস্কৃতির জ্ঞানবৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে সংঘর্ষবৃদ্ধি পাওয়ারই আশঙ্কা বেশী।

এব সমাধান হতে পারে ভারত হতে খৃষ্টান-মুসলমান বিতাড়িত করে'—অথবা ইউরোপীয় ও আরবীয় সভ্যতার সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণভাবে উন্মূলিত করে', খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মকে ভাবতীয়তার উপর ভারতীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে'। অন্যদিকে ভারতীয় সমাজের বুদ্ধিপূর্বক যুগোপযোগী সংস্কার সাধন করে'।*

* লেখকের মন্তব্য সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বতোভাবে একমত নহি—এই বিষয়ে বক্তব্য পরে প্রকাশ করিব।—প্রঃ সঃ।

# যাত্রী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

অনাদি প্রভাত হতে, অনন্ত ভবিষ্য স্রোতে, যে কাল চলেছে গাহি গান,
তুমি আমি পাশাপাশি, সুখ-দুঃখ, কান্নাহাসি, বহিয়া এনেছি অবদান।
আজ বর্ত্তমানে এসে, তুমি চলে' গেলে ভেসে, আশামুগ্ধা আমি একাকিনী।
আবার মিলিব যবে, সুখে-দুঃখে মহোৎসবে, সেদিনও কি যাবে না তেমনি ?
এ যাত্রা ক্ষণিক নয়, আমাদের পরিচয়, বহু বহু যুগ যুগান্তের,
তাঁহার চরণে লীন, হ'ব মোরা যেইদিন, সেইদিন শেষ হ'বে এর।

# গান ও স্বরলিপি

## মিশ্র—কাফি

ছায়ায় ধরিতে চাহি, দেয় না ধরা
আলেয়ার দীপে গৃহ আলো করা।
আকাশের বিজলী ক্ষণ উঠে উজলি
গানের বুক পুনঃ আঁধারে ভরা।

যে ফুল ফুটিয়া উঠে, মানস বনে
নীরবেই পড়ে ঝরে আপন মনে;
আশার ছলনায় কত কি যে মন চায়
কারাহীন মায়া সাথে ঘুরিয়া মরা।

কথা—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সরকার

\+ ০ + ০
II ন্া -সা -গা -মা | -রগা -া -া -া I গা পা গা রসা | পা -া -া -া I
ছা ০ ০ ০ | ০য়্ ০ ০ ০ ধ রি তে চা০ | হি ০ ০ ০

জ্ঞপা জ্ঞপা পা -জ্ঞা | জ্ঞা -া সা -া I গা মা পা -মা | -পা -না -পা র্সা I
দে০ ০য়্ না ০ | ধ ০ রা ০ আ লে য়া ০ | ০ ০ ০ র্

না -ধা গা রা | সা -া -া -া I গা মা পা সা | সগা -া -া -া II
দী ০ পে গৃ | হ ০ ০ ০ উ জ্ব ল ক | রা ০ ০ ০

II গা পা ধা -গা | পা -না না -া I র্সা -র্গা -র্রা -র্সা | -া -া -া -া I
আ কা শে র্ | বি ০ জ ০ লী ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

র্সা র্গা র্রা -র্সা | না -র্সা -না -া I না -ধা পা -মা | না -া -া -া I
ক্ষ ণ উ ০ | ঠে ০ ০ ০ উ ০ জ ০ | লি ০ ০ ০

র্সা র্সা পা -া | গা মা পা ণা I ধা -া -া -া | পা -ধা ণা ধা I
গা নে র ০ | বু ০ ক পু ন ০ ০ ০ | আঁ ০ ধা রে

পা -মা -গা -রসা | গা -া -া -া II
ভ ০ ০ ০০ | রা ০ ০ ০

II সগা রা -সা সা | ন্া -রা সা -ন্া I ধ্ন্া ন্া -া -া | ন্া সা ন্া মা I
যে০ ফু ল্ ফু | টি ০ য়া ০ উ০ ঠে ০ ০ | মা ন স ব

সা -া -া -া | ন্া সা মা -মা I মধা পধা গা -পা | মা -গা -া -গমা I
নে ০ ০ ০ | নী র বে ই প০ ড়ে০ ঝ ০ | রে ০ ০ ০০

সা রসা ন্ধ্া ন্া | সা -া -া -া I
আ প০ ন০ ম | নে ০ ০ ০

গা মা -পা জ্ঞা | না -া না -না I র্সা র্গা র্রা -র্সা | না -র্রা -র্সা -না I
আ শা র্ ছ | ল ০ না য়্ ক ত কি ০ | যে ০ ০ ০

ধা -পা জ্ঞা -পা | র্রসা -র্সা -া -া I র্সা র্সা র্সা -র্সা | -া -া -া -া I
ম ০ ন ০ | চা০ য়্ ০ ০ কা রা হী ন্ | ০ ০ ০ ০

রা -গা -মা পা | ধা -ণা -ধা -পা I গা মা -গা রসা | ন্া -সা -া -া II II
মা ০ য়া সা | থে ০ ০ ০ ঘু রি য়া ম০ | রা ০ ০ ০

# "প্রবর্ত্তক" রজত-জয়ন্তী

## দ্বিতীয় মাসিক অনুষ্ঠান

[ আশ্রমী ]

'প্রবর্ত্তক' রজত-জয়ন্তীর দ্বিতীয় মাসিক সভার অনুষ্ঠান ১লা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৬॥০ ঘটিকায় কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটি হলে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের নারী-মন্দির কর্ত্তৃক ঋঙ্মন্ত্র উচ্চারিত ও সঙ্ঘের চারণ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন শক্তিমধুর উদ্বোধন-সঙ্গীত করিলে, সঙ্ঘ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত সভাপতিকে মাল্য-ভূষিত করেন। সভাপতি মহাশয় প্রবর্ত্তক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়ের গলায় মালা জোর করিয়া পরাইয়া দিলে মতিবাবু বলেন, "ইহা বাংলার শার্দ্দুল পরলোকগত স্যার আশুতোষের অমর স্পর্শ; আমি এই পুষ্পমাল্য সশ্রদ্ধায় গ্রহণ করিলাম।" তারপর তিনি বলেন, "১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাকুরুক্ষেত্রকালে 'প্রবর্ত্তকে'র জন্ম, আজ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ সেই মহাবিবর্ত্তনের পুনরাবর্ত্তন-কাল। এই সকলই ভারতের ভাগ্যপরিবর্ত্তন সূচনা করে। বর্ত্তমান শতাব্দীটাই ভারতের ভাগ্যে নব সূর্য্যোদয় হইবার পক্ষে অনুকূল শতাব্দী। তিনি বিগত মন্বন্তর আলোচনা করিয়া বিংশ শতাব্দীতে নূতন মনুর আবির্ভাবকাল ঘোষণা করেন।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বক্তার বিশ্বাস—ভারতে ধর্ম্মের ভিত্তির উপরই যে জাতির সৃষ্টি হইবে, তাহাদের সংখ্যাধিক্যের প্রয়োজন নাই। ১০০ মানুষের সম্মিবদ্ধ প্রাণশক্তি ভারতের স্বাধীনতা আনিবে; বাঙ্গালীই হইবে তাহার অগ্রপুরোহিত। তিনি গণজাগরণের প্রয়োজন স্বীকার করেন; কিন্তু কোন এক চিহ্নিত শ্রেণী-সংহতির মধ্য দিয়াই স্বাধীনতার জাহ্নবী-ধারা বাহির হইবার আশা রাখেন। রাশি রাশি অচল পয়সার অপেক্ষা এক মুঠা সচল পয়সাই কার্য্যকরী—তাই এইরূপ মুক্তিপরায়ণ এক শ্রেণীর মানুষের ঐকান্তিক ত্যাগ ও নিষ্ঠার দ্বারাই নব-যুগ আসিবে বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

স্বাধীনতাকামীদের বিলাস থাকিবে না, বিদ্বেষ থাকিবে না, আত্মপ্রাধান্যের জিদ থাকিবে না, বিবেকানন্দের বাণীই সফল করিতে হইবে। তাহাদের কটিতটে থাকিবে এক খণ্ড জীর্ণ বস্ত্র, উদর-পূরণের জন্য সম্বল হইবে মুষ্টিমেয় অন্ন। রক্তের প্রতি বিন্দু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত হইয়া থাকিবে। ধূর্জ্জটী জন্মিলে গঙ্গোত্রীর অবতরণের ন্যায়, এইরূপ স্বাধীনতা-কামীর শতদল-সৃষ্টি হইলে মুক্তির নির্ঝর স্বতঃ প্রকাশিত হইবে।

মতিবাবু ঐক্য ও প্রেমের বিজ্ঞান বলিতে গিয়া গবেষণাপূর্ণ দার্শনিকতার অবতারণা করেন। পার্থ কৃষ্ণের ঐক্যবদ্ধ জীবনের ভিত্তিতে ভারত চাহিয়াছিল ধর্ম্মরাজ্য, স্বর্গরাজ্য নহে। সেই মিলন-বার্ত্তা "মৈ ভুখা হুঁ" বলিয়া আজও পাঞ্চজন্যে বাজিয়া উঠে। নান্নুর হইতে নবদ্বীপ, হালিসহর হইতে দক্ষিণেশ্বর প্রেম ও শক্তির তীর্থে মিলনের রাগিণীই বাজিয়াছে। দক্ষিণেশ্বরে একের সহিত অন্যের যে অভেদ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহাই শত জীবনে সিদ্ধ হওয়ার বীর্য্যস্বরূপ ভারতের সুদিন আনিবে। বাঙ্গালী ধর্ম্মের ভিত্তির উপর রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

মতিবাবু দ্বাদশ জয়ন্তী করিয়া ব্রত পূর্ণ করিবেন। মহাবোধি হলে তাহার দ্বিতীয় অনুষ্ঠান। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র-

দেব রায় মহাশয় বলেন, "প্রবর্ত্তকের স্বপ্ন কথা নহে, জীবন" আর 'প্রবর্ত্তকের' রজত জয়ন্তীর পর সুবর্ণ জয়ন্তী ও জয়ন্তীর পর জয়ন্তীর তিনি অভিলাষ পোষণ করেন। শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় বলেন "প্রবর্ত্তকের বাণী মূর্ত্তি লইয়াছে যাহাদের জীবনে, তাহাদের সঙ্গে তিনি পরিচিত। প্রবর্ত্তকের দীর্ঘায়ুঃ তিনি কামনা করেন।" শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন বলেন, "স্বকীয় ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ২৫ বৎসর প্রবর্ত্তকের আত্মরক্ষা অসীম সাহসের পরিচয়। অনেক ঝঞ্ঝা, অনেক বিপদের মধ্যেও মতিবাবুর অগ্নি-বিশ্বাস ম্লান হয় নাই, প্রবর্ত্তকের জয়-যাত্রা সফল হইবে। 'প্রবর্ত্তক' কৃষ্টি ও সংস্কৃতির জয়কেতন, জাতির গর্ব্ব।"

সভাপতি শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, "ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষ যে ধারায় বাঁচিবে, আত্মরক্ষা করিবে, বিজয়ী হইবে, প্রবর্ত্তক তাহা ২৫ বৎসর আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে। 'প্রবর্ত্তকের' আমি অনুরাগী, তার কারণ প্রবর্ত্তকে যে ভাব ও ভাষার ঝঙ্কার আমার প্রাণের তারে বাজে, তাহা আমারই মর্ম্মকথা। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তক যাহা ছিল, বর্ত্তমানে তাহা নাই। সর্ব্বসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য ইহাতে নানারূপ প্রবন্ধ ও গল্পাদি স্থান পাইয়াছে; ইহারও প্রয়োজন আছে। লঘুচিত্ত লইয়া প্রবর্ত্তকের পাতায় গল্প-উপন্যাসাদির দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়া মতিবাবুর উদ্দীপনাময়ী বাণীর ন্যায় অগ্নিময়ী রচনার দিকেও দৃষ্টি পড়িবে।" রমাপ্রসাদবাবু আরও বলেন, "এ জাতির প্রাণ যে ঋতকে আশ্রয় করিয়া টিকিয়া আছে, তাহা আমরা ক্রমেই ভুলিয়া যাইতেছি। প্রবর্ত্তক নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে সেই ঋতকে আমাদের সম্মুখে ২৫ বৎসর ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত রাখিয়াছে। আমরা ইহার দীর্ঘায়ুঃ কামনা করি।" তিনি বলেন, "মতিবাবু অবসর লইতে চাহেন। সঙ্ঘের কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া ক্ষুদ্র সেবকের স্থানপ্রার্থী হইয়াছেন; ইহাতে ভালই হইবে। প্রবর্ত্তকের ভাবধারায় যাঁহারা দীক্ষিত, তাঁহাদের জীবন-প্রকাশের উপরই মতিবাবুর স্বপ্ন অধিকতর সফল হইবে। তাঁর জাতিগঠন ব্রত যদি প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কর্ম্মীরা সফল করিতে পারেন, তবেই প্রবর্ত্তকের এই আত্মদানের যথার্থ মূল্য নিদ্ধারিত হইবে। বর্ত্তমান যুগ-বিপ্লবে 'প্রবর্ত্তক' যে ঋতময় পথ জাতিকে দেখাইতেছে তাহার জন্য আমরা ইহার শতমুখে প্রশংসা করিব।" অতঃপর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন ভট্টাচায্য উদাত্ত কণ্ঠে সমাপ্তিসঙ্গীতে সকলকে অনুপ্রাণিত করেন।

সভায় শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু, শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কর, কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচায্য, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার বসু, শ্রীযুক্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন, শ্রীযুক্ত তারাকিশোর বর্দ্ধন, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী মল্লিক চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাস, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ভদ্র, শ্রীযুক্তা রাধারাণী বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত সৌরাজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মিহিরলাল কবীন্দ্র, কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেনশাস্ত্রী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। মহাবোধি সোসাইটী হলে তিলধারণের স্থান ছিল না।

# সেই সে আমি সয় যে সুখের ব্যথা

( Walt Whitman থেকে )

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

সেই সে আমি সয় যে গভীর প্রেমের জ্বালা।
এই পৃথিবী ঘোরে না কি?
কয়ে না কি একটা বস্তু আর-একটাকে আকর্ষণ?

তাই তো আমার এই দেহটা,
যাদেরকে, হায়, দেখি জানি
সেই সবারে অহর্নিশি করছে আকর্ষণ।

# ব্রহ্মসূত্র

## উপক্রমণিকা

শ্রীমতিলাল রায়

মহামুনি বেদব্যাস ভারতের প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির শুধু পুনরুদ্ধার করেন নাই, প্রচারের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। বেদধর্ম্মের ব্যাপক সুপ্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষে মহামতি ব্যাসেরই কীর্ত্তি। তিনি ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বেদমন্ত্রগুলিকে সংহৃত করিয়া বেদ চারি ভাগে বিভক্ত করেন এবং এই চারি বেদের চারি শাখার প্রচার মানসে, তিনি পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনীকে সামবেদ ও সুমন্তকে অথর্ব্ব বেদে পারদর্শী করিলেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসার ভার তিনি জৈমিনীর উপর দিলেন; এবং উপাসনাকাণ্ড নামক যে উপনিষৎ বা জ্ঞানকাণ্ড, তাহারই মীমাংসার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন; ব্রহ্মসূত্রে তাহারই অবতারণা।

গীতা ও ব্রহ্মসূত্র সমসাময়িক রচনা। বেদাদি শাস্ত্রে সর্ব্বসাধারণের অধিকার না থাকায়, বেদব্যাস বেদ-ধর্ম্মের মর্ম্মকথা সবিস্তার মহাভারতে প্রচার করেন। গীতা মহাভারতের অন্তর্গত বিষয়। বেদান্তসূত্র উপনিষদাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যেমন রচিত হইয়াছে, গীতা ও মন্বাদি শাস্ত্রের দিকেও তদ্রূপ লক্ষ্য রাখিয়া তাহার রচনা লক্ষ্যে পড়ে।

মহাভারতের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ২।৩ হাজার বৎসর পূর্ব্ব বলা যাইতে পারে।

ঋষি বেদব্যাসের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য পাণিনির গুরু উপবর্ষকে করিতে দেখা যায়। ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা বোধায়ন ঋষি কর্ত্তৃকও প্রণীত হয়; ইহা আমরা রামানুজাচার্য্যের ভাষ্য হইতে জানিতে পারি।

পাণিনি বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে; আর আচার্য্য রামানুজ যে বোধায়ন-ভাষ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই শ্রীমৎ বোধায়ন কতদিনের, তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। অতএব এইরূপ অনুমান স্পষ্টই অসঙ্গত নহে যে, ব্রহ্মসূত্র অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মহাভারতাদি পুরাণ গ্রন্থের সহিত বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রও রচনা করিয়াছিলেন।

বেদান্তে উপনিষদের অর্থই বিশদ হইয়াছে, গীতার মর্ম্ম ব্রহ্মসূত্রে সুস্পষ্ট। ইহা হইতে উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র, গীতা, প্রস্থানত্রয় বলিয়া কথিত হয়। উপনিষৎকে আমরা শ্রুতি-প্রস্থান বলিতে পারি। গীতা স্মৃতি-প্রস্থান এবং ব্রহ্মসূত্র ন্যায়-প্রস্থান। ভারতের সুবিশাল জ্ঞানরাজ্যের সম্যক্ পরিচয় পাওয়ার জন্য আমরা যদি এই প্রস্থানত্রয়ের আশ্রয় লই, উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে ইহা অধিকতর সুপথ বলিয়াই আমার ধারণা।

ভারতে বৈদিক সভ্যতার প্রভাব থাকায় বেদব্যাস বেদালোচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং বৈদিক শিক্ষাপরিষৎ গড়িয়া তুলেন। ভারত বলিতে আজিও বৈদিক ভারতের পূত স্মৃতির উদয় হয়। বেদাচার ও বেদানুভূতিশূন্য ভারত ভারত-নামের অযোগ্য। এইজন্য বৈদিক যুগের ইতিহাসঅন্বেষণ অভারতীয় মনীষীরাও অতিশয় যত্নসহকারে করিয়াছেন। ভারতের বেদধর্ম্ম কেবল ভারতের সম্পদই নহে। পিথাগোরাস, প্লেটো প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতের বেদাদি গ্রন্থের প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদ ইউরোপে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়; আমরা দার্শনিক প্লেটোর মতবাদের সহিত বেদান্তমতের সাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হই। এই বৈদিক ভারতসভ্যতার যুগনির্ণয় করিতে গিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহ কেহ মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে বৈদিক সভ্যতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আমরা ঐতিহাসিক প্রমাণ নজির-রূপে হয়তো কিছু উপস্থাপিত করিতে পারিব না; ব্রহ্মসূত্রের যেমন প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ প্রমাণরূপে গণ্য হয় নাই, শ্রুতি-প্রমাণই উহার একমাত্র প্রমাণ; আমরা তদ্রূপ ভারতের বৈদিক কাল শ্রুতি-প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়াই অনায়াসে বলিতে পারি যে, বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশতি যুগে যদি কুরুক্ষেত্রের কালনির্ণয় করা হয়, তাহা হইলে মাত্র সপ্তর্ষির গণনায় শতবর্ষকাল যুগসংখ্যা ধরিয়া আমরা বিগত ছয় মনুর যুগের যথারীতি হিসাবে—বর্ত্তমান কালের ৪০।৫০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে বৈদিক সভ্যতার সূত্রপাত হইয়াছিল। আমাদের মনে রাখিতে হইবে—ভারতের মানবসভ্যতার কালগণনায় আমরা স্বায়ম্ভুব মনুকে

ভিত্তিস্বরূপ পাইয়া থাকি, কিন্তু বৈদিক সভ্যতার প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করার জন্য আমাদের অধিক সচেষ্ট হওয়া অপেক্ষা উক্ত সভ্যতার ঋতকে রক্ষা করিয়া, উহার সনাতনত্বকে জীবনে প্রমাণিত করিতে পারিলে বিশ্বের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইবে। কাউণ্ট বায়রণ্ট জেনা, "থিওলজি অব্ দি হিন্দুজ" গ্রন্থ লিখিতে গিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, "ভারতের আর্য্যজাতি ৬ হাজার বৎসর খৃষ্টপূর্ব্বে উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল। এই হেতু বেদের প্রাচীনত্ব ইহারও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে হইবে।" এই কথা জেনা সাহেব ঐতিহাসিক নজির দেখাইয়াই প্রমাণ করিয়াছেন। ইহা হইতেও বৈদিক সভ্যতা বর্ত্তমান হইতে প্রায় দ্বাদশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হয়। অতএব আমরা এইরূপ অনুমানের আশ্রয় না লইয়া মন্বন্তরের হিসাবে অতি কম করিয়াই ভারত-সভ্যতার প্রাচীনত্বের বয়স যদি কিঞ্চিদল্প ৫০ হাজার বৎসর বলি, তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে।

উপনিষৎ শ্রুতি। মানবাত্মার অনুভূতি ঐহিক-পারত্রিক বিষয়-বস্তু যাহাই হউক, তাহাই কণ্ঠে কণ্ঠে উদ্গীত হইয়াছিল গুরুপরম্পরায়। ইহা কোন অতীত যুগ হইতে গঙ্গোত্রীধারার ন্যায় মানবজাতিকে অভিষিক্ত করিতেছে। ইহার প্রথম উদ্গাতা কে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। শ্রুত ঋক্ পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইলেও, ইহার অভিনবত্ব ও তাৎপর্য্য পুরাতন ও অকেজো বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাই। তাই শ্রুতি অপৌরুষেয় আখ্যা পাইয়াছে। যাহা শ্রুত, তাহা মনন করিতে হইলে স্মৃত স্বরূপ হয়, তাই এই শ্রুতিই স্মৃতিরূপে মহামূল্য সম্পদ্ বলিয়া গীতার এত সমাদর। শ্রুতি ও স্মৃতির প্রতিপাদ্য বিষয় যুক্তি ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্মসূত্রের রচনা। এই ব্রহ্মসূত্র অবলম্বন করিয়া উপবর্ষ যেমন অদ্বৈতবাদ প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তেমনই মহামতি বোধায়ন ব্রহ্মসূত্রের সাহায্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদপ্রচারে সফলকাম হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে উপবর্ষের সূত্র-সঙ্কেতে আচার্য্য শঙ্কর অদ্বয় ব্রহ্মবাদ প্রচার করেন। রামানুজাচার্য্য বোধায়নের ভাষ্য আশ্রয় করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করেন।

বেদান্ত-মতের উপর ভারতের ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি স্ব স্ব অস্তিত্বরক্ষার প্রচেষ্টা করিয়াছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পৃথক্ পৃথক্ মতবাদে ব্রহ্মসূত্রের ভিন্ন ভিন্ন অর্থবাদ পরিলক্ষিত হয়। অদ্বৈতবাদ আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যে যেরূপ সুস্পষ্ট হইয়াছে, এমন পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য আর একটিও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গৌড়পাদাচার্য্য আচার্য্য শঙ্করের গুরু। অদ্বৈতবাদের প্রাচীন নিবন্ধ তাঁহারই রচিত। অদ্বৈতবাদ ভারতের প্রাচীনতম মতবাদ। আচার্য্য শঙ্কর এই মতবাদের সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন বলিয়াই অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। জীব ব্রহ্মের অধ্যাস, অর্থাৎ যে বস্তু যাহা নহে, সেই বস্তু তদনুরূপে অনুভূত হইয়াই জীবাভাস হইয়া থাকে। অধ্যাস দূর হইলে, এক অদ্বয়-ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু থাকে না।

সৃষ্টিতত্ত্বটা মায়া বলিয়া অদ্বৈত মতবাদে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য আচার্য্যেরা ব্রহ্মসূত্র অবলম্বন করিয়া দ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। এই দ্বৈতবাদ আবার নানাভাবে বিভক্ত। রামানুজাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদী। বল্লভাচার্য্য শুদ্ধদ্বৈতবাদী। আচার্য্য নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। এবং গৌড়ীয় বলদেব বিদ্যাভূষণ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী। এই সকল আচার্য্যগণ হইতে ব্রহ্মসূত্র নানা রূপ ভাষ্যে হিন্দুধর্ম্মের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছে। শঙ্করাচার্য্য প্রণীত বেদান্তভাষ্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের জন্য রচিত। ভারতের বৌদ্ধমত একদিন উপনিষৎ-ধর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যামূলক শ্রুতি উপেক্ষা করিয়া প্রবল মূর্ত্তি ধরিয়াছিল। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ, সর্ব্বশূন্যবাদ প্রচার করিয়া বৌদ্ধগণ ভারতের প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মূল শিথিল করিয়া দিতেছিল। আচার্য্য শঙ্কর বেদান্তভাষ্যে ইহার যোগ্য প্রতিবাদ করিয়া, ব্রহ্মবিদ্যার গৌরব রক্ষা করেন। শঙ্কর-পন্থিগণ ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিরক্ষার সেনানীরূপে বিপরীত-ধর্ম্মীর সহিত এক প্রকার সংগ্রামপরায়ণ হইয়াছিলেন। ভারতের চারি কোণে আচার্য্যশঙ্করপ্রবর্ত্তিত মঠস্থাপন ভারতধর্ম্মরক্ষার দুর্গপ্রতিষ্ঠা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতধর্ম্মরক্ষায় সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ব্যতীত আর এক শ্রেণীর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়। এই সম্প্রদায় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়াই প্রথিত। আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া জীবের সহিত ব্রহ্মের যুক্তি যে ধর্ম্ম

সাধনার লক্ষ্য এবং জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভেদ হইলেও, এই দুইয়ের মধ্যে একটা নিত্য ভেদ আছে, রূপবৈচিত্র্য আছে, লীলাবিলাস আছে, ইহাই ইহারা প্রমাণ করিয়াছেন। কেয়ূর কুণ্ডল, বলয়, কণ্ঠহার নাম-রূপের বৈচিত্র্য; কিন্তু ইহার উপাদান কারণ সুবর্ণ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আকৃতিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, মূলগত উপাদান ও নিমিত্ত কারণের জ্ঞান জীবের পক্ষে সম্ভব; অতিশয় নিপুণ যুক্তি সহকারে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্যগণ বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীমৎ মধ্বাচার্য্য, শ্রীমৎ বিষ্ণুস্বামী, শ্রীমৎ নিম্বার্কাচার্য্য, শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্য, শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণকে দ্বৈতবাদপ্রচারের জন্য দায়ী বলা যাইতে পারে।

বাংলা দেশে শ্রীমৎ মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদই প্রথম প্রচারিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ দেব যে দ্বৈতবাদ প্রেমের গানে প্রচার করেন, তাহার মূলে মধ্বাচার্য্যের মতবাদ প্রবর্ত্তিত ছিল, এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জন্য বেদান্তসূত্রের নিজস্ব ভাষ্য রচনা করেন, তাহাই 'গোবিন্দ-ভাষ্য' নামে প্রখ্যাত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরচনায় কৃতী বাঙ্গালীর নাম উচ্চারণ করিতে হইলে, আমরা অদ্বৈতবাদী আচার্য্য মধুসূদনের নাম সগৌরবে করিতে পারি। তারপর দ্বৈতবাদী বলদেব বিদ্যাভূষণের নামও বাঙ্গালীতে অতিশয় গর্ব্বের সহিত করিতে পারে। ইহার পর বেদান্তসূত্রের ভাষ্যরচনা বাংলায় আর দেখা যায় না। যে দুই একখানি গ্রন্থ সম্প্রতি চক্ষে পড়ে, তাহা বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত, পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুবৃত্তি মাত্র। সম্প্রতি ভট্টপল্লীর গৌরব শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয় বেদান্তসূত্রের এক অপূর্ব্ব 'শক্তিভাষ্য' রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্যের কিছু অভিনবত্ব আছে, এ কথা সুধীসমাজ অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

গীতার পর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনার প্রবৃত্তি স্বতঃই আমার চিত্ত উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ব্রহ্মসূত্র আলোচনা করিতে গিয়া সর্ব্বপ্রথম এইটাই লক্ষ্যে পড়ে যে, ব্রহ্মকে জানিবার জন্য যে শ্রুতিবাক্য উপনিষদাদি গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে, ব্রহ্মকে পাইবার জন্য যে অপূর্ব্ব স্মৃতিলেখা গীতার পাতায় পাতায় অঙ্কিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মের সহিত পরিপূর্ণ সংযুক্তির হেতু ন্যায় ও যুক্তির ভিত্তির উপর দিবার জন্যই ব্রহ্মসূত্রের অবতারণা। সেই ব্রহ্মসূত্রের প্রয়োগকৌশলে পূর্ব্বাচার্য্যগণ স্ব স্ব মতবাদপ্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; এইজন্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে প্রতিক্রিয়ার ঝটিকাবর্ত্ত এবং মাঝে মাঝে সামঞ্জস্যরক্ষায় ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্ম-সূত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই; কোন বাদ নয়। ব্রহ্ম এক, অদ্বয়। অথবা ব্রহ্ম এক অদ্বয় হইয়াও বহুধা বিভিন্ন, এ বিচার স্বতন্ত্র দর্শনাদি শাস্ত্রে অন্বেষণীয়। ব্রহ্মসূত্রে আমরা ব্রহ্মবাদেরই প্রতিষ্ঠা দেখিতে চাহি। ব্রহ্মকে কোনরূপে বিশেষিত না করিয়া, এক অখণ্ড ব্রহ্ম-তত্ত্বের অমৃতাস্বাদই ব্রহ্মসূত্র-রচয়িতার অমোঘ লক্ষ্য ছিল; তিনিই গীতায় পার্থ ও যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে শাশ্বত সনাতন বিগ্রহরূপেই আঁকিয়াছেন। কেননা, হিরণ্যগর্ভ আদিত্য-পুরুষের সন্ধান পাইয়া উপনিষদের ঋষি গাহিয়াছেন "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি" এবং সেই ঋষিই উদাত্ত কণ্ঠে অমৃতের পুত্রদের বাণী শুনাইতেছেন "জিজ্ঞী বিষেচ্ছতং সমা":—আমি ও তুমি, আর ইহার মধ্যে যে অবকাশ—ব্রহ্ম নিমিত্ত হেতুই এই স্থান ও রূপবৈচিত্র্য, ইহা অবধারণ করিলে বামদেবের মতই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বলিবে "আমিই আদিত্য, আমিই মনু।" তাই বলিয়া এই বামদেব গগন-তলে আদিত্য রূপে উদ্ভাসিত হইবেন না। ব্রহ্ম যেখানে যে রূপে আনন্দচ্ছলে লীলায়িত, সেখানে সেই রূপ দর্শন করিয়াই ব্রহ্মজ্ঞানাভিষিক্ত যে আনন্দ, তাহাই শাস্ত্র আমাদের পরিবেশন করে। আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মবাদ নাকচ করার দুর্দ্দমনীয় প্রচেষ্টার নিবারণকল্পে ব্রহ্মসূত্র অবলম্বন করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় ভাষায় ও যুক্তিতে তাহা খণ্ডন করিয়াছিলেন তাহা যেমন অনবদ্য, তেমনই চিত্তাকর্ষক। সেই ভাষ্য সর্ব্বত্যাগীর ব্রহ্মাস্ত্র হইয়াছিল যে যুগে, সে যুগান্তে চির-নিস্তৃত জীব-ব্রহ্মের লীলামৃত পুনরুদ্ভূত হইয়া বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের লেখনীমুখে অপরূপ ভাষ্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। আজ মতামত-প্রবর্ত্তনের যুগ নহে, ব্রহ্মবাদাবধারণের যুগ। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই শ্রুতি সিদ্ধ করিয়া ভারতীয় বীরপুত্র জগজ্জয়ী হইতে চাহে। স্বরূপজ্ঞান না হইলে, দিগ্বিজয়ী শক্তি কোথা হইতে আসিবে? ব্রহ্মই স্বরূপ।

আমরা সাধনার কার্য্যকারণ-প্রতিনিধিরূপে ব্রহ্ম ও জীবকে সর্ব্বাগ্রে পাই। এই দুইয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া স্পষ্টই প্রতীতি হয়, ইহার মধ্যে স্বভাব একটী গুণনিয়ক (factor)। তারপর আসিয়া পড়ে কাল ও কর্ম্ম। এই ৫টী রাশি লইয়া বিচারফলে যে সমন্বয়ের শক্তি বিকশিত হয়, তাহাই ব্রহ্মশক্তি। আচার্য্য বলদেব এই ৫টীকে তত্ত্ব-বিচারের সামগ্রী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ইহা জ্ঞান-বিজ্ঞানসঙ্গত নীতি বলিয়াই স্বীকার করিতে পারি। বেদান্তের অনুবন্ধচতুষ্টয় আলোচনা করিলে, প্রথমে ব্রহ্মসূত্রের বাচ্যবাচক সম্বন্ধের একটানা অখণ্ড স্রোতই লক্ষ্য করি। বেদান্তে প্রতিপাদ্য—সুস্পষ্ট ঈশ্বরতত্ত্ব ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রয়োজন ব্রহ্মযুক্তি ও পরম-পুরুষার্থলাভ। ব্রহ্মসূত্রের বিষয় সংশয়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া রচিত। পূর্ব্বপক্ষের মতবাদ খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মসূত্র যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, তাহা কোথাও অসঙ্গতিপূর্ণ নহে। আমরা মহামতি ব্যাসদেবের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বলিতে চাহি, উপনিষদের পর গীতা, তারপর ব্রহ্মসূত্র। এই শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায় প্রস্থানত্রয়ের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সমূলক ব্রহ্মবিদ্যা যে ভারতসন্তান গ্রহণ না করে, ব্রহ্মজ্ঞানহীন সে জীবন ব্যর্থ, অভারতীয়।

ব্রহ্মসূত্র চতুরধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রতি অধ্যায় চারিটী পাদে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে নিখিল বেদ ব্রহ্মে সমন্বিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সর্ব্ব শাস্ত্রের সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন-নীতি উক্ত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মভূত হইয়া পুরুষার্থপ্রাপ্তির কথা উল্লিখিত আছে।

আমরা ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়া কোন মতবাদ প্রশ্রয় দিব না, কোন সাম্প্রদায়িক আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠায় ইহা প্রয়োগ করিব না। ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মবাদ বিদিত হইয়া বাদ বর্জ্জন দিয়া ব্রহ্মে অন্বিত হওয়ার সঙ্কেতই আবিষ্কার করিব। ব্রহ্মৈক্যলাভ করিয়া গীতার যোগ জীবনে সিদ্ধ করিব। ব্রহ্মসূত্রালোচনার প্রারম্ভে আমরা আর কি শুভ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারি? গঙ্গাজলে গঙ্গাতর্পণের ন্যায় উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করি—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥"

# ভালবাসি

শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ

বড় ভালবাসি প্রাণখোলা হাসি কুটিলতা লেশহীন।
বক্ষ যাহার সম উন্নত, হোক সে ক্ষুদ্র দীন;
ঈর্ষ্যা যাহার মনের কোণায় স্থান পায় নাক খুঁজি',
ক্লান্ত হয় না মিথ্যার সাথে নিয়ত যে জন যুঝি',
শত কলুষতা, কপটতা আর বিলাসব্যসনে নাশি'
জয়ের মাল্য কণ্ঠে যাহার, তাহারেই ভালবাসি।
পরের ব্যথায় বেদনার জল নয়নে যাহার ঝরে,
নিজের জীবন তুচ্ছ মানে যে পর-উপকার তরে,
হিম-গিরি সম অচল অটল শত বিপদের মাঝে,
ক্ষণিক ভুলে'ও জলাঞ্জলি যে দেয়নি সরম-লাজে,
বিশ্বমানবে আপনার বলি' যে জন বাজায় বাঁশী,
ভাগীরথী সম বিশাল উদার, বড় তায় ভালবাসি।
সঙ্গী নিয়ত মিষ্ট ভাষণ, বিনয়ী, নম্র, ধীর,
অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেবা দাঁড়ায় তুলিয়া শির;
অন্যায় যেবা নীরবে সহ্য করেনি কোনও ক্ষণ
অন্যায় কারো করিতে ক্ষিপ্ত হয়নি যাহার মন,
হৃদয় যাহার টলাতে পারে না কুৎসা নিন্দারাশি
মহৎ হতেও মহত্তর তাহারেই ভালবাসি।
কথায় কথায় চক্ষে যাহার আসে নাক জল ভরে'
ব্যঙ্গ-শায়কে হৃৎ-কমলের পাপড়ি পড়ে না ঝরে',
কর্ম্মই যার জীবনের পূজা, অলসতা করে জয়,
উপকারী যে উপকার ক'রে দেয় শত পরিচয়—
অন্তর বার এক যার দেখি প্রেমালোকে ওঠে ভাসি'—
সকলের চেয়ে বৃহৎ যে-জনা, তাহারেই ভালবাসি।

# অক্ষয়তৃতীয়া উৎসব

[ পরিদর্শক ]

অষ্টাদশ বর্ষের অক্ষয়তৃতীয়া উৎসব গত ২৭শে বৈশাখ অক্ষয়তৃতীয়ার দিন হইতে ৭ই জ্যৈষ্ঠ বৈশাখী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের শ্রীমন্দিব ঘিরিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সঙ্ঘের নরনারী উৎসবে আগত বহু ভদ্র-পরিবারমণ্ডলী শ্রীমন্দিব-চত্বরে উপস্থিত হইয়া নারীমন্দিব কর্ত্তৃক গীত সুমধুর ভজন শ্রবণান্তর সমবেত উপাসনায় যোগদান কবেন। সঙ্ঘগুরুর আশীর্ব্বাণী শ্রবণ কারয়া তাঁরা পুলকিত উৎসাহিত হয়েন। গগনচুম্বী শ্রীমন্দিবের একাদশ চূড়ায় গৈরিক পতাকা উড়িতেছিল। সঙ্ঘগুরু এবৎসর শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ বর্ণের অসি, প্রণব, হল, পূর্ণ ঘট-অঙ্কিত বিশাল পতাকা আকাশে উড়াইয়া বলেন,
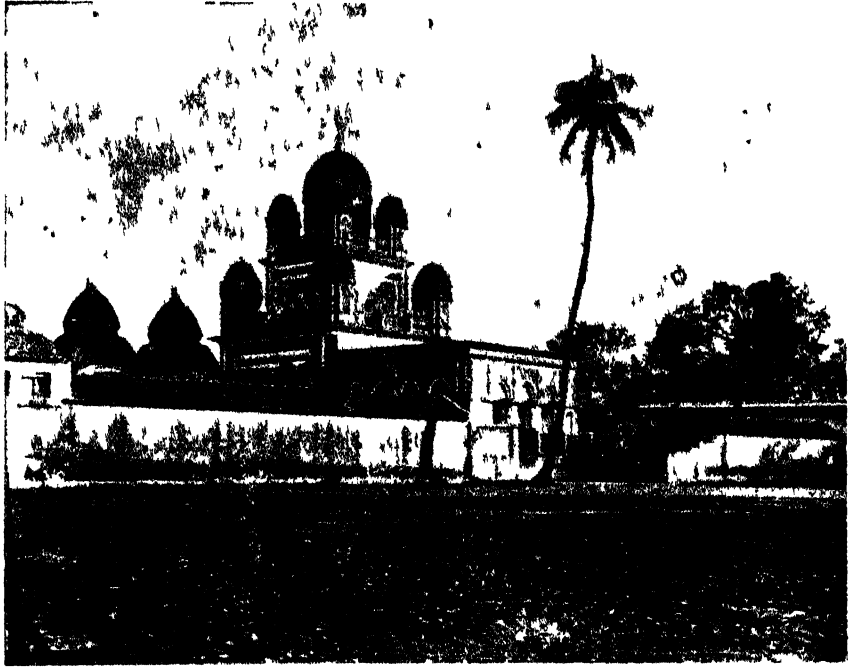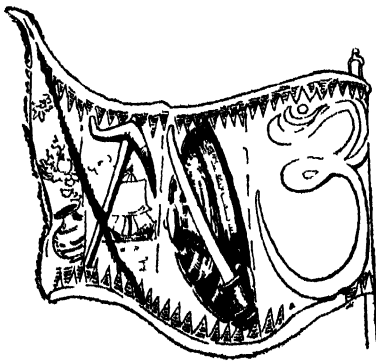
শ্রীমন্দির

গৈরিক পতাকা

"এই পতাকা শুধু সঙ্ঘের নহে, বা ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পরিচয় দিতেই এ নিশান আমি উড়াইতেছি না, এ জয়-কেতন নিখিল মানবজাতির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দ্যোতনা দিবে, এ ভরসা আমি রাখি।".

আশ্রমবালিকাদিগের কণ্ঠে পতাকার বন্দনা-সঙ্গীত আকাশ বাতাস মুখরিত করে। পল্লীবালকেরা নগর-কীর্ত্তনের সুরে, চন্দননগরে নূতন প্রাণ সঞ্চার করে।

নিদাঘেব জ্যোতির্ম্ময় কিবণ জালে অভিষিক্ত হইয়া শ্রীমন্দিরের সহিত বিশাল প্রদর্শনীক্ষেত্র এক অভিনব শ্রী ধাবণ করিয়াছিল। সায়াহ্নের পূর্ব্বে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সভাপতি শ্রীযুক্ত সনৎকুমাব রায় চৌধুবী উপস্থিত হইলে, সভাধিবেশন হয়। শ্রীমৎ শ্রদ্ধানন্দ স্বামী স্বস্তিবচন উচ্চারণ করেন। সঙ্ঘ-সম্পাদক মেলার পবিচয় প্রদান করেন। সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা তাঁব স্বভাবসুলভ উদ্দীপনী ভাষায় উদ্বোধন-বাণীর উচ্চারণ করিলে, ভূতপূর্ব্ব পুরনায়ক শ্রীযুক্ত সনৎকুমার হিন্দু জাগরণ-মূলক সুচিন্তিত অভিভাষণে সভাস্থ সকলকেই উৎসাহিত করেন। দেশশ্রী শ্রীযুক্ত হবিহর শেঠ মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দেন।

উৎসবক্ষেত্রের একদিকে সুবিশাল প্রাঙ্গণপরিবেষ্টিত বিপণি-শোভা। মন্দিরের চূড়ায় চূড়ায় সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় বিদ্যুৎ-প্রদীপ, কার্ণিশে শ্রেণীবদ্ধ সুরঞ্জিত আলোক-

মালা। অন্যদিকে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সুবিশাল প্রদর্শনী। প্রবর্ত্তক নারীমন্দিরের চিত্তবিনোদনকারী 'আনন্দবাজার' আর সমুৎসুক অসংখ্য নরনারীর উৎসাহপ্রদীপ্ত নয়ন-প্রদীপের আলো—অক্ষয়তৃতীয়ার পুণ্যস্মৃতি জাগ্রত বিগ্রহ-মূর্ত্তি ধরিয়াছিল।

রক্তবর্ণ প্রবেশপথ অতিক্রম করিয়াই সম্মুখে বিদ্যুদালোকে উদ্ভাসিত মনোরম দৃশ্য—কৃত্রিম ভারতচিত্রের উপর হিমালয়শীর্ষে শ্রীপুরুষোত্তমমূর্ত্তি। পদতলে ত্রিশক্তি লীলায়িতা, সচ্চিদানন্দের ত্রিমূর্ত্তি—দর্শকের চিত্ত বিমোহিত করে। তারপর বিশ্বসৃষ্টি হইতে কুরুক্ষেত্র যুগ পর্য্যন্ত

শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী

চিত্র ও লিপি সহযোগে আধুনিক বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোয় অপূর্ব্ব চিন্তাধারার পরিবেশ। অভিজ্ঞ দর্শকের তাহা চিত্ত মুগ্ধ করে। অনভিজ্ঞও সবিস্ময়ে ভারতের নিখিল পুরাণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া যায়। তারপর চক্ষে পড়ে ভার্গবের সূতিকা-গৃহ। ব্রাহ্মণের জ্ঞান একমাত্র বল নয়, জ্ঞানের সহিত বীর্য্যের সমন্বয় করিতে ভার্গবের জন্ম, উহা এই অক্ষয়তৃতীয়ায় হইয়াছিল। জ্ঞান ও বীর্য্যের পর মানুষের হিয়ায় প্রেমের স্ফুরণ হওয়ায়, পৃথিবীর বুক চিরিয়া শস্যামৃতসঞ্চয়ের প্রথম প্রচেষ্টা এই অক্ষয়তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতেই ঘটিয়াছিল। মৃত্তিকামূর্ত্তির সাহায্যে শস্যসৃষ্টির সে অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়ন মন মুগ্ধ করে। তারপর এই অক্ষয়তৃতীয়ায় সেবার অর্ঘ্যহাতে মানবচিত্ত প্রথম উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। সে স্মৃতিচিত্র আজিও ভারতবাসী কলসী-উৎসর্গের নামে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ভারত বুঝিয়াছিল জ্ঞান, বীর্য্য, প্রেম, সেবা সবই নিষ্ফল, সত্যপ্রতিষ্ঠ না হইলে। তাই এই অক্ষয়তৃতীয়ায় কৃতযুগের সাধনা প্রবর্ত্তিত হয়। তাহাও মৃণ্ময়মূর্ত্তিতে এই বিভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে। পরিশেষে মকরবাহিনী গঙ্গাদেবী ভগীরথের শঙ্খধ্বনির অনুসরণ করিয়া ঊর্দ্ধলোক হইতে নামিয়া আসিতেছেন। এই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীধারায় বসুন্ধরা অভিষিক্ত হইয়াছে এই অক্ষয়তৃতীয়ায়। শিল্পীর হাতে এ চিত্র অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে।

ইহার পর তৃতীয় বিভাগে দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। প্রথমেই চক্ষে পড়ে শ্রদ্ধানত শিরে আচার্য্যের নিকট বসিয়া তরুণের বিদ্যাশিক্ষার দৃশ্য। তারপর যুগের প্রভাবে শ্রদ্ধা, বিনয়, বাধ্যতা প্রভৃতি অন্তর্গুণের তোয়াক্কা না রাখিয়া, পুস্তককীটের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের স্পর্দ্ধিত নব্য যুগের তরুণদের মূর্ত্তিসহ আর এক দৃশ্য। এই বিভাগটী পূর্ব্বাপর যুগের পরিণাম তুলনামূলক করিয়া দেখান হইয়াছে।

যোগ্য আচার্য্যের নিকট জ্ঞান লাভ করিয়া তরুণ পরিণত বয়সে সুখময় গার্হস্থ্যজীবন লাভ করিয়াছে। আত্মীয়স্বজনপরিবেষ্টিত হইয়া অতিথিপরায়ণ হৃদয়বৃত্তির তৃপ্তিময় দৃশ্য। তারপর অর্ব্বাচীন যুগের শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ ভিখারীকে তাড়না করিতেছে, আর পুত্র বিড়ি-পশ্চাতে ধরিয়া মায়ের নিকট হইতে সিনেমার পয়সা চাহিতেছে। বর্ত্তমান সমাজজীবনের নিষ্ঠুর গার্হস্থ্যচিত্র।

পরবর্ত্তী দৃশ্যে পূর্ব্বশিক্ষার প্রভাবে গৃহী প্রৌঢ়াবস্থায় যোগ্য পুত্রের হস্তে গৃহস্থালীর ভার অর্পণ করিয়া জনহিত-কর কর্ম্মে আত্মনিয়োগের ব্যবস্থা করিতেছে। অন্যদিকে অর্দ্ধ যুগের শিক্ষায় প্রৌঢ় অবস্থায় ঋণগ্রস্ত গৃহস্থ মহাজনের পীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া সপরিবারে ভিটা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। বাণপ্রস্থের ইহা বড় করুণ দৃশ্য।

উপসংহারে, একদিকে "ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদম্" বলিয়া

উত্তমের তীর্থযাত্রা আর একদিকে দৈন্যপীড়িত উপেক্ষিত গৃহী মহাযাত্রায় ভূমিশয়নে অবজ্ঞাত। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সাধ্য নাই, অসহায়া পত্নীকে গুলিখোর ডাকিতে হইয়াছে। ইহাও সন্ন্যাস, মানবজীবনের চরম পর্য্যায়!

অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

ইহার পর চতুর্থ বিভাগ। এই বিভাগ বর্ণনার নহে। দেখিবার, উপলব্ধি করিবার। সুবিশাল হিমালয়ের ন্যায় ইহা যেমনই জটিল, তেমনই মহিমময়। প্রতি দর্শক বিস্ফারিত নেত্রে দেখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—ইহা মস্তিষ্কের অফুরন্ত মহাব্যয়। কয় জন ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন?

সম্মুখে পুরুষোত্তম, বিচিত্র পটভূমি। উর্দ্ধে নীলিমার কোলে জ্যোতির্ম্ময় তরঙ্গ। সুনীল ধরণীর উদার বক্ষে স্বেদ-ধারার ন্যায় রজত-প্রবাহ। শ্রীবিগ্রহ পুরুষোত্তম ত্রিভঙ্গিম মূর্ত্তিতে অতিঅপ্রাকৃত—স্বপ্নবিহ্বল তার নয়নের দৃষ্টি, মাধুর্য্য-মণ্ডিত-কান্তি। জগতের কান্তি পটভূমিতে আঁকিয়া উঠিয়াছে। নয়ন ফিরান যায় না। দৃশ্যচিত্রের সহিত শিল্পীর হাতের অনিন্দ্য মৃণ্ময় মূর্ত্তি, ইহার উপর লিপি। লিপনভঙ্গী—সুচিত্রিত ক্ষেত্রে সুলিখিত অক্ষরমালা নববেদ রচনা করিয়াছে। প্রেরণাশক্তি সাবিত্রী। বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী। ধনদায়িনী কমলা,' রাষ্ট্রশক্তি মহাদুর্গা। সর্ব্বশেষে প্রেমদায়িনী শ্রীরাধা। দৃশ্যের পর দৃশ্যের অবতারণা সে যে কি মনোরম, তাহা ভাষায় বলা যায় না। নয়া বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা অধ্যাপক শ্রীবিনয় সরকার দুঃখের সহিত বলিলেন, ১৮ বৎসর ধরিয়া যে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির স্রোতঃ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে বহিয়া চলে, দেশের সাংবাদিকদের তো তাহার দিকে দৃষ্টি নাই। এ দেশের অবস্থার পরিচয় এইখানেই পাওয়া যায়।

পঞ্চম দফায় "শ্রমের মূল্য" মৃণ্ময় মূর্ত্তিতে দেখান হইয়াছে। উহা সম্পাদকের এই সংখ্যার "প্রবর্ত্তকে" প্রকাশিত গল্প হইতেই পাঠকেরা বুঝিয়া লইতে পারিবেন। ইহার পর শেষ দৃশ্য—"ধর্ম্মের কুসংস্কার।" লিপি ও চিত্রসহযোগে সত্যকে মিথ্যার আবর্জ্জনা হইতে বাহির করা হইয়াছে। সর্ব্বশেষ প্রস্থে শ্রীমন্দিরের ইতিহাস চিত্রে দেওয়া হইয়াছে। বাংলার সর্ব্বপ্রাচীন এই শক্তিপীঠ "শ্রীমন্দিরের ইতিকথা" ইহাতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ডাঃ শ্রীইন্দুভূষণ বসু

ইহার পর দিনের পর দিন নানা মনীষীর আগমন নানাবিধ শিক্ষা ও জ্ঞানের অবতারণা আর সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতার সহিত অবাধ সাক্ষাৎকার ও আলাপ। সঙ্ঘধর্ম্মিগণের অমায়িক ব্যবহার ও অভ্যর্থনা। উৎসবের ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলা যাইতে পারে।

২৮শে বৈশাখ, শনিবার সুসজ্জিত সভামণ্ডপে শ্রোতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রথম উপাধিপ্রাপ্ত আচার্য্য ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার প্রাক্-চৈতন্য ও পর-চৈতন্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালীর পরিচয় দিলেন উদাত্ত-কণ্ঠে। ধন্যবাদচ্ছলে সঙ্ঘগুরু যে মর্ম্মবাণী প্রকাশ

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার

করিলেন, তাহা যেমনই অপূর্ব্ব, তেমনিই অভিনব। জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চ্চার সহিত পল্লীর তরুণদলের সঙ্গীত-অভিনয়ের উৎসাহ ও আনন্দ কম নহে। বোড নিউ থিয়েটার ক্লাব "মাটীর ঘর" অভিনয় করিলেন।

তারপর ২৯শে বৈশাখ, রবিবার ডাঃ ইন্দুভূষণ বসু সদলবলে লীলা - কীর্ত্তনে আনন্দ বিতরণ করিলেন। ৩০শে বৈশাখ সোমবার শ্রীসিদ্ধেশ্বর ভাগবতভূষণের সভানেতৃত্বে মহিলাসভার অনুষ্ঠান হইল। নবযুগে প্রকৃষ্ট গতি লইয়া প্রবর্ত্তকের নারীমন্দির যে নবাভিযান করিয়াছে, ভাগবতভূষণের কণ্ঠে তাহার প্রশংসাবাণী গদগদ কণ্ঠে উদ্গত হইল। রাত্রে "গ্রহ-চক্রে"র অভিনয় শত শত নরনারীর প্রাণে তৃপ্তিদান করিল।

তারপর দিন অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকারের "বাঙ্গালী জাতিকে ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায় কিনা" প্রসঙ্গ লইয়া অধ্যাপক সরকার অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিলেন। তাঁহার নয়নে নয়া বাংলার স্বপ্নসৃষ্টি উজ্জ্বল আলোকে ঠিকরিয়া পড়িল। শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র বাঙ্গালীর প্রাচীনতার ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার প্রশ্নচ্ছলে প্রতিবাদের কণ্ঠ তুলিলেন। অধ্যাপক বিনয়বাবু সপ্রশংসায় তাহা গ্রহণ করিয়া, বিষয়টা বিচারাধীনে রাখিয়া অতি প্রাঞ্জল ভাষায় মর্ম্মবাণী প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণার মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায় না।

তারপর দিন মিঃ এস, গুপ্তের ইন্দ্রজাল প্রদর্শন হয়।

২রা জ্যৈষ্ঠ চন্দননগরের ১৯টী সংহতির সম্মেলন। ফরাসী চন্দননগরের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। সহরের ভিন্ন ভিন্ন সংহতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রেরণা এই অনুষ্ঠানের মূলমন্ত্র ছিল। সভার প্রতিনিধিবর্গ এই

অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়

কর্ম্মসাধনের জন্য একটী কমিটী নিয়োগ ও শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্তকেই তাহার অস্থায়ী সম্পাদক-পদে নিয়োজিত করিলেন।

৩রা জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূ-তত্ত্বের অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায় ছায়াচিত্রযোগে পৃথিবীর উৎপত্তি ও ভূ-তত্ত্বের অবলম্বনে ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

• ১৮ই মে শনিবার শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী "প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ধারা" বলিতে গিয়া অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করেন। তাঁহার সুললিত কণ্ঠে দেবভাষার অমৃত-নির্ঝরে সভাস্থ শত শত নরনারী পুলকে অভিষিক্ত হয়। তারপর কলিকাতার সিকদার বাগানের "বান্ধব-সমাজ" কর্ত্তৃক 'মীরাবাঈ' অভিনয় দেখিয়া দর্শকের চিত্ত প্রেম ও ভক্তিরসে আপ্লুত হয়।

তার পরদিন ফরাসী চন্দননগরের এড্‌মিনিষ্ট্রেটার মঁসিয়ে ব্যারোঁ সপত্নী বিশাল জনগণের সহিত একত্র বসিয়া নৈহাটীর ঙ, বি বেলের বকেট ইনস্টিটিউটের ব্যায়ামবীর এন, আর, সরকার ও তাঁহার শিষ্যদের ব্যায়াম-কৌশল দর্শন করেন।

মঁসিয়ে ব্যারোঁ

মেয়র শ্রীতুলসীচরণ রক্ষিত

৬ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার, আকাশে ঘন মেঘের সঞ্চার হয়, তারপর মুষলধারে বৃষ্টি। সেই ঘনবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া দলে দলে প্রদর্শনী ক্ষেত্রে লোকজন আসিতে থাকে। এইদিন শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী "বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতি" সম্বন্ধে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করেন। তিনি ঘন বর্ষার আকাশজোড়া 'কাশী হইতে কামাখ্যা পর্য্যন্ত আর হিমালয় হইতে সুন্দরবন বাঙ্গালীর স্বক্ষেত্র বলিয়া দাবী করেন। তাঁর ওজস্বিনী ভাষা প্রাবৃটের আকাশকেও স্তম্ভিত করিয়াছিল।

মঙ্গলবারে ভোরের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, এইদিনেই উৎসবসমাপ্তি। বুদ্ধ-পূর্ণিমার পুণ্যদিনে তীর্থবাসীদের অন্তরে আনন্দের উদ্দীপনা বর্ষার ঘন আকাশ দেখিয়া বিন্দুমাত্র বিক্ষুব্ধ হয় নাই। শ্রীমন্দিরে যথাকালে উপাসনার উদ্গান উঠিল। সঙ্ঘগুরুর কণ্ঠে বেদান্তের সিংহ-গর্জ্জন শোনা গেল। উৎসবস্রোতে আকাশের ঘনঘটা ক্রমেই অপসারিত হইতে লাগিল। অপরাহ্নে সূর্য্যাস্তের সময়ে ভাগীরথীর জল রক্তবর্ণ ধরিল। পরে সন্ধ্যার ঘনঘটা বিদীর্ণ করিয়া শুভ্র জ্যোৎস্নাবিতরণে পূর্ণচন্দ্রের উদয়। সভাক্ষেত্রে বিদ্যুদ্বাতি জ্বলিল। মেয়র শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ

শ্রীমতিলাল রায়

রক্ষিত সমাপ্তি-সভার সভাপতি হইলেন। শ্রীমৎ শ্রদ্ধানন্দ স্বামী মেলার বিবরণ পাঠ করিলে, সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তারপর সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় "মানব-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব ছন্দে ও ভঙ্গীতে বক্তৃতা প্রদান করেন। বাঙ্গালীর ধর্ম্ম বিশ্ব-মানব ধর্ম্ম, উদ্দীপনাময়ী ভাষায় ইহা প্রমাণ করিয়া তিনি

আসন গ্রহণ করিলে, শত শত নরনারী স্থির ও স্তব্ধ হই। ভাষার ঝঙ্কারশেষে যে রেশ চলিতেছিল, তাহাই যেন ক। পাতিয়া শুনিতেছিলেন। "সুরেন্দ্র-স্মৃতি সমিতির" ঐক্যতান বাদন, যুগল বালিকার অগ্নিনৃত্য, প্রবর্ত্তক ছাত্র-সঙ্ঘের "বাঙ্গালী" অভিনয় — এইরূপে অঙ্কতৃতীয়া। উৎসব-সমাপ্তির মহাসমারোহ সূর্য্যোদয় হইতে পুঃ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চলিয়াছিল।

উৎসবরাত্রি শেষ হইলে নবপ্রভাতে সঙ্ঘসাধকগণে কণ্ঠে প্রাতর্মন্ত্র শুনিতে শুনিতে প্রদর্শনীক্ষেত্র জনশূ হইতে লাগিল। উৎসবশেষে আকাশে বর্ষার আবির্ভাব-বুঝি নিদাঘ-দগ্ধ জনগণের মস্তকে ইহা অমৃতবর্ষণ উৎসব-দেবতার অন্তর্দ্ধান হইয়াছে, তাঁহার পুনরাগমন প্রার্থনায় কণ্ঠ মুখরিত। আমরা আগামী বর্ষে উৎসব দেবতাকে আরও অধিক সমারোহে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইতে দেখিব। সঙ্গীতের ঝরণাধারায় কা বাজিতেছে —

আসিবে আবার তুমি আসিবে আবার
নব সাজে হয়ে পুনঃ নব অবতার।

## শুভেচ্ছা

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

"প্রবর্ত্তকে"র রজত জয়ন্তী সংখ্যা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। প্রায় দেড় মাস জলপথে খুলনা জেলায় ঘুরিয়া

বেড়াইতেছিলাম বলিয়া ইতিপূর্ব্বে পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই।

"প্রবর্ত্তকে"র নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে, একথা সবাই জানে এবং পঁচিশ বছরের জীবনে সে প্রমাণ করিয়াছে যে তাহারও দিবার কিছু আছে।

আমি কামনা করি—"প্রবর্ত্তকে"র সাধু উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হউক।

বিনীত
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

"প্রবর্ত্তক" বাংলার অন্তরে ভাগবত জীবনের দিব্য সিদ্ধি ও ঋদ্ধির বীজ বপন করিবার যে কল্যাণ ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে জয়যুক্ত হউক — এই কামনা করি।

শ্রী[illegible] সরকার
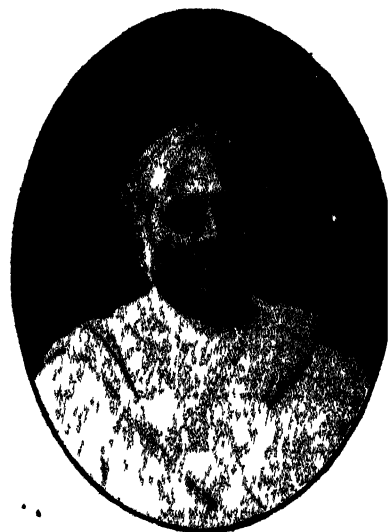
# চার্লস্ ওয়াল্টার বোল্টন
## ( ১৮৫০-১৯১৯ )

চার্লস্ ওয়াল্টার বোল্টনের (Charles Walter Bolton I. C. S., C. S. I.)-এর বিশেষ ও বিশদ বিবরণ অধুনা বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত ; সৌভাগ্যের বিষয়—এমন একজন আজও জীবিত আছেন, যাঁহার সঙ্গে ইঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং যাঁহার সঙ্গে ইঁহার পত্রালাপ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।. তিনি হচ্ছেন, শিক্ষাবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার ; পূর্ব্বে ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, পরে এ্যাডিসনাল স্কুল ইন্স্পেক্টর ( অধুনা অবসর প্রাপ্ত )। এই ইন্স্পেক্টরবাবুর সৌজন্যেই আজ বোল্টন সাহেবের এই ক্ষুদ্র ইতিবৃত্তিকা-গ্রন্থনে সমর্থ হইয়াছি। ইঁহার সহিত মিঃ বোল্টনের (Mr. Bolton)-এর বহু পত্র লেখালেখি হইয়াছিল ; বোধ হয় উক্ত বোল্টন সাহেবের ভারতীয় অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গের মধ্যে অধুনা একমাত্র ইনিই জীবিত। ইঁহার নিকট হইতে আশাতীত উপাদান না পাইলে, আজ মিঃ বোল্টনের জীবনী অনুশীলন করিতে প্রয়াসী হইতাম না। বিংশতি বৎসর অতীত হইতে চলিল মিঃ বোল্টন্ মরলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার মৃত্যুবার্ষিকী বঙ্গদেশে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে তাঁহার বঙ্গদেশীয় অকৃত্রিম সুহৃদ্ এই হেমবাবুর প্রচেষ্টায়।

মিঃ বোল্টন যে ভারতবাসীর প্রতি অনুরাগী হইবেন, তাহার পূর্ব্ব সূচনা পাই তাঁহার জন্মস্থান হইতে ; তিনি জন্মগ্রহণ করেন ভারতমহাসাগরে অবস্থিত মরিশস দ্বীপে, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে। পিতা ডক্টর জন বোল্টনের (Dr. John Bolton)-এর বহু যত্নে তিনি মরিশস দ্বীপের রয়েল কলেজ (Royal College)-এ শিক্ষালাভ করেন এবং পরে লণ্ডনে কিংস্ কলেজে (King's College)-এ ভর্ত্তি হন ; অনন্তর আই, সি, এস্ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে কার্য্যভার প্রাপ্ত হন। যে বৎসর মিঃ বল্টন বঙ্গদেশে পদার্পণ করেন, ঠিক সেই বৎসর তদীয় অন্তরঙ্গ ভারতবন্ধু হেমচন্দ্র সরকার জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, এবং আসামের বিভিন্ন স্থানে কর্ম্ম করিবার পর বোল্টন পাবনার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট হন। সেই সময়ে হেমবাবুর আত্মীয় ৺কালীমোহন বসুর সঙ্গে তাঁহার হৃদ্যতা হয়। পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটারী নিযুক্ত হ'ন এবং সেই বৎসরেই দার্জ্জিলিঙে তাঁহার সহিত কার্য্যপ্রসঙ্গে হেমবাবুর প্রথম আলাপ-পরিচয় ঘটে ; আর ক্রমশঃ এই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মিঃ বোল্টন আসামের অস্থায়ী 'চীফ্ কমিশনার' নিযুক্ত হইয়া নূতন কার্য্যভার গ্রহণার্থ যাত্রা করিবার কালে সন্তোষের মহারাজা ( অধুনা মৃত ) স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী তাঁহাকে অভিনন্দন দিবার সময়ে বলিয়াছিলেন—"মহাশয় ! আপনি আমাদের কলিকাতার এই মূক ও বধির বিদ্যালয়ের সভাপতির কাজ অতি যোগ্যতার সহিত এতদিন পরিচালন করিতেছিলেন ; এখন উচ্চতর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসামে চলিয়া যাইতেছেন ; আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে আরও উচ্চতর পদে নিযুক্ত হইয়া আপনি পুনরায় আমাদের বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এবং তখন এই বিদ্যালয়ের ভাবী কর্ম্মচারিবৃন্দ আপনার সদুপদেশ ও সাহচর্য্যলাভে পুনরায় সমর্থ হইবেন।" বাস্তবিক তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও আপ্রাণ চেষ্টার ফলেই উক্ত মূক ও বধির বিদ্যালয় এত দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে। তাঁহার জীবনের উত্তর ভাগে শত কাজের মধ্যেও তিনি এই বিদ্যালয়টিকে ভুলিতে পারেন নাই। এমন কি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও তিনি বিলাত হইতে হেমচন্দ্রবাবুকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত পত্রে, অন্য কথার মধ্যে লেখেন—

"I have not heard any news of the Deaf and Dumb School for some time. I hope that it is making a steady development and that smaller schools are being started out of Calcutta. It will be a lasting pleasure to me to think that I had some share in the woik of educating the Deaf and Dumb in Bengal."

তাঁহার এই বিস্তীর্ণ কর্ম্মবহুল জীবন হইতে বিশ্রাম লাভান্তে লণ্ডন হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২৬ শে আগষ্ট তারিখে পূর্ব্বোক্ত হেমচন্দ্রবাবুকে লিখিত পত্র হইতে শুনিতে পাই তাঁহার জীবনসঙ্গিনীর মর্ম্মন্তুদ মৃত্যুবার্ত্তা—

"I have retired on the expiration of my furlough. * * * I regret exceedingly to hear that you have lost your uncle—who was one of my oldest Indian

friends and for whom I never ceased to have the highest regard from the days when we were together in Pabna. I have myself suffered deepest bereavement in the loss of Mrs. Bolton, who was taken from me suddenly a few months ago. It has been a grievous blow at the end of my service when I have to settle down and make the best of life at home.

তিনি একদিকে যেমন জনপ্রিয় শাসনকর্ত্তা ছিলেন, অপরদিকে তেমনি পক্ষপাতশূন্য বিচারকও ছিলেন। নিজের সৎকর্ম্মের ঢক্কানিনাদ তিনি শুনিতে পছন্দ করিতেন না। তিনি ছিলেন যথার্থ বীরকর্ম্মী; এমন কি তাঁহার অবসর-গ্রহণের পর তাঁহার ভারতবন্ধু হেমচন্দ্রবাবু যখন তাঁহার জীবনী লিখিবার প্রয়াসী হইয়া তাঁহার ইউরোপীয় ও ভারতীয় বন্ধুদিগের নিকট উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করেন, তখন তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়া লেখেন—

"I have always rigidly abstained from anything having even the appearance of self-advertisement and should not at all like to see myself the subject of a published biography. I do not also think that any account of my official life would be of interest or value to the public."

বাঙ্গালীর প্রতি ভালবাসা তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অটুট ছিল এবং বাঙ্গালীর জাতীয় অভ্যুত্থান বিষয়ে তিনি চিরদিনই উৎসাহ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর তারিখের পত্রে দেখিতে পাই—

"My knowledge of Bengali remains good enough to enable me to understand readily the article in the "Swadesh" and to make out very fairly the sense of the national song by Rabindranath. You are passing through a period of much trouble* in my old Province. I can only hope that the return af peace and goodwill will not be delayed."

মিঃ বোল্টন একজন সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন; দর্শন এবং বিজ্ঞানেও তাঁহার অনুরাগ কম ছিল না। কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া তিনি খুব আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গালার অনাগত সন্তানগণের তিনি চিরদিন কল্যাণকামনা করিতেন। পুরাতন গ্রন্থ পাঠে তাঁহার প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল এবং মরণকাল পর্য্যন্ত পুরাতন পুস্তক পাইলেই ক্রয় করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ Shakspear-এর একশত সংস্করণ তাঁহার সংগ্রহ ছিল। প্রাচীন মুদ্রাদিও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

তিনি কলিকাতার মূক এবং বধির বিদ্যালয়ের যেমন প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, সেইরূপ Society for the higher training of young men (যাহার নাম পরে Calcutta University Institute হয়)-এরও একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এই প্রতিষ্ঠানেরও কার্য্য-পরিচালক সমিতির কয়েক বৎসর তিনি সভাপতি ছিলেন। পরে W. C. Macpherson-এর সভাপতিত্বে ঐ University Institute-এ Earle সাহেব কর্ত্তৃক যখন তাঁহার চিত্র উন্মোচন হয়, তখন অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র সেন প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার অশেষ গুণাবলীর কীর্ত্তন করেন। এই চিত্র প্রদান করেন বাবু হেমচন্দ্র সরকার। এই সংবাদ পাইয়া Bolton বিলাত হইতে ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯১০ সালে যে পত্র লেখেন, তাহার নকলও নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

"I was deeply gratified to receive your letter and the enclosed extract from the Statesman* giving a description of the unveiling of my portrait which you have, in so good and kindly a spirit, presented to the Calcutta University Institute. It is a genuine pleasure to have this proof of your feelings of true friendship for myself The pleasure is far greater than any which arises from the knowledge that a memorial of me exists somewhere in my old province for I was quite content to work among and for the people of Bengal without desire for anything of the kind."

১৯১২ হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত Mr. Bolton ছিলেন Eastbourne এর মেয়র। ইতিমধ্যে অবসর-প্রাপ্ত মৃত Mr. Inglis I. C. S. সাহেবের বিধবা পত্নীকে তিনি বিবাহ করেন। মেয়র Bolton এবং তাঁহার নব পরিণীতা পত্নী ইংলণ্ডের বিগত মহাসমরের সময়ে দেশের মহদুপকার সাধন করেন এবং তজ্জন্য জন-সাধারণের নিকট প্রভূত সুখ্যাতি ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। Bolton-এর দুই পুত্রই যুদ্ধে যাইয়া প্রভূত যশঃ এবং সম্মান লাভ করেন; বড়টি হইলেন Brevest Lieutenant Colonel এবং ছোটটি Military Cross লাভ করিলেন।

এই মহানুভব বোল্টনের কর্ম্মময় জীবনের যবনিকা-পাত হয় ২৭শে ডিসেম্বর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে। ম্যাক্‌ফারসন্ সাহেব, যিনি বোল্টনের পরে কলিকাতায় Board of Revenue র সদস্য হইয়াছিলেন, উক্ত বোল্টনের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"I knew Mr. Bolton well far 20 years and had great regard for him. He was an able and sympathetic administrator, a good linguist and a ready speaker. He had a very high standard of duty and of work and did thoroughly all to which he put hand. It was not my good fortune to meet him again after I retired from India, as I always lived in Scotland but I have sometimes heard of the good work which he did as Mayor of the town of Eastbourne."†

* বঙ্গবিচ্ছেদের পর স্বদেশী আন্দোলনকে উদ্দেশ করিয়া।

* "Mr. Bolton loved Bengal and Bengal loved Mr. Bolton."

† অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম-এ মহোদয়ের ইংরাজী প্রবন্ধের ভাবাবলম্বনে শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় লিখিত।

# সমালোচনা

**শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত এবং স্বামী জগদানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত। উদ্বোধন কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা হইতে স্বামী আত্মবোধানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৸৶০ আনা। ছাপাই, বাঁধাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ;

গীতার আদর বাঙালায় বাড়িতেছে। বিভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক অনেকগুলি সংস্করণই তাহার প্রমাণ। বাজারে প্রচলিত গীতাগুলির মধ্যে এই বইখানি পারিপাট্যে, স্বচ্ছতায়, সরল ও সহজ ব্যাখ্যামাধুর্য্যে অনায়াসে নিজের বিশিষ্ট স্থান করিয়া লইবে। অনুবাদক শঙ্কর-ভাষ্যের অনুগত ব্যাখ্যা ও অনুবাদই ইহাতে প্রধানতঃ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও কোথাও অন্যান্য আচার্য্যের মতও প্রদত্ত ও স্বীকৃত হইয়াছে। বহু পাঠান্তরও যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। পাণ্ডিত্যের চেয়ে সাধারণ শিক্ষিত পাঠক-পাঠিকা, এমন কি সুকুমারমতি ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা ও সহজবোধ্য করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহা সম্পাদিত হওয়ায়, ইহা সর্ব্বসাধারণের সুখপাঠ্য ও বিশেষ উপযোগী হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। গ্রন্থখানি সুপ্রচারিত হইয়া বাঙালীর ধর্ম্ম-পিপাসা পরিতৃপ্ত করুক—ইহাই আমাদের কামনা।

**প্রেম ও বিবাহ সাফল্যে হস্ত-রেখা বিচার**—শ্রীতিলক প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ বাইণ্ডার্স, ৩১।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। দাম ॥০ আনা; ভিঃ-পিঃ-তে ৸০ আনা।

মানুষ অদৃষ্ট দেখিতে চাহে, অজানাকে চায় জানিতে। ইহা নিছক কৌতূহল-বৃত্তি বলা যায় না। জীবনকে ঠিক পথে পরিচালনার জন্যও ইহার প্রয়োজন আছে। যদিও ইহা কঠোর তপঃসাধ্য। অদৃষ্ট-জ্ঞাপক বিদ্যাগুলির মধ্যে জ্যোতির্ব্বিদ্যা অন্যতম। তন্মধ্যে সামুদ্রিক অর্থাৎ করেরেখাবিচার শাস্ত্র মনে হয় আরও কঠিন। গ্রন্থকার এই বইখানি লেখার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'শত-করা ৮০জন লোক চরিত্র, প্রেম ও জীবিকা সম্বন্ধে এতটুকু চিন্তা না করে' ভুল পথে চলেছে। জ্যোতিষ বা সামুদ্রিক শাস্ত্রের বিচারপ্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত যুগ-যুগান্তর ধরে'; নিজের ভবিষ্যৎ দেখে সতর্ক হওয়াই এ শাস্ত্রের সার্থকতা।" সুতরাং এই বিদ্যার্জ্জন প্রয়োজনীয়।

গ্রন্থকার হস্তরেখাবিচারে দাম্পত্যজীবনের উপর আলো ফেলার চেষ্টাই এই গ্রন্থে করিয়াছেন। বইখানি আগাগোড়া ধৈর্য্যসহকারে পড়িলে, এ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা পাঠকের জন্মিবে, নিজের বা পরের হাত দেখিয়া অদৃষ্টগণনার ইচ্ছাটুকুও যে জাগিয়া উঠিবে—ইহাও অনায়াসেই বলিতে পারি। হাত পড়িবার আরও সহায়তা করিবে গ্রন্থশেষে হাতের ছবিগুলি—প্রায় দশখানি এইরূপ ছবি উদাহরণচ্ছলে ইহাতে মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে বিষয়টী স্পষ্টতর হইবে, আশা করা যায়। মোটের উপর, একটী জটিল বিষয়কে যতখানি ভাষার সাহায্যে প্রাঞ্জল করা সম্ভব, তাহার চেষ্টা গ্রন্থকার করিয়াছেন। এইখানি বহু জিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকার নিশ্চয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে ও উদ্দিষ্ট জ্ঞানার্জ্জনে যথেষ্ট সাহায্যও করিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে, আশা করি।

**হিন্দু-রঞ্জিকা**—সম্পাদক শ্রীপ্রমদাকান্ত সান্যাল বি-এ, বিদ্যাবিনোদ। রাজসাহী হইতে প্রকাশিত। বঙ্গের প্রাচীনতম সাপ্তাহিক পত্রিকা।

আমরা পত্রিকাখানি ধারাবাহিক লক্ষ্য করিয়া যাইতেছি—মফঃস্বল হইতে হিন্দুর স্বচ্ছ সমাজ ও জাতীয়ভাবের পরিপোষক এমন একখানি সাপ্তাহিকের এই সুদীর্ঘ জীবন ও সুপরিচালনা সত্যই গৌরবের বিষয়। মাতৃভূমি-মাতৃভাষা স্বধর্ম্ম-স্বজাতি—হয় যেন আমাদের ধ্যান দিবারাতি"—এই নীতি হিন্দু-রঞ্জিকার; জাতির জীবনে আজ এই নীতিরই পরিপূর্ণ অনুশীলনের প্রয়োজন হইয়াছে। "হিন্দু-রঞ্জিকা" আরও দীর্ঘায়ুঃ হউক—বাংলার হিন্দু সমাজকে সংগঠন ও আত্মমুক্তির সুপথ প্রদর্শন করুক—আমরা ইহাই চাহি।

**মন্ত্র ও পূজা-রহস্য**—১ম ও ২য় প্রবাহ। শ্রীমৎ নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অনূদিত। প্রকাশক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন, ৭৯।সি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—মূল্য ॥৶০ আনা।

হিন্দুর অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে মূল করিয়াই তাহার সমাজসাধনা পরিকল্পিত ও সামাজিক সংগঠন বিধৃত রহিয়াছে। মন্ত্র, পূজাদি সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ব্যক্তির অধ্যাত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমাজ-সংগঠনেরও অন্যতম প্রকরণ। লেখক একজন অধ্যাত্মসাধক। তিনি তাঁহার অনুভবের আলোকে বৈদিক মন্ত্র ও পূজাপদ্ধতির যেভাবে ব্যাখ্যার প্রয়াস এই গ্রন্থে করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মপিপাসুজনের হৃদয় আকৃষ্ট করিবে ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতেও আশা করি, সাহায্য করিবে। বাংলায় বৈদিক সাধনা ও ব্রহ্মসূত্রাদির যে শক্তি-তত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া বুঝিবার ও প্রচার করিবার প্রেরণা আসিয়াছে, এই গ্রন্থ-মধ্যেও সেই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের ভাষাও বেশ প্রাঞ্জল, ভাবময়, সুখপাঠ্য।

—শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

**মাটীর পুতুল**—শ্রীযুক্ত নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক নিউ বুক হল, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

বারোটি গল্পের সমষ্টি। সব গল্পগুলিই ইতিপূর্ব্বে মাসিকপত্রে বাহির হইয়াছে।

গ্রন্থকার বিবিধ বিষয়ে পুস্তক রচনা করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ইংরাজী এবং বাংলা উভয় ভাষায় রচনাতেই তিনি দক্ষ।

বর্ত্তমান বইখানি প্রথম গল্পটির নামানুসারে নামাঙ্কিত। সমস্ত গল্পগুলির মধ্যে লক্ষ্য করিবার বস্তু তাদের বৈচিত্র্য। লেখক বিভিন্ন প্রকারের প্লট লইয়া এক্সপেরিমেণ্ট করিয়াছেন—কোন উদ্দেশ্য প্রমাণ করিবার জন্য তাঁর গল্প লেখা নয়—ফলে বইখানির মধ্যে কোন ম'নাটনি নাই। তিব্বত দেশের একটি 'মাটীর পুতুল' খেলানা হিসাবে লইয়া আসায় যে অনর্থ ঘটিল, এমন কি ট্রেণ কলিশন পর্য্যন্ত হইয়া গেল—ইহা বাস্তবিকই উপভোগের সামগ্রী। এই গল্পেও পর্য্যটক নিত্যনারায়ণের পরিচয় পাই। কিন্তু গল্প লেখার আর্ট হিসাবে উত্তরাইয়াছে "মরীচিকা" এবং "কল্প"। "নিয়তি" গল্পের মধ্যে মাউণ্ট এভারেষ্ট অভিযানের মিঃ রবার্টের যে চিত্র লেখক আঁকিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক কিংবা তাহা গল্প এই প্রশ্ন অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি বলিব এইখানেই গল্পের সার্থকতা—যে ইতিহাস এবং গল্পকে আর্টিষ্ট সমান পর্য্যায়ে আনিয়া এমন করিয়া মিশাইয়াছেন যে তাহার কতটুকু গল্প এবং কতটুকু ইতিহাস তাহা চিনিবার যো রাখেন নাই।

—শ্রীঅবনীনাথ রায়

**Bankimchandra - His life and art**—Matilal Das. Published by Gopaldas Majumdar, D. M. Library, 42, Cornwallis Street, Calcutta. Price Rs. 2-8. Page 189.

ইংরাজিভাষায় লিখিত আলোচ্য পুস্তকখানিতে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী ও শিল্পনৈপুণ্য মোটামুটিভাবে আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকখানি চৌদ্দটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। কোনও পরিচ্ছেদেই গবেষণামূলক দৃষ্টি-ভঙ্গীর স্বতঃপ্রকাশ না থাকিলেও, সাধারণভাবে বলা যায় যে, গ্রন্থটি সুলিখিত। 'Bankimchandra as a Novelist' পরিচ্ছেদটি বেশ সুপাঠ্য হইয়াছে। এ ছাড়া, অন্যান্য তিন চারিটি পরিচ্ছেদ মন্দ লাগে নাই।

পুস্তিকাখানির প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই ছাপার ভুল আছে। গ্রন্থকার, প্রকাশক ও মুদ্রাকরের ইহা মারাত্মক ত্রুটি। এতদ্ব্যতীত, বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনা-ঘটনের সময়-নির্দ্দেশে ও বিশ্লেষণে কিছু ভ্রম-প্রমাদ রহিয়াছে। এই কারণে পুস্তিকাখানি মোটামুটিভাবে সুলিখিত হইলেও, পঠন-পাঠনে অতিশয় অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

—অধ্যাপক শ্রীবিনয় সরকার

**গোপেশ্বর-গীতিকা** (২য় ভাগ)—শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতসাগর কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য—১৲ টাকা।

সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রচিত ঊনত্রিশটি গান বিভিন্ন সুরে, তাল ও শ্রেণীতে পর্য্যবসিত হইয়া আলোচ্য পুস্তকটি লেখক কর্ত্তৃক স্বরলিপিকৃত হইয়াছে। গানগুলি অধিকাংশই ধ্রুপদ শ্রেণীর, খেয়াল ও ঠুংরী শ্রেণীর গানও ইহাতে আছে। বাংলা ভাষায় হিন্দুস্থানী ঢংয়ের গান যাঁহারা কণ্ঠায়ত্ত করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে এ বইখানি উপযোগী বলিয়া মনে করি। ছাপা ও কাগজ চলনসই।

—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

**শুভদৃষ্টি**—শ্রীমমতা ঘোষ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

কবিতার বই। ৪৩টি সুনির্ব্বাচিত কবিতার সমষ্টি। প্রথম কবিতাটির নাম শুভদৃষ্টি। কবির কাব্যরস সৃষ্টির সফল পরিচয় ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত "মৌন ও মুখর" (কবিতা) এবং গীতাংশুক (গান) পুস্তকে আমরা ভাল ভাবেই পাইয়াছি। মাসিক পত্রিকার পাঠক-পাঠিকার নিকট শ্রীমমতা মিত্রের (অধুনা ঘোষ) নাম দীর্ঘকাল পরিচিত এবং সুপ্রশংসিত। কবির শুভ দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় 'শুভদৃষ্টি'র প্রতি কবিতায়ই অম্লান। কবিতাগুলির অন্তর্গত ঐন্দ্রিক ও অতীন্দ্রিয় ভাবের ওতঃপ্রোত দ্বন্দ্বাবেগ শেষ পর্য্যন্ত পরমের দিকেই পাঠককে প্রেরণা দেয়। একান্ত নিরতিশয়ে প্রতিষ্ঠা না পাইলেও, উহা নিঃশ্রেয়সের অভিব্যঞ্জনাপূর্ণ। কবির এই বিশুদ্ধ দিব্যৈষণা তাঁকে মহাকালের পথে সুপ্রতিষ্ঠা দিয়া যাইবে। 'শুভদৃষ্টি'র মনোরম সজ্জা, ছাপা, বাঁধাই দৃষ্টিমাত্রকেই প্রসন্ন করিয়া তুলিবে। বাংলা ভাষায় বিশেষ কবিতার বইয়ে এইরূপ পারিপাট্য অতিশয় বিরল। তবুও এই গরীব দেশে বইখানির দুই টাকা মূল্য কিছু বেশী বলিতেই হইবে।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

# দুঃখের সংসার

শ্রীমতিলাল রায়

দুঃখের মাত্রা সহিষ্ণুতার সীমা ছাড়াইল। শান্তিরাম ঘোষ এত অনুরোধ সত্ত্বেও, বাড়ীখানি ক্রোক্ করিতে ছাড়িল না। রাইচরণ দুইটী শিশু পুত্রের সহিত স্ত্রীর হাত ধরিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল। রাইচরণ কাঁদিল। ছেলে দুটী বাপের মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। রাইচরণের স্ত্রীর চক্ষে কিন্তু জল নাই। রাইচরণ বার বার পৈতৃক ভিটাটীর দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহে, আর তাহার চক্ষে অশ্রু-সাগর উথলিয়া উঠে। রাইচরণের স্ত্রী বলিল "যাহা যায় তাহা আমাদের নয়, চল ছেলে দুটীকে নিয়ে একটা গাছতলায় গিয়েও আশ্রয় নিই।" রাইচরণের স্ত্রী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়াই কথা বলিল। তার দৃষ্টি অন্য কোন দিকে ছিল না। পাড়া-প্রতিবাসী ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া, কাহারও চক্ষের উপর দৃষ্টি পড়িলে সে যে লজ্জায় মরিয়া যাইবে। একদিন কত ঘটা করিয়া সে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল। প্রতিবাসিনীদের মধ্যে অনেকেই এমন আছেন, যাহারা তাহাকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়াছিলেন। সে ছিল উৎসবের দিন। আজ বিসর্জ্জনের পালা। ভিটা ছাড়িতে তাহারও প্রাণে শেল বিঁধিতেছিল, কিন্তু তার স্বামীদেবতাটী বড় নরম প্রকৃতির, তাহার সহিত সেও যদি কান্না সুরু করে, ছেলে দুটী ককাইয়া কাঁদিয়া উঠিবে। সহানুভূতি-প্রকাশের কত কথাই সে শুনিল; কিন্তু কার্য্যতঃ কাহারও সহানুভূতি সে পাইলে না। তাহা হইলে আজ তাহাদের এমন দশা হইবে কেন? স্বামীর হাত ধরিয়া, ছেলে দুটীকে বুকে লইয়া রাইচরণের স্ত্রী হাজিবাগানে এক গৃহস্থের ক্ষুদ্র একখানি ঘরে গিয়া হাঁপ ছাড়িল। ছোট ছেলেটী মায়ের আঁচল ধরিয়া বলিল, "মা, বাড়ী যাব।"

বড় ছেলেটী বাবার হাত ধরিয়া বলিল, "বাবা এখানে? বাড়ী যাবে না?" রাইচরণ ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া এমন কাঁদিল, যেন তার দম বন্ধ হইয়া যায়। তার পত্নী ধমক্ দিয়া বলিল, "তুমি পুরুষ মানুষ, এমন নরম হলে চল্‌বে না।" একটা সিঁদুর-মাখান টাকা তার আঁচলের খুঁটে বাঁধা ছিল; স্বামীর হাতে টাকাটা গুঁজিয়া দিয়া সে বলিল, "দুই চারিদিনের জন্য হাটবাজার করে আন; আর ছেলে দুটোর জন্য কিছু খাবার না হলে তাদের ভুলিয়ে রাখতে পারব না।" রাইচরণ কাঁদিতে কাঁদিতেই বাহির হইয়া গেল।

বাংলার গার্হস্থ্যজীবনের এ চিত্র করুণ; কিন্তু ক্রমেই গা-সহা হইয়া যাইতেছে। রাইচরণ ভিটাছাড়া হইল; কেহ দুঃখ প্রকাশ করিল, কেহ বা বলিল, তিনটা পাস করাই বৃথা। খাইয়ে পরিয়ে বাপ মানুষ কর্‌লো—ভিটে রাখার সাধ্য হ'ল না।

রাইচরণের পিতা গভর্ণমেণ্ট অফিসে ১৫০৲ মাহিনার কেরাণী ছিলেন। মেয়ে দু'টীর বিবাহ দিতেই যে ঋণ হইল, তাহার সুদ দিতেই পুরা মাহিনা ঘরে আনিতে পারে নাই। তার উপর বড় ছেলেটী শ্বশুরালয়ে গিয়া বাসা বাঁধিল। ছোট রাইচরণকে তিনি গ্র্যাজুয়েট্ করিলেন। অফিসের বড়কর্ত্তাদের ধরিয়া একটি চাকুরীর ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন; কিন্তু গ্রহ প্রসন্ন নহে বলিয়া রাইচরণ গুরুতর ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায়, সে চাকুরী আর রাখিতে পারিল না। এক বৎসর রোগভোগের পর চাকুরীর পুনঃ চেষ্টা করিতে না করিতেই পিতৃদেব চিরদিনের জন্য সরিয়া পড়িলেন। রাইচরণের চক্ষে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। তারপর পাঁচ বৎসর চাকুরীর উমেদারী করিয়া তাহার পায়ের সুতা ছিঁড়িয়া গেল। চাকুরী আর মিলিল না। বাড়ী বাঁধার টাকা সুদে আসলে এত ভারী হইয়া উঠিল যে, রাইচরণের পক্ষে তাহা বহন করা সম্ভব নহে। দুঃসময় যখন আসে, তখন চোখে কাণে কিছু দেখিতে দেয় না। দুঃখের দিনে মাতৃস্নেহ হইতেও সে বঞ্চিত হইল। রাইচরণকে রাখিয়া মাতৃদেবীও স্বর্গারোহণ করিলেন।

রাইচরণ অগ্রজের নিকট গিয়া দুঃখের কথা জানাইল। কিন্তু সে স্রেফ্ বলিয়া দিল—পিতামাতার সহিত বহুদিন সম্বন্ধচ্ছেদ হইয়াছে, ও ঝঞ্ঝাটে সে মাথা দিতে পারিবে না, বিশেষ শ্বশুরেরও ইহাতে অমত আছে।

দিন আর চলে না। বাঙ্গালীর চাকুরী না থাকিলে, দুরবস্থার সীমা থাকে না। ছেলে পড়াইয়া দুই দশ টাকা ঘর ভাড়া ও চারিটী পেট আর চালান যায় না, ছেলে পড়ান কাজটাও বার মাস থাকে না। এ ক্ষেত্রেও উমেদারের সংখ্যা কম নহে। তার উপর সুপারিশেরও জোর আছে। বি-এ পাস করিয়া রাইচরণকে এমন নিরুপায় হইতে হইবে, সে কল্পনাও করে নাই। তাহার স্ত্রীও ভাবে নাই—শিক্ষিত স্বামীর স্ত্রী হইয়া এমন দৈন্যে তাহাকে নিপীড়িত হইতে হইবে। পিতৃকুলের অবস্থাও এমন নহে যে, সেখানে গিয়া সে দাঁড়ায়। বাঙ্গালীর সংসার আজ এমনই কূলহারা হইয়া ভাসিয়া বেড়ায়, তবুও তার বুকে নৈরাশ্যের আঁধার নাই। স্বামী তার বড় ভালমানুষ; যে প্রকৃতির লোক হইলে এই দুর্দ্দিনে চুরি জুয়াচুরী করিয়াও, স্ত্রীপুত্রের মুখে অন্ন-জল যোগাইবে সে তেমন নহে। প্রতিদিন অন্নাভাব সহা যায় না—সে একদিন স্বামীকে ধরিয়া বসিল। বলিল, "রোজগার করার কি আর কোন পথ নাই! কেরাণীগিরি আর ঐ ছেলে পড়ান?"

রাইচরণ বলিল, "পুঁজি থাকলে, ব্যবসাও করা যায়।"

স্ত্রী বলিল, "যাহার তাহা নাই?"

রাইচরণ বলিল, "সে আমার মত লক্ষ্মীছাড়া হয়। গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলে। সেদিনের বেশী দেরীও নেই।"

রাইচরণের স্ত্রীর কঠিন ললাট কুঞ্চিত হইল। বলিল, "হুঁ"।

সেদিন অনাহার ভিন্ন আর গতি নাই। ছোট ছেলেটী ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। বড় ছেলেটী সকালে খাওয়ার আবদার করিয়াছে, শেষে মায়ের চাপড় খাইয়া সেই যে কোথায় বাহির হইয়াছে কোন খবর নাই। ঠিক এই অবস্থায় মানুষ আত্মহারা হইয়া সপরিবারে আত্মহত্যা করে।

রাইচরণের স্ত্রী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হঠাৎ বলিল, "আচ্ছা, একটা কাজ করবে?"

"কি কাজ?"

"করবে?"

"কি বলনা শুনি? যদি খেতে পাই, কর্‌ব না কেন?"

"মানুষ হয়ে জন্মেছি, খেতে না পেয়ে মরব, এ কথা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আমার কথা শুনবে?"

রাইচরণ স্ত্রীর চোখে একটা আলোর ঝিলিক্ দেখিয়া উৎসাহ পাইল। বলিল, "মোট বইতে বল, তাতেও রাজী আছি। দু' মুঠো ভাতের মূল্য আমার সমস্ত জীবন বিক্রয় করে' যদি পাই, তাও আমার সৌভাগ্য।"

রাইচরণের স্ত্রী উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল, "চল, এখানে নয়, যতক্ষণ শরীর আছে, চাকুরী দুষ্মূল্য, শ্রমের কড়ি নয়। আমরা শ্রমিক হব।"

"তারও ক্ষেত্র কোথা প্রভা?"

রাইচরণের স্ত্রীর নাম প্রভা। প্রভা বলিল, "শ্রমের ক্ষেত্র পথের দু'ধারে ছড়িয়ে আছে; ষ্টেশনে ষ্টেশনে কুলী-মজুরেরা কি দু' মুটো ভাত খায় না?"

"আমি রাজী আছি, কিন্তু তাতে আমাদের চারিজনের পেট কি চল্‌বে?"

প্রভা বলিল, "একটা পয়সারও যে মুখ দেখতে পাই না। দুই চারি আনাও যদি জোটে, একমুঠা অন্নেরও জোগাড় হবে। এমন যায়গায় নিয়ে চল, যেখানে রেল-ষ্টেশনের কাছে মেয়েরা ক্ষেত-খামারে কাজ করে; তুমি রেলের কুলী হবে; আমি চাষীর মেয়েদের সঙ্গে খেটে খাব। তুমি লেখাপড়া শিখেছ, মূর্খ শ্রমিক চিরদিন শ্রমিক হয়ে থাকে, আজ পেটের ভাবনা যদি ঘোচে, তুমি চিরদিন শ্রমিক হয়ে থাকবে না।"

একটা বিপ্লবময় জীবন বটে। রাইচরণ ভরসা পাইল। সে ভাবিল—বাঙ্গালী তো বিপ্লবী। রাষ্ট্রবিপ্লবের চেয়ে এই বিপ্লব অনেক ছোট—কেন সে ইহা পারিবে না?

৩

ডায়মণ্ড হারবারে গাড়ী আসিয়া পৌছিতেই রাইচরণ একটী মধ্যম শ্রেণীর কামরায় উঁকি মারিয়া দেখিল—এক

ভদ্রবেশী সন্ন্যাসী বাক্স হইতে একটা চুপড়ী ধরিয়া টানা-টানি করিতেছে; রাইচরণ তাড়াতাড়ি গিয়া চুপড়ীটী বাক্স হইতে নামাইয়া দিল। বলিল, "কোথায় যাবেন ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "ঘাটে।"

রাইচরণ বলিল, "চলুন, নিয়ে যাচ্ছি।" ঝাঁকাটী মাথায় তুলিয়া লইল। সন্ন্যাসীর হাতে একটা ছোট স্যুটকেশ ছিল, তাহাও সে হাত বাড়াইয়া লইতে চাহিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "না না, থাক্ থাক্।" রাইচরণ শুনিল না।

রাইচরণের মাথায় মোট, হাতে স্যুট্কেস। সে আগে আগে চলিয়াছে, সন্ন্যাসী তাহার অনুসরণ করিতেছেন। রেল-লাইন পার হইয়া, তাহারা একটা পতিত জমির উপর চলিতে লাগিল। বাম পার্শ্বে হাসপাতাল, দক্ষিণ দিকে নাতিদীর্ঘ ঝিল। এক পায়ে দাঁড়াইয়া কয়েকটা বক ধ্যান করিতেছে। সন্ন্যাসী বলিলেন, "বক-ধার্ম্মিক একেই বলে।"

রাইচরণ বলিল, "আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু বক-ধার্ম্মিক বল্‌তে ভণ্ডামী বোঝায় না, আত্মরক্ষার কৌশল ধর্ম্মাঙ্গ বল্‌তে হবে।"

সন্ন্যাসী বিস্মিত হইলেন। রেলের কুলীর মুখে এমন কথা বিস্ময়ের বৈকি। সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি কিছু লেখা-পড়া শিখেছ, নয় ?"

রাইচরণ বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

সে পথ চলিতেছিল।

সন্ন্যাসী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের গ্রামে মাইনর-স্কুল আছে বুঝি ?"

রাইচরণ বলিল, "আজ্ঞে থাক্‌তে পারে, তবে আমি আর একটু বেশী পড়েছি।"

"ছাত্রবৃত্তি পাস করেছ বুঝি ?"

রাইচরণ হাসিল। সে পথ চলিতে চলিতে বলিল, "আপনি কতদূর যাবেন ?"

সন্ন্যাসী বলিল, "নারায়ণীতলা।"

রাইচরণ বলিল, "ফ্রেজার সাহেবের লাট ঐখানেই আছে না? স্যাণ্ডারসন সাহেব কি টাকাই না ঢেলে গেছেন! কিন্তু কিছুই হ'ল না।"

সন্ন্যাসী সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি তো অনেক খবর রাখ দেখছি। একটু লেখাপড়া শিখেও যে কুলীগিরির কাজ করছ, আমি তার জন্য ভারী খুশী হয়েছি। আমি নারায়ণীতলাতেই যাচ্ছি; তোমার মত শ্রমিক দুই চারিজন পেলে আমি আরও খুশী হতুম।"

রাইচরণ বলিল, "আমায় নিয়ে চলুন না—তবে হাল চষতে জানি না, মোট বইতে পারব।"

"ছাত্রবৃত্তি যখন প'ড়েছ, হিসাবপত্রও ত রাখতে পারবে।"

পথ চলিতে চলিতে কথা। দুই জনে তখন ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। রাইচরণ ঝাঁকাটী মাথা হইতে নামাইয়া হাসিয়া বলিল, "কেরাণীগিরি যদি জোটে, রাজী আছি আপনার সঙ্গে যেতে। কিন্তু বাংলা হিসাবটা একটু শিখিয়ে দিতে হবে। ইংরাজীতে হ'লে, ডেবিট্-ক্রেডিট্ মিলিয়ে, একাউণ্ট রাখতে পারতুম। সাহেবের কেরাণী-গিরি না জুটুক, আপনার কাজকর্ম্মে পেটের ভাত জুটলে বরাত ভাল হবে।"

সন্ন্যাসী অবাক্ হইয়া রাইচরণের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়েছ দেখছি যে!"

"আরও একটু বেশী পড়েছি।"

সন্ন্যাসী তাহার পিঠে চাপড় দিয়া বলিলেন, "আই, এ, পাস করেছ নাকি ?"

রাইচরণ করজোড়ে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া বলিল, "আর এক ধাপ উঠলে যা হয়, অর্থাৎ আমি গ্র্যাজুয়েট্।"

ষ্টেশন হইতে ঘাট পর্য্যন্ত কুলীরা ৮৵১০ পয়সা পায়। সন্ন্যাসী রাইচরণের হাতে একটী টাকা তুলিয়া দিলেন।

রাইচরণ বলিল, "আমার কাছে ভাঙ্গানী নাই।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার কত উপায় হয় ?"

রাইচরণ উত্তর দিল, "আট আনা, দশ আনা।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার কে আছে ?"

"স্ত্রী আর দুটী শিশুপুত্র।"

"দিন কেমন করিয়া চলে ?"

"স্ত্রী তাঁত বুনতে শিখেছে। নিজেদের চাহিদা মিটে, দুই চারিখানা কাপড় বিক্রীও করি। না খেয়ে মরার চেয়ে আছি ভাল।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "এই একটী টাকা তোমার প্রতিদিনের উপায়। আজ থেকে আমার কাছেই তোমার চাকুরী বহাল হ'ল। রাজী আছ?"

রাইচরণ হাসিয়া বলিল "কাজ কি করতে হবে, তা'তো বল্লেন না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "যে শিক্ষিত হয়েও কুলীগিরি করে' দিন চালায়, তার ভাগ্যপরিবর্ত্তন বিধাতা স্বয়ং আনেন। আমি উপলক্ষ। কুলীগিরিতে আট আনা, দশ আনা হয়। প্রতিদিন এক টাকা মাহিনায় এর চেয়েও যে বড় চাকরী, এই কথাটাই জেনে রাখ। এই সঙ্গে তোমার স্ত্রীর তাঁত বোনা কামাই যাবে না। ফিরে, ডায়মণ্ডহারবারেই দেখা হবে তো?"

রাইচরণ ঠিকানা লিখিয়া দিল। সন্ন্যাসী নৌকায় গিয়া চড়িলেন। উত্তরে বাতাসে পালে হাওয়া লাগিল। রাজহংসের ন্যায় নৌকা ছুটিল নক্ষত্রবেগে। রাইচরণ ললাটের ঘর্ম্ম নিঃশেষে মুছিয়া মনে মনে ভাবিল, শিক্ষিত শ্রমিক বুঝি নূতন গ্রেডে উঠিল। আট আনা, দশ আনার রোজগার এক টাকা দাঁড়াইল। প্রভা ঠিকই বলিয়াছিল,— মূর্খ শ্রমিক চিরদিনই শ্রমিক থাকে, শিক্ষিত শ্রমিকের ভাগ্য পরিবর্ত্তন অবশ্যই হয়।

ঘরখানির দেওয়ালগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত। কোন কালে বালি ধরান ছিল, এখনও তার চিহ্ন কয়েক জায়গায় দেখা যায়। মেজেটী এবড়ো-থেবড়ো, কিন্তু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দক্ষিণদিকে দু'টী ছোট ছোট জানালা, নীল রঙের পর্দ্দা-ঘেরা। উত্তর দিকের কুলুঙ্গিতে একটী পিতলের ঘট, সবুজ আম্রপল্লব আর জবাফুলে ঢাকা, বুকে তার সিন্দূরচিহ্ন। প্রভা জোড় হাতে ঘটের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। ঘরের কোলে টিনের ছাদ, এক অপ্রশস্ত বারান্দায় বসিয়া ছেলে দু'টী নলিতে সুতা গুটাইতেছিল। বাহিরে একটা গোলমাল শুনিয়া প্রভার চমক্ হইল, সে দ্বারের দিকে চাহিতেই দেখিল—মাথায় ফেটী-বাঁধা তাহার স্বামীকে দুই চারিজন লোক ধরাধরি করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। একটা যে অনর্থ কিছু ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না; সে তাড়াতাড়ি তক্তপোষের উপর বিছানার চাদরটী ঝাড়িয়া, স্বামীকে শোয়াইবার ব্যবস্থা করিল। লোকগুলি বলিল, "ছোটলোকের সঙ্গে থাকতে হ'লে যেমনটী হতে হয়, তা ভদ্রলোকে পারবে কেন?"

প্রভা উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে?"

তাহারা বলিল "রেলের কুলীরা আজ ধর্ম্মঘট করেছে, বাবু তাতে যোগ দেয় নি, একজন কুলী হঠাৎ মাথায় চোট লাগিয়ে দেয়, বাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে, হাসপাতালে গিয়ে জ্ঞান হয়।"

প্রভা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকেরা বিদায় লইল। প্রভার চক্ষে আজ জলধারা উছলিয়া উঠিতেছিল। রাইচরণ বলিল, "জীবন-সংগ্রামে এমন হবেই, আমি ইহাতে অমঙ্গল দেখি না, আর আঘাত আমার গুরুতর নয়। হঠাৎ চোট খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলাম।"

প্রভা বলিল, "আঘাতটা আরও গুরুতর হলে কি হ'ত?"

রাইচরণ বলিল, "হবে কেন?" সে সশ্রদ্ধায় স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল।

প্রভার চক্ষে করুণ দৃষ্টি। একবার ভাবিল, তাহার দায়েই রাইচরণের এত দুঃখ। পর মুহূর্ত্তেই মনে হইল, যে পুরুষ জীবন-যুদ্ধে বিরত, তার মূল্য একটা কাণা-কড়িও নহে। তাহার স্বামী বীর। গর্ব্বে প্রভার হৃদয় ফুলিয়া উঠিল। বলিল, "ধর্ম্মঘট কিসের জন্য?"

রাইচরণ বলিল, "রেলের কুলী মোট বয়ে যা' পায়, তাতে তাদের কুলায় না। মোটের হার বাড়াবার জন্য এই ধর্ম্মঘট। তা না হলে কর্ত্তৃপক্ষ সাড়া দেয় না।"

"তোমায় তারা মারলে কেন?"

"আমি এই হুজুগের পিছনে যাতে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তার পাকা ব্যবস্থার উপর ধর্ম্মঘট সুরু করার কথা বুঝাতে গিয়েছিলাম। তারা ভেবে নিলে, আমি তাদের বিরোধী। ধাঁ করে একজন মাথায় লাঠী মেরে বসল।"

"কি সর্ব্বনাশ। ভাল করতে গিয়েও তো বিপদ্ কম নয়।"

রাইচরণ বলিল, "দেশের অন্ধ শক্তি নিয়ে কাজ হয় না; তাই প্রতিকারের পথ ধরার আগে এদের তৈয়ারী করতে হয়। সে কাজে কেউ এখনও হাত দেয়নি। এ যেন অসামরিক জন-গণ নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করে' মিছামিছি নিজেদের দুর্ব্বল করা।"

প্রভা একটু ভাবিয়া বলিল, "এ কাজ তোমার নয়। তোমার কাজ বেঁচে থাকা; বেঁচে থাকতে গেলে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা আগে। কিন্তু এখন দেখছি, এ কাজে আর তোমার থাকা হবে না।"

রাইচরণ বলিল, "কিন্তু গরীবের সঙ্গে থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করলুম, আজ না হোক, একদিন এইখানেই আমায় কাজ করতে হবে প্রভা। সহায়-সম্পদ্-শক্তিহীন, মুর্খ, মুক জনগণের রক্তমোক্ষণের যে কয় গণ্ডা কড়ি পাওয়া যায়, তাতে জীবনের খোরাক মিলে না, কড়ি আদায় করতে হবে। কিন্তু তার জন্য একটা শিক্ষা আছে, সংযম আছে; দরদী নেতার প্রয়োজন আছে। যদি কোনদিন সুদিন আসে, এইখানেই আমার আত্মদান হবে।"

ছেলে দুটী নলি গুটান ছাড়িয়া, বাপ মায়ের কথা শুনিতেছিল। প্রভা তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমাদের তো ডাকিনি, কাজ ছেড়ে এলে কেন?"

ছেলে দুটী মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া, বারান্দায় আবার নলি গুটাইতে বসিল।

রাইচরণ বলিল "ছেলে দুটীকেও সৈনিকের মত গড়ে' তুলছ দেখছি।"

প্রভা বলিল "আমরা তো সংগ্রাম-ক্ষেত্রেই দাঁড়িয়ে। এই আত্মসংগ্রামে বাঁচতে হলে, যে কয়জন নিয়ে আমাদের পারিবারিক জীবন, তাদের প্রত্যেককেই নিয়মানুবর্ত্তী হয়ে শক্ত-চরিত্র গড়ে' তুলতে হবে। খেতে হবে, খেলতে হবে, কাজ করতে হবে; ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে হবে। দুর্দ্দিন তো এই জন্যই আসে। দুর্দ্দিনের দান যে না বুঝে, তার ঠাঁই পৃথিবীতে নাই।"

রাইচরণ বালিসে ঠেস দিয়া একটু মাথাটা উঁচু করিয়া বসিল। বলিল, "প্রভা, তোমার ঐ কুলুঙ্গীর মঙ্গলঘট ঘরখানির আত্মা। তোমার ঐ তাঁতখানি আমাদের প্রাণশক্তি। তোমার নিয়মশৃঙ্খলারক্ষার দৃঢ়তা আমায় মুগ্ধ করে। প্রেমে, আনন্দে আমি ভরে যাই। মোট বয়ে খাই, কিন্তু এত তৃপ্তি; তোমার মত গৃহিণী যার নাই, তার পক্ষে তো এ সম্ভব নয়। আমার মনে হয় তোমার মত বুদ্ধিমতী নারী যদি আমাদের ঘরে ঘরে গড়ে' উঠে, অনেক বড় সমস্যার সমাধান হবে।"

প্রভা বলিল, "খুব হয়েছে, বিশ্রাম কর। বড় ছেলেটার সর্দ্দি; ব্রাহ্মীশাকের এক ছটাক রস করে দিতে হবে।" প্রভা কার্য্যান্তরে গেল।

রাইচরণ চিৎ হইয়া ঘরের মট্‌কার দিকে চাহিয়া দেখিল। গৃহপ্রবেশকালে যে ঝুলের আস্তানা তা' আজ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। তাঁতের একখানি রাঙ্গাপেড়ে শাড়ী আধখানা বুনিয়া প্রভা গুটাইয়া রাখিয়াছে। দেবদারু কাঠের তাকে বড় বড় শিশিতে কত টাট্‌কা টোট্‌কা ভেষজ-চূর্ণ। মোট বওয়া কড়ি ঔষধ-পথ্যে ব্যয় না হয়, সে দিকে তার কত লক্ষ্য। প্রভা পরিপাটী করিয়া রন্ধন করে, তার সফেণ অন্নপরিবেশন কত যে শ্রদ্ধার, কত যে বলপ্রদ তাহা নিজের, ছেলের ও প্রভার স্বাস্থ্য দেখিয়া রাইচরণ মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। দুঃখের সংসারে খাদ্যাদির বিচারও প্রভা কম করে না। ভাতের ফেণ সে ফেলে না; ঘৃত-দুগ্ধ নাই, কিন্তু যবের ছোলার ছাতু তার শিশি-ভরা। নিজেই গম চূর্ণ করিয়া মোটা আটার রুটী সে বড় কোমল করিয়া পতিপুত্রের কোলে সযত্নে তুলিয়া ধরে। সে যেমন করিয়াই পারে, প্রচুর মৎস্য সঞ্চয় করিয়া দুই বেলা তাহাদের খাওয়ায়। তাহার খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে সত্য কথাই বলে, সকলের সঙ্গে তুল্য ভাবেই সে খায়; এই খাওয়া তাহাকে সবল ও সুস্থভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে বলিয়া। সে যদি শীর্ণকায় হইয়া পড়ে, ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তাহার পতিপুত্রের আরও যে দুর্গতি বাড়িবে। প্রভা মরিতেও চাহে না, স্বামীকে জীবন-সংগ্রামে জয়ী না দেখিয়া মরা যে ভীরুর মত পলায়ন হইবে। রাইচরণ ভাবিতে ভাবিতে আনন্দের আতিশয্যে যেন তলাইয়া যাইতেছিল, এমন গুণবতী নারীর স্বামী কুলী হওয়াও যে তৃপ্তি; প্রভার অভাবে শ্লাঘা হইলেও, তাহার সে সুখ হইত না। রাইচরণ তন্দ্রাভিভূত হইল।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। প্রভা ছেলে দুটীর সঙ্গে প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আজিকার কর্ম্মতালিকা বিশেষ বিশেষ ঘটনার বিবৃতি-আলোচনার ছলে ছেলেদের দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস-রচনার শিক্ষা দিতেছিল। বাহিরের রুদ্ধ কবাটে আঘাত করিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে কে ডাকিল, "রাইচরণ।"

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "কে আপনি?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল "আমি পরমানন্দ, রাইচরণ আমায় চেনে।"

প্রভা দরজা খুলিয়া দিল। এক মুণ্ডিতমস্তক, প্রসন্ন-শ্রী সন্ন্যাসী-মূর্ত্তি। স্বামীর কাছে সন্ন্যাসীর কথা সে শুনিয়াছিল। প্রভা সন্ন্যাসীর পদধূলি লইলে, সন্ন্যাসী বলিলেন, "আয়ুষ্মতী হও"।

কাল রাত্রে গ্রামবাসীরা মশাল হাতে ছুটাছুটী করিয়াছে। মহিম মাঝির গোয়াল থেকে বাঘে একটা গরু লইয়া যাওয়ার খবরটা রাষ্ট্র হওয়া মাত্র, গ্রামে যত চাষী মজুর ছিল, লাঠী-কুড়ুল-বল্লম হাতে মশালের আলোয় বাঘের খোঁজাখুঁজি অনেক করিল, ব্যাঘ্র মহারাজের সাক্ষাৎ কেহ পাইল না, শেষে সকলে নিরাশ হইয়া রাইচরণের প্রাঙ্গণে একত্র হইল। রাইচরণ লাটের মালিকের ম্যানেজার। গ্রামের লোকেরা রাইচরণকে ভয়ও করে, ভালও বাসে। রাইচরণ কাজ আদায় করে কড়া কথায়, আবার বিপদের সময়ে মাথা পাতিয়া দেয়। রাইচরণ আসার পর লক্ষ্মীপুরের লাট সত্যই লক্ষ্মীর লীলা-নিকেতন হইয়াছে।

করিম বক্স বলিল, "রাই-দা, তোমার খোঁয়াড়ে গরু-গুলো তো ছাড়াই থাকে, আগোড়ও নেই। ছিটকে যদি দুই একটা ঘর ছেড়ে বেরোয়, বাঘের পেটে যাবে, ব্যবস্থা করতে হবে কালই।"

করিম বক্স লাটের মোড়ল। যখন জঙ্গল কাটা হয়, সে আসিয়াছিল মেদিনীপুর হইতে সাগর ডিঙ্গাইয়া। তার আমলের লোক এ লাটে আর একটীও নাই। এই এক ঘর মুসলমানকে ঘিরিয়া পঞ্চাশ ঘর হিন্দু ঘর বাঁধিয়াছে। আর রাইচরণ আসার পর করিম বক্সের প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়াছে। কেন না, লাটের এই একটি পুরাতন লোককে রাইচরণ আসিয়াই সম্মান দেখাইল। আর সকল কাজ করিবার সময়ে রাইচরণ করিম বক্সেরই পরামর্শ লইতে লাগিল, করিম বক্স রাইচরণের এক প্রকার অভিভাবক রূপে গণ্য হইল। লাটের ম্যানেজারের কাছে করিম বক্সের এই উচ্চপদে পঞ্চাশ ঘর হিন্দু চাষী-মজুর উপেক্ষা করে কেমন করিয়া? সকলেই এক প্রকার করিম বক্সেরই তাঁবেদার হইয়া রহিল। রাইচরণের সুবিধা এই লাটের সকল অভিজ্ঞতাই সে করিম বক্সের নিকট হইতে পাইয়া থাকে, অন্যান্য চাষী-মজুরদের রীতি ও প্রকৃতি বুঝিয়া সে কাজের ব্যবস্থা করে। করিম বক্সের নামেই মুসলমান, হিন্দু শ্রমিকদের সহিত তাহার অন্য কোন ভেদ ছিল না।

রাইচরণ বলিল, "করিম চাচা, লাটে বাঘ আসা বন্ধ করতে হবে।"

করিম বলিল, "অনেকদিন বাঘের উপদ্রব ছিল না। লাটের গরু-ছাগল লুটে খাবে বাঘে, করিম বক্স তা' সইবে না। কুমীরের উপদ্রব এই করিমের ফিকিরেই বন্ধ হয়েছে।"

প্রভা হাসিয়া বলিল, "করিম কাকা, সে কেমন করে করলে?"

করিম হৃদয় মাঝিকে এক ছিলিম তামাক সাজিতে বলিয়া ছোট টুলখানির উপর জাঁকিয়া বসিল, তারপর বলিল, "সে কি আজকের কথা মা, পঞ্চাশ বছরের কথা। বাঘের তাড়া, হাতে যদি কুড়ুল থাকে, করিম ভয় খায় না। আর আগোড় দিয়ে ঘরে শুলে, বাঘ ঘর ঘুরে চলে যায়। বাঘের ভয় লাটের লোক করে না। একবার ভারী কুমীরের উপদ্রব হয়েছিল, এমন দিন নেই, সকালে উঠে' কান্না শোনা বন্ধ যেত। আগে আগে গরু ছাগল যেত তারপর রোজ একটা করে মানুষ।"

রাইচরণের ছেলে দুটী বিস্ফারিত নেত্রে মাকে জড়াইয়া ধরিল। সমবেত চাষীরা মুখব্যাদন করিয়া করিমের দিকে চাহিয়া রহিল। রাইচরণ সবিস্ময়ে বলিল, "তারপর?"

"দাওয়ায় মানুষ শুয়ে থাকত, সকালেই নিখোঁজ। গরু-ছাগলেরও এই অবস্থা। বাঘের হাঁক-ডাক নেই, মাটীতে পায়ের ছাপ পড়ে না, ব্যাপার কি প্রথমে বোঝা

যায় নি। মজবুৎ আগড় বেঁধে সবাই ঘরের মধ্যেই রাত কাটাতে লাগলুম। একদিন ভোর রাত্রে হারুই পাওার বাড়ীতে গোল উঠ্‌ল—সবাই ছুটলাম হাতিয়ার নিয়ে। হারুয়ের বউ কেঁদে আকুল, তার ঘাড়ে রক্ত পড়ছে ঝর-ঝর করে'। সে যা' বল্‌লে, মনে হলে এখন গা শিউরে উঠে।"

শ্রোতারা করিমের গা ঘেঁষিয়া বসিল, সকলেরই মুখে-চোখে ভয় ও বিস্ময়। রাইচরণ বলিল, "তারপর ?"

"পাণ্ডা গিন্নী বল্‌ল, আগড়ের দড়ি ফস-ফস করে খুলে' ঘরে প্রবেশ করল এক প্রকাণ্ড জানোয়ার। চোখ দুটো জলছে আগুনের মত ধ্বক্ ধ্বক্ করে'। এক ঝাপটায় হারুই পাণ্ডার কি যে হয়ে গেল, সাড়া পেলুম না। তারপর আমার দিকে চেয়ে ঘাড় ধরল খপ্ করে'। আমি ছিট্‌কে পড়লুম ঘরের দাওয়ায়; তারপর উঠানময় ছুটাছুটি আর প্রাণপণে চীৎকার করি। দেখি প্রকাণ্ড কুমীর। লোকের সাড়া পেয়ে, হারুইকে বেমালুম নিয়ে গেল!"

প্রভা বলিল, "ওরে বাবা! তারপর ?" করিম তখন হুঁকার উপর কলিকা বসাইয়া, জোরে টান দিতে দিতে মুখখানা ধোঁয়ায় ভরাইয়া ফেলিল। ধোঁয়া বাহির করিতে করিতে সে বলিল, "তারপর করিমের পাল্লায় কুমীর-ঠাক্‌রুণ শাস্তি পেল—একেবারে পঞ্চাশ-ষাট জনের লাঠী ও কুড়ুলের চোটে প্রায় দু' ঘণ্টা যুদ্ধ, তারপর সাবাড়!"

রাইচরণ বলিল, "কি রকম ?"

করিম বক্স বলিল, "সকলের ঘরের দুয়ারে সারাদিন ধরে' খাদ কেটে রাখা গেল; পড় তো পড় নিমাই ঠাকুরের দোরে; তারপর লম্প নিয়ে গিয়ে দেখি—প্রকাণ্ড দশ হাত কুমীর তিড়িং-মিড়িং লাফাচ্ছে। লাঠীর উপর লাঠী। খোঁচা খেয়ে কত ক্ষণ লড়বে ? তারপর লেজে দড়ি বেঁধে সারা লাট ঘুরাই। শুনছ বাবু, আজ লাটে কালেভদ্রে এক আধটা গরু-খেকো বাঘ ছিট্‌কে এসে পড়ে। লাট বানিয়েছে এই করিম বক্স, আর হাঁ, ছিল বটে নফর বাগ্দী। বাবুদের এক-নলা বন্দুকে কত বাঘ যে জখম হয়েছে, তার আর ঠিকানা নাই।"

রাত্রি অনেক হইল। করিম উঠিয়া বলিল, "ছেলাম বাবু। বাঘটার সন্ধান করতে হবে। কোন ভয় নেই আপনাদের। করিম বক্স বেঁচে থাকতে এ লাটে যমও ঢুকবে না।"

বীরের মত করিম আগে আগে চলিল, তাহাকে ঘিরিয়া লাটের সেনাবাহিনী প্রস্থান করিল।

রাইচরণ বলিল, "প্রভা, ভাগ্যচক্র কোথায় এনেছে দেখ। সামনে সমুদ্র হাঁক্‌ছে মেঘমন্দ্রে। আর ঐ খালের পাশে বক্‌খালির জঙ্গলে হরিণের দল লাফিয়ে বেড়ায়; মাঝে মাঝে শুনি বাঘের হুঙ্কার। করিম বক্স হয়েছে আমাদের রক্ষক।" প্রভা হাসিয়া বলিল, "গৃহহারা ভিখারীর চেয়ে রেলের কুলীগিরি সুখের ছিল। তার চেয়ে বড় সুখ এই সরল কৃষকদের তুমি আজ কর্ত্তা। ত্রিশ টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকায় দাঁড়িয়েছে তোমার শ্রমের কড়ি। খরচ নেই এক পয়সা, মাঠের ধান, বাগানের শাকসব্জি, পুকুরের মাছ আর তাঁতের কাপড়; আর কিছু দিন চল্‌লে, টাকার আণ্ডিল তোমার হাতে তুলে দেব।"

রাইচরণ বলিল, "ভারী কৃপণ তুমি! আচ্ছা, ঐ চটের মত মোটা কাপড় আর ঐ খইল-তেঁতুল দিয়ে গা রগড়ান তুমি কি এখন ছাড়বে না ? এখন হাটে সব জিনিষই আসে জান ?"

প্রভা ছোট ছেলেটার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "পুরুষ জাতটা যে দশ হাত কাপড়ে ন্যাংটো, তার কারণ এক দফায় সে বে-হিসাবী আর দ্বিতীয় দফায় অকৃতজ্ঞ।"

রাইচরণ বলিল, "হিসাব-জ্ঞান আমার চেয়ে যে তোমার বেশী, এ কথা একশো বার স্বীকার করি। কিন্তু অকৃতজ্ঞ হলুম কিসে ?"

প্রভা ছেলে দুটীর হাত ধরিয়া শয়নগৃহের দিকে যাইতে যাইতে বলিল, "মনে রেখো এ পৃথিবীতে আজ যে সুখের স্বপ্ন দেখ্‌ছি আমরা, তার পিছনে আছে সন্ন্যাসীর গৈরিক—সর্ব্বত্যাগীর করুণা-প্রসাদ।"

প্রভা চলিয়া গেল। রাইচরণের কর্ণে সমুদ্রের রুদ্র গর্জ্জন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সম্মুখে সুবিস্তৃত শূন্য মাঠে জ্যোৎস্নার ঢেউ বহিতেছে। আর সুদূর প্রান্তে সুশ্যাম বনানীকুঞ্জ কুহেলীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। সে ভাবিল—কোথায় গেলেন সেই সন্ন্যাসী। লাটের মালিক সনাতন পাঁজার সহিত তাহার তো আজিও প্রত্যক্ষ পরিচয় হইল

না। কিন্তু তাঁর পত্রেই চাকুরী বাহাল হইয়াছে, মাহিনা বাড়িয়াছে। শ্রম দিতে সে কৃপণতা করে নাই। লাটের শ্রী ফিরিয়াছে। রাইচরণের দুরবস্থা ঘুচিয়াছে। কিন্তু কোথায় সে সন্ন্যাসী?

৬

টালিগঞ্জের একখানি সুদৃশ্য পাকা বাড়ীর এক বিস্তৃত কক্ষে প্রভা, ঠক্ ঠক্ করিয়া তাঁত বুনিতেছিল। রাইচরণ হাসিতে হাসিতে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "সত্যি বল্‌ছি প্রভা, আর তাঁতে গতর নষ্ট করো না। এখন কি দরিদ্র-মূর্ত্তি ছাড়বার সময় হয়নি? গৃহলক্ষ্মীর সুবেশ দেখবো কবে?"

প্রভার হাতে তাঁত চলিল আরও জোরে, ঠক্-ঠক্-ঠকাস্।

রাইচরণ প্রভার পিঠে হাত রাখিয়া বলিল, "কুলী থেকে কৃষক, তারপর ভাগ্যগুণে ধান্যব্যবসায়ী। সরিষা-বাড়ীর পাটের গুদামে কড়ি আমার উপছে পড়ে। প্রভা তুমি তাঁত ছাড়।"

প্রভা বলিল, "তাঁত আমার হরিনামের মালা। কি ছিল তোমার পুঁজিপাটা? শ্রমের কড়ি আমাদের রক্ত ও প্রাণের খোরাক জুগিয়েছে। ধন লক্ষ্য নয়, শ্রম আমাদের আদর্শ। আমায় তাঁত ছাড়তে বলো না।"

রাইচরণ প্রভার দিকে চাহিল। প্রভার তাঁত চলিতেছে অবাধে। সেই বাড়ী ছাড়ার সময়ে তাহার ললাটে সে সঙ্কল্পের ত্রিবলী-চিহ্ন, আজ তাহা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রাইচরণ আজ ব্যবসায়ী। লক্ষ্মীপুরের কৃষিক্ষেত্রের পর্য্যবেক্ষণ-কর্ম্মে তাহাকে সনাতন পাঁজা নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহার স্থানে নূতন লোক নিযুক্ত হইল। সনাতন পাঁজাই তাহার চাকুরীতে খুশী হইয়া, কিছু পুঁজি দিয়া ধান্যব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে বলিল। ধানের পর পাট। চেৎলা আর হাটখোলা। উপায় তো কম হয় না! টালিগঞ্জের এই বাড়ী তার শ্রমের কড়ি দিয়েই গড়া। অভাবেই হোক, ভাবেই হোক, শ্রমবিমুখ জীবনের ধর্ম্ম নয়। শ্রমেই শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়। শ্রমেই মানুষ শ্রেয়ঃ পায়; সে নিজেই যে তার প্রমাণ। প্রভা তাই শ্রমের পূজা ছাড়িবে না।

রাইচরণকে নীরব দেখিয়া, প্রভা তাঁত বন্ধ করিল। হাসিয়া বলিল, "বাড়ী করেছ, ভালই হয়েছে, মাথা গুঁজে আমরাও থাকব, দশজন আশ্রয় পাবে। আমাদের দরকার কতটুকু, পেট ভরে' দু' বেলা ডাল-ভাত; আর পরণের কাপড়। ছেলে দুটো দরিদ্রের ন্যায় মানুষ হচ্ছে; শ্রম ছেড়ো না, চাল বাড়্‌বে, লক্ষ্মী ছাড়্‌বে। সুখ ও আনন্দ ধনে নাই; আছে শ্রমে।"

রাইচরণ প্রভার মাথাটা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল; প্রভা বলিল, "ছাড, ছাড কর কি, ছেলেদুটোও যে তোমার মত বেহায়া হবে! আর বামুন-চাকর, তারা দেখলেই বা বলবে কি?"

পদশব্দে রাইচরণ ত্রস্ত হইয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

লক্ষ্মীপুর হইতে করিমবক্সের ভাগিনেয় ভুলু শেখ তাহার সঙ্গেই আসিয়াছে, সে রাইচরণের বড় প্রিয় ভৃত্য। সে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "একজন ফকির খবর দিল দেখা করবে।"

প্রভা উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "ফকির?" স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "বোধ হয় সেই সন্ন্যাসী। দেখ, দেখ, শীঘ্র দেখ। রাইচরণের মনে পড়িল সেই ডায়মণ্ড হারবারের ষ্টেশন—সেই মাথায় মোট লইয়া সন্ন্যাসীর অনুগমন—সেই লক্ষ্মীপুর লাটের ত্রিশ টাকা মাহিনার চাকুরী। সে বাহিরে গিয়া সত্যই দেখিল, সেই সন্ন্যাসী।

৭

যুঁই ফুলের গোড়ে মালাটী গলা হইতে খুলিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী ফুলের সৌরভ আমায় আঘ্রাণ করতে নেই। এ মালা আমার আশীর্ব্বাদরূপে তোমরাই পুনঃ গ্রহণ কর।"

প্রভা ও রাইচরণ গদগদকণ্ঠ হইয়া বলিল, "আপনি আমাদের প্রভু, আপনি আমাদের ভগবান। আপনি শুধু সন্ন্যাসী নন।"

সন্ন্যাসী বলিল "এই পতিত জাতির দৃষ্টান্ত তোমরা। শ্রমকাতর হওনি; নিয়ত কর্ম্মে আত্মার জাগরণ। আত্মার জাগরণে ভক্তির উদয়। তোমাদের দীক্ষা দিতে এসেছি।"

দীক্ষার নামে প্রভার চিত্ত উদ্বুদ্ধ হইল। রাইচরণ বলিল "লেখাপড়া শিখে চাকুরী ছাড়া পথের সন্ধান আপনি দিয়েছেন। কুলী থেকে শিক্ষিতের পক্ষেই বড় হওয়া সম্ভব। ছেলেও আমার মানুষ হয়ে উঠেছে। দীক্ষা দিন। কিন্তু ভগবান আমার চাই না, তা' আমি পেয়েছি। দীক্ষার ফল-শ্রুতি কি বলুন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "শাসন-শক্তি হাতে নিতে হবে। তোমার মত কয়জনকে মানুষ করা যায়, শাসন-শক্তি হাতে থাকলে প্রত্যেক গ্র্যাজুয়েট্‌কে আইনের জোরে চার বছর শ্রমের পূজা দিতে বাধ্য করা যাবে। শ্রমসাধ্য কর্ম্মের বিস্তৃত ক্ষেত্র আমাদের সম্মুখে। যদি শতকরা ৯৯ জন শিক্ষিত হয়, শ্রমের জন্য কি বনের পশু ধরে' আন্‌তে হবে? শ্রমটাই হবে প্রত্যেক জীবনের একটা অনিবার্য্য পর্য্যায়।

রাইচরণ হাসিয়া বলিল, "একটু আগে বল্লেন না কেন? বুড়া বয়সে এত বড় কাজটা পারব কি? আর সইবেই বা কেন?"

সন্ন্যাসী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ইহার জন্য ঢাল খাঁড়া নিয়ে তোমায় যুদ্ধ করতে হবে না।"

রাইচরণ বলিল, "তবে কি?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "চরিত্র গড়—পুরুষ এবং নারীর চরিত্র। শ্রমে ঐশ্বর্য্য। চরিত্রে স্বাধীনতা লাভ হয়।"

রাইচরণ জিজ্ঞাসা করিল "চরিত্র-গড়ার উপায় কি?"

"সত্য, সংযম ও সম্বন্ধের সাধনা।"

"কি রকম, খুলে' বলুন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "প্রত্যেক নরনারী সত্যরক্ষার সুনির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র গড়ে' নেবে। সে পিতা, স্বামী, বন্ধু, গুরু, যেমনই হোক, সত্যকে রক্ষা করা চাই জীবনের কোন এক ক্ষেত্রে। যার যে ভাব, অন্তরে-বাহিরে তাহা রক্ষা করার নাম সংযম। বিবাহিত যারা, তাদের এক পতি ও পত্নীতে অনন্যচিত্তে সংযমও ব্রহ্মচর্য্য। অবিবাহিতা নারী-পুরুষের নিঃসঙ্গ জীবনই সত্য সংযম। অন্তর-বাহির দুইই সমান রাখাই আমি সংযমের পরিচয় বলি। আর ঈশ্বর ভিন্ন সম্বন্ধ নাই। এই সম্বন্ধরক্ষার জন্য চাই ঘরে ঘরে উপাসনা। এইভাবের মানুষ যদি গড়ে উঠে এক হাজার—স্বাধীনতার তাজ স্বয়ং বিধাতা এদের মাথায় পরিয়ে দেবেন যথাকালে।"

রাইচরণ একটু বিস্ময়ের সহিত বলিল, "এতো সহজ

প্রভা গ্রীবা উত্তোলন করিয়া বলিল, "সহজ মনে করো না, এ কাজ রক্ত-বিপ্লবের চেয়েও শক্ত। কঠোর তপস্যা ও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। কিন্তু এই-ই পথ। ধর্ম্মের পথ, সত্যের পথ। আমি ধর্ম্মপত্নী, পতির সঙ্গে আমাকেও দীক্ষা দিন।"

এই নব-যুগের নারী-পুরুষ সন্ন্যাসীর চরণে ভূনত হইলে, যুগের সন্ন্যাসী তাহাদের নব-যুগের দীক্ষায় অভিষিক্ত করিলেন।

এমন পুত্র, এমন কন্যাই জাতির আশা-প্রদীপ।

# গান

শ্রীনমিতা মজুমদার

এম্‌নি করে আকাশ ভরে দিলে কীসের ডাক্!
গ্রহ গ্রহতারা
এম্‌নি আপনহারা
চল্‌ছে বেগে, খুশী লেগে ব্যাকুল, নির্ব্বাক্।

সেই যে বেগে চলার খবর আসে
বাতায়নের খোলা দ্বারে দক্ষিণ বাতাসে,
পেলেম খবর, যা আছে মোর তোমার ছোঁয়া পাক্।

ধূলির ধূলি আছি ধুলার 'পরে
ক্ষোভ কিছু নাই মোর মাঝারে সবার অগোচরে,
কত যে ধন, কী আয়োজন করেছো অবাক্।

# এন্‌তোয়ার্পে একরাত্রি

### ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

হল্যাণ্ডের সীমান্তবর্ত্তী সহর বৃডা। বৃডা হ'তে এন্‌তোয়ার্পে ( বেলজিয়াম ) যাবার ইচ্ছা ছিল একই দিনে, পথ বেশী ছিল না ব'লেই এতে সাহস করেছিলুম। হল্যাণ্ডের সীমান্তে কোনও কাষ্টম অফিসার ছিলো না, অথচ একটু দূর এসেই কাষ্টম অফিসারের দর্শন পাওয়া গেল। লোকটি আমার কালো চামড়া দেখেও সম্মান দেখিয়েছিল। শ্বেতাঙ্গের সেলাম আমি তুরুকদের কাছ হতেই পেতে আরম্ভ করেছিলাম। বেলজিকরা ত করবেই, এতে বেশী কি আছে? সীমান্তের দশ হাত দূরেই একটি বড় "কাফে", তাতে টুপি মাথায় রেখেই একটা চেয়ার দখল করলাম এবং এক পেয়ালা কাফির আদেশ দিলাম। আমার মন সেদিন বেশ প্রফুল্ল ছিল, কারণ কেউ আমাকে এর পূর্ব্বদিনও "Int coloniya Englay" বলে নাই। এ কথাটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। আশেপাশের লোকের সঙ্গে ভাব করে নিয়ে কথায় মন দিয়েছিলাম। হঠাৎ পেছন হতে একটা পুলিশ আমার টুপিটা মাথা হতে উঠিয়ে নিল। মুখ ফিরিয়ে দেখি লোকটা পুলিশ বটে, কিন্তু পুলিশের নির্ম্মমতা তার চোখে মুখে নেই। ভয় মোটেই হল না, রাগ হল। এই অন্যায় আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। পুলিশ তৎক্ষণাৎ বল্লে, "মহাশয়, যেরূপ করে মাথায় টুপি দিয়ে বসে আছেন, এই ত আমার কোটটার বাতাস লাগলেই পড়ে যেত, তাই নয় কি, যা হউক আপনাকে কষ্ট দিয়েছি, সেজন্য ক্ষমা চাই।" তার মুখের কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই, অন্য একজন লোক তার প্রতিবাদ করল, "না মহাশয়, পুলিশ সত্য কথা বলে নাই, আপনাকে নিগ্রো ভেবেছিল, তাই টুপি খুলে দেখ্‌ল আপনি নিগ্রো না ইংলিশ।" অবাক্ হলাম, আজ থেকে "ইংলিশম্যান" আমি। তারপরই লোকটি বল্লে, "কঙ্গোদের মাথায় হাত বুলিয়ে খাওয়া হচ্ছে অথচ তাদেরে অসভ্য বলে' ঘৃণা করা হচ্ছে। এ সকল উৎপাতের চিৎপাত একদিন হবে বাবাজী, একদিন হবেই, আজকাল না হয় ভাব্‌ছ, ভগবান নাই, আছে, দেখে নিও আমার কথা সত্য না মিথ্যা।"

বেশ একটু ঝগড়ার মাঝ দিয়েই আমায় বেলজিয়ামে প্রবেশ হ'ল। নিগ্রোদের প্রতি অত্যাচার কেন হয়, তা' বুঝ্‌তে পারি নাই। একদিন স্তাম্বুলে কতকগুল নিগ্রোদেরে আমাদের দেশী লোক ভেবে স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়ে কথা বল্‌তে গিয়েছিলাম। তারা আমাকে দেখে হেসেছিল। সেই হাসিতে ছিল এক দুঃখের প্রতিক্রিয়া। তখন তা' বুঝতে পারি নাই, পরে তা' বুঝতে পেরেছি আফ্রিকা ভ্রমণ করে'। দক্ষিণ আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ায় যাইনি; তাই আবার এ সকল দেশে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। দেখা যাক হয়ে উঠে কিনা।

বৃডা-এন্‌তোয়ার্প পথটি যেমন সুন্দর, তেমনি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। পথে দু'পাশে পপি ফুল ফুটে রয়েছে। যেন রক্তময়। তার উপর মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, রক্তের তরঙ্গ বইছে। তাতে আবার মাঝে মাঝে পপিফুল না থাকাতে যেন রক্তগঙ্গা হাস্‌ছে। হাস্‌বার কথাই। এত ছোট একটা দেশ, কত বড় বেলজিয়ান কঙ্গো দখল করে' আছে। আমাদের দেশের গ্র্যাজুয়েটরা ভাব-তরঙ্গে গা ঢেলে দিয়ে সুর-সোহাগের তন্দ্রায় ডুব্‌ছে, আর তারা পৃথিবীর কোথায় কি আছে তারই সংবাদ নিচ্ছে। তাদের রক্তগঙ্গা হাস্‌বে না ত কি?

এন্‌তোয়ার্প সহরে প্রবেশের মুখেই একটা বড় সেতু। তার নীচ দিয়ে একটা শুষ্ক নদী। বোবার মত সারা সহরটা প্রদক্ষিণ করে' বৃটিশপ্রতিষ্ঠিত সেলভেশন আর্ম্মির বাড়ীতে এসে উঠ্‌লাম। ঐ মুক্তি-সেনাদের কাপ্তেন জাতে যদিও বেলজিয়ান, ইংরাজী বল্‌তে পারেন অনর্গল, একদম ইংরেজের মত 'হেপেনী', 'টাপেন্স', 'এমর্টিন' তার কথার মাঝে লেগেই আছে। আমাদের দেশের বিলাতফেরতারা তাই শিখে আসেন বেশী। ইংরেজের সভ্যতা শিখে আসা, এমন কি দেখে আসাও সকলের ভাগ্যে হয় না।

কাপ্তেন আমার সঙ্গে শুধু ভাব করলেন না, আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করলেন। কাপ্তেন আমাদের গুর্খাদের বেশ প্রশংসা করলেন। তাদের নামে গুর্খা রোডও এন্‌তোয়ার্পে আছে। তারই এবং একটি সিলেটী "রাইস কারি"-বিক্রেতার অনুগ্রহে বেলজিয়মের অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ জেনে নিলাম।

বেলজিয়মের অতীত কাহিনী আমার শুনতে মোটেই ভাল লাগ্‌ত না। গত যুদ্ধের পর হতে যা' হয়েছে, তাই শুন্‌তে বেশ ভাল লাগত, তারপর ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যতের কথা আমার কাছে বেশ সুন্দর লাগত, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রতি আমারই অজানাতে একটা মমতা আসত, আমার মুখ দেখেই তারা তা' বুঝতে পারত। ভবিষ্যতের ভয়ের কারণ কি, সেই কথাটি কেউ বল্‌তে চাইত না। শুধু বল্‌ত, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ভবিষ্যতের অন্ধকারে কি করে' আলো নিক্ষেপ করতে হবে, তার উপায় যেন কা'রো মাথায় খেলত না। যাঁরা পোল্যাণ্ড, চেকশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া দেখে আসছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, সেই দেশগুলির তখনকার আর্থিক অবস্থা কিরূপ খারাপ ছিল। বেলজিয়ামও সেই অবস্থায়। বাজেট হচ্ছে। টাকা খরচ হচ্ছে। সরকারী কাজও চল্‌ছে। সরকারী কাজ সর্ব্বসাধারণের যেন নয়, এইভাবই সকলে পোষণ করছে। কারও কাছে কথা বল্‌তে হবে, engagement কর, তারপর দেখাসাক্ষাৎ, অথচ দরজার কাছে জার্ম্মেণী, তাদের সেই বালাই নাই। হিট্‌লার হ'তে আরম্ভ করে যে কোনও 'হারের' সঙ্গে দেখা করতে হলে, engagement-এর কোনও দরকার নাই, দরজা খোলা, তোমার মুখ এবং তোমার কথা। এত আদব কায়দার দরকার কি?

এন্‌তোয়ার্পে যে সকল বাড়ীঘর গত যুদ্ধে ধ্বংস হয়েছিল, তার নমুনা বড় দেখতে পেলাম না, শুধু একটা চক তখনও মেরামত হয়ে উঠে নাই। ইট সুরকী আছে, বেকার মজুর আছে, অথচ কাজ হচ্ছে না। তার কারণ টাকা নাই। এদিকে জার্ম্মেণীতে এমন কোনও সহর এবং গ্রাম দেখলাম না, যথায় চক্ষুশূল বলে কিছু দেখতে পাওয়া যায়। জার্ম্মেণী ভার্‌সাই সন্ধি অনুযায়ী মিত্রপক্ষকে টাকা পরিশোধ করছিল কিনা জানি না, তবে বেকার মজুর বড় একটা দেখি নাই। ছাত্র হতে কৃষক, ধনী হতে মজুর সকলেই কিছু না কিছু কাজ করছে, অন্ততঃ প্রাতঃকালটায়। অথচ এই পার্শ্ববর্ত্তী বেলজিয়ামে যদি কেউ প্রাতে বের হয়, তবে দেখ্‌বে, মাতাল পা ঠিক না রাখতে পারে হয়ত পথেই বসে পড়েছে। পরশ্রমজীবীরা নাক ডাকাচ্ছে, রেস্তোঁরাগুলির সাম্‌নে নানারূপ কুদৃশ্য দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে, যেন কোনও শৃঙ্খলা নাই। লোকগুলি যেন মৃতবৎ।

এন্‌তোয়ার্পে কয়জনা গুজরাতী হীরা-ব্যবসায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তারা আমাকে হাজার ফ্রাঙ্কের তোড়া দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "এত কষ্ট করে' বিদেশে আস্‌ছেন, সাইকেল নিয়ে পথের মাইল গুণ্‌বেন না, শরীরের শক্তি দেখবেন না। বেশ করে' সব দেখে যাবেন। তারপর যদি সুবিধা হয়, দেশের লোকের কাছে গিয়ে বল্‌বেন।"

কি দেখ্‌ব, তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না। টাকা পকেটে আছে, শরীরের রক্ত টগবগ করছে টাকার গরমে, অথচ খুঁজে পাচ্ছি না কি দেখ্‌ব, টাকা কি করে' খরচ করব। হাজার ফ্রাঙ্ক কম নয় এই দরিদ্রের হাতে। অনেক ক্ষণ ঘুরে ঘুরে যখন নয়নপথে কিছুই আস্‌ল না, তখন গুজরাতী ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে বল্লাম "মহাশয়গণ, কিছুই ত দেখতে পাচ্ছি না, যদি আপনারা এদিকেও একটু সাহায্য করেন, তবে ভাল হয়। ভারতের বাইরে ভারত-বাসীর মাঝে যদি কেউ আমাকে ধনে জ্ঞানে সাহায্য করে' থাকে, তবে ঐ গুজরাতীরা। গুজরাতীরা বাঙ্গালীর ভক্ত। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র আমাদেরে তাদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্রও তাতে বেশ সাহায্য করেছেন বল্লে দোষ হয় না। তাঁর গাওয়া বিখ্যাত গান "আকাশে পাখী, গাহিছে ডাকি, মরণ নাহি, মরণ নাহি" যখন গুজরাতী, আরবী, সুরে গায়, তখন মরণ যেন সাক্ষাৎ এসে তাণ্ডব নৃত্য করতে আরম্ভ করে। এতজনের প্রশংসাপত্র আমার শরীরে আছে বলে'ই এই গুজরাতীরা আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করছে।

আমার 'কি দেখব, কি জান্‌ব', কথাটা শুনেই গুজরাতীরা হেসে উঠ্‌লেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, জার্ম্মেনীতে কি দেখে এসেছি। ও-দেশের অভিজ্ঞতা

খুলে' বল্লাম। এখানে কি দেখ্‌ছি, তাও বল্লাম। তাঁরা শুনে সুখী হলেন, তারপর তাঁদেরই ভৃত্যকে আদেশ দিলেন, সে যেন আমার চোখের ঠুলি খুলে দেয়। চাকর একটি পাকা মজুর। সে বেশ ইংরেজি বল্‌তে পারে এবং আমাকে বোধ হয় ইংরেজী শিখাতেও পারে, তবে জাতে ইহুদী। বিকালে অর্থাৎ রাত্রে এগারটার সময়ে সেলভেশন আর্ম্মির বাড়ীতে এসে আমাকে নিয়ে যাবে বল্ল। আমি তারই কথামতে, কাপ্তেনকে জানালাম যে, রাত্রে এগারটার সময় আমাকে বাইরে যেতে হবে, অতএব সেজন্য নূতন ব্যবস্থা করতে হবে। কাপ্তেন আমার প্রতি দয়া দেখিয়েছিলেন। সেলভেশন আর্ম্মির বাড়ীর দরজা রাত্রি সাড়ে দশটার সময়ে বন্ধ হয়ে যায়। যার ইচ্ছা এর পূর্ব্বে এসে আপন আপন বিছানা দখল করবে, নতুবা বাইরে থাক। এন্‌তোয়ার্পে রাত্রের ঠাণ্ডা আমার কাছে সহ্য হত না। কাছেই সাগর, সাগর হ'তে শীতল বায়ু এসে শরীরটা কাঁপিয়ে দিত।

এগারটার একটু পূর্ব্বেই আমরা সহরের মাঝে এসে পড়লাম। কোথাও ছোট গলি, কোথাও বড় পথ। মানুষ চট্‌পট্ করে চল্‌ছে আর দরজার কড়া অথবা বেল্ দিয়েই আপন আপন গৃহে প্রবেশ করছে। আমরাও সেরূপ একটা গৃহে প্রবেশ করলাম। তিন তলায় গিয়ে মস্ত বড় একটা ফ্ল্যাটের দরজায় "নক্" করা গেল। দরজা খোলা মাত্রই আমরা সে গৃহে প্রবেশ করলাম। ঘরটার মাঝখানে একটা বড় লম্বা টেবিল। পাশে আরামকেদারাও আছে। আমরা দু'খানা চেয়ার দখল করে' বসে পড়লাম। সঙ্গের ইহুদী আমার পরিচয় দু'মিনিটে করে' দিয়েই, লেক্‌চার শুন্‌তে মন দিলেন। আমি তার একটা কথাও বুঝি নাই। লেক্‌চার সমাপনান্তে ইহুদী মহাশয় দাঁড়িয়ে একটু ফরাসী ভাষাতে বলেই আমাকে বুঝাতে লাগলেন এই সভার উদ্দেশ্য কি? ইহুদী মহাশয় যে ভাষায় আমাকে লেকচার বুঝাতে লাগলেন, তা যদিও ইংরেজী তবুও বুঝতে পারলাম না। কারণ তাতে "টেক্‌নিক্যাল" শব্দ অনেক ছিল। National Socializm and Democratic Socialism-এর প্রভেদ, এ দুটার কার্য্যপদ্ধতি, এবং ভবিষ্যতের এ দুটার কিরূপ স্বরূপ হবে, তাই নিয়েই অনেক কথা হয়েছিল। ইহুদী মহাশয় যদিও জার্ম্মেণী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, তবুও দেখলাম তার টান রয়েছে হিটলারের প্রতি। এরূপ জার্ম্মাণ জু এই পৃথিবীতে বিরল, যার টান রয়েছে হিটলারের প্রতি। আমাকে বোঝাবার বেলা বার বার বল্‌তে লাগলেন, "যদিও আমি ইহুদী, তবুও আমার জাতের প্রতি কোনও টান নাই, কারণ তারা হ'ল পরশ্রমজীবী। পারসী-সভ্যতা ইরানের, ইহুদী-সভ্যতা প্যালেষ্টাইনের, এ দুটা লোপ পাবার একমাত্র কারণ অলসতা। অলস শুধু কথাই বলে, কথার মালা গাঁথে, অপরের গলায় পরিয়ে দিয়ে ভাবে বেশ মালা গেঁথেছিলাম, বেশ সুন্দর মানিয়েছে। কিন্তু সেই মালায় গন্ধ নাই, সে তা' ভাবে না। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যদি রক্তের বলিদান না থাকে, তবে সেই জ্ঞানের উন্মেষ হতে পারে না, কখনও হবে না।" আরও নানা কথা শুন্‌লাম তথায়, কিন্তু জার্ম্মেনী এবং রাশিয়ার অর্থনীতির বিভিন্নতা বুঝতে পারলাম না। প্রথম কথা হ'ল রাশিয়া দেখি নাই, জার্ম্মেণী দেখেছি।

তবে এই পর্য্যন্ত ভাল করে'ই বুঝতে পেরেছি যে, জার্ম্মেণীতে নামে অনেক ধনী আছেন, কিন্তু ধনীদের ধন খরচ করবার অধিকার ধনীর হাতে নাই। ব্যাঙ্কে ধনীদের নামে টাকা আছে অথচ চেক কাটবার অধিকার নাই। কিন্তু বেলজিয়ামে সেরূপ কিছুই না থাকাতে অনেক অনর্থ ঘটেছে। লোকে দরজার সামনে দেখ্‌ছে ধনের সদ্ব্যবহার এবং ঘরে দেখছে ধনের অসদ্ব্যবহার। রাজ-ভক্তি, দেশভক্তি, জাতিপ্রীতি, পেটের ক্ষুধা দমন করতে পারছে না। তাই যে এন্‌তোয়ার্পে একদিন জার্ম্মাণবিদ্বেষ প্রচণ্ডভাবে দেখা দিয়েছিল, সেই এন্‌তোয়ার্প আজ ভারতীয় দ্বিপ্রহর রোদে যেমন মানুষ আশ্চর্য্য বোধ করে, সেরূপই করছে। এক যুদ্ধ যেতে না যেতে আর এক যুদ্ধ এসে দেখা দিয়েছে। এখন বুঝা যাবে দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম এবং রাজভক্তির শক্তি কতটুকু, এবং আর্থিক উন্নতির দৌড় কতটুকু। অবশ্য যাঁরা এখনও পথে দাঁড়িয়ে ভগবানের গুণকীর্ত্তন করে আবেগভরে, তাদের প্রতি এই নিয়ম প্রযুজ্য নহে।

এন্‌তোয়ার্পের সিনেমাকে "ক্রিপ" বলে, (কিন্) নয়।

কিপেতে আর পুরাতন যুদ্ধের ছবি নাই, এরোপ্লেনের মেসিন গান আর ঘড় ঘড় করে না, এখন প্রেমের চিত্র হচ্ছে অনবরত। যুবক-যুবতী তাই নিয়ে মত্ত। তারা এখনও পুরাতন রণবিজয়ের চিন্তাধারা মনে এনে আনন্দের স্রোত বসাতে চায় এবং সিনেমা হ'তে বের হ'লেই দেখতে পাওয়া যায়, গরীবের দল মাথা নত করে পথে চল্‌ছে। তাদের সিনেমার প্রতি লক্ষ্য নাই, তারা চল্‌ছে পেটে হাত দিয়ে, বেল্টটা আরও ভাল করে' এঁটে। আমার ইহুদী সঙ্গীটি এসব একে একে দেখাতে লাগ্‌লেন। তার প্রাণের কথা যে ভাষায় বের হচ্ছিল, তা' বোধ হয় বার্ক, লিন্‌কন শুনেও পরাজয় মান্‌তেন। তাতে কোনরূপ ডিপ্লোমেসি ছিল না, তাতে কোনওরূপ জাতীয়তার ভাব ছিল না, তাতে প্রকাশ পেয়েছিল, সর্ব্বহারাদের মুখের কথা, প্রাণের বেদনা, একজন ধনী সর্ব্বস্বহীন ইহুদীর মুখ হতে।

রাত্রি ঘনিয়ে আসছিল, আমার চোখ দুটো ঘুমের আবেশে ঢুলে পড়ছিল। ইহুদী আমাকে টেনে নিয়ে চল্‌ছে এন্‌ভোয়ার্পের আনন্দের ফোয়ারা দেখাতে। কলকাতায় বড় বড় লাইনার আসে না, এন্‌ভোয়ার্পে বড় বড় লাইনার যায়, তার নাবিক সহরে যায়, মাতাল হয়, অর্থের অনর্থ করে, আনন্দ করে, তারপর যা সাধারণের হয় তাই হয়ে থাকে। আম্‌রা চল্লাম সে দৃশ্য দেখতে। পথের নাম মনে নাই, তবে নদীতীরের পথ। এই নদী আর সাগর-সঙ্গমের গঙ্গানদীর অনেক সমতা আছে। জোয়ার আছে, ভাটা আছে, চিল উড়ে, মাছ পালায়, মোটর বোট ঝপ্ ঝপ্ করে চ'লে, নিগ্রোরা পথে হাঁটে, লোকে তাদের ঠেঙ্গায় আর লাথি মারে, কাণমলা দিতেও সাহস করে। এমনকি ওদের কাণের কাছে হাতও নেয়। মহাশয় ইহুদী কখন বা আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করেন, কখন তার কথা আমার কাণে যায়, কখন আমি আনমনে চলি। কত মাতাল পথে পড়ল। কত মাতাল আমাকে নিগ্রো ভেবে গালি দিল। শেষটায় একটা ইরাণী আমাকে বল্লে "পাদের ছাগ নিগার।" তার হাতখানা ধরে বল্লাম "পাদের ছাগ ইরাণী।" লোকটার জ্ঞান হ'ল। ইরাণীতে বল্লে, "আপনার গোলাম অন্যায় করেছে।" আমি বল্লাম, "আপনার গোলাম সব কথা ভুলে গেছে।" করমর্দ্দন করে' দু'জনা দু'দিকে বিদায় নিলাম। তবুও ইরাণী সে আমার দেশের লোক নয়, দেশের কাছের লোক। তার প্রতি যেন একটা আন্তরিকতা অথবা মনের টান এর মাঝেই হয়ে গিয়েছিল। ইহুদী মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন—কি কথা হয়েছিল। আমি বল্লাম, "এই লোকটি ইরাণী, সে আমাকে 'কুকুরের বাচ্চা নিগার' বলেছিল, আমি তাকে 'কুকুরের বাচ্চা ইরাণী' বলেছিলাম। সে আমার কাছে ক্ষমা চায়, আমি আমার মুখ অপবিত্র করার দরুণ তার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলাম। এই মাত্র।" ইহুদী মহাশয় বল্লেন, "যেদিন সর্ব্বহারার দল ধনীদের উপর এরূপ ব্যবহার করবে, সেদিন ধনীরা সর্ব্বহারাদের কাছে ক্ষমা চাইবে, আর পরের শ্রমের উপর নির্ভর করবে না, আপনার জমি আপনি চষ্‌বে।" আমার মনে হ'ল লোকটি ইহুদী বেশে "অগ্‌পু" নয়ত? জার্ম্মেনী ভ্রমণকালে এরূপ কত অগ্‌পুর সাহায্য পেয়েছি, তার সংখ্যা নাই। তাদের আমি ভক্ত ছিলাম। হিটলারকে ভক্তি করতাম। যেহেতু স্বচক্ষে দেখেছি, Sanitation-এর দিক্ দিয়ে, Economic-এর দিক্ দিয়ে, জাতিগঠনের দিক্ দিয়ে হিটলার যেমন কাজ সুরু করেছে, এমনটি ইউরোপে আর কোথাও নাই। ভাল সেনিটেশন যথায় যথায় দেখেছি, তথায়ই আমার মন সেই শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের দিকে আপনা হ'তে ঝুঁকে পড়েছে। ইচ্ছা হত তাদেরে আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে দেই। ইচ্ছা হত তাদের শাসন-কাজে আমিও সাহায্য করি। কিন্তু আফ্রিকার টাঙ্গানিকা যা পূর্ব্বে জার্ম্মানরা শাসন করতেন, তথায় যাবার পর "বালা সাউরী" সম্বন্ধে যা' শুনেছি, তাতে আমার সকল ভক্তির অবসান হয়েছে। যদি কোনদিন সময় পাই, তবে এই "বালা সাউরীর" কথা আফ্রিকাভ্রমণে লিখব। এখানেই National Socialism-এর দোষ, আর Democratic Socialism-এর গুণ। মানুষ মানুষই। তার চাম্‌ড়া, তার চুল, এ সকল দেখে লাভ কি? দেখতে হবে তার কার্য্যক্ষমতা, দেখতে হবে তার মনের উচ্চতা, দেখাতে হবে তার মানবতা। সোসিয়েলিজম তা' দেখে বলেই, নিগ্রো অবতার ফাদার ডিভাইন মস্কো-ফেরতা নিগ্রোর কাছে চড় খেয়ে, ওয়াশিংটনে রুষ-বর্জ্জনে যোগ দিয়েছিলেন।

আমরা এগিয়ে চল্লাম "ডেন"গুলি দেখ্তে। প্রত্যেক "ডেনে" রমণীগণ বসে বসে নাবিকদেরে বিয়ার, মদ্য, কড়া মদ গ্লাসে গ্লাসে ঢেলে দিচ্ছেন। নাবিকগণ রমণীর হাসি এবং সরাবের নেশা, একই সঙ্গে উপভোগ করছে। রমণীগণ হুমুখী। মদের দাম-স্বরূপ কখন কখন ডবল্ দাম নিয়ে নিচ্ছেন, আবার চেঞ্জ নাই বলে' পুবা নোটের ক্রাঙ্কই পকেটস্থ করছেন। মদের নেশার মাতালকে পথে বসানই হল এই মেয়েদের কার্য্য। অথচ নাবিক তার দিকে খেয়াল করছে না, যতক্ষণ পকেটে নোট, রৌপ্য, তামা আছে, ততক্ষণ বিলিয়ে দিচ্ছে জলের মত। একদিকে দিবার ইচ্ছা, অন্যদিকে নিয়ে জমা কবার ইচ্ছা, এই দুই ইচ্ছায় যেন মিতালী চল্‌ছে। যখন নাবিকের পকেট খালি হল, তখন নাবিক পায়ে হেঁটে চল্ল তার আপন জাহাজের দিকে ; যারা পায়ে হাটতে পারছে না, তারা পড়ে রইল পথে। পথিক ইচ্ছা করে' তাদেরে পদাঘাত করছে, পকেট খুঁজছে, যখন কিছুই পেল না, তখন তার মুখে আর একটা পদাঘাত করে', তার রক্তাক্ত মুখে থুথু ফেলে চলে। এই সব দৃশ্য দেখে রাত্র তিনটায় সেল্‌ভেশন আর্ম্মির বাড়ীতে ফিরলাম। চিন্তা আমাকে অস্থির করেছিল। তার কি কোনও প্রতিকার নেই! এই সব উদ্ভট চিন্তা মগজে নিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, খেয়াল নেই।

# দুর্গম যাত্রী

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ দাশ

মাঙ্গলিক শঙ্খের শুভধ্বনি তোর
বজ্রের নির্ঘোষে আর বিদ্যুৎবিকাশে ;
চল যাত্রী, অপেক্ষিছে দুর্য্যোগের ঘোর—
পদতলে ভূকম্পন তোমারে সম্ভাষে।
গৃহ নহে তোর তরে,
আত্মীয়স্বজন,
বাসরের ফুলশয্যা,
প্রিয়ার চুম্বন।

অভিসম্পাতের মাত্র তুমি অধিকারী ;
আলোর আরতি ঐ আনিছে বিদ্রূপ
দুর্ব্বিসহ অন্ধকারে দিতে হবে পাড়ি ;
কণ্টকের আস্তরণ, গুপ্ত-চোরা কূপ
তোব লাগি আছে জেগে,
সে যে তোর প্রিয়
বরণ রেখেছে বুকে
তারে তুমি নিও।

সমুৎক্ষিপ্ত উল্কাপিণ্ড দীপালী জ্বালায়,
সমুদ্র গর্জ্জিয়া উঠে তোরে সম্ভাষিতে,
পথে পথে তোরই লাগি' চেয়ে আছে হায়,
লোলজিহ্বা ক্রুদ্ধ ফণী বিশ্রামের ভিতে।
আঘাতের তিক্ত ব্যথা
জয়মাল্যদানে—
রুদ্রের বিদ্রূপ-হস্ত
আশীর্ব্বাদ আনে।

১৪

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে ইউরোপের রণক্ষেত্রে চন্দননগরের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করার দায়িত্ব আমাকেই প্রথম লইতে হইয়াছিল। চন্দননগরের বাঙ্গালী সৈনিকেরা ভাদ্রূন যুদ্ধে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিল, একথা ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে কোনদিন মুছিয়া যাইবে না। ইহাদের মধ্য হইতে ১১ জন সৈনিক ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ ছুটী পাইয়া চন্দননগরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। যে ২৬ জন সৈনিক এই বীরব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন ব্যতীত সকলেই অক্ষত শরীরে ফিরিয়া আসিয়াছিল। কেবল মদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ৺রবীন্দ্রনাথ রায়কে ভার্দুন যুদ্ধে কামানপরিচালনার সময়ে বিরুদ্ধ পক্ষের গোলার আঘাতে দক্ষিণ হস্তের দুইটী অঙ্গুলী বলি দিতে হইয়াছিল। আর একজনকে ফিরিয়া পাই নাই—বাংলার বীরপুত্র মনোরঞ্জন দাস। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিলেও টিউনিস প্রদেশের বীজার্থ নগরের কৃমিকেল্লা প্রাঙ্গণে তাহাকে উৎসব করিতে শুনিয়াছি; এই উৎসবের বিবরণ "প্রবর্ত্তকে"র দ্বিতীয় বর্ষের নবম সংখ্যায় বাহির হয়। বীর সৈনিকেরা কঠোর কর্ম্মকে সুখের করিয়া লইয়াছিল, তাহাদের পত্র-মর্ম্ম এই কথাই সেদিন প্রকাশ করিয়াছিল। তারপর ২৫শে এপ্রেল কেব্‌ল পাইয়া জানিলাম—মনোরঞ্জন ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে। মনোরঞ্জন শ্রীরামপুরের ৺কার্ত্তিক চন্দ্র দাসের মধ্যম পুত্র। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া সে কলিকাতার জাতীয় বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষায় ব্রতী হইয়াছিল। চন্দননগর হইতে যুদ্ধের ডাক শুনিয়া মনোরঞ্জন পুস্তক, বাটালি, হাতুড়ির পরিবর্ত্তে বন্দুক ধারণ করিয়া প্রথম বাহিনীর সহিত যোগ দিয়াছিল। পণ্ডিচারীতে একটী ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় ৫০০ সৈনিক ও অফিসারদের মধ্যে সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। বিজার্থ দুর্গে পদাতিক সৈন্যের রণকৌশল ও কামান-পরিচালনা শিক্ষা করিয়া ফ্রান্সের রণাঙ্গণে গমনের উদ্যোগ-পর্ব্বেই ভীষণ টাইফয়েড্ রোগে মনোরঞ্জনের আশা চিরদিনের জন্য অপূর্ণ রহিয়া যায়।

রণজয়ী বীরবৃন্দ চন্দননগরে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, আনন্দের মধ্যে মনোরঞ্জনের অভাব অনুভব করিয়া আমরা চক্ষে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। সেদিনের জয়োৎসবে মিত্ররাজ্যগুলিতে উৎসবের ধুম কি ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে জনৈক ফরাসী সৈনিকের পত্রে অবগত হইয়াছি। কিন্তু চন্দননগরের রাজপথে বাংলার এই প্রথম স্বেচ্ছা-সৈনিকদিগের যে জয়োচ্ছ্বাস দেখিয়াছি, তাহাতেই রণজয়ী জাতির কি যে আনন্দ ও উল্লাস তাহার অনুভূতি চিরস্মৃতি হইয়াই থাকিবে।

দুঃখের দিনে দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিলে মানুষের চিত্তে যে কঠোর ভাব জমিয়া উঠে, চরিত্রে যে দৃঢ়তার লক্ষণ প্রকাশিত হয়, আনন্দের দিনে উৎসবের দিনে সে দৃঢ় স্বভাব তরল ও লঘু হইয়া আপনাকে ঘিরিয়া একটা সুখের ও তৃপ্তির আব্‌হাওয়া সৃষ্টি করে।

স্বেচ্ছা-সৈনিকদের পুনরাগমন উপলক্ষে নগর-পথে অসংখ্য সুসজ্জিত তোরণদ্বার, প্রাসাদে প্রাসাদে, দেব-মন্দিরের চূড়ায় চূড়ায় নহবতের মঙ্গলবাদ্যের ব্যবস্থাদির সহিত আমার গৃহদেবীকেও সেদিন সুবেশিত করার প্রয়োজন হইয়াছিল। কোনদিন তাঁহাকে এমন অভিনব দাবী করিতে দেখি নাই; নগরে আনন্দের মহা-কলরব উত্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র ভবনটী দূর-দূরান্তর হইতে অতিথিসমাগমে পূর্ণ হইতে লাগিল। কমলার বরপুত্রীগণের সালঙ্কার বেশ-ভূষায় চক্ষের তৃপ্তি হৃদয়ে আনন্দ উছলিয়া উঠিল। পরের অঙ্গনাদের বেশ-ভূষার পারিপাট্যে পুলকিত হইয়াই রক্ষা পাইলাম না; সেদিন বালিকার ন্যায় ব্রহ্মচারিণী মহাতপস্বিনী করুণ নয়নে নিঃসঙ্কোচে জানাইলেন—তিনি আজ নিরলঙ্কারা থাকিবেন না।

প্রাঙ্গণে মঙ্গল-উলুধ্বনি। রাজপথে কাতারে কাতারে সংখ্যাহীন নরনারী, অট্টালিকাচূড়ায় পুষ্প, শঙ্খ, ধান, দূর্ব্বা হস্তে পুরমহিলাগণের সোৎসুকপুলকদৃষ্টি, মৃত্যুর কবল হইতে ফিরাইয়া আনার অভাবনীয় গর্ব্বে আমার চিত্ত হিল্লোলিত। অকস্মাৎ পত্নীর অযথা দাবী আমার প্রথম পরিহাস বলিয়াই মনে হইল; কিন্তু তাঁর সজল চক্ষের মিনতি-কণ্ঠে দাবী আর পরিহাস বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। আমি কোনদিন কল্পনাও করিতে পারি নাই—এই পতিসোহাগিনী নারীর অন্তরে অলঙ্কারবিলাসের স্থান আছে। আমি প্রথমে বিস্মিত হইলাম; তারপর ভিখারীর পত্নীর এই দাবী যে কতখানি হীনতার পরিচয়, তাহাও বুঝাইলাম। শেষ অস্ত্র উপেক্ষা ও কটু তিরস্কার··, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। অন্তরের কোন্ গভীর স্থল হইতে সাজিবার সাধ তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল, তিনি সব বুঝিয়াও এই কামনা-পূর্ত্তির জন্য অতি করুণ আকুতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আজ মনে হইল—আমি দরিদ্র। আজ মনে হইল—আমি বেকার, স্ত্রী-গ্রহণের অযোগ্য। দৈন্য, দুঃখ, ক্ষুন্নতা সব যেন কটু করতালি দিয়া আমায় ঘুরিয়া নৃত্য জুড়িয়া দিল। আমি বলিলাম, "ওরে ভিখারীর পত্নী, এক মুষ্টি অন্ন আর কটিতটে বস্ত্র ছাড়া আর যে কিছু চাহি নাই। এমন কি প্রাকাম্যসিদ্ধি আছে যে, তোমার এই আকস্মিক কামনা পূরণ করি?"

মনে কত ঝড় উঠিল—এই যে তরুণী ভার্য্যাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি, এই যে তাঁহাকে নিরাভরণা রাখিয়া সুমহান্ আদর্শের লক্ষ্যে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছি; আর তাঁহার এই অলঙ্কার-প্রার্থনার মত কত প্রার্থনাই না অন্তরে গুমরিয়া মরিতেছে; কত অব্যক্ত বেদনা বুকে চাপিয়া অসহায় বাঙ্গালী বধূ বাধ্য হইয়াই আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে—ইহা কি স্বাস্থ্য? ইহা কি আনন্দ? ইহা কি পতিপত্নীর সত্য যুক্তি? এই জীবন কি শক্তিতে অভিষিক্ত হইবে? কল্পনাতীত সংশয়ে আমার মুখ যেন কাল হইয়া গেল। কোথায় কোনদিন তাঁর অতর্কিত চরণ-চিহ্ন অনাবশ্যক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি, তাঁর আনত দৃষ্টি কোথায় যেন কোন্ দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, আমায় দেখিয়া সচকিত হইয়া গেল; কোন সন্ধ্যার বিষাদ-ছায়ায় ছাদে বসিয়া সেই যে অনন্যমনে কিসের চিন্তা করিতেছিলেন, সবের মধ্যেই অতৃপ্ত কামনার অভিব্যক্তিই ছিল; আমি তাহা উপেক্ষা করিয়া আদর্শের মোহে পত্নীকে ধর্ম্মসঙ্গিনী করিয়া সমুচ্চে স্থান দিয়া চলিয়াছি। আশার স্বচ্ছ নীল আকাশে প্রাবৃটের ঘন ঘটা ঘিরিয়া ধরিল। দীনতার আসক্তি ও অক্ষমতার মসীচিহ্নে বোধ হয় ললাট লেপিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু আমার প্রতি এমন উপেক্ষা তাঁহার কোনদিন দেখি নাই। সেই অনাহত করুণ রাগিণী অলঙ্কারের আকাঙ্ক্ষা—আমায় বড় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

নিষ্করুণ হইতে পারিলাম না, কুটিল কটাক্ষে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম – তাঁহার মুখাবয়বে এক বিন্দু সঙ্কোচ নাই; দৃষ্টি অভাবের ক্ষুধায় কাতর নহে; সরল শিশুর মত সুনির্ম্মল কম্পিত ওষ্ঠপুটে আধ-আধ প্রার্থনা "নিরলঙ্কারা হইয়া তিনি আজ রণজয়ী বীরবৃন্দকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিবেন না।"

বিকৃত কণ্ঠে বলিলাম, "কোথায় পাইব এই মুহূর্ত্তে সোণার কঙ্কণ তোমার হাতে দিতে, গলায় গজমুক্তার মালা! একেবারে যাহা আমার অসাধ্য, তাহার জন্য জিদ্ যে কত বড় অত্যাচার, বুঝিবার বুদ্ধি নাই কি তোমার?"

আশ্চর্য্য, এমন অবুঝ মনের অবস্থা তাঁহার হইয়াছিল, কোন কথাই শুনিতে চাহিলেন না। নিজের নিরুপায় অবস্থা বার বার জ্ঞাপন সত্ত্বেও তিনি জিদ্ ছাড়িলেন না, বরং বলিলেন, "নিরাভরণা হইয়া আজ আমি ঘরের বাহিরে একটী পাও বাড়াইব না।"

ক্রোধে, দুঃখে মনে হইল—চুলের ঝুঁটী ধরিয়া দুই ঘা বসাইয়া দিই। অসংখ্য ভদ্রমহিলা দলে দলে উপস্থিত। বহু স্থান হইতে বহু লোক আজ সমাগত, আর আত্মজের অধিক বীরেরা মরণ জয় করিয়া আমারই বাড়ীতে প্রথম প্রবেশ করিবে, মায়েরা হর্ষোৎফুল্ল লোচনে গন্ধমাল্য, খাদ্য-দ্রব্যাদি লইয়া কত আনন্দে আজ এইখানে উপস্থিত, আমার সহধর্ম্মিণী এই উৎসবদিনে তুচ্ছ অলঙ্কারের দাবী ধরিয়া আমার সহিত অসহযোগ করিবে—ইহা যেন ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াইয়া যায়। ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া

[illegible] তাঁহাকে পার্শ্বে না দেখিলে, কোন কর্ম্ম সমাধা হইল বলিয়া মনে হয় না। একবার মনে হইল—থাক গৃহ-বন্দিনী হইয়া, বাহিরে অনেক মাতা, ভগ্নী উপস্থিত হইয়াছেন; কাজ সারিয়া লইব। কিন্তু দীর্ঘ প্রবাসের পর সৈনিকদের চক্ষুও চাহিবে সর্ব্বাগ্রে তাহাদের 'কাকীমাকে'। বুঝি আমার চেয়েও, অলক্ষ্যে থাকিয়াও, ছেলেদের চিত্ত জয় তিনিই অধিক করিয়াছিলেন। নিজেকে বড় অসহায় মনে হইল, কিন্তু উপায় কি? কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া শাসাইয়া বলিলাম, "আজ এই চির বিদায়। আর তোমার মুখ-দর্শন করিব না।" হায়রে, মুখের কথা যদি হৃদয়ের হইত, তাহা হইলে এক কথায় অনেক পূর্ব্বে সব গোলই মিটিয়া যাইত। এত বড় সাঙ্ঘাতিক কথাটা তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিল না; হৃদয়টা এমন করিয়াই জানা ছিল বলিয়াই আমার রোষ ও আন্দোলন তাঁহাকে অস্থির করিত না। তিনি বেশ নিঃশঙ্ক নির্ব্বিকার চিত্তেই, অকপট সরল কণ্ঠে বেমালুম বলিলেন, "যাই বল, আজ আমি শুধু হাতে আর শ্মশান গলা লইয়া তোমার উৎসবে যোগ দিব না।"

মেয়েরা কণ্ঠহার না পাইলে, একটা কারে ঝুলাইয়া মাদুলীও গলায় পরে। সধবা নারীর নিরলঙ্কারা কণ্ঠ শ্মশান বলিয়া প্রবাদ আছে। এ বালাই এ যুগে নাই। সে যুগে ছিল। কিন্তু আজ ৬৭ বৎসর ভিখারিণীর বেশ তাঁহাকে তো আজিকার মত এমন ভাবে পীড়ন করে নাই! আমাকেই তিনি সাজাইয়া রাখিতে ভালবাসিতেন, নিজে তো কোনদিন সাজিতে চাহেন নাই! আজ এ কি ভাববৈচিত্র্য?

নিজের পায়ে দুর্ম্মূল্য শ্লিপারের দিকে দৃষ্টি পড়িল। ফরাসডাঙ্গার দেশী ধুতিখানি আমার পরিধানে। আদ্দির পাঞ্জাবী, সোণার বোতাম, কাশী সিল্কের চাদর, অঙ্গুলীতে হীরার আংটী। জবাকুসুম-চর্চ্চিত মাথার দীর্ঘ কেশ সুবেশিত, শৃঙ্খলিত; ইহার তিনি একটুও ব্যত্যয় হইতে দিতেন না—আর নিজে সারা দিন একবস্ত্রে কাটাইতেন। সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিলে, একখানি খাটো বস্ত্র কোমরে জড়াইয়া, পরিহিত বস্ত্রখানির এক পাশ ধরিয়া একবার ঝাড়িয়া লইতেন, পুনরায় অপর ধার হাতে উঠাইয়া, ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া কাপড়খানিকে শুদ্ধ করিয়া লইতেন। কোনদিন দাবীর কণ্ঠ তো শুনি নাই। কেশ বিন্যাস করার বিলাসও তাঁহার ছিল না, চুল পরিষ্কার করিয়া সীঁথিতে সিন্দুরবিন্দু দেওয়াই ছিল তাঁর বিলাস আর দেখিতাম চরণ অলক্তরঞ্জিত করার দিকে মনের ঝোঁক। আমি কোনদিন ভাবি নাই—ইহা ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজনের দাবী তাঁহার থাকিতে পারে।

তাঁহার দাবী বুঝিবার আমার অবকাশ ছিল না। আমার সাজ-সজ্জা, খাদ্যাদি না চাহিতেই তিনি পূর্ণাঙ্গ করিতেন। কিন্তু তাঁহার ঐ দৈন্য বেশ ঘুচাইবার জন্য আমি কি করিয়াছি?

চৈত্রের প্রচণ্ড খরকরোজ্জ্বল চন্দননগর সেদিন হাস্য-মুখর, লোককোলাহলে উৎসবময়। পথে পথে পল্লব-পুষ্প-শোভিত তোরণ-দ্বার। ফুলদল করে নরনারীর মহামেলা। দেবমন্দিরচূড়ায় নহবতের মধু-রাগিণী বাজিতেছে; হৃদয়ের উৎসাহ-প্রদীপ আমার যে নিবিয়া যায়। আমার উৎসবময়ী আজি কি গৃহ-বন্দিনীই থাকিবে?

এমনই হয়, আদর্শের চেয়ে আত্মার দাবীই বড়; অন্তর্য্যামীর দাবী বুঝি তিনি শুনিতে পাইতেন। ভবিষ্যতের সংঘ-জননীর অন্তরপ্রেরণার এই যে ঐশ্বর্য্য-লক্ষণ-ধারণের দাবী, তাহা পূর্ণ করার প্রাকাম্য-সিদ্ধি দূরাগত ছিল না। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু অরুণচন্দ্র সোমের মাতাঠাকুরাণী সেদিনের এই ঐশ্বর্য্য-প্রেরণার পূজা দিয়াছিলেন অন্তরে। রায় বাহাদুর পূর্ণচন্দ্র সোমের তিনি বিধবা পত্নী। তিনি তাঁর লৌহসিন্দুক খুলিয়া থরে থরে স্বর্ণালঙ্কার, মুক্তার মালা, হীরক-বিজড়িত বিচিত্র ভূষণরাজী আমার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "বৌমাকে আজ নিরাভরণ থাকিতে নাই; তাঁহার যাহা পছন্দ গ্রহণ করুন।"

আমি পুলকিত, বিস্মিত হইলাম। কোন দিক্ দিয়া কোথায় কাহার সহিত সম্বন্ধ-সৃষ্টির স্রোতঃ তাঁহার মধ্যে বহিত, আমি বুঝিতে পারিতাম না। আজ বলিব—অপরাধী আমি নহি, তিনি আমায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতেন। তিনি এই অলঙ্কাররাশির মধ্য হইতে পান্না-খচিত দুই গাছি চুড়ি, হীরক-খচিত দুইগাছি অনন্ত,

আর বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত একগাছি সোণার হার তুলিয়া লইলেন। তারপর যাহা দেখিলাম, তাহা বড় অপূর্ব্ব। রাজলক্ষ্মীর সে অপরূপ মূর্ত্তি আমার আজ ধ্যানের বিষয় হইয়াছে। সে স্বর্ণপ্রতিমা চক্ষে দেখিবার নয়, ধ্যানের সামগ্রী।

* * *

দেখিলাম—মানুষের বুকে মানুষ ছুরী বসাইয়া ফিন্‌কি দিয়া রক্ত-প্রস্রবণ খুলিয়া দেয়; সে তপ্ত ফেনিল রক্ত-তরঙ্গে সমর-মত্ত জাতি চিরদিন প্রমত্ত হইয়াছে; মানবের এই রক্ত-স্নানের পরিণাম ভাবিয়া ভবিষ্যৎ শিহরিয়া উঠে, প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত হয়। এই রক্ত-বঙ্গে দীক্ষিত বাঙ্গালী বীর ইউরোপে মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় নাচিয়া বাড়ী ফিরিল, তাদের ঐ আকাশের আসমানী রঙের বীরসজ্জা, গৌরবদীপ্ত বজ্রকঠোর ললাটে স্বেদাশ্রু ঝরিতেছে। বীরোচিত প্রশস্ত হৃদয়, প্রতি পদক্ষেপে কি এক অসাধারণ জীবনপরশে নাচিয়া নাচিয়া, দুলিয়া দুলিয়া শোভাযাত্রীদের হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে। বীরপূজার সংস্কার ভীরু বাঙ্গালীর মজ্জায় মজ্জায়; আজ তাই রণজয়ী বীরবৃন্দের সম্বর্দ্ধনায় সহস্র সহস্র নারী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ যুবার উৎসাহ-প্রদীপ্ত নয়নের আলো দেখিয়া মনে হইল—সংগ্রাম চিরস্থায়ী হউক। মানুষের রক্তে এমন প্রলয়-ঝঞ্ঝা মাঝে মাঝে না উঠিলে, মানুষ যে ভীরু লঘু হইয়া পড়িবে। ইউরোপের গগনে রক্ত-পতাকার বিদ্যুৎশোভা মানবতার জয়ধ্বজাই উড়ায়। ভারতের হিয়ায়ও সেদিন দেখিলাম রণচণ্ডীর তাণ্ডব-নৃত্য-চঞ্চল করালিনী মূর্ত্তি—প্রসন্ন ভগবতী বুঝি এমন মহাকালীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াই জগতের স্থিতিশীল সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনে নব নব প্রেরণা সঞ্চার করেন।

বিধাতার ভীষণ ভ্রূকুটীকটাক্ষের সঙ্কেতে মঘবানের নিদারুণ বজ্রবর্ষণের মরণক্ষেত্রে বাঙ্গালী বীরেরা দেশগত, জাতিগত, সংস্কারগত সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, নিখিল মানবজাতির সহিত অচ্ছেদ্য ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কোন সুদূর প্রবাসে অপার্থিব প্রেমের রাজ্যগঠনেরই সূত্রপাত করিয়া আসিল। সেখানে হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান, সিনোগেলিস, ইণ্ডোচীনা কিছুর ভেদ ছিল না। রাজশক্তির সহায় হইয়া, বিশ্ব-মানবজাতির সহিত একাত্মতার ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া এই যে বাঙ্গালীর আত্মদানের সঙ্কল্প, ভারতের এই যে নিঃস্বার্থ আত্মবলির উৎসবশোভা আমার সম্মুখে—ইহা কি ভারতের সৌভাগ্য-যুগের দ্যোতনা নয়?

এক অপূর্ব্ব অনাগত স্বপ্ন এই সৈনিকদের চক্ষের দৃষ্টিতে আমায় অভিভূত করিল। জনে জনে আলিঙ্গন করিয়া তাহাদের আবার ঘরে তুলিয়া লইলাম। এই বিজয়ী বীরবৃন্দকে ধান্যদূর্ব্বাদলে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়া কুল-লক্ষ্মীগণ মঙ্গল উলুধ্বনি দিল। কেহ শঙ্খ বাজাইল। আর ইহারই মাঝে একজনকে দেখিলাম—সালঙ্কারা দেবীপ্রতিমা হর্ষোৎফুল্ল লোচনে প্রতি জনের ললাটে জয়টীকা পরাইয়া কণ্ঠে কণ্ঠে মল্লিকার মালা দোলাইয়া দিতেছেন। বাংলার বীরজাতির সূচনা-পর্ব্ব আমারই প্রাঙ্গণে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইল। আমি সে ধূলা আজিও তাই সশ্রদ্ধায় ললাটভূষিত করি।

সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিল। বাজিয়া বাজিয়া নহবতের সুর বাতাসের গায়ে অবসন্ন হইয়া নিদ্রাভিভূত হইল। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, প্রিয়তমা পত্নী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রসন্ন দৃষ্টি লইয়া উৎসব ক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিল। পথের ধূলা পথে পড়িয়াই বিশ্রাম লইল। জনশূন্য প্রাঙ্গণে নৈশ ভোজের আয়োজন। প্রীতির উৎস মুক্ত হইয়া আমরা অভিষিক্ত। কোন্ সুদূরের রণাঙ্গনের স্মৃতি বৈচিত্র্য বহিয়া সৈনিকেরা ঘরে ফিরিয়াছে, কত গিরি-নদী-পর্ব্বত, কত পল্লী-নগর অতিক্রম করিয়া তাহাদের রণক্ষেত্রে যাত্রা। পল্লীনারীগণের জয়কণ্ঠে মধুর সম্বর্দ্ধনা—পথের দু'ধারে ফরাসী নরনারীর সোৎসাহ অভ্যর্থনা—সে কত বিচিত্র কাহিনী; কত গোপন প্রণয়-কাহিনী, সৈনিক-জীবনের কৌতূহলপূর্ণ কত ঘটনারাজী! প্রণয়ের আকর্ষণে কেহ নদী পার হইয়া, আপেল বৃক্ষের বনে ক্ষুদ্র কুটীরে কৃষকরমণীর অন্বেষণে চলিয়াছে; কেহ আঁধারে অঙ্গ ঢাকিয়া, মরু-তুষার ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে গ্রামাভিমুখে। বিদেশী সৈনিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইতে গিয়া, ফরাসী রমণীর প্রণয়-যাজ্ঞা সে ভুলিতে পারে নাই, কোন আহত সৈনিক হাসপাতালে অবস্থান-কালে কোন কিশোরী নার্সের স্নেহচুম্বনে অভিভূত হইয়া বুকে তার চিরস্মৃতি

আঁকিয়া লইয়াছে। রণজয়ী হইয়া সে কৃতজ্ঞতার শোধ লইবে, হৃদয়ে আশার উৎসাহ। শত্রুর গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া সে ছুটিয়াছে, ট্রেঞ্চের পর ট্রেঞ্চ অধিকার করিয়া। উৎসবের দিনে পরস্পর রক্তপিপাসু প্রতিদ্বন্দ্বী নিরস্ত্র হইয়া, এই দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রাম-পিপাসার অন্তর্নিহিত মানব-প্রীতির ঝরণা-ধারা উৎসরিত করিয়া একে অন্যকে অভিনন্দিত করিতেছে—ট্রেঞ্চ হইতে ট্রেঞ্চে ফুল, ফল, রুমাল, রুটির টুকরা উপহার দিয়া। পরক্ষণেই শত্রুর ন্যায় যাহাকে নিধন করিতে হইবে, তাহার সহিত ক্ষণিকের প্রেম-বিনিময় মানবচরিত্রের অপরূপ লীলাভঙ্গী। এমন কত কথা। রাত্রির মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আলাপ আলোচনায় কাটিল।

তারপর শয়ন কক্ষে গিয়া আর এক অভিনব দাবী গৃহদেবী জানাইলেন। সবিস্ময়ে দেখিলাম, আবার তিনি নিরাভরণা। অলঙ্কারগুলি সযত্নে একটী হস্তিদন্তনির্ম্মিত কৌটায় রাখিয়া তিনি বলিলেন, "কাজ মিটিয়াছে, এইবার ফেরৎ দিয়া আইস।"

এত শীঘ্র সাধ মিটিবে, এমন প্রত্যয় হইল না। আমি বলিলাম, "উহা ফেরৎ দিব না। তোমার ভাল লাগিয়াছে, তুমি উহা গ্রহণ কর।"

তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "পরের জিনিষ, প্রয়োজন শেষ হইলে ফেলিয়া রাখিতে নাই। তুমি এইগুলি শীঘ্র ফেরৎ দিয়া আইস।"

বিরক্তির মাত্রা আমারও বাড়িয়া উঠিল। উৎসবের ধুমে শরীর বড় ভাল ছিল না, খুব অবসন্ন মনে হইতেছিল; আমি বলিলাম, "তোমার গহনার সাধ পুরণ করিব বলিয়াই এইগুলি আনিয়াছি, উহা আর ফেরৎ যাইবে না।"

তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, "পরের জিনিষ কাজ শেষ হইলে ঘরে রাখিতে নাই", আমিও বার বার বলিতে লাগিলাম, "উহা তোমার জন্যই আনিয়াছি, উহা আর ফেরৎ দিব না।"

কথা-কাটাকাটি ঝগড়ায় পরিণত হইল। "আজ উহা পরের জিনিষ, ব্যবস্থা করিলে কাল আবার ঘরের জিনিষ হইবে।" এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তবে তোমার টাকা আছে, আমাকে ভিখারিণী করিয়া রাখা তোমার ছল।"

আমি বলিলাম "না, আমি স্বামী হইয়াছি, তোমার দাবী পুরণ করা আমার কর্ত্তব্য।"

বেশ মনে পড়ে—ফুটন্ত যুঁইয়ের রাশি হাসির ফাঁকে যেন ঝরিয়া পড়িল, যেন বিদ্রূপ করিয়াই তিনি বলিলেন, "আরও তো অনেক দাবী আছে, সব কি পুরণ করিতে পার?"

কথা শুনিয়া বুকটা কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল; যেন মনে হইল—ধর্ম্মের নামে কিশোরী পত্নীর প্রতি সর্ব্বক্ষেত্রেই অত্যাচার করিতেছি। ধর্ম্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ আমি, তিনি নহেন। আমার দায়েই তিনি তপস্বিনী। মুখে আমার বোধ হয় বিষণ্নতার ছায়া পড়িয়াছিল। তিনি একটু উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "এইবার নিজের ফাঁদে পা পড়িয়াছে। কিন্তু অতটা গুরু চিন্তার প্রয়োজন নাই, গহনাগুলি দিয়া আইস।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু গহনার সাধ আমি তোমার অপূর্ণ রাখিব না।"

তাঁহার কথা অবহেলা করিতে পারিলাম না। তাঁর স্বভাবের মধ্যেই ছিল—প্রয়োজন হইলে পরের জিনিষ চাহিয়া আনিতেন, প্রয়োজন শেষ হইলে এক মুহূর্ত্ত তাহা ঘরে রাখিতেন না। সে গহনা কেন, বাজারের ঝুড়ি, চুপড়ীটী পর্য্যন্ত কাজের বাড়ীতে নানা স্থান হইতে জড় হইলে, কাজের শেষে সেইগুলি যথাস্থানে ফিরাইয়া দিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। আমায় সেই রাত্রেই গহনাগুলি পৌঁছাইয়া দিতে হইল।

এই ঘটনা তাঁহার নিকট স্বচ্ছসলিলা তটিনীর ন্যায় সহজে আসিয়াছিল, সহজেই চলিয়া গেল, এ একটা আকস্মিক অন্তরপ্রেরণায় তাঁহার উদ্বুদ্ধতা; আমায় কিন্তু উপার্জ্জনের প্রেরণায় তাহা উদ্বুদ্ধ করিল। আমি শ্রীঅরবিন্দের সম্পূর্ণ ব্যয় সঙ্কুলান করার সুব্যবস্থা করিয়াছিলাম। পতি-পত্নীর ক্ষুদ্র সংসারটী চলিয়া যাওয়ার মত একটী ব্যবসাও ফাঁদিয়াছিলাম। কিন্তু ইহাতে আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। স্ত্রীর সহিত সম্পদের, সত্যের সহিত জয়ের একটা অনিবার্য্য আকূতি আমায় পাইয়া বসিল। এইদিন হইতেই আমার মনে হইল—আমি যে

সাজি, আমার যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, ইহার মূলে আছে আমার গৃহদেবীর শুভেচ্ছা; আমার তাই কিছুতে অভাব অনুভব নাই। আমি পুরুষ, নারী যদি প্রসাধন চাহে, আমার ধর্ম্ম, আমার প্রতিশ্রুতি, কিছুর ব্যত্যয় না করিয়া তাহার সে সাধ পূর্ণ করিব। কোন দিক্ দিয়া কি হয় কে জানে? সৃজনের দেবদূত এমনই সঙ্কীর্ণ পথে আমায় যুগশঙ্খ বাজাইয়া আহ্বান দিয়াছিলেন। আমি অর্থ-সৃষ্টির পথে পা বাড়াইলাম। লক্ষ্য ছিল গৃহলক্ষ্মী, তাঁর পুষ্টির উপলক্ষ্যে এক বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া উঠিল। বিশ্বকর্ম্মা বিউগল্ বাজাইয়া আমায় অর্থ-সংগ্রামে নাচাইলেন। অন্নক্ষেত্রের জন্য বিশাল কৃষিক্ষেত্রেব রচনা, আর বস্ত্রসমস্যাপূরণের ব্যবস্থা হইল—সুবিশাল তাঁতশালা-নির্ম্মাণের। সঙ্ঘের কর্ম্মসূত্র আমায় হাতে করিয়া ধরাইয়া দিলেন চিৎশক্তি—এমনই তুচ্ছ উপলক্ষ্য আশ্রয় করিয়া। যাহা অভিধেয়, তাহার অনুবাদ হয় কত ভাষায়, সকলের তাহা উপলব্ধিগম্য হয় না।

(ক্রমশঃ)

# আশুতোষ-স্তুতি

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

বাঙ্গলার বাঘ, আজকে তোমায়
জানাই নমস্কার!
যে মাটীতে কেঁচো জাগে, সেই মাটীতে
জন্ম তোমার—
লাগে চমৎকার।
শৈত্য মাঠে জাগ্‌ল যেন
দীপ্ত হুতাশন,
আলস্যেরি মধ্যে জাগে
কর্ম্ম-বিলোড়ন।
তেজে ও বিদ্যায়
অটল মহিমায়
জাগ্‌ল যেমন বিদ্যাসাগর বীর;
বিবেক-আনন্দ যেমন
তেজস্বী ও ধীর;
তেম্‌নি আশুতোষ—
হাস্য এবং রোষ
দু'য়ের সমন্বয়ে গড়া
অপূর্ব্ব অদ্ভুত!
নামে যেবা শঙ্কর,
সে স্বভাবে তাঁর দূত!

কেবল দয়া, কান্না, স্নেহ
নয় ক বাঙ্গালীর;
নয় ক কেবল নুইয়ে চলা,
কেবল নত শির;—

বজ্র গড়ে, বজ্র হানে,
যুদ্ধে পরাজয় না জানে,
আপন মতে অটল গিরি,
কারুর নহি দাস;
কেঁচোর পাশে সর্প যেন,
মৃগের পাশে ব্যাঘ্র হেন,
ক্ষীণ বঙ্গবাসীর পাশে
দৃপ্ত বলোচ্ছ্বাস।

এই আশুতোষ অল্পে খুসী,
এই আশুতোষ পাকায় ঘুঁসি,
এই আশুতোষ বঙ্গদেশের
বক্ষে নব প্রাণ;
প্রেম সে বিলায়,
শক্তি সে দেয়,
নিজেও শক্তিমান্।
আজকে নমি সেই সে বীরে,
হাস্যভরা সেই সে ধীরে,
বঙ্গবাসীর মূর্ত্ত মনস্কাম।
গড়্‌ল যেবা শিক্ষা-সদন,
করল উজল বঙ্গ-ভবন,
মাতৃভাষায় করল অভিরাম;
তারেই জানাই যুক্তকরে
অসংখ্য প্রণাম।
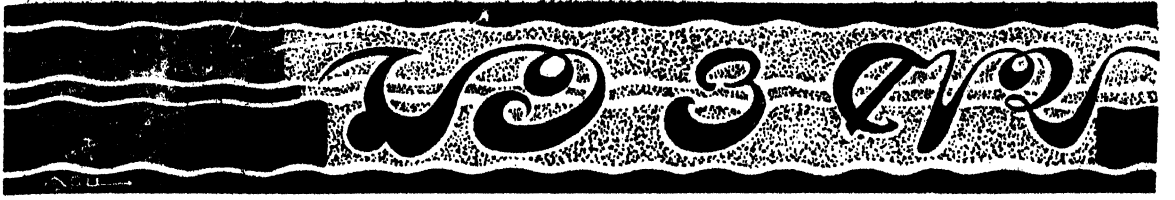
## যুগপরিবর্ত্তনের ক্ষণ

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের ন্যায় বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধও একটা যুগপরিবর্ত্তনেরই সূচনা করে। সেদিন জর্ম্মণ-সম্রাট্ স্বাহঙ্কারদৃপ্ত নিজেরই কথায় "বিধাতার ক্ষুরধার অসি" স্বরূপ কালশক্তির রুদ্র ধ্বংসলীলার যন্ত্র হইয়াছিলেন। রক্তযজ্ঞে ধরণী স্নাতা হইয়াছিল। জর্ম্মণী চূর্ণ হইয়া গেল। প্রকৃতির ইচ্ছা বুঝি ইহাতেও সিদ্ধ হইল না। তাই লীগ-অফ্-নেশনস্ নাম লইয়া যে শান্তি-শিশু ভূমিষ্ঠ হইল, তাহারই অন্তরে রহিয়া গেল ভাবী যুদ্ধের বীজ—এই বীজ অব্যর্থ প্রতিক্রিয়ায় জন্ম দিল নবীন জর্ম্মণীকে। আজ কাইজারের ন্যায় হিটলার শুধু রুদ্রের অসি-যন্ত্র নয়, যেন স্বয়ং ধ্বংস-মূর্ত্তি। যুদ্ধে জয়-পরাজয় যে পক্ষে যাহাই ঘটুক, যে অন্তহীন নরশোণিত-স্রোতে ধরিত্রী আবার রঞ্জিতা ও প্লাবিতা হইল, তাহার তুলনা বুঝি ইতিহাসেও মিলে না। এতখানি রক্তমোক্ষণের মধ্য দিয়াও কি ইউরোপের অন্তর-প্রকৃতি বিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে না? অন্ততঃ আমরা দূর হইতে পাশ্চাত্যে আত্মশোধনেরই গূঢ় শক্তির ক্রিয়া দেখিবার আশা করিব। যাহা ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ-বন্ধেও সম্ভব হয় নাই, তাহা কি আজ যুদ্ধান্তে সত্যই দেখা যাইবে? জগতে একটা যুগপরিবর্ত্তনেরই শুভ ক্ষণ কি সত্যই আসন্ন?

## ভারতের অধিকার

ইউরোপ আজ সাক্ষাৎভাবে রক্তাহবে প্রবৃত্ত হইলেও, এই জিঘাংসা ও নরবলি শুধু পাশ্চাত্যেই নিবদ্ধ নহে। এসিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে চীন-জাপানেও একই রুদ্রতাণ্ডব ভিন্ন ধারায় চলিতেছে। সুদূর সমুদ্রপারে আমেরিকাও রণ-সজ্জায় প্রমত্ত। পরাধীন নিরীহ ভারতবর্ষও এই প্রলয়ঙ্কর মরণ-লীলা হইতে ইচ্ছাসত্ত্বেও একেবারে নিরপেক্ষ থাকিতে পারিবে না। ভারত আজ যুগসঙ্কটে আত্মরক্ষায় উদাসীন নয়, নিরুপায়—কিন্তু বিশ্বের শক্তি-পরীক্ষায় স্বেচ্ছায় যোগ দিতে অনধিকারী হইয়াও, বাধ্য হইয়া তাহাকে রক্ত ও অর্থ যোগান দিতে হইবে। ভারতের রাষ্ট্রচেতনা ন্যায় ও ধর্ম্মযুদ্ধে স্বাধীনভাবে পক্ষ-গ্রহণে যদি আজ অবকাশ পায়, তাহার গূঢ় মহাশক্তি উৎসরিত করিয়া সে একাই বিশ্ব-মানবের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে সমর্থ। কিন্তু সে শুভযোগ তাহার এখনও আসে নাই। তাই প্রতীক্ষায় ভারতশক্তি দিন গণিয়া চলিয়াছে। ভারতের জনসাধারণ জীবনসংগ্রামে নিঃসহায় ভাবে তাড়িত হইবে ততদিন, যতদিন না আত্ম-শক্তির সন্ধানে তাহার অন্তরের অভিযান বাহিরেও মুক্ত-স্বচ্ছ প্রবাহ সৃষ্ট করিয়া লইতে পারিতেছে। ভারতের সমস্যা আজ স্বরাজ-সমস্যা, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, গণ-পরিষৎ সমস্যাই নহে; ভারতের মুখ্য সমস্যা আজ যুগধর্ম্মের দিক্‌পরিবর্ত্তন। ভারতীয় ধর্ম্মবীর্য্য যদি আজ আর আত্মসমাহিত না থাকিয়া জগন্মুখী হয়, এই সনাতন-ধর্ম্মী জাতি ঈশ্বর-যুক্তি লইয়া জীবন-সাধনায় অবতরণ করে, তাহার রাষ্ট্রীয় সকল সমস্যার স্বতঃপূরণ তো হইবেই, উপরন্তু দিগ্বিজয়ী ভারত ধর্ম্ম মানবজাতির দুর্ম্মতি-শাসনে আবার অধিকার পাইবে। এই বিধাতার "চাপরাস" একমাত্র ভারতেরই আছে। ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় সেই অমোঘ অধিকার-পালনেই সে অচিরাৎ বাধ্য হইবে।

## ধর্ম্মযুদ্ধের আহ্বান

ভারতের সাধনা সংগ্রাম নয়, সংগঠন। সংগঠন—জীবনের। জাতি তাহার আশ্রয় মাত্র। ভারতের জাতীয়তা তাই বিশ্ব-মানবজাতিকে সংগঠন করিয়া তুলিতে চাহে। ভারতের রাষ্ট্ররূপ যতক্ষণ সংগঠনকেই মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলিতে না পারিবে, ততক্ষণ তাহার জাতীয়তার পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ও সার্থকতা হইবে না। আর্য্যভারতের ধর্ম্মরাজ্যের স্বপ্ন এই সংগঠনমূলক জাতীয়তার প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছিল। সে স্বপ্ন যেদিন ভাঙ্গিয়াছিল, সেদিন পশ্চিম এশিয়া হইতে

নবোত্থিত ধর্ম্মরাষ্ট্রের স্বপ্ন লইয়া ভারতের পরিত্যক্ত শক্তি-সংহতি আক্রমণচ্ছলে এদেশে ফিরিয়াছিল ও তাহার প্রতিক্রিয়ায় আর্য্যভারতকে হিন্দু ভারতে পুনর্গঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুস্থানে পরিবর্ত্তন সংগঠনশীল ভারতেরই এক অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক রহস্য। আরব ও তাতার-দর্প পাঠান ও মোগল সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়া ভারতেই সমাহিত হইয়া, হিন্দু সভ্যতা ও সাধনাকে ধীরে ধীরে রূপায়িত করিয়াছিল ও পাঁচ শত বৎসর পরে ইহাই ইউরোপের খৃষ্টীয় শক্তি ও সাধনার সম্মুখীন হইয়াছিল। গত দেড় শতাধিক বৎসর কাল বৃটেনের রাজচ্ছত্রতলে সংগঠনশীল ভারত এই নবাগত শক্তি ও সাধনাকেই আত্মসাৎ করিয়া বিশ্বমানবজাতির সেবা ও সংগঠনের শক্তি ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিতেছে। ভারত প্রস্তুত হইতেছে—শুধু মুক্তি-সংগ্রামের জন্য নয়, বিশ্বজীবনকে পুনর্গঠিত করিয়া ধর্ম্মসাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠারই জন্য। তাহার পার্থিব অস্ত্রপরিত্যাগের মূলে আছে বিধাতার নিগূঢ় প্রেরণা। পরিত্যক্ত গাণ্ডীব ভগবানই আবার তাহার হস্তে ফিরাইয়া দিবেন সেইদিন, যেদিন তাহার জাতীয় লক্ষ্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন হইয়া উঠিবে। পার্থিব ভোগ ও স্বার্থের অধিকার লইয়াই জগতের সংগ্রাম—ইহা ভারতের ধর্ম্ম নয়। ভারত চায় সংগঠন। ইহারই জন্য তাহার রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য। ধর্ম্মবীর্য্য যখন সংগঠনকেই প্রচার করিতে দিগ্বিজয়ে বাহির হয়, তাহা রূপ লয় ধর্ম্মযুদ্ধের। পরাধীনতার তপস্যা আজ ভারতকে অন্তরে বাহিরে নির্লিপ্ত রাখিয়া, অলক্ষিতে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে এই ভবিষ্যৎ ধর্ম্মযুদ্ধেরই জন্য। সে ধর্ম্মযুদ্ধের আহ্বান রুষ, জর্ম্মণী, ইংরাজ কাহারও আদর্শবাদের অনুকরণে বা অনুসরণে নয়, ভারতের নিজস্ব সত্তার প্রতিভায় ধরা পড়িবে। এই আত্মবৈশিষ্ট্যেরই সন্ধান ও পরিচয়ে তাই আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে।

## স্বাধীনতার দিগ্‌দর্শন

এই ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের আলোকে, আমাদের জাতীয় সাধনায় একটা অভিনব আশাপ্রদ রূপ চক্ষে ফুটিয়া উঠে। স্বাধীনতা-সাধনা গঠন-সাধনাতেই পরিণত হয়। কারণ, তখন স্বাধীনতা অর্থে বুঝায় আমাদের জাতীয় কৃষ্টি ও আদর্শকে রাষ্ট্রীয় রূপদান। শাসন-তন্ত্রের হস্তান্তর যেখানে স্বকীয় কৃষ্টি ও আদর্শকে ভিত্তি ও লক্ষ্য করিয়া নহে, সে রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন আমাদিগকে স্বাধীনতা দান করিবে না, পরন্তু পরকীয় শাসনেরই বর্ণপরিবর্ত্তন করিবে মাত্র। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪০ পর্য্যন্ত ৩৫ বৎসরের মুক্তি-সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, আমরা স্বাধীনতা-সংগ্রামের নামে কখনও ম্যাজ্জিনী-গ্যারিবল্ডি, কখনও পার্ণেল, সিন্‌ফেন্, কখনও বা কার্ল মার্ক্সের বা লেনিনের রাষ্ট্রীয় মত ও পথের অনুসরণ করিয়াছি বা করিতেছি—পরন্তু ভারতের স্বকীয় কৃষ্টি ও জীবনের যে অনিবার্য্য রাষ্ট্রীয় অভিব্যক্তি, তাহার দিকে এক পাও অগ্রসর হইতে পারি নাই। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব চীৎকার করিয়া বাঙালীকে নিজের কোটে ফিরিতে বলিয়াছিলেন, শ্রীঅরবিন্দের ভাস্বর মনীষাও একদিন এই জাতীয়তার কল্পমূর্ত্তি আভাসে চিনিয়াছিল ও বাঙালীকে তাহার সঙ্কেত দিয়াছিল, কিন্তু বাঙালী তথা ভারতের শিক্ষিত রাষ্ট্রনেতৃবৃন্দ মূলতঃ যে গতিস্রোতঃ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্যেরই অনুবৃত্তি। ইহা ভারতীয় স্বাধীনতার যথার্থ দিগ্‌দর্শন নয়। তাই ভারত-সত্তার রাষ্ট্রীয় প্রতিভা এই প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর রাজনৈতিক জাগরণের পরও আপনাকে পূর্ণরূপে আবিষ্কার করিতে পারিল না। আমরা এখনও প্রতীচ্যের চলার পথেই চিহ্নিত পদাঙ্ক ধরিয়া চলিয়াছি। চলার তপস্যা হইল বটে, কিন্তু সিদ্ধির অনুকূল মার্গ বলিয়া কোনও পথেই আজও আমরা সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। ভারতীয় কৃষ্টি ও আদর্শ সম্বন্ধে অস্পষ্ট বা ঘোলাটে দার্শনিকতাই ইহার কারণ।

স্বাধীনতা গড়িবার বস্তু। ইহার জন্য যুদ্ধ অবান্তর ঘটনা। স্বাধীন রাষ্ট্র যিনি গঠন করেন, তিনি তাহা গড়িবার মানুষ ও উপাদান অন্তর্দ্দেবতার অনুপ্রেরণায় সর্ব্বাগ্রে সৃষ্টি করিয়া লন। স্বাধীন রাষ্ট্র—এই রাষ্ট্র-বীরগণেরই জীবন-প্রকাশ। গণশক্তি যোগ্য রাষ্ট্রীয় নায়ককে চিরদিন অনুসরণ করে। গণ-জাগরণের অগ্রে প্রয়োজন হয় না; কিন্তু গণ-সেবা লক্ষ্যে রাখিয়াই স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হয়। স্বাধীনতা কেহ দেয় না, নেয়ও

না—ইহা নিজের ভিতর হইতেই স্ফুরণ করিয়া লইতে হয়। পশ্চাদনুগত্য বর্জ্জন করিয়া স্বানুগতি সুরু করিলেই স্বাধীনতার প্রকৃত সূচনা হয়। ইহা প্রথম হয় কৃষ্টি ও সাধনার ক্ষেত্রেই। কারণ, মাত্র আত্মকৃষ্টিই আত্মপরিচয় দিতে পারে। ইহা ব্যক্তিগত কৃষ্টিই শুধু নয়—একটা সমষ্টি যে কৃষ্টি ও সাধনায় আত্ম-বিকশিত ও আত্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলে, তাহার অব্যাহত প্রকাশই সমষ্টি-স্বাধীনতা। এই জাতীয় আত্মপ্রকাশ বা স্বাধীনতা ব্যক্তিগত মতামতের উপর নির্ভর করে না, অনেক সময়ে ব্যক্তির নিজ নিজ মত-পথ বিসর্জ্জন দিয়াই জাতীয় স্বাধীনতার পথ নিষ্কণ্টক ও প্রশস্ত করিয়া তুলিতে হয়। স্বাধীনতার পরিমাপ তাই ব্যক্তিত্বের প্রকাশে নয়, কতখানি সমষ্টি-চৈতন্যের প্রতি ব্যক্তি অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারিতেছে, তাহারই অর্থাৎ কৃষ্টিরই অনুমাপে। আমরা এই কথা যদি ভুলি, ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার আবিষ্কারে ও প্রতিষ্ঠায় অধিকারী হইব না।

## স্বাধীনতার মূল-সূত্র

স্বাধীনতার প্রধান সূত্র এই জাতীয় কৃষ্টি। আর সব গৌণ সূত্র অর্থাৎ ইহারই অনুসূত্র (corrolary)। গত বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীজ্যোতিষ-চন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে যে চতুর্ব্বিধ অধিকার স্বাধীনতার মৌলিক নীতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য আছে। অধ্যাপক ঘোষ মহাশয়ের উল্লিখিত সেই চতুঃসূত্র এই :—

(১) প্রকাশ্যভাবে সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অধিকার ;

(২) প্রকাশ্য সভায় জনমতগঠনের উদ্দেশ্যে স্বাধীন-ভাবে নিজ নিজ মত প্রকাশ করিবার অধিকার ;

(৩) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিবার অধিকার অর্থাৎ প্রেসকে কোনরূপ আইনের কবলিত করিয়া তাহার ভাব-প্রচারের পথে অন্তরায়-সৃষ্টি যাহাতে না হয়, তাহার বিধান ;

(৪) আত্মরক্ষার অধিকার এবং সেই উদ্দেশ্যে অস্ত্র রাখিবার ও তাহা ব্যবহার করিবার পূর্ণ অধিকার।

এই চারিটী অধিকার ইংরাজ তাহার স্বদেশ ইংলণ্ডে যে ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, এদেশে তাহা করে নাই—তাই ইংলণ্ডে ইংরাজ স্বাধীন, পক্ষান্তরে আমরা ইংরাজের অধীন। বর্ত্তমান যুদ্ধকালে, আমরা দেখিতেছি, ইংলণ্ডেও এই চতুর্ব্বিধ অধিকারের যথেষ্ট সঙ্কোচ করা হইয়াছে। ইহাতে ইংরাজ পরাধীন হইয়া গেল, তাহা আমরা বলিতে পারিব না। তবেই স্বাধীন রাষ্ট্রের এইগুলি মৌলিক অধিকার—যাহা যুদ্ধে, শান্তিতে সকল অবস্থাতেই অপরিহার্য্য—এমন কথা বলিবার যুক্তি খুঁজিয়া পাই না। আসল কথা, জাতির সমষ্টি-স্বার্থই জাতীয় স্বাধীনতা-তন্ত্রের মৌলিক বিধান; আর সকল মৌলিক বিধান নয়, সাময়িক বা আপেক্ষিক সূত্র মাত্র। অপর দৃষ্টান্ত, সাম্যবাদের নবীন তীর্থ সোভিয়েট রুষিয়ায়ও উক্ত চারিটী নীতি যথার্থ প্রযুক্ত হয় না। এই দিক্ দিয়া ষ্টালিনের রুষিয়া বা হিট্‌লারের জর্ম্মণীকে বরং পৃথক্ করাই যায় না। তাহা হইলে, এই সকল দেশগুলিও কি স্বাধীন রাষ্ট্রপদবাচ্য নহে? আমরা বাঙালী জাতিকে অবান্তর চিন্তাধারা অতিক্রম করিয়া জাতীয় সাধনার মূল মর্ম্মমন্ত্র হৃদয়ঙ্গম করিতেই আহ্বান করিব। জাতীয় স্বাধীনতার কেন্দ্র সত্য—জাতীয় কৃষ্টিরই অনুশাসন, ব্যক্তিগত মতামত নয়। এই ব্যক্তি-তন্ত্রের উপর গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও কোথাও কোন দেশে বা যুগে সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হয় নাই। ব্যক্তিতন্ত্রের চরম উৎকর্ষ এনার্কিজম বা স্বেচ্ছাচারতন্ত্র—ইহা মানবসভ্যতার বিধান নয়। বাঙালী অবান্তর লক্ষ্যে স্বাধীনতার মহাবীর্য্য লাভ করিবে না। তাই আমাদের এই আকৃতি। ব্যক্তি যেখানে জাতির সহিত যুক্তি পাইবে, সেইখানেই স্বাধীনতার উন্মেষ—বহুজন এইরূপ একই তত্ত্বে সংযুক্ত হইলে, স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য হয়। আমরা স্বাধীনতার রাষ্ট্র-সাধনায় ব্যক্তিত্বের উৎসর্গনীতি ভুলিতেছি — অধিকারবাদের (doctrine of right) আওতায় কর্ত্তব্যবাদ বা ধর্ম্মবাদ (doctrine of duty) বাঙালীর চিন্তায় বিলীয়মান হইয়া যাইতেছে। ইহা ভারতীয় চিন্তা নয়, পাশ্চাত্য চিন্তাতন্ত্রের দ্বারা অভিভূতিরই আর একটী লক্ষণ মাত্র। বাংলার চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীরগণ এই অভিভব-মুক্ত হইয়া, যথার্থ স্বাধীন

ও জাতীয় সাধনার অধিকারী হউন, এই প্রার্থনাই করি

## স্বাধীনতার কর্ম্মপন্থা

অধ্যাপক ঘোষ তাঁহার অভিভাষণে একটী অতি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন, আমরা উহার সমর্থন করি। তিনি "কর্ম্মপন্থা" প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "দেশের কার্য্য সুচারুরূপে চালাইবার জন্য প্রতি জেলায় অন্ততঃ এক শত স্বেচ্ছাসেবককে whole-time কর্ম্মী করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।" সংগ্রামের জন্য সৈনিক-গঠন তাঁহার লক্ষ্য। এইরূপ সর্ব্বকালীন কর্ম্মী ব্যতীত দেশের গঠনকার্য্যও হয় না। তাই আমরা এই নীতির পক্ষপাতী। কিন্তু সংগ্রামের জন্য একটা সাময়িক বিধান আমরা এই যুগ-সঙ্কটকালে জাতির জাগরণ পক্ষে পর্য্যাপ্ত মনে করি না। জাতির প্রাণশক্তি স্থায়ীভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে যে স্থির নীতি, বস্তুতন্ত্র শ্রম ও একদল সম্পূর্ণ উৎসর্গীকৃত শক্ত-চরিত্রের মানুষের প্রয়োজন, তাহার উল্লেখ অধ্যাপক ঘোষের অভিভাষণে আমরা পাই না। এই নীতি—এজিটেশন বা প্রপোগ্যাণ্ডা নহে, কৃষক ও শ্রমিকের সহিত কৃষক ও শ্রমিক হইয়াই পল্লীজীবন সংগঠিত করিয়া তোলা। সে বিরাট্ কার্য্য দুই দশ দিনের বক্তৃতা বা প্রচারসাধ্য নহে, শ্রেণী-সংগ্রাম বা গণ-সত্যাগ্রহের জন্য পটভূমিকার প্রস্তুতিও তাহা নহে; পরন্তু জীবনব্যাপী শ্রম চালিয়া, দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে নূতন সংহতি, নূতন শিক্ষায়তন, নব নব শিল্প-বাণিজ্যমূলক অর্থকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা। "দেশে রাষ্ট্রনৈতিক পরাধীনতা বজায় থাকিতে আমাদের দেশে নিছক শ্রেণীসংগ্রাম বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না"—ইহা শ্রদ্ধেয় জ্যোতিষবাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। এই রাষ্ট্রনৈতিক পরাধীনতা দূর করিতে, জাতির সকল শ্রেণীভুক্ত মানুষকে লইয়াই স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মকেন্দ্রের সূত্রপাত করিতে হইবে। ইহা দীর্ঘ ও কঠিন সাধনাসাপেক্ষ; জাতীয় সংগঠন একদল মানুষের জীবন-ব্যাপী সাধনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরাধীনতার মধ্যেও যে জাতি সংহতিবদ্ধ জীবনে তাহার বিশিষ্ট কৃষ্টি ও সাধনা সুরক্ষিত করিয়া চলিতে পারে, তাহার স্বাধীনতার সুপ্রভাত নিশান্তে সূর্য্যোদয়ের মতই অনিবার্য্য ও আসন্ন, ইহা অনুভব করা শক্ত নয়। এই নীতি ধরিয়াই ইংলণ্ড শত্রু-সমাক্রান্ত, এমন কি বারম্বার পরাভূত হইয়াও স্বাধীনতা অটুট রাখিবার ভরসা করে—ভারতের পক্ষেও তাহা কেন অসম্ভব হইবে?

## সামরিক শিক্ষা

আমরা ভারতের নিরস্ত্র অবস্থা একটা অর্থপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়াই ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য অস্ত্রগ্রহণ করিতে ভারতের সঙ্কোচ নাই। ইহা হিন্দু শাস্ত্রেরই নির্দ্দেশ। এই ধর্ম্মব্রত প্রণিধান করিতে ভারতবর্ষ অবকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ভারতের ভাগ্যবিধাতা চিরদিন এই নিরস্ত্র অবস্থা বজায় রাখিবেন না। ইহাতে ভগবানের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। ইংরাজ বিধাতারই যন্ত্রস্বরূপ সেই দৈব ইচ্ছার অনুগমনে বাধ্য হইবেন। আমরা এই দিক্ দিয়া ভিতরের ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মুষ্টিপ্রসার ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য করিতেছি। বর্ত্তমান যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়াই যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে দুইটী নূতন সামরিক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে এবং আরও কয়েকটী বিদ্যালয়ের প্রসারবৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহার ফলে, অধিক সংখ্যক সামরিক-যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতবাসী দেশরক্ষার অধিকার পাইবে, জীবিকার্জ্জনেরও পথ পাইবে।

আমরা জানি, এই পথে বাধা আছে—বিশেষতঃ বাঙালীর ন্যায় বৃটন কর্ত্তৃক সমরবিদ্যায় বঞ্চিত জাতির পক্ষে সামরিক শিক্ষা ও সাধনার ক্ষেত্রে আজ সম-পাঙ্‌ক্তেয়তা লাভ করা খুবই দুরূহ। আজ সমুদ্রতটরক্ষিণী সেনাবাহিনীতে বাঙালী তরুণদের গ্রহণ করিয়া গভর্ণমেণ্ট বাঙালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন বটে; কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেণিং-কোর আরও বিস্তৃত করিবার যে প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা নাকচ করিয়া সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গালীকে অনেকটা নিরাশ করিয়াছেন। অবশ্য কলিকাতার নিকটস্থ মফঃস্বলের কোন কলেজ শাখা স্থাপন করা যাইতে পারে বলিয়া তাঁহারা অভিমত

দিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা আজ অন্যদিক্ দিয়া যাহাই হউক, নিছক অর্থ সঙ্কুলানের দিক্ দিয়াই নিকট সম্ভাবনীয়তার মধ্যে পাওয়া যায় না, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বাঙালীর সমর-শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে এখনও গভর্ণমেণ্টের মনে কুণ্ঠা ও অন্তরায়ের কারণ কি?

## ফ্লাউড কমিশনের সিদ্ধান্ত

বাংলার ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে ফ্লাউড কমিশনের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে কর-গ্রহণকারী সকল জমিদার, জোতদার ও দখলী সত্ত্বাধিকারী রায়তদের ভূমি বিষয়ক স্বার্থ ক্রয় করিয়া বর্গাদারদের উহার ভোগদখলাধিকার দেওয়া হউক। এই প্রস্তাব কার্য্যকরী হইলে, বাংলার সামাজিক ও আর্থিক জীবনে যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, চিরস্থায়ী ব্যবস্থা ও জমিদারী প্রথার মূলোচ্ছেদ করায় তাহা একটা যুগান্তকর বিপ্লব বলা যাইতে পারে। ইহার ফলাফল সম্বন্ধে তাই গভর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী উভয়কেই ধীরভাবে চিন্তাপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে হইবে, নতুবা এক শ্রেণীর দারিদ্র্যমোচন করিতে গিয়া সমাজে আর এক শ্রেণীর দরিদ্র সৃষ্টি করাও অসম্ভব নহে। জমিদারের যে ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব ফ্লাউড সিদ্ধান্তে আছে, তাহার অর্থই বা আসিবে কোথা হইতে? এই টাকা ঋণ করিয়া যদি গভর্ণমেণ্ট দেন, সে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত কৃষক প্রজার উন্নতিকল্পে কোনও স্থায়ী উন্নতিমূলক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার সম্ভাবনা গভর্ণমেণ্টের থাকিবে না। ফলতঃ, যে উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাবনা, তাহা আশু কার্য্যে পরিণত হইবে না; ইতিমধ্যে জমিদার ও তালুকদারদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া দরিদ্র কৃষকদের অবস্থা শুধু যথা পূর্ব্বং তথা পরং নয়, আরও জটিল ও দুর্ভাবনাকর হইয়া উঠিবে। দরিদ্র কৃষকদের কল্যাণোদ্দেশ্যেই যে ঋণ-সালিসী প্রথা বা পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি গভর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে যেমন হিতে বিপরীত ফলই হইয়াছে—কৃষকদের অসহায় অবস্থা আরও নিরুপায় ও কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি এই নূতন নীতিও ভাজা কড়ার দাহ যন্ত্রণা লাঘব করিতে গিয়া সমধিক অগ্নিদাহন যন্ত্রণার সৃষ্টি না ক'রে, সেই দিকে কর্ত্তৃপক্ষকে সতর্ক হইতে অনুরোধ করিতেছি।

এই ফ্লাউড কমিশন রিপোর্টে জানা যায় যে—

"(১) জমিদারী ও যাবতীয় মধ্যস্বত্বের উচ্ছেদ সাধন করিয়া বাংলার সমস্ত জমি সরকারী খাসমহলে পরিণত করা বাঞ্ছনীয়।

(২) প্রকৃত চাষী যাহারা, শুধু তাহারাই চাষযোগ্য জমি দখল করিতে পারিবে।

(৩) বর্গাদারগণকে রায়তীস্বত্ব দিতে হইবে। কেবল তাহাই নয়, যাহাতে বর্গাদারদের নিকট হইতে অংশের অধিক ফসল আইনতঃ আদায় করা না যায়, সেইরূপ আইনও প্রণয়ন করিতে হইবে। বর্গাদারগণ রায়তী স্বত্ব পাইবার পর তাহাদের উর্দ্ধতন মালিকের স্বত্ব খাস করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) যাঁহাদের স্বত্ব খাস হইবে, তাঁহারা গভর্ণমেণ্ট হইতে সম্পত্তির নিট আয়ের উপর ক্ষতিপূরণ পাইবেন। ক্ষতিপূরণের হার সম্বন্ধে কমিশন এক মত হইতে পারেন নাই। তাহা ১০, ১২, অথবা ১৫ গুণ হইতে পারে।

(৫) ৫০০৲ টাকার উপরে যাঁহারা ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী, তাঁহারা নগদ টাকা পাইবেন না। কোম্পানীর কাগজ পাইবেন এবং সে বাবদ শতকরা বার্ষিক ৪৲ হারে সুদ পাইতে থাকিবেন। ৬০ বৎসর মধ্যে ক্ষতিপূরণের টাকা শোধ করিয়া দেওয়া হইবে।

(৬) দেবোত্তর ও ওয়াকফ সম্পত্তির বাবদ নিট আয়ের ২৫ গুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। অর্থাৎ বর্ত্তমান আয় যাহাতে হ্রাস না পায় তাহারই ব্যবস্থা হইবে।

(৭) যতদিন না সমস্ত জমি সরকারের খাসে আসিতেছে—ততদিন পর্য্যন্ত কৃষি সম্পর্কিত আয়ের উপর আয়কর ধার্য্য করিতে হইবে।

ইহাই কমিশন রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত মোটামুটী বিবরণ।

ডি, চৌধুরী
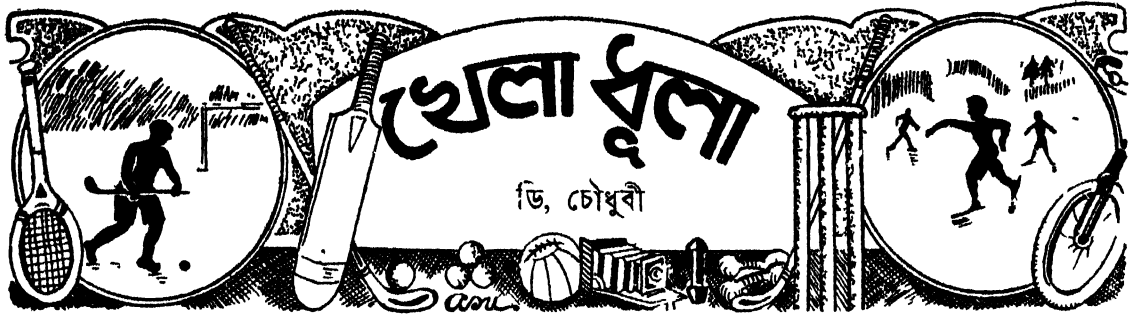
**ফুটবল বিরোধের অবসান**—দীর্ঘ এক বৎসর ধরিয়া কলিকাতা ফুটবল খেলা লইয়া যে অপ্রীতিকর ঘটনা, অখেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি এমন কি খেলার মাঠে সাম্প্রদায়িকতার আবির্ভাব লইয়া ক্রীড়ামোদীদের বাংলার ফুটবল খেলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল, সম্প্রতি তাহা অবসান হইতে চলিল দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব আই-এফ-এ'র পরিচালিত লীগ খেলায় পুনরায় যোগদান করিয়াছে। যে সর্ত্তে তাহারা যোগ দিয়াছে উহা বহুদিন পূর্ব্বেও সম্ভব হইত। আই-এফ-এ সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে দাঁড়াইয়া এই পথ সর্ব্বদাই খোলা রাখিয়াছিল। এখন আই-এফ-এ কর্ত্তৃক নূতন নিয়মতন্ত্র গঠনের পর সমস্ত ক্লাব উহা মানিয়া লইলে এই বিরোধের সম্পূর্ণ মীমাংসা হইল, বুঝা যাইবে।

গত বৎসরের লীগ খেলার শেষের দিকে এই বিরোধের সূত্রপাত হয়। মহামেডান স্পোর্টিং, কালীঘাট ও ইষ্ট বেঙ্গল এই তিনটী বিশিষ্ট ক্লাব আই-এফ এ'র পরিচালক মণ্ডলীর নিকট খেলায় রেফারীর ত্রুটী-বিচ্যুতি ও লীগ খেলার তালিকা নির্ম্মাণে উপরোক্ত ক্লাবসমূহের অসুবিধা ইত্যাদির অভিযোগ করিয়া তাহার প্রতিবিধান না হওয়া পর্য্যন্ত খেলা বন্ধ করিবার হুমকী দেখান এবং পরে লীগ খেলা বন্ধ করে। আই-এফ-এ'র পরিচালকগণ ইহাতে বিচলিত না হইয়া এই তিনটী ক্লাবের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ইহাতে এই তিনটী ক্লাব আই-এফ-এর সংস্রব ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র 'বেঙ্গল ফুটবল এসোসিয়েশন' গঠন করে এবং একটা কাপ খেলারও ব্যবস্থা করে। আই-এফ-এর ২১টী নিম্নশ্রেণীর ক্লাব ব্যতীত আই-এফ এর অন্তর্ভুক্ত কোন ক্লাব উক্ত এসোসিয়েশনে যোগদান করে নাই। কাজেই তাহাদের প্রতিযোগিতা নৈরাশ্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। গত বৎসর হইতে এই বিরোধের অবসানের জন্য অনেকবার চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। এই বৎসরের ফুটবল মরশুমের পূর্ব্বে কয়েকজন বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদীর প্রচেষ্টায় আই-এফ-এ ও বি এফ-এর সম্মতিক্রমে উভয়ের দুইজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া একটী বিরোধ মীমাংসা-কমিটী গঠিত হয়। উক্ত কমিটীর সর্ত্তসমূহ উভয় পক্ষ মানিয়া লইবে, স্থির হয়। উক্ত কমিটীর সর্ত্তসমূহ প্রস্তুত হইলে আই-এফ-এ, ইষ্ট বেঙ্গল ও কালীঘাট উহা মানিয়া লয় এবং ইষ্ট বেঙ্গল ও কালীঘাট আই-এফ-এতে পুনঃ যোগদান করে, কিন্তু মহামেডান স্পোর্টিংএর কর্ত্তৃপক্ষগণ এই সর্ত্ত মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হন, তাহারা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে আই-এফ-এর পরিচালকমণ্ডলীতে প্রতিনিধি দাবী করেন। আই-এফ এর পরিচালকমণ্ডলী এইরূপ সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রশ্রয় দিতে রাজী হন না। ইহাতে নূতন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ইহার পর কলিকাতার পুলিস কমিশনার মহামেডান স্পোর্টিংএর দাবী পূরণ না করিলে খেলার মাঠে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিবার সম্ভাবনার কথা এবং উক্ত দাঙ্গা বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনায় পুলিস কমিশনার সমস্ত খেলা বন্ধ করিয়া দিতে হয়ত বাধ্য হইবেন বলিয়া আই এফ-এর সভাপতিকে জানান। আই-এফ এ ইহাতে ভীত না হইয়া মহামেডান স্পোর্টিংকে বাদ দিয়া ফুটবল লীগ খেলা চালাইতে থাকেন। এদিকে মুসলমান ক্রীড়ামোদীগণ তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়া একটী সমর-পরিষদ গঠন করে এবং সভা করিয়া বাংলা সরকারকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে এবং একটী অনুসন্ধান-সমিতি গঠন করিতে অনুরোধ করে। বাংলা সরকার একটী সালিশী বোর্ড গঠন করেন। এই সালিশী বোর্ডের তিনজন সভ্যের মধ্যে

মহামেডান স্পোর্টিংএর সহঃ সভাপতি একজন থাকায় আই-এফ-এ এই বোর্ডের সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করে। পুনরায় গবর্ণমেণ্ট নূতন বোর্ড গঠন করিয়া আই-এফ-একে সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করে। বাংলা গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী ও কলিকাতার পুলিস কমিশনার আই-এফ-এর সভাপতিকে শীঘ্র মহামেডান কর্ত্তৃপক্ষের সর্ত্তানুসারে একটা মিটমাট করিবার জন্য চাপ দিতে থাকেন। আই-এফ-এর সভাপতি কিন্তু খেলার মাঠে সাম্প্রদায়িকতা মনোভাবের প্রশ্রয় দিতে কিছুতেই রাজী না হইয়া দৃঢ়তা প্রকাশ করেন। আই-এফ-এও তাহার সভাপতিকে সমর্থন করে। এই অবস্থায় দার্জ্জিলিঙে এই বিষয়ে মন্ত্রীবর্গের এক বৈঠকের পর তিনজন মন্ত্রীকে কলিকাতায় আসিয়া মিটমাট করিবার জন্য ব্যগ্র দেখা যায়। যাহা হউক মহামেডান স্পোর্টিংএর সভাপতির সহিত আই-এফ-এর সভাপতির আলাপ-আলোচনায় এবং উভয়ের রচিত সর্ত্তাবলী গ্রহণে এই ফুটবল বিরোধের সম্প্রতি অবসান হইয়াছে। এই সর্ত্ত সমূহের মধ্যে আই-এফ-এর পরিচালকমণ্ডলীতে প্রতিনিধির স্থান লইয়া যে প্রধান সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল তাহাতে এই স্থির হয় যে, নূতন নিয়মতন্ত্র গঠন না হওয়া পর্য্যন্ত মহামেডান স্পোর্টিংএর প্রতিনিধি ব্যতীত আরও দুইজন প্রতিনিধি দুইটা মুসলমান ক্লাবের প্রতিনিধি হিসাবে আই-এফ-এর পরিচালকমণ্ডলীতে স্থান পাইবেন।

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি খেলার মাঠে রাজনীতির ন্যায় যেন সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি প্রশ্রয় না পায়। আই এফ-এও তাহার বর্ত্তমান সভাপতি ও গত বৎসরের সভাপতি সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিরুদ্ধে যে দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। আমরা মহামেডান স্পোর্টিংএর বর্ত্তমান সভাপতি এই মীমাংসার জন্য যে খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব প্রদর্শন করিয়া কলিকাতার ফুটবল খেলায় এই বিরোধ মীমাংসার সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি এবং এই বিষয়ে আই-এফ-এর পরিচালকমণ্ডলী ও তাঁহার সভাপতি মহাশয়কেও আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

**কলিকাতায় ফুটবল মরসুম**—কলিকাতা ফুটবল লীগের বিভিন্ন বিভাগের খেলা খুব উত্তেজনা ও উৎসাহের সহিত আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম বিভাগের খেলায় লীগ চ্যাম্পিয়ন কে হইবে ইহা লইয়া ক্রীড়ামোদিগণ গোড়া হইতেই জল্পনা-কল্পনা সুরু করিয়াছে। তার উপর ফুটবল খেলার বিরোধ অবসানের পর মহামেডান স্পোর্টিং লীগে যোগদান করায় খেলায় উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লইয়া প্রবল প্রতিযোগিতা হইবে বলিয়া ক্রীড়ামোদিগণ আশা করিতেছে। মাঠে মুসলমান ক্রীড়ামোদিগণের ভীড়ও বাড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ক্লাবের সমর্থকগণ তাদের নিজস্ব ক্লাবকে উৎসাহ দান করিতেছে। এই বৎসর প্রথম বিভাগে বহু বাঙ্গালী পরিচালিত ক্লাব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে এবং সুখের বিষয় এই যে, এইবার বাঙ্গালার বাহির হইতে খেলোয়াড় আমদানীর হিড়িক কিছুটা কমিয়াছে এবং বাঙ্গালী যুবকেরা খেলার সুযোগ পাইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস বাঙ্গালী খেলোয়াড়েরা ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ পাইলে ভবিষ্যতে আর আমাদের বাহিরের খেলোয়াড়ের আশায় অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে না।

জোসেফ (কালীঘাট)

লীগ খেলার গোড়ার দিকে খেলোয়াড় বাছাই লইয়া প্রত্যেক ক্লাবের একটা সমস্যা দাঁড়ায়। ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষগণ কোন্ খেলোয়াড় কোন্ স্থানের উপযুক্ত ইহা পরীক্ষা করিতে গিয়া লীগের প্রথম দিকের খেলায় মূল্যবান পয়েণ্ট নষ্ট করে এবং পরে এই মূল্যবান পয়েণ্টের জন্য অনুশোচনা করে। অনুশীলন-খেলার ব্যবস্থা করিয়া খেলোয়াড় নির্ব্বাচন না করিয়া লীগের খেলায় খেলোয়াড় পরীক্ষা চলিলে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক হইতে অনেক সময় লাগে এবং রক্ষণ-বিভাগের খেলোয়াড়ের সহিত আক্রমণ বিভাগের খেলার যোগাযোগ ও আদান প্রদান ইত্যাদি ঠিক করিয়া লইতে লীগ খেলায় অর্দ্ধেক দিন চলিয়া যায়। আমরা এই দিকে ক্লাব-কর্ত্তৃপক্ষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

এইবার লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লইয়া পাঁচটী ক্লাবের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। খেলার গোড়া হইতে কালীঘাট ক্লাব অপরাজেয় থাকিয়া প্রথম স্থান দখল করিয়া থাকে। ইষ্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও রেঞ্জার্স কালীঘাটকে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে থাকে। এদিকে মহামেডান স্পোর্টিং যোগদান করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়াইয়া দিয়াছে। এই পাঁচটী ক্লাবের মধ্যেই চ্যাম্পিয়নশিপ লইয়া প্রতিযোগিতা চলিবে।

এই লেখা লিখিবাব সময় গত বৎসরের লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান তাহাদের লীগের অর্দ্ধেক খেলা সমাপ্ত করিয়া ১২টী খেলায় ১৮টী পয়েন্ট লাভ করিয়া প্রথম স্থান দখল করিয়া আছে। মোহনবাগান ১২টী খেলা খেলিয়াছে, তাহার মধ্যে ৯টী খেলায় জয়লাভ করিয়াছে ও তিনটী খেলায় পরাজিত হইয়াছে। মোহনবাগান এই বৎসরের প্রথম খেলায় রেঞ্জার্স এর কাছে দুই গোলে পরাজিত হয়। এইদিন মোহনবাগানেব হার—খেলা অনুযায়ী ফল ঠিকই হইয়াছে। খেলোয়াড় নির্ব্বাচন ইহার জন্য কতকটা দায়ী। দ্বিতীয় খেলায়ও কালীঘাটের কাছে ১ গোলে মোহনবাগান পরাজিত হয়। এই খেলার ফলাফল সমান হইলে সঙ্গত হইত। ইহাব পর মোহনবাগান উপর্য্যুপরি চারিটী খেলায় জয়লাভ করে, পরে ইষ্টবেঙ্গলের কাছে মোহনবাগানের ১ গোলে পরাজয় অপ্রত্যাশিত। মোহনবাগান এই হারের পর সচেতন হইয়াছে। পুরাতন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের সঙ্গে নূতন তরুণ খেলোয়াড়ের সমন্বয়ে মোহনবাগান দল এইবার বিশেষ পুষ্ট হইয়াছে। ইহার পর পাঁচটী খেলায় পর পর মোহনবাগান জয়ী হইয়া লীগের প্রথমার্দ্ধে শীর্ষস্থান দখল করিয়া আছে। শেষ খেলায় দুর্দ্ধর্ষ মহামেডান স্পোর্টিংকে ২ গোলে পরাজিত কবিয়া মোহনবাগান বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে এবং তাহাদের সমর্থকের প্রাণে উৎসাহ সঞ্চাব করিয়া পুনরায় লীগ চ্যাম্পিয়ন হইবার আশা জাগাইয়াছে। মোহনবাগান লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধেও যদি এই ধরণের খেলা খেলিতে পারে তাহা হইলে তাহারা পুনঃ যে চ্যাম্পিয়ন হইবে ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়। মোহনবাগানের রক্ষণ ভাগে পরিতোষ চক্রবর্ত্তী, তারক চৌধুরী, এস্‌, পরামাণিক, অনিল দে, নীলু মুখার্জ্জি বিশেষ দক্ষতায় পরিচয় দিতেছে। আক্রমণ ভাগে মোনা গুঁই, ও নির্ম্মল মুখার্জ্জিও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছে। এ, রায় চৌধুরী প্রাণপণ করিয়া খেলিতেছে। দুইটী 'ইন' যদি যোগ্যতার সহিত খেলিতে পারিত তাহা হইলে মোহনবাগানকে হারান এক রকম অসম্ভব হইত।

কালীঘাট ক্লাব লীগের গোড়া থেকে দশটী খেলায় অপরাজিত থাকিয়া অবশেষে এরিয়ানের কাছে পবাজয় বরণ কবিয়াছে। তাহারা পাঁচটী খেলায় জয়ী হইয়াছে পাঁচটী খেলার ফলাফল সমান হইয়াছে ও একটী খেলায় পরাজিত হইয়াছে, এগারটী খেলা খেলিয়া ১৫ পয়েন্ট লাভ করিয়াছে। তাহাদের আক্রমণ ভাগের খেলায় জোসেফ, রামালু ও আপ্পারাওয়েব মধ্যে ভাল বোঝাপড়া থাকায় এবং প্রত্যেকে পায়ের আয়ত্ত-কৌশলে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া আদান প্রদান খেলায় তাহারা দর্শকদের পুলকিত করিতে পারে। তাহারা সারা মাঠে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া কৃতিত্ব অর্জ্জন করে কিন্তু গোলের অতি নিকটে গিয়াও যে ভাবে গোলের সুযোগ নষ্ট করে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। শুকনা মাঠে তাহাদের খেলা নয়নমুগ্ধকর হয় কিন্তু ফলপ্রসূ হয় না বলিয়া তাহারা লীগে এখন তৃতীয় স্থানে নামিয়াছে। বর্ষা আরম্ভ হইলে হয়ত তাহাদের আরও নামিতে হইবে। কালীঘাটের গোল রক্ষক ভিন্ন তাহাদের রক্ষণ ভাগও বিশেষ পুষ্ট নয়।

লক্ষ্মীনারায়ণ (ইষ্টবেঙ্গল)

ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব প্রায় ২।৩ বৎসর লীগ বিজয়ী হইবার মত হইয়াই দুর্ভাগ্য বশতঃ লীগ-বিজয়ী হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। শেষ সময় দুর্ব্বল টীমের কাছে হয়ত পরাজয় স্বীকার করাতে এইরূপ ঘটিয়াছে। এই বৎসর তাহারা গোড়া হইতেই যত্ন সহকারে খেলা আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু খেলোয়াড় নির্ব্বাচন সমস্যা এখনও তাদের শেষ হয় নাই। কোন্ দিন তাহারা জয়লাভ করিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। দুর্দ্ধর্ষ দলের সহিত ভাল খেলিয়াও দুর্ব্বল

টীমের কাছেও তাহারা এই বৎসর পরাজিত হইয়াছে বা 'ড্র' করিয়াছে। তাহারা এ পর্য্যন্ত এগারটী খেলা খেলিয়াছে—ছয়টীতে জয়লাভ করিয়াছে, চারিটীর ফলাফল সমান, একটী খেলায় পরাজিত হইয়াছে। তাহারা লীগে এখন মোহনবাগান অপেক্ষা একটী খেলা কম খেলিয়াও ১১টী খেলায় ১৬ পয়েণ্ট পাইয়া দ্বিতীয় দান দখল করিয়া আছে। ইষ্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক ডি সেন গত বৎসর বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে, এ বৎসরও এই এগারটী খেলায় মাত্র তাহার বিরুদ্ধে ৪টী গোল হইয়াছে। ইহাতে তাহার ও ব্যাকদ্বয়ের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। এই বৎসর ব্যাক প্রমোদ দাসের চেয়ে রাখাল মজুমদারের খেলায় উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। হাফ ব্যাকগণ বিশেষ ভাল না হইলেও খুবই পরিশ্রমী। আক্রমণ ভাগের খেলার উন্নতি সাধন করিতে পারিলে ইষ্ট বেঙ্গল এ বৎসরও

সন্মথ দত্ত (মোহনবাগান) রসিদ (মহামেডান)

শেষ পর্য্যন্ত লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে।

রেঞ্জার্স গোড়া হইতে ভাল ভাবেই খেলা আরম্ভ করে কিন্তু তাহাদের খেলার কোন নিশ্চয়তা নাই। তাহারা ১২টী খেলা খেলিয়া ১৫ পয়েণ্ট লাভ করিয়াছে। ছয়টী খেলায় জয়লাভ করিয়াছে—তিনটী খেলার ফলাফল সমান এবং তিনটী খেলায় পরাজিত হইয়াছে। তবে লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বৃষ্টি হইলে তাহারা ভাল ফল করিবে আশা করা যায়।

মহামেডান স্পোর্টিং লীগের প্রায় প্রত্যেকের ৬।৭টী খেলা শেষ হইবার পর লীগে যোগদান করিয়াছে। তাহাদের প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ ৩টি করিয়া খেলা খেলিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত তাহারা ৬টী খেলায় ৮টী পয়েণ্ট লাভ করিয়াছে। কাষ্টমস্ ও ই-বি-আর-এর সঙ্গে সমান সমান ফল ও মোহনবাগানের কাছে দুই গোলে পরাজিত হইয়াছে। ভবানীপুর পুলিস ও ক্যালকাটাকে পরাজিত করিয়াছে। এই বৎসর একমাত্র করিম ও সেকেন্দার ব্যতীত তাহারা তাহাদের পুরাতন খেলোয়াড়দের খেলাইতেছে। কলিকাতার গত কয়েক বৎসরের শ্রেষ্ঠ ফরওয়ার্ড রসিদ পুনরায় রীতিমত খেলায় যোগদান করিতেছে। এখনও তাহার পুরাতন খেলার নমুনা খেলায় দৃষ্ট হইতেছে। আরও খেলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুরাতন খেলা খুলিবে আশা করা যায়। মহামেডান স্পোর্টিং যে কয়েকটী খেলা খেলিয়াছে তাহাতে তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব গৌরব অনুযায়ী খেলিতে পারেন নি। অবশ্য খেলোয়াড়দের বয়োবৃদ্ধি ইহার একটী প্রধান কারণ বলিয়া মনে হইতেছে। ক্রমশঃ অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আরও ভাল খেলিতে না পারিলে তাহাদের লীগ চ্যাম্পিয়ন হইবার আশা কম। তাহাদের মাত্র ছয়টী খেলা হইয়াছে কাজেই এ সম্বন্ধে এখনও সঠিক করিয়া কিছু বলা সম্ভব নহে। তবে লীগ প্রতিযোগিতায় তাহারা যে বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়।

প্রথম বিভাগের বাকী অন্যান্য দলের খেলার মধ্যে বর্ডার রেজিমেণ্ট গোড়ার দিকে খুবই ভালভাবে খেলা আরম্ভ করিয়াছিল কিন্তু এখনও তাহারা ভাল খেলিয়া পরাজিত হয়। অন্যান্য দলের খেলায় এ বৎসর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নহে। নিম্নবিভাগে নামিবার ভয়ে ভবানীপুর পুনঃ নূতন উদ্যমে খেলা আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা ১২টী খেলা খেলিয়া মাত্র ৪টী পয়েণ্ট লাভ করিয়াছে। প্রথম বিভাগে নবাগত স্পোর্টিং ইউনিয়ন আরও ভাল না খেলিলে ভবানীপুরের সহিত তাহাদের নিম্নবিভাগে নামিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিবে। ক্যালকাটাকে এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

"প্রবর্ত্তক" ছাপা হইবার সময়ে প্রথম বিভাগের লীগ তালিকা এইরূপ :—

| | মোট খেলা | জয় | সমান-পাল্লা | পরাজয় | জয়াঙ্ক |
|---|---|---|---|---|---|
| মোহনবাগান | ১২ | ৯ | ০ | ৩ | ১৮ |
| ইষ্টবেঙ্গল | ১১ | ৬ | ৪ | ১ | ১৬ |
| কালীঘাট | ১১ | ৫ | ৫ | ১ | ১৫ |
| রেঞ্জার্স | ১২ | ৬ | ৩ | ৩ | ১৫ |
| বর্ডার রেজিমেণ্ট | ১১ | ৫ | ২ | ৪ | ১২ |
| কাষ্টমস এ সি | ১৩ | ৩ | ৫ | ৫ | ১১ |
| ই বি আর | ১১ | ৩ | ৫ | ৩ | ১১ |
| এরিয়ান্স | ১১ | ৩ | ৩ | ৫ | ৯ |
| পুলিশ এ সি | ১২ | ৩ | ৩ | ৬ | ৯ |
| ক্যালকাটা এফ সি | ১২ | ৩ | ৩ | ৬ | ৯ |
| মহমেডান স্পোর্টিং | ৬ | ৩ | ২ | ১ | ৮ |
| স্পোর্টিং ইউনিয়ন | ১১ | ২ | ৩ | ৬ | ৭ |
| ভবানীপুর | ১১ | ২ | ০ | ৯ | ৪ |

# সাময়িকী

## বঙ্গীয় মহাকোষ

'বঙ্গীয় মহাকোষে'র প্রধান সম্পাদক পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাঁহার আরব্ধ কার্য্য মহাকোষের প্রকাশকার্য্য সম্বন্ধে আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা শুনিয়া আশান্বিত হইলাম যে, মহাকোষের মুদ্রণ ও প্রকাশকার্য্য যথারীতি ও যথাপূর্ব্বই চলিতেছে। এই বিরাট্ কোষগ্রন্থ সঙ্কলনের জন্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রায় ৪০ বৎসর পরিশ্রম করিয়া যে মালমশলা রাখিয়া গিয়াছেন তাহার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার যাহাতে হইতে পারে, তাহার জন্য বাংলার দরদী সুধীবৃন্দের একযোগে তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। মহাকোষের অনেক বিষয়বস্তু বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রস্তুত রাখিয়া গিয়াছেন শুনিয়াও আমরা আশান্বিত হইলাম।

এই বিরাট্ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে বাঙলার এক অমূল্য সম্পদ্ হইবে এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষিত হইবে। যাঁহারা এই কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

## কালীমোহন ঘোষ

বিগত ২৯শে বৈশাখ প্রসিদ্ধ কর্ম্মী ও দেশসেবক কালীমোহন ঘোষ পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। তাঁহার সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। কালীমোহনের আনাড়ম্বর জীবন, অমায়িক ব্যবহার ও অকপট সারল্য মানুষ মাত্রকেই আকর্ষণ করিত। দেশ-বিদেশের সুদীর্ঘ ও সুনিবিড় অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি শ্রীনিকেতনের পল্লী-সংগঠন কার্য্যে আত্মদান করিয়াছিলেন এবং প্রভূত সাফল্য লাভও করিয়াছিলেন। সমবায় প্রণালীতে কর্ম্মপরিচালনা ব্যাপারে তিনি অগাধ অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কথার চেয়ে তিনি কাজের লোক ছিলেন বেশী। এ হতভাগ্য দেশে এইরূপ লোকের স্থান সহজে পূরণ হইবার নয়।

## শ্রাদ্ধ-বাসর

"কুলং পবিত্রং জননী পবিত্রা।"—একজন দেবব্রতী যে কুলে জন্মগ্রহণ করে, সেই কুল পবিত্র, সে সন্তানের জনক জননী কৃতকৃতার্থ হয়। এই দেবব্রতী—পুরুষ বা নারী দুইই হইতে পারে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা-যুগ হইতে নির্ম্মলাবালা এমনই একজন সঙ্ঘমন্ত্রের নারী সাধিকা। তাহার মাতাঠাকুরাণী কালীদাসী গত ২৮শে মে তারিখে পরলোকে গমন করিয়াছেন। নির্ম্মলার মধ্যে যে শুদ্ধা

৺কালীদাসী

ভক্তি ও সেবাশীল প্রকৃতির স্বচ্ছ বিকাশ আমরা দেখিয়াছি তাহার মূল খুঁজিলে তাহার এই গর্ভধারিণী জননী ঠাকুরাণীর কথাই মনে পড়ে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার গৃহ তাঁহারই ভক্তি-স্নেহের অনাবিল প্রবাহে অনুলিপ্ত, বহু ভক্ত সাধক-সাধিকার কলকণ্ঠে মুখরিত দেখিয়াছি। এই স্নেহময়ী ভক্তিমতী নারীর হৃদয়-মাধুর্য্যে তাহারা আকৃষ্ট হইত। ৺কালীদাসী শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবদাস শীলের সতী সাধ্বী পত্নী ছিলেন।

মৃত্যুর চতুর্থ দিবসে প্রবর্ত্তক আশ্রমের মাতৃ-মন্দিরে সঙ্ঘমণ্ডলীর সম্মুখে নির্ম্মলা মাতাঠাকুরাণীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করে। সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায় মহাশয় এই উপলক্ষে যে স্বস্তি-ভাষণ প্রদান করেন, তাহা মর্ম্মস্পর্শী এবং বিগতাত্মার কল্যাণপ্রদ। এই শ্রাদ্ধ-বাসরে শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবদাসবাবুও উপস্থিত ছিলেন।

## নৃত্যশিল্পী রবীন গাঙ্গুলী

বিগত ৫ই মে ই, বি, আর ম্যানসনে নিঃ-বঃ সঙ্গীত-সমিতি কর্ত্তৃক যে চতুর্থ বার্ষিক নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে উদীয়মান নৃত্যশিল্পী শ্রীমান রবীন গাঙ্গুলী বিচিত্র নৃত্য প্রদর্শনে প্রথম স্থানাধিকার করিয়া উপস্থিত সকলেরই প্রশংসার্জ্জন করিয়াছে এবং বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হইয়াছে। মাত্র ১৩।১৪ বৎসর বয়সে বালক রবীন গাঙ্গুলী যে নৃত্য- নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে তাহাতে তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই আশা করা যায়। সুদর্শন শ্রীমানের শারীর-গঠনও নৃত্যানুকূল। সনিষ্ঠ অনুশীলনে শ্রীমানের কলাকুশলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক, এই শুভেচ্ছাই জ্ঞাপন করি। শ্রীমান জনপ্রিয় সৌখীন অভিনেতা বটু গাঙ্গুলীর কৃতী পুত্র।

রবীন গাঙ্গুলী

## বর্ষ-প্রবন্ধপঞ্জী

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, সুসাহিত্যিক শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন মাসিক পত্রের প্রবন্ধগুলি সঙ্কলন করিয়া শ্রেণীবিভাগ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে ভাবী গবেষণা-কার্য্যে শুধু সহায়তা করিবে না, বাংলা সাহিত্যকেও প্রভূত প্রবৃদ্ধি করিবে। বাংলার তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে এদিকে যত বেশী মনোযোগ আকৃষ্ট হয় ততই মঙ্গল। এই শুভ প্রচেষ্টার জন্য শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রশংসার্হ।

## সঙ্ঘের শিক্ষা-বিভাগ

এবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় চন্দননগর প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থী ভবন হইতে মোট সাতজন ছাত্র পরীক্ষা দেয়। তন্মধ্যে শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মিত্র প্রথম বিভাগে, শ্রীসচ্চিদানন্দ মুখার্জ্জী ও শ্রীস্মরজিৎ শর্ম্মা দ্বিতীয় বিভাগে এবং শ্রীঅমলেন্দু রায় তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র অঙ্ক, মেকানিক্স এবং ইতিহাসে 'লেটার' পাইয়াছে।

চট্টগ্রাম প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠের শ্রীমান শচীন্দ্রলাল দাস ১ম এবং শ্রীমান সুখেন্দুবিকাশ দাস ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই দুইজনই এবার পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল।

## ইণ্ডিয়ান জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েশন

এই সঙ্ঘের ১৯৩৯ সালের রিপোর্ট আমরা পাইয়াছি। ১৯২২ সালে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা। এই সঙ্ঘ বর্ত্তমানে ৯৫টি সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা এবং সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিভূ। ১৯৩৯ সালে ২৭ জন নূতন সভ্য সংযোজিত হইয়াছে এবং সঙ্ঘের বার্ষিক আয় ও ব্যয় যথাক্রমে ৬৩৩৷৫ এবং ৫৩৩৷৴১০ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন দিক দিয়া এই সঙ্ঘ যে সকল কার্য্য করিয়াছে তাহাও প্রশংসনীয়। এই সঙ্ঘের পরিচালনাধীন 'ওয়ার্কিং জার্ণালিষ্ট বেনিফিট ফাণ্ড' একটি প্রশংসনীয় উদ্যম এবং ইহার ক্রমবর্দ্ধন ও পরিপোষণে, আশা করা যায়, একদিন ইহা দৈন্যপীড়িত সংবাদপত্রসেবীর সান্ত্বনাস্থল হইবে। সাধারণতঃ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও অভিপ্রায় সিদ্ধির অপপ্রচেষ্টা হেতু এদেশে কোন মহত্তর কল্যাণ সিদ্ধ হইতে পারে না। আমরা আশা করি, সমান আকুতি ও ঐক্যবদ্ধ অভিপ্রায়ে উদ্বুদ্ধ হইয়া সঙ্ঘের ব্যষ্টি ও সমষ্টি এই 'ইণ্ডিয়ান জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েশন'কে একটি বৃহত্তর কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবে।

## নবদ্বীপ পূর্ণিমা সম্মেলন

গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে স্থানীয় এডোয়ার্ড লাইব্রেরী ভবনে নবদ্বীপ পূর্ণিমা সম্মেলনের দশম বার্ষিক অধিবেশন

নবদ্বীপ পূর্ণিমা সম্মেলনের সভাপতি ও কার্য্যকরী সদস্যবৃন্দ

অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ-কবিতাদি পঠিত হয় এবং সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা চলে। পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ, পণ্ডিত শ্যামাচরণ বিদ্যার্ণব, পণ্ডিত হরিদাস গোস্বামী, বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিত অমরনাথ তর্কতীর্থ, পণ্ডিত দেবনারায়ণ গোস্বামী কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত রমেশ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত জনরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত বিশ্বজীবন ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক বীরেশ্বর বসু প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীগণ এই আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া আলোচনাটিকে প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য করিয়া তুলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা, সংবাদপত্র সেবা ও সাহিত্যানুশীলনের বিচিত্র জ্ঞানগর্ভ কাহিনী বিবৃত করেন। বৈষ্ণব সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ইতিহাস ও গতি পর্য্যালোচনা করিয়া বাংলার সাহিত্যসেবীগণের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বহু সারগর্ভ উপদেশ তিনি প্রদান করেন।

বহু এবং বিচিত্র প্রতিকূলতা ও বাধা-বিঘ্নের মধ্যে এই সম্মেলনটি দশ বৎসর টিকিয়া আছে সত্য, কিন্তু যে অফুরন্ত সঙ্ঘবদ্ধ প্রাণ গতিকে ক্রমপরিস্ফুট ও স্বচ্ছ করিয়া তুলে এবং নিত্যনূতন সবুজ তারুণ্যে অভিসিঞ্চিত করিয়া গতানুগতিকতার দায়মুক্ত করে, সেই প্রবহমান প্রাণের অভাব সর্ব্বক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও দৃষ্ট হয়। নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটি ও সুধীমণ্ডলীর দরদী দৃষ্টি যদি এদিকে আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে নবদ্বীপের সাহিত্য-সাধনার প্রাক্‌গৌরব এই সম্মিলনটীকে কেন্দ্র করিয়াই পুনঃ প্রতিষ্ঠা পাইতে পারে।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
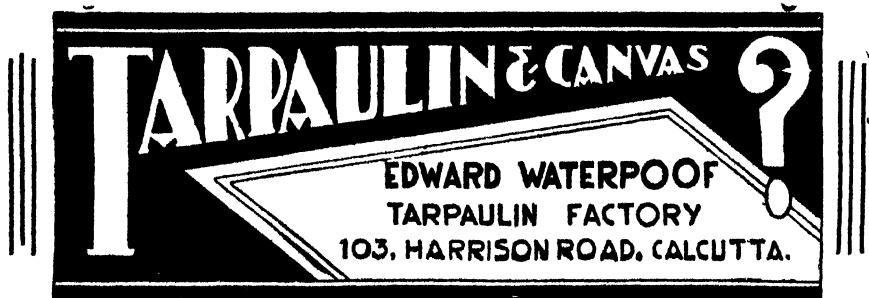


পরিচালক ও প্রকাশক : শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ, প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
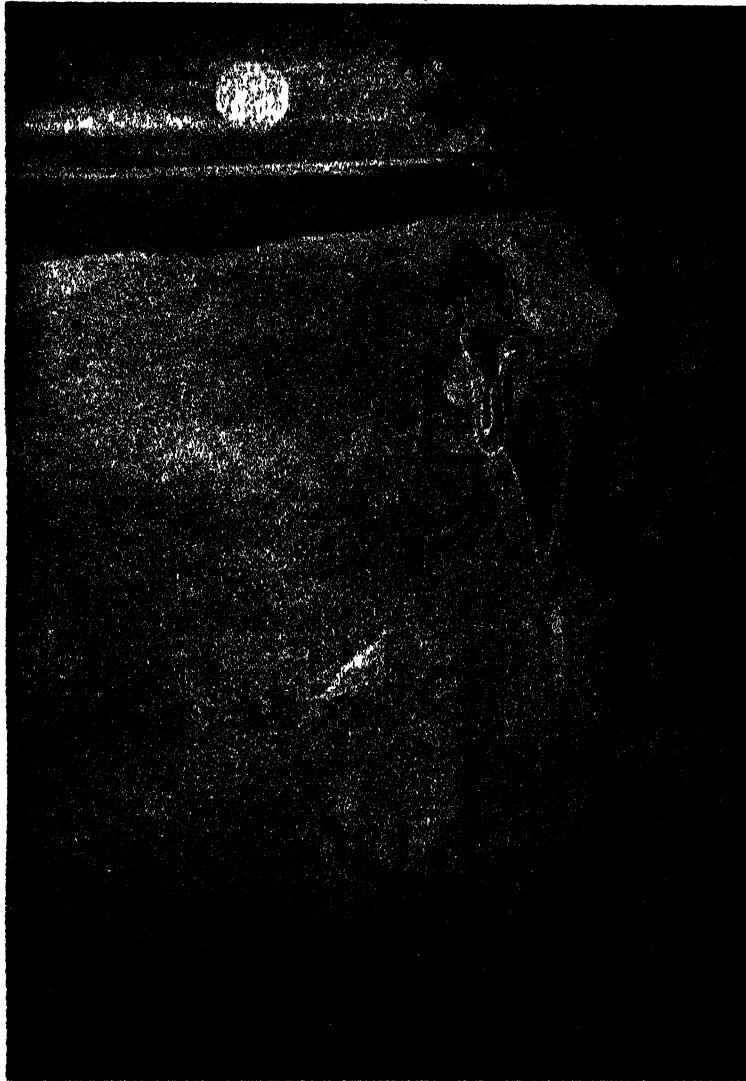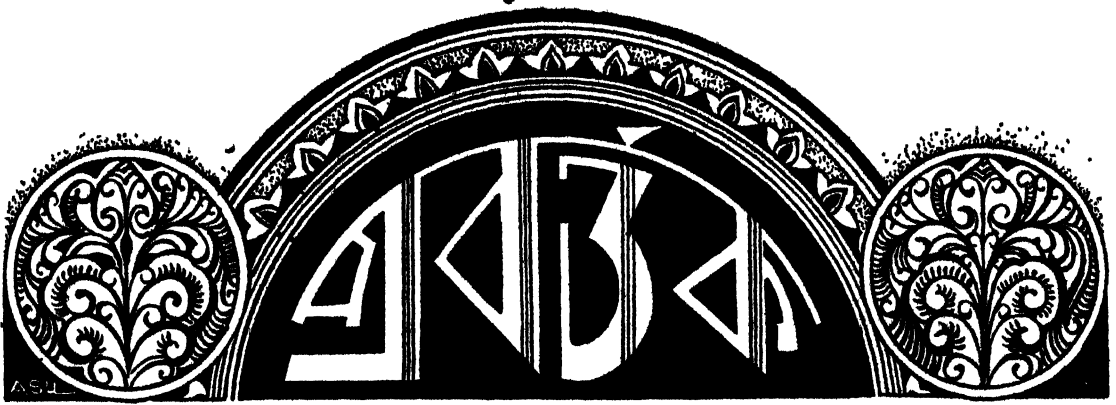
# রজত জয়ন্তী

## সঙ্ঘের কর্ম্ম-যুগ

লোক ও অর্থবলের উপর ভিত্তি করিয়া সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তাই কোন দিন 'সঙ্ঘ' বা সঙ্ঘগত কোন ব্যক্তি যদি লোকবল ও অর্থবলই শ্রেয়ঃ করে, তবে সঙ্ঘের ভিত্তি বালুর উপর হইয়াছে এবং সঙ্ঘগত এই ব্যক্তিও সঙ্ঘ সত্তার সত্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই, এইরূপ বুঝিতে হইবে। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতি বাহিরের শক্তির উপর নির্ভর করে না, ইহার অধ্যাত্ম-ভিত্তি সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠার মুখ্য হেতু। ব্রহ্মবীর্য্য যেমন সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের শক্তি ও জ্ঞানসমন্বিত, যুগবীর্য্য সঙ্ঘও তদ্রূপ আত্মপ্রকাশের যাবতীয় শক্তি ও ঐশ্বর্য্যে অন্বিত। সঙ্ঘ আত্মিক বল। এই বলের অনুশীলনেই তাহার ব্যাপ্তি ও প্রতিপত্তি। কোন প্রলোভন, প্রশংসা, লোকপ্রিয় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সঙ্ঘধর্ম্মীর থাকিতে নাই। যদি কোথাও দৈন্য থাকে, তাহা সঙ্ঘের নহে—সঙ্ঘ-সাধনায় অপূর্ণাঙ্গ সাধকের উহা অবস্থা। সঙ্ঘ-বীর্য্য তার পরিপূর্ণ প্রকাশের শক্তি ও আনন্দে বিভূতিমান্। সঙ্ঘাত্মার ভিতর দিয়াই প্রয়োজনমত ঈশ্বর-শক্তি আত্ম-প্রকাশ করিয়া চলে কর্ম্মে, অর্থে ও প্রতিপত্তিতে; কিন্তু এইগুলি সবই সঙ্ঘের গৌণ প্রকাশ।

সঙ্ঘ একটী তত্ত্ব। অদ্বয়, শাশ্বত, অখণ্ড ব্রহ্মানন্দের অভিব্যক্তি সঙ্ঘে। সঙ্ঘ সাধ্যরূপে গ্রহণ করা অর্থে ঈশ্বরকেই প্রকাশ করার পন্থা আবিষ্কার করা।

প্রচলিত সাধনসংস্কারে আকৃষ্টচিত্ত বহু ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি সঙ্ঘসাধনার মধ্যে তাঁদের পরিচিত ধর্ম্মাচরণ দেখিবেন না। অনেকে মনে করিবেন, কর্ম্মনিষ্ঠার দিকেই সঙ্ঘের ঝোঁক অধিক। এই কর্ম্মপ্রবৃত্তির ভাল মন্দ পরিণাম আছে। সঙ্ঘ যেদিন এইরূপ এক নির্দ্দিষ্ট সীমায় উপনীত হইবে, সেইদিন উহা কর্ম্মবিমুখ হইয়া জ্ঞানঘন চৈতন্যের আশ্রয় লইবে। সঙ্ঘ-ধর্ম্মীদের প্রতি তথাকথিত ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদের এইরূপ মনোভাব সর্ব্বক্ষেত্রে উদ্দেশ্যবিহীন নহে। ধর্ম্ম প্রায়শঃ ক্ষেত্রে জীবনের প্রতিক্রিয়ামূলক হইয়াছে; তাই সঙ্ঘের জীবনগতির পথে জ্ঞানে অজ্ঞানে অনেকে দ্বন্দ্বসৃষ্টি করিয়া এই নূতন সাধনপথ রুদ্ধ করিতে চাহিবে। কোন ক্ষেত্রে উপেক্ষা ইহার জন্য অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হয়, কোন ক্ষেত্রে সক্রিয় প্রতিবাদ নানা ভঙ্গীতে অভিব্যক্ত হয়। সঙ্ঘধর্ম্মী মনে করিতে পারে, এইরূপ ক্ষেত্রে উপেক্ষাই শ্রেয়ঃ; কিন্তু তাহা অন্ধ ধর্ম্মনীতির মিথ্যা আচরণ। নবযুগের সাধকদের স্মরণে রাখিতে হইবে, অতি বড় মিথ্যারও পুনঃ পুনঃ অনুবৃত্তিতে এক প্রকার শক্তির আবির্ভাব হয়, তখন ঘনীভূত মিথ্যা যুগসাধকদের সম্মুখে পাষাণ প্রাচীর নির্ম্মাণ করে, এই জন্য প্রতিপক্ষের সর্ব্বপ্রকার প্রতিবাদ-মূলক আচার অঙ্কুরেই বিনাশ করিতে হয়। তরল অবস্থায় মিথ্যা বিদীর্ণ করা যত সহজ, প্রশ্রয়ে প্রশ্রয়ে মিথ্যার ঘনায়মান মূর্ত্তি তত সহজে অপসারিত

হয় না। সঙ্ঘ-ধর্ম্মী প্রতিবাদী শক্তিকে প্রতিপদে প্রতিহত করিয়া চলিবে, ঘৃণায় নয়, হিংসায় নয়—আপনার সত্যকে নির্দ্বন্দ্বে, নিঃসংশয়ে প্রকাশ করিয়া। বাধার সম্মুখে তুষ্ণীভাব আত্ম-ধর্ম্মে চিত্তের অদৃঢ়তা হেতু হইয়া থাকে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ আজ জাতীয় জীবন সুরু করার পথে। গোড়া হইতে সতর্ক না হইলে, গতি আমাদের ক্ষিপ্র হইবে না।

সঙ্ঘ আদর্শবাদ নহে। তোমার আমার মিলনের ফল সঙ্ঘ নহে। তোমার আমার অর্থে ও প্রতিভায় সঙ্ঘ পুষ্ট হয় না, অধ্যয়নে-উপদেশে সঙ্ঘ মূর্ত্তি লয় না; ইহা স্বতঃ উৎসৃত বীর্য্য। এই বীর্য্যনিহিত শক্তির রূপ ও আকার সঙ্ঘমূর্ত্তি ধারণ করে।

সঙ্ঘ ও সঙ্ঘ-কর্ম্ম দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। যুগোপযোগী লোকহিতসাধনের জন্যই সঙ্ঘের কর্ম্ম। যেখানে ইহার ব্যত্যয় হয়, সঙ্ঘ সেখানে কর্ম্মবিরত হইবে। এইরূপ এখনও হয় নাই। তাই দেখি—সঙ্ঘের কৃষিক্ষেত্রে, শিক্ষাকেন্দ্রে, ব্যবসা-বাণিজ্য-অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে সঙ্ঘকে আশ্রয় করিয়া অসংখ্য পারিবারিক জীবন সংহত হইয়া উঠিতেছে। জগতের স্বভাব-ধর্ম্ম সুখ ও সম্পত্তি, আবার দুঃখ, দৈন্য সবই এইখানে আছে। প্রাকৃত মনের সর্ব্বপ্রকার লক্ষণও এই ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। সঙ্ঘ ধর্ম্মীকে বস্ত্রখণ্ড কটিতটে জড়াইয়া ইহাদের মধ্যে আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছে। পারিবারিক জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি যেমন আছে, পুষ্টি ও বৃদ্ধি যুগপৎ তাহা পূরণ করে। প্রাকৃত জীবনের সম্মোহনীয় এক প্রকার কান্তি আছে, সঙ্ঘের বৈরাগ্যদীপ্তি এই ক্ষেত্রে অক্ষুণ্ণ রাখা অতি কঠোর ত্যাগ ও তপস্যারই পরিচয়। সঙ্ঘ-ধর্ম্মী এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, এই যে অসংখ্য পারিবারিক জীবন তাহাকে ঘিরিয়া আশ্রয় লইতেছে, সেইখানে তাহার প্রকৃত কর্ম্ম আরম্ভ হইবে। সঙ্ঘের বর্ত্তমান কর্ম্ম সিদ্ধকর্ম্ম নহে। ইহা নিরাসক্তি ও ঈশ্বরযুক্তির পরিচয়দানের একটা পরীক্ষাক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। সঙ্ঘের নীতি তপঃ ও বৈরাগ্য। সঙ্ঘের কর্ম্ম ভোগ ও অধিকার। সাধক সঙ্ঘাশ্রয়ী—ত্যাগ-তপস্যাই তাহার স্বভাব। কর্ম্ম তাহার তখনই সিদ্ধ হইবে, যখন তাহার কর্ম্মক্ষেত্রে সন্নিহিত পারিবারিক জীবনকেন্দ্রে ব্রহ্মবিগ্রহ উহা মূর্ত্ত করিয়া তুলিবে। তাই সঙ্ঘ—শুধু কর্ম্মপরায়ণ নহে, শুধু ধর্ম্মপরায়ণও নহে, পরন্তু ব্রহ্মপরায়ণ।

এই সৃষ্টি ঈশ্বরের চাওয়া। "অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়" ঋগুচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র ভুবন গড়িয়া উঠিয়াছে। সঙ্ঘের সৃষ্টিও এইরূপ এক অশরীরী মন্ত্রধ্বনির দ্যোতনায় মূর্ত্তি লইয়াছে। তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'সঙ্ঘ' অনুষ্ঠেয় নয়, ইহার মুখ্য কারণ ঈশ্বরেচ্ছা।

বিগত ২৫ বৎসর ধরিয়া এই ভাগবত প্রেরণাকে অনুভূতিঘন করিয়া যে বিগ্রহ আমার সম্মুখে গড়িয়া উঠিয়াছে, এখানে আর কিছু নাই—আছে শুধু তত্ত্ব আর তত্ত্বের আশ্রয়। সে আর আমি। এই যুক্তির অমৃতই পরিবেশন করা হইয়াছে বিগত ২৫ বৎসর ধরিয়া। পাঁচ জনও এই অমৃতের আস্বাদ যদি পাইয়া থাকে, সঙ্ঘের জীবনসিদ্ধি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াছি। সঙ্ঘের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিপ্রকাশ কালসাপেক্ষ হইতে পারে, কিন্তু ইহা অমোঘ ও অব্যর্থ হইবে।

'সঙ্ঘ-শক্তি' জাতির অভ্যুত্থান চায়, মুক্তি চায়, জীবন-গতির দিব্য-নীতি চায়। ইহার জন্য যাহা করণীয়, তাহা বিপ্লব নহে, সংস্কার নহে, কিছু গ্রহণ ও বর্জ্জন নহে, পরন্তু অন্তরের সংগঠন। আত্মাকে ঘিরিয়া যে গুণ-ক্রিয়া-বস্তু ও জাতি গড়িয়া উঠে, তাহার ছন্দে যদি এমন লক্ষণ প্রকাশ পায়, যাহার নাম বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন, তাহা সঙ্ঘ-ধর্ম্মীর নিকট একান্ত গৌণ; আদৌ তাহা লক্ষ্য নহে। লক্ষ্য—আত্ম-প্রেরণা। আজ সঙ্ঘের এই শিশু-মূর্ত্তি যদি সংগঠনকৌশল যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে না পারে, বাহিরের বাধায় তাহা যদি ক্ষুণ্ণ হয়, তবে সঙ্ঘের অভিনয় একাঙ্কেই শেষ হইবে। তবে আমি বিশ্বাস করি, এত অল্পায়ুঃ লইয়া সঙ্ঘ-বীর্য্য প্রকাশ পায় নাই। এই বীর্য্যকে আশ্রয় করিয়া জাতির অভ্যুদয় হইবে, মুক্তি আসিবে। বিশ্বজাতিকে এই সংগঠনের নীতি আশ্রয় করিয়াই এ জাতি নববিধান দিবে।

সঙ্ঘ-ধর্ম্মে আস্থাপরায়ণ প্রত্যেক নর-নারীকে আমি স্মরণে রাখিতে বলি, সঙ্ঘের অর্থবল ও লোকবল গণনার বিষয় নহে। যে কোন পতিত জাতির অভ্যুত্থানকামনায় যখন শক্তি-ব্যূহ দেশ ও জাতিগত প্রকৃতি লইয়া মাথা তুলে, তখন উহা লোক ও অর্থের হিসাব করে না; এইগুলি একান্ত বহির্ম্মুখী জীবন-ধর্ম্মের অনিবার্য্য প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। অধ্যাত্মশক্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সঙ্ঘশক্তির জাগরণ। ঘটনা ও অবস্থার বিচিত্র বিপরীত ছন্দ বিদীর্ণ করিয়া, সঙ্ঘকে অগ্রসর হইতে হইবে। অতীতের সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর সঙ্ঘ-শক্তির সেবায় অতিবাহিত হইল, অতঃপর এই দেবশিশু আত্মিক বল লইয়া জাতির মধ্যে ক্রীড়ারত হউক। দূরে দূরে দাঁড়াইয়া করতাল-বাদ্যে এই সঙ্ঘ-শক্তিকে অভিনন্দিত করিব।

## সাবর্ণি ভবিতা মনুঃ

পৃথিবীর ইতিহাস আছে। সৃষ্টিকালে কেহ বিদ্যমান ছিল না, এই ইতিহাসরচনা হইল কি প্রকারে? বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে এইরূপ প্রশ্ন অবান্তর বলিয়া গণ্য করা যায়। বৈজ্ঞানিকের অভ্রান্ত দৃষ্টি আজ হিসাবের অঙ্ক কষিয়া বলিয়া দিতেছে—কত হাজার বৎসর পূর্ব্বে, ভারত মহাসমুদ্র বা ভূমধ্যসাগর বিপুল জনপদ ছিল। আর অত্যুচ্চ হিমাচল ছিল বিশাল জলধিগর্ভে। মানুষ জন্মে এবং মরে; কিন্তু সৃষ্টি অল্পায়ু মানুষের তুলনায় শাশ্বত, নিত্য বলা যায়। সৃষ্টি তার বক্ষপঞ্জরে আত্মেতিহাস রচনা করিয়া চলিয়াছে। প্রতিভাবান্ বিচক্ষণেরা বিশ্বপ্রকৃতির সে রচনা পড়িতে শিখিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন পুরুষদের ইহাদের অপেক্ষা সমধিক জ্ঞান ছিল। তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীর আয়ুঃ গণনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের মনীষিদের গণনা তাঁহাদের সহিত মিলিয়া যাইতেছে। সুপ্রাচীন প্রজ্ঞার সহিত অর্ব্বাচীনের জ্ঞানসংযোগ অতীতের দর্শন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা দিতেছে। মানুষ যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান।

পৃথিবীর আয়ুঃ ৪২৯৪০৮০০০০ বৎসর। ইহার মধ্যে চলিয়া গিয়াছে ১৯৬০৮৫৩০৪০ বৎসর। অতএব ২৩৩৩২২৬৯৬০ বৎসর এখনও এই পৃথিবীটা বাঁচিয়া থাকিবে।

পৃথিবীর এই সুদীর্ঘ কাল প্রথমতঃ ১৪ ভাগে সমপরিমাণে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগফলের নাম দেওয়া হইয়াছে মন্বন্তর। আমরা এইরূপ ৬টা মন্বন্তর শেষ করিয়া, সপ্তম মন্বন্তরে আসিয়া পড়িয়াছি। ইহা হইল সৃষ্টি-গণনার হিসাব।

ভারতের মানব সভ্যতার কালগণনাও এই পদ্ধতি ধরিয়াই করিতে হইলে, আমাদের মানব-সভ্যতার প্রথম দিনটী আবিষ্কার করিতে হইবে। তাহা করিবার উপায় কি? আমরা পুরাণাদিতে পাই—সপ্তম মনুর সপ্তবিংশতি যুগ শেষ হইলে কুরুক্ষেত্র-সংগ্রাম সূচিত হয়। এক এক মন্বন্তর-কাল ৭১ ভাগে বিভক্ত হইয়া মহাযুগ নামে কথিত হয়। এই এক একটী মহাযুগ আবার চারি ভাগে বিভক্ত। উহাদের নাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। পৃথিবীর আয়ুঃ-গণনার জন্য এইরূপ ক্রম-সূক্ষ্ম কালের নিরিখ অবশ্যই অবধারণযোগ্য। কিন্তু আমরা মানবসভ্যতার কালগণনা করিতেছি। ইহার মধ্যেও যে যুগ-গণনা, বৎসর-গণনা অসম্ভব, তাহা নহে। তবে সৃষ্টি-গণনায় এইগুলির গণনাকাল যত দীর্ঘ হইবে, রাষ্ট্রগণনায় তাহার সম্ভাবনা নাই।

সৃষ্টি-গণনায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির কাল-সংখ্যা ৪২০০০০০ বৎসর। এইরূপ ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর হইলে, মন্বন্তর-কাল হয় ৩০৬৭২০০০০ বৎসরে। জগতের রাষ্ট্রেতিহাসের এই দীর্ঘ কালগণনার পদ্ধতি সমীচীন বলিয়া কেহ মনে করিবেন না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সপ্তম মনুর ২৭টী মহাযুগ অতিবাহিত হইলে, কুরুক্ষেত্র-সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এই সময়ে যুগ-গণনার একটা সঙ্কেত আমরা পাই। ভাগবত প্রসঙ্গে শুকদেব বলিয়াছেন, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ লইয়া যে শত সংখ্যক কাল, তাহাই যুগ নামে কথিত। তাহার পরই দেখা যায়, পরীক্ষিতের রাজ্যকাল নির্ণয় করার জন্য পুরাণকার এক এক নক্ষত্রে সপ্তর্ষির এক শত বৎসর স্থিতিকাল ধরিয়া বৎসর সংখ্যা গণনা করিয়াছেন। অতএব এই হিসাবে এক এক শতাব্দী এক এক মহাযুগ ধরিলে আমরা প্রত্যেক মনুর রাজ্যকাল ৭১ যুগের হিসাবে ৭১০০ বৎসর পাই। এই হিসাবে প্রথম মনুর রাষ্ট্রকাল ৭ম মনুর হইতে ৪২৬০০ বৎসর পূর্ব্বে আমরা অনায়াসেই নিরূপণ করিতে পারি। বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের সহিত মানব-সভ্যতার এই কাল হুবহু মিলিয়া যায়। আমরা গত সংখ্যার 'প্রবর্ত্তকে' বলিয়াছি, বৈবস্বত মন্বন্তর শেষ [illegible] কথা। ৭১০০ বৎসর যদি রাষ্ট্রীয় মনুর অধিকার [illegible], তাহা

হইলে দেখা যায় ২৭০০ বৎসরের পর কুরুক্ষেত্রে এবং কুরুক্ষেত্র হইতে খৃষ্ট-জন্ম পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক ২৪০০ বৎসব, আর ইহার পর ১৯৪০ বৎসর শেষ হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যায়—বর্ত্তমান কাল বৈবস্বত মন্থব প্রায় ৭০৪০ বৎসর হইবে। অর্থাৎ এই বিংশ শতাব্দীতেই বৈবস্বত মন্থর অধিকার শেষ হইয়া জগতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে অষ্টম মন্থর প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে। এই অষ্টম মন্থ সম্বন্ধে হিন্দুর পুরাণ শাস্ত্রে এক অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী আছে। যাঁহারা মার্কণ্ডেয় পুরাণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন, এক বৈশ্য আর এক ক্ষত্রিয় রাজা রাজ্য ও সম্পত্তিভ্রষ্ট হইয়া মেধস ঋষির আশ্রয় লাভ করেন। রাজ্যের সহিত ঐশ্বর্য্যের এই সম্মিলন ভবিষ্যৎ মন্থর রাষ্ট্র-শক্তির সুলক্ষণ। সাবর্ণি মন্থ তেজো-দীপ্ত হইবেন এবং তদীয় রাজ্যকালে অর্থশক্তি মুক্তিলাভ করিবে। ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ সুরথের সহিত বৈশ্যের এই সম্মিলিত সাধন ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট সঙ্কেত।

মন্থ কি মানুষ ? একথা অবশ্যই স্মরণীয়, ইহা কাল-চক্রের বিশেষ বিশেষ পর্য্যায়ের নাম। নামের সহিত গুণ ও ক্রিয়া সংবর্ত্তিত হয়। বৈবস্বত রাষ্ট্রযুগের বিধান সাবর্ণি মন্বন্তরে রূপান্তরিত হইবে। এই পরিবর্ত্তন দেশবিশেষের জন্য নহে, সমগ্র ভূমণ্ডলের রাষ্ট্র-বিধির পরিবর্ত্তন সূচনা করিবে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যেই আমরা অতীত বিশ্বরাষ্ট্রের আমূল পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য মনে করি। সূর্য্যতনয় সাবর্ণির জ্যোতির্ম্ময় রথের চক্রনির্ঘোষ আমাদের কর্ণ বধির করে। কাত্যায়নী তন্ত্রের অভিপ্রায়া-নুসারে আমরা এই মন্ত্রটী পাঠকদের দুই বার উচ্চারণ করিতে বলি।

সূর্য্যাজন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণিভবিতা মন্থঃ। "ক্লীঁওঁ"

## ভারতের প্রাণ ধর্ম্মে

জার্ম্মাণীর বিজয়ী মূর্ত্তি দেখিয়া বৃটন আজিও আতঙ্কিত হয় নাই। বৃটিশের সত্তা বলিতেছে—জার্ম্মাণীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিব না; মৃত্যু শ্রেয়ঃ, দেশান্তর শ্রেয়ঃ। বৃটনের প্রাণ রাষ্ট্র। রাষ্ট্রশক্তিহারা হইয়া বৃটনের বাঁচা জীবন্মৃত অবস্থা। বৃটিশের আত্মা তাই ভয়কাতর নয়।

ভারতের প্রাণ রাষ্ট্র নহে, এ কথা পুনঃ পুনঃ ভারত-সত্তা নানা আশ্রয়ে ব্যক্ত করিয়াছে। ভারতের প্রাণ ধর্ম্মে। ভারতও বৃটনের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাকে যদি কেহ হত্যা করে, সে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। বিগত শত শত বৎসরের নানা বিপর্য্যয়ে সে এ সঙ্কল্প দৃঢ় রাখিয়াছে। ইউরোপের সংগ্রাম মাত্র দশমাস কাল ধরিয়া চলিয়াছে। দশমাসের সংঘর্ষে বৃটন স্বরাষ্ট্ররক্ষায় আপ্রাণ উদ্যত হইয়াছে। আর আমরা এক প্রকার হাজার বৎসর বলিলেও চলে, রাষ্ট্ররক্ষার জন্য যত না হউক, আত্মধর্ম্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছি। দেহ লইয়া রাষ্ট্রসংগ্রামে হতাহত হইতে হয়। ধর্ম্মসংগ্রামে আত্মঘাতী হইতে হয়। ধর্ম্মযুদ্ধে ভারতের বহুসংখ্য সৈনিক আত্মঘাতী হইয়াছে, আজিও হইতেছে।

আত্মধর্ম্মে আস্থাহীন হওয়ার নাম আত্মঘাতী হওয়া। তার পর যে বাঁচিয়া থাকা, তাহা জীবন্মৃত অবস্থা। দেহের পতনে পরাজয়ের স্মৃতি থাকে। কোন দুশ্চিহ্ন লক্ষ্যে পড়ে না। কিন্তু আত্মঘাতী হইলে, পরাজয়ের ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে জাতির মধ্যে বিকৃতাত্মার বীভৎস মূর্ত্তি ধর্ম্ম-রক্ষায় প্রযত্নবান্ জাতিকে অতিশয় নিরুৎসাহিত করে। শত্রুর অপেক্ষা এই সব আত্মঘাতীর সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, ততই পরাজয়ের আশঙ্কা অধিক হইয়া থাকে। ভারত আজ এই দুরবস্থার সম্মুখে।

ধর্ম্মের নামে বিজাতীয় ভাবকলুষিত নব নব আদর্শ-বাদে ভারতের বহু মনীষী আত্মঘাতী হইতেছেন। সমাজসংস্কারের নামে, সাময়িক চাকচিক্যময় ঘটনার সঙ্কেতে স্বধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিত সমাজের ভিত্তি তাঁহারা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন। রাষ্ট্রশক্তিলাভের প্রলোভনে আত্মঘাতীর সংখ্যা এত বাড়িয়া চলিয়াছে যে, তাহারাই ভারত-জাতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছেন। দেশের দারিদ্র্য দূর করার অছিলায় আর এক শ্রেণীর মানুষ ভারতধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া ক্ষণভঙ্গুর বৈদেশিক অর্থনীতিক সংগ্রামে একটা বিকৃত অবস্থার সৃষ্টি করিতেছেন। ভারতের ধর্ম্ম এইরূপ নানা

প্রচেষ্টায় লোকচক্ষুর অন্তরালে ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে। যে সাহিত্য জাতির ধর্ম্ম-প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়, তাহা গ্রন্থাকারে, সাময়িক পত্রাদিতে বিজাতীয় ভাবই প্রচারিত হইতেছে। জাতির উপরিভাগে পরশিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে সম্মোহিত মানুষের সংখ্যা এমনই করিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই সব আত্মঘাতীদের জীবনকুশলতার পরিচয় ভেদ করিয়া জাতির স্বরূপ নির্ণয় আর সম্ভব নয়। এই বিশাল আত্মঘাতী জাতির তলে তলে ফল্গু-প্রবাহের ন্যায় স্বচ্ছ অনাবিল ভারত-ধর্ম্ম প্রবহমান, কে তাহার সন্ধান রাখে? ভারতের ধর্ম্ম ধ্বংস করার জন্য প্রকৃতি ভারতধর্ম্মীদের লইয়াই প্রবল সেনানী গড়িয়া লইয়াছেন। তিনি অলক্ষ্যে থাকিয়া ভারতবাসীর দ্বারাই ভারত-ধর্ম্ম নিশ্চিহ্ন করার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কিন্তু ভারতের শীর্ণ ধর্ম্মামৃত-ধারা কালপ্রভাবে আজ যতই উপেক্ষিত হউক, ইহার বিদ্যুচ্ছক্তি কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু তাহাতেই আমাদের সান্ত্বনা নাই। আমাদের সৃষ্টি করিতে হইবে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র। যেখানে ধর্ম্মকে গতি দিতে হইবে। ধর্ম্ম—ঋতময় বীর্য্য। সে চিরদিন মূর্চ্ছিতপ্রায় থাকিবে না। ভারতের ধর্ম্ম সনাতন; ভারতের সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ, বাণিজ্য-নীতিও সনাতন। সংস্কারের নামে জাতি আর তার ধর্ম্ম হৃতশ্রী হইতে দিবে না। ভারতের শ্রুতি আছে, স্মৃতি ও ন্যায় আছে, দর্শনশাস্ত্র আছে, পুরাণ আছে, সংহিতা আছে, আছে তার গৌরবময় ইতিহাস। এই অবিমিশ্র কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপর দাঁড়াইয়া জাতি যদি প্রগতি না পায়, তবে এই সনাতন শিক্ষা অবশ্যই সে পরিহার করিবে। কেহ কি ভরসা করিয়া বলিতে পারেন যে, ভারত-ধর্ম্মে অকপট আত্মদান করিয়া যুগধর্ম্ম-রক্ষায় ব্যর্থ হইয়াছেন? ব্যর্থতার যে কদর্য্য মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে চিত্রিত হয়, উহা ভারত-ধর্ম্মের শত্রুশক্তির ছলনা। ভাবের ঘরে চোরের দলই কি ভারতের সনাতন ধর্ম্ম কার্য্যকরী নহে, ইহা প্রমাণ করার জন্য এই ছল আশ্রয় করে না?

আমরা বলিব—বাংলার নবদ্বীপ, দক্ষিণেশ্বর, ভাগীরথী-চুম্বিত তীর্থ, তোমার কোলে শত জন শিশুও যদি আজ ভারত ধর্ম্মের আনুগত্যে সর্ব্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করে, তারাই আজ প্রমাণ করিতে বাহির হইবে—'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'। এই জাতিই প্রমাণ করিবে —ধর্ম্মই জীবনভিত্তি জাতির সমাজ, রাষ্ট্র, ধনদৌলত সবই ইহার মধ্যে আছে? আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিব—দক্ষিণেশ্বর যেখানে আসিয়া দাঁড়ি টানিয়াছে, 'ততঃ কিম্' বলিয়া তাহার পর হইতে একদল মানুষকে অমিশ্র ভারত-ধর্ম্মের অনুভূতি লইয়া জয়যাত্রায় বাহির হইতে হইবে। সে আশা কি বাঙ্গালী তরুণদের নিকট নিরর্থক হইবে? ভুয়া আদর্শবাদের ছলনায় বাঙ্গালী বিগত ২৫ বৎসর ধরিয়া অনর্থক ত্যাগ ও তপস্যার গুরুভার বহিয়াছে, আজিও বলিবর্দ্দের মত সে পিশিয়া মরে। ভারত-ধর্ম্মের জন্য তাহারা উদ্বুদ্ধ হউক। বাংলার উন্নয়ন অতি আসন্ন। আমি তরুণ বাংলার এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

## বৃটনের সঙ্কটে ভারতের কর্ত্তব্য

১৯১৫।১৬ খৃষ্টাব্দে আমরা লিখিয়াছিলাম—"ভারত ও মিশরের সঙ্গে বৃটনের আন্তরিক পরিচয় যদি হয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের আদর্শ বৃটনের দ্বারা সিদ্ধ হওয়ার আশা আছে।" কিন্তু প্রায় ২৫ বৎসরেও সে পরিচয় ঘটিল না। অপরাধ এক পক্ষের নহে, উভয় পক্ষেরই।

বৃটনের অপরাধ—পরাধীন দেশের কোটী কোটী লোক-বল দমিত রাখিয়া, অস্খলিত রাজ্যভোগের দুরাকাঙ্ক্ষা; আর ভারতের অপরাধ—বৃটিশ শাসন-নীতির প্রশ্রয়ে স্বাধীনতার স্পৃহা যথেচ্ছ প্রকাশ করিয়া আত্মশক্তির অবলোপ।

দেড় শত বৎসর বৃটন আমাদের সুশিক্ষা দেয় নাই, যেটুকু দিয়াছে তাহাও ভারতচরিত্রের অনুকূল নহে। বৃটন আমাদের ব্যবসাবাণিজ্যে উৎসাহ দেয় নাই, আত্মপ্রকাশের স্পর্দ্ধা হরণ করিয়াছে, অস্ত্রবল হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে, ভারতের ৩০ কোটী লোক নিরস্ত-

মস্তিষ্ক হওয়ার উপক্রম করিয়াছে। ক্লীবের দেশ বলিতে যদি কিছু থাকে, তবে সে এই বর্ত্তমান ভারত।

ভারতবাসী জাতীয় সভা গড়িয়াছে, স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়াছে, সত্যাগ্রহ করিয়াছে। রাজশক্তি আন্দোলনে আন্দোলনে জাতির শক্তিহরণের জন্য যত দূর প্রশ্রয় দিয়াছে, তত দূর তাহারা গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় ছুটিয়াছে, বীরত্ব দেখাইয়াছে। একবারও তাহারা ভাবে নাই—ইহা রাজশক্তিরই করুণা মাত্র। রাজশক্তি জাতীয়-সভা করিতে দিয়াছে, তাই জাতীয় সভার সৃষ্টি; জাতীয় পতাকা উড়াইতে দিয়াছে, তাই উৎসাহ—বিজাতীয় সমাজতন্ত্রবাদে মাতিবার অধিকার দিয়াছে বলিয়া তাই সমাজতন্ত্রী দলের অস্তিত্ব। এখনও হলওয়েল মনুমেণ্ট ভাঙ্গার কৌতুকদৃশ্য এই সঙ্কটদিনে রাজশক্তি যতক্ষণ দেখিতে চাহে, ততক্ষণই ইহার আড়ম্বর, পঙ্গু জাতির—লম্ফ-ঝম্প বন্ধ করিবার জন্য অন্য পক্ষের কলমের খোঁচাই যথেষ্ট। অতএব আন্দোলনের মাত্রাধিক্য দেখিয়া স্থিরবুদ্ধি লোকেরা যদি আজ এই সকল বিষয়ে উদাসীন হয়, তাহাদের বলিবার কিছু নাই।

দুর্ব্বল জাতি আত্মগঠনে মন দিল না, প্রলুব্ধ হইয়া সে রাজশক্তির সহিত ভুয়া সংগ্রাম করিতে ছুটিল। রাজশক্তি ইহাতে চিরদিন প্রশ্রয় দিয়াছে। কিন্তু আজ এই বিশাল জাতিটাকে ভুয়া করার এইরূপ প্রশ্রয় রাজশক্তি উত্তম নীতি বলিয়া স্বীকার না করিলেই ভাল। প্রকৃতির অট্টহাস্যে এই উভয় দিকের ভুল সংশোধনের সঙ্কেত পরিশ্রুত হয়—ভুলের জন্য উভয় পক্ষ দায়ী; দোষ কাহারও নহে, অধিকন্তু প্রকৃতির ইহা এক অনিবার্য্য ছলনা। এই ছল হইতে মুক্তি চাই।

প্রকৃতির শ্লথগতি কি ইংরাজ অথবা ভারতবাসী, উভয়ের আত্মরক্ষার পক্ষে অনুকূল নহে। একটা যৌগিক মিলন বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। সেই পথে আজ জাতিকে বিধাতা ডাক দিয়াছেন; ইংরাজ এখনও হইয়া আছে তাহার উপলক্ষ্য।

আমরা গত সংখ্যার "প্রবর্ত্তকে" ফরাসী ও বৃটনের ঐক্যবদ্ধ আত্মরক্ষণ-নীতি জার্ম্মাণীর আক্রমণ ব্যর্থ করার পক্ষে এখনও যথেষ্ট বলিয়াছিলাম; কিন্তু আজ দেখা যায়, ফরাসী ঐক্যবদ্ধ তো নহেই, পরন্তু শত্রুশক্তির কবলে। এই বিশ্বব্যাপী রণাঙ্গণে বৃটন একাকী রণজয়ে দৃঢ় পদে দাঁড়াইয়াছে। বৃটনের দৃঢ় ভিত্তি কিন্তু শক্তিপীঠ ভারতবর্ষ—এ কথা ইংরাজ মনীষীরাও স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দীর্ঘ দিনের অনাদৃত এই শক্তি আজ শ্লথ ও শৃঙ্খলহীন। ইহাকে ব্যবহারোপযোগী করিতে কিছু সময় লাগিবে। সঙ্কট কিন্তু খুব আসন্ন।

ভারতের আত্মিক ও নৈতিক বল ভিন্ন গান্ধিজী প্রমুখ ভারতনেতৃবৃন্দের আর কিছু দিবার নাই। এবং ইহা বৃটনের আনুকূল্যে আনিতে হইলেও মহাত্মাজীর দাবী আছে; বৃটন সে দাবী পূর্ণ করায় সোজাসুজি সম্মতি দিতে পারিতেছেন না। এই ক্ষেত্রে বৃটনের এই যে অসমর্থতা, তাহার কারণ তো আর অন্য কিছু নহে, ভারতের লোকবল, অর্থবল সবই তার করতলগত। তাহার সহিত ভারতনেতৃবৃন্দের নৈতিক বল সংযুক্ত হইলে, অধিকতর শ্রেয়ের সম্ভাবনা আছে। এবং এই জন্য বৃটনের যেটুকু প্রতিদান, তাহার অধিক সে দিতে পারে না। জাতি দাবী করার মত শক্তি অর্জ্জন করে নাই, করিতে পারে নাই, করার পথে নিজে ও অন্যে উভয়ই দায়ী, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

আদর্শবাদ আজ আর বড় কথা নহে। আদর্শবাদের মূল্য সাময়িক। উহা গণতন্ত্রবাদই হউক, সমাজতন্ত্রবাদ, নাজী অথবা ফ্যাসিষ্টবাদ যাহাই হউক। শক্তি যে বাদ যখন আশ্রয় করেন, তখন সেই বাদেরই জয় হয়, এবং শক্তির আশ্রিত বাদী তখন দুর্ব্বলের উপর আধিপত্য করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। সেদিনও ফ্রান্স আলজিরিয়া ও ইণ্ডো-চায়নাকে বলিয়াছে—স্বাধীনতার দাবী করা পাপ। উহা গাছের ফল নয় যে, পাকিলেই পড়িবে। উহা শক্তিপ্রয়োগেই লাভ করিতে হয়। বিধাতার পরিহাস—শক্তিপ্রয়োগেই ফ্রান্সের সাধের প্যারিস আজ শত্রুকরতলগত।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য এমন অনেক নেতা আছেন, যাঁহারা অর্ব্বাচীনের মত বলেন যে, স্বাধীনতা আমাদের দরজায় টোকা মারিতেছে, আমরা স্বেচ্ছাসৈনিকবাহিনী গড়িতে পারিলেই উহাকে আঁকড়িয়া ধরিব। শক্তিহীন, স্বপ্নপ্রিয় জাতির পক্ষেই এইরূপ কথা শোভা পায়। আমাদের ৫০ বৎসর রাষ্ট্রজীবনের ইতিহাসে স্বাধীনতালাভের শক্তি আহরণ করার বস্তুতন্ত্র নীতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বৃটন আমাদের ইহা করিতে দেয় নাই। রাজশক্তি

যেটুকু করিতে দিয়াছে তাহাই আমরা করিয়াছি। উহাতে শক্তিসঞ্চয় হয় নাই, বরং শক্তিক্ষয়ই হইয়াছে।

বৃটন আজ বিপন্ন। পঙ্গু জাতি মনে করিতে পারে, রোমানদের ন্যায় বৃটন ভারতকেও স্বাধীনতা দিয়া যাইবে। ইহাও ক্লীবত্বের পরিচয়। আর আজ যে মহাত্মা গান্ধিও বৃটনকে অহিংস নীতির উপদেশ দেন, তাহার মূল্য আমরা এই মাত্র দিতে পারি যে, তিনি এই সুবিধায় নিজ আদর্শ-বাদের সুপ্রচারপ্রার্থী। ইহা আদৌ রাষ্ট্রনীতি নহে।

ভারতের জাতীয় মহাসভাকে যে বড়লাট বার বার আহ্বান দেন তাহার কারণ উহা ৮টী প্রদেশের উপর ইংরাজের দেওয়া শাসনসংস্কারের দৌলতে পুরোভাগে দাঁড়াইয়াছে। লীগকে ডাকাডাকির মূলেও আছে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের উপর তাহার প্রতিপত্তির হিসাব। এই দুই পক্ষ আজ ইংরাজের সহায় না হইলে, কেবল নৈতিক সহায়তটুকুর জন্য ইংরাজ হিন্দু সভা ও ভারতের জাতীয়তাবাদীর সংহতির সহায়তা প্রার্থী হইবে। ইহা ভারতকে যুদ্ধোপযোগী করিয়া তোলার 'অধিকন্তু ন দোষায়' গোছের আর একটা পরিচ্ছদ মাত্র।

আসল কথা, ইংরাজের আজ সঙ্কটকাল উপস্থিত। ইংরাজের সহিত এই দেড়শত বৎসরের পরিচয় সুখের বলিয়া ভারত মনে করে না। শাসনে ও শোষণে আমরা একেবারে মরিয়াছি। ইহার পাল্টায় আমরাও বৃটনের ক্ষতি বড় কম করি নাই। আমাদের গোলামী ও অন্তঃসার-শূন্য আন্দোলনের কৌতুকে তাহাদেরও এমন করিয়া আমরা মাথা খাইয়াছি যে, আজ বীরেন্দ্রকেশরী বৃটিশকে বলিতে হয় যে, জার্ম্মাণীর অভিযান অভিনব ও বিচিত্র। ভারতকে সে নির্বীর্য্য করিয়াছে, আর নির্বীর্য্য ভারত তাহাকে ততোধিক নির্বীর্য্য করিয়াছে; নতুবা বৃটনের ন্যায় সর্ব্বপ্রধান শক্তি আজ এমন নিদারুণ সঙ্কটে পড়িল কেন?

আমাদের যাহা হইয়াছে তাহা আমাদের কর্ম্মফল। বৃটনের পরাজয়ে ভারতের ভাগ্যপরিবর্ত্তন হইবে বটে, কিন্তু উহা সৌভাগ্য নহে, আমাদের এখন কর্ত্তব্য—বৃটনকে জয়ী করা। ভারতের সুপ্তবীর্য্য জাগ্রত হইয়া সর্ব্বতোভাবে বৃটনের সহায়তা করুক। ইংরাজের মিত্রপক্ষ ভারত ভিন্ন আর কেহ নহে। ইংরাজ জয়ী হইলে, তাহার মধ্যে যে মানবতা আছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা অনায়াসে বলিতে পারি—বৃটন মিত্রদ্রোহী হইবে না। যদি অতিশয় মন্দের দিক দেখিয়াই বিচার করিতে হয়, তবুও আমরা বলিব, ভারত বৃটনকে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিবে। যদি বৃটন জয়ী হয় আর ভারতকে তার যোগ্য রাষ্ট্রাধিকার দিতে তখন কুণ্ঠিত হয়, আমাদের এই অকপট মৈত্রীশক্তি সেদিন নীরব থাকিবে না। এক নূতন প্রাণের জাগরণে ভারত আপনার জন্মগত অধিকার কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইবে। আজ আমরা দাবীর কণ্ঠ না তুলিয়া, বৃটনের জয়কল্পে পরিপূর্ণ সহায় হইতে চাহি।

## ধর্ম্ম-সমন্বয়ের অর্থ-বিচার

আষাঢ়ের প্রবর্ত্তকে "রাজধর্ম্মের আদর্শ" সন্দর্ভ পাঠ করিয়া আমার এক শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী বন্ধু লিখিতেছেন, "আষাঢ়ের প্রবর্ত্তকের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আপনি লিখেছেন * * 'তাই আমরা ধর্ম্মসমন্বয় স্বীকার করি না। কোন মহাপুরুষ ঠিক এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। ধর্ম্মসমন্বয় কথাটা অর্ব্বাচীন যুগের বিকৃতমস্তিষ্কের একটা খিচুড়ি। ধর্ম্মের সমন্বয় হয় না * *।'

শ্রদ্ধেয় কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুবর্ত্তিগণ বলেন—তিনি সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করেছেন। পরমহংস দেবের অনুবর্ত্তিগণও বলেন যে, পরমহংসদেব সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করেছেন। এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? ...

ধর্ম্ম-সমন্বয় কথাটা আপনি কি অর্থে ব্যবহার করেছেন?" ইত্যাদি।

সব চেয়ে বড় কথা—ধর্ম্ম-শব্দের অর্থনির্ণয়। আমি শ্রদ্ধেয় বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মার্থ লইয়া সামান্য আলোচনা করিব।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে—ভারতের সংস্কৃত শব্দ অর্থের সহিত চিরন্তন সম্বন্ধবিশিষ্ট। "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ"। উহা যখনই কল্পিত অর্থে প্রযুক্ত হইবে, সেইখানেই আমরা শব্দার্থ লইয়া ব্যভিচার করিব। শব্দ-বিজ্ঞানের এই ন্যায় চির-প্রসিদ্ধ ও প্রমাণিত—শব্দ-ভেদে কর্ম্ম-ভেদের ন্যায়, অর্থ-ভেদে জ্ঞান-ভেদও হইবে। অর্ব্বাচীন যুগের মনীষীরা ইহা না বুঝিয়া, ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অধিক নষ্ট করিতেছেন। ভারতীয় মস্তিষ্ক হারাইয়া ভারতীয় ধর্ম্মের অনুশীলন অধিক সাংঘাতিক হয়। এই দেড়শত বৎসরের ইতিহাসে এই হেতু সংস্কৃত সাহিত্যে অনভিজ্ঞ দেশীয় মনীষীদের আমরা অতিশয় ভয় করি। সাধন-বিজ্ঞানও শব্দ-ভেদ ও অর্থ-ভেদ হেতু বিকৃত পথ ধরায়। পণ্ডিতদের ন্যায় ধার্ম্মিকদের দ্বারাও ভারতের জাতীয়তা ক্রমে ভিত্তিহীন হয়। শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়ের সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ করিতে হইবে এবং ইহা অতিক্রম করিয়া যদি কোন শব্দের অর্থ করিতে হয়, শব্দ-শক্তির অনুভূতির দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে। এইরূপ অর্থ শব্দ শাস্ত্রে রূঢ়ার্থ বলিয়া কথিত।

ধর্ম্ম—ইহার সাধারণ অর্থের দিকটাই দেখা যাউক। ঔণাদিক ম-প্রত্যয়ের দ্বারা উহা নিষ্পন্ন। ধারয়তি বা ধরতি লোকান্ অপায়াৎ ইতি ধর্ম্মঃ বা ধর্ম্মম্।

ধৃ—কর্ত্তৃবাচ্যে ম করিয়া ধর্ম্মঃ, যাহা সর্ব্ববিধ অপায়ে অর্থাৎ অমঙ্গল বা পতন হইতে মানবসমাজকে ধারণ করিয়া থাকে।

এই হেতু ধর্ম্ম-শব্দের অর্থ, শুভাদৃষ্টে, পুণ্য, আচার, সৎকর্ম্ম, স্বভাব, গুণ, অহিংসা প্রভৃতি রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে।

অতএব ধর্ম্ম নিষ্পাদ্য বিষয় হইল, বিধায়ক হইল, যাহা করিলে হয় অর্থাৎ অনুষ্ঠানসাধ্য, পুরুষব্যপারের অধীন, তাহার সমন্বয় হইবে কেমন করিয়া? মানুষ তো সমগুণ লইয়া জন্মে নাই। প্রকৃতি-ভেদে মানুষকে পতন হইতে রক্ষা করার জন্য বিচিত্র আচার শুধু প্রয়োজন নয়, অনিবার্য্য। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ধর্ম্মের অনুবাদ যজ্ঞ, দান, অহিংসা, এমন কি ধর্ম্মের যে ধৃতি-শক্তি তাহাও গুণ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইবে বলা হইয়াছে। এই জন্যই তো স্ব-কর্ম্মের ন্যায়, স্ব-ভাবের ন্যায়, স্ব-ধর্ম্মে আনুগত্যের বিধান দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্ব-কর্ম্মের ন্যায় সর্ব্ব-ধর্ম্মের উৎসর্গে শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণের বিধানই গীতায় বিশদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই পরম ভাগবত তত্ত্বেই ধর্ম্ম-ভেদ ও সর্ব্ব-ভেদের সমন্বয়। এই জন্যই তো 'তত্তু সমন্বয়াৎ'—ব্রহ্ম-সূত্রের রচনা। ধর্ম্ম-সমন্বয় নিছক কল্পনা নহে কি?

ধর্ম্মের এই অর্থ স্বীকৃত হইলে, ধর্ম্ম-সমন্বয়ের কথা আর আসে না। প্রকৃতি-প্রত্যয় ছাড়িয়া শব্দশক্তির অনুভূতি ধর্ম্মের রূঢ়ী অর্থে যদি অন্য কিছু গৃহীত হয়, তাহা হইলে অন্য কথা। কিন্তু তাহারও প্রতিবাদ আছে। শক্তি বুঝিয়া বাক্যের অর্থ-কল্পনা, তাহা প্রমাণসিদ্ধ হওয়া চাই; এই প্রমাণ শ্রুত্যাদি প্রমাণ। কোথাও কি ধর্ম্ম-শব্দের রূঢ়ী অর্থে ধর্ম্মকে ক্রিয়া ও গুণবিরহিত অদ্বয় বস্তু বলা হইয়াছে, যাহা সর্ব্ব-সমন্বয়-মূর্ত্তি? বরং মহর্ষি জৈমিনির পূর্ব্ব মীমাংসার রচনায় ইহাই সুস্পষ্ট হয় যে, ধর্ম গুণ ও ক্রিয়াযুক্ত হওয়া, উহা চির দিন অনুষ্ঠেয়, এবং অনুষ্ঠানকারী যাহারা, তাহারা এক প্রকৃতি-বিশিষ্ট না হওয়ায়, ধর্ম্মাচার ভিন্ন ভিন্ন হইবেই। যুগ-ভেদে ধর্ম্মের হ্রাসবৃদ্ধিও হইবে। নানা ধর্ম্মের কথা কোন্ হিন্দু না জানে? মনুও বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম, রাজ-ধর্ম্ম, ক্ষাত্র-ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রকৃতিভেদে ধর্ম্মভেদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা আজ যদি শ্রুতি ও স্মৃতি অতিক্রম করিয়া ধর্ম্ম-শব্দের কল্পিত অর্থ করি, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অর্থভেদে জ্ঞান-ভেদ অবশ্যম্ভাবী। এক্ষণে প্রশ্ন শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করিয়াছেন কিনা? ব্রাহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বাঙ্গালীর চির প্রণম্য; কিন্তু অধুনা বহুপ্রসিদ্ধ মনীষীদের ন্যায় তিনিও মিশ্রবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। আদর্শবাদের দায়ে আর্য দৃষ্টি ম্লান করিয়া তিনি ধর্ম্মে নিখিল মানবজাতির সমন্বয়সাধনের স্বপ্ন দেখিতে পারেন, কিন্তু পরমহংস দেবের ভারতীয় মস্তিষ্ক অবিকৃত ছিল। তিনি কি ধর্ম্মসমন্বয়ের বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন?

তাঁর নিজের সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ কথা "যত মত, তত পথ।" মত-বৈচিত্র্যে পথ-বৈচিত্র্যের কথা এইখানে সুস্পষ্ট। তিনি হিন্দুর নানা শাখা-ধর্ম্মে, খৃষ্টের সাধনে, গোবিন্দ সুফির ইসলাম-দীক্ষায় মত ও পথের সমন্বয় করেন নাই, ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথ পৌঁছিয়াছে সেই নিরতিশয় ব্রহ্মে, এই কথাই প্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার মর্ম্ম আমরা এই ভাবেই গ্রহণ করিয়াছি।

কর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্মের গতিও গহন অর্থাৎ প্রকৃতিভেদে দুর্জ্ঞেয়। ইহা শিবের জটাজালের ন্যায় বিচিত্র বহু ভঙ্গী ও ছন্দে লীলায়িত। ঠাকুরের জলন্ত ঈশ্বরানুভূতি কোনও কাল্পনিক আদর্শবাদের প্রশ্রয় দিয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা হয় না। বরং তাঁহারই জীবনে আমরা দেখি, তিনি স্বয়ং বিভিন্ন সাধনপথে বিচরণ করিয়া, অগণ্য ভবিষ্য সাধক-সাধিকার প্রকৃতি-ভেদে বিভিন্ন ভাবেই তাহাদের ধর্ম্মজীবন সুগঠিত করার বিধান দিয়া গিয়াছেন ও স্বয়ং গুরু-রূপে, ইষ্টরূপে তাঁহাদের সকলকেই সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-মার্গেই নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। গীতার উত্তম রহস্য "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে"—এই বাণীই ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাধনায় ও জীবনে প্রমাণিত। যাহা গীতায় জাতির নিকট অভিধেয় ছিল, দক্ষিণেশ্বরে তাহার অনুবাদ দেখিয়াছি। সর্ব্ব ধর্ম্মী চরম সত্য এইখানেই নিহিত। যে যোগ ভগবান বিবস্বান্ মনুকে দিয়াছিলেন, তারপর পরম্পরা-প্রাপ্ত ভারত কালে নষ্ট করিয়াছিল—যে যোগের মন্ত্র মাত্র আবিষ্কৃত হয় কুরুক্ষেত্রে, দক্ষিণেশ্বরে তাহার সিদ্ধি। ধর্ম্মের উত্থান আছে, অনুত্থান আছে। কিন্তু 'ব্রহ্মানন্দং পরম-সুখদম্' নিত্য শাশ্বত॥। তাই যোগসূত্রে কৃষ্ণের সহিত পার্থের মিলন-তত্ত্ব; রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তার অনুবাদ। এই সত্য-প্রচারেই জাতির শ্রী ও নিঃশ্রেয়স্-লাভ হইবে।

## ত্রুটি-স্বীকার

বহু পত্রোত্তর দেওয়া সম্ভব হইল না। স্থানাভাবের সহিত শক্তি ও সময়ের অভাব ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ "অবান্তর প্রশ্নের" উত্তর শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসাদ নিয়োগী মহাশয় দিয়াছেন—উহার আলোচনা আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করার ইচ্ছা রহিল।

# মধু-প্রতিভা

শ্রীজহরলাল বসু

প্রতিভা চায় মুক্তপক্ষে অনন্ত শূন্যে অবাধ গতিতে বিচরণ করিতে। নির্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে প্রতিভাকে আবদ্ধ রাখিতে পারা যায় না। মধুসূদন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন অলোকসামান্য প্রতিভা লইয়া; তাই কি বাল্যে, কি শৈশবে, কি যৌবনে, কি বার্দ্ধক্যে সকল সময়েই তাঁহার জীবনে প্রচণ্ড উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল আচরণই পরিলক্ষিত হয়। আমার তো মনে হয় না—কোন দিনই মধুসূদনকে শান্ত শিষ্ট বিনীতভাবে আচরণ করিতে দেখিয়াছি।

শৈশবে দেখিতে পাই—মধুসূদন স্নেহের দুলাল, অতিরিক্ত বিলাসপ্রিয়, উচ্ছৃঙ্খল কিন্তু অতিশয় মেধাবী। এই মনোবৃত্তিগুলিই ক্রমশঃ তাঁহার উত্তরজীবনে পরিবর্ধিত ও প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তাঁহার গর্ভধারিণী জাহ্নবী দেবী যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন আদরের দুলাল মধুসূদন অর্থকৃচ্ছ্রতা কাহাকে বলে তাহা কখনও জানিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রাণ যখন যাহা চাহিত, তাহাতেই মুঠা মুঠা অর্থ তিনি দুই হাতে খরচ করিতেন; ইহার জন্য তাঁহার পিতা বা মাতা একদিনের জন্যও তাঁহাকে কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু এই শাসন না করাই তাঁহার চরিত্রের সমস্ত অংশটারই উপর অমিত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সংযম বলিয়া জিনিষটা ছিল তাঁহার নিকট অনাস্বাদিত রস মধু; বাল্যে শাসন না করায় তাঁহাকে পরে শাসন করা অসম্ভব হইয়াছিল। ইহার জন্য, জীবনের উত্তরভাগে তিনি যতই উচ্ছৃঙ্খল ও অনাচারী হউন না কেন, এই একান্ত শাসনাভাবই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি জীবনের অন্তর্নিহিত মনোবৃত্তিগুলির স্বতঃস্ফূরণের প্রচুর সুযোগ দান করিয়াছিল।*

মদমত্ত মাতঙ্গকে আলানে নিবদ্ধ রাখিবার প্রয়াস যেমন বৃথাই হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রচণ্ড প্রতিভাসম্পন্ন মধুকে সংযম মিতাচার প্রভৃতির নিগড়ে কেহই কোনদিন বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহার মন যখন যেদিকে যাইতে চাহিত—ধূমকেতুর মত, কক্ষচ্যুত গ্রহের মত, প্রচণ্ড উদ্দামবেগে সেই দিকেই ছুটিত; সমাজের বিধিনিষেধের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিত না। এই অবাধ স্বাধীনতার গুণেই মধুসূদনের দোষগুণসমূহের স্বতঃস্ফূরণের প্রচুর সুযোগ পাইয়াছিল। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে চিরদিনই তিনি মেধাবী ছাত্র বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

যৌবনে যেরূপ পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মধ্যে তিনি আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও অনুরাগ ক্রমশঃই শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। বিজ্ঞানেই বলে—Nature abhors vacuum; তখন তাঁহার মনের সেই রিক্তস্থান দখল করিতে আসিল খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ।

মদ্যপান জিনিষটা তখনকার সমাজে তত নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত না। (শুনা যায়—তখনকার দিনে রাজা রামমোহনের মত লোকও মদ্যপান নিন্দনীয় মনে করিতেন না।) বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যেও মদ্যপান বিষয়ে সতর্কদৃষ্টি তো দূরের কথা, বরং ডিরোজিও প্রভৃতিরা গুরুশিষ্যে একত্র পান করিতেন। শুধু তাই নয়—মধুসূদনের আবার এ বিষয়ে লাভ হইয়াছিল double encouragement, তাঁহার পিতাও নাকি তাঁহাকে এ বিষয়ে পরোক্ষভাবে উৎসাহ দিতেন।

অধ্যয়ন বিষয়েও তাঁহার ঠিক এই উদ্দাম ভাব। জীবনের প্রথম ভাগে তিনি ছিলেন মাতৃভাষার প্রতি একান্ত আস্থাহীন। বিদ্যালয়ে পরিদর্শক (Inspector) আসিয়া লিখিতে বলিলেন "পৃথিবী",—তিনি লিখিয়া বসিলেন প্র—থি—বি; সমপাঠীরা ঠাট্টা করিল, তিনি গ্রাহ্যই করিলেন না; বরং বলিলেন—"It is all the same, whether I write পৃথিবী" or প্রথিবি; তখন তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বিজাতীয় ভাষা উত্তম রূপে আয়ত্ত করিয়া, সেই ভাষায় উচ্চ দরের কবিতা রচনা করা। এই বয়সে তিনি অনেক ভাল ভাল ইংরেজী কবিতা লিখিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তখন তাঁহার মনে একথা একদিনও জাগে নাই যে, বিজাতীয় ব্যক্তির পক্ষে ইংরেজীতে কবিতা রচনা করিয়া নিজেকে ইংরেজের চক্ষে প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী কবি বলিয়া প্রতিপন্ন করান—বাতুলতা বা আকাশ কুসুম মাত্র। তখন তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা Milton বা Byronএর সমকক্ষ কবি হওয়া। তারপরে খেয়ালবশে বিলাত গমন করিয়া Barrister

হইলেন বটে, কিন্তু কোনদিন মন দিয়া ব্যারিষ্টারি করিলেন না। ব্যারিষ্টারি করিলে যে উপার্জন হইত না, তাহা নয়। কিন্তু এদিকে কোনদিনই তিনি মনোযোগ দেন নাই—দিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে তিনি Hebrew, Greek, Latin, French, German প্রভৃতি ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন এবং ঐ সকল ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ পুস্তক সকল অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন। Tasso, Homer, Virgil, প্রভৃতি কবির রচনা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

যখন যে জিনিষ তিনি শিক্ষা করিতে মনস্থ করিতেন তাহা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতেন। পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষাগুলি তিনি এরূপ উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে হোমর, দান্তে, ভার্জিল, ইউরিপিডিস্, পেত্রার্ক, ওভিড্, ট্যাসো, শেক্সপিয়ার, মিল্টন প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ইউরোপীয় ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিতে সমর্থ হওয়া অসম্ভব বুঝিতে পারিয়া, শেষে তিনি বঙ্গভাষায় লিখিতে সুরু করেন। বঙ্গভাষার জন্য কবি কখন এবং কি কারণ লেখনী ধারণ করেন, তাহার কারণ তিনি স্বয়ং নির্দেশ করিয়াছেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা' শীর্ষক চতুর্দশপদী কবিতায়।

দেশীয় ভাষার মধ্যে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষা তিনি উত্তমরূপেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। দেশজ সংস্কার বা কোনও সংস্কার তিনি কোনদিনই মানেন নাই, মানিতে পারেন নাই। সংস্কারের বা বিধি-নিষেধের আড়ষ্টবন্ধন ছিন্ন করাই তিনি গৌরবের মনে করিতেন। তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যেও এ মনোবৃত্তির অভাব ছিল না। প্যারীচরণ, ভূদেব প্রভৃতির মত মিতাচারী বা স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহার যুগে অল্পই ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু শিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন না। তবে মধুর ছিল সবেতেই বাড়াবাড়ি;—তিনি খৃষ্টান হইলেন, মেম বিবাহ করিলেন, বিলাত গেলেন,—কোনও বাধাবিঘ্ন তাঁহাকে আটকাইতে পারিল না। মধু জননীকে পৃথিবীর জীবন্ত দেবতার মত ভক্তি করিতেন, কিন্তু সেই জননীও তাঁহাকে স্বধর্মত্যাগ, বিধর্মীবিবাহ বা বিলাত গমন হইতে বিরত করিতে পারেন নাই।

কবি যখন বঙ্গভাষার জন্য লেখনীধারণ করিলেন, তখনও তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভা তাঁহাকে চিরাচরিত প্রথার অনুসরণ করিতে দিল না। সেই পয়ার আর ত্রিপদীতে কবিতা রচনা করিয়া যশোলাভ করা তিনি গৌরবজনক মনে করিলেন না। বাঙ্গালার নূতন ছন্দের মহাকাব্য জন্মলাভ করিল এই বঙ্গবিদ্বেষী বিধর্মী মধুর মধুস্রাবী লেখনী হইতে। প্রতিভাবান্ ব্যক্তি নিজের অলোকসামান্য শক্তির বিষয়ে সচেতন হইয়াই থাকেন। ভবভূতিও একদিন বলিয়াছিলেন—উৎপৎস্যতে মম কোঽপি সমানধর্মা। মধুও বলিলেন, 'রচিব মধুচক্র গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

কেহ কেহ Goldsmithএর সঙ্গে মধুর তুলনা করিয়াছেন। অন্ধকবি Miltonএর সঙ্গে তাঁহার তুলনা তো সকলেই করিয়াছেন; সে কথার পুনরাবৃত্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। আমি মধুসূদনের শুধু একটা দিক্‌ই অবলম্বন করিয়াছি; সেই দিক্‌টা লইয়াই আরম্ভ করিয়াছি, সেই দিকটা লইয়াই এ ক্ষুদ্র আলোচনার উপসংহার করিব। বাস্তবিক Goldsmith, মধুসূদন এবং হরিনাথ দে—তিনজনেই অল্পবিস্তর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন; হিসাবমত ব্যয় করিলে ইঁহাদের কাহাকেও কোনদিনই দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিতে হইত না। যেদিন পঞ্চাশ মুদ্রা রোজগার, সেদিনের ব্যয় হয়তো শতমুদ্রা; মধু এইরূপ ভাবেই চিরদিন ব্যয় করিয়াছেন। আবার পরের কাছে হাত পাতিতে কোনদিনই সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তাঁহার মন এত উদার ছিল যে, বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট সাহায্য গ্রহণ তিনি কোনদিনই অপমানজনক মনে করেন নাই! অর্থকে তিনি অতি তুচ্ছ জিনিষই মনে করিতেন। তাঁহার বিরাট্ প্রতিভা এই সব তুচ্ছ জিনিষের দিকে ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত করে নাই। মন তাঁহার চিরদিনই ছিল অনন্ত উদার।

মধুসূদনের সম্বন্ধে আমার এ আলোচনা একদেশী মাত্র। মধুসূদনের ভুবনবিজয়ী প্রতিভার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এবং তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে মধুসম্বন্ধীয় আলোচনা-প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

# ফরাসী ঔপনিবেশ সাম্রাজ্য

বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের অন্যান্য কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ—বৃটন ও ফ্রান্সের বিশাল দিগন্তব্যাপী ঔপনিবেশ সাম্রাজ্য আছে, জার্ম্মাণীর আজ তাহা নাই। বৃটনের সাম্রাজ্যে সূর্য্যাস্ত নাই, ইহা আমরা জানি; কিন্তু ফ্রান্সের সাম্রাজ্যেও যে সূর্য্য অস্ত যায় না, ইহা অনেকে হয়ত খেয়াল করেন না। প্রকৃতপক্ষে, ফ্রান্সের উপনিবেশের মধ্যে ব্যবধান মাত্র ভূমধ্য-সাগর ছাড়া আর কিছুই নাই।

এশিয়ায় সর্ব্বপ্রধান ফরাসী উপনিবেশ—ইন্দোচীন। ইহার পরিমাণ সমগ্র সাম্রাজ্যের ৬% ও লোক-সংখ্যা ২%। ইহা ছাড়া লেভেণ্টাইন রাষ্ট্রগুলি ফ্রান্সের অভিভাবকত্বাধীন রাজ্য (mandatory states)। ভারতের পাঁচটী ছোট
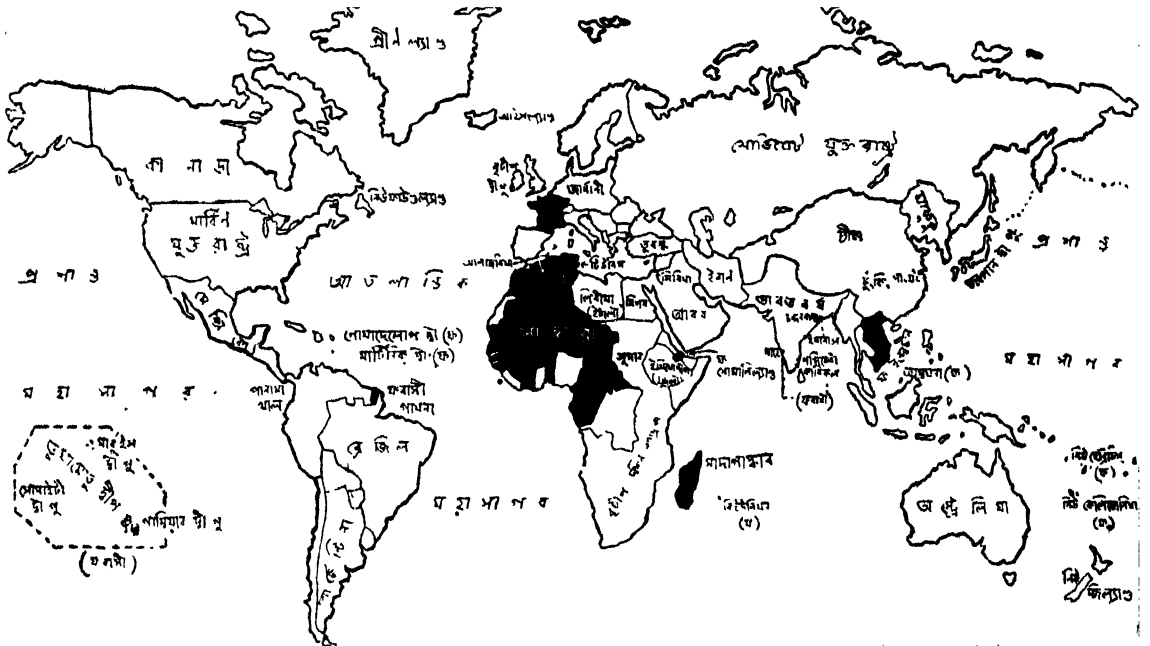
মানচিত্রের কাল চিহ্নিত স্থানগুলি ফরাসী অধিকৃত, প্রভাবিত ও অভিভাবকত্বাধীন স্থান

উনিবেশগুলি বৃটনেরই ন্যায় পৃথিবীর পঞ্চ মহাদেশে ছড়াইয়া আছে—পরিমাণে ইহা ঠিক বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরই দ্বিতীয়-স্থানীয়।

মূল ফ্রান্স সমগ্র ফরাসী সাম্রাজ্যের মাত্র শতকরা ৪ অংশ স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাহার লোকসংখ্যা সমগ্রের শতকরা ৪০ জন মাত্র। বিরাট্ ফরাসী সাম্রাজ্যের শতকরা ৮১ অংশ স্থান উত্তর ও মধ্য আফ্রিকায় অবস্থিত, তাহার লোকসংখ্যা শতকরা ৩৩ জন। ফ্রান্সের এই আফ্রিকান সাম্রাজ্য আলজিরিয়া, টিউনিস, মরক্কো, পশ্চিম আফ্রিকা, বিষুবরেখাবর্ত্তী আফ্রিকা, টোগো ও ক্যামারুন দেশগুলি লইয়া গঠিত। খাস ফ্রান্স ও আফ্রিকান উপনিবেশের কথা আমরা সকলেই বিদিত। এই ভারতীয় উপনিবেশে আসিবার পথে ফরাসী সোমালি তটভূমি এবং মাদাগাস্কা দ্বীপপুঞ্জ ও রে-ইউনিয়ন। তবে ভারত মহাসাগরের প্রবেশমুখে শেথসৈয়দের উপর ফরাসীর দাবী আজ পর্য্যন্ত বৃটন কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় নাই।

মাদাগাস্কার একতন্ত্রাধীন কমোরো দ্বীপপুঞ্জ, নিউ এমষ্টার্ডাম দ্বীপ, ক্রজেট দ্বীপ, কার্গুলে দ্বীপ—এইগুলি ভারত মহাসাগরে অবস্থিত। পক্ষান্তরে আদেলিল্যাণ্ড এণ্টার্টিক মহাসমুদ্রের দ্বীপ। এই সকল লইয়া একটী ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য বলা যাইতে পারে। ইহাও ফরাসী শক্তির একটী প্রধান প্রভাব-ক্ষেত্র।

আমেরিকাতেও ফরাসী উপনিবেশ আছে। ইহা তাহার পূর্ব্বতন বিশাল আমেরিকান উপনিবেশ-সাম্রাজ্যের শেষ ধ্বংসাবশেষ মাত্র। গদেলুপ, মার্তিনিক, সেণ্ট পিয়ের ও মিকেলন, ফ্রেঞ্চ গায়েনা ও ইনিনি—এইগুলি বর্ত্তমান ফরাসী-আমেরিকান রাষ্ট্র। কিন্তু প্রশান্ত মহাসমুদ্রের উপকূল ওশিনিয়ায় ও নিউ ক্যালিডোনিয়ায় এখনও তাহার পূর্ব্বাধিকৃত সমস্ত স্থানই প্রায় আছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের ন্যায় ফ্রান্সের উপনিবেশগুলি Commonwealth নহে অর্থাৎ তাহার অধিকাংশ অঙ্গ Dominion states নহে, পরন্তু ফরাসী উপনিবেশ সবই ভারতের ন্যায় ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে উত্তর আলজিরিয়া, কোচীন চায়না, সেনেগাল, গদেলুপ, মার্তিনিক, রে-ইউনিয়ন ও ফ্রেঞ্চ গায়েনা প্যারিসের রাষ্ট্রপরিষদে সদস্য প্রেরণ করে। তাহা ছাড়া সর্ব্বত্রই প্যারিস হইতে গভর্ণর বা গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত করিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়। ম্যাণ্ডেটারী রাষ্ট্র—টোগো ও ক্যামারুনে কমিশনর শাসন করেন। মরক্কো ও টিউনিস ফ্রান্সের রক্ষণাধীন রাষ্ট্র অর্থাৎ protectorates—এখানে ফ্রেঞ্চ রেসিডেণ্ট জেনারেল আছেন। ফ্রান্সের প্রান্তদেশে মনাকো ও আন্দোরাও প্রটেক্টোরেট রাষ্ট্র।

উপরে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহা ছাড়া নিউ হেব্রিডিসে, ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ কণ্ডোমিনিয়ম, তাঞ্জিয়ার (যাহা সম্প্রতি স্পেন দখল করিয়াছে) সাংহাই, হঙ্কো, টিয়েন্‌সিন ও ক্যাণ্টনেও ফরাসী প্রভাবের পরিচয় আছে। ফ্রান্সের আর্থিক প্রভাব—যুগোস্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড, মিশর ও সুয়েজ ক্যানেল, স্প্যানিস মরক্কো, আবিসিনিয়া, বলকান ও লাতিন আমেরিকাতেও যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল বা আছে। ফ্রান্সের মূলধন আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে, কানাডায়, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ও বৃটেনেও প্রভূত পরিমাণে খাটিতেছে। নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড ও স্পিটজবার্গেনে ফরাসীদের মাছ ধরিবার অধিকার আছে।

ফ্রান্সের মিত্র ছিল—ক্ষুদে আঁতাস্ত (চেকোস্লোভেকিয়া, রুমেনিয়া, যুগোস্লাভিয়া), পোল্যাণ্ড ও রুষিয়া। তাহা ছাড়া, গ্রেট ব্রিটেন ও বেলজিয়মের সহিত তাহার সামরিক সন্ধি ছিল। এইরূপে জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ফ্রান্সই ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থলশক্তি ছিল। ফ্রান্সের কৃষ্টিগত প্রভাবও জগতে ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজী ভাষার সঙ্গে ফরাসী ভাষা আজও জগতের সর্ব্বত্র আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রনীতিক ভাষা বলিয়া স্বীকৃত। ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই ফরাসী ভাষা মাতৃভাষার পরেই দ্বিতীয় ভাষারূপে শিক্ষণীয়। সুইজারল্যাণ্ড, লাক্সেমবার্গে, বেলজিয়ম ও বেলজিয়ান কঙ্গোয়, হাইটি, কানাডার কুইবেক প্রদেশ, বৃটিশ চ্যানেল আইল্যাণ্ড, এমন কি মরিটিয়স প্রভৃতি ইংরাজ উপনিবেশেও ফরাসী ভাষা মূল বা অন্যতম মাতৃভাষারূপে প্রচলিত। পোল্যাণ্ড, রুমেনিয়া, ইরাণ, লাক্সেমবার্গে ফরাসী কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রভাব বিশেষভাবেই লক্ষিত হয়।

# গান

শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত

নিশিদিন জাগি তোমার লাগিয়া, সে কথা জান তো প্রিয়,
তুমি আছ আর আমি আছি শুধু, এ কথা বলিয়া দিও।
নিখিল বিশ্বে ফিরি একা একা,
কেবল নেহারি মরু-বালু-রেখা,
মাঝে মাঝে কেন অভিসার-বেশ, সে পরশ রমণীয়।

# ব্রহ্মসূত্র

## ২

শ্রীমতিলাল রায়

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে সকল বাক্যের তাৎপর্য্য ব্রহ্মে পর্য্যবসিত, তাহাই প্রদর্শিত হইবে। প্রত্যেক অধ্যায় চারিটী করিয়া পাদে বিভক্ত। আমরা প্রথম পাদের প্রথম সূত্র উচ্চারণ করিতেছি। এই পাদে ব্রহ্মলিঙ্গ বাক্যসমূহ মীমাংসিত হইবে।

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥১॥

অথ ( অনন্তর ) অতঃ ( অতএব ) ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক শব্দটী সংশয়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইতে হইবে। প্রতিপক্ষের যদি এই বিষয়ে কিছু বলিবার থাকে, তাহার নিরাকরণ করিতে হইবে। তারপর সূত্রের অর্থ সিদ্ধান্তপূর্ণ হইলে, উহার পারম্পর্য্য দেখিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রথম অথ শব্দ। অথ শব্দের ৯টী অর্থ আছে। মঙ্গল, অনন্তর, সমুচ্চয়, প্রশ্ন, আরম্ভ, সাফল্য অধিকার, সংশয় ও বিকল্প।

গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলবাচী অথ শব্দ অপ্রাসঙ্গিক নহে। 'অথ' শব্দের মধ্যে মাঙ্গলিক সঙ্কেত আছে, ইহা সত্য এবং অথ শব্দটী প্রয়োগ করার ইহাও একটা কারণ হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সহিত এই বাক্যের এইরূপ অর্থের কোন সম্বন্ধ নাই। 'অথ' শব্দ মঙ্গলার্থে গৃহীত হইলে সূত্রটী অপৃথক্ করিয়া ধরা যায় না, অতএব অথ শব্দের মঙ্গল ভাবটী মাত্র গ্রহণ করিয়া, এইখানে ইহা কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাই গ্রহণীয়। পূর্ব্বাচার্য্যগণ, বিশেষতঃ আচার্য্য শঙ্কর অথ শব্দের বিচার বিস্তৃত ভাবে করিয়া ইহার অর্থ অনন্তর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। একটী বাক্যের অর্থ লইয়া বিচারের কারণ—'অথ' শব্দের অর্থগুলির মধ্যে 'শাস্ত্রারম্ভের এই বাক্যটীর যতগুলি অর্থ আছে তাহা নানাভাবে প্রযুজ্য হইতে পারে। 'অথ' শব্দের অর্থ মঙ্গলের ন্যায় ইহার আরম্ভ অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ঐ শব্দের ন্যায় আরম্ভ বাক্যটীও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সহিত অন্বিত হয় না। এইরূপ 'অথ' শব্দের যতগুলি অর্থ আছে, সেগুলি স্বতঃই সম্মুখে আসিয়া পড়ে। কিন্তু কোন অর্থই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বাক্যের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট না হওয়ায়, অথ শব্দের অর্থ অনন্তর অবশ্যই গ্রহণীয়। অনন্তর অর্থ গ্রহণ করিলেই সংশয় দূর হয় না, স্বতঃই প্রশ্ন উঠে কাহার অন্তর? এই প্রশ্নের সদুত্তর না পাইলে, অর্থগ্রহণ কার্য্যকরী হইবে না। "শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ" অর্থাৎ শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ চিরন্তন। 'অথ' শব্দের সেই অর্থই গ্রহণযোগ্য হইবে, যে অর্থ শুধু ঐ বাক্যের সহিত অন্বিত নহে, পরন্তু সমুদয় সূত্রার্থকে বিশদ করিয়া তুলে। কিসের অন্তর বা কাহার অন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার হেতু হন?

পূর্ব্বমীমাংসায় ঠিক এইরূপ সূত্রই মহর্ষি জৈমিনি রচনা করিয়াছেন। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বেদাধ্যয়নের পর গুরুগৃহে অবস্থানকালে করিতে হয়। ধর্ম্ম কর্ম্ম বা অনুষ্ঠানসাধ্য। ইহার একটা ক্রম আছে। এই কার্য্যের পর অন্য কার্য্য—শাস্ত্রে এইরূপ বিধিবাক্য অপ্রসিদ্ধও নহে। কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কি এইরূপ কর্ম্মসম্বন্ধবিশিষ্ট যে, কোন কিছু করার পর, তবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে হইবে? ধর্ম্মের ফল অভ্যুদয়, উহা অনুষ্ঠানসাধ্য। ব্রহ্মজ্ঞান মুক্তি। ইহা অনুষ্ঠাননিরপেক্ষ। কর্ম্মাশ্রয়ী—ধর্ম্ম। জ্ঞানাশ্রয়ী—ব্রহ্ম। কর্ম্ম—করণীয়। জ্ঞান—উৎপাদনীয়। ধর্ম্ম—আদিষ্ট হইতে পারে। জ্ঞান আদেশের অপেক্ষা রাখে না, উহা স্বতঃই উৎপাদ্য। এই হেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে কিছু করার উপর এই অধিকার যদি প্রতিষ্ঠা পায়, তবে ব্রহ্ম করণীয় হইয়া পড়েন। ইহাতে ব্রহ্মের নিত্যসিদ্ধত্ব রহিত হয়। তিনি লোকব্যাপারের অধীন হইয়া পড়েন। ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম, এই দুই বিষয়ের চোদক বাক্যও এই হেতু ভিন্ন ভিন্ন। 'ধর্ম্ম কর' বলিয়া উপদিষ্ট হয়, 'ব্রহ্ম জান' এই কথাই শ্রুতি-প্রসিদ্ধ। ব্রহ্ম করার নয়, অতএব অননুষ্ঠেয়। তবে কিসের অনন্তর?

কেহ কেহ বলেন "বৃত্তাৎ কর্ম্মাধিগমনাদনন্তরং ব্রহ্মবিবিদিষা" অর্থাৎ পূর্ব্বে অধীত বেদোক্ত কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের অন্তর, উপনিষদাদি পাঠের অন্তর ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের ইচ্ছা হয়। আচার্য্য শঙ্কর বলেন—বিবেক, বৈরাগ্য,

শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, সমাধান, শ্রদ্ধা এবং মুমুক্ষুত্ব যাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায়, তিনিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। প্রশ্ন হইতেছে—পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যগণের অভিমতানুযায়ী কার্য্যাদি না করিয়াও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রহ্ম, ভগবান, আত্মা নামভেদ মাত্র। যাঁহারা পূর্ব্বমীমাংসা বা উপনিষদাদি অধ্যয়ন করেন না, যাঁহারা আচার্য্য শঙ্করের উল্লিখিত সাধন আশ্রয় করেন না, এমন লোককেও আমরা ব্রহ্মজ্ঞানের পিপাসু হইতে দেখিয়াছি। ভারতেতর প্রদেশেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর সন্ধান পাওয়া যায়। অতি অসচ্চরিত্র বিল্বমঙ্গলকেও আমরা উক্ত প্রকার অধিকার অর্জ্জন না করিয়া ব্রহ্মপিপাসু হইতে দেখি। এই প্রমাণে অনায়াসেই বলা যায়, অথ শব্দের অর্থ অনন্তর হইলেও, ঐ সকল অনুষ্ঠানসাপেক্ষ নহে।

অতএব কাহার অন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা? আমরা পূর্ব্বাচার্য্যগণের অথ শব্দের ব্যাখ্যা সশ্রদ্ধায় স্বীকার করিয়া বলিতে চাহি—ব্রহ্মসূত্র প্রসিদ্ধ ১৮ খানি উপনিষৎ, মহাভারত, মনু, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায়, পূর্ব্বমীমাংসা, চার্ব্বাক্, বৌদ্ধ, জৈন, মাহেশ্বর প্রভৃতির মতবাদ, পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত গ্রন্থগুলি অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে ব্রহ্মবিষয়ক প্রসঙ্গ আছে, ব্রহ্মের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব সম্বন্ধে বিচার আছে। কিন্তু ব্রহ্ম কি বস্তু, তাহার প্রকৃতি কিরূপ, তাহা ন্যায়তঃ বিচার করিয়া গ্রহণ করার সুস্পষ্ট পথ নাই। ঋষি বাদরায়ণ নিখিল বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, বিভাগ করিয়া, সর্ব্বদর্শন নির্ঘণ্ট করিয়া, চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতির নাস্তিক্যবাদ খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছেন। অতএব কাহার অন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ইহা সহজেই অবধারণযোগ্য। গ্রন্থারম্ভে প্রথম সূত্র গ্রন্থকারেরই মনোভাব প্রকাশ করিতেছে। আমরা এই অর্থই সমীচীন মনে করি। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, মতদ্বৈধের কারণ থাকে না; আর গ্রন্থকার যে অবস্থায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অবস্থায় উপনীত, সেই অবস্থায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইলে অর্থাৎ নিখিল বেদাদি শাস্ত্র এবং পাতঞ্জলাদির যোগসাধনের পর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা স্বভাবতঃই আসিয়া পড়িবে; না আসিলেও, মহামতি বাদরায়ণের সূত্রার্থ অনুধাবন করিলে ফল সমতুল্যই হইবে—কেননা ব্রহ্মসূত্রের মধ্যেই আমরা সর্ব্ব শাস্ত্রের নির্য্যাস আস্বাদ করিতে পারি।

নিখিল বেদাদি শাস্ত্রের আলোচনা ও বেদ-বিভাগের পর, ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা রূপ সূত্র রচনা করিতেছেন। কি হেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, এই প্রথম সূত্রের রচনায় তাহা বলা হইল। এক্ষণে ব্রহ্ম কি এবং জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ কি, ইহাই বিচার্য্য।

ব্রহ্ম কি, তাহা পর পর সূত্রে যথারীতি বিজ্ঞাপিত হইবে। ব্রহ্ম যদি অনাশ্রিত বস্তু হন, অথবা ব্রহ্মাশ্রয়ী কিছু না থাকে, তাহার বিচারও হইবে। অথবা ব্রহ্ম যদি কিছুর আশ্রিত হন বা ব্রহ্মাশ্রিত কোন বস্তু থাকে, ব্রহ্মের সহিত আমরা এই সকলই পাইব। অতএব ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই ক্ষেত্রে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিব না।

তবে একটা প্রশ্ন—ব্রহ্ম জানিবার বস্তু কি না? এবং জানিবার বস্তু হইলেও তাহা জানা যায় কিনা?

এইরূপ প্রশ্নের কারণ—চার্ব্বাকাদি নাস্তিকেরা বলেন, স্থূল অহং আস্পদ, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। অন্য কেহ কেহ বলেন, "চেতন বস্তু ইন্দ্রিয়সমষ্টি, অতএব ইন্দ্রিয়-সমষ্টিই আত্মা।" সূক্ষ্মবুদ্ধি পণ্ডিতেরা বলেন, "ইন্দ্রিয়-সমষ্টির উপরে মনের নিয়ন্তৃত্ব দেখা যায়, অতএব মনই আত্মা।" বৌদ্ধেরা বলেন, "ক্ষণবিনাশী বিজ্ঞানপ্রবাহ আত্মা নামে কথিত।" আর এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা বলেন, "আত্মা কোন পদার্থ নহে, উহা একটা মহাশূন্য।" নৈয়ায়িকের মতে "আত্মা দেহাদির অতীত, কিন্তু দেহাশ্রয়ী সংসরণশীল, কর্ম্মনিবহের কর্ত্তা, আত্মাই ভোক্তা।" কিন্তু আর এক পক্ষ বলেন, "আত্মার ভোক্তৃত্ব আছে, কর্ত্তৃত্ব নাই, আত্মা স্বয়ং অকর্ত্তা। ছায়ারূপে প্রকৃতির কর্তৃত্ব আত্মায় অনুক্রান্ত হয়।" অন্য আর এক পক্ষ বলেন, "দেহাশ্রয়ী সংসারী আত্মা ছাড়া অন্য এক স্বতন্ত্র ঈশ্বর আছেন। এই ঈশ্বরই দেহাশ্রয়ী আত্মার আত্মা।"

এমন কত আত্মবিষয়ক বিচারে আমাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হয়; ব্রহ্মসূত্রে এক পরম সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আত্মা ও ব্রহ্ম একার্থবাচক। আত্মা যদি জানিবার বিষয় না হইত, আত্মা লইয়া এত গবেষণা হইবে কেন? যাহা একেবারেই অপ্রসিদ্ধ তাহাকে জানিবার প্রবৃত্তি হয় না।

এই ক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠিতে পারে—এই তত্ত্ব যদি প্রসিদ্ধ হয়, তবে তাহাকে আবার জানিবার জন্য এত প্রযত্ন কেন? এই কথার উত্তর জিজ্ঞাসা শব্দে দেওয়া হইয়াছে। জিজ্ঞাসা অর্থে জানিবার প্রবৃত্তি। জ্ঞান নামক চিত্তবৃত্তিতে জ্ঞেয়রূপ বিষয়স্ফূর্ত্তি না হইলে, কিছু জানা যায় না। ব্রহ্মকে জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা। বৃহ ধাতু মন্ করিয়া ব্রহ্ম। বৃহ্ বৃদ্ধি। মন্ নিরতিশয়। অবধিরহিত সমৃদ্ধি ব্রহ্মের স্বরূপ। এই ব্রহ্মকে প্রকৃষ্টতর রূপে জানা নাই বলিয়া জিজ্ঞাসার উদয়। পরন্তু তিনি অবিজ্ঞেয় নহেন, ইহার শ্রুতি-প্রমাণ আছে। অতঃপর আমরা দ্বিতীয় সূত্রের আবৃত্তি করিতেছি।

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥২॥

যতঃ অর্থাৎ যাহা হইতে অস্য, এই জগতের জন্মাদি অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয়।

প্রথম সূত্রের যে জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম, তাঁহার লক্ষণ সম্বন্ধে সূত্রকার বলিতেছেন, এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাহা হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ম।

তাহা হইলে দেখা যায়, সৃষ্টির যত নাম, যত রূপ, যত আকার প্রকাশমান, যাহা কিছু সবই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টি। ব্রহ্মেই স্থিতি ও ব্রহ্মেই জগতের লয় হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই কথাই আছে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্মেতি।"

ব্রহ্ম শুধু সৃষ্টিকারণ নহেন, স্থিতি ও লয়েরও কারণ হন। অতএব ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে। সর্ব্বজ্ঞ না হইলে, সৃষ্টি হয় কি প্রকারে? স্থিতি ও লয়কাল নির্দ্দিষ্ট হয় কি প্রকারে? ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব, দুইই ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে। আর এক কথা। সূত্রে জন্মাদি শব্দ থাকায় সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, এই তিন অবস্থাই ব্রহ্মে অনুস্যূত হয়। ব্রহ্ম সৃষ্টির উপাদান। সৃষ্টি লীন হয় ব্রহ্মে। অতএব খুব স্পষ্টই বুঝা যায়, জগতের নিমিত্ত ও উপাদান ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য নহে। সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বশক্তিমত্তাও ব্রহ্মে সূচিত হইতেছে এবং তিনি যখন সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্ত্তা, তখন তিনি নিরতিশয় অর্থাৎ সৃষ্ট জগৎ হইতে অতিরিক্ত, ইহাও প্রমাণিত হইল। সুতরাং ব্রহ্ম এক অদ্বৈত, সর্ব্বব্যাপী অনন্ত; তিনি জগদ্ব্যাপী, জগন্মূর্ত্তি এবং জগদতীত।

পূর্ব্বপক্ষ বলিতে পারেন—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্তও উপাদান কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব-নিরূপণ শ্রুতির অনুমান মাত্র। ইহার উত্তর—শ্রুতিতে ব্রহ্ম-নিরূপণ-সূচক বাক্যই শুধু উক্ত হয় নাই, পরন্তু ব্রহ্মবিষয়ে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের উপদেশও আছে। ব্রহ্মবিজ্ঞান আচার্য্যের সাহায্যেই জন্মিয়া থাকে। ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তিতে ব্রহ্মই উদিত হন। কেননা, ব্রহ্ম নিত্য ও সিদ্ধ বস্তু।

প্রতিপক্ষের ইহা যথেষ্ট উত্তর হইল না; কেননা, ব্রহ্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে ইহা প্রমাণ নহে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—ব্রহ্মবিজ্ঞান কর্ত্তব্য বা ক্রিয়ানিষ্পাদ্য নহে; পরন্তু অনুভব্য। অনুভবের প্রমাণ শ্রুতি ভিন্ন আর কিছু নয়; তাহার হেতু—ঘটের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ যেমন ঘটের কারণীভূত মৃত্তিকার সহিত সম্বন্ধের হেতু হয় এবং ঘট দেখিলেই তাহার কারণীভূত মৃত্তিকা সম্বন্ধে অনুভূতি জন্মে, ব্রহ্ম এইরূপ ইন্দ্রিয়গম্য নহেন, অতএব বেদান্ত বাক্য ভিন্ন ব্রহ্মের অন্য প্রমাণ কি থাকিতে পারে?

ইন্দ্রিয়াদি বাহ্য বস্তুই সন্দর্শন করে এবং উহা হইতেই অনুমান, উপমানাদি প্রমাণ সিদ্ধ হয়। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু নহেন। তাই কার্য্য দেখিয়া কারণ অনুমান এই ক্ষেত্রে অসাধ্য।

বরুণপুত্র ভৃগু পিতার নিকট ব্রহ্মোপদেশ চাহিয়াছিলেন। বরুণ পুত্রকে যাঁহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়, তাঁহাকেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছিলেন। ইহার কারণ—এই ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্ববস্তু জ্ঞানের দ্বারাই অনুভূত হয়। ব্রহ্ম অন্য কিছুর প্রমাণাধীন নহেন; অন্যের নিকট হইতে তাহাকে জানাও যায় না—ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হয়। এই হেতু শ্রুতি-প্রত্যয়হীন ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে ব্রহ্মসূত্র অপাঠ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

একই তত্ত্ব সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের হেতু কি প্রকারে হইতে পারে? এ তত্ত্ব অসমীচিন নহে। একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যায়, যাহা হইতে যাহা জন্মে, তাহাতেই তাহার স্থিতি ও লয়, দুইই হইয়া থাকে। সুবর্ণ হইতে কুণ্ডল, কুণ্ডলাকৃতি সুবর্ণেতেই অস্তিত্ব রক্ষা করে এবং উহার আকৃতি সুবর্ণেই লয় হয়। যাহা

হইতে সৃষ্টি, তাহাতেই সংহার সনাতন-নীতি। সৃষ্টি হইতে সংহার—এই অবকাশ-কালই সৃজনের আয়ুঃ। কাল ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র নহে, এ কথারও প্রচুর শ্রুতিপ্রমাণ আছে। তত্ত্বে প্রতিলোম-ক্রমে সৃজন সংহৃত হয়, অনুলোমক্রমে সৃষ্টির প্রকাশ হয়। সাগরতরঙ্গের ন্যায় প্রতিলোমে লীন ও অনুলোমে উৎপন্ন, ইহা দুর্ব্বোধ্য নহে। আমরা সৃষ্টিতে তত্ত্বের বহুত্ব অনুভব করি। সংহারে একত্বই প্রতিপাদিত হয়। ব্রহ্মের এই দুই অবস্থায় দুইটি নামকরণ হইয়াছে। একটী ক্ষর ভাব আর একটী অক্ষর ভাব। ক্ষর ভাবে অব্যয় ভাব নাই; আছে নানাত্ব। অক্ষরে সর্ব্ব অব্যক্ত হয়। এই তত্ত্ব ব্রহ্মবিজ্ঞানে নূতন নহে।

সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সংসরণশীলতার লক্ষণ, সুতরাং ইহার মধ্যে শক্তিমত্তার পরিচয় আছে। ব্রহ্ম তাই সর্ব্বশক্তিমান্। এই সূত্রে ব্রহ্মকে জ্ঞানঘন বলার কি তাৎপর্য্য আছে?

তাৎপর্য্য আছে। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় যাহা হইতে হয়, তাহার সর্ব্বশক্তিমত্তা আছে বলিলেই যথেষ্ট হয় না। পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু, তাহা গোচরীভূত হয়, অতএব এই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ থাকিতে পারে। কিন্তু যাহা প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নহে, কোন লক্ষণ দ্বারা তাহা অনুমেয় নহে। ঘটের কারণ মৃত্তিকা। ঘটের নির্ম্মাতাকেও আমরা অনুমান করিতে পারি। কেননা, সে ব্যক্তি অগোচরীভূত নহে। অতএব অনায়াসেই বলা যায়—ঘটনির্ম্মাতার ঘট সম্বন্ধে জ্ঞান অবশ্যই আছে। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় যাহা হইতে হয়, ঘটের মৃত্তিকার ন্যায় তাহা কেবল উপাদান কারণ নয়, তাহার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বও আছে। সেই তত্ত্ব দুর্নিরীক্ষ্য, তাই অনুমান-প্রমাণাদির দ্বারা তত্ত্বের সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রমাণিত হয় না; শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। আচার্য্য শঙ্কর তাই বলিয়াছেন, "......জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাৎ ভবতি তৎ ব্রহ্ম।"

ব্রহ্মস্বরূপনিরূপণ সূত্র সবখানি প্রমাণ নাও হইতে পারে, তাই তৃতীয় সূত্রের অবতারণা।

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥৩॥

শাস্ত্রের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থান, সেই হেতু।

প্রশ্ন—সেই হেতু কি? পূর্ব্ব সূত্রে ব্রহ্ম জগৎকারণ বলায়, তাঁহাকে কেবল সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়াই ব্যাখ্যা করা হয় নাই, সর্ব্বজ্ঞও বলা হইয়াছে। ইহাতে বাক্যার্থ বাক্যার্থ বা পারিভাষিকার্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা নহে। পূর্ব্ব সূত্রে ব্রহ্ম যখন সর্ব্ব-জগতের কারণ, তখন তিনি সর্ব্বজ্ঞ, এইরূপ অর্থ উপক্ষেপ হইয়াছে মনে হইতে পারে বলিয়াই তৃতীয় সূত্রের অবতারণা। এই সূত্রে বলা হইতেছে—শাস্ত্রযোনিত্ব হেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম। বৃহদারণ্যকে শাস্ত্রযোনিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ-বাক্য এইখানে উদ্ধার করিতেছি। "...অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিশ্বসিতানি।"

এই মহাভূত হইতে বেদাদি, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎসমূহ, শ্লোক ও সূত্রসমূহ, ব্যাখ্যান অনুব্যাখ্যান, সবই নির্গত হইয়াছে। ভূরি ভূরি শ্রুতি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য জটিল করিব না। মনু মহারাজও বলিয়াছেন "ইদং শাস্ত্রন্তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ"—অতএব নানা বিদ্যার আকর ও আশ্রয় যে শাস্ত্র, তাহার উদ্ভব-স্থান ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্মের যে সর্ব্বজ্ঞত্ব, তাহা প্রতিপাদিত হইল। উক্ত সূত্রে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব যদি প্রমাণিত হয়, তবে পূর্ব্ব সূত্রে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব অর্থ অবশ্যই উপক্ষিপ্ত হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। কিন্তু—না। পূর্ব্বসূত্রে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব ব্রহ্মবিদের পরোক্ষানুভূতি। এখানে শাস্ত্রের প্রতীক্ষা নাই। ব্রাহ্মণকে না দেখিয়া ব্রাহ্মণত্বের অববোধ পরোক্ষ জ্ঞান। অনুবাদ-রূপে ব্রাহ্মণ-বিগ্রহ দেখিয়া ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহা অপরোক্ষানুভূতি। ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব বিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞান সবখানি নহে। তাহার অপরোক্ষানুভূতিও আছে। এ ক্ষেত্রে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রদর্শনে শাস্ত্রযোনি ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রমাণ করা অনুবাদ দেখিয়াই অভিধেয়কে বরণ করা হইয়াছে; এই সূত্র পূর্ব্বোক্ত সূত্রের পূরণাত্মক বলা যাইতে পারে। আর এক প্রশ্ন উঠিতে পারে—বেদ যখন শাস্ত্র, তখন ব্রহ্ম বেদপ্রমাণ কি প্রকারে হইতে পারেন? বেদ তো শুধুই জ্ঞানপ্রতিপাদক নহে, ঋষি জৈমিনি বেদ ক্রিয়াপ্রতিপাদক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। যাহা ক্রিয়া প্রতিপাদক, তাহা জ্ঞানঘন ব্রহ্মের প্রমাণ কেমন করিয়া হইবে? তাহার উত্তরে বলা যায়, ব্রহ্মে ব্যুৎপন্ন শাস্ত্র কর্ম্মপর-রূপে কল্পিত হয় নাই, বেদের ক্রিয়ার্থক বাক্যাদি জৈমিনির বিধিনিষেধের কষ্টিপাথরে করিয়া কর্ম্মপ্রকরণের মন্ত্র সকলের স্বার্থত্যাগই ব্রহ্ম-স্বরূপত্বের উপায়—এই সঙ্কেতই দেওয়া হইয়াছে। জৈমিনি স্বয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। প্রবৃত্তিমূলক স্বভাবকে শাস্ত্রসহায়ে ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত করার জন্য বেদের আক্ষরিক কর্ম্মার্থগুলিকে বাছিয়া বাছিয়া তিনি ব্রহ্মলাভের সোপানস্বরূপ ধর্ম্মাঙ্গ গড়িয়া তুলিয়াছেন। পরন্তু শাস্ত্র সততই যাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমানগম্য, তাহার উপদেশ করে নাই।

"অজ্ঞাতজ্ঞাপকং শাস্ত্রম্" অর্থাৎ যাহা কেহ জানে না, অন্য কোন উপায়ে জানা যায় না, শাস্ত্রই সেখানে আশ্রয়। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, স্বতঃসিদ্ধ কর্ম্মরূপে প্রাথিত, তাহা সর্ব্বদাই অপুরুষার্থ। কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিরোধে শাস্ত্রবিরোধ হেতু বেদান্তবাক্য নিরর্থক অথবা প্রত্যক্ষানুমানাদি কর্ম্মের অনুবাদস্বরূপ যাহাতে না হয়, তাহার জন্য ঋষি বাদরায়ণ চতুর্থ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

# গবেষণা ও প্রেম

শ্রীমতিলাল দাশ

শারদ-প্রভাত। অতি-বর্ষণ শ্রাবণ বিদায় নিয়াছে—ভাদ্রের মেঘমুক্ত নীল আকাশে নূতনতর জ্যোতিঃ। সুধাংশু ওকালতী করে, কিন্তু ব্যবহার তাহার মন ভুলায় না—সে গবেষণা করে। প্রাচীন ভারতের বিগত দিনের ছবি তুলিতে তাহার আপ্রাণ যত্ন। শারদ-প্রভাতের মাধুর্য্য তাই তাহার চিত্তকে স্পর্শ করে না—সে ঋগ্বেদ খুলিয়া 'সভেয়' কাহাদের বলিত তাহাদের তত্ত্বানুসন্ধানে মগ্ন ছিল। রাত্রি-জাগরণ-ক্লান্ত সুধাংশুর চোখে অজ্ঞাতে ঘুম নামিয়া আসে—সে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখে।

কালের যাত্রা যেন পশ্চাদ্‌গতিতে বেদের যুগে ফিরিয়াছে। দর্ভ রাজার কাষ্ঠ প্রাসাদের সম্মুখে বিস্তৃত অঙ্গন। দর্ভপুত্র রথবীতি তখন রাজা। রাজার ইচ্ছা বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাই তিনি অত্রিকুলের মহাতপা অর্চ্চনানকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। চন্দ্রাতপের তলে সুন্দর বেদী—এক পাশে গার্হপত্য অগ্নি—এক পাশে আহবনীয় অগ্নি—নিম্নে দক্ষিণাগ্নি। শুষ্ক অশ্বত্থ কাষ্ঠে অরণি-সংযোগে অগ্নি সমুৎপাদিত হইল। তারপর উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত স্বরে হোতা মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন—অন্য দিকে অধ্বর্য্যু যজ্ঞ-কুণ্ডে হবিঃ প্রদান করিতেছেন। উদ্গাত্রী সামগান করিতেছেন—আর অর্চ্চনান প্রধান ঋত্বিক্‌রূপে সমস্ত দ্রব্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

ঋষির কণ্ঠে ঋক্ ধ্বনিত হইল—

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্
হোতারং রত্নধাতমম্।
অগ্নিঃ পূর্ব্বেভি ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি। ইত্যাদি

সুধাংশুর মনে হইল সে যেন বর্ত্তমানের নয়—সে যেন যাজ্ঞিক ঋষির পুত্র শ্যাবাশ্ব। বিস্মিত মুগ্ধ চিত্তে সে অগ্নির আহ্বান শুনিতেছে। সে যুগ এ যুগ নয়। হাতের কাছে সুইচ টিপিলে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে না, তাই অগ্নিকে ঋষির চক্ষে দেখা সম্ভব ছিল—শ্যাবাশ্বের অনুভূতি সুধাংশুর মনে জাগিল—অজ্ঞাতে সেও যেন গাহিল :

স্তুতি করি অগ্নি তোমা দেব বৈশ্বানর।
যজ্ঞ-পুরোহিত তুমি ঋত্বিক্ অমর। ইত্যাদি

কিন্তু অগ্নির শিখার বাহিরে কাহার ওই কাঞ্চন-বর্ণ দ্যুতি। সুধাংশু স্বপ্নে চোখ মুছিল—তাহার সুন্দর কেশদাম 'কপর্দ্দে' সজ্জিত—চোখে বিদ্যুৎ-দীপ্তি—ওষ্ঠে, বিম্বরাগ—গলদেশে নিষ্কমালা।

কর্ণে দুলিতেছে কর্ণশোভনা—হস্তে খাদি—খাদি-প্রতিষ্ঠানের নহে—সেকালের মণিখচিত অঙ্গুরীয়ক—পরণে পশমী নীবি, তাহার উপর হিরণ্ময় দ্রাপী। শ্যাবাশ্বের চোখে লাগিল বিস্ময়।

সে বিস্ময় অনাদি ও শাশ্বত। নারীর যে ভুবন-মোহিনী রূপ যুগযুগান্তর নরের চিত্তে পুলক ও মোহ জাগাইয়াছে সেই রূপের অনুভূতি শ্যাবাশ্বের চোখে লাগিল। যৌবনেই এমন মুহূর্ত্ত জাগে—যখন আশার অরুণ রশ্মি জীবনের দীর্ঘ পথকে রহস্যময় ও মধুময় করিয়া তোলে। পিছনে পড়িয়া রহে কিশোর মনের চপলতা—সম্মুখে জাগে আনন্দের নন্দন-পারিজাত। আলোছায়ায় প্রতিটি কৌতুকেই সঞ্চরিত হয় নব নব আশা। পথের প্রতিটি মোড়ে জাগে নব নব প্রলোভন। মনে হয় বিশ্বমানবের চির-পরিচিত অভিজ্ঞতার পথ—তবু যেন তাহার মাঝে রহিয়াছে তাহার স্বতন্ত্র অনুভূতি—তাহার ব্যক্তি-সত্তার বিশিষ্ট পুলক।

চারি চক্ষুর মিলন হইল। সুন্দরী সুবেশা রাজনন্দিনী রথবীতি-তনয়া সন্ধ্যা শ্যাবাশ্বের প্রতি স্নেহদৃষ্টিতে চাহিল। শ্যাবাশ্ব মুগ্ধ হইয়া গেল।

সুধাংশুর অন্তরে যখন এমনই আনন্দস্ফূর্ত্তি তখন পত্নী এবা ডাকিল—কণ্ঠ মধুবর্ষী নহে, চোখে সন্ধ্যার বিদ্যুৎ-চাহনি নাই—"শুনছ! ভোর বেলায় ঘুমিয়ে পড়ছ যে?"

সুধাংশু চোখ মেলিল। দূরে গেল বৈদিক যুগের সারল স্নিগ্ধ পরিবেশ—দূরে গেল প্রথম প্রণয়ের অপূর্ব্ব কুহক। সম্মুখে তাহার লেখার টেবিল অগোছাল হইয়া রহিয়াছে, বইগুলি ছড়ানো—এখানে এক টুক্‌রা কাগজ, ওখানে

পেন্সিল, পাশে পত্নী এষা। দূরে পুত্র পড়িতেছে—টানা সুরে বার বার একই কথার পুনরাবৃত্তি চলিতেছে।

সুধাংশু প্রশ্ন করিল—কি?

ঝঙ্কার উঠিল—"এই সব বাজে কাজ না করে যদি খোকাকে পড়িয়ে দিতে তাহলে খুব ভাল হ'ত।

—"বাজে কাজ?"

—"বাজে নয়ত কি? এই যে পঁচিশ বছর ধরে কাগজ কালি নষ্ট করছ—এর ফল কিছু ফলেছে?"

পত্নীর অনুযোগ মিথ্যা নয়। সুধাংশুও সাহিত্যিক, বহু দিন সাধনা করিয়াছে—যদিও সরস্বতীর প্রসাদ লাভ করিয়াছে তথাপি লক্ষ্মী বিরূপ। তাই নীরব হইয়া গেল।

—"কথা বলছ না যে? যদি নিজে না পড়াতে পার—একজন টিউটর রাখ—"

হায় অর্থহীন সে, সেখানেও তাহার মুস্কিল। সুধাংশু ডাকিল—"খোকা?"

—"বাবা।"

—"আয়, কি পারিস্‌নি বুঝিয়ে দেবো'খন—"

—"বাবা, আমার পড়া হয়ে গেছে, এইবার ছুটি দাও, আমি ওদের বাড়ীর সুধার সঙ্গে লাটিম খেলব—"

—"আচ্ছা যাও।"

খোকার ত্বরা সহিল না, সে দৌড়াইয়া পলায়ন করিল। গৃহকর্ত্রী নিবারণ করিবার অবসর পাইলেন না।

এষা রাগিয়া বলিল, "নিজের মাথাটি খেয়েছ, এখন ওর পরকাল ঝরঝরে কর—"

সুধাংশুও হাসিয়া বলিল, "একটা মজার স্বপ্ন দেখছিলাম—"

কৌতূহল নারীর স্বভাব-ধর্ম্ম। পুত্রের ভবিষ্যৎ ভুলিয়া এষা বলিল, "কি?"

—"আমি দেখছিলাম যেন ভারতের সামগীতি ঝঙ্কৃত যুগে ফিরেছি—আমি যেন ঋষির তনয়—রাজার যজ্ঞে গিয়েছি, সেখানে রাজকুমারী সন্ধ্যা তার প্রেম দিয়ে আমায় মুগ্ধ করছেন—"

—"এই বুঝি তোমার গবেষণা—আমি ভাবি তুমি বুঝি বেদ, উপনিষদ পড়ছ—ওমা, তা না—তুমি পরস্ত্রীর চিন্তা করছ! এই তোমার ভালমানুষি, ডুবে ডুবে জল খাও।"

সুধাংশু হাসিল, বলিল—"পরস্ত্রী না হ'লে কাব্য হয় না, কিন্তু এটা আমার নয়, গল্পটা বেদের, শুনবে?"

এষা রাগিয়া বলিল, "কিন্তু এই এক কথা ছাড়া কি গল্প হয় না, তা হলে? তোমার বেদেও এই সব অনাসৃষ্টি কথা—"

সুধাংশু বলিল, "অনাসৃষ্টি নয়, সৃষ্টির প্রথম ও শেষ কথা প্রেম। বেদে কি তার অভাব হতে পারে, শোন গল্পটি।"

—"মনে করেছিলাম আজ তিলের নাড়ু করব, তা হল না, তা হলে গল্পই বল শুনি।"

সুধাংশু উত্তর করিল, "অয়ি সুভাষিণি। তিল-লড্ডকা ভক্ষণে আমার প্রবৃত্তি নেই, তুমি অবহিত হও।"

এষা হাসিয়া বলিল, "তুমি যে কথক ঠাকুরের মত আরম্ভ করছ?"

—"কথক বই কি। দক্ষিণা চাই, দেবে ত?"

—"কি, চা আর আমলেট্?"

—"সে তর্ক এখন নয়, এখন গল্প শোন, তারপর দক্ষিণা বুঝে নেব।"

—"বল।"

সুধাংশু আরম্ভ করিল, "শ্যাবাশ্ব ঋষি তনয়। গুরু গৃহে ব্রহ্মচর্য্য যাপন করে' গৃহে ফিরেছেন স্নাতক হয়ে।"

এষা প্রশ্ন করিল, "স্নাতক কি?"

সুধাংশু বলিল, "আজকালকার ভাষায় বলতে পার—গ্র্যাজুয়েট্ হয়ে তখনকার দিনে যারা পাঠ শেষ করত, তারা সমাবর্ত্তন স্নান করে গৃহে ফিরত, তাই স্নাতক বলত। শ্যাবাশ্বের পিতা দার্ভরাজার পুরোহিত। রাজা যজ্ঞে পুরোহিতকে ডেকেছেন, পিতা পুত্রকে নিয়ে চললেন—সেখানে সন্ধ্যার সঙ্গে তার দেখা হ'ল আর জাগল ভালবাসা—"

এষা বলিল, "দেখা হল আর ভালবাসা হল এটা সম্ভব নয়, তোমাদের গল্পে উপন্যাসে চিরকাল এই মিথ্যা বলে' চলেছ।"

সুধাংশু উত্তর দিল—"যুগে যুগে কালে কালে মানুষ যখন বলেছে তখন হয়ত সত্য হবে।"

এষা কিঞ্চিৎ পড়াশুনা করিয়াছিল, বলিল—"তা হয় না, রোজ মানুষ দেখে সূর্য্য উঠছে পূব আকাশে, ডুবছে পশ্চিমে, তা কি সত্যি ?"

সুধাংশু থামিয়া বলিল, "তুমি দেখছি বৈজ্ঞানিক হতে পারবে, কিন্তু এটা আমার গল্প, রস থাকলেই হ'ল, তত্ত্ব বিচার নিয়ে তর্ক এখন দরকার নেই—"

—"বেশ বল।"

—"শ্যাবাশ্বের পিতা রাগ করিলেন না, তিনি দেখিলেন, স্নেহময় পিতার চক্ষে পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক—রাজকন্যা সন্ধ্যা যোগ্যা বধূ—রাজার নিকট কন্যা যাচ্ঞা করলেন—"

এষার প্রশ্ন—"কিন্তু ঋষি-তনয় ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যা ক্ষত্রিয়-কন্যা—তোমার গল্পটা স্বকপোলকল্পিত নয় ত ?"

সুধাংশু বলিল, "না, এটা সায়নাচার্য্য লিখেছেন তাঁর টীকায়। কিন্তু তোমার বেদের যুগে আর্য্যদের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না—"

—"আচ্ছা রসভঙ্গের অপরাধ মার্জ্জনা করো—"

—"রাজা ভালমানুষ—পুরোহিত ঠাকুরকে না বলিতে পারিলেন না, কিন্তু শেষকালে মাথায় বুদ্ধি হ'ল—বললেন, একবার রাজমহিষীকে জিজ্ঞাসা করি।"

রাজমহিষী বুদ্ধিমতী, বললেন "রাজকন্যা নির্ধনের গৃহে কষ্ট পাবে—এ বিয়ে কিছুতেই হবে না। রাজা কন্যার মুখের দিকে চেয়ে দুঃখিত হ'লেন কিন্তু রাণীর কথা অবজ্ঞা করতে পারলেন না—"

—"তুমি যে আমায় খোঁটা দাও, দেখছ সেকালে রাজারা কেমন 'সিভাল্‌রি' (chivalry) জানতেন।

—হাসিয়া সুধাংশু বলিল, "তা জানতেন, কিন্তু গল্পের নায়কদের নিয়ে নিজেদের জীবন তুলনা করতে যেও না—তাতে ফলম্ দুঃখম্।"

—"থাক্ দৈবজ্ঞ ঠাকুর, আপনাকে আর পঞ্জিকা আওড়াতে হবে না।"

—"শ্যাবাশ্ব সে কথা শুনে মুষড়ে গেল, চোখে দেখল কুজ্ঝটিকা—বুকে পেল অসহ বেদনা। মর্ম্মান্তিক দুঃখে সে চল্‌ল পথ বেয়ে দেশ-দেশান্তর উদাসী পথিক।"

রাজা তরন্তের রাণী পথিককে দেখে মুগ্ধ হল, দুঃখদীর্ণ যুবকের চক্ষে জ্যোতির্ময় ছটা, মুখে প্রতিভার দীপ্তি। রাণী পথিককে ডাকালেন, বল্‌লেন "কি তোমার দুঃখ পরিব্রাজক ?"

শ্যাবাশ্ব চমৎকৃত হ'ল, সংসারে দয়া ও সহমর্ম্মিতা নারীর কোমল অন্তঃকরণেই শোভা পায়—স্নেহের স্পর্শ তার চোখে জল নিয়ে এল, বল্‌ল, "ক্ষমা করুন দেবী! আমার ব্যথা—আমার গোপন কথা—"

রাণী তাকে প্রাসাদে নিলেন। পরিচর্য্যায় মুগ্ধ হয়ে শ্যাবাশ্ব বলিল, তার উজ্জ্বল প্রেমের কথা রাণী শুনলেন, হাসলেন আর কৌতুকভরে বললেন, "সে কি আমার চেয়েও সুন্দরী ?"

শ্যাবাশ্ব বলিল, "আমার চোখে দেবি।"

রাণী খুশী হলেন—রাজার নিকট নিয়ে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন—শ্যাবাশ্বকে ধনরত্ন, অশ্ব, গোধন ও মেষ-পাল দিলেন। রাণী বিদায় দিয়ে বললেন, "জয়ী হও ঋষিকুমার!"

ঋষিকুমারের চিত্তে তখন জাগল বাণী—শ্যাবাশ্ব রাণীর প্রশংসায় মন্ত্র রচনা করল—সে হল ঋক্।

'যারা দুঃখীর দুঃখে কাতর নয়, হৃদয় তাদের পাষাণ, তরুণী আনন্দিতা রাণী শ্যাবকে অশ্ব দিয়েছেন—দু'টী রক্তবর্ণ দ্রুত গতি অশ্ব, তাই তার করুণার কথা স্মরণ করে আমার নাম হবে শ্যাবাশ্ব, নিষ্ঠুর-চিত্তা নারী জানে না মমতা—'

শ্যাবাশ্ব রাণীর ঘোড়ায় চড়িয়া পুরুমিহ্ন রাজার রাজ্যে চললেন।

এষা বলিল, "তোমার ঋক্ শুনে মনে হয় শ্যাবাশ্ব তরন্ত রাজার রাণীকে ভালবেসেছিল—"

—"তার উত্তর দেওয়া কঠিন—ফ্রয়েডের কথা যদি সত্যি হয়—রাণীর মমতার পিছনে ছিল অতৃপ্ত কামনার দীর্ঘশ্বাস। ওটা দয়া নয়—ওটা কামনার ভোলফের কিন্তু সেকালের ঋষিরা ফ্রয়েড-তত্ত্ব জানতেন না, তাই তাঁরা এমন ইঙ্গিত করেননি।"

এষা জিজ্ঞাসা করিল—"ফ্রয়েডের কথা নয়, তুমি কি মনে কর—তোমার নিজের কথা বল।"

—"আমি ফ্রয়েডের কথা সত্য মনে করি না—মাতার চিত্তে যে প্রীতির মন্দাকিনী, ভগিনীর বক্ষে যে সোদর

ভ্রাতৃবাৎসল্য তাকে আমি এত হীন মনে করি না। মমতা, প্রীতি, বাৎসল্য, সত্য, দয়া, অনুকম্পা ও সহানুভূতি তেমনই সত্য—তাকে যৌন-লালসার অভিব্যক্তি বলা একান্ত ভুল হবে।"

খোকার খেলা শেষ হইয়াছিল। দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, "মা সাপুড়ে যাচ্ছে—ডাকবে?"

রাস্তা দিয়া সাপুড়ে চলিয়াছে—তাহার বাঁশী বাজিতেছে। পুত্রের কৌতূহল দমনীয় নয়। সুধাংশু বলিল, "আচ্ছা যা ডেকে নিয়ে আয়।"

এষা বলিল, "না না থাক্, সাপ দেখতে আমার বড় ভয় করে।"

খোকা বলিল, "না ভয় কি, আমি আমার বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, তোমার ভয় নেই।"

এষার ভয় দূর হইল কি না জানি না—হাসিতে হাসিতে বলিল "তবে যা—"

সুধাংশু বলিল,

"প্রেমের পাঁচালি এই মধুমাখা জানি
সুধাংশু বাখানে আর শুনে এষারাণি—"

এষা—"আজ সন্ধ্যাবেলায় শুনব।"

সন্ধ্যা হইয়াছে। খোলা ছাদে শুইয়া সুধাংশু রজনী-গন্ধার গন্ধ আঘ্রাণ করিতেছিল আর আকাশে নক্ষত্রের যাত্রা দেখিতেছিল। বৃহস্পতি গ্রহের দীপ্ত আভা তাহাকে মুগ্ধ করিতেছিল। খোকা ঘুমাইয়াছে।

এষা আসিয়া—বলিল, "এখন বল।"

সুধাংশু বলিল, "শ্যাবাখের কথা মনে পড়ায় আমার দুঃখ হচ্ছে—ও প্রেমকে জয় করেছিল, কিন্তু আমরা?"

এষা হাসিয়া বলিল "থাক্, এখন রসিকতার প্রয়োজন নেই—"

—"রসিকতা নয়, সেদিন একটা বই পড়েছি—লেখক বলেছেন ভারতবর্ষের বিয়ে প্রেমহীন—"

—"থাক এই আমাদের ভাল।"

—"কিন্তু মনে কর তোমার আমার বিয়ের কথা—বিয়ের আগে তোমায় দেখিনি—কাকা এসে বললেন, তুমি নেহাৎ কালিন্দী—বাবা ও মামার উপর ভয়ানক রাগ হ'ল, অবশ্য ভার না হয় দিয়েছিলাম, কিন্তু তাই বলে একথাটি তাদের জানা উচিত ছিল—"

এষা রাগিল, "আর দুঃখ রেখে লাভ কি—এইবার একটা বিয়ে পাশ—কটা মেয়ে বিয়ে করে মনের ক্ষোভ মেটাও—"

সুধাংশু বলিল, "কথাটি তুমি ভুল বুঝছ, আমি বলছি প্রেমকে যখন সহজে পাওয়া যায়, তখন তাকে ঠিক পাওয়া যায় না—তাই তাকে জয় করে নিতে হয়।"

এষা খানিক শান্ত হইল—"কিন্তু আমাদের ত দিন চলছে—অসুবিধে কিছু হচ্ছে কি?"

—"সে আলোচনা নিষ্ফল, আর করাও বিপজ্জনক।"

—"বেশ বুঝতে পারছি, তাহলে তুমি ভালবাস না?"

—"আসল কথা যদি চাও, তা হলে বাসি না—কারণ ভালবাসার জন্য ত বিয়ে হয়নি, তুমি এসেছ গৃহিণী হয়ে।"

—"বেশ বেশ, তা হলে এসব প্রেমের গল্প পড়াই বা কেন আর বলাই বা কেন?"

—"হয়ত মনের দুঃখ মেটানো।"

—"তুমি বক্তৃতা করবে, না গল্প বলবে?"

—"গল্পই বলছি।"

পাশের বাড়ীর মেয়েটি পড়ে—তাহার একঘেয়ে টানা সুর বাতাসে ভাসে, ওপাশের বাড়ীতে রেডিও বাজে, রাস্তায় মোটরের হর্ণ বাজে। সুধাংশুর মনে হয় এই পরিবেশ শ্যাবাখের গল্পের নয় কিন্তু অভাগিনী এষাকে সে দুঃখের কথা বলা চলে না।

সুধাংশু আরম্ভ করে—"অশ্ব চলে, বায়ুর মত গতি—রাণী দিয়েছেন যুগ্ম অশ্ব একবার চড়ে একটায় আবার অন্যটায় এমনই করে যাত্রা চলে—নদনদী গিরিকান্তার ছাড়িয়ে চলেছে উৎসুক রব—মনে পড়ে বধূর মুখ, যজ্ঞ-ধূমের মেঘে আচ্ছন্ন সেই শরদিন্দু নিভাননার কথা। সেই অনুপম মুখচ্ছবি জাগায় উৎসাহ—দেয় আনন্দ।

এষা বলে—"তুমি আমায় সত্যি কুরূপা মনে কর?"

—"কেন?"

—"মনে হচ্ছে তুমি কল্পনায় দেখছ জ্যোতির্ময়ী সুন্দরীর রূপ—"

—"এ তোমার অন্যায় এষা! তুমি কি কল্পনাকেও শাসন করতে চাও?"

—"চাই বই কি! যে মন্ত্র পড়েছ তাকে মন-প্রাণ-জীবন-যৌবন সবই ত দেবে, এমনই ত চুক্তি—"

সুধাংশু হাসে—রেডিওর গান থামে। তাহার সুর-ঝঙ্কার ভাসিয়া আসে—পাশের বাড়ীর কলেজ-পড়ুয়ার গলাটি শোনা যায়। সে বলে—"তা হলে ভাব—এ মানসী তুমিই—"

এষা স্বামীর কাছে ঘেঁসিয়া আসে, প্রশ্ন করে "সত্যি?"

সুধাংশু পত্নীর এলায়িত কুন্তলে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে বলে "সত্যি।"

ক্ষণিক বিভ্রম। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যেই ত অনন্ত কালের সম্ভাবনা। এষা সুন্দরী গৌরী নয়, সে ভাবে স্বামী তাহাকে পাইয়া খুশী হয় নাই, সেই বেদনা কাঁটার খোঁচার মত তাহার বুকে বেদনা জাগায়।

এষা বেদনা ভুলিয়া যায়। স্বামীর আদরে সে গলিয়া যায়। বিশ্বে কলকোলাহল আছে—থাকুক, সংঘর্ষ আছে—থাকুক। যুদ্ধ, হিংসা ও বিপ্লব সত্য—কিন্তু এই নিভৃত সন্ধ্যায় রজনীগন্ধার গন্ধসুরভি ছাদে এই যে ক্ষণিকের বিভ্রম—মানুষের ইতিহাসে তাহার হয়ত কোনই মূল্য নাই, কিন্তু এই দম্পতীর জীবনে তাহা চিরন্তন হইয়া বিলাস করে।

খানিক পরে সুধাংশু বলে—"শ্যাবাশ্ব পুরুমিহ্ন রাজার রাজ্যে পৌঁছে গেলেন।"

এষা বলে, "তারপর?"

—"বিদদাশ্ব রাজার ছেলে পুরুমিহ্ন খুব জ্ঞানী ছিলেন।"

এষা বাধা দিয়া বলিল, "নামগুলি খুব বিদঘুঁটে।"

—"রুচির তফাৎ হয়—রাজা শ্যাবাশ্বকে পাদ্যার্ঘ্য দিয়ে বন্দনা করলেন—বললেন, 'বলুন ঋষি আপনার আদেশ।' তখনকার দিনে মানুষ সরল ছিল, মিথ্যা গরিমা নিয়ে দম্ভ করতে তারা লজ্জিত হত। শ্যাবাশ্ব বলল, 'আমি ঋষি নই, আমি শাস্ত্র পড়েছি, আমার সত্য দৃষ্টি হয়নি।' রাজা খুশী হয়ে বললেন 'আপনি সত্যবাক্, সত্য আপনার নিকট প্রকাশ হবেন—বলুন আপনার প্রার্থনা।' শ্যাবাশ্ব বললেন, 'আমি কামাতুর, রাজতনয়া সন্ধ্যার পাণিপীড়নে আমার অভিলাষ, কিন্তু আমার অর্থ নেই।' রাজা তখন তাকে স্বর্ণ, মণি ও শত গাভী দান করলেন। শ্যাবাশ্ব আহ্লাদে আটখানা হয়ে গৃহের দিকে রওনা হলেন।"

এষা প্রশ্ন করে "রাজারা সেকালে খুব দানশীল ছিলেন?"

—"তা ছিলেন—দানস্তুতি বলে বেদে অনেক সূক্ত আছে, সেকাল আর একাল নয়, মানুষের মহত্ত্ব তার দানের মধ্যেই বোঝা যায়।"

—"আচ্ছা ও-কথা থাক্, গল্প শেষ কর, রাত অনেক হ'ল—"

—"হোক না—মনে কর তুমি আমার সেই মানসী সন্ধ্যা, আমার হৃদয়-বধূ, তোমাকে জয় করবার জন্য চলেছি শ্যাবাশ্বের মত—"

—"হয়েছে বাপু, তাই না হয় মনে করলাম, আরম্ভ কর তোমার স্তুতি—"

—"অয়ি বরদে দেবী! তুমি প্রসন্ন হয়েছ, তাই ত আমার কণ্ঠের ভাষা রুদ্ধ—গদ্গদ হয়ে—"

এষা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠে।

হাসি থামিলে গল্প চলে—"শ্যাবাশ্ব খুশী মনে ফিরছে, তখন পথে এল মরুৎগণ, শ্যাবাশ্বের চিত্তে অজানিতে ভাষা ফুটে উঠল, শ্যাবাশ্ব গেয়ে উঠল স্তোত্র—মরুৎগণ ঝড়ের দেবতা ইন্দ্রের চিরসাথী রণদুর্ম্মদ বীর্য্যবান্ মূর্ত্তি, রুদ্র তাদের পিতা, পৃথ্বি তাদের মাতা—তাদের সোণালী ওড়না ওড়ে—শোণিত-স্রোতের মত শ্যাবাশ্ব গেয়ে ওঠে—

এষা বলে, "তোমার সংস্কৃত মন্ত্র আমি বুঝতে পারব না।"

"বোঝাটাই সব নয় এষা, শোন না—মানুষের আদিম কণ্ঠের প্রথমতম ভাষা—এর মাঝে আছে জীবনের চঞ্চল শিহরণ—প্রথম আবেগের অস্ফুট কাকলী—অপূর্ব্ব অনবদ্য মন্ত্র।

—"তুমি যে বাগ্মী হয়ে উঠছ!"

—"ওটা আমার স্বভাব—তবে বেদ-মন্ত্রকে শ্রদ্ধা করেই বলতে হয়, ভাব দেখি কোন দূর অতীতে সরস্বতীর তীরে এই সমস্ত মন্ত্র রচিত হয়েছিল, তারপর কতকাল গেছে তবু তার সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র রয়ে গেছে—এগুলি

আমাদের পিতৃপিতামহের ধন—রাজ্য গেছে, ঐশ্বর্য্য গেছে, দুঃখ এসেছে, দৈন্য এসেছে তবু ভুলিনি—এদের মর্ম্মে মর্ম্মে গেঁথে রেখেছি—শোনো এষা !"

এষা বলিল, "তুমি না হয় বাংলা করে বল—আমি অভক্তি করছিনে, কিন্তু না বুঝে আবৃত্তি শোনার আনন্দকে বরদাস্ত করতে পারব না।"

সুধাংশু বলিল, "আমি ত কবি নই, ঋষি নই—তবে তোমার জন্য মুখে অনুবাদ করছি, তাতে মূলের গম্ভীর উদাত্ত সুর হারিয়ে যাবে।"

—"যা পাব তাতেই খুশী হবো।"

সুধাংশু বলিয়া চলিল—

কোন সুদূরের বুক থেকে আজ
তোমরা এলে বীরের দল,
সবার সেরা বীর্য্যে অবিচল,
কেমন করে একলা এলে
কোথায় গেল তুরগশ্রেণী ?
রোদসী যে ডাকছে গেহে দুলিয়ে দোদুল বেণী—
যাও না ঘরে আগুন তাপে
জুড়িয়ে নেবে দেহ
বধূর পাবে স্নেহ।

এষা বলিল, "শুনতে ত মন্দ নয়।"

সুধাংশু বলিল, "এটা আক্ষরিক অনুবাদ নয়, তোমার জন্য তাড়াতাড়ি ভাবার্থ বলছি—তারপর শ্যাবাশ্ব—তরন্তের সুন্দরী রাজ্ঞী শাশিয়াসির জন্য বর প্রার্থনা করল—রাণী যাতে ধনে ঐশ্বর্য্যে গৌরবময়ী হয় তা জানাল।"

মরুদ্‌গণ খুশি হলেন। বললেন, "আজ থেকে তুমি ঋষি।"

শ্যাবাশ্ব নূতন দৃষ্টি পেল। তিমির-যবনিকা যেন যাদু-মন্ত্রে দূরে চলে গেল। সত্যের যে পবিত্র রূপ তা তার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হল। সেই উদ্বোধন কি আনন্দের, সেই জাগরণ কি আবেগময়, কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হল নব নব মন্ত্র।"

এষা জিজ্ঞাসা করিল—"একি সম্ভব ?"

"সম্ভব, শেখা ত গেলা নয়—হৃদয়ে সত্যজ্যোতিঃ জ্বলছে, তার অনির্ব্বাণ ভাতি আমরা দেখতে পাই না—কারণ আমাদের দৃষ্টি আড়ষ্ট, ব্যাহত, তমোময়—যেদিন আঁধার ঘোচে, সেদিন জাগে বোধি আমাদের তপস্যায়—আমাদের সাধনায় এই ত মন্ত্র।"

এষা স্বামীর ভাবোচ্ছ্বাস দমন করিবার জন্য বলিল, "তারপর ?"

শ্যাবাশ্বের মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলে আছে—আর একদিন তোমায় আসল মন্ত্রগুলি পড়ে শোনাব—মন্ত্র যখন শেষ হয়ে এল তখন রাত্রি-দেবতাকে আহ্বান করে শ্যাবাশ্ব বলল—'হে উর্ম্ম্যা! তুমি দার্ভ্যের নিকট আমার এই স্তুতি বহন করে নিয়ে যাও—নিয়ে যাও তোমার দ্রুতগতি রথ্যায়—রথবীতিকে বল, যখন যজ্ঞ শেষে রাজা সোম পান করবেন তখন বল যে আমি আমার প্রার্থনা পুনরায় জানাব। রাজতনয়া সন্ধ্যার পাণি-প্রার্থনা করি, যাও দেবী, রথবীতি দূর পাহাড়ের কোলে বাস করে, তার রাজ্য গোধনে সমৃদ্ধ, যাও সেখানে তুমি আতিথ্য পাবে।'

—"রাত্রিদেবী শ্যাবাশ্বের প্রার্থনা শুনলেন।"

"তারপর ?"

"রথবীতি যজ্ঞ শেষে উৎসব করছেন—সোমপাত্রের উজ্জ্বল আনন্দে রাজ-অঙ্গন উল্লসিত। রাত্রিদেবী এসে বললেন, 'আমি শ্যাবাশ্ব ঋষির দূত—ঋষি তাঁর প্রথম প্রণয় ভোলেননি,—সন্ধ্যা ছিল সেখানে—তার লাবণ্যময়ী মুখে জ্বলল অলৌকিক লাবণ্য, আর্চ্চনান উৎসুক হয়ে চাইলেন। রাত্রিদেবী বললেন, 'মরুদ্‌গণ প্রসন্ন হয়ে বর দিয়ে গেল—শ্যাবাশ্বের মন্ত্রে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন।' রথবীতি মহিষীর দিকে চাইলেন। রাণী রাত্রিদেবীকে বললেন, —"ঋষির কণ্ঠে আমার কন্যা মালা দেবে—চারিদিকে সাধুবাদ উঠল।"

—"তারপর ?"

—"আমার কথাটি ফুরালো—নটে গাছটি মুড়ালো—রথবীতি শ্যাবাশ্বকে অভিনন্দন করার জন্য সভাসদ্ পাঠালেন—পরম সমারোহে বিতাড়িত শ্যাবাশ্ব ফিরে এল—তারপর শুভলগ্নে শুভযোগ—সন্ধ্যা ও শ্যাবাশ্বের বিয়ে হ'ল।"

—"সেকালের বিয়ের রীতিটা বর্ণনা কর না।"

সুধাংশু বলিল, "তার মধ্যে গল্পের রস নেই—আর

সেইটাই ত গৌরবের কথা। স্থায়সূত্রে বিয়ের যে প্রণালী পড়ি—আজও আমাদের দেশে প্রায় সেই সকলই বিয়ে হয়—বরের পিতা সঙ্কল্প শেষে বরকে বলতেন—ধর্ম্মার্থ কামেষু নাতিচারিতব্যা। বর উত্তর দিতেন—নাতি চরামি। পত্নীর আসন ছিল উচ্চ—সম্মানের ও গৌরবের—সেকথা পড়লে মন খুশী হয়ে ওঠে। তারপর কঙ্কণ-বন্ধন, পাণি-গ্রহণ, সপ্তপদী গমন ও লাজ-হোম হ'ত। সে সব নীরস—শিলারোহণ করে বধূ ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে চেয়ে বলতেন—ওঁ ধ্রুবমাসি ধ্রুবাহম্ ভূয়োসম্—বধূ যেতেন স্বামীগৃহে অগ্নিহোত্র জ্বালতেন আর অচল-প্রতিষ্ঠ হয়ে সুধাভাষিণী সুহাসিনী হয়ে থাকতেন।"

—"তুমি কি বলতে চাও, আমি সুধাভাষিণী নই।"

—"না আমি কিছুই বলতে চাইনে — তুমি যা তুমি তাই—অনন্যা, অপূর্ব্বা।'

এষা রাগিয়া উঠিল, বলিল, "জানি মশায়, তুমি মনে মনে আমায় কিছুতেই ভালবাস না—স্বাবাশ্ব যেমন জয় করেছিল—তুমি কি···"

সুধাংশু হাসিয়া পত্নীকে বক্ষে আদর করিয়া টানিয়া লইল—"অতীতের ভুল এখন না হয় শোধ করি—"

"বা, এই বুঝি তোমার গবেষণা!"

সুধাংশু খানিক কথা কহিল না। রাত্রিচর একটা পাখী অকারণে ডাকিয়া গেল—আকাশে রাশিচক্র সরিয়া গিয়াছে।

—"কথা বলছ না যে?"

সুধাংশু বলিল, "গবেষণা বড় নয়, প্রেম বড়।"

এষা কথা বলিল না—বলিষ্ঠ স্বামীর আলিঙ্গনের মধ্যে তৃপ্ত নীরব হইয়া রহিল।

দূরে ধ্রুব নক্ষত্র জ্বলিতেছিল। আকাশে মেঘেরা খেলিতেছিল—তাহারা সরিয়া গিয়া ধ্রুবকে মুক্ত করিল। ধ্রুব নক্ষত্র যেন সকৌতুক নেত্রে দম্পতীর প্রতি চাহিয়া লইল—হয়ত মনে মনে বলিল, "গবেষণাও বড় নয়, প্রেমও বড় নয়—যা ধ্রুব, যা শাশ্বত তা আমার মতই শান্ত, সমাহিত ও আবেগহীন।"

খোকা কাঁদিয়া উঠিল। এষা উঠিয়া বলিল, "যাক্ এই প্রেমের গল্পের জন্য বেদ পড়ার কি দরকার?"

সুধাংশু নিরুত্তর রহিল। নিশীথ-রাত্রির অন্ধকারে কান্না-মুখর হইয়া ওঠে—সে তখন বলে—"আমাটাই মিথ্যা —যা বলছ তাই সত্য।"

পাশের বাড়ীর ইউক্যালিপটাস গাছে যে পাখীটি ঘুমাইতেছিল—সে ডাকিয়া উঠিল। সে যেন বলিতে চাহিল—"তা ঠিক—যুগযুগান্তর একই রহস্য চলার পথেই তার নিত্য নূতন রূপ।"

# আমারে জাগায়ে দাও

শ্রীসমীর ঘোষ

আমারে জাগায়ে দাও ঝড়ের দোলায়
উধাও উন্মুক্ত সীমা আকাশের পথে—
স্পন্দহীনা ধরিত্রীর জড়ত্ব ভোলায়
আমারে উঠিতে দাও সে মহান্ রথে।
প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন জীবন
পৃথিবীর মৃত্তিকায় ছিল গতিময়;
উত্তাল তরঙ্গ ক্ষুব্ধ সাগর পবন
মলয় অনিল হ'য়ে হয়নি উদয়—
তখন দুর্দ্দম বেগে চলিত যেমন
জগত দোলাতো বৃক্ষ অতিকায় শাখা
আন্দোলিয়া প্রেত সম—আমারে তেমন
দাও না দুর্ব্বার গতি, দুর্নিবার পাখা
সে পাখায় ঝাপটিয়া সিন্ধু বিহঙ্গম
সুদূরের পাড়ি দেবো অক্লান্ত উদ্যম।

# সাধনার কথা

হৃদয় চায় রতি, প্রেম, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব। বর্ষার ঘনাবৃত আকাশের তলে বিপিনে বিপিনে যে মুরলী বেজেছিল মর্ত্ত্যের বৃন্দাবনে, তার সুরে ছিল এই রসের কথা। বেদের মন্ত্র—"রসো বৈ সঃ", তাকে রূপ দিল বাংলার কবি ভাষায় ও সাধনায়। সে এক অপরূপ বিজ্ঞান।

মহাভাব মানুষের নয়। উহা মানব-তনুর সীমার বাহিরে। কিন্তু তাকে ভেবেই রতির উদয়। যখন সে সান্ত, অন্তরের ঘোমটা খুলে' চন্দ্রমুখ তুলে' চায় শুধু মানুষের দিকে—চারি চোখে হয় মিলন। পাওয়ার কথা নাই, কেবল সে কটাক্ষে সর্ব্বাঙ্গ হয় শীতল; চক্ষু আসে মুদে'। সে পরম শান্তি। রতির উদয় বুকে উঠে—যেন শরতের চাঁদ; জাগে প্রেম। এই আকর্ষণেই তো গৃহ-হারা, সর্ব্বহারা হয় লোকে।

তারপর, সঙ্কেতে মরণ-পণ। সে এক অপার্থিব আনুগত্য। অনুগত হয়ে রসাস্বাদে উন্মাদ। প্রেমের পর এই যে রাগ, ইহাই দেয় সেবার শক্তি। প্রতি অঙ্গ নাচে প্রতি অঙ্গের তৃপ্তি দিতে। এই সেবার অধিকার যার, তারই জন্মে পরম রাগ, লোমহর্ষণ হয় পুলকে। সে আনন্দ দেহের নয়, দেহ পায় শুধু উত্তাপটুকু—আত্মার পোষণেই দেহের তুষ্টি।

সেবায় সৌহৃদ্য, সেবায় স্নেহ—দুটী হৃদয় তুল্য হওয়ার। একবার তুল্যানুভূতি আর একবার পূজ্য, পুনরায় নিজেই পূজনীয় স্বরূপ—দাবীর অধিকার নিয়ে মাথা তুলে। সখা যেন কখনও চায় সন্তানের ন্যায় করুণা, কখনও বা পিতৃ-মাতৃ-হৃদয় নিয়ে দাবী করে স্নেহের। চাওয়ার রূপ—ভেদ। অনুরাগ-প্রার্থনার ইহা ভঙ্গী-বৈচিত্র্য মাত্র।

ইহার পর ভাব। মহাভাবের রসঘন মূর্ত্তি ফুটে উঠে ইষ্টে। এই ভাব রূঢ়, অধিরূঢ় ভেদে দ্বিবিধ। রূঢ় ভাব সাধারণ আর সমঞ্জসা। অধিরূঢ় ভাবই সমর্থা রতি। সাধারণ আর সমঞ্জসা অনায়াসসিদ্ধ। উহা বিনা ত্যাগ, বিনা তপস্যায় মিলিতে পারে। এই সিতোৎপল মহাভাব হৃদয়ে ধারণ করার যে সমর্থা রতি, তাহা কিন্তু কেবল অশ্রুর তর্পণে মিলে। নিয়ত তপস্যা, কিন্তু স্থির নয় এই পাওয়া—"কভু মিলে, কভু না মিলে, দৈবের ঘটন।"

এ এক অদ্ভুত আকর্ষণ—যে পেয়েছে সন্ধান, সেই এই অবস্থার মর্ম্ম বুঝে। এখানে আছে চেষ্টা, আছে উৎকণ্ঠা, আছে পদে পদে কণ্টকের ব্যথা কিন্তু বিমুখ হওয়ারও উপায় নেই। অথচ এত কষ্টেও হয়ত সে ভাব মিলে না। যখন মিলে, তখন বিনা আয়াসে। তাই মনে হয় বৃথা চেষ্টা, বৃথা যত্ন, কেবল চেয়ে থাকা—কেবল প্রতীক্ষা।

এ রস-আস্বাদন বিনা হৃদয়ও বাঁচে না। তাই কৃষ্ণ-বিরহে গোপীদের মত ব্রজমাধুরী কোথায় ফুটে, সে কোন গোপন হৃদয়-পুরে—উঁকি মেরে দেখার সাধ। ক্ষণে ক্ষণে চাঁদের উদয় আর মেঘের আড়ালে লুকোচুরির খেলা—হৃদয় যার ছুটে চলে গহন বনে, তারই পিছনে মুরলীধারী চলে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। যখন দেখে ফেরার পথ হারিয়েছে জন্মের মত, তখনই রাসোৎসবের ঘটা। সে ভাব জন্মের স্বপ্নে। সিদ্ধ কবি বিভোর, আত্মহারা—তার কণ্ঠে শুধু গানের মূর্চ্ছনা—

"ওগো তোরা কে কে যাবি আয়!"

# রামায়ণে সুন্দরাকাণ্ড বিচার

শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী

সমগ্র রামায়ণখানির মধ্যে সাতটি বিশিষ্ট অধ্যায় আছে। এক একটির নাম কাণ্ড, যথা—আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরাকাণ্ড। দাশরথী রামচন্দ্র ও জনকনন্দিনী সীতাকে কেন্দ্র করিয়া আরও অন্যান্য গ্রন্থে রামচরিত বর্ণনা আছে, যেমন পদ্মপুরাণ, অদ্ভুত রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ, মূল বাল্মীকি প্রণীত এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অন্তর্গত অধ্যাত্ম রামায়ণ। তন্মধ্যে বাল্মীকীয় রামায়ণ আদি ও অনবদ্য। বাংলা এবং হিন্দীতেও বহু সংস্করণ বাহির হইয়াছে—রামানুজপন্থী হিন্দীভাষাভাষীদের রামভক্তি এখনও উত্তর ভারতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তুলসীদাসের রামায়ণ আজও উত্তর ভারতে বহুল প্রচার পাইতেছে।

বাংলাভাষায় আদিম রামায়ণ বলিতে কৃত্তিবাস কবি সম্পাদিত গ্রন্থই বুঝায়। কথক ঠাকুরদের মুখ হইতে শুনিয়া শুনিয়া বাল্মীকি রামায়ণের বহির্ভূত অনেক ঘটনা ও বস্তু কবি প্রক্ষিপ্ত ও স্বকল্পিতভাবে যোগ করিয়াছেন।* তিনি নিজে সংস্কৃতভাষা বুঝিতেন না। অনুপম পদলালিত্যে কবি কৃত্তিবাস রামায়ণের ঘটনাবিন্যাসকে মনোহর ভাবমাধুর্য্যে যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার অনেকাংশই অলৌকিক ও অতিরঞ্জিত।

ব্যাস প্রণীত অধ্যাত্ম রামায়ণখানি অতিশয় সংক্ষিপ্ত—উত্তরকাণ্ড-বর্ণিত বহু উক্তি ও ঘটনার সামঞ্জস্য তাহাতে নাই বলিলেই হয়। রামচরিত্রের অধ্যাত্ম বিশ্লেষণে উহা পরিপূর্ণ। মহর্ষি বাল্মীকির অন্যান্য দুইখানি গ্রন্থ অদ্ভুত রামায়ণ ও যোগবাশিষ্ঠ মূল আদি গ্রন্থ হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। বহু বিষয় ও ঘটনা তাহা হইতে স্বতন্ত্র, যেমন—অদ্ভুত রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে সীতার রাবণ বধ ও আদ্যাশক্তির প্রকাশ-রহস্য। বাল্মীকীয় যোগবাশিষ্ঠ ও দ্বৈপায়নের অধ্যাত্ম রামায়ণে অসাধারণ কল্পনাশক্তি, কলাকুশলতা, বৈরাগ্য ও মীমাংসা-দর্শন সংক্রান্ত জ্ঞানগর্ভ রচনাপটুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অত্যন্ত দূরদৃষ্টি, কাব্যরস ও অলঙ্কার জ্ঞানের রসনৈপুণ্য বাল্মীকির মূল রামায়ণে একত্র সমাবেশিত আছে। তাই, টীকাকার রামানুজ বাল্মীকির আদি রামায়ণকে প্রশংসা ও সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিয়াছেন—

"কূজন্তং রামরামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরূঢ় কবিতাশাখং বন্দে বাল্মীকিকোকিলম্॥"

—বস্তুতঃ সপ্তকাণ্ডের মধ্যে সমগ্র রামায়ণখানিতে "সুন্দরাকাণ্ড" নামটির তাৎপর্য্য পাঠকদিগকে জিজ্ঞাসু করিয়া তোলে। আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড কিংবা উত্তরাকাণ্ডকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কি জন্য মহাকবি "মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে হনুমানের লম্ফ প্রদান, সিংহিকার উদরভেদ, ও চিত্রকুট তটে পতন হইতে সীতাসহ হনুমানের কথোপকথন বৃত্তান্ত রামের নিকট বর্ণন পর্য্যন্ত" অধ্যায়কে "সুন্দরাকাণ্ড" নামকরণ করিলেন—এই প্রশ্ন পাঠকের মনে উদিত হয়। এই সঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন ওঠে ব্যাকরণ সম্বন্ধে। কিছুদিন পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মোহিনীমোহন তর্কতীর্থ প্রবাসী পত্রিকায় এই বিষয়ে আংশিক আলোচনা করিয়াছিলেন।

কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে 'সুন্দর' কথাটি অসংস্কৃতজ।* প্রমাণকল্পে তাঁহারা বলেন যে, 'সুন্দর'

* যেমন—তরণীসেন বধ, জয়ন্তকাকের এক চক্ষু বিদ্ধকরণ, হনুমানের গন্ধমাদন পর্ব্বত আনয়নকালে নন্দীগ্রামে গমন ও সূর্য্যকে কুক্ষিতে ধারণ, মহীরাবণের পালা, অহীরাবণ বধ, হনুমানের চণ্ডী অশুদ্ধকরণ, গর্ববতীর রণস্থল ত্যাগ, হনুমান কর্ত্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ, সীতার পরিবেশন ও হনুমানের অন্নভোজন, কুশীলবের অশ্বধারণ, রামাদির ষ্ঠা ও ভ্রাতৃগণের মৃত্যু প্রভৃতি মূল বাল্মীকীয় রামায়ণবহির্ভূত অনেক অসম্বন্ধ উক্তি কৃত্তিবাস সঙ্কলিত রামায়ণে পাওয়া যায়।

* অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় এই বিষয়ে আমাকে যে সাহচর্য্য করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ। নবদ্বীপে পূর্ণিমা সম্মেলনের সাহিত্যসেবিবৃন্দের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার সহিতও কয়েকটি স্থলে মতানৈক্য হওয়ায় প্রবন্ধটি লিখিতভাবে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে মাসিক পত্রিকায় আলোচনার জন্য প্রকাশ করিলাম। ইতি লেখক।

কথাটি এখানে সংস্কৃত শব্দ নয়। 'সুন্দর' শব্দটি বেদে অর্থাৎ মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ প্রভৃতিতে নাই। ইহা কেবল মহাভারত প্রভৃতি লৌকিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে আসিয়াছে। বৈদিক সূনর (বস্তুতঃ সুনর হইতে) 'সুন্দর' উপপত্তি আসিয়াছে। গ্রীক্ ভাষাতেও 'দ'কারের আগম দেখা যায়। হিন্দী প্রভৃতিতেও বন্দর শব্দের উৎপত্তি দেখা যায়। চম্পক, কণ্টক পদগুলি বাংলায় এইরূপ চম্পা বা চাঁপা, কাঁটা ইত্যাদি প্রাকৃত ভাষার ভিতর দিয়া আসিয়াছে। সুন্দরাকাণ্ডও প্রায় সেইরূপ। আমরা কিন্তু এই ব্যুৎপত্তি যুক্তিগ্রাহ্য বলিয়া গ্রহণ করি না। কারণ, কেবলমাত্র কৃত্তিবাসী বাংলা রামায়ণের কথা নয়, মূল সংস্কৃত রামায়ণেও সুন্দরাকাণ্ড (কিংবা সুন্দরকাণ্ড) এই পাঠভেদ পাওয়া যায়। আমাদের দেশের হস্তলিখিত কোনও কোনও পুঁথিতে এবং রামায়ণের কুম্ভকোণম্, গুজরাট, বোম্বাই প্রভৃতি সংস্করণে 'সুন্দরকাণ্ড' পাঠও আছে। রামায়ণ লৌকিক কাব্য—পুরাণ গ্রন্থশ্রেণীভুক্ত। অধ্যাত্ম রামায়ণের অধিকাংশ সংস্করণে সুন্দরাকাণ্ড প্রচলিত। সুতরাং, পূর্ব্বোক্ত মতকে সুগ্রাহ্য বলিতে পারা যায় না।

কোনও কোনও ব্যাকরণবিদ্‌দের মতে 'সুন্দরকাণ্ড' পাঠই সমীচীন।* মতান্তরে, অন্য দল বলেন যে 'সুন্দরাকাণ্ড' শব্দটি বাংলাভাষায় চলিয়া আসিবার কারণ মিষ্টত্ব রক্ষা। "হ্রস্বস্য দীর্ঘতা" (কলাপ ২৮৬ সূ) এই সূত্র দ্বারা মধ্যের অকারটির দীর্ঘ হইয়াছে। যথা—বিশ্বাবসু, মিত্রাবরুণৌ, তারকাভৈরব (সুন্দরাকাণ্ড, উত্তরাকাণ্ডও এইরূপ) ইত্যাদি। শেষোক্ত মতটি নবদ্বীপের নৈয়ায়িক-চূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ প্রমুখ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত। তাঁহাদের মতে "প্রয়োগরত্নমালায়" এই প্রকার পদবিধান সম্ভব। তাহা ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত অধ্যাত্ম রামায়ণকার যখন ঐ পদই রাখিয়াছেন তখন আর্ষ প্রয়োগ বলা যাইতেও পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে 'সুন্দরকাণ্ড' কিংবা 'সুন্দরাকাণ্ড' দুই প্রকার পদই সাধু।

সমগ্র রামায়ণখানি পড়িয়া পাঠককে অনেক সময়ে মনে করিতে হয়—কবি নানাভাবে রামচরিত্র অঙ্কিত ও বর্ণিত করিলেন, কিন্তু সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে অন্যান্য কাণ্ডকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র এই কাণ্ডকে কবি 'সুন্দর বলিলেন কেন? মূল সংস্কৃত রামায়ণখানিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন অনেকেই। তন্মধ্যে বসুমতী-সম্পাদক স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ, পণ্ডিত শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর ও প্রবাসী-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণের সম্পাদনায় বাংলা রামায়ণের বিভিন্ন বিশুদ্ধ সংস্করণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রমাদ অতিরঞ্জনগুলিকে নষ্ট করিয়া মূল গ্রন্থের সঙ্গে বাঙ্গালীর (বিশেষতঃ, সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞদের) পরিচয় ঘটাইয়া দিয়াছে।

নানারূপ অদ্ভুত ও সুন্দর ঘটনায় এই কাণ্ডটি অলঙ্কৃত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম "সুন্দরাকাণ্ড"।

সুন্দর বা অদ্ভুত ঘটনাবলী লক্ষ্য করিয়া কৃত্তিবাসও নিজের রামায়ণে এই কাণ্ডের প্রথমে বলিয়াছেন—

'পঞ্চমে সুন্দরাকাণ্ড শুনিতে সুন্দর
রামের আজ্ঞায় নল বাঁধিল সাগর॥"

অন্যান্য কাণ্ডের ন্যায় এই কাণ্ডে এমন কোনও একটি প্রধানতম বিষয় নাই যে, উহার নামে সমগ্র কাণ্ডের নাম হইতে পারে। অনেকগুলি ঘটনাই স্বপ্রধান। একের নামে কাণ্ডের নাম হইলে অপর বিষয়ের নামে কেন হইল না, প্রশ্ন হইতে পারে। সুতরাং, তন্মধ্যস্থ ঘটনাবলীর উপর দিয়াই কাণ্ডের নাম রাখা হইয়াছে। সাহিত্যের অধিকাংশ গ্রন্থে, কাব্যে, নাটকে ও প্রকরণে সামান্য এক নামকে উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র পুস্তকের নাম রা[খা] হইয়াছে। মৃচ্ছকটিক, অভিজ্ঞানশকুন্তল প্রভৃতি বহু [গ্রন্থ] তাহার সুস্পষ্ট উদাহরণ। কাব্যাংশের সৌন্দর্য্যের আধিক্য

* তাঁহারা বলেন যে 'সুন্দর' এই পদ বিশেষণ। সংস্কৃতজ্ঞ শব্দ, ঔণাদিক প্রত্যয় সিদ্ধ। বাক্য যথা—সুন্দরশ্চাসৌ কাণ্ডশ্চেতি সুন্দরকাণ্ডঃ। সর্ব্বত্রই কর্ম্মধারয় নিষ্পন্ন। কোথাও বা শুদ্ধ, কোথাও বা মধ্যপদলোপী। বাক্য যথা—সুন্দরবিষয়গর্ভশ্চাসৌ কাণ্ডশ্চেতি। 'সুন্দরা' এবং 'উত্তরা' এইরূপ ব্যবহার অযোধ্যা, কিষ্কিন্ধ্যা, লঙ্কা এই সকল 'আ'কারের অনুকরণে বাংলায় চলিয়া আসিয়াছে। এই মতটি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকীনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ সুধীবৃন্দ কর্ত্তৃক সমর্থিত। ইতি লেখক।

এই কাণ্ডকে সুন্দরকাণ্ড বলা হয়। মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে হনুমানের লম্ফপ্রদান, সিংহিকার উদরভেদ ও চিত্রকূট হইতে তটদেশে পতন ও সীতাসহ হনুমানের কথোপকথন বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত এবং রামের নিকট বর্ণন অবধি সুন্দরকাণ্ড বলা হইয়াছে।

এখন দেখা যাউক সৌন্দর্য্য কোথায়? আদর্শ-পুরুষ বিয়োগে আদর্শচরিত্রা বিয়োগবিধুরার চিত্ররূপটি সত্যনিষ্ঠা ও পাতিব্রত্যধর্ম্মে চির উজ্জ্বল ও মহিমময়ী। হনুমান লঙ্কায় গিয়া দেখিলেন রাক্ষসপুরীতে রাবণের কবলে পড়িয়াও সীতা নিজের সতীত্ব রক্ষা করিয়া তখনও জীবিতা। কান্তপ্রেমে বিভোরা। রামায়ণকার এই চিত্রে তদ্গতপ্রাণা আর্য্যারমণীর চরিত্রে অসীম সৌন্দর্য্যের পরিচয় পাইলেন। অধ্যাত্মরামায়ণে অশোকবনবাসিনী সীতার তৎকালীন রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন—

"সমতীত্য পুনর্গত্বা কিঞ্চিদ্দূরং সঃ মারুতিঃ।
দদর্শ শিংশপা বৃক্ষমত্যন্ত নিবিড়চ্ছদম্॥
অদৃষ্টাতপমাকীর্ণং স্বর্ণবর্ণবিহঙ্গমম্।
তন্মূলে রাক্ষসীমধ্যে স্থিতাং জনকনন্দিনীম্॥
দদর্শ হনুমান্ বীরো দেবতামিব ভূতলে।
একবেণীং কৃশাং দীনাং মলিনাম্বরধারিণীম্॥
ভূমৌ শয়ানাং শোচন্তীম্ রাম রামেত্তিভাষিণীম্।
ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তীমুপবাসকৃশাং শুভাম্॥"

আর্য্য অনার্য্যযুদ্ধ ও নারীহরণ পৌরাণিক যুগে যেরূপ দৃষ্ট হয় তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, উৎকর্ষমুখী সতীত্ব বোধ ও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম আর্য্যরমণীর কিরূপ আরাধ্য ছিল। সমাজ-সেবা ও জনমত পালন ছিল আর্য্য-পুরুষগণের তখন বিশেষ লক্ষ্য। আদর্শপুরুষ রামচন্দ্রকে ধ্যান করিয়া সীতা কিরূপভাবে অনার্য্য রাবণের অত্যাচার ও রাক্ষসীদিগের ভর্ৎসনা সহ্য করিতেছেন, হনুমান মুখে বানরগণ তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই জানকীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিল।

ভট্টিকাব্যেও আমরা দেখিতে পাই যে, হনুমান সীতাকে দেখিবার জন্য অশোকবনে গমন করিলেন। লঘু কলেবর মহাবীর হনুমান দেখিলেন 'জনগণমানিতা' কমললোচনা রঘুবংশকুলবধূ রামপ্রিয়া জানকী বনমধ্যে তরুমূলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।* আদর্শচরিত্র শ্রেষ্ঠ নরনারীর Ideal আর্য্যসভ্যতার চির অভিপ্রেত। দয়িতের অভাবে রামগতৈকপ্রাণার স্বামী-বিরহ কত দুঃসহ! কোনও রকমে জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সত্যই, ইহার তুল্য 'সুন্দর' আর কি হইতে পারে? Troyএর Helen, কিংবা Penelope সে সত্যনিষ্ঠার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। ভট্টিকার তাই হনুমানের সীতার সেই নিরাভরণা মূর্ত্তি ও কষ্টস্বীকারকে নিপুণভাবে অনুভব ও পরিদর্শন করিলেন। তিনি লিখিলেন—কান্তাসহমানা দুঃখং চ্যুতভূষা।"

প্রিয়কে ও বল্লভকে সীতা নিরন্তর মনে মনে স্মরণ করিয়া চলিয়াছেন। পাছে চিন্তার পাতিত্য ও ব্যভিচার পর্য্যন্ত না হইয়া পড়ে। সতীত্বের এই আদর্শই সৌন্দর্য্য—সত্যকার অমূল্য সম্পদ, নিখিলের যুগ যুগ বাঞ্ছিত বস্তু। অননুকরণীয় দৃষ্টান্তে পর্য্যবসিত। হনুমান ইচ্ছা করিলেই সীতাকে উদ্ধার করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি ইচ্ছা-পূর্ব্বকই তাহা করিলেন না। কারণ, তাহাতে ইষ্টাপত্তি আশঙ্কা ছিল। রামচন্দ্রকে দিয়া রাবণবধ শ্লাঘ্য ও অভিপ্রেয়। তাই, সীতা কিরূপভাবে কালযাপন করিতেছেন রামচন্দ্রকে হনুমান আসিয়া গদ্‌গদ্ ভাষায় বলিতে লাগিলেন—

"তস্যাধিবাসে তনুরুৎসুকাসৌ
দৃষ্টাময়া রামপতি প্রমন্যুঃ।" —ভট্টিকাব্যম্।

সীতা দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসদিগের আলয়ে উৎকণ্ঠিত অবস্থায় কাল কাটাইতেছেন। তিনি কৃশা হইয়া পড়িয়াছেন। একমাত্র রামেই তাঁহার পতিভক্তি। তিনি একান্তই দৈন্যগ্রস্ত; আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। হনুমান সীতার রূপ বর্ণনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—যদি কনক অতিক্রান্ত হইয়া নিজের শুভ্রবর্ণা, যক্ষাগ্রস্তা ইন্দুলেখাকে

* "ঘন গিরীন্দ্র বিলঙ্ঘনশালিনা
বনগতা বনজদ্যুতিলোচনা।
জনমতা দদৃশে জনকাত্মজা
তরুমৃগেন তরুস্থলশায়িনী॥" ১৫ শ্লোক। ১০ম সর্গ

ক্ষয়ে লঘু করিয়া দেয় এবং সেই কনক যদি আর পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে সেই শুদ্ধা শোককৃশা সীতা শশিলেখার সহিত উপমিতা হইতে পারেন।*

রামায়ণের প্রসিদ্ধ টীকাকার গোবিন্দরাজ মূল টীকায় সুন্দরাকাণ্ডের তাৎপর্য্য প্রসঙ্গে এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন।

কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার আবার সৌন্দর্য্যকাণ্ড এইরূপ নামকরণ যুক্তিযুক্ত বলিয়াছেন। হনুমানের লঙ্কা অগ্নিসাৎ করণ, রাক্ষসী ত্রিজটার স্বপ্ন বর্ণনা, রাবণের ত্রাস ও সীতার আদর্শ জীবন যাপন ইত্যাদি সুন্দর ঘটনা বিন্যাস ও দৌত্যসাধন কাব্যাংশের সৌন্দর্য্যে এই কাণ্ডকে 'সুন্দর' বলা হইয়াছে।

* 'সমতাং শশিরেখয়োপযায়া—
দবদাতা প্রতনুঃক্ষয়েণ সীতা।
যদি নাম কলঙ্ক ইন্দুরেখা
মতিবৃত্তো লঘয়েন্ন চাপি॥"—ভট্টিকাব্যম্।

# বিশ্বজগৎ

শ্রীশিবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবী ঘুরপাক খায় তার নিজের মেরুদণ্ডের চারি পাশে দিনে একবার। দিনের বেলায় সে আমাদের মুখ ফিরিয়ে দেয় সূর্য্যের দিকে। সূর্য্যের আলোয় আলোকিত হয়, আকাশ বাতাস সব পৃথিবীর যাবতীয় জিনিষ আমাদের চোখে পড়ে তাই। বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত সমস্ত ধূলিকণা আমাদের দৃষ্টির গণ্ডী কমিয়ে কেবল এই পৃথিবীরই মধ্যে রেখে দেয়। তারপর রাত্রি বেলায় আমরা ঘুরে যাই অন্ধকারের দেশে। সেখানে তখন আমাদের বিশ্বজগতের সঙ্গে চাক্ষুষ দেখা হয়। লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের পরিচয় হয় আমাদের সাথে। সবই যেন রহস্যময়। অজানা, অচেনা, দুর্বোধ্য। প্রকৃতির অতৃপ্ত দুরন্ত সন্তান এই মানব সকল রহস্যের আবরণ ছিন্ন করে চলেছে একটার পর একটা এক অন্তহীন মহাযাত্রায় তার অজানাকে জানতে, তার অপরিচিতকে পরিচিত করতে।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কথা উঠলেই প্রথমে আমাদের মনে পড়ে আমাদের পৃথিবীকে, আমাদের চাঁদ, আমাদের সূর্য্য, আমাদের সৌর-জগৎকে। তারপর আসে নাক্ষত্র লোক, নীহারিকাপুঞ্জ, ছায়াপথ, অনন্ত আকাশ।

সৌরজগৎ কি? কেমন করে হ'ল? এই প্রশ্নের উত্তর বেদ পুরাণ বাইবেলের কথা ছেড়ে দিয়ে 'কোপারনিসাস্' (Copernicius) থেকে আজ পর্য্যন্ত সকল সত্যান্বেষী মনীষিদের কথা আলোচনা করলে সঠিক সত্যের সন্ধান না পেলেও একটা আত্মতৃপ্তি আসে। আমার মনে হয় সেইটাই আমাদের যথেষ্ট।

কোপারনিসাস্ জগতে প্রথম দেখালেন সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে না—পৃথিবীই সূর্য্যকে কেন্দ্র করে তার চারি পাশে ঘোরে। এমনি আরও অনেক জ্যোতিষ্ক (havenly bodies) যারা সূর্য্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে তারা নক্ষত্র নয় গ্রহ। তারপর দূরবিনের জন্ম হ'ল। তখন আরও নূতন নূতন গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেল। কেপলার প্রমুখ জ্যোতির্বিদরা অঙ্ক কষে বার করলেন দূরের আরও দূরের গ্রহ 'ইউরেনাস্', 'নেপচুন', 'প্লুটোকে'। তারপর তাদের দিনরাতের, ঘণ্টার পরিমাণ; উপগ্রহদের সংখ্যা, আমাদের বৎসরের অনুপাতে তাদের বৎসরের কাল কত; এমনি কত কি।

এদের জন্ম নিয়ে নীহারিকাবাদ (Nabular theory) আনলেন 'ল্যাপলেস্' (Laplace)। তিনি বললেন, আমাদের গ্রহরাজ সূর্য্য ও তার গ্রহগণ জন্ম নিয়েছে কেবল মাত্র একটী বায়বীয় নীহারিকায় এবং কালক্রমে তার আপন সঙ্কোচনে তার ঘূর্ণন বেড়ে গেল ও আস্তে আস্তে ঐ প্রক্রিয়ায় সেই নীহারিকাটীর পরিধি বলয় থেকে

কিয়দংশ বলয়াকারে আলাদা হ'য়ে জমা হ'ল একটা বায়বীয় গ্রহে। পরে ঠাণ্ডা হ'য়ে জমে উঠল। জমাট বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তুলাকার প্রাপ্ত হ'ল তার নিজেরই আবর্ত্তনে। এমনি করে একটার পর একটা গ্রহ জন্ম নিয়েছে নীহারিকার ঐ ক্রমহ্রস্বমান পরিধি বলয় হ'তে; "প্লুটো" "নেপচুন" থেকে আরম্ভ করে পরের পর বুধ অবধি। সেই নীহারিকার বাকি অংশটুকু এখনও জমে উঠতে পারে নি, তাই সে আজও জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে আমাদের সূর্য্য হ'য়ে। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে পঁাকে (Poincare) বললেন, যদি ল্যাপলেসের নীহারিকাবাদকে ঠিক বলে ধরে লওয়া যায় তবে আমাদের সৌর-জগতের আদিমাতা ঐ নীহারিকাটীর বয়স হিসাব করলে আমাদের আরও 'Wrinkles' কোঁচ পাওয়াই স্বভাবিক হ'ত অর্থাৎ তাহ'লে আমাদের গ্রহের সংখ্যা আরও বাড়ত। তারপর সৌরজগতের সকল গ্রহই কেন নিজ নিজ মেরুদণ্ডের পশ্চিম থেকে পূর্ব্বে ঘোরে এবং কেনই বা সকলে প্রায় একই পর্য্যায়ে অবস্থান করে বা একই মুখে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর নীহারিকা-বাদ দিতে পারে নি। Inertia দিয়ে স্যার জেম্স্ জীন (Sir Jeams Jean) তার প্রত্যেকটার উত্তর দিলেন তাঁর টাইড্যাল থিওরিতে (Tidal Theoryতে)। এই মতবাদে 'জীন' বললেন মহাশূন্যে নানা আকারের নক্ষত্র অর্থাৎ বিরাট্ বিরাট্ বায়বীয় জ্বলনের অগ্নিকুণ্ড গুলি পরস্পর পরস্পরের বহু দূর দিয়ে ছুটে চলেছে। কিন্তু যদি কখনও হঠাৎ কোন একটী নক্ষত্র আর একটী তদপেক্ষা ক্ষুদ্র নক্ষত্রের কাছে এসে পড়ে এবং ওই ক্ষুদ্র নক্ষত্রটীকে যদি সে তার আকর্ষণী সীমার মধ্যে পায় তবে বড় নক্ষত্রটীর টানে ছোট নক্ষত্রটীর অগ্নিবাষ্প উথলে উঠবে ফেঁপে, উত্তাল তরঙ্গে জোয়ারের জলের মত। এখন নক্ষত্র দুইটীর মধ্যে যদি ওজনের পার্থক্য বেশী হয় ও দূরত্বের ব্যবধান কম হয় এবং এই দুয়ের মান (ratio) যখন খুবই বড় হ'তে থাকে তখন যদি ঐ ছোট নক্ষত্রটী বড় নক্ষত্রটীর আকর্ষণে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে না পারে, তবে প্রথমটী দ্বিতীয়টীর মধ্যে প্রচণ্ড আঘাত করে ঢুকে যাবে। আগুনের দহন তখন আরও বেড়ে উঠবে। আর যদি তার উল্টো হয়, মানে দুই নক্ষত্রের ওজনের পার্থক্য কম আর দূরত্বের ব্যবধান বেশী হয় তবে যতক্ষণ তারা তাদের আকর্ষণ বিনিময় করবে ততক্ষণ অগ্নি-বাষ্পের জোয়ারের ঢেউ উঠবে তারপর আবার তাহা দুলে দুলে মিলিয়ে যাবে যখন নক্ষত্র দুইটী পরস্পর পরস্পরকে নিজেদের আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে দেবে। এই দু'এর মাঝামাঝি হ'লে প্রথমে ক্ষুদ্র নক্ষত্রটীর বুকে ঢেউ উঠবে ভীমাকারে। পরে সেই ঢেউএর চূড়া বৃহৎ নক্ষত্রটীর দিকে ছুটে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে বড় নক্ষত্রটীর জয়ী টানে (বড় নক্ষত্রটীর বুকেও ঢেউ উঠবে কিন্তু তা ছোট নক্ষত্রটীর ঢেউ এর তুলনায় কিছু নয়)। জীন বলেন, আমাদের সূর্য্য ওইরূপ একটী ছোট নক্ষত্র—নাক্ষত্রলোকে ছুটে চল্‌ছিল অনন্ত বিশ্বের মহাটানে। এমন সময় সম্পূর্ণ এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় আমাদের সূর্য্যের চেয়ে বড় একটা ধাবমান নক্ষত্র এসে তার আকর্ষণী ক্ষেত্র-সীমা রেখার মধ্যে আমাদের সূর্য্যকে ফেলে দিয়েছিল। যদিও সে সূর্য্যকে একেবারে তার নিজের মধ্যে টেনে নিতে পারেনি তবুও তার প্রচণ্ড আকর্ষণে সূর্য্যের বুকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ উঠেছিল, সেই আকর্ষণী শক্তি ওদের তৎকালীন ব্যবধান ও আয়তন অনুসারে এক সময়ে এত প্রবল হ'য়েছিল যে, বড় নক্ষত্রটী সূর্য্যের বুক থেকে খানিকটা সূর্য্যের অংশ টেনে ছিঁড়ে আলাদা করে দিয়েছিল হয়ত বা তার কিয়দংশ সে একেবারে আত্মসাৎ করে নিয়েই চলে গেছে তাইবা কে জানে। কিন্তু যে টুকরোটুকু এদের দু'এর মাঝে পড়েছিল সেটুকু দোটানায় পড়ে প্রথমে টুকরো টুকরো হ'য়ে যায়; পরে সূর্য্য থেকে বেরিয়ে যাবার গতি ও সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণের টানের সাম্য রেখে তারা সূর্য্যের চারি পাশেই ঘুরতে থাকে। কিন্তু তখন তাদের কক্ষ ছিল খুবই জটিল জ্যামিতিক অঙ্কনে। ওই টুকরোগুলোই হ'ল গ্রহগণের আদি মাতা। কালক্রমে তারা নিজেদের তাপ ও আলো বিকীরণ করে বর্ত্তমান কঠিন জমে যাওয়া গ্রহের আকার ধারণ করেছে ও নিয়মিত বৃত্ত ডিম্বাকারে সূর্য্যের চারি-পাশে ঘুরপাক খাচ্ছে।

বর্ণ-বিশ্লেষণ (Spectro-annalysis) দ্বারা প্রমাণিত

হ'য়েছে পৃথিবীতে যে যে মৌলিক পদার্থের সন্ধান আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে, সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহগণের মধ্যেও সেই সেই পদার্থের অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে। ইহাদের গঠন উপাদানগুলির ঐক্য হইতে আমরা 'জীনের' (Jeanএর) মতবাদের কোন ত্রুটী পাই না। তারপর সূর্য্য-কলঙ্ক পর্য্যবেক্ষণ আমাদের জানিয়ে দিয়েছে যে সূর্য্য নিজ মেরুদণ্ডের চারিপাশে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে আবর্ত্তন করে ২৬ দিনে একবার। বিজ্ঞানবিদ্ জীন বলেন ঘুরন্ত জিনিষ থেকে ছিট্‌কে যাওয়া জিনিষের যেমন ঘুরন্ত স্বভাব পাওয়াই স্বাভাবিক তেমন গ্রহগণের আহ্নিক গতির কারণ আমাদের সবিতা সূর্য্যের নিজ মেরুদণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে প্রচণ্ড আবর্ত্তন। এবং সকল গ্রহের প্রায় একই ধরণের অবস্থানের কারণ জীনএর মতবাদ হইতে বেশ উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলেছেন, গ্রহগণ একই সময়ে ছিন্ন সূর্য্য অংশ থেকে জন্ম নিয়েছে, তাই তারা প্রায় একই ভাবে অবস্থিত। যেমন করে গ্রহদের সৃষ্টি হয়েছে সূর্য্য থেকে, তেমনি করেই আবার তাদের চাঁদ বা উপগ্রহদের জন্ম হয়েছে গ্রহদেরেই গর্ভ হ'তে।

গ্রহগণের উৎপত্তি নিয়ে কোন কোন পণ্ডিত আর একটী কারণ অনুমান করেছেন। সেটী হচ্ছে আমাদের দূরবীক্ষণে, মাঝে মাঝে "নূতন তারার" আবির্ভাব। এখন এই নূতন তারা কাকে বলে তা জানার দরকার। পর্য্যবেক্ষণে দেখা যায়, এক একটী তারকা আছে যাদের আলোক হঠাৎ অতি দ্রুত গতিতে খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উজ্জ্বলতা হাজার থেকে লক্ষগুণ পর্য্যন্ত বেড়েছে দেখা গেছে, তারপর ধীরে ধীরে ম্লান হ'য়ে যায়, এক সময়ে হঠাৎ জ্বলে ওঠা আলোকে নূতন তারার আবির্ভাব মনে করে ওদের নাম দেওয়া হ'য়েছিল "নূতন তারা"। কিছুদিন পূর্ব্বে লাসেটো নক্ষত্ররাশির কাছে সেইরূপ একটী নূতন তারার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এই সব "নূতন তারা" নামে অভিহিত নক্ষত্রগুলি নিজেদের আকর্ষণী শক্তি ক্রমে ক্রমে হারিয়ে ফেলে তাদের উপরিস্থিত গ্যাসমণ্ডলকে আর ধরে রাখতে পারে নাই। তাই সেই জ্বলন্ত খোলস ওঠার মত গ্যাসপুঞ্জ নূতন তারা হ'য়ে আমাদের চোখে ধরা পড়ে। অনেক পণ্ডিতের ধারণা—ওইরূপ কতকগুলি "নূতন তারা" অর্থাৎ কোন একটী মরন্মুখ নক্ষত্রের জ্বলন্ত খোলসগুলি জমে উঠে আমাদের সৌরজগতের গ্রহ সৃষ্টি করেছে। আর সেই মুমূর্ষ নক্ষত্রটী হ'ল আমাদের সূর্য্য। কিন্তু এ মতবাদকে সমর্থন করলে আমাদের বিশ্বজগতে সূর্য্যের মত গোষ্ঠীবর্গ সম্পন্ন আরও অনেক নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া যেত। কারণ বেশী বয়সে সকল নক্ষত্রই নিজেদের আকর্ষণী শক্তি ক্রমশঃ হারিয়ে প্রচুর "নূতন তারার" জন্ম দেবে; কিন্তু আমাদের জানা বহু বুড়ো, খুব বুড়ো নক্ষত্র আছে যাদের কাহারও গ্রহজগৎ নেই। এমনকি গোষ্টিবর্গসমেত নক্ষত্র বিশ্বজগতে প্রায় নেই বললেই হয়। সেইজন্য আধুনিক পণ্ডিতগণ ওই মতবাদকে নাকচ করে দিয়েছেন। সূর্য্যের গ্রহগণ যে সম্পূর্ণ এক আকস্মিক কারণে জীন-এর টাইড্যাল থিওরি অনুসারে সৃজন হয়েছে, সেই মতবাদই এখনকার সুধীবৃন্দ পোষণ করেন। এ মতবাদকে সন্দেহ করে অনেকে বলেছেন, আকাশে নক্ষত্রের সংখ্যা দেখে তাঁদের মনে হয় নক্ষত্রে নক্ষত্রে সংঘর্ষণ খুব স্বাভাবিক ও সত্বর হওয়াই উচিৎ। জীন তার উত্তরে বহু উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, আকাশে এত স্থান যে ওসব প্রশ্ন শুধু অস্বাভাবিক নয় প্রায় অসম্ভব।

সৌরজগতে আর একটা সভ্য আছে, সেটা ধূমকেতু। তারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের জগতের কেহ নয়, সম্পূর্ণ বাহিরের জগতের লোক। নীহারিকা দিয়ে তাদের শরীরের গঠন। সূর্য্যের আকর্ষণে সূর্য্য তাদের নিজের চারি পাশে পাক খাইয়ে নেয়, কেউ কেউবা ধরা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ঘুরপাক খেয়ে যায়, কেউবা একবার দেখা দিয়েই ঘুরে চলে যায় চির জনমের মত—আর আসে না।

আমাদের সৌরজগতের গণ্ডী পার হ'য়ে আমরা পড়ি আমাদের নক্ষত্রলোকে (steller system)। এই নক্ষত্রলোকে আছে অসংখ্য নক্ষত্র, অগণন নীহারিকা। পণ্ডিতেরা বলেন, আমাদের আপন নক্ষত্রলোকটী বহু কোটী নক্ষত্রে পূর্ণ। তার মধ্যে যে আকাশ তাতে আছে সূক্ষ্ম গ্যাস, তা কোথাও বা অত্যন্ত বিরল কোথাও বা অপেক্ষাকৃত ঘন, কোথাও বা উজ্জ্বল, কোথাও বা অস্বচ্ছ। আমাদে

গ্রহরাজ সূর্য্য আছে এই নক্ষত্রলোকের কেন্দ্র থেকে বহু দূরে একটা নাক্ষত্র মেঘের মধ্যে অর্থাৎ একটা নীহারিকায়। কিন্তু নক্ষত্রগুলি বেশীর ভাগই আছে তার কেন্দ্রের দিকে।

এখন এই নাক্ষত্রলোকের সীমার বা পরিব্যাপ্তির একটু আভাষ দেওয়া যাক্। যে নক্ষত্রটী আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে তার দূরত্ব চার আলোক-বৎসর (4 light years)। এক আলোক-বৎসর মানে আমাদের এক মাইলের পাঁচ লক্ষ অষ্টাশি হাজার কোটী গুণ (5,88,00,000,00,000) আর সব চেয়ে দূরেরটী আছে ৩০০,০০০,০০০ আলোক-বৎসর দূরে।

তারপর "থার্মোপাইল" (Thermopile) ও "বোলামিটার" (Bolametre) যন্ত্রের দ্বারা প্রত্যেক নক্ষত্রটার উত্তাপ জানা গেছে। আর বর্ণলিপি বাঁধা দূরবীণে (Spectrometer এ) তাদের রং পর্য্যবেক্ষণ করে তাদের বয়স ও তাদের গতি আমাদের কাছে ধরা পড়েছে। বুড়ো নক্ষত্রগুলির রং বর্ণসপ্তকের লালের দিকে কারণ সাদা রংএর আলোক উত্তাপ হারিয়ে ক্রমে বেগুণী থেকে লালের দিকে নেমে আসে। বুড়ো নক্ষত্রগুলি অনেক কাল ধরে অবস্থানের জন্যে ক্রমে তার তাপ হারিয়ে ফেলে। যদিও লাল রংএর অনেক নক্ষত্রই আছে যাদের উত্তাপ এত যে সেখানে সোণা বা প্ল্যাটীনাম এখনও গ্যাসের আকারে বর্ত্তমান। তার কারণ, তাদের দৈহিক ওজন ও পরিমাণ। তারপর বিবেচ্য কোনও নক্ষত্র আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে না পিছিয়ে যাচ্ছে—তার প্রমাণ "ডপলার এফেক্ট" (Doppler's effect) থেকে আমরা তার রংএর তারতম্য দেখে বুঝতে পারি। কোন ট্রেণ যদি বাঁশী দিতে দিতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে তা হ'লে সেই বাঁশীর স্বর ক্রমে চিকণ হ'তে চিকণতর হ'তে থাকবে। তারপর যখন বাঁশী দিতে দিতে ট্রেণ আমাদের ছাড়িয়ে চলে যাবে তখন তার স্বর ক্রমেই নামতে থাকবে—যতই ট্রেণখানি দূরে যাবে ততই। তেমনি আবার কোন দাঁড়িয়ে বাঁশী দেওয়া ট্রেণের দিকে যদি আমরা অন্য ট্রেণে চেপে যাই তবে যত এগিয়ে যাব, বাঁশীর স্বর ততই চিকণ হবে—বিপরীত মুখে গেলে তার উল্টো হয়। এই হ'ল মোটামুটি "ডপলার প্রিন্সিপল" (Doppler's principle). এখানে আর একটা কথা জেনে রেখে দেওয়া দরকার: লাল আলোর ঢেউ সব চেয়ে বড়। তারপর কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল, গাঢ় নীল এই সব আলোর ঢেউ যথাক্রমে ছোট হ'তে হ'তে বেগুণী আলোয় সবচেয়ে ছোট হ'য়েছে। এখন যদি কোন নক্ষত্রের আলো আমরা স্পেক্ট্রোমিটার (spectrometer) দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পাই যে আলোর রং বর্ণ সপ্তকের বেগুণীর দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ আলোর ঢেউএর সংখ্যা বেশী হচ্ছে কিন্তু দৈর্ঘ্য কমে আসছে, তবে বুঝবো নক্ষত্রটী আমাদের কাছে এগিয়ে আস্‌ছে। আর যাদের লালের দিকে রং ফুট্‌ছে তারা আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কারণ যে আলোর কম্পন সংখ্যায় কমতে থাকে ও দৈর্ঘ্যে বাড়তে থাকে তা যায় লালের দিকে।

তারপর আসে নীহারিকাপুঞ্জের কথা। এদের অনন্ত আকাশে দ্বীপের সঙ্গে তুলনা করে বলা হ'য়েছে "দ্বীপ-জগৎ" (Island universe)। এক একটা নীহারিকা ধরে রেখেছে বহু শত নক্ষত্রকে। আমাদের সূর্য্যও বন্দী হ'য়ে আছে ঐরূপ একটি নীহারিকাপুঞ্জে। এই নীহারিকা-উৎপত্তি নিয়ে বিজ্ঞানবিদ্‌রা অনুমান করেন, সৃষ্টির রূপ-বৈচিত্র্যের পালা আরম্ভ হবার অনেক আগে কেবল ছিল একটী পরিব্যাপ্ত জলন্ত বাষ্পমণ্ডল। উত্তপ্ত পদার্থের ধর্ম্মানুসারে সেই জলন্ত বাষ্প কালের প্রবাহে তার তাপ বিকীরণ করে যেতে লাগল। সেই দহনের উত্তাপে প্রথমে বিশ্বের ভারি হাল্‌কা সব পদার্থ ছিল গ্যাসের অবস্থায়। কোটী কোটী বছর ধরে কালে কালে তা ঠাণ্ডা হ'য়েছে। তাপ কমতে কমতে গ্যাস থেকে ছোট ছোট টুক্‌রো কণা হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। এই বিপুল সংখ্যক কণা তারার আকারে জোট বাঁধায় নীহারিকা গড়ে উঠেছে। আসে পাশে যে সব নীহারিকার আলো আমাদের যন্ত্রে ধরা পড়েছে তা তার আপন আলোক নয়। যে নক্ষত্রগুলি সেই নীহারিকায় জলছে তারাই ওকে আলোকিত করেছে, কিন্তু তাই বলে নক্ষত্রগুলির প্রতিফলিত আলোক তা নয়। সে আলোক নীহারিকার পরমাণুগুলি শুষে নিয়ে ভিন্ন দৈর্ঘ্যের যা আলো দেয় তাই। নীহারিকাদের মধ্যে অবশ্য অসংখ্য তারা আছে কিন্তু তার মাঝে মাঝে বিরাট্ বিরাট্ কালো ফাঁক দেখা গেছে। জ্যোতিষী বার্ণাডে

প্রায় দুই শত ওইরূপ ছোটবড়, কাছের দূরের কালো আকাশ দেখেছেন। তিনি অনুমান করেন ওগুলি অস্বচ্ছ গ্যাসের মেঘ। ওর পিছনে আরও নক্ষত্র আছে কিন্তু তারা ঢেকে গেছে ওই মেঘে।

ছায়াপথের কথা তারপর। এই ছায়াপথ আমাদের নাক্ষত্রলোকের শেষ সীমায় পাহারা দিচ্ছে অসংখ্য নক্ষত্র নিয়ে। তাতে এমন অনেক নক্ষত্র আছে যাদের উত্তাপ আসার পথে তেজ হারিয়ে পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মোট চার ডিগ্রী ওপরে। আর এমন অনেক নক্ষত্রও আছে যাদের আলোক আজও পৃথিবীতে এসে পৌছিয়ে উঠতে পারেনি। এখনও আসছে। পৌছবে একদিন নিশ্চয়ই কিন্তু কবে তা কে জানে।

"বর্ণলিপিবাধা দূরবীণ ফটোগ্রাফে" জ্যোতির্ব্বিদ্‌রা আমাদের নক্ষত্রলোকের অদৃশ্য আলোককে দৃষ্টিপথে এনে সেই সুদূরের ছায়াপথের পারে আরও বৃহত্তর নক্ষত্রলোকের সন্ধান পেয়েছেন। আমাদের নাক্ষত্রলোক যার হ'ল ক্ষুদ্রতম এক অংশ মাত্র। কিন্তু ইহাও একটা মাত্র আংশিক ঘনীভূত অবস্থা (Local condensation)। পুঞ্জ পুঞ্জ তারায় খণ্ডিত এক মেঘরাশি। একটা মাত্র নাক্ষত্র মেঘ (starcloud)। দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে যতদূর যাওয়া যায় মহা ব্যোমের সীমাহীন অবকাশকে ভেদ করে কেবল দেখা যায় নক্ষত্র আর নক্ষত্রলোক, তারপরে আবার নক্ষত্রলোক, ছায়াপথ আর ছায়াপথ তারপর আবার ছায়াপথ সাজানো আছে গুচ্ছে গুচ্ছে, স্তরে স্তরে; হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী। এই বিস্ময়কর বিন্যাসকে বৈজ্ঞানিকরা নাম দিয়েছেন 'গ্যাল্যাক্সীক সিষ্টেম' (Galaxitic system) যার দুস্তর ব্যাপ্তি অপার দুরন্ত।

মহাপ্রলয়ের দিন এখনও বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করতে পারেননি এবং কি ভাবে তা ঘটবে তাও জানতে পারেননি। কিন্তু খণ্ড প্রলয় অনন্ত বিশ্বে অহর্নিশ ঘটছে। আমাদের পৃথিবীর প্রাণীজগতে তার ঢেউ কেমন করে এসে লাগবে তার আভাষ তাঁরা দিয়েছেন। তাঁরা বলছেন, পৃথিবীর তাপহীনতা সূর্য্যের আলো ও তেজহীনতাই আমাদের ধ্বংশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এই উত্তাপই একদিন আমাদের জীবন দিয়েছে—এই উত্তাপই একদিন আবার আমাদের মরণ ঘটাবে। জীনের ভাষায় এ "তাপ মৃত্যু" (heat-death)। পৃথিবীর তাপ বাঁচিয়ে রাখবার ও সূর্য্যের আলোককে জিইয়ে রাখবার কথা নিয়ে আলোচনার দিন আজ এখনও আসেনি কিন্তু একদিন তা আসবে, নিশ্চয়ই আসবে, যেদিন সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা জীবরাজ্য, প্রাণীরাজ্যকে বাঁচাবার শত চেষ্টা করেও তা পারবে না। সব জমে জমাট বেঁধে যাবে বরফের চেয়ে ২৭৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নীচে, অনন্ত কালের অনন্ত প্রবাহে।

# গান

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

নয়নে তোমারে দেখি বা না দেখি
মনে যেন দেখা পাই মা
তোমার মূরতি হৃদয়ে আঁকিয়া
পূজিবারে আমি চাই মা।

অপরাধ যদি করি কভু পায়
অভাজন বলি ক্ষমিও আমায়,
তোমা বিনা মোর এ জগতে আর
কেহ নাই, কিছু নাই মা।

অন্তিমে যবে স্মরিব তোমারে
দেখা দিও মোর স্মৃতির দুয়ারে,
সেইদিন যেন পদধূলি পাই,
আর কিছু নাহি চাই মা।

# পৃথিবীর জন্মরহস্য ও জীবের সৃষ্টিতত্ত্ব*

অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়

যে পৃথিবীতে আমরা জন্মলাভ করিয়াছি ও পুরুষানুক্রমে বসবাস করিতেছি সেই পৃথিবীর জন্মরহস্য ও যাবতীয় জীবের সৃষ্টিতত্ত্ব জানিবার জন্য স্বভাবতঃই সকলের আগ্রহ হইতে পারে। যে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি তাহাকে 'ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞান' (Geology) বলা হয়। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে আজ আমরা পৃথিবীর ও ভূপৃষ্ঠের প্রাচীন ইতিহাস বা পুরাতত্ত্বের সন্ধান পাই ও এ বিষয়ে কিছু আলোচনার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের অবতারণা। এ প্রসঙ্গে দেশীয় বা বিদেশীয় কোন পৌরাণিক উপাখ্যানের উল্লেখ বা আলোচনা করা হইল না।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বহুদিনের পরিশ্রমে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তর হইতে উদ্ভিদের চিহ্ন ও প্রাণীসমূহের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল সংগ্রহ করিয়া পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিহাস সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে পারিয়াছেন। এস্থলে ইহাও স্বীকার্য্য যে, ঐ ইতিবৃত্ত এখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই তবে ক্রমাগত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে আমাদের জ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমাদের সৌরজগতের সৃষ্টি ও পৃথিবীর উৎপত্তি কি প্রকারে ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বিভিন্ন সময়ে নানা প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল মতের মধ্যে লাপ্‌লাসের "নীহারিকা বাদ" ( Nebular theory ), চেম্বারলিন ও মুল্টনের "গ্রহাণুবাদ" ( Planetesimal theory) ও বর্ত্তমানে জিন্‌স্ ও জেফ্রিজের 'বিস্ফোতিবাদ" (Tidal disruption theory) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে Jeans ও Jeffreys-এর শেষোক্ত অভিমতই আজ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে ও বর্ত্তমান পণ্ডিতসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত। অতি সংক্ষেপে এই শেষোক্ত মতানুসারে একটি আকস্মিক ঘটনার ফলে সূর্য্য একটী ধাবমান বিরাট্ তারকার নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়ে ও ঐ তারকার আকর্ষণের প্রভাবে সূর্য্য হইতে কতক গ্যাসীয় অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই বিচ্যুত অংশ সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণের সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে ও ক্রমশঃ শীতল হইয়া বর্ত্তমান গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি করে। আমাদের পৃথিবী এই সকল গ্রহদের মধ্যে একটী। পৃথিবীর জন্ম-তারিখ ও বয়স সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ অনেক গবেষণা ও গণনার পর স্থির করিয়াছেন যে, প্রায় আড়াই শত কোটী বৎসর পূর্ব্বে এইভাবে পৃথিবীর জন্ম বা সৃষ্টি হইয়াছিল। পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে ও এস্থলে অবান্তর হইবে। এই প্রথমাবস্থার গ্যাসীয় পৃথিবী তাপ বিকীরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ শীতল হইয়া তরল গোলাকার অবস্থায় পরিণত হইল ও কিছুকাল পরে এই তরল পৃথিবী হইতে চন্দ্র বিচ্যুত হইয়া শূন্যে নিক্ষিপ্ত হইলেও পৃথিবীর আকর্ষণের মধ্যেই থাকিয়া নিজের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে আরম্ভ করে। পৃথিবীও ক্রমশঃ শীতল ও সঙ্কুচিত হইতে লাগিল ও এই অসমান সঙ্কোচনের ফলে ইহার উপর একটী অসমতল কঠিন আবরণের বা ভূত্বকের সৃষ্টি হয়। এই পরিবর্ত্তনের সময় নানারূপ বাষ্পীয় পদার্থ পৃথিবী হইতে বহির্গত হইয়া উর্দ্ধে বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি করিল ও পৃথিবীর আকর্ষণ হেতু পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ইহা একটী বাষ্পীয় আচ্ছাদন অবস্থায় রহিল। এইরূপে ক্রমশঃ ভূপৃষ্ঠে প্রথম স্থলভাগের সৃষ্টি হয় ও পৃথিবীর এই বাষ্পীয় বহিরাচ্ছাদন হইতে প্রবল বারিপাত হওয়ায় ভূপৃষ্ঠের নিম্নতর স্থানগুলিতে জল সঞ্চিত হইতে লাগিল ও এইভাবে প্রথম জলাশয়ের আবির্ভাব সম্ভবপর হইল। তদানীন্তন কাল হইতে জলবায়ুর প্রকোপে ও বারিপাতের ফলে উন্নত স্থলভাগের শিলাসমূহ বিকৃত ও বিচূর্ণ হইতে লাগিল ও জলস্রোতে নীত হইয়া জলাশয়ে সঞ্চিত হইতে লাগিল। এইভাবে প্রথম পলির সৃষ্টি হয় ও এই পলিস্তর ( বালুকা, মৃত্তিকা প্রভৃতি )

* প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব উপলক্ষে চন্দননগরে প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে।

ক্রমশঃ কঠিন হইয়া পরে শিলায় পরিণত হইতে লাগিল। পৃথিবী ক্রমশঃ শীতল হইবার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের বাষ্পীয় অংশ হইতে অজস্র বারিপাত হইতে লাগিল ও ইহার ফলে বায়ুমণ্ডলের অবস্থারও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হওয়ায় আকাশ পরিষ্কার হইল ও সূর্য্যের স্বচ্ছ কিরণে বসুন্ধরা আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই সকল অবস্থার আনুকূল্যে ও সূর্য্যকিরণের প্রাণদায়িনী শক্তির প্রভাবে প্রথম জীবের উদ্ভব বা সৃষ্টি হইয়া ভূপৃষ্ঠে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল। তারপর যুগে যুগে নানারূপ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে ভূপৃষ্ঠে জল ও স্থলভাগের বিন্যাস ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল ও এইরূপে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান জল ও স্থলভাগের সমাবেশ দেখিতে পাই। এই সকল কারণেই "পরিবর্ত্তনশীল জগৎ" এই কথাটীর সার্থকতা প্রমাণিত হইতেছে। প্রথম স্তরের সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত ভূপৃষ্ঠে কত ফুট পলি স্তরের সমাবেশ হইয়াছে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ যত্ন সহকারে তাহার হিসাব রাখেন। ইংলণ্ডে সমস্ত পলি স্তরের সমষ্টি প্রায় ৭৫০০০ ফুট বা ১৪ মাইল হইবে। ভারতবর্ষে তদপেক্ষা অনেক অধিক পলি স্তরের সমাবেশ দেখিতে পাই। আজ হইতে পঞ্চাশ কোটী বৎসর পূর্ব্বের "আদি" কল্পের Cambrian যুগ পর্য্যন্ত ভারতে প্রাচীন পলির হিসাব অন্যূনাধিক ৭৫০০০ ফুট হইবে ও তদপেক্ষা প্রাচীন স্তরের সঠিক হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই, তবে তাহাদের সমষ্টি আরও প্রায় ৭৫০০০ ফুট হইবে এইরূপ ধারণাই পণ্ডিতগণ পোষণ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সাধারণের নিকট অদ্ভুত মনে হইলেও আজ যেখানে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী দণ্ডায়মান সেখানে পঞ্চাশ কোটী বৎসর পূর্ব্বে একটী বিশাল ও সুগভীর "টেথিস" নামক সমুদ্রের অবস্থিতি ছিল ও ঐ সমুদ্রগর্ভে অন্যূনাধিক চল্লিশ কোটী বৎসর যাবৎ যুগে যুগে পলি সঞ্চিত হইতেছিল। যেখানে আজ বিন্ধ্য পর্ব্বতমালা বিরাজ করিতেছে তথায় প্রায় পঞ্চাশ কোটী বৎসরেরও অধিক দিন পূর্ব্বে বিশাল জলাশয়ের বিস্তার ছিল এবং ঐ জলাশয়ের সঞ্চিত পলি হইতেই বর্ত্তমান বিন্ধ্য পর্ব্বতের সৃষ্টি। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এ সকল বিষয়ের অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন ও স্থানাভাবে তাহাদের বিশদ আলোচনা এস্থলে সম্ভবপর নহে।

ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের সাহায্যে আজ পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন যুগের স্তর বিন্যাস ও তাহাদের বয়স অতি সংক্ষেপে নিম্ন তালিকায় দেওয়া হইল। পৃথিবীতে প্রথম জীবের আবির্ভাব যে কবে হইয়াছিল সে বিষয়ে সঠিক সংবাদ আজও পাওয়া যায় নাই—তবে "আদি" কল্পের নিম্নতর "পুরাতন" কল্পের স্তর হইতে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ভিদের চিহ্ন উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং এই "পুরাতন" কল্পে জীবোদয় (Dawn of Life) যে হইয়াছিল তাহা আমরা সঠিক বলিতে পারি। ভারতেও এই যুগের স্তর হইতে কিছু কিছু উদ্ভিদের চিহ্ন সংগ্রহ করা হইয়াছে। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী "অতি প্রাচীন" কল্পের স্তর হইতে বিশেষ কিছু সংগ্রহ করা যায় নাই। এ কারণে বলা যাইতে পারে যে, জীবগণের ক্রমবিকাশের প্রথম অধ্যায় আজও আমাদের নিকট অজ্ঞাত। এই "প্রাচীন" কল্পের অঙ্গারযুক্ত কর্দ্দম-শিলা ও গ্রাফাইট পদার্থের অস্তিত্ব হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, ঐ সময়ে জীবের সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল ও অতি নিম্নশ্রেণীভুক্ত উদ্ভিদ ও ক্ষুদ্র কোষযুক্ত প্রাণী বিভিন্ন জলাশয়ে অবস্থান করিত। এই সময়ের জীবগণ ক্ষুদ্র এক-কোষযুক্ত (uni-cellular) থাকায় ও কঠিন আবরণ বা কঙ্কালযুক্ত না হওয়ায় সম্ভবতঃ তাহাদের কোনও চিহ্নই আজ পর্য্যন্ত আমরা "প্রাচীন" স্তরের মধ্যে শিলীভূত বা প্রস্তরীভূত অবস্থায় দেখিতে পাই নাই। সেই কারণেই আজ জীবের প্রথম উদ্ভব ও বিকাশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা একটী কঠিন সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। এ বিষয়ে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের আরও অধিক অনুসন্ধান ও পরিশ্রম নিয়োজিত করা বিধেয় ও যেদিন এই "প্রাচীন" স্তর হইতে কিছু জীবাশ্ম উদ্ধার করা হইবে সেদিন পণ্ডিত-গণের বহুদিনের ঈপ্সিত তত্ত্বের সন্ধান মিলিবে ও জীবগণের অভ্যুদয়ের প্রথম অধ্যায়টীও আমাদের হস্তগত হইবে। "আদি" কল্পের Cambrian স্তরে উদ্ভিদের ও উচ্চ শ্রেণীর সামুদ্রিক প্রাণীর যথেষ্ট চিহ্ন সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং বর্ত্তমান পণ্ডিতগণের মতে এই Cambrian

স্তরের বয়স হইবে প্রায় পঞ্চাশ কোটী বৎসর। সুতরাং পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিকাশ যে পঞ্চাশ কোটী বৎসর পূর্ব্বে অল্প ভাবেই হইয়াছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তবে আরও কিছুকাল পূর্ব্বে যে উহাদের প্রথম উৎপত্তি বা আবির্ভাব হইয়াছিল সে ধারণাও পোষণ

দশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে "প্রাগাধুনিক" (Pleistocene) যুগে সম্ভব হইয়াছিল। মানবশ্রেণীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের নানা তথ্য জানিবার কৌতূহল অনেক পাঠক পাঠিকার হইবে সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতে আর একটী প্রবন্ধের জন্য এ বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রহিল। নিম্ন তালিকায়

## তালিকা
### ভূপৃষ্ঠের স্তর বিন্যাস

| বয়স (বৎসর) | Period (যুগ) | Era | কল্প | প্রাণীজগৎ | উদ্ভিদরাজি |
|---|---|---|---|---|---|
| | Recent | | আধুনিক | মানব যুগ | Present Flora |
| ১০ লক্ষ | Pleistocene | | প্রাগাধুনিক | | |
| | Pliocene<br>Miocene<br>Oligocene<br>Eocene | Tertiary | নব | স্তন্যপায়ী যুগ<br>( বরাহ যুগ ) | Modern Flora |
| ৬ কোটী | | | | | |
| | Cretaceous<br>Jurassic<br>Triassic | Secondary Or Mesozoic | মধ্য | সরীসৃপ যুগ<br>( কূর্ম যুগ ) | Angiosperm<br>Cycad &<br>Conifer |
| ১৭ কোটী | | | | | |
| | Permian<br>Carboniferous<br>Devonian<br>Silurian<br>Ordovician<br>Cambrian | Primary Or Palaeozoic | আদি | উভচর যুগ<br>মৎস্য যুগ<br>অমেরুদণ্ডী যুগ | Pteridosperm<br>Lycopods<br>Ferns<br>Algae |
| ৫০ কোটী | | | | | |
| ১০০ কোটী | Pre-Cambrian (Purana) | | পুরাতন | জীবোদয় | Plant |
| ১৫০ কোটী | Archaean | | অতি প্রাচীন | জীবশূন্য (?) যুগ | ? |
| ২৫০ কোটী | ভূপৃষ্ঠের উৎপত্তি ও গঠন। | | | | |
| | সৌর-জগতের সৃষ্টি ও পৃথিবীর জন্ম। | | | | |

করা যাইতে পারে। কারণ Cambrian যুগে যে সমস্ত প্রাণীর প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রাণি-জগতের কিছু উচ্চ শ্রেণীর, যথা—ত্রিবলী (Trilobite), শম্বুক (Mollusc) ইত্যাদি। আধুনিক মানবের (Homo sapiens) পূর্ব্বপুরুষের সন্ধানে অনেক পরিশ্রম ও ব্যয়সাধ্য অভিযান করা হইয়াছে ও আজ পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভূপৃষ্ঠে মানবের পূর্ব্বপুরুষের (Ape man) আবির্ভাব প্রায়

ভূপৃষ্ঠের স্তর বিন্যাস দেখান হইল। উপরে "আধুনিক" স্তর ও ক্রমশঃ নিম্নের দিকে প্রাচীন হইতে প্রাচীনতর স্তরের উল্লেখ করা হইয়াছে। এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত যে, এই তালিকায় প্রদত্ত বিভিন্ন যুগের সকল স্তরের পূর্ণ সঞ্চয় যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র হইয়াছে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই তালিকা অনুধাবন করিলে সাধারণ পাঠক পাঠিকাদের ভূপৃষ্ঠের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু ধারণা জন্মিবে এরূপ আশা করা যায়।

উপরোক্ত তালিকায় ভূপৃষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন যুগের স্তর বিন্যাস ও তাহাদের আনুমানিক বয়সও দেখান হইল। ইহাদের মধ্যে পঞ্চাশ কোটী বৎসর পূর্ব্বের "আদি" কল্পে যে সামুদ্রিক প্রাণীর বেশ প্রাচুর্য্য ছিল তাহা ঐ স্তর হইতে তাহার অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। ঐ যুগের ত্রিবলী (Trilobite) ( ১ নং চিত্র ) জাতীয় উচ্চ শ্রেণীর

১নং

অমেরুদণ্ডী প্রাণী যে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহাও ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ সুপ্রমাণিত করিয়াছেন। ঐ যুগে নানারূপ প্রবাল, শিরোপদী (১ক), কণ্টকদেহী (Echinoid), Graptolite (১খ), শম্বুকাদি ও কাঁকড়া বিছার আদি পুরুষের ( Eurypterid ১গ ) উদ্ভব ও
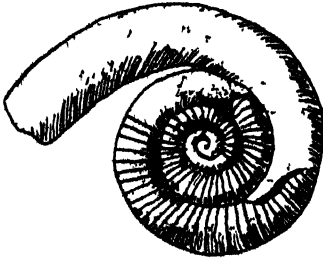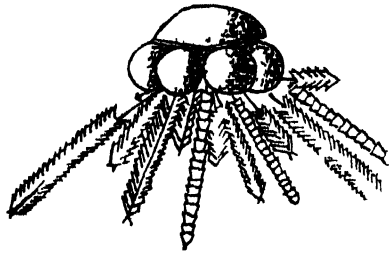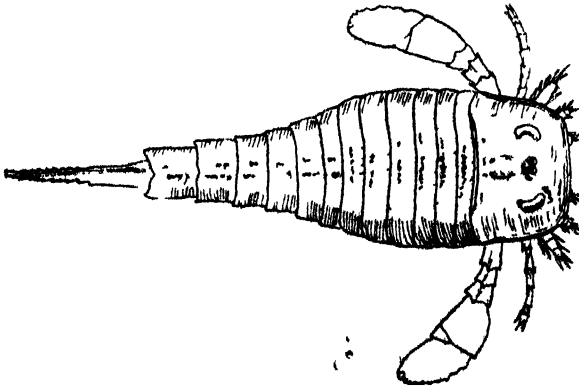
২ নং
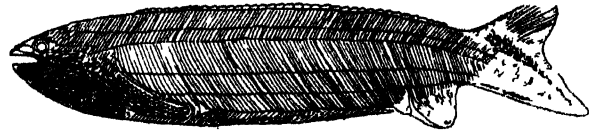
২ (ক)

বিকাশ হইয়াছিল তাহাও জানিতে পারা গিয়াছে। এগুলি সমস্তই প্রাণী জগতের মধ্যে অমেরুদণ্ডী শ্রেণীভুক্ত। আদি কল্পের Ordovician যুগের জলাশয়ে মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল অস্থি আবরণ যুক্ত বাইন মৎস্য সদৃশ এক প্রকার মৎস্যের (Ostracoderm) ও কিছুকাল পরে Devonian যুগের শেষ ভাগে ইহারা বিলুপ্ত হইয়া যায় ( ২ নং চিত্র )। তবে Silurian যুগ হইতেই যে প্রকৃত মৎস্যের ( ২ক চিত্র ) উদ্ভব হইয়াছিল ও ক্রমশঃ তাহারা যে বিস্তার লাভ করিতে থাকে তাহা জানা গিয়াছে।

১ (ক) ১ (খ)

১ (গ)

উদ্ভিদের মধ্যে শৈবাল ইত্যাদির উদ্ভব ও প্রসার এই 'আদি' কল্পের প্রারম্ভেই হইয়াছিল। অমেরুদণ্ডীর মধ্যে কীটপতঙ্গ ও মাকড়সার বিকাশ সম্ভবতঃ প্রায় ৩৩ কোটী বৎসর পূর্ব্বের Devonian যুগে হইয়াছিল ও ক্রমশঃ

২ (খ)
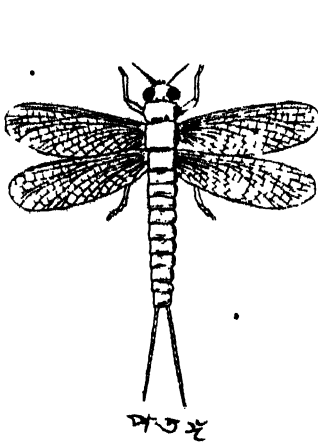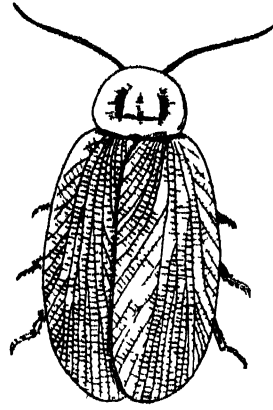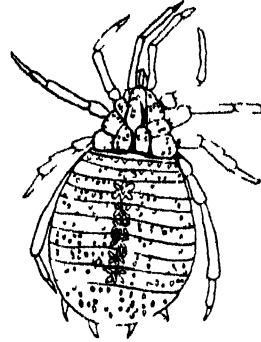
(Pteridosperm) ক্রমবিকাশ দেখিতে পাই। তাহার পরবর্ত্তী যুগে উপরোক্ত সকল জীবজগতের নানা শ্রেণীর ক্রমবিকাশ ও অধিকতর বিস্তৃতি পরিলক্ষিত হয়। তাহার পর Carboniferous যুগে (অর্থাৎ ২৮ কোটী বৎসর পূর্ব্বে) স্থলজাত উদ্ভিদের যথেষ্ট প্রাধান্য দেখা যায়। এই স্থলজাত উদ্ভিদরাজি (৪ নং চিত্র) হইতে এই সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক স্থানে পাথুরে কয়লার সৃষ্টি হইয়াছিল। কুড়ি কোটী

Carboniferous—Permian যুগে তাহাদের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। (২খ চিত্র)। এই Devonian যুগে মেরুদণ্ডী শ্রেণীভুক্ত নানাজাতীয় Dipnoi (Lung-fish) (৩ নং চিত্র) ও শল্ক-বিশিষ্ট (ganoid) মৎস্যের বিশেষ প্রাচুর্য্য ছিল

৩ নং
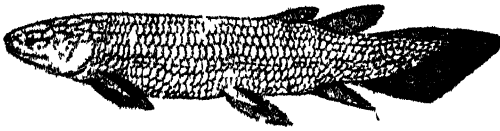
৪ নং

৩ (ক)

তাহা সুপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। এই সময়ে সমুদ্রে বহু ছোট বড় আকারের হাঙ্গর মৎস্য (shark) বিচরণ করিত। কুড়ি ফুট লম্বা অতিকায় shark (৩ক চিত্র)এর চিহ্ন ঐ যুগের স্তর হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই কারণেই Devonian যুগকে "মৎস্য যুগ" নামে অভিহিত করা হয়। এই Devonian যুগের স্তরে মৎস্য হইতে কিছু উচ্চতর শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রথম উভচর (Amphibian) প্রাণীর ৮ ব ইঞ্চ লম্বা পদচিহ্ন আবিষ্কার করা হইয়াছে। উদ্ভিদের মধ্যে এই যুগে গুল্ম জাতীয় (Fern) ও বীজজাত বৃক্ষের

৫ নং

বৎসর পূর্ব্বের Permian যুগের প্রথম ভাগে মেরুদণ্ডী উভচর যে যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে Stego cephalia শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এই Stegocephalia-এর প্রাপ্ত কঙ্কাল হইতে

৫ (ক)

জানা গিয়াছে যে ইহারা এক ইঞ্চ হইতে আট ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইত ও ত্রিনেত্র যুক্ত ছিল (৫ নং চিত্র)। ইহাদের অধিকাংশই Trias যুগের শেষ ভাগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তবে তাহাদের দুইটী শাখার মধ্যে একটী হইতে সরীসৃপের ও অপরটী হইতে স্তন্যপায়ী জন্তুদের ক্রমশঃ উদ্ভব হইতে দেখা যায়। এই যুগে একশ্রেণীর মাংসাশী সরীসৃপের (Cotylo surs, pelycosaurs) উদ্ভব হয় ও ক্রমশঃ তাহারা বিস্তৃতি লাভ কবিতে থাকে (৫ক, খ)। ইহারা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭ ফুট হইত ও পূর্ব্ব বর্ণিত Stegocephalia-এর সহিত ইহাদের আকৃতি ও অবয়বের অনেক সাদৃশ্য ছিল। এই

৫ (খ)

৬ (ক)
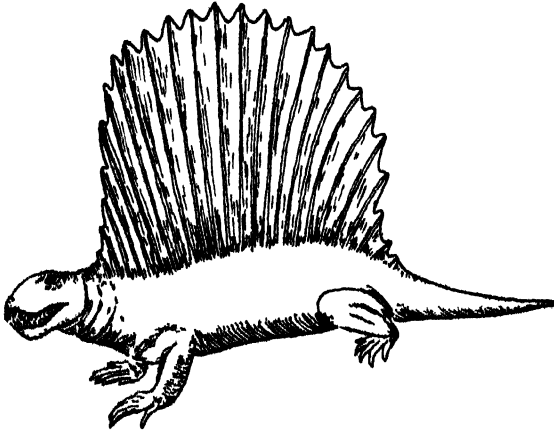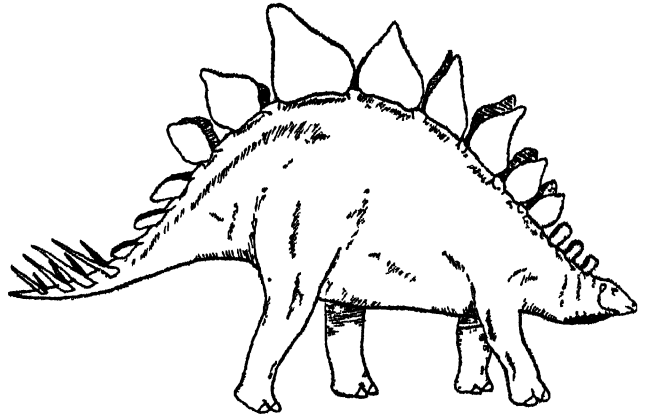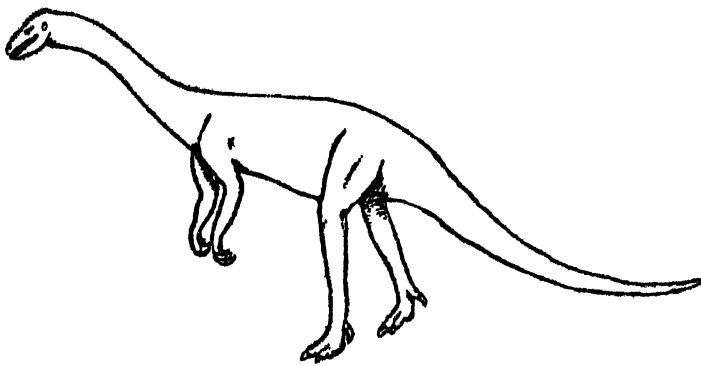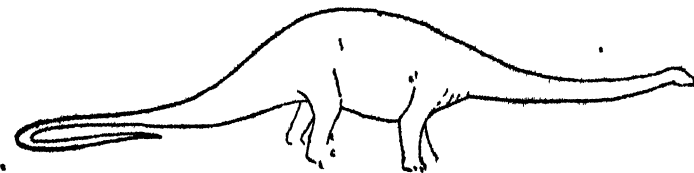
যুগে স্থলজাত উদ্ভিদের বেশ প্রাচুর্য্য দেখা যায় ও ভারতবর্ষে Glossopteris, Dadoxylon ইত্যাদি বহুজাতীয় স্থলজাত উদ্ভিদের চিহ্ন নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই সকল উদ্ভিদ হইতেই রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, গিরিডি, বোকারো প্রভৃতি স্থানের গণ্ডোয়ানা যুগের (২০ কোটী বৎসর পূর্ব্বের) কয়লার উৎপত্তি হইয়াছে।

পরবর্ত্তী Mesozoic বা "মধ্য" কল্পে (১৭ কোটী বৎসর পূর্ব্বের) অতিকায় সরীসৃপের বিশেষ প্রাধান্য ও নানা শ্রেণীর উদ্ভব ও পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল সে বিষয়ে অনেক সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং

৬ নং

৬ নং

এই মধ্য কল্পকে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ "সরীসৃপ যুগ" (কূর্ম্মযুগ) বলিয়া পরিগণিত করেন। এই শ্রেণীর অতিকায় সরীসৃপের (Dinosaur) (৬ নং চিত্র) কঙ্কাল ও কূর্ম্ম প্রভৃতির পৃষ্ঠের নানা অংশ মধ্য ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে Titanosaurusএর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই Dinosaur সরীসৃপের মধ্যে কতকগুলি নিরামিষাশী ও কতকগুলি আমিষভোজী ছিল। ইহারা দৈর্ঘ্যে প্রায় পঞ্চাশ সাট ফুট ও ওজনে প্রায় ৫০০—১০০০ মণ হইত। ইহাদের মস্তিষ্ক ওজনে প্রায় তিন চার আউন্স হইত। এই কারণেই ইহাদের বুদ্ধি বৃত্তির কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। ইহাদেব মধ্যে আবার কতকগুলি বর্ম্মাবৃত (৬ক) ও আর এক শ্রেণী শৃঙ্গ বিশিষ্ট (৬খ) ছিল। মধ্য কল্পের প্রারম্ভে একজাতীয় দন্ত ও লেজ বিশিষ্ট মাংসাশী ও উড্ডীয়মান সরীসৃপের (Pterosaur) (৭নং চিত্র) উদ্ভব হইয়াছিল ও Jurassic যুগে তাহাদের পূর্ণ বিকাশ ও বিশেষ প্রাধান্য দেখিতে পাই। ইহারা দাঁড় কাক অপেক্ষা আকারে কিঞ্চিৎ বড় হইত ও তিন ফুট ডানা বিস্তার করিতে পারিত ইহার পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ Cretaceous যুগে ক্রমবিকাশের ফলে এই উড্ডীয়মান সরীসৃপ বৃহদাকার ধারণ করে কিন্তু দন্ত ও লাঙ্গুল বিহীন হইয়া পড়ে। ইহাদের মস্তক অন্যূনাধিক তিন ফুট লম্বা ও দেহের তুলনায় ডানার আয়তন অনেক অধিক হইত (৭ক) অর্থাৎ
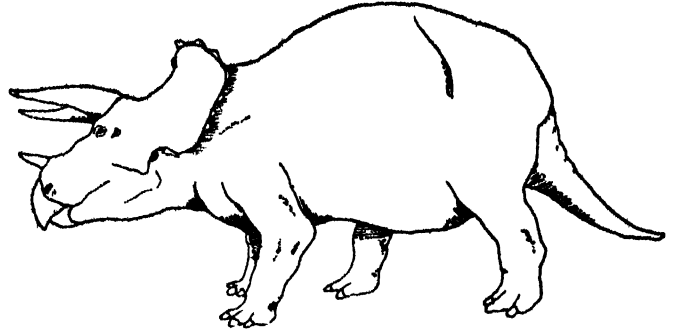
৬ (খ)
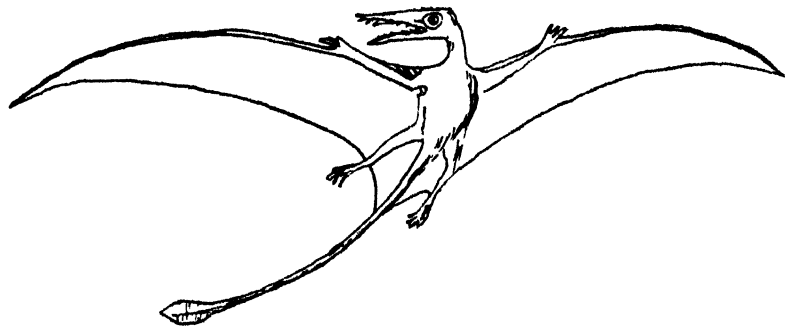
৭ নং

৭ (ক)
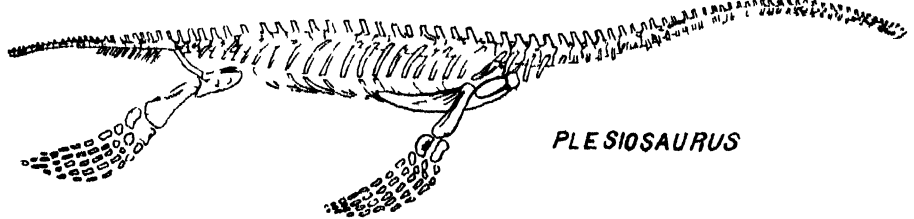
PLESIOSAURUS
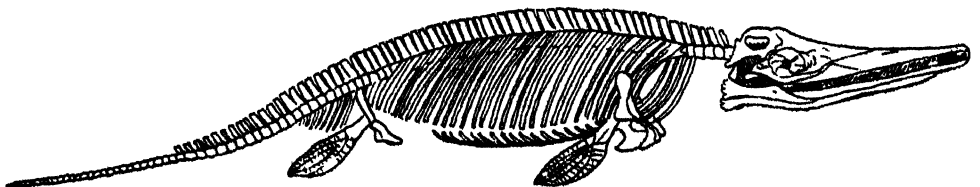
ICHTHYOSAURUS

৭ (খ)

প্রায় ২৫ ফুট ডানা বিস্তার করিতে পারিত। তাহারা ঐ সময়ে শূন্যমার্গে "এরোপ্লেন" রূপে বিচরণ করিত বলিলেই হয়। এই মধ্য যুগের সমুদ্রেও অনেক অতিকায় (৪০-৫০ ফুট লম্বা) সরীসৃপ (Plesiosaurus, Ichthyosaurus) বিচরণ করিত (৭খ)। কতকগুলির আবার গলা প্রায় ২০।২২ ফুট লম্বা হইত। এই সকল সামুদ্রিক সরীসৃপ হইতেই ক্রমশঃ বর্ত্তমান যুগের কুমীর, ঘরিয়াল প্রভৃতি জন্তুর আবির্ভাব হয়।

এই সময় পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারত, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশগুলি যে একত্রে সংযুক্ত ছিল তাহা বৈজ্ঞানিকগণ সুপ্রমাণিত করিয়াছেন (৮ নং চিত্র)। কারণ ২০ কোটী বৎসর পূর্ব্বে এই সকল দেশের বিভিন্ন স্থানে একই জাতীয় উদ্ভিদরাজি হইতে একই সময়ে প্রায় একই প্রকারের কয়লার উৎপত্তি হইয়াছে। এই বিরাট্ স্থলভাগের নাম গণ্ডোয়ানা মহাদেশ
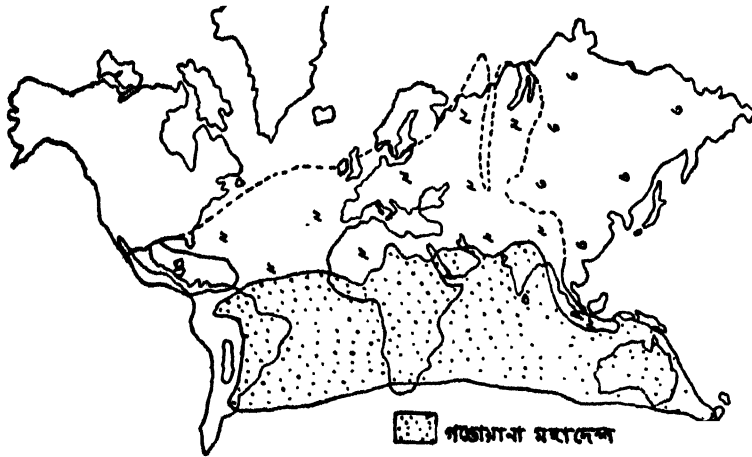
গণ্ডোয়ানা মহাদেশ

টেথিস (Tethys) সমুদ্র

আলোয়া মহাদেশে
এশিয়া দেশ

৮ নং

(Gondwana land) দেওয়া হইয়াছে। ইহার উত্তরে একটী বিস্তীর্ণ সমুদ্র বিরাজিত ছিল তাহার নামকরণ হইয়াছে টেথিস্ (Tethys)। এই টেথিস্ সমুদ্রের পলি হইতেই হিমালয় পাহাড়ের অভ্যুদয় ও সৃষ্টি।

মধ্য কল্পের Jurassic সময়েই পক্ষীদের উদ্ভব হয় ও এক প্রকার দন্তযুক্ত পক্ষীর (৮ক) আবির্ভাব এই সময়েই হইয়াছিল। তারপর সাধারণ পক্ষীদের ক্রমবিকাশ দেখিতে পাই ও দন্তযুক্ত পক্ষী বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই যুগে Conifer ও Cycad জাতীয় উদ্ভিদের
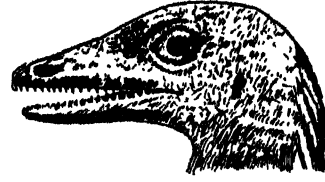
৮ (ক)

আবির্ভাব ও বিকাশ হইয়াছিল এই জন্যই মধ্য কল্পের Jurassic সময়কে Cycad যুগ বলা হইয়াছে। এই কল্পের শেষ ভাগে Angiosperm জাতীয় উদ্ভিদের প্রথম উদ্ভব হয় ও পরবর্ত্তী যুগে ক্রমশঃ তাহারা বিস্তার লাভ করিতে থাকে। সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে শিরোপদীর অন্তর্গত Ammonite শ্রেণী এই Jurassic যুগে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে। ইহারা কুণ্ডলীকৃত ও ১ক চিত্রের ন্যায় গোলাকার। সাধারণতঃ ইহারা ৩।৪ ইঞ্চ ব্যাসের আয়তন প্রাপ্ত হইত তবে অনেক বৃহদাকার (৬।৭ ফুট ব্যাস) Ammonite-এর জীবাশ্মও পাওয়া গিয়াছে। হিমালয় পর্ব্বতে এই যুগের স্তর হইতে এই শ্রেণীর শিরোপদীর চিহ্ন যথেষ্ট সংগ্রহ করা হইয়াছে ও ইহাদের দু' এক সম্প্রদায় শালিগ্রাম শিলারূপে হিন্দুদের ঘরে ঘরে পূজিত হয়।

মধ্য কল্পের শেষ ভাগে (প্রায় ছয় কোটী বৎসর পূর্ব্বে) ও "নব" কল্পের প্রারম্ভে নানাস্থানে মহাপ্রলয়ের সূচনা হয় ও নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ও বিপর্য্যয়ের ফলে পূর্ব্বোক্ত অতিকায় সরীসৃপ শ্রেণী ভূপৃষ্ঠ হইতে সমূহ বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই সময়ে মধ্য-ভারতে বিষম আগ্নেয়োচ্ছ্বাস দেখা দেয় ও প্রায় সমস্ত গুজরাট, বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশ দুই লক্ষ বর্গ মাইল ব্যাপী গলিত প্রস্তরের
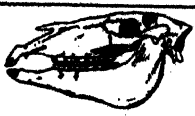
(Lava) দ্বারা প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। এই লাভাই ক্রমশঃ শীতল হইয়া Deccan Trap Basalt নামক প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ও ভূকম্পনের ফলে টেথিস্ সমুদ্র ক্রমশঃ উত্তর দিকে অপসারিত হইতে লাগিল এবং ঐ সমুদ্রের সঞ্চিত পলি হইতে ক্রমশঃ হিমালয় পাহাড়ের অভ্যুদয় ও ক্রমবিকাশ হয়। এইরূপ কয়েকবার অভ্যুত্থানের পর হিমালয় পাহাড় বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। এই সময়ে গণ্ডোয়ানা মহাদেশ বিচ্ছিন্ন হইয়া আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়া পরস্পর হইতে বিভক্ত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিল। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, এই "নবকল্পের" সূচনার সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান ভারতবর্ষের জন্মলাভ ঘটে। তাই কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সুমধুর গান "যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ" ·· মনে পড়িয়া যায়। তবে সুগভীর টেথিস্ সমুদ্র হইতে যে হিমালয় পাহাড় সত্য সত্যই ক্রমশঃ উত্থিত হইয়াছিল তাহা বিজ্ঞান সম্মত ও এই "নবকল্পের" প্রারম্ভে অর্থাৎ প্রায় ৬ কোটী বৎসর পূর্ব্বে সম্ভব হইয়াছিল। এই নবযুগের সঙ্গে সঙ্গে ভূপৃষ্ঠে অনেক নূতন জীবেরও উৎপত্তি হইতে লাগিল এবং এই যুগের শেষ ভাগ হইতেই ভারতের বর্ত্তমান আবহাওয়ার (Climate ও Monsoon) সূচনা সম্ভবপর হইল।

টারসায়ারী (Tertiary) বা "নবকল্পে" বর্ত্তমান বৃক্ষ-রাজি ক্রমশঃ বেশ প্রধান্য লাভ করিতে লাগিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানের স্তর হইতে এই সকল উদ্ভিদের চিহ্ন ও ছাপ সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই "নবকল্পে" নানা প্রকার স্তন্যপায়ী জন্তুদের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ হইতে থাকে ও বর্ত্তমান যুগের যাবতীয় জীবগণ ( উদ্ভিদ ও প্রাণী ) প্রকটিত হইতে লাগিল। নব কল্পকেই সেই জন্য "স্তন্যপায়ী যুগ" ( বরাহ যুগ ) বলা হয়। অবশ্য প্রথম স্তন্যপায়ী ক্ষুদ্রকায় প্রাণীর আরও অনেক পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ১৪।১৫ কোটী বৎসর পূর্ব্বে উদ্ভব হইয়াছিল · তবে তাহারা· 'মধ্য কল্পের' অতিকায় সরীসৃপের নিকট বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। উত্তর· ভারতের বনে জঙ্গলে এই "নব কল্পে" আড়াই কোটী বৎসর পূর্ব্বে যে সমুদয় উচ্চ শ্রেণীর স্তন্যপায়ী জন্তু যথা ঘোড়া, গরু, হস্তী, বাঘ, ভল্লুক, জলহস্তী, বরাহ, উট, জিরাফ, গণ্ডার, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি বিচরণ করিত তাহাদের কঙ্কাল সমূহ আজ হিমালয়ের পাদদেশে সিবালিক (Siwalik) পাহাড়ের স্তর হইতে উদ্ধার করিয়া ভূতত্ত্ববিদগণ পুরাতত্ত্বের যথেষ্ট জ্ঞান বর্দ্ধন করিয়াছেন। এই সিবালিক পাহাড়ের স্তর হইতে সরীসৃপের মধ্যে একটি ২০ ফুট দীর্ঘ অতিকায় কূর্ম্মের কঙ্কাল আবিষ্কার করা হইয়াছে। উত্তর ভারতে হিমালয়ের পাদদেশে ঐ সময়ে বিভিন্ন নদীর উপত্যকাও তীরভূমি অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিল ও সেই অরণ্য ভূমির জলবায়ু ও উদ্ভিদ-রাজি জীবজন্তুর বাসের পক্ষে এত অনুকূল ছিল যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল ( আমেরিকা, আফ্রিকা, মধ্য চীন ইত্যাদি ) হইতে জীবকুল উপযুক্ত বাসভূমির সন্ধানে ফিরিতে ফিরিতে এই সিবালিক জঙ্গলে আসিয়া আশ্রয় লইয়া বসবাস করিতে থাকে ও অনেক নূতন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঘটে।

এই সকল স্তন্যপায়ী জন্তুদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল বিভিন্ন স্তর হইতে উদ্ধার করিয়া ভূতত্ত্ববিদ্গণ তাহাদের ক্রমবিকাশের ধারা অনেক পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সে সকল আশ্চর্য্য ও অভিনব সংবাদের বিশদ বিবরণ এ স্থলে সম্ভব নহে। তবে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঘোটক ও হস্তী জাতির অভ্যুদয় ও বিকাশ সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিতেছি। প্রায় ছয় কোটী বৎসর পূর্ব্বে নব কল্পের প্রারম্ভে ও Eocene যুগে ঘোটক জাতির আদিম পূর্ব্বপুরুষেরা বর্ত্তমান বিড়াল ও কুকুরের ন্যায় ক্ষুদ্রকায় হইত ও তাহাদের পায়ে চারিটী আঙুল বা ক্ষুর থাকিত কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ও নানা কারণে তাহাদের আকারের পরিবর্ত্তন ও বৃদ্ধি হইতে থাকে ও পায়ের অপরাপর আঙুল বা ক্ষুরগুলি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে লাগিল ও পরবর্ত্তী বিভিন্ন যুগে ত্রিক্ষুর ও দ্বিক্ষুর বিশিষ্ট ঘোটকের আবির্ভাব হয় ও সর্ব্বশেষে এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া প্রায় ১৫।২০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ঘোটক জাতির অভ্যুদয় হয় ও তাহাদের পায়ের একটী ক্ষুরই প্রাধান্য লাভ করে ( ৯নং চিত্র )। হস্তীর পূর্ব্বপুরুষেরাও আগে Eocene যুগে বর্ত্তমান টাপির

Recent. Pleistocene | Pliocene | Miocene | Oligocene | Eocene
One Toe | Three Toes | Three Toes | Four Toes | Four Toes

৯ নং

১০ নং
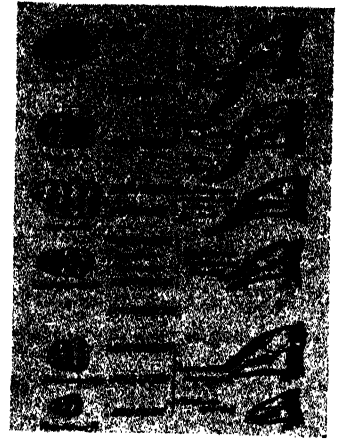
জন্তুর ন্যায় ক্ষুদ্রকায় হইত ও তাহাদের শুণ্ড ও গজদন্তের আকার ও বিন্যাস বিভিন্নরূপ ছিল। আমরা আরও জানিতে পারি যে, তাহাদের আকার, শুণ্ড ও গজদন্ত নব কল্পের বিভিন্ন যুগে নানারূপ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া প্রাগাধুনিক যুগে প্রায় ১০।১৫ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে দীর্ঘশুণ্ড ও গজদন্ত বিশিষ্ট বর্ত্তমান হস্তী জাতির অভ্যুদয় ও বিকাশ হইয়াছে (১০নং চিত্র)। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে Primates শ্রেণীর ক্রমশঃ উৎপত্তি হয় ও ইহার একটি শাখা ক্রমবিকাশের ফলে জটিল হইতে জটিলতর হইয়া ক্রমশঃ উচ্চতর শ্রেণীতে পরিণত হইতে লাগিল ও অবশেষে প্রায় দশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে "প্রাগাধুনিক" (Pleistocene) যুগে বর্ত্তমান মানুষের (Homo sapiens) পূর্ব্বপুরুষের (Ape man) আবির্ভাব ভূপৃষ্ঠে সম্ভব হইয়াছিল। এই ape man-এর কঙ্কাল এখনও ভারতের স্তর হইতে পাওয়া যায় নাই। তবে জাভা হইতে Pithecanthropus বা Java man (১১ নং চিত্র), পিকিং হইতে Sinanthropus বা Peking man ও Piltdown হইতে Eonthropus বা Piltdown man-এর কঙ্কাল উদ্ধার করা হইয়াছে। উপরোক্ত Ape-man-এর আবির্ভাবের কিছুকাল পর ক্রমবিকাশের ফলে নানা স্থানে আদিম মানুষের (যথা Heidelburg man, Neandertal man, (১২নং চিত্র), Cro-magnon Man ইত্যাদি) উদ্ভব ও বিস্তৃতি ঘটে। তাহাদের কঙ্কালও দৈনন্দিন কার্য্যে ও পশু পক্ষী শিকারে ব্যবহৃত অস্ত্র প্রভৃতি নানা স্থানের মৃত্তিকা স্তর বা গুহাভ্যন্তর হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে বলিয়া আজ আমরা
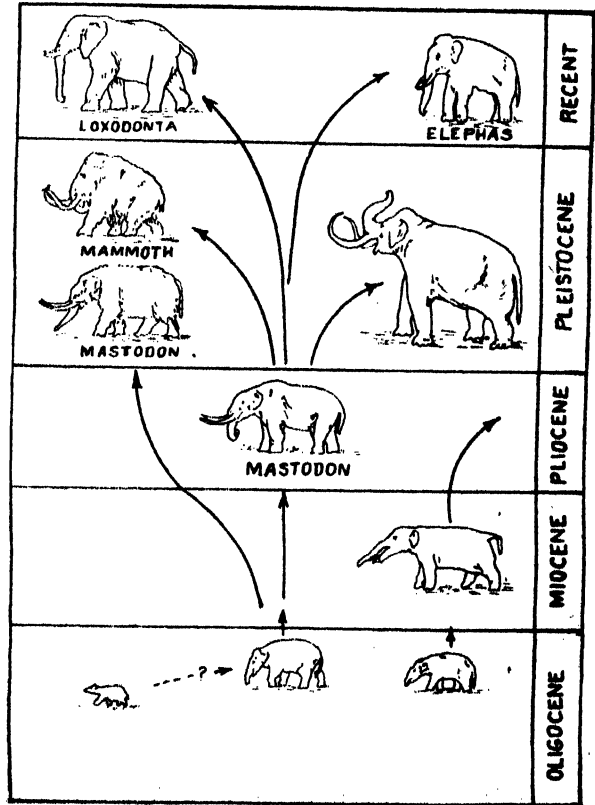
১০ নং

মানবের পূর্ব্বপুরুষের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছি। এবং সর্ব্বশেষে বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন বর্ত্তমান মানব শ্রেণীর (Homo sapiens) উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়াছে দেখিতে পাই। এই বর্ত্তমান মানব শ্রেণী ক্রমশঃ পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে ও নানা সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া বিভিন্ন দেশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহাদের কিছু সংবাদ ভবিষ্যতে দিবার ইচ্ছা রহিল। মানব-শ্রেণীর ক্রমবিকাশের ধারা ১৩ নং চিত্র হইতে কিছু বুঝিতে পারা যাইবে।

১১ নং

১২ নং

এই "প্রাগাধুনিক" যুগের বিভিন্ন সময়ে উত্তর ভাবতে পুনঃ পুনঃ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে নানা স্থান বরফাবৃত (Glaciation) হইয়াছিল। এইরূপ অতিরিক্ত শৈত্যের প্রকোপে ও আরও নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থায় পূর্ব্ববর্ত্তী নবকল্পের স্তন্যপায়ী উন্নত-শ্রেণীভুক্ত প্রাণীকুলের অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাহাদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছেন ও এই সকল দুর্লভ কঙ্কালের অংশগুলি পুরাতত্ত্বের নিদর্শন স্বরূপ সংরক্ষিত হইয়া যাদু ঘরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

তারপর ক্রমশঃ 'আধুনিক' যুগের সূচনা হয় ও ভূপৃষ্ঠে বর্ত্তমান উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের নানা শ্রেণীর সমাবেশ দেখিতে পাই। এই যুগে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় বা পরিবর্ত্তন যৎসামান্যই পরিলক্ষিত হইয়াছে তবে ভবিষ্যতে জল ও স্থলভাগের যে কি পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইবে ও বর্ত্তমান মানবের ও অপরাপর শ্রেণীভুক্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের যে কি অবস্থান্তর প্রাপ্তি হইবে সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ একেবারে নীরব ও কোনরূপ নির্দ্দেশ দিতে অক্ষম।

হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীর অভ্যুত্থানের পর তাহাদের পাদদেশ দিয়া গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধুনদ প্রবাহিত হইতে লাগিল। হিমালয় পাহাড়ের নানা প্রকার শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া এই সকল নদ নদী দ্বারা পলিরূপে বাহিত বা নীত হইয়া নিম্ন উপত্যকায় সঞ্চিত হইতে লাগিল।

MODERN RACES

CROMAGNON MAN

RHODESIAN MAN

NEANDERTAL MAN

HOMO SAPIENS

HEIDELBURG MAN

EOANTHROPUS

SINANTHROPUS

PITHECANTHROPUS

PLEISTOCENE

PLIOCENE
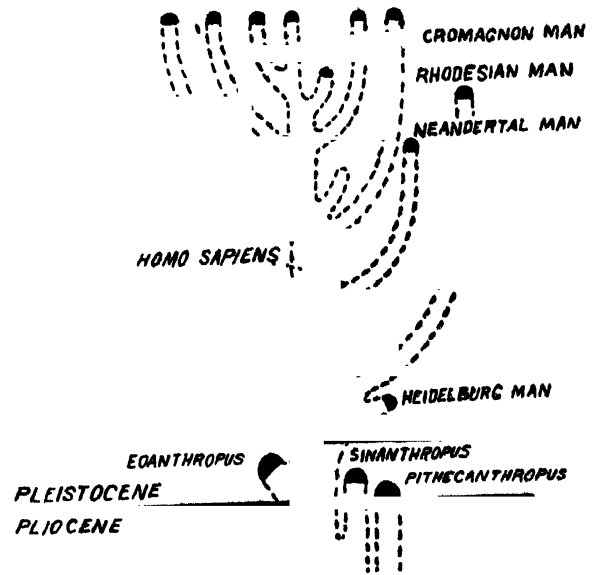
১৩ নং

ইহার ফলেই বিগত কয়েক লক্ষ বৎসরের মধ্যে সিন্ধু, পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ ও বেহার প্রভৃতি প্রদেশের ক্রমশঃ উৎপত্তি হইল ও সর্ব্বশেষে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও তাহাদের শাখাপ্রশাখার রাশি রাশি পলি বা মাটি মোহনায় সঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ সমুদ্র দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল ও এই প্রকারে বর্ত্তমান বঙ্গদেশের সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছিল। বর্ত্তমানেও বাংলার নদনদী-বাহিত পলি

দ্বারা সুন্দরবন অঞ্চলে নদীর মোহনায় অনেক "ব" দ্বীপের উদ্ভব ও সৃষ্টি হইতেছে দেখিতে পাই। এই নদ-নদীর পলি বা উর্ব্বরা মাটি হইতে সহজেই ফলফুল ও ফসলাদি উৎপন্ন হইয়া বহু দিন হইতে বাঙ্গালীর প্রাণ ধারণের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে সেই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র গাহিয়াছেন—"সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।" এইরূপ বিশেষণে ভূষিত করিয়া কবি বাংলাদেশের যথার্থ রূপ বর্ণনাই করিয়া গিয়াছেন।

গ্যাসীয় পৃথিবীর জন্মের ও ক্রমশঃ ভূপৃষ্ঠের সৃষ্টির পর হইতে আজ পর্য্যন্ত যতদূর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই প্রবন্ধে দেওয়া হইল। বিরাট ও অসীম বিশ্বের মাঝে আমাদের সৌরজগতের সৃষ্টি ও এই সীমাবদ্ধ পৃথিবীর উৎপত্তি ও নানারূপ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ও যাবতীয় পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিলে গভীর বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। কোথা হইতে ও কিরূপে এই সকল জীবের অভ্যুদয় ও ক্রম-বিকাশ হইল ও এর পরিণামই বা কোথায় ও কি ভাবে লীন হইবে এবং কাহার কঠোর ইঙ্গিতেই বা পৃথিবীর উপর নানা প্রলয় ও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে বা এই সমুদয় প্রলয়ের তাৎপর্য্যই বা কি, এই জটিল বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া কেবল চমৎকৃতই হইতে হয়। এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় ও এই সকল পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করিবার জন্য যুগে যুগে হয়ত বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর চালনা করিতে হইবে ও কবে যে সঠিক উত্তর মিলিবে সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা এ স্থলে অসম্ভব। যে মহতী শক্তির প্রভাবে পৃথিবীতে এরূপ মহাপ্রলয় ও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে ও যে শক্তি প্রতিহত করা বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকের পক্ষে একান্ত অসম্ভব সেই শক্তির নিকট সশ্রদ্ধ মস্তক অবনত করিয়া আজ এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

# আলোর দেশে

শ্রীহরেকৃষ্ণ অধিকারী

এমন সে কোন্ আছেরে দেশ
(যার) উজল আলোর মালা,
যায় না মিলে আঁধার কোণে
ভুলায় ব্যথার জ্বালা।

স্বপন-মায়ার সে দেশখানি—
আকাশ-পারের মিলন-বাণী,
ভ'রলো পরাণ আবেশ আনি',
আলোর দেশের ডাকে;

বিজন-বীথির ভ্রমর-গীতি,
(আর) হৃদয়-কুঞ্জে গায় না নিতি,
মন নিয়ে যায় পারের স্মৃতি,
জীবন-সাঁঝের ফাঁকে।

সকল ব্যথার অন্তরালে
রঙীন দেউটী কেবা জ্বালে,
উজ্জল আলোক প্রবীণ ভালে,
'জ্ব'লবে দিনের শেষে,
ঘুচ্‌বে সকল বাঁধন, বেদন,
সোণার 'আলোর দেশে।'

# সমালোচনা

## হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান—

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত। ময়মনসিংহ, গৌরীপুর হইতে শ্রীবীরেশ্বর বাগচী কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২+১২+১৪৪। মিঞা তানসেনের একখানি ও অপর দুইখানি চিত্র সম্বলিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

বইখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া যেরূপ ধারণা হইল তাহাতে বলা যায়, গ্রন্থকার বিশেষ পরিশ্রমসহকারেই ইহার প্রণয়নকার্যে অবহিত হইয়াছেন। তানসেনের নাম ভারতের ঘরে ঘরে প্রচলিত—এই প্রসিদ্ধির একমাত্র কারণ এই যে, ভারতীয় সঙ্গীত-জগতে তিনি এমন একটা জোয়ার আনিয়া দিয়াছেন যাহার ফলে স্তরে স্তরে ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ চলিয়াছে। তানসেনের পূর্বে বা সমসাময়িক বা পরে আরও অনেক গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিলেও, তানসেন যে রেনেসাঁর প্রবর্তন করিয়াছেন, সেই রেনেসাঁর অগ্রদূত রূপেই তিনি চিরকাল মানবের শ্রদ্ধা লাভ করিবেন। এই তানসেন-সম্বন্ধে একখানি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থের যথার্থই অভাব ছিল।

গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য তানসেনের ব্যক্তিগত জীবনচরিতের উপর সীমাবদ্ধ নয়, তানসেন এবং তাঁহার বংশধর ও ঘরয়ানা হইতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে যে প্রভাব আসিয়াছে তাহাই তিনি আলোচনা করিয়াছেন। তবে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত মাত্র না বলিয়া ভারতীয় সঙ্গীত বলিলেই বোধ হয় আরও ভাল হইত, কারণ তানসেনের ঘরয়ানা হইতে যে সমুদয় বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে সেগুলি সমগ্র ভারতেই আদৃত হইয়াছে, এজন্যই হিন্দুস্থানীর মধ্যে বলিয়া যেন তাঁহার প্রভাব ও দানের প্রবাহকে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। অবশ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে গ্রন্থকার তানসেন ও তাঁহার বংশধরদের প্রভাব ও দানের বিষয় প্রস্তুতভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, তিনিও পরোক্ষভাবে সেই বৃহত্তর প্রভাবেরই ইঙ্গিত দিয়াছেন।

যে বিষয়বস্তু লইয়া গ্রন্থকার মূলতঃ আলোচনা করিয়াছেন তাহা কিছু সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আরও বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা হইলে গ্রন্থখানির মূল্য যেন আরও বাড়িয়া উঠিত। অবশ্য ইহা একমাত্র গ্রন্থকারের দ্বারাই সম্ভব এবং প্রকাশকও পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থখানি অধিকতর শোভন করিবার আশা দিয়াছেন। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে তাহা হইবেও।

বর্তমান গ্রন্থখানি বাঙলা সাহিত্য-সমাজে আদৃত হইবে বলিয়া মনে করি। সঙ্গীততত্ত্ববিৎ ও সঙ্গীতরসিকদের মধ্যেও ইহা বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবে। বইখানির ছাপা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন।

— শ্রীঅজিত ঘোষ

## বঙ্গীয় মহাকোষ—২য় খণ্ড, ১৫শ সংখ্যা।

এই মহাকোষের প্রতিষ্ঠাতা মনীষিপ্রবর পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ আর ইহধামে নাই। তাঁর স্বপ্ন অসমাপ্ত অবস্থায় না থাকে, এইজন্য তাঁহারই সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনায় যথাযোগ্য কোষ গ্রন্থখানির সম্পাদনের জন্য বিশিষ্ট মনীষী ও সুধীবর্গকে লইয়া একটী সঙ্ঘ গঠিত হইতেছে ও আগামী সংখ্যা ইহা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে জানিয়া আমরা সুখী ও আশ্বস্ত হইলাম। স্বর্গীয় মহাত্মা ইহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন এবং বাঙালীজাতিরও ইহা দ্বারাই তাঁহার পুণ্যস্মৃতি রক্ষার সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থা করা হইবে।

বর্ত্তমান সংখ্যার পাণ্ডুলিপি পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই মৃত্যুর পূর্ব্বে সম্পাদন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার যোগ্য সম্পাদনার বৈশিষ্ট্য ইহাতে সম্পূর্ণরূপেই বজায় আছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই বিরাট্ ব্যাপারে স্বদেশ ও মাতৃভাষার অনুরাগী বাঙালী মাত্রেরই সহায়তা ও আনুকূল্য করা অন্যতম জাতীয় কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত।

## নীরব কর্ম্মী হরিশ্চন্দ্র সিকদার—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—এন্, সি, দত্ত এণ্ড কোং, ১০।৭ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছোট বই—একজন নীরব কর্ম্মীর, অনাবিল দেশপ্রেমিকের পবিত্র জীবন-কথা বলিতে গিয়া লেখক সংক্ষেপে যে যুগের স্মৃতি ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রাণের এক গোপন সুপ্ত তন্ত্রীতেই ঘা দিয়া জাগাইয়া দিল। সেই অর্দ্ধোদয়, জামালপুরের দয়াময়ীর মন্দির-রক্ষা, দামোদরের বন্যায় স্বেচ্ছাসেবা, কারাবাস, অন্তরীণ, অনশন, দরিদ্র দেশকর্ম্মীর দেশসেবার সঙ্গে কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম, আত্মোন্নতি ও শক্তিসঞ্চয়—একে একে সমস্ত স্মৃতিকাহিনী মর্ম্মের তারে ছোঁয়া দিয়া গেল। "এ সেই যুগ, যে যুগে "নামের জন্য কাজ, এরূপ মনোবৃত্তি তখনও কর্ম্মীদের সংক্রামিত করে নাই। দলের একজন বড় হইলে, অপর একজনের হৃদয় হিংসায় জ্বলিয়া উঠিবে, এরূপ মনোবৃত্তি আমাদের মধ্যে কখনও স্থান পায় নাই।" হরিশচন্দ্রকে সেই যুগের একজন আদর্শ কর্ম্মী বলিয়াই আমরা জানিতাম—মনে মনে পূজা করিতাম। কর্ম্মী ও কর্ম্মচিত্র, দুইই এই ছোট বইখানিতে বেশ করুণভাবে সুচিত্রিত হইয়াছে। লেখক নিজেও একজন অভিজ্ঞ কর্ম্মী—তাই জন্যই ত এমন অভিজ্ঞতার কথা তাঁর লেখার মুখে ফুটিয়াছে "হৈ-চৈ করিয়া কাজ করা—একটা অপালনীয় অসম্পাদ্য লম্বা চওড়া কর্ম্মসূচী দিয়া কাজ করার কখনও পক্ষপাতী ছিলাম না। কাজের মধ্য দিয়া আমাদের কর্ম্মপন্থা ফুটিয়া উঠিত, চোখের সামনে কেবল আদর্শ ধ্রুবতারার মত জ্বল্ জ্বল্ করিত। বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মীরা আমাদের

এইরূপ কর্ম্মপন্থা পছন্দ করেন না ।...এক দলের লোক আমরা, পরস্পর এক পরিবারভুক্ত ভাইয়ের মত মনে করিতাম। একজনের আপদে বিপদে সকলেই গিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইতাম। পাছে বিপদে সে অবসন্ন হইয়া পড়ে, পরস্পরের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ঠিক এই ভাবটাও বড দেখিতে পাই না।" লেখক আর একটী কথা এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, যাহা এইখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—"ইহা ছাড়া বর্ত্তমানে কর্ম্মীরা অনেকেই রাজনৈতিক কাজকেই কেবল দেশের কাজ মনে করিয়া থাকেন—অন্য কোনরূপ সামাজিক, অর্থনৈতিক, গঠনমূলক কাজ তাঁহাদের মনঃপূত নয়। আমাদের মত—ভাঙ্গনের সঙ্গে গঠনও দেশের কাজের প্রধান অঙ্গ।" হরিশ্চন্দ্র এই মতেরই একজন মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন। কর্ম্মবীর আজ নাই; কিন্তু তাঁহার স্মৃতি-পূজার অধিকার আমাদের আছে।" সমালোচনা উপলক্ষ—লেখকের সহিত অশ্রু মিশাইয়া আমরাও আজ হরিশদা'র অমর আত্মার উদ্দেশে অশ্রু-তর্পণেই শ্রদ্ধাঞ্জলী দেই।

—শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

**শিশু-মনের চলচ্চিত্র**—শ্রীমতিলাল দাশ প্রণীত, শিব-সাহিত্য কুটীর, ২৬।৮এ, হ্যারিসন রোড হইতে প্রকাশিত. দাম এক টাকা মাত্র।

বস্তুতঃ বইখানি লেখকের শৈশবের চিত্র। লেখক শৈশবের ছোট বড় অনেক—মামার বাড়ী, গ্রামের পথ, নদী, মাঠ ও পদ্মপুকুর, ঠাকুরমার মুখে রূপকথার গল্প, শৈশব-সঙ্গী, পাঠশালা প্রভৃতি ঘটনার পরিপূর্ণ সমাবেশে চিত্রের রূপ এবং ভাববহুল শিশুমনের কৌতুহল, উল্লাস, অভিমান, ক্রোধ, ভীতি ও দয়ার সুস্পষ্ট বিকাশে একদা ফেলে-আসা দিনগুলোকে জীবন্ত করে' তুলেছেন। লেখকের হ'লেও ইহা সর্ব্বকালের সকল শিশুর মনস্তত্ত্বের প্রতিভূচিত্রাঙ্কন বলা চলে। অনেক চলার পর হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে তিনি যে কোমল অনুভূতির পরশ ও ক্ষণিক সান্ত্বনা পেয়েছেন তারি অন্তরালে বুক চিরে বেরিয়েছে একটি অস্ফুট ও করুণ দীর্ঘনিঃশ্বাস, এইখানেই রয়েছে তাঁর শ্রমের সার্থকতা। চিত্রাঙ্কনে যেমন, শিশু মনস্তত্ত্বের গবেষণারও তিনি সমতুল পরিচয় দিয়েছেন। বেশী বলার প্রয়োজন না হ'লেও এইটুকু বলতে পারি, সমবয়সী বা বয়স্কদের হাতে তুলে দিলে তাঁরা আগ্রহের সহিত বইখানি পড়বেন। ভাষা সাবলীল ও আবেগময়।

—শ্রীজ্যোৎস্নাময় চৌধুরী এম-এ

**পূর্ণিমা**—শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী প্রণীত। ফাইন আর্ট পাব্লিশিং হাউস, ৬০ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবীর 'পূর্ণিমা' প্রথম উপন্যাস। সাময়িক পত্রিকায় আজ কয়েক বৎসর গল্প-উপন্যাস লিখিয়া তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। 'পূর্ণিমা'য় লেখিকার কৃতিত্বের পরিচয় মিলে। নিঃসন্দেহে বলা চলে, পূর্ণিমা পাঠক সমাজের প্রশংসা অর্জ্জন করিবে।

অসহায়া কায়স্থ কুমারী 'পূর্ণিমা'র জীবন ও যৌবনকে কেন্দ্র করিয়া আখ্যায়িকা স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকশিত হইয়াছে। চরিত্র-সৃষ্টি, ঘটনা-বিন্যাস, ভাষার সাবলীলতা কোথাও ব্যাহত হয় নাই। নিকট অতীতের বিস্মৃতপ্রায় পল্লী-সমাজের যে প্রতিচিত্র গ্রন্থকর্ত্রী হিয়ার অপরিসীম দরদ দিয়া আঁকিয়াছেন। তাহা আজও বাঙ্গালীর মর্ম্ম হইতে মুছিয়া যায় নাই। নায়ক-নায়িকার স্ফুটনোন্মুখ মর্ত্ত্য-জীবনের উপর অকালে যবনিকা টানিয়া লেখিকা কায়স্থ পূর্ণিমা ও ব্রাহ্মণ চন্দ্রনাথের প্রেম-সমস্যার সহজ সমাধান করিয়াছেন। এমনটি হইতে পারে না ঘটনার ইহা স্বাভাবিক পরিণতি, ইহা স্বীকার করিয়াও এ কথা বলা চলে যে, এই শোচনীয় পরিণতি উদীয়মান সমাজ-জটিলতার উপর আলোকপাত করে না। প্রেম ভাব-বিহ্বলতা নয়। জীবনের ঘটনায় ও আচরণে মর্ত্ত্যের বুকে প্রেম যদি সৃজনের শতদলই না ফুটাইল তবে তাহা জীবনে কাম্য কি করিয়া হইতে পারে? ভাবী কালের বুকে পদচিহ্ন আঁকিতে হইলে সৃষ্টিকরী প্রতিভার ইহা অনুধাবনীয়।

কামাতুর জমিদারপুত্র হিরণ্ময়ের চরিত্রের শঠতা ও পঙ্কিলতা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তনীয় মসীমলিনই রহিয়া যাওয়াটা ভালমন্দ মিশ্রিত মনুষ্যজীবনের প্রতি যেন অবিচারই করা হয়। সতী সাধ্বী স্ত্রী লাবণ্যের পবিত্রতা ও সাহচর্য্য এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়া পূর্ণিমা-চন্দ্রনাথের ত্যাগ মহিমা হিরণ্ময়ের চৈতন্যোদয় করিলে তাহা মনোবিজ্ঞান সম্মতই হইত। নির্জ্জন তপোবন এবং রাজসভার সমারোহ, এই দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থায় শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্তের আচরণ বৈপরীত্য অসঙ্গত নয়। দ্বিবর্ণ প্রচ্ছদপট, ছাপা-বাঁধাই রুচি-সম্মত। ভাবী সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবীর সুপ্রতিষ্ঠা আমরা সুনিশ্চিত আশা করিতে পারি।

**Political Science and Government**—By Biman Behari Mazumder M.A. Ph.D Mandal Brothers & Co., Ltd College St. Calcutta.

বইখানি প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যোপযোগী করিয়া লিখিত হইলেও, সর্ব্বদেশের বিশেষভাবে ভারতের রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যগুলি সবিশদ আলোচিত হওয়ায় ইহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও প্রভূত সহায়ক হইবে। দেশে রাষ্ট্র-চেতনা যেরূপ ব্যাপকতর হইয়া উঠিতেছে তাহাতে এই ধরণের গ্রন্থের প্রয়োজন অপরিহার্য্য বলিয়া আমরা মনে করি। প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থের মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই, সজ্জা ও পারিপাট্য সুন্দর।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

# 'প্রবর্ত্তক' রজত-জয়ন্তী

( তৃতীয় অনুষ্ঠান )

[ আশ্রমী ]

১লা আষাঢ় শিবপুর পাব্‌লিক লাইব্রেরী হলে হাওড়ার প্রবীণ উকীল দেশসেবক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরোহিত্যে প্রবর্ত্তক পত্রিকার রজত-জয়ন্তী উৎসবের তৃতীয় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সঙ্কল্প—মাসে একটি করিয়া এইরূপ দ্বাদশটী অনুষ্ঠান বাংলার বিভিন্ন স্থানে করিবেন। প্রথমটী প্রবর্ত্তকের জন্মস্থান চন্দননগরে দেশশ্রী শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সম্পন্ন হইয়াছিল, কলিকাতায় দ্বিতীয় অনুষ্ঠান শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী হলে এক জনসভা হয়। সঙ্ঘ-সেবক স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী উদ্গান করিলে পর, সঙ্ঘের চারণ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্যের বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত হইয়া সভারম্ভ হয়। সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত সভাপতি বরণ করিবার সময়ে হাওড়ার সহিত সঙ্ঘের কি যোগসূত্র আছে এবং সভার উদ্দেশ্য কি, তাহা অল্প কথায় বুঝাইয়া দেন হাওড়া জেলা হইতে কয়েকটী তরুণ সঙ্ঘে আত্মদান করিয়াছেন, এই হেতু সঙ্ঘ হাওড়ার নিকট কৃতজ্ঞ। সেই সব তরুণ যে জীবন লইয়াছে, জাতি-গঠনের যে বিরাট্ স্বপ্নে তাহারা উন্মাদ, 'প্রবর্ত্তক' আজ ২৫ বৎসর ধরিয়া সেই বাণীই প্রচার করিতেছে। জাতীয়তার মূল বস্তু কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, ইহারই উপর আজ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ দাঁড়াইয়া আছে। বাংলার জাতীয় জীবনে প্রবর্ত্তকের বাণী ব্যর্থ হয় নাই, হাওড়াবাসীর উদ্যোগে প্রবর্ত্তকের রজত-জয়ন্তীর উৎসবের এই তৃতীয় অনুষ্ঠান তাই অতি উপযোগীই হইয়াছে।

সভাপতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে দেশাত্মা শ্রীমতিলাল রায় মহাশয় তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় জাতিগঠনের মূল তত্ত্বগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন—আজ জাতির সম্মুখে বহুবিধ সমস্যা। শিক্ষায়, সামর্থ্যে, অন্নে, রাষ্ট্রে, সমাজে সর্ব্বত্রই আজ দৈন্য দেখা দিয়াছে; কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, ইহার নিরাকরণার্থে আমরা কেবল উপরেই প্রলেপ দিতেছি। যে জাহ্নবীস্রোতঃ অনাহত-ভাবে একদিন প্রবাহিত হইতেছিল, আজ কেন তাহা রুদ্ধ হইয়া গেল, কি ভাবে তাহাকে পুনঃ প্রবাহিত করিতে হইবে তাহার তত্ত্বকথা জানিতে হইবে। বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যকে ঠেকাইতে গিয়া ২।৪ জনের অন্নসংস্থান বা শিক্ষার ব্যবস্থা হইলেই চলিবে না। হিমালয়ের তুহিনরাশি যেমন জাহ্নবী স্রোতের মূল উৎস, তেমনই হিন্দুর কৃষ্টি ও সংস্কৃতিই এই জাতি-সাধনের মূল বস্তু। হিন্দু বলিতে যদি আজ আমরা লজ্জাবোধ করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমরা ব্যভিচার করিতেছি। মুসলমান তার অমিশ্র জীবন লউক, হিন্দুকেও তার অমিশ্র জীবন পাইতে হইবে—এখানে ভয় নাই, সঙ্কোচ নাই—ইহাই ভারতের কৃষ্টি—জাতির ধর্ম্ম। বিকারগ্রস্ত হইয়া আজ আমরা ভারতের এই কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি। জাতি বাঁচিবে, যদি আমরা ভারতের এই তত্ত্বকে জীবনে নামাইয়া আনিতে পারি।

প্রগতি অর্থে উচ্ছৃঙ্খলতা নহে; যে উৎকৃষ্টতর গতি হইলে আমরা জগতে ভারতের মহিমাময়ী বিজয়শ্রী ফিরাইয়া আনিতে পারি, সেই পথই অবলম্বন করিতে হইবে। ভারতের শাস্ত্র দেখাইয়াছে, মানব জীবন তুচ্ছ বা সঙ্কীর্ণ নহে, একাধারে সে চতুঃশক্তিসমন্বিত ঈশ্বরের বিগ্রহ। মস্তিষ্কের অনুশীলনে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে বলিয়া সে ব্রাহ্মণ, হৃদয়ে প্রেমের অনুভূতিতে সে আশ্রিতকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করে বলিয়া সে আবার ক্ষত্রিয়, প্রাণের ব্যাপ্তির প্রেরণায় দিগ্বিদিক্ অর্থ অন্বেষণে ছুটে বলিয়া সে হইয়াছে বৈশ্য এবং শরীরের সেবাপরায়ণতার দ্বারা সে পাইয়াছে শূদ্রত্ব; এইভাবে সে একাধারে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সমাজ-শরীরেও তাই এই ব্যবস্থা তখন ছিল। এখানে সম্প্রদায়বিশেষের কথা নাই, সকল কোষেরই স্ফূর্ত্তি ও পুষ্টি লইয়া সে জানিত—নিজেকে ব্রহ্মেরই স্বরূপ বলিয়া। তিনি আরও বলেন—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও যতি—এই যে জীবনের চারিটী পর্য্যায় নির্দ্ধারিত ছিল, ইহার মধ্যে ভারতের ঐ তত্ত্ববস্তুকে জীবনে যথারীতি অনুশীলন করিবারই একটী সুষ্ঠু ছন্দঃ দেখিতে পাওয়া যায়। আজ প্রয়োজন হইয়াছে এই তত্ত্বানুশীলনের। জাতিগঠনের মূল কথা তাই আপনাকেই গড়িয়া তোলা। তরুণদিগকে হিন্দু কৃষ্টির এই অমৃত পরিবেশন করিলে আগামী দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির অভ্যুত্থান আসিবেই আসিবে। সাড়ে চারি হাজার বৎসরের পূর্ব্বে বেদব্যাস, শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যা- প্রস্থান বা বেদান্ত রচনা করিয়া যে কৃষ্টিকে রূপ দিয়াছেন, তাহা কেহ নিশ্চিহ্ন করিতে পারিবে না। চণ্ডীদাস, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ সেই বাণীই প্রচার করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় জাতি-সাধনার সহজ সঙ্কেত-স্বরূপ সত্য, সংযম ও সঙ্ঘ এই তিনটী তত্ত্বের সম্যক্ অনুশীলনের জন্য বাংলার তরুণদিগের নিকট আবেদন করেন।

শ্রীযুক্ত রায়ের পর শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা করেন। শিবপুর জয়ন্তী-উৎসবের সাফল্যের মূলে শ্রীযুক্ত বিজয়বাবু ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের অকপট উদ্যম ও সহযোগিতা বর্ত্তমান। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি স্থানীয় তরুণ ও ভদ্রমণ্ডলীকে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের জাতিগঠনমূলক কর্ম্মপন্থাকে অনুধাবন করিতে অনুরোধ করেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষাল ও সুকবি শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু প্রবর্ত্তক ও প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সাফল্য কামনা করেন। শ্রদ্ধেয় ঘোষাল মহাশয় শ্রীযুক্ত রায়ের বক্তৃতার অংশবিশেষ যেমন চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রভৃতির সবিশদ ব্যাখ্যা বক্তার নিকট ভবিষ্যতে প্রত্যাশা করেন এবং শ্রীযুক্ত গিরিজাবাবু সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবর্ত্তক মাসিকের বিপুল দানের বিষয় উল্লেখ করিয়া তেমনই ঐ পত্রিকার সহযোগিতা করিতে সকলকে অনুরোধ করেন।

সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পরে বিগত ৭০ বৎসরের মধ্যে শিবপুরে শ্রদ্ধেয় মতিবাবুর বক্তৃতার মত এইরূপ ওজস্বিনী বক্তৃতা আর শুনা যায় নাই। প্রবর্ত্তকের সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীমতিলাল রায় মহাশয়ের বক্তৃতা তাঁর অন্তরে এক অভাবনীয় নূতন আলো দিয়াছে—জাতি-গঠনের এই মন্ত্রের পরিপূর্ণ সার্থকতা তিনি উপলব্ধি করেন। সমাজ, জাতি ও মানুষ গড়ায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের এই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক—এই আশীর্ব্বাদই তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন।

সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায় সভাপতি মহাশয়কে ও সমাগত সকলকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে, পুনরায় প্রফুল্লবাবুর একটী প্রাণমাতান গান হইয়া সভাভঙ্গ হয়। সভায় বিপুল জনসমাবেশ হয়। অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ দে সরকার, শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, শ্রীবসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপরেশনাথ ব্যানার্জ্জি, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীশীতলচন্দ্র বসু প্রমুখ বহু স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

# দক্ষিণায়ন

শ্রীসমীর ঘোষ

বন্যার জল বাড়িতেছিল। কয়েকদিন ধরিয়া বাড়িতেছে। কিন্তু আজকের এই বৃদ্ধির পরিমাণ বিশ্বানন্দের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। সমস্ত দিন এই দুশ্চিন্তায় ডুলিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি সকলকে ডাকিয়া আনিলেন তাঁর চারপাশে। আদেশ দিলেন: এই স্থান পরিত্যাগে আর বিলম্ব করা অনুচিত।

এই পাশের সমস্ত গ্রাম বন্যার জলে ঢাকা পড়িয়াছে, গৃহস্থালী ভাসিয়াছে, মানুষ যারা বাঁচিয়াছিল সেবক সেবিকারা অক্লান্ত পরিশ্রমে খাবার দিয়াছে, শুশ্রূষা করিয়াছে, তারপর তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছাইয়া দিয়াছে। পশু যারা দৃষ্টিপথে আসিয়াছে বিপন্মুক্ত হইয়াছে।

সকলে প্রস্তুত হইল। মাঝারি নৌকা একখানি, বড় ও ছোট নৌকা মিলাইয়া দু'খানি। বিশ্বানন্দ দাঁড়াইয়া সমস্ত হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স, কম্বল ইত্যাদি ও খাবার বড় নৌকায় তুলিয়া দিলেন। তাঁর আদেশমত সেবিকা তিনজন ও সেবক দু'জন সেই নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। মাঝারি নৌকায় সেবকেরা ও ছোট নৌকায় বিশ্বানন্দ নিজে উঠিলেন।

লগি ঠেলিয়া নৌকাগুলি উত্তর পশ্চিম বাহিয়া চন্দনতলীর দিকে চলিল। সেই গ্রামটি আর পীরমুকুন্দপুর এখনও জলে তলাইয়া যায় নাই। বিশ্বানন্দ সম্মুখের বৃসরাভ জলকল্লোলের দিকে চাহিলেন—আজকে রাত্রিতে বোধ হয় পীরমুকুন্দপুরের উপস্থিত পরিচয় ওই পরিধিবিহীন জলতরঙ্গ মুছিয়া ফেলিবে। একটা নিঃশ্বাস গভীরভাবে ফেলিয়া বিশ্বানন্দ আকাশের গায়ে চোখ রাখিলেন। মেঘে মেঘে বিস্তীর্ণ আকাশের অসীম বিস্তার সঙ্কীর্ণ হইয়া গেছে—তার উপরেও আবার মেঘ ঘনাইতেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার দুশ্ছেদ্যতা লইয়া নামিতে লাগিল। বিশ্বানন্দ চকিত হইয়া উঠিলেন। আর একটু পরে অন্ধকারের প্রাচীরের আড়াল নামিবে: এক নৌকার সহিত অপর নৌকার সংযোগ থাকিবে না। তাঁর আদেশমত বড় নৌকার গলুই-এর সঙ্গে মাঝারি নৌকার এবং মাঝারি নৌকার গলুই-এর সঙ্গে ছোট নৌকা বাঁধা হইল। বড় নৌকায় বসিয়া সেবক অমিয়ানন্দ দিগ্‌নির্ণয়ন সাহায্যে চন্দনতলীর পথ নির্ণয় করিয়া চলিলেন।

বিশ্বানন্দ আবার নিজের মধ্যে ডুবিয়া গেলেন। পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, কৃষ্ণাভ প্রকৃতির পটভূমিকা পূর্ব্বদিক্ ব্যাপিয়া ছড়াইয়া গেছে, তার সঙ্গে পশ্চিমের কৃষ্ণতার কোন প্রভেদ আজ আর নাই। আজ যদি তিনি সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের সহিত পরিচিত হইতে চাহিতেন, তাহা হইলে কোন দিগন্তে সূর্য্যোদয় আর কোন দিগন্তে সূর্য্যাস্ত হইল, তাহা অমীমাংসিত রাখিয়া দিতে বাধ্য হইতেন।

সম্মুখের বড় নৌকায় দৃষ্টি পড়িতে বিশ্বানন্দের চিন্তাধারার সংযোগ ছিন্ন হইয়া গেল। তাঁর স্বাভাবিক স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, অরুন্ধতি! তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে?

অমিয়ানন্দ উত্তর করিলেন, হাঁ। এঁদের বসবার স্থান বড় কম।

নিজের নৌকার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া এক মুহূর্ত্ত বিশ্বানন্দ কি যেন ভাবিলেন। তারপর বলিলেন, বেশ। আমার এখানে জায়গা আছে। আমি নৌকা নিয়ে ওখানে যাচ্ছি, তোমাদের একজন আমার নৌকায় এস।

বিশ্বানন্দ নিজের নৌকার সংযোগ মাঝারি নৌকা থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে বড় নৌকার গায়ে নিজের নৌকা ভিড়াইলেন। কিন্তু তিনি আবার যখন মাঝারি নৌকার সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে চলিলেন, তখন তার নৌকায় স্বাতী বসিয়া আছে আর বিশ্বানন্দের প্রশস্ত ললাটে একটা কিসের ছায়া যেন পড়িয়াছে।

আলো জ্বালা হইল। প্রগাঢ় অন্ধকারে তিনটি নৌকার আলো তিনটি জোনাকী পোকার মত নৌকার গায়ে

প্রতিহত ছলাৎ ছলাৎ শব্দতরঙ্গের বুকে উড়িয়া চলিল। বিশ্বানন্দ গম্ভীর; তাঁর সম্মুখে সেবিকা স্বাতী মুখ নীচু করিয়া, ব্যর্থ দৃষ্টি লইয়া কালি-মাখা অন্ধকার দেখিতেছে।

বিশ্বানন্দ স্বাতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এলে কেন স্বাতি?

মৃদু, সংযত স্বরে স্বাতী উত্তর করিল, অরুন্ধতীর ইচ্ছা ছিল না আপনার নৌকায় আসে।

তীব্র এবং কঠিন আঘাতে বিশ্বানন্দ দুলিয়া উঠিলেন অন্ধকারে দৃষ্টি চলিলে, স্বাতী দেখিতে পাইত: বিশ্বানন্দের সৌম্য মুখ বিবর্ণ হইয়া গেছে। অস্ফুট স্বরে তিনি যেন নিজেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন?

স্বাতী কহিল, আপনাকে সে ভয় করে।

—ভয়! আমাকে? বিশ্বানন্দ যেন স্বগতোক্তি করিলেন।

কোথা হইতে স্বাতী সাহস পাইল তাহা কে জানে, বেশ সহজ কণ্ঠে সে বলিল: কি জানেন, অরুন্ধতী সাঁতার জানে না বলে ছোট নৌকায় আসতে ভয় পায়; যদি বড় ঢেউ আসে নৌকা উল্‌টে যাবে, অথচ আপনি আসতে বল্লে না-ই বা বলে কেমন করে?

বিশ্বানন্দ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা সমস্যার মীমাংসাও তিনি মনে মনে করিলেন: তাই না অরুন্ধতী অমন কাঠ হইয়া বসিয়াছিল, যখন তিনি তাকে নিজের নৌকায় আসিতে আহ্বান করেন! আর সেইজন্যেই বোধ হয় স্বাতী তাড়াতাড়ি তার সঙ্গে আসিবার সময়ে অরুন্ধতীকে কি যেন বলিয়া আসে।

আপন মনে একটুখানি হাসিয়া বিশ্বানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন এলে স্বাতি, তোমার ভয় করে না?

স্বাতী হাসিল। বিশ্বানন্দের মনে হইল—স্বাতীর দুটি উজ্জ্বল চোখ বিশ্বানন্দের চাহনীর সহিত মিলিল। স্বাতী বিশ্বানন্দের প্রশ্নের উত্তর দিল, না, ভয় কিসের? আপনার কাছে থাকলে আবার কিসের ভয়!

তারপরে একটু থামিয়া সে আরও বলিল, তবে আপনি অরুন্ধতীকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন। দিন দিন ও ভারী মন-মরা হয়ে যাচ্ছে।

—বেশ। তাই হবে। বিশ্বানন্দ আবার চিন্তাসমুদ্রে তলাইয়া গেলেন।

স্বাতীকে বিশ্বানন্দ কোনদিন পছন্দ করিতে পারেন নাই। প্রথম যখন স্বাতীকে দেখেন, তখন বিশ্বানন্দ নিজে নিজের মনকে বলিয়াছেন, একে এই সব সেবা-সমিতির কাজে মানায় না। ওকে যেখানে মানায়, সেখানকার সংজ্ঞা বিশ্বানন্দ অনেক বার মনে মনে দিয়াছেন আর শেষ মীমাংসা করিয়াছেন: স্বাতীর আছে সম্পূর্ণ সেই নারীত্ব, যার মধ্যে যেন মাতৃত্বের স্থান নাই। তার হাসি রক্তে চঞ্চলতা আনিতে পারে, তার কথা যৌবনকে মুগ্ধ করে, তার চাহনী সংযমের গণ্ডীকে আঘাত করে আর সর্ব্বোপরি তার উপস্থিত পরিপূর্ণ দেহের সম্ভার মানুষকে তার বুকের কাছে অহরহ করিতেছে আকর্ষণ। অনেক বার স্বাতীর সঙ্গে কাজ করিতে করিতে বিশ্বানন্দ স্বগতোক্তি করিয়াছেন, এ-যে মেয়ে, তা' ভোলা অসম্ভব! হ্যাঁ, অতি গুরুতর সঙ্কটকালেও মনে থাকে তাঁর সহকর্ম্মিণী স্বাতী!

এই দ্বন্দ্বের সংঘর্ষণে দিন কাটাইয়া আজ এক মাসের উপর এই বন্যার মাঝে সেবা-সমিতির কাজ চলিয়াছে। অরুন্ধতী বেশ শান্ত। বিশ্বানন্দ বরাবর অরুন্ধতীকে তাঁর সঙ্গে কাজে লাগিবার জন্যে পছন্দ করিয়াছেন। কিন্তু প্রায় সকল ক্ষেত্রে স্বাতী আগাইয়া আসিয়াছে। বিশ্বানন্দ দেখিয়াছেন—স্বাতী খাটিতে পারে অজস্র। শুধু খাটে তাহা নয়, সেই খাটুনীর পিছনে থাকে একটা চমৎকার সামঞ্জস্য। শান্ত অরুন্ধতী কেমন ভীরু। অবশ্য আজ স্বাতীর কথায় বিশ্বানন্দের চোখে এই ভীরুতা বেশী করিয়া লাগিতেছে। স্বাতী, অরুন্ধতীর কথা ছাড়িয়া দিলেও, অবশিষ্ট সেবিকা তারা যে সকল সময়ে ম্রিয়মাণ, তাহা শুধু বিশ্বানন্দ নয়, সকলেই লক্ষ্য করিয়াছে। কিন্তু কেহ কোন কথা কহে নাই। সকলে জানে তারার অতীত জীবনের ইতিহাস। সে ইতিহাস যে বেদনাব্যথিত, তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কাজেই সকল কাজে যে সহজভাবে স্বাতী আগাইয়া আসিয়াছে, তার সেই আগমনীতে কিছুমাত্র অশোভনতা যে ছিল না, তাহা বিশ্বানন্দ আজ সর্ব্বপ্রথম তলাইয়া বুঝিলেন। তবুও তিনি কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন তাঁর নৌকায় স্বাতী আছে ভাবিয়া। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত

ধরিয়া তাঁর মনে পড়িতে লাগিল সর্ব্বকাজে স্বাতীর সাহায্যের কথা। আরও বেশী কথা বিশ্বানন্দের মনে পড়িল, প্রতি কাজে স্বাতীর আন্তরিকতা কত বেশী ছিল, কত গভীর ছিল স্বাভাবিক সহানুভূতি! কিন্তু দিনের পর দিন, রাত্রির পর আগামী রাত্রি ব্যাপিয়া তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, স্বাতীর উপস্থিতি সেবকদের মধ্যে কেমন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। অথচ বিশ্বানন্দ এও দেখিয়াছেন, স্বাতীকে এখান হইতে সরানো চলে না। কারণ, তার স্থানে যে আসিবে সে যে এত দরদ লইয়া, এমনি বুক ঢালিয়া কাজ করিবে, তাহা সমর্থনের ভাষা বিশ্বানন্দের তিক্ত এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতা খুঁজিয়া পায় না। কাজেই স্বাতী অপরিহার্য্য।

এমন যে অপরিহার্য্য স্বাতী, তাকেই লইয়া এই ছোট নৌকা যাকে ডিঙ্গা বলা চলে, তাতে বিশ্বানন্দ ভাসিয়া চলিয়াছেন এই ভবিষ্যতের যত কালো এবং বিপৎসমাচ্ছন্ন জলবিস্তার ভাঙ্গিয়া। একবার বিশ্বানন্দ ভাবিলেন, ভালই হইয়াছে, স্বাতী আমার কাছেই থাক। তাতে শুধু স্বাতী নিরাপদ্ নয়, নিরাপদ্ সেবকেরা সকলে, নিরাপদ্ আমি নিজে।

প্লাবন আসিল বিশ্বানন্দের অনুমিত সময়ের পূর্ব্বেই। অন্যদিনের মত আজ যদি বিশ্বানন্দ সচেতন থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁর অভিজ্ঞ কাণে অনেক আগেই বাজিত সুদূরস্থিত একটা অদ্ভুত সোঁ-সোঁ আওয়াজের উত্থান, যাহা এই জলবিস্তারের উপরে পরিবিস্তার লাভ করিতেছে। সেই অদ্ভুত শব্দে অবশ্য বিশ্বানন্দের চমক ভাঙ্গিল; কিন্তু বড় দেরীতে। স্বাতী অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; বিশ্বানন্দের চোখে আগামী মুহূর্ত্ত কুয়াশাবৃত বিপদ্বেষ্টিত বলিয়াই ধরা পড়িল। চিন্তার ব্যস্ততার মাঝে বিশ্বানন্দ যখন স্বাতীকে লইয়া বড় নৌকার পাশ হইতে ফেরেন, তখন তিনি মাঝারি নৌকার সহিত সংযোগরক্ষাকারী দড়ি নিজের নৌকার গলুই-এর সঙ্গে শক্ত করিয়া বাঁধেন নাই। জলের সজোর আঘাতে সেই পলকা বাঁধন খুলিল, চোখের পলকে নৌকার মুখ ঘুরিয়া গেল। তারপর হাল্কা একগাছি শুকনো খড়ের মত প্লাবনের স্রোতের অনুকূলে যে গতিতে নৌকা ভাসিয়া চলিল, তাকে ভাসা না বলিয়া উড়িয়া যাওয়া বলা বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন শব্দ যাহা ভাষায় প্রকাশ করা চলে। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বড় এবং মাঝারি নৌকার জোনাকী পোকার মত লণ্ঠনের আলো স্বাতী এবং বিশ্বানন্দের চোখের আড়াল হইয়া গেল। বার দুই টর্চের তীব্র আলোকধারা অপর দুই নৌকা হইতে স্বাতী ও বিশ্বানন্দের উপরে নাচিয়া চারি পাশের জলকল্লোলে ছড়াইয়া পড়িল বটে, কিন্তু নৌকা শীঘ্রই সেই আলোকের বিস্তার-শক্তির সীমানার বাহিরে চলিয়া গেল—স্বাতী ও বিশ্বানন্দকে ঘিরিয়া নামাইয়া দিয়া গেল বিপুল অন্ধকার, যাকে তুলনা করা চলে একটা সর্ব্বগ্রাসী বুভুক্ষার সঙ্গে। বহু আগেই প্লাবনের আঘাতে এই ছোট নৌকার লণ্টন উল্টাইয়া গিয়াছিল।

নৌকা ভাসিয়া চলিল। বাতাসও ক্রমশঃ তীব্রতর হইতেছে। বিশ্বানন্দ হালটি ধরিয়া অসহায় হইয়া বসিয়া রহিলেন। কে জানিত গলুই-এর বাঁধন খুলিতে পারে; কে জানিত যে, জীবনের একটা দীর্ঘকালের হিসাব এই বন্যার কাজে গড়িয়া উঠিয়াছে, সে আজ এমনিভাবে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া সকল হিসাব ব্যর্থ করিয়া বন্যায় ভাসিয়া যাইবে আর তার সঙ্গে থাকিবে স্বাতীর মত মেয়ে, যাকে বলা হয় অপরিহার্য্য!

বিশ্বানন্দের সমস্ত চিত্ত কঠিন হইয়া উঠিল: কেন তিনি আজ মনের মধ্যে এত বেশী করিয়া স্বাতীর কথার স্থান দিয়াছিলেন?

এই জীবনেই অনেকদিন পূর্ব্বে প্রায় যৌবনের প্রথম থেকে দ্বিতীয় পাদে দাঁড়াইয়া বিশ্বানন্দ তো যৌবনের সমস্ত দাবী, কামনা, উচ্ছৃঙ্খলতা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন। কত বছর আগে তিনি প্রথমে নিজেকে বন্যার কাজে ডুবান, তাহাও আজ সমুজ্জ্বল রেখা টানে না বিশ্বানন্দের মনে। যে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সেই কথা আজ খালি মনে পড়িতেছে: আলো, গান, কলহাসি, আরও কত কি! তখন সেবক বিশ্বানন্দ ছিলেন নূতন ব্যারিষ্টার।

তারপর একদিন নিজের হাতে নিষ্করুণ ভাবে তিনি সকল কিছু মুছিলেন। নির্দ্দয় ভাবে তিনি নিশ্চিহ্ন করিলেন জন্মগত পরিচয়, পৈত্রিকধারাবাহিকতা। এর

পিছনে হয়তো কোন সুন্দরী তরুণী ( তার নাম না হয় আজও অনুচ্চারিত রহিল ) ছিল, যার বিশ্বাসঘাতকতার পরিণামে একদিন দেখা গেল—গেরুয়া কাপড় ঢাকা একটি লোক বন্যা-সঙ্কটত্রাণ কমিটীর কাজে আসিয়াছে। তাকে আজ আমরা সকলেই চিনি। সেই তরুণী হয়তো স্বাতীর মত উচ্ছল ছিল, মুখর ছিল দেহের পরিপূর্ণ সম্ভারে! তাই না বিশ্বানন্দ স্বাতীকে ভয় করেন! কে জানে হয়তো সেই আগামী মুহূর্ত্ত বর্ত্তমানে পৌছিবে, স্বাতী তার শক্তি-প্রাচুর্য্য প্রয়োগ করিবে, বিশ্বানন্দকে সে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া তুলিবে জীবনস্রোতের আর এক তীরে এমন একটা নূতন অথচ পরিচিত রূপে, যে রূপটাকে পঙ্কিল বলিয়া আজ সুদীর্ঘ বছরের একটা সমষ্টিগত হিসাব ঘৃণা করিয়া আসিতেছে।

—স্বাতি! বিশ্বানন্দ ডাকিলেন।

—বলুন।

—আজ বোধ হয় নিস্তার নেই।

—স্বাতীর কোন উত্তর না পাইয়া বিশ্বানন্দ আবার বলিলেন, তোমার ভয় করছে না স্বাতি?

—না। আপনার সঙ্গে যখন রয়েছি, তখন ভয় কিসের!

বিশ্বানন্দ কাঁপিয়া উঠিলেন, কোন যুক্তিতর্ক আজ স্বাতীকে এমন সহজ ভাবে কথা কহিবার সাহস আনিয়া দিতেছে!

বিশ্বানন্দের প্রশ্নোদ্বেলিত মন বুঝিল না, এ ছাড়া স্বাতীর আর কিছুই বলিবার নাই।

চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও বিশ্বানন্দের পক্ষে অসম্ভব। তাঁর প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইতে লাগিল, স্বাতী তাঁর বুকের কাছে আগাইয়া আসিতেছে। তার হাল্কা নিঃশ্বাস বিশ্বানন্দের বুকে আসিয়া পড়িতেছে। তার চুলের একটা অনামী মিষ্ট গন্ধ বিশ্বানন্দের বুক ভরিয়া দিতেছে। এইবার বুঝি তার দুটি নরম সুগঠিত বাহু গলা জড়াইয়া ধরিবে, অজগরের মত স্বাতী গ্রাস করিবে বিশ বছরের বন্যা-সেবক বিশ্বানন্দকে!

বিশ্বানন্দ শিহরিয়া সেই অজগর-পাশ হইতে সরিয়া যাইলেন।

জলকল্লোল ও বাতাসের সোঁ-সোঁ শব্দ ছাপাইয়া একটা শব্দ উঠিল, ঝপাং! চমক ভাঙ্গিয়া কে জানে কিসের অনুপ্রেরণায় একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া স্বাতী জলে লাফাইয়া পড়িল, ডাকিল, স্বামিজি!

বিশ্বানন্দ তখন জলে ভাসিয়া চলিয়াছেন। জলের শীতলতায় ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করিবার মত অনেকটা প্রশান্তি বিশ্বানন্দের তখন আসিয়াছিল। কিন্তু স্বাতীর এই কম্প্র কণ্ঠের ব্যাকুল আহ্বান—স্বামীজী—শব্দটায় তিনি আবার শিহরিয়া উঠিলেন। ইচ্ছা করিয়া কোন উত্তর না দিয়া, স্রোতের মধ্যে যথাসাধ্য নৌকার পিছনে ভাসিয়া যাইবার জন্য মনে মনে একটা আন্দাজ করিতে লাগিলেন নৌকার গতি সম্বন্ধে।

আবার স্বাতীর বিশ্বানন্দকে কম্প্র কণ্ঠের ব্যাকুল আহ্বানের শব্দ শোনা গেল। উত্তরে বিশ্বানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথায় স্বাতি?

উত্তর হইল, সে নৌকার হালের একটা অংশ ধরিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। বিশ্বানন্দ তাকে বলিলেন, নৌকার হাল সম্পূর্ণরূপে বাঁকাইয়া দিতে। কিছুক্ষণ পরে স্বাতীর গলা পাওয়া গেল, বিশ্বানন্দের আদেশ সে পালন করিয়াছে। তাকে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, স্রোতের অনুকূলে ভাসিতে ভাসিতে বিশ্বানন্দ সম্মুখে ও দু'পাশে চাহিলেন। আগাগোড়া সমস্ত প্রকৃতি অন্ধকারের কালিমায় মুখ ঢাকিয়াছে। সে অন্ধকার ভীষণ, এমন তীব্র যে, তার দিকে চাহিয়া থাকিলে চোখ ব্যথা করে। স্বাতী হাল বাঁকাইতে নৌকার গতি কমিয়া গেছে বটে, কিন্তু সে কত ক্ষণ এমনভাবে হাল বাঁকাইয়া রাখিতে পারে? আর কে জানে সকলে আসিবার আগে কেমন করিয়া বিশ্বানন্দ জানিতে পারিবেন নৌকা কোথায়?

বাতাসের মত্ততা বাড়িয়া গেল। সহসা বিশ্বানন্দের চোখের সম্মুখ হইতে কে যেন অন্ধকারের কালো পর্দ্দাখানি সরাইয়া লইল। সমস্ত অন্ধকার ছাপাইয়া, প্লাবনের জল যেন আলোড়িত করিয়া কাস্তের মত একফালি সোণালী চাঁদ আকাশের ধূসর গায়ে ভাসিয়া উঠিল—ঢালিয়া দিল অতি পাণ্ডুর ম্রিয়মাণ জ্যোৎস্নার আলো। সেই বিবর্ণ জ্যোৎস্নার আলোকে বিশ্বানন্দ দেখিলেন—নৌকা খুব কাছ

দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে আর স্বাতী একহাত গলুই-এ রাখিয়া, অপর হাতে হাল বাঁকাইয়া নৌকার গতি যথাসাধ্য কম করিতেছে।

নৌকায় উঠিয়া বিশ্বানন্দ হাত বাড়াইয়া দিলেন, উঠে এস স্বাতি!

হাতে হাত লাগিতে বিশ্বানন্দ আবার শিহরিয়া উঠিলেন। সমস্ত শরীরে, স্নায়ুতে একটা উষ্ণতা গান গাহিয়া উঠিল, বিশ্বানন্দ আবার মনোবিকারে ডুবিয়া গেলেন। স্বাতী নৌকায় উঠিল, তারপর বিশ্বানন্দের বুকের কাছে দাড়াইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাসিমুখে, চপল কণ্ঠে বলিল, বেঁচে গেলুম স্বামিজি!

সেই কথাগুলি এক ঝলক দক্ষিণের বাতাসের মত বিশ্বানন্দের কাণে ঢালিয়া দিল তাঁর প্রথম ব্যারিষ্টার জীবনেব মানসী-সুন্দরী তরুণী রেবার আহ্বান। বিশ্বানন্দ দু'হাত বাড়াইয়া স্বাতীকে তাঁর তীব্র তপ্ত আর উদ্বেলিত বুকে চাপিয়া ধরিলেন। ভয়ার্ত্তা স্বাতী দু'হাতে বিশ্বানন্দকে ঠেলিয়া ধরিল ধাক্কা দিয়া। পিচ্ছিল পাটাতনের উপর সে ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া বিশ্বানন্দ সশব্দে পড়িয়া গেলেন।

রাত্রি তখন অনেক। বিশ্বানন্দের জ্ঞান হইল। দেখিলেন স্বাতীর কোলে তাঁর মাথা রহিয়াছে। তাঁকে চোখ মেলিতে দেখিয়া স্বাতী ডাকিল, কেমন আছেন স্বামিজি?

—ক্ষমা কর স্বাতি! ক্ষমা কর! অস্ফুট স্বরে কথাগুলি বলিয়া বিশ্বানন্দ স্বাতীর কোলে মুখ লুকাইলেন। কে জানে, কেন তাঁর দু'চোখ ছাপাইয়া জল আসিয়াছে!

কোন উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে স্বাতী বিশ্বানন্দের মাথায় ধীরে ধীরে অতি স্নেহে হাত বুলাইতে লাগিল। মাতৃত্বের স্পর্শে বিশ্বানন্দের রুক্ষ কর্কশ চুলগুলি যেন নরম কোমল স্নিগ্ধ পদার্থে সুরভিত হইতে লাগিল।

নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে। আকাশের সেই কাস্তের মত সরু সোণালী অথচ বিবর্ণ চাঁদ ডুবিয়া গেছে উত্তাল মেঘসমুদ্রে, বাতাস হইয়াছে প্রখর, তীব্রতর। চারিপাশে নামিয়া আসিতেছে সেই চক্ষুপীড়নকারী অবিচ্ছেদ্য অন্ধকার।

# আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

কত শত বর্ষ আগে এমনি এক আষাঢ়ের মেঘভরা প্রথম প্রভাতে
হে কবি! শুনায়েছিলে বিরহী যক্ষের গান শাপবাহী বিচ্ছেদ ব্যথাতে।
কেমনে সে প্রিয়া-বার্ত্তা লভিবারে অর্ঘ্য তা'র রচি লয়ে শ্বেত কুর্চ্চিফুলে
মিনতি জানায়েছিল পুষ্করে সে মেঘপানে যুক্ত তার বাহু উর্দ্ধে তুলে:
ছাড়ি শিপ্রা, উজ্জয়িনী, সিদ্ধ নগবালাদের ঝর্ণাপাশে দ্রুত পিছে রাখি'
দেখিবারে না থামিয়া যত পৌর কামিনীর মেঘনীল কৌতূহলী আঁখি
দূতরূপে প্রবেশিতে রম্য কক্ষে অলকার, যক্ষপ্রিয়া যেথা স্তব্ধ বসি'
বক্ষে লয়ে গুরুভার, কোলে অনাদৃতা বীণা, পৃষ্ঠে বেণী পড়িয়াছে খসি'।
কহিতে বারতা তারে অবরুদ্ধ ব্যথা বহি' কেমনে সে রামগিরি শিরে
যাপিছে প্রহর গণি', শাপান্তে কবে সে পাবে প্রিয় তার দয়িতারে ফিরে।
আজ ফিরি আসিয়াছে পুনঃ সেই আষাঢ়ের নিত্য নব প্রথম প্রভাত,
আনিয়াছে মায়া তার সে বিগত দিন সম, তুমি শুধু নাই তা'র সাথ।
কিন্তু চির-বিরহীর যে রুদ্ধ ব্যথার মূর্ত্তি মেঘাঞ্জনে তুমি আঁকিয়াছ
যুগ যুগ বিরহীর বক্ষতলে তারি মাঝে কবি! তুমি আজো বাঁচি আছ।

# ইউরোপের পথে পথে

## ( যুগস্লাভিয়া )

ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

আলেকৃজিনিক হতে যে পথটা বেলগ্রেদের দিকে চলেছে, তা ক্রমশঃ উঁচু হয়ে চলেছে। অনেকটা কলকাতা-পেশোয়ারের ট্রাঙ্ক রোডের মত। যারা সাইকেলে পথ চলে, তাদের ঐ বিষয়টা বোধগম্য হয় বেশী। এটা হল পথের বাস্তবতা। এইটুকু অনুভব ক'রেও যারা পথের সৌন্দর্য্য অনুভব করে, পথচলা ভালবাসে, তারাই ঠিক ঠিক পর্য্যটক। আমি তা' নই। আমার পথচলার নেশা অন্য রকমের। আজ এই পথচলা আমাকে ক্লান্ত ক'রে ফেল্‌ছিল। শরীরে কোন রোগ নাই, খাবারের কোন অভাব নাই, তবুও ক্লান্তি। মনের যখন জড়তা আসে, সেই জড়তা ছাড়াবার যখন উপায় থাকে না, তখনই মন ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে। দেখলাম পথে জিপ্‌সিরা গান গাইছে, ভিওেলা বাজাচ্ছে, হোটেলে বসে খাচ্ছে আর গল্পগুজব করছে। তাদের শিক্ষা শক্তির অভাব নেই, তবুও তারা জিপ্‌সি।

এখানে বলে' রাখা ভাল, যাঁরা মজা ক'রে তাজা গল্প পাঠ করেন আর তোয়াজে থাকেন, তাঁদের পক্ষে এ পথ-চলার মর্ম্ম গ্রহণ করা কঠিন। যে ভিখারী হয়ে জন্মেছে, তার ভিক্ষা করতে কষ্ট হয় না। যে ভিখারী হয়ে জন্মায় নাই অথচ ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে, সে যদি মানুষ হয়, তবে ভিক্ষার কারণ বের করে, যাতে জগতে আর কেউ ভিক্ষা না করে তার ব্যবস্থা করে।

তুর্কিতে অনেক জিপ্‌সি ছিল। সুলতান তাদেরে মুস্‌লিম ধর্ম্মের সুশীতল ছায়াতলে স্থান দিতে গিয়ে কৃতকার্য্য হন নাই। সুলতানের রাজত্বকালে কত আর্ম্মেনিয়ান মুস্‌লিম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে মরেছে, তার অনেক কথা শুনা যায়। কিন্তু জিপ্‌সি মরে নাই, কেউ তাদেরে মারে নাই, স্থানান্তর হয় নাই, তবে তারা গেল কোথায়? আকাশে বাতাসে উড়ে গেল নাকি? অথচ বুলগেরিয়ার এবং যুগস্লাভিয়ার আনাচে-কানাচে কলকাত্তা-রাস্তার দু'পাশের ভিখারীর মত তাদের দেখা যায়। অবশ্য এত হীন অবস্থায় নয়, তবে পাড়াগাঁয়ের লক্ষ্মীছাড়াদের সঙ্গে যে তুল্য তা বেশ বলা চলে।

যেখানে ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে ধর্ম্মবাদের লড়াই হয়, তথায় সর্ব্বসাধারণ থাকে আঁধারের মাঝে। ধর্ম্মের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য না বুঝে'ই ছোটখাট কথার কলহ হতে হয় দাঙ্গা, আর দাঙ্গা হতে হয় বিপ্লবের সৃষ্টি। তুর্কিতে সেই ভাব-বিপর্য্যয় অনেকদিন চল্‌ছিল। মুস্তাফা কামাল সেই ভাব-বিপর্য্যয়কে দূর করতে পেরেছিলেন। গর্ব্বিত, অন্ধ মুষ্টিমেয়ের স্বার্থপরতাকে তিনি ভেঙ্গে চুরমার করে' দিয়েছিলেন। জিপ্‌সিরা সর্ব্বপ্রথম মানে নাই মুস্তাফা কামালের কথা। তারা বলেছিল "আমাদের চৌদ্দপুরুষ যে ভাবে থেকে আসছে, সেই ভাবে থাকতে আমরা ভালবাসি। সুলতানগণ আমাদেরে সেই ভাবে থাকতে দিয়েছেন, আমরা এখন সেভাবে থাকব না কেন?" মুস্তাফা কামালের এই গতানুগতিকতা সহ্য হয়নি। তাদের তিনি দিলেন জমি, বাড়ীঘর, খরচের টাকা এবং তাদের স্বাধীন সচ্চরিত্র মনোবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে পাঠিয়ে দিলেন শিক্ষক রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য মজুত রাখলেন "শিক্ষিত জেন্দ আর্ম্মি"। তুর্কির জিপসি চিরতরে লোপ পেল। এখন তারা ভাল কৃষক, ভাল মজুর, ভাল বৈজ্ঞানিক হয়ে গড়ে উঠছে। তাদের ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয় নাই, মুসলমানী তারা গ্রহণ করে নাই, কিন্তু তাদের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয়েছে। ক্রমশঃ তারা স্বাধীন তুর্কি-জাতিতে পরিণত হতে চলেছে। যারা পালিয়ে গিয়েছিল আমেরিকায়, আমেরিকান মিশনারীদের অনুগ্রহে তারা ক্যালিফোর্ণিয়াতে পামিষ্ট, চোর, অকাল্‌টিষ্টের ব্যবসা করছে আর মাঝে মাঝে সরকারী ডালভাত খেয়ে দিন গুণছে। যুগস্লাভিয়ার জিপ্‌সিদের অবস্থা যথাপূর্ব্বং তথাপরং। বুকের কাছে তাদের টেনে নিতে এখানে কেউ নেই। কপিট্যার পথে সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে এই কথাই বার বার মনে হচ্ছিল।

* বুলগারীয়ান যদিও সার্ভিয়ানদের এক জাতীয় তবুও লড়াই করার সময় এরা একটু ক্ষিপ্র এবং মরণতৎপর। কাপির্য্যা পর্য্যন্ত বুলগেরী সেপাই এসেছিল অষ্ট্রিয়ান সেপাইকে সাহায্য করতে গত লড়াইর সময়ে। এ

কথাটা অনেকে আমাকে বলেছেন। আমেরিকান রেড ক্রশ সোসাইটির এই সহরেই একটা বাড়ী ছিল। সেই বাড়ীতে গেলাম। যাবার হেতু, যদি কোন ইংরেজি বই পাই তো পাঠ করব। আমার কাছে যত ধর্ম্মগ্রন্থ ছিল, তা' একে একে পথে ফেলে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের উপদেশ এবং গীতা। এসকল ধর্ম্মগ্রন্থ অনেকবার পাঠ করেছি। বাংলা ভাষা যাতে না ভুলে যাই, সেই জন্যই বিশেষ করে' এই সব রাখা। যখনই সেই চার আনার চটি বইখানা খুলতাম, তখনই নিজের মাথার চুল নিজেই ছিঁড়তে উদ্যত হতাম। তারপর একদিন যখন ফিলিপ পল্লীতে জ্বর হয়, সেদিন সেই বইখানা খুলে' অনেকক্ষণ পাঠ করে' তারপর আমার এক নূতন স্লাভ বন্ধুকে দিয়ে বল্লাম, "এই বই বয়ে নিবার আমি উপযুক্ত নই।" যদিও এই বই আমার নিজের ভাষায় লিখা, আপনি তার এক কথাও বুঝবেন না, তবুও এই বই রাখার অধিকার আপনার আছে, আমার নাই। এতে তিনটি ভাব আছে। এই তিন ভাবের পূর্ণ বিকাশ আপনাদের হয়েছে, আমাদের হবার উপায় নাই। লোকটি বোধ হয় আমাকে বিকারগ্রস্তই ভেবেছিল, তাই সে বইখানা নিয়ে গিয়েছিল। আমরা উড়ি আকাশে, আর চেয়ে থাকি সামান্য ব্যক্তিগত লাভের দিকে। বাংলা ভাষার পরই আমি লিখতে এবং পাঠ করতে পারি মামুলী ইংরেজী। বাংলা ভাষার আর বই নাই, তাই ইংরেজী ভাষার বই-এর সন্ধানে গিয়েছিলাম।

আমাদের দেশে লড়াই, খণ্ড যুদ্ধ, এ সকলের বিরুদ্ধে নানারূপ বই লিখা হয়েছে; ইউরোপে আমেরিকায়ও তার অল্পতা নাই। কিন্তু বল্‌কান দেশকে ভাল করে' দেখতে ভাবপ্রবণ লেখকদেরে আমি আমন্ত্রণ করি। গত যুদ্ধে আমরা সংবাদপত্রের মারফতে শুনেছি, বেলজিয়াম নাকি ইট-পাটকেলে পরিণত হয়েছিল। আমি সেই বেলজিয়াম এবং পুরাতন সার্ব্বিয়া, উভয়ই দেখেছি। আমার মনে হয় পূর্ব্বে সার্ব্বিয়া যেরূপ আপদ বিপদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছিল, যুদ্ধের সময়েও সেরূপ কষ্ট পায় নাই। যুদ্ধের সময়ে ছেলে-মেয়ে কার কোথায় চলে গেছে, তার ঠিক নাই। এরূপ অনাথ ছেলেমেয়ে উপবাস করে' কত মরেছে, তারও ঠিক নাই। দুঃখের মরণ পুরাতন সার্ব্বিয়ায় বর্ত্তমান ছিল পুরাদমে। যে দিন অষ্ট্রিয়ান সেপাই বিদায় নিল যুগস্লাভিয়া হতে, আলবেনিয়ার লোক বুঝল—এখন আর সেই পুরাতন মহাপাপ চল্‌বে না। এরা এবার মানুষ হয়েছে, এবার আর ওদের মুসলমান করা চল্‌বে না, এবার চল, আপন ঘরে, আপন কাজে, আপনাকে বাঁচাতে। গ্রীক্ ধর্ম্ম-যাচকগণ প্রমাদ গণলেন। একে একে গ্রীক অর্থডক্স চার্চ্চগুলি ভেঙে গেল। জাতের গড়নের পত্তন সুরু হল। যুবকযুবতী বুঝল—এবার আর সেই ভাবে থাক্‌লে চল্‌বে না। উত্তর সার্ব্বিয়ার পুরাতন জাত যদিও অষ্ট্রিয়ার অধীন ছিল, তবুও অষ্ট্রিয়ানরা সেরূপ অত্যাচার করে নাই তাদের উপর, অন্ততঃ তাদের মরণের অধিকার হতে বঞ্চিত করে নাই। গ্রীক্ চার্চ্চ এবং আলবেনীয়ান চার্চ্চ কিন্তু পুরাতন সার্ব্বদের প্রত্যেক দিন মরণের অধিকার হতে বঞ্চিত করছিল। হয় ত এই কথাটা বল্‌তে শুনে অনেকে বল্‌বেন, সে কি, আল্‌বেনিয়ার মুসলমান এবং গ্রীক্ চার্চ্চ স্লাভদের উপর এমন কি অত্যাচার করেছিল? এংল-সেক্সন এবং স্লাভগণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক বই লিখেছেন। মুস্তাফা কামাল পাশার নূতন সমাজস্থাপন সম্বন্ধে যে সব নিরপেক্ষ পুস্তকাদি লিখিত হয়েছে, তা' পাঠ করলে বুঝা যায়, সেই অধঃপতন কোন শ্রেণীর।

মনে হয়—বিগত মহাসমর হয়েছিল বলে'ই যুগস্লাভিয়া আজ মাথা তুল্‌তে পেরেছে, আপনার মাঝে নিরন্তর অন্তরের মরণাস্ত্রকে মরণ-বিজয়ী রক্ত দিয়ে পরিষ্কার করেছে। আমি তাই চোখে দেখেছি, অনুভব করেছি। দেখেছি যুগস্লাভিয়া এগিয়ে চলেছে। পলাতক শাদা রাশিয়ানরাও সেইদিক্ দিয়ে অনেক সাহায্য করেছে। শাদা রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে চীন ভ্রমণের কথা বল্‌তে গিয়ে অনেক বলেছি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলেছি যে এদের যে-মত, সেইমত না বদ্‌লাবার জন্যই এরা এত কষ্ট করছে। মতকে বজায় রাখতে গিয়ে এত কষ্ট করাটাও কম কথা নয়। চোর, ডাকাত্, দোষী, কামুক কিন্তু তা' পারে না, যেই বিপদ্ আস্‌ল অমনি পালাল। বেলগ্রেদের "তোরিং" ক্লাবের সেক্রেটারীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন বৃটিশ যদি এখন চায় ভারতকে পঙ্কিলতা হতে

উদ্ধার করতে, এই মুহূর্ত্তে পারে। ধর্ম্মঘট হবে না, সেপাই-বিদ্রোহ হবে না, লোক অবনত মস্তকে বৃটিশের আদেশ মানবে, কারণ তার পেছনে আছে সমাজের কল্যাণ। এইত সেদিন লাহোরে Modern Sanitation স্থাপন করতে বৃটিশ প্রস্তাব করতে, প্রতিবাদ হয়েছিল মাত্র। বৃটিশ পেছিয়ে গেল, কিন্তু ঐ বিষয়টা যদি একটু তৎপরতা এবং সহিষ্ণুতার সহিত কাজে লেগে যেতেন, তবে টেক্সও আসত, সহরও পরিষ্কার হত, ধুয়া এবং ভুয়া (Economic Argument) বুদ্বুদের মত চলে যেত। কারণ তার পেছনে রয়েছে সমাজের কল্যাণ। সর্দ্দা আইনএর জন্য ত বিদ্রোহ হয় নাই, ইংরাজ রাজত্ব ভারত হতে মুছে যায় নাই; এতে যাবেও না, কারণ তার পেছনে ছিল সমাজের কল্যাণ।

ইচ্ছা করলেই তিনদিনের মাঝে সাইকেল চালিয়ে সমুদয় যুগস্লাভিয়া ভ্রমণ করে' চলে যেতে পারি। কিন্তু তা' করি নাই। দেখ্‌তে এসেছি, শিখ্‌তে এসেছি, এমন রশি পেছনে বাঁধা নাই, যাতে করে' ফিরে যেতে হয় তাড়াতাড়ি। বুলগেরিয়া, যুগস্লাভিয়, হঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া, হলেণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি ইউরোপের দেশ আমাদের এক একটা জেলার সমান। অথচ তাদের নাম আছে, কাম আছে। সংবাদপত্র খুল্‌লেই তাদের দেশের কথা চোখে পড়ে। ঘটনা পড়ে হয়তো অনেকের ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, কত বড়ই বা হবে এই সকল দেশ। তাই অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, কি করে' হল্যাণ্ড দেশটা তিনদিনে সাইকেলে পার হয়ে গেলেন। তিনদিনও বেশী। জার্ম্মেণীর সীমা হতে কেবল ৬০ কিলমিটার আমষ্টারডম পর্য্যন্ত এবং আমষ্টারডম হতে ফরাসী সীমান্ত হবে তার চেয়ে একটু বেশী। লেংটিহীন সাইকেল নিয়ে অর্থাৎ যে সাইকেলে মাডগার্ড পর্য্যন্ত থাকে না তা' নিয়ে একদিনে দু'বার হল্যাণ্ড ঘুরে' আসা যায়। মানচিত্র খুলে' দেখুন, হল্যাণ্ডের স্থান পৃথিবীর মধ্যে কতটুকু? আসলে সেই দেশ-গুলিতে মানুষ বাস করে বলে তাদের সংবাদ, এত সংবাদ-পত্রে বের হয়। শুধু দুই হাত-পা হলেই মানুষ হয় না।

এই ত হল ইউরোপের রাজ্যগুলির আকৃতি; কিন্তু তাদের প্রকৃতি জানার জন্যই আমার উদ্যোগ বেশী। এই যে নূতন তুর্কিতে নূতন ঘরে নূতন খোলা দেওয়া হয়েছে, বুল্‌গেরিয়ায় এবং যুগস্লাভিয়ায়ও সেরূপই। অতএব ঘর-দুয়ারের কথা নিয়ে আর আমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। এই একই প্যাটার্ণের বাড়ীঘর লণ্ডন পর্য্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতির বৈষম্য রয়েছে। আমাদের দেশের পর্য্যটক, ছাত্র, অর্থাৎ যাদের মাথায় একটু মগজ আছে, তারাই ভদ্রতা দেখে এবং ভদ্রতা শিখে ইউরোপ হতে ফিরে। এক ভদ্র অন্য ভদ্রের কাছ হতে নকল মুখোস পড়ে' আসল মুখোস খুল্‌তে পারে না। উভয়েই নকল মুখোস পরে অভিনয় করে' যায় মাত্র। আমি সেরূপ পর্য্যটক নই। আমি সত্য এবং আসল, আমার কাছে নকল মুখোস-পরা আস্‌তেও ভয় পেয়েছে। আমাদের দেশের যে সকল মজুর বৃটেনে আছে, তাদের যদি লিখবার ক্ষমতা থাকৃত, তবে আমাদের দেশের জার্ন্যালিষ্ট হ'তে ভাল রিপোর্ট বিলাত সম্বন্ধে পাঠাতে পারত।

বেলগ্রেদ পৌছাবার পূর্ব্বে ইচ্ছা করে' যুগস্লাভিয়ার গ্রামে বাস করতে লাগ্‌লাম। গ্রাম্য চরিত্র অনুধাবন করতে আমার বেশ ভাল লাগে। গ্রামের লোক আমাকে ভালবাস্‌ত, সাহায্য করত, আমি তাদের মাঝে থেকে আনন্দ পেয়েছিলাম। একটা গ্রামে রবিবারে ঠিক দ্বিপ্রহরে পৌছেই গ্রামের হোটেলে গিয়ে আস্তানা গাড়লাম। ভাষার দরকার নাই, শুধু টাকার দরকার। গ্রামে টাকার দরকার বড়ই কম, সকল জিনিসই সস্তা। হোটেলের কাছেই একটা রেস্তোঁরা। আজ যেন আপন গৃহে কেউ পাক করে নাই। সকলেই এসেছে রেস্তোঁরায় খেতে। দ্বিপ্রহরের ভোজনকে স্থানীয় ভাষায় "ডিনার" বলে। ইংলণ্ডেও অনেক স্থানে দ্বিপ্রহরের ভোজনকে "ডিনার" বলে। কিন্তু সে সংবাদ রাখবার যদি ইচ্ছা হয় তবে পাওয়া যায়। কিন্তু তা' কি করে হয়, Londoner যা বলে তাই ভাষা, যেমন কল্‌কাতায় "আমলেট"কে "মামলেট" বলে। এখন কলকাতার রেষ্টোরেণ্টে আর "আমলেট" পাওয়া যায় না, "মাম্‌লেট" পাওয়া যায়। ঠিক সেরূপ আজকাল লণ্ডনের কোনও রেষ্টোরেণ্টে দ্বিপ্রহরে আর "ডিনার" পাওয়া যায় না, "লাঞ্চ" পাওয়া যায়। গ্রামে গেলে এখনও দ্বিপ্রহরে "ডিনার"ই মিলে,

"লাঞ্চ" বল্লে কেউ শুনবেও না, অথবা "Eats" and "Teas" পাওয়া যায়, তবুও "ডিনার" পাওয়া যায় না।

সার্বিয়ার গ্রামেও ডিনার খাবার জন্যই সকলেই রেস্তোঁরাতে এসেছে। ডিনার জিনিষটাই অপরূপ বলে' মনে হল। কোনরূপ রকম-রকমের খাদ্য নাই। যা আছে, তা' প্রচুর। ডিম, সব্জী, মাখন, রুটি, মাংস, দই, ক্রীম, বিয়ার। প্রত্যেকে পেট ভরে' খাচ্ছে। কেউ মাতাল হচ্ছে না, একে অন্যকে গালি দিচ্ছে না। মহানন্দে সকলেই ভোর হয়ে আছে। মাঝে মাঝে রাষ্ট্রনৈতিক চর্চ্চা হচ্ছে অথচ রবিবারে ছাপাখানা বন্ধ থাকায় কোনও সংবাদপত্র বের হচ্ছে না। একদিন ত সপ্তাহে আরাম করা চাই। চোখও বিশ্রাম চায়, তাই ছাপাখানাও বন্ধ। কিন্তু যেখানেই ধনতন্ত্রবাদের বৃদ্ধি হয়েছে, সেখানেই যাচাই করে' অপ্রত্যাশিত দ্রব্যের আমদানী করা হয়েছে। লোককে অন্ধ করে' দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, আজ রবিবার হে, ডবল মাইনে দেওয়া হবে, কাজ কর। ঐ রবিবারে ডবল মাইনে দিবার পরও লাভ থাকে ব'লেই এরূপ বিরূপ কাজকে সুন্দরের স্বরূপ দিয়ে জন-সমাজে হাজির করা হয়। সর্ব্বসাধারণ তা' প্রত্যাখ্যান করতে পারে না, তাই বদ্‌হজমীতে কষ্ট পায়, অকালে মরে। যথায় ধনতন্ত্রবাদের উপর শাসনতন্ত্রের আদেশ চলে, তথায়ই এরূপ অঘটন ঘটতে পারে না।

নরনারী 'ডিনার' খেয়ে কাছেই একটা ঘরে নৃত্য করতে চল্ল। আমি তখন একটু বিশ্রাম করছিলাম। হোটেলের ম্যানেজার আমাকে নাচের ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি একটা বিশেষ স্থানে বস্‌লাম। যুবক-যুবতী নৃত্য আরম্ভ করল। এক একটা নৃত্যের পর বিয়ারের গ্লাসগুলি যুবকযুবতীর তৃষ্ণা নিবারণ করতে লাগল। আমার কাছেও বিয়ারের গ্লাস আসতে লাগ্‌ল। একটার পর একটা গিল্‌তে লাগ্‌লাম। চোখ দুটো লাল হয়ে উঠ্‌ল, মাথা ঘুরতে লাগ্‌ল। যুবক-যুবতীর নৃত্য আমার কাছে সবাক্ চিত্রের মতই দেখতে লাগল। আমি উঠে যেতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু যুবক-যুবতী উঠ্‌তে দিল না, আমার মাথায় তারা বিয়ার ঢেলে মনের বাসনা পূরণ কর্‌তে লাগ্‌ল। আমি তাতে খুশীই হয়েছিলাম, বিরক্তি হয় নাই।

যুবক-যুবতীর প্রিয় সম্মিলনের দিকে আমার দৃষ্টি ছিল না। ভাবছিলাম সে দিকে চেয়ে দেখব না। কিন্তু কুসঙ্গে যার বিহার, সে হাজার চেষ্টা করে'ও চোখের দৃষ্টির পরিবর্ত্তন সহজে করতে পারে না। অনেক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আমার কাছে বসেছিল। আনন্দেই বোধ হয় তাদের চোখের জ্যোতিঃ ফিরে আস্‌ছিল, দ্বিগুণ হয়ে আগুনের মত জ্বলছিল। সেই প্রিয় সম্মিলন ক্রমশঃ চরম হয়ে আস্‌ছিল। এই নৃত্য-গৃহই হল এদের ভবিষ্যৎ গৃহকর্ম্মের প্রথম অঙ্গ। খুব বেশী দিন নয়, এরূপ নৃত্যের প্রচলন এদেশে হয়েছে। যতদিন গ্রীক্ চার্চ্চ এদেশের ধর্ম্মের শাসনবিভাগের কার্য্য চালাতেন, ততদিন গোপনে কত যে শিশু যমালয়ে প্রেরিত হয়েছে, সে কথা অনেকে আজও বলে' থাকেন। এমন কি আমাকে পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করেছে, আমাদের দেশে ধর্ম্মের নামে শিশুহত্যার ব্যবস্থা আছে কিনা? দেশের কথা বিশেষ কিছুই জান্‌তাম না, তাই বলে' দিতাম আমাদের দেশে গোপনে শিশুহত্যার প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। মহাভারত হতে উদ্ধৃত করে বল্‌তাম অনেক মূল্যবান্ কথা, তারা তাই লিখে রাখত। অনেক যুবক আমাকে বলেছে, এরূপ সুন্দর বইএর কথা কখনও শুনে নাই, যদি শুন্‌ত তবে পাদ্রীদের কাঁদিয়ে ছাড়ত। বুলগেরিয়া হতে হাঙ্গেরী পর্য্যন্ত দেশগুলিতে সাধারণতঃ ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় পুরাতন পুস্তকের কথা মীমাংসিত সত্য বলে' গ্রহণ করা হয়। যেমন আমরা সাধারণতঃ কোন ইংরেজের কথা যদি উদ্ধৃত করে' বলি, তবে তা' যেমন আজকালকার তথাকথিত ইংরেজীশিক্ষিতেরা অবিশ্বাস করে না।

তরুণ যুবক-যুবতীদের উপর গ্রীক্ চার্চ্চ অনেক অত্যাচার করেছিল, আলবেনিয়ার মুসলমানী সমাজ তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল। কিন্তু নবযুগের নব কার্য্য, নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। ভাবী শান্তি, সাম্য ও মৈত্রীর স্বপ্নে এখানকার মানবমানবী ভরপুর।

# বাংলার বস্ত্র-ব্যবসায়ের সমৃদ্ধির যুগ

শ্রীশ্রীশচন্দ্র গুহ

বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি। একদিন যে বাঙ্গালী চরকা ও তাঁতের ভিতর দিয়া তাহার অসাধারণ কর্ম্মশক্তি ও শিল্পকৌশলের পরিচয় দিয়াছিল, তাঁত ও চরকা যে বাংলাকে একদিন প্রকৃতই "সোণার বাংলা" করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা আত্মশক্তিতে নষ্টপ্রত্যয়, শ্রমবিমুখ, অলস, মৃতকল্প বাঙ্গালী আজ ধারণা করিতেও অক্ষম। সে গৌরবের স্মৃতিমাত্র প্রত্যক্ষকারীর বর্ণনায় জীবন্ত রহিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইয়োরোপবাসী বহু পর্য্যটক কেহ বা ভ্রমণোপলক্ষ্য করিয়া, কেহ বা খৃষ্টধর্ম্মপ্রচার ব্যপদেশে ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

তাঁহারা ছিলেন পর্ত্তুগাল, হলণ্ড, ফরাসী ও ইংলণ্ডবাসী লোক। তাঁহারা নিজ ভাষায় তাঁহাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে ঐ সকল বিদেশী ভাষায় লিখিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাহাতে ভারতের প্রাচীন শিল্পসমৃদ্ধির ও সম্প্রসারেরও ইতিহাসের এক উজ্জ্বল পরিচ্ছেদ উন্মুক্ত হইয়াছে। ঐ সব বিবরণী হইতে জানা যায় যে, বাংলার সমৃদ্ধির যুগে বাংলার তাঁতের বস্ত্র ভারতের নানা স্থানে ও ভারতের বাহিরে বহু পরিমাণে রপ্তানি হইত।

(১) খৃঃ প্রথম শতাব্দীর ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের বিদেশী ইতিহাস গ্রন্থের নাম "Peri phus of the Erythrean Sea" তাহাতে আছে গাঙ্গেয় প্রদেশের বন্দর হইতে Spikenard নামক সুগন্ধি উদ্ভিজ্জ ও প্রসিদ্ধ গাঙ্গেটিকি নামক বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইত। (Mac crindle's "Periphus". p. 148) বাংলার মস্‌লিনকেই পাশ্চাত্য জাতিরা গাঙ্গেটিকি নাম দিয়াছিল।

(২) ১৪৯৮ খৃঃ Vasco de Gama (ভাস্কো ডি গামা) সর্ব্বপ্রথম সমুদ্রপথে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা হইতে প্রচুর মূল্যবান্ বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হইতে তিনি দেখিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বস্ত্রব্যবসায়ীরা বাংলা হইতে ২২ শিলিং দরে কাপড় কিনিয়া, সেই কাপড় কালিকাটে বিদেশী বণিক্‌দের নিকট ৯০ শিলিং দরে বিক্রয় করিত। (Compa's Portugese in Bengal p. 25)

(৩) ১৫১০ খৃষ্টাব্দে ভারতাগত ভারথামা (Verthema) নামক পর্ত্তুগীজ পরিব্রাজকের বিবরণ হইতে জানা যায়, বাংলা হইতে প্রতি বৎসর ৫০ পঞ্চাশখানা জাহাজ বোঝাই কার্পাস ও রেশম বস্ত্র তুর্কী, সিরিয়া, পারস্য, আরব, আফ্রিকা দেশে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চালান হইত ("সমসাময়িক ভারত" ১৯শ খণ্ড ১৫ পৃঃ)

(৪) সিজার ডি ফ্রেডারিচি (Ceasar de Fedirici) ১৫৬৭ খৃঃ ১৮ খানা জাহাজ চট্টগ্রামের বন্দরে নোঙ্গর করা দেখেন। সে সব জাহাজে যে সব পণ্যদ্রব্য চালান হইত, তাহার মধ্যে কার্পাস বস্ত্র ও চালই ছিল প্রধান। Purcha Ilis Pilgrimage Vol. X p. 138)

(৫) রাল্‌ফ ফিচ্ (Ralph Fitch) ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের দৌত্যকার্য্যে চীনে গমনের পথে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি ১৫৮৮ খৃঃ বাংলার বারভূঞা ঈসা খাঁর রাজধানী সোণারগাঁও ও কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর ও কন্দর্পনারায়ণের রাজধানী বাক্‌লা দেখিয়াছিলেন। ঐ সব বন্দরে তিনি প্রচুর কার্পাস বস্ত্রের রপ্তানি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, সোণারগাঁ-এ তৎকালে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মস্‌লিন ও অন্যান্য কার্পাস বস্ত্র পাওয়া যাইত। বাংলাতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইত। সোণারগাঁও হইতে বাংলার কার্পাস বস্ত্র ভারতের নানা প্রদেশে এবং ভারতের বাহিরে সিংহলে, পেগুতে, মলকা প্রভৃতি স্থানে চালান হইতে তিনি দেখিয়াছিলেন।

(৬) পাইরার্ড (Pyrard) ভারতের নানা প্রদেশে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৬০৭ খৃঃ তিনি বাংলায় আসিয়া রেশমের মত এক প্রকার উদ্ভিজ্জ আসের সূতায় সূক্ষ্ম কাপড়ের ব্যবসা দেখিতে পান। ঐ কাপড় এমন উজ্জ্বল ও সুন্দর ছিল যে, রেশমের বস্ত্রের মতই লোকেরা তাহার আদর করিত।

এই কাপড়ই বোধ হয় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রোল্লিখিত বাংলার প্রসিদ্ধ বাকলের কাপড়। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাংলার পঞ্চবিংশতি গৌরবের মধ্যে এই "দুকুল" ও রেশমী বস্ত্র বাংলার একটি গৌরব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কোটিল্য এই "দুকুল" বহুমূল্য মণিরত্নের মত রাজকোষে অতি যত্নে রক্ষা করার বিধান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (সাহিত্যসম্মেলনে ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বর্দ্ধমান অভিভাষণ)।

পাইরার্ড বলেন, তাঁহার সময়ে আফ্রিকা হইতে চীন পর্য্যন্ত সমস্ত নরনারীর আপাদমস্তক বস্ত্রাবরণ যোগাইত ভারতের তাঁত। আজ আমরা তাঁতে চরকায় আস্থাহীন।

(Compo's "Portugeses in India" p. 117, Moreland's "India at the death of Akbar" p. 178)

(৭) মানরিক (Manrique) ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে বাংলায় হুগলী বন্দরে "গিংহাম (Gingham) নামক এক প্রকার ঘাসের (grass) সুতার বস্ত্রের ও রেশমী বস্ত্রের প্রচুর রপ্তানি দেখিযাছিলেন। পাইরার্ড বোধ হয় এই ঘাসের আসের সুতার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

(৮) মানুসী (Manuccie) নামক বিখ্যাত ফরাসী ডাক্তার সাজাহানের দরবারে দীর্ঘকাল ছিলেন। তিনি ১৬৬০ খৃঃ বাংলার তৎকালীন রাজধানী ঢাকাতে আসিয়া প্রচুর পরিমাণে সুতার ও রেশমী কাপড়ের ব্যবসা দেখিয়াছিলেন। ঢাকা হইতে ঐ সব বস্ত্র তিনি ইয়োরোপে ও বিদেশের নানা স্থানে জাহাজে চালান হইতে দেখিয়াছিলেন। ( Storia de Magor Vol. VI, p. 429)

(৯) টেভার্নিয়ার ( Taverneer ১৬৬৬ খৃঃ ) তাঁহার বিখ্যাত ভারত-ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, বাংলা হইতে ফসিদা, জড়িদার, রেশমী ও কার্পাস বস্ত্র, ফরাসী প্রভন্ লাক্সুইভক ও ইতালীতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইতে তিনি দেখিয়াছেন।

(১০) ১৬৬৮ খৃঃ ২৪শে জানুয়ারী তারিখে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলাতস্থ ডিরেক্টরগণ কোম্পানীর ঢাকার রেসিডেন্টের নিকট যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে জানা যায় যে, "ঢাকার খাসা মস্‌লিন বিলাতে এত পরিমাণে রপ্তানি হইত যে, ঢাকাতে প্রেরিত বিলাতী মালের মূল্যের বিনিময়ে ও তাহার মূল্যের টাকার সঙ্কুলন না হওয়াতে, ঐ মস্‌লিনের উদ্বৃত্ত মূল্যের দরুণ বিলাত হইতে নগদ টাকা পাঠাইতে হইত।

(১১) সুরাটের বিদেশী বণিকরা ঢাকার মস্‌লিন এত বহুল পরিমাণে বিদেশে চালান দিত যে, নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে ঐ সব মালের মূল্যের টাকা বিদেশী মালের মূল্য দ্বারা পরিশোধিত না হওয়াতে ঢাকাতে আরকট মুদ্রার প্রচলন ছিল ( Bradlybirt's "Dacca" p. 116)

(১২) ঢাকার মস্‌লিন রোমের ধনী বিলাসিনীদের এমন সখের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, আড়াই লক্ষ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় ৩৭ সাইত্রিশ কোটী টাকার মস্‌লিন কেবল রোমেই বিক্রয় হইত (Commerce and statisitcs of India—Wacha p. 10)'

বিখ্যাত প্লিনী (Pliny Elden) রোমের ঐ অর্থনাশ নিবারণকল্পে মস্‌লিন বন্ধের জন্য আন্দোলন করেন (Indian Industrial Commissioner's Repbrt p. 295)

স্বনামখ্যাত কটন (cotton) সাহেব ১৮৯০ সনে লিখিয়াছিলেন যে, এক শতাব্দী কাল পূর্ব্বে ঢাকা হইতে বিদেশে প্রেরিত দ্রব্যের মূল্য ছিল এক কোটী টাকা। তখন ঢাকার লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ২ লক্ষ। ১৭৮৭ খৃঃ ঢাকা হইতে ৩০ লক্ষ টাকার মস্‌লিন কেবল ইংলণ্ডেই চালান হইয়াছিল। ( Quoted in Industrial Commissioner's Report p. 291)

সুতরাং ঢাকার বস্ত্র ব্যবসার সমগ্র আয় ধরিলে ঢাকাবাসীরা যে কেবল বস্ত্র-ব্যবসার আয়ের দ্বারাই সুখে স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই বয়ন-শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে যে আরও শিল্প-ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সুনিশ্চিত।

ঢাকার ব্যবসার সুদিনে ঢাকাতে পৃথিবীর নানাস্থান হইতে বণিকেরা ব্যবসার জন্য আসিত। কোম্পানীর আমলের বিবরণে জানিতে পারা যায় যে, ১৮২৩-২৪ খৃঃ ঢাকা হইতে ১৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকার মোটা কাপড় রপ্তানী হইয়াছিল। ১৮৭৫ সালে সর্ব্বরকমে ৫০ লক্ষ টাকার তাঁতের কাপড় ঢাকা হইতে চালান হইয়াছিল। (Good old days of John Company, Vol. II. p. 432).

(১৩) Bolts consideration of Indian affairs p. 200) নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজের লিখিত প্রাচীন বিবরণী হইতে জানা যায় যে, "বাংলার বস্ত্র তুলার ব্যবসা উপলক্ষ্য করিয়া এককালে বাংলাতে ভারতের এবং ভারতের বাহিরের নানাস্থান হইতে বহু ব্যবসায়ী বণিকের সমাগম হইত। পাঠান, মুলতানী, শ্যামদেশীয়, শিখ, বেলুচী বণিকেরা অশ্ব ও বলদের বহর লইয়া আসিয়া বাংলার শিল্পদ্রব্য লইয়া যাইত। বাংলার এই স্থলপথে চালিত ব্যবসায় অর্থাগম সমুদ্রপথে জাহাজবাহী পণ্য-বিক্রয়-মূল্যাপেক্ষা কম ছিল না।"

(১৪) রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতের আর্থিক দুর্গতি আলোচনায় বলেন যে, সমস্ত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চারি বৎসরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ১৫ হাজার বেল ( ৭৫ হাজার মন ) কার্পাস বস্ত্র এক কলিকাতা বন্দর হইতেই চালান হইয়াছিল। তারপর ১৮১৩ সন হইতে রপ্তানী বন্ধ হইয়া যায়। কেন, কি কারণে, কি অবস্থায় বন্ধ হয়, তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

ঢাকার বস্ত্র-ব্যবসায়ের সুদিনে পল্লী হইতে বহুলোক সহরে আসিয়া বস্ত্র-ব্যবসার সংস্রবে জীবিকার্জ্জন করিত। ঐ সময়ে ঢাকার রাস্তাগুলি বাজার বন্দর লোকে লোকারণ্য ছিল। ঢাকার উপকণ্ঠ ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী টাঙ্গী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঢাকাতে ঐ সময়ে ৯ লক্ষ লোকের বসতি ছিল। ঐ সময়ে ঢাকায় ৫৩ হাজার পল্লী ৫৬ হাজার বাজার ছিল বলিয়া এখনও প্রবাদ আছে (Bradlybirts "Dacca" p. 180)। এই বিবরণ অতিরঞ্জিত ধরিয়া লইলেও, সেই সময়ে অসংখ্য রাস্তা, গলি ও বাজার ছিল, এইটুকু বুঝা যায়।

কেবল ঢাকা বলিয়া নয়, ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের দিনে ঢাকার মত ভারতের অন্যান্য ব্যবসায় কেন্দ্রস্থানগুলি বিপুল শ্রমিক ও ব্যবসায়ী জনসঙ্ঘের বিশাল কর্ম্মস্থলীতে পরিণত হইয়া সমৃদ্ধ ও সুবিস্তৃত নগরের সৃষ্টি করিয়াছিল। বিদেশবাসীদের বর্ণনা হইতেই তাহা আমরা জানিতে পারি।

Gaurdian বলেন, আগ্রা পৃথিবীর মধ্যে খুব বড় সহর ছিল। Ralph Fitch বলেন, আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রী প্রত্যেকেই লণ্ডনের মত বড় ছিল। Bernier বলেন যে, দিল্লী প্যারিস নগরীর তুলনায় ছোট ছিল না। আগ্রাও দিল্লীর মত বড় ছিল। Coryat বলেন, লাহোর তাঁহার সময়ে কনষ্টান্টিনোপলের (রুম) সমকক্ষ ছিল। Paes বলেন, বিজয়নগর রোমের মত বড় ছিল। Debarros গৌড়ের বর্ণনায় বলেন, গৌড়ের রাজধানী ৯ মাইল বিস্তৃত ছিল এবং দুই লক্ষ লোকের বাসস্থান ছিল এবং তার রাজপথে ব্যবসাজীবিদের জনস্রোতে এত জনতা হইত যে, লোকচলাচলের কষ্ট হইত। Clive মুর্শিদাবাদকে লণ্ডন সহরের মত সুবৃহৎ দেখিয়াছিলেন।

কালচক্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব সুবিশাল নগরী বহু পরবর্ত্তী কালে বিরাট্ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। পরাধীন ভারতের সে পূর্ব্ব গৌরব আজ স্বপ্ন।

# দেশবন্ধুর স্মৃতি-অর্ঘ্য

শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

শুধুই কি স্মৃতি-সভা—শুধুই কি পটপূজা তবে
তোমার অমর স্মৃতি রেখে গেছ প্রতি ঘরে ঘরে,
শুধুই কবিতা আর শুধু অভিভাষণের মাঝে
তোমারে পাইবে লোকে, পাইবে না নিজ নিজ কাজে,
পাবে না আহুতি স্বাদ, করিবে না আত্মবিসর্জ্জন,
তুমি এসে দেখে যাবে বাঙালীর ঘৃণিত জীবন?
কি হবে তর্পণ করে'—যদি নাহি পারে দেশবাসী
তোমার আদর্শ নিয়ে তব সম হইতে সন্ন্যাসী,
সবারে বান্ধব করে' সবারে সমান ভালবেসে
এক ডোরে বেঁধে দিতে ছিন্নভিন্ন এ দুর্ভাগা দেশে
যদি না পারিল কেহ—তবে এক স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে'
কি হবে দেশের লাভ, কিবা হবে খণ্ডকাব্য পড়ে!
পঞ্চদশ বর্ষ আগে ভারতের ত্রিশ কোটি প্রাণ
তোমার অলঙ্ঘ্য-নীতি তোমার আশ্চর্য্য অবদান
কৃতাঞ্জলি হয়ে নিয়ে করেছিল মন্ত্র উচ্চারণ
"দেশপ্রীতি যদি পাপ—আমি পাপী, এ পাপ জীবন
সে দিন কোথায় গেল তব নামে হে চিত্তরঞ্জন,
হিন্দু আর মুসলমানে ক্রিশ্চিয়ানে করেছে বন্ধন
বন্দেমাতরম্ রাখী—প্রত্যেকের বাহুতে বাহুতে
ক্ষোদিত করেছে সবে এ দেশের সকল বস্তুতে
অগ্রগামী বাঙালীর ঋষিত্বের মহা-ইতিহাস
যার পুণ্যে উঠেছিল দেশব্যাপী মুক্তির আশ্বাস,
যার পুণ্যে দেখেছিল পশ্চিমের রাজরাজেশ্বর
এ জাতি অক্ষম নহে—এরা নহে অসভ্য বর্ব্বর।
সাহিত্য-দর্শন-শিল্প—ধর্ম্মভাব, কূট রাজনীতি
সকলই সহজসাধ্য ··তুচ্ছ করে পীড়নের ভীতি
এ জাতি স্বাধীন চিত্ত—এরা কারো পদানত নয়
এ দেশে সুরেন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, দেশবন্ধু হয়।

মাত্র এক যুগ গত এরই মধ্যে ধরেছে ভাঙ্গন,
তোমরা তুলেছ যাহা এরা তার ঘটায় পতন।
জীবন উষার কালে—পুনঃ ওই আসে অন্ধকার,
দেশবন্ধু তুমি এসো—জন্ম তুমি লভ পুনর্ব্বার।
এ শুধু স্মরণ নহে—ইহা নহে আত্মার তর্পণ—
এ তোমারে ফিরে ডাকা এ তোমারে পুনঃ আকর্ষণ।

# মরণ-মহেশ্বর

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

গ্রামের সীমানা ছাড়াইয়া যে পথ বহুদূর চলিয়া গেছে, সে পথ ধরিয়া রায়দীঘির ধারে আসিলে, মহেশ্বরের অশান্ত মূর্ত্তি তোমার চোখে পড়িবে। কবে কে এ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে অথবা মৃত্তিকার গর্ভ হইতে আপনি এ জন্ম লইয়াছে কি না, সে কথা কেহ জানে না; কিন্তু ওই মূর্ত্তি যত বার তোমার চোখে পড়িবে ততবার যদি তুমি সশ্রদ্ধ নমস্কার না কর, তাহা হইলে তোমার মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী সেকথা জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস। গ্রামের শিক্ষিত লোকেরা তাই ওই মূর্ত্তির নাম দিয়াছে মরণ-মহেশ্বর।

নিরঞ্জনের মুখে শ্যামাময় ওই আশ্চর্য্য ভয়াল মূর্ত্তির গল্প শুনিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে নিরঞ্জনের আত্মীয়—এ গ্রামে চাকরী লইয়া নূতন আসিয়াছে, নিরঞ্জনের বাড়ীতেই থাকে। তাহারা দুইজন শুধু বাড়ীর বাসিন্দা।

হাসি থামাইয়া শ্যামাময় বলিল, 'তুমিও ওসব বাজে ইয়ে বিশ্বাস কর?'

'করি বই কি', নিরঞ্জন বলিল, 'চোখে দেখা ঘটনা তো আর অবিশ্বাস করতে পারি না!'

'আজকালকার ছেলে যে এ রকম হতে পারে, সেকথা আমার জানা ছিল না নিরঞ্জন।'

'অনেকেরই অনেক কিছু জানা থাকে না।'

'গেঁয়ো ভূত', শ্যামাময় নিরঞ্জনের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, 'তুমি ওই মূর্ত্তিকে নমস্কার না করিয়া দেখ একবার, তোমার কিছুই হবে না।'

'সে সাহস আমার নেই শ্যামাময়।'

'আচ্ছা', কি ভাবিয়া শ্যামাময় বলিল, 'দেখিয়ে দিও আমায় তোমাদের মরণ-মহেশ্বর, আমি নমস্কার না করে' দেখাব কিছুই হবে না আমার।'

'কিন্তু তুমি নমস্কার না করলে, তোমার মৃত্যুর জন্যে যে আমাকেই দায়ী হতে হবে।'

আকাশে মেঘ জমিয়া উঠিল, বাতাস বহিতে লাগিল হু-হু করিয়া, ঝুপ্-ঝুপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল বৃষ্টি।

আসন্ন প্রলয়ের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া লম্বা লম্বা পা চালাইয়া দেবী ঘোষ ছুটিল ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে। মূর্ত্তিকে নমস্কার করার কথা তাহার মনেই ছিল না।

আর কি আশ্চর্য্য, সেই রাত্রেই আক্রান্ত হইল দেবী ঘোষ ভয়ঙ্কর বিসূচিকা-রোগে। যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিল সে। লোক জমিল। তাহারা শুনিল দেবী ঘোষের আর্ত্তনাদ, 'উঃ, মাপ কর, মাপ কর আমায় শিব ঠাকুর, তোমায় নমস্কার করার কথা একেবারে আমার মনে ছিল না, মাপ কর এবার, উঃ—"

অসহ্য কষ্ট পাইয়া দেবী ঘোষ একদিন মরিল।

একদা পুলিন সরকার মহেশ্বরের মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া একবার মুচকিয়া হাসিল। কি মূর্খ জনসাধারণ, কুসংস্কার তাহাদের হৃদয় একেবারে জয় করিয়া ফেলিয়াছে—পুলিন সরকার মনের মনে ভাবিল এবং মূর্ত্তিকে নমস্কার না করিয়া আস্তে আস্তে পথ চলিতে লাগিল।

কিন্তু কয়েক পা অগ্রসর হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল পুলিন সরকার—পায়ে বিষাক্ত সাপ ছোবল মারিয়াছে।

বহু ওঝা আসিল; কিন্তু বিষ কেহই নামাইতে পারিল না। পুলিন সরকারের মৃত্যু হইল।

একদিন সদলবলে তরুণ জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ রায় দীঘিতে মাছ ধরিতে আসিলেন।

জনৈক মোসায়েব বলিল, 'মূর্ত্তিকে নমস্কার করুন হুজুর।'

'দুত্তোর!' জমিদার মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

তারপর একদিন খবর পাওয়া গেল—তরুণ ইন্দ্রনারায়ণ নৌকাডুবি হইয়া মরিয়াছেন।

স্বর্ণপুর গ্রামের যে কোন লোকের মুখে এমন অনেক আজগুবি অবিশ্বাস্য গল্প শোনা যায়।

শ্যামাময় হাসিয়া বলিল, 'তুমি কি ধরে' রেখেছ—মূর্ত্তিকে নমস্কার না করলে সত্যি সত্যিই আমার মৃত্যু হবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'তুমি যে এখনও এতদূর গেঁয়ো, আজ সে কথা সত্যি ভাই নিরঞ্জন, আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।'

'চোখের সামনে কয়েক জনের মৃত্যু পরপর দেখলে তুমিও শ্যামাময় আমারই মতে মত দিতে।'

'একটা আজগুবি কথা কেমন করে' বিশ্বাস করব নিরঞ্জন?' একটু থামিয়া আবার শ্যামাময় বলিল, 'যা হোক, তোমাদের রুদ্রদেবকে আমায় যথাসম্ভব শীঘ্র দেখিয়ে দিও।'

'দেব, কিন্তু ছেলেমানুষী করতে যেও না।'

'দেখা যাক কি হয়।'

সে রাত্রে অনেকক্ষণ অবধি শ্যামাময়ের চোখে ঘুম আসিল না। অদেখা মরণ-মহেশ্বরের কথা সে ভাবিতে লাগিল। এমন বহু ব্যাপার সে অনেকের মুখে শুনিয়াছে—কবে কোন দেবতার পূজা না দিয়া এক বংশ নাকি একেবারে উজাড় হইয়া গিয়াছিল—এমন অনেক গল্প। মূর্ত্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ভয়াল মূর্ত্তির স্বপ্ন দেখিল শ্যামাময়। নিবিড় তিমির রাত্রি। কে যেন শ্যামাময়কে এক বিরাট্ বটগাছের নীচে আনিয়া দাঁড় করাইল। চারিদিক্ হইতে কাহারা যেন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভগ্নকণ্ঠে রহিয়া রহিয়া তীক্ষ্ণ পৈশাচিক আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। হঠাৎ হা-হা-হা করিয়া কে যেন অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল।

চমকিয়া শ্যামাময় দেখিল সেই মূর্ত্তির দিকে। অমনি হাত নাড়িয়া সে মূর্ত্তি বলিল,—'আমায় অপমান কর' না—ভীষণ কষ্ট পেয়ে মরবে—' চারিদিক্ হইতে ভাসিয়া আসিল তীব্র অট্ট হাহাকার। আর সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলওয়ালা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ কোথা হইতে আসিয়া শ্যামাময়ের একটি হাত ধরিল। ভীষণ ভয় পাইয়া হাত ছাড়াইয়া লইতে গেল শ্যামাময়। তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল এইবার।

দিন কয়েক পর একরাত্রে শ্যামাময় বলিল, 'অনেক দিন আমায় ঠেকিয়ে রেখেছ, আর না; এবার দেখাও তোমাদের জাগ্রত দেবতাকে।'

নিরঞ্জন বলিল, 'কি দরকার, বেশ তো আছ।'

'কিন্তু কেন তোমার আপত্তি?'

'যেহেতু তোমার বিপদের সম্ভাবনা।'

'ওঃ', শ্যামাময় হাসিল, 'কিন্তু আমি ঠিক করেছি একটা কিছু কালকেই করব।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ তোমার এবং গ্রামের লোকের ভুল ধারণা ভেঙে দেব।'

'পাগলামী কর না শ্যামাময়', নিরঞ্জন হাসিল।

'পাগলামী নয় নিরঞ্জন, হ্যাঁ কালকেই—'

বাধা দিয়া নিরঞ্জন বলিল, 'কি দরকার দেবতাকে অপমান করবার?'

'তোমাদের কুসংস্কার শুধু আমি উড়িয়ে দিতে চাই, সকলের সামনে কাল বিকালে মূর্ত্তিকে নমস্কার না করে' আমি বাড়ী আসব, তুমি সকলকে বলে' দিও নিরঞ্জন', শ্যামাময়ের মুখে স্থিরতার ছায়া।

'কিন্তু কিছু যদি তোমার হয়—'

'না, না, না নিরঞ্জন, আমার কিছুই হবে না।' স্বপ্ন দেখিয়া শ্যামাময়ের জিদ বাড়িয়া গেছে।

নিরঞ্জন বলিল, 'রাত অনেক হ'ল।'

তাহারা ঘুমাইতে গেল।

সেই ক্রুদ্ধ মূর্ত্তির স্বপ্ন আবার দেখিল শ্যামাময়। ইচ্ছা করিয়া মরণ ডাকিয়া আনিতে বার-বার মূর্ত্তি শ্যামাময়কে বারণ করিতেছে।

পরদিন অপরাহ্নে জনসাধারণ ভীড় করিল নিরঞ্জনের বাড়ীতে।

প্রবীণ নারায়ণ আগাইয়া আসিয়া শ্যামাময়ের একটা হাত ধরিয়া বলিল, 'বাবু, এ ছেলেমানুষী কর না, কেন এমন সোণার প্রাণ নষ্ট করবে—' কিছু না বলিয়া শ্যামাময় হাত ছাড়াইয়া লইল।

এবার কথা বলিল দেবী ঘোষের পুত্র, 'তোমার হাতে ধরে' বলছি—একাজ ক'র না, আমার বাবার কষ্ট যদি দেখতে দাদাবাবু—' দেবী ঘোষের পুত্র চোখ মুছিল।

'আমি তোমাদের ভুল ভেঙ্গে দেব', শ্যামাময় বলিল।

'তুমি মরবে, কেউ বাঁচাতে পারবে না।'

একটু বিরক্ত হইয়া নারায়ণকে শ্যামাময় বলিল, 'বাজে কথা ব'ল না, তোমাদের কুসংস্কার আমি উড়িয়ে দেব।'

'দেবতাকে নমস্কার না করে' অনেকে মরেছে, তুমিও মরবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। বারবার বলছি একাজ ক'র না, তুমি মরবে মূর্ত্তিকে নমস্কার না করলে, নিশ্চয়ই মরবে।'

'না, না, না, আমি মরব না, কেন তোমরা মিথ্যা ভয় দেখাচ্ছ আমায়?'

'মিথ্যা নয় দাদাবাবু', দেবী ঘোষের পুত্র বলিল, 'ইচ্ছে করে' মরণ ডেকে এন না।'

'আর দেরী নয়', শ্যামাময় চলিতে লাগিল, 'চল তোমরা আমার সঙ্গে, এখুনি আমি দেখব তোমাদের মরণ-মহেশ্বরকে।'

নিরঞ্জন বলিল, 'কিন্তু শ্যামাময় শেষ বার বলছি—এর ফল ভাল হবে না।'

'তাই নাকি?' শ্যামাময় গম্ভীর হইয়া বলিল।

বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া সকলে শ্যামাময়ের সহিত চলিতে লাগিল।

রায়দীঘির ধারে আসিয়া শ্যামাময় শিহরিয়া উঠিল। প্রথমে স্বপ্নে সে যাহা দেখিয়াছিল, তাহা যেন প্রায় সত্য হইয়া উঠিয়াছে। একটু ভয় পাইয়া চারিদিকে শ্যামাময় চাহিয়া দেখিল। সামনে মরণ-মহেশ্বর, ডাণদিকে বিরাট্ বটগাছ, বাঁ-দিকে নিঃসঙ্গ মাঠ আর মাথার উপর খোলা আকাশ। শ্যামাময় মিনিট কয়েকের জন্য চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কি করিবে ভাবিয়া পাইল না।

'শ্যামাময়, চল ফিরে যাই', গম্ভীর কণ্ঠে নিরঞ্জন বলিল। ভীত জনসাধারণের দিকে চাহিয়া শ্যামাময় শুধু বলিল, 'না।'

'বাবু', কোন একজন বলিল, 'তুমি লেখাপড়া শিখেছ, কিন্তু এ যে মূর্খের কাজ।'

'কেন মরবে বাবু?'

'মিথ্যা ভয় দেখিও না', শ্যামাময় গলার স্বর চড়াইল, 'দেখ তোমাদের ভুল ধারণা ভাঙ্গব আমি এবার, একবার নয়, তিনবার আমি ওই মূর্ত্তিকে নমস্কার করব না।'

কাহারও মুখে কথা নাই। শ্যামাময়ের দুঃসাহস দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়াছে।

'এই দেখ', শ্যামাময় হাসিতে চেষ্টা করিল। তারপর মূর্ত্তির দিকে আগাইয়া গেল সে। তিন বার আগাইয়া গেল, তিন বার পিছাইয়া আসিল, তিন বারই মরণ-মহেশ্বরকে নমস্কার করিল না।'

'দেখলে?' জনসাধারণের দিকে চাহিয়া দেখিল শ্যামাময়—প্রত্যেকেই মূর্ত্তিকে করিতেছে বার বার নমস্কার।

'কি করলে দাদাবাবু!' দেবী ঘোষের পুত্র আগাইয়া আসিল, 'তোমার মরণ এবার কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

প্রবীণ নারায়ণ বলিল, 'দাদা, বাঁচবে না তুমি আর।'

'শ্যামাময়, কি করলে তুমি!' নিরঞ্জনের মুখে উৎকণ্ঠা, আর সকলে 'হাঁ' করিয়া শ্যামাময়ের মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল, কিছু বলিবার শক্তি তাহাদের নাই।

'যাও তোমরা আমার সামনে থেকে', একটু বিরক্ত হইয়া শ্যামাময় বলিল, 'তোমরা জোর করে' আমার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিচ্ছ।' থামিয়া আবার সে বলিল, 'আমি যাব না এখন, যাও তোমরা।'

সূর্য্য অস্ত গেল। সকলে চলিয়া গেছে। মরণ-মহেশ্বরের সামনে শুধু একাকী শ্যামাময় দাঁড়াইয়া। কেন লাগিতেছে ভয়? কেন কাঁপিতেছে তাহার সারা অঙ্গ? মূর্ত্তি যেন অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাসাইতেছে। ভয় পাইয়া শ্যামাময় ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল রায়দীঘির ধারে।

সন্ধ্যার কালো ছায়া নামিল। আর সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাময়ের সারা অঙ্গ হিম হইয়া গেল যেন। কে যেন কাণের কাছে বার বার রহিয়া রহিয়া বলিতেছে, 'তুমি মরিবে, তুমি মরিবে, তুমি মরিবে।'

'সত্যিই যদি আমি মরি!' শ্যামাময়ের মুখে ভয়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন। পৃথিবীর আলো যদি চোখ হইতে মুছিয়া যায়! চারিদিকে নিস্তব্ধতা। লোকজন কেহ কোথাও

নাই। অন্ধকারে শ্যামাময়ের ভীষণ ভয় করিতে লাগিল। আগুন জ্বলিতে আরম্ভ করিল তাহার বুকে। কিন্তু কেন এ কুসংস্কারে বিশ্বাস করিতেছে সে? কেন এ ভয়? কেন মরিবে সে? কি করিয়াছে শ্যামাময়? সে বাজে সামান্য কথাটাকে ভুলিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না। অন্ধকার অকস্মাৎ আরও ঘন হইয়া উঠিল তাহার চোখে। পলকে একবার শ্যামাময়ের মনে পড়িল সেই দুঃস্বপ্নের কথা। শিহরিয়া উঠিল সে।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, কিন্তু তখনও শ্যামাময় ফিরিল না দেখিয়া নিরঞ্জন ব্যস্ত হইয়া তাহার সন্ধানে বাহির হইল।

রায়দীঘির ধারে আসিয়া নিরঞ্জন দেখিল—তাহার পায়ের কাছে একজন মানুষ পড়িয়া আছে। বুঝিতে আর দেরী হইল না যে, সে শ্যামাময়। এরই মধ্যে শেষ হইল নাকি? নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি ঝুঁকিয়া পড়িল শ্যামাময়ের দেহের উপর।

'শ্যামাময়, শ্যামাময়—' নিরঞ্জন ডাকিল।

'কে, নিরঞ্জন? আমার কি হয়েছিল?'

রাগিয়া নিরঞ্জন বলিল, 'কেন জিদ করতে গেলে শ্যামাময়? এখন তোমাকে বাঁচাব কেমন করে'?'

'কেন মিথ্যা ভয় দেখাচ্ছ নিরঞ্জন?' শ্যামাময় উঠিয়া বসিল, 'তোমরা কি জোর করে' আমায় মেরে ফেলবে?'

'শ্যামাময়, তুমি মরবেই, বাঁচবার আর কোন উপায় নেই। এখন যদি হাজার বার মূর্ত্তিকে নমস্কার কর, তা' হলেও তুমি বাঁচবে না।'

হঠাৎ ভীষণ জোরে হা-হা করিয়া পাগলের মত শ্যামাময় হাসিয়া উঠিল। সে হাসি শুনিয়া নিরঞ্জন চমকিয়া একটু সরিয়া বসিল; তাহার মনে হইল—শ্যামাময় যেন স্বাভাবিক অবস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সেই ভয়াল মরণ-মহেশ্বর ক্রুদ্ধ চোখে হাত নাড়িয়া বলিতেছে, 'কেন আমায় তুচ্ছ করলে? তিল তিল করে' পুড়িয়ে মারব—আমি তোমায় গ্রাস করব। আমাকে অপমান! তুমি মরবে—কুকুরের মত কষ্ট পেয়ে মরবে—' চীৎকার করিয়া শ্যামাময় বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। ছুটিয়া আসিল নিরঞ্জন।

'কি হ'ল শ্যামাময়?'

'নিরঞ্জন', শ্যামাময়ের ভয়কম্পিত কণ্ঠস্বর, 'তুমি থাক, আমায় ছেড়ে যেও না, মরণ-মহেশ্বর আমায় গ্রাস করবে। নিরঞ্জন—নিরঞ্জন, ভয় লাগছে আমার—' নিরঞ্জন বোকার মত দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রায় প্রতি রাত্রেই এমন হয়। স্বপ্ন দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে শ্যামাময়। তাহার যেন কি হইয়াছে, কিছুই ভাল লাগে না, কোন কাজে আর মনও লাগে না। শ্যামাময়ের কেবলই মনে হয় সে মরিবে—সে মরিবে, যেমন অন্যেরা মরিয়াছে মূর্ত্তিকে নমস্কার না করিয়া শ্যামাময় বুঝিতে পারে—তাহার মরণ আগাইয়া আসিতেছে আস্তে আস্তে। দেবতার ক্রোধে কেমন করিয়া ঠেকাইবে সে? তাহার আহারে বিহারে, ঘুমে জাগরণে, কল্পনায় চিন্তায় বিরাজ করে শুধু মরণ-মহেশ্বর।

কিন্তু সত্যই শ্যামাময় একদিন আক্রান্ত হইল কঠিন মানসিক রোগে। নিরঞ্জন ভয় পাইল।

একদিন নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ভাব শ্যামাময়?'

'কিছু না নিরঞ্জন', শ্যামাময় হাসে। প্রাণহীন সে হাসি।

'কেন লুকাও শ্যামাময়? তুমি ভয় পাও না?'

'ভয়!' শ্যামাময় রাগিয়া যায়, 'না, ভয় পাব কাকে?'

'তবে তুমি রাত্তিরে চেঁচিয়ে ওঠ কেন?'

'নিরঞ্জন, তুমি এ ঘর থেকে যাও', শ্যামাময় ক্ষেপিয়া উঠে, 'যাও আমার সামনে থেকে, তোমরা জোর করে' আমায় মেরে ফেলবে—তোমরা কেবলই মিথ্যা ভয় ঢুকিয়ে দিচ্ছ আমার মনে, যাও—' নিরঞ্জন বাহির হইয়া গেল।

শ্যামাময়ের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল শুধু সে প্রলাপ বকে। ডাক্তার আশা ছাড়িয়া দিল।

এক গভীর রাত্রে শ্যামাময় চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ওই যে মরণমহেশ্বর আমায় নিতে এসেছে, উঃ কী ভীষণ! আমি আর বাঁচব না, এবার বুঝি আমার সময় হ'ল—' নিরঞ্জন ঘাবড়াইয়া গেল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

একটু পরে আবার অকস্মাৎ শ্যামাময় চীৎকার করিয়া উঠিল, 'নিরঞ্জন, আমি চেয়েছিলাম তোমাদের ধারণা উড়িয়ে দিতে, মিথ্যা বিশ্বাস ভেঙে দিতে, এখনও বলছি, যদিও আমার বলবার আর মুখ নাই—তোমাদের ধারণা ভুল, সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমি মরছি কিন্তু মূর্তিকে নমস্কার না করার জন্যে নয় ভাবনার জন্যে, চিন্তা চিন্তা—ভয়, ভাবনা ভাবতে আমার অসুখ হ'ল আর ভাবনাই আমায় মেরে ফেলবে—মূর্তি কিছু না, মিথ্যা তোমাদের বিশ্বাস—ভাবনা, চিন্তা, ভয়—উঃ—' অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া শ্যামাময় উঠিতে চেষ্টা করিল এবং উঠিতে গিয়া কটমট করিয়া একবার নিরঞ্জনের মুখের দিকে তাকাইল তারপর আবার ধপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

আর উঠিল না।

# সাউরিয়া নৃত্য

শ্রীক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য্য

আজি সাউরিয়া* দল
মাদলের বোলে
চাতালে নৃত্য মাতোয়াল।

(তোরা) খুলে রাখ্ আজ
মানের খোলস্
চুপ করে শোন্ ক্ষণকাল!

ধরি' সাগর দানার ছল
ঢেউয়ের ভঙ্গী
অঙ্গে দোলায়ে
মরদ বীরের দল
(শোন্ ঐ) বাজায়ে মাদল
দাদুরীর বোলে
চালায় চরণ চঞ্চল্!

খুলে রাখ্ আজ
মানের খোলস্
চুপ্ করে শোন্ ক্ষণকাল!

নৃত্য-রণনে শিহরি' শিহরি'
দলের যতেক আউরাৎ
করে ভয়-ভান
ছল অভিমান
মিনতির সুরে কস্রৎ।

দুলিয়া দুলিয়া
গ্রীবা বাঁকাইয়া
আঁখির ঝলকে
পুলক হানিয়া
রণিয়া রণিয়া
রতি-মদিরায়
করে দানবেরে পরাজয়—
তারা নর্ত্তন-তালে তন্ময়।

পায়ের কল্লিণ†
ঝিল্লীর রবে
রুণু গুঞ্জন বোলে
কম্পিত থর
নাকের বেসর
হাঁসুলী বিজুলী খেলে,
দেহ-দরিয়ায়
সুর মদিরায়,
(শত) পুলক লহরী তুলি'
কল - কল্লোলে
মৃদু হিল্লোলে
নাচে মাদলের তালে দুলি।
ঘন নিক্কণে
সুর সঞ্চারি'
করে ধরার চিত্ত তান্মাতাল
তোরা চুপ্ করে শোন ক্ষণকাল্
আজি সাউরিয়া দল
মাদলের বোলে
চাতালে নৃত্য মাতোয়াল।

* সাঁওতাল কুলি।

† পায়ের নূপুর।

১৫

বাঙ্গালী সৈনিকেরা ঘরে ফিরিল। হৃদয়ে নবানুভূতি নূতন-রূপে প্রকাশ হইতে চাহিল। স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বাংলার তরুণ যে যুগে দলে দলে কারা-বরণ করিতেছিল, সেই যুগে একদিকে বিপন্ন বাঙ্গালীর দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী অশ্রুসিক্ত নয়নে যেমন মর্ম্মন্তুদ সুরে 'প্রবর্ত্তকের' বুকে আঁকিতেছিলাম, তেমনই এ কথাও সে দিন ঘোষণা করিতে বাধে নাই, ভারতের রাষ্ট্রবিধাতা বৃটিশ জাতির আশ্রয়ে দাঁড়াইয়াই আমাদিগকে শক্তিশালী সঙ্ঘ রচনা করিতে হইবে। এই দুঃসাহসের কথা আজিকারই মত সে দিন বলাও সহজ ছিল না। চন্দন-নগরের ষড়বিংশতি জন যুবক ফরাসীর রণাঙ্গনে তাৎকালীন বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ ফরাসীর বিখ্যাত সেভেন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার কামান পরিচালনা করিয়া সে দিন জার্ম্মাণ জাতির হৃৎকম্প উপস্থিত করিয়াছিল। এই ষড়বিংশতি জনকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া সেন্টমিহি-এলের নিকটস্থ কতক স্থান রক্ষার ভার ইহাদের হস্তে প্রদান করিয়া ফরাসী জাতি সে দিন নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তাহাদের উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহস দর্শনে প্রীত হইয়া ফরাসী গোলন্দাজ বাহিনীর অধ্যক্ষ আমায় লিখিয়াছিলেন "বাঙ্গালীর মত যদি ফরাসী জাতির আরও কয়েকটা ব্যাটেলিয়ান থাকিত, তবে আজ আমরা ফরাসীর সীমারেখায় এক অদ্ভুত যুদ্ধাভিনয় দেখাইয়া শত্রুবাহিনীকে চমৎকৃত করিয়া তুলিতাম।"

এই ঘটনায় আমার মনে হইয়াছিল—ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে হইলে, রাজশক্তির সহিত বিরোধ না করিয়া, অতি স্পষ্টতার সহিত, সৎসাহস ও অসাধারণ ধৈর্য্যের সহিত শক্ত চরিত্রের সঙ্ঘবদ্ধ দেশ-বাসীকে তাঁহাদের সহায় হইয়াই রাজ্য-শাসনের সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা আয়ত্ত করিতে হইবে। রাজশক্তির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ রাখিয়া আমরা সংহতিবদ্ধ হইতে চাহিলেও তাহা নানা কারণে কার্য্যকরী হইবে না, আবার অন্তরে তাঁহাদের উচ্ছেদ-কামনা রাখিয়া যদি ছল পূর্ব্বক এই সহায়তার পথে অগ্রসর হই—অন্তর-বাধায় আমরা এই পথেও সিদ্ধকাম হইব না। আমাদের মানুষ হইতে হইবে— অতএব মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রাখিয়া প্রবলের সহিত যুক্তিই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল হইবে। ফরাসী জাতি চন্দননগরের বাঙ্গালী সৈনিকদের এইরূপ চরিত্র ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়াছিলেন; তাই তাহারা বাঙ্গালী সৈনিকের একটা চিরস্থায়ী ব্যাটেলিয়ান গড়ার প্রস্তাব উত্থাপনও করিয়া-ছিলেন। এই কার্য্য ফলপ্রসূ করার সাধ্য আমার ছিল না—সে আশা সেদিন হৃদয়ে অঙ্কুররূপে উদ্গত হইয়া অঙ্কুরেই শুখাইয়া গিয়াছিল।

বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের অগ্রগামী হইয়া যে প্রাণশক্তির সন্ধান পাই নাই—সতত গোপননীতির আশ্রয়ে মূষিক-স্বভাবই তাহাতে বড় হইয়া উঠিতেছিল - দেশের মতবাদ সেদিনও আমার পরিপন্থী ছিল—দেশ-প্রীতির ভুয়া আদর্শবাদ সেদিনও অনেকের ওষ্ঠপুটের সামগ্রী ছিল। উহা আমি লঙ্ঘন করিয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অকপট সহায়রূপে চন্দননগরে সেনাবাহিনী গড়ায় সফলকাম হই, আর এই সেনাবাহিনীই ভারতের সর্ব্বপ্রথম গোলন্দাজ-বাহিনী। এই ঐতিহাসিক সত্য স্মরণ রাখিবার জন্যই এই কয় ছত্র লেখা এই ক্ষেত্রে সংযোজিত করিলাম।

চন্দননগরের সৈনিকজীবনের গৌরবকাহিনী বৃটিশ রাজ্যে নূতন জীবনের সাড়া তুলিয়াছিল। মেসোপটেমিয়ায় বাঙ্গালী সৈনিক-দল-প্রেরণ তাহার প্রমাণ। বীর মনোরঞ্জন সর্ব্বপ্রথম সঙ্ঘের সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিল; সেও ছিল মেসোপটেমিয়াপ্রত্যাগত এক জন বীর সৈনিক।

সে দিন রাজশক্তি প্রতি পদে বলিতেন—'বাঙ্গালীর চরিত্র বস্তুতঃ বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তাহাদের অন্তরে রাজবিদ্বেষের হলাহল পরিপূর্ণ রহিয়াছে।' হোম-

রুল আন্দোলনে বিবি বাসন্তী কারারুদ্ধ হইলে, তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া বাংলার রাজবন্দীগণের মুক্তির জন্য যে প্রবল আন্দোলন হয়, সেই আন্দোলনের উত্তরেও বাঙ্গালী সেনা-বাহিনীগঠনের প্রতিপক্ষে রাজপুরুষগণের মুখে আমরা উক্তরূপ কথা শুনিতাম। পরে ইউরোপের কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে ইংরাজ জয়ী হইলে, বৃটিশ জাতির কর্ণধারগণ মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভারতবর্ষকে নূতন শাসনসংস্কার দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু অন্য দিকে ইংরাজের কারাগারে রাজবন্দীগণ অনাহারে উৎপীড়নে একের পর এক আত্ম-হত্যা করিয়া চলিতেছিল। এই অবস্থা অনতিক্রম করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে রাজশক্তির সহিত সহযোগিতায় আমরা সংশয় ও অস্পষ্টভাব বাহিরে দেশে এক শক্তিশালী সংগঠনপরায়ণ সংহতি গড়ার প্রচেষ্টা করিতেছিলাম। এই আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ত্তি দেশের বৈপ্লবিক সংস্থার মধ্যে সম্ভব হইতে পারে না, আবার ভারতের জাতীয় সমিতির অন্তর্গত হইয়াও ইহা সুসিদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে—এই ধারণা দৃঢ় ছিল, এখনও আছে। এই সংগঠন-সংহতি স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবেই গড়ার প্রচেষ্টায় তাই আমি উদ্বুদ্ধ হই। আজ এ নীতির প্রশংসা-বাণী কর্ণগোচর হয়; সে দিন উহার প্রতি-কূলতা কম ছিল না। "প্রবর্ত্তকের" ছত্রে ছত্রে বিশদ করিয়া গঠননীতির কথা বাহির হইতেছিল। শ্রীঅরবিন্দকে আমি এই সংহতি-সৃষ্টির কথা জানাই। ইহার জন্য আমার দুইটি প্রস্তাব ছিল। প্রথম প্রস্তাব—এই সংহতি স্বাবলম্বী হইবে এবং স্বাবলম্বনের সাধনা-স্বরূপ তাহারা নিজেরাই অন্নক্ষেত্র গড়িয়া তুলিবে ও স্বহস্তে বস্ত্রশিল্পের উদ্ধার করিবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—এই সংহতি যোগপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইহাদের অর্থভাণ্ডার এক হইবে। শ্রীঅরবিন্দ আমার দীর্ঘ পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া উহা সমর্থন করেন। এবং 'প্রবর্ত্তকে" এইরূপ সংহতি সঙ্ঘ নামে অভিহিত হওয়ায়, শ্রীঅরবিন্দ 'সঙ্ঘ' নামটীও সমর্থন করেন। ইহার পর হইতেই আমরা প্রকাশ্যে "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ" নাম প্রকাশ করি।

"প্রবর্ত্তকের" পাতায় এই সময় লিখিয়াছিলাম;—

"ধর্ম্মই সঙ্ঘের সহায়। ভগবচ্ছক্তিই আমাদের অবলম্বন। অহংমিকার কঠিন বন্ধন ঈশ্বরবিশ্বাসে খণ্ড খণ্ড করিয়া বাংলার চরিত্রগত বলের অদ্ভুত নিদর্শন প্রদর্শন করিব। আমরা মুক্ত স্বচ্ছন্দ, কোন বন্ধন আমাদের নাই; মানবজাতির মঙ্গল-সাধনের ব্রত-ধারী আমরা হইব। কালধর্ম্মের প্রবল বাধা আমরা অতিক্রম করিব। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার পথে যে সকল অন্তরায়, তাহা পশুবলপ্রয়োগে দূর করা সঙ্ঘ-চরিত্রের উপযোগী অস্ত্র নহে। নৈতিক বলের দ্বারাই উহা দূর হইবে। বিশ্বাস, ধৈর্য্য ও চরিত্রবল লইয়া আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইব। সকল অন্তরায় সূর্য্যপ্রকাশে কুয়াশার মত অন্তর্হিত হইবে।"

এই সময়ে আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ও সুরেশচন্দ্র 'প্রবর্ত্তকে' লেখনী ধারণ করিয়া সঙ্ঘের যৌগিক আদর্শকে প্রাঞ্জল ও তেজস্বী ভাষায় দিনের পর দিন সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতেছিলেন। ইউরোপে শান্তির ডঙ্কা বাজিয়া উঠিলে, "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ" সর্ব্বপ্রথম বীর সৈনিক শ্রীমান্ হারাধনকে বাংলার তটপ্রান্তে সুন্দর বনে কৃষিক্ষেত্রনির্ম্মাণের কার্য্যে পাঠাইয়া দেয়। আর আমাদের অকৃত্রিম সুহৃৎ শ্রীযুক্ত সাগর কালী ঘোষ "মৃণালিনী বস্ত্রবয়নশালা" গঠন করিয়া একটি কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করেন। বাংলার এই নিভৃত ক্ষেত্র চন্দননগরে বাঙ্গালী সৈনিকদল-গঠনের যেমন প্রথম সূত্রপাত হয় ও এই চন্দনগরের তরুণ বাহিনীই কামান-পরিচালনায় যেমন প্রথম অধিকার লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ বাংলার স্বাবলম্বন সাধনায় শিক্ষিত বাঙ্গালী সর্ব্বপ্রথম হলস্কন্ধে মাঠে গিয়া দাঁড়াইল চন্দননগরেরই তরুণ; আর খাদি-বস্ত্রপ্রবর্ত্তনের সর্ব্বপ্রথম প্রচেষ্টাও 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘেই' সূচিত হয়। এই সকলের সাক্ষ্য ভার্দুন যুদ্ধের ইতিহাস, সুন্দরবনের কৃষিক্ষেত্র এবং প্রবর্ত্তক খাদি বিভাগ।

'জীবনসঙ্গিনী' লিখিতে গিয়া কথাগুলি অবান্তর মনে হইতে পারে; কিন্তু জীবন-রঙ্গে দিবারাত্র যিনি আমার সহযাত্রী, এই কর্ম্মসৃষ্টির সহিত তাঁহার জীবনপরিচয়ও অবিভাজ্য।

সেদিন সমবেত বন্ধুদের মধ্যে দাঁড়াইয়া অকস্মাৎ প্রতিশ্রুতি লইলাম, স্বহস্তে কার্পাস চাষ করিয়া উহা হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়া বস্ত্রনির্ম্মাণ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি একই বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিব। বৈরাগ্যের উৎকট অনল

এমন করিয়াই নানা উপলক্ষে আমার অস্থি-পঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া প্রকাশ হইতে চাহিত, কিন্তু সে অগ্নিকে আবরণ দিবার সুধা-হস্ত আমায় সতত বেষ্টন করিয়া থাকিত, বৈরাগ্যমূর্ত্তি আর প্রকাশ পাইত না। আমার এই সঙ্কল্প-মন্ত্র সহসা উচ্চারিত হওয়া মাত্র গৃহদেবী হা-হা করিয়া উঠিলেন। তাঁর অন্তরের আকুতি বিধাতাও শুনিতেন। সেদিন আমার এক অকৃত্রিম সুহৃৎ ভূনত হইয়া আমার এই সঙ্কল্পপালনের ইচ্ছা স্বয়ং ভিক্ষা চাহিয়া লইল। গৃহদেবী স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের পরিচয় বটে, কিন্তু তিনিও যে অসহায়। ইষ্টমূর্ত্তির যে রূপ ও আকৃতি তাঁহার হৃদয়মন্দিরে পূজার আসন অধিকার করিয়াছিল, তাহার অন্যথা হইতে না দেওয়াই ছিল তাঁর স্বভাব ও স্বধর্ম্ম। যে বন্ধু আমার ব্রতভার বহন করিয়া সম্বৎসর এক বস্ত্রে কাটাইল, তাহার প্রতি স্নেহ-মমতার কি অমৃত-বন্ধন সঙ্ঘজননীর আচরণে প্রকাশ পাইত, তাহা আমরা তিন জনেই অনুভব করিতাম। যুগ-প্রভাব হ্রাস পাইলে, বাহ্যতঃ বিচ্ছেদের বৃশ্চিকদংশনে কালচক্রে সে প্রেম ও ঐক্যের সূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু 'কাকীমার' পুণ্য স্মৃতি সে সুহৃৎ আজও মুছিতে পারে নাই, ইহা মুছিতে পারা যায় বলিয়া আমিও বিশ্বাস করি না।

এইরূপে কাঠের কারবারের সহিত সুন্দরবনের সুবিপুল কৃষিক্ষেত্র এবং 'মৃণালিনী বস্ত্রবয়ন কার্য্যালয়' সঙ্ঘের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিল।

আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধু ইতিপূর্ব্বে একটী হ্যাণ্ডপ্রেস খরিদ করিয়া আমারই অনুরাগী আর এক বন্ধুকে পরিচালনার ভার দিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ প্রেস পরিচালনা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব না হওয়ায়, উহা আমারই তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হওয়ার ব্যবস্থা হইলে, 'প্রবর্ত্তক' অতঃপর নিজস্ব প্রেসে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। 'প্রবর্ত্তক' আত্ম-শক্তির দ্বারাই আপনার প্রকাশ-পথ সুগম করিয়া লইল। কর্ম্মক্ষেত্র-প্রসারণের সহিত ঝঞ্ঝাটের মাত্রা বাড়িল। সংসার তিনটী প্রাণী লইয়া আরম্ভ হইয়াছিল; নূতন অতিথি-অভ্যাগতের আগমনে রন্ধন-শালার কার্য্য আরও বাড়িয়া গেল। দিবারাত্র পরিশ্রমে গৃহলক্ষ্মীর শরীর ভাঙ্গিল। কর্ম্ম বাড়িয়াছে, কিন্তু অর্থের মুখ দেখা যায় না; একমাত্র কাঠের কারবার হইতে জীবনযাত্রানির্ব্বাহের যে কয়টা টাকা প্রতি মাসে লওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা হইতেই তাঁতশালার কাজ আরম্ভ হইল। সুন্দরবনের চাষে প্রচুর ব্যয় হইতে লাগিল। 'প্রবর্ত্তক' চলিল কতক গ্রাহকদের অনুগ্রহে এবং প্রেসের অন্যান্য আয় হইতে। সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের সুব্যবস্থা নাই, অথচ সংসারের খরচ বাড়িয়া চলে; কেমন করিয়া চলে, সে খবর রাখার স্বভাব আমার নাই। তাই তাঁহাকেই শ্রমের সহিত দুশ্চিন্তায় পড়িতে হইল। দুশ্চিন্তার দায় হইতে যথাসময়ে রক্ষা পাইলেও, শ্রমের হাত হইতে তাঁহার মুক্তি নাই। সাধ্যের একটা সীমা আছে, একদিন সে সাধ্যের সীমার বাহিরে তাঁহাকে দেখিলাম। সে কাতর ক্লান্ত মূর্ত্তির কথা স্মরণ হইলে, আজিও চক্ষে জল আসে।

আমরা ৫।৭ জন মধ্যাহ্ন-স্নান সারিয়া যথারীতি ভোজনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, ভোজনের আহ্বান প্রতিদিনের ন্যায় শোনা গেল না। বিরক্ত, ক্রুদ্ধ হইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম—রন্ধন শেষ করিয়া তিনি রন্ধনশালার বাহিরে উন্মুক্তপ্রাঙ্গণে ধূলিধূসরিত। হইয়া পড়িয়া আছেন। চক্ষের দৃষ্টি স্থির, অপলক। ওষ্ঠ-পুট কালিমা-ময়। মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাত ছিন্ন বল্লরীর ন্যায় ভূলুণ্ঠিত। পদযুগলের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুইটী ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হইতেছে। এই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া আমি হতভম্ব হইলাম। অনেক শুশ্রূষার পর তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিলেন। মুষ্টিবদ্ধ হস্ত শিথিল হইল, তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন।

ভোজনব্যবস্থা নিজেরাই করিবার জন্য উদ্যত হইলে, তিনি কাতর কণ্ঠে তাহা নিষেধ করিলেন। স্বহস্তে পরিবেশন করা তিনি ব্রতরক্ষা মনে করিতেন। রন্ধন-শালাকে তিনি দেবমন্দিরের ন্যায় পুণ্যক্ষেত্ররূপে শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁর রন্ধনের মৃণ্ময় পাত্রগুলি দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হইলেও, সর্ব্বদা নূতনের ন্যায় দেখাইত। চাউল একবার ধৌত করিয়া তিনি রন্ধনের উপযোগী মনে করিতেন না, বার বার ধৌত করিয়া যখন দেখিতেন জলে আর কোন আবিলতা নাই, তখন তিনি তাহা রন্ধন করিতেন। অন্নগুলি থালীতে শুভ্র মল্লিকার ন্যায় শোভা পাইত।

কুট্‌না কোটাতেও তাঁহার একটী বিশেষ শিল্পনৈপুণ্য ছিল। প্রত্যেক আনাজটী তিনি সমান পরিমাপে কুটিয়া ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিতেন। রন্ধনের এইরূপ পারিপাট্য রক্ষা করিতে গিয়া শ্রমের অবধি থাকিত না; তদুপরি রন্ধন ব্যতীত এই নূতন বেহিসাবী সংসারটির যাবতীয় কর্ম্মভার তাঁহাকে বহন করিতে হইত। তিনি প্রতিদিন বলিতেন, রন্ধনশালায় তাঁহার যেন দম বন্ধ হইয়া যায়, মনে হয় জ্ঞান হারাইবেন। সে কথা শুনিতাম মাত্র; তিনি যে প্রতি-কার প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহার কথার এই অর্থ আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই। কিন্তু সে দিনের সেই তাঁর দুঃখমূর্ত্তি আমায় বিচলিত করিল।

বাড়ীতে দাসী টিকিত না, ভৃত্য দুই চারি দিন কাজ করিয়া পলাইত; তাহার কারণ, তিনি সব কর্ম্ম এমন নিখুঁত ভাবে করা পছন্দ করিতেন, যাহা অন্যের পক্ষে সম্ভব নহে। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার এমন নিপুণ দৃষ্টি ছিল যে, সংসার হইতে কিছু যে অপসারিত হইবে, তাহার পথ ছিল না। হিসাবের কড়িও তিনি কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতেন। মেছুনী আধ সের মাছ ওজন করিতে বসিয়া অর্দ্ধছটাকও যে কম ওজনে দিবে, সে পথও তিনি আগুলিয়া ধরিতেন। ফাঁকি নিজেও দিতে জানিতেন না, কাহারও ফাঁকি দেওয়া বরদাস্ত করিতেন না; কাজেই বাহিরের লোকের নিকট তিনি খুব অপ্রিয় হইতেন। রামেশ্বর ছিল এই সকল বিষয়ে 'মামীমার' পুরাপুরী সমর্থক; এই দুই জনার মধ্যে ঘর-সংসার লইয়া অদ্ভুত ঐক্য পরিলক্ষিত হইত।

তাঁর শ্রমলাঘব করার জন্য আমারই প্রস্তাবে আমার এক বিধবা শ্যালিকাকে পুত্রকন্যা সহ বাস উঠাইয়া আনিলাম। সংসার বাড়িল; কিন্তু তিনি একজন সহকারিণী পাইয়া কিছু অবকাশ পাইলেন। আমার সংসারের সীমা-রেখা এইখানেই যদি শেষ হইত, তিনি আসান পাইতেন, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র সংসার-চক্র সঙ্ঘচক্রে পরিণত হইতে চলিয়াছিল। স্বামিগৃহে আসিয়া এই বৃহত্তর সংসার-ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রীত্বের ভার যে তাঁহাকে বহিতে হইবে, এ স্বপ্ন তিনিও দেখেন নাই, আমিও কল্পনা করি নাই; এই হেতু তাঁর কর্ম্মশক্তি যতই বিস্তৃত হউক, কর্ম্মের সুবিধা যতই করিয়া দিই, সংসারবৃদ্ধির প্লাবনে তাহা নস্যাৎ হইয়া যায়। তিনি নূতন সংসার করিতে বসিয়া আত্মশক্তির আর হিসাব পাইলেন না। এই অভাবনীয় সংসাররচনায় তিনি একপ্রকার উন্মাদিনীর ন্যায় সঙ্ঘের সেবা দিয়া গিয়াছেন।

সঙ্ঘের কর্ম্মক্ষেত্রবিস্তৃতির পথে শ্রীঅরবিন্দ ইষ্টস্বরূপ লক্ষ্য। ইষ্টশক্তি মৃণালিনী দেবীকে মা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি; তাঁহারই পবিত্র নামে বস্ত্রবয়ন কার্য্যালয়ের নামকরণ হইয়াছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, ১৩২৫ সালের ২রা পৌষ মঙ্গলবার পূর্ণিমা তিথিতে তাঁর পরলোকগমনের সংবাদ আমাদের হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিল। দেবী মৃণালিনীর সহিত আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে নাই; কিন্তু ভারতীয় জীবনসাধনায় ইষ্টের সহিত ইষ্টশক্তির আবির্ভাব আমার হৃদয় আলো করিয়াছিল। তাঁহার তিরোধান-সংবাদে আকুল হইয়া "প্রবর্ত্তকে" লিখিয়াছিলাম "দেবী কালের অতল তলে নিমজ্জিতা হইলেন। সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জিতা হইল। সহস্র সন্তানের হাহাকার-ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে—মা, মা, জগতের অন্তরায় হইতে মুক্ত অজস্র ধারায় শক্তি তোমার পৃথিবী ছাইয়া ফেলুক; ভারতের যে অশুদ্ধ শক্তি উৎসবময় জনপদ শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত করে, তাহার বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধ ঘোষণা কর; কোটী কোটী সন্তান হর্ষে, আনন্দে তোমার অনুসরণ করিবে।"

মাতৃসাধনার সর্ব্বপ্রথম সূচনা "প্রবর্ত্তকে" আমারই কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। সে স্বপ্ন আজও স্বপ্ন হইয়াই আছে।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ দেবী মৃণালিনীর পাণিগ্রহণ করেন। দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ স্বামিসোহাগিনী হওয়ার কঠোর তপস্যাই তিনি করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গিনী হওয়ার তাঁর আকুতি পূর্ণ হওয়ার কাল উপস্থিত হইলে তিনি মহাপ্রয়াণ করিলেন। বিধাতার এই দুর্জ্ঞেয় নীতির মধ্যে কি রহস্য নিহিত আছে, সে বিচার আজও আমার শেষ হয় নাই।

শ্রীঅরবিন্দ আই, সি, এস হইয়াও অতি সস্তায় বরোদা-রাজ্যের নিকট যখন বিকাইয়া গিয়াছিলেন, তখন কে জানিত দেশাত্মার জাগরণ-যুগে অকস্মাৎ বাংলা দেশ হইতে

আসমুদ্রহিমাচল তাঁর বিদ্যুৎচ্ছক্তিপ্রভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে—দেশহিতব্রতী পরম যোগী শ্রীঅরবিন্দ বাংলার অন্ধযুগের আবরণ দূর করার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে নিজের কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিয়া ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে এক অসাধারণ রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুত্থান আনিলেন। রাজসম্মান, অতুল ঐশ্বর্য্য, রূপলাবণ্যময়ী যুবতী ভার্য্যার আসক্তি তিনি পরিত্যাগ করিলেন। ভারতের রাষ্ট্রে তিনি দেশ-প্রীতির অমৃত ঢালিয়া দিলেন। ধর্ম্ম ও ভাগবত বিশ্বাসের অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া তিনি জাতির আত্মাকে জাগাইয়া তুলিলেন। মাতা মৃণালিনী শ্রীঅরবিন্দকে স্বামি-রূপে যত বার ধরিতে গিয়াছেন, নাগাল পান নাই। শ্রীঅরবিন্দ নিজের তিনটী পাগলামীর কথা উল্লেখ করিয়া পত্নীর নবজন্ম চাহিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পাগলামী—তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন তিনি পাইয়াছেন, সবই ভগবানের; নিতান্ত আবশ্যকীয় যাহা তাহা ব্যয় করার অধিকার তাঁহার আছে, বাকী সবই ভগবানকে ফেরৎ দিতে হইবে। তাঁহার কথা "যে ইহা না করে, সে চোর। হিন্দুশাস্ত্রে ভগবানের ধন লইয়া ভগবানকে যে দেয় না, তাহাকে চোরই বলা হইয়াছে। ভগবানকে দুই আনা দিয়া চৌদ্দ আনা নিজের সুখে খরচ করিয়া সাংসারিক সুখে মত্ত আছি; জীবনের অর্দ্ধেক চলিয়া যায়, পশুও এমন করিয়া কৃতার্থ হয়।

এইরূপ পশুবৃত্তি ও চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া আসিয়াছি বুঝিতেছি; বুঝিয়া বড় অনুতাপ ও নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে, এ পাপ আর নয়। ভগবানকে দেওয়া মানে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করা। সরোজিনীকে যাহা দিয়াছি, তাহার জন্য অনুতাপ নাই; পরোপকার ধর্ম্ম, আশ্রিত-রক্ষা মহা-ধর্ম্ম। কিন্তু শুধু ভাই-বোনকে দিয়া হিসাব চোকে না, আজ দেশ আমার আশ্রিত। ৩০ কোটী ভাইবোন এই দেশে আছে; অনেকে অনাহারে মরিতেছে, কষ্টে দুঃখে জর্জ্জরিত, কোন মতে বাঁচিয়া আছে, তাহাদেরও হিত করিতে হয়।"

এই প্রথম পাগলামীর কথা বলিয়া তিনি এই পথেই পত্নীকে আহ্বান দিয়াছিলেন। মাতা মৃণালিনী একবার নাকি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আমার কোন উন্নতি হইল না।" শ্রীঅরবিন্দ উন্নতির ঐ একটা পথ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন "তুমি এই পথে যাইবে কি?"

তিনি আর এক পাগলামীর কথা পত্নীর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহাই তাঁহার দ্বিতীয় পাগলামী। তিনি লিখিলেন "যে কোন মতে ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শনলাভ করিতে হইবে····· ঈশ্বর যদি থাকেন, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার পথও থাকিবে, সে পথে যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মে বলে—নিজের মধ্যেই সে পথ আছে, যাওয়ার নিয়মও দেখাইয়া দিয়াছে, আমি তাহা পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এক মাসের মধ্যে অনুভব করিলাম—হিন্দুধর্ম্মের কথা মিথ্যা নয়; যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে, সে সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা—তোমাকে সেই পথে লইয়া যাই; ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আসিতে পারিবে না, কারণ তোমার তত জ্ঞান হয় নাই। কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিতে বাধা নাই। সেই পথে সিদ্ধি সকলেরই হইতে পারে, কিন্তু প্রবেশ করা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কেহ তোমায় ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না; যদি ইচ্ছা থাকে, এ সম্বন্ধে আরও লিখিব।"

শ্রীঅরবিন্দ তৃতীয় পাগলামীর কথা বলিতে গিয়া স্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন "লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ—কতকগুলা মাঠ, ক্ষেত, বন, পর্ব্বত, নদী বলিয়া জানে। আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয় ছেলে কি করে? নিশ্চিন্ত মনে আহার করে, স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে আমোদ করে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়ায়? আমি জানি এই পতিত জাতির উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক লইয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষাত্রতেজঃ একমাত্র তেজঃ নয়, ব্রহ্মতেজও আছে। সেই তেজঃ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নয়, এই ভাব লইয়া আমি জন্মিয়াছি, এই ভাব আমার মজ্জাগত। ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমায় পাঠিয়েছেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজ

অঙ্কুরিত হয়, ১৮ বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল। তুমি ন' মাসীর কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিলে, কোথাকার বদ লোক আমার সরল ভালমানুষ স্বামীকে কুপথে টানিয়া লইয়াছে। তোমার ভাল মানুষ স্বামীই কিন্তু সেই লোককে ও আর শত শত লোককে কুপথ বা সুপথে হোক, প্রবেশ করাইয়াছিল, আরও সহস্র সহস্র লোককে প্রবেশ করাইবে। কার্য্যসিদ্ধি আমি থাকিতেই হইবে, তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু হইবে নিশ্চয়ই।"

মাতা মৃণালিনীব মৃত্যুসংবাদে শোকের তীব্র কষাঘাত আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিযাছিল, আমরা সে দিন শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গ লইয়া কত কথা আলোচনা করিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র "আনন্দমঠে" লিখিয়াছিলেন "সতীর পতি বড়, তার চেয়েও পতির ধর্ম্ম বড়", শ্রীঅরবিন্দ ধর্ম্মপত্নীকে তিনটী পাগলামীর ভিতব দিয়া ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। এই সকল কথার আলোচনায় আমার গৃহদেবীর মুখশ্রী নির্ম্মল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নিজের জীবনধর্ম্মে আস্থা ও প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হইল। আমাবও বেদনাবিধুব জীবন-বীণা মুখর হইয়া উঠিল; শ্রীঅরবিন্দের মর্ম্মস্পর্শী জীবন-কাহিনী সারা রাত্রি ধরিয়া মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম। ধর্ম্মের জন্য, ভগবানের জন্য, দেশের জন্য শ্রীঅরবিন্দের অসাধারণ ত্যাগের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন "শ্রীঅববিন্দের অনুগ্রহ-প্রসাদে তুমিও ধন্য হইলে।" শ্রীঅরবিন্দের আমার বাড়ীতে অবস্থান-কালে তাঁর স্থির সৌম্য শান্ত মূর্ত্তির প্রশংসা করিযা তিনিও বলিলেন "এই তিনটী পাগলামীর নেশায় তাঁহার বিভোবতা আমিও দেখিয়াছি।" সে রাত্রি আব আমাদের নিদ্রা হইল না। তিনিও খুঁটিয়া খুঁটিয়া শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

# সাধু-সঙ্গ

শ্রীকুমুদবঞ্জন মল্লিক

মনে পড়ে সুন্দব সে কুটিরখান,
অবিবাম ভগবৎ-লীলা-বস পান।
সেই সাধু সমাগম,
সেই বেলা মনোবম,
প্রাতে সাঁজে আরতি ও ভজনের গান

হরিনাম, হরিকথা, হবি আলাপন,
হরি পরিমণ্ডলে জীবন যাপন।
শুনি বাণী অনিবার,
শুধু তাঁরি মহিমাব,
অলখিতে দেবতার নিতি আগমন।

অন্তবে বেণু বাজা, বাস আর দোল
সুধা-সাগবেব সেই গণা হিল্লোল।
আজ শুধু খনে খন
করে চঞ্চল মন,
সাধু মুখে এত কি মধুর হরিবোল!

সে জীবন হতে আজ আসিয়াছি দুব,
সত্য যা ছিল, হল স্বপ্ন মধুব।
সেই সুখ-দেশ হায়,
মনে দোল দিয়ে যায়,
ক্ষীণ পুণ্যেতে হাবা ছোট সুরপুব।

মরু আজ সাধনাব শ্যাম উপবন
স্মবি স্মরি আজি মোর ঝরে দুনয়ন।
হায় শাঁখা হল শাঁখ
হীন চাকা মৌচাক,
ধারাপাত হ'ল তুলসীর রামায়ণ।

# ইউরোপের কুরুক্ষেত্র

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

বর্ত্তমানে ইউরোপের রাষ্ট্রমঞ্চে দ্রুত পটপরিবর্ত্তন সুরু হয়েছে। ঘটনার পর ঘটনাস্রোত যে রকম অবিশ্বাস্য গতিবেগে বয়ে যাচ্ছে, তাতে ইউরোপের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কোন প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী করা শুধু যে নিরর্থক তাই নয়; বহু রাষ্ট্রনীতিবিদ্ পণ্ডিতের দীর্ঘসঞ্চিত অভিজ্ঞতা পর্য্যন্ত আজ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। সুদূর পোলাণ্ডে যার সূচনা হয়েছিল, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে' সেই নাৎসী বিভীষিকা আজ ইংলিশ চ্যানেলের তট প্রান্তে এসে পৌছেছে। একদিকে সূর্য্যাস্তবিহীন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অফুরন্ত সম্পদ্, অপরদিকে নাৎসী ডিক্‌টেটরের বৈজ্ঞানিক রণসজ্জার, নিষ্ঠুরতায় যা আজ কল্পনাকে পর্য্যন্ত কণ্টকিত ক'রে তুলেছে। এই দুই বিরাট্ শক্তি আজ পরস্পরের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা জগতে এই দুই শক্তির সংঘাত সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তনের সূচনা করবে। কিসের প্রত্যাশায় ইউরোপের আকাশে যেন আজ মৃত্যুর নিস্তব্ধতা দেখা দিয়েছে।

ইউরোপীয় কুরুক্ষেত্রের সমরনায়ক হের হিটলার

বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে কয়েকটি বিষয় যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা এই যে, বর্ত্তমান মহাসমরের যারা হোতা কোন "ইসম্"এর মোহ তাদের পথরোধ করে' দাঁড়ায় নি। অথচ ইউরোপের রাজনীতিতে এক সময়ে এ ধারণা খুবই প্রচলিত ছিল যে, আদর্শবাদ নিয়েই আগামী যুদ্ধ সংঘটিত হবে। ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে আজ বহু "বাদ" মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু যে নীতি আজ সর্ব্বাপেক্ষা 'প্রাধান্য পাচ্ছে তা' হল, "সুবিধাবাদ", এই opportunism-এর প্রতি শ্রদ্ধা হিটলার ও ষ্ট্যালিনের মিলন সম্ভব করেছে, সম্ভব হলে এবং মিত্রপক্ষের কাছ থেকে উপযুক্ত মূল্য পেলে মুসোলিনীর পক্ষেও Axis-এর আনুগত্য ত্যাগ করা অসম্ভব হ'ত না। সুযোগ পেলে ইটালীর রাষ্ট্রনায়ক highest bid-এর লোভ ত্যাগ করেন না, তার নজীর ইটালীর ইতিহাসেই লেখা আছে, সুতরাং তা' নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই। দুঃখের বিষয়, বৃটিশ পররাষ্ট্র বিভাগের এবং তার মধ্যে বহু প্রফেশন্যাল রাষ্ট্রনৈতিক আছেন—যাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ভবিষ্যৎ যুদ্ধ আদর্শবাদ নিয়ে সুরু হবে। এবং এই ভেবে তারা নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, কম্যুনিজ্‌ম্ ও ফ্যাসিজ্‌ম্ পরস্পরের বিরোধিতায় ও সংঘর্ষে যখন হীনবল হয়ে পড়বে, তখন আগামী যুদ্ধের বিভীষিকায় ত্রস্ত হয়ে কোন লাভ নেই।
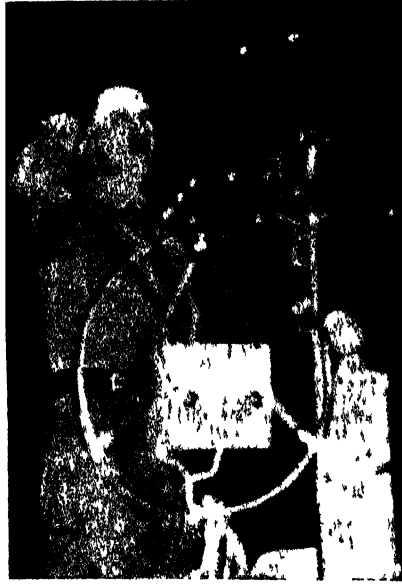
দ্বিতীয়তঃ, গত মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপের সমস্ত রাষ্ট্রে pacifism বা শান্তিবাদের প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। ইউরোপের বহু রাষ্ট্রের শাসন পর্য্যন্ত এই সব শান্তিবাদীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। আমেরিকাও ইউরোপের গোঁড়া শান্তিবাদীদের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। ইউরোপ ও আমেরিকায় অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল pacifism-এর প্রচার কার্য্যে। গল্প, উপন্যাস, সিনেমা, সংবাদপত্র—প্রচার কার্য্যের কোন বাহনটিকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা করা হয়নি। ফলে ইউরোপে মানবতা ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য একদলের প্রচার কার্য্যের যেমন বিরাম ছিল না, অপর দল ইউরোপের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলির নিশ্চেষ্টতার সুযোগে নিঃশব্দে ও সন্তর্পণে তাদের রণসম্ভার বাড়িয়ে তুলেছিল। আমাদের মনে হয়; কর্ত্তৃপক্ষ মহলের

উগ্র pacifist মতবাদ ফরাসীর বর্ত্তমান ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের জন্য দায়ী।

তৃতীয়তঃ, বৃটিশ নৌ-বিভাগে এখনও একদল ঝুনো রাষ্ট্রনীতিকের প্রভাব অক্ষুণ্ণ আছে, যাদের ধারণা ছিল এবং এখনও যাদের দৃঢ় বিশ্বাস—বৃটেনের অপরাজেয় নৌ-বহর আগামী কাল ও বর্ত্তমানের যে কোন যুদ্ধের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করবে। সেদিনও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট্ নেই। এই বিতর্কের উত্তরে অপর পক্ষ বিমান্ থেকে high explosives নিক্ষেপ করে' আমেরিকার একখানি সুদৃঢ়, শক্তিশালী রণতরীর শক্তি পরীক্ষা করতে উৎসুক হন। ফলে দেখা গেল—এই ধরণের explosives-এর আঘাতে সেই তথাকথিত শক্তিশালী রণতরীর এক-তৃতীয়াংশ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। এই পরীক্ষার ফলে আমেরিকার নৌ-বিশারদগণ তাদের অপরাজেয় নৌ-বহরের উপর আস্থা অটুট রাখতে পেরেছিলেন কিনা জানি না;

সাগর-রাণী বৃটেনের অপরাজেয় ডেষ্ট্রয়ারবাহিনীর একাংশ
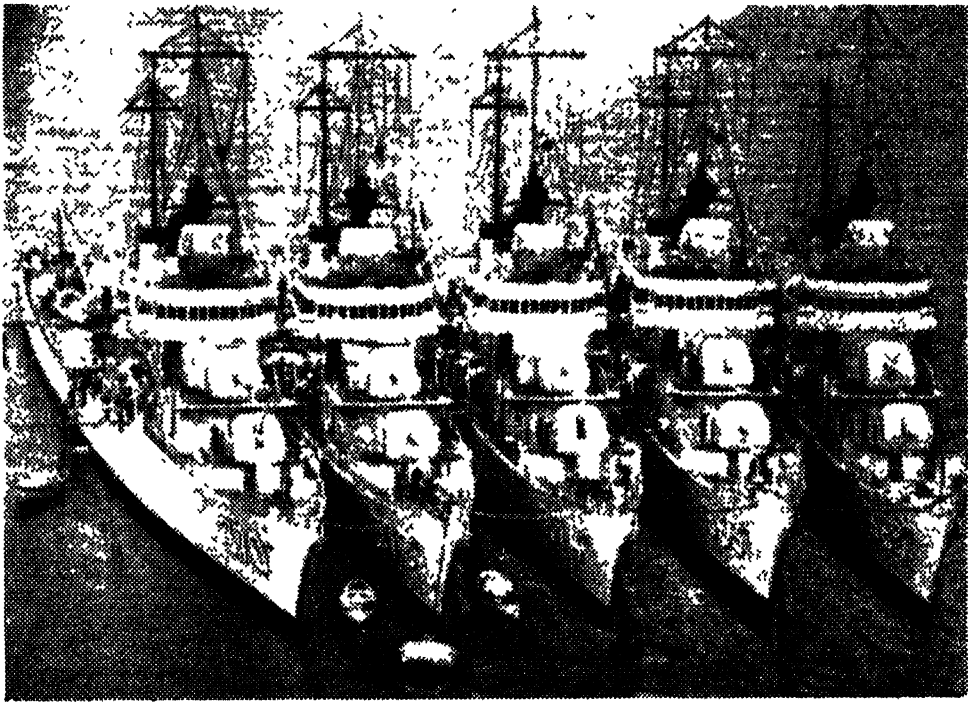
নৌ-বহর তাংক সমস্ত বিপদ্ থেকে মুক্ত রাখতে সমর্থ হবে। সুতরাং অপরাজেয় নৌ-বহর নির্ম্মাণের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের যে তীক্ষ্ণ নজর ছিল, তার পরিচয় আমরা বহুক্ষেত্রেই পেয়েছি। কিছুদিন আগে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দুই দল সমরবিশারদের মধ্যে এই নিয়ে তর্ক উপস্থিত হয় এবং এক পক্ষ এই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, বিমান নিক্ষিপ্ত high explosives-এর দ্বারা নৌ-বহরের যে দুর্দ্দশা আমরা কল্পনা করি, তাতে অতিরঞ্জনের ভেজাল থাকে অত্যন্ত বেশী; মোট কথা, অত বেশী ভয় পাবার কোন কারণই কিন্তু সাধারণের সামনে বিমান আক্রমণের বীভৎসতা সেদিন এক ভাবী অমঙ্গলের সূচনা করেছিল।

বর্ত্তমান যুদ্ধের দিনপঞ্জী নিয়ে আলোচনা করবার মত ব্যর্থতা আর কিছু নেই; তথাপি যুদ্ধের অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ না করলে বর্ত্তমান আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নরওয়ে নাভিক থেকে ইংলিশ চ্যানেল পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর যে অভিযান ঝটিকার গতিতে অগ্রসর হয়েছিল, তাতে বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রথম পর্য্যায় শেষ হয়েছে বলা যেতে পারে। নরওয়ের বহু সামরিক

গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করবার পর জার্ম্মাণী বিগত ১০ই মে একযোগে বিদ্যুদ্গতিতে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ আক্রমণ করে। হল্যাণ্ড পাঁচদিন পর্য্যন্ত অসীম সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ চালিয়ে অবশেষে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্ড ২৫শে মে তারিখে তাঁর সৈন্যদলের নিকট যুদ্ধ বিরতির অনুরোধ জানিয়ে আত্ম-সমর্পণ করেন। ফ্লাণ্ডার্স রণক্ষেত্রের যুদ্ধ ভীষণতা ও নিষ্ঠুরতার দিক্ থেকে আধুনিক যুদ্ধের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই যুদ্ধ সম্পর্কে বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্টবাদিতার সহিত মন্তব্য করেছিলেন "It was a colossal military disaster" তিনি আরও বলেছিলেন—"Even if this island in a large part were subjugated and starving, then our Empire, armed and guarded by the British fleet will carry on the struggle..." প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিলের এই সতর্ক-বাণী থেকে বোঝা যায় যে, ইউরোপের রণক্ষেত্র প্রাচ্যে প্রসারিত হয়ে যাবে। ফ্লাণ্ডার্সের পর হিটলার ফ্রান্সের দিকে যুদ্ধের গতি পরিচালিত করেন। ৬ই জুন নাৎসী-বাহিনী প্যারিস আক্রমণ করে এবং দশম দিবসে প্যারিসের পতন হয়। জেনারেল গ্যামেলার পরিবর্ত্তে জেনারেল ওয়েগাঁ ফরাসী বাহিনীর কর্তৃত্ব করেন। এই সময়ে এ কথাও প্রচারিত হয় যে, গ্যামেলা আত্মহত্যা করেছেন। জেনারেল ওয়েগাঁর অধিনায়কত্বে ফরাসী বাহিনী যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হতে কৃতসঙ্কল্প হয়। জার্ম্মান মেকানাইজড্ সৈন্যদল ওয়েগাঁ লাইন ভেদ করে' প্যারীর দিকে ধাবিত হয়। ফরাসী বাহিনী অমিত বিক্রমে বাধা দিতে অগ্রসর হয়। চ্যানেল পোর্ট থেকে ম্যাজিনো লাইন পর্য্যন্ত যে বিরাট্ সৈন্যব্যূহ তাঁরা রচনা করেছিল, যুদ্ধের আধুনিক ইতিহাসে তা' অভূতপূর্ব্ব। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যান্ত্রিক বাহিনীর (mechanised army) সম্মুখে ফরাসীর এই বিরাট্ প্রতিরোধ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হয়ে যায়। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট যুক্তরাষ্ট্রের নিকট সাহায্যের আবেদন জানিয়েও কোন ফল পায়নি। অবশেষে রেণো মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ও পেঁতার মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ ফরাসীর ভাগ্য বিপর্য্যয়কে আরও নিকটতর করে' আনে। জার্ম্মাণী ও ইটালীর সহিত ফরাসীর যুদ্ধ বিরতির প্রাক্কালে মসিয়েঁ রেণো আমেরিকার কাছে সাহায্যের জন্য যে মর্ম্মস্পর্শী আবেদন জানিয়েছিলেন, সেকথা বর্ত্তমান যুদ্ধের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আটলাণ্টিকের পরপারে ফরাসী প্রধান মন্ত্রীর এই আবেদন কতটুকু সাড়া তুলেছিল তা' আমাদের জানা নেই ; কিন্তু বহু প্রত্যাশিত সাহায্য এসে পৌঁছায়নি।

ভাগ্যান্বেষী জাপানের নৌবহরের তোড়জোড়

আটলাণ্টিকের সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করে' আমেরিকার বিমানশ্রেণী এসে শত্রুবাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন করে' তুলবে—ফরাসীর এই স্বপ্ন আজ স্বপ্নই থেকে গেছে। সম্প্রতি পেঁতার নেতৃত্বে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ইটালী ও জার্ম্মাণীর সঙ্গে সমস্ত সংঘর্ষ পরিত্যাগ করেছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধ-বিরতির কঠোর সর্ত্তগুলির বিষয় আলোচনা করলে মনে হয়, ফরাসীকে এই সাময়িক শান্তি ক্রয় করতে অত্যন্ত অধিক মূল্য দিতে হয়েছে।

ফ্রান্সের সঙ্গে ইটালী ও জার্ম্মাণীর যুদ্ধ-বিরতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের রাষ্ট্রমঞ্চে আবার পট-পরিবর্ত্তন হয়েছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নাৎসী জার্ম্মাণীর এই সংঘর্ষ অভিনব। বর্ত্তমান সংঘষের ভারকেন্দ্র ইউরোপ হ'লেও বর্ত্তমান যুদ্ধ মধ্য-প্রাচ্য ও সুদূর-প্রাচ্যের রাষ্ট্রনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করবে। ইতিমধ্যেই তুরস্কের রাষ্ট্রনীতিতে গুরুতর পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দিয়েছে। মনে হয় তুর্কী সোভিয়েটের সঙ্গে একটা দৃঢ় কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায়। সম্প্রতি তুর্কীর পররাষ্ট্র সচিব মস্কোতে নিমন্ত্রিত হয়েছেন এবং সোভিয়েট ও তুর্কীর মধ্যে শীঘ্রই যে একটি অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হবে, তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তুর্কীর ভৌগোলিক অবস্থান বহুদিক্ দিয়ে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে তুর্কী একটা সংযোগের সেতু রচনা করেছে, বলা যেতে পারে। বর্ত্তমানে দার্দ্দানেলিস প্রণালী তুর্কীর করতলগত। কৃষ্ণ সাগরের সমস্ত গুরুত্ব আজ ভূমধ্যসাগরের উপর নির্ভর করে। বল্কানের ভাগ্যসূত্র আজ তুর্কীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। কৃষ্ণ সাগরের পার্শ্ববর্ত্তী সোভিয়েটের অধিকারভুক্ত অঞ্চলে আজ যথেষ্ট শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হয়েছে এবং এই অঞ্চলের তৈলখনিগুলিকে বহুল পরিমাণে ভূমধ্যসাগরের উপর নির্ভর করতে হবে। ইউরোপীয় কূটনীতি বহুবার তুর্কীকে কেন্দ্র করে' আবর্ত্তিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাশিয়া ও বৃটেন তুর্কীকে উপলক্ষ্য করে' যথেষ্ট তিক্ততার সৃষ্টি করেছে। বর্ত্তমান ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিক পরিস্থিতি তুর্কীকে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছে, সন্দেহ নেই। মুসোলিনীর নেতৃত্বে ইটালী আজ আবার রোমান সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে। বাল্‌টিক থেকে বল্কান সীমান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাচ্য ইউরোপ আজ নাৎসী-কবলিত। আতাতুর্ক তার জীবনের শেষ বিন্দু দিয়ে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে একটা সহযোগিতার ভাব বজায় রেখে গেছিলেন। তুর্কীর অভ্যুদয়ের পশ্চাতে ছিল আতাতুর্ক কামাল পাশার প্রতিভা ও সোভিয়েটের বন্ধুত্ব। Monfreux সম্মেলনের পর তুর্কী দার্দ্দানেলিসের প্রণালী পথে নৌ-বহর নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে। কামাল জার্ম্মাণীর সহযোগিতায় তুর্কীকে শিল্প-প্রধান করে' তুলতে মনস্থ করেন এবং বৃটেনও তুর্কীকে যথেষ্ট ঋণ দিয়ে সাহায্য করে। তুর্কীর জাতীয় জীবনে সংগঠনের

রণপোতসজ্জায় মার্কিনের নব উদ্যম

প্রয়োজন যখন অত্যন্ত বেশী, সেই সময়ে ইউরোপের আকাশে আবার এক মহাসমরের আশঙ্কা দেখা দিল।

সোভিয়েট-তুর্কী মৈত্রী যদি সম্ভবপর হয় তা'হলে সোভিয়েট তুর্কীর নিরাপত্তা রক্ষা করতে সচেষ্ট হবে। এই মৈত্রীর ফলে বল্কানের মধ্য দিয়ে ইটালী ও জার্ম্মাণীর নিকট-প্রাচ্যে প্রবেশের চেষ্টা অনেকাংশে ব্যাহত হবে। ত্রিপোলী ও হাইফা অঞ্চলের মোসাল তৈলখনি বহুদিন এই দুই ডিক্‌টেটরের সতৃষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং এটা মোটেই অসম্ভব নয় যে, ইটালী ভূমধ্যসাগরের বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগে এই সব অঞ্চলে হানা দিতে পারে। বর্ত্তমানে ইরাক, ইরাণ ও আফগানিস্থান তুর্কীর সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তুর্কী ও সোভিয়েটের বন্ধুত্ব এই সব দেশের রাষ্ট্রনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করবে। প্রাচ্যদেশসমূহে তুর্কী-সোভিয়েট বন্ধুত্বের ফল সুদূরপ্রসারী হবে বলে মনে হয়।

বর্ত্তমানে সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য—যে সমস্ত ভূভাগ গত মহাযুদ্ধে সে হারিয়েছে, সেগুলো ফিরে পাওয়া। প্রথমতঃ, রুমানিয়ার কথা ধরা যাক। গত মহাযুদ্ধের পর বড় বড় রাজ্য ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু রুমানিয়া ছোট না হয়ে আয়তনে অনেক বেড়ে গেছে। কিছু সার্ভিয়া থেকে, কিছু রুশিয়া থেকে, কিছু অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারী থেকে গ্রহণ করে রুমানিয়ার আয়তন এখন হয়েছে ১ লক্ষ ২২ হাজার বর্গ মাইল (বঙ্গদেশের প্রায় দেড়গুণের অধিক)। রুমানিয়া কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমান বেসারেবিয়া ও বুকোভিনা অঞ্চল পুনরায় সোভিয়েটের হস্তে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এই দু'টি অঞ্চল রুষের অধিকৃত ছিল।

বর্ত্তমান মহাসমরের ভয়াবহ সামরিক বোমারু বিমানপোত

ফিনল্যাণ্ড, এষ্টোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে রুশীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। যুদ্ধের পর এরা স্বাধীন হয়েছে বটে, কিন্তু এই ক'টি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সম্বন্ধে সোভিয়েটের দাবীর আজ অন্ত নেই। পোলাণ্ডের ব্যাপারেও সেই একই কথা। অনেকেই আজ এ কথা মনে করেন যে, সোভিয়েটের এই নীতিতে জার্ম্মাণীর সম্মতি আছে এবং কোন কোন বিশেষজ্ঞ মহলে এ কথাও বলা হয়েছে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে সোভিয়েট কোন পক্ষেই যোগদান

না করে' তার বর্ত্তমান নীতি অনুসরণ করে যাবে। ফিন্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধের পর সোভিয়েট সামরিক শক্তির দুর্ব্বলতা অনেকটা ধরা পড়ে গেছে। ফিন্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধে হিটলার দেখেছেন ঐতিহাসিক সোভিয়েট লাল ফৌজের কৃতিত্ব। সোভিয়েট সৈন্যদলের এই দুর্ব্বলতায় জার্ম্মাণী মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। জার্ম্মাণীর হুমকিই অবশেষে ফিন্‌ল্যাণ্ডকে বাধ্য করেছিল রাশিয়ার কবলে আত্মসমর্পণ করতে, নচেৎ ফিনিশ সৈন্যদল আরও কিছুকাল সাফল্যের সহিত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারতো। সম্ভবতঃ এটাও স্থির হয়ে আছে যে, যদি কোন পক্ষের প্ররোচনায় সোভিয়েট জার্ম্মাণী ও ইটালীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, তা'হলে জাপানের শক্তিশালী যান্ত্রিক বাহিনী রাশিয়ার পূর্ব্বাঞ্চল আক্রমণ করবে। সে ক্ষেত্রে জাপান, জার্ম্মাণী ও ইটালীর মত পরাক্রান্ত শক্তির কবলে পিষ্ট হয়ে রাশিয়ার নবগঠিত রাষ্ট্রতন্ত্র ও আদর্শবাদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সম্ভবতঃ রাশিয়া এই বিপদের সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করতে পারে না। সেই-জন্যে বর্ত্তমানে ষ্ট্যালিন সোভিয়েট ও জার্ম্মাণীর মধ্যে সৌহার্দ্দ্য অক্ষুণ্ণ রেখে' যথাসম্ভব সুবিধা আদায় করতে সচেষ্ট হয়েছে। অনেকে মনে করেন—জাপান চীনের ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ইউরোপীয় যুদ্ধে যোগ দেবার মত ক্ষমতাও তার নেই। চীনের যুদ্ধকে কতকটা গৃহযুদ্ধ বলা যেতে পারে; কারণ জাপান চীনের একটি বড় অংশের সহায়তায় চিয়াং কাইসেকের বিরুদ্ধে লড়ছে। সুতরাং সৈন্য সংখ্যার দিক্ দিয়ে জাপানের খুব বেশী ক্ষতি হয় নি। কারণ প্রধানতঃ চীনসৈন্য ও ফর্ম্মোসান সৈন্যের সহায়তায় জাপান চিয়াং কাইসেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এখনও বিরাট্ জাপ-বাহিনী আধুনিক মেকানাইজ্‌ড অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করছে—যদি নিকট ভবিষ্যতে সোভিয়েটের সঙ্গে তার শক্তিপরীক্ষার আহ্বান আসে। সুতরাং বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে সোভিয়েটের আবির্ভাব কতকটা অহেতুক বলে'ই মনে হয়।

বর্ত্তমানে আমেরিকার কার্য্যকলাপ অত্যন্ত রহস্যময় ও দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠেছে। অনেকেই আজ সন্দেহ করছে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের মৌখিক 'সহানুভূতির কোন মূল্য আছে কি না। বর্ত্তমানে আমেরিকার একাধিক দল ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতির জটিলতা থেকে আমেরিকাকে মুক্ত রাখবার পক্ষপাতী। বর্ত্তমানে আমেরিকার শক্তিশালী লিবারেল দল এই "Isolationist" মনোবৃত্তিসম্পন্ন এবং এরা ইউরোপীয় যুদ্ধ সম্পর্কে রুজভেল্টের বর্ত্তমান কার্য্য-কলাপ সমর্থন করেন না। বৃটিশ রক্ষণশীল দলের কার্য্য-কলাপের উপরও এই লিবারেল দল বহুদিন যাবৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে আসছে। কারণ এরা মনে করেন যে, বৃটেনের এই রক্ষণশীল দলের অনুসৃত নীতি আমেরিকার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে এবং আমেরিকাকে ইউরোপীয় সংঘর্ষের আবর্ত্তে টেনে আনবে। ইতিমধ্যেই বৃটেন আমেরিকায় প্রচারকার্য্য হিসাবে বৃটেনের গণ্যমান্য ব্যক্তি দ্বারা বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করেছে। এ ছাড়াও বিগত কয়েক বৎসর ধরে' সমস্ত আমেরিকার প্রেসে বৃটেনের পক্ষে প্রচারকার্য্যের অন্ত ছিল না। বৃটিশ রাজ-দূত রূপে লর্ড লোথিয়ানের উপস্থিতি এ বিষয়ে বৃটেনকে যথেষ্ট সাহায্য করবে। আমেরিকার এই লিবারেল দল "America self-contained and self-sufficient, whatever happens to Europe" এই নীতির পক্ষপাতী। তা'ছাড়া প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সর্ব্বশেষ কয়েকটি বক্তৃতায় যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে; তাতে বৃটেনের পক্ষে উল্লসিত হবার কিছু নেই। আগামী প্রেসিডেণ্ট-নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতিতে যে খুব বেশী পরিবর্ত্তন দেখা দেবে, তা আমাদের মনে হয় না এবং প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বহু পরিবর্ত্তন দেখা দেবে। বর্ত্তমানে একথা বলা যায় যে, মন্‌রো-নীতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে' আমেরিকা তার নিজের দেশরক্ষার দিকে কড়া নজর দেবে এবং এই হেতু যে প্রচুর সমরোপকরণ সংগ্রহ করবার প্রয়োজন তা করে উদ্বৃত্ত মিত্রশক্তির নিকট নগদ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে।

বস্তুতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে' আমেরিকা ও তার প্রতিবেশী শক্তিসমূহ যেমন সংহত হ'তে প্রয়াস পাচ্ছে, তেমনি জার্ম্মাণীর নেতৃত্বাধীনে ইউরোপীয় ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহকে সঙ্ঘবদ্ধ করবার চেষ্টা হিটলার করছেন। এইবার ইউরোপীয় যুদ্ধে সেইজন্যই আমেরিকার হস্তক্ষেপ অসহনীয়

বলে' হিটলার স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিয়েছেন। আপাততঃ পূর্ব্ব-এশিয়ার মালিকানি করবার স্বপ্ন জাপানও দুনিয়ার এই বিশৃঙ্খল যুগে সজাগ হয়েই দেখছে। ইউরোপ ও এশিয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে আছে রাশিয়া। সেও এই সুযোগে আপন ঘর ভালভাবেই গুছিয়ে নিচ্ছে। বৃটেনকে মধ্যমণি করে' দুনিয়ার বুকের উপর ইংলণ্ডের যে বহু বিঘোষিত রাষ্ট্রহার রচনার পরিকল্পনা তাও এই দুর্য্যোগের দিনে আরও দৃঢ় হয়েই উঠবে। চির নাবালক ভারত ও আফ্রিকাকে এই অবস্থায় বলতেই হয় 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথায়?' কিন্তু দেখা যাক কালের গতি গড়ায় কি ভাবে?

# যা' হ'য়েছিল

শ্রীমতিলাল রায়

"প্যান্-প্যান্-প্যান্ রেডিওটা থামাও বৌদি! পথে ঘাটে কাণ পাতার যো নেই, প্যান্ প্যান্ করছেই।"

হরিপ্রসন্ন ঘরে ঢুকিবামাত্র রেডিওর মজলিস ভাঙ্গিল। হরিপ্রসন্ন দেখিল, দুইজন অপরিচিতা মহিলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হরিপ্রসন্ন যেমন ঘরে ঢুকিয়াছিল, তেমনিই বাহির হইয়া যাওয়ার উপক্রম করিতেছিল; কিন্তু বৌদিদি বলিল, "ঠাকুরপো যেন কালাপাহাড—গানটা একবার মন দিয়ে শোন দেখি।"

"কাণ দুটো ত আর ফেলে আসতে পারিনি:

'ঐ নবম মন্দিরে মুরতি মোহন
স্বপনে রহিল লেখা—'

ওর মানেটা কি বল দেখি?"

"ফিজিক্সের প্রফেসার ওর মানে হয়তো কোন দিনই বুঝবে না; কিন্তু সুর-বিজ্ঞানেও তো তুমি ওস্তাদ, সেটারও তো তারিফ করবে।"

"ছাই আর ভস্ম! ওটা কি একটা সুর? কেবল প্যান্-প্যান্ করছে, আঁতুড় ঘরে ছেলে কাঁদার মত ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কান্নার সুরে গান শুনলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে' যায়। আর জাতটাও হতভাগা, এই সব প্রশ্রয় দিতেও ছাড়ে না!"

হরিপ্রসন্ন রেডিওর উপর চটা। আজ সকালে কোন ওস্তাদ গান শিখাইতে সুর ভাঁজিতেছিল, হরিপ্রসন্ন আসিয়া বলিল, "গলা টিপে ধরা যায় না বৌদি! লোকটা ঐ যে ওয়াক্ ওয়াক্ করে' বমি তুলছে, ঐগুলো তোমার শুনতেও ছোঁ ভাল লাগে!"

বৌদিদির সহিত রেডিও লইয়া এমনই কথা কাটাকাটি নিত্য হয়। ইহা এক প্রকার কৌতুকে দাঁড়াইয়াছে। বৌদি বলিল, "রেডিওর উপকারিতা তুমি কি অস্বীকার কর?"

হরিপ্রসন্ন বলিল, "ঐ যে ভারী গলায় রেডিওতে যখন বার্ত্তা-ঘোষণা করা হয়, এই সপ্তয়ের অভিনয়টা আর দেশ-বিদেশের মনীষিদের বক্তৃতা ছাড়া রেডিওর প্রয়োজন আর কিছুতে আমি স্বীকার করি না। একটা মরা জাতির হাড়ে দুর্ব্বা গজাতে দু' দশ দিন দেরী যদিও হ'ত, কিন্তু রেডিওর বাজে গানে তারও উপায় রইল না। সত্য সত্য জাতটাকে স্থাণু করে' দিলে।"

গান চলিতেছিল—

"স্বপনেতে আসে, স্বপনেতে যায়
স্বপনের স্মৃতি ভুলা নাহি যায়।"

হরিপ্রসন্ন এইবার আগ্রহ-স্বরে বলিল, "বন্ধ কর বৌদি, বন্ধ কর—ঐ বাজে গান আর ঠাট্ করে ঢোঁক গিলে গিলে কান্নার সুরে মাথাটা নষ্ট করো না।"

বৌদি এবার রেডিও বন্ধ করিয়া দিল। একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "এই প্রগতির দিনে তোমার মত মানুষ বিধাতার অপরূপ সৃষ্টি। যেদিন গ্রামোফোন হল—মানুষের কত আনন্দ। তারপর রেডিও—একঘেয়ে রেকর্ডের দায় থেকে মুক্তি—"

কথা শেষ না হইতেই হরিপ্রসন্ন বলিল, "তারপর আবার আসছে শুধু গান শোনা নয়, ঘরে বসে অঙ্গভঙ্গীও চক্ষে দেখবে।"

বৌদি বলিল, "বিজ্ঞানের কত উন্নতি বল দেখি?"

—"বিজ্ঞানের উন্নতি কে না চায় বৌদি, কিন্তু তার অপব্যবহার যে কত সর্ব্বনাশের তা তোমরা বুঝবে না।"

—"অপব্যবহার তোমার কাছে। সরসীবালার রেকর্ড বাজাবে পড়তে পায়নি, তাব গানখানা তোমার পছন্দ হ'ল না। কি যে তুমি, বিধাতাই জানেন।"

—"আমি বলি কি জান বৌদি? ঐ সরসীবালা প্রভৃতি রেডিওর দৌলতে সস্তায় নাম কিনে' ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে। আমার কাছে ওরা যেন নামজাদা ডাইনী। তাদেব এই সব গৌরবের দায় থেকে বাঁচাতে আঁতুড়-ঘরে মুখে নুন টিপে এদের শেষ করা উচিত ছিল।"

আধখানা মুখ ফাঁক করিয়া সবিস্ময়ে বৌদিদি বলিল, "চুপ, চুপ—মহিলাসমাজেব উপর তোমার এই নিন্দনীয় অভিযোগ আমিও হজম কবতে পারছি না ঠাকুরপো।"

—"শাস্তি দিতে পাব। কিন্তু বৌদিদি, বেডিওতে ঘরে ঘবে, হাটে বাজারে এই বকম প্যান্ প্যান্ করতে বাত্রিদিন যাদের দেখতে পাই, তাদেব আমি দেশের শত্রু মনে করি। যারা প্রশ্রয় দেয়, তারা এই সব নবীনাদের অধিক শত্রু।"

বৌদি কথা কহিল না। হরিপ্রসন্ন বুঝিল—বৌদিদি ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। কথাটাও বোধ হয় অভদ্র ধরণেব হইয়াছে। কিন্তু একটী কথা তাব এখনও বলা হয় নাই, তাহা না বলিয়া সে থাকিতে পারিল না। সুগম্ভীর স্বরে বলিল, "রাগ করো না বৌদি। আমি ঠোঁট-কাটা, একটা কথা বলি। একটা পরম গুণবান্ মানুষকে যদি ২৪ ঘণ্টা এই মেয়েকাঁদুনে সুবের মূর্চ্ছনায় বেঁধে রাখ, দেখবে পবদিন তার গুণের দুই আনা অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। মানুষের মস্তিষ্ক প্রতিদিন গড়ে' ওঠে তার স্বভাব-স্ফূর্ত্তি নিয়ে। প্রতিদিনের ব্যবহারে মস্তিষ্কের ক্ষয় পূরণ করে নির্ম্মল অবকাশ। একটা জাতি-বিশেষ একেবারে উৎসন্নপ্রায়, জাতি মস্তিষ্ক গডার অবকাশ পায় না, ক্ষয়-পূরণের সুযোগ তাকে দেওয়া হয় না।"

বৌদি বলিল, "শুধু রেডিও কি তার জন্য দায়ী?"

"কম্প্লিকেশন অনেক জুটেছে, কিন্তু রেডিওতে ঐ সব অর্থহীন প্রলাপ সুরের ভাঁজে ভাঁজে জীবন্ত মস্তিষ্ক অকেজো করে প্রতিক্ষণ। এই মহাক্ষয় দূর করার শক্তি নেই আমাদের। আমার নাই, আমার বৌদিদিরও নাই। কত নিরুপায় আমরা।"

হরিপ্রসন্ন পণ্ডিতের ন্যায় গম্ভীর ভাবে প্রস্থান করিল। এমন নিত্য হয়। বৌদিদি বেডিও আবার খুলিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ কৃত্রিম সুরের মূর্চ্ছনার ধ্বনি উঠিল—'মজালে মজালে, রূপের নেশায় মজালে—।" বৌদির আজ মনে হইল—মস্তিষ্কের উপর সত্য যেন হাতুড়ির ঘা পড়িতেছে, মস্তিষ্ককোষের দৃঢ়তা শিথিল করিয়া দেয়। হরিপ্রসন্ন তাই বোধ হয় রেডিওর উপর এত চটা। রেডিও মানুষকে 'সিরিয়াস' হইতে দেয় না। হরিপ্রসন্ন 'সিরিয়াস' চরিত্রের লোক, তবুও তার মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

হরিপ্রসন্ন আজ গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরিল। ইচ্ছা করিয়াই তাহার এই বিলম্ব। মনের ঝাল রেডিওর ওপরে ঝাড়িতে গিয়া যেন সে বৌদিদির মনের উপর আঘাত দিয়াছে। মনটা ভাল ছিল না।

হরিপ্রসন্ন অবিবাহিত। বয়স প্রায় ৩২ বৎসর হইয়াছে। কলিকাতার কোন এক কলেজে সে অধ্যাপনা করে। তরুণ ছাত্রেরা হরিপ্রসন্নের প্রতি সশ্রদ্ধ, কিন্তু বড প্রগতিবিমুখ বলিয়া ছাত্রদের সে প্রিয় হইতে পাবে নাই। হরিপ্রসন্নের গম্ভীর মুখ আর গোল গোল উজ্জ্বল চক্ষু দুটির দিকে চাহিয়া সকলে সন্ত্রস্ত হইত। ভরসা করিয়া কেহ কাছে ঘেঁসিত না। হরিপ্রসন্ন আপন ভাবেই থাকিত, একলা থাকিতেই ভালবাসিত, কথাবার্ত্তা ঐ বৌদিদির সঙ্গেই হইত। বৌদিকে কোন কারণে ক্ষুণ্ণ করা তাহার ইচ্ছা নয়। কিন্তু সঞ্চিত মনের ভাব এই একজনের কাছে ব্যক্ত করিতে গিয়া অনেক অপ্রিয় কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িত। হরিপ্রসন্ন রেডিও অথবা সিনেমা ভালবাসিত না। এই দুইটাই অধঃপতনের হেতু বলিয়া সে ধারণা করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু তার বৌদিদি এই দুইয়েরই অত্যন্ত অনুরাগী ছিল। তাহার ঘরে রেডিও চলিত হর্দ্দম। আর সিনেমার নূতন পালা তাহার বাদ

যাইত না। তর্কবিতর্ক করিয়াও হরিপ্রসন্ন বৌদিদিকে বুঝাইতে পারিত না—ঐ দুইটা আমোদ নহে, বিশ্রামের সুখাদ্য নহে, উহা মানুষের স্বভাব-আনন্দকে ধ্বংস করে, আয়ুঃ-হরণের ঐ দুটা কালকূট হলাহল।

বৌদির সম্মুখীন হইতে না হয়, এই জন্য আজ তার রাত্রি করিয়া বাড়ী ঢোকা। হরিপ্রসন্ন ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল—আজ ঘরখানির কিছু রূপান্তর সাধিত হইয়াছে। শয্যাধারটি পূর্ব্ব-পশ্চিম হইতে উহা উত্তর-দক্ষিণ করিয়া বসান হইয়াছে। লেখার টেব্‌লটি একটি বাতায়ন পথ রুদ্ধ করিয়াছিল, উহা উত্তর দিকের দুইটি জানালার মধ্যবর্ত্তী ভিত্তিগাত্রে সংস্থাপিত করা হইয়াছে; দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকের জানালার নীচে তাহার ইজি-চেয়ারখানি রাখা হইয়াছে। ঘরের মধ্যভাগে একটা মেজের উপরে সুদৃশ্য ফুলদানীতে ফুটন্ত অফুটন্ত রজনীগন্ধার কয়েকটি ঝাড় শোভা পাইতেছে। আর বিছানার উপর একরাশি যূঁইফুল একটা কাঁচের প্লেটে যেন সহাস্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উজ্জ্বল বিদ্যুদালোকে বিছানার পারিপাট্য তাহার চক্ষু এড়াইল না। শয্যাস্তরণ নূতন এবং অতিশয় পরিচ্ছন্ন।

টেব্‌লের উপর নৈশভোজনের খাদ্যসামগ্রী সযত্নে রক্ষিত ছিল। সে ঢাকা খুলিয়া দেখিল, খাদ্য-সামগ্রীগুলিও আরও অধিকতর শ্রীমণ্ডিত। অতি যত্নসহকারে যথারীতি ঐগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। হরিপ্রসন্ন ভাবিল—বৌদিদি আজ উত্তম প্রতিশোধ লইয়াছেন; তাহার প্রতি বিরক্তি-প্রকাশের এই সস্নেহ প্রতিবাদ আনন্দের সহিত কিঞ্চিৎ কটু মনে হইল। ইহার প্রতিবাদ কাল সে করিবে। হঠাৎ মনে হইল, কে যেন বাহিরের জানালায় দাঁড়াইয়াছিল, সরিয়া গেল। হরিপ্রসন্ন অপরাধীর মত ডাকিল, "বৌদি!"

কোন সাড়া নাই। হরিপ্রসন্ন আলো নিভাইয়া শয়ন করিল।

পরদিন প্রভাতে বাড়ীর বৃদ্ধা পরিচারিকা বামা মাসী ঘরে ঢুকিয়া সুর পঞ্চমে বলিল, "আহা, কি ছিরিই হয়েছে, মাথার দিকে সোপাট দক্ষিণে জানালা। মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ—; দমকা বাতাসে সর্দ্দি হয় যদি, এই বামা মাসীই তখন পায়ে গরম তেল মালিস করবে। আর ঘরের মাঝখানে একটা মনুমেণ্ট, হাড় জ্ব'লে যায়!" সে আপন মনে গজ-গজ করিতে করিতে ঘর পরিষ্কার করিতে লাগিল।

হরিপ্রসন্ন বলিল, "ঘর আমার উল্টে-পাল্টে গেছে বামা মাসী, তুমি বুঝি খবর রাখনি?"

"খবর আর রাখিনি। আমার কথা শুনবে কে বল। যে শোনবার, সে চলে গেছে।" এই বলিয়া বামা মাসী একটু ভাঙ্গা গলায় পুনরায় বলিল, "বামাকে জিজ্ঞাসা না করে' কোন কাজ তোমার মায়ের করার সাধ্য ছিল না। আমি তো আজকের নয়, এই তিন পুরুষ দেখলুম!"

হরিপ্রসন্ন প্রাতঃকৃত্য সারিয়া ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র সবিস্ময়ে দেখিল—আজ তার প্রাতরাশ লইয়া আসিয়াছে বামা মাসী নহে, এক নবীনা। সে কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। এক অপরিচিতা আগন্তুক তাহার উপর এমন রাহাজানী করিবে, তাহার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। একটু থতমত খাইয়া মুখ তুলিতেই সে দেখিল—নবীনা খাবারের প্লেট টেব্‌লের উপর রাখিয়া অপলকে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। দৃষ্টিতে প্রখর আগুনের ঝাঁজ বাহির হইতেছে।—কিন্তু একি? এ মুখ তো অপরিচিত নয়, হরিপ্রসন্ন মাথা নীচু করিল।

নবীনা হাসিয়া বলিল, "একেবারেই ভুলে' গেছ দেখছি। সব পুরুষের একই স্বভাব। চোখের আড়ালে আর কিছু মনে থাকে না।"

এইরূপ কথার ভঙ্গীও নূতন নহে। কিন্তু সে যে অনেক দিনের কথা। সে রূপের সহিত এ রূপের তুলনা করা যায় না। সে অষ্টাদশ-বর্ষীয়া অনূঢ়া গোলাপের কুঁড়ি। আর এ শুভ্র-বিকশিতা মল্লিকা, অপরূপ-মাধুর্য্যময়ী—একি সেই শৈল?

হরিপ্রসন্ন এবার ভরসা করিয়া চাহিল, হাঁ, শৈল বটে! একখানি অতি শুভ্র, সূক্ষ্ম থান কাপড় তাহার পরিধানে, অলঙ্কারহীন বাহুযুগল মৃণালদণ্ডের ন্যায় অতি কমনীয়, সুন্দর। সেই গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কেশপাশ। সেই

মাছের কাঁটার ন্যায় সরল সীঁথি। শিথিল কবরীতে পৃষ্ঠাবরণের বস্ত্রখানি আটকাইয়া আছে। অনিন্দ্য মুখশ্রী। হরিপ্রসন্ন ডাকিল, "শৈল!"

শৈল হাসিয়া বলিল "এতক্ষণে চিনেছ। খাও, হাঁ করে' তাকিয়ে থাকতে আর হবে না। বামা-কণ্ঠের গানে যখন এত অরুচি, বামার পানে চেয়ে থাকার রুচি তো ছাড়তে পার নি!"

কথায় শ্লেষ ছিল। হরিপ্রসন্ন অপ্রতিভ হইল। পূর্ব্ব-স্বভাব আবার বুঝি ফিরিয়া আসে! দশ বার বৎসরের স্মৃতি মুছিয়াছে কই?

শৈল তার বাপ-মায়ের সঙ্গে এই বাড়ীর একাংশে ভাড়া ছিল। কিশোরী যৌবনে উপনীত হইল তাহার চক্ষের সম্মুখে। শৈল'র পিতামাতার অনুরোধে সে তাহাকে পড়াইতে রাজী হইল—পড়াইতে পড়াইতে চারি চক্ষের চাওয়া-চাওয়ি; কিশোরীর নয়নের আলো প্রভাত-সূর্য্যের ন্যায় অনুরাগরঞ্জিত স্নিগ্ধ—তরুণের নয়নে মধু প্রলেপ ঢালিয়া দিত। হরিপ্রসন্ন চক্ষু ফিরাইতে পারিত না। শৈল নয়নে নয়ন বাঁধিয়া মিটি-মিটি হাসিত। হাওয়ায় বইয়ের পাতা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উড়িত, কে তাহার খেয়াল রাখে! তারপর বৌদিদির পদশব্দ। হঠাৎ দু'জনে সচকিত হইয়া পড়ার ভান করিত। সে বড় সুখের দিন গিয়াছে; বৌদিদি হাসিয়া বলিত, "পড়াশুনার নলিচা-আড়ালে প্রেমের লুকোচুরি আর কত দিন চলবে? দাদাকে বলব।"

হরিপ্রসন্নের তাহাতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু শৈল'র পিতামাতা সুন্দরী কন্যাকে শীকারের মত সম্মুখে রাখিয়া, এক ধনবান্ প্রৌঢ়ের হাতে তাহাকে সঁপিয়া দিল। শৈল কাঁদিল। হরিপ্রসন্নের কাছে আত্মরক্ষার নিবেদন সে জানাইল। হরিপ্রসন্নর মুরুব্বি বৌদি, কিন্তু বৌদিদির সাধ্যে কুলাইল না শৈলকে ফিরাইয়া আনা। বিবাহের ঢোল-কাঁশি বাজিল, শঙ্খ হুলুধ্বনি উঠিল। বৌদিদিও বরণ-ডালা মাথায় করিয়া সাত পাক ঘুরিয়া বর-কনে' বরণ করিল। হরিপ্রসন্ন কাঠের মত দাঁড়াইয়া দেখিল—শৈল বরের সহিত গাঁটছড়া বাঁধিয়া মোটরে চাড়য়া বসিল—শৈলহরণ হইয়া গেল।

যৌবনপ্রভাতে প্রথম প্রণয়ের একাঙ্কেই যবনিকা পড়িল; সে দশ এগার বৎসরের কথা। তারপর সেই শৈল আজ তাহার সম্মুখে পুনরায় উপস্থিত।

কথা কিছু হইল না। বামা মাসী তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "সাত-তাড়াতাড়ি জলখাবারের রেকাবী তোমায় কে নিয়ে আসতে মাথার দিব্যি দিলে বলত? বাছার কাল রাত্রেও খাওয়া হয় নি। ঐ উনিই—শুনছো বাবা হরিপ্রসন্ন—ছাই-পাঁশ কি যে করে রেখেছিল, ওই জানে। কণা কেটে একটুও তো মুখে দাও নি!"

হরিপ্রসন্ন বলিল, "অনেক রাতে বাড়ী ফিরেছি বামা মাসী, তাই বেশী খাইনি। এখন ক্ষিদে পেয়েছে।"

"খাও, বাবা খাও। ও সেই শৈল, সেই আমাদের বাড়ীতে ভাড়া ছিল। বছর না ফিরতেই কপাল ভেঙ্গেছে। তাই বলে' কয়ে আর, অত বড় মাগী পালিয়ে এল' কি করে' গো!"

হরিপ্রসন্ন ক্ষুণ্ণ দৃষ্টিতে শৈল'র দিকে চাহিল। শৈল'র নয়ন রহস্যময়। সে হরিপ্রসন্নের চক্ষের উপর একটা চাবুক মারিয়া কটাক্ষপাত করিল। তারপর মৃদুহাস্যে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

বামা মাসী খুঁটিয়া খুঁটিয়া সব কথা বলিয়া গেল। কাল মধ্যাহ্নে এক পরিচারিকাকে লইয়া সে কাশী হইতে পলাইয়া আসিয়াছে; তারাপ্রসন্ন তখন বাড়ীতে ছিল, সে কাশীর বাড়ীতে টেলিগ্রাম করিয়া দিতে চাহিল শৈল দুইদিন পরে উহা হইবে, এইরূপ বলায় তারা-প্রসন্ন তাহাতেই রাজী হইয়াছে। বৌঠাকরুণ শৈলকে পাইয়া যেন হাতে চাঁদ পাইয়াছে। কত কথা, হাসি, গান, বাপ্ রে বাপ্! ঐ পালানে হাতী মেয়েটাকে নিয়ে কি সোহাগ?

হরিপ্রসন্ন বুঝিল—যৌবনের সুখ-মিলন স্বপ্ন মাত্র নহে; বড় বস্তুতন্ত্র; কঠোর সত্যমূর্ত্তি ধরিয়া তাহার সম্মুখে উপনীত।

বৌদি তাহাকে একটী কথাও বলে নাই। দাদাও যে নীরব আছেন, উহা বৌদিদিরই কারসাজি। সমস্ত ব্যাপারই আড়াল হইতে বৌদিদির পর্য্যবেক্ষণে আছে।

তিনি সবখানি তলাইয়া না বুঝিলে, কোন কাজের উপসংহার করেন না। রাত্রের গৃহসজ্জা, প্রাতরাশ লইয়া শৈল'র আগমন—এ সবের মূলে আছে বৌদির চাতুরী। তিনি দেবরের মন বুঝিতেছেন।

হরিপ্রসন্ন যথসময়ে কলেজে চলিয়া গেল। বৌদিদি লক্ষ্য করিল—হরিপ্রসন্নের গর্ব্বোন্নত শির আজ ইঞ্চি দুই নত হইয়াছে। খাওয়ার সময়ে অনাবিল হাসির ঢেউ আজ আর তেমন সহজ ও স্বচ্ছ নহে। বৌদিদি মনে মনে হাসিল। আজকে রেডিওতে সরসীর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি উঠিলেও, উহা শৈল'র প্রত্যক্ষ রূপের মূর্চ্ছনায় মুখরিত হইবে—যাদুমণি ধরা পড়িয়াছে।

৩

তারাপ্রসন্ন ডাক্তার। মধ্যাহ্নভোজনের পর আরাম-কেদারায় ঠেস্ দিয়া যুদ্ধের খবর পড়িতেছিলেন। পত্নী নীরজাসুন্দরী কাগজখানা হাত হইতে টানিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "প্রেমের বানে ঘর-বাড়ী যে ভাসে—খেয়াল নাই এক বিন্দু।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "প্রেমের বানে ভাসতে রাজী আছি নীরজা। তুমি আছ, আমি নিরাপদ, দুর্ভাবনা এক বিন্দু নাই।"

—"সত্যি! করি কি বল দিকিনি? সেই ১৭।১৮ বছরের শৈল ঠিক সেই মন নিয়েই ফিরেছে।"

—"করবার কি আছে?"

—"ভাজা মাছ উল্টে খেতে জান না! অত বড় মেয়ে পালিয়ে এসেছে কি আবেগ নিয়ে—ডাক্তার মানুষ, নাড়ী টিপ্‌তেই শিখেছ, মনের খবর তো রাখ না?"

—"মনের ডাক্তারী তুমিই ভাল জান। কিন্তু আমি বলি—ওর বাড়ীতে খবর দেওয়া ভাল। নইলে একটা ফ্যাসাদে পড়তে হবে।"

—"খবর তো দিতে হবে। গোড়ার খবরটা জানতে হবে তো ভাল করে'।"

—"গোড়ার খবর আবার কি?"

—"খুব তুমি তো? ভাইয়ের মন বাঁধা পড়েছে, সে খবর রাখ না বুঝি? এই দশ বৎসর অভিমানেই ভায়া কাটিয়েছে, একগুঁয়ে জানোয়ারের মত। আর শৈল স্বামী মরার দশ বৎসর পরে, কি টানে এখানে এসে হাজির হ'ল, সে খবরও ডাক্তারকে রাখ্‌তে হবে।"

"বড় কম্‌প্লিকেটেড্ কেস্! বড় ডাক্তার ডাক, এ সবের চিকিৎসা আমার মাথায় কুলোয় না!"

—"আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

—"কি বল?"

—"বিধবার বিয়ে যদি হয়, তোমার আপত্তি আছে?"

তারাপ্রসন্ন ললাট কুঞ্চিত করিয়া নীরজা দেবীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বল কি তুমি, হরিপ্রসন্ন বিয়ে করবে? ভায়াকে তুমি চেন নি।"

"চেনাচিনির কথা পরে। তোমার আপত্তি আছে কিনা বল?"

টেব্‌লের উপর ফোণের ঘণ্টা বাজিল। তারাপ্রসন্ন মনে মনে এ দায় হইতে রেহাই চাহিতেছিলেন। রিসিভারটা কাণে লইয়া বলিলেন, "হ্যালো?" তারপর তাড়াতাড়ি বলিলেন, "নীরজা, একটা জরুরী কল্। আমাকে এখনই বাইরে যেতে হবে।" ডাক্তার দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

নীরজা বলিল, "ঠাকুরপোর সঙ্গে শৈল'র বিবাহে তোমার আপত্তি আছে কিনা বলে' যাও।"

তারাপ্রসন্ন মুখটা ফাঁক করিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, "মনু-মহারাজের আমলে আপত্তির কথা চল্‌ত। হরি যদি চায়, শৈল'র যদি অসম্মতি না থাকে, তুমিও যদি রাজী হও—এ অধীন ঘটনার অনুসরণ করতে বাধ্য হবে।"

ডাক্তার চলিয়া যাওয়ার পর নীরজা দেবী শৈল'র নিকট গেল। শৈল নীরজার অর্দ্ধসমাপ্ত সোয়েটারটা বুনিতে বসিয়াছিল, আর গুণ্‌-গুণ্ করিয়া গান গাহিতেছিল। সে যে এত বড় একটা কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে, সেদিকে তার আদৌ ভ্রূক্ষেপ নাই।

নীরজা বলিল, "শৈল, ডাক্তারবাবু আজই তোমার ভাসুরকে টেলিগ্রাম করে' দিতে বল্লেন, তুমি কি বল?"

শৈলর মুখ পাংশুবর্ণ হইল। সে ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "আজকের দিনটা যাক্ বৌদি।"

নীরজা বলিল, "কেন, আজ না হয় কাল বাড়ীতে

জানাতেই ত হবে, পুলিসে তারা খবর দিয়েছে নিশ্চয়। তোমাকে এখানে রাখা তাদের না জানিয়ে অপরাধ— বুঝতে পার তো?" শৈল'র চক্ষু অশ্রুময় হইল। সে বলিল, "আমি সেখানে থাকতে পারব না। দশ বৎসর চেষ্টা করেছি; থাকতে পারি নি।"

—"এখানেও যে থাকতে পারবে, তার কি কোন মানে আছে?"

শৈল মাথা নীচু করিয়া রহিল। ইচ্ছা হইতেছিল সে বলে—এখানে সে থাকিতে পারিবে। যদি প্রশ্ন উঠে কেন, সে তাহার উত্তর দিতে পারিবে না। শৈল এক বৎসর প্রৌঢ় স্বামীকে ক্রীড়নক-রূপে হাসাইয়াছে, নাচাইয়াছে, কত খেলা খেলিয়াছে। আরও দশ বৎসর এ খেলায় সে হয়তো ভুলিয়া থাকিতে পারিত, কিন্তু বিধাতা সে সাধেও বাদ সাধিল। সে কি লইয়া আর থাকিবে? ভাশুর মহাশয় এক গুরু ডাকিয়া মন্ত্র দিয়াছেন। গুরু-মহারাজ পূজা-পদ্ধতি শিখাইয়াছেন—অঙ্গন্যাস, করন্যাস, নাক টিপিয়া প্রাণায়াম—মনকে পরকালের জন্য প্রস্তুত করার অনেক বিধানই দিয়াছেন। কিন্তু শৈল'র পরলোকের চিন্তা আছে কি নাই, সে খোঁজ গুরুদেব করেন নাই। যৌবনের সীমা সে ছাড়াইয়া আসিয়াছে; কিন্তু যৌবনের রং অঙ্গে চিরদিন লাগিয়া না থাকুক, মনকে সে সহজে ছাড়ে না। শৈল'র যৌবন-কুঞ্জে প্রৌঢ় স্বামী-দেবতাকে তাড়া দিয়া সে বেশ নাকাল করিত; মন কৌতুকে ভরিয়া উঠিত। কিন্তু সে আশ্রয়টুকু যখন ভাঙ্গিয়া গেল, শৈল চক্ষে অন্ধকার দেখিল। অন্তরে বাহিরে সে অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। স্বামীর পূর্ব্ব-পক্ষের ছেলেমেয়েরা কৃত্রিম স্বরে তাহাকে মা বলিয়া ডাকিত, পাল্টা ব্যবহার তাহার মনে হইত নিছক কপটতা; ইহা মাতৃত্বের অপমান। সে দশ বৎসর ধরিয়া কি আশ্রয় করিয়া থাকিবে, ভাবিয়াছে। যৌবনের সেই প্রথম সঙ্গী হরিপ্রসন্নকেই মনের সম্মুখে বার বার দেখিয়াছে, এখনও তাহার বাঁচিয়া থাকায় সার্থকতা আছে। বিবাহ নাই হইল— মনতো আশ্রয় পাইবে, নতুবা এই দুঃসহ জীবনভার সে বহিতে পারিবে না। আত্মহত্যা করিয়া একটা পারিবারিক দুর্ঘটনা সৃষ্টি অপেক্ষা নির্লজ্জার ন্যায় হরিপ্রসন্নের কাছে উপস্থিত হওয়াই তাই সে শ্রেয়ঃ করিয়াছে। এখানেও যদি সে উপেক্ষিতা হয়, জীবনের যবনিকা টানিয়া আনিতে সে কাতরা হইবে না।

শৈলকে সুগভীর চিন্তারতা দেখিয়া নীরজা বলিল, "শৈল, তোদের কথা আমি জানি। কিন্তু তুই কি মনে করিস্—ঠাকুরপোর সঙ্গে তোর আবার বিয়ে হবে?"

শৈল হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নীরজা তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিল। শৈল একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "বিয়ে কি বড় বউদি—বিয়ে নাই হ'ল— আমায় একটু আশ্রয় দাও, মনের তৃপ্তি আমার এইখানেই—"

নীরজা বুঝিল—এ যুগে এমন ব্যবস্থা নূতন নহে, কিন্তু ঠাকুরপোর প্রকৃতিতে ইহা বোধ হয় সহিবে না। প্রকাশ্যে বলিল, "খবরটা বাড়ীতে পাঠিয়ে দিই।"

শৈল অধীর হইয়া বলিল "আর একদিন অপেক্ষা কর বউদিদি।"

নীরজা মনে করিল—শৈল তাহাদের দেবরের সহিত এই বিষয় লইয়া স্পষ্টাস্পষ্টি কথা কহিতে চায়, সে সুযোগ সে তাহাকে দিয়াছে। কিন্তু এক দিন, দুই দিন ইহার জন্য যথেষ্ট নহে—সে শৈল'র কথায় রাজী হইল।

## ৪

হরিপ্রসন্ন আজও কলেজ হইতে অপরাহ্নে না ফিরিয়া একটু রাত্রি করিয়া বাড়ী ফিরিল। ইচ্ছা ছিল চুপি-চুপি ঢাকা খুলিয়া আহারাদি-সমাপনের পর দরজায় খিল্ দিয়া শুইয়া পড়িবে। কিন্তু ঘরে ঢুকিতেই তাহার মাথায় বাজ পড়িল। সে দেখিল—শৈল ঘর জাঁকাইয়া বসিয়া আছে— একখানা পুস্তক হাতে লইয়া পড়ার ছল করিতেছে।

হরিপ্রসন্নকে দেখিয়া শৈল উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আজকাল কলেজ বুঝি রাত ৯টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে?"

কথা শুনিয়া হরিপ্রসন্ন শৈল'র দিকে চাহিল। দশ-এগার বৎসর পূর্ব্বের শৈল এ শৈল নহে। এক প্রৌঢ়ের যুবতী স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে যেরূপ ভঙ্গীতে কথা কহিয়াছে, স্বামীহীনা হইলেও, সেই সংস্কার তাহার চিত্তে দৃঢ় হইয়াছে। শৈল হরিপ্রসন্নকে যে স্থানে বসাইতে চাহে—

তাহার কথা বলার ভঙ্গীতে হরিপ্রসন্ন তাহা স্পষ্টই বুঝিয়া লইল। হরিপ্রসন্ন শৈলের এইরূপ দাবী তাহার সুদূর অতীতের আচরণের জের ধরিয়া চলিবে, ইহা পছন্দ করিল না—শৈল'র কথার উত্তরে সে আপনার মনের ভাব দমন করিয়া সহজ ভাবে বলিল "কলেজের পর লেকের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তাই দেরী হয়ে গেল।" শৈল এই সহজ উত্তরে সুখী হইল না। হরিপ্রসন্নের সহিত তাহার সম্বন্ধটাকে আরও একটু ঘোরাল করিয়া বলিল, "দেরী তো শুধু আজ হয় নি, কালও এসেছ অনেক রাত্রিতে।"

শৈল'র এইরূপ কথা হরিপ্রসন্নের বরদাস্ত হইল না। সে বলিয়া ফেলিল, "আমি রোজই যদি রাত করে' আসি, তাতে তোমার কি?"

শৈল মুখ ভারী করিয়া বলিল, "এগারটী বছর তোমার এই ভাবেই কেটেছে; আমার কি? আমার যদি কিছু না থাক্‌বে, তবে ছুটে আস্‌ব কেন? অমন করে' আর তোমার চলা হবে না।"

অদ্ভুত দাবী! হরিপ্রসন্ন ভাবিল—শৈল আমার কে? যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের দায়ে তাহার সহিত যে সম্বন্ধ, তাহার সমাপ্তি হইয়াছে শৈল'র বিবাহে। আজ সে বিধবা হইয়াছে বলিয়াই না সে একটা তুচ্ছ জীবন-ঘটনার দাবীর সূত্র ধরিয়া আজ আবার নিজের প্রতিষ্ঠা চাহিতেছে। হরিপ্রসন্নকে নীরব থাকিতে দেখিয়া শৈল বলিল, "কোন সকালে দুটী খেয়ে গেছ! নিজের শরীরের দিকে নজর দাও না। সে কুলোর মত পিঠ তোমার কোথায় গেল, সে বুকের ছাতি? গলার হাড় যে বাহির হয়ে পড়েছে! নিজের প্রতি এত অযত্ন আর তোমায় করতে দেব না।"

হরিপ্রসন্ন এই দশ বৎসর কাল অন্তরবিচারে নিজের নিঃসঙ্গ জীবন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়াছে। শৈল'র দরদ নারী-সুলভ কৃত্রিমতা বলিয়াই মনে হইল। শৈলকে এড়াইবার জন্ত জিজ্ঞাসা করিল "বৌদি কোথায়, শৈল?"

শৈল বলিল, "তোমার জন্ত রাত জেগে বসে থাক্‌তে তাঁর বয়ে গেছে। তাঁর স্বামী আছে, ছেলেপুলে আছে; তুমি তো তার সবখানি নও!"

তুলনামূলক কথা। মনে হইল—বলে, এতদিন কোথায় ছিলে শৈল? স্বামী, পুত্র, কন্যা—এই সবখানির সঙ্গে আমিও তাঁর একজন; বৌদিদির স্নেহের ঋণ কোনদিন শোধ হইবে না। হরিপ্রসন্ন কথা বাড়াইয়া আর সময় নষ্ট করিতে রাজী নহে; সে বলিল, "তুমি আমায় ভুল বুঝ্‌ছ শৈল! তোমার দাবী অন্যের কাছে হয় তো ঠিকই হত, কিন্তু আমি অনেক দূর চলে' এসেছি, সেখানে তুমি আর নাই। বৌদিদি আর এই তাঁর সংসার আমার সর্ব্বস্ব।"

শৈল হাসিয়া ব'লিল, "সে কথা বলে' বোঝাতে হবে না। এ কথাও জেনেছি—তোমার রেডিওর বিরক্তি, সিনেমায় যাও না, সময়ে খাও না, কারও সঙ্গে মেশ না, হাস না; কোথায় ব্যথা তা' কি বুঝিনি? আরও একটা বড় কথা—"

কথাটা শোনার জন্য হরিপ্রসন্ন বলিল, "কি বল?"

—"বয়সও তো কম হয়নি।"

—"ও বুঝেছি—বিয়ে করিনি, কেমন?"

শৈল হাসিয়া কুটী-কুটী হইল। হরিপ্রসন্ন বলিল, "আমার এই বৈরাগ্যের অন্যান্য কারণের মধ্যে তুমি একটী কারণ, কিন্তু একমাত্র কারণ নও শৈল। তোমায় একটা কথা বলি শোন।"

হরিপ্রসন্ন একটু স্থির থাকিয়া বলিল, "আমি মাষ্টারী করি, স্বভাবটা একটু শিক্ষাদাতার ন্যায় হয়ে পড়েছে, মনে কিছু করো না। দুটী বিষয়ে আস্থা রেখো না। একটী যৌবনের প্রণয়। আর একটী বার্দ্ধক্যের বৈরাগ্য। এই দুইটী অক্ষমতাপ্রসূত। যৌবন বলপূর্ব্বক মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করে, আর বার্দ্ধক্যে মানুষ বাধ্য হয়ে ঈশ্বরের পথে চলে। এই দুইটীই মানুষের ভয়ের কারণ। অতি বড় কাপট্য এইখানে বাস করে।"

শৈল হাসিয়া বলিল, "তোমার কথাটা উল্টে ধরলে বোধ হয় সত্য পাওয়া যাবে। বুড়ার প্রেম আর তরুণের ঈশ্বর-বিশ্বাস। আমাদের দু'জনেরই দেখ্‌ছি ভাগ্য ভাল।"

হরিপ্রসন্ন শৈলের কথার মর্ম্ম বুঝিল—গম্ভীর হইয়া বলিল, "কথাটা মিথ্যা নয়। যৌবনের দৃষ্টি নিয়ে দু'জনের যে হৃদয়-বিনিময়, তা' কি সত্য শৈল?"

শৈল এইবার একটু শিহরিয়া উঠিল। বলিল, "তবে কি তুমি আমার সহিত কপটতা করেছ?"

—"কপটতা ঠিক বলতে পারি না। কিন্তু যৌবনের মোহে আমরা দু'জনেই অন্ধ প্রলুব্ধ ছিলাম। দু'জনেরই রক্ত-মাংসের প্রথম ক্ষুধার তীব্রতায় আমরা হিতাহিত বুঝি নি; কেউ কারও কল্যাণ দেখিনি, সত্য নয় কি?"

শৈল'র বদন আরক্ত হইল। শৈল বুঝিল না—হরিপ্রসন্ন কি কথা বলিতে চাহে। প্রেমের পরিণতি ভোগে। যৌবনের ক্ষুধায় নয়নমন চঞ্চল হয়, রক্ত-মাংসের সতেজ সবুজ আসক্তি দুটী হিয়া এক করিয়া যে পূর্ত্তি চায়, তাহাই কি প্রেমের অমৃত-পরিবেশন নহে? হরিপ্রসন্নকে সে কি না দিয়াছে? তরুণ-তরুণীর সে মিলনকাহিনী আগুনের মত স্মৃতি হইয়া তাহার বুকে জ্বলিতেছে। শৈল'র দাবী একেবারে তো ভিত্তিহীন নহে। দাবীর অধিকার আছে বলিয়াই সে যে অকূলে পাড়ি দিয়াছে। শৈল নয়ন বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "তুমি কি বলছ, স্পষ্ট করে' বল।" হরিপ্রসন্ন বুঝিল—কথা শুনিয়া শৈল বিচলিতা হইয়াছে। হরিপ্রসন্ন দীর্ঘদিন মনস্তত্ত্বের আলোচনায় যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা শৈল'র প্রণয়াকর্ষণে আর নাকচ হইতে পারে না। জীবন-ধর্ম্মে অনভিজ্ঞ দুটা মানুষাকৃতি পশু যৌবনের ক্ষুধায় একত্র হইলে যাহা সর্ব্বত্র ঘটিয়া থাকে শৈল'র সহিত তাহার প্রণয়-সংঘটন ইহা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যাহারা নারী ও পুরুষের এইরূপ মিলনকে রঙের পর রঙ ছড়াইয়া বিচিত্র মহনীয় চিত্রে অঙ্কিত করিয়া অজ্ঞদের প্রলুব্ধ করে, তারা মানবজীবনের মহত্ত্বের ইতিহাস অনবগত। হরিপ্রসন্ন মুক্তি পাইয়াছে—শৈলকে মুক্তি দিতে না পারিলে, তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। সে বলিল, "শৈল বিস্মিত হয়ো না; আমি কেন, তুমি কেন, যে কোন তরুণ-তরুণী এই সুযোগে যা করে, আমরাও তাই করেছি। সেদিন শৈল ছাড়া আর এক তরুণীও যদি আমার সম্মুখে উপনীত হত, এই একই ঘটনার অবতারণা হত। তোমার পক্ষেও এই একই কথা।"

শৈল আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ফণিনীর ন্যায় সগর্জ্জনে বলিল, "মিথ্যা কথা! পুরুষের ন্যায় নারী নয়। পুরুষ ধূর্ত্ত কপট। তুমি এত নীচ, এত ক্ষুদ্র?"

—"সত্য বড় অপ্রিয়, শৈল। তবুও বলব—সেই তুমি, সেই আমি। কিন্তু সেই এক দিনের অধঃপতনে আমাদের পরিচ্ছন্ন জীবনে উভয়ে উভয়ের মসীচিহ্ন।"

কথা শুনিয়া শৈল'র সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। সে থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "পায়ের তলা থেকে আজ পৃথিবী সরে' গেল। দুর্ভাগ্য আমার—তোমার ভাগ্যে আর এক শৈল যদি জুটত, তা' হলে আমায় আর বঞ্চিত হতে হ'ত না। আমি মরীচিকাভ্রান্ত, মৃত্যুপথের পথিক।"

—"ভালই বলেছ। আমার সৌভাগ্য—তোমার ভাগ্যে আর এক হরিপ্রসন্ন জুটেছিল, সে বেচারী বেঁচে থাক্‌লে এত কথারও বোধ হয় প্রয়োজন হ'ত না!"

"কি বল্‌লে?" শৈল'র অধর স্ফুরিত হইতেছিল।

হরিপ্রসন্ন বলিল, "রাগ করো না শৈল! অসত্যকে অতি নিষ্ঠুরের ন্যায় পরিহার বাঞ্ছনীয়। সত্যই যদি তুমি আমার হবে, সেদিন আমি সত্য প্রকাশ করতে ভরসা পাইনি কেন? তুমিই বা মুক্তকণ্ঠে আপনাকে প্রকাশ করতে পারনি কেন? আজও আমি সেই দুর্ব্বলতার কথাই ভাবি। অক্ষমতায় সৃষ্টিশক্তি দেয় না, শান্তি দেয় না; তাই আমি নিঃসঙ্গ।"

শৈল অস্থির হইয়া টেব্‌লের উপর কাগজ-চাপা এক খণ্ড সুদৃশ্য প্রস্তর হরিপ্রসন্নকে লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিল। প্রস্তরখণ্ডটী হরিপ্রসন্নের রগ ঘেঁসিয়া একখানি আর্সীর উপর গিয়া পড়িল। ঝন্‌ঝন্ করিয়া আয়নাখানা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইল। শৈল মরিয়া, যেন তাহার ঘাড়ে খুন্ চাপিয়াছে; লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল দেখিয়া টেব্‌ল হইতে ফুলদানীটা দুই হাতে তুলিয়া হরিপ্রসন্নের দিকে সে ধাবিত হইল। হরিপ্রসন্ন তাহার হাত দুটী দৃঢ় করে ধরিয়া সস্নেহে বলিল, "শৈল, পাগল হলে নাকি?"

শৈল ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া বলিতে লাগিল "কপট জুয়াচোর, আমায় ছেড়ে দাও! কি বলছ তুমি?"

শৈল অবসন্ন দেহে হরিপ্রসন্নের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল। হরিপ্রসন্ন ধীরে ধীরে তাহাকে কোলের উপর শোওয়াইয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "শান্ত হও শৈল। অতীতের পুনরাবর্ত্তন সত্য যদি হত, এত দিতাম না। মানুষ এই সহজ পথেই চলে। তোমায়

ভালবাসি, তাই আপাত সুখের অশান্তি ও ক্ষতির পথে তোমায় চল্‌তে দেব না।"

হরিপ্রসন্নের হস্তসঞ্চালনে অভিমানিনী আরাম অনুভব করিল। তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ রাস্তায় একটা মোটর গাড়ীর বিকট চীৎকারে সে চমকিয়া উঠিল। শৈল দেখিল—তাহার কপালে হরিপ্রসন্ন করপল্লব সঞ্চার করিতেছে। সে হাত দুটা প্রসারিত করিয়া হরিপ্রসন্নের কণ্ঠবেষ্টন করিল, অতি কাতরকণ্ঠে বলিল, "বল তুমি আমার হবে?"

হরিপ্রসন্নের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ—সে কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু তাহার কথা বাহির হইল না। উষ্ণ প্রস্রবণে বুক ভাসিয়া গেল, শৈলের মুখমণ্ডল তাহাতে অভিষিক্ত হইল।

৫

আজও রাত্রি করিয়া হরিপ্রসন্ন বাড়ী ফিরিল। দ্বিতলের বারান্দায় উঠিয়াই সে কাতর কণ্ঠে হাঁকিল "বৌদি! বৌদি!"

নীরজাসুন্দরী সান্ধ্যভোজন সারিয়া পান সাজিতে বসিয়াছিল। দেবরের কণ্ঠ শুনিয়া পানে চুণ দিতে দিতেই বলিল "কেন গো, আজ দিগ্বিজয় করে' এলে নাকি? এত হাঁকাহাঁকি?"

নীরজা শুনিল—কাতর করুণ কণ্ঠ "বৌদি, শীঘ্র এস, ভারী যন্ত্রণা!"

নীরজা তাড়াতাড়ি পানটা মুখে গুঁজিয়া ঘর হইতে বাহির হইল। সে দেখিল—হরিপ্রসন্ন টলিতে টলিতে আগাইয়া চলিয়াছে, তাহার সঘন নিঃশ্বাস ও মুখ দিয়া অব্যক্ত যন্ত্রণাসূচক শব্দ বাহির হইতেছে।

হরিপ্রসন্ন বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। গত রাত্রের ন্যায় আজও শৈল হরিপ্রসন্নের প্রতীক্ষায় একখানি চেয়ারে বসিয়া বই পড়িতেছিল। নীরজা হরিপ্রসন্নের ললাটে হাত দিয়া বলিল "ইস্, খুব জ্বর হয়েছে বুঝি!"

—"হাঁ বৌদি, মাথার বড় যন্ত্রণা!"

শৈল আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। হরিপ্রসন্ন বলিল, "শৈল, তুমি যাও, বৌদির সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।"

শৈল একটু বিরক্ত হইয়াই বাহিরে চলিয়া গেল।

হরিপ্রসন্ন বলিল, "বৌদি, আমায় বাঁচাও, ভারী যন্ত্রণা!"

—"তোমার দাদা আসুক, ওষুধ দেবে।"

হরিপ্রসন্ন বৌদিদির হাতখানা ললাটে বুলাইতে বুলাইতে বলিল "শৈলকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও বৌদি।"

—"কোথায় যাবে? তোমার সঙ্গে শৈল'র কথা কি হয় নি?"

—"কি কথা হবে বৌদি?"

হরিপ্রসন্নকে একটু সুস্থ মনে করিয়া নীরজা হাসিল। হরিপ্রসন্ন বলিল, "তুমি রঙ্গ দেখ্‌ছো, আমার কিন্তু প্রাণ যায় বৌদি!"

নীরজা হাসিমুখে বলিল, "তোমার দাদাকে বলেছি, দাদা রাজী আছে; এ যুগে ওসবে বড় বাধা নেই।"

হরিপ্রসন্ন নীরজার হাতখানা দূরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "কি বলছ বৌদি!"

নীরজা আবার হাসিয়া বলিল, "বল্‌ব আর কি? যা হবার, হয়ে গেছে। শৈল যখন তোমায় ছেড়ে থাকতে পার্‌বে না, আর তুমিও যখন শৈল ছাড়া বিয়ে কর্‌বে না, তখন তোমাদের সিভিল-ম্যারেজ হওয়াই শ্রেয়ঃ।"

হরিপ্রসন্ন হাতটা মুঠি করিয়া নিজের কপালে সজোরে বসাইয়া দিল। নীরজা তাহার হাতখানা তাড়াতাড়ি ধরিয়া বলিল, "আহা, কর কি?"

হরিপ্রসন্ন বলিল, "বৌদি, তুমি কি মনে কর, আমি যে বিয়ে করিনি, শৈলকে পাইনি বলে'?"

—"তা' নয় তো কি?"

—"না, বৌদি! আমায় ভুল বুঝেছ। শৈল আজ বিধবা, তাই সে ফিরতে পেরেছে। শৈল'র বিয়ের পর, আমার বিয়ের বাধা ছিল না; বিয়ে করিনি কেন জান?"

হরিপ্রসন্নের মাথায় খুব যন্ত্রণা হইতেছিল; সে দুই হাতে মাথাটাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ভাগ্যে যদি একটা অনাঘ্রাত ফুল অর্ঘ্যস্বরূপ আমার কাছে আসত, আমি তার প্রতি কি চিরদিন অপরাধী হয়ে থাকতুম না; নিজের অতর্কিত স্বেচ্ছাচারের কথা তাকে বলে'ও কি আমি নিষ্কৃতি পেতাম? সে ব্যথার ভার বয়েও কি সে আমাকে আপন করে' নিতে পার্‌ত? বিবাহের অধিকার আমি

হারিয়েছি বলে'ই অবিবাহিত থাকা আমি স্থির করেছি। শৈল'র বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার কথা মনেও রাখিনি বৌদি। বিশ্বাস কর কি?"

নীরজা হরিপ্রসন্নের কথা শুনিয়া অবাক্ হইল। এমন সততা এ যুগে দুর্লভ। নীরজা দেবরকে নূতন চক্ষে দেখিল। ইহার উপর কোন কথা বলিতে সে সাহস করিল না।

হরিপ্রসন্ন যন্ত্রণার আতিশয্যে অস্থির হইয়া উঠিল। নীরজা বলিল, "শৈল একটু কাছে বসুক, আমি তোমার দাদাকে খবর দিই।"

হরিপ্রসন্ন নীরজার হাতখানি ধরিয়া বলিল, "এ এক অসহ্য যন্ত্রণা বৌদি! মনে হচ্ছে, শীঘ্রই জ্ঞান হারাব। এই দশ বৎসর নারীপুরুষের সম্বন্ধ নিয়ে যা' ভেবেছি তা' বলি শোন। মরি যদি, বলা হবে না।"

"বালাই, ও কি কথা ঠাকুরপো? অমন কথা মুখে এন না।"

হরিপ্রসন্ন এক হাতে চুলের মুঠি ধরিয়া ঈষৎ হাসিল। কথা বলিতে কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু আজ যা' বলার, যেন তাহা শেষ করা চাই। জ্বরের ধমকে কথা বলার প্রবৃত্তিও বাড়িয়াছিল—সে বলিল, "একটা কাজ করো বৌদি—তোমার ছেলে মেয়েদের বিয়ে দিতে দেরী ক'রো না।"

—"তুমি হলে কি? বাল্যবিবাহে সমাজের ক্ষতি বলে'ই তো সদ্দা বিল পাস হল!"

—"ছাই হয়েছে! তোমার বিয়ে হয়েছিল ক' বছর বয়সে?"

—"১৩।১৪ বয়স হবে।"

—"দাদার তখন ১৯ বছর বয়স। তোমরা কি অসুখী হয়েছ?"

—"শ্বশুরের কিছু টাকা কড়ি ছিল আর তোমরাও মানুষ হয়ে উঠেছিলে—তাই বাঁচোয়া। তা' না হলে ছেলেপুলে বালি খেয়ে মরত।"

—"ভিত্তিহীন দুর্ভাবনা। পিতামাতার দায়িত্বে পুত্রকন্যার পরিণয় সুখের শুধু নহে, পুণ্যের। আর যে নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে বিয়ের সাধ করে, তার মত অহঙ্কার আর কি হতে পারে? সেখানে সুখ নাই, শান্তি নাই। ফল অদৃষ্টগত সর্ব্বক্ষেত্রেই হয়। যদিও কোথাও স্বাচ্ছল্য দেখ, জেন বৌদি, সেখানে জীবনের হিসাব কষতে গিয়ে নারীপুরুষের মিলনের অঙ্কে এত অসংখ্য ভ্রান্তি থেকে যায়, যা' মুছে ফেলে কেউ কাউকে পায় না। ঘর-সংসার একটা চুক্তিঘটিত সর্ত্তের মত প্রাণহীন। যৌবনের লঘু ও সরস বাতাসে মানুষের জীবন যখন সুষমায় ভরে' যায়, তখন তার উপর দিয়ে ভোগপ্রবৃত্তির প্রবাহ প্রকৃতি স্বয়ং টেনে আনে, যেমন শৈল আর আমি।—আমি বিয়ে করিনি—"

হরিপ্রসন্ন কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়া রহিল, তারপর অতি কষ্টে বলিল, "এই পরাধীন জাতির সমাজ-প্রাণে দুর্ব্বলতার মাত্রা বাড়াতে চাইনি বৌদি! আমাদের অধঃপতনের বেগবৃদ্ধি হয়। ক্ষতবিক্ষত তরুণতরুণীর পচা দুর্গন্ধময় নিকৃষ্ট সমাজ-জীবনের পুষ্টিতে। অনাঘ্রাত মকরন্দ বুকে নিয়ে যে মধুচক্র, তাহাতেই অমৃতধারা নব শিশুর আবির্ভাব হয়। যে সমাজ-জীবনের গোড়ায় গলদ, সেখানে অক্ষমতার দুশ্চিহ্ন-স্বরূপ অকেজো ভবিষ্যৎ গড়ে' উঠে। তোমার ছেলেমেয়েরা দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের বাঁচিও—"

তারাপ্রসন্ন তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ করিলেন—পশ্চাতে শৈল। হরিপ্রসন্নের চক্ষে জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

হরিপ্রসন্নের জ্বর ১০৪°এর উপর। হৃদ্‌যন্ত্রের অস্বাভাবিক দ্রুততা, রক্তের চাপ অতিশয় প্রবল, রক্তবর্ণ চক্ষু, মস্তিষ্কের যন্ত্রণায় রগের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, ঘাড় কঠিন আকার ধারণ করিয়াছে। তারাপ্রসন্ন ভাইকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "খুব কষ্ট হচ্ছে, নয় হরি?"

হরিপ্রসন্ন মাথা চালিতে চালিতে বলিল, "হাঁ দাদা! আর যেন জ্ঞান থাকছে না।"

তারাপ্রসন্নের মুখে অব্যক্ত শব্দ বাহির হইল। তারপর বলিল, "দুটো আইস-ব্যাগ পাঠিয়ে দিচ্ছি, একটা ঘাড়ের দিকে, একটা সামনে সর্ব্বদা ধরে' থাকবে।"

হরিপ্রসন্ন বলিল "দাদা?"

তারাপ্রসন্ন বলিলেন, "ভয় কি ভাই, আমি আসছি।"

নীরজা তারাপ্রসন্নের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল—অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখ্‌লে?"

তারাপ্রসন্ন হতাশ হইয়া বলিল, "নীরজা, সর্ব্বনেশে ব্যাধি—মেনিন্‌জাইটিস্!"

নীরজা স্বামীর সঙ্গে ঘরে আসিল। তার বড় ছেলেটি রেডিও খুলিয়া গান শুনিতেছিল—নীরজা ছেলের গালে চড় বসাইয়া বলিল, "শুয়ার, আবার যদি এতে হাত দিবি, মেরে' হাড় ভেঙ্গে দেব।" তারপর স্বামীকে বলিল, "কি হবে?"

—"ভয় নেই, বড় ডাক্তার ডাকছি।"

ডাক্তারের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। কাল সারাদিন শৈলকে আর রোগীর কাছে যাইতে দেওয়া হয় নাই। আজ সন্ধ্যার পর সে জোর করিয়া হরিপ্রসন্নের নিকট গিয়া

বসিয়াছে। নীরজার নয়ন অশ্রুসিক্ত। শৈল'র আকৃতি দেখিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

শৈল দুই হাতে মাথায় বরফ চাপিয়া, মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "আমি বিদায় হয়ে যাচ্ছি, বল তুমি ভাল হবে?"

হরিপ্রসন্ন স্থির দৃষ্টিতে শৈল'র দিকে চাহিয়া রহিল মাত্র। কথা কহিবার শক্তি তাহার ছিল না।

শৈল বলিল, "কি অপরাধ আমাদের? বিধাতার কেন এই অভিসম্পাত?"

হরিপ্রসন্নের দুই চক্ষের কোণে জল গড়াইয়া পড়িল। কি যেন বলিবার ছিল, বলা হইল না। বলিবার চেষ্টায় অধর স্ফুরিত হইল; কিন্তু কথা বাহির হইল না।

শৈল বলিল, "আমি মেয়েমানুষ, আমার যে হাত-পথ ছিল না। তুমি কেন তখন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে; বাধা দিলে না। সেদিন ত মরার সুযোগ দু'জনেরই ছিল।" হরিপ্রসন্নের বিস্ফারিত উদাস দৃষ্টি দেখিয়া শৈল'র অনুচ্চকণ্ঠ উচ্চগ্রামে উঠিল, সে চীৎকার করিয়া বলিল "ভুল কার না হয়? কে এমন অভিমান করে' অবলাকে কাঁদিয়ে যায়? ওগো তোমার পায়ে পড়ি— আমায় সঙ্গে নিয়ে চল।"

নীরজা ঘরে আসিয়া দেখিল—হরিপ্রসন্নের দৃষ্টি বড় নৈরাশ্যব্যঞ্জক। শৈল'র আর্ত্তনাদে সে যেন বড় কাতর, অতিষ্ঠ। চক্ষের কোণে জল থিতাইয়া উঠিয়াছে। বিবর্ণ পাংশুবর্ণ মুখখানি দেখিয়া নীরজার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হরিপ্রসন্ন আর্ত্তের ন্যায় নীরজার মুখের দিকে চাহিয়া অতি দীনের ন্যায় যেন আশ্রয়প্রার্থী। নীরজা বলিল, "শৈল, যা তুই, দূর হয়ে যা। সর্ব্বনাশী, তোর এখানে থেকে কাজ নেই।"

নীরজা তাহার হাত হইতে বরফের থলি দুটা কাড়িয়া লইল। আলুলায়িতকুন্তলা শৈল দাঁতে দাঁত রাখিয়া বলিল, "ভুল বুঝি শোধরাণ যায় না? বিধাতার ছলনা বুঝি মানুষ অতিক্রম করতে পারে না?" কিন্তু শৈল কি দেখিল —অতি নিষ্ঠুর বিকৃত মুখভঙ্গী হরিপ্রসন্নের। সে যেন পৃথিবীর একটী নিঃশ্বাস-শব্দও শুনিতে পারিতেছে না। শৈল হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। নীরজা আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে তাহার হাত ধরিয়া হিড়-হিড় করিয়া তাহাকে ঘরের বাহিরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "পাগলামী করতে হয়, নীচে গিয়ে কর্‌গে, রোগীর কাছে নয়।"

শৈল বিকট হাস্য করিতে করিতে নীচে নামিয়া গেল।

ডিস্‌পেন্সারীতে কেহ নাই, শৈল'র ইচ্ছা হইল— আলমারীর কাঁচ, তাকের শিশিপত্রগুলি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া-নাড়া করিয়া দেয়। কালবৈশাখীর ঝড়ে তাহার অন্তর-বাহির ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সে একটা বড় ওষুধের বোতল ধরিয়া টান দিল; হস্তস্খলিত হইয়া উহা সশব্দে মেঝের উপর পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইল। উৎকট ঔষধের গন্ধে শৈল'র চিত্ত যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে উন্মাদিনীর ন্যায় আর একটা শিশি ধরিয়া টান দিল। শিশি ভাঙ্গার শব্দে কম্পাউণ্ডার রামচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে আর সে স্থির থাকিতে পারিল না। প্রথম সে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল; কিন্তু তার-পরই শৈল'র হাত হইতে শিশিটা কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিবা মাত্র, শৈল সেই আট আউন্স শিশির ঔষধটা মুখে ঢালিয়া দিয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। কম্পাউণ্ডার দেখিল—আট আউন্স টিঞ্চার নাক্স রমণী দুই তিন ঢোঁকে কতক খাইল, কতক উগারিয়া ফেলিল। তারপর সে মেঝের উপর উপুড় হইয়া মুখ ঘষিতে লাগিল। ডাক্তারবাবু বাড়ী নাই, সে কি করিবে? চক্ষের সম্মুখে বিষ-ক্রিয়া দেখা দিল। শৈল'র হস্ত পদ সঙ্কুচিত হইতে লাগিল, সে যন্ত্রণায় এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিল।

পথে মোটরের হর্ণ বাজিল। বাঁচা গেল—ডাক্তার ফিরিয়াছেন। সঙ্গে সহরের নামজাদা ডাক্তার ব্যানার্জ্জি। ঘরে ঢুকিয়াই তারাপ্রসন্ন বলিলেন, "এ কি কাণ্ড?"

রামচন্দ্র বলিল, "আট আউন্স নাক্স টিঞ্চার খেয়ে ফেলেছেন।"

দ্বিতল হইতে নীরজার কণ্ঠের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। তারাপ্রসন্নের হৃৎকম্প হইল। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ডাক্তার ব্যানার্জ্জি, শীঘ্র আসুন, বুঝি আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।"

ডাক্তার ব্যানার্জ্জি বলিলেন, "পাম্প কর, যতটা পার তুলিয়ে দাও। আমি আস্‌ছি।"

ভূলুণ্ঠিতা শৈল মৃত্যুবাণবিদ্ধা পক্ষিণীর ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, রামচন্দ্র তার গলায় রবারের নল ঢুকাইয়া ফানেলে জল ঢালিতে উদ্যত, উপর হইতে শুনা গেল— সাগরগর্জ্জনের ন্যায় রমণী কণ্ঠের হাহাকার, আর সঙ্গে সঙ্গে তারাপ্রসন্নের হৃদয়ভেদী বজ্র-ধ্বনির ন্যায় আর্ত্তনাদ।

ফানেল হস্তচ্যুত হইয়া খান-খান হইয়া ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইল। রামচন্দ্র হতভম্ব, শৈল হাত-পা ছুঁড়িতেছে, দুই কস্ দিয়া ফেন নির্গত হইতেছে!
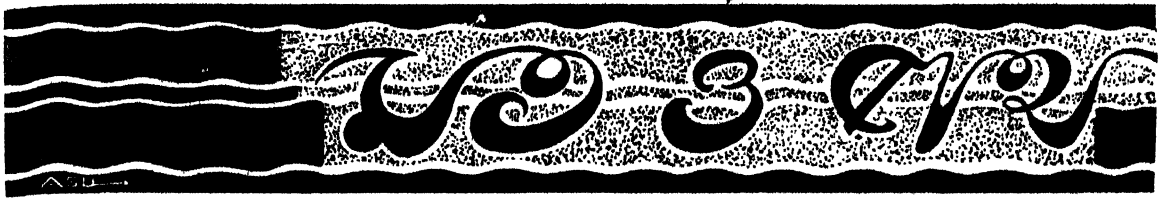
শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

## যুদ্ধের পরিস্থিতি ও বৃটনের বীর-প্রতিজ্ঞা

ফ্রান্সের পতনে ইউরোপীয় যুদ্ধের আবার একটা নূতন অঙ্কপাত ঘটিয়াছে। জার্মাণীর উদ্ধত অভিযান প্রতিরোধ করিবার মিত্রপক্ষে ইংরাজ ছাড়া আর কেহই রহিল না। বৃটন আজ সত্যই একা—কিন্তু ইহাতে বৃটিশ জাতির বীর-হৃদয় কম্পিত হয় নাই, বরং তাহার বিশ্বাস (faith) আরও অগ্নিময়, দৃঢ় পণ (purpose) আরও দৃঢ়তর মরণ-সঙ্কল্পে তীক্ষ্ণাগ্র হইয়া উঠিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চহিল সমস্ত সামরিক পরিস্থিতি ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া, ইংরাজজাতির এই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন—"We become the sole champions now in arms to defend a world cause. We shall do our best to be worthy of this high honour."—একটা মহৎ লক্ষ্যের একমাত্র বীর পতাকা-বাহী হওয়া বড় কম গৌরবের কথা নহে। প্রধান মন্ত্রী এই মহাগৌরবের অধিকারীরূপেই আজ বৃটিশ জাতির অগ্নিমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাই তিনি মহাব্রতে উদ্বুদ্ধ জাতির পক্ষ হইতেই বলিয়াছেন—"The battle of France is over, the battle of Britain is about to begin." ফ্রান্সের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, এইবার বৃটনের যুদ্ধ সুরু হইতেছে। এবং ইহার জন্য তাঁহারা বীরোচিতভাবেই প্রস্তুত হইতেছেন।

প্রধান মন্ত্রী এই প্রসঙ্গে খুব আশ্বস্তিভরে বলিয়াছেন—"After all, we have a Navy"—"আমাদের যে নৌবাহিনী আছে।"

সত্যই দ্বৈপায়ন ইংরাজজাতির অসীম শক্তি ও ভরসার কেন্দ্র এই নৌবাহিনী। ইংরাজের এই নৌশক্তির সম্যক্ পরিচয় ভারতে অনেকে হয়ত রাখেন না। কিন্তু ইংরাজের প্রকৃত শক্তির পরিচয় ইহা না জানিলে জানাই হয় না। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমগ্র নৌবহরের পরিমাণ ছিল ১,১৬,১০০০ টন। তন্মধ্যে খাস ইংলণ্ডের জন্য ৭০৯০০০ টন, ভূমধ্যসাগরে ২৮০০০০ টন, চীনে ৮০০০০ টন ও অষ্ট্রেলিয়ায় ৪৭০০০ টন। ১৯৩৭ হইতে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ—এই কয় বৎসরের মধ্যে এই শক্তির হার আরও বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এক্ষণে কি পরিমাণে (tonnage), কি শক্তিমত্তা ও প্রস্তুতিতে (importance and equipment)—ইহা সকল শত্রুজাতির সংযুক্ত নৌশক্তিকে বহুদূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

অবশ্য এই যুদ্ধে এই বিপুল নৌবাহিনীর কিছু অংশ যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু ইংরাজ তাহার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াই যুদ্ধে নামিয়াছিলেন এবং সম্প্রতি সমর-সচিবের বক্তৃতা হইতে বুঝা যায়, এই ক্ষতি তাঁহারা নব-নির্ম্মাণের দ্বারা সবখানিই পূরণ করিয়া তুলিতেছেন। কাজেই প্রধান মন্ত্রীর উক্তি—"আমাদের যে নৌবাহিনী আছে"—ইহার মধ্যে অতিশয়োক্তি একবিন্দুও নাই। সাগররাণী বৃটনের নৌবাহিনী জন্মভূমির গৌরব ও সাম্রাজ্যের গৌরব উভয়ই রক্ষা করিতে আজ সত্য সত্যই প্রস্তুত হইয়া আছে।

কিন্তু ইংরাজজাতি যে আজ শুধু জড়শক্তির উপরেই নির্ভর করিয়া, এই আত্মপ্রত্যয় ধারণ করিয়াছেন, তাহা নহে। আমরা তরুণ সচিব মিঃ ইডেনের এই বাণী পড়িয়া বুঝিতে পারি—ইংরাজের অন্তরশক্তির আস্থা কত সুগভীর ও সর্ব্বজয়ী। জাতিকে ডাক দিয়া তিনি সেদিন বেতারযোগে ঘোষণা করিয়াছেন—

"We know you will never flinch. We have learned from the tragic fate of the French nation that civilisation cannot be preserved by material means alone. We have seen that ramparts of concrete are not enough. It is only by the dedication of the human spirit and human will throughout

the length and breadth of the land that complete and final victory can be won."

—অর্থাৎ "আমরা জানি, আপনারা কখনই কর্ত্তব্য হইতে টলিবেন না। ফরাসী জাতির শোচনীয় দুর্ভাগ্য হইতে এই শিক্ষাই আমরা পাইয়াছি যে, সভ্যতা-রক্ষা শুধু জড় উপায়ের সাহায্যে সম্ভব নয়। আমরা দেখিয়াছি কংক্রীটে গঠিত দুর্গপ্রাকারই ইহার জন্য যথেষ্ট নহে। সারা দেশে মানুষের আত্মার ও মানুষের সঙ্কল্প-শক্তির উৎসর্গের উপরেই সম্যক্ ও সম্পূর্ণ বিজয় নির্ভর করে।"

জাতীয় শক্তির মূল উৎস—এই উৎসর্গ-শক্তি। এই মহাবীর্য্যই বৃটনের বীরজাতির প্রধান বিজয়-স্তম্ভ।

### ফ্রান্সের পতনের কারণ

একটা বীর জাতির সামরিক পরাজয় ব্যথার কারণ। ফ্রান্সের পরাজয়-কাহিনী অতীব করুণ। পোল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম—এই যুদ্ধে ইহারাও পরাজয় স্বীকার করিয়াছে—দুর্ব্বার নৃশংস জার্ম্মাণীর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশক্তির কাছে; ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় তত কিছু ছিল না। কিন্তু পোল্যাণ্ডের ন্যায় ক্ষুদ্রশক্তি রাষ্ট্রকে অধিকার করিতে যেখানে জার্ম্মাণীর প্রায় ১৮ দিন সময় লাগিয়াছিল, সেখানে ফ্রান্সের ন্যায় ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কন্টিনেন্টল শক্তিকে এমনভাবে পরাভূত ও পদদলিত করিতে জার্ম্মাণীর তের দিনের অধিক লাগিল না, ইহাতে বিশ্বজন শুধু মর্ম্মাহত নহে, স্তম্ভিত হইয়াছে। এই শোচনীয় পরাভবের আসল কারণ সম্প্রতি ফরাসী জেনারেল দে গলের প্রকাশিত তথ্যসমূহ হইতে কতক অনুমিত হইতে পারে। তাহা হইতে জানা যায় যে, বীর ফরাসী জাতি প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ করিতেই পারে নাই। যে যুদ্ধে ফরাসী সেনা মাত্র ৬০,০০০ নিহত ও ৩৫০,০০০ আহত, পক্ষান্তরে প্রায় ১০ লক্ষ সেনা শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছে; সে যুদ্ধ ফরাসীর জীবন-মরণ যুদ্ধ, ইহা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইল, সে রহস্যও জেনারেল গল কিছু কিছু প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতেছে—ফ্রান্সের সেনানায়কগণ সে-কেলে সামরিক যুগের মানুষ, তাঁহারা সময়ের অগ্রগতির সহিত জার্ম্মাণীর আধুনিক রণনীতির কিছুই খবর রাখেন নাই। ফরাসী সেনানায়কগণ গোড়াতে রণনীতির ক্ষেত্রেই হারিয়াছেন—রণক্ষেত্রে পরাজয় এক প্রকার বিনা যুদ্ধেই তাই সম্ভবপর হইয়াছে। অবশ্য ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধ অতি ঘোরতর হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেখানেও সমরনৈতিক প্রাথমিক ভ্রান্তি বেলজিয়াম-রাজের বিশ্বাসভঙ্গের সহিত নিদারুণ বিপর্য্যয়ের কারণ হইয়াছিল। বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্ড মিত্রশক্তির নিকট যদি মিঃ রেণোর কথামত বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ফ্রান্সের বৃদ্ধ অনীকিনীপতি মার্শাল পেঁত্যা ও জেনারেল ওয়েগাঁও তার চেয়ে কম বিশ্বাস-ভঙ্গের পরিচয় দেন নাই। জেনারেল দো গলের উক্তি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা বলিতে বাধ্য যে, ইচ্ছায়-হউক, অনিচ্ছায় হউক, একটা আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের পাক-চক্রেই ফরাসীর ন্যায় বীরজাতি শত্রুহস্তে শোচনীয় আত্মসমর্পণ করিয়াছে অথবা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ফরাসী নৌবাহিনী সম্পর্কে ও তৎপরে ৪০০ জার্ম্মাণ বিমানচালকের মুক্তিপ্রদান প্রভৃতি যে সকল তথ্য জানা যাইতেছে, তাহার অনুসরণ করিলে স্বতঃই একথা মনে জাগে যে, বর্দ্দো গভর্ণমেণ্ট ধীরে ধীরে নাজী-ফ্যাসিষ্ট অক্ষচক্রের অন্তবর্ত্তী হওয়ার পথেই ধাবিত হইতেছে। মার্শ্যাল পেঁত্যা যে বলিয়াছিলেন—"too few children, too few arms, too few allies" "বড় কম শিশু, বড় কম অস্ত্র, বড় কম সাহায্য আমরা পাইয়াছি"—ইহা তবে সম্পূর্ণ সত্য কথা নহে। কিন্তু যে জাতির সেনানায়ক বা রাষ্ট্রনায়কগণের মধ্যে এই ভাবগত পরাজয় পূর্ব্বাহ্ণেই সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, সে জাতির সামরিক পরাজয় অতি অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য্য ঘটনাই বলিতে হয়। এই অন্তরের পরাভব যে আভ্যন্তরীণ অধঃপতনের হেতু নির্দ্দেশ করে, সে সম্বন্ধে মার্শ্যাল পেঁত্যার একটী উক্তি আমরা বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়াই মনে করি—সহযোগী "সোণার বাংলার" কথা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গে আমরাও বলিব—

"যেমন হিন্দুর দুর্গতি-মূলে দুর্ম্মতি হিন্দুর—তেমনি ফরাসীর এই দুর্গতির মূলে ফরাসীর দুর্ম্মতিই কার্য্য করিয়াছে। শক্তির যে উদ্দাম, উৎসাহ, সংযম, ত্যাগ,

জীবন্ত সত্যশক্তির গুণে একটা জাতির জীবনে জীবন্ত হইয়া উঠে, ভোগ, বিলাস, আত্মপরতা, ভেদবুদ্ধি তাহারই গোড়া কাটিয়া দিয়াছে।"

একটা স্বাধীন জীবন্ত জাতির চক্ষের সম্মুখে এই অবস্থান্তর দেখিয়া, আমাদের স্থায় দীর্ঘদিন পরাধীন জাতির কতখানি নৈতিক সচেতন ও সতর্ক হওয়া উচিত?

## অধঃপতনের গতি

মার্শ্যাল পেঁত্যার কথা "বড় কম শিশু, বড় কম অস্ত্র, বড় কম সাহায্য আমরা পাইয়াছি"—ইহা যত অনুধাবন করা যায়, ততই বীর ফরাসী জাতির দারুণ অধঃপতন ও মর্মন্তুদ অন্তর্দৌর্ব্বল্যই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কম অস্ত্র-শস্ত্র থাকা যে কারণে ঘটিয়াছে, জেনারেল দে গলের কথায় তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে—ইহার জন্য দায়ী মার্শ্যাল পেঁত্যার ন্যায় রণনায়ক ও রাষ্ট্রনায়কগণই। আর বৃটেন নাকি এই যুদ্ধে ফ্রান্সকে প্রাণ দিয়া সাহায্য করেন নাই। ইহার প্রমাণস্বরূপ মার্শ্যাল পেঁত্যা বলিয়াছেন—গত যুদ্ধে যেখানে ইংরাজ ৮৫ ডিভিশন সৈন্য দিয়াছিলেন, এ যুদ্ধে তাহারা দিয়াছেন মাত্র ১০ ডিভিশন। কিন্তু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত বৃটেনের সেনা-সাহায্য ১০ ডিভিশনেরও অধিক ছিল না, তারপর অবশ্য ইহা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিজয়োদ্ধত জার্ম্মাণী সেদিন বৃটিশের মিত্রসেনাকে "the contemptible British Army" বলিয়াই উপেক্ষা করিয়াছিল। এবারে আমাদের বিশ্বাস, বৃটেন ধীরে ধীরে তাহার সমস্ত সাধ্য দিয়াই ফ্রান্সকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছিলেন। যে সাহায্য তাঁহারা দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নোল্লিখিত বৃটেনের প্রথম উদ্যোগ-পর্ব্বে সঞ্চিত সমস্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট যুদ্ধ-সম্ভার ও সুশিক্ষিত সেনা প্রভৃতি। এই সাহায্য আরও বাড়িতেছিল—বাড়িতে বাধ্য হইত, কেননা, ফ্রান্সকে রক্ষা করা অর্থে বৃটেনেরই আত্মরক্ষার বহিরঙ্গন রক্ষা করা ও ইংলণ্ডের দ্বীপভূমি হইতেই শত্রুকে দূরে রাখা। অতএব বৃটেনকে এখানে বিশ্বাসভঙ্গের দোষে দোষী করা যায় না। মার্শ্যাল পেত্যাঁ তাহা ইঙ্গিতে যদিও বলিয়া থাকেন, স্পষ্টতঃ বলেনও নাই। কিন্তু আমরা যদি ধরিয়াও লই যে, ফরাসী জাতি মিত্র পক্ষের যথোপযুক্ত সাহায্য পায় নাই, তাহা হইলেও কি এই কথা সত্য নহে যে, ফরাসীর ন্যায় একটা জাতির বিনা অন্যের সাহায্যে জার্ম্মাণী বা যে কোনও শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার শক্তি ও সাধনা থাকাই কর্ত্তব্য—থাকাই জগৎ আশা করিতেছিল, এমন কি ইংরাজও করিতে পারে? জার্ম্মাণী যে চিরশত্রু ফ্রান্সকে শুধু বিধ্বস্ত নয়, একেবারেই ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিতে চাহেন, এ অভিসন্ধি জার্ম্মাণনেতা হিটলার স্পষ্ট প্রকাশ করিতে কোনদিনও কুণ্ঠা করে নাই।

তারপর, কম শিশুর কথা। এইখানেই ফরাসীজাতির আসল দুর্ব্বলতার বীজ নিহিত। ফরাসী জাতির লোক-সংখ্যা দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর, ইহা বিশেষজ্ঞগণ তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দেখা যায় যে, ফরাসী লোক-সংখ্যা ছিল ৩৮,০০০,০০০, এই সময়ে জার্ম্মাণীর লোক-সংখ্যা ছিল সম-পরিমাণ, জাপানের ৩২,০০০,০০০, ইতালী ও বৃটন উভয়ের ২৪,০০০,০০০, ব্রেজিলের ৯,০০০,০০০।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে দেখা যায়, ফ্রান্সের লোক-সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪২,০০০,০০০—কিন্তু তাহার মধ্যে বৈদেশিকের সংখ্যাই ৩,০০০,০০০, এই সময়ে বৃহত্তর জার্ম্মাণীর জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮২,০০০,০০০, জাপানের ৭২,০০০,০০০, ব্রেজিলের ৪৮,০০০,০০০, ইতালীর ৪৪,০০০,০০০।

১৮৭৬ সালে ফ্রান্সে জন্মহার ১,০২২,০০০; ১৯৩০-এ ৭৫০,০০০, ১৯৩৭-এ ৬১৬,০০০, ১৯৩৮-এ ৬১০,০০০ (ইহার মধ্যে বৈদেশিক ২৫,০০০)। দেখা যাইতেছে, ১৮৭৬ হইতে ১৯৩০ মধ্যে জন্মহার কমিয়াছে ২৭২,০০০, ১৯৩০ হইতে ১৯৩৮ মধ্যেই কম হইয়াছে ১৪০,০০০—অতএব এই হারে জন্মসংখ্যা কমিলে ১৫ বৎসরে মধ্যে ফ্রান্সের জন্মসংখ্যা দাঁড়াইবে বৎসরে ৪০০,০০০। ইহার সহিত জার্ম্মাণীর তুলনা করিলে, ১৯৩৬-এ ১,২৭৭,০০০ ও ১৯৩৮-এ ১,৪৫০,০০০—ইতালীর ১৯৩৬-এ ৯৫৫,০০০ ও ১৯৩৮-এ ১,০০১,০০০—বৃটনে ১৯৩৭-এ ৭২৪,০০০ ও ১৯৩৮-এ ৭২৫,০০০।

ফরাসীর এই ভয়াবহ জন্মহ্রাসের কারণ খুঁজিতে গিয়া

জানা গিয়াছে—ইহার মূল হেতু অতিরিক্ত ভ্রূণ-হত্যা ও উপদংশ রোগ। ফরাসী সরকারী তদন্ত-পত্রে প্রকাশ—ফ্রান্সের প্রতি হাজার ব্যক্তির মধ্যে বয়স্ক লোকের সংখ্যা মাত্র ১৪০ জন এবং ফ্রান্সই ভ্রূণ-হত্যা অপরাধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অগ্রণী। ডাঃ দেবরাঁই-এর মতে, এই ভ্রূণহত্যার সংখ্যা বাৎসরিক ৫০০,০০০, অন্ততঃ পক্ষে ৪০০,০০০-এর কম নহে, অর্থাৎ জন্মসংখ্যাবই ইহা সমতুল। শুধু প্যারী নগরীর তথ্য লইয়াই জানা যায় যে, প্যারী ডিষ্ট্রিক্টে অবৈধ ভ্রূণহত্যার সংখ্যা বৎসরে ১০,০০০, তথায় ২॥০ পাউণ্ড হইতে ৬ পাউণ্ড মূল্য দিয়াই ভ্রূণহত্যা সম্পাদন করা যায়। এমিল্ কন্‌ব্রইয়ে বলেন, ফ্রান্স জন্মহার বিষয়ে কালের সহিত তাল রাখিয়া চলা দূরে থাক, অর্দ্ধ শতাব্দী পিছাইয়া গিয়াছে। তিনি কঠোর ব্যঙ্গভরে বলিয়াছেন "we must buy ready-made children"—"আমাদের গড়া-পেটা শিশুসন্ততি কিনিয়া আনিতে হইবে।"

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং মুসোলিনী এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়াই সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন—"গত ১৫ বৎসর ধরিয়া যে ভাবে ফরাসী দম্পতিগণের প্রজননশক্তি কমিয়া আসিতেছে, তাহা যদি সেইভাবে চলে, তাহা হইলে, গাণিতিক সুনিশ্চয়তার সহিত বলা যায় যে, ফ্রান্স শুধু জনশক্তির অভাবেই তাহার সীমান্ত-রক্ষায় অসমর্থ হইবে। বিপদ্ আসিতেছে, এ বিষয়ে ফ্রান্সের আর এক ঘণ্টা সতর্ক হইতে বিলম্ব করা উচিত নহে।" ১ ঘণ্টা নহে, ইহার ৫ বৎসর পরে মুসোলিনী আবার বলিয়াছিলেন, "ফ্রান্সকে পরাস্ত করিতে আমাদের রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে হইবে না—তাহাকে সময় দিলে, সে আপনি আপনাকে নিভাইয়া ফেলিবে"—"It is not necessary for us to defeat Frai ce on the battle-field. Give her time and she will extinguish herself." যে জাতির আত্মনির্ব্বাণ বা আত্মহত্যার পথে এই ক্রমাবনতি বৈদেশিক পররাষ্ট্রেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহার যে রণক্ষেত্রে নাম মাত্রই পরাজয় ঘটিবে, তাহা বিচিত্র কি? বিখ্যাত মনীষী ডাঃ স্পেঙ্গলারের কথাই মনে পড়িয়া যায় "এ যুগের নারী সন্তান গর্ভে ধারণ করিতে চাহে না, কাহারও বেশী সন্তান হইলে সহরের নাগরীরা তাহাদের ঠাট্টা করে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে—প্যারী নগরীর নায়িকারা প্রণয়ীকে এক দিনের জন্যও ভোগ-বঞ্চিত করিতে চাহে না বলিয়া গর্ভধারণ ও সন্তানপালনের দায়িত্ব দুর্ব্বহ বোঝা বলিয়াই মনে করে।" ফরাসী নারীরা ফ্রান্সকে সন্তান দেয় নাই, যথেষ্ট সংখ্যক বীরপুত্রপ্রসবিনী হয় নাই, ইহাই মার্শ্যাল পেতাঁার মর্ম্মান্তিক আক্ষেপের মর্ম্ম। ভ্রূণহত্যা ও জন্মনিয়ন্ত্রণের পাপে ফরাসী দেশ আজ কলঙ্কিত—পদানত—বীরশূন্য। প্রগতির এই পরিণাম। এ দেশের প্রগতিবাদীদের ইহাতেও চক্ষু ফুটিবে কি?

## যুদ্ধে ভারত

ইউরোপের বর্ত্তমান সামরিক পরিস্থিতির সহিত বর্ত্তমান ভারতের অবস্থা একান্ত সম্পর্কহীন বলা যায় না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে অনবহিত, ইহা আমাদের মনে হয় না। সম্প্রতি সমুদ্রপথে বৃটন ও ভারতের সংযোগ যদি কোনও প্রকারে বিঘ্নিত বা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় পূর্ব্বাহ্নেই ইংরাজ যে সকল সতর্কতাবলম্বন করিয়াছেন, তন্মধ্যে বড়লাটের উপর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বাপণ মূলক যে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহা অন্যতম। এই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তনের আভাস পাইয়া যাঁহারা অনেক কিছু আশার আকাশকল্পনা রচনা করিতেছিলেন, তাঁহাদের আশাভঙ্গ হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু যুদ্ধে বৃটনের বিপন্নতার সুযোগে আমরা দানের মত দান ভিক্ষা পাইব, এ জল্পনা জল্পনাই মাত্র, তপস্যার শুল্ক না দিয়া এমন ভিক্ষার দান জাতিকে বড় করে না, মুক্তির যথার্থ অধিকারী করিয়া তোলে না। আমরা সেই জন্য এইরূপ দিবাস্বপ্ন দেখিতে নারাজ। দেশবাসীকেও নিষেধ করি, এই পরাধীনতা হইতে মুক্তির জন্য সাহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘোরী, বাবর কিম্বা লর্ড ক্লাইবের ন্যায় আজ আবার আর একজন অপরিচিত হিটলার বা আর কেহ আমাদের জন্য মুক্তির সুযোগ দিতে আসিয়াছেন, আমরা যেন এই প্রতীক্ষা না করি। পরাধীন জাতির স্বাধীন হওয়ার শক্তি তাহার নিজের মধ্য হইতেই ফুটিয়া উঠে—সেই শক্তিই উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করিয়া লয়। নতুবা শুধু মনের আর্ত্তি লইয়া তপস্যাহীন প্রতীক্ষা বা

সুযোগের আবাহন বকাণ্ড প্রত্যাশা ছাড়া আর কিছু নহে। যুদ্ধের সুযোগে কিছু পাওয়ার দুরাশা তাই নির্বোধের আত্ম-প্রতারণা বলিয়াই আমাদের ধারণা।

এই যুদ্ধে ভারতবর্ষ কি করিবে? ইংরাজ যদি ভারতের সাহায্য চায়, সে সাহায্য দিতে আমাদের আপত্তি কি হইতে পারে? দেখিতে হইবে, সে সাহায্যের বিনিময়ে আমরা কি পাইতে পারি? আমাদের দাবী জাতীয় দাবী বলিয়া ইংরাজ স্বীকার করিতেছেন না, এ অনুযোগ নিরর্থক। আজও গান্ধীজি-বড়লাটের সাক্ষাৎকার ও আলোচনার পর মহাত্মাজী যে কৈফিয়ৎ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়—স্বাধীন জাতির অধিকার ও মর্য্যাদা লইয়া ভারতবর্ষ তাহার নৈতিক ও অন্যান্য শক্তির দ্বারা বৃটেনকে সাহায্য করুক, এই প্রস্তাব বৃটিশ শাসকবৃন্দ অগ্রাহ্য করিয়াছেন দেখিয়া তিনি লিখিয়াছেন "এই জন্য আমি বৃটনকে দোষী করিব না। তাঁহারা ইহার প্রয়োজনই বুঝিতেছেন না। কংগ্রেসের যে নৈতিক শক্তি আছে বলিয়া আমি দাবী করিয়াছি, তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতেই অসমর্থ"। যে দাবীর কথা মহাত্মা এক্ষেত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যে শুধু কংগ্রেসের দাবী নহে, ভারতের জাতীয়তার দাবী, ইহা কেন বৃটিশ জাতি স্বীকার করিতেছেন না? কেন না, তাহা স্বীকার করার কোনও বস্তুতন্ত্র হেতু তাঁহারা পান নাই। ইংরাজ জানেন—বর্ত্তমান যুদ্ধে কংগ্রেসের এই নৈতিক শক্তির বাস্তব মূল্য অধিক নাই। কংগ্রেস যদি তাহার নৈতিক সাহায্য প্রত্যাহার করিয়াই রাখেন, তাহা হইলেও ভারতের নিকট হইতে ইংলণ্ড যে বাস্তব সাহায্য নিশ্চয়ই পাইবেন, তাহাতে তাহার সন্দেহ নাই। গত মহাযুদ্ধ কালে ভারতে বৃটিশ সৈন্য ছিল ৮০,০০০ ও ভারতীয় সৈন্য ২৩০,০০০; যুদ্ধোপলক্ষে ১৯১৪ হইতে ১৯১৬ পর্য্যন্ত ৮০০,০০০ সৈনিক (fighting units) ও ৪০০,০০০ রিজার্ভ নূতন সংগৃহীত হয়। ১৯১৭ সালে, ইহার উপর আরও ২০০,০০০ সেনা সংগ্রহ করা হয়। তন্মধ্যে পঞ্জাব দিয়াছিল ১৯১৬ পর্য্যন্ত ১১০,০০০ ও ১৯১৭-তে ১১৪,০০০; যুক্ত প্রদেশ দিয়াছিল ১৪০,০০০; ভারতীয় রাজন্যবৃন্দ দেন ১০০,০০০—সর্ব্বশুদ্ধ মোট ১২॥০ লক্ষ সেনা ভারত দিয়াছিল। নেপাল তাহার সমগ্র লোক-সংখ্যার এক ষষ্ঠাংশ ১৮ হইতে ৩৫ বর্ষীয় যুবকদের সৈনিকরূপে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।

উক্ত মহাসমরে, ভারত হইতে প্রদত্ত যুদ্ধাস্ত্র ও রসদের পরিমাণ ছিল ৩৫ লক্ষ টন এবং মোট আর্থিক সাহায্য গিয়াছিল ১৬ কোটী পাউণ্ড অর্থাৎ ২৪০ কোটী টাকা।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতের নিকট হইতে সমপরিমাণ বা ততোধিক জনবল, অস্ত্রবল বা অর্থবল পাওয়ার এমন কোনই বাধা নাই, যাহা দুর্লঙ্ঘ্য—বড়লাট বাহাদুর তাঁহার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বের বলেই তাহা দূর করিয়া ঐ সকল আদায় করিয়া লইতে পারেন। কংগ্রেসের নৈতিক প্রত্যাখ্যান শুধু এই প্রক্রিয়ার নাটকীয় রসায়ন যোগাইতে পারে মাত্র। যেমন মহাত্মাজীর প্রত্যেক বৃটনবাসীকে সম্বোধন করিয়া যে অহিংসার আবেদন, তাহা কোন বীর বৃটনবাসীই বস্তুতন্ত্র মূল্যসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন, আমাদের বিশ্বাস হয় না—তেমনি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বড়লাটের আহ্বান উপেক্ষা করিয়া কংগ্রেসের দূরে অবস্থিতিও বৃটিশ জাতি বাস্তবতার কষ্টিপাথরে কষিয়া বিশেষ দুর্ভাবনার হেতু খুঁজিয়া পাইতেছেন না। অথচ কংগ্রেসের পক্ষে এই নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষতা ব্যতীত গত্যন্তরও দেখা যায় না। নিজের শক্তিকে বস্তুতন্ত্রভাবে সমঝাইয়া দিবার কোনও অস্ত্রই যখন কংগ্রেসের হাতে নাই অথবা তাঁহারা সেরূপ অস্ত্র ব্যবহার না করাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তখন শুধু আত্মগঠন ছাড়া কংগ্রেসের পক্ষে আর কোনও বাস্তব কর্ত্তব্য দেখা যায় না। যে সকল অগ্রশীল দল ইহা ছাড়া অন্য কিছু সংগ্রামমূলক গতি আশ্রয় করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন অথবা উদ্যম করিতেছেন, তাঁহাদের সে চেষ্টার উদ্দেশ্য শুধু সংগ্রামাত্মক মনোবৃত্তিকে দেশে জাগাইয়া রাখা অর্থাৎ দেশকে তাতাইয়া রাখা—ইহা কার্য্যকরী নীতি বলা যায় না। সুভাষচন্দ্রের হলওয়েল স্তম্ভভঙ্গের অভিযান এইরূপ প্রচেষ্টাই বলা যাইতে পারে—কিন্তু তাহার অন্য মূল্য বড় বেশী নাই। এই ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে রাষ্ট্রীয় সাধনা আজ কিছু নাই বলিলেই চলে। এ যুদ্ধেও ভারত আজ আসলে দর্শক মাত্র—ইংরাজ যে যুদ্ধ একা করিতেছেন, সে যুদ্ধে ভারত তাহার অপরিসীম জনবল, ধনবল ও বস্তুবল লইয়া দাঁড়াইবার

বিধাতার সুস্পষ্ট আহ্বানবাণী আজও পান নাই—পান নাই বলিয়াই একদিকে দাবী, অন্য দিকে দাবীর অস্বীকৃতি—ইহাতে নাটকীয় ক্রম ধরিয়াই শূন্যে টানাপোড়েন চলিতেছে, আখেরে কিছুই দাঁড়াইতেছে না।

যুদ্ধে ভারতকে আমরা তাই হয় ইংরাজের সম্পূর্ণ সাহচর্য্যনীতি গ্রহণ করিতে বলিব—নতুবা বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় দৃক্‌-ভঙ্গী পরিবর্ত্তন করিয়া একটা অভিনব উপায়ে আত্মসংগঠন অর্থাৎ জাতীয় শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করিয়া তুলিতে বলিব। আমরা ভারতবাসী—আমাদের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট কি দিবার ও করিবার কিছু নাই? তাহা যদি আমরা না বুঝি, তাহা হইলে বাস্তবের সহিত কোনদিনই অন্তরের সামঞ্জস্য বিধান করিতে আমরা পারিব না। ইংরাজ যদি আমাদের শত্রুই হয়, তাহার সহিত রাষ্ট্রীয় দেনা-পাওনার কথাবার্ত্তা কেন এবং কতক্ষণ? সে অবস্থায়, দাবী নাকচ হইলে প্রতীক্ষাই বা তবে কিসের জন্য? আর যদি ইংরাজের সহিত যথার্থ মৈত্রী-বন্ধনের কোন সদুপায় থাকে, তাহা হইলে সে পথ সরাসরি বরণ করিয়া, আপনারই শক্তি ও তপস্যায় সেই সম্বন্ধ সুনিয়মিত—সত্যই উভয়ের কল্যাণপ্রসূ করিয়া না তুলিব কেন? আমাদের বিশ্বাস, এই শক্তি ভারতের আছে। ভারত যদি যথার্থ আত্মপ্রত্যয়ী হয়, ইংরাজকে মিত্ররূপে এই মুহূর্ত্তেই লাভ করিবে। ইংরাজের অপেক্ষা আমাদের নাই। আমরা আত্মস্থ হইয়াই ইংরাজ ও বিশ্বজাতির সহিত যথাযোগ্য সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়া লইব। ইংরাজ ইহা করিতে দিতেছে না, ইহা নিছক আত্মপ্রত্যয়েরই ক্ষুণ্ণতা। আমরা যাহা, তাহাই আমাদের প্রাপ্য। ইংরাজের মৈত্রী চাহিলে, তাহা পাওয়ার পথ সংশয় নহে, বিরোধিতা নহে, আত্মগঠনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে সুবিবেচনাপূর্ণ সহযোগিতা। এ আত্মপ্রত্যয় ইংরাজের দানে অদানে কুণ্ঠিত বা ব্যর্থ হইবার নহে—পরন্তু আপনার মহিমায় সমুজ্জ্বল হইয়া সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্ব অবস্থাকেই আত্মসিদ্ধির অনুগামী করিয়া লইবে।

## কৃষ্ণনিন্দা

শিশুপাল কৃষ্ণনিন্দা করিয়াছিল। উনশত বার ক্ষমা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শততম বারে তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া তাহাকে মুক্তিদান করেন। শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দা মুক্তিপিপাসারই ছলনা মাত্র ছিল। শুনিয়াছি, এ যুগে কৃষ্ণনিন্দা হইয়াছে বা হইতেছে—কিন্তু এই নিন্দার মূলে কাহারও মুক্তিপিপাসা নাই, কাজেই কৃষ্ণ নিজে আবির্ভূত হইয়া কৃষ্ণনিন্দুককে মুক্তিদান করিবেন, এ সম্ভাবনাও দেখা যায় না। কিন্তু এ যুগের কৃষ্ণনিন্দা অর্থে কৃষ্ণপূজকের হৃদয়ে আঘাত দেওয়া যদি হয়, তবে তাহার জন্য দায়ী নিন্দুককে না করিয়া আমরা নিন্দাশ্রবণকারীকেই অধিকতর করিব। কৃষ্ণনিন্দুক কৃষ্ণমহিমা না বুঝিয়াই কৃষ্ণ সম্বন্ধে অকথা-কুকথা বলেন, কেননা তরিবার উদ্দেশ্য তাঁহার নাই—অতএব স্বচ্ছন্দে তাহা করিলেও তাঁহার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু কৃষ্ণপূজক আমরা কি বিশ্বাসের দায়েই এই আচরণের প্রতিকার কামনা করিতেছি? কৃষ্ণতত্ত্বে খাঁটি বিশ্বাসী যে, তাহার ইষ্ট বস্তু লইয়া এমন ঢলাঢলি শোভা পায় না। বিশ্বাসের অগ্নিমূর্ত্তির কাছে অবিশ্বাসীর হৃদয়ও শ্রদ্ধায় বা আতঙ্কে অবনমিত হয়। আসলে নিজেরাও আমরা ঢাকঢোল পিটিয়া কৃষ্ণনিন্দাই ছড়াইতেছি। বিশ্বাসের সাধনা চিন্তায়, আচারে, কর্ম্মে হিন্দু সমাজে আজ কোথায়?

## বাঙালী গোলন্দাজ-বাহিনী

সম্প্রতি বাঙালার যে সমুদ্রকুলরক্ষিণী বাহিনী গঠিত হইয়াছে, তাহাতে ৮০ জন বাঙালী তরুণ যোগদান করিয়াছেন জানিয়া আমরা উল্লসিত হইয়াছি। এই ৮০ জনের মধ্যে দেখা যায়—হিন্দুর সংখ্যা ৭২, মুসলমান ৮ জন মাত্র। এখানে দেশরক্ষার ব্যবস্থায় মুসলমান যুবক অপেক্ষা হিন্দু যুবকগণের আগ্রহ যে বেশী, ইহা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই নব-গঠিত বাহিনীকে সামরিক শিক্ষার জন্য আম্বালায় পাঠান হইয়াছে। বাঙালী তরুণদের গোলন্দাজ-বাহিনীর উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে, ইহাও অতীব আনন্দের কথা। বাংলার বীরপুত্রগণ যোগ্য শিক্ষালাভে দেশ ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য অগ্নিনালিকাচালনায় সুপটু হইয়া উঠুন ও জাতির মুখোজ্জ্বল করুন, এই প্রার্থনা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে করি।

এই প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, বাঙালী যুবকদের গোলন্দাজ হওয়ার অধিকার এ যুগে এই প্রথম। আমরা জানি, এ কথা সত্য নহে। পলাশী যুদ্ধের পর, প্রথম গোলন্দাজ হওয়ার অধিকার ও সুযোগ ফরাসী জাতিই দেন, ও শ্রীমতিলাল রায়ের প্রেরণানুপ্রাণিত ফরাসী চন্দননগরের ২৬ জন বীর তরুণই এই অধিকার সর্ব্বপ্রথমে বরণ করিয়াছিলেন। এই বাঙালী গোলন্দাজবাহিনী ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছিলেন ও ভার্দুনের স্মরণীয় সংগ্রামে যোগদান করার সুযোগও পাইয়াছিলেন। সেই ভার্দুনজয়ী ফরাসী পল্টনের সহিত বাঙালী পল্টনের নামও ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

[illegible] কলিকাতা ফুটবল লীগের বিভিন্ন বিভাগের খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। সকল বিভাগের মধ্যেই ২।৩টি দলের মধ্যে চ্যাম্পিয়নশিপ লইয়া খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছে।

প্রথম বিভাগে মোহনবাগান দল এখন পর্য্যন্তও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পয়েণ্ট লাভ করিয়া লীগ তালিকায় শীর্ষ স্থান দখল করিয়া আছে। কিন্তু গত কয়েকটী খেলায় তাহারা যেমন নৈরাশ্যজনকভাবে খেলিয়াছে তাহাতে তাহাদের সাফল্য সম্বন্ধে ভরসা ত্যাগ করিতে হইতেছে। লীগের নিম্ন স্থানের ভবানীপুর ও ক্যালকাটার সহিত তাহারা ড্র করিয়া দুইটী মূল্যবান পয়েণ্ট নষ্ট করিয়াছে এবং ইষ্টবেঙ্গলের সহিতও তাহাদের দ্বিতীয় খেলার ফলাফল সমান হইয়াছে। মোহনবাগান ২০টী খেলা খেলিয়া ৩১টী পয়েণ্ট লাভ করিয়াছে, ৩টী খেলায় হারিয়াছে ৩টীর ফলাফল সমান, ১৪টী খেলায় জয়লাভ করিয়াছে। মহামেডান, বর্ডার্স, ই বি আর ও স্পোর্টিং ইউনিয়নের সহিত ৪টী খেলা বাকী। মোহনবাগানের রক্ষণ-ভাগ খুবই পুষ্ট, আক্রমণভাগ আরও উন্নত করিতে না পারিলে তাদের লীগ চ্যাম্পিয়নসিপের ভরসা ত্যাগ করিতে হইবে।

মহামেডান স্পোর্টিং ১৯টী খেলা খেলিয়া ৩০টী পয়েণ্ট লাভ করিয়া দ্বিতীয় স্থানে পৌছিয়াছে। তাহারা মাত্র মোহনবাগানের সহিত একটী খেলায় পরাজিত হইয়াছে, ৬টী খেলার ফল সমান সমান, ১২টী খেলায় জয়লাভ করিয়াছে। মহামেডানের খেলায় ক্রমশঃ উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে এবং প্রতি সপ্তাহে ৩।৪টী খেলা খেলিয়াও তাহারা যেরূপ নৈপুণ্য ও দৃঢ়তা প্রকাশ করিতেছে, তাহাতে তাহাদের লীগজয়ী হইবার সম্ভাবনাই অধিক। তাহারা এই পর্য্যন্ত ৩১টী গোল করিয়াছে এবং তাহাদের বিপক্ষে মাত্র ৭টী গোল হইয়াছে। ইহাতে তাহাদের রক্ষণভাগ ও আক্রমণভাগ উভয়ই যে পুষ্ট, তাহা সুস্পষ্ট। বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। ভিজা মাঠে বুট পায়ে মহামেডান আরও উন্নতি করিতে পারিবে, মনে হয়।

ইষ্টবেঙ্গল দল তাহাদের বিশিষ্ট খেলোয়াড় লক্ষ্মীনারায়ণের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া নূতন দুইজন খেলোয়াড় লইয়া খেলিতেছে। তাহারা ২১টী খেলা খেলিয়া ২৯টী পয়েণ্ট লাভ করিয়া তৃতীয় স্থান দখল করিয়া আছে। ইষ্টবেঙ্গলকে এখনও কাষ্টমস, ক্যালকাটা এবং মহামেডান দলের সহিত খেলিতে হইবে। কাজেই তাহাদের লীগ চ্যাম্পিয়ন হইবার আশা খুবই কম।

বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় কালীঘাটের খেলা ক্রমশঃ নিম্ন স্তরের হইতেছে। তাহারা লীগের প্রথম স্থান থেকে ক্রমশঃ নামিয়া ৫ম স্থানে আসিয়াছে। বৃষ্টির মধ্যে তাহারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইতেছে। রেঞ্জার্স বর্ষা আরম্ভ হইবার পর উন্নতি করিতেছে। তাহারা ২১টী খেলা খেলিয়া ২৬টী পয়েণ্ট লাভ করিয়াছে।

লীগে বিপর্য্যয়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ভবানীপুর অদম্য চেষ্টায় খেলায় ক্রমশঃ উন্নতি করিতেছে। এখন স্পোর্টিং ইউনিয়ন, ক্যালকাটা এবং পুলিশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিবে। শেষ পর্য্যন্ত স্পোর্টিং ইউনিয়নকে দ্বিতীয় বিভাগে হয়ত নামিতে বাধ্য হইতে হইবে।

দ্বিতীয় বিভাগ হইতে প্রথম বিভাগে প্রমোশনের জন্য জেলহাউসি ও অরোরার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে। তৃতীয় বিভাগে ট্রপিকেল স্কুল শীর্ষ স্থান দখল করিয়া আছে। চতুর্থ বিভাগে রবার্ট হাডসন ও জোড়াবাগানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। দ্বিতীয় বিভাগে অরোরা, তৃতীয় বিভাগে ট্রপিক্যাল ও চতুর্থ বিভাগে রবার্ট হাডসন লীগ চ্যাম্পিয়ন হইবার সম্ভাবনা।

১ম বিভাগের ২২শে আষাঢ় পর্য্যন্ত লীগ তালিকা:—

| দলের নাম | জয় | ড্র | পরা | প |
|---|---|---|---|---|
| মোহনবাগান | ১৪ | ৩ | ৩ | ৩১ |
| মহঃ স্পোর্টিং | ১২ | ৬ | ১ | ৩০ |
| ইষ্টবেঙ্গল | ১০ | ৯ | ২ | ২৯ |
| রেঞ্জার্স | ১০ | ৬ | ৫ | ২৬ |
| কালীঘাট | ৯ | ৭ | ৫ | ২৫ |
| ই বি আর | ৬ | ৮ | ৭ | ২০ |
| এরিয়ান্স | ৬ | ৬ | ৮ | ১৮ |
| বর্ডার রেজিমেণ্ট | ৬ | ৫ | ৯ | ১৭ |
| কাষ্টমস | ৪ | ৮ | ৮ | ১৬ |
| পুলিশ | ৫ | ৫ | ১১ | ১৫ |
| ভবানীপুর | ৫ | ৪ | ১২ | ১৪ |
| ক্যালকাটা | ৩ | ৭ | ১১ | ১৩ |
| স্পোর্টিং ইউনিয়ন | ৪ | ৪ | ১২ | ১২ |

# সাময়িকী

## সঙ্ঘের পল্লী-সংগঠন

কাঁথি মহাকুমার অন্তর্গত মাজিলপুর গ্রামবাসীর আহ্বানে সঙ্ঘের অন্যতম সভ্য স্বামী বোধনন্দজী গত ৮ই জুন শনিবার তথায় গমন করেন। ঐদিন এই উপলক্ষে গ্রামের প্রবেশ পথে সুসজ্জিত পত্র পুষ্প নির্ম্মিত তোরণদ্বারে গ্রামবাসিগণ স্বামিজীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে গ্রামের কেন্দ্রস্থল প্রাচীন বামগড় জলাশয়ের তটে অবস্থিত মাজিলপুর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুসজ্জিত প্রাঙ্গণে সমবেত হন। অতঃপর বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুরোধে স্বামিজী বিদ্যালয়টী পরিদর্শন করেন।

কাঁথি মহাকুমা জোনপুব সমুদ্রতটের মধ্যস্থল, প্রাকৃতিক দৃশ্যে পরিবেষ্টিত, অথচ লোকালয় হইতে স্বতন্ত্র, এবং উন্মুক্ত আবহাওয়ার মধ্যে বিদ্যালয়টী অবস্থিত। বিদ্যালয়টী গ্রামবাসিগণের মিলন-কেন্দ্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহাদের সকল প্রকাব সমস্যা, বারোয়ারী পূজা, সমাজ হিতকর কার্য্য ইত্যাদি সব কিছুর ইহা প্রাণ-স্বরূপ। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৯০ জন, গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক গঠিত একটী ম্যানেজিং কমিটীর তত্ত্বাবধানে তিনজন শিক্ষকদ্বারা উহা পরিচালিত। অপরাপর শিক্ষার মধ্যে দৈনিক উপাসনা ও ব্যায়াম চর্চ্চা অন্যতম। সঙ্ঘের ভাব ও আদর্শে বিদ্যালয়টী যাহাতে আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়—ইহার জন্য স্বামিজীকে তাহাদের অন্তরের আকুতি জ্ঞাপন করেন। সারাদিন ব্যাপী দলে দলে গ্রামবাসিগণ স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সঙ্ঘের ভাব ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অপরাহ্ণে এক সুসজ্জিত মণ্ডপে বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। স্বামিজী 'বর্ত্তমান যুগধর্ম্মে সঙ্ঘের দান ও সনাতন-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দেন এবং তাঁহাদের প্রাণে আনন্দ ও উৎসাহ সঞ্চার করেন। গ্রামবাসীগণ সঙ্ঘের শাখাকেন্দ্র স্থাপনে সংকল্প জ্ঞাপন করেন।

## ঠাকুর রামকৃষ্ণোৎসব

গত ১৬ই আষাঢ় চন্দননগর নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দিরে স্থানীয় রামকৃষ্ণ স্মৃতি-সমিতির উদ্যোগে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পঞ্চাধিক শততম জন্মোৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব-সভায় দেশাত্মা শ্রীমতিলাল রায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বেলুড় মঠ হইতে শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ও শ্রীমৎ অচিন্ত্যানন্দ মহারাজ এই সভায় যোগদান করিয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। এই উপলক্ষে ফ্রেণ্ডস্ ক্লাবের সঙ্গীত ও বিশেষ ভাবে কুমারী পারুলবালার ভজন ও কীর্ত্তন-গানে সকলে প্রীতি লাভ করেন। শ্রীমান্ আশুতোষ দে ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ দেশের তরুণমণ্ডলীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, আচারণবাদ, ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান ও কার্লমার্ক্সের কমিউনিজম আলোচনাপূর্ব্বক বুঝাইয়া দেন যে, এই সকল বাদ সত্যের একটী ক্ষুদ্র অংশ মাত্র— জীবনের সমগ্র সত্যের সন্ধান ইহার মধ্যে পাওয়া যায় না। সেই পূর্ণ সত্যের সন্ধান একমাত্র ভারতের সভ্যতার মধ্যেই পাওয়া যায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবন এই পূর্ণতত্ত্বেরই জলন্ত বিগ্রহ ছিল—বক্তা সভাপতি মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া বলেন—"শ্রদ্ধেয় রায় মহাশয় একজন মহাসাধক, মহাকর্ম্মী, মহালেখক ও মহামনীষী—তাঁহার রচিত যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবনে বহু নূতন তথ্য আছে, আজও তাঁর মুখে এসম্বন্ধে নূতন বাণীই শ্রবণ করিব।"

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ ঠাকুরের জীবনী আলোচনা করিয়া দেখান যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষকে দিয়া গিয়াছেন তাহার প্রকৃত মনুষ্যত্বের সন্ধান।

সভাপতি রায় মহাশয় সমাপ্তিভাষণে বলেন—"ঠাকুরের জীবন পরম তত্ত্বেরই অনুবাদ। এই তত্ত্বেরই চাই প্রচার। অকপট প্রচারে গড়ে সংহতি। সংহতির পর সমাজ। ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনকে শুধু প্রচার নয়, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই আজ গড়িয়া উঠিয়াছে পবিত্র সংহতি—উহাই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ। আজ দিব্য সমাজ-রচনার যুগ আসন্ন। ঠাকুর এই সমাজ-সাধনারও [illegible] আদর্শ নিজে আচরিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। পতি-পত্নীর দাম্পত্য সম্বন্ধ—ভগবান ও ভগবতীরই নিত্য সম্বন্ধ। ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া গড়িবে যে নূতন জাতি, তাহার স্বাধীন বিকাশই আনিয়া দিবে স্বরাজ বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা। দক্ষিণেশ্বরের মাটীতে এই দিব্য জাতীয়তারই সিদ্ধবীজ নিহিত রহিয়াছে। তাই দক্ষিণেশ্বর নবযুগের মহাতীর্থ।"

অতঃপর শ্রীশৈলেন্দ্র পাল কর্ত্তৃক যথাবিহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে প্রায় রাত্রি ৯ ঘটিকায় সভাভঙ্গ হয়।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

পরিচালক ও প্রকাশক : শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হা[illegible] ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীক[illegible] রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

"[illegible] কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে।
পুন দরশন লাগি কত চাটু বোলে॥"

[ শিল্পী : শ্রীযুক্ত হেরম্বকুমার বন্দোপাধ্যায়
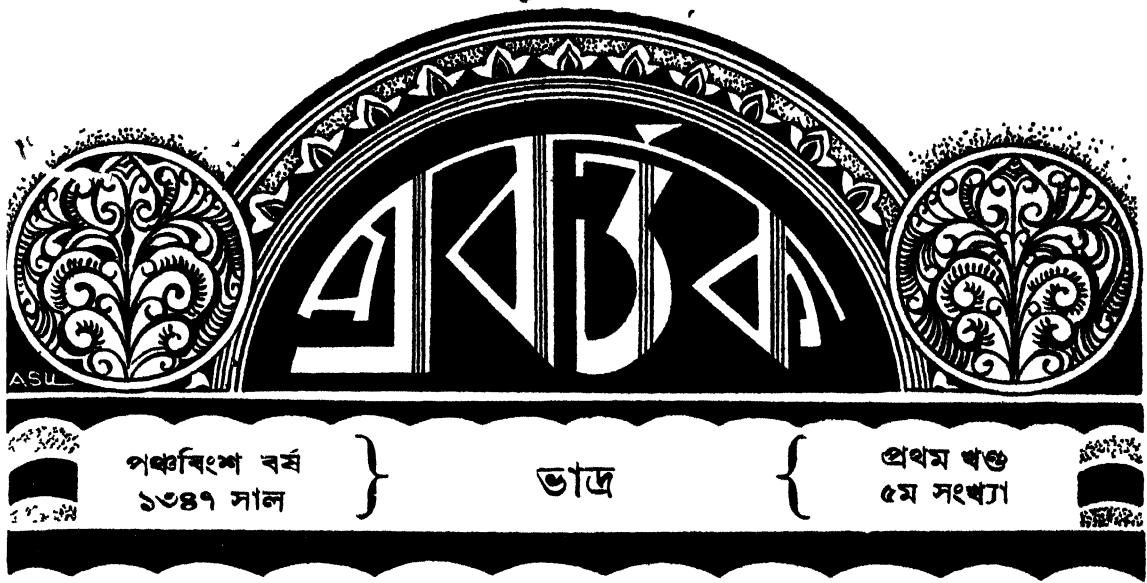
# রজত-জয়ন্তী

## প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের স্বাধীনতার আদর্শ

স্বাধীনতার সাধনায় বিজেতার প্রতি আক্রমণ-নীতি গণকে অধিক আকৃষ্ট করে। সঙ্ঘ-সৃষ্টির পূর্ব্বে এই রুদ্র বৈপ্লবিক পথই আশ্রয়ণীয় হইয়াছিল। দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন ও আদর্শের অত্যদ্ভুত আকর্ষণ আছে, অপূর্ব্ব মাদকতা আছে, এই পথে তাই অসাধারণ উত্তেজনায় তরুণ উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু কেবল উত্তেজনায় মুক্তিকামনা পূর্ণ হয় না; ইহার সুনিয়মিত আত্ম-প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। স্বাধীনতা যে চাহে, ঈশ্বর প্রাপ্তির তপস্যার অপেক্ষা তাহা অল্প তপস্যায় সিদ্ধ হয় না। অতি দৃঢ় সুগঠিত চরিত্র লাভ করিতে না পারিলে স্বাধীনতা কেহ লাভ করে না। স্বাধীনতার রুদ্র-নীতি পরিহার করিয়া তাই আত্মগঠন-সঙ্ঘে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের অভ্যুত্থান।

স্বাধীনতার পরিপন্থীশক্তির অপসারণে স্বাধীনতা, অথবা বিজেতার আশ্রয়ে বিজেতার অনুগ্রহদানরূপে স্বাধীনতা কিম্বা বিজেতাকে কোনরূপ বাহিরের আক্রমণ না করিয়া নৈতিক শক্তি প্রয়োগে তাহাকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য করা—এমন সকল নীতিই হয় তো কার্য্যকরী, প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ কিন্তু এইসব প্রচলিত পথের অতীত এক অভিনব নীতি আশ্রয় করিয়া স্বাধীনতালাভের পথে চলিতে চাহিয়াছে। উহাই সংগঠন। আত্মগঠনের উপর ভিত্তি করিয়া যে স্বাধিকার, তাহাই জাতির স্থায়ী স্বাধীনতা। আত্মসংগঠনের মধ্যেই দেশের স্বাধীনতা নিহিত আছে, প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ এই বিশ্বাস করিয়াছে। আত্ম-গঠনের জন্য আত্মজ্ঞান চাই। উহা আত্মসমর্পণ যোগের মধ্য দিয়া সিদ্ধ হয়। ভগবানে আত্মসমর্পণ, উৎসর্গের হোমানলে বিশুদ্ধ চরিত্র গড়িয়া উঠে। দিব্য ভাগবত-জীবন লাভ হয়, এই ক্ষেত্রে মুক্তি-কামনা যখন স্ফুরিত হয়, তখন কোনপ্রকার অমঙ্গল, অহিত ইহাতে প্রশ্রয় পায় না। আঘাত ও প্রতিবাদে কোন পক্ষকেই এই পথে বিব্রত হইতে হয় না। শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে দেশের স্বাধীনতা গড়িয়া উঠে, ইহা দান প্রতিদানের বস্তু নয়। স্বজাতি ও বিজাতির বিরুদ্ধতা বা বাধায় স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ বিগ্রহ রচনা বিলম্বিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা ব্যর্থ হয় না। বরং স্বাধীনতাকামীর ইহাতে ধৈর্য্যগুণ বর্দ্ধিত হয় এবং অতিশয় নিপুণতার সহিত বিগ্রহসৃষ্টি সংসাধিত হইয়া থাকে। স্বাধীনতা গড়িয়া

তুলিতে না পারিলে ইহা কাড়িয়া লওয়ার কথা আসিতেই পারে না।

স্বাধীনতা—আত্মধর্ম্ম। স্বরূপের অভিব্যক্তি। মানুষ যদি বাঁচিয়া থাকে আত্মজ্ঞানের আলোয়, তাহা হইলে তাহার স্বাধীনতা কেহ ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। স্বভাবকে কি কেহ বিপরীত ভাবাপন্ন করিতে পারে? ইহা যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত কথা।

'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে'র বর্ত্তমান ও অনাগত প্রত্যেক নারীপুরুষের প্রতি আমার এই উপদেশ—তাহারা যেন সর্ব্বাগ্রে আত্মবিশ্বাসী হয়; এবং ঈশ্বরে আত্মনিবেদন করিয়া বুদ্ধি, হৃদয়, প্রাণ ও শরীরকে ঈশ্বরেচ্ছা প্রকাশের ক্ষেত্রস্বরূপ করার সাধনা গ্রহণ করে। জগতের ধর্ম্মোপদেশ নানা বাদে পূর্ণ। ইহা চিত্ত চঞ্চল করে, সেদিকে যেন তাহারা আদৌ লক্ষ্য না রাখে।

সংগঠন-নীতির দ্বারা যে স্বাধীনতা তাহার জন্য আমাদের কয়টী উপকরণ স্থির করিয়া লইতে হইবে, যেমন আত্মগঠনের জন্য সমগ্র আধার যন্ত্রটী এবং ইহার সকল করণগুলিকে আয়ত্তে আনিতে হয়, স্বাধীনতার জন্য তদ্রূপ কর্ম্মীকে দেশ, জাতি, দেশের ইতিহাস, বিজ্ঞান, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতিকে আয়ত্তে আনিতে হয়। তারপর আত্ম-শক্তি প্রয়োগ করিয়া চাই আত্মার ব্যাপ্তি। কোন কূট-কৌশলে নহে, কোনপ্রকার জড়শক্তির প্রয়োগে নহে, বিশুদ্ধ আচার ও জ্ঞানের প্রসারতায় ইহা সম্ভব করিতে হয়।

আমাদের সর্ব্বাগ্রে যে দেশের উপর স্বাধীনতার বিজয়-ছত্র প্রোথিত করিব সে দেশের পরিধি কতখানি, স্থির করিতে হইবে। স্বাধীনতার স্থান নিরূপণে জাতিনির্ণয়ও অবশ্যম্ভাবী। জাতির পরিমাণ স্থির না হইলে—দেশের পরিমাণ অব্যক্ত থাকে। জাতির জন্যই দেশ—জাতি বলিতে ইহাই বুঝায়—কোন শাশ্বত ধর্ম্মে একই আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট অনেকের সমষ্টি-মূর্ত্তি। অতএব এই সমষ্টির আয়তনের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের আয়তনও স্থির হইবে। এইরূপ হইলে এই কথাই গ্রহণ করিতে হয়; জাতি অর্থে একই ধর্ম্মে অনেকের সমবেত মূর্ত্তি। এমন জাতি-সংহতি আমাদের দেশে জন্মিয়াছে কি? সর্ব্বত্র ইহার অন্যথাই পরিলক্ষিত হয়। আমরা হিন্দু বলিলে কি হইবে! ধর্ম্ম আমাদের ভিন্ন ভিন্ন, জাতিও তাই খণ্ডিত ও বিভক্ত। এই জন্যই আমরা নিজ বাসভূমে পরবাসী এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

এই সত্যকে অস্বীকার করিয়া জাতি বলিয়া যে গর্ব্ব, তাহার ভিত্তি নাই। নিজেদের দুরবস্থা চক্ষের উপর পড়িয়া আছে। তবুও নানা কাল্পনিক দৃষ্টান্তে যে সান্ত্বনা তাহা ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই জন্য একই ধর্ম্মনীতির উপর যেটুকু বাস্তব সত্য সিদ্ধ হয়—সেই কেন্দ্রবিন্দু ধরিয়াই সংগঠনব্রতীকে স্বাধীনতা লাভের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

পূর্ব্বে কি ছিল, এখন কি নাই। পূর্ব্বে যাহা ছিল, যাহা ছিল না, এবং এখন যাহা আছে ও যাহা নাই, এই সকলতথ্য বিচার করিয়া বর্ত্তমানে দেশ ও জাতিকে পাওয়ার সহায় স্বরূপ যাহা, তাহাই আমাদের বাছিয়া লইতে হইবে। ইহার জন্য এই শ্রেণীর স্বাধীনতাকামীদের জাতীয় ইতিহাস উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে; সে অর্ব্বাচীন যুগের সত্য মিথ্যা মিশ্রিত ইতিহাসও বটে, আবার প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুরাতত্ত্ব আমাদের অধিকৃত করিতে হইবে। আর যে জ্ঞান ও শক্তি জাতির ইতিহাস হইতে আমরা উদ্ধার করিব, যুগপৎ আত্মগঠনের সঙ্গে সঙ্গে দেশ, জাতি ও স্বাধীনতার জন্য তাহার প্রয়োগবিধি বৈজ্ঞানিক নীতি ধরিয়াই সাধিত করিতে হইবে।

রাষ্ট্র বিজাতীয়—ইহা স্বীকার্য্য। বিজেতার গৌরব লক্ষণ তাহার রাষ্ট্রে। রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তন বিজেতার ঈপ্সিত না হইলে বিজেতৃত্বের মহিমা খর্ব্ব হয়। এক রাষ্ট্রশক্তি যদি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে অথবা জাতির বিগ্রহ যদি গড়িয়া উঠে, জাতির অনুকূল রাষ্ট্রে পরিবর্ত্তন তখনই তাহার পক্ষে সম্ভব হয়। এই হেতু সংগঠনব্রতীদের স্বাধীনতা লাভের পথ উপদ্রবময় ও প্রতিবাদাত্মক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সংঘাতে প্রবল শক্তি প্রবলতর হয়, দুর্ব্বল দুর্ব্বলতর হইয়া পড়ে, এইজন্য বর্ত্তমান রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়াই দেশ ও জাতিগঠনের শক্তির পরিমাপেই পরকীয় রাষ্ট্রকে শনৈঃ শনৈঃ নিজেদের অনুকূলে আনিতে হইবে। গোড়ার কথা—চাই মানুষ; এক হইতে বহু। জন্ম হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত অপ্রতিবাদে যে সমষ্টি কোন এক

শাশ্বত ধর্ম্মাচারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইবে, তাহাই জাতি আখ্যা পাইবে। সমধর্ম্মীর সমষ্টি বিপুলকায় হইলেই দেশ, জাতি ও রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবে—এমনও না হইতে পারে। যে জাতি কেবল ধর্ম্মে ঐক্য চায়, দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রে উদাসীন, তাহার জাতি সংজ্ঞা হয় না। এইরূপ সমষ্টির আখ্যা সম্প্রদায়। জাতি হইলে তাহার দেশ থাকিবে, রাষ্ট্র থাকিবে, বিশেষ সংস্কৃতি থাকিবে। প্রারম্ভে এই জাতির সংখ্যাধিক্য না থাকিলেও ক্ষতি নাই, কেননা, আসন্ন স্বার্থচরিতার্থতার জন্য এই জাতির অভ্যুত্থান নহে। আত্মস্বরূপের উপর তাহার দেশ শাসনের অধিকার অর্পিত হইবে। এই অধিকার এই ব্যষ্টি বা সমষ্টি স্বার্থকে স্বার্থ হিসাবেই রক্ষা করিবে না, পরন্তু মানবতার কল্যাণ কামনাই তাহার মধ্যে নিহিত জানিয়াই আত্মস্বার্থ সংরক্ষণ করিবে। ঔদার্য্যের নামে জাতি আত্মসীমার বাহিরে কোন কাল্পনিক আদর্শে অভিভূত হইবে না, বুদ্ধিমান মানুষেরা ইহাদিগকে সংকীর্ণমনা বলিয়া পরিহাস করিবে, কিন্তু তাহাতে ইহাদের দৃক্‌পাত করিলে চলিবে না। নিজের রক্তধারার ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অনুসরণ করিয়াই সত্যের আবিষ্কার হয়, দেশের যে কোন অংশে যে কোনরূপ ক্ষেত্রে এই জাতি-বীর্য্য অঙ্কুরিত হয়, সেখানে দেশগত সংস্কৃতির বীর্য্যই অবাধে অভিব্যক্তি হয়, ইহা অবধারিত। শান্তি, অহিংসা—বিশ্বমানবতার বড় বড় আদর্শের কেবল বাণী প্রচার—জাতির অসারতা প্রতিপাদন করে—জাতি তাহার স্বধর্ম্মকে লীলায়িত করিবে জ্ঞানে, প্রেমে, সেবায় ও শক্তিতে। বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রাধান্য যে ক্ষেত্রে স্থান পায়, সেই ক্ষেত্রে ব্যভিচারিণী নারীর গর্ভে দেশবরেণ্য বীর সন্তান যেমন জন্মগ্রহণ করে না, তদ্রূপ জাতিবীর্য্যও এই ক্ষেত্রে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না।

গোঁড়া নাম আর অবহেলার বস্তু নয়; যদি গোঁড়া অর্থে অমিশ্র খাঁটী ভারতীয় জীবন বুঝায়। টিউটন জাতীয় গর্ব্বে মাথা তুলে। ব্রিটেন্ অষ্টম এডোয়ার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া জাতির আভিজাত্য রাখে, বীরজাতির এই সকল দৃষ্টান্ত অবজ্ঞেয় নহে। পরাধীন জাতি মিশ্রবুদ্ধিবশতঃ বিশ্বধর্ম্ম আঁকড়িয়া ধরে। ইহাতে ধর্ম্মসঙ্কর, বর্ণসঙ্কর আদর্শসঙ্করে জাতি গড়ে না, বরং উৎসন্নের পথ প্রশস্ত হয়। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘকে আমি 'প্রাতঃসমুত্থায়' ঈশ্বরপ্রীতির জন্য জাতিরূপে মাথা তুলিতে বলি। জাতীয় রক্তের ঐতিহাসিক ধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া ধর্ম্মসঙ্কর, বর্ণসঙ্কর, আদর্শসঙ্করের লোভনীয় ক্ষেত্র হইতে দূরে দাঁড়াইয়া অভিনব বিধানে, দেশ জাতির অভ্যুত্থান ও মুক্তিকামনায় অভিযান সুরু করিতে বলি—কিছুতে ঈশ্বরত্বের অধ্যাস না রাখিয়া প্রত্যক্ষ ব্রহ্মানুভূতির অমৃত আস্বাদ করিয়া তাহারা ভারতে স্বাধীনতার তীর্থ রচনা করুক। জগতের কল্যাণ অমিশ্র ভারত-ধর্ম্মে। সে ধর্ম্ম মিশ্র-বুদ্ধি বশতঃ শাস্ত্র ও ইতিহাস বিগর্হিত নহে। জাতির বিশুদ্ধ রক্তের দ্যোতনায় সমাজ ও রাষ্ট্রশ্রী ও জয়মণ্ডিত হয়। আত্মবৈশিষ্ট্য হারাইয়া নিখিল মানবতার প্রতি দাসজাতির আন্তরিক প্রেমপ্রয়াস স্বাধীনজাতির নিকট হীন অভিনয় মনে হয়, সত্যই ইহা মহত্ত্ব নহে, দাসত্ব। আত্মপ্রভুত্বে একটা গোঁড়া ভারতজাতির অভ্যুত্থান যদি সম্ভব হয়, সেই জাতি রাষ্ট্রশক্তি যদি লাভ করে—তবেই বিশ্বমানব তাহার সুমহান্ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইবে। স্ব স্ব চিহ্নিত ক্ষেত্রে শান্তি ও আনন্দে অসংখ্য বৈচিত্র্যের মাঝেই ঐক্যের অমৃত লাভ করিবে—স্বর্গ হইতে দুন্দুভি ধ্বনি তবেই মর্ত্ত্য নিনাদিত করিবে।

## স্ব-ধর্ম্মনিষ্ঠ ভারতজাতি

মানুষ একটা কল্পনার যুগে ফিরিয়া যাইতে চাহে। সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, হিংসা, প্রেম পরস্পর দ্বন্দ্বযুক্ত, কোন অবস্থাই নিত্য নহে, সবই আসে এবং যায়। প্রিয় যাহা তাহাই মানুষ চায়, অপ্রিয় যাহা তাহা কেহ চাহে না। মানুষের এই চাওয়ার কোনই মূল্য নাই; কেননা জগৎটাই দ্বন্দ্বময়। কিন্তু মানুষ দ্বন্দ্ব চাহে না, তাই তার কল্পনার জগৎ সৃষ্টি।

মানুষ চিরসুখী হওয়ার জন্য অতি আদিম কাল হইতে একটা কল্পনার জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছে, সে জগতের বাস্তব অস্তিত্ব ছিল কিনা তাহার প্রমাণ নাই, কিন্তু নিত্য প্রিয়কে স্বপ্ন দেখিয়াও মানুষের চিত্ত তৃপ্তি পায়; এই সুখের জগৎটাই সত্য যুগের লক্ষণ বলিয়া সকল জাতিই স্বীকার করে।

এই যুগমাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে হিন্দুজাতি সর্ব্বাপেক্ষা মুখর কণ্ঠ; আমরা তাহার একটু উদাহরণ দিব। ইহা সত্য-যুগের কথা, যুগের ইহাই আদিমকাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্ভবতঃ সূর্য্যবক্ষ হইতে বিচ্যুত এই পৃথিবীটা সেদিন কতকটা অনুতপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুনিবিড় নীহারিকাপুঞ্জ বিদীর্ণ করিয়া আত্মপ্রকাশে উদ্যত হইয়াছিল। জল-স্থল-অন্তরীক্ষ তখন বেশ সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে, জল হইতে প্রাণ; প্রাণ হইতে শুক্র উৎপাদনে পৃথিবী নানা জীব সমাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সেই আদিম যুগে শীত-বৃষ্টি-আতপাদি অল্পই অনুভূত হইত। আদিম যুগের মানুষেরা সরিৎ, সরোবর, সমুদ্র, পর্ব্বতাদিতে বাস করিত। বলিয়া রাখি, অর্ব্বাচীন যুগের 'জিওলজির' আমি অনুবৃত্তি করিতেছি না; ভারতের প্রাচীন ঋষিদের বিবরণ হইতেই আমি ইহা বিবৃত করিতেছি।

"সরিৎসরঃ সমুদ্রাংশ্চ সেবান্তে পর্ব্বতানপি" এই সময় ফল, মূল, পুষ্পাদি আর্ত্তব অথবা ঋতু কিছুই ছিল না। পৃথিবীর রসজাত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম ছিল না। আয়ু, আকৃতি ও সুখ সকলেরই প্রায় তুল্যরূপ ছিল। সকলেই ছিল শোকহীন কামচারী ও প্রমুদিতচিত্ত। সকলেই নিজ নিজ অধিকারে থাকিয়া জীবনযাপন করিত। কাহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না; ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া তাহারা কোন কাজ করিত না; স্বভাববশেই সর্ব্ব কর্ম্ম সমাহিত হইত। সত্য যুগকে সৃষ্টির ধ্যান-মূর্ত্তি বলা যায়, তারপর মানুষের যখন জ্ঞান হইল তখনই হাঙ্গামা বাধিল। জ্ঞানের পর—কর্ম্ম। কর্ম্মের পর—মানুষের জীবন যে বৈচিত্র্যময় হইবে তাহাতে আর কি সংশয় আছে। আমরা আজ কলিযুগের মানুষ, সত্য যুগের স্বভাব শক্তিকেও ছাড়িতে পারি নাই; জ্ঞান-প্রভাবকেও ঘাড় হইতে নামাইতে পারি নাই। ইহার উপর কর্ম্মপ্রেরণা যখন জাগিল তখন একদিকে স্বভাবের আকর্ষণ অন্যদিকে বিবেকের তাড়না এই অবস্থায় কর্ম্মে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হওয়া অতিশয় সঙ্গত কথা। তারপর অসামান্য বৈচিত্র্যময় জীবন আমাদের, সে নির্ব্বিশেষ অবস্থা আর নাই। রূপেরও বৈষম্য। আয়ু-স্বভাব-ক্রিয়া কিছুই আর তুল্য নহে। প্রত্যেক মানুষ স্বাতন্ত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে, [illegible] আত্ম-স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য অন্তর্দ্দ্বন্দ্ব শুধু নহে, বাহিরেও বীভৎস সংঘর্ষের সৃষ্টি হইতেছে। পর্দ্দায় পর্দ্দায় সেই আদিম যুগের মানুষের বর্ত্তমান পরিণতির বিবরণ আমাদের প্রাচীন ঋষিরা অতি সুন্দররূপে বেদাদি পুরাণ শাস্ত্রে বিবৃত করিয়াছেন। সত্যযুগ শেষ হইলে যে নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হয় তাহাতে আর যুগাদিম কালের প্রজাগণের যে সিদ্ধি তাহা থাকে না। অন্য প্রকারের সিদ্ধি মানব জাতিকে কর্ম্মপ্রবৃত্ত করে।

আদিমকালের জলরাশির সূক্ষ্মতা বিনষ্ট হয়। উহাই গর্জনকারী মেঘরূপে পরিণত হইয়া বর্ষণ-ধারায় পৃথিবী প্লাবিত করে। আর এই বর্ষণের ফলেই প্রজাগণের বাসস্থানসমূহে বিবিধ বৃক্ষ সমুদ্ভূত হয়। যুগের প্রথম অবস্থায় জীবিকানির্ব্বাহের উপায় ইহা হইতেই হইয়া থাকে। তারপর বৃক্ষাদি সম্পদ্ লইয়া আসক্তি ও লোভ বশতঃ পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধে। একে অন্যের গৃহবৃক্ষ-সমূহের উপর অধিকার বিস্তারের জন্য সংগ্রামপরায়ণ হয়, একে অন্যের বৃক্ষজাত সম্পদ মাক্ষিক মধু, বস্ত্র, আভরণ ফল আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করে। যথেচ্ছবিহারী গৃহহীন প্রজা শীতবাতাতপপীড়িত হইয়া গৃহ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়। মরু, পর্ব্বত, নদী প্রভৃতি স্থানে রুচি অনুসারে দুর্গ-ভবনাদি নির্ম্মাণ করিতে থাকে। গ্রাম, পুর নির্ম্মাণ করিতে গিয়া প্রদেশ, ব্যাস, তাল প্রভৃতি পরিমাপ জ্ঞান জন্মে। খেট, নগর, গ্রাম, দুর্গাদি দলে দলে অধিকার করিয়া জাতিস্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি হয়। গৃহজাত বৃক্ষাদির সম্পদ্ যথেষ্ট মনে না হওয়ায় ব্রীহি, যব, কলায়, মুদ্গ, চনক প্রভৃতি গ্রাম্য ওষধির চাষ আরম্ভ করে। ক্রমে কর্ম্ম বিভাগ না করিলে জীবনযাত্রা অচল হয়। এইজন্য কেহ যজন, যাজন ; কেহ শাসন, যুদ্ধ, কেহ কৃষি, বাণিজ্য, কেহ শিল্প, দাসত্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তারপর অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হইয়া পড়ে এইরূপে যুগ হইতে যুগান্তরে আজ পৃথিবীর এই মূর্ত্তি।

সৃষ্টির এই পরিণাম আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। সৃষ্টি-কর্ত্তার অপ্রত্যক্ষ ইচ্ছার সঙ্কেতে এমনই হইয়া আসিতেছে। আমরা সকলেই এই সুমহতী ইচ্ছার অধীন। বর্ত্তমান যুগের নাম কলি। এ যুগের ধর্ম্ম স্বাতন্ত্র্যবাদ ; সাম্যবাদ নহে। সাম্যের নামে যেখানে আস্ফালন সেখানে সেই প্রাচীন যুগের সুখ-স্বপ্নের মধুচক্রে নাড়া দিয়া বহু মানুষকে সেই স্বপ্নে অভিভূত রাখিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কামনা-পূর্ত্তির চাতুর্য্য ছাড়া আর কিছু নহে।

মানুষ বিধাতার ক্রীড়নক। বিশাল ভারতভূমি যুগ-প্রভাবে অধিক আবিষ্ট। ভারতবাসীর মধ্যে সেই অতি প্রাচীন যুগের সাম্যের পূত-স্মৃতি আজিও মুছে নাই ; তাই এক ধর্ম্মে তাহারা অন্বিত হইতে চাহে, কিন্তু স্বভাব-বৈষম্যে তাহাদের প্রাদেশিকতা বারণ মানে না। অতীতের প্রভাব আমাদের বার বার এক করিতে চাহিবে, আবার পুনঃ পুনঃ আমরা যুগপ্রভাবে বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হইয়া পড়িব। ভারতের ভাগ্য জগতের ভাগ্য নিরাকরণ করিবে। আজিকার উত্থান পতনের লক্ষণ পরিণামে যুগধর্ম্মের দিকেই নিখিল মানব জাতিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিবে। আমরা এই হেতু স্বধর্ম্মনিষ্ঠা হারাইয়া যুগপ্রভাবের লক্ষণস্বরূপ বিচিত্র মতবাদের প্রভাবে আবিষ্ট-চিত্ত হইব না। আমাদের স্বভাব ও স্ব-ধর্ম্ম সনাতন। সেই সনাতনকে আশ্রয় করিয়া, এই জাতি-কল্প নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যেও যোগভ্রষ্ট হয় নাই। যুগপ্রভাবের বৈচিত্র্যে একমাত্র ঈশ্বরযুক্তির মানুষ বিভ্রান্ত হয় না। এই স্থিতধী স্থিতপ্রজ্ঞ ভারতের একদল মানুষ নব জাতি নির্ম্মাণ করিয়া সুদূর ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা করিবে। দৈন্যে নয়, ভাগবত ঐশ্বর্য্যে। আমরা তাই আজিও উদাত্তকণ্ঠে বলিতেছি।

সর্ব্বধর্ম্মং পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

## ভারতের সংরক্ষার ব্যবস্থা

ভারতের সুপ্রাচীন ইতিহাস জানিতে হইলে গীতা ও উপনিষদের ন্যায় বেদের ঋক্ ও তাহার অর্থগুলি সর্ব্বজন বিদিত করার ব্যবস্থা চাই। বেদ ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ। বেদের অর্থ দুর্জ্জেয় বলিয়া উহার দিক হইতে জাতির মুখ ফিরাইয়া থাকা চলিবে না, অনুশীলন ও আলোচনার ফলে উহা ক্রমে ক্রমে সুগম হইবে এবং ভারতজাতি আত্মসম্বিৎ লাভ করিয়া মাথা তুলিতে পারিবে।

বেদ সঙ্কলিত হওয়ার পূর্ব্বেও বেদমন্ত্রসকলের ন্যায় পৌরাণিক ইতিবৃত্তও লোকশ্রুতি হিসাবে এ দেশে প্রবর্ত্তিত ছিল। ভারতের ইতিহাস জানিবার পক্ষে পুরাণ গ্রন্থগুলি পঠনপাঠনের প্রবর্ত্তনও আত্মবিস্মৃত জাতির পক্ষে অমৃত তুল্য হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যাহা শিক্ষা করিতেছি, সে শিক্ষায় ভারতের স্বরূপ জ্ঞান জন্মে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের

নিয়ামক যাঁহারা তাঁহারা শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য স্বরূপের দীক্ষা এবং তাহার সাধনা এ কথা স্বীকার করেন না; অথবা এই অস্বীকৃতি স্বরূপজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদের অজ্ঞতাজনিত বলা যাইতে পারে।

শিক্ষা যে লক্ষ্যভ্রষ্ট তাহার মূল কারণ ভারত-সত্তা বিদেশীর নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছে। বিদেশীর পক্ষে ভারতধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করা সহজ কর্ম্ম নয়। ভারতকে ভারতরূপে গড়ার ঔদার্য্যও যদি তাঁহাদের থাকে, তবে তাহাও ভারতের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে উহা কার্য্যকরী হইয়া উঠে না। দোষ কাহারও নহে, আমাদের কপাল পুড়িয়াছে।

আমাদের দেশের খ্যাতনামা মনীষীবর্গ অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয় ভাব প্রচার করিয়া ভারতধর্ম্মের প্রতি জাতির কতকাংশকে অনুরাগী করিয়াছেন, করিতেছেনও বটে, কিন্তু ভারতীয় ভাবই জীবনের সবখানি নহে; ভারতের একটা জীবন-নীতি আছে। ধর্ম্ম ও সমাজগত আচার আছে, এইদিকে তাঁহারা উদাসীন বলিয়া ভারতীয় ভাবের উদ্বুদ্ধতা, ঘাটে আসিয়া ভরাডুবির ন্যায় নস্যাৎ হইয়া যাইতেছে; এই দিকে আমরা এক শ্রেণীর উদীয়মান তরুণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

দেশের নানা কাজ। প্রচলিত কর্ম্মস্রোত আমাদের উপেক্ষায় বারণ মানিবে না। বিশ্ববিদ্যালয় চলিবে; বিচারালয়ও বন্ধ থাকিবে না; শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার শাসন-শক্তি অবাধে অগ্রসর হইবে। পৌরকর্ম্ম, আইন সভা, ব্যবসা, বাণিজ্য কিছুই অচল থাকিবে না; যুগের হাওয়ায় সকল তরীই পাল তুলিয়া চলিবে—অপথ কুপথ বলিয়া চীৎকারে কিছুই বাধা মানিবে না; আর বাধা দিলেও কি এমন সুপথ আমরা আবিষ্কার করিয়াছি বা করিতে পারিলেও এমন কি শক্তি আমরা সঞ্চয় করিয়াছি যে, জাতির প্রচলিত জীবন-ধারা অভারতীয় বলিয়া তাহার বর্জ্জন বা সংস্কার সাধন করিব।

ভারতের মৌলিক জীবন-নীতির অনুকূলে জাতীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার মস্তিষ্ক আমরা হারাইতেছি; এই হেতু বর্ত্তমান যুগপ্রবর্ত্তিত যে সকল নীতি ও বিধি ব্যষ্টির ও সমষ্টির বা সম্প্রদায়ের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে, তাহার প্রতিবিধান করিতেই আমাদের জীবনীশক্তি ব্যয় হইয়া যায়। ইহার প্রয়োজনও অস্বীকার করা যায় না; অবশ্য যেরূপই হউক, ব্যক্তিসমষ্টি বা সম্প্রদায় নিজ নিজ স্বার্থ-রক্ষায় যদি উদাসীন হয়, তাহারা আপনার অস্তিত্ব হারাইবে; এই হেতু দেশের জাগ্রত প্রাণশক্তির স্বার্থ-সংরক্ষণে যে উদ্যত মূর্ত্তি তাহার আমরা ভূয়সী প্রশংসা করি। এক বিধি এক সম্প্রদায়ের শ্রেয়ঃ সাধনে প্রবর্ত্তিত অথবা অন্যের তাহাতে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। এই অবস্থায় ঐ বিধির প্রতিবাদ না করা অন্যের ক্লীবত্বের পরিচয়। জাতির যে অংশ পঙ্গুত্বে অবশ হইয়া পড়ে সে অঙ্গের আর ভবিষ্যৎ নাই। বঙ্গভঙ্গের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রতিবাদমূলক আন্দোলনের যে ছন্দই প্রকাশ হউক, উহা আমাদের জীবনের পরিচয় দিয়াছে। এই জীবন আছে বলিয়াই আমরা দেশের অনাদৃত উপেক্ষিত একটী বিশেষ কর্ম্মের দিকে জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছি।

সেই কর্ম্ম, ভারতীয় শিক্ষার জাহ্নবীধারা রক্ষা করা। রাজশক্তি বৈদেশিক, এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, বলীবর্দ্দের মত জীবন যাহাদের, তাহাদের অনেক অবান্তর ভার বহন করিতে হয়; দাস-জাতির জীবন বলীবর্দ্দের চেয়ে বড় নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিক্ষার গুরুভারও আমাদের বহন করিতে হইবে। ইহার স্বার্থকতা আসন্ন ফলপ্রসূ নহে, তাই বলিয়া ইহার প্রতি আরও দীর্ঘদিন উদাসীন থাকিলে, আসন্ন কর্ম্মসিদ্ধির জন্য যে শিক্ষা, উহা পূর্ব্বোক্ত জাতীয় চরিত্র গঠনের শিক্ষার অভাবে মরীচিকার ন্যায় নিষ্ফল হইবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণদের ভাগ্য এই হেতু আজও মসীময়, ভবিষ্যতে অধিকতর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে। এই শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমরা আর আশা করিতে পারি না। নূতন শাসন-সংস্কার দ্বারা জাতি-গড়ার শিক্ষানীতি সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। আমরা আজ 'বার রাজপুতের তের হাঁড়ীর ন্যায়' ছন্নছাড়া। মূলতঃ আমাদের চরিত্র শাসন সংস্কারের আশ্রয়ে স্বরূপই প্রকাশ করিয়াছে। এই অবস্থায় ভারতীয় চরিত্র গঠনের

উপাদান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কেমন করিয়া আশা করা যাইবে?

আমাদের দেশে অসংখ্য প্রকার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিগত বহু জাতি লক্ষ্যে পড়ে; এক হিন্দুজাতির মধ্যেও প্রকারভেদ আছে। ইহাতে আতঙ্কিত বা নিরাশ হবার কিছু নাই; ছেঁড়া চুলে বড় খোঁপার মত বৃহত্তর জাতি বলিয়া আমাদের গর্ব্ব হাস্যকর মাত্র।

যাঁহারা বলেন, রাষ্ট্রে জাতির কৃষ্টি সংস্কৃতির কোন স্থাই নাই, তাঁহারা নিশ্চয় মনকে চোখ ঠারেন, যে সকল ক্ষেত্রে এইরূপ মনোভাবের অনুকূল দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া তাহারা সান্ত্বনা লাভ করেন, সে সকল দৃষ্টান্ত জাগ্রত জাতির নহে, উহা অজাগ্রত, অনুদ্বুদ্ধ প্রাণের পরিচয়।

আমরা এইজন্য ভারতের নদ, নদী, পর্ব্বত, অরণ্য, জনপদ, তীর্থ, মন্দির প্রভৃতির সহিত যে জাতির চিরপরিচয় আছে, দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি শুধু নহে অতি বাস্তব ভিকায়ও যাঁহাদের জীবনের ইতিহাস বিজড়িত, তাঁহাদের আত্মস্থ হইয়া আত্মগঠনের জন্য গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিগত শিক্ষার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে বলিব।

মোগল-পাঠানের যুগে বিক্রমপুর, কোটালীপাড়া, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী প্রভৃতি জাতীয় সংস্কৃতি যেরূপ রক্ষা করিয়াছে, নবযুগে একদল নব-ব্রাহ্মণের ত্যাগ ও তপস্যায় সেইরূপ সৃষ্টিশক্তিশালী প্রতিভা বিকাশের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হউক। এই কর্ম্ম সংগঠনপন্থীদের দ্বারাই সম্ভব। দেশের সংগঠনপন্থী যাঁহারা তাঁহারা যেন মনে না করেন, এইরূপ কর্ম্ম একান্ত নিরুপদ্রব ও শান্তিময়, আত্মরক্ষার জন্য এমন গুরুতর সংগ্রাম আর কিছুতে নাই। এইরূপ সংগ্রামশীল মনোবৃত্তি না থাকিলে মানুষ বৃহৎ হয় না। যেখানে এই আত্ম-সংগ্রামবিরতি, মানুষ সেইখানেই হয় কল্পনাপ্রিয়, নয় নিষ্ফল চিন্তাশীল। বাংলার ব্রহ্মণ্য-প্রতিভার এই দুর্দ্দশা আসায় আমরা এমন লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছি। আমাদের এই অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। আত্মগঠনের জন্য সংগ্রামশীল মনোবৃত্তির জাগরণ যদি না হয়, জাতির অধঃপতনের প্রথম বেগ আমরা রুদ্ধ করিতে পারিব না। সে সংগ্রাম আত্মকৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্যই উদ্যত করিতে হইবে।

## বর্ত্তমানের রাষ্ট্র-চিন্তা

যাহা চাই তাহার দাবী ভাল। কিন্তু দাবী অন্যের দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হয় না যদি দাবীদার তাহার জন্য প্রস্তুত না হয়। ভারতের বড় দাবী স্বাধীনতা। দাবীর প্রতিষ্ঠায় যে শক্তির প্রয়োজন তাহা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই শক্তি হিংস অহিংস যাহাই হউক, উহা দাবীদারের এরূপ সামর্থ্য নহে, যাহা অব্যর্থভাবে তাহার দাবী পূর্ণ করিতে পারে।

কালের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতাকামীদের এই চৈতন্য জাগিতেছে। অথচ স্বাধীনতা-লাভের উপযোগী চরিত্র গঠনে স্থৈর্য্য আমাদের নাই। এই অবস্থায় আমরা রব তুলিতে সুরু করিয়াছি যে, স্বাধীনতা না পাইলে স্বাধীনতা ধারণের শক্তি অর্জ্জন সম্ভব নহে।

সোজা কথায় আমরা স্বাধীনতাপ্রার্থী, কিন্তু শক্তি-হীন। কাজেই দাবীটা প্রার্থনার নামান্তর দাঁড়াইয়াছে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় ও বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক শক্তির অভাবনীয় প্রভাব দেখিয়া পরাধীন জাতি স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক শক্তির আদর্শ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিতেছে। প্রার্থনা সর্ব্বসময়েই হীনতাসূচক। তা উহা যে আকারেই প্রকাশ হউক। কোথাও দাবী কোথাও আন্দোলন, কোথাও বা হুমকী অথবা কোথাও নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহ—এইরূপ নানা নীতির আশ্রয়ে এই প্রার্থনা প্রকাশ হইতেছে। শক্তিহীন হইলে কিন্তু কল্পনা-প্রিয় হইতে হয়, তাই স্বাধীনতা-প্রার্থীগণ বর্ত্তমান ইউরোপের সংগ্রামে বৃটনের বিপদ দর্শনে কোন এক দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে তাঁহাদের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া স্বাধীনতা দানরূপে বাহির হইয়া আসিতে পারে, এইরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে আশা বার বার নির্ম্মূল হয়। উপস্থিত লর্ড লিন্‌লিথগোর ঘোষণা তাহার প্রমাণ। তবুও এমন ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ্ আছেন, যাঁহারা এখনও হাল ছাড়িবেন না। তাঁহারা মনে করেন রাজশক্তি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা

অথবা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চয় দিবেন। হাঁ, দিবেন বটে, কিন্তু এই দান দাতার অভিরুচি অনুযায়ী হইবে। এই সঙ্গত কথা আশার ছলনায় অতি বড় বিচক্ষণও বুঝেন না। দেড় শত বৎসর ভারত-শাসনে বৃটন কি বুঝে নাই, ভারতের রাষ্ট্রনেতাগণের দেশের উপর কতখানি প্রভাব। কতখানি তাঁহারা ইহার জন্য যোগ্য হইয়াছেন, কতখানি শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন? এমন দিন ছিল, যেদিন অপরিণত মস্তিষ্ক ভারতের জনশক্তি কোন এক নেতার অঙ্গুলী-হেলনে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিত। সেদিন ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে। এইরূপ অচল পয়সার মত বিপুল জনজাগরণ জাতির কল্যাণ সাধন করে না, শৃঙ্খলিত রাজশক্তির বিশেষ সহায়তায়ও আসে না। ভারতের শৃঙ্খলিত প্রাণশক্তি যতটুকু তাহা রাজকর্ত্তৃপক্ষদিগের মুঠার মধ্যেই আছে এবং তাহা প্রয়োজন মত বর্দ্ধিত করার শক্তি ও কৌশল তাঁহাদের করায়ত্ত। এই অবস্থায় যাঁহারা মনে করেন, রাজশক্তির নিকট হইতে স্বাধীনতার বাণী পাইলে বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহারা সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন এবং ভারতের এই জাতীয় রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য প্রাপ্তির লোভে, বৃটন ভারতের ভাগ্যে স্বাধীনতার জয়টীকা পরাইয়া দিবেন, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা আমরা করিতে পারি না। জাতি নিজ গরিমায় ও সামর্থ্যে বিধাতার দানরূপেই স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে। স্বাধীনতার নামে আর যাহা কিছু আসে, তাহা ভিক্ষার চাউল। আমরা আশ্চয্য হই, উহা আবার আকাঁড়া বলিয়া গলা চিরিয়া ঘোষণা করি, সেই কথা সংবাদপত্রে বড় বড় ইংরাজী অক্ষরে ভাষান্তরিত হইয়া প্রকাশ হয়—Inadiquet unsatisfactory ও unacceptable :—চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া রাজবিদ্বেষ ছড়াইতে গিয়া নিজেরাই পুড়িয়া ছাই হই। হরিপুরা হইতে ভারতের রাষ্ট্রশক্তির স্বরূপ দেশের কাছে ও রাজশক্তির কাছে ধরা পড়িয়াছে। ভাষার ছলনায় জাতিকে বিমূঢ় রাখা আর সম্ভব নহে।

মহাত্মা গান্ধীও বোধহয় আত্মশক্তির সীমা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। জাতীয় রাষ্ট্রশক্তির সীমার মধ্যে এতদিন তিনি স্বাধীনতার চেয়ে নিজের জীবন-মন্ত্র প্রচারের সুযোগ অধিক পাইয়াছিলেন। পুণায় ইহার ব্যতিক্রম হইল। তিনিও যেন অচল হইয়া পড়িলেন। রাষ্ট্রপতির ঘোষণা বাণীর মধ্যে তাই শুনি রাষ্ট্র-সভা কোন মানুষের অহিংসা প্রচারের ধর্ম্মবেদী নহে, উহা জাতীয় স্বাধীনতার কর্ম্মক্ষেত্র।

এই জাতীয় সভার স্বাধীনতা অর্জ্জনের শক্তি অহিংস সত্যাগ্রহ। কিন্তু তাহার জন্য আবার দেশ প্রস্তুত নহে, অতএব ভারতের অন্তরশাসনের জন্য এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতসভা অহিংস নীতি পরিত্যাগ করিবে, এই ঘোষণায় জাতিকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হইয়াছে। রাষ্ট্র-ধুরন্ধরদের ধারণা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে জাতীয় সভার এই অবদান অমান্য করা সম্ভব হইবে না, যেন ভারত সভার বিপুল সাহায্যের জন্য বৃটন উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছেন—ভারত-সভার সর্ব্ব পক্ষ এই হেতু এই হিঁয়ালির উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে পারেন নাই। কেহ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, কেহ হাস্য সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন।

মহাত্মা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য অহিংস নীতি ব্রহ্মাস্ত্র বলিয়া এখনও মনে করেন। এতদিন তিনি ভারতের রাষ্ট্রসভায় এই কথাই প্রচার করিয়াছেন, অতঃপর দেখা যায়, অহিংসা রাষ্ট্র স্বাধীনতার ব্রহ্মাস্ত্র, কিন্তু পররাষ্ট্রের আক্রমণ অথবা দেশের শান্তিরক্ষায় ইহা কার্য্যকরী নহে, কংগ্রেস এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করায় মহাত্মা আদর্শ বিভ্রাটে দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা অতঃপর ভারতের স্বাধীনতা একান্ত আশ্রয়হীন মনে করিতেছি। পুণায় বেশ বুঝা গেল, উহা "স্বপনের লৈহাব" ন্যায় ভারতবাসীর মাথার উপর শূন্যে শূন্যেই দীর্ঘদিন বিচরণ করিবে।

বাঙ্গালী স্বাধীনতার দাবী করিয়াছিল নিজের সবখানি দিয়া। কোন আদর্শবাদে তাহার দাবীকে আচ্ছন্ন করে নাই। কিন্তু তাহার এই দাবী নিরাময় ছিল না; দাবীর দায়ে বিপথেই পা বাড়াইয়াছিল, ইহাও নিছক অনভিজ্ঞতা হেতু। রাষ্ট্র-সাধনায় তাই সে এক পাও অগ্রসর হইতে পারে নাই। ক্রমে দেখা গেল বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ই রাষ্ট্রশাসনের অধিকার হস্তগত করিতেছে। ইহা আকস্মিক বলিয়া যাঁহারা বিস্ময় প্রকাশ করেন তাঁহারা এই কথাটা বুঝেন না—বাঙ্গালী রাষ্ট্র-সাধনায় জাতির সম্প্রদায় বিচার

পথে নাই, রাষ্ট্র-সাধকদের আত্মদান একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। যে শ্রেণীর লোক এই কর্ম্মে আত্মদান করিয়াছিল, রাজশক্তি কেবল সেই শ্রেণীকে দূরে রাখিয়া, অন্য শ্রেণীর হস্তে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত প্রার্থনা যতটা সম্ভব পূরণ করিয়াছেন।

বাংলার হিন্দুজাতি স্বাধীনতাকামী হইয়া যেদিন জটিল আবর্ত্তগত, বৃটনের সুযোগ্য শিষ্যের ন্যায় সেদিন ইসলাম-ধর্ম্মিগণ ভাবী রাষ্ট্রশাসনাধিকার লাভ করার শিক্ষার্জ্জনে নিবিষ্টচিত্ত। হিন্দুগণ যখন রাজ-বিদ্বেষী হইয়া রোষাবিষ্ট রাজশক্তির শাসনযন্ত্রে নিষ্পেষিত, তখন বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের অধিকারযোগ্যতায় ধীরে ধীরে রাজ-শক্তির আনুকূল্যেই রাজ্যশাসনযন্ত্রগুলির পরিচালনার জন্য উদ্যতহস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা জানিতেন, হিন্দুদের এই প্রচেষ্টা একান্ত নিরর্থক হইবে না। এই জন্যই দেখা যায়—আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, কর্পোরেশনে, আইনসভায়, রাজ্য-শাসনের সকল ব্যবস্থার শাসন-যন্ত্র তাঁহারা হস্তগত করিয়াছেন। শত বৎসর যে সুযোগ পাইয়া হিন্দু সম্প্রদায় স্বজাতিনিয়ন্ত্রণে ঔদাসীন্য ও ভুয়া ঔদার্য্যগুণে সদ্ব্যবহারে অসমর্থ হইয়াছেন, স্বজাতি-বাৎসল্যে মুসলমান সম্প্রদায় এই পাঁচ বৎসরেই একটা শক্তিশালী জাতিগঠনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া দৃঢ় পদে অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের এই অগ্রগতিতে ঈর্ষ্যাপরায়ণ নহি—বরং বলি 'বাঢম্'।

আত্মগৌরবে, ঔদার্য্যগুণে হিন্দুর তুলনা নাই। হিন্দু নিজের আত্ম-প্রকৃতি জানে না, যে সর্প তার প্রাণহারী, সে তাহা বাস্তু বলিয়া দুধ-কলা দিয়া পোষণ করে। এই স্বভাবের দোষেই আজও মুসলমান যুগের মিথ্যা সাক্ষ্য হলওয়েল মনুমেণ্টের অপসারণের জন্য মুসলমান সম্প্রদায়কে রাজশক্তির সহিত সংঘর্ষ করিতে হইল না, অতি কৌশলে কণ্টক দিয়া কণ্টক অপসারিত করার নীতিই আশ্রয় করিয়া তাঁহারা কার্য্যসিদ্ধি করিলেন। সিরাজদ্দৌল্লার গৌরব-স্তম্ভ এইরূপ রাজনৈতিক কৌশলেই রাজপথে রক্ষিত হইবে। ইহাও রাজনীতি। আমরা মুসলমান সম্প্রদায়ের এই রাজনৈতিক বুদ্ধির প্রশংসা করিব। আস্ফালন শক্তির পরিচয় নহে। উদ্দেশ্যসিদ্ধির সুকৌশল শক্তির বরণীয় মূর্ত্তি। মুসলমানদের রাষ্ট্রনীতি যাঁহারা উপেক্ষণীয় মনে করেন এবং উঁহাদের শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা অপ্রচুর বলিয়া যাঁহারা ধারণা করেন, তাঁহাদের আমরা ভ্রান্তই বলিব।

রাষ্ট্রক্ষেত্রে আমরা সর্ব্বতোভাবে দেউলিয়া হইয়াছি। আমাদের এক্ষণে কর্ত্তব্য—বাংলায় জাতিসংহতি গঠন করা। এই সংগঠননীতি আত্মপ্রচার নহে—জনগণের জয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ করা নহে। বিপুল জনসভায় মানপত্র গ্রহণ নহে। বাংলার ৫ কোটী ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে জাতি ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলের স্বার্থের সামঞ্জস্য করিয়া এমন এক শক্তি-সংহতি রচনা করিতে হইবে, যে সংহতি নিজ যোগ্যতাবলে রাষ্ট্রশাসনের সকল ব্যবস্থার উপর নিজেদের কর্ত্তৃত্ব অনিবার্য্যরূপে বিস্তার করিবে। এই সংহতিগঠনের প্রধান ভিত্তি আত্মবিশ্বাস, অন্তরের অনাবিল প্রেম ও ঐক্য। আপাতদৃষ্ট স্বার্থের ভাগবাঁটোয়ারা হইতে যে শক্তিশালী সংহতি মুখ ফিরাইবে, যে এই শক্তি অর্জ্জন করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ ও তপস্যা বরণ করিতে পারিবে, সেই ভবিষ্যতে জয়যুক্ত হইবে। সে হিন্দু, মুসলমান, অথবা হিন্দু মুসলমানের মিশ্রণ-শক্তি, যাহাই হউক।

## যুদ্ধের কথা

দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মাণ জাতির ফ্রান্সের উপর আধিপত্য-বিস্তারের পর, বৃটনের উপর তাহার সমরাভিযান অতি আসন্ন বলিয়া অনেকে ধারণা করিয়াছিলেন। জার্ম্মাণীর ভাগ্যবিধাতা হিটলারও স্বীকার করিয়াছেন, ফ্রান্স-বিজয়ের পর তিনি প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্ত অপব্যয় করেন নাই, বৃটনের উপর আক্রমণ চালাইয়া আসিতেছেন। তাঁহার কথাতে ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে যে, পোল্যাণ্ড, নরওয়ে, ফ্রান্স জয় করার সংগ্রাম-নীতি বৃটনের পক্ষে প্রযুজ্য নহে। এখানে বিপুল স্থলসৈন্যের প্রয়োজন নাই। সামরিক জল ও বিমানযান ব্যতীত বৃটনাক্রমণের অন্য অবস্থা নাই। তিনি মনে করেন যে, অতি অল্প লোকের দ্বারাই বৃটনের উপর যুদ্ধাভিযান সফল করিয়া তুলিবেন। কিন্তু সেদিন ক্রমেই পিছায়, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বৃটন সমুদ্ররাণী জলধিদেবী বৃটনের রক্ষাকবচ হইয়া আছেন। বৃটনবিজয় শুধু এই জন্যই সহজসাধ্য হইতেছে না, এরূপ নহে ; বৃটনের প্রাণশক্তি জার্ম্মাণীর অপেক্ষা কম নহে। জার্ম্মাণীর রণচাতুর্য্যের তুলনায় বৃটন বিন্দুমাত্র হীন নহে। ইহা ব্যতীত বৃটনের রণসম্ভার এক প্রকার অফুরন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৃটনের ধনভাণ্ডার কুবেরের ঐশ্বর্য্যতুল্য। লোকবলেরও ইয়ত্তা নাই। বৃটনকে পরাভূত করা জার্ম্মাণীর পক্ষে সহজ তো নহেই, পরন্তু সম্ভব কিনা, তাহাও ভাবিবার কথা।

হিটলার কূটরাজনীতিবিৎ। বৃটনও কম নহে। হিট্‌লার দক্ষিণ দিকে চলিলে, বৃটন সর্ব্বাগ্রে উত্তর দিক্ সামলায় আবার দক্ষিণ দিকেও দৃষ্টি রাখিতে ভুলে না। বর্ত্তমান যুদ্ধ শেয়ানায় শেয়ানায় কোলাকুলীর মত—কে হারে, কে জিতে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

বৃটনের সহিত জার্ম্মাণীর সংগ্রাম হিটলার যত গুরুত্ব-পূর্ণ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, আমরা উহার সত্য মিথ্যা তেমন বিশেষভাবে দেখিতেছি না। আমাদের মনে হইতেছে যে, হিটলার উত্তর ইউরোপ হইতে দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম ইস্তাম্বুল পর্য্যন্ত যে আধিপত্যের ভোজ গলাধঃকরণ করিয়াছেন, তাহা পরিপাক করা তাঁহার পক্ষে সহজ নহে, এবং উহা কিছু সময়সাপেক্ষও হইবে। চ্যানেলের উপকূলে কামানপাতা বৃটন হইতে আত্মরক্ষার হেতুও হইতে পারে। বৃটনকে বিমানযুদ্ধে ব্যস্ত রাখিয়া ইটালীর সাহায্যে লোহিতসাগরের বৃটিশাধিকৃত তটভূমি অধিকার করার মধ্যে তাঁহার কোন নিগূঢ় অভিসন্ধিও থাকিতে পারে। ইটালীয় সৈন্যের সোমালিল্যাণ্ডাক্রমণ এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত।

আপাততঃ সোভিয়েটও হিটলারের বিরুদ্ধে যাইবে না। রুমানিয়ার উপর হিটলারের বিন্দুমাত্রও দরদ নাই। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধ পক্ষে রুমানিয়া সংগ্রাম করিয়াছিল। রুমানিয়ার প্রতি হিটলারের ব্যবহার ঠিক কাঁটা দিয়া কাঁটা উপড়াইবার মত মনে হয়। তুর্কীর মনোভাবও অস্পষ্ট। সুদূর পূর্ব্বে জাপানের আস্ফালনের মূলে হিটলারের প্ররোচনা থাকিতে পারে। এই বিশ্বব্যাপী সমরানল কোথাও ধূমায়িত, কোথাও বা প্রজ্জ্বলিত হুতাশন রূপে ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। এই মহা-দুর্দ্দিনে বৃটনের ভয়ঙ্কর ড্রাগন বিজয়গর্ব্বে উড়িতেছে ; ঠিক যেন ভারতের কুরুক্ষেত্রে গুরু-শিষ্যের মধ্যে ভীম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এ যুগে জয়টীকা কাহার ভাগ্যে মিলিবে, দেখিবার জন্য নিখিল মানবজাতি উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে।

আমরা অন্ধের ন্যায় রাত্রিদিন এক করিয়াই বসিয়া আছি। তবে এই ধারণা আমাদের মধ্যে সুস্পষ্ট যে, কোন 'ইজমের' অনুরাগে আমাদের রক্ষা নাই। কমিউনিজম, নাজিজম্, ফ্যাসিজম্, ইম্পিরিয়ালিজম্ প্রভৃতি নাম মাত্র। শক্তি যাহাকে আশ্রয় করে, তাহারই অভ্যুত্থান হয়—নামের নহে। সোভিয়েট সুযোগের দিনে আত্মবিস্তার করিতেছে, বিনা শক্তিপরীক্ষায়। ক্ষুদ্র ফিনের হাতে তাহার যে অবস্থা দেখিয়াছি, সোভিয়েটের বিপুল মূর্ত্তির তুলনায় তাহা গৌরবের নহে। ইটালীরও মুখবিবরসন্নিহিত মাল্টা আজও অবিজিত। ইটালীর শক্তিও বৃটনের নিকট অতি তুচ্ছ। ইউরোপে আজ দুইটি বীর জাতি পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই যুদ্ধের অর্দ্ধ সমাপ্ত অবস্থায় সর্ত্তবদ্ধ হইয়া উভয় জাতি যদি তাহা হইতে বিরত হয়, সে শান্তি দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবে না। তাই উভয় জাতি জয়াকাঙ্ক্ষায় মৃত্যু পণ করিয়াছেন। ভারতের পরিচিত প্রভু বৃটন। আমরা তাই গোড়া হইতেই বৃটনের জয়কামী। আজ এই বিপদের দিনে কোন দাবী আমাদের নাই। তবে বৃটন যদি জয়ী হয়, সে জয় ভারতের আদর্শবাদের সাফল্যের জন্য যে হইবে না, ইহা সুনিশ্চয়। বৃটনের আদর্শবাদই জগতের উপর অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করিবে। কোথায় কে বিনা বুকের রক্তে, আত্মবৈশিষ্ট্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিরক্ষায় সমর্থ হয়। তবুও আমাদের সেই সময় আত্মসংরক্ষণনীতির দিক্ দিয়া যথেষ্ট কিছু করিবার থাকিবে। আজ ভারতশক্তি সর্ব্বতোভাবে বিনা সর্ত্তে বৃটনের সহযোগিতা করুক। আমাদের দাবী ইহারই ফলে কথঞ্চিৎ জয়যুক্ত হইতে পারে। বিজয়ী বৃটনের তাহা উল্লসিত দান।

## ব্রহ্মাবর্ত্ত বা আদি মনুর রাজ্য

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "অবান্তর প্রশ্ন" নিবন্ধে আমাদের শ্রদ্ধেয় লেখক শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগীর 'প্রবর্ত্তকে' প্রকাশিত একটী রচনার উল্লেখ করিয়াছিলাম। তিনি মনুসংহিতাবর্ণিত ব্রহ্মাবর্ত্তের বিবরণ দিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন যে, সরস্বতী ও দৃশদ্বতী, এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত; উহা বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণা ও মুর্শিদাবাদে এবং উড়িষ্যায় প্রবাহিত ব্রহ্মাণী নদীদ্বয় ভিন্ন অন্য নহে; অতএব এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানই ব্রহ্মাবর্ত্ত এবং ইহাই আদি মনুর রাজ্য।

আমরা এই ক্ষীণকায়া ব্রহ্মাণী নদীদ্বয় যে সরস্বতী ও দৃশদ্বতী, ইহা কোথাও না পাইয়া তাঁহার নিকট এই বিষয়ে সমধিক আলো পাওয়ার আশায় এক প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছিলাম। তিনি ১১ই জুন তারিখে পত্রোত্তরে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহারই প্রয়োজনীয় অংশটী সর্ব্বপ্রথমে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিতেছেন:

"আর্য্যদিগের প্রাচীন নিবাসস্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত কোথায়, এ সম্বন্ধে পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতিতে নানা স্থানে নানা কথা আছে, তাহাদের সমন্বয় করা আমার সাধ্যাতীত। সেইজন্য আমি ভূ-তত্ত্ব, মানচিত্র এবং ইউরোপের পণ্ডিতগণ যাহাকে পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বলেন, সেই ঋগ্বেদের সাহায্যে উহার পরিস্থিতি নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি। পুরাণ যে স্থানে এই নির্দ্ধারণের সমর্থন করিয়াছেন, তাহারও উদ্ধার করিয়াছি।

"বাঙ্গালি নামের অর্থ কি?" এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের গোড়ায় "আর্য্য" কাহাকে বলে, ইহার একটি উভয়পক্ষসম্মত সাময়িক (tentative) সংজ্ঞা বা definition স্থির করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

"আর্য্য" কাহাকে বলে, তাহা প্রথমে স্থির করিতে হইবে। চতুষ্পদ অর্থ কি, তাহা না জানিলে সাপ চতুষ্পদ কিনা, তাহা স্থির করিব কিরূপে? আমি যে আর্য্যের সংজ্ঞা বা definition দিয়াছি '(আর্য্য) অর্থাৎ মহানন্দা নদীর পারের লোক', তাহা হঠাৎ গ্রহণ করিতে অন্য পক্ষ বাধ্য নহেন। সুতরাং উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে একটা সংজ্ঞা স্থির করিতে হইবে।

এসিয়া মাইনরের বোখাজকোই নামক স্থানে একখানি প্রাচীন লিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মিতানি নামক এক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহারা ইন্দ্র, বরুণ ও নাসত্যদ্বয়ের পূজা করিত এবং তাহাদের ভাষা ঋগ্বেদের সংস্কৃতের সহিত মিলে। এই দুই কারণে তাহাদিগকে আর্য্য স্থির করা হইয়াছে। এই প্রাচীন লিপির তারিখ ১৪০০ খৃষ্টাব্দ। এই জন্য ঐ তারিখের পূর্ব্বে এসিয়া মাইনরে আর্য্যের আবাস ছিল, একথা স্থির হইয়াছে। যে চারি দেবতার নাম বলিলাম, তন্মধ্যে ইন্দ্রই সর্ব্বপ্রধান; অতএব আর্য্যের—অন্ততঃ এসিয়া খণ্ডের আর্য্যের আমি সংজ্ঞা করিতে চাই "ইন্দ্রপূজক সংস্কৃতভাষী ব্যক্তি।" ইহাতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না (৪ পৃঃ)।

তারপর রাজমহল পর্ব্বতের অন্তর্গত মন্দর পর্ব্বতের ইন্দ্রকীল, এই নাম এবং তাহার পূর্ব্ব দিকের সমুদ্র হইতে উত্থিত দ্বীপের বরেন্দ্র, এই নাম হইতে ঐ সমুদ্রের ইন্দ্রসমুদ্র এই নাম বাহির করা হইয়াছে।

ঐ সমুদ্রের ইন্দ্র এই নাম রাখিয়াছিল কাহারা? উহার নিকটে যাহারা বাস করিত। তবেই পাইতেছি—যখন রাজমহল পর্ব্বতের পূর্ব্বে সমুদ্র ছিল, তখন ভাগলপুর জেলায় মনুষ্য বাস করিত এবং তাহারাই ঐ সমুদ্রের নাম রাখিয়াছিল ইন্দ্র। ইন্দ্র কথাটি সংস্কৃত এবং উহার অর্থ পরম ঐশ্বর্য্যশালী। অতএব সর্ব্বপ্রথমেই উহা দেবতার নাম হইয়াছিল, পরে সমুদ্র কিম্বা অন্য পদার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যখন সোমেশ্বর পর্ব্বত হিমালয়ের পাদদেশে উত্থিত হয়, তখন ঐ পর্য্যন্ত সমুদ্র ছিল। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, খৃষ্টের জন্মের পাঁচ হাজার বৎসরেরও বহু পূর্ব্বে সোমেশ্বর পর্ব্বত (শিবালিক বা Teritory rock) সমুদ্র হইতে উঠিয়াছিল। তবেই পাইতেছি—অদ্য হইতে সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভাগলপুর জেলায় সংস্কৃতভাষী ইন্দ্রপূজকের অর্থাৎ আর্য্যের বাসস্থান ছিল। আর্য্যের খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দে হাঙ্গেরী হইতে এ দেশে আসিবার কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। ৭ পৃঃ।

মনুসংহিতায় লিখিত আছে—আর্য্যদিগের প্রাচীনতম নিবাসস্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত।

সরস্বতী দৃশদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী, এই দুই দেবনদীর মধ্যে যে দেব-নির্ম্মিত দেশ, তাহাই ব্রহ্মাবর্ত্ত।

এই মাত্র দেখিলাম—খৃঃ পূঃ ৫০০০ বৎসরেরও বহু পূর্ব্বে ভাগলপুরে আর্য্যদের নিবাস ছিল। ঐ সময়ে বঙ্গদেশ ও পঞ্জাব অকূল সমুদ্রের নীচে ছিল। অতএব ব্রহ্মাবর্ত্ত বঙ্গদেশেও নহে, পঞ্জাবেও নহে। হয় উহা ভাগলপুরে নয় তো ভাগলপুর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত যে প্রকাণ্ড গ্রাণাইট পাথরের দেশ তাহারই আর কোনও স্থানে।

হুগলী জেলায় একটি সরস্বতী নদী আছে। উহার উপরের ভাগ নদীয়া জেলায় ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে। উহার নাম বাগ দেবী। আর বাগ দেবীরও উপরের ভাগ মুর্শিদাবাদ ও সাঁওতাল পরগণায়, উহার নাম ব্রহ্মাণী। তবেই খাঁটি একটি সরস্বতী নদী পাইলাম। যিনি ব্রহ্মাণী, তিনিই বাগ দেবী, তিনিই সরস্বতী।

আবার দেখি—উড়িষ্যায় আর একটি ব্রহ্মাণী পাওয়া যাইতেছে। ইহার পারে একটি দরোন্দা পরগণা পাইতেছি। দরন্দা কথাটি দৃশদ্বান্ কথার সহিত প্রায় মিলিয়া যায়। দৃষদ্বান্ সহজেই দৃষদ্বাঁ, দিরদ্বাঁ—দরন্দা হইতে পারে। দৃষদ্বতী নদীর পারে দৃষদ্বান্ পরগণা থাকিবারই কথা।

দৃষদ্বতী কথার মানে কি? প্রস্তরবতী। এই ব্রহ্মাণী নদী একেবারে গ্রাণাইট পাথরের উপরে। অতএব ইনি প্রস্তরবতী। অতএব সরস্বতী বা উত্তর ব্রহ্মাণী এবং দৃষদ্বতী বা দক্ষিণ ব্রহ্মাণী পাওয়া গেল। এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত হওয়ারও কারণ পাওয়া গেল। ব্রহ্মাণী নদী দ্বয়ের আবর্ত্ত বা জলের ব্রহ্মাবর্ত্ত। এই দুইটি নদী এবং ইহাদের মধ্যবর্ত্তী দেশ গ্রাণাইট পাথরের উপরে, অতএব অতি প্রাচীন। অতএব নদী দুইটিকে দেবনদী ও দেশটিকে দেবনির্ম্মিত বলাতে কোন ক্ষতি হয় না; কারণ ইহাদের আদি কেহ দেখে নাই। ব্রহ্মাবর্ত্তের নাম অর্থযুক্ত হইল, বর্ণনাও সার্থক হইল (৮ পৃঃ)।

'দেবনদী' এবং "দেবনির্ম্মিত দেশ" সম্বন্ধে যাহা পূর্ব্বে বলা হয় নাই তাহা হইতেছে এই:—

ভাগলপুর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত গ্রাণাইট পাথরের দেশ যে ধাতা কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্ট হইয়াছিল এবং ঐ দেশের যে নাম দিব,

এই কথা ঋগ্বেদের "ঋতমত সত্যমত অভীদ্ধাৎ তপসো (অ)ধ্যজায়ত" ইত্যাদি সন্ধ্যার মন্ত্রে "দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ অন্তরিক্ষমথো স্বঃ" এই অংশে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক উপনীত ব্যক্তিকে ত্রিসন্ধ্যা ঐ কথা আওড়াইতে হয়। বিজ্ঞান অর্থাৎ Geologyতেও পাই—ঐ গ্রাণাইট পাথরের দেশই সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্ট হইয়াছিল।

অতএব এই নদীদ্বয় "দেবনদী" অর্থাৎ দিব দেশের নদী এবং উহাদের মধ্যের দেশ প্রথম দেবতা কর্ত্তৃক প্রথম নির্ম্মিত দেশ। অতএব উহার মনুসংহিতায় বর্ণনা ও ব্রহ্মাবর্ত্ত, এই নাম সার্থক হইল। নদী দুইটি এক্ষণে ক্ষীণতোয়া। মানুষের চিত্তের ক্রমক্ষীণতা এবং নদীর সলিলসম্পত্তির ক্রমক্ষীণতা সর্ব্বদাই লক্ষিত হইতেছে।

তারপর উপরোক্ত গ্রন্থে (বাঙ্গালি নামের অর্থ কি? ২য় খণ্ড) আছে :—

"কেম্‌ব্রিজ হিষ্টরি" নামক ইতিহাসে প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে পঞ্জাবের নিকট শতদ্রু ও যমুনার মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেখান হইয়াছে। কিন্তু ঐ স্থানে দৃশদ্বতী নামে কোনও নদী নাই (১)। যে সরস্বতী (২) পাওয়া গিয়াছে, তিনি পূর্ব্ববাহিনী নহেন—দক্ষিণ ও পশ্চিমবাহিনী। অথচ শ্রীমদ্ভাগবতে লেখা আছে, ব্রহ্মাবর্ত্তের সরস্বতী পূর্ব্ববাহিনী।

"পরীক্ষিন্নাম রাজর্ষিঃ প্রাপ্তঃ প্রাচীং সরস্বতীম্"।
"প্রাচীং পূর্ব্ববাহিনীম্" ইতি শ্রীধরঃ।" শ্রীমদ্ভা ১।১০।৩৭

সাঁওতাল পরগণার ব্রহ্মাণী সরস্বতীও খাঁটি পূর্ব্ববাহিনী। ১০ পৃঃ

যে কোন মানচিত্রে (ই) দেখিবেন—এই উত্তর ব্রহ্মাণী বা সরস্বতী এবং দক্ষিণ ব্রহ্মাণী বা দৃষদ্বতীর মধ্যে মানভূম মান(বে) ভূমি অবস্থিত। এখন ঋগ্বেদের ৩ মণ্ডলের ২৩ সূক্ত ৪ ঋকে দেখুন

দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপয়ায়াম্
সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি।

হে অগ্নি, দৃষদ্বতী, সরস্বতী ও আপায়ার পারে এই মানুষ দেশে তুমি ধনযুক্ত হইয়া জ্বলিতে থাক। সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যের দেশ মানচিত্রে পাই মান(বে)-ভূমি ঋগ্বেদে পাই মানুষভূমি। অতএব আমরা স্থাননির্ণয় বোধ হয় ঠিকই করিয়াছি। ১০ পৃঃ।

"শ্রীমদ্ভাগবতে পুনঃ পুনঃ বলেন—ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রাতঃস্মরণীয় ভক্ত ধ্রুবের পিতামহ আদি মনুর রাজধানী ছিল—

প্রজাপতিসুতঃ সম্রাড়্মনুর্বিখ্যাত মঙ্গলঃ।
ব্রহ্মাবর্ত্তং যোঽধিবসন্ শাস্তি সপ্তার্ণবাংমহীম্।
শ্রীমদ্ভা ৩।২১।২৫, ২৫ পৃঃ

এই আদি মনুর রাজধানী মানবভূমি বা মানভূম আমরা মানচিত্রে প্রাপ্ত দুই ব্রহ্মাণী নদীর মধ্যে পাইয়াছি; উহার এক ব্রহ্মাণীর যে নামান্তর দৃষদ্বতী তাহাও আমরা পাইয়াছি। আদি মনু কর্ত্তৃক শাসিত সপ্তার্ণববেষ্টিত সপ্তদ্বীপ যে এই মানভূমের চারিদিকে, তাহাও "বাঙ্গালি নামের অর্থ কি?" গ্রন্থের Geological Map of Indiaতে পাওয়া গিয়াছে।

"শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, ব্রহ্মাবর্ত্তই বরাহদেবের যুদ্ধক্ষেত্র (শ্রীমদ্ভা ৩।২২।২৮-২৯), আর আমি যে স্থান দেখাইয়াছি, তাহার মধ্যেই "বরাহভূম", বারাহী নদী।" ২২ পৃঃ

উপরোক্ত Geological map'এ দন্তোদ্ধৃতা নব বসুন্ধরা সহ বরাহদেবের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিও আমি যে স্থান দেখাইয়াছি, তাহাতে পাওয়া যাইবে।

সুতরাং প্রকৃত ব্রহ্মাবর্ত্ত এবং তাহার সীমানির্দ্দেশে আমাদের ভ্রম হয় নাই বলিয়াই বোধ হইতেছে।

বাহুল্যভয়ে ইহার অধিক আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। স্বায়ম্ভুব মনু পৃথিবী-পতি ছিলেন, একথা পুরাণাদিতে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। তাঁহার পুত্র প্রিয়ব্রত সপ্ত সন্তানকে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। অগ্নীধ্র হইয়াছিলেন এশিয়া দেশের অধিপতি। সৃষ্টি-পদ্মের চারিটী দলের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম দেশের যে বর্ণনা পুরাণে পাওয়া যায়, তাহাতে অগ্নিধ্রের রাজ্য বর্ত্তমান এশিয়া বলিতে বাধে না। তাঁর সন্তানকে এশিয়া দেশ ৯ ভাগে বিভক্ত করিয়া দান করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নাভি এই সময়ে যে হিমবর্ষের আধিপত্য লাভ করেন, তাহা হিমালয়ের দক্ষিণ পশ্চিম হইতে আরব সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেননা ভারতের পশ্চিমে ম্লেচ্ছ দেশের পর সমুদ্র-বর্ণনায় উহা বর্ত্তমানে আরব সাগর অনুমান করা অসঙ্গত নয়। নাভির পর ভরত হইতে যে ভারতবর্ষ, তাহার বিবরণ সুস্পষ্ট পাওয়া যায়।

বায়ুপুরাণের পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়টী পাঠ করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, সমুদ্র দ্বারা "অন্তহিত" নয়টী দ্বীপ বৃহত্তর ভারত নামে অভিহিত হইত। এই ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে কিরাতগণ এবং পশ্চিম প্রান্তে যবনগণ বাস করিত। এইরূপ নানা বৈদিক ও পৌরাণিক গবেষণায় বৃহত্তর কল্পনায় আমরা ব্রহ্মাণী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলিয়া স্বীকার তো করিতেই পারি না, এবং উহা আদি মনুর রাজ্যরূপে স্থির করিলে, প্রাচীন যুগের ভারতেতিহাস সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ব্রহ্মাবর্ত্তের স্থান নির্দ্দেশ সহজ নহে; কেননা সরস্বতী দৃষদ্বতী দুই নদীই অন্তহিত হইয়াছে, সেও দীর্ঘ দিনের কথা। ইহা ব্যতীত যে সরস্বতী নদীকে তিনি পূর্ব্বগামিনী বলিয়া স্থির করিয়াছেন তাহা উত্তর দিক্ হইতে ধরিলে এখনও দক্ষিণগামিনী, হাওড়া জিলার মধ্য দিয়া উলুবেড়িয়ার সন্নিকটে উনি সমুদ্রগামিনী হইয়াছেন; এই সরস্বতী সেই সরস্বতী

(১) থাকিতেও পারে না—কারণ দৃশদ্ বা পাথর ঐ স্থানে বা উহার নিকটে কোথাও নাই।

(২) ইনি এক্ষণে তোয়হীনা—dried bed of a river; কেহ কেহ বলেন—ইহার নাম ছিল Sarsuti, কিন্তু Cambridge History'র এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাই Map-এ ইহার কোন নাম দেওয়া হয় নাই।

নহে। পুরাণাদিতেও লিখিত আছে—কলিযুগে সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব থাকিবে না।

বাংলায় বার ভুঁইয়ার ন্যায় পঞ্চ ভূম্যধিকারীর নামও প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। বীরভূম, সিংহভূমাদির ন্যায় মানভূম তাহারই অন্তর্গত। উহা মানবভূম নহে। ভূম্যাধিকারীদের গুণক্রমে পঞ্চভূমের নামকরণ হয় বীর, সিংহ, মল্ল, প্রভৃতি।

শতপথ ব্রাহ্মণ একটী প্রাচীন গ্রন্থ। উহাতেও দেখিতে পাই, অগ্নি সরস্বতীতীর হইতে সরযূ, গণ্ডকী, কুশী নদী পার হইয়া সদানীরাতীরে আসিয়াছিলেন, উহার দক্ষিণে আর প্রবেশ করেন নাই। ইহার মধ্যে উক্ত গ্রন্থকারের বাংলার উপর বিদ্বেষ থাকা সম্ভব হইলেও, প্রামাণিক ঐতরেয় উপনিষৎ গ্রন্থে বঙ্গ-শব্দের উল্লেখ আছে। আরণ্যকরচনাকালে বঙ্গের অধিবাসিগণকে আর্য্যগণ পক্ষীর ন্যায় মনে করিতেন। মনু আয্য ছিলেন, বাঙ্গালী ছিলেন না। উপনিষদ প্রামাণিক নহে যাঁহারা মনে করেন, তাহাদের কথার উত্তর নাই।

বাঙ্গালী আর্য্য হইলেই যে বড় হইবে, এমন কোন কথা নাই। দ্রাবিড় ও তামিল জাতি ভারতের প্রাচীন জাতি বলিয়া গণ্য। অনেকের ধারণা—বাঙ্গালী এইরূপ এক আদিম অধিবাসী। সে কত দীর্ঘদিনের কথা, আর্য্য জাতির অভ্যুত্থানের পূর্ব্বেও বাঙ্গালী ছিল। বাংলা ভূতত্ত্ব-বিদের নিকট আজ আর অর্ব্বাচীন দেশ নহে। রক্তমিশ্রণে বাঙ্গালী আজ আর্য্য জাতিও বটে। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া কত প্রকার রক্তমিশ্রণ যে হইয়াছে, তাহার কে ইয়ত্তা করিবে।

আমরা বাংলা দেশের নাম আর্য্য ভারতে নানা স্থানে প্রচারিত হইয়াছিল, দেখিতে পাই। আদি মনু স্বায়ম্ভুবের যুগে বিশ্বের পরিস্থিতি যেরূপ ছিল, তাহার সুস্পষ্ট চিত্র বেদগ্রন্থাদি অপেক্ষা পুরাণেই অধিক পাওয়া যায়। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যার "প্রবর্ত্তকে" স্থানাভাববশতঃ উহার আলোচনা হইতে বিরত হইলাম, পরবর্ত্তী সংখ্যায় ইহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

# শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমতিলাল রায়

'প্রবর্ত্তকে'র রজত-জয়ন্তী বৎসরে অতীতের যত স্মৃতি, তাহার পরিপূর্ণ তর্পণ এই যজ্ঞাগ্নিতে প্রদান করিয়া অন্তরে বাহিরে মুক্তির আনন্দ অনুভব করিতে চাই। প্রবর্ত্তকের জয়ন্তী উৎসব তাই ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি। 'প্রবর্ত্তকে'র সেবার অধিকার পূর্ণাঙ্গ করিয়া, ইহাকে ভবিষ্যতের হস্তে অঞ্জলী দিতে প্রস্তুত হইতেছি।

সে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের কথা—মাঘ মাসের শেষে একদিন বাসন্তী প্রভাতে, দেশপূজ্য শ্রীঅরবিন্দ রাষ্ট্রক্ষেত্রে অপরাধীরূপে কারাবন্দী হওয়া অপেক্ষা নিরাপদ্ ক্ষেত্রের সন্ধানে চন্দননগরে আসিয়া উপস্থিত হন।

রাষ্ট্রক্ষেত্রের পরিচয় ছিল যাঁহাদের সহিত তাঁহারা সেদিন তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। আমি ছিলাম সেদিন তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত তরুণ—ধর্ম্ম ও জাতীয়তার ভাবপ্রবণতায় উচ্ছ্বসিতপ্রাণ দেশসেবক। অভাবনীয়রূপে শ্রীঅরবিন্দের আগমন-সংবাদ পাইয়া, এই নব অতিথিকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন করিয়া বরণ করিলাম। তারপর দেখিলাম—এ মানুষের সহিত পরিচয় নূতন নহে, কত যুগের এ সম্বন্ধের বন্ধন তাহার ইয়ত্তা হয় না। আমাদের চারি চক্ষের মিলনের সঙ্গে সঙ্গে এমনই সুনিবিড় পরিচয়ের অমৃত উথলিয়া উঠিয়াছিল—সে কথা আজি আর নহে। 'জীবন-সঙ্গিনী'তে ইহার পরের কথা কিছু কিছু লিখিয়াছি। আজ শ্রীঅরবিন্দের জন্মতিথি উৎসবের দিন স্মরণ করিয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত চন্দননগরে এই ১২ বৎসর যে মহোৎসবের প্রবাহ বহিয়া গিয়াছিল, তাহার মৃদুমন্দ স্পন্দন হৃদয়-

তন্ত্রে বাজিয়া উঠিতেছে। অতীতকে বিসর্জ্জন দেওয়ার ইহাই শুভক্ষণ; তাই ১৫ই আগষ্টের স্তুতি-কীর্ত্তন করিয়া শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কাহিনীর একটী সংক্ষিপ্ত অধ্যায় পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। এ কথা তাঁরই মুখের কথা। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর তিনি বলিতেছিলেন, আমি লিখিয়া লইতেছিলাম। তাঁরই বাণীর সংক্ষিপ্তসার উদ্ধার করিয়া ১৫ই আগষ্টের পুণ্য-দিনে শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ ইহা উৎসর্গ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সেই ঋষি-বচন উচ্চারণ করিতেছি—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং<br>
পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।<br>
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়<br>
পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

শ্রীঅরবিন্দ

১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মোৎসব ১৯১৫ হইতে মহাসমারোহে আমারই বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হইত। শ্রীঅরবিন্দ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ৺মনোমোহন ঘোষের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। শিশু বলিয়া বিধাতার বিন্দুমাত্র করুণা তিনি লাভ করেন নাই। চারি বৎসরের শিশুকে মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, একেবারে সম্পূর্ণ অপরিচিতা বিদেশিনীদের হস্তে তাঁর শিক্ষার ভার প্রদান করা হয়। উদর পূরিয়া মাতৃদুগ্ধ পান করার সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। দার্জ্জিলিংয়ের কন্‌ভেণ্টে বিদেশিনীদের স্নেহ-যত্নে তিনি শিশুজীবন যাপন করেন। পারিবারিক মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বাংলার ধূলিকণা মাখিয়া দেশের মমতায় তাঁর হৃদয় সম্মোহিত হওয়ার অবসর পায় নাই। জনকজননী, সহোদর-সহোদরা, আত্মীয়দের স্নেহস্পর্শে শ্রীঅরবিন্দের হৃদয় বাঙ্গালীসুলভ কোমল হওয়ার সুযোগও লাভ করে নাই। ক্ষেত্রগত আসক্তিতেও তাঁহার চিত্ত আচ্ছন্ন হয় নাই। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আবাল্য তাঁহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে বিধাতার চক্রান্তে। দার্জ্জিলিং কন্‌ভেণ্টে এক বৎসর যাপন করিতে করিতেই ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে লণ্ডনে আসিতে হয়। মাতৃভাষার সহিত পরিচয় হওয়া দূরে

বাবু, কোন দেশে তিনি জন্মিয়াছেন, এই কথাও তাহার জানিবার উপায় ছিল না। লণ্ডনে গিয়াও তিনি নিয়ত একাশ্রয়ে অবস্থান করেন নাই, আশ্রয় হইতে আশ্রয়ান্তরে পালিত হইয়াছিলেন। কোন এক গৃহস্থ পরিবারের সহিত যে আসক্তচিত্ত হইবেন, সে অবসরও তিনি পান নাই। এ এক অপূর্ব্ব জীবন লীলা। তাঁহাকে ভবিষ্যতে স্বদেশ-প্রীতির পুরস্কারস্বরূপ এক বৎসর নির্জ্জন কারাবাসে থাকিতে হইয়াছিল। নিঃসঙ্গ-জীবন যাত্রার বিধাতার ইচ্ছা এইভাবেই তাঁহাকে প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিল। ১৮৮৯ ও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বিলাতে তিনি যে দারুণ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় এক বৎসর কারাক্লেশ তুচ্ছ বলিতে হয়।

এই সময়ে দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতায় লণ্ডনের প্রবল শীতে কয়লা কিনিবার সঙ্গতি তাঁহার ছিল না, তিনি বুকে হাঁটু বাঁধিয়া নিশি যাপন করিতেন। তিনি কঠোর অধ্যয়নপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু এই শীতপ্রধান দেশে প্রাতঃকালে এক টুকরা রুটী, এক পাত্র চা, রাত্রে এক পেনীর এক খণ্ড মাংস ও এক পাত্র চা ব্যতীত আর কিছু খাইতে পাইতেন না। এই অপ্রচুর আহারে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িত, কিন্তু তিনি অধ্যয়নরত থাকিয়া নিজের পারদর্শিতার ফলে বিদ্যালয়ের উচ্চ বৃত্তি লাভ করিয়া এই কঠোর দারিদ্র্য-ক্লেশ দূর করিয়াছিলেন। ইহার পর সিভিল সার্ভিস পাস করার সময়ে শ্রীঅরবিন্দের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। ভারত হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত এই মানুষটী ভারতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন। তিনি সর্ব্ব বিষয়ে পারদর্শিতার সহিত পরীক্ষা দিয়া অশ্বারোহণ-পরীক্ষার দিন ইচ্ছা করিয়াই অনুপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। ইংরাজ অভিভাবকেরা যুবকের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য ধিক্কার দিলেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের জীবনদেবতা সেদিন কাঁদিয়া উঠিয়াছে ভারতের ডাকে। তিনি পার্থিব সম্মান-ঐশ্বর্য্য অবহেলায় পরিত্যাগ করিয়া, কোন এক তৃতীয় শক্তিরই প্রেরণায় ভারতের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বরদারাজ ২০০৲ টাকা বেতনে শ্রীঅরবিন্দকে রাজ-কার্য্যে নিয়োগ করিয়া ভারতে পাঠাইয়া দেন। দুর্ভাগ্যের কষাঘাত তিনি নীরবেই সহ্য করিলেন। আসিয়াই দেখিলেন—তাঁহার পিতৃদেব লোকান্তরে গমন করিয়াছেন।

তিনি ৺ভূপালচন্দ্র ঘোষের কন্যা মৃণালিনী দেবীকে হিন্দু মতেই বিবাহ করেন। বিবাহকালে গোময় খাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাঁহাকে হিন্দু হইতে বলা হয়। তিনি হিন্দু, অতএব এমন কোন পাপ নাই, যাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাঁহাকে হিন্দু হইতে হইবে। সমাজ-পুরুষেরা শ্রীঅরবিন্দের দৃঢ়তা দেখিয়া এ বিষয়ে নিরস্ত হন। দুই শত টাকা বেতন হইতে ৫৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত তাঁহার বেতনবৃদ্ধি হয়। পরে ৭০০৲ টাকা বেতনে তিনি বরোদা কলেজের প্রিন্সিপালের পদে নিয়োজিত হন। এই স্বভাব-সুখের দিন বিধাতা তাঁহার ভাগ্যে অতি সংক্ষেপে করিয়াই লিখিয়াছিলেন। ঠিক এই সময়ে বাংলায় স্বদেশ-প্রেমের বান ডাকিল। তিনি সে ডাকে উন্মাদ সন্ন্যাসীর ন্যায় বাংলা মায়ের কোলে আসিয়া বসিলেন। অলক্ষ্যে ভারতলক্ষ্মী সে-দিন মঙ্গল-শঙ্খ বাজাইয়া সন্তানকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার পরের কাল কাহারও অবিদিত নাই। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি "ধর্ম্ম" ও "কর্ম্মযোগিন্" পত্রিকায় সম্পাদনারত, এই সময়ে কোন এক বৈপ্লবিক ঘটনায় গভর্ণমেণ্ট পক্ষ তাঁহাকে পুনঃ বন্দী করার অভিসন্ধি পোষণ করেন। এই সংবাদে যখন তিনি ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিতে চিন্তারত, বিদুষী ভগ্নী নিবেদিতা বন্দী হওয়া অপেক্ষা শ্রীঅরবিন্দের কোন নিরাপদ্ স্থানে সাধনরত হওয়া সঙ্গত বুঝিয়া মত প্রকাশ করেন। শ্রীঅরবিন্দের হৃদয়দেবতাও এই কথার সমর্থন করেন। তার পর বাংলা হইতে শ্রীঅরবিন্দের অগস্ত্যযাত্রা—সে ইতিহাসও আমার হৃদয়-মন্দিরে সুলিখিত আছে। উহা ১৯১০ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত—তাঁর জীবন-কথা। ইহাই শ্রীঅরবিন্দের যোগ-যুগ। কিন্তু সে কাহিনী মর্ম্মবীণায় রুদ্ধ রহিল। আমি আজ অতি সন্তর্পণে শ্রীঅরবিন্দের পুণ্য জন্মতিথির দিনে অন্তরের সঞ্চিত শ্রদ্ধার্ঘ্য নিঃশেষ করিয়া ভূনত প্রণাম করি—"ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিম্ বিধেম।"

# মৃত্যুদণ্ড

শ্রীকালিদাস রায়

মৃত্যু ত তোমারি দণ্ড। আমাদের নাহি মৃত্যুভয়,
বাঞ্ছিত তা নয় বটে, মোদের তা দণ্ড কভু নয়।
নিঃস্ব মোরা নিঃসম্বল এই বিশ্বে মিলেনিক সুখ,
এমন কি আছে যাহা ফেলে যেতে ফেটে যাবে বুক?
যেদিন ডাকিবে মৃত্যু এক বস্ত্রে যাবো মোরা চলে,
নিব না সময় যেচে প্রস্তুত হইনি আজো ব'লে,
হাসিমুখে যাই হোক, ফেলিব না তপ্ত অশ্রুজল,
অজ্ঞাতের আতঙ্কেরে জিনিবে মোদের কুতূহল।
হা-হুতাশ করিব না লোভে ক্ষোভে পিছু পানে চেয়ে,
ভয় ডর করিব না মহাপথে সাথী নাহি পেয়ে।
মৃত্যু ত তোমারি দণ্ড। চিরদিন ভুলে গিয়ে তারে
এই ধরণীর সাথে সহস্র বন্ধনে আপনারে
বাঁধিয়াছ নিরুদ্বেগে। ভূসম্পদ্ যশ মান ধন,
বিরাট্ ভবনশ্রেণী স্বাচ্ছন্দ্যের কত আয়োজন
রচিয়াছ চারিপাশে। কতজনে করিয়া বঞ্চিত
জীবনের ভোগ্যভার রাশি রাশি করেছ সঞ্চিত
সমস্ত জীবন ধরি। কতটুকু করিয়াছ ভোগ,
ভোগশক্তি সীমাবদ্ধ, ছিল তায় দেহে মনে রোগ,
অর্জ্জনের তাড়নায় মিলেনি প্রচুর অবসর,
ভুঞ্জিতে পারিতে যদি পেতে আয়ু সহস্র বৎসর।
আমার আমার বলি দু' বাহুরে দু'হাজার করি,
আঁকড়ি ধরিলে যাহা, তার সবি হেথা রবে পড়ি,
কিছু সাথে নাহি যাবে। এ কথা ভাবনি কোন ছলে,
আসিবে যেদিন মৃত্যু সুরক্ষিত তব হর্ম্ম্যতলে
সেদিন কি হবে বন্ধু? সকলি ফেলিয়া যেতে হবে,
এর চেয়ে বেশি দণ্ড হইবে কি কল্পিত রৌরবে?
ছিন্ন কন্থা 'পরে মৃত্যু হোক তাহা যতই করুণ,
সোণার পালঙ্কে মৃত্যু সব চেয়ে দণ্ড নিদারুণ।

# বন্ধু

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

১

"মা! মাগো!"

দ্রুত চঞ্চল চরণে বিধবা জননী ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার বিষণ্ণ দৈন্যক্ষুণ্ণ আননে আনন্দের বন্যাপ্রবাহ যেন অকস্মাৎ উদ্বেল হইয়া উঠিল।

"বাবা! তুই!"

চরণপ্রান্ত হইতে পুত্রকে দুই হাতে টানিয়া তুলিয়া মাতা বিনয়কে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার বর্ষণক্লান্ত নয়ন যুগল হইতে অশ্রুর প্রবাহধারা ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দীর্ঘ এক বৎসর পরে হারানিধি ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে! রাজ-অতিথিরূপে যেদিন সে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, সেদিন হইতে দুঃখিনী বিধবা জয়ার নয়নের অশ্রু শুকায় নাই। দীর্ঘ দিবা, দীর্ঘ রজনী তাঁহার কি ভাবে কাটিয়া গিয়াছে, তাহা শুধু জয়াই জানেন, আর জানেন তিনি যাঁহার এই বিচিত্র বিশ্বরচনা।

পুত্র ও মাতা উভয়েরই নয়নে বন্যার প্রবাহ বহিয়া চলিল। কাহারও মুখে ভাষা নাই। এক বৎসর পূর্ব্বে বিনয় যখন ম্যাট্রিক ক্লাশের ছাত্র, সেই সময় দেশনেতৃগণের আহ্বানে স্কুল কলেজের ছাত্রদলের অনেকেই তাঁহাদিগের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—অসহযোগ আন্দোলনের হোমাগ্নিশিখা তাহারাই জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল। কিশোর বয়স—মনে তখন স্বার্থপরতার ছাপ পড়ে নাই; হিসাব নিকাশে জমার অঙ্কে শূন্যই সুস্পষ্টরূপে ভবিষ্যতের পাথেয় হইবে, ইহা ভাবিয়া দেখিবার মত বুদ্ধি ও বয়স তাহাদিগের হয় নাই। উৎসাহের উত্তেজনায় নেতৃবৃন্দের কথায় তাহারা সম্মুখের পথে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। তাহারই ফলে বিনয়কেও এক বৎসরের জন্য রাজার আতিথ্য মাথা পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।

জননীর বুকে মাথা রাখিয়া বিনয় যখন অশ্রুপাত করিতেছিল, তখন মাতার শীর্ণ দেহ, ছিন্ন বসনের মলিনতা তাহার ভাবপ্রবণ হৃদয়কে তীব্র বেগে আঘাত করিতে লাগিল। মাতার দুঃখ দূর করিবার ব্রত লইয়া সে অধ্যয়ন করিতেছিল। বিদ্যালয়ে সর্ব্বপরীক্ষায় সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছিল। তাহারই ফলে সে বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পড়িতে পাইত। নচেৎ দরিদ্রা, দুঃখিনী মাতার পক্ষে তাহার অধ্যয়নের ব্যয় নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। সে ত তাহাদিগের অবস্থার কথা সবই জানে। এই সকল কথা আজ নূতন করিয়া বিনয়কে পীড়া দিতে লাগিল।

"একি? দাদা!—তুমি কখন এলে?"

কিশোরী সহোদরা মালতী ছুটিয়া আসিল।

বিনয় মাতার ক্রোড় হইতে উঠিয়া সহোদরার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, "হ্যাঁ ভাই, দশদিন আগে ছাড়া পেয়েছি। তুই ত খুব রোগা হয়ে গেছিস্ দেখ্‌ছি!"

দাদার পদধূলি লইয়া মালতী অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। অনাহার, অর্দ্ধাহার এবং অন্য শত প্রকার অসহনীয় দুঃখময় স্মৃতির কথা অসহায় জ্যেষ্ঠকে জানাইয়া কোন লাভ নাই। তাহাতে তাহার দুঃখের বোঝা অসম্ভবরূপে ভারী হইয়াই উঠিবে না কি?

বিনয় একবার মাতা, আর বার মালতীর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "বড় দুঃখ, বড় কষ্ট তোমরা পেয়েছ, শুধু আমারই জন্য। উঃ!"

মাতা পুত্রের হাত ধরিয়া বলিলেন, "সেজন্য আর দুঃখ করে কি হবে, বাবা! এখন ঘরের মধ্যে চল্।"

সহসা বাহিরের দ্বারপ্রান্ত হইতে কেহ বলিয়া উঠিল, "মাসীমা, বিনু ফিরে এসেছে না?"

বলিতে বলিতে বিনয়েরই সমবয়স্ক একজন কিশোর ভিতরে প্রবেশ করিল।

মা বলিলেন, "কে, যতু? তুই এতদিন কোথা ছিলি, বাবা?"

বিনয় তখন বন্ধুর সুদৃঢ় আলিঙ্গনে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে।

যতীন্দ্র গাঢ়স্বরে বলিল, "আমি এতদিন দেওঘরে ছিলাম, মাসীমা। কলকাতায় থাকলে আবার কোন হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ি ভেবে, বাবা মার সঙ্গে আমাকে দেওঘরে রেখেছিলেন। সেখানে মাষ্টার দু'জন ছিলেন। এবার পরীক্ষা দিতেই হবে। তাই প্রাইভেটে পরীক্ষা দেব বলে সেখানে ছিলাম। ম্যাট্রিক পরীক্ষার একদিন আগে এখানে এসেছি। আজ পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল—এখন ছুটী। পথে খবর পেলাম, বিনয় ছাড়া পেয়েছে। তাই ছুটে এলাম।"

যতীন ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। বন্ধুর মাতা ও ভগিনীর ছিন্ন মলিন বেশ লক্ষ্য করিল। সে তাহার বাল্যবন্ধুর পারিবারিক সমস্ত অবস্থাই সুবিদিত ছিল। দেশেও ইহাদের মাথা গুঁজিবার মত স্থান নাই। সরিকরা সকল রকমেই অসহায়া বিধবাকে বঞ্চিত করিয়াছে। সামান্য দুই চারিখানি অলঙ্কার ব্যতীত বিনয়ের মাতার অন্য কোন অবলম্বন ছিল না। পুত্র লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবে, অর্থোর্জ্জন করিবে, এই আশায় সামান্য ভাড়ায় ছোট বাড়ীতে বাস করিতেন এবং অলঙ্কার বিক্রয়লব্ধ অর্থে কোন মতে তিনটি প্রাণীর অশন বসনের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছিল। বিনয় পড়াশুনায় স্কুলের মধ্যে উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিল। পরীক্ষায় বৃত্তি পাইবার বিশেষ সম্ভাবনার কথা শিক্ষক মহাশয়রা প্রায়ই বলাবলি করিতেন, যতীন তাহা জানিত। কিন্তু সে সম্ভাবনা ত আজ বিলুপ্ত!

ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া যতীন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তীক্ষ্ণ অনুমানশক্তির প্রভাবে মাতা ও কন্যার মুখে অনশনের প্রভাব তাহার দৃষ্টি এড়াইল না।

"মাসীমা আমি এখুনি আস্‌ছি" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাড়ীর বাহিরে ছুটিয়া গেল। বিনয়ও তাহার অনুগামী হইল।

অল্পক্ষণ পরে মুটের মাথায় নানাবিধ দ্রব্য চাপাইয়া বন্ধুর সহিত সে ফিরিয়া আসিল। তারপর বিনয়ের মাতার হাতে গোটা দুই টাকা ও কয়েক আনার পয়সা দিয়া বলিল, "লজ্জা করবেন না, মাসীমা। আমি ও বিনয় আলাদা নই।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

চা-পান শেষ করিয়া যতীন দ্রুতচরণে মাতার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। মা তখন ভাঁড়ার বাহির করিয়া ঠাকুরকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন।

ঠাকুর রান্নাঘরে চলিয়া গেলে, যতীন বলিল, "মা, এখন ত আমার ছুটী। কোন কাজ নেই। পরীক্ষার ফল না বেরুনো পর্য্যন্ত আমি নিজের হাতে সব বাজার করে দেব। সরকার মশাইকে দিয়ে কোন কিছু কেনা-কাটা করবার দরকার হবে না।"

মাতা জ্যেষ্ঠপুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন। দেশের কাজ, লেখাপড়া এবং বন্ধুবান্ধব লইয়া যাহার সমস্ত সময় চলিয়া যায়, অকস্মাৎ ঘর-সংসারের কাজের দিকে তাহার এই অনুরাগ যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনই অদ্ভুত বলিয়া তাঁহার মনে হইল।

যতীন একটু চঞ্চল ভাবে বলিয়া উঠিল, "তুমি ভাবছ বুঝি, আমি এসব কাজ পারব না?"

মাতা হাসিয়া বলিলেন, "পারবিনে সে কথা ত ভাবিনি। তবে হঠাৎ তোর এমন সুমতি হ'ল কেন, তাই ভাব্‌ছি।

যতীনও হাসিয়া উঠিল। সে বলিল, "মন কি সব সময়ে এক রকম থাকে? মতের পরিবর্ত্তনও ত হয়।"

মাতা বলিলেন, "হলেই ভাল। আজ ত মাসের প্রথম। সব জিনিষই আন্‌তে হবে। বলাইকে নিয়ে তাহলে বাজারে বেরিয়ে পড়্।"

পুত্রকে সঙ্গে লইয়া মাতা শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বাজারের ফর্দ্দ ও কয়েকখানি নোট যতীনের হাতে দিয়া বলিলেন, "তোর বন্ধু বিনয় জেল থেকে ফিরে এসেছে শুন্‌লাম। তাকে এখানে একদিন নিয়ে এলি না কেন, যতু?"

যতীন নোটগুলি ও ফর্দ্দ পকেটে রাখিতে রাখিতে

বলিল, "ক'দিন ধরে একটা বাসা খুঁজতে সে ব্যস্ত ছিল। মাসে মাসে আট টাকা করে ভাড়া দেবার শক্তি তাদের নেই। আমাদের পাড়ার কাছে একটা বস্তীতে তিন টাকা ভাড়ায় একখানা খোলার ঘরে তারা কাল উঠে এসেছে। তাকে আজ বা কাল নিয়ে আসব।"

জননী পুত্রের মুখের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "ওদের সংসার চলে কি করে, যতু?"

উদ্গতপ্রায় নিঃশ্বাস অতি কষ্টে রোধ করিয়া যতীন বলিল, "চলে না, মা। এতদিন ধরে মাসীমার যে কখানা গয়না ছিল তাই বেচে কোন মতে চলেছে। এখন অচল।"

মা খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিলেন। তারপর বলিলেন, "বিনুর লেখাপড়া আর হবে না বুঝি? দুটো বছর তো নষ্ট হয়ে গেল।"

তিক্ত হাসি হাসিয়া যতীন বলিল, "পেট চলে না, তা লেখাপড়া! আমি ওকে সেই সময় বলেছিলাম, সে তার মায়ের একমাত্র ছেলে, তার পক্ষে এসব আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিত হবে না। আমার দৃষ্টান্ত সে দেখিয়েছিল। তাতে আমি বলেছিলাম, আমি আমার মা-বাবার একমাত্র ছেলে নই। আরও অনেক ভাই আমার আছে। আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হলে কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু মাসীমার ভরসা ঐ বিনয়। তা এমন জেদী ছেলে মা, আমার কথা শুনলে না।"

আর্ত্তকণ্ঠে মা বলিলেন, "ওকি কথা রে, যতু? তোর আরও ভাই আছে বলে, তোর অভাব আমাদের কাছে কিছু নয়!"

তাঁহার নয়ন ছল ছল করিয়া উঠিল।

যতীন কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "ও কথা ভেবে আমি বলিনি, মা। আমি বলেছিলাম—"

বাধা দিয়া মা বলিলেন, "থাক্, ও আলোচনা আমি শুনতে চাইনে। তুই আর দু'খানা নোট রাখ। খানকতক কাপড় আজ কিনে আনবি। বিনুর একটি বোন্ আছে না?. তার বয়স কত হল রে?"

যতীন গম্ভীর স্বরে বলিল, "ঐ আর একটা বিপদ! মালতীর বয়স পনের বোধ হয়। বিনয়ের চেয়ে দু'তিন বছরের ছোট হবে। মেয়ের বিয়ের ভাবনায় মাসীমা অস্থির হয়ে পড়েছেন। পেটে নেই অন্ন, অথচ মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। কি অবস্থা একবার ভাব দেখি, মা।"

মাতা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ঘরে ঘরে এইরূপই দুর্দ্দশা।

তিনি সহসা আত্মস্থ হইয়া বলিলেন, "তুই তাড়াতাড়ি বাজার যা, বাবা। হ্যাঁ, ভাল কথা, তোর বন্ধুর বাড়ীর খোঁজ খবর রোজ রোজ রাখিস্ ত?"

"তা রাখি। রোজই আমি সেখানে যাই। বিনয় যে আমার বুকের অনেকখানি জুড়ে রয়েছে, মা! আমি জোর করে শ্যামবাজারের বাসা ছাড়িয়ে আমাদের পাড়ার কাছে তাদের এনে রেখেছি।"

"বেশ করেছ, বাবা। এখন আর দেরী করিস না, যতু। তাড়াতাড়ি বাজার সেরে বাড়ী ফিরিস্।"

যতীন একবার মাতার প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

মাতা বাতায়নের পথে বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পাঁচটি সন্তানের মধ্যে যতীনই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার প্রাণে মাতৃত্বের মাধুর্য্য রস পরিবেষণ করিয়াছে। তাহার মত গভীর-হৃদয়, মাতৃভক্ত সত্যসন্ধ পুত্রের জননী হইয়া তিনি আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিয়া থাকেন। দেশজননীর আহ্বানে সে এই অল্প বয়সেই যে ভাবে সাড়া দিয়াছিল, তাহা বস্তুতান্ত্রিক জগতের পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের কাম্য না হইতে পারে, কিন্তু বিমলা সন্তানের সে মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চাহেন না। তিনি নিজে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার মধ্যেও তিনি পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে দেশপ্রেমের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পুত্র লেখাপড়া ছাড়িয়া অসহযোগের আহ্বানে কারাবরণ করায় তাঁহার স্বামী সুখী হইতে পারেন নাই, তিনিও কিশোরবয়স্ক পুত্রের জন্য স্বাভাবিক মমতার প্রভাবে উদ্বেগ ও শঙ্কা অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রের কার্য্যে তিনি অসন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। আজ সেই সব কথাই নূতন করিয়া তাঁহার মনে আলোড়ন তুলিল।

স্বামী বিজনলাল প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। দেশীয়

কোন প্রসিদ্ধ জীবনবীমা কোম্পানীর তিনি ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। অর্থে ও যশে তাঁহাদের পরিবারের নাম বাঙ্গালাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পুত্র সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বহুল সংসারে প্রতিপালিত হইয়া দেশের কল্যাণে, দেশ-নেতৃগণের আহ্বানে সাড়া দিতে পারিয়াছে, এজন্য তাঁহার মাতৃহৃদয় গর্ব্ব অনুভব করিত। তবে সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি অতিক্রম করিতে পারে ইহাও তাঁহার কাম্য, তাহা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না।

আজ সন্তানের মনের গতির পরিচয়ে তিনি আরও পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। বন্ধুবাৎসল্য পুত্রকে কতদূর বিচলিত করিয়াছে, তাহা তিনি মনে মনে উপলব্ধি করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

"বিনু, তোকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতেই হবে।"

রুদ্ধশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিনয় বলিল, "মা, বোনের অন্নসংস্থান এক রকম ভিক্ষের উপরেই চল্‌ছে। তুই যদি সাহায্য না কর্‌তিস্‌, না খেতে পেয়েই মারা যেতে হত। এ অবস্থায় পরীক্ষা দেবার সঙ্গতি কোথায় বল্‌ দেখি।"

যতীন দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমাদের বড় বড় নেতাদের সঙ্গে একবার দেখা করা যাক্‌। তাঁরা হয়ত সাহায্য করতে পারেন। সে যাই হোক্‌, তুই প্রাইভেট পরীক্ষা দে। পরীক্ষার ফি আর বইটই সব আমি জোগাড় করে দেব। পাশ তোকে করতেই হবে।"

বিনয়ের ওষ্ঠ প্রান্তে ম্লান হাস্যরেখা দেখা দিল। সে বলিল, "পড়াশুনা কর্‌বার আগ্রহ আমার খুবই আছে। কিন্তু সংসার চলে কি করে—ঘরভাড়া, তিন তিনটি প্রাণীর অন্নবস্ত্রের সংস্থান কি করে হবে, সেই চিন্তায় আমি অস্থির হয়ে পড়েছি।"

যতীন বলিল, "যা হোক্‌ করে চলে ত যাচ্ছে। তারপর চল একবার কংগ্রেস আফিসে যাই। দেখি তাঁরাই বা কি বলেন।"

বিনয় বন্ধুর স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিল, "তুই আর কতদিন এ ভাবে চালাবি বল্‌ত? তা ছাড়া—"

বাধা দিয়া যতীন বলিল, "জানি, জানি, এতে আত্ম-সম্মানে খুবই আঘাত লাগে। সে কি আমি বুঝিনে? কিন্তু, আমাকে তোর সহোদর বলে মনে করতে কোথায় বাধছে বল্‌ দেখি?"

দুই করপল্লবে বন্ধুর করপল্লবযুগল চাপিয়া ধরিয়া বিনয় গাঢ়স্বরে বলিল, "তুই সত্যি মায়ের পেটের ভাইয়ের মত আমায় ভালবাসিস্‌, তা আমি খুব জানি। তোর মা—মাসীমা আমায় অত্যন্ত স্নেহ করেন, তাও আমার অজানা নেই। কিন্তু তবু, ভাই, এটা ভিক্ষাবৃত্তি নয় কি?"

যতীন কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "সত্যকে অস্বীকার করা চলে না। সবই ঠিক। আচ্ছা চল্‌, এখন যাওয়া যাক্‌।"

দুই বন্ধু তখন কংগ্রেস আফিসে গিয়া উপস্থিত হইল।

নেতৃস্থানীয় অনেকেই এই কিশোরযুগলকে চিনিতেন। তাহারা অসহযোগের আহ্বানে মনে প্রাণে সাড়া দিয়া পিকেটিং করিয়া রাজ-আতিথ্য লাভ করিয়াছিল, নানা প্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিল, তাহা তাঁহাদের অবিদিত ছিল না। যাহারা প্রবল প্রাণশক্তি ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়া দেশের কাজে কণ্টকমুকুট ধারণ করিয়াছিল, বিনয় ও যতীন তাহাদিগের কাহারও পশ্চাতে ছিল না, সে কথাও তাঁহাদিগের ভালভাবে জানা ছিল।

যতীন কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কাছে ধীরে ধীরে তাহার বন্ধুর বর্ত্তমান শোচনীয় অসহায় অবস্থার কথা নিবেদন করিল। নিরাশ্রয়া, রিক্তা বিধবা মাতা ও তরুণী সহোদরাকে লইয়া বিনয় কিরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে—সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের কোনও পথ তাহার কাছে মুক্ত নহে, সবই সে উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশ করিল। যদি অর্থ সাহায্য সম্ভবপরও না হয়, তাহাকে কোনও একটি চাকরী যোগাড় করিয়া দিলে, আপাততঃ ঘর ভাড়া ও উদরের অন্ন সংস্থানের উপায় হইতে পারে। নচেৎ অনশনে মৃত্যু অনিবার্য্য।

যাঁহাদিগের নিকট যতীন মুক্তকণ্ঠে বন্ধুর পারিবারিক শোচনীয় দুর্দ্দশার ইতিহাস বিবৃত করিল, সহিষ্ণুভাবে

তাহারা সবই শ্রবণ করিলেন। সহস্র সহস্র বিপন্ন কংগ্রেসকর্ম্মীর অসহায় অবস্থার কথা!—অনাহারের বার্ত্তা শুনিতে শুনিতে তাঁহারা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বহু সহস্র পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিবার মত অর্থ কংগ্রেস ধনভাণ্ডারে থাকিতে পারে না, সে কথাটা তাহারা বিশদভাবে কিশোরযুগলকে বুঝাইয়া দিলেন।

কেহ কেহ এমন কথাও বলিলেন যে, দেশের কল্যাণ-কল্পে আত্মদান করিতে হইলে, এই প্রকার দুর্ব্বিপাক অবশ্যম্ভাবী। অনশন, নির্য্যাতন দেশকর্ম্মীর শিরোভূষণ হইবেই। নির্য্যাতনের পথে, ত্যাগের কার্য্যেই মানবের কাম্যফল আবির্ভূত হয়। সুতরাং দেশকর্ম্মীকে, অনাহার নির্য্যাতন, দুঃখ কষ্ট, অভাবের পেষণ সহ্য করিতেই হইবে।

উপদেশ বাণী বর্ষণের আতিশয্যে বিনয় হাঁপাইয়া উঠিল। যতীনের সুগৌর মুখমণ্ডল আরক্ত আভা ধারণ করিল। সে অন্তরের উত্তেজনার তাপ সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিল, "কিন্তু একটা বিষয় বিবেচনা করে দেখা কি উচিত নয়? অল্পবুদ্ধি বালক যারা, তারা আপনাদের ডাকে সব ছেড়ে ছুড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে যাদের কেউ নেই, কিছু নেই, তাদের ক্ষুধার অন্ন যোগাড় করে দেওয়া কি উচিত নয়? আমার বাবার যথেষ্ট অর্থ আছে। আমিও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আমি ত প্রার্থী নই। বিনয়ের যে কেউ নেই। তার ব্যবস্থা করা কি আপনাদের কর্ত্তব্য নয়?"

একজন গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তা' তোমার বাবাকে বলে' ওর একটা উপায় করে দিতে পার। ও ত তোমার বন্ধু।"

যতীন অতি কষ্টে উদ্যত ক্রোধকে দমন করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, সে পরামর্শ নেবার জন্য এখানে আসিনি। আপনাদের দায়িত্বজ্ঞানের বহরটা একবার যাচাই করে' দেখবার ইচ্ছে ছিল। তা ভাল পরিচয়ই পাওয়া গেল। চল, বিনয়।"

সে বন্ধুর হাত ধরিয়া দ্রুতপদে রাজপথে নামিয়া আসিল।

উত্তেজনার উত্তাপ হ্রাস পাইলে সে বলিল, "একটা পথ আছে, বিনু। দু'জনে মিলে স্বদেশী দেশালাই বিক্রী করব! কিন্তু তোকে প্রাইভেটে পরীক্ষা পাশ করতেই হবে। আমি তখনই তোকে বলেছিলাম, দেশের ডাকে তোর ঝাঁপিয়ে না পড়াই ভাল। যাক্, এখন অনুতাপ নিষ্ফল।"

বিনয় বলিল, "অনুতাপ আমার হচ্ছে না। কর্ত্তব্যের প্রেরণায় যা' করেছি তার জন্য দুঃখ ভোগ করতেই হবে, ভাই। পণ্ডিতরা বলেছেন, কোন কাজ নিষ্ফল হয় না। সত্য চিরদিনই বেঁচে থাকে।"

যতীন দীপ্ত কণ্ঠে বলিল, "সত্যকে আমরা মেনেই চলেছি। ধর্ম্মকে মাথায় রেখেছি। বাঁচতে আমাদের হবেই। দেখি, ভগবান কি করেন!"

"দেশী দেশালাই—নিন্‌না এক প্যাকেট।"

প্রখর রৌদ্রে দুই সুন্দর কিশোরকে দিয়াশলাই বিক্রয় করিতে দেখিয়া পথচারীরা সস্তার দীপশলাকা ক্রয় করিতে আগ্রহের অভাব দেখাইতেছিল না। দেশের মধ্যে নবচেতনার সঞ্চার হইয়াছিল। স্বদেশী দ্রব্যের চাহিদা বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল।

দারুণ গ্রীষ্মে ভদ্রবংশের কিশোরযুগলকে দীপশলাকা ফেরি করিতে দেখিয়া অনেকেরই হৃদয়ে অনুকম্পার সঞ্চার হইতেছিল। রৌদ্রতাপে তাহাদিগের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, স্বেদধারায় সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত।

মাসাধিককাল বিনয় ও যতীন নির্ব্বিকার ভাবে দিয়াশালাই বিক্রয় করিয়া বুঝিয়াছিল, দৈনিক দেড় টাকা হইতে দুই টাকা তাহাদিগের লাভ থাকে। সকাল হইতে বেলা এগারটা, আবার একটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত তাহারা কলিকাতার বড় বড় রাজপথ এবং পল্লীর গৃহস্থ গৃহে অসঙ্কোচে দেশী দিয়াশালাই ফেরি করিয়া বেড়াইত।

যতীন লভ্যাংশের সমস্তই বন্ধুকে অর্পণ করিত। ইহাতে দরিদ্র পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অভাব দূরীভূত হইবার উপায় হইল। উৎসাহভরে যতীন বন্ধুকে সাহস দিল। পরানুগ্রহের লজ্জা বন্ধুকে ম্রিয়মান্ করিতে

পারিবে না। রাত্রিকালে পাঠাভ্যাস করিয়া বিনয় যথা সময়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারিবে।

বিনয় যদিও আপাততঃ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মনে একটা আশঙ্কা ছিল, এইভাবে কতদিন চলিবে? পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর যতীন নিশ্চয়ই কলেজে ভর্ত্তি হইবে, তখন কি সে আর এমন বে-পরোয়াভাবে ফেরির কাজে তাহাকে সাহায্য করিবে? তখন?

কিন্তু যতীন বন্ধুর মনের আশঙ্কা অনুমান করিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিল, এখনও হইতে পারে যে, একটা ছোট স্বদেশী দোকান খুলিয়া সে তাহার বন্ধুকে সাহায্য করিতে পারিবে। তাহার স্নেহময়ী গভীরহৃদয়া জননী, দোকান খুলিবার জন্য অর্থ-সাহায্য করিবেন না এমন হইতে পারে না। অবশ্য যতীনের আশঙ্কা ছিল, তাহার পিতা যদি তাহার দিয়াশালাই ফেরির কথা জানিতে পারেন, তাহা হইলে অনর্থ বাধিতে পারে। কিন্তু এই বিরাট্ জনারণ্যের মধ্যে কলিকাতা সহরের অসংখ্য রাজপথের জনকোলাহলের মধ্যে তিনি তাহার এই কার্য্যের সন্ধান পাইবেন কিরূপে? বিশেষতঃ তাহারা সহরের যে অংশে বাস করিত, তাহার সান্নিধ্য সর্ব্বদা পরিহার করিয়া চলিত। দক্ষিণ কলিকাতাকে এড়াইয়া তাহারা মধ্য ও উত্তর কলিকাতা অঞ্চলকেই তাহাদিগের কর্ম্মক্ষেত্ররূপে নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিল।

সেদিন সকালের দিকে দোকানে দোকানে দীপশলাকা সরবরাহ করিয়া যতীন দেখিল, দৈনিক দুই টাকার উপর তাহাদিগের লাভ দাঁড়াইয়াছে। অত্যন্ত উৎসাহভরে তাহারা অপরাহ্নের ফেরির কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল। তাহারা চেষ্টা করিয়া কারখানার মালিকদিগের অনুমোদনক্রমে এজেণ্টের নিকট হইতে কলিকাতায় বিক্রয় করিবার সব্ এজেন্সী লইয়াছিল। দুই তরুণ বয়স্ক ভদ্র সন্তানকে দেশীয় দ্রব্যের সরবরাহ ও ফেরিকার্য্যে সমুৎসুক দেখিয়া এবং তাহাদিগের সত্যনিষ্ঠা এবং কর্ম্মতৎপরতায় প্রসন্ন হইয়া এজেণ্ট তাহাদিগকে নানা প্রকার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন।

শিয়ালদহের মোড়ে যতীন ট্রেণের যাত্রীদিগের নিকট অনেক ডজন দীপশলাকা বিক্রয় করিয়া বিশেষ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সঙ্গে যত মাল ছিল তাহা ফুরাইয়া আসিয়াছে দেখিয়া সে বিনয়কে নিকটবর্ত্তী দোকানে রক্ষিত মাল হইতে আরও কয়েক ডজন দীপশলাকা আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিল।

উৎসাহের আনন্দে তাহার আরক্ত মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সে সম্মুখবর্ত্তী একজন ভদ্রলোককে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "নিন না, মশাই, দেশী দেশালাই। খুব সস্তা।"

ভদ্রলোক যতীনের হাত হইতে এক ডজন দীপশলাকা লইয়া তাহার মূল্য প্রদান করিলেন। ফিরিয়া যাইবার সময় তিনি কিশোর বিক্রেতার দিকে আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। তারপর নিকটে আসিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "তুমি বিজনের ছেলে না?"

যতীন চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্নকারী ভদ্রলোকের মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। এতক্ষণ সে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিবার সুযোগ পায় নাই।

সত্যই ত, ইনি তাহার পিতৃবন্ধু হরবিলাসবাবু। বহুবার তিনি তাহাদিগের কলিকাতার বাসায় গিয়াছেন।

যতীনের আরক্ত আনন সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল।

হরিবিলাসবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "পথে পথে দেশালাই বেচবার দুর্ভাগ্য তোমার হ'ল কেন, বাপু?"

যতীন নির্ব্বাক্ হইয়া ঘামিতে লাগিল। এমন সময় বিনয় কয়েক ডজন দীপশলাকা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। ভদ্রলোক একবার তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্থানত্যাগ করিলেন।

কথাটা সে বিনয়কে জানাইতে কুণ্ঠিত হইল। বিনয় তাহার বন্ধুর সঙ্কট অবস্থার কথা জানিতে পারিলে কোন মতেই ফেরির কার্য্যে তাহার সাহায্য লইবে না, ইহা সে জানিত। বন্ধুকে তাহার পিতার কাছে তাহাদিগের জন্য অপমানিত লাঞ্ছিত বা অপদস্থ হইতে হইবে, এমন সম্ভাবনা থাকিলে বিনয় কখনই তাহাকে সে কার্য্যে অগ্রসর হইতে দিবে না। তাই সে পিতৃবন্ধুর সহিত সাক্ষাতের ঘটনাটা সম্পূর্ণরূপে চাপিয়া গেল।

কিন্তু কথাটা পিতার কর্ণগোচর হইলে তিনি কি বলিবেন, কি করিবেন সেই দুশ্চিন্তা যতীনের মনকে পীড়িত করিতে লাগিল। তাহার পিতা কর্ম্মোপলক্ষে প্রায় দেড় মাস কাল বাহিরে ছিলেন, আজ তিনদিন ফিরিয়া আসিয়াছেন। হরবিলাসবাবু নিশ্চয়ই এই ঘটনার কথা তাহার পিতাকে জানাইবেন। তখন?

প্রকাশ্যে উৎসাহের অভিনয় করিলেও, যতীন মনে মনে নিদারুণ অসাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিল। সে পথে পথে ফেরি করে, ইহাতে তাহার পিতার সম্ভ্রম হানি অবশ্যম্ভাবী। পিতাকে সে অনেক দুঃখ দিয়াছে; তাঁহার অবাধ্যতাও করিয়াছে, কিন্তু দেশজননীর প্রতি কর্ত্তব্যের প্রেরণায় তাহা করিয়াছিল বলিয়া সে মনকে প্রবোধ দিয়াছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে তাহার কি সঙ্গত কৈফিয়ৎ আছে?

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফেরির কার্য্য বন্ধ করিয়া বন্ধুযুগল তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ফিরিয়া গেল।

৫

"যতু, শুনে যাও।"

যতীন আহারাদির পর বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে পিতার আহ্বান তাহার কাণে গেল। যতীনের বুকের মধ্যে তখন সমুদ্র মন্থন আরম্ভ হইয়াছিল। অবশ্য পিতার আহ্বানে রূঢ়তার সমাবেশ ছিল না, তথাপি গম্ভীর প্রকৃতি পিতাকে সত্যই সে একটু ভয় করিয়া চলিত। তিনি কোনদিনই তাহাকে কটু তিরস্কার করেন নাই, কঠোর ভাষায় তাহার সহিত আলাপ করেন নাই, কিন্তু তথাপি যতীন পিতার নিকট মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতে সাহস করিত না। সে জানিত, তাহার পিতা বংশের সম্মান সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। আভিজাত্য গর্ব্ব তাহার পিতার প্রত্যেক কার্য্যে প্রকাশ পাইত। অথচ তিনি কখনও কাহারও সহিত অশোভন ব্যবহার করেন নাই।

সত্যাগ্রহের ফলে তাহাকে ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল, সেজন্য কারামুক্তির পরে সে পিতার নিকট কখনও তিরস্কৃত হয় নাই, কিন্তু লেখাপড়া ছাড়িয়া এই বয়সে দেশের কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া পিতার মুখে ক্ষোভের লক্ষণ সে লক্ষ্য করিয়াছিল।

মন্থর গতিতে শ্লথ পদে যতীন পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি চশমার ভিতর দিয়া পুত্রের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

দারুণ গ্রীষ্মে যতীন ঘামিয়া উঠিল। বিজলী পাখার বাতাসেও ঘাম শুকাইয়া গেল না।

"ঐখানে ব'স।"

পিতার নির্দ্দেশে যতীন সম্মুখস্থ আসনে বসিয়া পড়িল। কিন্তু মুখ তুলিয়া পিতার দিকে চাহিতে তাহার সাহস হইতেছিল না।

গম্ভীর কণ্ঠে বিজনলাল বলিলেন, "আমার এ বিশ্বাস আছে, আমার ছেলে আর যাই করুক, কখনো কোন অন্যায় কাজ করবে না, বা মিথ্যাকথা বল্‌বে না।"

যতীন সহসা মাথা তুলিয়া পিতার দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মুখমণ্ডল তখন আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

পিতার নয়ন যুগলের উজ্জ্বল দৃষ্টি তাহার উপর নিবদ্ধ হইলেও, সে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল।

পিতার গম্ভীর আননে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নাই। কিন্তু ওষ্ঠপ্রান্তে ও কিসের মৃদু রেখা? ক্রোধ না হাস্য?

মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে যতীন বলিল, "জীবনে কোন অন্যায় কাজ করেছি বলে মনে পড়ে না, বাবা। মিথ্যা কথা আমি ঘৃণা করি।"

"তাইত আমি জানি। কাল শিয়ালদহের মোড়ে দেশালাই বিক্রয় করছিলে কেন? কিসের অভাবে এ কাজ করতে হয়েছে?"

যতীনের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। হরবিলাস-বাবু কথাটা তাহা হইলে তাহার পিতাকে জানাইয়া দিয়াছেন।

মাথা নত করিয়া যতীন বলিল, "আমার নিজের জন্য নয় বাবা।".

"তবে কা'র জন্য ফেরিওয়ালার কাজ করছিলে? এমন কাজে তোমার বাবার, তোমার বংশের সম্ভ্রমহানি হয়, তা জান?"

অপলক দৃষ্টিপাতে পিতার মুখের ভাবভঙ্গী দেখিয়া লইয়া ব্যথিত কণ্ঠে যতীন বলিল, "একটি অসহায় নিরুপায়, দরিদ্র পরিবারের—"

যতীনের কণ্ঠস্বর আবেগে শুদ্ধ হইয়া গেল।

"একটি পরিবারের, তা বুঝলাম। কিন্তু সে পরিবারটি কার, কোথায় তারা থাকে?"

যতীন এবার মুক্তকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, "আমার বন্ধু বিনয়। কাছেই তারা একটা খোলার ঘরে থাকে।"

পিতা পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবেই বলিলেন, "সব কথা খুলে বল।"

তখন যতীন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বিনয়দের অবস্থার সমস্ত কথা বর্ণনা করিতে লাগিল। এক একবার তাহার নয়ন ভাবাবেগে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। অতি কষ্টে সে অশ্রু-বেগ সংবরণ করিল।

অবিচলিত ভাবে প্রৌঢ় বিজনলাল সমস্ত কাহিনী শ্রবণ করিলেন। তারপর মৃদু স্বরে বলিলেন, "বিনয় এখন বাসায় আছে?"

"হ্যাঁ, বাবা।"

"তাকে একবার আমার কাছে নিয়ে এস।"

যতীন পিতার সান্নিধ্য যথাসম্ভব মৃদু গতিতে ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। তারপর দ্রুততর গতিতে বন্ধুর বাসার দিকে ছুটিয়া চলিল।

অল্পকাল মধ্যেই উভয় বন্ধু কুণ্ঠিত চরণে বিজনলালের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনি তখন নিবিষ্ট মনে কি লিখিয়া শেষ করিতেছিলেন।

তাহাদিগকে সম্মুখের আসনে বসিতে বলিয়া বিজনলাল বিনয়ের সুন্দর প্রশান্ত মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

কিয়ৎকাল পরে তিনি বলিলেন, "আমার বিশ্বাস ছিল, আমার ছেলে তার বাবাকে বন্ধুর মতই দেখবে। তা হয় নি। সে শুধু আমাকে কঠোর-হৃদয়, গম্ভীর-প্রকৃতি বাবা বলেই জেনে এসেছে।"

কথাটা তীরের ফলার মত যতীনের হৃদয় বিদ্ধ করিল। সে আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বাবা! বাবা!"

"থাম। তোমার উচিত ছিল, আমাকে পত্র লিখে বিনয়দের সব ব্যাপার জানানো। তা তুমি করনি। তোমার মাকেও সব কথা খুলে বল নি। এটা তোমার অপরাধ নয় কি, যতু?"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে যতীন বলিল, "আমার দোষ হয়েছে, বাবা। ক্ষমা করুন।"

তৃপ্তির হাসি হাসিয়া বিজনলাল বলিলেন, "বাবা ছেলেকে ক্ষমা করে না, কোলে তুলে নেয়। যাক্, বিনয়, আমার আফিসে কাল থেকে তোমার ৪০৲ বেতনের একটা কাজ ঠিক করে দিলাম। আফিসের নিয়মানুসারে বাড়ী ভাড়ার দরুণ আরও ১০৲ টাকা পাবে। তোমার কাজের সময় বেলা ১০টা থেকে ৫টা। এই চিঠিখানা নিয়ে কাল ১০টায় আফিসে যাবে।"

এই অযাচিত অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে বিনয় ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বিজনলাল বলিলেন, "যখন অন্য কোন পথ থাকে না, তখনই পথে পথে ফেরি করা চলে। তার আগে নয়। বিনয়, তোমার বোনের বিয়ের সমস্ত ভার আমার। তোমার মাকে সে কথা জানিয়ে দিও। কিন্তু আজই ও বাসা ছেড়ে চলে এস। এই পাড়ার মোড়ে একটা বাড়ী আছে। সেটা এখুনি দু'জনে গিয়ে দেখে এস।"

বিজনলাল উভয় বন্ধুর পৃষ্ঠে সস্নেহে মৃদু করাঘাত করিলেন।

# বর্ব্বরজাতির ব্যভিচার-ভীতি

শ্রীসন্তোষকুমার দে

আমরা সভ্য জাতি, সভ্য সমাজে বাস করি। আমাদের প্রাচীন সভ্যতা আছে, শিল্প আছে; সত্য, শিব ও সুন্দরের ধারণা করিতে পারি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় আমরা বহু অগ্রসর হইয়াছি: অর্থাৎ এক কথায় সুসভ্য জাতি বলিতে যাহা বুঝায়, আমরা তাহাই। তাই আমাদের ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্মের যে সূক্ষ্ম জ্ঞান থাকিবে, তার আর আশ্চর্য্য কি? কাজেই আমাদের সমাজে ব্যভিচার অতি ঘৃণার বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইবে, ইহা অতি স্বাভাবিক। সভ্য সমাজে ইহা দুষ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেও, ইহা যে একেবারেই ঘটে না, এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না; তবে ইহার উপর যে মানুষের গভীর বিতৃষ্ণা আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাহাই হউক, এই ব্যভিচারকে অসভ্য বা বর্ব্বর সমাজ কি চক্ষে দেখিয়া থাকে, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। বর্ব্বর জাতি বলিতে আমি অর্দ্ধ সভ্য জাতিগুলিকে বলিতেছি না—যে সমস্ত জাতি সভ্যতার সংস্পর্শে আসে নাই, যাহারা কুটীরাদি নির্ম্মাণ করিতে, ভূমি কর্ষণ করিতে, গৃহপালিত জীবজন্তু রাখিতে শিখে নাই, যাহারা বন্য ফলমূল ও আমমাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে, যাহাদের মধ্যে পূজা, যজ্ঞ, দেবতা বা ধর্ম্মের অতি অস্পষ্ট ধারণাও নাই, যাহারা নরখাদক এবং উলঙ্গ বা অর্দ্ধোলঙ্গ হইয়া বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই সমস্ত জাতিকেই বলিতেছি। এই সমস্ত অসভ্য জাতির নৈতিক জীবন, তথাকথিত সভ্য জাতির জীবনাদর্শ অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের হইবে বা তাহাদের যৌন-লিপ্সা কঠোর বিধি-নিষেধের দ্বারা সংযত হইবে, ইহা আমরা সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। কিন্তু নৃতত্ত্ববিৎ ও প্রামাণিক ভ্রমণকারীরা এই সমস্ত উলঙ্গ বর্ব্বর জাতি সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে নিঃসন্দেহভাবে জানা যাইতেছে যে, এই সমস্ত জাতি ব্যভিচারকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখে—এত ঘৃণা মনে হয় সভ্য সমাজও করে না।*

সমস্ত সমাজেই এককালে যৌনিবিচার ছিল না, মানুষ ইতর প্রাণীর ন্যায়ই যৌন-জীবন যাপন করিত; কিন্তু এইভাবে জীবন যাপন করিলে মানুষ প্রকৃত গৃহসুখে বঞ্চিত হয়, স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়, জাতি ধ্বংস পায়; তাই এই অসংযত যৌন-জীবনকে সংযত করিবার জন্যই হয় বিবাহের সৃষ্টি—ইহাই সাধারণের ধারণা। Lubbock বলিয়াছেন—

"Marriage did not exist, or as we may perhaps for convenience call it, a communal marriage, where all the men and women in a small community were regarded as equally married to one another."*

"Tradition is found everywhere pointing to a time when marriage was unknown, and, to some legislator, to whom it owed its institution: among the Egyptians to Menes, the Chinese to Fohi, the Greeks to Cecrops, the Hindus to Svataketu."†

এই মত Bachofen, Herbert Spencer, Margan প্রভৃতি পণ্ডিতেরা মানিয়া লইয়াছেন; কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা যথা, Taylor, Starche, Lowie, Westermarck প্রভৃতি বিবাহের এই ক্রমবিবর্ত্তন মানেন না। অবাধ যৌন-জীবন হইতে বিবাহের উৎপত্তি হইয়াছে, এ কথা ওয়েষ্টারমার্ক কিছুতেই মানিতে চাহেন না। তিনি বলেন,—

"The only result, to which a crucial investigation leads us, is that, in all probablity, there has been no stage of human development, when marriage did not exist."‡

হাওয়ার্ডও এই কথাই বলিতে চাহেন,—

"The researches of several recent writers, notably those of Starche and Westermarck, confirming in part and further developing the earlier conclusions of Darwin and Spencer, have established a probablity that marriage or pairing between one man and one woman, though the union be only transitory and the rule frequently violated, is the typical form of sexual union from the infancy of the human race."§

* "Murder and incest, or offences of like kind against the sacred law of blood, are in primitive society the only crimes which the community as such takes cognizance." —Religion of the Semetics, p. 419.

* Origin of civilisation, 3rd. Ed. Page 91.

† Studies in Ancient History by Mc Lennan.

‡ History of Human Marriage.

§ Howard : History of Matrimonial Institution.

ওয়েষ্টারমার্ক এ বিষয়ে বিশেষ বিচার ও বিবেচনা করার পর বলিয়াছেন—

"We have reason to believe that even in primitive times, it was the habit for a man and a woman (or several women) to live together, to have sexual relations with one another and to rear their offspring in common, the man being the protector and supporter of his family, and the woman being his helpmate and nurse of their children."*

বানর, ওরাংওটাং প্রভৃতি উচ্চশ্রেণী স্তন্যপায়ী প্রাণীর জীবনে অবধি যৌন-ক্রিয়া দেখা যায় না, ইহা হইতেই ওয়েষ্টারমার্ক অনুমান করেন—আদিম মানবও অসংযত যৌন-জীবন যাপন করিত না। এই জন্য তিনি বলিতে চাহেন, বিবাহ হইল একটি অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। তাঁর এই মত সকলে মানেন না বটে; কিন্তু অযথা ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি বা ব্যভিচারের প্রতি ঘৃণা অতি অসভ্য সমাজেও দেখা যায়। শুধু তাই নয়, তাদের সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থাই মনে হয়, স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক পবিত্রতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। J. G. Frazer-র "Totem and Exogamy" নামক পুস্তকে এ বিষয় বহু তথ্য অবগত হওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা ব্যভিচারকে অতি ভয়ের চক্ষে দেখে এবং এই পাপের জন্য তাদের সমাজে শাস্তিও অতি কঠোর। তাহারা বরং আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিবে, তবু এই পাপে লিপ্ত হইতে চাহিবে না। শুধু যে সমাজের শাস্তির ভয়েই তাহারা ইহাকে এত ভয়ের চক্ষে দেখে, তা' নয়; তাহাদের ধারণা—এই সব পাপে লিপ্ত হইলে, দেবতা রুষ্ট হইবেন, শুধু তাহাদেরই নয়, সমস্ত গোষ্ঠী বা জাতির অমঙ্গল হইবে—দেশের অকল্যাণ হইবে।

"অষ্ট্রেলিয়ায় নিষিদ্ধ গণ্ডীর ভিতর নরনারীর মধ্যে যৌন-সংসর্গ হইলে, তাহার নির্দ্দিষ্ট শাস্তি হইল মৃত্যু। ঐ স্ত্রীলোক স্থানীয় নির্দ্দিষ্ট গোষ্ঠীরই হউক কিংবা যুদ্ধে অপর জাতি হইতে অপহৃতই হউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না; নিষিদ্ধ গণ্ডীর কোন পুরুষ তাহার সহিত স্ত্রীর ন্যায় বসবাস করিলেই, স্বজাতিরা তাহাকে এবং ঐ স্ত্রীলোককে হত্যা করিবেই; অবশ্য কখন কখন পলায়ন করিয়া কিছুদিন লুকাইয়া থাকিতে পারিলে, ঐ দোষ ক্ষমা করা হয়, এরূপ যে দেখা যায় না তাহা নহে। নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্‌এ টাটা থি জাতির মধ্যে এই ঘটনা কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে; ঘটিলে, পুরুষকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হয়, আর স্ত্রীলোকটিকে হয় অতিরিক্ত প্রহারে জর্জ্জরিত করা হয় নয়ত বর্শাবিদ্ধ করা হয়, কিংবা উভয়বিধ শাস্তিই দেওয়া হয়, এবং তৎপরে তাহাকে মৃতপ্রায় দেখিলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়; তাহাকে হত্যা না করিবার কারণ দর্শান হইয়া থাকে যে, হয় ত তাহাকে ভয় দেখাইয়া এই কার্য্যে সম্মত করান হইয়াছিল। এমন কি অল্পস্বল্প গুপ্ত প্রণয় ব্যাপারেও এই নিয়ম কঠোরভাবে প্রতিপালিত হইয়া থাকে এবং কোনরূপ বিধিনিষেধ ভঙ্গ করিলে, তাহা অতি ঘৃণার্হ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং তাহারও শাস্তি হইল মৃত্যু।"*

সভ্য অপেক্ষা অসভ্য জাতিদের এই পাপে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা অনেক বেশী, কারণ তাহারা উলঙ্গ বা অর্দ্ধোলঙ্গ থাকে, একই কুটীরে বা স্বল্প পরিসর স্থানে তাহাদের বাস করিতে হয়, কাজেই যাহাতে এই পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়, সেইজন্য তাহাদের পরস্পরের সহিত যাহাতে কথাবার্ত্তা, দেখাশুনা বা মিলামিশা না হয়, সেই জন্য বহু কঠোর বিধিনিষেধের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমস্ত বিধিনিষেধকে এক কথায় এড়াইয়া চলিবার পন্থা বলা যাইতে পারে। ফ্রেজার তাঁর "Totem and Exogamy" নামক অমূল্য পুস্তকে এই সমস্ত বর্ব্বর জাতির পুরুষেরা প্রাপ্তবয়স্কা আত্মীয়স্বজনকে দূরে পরিহার করিয়া কিরূপে এড়াইয়া চলে, তাহার বহু উদাহরণ দিয়াছেন। তাঁর পুস্তক হইতে এই বিষয়টিকে সহজবোধ্য করিবার জন্য কয়েকটি উদাহরণ অতি সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হইল।

লেপাব দ্বীপে বালকেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই মাতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া "ক্লাব হাউসে" গিয়া বাস করে, সেখানেই তাহারা রাত্রিযাপন ও আহারাদি করিয়া থাকে। অবশ্য তাহারা স্বগৃহে আসিয়া খাদ্যাদি চাহিতে পারে, কিন্তু সে সময়ে যদি ভগিনী গৃহে থাকে, তাহা হইলে না খাইয়াই চলিয়া যাইতে হইবে—আর ভগিনী যদি গৃহে না থাকে, তাহা হইলে দুয়ারের বাহিরে বসিয়া আহার করিয়া চলিয়া যাইতে পারে। ভ্রাতা-ভগিনীতে যদি

* History of Human Marriage, Vol. I, p. 17-28.

* Frazer—Totem and Exogamy. P. 55.

কখনও দৈবক্রমে সাক্ষাৎ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে পলায়ন করিবে বা কোথাও লুকাইয়া পড়িবে। ভ্রাতা যদি বালুর উপর ভগিনীর পদচিহ্ন দেখিয়া চিনিতে পারে, তাহা হইলে আর সে দিকে অগ্রসর হইবে না। ভ্রাতা ভগিনীর নামোল্লেখ করিবে না এবং তাহার নাম-সংক্রান্ত সমস্ত কথাই পরিহার করিয়া চলিবে। ইহা ছাড়া মাতাপুত্রেও সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। মাতা বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রকে আদরের নাম ধরিয়া ডাকিতে পারিবে না, পুত্রের জন্য খাদ্যসামগ্রী আনিলে, সাক্ষাতে ঐ সামগ্রী দিতে পারিবেন না, দুয়ারের বাহিরে রাখিয়াই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইবে।

নিউ ব্রিটেনের গেজেল উপদ্বীপে ভগিনী বিবাহিত হইলেই, আর ভ্রাতার সহিত কথোপকথন করিতে পারে না।

আফ্রিকার অন্তর্গত ডেলা-গোয়া-বের বেরঙ্গ জাতির মধ্যে শ্যালক-পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ বা কথোপকথন নিষিদ্ধ।

ব্রিটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকায় আকাম্বা জাতির মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে প্রাপ্তযৌবনা পুত্রী ও পিতার মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ নিষিদ্ধ, কিন্তু বিবাহের পরে এই বাধা আর থাকে না।

সুমাত্রায় বাত্তা জাতীয় ভাই ভগিনীকে কোন ভোজ বা পর্ব্বে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারে না; পরিবারস্থ অন্যান্য লোকের সমক্ষেও ভ্রাতা ভগিনীর সম্মুখে বড়ই অস্বস্তি বোধ করিয়া থাকে। পিতা কন্যার সহিত বা মাতা পুত্রের সহিত একলা এক গৃহে থাকিতে পারে না।

নব-ম্যাক্‌লেনবর্গে খুড়তুত, মাসতুত, জ্যেঠতুত, মামাত ভাইভগিনী পরস্পরের করমর্দ্দন করিতে বা কোন প্রকার উপহার দান করিতে পারে না; অবশ্য প্রয়োজন হইলে, দূর হইতে কথোপকথন চলিতে পারে।

ভানা-লাভার সাগরতীরে শ্বশ্রূর পদচিহ্ন জোয়ারের জলে ধুইয়া পুঁছিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত জামাতা শ্বশ্রূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে পারে না; কিন্তু দূর হইতে পরস্পর কথা-বার্ত্তা করিবার অধিকার তাহাদের আছে।

জুলু কাফিরদের মধ্যেও দেখাসাক্ষাৎ বিষয়ে অনেক বাধানিষেধ আছে। শাশুড়ী কুটীরে থাকিলে, জামাতা সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না; যদি তাহাদের কখনও দেখা হইয়া যায়, তাহা হইলে শাশুড়ী বন-ঝোঁপের মধ্যে লুকাইয়া যান আর জামাতা ঢালের আড়ালে নিজেকে গোপন করেন। তাহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তার প্রয়োজন হইলে, তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্যে কিংবা বহুদূর হইতে চীৎকার করিয়াও ঐ কাজ করা চলিতে পারে। তাহারা পরস্পরের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করিতে পারে না।

বাসোগা নামে আর একটি জাতির মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত আছে। শাশুড়ী ও জামাতা বিভিন্ন ঘর হইতে দৃষ্টিপথের সম্মুখীন না হইয়া কথোপকথন করিতে পারে। এই জাতির ব্যভিচার-ভীতি এত প্রবল যে, তাহারা গৃহ-পালিত জীবজন্তুর মধ্যেও ইহা সহ্য করিতে পারে না।

ভারতবর্ষেও খাসিয়া, যুয়াং, ওঁরাও, হো প্রভৃতি অসভ্য জাতির মধ্যেও ব্যভিচার অতি দূষণীয় বলিয়া পরিগণিত।

ফ্রেজারের উক্ত পুস্তক হইতে আরও অন্যান্য জাতির এইরূপ কঠোর বিধি-নিষেধের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে, বাহুল্যভয়ে করা হইল না। এই স্থলে যতগুলি জাতির রীতিনীতি বিধি-নিষেধের কথা বলা হইল, এগুলি সবই ব্যভিচারের হস্ত হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্যই হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া বলিবার দরকার হয় না। এই সব জাতি ব্যভিচারকে অতি দূষণীয় বলিয়া মনে করে, তাই তাহাদের সমাজে এ বিষয়ে নিয়মকানুনের এত কড়াকড়ি। কিন্তু এই ভয় আসিল কোথা হইতে? ইহার মূল কোথায়? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দান করা অতি কঠিন ব্যাপার।

কেহ কেহ বলেন, এই ব্যভিচার-ভীতির মূল হইল ব্যভিচারের উপর মানুষের "সহজাত বিতৃষ্ণা।" ওয়েষ্টার-মার্কের কথাই ধরা যাক্। তিনি বলেন,—"যাহারা বাল্যাবধি এক সঙ্গে বাস করে, তাহাদের মধ্যে যৌন-সংসর্গের উপর এক সহজাত বিতৃষ্ণা দেখা যায় এবং সাধারণতঃ ইহারা যে সগোত্র হইয়া থাকে, এই বোধ অতি নিকট আত্মীয়দের মধ্যে যৌন-মিলনের প্রতি ঘৃণার মধ্য দিয়া নীতি ও আইনকানুনে রূপায়িত হইয়াছে।"* ব্যভিচারের উপর মানুষের গভীর ঘৃণা আছে, সে বিষয়ে

* Origin and Development of Moral Conception, Vol. II: Marriage (1909).

সন্দেহ নাই, কিন্তু এই ঘৃণা যে সহজাত (innate), তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। মনঃসমীক্ষকেরা ত এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করেন না, তাঁরা বলেন, বরং এই বিতৃষ্ণা হওয়াটাই অস্বাভাবিক। ফ্রেজারও একথা মানেন না। তিনি বলেন, "ব্যভিচার আইনতঃ নিষিদ্ধ, ইহা হইতেই ব্যভিচারের উপর মানুষের সহজাত বিতৃষ্ণা আছে, এইরূপ অনুমান না করিয়া বরং ব্যভিচারের উপর মানুষের স্বাভাবিক অনুরাগ আছে, ইহাই মানিয়া লওয়া উচিত এবং দেশের আইনকানুন যদি দূষণীয় মনে করিয়া ইহাকে দমন করিতে চাহে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির ফলে সমাজের সমূহ ক্ষতি হইবে, ইহাই বুঝিতে পারিয়া এইরূপ আইনের সৃষ্টি হইয়াছে।"

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সমাজে ব্যভিচার প্রচলিত হইলে, সমস্ত জাতি ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইবে, অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও সুপ্রজননের দিক দিয়া "in-and-in-breeding" সমর্থন করা চলে না, এইরূপ ধারণা হওয়ায় বর্ব্বর সমাজে ব্যভিচারের প্রতি এত ভয়। এ যুক্তি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নহে। জীবন-বিজ্ঞান (Biology) বা সুপ্রজনন বিদ্যায় (Engenies) এই সমস্ত গভীর তত্ত্ব অজ্ঞ ও বর্ব্বর জাতির পক্ষে জানা একেবারেই অসম্ভব; বিশেষ করিয়া যে সমস্ত জাতি সভ্যতার অতি নিম্নস্তরে রহিয়াছে—যাহারা ভূমিকর্ষণ, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি প্রাত্যহিক জীবনের অতি সাধারণ বিষয়গুলিও এখনও পর্য্যন্ত শিখিয়া লইতে পারে নাই, তাহারা বিজ্ঞানের এই সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি বুঝিতে পারিয়াই ব্যভিচারকে এত ভয়ের চক্ষে দেখিল, একথা বলিলে শুধু হাস্যেরই উদ্রেক করিবে। তাহা ছাড়াও in-and-in breeding এ জাতির প্রাণশক্তি যে ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসে, এ সত্য সভ্য মানবই গৃহপালিত জীবজন্তুর উপর পরীক্ষা করিয়া খুব বেশীদিন জানিতে পারে নাই।

কেহ কেহ ডারউইন সমাজ-পত্তনের প্রারম্ভে যে father hordeর কল্পনা করিয়াছেন, তাহাকেই ব্যভিচার-ভীতির মূল বলিতে চাহেন। ডারউইন বানর প্রভৃতি জীবের জীবন-যাত্রা-প্রণালী লক্ষ্য করিয়া কল্পনা করিয়াছেন, আদিম যুগে মানুষ একাধিক স্ত্রী লইয়া বাস করিত, এই সমস্ত স্ত্রীর উপর তাহার অনপত্য অধিকার ছিল। তারপর এই সমস্ত স্ত্রীর গর্ভে সন্তান হইল। এই সমস্ত সন্তানেরা যখন বড় হইল, তখন প্রভুত্বের জন্য বা এই সমস্ত স্ত্রীলোকদের অধিকার করিবার জন্য পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া, তাহাকে হত্যা করিল। সন্তানদের মধ্যে যে বা যাহারা শক্তিশালী, তাহারাই সমস্ত স্ত্রীলোকগুলিকে অধিকার করিয়া লইল এবং পরে অন্যান্য ভ্রাতাদেরও হত্যা করিল বা তাড়াইয়া দিল। এই বিতাড়িত ভ্রাতারা আবার দলবদ্ধ হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিল। হয়ত কয়েক শত বৎসর ধরিয়া এই ভাবে সংগ্রাম চলিল। তারপর তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিতে পারিল, যৌন-প্রয়োজনে মানুষ পরস্পর মিলিত হইতে পারে না; জানিতে পারিল, যে প্রভুত্বের লালসায় পিতাকে হত্যা করিয়াছে, সেই প্রভুত্ব তাহারা কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না এবং জাতি গৃহবিবাদের ফলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে (অবশ্য ইহা বুঝিতে তাহাদের কয়েক পুরুষ কাটিয়া গিয়াছিল), যদি না তাহারা স্বেচ্ছায় এক জনকে পিতার প্রভুত্ব প্রদান করে এবং পিতার সমস্ত স্ত্রীর সহিত যৌন সম্বন্ধ-স্থাপনকে গুরুতর পাপ বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। এই ভাবে সেই নবীন সমাজ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইল এবং এইরূপ যৌন-সংসর্গ ব্যভিচার বলিয়া পরিগণিত হইল। আর এই ব্যভিচারের হস্ত হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কঠোর বিধি-নিষেধ প্রস্তুত হইল। সেই অস্পষ্ট অতীতের অখ্যাত যুগের এই করুণ ইতিহাস জাতির মর্ম্মস্থলে এক অসহ্য বেদনা ও ভয়ের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাই তাহারা সমস্ত দুঃখের মূল অযথা ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিকে, ব্যভিচারকে এত ভয়ের চক্ষে দেখে।

এই মত অনেকটা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সমাজের এই অবস্থা ত শুধু কল্পনা করিয়াই লওয়া হইয়াছে—সমাজ যে এইরূপই ছিল, তাহার ত কোন প্রমাণ নাই।

L. Fishon-এর মতে ব্যক্তিগত বিবাহের বহু পূর্ব্বে সমাজে দলগত বিবাহ (Group-marriage) প্রচলিত

ছিল ; অর্থাৎ এক দল পুরুষ দলগত ভাবে আর এক দল স্ত্রীলোককে বিবাহ করিত, কাজেই ইহাদের পুত্রকন্যারা সকলেই এক পিতার ঔরসজাত না হইলেও, পরস্পর ভ্রাতাভগিনী এবং এই দলের সকল পুরুষই তাহাদের পিতা ; কাজেই পুত্রকন্যারা একই পিতার না হইলেও, (অবশ্য জানিবারও উপায় ছিল না) তাহাদের মধ্যে যৌন-সম্বন্ধ নিষিদ্ধ হইল এবং এই নিষেধ হইতেই ব্যভিচার-ভীতির সৃষ্টি।

ফ্রয়েড ব্যভিচারের উপর মানুষের যে সহজাত বিতৃষ্ণা আছে, ইহা কিছুতেই স্বীকার করেন না ; বরং তিনি ইহার বিপরীতই বলিতে চাহেন। তিনি বলেন, শিশুর প্রথম যৌন-লিপ্সাই হইল ব্যভিচারমূলক (incestious nature)। তাহাদের প্রথম কামনা জাগিয়া উঠে নিষিদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে—মাতা, ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনকে লইয়া যে ক্ষুদ্র জগতে বাস করে, তাহারই মধ্যে তার কামনা সীমাবদ্ধ। পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর এই ভাব পরিবর্ত্তিত হয় (sublimated) ; যেখানে হয় না, প্রবল অব-দমনের ফলে শিশু সেখানে নানাবিধ মানসিক ও স্নায়ুসংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। এই মত প্রমাণ করিবার জন্য তিনি ঈডিপাস এষণা ও ইলেক্‌ট্রা-এষণার অবতারণা করিয়াছেন। তাই ফ্রয়েডের মত—অসভ্য জাতিদের মধ্যে যেখানে ভ্রাতা-ভগিনী, পিতা-পুত্রীর সহিত দেখাসাক্ষাৎ নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেখানে এই ব্যভিচারের ভয়েই এইরূপ বিধিনিষেধের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই সমস্ত বিধিনিষেধের মূলে রহিয়াছে ঈডিপাস্-এষণা ও ইলেক্‌ট্রা-এষণা। জামাতা-শ্বশ্রূর মধ্যে বিধিনিষেধের মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ফ্রয়েড বলেন, যে সমাজে বিবাহ ব্যতীত যৌন-পরিতৃপ্তির আর কোন উপায় নাই, সেই সব সমাজে এই পরিতৃপ্তির পথ সহসা রুদ্ধ হইয়া যাইলে, স্ত্রীলোকের মনে ভয়ানক অশান্তির সঞ্চার হয়। এই অশান্তি অনেকটা দূর হয় পুত্র-কন্যার সুখ সম্ভোগ দেখিয়া—তাহাদের জীবনে তিনি যেন নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পান। কন্যার সুখে নিজের সুখ ভাবিতে ভাবিতে তিনি কন্যার সহিত যেন একাত্ম হইয়া পড়েন এবং পরিশেষে কন্যা যে পুরুষকে ভালবাসে, তিনিও তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলেন ; এই জন্যই শ্বশ্রূ-জামাতার বিষয় এই সমস্ত বিধি-নিষেধ। ফ্রয়েড তাঁর মতামত আরও সুস্পষ্টভাবে নিম্নলিখিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন :—

"The path of object-selection has normally led him (son-in-law) to his love-object through the image of his mother and perhaps of his sister ; in consequence of the incest barriers his preference for these two beloved persons of his childhood has been deflected and he is then able to find their image in strange objects. He now sees the mother-in-law taking the place of his own mother and of h's sister's mother, and there develops a tendency to return to the primitive selection, against which everything in him resists. His incest dread demands that he should not be reminded of the geneology of his love-selection ; the actuality of his mother-in-law, whom he has not known all his life like his mother so that her picture can be preserved unchanged in his unconscious facilitates this rejection. An added mixture of irritability and animosity in his feelings leads us to suspect that the mother-in-law actually represents an incest temptation for the son-in-law, just as it not infrequently happens that a man falls in love with his subsequent mother-in-law before his inclination is tiansferred to her daughter.'

ফ্রয়েড এবং তৎশিষ্যদের মনঃসমীক্ষামূলক এই সব অভিমত সকলে মানিয়া লইবেন কিনা জানি না, তবে এই মত গতানুগতিকের ধারা ত্যাগ করিয়া এক নূতন উপায়ে অস্পষ্ট অতীতের, সুদূর যুগান্তের তমিস্রারজনীতে উষার আলোকসঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছে এবং অনেকটা সফলও যে হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ফ্রয়েড যে একটা নূতন কিছু করিবার প্রলোভনে এই অভিনব মতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নহে ; তিনি ভিয়েনার একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক, বহু বর্ষের গবেষণার ফলে Psycho-analysis প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং আজ য়ুরোপ-আমেরিকায় পণ্ডিতেরা ধীরে ধীরে তাঁর অভিমত স্বীকার করিয়া লইতেছেন।

ব্যভিচার-ভীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতগুলির আলোচনা করা হইল ; কিন্তু কোন মতটি যে ঠিক, তাহা জোর করিয়া বলা কঠিন। ব্যভিচারের উপর মানবসমাজের এক বিষম বিতৃষ্ণা আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং এই

বিতৃষ্ণা অসভ্য অপেক্ষা সভ্য সমাজে যে অনেক কম তাহার প্রমাণ, ব্যভিচার বিষয়ে সভ্য সমাজে কোন বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা নাই। সভ্য করিন্থীয়ান খৃষ্টান সমাজে ব্যভিচার যে অবাধে প্রচলিত ছিল, তাহা St. Paulর First Epistle to the Corinthians পাঠে জানা যায়। এই করিন্থীয়ান খৃষ্টানেরা বিমাতার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত থাকিতেন, তাহা এই Epistle পাঠে জানা যায়।* কেন যে অসভ্য সমাজ ব্যভিচারকে সভ্য সমাজ অপেক্ষা এত ভীতির চক্ষে দেখে, তাহা জানিবার উপায় নাই। সভ্য জাতিরা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চার ফলে জানিতে পারিয়াছে, ব্যভিচারে জাতির এমন কিছু মারাত্মক রকম ক্ষতি হয় না, বা পাপপুণ্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিতে পারিয়াছে বলিয়াই কি তাহাদের বিতৃষ্ণার ভাব কমিয়া আসিয়াছে; আর অসভ্য জাতিরা জ্ঞানবিজ্ঞানে অগ্রসর হইতে পারে নাই বলিয়াই কি ব্যভিচার সম্বন্ধে তাহাদের এই অমূলক ভীতি? ইহাও ভাবিবার বিষয়। যত কারণই দেখান হউক না কেন, সঠিক উত্তর বোধ হয় কেহই দিতে পারেন নাই, তাই ফ্রেজারের বাক্যে উপসংহার করি—"এই ভাবে বহির্বিবাহ ও তাহার সহিত ব্যভিচার-নীতির উৎপত্তি — যেহেতু ব্যভিচারনিবারণের জন্যই বহির্বিবাহের পরিকল্পনা নিত্যকালের গভীর সমস্যাই থাকিয়া গেল।*

* I. Cor. V. I.

* Frazer—Totem and Exogamy, I, P. 165.

# শ্রাবণ-শর্ব্বরী

শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়

মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙ্গে অশ্রান্ত বর্ষণ-কলরোলে,
গুবাক তরুর শীর্ষ বায়ুবেগে ঘন ঘন দোলে,
শূন্যে তার নাহি যে আশ্রয়,—জনহীন রাজপথে
শ্রাবণের স্ফীতধারা ধায় ছুটে উচ্ছ্বসিত স্রোতে।
অন্ধকার গাঢ়তম, তড়িৎ শিখার সঞ্চরণ
দুর্ব্বল বক্ষের মাঝে জাগায় সত্রাস শিহরণ।
তবু মোর ভাল লাগে এই বর্ষা, তার রুদ্ররূপ,
বারে বারে অলক্ষিতে খুলে যায় অন্তর-স্বরূপ
চিনি মোরে নবরূপে, কচি আমি যুগ যুগ ধরি,—
অবিরাম বারিধারে মুখরিত শ্রাবণ-শর্ব্বরী।

মিলনের বিরহের শত সুখ-দুঃখ দিয়ে ঢাকা,
মোর কল্পনার রঙে তারি ছবি নিত্য হয় আঁকা।
কি এক বেদনা জাগে—অব্যক্ত সে তবু সুমধুর,
চিরন্তন বিরহের স্বপ্নাবেশে সে ব্যথা বিধুর।
বর্ষা মোর ভাল লাগে, সুদূর মানস-তীর্থ-পারে
অন্তর-বিহঙ্গ মোর চাহে তার ডানা মেলিবারে।
মুখর করেছে বর্ষা নিস্তব্ধ রাত্রির ক্ষণগুলি,
মৃদু মধু সুর-ছন্দ রচে মোর শিথিল অঙ্গুলি
সেতারের ক্ষীণতারে, মল্লারের গুঞ্জন প্রলাপে
বর্ষণ-মুখর রাত্রি উন্মনা অন্তর মোর যাপে।

স্মৃতির সুরভি-রসে আনন্দের পাত্র উঠে ভরি',
হরষে রভসে মোর কেটে যায় শ্রাবণ-শর্ব্বরী।

# বাণী-পাহাড়ে প্রাগৈতিহাসিক চিত্র

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মল্লিক

বৈবর্ত্তনিক নিয়মানুসারে জীব-জগতের জৈবিক পরিবর্ত্তনের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। সেইরূপ চেতনার বিকাশও যে ধারাবাহিক ভাবে হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখানে চেতনা বলতে এই অর্থ করা গিয়েছে, পৃথিবীতে উন্নত জীব সৃষ্টি যেখানে এসে, থেমে গেল, সেই প্রথম বা আদিম মানবচিত্তের যে বিবর্ত্তন ঘটেছিল, তাহা ক্রমিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে—অনুভূতির সকল অঙ্গ বিকাশ হবার পথ পেয়েছিল। এক সময়ে সেই সকল অভিজ্ঞতা, চিত্তোৎকর্ষতা, সর্ব্বদেশের প্রথম স্তরের মানবগোষ্ঠীর মানসিক ঐক্যের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছিল, দেখা যায়। অর্থাৎ আমরা যদি আদিম মানবচিত্তের উৎকর্ষতার ধারা অনুসরণ করে বিচার করি, তা'হলে দেখ্‌তে পাব—৪০,০০০ এবং ২৫,০০০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চতুর্থ তুষার-যুগের পর, পৃথিবীতে যে মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল, তার নিদর্শন পাই গৃহস্থালীর আসবাব-পত্রে, গুহা-চিত্রে, অস্ত্রশস্ত্রে যেখানে তারা রেখে গেছে জীবনের বিচিত্র অনুভূতি—অভিজ্ঞতার কাহিনী। যদিও মানবগোষ্ঠী সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে সমগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হয় নি, তা' হলেও পৃথিবীর দুই প্রধান কেন্দ্রে যে দুই গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছিল, তাদের বাহ্যিক অনৈক্য দেখা গেলেও, মূলতঃ দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্য ছিল। গ্রীষ্মমণ্ডলের এবং শীতোষ্ণ-মণ্ডলের দুই গোষ্ঠীর চিত্তবিকাশের প্রথমাবস্থায় মিলন থাকা সম্ভব হলেও, প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে অভিজ্ঞতার তফাৎ ঘটেছিল। পরবর্ত্তী যুগে এই তফাৎ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল এবং সমগ্র গ্রীষ্মমণ্ডলের মানবগোষ্ঠীর আত্মচেতনার তফাৎ দেখা গেলেও, কান্তিরসের (aesthetic sentiment) তফাৎ ঘটে নি। এই কমনীয় রসের মিলন দেখা যায় বিভিন্ন দেশের গুহা-চিত্র এবং শিল্পের মাঝে। বাণী পাহাড়ের চিত্রের সাথে অন্যান্য গুহা-চিত্রের রৈখিক ছন্দের মিলন—তাহার মধ্যে অন্যতম।

বাণী-পাহাড় ছত্রিশগড় জায়গীরভোগী রাজ্যবিভাগের—উদয়পুরের মধ্যে। বি, এন, রেলওয়ের খারসিয়া ষ্টেশন থেকে ৩৯ মাইল উত্তরে প্রধান নগর ধরমজয় গড়ের ৩।৪ মাইল পূর্ব্বে। উদয়পুর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ছোট নাগপুর (বাঙ্গলা) বিভাগের অন্তর্গত ছিল; বর্ত্তমানের মধ্য প্রদেশের মধ্যে। এক সময়ে উদয়পুর সরগুজার অংশ ছিল, পরে রাজবংশীয় খোরপোষদারী পেয়ে পৃথক্ হয়ে যায়। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে উক্ত খোর-পোসদার বিদ্রোহাচরণের ফলে একটী সম্পূর্ণ পৃথক্ জায়গীরদাররূপে গণ্য করা হয় এবং খোরপোসদারকে বিতাড়িত করে দেয়। রাজবংশের ইতিহাস বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। কথিত আছে, কুণ্ডেয়ী ও পালামৌ জেলার দিক হতে, অনুমান ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে রাখসেল রাজপুতবংশীয় কোন প্রধান এসে সমগ্র সরগুজাস্‌পুর (উদয়পুর প্রভৃতি) করতলগত করে।*

রাজবংশ বাদ দিলে সমগ্র প্রদেশের আদিবাসী: অসভ্য দ্রাবিড়গোষ্ঠীয়, গণ্ড, করোয়া, কোড় (কোড়কুস্‌) ঘাসি, ওরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি। এবং অন্য দেশ হ'তে এসে বসবাস করছে উড়িয়া, মুর্জাপুরী, ব্রাহ্মণ ও আহির।

বাণী-পাহাড় নামকরণ সম্বন্ধে কোন কাহিনী অথবা কেন পাহাড়ের এ নামকরণ হয়েছে, সে বিষয় কিছু জানা যায় না। মধ্য প্রদেশে এইরূপ সংস্কৃতবহুল স্থানের নাম প্রচুর পাওয়া যায়, যার অর্থ স্থানীয় অধিবাসীরাও জানে না। পাহাড় উচ্চতায় ২০০০ ফুট। নিকটস্থ গ্রাম ওঙনা হ'তে ১ মাইল পশ্চিমে ঘন জঙ্গলের মধ্যে। ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত এখানকার চিত্র সম্বন্ধে কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ সময়কার মানচিত্রে "বাণীপাথর হিল" নামের উল্লেখ আছে। অনুমান হয় সরকারী রিপোর্টে পাহাড়ের চিত্র সম্বন্ধে উল্লেখ না থাকলেও, স্থানীয় অধিবাসীদের অজানা ছিল না। চিত্রিত গুহা ছাড়া পাশাপাশি আরও অনেকগুলি গুহা একই উচ্চে আছে। চিত্রিত গুহা অনুমান ৫০।৬০ ফুট উচ্চে গুহার দক্ষিণ দিকে, তিন ফুট

* C. P. Gazoetter. (Chattisgarh F. State 1909)

উচ্চ এবং ২০।২২ ফুট গভীর একটি সুরঙ্গ আছে। সুরঙ্গের বামে একটী ছোট ২।২॥০ ফুট ব্যাস গর্ত্ত—বাতাস ও আলো যাতায়াত করে। এই গর্ত্ত স্বাভাবিক কিনা অনুমান করা শক্ত। কোন এক সময়ে এই সুরঙ্গ রাত্রে বাসের জন্য ব্যবহার হ'ত অনুমান হয়। উক্ত সুরঙ্গের একটি ডমরু আকৃতি পাথর আছে—স্থানীয় লোকের বিশ্বাস ঐ পাথর দেবতার বাদ্যযন্ত্র ছিল। চিত্রিত গুহার স্থানীয় নাম লিখ-মাড়া। লিখ—লিখিত কিছু; মাড়া—গুহা। আমি যখন গুহার চিত্র নকল করিতে যাই, সেই সময় ভূতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত টি. দাশগুপ্ত মহাশয় ভূতত্ত্বানুসন্ধানে এখানে আসেন। তাঁর মতে গুহার পাথর নিম্ন গণ্ডোয়ানা (Felspathic sandstone of Lower Gondowana age probably—Barakar Raniganj Stage) যুগের। মধ্য প্রদেশকে এক সময়ে, পৃথিবীর জীবাবির্ভাবের পূর্ব্বে, যে ভূমি এক অংশ যুক্ত ছিল কটিবন্ধের মত, সেই গণ্ডোয়ানা ভূমির অংশ ছিল। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, এই সংযুক্ত ভূমি ছিল আফ্রিকা, মধ্যভারত, মালয়-দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে Dr. Mailty জব্বলপুরের কাছ হ'তে উক্ত যুগীয় রাক্ষুসে গিরগিটি ডাইনোসরের কঙ্কাল আবিষ্কার করেন। কঙ্কাল ৪ ফুট মাটীর তলা হতে আবিষ্কৃত হয়। এক সময়ে দুই প্রান্তিক প্রদেশের আদিবাসীদের সহিত ঘনিষ্টতা ছিল, তার প্রমাণ—এই প্রদেশের আদিবাসী করোয়া, গণ্ড, ঘাসী প্রভৃতির মুখাবয়বে পাওয়া যায়। চ্যাপ্‌টা-নীচু নাসামূল, বাদামী-চক্ষু এবং মুখ গঠন (Supila-orbital ridges, sunken nasal root and projection of face) অষ্ট্রেলিয়েডদের অনুরূপ। এছাড়া সিঙ্গানপুর ও হাসঙ্গাবাদ প্রাগৈতিহাসিক গুহা-চিত্রে জিরাফ এবং কাঙারুর চিত্রে আমাদের যুক্তির স্বপক্ষে। উক্ত দুই জীবের অস্তিত্ব ভারতে ছিল কিনা জানা যায় না, কিন্তু এই দুই জীবের অস্তিত্ব যে দেশে এখনও পাওয়া যায়, সেই দেশের মানবগোষ্ঠীর আগমন সম্ভাবনা আমরা অনুমান করতে পারি। বস্তুতঃ মধ্য প্রদেশের আদিবাসীর সহিত নিগ্রোয়েড এবং অষ্ট্রেলিয়েড গোষ্ঠীর সাদৃশ্য এক-সময়ে ভারতের আদিম সমাজের ঘনিষ্ঠতার আভাস দেয়।

সমগ্র প্রদেশে কোরোয়াদেরই বেশী অনুন্নত বলা যেতে পারে। বস্তারে যেমন মার ও অবুঝ মার, নিজেদের মধ্যে এখনও যেমন আদিম সংস্কারের গণ্ডী টেনে রেখেছে; সেই রূপ কোরোয়া কোড়কুস নিজেদের মাঝে গণ্ডী করে রেখেছে। যদিও মার ও অবুঝ মারের মত এখন আর অত বন্য স্বভাব নেই। শ্রীযুক্ত Colden Ramesay সাহেব কোরোয়াদের সম্বন্ধে লিখেছেন:

কোরোয়ারা নিজেদের যাসপুরের কোরোয়া এলাকার আদিবাসী বলে' দাবী করে। তারা কয়েক গোষ্ঠী সরগুজার মহারাজের কাছ থেকে হুকুম নামা নিয়ে বসবাস করছে। যাসপুরে যেমন ডিহারিয়া ও পাহাড়িয়া দুই গোষ্ঠী আছে, সরগুজাতে তেমনি কোরোয়া এবং কোড়কুস। কোড়কুস্ নিজেদের সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণী বলে' দাবী করলেও, সামাজিক ব্যবহার ছাড়া অন্য কোন তফাৎ দেখা যায় না। কোরকুস কোড়োয়াদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প বন্য এবং সভ্য। সমগ্র সরগুজায় এই গোষ্ঠীর বসবাস বেশী। কোরোয়া গোষ্ঠীর অল্প দল নির্জ্জন পাহাড়ের মাথায় বেওরা (আবাদ করবার জন্য খানিকটা বনভূমি আগুন লাগিয়ে পরিষ্কার করা ঝুমের মত) কেটে চাষ আবাদ করে—তা' হলেও এই গোষ্ঠীর প্রধান খাদ্য স্কন্দমূল এবং বন্য ফল। যাস্‌পুরের কোরোয়া এলাকার চেয়ে সরগুজার কোরোয়ারা লোকালয়ে যাতায়াত করে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের উৎসব প্রভৃতিতে যোগদান করে। এই দুই শ্রেণীর প্রধান প্রভেদ ধর্ম্মমত, কোরোয়াদের উপাস্য সাতবাহিনী ও বড়কাদেও এবং কোড়কুসদের মলধনি ও মহাদেও। পাহাড়ী কোরোয়া চার গোত্রে বিভক্ত: (১) হেন্দ্র, (২) সামাটী, (৩) এধিখর, (৪) মধিখর। কোড়কুস সাত গোত্রে—সামাত, সাধম, পহলা, চুড়গড়, কুন্ডা, নৈহার, হেতলু এবং তারা। কোড়কুস তাদের বংশমাতা কুড়িয়া এলাকার কোরোয়া রাণীকে দাবী করে না; নিজেদের আদি পুরুষ সম্বন্ধে কাহিনী বলে, "বহুকাল পূর্ব্বে এক নিঃসন্তান দম্পতী, সরগুজার পালটপ্পায় (পরগণা) বাস করতো। বৃদ্ধ বয়সে যখন আর পুত্র সম্ভাবনা রইল না, তখন পুত্রকামনায় দেবারাধনার জন্য দেশভ্রমণে বেরুল। তাদের সেবায় তুষ্ট হয়ে দেবতা অবশেষে একটী পুত্রসন্তান

দিলেন। ভূমিষ্ঠ হয়েই শিশুপুত্র পিতামাতাকে বলল, আমার ক্ষুধা পেয়েছে, কিছু খেতে দাও; এবং জানিয়ে দিলে যে জঙ্গল থেকে কিছু কাদা (স্কন্দমূল) খুঁড়ে এনে দিতে। পুত্রের খাদ্য স্কন্দমূল খুঁড়ে আনার জন্য তাদের বংশের নাম কোড়কুস হল। কোড়ো = খোঁড়া, কুস = খাওয়া।" কোড়কুস চাষ আবাদ করলেও, দুই গোষ্ঠীরই বৎসরের বেশী সময় মহুয়া, স্কন্দমূল, সিহার, ক্রজু (এক প্রকার জঙ্গলী ফল), শাল ফুল, কদম ফুল প্রভৃতি খেয়ে কাটায়। রুচিকর প্রাণীর মাংসের মধ্যে কুকুরের মাংস এদের উপাদেয় খাদ্য। উৎসব অথবা ছেরতা (বনভোজন) উপলক্ষে দুই গোষ্ঠীর পুরুষ এক সঙ্গে আহার করে; কিন্তু মেয়েদের সে অধিকার নেই। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কোন রকম সামাজিক চলন নেই। যদি কোথাও দুই গোষ্ঠীর বিবাহ সম্ভাবনা ঘটে ত দুই পক্ষ হতেই প্রবল আপত্তি উঠে। কোরোয়া ছাড়া অন্য অ'ধ-বাসীদের মধ্যে ধর্ম্ম এবং সামাজিক আচার কতকাংশে বর্ণ হিন্দুর মত হয়ে পড়েছে।

ঘাসি প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর বিবাহে মহুয়া গাছ অভাবে আঙিনায় মহুয়া ডালকে সাতবার পরিক্রমণ বিবাহের একটী বিশেষ অঙ্গ। ওড়াওদের বিবাহে স্ত্রী পরীক্ষা হাস্যোদ্দীপক। বিবাহের রাত্রে একটী ছোট নীরন্ধ্র ঘরে লঙ্কার ধোঁয়া করা হয় এবং বিবাহ অনুষ্ঠানের পর, নব বধূ স্বামী-ঘর বেশীদিন করবে কিনা পরীক্ষার জন্য ঐ লঙ্কাধুমপূর্ণ ঘরে বধূকে বন্ধ করে রাখা হয়। যদি বেশীক্ষণ নব বধূ থাকতে পারে তা'হলে বুঝতে হবে, সে ঘর করবে। তারপর কিছু ধূলি তার সীমন্তে দেওয়া হয় এবং বিবাহ শেষ হয়। এ ছাড়া বিবাহানুষ্ঠান সাঁওতালদের অনুরূপ। বিবাহ অথবা শুভ কর্ম্মের পূর্ব্বে গৃহে ভূত নামিয়ে ফলাফল জেনে নেয়। গ্রামের বৈগা উক্ত অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করে এবং গ্রাম্য দেবতাকে সুপারী, নারিকেল অথবা একটী পশু দেওয়া হয়।

২

গুহা সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদ—"কোন এক সময়ে গ্রাম্য দেবতা খুসি হয়ে, গ্রাম্য পুজারীকে (বৈগা) স্বপ্নে বলেন, তিনি নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে আছেন এবং গ্রামের মঙ্গলের জন্য প্রতিদিন রাত্রে উক্ত মাড়ায় নাচ-গান করবেন। গ্রামের লোকেরা প্রতি রাত্রে বাজনা শুনতে পেত। কিন্তু একদিন জনৈক গ্রামবাসী কৌতূহল দমন না করতে পেরে দেবদর্শনে গুহায় যায়। তার ফলে দেবতা গুহা ছেড়ে চলে যান এবং তার বাদ্যযন্ত্র পাথর হয়ে যায়। তিনি যে ছিলেন সেই প্রমাণের জন্য গুহার প্রাচীরে লিখে রেখে
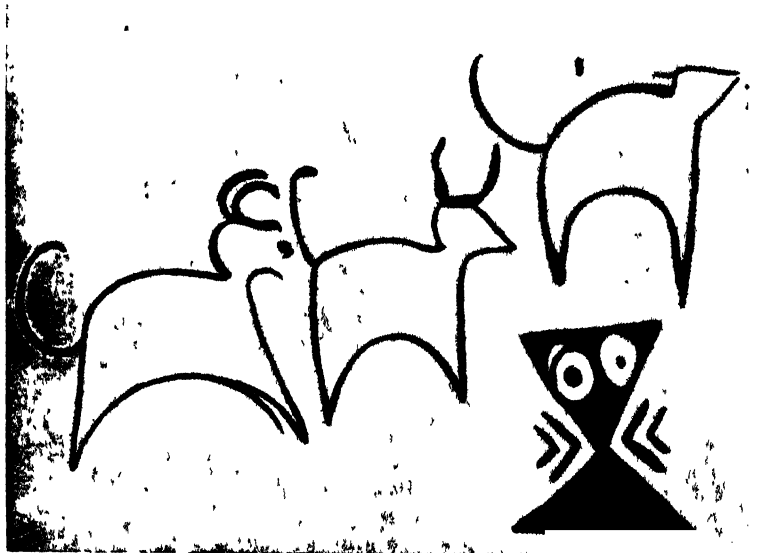
প্রথম স্তরের চতুষ্পদ জীব নীচে: অঙ্গুলেখ

যান।" এ প্রবাদের কোন মূল্য নেই, এই কাহিনী অনেক পরে রচিত হয়েছে। গুহা ভিতর দিকে গভীর নয়। উচ্চতায় ৩০।৪০ ফুট এবং লম্বায় ২০ ফুট। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে, গুহার পাথর ফ্লেস্প্যাথিক বালি পাথর—নিম্ন গণ্ডোয়ানা যুগের। ছবিতে লাল গেরী মাটীর রঙ ব্যবহার হয়েছে এবং বেশীর ভাগ চিত্রের রেখা অস্পষ্ট, বাকী কতকগুলি খোদিত। মাঝে মাঝে হাতের চেটোর ছাপ আছে। ছবি তিন স্তরে অথবা তিনটি বিভিন্ন সময়ে আঁকা হয়েছে। এই যুগ-বিভাগ, অঙ্কন-রীতির বিশেষত্বে' ভাগ করা যায় এবং তিন শ্রেণী বা তিনটি বিভিন্ন গোষ্ঠীর

আগমনবার্ত্তা ছবিগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা এই যুগ-বিভাগে তিনটি সংখ্যা গ্রহণ করলাম, কারণ তাতে পরিচয়ের সুবিধা হবে।

প্রথম ক স্তর। এই স্তরের ছবি শুধু মোটা লাল রঙের রেখায় আঁকা। একটীর পিছু একটি করে সারিবদ্ধ তিনটী ষাঁড়, সর্ব্বশেষেরটীর মাঝে মানব মূর্ত্তি, মুখ বা দেহের পূর্ণ রূপ দেওয়া হয়নি; তার পাশে এক জোড়া ষাঁড়

উপরে: প্রথম স্তরের বৃষ। নীচে: দ্বিতীয় স্তরের প্রধান দম্পতী। পাশে: অঙ্গুলেখ

ও গরু মুখোমুখী। এই যণ্ডযূথের বামদিকে তিনটী বাছুর অথবা অন্য কোন চতুষ্পদ জীব এবং দক্ষিণে যুদ্ধ দৃশ্য। যুদ্ধ দৃশ্যের মনুষ্য মূর্ত্তির অবয়বের পূর্ণ রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে। একটী মূর্ত্তি জন্তুর উপর বসে, একদল সৈনিকের সাথে যুদ্ধ রত। প্রথম দলের পক্ষই অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট ধনুক ছোঁড়ার ভঙ্গীতে মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে—এগিয়ে আসার ভঙ্গী বেশ স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়েছে, কিন্তু নিম্নে তিনটী মৎস্যপুচ্ছের অনুরূপ রেখার ব্যবহার কেন হয়েছে বোঝা শক্ত। ক স্তরের নিম্নে খ স্তর বা দ্বিতীয় যুগ বলা যেতে পারে। একটী পুরুষ এবং একটী স্ত্রী মূর্ত্তি, পুরুষের মস্তকে পালকের এবং বৃক্ষ পত্রের মস্তকাবরণ। দক্ষিণ পার্শ্বে একটী বিরাট্ মূর্ত্তি, একটী কুকুর ও ছোট ছোট দুটী মূর্ত্তির হস্তে অস্ত্র বিশেষ। এই স্তরে নানা রকম অঙ্গুলেখ অলঙ্কার (symbol) ব্যবহার হয়েছে। এই সব অঙ্গুলেখের মধ্যে ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ, জল প্রভৃতি দেখানোর চেষ্টা এবং আল্পনার মতন অলঙ্কার, ত্রিভুজাকৃতি অলঙ্কার আঁকা আছে। এ স্তরের চিত্র বেশীর ভাগই নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তৃতীয় স্তরের মত নষ্ট হয় নাই। তৃতীয় স্তরের (গ) চিত্র উন্নত এবং পাকা হাতের কাজ। ছবি বাস্তবের রূপ ধরে প্রকাশ হয়েছে, এ দাবী করতে পারে। মূর্ত্তির পরিমাপ ক্রমেই ছোট হয়ে গেছে এবং স্থানে স্থানে অস্পষ্ট, তথাপি এই অংশের প্রকাশ-ভঙ্গী পাকা শিল্পীর হাতের কাজের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নয়। একটী লোক একটী ষাঁড়কে জোড় করে' টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সামনের দিকে একটী নারী পুরুষকে সাহায্য করছে, তাহার নিম্নে অনুরূপ আর একটী বৃষ এবং একটী নারী মূর্ত্তি সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এর পর আরও ছবির অস্পষ্ট রূপ-রেখার আভাষ পাওয়া যায় কিন্তু নকল করা সম্ভব নয় এবং ফটো গ্রহণও অসম্ভব। বৃষকে নিয়ে যাবার ভঙ্গী এবং বৃষের না যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ, শিল্পী অপূর্ব্ব কৌশলে ফুটিয়ে তুলেছে। বস্তুতঃ তৃতীয় স্তরের চিত্রে শৈল্পিক বিকাশ অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে মনোরম হয়ে উঠেছে। সমস্ত চিত্র নকল সম্ভব না হলেও যে কয়েকটি চিত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হল, তাতে স্পষ্ট অনুভব করা যায়, কি বিরাট্ শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল আদিম অসভ্য সমাজে শক্তিমান্ শিল্পী।

যদিও ভূমিজ প্রাচীনতার বহু পরে এই গুহা-চিত্রের আবির্ভাব, তা হলেও এই চিত্রগুলির মাঝে যে মানব-গোষ্ঠী এখানে বসবাস করেছিল, তাদের জীবনের অনেক কাহিনী জানা যায়। তাদের আত্মিক উন্নতির ক্রমিক ধারাও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম স্তরের চিত্র যে

গোষ্ঠীর দ্বারা অঙ্কিত; তাদের গৃহস্থালীতে গরুর ব্যবহার জানা ছিল না, কিন্তু বৃষের ব্যবহার জানা ছিল। (একটা বিষয় লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আদিম মানব সমাজে পশু ব্যবহারে বৃষের স্থান ছিল কিন্তু গরু নয়—এখনও যে সমস্ত আদিম মানব-বংশ ভারতে আছে, তাদের মধ্যে গো-দুগ্ধ ব্যবহার ধর্ম্মগত নিষিদ্ধ; সাঁওতালদের মধ্যে প্রবাদ—গোদুগ্ধ দোহন করলে, গ্রামের অকল্যাণ হয়। কেন যে তাদের মধ্যে এ সংস্কার আছে, তাহা বলা শক্ত।) এই দলের পশু উপজীব্য করা এবং বৃষ যে একটী প্রধান সম্পদ্ তাদের ছিল, এ অনুমান আমরা করতে পারি। সম্ভবতঃ আবাদ করার শিক্ষা তখনও সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসেনি এবং বসবাসের সময় জীবন-সংগ্রাম ছিল। অনাড়ম্বর জীবন যাপন, সুস্থভাবে বসবাস তাদের ভাগ্যে বেশীদিন ঘটেনি। যুদ্ধ দৃশ্যে তাহাই নির্দ্দেশ করে। প্রথম দল যখন শান্তিতে বসবাস করছিল, তখন হয় ত ভ্রাম্যমান কোন দল তাদের আয়ত্তে আনে। দ্বিতীয় দলের অস্ত্রের মধ্যে হার্প জাতীয় অস্ত্র দেখে অনুমান হয় যে ঐ অস্ত্র গুল্‌তির মত ব্যবহার হত। এই সৈন্যদলের অস্ত্র ব্যবহারের ভঙ্গীতে মনে হয়, এই দলের অষ্ট্রেলিয়বাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল; কারণ আদিম অষ্ট্রেলিয়বাসীদের গুল্‌তি অস্ত্রের ব্যবহার প্রচলন ছিল। এই দৃশ্যে সৈনিকদের তৎপরতা অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যের সহিত প্রকাশ হয়েছে। যুদ্ধ দৃশ্যের পরবর্ত্তী অংশ দেখলে অনুমান হয়, যদিও বা প্রথম দলকে পরাজিত করে দ্বিতীয় দল প্রতিষ্ঠা লাভ

অনুলেখ অথবা অলঙ্করণ-চিত্রের নমুনা

প্রথম স্তরের যুদ্ধ দৃশ্য

করেছিল, কিন্তু সে প্রতিষ্ঠা বেশীদিন ছিল না। ক স্তরের নিম্ন দিকে যে প্রধান দম্পতীর মূর্ত্তি দেখা যায়, হয় প্রথম দল তাদের অধিকার ফিরে পেয়েছিল, নয় ত অন্য অপেক্ষাকৃত উন্নত গোষ্ঠীর অধিকারে এসেছিল। সে যাহা হউক, তৃতীয় স্তরের মানব গোষ্ঠী সর্ব্বতোভাবে অপর দুই গোষ্ঠীর চেয়ে মানসিক ও অন্যান্য সর্ব্ববিষয়ে উন্নত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আমরা এই স্তরের মানব চিত্তের রসানুভূতির বিকাশ দেখতে পাই নানারূপ অলঙ্কার চিত্রের মধ্যে। তারা মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্য নানারূপ অনুলেখ লিখিবার চেষ্টা করছিল, অথবা আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মত চিত্রাক্ষর ব্যবহার করতে জানত। এখন বলা শক্ত এই অনুলেখ-লিপি কোন্ স্তরের? তবে চিত্রকর্ম্ম দেখে তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত হবার স্বপক্ষেই বেশী সম্ভাবনা। কারণ সব স্তরের চিত্রই গুহা-প্রাচীরের একই পটভূমিতে অঙ্কিত, আমাদের সুবিধার জন্য চিত্রাঙ্কন-রীতির তারতম্যে বিভক্ত হয়েছে মাত্র।

তৃতীয় স্তরের বৃষ ও দম্পতী

লিখমাড়ার চিত্র যখন রচিত হয়েছে, তখন মানব-সমাজ অপেক্ষাকৃত সভ্য হয়েছিল, তারা বন্য প্রকৃতি ছেড়ে নব-জীবনের রসাস্বাদ পেয়েছিল এবং তারপর হয়েছিল স্বপ্রতিষ্ঠ। আমরা চিত্রে যুদ্ধের দৃশ্য দেখে এবং পদ্ধতির বিকাশ দেখে, যে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর আগমন কল্পনা করেছি—এখনও হয় ত তাদেরই বংশধর সমগ্র প্রদেশে, গণ্ড, মার, রাও, কোরোয়া প্রভৃতি ছোট ছোট বিভক্ত গোত্রে বসবাস করছে, হয়ত তাদেরই পূর্ব্বপুরুষদেরই রচনা এই গুহা-চিত্র। সমগ্র গ্রীষ্মমণ্ডলেব মানবগোষ্ঠীর চিত্রের মাঝে পদ্ধতিগত ঐক্য দেখা গেলেও প্রাকৃতিক আবেষ্টনে তাদের চিন্তা, মননশক্তির যে তফাৎ ঘটেছিল, ইহা স্বীকৃত হতে বাধ্য। ভারতীয় আদিম মানবগোষ্ঠীর চিত্তে ভারতীয় দর্শনের সূচনা হয়েছিল—তাদের আত্মিক ধারণাশক্তির বৈশিষ্ট্যে এবং তাদের চিত্র রচনার ছন্দে, ভারতীয় চিত্রের গোড়া পত্তন করেছিল অনুমান করা নিতান্ত অস্বাভাবিক হবে না। ভারতীয় আলঙ্করণ পদ্ধতি কি আদি মানব-সমাজের দান? এ প্রশ্ন মনে হয় বাণীপাহাড় চিত্রগুলির আলঙ্করণ দেখে। কারণ খৃষ্টপূর্ব্ব ও তৎপরবর্ত্তী শতকের আভাষ ভিত্তি-চিত্রে পাওয়া যায়। গুহা-চিত্রের কাল-নির্ণয় সম্ভব নয়। মোটামুটি এই প্রাগৈতিহাসিক চিত্র ভারতীয় চিত্রের ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসুদের রসের খোরাক যে দেবে, ইহা সুনিশ্চিত।

# কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

### সংক্ষিপ্ত ইতিকথা

কীর্ত্তন শব্দ কৃৎ ধাতুর সহিত অনট্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কৃৎ ধাতুর অর্থ প্রশংসা করা অর্থাৎ গুণবর্ণন। ইহা হইতে ভগবৎ নামানুকীর্ত্তন অর্থ সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং এদেশে সুদীর্ঘ কালাবধি এই বিশিষ্ট অর্থেই কীর্ত্তন শব্দটি ব্যবহৃত হইতেছে।

কীর্ত্তন ঠিক কোন সময়ে জনসমাজে বর্ত্তমান আকারে প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা খুব সহজসাধ্য নয়। ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন বা নামসঙ্কীর্ত্তন অর্থে বিচার করিতে গেলে সামগানও অপ্রতিবাদে ইহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, এবং তাহা হইলে গৌণভাবে কীর্ত্তন অপৌরুষেয় বলিলেও অত্যুক্তি হইতে পারে না। ঐতিহাসিক ভিত্তিমূলে আমরা সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতেই দক্ষিণ ভারতে ভক্তিমার্গাশ্রিত বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম্মমূলক সঙ্গীতের বিশেষ প্রচলন দেখিতে পাই। বিদ্বানপ্রবর হারবার্ট এ, পপ্‌লি মহোদয় বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার "The Music of India" নামক গ্রন্থে "ভারতীয় সঙ্গীতের কাহিনী ও ইতিবৃত্ত" শীর্ষক অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, "The seventh and eighth centuries of our era in South India witnessed a religious revival associated with the Bhakti movement and connected with the theistic and popular sects of Vishnu and Siva. This revival was spread far and wide by means of songs composed by the leaders of the movement and so resulted in a great development of musical activity among the people generally and in the spread of musical education." ইহার ভাবার্থ এইরূপ—খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তিমূলক ধর্ম্মভাবের একটা নবজাগরণ প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই ধর্ম্মপ্রেরণা কথিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নায়কগণ বিরচিত গীতাবলী সাহায্যে বহু দূর-দূরান্তরে বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে,—ফলে সাধারণ লোকের মধ্যে সঙ্গীতচর্চ্চা ও সঙ্গীত শিক্ষা প্রসার লাভ করে।

কিন্তু উত্তর ভারতে এই সময়ে অথবা তৎপরবর্ত্তী দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও কীর্ত্তনের কোন প্রভাব সম্বন্ধে, এমন কি, ভারতীয় সঙ্গীতের তদানীন্তন অবস্থা সম্পর্কেও আমরা কোন ইতিহাসের সন্ধান পাই না। উত্তর ভারতে এই অন্ধকার যুগের অবসানে আমরা ভারতীয় সঙ্গীতের পরন্তু ভগবৎগুণানুকীর্ত্তনের প্রথম আলোকচ্ছটার বিকাশ দেখিতে পাই, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান বীরভূম জেলার অন্তর্গত—কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বোলপুর শান্তিনিকেতনের সন্নিকটবর্ত্তী কেঁদুলী বা কেন্দুবিল্ব মহাতীর্থক্ষেত্র হইতে। এই সুপবিত্র কেঁদুলীর এক পর্ণকুটীরবাসী অনন্যসাধারণ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ মহাকবির কণ্ঠ হইতেই রাগতালসমন্বিত ভক্তিরসসমাকুল অদ্ভূত পদলালিত্যমণ্ডিত যে ভগবৎ-গুণানুকীর্ত্তন বিনির্গত হইয়াছিল, তাহাই আজ পর্য্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ গীতিকাব্য "গীতগোবিন্দ" আখ্যায় অভিহিত হইয়া আসিতেছে। গীতগোবিন্দের কবিতারাজির কমনীয়তায় মুগ্ধ হইয়া ইহার ইংরেজী অনুবাদক Sir Edwin Arnold মহোদয় তাঁহার অনুবাদ গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন "The Indian Song of Songs"।

গীতগোবিন্দের পরিচয় সম্বন্ধে বঙ্গদেশবাসী কাহাকেও আর বিশেষ কিছু বলা আবশ্যক হইতে পারে না। উত্তর ভারতের কীর্ত্তনের প্রারম্ভ আমরা এই সময় হইতে গণনা করিয়া লইলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ৺সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অভিধানে শ্রীশ্রীজয়দেব গোস্বামীর আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার এই অনুমানের অবলম্বন-যোগ্য কোন ভিত্তির উল্লেখ তিনি করেন নাই। অথচ হারবার্ট পপ্‌লি মহোদয় বহু গ্রন্থ আলোচনা ও পুরাতত্ত্ব গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে,

গীতগোবিন্দ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই লিখিত হইয়াছিল। তিনি সুনিশ্চয়তার সহিত বলিতেছেন, "The first North Indian musician whom we can definitely locate both in time and place is Joydeva who lived at the end of 12th. century. He was born at Kedula near Bolepur where lives to-day the poet-laureate of Bengal and modern India." ইহার ভাবার্থ এইরূপ—উত্তর ভারতে সর্ব্বপ্রথম যে সঙ্গীতবিদের আবির্ভাবকাল ও স্থান আমরা সুনিশ্চয়তার সহিত বাহির করিতে পারি তাঁহার নাম জয়দেব। তিনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গলার তথা আধুনিক ভারতের কবিশ্রেষ্ঠ আজ যেখানে বাস করেন সেই বোলপুরের নিকটবর্ত্তী কেঁদুলীতে জন্মগ্রহণ করেন। আমরা এই পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তই প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচনা করি।

অতঃপর আমরা খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মিথিলা প্রদেশস্থ ত্রিহুতের রাজা শিবসিংহের দরবারে স্বনামধন্য বৈষ্ণবগীতিকাব্যকার বিদ্যাপতির সাক্ষাৎলাভ করি। বিদ্যাপতির গীতিকাব্যেরও বিশদ পরিচয় বঙ্গদেশবাসী কেন উত্তর ভারতবাসী শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এস্থলে বলা আবশ্যক যে, কবিবর বিদ্যাপতির গীতিসমূহ শাস্ত্রীয় রাগতাল সমন্বিতই ছিল এবং তাহার অন্যতম প্রমাণরূপে আমরা তদানীন্তন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্রকর্ত্তা লোচন কবির "রাগ-তরঙ্গিনী" নামধেয় সঙ্গীত গ্রন্থে বিদ্যাপতির কতকগুলি গীতির বিশিষ্ট আলোচনাও দেখিতে পাই। এই "রাগ-তরঙ্গিনী" গ্রন্থখানি উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আলোক-স্তম্ভের ন্যায় অদ্যাপি বিরাজমান রহিয়াছে।

ঠিক এই সময়ে বঙ্গদেশে কীর্ত্তনের কি অবস্থা ছিল, তাহার ইতিহাস নির্ণয় করিতে মিথিলার সহিত বঙ্গের তৎকালীন ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বঙ্গদেশে নবদ্বীপধাম তখন সর্ব্বপ্রকার সংস্কৃত শাস্ত্রালোচনার প্রকৃষ্ট কেন্দ্রস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এবং এই শাস্ত্রালোচনা উপলক্ষে মিথিলার সহিত নবদ্বীপস্থ ছাত্রবৃন্দের গতিবিধিও যথেষ্টই ছিল। বিশেষতঃ সেই সময়ে ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি গ্রহণ করিতে হইলে নবদ্বীপের ছাত্রগণকেও নিজ নিজ শাস্ত্রব্যুৎপত্তির পরীক্ষা প্রদান করিতে মিথিলায় যাইতে হইত। নবদ্বীপের ভারতপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয় মিথিলার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রকে ন্যায়শাস্ত্রের তর্কে পরাস্ত করিয়া এই নিয়মের পরিবর্ত্তন সাধন করেন এবং তৎকাল হইতে তাঁহারই কৃতিত্বে নবদ্বীপ বঙ্গদেশবাসীকে ন্যায়ের উপাধি প্রদানের ক্ষমতা লাভ করে। নবদ্বীপ ও মিথিলার মধ্যে এইরূপ পারস্পরিক সম্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠতার সদ্ভাব হইতে নিঃসন্দেহরূপেই অনুমান করা যায় যে, তৎকালে মিথিলার ভক্তিরসাত্মক কীর্ত্তন-গীতির তরঙ্গস্রোত অন্ততঃ ক্ষীণাকারেও নবদ্বীপে আসিয়া পৌছিয়াছিল এবং ইহারই অত্যল্পকাল পরে হয়তো এই ক্ষীণস্রোতের অনুকূল গতি অবলম্বন করিয়াই কীর্ত্তন জগতে নব যুগের প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিরসের প্রবল বন্যায় একদিন সমগ্র ভারত প্লাবিত করিয়া কীর্ত্তনের অপরিমেয় মহিমা প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।
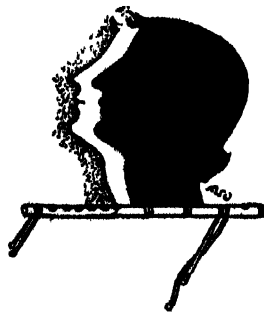
# লীলা-কমল

শ্রীসুকৃতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমরা সবাই এক একজন দেশসেবক। অর্থাৎ, আমাদের ঠারে ও ঠোরে এই কথাটাই স্পষ্ট ফুটে উঠেছে দেশের সুমুখে যে, যে অবধি এই দুর্ভাগ্যদগ্ধা অপমানিতা বন্দিনী ভারতমাতার অবগুণ্ঠনের নীচে থাকবে চোখের জল, শৃঙ্খল থাকবে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়ান, সে অবধি আমাদের চোখে মুখে জ্বলবে বহ্নিশিখা। মনে মনে থাকবে কঠিন পণ, এই দেশের জলমাটী থেকে যতদিন না ইংরেজরা পরাজিত সৈনিকের মত ঝুলি কাঁধে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে জাহাজ ঘাটে স্বদেশে যাত্রার জন্য; সে পর্য্যন্ত আমাদের মুখে অন্ন নেই। বিনিদ্র রজনী কাটবে পথ ও প্রান্তরে। ঘর ছেড়ে আমরা নিরুদ্দেশই হ'য়ে গেছি যখন বিপ্লবের পথে, স্বরাজ-পতাকা যখন উঁচুতে তুলেই ধরেছি, সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে জয়ের টীকা না প'রে আর ফিরছিনে।

বন্ধু নেই, বান্ধব নেই। প্রিয়জনের নেই আনাগোনা। কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি ঝুলিয়ে কংগ্রেসের চাঁদা সংগ্রহ ক'রতে চলেছি দেশ হ'তে দেশান্তরে। লীডারদের পিছু পিছু চলি। এক পা এদিক্ ওদিক্ হবার যো নেই। হলেই অজয়াদি' ব'লবেন, তোমাকে দিয়ে হবে না। সব জানি। সব শুনি। কত লোক নিন্দে রটায়। চোর, স্বার্থপর ব'লে আমাদের অখ্যাতি রটায়। অথচ, জগতে বাস্তবে একটি পরার্থপরের সাক্ষাৎও পেলুম না আজও। অবনত মস্তকে সব মেনে নিতে হবে। মান অপমানের গ্লানি না মুছতে পারলে চলবে না। আঘাতকে দেখতে হবে খুব ছোট্ট ক'রে; স্বরাজ-মুক্তির পথে সমস্ত লাঞ্ছনাকে দেখতে হবে সামান্য ক'রে, তবেই আমরা নাকি যোগ্য হ'তে পারব সকল কাজে।

অন্ততঃ আমাদের লীডার রেণুদি' তাই বলেন।

তবে, যদি কেউ কৈফিয়ৎ করেন, আকাশে-বাতাসে বাণ পাঠিয়েছ তো অনেকদিন। কতটুকু এগুলে তার? যা'দের বলতে একটু বাধবে। তবু বলতে হবে, পারিনি এগুতে। যতটা এগিয়েছি, তার দ্বিগুণ পিছিয়ে গেছি।

কোথায় যে খাদ মিশে গেছিল অটল প্রতিজ্ঞার সঙ্গে, সে কথা আজ আর বল্‌ব না। দেশে যদি কোনদিন সত্যিকারের লীডার আসে, তাঁর মুখেই শুনতে পাবেন— আমাদের এই সব আত্মসেবকের জলন্ত রূপটা কি?

দোষ-অপরাধ, সত্য-মিথ্যা, আজ এমনি অনেক কথায় ভাবতে পারি। কেননা, তার বর্ণে বর্ণে কোথাও কল্পনা নেই। করেছি আমরা যতটুকু, তার অনেক গুণ উচ্চৈঃস্বরে টেবিল ঠুকে চেঁচিয়েছি। কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েছি কোন কাজে, এমন অপবাদ কেউ দিতে পারবে না বোধ হয়। ভাবতে বসলেই যদি ছিন্নবিচ্ছিন্ন চিন্তাসূত্রগুলিকে একত্র করা যায়, অনেক শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ মনে পড়ে যায়। যারা করেছে সবার চেয়ে অধিক, অথচ খ্যাতির ভাগ নিল না বুঝে। চলে গেছে চিরদিনের মত সীমার বাইরে, আসবে কি আসবে না ব'লে যায়নি কিছুই; মন তাদেরই জন্য কেঁদেছে। কতদিন ভেবেছি, ভারত মাতার মুক্তি অসম্ভব আমাদের দিয়ে। যারা ছিল তার সত্যিকারের ছেলে, পায়ের নীচে চেপে সবাই তাদের মেরেছে। আর আজ যারা ঐ খ্যাতি এবং ধনে জনে মানের সর্ব্বোচ্চ আসনে আসীন, ওরাই হ'ল স্বাধীনতার পথের সব চেয়ে বড় পরগাছা।

একদা আমাদের অজয়াদি' স্বাধীনতার বন্যাস্রোতে ঘর ছেড়ে এসেছিলেন ব'লে, তাঁকে পুনর্ব্বার ঘরে তুলবার সৎসাহস স্বামী দেখান নি। কাজেই কন্যা মাধুরীকে নিয়ে তিনি ঘুরছেন আমাদের সাথে সাথে।

দেশের ভাবনার চেয়ে তাঁর মেয়ের বিয়ের ভাবনাটাই এখন প্রবল। কাজেই লীডারের আদেশমত যে যেদিকে পারলুম, ঝোলা নিয়ে ভিক্ষের জন্য দিকে দিকে বেরিয়ে পড়লাম।

আমি যাচ্ছিলাম মহিষাদলের দিকে। এমন সময়ে মেঘনার দুই তীরে আম কাঁঠাল বাঁশ বনে উঠ্‌ল প্রবল ঝড়। বাঁশ বন নুইয়ে পড়ল পথের 'পরে। নদীর ধারে পরিশ্রান্ত হয়ে বসেছিলাম যখন, বেলা তখন যায় যায়।

স্বরাজ-সাধনার দলের ফর্দ্দে যাদের নাম বড় বড় হরপে ছাপা হয়ে থাকে, আমাদের লীলা আর কমল ছিল তাদের বাইরে। এসেছিল তারা কোথা থেকে, এ কথা ঠিক মনে নেই। কোথায় কবে দেখা, সেটাতেও ভুল হ'তে পারে।

এমনি পথে যেতে যেতেই তাদের সঙ্গে আমার পরিচয়। সেবার ল্যান্‌সকটু জুট মিলেব শ্রমিক ধর্ম্মঘটে সর্ব্বাগ্রে আমি যখন পতাকা নিয়ে আসছিলাম, তারা আসছিল পিছু পিছু। আমাদের দলের মেয়ে লীডার অজয়াদি' জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি ভাই?

মেয়েটি চপলতাভরে জবাব দিল, লীলা।

—দেশ?

—ভারতবর্ষ।

—না, না, আমার বলবার মানে—,

—বুঝেছি। আপনার ছেলে আছে বুঝি?

ব'লেই লীলা আড়চোখে তাকাল।

অজয়া ঠিক বুঝতে না পারার মতই বললেন, কেন বলত?

—বলছিলাম প্রজাপতির কারখানার কারিকর আর আমি নেই। সে ভাবনা আমার চুকে গেছে।

অজয়াদি' সপ্রতিভ ভরে বললেন, না না, সে কথা বলিনি। কোথায় বিয়ে হ'ল?

—জেলখানায়। লীলা মুচকে হেসে উঠ্‌ল।

অজয়াদি' অবিশ্বাসের সুরে বললেন, মানে?

চলতে চলতে লীলা জবাব দিল, খুব সোজা। জেলখানা নয়ত যেন একটা স্বয়ম্বর-সভার ঘর। আমাদের সঙ্গে থাকতেন অতসী বোস বলে একটি মেয়ে। আর তার সঙ্গে প্রায় আসতেন দেখা ক'রতে চাঁটগার অস্ত্রাগার লুঠের একজন আসামী। শেষকালে খবর পাওয়া গেল, অস্ত্রাগারের অগ্নি-উপাসক অতসী বোসকেও লুটে নিয়ে গেছেন আরাকানে। ঘোর সংসারী এখন তাঁরা।

একটু ঠোঁট চেপে অজয়া জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে লুট করেনি কেউ?

বিহুনিতে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে লীলা বলে উঠ্‌ল, না কর্‌লে কি কম দুঃখ পেতাম? বাপ্‌স্! আমি বুঝি অতই কাঁচা মেয়ে মনে করেচেন আপনি? অমনি অমনিই দেশের কাজ করা যায় বুঝি?

এখানে অজয়ার ছিল একটা মস্ত পরাভব। মুখ নামিয়ে চললেন। প্রতিবাদ করবার সাহস কুলাল না। বল্লেন, একদিন এনো তোমার স্বামীকে দেখব আলাপ ক'রে,—

—খু-উ-ব। এখুনি বলেন যদি—

সামনে পিছনে চেয়ে অজয়া ধীরকণ্ঠে বললেন, ঐ ছেলেটি বুঝি?

—হুঁ। আপনি জানলেন কি করে?

অজয়া বীরত্বের গৌরবে জবাব দিলেন, যে মেয়েরা ঘর ছেড়ে পথে আসে, স্বামী চিনতে তাদের দেরী লাগে না লীলা। কিন্তু তোমার সিঁদুর?

—এখনও পারিনি। কেন, সে কথা জানে চন্দ্রা। জিজ্ঞেস করুন ওকে।

সব চেয়ে পিছনে ছিল চন্দ্রা। তার পানে চেয়ে লীলা বললে, দেশসেবা তো আছেই। তার সঙ্গে নিজেব সেবাটাও তো চাই। কি বল চন্দ্রা?

চন্দ্রার মুখখানা শুকিয়ে গেল। আজকাল চন্দ্রার মুখের পানে চাইতেই আমার ভয় করে। মনে হয় কি একটা পাপ যেন ওকে স্পর্শ করে আছে আজকাল।

আমাদের স্বেচ্ছাসেবক-মহলে এই নিয়ে জল্পনা কল্পনারও অন্ত নেই। লীডারদের কাণেও তুলেছি। তবে কোন ফল পাওয়া যায়নি তার। কেননা, শাসন যাঁরা ক'রবেন, শাসনকে ক'রেছেন তাঁরাই খাটো। এক একদিন দেখা যায়, আমাদের পুরুষ দলের লীডার যেদিন উধাও, সেদিন মেয়ে-মহলের অজয়া কি রেণুদিও' উধাও। ফেরেন যখন, আধঘণ্টার এক ঘণ্টার প্রভেদ রেখে। কাজের ফর্দ্দ দেন। আপনা হতেই কৈফিয়ৎ দেন। আমরা মুচ্‌কে শুধু হাসি। ঠোকা দিয়ে অনেক সময়ে বলেও থাকি, তোমরা এ পথে কেন এলে রেণুদি'? এ পথের ব্রত কলঙ্ক, হীনতা দিয়ে হয় না। ত্যাগ এবং সংযমই সব চেয়ে বড় পদার্থ।

রেণুদি' মুখ টিপে হেসে ওঠেন, আহা-হা!

আমরা জন কয়েক টেব্‌লটার চারধারে ঘিরে বসে বসে নানা প্রকার প্ল্যান করছি। কখনও মহাত্মা গান্ধীর মুণ্ডপাত, কখনও ইংরেজের। এমন সময়ে কমল একখানা খবরের কাগজ এনে লীলার সামনে এগিয়ে দিয়ে বল্‌ল, এইটে প'ড়ে তোমার কি মত বল।

কাগজ লীলা যেমন দ্রুত পড়তে পারত, এত দ্রুত আর কেউ পারত না আমাদের দলে। এক নিঃশ্বাসে পড়া শেষ করে' লীলা বলল, এতে ভাববার তো কিছু নেই। ইংরেজরা চিরদিন গৃহবিচ্ছেদের মালমশলা জুটিয়েছে, আজও জুটাবে। ভারতবর্ষকে যদি ভাগই ক'রে নেয়, তাতেও ক্ষতি নেই।

—ক্ষতি নেই? কি বলছ লীলা! —এবার অগত্যা কমলকে বলতে হ'ল। লীলা সোজা হ'য়ে বসে হাতের চুড়ি ঘষতে ঘষতে জবাব দিল, সত্যিই নেই। যদি তাই হয় একথা তুমি ভুলে যেও না। মনে কর—একটা নদী কেটে ভারতবর্ষকে আধাআধি করা হবে। এ পারে থাকবে একজাতি, ওপারে থাকবে একজাতি। যারা হিন্দু, তারা সমস্ত শুকিয়ে মরবে। ঐ নদীর জলে হবে তাদের দেহান্ত। সেই হাড়গোড়ের কীটাণু থেকে প্রেতও হ'তে পারে, কুমীরও হ'তে পারে। সে থাকবে নদীর পারে বসে একটা উগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। ওপারের মুসলমান বধূটি যখন ছেলেকে সঙ্গে করে আসবেন নদীতে জল ভরতে, নামবেন জলে, তখন কোথা থেকে কে এসে যে তাঁকে টেনে নামিয়ে নিয়ে যাবে অতল তলে, সে কথা তার আত্মীয়ের কাণেও পৌঁছবে না। এই রকম ক'রে একটা অকৃতজ্ঞ জাতির সমাপ্ত হবে দিনে দিনে।

বাধা দিয়ে বলল কমল, তারপর?

—তারপর? তারপর আসবে যাবে কত পরিবর্ত্তন। আমাদের মৃত আত্মারা প্রাণ না পাক, তবু ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রে বনের গাছের ডগায় ফুল হ'য়ে ফুটবে। সেই গন্ধ শুঁকে জাগবে এই অত্যাচারিত জাতি। ঘরে ঘরে দেখা যাবে আনন্দের কলরব। দেশে দেশে দেখা দেবে কর্ম্মতৎপরতা। আজকের এই সমস্ত ভণ্ডামীর খোলস ছেড়ে মানুষ সেদিন সত্যিকারের মানুষ হ'য়ে দাঁড়াবে। কারও প্রতি কারও বিদ্বেষ থাকবে না। হিন্দু মাত্রেই হিন্দুর ভাই হ'য়ে পাশা-পাশি বাস করবে অযুত কোটি বছর ধরে'। কারও যোগ্যতায় কেউ সন্দেহ করবে না। নেতৃত্ব নিয়ে খুনোখুনি হবে না। তখন দক্ষিণের বাতাসে আকাশ বিদীর্ণ ক'রে উঠবে স্বরাজ-পতাকা। সবার চেয়ে উঁচুতে হবে তার স্থাপন।

অভয় বললে, সে তো অনেক দেরী লীলা দেবি!

—তা' আছে! —লীলা বললে, এখনও আমাদের যথার্থ সময় আসেনি। ঘরের শত্রু যতক্ষণ না বিনাশ করতে পারছি আমরা, বাইরের শত্রুদের সঙ্গে পারা অসম্ভব। এরা যে কত বড় বিঘ্ন, একবার ভেবে দেখুন দেখি।

বলেই লীলা চুপ। আর কারও মুখে কোন কথা নেই। সবাই স্বদেশ-চিন্তায় তন্ময়। এমন সময়ে রেণুদি' সিঁড়ি বেয়ে তর্‌-তর্‌ করে নীচে আমাদের সুমুখে এসে দাঁড়ালেন। লীলা তন্ন তন্ন ক'রে তাঁর পানে আপাত দৃষ্টিপাত ক'রে জিজ্ঞেস করল, দিদি কি অভিসারে চললেন নাকি?

রেণুদি'র মুখখানা রাঙা দেখাল। কোন জবাব না দিয়ে এগুতে যাবেন—এটা কোথাকার কাপড় দেখি রেণুদি', বেশ কাপড় তো, বলে' লীলা কাপড়খানা উল্‌টে পালটে বলল, ও, ক্যালিকো? তুমিই দেশের সেবা করছ বটে রেণুদি'। মুখে বুঝি পাউডার মেখেছ? বেশ।

লীলা মুখ টিপে হেসে, কেউ শুনতে না পায় এমনি স্বর নামিয়ে বলল, বিকাশবাবুর ক্যাম্পে যাচ্ছেন বুঝি? তাই এত ঘটা? ও! কেমন ক'রে জানব বলুন। আমরা দেশসেবা করতে এসে নিজের সেবায় যে এতখানি নেচে বেড়াচ্ছি রেণুদি', কেউ যেন শুনতে না পায়। তা হ'লে আহার বিহার সব—

ওপর থেকে শোনা গেল, অজয়াদি' হেঁকে বললেন, লীলা, তোমার সিনিয়র লীডারদের খুঁত ধরবার কোন অধিকার নেই। সমালোচনা করা ঠিক নয়।

লীলা ঘুরে দাঁড়াল। বলল, সিনিয়রিটি কি শুধু বয়সের তারতম্যেই হয়?

—হ্যাঁ।

—রং আইডিয়া। দেশের কাজ করতে এসেছি অথচ দেশকে দেব ফাঁকি। বিলাসিতা আর হীনতা যে পথের চিরবৈরী, তাকেই কাঁধে চড়িয়ে চীৎকার ক'রে বেড়ালে

কি দেশকে ভালবাসা যায়! একে ভালবাসতে গেলে এর সমস্ত মন্দকে ভাল বলে' গ্রহণ করতে হবে!

রেণুদি' রুমালে মুখ ঘষতে ঘষতে বললেন, নেহাৎ পুরান কথা। তাই বলে মোটা একখানা দশহাত কাপড় কিনে বইতে পারব না।

—যদি পারবেনইনা তবে এসেছিলেন কেন? আপনারা এসেই তো সর্ব্বনাশ করলেন আরও। চারিদিকে কেবল ভণ্ডামী আর ভণ্ডতে পরিপূর্ণ। এদের দিয়ে কি কোন মহৎ কাজ চলে? চলতে পারে মধু যামিনীর হোলী খেলা। তার চেয়ে বৃন্দাবনে গিয়ে ঘর বাঁধুন না। বলেই লীলা হন্ হন্ ক'রে চলে গেল।

কোন দিকে তার দৃষ্টি নেই। পিছু পিছু কমল এসে জিজ্ঞেস করল, এমন ভাবে চললে কোথায়?

লীলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, পাগল হয়েছ তুমি? এদের দলে মানুষ থাকে? আমি আজই চলে যাব বাড়ী। শুধু দল ভারি করে লাভ কি? করতে যদি কিছু পারি, ঘরে বসেও পার। তুমিও যাও। এ সব ভুল রাস্তা। ছেড়ে যাও এ পথ। তোমার মামা তোমাকে মাইনিং পড়তে পাঠাবেন বলছিলেন না? তাই যাও। থাকুক এখন দেশের কাজ। তুমি একটা কিছু হয়ে এস আগে, তারপর দু'জনে অন্য দল ক'রে কাজে নামব। এই সব ভণ্ডদের সরাব তখন আগে। তারপর অন্য কাজ। 'ফুল' কোথাকার সব!

ধীরে ধীরে দু'জনে এগিয়ে গেল সামনে।

কমল জিজ্ঞেস করলে, তোমার সঙ্গে দেখা হবে আবার। কোথায় করতে হবে বল ত?

—কেন আমার বাড়ীতে। সেখানকার দোর খোলা রইল। যাবে বই কি, নিশ্চয় যাবে।

—যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন কে, তুমি কি বলবে?

—বলব বন্ধু। এর চেয়েও বড় পরিচয় কিছু চাও?

—না। থাকে যদি কিছু, থাক. তা পরজীবনের জন্য। এ জীবনে ঐ সম্পর্কতেই আমরা সবার কাছে পরিচিত হব। যতদিন দেশ্' না স্বাধীন হয়, ততদিন আমাদের প্রতিজ্ঞার কথা মনে আছে তো?

লীলা সজোরে বলল, নিশ্চয়, তা থেকে যদি চ্যুত হ তবে রেণুদি'র ছায়া থেকে সরে দাঁড়াব কেন।

এবার দু'জনে নদীর ধারে এসে দাঁড়াল। একটি অশোক গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কমল বললে, তোমাকে ছাড়তে আমার কত কষ্ট হচ্ছে জান ললা ভাবছি টোকিও, আমেরিকা, লেখাপড়া সব যাক তুমি থাকো।

ধীরে ধীরে কমলের হাতখানা তুলে নিয়ে লীল বলল, তুমি এত দুর্ব্বল হয়ে পড়ছ কেন বল তো? আমি চাই তুমি কঠিন হও। প্রথম জীবনের ত্যাগকে বৃহৎ মনে করে চলে যাও টোকিও, আমেরিকা। সেখানকার পড়া শোনা শেষ ক'রে ফিরে আসবে যখন দেখবে, আমি জানলার গরাদে মাথা নুইয়ে তোমার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তুমি বড় হয়ে ফিরবে। সেদিন তুমি না বললেও আমি একটা কথা বলতে পারি, যেটা সব মেয়েরাই ব'লে থাকে। তবে চেষ্টা ক'রব যেন না বলতে হয়। সেদিন ভরসা ক'রে তোমার সঙ্গে আবার বেরুবো। আজ দেশের কাজ এই অবধি থাক। দেখে তো গেলাম সেবক সেবিকাদের মনোবৃত্তি। যদি দমন করতে পারি সে মনোভাব, তবেই আমরা আসব, কি বল?

কমল চুপ ক'রে দাড়িয়ে রইল।

সূর্য্য গাছের আড়ালে নেমে গেল ধীরে ধীরে। জলেতে নামল ছায়া। বুঝি এমনি সময় কোন রাখালিয়া বাঁশী বাজিয়ে ফিরছে ঘরে। চারিদিকে একটা শান্ত সৌম্যভাব। লীলা ধীরে ধীরে বিদায় নিয়ে চলে গেল ঘর মুখো। কমল তার পরদিনই কমরেডের দল থেকে নাম কাটিয়ে যখন গ্রাম ছেড়ে চলে গেল—একটা চাপা পরিহাস রেণুদি' যেন করেছিলেন:

'সব মেয়ে, সব পুরুষই সমান!'

সে কথার উত্তর কেউ দেয়নি। আজ মহিষাদলের পথে যেতে যেতে যখন পরিশ্রান্ত হ'য়ে ঝুলি নামিয়ে ঘাটের ধারে বসেছিলাম, অনেক পুরোন কথা, অনেক পুরোন মুখ নদীর জলের বুকে নুইয়ে পড়া অশোক বকুলের ছায়ার মত বার বার অন্তরের নিভৃত অঞ্চলে থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

# আমার অতি-পরিচিত স্বপ্ন

(Paul Verlaine-এর "Mon Rêve Familier" নামক মূল ফরাসী কবিতার অনুবাদ)

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন ভড়

[ **কবি-পরিচিতি**—ফরাসী কবি Paul Verlaine ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কমিউনিষ্ট বিপ্লবের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যারিস হইতে বিতাড়িত হন এবং নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর অবশেষে ইংলণ্ডের কোন বিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষা ও চিত্রাঙ্কন বিদ্যার শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ফরাসী সাহিত্যের Symbolist কবিগণের অভ্যুদয় হয় উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে।, Paul Verlaine ঐ কবি-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতৃস্বরূপ ছিলেন। Naturalism-এর প্রতিক্রিয়ায় Symbolism-এর উৎপত্তি। পূর্ব্ববর্ত্তী কালের Naturalist সাহিত্যিকগণ সাহিত্যের সহিত বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করিতেছিলেন। বিশ্লেষণমূলক তাঁহাদের রচনার বৈশিষ্ট্য ছিল বস্তুতান্ত্রিকতা। জগতের গভীরতম সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হইলে, মানব-মনে যে বিভিন্ন ভাবের উদয় হইতে থাকে, তাহার সীমাহীনতা ও অস্পষ্টতার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল Symbolist কাব্যে। এ কাব্য কোন অতি স্পষ্ট বস্তুর প্রতিচ্ছবি নহে, ইহা কেবল নিবিড় রহস্যে আচ্ছন্ন জ্ঞানাতীত সত্তার সঙ্কেত মাত্র। ]

অপূর্ব্ব অতলস্পর্শ এই স্বপ্ন হেরি বারে বারে।
অচেনা অজানা এক নারী,—তারে আমি ভালবাসি,
সেও মোরে বাসে ভাল।

মূর্ত্তি তার প্রতিবারে অভিন্ন দেখি না আমি
সম্পূর্ণরূপে,—ভিন্নও হেরি না কভু পূর্ণভাবে।

সে নারী বেসেছে মোরে ভাল,—চিনেছে, জেনেছে
মোরে।

এ মোর হৃদয়খানি অতি স্বচ্ছ শুধু তারই কাছে,
শুধু তারই কাছে নহে ইহা অভেদ্য রহস্যজড়িত
ঘন কুহেলিকা।

পাণ্ডুর ললাটে মোর জমে স্বেদকণা, সেই শুধু
পারে নিবারিতে তাহা আঁখিজল ঢালি'।

সে কি শ্যামবর্ণা, গৌরকান্তি, না রক্তরাগরঞ্জিতা?
—জানি না তা'।

নাম তার জিজ্ঞাসিছ?—স্মরণে আসিছে, অতি
সুমধুর তাহা, জীবলোক হতে নির্ব্বাসিতা দয়িতার
নাম মম।

আঁখির চাহনি তার তুলনা রাখিয়া যায় মর্ম্মর
মূরতি' পরে। নীরব হয়েছে যত প্রিয়জন-কণ্ঠস্বর চিরতরে,
তাহারই মূর্চ্ছনা শুনি দূরাগত, প্রশান্ত, সুগম্ভীর তার
ধ্বনি মাঝে।

# বিংশ শতাব্দীতে অজৈব রসায়নচর্চ্চার ধারা

শ্রীভবেশচন্দ্র রায় এম্, এস্‌সি

মানব সভ্যতার প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হৃদয় রাসায়নিক গবেষণার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল—কতকটা শারীরিক প্রয়োজনের তাগিদে, কতকটা অদম্য অর্থলোভে। কালক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিককেও তাঁহার লব্ধ জ্ঞানকে বিভিন্ন গণ্ডী টানিয়া অনেক ভাবেই শ্রেণী বিভাগ করিতে হইয়াছে। এইরূপেই জৈব, অজৈব, তত্ত্বমূলক (Physical) রসায়ন, প্রাণ-রসায়ন (Biological) ইত্যাদি রসায়নের বিভিন্ন বিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন কালে রাসায়নিকগণ বিভিন্ন দিকে তাঁহাদের গবেষণা চালাইয়াছেন—আজ যদি যৌগিক প্রস্তুত করিবার প্রেরণা তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে, তবে আজ হইতে ১০।২০।৫০ বৎসর পরও সেই একই ভাবে তাঁহারা তাঁহাদের গবেষণা পরিচালনা করিবেন, ইহা আশা করা অন্যায়। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ করিলে বুঝিতে হইবে, রসায়ন শাস্ত্রের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে।

বর্ত্তমান কালে, অজৈব রসায়নের গবেষণার ধারা সম্বন্ধে তাই দু-একটি প্রসঙ্গ আলোচনা করিব।

অজৈব রসায়নক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই একটি নূতন গতির সঞ্চার হইয়াছে। সুদূর অতীত কাল হইতে রাসায়নিক সমাজের দৃষ্টি অজৈব রসায়নের ক্ষেত্রে নিবদ্ধ ছিল, সত্য; কিন্তু যুগপরম্পরা যে নব নব অন্তর্দৃষ্টি ক্রমবর্দ্ধমান রাসায়নিক সমাজকে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছিল, উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশেষ দশক পর্য্যন্ত তাহা মূলতঃ একই গতিপথ অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল। ডালটনের পরমাণুবাদ অনুসরণ করিয়া বিশ্বের বৈজ্ঞানিকগণ যেদিন পরমাণুর ওজন, শ্রেণী এবং গুণাবলী সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞান লাভ করিলেন, এভোগ্যাড্রো ও ক্যানিজারোর গবেষণার ফলে যেদিন তাঁহারা অণু ও পরমাণুর বিভিন্নতা হৃদয়ঙ্গম করিলেন, সেইদিন হইতেই রাসায়নিকগণ তাঁহাদের বিভিন্নমুখী গবেষণার ফলাফল পরমাণুবাদোক্ত সত্যের মাপকাঠিতে বিচার করিয়া চলিতেছিলেন, কিন্তু পরমাণুর গঠন-তত্ত্ব সম্বন্ধে মাথা ঘামাইবার সময় তাঁহাদের ছিল না। একের পর আর মৌলিক পদার্থ তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন—একটা হইতে আর একটা, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় যৌগিক সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সর্ব্বপ্রকার গুণ তাঁহারা নির্ণয় করিয়াছেন; কিন্তু যে পরমাণুগুলিকে আশ্রয় করিয়া নূতন যৌগিকটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার গঠন কিরূপ, তাহাতে একটি বিশেষ গুণ, নির্দ্দিষ্ট ওজন কেন আসিল, সেদিনের রাসায়নিক তাহার উত্তর দিতে পারেন নাই। একটি উদাহরণ লইলেই বক্তব্য বিষয়টি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে কোন ভাবেই পাওয়া যাক্ না কেন, হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুগুলির ওজন এবং গুণ সর্ব্বদা একই থাকিবে, আবার তেমনিই অক্সিজেন গ্যাসের পরমাণুগুলিও সব সময়েই নির্দ্দিষ্ট ওজন ও গুণসম্পন্ন হইবে। এদিকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস একত্রে মিলিত হইলে জল পাওয়া যাইবে এবং সেই জলে অক্সিজেনের প্রত্যেক পরমাণুর জন্য দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকিবে। হাইড্রোজেন পেরক্সাইডে প্রতি অক্সিজেন পরমাণুর জন্য একটি মাত্র হাইড্রোজেন পরমাণু আছে, তাই ইহা হইতে অতি সহজে অক্সিজেন বাহির হইয়া ইহা অনায়াসেই স্বাভাবিক জলে পরিণত হয়। বস্তুতঃ পক্ষে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরস্পর আকর্ষণ ও বন্ধনে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহাকে উপেক্ষা করিয়া কোন যৌগিক প্রস্তুত করা সম্ভব নহে—ভাগ্যক্রমে সম্ভব হইলেও, উৎপাদিত যৌগিক হইবে ক্ষণভঙ্গুর। একটু ভাবিলেই ইহা বোঝা যায় যে, বিভিন্ন পরমাণুর বিভিন্ন গুণ ও মিলনক্ষমতার (valency) মূলে হয়ত আছে তাহার গঠন-বৈচিত্র্য। দীর্ঘকালের রসায়ন-চর্চ্চায় রাসায়নিকের এ অনুভূতি আসিয়াছিল কিনা

তাহার কোন প্রমাণ না থাকিলেও, রাসায়নিক "রুদ্ধ করি' গৃহদ্বার, বদ্ধ করি' অলিন্দ সোপান" বসিয়া থাকিতে পারে নাই, নানা দেশের পদার্থবিদ্‌গণ বিদ্যুৎ ও রশ্মির সম্বন্ধে যে গবেষণা করিতেছিলেন, রাসায়নিকগণ এতাবৎ-কাল তাহার সহিত কোন সাক্ষাৎ সংশ্রব রাখেন নাই বা রাখিতে চেষ্টা করেন নাই ; কিন্তু ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেকারেল ও কুরীদম্পতি ভাবী কালের রাসায়নিকগণের জন্য যে নূতন ও বিশাল ক্ষেত্রের সন্ধান দিলেন প্রত্যক্ষভাবে তাহা এই পদার্থবিদ্‌গণের গবেষণার সূত্র ধরিয়াই। কুরীদম্পতি রসায়নের ক্ষেত্রে যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না—কিন্তু তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কার্য্য হইতেছে রাসায়নিক ও পদার্থবিদ্‌গণের মধ্যে একটি সহজ যোগসূত্র সংস্থাপন। রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম নামক মৌলিক ধাতুর রশ্মি-বিকীরণের (radio-activity) ন্যায় একটি আশ্চর্য্য ক্ষমতার কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া, তাঁহারা পরমাণুর গঠন-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অদ্যাবধি বিশ্বের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ—রসায়নবিদই হউন বা পদার্থবিদই হউন—পরমাণুর কত বিচিত্র রূপেরই না সন্ধান দিতেছেন! ডালটনের পরমাণুবাদ যেস্থানে ছিল নির্ব্বাক্—আজ সেখান হইতে আসিতেছে প্রকৃতির আহ্বান। মানুষের "কাঙ্গাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে", সেখানে বিংশ শতাব্দীর রাসায়নিক করিতেছে আলোকসম্পাত। বস্তুতঃ আজিকার দিনে অজৈব রসায়নের প্রধানতম লক্ষ্য হইতেছে পরমাণুর গঠন-তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ। মানুষের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া যে পরমাণু বিপুল বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া আসিতেছিল, তাহার পরিপূর্ণ রূপ রাসায়নিক মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সুস্পষ্ট ফুটিয়া না উঠিলেও, যতটুকু সন্ধান তার মিলিয়াছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই মানুষ যাত্রা করিয়াছে নিত্য নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারে। ১৮৯৬ সালে কুরীদম্পতি যে বিস্তীর্ণ গবেষণার ক্ষেত্র আবিষ্কার করেন, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে রেডিয়াম, পোলোনিয়াম প্রভৃতি মৌলিক ধাতু আবিষ্কার করিয়া তাঁহারা তাঁহার ন্যায্য মূল্য দান করেন। আর ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদেরই কন্যা-জামাতা জোলিও-দম্পতি যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহার মূল্য কত দূরপ্রসারী, এই স্বল্প কালের মধ্যেই তাহারও একটা আভাস পাওয়া যাইতেছে।

এই স্থানে পরমাণুর গঠন-তত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের আজিকার ধারণার বিষয় দুই একটি কথা বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরাজ রাসায়নিক ডাল্‌টন প্রথমে আবিষ্কার করেন—প্রত্যেক পরমাণুর একটা নির্দ্দিষ্ট ওজন আছে এবং বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন প্রকার অর্থাৎ একই মৌলিক পদার্থের পরমাণু একই প্রকার এবং এই সকল পরমাণুর একত্র সম্মিলনেই গড়িয়া উঠিয়াছে পদার্থটির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ। বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিকের ধারণা পরমাণুর ওজনের পরিমাপ হইতেছে প্রোটন। পরমাণুর ওজন ২৩ বলিলে, একদিকে ডালটনের তথ্য অনুসারে যেমন বুঝিতে হইবে—পদার্থটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা ২৩ গুণ ভারী; অন্যদিকে আধুনিক তথ্যের নির্দ্দেশানুসারে মনে করিতে হইবে যে, পরমাণুটি ২৩টি প্রোটন ও ২৩টি ইলেকট্রণ সমবায়ে গঠিত। বৈজ্ঞানিকগণের মতে এই প্রোটনগুলি ওজনবিশিষ্ট ধনতড়িৎ-কণিকা। কয়েকটি ওজনবিহীন ঋণতড়িৎ (electron) (প্রোটনের ন্যায় অর্দ্ধেক) লইয়া এই প্রোটনগুলি একটি কেন্দ্রে অবস্থিত। পরমাণুর এই কেন্দ্রটি সমসংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রণের সমবায়ে গঠিত না হওয়ায়, ইহাতে একটা বৈদ্যুতিক সংস্পর্শ (electric charge) থাকিয়া যায়।

এই বৈদ্যুতিক সংস্পর্শের পরিমাণের উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে পরমাণুটির বৈশিষ্ট্য। মূল পরমাণুটি কিন্তু বৈদ্যুতিক সংশ্রববিহীন। পরমাণুটিকে বৈদ্যুতিক সংশ্রববিহীন করিতে যতগুলি ইলেকট্রণ প্রয়োজন, ঠিক সেই কয়টি ইলেকট্রণ আবার পূর্ব্বোক্ত কেন্দ্রটিকে মধ্যে রাখিয়া ডিম্বাকৃতিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। এক কথায় বলিতে গেলে এক একটি পরমাণু এক একটি স্বতন্ত্র সৌরজগৎ। সমস্ত জগতের ক্ষুদ্রতম অংশটিও তাই সৌরজগতের অনুকরণে গঠিত বলিলে কোনই ভুল হইবে না। কোন উপায়ে বাহির হইতে একটি ইলেকট্রণ সরিয়া গেলে বা পরমাণুটির বহিরাবরণে ঢুকিয়া পড়িলে, ইহার কতকগুলি

গুণ পরিবর্ত্তিত হয় বটে; তবে মূলতঃ পরমাণুটির কোন পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় না। কিন্তু যদি মূল কেন্দ্র হইতে একটি ইলেকট্রণ বা প্রোটন কোন প্রকারে সরাইয়া দেওয়া যায়, তবে সম্পূর্ণরূপে একটি নূতন পদার্থের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। সুদীর্ঘ কালের অকপট সাধনায় বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের কোণে বসিয়া এই ভাবে পদার্থ হইতে পদার্থান্তর সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার অক্লান্ত সাধনায় আজ বালি হইয়াছে—ফস্ফরাস, পারদ হইয়াছে সোণা।

লোভী মানুষ মাটির বুক ছিঁড়িয়া সোণা তুলিয়াছে—লোভ কমে নাই; পরশপাথর খুঁজিয়া প্রাণ দিয়াছে, তবুও সোণার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। লোহা তাহাকে ক্ষুধার অন্ন দিতেছে, পরিধানের বসন যোগাইতেছে, আত্মরক্ষার শক্তি দিয়াছে, তবুও লোহা তাহার কৃতজ্ঞ দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে পারে নাই। সে অকম্পিত স্বরে চাহিয়াছে, হায় এমন কি হয় না "লোহার কবচ ঢুটি সোণা হ'য়ে ওঠে ফুটি!" পরমাণুর রূপ-বৈচিত্র্যের আভাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই কুরি জোলিও চেষ্টা করিয়াছেন—কি করিয়া এক মৌলিক পদার্থকে অন্য মৌলিক পদার্থে পরিণত করা যায়। বিংশ শতাব্দীর রাসায়নিক আজ সে সন্ধান পাইয়াছে—তাহার সে অক্লান্ত সাধনা আজ সফল হইয়াছে। শুধু তাই নয়, প্রকৃতি মাত্র কয়েকটি মৌলিক পদার্থে যে অদ্ভুত (radio-activity) রশ্মিবিকীরণের ক্ষমতা দিয়াছেন রাসায়নিক আজ তাঁহার অপরিসর পরীক্ষাগারে বসিয়া নির্ব্বিচারে সকল পদার্থেই সেই শক্তি সঞ্চারিত করিয়া প্রকৃতিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া দিয়াছেন।

মৌলিক পদার্থগুলি বিভিন্ন পরিমাণে পরস্পর সংযোজিত হইয়া বিভিন্ন যৌগিক উৎপন্ন করে, ইহা অতি আদিম কাল হইতেই রাসায়নিকের জ্ঞানগোচর ছিল। পদার্থগুলির পরস্পর মিলনে একটি সূক্ষ্ম নিয়ম বর্ত্তমান আছে। সময়ে সময়ে অবস্থাবিশেষে একই পদার্থ অন্য একটা মৌলিক পদার্থের সহিত বিভিন্ন পরিমাণে সংযুক্ত হইতে পারে। জল ও হাইড্রোজেন পেরক্সাইডের উদাহরণ হইতে ইহা সহজেই বোঝা যাইতে পারে; কিন্তু পদার্থের মিলন-বৈচিত্র্যের ইহাই চরম উদাহরণ, এরূপ মনে করা হইলে ভুল করা হয়। রাসায়নিক যৌগিক প্রস্তুত করিতে বসিয়া শুধু সাধারণ যৌগিক প্রস্তুত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—জটিল যৌগিক (Complex Compounds) সৃষ্টি করিয়া তাহাদেরও গুণ ও প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর অজৈব রসায়নচর্চ্চার আর একটি বিশিষ্ট ধারা হইতেছে—জটিল যৌগিকের সৃষ্টি, তাহার প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যনির্দ্ধারণ, সংশ্লিষ্ট মৌলিক পদার্থগুলির আকর্ষণ ও বন্ধন-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বিবিধ তত্ত্ব নিরূপণ।

এই স্থানে পদার্থের এই বিচিত্র মিলনক্ষমতার আবিষ্কারক জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক অ্যালফ্রেড্ হ্বার্ণারের (Alfred Warner) বিচিত্র জীবন-কথার সামান্য অবতারণা করা হয়ত অসঙ্গত হইবে না। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর মাল-হাউসের জনৈক দরিদ্র কারখানা-পরিদর্শকের গৃহে আলফ্রেড হ্বার্ণার জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকিতেই হ্বার্ণার রসায়ন-শাস্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং রসায়নচর্চ্চার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে এতদূর বদ্ধমূল হইয়া পড়ে যে, বালক হ্বার্ণার স্বীয় প্রতিবেশীদিগের গৃহে কাঠ কাটিয়া অর্থসংগ্রহ করিয়া একটি পরীক্ষাগার স্থাপন করেন। ১৮ বৎসর বয়সে কিশোর হ্বার্ণার স্বীয় তথাকথিত গবেষণার ফল অধ্যাপক নোয়েলটিংকে দেখাইয়া প্রশ্ন করেন "অধ্যাপক হইতে আমার আর কতদিন লাগিবে?" প্রবীণ অধ্যাপক পর্য্যাপ্ত সহানুভূতি অথচ যথোচিত সতর্কতার সহিত এই উচ্চাভিলাষী যুবককে উৎসাহদান করিলেন। ১৯ বৎসর বয়সে হ্বার্ণার এক বৎসরের জন্য সৈন্যদলে স্বেচ্ছাসেবকরূপে কার্লরুহে নগরে বাস করিতে গেলেন এবং তত্রত্য টেক্‌নিক্যাল স্কুলে শিক্ষালাভ করিবার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ গ্রহণ করিলেন। স্বেচ্ছাসেবকরূপে কার্য্যকালে হ্বার্ণার অনেক সময়ে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার প্রাসাদে রক্ষীর কার্য্য করিয়াছেন; তাই পরবর্ত্তীকালে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া সুইডেনের রাজমহিষীরূপে হ্বার্ণারের হাতে যখন নোবেল পুরস্কার তুলিয়া দেন, তখন হ্বার্ণার জিজ্ঞাসা করেন—বাল্য-জীবনের সেই প্রাসাদরক্ষীকে রাণী চিনিতে পারিয়াছেন কি না?

২০ বৎসরের যুবক হ্বার্ণার জুরিকে অধ্যাপক লুঙ্গে, হ্বান্সা ও ট্রেড্‌ওয়েলের অধীনে শিক্ষা লাভ করিতে আসেন। শ্রমতৎপর এই যুবক সর্ব্বাগ্রে পরীক্ষাগারে আসিতেন এবং সর্ব্বশেষে পরীক্ষাগার ত্যাগ করিয়া যাইতেন। শেষ পর্য্যন্ত হ্বার্ণার জুরিকেই অধ্যাপকরূপে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে হ্বার্ণার নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। দীর্ঘ ৫ বৎসর দারুণ রোগযন্ত্রণা সহ্য করিয়া হ্বার্ণার ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর ধীরভাবে মৃত্যু বরণ করেন।

হ্বার্ণার জীবনে গবেষণা করিবার খুব বেশী সময় পান নাই। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অজৈব রসায়নক্ষেত্রে যাহা দান করিয়াছেন, পরবর্ত্তীকালের বৈজ্ঞানিকগণ তাহার সুষ্ঠু ব্যবহারের দ্বারা রসায়ন-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি করিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক সমাজ তাঁহাদের গবেষণার বহু বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রকে আপন রুচি ও প্রয়োজনানুসারে বিবিধ ভাগে বিভাগ করিয়া লইয়া সাধ্যানুসারে স্ব স্ব গবেষণা পরিচালন করিয়াছেন, ইহা সকলেই জানেন। দুঃখের বিষয়, অতি অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তাঁহাদের পরস্পর কোন যোগসূত্র পাওয়া যায় নাই। পরমাণুর গঠন-তত্ত্ব সম্বন্ধে সামান্য মাত্র জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াই তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন—এই প্রকার নিঃসঙ্গ যাত্রা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। আজ তাই পদার্থবিদ্‌ এবং রসায়নবিদ্‌ একত্র প্রকৃতির রহস্যোদ্ঘাটনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

সম্পূর্ণ সার্থকতায় বৈজ্ঞানিকের প্রাণান্ত পরিশ্রম আজও পুরস্কৃত হয় নাই—বিফলতার মধ্য দিয়াই চলিয়াছে তাহার বিজয়াভিযান, প্রত্যক্ষ ফল হয়ত বা তাহার প্রচেষ্টাকে লোকপ্রিয় করিতে পারিয়াছে, হয়ত বা পারে নাই—তবুও আশু ফলকে মুখ্য না করিয়া সে তত্ত্বানুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। নীরস তত্ত্ব কবে কত যুগ পরে তাহাকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিবে কে জানে—প্রকৃতি কবে তাহার রহস্যময় অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া সোনার কাঠির সন্ধান দিবে, তাহা নির্দ্ধারিত করিবে অনাগত কালের মানুষ, সে অবগুণ্ঠন আদৌ উন্মোচিত হইবে কি না তাহাও নিঃসংশয়ে বলিবার সময় আজও হয় নাই।

# মন্দিরে এস একবার

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বট-বিল্ব বিটপীর ছায়ে তপঃসিদ্ধ পল্লী দেবালয়
ভগ্ন প্রাণে কণ্টকিত পথে তৃণাচ্ছন্ন অশ্রুসিক্ত রয়,
আঙ্গিনায় অতীতের লক্ষ স্মৃতি তার দুঃখেতে বিলীন,
বেদনায় মৌন বন-বীণা, বনেশ্বরী জীবন-বিহীন।
মন্দিরের যজ্ঞ-শিখা হ'তে জীবনের জেগেছিল গান,
এ প্রাচীন মন্দিরের ছিল শ্রেষ্ঠ ধন—ভক্ত ভগবান,
এস চিত্ত-দেবালয়ে করিয়া প্রণাম, ক্লান্তি অবসাদ
রাখি' দূরে করি আরাধনা।
থাক্‌ আজ শঙ্খ ঘণ্টানাদ,
সংসারের সর্ব্ব কোলাহল সর্ব্ব দ্বন্দ্ব থাক্‌ দূরে তব;
সৈকতিক! রক্ত শতদলে সাজাইয়া পুষ্প-অর্ঘ্য নব

দক্ষিণের অলক্ষ্য পরশে অনন্তের অন্তরের ধ্বনি
শোনো আজ। সে ধ্বনির মর্ম্মকোষে মন্ত্র অনুরণি'
যে বাণীরে কর্ণে দিবে তব, তুমি তার ধ্যানের স্বপনে
ডুবে যেয়ো গভীর পুলকে বাণীহীন স্তব্ধতার সনে।
একদিন মুক্তির সোপান দেখো হেথা আসে কোথা হতে!
ভগ্ন সোপানের বক্ষ স্তূপে জ্বালো দীপ জনহীন পথে।
এ পূজায় দিতে হবে বলি আত্ম-পশু কালের কল্যাণে,
মৃত্যুম্লান মৃত্তিকায় বসি এস আজ রহি রুদ্র ধ্যানে।

শান্ত সৌম্য স্তব্ধতায় রহ। লহ শুভ্র ললাটে তোমার
রাগরক্ত চন্দনের লেখা,—এ মন্দিরে এস একবার।

# স্থানীয় উপভাষা বাঙ্গালা সাধু-ভাষায় প্রচলনের অপচেষ্টা

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়

একটী দেশের লিখন-পঠনের ভাষা এক হইলেও, সেই দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের কথিত ভাষার মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। প্রায়শঃ দেশের রাজধানী অঞ্চলের ভাষাই মার্জ্জিত হইয়া সমগ্র দেশে লিখন-পঠনের জন্য ব্যবহৃত হয়; যেমন কলিকাতা অঞ্চলের কথিত ভাষা কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশে পুস্তক, পত্রিকা এবং পত্রাদি লিখায় ব্যবহৃত হইতেছে। দিল্লী অঞ্চলের কথিত ভাষার সহিত ভারত-বিজেতা আফগান বা পাঠানগণের পশতু বা পষতু ভাষা এবং পার্শী বা আরবী, তুর্কী প্রভৃতি ভাষার শব্দ মিশ্রিত হইয়া উর্দ্দু অর্থাৎ মুসলমান ছাউনির ভাষা উৎপন্ন হয়। তাহাই পশ্চিম ভারতের অনেক প্রদেশে বহু শতাব্দী ধরিয়া লিখন-পঠনে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এইরূপে প্রত্যেক দেশেই রাজধানী অঞ্চলের ভাষা সাধুভাষা এবং সেই দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ভাষা হীন বা অপভাষা মনে করা হয়। ইংলণ্ডে লণ্ডন অঞ্চলের ইংরাজীকে মার্জ্জিত করিয়া 'King's English' বলা হয়। আর ইয়র্কসায়ার, নিম্ন স্কটল্যাণ্ড প্রভৃতির ভাষা হেয গণ্য হয়। সেইরূপ আমাদের দেশে বাঁকুড়া, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষা ঘৃণিত ও উপহাস্য ও কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা আদরণীয় বলিয়া ধরা হইতেছে। যদিও ইহাই ভাষা সম্বন্ধে সর্ব্বসম্মত অভিমত তথাপি এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলের ভাষা অপেক্ষা ভাল বা মন্দ বলার হেতু তেমন নাই। যাহারা .য ভাষায় অভ্যস্ত—যে ভাষা যাঁহার মাতৃভাষা অর্থাৎ মায়ের মুখ হইতে শিক্ষিত তাহা তাঁহার নিকট প্রিয় এবং তাহাই তাঁহার ভাল লাগে। এজন্য কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা তদঞ্চলবাসীদের নিকট নিশ্চয় ভাল লাগিবে কিন্তু উহা যে চট্টগ্রাম বা রংপুরে নিরক্ষর পল্লীগ্রামবাসীদের নিকট ভাল লাগিতেই হইবে এইরূপ কোন কারণ নাই। তবে রাজধানীর ভাষাতে পুস্তক পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ায় আবাল্য এমন কি আশৈশব বঙ্গের সমস্ত অঞ্চলের লোকেরা উহা অভ্যাস করার ফ'ল বঙ্গবাসী মাত্রেরই উহা মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। উপরে যাহা লিখিত হইল তাহার কিছু কিছু ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয। যথা:—বরিশাল অঞ্চলের "করিয়া" "খাইয়া" ইত্যাদি বাংলার লিখন-পঠনের ভাষায় প্রচলিত অথচ কলিকাতা অঞ্চলের কথিত "ক'রে" "খেয়ে" ইত্যাদি বঙ্গের লিখিত বা সাধু-ভাষা বলিয়া গণ্য হয় নাই। কিন্তু আজকাল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কলিকাতা অঞ্চলের অপভাষা "গেলুম" "খেলুম" ইত্যাদ পুস্তকাদিতে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার পর হয়ত ঐ অঞ্চলের "গেনু", "খেনু"ও চালাইবার চেষ্টা চলিতে পারে—ইহা ভাবিয়া আতঙ্কিত হইতে হয়। এ সকল অপচেষ্টা লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখকগণের জুলুম ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ "গেলুম", 'খেলুম", যদি সাধু-ভাষা বলিয়া চলিতে পারে তবে পূর্ব্ববঙ্গের "করুম", "খামু" প্রভৃতি কি দোষ করিল? ফলে কবিসম্রাটের এইরূপ জুলুমের প্রতিবাদ স্বরূপ কলিকাতা প্রবাসী পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্র ছাত্রীগণ কেহ কেহ "করুম", "খামু" ইত্যাদি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা আশা করা অসঙ্গত নহে যে, কবিসম্রাট ও তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ এবং উপরোক্ত বিদ্রোহী ছাত্র-ছাত্রীরা অপশব্দগুলি বর্জ্জন করিবেন।

সকলেই জানেন, ভাষার একতাই একজাতীয়তার কষ্টিপাথর। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপের নানা দেশের লোক যাইয়া বসবাস করিয়াছে। কিন্তু তাহারা সকলেই ইংরাজীর সাধুভাষাতেই লিখন-পঠন করিয়া থাকে এবং যতদূর সম্ভব কথায় বার্ত্তায়ও তাহাই ব্যবহার করে। "Americanism" বলিয়া যে কোন কোন শব্দের বিশেষ ব্যবহার আমেরিকায় প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নগণ্য। ফলে সমস্ত উত্তর আমেরিকা অর্থাৎ কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে ইংলণ্ডের সাধু-ভাষাই চলিতেছে এবং তাহাই দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অন্যান্য স্থানের মধ্যে ঐক্যসূত্র ও মৈত্রীর বন্ধন। একখানি পুস্তক বা পত্রিকা লণ্ডনে প্রকাশিত হইলে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই তাহা চলে। মৈত্রীর আশাতেই ইংরাজ ভারতে ইংরাজী ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে প্রচলিত করিয়াছেন এবং ঐক্যের আশাতেই ভারতীয় রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিকগণ হিন্দী বা উর্দ্দুকে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা করার প্রয়াসী। অতএব, যে সাধু বঙ্গভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কাহারই হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। উহাই বাঙ্গালী জাতির একত্বের মূল সূত্র হইয়া থাকুক। ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় কথিত ভাষাগুলিও ঐ সাধু-ভাষার অনুরূপ হইবে। আমরা সেই সুবর্ণ যুগের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

# সংস্কৃতির সংঘর্ষ

( নাটিকা )

শ্রীমতিলাল রায়

### প্রথমাঙ্কের নাট্যোল্লিখিত পাত্রগণ

অঙ্গরাজ—হিমবর্ষের রাজা
বেণ— ঐ পুত্র
মৃত্যুদেব— ঐ মাতামহ
মন্ত্রী, বিপ্রগণ, ভৃত্যগণ, বন্দীগণ প্রভৃতি

## প্রথম অঙ্ক

### রাজপ্রাসাদ

( অঙ্গরাজ ও মন্ত্রী )

শুন হে রাজন !
অধৈর্য্যের নাহি প্রয়োজন।
মরীচি, পুলস্ত্য, ক্রতু,
ভৃগু, অত্রি বংশের গৌরব,
তব সভাসদ, শিক্ষাক্ষেত্রে
বৃহস্পতি সম
সুবিজ্ঞ আচার্য্য সদা
সুনীতি প্রচার করে।
সুশিক্ষাই লভিবে কুমার।
অজ্ঞানতা হবে দূর।
উচ্ছৃঙ্খল যৌবনস্বভাব
পঙ্কিল না রবে চিরদিন।
ধৃতি, ক্ষমা, অহিংসা, সদ্‌গুণ
অপূর্ব্ব চরিত্রবল
লভি' অনায়াসে
সদাচারী হইবে কুমার।
পরিতাপ বৃথা নরনাথ।

অসহ্য হয়েছে মন্ত্রী !
জান তুমি ভাল মতে—
পঞ্চম মনুর রাজ্য
হলে অবসান,
এই পুণ্য হিমবর্ষে
আকূতির গর্ভে জন্মে
চক্ষু নরপতি।
তাহার তনয়
ষষ্ঠ মনু বিদিত ধরায়—
আর্য্যধর্ম্ম প্রবর্ত্তিল পুনঃ,
দিল লোকে নব ধর্ম্মবিধি।
পিতামহ তিনি মম।
আজি হের পুত্রের পীড়নে
আর্য্যধর্ম্ম যায় রসাতলে।
বেণের দৌরাত্ম্যে,
ক্রুদ্ধ মুনিগণ ;
প্রজাগণ আতঙ্কিত অতি—
পুত্রে দেয় মৃত্যু অভিশাপ।
পুত্রকাম যজ্ঞ করি'
লভিলাম তনয় সুন্দর,
সেই পুত্র ধর্ম্মবিধি
করি' অতিক্রম,
অধর্ম্ম ডাকিয়া আনে।
বুঝায়েছি শত বার
কিন্তু নীতি হের বিধাতার—
কুলধর্ম্ম ত্যজি' অবহেলে
মাতামহে হয় অনুগামী।
অধর্ম্মের অবতার—
মৃত্যুনামা শ্বশুর আমার
দৌহিত্রেরে করে ধর্ম্মদ্রোহী।
বেণ কুসন্তান।
বিবেক সঙ্কেত হেয়—
পুত্রের বর্জ্জন,

নয় রাজ্য বিসর্জ্জন।
কিন্তু স্নেহ নীচগামী ;
থাক পুত্র—রাজ্যত্যাগ
করিব নিশ্চয়!

মন্ত্রী— ভাগ্যহীনা ভারতজননী!
যুগ যুগ ভারতের প্রাণ
দিতে চাহে রাষ্ট্রবীর্য্যে
অটল আসন—
আর্য্যশিক্ষা-সাধনা সহায়ে।
বিশুদ্ধ রাষ্ট্রের ভিত্তি
রক্ষিতে সতত
মুনি-ঋষি করিল যতন—
নীতি-বিধি অসংখ্য রচনা।
কিন্তু যত ক্ষত্র নরপতি
রাজ্যের গৌরব-সূর্য্য
মধ্যাহ্ন-গগনে তুলি'
বৈরাগ্যের লইল আশ্রয়।
পতিহীনা নারী সম
অনাথিনী, উপেক্ষিতা ভারতজননী।
ঋষভ হইতে ধ্রুব,
পুত্র তার উৎকল অবধি,
রাজলক্ষ্মী, রাজাসন,
ত্যাগধর্ম্মে দিল বিসর্জ্জন
রাষ্ট্ররক্ষা ব্রাহ্মণ করিল ;
বৎসরকে দিল রাজ্যভার—
বংশে যাঁর জনমিল
যুগস্রষ্টা ষষ্ঠ মনু।
পৌত্র তার তুমি হে রাজন্,
ধরণীর অধীশ্বর,
বনবাসে যাবে পুত্র হেতু ?
পুত্র হতে প্রজা কি অধিক নহে ?
প্রজার পালন
ঈশ্বর-সেবন ;
রাজ-সিংহাসন
তাই এত গৌরবের ।
দারা-পুত্র, ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগ
রাজধর্ম্ম নহে মহারাজ।

রাজা— নিঃসন্তান তুমি মন্ত্রী।
বুঝিবে না, হলে কুসন্তান,
পিতার যন্ত্রণা কত!
প্রজার পালন ধর্ম্ম মম।
কিন্তু যদি প্রজাকুল
উৎপীড়িত হয় পুত্র হেতু,
সিংহাসন ধর্ম্ম নহে,
আত্মার বন্ধন শুধু।
রাজ্য-ধনে নাহি প্রয়োজন!
কুসন্তান শোকস্থান সদা।
পুত্র যত করে অত্যাচার
অব্যর্থ নির্দ্দেশ বিধাতার—
যেন বলে নির্ব্বেদ করিতে লাভ।
রাজ্যত্যাগ পাপমুক্তি হেতু।

( আহত গাভীকে লইয়া জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ )

ব্রাহ্মণ— মহারাজ! মহারাজ!
রাজ্য ছাড়ি' যাইতে হইল।
মেষাদি পশুর যথা
রক্ষক অভাবে—
যত ভয় বৃক-ব্যাঘ্র হতে ;
খর্ব্ব হলে রাজার প্রভাব
প্রজাপুঞ্জ যেরূপ আশঙ্কা করে ;
দস্যুদল হতে—
ততোধিক আতঙ্কিত মহারাজ,
কুমার বেণের অত্যাচারে।
হের রাজা! দুগ্ধবতী গাভী মোর,
অকারণে শরবিদ্ধ করে তারে।
গোরক্তপ্লাবনে
কলুষিত অঙ্গন আমার।
পুত্র-পরিজন
হাহাকার করি' কাঁদে।

রাজা— দেখ, দেখ মন্ত্রী!
কত অসহায় আমি!

হেব প্রজাকুল নির্য্যাতিত
আমার সন্তান হতে।
অহো ভাগ্য! পাপ-রাজ্যে
কিবা প্রয়োজন!
নারায়ণ, মুক্তি দাও মোরে।
(পুত্রকে লইয়া জনৈক ব্রাহ্মণ পিতার প্রবেশ)

পিতা— যে রাজ্যে রাজার পুত্র
প্রিয়তর প্রজা হতে—
সগর্জ্জনে বজ্র কেন
সেই রাজ্য ধ্বংস নাহি করে?
অভিযোগ প্রতিদিন হয়,
নীরব নৃপতি তবু—
প্রতিকার নাহি করে।
হের রাজা, নেহার সচিব,
পুত্র মোর জর্জ্জরিত
দুর্জ্জয় প্রহারে।
প্রাণটুকু আছে বাকি।
কাতর হৃদয়ে
বিচার প্রার্থনা করি।
পুত্র বলি' ক্ষমা
যদি কর মহারাজ,
বিদ্রোহী হইবে প্রজা।
গৃহহারা হই,
বংশনাশ যদি হয়,
ভয় নাই—মৃত্যুপণ
করিয়াছি মোরা।

মন্ত্রী— বন্দী তুমি, অশিষ্ট বাক্যের দায়ে।
জান তুমি অসতর্ক জন,
অগ্নির নিকটে যেবা যায়,
পরিত্রাণ নাহি তার,
শুধু সেই দগ্ধ হয়
অগ্নির প্রভাবে;
কিন্তু অসাবধানে
রাজার সম্মান যেবা নাশে,
রাজরোষে মরে সেই
সর্ব্বস্ব সহিত।
কুলে তার কেহ নাহি
রহে বাতি দিতে।
রাজার অপ্রিয় বাক্য
করি' উচ্চারণ,
রাজদ্রোহী তুমি,
সমুচিত শাস্তি পাবে।
রাজ্যেশ্বর কারাদণ্ড
দিবেন তোমারে।

রাজা— মন্ত্রি! রাজদণ্ড ধর্ম্মরূপে
প্রজাহিত করিবে বিধান।
স্বধর্ম্ম হইতে
বিচলিত যেই জন,
দণ্ড তার অবশ্য হইবে।
দণ্ড রাজা, দণ্ডই পুরুষ।
রাজশক্তি, রাজ্যের শাসন
দণ্ড বিনা কিছু নাহি।
কিন্তু সেই দণ্ড যদি
প্রজার সুখের
হেতু নাহি হয়,
দণ্ড যদি অবিচারে
প্রজাকুলে করে নির্য্যাতন,
প্রজার শাসন নহে তাহা।
রাজ্যনাশ দণ্ডই করিবে।
অপরাধী মম পুত্র।
দণ্ডবিধি সর্ব্বাগ্রে তাহার কর।

মন্ত্রী— ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য,
দেবতার সারভূত রাজা,
ধরায় জনম তাঁর
প্রজার রক্ষণ হেতু।
ঈশ্বরপ্রেরিত রাজা।
পৃথিবীশাসন ধর্ম্ম—
প্রকৃতি তাঁহার।
মর্ত্তলোক নহে তো নির্দ্দোষ;
রাজদণ্ড তাই রাজ-করে।

ভয়ে লোক ন্যায়পথে চলে।
এই ন্যায়দণ্ড যাঁর হাতে,
সামান্য মানুষ বোধে
প্রজা হতে তিনি যদি
হন অবজ্ঞাত,
দণ্ড দিতে হবে মহারাজ,
রাজদ্রোহী দুষ্ট জনে।

রাজা— মোরে প্রজা অবজ্ঞা না করে।
পুত্রধন আত্মার অধিক প্রিয়তর।
পুত্রের মমতা কত,
জানে পুত্রবান্।
পুত্রের ব্যথায় পিতা
মর্ম্মজ্বালা করেছে প্রকাশ—
অপরাধ নাহি তার।

মন্ত্রী— মহারাজ, দণ্ড, ক্ষমা
রাজার বিধান।
দুই তুল্য মম।
ক্ষমা যদি কর নরনাথ,
বলিবার কিছু নাহি আর।
কিন্তু শুন ভদ্র—
রাজপুত্র বেণ,
রাজরক্ত শরীরে তাহার,
রাজদণ্ড যথাকালে
শোভিবে তাহার করে।
অপরাধ তার নাহি লও।
ঈশ্বরের অবতার রাজা—
পুত্র তার, ঈশ্বরাংশ সেও;
অপরাধ সেথা গণ্য নহে।

রাজা— রাজভক্তি অতুলনা
আর্য্যধর্ম্মে; আর্য্যজাতি
তাই জগতে অতুলনীয়।
রাজপুত্র রাজা হবে,
এ যুক্তি অকাট্য যদি,
রাজ-রক্তে পাপিষ্ঠ কুমার
জন্মে কি কারণ?

মন্ত্রী— যৌবনের প্রথম প্রভাব
উপশম হলে,
রাজরক্তে রাজধর্ম্ম
অবশ্য প্রকাশ পাবে।

রাজা— এ বিধি শাশ্বত নহে।

মন্ত্রী— সংসার অনিত্য মহারাজ।
কিন্তু বিধি চির বলবান্।
রাজরক্ত হইলে দুর্ব্বল,
ব্রাহ্মণের আছে অধিকার—
যোগ্য জনে সিংহাসন দিতে।
কিন্তু অনর্থক সে কল্পনা আজি,
শুধু বুদ্ধি-ক্ষয়।
যুবরাজ হবে রাজা,
এই বিধি অকাট্য রাজন্।

রাজা— যদি তার হয় ব্যতিক্রম।

মন্ত্রী— ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া লবে
শক্তিধর রাজা রাজ্য হতে।

রাজা— প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ যদি হয়?

মন্ত্রী— সে দর্শন ব্রাহ্মণের আছে।
রাজ্যের শাসন-শক্তি
জন্মগত অধিকার যার,
সিংহাসন হয় তার;
ইচ্ছাধীন নহে রাজা।
স্বাধীন স্বতন্ত্র শক্তি
রাজা রূপে রাজদণ্ড ধরে করে।
প্রজাকুল অনুগামী হয় তার।

রাজা— যুক্তি অপরূপ!
রাজ্যভার ব্রাহ্মণের দায়।

মন্ত্রী— কর্ম্ম তার ধর্ম্মরক্ষা মহারাজ।
রাজা করে রাজ্যরক্ষা,
সহায় ব্রাহ্মণ চিরদিন।
ঈশ্বরবিধান ইহা।

(একদল ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

রাজা— মন্ত্রিবর, দেখ,
ঘটে পুনঃ কিবা অঘটন!

ব্রাহ্মণগণ—সর্ব্বনাশ হবে!
ছারেখারে যাবে রাজ্য।
মহারাজ, দুর্দ্দান্ত সন্তান তব।
শুধু অপমান নয়,
যজ্ঞ নষ্ট করিল কুমার!

রাজা শুন, শুন মন্ত্রী!
আমি লক্ষ্যহারা—
যোগ্য জনে সিংহাসন দাও।
গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষার কারণ
রাজ-দণ্ড ধরি করে;
পুত্র হতে দুষ্ট যায়—
রাজ্য মোর কণ্টক সমান।

মন্ত্রী— শুন বিপ্রগণ!
কথায় কথায়
রাজার নিকট যদি
আন অভিযোগ সবে,
আমি মন্ত্রী—প্রয়োজন
কিবা মম? চল সবে
মন্ত্রণাসভায়।
অপরাধ করে কেহ,
বিচারে প্রমাণ হবে।
রেখ মনে, মহারাজ
অঙ্গের তনয়
সাধারণ প্রজা নয়—
যুবরাজ আমাদের।
যদি কিছু হয় অপরাধ—
দণ্ড তার গুণগার হবে।

রাজা— যাও মন্ত্রী, সভাগৃহে;
কর ত্বরা যা হয় বিহিত।

মন্ত্রী— এস সবে, বিলম্বের
নাহি প্রয়োজন।

(রাজা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

রাজা— এই তো সংসার।
পুত্র-কামনায়
যজ্ঞেশ্বরে সেবিনু শ্রদ্ধায়;
যজ্ঞ-হবিঃ ভক্ষিয়া মহিষী
পুত্রধন করিল প্রসব।
কুকীর্ত্তি রটায় পুত্র।
ত্যাগ শ্রেয়ঃ, দুঃখময়
রাজ্যভোগ চেয়ে।
সিংহাসন শূন্য নাহি রবে;
ব্রাহ্মণ বাছিয়া লবে
যোগ্যজন রাজা রূপে।
থাক রাজ্য, প্রজাবর্গ,
পুরনারী—কিছু
নাহি চাহি আর।
নারায়ণ, অকপট
অশ্রু-অর্ঘ্য ধর,
দাও ঠাঁই চরণে তোমার।

(একদল প্রজার সবেগে প্রবেশ)

প্রজাগণ—মহারাজ। ঐ বেণ, ঐ বেণ—
কুমার তোমার
মৃত্যু ধনুর্ব্বাণ করে—
বধিবে এখনি প্রাণ!
প্রাণভিক্ষা চাহি নরপতি।

(বেণের প্রবেশ)

বেণ— হা, হা, হা, হা—লইয়াছ
পিতার আশ্রয়!
মনে কর—ঘুচিয়াছে
মৃত্যুভয়! ওরে ভীরু,
বনে বধি মৃগযূথ
অনায়াসে যথা,
সেইরূপ বধিব তোদের—
প্রাণ নিয়ে নাহি পরিত্রাণ। (শরনিক্ষেপ)

(একজন প্রজার পতন। সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল)

ব্রাহ্মণগণ—পরিত্রাণ নাই, পরিত্রাণ নাই—
'রাজ্য ছেড়ে' পালাও সবাই!

(সকলের পলায়ন)

রাজা— কি করিলি? নরঘাতী হলি?

বেণ— অকারণে নহে পিতা।

এরা নহে রাজভক্ত প্রজা।
স্বার্থ শুধু লক্ষ্য ইহাদের।
এক রাজা যাবে,
অন্য রাজা হবে,
উদাসীন সবে—
রাষ্ট্রের উন্নতি নাহি চাহে।
আছে নিজ আদর্শ অদ্ভুত—
জনগণ-হিত নাহি চায়।
কল্পিত দেবতা-জ্ঞান
করিয়া প্রচার,
ভারতের সত্য করে নাশ।
জ্বালি' যজ্ঞানল
প্রতারণা করে লোকে।
ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী এরা।
নিষ্কণ্টক রাজ্য চাই—
তার আগে—রাজ্যে যত
আছে বিপ্রজাতি,
সবংশে নির্ম্মূল করা
অনিবার্য্য প্রয়োজন বুঝি।
রাজ্যের বিস্তার হবে,
ক্ষুদ্র হয়ে থাকিব না আর—
ত্রিভুবন করি' জয়,
বিপুল সাম্রাজ্য
করিব স্থাপন।

রাজা- ধিক্ তোরে—কুমন্ত্রণা
কে দেয় তোমায়?
মম শিক্ষা নিষ্ফল সতত।
আমি প্রজাপতি—
পুত্র হয়ে অসম্মান
করিলি আমার?
কি নির্দ্দয় ব্যবহার।
অতি অসহায় আমি—
বিপ্ররক্তে প্রাসাদ রঞ্জিল!
কলঙ্কিত হইল জীবন।
প্রায়শ্চিত্ত আত্মবিসর্জ্জন!
এস হে আহত,
সেবা মোর করিবে গ্রহণ।

(আহত বিপ্রকে লইয়া রাজার প্রস্থান)

(মৃত্যুদেবের প্রবেশ)

বেণ— দাদু! দাদু!—

মৃত্যুদেব—অবিচল থেকো ভাই।
শিখিয়াছ যে কৌশল,
বিপ্রহীন হইবে ধরণী।
খেলিবার ছলে,
যত বিপ্র বয়স্য তোমার
একে একে করেছ নিহত।
আছে ভৃগু, মরীচি, পুলস্ত্য—
সুবিশাল ব্রাহ্মণ-সংহতি,
লভি' রাজসিংহাসন,
উচ্ছেদসাধন
সমূলে করিতে হবে।
ভারতের লুপ্ত কৃষ্টি
তবেই উজ্জ্বল হবে।

বেণ— দাদু, আজিও বুঝি না
ভাল—কি উদ্দেশ্যে
নিয়ন্ত্রিত কর মোরে।
ভবিষ্যৎ অন্ধকারে
কি বারতা রেখেছ লুকায়ে?
শুধু চলি অনুবর্ত্তী হয়ে।

মৃত্যুদেব—আনুগত্য প্রথম সোপান।
হের, তপন অচলে চলে—
বহে ধীর সান্ধ্য সমীরণ।
আর ঐ—ঐ শোন
ব্রাহ্মণের কণ্ঠে আস্ফালন—
অর্থহীন ঋক্ধ্বনি,
প্রবঞ্চনা করে লোকে।
বাক্য আছে, অর্থ নাই—
দুর্ব্বোধ্য ঝঙ্কার তুলি'
সম্মোহিত করে সর্ব্বজনে।
মূর্খ নর ভাবে—

দেবতা প্রসন্ন হবে,
ইষ্টলাভ করিবে সবাই।
চল ত্বরা যাই—
ব্রাহ্মণের কোশাকুশী,
কুশাসন যত,
বিসর্জ্জন দিতে হবে।
উদাত্ত কণ্ঠের বাণী
বলে রুদ্ধ কবি',
প্রকাশিতে হবে
জীবনের প্রচণ্ড প্রভাব।
বুঝাইতে হবে সবে
বিপ্র একমাত্র শত্রু
মানব ধর্ম্মের।

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

প্র'রী— যুবরাজ, প্রধানসচিব যাচে—
সভাগৃহে দর্শন তোমার।

বেণ— দাদু, কিবা প্রয়োজন মোরে?

মৃত্যু— প্রয়োজন—আজিকার
দিগ্বিজয়বার্ত্তা তব
অভিযোগ-রূপে
পৌঁছিয়াছে রাজসন্নিধানে,
বিচারের ভার
স্বয়ং সচিব বুঝি
করেছে গ্রহণ!
যাও ভাই—শির বেণ
উন্নত সদাই।
জনগণে করিয়া বঞ্চিত
আপনার স্বার্থবশে
যে জাতি রাখিয়া চলে
প্রাধান্য-মহিমা,
সেই ব্রাহ্মণের
সমূলে উচ্ছেদ-ব্রত
জীবন তোমার।

বেণ— শুন দাদু, আজিকার কথা।
গ্রামপ্রান্তে নির্ধন গৃহস্থ
কারুষের কৃষিক্ষেত্রে—
গাভী এক করিয়া প্রবেশ,
শস্য নষ্ট অবাধে করিল।
অধিস্বামী বিপ্র চুপে হাসে।
দরিদ্র কারুষ
ব্রাহ্মণের গাভী
নারে নিবারিতে
রাজদণ্ড-ভয়ে।
ক্ষেত্র নষ্ট করে যবে
বরাহের দল,
শরাঘাতে তারে যথা
বিতাড়িত করে ক্ষেত্রপাল,
আমি সেই মত
গাভীরে নিরস্ত করি
সুতীক্ষ্ণ শায়কে।
এই কর্ম্ম প্রথম আমার।
তারপর হেরি এক
ব্রাহ্মণকুমার—
গায়ত্রী জপিছে
বসি' নদীতীরে।
দৈববশে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
মাগধ আসিয়া পড়ে।
বিপ্রপুত্র করে তিরস্কার—
নীচকুলে জন্ম তার,
গায়ত্রীশ্রবণ-পাপ
কেমনে নাশিবে?
মাগধ কাঁদিয়া মরে।
আমি বলি—সমতুল্য
সকল মানব।
মন্ত্র যদি শ্রেয়ঃ দান করে,
অধিকার সর্ব্ব মানবের তাহে।
আমি যুবরাজ,
অবহেলে উপেক্ষিয়া মোরে,
কহে কটুভাষে—
নিরয়গমন ভালে

বিপ্রমান-নাশ হেতু।
প্রচণ্ড চপেটাঘাতে
বুঝাইলাম ব্রাহ্মণ-বালকে—
ক্ষত্রিয়-প্রসাদভোজী
বিপ্র নরাধম,
শ্রম যারা করি' আলম্বন,
জীবিকানির্ব্বাহ করে—
শ্রেষ্ঠ তারা বিপ্র হতে।

মৃত্যুদেব—উত্তম, উত্তম কর্ম্ম যাদুমণি।

বেণ— তারপর শুন দাদু!
শুনিলাম নিকট অরণ্যে
যজ্ঞকুণ্ড জ্বালি' বিপ্রগণ,
সম্বৎসর অগ্নিরে আহুতি দিবে।
আমি ভাবি—এত
ধন অপচয়!
রাজ্যমাঝে দরিদ্রের
সংখ্যা নাহি হয়;
যজ্ঞ পণ্ড করিব তাদের।
সঙ্গে মোর লয়ে
পার্ব্বত্য নিষাদ জাতি—
মহারঙ্গে যজ্ঞশালা করি ভঙ্গ।
ফেরুপাল বিপ্রজাতি
করে ছুটাছুটি।
সে কৌতুক না দেখিলে
বুঝিবে না, দাদু!

মৃত্যুদেব—সাধু! সাধু! তারপর?

বেণ— তারপর অপরাহ্নে,
একদল বিপ্রের তনয়
শ্বপচ হেরিয়া দূরে
কটু কণ্ঠে করে পরিহাস।
আমারে দেখিয়া ত্রাসে
ছুটে চলে প্রাসাদের দিকে;
মনে ভাবে—পিতৃ-সন্নিধানে,
আমা হতে পাবে পরিত্রাণ।
নির্দ্দয় প্রহারে
একজনে দিনু শাস্তি।
পিতা মোর ক্ষুণ্ণ অতিশয়।
বল দাদু, অন্যায় কি করেছি কিছু?

মৃত্যুদেব—উত্তম, উত্তম কর্ম্ম ভাই!
উপযুক্ত দৌহিত্র আমার।
ভাবতে মানুষ নাই,
বিপ্র শ্রেষ্ঠ, দেবতা-অধিক!
ক্ষত্রিয়ের সিংহাসন
দান ব্রাহ্মণের,
রাজদণ্ড নাম মাত্র
নৃপতির করে!
ব্রাহ্মণ শাসন করে—
যন্ত্রমাত্র ক্ষত্রিয় তাদের।
নিজ স্বার্থ করিতে রক্ষণ,
শাস্ত্রবিধি হের
নিজেরা রচনা করে।
রাজশক্তি করিয়া অধীন,
অবাধে প্রচার করে—
শাশ্বত ধর্ম্মের মূর্ত্তি
ব্রাহ্মণশরীর,
ত্রৈলোক্যের অধিকারী তারা।
ভোজ্য যাহা ব্রাহ্মণের,
যাহা পবিধেয়,
সব কিছু ক্ষত্রিয়ের
দানরূপে পায়—
তবু কহে, বিশ্বের ঐশ্বর্য্য
ব্রাহ্মণের অধিকৃত সব,
প্রতিগ্রহ ধর্ম্মরক্ষা হেতু।
আরও কহে নির্লজ্জের মত—
ব্রাহ্মণের শান্তি, তৃপ্তি
জগতের সুখের কারণ।
স্বার্থপর এই জাতি
নির্ম্মূল না হলে,
ভারতের রাষ্ট্রশক্তি
নিরঙ্কুশ নহে।

যাও তুমি, প্রধানসচিব ডাকে,
স্পষ্ট কণ্ঠে কহিও তাহারে—
যাহা করিয়াছ তুমি—
রাজ্যহিত, লোকহিত তরে তাহা।
নিষ্ফল বিচার।
রাজ-বক্ষ ধর শিরে—
অপরাধ গণ্য নাহি হবে।

(অভিনন্দন করিয়া বেণের প্রস্থান)

মৃত্যুদেব—ভারতের অনার্য্য সন্তান
তারা কি মানুষ নয়?
ছিল না কি তাহাদের ভাষা,
শাস্ত্র, সমাজ, সংহতি।
ধরি' আর্য্য নাম
যন্ত্রশক্তি করে পরাভূত,
ভারতের ইতিহাস দেয় মুছে।
কোথা গেল মাগধ প্রাকৃত ভাষা?
কোথা গেল আত্মজ্ঞান—
সৃষ্টির বিজ্ঞান,
ভারতের রাজনীতি?
কহিল—বেদ অপৌরুষেয়।
মূর্খ নর—অলৌকিকে
অদ্ভুত প্রত্যয়।
মানুষ কি বড় নয়
কল্পিত দেবতা চেয়ে?
ধিক্ হিমবর্ষবাসী,
স্ব-ধর্ম্ম ছাড়িয়া
কর ব্রাহ্মণ-সেবন।
কল্পিত ঈশ্বরবাদ
বেদে প্রবর্ত্তিত।
আরে বাপু, কোথা
ছিল বেদবাণী—
সাগরের তলে
যবে ছিল হিমালয়?
আর্য্য জাতি নহে
প্রথম মানব ভারতের,
আর্য্যভাষা নহে আদি ভাষা।
কেমনে বুঝাব নরে
এ সত্য বারতা।
কহে—আছে স্রষ্টা দুর্নিরীক্ষ্য,
প্রতারণা কি আছে অধিক আর?
অণু-পরমাণু মিলে
সৃষ্টিপ্রসারণ,
রচিয়া উঠিল বিশ্ব
আপন আনন্দে—
নর তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।
এই মহামানবের
সকল সন্তান
সবে তুল্যরূপে
সমুন্নত হবে।
ভেদাভেদ কিছু নাহি রবে।
রাষ্ট্রশক্তি থাকিলে সহায়,
সহজেই এই কর্ম্ম
হইত সাধন।
বন্যা সুনীথারে
অঙ্গরাজ্য এই হেতু দিনু।
নির্ব্বীর্য্য নৃপতি—
ব্রাহ্মণ-সেবক হয়।
দৌহিত্র আমার
সত্য ধর্ম্ম শিখিয়াছে ভাল।
আদিনাথ, তীর্থঙ্কর
মহর্ষি ঋষভ,
আশীর্ব্বাদ কর মোরে,
প্রচারিব সত্য ধর্ম্ম
নিখিল ভারতে।

(প্রস্থান)

(মন্ত্রী ও বেণের প্রবেশ)

মন্ত্রী— শুনহে কুমার।
এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ তুমি।
প্রজাহিত সাধিবে সতত।
প্রজা যদি রাজভয়ে

নিপীড়িত হয় সদা—
খর্ব্ব হবে রাজশক্তি।

বেণ— প্রজার অহিত কভু
করি নাই আমি।
বিপ্রজাতি নহে প্রজা।
প্রজারূপে ছদ্মবেশে
রাজারে শাসন করে।
ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষ তাই।
বিপ্রজাতি থাকিতে ধরায়
রাজদণ্ড বৃথা ক্ষাত্রকরে।
শক্তি যদি থাকে ব্রাহ্মণের,
রাজদণ্ড করুক ধারণ।
ক্ষত্রিয় সম্মুখে রাখি',
বৃথা কেন বিপ্রশক্তি
করে প্রবঞ্চনা!
ক্ষাত্রবল ছায়া মাত্র ব্রাহ্মণের।
আর হের সুবিপুল
মানব-সংহতি—
শূদ্র নামে হয় অভিহিত,
নহে কি এ ছল ব্রাহ্মণের?
শিক্ষা নাহি পায় তারা
শাস্ত্রের শাসনে;
দাসের কলঙ্কটীকা
ললাটে তাদের।
আর দেখ, ব্রাহ্মণের বেদ-রব
শূদ্র যদি শুনে,
শাস্তি তারে পেতে হবে
নিদারুণ অকারণে।
মানবের প্রতি কত দিন
এই অত্যাচার হবে।
যুগ যুগ প্রতিকার
কেহ নাহি করে।
উদ্বুদ্ধ আমার প্রাণ—
ব্রাহ্মণ-শাসন ধর্ম্ম মোর।
ইথে মোরে কর না বিমুখ।

মন্ত্রী— যুবরাজ! আমি বৃদ্ধ
ব্রাহ্মণ-সচিব,
ভাবিয়াছিলাম মনে—
প্রচণ্ড যৌবনপ্রাণ
ক্রীড়াচ্ছলে উপদ্রব করে।
কিন্তু আজ বুঝিলাম—
কর্ম্ম তব নহে
চপলতা তরুণের।
আছে পিছে সুনিপুণ
মস্তিষ্কচালনা,
প্রতি কর্ম্মে নিগূঢ় উদ্দেশ্য
সতত সাধন কর।
শুন নৃপ-সুত,
কহি হিতবাণী—
ব্রাহ্মণের শাস্ত্র
ধর্ম্ম অর্থ-কাম মোক্ষ হেতু।
নাহি তায় মানবের
ঐহিক কামনা-পূর্ত্তি।
কর্ম্মে ধরণীর অভ্যুদয়,
কর্ম্মে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়,
কর্ম্মবশে রাজা-প্রজা,
বর্ণচতুষ্টয়।
কর্ম্মের শৃঙ্খল
বিশৃঙ্খল নাহি হয়,
ব্রাহ্মণের শাস্ত্রবিধি
তারি প্রয়োজনে।
যুবরাজ, দেখ মনে
বিপ্রজাতি ধরে
স্রুক্ যেই করে,
হলে প্রয়োজন,
তরবারি সেই করে
করিবে ধারণ।
হীন-বীর্য্য বিপ্রজাতি
কদাচ না হয়।
তবু সে নির্ধন,

সর্ব্বহারা—ধন তার
মানবকল্যাণ।
তাই বিধি—প্রতিদিন
প্রত্যুষে উঠিয়া রাজা
শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-সেবা
করিবে নিয়ত,
ব্রাহ্মণের উপদেশ
করিলে পালন—
সর্ব্ব বিঘ্ন হয় বিনাশন,
দিগ্বিজয়ী হয় রাজা।
(ঘণ্টাধ্বনি হইল)
প্রথম প্রহর নিশি
হইল অতীত।
রাজকার্য্যে সমস্ত জীবন গেল।
রাজপুত্র, ধর
উপদেশ সচিবের।
ব্রাহ্মণের শাস্ত্র-বিধি
করিয়া আশ্রয়,
স্বরাজ্য শাসন কর।
রাখ দূরে তীক্ষ্ণ দণ্ডে
বিদেশী শত্রুরে।
অকপট ব্যবহারে
তুষ্ট কর আত্মীয়স্বজন।
ব্রাহ্মণের প্রতি সদা
হও ক্ষমাবান্।
শাস্ত্রমতে সুশাসনহেতু
উঞ্ছবৃত্তি করিবারে হয় যদি,
শ্রেয়ঃ কর তাহা।
সলিলস্থ তৈলবিন্দুসম
যশঃ তব বিঘোষিত হবে।
(প্রস্থান)

বেণ— প্রতি পদে শিহরিয়া উঠি—
সন্দেহে, সংশয়ে
বিমূঢ় হৃদয়।
কি করি, কি হয়,
রাজা যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হবে,
বিপ্র কেন শিয়রে বসিয়া রহে?
সংশয়! সংশয়!
কে যেন হাঁকিয়া কয়,
নাশ বিপ্র, চূর্ণ কর
যজ্ঞশালা ব্রাহ্মণের।
ভেঙ্গে দাও রাজ্যে যত
দেবতা-মন্দির।
যজ্ঞ, তপঃ কল্পনা কুহক—
প্রজাকুলে নির্ব্বীর্য্য করিয়া রাখে।
আপন প্রাধান্যহেতু
ক্ষাত্র জাতি গড়া ব্রাহ্মণের।
তুচ্ছ এই অধিকার।
হয় হোক রাজশক্তি বড়,
নয় শ্রেষ্ঠ বিপ্রজাতি—
প্রমাণ করিতে হবে
জীবনে আমার।
(প্রস্থান)
(রাজপ্রাসাদে নৈশ বাদ্য চলিতে লাগিল)
(মুক্তকেশ ও সামান্য পরিচ্ছদে রাজার প্রবেশ)

রাজা— ভগবান্! নিত্য মুক্ত তুমি।
নির্ব্বিকার, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ।
আমি জীব, জড়গুণাধীন।
রাজ-সিংহাসন
বন্ধনকারণ মম।
দেহ, পুত্র, কলত্র, সামর্থ্য
এই রাজধনাগার,
রমণীয় হিরণ্যপ্রাসাদ;
নিত্য কিছু নহে,
নহ মায়া-বিরচিত সব।
কুপুত্র বলিয়া দুঃখ,
সেও হেরি মায়া।
ভাবি আজ—সুসন্তান হতে
ভাল কুসন্তান।
মোহভঙ্গ হয় শীঘ্র করি'

কিছুই বুঝিতে নারি।
বিপ্র কি প্রজার জাতি?
রাজার অধিক শ্রেষ্ঠ
স্থান তাহাদের।
জ্বলে প্রাণ গৃহ-দুঃখে।
শান্তিবারি চাহি দীননাথ!
সকলি রহিল পড়ি'—
বিহরিব বনে বনে।
যাপিব যামিনী এলে,
পর্ব্বত-কন্দরে।
ফলমূলে রাখিব জীবন।
রাজভোগে নাহি প্রয়োজন।
চল মন, গোবিন্দচরণ স্মরি'।
সুনীথা! প্রেয়সি!
মহাতেজাঃ রহিল কুমার।
ছিলে মহিষী রাজার,
হবে রাজমাতা।
রাজসিংহাসন,
বুদ্ধিহীন—শাস্ত্রনীতি
করি' উল্লঙ্ঘন
অপরাধী আমি;
কর ক্ষমা—রাজা
আর নহি: আমি।
পথের ভিখারী—
প্রেমভিক্ষা ধর্ম্ম আজি হতে।

(প্রস্থান)

(নৈশবাদ্য তখনও চলিতেছে। চতুর্থ প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি হইল)

(বন্দীগণের প্রবেশ)

বন্দীগণের গীত

সুনীতিতনয় ধ্রুব জয় জয় জয় হে,
পরাভূত দেব-নর তব মহিমায় হে॥
ধ্রুবপুত্র উৎকল খ্যাত চরাচরে হে।
রাজ্য-ধন বিসর্জ্জন দিলে ধর্ম্মপ্রাণ হে॥
সিংহাসন করে লাভ বৎসর নৃপতি।
ছয় পুত্র মাঝে হন সুপর্ণ অধিপতি॥
ছুই পত্নী সুপর্ণের নাম প্রভা, দোষা হে।
দোষাগর্ভে জন্মে ব্যুষ্ট অতিপরাক্রম হে॥
ব্যুষ্টের ঔরসে জন্মে সর্ব্ববেত্তা চক্ষু হে।
চক্ষু হইতে চাক্ষুষ মনু বিদিত ভুবনে হে॥
নড়বালা মনু-পত্নী উন্মুখে প্রসবে হে।
অঙ্গরাজ-পিতা তিনি আমাদের রাজা হে॥
জয়, জয়, জয় হিমবর্ষ-অধিপতি হে।
সুপ্রভাতে গাহি জয়মহিমা তোমার হে॥

(উভয়ের প্রস্থান)

(দুইজন রাজভৃত্যের প্রবেশ)

১ম ভৃত্য—ঠিক্ দেখেছিস্। শৌচে যায়নি? গোঁসা ঘরে ঢোকে নি? এঁ্যা বলিস্ কি? ভোরে উঠে দেখলি? বলিস্ কিরে? রাজা নেই?

২য় ভৃত্য—না, না। মহিষী আঁতি-পাঁতি করে' দেখেছেন। এ ঘর, সে ঘর। রাজকুমারের পুরী পর্য্যন্ত খোঁজ হয়েছে—কোথাও নেই!

২য় ভৃত্য। তোর পিণ্ডি। রাজা কর্পূর নাকি? এ দিকে মহিষী, ওদিকে কুমার। পরিচারিকা, ভৃত্য, আত্মীয়-স্বজন, শান্ত্রী-পাহারা। গোলমরিচের গাদা! উপ্‌তেই পারে না। দরবারে যায়নি তো?

২য় ভৃত্য—পাদুকা পড়ে'। মেঝেয় মুকুট গড়াগড়ি। গলার মুক্তা-মালার ছড়াছড়ি। রাজার পোষাক সব মাটিতে পড়ে' কাঁদে। রাজা সরে' পড়েছে, এ আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারি।

১ম ভৃত্য—ঐ আস্‌ছে না? রাজার কুমীর-চোকো বুড়ো শ্বশুরটা! ঐ ব্যাটা কুচক্রী, সাধের নাতিকে নিয়ে কিছু একটা মতলব ভেঁজেছে নিশ্চয়। ঐ যে কুমারকে নিয়ে এই দিকেই আস্‌ছে। আয়, আমরা সরে' পড়ি।

(উভয়ের প্রস্থান)

(মৃত্যুদেব ও বেণের প্রবেশ)

মৃত্যুদেব—শুন ভাই বেণ,
জামাতা পালায়
বুঝি রাজ্যভয়ে!
অদ্ভুত বারতা
প্রভাতে প্রহরী দিল।
আমি নিঃসংশয়—
অঙ্গরাজ সরেছে নিশ্চয়।

বেণ— অহো মাতামহ !
আমি অপরাধী।

মৃত্যুদেব—বৃদ্ধ পিতা তব,
বাণপ্রস্থ আর্য্যধর্ম্ম।
অসম্ভব রাজ্যত্যাগ নহে।
এবে কর্ত্তব্য কঠোর তব।
গুরু রাজ্যভার
তোমারে লইতে হবে।
উপক্রুত ব্রাহ্মণ-সংহতি
বিপরীত করিতে চাহিবে।
অব্রাহ্মণ রাজকর্ম্মচারী যত
হবে বশীভূত—
ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী সবে
হইয়াছে মম ছলে।
এবে অনর্থক গণ্ডগোলে
নাহি প্রয়োজন।
শাস্ত্রবিধি অনুসারে
যুবরাজ হবে রাজা।
প্রতিবাদী কেহ নাহি হবে।
যদি কেহ প্রতিবাদ তুলে,
ব্রাহ্মণের সম্মানরক্ষণ
রাজধর্ম্ম বলি'
করিও ঘোষণা।
তারপর ভবিষ্যৎ তব হাতে।

বেণ— শুন মাতামহ,
কপটতা কেমনে করিব ?

মৃত্যুদেব—কপটের সাথে
কপট আচার বীরনীতি।
জান না কি ভাই,
মানবজাতিরে
ক্লীব করিয়াছে যারা,
শাস্তি তাহাদের
দিতে হবে সমুচিত।
জাতির উত্থান
রাজা যদি নাহি চায়,
জাতি-গর্ব্ব কে রাখিবে আর ?

বেণ— আতঙ্কিত প্রাণ—
ধৈর্য্যহীন পিতার বিরহে।
হিয়া মোর নহে স্থির।
হুতাশে কাঁদিছে ;
দুর্লক্ষণ হেরি চারিভিতে।

মৃত্যুদেব—জীবনের প্রতি
পরিবর্ত্তনের যুগে
ক্ষেত্র হতে ক্ষেত্রান্তরে
ধায় মানবের প্রাণ,
ঔদাসীন্য স্বভাব-প্রকাশ—
অকারণ নহে ভাই।
আমি তোরে আপ্রাণ প্রয়াস করি'
যে শিক্ষায় করেছি গঠন
সাম্যের সাধন তরে,
শ্রেণীশক্তি, ব্রাহ্মণপ্রভাব
ঘোরতর অন্তরায় তার।
উচ্চ নীচ কেহ নাহি রবে—
তুল্য অধিকার
সর্ব্বক্ষেত্রে, সর্ব্বকর্ম্মে।
জাতি-ধর্ম্ম নাই বিধাতার।
লহ বৎস, দীক্ষা সুমহতী—
আর্য্যধর্ম্মে দাও বিসর্জ্জন,
কর কেন্দ্র নিজ রাজ্যে—
বিশ্বধর্ম্ম পাইবে আশ্রয়।

বেণ— মাতামহ ! দাও দীক্ষা দাসে।

মৃত্যুদেব—আমি নহি দীক্ষাদাতা।
শুন বেণ, আর্য্যধর্ম্মে
চতুর্যুগ খ্যাত ধরাধামে।
সত্যেতে উত্থান ;
ত্রেতা ও দ্বাপরে
ধরি' পতনের ক্রম,
কলি অন্ধকারময়।
এই অন্ধ তমিস্রা বিদারি'—
পুনঃ হয় জীবের উত্থান।
এবে চাহে অভ্যুত্থান

মানব-চেতনা।
এই যুগধর্ম্ম
শুধু নহে ব্রাহ্মণের।
রাজর্ষি ঋষভ মতে,
উত্থান ও অনুত্থান
শুধু দুই যুগ।
চতুর্ব্বিংশতি জন
নিত্য জিনদেব
নব-ধর্ম্মে দীক্ষা দেন তাঁরা।
এস মোর সনে,
মম পুরে আদিনাথ জিনধর্ম্মী,
গোপনে করিছে বাস
তোরে দীক্ষা দিতে।
এ স্বজন নহে মরীচিকা,
মুক্তি নহে ঈশ্বর-করুণা।
নিত্য মর্ত্ত্যে শাশ্বত জীবন।
লহ দীক্ষা বেগ।
শ্রেণীর পীড়নে শ্রেণী—
ধর্ম্ম নামে হয় নিপীড়িত।
রাজদণ্ড ধরি' করে—
নব-যুগ প্রবর্ত্তন
কর ধরণীতে।
ঐ উষা রক্ত থালি হাতে—
ললাটে পরায়ে দিবে
বিজয় সিন্দুর।
আজি হতে সিংহাসন
তোমার অধীন,
দীক্ষা তাই দিব ত্বরা করি'।

(উভয়ের প্রস্থান)

(আগামীবারে সমাপ্য)

# জন্মাষ্টমী

শ্রীননীগোপাল ঘোষ

সেদিনও এমনি ভাদ্র মাসের আর্দ্র ধরণী 'পরে,
দুর্যোগ রাতে জনম লভিলে আঁধার কারার ঘরে।
নারকী কংস ভেবেছিল মনে বধিবে তোমারে ঠিক,
দাম্ভিক রাজা আপন গর্ব্বে হারায়ে দিখিদিক্।
সত্য দানিল মুক্তির আলো সত্যাশ্রয়ী জনে—
এ ধরণী 'পরে আসিলে গো তুমি যে মহা লগন-খনে।
তোমারে ভাবিয়া নাশিবে যেমনি অন্য শিশুরে আনি,
বিস্ময়ভরে শুনিল সহসা সে এক দৈববাণী।
"শোন্‌রে নিঠুর, দয়ামায়াহীন, তোমারে বধিবে যেই,
তোমার কৃপাণ হ'তে বহু দূরে গোকুলে বাড়িছে সেই।"
তারপর, তব বৃন্দাবনের কথা আজ পড়ে মনে,
যার মাঠে বাটে করিয়াছ খেলা ব্রজের বালক সনে।
কদম্ব-তলে নিতি কত ছলে বাজায়ে মোহন বেণু,
মুরলীর তানে বাধা নাহি মানে ছুটিয়া এসেছে ধেনু;
যমুনার জলে সাঁঝের বেলায় কত না চাতুরি করি',
করিয়াছ কেলি আপনায় ভুলি' লয়ে গোপ-সহচরী।
চুরি করি' কত ক্ষীর-সর-ননী খেয়েছ গোপের ঘরে,
যশোদা মায়ের নয়নের মণি কে আর তোমারে ধরে।
তারপর যবে সহসা সেদিন কিসে কেহ নাহি জানে,
বন্দিনী মা'র রোদনের ধ্বনি বাজিয়া উঠিল প্রাণে।
ছাড়ি তব বাঁশী কোষে ল'য়ে অসি দূরে ফেলি ধড়াচূড়া,
মায়ের হাতের লৌহ-বেড়ীরে চলিলে করিতে গুঁড়া।
মুক্ত করিলে লৌহ দুয়ার দর্পীরে নিজে নাশি',
মায়ের চোখের অশ্রুরাজিরে মুছালে আপনি আসি'।
পার্থ-সারথি, কুরুক্ষেত্রের মহারণে কত ছলে,
ধর্ম্ম রাজ্য স্থাপিলে আপনি নাশিয়া পাপীর দলে।
যে অভয় বাণী শুনালে আপনি জানে তা বিশ্ববাসী,
ধর্ম্ম রাখিতে যুগে যুগে আসি' পাপীরে যাইবে নাশি'।
আজি তাই জনম লগনে এসো নামি' একবার,
দেখ ধরা 'পরে জাগিতেছে নিতি কত শত হাহাকার।
শত কংসের অত্যাচারের নাহি আজ কোন শেষ,
অধর্ম্মে আজি প্লাবিত ধরণী—নাহিক ধর্ম্ম-লেশ।
নিরাশ পরাণে এসো হে শ্রীহরি আশার আলোক ধরি',
শোক, তাপ, ভয়, অধর্ম্ম সবি দাও এসে দূর করি'।
হাজার কণ্ঠ গর্জ্জি' উঠুক ভয়ে মূক যারা আজি
ন্যায়ের ডঙ্কা ঘুচায়ে শঙ্কা পুলকে উঠুক বাজি'।

# বিদ্যাসাগর-স্মৃতি

শ্রীজহরলাল বসু

পরলোকগত পুরুষের প্রতি সভা করিয়া সম্মান প্রদর্শন বা তাঁহার মর্ম্মর মূর্তির বেদীমূলে একত্র আসীন হইয়া মৃতাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি নিবেদন—আমাদেব দেশজ রীতিসম্ভূত নয়। এ পদ্ধতির মূলে বৈজাতিক ছোঁয়াচ থাকিলেও, এই প্রকার স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠানকে আমি ঠিক ঐ পর্যায়ভুক্ত করিতে প্রস্তুত নহি। ইহার দ্বারা অন্ততঃ একটা উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে। জগদীশ্বর সকলকে তুল্যরূপ স্থায়ী স্মৃতিশক্তি দান করেন নাই; মৃত মান্যব্যক্তির অলোকসামান্য গুণাবলী বা তাঁহাব বলিষ্ঠ মনঃপ্রসূত কার্যাবলী আমাদিগের চিত্তপট হইতে 'গন্ধর্বনগর লেখার ন্যায়' ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া যায়। লৌহ বা পিত্তলকে যেমন ঘন ঘন মাজিয়া রাখিলে তাহার ঔজ্জ্বল্য মলিনতা স্পৃষ্ট হইতে পায় না, তেমনি এই-প্রকার সভাসমিতির ন দ্বারা মৃত মান্যব্যক্তির সুদুর্লভ গুণাবলীর আলোচনা মাঝে মাঝে করিলে তাহা মন হইতে মুছিয়া যাইবার সুযোগ পায় না।

বাঙ্গালার নরশার্দূল আশুতোষ তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর ও তৎসচিবের সঙ্গে নির্ভীক ভাবে যে সমুদয় পত্রালাপ করিয়াছিলেন তাহা আজ সকলের মনে সমানভাবে সমুজ্জ্বল আছে কি? পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ও প্রয়োজনানুরোধে তালতলার দেশী চটির গৌরব কিরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন, কলিকাতার যাদুঘরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হইয়াও এক তুচ্ছ কারণ লইয়া পরবর্তী কালে তিনি যে সেই যাদুঘরে আর পদার্পণ করেন নাই, এসব কথা আজ কয়জনের মনে সমানভাবে জাগরূক আছে?

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

যে সময়ে রাজ-পুরুষদিগের সান্নিধ্য লাভ বা তাঁহাদিগের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বাক্যালাপ করিতে যে কেহ নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন এবং যে সময়ে রাজ-পুরুষদিগের নিকটে যাইবার আহ্বান আসিলে, কি বেশে তাঁহাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইলে ঐ রাজপুরুষদিগের আদর লাভ করিতে বা অনুগ্রহ-ভাজন হইতে পারিবেন, তজ্জন্য সকলে যত্নবান্ থাকিতেন—সেই সময়ের লোক হইয়াও, প্রাতঃস্মরণীয় জগৎ-বরেণ্য বিদ্যাসাগর মহাশয় জাতীয় পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়াও রাজন্যবর্গের নিকট হইতে কিরূপ আদর সম্মান পাইতেন তাহা শুনিলে কি আমাদের চিত্তে অপূর্ব পুলকের সঞ্চার হয় না?

দেশাত্মবোধ, আত্মসম্মান, মাতৃভক্তি—বিদ্যাসাগরের চিত্তে চিরদিনই পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান ছিল দাম্ভিকের পক্ষে যেগুলি দোষের কারণ হইতে পারে, গুণীর নিকট সেইগুলিই তাঁহার গৌরব বর্দ্ধন করিয়া থাকে। সংস্কৃত কলেজের কর্ম্মত্যাগের সময় তিনি যে মনের তেজ দেখাইয়াছিলেন তাহা একমাত্র বিদ্যাসাগরেই সম্ভব এবং

উহারই ফলে দেশের লাভ, তাঁহার অমর কীর্তি 'মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশন'—যাহাতে পড়িবার সুযোগ সুবিধা পাইয়া, দেশের অনেক গরীবের ছেলে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া, জীবনের উত্তরভাগে দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর শুধু বিদ্যার সাগর ছিলেন বলিয়া আজ তাঁহার জগদ্ব্যাপী নাম নয়; বিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি তাঁহার পূর্বে বা পরে আরও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও, আরও যে সব অলোকসামান্য গুণ তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, তাহার জন্যই আজ তিনি দেশে মৃত্যুবিজয় নাম কিনিয়া গিয়াছেন। দেশে পণ্ডিত অনেক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও তাঁহাদের অবদান কৈ? বঙ্গভাষাভাষী আপামর নরনারীর মধ্যে এমন কে আছেন যিনি বলিতে পারেন যে, বিদ্যাসাগরের প্রাথমিক শিক্ষার পুস্তকাবলী হইতে কোনই উপকার লাভ করেন নাই? আজ দেশে প্রাথমিক শিক্ষার বাঙ্গালা পুস্তক অনেক প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু তাহার প্রথম প্রবর্তক, পথ প্রদর্শক কে? এ বিষয়ের spade-work সেই বিদ্যাসাগরেরই, এটা যেন সকল সময়ে আমাদের মনে থাকে। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর বাঙ্গালায় বহু প্রাথমিক শিক্ষার পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে একটিও কি বিদ্যাসাগরের তত্তৎ পুস্তককে হঠাইয়া সেই স্থান দখল করিবার উপযুক্ত; না, শুধু আমাদিগের মধ্যে এ বিষয়ে ঔদাসীন্যের জন্যই বা অন্যের রচিত পুস্তকের প্রতি অহেতুক অনুরক্তি বশতঃই আজ বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় বিদ্যাসাগরের কোন পুস্তকে নাম দেখিতে পাই না? ইহার প্রতীকারার্থ আমরা আজ পর্যন্ত কোন চেষ্টা করিয়াছি কি? বঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার পথও সুগম করিয়া দিয়াছিলেন তিনিই।

ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগরের যে সকল অনন্যসাধারণ গুণের উল্লেখ করিলাম তাহার যে কোন একটা গুণ থাকিলেই আমাদের মধ্যে অনেকে নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করিতে পারিতেন। এই অত্যল্প স্থানের মধ্যে বিদ্যাসাগরের সমুদয় গুণের উল্লেখ বা অনুশীলন সম্ভব নয়। তিনি ছিলেন বাস্তবিক "অনন্ত-রত্নপ্রভব", পূর্বালোচিত গুণাবলীর তিনি পূর্ণাধিকারী ছিলেন সন্দেহ নাই; এবং তা' ছাড়া তাঁহার আরও অনেক গুণ ছিল; কিন্তু এখানে তাঁহার একটি গুণের কথা বলিব যাহার জন্য তিনি আপামর নরনারীর নিকট হইতে চিরদিনই অগ্রপূজার অধিকারী থাকিবেন।

তির্যগ্-যোনিসম্ভূতা ক্রৌঞ্চীর বিরহ ব্যথায় বিগলিত প্রাণ আদিকবি বাল্মীকিকে সংস্কৃতে পরম কারুণিক ঋষি বলিয়া অভিহিত করা হয়; বাঙ্গালী বালবিধবার বিরহ ব্যথায় বিগলিত প্রাণ বিদ্যাসাগরকেও সেইরূপ পরম কারুণিক পুরুষ বলা যাইতে পারে। এইখানে বলিয়া রাখি—তাঁহার অচলা মাতৃভক্তিই তাঁহাকে এই নির্ভীক প্রয়াসে প্রথম প্রেরণা দিয়াছিল। বালবিধবার বুকের ব্যথা দূরীকরণ ব্যাপারে তাঁহাকে তদানীন্তন সমাজের সঙ্গে কি কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাহা একবার মনে মনে ভাবুন! হিমগিরি তুল্য কত কঠিন অনড় অচল মন হইলে তবে লোকে এরূপ দুঃসাধ্য কার্যে অগ্রসর হইতে পারে? এমন কি, তাঁহার একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সহিত এক বিধবার বিবাহ দিয়া তিনি তাঁহার আদর্শকে লোকসমক্ষে দৃষ্টান্তে পরিণত করিয়াছিলেন।

শুধু বিধবা বিবাহ প্রবর্তনই তাঁহার অপার করুণার নিদর্শন নয়, আর্তের দুঃখমোচনের জন্য, নিরন্নকে অন্ন দানের জন্য, ব্যাধিতের চিকিৎসার জন্য, জীবদ্দশায় তিনি যে কিরূপ মুক্তহস্তে দান করিতেন, তাঁহার জীবনী পাঠে তাহা জানিতে পারা যায়। তাঁহার দান যে শুধু তাঁহার জীবৎকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নয়, যিনি তাঁহার উইলের নকল পড়িয়াছেন তিনিই জানেন, আত্ম পর ভেদ জ্ঞান না করিয়া কত লোককে তিনি কত নগদ টাকা বা মাসহারা দিবার নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন!

শেষ কথা—বিদ্যাসাগর যে এত বড় হইয়াছিলেন তাহার মূলে ছিলেন তাঁহার গর্ভধারিণী। একটা গল্প আছে:—এক সময়ে বিদ্যাসাগর-জননী যখন কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন তখন জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন "বিদ্যাসাগরের মায়ের হাতে রূপার খাড়ু!" তাহাতে বিদ্যাসাগর-জননী উত্তর দিয়াছিলেন "সোণা রূপায় কি করে? উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের সময় এই হাত রাঁধিয়া রাঁধিয়া হাজার হাজার লোককে অন্ন দান করিয়াছিল, তা'তেই বিদ্যাসাগরের মায়ের হাতের শোভা।" আমি এখানে ভূষণপ্রিয়া ভগিনীগণকে বিদ্যাসাগর-জননীর এই উক্তি মনে রাখিতে বলি। এমন মা না হইলে কি এমন ছেলেকে পেটে ধারণ করিতে পারেন? বিদ্যুৎ কি আর মাটী থেকে জন্মায়? "ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ।"

বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত কত যে ছোট বড় উপদেশমূলক গল্প আছে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ইহা উদীয়মান জাতির নিত্য পাঠ্য হওয়া উচিৎ।

# 'প্রবর্ত্তক' রজত-জয়ন্তী

( চতুর্থ মাসিক অনুষ্ঠান )

—শ্রীরমণ—

১৩৪৭ সালে প্রবর্ত্তক মাসিক পত্রিকার পঁচিশ বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে বার মাসে বাংলার বারটি জেলায় সভা করিবার সঙ্কল্প প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ গ্রহণ করিয়াছে এবং এই সকল সভায় প্রবর্ত্তক-সম্পাদক, প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও গুরু শ্রীমতিলাল রায় তাঁহার চিন্তা, দর্শন ও জীবন-সাধনার মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিতেছেন।

এ দেশে কোন মাসিক পত্রিকার পক্ষে অবিচ্ছিন্ন পচিশ বর্ষকাল জীবিত থাকা অভিনন্দনীয় হইলেও, ইহা লইয়া এতখানি হৈ-চৈ করার সার্থকতা কি, তাহা সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিবে না, যদি প্রবর্ত্তক পত্রিকা তথা প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের বিশেষ ভাব ও আদর্শে অবহিত হওয়া না যায়। সুদীর্ঘ ২৫ বর্ষের বৈচিত্র্যময় জীবনে প্রবর্ত্তক যেমনি এই ভাব ও আদর্শের পরিবেশন বাঙালীর নিকট করিয়াছে, তেমান প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ তার সমষ্টি জীবনে উহাকে রূপ দিবার অনুশীলনও করিয়া চলিয়াছে। তাই নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে, আদৌ ব্যবসাবুদ্ধি লইয়া প্রবর্ত্তক আরম্ভ হয় নাই অথবা পরিচালিতও হয় না।

আচার্য্য শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্নিযুগের নির্ব্বাপিতপ্রায় চিতাভস্মের অন্তরালে যে বলিষ্ঠ প্রাণ নব জাগরণের দ্যোতনা বুকে ধরিয়া ধুমাইতেছিল, তাহাই একদিন ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী চন্দননগরের পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে সৃজনের এক অনুকূল পবনের ছোঁয়া লাগিয়া উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। অনির্ব্বাণ তুবড়ীর মত এই অফুরন্ত বিদ্রোহী প্রাণ জ্বলিয়া জ্বলিয়া সেদিন জাতি-সাধনার ধ্বংসস্তূপের উপর যে নির্ম্মাণ-পীঠ রচনা করিয়াছিল, তাহারই বহিঃপ্রকাশ প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ। বিধাতার অমোঘ বিধানে ইহারই অন্তরঙ্গ অনুপ্রেরণার বাহনরূপে যুগপৎ প্রবর্ত্তকেরও জন্ম। এই দিব্য প্রাণের আশ্রয়ীরূপে দেশমান্য শ্রীমতিলাল রায়ের জীবন-গতির বিচিত্র ও বঙ্কিম ছন্দের তালে তালে বিগত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া সঙ্ঘ ও পত্রিকা আত্মবিকাশ করিয়া চলিয়াছে।

সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালে ইহাই দেখা যায় যে, বিশেষ কোন মতবাদ, ভাব বা তত্ত্ব বিশেষ কোন মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই প্রকট হইয়া থাকে। প্রাচ্যে বুদ্ধের নির্ব্বাণবাদ, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের সগুণ ঈশ্বরবাদ, নিম্বার্কাচার্য্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অথবা বল্লভের বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ এই কথার সমর্থনে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রতীচ্যেও ইহার অপ্রতুল নাই। তত্ত্ব যদি জীবনের প্রত্যক্ষানুভূতির গোচরীভূত না হয়, তবে মর্ত্ত্য-মানুষের কাছে উহার আবেদন থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে আবার স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্রষ্টা এক নয়। কিন্তু প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের জন্মদাতা শ্রীমতিলাল রায়ের মনীষায় স্বপ্ন ও সৃষ্টি দুইই যুগপৎ বিরাজমান এবং ইহাই প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ তথা প্রবর্ত্তক পত্রিকার বৈশিষ্ট্য।

মানুষের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও চরিত্র যদি না পরিশুদ্ধ হয় তবে জাতি সাধনার দৈন্য দূর হওয়াও সম্ভব নয়। অবিশুদ্ধ মানুষের অসদ্ব্যবহারে দেশের আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা শোষণ এবং পীড়নেরই কারণ হইয়া থাকে। ভারতীয় সভ্যতার মর্ম্মকথা তাই সৎ এবং কল্যাণেরই উপাসনা। পারমার্থিক বিজ্ঞানমুখী হইয়াই ভারতীয় সকল উৎকর্ষ ও সংস্কৃতি তাই আবর্ত্তিত। ভারতাত্মার এই শাশ্বত প্রেরণায় অবগাহিত হইয়া সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা ভারতের মূলবীর্য্য আধ্যাত্মিকতার কালোচিত ভিত্তির উপর জাতি-নির্ম্মাণে ব্রতী হইয়াছেন। সঙ্ঘের ব্রত তাই শুদ্ধ সংগঠন। মানুষের প্রতি হৃদয়ের অপরিসীম দরদ ও প্রীতি লইয়াই তিনি জীবন-সায়াহ্নে এই পরম, শুভবাণী দেশের দ্বারে দ্বারে ব্যক্ত করিবার জন্য বাংলার

বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমণের সঙ্কল্প লইয়াছেন। ইতিমধ্যে চন্দননগর, কলিকাতা ও হাওড়া-শিবপুরে তিনটি উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। চতুর্থ মাসিক অনুষ্ঠান খুলনা-বাগেরহাটের কলেজ হলে ১লা শ্রাবণ তারিখে দেশপ্রাণ আচার্য্য শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরোহিত্যে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রবর্ত্তক নারী-মন্দিরের কুমারী নিশাবাণী প্রশস্তি পাঠ করেন। ভক্তচারণ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অগ্নিময় উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হইবার পর, সঙ্ঘসম্পাদক শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত সভাপতিকে মাল্যভূষিত করেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে তিনি এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য এবং প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ব্যাপক সংগঠননীতির কথা ব্যক্ত করেন ও বলেন, বাগেরহাট কলেজের সুন্দর স্বপ্নময় প্রাকৃতিক আবেষ্টনী, বর্ত্তমান অধ্যক্ষ নৃপেন্দ্রচন্দ্রের উদার হৃদয়ের অপরিসীম দরদ ও প্রীতি এবং এখানকার ত্যাগ ও তপস্যাপূত আব্‌হাওয়ায় আচার্য্যপল্লী ও ছাত্রাবাসের অবস্থিতি সকলকে যেন সেই প্রাচীন নালান্দা, তক্ষশিলা, ওদন্ত-পুরীর কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

অতঃপর সভাপতির প্রেম ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আহ্বানে, দেশাত্মা শ্রীমতিলাল রায় মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতায় ভারতের ধর্ম্মপ্রাণ জাতীয়তা ও সমাজ-সংগঠন, চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রকৃত মর্ম্ম, ধর্ম্মবীর্য্যের প্রকাশে ও প্রয়োগে কেমন করিয়া এদেশ স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে এবং ইহাই যে সর্ব্ববিধ জাতীয় সংগঠনের মূল নীতি, এই সকল বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, যে জাতির যাহা মূল বীর্য্য, তাহা লঙ্ঘন করিয়া সে জাতির মুক্তি নাই, কল্যাণ নাই। সমাজের মূলে চাই পবিত্রতা ও সংযম—তাই যে প্রগতিবাদ নারীশক্তিকে কলুষিত, উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলে, তাহা জাতির সর্ব্বনাশই সাধন করে। জাতির জননী নারী—জননী যদি সাধ্বী সতীলক্ষ্মী হন, তবেই এদেশে কৃষ্ণ বা রামচন্দ্রের ন্যায় দেবসন্তান জন্মগ্রহণ করিবেন। শক্তিশালী সমাজই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অধিকারী হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত রায় বলেন, এইজন্য চাই শুদ্ধ ও আমূল সংগঠন। সংগঠন অর্থে আপনার অন্তরদেবতার জাগরণ, অফুরন্ত শক্তির উৎসের সঙ্গে স্বীয় সীমাবদ্ধ সামর্থ্যের যুক্তি। এই বৃহতের মধ্যে মুক্তি পাইলে মানুষ মৌলিক সৃষ্টিধর ও পরম শক্তিমান্ হইয়া উঠে। ধর্ম্মসমন্বয় অর্ব্বাচীন মনের অন্ধতা। তত্ত্বের সমন্বয় সম্ভব, কিন্তু প্রতি মানুষেরই স্ব-স্ব ধর্ম্ম আছে। ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়—আপন প্রকৃতির সুষ্ঠু বিকাশের জন্যই ধর্ম্মানুশীলন। এইরূপ পরিপূর্ণ বিকশিত মানুষের সমষ্টি লইয়াই হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিচারে পূর্ণাঙ্গ ভারতজাতি গড়িয়া উঠিবে। বর্ত্তমানে ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থের হিসাব কষাকষির ফলে ধর্ম্ম-বিরোধ তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান স্ব স্ব বিশিষ্ট প্রকার ভগবানের উপাসনায় অবগাহিত হইতে পারিলে, অন্তরের যে প্রীতি ও মিলন সংঘটিত হইবে, তাহা অন্য কোন উপায়ে সিদ্ধ হইবার নহে।

হিন্দুদের মধ্যে যে শ্রেণীগত পার্থক্য ও বাদ-বিসম্বাদ, তাহাও অপূর্ণতা ও বিভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীরই ফল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—জ্ঞান, প্রেম, শক্তি ও সেবাগুণেরই প্রতীক। শ্রীযুক্ত রায়ের মতে ঈশ্বরের এই চতুর্ব্ব্যূহ মূর্ত্তি একাধারেই প্রকাশ হইতে পারে এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য জীবনে অখণ্ড ঈশ্বরোপলব্ধির ইহাই পরম লক্ষণ। বস্তুতঃ চাতুর্ব্বর্ণ্য অখণ্ড মানবতারই পূর্ণ প্রকাশ। ভারতের ঋষিকণ্ঠে একদা এই বৃহতের চাওয়াই উদ্‌গীত হইয়াছিল। বক্তা দৃঢ় কণ্ঠেই বলেন যে, ভারতের অধঃপতন ধর্ম্মের জন্য নয়, পরন্তু ধর্ম্মবিলাসের জন্য—ধর্ম্মকে জীবনে অনুবাদ করিতে না পারার ফলেই।

তারপর উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রণদাকান্ত রায়চৌধুরী মহাশয় এই জয়ন্তী উৎসবের সাফল্য কামনা করেন এবং শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করিয়া জাতিগঠন-মূলক বলিষ্ঠ মর্ম্মবাণী সকলকে অনুধ্যান ও অনুধাবন করিতে বলেন। প্রসঙ্গক্রমে বক্তা বর্ণধর্ম্ম সম্বন্ধে অতীত ভারতের আদর্শের কথা উত্থাপন করায়, শ্রীযুক্ত রায় পুনরায় ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে বিষয়টির এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়া তাঁহার বক্তব্য আরও পরিস্ফুট করিয়া তুলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় আবেগপূর্ণ কণ্ঠে শ্রীযুক্ত রায়েব ত্যাগ-সমুজ্জ্বল জীবনাদর্শের বন্দনা করিয়া বলেন : আমার সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি যে, এক মাত্র প্রেমই সার বস্তু। হৃদয় প্রেমোদ্ভাসিত হইলে জ্ঞান, শক্তি, সেবা সবই সার্থকমন্য হয়। একমাত্র সত্য ভগবান। ঈশ্বর প্রেমঘন মূর্ত্তি। আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া এই প্রেম লভ্য। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের সঙ্গে আমার মানসিক ও আত্মিক যোগ আছে। আমি এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের অপূর্ব্ব ও বহুমুখী কর্ম্মসাধনা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই। সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতার প্রেমস্নাত হইয়াই ইঁহাবা আয়াসসাধ্য কর্ম্মকে স্নিগ্ধ ও সহজ করিয়া তুলিতে পারিয়াছে। ভগবান অখণ্ড বলিয়া তাঁহার সৃষ্টিও অখণ্ড এবং এই বোধ না হইলে ঐক্য মিলে না। হিন্দুর উপাসনা, মুসলমানের আজান ধ্বনির মধ্য দিয়া আমবা যেন এই ঐক্য-সেবাই কবিতে পারি। শ্রীযুক্ত রায় এই মহামিলনের উদ্দেশ্য লইয়াই বাগেবহাটে আসিয়াছেন। আমরা যেন তাঁহাব এই মহান্ অভিপ্রায় মর্ম্ম দিয়া গ্রহণ করি। পায়ের কাদা হইয়া আমি দেশ ও দশের সেবক হইতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করিব।"

শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় সভাপতি ও বাগেরহাটবাসীদের এই উৎসবে আন্তরিক সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ভক্তচারণ প্রফুল্লচন্দ্র কর্ত্তৃক একটি উদ্দীপনাময়ী সমাপ্তিসঙ্গীতের পব সভাভঙ্গ হয়। সভায় অধ্যাপক, ছাত্র, তরুণ এবং সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে কলেজ হলে তিলধারণের স্থান ছিল না। শ্রীক্ষেত্রনাথ মিত্র এম-এ, বি-এল, ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল শ্রীরাধারমণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর শ্রীসুখলাল নাগ, রায় সাহেব শ্রীরসিকলাল চক্রবর্ত্তী, জমিদার শ্রীকমলেশচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার শ্রীপ্রণবচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার শ্রীরাজেন্দ্রকুমার নাগ, ডাক্তার শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-বি, অধ্যাপক শ্রীশবৎচন্দ্র হালদাব এম-এ, অধ্যাপক শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র ভট্টাচায্য এম-এ এবং অধ্যাপক শ্রীবনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম-এ প্রমুখ উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে অন্যতম।

# বাগেরহাট-পরিক্রমণা

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

৩২শে আষাঢ় বাত্রি দশটায় খুলনা মেলে বাগেবহাট রওনা হইলাম। উপলক্ষ—প্রবর্ত্তক পত্রিকার চতুর্থ মাসিক বজত জয়ন্তী উৎসব। প্রবর্ত্তক-সম্পাদক ও সঙ্ঘ-গুরু পূজনীয় শ্রীমতিলাল রায়ের আমবা সাত জন সহযাত্রী। শুক্লা দ্বাদশী। আকাশ ছাইয়া মেঘের ঘনঘটা। সারারাত্রি যেন এক বহস্যময় স্বপ্নরাজ্যের মধ্য দিয়া রুদ্ধশ্বাসে ট্রেণ ছুটিল। ভোরের আলো ফুটিল খুলনা ষ্টেশনে। ভৈরবের শীতল হাওয়ায় আমবাও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ষ্টীমার-যোগে রূপসা এবং সেখান হইতে মিটার গেজের ছোট গাড়ীতে প্রাতঃ আটটায় বাগেরহাট কলেজ ষ্টেশন।

প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে অধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, অধ্যাপকমণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দ সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। আচায্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র শ্রীযুক্ত রায়ের সহিত তাঁহার সহকর্ম্মী অধ্যাপকবৃন্দের পরিচয়প্রদান প্রসঙ্গে সকলের অকপট সহযোগিতা ও কলেজের উন্নতিকল্পে তাঁহাদেব আন্তরিকতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। শ্রদ্ধেয় নৃপেনবাবুব আতিথ্যের তুলনা মিলে না। তাঁহার উল্লসিত হৃদয়ের আবেগ-স্পর্শ আমাদের মুগ্ধ অভিভূত করিল।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। শ্রাবণের অঝোর ধাবা সমানে বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত বর্ষিত হইল। তারপর বর্ষণস্নিগ্ধ রৌদ্রের হাসি ফুটিল। সবুজঘন বিটপীবেষ্টিত সুপ্রশস্ত কলেজপ্রাঙ্গণ। সারা আঙিনা জুড়িয়া শ্যামল দূর্ব্বাদলের আস্তরণ-বিস্তৃত। হেথা হোথা বর্ষাস্নাত বিনম্র কুটিরাবলী। তপোবনের অপরূপ শ্রী সত্যই নয়নাভিরাম।

অপরাহ্ণের সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে লোকসমাগম হইতে সুরু হইল। শ্রীযুক্ত রায়ের সম্মানার্থে সম্মুখের প্রশস্ত ময়দানে শ্রীযুক্ত প্রাণহরণ চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে ড্রাম বাদ্যসহ ছাত্রদের কুচকাওয়াজ চলিতে লাগিল। কলেজের সমগ্র আব্‌হাওয়া নব প্রাণের জাগরণে যেন মুখর হইয়া উঠিল। বেলা ছয় ঘটিকায় কলেজ-হলে দেশপ্রাণ আচার্য্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

একটা পরিচ্ছিন্ন সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রামের মধ্য দিয়া সভার আরম্ভ ও শেষ। বাগেরহাটের মাথার মণি প্রায় সমস্ত ভদ্রলোকের উপস্থিতি, হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে ছাত্রবৃন্দের সমাবেশ, সভাপতির অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠের আবেগ, আন্তরিকতা ও আবেদন সভার কার্য্যটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিল। প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত রায়ের অমৃতবর্ষী অভিভাষণ প্রত্যেককেই মুগ্ধ করিল। প্রফুল্লচন্দ্রের যন্ত্রছাড়া দরাজ কণ্ঠসঙ্গীতের মাধুর্য্যাকৃষ্ট হইয়া সভাভঙ্গের পর একবাক্যে শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। সঙ্গীতের লোকপ্রিয়তা ও আকর্ষণী শক্তি যে কত তাহা ভাল করিয়াই সেদিন অনুভব করিলাম। সন্ধ্যার পর অধ্যক্ষ নৃপেনবাবুর বহির্বাটীর প্রশস্ত বারান্দায় প্রফুল্লচন্দ্র কীর্ত্তন করিলেন। এই কীর্ত্তনের আসরে উপস্থিত ছাত্রবৃন্দের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান ছাত্র লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য নৃপেন্দ্রচন্দ্রের উদার হৃদয়ের অকুণ্ঠ প্রেমপ্রীতিরই পরিচয় পাইলাম।

পরদিন ২রা শ্রাবণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ভারমুক্ত মন সহজ-ভাবেই যেন স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া উঠিল। আকাশে হাল্‌কা মেঘের লুকোচুরি। বৃক্ষের চূড়ায় চূড়ায় প্রভাত-কিরণের ঝলমল আভা। একটা অপার আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে আমরা প্রাতঃকালীন উপাসনা সারিয়া সঙ্ঘের গৃহীভক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুর আমন্ত্রণে অদূরবর্ত্তী গোটাপাড়া পল্লীতে তাঁহার বাটী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ইচ্ছা—যাইবার পথে ইতিহাসবিশ্রুত প্রাচীন কীর্ত্তি খান জাহান আলির দরগা ও ষাটগুম্বজ মসজিদ দেখিয়া যাওয়া। বাগেরহাট সহর হইতে ষাটগুম্বজ রোড ধরিয়া দুইখানি ঘোড়ার গাড়ীতে সঙ্ঘগুরু, প্রফুল্লদা ও আমরা পাঁচজন গুরুভাই-ভগ্নী মিলিয়া রওনা হইলাম। সহতীর্থ অমৃতানন্দজী অসুস্থ হওয়ায় আর যাইতে পারিলেন না। স্বামীজীর সঙ্গসুখ-বঞ্চিত এ আনন্দযাত্রা যেন খানিকটা অপূর্ণই রহিয়া গেল। সাধকজীবনে ইষ্টের প্রত্যক্ষ পরিমণ্ডলের অন্যতম সাথীরূপে সেদিন কর্ম্মবিহীন অবকাশের ফাঁকে তাঁর যে অহেতুক দাক্ষিণ্য ও কারুণ্যের স্পর্শ পাইলাম, তাহা অসাধারণ। সত্যই সে এক অপার্থিব সৌভাগ্য!

আমাদের মুহুর্মুহু তাড়া সত্ত্বেও গাড়ী চলিয়াছে মন্থর গতিতে। লিখিতমতে প্রথম শ্রেণীর গাড়ী হইলেও, তার অনাহারক্লিষ্ট অশ্বশক্তির পক্ষে আর অধিকতর দ্রুত চলা যে সম্ভব নয়, তাহা আমাদের সময়সংক্ষেপ করিবার মানসিক অধৈর্য্যের কাছে ধরা পড়িয়াও যেন পড়িতে চাহে নাই। পথিপার্শ্বের নিবিড়ঘন বিচিত্র বৃক্ষ-লতা-বিটপীর সুশ্যাম শোভা। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উন্নতশির গুবাক-নারিকেলের অপূর্ব্বশ্রী। এখানে-ওখানে কাশবনের শ্যামলিমা। মাঝে মাঝে শস্য-শ্যামল প্রান্তর আর খালবিলে সতেজ জার্ম্মানি-পানার অবাধ বিস্তার। এই নগ্ন রূপের মুখোমুখি হইয়া সত্যকার বাংলার পরিচয় পথক্লেশকে ল করিয়া তুলিল। মহানগরীর অবিরাম শব্দের পীড়ন ও লৌহ-ইট-কাঠ-পাথরের রুক্ষতা এবং কাজের পিছনে অবিশ্রাম দৌড়াদৌড়ি হইতে দূরে এই উদার উন্মুক্ত অবাধ অবসরের মাঝে মনটা কেমন যেন একটা মুক্তির আস্বাদে ভরপুর হইয়া উঠিল। অখণ্ড প্রকৃতির সঙ্গে সত্তার ঐক্যবোধ সহজ-ভাবেই সাধককে অন্তর্ম্মুখী আত্মস্থ করিয়া তুলে। কিন্তু এই প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্যের কোলে যথা তথা অর্দ্ধনগ্ন ছিন্ন-জীর্ণ-মলিন বসনভূষিত নরনারীর উলঙ্গ দারিদ্র্য-বাহুল্য একটা অসহায় ব্যথা-বেদনায় অন্তরকে আবিল করিয়া তুলে। সুখ-দুঃখের এই মিশ্র ফল্গুধারার মোড় ফিরাইয়া দেয় থাকিয়া থাকিয়া প্রফুল্লদার ভাগবত-সঙ্গীত।

মাইল তিনেক পথ। মাঝপথে অকস্মাৎ গোবিন্দের আবিষ্কার প্রফুল্লদা'র 'গানের সঙ্গে তবলার চাঁটি'র কাজ চলিল। বছর বারো বয়েস। পরিধানে ময়লা হাফপ্যাণ্ট। গোবিন্দ ও-অঞ্চলের সকলেরই জানা-চেনা। গোবিন্দ 'গাইড' হইল। ভরসা দিল, বড় বড় কুমীর দেখাইবে।

ঘোড়াদীঘির পাড়ে ষাটগুম্বজ মসজিদের সামনে আসিয়া নামিলাম। মসজিদের একটি কোণে সিঁড়ি।

সবা সোজা উপরে উঠিলাম। গুণিয়া দেখিলাম মোট ৭৭টি গুম্বজ আছে। এগারটি শ্রেণী। প্রতি সারিতে ৭টি বারয়া গুম্বজ। মাঝের গুম্বজগুলি চতুষ্কোণ আর বাকীগুলি গোলাকার। চারি কোণে চারিটি মিনার। গুম্বজের উপরে উঠিয়া নয়ন ভরিয়া চারিদিকের দৃশ্য দেখিলাম। সুদূর বিস্তৃত সবুজ প্রান্তর দিক্‌চক্রবালে মিশিয়াছে। শ্রাবণের স্নিগ্ধশীতল ঝিরঝিরে হাওয়ায় শ্রান্ত তনুমন জুড়াইল। সত্যই বিচিত্র আমাদের বাংলা মা এত সুন্দর!

নীচে নামিয়া অভ্যন্তর-ভাগ খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিলাম। প্রায় পাঁচশো বছর পূর্ব্বে এই জলা-জঙ্গলা সুন্দরবন অঞ্চলে কি করিয়া এত বড় বিশাল মসজিদ তৈরী সম্ভব হইয়াছিল, ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ১৬০', প্রস্থে ১০৫' এবং উচ্চতায় ২২ ফুট। ভিতের চওড়া ৯ ফুট। ৬০টি স্তম্ভের উপর ছাদের খিলান গৃত। স্তম্ভগুলি প্রস্তর-

ঘোড়াদীঘির পাড় হইতে ষাটগুম্বজের দৃশ্য

নির্ম্মিত; বাকী সব ছোট ছোট ইঁটের গাঁথুনি। প্রবাদ আছে, এই পাথরগুলি নাকি খান জাহানের ফকিরী কেরামতির ফলে চট্টল হইতে ভাসিয়া আসে। অন্ততঃ ও-অঞ্চলের সাধারণের ইহাই বিশ্বাস। গোবিন্দও সেই সাক্ষ্যই দিল। প্রবেশপথের দুই পার্শ্বে কয়েকটি খিলান দৃষ্ট হয় এবং এই খিলান অবলম্বনে গভীর কুলুঙ্গী খোদিত। কুলুঙ্গীগাত্রে কিছু কিছু কারুকার্য্যের চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিলেও, বিশালতা ছাড়া ইহার কারুতা উল্লেখযোগ্য নয়। মনে হয়, ষাটগুম্বজ একাধারে খান জাহান আলির দরবার-গৃহ ও উপাসনাক্ষেত্র ছিল। অবশ্য এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্য কি, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হইল না।

মসজিদরক্ষককে কিছু দক্ষিণা দিয়া ঘোড়াদীঘির পাড়ে আসিলাম। প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। শতাব্দীর মধ্যে কোন সংস্কার হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। গোবিন্দ পীরসাহেবকে কুমীর ডাকিতে বলিল। আমাদের দুর্ভাগ্য, পীরের বহু ডাকাডাকিতেও কুমীর আর আসিল না। গোবিন্দ ভয়ানক লজ্জিত হইলেও, জোর করিয়াই বলিল, ঠাকুর-দীঘিতে নিশ্চয়ই কুমীর দেখাইবে। পুরাণো হইলেও ঘোড়া-দীঘির জল নাকি খুব হজমী আর উপকারী। দেখিলাম, গরুর গাড়ীভর্ত্তি নূতন কলসীতে জল লইয়া যাওয়া হইতেছে। বাগেরহাট সহরে এক এক কলসী জল পাঁচ পয়সায় বিক্রি হইয়া থাকে। কিসে কি হয় বলা যায় না, কয়েক অঞ্জলী জল পান করিয়া লইলাম। কাঁচের মত ফটিক জল হইলেও, শ্যাওলার গন্ধ আছে। অদূরেই আর একটা পুষ্করিণী। উহার জল কেহ ব্যবহার করে না। করিলে নাকি মৃত্যু অবধারিত। খান্ জাহান আলীর মৃত্যুর পর তাঁহার অন্যতমা পত্নী সোণাবিবি বিষ খাইয়া ঐ পুষ্করিণীর জলে প্রাণত্যাগ করার ফলেই ইহার জল বিষাক্ত হইয়াছে। বিষপুকুর সম্বন্ধে এই প্রবাদটি ও-অঞ্চলে বহুল প্রচলিত। সময়াভাবে পরীক্ষা আর আমাদের করা হইল না।

ফিরিবার পথে মাইলখানেক দূরে খাঞ্জালির দরগা দেখিতে গেলাম। বুঝিলাম, জনসাধারণের নিকট খান্

জাহান আলি নামই চুম্বক হইয়া 'খাঞ্জালি' হইয়াছে। প্রকাণ্ড জলাশয় ঠাকুরদীঘি। তাহারই সুউচ্চ পাড়ের উপর খান জাহান আলির সমাধি-সৌধ। সাম্প্রতিক সংস্কারের কোন চিহ্ন না থাকিলেও, ইহা যে একদা সুন্দর ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সৌধটি ২০।২৫ ফুট উচ্চ হইবে এবং একটি মাত্র বড় গুম্বজবিশিষ্ট। কারুকার্য্যে ইহা ষাটগুম্বজের চেয়ে উৎকৃষ্ট। তারিখ লেখা আছে ৮৬৩ হিজরার ২৬শে জিলহিজ্জা (২৩শে অক্টোবর, ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ)। খান্ জাহানের কবরের উপর এই সমাধি-সৌধটি নির্ম্মিত।

পাশেই পীর আলির অনুচ্চ সমাধি। প্রবাদ, পীর আলির আসল নাম মহম্মদ তাহির। ইনি খান জাহানের প্রধান চেলা ছিলেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ও পরে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করায়, ইনি 'পীর আলি' আখ্যা লাভ করেন। প্রচলিত ধারণা, মুসলমানধর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বে মহম্মদ তাহিরের যে পুত্রসন্তান, তিনিই নাকি হিন্দু পীরালি সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপুরুষ।

মস্ত বড় ঠাকুরদীঘি সংস্কারাভাবে পানা ও আগাছায় ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। এত বড় দীঘি খননের কল্পনাও বোধ হয় এ যুগে কারও আসে না। জনশ্রুতি, এই দীঘিটি খননের সময়ে একটি বিগ্রহমূর্ত্তি আবিষ্কার হওয়ায় ইহার নাম ঠাকুরদীঘি রাখা হইয়াছিল। পুকুরের প্রশস্ত সোপানশ্রেণীর ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। দীঘির মধ্যে অনেকগুলি কুমীর আছে। ইহারা নাকি কালাপাহাড় ও ধলাপাহাড় নামক খান্ জাহানের প্রিয় পোষা কুমীরের সন্তান-সন্ততি।

কুমীর দেখাবার আগ্রহে গোবিন্দ ইতিমধ্যেই দরগার এক ফকিরকে আনাইয়া হাজির করিয়াছে। ফকির 'কালাপাহাড়' বলিয়া বারকয়েক ডাক দিতেই বহু দূরে একটি কুমীর সত্যই মাথা তুলিল এবং ডাকের অনুসরণ করিয়া একদম পাড়ের কিনারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ফকির বলিল, মুরগী বা খাসী আহার্য্য দিলে ডাঙ্গায় উঠিয়া কুমীর আমাদের হাত হইতে ঐ খাদ্য খাইয়া যাইবে। একটু আগেই কয়েক জন যাত্রীর দেওয়া খাসী কুমীরেরা খাইয়া গিয়াছে। দশ বার হাত ডাঙ্গার উপরে তাজা রক্তের দাগ তখনও দগ্ দগ্ করিতেছে। গোবিন্দের খুব উৎসাহ—মুরগী কিনিয়া আনে। কিন্তু অধিক বেলা হওয়ায়, মুরগীর মূল্য তিন আনা ফকিরকে বকশিস্ দিয়া আমরা গাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম।

গাড়ী চলিল। বার বার কেবলই খান জাহান আলির পুরাকীর্ত্তির কথা মনে হইতে লাগিল। কি সৃষ্টিধর পুরুষই না তিনি ছিলেন! সে-যুগে সুন্দরবনের হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল বনবাদাড় আবাদ করিয়া বসতি স্থাপন অসীম সাহস ও শক্তিমত্তারই পরিচায়ক। এই বাগেরহাট ষাটগুম্বজ রাস্তাটিও শুনা যায় খান জাহানেরই নির্ম্মিত। বাগেরহাটের আশেপাশে বহু পুরাকীর্ত্তি ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দীঘি তাঁর স্মৃতি এখনও সগৌরবে বহন করিতেছে।

খান জাহান আলির ঐতিহাসিক ভিত্তি এইরূপ: খৃঃ ১৫শ শতকের মধ্যভাগে যশোহরের দক্ষিণাংশ খান জাহান আলি নামক মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীন ছিল। কিম্বদন্তী প্রায় ৫০০ বর্ষ পূর্ব্বে সুন্দরবনের আবাদ পরিষ্কৃত করা ও চাষের জন্য খাঁ তথায় আগমন করেন। সঙ্গে ৬০,০০০ বেলদার সৈন্য। পথে তাঁহারা জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ ও মাঝে মাঝে দীঘি খনন করিয়া চলেন। অভিযান বাগেরহাট পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়—এবং ঐখানেই খাঁ বসতি স্থাপন করেন। ভৈরবতীরে তাঁর নির্ম্মিত একটা রাস্তার ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। কেশবপুরের ৪ মাইল পশ্চিমে বিদ্যানন্দবাটী ও যশোরের উত্তরে বড়বাজারে খাঁ জাহানের স্মৃতি এখনও বিদ্যমান। খাঁ বৃদ্ধ বয়সে ফকির হন। ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

উত্তর ও দক্ষিণ যশোহরের নাম সরকার মামুদাবাদ ও খিলাতাবাদ বলিয়া আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত আছে। খেলাতাবাদের সহিত সম্ভবতঃ খান জাহানের নামের সম্পর্ক আছে। খিলাতাবাদ অর্থে—রাজ-প্রতিনিধির আবাদী দেশ। এখানে টাকশালও ছিল। খাঁ জাহান যে শুধু ফকির নহেন, রাজপ্রতিনিধিও ছিলেন, ইহার প্রমাণ খিলাতাবাদ নামে পাওয়া যায়। এক হস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে কৃপাণ লইয়া খাঁ-ধর্ম্ম প্রচার ও রাজ্যবিস্তারে বোধহয় অগ্রসর হইয়াছিলেন।

বেলা এগারটায় ভৈরবের পাড়ে আসিয়া গাড়ী থামিল।

সারা রাস্তা গোবিন্দের মুখে কথার খৈ ফুটিয়াছে। স্বল্প সময়ের পরিচয় হইলেও, গোবিন্দকে বিদায় দিতে মনটা যেন কেমন করিতে লাগিল। মনে হইল বাপ-মা-হারা অনাথ সে। কিছু পয়সা হাতে দিয়া কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোবিন্দ, তুমি কি জাত ?"

—"বামুন—চট্টোপাধ্যায়।"

—"তোমার বাপ-মা আছেন ?"

—"আছে। বাবা কলকতায় থাকেন, বিশেষ খোঁজ-খবর নেন না।"

—"স্কুলে পড়্‌বে—চল আমাদেব সঙ্গে।"

—"যা বাবুদের সঙ্গে। বামুনের ছেলে বোম্বেটে হয়ে যাচ্ছিস্"—কোচম্যান গোবিন্দকে উৎসাহ দিল।

কে কার কথা শুনে। গোবিন্দ ততক্ষণে নিকটেব দোকানে পাঁউরুটি কিনিয়া কামড়াইতে সুরু করিয়াছে। বন্ধন সে চাহে না। কিশোর মনে ভবিষ্যতেরও ভাবনা নাই। মুক্তির মাঝে সে বেশ আছে! নিত্য নূতন যাত্রীব সঙ্গে এমনি পরিচয় হয়তো সে রোজই জমায়।

পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বজরায় গিয়া আমরা উঠিলাম। ভরা ভৈরবেব বুকে নৌকা ছাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে নামিল মুষল-ধারে বৃষ্টি। ঘণ্টাখানেকের পথ গোটাপাড়া। খানিকটা গিয়া দপারআড়া খালে নৌকার মোড় ফিরিল। খাল তো নয়, সবুজ পটভূমিকার উপর যেন আঁকা-বাঁকা রূপালি রেখা। মন ও মস্তিষ্কের অগাধ অবসরের ফাঁকে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের এক সুনিবিড় পরিচয়। কথায় কথায় গোটাপাড়ার পল্লীতীবে নৌকা ভিড়িল। পুরনারী মঙ্গল শঙ্খধ্বনি ও ববণডালা সহকারে শ্রীগুরুর চরণ বন্দনা করিলেন।

সবলপ্রাণ পল্লীনরনারীর ধর্ম্মভাব মজ্জাগত। ভাগবৎ পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া উৎসুক ধর্ম্মপ্রাণ গ্রামবাসীর মেলা বসিয়া গেল। শ্রাবণের ঘন বরিষণ উপেক্ষা করিয়া উপেন বন্ধব বাড়ীতে "দীয়তাং ভুজ্যতাং" উৎসব চলিল। সঙ্কোচ নাই, দ্বিধা নাই—যেন কতদিনের পরিচয়! নয়নের দৃষ্টি-বিনিময়ে এ নীরব পরিচয় ঘনাইয়া উঠে আর সংক্রামিত হয়। শিষ্যের আকুতি রক্ষায় পূজনীয় এক হাঁটু কাদা ভাঙ্গিয়া চলিলেন অন্যতম গৃহীভক্ত নন্দ কবিরাজের বাড়ী। কাতারে কাতারে পশ্চাদনুসরণ করিল আবালবৃদ্ধ যতেক নরনারী। দু'পাশের বাঁশবন কাঁপাইয়া শূন্যে ছড়াইয়া পড়িল প্রফুল্লদার কীর্ত্তন-ধ্বনি। সব ভুলিয়া পল্লীর চিত্তাকাশে আজ কিসের এক দিব্যোন্মাদনা। বর্ষার বাতাসে আনন্দের মাতামাতি স্পর্শ করা যায়।

দ্বারদেশে পাদ্য-অর্ঘ্য হাতে কবিরাজ ইষ্টদেবকে বরণ করিলেন। সময় সংক্ষেপ। অধিক বিলম্ব না করিয়া আমরা উঠিলাম। প্রচুর জলযোগের আয়োজন। একটি মাত্র আঙ্গুর সেবা করিয়া গুরুদেব প্রসাদী করিয়া দিলেন। তাহাতেই ভক্তের অপার তৃপ্তি! উপেনবাবুর বাড়ীতে অবেলায় ভূরিভোজনজনিত আমাদের জলযোগে অপারগতা গুরুভাই কবিরাজ হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

সটান নদীর ঘাটে আসিয়া নৌকায় উঠিলাম। বেলা বারটা হইতে ছয়টা যেন এক পলকে কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়া গেল। একটানা উৎসবের আসন্ন বিরতি সকলকেই ম্রিয়মাণ করিয়া তুলিয়াছে। মুখে মুখে প্রিয়হারা-বিরহের ছায়া। নদী-পাড়ের সরু ফালি পথে ভীড় করিয়া উদাসী বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বনিতা দাঁড়াইয়া। অস্তাচলগামী রবি। সাঁঝের ম্লানিমাপাতে সারা আব্‌হাওয়া ব্যথাতুর। মেঘের গুমোট আর নাই। গোটপাড়াবাসীর অন্তরাকাশ জুড়িয়া আজ পুঞ্জীভূত যত বিরহ-মেঘ। বাহিরের বর্ষণ ধরিয়াছে সত্য, কিন্তু আকুল অপেক্ষমাণ নরনারীর নয়ন ছাপাইয়া অশ্রুর বান ডাকিয়াছে। নৌকা ছাড়িল। পাটাতনে দাঁড়াইয়া পূরবীর করুণ রাগিণীতে প্রফুল্লদা বিদায় জ্ঞাপন করিলেন—"আজি বিদায় বন্ধু, ওগো গোটাপাড়াবাসী.... ...."
দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্য্যন্ত জলভরা আঁখি নৌকার অনুসরণ করিল। অব্যক্ত বেদনায় অন্তর গুমরিয়া উঠিল। নয়নের উদ্গত অশ্রু মুছিয়া নির্ব্বাক বসিয়া পড়িলাম।

গগনে গুরু-পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্রোদয়। নির্ম্মেঘ আকাশ। মৃদু মন্দ পূবালী পবন। জলে-স্থলে জ্যোৎস্নার প্লাবন। সব কিছু মিলিয়া ফিরতি যাত্রা ভারী সুখময় করিয়া তুলিল।

৩রা শ্রাবণ। আজ দুইটার গাড়ীতে কলিকাতায় ফিরিবার কথা। সময় সংক্ষেপ। বহু আহ্বান কাট-ছাঁট করা সত্ত্বেও 'হেভি প্রোগ্রাম'। স্বামী ক্ষেমানন্দজীর

আহ্বানে প্রাতঃকালে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের মন্দির-চত্বরে এক সুনির্ব্বাচিত বৈঠকে আমরা যোগদান করিলাম। পূজনীয় সঙ্ঘগুরুর নির্দ্দেশে অরুণদা শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের দাম্পত্য-সাধনা সম্বন্ধে কিছু বলিবার পর, তিনি স্বয়ং 'জাতিগঠনে ঠাকুরের দান' বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা করেন। সাড়ে নয়টায় আলোচনা সঙ্গে হইল। শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়-বিনিময়ান্তে অপেক্ষমাণ মোটরে গিয়া আমরা উঠিলাম।

মাইল তিনেক দূরে কারাপাড়ার জমিদারবাটী পৌঁছিতেই উপস্থিত সকলে সশ্রদ্ধ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীযুক্ত রায়কে দেখিবার দীর্ঘকালের আকাঙ্ক্ষিত আশা পূর্ণ হওয়ায় অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার রায় সাহেব শ্রীনিকুঞ্জবিহারী রায় চৌধুরী মহাশয় সঙ্ঘগুরুকে পুনঃ পুনঃ প্রেমসম্ভাষণ ও সৌভাগ্য জ্ঞাপন করিলেন। অভিজাত প্রাচীন জমিদার বংশ। চারিদিকে দরদালানবেষ্টিত নাটমণ্ডপে আচার্য্য নৃপেন্দ্রচন্দ্রের পৌরোহিত্যে সভা বসিল। সাধারণ সভার প্রাণহীন কৃত্রিমতা নাই। এখানকার সমগ্র আব্‌হাওয়া শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতায় সমুজ্জ্বল। কাড়াপাড়ার তরুণ যুবকবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রায়কে অভিনন্দিত করা হইল :

"হে মহান্,

আজ "শাওনের অসীম ধারায়" ঝরে-পড়া প্রকৃতিরাণী সজীব হ'য়ে উঠেছে—জেগে উঠেছে এক অফুরন্ত স্পন্দন। এমন দিনে তোমাকে এই সুদূর পল্লীতে আমাদের কাছে পেয়ে, আমাদেরও প্রাণে একটা সাড়া জেগে উঠেছে—আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছি।

হে কর্ম্মবীর,

তোমার কর্ম্মজীবন তোমাকে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখ্‌বে। আজ বহির্জগতে যে সংগ্রাম চলেছে—যে আলোড়ন উপভোগ করছি, তাতে খুব যে বিচলিত হয়েছি, তা' নয়, তবে আমাদের চলার পথটা একটু পিচ্ছিল হ'য়ে উঠেছে, আজ পথ চলতে তুমি আমাদের সাহায্য ক'রো। শুধু "প্রবর্ত্তকে"র সম্পাদক নয়, তুমি আমাদের পথদ্রষ্টা, আমাদের উন্নতির পথে তোমার আলোক-শিখা আমাদের দেখিও। প্রার্থনা করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও—তোমার পুণ্যপূত জীবন সর্ব্বসাফল্যে ভূষিত হো'ক—বাংলার নব নব কর্ম্মক্ষেত্র ধন্য হো'ক তোমার আদর্শে ও প্রতিভায়।

হে দেব,

আমাদের হৃদয়ের ভক্তি ছাড়া তোমাকে অর্চ্চনা করবার মত কিছুই আমাদের নেই ; তাই তোমাকে ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়ে বরণ ক'রে নিচ্ছি। তুমি সানন্দে তা' গ্রহণ ক'রো।"

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী আবেগপূর্ণ পরিচয় প্রদান করিবার পর, অরুণদা সঙ্ঘের গঠন-নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। তারপর সঙ্ঘগুরু এক সুচিন্তিত মর্ম্মস্পর্শী অভিভাষণে "ভারতের জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি" সম্বন্ধে সবিশদ আলোচনা করিলেন। প্রাণ-নিংড়ানো ভাষা যেমনি প্রাঞ্জল তেমনি ছন্দোময়। যেন এক অখণ্ড কাব্যের আরম্ভ আর শেষ। বক্তৃতান্তে চিত্রার্পিত শ্রোতৃবৃন্দের যেন চমক্ ভাঙ্গিল। জমিদার শ্রীযুক্ত প্রণবচন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত কমলেশচন্দ্র রায় চৌধুরীর অকপট প্রীতি ও আদর-আপ্যায়নের বুঝি সীমা নাই। প্রচুর জলযোগান্তে রওনা হইলাম।

ফিরিবার পথে আমরা কারাপাড়া সেবাশ্রম পরিদর্শন করিলাম। শ্রীযুক্ত রায় এই সেবাশ্রমটিকে কেন্দ্র করিয়া পল্লীপ্রাণে নবজীবন সঞ্চার করিতে স্থানীয় তরুণদের আবেদন জানাইলেন।

সাড়ে বারটায় বাসায় ফিরিয়া কোন রকমে স্নান শেষ করা গেল। আচার্য্য নৃপেনবাবু ও তাঁর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণীর সস্নেহ তত্ত্বাবধানে মধ্যাহ্নাহার শেষ করিয়া প্রস্তুত হইলাম।

ষ্টেশনের এক কোণে চুপচাপ ট্রেণের অপেক্ষা করিতেছি। কৌতূহলী এক তরুণ আকস্মিক প্রশ্ন করিল, "প্রবর্ত্তক পত্রিকার রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে এত ঢাক পিটাইবার হেতু কি? পত্রিকার উদ্দেশ্য কি সাহিত্য-সাধনা নয়?"

জবাব দিলাম, "সাধনা যদি শুধু অবাস্তব বিলাস হয় তবে তা একদিন কর্পূরের মত উবে যাবে। জাতির জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে বাস্তব সমস্যাকে উপেক্ষা করে যে সাহিত্য-চর্চ্চা তা নিরর্থক আত্মবঞ্চনা। সৃষ্টিকরী বলিষ্ঠ মনের কাছে তার কি আবেদন থাক্‌তে পারে আপনিই বলুন?"

হঠাৎ কি উত্তর দিবে, ছেলেটি বোধ হয় ভাবিয়া পাইতেছিল না। উল্টে প্রশ্ন করিলাম, "সেদিন মতিবাবুর বক্তৃতা কেমন লাগলো?"

—"খুউব সুন্দর। জাতিগঠনের নূতন আলো, নূতন চিন্তার খোরাক বক্তৃতায় ছিল। ধর্ম্ম-বক্তৃতা যে এমন হবে, আমাদের মধ্যে তা অনেকেই আগে ভাবেনি।"

—"তা হলেই বুঝুন, প্রবর্ত্তকের দেওয়ার কিছু আছে। রজত-জয়ন্তীর উদ্দেশ্য .."

কথা শেষ হইল না—অদূরে ট্রেণ দেখা গেল।

বিদায়োপলক্ষে সদলবলে অধ্যক্ষ নৃপেন্দ্রবাবু ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণ প্ল্যাট্‌ফর্‌মে উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রবৃন্দের অনুরোধে প্রফুল্লদা গান ধরিলেন : "আবার তোরা মানুষ হ।" ট্রেণ আসিল—ধরিল—ছাড়িল—গান আর থামিল না। শুষ্ক কণ্ঠে নির্ম্মলাদি বলিল, "ঐ যা, গানের গোলে আমার বিছানা-কাপড়ের পুঁটুলি ফেলে এসেছি।"

বলিলাম, "বেশ হয়েছে, বাগেরহাটের আড়াই দিনকার মধুময় স্মৃতির ভোজে এ-ঘটনা চিরদিন চাট্‌নি হয়ে থাকবে।"

—"যান—রমণদা'র সবতাতেই চালাকি! ভগবান কি ভাববেন?"—নির্ম্মলাদির মুখে বিরক্তি-চিহ্ন।

পুনরায় হেসে উত্তর দিলাম, "যাই ভাবুন, লাভ-ক্ষতি সবেতেই আত্মসমর্পণ যোগীর **"ইষ্টার্পণমস্তু"**।

১৬

১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে নূতন কর্ম্ম-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলাম, পুরাতন কর্ম্মজীবনের যেন অক্ষপাত হইয়া গেল, সাধনারও করিবার কিছু রহিল না; নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত এই চৈতন্যই প্রাণকে সঞ্জীবিত রাখিল—

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

হৃষীকেশের সঙ্কেতে সেই যে যাত্রা সুরু হইয়াছে, আজিও তাহার পরিসমাপ্তি হয় নাই। যাহা হয়, তাহার জন্য দুশ্চিন্তা নাই। কত প্রিয় বস্ত অন্তর্হিত হয়, কত অপ্রিয় ঘটনায় জড়াইয়া পড়ি, সুখের সীমা ছাড়াইয়া দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাই, শান্তি ও স্বস্তির প্রার্থী হই। হৃষীকেশের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়, অশান্তি ও অস্বস্তিই বাড়ে। নয়নকোণে অশ্রু উথলিয়া উঠে; কিন্তু তবুও সান্ত্বনা— ঈশ্বরেচ্ছায় জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়, দায়ী কেহ নহে। দাবী কাহারও উপর করিবার নাই। অপ্রিয় আশ্রয় হইতে মুখ ফিরাইবার চেষ্টাও বৃথা হয়, অতএব—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ,<br>
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।<br>
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন<br>
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

দিন চলিল। কালস্রোতঃ কোন বাধাই মানে না। কর্ম্ম হয়, ভাল-মন্দ দুইই। ভাল-মন্দ কিছুই প্রশ্রয় ও আশ্রয়ে ইতরবিশেষ হয় না। যাহা করি, কে যেন বাধ্য করে; সব কিছু অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কর্ম্ম নির্দ্বন্দ্বে হয়। সেখানে কোন বাধাই নাই। চিন্তার জগৎ কিন্তু সেদিন দ্বন্দ্বহীন হয় নাই। ভাল-মন্দ লইয়া বিচারের দরবার চিন্তাজগতে অধিকরূপে জাঁকাইয়া উঠিল। কর্ম্মক্ষেত্রে সে বিচার-শক্তির বাহিরে; সেখানে বিচারকের রায় কোন কাজেই আসে না। রাষ্ট্র ছাড়িয়া স্বাবলম্বী হওয়ার প্রবৃত্তি একের পর আর এক কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছিল। রাষ্ট্রকর্ম্মে উৎকণ্ঠা ছিল, আশঙ্কা ছিল, চিন্তার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু এই কর্ম্মে এই সকলের কোনই প্রয়োজন রহিল না। কর্ম্ম অতিথির ন্যায় প্রতিদিন উপনীত হয়; আমার শরীর-মন তাহার যথোচিত সৎকার করিয়া ধন্য হয়। বিবেক চীৎকার করিয়া মরে। আমার দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদির উপর কিন্তু তাহার প্রভাব স্পর্শ করে না। এই সময়ে কেহ বিষ দিলে, বিষ খাইতেও কুণ্ঠা হইত না। কিন্তু আশ্চর্য্য, যাহা অহিত, যাহা অমঙ্গল, তাহা সম্মুখে দেখা দিত বটে; আমার বিচার না থাকিলেও, ঐগুলি জীবনে সম্পূর্ণরূপে সংঘটিত হওয়ার সুবিধা পাইত না। আমি ঈশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণের মন্ত্র-সাধনায় এই কথাই ভরসা করিয়া বলিতে পারি যে, ভাল-মন্দের বিচার ও বিবেক মানুষের স্বভাবসংস্কারে স্বরূপ হারাইয়া আচার ও ব্যবহারগত যাহা ভাল ও মন্দ সমাজে প্রচলিত, তাহাতেই অভিভূত হইয়াছে। জীবনযন্ত্র যখন ভগবানের সঙ্কেতে চলিতে থাকে, তখন পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ বিচার-বিবেক কর্ম্মের সহিত যুক্তি না পাইয়া কিছুদিন চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হয়; তারপর ঐগুলিও ভাগবত কর্ম্মের সূত্র ধরিয়া নূতন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতঃপর ঈশ্বরকৃত কর্ম্মের অভিব্যক্তির সহিত অন্তরের অমিল চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়। সাধক মুক্তি পায় অন্তর-দ্বন্দ্বের পীড়ন হইতে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের কর্ম্মপ্রেরণায় জীবন-সঙ্গিনী যেন হারাইয়া গেল। তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের কোন কারণই বিদ্যমান রহিল না। ছায়ার ন্যায় তিনি চির-সঙ্গিনী; কিন্তু তাঁহার কায়ার সহিত শুধু দেহগত নয়, অন্তরের সম্পর্কও ছিন্ন হইয়া পড়িল। প্রফুল্লমুখী গৃহদেবী সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই আত্মস্থ হইয়া আমার অনুসরণ করিতেন। সম্ভবতঃ এইজন্যই অতি অল্প বয়সেই তাঁহার ভাবগভীর প্রতিমায় প্রবীণতার ছায়াপাত হইয়াছিল। ইহা বার্দ্ধক্যের শিথিলতা নহে, ভাবগাম্ভীর্য্যের আতিশয্য। এই ২৯ বৎসর বয়সেই তিনি এমন গুরু-প্রকৃতির

হইয়াছিলেন, যাঁহার সম্মুখে অতি প্রগল্‌ভ নরনারীও মাথা নত করিতে বাধ্য হইত।

কাজের অন্ত রহিল না। জীবন-সঙ্গিনীর সহিত বাহ্যতঃ পরিচয় না থাকার ফলে, এই সময়কার ঘটনায় তাঁহার কথা লিখিবার মত কিছুই নাই। সমস্ত পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে এমন একটী সুদৃঢ় জীবন-নীতি আমাদের অভিভূত করিয়াছিল, যাহা স্বতঃই আমাদের নীরব ভাষায় এই কথাই ব্যক্ত করিত "তাঁর কাজে আছি বত, আর কিছু জানি না রে।" জীবননিয়ন্ত্রণের ভার ভগবানের হাতে ছাড়িয়া দিয়া অবধি এমন দিন কখনও আসে নাই, যেদিন নিয়ম-শৃঙ্খলের ব্যতিক্রম হইয়াছে। কে যেন অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠাইয়া দেয়, উপাসনা করায়, "প্রবর্ত্তক" লেখায়, অসংখ্য কর্ম্মের হিসাব রাখায়। সে নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্ম, অবসন্নতা নাই। যথাসময়ে শয্যাগ্রহণ করি, আবার উঠি যথাকালে। এইভাবে জীবন চলিয়াছে।

প্রাঙ্গণে উষার আলো বিচ্ছুরিত হয়, শেফালীর ডালে ডালে শিশিরসিক্ত ফুলের হাসি, বাতাসে মধু-সৌরভ ভাসিয়া আসে। ঝলমল সূর্য্যকিরণে গৃহচূড় উদ্ভাসিত হয়। দুয়ারে আসিয়া ভিখারীর পর ভিখারী কেহ খঞ্জনী, কেহ একতারা, কেহ বা বেহালা বাজাইয়া গান গাহিয়া যায়। মুষ্টিভিক্ষায় কেহ বঞ্চিত হয় না। সঙ্গীত নীরব হয়, অর্থ তার ভাসিয়া বেড়ায় অনেকক্ষণ, মনে গাঁথিয়া যায়—

"বাহির ভিতর দুই সমান রেখ ভাই,
মানুষ যদি হতে চাও।"

এমন কত গান!

"প্রবর্ত্তকে"র সুর-সঙ্কেতে তরুণের আনাগোনা বাড়িল। বাণীর নেশায় চক্ষে যাহাদের রং ধরিয়াছিল, তাহাদের দেখিয়াই চিনিতাম। ইহার মধ্যে কাঁচা-পাকা রং দুইই ছিল। আমি ইচ্ছা করিয়া পাকা রংয়ের চেয়ে কাঁচা রঙে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িতাম। কাঁচা রং গায়ে ছোপ দিত, দেখাইত ভাল। সেদিন ছিল এমনই অবস্থা। স্বেচ্ছায় প্রবঞ্চিত হইতাম। পাকা রঙের লোকেরা সমালোচনা করিত, হয় ত আমার ভ্রান্ত দৃষ্টির জন্য দুঃখ-সংশয় দুইই করিত। আমার আচরণের জন্য দায়ী যে আমি নহি, অনেক দিন সে কথা তাহারা বুঝে নাই।

ভগবান যখন অন্তর অধিকার করেন, তখনই জ্ঞানের অফুরন্ত উৎস বিকশিত হয়। সে জ্ঞানধারার নানা ভঙ্গী আছে। হৃদয়ের ধর্ম্মেও ঈশ্বর-প্রকাশের প্রেমঘন রূপ—তারও এক ছন্দঃ নহে, বিচিত্র ভঙ্গী। প্রাণের কর্ম্ম প্রেরণায় ঈশ্বরের আলো যখন প্রকাশ হয়, তাহাও এক বর্ণ নহে, ইন্দ্রধনু সৃষ্টি করে। এমনই শরীরটাতেও তাঁর রূপের আভা প্রকৃতির বিলাসের ন্যায় নানা মূর্ত্তি ধরে। লোক আসিলেই ঈশ্বরের প্রকাশ-মূর্ত্তি দেখার জন্য মুখ পানে চাহিয়া থাকিতাম। দুইজনের মুখেই যদি হাসির রেখা ফুটিত, মনের মানুষ বলিয়া জড়াইয়া ধরিতাম। এই স্পর্শটা দেহের চেয়ে মনেরই বেশী হইত। মনের মানুষ খোঁজাও ছিল এক বড় কাজ। মনের মানুষ খুঁজিতে খুঁজিতে কত গানই গাহিতাম। অনেক জনের ভীড় ঠেলিয়া দুই একজনই মিলিত। ভীড়ের সময়ে এই দুই এক জন উপেক্ষিত হইয়াই থাকিত, ভীড় কমিলে ইহাদের আনন্দ ও মহিমা ভাবে ও ভাষায় চিত্ত আমার পুলকিত করিত। এই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতেই এক, দুই, তিন করিয়া মনের মানুষ লাভ হইয়াছে। 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ' তাই সংহত নয়, এই সব মনের মানুষের রং।

ভাবের ঘোরের সঙ্গে কর্ম্মের সামঞ্জস্য ঈশ্বরই রাখিতে পারেন, মানুষ পারে না। মানুষ হয় ভাবে থাকে, নয় কর্ম্মে মাতাল হয়। ভাব ও কর্ম্ম, দুইই পুরাদমে চলিল ভগবদিচ্ছায়। ভাবের কথা ছাড়িয়া দিই, কর্ম্মের কথাই বলি।

প্রথম যুদ্ধ-শেষের কথা। কথাটা প্যারিসের। "প্রবর্ত্তকে"র জন্মদিন হইতেই এই যুদ্ধ-কর্ম্মটা ভাবতঃ আমায় খুবই পাইয়া বসিয়াছিল। আত্মীয় ও বন্ধুদের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ-হেতু সেদিনের ইউরোপের কুরুক্ষেত্রের সহিত সংযোগ-রক্ষা করার সুবিধা হইয়াছিল। যুদ্ধ শেষে এক ফরাসী মহিলার অনুভূতি বর্ত্তমান পাঠক-পাঠিকার মন্দ লাগিবে না। অতি সংক্ষেপেই তাঁহার কথা উল্লেখ করিব। তিনি লিখিয়াছেন—"শান্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। তোমরা কত কি মনে করিতেছ। কত নাচ, কত গান, কত আনন্দই না হইতেছে! * * * হয়তো মনে করিতেছ—দেশপ্রেমিক আনাতল নূতন উপন্যাসরচনার বিষয়সংগ্রহে মত্ত। কবি রিশপ্যাঁ নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ।

সমাজতন্ত্রী তমাস আশ্বস্ত। কিন্তু কিছুই নাই। নাচ গানের অভাব নাই বটে; গালে মাথার লাল রং চতুর্দ্দশ লুইয়ের সমস্ত রাজ্যকালে বোধ হয় অত বিক্রয় হয় নাই, কিন্তু তবুও যেন উৎসাহ নাই। * * একটা নৃত্যামোদ-নিমন্ত্রণে যোগ দিয়াছিলাম। নৃত্যযুদ্ধ শেষ হইলে, একজন সৈনিক তাঁহার প্রণয়িনীকে আরাম-কেদারায় বসিয়া চুপি চুপি বলিতেছে শুনিলাম "সারেন, (প্রিয় সম্ভাষণ) আনন্দের কি আছে? যাদের শির-কঙ্কালের উপর এই নৃত্য, তারা আমারই মত ছিল, তাদেরও প্রিয়জন ছিল, আজ তারা এই আমাদের আনন্দ দেখিয়া কি অভিশাপ দিতেছে না?"

পত্রলেখিকা একখানি ছবি পাঠাইয়াছিলেন; ছবিখানির উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন "এক সঙ্গে দুই-তিন শত মড়ার মাথা, তার উপর কাঠের ক্রশ পড়িয়া গিয়াছে; উপরে শ্যামাঘাস লক্ লক্ করিতেছে, এদের মাথার খুলির ভিতর তাহার শিকড় পৌছিয়াছে। মৃত কঙ্কাল-গুলি কি তপস্যা করিতেছে? তপস্যা করুক আর নাই করুক, তাদের জীবনের উদ্দেশ্য পদদলিত করিয়া যে অকৃতজ্ঞ জাতি আজ আনন্দমগ্ন, কবরের ভিতর হইতে এই সুখের অন্নে বালি দিতে তারা এক ছেদহীন ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে, তাহাদের সেই ইচ্ছা আরও করাল মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইবে। * * ডাচেসল্যাণ্ড কবরে যে সকল সৈনিক বীর শয়ন করিয়া আছে, তাহারা দূরের আকাশে ঘূর্ণায়মান কলের চিমনীর দিকে তাকাইয়া, ধনিকের আবার শ্রমিককে পিষিয়া মারার আগুন জ্বালা দেখিতেছে। এই সব ভাবিয়া আনন্দের ধূম স্তম্ভিত।

২৮শে জুন সন্ধিপত্রে যখন স্বাক্ষর হয়, বঁনভ্যালের রেষ্টুরেণ্টে ৩০।৪০ জন মিত্র ও নিরপেক্ষ জাতির প্রতিনিধি লোকচক্ষুর অন্তরালে পরস্পর ঐক্যসূত্রের অন্বেষণ করিতেছিলেন। বাহিরে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া কামানশ্রেণী বজ্র-নিনাদ করিতেছিল। বন্দুকের ফট্‌ফট্ শব্দে কাণে তালা ধরিতেছিল। তখনও রণবাদ্য বাজিতেছে ঝন্ ঝন্ ঝন্, আর আকাশে রণ্ রণ্ করিয়া ব্যোমযান উড়িতেছে। দিগ্ দিগন্তে ইথর-তরঙ্গে শান্তিবার্ত্তা-প্রেরণের ব্যবস্থা।

বঁনভ্যালের সভাভঙ্গ হইল। সভার ফলাফলের কথা কেহ জানে নাই। কিন্তু সভাপতি চার্লস্ গিদ বলিতে ভুলেন নাই "আজিকার সন্ধিসর্ত্ত বোধ হয় স্থায়ী হইবে না। রাজ্যের আদানপ্রদান, অর্থবিনিময় দুই বৎসরের মধ্যেই বদলাইয়া যাইবে। সন্ধির কোন সর্ত্তই তাহার থাকিবে না।" গিদের এই নৈরাশ্যের মধ্যেও আত্মপ্রসাদ ছিল। যে নিঃস্বার্থ সাধনায় ইউরোপের শান্তিপ্রতিষ্ঠা, তাহা আমরা ব্যর্থ হইতে দিব না এই কথায়।

"মিত্রপক্ষের বুকে এই আশাটুকুই ছিল সান্ত্বনা। সমস্ত পৃথিবীই বুঝিয়াছে—ইউরোপের কুরুক্ষেত্র উপস্থিত ধামা চাপা রহিল।"

সেদিন যুদ্ধারম্ভ মাত্র, অন্তরে যে প্রেরণা পাইয়াছিলাম, তাহাতে বাংলায় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলাম। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এম্বুলেন্স কোর গঠনের সূত্র অবলম্বনে আমার প্রচেষ্টার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ফরাসী দেশে বাঙ্গালী সেনাবাহিনী গড়ার সুযোগ পাইয়া, আমার সে সুবিধা সিদ্ধ হইয়াছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট তারিখে শ্রীঅরবিন্দ এক অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। যুদ্ধের তিনটী সম্ভাবনীয়তার কথা তাঁহার পত্রে উল্লিখিত ছিল, সেইগুলি এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাঁহার লিখিত পত্রখানির কিয়দংশ অবিকল উদ্ধৃত করিলাম—

"I. Those bringing about the destruction of the two Teutonic Empires—German and Austrian.

This may happen either by an immediate German defeat—its armies being broken and chased back from Belgium and Alsace—Lorraine to Berlin, which is not possible or by the Russian arrival at Berlin and a successful French stand near Rheims or Compiegne or by the entry of Italy and the remaining Balkan States into the war and the invasion of Austro-Hungary from two sides.

II. Those bringing about the weakening or isolation of the British Power.

This may be done by the Germans destroying the British Expeditionary Force and entering Paris and dictating terms to France, while Russia is checked in its

march to Berlin by a strong Austro-German force operating in the German quadrilateral between the forts of Danzig, Thoren, Posen and Konigsburg. If this happens, Russia may possibly enter into a compact with Germany based on a reconcilation of the three Empires and a reversion to the old idea of a simultaneous attack on England and a division of her Empire between Germany and Russia.

III. Those bringing about the destruction of British Power.

This may happen by the shattering of the British fleet and a German landing in England."

যুদ্ধের এই তিন সম্ভাবনীয় পরিণামের মধ্যে সেদিন তাঁর প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল এবং বৃটনের জয়ে আমরা সেদিন বিশেষভাবে আশান্বিত হইয়াছিলাম।

সেদিনকার "প্রবর্ত্তক" যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের উদ্দেশ্যবিষয়ে অনবগত নহেন। ইউরোপীয় যুদ্ধে বৃটেনের জয় হইলেও, ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাদের বিপুল প্রস্তুতির কথা আমরা বরাবর লিখিয়াছি। বৃটেনে বাধ্যতামূলক সামরিক বিধির প্রবর্ত্তন এবং মিশরে ও ভারতের সহিত যথাযোগ্য মৈত্রী স্থাপন করিয়া বৃটন বিপুল শক্তি অর্জ্জন করিতে পারে, বৃটনের ইহাই উত্তম ভবিষ্যৎ; কেননা, বিজয়ী বৃটনকে সুদূর ভবিষ্যতে উন্নতশিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইলে, পরকীয় অন্য বৈদেশিক শক্তির আনুকূল্য অপেক্ষা ভারত ও মিশরের সম্মিলিত শক্তি অধিক সুখ ও শ্রেয়ের কারণ হইবে।

এই উদ্দেশ্যে আমার ক্ষুদ্রশক্তি সুস্পষ্টভাবে "প্রবর্ত্তকে"র ভাষায় ও কর্ম্মে প্রমাণিত হইত; কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনায় বুঝিয়াছি—আমার এই অকপট প্রচেষ্টা অরণ্যে রোদনের ন্যায়ই ব্যর্থ হইয়াছিল।

ভগবান আমায় এই সময় হইতে বিশ্ব-মানবতার মঙ্গল লক্ষ্যে সুনির্দ্ধারিতরূপে পরিচালিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমার চিন্তার জগৎ ও কর্ম্মের জগৎ এক হইয়া গিয়াছিল। আমার লক্ষ্য সুস্পষ্ট ছিল; কিন্তু প্রকৃতির বাধায় উদ্দেশ্যসিদ্ধির বহু দূরে পড়িয়া যাইতেছিলাম। তবে শ্লথগতি হইলেও, সে লক্ষ্য হইতে আমি কোনদিন সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট হই নাই।

বিশ্বমানবতার হিতসাধন করিতে হইলে, ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার সুস্পষ্টতা দরকার। যুগপৎ এই কর্ম্ম করিতে হইলে, কংগ্রেসের ন্যায় একটা বিপুল সংহতি ইহার অনুকূল হইবে না, এ বিষয়ে আমার কোনই সংশয় ছিল না। তথাকথিত একটা বৃহত্তর সংহতি গড়িলেও, এই কর্ম্মের জন্য তাহা উপযোগী হইবে না। হৃদয়-বীণায় অন্তর্য্যামীর যে মধুময় সঙ্কেত ঝঙ্কৃত হইত, সেই সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের যে সমর্থনবাণী শব্দে ও অনুভূতিতে পাইতাম, তাহাতে আমি আমার লক্ষ্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত হই নাই। গতি ক্ষিপ্র না হইলেও, লক্ষ্য অমোঘ, অব্যর্থ হইয়াছিল।

রাষ্ট্রবিপ্লবের ভিতর দিয়া জাতির অভ্যুত্থান ও মুক্তির জন্য বিপুল লোক-সংহতি, অর্থ ও অস্ত্রবলের প্রয়োজন। আমার পথ বিপ্লবাত্মক নহে, এমন কি প্রতিবাদের কণ্ঠও সেখানে প্রয়োজনীয় হয় না। মানবতার মুক্তি ও শান্তির উদ্দেশ্যে ভারতের আত্মা জাগ্রত করাই প্রথম কাজ। কিন্তু সে বৃহত্তর কর্ম্মসাধনার পূর্ব্বে বাংলার সুশ্যাম নৈমিষারণ্যে শতাব্দী শতাব্দী কাল ধরিয়া যে অধ্যাত্মজাতিগঠনের ঋক্‌ধ্বনি উঠিয়াছে, তাহার অনুসরণ করিয়া, তাহার জাগ্রত অনুভূতি লইয়া এক বিশেষ সংহতিসৃষ্টির প্রয়োজন। "প্রবর্ত্তকে"র বাণীমন্ত্র ইহার জন্য কয়েক জন চিহ্নিত সন্তানকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তাহাদের পরিচয় পাইলাম। পটভূমিকার উপর সুরঞ্জিত চিত্র যেমন ক্ষেত্রটীকে আড়াল করিয়া ধরে, সেদিন আমার গৃহলক্ষ্মীর সেই অবস্থাই হইয়াছিল। পতি-পত্নীর মধ্যে এই ব্যবধান সুখের নহে। আমি ঈশ্বর-প্রেরণা-মুগ্ধ, তিনি পতিসোহাগিনী। আমার উদ্দেশ্য ও কর্ম্ম তাঁহার নিকট সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত ছিল; তিনি কিছুই বুঝিতেন না। মনে করিতেন, তিনি যেন দূরে পড়িয়া যাইতেছেন। এইরূপ অনুভব করিয়া তিনি হাঁপাইয়া উঠিতেন—কত প্রশ্ন তুলিতেন। তাঁহাকে কার্য্যোপযোগী করিয়া তোলার শিক্ষা দিবার অবকাশ পাইতাম না; সময়ের অভাবে নহে, প্রবৃত্তি ছিল না। এই নিষ্ঠুরতার জন্য আমি কি দায়ী হইব?"

আমরা কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত অনুসরণ; অতএব সে যুগের ঘটনার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় পাঠকদের গ্রহণ করিতে হইবে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জীবনযাত্রার নূতন সূত্রপাত। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তাহার নিদারুণ অঙ্কপাত। সেই কথাই জীবন-সঙ্গিনীর চরম কথা। আজ জাতির অপ্রকাশিত কয়েক পৃষ্ঠা ইতিবৃত্ত রচনা করিতেছি।

"প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ" শুধু বিপ্লবী হইবে না, তাহা নহে; অপ্রতিবাদী হইয়া কার্য্য করিবে। "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের" প্রতি নারীপুরুষ ঈশ্বরে আত্মসমর্পিত হইবে। জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে নিখিল মানব-জাতি এই একই অন্তর্য্যামীর সঙ্কেতে চলিয়াছে; প্রতিবাদ করিবে কাহাকে? শূন্যে ফুৎকার নিক্ষেপ করিয়া ইহাতে যে নিজেকেই কলঙ্কিত করা হইবে।

বিনা সংঘর্ষে কি কর্ম্ম হয়? বিনা ধ্বংসে কি সৃজনের শতদল বিকশিত হয়? অরাতিদমন না হইলে কি সাধু পরিত্রাণ পায়? এ প্রশ্ন, এ বিচার আত্মসমর্পণযোগীর নহে। ঈশ্বরের যন্ত্র যে, সে কি শুধু নিজেই এই অধিকার লাভ করিয়াছে? এ জগৎ কি মহাযন্ত্রশালা নহে? এক অদ্বয় যন্ত্রী ব্যতীত অন্যের কর্তৃত্ব আত্মসমর্পণযোগী কি স্বীকার করিতে পারে? তবে কর্ম্ম হইবে কি প্রকারে? প্রতিদিনের পদক্ষেপ প্রমাণ করিয়া চলে যোগীর অপ্রতিবাদী গতি। পৃথিবীর ধূলি হয়তো বিমর্দ্দিত হয়, বায়ুসাগর সন্ত্রাসিত হইয়া উঠে—পথিকের চিত্তে এই সংঘর্ষ স্পর্শ করে না। ধূর্জ্জটীর শির হইতে নামিয়া আসিতেছে ভাগীরথী—কানন-কান্তার, অচলস্তূপ সম্মুখে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করে। জাহ্নবীর বিরোধ নাই; সে আঁকিয়া বাঁকিয়া বিপত্তিসঙ্কুল পথে আপনার আনন্দে হিল্লোলিত হইয়া চলিয়াছে। বাধার সহিত সংগ্রাম নাই, প্রতিবাদ নাই। গতি যে তার অনাহত; অনন্ত সাগর-বক্ষ তার লক্ষ্য। পথের কোন্দল লক্ষ্যচ্যুত হওয়া। এইরূপ সঙ্ঘের সংগঠনস্রোতের আবিষ্কার করিয়া অতি ক্ষীণ তটিনীর ন্যায় যাত্রা আমাদের সুরু হইল বিনা আড়ম্বরে—আত্মার অনুপ্রেরণায়। প্রবাহের প্রাণ অফুরন্ত আত্মশক্তি। এই আত্মস্থ যোগীর সঙ্ঘই বাংলায় নববেদ মূর্ত্ত করিয়া, নিখিল ভারতাত্মার জাগৃতিসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বিশ্বমানবের সম্মুখে মুক্তি ও শান্তির বার্ত্তা ঘোষণা করিবে। এ অমৃত, স্বপ্ন বা কাহিনী মাত্র বলিয়া সেদিন যাহারা ফিরিয়া গেল না, তাহাদেরই লইয়া "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ।"

"প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ" স্বাবলম্বী হইবে, আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে, প্রেম ও ঐক্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবে না; ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে না। এই স্বচ্ছ নিরাপদ্ যাত্রাপথে সহসা ঈশ্বরের সতর্কবাণী কর্ণ বধির করিল। স্তম্ভিত হইয়া দেখিলাম—অতীতের সাথী তারা যে আজ বন্দী! সহযাত্রীদের শৃঙ্খলিত জীবন উপেক্ষা করিয়া এই যে নব-যাত্রা, তাহা কি তাঁহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা নহে?

বৃটনের যুদ্ধজয়ে ভারতের প্রাণে আশার সঞ্চার হইয়াছিল। ভারতে নূতন শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তনের আবহাওয়া বিলাতের পার্ল্যামেণ্ট হইতে ভারত পর্য্যন্ত হিল্লোলিত হইতেছিল। এই অবস্থায় বাংলার রাজ-বন্দীদের মুক্তি আসন্ন হওয়া উচিত ছিল; তাহা না হইয়া কুবিখ্যাত রাউলাট বিল প্রবর্ত্তিত হওয়ার আয়োজন দেখা গেল। যুদ্ধকালে অন্তরীণ আইনে এই চারি বৎসর যাহারা বন্দী, তাহারা মুক্তি না পাইয়া কারাবন্দী থাকিবে, আর দেশ নূতন শাসনসংস্কার লইয়া তাহাদের ভুলিয়া যাইবে? আর আমরাও বাহিরের রাষ্ট্রসংস্কারের প্রতি অনপেক্ষ হইয়া আত্মার গতি ধরিয়া চলিব? ইহা যেন বিসদৃশ মনে হইল। "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের" সংগঠননীতি বিস্তৃতভাবে কার্য্যে পরিণত করা হইল না। বাংলার রাজবন্দীদের মুক্তি-উদ্দেশ্যে "প্রবর্ত্তকে" শুধু আলোচনা নহে, অনাড়ম্বরে ও অবিজ্ঞাপনে ইহার জন্য ব্যবস্থায় ও আয়োজনে জীবন অবকাশহীন হইয়া পড়িল। অন্তরীণদের মুক্তি-আন্দোলনের সে অপ্রকাশিত অধ্যায় বাহিরের লোক জানিয়াও জানিতে চাহেন নাই; আজ সে কথা প্রকাশ না করিলে, বাংলার জাতীয় ইতিহাসের কয়েক অধ্যায় মিথ্যারঞ্জিত হইয়া থাকিবে। মানব-প্রকৃতির মধ্যে যে সত্যগোপনস্পৃহা সুদৃঢ় শিকড় গাড়িয়া আছে, তাহাই ইতিহাসের পৃষ্ঠা মিথ্যায় ভরায়। সত্য স্তব্ধ মৌন হইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের খোরাক যোগায়। বর্ত্তমান যুগে সব কথা প্রকাশ করা সম্ভব না হইলেও, আমি সাধ্যমত সে যুগের অবিসংবাদিত ইতিহাস বলিবার প্রয়াস করিব।

( ক্রমশঃ )

# প্রাচীন চীনের সামাজিক ভিত্তি

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম.এ., পি. এইচ্‌ডি.

২

## ভাবরাজ্যে চীনের ক্রমবিকাশ

প্রাচীন চীনে যে সব জ্ঞানী দার্শনিকেরা প্রকট হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দার্শনিক মতসমূহ তৎকালীন চীনের রাজনৈতিক অবস্থা হইতে নির্লিপ্ত হইয়া অর্থাৎ বিমুক্তভাবে উদ্ভূত হয় নাই; দেশের অবস্থা তাঁহাদের মতকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। সম্রাট্ পিঙ্গওয়াং হইতে কুঙ্গচিউ (কন্‌ফুসিয়ুস্) পর্য্যন্ত (৭৬০-৫৫১ খৃ: পূ:) এক শতাব্দীর উপর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা গিয়াছিল। এই সময়কে "পাঁচ নেতার" যুগ বলা হয়। কারণ যখন বিবদমান খণ্ড রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্রাট্ নিজের ক্ষমতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছিল, তখন এই খণ্ড রাষ্ট্রের পাঁচটি একটির পর একটি উত্থিত হইয়া নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। একবার খৃ: পূ: ৫৪৬ সালে সুঙ্গে চৌদ্দটি রাষ্ট্র মিলিত হইয়া একটা "জাতিসংঘ" স্থাপন করে এবং সকলের মধ্যে শান্তিস্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।

চীন-রাষ্ট্রের এই অবস্থার সঙ্গে ধর্ম্মের অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, চীনের প্রাচীন ধর্ম্মের ভিত্তি, প্রকৃতি ও প্রেতাত্মার উপাসনার উপর স্থাপিত। প্রকৃতির উপাসনার সঙ্গে রোজা, ঝাড়ন, ফোড়ন কুসংস্কার জড়িত এবং প্রেতাত্মার উপাসনার সঙ্গে মৃত পূর্ব্বপুরুষদের আত্মার উপাসনা জড়িত। আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বা ভগবান অথবা অতি পূর্ব্বপুরুষের উপাসনা সম্রাটের একচেটিয়া। ইহ-জগতে সমাজে যেমন সামাজিক স্তরভেদ আছে, পরলোকে প্রেতাত্মাদের মধ্যেও তেমন স্তর কল্পিত হইয়াছে।[১]

রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম বিষয়ে, সম্রাট্‌কে জাতির প্রধান পুরোহিত বলা হইত; সে "স্বর্গের পুত্র" (Son of heaven) নামে অভিহিত হইত। প্রতিনিধিমূলক পূজাসমূহ সম্রাটের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। এই রাজনৈতিক ও ধর্ম্মের পটে প্রথম বড় ধর্ম্মপ্রচারক হন লাওট্‌সু। ইনি ৬০৪ * খৃ: পূ: জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জীবনী বিষয়ে কিছু জানা যায় না। কেহ বলেন—তাঁহার জীবনী গল্প মাত্র। আবার কেহ ইহা বুদ্ধের জীবনীর জনশ্রুতির বিকৃতি মাত্র বলিয়া অনুমান করেন। লাওট্‌সুর উপদেশ কন্‌ফুসিউসের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়াই তাহা বিদেশাগত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন[২]। তাঁহার মত হইতেছে টাও (Tao)—ইহার অর্থ "পথ" (way)। কিন্তু এই পথটি কি, তাহা কেহ ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই। এক কথায়, এই মতের লক্ষণ হইতেছে অতীন্দ্রিয় (mystical) ও অ-চঞ্চল (quietist) ভাব। ইনি পথের (Tao) অনুসন্ধান করিতে গিয়া বলেন, "সমস্ত জিনিষ অস্তি (being) হইতে আসে, এবং অস্তি নাস্তি (non-being) হইতে আসে।[৩] এই নাস্তিই সমস্ত জিনিষের আরম্ভ কাল। ইহার আদর্শ হইতেছে প্রকৃতির অবস্থা—সরলতা ও নির্দ্দোষিতায় থাকা। এই জন্য ইনি সমস্ত মানুষের সৃষ্ট বাঁধাধরা পদ্ধতি ও সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি, যাহা সভ্যতার মূল তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে বলেন। ইনি বলেন, প্রকৃতির পথ হইতেছে স্থিরতা বা অচঞ্চলতা (non-activity)। "যত বন্ধন ও নিষেধাজ্ঞা জগতে থাকিবে, লোকে তত গরীব হইবে। যত উদ্ভাবন ও যন্ত্রপাতি বা অস্ত্র মানুষের হাতে থাকিবে, রাষ্ট্র তত বিপদে পড়িবে। মানুষ যত চালাক হইবে, ঘটনাগুলিও তত তাহার বিপরীত হইবে; যত আইন ও হুকুম প্রচারিত হইবে, তত চোর ও ডাকাইত বাড়িবে।

১। Gowen and Hall—p. 69.

* লিয়াং-লি বলেন ৫৭০ খৃ: পূ:।

২। Gowen and Hall P. 70.

৩। Tao Te Ching—Ch. XL.

এই জন্য জ্ঞানী লোকেরা বলেন, "আমি স্থিরতা অভ্যাস করি, লোকেরা নিজেই শোধরাইবে। আমি অচঞ্চলতা বা শান্তি ভালবাসি; লোকে নিজেরাই ন্যায়পরায়ণ হইবে। প্রকৃতি কিছুই করে না, কিন্তু কিছু-ই অপূর্ণ থাকে না।"[১]

লাওট্সুর দর্শন নিহিলিষ্টিক হইলেও, তাহাতে এমন জিনিষ ছিল, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া পরে কনফুসিউস ও অন্যান্য দার্শনিকেরা তাঁহাদের গঠনমূলক দার্শনিক পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছেন। সকল জিনিষই শূন্য বা নাস্তি হইতে আরম্ভ হয়—এই মত তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। লাউট্সু বলেন, পরিবর্ত্তনের প্রণালী হইতেছে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে, এক থেকে বহুতে, সরলতা (simple) থেকে জটিলতায় (complex), সহজ থেকে শক্ততে ক্রমবিকশিত হওয়া।[২]

লাওট্সুর শিষ্য চুয়াংট্সের দার্শনিক "টাওবাদ" খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে এবং খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে চীনের চিন্তাধারার উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে এবং এতদ্দ্বারা চীনের সমস্ত রাজনৈতিক ও নৈতিক চিন্তাকে প্রভাবান্বিত করে।[৩] ইনি বলেন, "টাও চালাইতেছে এবং নিজের কর্ম্ম সম্পাদন করে। দ্রব্যগুলি নাম প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা যাহা, তাহাই থাকে। প্রত্যেক জিনিষের নিজস্ব সত্তা আছে...শূন্য বা নাস্তি যাহা দেখা যায়, তাহা নয়। শূন্য বা নাস্তি যাহা হইতে পারে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। এইজন্য এই ভিত্তিতে দেখিলে, একটা কড়িকাঠ ও একটা স্তম্ভ এক, সৌন্দর্য্য ও কুরূপ এক। ভাঙ্গনের মধ্যে গঠন আছে। সমস্ত জিনিষ, তাহা ভাঙ্গনের বা গড়নের অবস্থায় থাকুক, তাহা এক মূলতত্ব দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কেবল যথার্থ জ্ঞানীই সর্ব্ব জিনিষের মূলে বা আদিতে যে একত্ব আছে, তাহা বুঝিতে পারে।[৪] চুয়াটেস প্রকৃতির ধারা বা গতির আত্মনির্ভরশীল ক্ষমতা উপলব্ধি করিয়া সেই বিষয়ে এত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, মানুষের সমস্ত চেষ্টা ও জ্ঞানকে বৃথা বলিয়া মনে করিতেন। এইজন্য তিনি লোককে জ্ঞানের আশাহীন অন্বেষণ ও দ্রুত গতিতে পরিবর্ত্তনের চেষ্টা হইতে বিরত থাকিতে বলিতেন।

টাওবাদ দর্শনের মূলতত্ত্ব হইতেছে অদ্বৈতবাদ (monism)। এই মতের স্থাপয়িতারা বলিতেন, জীবন একমাত্র (absolute) সত্তার প্রকাশ মাত্র এবং সেই হেতু অবিনশ্বর। এই জন্য মৃত্যুর পর অমরত্ব চাইবার প্রয়োজন নাই। টাওবাদের এই ধারণা পরে লৌকিক কুসংস্কারকে জীর্ণীভূত করিতে গিয়া কলুষিত হইয়া যায়। টাওবাদীরা পরে দার্শনিকের প্রস্তর (Philosopher's stone) ও অমৃত (Elixir of life) খুঁজিবার জন্য ঐন্দ্রজালিক হয় এবং দার্শনিকের "প্রস্তর" (philosopher's stone) ও "অমৃত" (elixir of life) খুঁজিবার সন্ধানেই ব্যস্ত হইয়া পড়ে।[৫]

খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে টাও-বাদ চীন সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে সম্রাট্ নিজে তাহার পরিষদদের এই মত ব্যাখ্যা করিতেন এবং যে কেহ ঐ সময়ে লঙ্ঘণ করিত, তাহাকে হত্যা করিবার জন্য সম্রাট্ জল্লাদের হস্তে সমর্পণ করিতেন। পররর্ত্তী যুগে, প্রথম হানসম্রাট্ এই ধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন। এই সময় হইতে টাওবাদের পোপদের (মোহান্ত) স্তরভেদ (Hierarchy) সৃষ্ট হয়।

এতদ্দ্বারা বোধগম্য হয় যে, টাওবাদ চীনের অরাজকের সময়ে উদ্ভূত হয়। তখনও রাষ্ট্রসমূহের অধিপতিরা পরস্পর কাটাকাটি করিতেছিল। এই সময়ে টাওবাদ উত্থিত হইয়া লোকদের ব্যবহারিক জগত যে মিথ্যা এবং যাহা হইবার হইবেই, এই অদৃষ্টবাদ (fatalism) শিক্ষা দেয়। রাষ্ট্রীয় অরাজকতার মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়া টাওবাদে প্রতিবিম্বিত হয়। আবার এই মত লোকদের নিষ্ক্রিয় জ্ঞানবিহীন হইতে উপদেশ দেওয়ায় উহার শাসকবর্গের খুব প্রয়োজনে আসিয়াছিল। 'চীন' ও 'হান' সম্রাটেরা এইজন্যই এই মতকে গ্রহণ করিয়াছিল এবং লোকদের তাহা গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিত। যে মত লোককে অদৃষ্টবাদী ও নিষ্কর্ম্মা করিয়া স্থাণুবৎ করিয়া রাখিত, সেই মত সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের যথেচ্ছাচারের

১। Tao Te Ching—Ch. XXXVII.

২। Leang-Li—p. 16.

৩। Hu Shih—"The Development of the Logical Method in Ancient China. 1922, Pp. 16—20, 130—48.

৪। Leang Li—P 17—18.

৫। Leang Li—P 19: Gowen & Hall—P. 72.

সুবিধাই করিয়া দিয়াছিল। ইহা সাধারণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়া শোষণ করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের হস্তে একটি শাণিত অস্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিল।

টাওবাদের পর, কন্‌ফুসিউসের মতবাদ প্রকট হয়। কুংচিউ ৫৫১ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সাংটুং প্রদেশের কুং বংশ বোধ হয় পৃথিবীর সর্ব্ব-পুরাতন অভিজাতবংশ। এই বংশের বর্ত্তমান উপাধিধারীরা সপ্তত্তিতম পর্য্যায়ের লোক।[১] হান-বংশের শাসনকালে কুংচিউ* আভিজাত্য উপাধি (ডিউক ও আর্ল প্রভৃতির ন্যায় চীনের অনুরূপ খেতাব) প্রাপ্ত হন। জনশ্রুতি অনুসারে কংফুচিউ খৃঃ পূঃ ৫১৮ সালে লাওটস্থকে দেখিতে যায় এবং কিছুকাল তাহার কাছে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে লাওটস্থর সময়কার অরাজকতা, সামাজিক অশান্তি চলিতেছিল। কর্‌স যিনি খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি এই সময়ের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—"জগৎ ধ্বংস হইয়াছে, সত্য অন্তর্ধান হইয়াছে। অনিষ্টকর মতসমূহ ও হিংসাপূর্ণ দুষ্ক্রিয়াসমূহ উত্থিত হইয়াছে। মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক তাহাদের রাজাদের হত্যা এবং পুত্রগণ তাহাদের পিতাদের হত্যার নজির আছে। কংফুচিউ ভীত হইয়াছিলেন।"[২]

যখন সমাজের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তখন কুংফুচিউ বিভিন্ন সামন্ততান্ত্রিক দরবারে নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রকে বাঁচাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ধ্বংসের কর্ম্ম এত বিস্তারলাভ করিয়াছে যে, তিনি দেখিলেন তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। সভ্যতার সৌধ রক্ষা করিতে না পারিয়া, তিনি তাহার ভিত্তি রক্ষা করিবার জন্য তরুণদের শিক্ষার কর্ম্মে নিজেকে নিয়োজিত করিবার জন্য মনস্থ করেন। এই জন্য তিনি সমগ্র চীন-সাম্রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া প্রচারকার্য্য চালান। পূর্ব্বে সভ্য নামধারী বা জিম্মাদার ছিল রাজা। এই কর্ম্ম তিনি স্বয়ং একটি শিক্ষিত যুবকশ্রেণী (intellectuals) গঠন করিয়া তাহার হস্তে ন্যস্ত করেন। এই শ্রেণী কালে বিভিন্ন রাজার মন্ত্রী ও পরামর্শদাতা হইয়া রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিশেষ প্রভাবশালী হয়।

টাও-এর (পথের) অনুসন্ধান করিতে গিয়া কংফুচিউ সমসাময়িক চিন্তাক্ষেত্রে অরাজকতা দেখেন। এইজন্য তাঁহার এই ধারণা হয় যে, চিন্তারাজ্যে উচ্ছৃঙ্খলার জন্য সমাজের অধঃপতন হইয়াছে। পূর্ব্বের ব্যবহারবিধি, সঙ্গীত এবং শান্তির জন্য অভিযান আর "স্বর্গের পুত্রের" (সম্রাট) কাছ থেকে আসে না। গভর্ণমেণ্ট প্রায়ই রাষ্ট্রের বড় বড় কর্ম্মচারীর করায়ত্ত থাকে; সাধারণ লোকদের মধ্যে ব্যক্তিগত মত ও রাজনীতিক বিতর্ক বিরাজ করে। শনৈঃ শনৈঃ চিন্তার বিশৃঙ্খলতা হইতেছে, ধর্ম্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিগত বিশ্বাস বিনষ্ট হইতেছে, কর্ত্তব্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক শিথিল হইয়াছে। কেন্দ্রীভূত কর্ত্তৃত্বের অভাবেই, কংফুচিউএর মতে, নৈতিক অবনতি হইতেছে। এইজন্য Book of Changes পাঠ করিয়া তিনি বুঝিলেন, ইতিহাস একটি অবিচ্ছিন্ন গতিতে যায়, সরল এবং ক্ষুদ্র হইতে জটিল ও বৃহৎ হয়। এইজন্য ইহা মানবের বোধ ও আয়ত্তাধীন। তিনি বলিতেন, "যে অতীতকে জানে এবং তজ্জন্য নূতনকে বুঝিতে পারে, সে-ই শিক্ষক হইবার উপযুক্ত।"[৩]

কংফুচিউ Book of Changes-এর মধ্যে অষ্ট Trigram-এর বিভিন্ন সংযোগ দ্বারা চৌষট্টি Henagrams প্রাপ্ত হওয়ায়—তাহার মধ্যে তিনি জাগতিক পরিবর্ত্তনের জটিলতার প্রতীক খুঁজিয়া পান। সমস্ত পরিবর্ত্তন গতি (motion) হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা নিষ্ক্রিয়ের (passive) বিপক্ষে ক্রিয়াশীল (active) ধাপে ঠেলিয়া দিলে উৎপন্ন হয়। পুরুষ ও স্ত্রীর পারস্পরিক ক্রিয়া দ্বারা সৃষ্টি হয়।[৪] আধুনিক চীন পণ্ডিতেরা বলেন, জগতের এই দ্বৈত ধারণা দ্বারা কংফুচিউ দার্শনিক Determinism বা অদৃষ্টবাদে উপনীত হইয়াছিলেন এবং এই মত চীনের অধিবাসীদের মন ও কর্ম্মকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। কংফুচিউ (A P P III) বলিয়াছেন, "স্বর্গ উচ্চে আছে

১। Gowen and Hall—P. 73.

* কুংচিউ-এর লাটিন রূপ হইতেছে কনফিসিউস।

২। Uencius works I Be III.

৩। Lun Yil (Analects) I, II, III.

৪। Book of Changes A P—I, pt I, 1, 2, 6, pt ii.,

এবং পৃথিবী নীচুতে আছে। ক্ষমতাবান্ ও দুর্ব্বলের সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হইয়া আছে। ইতর ও উচ্চ পর্য্যায়ক্রমে বন্দোবস্ত হইয়া আছে; অভিজাত ও ইতরের সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হইয়া আছে। জিনিষসমূহ তাহাদের শ্রেণী অনুযায়ী স্থাপিত হইয়া আছে। প্রাণিসমূহ তাহাদের সমষ্টি অনুযায়ী ভাগ হইয়া আছে; মন্দ ও ভাল আছে। স্বর্গে বিভিন্ন সমষ্টি গঠিত হইয়াছে এবং তথায় পরিবর্ত্তনও নূতন রূপ ধারণ চলিতেছে।

কুংফুচিউ সোজা ও সরলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহাকে 'চি'র (Chi) সন্ধান বলে। সমাজের চিন্তাক্ষেত্রে শৃঙ্খলাস্থাপনের ইহা প্রথম সোপান। সমাজে এই শৃঙ্খলা আনিবার জন্য তিনি লু-রাষ্ট্রের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেন। ইহাকে "চুন ও চিউ" (Spring and Autumn) বলে। এই ইতিহাসে অনেক স্থলে তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন—তাহার মধ্যস্থিত আদর্শ দ্বারা তিনি ন্যায়পরায়ণতা ও বিশুদ্ধতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। তৎপরে তিনি রীতি, নৈতিক উপদেশ, ধর্ম্মের ক্রিয়াকাণ্ড, আদবকায়দা-সমূহ 'লি' (Li) পদ্ধতি দ্বারা বিস্তারিত ও আইনবদ্ধ করেন। "লি"কে রীতি (propriety) বলিয়া ইংরাজীতে অনুবাদ করা হয়।[১] কংফুচিউ চাহিয়াছিলেন পারস্পরিক ব্যবহার ও অসামাজিকতার বাঁধাধরা নিয়মবন্ধনের জন্য একটি আইনপদ্ধতি সৃষ্টি করিতে। কিন্তু এই "লি" পরে মানবজীবনের প্রত্যেক কর্ম্মকে কড়া বন্ধনের মধ্যে আনিয়া অসহনীয় বিধান হইয়া উঠে।[২]

এই কড়া নিয়মপ্রণয়ন সত্বেও কংফুচিউ আইনগত গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষ ছিলেন। সমাজে "ভদ্রলোক" 'লি' দ্বারা শাসিত এবং "সাধারণ লোক" শাস্তির ভয় দ্বারা শাসিত, এই দুই ভাগ করিয়া আইনগত গভর্ণমেণ্টকে অপ্রিয় করিয়া তোলে। যাহাই হউক, কালে কংফুচিউ চীনের জাতীয় শিক্ষকরূপে সম্মানিত হন। দুই হাজার বৎসরের উপর আজ পর্য্যন্ত চীনবাসীরা তাঁহার বাঁধাধরা আইনের দ্বারা নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করিতেছে। পরে মেংকো (মেনচিউস) কংফুচিউ এর মতকে জনপ্রিয় করিয়া তোলেন।

কংফুচিউ-এর মতবাদে আমরা সমাজভেদের দর্শন পাই। তিনি অভিজাতবংশীয় লোক; তাঁহার পক্ষে সমাজে স্তরবিভাগ স্বাভাবিক এবং উহা চিরস্থায়ী করিবার ব্যবস্থাও তিনি করেন। ইহার দর্শনশাস্ত্র কেন্দ্রীভূত সমাজে উচ্চ ও নিম্ন এই বিভেদ গ্রহণ করিয়া কড়া বিধিনিষেধ দ্বারা কেন্দ্রীভূত শাসনাধীনে আনিবার ব্যবস্থা প্রদান করে। লাওটসুর মতের ন্যায় ইহার মতও অভিজাতদের শাসনের পোষকতা করে।

১। Leang Li P 24

২। Leang Li P 24

# দুঃখ

কুমারী বিজলী চক্রবর্ত্তী

চৈত্রের রজনী শেষে, যে বসন্ত চলে গেল,
রেখে গেল বিদায়ের গীতি,
বৈশাখের রুক্ষ-প্রাতে, লিখিল আপন হাতে,
নিজে তার নিজ মৃত্যু-তিথি।

নবীন বর্ষের গানে, মুখরিত এ ধরণী,
কেন মোর আঁখিজল ঝরে?
শুধু মোর মনে পড়ে, আমার সঞ্চয় হতে
এ বসন্ত গেল চিরতরে।

# ব্রহ্মসূত্র

৩

শ্রীমতিলাল রায়

তত্তু সমন্বয়াৎ ॥৪॥

তৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম। তু সমুচ্চয়ার্থে, সমন্বয়াৎ সমন্বয় হেতু।

অর্থাৎ ব্রহ্মেতে সব কিছুই সমন্বিত হইতেছে, সম্যক্-রূপে অন্বিত হইতেছে।

আচার্য্য শঙ্কর তু-শব্দ শঙ্কানিরাশের বোধক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

আশঙ্কার কারণ আছে। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের পৃথকত্ব সপ্রমাণ করিতে পারিলেও, কর্ম্মের পর জ্ঞান, জ্ঞানের পর ব্রহ্ম, এইরূপ ক্রম-প্রদর্শন করিয়া প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন—"অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসার" পর জৈমিনি যেমন ধর্ম্মবিচার করিয়া বলিয়াছেন—"অথাতো ক্রত্বর্থ-পুরুষার্থয়োর্জিজ্ঞাসা", তদ্রূপ ব্রহ্মের পরও মোক্ষজিজ্ঞাসা অসঙ্গত না-ও হইতে পারে। পূর্ব্ব সূত্রদ্বয়ে ব্রহ্মের সৃষ্টাদি শক্তি ও শাস্ত্রযোনিত্বাদি জ্ঞান, দুইই থাকিতে পারে। সাংখ্যের প্রকৃতিরও শক্তিমত্তাদি গুণ আছে, এবং প্রকৃতি সত্ত্বগুণযুক্তা বলিয়া তাঁহাকে জ্ঞানাভিমানিনীও বলা যায়। তবুও তো প্রকৃতির উপরেব তত্ত্ব জানিবাব আকাঙ্ক্ষা তত্ত্বদর্শীর পক্ষে অসম্ভব হয় নাই, ব্যাসদেবের এই বেদান্ত দর্শনই তাহার প্রমাণ। কে বলিবে — বেদান্তসূত্রের ব্রহ্ম—সাংখ্যকথিত প্রধানের বাচ্যান্তর নহে? ইহা ব্যতীত ব্রহ্মকে জগতের একমাত্র কারণ এবং পরম কারণ বলিয়া যে সকল শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মকে সর্ব্বপ্রধানরূপে প্রতিপাদন নাও করিতে পাবেন, কেননা জৈমিনি স্বয়ং বলিয়াছেন "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বা-দানর্থক্যমতদর্থানাম্" অর্থাৎ বেদযাগাদি ক্রিয়াকেই মুখ্য-রূপে প্রতিপাদিত করে বলিয়া, যাহা ক্রিয়ার্থপ্রকাশ করে না, তাহা অনর্থক। অতএব শ্রুতি ক্রিয়াবোধক বিধিবাক্য সকলেরই অর্থ প্রকাশ করিবে। এই যুক্তিতে ব্রহ্মবিষয়ে যে সকল শ্রুতি-বাক্য, তাহা ক্রিয়াবোধক, অতএব শ্রুতি বিধিবাক্য সকল হইতে স্বতন্ত্র হয় কি প্রকারে? বেদের কর্ম্ম-কাণ্ড যেমন ক্রিয়াসাধ্য, তেমনি জ্ঞানকাণ্ড ক্রিয়ার প্রকারভেদ হইলেও, উহা অক্রিয় হইতে পারে না। অন্যপক্ষও বলিতে পারেন—ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণের বিষয় নহে। শ্রুতিই তাহার একমাত্র প্রমাণ বটে, কিন্তু এই শ্রুতি শব্দমাত্র হওয়ায়, ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণগম্য হইলেন—ইহাতে নিরতিশয় ব্রহ্মত্বের হানি হয় নাকি? এইরূপ নানা আপত্তি উত্থাপন করিয়া প্রতিপক্ষেরা ব্রহ্মের শ্রুতি-প্রমাণত্ব অপসিদ্ধান্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই সকল অসংখ্য শ্রুতিবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া শ্রুতিই একমাত্র ব্রহ্মপ্রমাণ, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরা সেই সকল বিষয়ের পুনরাবৃত্তি না করিয়া, সূত্রগুলি পারম্পর্য্যক্রমে কি অর্থ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর হৃদয়ে প্রকট করে, তাহাই আলোচনা করিব।

ব্রহ্মের প্রথম লক্ষণ—তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ এবং তাঁহা হইতেই শাস্ত্রের উৎপত্তি। "শাস্ত্রাণাং যোনিঃ" শাস্ত্রযোনি, এই অর্থ ধরিয়া বিচার করিতেছি—এইরূপ হইলে সৃষ্টিবৈষম্য ও শাস্ত্র পরস্পর বিরুদ্ধ হয় কি হেতু? সৃষ্টির মধ্যেও সামঞ্জস্য নাই, ইহা প্রত্যক্ষ। আর শাস্ত্রও সর্ব্বক্ষেত্রে সমবাদ প্রকাশ করেন না। এক শাস্ত্র বলেন—'চক্ষু, বাক্য ও মন ব্রহ্মকে জানিতে পারে না', আর অন্য শাস্ত্রে 'ব্রহ্মকে জান', এমন উপদেশও দেওয়া হইয়াছে। এই শেষোক্ত উপদেশের ফলে ব্রহ্ম জানার বিষয় হইবেন। এই হেতু ব্রহ্ম অবিষয় বা নিরতিশয় হইতে পারেন না। আচার্য্যেরা ইহার উত্তর দিয়াছেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—সমস্ত পদার্থে ব্রহ্মাত্মক রূপ সমভাবে বিদ্যমান, সৃষ্ট্যাদি ও শাস্ত্রাদির আকৃতিগত ও অর্থগত পার্থক্যের মূলে ব্রহ্মের একাংশ মাত্রের অভিব্যক্তি বলিয়া তাহাদের অপূর্ণত্বও অস্বীকার্য্য নহে। গীতা বলিয়াছেন—"একাংশেন স্থিতো জগৎ" অথবা "মমৈবাংশঃ

জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।” আচার্য্য শঙ্করও তাই সৃষ্টিকে মায়া বলিয়াছেন, শাস্ত্রকে অবিদ্যা আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু জগৎ ও শাস্ত্র অপূর্ণ বা অংশ প্রকাশ হইলেও, উহা অন্বিত হইতেছে ব্রহ্মেই। এই হেতু ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রের পর এই চতুর্থ সূত্রের প্রয়োজন অনিবার্য্য হইয়াছে। ব্রহ্মই সমন্বয়ক্ষেত্র—শাস্ত্র সকলের তো বটেই, পরন্তু সৃষ্ট্যাদিরও।

কিন্তু শাস্ত্রযোনিত্বের আরও এক অর্থ হইতে পারে। শাস্ত্রের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান ব্রহ্ম, এইরূপ না হইয়া, “শাস্ত্রমেব কারণমুপায়োঽস্যস্বরূপাবগতৌ” অর্থাৎ শাস্ত্র যাহাকে জানিবার একমাত্র উপায়। আচার্য্য শঙ্কর এই মতেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রমাণের জন্য যে পুরুষ হইতে বিপুলার্থ শাস্ত্র জন্মে, সেইরূপ পুরুষকে ভাষ্যকার সম্মুখে ধরিয়াছেন, “শাস্ত্রাণাং যোনিঃ” এই ব্যাখ্যায়। শাস্ত্র ব্রহ্মোৎপন্ন, অতএব উৎপত্তির ক্ষেত্র অবগত হওয়ার উপায় ইহা হইতেই আবিষ্কৃত হইতে পারে। তাই শাস্ত্রই ব্রহ্মকে জানিবার উপায় বলিয়া কথিত হইল। শাস্ত্র যে ঈশ্বর-প্রমাণ, তাহার কারণও প্রদর্শিত হইতেছে।

## ঈক্ষতে র্নাশব্দম্

ঈক্ষতেঃ ন—অশব্দং।

অর্থাৎ জগৎকারণের শক্তি যে ঈক্ষণ, তাহা প্রধানের নাই। কেন না, তাহা “অশব্দং” অর্থাৎ শ্রুতিপ্রমাণবর্জ্জিত। এই অর্থ আচার্য্য শঙ্করের।

বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় আর এক অর্থ করিয়াছেন। অশব্দং অর্থাৎ যাহার শব্দ নাই, তাহাই অশব্দ। “নাস্তি শব্দো বাচকো যস্মিন তদ্ শব্দং” ব্রহ্ম এরূপ নহেন। পরন্তু তিনি শব্দবাচ্য। কুতঃ কেন? ‘ঈক্ষতেঃ’ ঈক্ষতৃত্ব হেতু।

ঈক্ষতে এই শব্দ লইয়া একটু গোল আছে। পূর্ব্ব মীমাংসায় ‘যজতি’ শব্দ ধাতুর অর্থ নির্দ্দেশক্রমে ‘যজতেঃ’ এইরূপ প্রযুক্ত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর এই নীতি আশ্রয় করিয়া ‘ঈক্ষতেঃ’ শব্দ ধাত্বর্থবোধক রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন—“ঈক্ষতেরিতি চ ধাত্বর্থনির্দ্দেশোঽভিপ্রেতো যজতেরিতিবৎ ন ধাতুনির্দ্দেশঃ” অর্থাৎ ঈক্ষতে ধাতুর অর্থবোধক, স্বরূপ-বোধক নহে।

ঈক্ষিতৃত্বের শ্রুতিপ্রমাণ নাই, ইহাতে সূত্রার্থ এইরূপ প্রতীয়মান হয়।

ঈক্ষিতৃত্বের শ্রুতিপ্রমাণ নাই, এইরূপ অর্থ হইলে, দেখা যায়—শ্রুতিতে ব্রহ্মের ঈক্ষণের বহু শ্রুতিবচন কথিত হইয়াছে—“সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয়-মিত্যুপক্রম্যতদৈক্ষত বহুস্যাংপ্রজায়েতি তৎ তেজোঽ-সৃজতেতি”—তবুও ব্রহ্মসূত্রে ঈক্ষিতৃত্বের শ্রুতিপ্রমাণ নাই শঙ্কর এইরূপ বলিলেন কেন? এই বিচার করিতে গিয়া আচার্য্য শঙ্কর স্থির করিলেন—এই সূত্র সাংখ্যের প্রধান-বাদের প্রতিবাদস্বরূপ ব্যাসদেবের রচনা। এই ধারণায় শঙ্করদেব পরবর্ত্তী সূত্রগুলির ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী আচার্য্যগণও এই স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন। শ্রীমদ্বলদেবের ভাষ্যে এই ভ্রান্তি নিরসিত হয়। ব্রহ্মসূত্র প্রতিবাদমূলক হওয়ার দায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। আচার্য্য বলদেবের সূত্রব্যাখ্যায় ‘ঈক্ষতেঃ’ শব্দের ব্যাখ্যায় এইরূপ আছে—‘ঈক্ষতেঃ’—ভাবেতিপ্ প্রত্যয়স্তার্থঃ” “ঈক্ষতেরিতি ধাতুবাচকেক্ষতি শব্দো লক্ষণয়া ধাত্বর্থেক্ষণপরঃ”। উভয়ক্ষেত্রে সূত্রার্থের দিক্ দিয়া ধাতুর অর্থবোধক ব্যাখ্যাই সঙ্গত হইয়াছে। আচার্য্যদ্বয়ের ব্যাখ্যাভেদ যাহাই হউক, ঈক্ষণ শব্দের অর্থভেদ হয় নাই। একজন বলিতেছেন—এই ঈক্ষিতৃত্ব প্রধানের নহে; কেননা প্রধানের ঈক্ষিতৃত্ব শ্রুতিতে পাওয়া যায় না। আর একজনের ব্যাখ্যায় ইহাই মনে হয়, ঈক্ষণ যে প্রধানের, এই কথা এই ক্ষেত্রে আসিতেই পারে না। ব্রহ্মের ঈক্ষণ হেতু তিনি “শব্দবাচ্যমেব”। ভাষ্যে আরও বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে—“উপনিষদ্বেদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করি এবং বেদ সকল তাঁহাকেই ব্যক্ত করে”—এইরূপ উক্তি হেতু, ব্রহ্ম শব্দবাচ্য প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রুতিতে প্রধানের ঈক্ষণ, একথা কোথাও উক্ত হয় নাই। আচার্য্য শঙ্করের এই অভিমত কি — তাঁহার অল্পজ্ঞত্ব হেতু? বিশেষতঃ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরচনায় এমন একখানি উপনিষদও বাদ পড়ে নাই, যাহার নির্ঘণ্ট তিনি না করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে প্রধানের

নাম আছে, কিন্তু প্রধানের ঈক্ষণ নহে, কোন শ্রুতিতেও নাই। 'ক্ষরং প্রধানং' এই উক্তি প্রধানের ঈক্ষণ লক্ষণা করে না। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আরও আছে 'যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ, ইহার অর্থ—যেমন উর্ণনাভ নিজ দেহ হইতে তন্তু বাহির করিয়া নিজ দেহকে আবৃত করে। এই সূত্রে প্রধানের ঈক্ষণত্ব প্রমাণিত হয় না। অতএব 'ঈক্ষতে' যখন শ্রুতিপ্রমাণবর্জ্জিত, তখন এই সূত্র সাংখ্যের প্রতিবাদ ছাড়া আর কি হইবে—আচার্য্যদেব এইরূপ স্থির করিয়াছেন। আমরা কিন্তু আচার্য্য বলদেবের ব্যাখ্যাই অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

শব্দ—ব্রহ্মবাচক। মহর্ষি পতঞ্জলিও বলিয়াছেন "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।" ব্যাসদেবও বলেন 'বাচ্য ঈশ্বরঃ প্রণবস্য'।

শব্দে ব্রহ্মসংবিৎ আছে। শব্দ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত। অতএব শব্দ হইতে ব্রহ্মাবগতি অসঙ্গত কথা নহে। দেবদত্ত যদি কাশী হইতে আসেন, সেই ব্যক্তির কাশীর ঐকদেশিক দর্শন ও স্পর্শন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। শব্দ ঈশ্বর হইতে সমুদ্ভূত। শাস্ত্র শব্দময়। যাহা হইতে যাহার প্রকাশ, তাহা প্রকাশকেন্দ্রের সবখানি নয়, অংশ। অংশ হইলেও, দেবদত্তের ন্যায় শব্দশাস্ত্র ব্রহ্মকে অংশতঃ বিজ্ঞাপিত করে। অংশের আয়ত্তীকরণে পূর্ণত্বের অনুভূতি নূতন কথা নহে।

বেদ অপৌরুষেয় নিত্য। শব্দার্থ—অনাদি কালের। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবীর্য্য যেমন একই পদার্থ, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও বেদ অবিভাজ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্রহ্ম—ঈক্ষণ করিলেন। ব্রহ্ম ঘোষণা করিলেন 'অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়' ইহা ব্রহ্মবীর্য্যের প্রকাশশীল প্রবাহ, তাই বেদের অনিত্যত্ব প্রমাণসাপেক্ষ নহে।

এইবার প্রশ্ন উঠিতে পারে—ব্রহ্ম যখন বাচ্য হইলেন অর্থাৎ শব্দময় হইলেন, তখন তিনি সগুণ কি নির্গুণ? তিনি যখন অশব্দং নহেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই বিশেষিত, নিরতিশয় নহেন। যাহা নিরতিশয় নহে, তাহাতে জীবের মুক্তি হইবে কি প্রকারে? ইহার উত্তর পরবর্ত্তী শ্লোকে দেওয়া হইতেছে।

গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ॥৬॥

চেৎ (যদি) গৌণ (হয়) ন (নহে), (কেন নহে?) আত্মশব্দাৎ (আত্মশব্দ হেতু)।

আচার্য্য শঙ্কর প্রধানের ঈক্ষণ নহে, পরন্তু 'ঈক্ষণ' শ্রুতি-প্রসিদ্ধ পুরুষেরই, এই কথা বলিয়াছেন। তবে আবার গৌণত্বের প্রশ্ন আসিল কেমন করিয়া? শ্রুতিতে ইহাও আছে 'তত্তেজ ঐক্ষত' 'তা আপ ঐক্ষন্ত'—এইরূপ ঔপচারিক অর্থে ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত অন্যান্য বস্তুরও ঈক্ষণশক্তি আছে, এইরূপ কথিত হইয়াছে। ইহা কি আচার্য্য শঙ্করের মত? আচার্য্য শঙ্কর সৎ কর্ত্তৃক ঈক্ষণ মুখ্য নহে ঔপচারিক পূর্ব্বপক্ষ এই অর্থ পাছে গ্রহণ করে তাহার জন্য বক্ষ্যমাণ সূত্র রচিত, ইহা প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। কেন ঔপচারিক নয়—কেননা, আত্ম-শব্দ হেতু।

প্রধানকে খণ্ডন করিতে গিয়া আচার্য্যদেবের এই প্রচেষ্টা।

গৌণ শব্দ গুণবাচক। ব্রহ্ম যখন বাচ্য, তখন ব্রহ্ম সগুণ পুরুষ। সূত্রকার বলিতেছেন, না, তাহা নহে। ব্রহ্ম বাচ্য, কিন্তু সগুণ নহেন। কেননা, আত্মশব্দে তাঁহার অনুবাদ আছে। শ্রুতি বলেন "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধ ইতি।" সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষবিধ আত্মাই ছিলেন। পুনঃ "এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তৎত্বমসি শ্বেতকেতো।" অর্থাৎ—"হে শ্বেতকেতু, এই সমুদয়ই তদাত্মক। সেই সত্য বা সৎস্বরূপ আত্মাই তুমি।

উপনিষদাদি শাস্ত্রে ব্রহ্ম আত্মশব্দে বিশেষিত হইয়াছেন। আত্মশব্দের সহিত ব্রহ্মের ঐক্যত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায়, ঈক্ষিতৃত্ব হেতু ব্রহ্ম গুণময় নহেন। গুণের বিকার হয়। নির্গুণ নির্বিকার। যাহা নির্গুণ, নির্ব্বিকার, তাহা হইতে গুণসৃষ্টি কি প্রকারে হয়, এ প্রশ্ন প্রতিপক্ষ করিতে পারেন। এ কথার উত্তরও শ্রুতিই দিয়াছেন। 'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে।' তাঁহার কার্য্যও নাই, করণও নাই। শ্রুতি এই কথাও বলেন—"অপাণিপাদোজবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ॥" তাঁহার হস্ত-পদ নাই, তবুও তিনি বেগ-গামী ও গ্রাহক। তাঁহার চক্ষু-কর্ণ নাই, তবুও তিনি দেখেন ও শুনেন; ইহাতে প্রমাণিত হয়, ব্রহ্ম সগুণ হইয়াও

নির্গুণ, তাঁহার সগুণতা ঔপাধিক জীবের ন্যায় নহে। জীব অংশ। ব্রহ্ম বিভু। বিভু সর্ব্বগত সনাতন। উপনিষৎ যেমন বলেন, "তদেজতি তন্নৈজতি"—তিনি সচল এবং অচল যুগপৎ। তাহার কারণ, তিনিই অংশ হইয়া পূর্ণের মধ্যে সচল। আর পরিপূর্ণ সত্তা অচল, শাশ্বত। যে গুণ ও ক্রিয়া লইয়া জগৎ, ব্রহ্মবস্তুতে সেই গুণ ও ক্রিয়া অভিভূত হইয়া অবস্থান করে। তিনি গুণ ও কর্ম্ম হইতে বঞ্চিত নহেন। এই হেতু তিনি বিভু। এবং অনুপাধিক চৈতন্যে গুণক্রিয়া তাঁহাতে বিধৃত থাকিলেও, তাঁহাকে নির্গুণ বলা যায়। এমন না হইলে, পরবর্ত্তী সূত্র নিষ্ফল হইত।

## তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥৭॥

তৎ-নিষ্ঠস্য (অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠের) মোক্ষোপদেশাৎ মোক্ষোপদেশহেতু)।

আত্মা যদি গৌণ হইত বা ঔপাধিক গুণময় হইত, শ্বেতকেতুকে আত্মনিষ্ঠ হওয়ার উপদেশ কোন মতেই দেওয়া হইত না এবং শ্বেতকেতুও আত্মবান্ হইতে পারিতেন না। গোলাঙ্গুল দৃষ্টান্তের ন্যায় আত্মনিষ্ঠ হইতে গিয়া তাঁহার আর দুঃখের পরিসীমা থাকিত না। কিন্তু তাহা হয় নাই। এই হেতু আত্মা গৌণ নহে, গুণময়ও নহে। ব্রহ্ম আত্মা অভেদ, সুতরাং ব্রহ্ম অগৌণ ও নির্গুণ হইলেন।

ব্রহ্মের ঈক্ষণ ও আত্মার ঈক্ষণ অভিন্ন। উহা গৌণ নহে। শ্রুতিই বলিতেছেন—

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।
স ঐক্ষত লোকান্নুসৃজা ইতি।

এইরূপ ব্রহ্ম ও আত্মা শব্দের ঐক্যত্বই ব্রহ্মসূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রুতিতে নানা কথা আছে, যেমন আমিই প্রাণ, আমাকেই উপাসনা করিবে। অথবা—

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্॥

এমন কি অমুখ্যে মুখ্যাত্মার উপদেশ ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গৌণ উপদেশ-দর্শনে আত্ম-শব্দেরও গৌণার্থে ব্যবহার হইতে পারে। আবার জ্যোতিঃ-শব্দের ন্যায় আত্মশব্দও যদি উভয়বাচক হয়, তবে ক্রতু ও জ্বলনের ন্যায় উহা সগুণ ও নির্গুণ হইতে পারে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে এক শব্দের এক কালে দুই অর্থ পরিদৃষ্ট হওয়া সঙ্গত নহে। এই ক্ষেত্রে ব্রহ্মবাচী আত্মশব্দ গৌণার্থে অথবা সগুণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। তাহার আরও হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

## হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥৮॥

হেয়ত্ব অবচনাৎ চ।

'চ' শব্দ সমুচ্চয়ার্থে। হেয় করার শ্রুতিবচন নাই, এই হেতু। অর্থাৎ আত্মাকে অতিক্রম করার বা ত্যাগ করার কথা কোন শ্রুতিতেই নাই। এই হেতু আত্মা গৌণ নহে।

যে বাক্যকে "তদ্বাচোহি বাচম্"—বাক্যস্বরূপ ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপ জানিয়া শ্রুতি অমৃতলাভের পথ দেখাইয়াছেন, সেই বাক্য ব্রহ্ম-স্বরূপ; ব্রহ্ম কিন্তু বাক্য-স্বরূপ নহেন। কেন না, বাক্য ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত। যাহা উদ্ভূত, তাহা কর্ম্ম। কর্ম্মকে ধরিয়াই কর্ত্তাকে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কর্ম্ম মুখ্য নহে। আত্মা ঠিক এইরূপ অর্থে প্রযুজ্য হয় নাই। আত্মার স্বরূপতাবিশ্লেষণে তাহার নির্গুণত্ব ও অগৌণত্বপ্রমাণের জন্য পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে।

## স্বাপ্যয়াৎ ॥৯॥

স্ব-অপ্যয়াৎ অর্থাৎ (সুষুপ্তি কালে যাহাতে লয় হেতু)।

আত্মার নির্গুণত্ব বুঝাইবার জন্য এই সূত্র। আত্মা সৎ-শব্দের নামান্তর না হইলে, সুষুপ্তিকালে জীবের স্বরূপে লীন হওয়ার কথা উঠিতেই পারে না।

শ্রুতিবচনের মধ্যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নদীস্রোতের সমুদ্রলয়ের ন্যায় শ্রুতিবচনগুলি ব্রহ্মে স্বরূপতা লাভ করে, তাই ব্রহ্মই সমন্বয়ের ক্ষেত্র।

স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ অনাবর্ত্তিত যে ক্ষেত্রে, তাহাই আত্মার স্বরূপ। স্বরূপ হইতে শব্দ। শব্দ হইতে যাবতীয় সৃষ্টিবিকাশ হইয়াছে। সকল প্রকাশই সুষুপ্ত অবস্থায় আত্মস্থ হইয়া লীন হয়।

সুষুপ্ত অবস্থা কি প্রকার? ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করে, তজ্জন্য মনে তদনুরূপা বৃত্তি জন্মে। এই সকল বৃত্তি জীবকে সুখদুঃখাদি কর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত করে। আত্মা এই সকল প্রবৃত্তিতে উপহিত থাকিয়া, তদনুকূল হইয়া কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব জ্ঞানে অহঙ্কাররূপে বিরাজ করে। এই অবস্থাকে জাগ্রত বলা হয়।

আবার ইন্দ্রিয়াদিকে ছাড়িয়া মন মাত্রে উপহিত হইয়া, মনোবৃত্তি মাত্রের আনন্দাস্বাদে আত্মার স্বপ্নাবস্থা। দেহ ও ইন্দ্রিয় অচল স্থির থাকিলেও, মন লইয়া আত্মার বিলাস চলিতে থাকে। এই জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থা হইতে আত্মা যখন অপসৃত হন, তখন অনুপহিত চৈতন্যের যে অবস্থা, তাহারই নাম সুষুপ্তি। এই অবস্থায় মনোবৃত্তি অথবা ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রহণ, দুইই হয় না। অতএব—

### গতিসামান্যাৎ ॥১০॥

গতি ( অবগতি )-সামান্যাৎ ( সমানতা হেতু )

বেদান্তবাক্যে ব্রহ্মাবগতির বিষয় কোথাও অসমান নহে, অর্থাৎ অবিচ্ছেদ প্রবাহে আত্মাকেই প্রকাশ করিয়াছে। যে ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ ও জগৎকারণ, তাঁহাকে সগুণ বলা যাইতে পারে। আর যিনি সত্তাস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, পূর্ণ, তাঁহাকেই নির্গুণ ব্রহ্ম বলিতে হইবে। বেদ-বাক্য সকল সগুণ ব্রহ্মদ্যোতক; কিন্তু উহার দ্বারাই নির্গুণ ব্রহ্মের তাৎপর্য্য অধিগত হয়। বেদাদিতে এই হেতু তিন প্রকার উপাসনার কথা কথিত আছে। ইহা না জানিলে, বেদ-ধর্ম্মের সহিত ব্রহ্মপ্রাপ্তিবোধের বিরোধ পরিদৃষ্ট হইবে। এই হেতু শ্রীভগবান বেদ-বাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার উপদেশ দিয়াছেন।

বেদে কখনও বলা হইয়াছে—বেদই ব্রহ্ম, শব্দই ব্রহ্ম। আদিত্যই ব্রহ্ম। মনই ব্রহ্ম। ব্রহ্মসূত্রে প্রমাণিত হইবে এইগুলি ব্রহ্ম হইতে তিরস্কৃত ও অপ্রধান, কিন্তু ব্রহ্ম-সাধনার অঙ্গ এইরূপ উপাসনার নাম সম্পদুপাসনা। অপর এক প্রকার সাধনা আছে — যাহা আশ্রয়ণীয়, অবলম্বনীয়, তাহার প্রাধান্য রক্ষা করিয়া একে অন্যের অধ্যাস উপাসিত হয়। ইহা প্রতীকোপাসনা। বেদাদি শাস্ত্রে এই উভয়বিধ উপাসনার সঙ্কেত আছে। ব্রহ্মোপাসনায় এই সকল বহু বাদ অতিক্রম করিয়া আত্ম-নিষ্ঠ হইতে হয়। আত্মা অধ্যাস নহে, সম্পদও নহে। আর সবই আত্মা হইতে উদ্ভূত। সকল বেদ পরিণামে এই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মায় পৌঁছায়। স্বর্গের দ্বার মুক্ত হয় বেদ-শাস্ত্রে; আবার অপবর্গের সঙ্কেতও তাহার মধ্যে নিহিত আছে। যেমন জ্বলমান বহ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের প্রাদুর্ভাব সেইরূপ বেদাদি যাবতীয় সৃষ্টি পরমাত্মা হইতে আবির্ভূত বেদাদির আশ্রয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না, ব্রহ্মের সঙ্কেত পাওয়া যায়।

আকাশরূপ সম্পদুপাসনা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান হয়; তাহার কারণ "এতস্মাদাত্মন্ আকাশঃ সম্ভূতঃ"। রূপাদি বিষয়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সমান গতির ন্যায় বেদান্তবাক্যসমূহ সমানরূপে ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিয়াছে মাত্র।

এই অর্থ আত্মাই যে অগৌণ এবং নির্গুণ, ইহার বোধ দিল না। ইহা বেদান্তসূত্রেরই মহিমা কীর্ত্তন করিল 'গতিসামান্যাৎ' ইহার অন্য অর্থও হইতে পারে—গতি অর্থে অবগতি না হইয়া আশ্রয়ও হয়। আশ্রয়ের সমানতা হেতু—এই অর্থই আত্মার স্বরূপতাকে অধিকরূপে সুস্পষ্ট করে। 'সূত্রে মনিগণাইব'। সর্ব্বভূতে সমান রূপে আত্মার অবস্থিতির কথা গীতায় আছে। গীতা আরও বলিয়াছেন, "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি"—আত্মার গৌণত্ব ও গুণত্ব ইহা দ্বারা তিরোহিত হইল। এখানে সগুণ ও নির্গুণের দ্বিরূপতা নাই। কেন নাই, পরে বলিতেছি।

পর সূত্রে ব্রহ্মলিঙ্গপ্রমাণের উপসংহার করা হইতেছে—

### শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১২ ॥

শ্রুতির উক্তি হেতু।

শ্রুতি বলিতেছেন—"একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্ব-ব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা"। এই সূত্রে পূর্ব্বোক্ত সূত্রব্যাখ্যা সমর্থিত হইল।

শ্রুতিতে আছে—সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর জগৎকারণ এবং জগতের অধিপতি।

ব্রহ্মসূত্রের এই সূত্র পর্য্যন্ত ১১টী সূত্রকে অধিকরণসূত্র বলা হয়। অবশিষ্টগুলি গৌণ সূত্র। এই সূত্রগুলিতে ব্রহ্ম জগৎকারণ বলিয়া যুক্তিপূর্ব্বক প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রুতিতে সগুণ ও নিগুর্ণ, ব্রহ্মের এই দুই অবস্থার কথা বলা হয়। ব্রহ্মের এক অবস্থায় আপনা হইতে সৃষ্ট্যাদি সব ভেদ, ইহাতে নানা জ্ঞান, নানা বস্তু দৃষ্ট ও শ্রুত হয়; তাহা ভূমা নহে, অংশ। অন্য অবস্থা ভূমা, তাহাই নিগুর্ণ, নিত্য বলিয়া কথিত হয়। যাহা অল্প, পরিচ্ছিন্ন, তাহাই মর্ত্ত্য। আর মর্ত্ত্যের অতীত যে স্বরূপসত্তা মোক্ষহেতু, তিনিই নিগুর্ণ ব্রহ্ম। অজ্ঞান যেমন জ্ঞান নহে, তেমনই গুণ নিগুর্ণ হইতে ভিন্ন।

ব্রহ্ম সগুণ নহেন, নিগুর্ণ অথবা নিগুর্ণ নহেন, সগুণ—এইরূপ একদেশদর্শিতা ব্রহ্মসূত্রে নাই। জগৎ ব্রহ্ম নহে, কেননা, জগৎ গুণের কার্য্য। জগৎ ব্রহ্ম নহে, এই কথার অর্থ জগৎ সাকল্যে ব্রহ্ম নহে। গুণ যখন ব্রহ্মাশ্রিত, জগৎও তখন ব্রহ্মাশ্রিত। এই হিসাবে জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। ব্রহ্ম জগৎ হইতে পারেন; জগৎ কিন্তু সাকল্যে ব্রহ্ম হইতে পারে না। এই হেতু জগতের ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব নহে। কেন না, ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন—জ্ঞান ও প্রাপ্তি, উভয়ে প্রভেদ আছে, বলাই বাহুল্য। তাই এই জ্ঞান হইলেই যে জগৎ সম্পূর্ণ ব্রহ্মত্ব পাইবে, ইহা নিছক কল্পনা। যেমন পাণিনির ব্যাকরণ জানিলেই পাণিনিকে পাওয়া যায় না, ব্যাকরণ হইতে পাণিনির জ্ঞান অধিক। এই হেতু জগতের জগৎত্ব জগতের ইচ্ছাপ্রসূত নহে। ব্রহ্মেচ্ছা তাহার হেতু। জগৎ ব্রহ্মাংশ। জীবও তাই। জ্ঞান এই হেতু মুক্তজীবন দেয়, বিভুত্ব দেয় না। বামদেবের ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছিল, তিনি ব্রহ্ম হন নাই। শ্রুতি এই ভেদের মধ্যে অভেদ জ্ঞানের সঙ্কেত দিয়াছেন। ইহার অধিক দিতে পারে নাই। শ্রুতি বলেন, "তাঁহাকে যে যেরূপে উপাসনা করে, তিনি তাহার নিকট সেইরূপ হন। ইহলোকে যে যেরূপ ক্রতুবিশিষ্ট হয়, পরলোকে সে তদনুরূপ শরীর প্রাপ্ত হয়।" উপনিষৎ শ্রুতি। গীতা স্মৃতি। গীতাও বলেন—'জীব অন্তকালে যদ্রূপ ভাবনায় ভাবিত হয়, শরীরত্যাগের পর হে অর্জ্জুন, সর্ব্বদা তদ্ভাবে ভাবিত হওয়ায় সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়।' শ্রুতি বলেন, "যে আপনাকে অত্যন্ত স্বপ্রকাশরূপে জানে, সে তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়।" গীতা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন "যিনি ঐশ্বর্য্যশালী, শ্রীমান্, তেজস্বী, তাঁহাকে আমার তেজের অংশভূত বলিয়া জানিও।" এই সকলই ভাব-প্রাপ্তির কথা, ভাবাতীত হওয়ার কথা নহে।

ব্রহ্ম নিত্য। জগতের তিনি উপাদান, অতএব জগৎও নিত্য, কিন্তু স্বরূপতঃ অংশ। গুণী পূর্ণ। গুণ অংশ। সগুণত্ব ও নিগুর্ণত্বের ইহাই নিগূঢ় কথা। দ্বৈতাদ্বৈত বোধ লইয়া যে বিরোধ, তাহা কোথাও নিছক তর্ক; কোথাও বা নিছক অজ্ঞানতা।

শ্রুতি ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন। সগুণ ব্রহ্ম সোপাধিক বাক্যে, নিগুর্ণ ব্রহ্ম নিরুপাধিক বাক্যে জ্ঞেয় হইয়াছেন। শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-ভেদের ন্যায় ব্রহ্মাত্মক জগতে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি-বিক্ষেপণ—এই দ্বিবিধ অবস্থার কথাই সত্য বলিয়া তিনি সগুণরূপে উপাস্য এবং নিগুর্ণ বলিয়া জ্ঞেয় হইয়াছেন। জীবের ইহাই শাশ্বত ধর্ম্ম। ব্রহ্মসূত্র শ্রুতি বা স্মৃতি নহে, যুক্তি—অতএব ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের অকাট্য যুক্তি আছে।

কিন্তু ব্রহ্মের নিগুর্ণত্ব কি ইহাতেই প্রমাণিত হইল? ব্রহ্ম যদি নিগুর্ণ হন, তবে গুণময় জগৎসৃষ্টি কি প্রকারে হইল? গুণ অবশ্যই তাঁহাতে নিহিত ছিল। অতএব ব্রহ্ম শুধুই নিগুর্ণ নহেন। জগতের সহিত ব্রহ্মগুণের পার্থক্য—জীবের গুণ ঔপাধিক; ঈশ্বরগুণ নিরুপাধিক, তাই তাঁর গুণের অনুভব আমাদের হয় না। ব্রহ্ম সগুণ হইয়াও নিগুর্ণ।

দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া, বৈশেষিক দর্শনে সৃষ্টিপ্রকরণের এই তিন পদার্থ। দ্রব্য থাকিলেই গুণ ও ক্রিয়া থাকিবে। ব্রহ্মও বস্তু। তাঁরও গুণ, ক্রিয়া আছে; তবে তিনি গুণ-ক্রিয়ার অধীন নহেন, তিনি এই সবের অতীত। গীতায় তাই তাঁহাকে বলা হইয়াছে "মত্তঃ পরতরম্ নাস্তি"। ব্রহ্মসূত্র ব্রহ্মের অমৃত আস্বাদ দিবে—তর্কে, বিচারে। ব্রহ্মসূত্র যুক্তিশাস্ত্র।
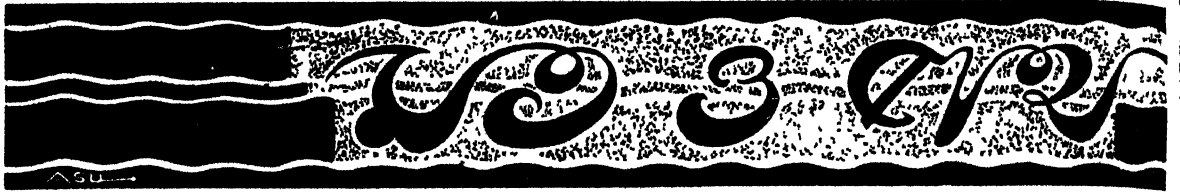
## মন্ত্র-পরিবর্ত্তন

ফ্রান্সের পরাজয় শুধু যে সামরিক নহে, পরন্তু মূলতঃ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক, ইহা আজ আর গোপন করার কথা নহে। ফরাসী জাতির বর্ত্তমান একচ্ছত্র নেতা ও কর্ণধার সম্প্রতি যাহা ঘোষণা করিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে, ফরাসী জাতি আর তাঁহার সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার মহামন্ত্রে আস্থাবান্ নহে, পরন্তু এই ত্রি-মন্ত্রের স্থলে শ্রম, পরিবার ও পিতৃভূমি, এই নূতন মন্ত্রত্রয়ের উপাসনাই অতঃপর মসিয়ে পেঁত্যা ফ্রান্সের বর্ত্তমান জাতীয় অধঃপতন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াই যে পূর্ব্বোক্ত আদর্শের পরিবর্ত্তনে উদ্যোগী হইয়াছেন, ইহা তাঁহার সন্ধিকালীন প্রথম ঘোষণা হইতেই প্রতীয়মান হয়। গত মহাযুদ্ধের পর হইতেই ফরাসী জাতির এই অধোগতির সূত্রপাত এবং সে জাতি বিলাস, ব্যভিচার, ভোগবাদে কিরূপ দ্রুতগতিতে উৎসন্ন হওয়ার পথে ছুটিয়াছিল, তাহার বিশদ তথ্যমূলক আলোচনা আমরা গত সংখ্যার "প্রবর্ত্তকে" করিয়াছি। মসিয়ে পেঁত্যা এই পতন-স্রোতের প্রতিরোধ করিতেই চাহিয়াছেন। ইহার মধ্যে জার্ম্মানীর প্রভাব কতখানি, তাহা আজ বিচার না করিলেও চলিবে। মোটেব উপর ফ্রান্সের পূর্ব্ব বৈপ্লবিক নীতি বর্ত্তমান ফরাসী জাতির জীবনের পক্ষে আর অনুকূল নহে, তাই যাহা অনুকূল, তাহাই ফরাসী জাতি বাঁচিবার জন্য বরণ করিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। রাষ্ট্রবীর হিটলার পরাভূত ও বিমুহ্যমান জার্ম্মানীকে যে ভাব ও আদর্শে পুনর্গঠিত ও অপূর্ব্ব শক্তি-সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন, তাহা যে আজ পরাজিত, হতমান ফরাসী জাতির প্রাণে নূতন আশা ও প্রলোভন সঞ্চার করিবে, ইহাও বিচিত্র নয়। এমনই করিয়াই জীবনের দায়ে আদর্শ পরিবর্ত্তনেও মানুষের বা জাতির পক্ষে বাধে না।

ফরাসী জাতির এইরূপ মন্ত্র-পরিবর্ত্তনে আমরা বিস্ময়ের কারণ দেখি নাই। কিন্তু এই সঙ্গে একথাও মনে হয় যে, এই সকল মন্ত্র তবে জাতির সুদৃঢ় ও অপরিহার্য্য নির্ভরস্থল নহে—মানবতার চিরন্তন সত্য ও শক্তি তবে ইহাতে নাই। কোন জাতি বিবর্ত্তন বা বিপ্লব, উভয় পথেই তাহার আদর্শের ক্রমবিকাশ বা পরিবর্ত্তন করিতে পারে। যে কৃষ্টির কালোচিত প্রবাহশীলতা নাই, তাহা বদ্ধ কূপোদকের মত প্রাণহীন। কিন্তু কৃষ্টির মর্ম্ম রক্ষা না হইলে, আবার জাতির প্রাণ রক্ষাও সম্ভব কি?

ইতিহাসের বিবর্ত্তন দেখিলে, ইউরোপীয় জাতিগুলির জাতীয়তার ভিত্তি আবিষ্কার করা দুরূহ নহে। কৃষ্টিকে তাহারা জীবনধর্ম্ম করে নাই অথবা কৃষ্টির মধ্যে চিরন্তন জীবনধর্ম্মের সন্ধান তাহারা পায় নাই। পেগান ইউরোপের গ্রীকো-রোমান কৃষ্টি ও সাধনা খৃষ্টীয় ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র সাধনার মধ্য দিয়া যে সকল জাতিবৈশিষ্ট্য কৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাদের সকলের ভিত্তি ভৌগোলিক রাষ্ট্র, ভাষা বা ঐতিহ্য—কিন্তু ঠিক ধর্ম্মপ্রাণ কৃষ্টি নহে। এই কৃষ্টি সনাতন আদর্শনিষ্ঠ নহে, তাই ইউরোপীয় জাতিগুলির জাতীয় আদর্শের ঘন ঘন বিবর্ত্তন বা পরিবর্ত্তন দেখা যায়। প্রাচ্যে আদর্শগত প্রগতি নাই, তাহার মূলে প্রাণের স্থবিরত্বই একমাত্র কারণ, ইহা আমাদের মনে হয় না। ভূয়োদর্শনে জানা যায় যে, প্রাচ্য, বিশেষভাবে ভারতবর্ষ একটা কৃষ্টি ও আদর্শের স্থিরভূমির উপরেই বরাবর দাঁড়াইয়াছে—অন্ততঃ দাঁড়াইবার অসাধারণ তপস্যা করিয়াছে। এ তপস্যা অন্য কুত্রাপি দেখা যায় না।

## ভারতের জাতীয় মন্ত্র?

ভারতের প্রাণ-মন্ত্র রাষ্ট্রে নাই, অর্থনীতি বা সমাজ-নীতিতে নাই—ভারতের জাতীয় প্রাণ ধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মমূলক একটা কৃষ্টি ও সাধনা। এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ, খর্ব্ব বা বিলুপ্ত করার প্রয়াস যে হয় নাই তাহা নহে। সম্ভবতঃ সৃষ্টির আদিযুগ হইতেই তাহা চলিয়াছে। আক্রমণের পর আক্রমণে ভারত সত্তা বিক্ষুব্ধ, বিপর্য্যস্ত হইয়াছে।

আজিকার এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার প্রাণের উপর এই রাহাজানি নিরস্ত হয় নাই। কিন্তু কি একটা সনাতন গরিমা এত আক্রমণে, বিপর্য্যয়েও তাহার কৃষ্টিগত এই মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট বা নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই। ভারতের প্রাণ-ধর্ম্ম আজও মৃত্যুঞ্জয়ী আদর্শের বেশে তাহার অন্তরের মণিকোটায় গোপনে জ্বলিতেছে—এ অনির্ব্বাণ ঘৃতদীপ একেবারে নিভাইতে মহাকাল স্বয়ং ব্যর্থ হইয়াছেন। ভারতের জীবনাদর্শের বিবর্ত্তনও নাই, পরিবর্ত্তনও নাই। জীবনের গতি কখনও রুদ্ধপ্রায় হইয়াছে, প্রাণের শাশ্বত-লীলা কখনও চলিয়াছে দ্রুত, বেগশীল নদী-প্রবাহের মত, কখনও বহিয়াছে ধীর, মৃদু-মন্থর, ঝির্-ঝির্ তরঙ্গ-ভঙ্গে, কখনও বা এমনই চক্ষের আড়ালে গিয়া পড়িয়াছে—যেন মনে হইয়াছে ফল্গু-প্রবাহ বুঝি হারাইয়া বা শুকাইয়াই গেল—কিন্তু আবার কোথা হইতে মুক্ত গিরিনির্ঝরিণীর মত সকল গ্লানি ও জড়িমা কাটাইয়া তাহা বাহির হইয়াছে বুকে লইয়া সেই অমর সনাতন ঋক্ ধ্বনি —"অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" অথবা "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম—জীবনের ব্রাহ্মী স্থিতি বা ব্রহ্মের জীবন-লীলা —ইহাই ভারতের জীবন মীমাংসা—তাহার সিদ্ধান্ত জাতীয়তার মন্ত্র। আবার বলি, অন্যান্য জাতির ন্যায় আমাদের এ জাতীয় মন্ত্রের বিবর্ত্তন নাই, পরিবর্ত্তন নাই। জগন্ময় ঘন ঘন স্লোগান বা আদর্শমন্ত্রের পরিবর্ত্তন-যুগে আমরা এই কথা বিস্মৃত হইব না। সম্পদে-বিপদে, জয়ে-পরাজয়ে, জীবনে-মরণে ইহাই আমাদের অক্ষয়, অটুট ও অদ্বিতীয় আশ্রয়।

## ভগবানের প্রত্যাবর্ত্তন

এই আদর্শ-পরিবর্ত্তনের যুগে রুষের নব বৈপ্লবিক মন্ত্র হুজনের মুখে মুখে শুনা যাইতেছে। আমাদের দেশেও নেক অপরিণত মস্তিষ্ক তরুণকে এই নূতন স্লোগানের য়ধ্বনি করিয়া মাতামাতি করিতে লক্ষ্য করা যায়। সাভিয়েট রুষের সঙ্ঘতন্ত্রে নাকি ধর্ম্ম ও ভগবানকে চির-র্ব্বাসন দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত রুষভক্ত তরুণেরা কণ্ঠে এই কথা বলিয়া আস্ফালন করেন ও এদেশেও হার প্রচলন করিতে চাহেন। রুষে ধর্ম্ম ও ভগবানের নির্ব্বাসন-দণ্ড সফল হয় নাই। রুষের মানবতা-প্রকৃতিই এমন অস্বাভাবিক দুশ্চেষ্টা বেশীদিন বরদাস্ত করিতে পারে নাই। সম্প্রতি সোভিয়েট রুষের নিরীশ্বর অভিযান-সঙ্ঘের নায়ক যারা-স্লাভাস্কি প্রকাশ করিয়াছেন যে, রুষিয়ায় এখনও ৩ কোটী খৃষ্টধর্ম্মবিশ্বাসী বয়স্ক ব্যক্তি বাস করিতেছে। আরও জানা গিয়াছে যে, মানুষের অন্তর্নিহিত ভগবদ্বিশ্বাস ও ধর্ম্মবিশ্বাস অতি দ্রুতগতিতে রুষ-প্রজার মনে আবার অধিকার বিস্তার করিতেছে এবং খৃষ্টধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় আশ্চর্য্যজনকরূপে বাড়িতেছে।

ইহাও শুনা যাইতেছে যে, স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ষ্ট্যালিন ধর্ম্ম-চিন্তার স্বাধীনতা সম্প্রতি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার নূতন শাসনতন্ত্রের ইহা অন্যতম বিশেষত্ব। ধর্ম্মবোধকে নিপীড়িত করিয়া রাখা যায় না, ইহা ক্রমশঃ স্বীকৃত হইতেছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী মুখপত্রে এই কথা ঘোষণা করা হইয়াছে যে, খৃষ্টধর্ম্মকে নির্ম্মূল করার প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র এবং নাস্তিকগণ যাহাতে আর খৃষ্টধর্ম্মবিশ্বাসিগণের প্রাণে আঘাত না দেন, এইজন্য তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, গির্জ্জাগামী ভক্তদের দোকান বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান এক-ঘরে করার নীতি ভবিষ্যতের জন্য একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিচিত্র এই যে, এই সকল পুনরুত্থিত ধর্ম্মবিশ্বাসিগণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও তথ্য দিয়াই কমিউনিষ্টদের কোণঠাসা করিয়া তুলিতেছেন। আরও, শুধু খৃষ্টধর্ম্মিগণ নহে, অন্যান্য বহু প্রকার ধর্ম্মমত ও সাধন পথ লইয়াও নানা দল বা সম্প্রদায় দেখা দিয়াছে এবং ইহাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলতঃ রুষের প্রলিটেরিয়টদের মধ্যে এই ধর্ম্মভাবের ব্যাপ্তি ও প্রচার নিরীশ্বরবাদিগণের শত চেষ্টাতেও আর ঠেকাইয়া রাখা যাইতেছে না।

দেখিতে দেখিতে এক বা দেড় শতাব্দীর মধ্যেই ফ্রান্সের বৈপ্লবিক মোহ কাটিয়া গেল এবং লেনিনের মৃত্যুর পর এক পুরুষের মধ্যেই রুষের ধর্ম্মহীন তন্ত্রে আবার ভগবান আসিয়া সিংহাসন দখল করিয়া লইতেছেন। পাশ্চাত্ত্যের এক একটী স্লোগানের আয়ুঃ কতটুকু? এই খদ্যোতিকার আলোর পিছনে ছুটিয়া এদেশের কমরেডগণ কি অমূল্য বস্তু লাভের আশা রাখেন?

## কংগ্রেসের দিক্-পরিবর্ত্তন

ত্রিপুরীর পর রামগড়, রামগড়ের পর দিল্লী, দিল্লীর পর পুণা—কংগ্রেসের পরিবর্ত্তন লক্ষণীয়। রামগড় পর্য্যন্ত কংগ্রেসকে অহিংসার যে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করার আয়োজন চলিয়াছিল, দিল্লীর ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠকে তাহাতে ফুটা ধরার প্রথম চেষ্টার পরিচয় পাওয়া গেল, তারপর পুণার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর বৈঠকে সুস্পষ্টভাবেই বুঝা গেল—ফুটা ভাঙ্গনেই পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং অহিংসার বিজয়-বৈজয়ন্তী হস্তে মহাত্মা গান্ধীজি কংগ্রেস হইতে সকল রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কংগ্রেসের নেতৃমণ্ডলীও এ বিষয়ে আর সম্পূর্ণ একমত নহেন। সীমান্তের গান্ধী মহাত্মা গান্ধীজিরই অনুবর্ত্তনে কমিটীর পদত্যাগ করিয়াছেন। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদও সম্ভবতঃ শীঘ্রই তাহাই করিবেন। শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারিয়া ও শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল কংগ্রেসকে ঋষিসঙ্ঘ হইতে না দিয়া অতঃপর তাহার রাজনৈতিক স্বরূপটীকেই পরিস্ফুট করার পথে পদক্ষেপ আরম্ভ করিয়াছেন। গান্ধীজি বলিতেছেন—ইহা ভুল পথ, বল্লভভাই ও রাজাগোপাল আচারিয়া ভ্রান্ত পথেই দেশকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, কিন্তু তিনি আশা করেন যে, এ ভুল শীঘ্রই ভাঙ্গিবে—আবার তাঁহার এই পথভ্রান্ত ভক্তগণ নিজেদের ভ্রম বুঝিয়া আবার তাঁহারই পতাকাতলে ফিরিবেন। এইজন্য তিনি তাঁহাদের ভুল পথে চলিবারও স্বাধীনতা দিতে কুণ্ঠা করেন নাই। পক্ষান্তরে রাজাজী স্পষ্ট কণ্ঠেই বলিয়াছেন—মহাত্মাজীর দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে এবং অহিংসার অতিরিক্ত বাতিকই ইহার কারণ। প্যাটেলজীও প্রকারান্তরে সহতীর্থের এই কথারই সমর্থন করিয়াছেন।

হিংসা ও অহিংসা লইয়া এই সময়ে এই মত-বিরোধে, ভারতের রাষ্ট্রকর্ম্মিগণ সকলেই বিস্মিত, অনেকেই ক্ষুণ্ণও হইয়াছেন। হওয়া স্বাভাবিক। বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার পর, একটা বিরাট্ জাতির আদর্শ বিচারে স্থির সিদ্ধান্ত এখনও মিলিল না, ইহাতে দুঃখ হয়; কিন্তু বিস্ময়ের কারণ নাই। ভারতের জীবন-বেদে এই দ্বন্দ্বের কোন স্থানই নাই। আমাদের শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্রে কোথাও এ সম্বন্ধে বিচারে অস্থিরতা নাই। ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনেতৃবৃন্দ কেহই ভারতাত্মার মর্ম্মবাণী অনুসরণ না করিলে, তাঁহাদের বুদ্ধি-রাজ্যে বিভ্রম বা বিপ্লব দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমরা অভিজ্ঞতার ভাব-বিপর্য্যয় ছাড়িয়া জাতীয় আত্মজ্ঞানের স্থির ভূমিতে উঠিয়া যতদিন আবার না দাঁড়াইতে পারিব, ততদিন এ অস্থিরমতিত্বও আমাদের ঘুচিবে না।

ভারতের জীবন-বিজ্ঞানে—আশ্রমধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, যতি-ধর্ম্মভেদে হিংসাহিংসাদি সকল নীতিরই যথাযথ স্থান আছে। বুদ্ধি যদি ভাব-সাঙ্কর্য্যদুষ্ট হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম-সাঙ্কর্য্যও অনিবার্য্য। বর্ত্তমান ভারত এই মিশ্র অবস্থার মধ্য দিয়াই চলিয়াছে।

## প্রতিবাদ

গত ২৫শে জুলাই কলিকাতা টাউন হলের সভায় এবং ৪ঠা আগষ্ট নিখিল বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রতিবাদ দিবস পালন করিয়া বঙ্গীয় জনসাধারণ প্রতিক্রিয়ামূলক সরকারী বিল ও ব্যবস্থার সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ এবং ঐ প্রস্তাবিত বিল ও ব্যবস্থাসমূহের প্রত্যাহার দাবী করিয়াছেন। এই প্রস্তাবিত আইন-ব্যবস্থা এই :—

(১) দ্বিতীয় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধন বিল, (২) মাধ্যমিক শিক্ষা বিল, (৩) বঙ্গীয় চাষী-খাতক সংশোধন বিল, (৪) সাম্প্রদায়িক চাকুরী বণ্টন-নীতি।

উপরোক্ত প্রত্যেকটী প্রস্তাব ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে দেশের জননেতৃগণ ও সাংবাদিকমণ্ডলী পূর্ব্বে ও এখন নানাভাবে ও নানা ক্ষেত্রে চুলচেরা আলোচনা করিয়াছেন। কলিকাতার জনসভায় গৃহীত সুদীর্ঘ প্রস্তাবের মধ্যে সেই সকল আলোচিত বিষয়ে বাংলার জনমতের যে সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায়, তাহা এইস্থলে উদ্ধারের যোগ্য:—

(১) দ্বিতীয় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল। এই বিলটি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন আইনের মূল ভিত্তিই ধ্বংস করিয়াছে এবং হিন্দুর অধিকার ও ক্ষমতা আরও সঙ্কুচিত করিয়াছে—যদিও হিন্দুরাই এই সহরে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাহারাই কর্পোরেশনের অধিকাংশ কর দিয়া থাকে। এই আইন অত্যন্ত অন্যায়ভাবে গভর্ণমেণ্টের হস্তে পরিচালন-ক্ষমতা ন্যস্ত করিতেছে, যাহা তাহাদের সুস্পষ্ট সাম্প্রদায়িকতার জন্য প্রগতিশীল দলসমূহের বিশ্বাস হারাইয়াছে।

(২) মাধ্যমিক শিক্ষা বিল—শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার প্রবর্ত্তন করিয়া এ প্রদেশের সমগ্র শিক্ষাযন্ত্রকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। শিক্ষার দিক দিয়া প্রতিক্রিয়াশীল এই আইন বিশেষভাবে যে হিন্দুর ত্যাগ ও শ্রমের ফলে বঙ্গদেশে শিক্ষার উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও অব্যাহত রহিয়াছে, তাহাদেরই সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় এই প্রদেশের মঙ্গল ও হিন্দুর স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিবে, এই সভা দৃঢ়ভাবে তাহার প্রতিরোধ করিতে সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিতেছে। হিন্দুগণ কোনমতেই তাহাদের স্কুল ও কলেজগুলিকে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর দয়ার উপর ছাড়িয়া দিবে না।

(৩) বঙ্গীয় চাষী-খাতক সংশোধন বিল ও অন্যান্য আইনের দ্বারা পল্লী-ঋণ ব্যবস্থা যেরূপভাবে নষ্ট করা হইয়াছে, তাহাতে কৃষকের কোনও উপকারই হইবে না, অথচ হিন্দু মহাজনকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে।

এই সভা এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের কোনপ্রকার সংশোধন করা উচিত হইবে না, যে পর্য্যন্ত গত তিন বৎসর ইহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত না হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইবে যে, পল্লী অঞ্চলে এই আইনের ফলে আভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য ও জনগণের অর্থনৈতিক জীবনে এক নিদারুণ সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সংশোধনী বিল যাহা সাম্প্রদায়িকভাবদুষ্ট বোর্ডগুলিকে আদালতের সাহায্যে নীলাম বিক্রয়ের ক্ষমতা পুনরুত্থান এবং হাইকোর্টের ক্ষমতা অপসারণ দ্বারা বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তের পবিত্রতার উপর জনসাধারণের বিশ্বাস নষ্ট করিয়া এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিবে যাহার ভবিষ্যৎ অতিশয় বিপদসঙ্কুল।

(৪) এই সভা যোগ্যতা এবং কর্ম্মকুশলতা বিবেচনা না করিয়া সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে চাকুরীতে নিয়োগব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং অধুনা বাঙ্গলার হিন্দু বা অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকতর যোগ্যপ্রার্থীর ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করিয়া যেখানে উপযুক্ত বাঙ্গালী মুসলমান পাওয়া যায় না, সেখানে বাঙ্গলার বাহির হইতে অবাঙ্গালী মুসলমান কর্ম্মচারী সংগ্রহের আধুনিক সিদ্ধান্তে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে।

"এই সভা বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলীর বর্ত্তমান হিন্দুবিরোধী নীতির বিশেষভাবে উপরোক্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও দুরভিসন্ধিমূলক আইনগুলির অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী করিতেছে। এই সভা সর্ব্বশ্রেণীর বাঙ্গালীকে দলগত বিভেদ ভুলিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর অত্যাচারমূলক ও ন্যায়বিগর্হিত নীতি প্রতিরোধের জন্য কার্য্যকরীভাবে জনমত সংগঠনের জন্য একতাবদ্ধ হইবার জন্য আহ্বান করিতেছে।

আমরা এই চারিটী দাবী শুধু হিন্দু বাঙালী নহে, সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকল বাঙালীরই সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য মনে করি। সরকারী নীতি ও প্রস্তাবগুলির মধ্যে যুক্তি নাই; তাহা দ্বারা সকল শ্রেণীর প্রজার প্রতি যথার্থ সুবিচার ও সেই কারণে শ্রেণীবিশেষের কোথাও কোথাও কিছু সাময়িক স্বার্থসিদ্ধি হইলেও, সমগ্রভাবে বাঙালীজাতির কল্যাণ নাই। গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের প্রতিবাদ শুধু শাসকের চক্ষে না দেখিয়া ও শাসকের কর্ণে না শুনিয়া, জাতির মর্ম্মোত্থিত আর্ত্তনাদ বলিয়া গ্রহণ করিলেই যথার্থ প্রজার মঙ্গল করিতে পারিবেন। আর্ত্তনাদ বই কি, কেন না, এই প্রতিবাদের কণ্ঠ যে অবধারিত প্রতিকারের শক্তি জাগাইয়া তুলিতে পারিবে, তাহার কোনও লক্ষণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবু ইহা ছাড়া আর কিছু করার সাধ্যসাধনাও তো আমাদের নাই।

## ছাত্রদের ক্ষয়রোগ

কলিকাতার ছাত্রদের মধ্যে যক্ষ্মারোগের প্রাবল্য সম্বন্ধে যাদবপুর হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ কে, এস্, রায় একটী বিবৃতি প্রচার করিয়া স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকমণ্ডলী উভয়কেই সতর্ক করিয়াছেন। এই বিবৃতি অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, কলিকাতার প্রায় ১ লক্ষ ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে ও বিশেষভাবে ১৭ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক তরুণদের মধ্যে যক্ষ্মারোগ অতিশয় প্রসার লাভ করিতেছে। তাহার গতিরোধের জন্য চেষ্টা একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু অন্যান্য দেশের ন্যায় উপযোগী চিকিৎসার ব্যবস্থা কলিকাতায় নাই। যাদবপুর হাসপাতালে স্থানাভাব। অতএব, তিনি কলিকাতার এক লক্ষ ছাত্রদের মধ্য হইতেই বাৎসরিক জনপ্রতি ১৲ টাকা হিসাবে চাঁদা তুলিয়া বিশেষভাবে ছাত্রদের জন্য কয়েকটী কেন্দ্রের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবটী অসাধ্য নয়, কাজেই সমর্থনযোগ্য। কর্ত্তৃপক্ষ ও অভিভাবকমণ্ডলী এই প্রস্তাব এবং অন্যান্য সদোদ্দেশ্যমূলক ব্যবস্থায় মনোযোগী হইবেন, আশা করি।

শুধু রোগ হইলে চিকিৎসা তো চাই-ই, সঙ্গে সঙ্গে রোগ কেন বাড়িতেছে, তাহারও নিদান আবিষ্কার ও সেইখান হইতেই প্রতিকার-চেষ্টা সুরু হওয়াও আমরা আবশ্যক মনে করি। কলিকাতার ধূম-ধূলির প্রতিকার যদি নাও থাকে, অন্ততঃ রেষ্টুরেণ্ট, চায়ের আড্ডাগুলি যে যক্ষ্মা প্রভৃতি

নানা রোগ-বীজাণু সংক্রমণের একটী প্রশস্ত উপায়, ইহা অনেকেই জানেন। ইহা ছাড়া, ছাত্রদের জীবনে যাহা কিছু মানসিক ও নৈতিক সংযমের অভাব ও পরিণামে শারীরিক বীর্য্যক্ষয়ে ধীরে ধীরে ক্ষয়রোগের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে—সেই সকলেরও কি প্রতিবিধানের ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই? আমরা সিনেমা, প্রগতিসাহিত্য, নর-নারীর অবাধ মিশ্রণ প্রমুখ তারুণ্য-প্রসারক এজেন্সীগুলির কথা বলিতেছি। এইখানেও কি ধুরন্ধরগণ দৃষ্টি দিবেন না? ক্ষয়রোগের মূল খুঁজিতে গেলে আমাদের মনে হয় এইখানেই সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

## হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ

হলওয়েল স্তম্ভ-ভঙ্গ আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি? ইহার উদ্দেশ্য স্তম্ভের উৎপাটন ততখানি নহে, যতখানি সংগ্রামের আবহাওয়া সৃষ্টি করা ও রক্ষা করা—একথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কারণ, উদ্দেশ্য যদি স্তম্ভ ভাঙ্গাই হইত, তাহা হইলে মান্দ্রাজের ও'-নীলমূর্ত্তি যেমন করিয়া অপসারিত হইয়াছে, এই মনুমেণ্টও সেইরূপেই অনায়াসে অপসারিত হইতে পারিত। ও'-নীলমূর্ত্তি অপসারণ করিতে কোনও সত্যাগ্রহ সফল হয় নাই—সফল হইয়াছিল কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের শাসনতন্ত্রগ্রহণ অর্থাৎ শাসনশক্তির সহায়তা। বাংলায় সেই নীতিই প্রযুক্ত হইতেছিল। প্রধান মন্ত্রী ইহার অপসারণে সম্ভবতঃ ভিন্ন-মত ছিলেন না—তিনি নাকি কিছু সময় লইতে-ছিলেন বোধহয় ইংরাজ সম্প্রদায়ের মনোভাব বুঝিবারই জন্য। সুভাষচন্দ্র তথা বি-পি-সি-সি ইহাতে অধীর বা হতাশ হইয়া সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া দেন। এক্ষেত্রে যাহা স্বভাবতঃই হয়, এক পক্ষ আন্দোলন করে, অপর পক্ষ শাসন-যন্ত্রের সম্মান রক্ষা করিতে সমধিক ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে সংগ্রাম চলে অর্থাৎ সংগ্রামবৃত্তি দেশে জীয়াইয়া রাখার উদ্দেশ্য অবশ্য সাধিত হয়। আমরা সুভাষচন্দ্রের ন্যায় মহাপ্রাণকে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে শক্তি নিয়োগ করিতে দেখিলে সুখী হইব। 'সুভাষচন্দ্রকে কারাবন্দী করিয়া গভর্ণমেণ্ট অনর্থক একটা হৈ-চৈ সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। আমরা আশা করি, এই সম্পর্কে ধৃত সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দিয়া গবর্ণমেণ্ট শুভ বুদ্ধির পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রধান মন্ত্রী ইতিমধ্যেই ভরসা দিয়াছেন যে, হলওয়েল মনুমেণ্ট অনতিবিলম্বে কলিকাতার কোন গীর্জ্জা-প্রাঙ্গণে অপসারিত করিবার সঙ্কল্প বাংলা গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহারা নাকি এজন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন।

## বাংলায় নারীহ্রাস

সহযোগিনী "সঞ্জীবনী" জানাইতেছেন—

"১৮৭২ সালে যেখানে প্রতি সহস্র পুরুষের মধ্যে নারীর সংখ্যা ৯৯২ জন ছিল, ১৯৩১ সালে সেই সংখ্যা হ্রাস পাইতে পাইতে ৯২৪ জনে দাঁড়াইয়াছে। ১৮৭১ সালে, প্রতি সহস্র হিন্দু পুরুষে হিন্দু নারীর সংখ্যা ১০০৩ জন ছিল। ১৯৩১ সালে প্রতি সহস্র হিন্দু পুরুষে মাত্র ৯০৮ জন হিন্দু নারী দেখা যায়। ৬৫ বৎসরে হিন্দু নারী কমিয়াছে প্রতি সহস্রে ৯৫ জন। ইহার উপর বিবাহের পণ, বিধবার সংখ্যা প্রভৃতি কারণে বাংলার হিন্দু ধ্বংসোন্মুখ। বাঙালী রাজনীতি লইয়া চর্চ্চা করিতে চাহে নিজে বাঁচিবে কিনা, তাহার প্রতি দৃষ্টি দেয় না। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল যাহা হয়, তাহাই হইতেছে। পূর্ব্বেও যে এইরূপ অবস্থা হয় নাই তাহা নহে, তবে তখনকার সমাজ নানা উপায় গ্রহণ করিয়া এই সকল সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালের বাঙালী হিন্দুসমাজরক্ষার দিকে মন না দিলে তাহার রক্ষার উপায় নাই।"

"সঞ্জীবনী"র কথাগুলি নিষ্ঠুর সত্য। বাঙালী নারীর সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে বিশেষতঃ, হিন্দু নারীর সংখ্যা। হিন্দু বাঙালী তরুণ-তরুণী আজ সামাজিক বিবাহে বিমুখ হইতেছে, বিবাহের চেয়ে বড় বলিয়া প্রেমের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছে। আরও পঞ্চাশ বৎসর এইরূপ চলিলে, বাংলার হিন্দু সমাজে বিবাহযোগ্যা নারীই আর মিলিবে না। ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু বাঙালী শুধু রাজনীতি-চর্চ্চায় কি আত্মরক্ষা করিতে পারিবে?

# প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রীমতিলাল রায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অধ্যাত্ম-প্লাবনের প্রচণ্ড তরঙ্গরূপে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় লক্ষ্যে পড়ে। তাঁহাকে আমি প্রত্যক্ষ করি নাই, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ধর্ম্মানুভূতির সাধনায় তাঁহার যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহা ভুলিবার নহে। আজ প্রভুপাদের শত-বার্ষিকী উৎসবে এই মহাপুরুষের পুণ্য-কথার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। লেখায়, বক্তৃতায় যুগপুরুষদের গৌরব বাড়িবে না; এই জন্য বাহ্যানুষ্ঠানের অপেক্ষা কোথায় তাঁর আত্মদান কার্য্যকরী হয় তাহাই দেখিবার বিষয়। আমরা আশা করি, শ্রীঅরবিন্দ যে বলিয়াছিলেন—"The truth of the future which Bijoy Goswami hid within himself has not been revealed. এই ভবিষ্যতের সত্যই আমাদের আবিষ্কার করিতে হইবে। এবং এই কার্য্যে আজও বাংলায় শত সহস্র সর্ব্বত্যাগী সন্ত এই শতবার্ষিকী উৎসবে জয়গর্ব্বে অভিযান করে না ইহাই দুঃখের কথা। বাংলার উদীয়মান তরুণ কি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল!

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ জন্মিয়াছিলেন যে যুগে, সে যুগও কম অন্ধকারময় ছিল না যে, একটা বিশেষ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পর জাতি আত্মস্থ হইয়া দাঁড়াইবে। সে সুযোগের পথ, পাশ্চাত্যের প্রথম সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় কিরণমালায় অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। রণক্ষেত্রে বিজয়ী বীরের ন্যায় বাংলার অধ্যাত্ম-সংগ্রামক্ষেত্রে বিজয়কৃষ্ণের অভ্যুত্থান ধর্ম্মামৃত আবিষ্কার হেতুই ঘটিয়াছিল। এ অমৃত তিনি যথাসম্ভব পরিবেশন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁর মর্ত্ত্যদেহ ত্যাগ করার কালে এই বাণীই আমাদের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে "এমন অনেক কার্য্য স্থূল দেহ বর্ত্তমান থাকিতে অনুষ্ঠিত হয় না; যথাসময়ে সে কার্য্য আরম্ভ হইবে।"

বাঙ্গালী কি সে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছে?

বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ ভক্তবীর অদ্বৈতাচার্য্যের বংশধর। তাঁহার রক্তধারায় সুনির্ম্মল ঈশ্বর-বিশ্বাস ও হিন্দুত্বের আচার-ধর্ম্ম স্বভাবতঃই প্রবাহিত হইত। গৌরাঙ্গদেব ছিলেন তাঁহার খেলার সঙ্গী। সেই স্বপ্নমূর্ত্তি লইয়া তাঁহার বিভোরতা যে দেখিয়াছে সেই বুঝিয়াছে গোস্বামী মহাশয়ের অপার্থিব প্রকৃতি। প্রেম ছিল তাঁর অঙ্গের কান্তি। ঐহিক ও পারত্রিক জগতের সন্ধিক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া তিনি মর্ত্ত্যে অমৃতের সন্ধান দিতে অতি শৈশবেই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন; বাল্যজীবনের সে সুবিশাল ইতিকথায় প্রবন্ধ ভারী করিব না।

যৌবনে বংশপ্রথানুগত সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শিতার সহিত বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞানে অভিভূত হইয়া তাঁর স্বভাব-নৈষ্ঠিক-ভক্তি কিছুদিনের জন্য বিচলিত হয়। তিনি

সমুদ্র মন্থন করিয়া যে অমৃত উদ্ধার করার জন্ম আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই অহং ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার প্রথম সোপান মাত্র। এইখানেই তিনি সান্ত্বনা লইলেন না। ব্রাহ্ম সমাজের সে ছিল অভ্যুত্থান যুগ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কণ্ঠে উপনিষদের ঋক্ উঠিয়াছে। রামমোহনের জীবন-প্রভাবে সে যুগের তরুণ উদ্বুদ্ধ। তিনি বগুড়ার প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম কিশোরীলাল রায়ের নিকট হইতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইলেন। অহংব্রহ্ম সাধনার বন্ধন ছিঁড়িয়া তিনি ব্রহ্মোপাসনায় তনু-মন ঢালিয়া দিলেন। কুলত্যাগী হইলেন, স্বধর্ম্ম হারাইলেন; ব্রাহ্ম হইয়া নির্য্যাতনের অবধি রহিল না। কিন্তু ধর্ম্মমত্তকেশরী বাধার বারণ মানে না। বিজয়কৃষ্ণের প্রত্যয় প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় উজ্জ্বল ও তাপময় ছিল। সেখানে যাহা কিছু পড়িত তাহাই ছাই হইয়া যাইত।

ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া কিন্তু তিনি তৃপ্তি পাইলেন না। ব্রহ্মানুভূতি কি জাতি বিচার রাখে, ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যদের আচরণে তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহারা নামে ব্রহ্ম, আচারে হিন্দু। গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যেরা উপবীত ত্যাগ করেন নাই। বিজয়কৃষ্ণের সত্য ইহাতে বিচলিত হইয়া পড়িল। এই সময় কেশবচন্দ্রের সহিত বিজয়কৃষ্ণ হরিহর আত্মা হইয়া ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে মহা বিপ্লব সৃষ্টি করিলেন। ব্রাহ্ম সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হইল। সে বিস্তৃত ইতিহাস লেখার ক্ষেত্র ইহা নহে।

বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন অন্তরে বাহিরে। তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপর চাহিয়াছিলেন জাতির অভিনব সমাজ-প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মের আচারে প্রতিদিনের জীবন-নীতি একেবারে নূতন করিয়া গড়িতে চাহিলেন। ইহাতেও বিরোধের সৃষ্টি হইল। বিজয়কৃষ্ণের ন্যায় খাঁটী ব্রাহ্ম বুঝি সেদিন জন্মে নাই। যে ব্রাহ্ম-বিবাহ পদ্ধতি সমর্থন করিয়া কেশবচন্দ্র বলিয়াছিলেন, এ বিধি রাজবিধি নহে, ভাগবত-বিধি। সেই কেশবচন্দ্রই নিজ কন্যার বিবাহকালে সেই বিধি উল্লঙ্ঘন করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ সিংহবিক্রমে কেশবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া দিলেন। নবযুগ-প্রবাহের সর্ব্বপ্রথম আবিল তরঙ্গে অভিষিক্ত হইয়া বিজয়কৃষ্ণ স্বভাব ও স্বধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করার জন্য জন্ম গ্রহণ করেন, সে লক্ষ্য সিদ্ধ করার জন্যই হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধ-বাদ প্রবল ব্রাহ্ম ধর্ম্ম স্বয়ং গ্রহণ করিয়া হিন্দুত্বের মহীয়সী শক্তির পরিচয় তাঁহার জীবনের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ হইল।

হিন্দু-ধর্ম্ম—প্রচার নয়, মুখের কথা নয়, জীবন। জীবন ধর্ম্মে সেই অবতার-বাদ, সেই পূজা-পর্ব্ব পৌরাণিক অনুষ্ঠান কেশবেও যখন বিকশিত হইতে লাগিল, বিজয়কৃষ্ণের সেদিন ক্ষিপ্ত মূর্ত্তি আমরা অবলোকন করি। অনেকে তাঁহাকে কেশবের প্রতিপত্তিতে বিদ্বেষী মনে করিতেন। বিজয়কৃষ্ণ জলদ-গর্জ্জনে তাঁহাদের বলিয়াছিলেন, ব্যক্তিগত বিদ্বেষের জন্য নয়, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্যের অপলাপ সহিব না। বিজয়কৃষ্ণের প্রচণ্ড প্রাণের তাড়ায় ব্রাহ্ম সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াও পরিত্রাণ পাইল না; বিজয়কৃষ্ণের প্রচেষ্টায় সাধারণ সমাজ গড়িয়া উঠিল। কিন্তু ধর্ম্মক্ষেত্রে এইরূপ নিয়ত সংগ্রামে তাঁহার জন্মগত প্রেম-ভক্তির হৃদয়-তন্ত্রীগুলি বোধ হয় মীড়ে মীড়ে সেদিন করুণার রাগিণী তুলিয়াছিল। তিনি আবার সদ্গুরু অন্বেষণে ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন। এই সময় কালনার বিখ্যাত চৈতন্য-দাস বাবাজী এক ভবিষ্যদ্বাণী করেন, বিজয়কৃষ্ণের প্রেম-ভক্তির আকৃতি দেখিয়া তিনি তাঁহাকে যতই নিকটে টানিতেন বিজয়কৃষ্ণ বিনয়-বচনে বলিতেন, আমি ব্রাহ্ম, হিন্দু সমাজের বাহিরে গিয়াছি; আমায় আপনারা দূরে দূরেই রাখুন। চৈতন্যদাস বাবাজী তাঁহার এই অমায়িক কুণ্ঠায় প্রীত হইয়া গদগদ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, কণ্ঠে আপনার তুলসী মালা, মাথায় বিপুল জটাভার, কে বলিল আপনি ব্রাহ্ম? বিজয়কৃষ্ণ এইদিন হইতে ব্রাহ্ম সমাজের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া আবার পরিত্যক্ত উপবীত গ্রহণ করিলেন। গয়ার আকাশগঙ্গায় সদ্গুরু লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া হিন্দু সমাজের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। হারাধন ঘরে পাইয়া ভারতজননীর নয়নে স্নেহাশ্রু ঝরিল। হিন্দু সমাজ বিজয়কৃষ্ণকে বুকে লইয়া ধন্য হইল। বাংলার উপেক্ষিত বৈষ্ণব, তন্ত্র-সাধনার অস্পষ্টতা দূর করিয়া বাঙ্গালীর অধ্যাত্ম গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ নীলকণ্ঠের

[illegible] যুগের হলাহল কণ্ঠে ধারণ করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুকে অমৃতের সন্ধান দিলেন। এই নবযুগেই ভগীরথ প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আজ শতবার্ষিকী উৎসব কোন সম্প্রদায়ের নহে; হিন্দুর মহোৎসব।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কেশবের সহিত ঠাকুর রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-পরিচয়ের ফলে যে দুইজন ধর্ম্মবীর ব্রাহ্মসমাজের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন; তাহার মধ্যে একজন বিবেকানন্দ; আর একজন গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্রে জাতি-বিরোধের সূত্র ধরিয়া যে অপূর্ব্ব সাধন-তত্ত্ব প্রচারিত হয় উহা শব্দ মাত্রই থাকিত, যদি নবদ্বীপে ঈশ্বর সম্বন্ধের জন্য প্রেম-ঘনমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব না হইত—এই প্রেমের প্রয়োগবিধি আমাদের অজ্ঞাত থাকিত, যদি পূত জাহ্নবী-ধারায় পবিত্র সরস্বতী যমুনা সম্মিলিত না হইত। নবযুগের ত্রিবেণী সঙ্গমে রামকৃষ্ণের সহিত শ্রীবিবেকানন্দ এবং গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের সম্মিলন জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সূচনা করিয়াছে।

অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান গীতার আত্মসমর্পণে জীবনকে রূপান্তরিত করে; বিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্ম চাহিয়াছিলেন; পরমাত্মার সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু শান্তিপুরের ধুলোটে গোস্বামীজীর উন্মাদ মূর্ত্তি যে লক্ষ্য করিয়াছে, সে বুঝিবে, সাধনার চরম সিদ্ধি যে ভগবত-তত্ত্ব—বিজয়কৃষ্ণ তাহারই সমুজ্জ্বল উদাহরণ। এই বিজয়কৃষ্ণকে দেখিয়া মহর্ষি বলিয়াছিলেন—"জ্ঞান কথা; প্রেমভক্তি ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায়। ব্রহ্ম চেষ্টাসাধ্য নয়। তাঁর দয়াই জীবন সার্থক করে।"

বাঙ্গালী জ্ঞান, যোগ, কিছুই চাহে না—চাহে ভক্তি ও প্রেম; ঈশ্বরযুক্তির ইহাই অমৃত-রসায়ন। গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ আমাদের এই সন্ধানই দিয়াছেন। আজ এই পুণ্যদিনে এই পতিত জাতি কি অভ্যুত্থানের সে নির্দ্দেশ গ্রহণ করিবে?

# হিন্দোল দোল

শ্রীগোপেশ্বর সাহা

শ্রাবণ আবার এলো যে ফিরিয়া, এসেছে বাদল দোল,
চপলা চলিছে চমকি' চমকি' উজলি মেঘের কোল।
কাজল আঁধারে কণক কিরণে সোহাগ নয়নে চেয়ে,
গগনে পবনে মধুর বারতা বঁধুরে খুঁজিছে ধেয়ে।
আজি পূর্ণিমা নব যৌবনে বনানী জাগিছে সুখে,
আসিবে বঁধুয়া মধুর মুরতি লভিবে তাহারে বুকে।
তমালের দল কাজল আঁধারে নীরবে আপন মনে,
গণিছে প্রহর কখন সময় আসিবে সে কোন্ ক্ষণে!
কেতকী আজিকে ফাটিয়া পড়িছে যৌবনে ঢল ঢল,
বঁধুয়া আসিলে আপন আঁচলে মুছাবে চরণ তল।
নীপের বনেতে পুলক আকুল উৎসব কলরোল,
বৎসর পরে এসেছে ফিরিয়া আজি হিন্দোল দোল।
কালো কালিন্দী কলকল্লোলে ভরা যৌবনে ধায়,
তট-তরঙ্গে অনাগত কথা উল্লাসে কহি যায়।
গগনে-পবনে বেজেছে সে বাঁশী, বেজেছে সে বাঁশী প্রাণে,
চলে অভিসারে নিখিলের প্রাণ কভু না বারণ মানে।
সে বাঁশী বেজেছে আপনার প্রাণে অভিসারে চলে বালা,
কণ্টক ক্ষত করপদতল দহে দংশন-জ্বালা।
পিচ্ছিল পথ কাজল আঁধার সরমের বাতি জ্বেলে,
নিত্য আসিছে শত শত প্রাণ পিছনের ভয় ফেলে।
আসিতে আসিতে মাঝ পথে যা'রা বন্দী কারার মাঝে,
অর্গল দ্বার বন্ধন ভাঙি তা'রাও আসিবে পাছে।
বন্ধুর পথে বন্ধুর বাঁশী বাজিয়া বাজিয়া যায়,
আয় কে আসিবি, আয় কে দোলাবি, আয় কে দুলিবি আয়।
মাথার উপরে ঝুলিছে খড়্গ শত দিকে শত ভয়,
শত কলঙ্ক অনল পশরা নিত্য দহিতে হয়।
ভরা যৌবনে উচ্ছল প্রাণ না মানে শাসন-বাধা
প্রাণের আবেগে পিচ্ছিল পথে অভিসারে চলে রাধা।

নিত্য উঠিছে, নিত্য পড়িছে, নিত্য চলিছে চলা,
জীবনের এই বন্ধুর পথে চির-হিন্দোল দোলা।

# সমালোচনা

**তুঁহু মম জীবন** — শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীশান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবশ্রী-সাহিত্য-মন্দির; ১৮।২, বাজে শিবপুর রোড, হাওড়া। প্রকাশ-সময়—জন্মাষ্টমী, ১৩৪৬। পৃষ্ঠা—২৯২; মূল্য দুই টাকা।

সুবৃহৎ এই উপন্যাসখানিতে কাব্যচর্চা প্রসঙ্গে প্রেমের অফুরন্ত প্রবাহ যথা-তথা বহিয়া গিয়াছে। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের হৃদয়হীন, সভ্যতা-মুখোসধারী type চরিত্র ইহাতে রহিয়াছে। প্রগতির ষ্টীম ইঞ্জিন চিত্রার চরিত্রটি আতিশয্যের চাপে স্বাভাবিকতা হইতে de-railed হইয়া গিয়াছে। স্যার গিরীশ ও টুসী প্রসঙ্গ অত্যধিক মাত্রায় melo-dramatic আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে। সিপ্রা চরিত্রের পরিবর্ত্তনটি বেশ উপভোগ্য। নায়ক পার্থ-চরিত্র পৌরাণিক মানববধ-যজ্ঞের পুরোহিত না হইলেও, আধুনিকাবশ-যজ্ঞে অহৈতুকী প্রভাব ও তেজস্বিতা দেখাইয়াছে। মনে করা যায় যে, সমস্ত চরিত্রের মধ্যে পার্থ চরিত্রটি বলিষ্ঠ ও অতুলনীয়। 'টুসী' চরিত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধে অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়াছে। অন্যান্য চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলিবার নাই।

পুস্তকখানির আয়তন বৃদ্ধি হওয়ার কারণ সম্পর্কে মনে করা যায় যে, অনাবশ্যক কয়েকটি দীর্ঘ বক্তৃতা ও আলোচনা প্রসঙ্গ পুস্তকটিকে ভারগ্রস্ত করিয়াছে। 'কবিতা', 'সাহিত্য', 'ভারত-সতী-সংসদ' এবং আরও অনেক প্রসঙ্গ বাদ দিলে উপন্যাসের গতিধর্ম্ম ও সৌষ্ঠব সংরক্ষিত হইত।

গল্প শেষ না-করা আধুনিক গল্পের ধাঁচ (technique)। গ্রন্থকার তাঁহার রচনায় এই ধাঁচটি বজায় রাখিতে অকৃপণ হন নাই।

ভাষা বেশ সরস ও ভাব স্থানে স্থানে সুমধুর হইয়াছে। কয়েকটি অনাবশ্যক প্রসঙ্গে আয়তন বৃদ্ধি ও গল্পের সরল গতি বিঘ্নিত হওয়ায় রস-গ্রহণে কথঞ্চিৎ বাধা সৃষ্টি হইয়াছে।

ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপত্র আধুনিক রুচিকে আঘাত দেয় নাই।

**উপসংহার**—শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ। প্রকাশক—গ্রন্থকার; পোঃ লাভপুর, চিতরা; বীরভূম। প্রকাশ-সময়—জন্মাষ্টমী ১৩৪৬। পৃষ্ঠা—১৭৬; মূল্য এক টাকা, প্রাপ্তিস্থান—প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আটটি সুপাঠ্য গল্পের পরে 'উপসংহার' গল্পটি সংযোজিত হইয়া এই গল্পসংগ্রহ পুস্তকটি উপসংহৃত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ গল্পই প্রবর্ত্তক ও অন্যান্য সাময়িক পত্রে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

কমলাকান্তের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, গাঁয়ের কথা, গাঁয়ের জীবন-প্রবাহ লইয়া তাঁহার গল্প-সাহিত্যের প্রবহমানতা। অধুনাতন কালে যখন চারিদিকে জীবনে ও জাগরণে, অন্তরে ও বাহিরে, বিলাসে ও ব্যসনে মানবজীবন পুঞ্জীভূত গ্লানি ও মলিনতার আবর্জনায় নাগরিক-সভ্যতার ক্লেদ রোমন্থন করিতেছে, তখন স্বামীর নিকটে বাগ্দীর 'দাসী' স্বীকার, 'দুর্দ্দান্ত বকধার্মিক জমিদারের অমানুষিক অত্যাচার, স্নেহ-সুধাময়ী 'মমতা'র অপরিমেয় সেবা, 'ভদ্র ও ইতরে'র সত্যিকার সত্তা ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সাধকের মনকে স্বাস্থ্যকর, উদার ও নির্ম্মল পরিবেষ্টনীর মধ্যে স্বতঃই টানিয়া লয়।

নাগরিক-সভ্যতা ও পরিস্থিতিই যে আমাদের বৃহত্তর জীবনের সবখানি নয়, পরন্তু গ্রাম্য-সভ্যতা ও পরিবেষ্টনীতেও মাটির এই দেহ প্রাণময় ও জীবন্তরূপে দেখা দিয়া থাকে—এই সত্য গাল্পিক কমলাকান্ত স্বীয় অনুভূতির স্পন্দনে গল্পাবলীর মধ্যে অনুস্যূত করিয়াছেন।

বিভিন্ন গল্পের চরিত্রসমূহের 'নাম' প্রদানে লেখক 'নব নব উন্মেষ-শালিনী' শক্তির পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সব স্থানে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

ভাষা ও রচনাভঙ্গী গল্পোপযোগী। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

—অধ্যাপক শ্রীবিনয় সরকার

**পথের কথা**—শ্রীবিজয়কান্ত রায়চৌধুরী এম এ প্রণীত। প্রকাশক—মেসার্স আর, সি, দধি এণ্ড কোং মিহিজাম।

অর্থনীতির দিক দিয়া, লেখক বাঙ্গালীর জন্য 'পথের কথা' আলোচনা করিয়াছেন। সে জন্য তিনি মোটামুটি চাষ, রেশম শিল্প, মৎস্য সমস্যা, দুগ্ধ সমস্যা, চিনি সমস্যা, গ্রাম্য স্বাস্থ্য, কৃষি-ঋণ, পাট-চাষ-নিয়ন্ত্রণ, বাঙ্গালীর ব্যবসা, ব্যাঙ্কিং, সারা বিশ্বের সহিত অর্থনীতির যোগসূত্র ইত্যাদি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। প্রাঞ্জল ও সুন্দর ভাষায় তিনি যে সব পথের নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে গেলে, রাজশক্তির সাহায্য বিনা সম্ভব নয় তাহাও জানাইয়াছেন। বর্ত্তমানে সেরূপ সম্ভাবনা কম, যদি না স্বায়ত্ত শাসন-যন্ত্র নিজেদের হাতে আসে, এই প্রকারই তাঁহার অভিমত। তবে বর্ত্তমান অবস্থাতেও বাঙ্গালী স্বচেষ্টায় যে অনেক কিছু করিতে পারে, তাহা গ্রন্থকার স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে ও দেশ বিদেশের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশেষ পরিস্ফুট করিয়াছেন। বইখানি সংগঠনকামী বাঙালীর পাঠ করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।

—শ্রীআশুতোষ ঘোষ

**বাঙ্গালা দেশের গাছপালা**— কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন প্রণীত। সংহতি কার্য্যালয়; ৭নং মুরলীধর সেন লেন হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ (ডাক টিকিট ।৶১০ সাড়ে সাত আনা)।

বাংলা পল্লীগ্রামের বনে জঙ্গলে যে সমস্ত গাছগাছড়া জন্মিয়া থাকে তাহারই কয়েকটীর রোগ-প্রতিষেধক গুণ ও ব্যবহারবিধি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এ দেশের জলমাটিতে জন্ম ও বর্দ্ধিত এই গাছগাছড়াই যে আমাদের ধাতুর অনুকূল তা আমরা এখন পাশ্চাত্য মোহে ভুলিতে বসিয়াছি। অথচ ইহাই যখন বিদেশীর সার্টিফিকেট কপালে আঁটিয়া কাঁদালো নামে আমদানী হয়, আমরা নির্ব্বিচারে ইহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা করি না। কবিরাজ মহাশয় এই সমস্ত গাছগাছড়া বিভিন্ন চিকিৎসা শাস্ত্রে কি নামে প্রচলিত তাহার পরিচয় দিয়া বাঙ্গালী জাতির এ মোহ ভাঙ্গিয়াছেন। আজিকার দুর্দ্দিনে এই সমস্ত গাছগাছড়ার গুণাগুণ ও ব্যবহার জানা থাকিলে আমাদের অনেক বিপদ ও অর্থব্যয় বাঁচিয়া যাইবে। গৃহপঞ্জার মতই এই পুস্তিকাখানি প্রতি গৃহস্থ ঘরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

**অতীশ দি গ্রেট**— শ্রীঅবনীনাথ রায় প্রণীত। দাম ১।০, প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক অবনীবাবু বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। মাসিক পত্রে সমালোচনা, প্রবন্ধাদি লিখিয়া তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। প্রবন্ধ ও কথা-সাহিত্য, দুইয়েতেই তাঁর লেখার শিল্প ও সারল্য সবচেয়ে পাঠককে মুগ্ধ করে। আলোচ্য উপন্যাসেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বইখানির কথা ভাবায় রবীন্দ্রনাথের লিখন-মাধুর্য্যের মাদকতা আছে। পড়িতে আরম্ভ করিলে এক নিঃশ্বাসে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী আভিজাত্যপূর্ণ—হৃদয়ের দরদ ও সহানুভূতির স্পর্শ বিষয়-বস্তুমাত্রকেই সরস ও করুণ করিয়া তুলে। পুস্তক শেষে বিধবা নির্ম্মলার অশ্রুর সঙ্গে পাঠকেরও অশ্রু ঝরে। রীণা ও অতীশের বিবাহ-ভঙ্গের চিত্রটি ভারী সুন্দর ফুটিয়াছে এবং এই ঘটনা অবলম্বনে মীনা পিসিমার চরিত্রাঙ্কন নিখুঁত হইয়াছে। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে অবনীনাথের তীক্ষ্ণতা আছে বলিয়াই কিশোর অতীশ সংসারের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া যৌবনেই 'দি গ্রেট' হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল ও প্রসাদ গুণযুক্ত এবং ভঙ্গী সাবলীল বলিয়া 'অতীশ দি গ্রেট' বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। অতীশ দি গ্রেটের' পরবর্ত্তী জীবন-কাহিনী দ্বিতীয় খণ্ডে শীঘ্রই আমরা দেখিবার প্রত্যাশা রাখি।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

**শনি-রবি-সোম**— শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। চিত্রা পাবলিশিং কোং ৩১ মহারাণী হেমন্ত-কুমারী ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য বইখানিকে একটী বড় গল্প বলা যায়। আইন-ব্যবসায়ী উকিল সর্ব্বেশ্বরের জীবন ঘটিত কয়েকটি ঘটনা তাহার জীবনে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইল সে বিষয়টি কেন্দ্র করিয়াই 'শনি-রবি-সোম' রচিত হইয়াছে। ইহার গল্পাংশের ভিতর হিন্দু বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের একটি সুন্দর রূপ পাওয়া যায়। তবে পুস্তক-বর্ণিত বিষয়ের কিছু কিছু ত্রুটীবিচ্যুতি লক্ষ্যে পড়িলেও লেখকের প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি হিসাবে তাঁহার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলা চলে। ছাপা-বাঁধাই চলনসই।

—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

**ইউরোপের চিঠি**— শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার, বাগচী এণ্ড কোং, ৭২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা, দাম দেড় টাকা মাত্র।

আজ পর্য্যন্ত ইউরোপ বহুভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হইয়াছে। দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা হেতু ও-দেশের বিচিত্রতাও ধরা পড়িয়াছে। ডক্টর সরকার শুধু দার্শনিক নহেন, সাধকও বটে। তাঁহার সুগভীর ধ্যাননেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে প্রচণ্ড গতি ও সঙ্ঘর্ষময় ইউরোপের বহির্জীবনের অন্তরালে প্রবাহিত মগ্ন-চিন্তা ও জীবন-দর্শন। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে প্রাচ্য প্রতীচ্যের ভাবধারার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার ইউরোপের সত্যকার চেহারাকে সুপরিস্ফুট করিয়া তোলায়, আমাদের ইউরোপ সম্বন্ধীয় প্রচলিত ধারণা ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে, ইহা সুনিশ্চিত বলা চলে। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ঝরঝরে।

**শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরি-লীলামৃত**—

আলোচ্য পুস্তিকাখানি উক্ত নামীয় ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমলবন্ধু দাস লিখিত দশ সহস্রাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। মাধুকরী দুই আনা মাত্র। প্রাপ্তব্য: মোহন লাইব্রেরী, ফরিদপুর।

**মহাত্মা গান্ধী ও স্বামী বিবেকানন্দ**—

শ্রীকলিঙ্গনাথ ঘোষ এম-এ প্রণীত। এই পুস্তিকাখানিতে দুইটি মহাপুরুষের তুলনামূলক জীবনী অতি শ্রদ্ধার সহিত আলোচিত হইয়াছে। আচার্য্য রায়ের একটি ভূমিকাও সংযোজিত হইয়াছে। জলপাইগুড়ি হইতে লেখক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৵০ মাত্র।

**পরিচয়**—

শ্রীবারেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত "পরিচয়" ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য-বিষয়ক তথ্যের খনি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। দেশে এই ধরণের 'রেফারেন্স' পুস্তিকার প্রয়োজন খুবই। ইহা ১ নং পুস্তিকা। লেখকের এই উদ্যম প্রশংসার্হ।

# খেলা ধূলা

ডি, চৌধুরী

**লীগ খেলা**—গত বার আমরা ২২শে আষাঢ় পর্য্যন্ত প্রথম বিভাগীয় লীগ খেলার আলোচনাদি করিয়াছিলাম এবং সেই সময়ে ২০টী খেলা খেলিয়া মোহনবাগান সর্ব্বোচ্চ পয়েণ্ট লাভ করিয়া লীগের শীর্ষস্থান দখল করিয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী খেলায় মোহনবাগান মহামেডান স্পোর্টিংএর নিকট রিটার্ণ লীগে ২ গোলে পরাজিত হওয়ায়, মোহনবাগানের লীগ লাভের আশা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়। এই খেলাই লীগের শেষ মীমাংসা করিয়াছে। মহামেডান মোহনবাগানের চেয়ে একটী খেলা কম খেলিয়াও, এই খেলায় জয়লাভের ফলে ১ পয়েণ্ট অগ্রগামী হইয়া লীগে শীর্ষস্থান লাভ করিল। ইহার পর মোহনবাগান পরবর্ত্তী তিনটী খেলায় ও মহামেডান পরবর্ত্তী চারটী খেলায় জয়লাভ করাতে মহামেডান মোহনবাগানের চেয়ে তিন পয়েণ্ট অগ্রগামী থাকিয়া পুনঃ এই বৎসর লীগ-চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করিবার গৌরব অর্জ্জন করিল এবং মোহনবাগান দ্বিতীয় স্থান লাভ করিল। ইতিপূর্ব্বে মহামেডান স্পোর্টিং ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল, পর পর পাঁচ বৎসর লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিল। গত বৎসরের চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানের এই বৎসরও লীগলাভের সুযোগ ছিল এবং তাহাদের সমর্থকগণও সেই আশা পোষণ করিয়াছিল। গত কয়েক বৎসর হইতে ইউরোপীয় দলসমূহ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়াতে ভারতীয় টিমগুলির মধ্যে মোহনবাগান ও মহামেডানের মধ্যেই যে লীগ লইয়া শেষ পর্য্যন্ত প্রতিযোগিতা হইবে, ইহা সকলেই অনুমান করিয়াছিল। গত বৎসরের বিজয়ী মোহনবাগান লীগের গোড়া থেকেই দৃঢ়তার সহিত খেলিলে অনায়াসে এবারও তাহারা লীগ বিজয়ের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিত। কিন্তু লীগের প্রথম তিনটী খেলায় তাহাদের পর পর পরাজয়ে ৬টী পয়েণ্ট নষ্ট করা, তারপর লীগের শেষের দিকে পুনঃ ভবানীপুর ও এই বৎসরের নিম্নস্থান অধিকারী ক্যালকাটার সহিত খেলার ফলাফল সমান্ করিয়া দুইটী মূল্যবান্ পয়েণ্ট নষ্ট করায়, তাহারা চ্যাম্পিয়নশিপ্ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। মোহনবাগান দুর্দ্ধর্ষ দলসমূহের বিরুদ্ধে অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াও, সামান্য দলের নিকট পরাজিত বা সমান হওয়াতে মনে হয়, তাহাদের খেলা এখনও কোন বিশেষ পর্য্যায়ে (standard) আসিয়া উপনীত হয় নাই। এদিকে মহামেডান স্পোর্টিংকে লীগের প্রায় এক-চতুর্থাংশ শেষ হইবার পর খেলা আরম্ভ করাতে প্রতি সপ্তাহে ৩।৪টী খেলা খেলিতে হইয়াছে। তাহারা লীগের গোড়ার দিকে ভাল না খেলিলেও ক্রমশঃ উন্নতি করিয়া লীগের শেষের দিকে অপূর্ব্ব দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া ষষ্ঠ বার লীগ-চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করিল।

দ্বিতীয় বিভাগে ডালহাউসী লীগ-তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করিয়া পুনরায় প্রথম বিভাগে আসিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিল। অরোরা লীগের গোড়া হইতে শীর্ষ স্থান দখল করিয়া আসিয়াও শেষ রক্ষা করিতে পারিল না। তৃতীয় বিভাগে ট্রপিক্যাল স্কুল ও ৪র্থ বিভাগে রবার্ট হাউসন লীগ-চ্যাম্পিয়ন হইয়াছে।

নিম্নে প্রথম বিভাগের চূড়ান্ত লীগ-তালিকা দেওয়া হইল :—

প্রথম বিভাগ

| দলের নাম | খেলা | জয় | ড্র | পরা | প |
|---|---|---|---|---|---|
| মহামেডান স্পোর্টিং | ২৪ | ১৭ | ৬ | ১ | ৪০ |
| মোহনবাগান | ২৪ | ১৭ | ৩ | ৪ | ৩৭ |
| রেঞ্জার্স | ২৪ | ১৩ | ৬ | ৫ | ৩২ |
| ইষ্টবেঙ্গল | ২৪ | ১০ | ১০ | ৪ | ৩০ |
| কালীঘাট | ২৪ | ৯ | ৯ | ৬ | ২৭ |
| ই বি আর | ২৪ | ৬ | ৯ | ৯ | ২১ |
| এরিয়ান্স | ২৪ | ৬ | ৮ | ১০ | ২০ |
| পুলিশ | ২৪ | ৭ | ৫ | ১২ | ১৯ |
| বর্ডার রেজিমেণ্ট | ২৪ | ৭ | ৫ | ১২ | ১৯ |
| কাষ্টমস | ২৪ | ৫ | ৯ | ১০ | ১৯ |
| ভবানীপুর | ২৪ | ৭ | ৪ | ১৩ | ১৮ |
| স্পোর্টিং ইউনিয়ন | ২৪ | ৫ | ৬ | ১৩ | ১৬ |
| ক্যালকাটা | ২৪ | ৩ | ৮ | ১৩ | ১৪ |

**আই-এফ-এ শিল্ড প্রতিযোগিতা—** এ বৎসর শিল্ড প্রতিযোগিতায় মোট ৪৪টী টিম যোগদান করিয়াছিল, ইহার মধ্যে মিলিটারী টিম ছিল মাত্র দুইটী। তাঁহারাও শেষ পর্য্যন্ত খেলে নাই। শিল্ডের ৭৭ বৎসরের মধ্যে মিলিটারী খেলোয়াড় ছাড়া শিল্ডের খেলা হইয়াছে এই প্রথম। বাংলার প্রায় প্রত্যেকটী জেলা হইতে দুই একটী করিয়া দল শিল্ডে যোগ দিয়াছে। বাংলার বহু খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় এবার খেলিবার সুযোগ পাইয়াছে। কিন্তু মিলিটারী টিমগুলি যোগদান না করায় এবারকার খেলায় উন্নততর খেলা দৃষ্ট হয় নাই। মফঃস্বল দলগুলির মধ্যে গৌহাটীর মহারাণা। দুর্দ্ধর্ষ মহামেডানের সহিত যুঝিয়া যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে তাহা ক্রীড়ামোদীদের বহুদিন স্মরণে থাকিবে। মহারাণার রক্ষণভাগ খুবই পুষ্ট ছিল। মফঃস্বলের অন্যান্য টিমগুলি তাহাদের সুনাম রক্ষা করিতে পারে নাই এবং তাহারা তেমন ভাল খেলোয়াড় তৈয়ারী করিতেও পারে নাই।

ভারতের 'ব্লু রিবণ্ড'—আই-এফ্-এ শীল্ড

মিলিটারী দলগুলি যোগদান না করায় খেলায় উৎকর্ষতার অভাব হইলেও উৎসাহ উদ্দীপনার দিক দিয়া কিন্তু এবারকার শিল্ড খেলা বহুদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। প্রথমতঃ স্থানীয় দলের মধ্যে যে কোনও দল যে এবার শিল্ড-বিজয়ী হইবে ইহা সবাই অনুমান করিয়াছিল, এবং এই গৌরব মোহনবাগান বা মহামেডান এই দুইএর মধ্যে যে কেহ অর্জ্জন করিবে, ইহা লইয়াই ক্রীড়ামোদিদের জল্পনা-কল্পনা চলিতে থাকে। শিল্ড খেলার তালিকাও এরূপ ভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল যে, দুইদিক হইতে মোহনবাগান ও মহামেডান যেন শেষ খেলা খেলিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে। মোহনবাগানের দিকে গত বৎসরের বিজয়ী পুলিস ও ইষ্ট বেঙ্গল এবং মহামেডানের দিকে বাঙ্গালোর মুস্লিম ও রেঞ্জার্স স্থান পাওয়ায়, এই খেলাগুলির উপর অনেকেই গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু দিল্লী এফ-এর কাছে ইষ্ট বেঙ্গলের অপ্রত্যাশিত পরাজয় ও কাষ্টমসের কাছে বাঙ্গালোর মুস্লিমের পরাজয়ে অনেকেই মোহনবাগান ও মহামেডান যে ফাইন্যাল খেলা খেলিবে তাহা এক প্রকার নিশ্চিত বলিয়া ধরিয়া লয়। কিন্তু খেলার কথা পূর্ব্বে কিছুই বলা যায় না, এই প্রবাদ সত্য হইল—এরিয়ান দল অকস্মাৎ কাষ্টমসকে প্রথম খেলায় ড্র করিয়া দ্বিতীয় দিনে ১ গোলে পরাজিত করিয়া কৃতিত্ব অর্জ্জন করে, আবার এদিকে রেঞ্জার্স দুর্দ্ধর্ষ লীগ-চ্যাম্পিয়ন মহামেডানকে ২ গোলে অপ্রত্যাশিত ভাবে পরাজিত করিলে মোহনবাগান ও রেঞ্জার্সের সঙ্গে যে শিল্ড-ফাইন্যাল হইবে এক রকম ইহা ঠিক হয়। কিন্তু তাহা হইবার নহে—এরিয়নের সৌভাগ্য তাহারা মহামেডান-বিজয়ী রেঞ্জার্সকেও সেমি-ফাইন্যালে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উপনীত হয়। মহামেডান স্পোর্টিং এবার লীগে যেরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল তাহাতে শিল্ডও যে তাহারা লাভ করিবে, ইহা তাহাদের সমর্থকেরা এক রকম নিশ্চিত বলিয়া জানিয়াছিল। কিন্তু শিল্ডে মহামেডানের প্রথম খেলায় গৌহাটীর মহারাণা ক্লাবের সহিত ১-১ গোলে সমান পাল্লা হয়, পরদিন অতিকষ্টে মহামেডান শারীরিক বল ও এতদিনের খেলার সমস্ত কৌশল খাটাইয়া কোন রকমে ১-০ গোলে মহারাণাকে পরাজিত করে। ইহার পর মহামেডান দল হবিগঞ্জ টাউন ক্লাবকেও পরবর্ত্তী রাউণ্ডে কোন রকমে ১-০ গোলে পরাজিত করে। মহামেডান পরবর্ত্তী খেলায় রেঞ্জার্সের নিকট পরাজয় বরণ করিয়া শিল্ড হইতে এই বৎসরের মত বিদায় লয়। অন্যদিকে মোহনবাগান খুলনা ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাবকে ৬ গোলে ও পরবর্ত্তী রাউণ্ডে বেঙ্গল আর্টিলারীকে ৮ গোলে পরাজিত করিয়া চতুর্থ রাউণ্ডে উঠে। এইখানে গত বৎসরের বিজয়ী পুলিসের সহিত প্রথম দিন মোহনবাগান প্রথমে ২ গোলে অগ্রগামী থাকিয়াও ড্র করে এবং দ্বিতীয় দিন পুলিসকে পরাজিত
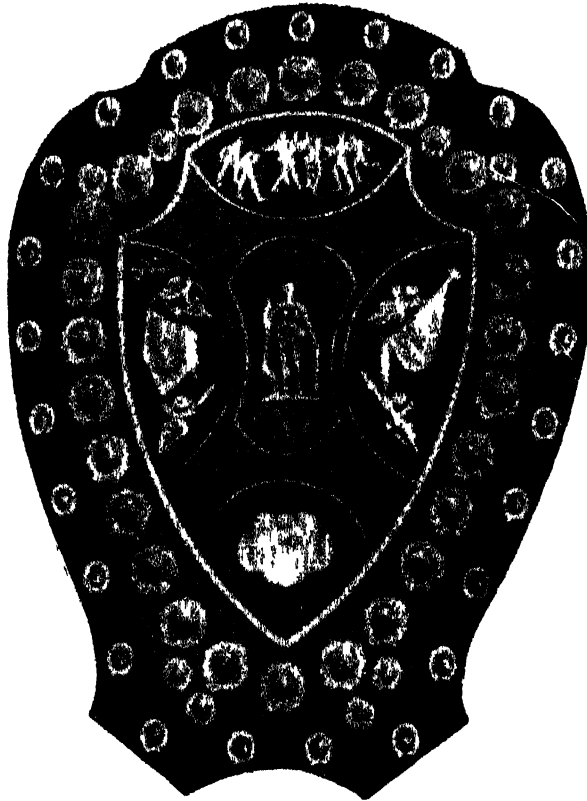
করিয়া সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয়। সেমি-ফাইন্যালে ভবানীপুরকে ১-০ গোলে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে এরিয়ানের সহিত খেলে।

**শীল্ড ফাইন্যাল**—আই-এফ এ শিল্ডের শেষ গণ্ডীর খেলা বাঙ্গালীর আদরের মোহনবাগান ও ৫৩ বৎসরের পুরাতন এরিয়ান্স ক্লাবের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। শিল্ডের ৪৭ বৎসরের খেলার মধ্যে ফাইন্যালে তুইটি বাঙ্গালী দলের খেলা এই সর্ব্বপ্রথম। তার উপর ১৭ বৎসর পরে জনপ্রিয় মোহনবাগান পুনরায় ফাইন্যালে উঠিলে ক্রীড়ামোদিদের উদ্বেগ ও উদ্দীপনার সীমা ছিল না। অধিকাংশ ক্রীড়ামোদী আশা করিয়াছিল, মোহনবাগান নিশ্চিত জয়লাভ করিয়া দ্বিতীয়বার শীল্ড-বিজয়ের সৌভাগ্য লাভ করিবে। এদিকে এরিয়ান্স দল পূর্ব্বে এই শীল্ড খেলায় শীল্ড-বিজয়ী হবার আশায় ফাইন্যালে প্রায় লক্ষ লোকের সমাবেশ হইয়াছিল—তার মধ্যে মাঠের বাহিরের লোকের সংখ্যা ভিতরের চেয়ে ৪ গুণ বেশী এবং মাঠের ভিতরে এত বেশী টিকিট বিক্রয়ও ইতিপূর্ব্বে কোন শিল্ড-ফাইন্যালে হয় নাই। ক্রীড়ামোদিগণ প্রবল উদ্বেগ ও উত্তেজনার মধ্যে থাকিয়া খেলার ফলাফলে স্তম্ভিত হইয়াছে। এরিয়ান্স দল মোহনবাগানকে ৪-১ গোলে পরাজিত করিয়া এ বৎসর শীল্ড বিজয়ী হইয়াছে।

এই খেলায় মোহনবাগানের সমর্থক-সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, এরিয়ান্সের ডি ব্যানার্জ্জী যখন খেলা আরম্ভের ৬ মিনিটের মধ্যে প্রায় ত্রিশ গজ দূর হইতে শট করিয়া প্রথম গোল করে, তখন প্রায় ২৫ হাজার লোকের মধ্যে ৫০০ শত লোক মাত্র হাততালি দিয়া উল্লাস প্রদর্শন করে এবং মাঠের

এরিয়ান্স ১৯৪০

কোনদিন সেমি-ফাইন্যালে না উঠিলেও, তাহারা দুর্দ্ধর্ষ মহামেডান-বিজয়ী রেঞ্জার্সকে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উঠিলে শিল্ড-বিজয়ের এই সুবর্ণ সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতে চায় না, তাই প্রাণপণে খেলিয়া জিতিবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছিল। যদিও এবার মিলিটারী দল না থাকাতে হয়ত এরিয়ান্স দল ফাইন্যালে উঠিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে তথাপি কাষ্টমস ও রেঞ্জার্সকে পরাজিত করিয়া তাহারা কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। এই এরিয়ান্স দল এবার লীগের প্রথম ভাগে নিম্ন বিভাগে নামিবার ভয়ের উদ্বেগ ভোগ করিয়াছে, তথাপি পরে তাহারা ক্রমশঃ লীগে উন্নতি প্রদর্শনও করিয়াছে। গত বৎসরের শিল্ডের প্রথম খেলায় এরিয়ান্সের কাছে মোহনবাগান পরাজিত হইয়াছিল কিন্তু এবার লীগের খেলায় মোহনবাগান দুইবারই এরিয়ান্সকে পরাজিত করায় পুনরায় যে তাহারা এই ফাইন্যালেও এরিয়ান্সকে পরাজিত করিতে পারিবে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না। তাই জনপ্রিয় মোহনবাগানের এবার বাহিরের লোক গোল হইয়াছে কিনা জানিতেও পারে নাই। যাহারা খেলা দেখিয়াছেন তাহারা ভাবিয়া পায় না, কি করিয়া কে দত্তের মত এই রকম একজন প্রথম শ্রেণীর গোল-রক্ষক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গোলে এরিয়ানের ৫টী শটের মধ্যে চারটী গোল খায়। কে দত্ত বহু পুরাতন নামজাদা গোল-রক্ষক, তিনি এই খেলায় কেন যে এমন নির্লিপ্তভাবে খেলিলেন, তাহা ক্রীড়ামোদিদের কাছে বহুদিন ভাবিবার বিষয় হইয়া থাকিবে। এই শীল্ড খেলার ফলাফল দেখিয়া কেহ খেলার সঠিক ধারণা করিতে সক্ষম হইবে না। মোহনবাগান খেলার শেষের ১০ মিনিট ছাড়া সারাক্ষণ এরিয়ান্সদের চাপিয়া রাখিয়া গোলে বহু আক্রমণ করিয়াও একটীর বেশী গোল করিতে না পারাও দুর্ভাগ্যের কারণ বলিতে হইবে। তিন চারবার পোষ্টে লাগিয়া, দুই তিনবার পরাভূত গোল-রক্ষকের গায়ে লাগিয়া বল ফিরিয়া আসা ও খালি গোলে বল না ঢোকা মোহনবাগানের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথাই মনে জাগে। তার

উপর বিশ্বাসী গোল-রক্ষক কে দত্তের এইরূপ আচরণ দেওয়ায় মোহনবাগানের খেলোয়াড়গণ শেষের দিকে ভাঙ্গিয়া পড়ে। প্রথম ৬ মিনিটের সময় হঠাৎ দূর হইতে প্রথম গোল খাইয়া মোহনবাগান দল প্রাণপণ খেলিয়া ১৬ মিনিটের সময় এস গুঁই গোল পরিশোধ করে। তারপর বিশেষ চেষ্টা করিয়াও প্রথমার্দ্ধে মোহনবাগান আর কোন গোল করিতে পারে না। দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলা আরম্ভের তিন মিনিটের মধ্যে পুনঃ এরিয়ান্সের ডি ব্যানার্জ্জি গোল করে। কে দত্তের হাতে লাগিয়া বল গোলে ঢুকিল। এই গোল হইবার পর মোহনবাগানের সমর্থকেরা জিতিবার আশা ত্যাগ করে। তার কিছুক্ষণ পরে এন ঘোষের সাহায্যে ভৌমিক আর একটী দর্শনীয় গোল দেয়। এই তিনটী গোলই মোহনবাগানের শ্রেষ্ঠ ব্যাক পি চক্রবর্ত্তীর ত্রুটীর জন্যই হয়। তিনিও সেদিন এমন খারাপ খেলা

মন্মথ দত্ত (মোহনবাগান) | ডি ব্যানার্জ্জি (এরিয়ান্স) | রসিদ (মহামেডান স্পোর্টিং) | কে ভট্টাচার্য্য (কাষ্টমস্) | লামসডেন (রেঞ্জার্স) | জোসেফ (কালিঘাট)

খেলিবেন, তাহা কেহ ধারণাও করিতে পারে নাই। এবার কলিকাতায় লীগে তাঁহার মত শ্রেষ্ঠ ব্যাক ছিল কিনা সন্দেহ, কিন্তু মোহনবাগানের এই গৌরব অর্জ্জনের সাহায্যে তাঁহার অক্ষমতা দেখিয়াও আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এরিয়ান্স ৪র্থ গোল দেয় দূর হইতে ফ্রি শটে। ডি ব্যানার্জ্জি শট করিলে গোলরক্ষক কে দত্ত বল গোলে ঢুকিতে শুধু দেখিতেছিলেন মাত্র, কিন্তু অঙ্গচালনা করিয়া তাহা ধরিবার মত সতর্কতা ও তৎপরতা দেখা যায় নাই। এই খেলায় ডি ব্যানার্জ্জি নিজে তিনটী গোল করিলেও, খেলায় তিনি কৃতিত্বের পরিচয় বিশেষ দিতে পারেন নাই। মোহনবাগানের বিশ্বাসী রক্ষণ-বিভাগের গোলরক্ষক কে দত্ত ও ব্যাক পি চক্রবর্ত্তীর অমার্জ্জনীয় ত্রুটীই তাহাকে গোল করিবার সুযোগ দিয়াছে ও এরিয়ান্সকে জয়ী হইতে সাহায্য করিয়াছে। এরিয়ান্স ৪টি গোল করিয়া জয়ী হইলেও এই খেলায় তাঁহারা মোহনবাগানের বিরুদ্ধে একটী কর্ণার শটও পায় নাই, ইহাতেই তাঁহাদের খেলা যে মোটেই ভাল হয় নাই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

এই খেলায় এরিয়ান্সের গোলরক্ষক আর ভট্টাচার্য্য (ভূতপূর্ব্ব মোহনবাগান) বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া কয়েকটী অব্যর্থ গোল বাঁচাইয়া বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। ব্যাকের মধ্যে এ গড়গড়ি ভাল খেলিয়াছেন। হাফ ব্যাকে নাসিমের খেলা প্রশংসনীয় হইয়াছিল। তিনটী গোল করিয়া সুযোগ-সন্ধানী ডি ব্যানার্জ্জি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। মোহনবাগানের রক্ষণভাগে টি চৌধুরী ও নীলু মুখার্জ্জি ভাল খেলিয়াছেন। এস প্রামাণিকও প্রথমার্দ্ধে ভাল খেলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রথমার্দ্ধের শেষ দিকে পি চক্রবর্ত্তীর একটী জোর শট মুখে লাগায় তিনি দ্বিতীয়ার্দ্ধে তাঁহার স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া খেলিতে বাধ্য হন। ইহাতে রক্ষণভাগ খুবই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ফরওয়ার্ডের মধ্যে গুঁইএর খেলা খুবই প্রশংসনীয়। এস মিত্র ও এ রায় চৌধুরীও খাটিয়া খেলিয়াছেন।

যাহা হউক আর একটী ভারতীয় দল তৃতীয় বার শিল্ড বিজয়ের গৌরব লাভ করাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি এবং এই সৌভাগ্য অর্জ্জনে আমরা বাংলার পুরাতন এরিয়ান্স ক্লাবকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

খেলোয়াড়দের নাম :—

মোহনবাগান—কে দত্ত, টি চৌধুরী ও পি চক্রবর্ত্তী, নীলু মুখার্জ্জি, এস প্রমাণিক ও প্রেমলাল; এস গুঁই, এস মিত্র, এ রায় চৌধুরী, এ ভট্টাচার্য্য ও এন মুখার্জ্জি।

এরিয়ান্স—আর ভট্টাচার্য্য, এন মজুমদার ও এ গড়গড়ি; ডি মিত্র, নাসিম ও এ মুখার্জ্জি; এন ঘোষ, এস রাও, ডি ব্যানার্জ্জি, এ জর্ডন ও এ ভৌমিক।

# সাময়িকী

## রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা

২২শে শ্রাবণ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের বাণীমূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথকে ডক্টর উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক গোলযোগে এই সমাবর্ত্তন উৎসব শান্তি-নিকেতনের সিংহসদন-ভবনে স্যার মরিস্ গায়ারের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে বিশেষ ব্যবস্থার মধ্য দিয়া কোন দূর দেশে এই
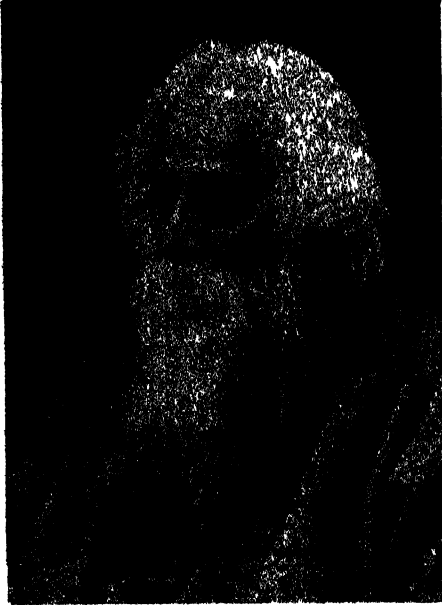
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

সম্মান প্রদান করা, ইহাই প্রথম। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ প্রতিনিধিরূপে স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকিশনের সহযোগিতায় স্যার গায়ার রবীন্দ্রনাথকে এই উপাধি দেন। অক্সফোর্ডের প্রথানুযায়ী জষ্টিস হেণ্ডারসন অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষে প্রধান বক্তার কার্য্য করেন। মোটের উপর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত রীতি, আদব কায়দা যা কিছু সমাবর্ত্তন উৎসবের অঙ্গ তাহা এখানেও নিখুঁতভাবে প্রতিপালিত হয়। বিশ্বাত্মার উপলব্ধির মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রত্যুত্তরে যে অমৃতবাণী বিশ্ববাসীকে পরিবেশন করিয়াছেন তাহা ভারতেরই শাশ্বত ঋষি-বাণী। এই উপলক্ষে আমরাও তাঁহাকে বন্দনা করিতেছি।

## সঙ্ঘ-জননীর আবির্ভাবোৎসব

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের অধ্যাত্ম-জননী শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবীর শুভ জন্মতিথি উৎসব বিগত ৬ই আষাঢ় সঙ্ঘ-মন্দিরে সঙ্ঘ-সন্তান ও সঙ্ঘাশ্রিত ছাত্র-ছাত্রী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের মধ্যে সশ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্ঘের অধ্যাত্ম প্রবাহকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করার জন্য ঐদিন সকলে ভোর ৫টায় মাতৃ-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া ধ্যান, উপাসনা ও হাজার আটবার মাতৃ-নাম করেন এবং তারপর দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্ঘের সঙ্কল্প মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করেন। বেলা ৭টায় সঙ্ঘগুরু সঙ্ঘের সাধন-নীতি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন এবং বলেন যে সত্য, সযম ও সম্বন্ধের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর আগামী দশ বৎসরের মধ্যে একটি নবজাতির অভ্যুত্থান অবশ্যই হইবে। সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় সঙ্ঘ-গুরুর লিখিত "গ্রহচক্র" নাটিকাখানি নারী-মন্দিরের ছাত্রিগণ কর্ত্তৃক সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়।

## মাতৃ-মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা

বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়া বিগত ৩১শে আষাঢ়, প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় প্রবর্ত্তক আশ্রমে সঙ্ঘ-শ্রীমতিলাল রায় সঙ্ঘ-জননীর চিতাভস্মের উপর সন-তারিখ সহ একটি মর্ম্মর ফলক প্রোথিত করতঃ নূতন মাতৃ-মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। শুভ চিহ্ন স্বরূপ ঠিক এই সময়ে আকস্মিক ফোঁটা ফোঁটা পতনের মধ্য দিয়া মায়ের আশীষ-ধারা ঝরিয়া পড়ে। এই উপলক্ষে সঙ্ঘের সাধক-সাধিকাবৃন্দ সমবেত হইয়া মাতৃ-শক্তির অনুধ্যান করেন। সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত সঙ্ঘ-জননী শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবীর জীবন-কাহিনী কীর্ত্তন ও বন্দনা করেন এবং সঙ্ঘ-গুরু মাতৃ-শক্তির অধ্যাত্ম-মহিমা পরিস্ফুট করিয়া তুলেন। মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আগামী ২২শে পৌষ সঙ্ঘ-জননীর তিরোভাব তিথিতে এই নব-নির্ম্মিত মন্দিরের উদ্বোধন হইবে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের জননী শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবী তাঁর শারীরি বিগ্রহাশ্রয়ে সঙ্ঘের আত্মসমর্পণ-মন্ত্রের যে নীরব-নির্ব্বাক্ সাধনা ও সিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাই মরণের মধ্য দিয়া চিন্ময়ী শক্তির আশ্রয়িণীরূপে ব্যাপ্তির পথে সঙ্ঘকে সতত আশীর্ব্বাদ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন—মাতৃ-মন্দিরের অভাবিত প্রতিষ্ঠা ও উদ্বোধনের তিথি বিবেচনায় শক্তির এই অধ্যাত্ম অভিপ্রায়ই সূচিত হয়।

## নিখিল বঙ্গ প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ

গত ২১শে জুলাই চন্দননগর প্রবর্ত্তক আশ্রমে নিঃ বঃ প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের কার্য্যনির্ব্বাহক মণ্ডলীর বাৎসরিক

অধিবেশনে সভাপতি শ্রীমতিলাল রায় বর্ত্তমান যুগ-পরিবর্ত্তনের উপযোগি সংগঠনমূলক একটি নূতন পরিকল্পনা প্রদান করেন। এই সভায় নিঃ বঃ প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের ৭ম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন সুন্দরবন-ফ্রেজারগঞ্জে আগামী ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে, বলিয়া স্থির হয়।

## ব্যায়ামবীর তাপসপ্রসাদ

বাংলা দেশে শরীর-চর্চ্চার ক্ষেত্রে উদীয়মান তরুণ ব্যায়ামবীর তাপসপ্রসাদ ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। অদম্য সঙ্কল্প ও নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাসের দ্বারা রুগ্ন দেহকে কি করিয়া সবল ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলা যায়, তাহার মূর্ত্তিমান সাক্ষ্য তাপসপ্রসাদ। ইনি ভটপল্লীর 'মহাবীর দল', নৈহাটীর 'রোকেট ইনস্টিটিউট্', চুঁচুড়ার 'কল্যাণ-সঙ্ঘ' প্রভৃতি বহু ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। নিঃ বঃ পেশী-সঞ্চালন প্রভৃতি বিভিন্ন

ব্যায়ামবীর শ্রীতাপসপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

প্রতিযোগিতা ও বহুতর অনুষ্ঠানাদিতে ইনি ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখাইয়া বহু পদক ও নানাবিধ পুরস্কার পাইয়াছেন। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের গত অক্ষয়-তৃতীয়া উৎসবে তাপসপ্রসাদের পেশী সঞ্চালন ও সুঠাম শরীর-গঠন সকলেরই অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জ্জন করে। 'বারবেলে ব্যায়াম' নামক একখানি বাংলা পুস্তিকার প্রণেতাও ইনি। ভট্টপল্লী অধুনা চুঁচুড়ায় শ্রীতাপসপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের নিবাস। শ্রীমানের বর্ত্তমান বয়ক্রম মাত্র ২৩ বৎসর। ভাবী জীবনে আমরা তাহার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

## ৺প্রতাপ চন্দ্র সেট

গত ১২ই শ্রাবণ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে স্বর্গতঃ প্রতাপচন্দ্র সেট মহাশয়ের দ্বিতীয় স্মৃতি - বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায়

৺প্রতাপচন্দ্র সেট

মহানগরীর বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া প্রতাপ-চন্দ্রের স্মৃতি-তর্পণ করেন। লিলি বিস্কুট কোম্পানীর মুখ্যতম স্থাপয়িতা হিসাবে বাংলার শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাঁহার জীবনাদর্শ বাঙালীকে অনুপ্রেরণা দান করিয়াছে। তাঁহার স্মৃতি-পূজা সমগ্র বাঙালীর জাতীয় অনুষ্ঠান বলিয়াই আমরা মনে করি।

## শিল্পী সারদা উকীল

গত ৫ই শ্রাবণ প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী সারদাচরণ উকীল পঞ্চাশ বর্ষ বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত প্রাচ্য শিল্প-রীতির ছাত্র হিসাবে জীবনারম্ভ করিলেও, সারদাচরণের মৌলিক প্রতিভা পরবর্ত্তী কালে তাঁর নিজস্ব স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে—যাহা এদেশে এবং ওদেশে সমানভাবেই সমাদৃত হয়। দিল্লীতে উকীল ভ্রাতৃত্রয়ের শিল্পশালা সুপরিচিত। সারদাচরণের

অভাবে বাংলা মা সত্যই একজন গুণী শিল্পী-সন্তান হারাইল।

### বাংলার মৎস্যে খাদ্যপ্রাণ

বাংলায় শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের প্রচুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও বাঙালী বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত বাংলার তরুণ সমাজে ব্যাপক বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে। ইহার হেতু, সম্ভাব্যের সদ্ব্যবহার করিবার অর্থসঙ্গতি ও অভিজ্ঞতা আমাদের নাই। নদীবহুল বাংলা দেশে বহু প্রকারের মৎস্য আছে। মৎস্যের বহুবিধ ব্যবসা দ্বারা আমরা বিপুল অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিতে পারি।

বাংলার মৎস্যে খাদ্যপ্রাণের প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে সম্প্রতি অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেল্‌থ যে গবেষণামূলক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অনুধাবনীয় এবং কার্য্যে পরিণত করা বাঙালী জাতির কর্ত্তব্য। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, বাংলার ইলিশ, বোয়াল, আইড়, শোল প্রভৃতি মৎস্যের যে তৈল তাহার "ক" খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন) বিলাতী কডলিভার তৈল অপেক্ষা অধিক। এইরূপ তৈল নিষ্কাষণের কোন কারখানা এদেশে নাই। বাংলার বিত্তশালী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আমরা এই দিকে আকর্ষণ করি।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় কলিকাতা মিউনিসিপাল সংশোধন বিল, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল, বঙ্গীয় চাষী-খাতক সংশোধন বিল এবং সাম্প্রদায়িক চাকুরী বন্টন-নীতি প্রভৃতি প্রতিক্রিয়ামূলক সরকারী বিল ও ব্যবস্থার প্রতিবাদকল্পে ২০শে জুলাই টাউন হলে ও ৪ঠা আগষ্ট শ্রদ্ধানন্দ পার্কে যে বিরাট প্রতিবাদ সভা হয় তাহাতে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি সভাপতিত্ব করেন।

দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র
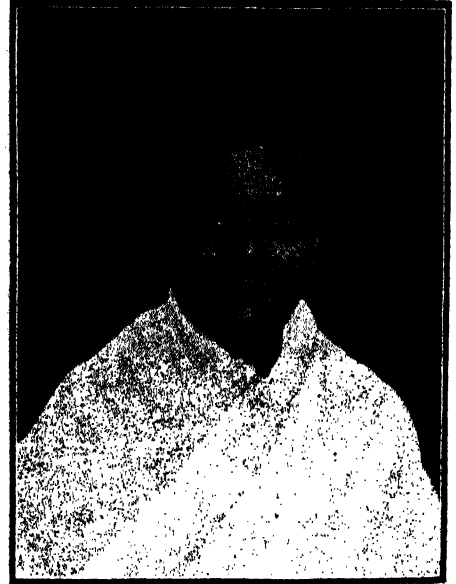
দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র সম্প্রতি হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণ-আন্দোলনে কারারুদ্ধ হইয়াছেন।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

পরিচালক ও প্রকাশক : শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কৈলাসে হর-পার্ব্বতী

[ শিল্পী : শ্রী কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায
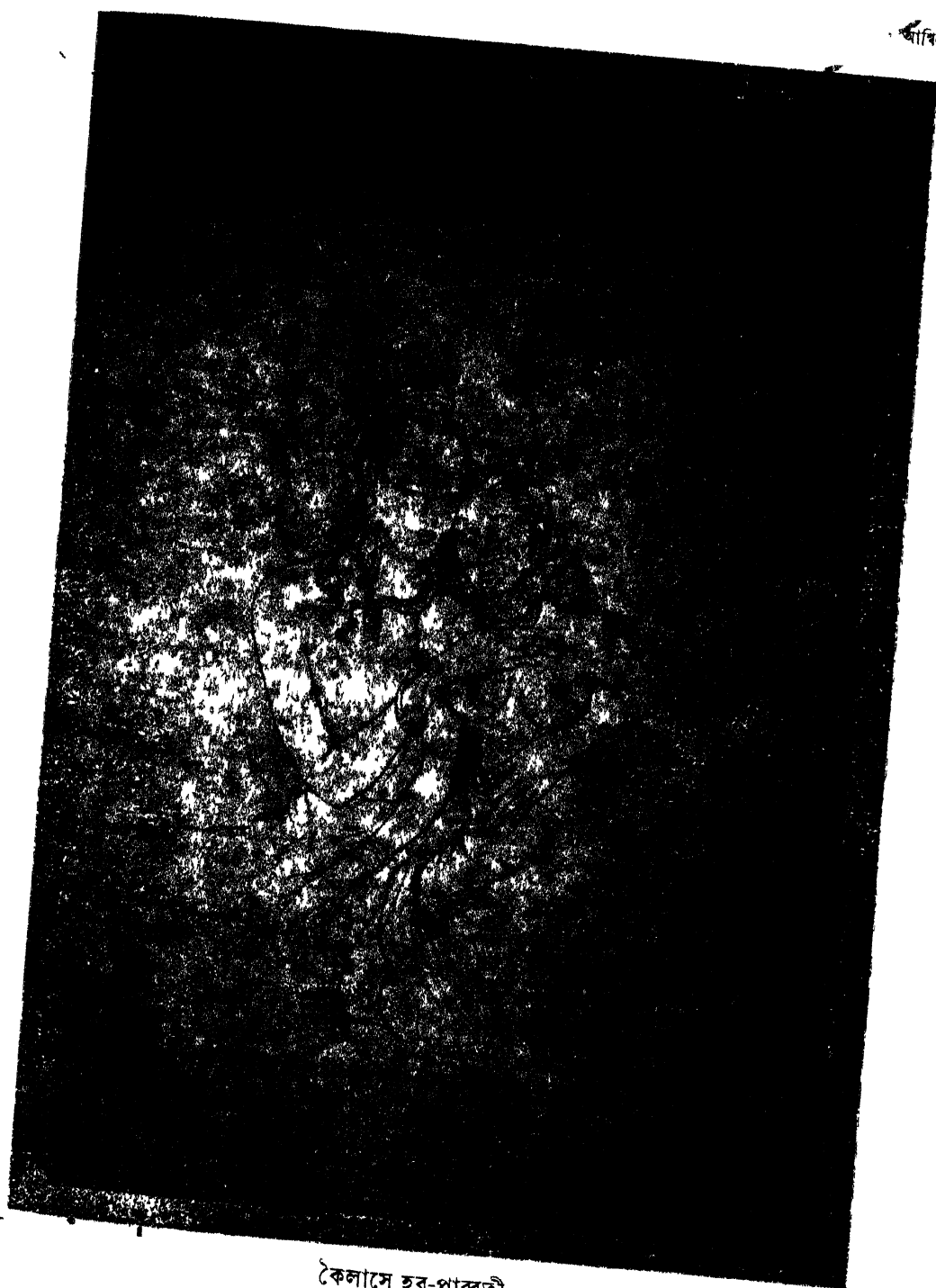
# রজত-জয়ন্তী

## প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের জাতি ও ধর্ম্ম

আমরা যে দেশে জন্মিয়াছি, তাহার নাম ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের সীমা সেদিন পর্য্যন্ত পশ্চিমে পারস্য সাগর হইতে, পূর্ব্বে শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল ভারতে বাস করিত চতুর্ব্বর্ণ জাতি। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে যবন, পূর্ব্ব প্রান্তে কিরাতগণের বাস ছিল। হিমালয়ের সানুদেশ হইতে দক্ষিণ সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ এই ভারতবর্ষ আজিও আছে; কিন্তু সেই প্রাচীন চতুর্ব্বর্ণ জাতির সে অধিকার ও গৌরব আর নাই। আজিও যেটুকু আছে, তাহা ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে।

চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়া যে জাতিটা এই দেশের উপর অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, সেই জাতীয় সংহতির ভিত্তি ছিল শ্রুতি, স্মৃতি, শীল, সদাচার ও আত্মপ্রসাদ।

বেদের নাম শ্রুতি। বেদ অপৌরুষের বলিয়া এই জাতি তাহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়া চলিত। বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা যে শাস্ত্রে বর্ণাদির ধর্ম্ম-নিরূপণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই স্মৃতি। প্রত্যেকের তদনুসরণ করিয়া চলার নাম[illegible] শীল। [illegible]াহা শ্রেয়ঃ, কালে উৎপন্ন হইয়া কালেই ল[illegible] পায় [illegible], যাহাতে আত্মার প্রকাশ হয়, অনাদিকালের প্রমাণ-প্রমেয়-স্বরূপ যে আচরণের অনুষ্ঠানে চিত্তবিক্ষোভ জন্মে না, তাহাই সদাচার। নিরুদ্বিগ্ন চিত্তের স্বতঃই যে আনন্দ ও তৃপ্তি, তাহাই আত্মপ্রসাদ। এই ঋতকে আশ্রয় করিয়া ভারতে আর্য্য-জাতি বাস করিত।

এই জাতি প্রকৃতিভেদে বর্ণভেদ স্বীকার করিত। প্রকৃতিভেদে কর্ম্মভেদ হয়—এই জীবনবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বর্ণবিশেষে কর্ম্ম বিভাগ করিয়া জাতি শ্রেয়ঃ-পথে পরিচালিত হইত।

একজন যাহা করিতে পারে, অন্যে তাহা পাবে না। যাহার যে কর্ম্ম, তদনুযায়ী বর্ণ-বিভাগের রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই হেতু কেহ কাহারও নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম অবহেলা করিয়া, অন্যের শীল ও আচার অনুকরণ করিত না। কেহ এরূপ করিতে চাহিলে, তাহাতে বাধাও দেওয়া হইত না। কর্ম্মানুসারেই বর্ণসৃষ্টি হয়। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যদি ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তবে কর্ম্মগুণে ভবিষ্যৎ জন্মে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বৃদ্ধি হইবে। আবার ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অথবা শূদ্রের আচার ও শীল আশ্রয় করে, তবে সেও তদনুযায়ী গুণপ্রাপ্ত হইবে। আন-

বিজ্ঞানবান্, শুচি ও ধর্ম্মজ্ঞ শূদ্রও তদনুযায়ী গুণধর্ম্ম লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারে। শাস্ত্রে একথা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। এক বর্ণ হইতে অন্য বর্ণে উন্নীত হওয়ার আকৃতি কোথাও বাধা প্রাপ্ত হইত না। কিন্তু কোন বর্ণ কর্ম্মগুণে উন্নীত হইলেও, তাহাকে জন্মগত ক্ষেত্রেই থাকিতে হইত—জন্মান্তরবাদী আর্য্যজাতি এইরূপ নীতি পালন করিত।

এই ক্ষেত্রে কেহ বিপ্লবী হইলে, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ধর্ম-দণ্ডের দ্বারা ইহা হইতে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিত। অধস্তন কোন বর্ণ উচ্চ বর্ণের ধর্ম্মসমস্যা পালন করিয়া স্বভাবের রূপান্তরে পরজন্মে তদনুযায়ী জন্মলাভ হইবে—এই ধৈর্য্যধারণের শিক্ষা সমাজপুরুষেরা দিতেন। শ্রুতি ও স্মৃতির শাসনই ছিল জাতির ধর্ম্মদণ্ড; ইহার উপর বিদ্রোহাচরণ কেহ করিলে, রাজদণ্ড ধর্ম্মদণ্ডের সহায় হইত।

আর্য্যজাতির সংস্কৃতি জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর্য্যসংস্কৃতি রাখিতে হইলে, এইরূপ নীতির পক্ষপাতী হওয়া ছাড়া তাঁহাদের অন্য উপায় ছিল না। মানুষ কর্ম্মের দ্বারাই উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট জন্ম লাভ করে। ভাগ্য ও আয়ুঃ কর্ম্ম দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। যে গুণ ও স্বভাব লইয়া মানুষ জন্মে, কর্ম্মই তাহার জন্য দায়ী এবং সমস্ত জীবন তাহারই অভিব্যক্তি। এক অন্যের ধর্ম্মে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া যদি তদনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তবে সেই কর্ম্ম তাহার পূর্ব্বজন্মার্জিত সঞ্চিত কর্ম্মবীজের প্রকাশ অথবা ঈর্ষ্যান্বিত দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র? ইহা স্থির করার জন্য .কাহারও কর্ম্মপ্রবৃত্তি দমন করা হইত না, কেবল বর্ণভেদের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া জাতির মধ্যে বর্ণ-সঙ্কর সৃষ্টি না হয়, সমাজপুরুষেরা এইখানেই সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। ব্রাহ্মণের রক্তে ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয়-রক্তে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের রক্তে বৈশ্য—এইরূপ অমিশ্র বর্ণরক্ষার জন্য, রক্ত-মিশ্রণের তাঁহারা পক্ষপাতী ছিলেন না। জাতির অধঃপতন রক্তমিশ্রণের ফলেই হয়, এই প্রত্যয় আজিও অকারণ বলিয়া কেহ মনে করিবেন না।

কর্ম্মবাদী আর্য্যগণ স্বভাবগুণের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ব্রাহ্মণের মধ্যে দেখিয়া, ব্রাহ্মণকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছিলেন। এই হেতু ব্রাহ্মণের রক্ত ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার মধ্যে নিহিত করিয়া সন্তানোৎপাদন তাঁহারা দোষের মনে করিতেন না। আবার ক্ষত্রিয় বৈশ্য-বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এইজন্য বৈশ্যার ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়-বীর্য্যে সন্তানের জন্মে জাতির ক্ষতি হইবে বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করিতেন না। আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ব্যতীত, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত দুইটী শ্রেণী এবং বৈশ্যার ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের ঔরসজাত আর এক শ্রেণী, এই ছয় বর্ণকেই আর্য্যজাতি বলিয়া আর্য্য-ধর্ম্মে গণ্য করি। শূদ্র চিরদিন দাস-জাতি। আর্য্যজাতি শূদ্র-কন্যাগ্রহণ অতিশয় নিন্দার্হ ও দণ্ডার্হ মনে করিতেন। গুণ ও কর্ম্মের অনুশীলনে বাধা নাই। তাই বলিয়া এক বর্ণ যখন অন্য বর্ণের সহিত রক্তমিশ্রণের আকাঙ্ক্ষা করে, তখন তাহা স্বভাব-ধর্ম্ম ভিন্ন আর কি হইতে পারে? স্বভাবগতি আর্য্যজাতি চিরদিন অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা, আর্য্যজাতি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এই শ্রেষ্ঠত্ব রাখার জন্য ধর্ম্মনীতিই অনুসরণীয়। সত্য, সংযম, সদাচার আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের জীবনগতি নিয়ন্ত্রিত হইত। ইন্দ্রিয়ের অবাধ প্রশ্রয় তাহাদের ছিল না, ইন্দ্রিয়সংযম জীবনের সর্ব্বপ্রধান নীতি ছিল। এই ক্ষেত্রে অন্যথা করিলে, রক্ত-মিশ্রণে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী হইবে। জাতিরক্ষার দরদ তাঁহাদিগকে অভিমানবের ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। একটা উৎকৃষ্ট জাতি নিকৃষ্ট জাতির সংসর্গে, রক্ত-মিশ্রণের ফলে অধঃপতিত হইবে—মানবতার এই অপমান তাঁহারা কোন মতে সহ্য করিতেন না। বরং উচ্চ গ্রামে তাঁহারা ঘোষণা করিতেন—ইন্দ্রিয়-বৃত্তির যথেচ্ছ ব্যবহারে বর্ণভেদের প্রাচীর আর্য্যজাতি যেদিন লঙ্ঘন করিবে, সেই দিনই আর্য্যজাতির গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে। এই জীবননীতির গুণাগুণপরীক্ষা চলিয়াছে ইউরোপের জাতিবিশেষে। ভারত কোথায়?

সেই ভারত, কিন্তু আর্য্যজাতি কোথা? আর্য্য-ধর্ম্মের জয়চ্ছত্র কি ভারত আজ ধরিয়া আছে? আর্য্য-বীর্য্যের মহিমস্তুতি ভারতের রাষ্ট্রে কি পরিশ্রুত হয়? ভারতের ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে আজ যে জাতি অভ্যুত্থান চাহে, সে জাতি কি আর্য্যজাতি? তাহাদের গোত্র কি? কি নামে তাহাদের অভিহিত করিব? ধর্ম্মপ্রচারের

ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র-সাধনার ক্ষেত্রে, সমাজসংগঠনে যে জাতি, তাহাদের আত্মবিচার করিয়া দেখার দিন আসিয়াছে। তাহারা যে জাতি হইবে, তদনুযায়ী দেশের সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্রের নামকরণ হইবে। আমাদের প্রশ্ন—ইহারা কি আর্য্যজাতির বংশধর? ইহারা কি হিন্দু, বৌদ্ধ না ইসলামধর্ম্মী? প্রশ্ন শুনিয়া কেহ হাসিবেন, কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিবেন। কিন্তু ভারতের অভ্যুত্থান যদি হয়, যে জাতি রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে, তাহাদেরই গুণ ও প্রকৃতি সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইবে। জাতির কর্ম্মক্ষেত্রে যাহারা অগ্রণী, তাহাদের জাতি, কুল ও গোত্র নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে।

আমি হিন্দু। এই সংবিৎ আমি পাইয়াছি, আমি বিশ্বাস করিয়াছি। ইতিহাস, পুরাণ হিন্দুস্থান আমার জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ দেয়। রক্ত-মাংসের শরীরগ্রহণই জন্ম বলিতেছি না—এ দেহ আমি উত্তরমেরু অথবা পেরু বা কামস্কাট্‌কায় লাভ করিতে পারি। আমার চিরাচরিত কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উৎপত্তি-ক্ষেত্রই আমার জন্মভূমি। আমি উপলব্ধি করিয়াছি—ভারত আমার ধর্ম্মসংস্কৃতির প্রসূতি। আমার মাতৃভূমি ভারতের ধর্ম্ম আর্য্য-ধর্ম্ম, হিন্দু-ধর্ম্ম। আমি ভারতের; তাই আমি আর্য্য, আমি হিন্দু।

আমার জাতি-ধর্ম্ম যাহা, তাহা আশ্রয় করিয়া কয় জন মানুষ আমরা—জাতির সংখ্যা এইরূপে নিরূপণ করিয়া লইতে হইবে। বুদ্ধির মাপকাটীতে এই আত্মানুভূতির বীর্য্য ও গৌরব নির্ণয় করা সম্ভব নহে। আমাদের জন্মগত অধিকার সম্যক্‌রূপে লাভ যদি হয়, তাহার অমোঘ শক্তি-প্রয়োগে আমাদের দেশ ও জাতিকে আমরা স্বরূপে ফিরাইয়া আনিতে পারিব। জাতীয় বোধের পরিচয় তবেই সত্য হইবে।

সংখ্যা দেখিয়া শক্তির বিচার হয় না। সংখ্যা দেখিয়া বৃটন দিগ্বিজয়ে বাহির হয় নাই। টিউটন আজ জগজ্জয়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে সংখ্যাবলেই নহে, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অভাবনীয় প্রভাবে। আমি হিন্দু, আমি আর্য্য —আমার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি আমার বল, বুদ্ধি, মেধা, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য—ইহাই আমাকে জয়ী করিবে।

রক্ত-মিশ্রণে আমরা হয়তো পতিত হইয়াছি—রক্তের শোধন আছে, পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? আজ আমাদের এই ক্ষীণ মূর্ত্তি যতই দুর্ব্বল ও নগণ্য হউক—আত্ম-বিস্মৃতির পঙ্ক হইতে মাথা তুলিলে দেখিব—নাম ও গোত্র লইয়া আসমুদ্রহিমাচল এই ভারত এখনও ত্রিশ কোটী হিন্দুর বাসভূমি। শোধন ও সাধনে আমরা যদি হিন্দু-কৃষ্টির পুনরুদ্ধার করিতে পারি, আমাদের বিজয়-ভেরীর আহ্বানে জগতের হৃৎকম্প হইবে। আর মোহগ্রস্ত হইয়া এই প্রাচীন জাতির যদি পতন ঘটিয়া থাকে, তাহার কাণে শত, সহস্র, লক্ষ কোটী কণ্ঠে জাগরণের বাণী আজ শুনাইতে হইবে। জাতি-চৈতন্যকে প্রবুদ্ধ করার জন্য প্রচারমন্ত্রের উচ্চারণই বড় কাজ। আজ রক্ত-মিশ্রণের দায়ে যদি এ জাতি শীর্ণকায় হইয়া ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে, তবে শোধনে ও প্রায়শ্চিত্তে জরাজীর্ণ হিন্দু-শরীরে প্রবহমান যেটুকু রক্ত বিচ্ছুরিত হয়, তাহা অতঃপর যথারীতি বিস্তার করিয়া আবার আমাদের এমন একটা পরিমাণ গড়িয়া লইতে হইবে, যাহার উপর নির্ভর করিয়া নিখিল ভারতে আমাদের শক্তি ও বীর্য্য প্রকাশ পাইতে পারে।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকে আমি বলিব—তুমি হিন্দু, তোমার ধর্ম্ম বেদ; স্মৃতি তোমার আচার। ভারতের ন্যায় ও যুক্তি তোমার নিয়ন্ত্রণ-শক্তি; হিন্দুধর্ম্মীদের মধ্যে এই পুনরাগমন-প্রবৃত্তি দেখিয়া যতই বিদ্রূপ ও অবজ্ঞার তরঙ্গ উঠুক—সঙ্ঘকে আমি এই প্রত্যয়ে অটলপদে দাঁড়াইতে বলি। হিন্দুজাতির গোড়া আল্‌গা হইয়া গিয়াছে; হিন্দুর নাম আছে, কিন্তু সে-সংস্কৃতিরক্ষায় উদাসীন। তাহার তপস্যা ও আচার ক্ষীণপ্রাণ লইয়া আর সে পালন করিতে পারে না। তাই বিশ্বধর্ম্ম, বিশ্বপ্রেম, বিশ্বজাতির ধুয়া ধরিয়া বৃথা সান্ত্বনায় সে টিকিয়া থাকিতে চাহে—কিন্তু এ ভুল তাহার অতি শীঘ্র ভাঙিয়া যাইবে। আর্য্যভূমি হইতে আর্য্য-জাতি নিশ্চিহ্ন হয়। দুই দিন পরে, তাহাদের যাযাবর জাতির ন্যায় দুরবস্থার সীমা থাকিবে না। কোন দিন তাহার উপর ইহুদি-বিতাড়নের পালা আরম্ভ হয়, কে জানে? আমেরিকা ও উত্তর আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের ন্যায় তাঁহাদের অতি শীঘ্র বিদায় লইতে

হইবে না, সে কথা কে বলিতে পারে? তবুও তাহার এই ভাবের ঘরে চুরি দুঃসহ হইয়াছে। হয়তো এই অক্ষম জাতি মনে করে—আত্মঘাতী হইয়া, কোন প্রবলের ঘাড়ে চাপিয়া, পরগাছার মত সে টিকিয়া থাকিবে। এই দুরাকাঙ্ক্ষায় আর্য্যধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া, সে আজ আন্তর্জাতিকতা অথবা বিশ্বজাতির দোহাই দেয়। এই সঙ্কর-জাতি অথবা বুদ্ধিভ্রষ্ট জাতির কথায় আর কর্ণপাত করা চলে না। এই সাড়ে তিন হাত শরীর বিগ্রহের ন্যায় আমাদের সসীম বিশেষ ধর্ম্ম আজ আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইবার দিন আসিয়াছে। এই বিশেষ ধর্ম্ম হইতেই এ জাতি ভূমার পথে চলিবে। দীর্ঘ ইতিহাস আমাদের এ আশা দেয় এবং এইরূপ পথই যে বিজ্ঞানসঙ্গত, তাহা প্রবল জাতি সমূহ সপ্রমাণ করে—অণুই বিভুর শক্তিধারণ করে, ভারতের বিশেষ আর্য্যধর্ম্মও ভূমার পথ আবিষ্কার করিবে।

এই পথে আরও বিপদ্ আছে। যে ধর্ম্ম ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভায় নূতন করিয়া ব্যাখ্যাত হয়, সে ধর্ম্ম স্বধর্ম্ম কিনা, তাহার বিচার করা হয় না। ব্যাধের বংশীধ্বনিতে মৃত্যু-মুখী হরিণের ন্যায় আমরা নূতন কিছু শুনিলেই তাহাতে আকৃষ্টচিত্ত হই। সমস্ত জীবন মরীচিকাভ্রান্ত পথিকের ন্যায় এমনই নাকাল হইয়া, আজ আর্য্যধর্ম্মের বিশাল বটচ্ছায়ায় চরম আশ্রয় লইয়াছি। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল উদীয়মান সূর্য্যের কিরণচ্ছটায় জীবন উদ্বুদ্ধ হয়। বুঝিয়াছি—ধর্ম্ম স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যাযুক্ত হইলে, উহা জাতির ভিত্তিক্ষয় করে। এমন উপধর্ম্মের অভাব আজ ভারতে নাই। ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্মের দায়ে আমরা বঞ্চিত হইব না। যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে একটি অতি প্রাচীন জাতির চিত্তপ্রসাদ স্বতঃই লাভ হইত—সৃষ্টিকাল হইতে যে শাস্ত্র আমাদের সম্মুখে চির উদ্ভাসিত, আমরা সেই ধর্ম্ম ও শাস্ত্রানুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মবাদী হইব, জন্মান্তরবাদী হইব; এবং ধর্ম্মপ্রাপ্তির জন্য আর্য্যজনোচিত সদাচারই আশ্রয় করিব। হয়তো আমাদের ঘিরিয়া অসংখ্য উপধর্ম্ম পুনঃ পুনঃ পথ জটিল করিয়া ধরিবে—উপধর্ম্মের প্রভাবে চিত্ত চঞ্চল হইবে। আমরা কিন্তু আমাদের শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়ের বিচারে সেইগুলি বিচার করিয়া প্রমাণ করিব—ঐ সকল ধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম নহে, হিন্দুধর্ম্ম নহে। দুরবস্থার দিকে চাহিয়া নিজের অবস্থার প্রতিকার বড় কাজ নয়। ধর্ম্মবীর্য্য আশ্রয় করিয়া ভারতে হিন্দুত্বের অভ্যুত্থান যদি সম্ভব না হয়—আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। তাই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকে উদাত্ত কণ্ঠে বলি—হিন্দুজাতি গঠন কর, হিন্দুর অভ্যুত্থান আনয়ন কর। হিন্দুধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম নহে; সম্মোহনমুক্ত মানব-চিত্ত এই ধর্ম্মেই স্বরূপলাভ করিবে। হিন্দু জাতির গতি ও উত্থান অবিরোধী ও অপ্রতিবাদী চিত্তে করিতে হইবে। কোথাও সঙ্ঘর্ষসৃষ্টির প্রয়োজন হইবে না; হিন্দুধর্ম্ম কাহারও ভাববিরোধী হইবে না। এই সনাতন শাশ্বত ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া, সত্যের জ্যোতির্ম্ময় রথে চড়িয়া জাতিসত্তা অভিযান সুরু করিয়াছে—এই জাতীয় ধর্ম্মের অনুসরণ ভারতের হিন্দু জাতিকে করিতে হইবে। বিশ্বধর্ম্ম জগন্নাথের রথচক্রে আবর্ত্তিত হইয়া বিমল ও সুন্দর বেশে পুরুষোত্তমের তীর্থ রচনা করিবে—ভারতের আর্য্যজাতির অভ্যুত্থান এই হেতু বিশ্বজগতের কল্যাণ সূচনা করে। সঙ্ঘকে আমি এই পথেই আহ্বান করি।

## সাধনার দুই এক কথা

"প্রবর্ত্তকে"র এক অনুরাগী বন্ধু জয়ন্তী বৎসরের "প্রবর্ত্তকে" হিন্দুত্বের প্রতি আমার অত্যধিক অনুরাগের অভিব্যক্তি দেখিয়া, সাধনার সঙ্কেত কিছু লিখিতেছি না বলিয়া অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আমার মনে পড়ে একদিন গাহিয়াছিলাম 'সাধন-ভজন সব অকারণ শুধু জীবন খোয়ান।' অবশ্য সাধন যদি ভাগ্যে থাকে, কাজ হয়; নতুবা বিড়ম্বনা মাত্র। সাধন জীবের নয়, ঈশ্বরের। জীব আশ্রয় মাত্র। সাধন করিতেছি বলিয়া যে অনুষ্ঠানাদি ব্যাপার, তাহা অহঙ্কৃত; এই জন্য সাধনহীন জনগণের মধ্যে বরং সাধুতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধনাভিমানীদের সাধনার গর্ব্বই দেখি, এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে রাগদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার বীভৎস ব্যবহার দেখিলে, চমৎকৃত হইতে হয়।

ধনের অহঙ্কার, রূপের অহঙ্কার, শক্তির অহঙ্কার মানুষকে অমানুষ করে; সাধনার অহঙ্কারে ততোধিক মনুষ্যত্ব হইতে লোকে বঞ্চিত হয়। ধনাদির মোহ মানুষকে যেমন আত্মার মালিন্য দেখিতে দেয় না, সাধনার অহঙ্কারও তদ্রূপ নিজের সঙ্কীর্ণতা ও হীনতা সাধককে বুঝিতে দেয় না। জগতে সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দুর্মতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার কারণ ইহাই।

সাধন করে জীব নয়, ঈশ্বর—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জীব অহং-আশ্রিত অজ্ঞতা। ঈশ্বর অহং-এর উর্দ্ধে ভর্ত্তারূপে বিরাজ করেন। ঈশ্বর দ্রষ্টা, জীবের কর্ম্ম তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে কেবল দেখিয়া থাকেন এবং নির্দ্বন্দ্বে কর্ম্মের ফল ভোগ করেন। এমন অনেক দার্শনিক তত্ত্ব পাতার পর পাতা লেখা যায়; লিখিয়াছিও অনেক; আর তাহাতে প্রবৃত্তি নাই। সম্পূর্ণ নিজস্বরূপে যাহা বুঝিয়াছি, তাহা হইতেছে—সাধন জীবমাত্রেই করিতেছে; অতএব উহা কিছু নূতন [illegible] নহে। তবে সাধনার ক্রম কর্ম্মসূত্রে যাহার যেরূপ অনুভূতি হয়, সাধন-রূপে তাহা তদ্রূপ তাহার নিকট অনুভূত হয়। কেহ স্বভাবের অনুগত হইয়াই আহারনিদ্রারত জীবনসাধনে দিনের পর দিন গণিয়া চলে; কেহ বা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া দিব্য জীবনের অধিকারী হয়। সাধন যে চায়, সেও পায় এবং না চাহিলেও ইহা অপ্রাপ্য নহে—কেননা, জীবনই যে সাধনা। তবে এই পাওয়ার একটু ব্যাখ্যা আছে। ইহা দ্রব্যাদি-লাভের ন্যায় কাহারও দেওয়া কিছু নহে। যাহা নিজস্ব, তাহার দিকেই সচেতন হওয়া, যাহা চিরদিনের তাহার দিকে হঠাৎ দৃষ্টি-পড়াই পাওয়ার অর্থ বুঝিতে হইবে।

কিন্তু নিজ হইতে ঠিক এইরূপ পাওয়া যার ভাগ্যে ঘটে না—এই পাওয়া অন্যের নিকট হইতে তাহাকে লইতে হয়। যাঁহার দ্বারা এই প্রাপ্তি ঘটে, তাঁহাকে আমরা গুরু বলি। তিনি যাহা দেন, তাহা নিজেরই বস্তু; যদি তাহা না হইত, এই দানের কোন মূল্যই থাকিত না। এক জনের নিকট হইতে অন্য জনের লওয়া চিরন্তন হয় না। যাহা লওয়া যায়, তাহা গুণান্বিত করিয়া একদিন ফিরাইয়া দিতে হয়। দাতার দাবী হইলে, তাহা ফিরাইয়া দিতে হয়। সাধন-ধন এইরূপ দান-প্রতিদানের বস্তু নয়। লেন-দেনের কথা আর্য্যধর্ম্মে নাই, আর্য্যেতর ধর্ম্মে থাকিতে পারে। ভারতের ঋষি নিজেকে জানার দীক্ষাই দিয়াছেন। যাহা নিজের বস্তু নহে, তাহা দেওয়ার অহমিকা তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই।

কর্ম্মসূত্রে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। শিক্ষা এই প্রস্তুতির সহায়। শিক্ষা অধিকারীকেই প্রস্তুত করে, অনধিকারীর নিকট শিক্ষা কার্য্যকারী হয় না। অধিকারী দীক্ষা পায়। দীক্ষা দেন গুরু। দীক্ষা সাধকের সংবিৎ জাগাইয়া রাখার অভাবনীয় কৌশল। গুরুর অপার্থিব সম্বন্ধের যোগাযোগে অন্তরের অন্ধকার দূর হয়। শাশ্বতকে ফিরিয়া পাওয়ার মন্ত্রই দীক্ষার উদ্দেশ্য।

দীক্ষায় একের সঙ্গে অন্যের চিরসম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই সম্বন্ধ স্বার্থসম্বন্ধ নহে। আত্মচৈতন্য জাগ্রত রাখা ও চৈতন্যমূর্ত্তির সহিত একাত্ম হওয়ার ইহা অনির্ব্বচনীয় দিব্যনীতি। গুরু ও শিষ্য যেখানে একাত্ম হইয়া যায়, সেইখানেই চৈতন্যতত্ত্বের অমৃতসম্বন্ধ-সৃষ্টি। এই সম্বন্ধের রসায়ণেই সাধক গড়িতে পারে জীবনধর্ম্মের অপূর্ব্ব মধুচক্র। জাগ্রত চৈতন্যযুক্ত মানুষের সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, এমন কি কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সবই অনিন্দ্য ও দিব্য হয়। হিন্দুধর্ম্ম-সাধনার ইহাই লক্ষ্য। ইহা ব্যতীত সাধনার পরিণামে যেরূপ মূর্ত্তিপ্রকাশ হউক না কেন, আর্য্যধর্ম্মে উহা মানুষের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ঈশ্বর ভোক্তা; তিনি অমৃতভুক্। চৈতন্যই অমৃত। ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠ জীবনের জন্য দীক্ষায় গুরুর ভজনপ্রবৃত্তি জাগে। কারণ গুরুমুখী হইয়া যত থাকা যায়, চন্দ্রোদয়ে স্ফীতবক্ষ সমুদ্রের ন্যায় তত চিত্ত স্বরূপচৈতন্যে উদ্বুদ্ধ হয়। মন্ত্রাশ্রয়ীর অজপাসাধন আর কিছু নহে, নিয়ত শ্রীগুরু-স্মরণের অমোঘ উপায়। গুরু দেহধারী। দেহের ভেদ আছে। তিনি কখনও সন্নিধানে, কখনও অতি দূরে। কিন্তু মন্ত্র নিত্যসঙ্গী। মন্ত্রাশ্রয়ী যে, সে গুরুর নিত্য আশ্রয় পাইয়াছে। তারপর, সাধনার কথা।

সাধনা চৈতন্যের। চৈতন্য প্রত্যক্ষ বা অনুমান-প্রমাণগম্য নহে। চৈতন্য এক মহাভাব। ভাবের অনুভূতি হয়, প্রত্যক্ষাদি হয় না। গুরু মন্ত্রাশ্রয়ের ভিতর দিয়া সাধককে ভাবাশ্রয়ী করেন। এই ভাব আত্মভাব—আত্ম-চৈতন্যের ভাব। ভাবে যে থাকে, সে নশ্বর গুরুমূর্ত্তি অতিক্রম করিয়া, গুরুভাবে অবগাহিত হয়। এই ভাব পরমের ভাব। ভাবময়ী শ্রীরাধা বলিয়া বৈষ্ণবেরা ভাবাশ্রয়ী হয়। আবার তান্ত্রিকেরা মহামায়ার মহাভাবে বিভোর হইয়া বলে "আমায় দে মা মাতাল করে।" ব্রহ্মভাবের কথা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। ভাব যে পায়, সে ব্রহ্মবিৎ হয়। সে ব্রহ্মকেই লাভ করে। ভাবই সাধনার শেষ কথা নহে। ভাবের সাধনে সাধকের দেহ-প্রাণ-মন আশ্রয় করিয়া শক্তিপ্রকাশ হয়। শক্তির পুংস্ত্ব, স্ত্রীত্ব জীবপ্রকৃতির ছন্দে দ্বিবিধ মূর্ত্তি ধরে। ক্লীবত্ব আর্য্যধর্ম্ম নহে। এইজন্য সে কথা বলিলাম না। এই শক্তির সহিত সাধক যখন সংযুক্তি পায়, তখনই জীবের যে পরমসাধ্য ঈশ্বরত্ব, তাহার লাভ হইয়া থাকে। গুরুতে সম্যক্ আশ্রয় ভাবাশ্রয়ী হওয়ার অধিকার দেয়। ভাবাশ্রয় সিদ্ধ হইলে, এই যে শক্তির আশ্রয়, কেহ ইহাকে রসরূপেও বর্ণনা করে। ইহাই সাধকের সিদ্ধির কারণ হয়। শক্তি বা রসাশ্রয়ে সাধকের জীবসংস্কার সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় জগৎ যদি মায়া হয়, তবে সাধক মায়াতীত হইয়া তুরীয় চৈতন্যে লয় পায়। আর মায়া যদি ঈশ্বরশক্তি হয়, তবে সাধক ঈশ্বরপ্রেমের তরঙ্গে সৃষ্টির মধ্যেই জীবন্মুক্ত হইয়া ঈশ্বরমহিমা প্রকাশ করে মর্ত্ত্যে এবং স্বর্গাদি চতুর্দ্দশ ভুবনে।

সাধনার এই সামান্য সঙ্কেতে কোন সাধকের চিত্ত যদি উদ্বুদ্ধ হয়, সাধু প্রশ্ন পাইলে আরও কিছু লিখিব।

## জাতির সত্য—তার নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

ভয় খাইলে চলিবে না। যাহা সত্য, তাহা স্বীকার করিয়া মাথা তুলিতে হইবে। সত্য কি? ইহার বিচার করিতে গিয়া প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার-স্বাতন্ত্র্যে সত্যও ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ঔদার্য্য দেখাইলে, বস্তুতঃ আমাদের শ্রেয়ঃ হইবে না। এইরূপ হইলে অন্যান্য জাতির কথা ছাড়িয়া দিই, হিন্দুজাতির সমস্ত অতীতটাকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে হয়, অস্বীকার করিতে হয়। জাতি বাঁচে ব্যক্তিগত জীবনযুদ্ধে নহে। জাতীয় জীবন রক্ষা করিতে না পারিলে, ব্যক্তি ও জাতি দুইই বাঁচে না। ধন-জন কিছুই নিজস্ব নহে। উহা জাতিরই সম্পদ্। সত্যও জাতির সম্পদ্, ব্যক্তির নয়। জাতির সত্য-রক্ষা হইলে, ব্যক্তি সত্যের শক্তি অর্জ্জন করে। সত্য কোন খ্যাতনামা ব্যক্তির ব্যাখ্যার প্রতীক্ষা রাখে না। কোন খ্যাতনামা পুরুষের বিচারাধীন তাহা নয়। অন্যথা যুগে যুগে তখনই জাতি ধ্বংসের পথে চলে। ... দুর্নীতির পথেই আমরা যাত্রা করিয়াছি মনে হয়।

যদি আমরা জাতিহিসাবে বাঁচিতে চাই, তবে এই মুহূর্ত্ত হইতেই আমাদের স্থির করিয়া লইতে হইবে—জাতীয় সত্যের স্বরূপ কোন দিন আমাদের বিচারাধীন নহে। জাতীয় শক্তির হ্রাস বিপৎকালে হয় না। জাতি শক্তিহীন হয়, যখন সে আত্মপ্রতিষ্ঠিত সত্যকে অস্বীকার করে। এই অস্বীকৃতি আসে জাতির মধ্য হইতেই। যখন কোন ব্যক্তি জাতির হিতসাধন করিতেছে বলিয়া খ্যাতি লাভ করে, সেই ব্যক্তির প্রতি জাতির অধিকাংশ লোকে শ্রদ্ধাশীল হয়, তখন সেই ব্যক্তি যদি এমন সত্য প্রকাশ করে, যাহা জাতির সত্য নহে অথচ বহু লোক এই ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাহার অনুসরণ করে, জাতির অধঃপতন আসিতে আর বিলম্ব হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে উত্তেজনার যুগ শেষ হইলে, দেখা যায়—লোকটি দেশ ও জাতির দরদের দাবী লইয়া জাতি-ভিত্তি ধ্বংস করার জন্যই ছদ্মবেশী শত্রুরূপে জন্মিয়াছিল। আমরা ইহার এক পৌরাণিক দৃষ্টান্ত অতি সংক্ষেপে উদাহৃত করিতেছি।

পূর্ব্বকালে শতধনু নামে পৃথিবীতে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। শৈব্যা নামে তাঁহার এক পত্নী অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। এই রাজা বেদোক্ত আচার যথারীতি পালন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যে হোম, জপ, দান, উপবাস, পূজা ও আরাধনার মন্ত্র নিয়ত পরিশ্রুত হইত। বেদধর্ম্মে নিখিল জাতি শ্রী ও উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এই জাতিকে হীনবীর্য্য করার জন্য দিগম্বর, মুণ্ডিতমস্তক, ত্যাগের প্রদীপ্ত মূর্ত্তি এক সন্ন্যাসী আসিয়া বলিলেন, "এই সকল কর্ম্মে তোমরা আত্মঘাতী হইতেছ কেন? তোমাদের কি বিচারবুদ্ধি নাই? কি কর্ম্ম করিলে ম হয়, তাহার বৈজ্ঞানিক তথ্য অবগত হও। এই যে হোম করিতেছ, ইহা ঘৃতের অপচয় মাত্র। অপ্রত্যক্ষ দেবতাদের কি বসনা আছে, যে তাঁহারা ইহা ভোজন করিবে?" এইরূপ আপাতযুক্তিপূর্ণ বাণীদ্বারা এবং বক্তার ব্যক্তিত্বপ্রভাবে জাতীয় আচার সম্বন্ধে প্রজাদের মনে সংশয়সৃষ্টি হইয়াছিল এবং কালে সমস্ত জাতির সহিত সেই রাজার আধিপত্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। জাতীয় আচারভ্রষ্ট হওয়ায়, সে রাজ্যও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আমাদের এই হেতু কোন এক ব্য [illegible] সত্য সর্ব্বদা অস্বীকার করিয়া, জাতির সত্যে আস্থাবান্ হইতে হইবে। মহাপুরুষ যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আমরা প্রকাশ করিব। কিন্তু যে ধর্ম্ম ভারতের আর্য্যজাতি উত্তরাধিকারসূত্রে আমাদের দিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কোন প্রকারেই বিচ্যুত না হই, সে দিকে লক্ষ্য রাখিব। জাতিকে শতধা বিচ্ছিন্ন করার জন্য বহু দুষ্টমতি জাতির হিতার্থে আত্মনিয়োগ করিয়া, প্রকৃতি-পরতন্ত্র হইয়া দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করে। যুগে যুগে আমাদের ইহাই ঘটিয়াছে। কর্ম্ম ও আচার শ্রুতিবিরোধী হইলেই, তাহা আমরা বর্জ্জন করিব। অসংখ্য ব্যক্তি মহাপুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রত্যেকের স্বকপোলকল্পিত মতবাদ যদি প্রচারিত হয়, জাতি ছন্নছাড়া হইবে, তাহা কিছু বিচিত্র কথা নহে। আমরা যদি জাতিরূপে বাঁচিতে চাই, আমাদের একটি জাতিগত মতবাদ নিষ্ঠাসহকারে আশ্রয় করিতে হইবে। আমরা যদি হিন্দুজাতি বলিয়া পরিচয় দিই, তবে আমাদের বেদ অবশ্যস্বীকার্য্য। বেদের অনুগত মতবাদেই হইবে আমাদের পরম প্রতিষ্ঠা। ভারতের যে বিপুল জাতি এখনও বেদপরায়ণ হইয়া আত্মবৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতেছে, তাহার মূলে অল্পকালস্থায়ী সত্যের বীর্য্য আছে, এমন দুর্ব্বুদ্ধি কাহারও হইবে না। কত জাতি উঠিল, পড়িল—কত জাতির কৃষ্টি ও সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল—বিকৃত মূর্ত্তি ধরিল; কিন্তু ভারতের আর্য্যজাতির সুপ্রাচীন সংস্কৃতি আজও বিচ্ছিন্ন হয় নাই। ইহার অন্তর্নিহিত সত্য বীর্য্যই যে ইহার কারণ, তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলিবে। যে জাতি আত্মসংস্কৃতি বাদ দিয়া টিকিয়া থাকে, সে জাতির মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে হয়। দেশ লইয়া তবুও যে তার অস্তিত্ব দেখা যায়, সে তাহার প্রেতমূর্ত্তি। ভারতের দুষ্কৃতি এতখানি হয় নাই। যে সত্য এ জাতিকে দীর্ঘায়ুঃ করিয়া ধৃতি দিয়াছে, আত্মরক্ষণের শক্তি দিয়াছে—আমরা সে সত্য বর্জ্জন করিব। আমাদের অবস্থান্তর হইয়াছে; কিন্তু আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আজিও লোপ পায় নাই। তাহাতেই জাতীয় সংস্কৃতির অমর বীর্য্য কিরূপ অমোঘ, তাহার পরিচয় পাই।

জাতির সংস্কৃতিরূপ অমৃত বাহিরের শত্রু অপহরণ করিতে পারে না। এমন হইলে, আমরা বহু পূর্ব্বে গতায়ুঃ হইতাম।

জাতি নিজের পায়ে কুঠার মারিয়া মরে, আত্মঘাতী হয়। এইজন্য ভয় নিজেদের মধ্যেই। আমরা আত্মকৃষ্টি হারাইয়া এই যে এতটা দুর্ব্বল হইয়াছি—তাহার কারণ যে নিজেরাই, অতীতের ইতিহাস তাহার প্রমাণ। ভারতের বৈদিক সভ্যতা যে দিন বিশ্বব্যাপী হওয়ার পথে, ঠিক সেই সময়েই ভারতের ধর্ম্মবিপ্লব শিরোত্তোলন করে। অবৈদিক ধর্ম্ম অনার্য্যজাতি প্রচার করে নাই—আর্য্যজাতিই ইহার জন্য দায়ী। বৈদিক আর্য্যজাতি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, শ্রুতির পর স্মৃতির অনুশাসনে জাতিকে সংহতিবদ্ধ করিতে প্রয়াস করিতেছিলেন, কিন্তু ভারতজাত জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়েই এক অখণ্ড আর্য্য চিন্তাধারা তখন বহুধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যুক্তিবিজ্ঞানসঙ্গত বৈদিক ধর্ম্ম অধিকতর ভাবে ব্যবহারোপযোগী করার জন্য নিরীশ্বর সাংখ্য ও যোগদর্শনপ্রবর্ত্তক ঋষি কপিল ও পতঞ্জলি আবির্ভূত হইয়া বেদকে ক্ষুন্ন করেন নাই, কিন্তু আর্য্যজাতির মধ্য হইতে চার্ব্বাক দলের অভ্যুত্থানে ভারতের বৈদিক মতবাদ ক্ষুন্ন হয়। ইহার পর জৈন ও বৌদ্ধ মতবাদে বিশাল আর্য্যজাতির পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকে। তার পর কেবল জৈন, বৌদ্ধ নহে, জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণিক মতবাদে আমাদের স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, তদুপরি আবার ভারতেরই হিতসাধনের নামে জাতির অসংখ্য শ্রদ্ধাভাজন পুরুষ স্ব-স্ব মতপ্রচারে জাতিকে বিচলিতবুদ্ধি করিয়া, প্রাচীন সংস্কৃতির মূল শিথিল করিয়া দিয়াছেন। হিন্দুকে যদি আজ জাতিরূপে বাঁচিতে হয়, তবে তাহাকে পুনর্বায় বেদবিশ্বাসী হইতে হইবে। যে প্রাচীন সংস্কৃতি আজিও আমাদের রক্ষা করিতেছে, তাহারই অনুবর্ত্তী হইতে হইবে। এই জন্য জাতিকে আবার শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তিপ্রধান ন্যায়, সাংখ্য, বৈশেষিক, যোগের প্রবল প্রচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ভারতের আর্য্যজাতির অভ্যুত্থান আনিতে হইলে, জ্ঞানপ্রচারের প্রয়োজন আছে। জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই দুইয়ের সনাতন নীতি বেদেই আছে। শ্রুতিপ্রধান পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসার প্রচার হইলে, ভারতীয় জ্ঞান ও কর্ম্মের স্বরূপ আমরা লাভ করিব এবং যুগোপযোগী ইহাদের ব্যবহার-গুণে আমাদের জাতীয় সত্তাকে নিরাময় করিতে পারিব। ভারতের শাস্ত্র উপেক্ষা করিয়া ব্যক্তি বিশেষের মনঃকল্পিত ধর্ম্মে আর জাতির আস্থা কো[...] মতে শ্রেয়ঃ নহে। আমরা এই হেতু আমাদের ম[...] কর্ম্মস্রোতে বা সংস্কারদোষে কোন মহাপুরুষে[র] প্রেরণায় যে সত্যই আবিষ্কৃত হউক, তাহা ভারতের শ্রুতি[...] নিষ্ঠ ও যুক্তিপ্রধান দর্শনাদি গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া গ্রহণ করিব। ভারতের জাতীয়তা আজও রক্ষা ক[...] ভারত-সভ্যতা—তাহাই বৈদিক ধর্ম্ম। দীর্ঘ দিনে[...] পরাধীনতায় আমাদের জাতীয়তা টিকিয়া আছে এ[...] অপৌরুষেয় বেদকে আশ্রয় করিয়া। যুক্তি ও ন্যায়, যোগ[...] সাংখ্য, স্মৃতি ও পুরাণ, এই অমৃতময় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি[...] আস্বাদ দেয়। কেন্দ্রে জাতির অভ্যুত্থানস্রো[ত] অনাবিল রাখার জন্য সর্ব্বত্র এই শিক্ষার ধারা[য়] আমাদের রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতে[র] কৃষ্টিরক্ষার পক্ষে কোন বিশেষ মানুষের প্রয়োজন আম[রা] স্বীকার করি নাই। আমাদের শাস্ত্রই এ জাতির শা[...] আশ্রয়। মানুষ এই শাস্ত্র মাথা পাতিয়া ধরিয়াছে, ধ[...] হইয়াছে। যাঁহারা বলেন—শাস্ত্র দেশের অধঃপতন আনিয়াছে[...] তাঁহারা পাষণ্ড ধর্ম্মী, জাতির শত্রু। শাস্ত্র আমাদের র[ক্ষা] করিয়াছে, শাস্ত্রই আমাদের অভ্যুত্থান আনিবে। ভার[তের] জাতিকে বাঁচাইবার জন্য এক অশরীরিণী ইচ্ছাশ[ক্তি] আজিও সমুদ্যতা—তাঁহাকে আমরা রূপ দিতে চাই[।] আত্মবৈশিষ্ট্যের মূলে যে অমৃত সংস্থিত, তাহাই আমাদে[র] আহরণ করিতে হইবে। বাহিরের দৌর্ব্বল্য দেখি[য়া] বিচারবুদ্ধির হিসাবের অঙ্কে শাস্ত্র যেন আর অবজ্ঞা[ত] না হয়। জাতির অভ্যুত্থানকামী সহস্র নারী-পুরু[ষ] কি বাংলায় জন্মেন নাই, যাঁহারা আমাদের কথার ম[র্ম্ম] উপলব্ধিগম্য করিয়া এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন[?] ঘর সংসার করিতে করিতে এই বিপুল কর্ম্ম সম্ভব নয়[।] মেধাবী সৃষ্টিশক্তিধর বাংলার তরুণ, তোমাদের আত্মদানে[র] অমৃতপ্রবাহেই ভারতের জাতীয়তা রূপান্বিত হইবে[।] সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভয় নাই; বাংলার হাজার সন্তান য[দি] সংহতিবদ্ধভাবে জাতির এই মৌলিক শিক্ষায় ও সাধনা[য়] ত্যাগবৈরাগ্যের মূর্ত্তি ধরিয়া আবির্ভূত হয়, দেশের ম[ঙ্গল] আসন্ন মনে করিতে হইবে।

## শ্রম-ধন-সমস্যা

শ্রমিকেরা ধনিকের বা সৃষ্টিশক্তিধর পুরুষের অথবা এইরূপ কোন সংহতির আশ্রয়ে জীবিকা উপার্জ্জনের সুবিধা পায়, কিন্তু ধনগর্ব্বে উপরোক্ত শ্রেণীর মানুষেরা শ্রমিকের দুঃখে দৃষ্টিপাত করেন না। এইরূপ সত্য-মিথ্যা অভিযোগ আজ আমাদের কর্ণ বধির করে, কিন্তু তাহাতে প্রতিকারের পথ আবিষ্কৃত হয় না। পাশ্চাত্যের সমাজ-তন্ত্রবাদের উপর এইরূপ অভিযোগ ও বিক্ষোভমূলক প্রচেষ্টা নানা আকারে সর্ব্ব জগতে দেখা দিয়াছে। শ্রমিকের পেটের খোরাক ধনিকেরাই দিয়া থাকেন। ইহারা ভিন্ন শ্রমিকদের প্রতিভূ বলিয়া যাঁহারা দরদ প্রকাশ করেন, দরিদ্রের প্রতি তাঁহাদের সহৃদয়তার প্রশংসা আমরা করিব। কিন্তু সকল সময় সুপথ যে তাঁহারা আশ্রয় করেন, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। ধনিকেরা শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথায় যদি কর্ণপাত করিতেন, মধ্যবর্ত্তী এই সকল দরদীদের আর প্রয়োজন হইত না। কেননা শ্রমিক-সমিতিও শ্রমিকদের সংহতি নহে; শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি-পরায়ণ, সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কশূন্য, শিক্ষিত বুদ্ধিমান্ লোকদের দ্বারাই এই সকল সমিতি সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ধনিকদের অত্যাচার নিবারণ করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। শ্রমিকদের প্রতি অবিচার বা অসদ্ব্যবহার যদি কিছু হয়, তাহার নিরাকরণ শ্রমিক ও ধনিকের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়া যদি হইত, তবে বিষয়টা শুধু সুখের হইত না, উভয়ের পক্ষেই শ্রেয়স্কর হইত। কিন্তু তাহা হয় না বলিয়াই সহৃদয় একশ্রেণীর দেশহিতৈষী শ্রমিক-নেতা এই উভয় দলের মধ্যপথে দাঁড়াইয়া, এইরূপ সমস্যার সমাধানে যত্নবান হয়েন। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে শ্রমিক ও ধনিকদের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষার আন্তরিকতা আছে উক্ত কারণে তাহাও অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে।

শ্রমিকের ধর্ম্মঘট ধনিকের সহিত একটা সংঘর্ষের ফল। সংঘর্ষের কারণ সব সময়ে যে যুক্তিযুক্ত হয় সে বিষয়ে সত্য কথা বলা বড় সহজ নহে। অর্থ-প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রমিকদের কেমন এক প্রকার বিরুদ্ধভাব ক্রমে যেন স্বভাবে পরিণত হইতেছে। কেবল উদরান্নের দায়েই যেন তাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে শ্রম দিয়া যায়। এই অবস্থায় দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে কেবল যে মহাজনদের একদেশ-দর্শিতায় শ্রমিকদের মনে বিরুদ্ধভাব প্রশ্রয় পায়, তাহা নহে পরন্তু শ্রমিক-সমিতির উপর শ্রমিকেরা অত্যধিক ভরসাশীল হওয়ায়, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের মাত্রা বাড়িয়া উঠিতেছে। ইহাতে ধনিকদের অপেক্ষা শ্রমিকদের দুর্দ্দশা ক্রমেই বাড়িতেছে। ধনসাম্যবাদের ভুয়া আদর্শ অস্ত্রস্বরূপ হইয়া শ্রমিকদের এক প্রকার হত্যা করিতেছে। প্রভু-ভৃত্যের মধ্যেও যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, সাম্যবাদী ভারত তাহা বুঝিয়াছিল। সে আদর্শ যত ম্লান হয়, অকারণ উপদ্রবে ততই জাতির শক্তিহ্রাস হইতেছে।

'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ' বহু বেকার লোকের অন্ন সংস্থানের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রের পর কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া চলিয়াছে। এই কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিতে হইলে, মূলধন-সঞ্চয়ের শক্তি চাই। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ ধনপরায়ণ নহে, ত্যাগ ও তপস্যাই তাহাদের মূলধন। এই ক্ষেত্রে স্রষ্টা যাহারা, তাহাদের চরিত্রবলের পরিচয় সুধীসমাজকে নূতন করিয়া দিতে হইবে না। সৃষ্টিক্ষেত্রে শ্রম দেয় যাহারা, তাহাদের সহিত ইহাদের এক পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না। তাহা বাস্তবও নয়। এই অবাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করিতে চাহিলে, উহা লাভের চেয়ে ক্ষতিই অধিক করিবে। অতএব কর্ম্মক্ষেত্রে সঙ্ঘ-সভ্যদের সহিত শ্রমিকের সম্পর্ক তুল্য হইতে পারে না। তবে 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের' ধনগর্ব্ব না থাকায়, শ্রমিকদের প্রতি তাহাদের আচরণ অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্র হইতে যে উন্নত ধরণের হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। শ্রমিকদের এই জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। শ্রমিক-সমিতি একদেশদর্শী হওয়ায় ও তাহাদের আদর্শবাদে শ্রমিকেরা সঙ্ঘের কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রের পার্থক্য বুঝিতে পারে না। তবে সুখের কথা, শ্রমিক সংহতির কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের এই আদর্শের প্রতি অনাস্থাবান নহে। কিন্তু শ্রমিকেরা যতদিন না সঙ্ঘের উদ্দেশ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করে অর্থাৎ যেখানে শ্রমিকদের জীবন-মরণ সম্পর্ক নিহিত, সেই ক্ষেত্রের সহিত তাহাদের অন্তরের দরদ মিশ্রিত না হয়, ততদিন শ্রমশিল্পের প্রসারণে যত বড় উদ্দেশ্য লইয়াই ধন-ব্যবহারের নিপুণতা আমাদের

থাকুক না কেন, তাহা গতানুগতিক ধনসাম্যবাদের যাঁতায় শ্রমিকদের সহিত আমাদেরও কম-বেশী পিশিয়া মারিতে হইবে।

আমরা সম্প্রতি কোন এক শ্রমিক-সমিতির সম্পাদকের নিকট হইতে আমাদের কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের কয়েক জন কর্ম্মীর অভিযোগের কথা অবগত হই। তৎক্ষণাৎ তাহার তদন্ত করিয়া দেখা যায়, অভিযোগটী একেবারেই ভিত্তি-হীন। কিন্তু অভিযোগ যে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছে, এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। অতঃপর আমাদের জিজ্ঞাস্য—শ্রমিক-সংহতির কর্ত্তৃপক্ষগণ শ্রমিকদের অভিযোগ শুনিলেই তার প্রতিকারের জন্য যেমন উদ্যত হন, তেমনি মিথ্যা অভিযোগকারীর প্রতি তাঁহাদের দণ্ড-বিধানের কি ব্যবস্থা আছে? যাঁহারা কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন, তাঁহারা নিজেদের স্বভাবতঃ ধনিক বলিয়া শ্রমিক হইতে ভিন্ন হন। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ নিজেদের কিন্তু শ্রমিকই মনে করে। কেননা, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য শ্রমই তাহাদের মূলধন। আমরা এই জন্য, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠানসমূহের জ্ঞানী, মূর্খ, দৈহিক শ্রম অথবা বুদ্ধির শ্রম দেন যাঁহারা, সকলকে লইয়া এক কর্ম্মি-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়াছি। শ্রমিক-সংহতির কর্ত্তৃপক্ষগণ এ কথা জানিয়া রাখিলে আমরা অতিশয় সুখী হইব। কেননা, শ্রমিকের সহিত এখনও তাঁহাদেরই সম্বন্ধ সমধিক। শ্রমিক ও কর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতৃবর্গের বাহিরে উভয়ের সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য কোন শক্তি বা সংহতি উভয় পক্ষের দিক না দেখিয়া চলায় কি প্রতিষ্ঠান, কি শ্রমিক কাহারও কোন কল্যাণ হয় না। বৈষম্যসৃষ্টি জাতির মধ্যে অধিক যাহাতে না হয়, এই জন্য শ্রমিকদের এবং মালিকদের সহিত শ্রমিক-সংহতির কর্ত্তৃপক্ষগণের যোগাযোগ রক্ষা শ্রেয়ঃ হইবে, মনে করি। দেশের অভ্যুত্থানের জন্য শ্রমিকই বড় শক্তি নয়—প্রতিষ্ঠান-গঠনকারীদের শক্তিও বিচার্য্য।

## যুদ্ধের সমাবর্ত্তন

যুদ্ধের এক বৎসর শেষ হইল। অনেকে আশা করিয়াছিলেন—আগষ্ট মাসের মধ্যেই যুদ্ধান্ত হইবে কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। যুদ্ধের অবস্থা জটিলতর হইয়া উঠিতেছে।

দেখিতে দেখিতে যুদ্ধ প্রায় বিশ্বব্যাপী ভীমমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ইউরোপ, আফ্রিকা, এসিয়া, কোন মহাদেশই যুদ্ধবিরত নহে; এমন কি সুদূর আমেরিকাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে। যুদ্ধ-শান্তি যদি আসন্ন না হয়, আশেপাশে থাকিয়া যে সকল দেশ আজিও কৌতূহলচিত্তে যুদ্ধ-বার্ত্তার রসাস্বাদ করিতেছে, সে সকল দেশের উপরেও রণবজ্র পতিত হইবে। হাহাকার উঠিবে বিশ্ব-মানব-কণ্ঠে।

যুদ্ধ সুরু হইয়াছে ভার্সাই চুক্তির দিন হইতে। একটী বীর জাতির পতন-কামনায় বৃটন ও ফ্রান্স যে কৌশলপূর্ণ চুক্তিপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা বিধাতার ইচ্ছায় কার্য্যকরী হইল না। বিধাতা জার্ম্মাণীকে হতবীর্য্য হইতে দিলেন না। সে আপনাকে শৃঙ্খলিত ব্যূহবদ্ধ করিয়া দাবীর পর দাবী উত্থাপন করিল। নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব লইয়া বৃটন যে সময়ে অস্ত্রশক্তি-সঞ্চয়ে উদাসীন, বিজয়ী ফ্রান্স যে সময়ে অদৃঢ় শ্লথ জীবন-রঙ্গে গা ঢালিয়া দিয়াছে, সেই সুযোগে জার্ম্মাণী অস্ত্রশস্ত্রের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ-সাধনের সঙ্গে জাতির প্রাণে যুদ্ধ-প্রবৃত্তির উগ্র মদিরা ঢালিয়া দিয়াছে। জার্ম্মাণীর দাবীর কণ্ঠ যেদিন বৃটনের কর্ণে প্রথম প্রতিধ্বনি তুলিল, বৃটনের রাজমন্ত্রী জার্ম্মাণীর শৌর্য্য বীর্য্যের পরিমাপ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন, জার্ম্মাণীর সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া উভয় জাতির আদর্শ-সাম্য স্থির করিয়া ইউরোপে বীর জাতিসঙ্ঘ রচনা করিতে। জার্ম্মাণীরও বৃটেনকে শত্রু করার ইচ্ছা ছিল না, হিটলার একথা একাধিকবার উচ্চারণ করিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপের লোকারণ্যে দুই সিংহের মধ্যে যুক্তি সম্ভব হইল না। জার্ম্মাণীর পোল্যাণ্ড অধিকার লইয়া মিত্রশক্তি আত্মসম্মান-রক্ষার দায়ে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন। জার্ম্মাণীর রাজ্যজয়স্পৃহা কেবল আত্মরক্ষার সূত্র ধরিয়া নহে। জার্ম্মাণীর অভ্যুত্থানের মূলে এক অপূর্ব্ব আদর্শবাদ আছে। আর্য্যধর্ম্মের নূতন ভাষ্য রচনা করিয়া হিটলার উহা কার্য্যে

পরিণত করার জন্ত উদ্বুদ্ধ। সমগ্র ইউরোপের উপর পূর্ণাধিপত্য না হইলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; তাই তিনি ধীরে ধীরে নরওয়ে হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত স্বাধিকারে আনিয়াছেন। জার্ম্মাণীর অভ্যুত্থানে ইউরোপে যে মহা-সঙ্ঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি বৃটেন। বৃটেন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। রাজমন্ত্রী চার্চ্চিল হইতে ভারতসচিব মিঃ আমেরি এবং লর্ড হ্যালিফাক্স পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে ইহা ঘোষণা করিতেছেন। তাঁহাদের এই সংগ্রাম খৃষ্টীয় সভ্যতার জন্য—খৃষ্টীয় জীবননীতির ভিত্তিরক্ষার জন্য—এক নব নীতির উপর পাশ্চাত্য জাতির জীবনপ্রতিষ্ঠার জন্য। হিটলারও যেমন স্পষ্টকণ্ঠে বলিতেছেন—আর্য্যজাতি বিশ্বশাসনের জন্য জন্মিয়াছে এবং জার্ম্মাণ জাতি সেই আর্য্য-ধর্ম্মের প্রতিনিধি। সমগ্র ইউরোপের উপর তার শাসনাধিকার চাই। রাজ্য-শাসন তার জন্মগত অধিকার। শ্লাভ জাতি, নিগ্রো জাতি, এসিয়াবাসী, ইহারা সব সনাতন দাসজাতি। দাসজাতি আর্য্যজাতির আশ্রয়েই সমাজ ও সংস্কৃতির সংস্কার সাধন করিব। এ আশ্রয়ের দায়িত্ব জার্ম্মাণ আর্য্যজাতিরই আছে। তদ্রূপ বৃটনও উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন ইউরোপের জাতিসঙ্ঘর স্বাধীনতারক্ষা, গণতন্ত্রের মর্য্যাদায় ইউরোপে নবতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া সভ্যতার আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত করা। জাতির রক্ত বীরধর্ম্মে যদি উদ্বুদ্ধ হয়, অতি সঙ্কট-মুহূর্ত্তেও সে জাতি আত্মধর্ম্ম গোপন করে না। বৃটনের ন্যায় জার্ম্মাণীও সুস্পষ্ট ভাষায় নিজেদের সত্য ঘোষণা করিতেছেন। বীরের সহিত বীরের সংগ্রাম! এইরূপ সংগ্রামে কোন জাতির পতন-সম্ভাবনা নাই। বরং সংগ্রামবিমুখ জাতিরই অধঃপতন হয়। বৃটেন তাই কৃতসঙ্কল্প রণজয়ে। এই সংগ্রামে যদি উভয় পক্ষের মরণ-সঙ্কল্প তুল্য হয়, জয় অথবা পরাজয় যে পক্ষেরই হউক, উভয় পক্ষেরই অক্ষয় কীর্ত্তি ইতিহাস রক্ষা করিবে, এবং মৃত্যু স্বীকার করিয়াও যদি কোন পক্ষ পরাজিত হয়, সে জাতির অমর আত্মা জাতির সমুজ্জল ভবিষ্যৎ পুনঃ ফিরাইয়া আনিবেই।

আমরা পরাজিত, মিশ্রবুদ্ধি, এক অভিশপ্ত জাতি। বৃটেনের সঙ্কটে আমরা মনে করিতেছি, এবারে আমাদের চির ঈপ্সিত স্বাধীনতার দাবী পূর্ণ করার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কিন্তু বীরজাতি দুঃসময়ের দাবী সহজে পূর্ণ করে না। জাতির গৌরব ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয়। এই জন্যই আমরা দেখি—ভারতের রাষ্ট্রমহাসভা এই সুযোগে দাবীপূরণের জন্য যে সর্ত্ত উপস্থিত করুন না—বৃটেন সবই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শক্তি-সহযোগেই বৃটনের অধিক শক্তি বর্দ্ধিত ও উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। সর্ত্তবদ্ধ হইয়া তাহার যে সহায় তাহা বাহ্যতঃ সুবিধার বিষয় মনে হইলেও, সে দাবীপূরণের বিনিময়ে যে দান তাহা বৃটনকে ভারাক্রান্তই করিবে। সুবিধা বুঝিয়া ভারতের রাষ্ট্রপ্রতিনিধিগণের স্বাধীনতার দাবী আমরা উন্নত জাতির চরিত্র মনে করি না। এই সময়ে দাবীপূরণের সুযোগ দেখিয়া স্ব-স্বার্থ চরিতার্থ করার কৌশল নিজেদের পঙ্গুত্বের পরিচয় দেয় এবং দাবী পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যাত হওয়ায়, নিজেদের অতিশয় ঘৃণ্য ও অবজ্ঞেয় হইতে হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় হয় ভারত স্বেচ্ছায় বৃটনের সহায় হইবে, নয় তাহার নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ হইবে। শক্তিহীন জাতি কোন অবস্থায় রাষ্ট্রলাভ করে না। একের দুর্দ্দিনের সুযোগ লইয়া যদিও সে রাষ্ট্রশক্তি পায়, সে-শক্তি তার রক্ষা করার সাধ্য হয় না—ঐ শক্তি অন্যের হাতেই পরিচালিত হয়। লীগ বা হিন্দু সভা হয়তো রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকার চেয়ে এইরূপ রাষ্ট্রশক্তি শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন। তাহা ছাড়া শক্তিহীন জাতি এইরূপ সময়ে কোন রাষ্ট্রকুশল জাতির সহায়তায় রাষ্ট্রপরিচালনার শিক্ষার্জ্জন করার যে সুবিধা পায়, তাহা অবজ্ঞেয় নহে। এইরূপ নীতি ভারত যদি আশ্রয় করে, পরে তার উপযুক্ততার পুরস্কার শিক্ষাদাতাদের হিসাব-মত দিতে বাধ্য করিবে। এ নীতি রাষ্ট্রশক্তি অর্জ্জন করারই রাজনীতি।

ইউরোপের রণক্ষেত্র মধ্যপূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। প্রশান্ত সাগরের উপকূলে, ভারতের প্রান্ত-পূর্ব্বে জাপানের রণদামামা ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। জার্ম্মাণ ও বৃটনের মধ্যে কোন অভাবনীয় ঘটনায় যদি শীঘ্র সন্ধি-স্থাপন না হয়, ভারত ও রণক্ষেত্রে পরিণত হইবে—ভারতের প্রধান সেনাপতিও এইরূপ উক্তি প্রকাশ

করিয়াছেন। ভারতকে রাজশক্তি রণোদ্যমে অতি দ্রুত প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছেন। ভারতের লোকবল, অর্থবল, খনিজ দ্রব্যশক্তি অতুলনীয়। রাজশক্তি স্বপ্রভাবে তাহা সংগ্রহ করিবে। এই পথে ভারতের নিশ্চেষ্টতা অথবা বাধা তাহাকে ইহা হইতে বিমুখ করিতে পারিবে না। এই সকল কথা ভাবিয়া ভারতের রাষ্ট্র-নীতির আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছে। নেতৃবর্গের এই নূতন দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করি। ভারতের কৃষ্টিগত সংঘাতও কম নহে। আত্ম-সংস্কৃতির প্রতি জাতির নিষ্ঠা তেমন দৃঢ় বলিয়া মনে হয় না। এই অবস্থায় ভারতের রাষ্ট্র-সঙ্ঘের রাজনীতিক চাল পরিবর্ত্তন করা উচিত। ইংরাজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বলিতেছে—আমরা খৃশ্চান, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অনুপ্রেরণায় ইউরোপে এক জাতিসঙ্ঘ রচনা করিয়া জগতের শান্তি রক্ষা করিব। আমরা দৈন্যপীড়িত বিকৃত কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছি—কৈ তোমরা ভারতের কথা তো বলিতেছ না? এই যাচিয়া প্রেমের দাবী অতি দুঃখেও হাসির উদ্রেক করে। আমরা রাষ্ট্রশক্তির দাবী করি—এই শক্তি লাভ করিতে হইলে আত্ম-সংস্কৃতির প্রতি যে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন, তাহা কিন্তু স্বীকার করি না—যে জাতির ইহা আছে, তাহাদের মর্ম্ম তাই অনুভূত হয় না। আমাদের যে মুক্তির দাবী, তাহা হয় প্রাচীন যুগের ক্ষীয়মাণ স্বাধীনতার সংস্কার, নয় স্বাধীন জাতির সম্পর্কে থাকিয়া অনুকরণপ্রবৃত্তির উত্তাপ। সত্য আকাঙ্ক্ষা সংস্কৃতির প্রভাবেই প্রকাশ পায়। ইউরোপের সংগ্রামে উভয় পক্ষের কেহ কম, কেহ বেশী নয়, উভয়ের মধ্যেই সংস্কৃতিগত শক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে—সমানে সমানে সংঘর্ষ তুলিয়াছে। বৃটন পোল নয়, নরওয়ে নয়, ফ্রান্সও নয়, সিংহের জাতি। যে সংস্কৃতি ও সভ্যতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ জাতি-দ্বয়ের মধ্যে সংগ্রাম, সে সংস্কৃতি ভারতের নহে। নানা সংস্কৃতির মিশ্রণে ভারত অন্ধ। সে বুঝি স্বয়ং এখনও জাতিই হয় নাই। এই অবস্থায় স্বাধীনতার কামনা দুঃস্বপ্ন ছাড়া অন্য কিছু নয়। ইহা ব্যতীত স্বাধীনতা বড় বস্তু নয়, যদি ইহার মূলে বিশেষ সংস্কৃতি না থাকে—জাতির সংস্কৃতিই বিজয়মূর্ত্তি ধরিয়া জগতে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের আজ আত্মস্থ হওয়ার দিন আসিয়াছে। অতি দুর্দ্দিনেও বৃটন যে আত্মহারা হয় নাই, তাহার কারণ—সে আত্ম-সংস্কৃতির উপর দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত। তাই দেখি—বৃটনের যৌবন-শক্তি আজিও ঈশ্বরের মন্দিরে দলে দলে উপনীত হইয়া আত্মবিশ্বাসের জয় ঘোষণা করে, আততায়ীর প্রতি ঘৃণাহীন হইয়া কুজ্ঝটিকাময় আকাশে কামানের ভীমবজ্রসমাকুল রণক্ষেত্রে স্বজাতির সংস্কৃতিরক্ষায় কর্ত্তব্যের জন্যই সংগ্রাম করে। জাতির মহিমারক্ষায় তাহারা বুকের রক্ত ঢালিয়া দেয়। অন্তরে তার কত তৃপ্তি কত উৎসাহ! তাই মরণযজ্ঞে ধূর্জ্জটীর ন্যায় এমন তাণ্ডব নৃত্য তার শোভা পায়। আর আমরা আরামকেদারা ছাড়িয়া এই সবেমাত্র জাতির জন্য লোহার গরাদা-ঘেরা রাজপ্রাসাদের অতিথিমাত্র হওয়ার সাহস পাইয়াছি। একটা জাতির সংস্কৃতি-রক্ষার জন্য কি মূল্য দিতে হয়, তাহা আজও আমরা নিরূপণ করিতে পারি নাই। আত্মশক্তির অনুশীলন নাই, রাজশক্তিও আমাদের অভ্যুত্থানের সহায় হয় নাই, আমরা আর কি করিব—নীরব প্রতীক্ষায় আমাদের পরিচিত রাজশক্তির জয়-কামনাই করিতে পারি যদি ইংরাজ রণজয়ী হয় সেদিন যেন জাতির সত্যকার দাবী, আমরা নির্ভীকভাবে ঘোষণা করিতে পারি। ইহার জন্যও আমাদের একটা প্রস্তুতি আছে। এই সময়ে বিনা সর্ত্তে জাতি যদি রাজশক্তির সহায় হইতে পারে, তাহা হইলে বৃটেনের জয়ের দিনে আমাদের দাবী একান্ত কথামাত্র হইবে না। দাবীর পশ্চাতে নৈতিক বল সঞ্চয় করায়, উহা কতকটা অমোঘ হইবে। যুদ্ধের সমাবর্ত্তন-দিনে এই সকল চিন্তাই আমাদের মস্তিষ্কপীড়া সৃষ্টি করে। ভারতবাসীকে আমরা এই দুর্দ্দিনে প্রকৃতিস্থ হইয়া সুপথ আশ্রয় করিতে বলি। আজও জিদের বশবর্ত্তী হইয়া যদি চলি, আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।

## ধর্ম্মসমন্বয়ের কথা

আমাদের "প্রবর্ত্তকে" 'রাজধর্ম্মের আদর্শ' শীর্ষক প্রবন্ধে আমি অনেক বিচারের পর লিখিয়াছি, "আমরা ধর্ম্ম-সমন্বয় স্বীকার করি না।" এই সত্যানুভূতি প্রকাশ করিতে গিয়া আমাদের প্রকৃত অবস্থাটাকে বুঝাইবার জন্য

এক ছত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা অন্যের নিকট রূঢ় মনে হইতে পারে। ভাদ্র মাসের 'উদ্বোধনে' স্বামী প্রেমঘনানন্দের যে প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে, তাহাতেই ইহা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আমি লিখিয়াছিলাম—"ধর্ম্মসমন্বয় কথাটা অর্ব্বাচীন যুগের বিকৃতমস্তিষ্কের একটা খিচুড়ী।" শব্দগুলি কটু মনে হইতে পারে, কিন্তু এই পতিত জাতির মস্তিষ্ক-বিকার আসিয়াছে বলিয়াই না, তাহার পায়ের তলা হইতে পৃথিবী সরিয়া যায়! ইহার কারণ কি ইহাই নহে যে, আমাদের স্বধর্ম্মনিষ্ঠার অভাবে আমরা বহু পরধর্ম্মের প্রভাবে পড়িয়া বিচলিতচিত্ত হইয়াছি। আমার উপরোক্ত লেখার মধ্যে কাহারও প্রতি আক্রমণ বা কোন সম্প্রদায়ের উপর কটাক্ষের ভাবও ছিল না। স্বামী প্রেমঘনানন্দের নিকট এই দিক্ দিয়া আমি সুবিচার পাইয়াছি, তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই।

সত্যই আমি ঠাকুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে লক্ষ্য করিয়া এই আলোচনা করি নাই—আলোচনাটা সাধারণ ভাবেই করিয়াছি। আমার দীর্ঘজীবনের সাধনায় ইহাই বুঝিয়াছি—ধর্ম্ম সাধনায় তথাকথিত কর্ম্ম, সাধনার লক্ষ্য ঠিক রাখিতে দেয় না। ঔদার্য্য—সিদ্ধি, সাধনা নহে—সে কথা আমি পরে বলিতেছি।

আষাঢ়ের উপরোক্ত সন্দর্ভ পড়িয়া স্বামী প্রেমঘনানন্দ ধর্ম্মসমন্বয় বলিতে আমি কি বুঝিয়াছি, এ বিষয়ে এক প্রশ্ন পত্রযোগে করিয়াছিলেন।

শ্রাবণের 'প্রবর্ত্তকে" ধর্ম্মসমন্বয়ের অর্থ-বিচার আমি করিয়াছি; পাঠকবর্গ ইহা অবগত হইয়াছেন। ভাদ্রের 'উদ্বোধনে' স্বামী প্রেমঘনানন্দ উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রথম, ধর্ম্ম-শব্দের অর্থবিচার। তাহা আমি যথারীতি করিয়াছি, এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয়। স্বামী প্রেমঘনানন্দ যে বলিয়াছেন, "এ ছাড়া ধর্ম্ম-শব্দের আরও অনেক অর্থ হয়·····প্রকৃতি প্রত্যয়ের সঙ্গতি রেখে এবং শ্রুতি-স্মৃতির অনুমোদন নিয়ে একই শব্দের বহু রকম অর্থ হয়।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "...ধর্ম্ম-শব্দের বহু অর্থের মাঝে, কোন অর্থে বা কোন্ কোন অর্থে কথাটা ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা পরিষ্কার হয় নি।" ইহার একমাত্র উত্তর আছে—ধর্ম্ম-শব্দের বহু অর্থ আছে, ইহা স্বীকার করি। জগতের যাবতীয় বস্তুই ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম-বিকৃতিতে পরিপূর্ণ। আমার কথা, ধর্ম্মের অভিধানে যত অর্থ আছে, সমন্বয়ের সহিত তাহার যখন সম্পর্কই নাই, তখন সে কথা পরিষ্কার করার আমার প্রয়োজন হয় নাই। শ্রুতি-স্মৃতিতে ধর্ম্ম-শব্দের যত অর্থই থাক, তাহার মূল কথা হইতেছে কি? হিন্দুর অবিকৃত মস্তিষ্ক ইহা উপলব্ধিগম্য করিলে, ধর্ম্ম-শব্দের সহিত সমন্বয়ের সঙ্গতি কোন মতেই অন্বেষণ করিবে না। আমি হিন্দু—আমার হিন্দুধর্ম্মে অকৃত্রিম নিষ্ঠাই সত্যপ্রাপ্তির পক্ষে অনিবার্য্য প্রয়োজন, এই বিশ্বাস আমি রাখি। আমার ধর্ম্মব্যাখ্যা ব্যক্তিগত মতবাদে ক্ষুণ্ন হইতে পারে, এইজন্য সমস্ত ব্যাখ্যাই শ্রুতির কষ্টি-পাথরে যাচাই করিয়া গ্রহণ করাও আমার ধর্ম্ম-প্রেরণা। সে দিক্ দিয়া যদি দেখি—ধর্ম্ম শব্দের অর্থনিষ্পত্তি পূর্ব্ব মীমাংসার এই একটী সূত্রেই সুনির্ণীত হইবে, তাহা হইতেছে—"চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ।"

চোদন-শব্দ প্রবর্ত্তন-শব্দের নামান্তর। চোদনা অর্থাৎ যাহাতে কার্য্যে প্রবর্ত্তনা দেয়, কর্ম্মপ্রেরণার লক্ষণ যাহাতে আছে, তদর্থই ধর্ম্ম। তাহা হইলে ধর্ম্ম-শব্দ লইয়া অধিক অগ্রসর হইতে হইবে না। বৈশেষিক দর্শনও ধর্ম্ম-শব্দের সংজ্ঞা দিয়াছেন—"যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।" যে কর্ম্মে আত্মার অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্-লাভ হয়, তাহা ধর্ম্ম। যে কর্ম্মে অভ্যুত্থান না হইয়া পতন আনে, তাহাকেই আমি ধর্ম্মবিকৃতি বলিতেছি। ধর্ম্ম সনাতন হইলেও, দেশ-কাল-প্রকৃতি-ভেদে তাহা বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। স্মৃতি এই হেতু ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয়, এমন কথাও বলিয়াছেন। ধর্ম্ম উৎপাদ্য, উহা ক্রিয়ানিষ্পাদ্য, প্রকৃতির স্বভাব-সিদ্ধ কর্ম্ম। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, তাই বৈষম্যই প্রকৃতির ধর্ম্ম। স্বামী প্রেমঘনানন্দ ধর্ম্ম-শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ যত প্রকারেরই করুন না কেন, ধর্ম্ম প্রকৃতিগত বলিয়া কোনটীর সহিত কোনটীর সমন্বয় হইতে পারে না। একজন যে প্রকারের আহার করিয়া শ্রেয়ঃ লাভ করে, অন্যের পক্ষে তাহা উপযোগী নয়। এই সামান্য ভোজনাদি ব্যাপার হইতে শাস্ত্রাদির আলোচনা, যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, সাধনভজন সবই প্রকৃতি-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধরিবে—ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি দিবে। শতগঙ্গশস্র উপর্য্যুপরি

রাখিয়া উহাতে সূচি-বিদ্ধ করিলে, এককালে সকল পত্র বিদ্ধ হইতেছে যেন মনে হয়; কিন্তু তাহা সত্য নহে। তদ্রূপ এক জনের ধর্ম্মের সহিত অন্য জনের ধর্ম্মের অনেক সাদৃশ্য থাকিলেও, প্রকৃতি-বৈষম্যে পরস্পর এমন সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকিয়া যায়, যাহা সহজে লক্ষ্যগোচর হয় না। অতএব আমি বলিয়াছি—ধর্ম্ম-সমন্বয় হয় না। এই ধর্ম্মবৈচিত্র্যের কথা স্বামীজিও অস্বীকার করেন না; কিন্তু তাঁর বিশ্বাস—এই ক্রিয়াসাধ্য, বৈচিত্র্যময় ধর্ম্মের মধ্যে সমন্বয় হয়; আর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক তাহাই বলিয়াছেন ও করিয়াছেন। তিনি সমন্বয় কথাটার অর্থবিচার করিয়াছেন, এই শব্দটির আলোচনা না করিয়া আমার রায়-প্রকাশ অবিচার বলিয়াছেন। অতঃপর সমন্বয় কথাটারই অর্থবিচার করা যাউক। স্বামীজি লিখিয়াছেন—"মিশ্রিত, সম্মিলিত অবস্থাটাকেই কি সমন্বয় বলা হয়? যেমন ডাল ও ভাতের সমন্বয় হলো খিচুড়ি।" আমি বলি—নিশ্চয় না। স্বামী প্রেমঘনানন্দ "সম্+অন্বয়=সমন্বয়; সম্+অনু+ই ধাতু কর্ত্তৃ ও ভাববাচ্যে অচ্" করিয়া ইহা ব্যাকরণশাস্ত্রানুযায়ী সিদ্ধ হয় দেখাইয়াছেন এবং অন্বয় শব্দের অর্থ অমরকোষ ও দুর্গাদাস ছাড়া রাম তর্কবাগীশের 'সম্বন্ধ' অর্থটাকেই ধর্ম্ম-সমন্বয় হওয়ার উপযোগী অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শব্দার্থ কর্ত্তৃবাচ্যে একরূপ হয়, ভাববাচ্যে অন্য প্রকার হইবে। কর্ত্তৃবাচ্যে অন্বয়-শব্দের অর্থ বংশ, কুল, আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, অবিরোধ, মিলন, সম্বন্ধ প্রভৃতি হইবে। উহা ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন হইলে, উহার অর্থ হইবে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি ও সম্যক্ তাৎপর্য্যবিষয়ত্ব। স্বামী প্রেমঘনানন্দ এই শেষোক্ত অর্থের দিকে লক্ষ্য দিলে, তাঁহার উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ পরিমাণে সিদ্ধ হইত। তাঁর নিজেরই বক্তব্য—মিশ্রণ বা সম্মিলন সমন্বয় নহে। উহা ডাল-ভাতের খিচুড়ি। তাই "আপাত-বিরোধী ধর্ম্মগুলোর মাঝে কোথায় অবিরোধ, কোথায় মিলন-স্থান, সম্যক্‌রূপে যথার্থ ভাবে তার নির্দ্ধারণ করার নামই ধর্ম্ম-সমন্বয়"—এই কথা বলিয়াই তিনি তাঁহার বক্তব্য বিশদ করিয়াছেন। স্বামী-স্ত্রীরও মিলন হয়, রাধাকৃষ্ণের মিলনের কথাও আমরা জানি। স্বামী প্রেমঘনানন্দ বলিয়াছেন—"সমন্বয় মানে একথা নয় যে, প্রত্যেকের পৃথক্ সত্তা থাকবে না। প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যসহ পৃথক্ পৃথক্ সত্তা থাকবেই......"

তিনি রাম তর্কবাগীশের অন্বয়-শব্দের অর্থ সম্বন্ধটিকেই বড় স্থান দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"ধর্ম্মের সমন্বয় কথাটা যখন আমরা ব্যবহার করি, তখন যদি বলি—'বিভিন্ন ধর্ম্মের মাঝে সম্বন্ধ সম্যক্‌রূপে নির্ণয় করা, তা'হলে ভুল হয় কি?' দেখা যাইতেছে—স্বামীজি অন্বয়-শব্দে সম্বন্ধার্থ গ্রহণ করিয়া, আপাতবিরোধী বিভিন্ন ধর্ম্মের মাঝে তাহাই সম্যক্‌রূপে নির্ণয় করা ধর্ম্ম-সমন্বয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য, ইহাই ধরিয়া লইয়াছেন। নিছক ব্যাকরণ বা ন্যায়শাস্ত্রের দৃষ্টিতে অবশ্য এখানেও গোলযোগ না থাকে, এমন নহে। কেন না, অন্বয় বলিতেই সম্বন্ধ বুঝিলে, সম্+বন্ধ্ যোগে ব্যুৎপন্ন সম্বন্ধ-শব্দের উপর সমন্বয় বুঝাইতে আর একবার সম্ উপসর্গ সংযুক্ত করিতে হয়—ইহাতে ব্যবহারদোষ ঘটে। কিন্তু এই শব্দশাস্ত্রের শুষ্ক অর্থ-বিচার আমার এখানে লক্ষ্য নহে।

অতঃপর, হারমোনিয়মের চার পাঁচটী চাবি টিপিয়া স্বর-সঙ্গতির যে দৃষ্টান্ত স্বামীজি দিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার নিজের কথাটী বোধ হয় স্পষ্টতর হইয়াছে। এই স্বর-সঙ্গতের ন্যায় প্রত্যেক ধর্ম্ম তাহার স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও মূলগত ঐক্যসূত্রের আবিষ্কারে পরস্পর অবিরোধী ও সঙ্গতিপূর্ণ হইতে পারে—আর ইহাই তাঁহার মতে ধর্ম্ম-সমন্বয়। তারপর, তর্কচ্ছলে আবার একথাও তুলিয়াছেন—"না হয় স্বীকার করলাম—ধর্ম্মের সমন্বয় হয় না। কিন্তু রামকৃষ্ণ দেব এই যে কাজটী করেছেন তাকে আমরা কি নাম দেবো? ধর্ম্মসমন্বয় করেছেন বল্লেই বা কি দোষ হয়?" অন্বয় শব্দের অর্থ বা সঙ্গতি অবিরোধ ধরিয়া তিনি আরও বলিয়াছেন রামকৃষ্ণ দেবের জীবনে শুধুই যে আমরা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মের সমন্বয় পাই তা নয়, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, বেদান্তী, গৃহী, সন্ন্যাসী, দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত সাকার, নিরাকার প্রভৃতি চির বিরোধী বিষয়গুলোর একটা সত্যিকার অবিরোধ, সঙ্গতি বা সমন্বয় পাই।"

এই প্রসঙ্গে তিনি আমার এই কথাও উদ্ধৃত করিয়াছেন "তাঁর (ঠাকুরের) নিজের সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ কথা 'যত মত, তত পথ'। মত-বৈচিত্র্যে পথ-বৈচিত্র্যের কথা এখানে সুস্পষ্ট। তিনি হিন্দুর নানা শাখাধর্ম্মে, খৃষ্টের সাধনে, গোবিন্দ সুফীর ইসলাম দীক্ষায় মত ও পথের সমন্বয় করেন নাই; ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথ পৌঁছিয়াছে সেই নিরতিশয় ব্রহ্মে, এই কথাই প্রমাণ করিয়াছেন।" ইহার পরই স্বামীজি বলিতেছেন—"রামকৃষ্ণ দেবের এই কাজটীকেই বলা হয় তাঁর ধর্ম্মসমন্বয়।" এইটুকুই বলিলে আমার আর উত্তর ছিল না। কিন্তু তাহার পর তিনি বলিতেছেন "আমি মনে করি এইটাই সত্যিকার সমন্বয়।"

শব্দার্থ লইয়া তিনিও নিশ্চয় তৃপ্তি পান নাই। আমিও এই বিষয় লইয়া আলোচনা করা সুখের মনে করিতেছি না। ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলীর আদর্শবাদ লইয়া আলোচনা করায় আমার কুণ্ঠা আছে। কেন আছে, তাহা স্বামীজি অবগত আছেন; কিন্তু সত্যের দাবী অগ্রাহ্য করা যায় না।

আমার কথা এখন থাক। ঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে

সমন্বয়-শব্দটী আশ্রয় করিয়া স্বামীজি ধর্ম্ম-সমন্বয় প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। ধর্ম্ম অথবা সমন্বয়-শব্দের ব্যবহারিক অর্থ এইখানেই নাকচ হইতে পারে। বিশ্বাস ও ভক্তির ক্ষেত্রে মাথা নত কাহার না হয়? কিন্তু ঠাকুরের উক্তির মধ্যেও ধর্ম্ম-সমন্বয় হয়, ইহা প্রমাণিত হয় না। প্রথম কথা, স্বামীজির উদ্ধৃত অংশ হইতেই আমার কথার সারবত্তা স্বীকৃত হইবে। ঠাকুরের উপদেশ "আমার সব ধর্ম একবার করে' নিতে হয়েছিল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, এ সব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলুম সেই এক ঈশ্বর। তাঁর কাছেই সকলে আসছে ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।"

ইহাতে প্রকৃতি-ভেদে ধর্ম্ম-ভেদ, এই কথাই প্রমাণিত হয়। স্বামীজিও স্বীকার করেন—ধর্ম ভেদ থাকিবে। কিন্তু প্রত্যেকের মাঝে "মূলগত ঐক্য-সূত্রের আবিষ্কারই সমন্বয়।" এ কথা কি ঠাকুর বলিয়াছেন? "ঈশ্বরকে কেউ বলে গড, কেউ বলে আল্লা·····যেমন পুকুরে জল আছে, এক ঘাটের লোক বলছে জল, আর এক ঘাটের লোক বলছে ওয়াটার। আর এক ঘাটের লোক বলছে পানি—কিন্তু বস্তু এক।" এই কথায় কি ইহাই প্রমাণ হয় না যে, ধর্ম্মভেদের ন্যায় ঈশ্বর লইয়া প্রকৃতিগত যে ভাষাভেদ, তাহারও সমন্বয় ভাষায় নহে, সেই এক ঈশ্বর-বস্তুতেই।

এই জন্যই আমি বলিয়াছি "তত্ত্ব-সমন্বয়ের" কথা। এক্ষণে ঠাকুরের মুখে সমন্বয় কথাটা যেখানে বাহির হইয়াছে, তাহারই আলোচনা করিয়া আমার কথা শেষ করিব। ঠাকুরের সহিত কথা প্রসঙ্গে তাঁহার মুখে অনন্ত মত, অনন্ত পথের কথা শুনিয়া ভক্ত উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন 'একটা জোর করে' ধরতে হয়। ছাদে গেলে পাকা সিঁড়িতে উঠা যায়। একখানা মইয়ে উঠা যায়, দড়ির সিঁড়িতে উঠা যায়, এক গাছা দড়ি দিয়ে, এক গাছা বাঁশ দিয়ে উঠা যায়, কিন্তু এতে খানিকটা পা, ওতে খানিকটা পা দিলে হয় না। ঈশ্বর-লাভ করিতে হইলে, একটা পথ জোর করে' ধরে' যেতে হয়।" এই ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা শ্রুতি-প্রসিদ্ধ। আর ঠাকুরের মুখে এই বাণী উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়াই তিনি আমাদের দেবতা। ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথে যে চলে, ধর্ম্ম-সমন্বয়ের আদর্শ তাহার ভাবনার বা সাধনার বিষয় হয় না। আপনার পথে দৃঢ়চিত্ত যার, সে অপরেও স্ব-মতে দৃঢ়চিত্ত থাকুক, এই আকূতিই পোষণ করিবে। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পরধর্ম্মে বিদ্বেষী হইবে না। তাহার 'মতুয়ার বুদ্ধি' থাকিবে না—ইহাই ঠাকুর বলিয়াছেন। আসলে, ধর্ম্ম-সাধনকালে একাগ্রচিত্ত হওয়ায়, অন্য ধর্ম্মই তাহার নিকট থাকে না; তবে সমন্বয়ের কথা আসিবে কোথা হইতে? ছাদে উঠিলে—সব মত-পথের একেই সমন্বয় হইয়াছে, ইহা বুঝিলে—মহাপুরুষ পারেন নানা মতের, নানা পথের সাধককে হাত ধরিয়া, আলো দেখাইয়া প্রত্যেকের সাধন-ধর্ম্মে সহায়তা করিতে—কিন্তু তাহা সাধকের ধর্ম্ম নহে; আর সিদ্ধের সিদ্ধ মহাপুরুষের উপরোক্ত উক্তি বা আচারণকেও সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় বলার কি যথার্থ হেতু আছে?

স্বামীজির শব্দার্থ ধরিয়াই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব—ইহাতে কি সকল ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা বা তাহাদের মূল সূত্রের আবিষ্কারে সকল আপাতবিরোধ দূর হইয়া সাক্ষাৎভাবে ধর্ম্মগুলির মধ্যে সঙ্গতির রাগিণী-সৃষ্টি হইল? ফলতঃ, বিভিন্ন মতে ও পথে ঈশ্বর-তত্ত্বে পৌঁছিলে, যিনি বা যাঁহারা পৌঁছিলেন, তাঁহার বা তাঁহাদের মধ্যে সমন্বয়ভূমি আবিষ্কৃত হইলেও, বিভিন্ন ধর্ম্মমত ও পথগুলির মধ্যে কখনও স্বভাবতঃ সম্বন্ধ বা সঙ্গতির প্রতিষ্ঠা হয় না—আর সে কারণে এই অর্থেও ধর্ম্মসমন্বয় হয় না।

ঠাকুরের উপরোক্ত কথার পর, তাঁর মুখে এই কথায় কি বুঝায়? "যে সমন্বয় করেছে, সেই লোক। অনেকেই একঘেয়ে। আমি কিন্তু দেখি—সবই এক। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত মত সবই সেই এককে লয়ে।"

এক ব্রহ্মসূত্র ব্যতীত দার্শনিক পরিভাষায় সমন্বয় শব্দটীর খুব কচিৎ প্রয়োগ দেখা যায়। অন্ততঃ আমার চক্ষে পড়ে নাই। ঠাকুরও এই এক স্থানে সমন্বয়ের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার "অনেকেই একঘেয়ে" এই কথার অর্থ কি যে মানুষ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, তার প্রতি কটু সমালোচনা? তাহা হইলে "ঈশ্বরলাভ করতে হলে একটা পথ জোর করে' ধরে' যেতে হয়" এই কথার অর্থ কি? "নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে' আন্তরিক তাঁকে ডাকলে ভগবান-লাভ হবে"—ঠাকুর এই বাণীও তাহা হইলে তাঁহার জীবনে ব্যর্থ হইয়াছে বলিতে হয়। আমরা বলি, ঠাকুরের "সমন্বয় করা" ধর্ম্মে নহে, ব্রহ্মে, ভগবানে। ঠাকুর ইহার নিজেই ভাষ্য করিয়াছেন—"শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত মত সবই সেই এককে লয়ে।" অতএব ঠাকুরের কথায় যে সমন্বয়, তাহা ধর্ম্মের সম্বন্ধে বা অবিরোধে নহে, প্রত্যেক সম্যক্ অন্বয় হইতেছে ব্রহ্মেই। ব্রহ্ম-সূত্র ঠাকুরের জীবনে মূর্ত্তি লইয়াছে।

এইবার আমার কথা। আমার লেখায় ধর্ম্মসমন্বয় কথা উক্ত হইয়াছে। আমি শুধু "শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্য-জীবনে" নহে, "রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী" প্রবন্ধে নহে, "হিন্দুত্বের পুনরুত্থানেও" ধর্ম্ম-সমন্বয়ের কথা বলিয়াছি।

ঠাকুরের পুণ্যময় ভাব ও চরিত্রের অনুধ্যান করিয়া যখন তাঁহার উদ্দেশে উক্ত গ্রন্থে বা লেখায় হৃদয় ঢালিয়া

আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি, তখন নিবিড়ভাবে প্রত্যেক শব্দার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকল কথা লেখা সম্ভব না থাকায়, ধর্ম্ম-সমন্বয় শব্দের অস্পষ্টার্থের জন্য স্বামীজি অবশ্যই আমাকে দায়ী করিতে পারেন—আমি সে ত্রুটি স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহি। কিন্তু ঠাকুরের মর্ম্ম দিন দিন উপলব্ধির রসায়ণে আমার অন্তরে যতই পরিস্ফুট হইতেছে, আমি দেখিতেছি—তিনি বিভিন্ন ধর্ম্মগুলির মধ্য দিয়া একই পরমতত্ত্বে পৌঁছিয়া ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ দূর করার পথে বিশেষ আলোকপাত করিলেও, পাশ্চাত্য ওস্তাদের স্বর-সঙ্গতির ন্যায় বিভিন্ন ধর্ম্মের একটা সঙ্ঘ (federation of faiths)-রচনার স্বপ্ন বা আদর্শবাদের কুহেলিকা মানবজাতিকে কখনও দিয়া যান নাই। ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্ম-সমন্বয়ের আদর্শবাদ—রাষ্ট্রক্ষেত্রে গণতন্ত্রাদির ন্যায় পশ্চিমের ওস্তাদগণেরই মস্তিষ্কজাত আর একটা মতবাদ মাত্র—ইহা ঠাকুরের জীবনের সাধন-সিদ্ধ অমূল্য দান নহে। প্রত্যেক ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য থাকিবে; প্রত্যেকের মাঝে মূলগত ঐক্যের আবিষ্কারে অবিরোধভাবের সঞ্চার হইবে, ধর্ম্মানুভূতির ক্ষেত্রে এইরূপ আদর্শবাদের মূল্য বড় বেশী নহে। এই আদর্শবাদই ধর্ম্মজগতে Electicism, রাষ্ট্র-জগতে Pact প্রভৃতি উদ্ভট কাল্পনিক নীতির জন্মদান করে। ঠাকুরের অধ্যাত্মদান এত লঘু নহে। তিনি অপার্থিব ঈশ্বরানুভূতি স্বয়ং জীবনে সিদ্ধ করিয়াছেন ও সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী মানুষের জন্য সেই অমৃতময়ী ঈশ্বরানুভূতি অকাতরে দান করিয়া জাতিকে ও জগৎকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। আর এই এক অখণ্ড ঈশ্বরানুভূতির মাঝেই শুধু ধর্ম্ম কেন, সব কিছু অবান্তর ভেদ-বৈচিত্র্যেরই চরম ও ঐকান্তিক লয় ও সার্থকতা। স্বামীজির সহিত বলিব—হাঁ, ইহাই ত "সত্যিকার সমন্বয়"।

উপসংহারে, আমার বক্তব্য—ধর্ম্ম-সমন্বয় লইয়া স্বামিজীর সহিত যে আমার মত-বিরোধ, তাহা যদি শুধুই ভাষাগত, শব্দগত না হয়, উভয়ের মধ্যে কুতর্কের প্রবৃত্তি বিন্দুমাত্র না থাকে, তাহা হইলে তাহার সমাধানের সূত্র আমরা অনায়াসেই পাইতে পারি। ধর্ম্মের শাস্ত্রীয় অর্থ যাহা, তাহা সমন্বয়-বিরোধী—পূর্ব্ব মীমাংসার দুই একটা সূত্রেই এই মীমাংসা পাওয়া যাইবে। মল্লিকার সহিত গোলাপের পার্থক্য পরস্পর যে স্বতন্ত্র ধর্ম্মে, তাহা উহাদের রূপে ও সৌরভে প্রতীত হয়। কিন্তু সেখানে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বা সঙ্গতি আর রাসায়ণিক খিচুড়ির মধ্যে খুব বেশী কিছু প্রভেদ নাই। কিন্তু সমন্বয়-শব্দে ভাববাচ্যে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি ধরিয়া ইহা বলা যায় যে, সকল সৃষ্টির মূলগত সত্য ও সাধ্য সেই একই। এই অর্থ কিন্তু ব্যবহারযোগ্য নহে। এই অর্থে শুধু ধর্ম্ম কেন, অধর্ম্মেরও সমন্বয় হইবে। ঠাকুর শুধুই বলিয়াছেন —"সমন্বয় করা"র কথা—ধর্ম্ম-সমন্বয়ের কথা নহে। তাঁহার পূর্ব্বাপর সকল উক্তি সেই শ্রুতিবাক্যই প্রমাণ করে, যাহাতে বলা হইয়াছে "সকল নদীই ছুটিয়াছে সেই একের বুকেই ঝাঁপ দিতে।" কি সৃষ্টির, কি সাধনার উদ্দেশ্য বা সাধ্যরূপে আমরা এইখানেই সমন্বয়ের সূত্র খুঁজিয়া পাই। কিন্তু তাহার প্রচার ও সাধন আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করিবে। অন্বয় শব্দের অর্থ "তৎসত্ত্বে তৎ সত্তা"। এই ন্যায়বাক্য লঙ্ঘন করিয়া কেহ যদি শব্দের অর্থ করে, তাহা অশাস্ত্রীয় হইবে। ইহা থাকিলে উহা থাকিবে, নতুবা উহা থাকিবে না। এই হেতু যাহা সৎ, তাহা আছে বলিয়াই বহু'র বৈচিত্র্যসৃষ্টি। ধর্ম্মও বৈচিত্র্যময়, প্রত্যেকের সহিত সত্তের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তাহার স্থিতি ও গতি। ইহাই অন্বয়-শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য। উৎপাদ্য বস্তুরাজির পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ও সঙ্গতির তারতম্য থাকিবেই—ইহারও কম বেশী প্রয়োজন ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে সর্ব্বক্ষেত্রেই আছে, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু সমন্বয় যে করিয়াছে একে, তাহার চক্ষে সবই একের অভিব্যক্তি। সিদ্ধ জীবনের এই পরম অনুভূতি অসঙ্গত কে বলিবে?

সাধন এই একে সমাপ্তির জন্য। সেইখানে সমন্বয় পাইলে, প্রতি অভিব্যক্তির মৌলিক সত্য অনুভূত হয়। ইহাই জীবনের অমৃতময় ঐক্যসূত্র। সেই পরম সত্যের ঈক্ষণে কিন্তু জগতের বিভিন্ন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও ধর্ম্ম-বৈচিত্র্যের সার্থকতাই উপলব্ধ হয়। এই যে সৃষ্টির সত্য ভেদদ্বন্দ্বাদি, তাহা মোক্ষবাদীর থাকে না; কিন্তু কর্ম্মবাদী ভারত সত্তা সমন্বয়ের সংবাদ পাইয়াও, অন্তরে পরম নির্ব্বেদ লাভ করিয়া বাহিরের বৈচিত্র্যজগতে প্রকৃতিগত স্বধর্ম্মের অনুবর্ত্তনেই জীবনের যথাকর্ত্তব্য করিয়া যায়; সেখানে সমন্বয়ের কথা নাই—কোন প্রকার আপোষ-নিষ্পত্তিও নাই। ব্যক্তির ন্যায়, জাতির রক্তধারায় যে বিশিষ্ট মত ও পথের স্বভাব-প্রবাহ, তাহাই রূপায়িত হয় বিশেষ দেশ, সমাজ, কৃষ্টি, ইতিহাস ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া। এই হেতু ধর্ম্ম-সমন্বয় বলিতে বিশেষের যে ধর্ম্ম, স্বভাবনিহিত যে ভাবনিষ্ঠা, তাহা ভূমার নামে, ঔদার্য্যের নামে, আপোষমূলক মিশ্রভাবে ক্ষুণ্ণ, ধর্ম্ম-সাঙ্কর্য্যে কলুষিত যাহাতে না হয়, তাহার জন্যই আমার আলোচনা। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বামী প্রেমঘনানন্দজী আমার কথার মর্ম্ম সহজেই উপলব্ধি করিবেন, ইহাই আমার বিশ্বাস।

# ষোল আনা

( গল্প )

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঁটিরাম যে বংশের ছেলে, বংশগত কোন প্রসিদ্ধি বা প্রতিষ্ঠা তাহার না থাকিলেও, বৈশিষ্ট্য একটা ছিল। সেটি হইতেছে—স্বাতন্ত্র্য-নিষ্ঠা। ইহাদের কুরচিনামা ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যাইবে—এই বংশের উর্দ্ধতন পুরুষ হইতে অর্দ্ধতন বংশধর—পুঁটিরামের পিতা গুইরাম পর্য্যন্ত কেহ কদাচ দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করে নাই। অনেকেই হয় তো এজন্য কষ্ট অনেক পাইয়াছে, অভাবের জ্বালাযন্ত্রণাও খুব সহিয়াছে, তথাপি বাঁধা-মাহিনার চাকুরীর প্রলোভন কিছুতেই ইহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

যে গ্রামাঞ্চলে ইহাদের বাস্তুভিটা, পুরুষানুক্রমে ইহারা বসবাস করিয়া আসিতেছিল; আলিপুর মহকুমার অন্তর্গত এবং সহর কলিকাতার সম্পর্কে দূরত্বের ব্যবধান মাইল বারোর অধিক না হইলেও—এই অঞ্চলের বাসীন্দাদিগকে সহর হইতে আড়াইশো মাইল তফাতের গাঁইয়াদের মতই বহু বিষয়ে অনভিজ্ঞ, প্রগতি সম্পর্কে উদাসীন এবং অন্যের অনুকরণে বীতস্পৃহ দেখা যাইত।

জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুঁটিরামও দেখিয়াছে—সারা গ্রামখানা সে সময়ে যেন পাঠশালার গুরুমহাশয়ের বাঁধাধরা রুটিনের মতই চলিতেছে। একটু এদিক্-ওদিক্ হইবার জো নাই। সকাল হইবা মাত্র ছেলেরা হাত মুখ ধুইয়া কোঁচড়-ভরা মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে পাঠশালায় ছোটে, 'জলপানি-বেলা' হইলেই বাড়ী ফিরিয়া স্নানাহার সারিয়া ঘণ্টাকয়েক বিশ্রামের পর পুনরায় পাঠশালায় যায় হাজিরা দিতে। বৈকালে ছুটীর পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দল বাঁধিয়া খেলার কি ধূম তাহাদের!

এদিকে বাড়ীর বড়রা খেত-খামারে গিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কি খাটুনিই খাটে! জলপানি বেলায় স্নানাহারের ছুটি পাইয়া ছেলেরা পাঠশালা হইতে ফিরিবার পথে প্রত্যহই দেখে—ক্ষেতের ধারে আইলের উপর উবু হইয়া বসিয়া কি তৃপ্তির সঙ্গেই তাহারা 'জলপান' করিতেছে? ধামাভরা মুড়ি, ভিজা ছোলা, আর আখের গুড় হইতেছে তাহাদের এই জলযোগের উপাদান। ইহার পর তাহারা আবার নূতন উদ্যমে আরও ঘণ্টা দুই খাটিবে—যতক্ষণ না কলের ভোঁর পরিচিত আওয়াজটি চেতাইয়া দিবে—দুপুর যে বাজলো, এবার ওঠো!

তৃতীয় প্রহরে পাঠশালায় যাইতে ছেলেরা চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে—তাহাদের আগেই অভিভাবকেরা এবেলার কাযে লাগিয়া গিয়াছে এবং সূর্য্যিঠাকুর পাটে না না-বসা পর্য্যন্ত ইহাদের কাজ চলিবে।

প্রত্যেক সংসারে মেয়েদের কাযের ধারাও এমনই কলের মত চলে। যাহারা সধবা বা বধূ, তাহারা ঘরে বসিয়া গৃহস্থালীর কাযকর্ম্ম ত করিবেই, কিন্তু সে-সব কায সারিয়াও তাহারা উপরি এমন অনেক কায খুঁজিয়াপাতিয়া লয়—যাহাতে সংসারে সুসার হয় এবং সময় সময় তাহা হইতে কিছু না কিছু অর্থাগমও হইয়া থাকে। যেমন—ছেঁড়া কাপড়চোপড় দিয়া কাঁথা সিলাই করা, ধুচুনি চুবড়ি ঘুনি আটল মাদুর ঝাঁতাল প্রভৃতি বোনা, নারিকেল পাতা চাঁচিয়া কাটি বাহির করা। আর যাহারা বিধবা, তাহারাও কেহই সংসারের বোঝা বা গৃহস্বামীর গলগ্রহ হইয়া থাকে না। জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য তাহাদের শ্রমশীলতা ও আত্মনির্ভরতার পরিচয় হয়ত বাহিরের লোকের নিকট সম্ভ্রমহানিকর বলিয়া নিন্দনীয় হইবে, কিন্তু এ-অঞ্চলের অধিবাসীরা পুরুষানুক্রমে ইহার সমর্থন করিয়া আসিতেছে। এই সকল অবীরা যে, দুই মুঠা অন্নের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া কিম্বা অন্যান্য অনুন্নত জাতির বিধবাদের মত পরিচারিকার বৃত্তি গ্রহণ না করিয়া স্বাধীনভাবে বেসাতী ব্যাপারে লিপ্ত, ইহাতে তাহারা আনন্দিত। তাই প্রত্যহ দেখা যায়—পল্লীজাত তরিতরকারি, সুলভে সংগ্রহ করিয়া, ইহারা চলিয়াছে

দিব্য সপ্রতিভ গতিতে সন্নিহিত গঞ্জে বিক্রয় করিতে এবং বিক্রয়ান্তে গঞ্জের মহাজনদের ধান মাথায় বহিয়া দ্বিপ্রহরে বাড়ী ফিরিতেছে। সারা বিকালটা এই সব ধানের তদ্বির করিতেই কাটিয়া যায়। ধানগুলি ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া, সিদ্ধ শুখাইয়া, তাহার পর ঢেঁকিতে ভানিয়া চাউল তৈয়ারী করিয়া মহাজনের দোকানে যথাসময় বুঝাইয়া দেয় এবং মজুরী হিসাব করিয়া লয়। ধানের ভূষি, কুঁড়া ও চালের খুঁদগুলি ইহারা অতিরিক্ত পাইয়া থাকে, তাহাতেও কিছু সংস্থান হয়। দৈহিক শ্রমে লিপ্ত থাকায় ইহাদের দেহগুলি বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যপুষ্ট এবং মনও নির্ভীক ও নির্ম্মল থাকিবার সুযোগ পায়। অপরিচিত পুরুষের সংস্রবে আসিলে ইহারা সঙ্কোচে জড়সড় বা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে না। নিজেদের পাওনাগণ্ডা বুঝিয়া লইতে যে-পরিমাণে ইহারা উদ্‌গ্রীব থাকে, নারীত্বের মর্য্যাদা সম্বন্ধেও সেই পরিমাণে থাকে সতর্ক ও সচেতন।

সুতরাং এই সকল কারণ-পরম্পরায় এই গ্রামের অধিবাসীরা সভ্যতার অনেকখানি তফাতে থাকিয়াও এই স্বাতন্ত্র্য-নিষ্ঠার জন্য শিক্ষাভিমানী বহু সভ্য সমাজের আদর্শ ছিল; অন্ততঃ পুঁটিরামের ধারণাটুকু এইরূপ। এখনও পুঁটিরামের মানসপটে শৈশবের স্মৃতিরেখাগুলি চিত্রের মত উজ্জ্বল হইয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া দেয়। সে শুধু জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলে—হায়রে সেকাল!

গ্রামখানির নাম দৌলতগাছি। যদিও গ্রামবাসীদের ঘরবাড়ী, চাল-চলন বা বেশভূষার বহর দেখিয়া বাহিরের কেহ ধারণাই করিতে পারিত না যে দৌলতের সহিত ইহাদের কোনরূপ পরিচয় আছে, কিন্তু ইহাদের গৃহস্থালী এবং সচ্ছন্দ জীবনযাত্রার প্রণালী ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে বাহিরের লোকের ভুল ভাঙ্গিয়া যাইত, তাহারা তখন উপলব্ধি করিতে পারিত যে, মনের মণিকোঠায় সন্তোষের সিন্দুকে যে ধনদৌলত ইহারা ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে, বাহিরের কোন ঐশ্বর্য্যের সহিত তাহার তুলনা হয় না। অখ্যাত গ্রাম-অঞ্চল আশ্রয় করিয়া ইহারাই বুঝি অতীত বাঙ্গলার আদর্শটুকু এখনও প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে।

অতিথি আসিলে এ অঞ্চল হইতে শুষ্ক মুখে কখন ফেরে না, বাড়ীর কর্ত্তারা হাজির না থাকিলেও, মেয়েরা তাহার যথোচিত সৎকার করে; চাল, ডাল, ঘী, তরকারী সাজাইয়া সিধা দেয়, বাহিরের চালায় পাকের বন্দোবস্তু চলে। গ্রামের কেহ বিপদে পড়িলে, সকলে মিলিয়া তাহাকে দায়মুক্ত করিতে কোমর বাঁধে। মনের ভুলে যদি কেহ কোনরূপ অন্যায় করিয়া বসে—পদস্খলনও যদিস্যাৎ ঘটে, সে জন্য গ্রাম্য মোড়লের চণ্ডীমণ্ডপে পঞ্চায়েৎ সভায় তাহার যে মীমাংসা হইয়া যায়, তাহাতে সাপও মরে এবং লাঠিও বাঁচে। অর্থাৎ পাপের খোলসটুকু ছাড়াইয়া লইয়া মানুষটিকে ইহারা আদর করিয়া ঘরে তুলিয়া লয়। কাযেই ইহাদের জাতের পদস্খলিতা মেয়েরা তাড়া খাইয়া বাহিরে গিয়া পাপের বীজ ছড়াইবার বা সমাজের মুখে কালি দিবার কোন ফুরসদই পায় না। আবার বাহিরের কোন আপদ আসিয়া যদি ইহাদিগকে দাবাইবার বা তাঁবেদার করিয়া তুলিবার প্রয়াস পায়, ইহারা তখন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এমন অদ্ভুত সামরিক প্রতিভার পরিচয় দেয় যে, বিরোধী পক্ষ সকল রকমে হয়রাণ হইয়া এই স্বভাবদুর্দ্ধর্ষদের সম্পর্ক ত্যাগ না করিয়া পারে না।

এমনই এক স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বী জাতির ঘরে জন্মগ্রহণ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিল বলিয়া পুঁটিরাম মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করে। এ সম্বন্ধে তাহার আরও বেশী রকমের শ্লাঘা এই যে—জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জাতির সংস্কৃতিগত ঐশ্বর্য্যের যে প্রদীপটির আলো দেখিয়া সে আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া উঠে—কিছুকাল পরে তাহারই চক্ষুর উপরে সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের প্রদীপটি নির্ব্বাণোন্মুখ হইলে, তাহার পিতা কি বিপুল যত্নেই তাহাকে বাঁচাইয়া রাখেন, এবং কালক্রমে তাঁহার জীবন-দীপের তৈলটুকু যখন নিঃশেষ হইয়া আসে, সমাজ-জীবনের সেই অখণ্ড প্রদীপটি অক্ষুণ্ণ রাখিবার ভার তাহারই উপর চাপাইয়া ও প্রতিশ্রুতি লইয়া কি তৃপ্তিতেই তিনি শেষ নিশ্বাস ফেলিয়াছেন!

এক সময়ে পুঁটিরামদের অবস্থা খুব ভাল ছিল। গ্রামখানার প্রায় পাঁচ আনা অংশের মালিকই ছিল পুঁটিরামের পূর্ব্বপুরুষেরা। কতক জমি, জমা দিয়া ও কতক জমিতে চাষ আবাদ করিয়া তাহারা বেশ প্রতিপত্তির

সঙ্গেই দিন কাটাইতেছিল। তাহার পর বংশবৃদ্ধির সঙ্গে ভাগবাঁটোয়ারায় বংশধররা ছাড়াছাড়ি হইয়া পড়ে। ইহার উপর পুঁটিরামের পিতা গুইরামের মাথায় চাপে কারবার করিবার বাতিক। গঞ্জে সে বড় রকমের এক আড়ৎ খুলিয়া বসে। কিন্তু এক রাত্রিতে আগুন লাগিয়া সমস্ত গঞ্জ পুড়িয়া যায়, আর সেই সঙ্গে গুইরামও সর্ব্বস্বান্ত হয়। যে জমিজেরাৎ ছিল, মহাজনের দেনা মিটাইতে অধিকাংশই বেহাত হইয়া যায়, শুধু বাস্তুভিটাটুকু কোন রকমে মহাজনের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা হইতে নিষ্কৃতি পায়। পুঁটিরামের পিতা তারপর অনেক চেষ্টা করিয়াও আর পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইতে পারে নাই, ভগ্ন মনেই তাহাকে অপূর্ণ আশাটুকু ফেলিয়া রাখিয়া : পরলোকের পথে পাড়ি দিতে হয়।

পিতার মৃত্যুর পর পুত্র ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া বসিল— বাবার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা সে পূর্ণ করিবে, বেসাতী করিয়া ভাগ্য ফিরাইবে ; তাহাতেই তাহার বাবাকে তুষ্ট করা হইবে, পরলোক হইতে দুই হাত তুলিয়া তিনি আশীর্ব্বাদ করিবেন কৃতকার্য্য পুত্রকে।

কিন্তু পুঁটিরামের তরুণ জীবনে এই সময়ে এক 'রোম্যান্স'এর সৃষ্টি হইল অপ্রত্যাশিতভাবে। মেটিয়া-বুরুজে এক আত্মীয় বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে জীবনসঙ্গিনীপ্রাপ্তির সহিত জীবনপথে এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ফিরিতে হইল। আত্মীয়টি অবস্থাপন্ন, সহরঘেঁসা বলিয়া তাঁহার সংসারে সহরসুলভ সভ্যতার কিছু কিছু আভা পড়িয়াছিল, এমন কি, বাড়ীর মেয়েদের মনমুকুরগুলি পর্য্যন্ত শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

ইহাদের সমাজে অর্থ দিয়া কন্যা ক্রয় করিবার প্রথা পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, পাত্র পক্ষের সহিত দর-কষাকষির পর একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া কন্যার পিতা তবে কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে রাজী হয়—যে ব্যবস্থা বর্ত্তমানে বর্ণ হিন্দুদের পুত্রের বিবাহ-ব্যাপারে চালু আছে! কন্যার বিবাহে প্রাপ্তিযোগ থাকায়, কন্যারা পিতৃগৃহে আর 'কন্যকা' হইবার অবসর পায় না, সাতে পড়িবার আগেই তাহাদিগকে 'ছাদনাতলায় সাত পাক ঘুরাইয়া দেওয়া হয়, কাজেই দশম বর্ষে পড়িয়া 'কন্যকা' হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে সধবা হইতে হয়।

মেটিয়াবুরুজের সামন্ত মহাশয় তাঁহার ত্রয়োদশী কন্যা দামিনীকে উপলক্ষ করিয়াই বুঝি সমাজ-প্রচলিত এই দুইটি প্রথার মূলোচ্ছেদে বদ্ধপরিকর হইলেন। যেখানে যত আত্মীয়কুটুম্ব তাঁহার ছিল, এ বিবাহে সকলেই নিমন্ত্রিত হইল, কুটুম্ব-মহলে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে, সামন্ত মহাশয় ডাগরডোগর করিয়া কন্যার বিবাহ দিতেছেন এবং পণ না লইয়া নিজেই ছেলেকে সখ করিয়া সাড়ে বাইশ গণ্ডা টাকা পণ দিতে রাজী হইয়াছেন।

কথাটা পদ্মবাজ সমাজে আলোচনার রীতিমত বিষয়-বস্তু হইয়া দাঁড়াইল।

যে পাত্রের সহিত সামন্ত মহাশয়ের কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ পাকা হইয়াছিল, পাটকলের দৌলতে তাহাদের তখন খুব শ্রীবৃদ্ধির অবস্থা। কথায় বলে—লাখ টাকায় বামুন ভিখিরী, আর এক টাকায় পোদ চৌধুরী! বোধ হয়, ইহাদিগকেই উপলক্ষ করিয়া এই প্রবচনটির উৎপত্তি হইয়াছিল। পাত্রের পিতা দুর্য্যোধন চৌধুরী পাটকলের ব্যাপারে যে উপায়ে পয়সা উপায় করিত, এবং এই পয়সার জোরে যেরূপ দাপটে ও বেপরোয়া হইয়া সে চলিতেছিল, সমাজ তাহা স্বীকার করিতে পারে নাই। ইহাদের সমাজে মুড়ি-মিছড়ির এক দর—সমাজের ব্যবস্থায় একই খুরে ছোট-বড় সবাইকে মাথা মুড়াইতে হয়, পয়সার স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এখানে নাই। কিন্তু পয়সার গরমে দুর্য্যোধন চৌধুরী প্রতিবেশী বামুন কায়েতদের দেখাদেখি সমাজকে দাবাইয়া চলিবে সাব্যস্ত করিয়াছিল। এমন কি, পারিবারিক কোন অনাচার সম্পর্কেও সে সমাজের তোয়াক্কা রাখে নাই। সমাজও এ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য বলে নাই, বোধ হয় উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। চৌধুরী-পুত্রের বিবাহ উপলক্ষ করিয়া সেই সুযোগ আসিয়া সমাজকে সচেতন করিয়া দিল। সমাজকে লুকাইয়া সমাজভুক্ত কেহ কিছু অনাচার করিলে এবং সমাজের নিকট ধরা দিয়া ছাড়পত্র না লইলে, সেই

অনাচারীর সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মানুষ্ঠানের সময় সমাজের ষোলআনা দলবদ্ধ হইয়া তাহার কৈফিয়ৎ চাহিত। এরূপ ক্ষেত্রে অনাচারীকে রীতিমত খেসারৎ আক্কেল-সেলামী-স্বরূপ ষোলআনার হিতকর কোন সদনুষ্ঠানে দাখিল করিয়া এবং কৃতাপরাধের জন্য মার্জ্জনা চাহিয়া লইতে হইত। তখন সে লোক পুনরায় ষোল আনার সহিত মিশিয়া যাইত এবং ষোলআনাও অতীতের সকল কথা ভুলিয়া তাহার অনুষ্ঠিত উৎসবে যোগ দিত।

দুর্য্যোধন চৌধুরীর সম্বন্ধেও সমাজ ঠিক এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছিল। খুব ঘটা করিয়া বর ও বরযাত্রী সহ দুর্য্যোধন চৌধুরী ভাবী বৈবাহিক সামন্ত মহাশয়ের বাড়ীর চত্বরে সামিয়ানাতলে সুসজ্জিত সভায় বসিবামাত্রই, সমাজের ষোলআনা 'ঘোঁট' সুরু করিয়া দিল, এবং একজন মাতব্বর মুখপাত্র হইয়া চৌধুরী পরিবারের অনাচারগুলির উল্লেখ করিয়া কৈফিয়ৎ চাহিল।

ফলে বারুদের স্তূপে যেন আগুনের ফুল্‌কী পড়িল। অখ্যাত অশিক্ষিত অজ্ঞান আহাম্মুখের দল তাহার মত পদস্থ গণ্যমান্য লোকের কাযের বিচার করিতে কৈফিয়ৎ চায়,—এত বড় স্পর্দ্ধা! পাটকলের জাঁদ্‌রেল সায়েবদের চরাইয়া যে লোক পয়সা পয়দা করে, বড় বড় ঘরের পাস করা ছেলেরা দুটি বেলা যাহার কাছে কাযের উমেদারী করে, আজ কিনা তাহার কাযের কৈফিয়ৎ চাহিতে আসিয়াছে—ঘৃণ্য নগণ্য অসভ্য চাষার দল? হইলই বা তাহার স্বজাতি,—কিন্তু সেকি কোনদিন ইহাদিগকে গ্রাহ্য করিয়াছে? সে ত ইহাদিগকে ডাকে নাই, নিমন্ত্রণও করে নাই—কোন্ সাহসে ইহারা সভায় আসিয়া কৈফিয়ৎ চায়?

ফলতঃ কুলির সর্দ্দার অধীনস্থ কুলিদিগকে যে দৃষ্টিতে দেখে এবং যেরূপ অমার্জ্জিত ভাষায় তাহাদিগকে তিরস্কার করে, সেইরূপ খরদৃষ্টিতে চাহিয়া, সেইরূপ উদ্ধতভাবে তর্জ্জনের সুরে সে সমাজের ষোলআনাকে শাসাইল।

কিন্তু তাহার ভাবী বৈবাহিক সামন্ত মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাহাকে সবিনয়ে জানাইয়া দিলেন,—মেয়ের বিবাহে আমি সমস্ত সমাজকেই নেমন্তন্ন করেছি। বিনা নেমন্তন্নে কেউ এখানে আসেনি। আপনি অমন করে ওঁদের সম্বন্ধে কথা বলবেন না, তাতে ওঁরা অপরাধ নেবেন। আপনি কি জানেন না, দৌলৎগাছি আমাদের সমাজের মাথা, আর ঘোঁটটা ওঁরাই তুলেছেন। এখন আপনি একটু নরম হলেই ওঁরা ক্ষমাঘেন্না করে আপনাকে রেহাই দেবেন।

চৌধুরী গর্জ্জন করিয়া কহিল,—কি! ক্ষমা-ঘেন্না ক'রে রেহাই দেবে দুর্য্যোধন চৌধুরীকে! গোল্লায় যাক্ তোমার দৌলতগাছি—যত সব গোঁয়ারগোবিন্দ চাষার গাদি—ওদের মাথায় মারি লাথি। শেষের কথা কয়টি ফরাসের উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া দুর্য্যোধন চৌধুরী পুরাণের দুর্য্যোধনের মতই সদম্ভে ও সপদদাপে ব্যক্ত করিল।

দৌলতগাছির লোকগুলিও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কন্যাকর্ত্তা সামন্ত মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—ওঁর লাথি আমরা মাথা পেতেই নিলুম, কিন্তু আপনাকেও জানিয়ে চললুম সামন্ত মশাই—ওঁর ঘরে যদি আপনার মেয়ে যায়, আমাদের সমাজে তা'হলে আপনারও হুঁকো-কলকে বন্ধ হয়ে গেল জানবেন।

দৌলতগাছির সঙ্গে সঙ্গে বঁইছে, বাবুকাচি, জৈঁয়তে, পীরপাছা প্রভৃতি অন্যান্য গ্রামের মাতব্বরেরাও জানাইয়া দিল—আমাদেরও এই রায় সামন্ত মশাই! আমরাও আপনার সঙ্গে হুঁকাকলকের সম্বন্ধ রাখতে পারবো না।

সামন্ত মহাশয় তখন হবু বৈবাহিককে ধরিয়া বসিলেন,—মাপ চান ওদের কাছে বেইমশাই, নইলে ভারি কেলেঙ্কারী কাণ্ড বাধবে।

কিন্তু দুর্য্যোধন চৌধুরীর ধনুর্ভঙ্গ পণ—মাথা সে কিছুতেই নীচু করিবে না—যদি সভা হইতে ছেলে তুলিয়া লইয়া বাড়ী ফিরিতে হয়—তাহাতেও সে পিছপাও নয়। সামন্ত মহাশয় শেষে শক্ত হইয়া বলিলেন,—আপনাকে খুশী করবার জন্য আমি সমাজ ছাড়তে পারি না, তা ছাড়া, সমাজের যখন কোন দোষই দেখছি না। আপনি শুধু পয়সার গরমে সমাজকে হেনস্তা করছেন, কিন্তু আমার সে সাহস নেই।

দুর্য্যোধন চৌধুরী তথাপি নরম হইল না, সে ভ্রূকুটী করিয়া বলিল,—বেশ! আপনি তা'হলে সমাজ নিয়েই থাকুন, আমি ছেলে নিয়ে চললুম।'

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সে উদ্ধতভাবে ছেলের হাত ধরিয়া তুলিল এবং তাহার অনুগত অন্তরঙ্গদের দিকে চাহিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিল,—'চলো।'

শত শত শুষ্ক চক্ষুর উপর দিয়া বর লইয়া দুর্য্যোধন চৌধুরী সদম্ভে চলিয়া গেল, বরযাত্রীদের কতক তাহাদের সঙ্গে গেল, কতক কনেযাত্রীদের দলে ভিড়িয়া বলিল,— আমরা বরের ঘরের মাসী, আর—ক'নের ঘরের পিসি। বাঘেই ফলার শেষ না ক'রে ফিরছি না।

এখন মহা সমস্যা দাঁড়াইল—কি করা যায়! কিসে সামন্তমহাশয়ের জাতকুল রক্ষা হয়! শেষে সমস্যার সমাধান করিল—দৌলতগাছির তরুণ অধিবাসী পুঁটিরাম। ষোলআনা ধরিয়া বলিয়া তাহাকে এ বিবাহে রাজী করাইল, পুঁটিরামও বুঝিল, ইহাতে দৌলতগাছির মান বাড়িবে—মুখখানা উঁচু হইয়া উঠিবে। কিন্তু সে একটি সর্ত্তে ছাদনাতলায় দাঁড়াইতে সম্মতি দিল, সর্ত্তটি এই যে, পণের একটি টাকাও সে লইবে না, সামন্ত মহাশয় একান্তই যদি ঐ টাকা দিতে চান, সেই টাকায় দৌলতগাছির পাঠশালাটি ভাল করিয়া মেরামত করিয়া দেওয়া হউক, যেহেতু সেটি ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইয়াছে।

সামন্ত মহাশয় সানন্দে জামাতার প্রস্তাবে সায় দিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে সম্প্রদানস্থলে লইয়া গেলেন।

যে বর সভা হইতে উঠিয়া গেল, তাহার তুলনায় পুঁটিরাম অবস্থার দিক্ দিয়া যত খাটোই হোক না কেন, চেহারার দিক্ দিয়া যেন রাজপুত্র। তাহার স্বাস্থ্য-পুষ্ট সুন্দর চেহারা দেখিয়া কন্যাপক্ষের সকলেই একবাক্যে বলিল—হ্যাঁ, যেমন ডাগর-ডোগর সোন্দোর কনে', তেমনই হয়েছে রাঙাপানা বর! সামন্তর ভাগ্যি ভালো।

বিবাহ শুভলগ্নেই হইয়া গেল এবং পুঁটিরাম বউ লইয়া বাড়ী ফিরিল। ওদিকে দুর্য্যোধন চৌধুরী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, দৌলতগাছির সম্বন্ধে বিবাহ-সভায় সবার সামনে দাড়াইয়া যাহা সে বলিয়াছে, কাযেও তাহা না দেখাইয়া ছাড়িবে না, এজন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতেও সে প্রস্তুত।

এই বিবাহের পর পুঁটিরামের নাম-ডাক খুব বাড়িয়া গেল। গ্রামের পাঠশালাটির শ্রী ফিরিয়া গেল তাহারই দৌলতে। পুঁটিরামের পড়াশুনাও কিছু ছিল, আর এই গ্রামে, লেখাপড়া জানা মেয়েকে সেইই প্রথম বধূর মর্য্যাদা দিয়া আনাতে—এই পরিবারটির মর্য্যাদাও গ্রামের ষোলআনাকে মানিয়া লইতে হইল। এই সূত্রে—বয়সের দিক দিয়া কাঁচা হইলেও, পুঁটিরাম পাকা পাকা মাথাওয়ালা পঞ্চায়েতদের দলে স্থান পাইল, ইহার উপর গ্রাম্য পাঠশালাটি ভালভাবে চালাইবার ভারটুকুও শেষে তাহারই উপর পড়িল।

দামিনীর সম্বন্ধে পাড়ার মেয়েরা যাহা ভাবিয়াছিল, কাযে কিন্তু তাহার উল্টা হইয়া গেল। বড়লোকের মেয়ে সহরঘেঁসা, তার উপর লিখিয়ে-পড়িয়ে—সেকি এই অজ পাড়াগাঁয়ে ঘরবসত করিতে পারিবে? তার বাপের পাকা দালান, কত চাকরবাকর; আর এখানে তাকে গতর খাটাইয়া সোয়ামীর ঘরসংসার দেখিতে হইবে— এসব কি তার মনে ধরিবে?

কিন্তু দামিনীর সম্বন্ধে যাহারা এই সব আলোচনা গোড়ায় গোড়ায় করিয়াছিল, মাস কয়েকের মধ্যেই তাহারা এই ডাগর-ডোগর বধূটির গতর, বুদ্ধি-ব্যবহার, কাযকর্ম্মের গোছালো ধারা ও আক্কেল বিবেচনা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। তাহারা বুঝিল, মেয়ে শুধু মাথায় বড় হয় নাই, খালি খালি বই পড়িয়া ডেঁপোমী শিখে নাই, ঘর-গৃহস্থালী গুছাইয়া চালাইতে যাহা যাহা আবশ্যক, সেই সমস্তই এই বয়সে এমন ভালো করিয়া মেয়েটি শিখিয়াছে যে, কোন বিষয়ে কাহারো খুঁৎ ধরিবার যো নাই।

এমন গুণবতী বধূ পাইয়া পুঁটিরাম যেন বর্ত্তাইয়া গেল। সে দামিনীর উপর সংসার ছাড়িয়া দিয়া নিজে দোকান লইয়া পড়িল। যদিও প্রতিবেশীরা তাহাকে বার বার বাধা দিয়া বলিয়াছিল—যাতে তোমার বাবা ফতুর হয়ে গেছে, সে কাজে আর মাথা দিয়ো না, তার চেয়ে চাষবাস কর আমাদের মত, না হয়—একটা চাকরী-বাকরীও যোগাড়-যন্তর করে দেখে শুনে নাও। কিন্তু ও কারবার-ফারবার তুলে দাও, কিছু ওতে হবে না।

কিন্তু পুঁটিরাম প্রতিবেশীদের এ পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারে নাই। সে বলিয়াছিল—চাষের কাজ ত শিখিনি, বাবার সাধ ছিল—এই ব্যবসাতেই মা-লক্ষ্মীকে ঘরে বেঁধে

আমাদের গাঁয়ের আর জাতের মুখ দেশের সামনে তুলে ধরবেন। তিনি ত কারবারে লোকসান খাননি, আগুন লেগেই না সব হেজে-পুড়ে গেল! কিন্তু বাবার আশা ছিল—মা-লক্ষ্মীকে তিনি পালাতে দেবেন না—ধরে আনবেনই। এই আশা সাথে নিয়েই তিনি গেছেন,—আমি বেশ বুঝতে পারি, আমার পানেই তিনি তাকিয়ে আছেন ওপর থেকে—তাঁর আশা আমি মেটাবো, আমি না পারি—আমার ছেলে মেটাবে।

পুঁটিরামের মত সচ্চরিত্র ও স্বাবলম্বী পাত্রের হাতে কন্যা দামিনীকে দান করিয়া সামন্ত মহাশয় সুখীই হইয়াছিলেন। এক সময়ে যে, পুঁটিরামদের অবস্থা খুব ভাল ছিল, শুধু অদৃষ্টবৈগুণ্যে দুর্ঘটনায় তাহাদের জমিজেরাৎ সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার জামাতা পৈতৃক ব্যবসায় চালাইয়া ভাগ্য ফিরাইতে ব্রতী হইয়াছে—এ সকল সংবাদও তাঁহার অবিদিত ছিল না। বিবাহের পরই তিনি স্থির করিয়াছিলেন—জামাতার কারবারটি যাহাতে মূলধন পাইয়া শীঘ্রই জাঁকিয়া উঠে, সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হইবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে দুর্য্যোধন চৌধুরীর চক্রান্তচালিত জালে তিনি এমন ভাবে জড়াইয়া পড়িলেন যে, নিজেরই শ্বাসবন্ধের উপক্রম হইল।

বিবাহরাত্রির সেই অপমানের প্রতিশোধ লইতে দুর্য্যোধন চৌধুরী নানারূপ তোড়জোড় করিয়া প্রথমেই সামন্ত মহাশয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিল। মিথ্যার দেনার সম্পর্কে নালিশ রুজু করিয়া, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাইয়া ফৌজদারী সোপরদ্দ করিয়া ক্রমাগতই সে নিরীহ সামন্ত মহাশয়কে এরূপ নাকাল করিয়া তুলিল যে, তিনি একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন।

সামন্ত মহাশয়কে অনেকটা কাহিল করিয়া দুর্য্যোধন চৌধুরীর দৃষ্টি পড়িল অবশেষে দৌলতগাছির উপর। এ পর্য্যন্ত মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলটিই তাহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল; ইদানীং বজবজ অঞ্চলের দুটি নূতন কলের কুলি ও জুট সরবরাহের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব পাইয়া দুর্য্যোধন চৌধুরী পুত্র সর্ব্ববিজয়ের সহিত এই উপলক্ষে দৌলতগাছির কাছাকাছি আসিয়া আস্তানা পাতিল।

দৌলতগাছি অঞ্চলটি বজবজের খুব সন্নিহিত। কিন্তু বজবজের মত কলকারখানাবহুল সমৃদ্ধ সহরের সান্নিধ্যে থাকা সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত এই গ্রামের বাসীন্দারা কলের ডাকে সাড়া দেয় নাই। তাহারা প্রহরে প্রহরে কলের বাঁশী শুনিয়া নিজেদের কাজের 'টাইম' ঠিক করিয়া লইতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলেও, কলের চাকুরীতে হাজীরা দিতে কখনো ছুটে নাই, বরং আমরা কারুর ভৃত্য নই—এই বলিয়া ছেলে-যুবা-বৃদ্ধ সবাই সগর্ব্বে অন্যান্য অঞ্চলের কলের চাকুরিয়াদিগের পানে চাহিত। কিন্তু তাহাদের এ গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য এই অঞ্চল ব্যাপিয়া যে চক্রান্ত-চালিত জালের ব্যূহ রচিত হইতেছিল—তাহা কি তাহারা লক্ষ্য করিয়াছিল?

একদিন সকলে সবিস্ময়ে শুনিল, মেটিয়াবুরুজের দুর্য্যোধন চৌধুরী দৌলতগঞ্জ তালুকের পত্তনী লইয়া জমিদারের সম্মান ও মর্য্যাদা আদায় করিতে গ্রামে আসিতেছে। দৌলতগাছি গ্রাম এবং এই গ্রামের লাগোয়া আরও কয়েকখানি গ্রাম লইয়া যে মৌজাখানি কলেক্টারীর তৌজীভুক্ত, তাহার জমিদার রায়বাবুরা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ায় দীর্ঘকালের মিয়াদে তাঁহাদের এই মহালটি দুর্য্যোধন চৌধুরীকে এই সর্ত্তে পত্তনী দিয়াছেন যে, জমিদারের সত্ত্বে সত্ত্ববান্ হইয়া পত্তনীদার উক্ত জমিদারী ভোগদখল করিবেন। সর্ত্তানুসারে রায়বাবুদের পাকা কাছারী বাড়ী ও তৎসংলগ্ন স্থানীয় আবাস-ভবন পত্তনীদারের দখলভুক্ত হইবে।

স্বজাতি ও বিশেষ প্রতিপত্তিশালী এই লোকটির এইরূপ প্রতিষ্ঠার সংবাদটি দৌলতগাছির বাসীন্দাদের কিন্তু প্রীতিপ্রদ হইল না। একে ত লোকটা সমাজচ্যুত হইয়া আছে, আর তাহার মূলে রহিয়াছে এই দৌলতগাছির মাতব্বরদের জিদ ও ধর্ম্মঘট। সে অপমান যে তাহার মন হইতে মুছে নাই, নিরীহ সামন্ত মহাশয়ের প্রতি আক্রোশ হইতেই তাহা জানা গিয়াছে। পিশাচের প্রবৃত্তি লইয়া কি হায়রানই তাঁহাকে করিয়াছে এবং সে পর্ব্ব শেষ না হইতেই এবার নজর দিয়াছে দৌলতগাছির উপর। এখন তাহাদের কি কর্ত্তব্য—তাহারা কি ভাবে এই সমাজদ্রোহীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবে?

পাঠশালার প্রাঙ্গণে এ সম্বন্ধে পরামর্শ-সভা বসিল এবং গ্রামের ষোলআনাই তাহাতে যোগ দিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বর্ষীয়ান্ ও বিচক্ষণ চাষী রামকালী মোড়ল বলিল,—আমার কথা হচ্ছে, হাঙ্গামা-হুজ্জুতি ক'রে কোন লাভ নেই। পাশার দান এখন দুর্য্যোধন চৌধুরীর দিকেই পড়েছে আর পড়তে থাকবে। ও এখন জমিদার, হাতে দেদার পয়সা, পাটকলের হাজারো কুলি ওর তাঁবেদার। কোনদিক্ দিয়েই আমরা ওর সঙ্গে পারবো না; মামলা মকদ্দমা বাধলে আমরাই ধনে প্রাণে মারা যাবো। কাজেই আইন মেনে সিধে রাস্তা ধরেই আমরা চলবো।

দুখীরাম নস্কর বলিল,—কিন্তু মোড়ল, যদি ওর মনে এই ইচ্ছেই থাকে যে, দৌলতগাছিকে জব্দ করা, তখন আমরা সিধে রাস্তা ধরে' আর আইন মেনে চললে—ও কি চুপ করে থাকবে ভেবেছ? মেটেবুরুজের সামন্ত মশাই ত কোনদিন বাঁকা রাস্তায় পা দেন নি, কিন্তু ঐ চৌধুরীই না তাঁর পায়ে পা দিয়ে হাঙ্গামা বাধালে!

মণ্ডল মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল—সে কথা ঠিক, কিন্তু দেখে নিও, আখেরে সামন্তই জিতবে। ভগবান কাণা নন, তাঁরই দেওয়া ক্ষ্যামতা পেয়ে মানুষে যখন বাড়ে—ধরাকে সরা দেখে, তিনি তখন কাঁদেন। আর সেই বাড়ন্ত মানুষ যখন পড়ন্ত হয়ে কাঁদে, তিনি তখন হাসেন। এখন আমাদের উচিত হচ্ছে—ঠিক পথে চলা। আমরা যদি জমিদারের সেরেস্তায় ঠিক মত খাজনা দাখিল করি, আইনের দিক দিয়ে জমিদারের যা দাবী, তা যদি মেনে নিই—তাহলে কেন গোল বাধবে। এক হাতে কখন তালি বাজে?

পুঁটিরাম বলিল—আপনার কথা ঠিক। তালি এক হাতে বাজে না। কিন্তু তালি দেবার লোক যদি ঠিক মিলে যায়—তখন এমন তালি বাজে যে—কাণে পর্য্যন্ত তালা ধরে' যায়। যতক্ষণ আমরা ষোল আনা এক হয়ে আছি, কোন ভয় নেই আমাদের, চৌধুরী যত বড়লোকই হোক, কোন ক্ষতি আমাদের করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের ভেতরে যদি ভেদ হয়, ষোল আনার একটা পাইও যদি ওর তরফে যায়, তখনই এ বড়াই আমাদের ভেঙ্গে যাবে। আজ দৌলতগাছি—এক পাঁজা আখের আঁটি, কারোর সাধ্য নেই জোর করে ভাঙ্গে; কিন্তু এই আঁটি যদি কোনদিন খুলে যায়, সে তখন হাসতে হাসতে পাঁকাটির মত পুট পুট করে ভেঙ্গে দেবে।

পুঁটিরামের কথাগুলি সকলেরই মনে ধরিল; সভার মাতব্বরদিগকে মানিতে হইল—হঁ্যা, এটা ভাববার মত কথা বটে!

মোড়ল তাহার দীর্ঘ হাতখানা উঁচু করিয়া তুলিয়া বলিল,—লাখো কথার সার কথা বলেছে পুঁটিরাম। পেটে ওর বিদ্যে আছে ত, বিদ্বানের মতই কথা বলেছে। সত্যি কথা, দৌলতগাছি আজ পর্য্যন্ত যে মাথা তুলে খাড়া হয়ে আছে—সে শুধু এই মিলটুকুর জন্যে। কথায় আছে—দশে মিলে করি কায, হারি জিতি নাহি লাজ! যাক্—এখন কি করে আমাদের এই ঐক্য ঠিক থাকে, দৌলতগাছি বরাবর গাছিই থাকে—সেই ব্যবস্থাই এখন করা চাই। আমি বলি কি, পুঁটিরামই বলুক—এর যুক্তি কি, এখন আমাদের কি উচিত।

ষোল আনার সকলেই মোড়লের কথার সমর্থন করিয়া পুঁটিরামের মুখেই যুক্তিটা শুনিতে চাহিল।

পুঁটিরাম অল্প কথায় তাহার বক্তব্যটুকু সকলকে শুনাইয়া দিল—আড়াই-শো ঘর চাষী নিয়ে আমাদের এই দৌলতগাছি। আমাদের সংসার, রোজগার সব আলাদা; এ সব নিয়ে কোন কথা নেই,—কিন্তু আপদ্ বিপদ্ এলেই এই আড়াই-শো ঘর মিশে হবে এক ঘর—এক সংসার। রামকে জব্দ করতে কেউ যদি নালিশ দায়ের করে আদালতে, সে নালিস গ্রামের আড়াইশো ঘরের ওপর হয়েছে ভেবে—সবাইকে তৈরী হতে হবে। গোপালকে কেউ যদি অপমান করে, আড়াইশো ঘর তার শোধ নেবার জন্য কোমর বাঁধবে। এই হ'ল আমার আগের কথা। এর পরের কথা হচ্ছে এই—আমাদের গাঁয়ের কাছে ঐ যে সহর জেঁকে উঠেছে—কলকারখানার বাহার তুলে আমাদের ডাকছে, আমরা তাতে সাড়া দেব, দলবেঁধে সেখানে যাবো—কিন্তু ঘুস দিয়ে চাকরী নিতে নয়—ফসল আর তৈরী জিনিস-পত্তর বেচে ওখানকার পয়সা ঘরে আনতে। দাস্ত আমরা কেউ কোনদিন করবো না।

এ যদি আমরা পারি—কোন চৌধুরীই দৌলতগাছিকে দাবাতে পারবে না।

সবাই স্তব্ধ, কাহারও মুখে কথা নাই। কিন্তু ষোল-আনার প্রত্যেকের মুখেই উত্তেজনার একটা আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সভার চারিদিকে চাহিয়া বয়ঃবৃদ্ধ মোড়ল তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। সে একবার মুখখানা গম্ভীর করিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, এর ওপর আর কথা নেই। পুঁটিরাম যে রাস্তা দেখালে, ঐ ধরেই আমরা চলবো, তাহলেই বাঁচবো; এখন ষোল আনার কি রায়—তাই আমি শুনতে চাই।

চারিদিক হইতে উত্তর শোনা গেল, আমরা রাজী, আমরা রাজী।

সভার সংবাদ যথাসময় দুর্য্যোধন চৌধুরীর কাণে গেল। সে মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল,—তিনটে মাস; এরই ভেতর যদি এক খুরে সব ভুষুণ্ডীর মাথা মুড়ুতে না পারি, আমার নাম মিছে, পেশা মিছে, হিম্মত মিছে।

কিন্তু ছয় মাস কেন, ছয়টি বছর চেষ্টা করিয়া এবং তাহার তূণে যত কিছু বাণ সঞ্চিত ছিল, একটি একটি করিয়া সমস্তই নিক্ষেপ করিয়াও তাহার পণরক্ষা করিতে পারিল না। জলের মত অজস্র টাকা ঢালিয়া, সহর হইতে গুণ্ডা আনাইয়া হাঙ্গামা বাধাইয়া এবং মামলার উপর মামলা দায়ের করিয়া ইহাদিগকে নাস্তানাবুদ করিতে কোন জবরদস্ত জমিদার বোধ হয় এপর্য্যন্ত এরূপ বিরা[ট] আয়োজন করে নাই। কিন্তু করিলে কি হইবে—দৌলতগাছির রুই-কাতলা হইতে চুনো-পুঁটিটি পর্য্যন্ত তখন গাঁথিবাঁধিয়া এক হইয়া গিয়াছে; তাহাদের মুখে[র] বুলি হইয়াছে—'আমরা ষোলআনা, এ আর ভাঙ্গছে না সবাই আমরা সবার জন্য; আমরা একলাই একশো,—একশো মিলে আমরা একা!' ইহাই যাহাদের মূলমন্ত্র কাহার সাধ্য তাহাদিগকে জব্দ করে!

ছয় বৎসর পরে হিসাবের খাতা খুলিয়া দুর্য্যোধ[ন] চৌধুরী দেখিল, অস্থায়ী ও তুচ্ছ একটা জিদের জন্য যে বিপুল অর্থ সে ব্যয় করিয়াছে, উৎসাহ, শক্তি, সাহস, স্বাস্থ্য তিল তিল করিয়া উজাড় করিয়া দিয়াছে, তাহাতে দীর্ঘস্থায়ী কোন কীর্ত্তি সে অনায়াসেই স্থাপন করিতে পারিত। কিন্তু সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া সে যাহা সঞ্চয় করিয়া গেল—তাহা শুধু তাহার বেদনাদায়ক পরাজয়ের ইতিহাস। অপ্রীতিকর কাহিনীর মতই চিরদিন তাহার বংশের সহিত মিশিয়া থাকিবে। এখন কিসে এই কলঙ্কের কালিমা মুছিতে পারা যায়—কি উপায়ে?

কিন্তু ঠিক এই সময়েই পরলোক হইতে এমন অতর্কিতভাবে নিকাশের তলব আসিল যে, সেই উদ্ভাবিত উপায়টি পুত্র সর্ব্ববিজয়কে জানাইবার অবসরটুকুও তাহার মিলিল না।

শ্রীশুভদর্শন দত্ত

ফল্গু, তোমার নীরব, নীথর, বিরাট্, বিশাল বুক বেয়ে,
যাচ্ছে চলে রৌদ্র-ভরা মাঠ্
কে জানে এই শুক্‌ন মাঠে, এই সাহারার তল দিয়ে,
কুলকুলিয়ে চল্‌ছে প্রেমের হাট।

আমি যখন তোমায় দেখি দাঁড়িয়ে তোমার কূলে
চোখ দু'টী হয় আপন হ'তে নীচু,
বুঝি তখন এই সৃজনে চাউনি শুধু বুলিয়ে দিলে,
স্বরূপ তাহার যায় না জানা কিছু।

# ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় এম. এ., বি. এল

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশে পুরা একশত বছর রাজত্ব করিয়াছেন। বণিক কোম্পানীর পলাশী আম্রকাননে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার কর্ত্তৃত্ব লাভ ঘটে ২৩শে জুন ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে। সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বণিক কোম্পানীর রাজ্যশাসন ক্ষমতা ব্রিটিশ রাজ্ঞী তথা পার্লামেণ্ট গ্রহণ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে এদেশবাসী দৃশ্য ও অদৃশ্য রক্তমোক্ষণে অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের উৎকোচ গ্রহণ প্রণালীর ইতিহাস এত নির্লজ্জ যে সমসাময়িক যুগে কোনও দেশে এরূপ অনাচার দেখা যায় নাই এবং সর্ব্বকালের ইতিহাসেও ইহার তুলনা মেলা ভার। বঙ্কিম তাঁহার চন্দ্রশেখরে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"এখনকার ইংরেজদিগের ভারতবর্ষে আসিলে যেরূপ নানাবিধ শারীরিক রোগ জন্মে, তখন বাংলার বাতাসে ইংরেজদিগের অর্থাপহরণের রোগ জন্মিত। * * এই সময় যে সকল ইংরেজ বাঙ্গলায় বাস করিতেন তাঁহারা দুইটি মাত্র কার্য্যে অক্ষম ছিলেন। তাঁহারা লোভ সম্বরণে অক্ষম এবং পরাভব স্বীকারে অক্ষম। * * বঙ্গীয় ইংরেজদিগের মধ্যে তখন ধর্ম্ম শব্দ লুপ্ত হইয়াছিল।" (চন্দ্রশেখর, তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। বঙ্কিম-বর্ণিত কোম্পানীর কর্ম্মচারীর চরিত্র ঐতিহাসিক উপাদান কর্ত্তৃকও সমর্থিত। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের হস্তে অতিশয়োক্তির ছাড়পত্র থাকিলেও, তিনি এই স্থলে কোনও অতিশয়োক্তি করেন নাই, ইতিহাসকেই অবলম্বন করিয়াছেন।

পলাশী-বিজেতা কর্ণেল ক্লাইভ নবাব মীরজাফরের নিকট হইতে যে বিপুল অর্থ উপঢৌকন স্বরূপ লইয়াছিলেন; তাহার সাফাই গাহিতে যাইয়া স্বয়ং ক্লাইভ বলিয়াছেন "তখন কোনও সর্ত্ত (covenants) বা কড়া আইন ছিল না। সুতরাং কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের সুবেদারের নিকট হইতে উপঢৌকন লইবার কোনই বাধা ছিল না যেস্থলে সুবেদার স্বাধীন ইচ্ছায় খোস মেজাজে তাঁহার অর্থ অপরকে দিতেছেন।" ক্লাইভ বলিতেছেন "যাঁহারা নবাব কর্ত্তৃক উপকৃত তাঁহাদের মধ্যে আমিও একজন, আমি এ ব্যাপার লুকাইবার চেষ্টা করি নাই পরন্তু খোলাখুলিভাবেই ভারতীয় ডিরেক্টারদিগের গোপন কমিটিকে চিঠিপত্র দ্বারা জানাইয়াছি যে, নবাবের বদান্যতা আমাকে ঐশ্বর্য্যবান্ করিয়াছে এবং কোম্পানীর ইষ্ট সাধনই আমার এ দেশে বাস করিবার বর্ত্তমানে একমাত্র উদ্দেশ্য। আমার অধীনস্থ কোম্পানীর সৈন্যদলের কৃতকার্য্যতার দরুণ কোম্পানী এক কোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা (পনেরো লক্ষ পাউণ্ড) পাইয়াছেন এবং বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা (এক লক্ষ পাউণ্ড) মুনফার অধিকারী হইয়াছেন। ইহা ছাড়া কলিকাতাতে কোম্পানীর অধীনস্থ ধন সম্পত্তি নষ্ট বা লুট হইয়াছিল তাহাও ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ নগরী আয়তনে লোকসংখ্যায় ও ধনবত্তায় লণ্ডনের তুল্য, শুধু এই তফাৎ যে, মুর্শিদাবাদে এমন সব ধনী ও বিত্তশালী নাগরিক আছেন সেরূপ ধনশালী নাগরিক লণ্ডনেও নাই। এই সকল ধনী নাগরিক এবং অন্যান্য বিত্তশালী ব্যক্তি আমাকে অনেক উপঢৌকন দিতে চাহিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগের উপঢৌকন গ্রহণ করিলে কোটী কোটী টাকা করিতে পারিতাম, যে টাকা কোম্পানীর বর্ত্তমান ডিরেক্টারগণ কিছুতেই আদায় করিতে পারিতেন না।"

ক্লাইভ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি মোট ১৬ লক্ষ টাকা নবাবের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি কোনও রত্নাদি গ্রহণ করেন নাই, কাঁচা টাকাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্লাইভের বিশ্বাস যে, মিঃ ওয়াট্‌স আট লক্ষ, মিঃ ওয়াল্‌শ পাঁচ লক্ষ এবং মিঃ ক্রাফ্‌টন দুই লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। অপর কাহারা কত পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার "মনে নাই।" পলাশী-বিজেতার এই উক্তি সাধুবাদ পাইবার যোগ্য, কারণ চুরির সভ্য নাম যে উপরি পাওনা ইহা আমাদিগের জানা

আছে। কিন্তু ক্লাইভের এই উক্তিতে গুরুতর গলদ আছে। ইচ্ছাপূর্ব্বক তিনি নবাব প্রদত্ত উৎকোচ বা উপঢৌকন স্বরূপ প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ কম করিয়া বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কারণ আমরা নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণ ও নিজামতের দলীল হইতে জানিতে পারি যে, পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফরকে মসনদে বসাইয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ (ক্লাইভও বাদ যান নাই) নিম্নলিখিত বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেন। যাহা করিবার ন্যায়ত অধিকার কোনও বেতনভুক কর্ম্মচারীর থাকিতে পারে না। যদি তাঁহারা এই বিপুল অর্থ কোম্পানীর ধনাগারে জমা দিতেন তাহা হইলেও হয়ত একটা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল কৈফিয়ৎ থাকিত। যদিও অসদুপায়ে লব্ধ অর্থ কোম্পানীর মালখানায় জমা দিলেও আইনত অপরাধীর মাত্রা কমে না। কিন্তু তাহা না করাতে অপরাধের গুরুভার যুগ যুগ ধরিয়া তাঁহাদিগের কলঙ্কিত স্মৃতিকে আরও মসীবর্ণে চিত্রিত করিতেছে। মীরজাফরকে মসনদে বসাইয়া তাঁহারা এই হারে অর্থ গ্রহণ করেন :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| মিঃ ড্রেক (গভর্ণর) | ৩ লক্ষ | ১৫ হাজার | টাকা |
| কর্ণেল ক্লাইভ | ২৩ ,, | ৪০ ,, | ,, |
| মিঃ ওয়াট্‌স | ১১ ,, | ৭০ ,, | ,, |
| মেজর কিল পাট্রিক | ২ ,, | ৭০ ,, | ,, |
| ,, ,, ,, (ব্যক্তিগত উপঢৌকন) | ৩ ,, | ৩৭ ,, | ৫ শত টাকা |
| মিঃ ম্যানিংহাম | ২ ,, | ৭০ , | টাকা |
| মিঃ বীচার | ২ ,, | ৭০ ,, | ,, |
| কোম্পানীর সভার ৬ জন সদস্য (প্রত্যেকে ১ লক্ষের উপর) | ৬ ,, | ৮২ ,, | ,, |
| মিঃ ওয়ালশ | ৫ ,, | ৬২ ,, | ৫ শত টাকা |
| মিঃ স্ক্র্যাফটন | ২ ,, | ২৫ ,, | টাকা |
| মিঃ ল্যামিংটন | | ৫৬ ,, | ২ শত ৫০ টাকা |
| ক্যাপটেন গ্রাণ্ট | ১ ,, | ১৫ ,, | টাকা |
| সামরিক বিভাগ (স্থল ও নৌ) | ৬০ ,, | টাকা | |
| | ১ কোটী ২৬ লক্ষ | ১৩ হাজার | ২ শত ৫০ টাকা |

ইহা ছাড়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য ইউরোপীয়ান যাহাদিগের ধনসম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল বলিয়া কথিত তাহাদিগের ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেওয়া হয়।

১ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা নিশ্চয়ই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয় কোম্পানীর এই সকল সাধু কর্ম্মচারীগণই করিয়াছেন এবং খুব সম্ভবতঃ কাঁচ নির্ম্মিত পানাধারের ক্ষতিপূরণস্বরূপ স্বর্ণ নির্ম্মিত পানাধার দাবী করিয়াছেন এবং পাইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক উইলসন লিখিয়াছেন (hedger and sword) যে সাত শত সিন্দুক পূর্ণ একশত নৌকায় এই বিপুল অর্থ নদীয়ায় লওয়া হয় তাহার পর অত্যন্ত খবরদারীর সহিত ফোর্ট উইলিয়ামে নীত হয়।

তিন বৎসর পরে (১৭৬০ খৃষ্টাব্দে) ক্লাইভের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া ভ্যান্সিটার্ট প্রভৃতি কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ নবাব মীরজাফরকে গদী হইতে অপসারিত করিয়া প্রভূত উৎকোচের বিনিময়ে জামাতা কাশীমালী খাঁ (মীরকাশিম)কে মসনদে বসান। নবাব মীরজাফরকে গদী হইতে নামাইবার ষড়যন্ত্রে কয়েকজন হিন্দু ধুরন্ধরও যোগ দিয়াছিলেন। এই হীন ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিলেন ভ্যান্সিটার্ট। এই সময় ভ্যান্সিটার্টের হীন ও নীতি-বিগর্হিত ষড়যন্ত্রের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া কর্ণেল কুট, মেজর কর্ণাক প্রমুখ কোম্পানীর খ্যাতিসম্পন্ন সদস্য কোম্পানীর বিলাতস্থ ডিরেক্টারদিগকে একটি গোপন চিঠি লিখিয়াছিলেন (১১ই মার্চ্চ ১৭৬২ খৃঃ)। এই চিঠিতে ইহাও জানান "ভ্যান্সিটার্টের এই গর্হিত আচরণের জন্য জনসাধারণের মনে এরূপ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে যে, বর্দ্ধমান-রাজ প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিয়াছেন ও অন্যান্য জমিদারগণও আনুগত্য অস্বীকার করিয়াছেন। নবাবের সৈন্যগণও বিদ্রোহ করিতেছে এবং বলিতেছে যে, তাহারা কাশীমালী খাঁকে চেনে না। যদি গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ইহা প্রকাশ্য না বলিতেন যে, কাশীমালি খাঁ তাহাদিগকে ২০ লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিবেন তাহা হইলে আমরা স্বতঃই বিশ্বাস করিতাম যে, ভ্যান্সিটার্টের এই আচরণ এই দেশের সত্যকার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম না করার ফলে ঘটিয়াছে এবং ইহা বিচারের ভুল ছাড়া আর কিছু নয়।" এই চিঠির ভাষা অত্যন্ত স্পষ্ট। ইহা দ্বারা নিশ্চয়রূপে বুঝা যাইতেছে যে, বহু লক্ষ টাকা উপঢৌকনের লোভই ভ্যান্সিটার্টকে নবাব মীরজাফরকে মসনদ হইতে অপসারিত করিবার মূলে ছিল।

যাহা হউক নবাব মীরজাফরকে মসনদ হইতে নামাইয়া জামাতা মীরকাশিমকে সিংহাসনে বসাইবার বিনিময়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ মীরকাসিমের নিকট হইতে যে বিপুল অর্থ আদায় করেন তাহার পরিমাণও বিশ লক্ষের উপর। প্রাপ্ত তালিকায় সদাত্মা ভ্যান্‌সিটার্টের নাম নাই, নিশ্চয়ই তিনিও বাদ পড়েন নাই, সম্ভবতঃ তাঁহার কোঠায় বড় রকম অলিখিত অঙ্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কারণ এক যাত্রায় পৃথক ফল হইবার নহে। এই তালিকায় দেখা যায়—

| | |
|---|---|
| মিঃ সামার | ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা |
| মিঃ হলওয়েল | ৩ ,, ৯ ,, ৩ শত ৭০ টাকা |
| মিঃ ম্যাকওয়ার | ২ ,, ৬ ,, ২ ,, ৫০ ,, |
| মিঃ স্মিথ | ১ ,, ৫৩ ,, ৫ ,, ৪০ ,, |
| মেজর ইর্ক | ১ ,, ৫৩ ,, ৫ ,, ৪০ ,, |
| জেনারেল গেইল্যাণ্ড | ২ ,, ২৯ ,, ১ ,, ৬০ ,, |
| মিঃ ম্যাকওয়ার (৫ হাজার স্বর্ণমুদ্রা) | ৮৭ ,, ৫ ,, টাকা |
| | ১৪ লক্ষ ১৯ হাজার ৩ শত ৬০ টাকা |

ইহা ছাড়া নবাব মীরকাশিমকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে হইয়াছিল ৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।

নবাব মীরকাশিমের পতনের পর নবাব মীরজাফরকে পুনরায় নবাব নাজীমের মসনদে বসান হয়। ক্লাইভ বিলাত হইতে কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ কর্ত্তৃক মীরজাফরকে সিংহাসন ফিরাইয়া দিবার জন্য প্রেরিত হন। কারণ, কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ নবাব মীরজাফরের সহিত কোম্পানীর চুক্তির খেলাপ করিয়া মীরকাশিমকে গদী দিয়াছিলেন। এরূপ করিবার অধিকার কোম্পানীর কোনও কর্ম্মচারীর ছিল না, কারণ মীরজাফরের সহিত কোম্পানীর যে চুক্তি হয় তাহাতে এই সর্ত্ত অতি পরিষ্কার ভাবে উল্লিখিত হইয়াছিল যে, মীরজাফর নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের পর নবাব নাজিমের মসনদ পাইবেন এবং পুরুষানুক্রমে তাহা ভোগ করিবেন। মীরজাফরের যোগ্যতা অথবা অযোগ্যতার বিচার পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে যোগ্য বিবেচনা করিয়া পরে সুবিধামত অযোগ্য বিবেচনা করিয়া অপসারিত করিবার অধিকার কোম্পানীর কর্ম্মচারীর ছিল না। এক্ষেত্রে মীরজাফর সিরাজের প্রতি কি পরিমাণ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন তাহা বিচার্য্য নহে, এখানে কোম্পানী তাহার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করিতে অধিকারী কিনা, ইহাই বিচার্য্য। মীরকাশিমকে মসনদে বসাইয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই তাহার সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি ঝামেলায় লিপ্ত হওয়া বণিক কোম্পানীর বিলাতস্থ ডিরেক্টারগণ পছন্দ করিতেছিলেন না, সেইজন্য এক অনিশ্চিত সংশয়কর এবং শঙ্কাজনক অবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য লর্ড ক্লাইভকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। একটি কথা এই স্থানে লক্ষ্য করিবার আছে। ক্লাইভের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া ভ্যান্‌সিটার্ট প্রভৃতি কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ নবাব মীরজাফরকে গদী হইতে অপসারিত করিয়া কতকটা লাঞ্ছনা, কতকটা অপমানের মধ্যে তাহাকে অতি দ্রুত যে কলিকাতায় প্রেরণ করেন এবং সিংহাসনলোলুপ জামাতা মীরকাসিমকে মসনদে বসান, ইহার মূলে কি বৃদ্ধ নবাব মীরজাফরের অযোগ্যতা এবং তরুণ মীরকাশিমের কর্ম্মদক্ষতা ছিল? ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না যে, ইহার মূলে যে বস্তুটি রহিয়াছে তাহা হইতেছে কোম্পানীর হীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন কর্ম্মচারীদিগের অমানুষিক অর্থলিপ্সা ও মীরকাশিমকে গদীতে বসাইয়া আশু অর্থলাভ।

ক্লাইভ আসিয়া মীরজাফরকে পুনরায় মসনদে বসাইলেন সত্য, কিন্তু ইহার মূল্য বাবদ নবাবকে যাহা দিতে হইল তাহাও সামান্য নহে (১৭৬৩)। ইহার পরিমাণও প্রায় দেড় কোটী টাকা।

| | |
|---|---|
| সামরিক বিভাগ (স্থল) | ২৯ লক্ষ ১৬ হাজার ৬ শত ৬০ টাকা |
| ,, ,, (নৌ) | ১৪ ৫৮ |
| | ৪৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯ শত ৯০ টাকা |

ইহা ছাড়া নৌবিভাগের যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল (সম্ভবতঃ মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধে) তাহার দরুণ দেওয়া হয় ৯৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। মেজর মুনরোকে দেওয়া হয় ৩০ হাজার টাকা। মেজর মুনরোর অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণকে দেওয়া হয় ৩০ হাজার টাকা।

নবাব মীরজাফরের মৃত্যুর পর মণি বেগমের গর্ভজাত পুত্র নাজিমদ্দৌলা নবাব নাজিমের মসনদ প্রাপ্ত হন। মীরজাফরের ইচ্ছানুসারেই সিংহাসন মৃতপুত্র মীরণের বংশধারায় না বর্ত্তাইয়া নাজিমদ্দৌলাকে দেওয়া হয়।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য পিতার মৃত্যুর পর উপযুক্ত পুত্রের নির্ব্বিরোধ সিংহাসন প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও অর্থ চাই। কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ নাজিমদ্দৌলাকে মসনদে বসাইয়া ( ১৭৬৫ ) আর একদফা অর্থ শোষণ করেন। তাহার পরিমাণ এই তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে।

| | |
|---|---|
| মিঃ স্পেনসার | ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩ শত ৩০ টাকা |
| মেসার্স প্লেডেল বারডেট ও গ্রে | ৩ ,, ৫০ ,, টাকা |
| মিঃ জনষ্টন | ২ ,, ৭৬ ,, ৫ শত টাকা |
| মিঃ লিষ্টার | ১ ,, ৩১ ,, ২ ,, ৫০ টাকা |
| মিঃ সিনিয়র | ২ ,, ১ ,, ১ ,, ৫০ ,, |
| মিঃ মিডিল্‌টন | ১ ,, ৪২ ,, ৯ ,, ১০ ,, |
| মিঃ জনষ্টোন | ৫৮ ,, ৩ ,, ৩০ ,, |
| | ১৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪ শত ৭০ টাকা |

এই সময় লর্ড ক্লাইভ মণি বেগমের নিকট হইতেও ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩ শত ত্রিশ টাকা লন। সম্ভবতঃ মীরণের বংশধরগণকে উপেক্ষা করিয়া মণি বেগমের পুত্র নাজিমদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসাইবার ইহাই গোপন মূল্য। বস্তুতঃ দেখা যাইতেছে যে, ক্লাইভ দুই বারে, প্রথমবার মীরজাফরকে মসনদে বসাইয়া ( ১৭৫৭ ), দ্বিতীয় নাজিমদ্দৌলাকে সিংহাসন দিয়া ( ১৭৬৫ ) মোট ২৯ লক্ষ ২৩ হাজার ৩ শত ত্রিশ টাকা লন ইহার নজীর আছে। সুতরাং মাত্র ষোল লক্ষ টাকা লইয়াছি, ক্লাইভের এই উক্তি সত্য নহে। মণি-মুক্তা রত্নাদি তিনি গ্রহণ করেন নাই, শুধু কাঁচা টাকাই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার এ উক্তিও সত্য না হইতে পারে। যাহা হউক যে লিখিত হিসাব পাওয়া যাইতেছে তাহাই যথেষ্ট, অদৃশ্য হিসাব লইয়া গবেষণা না করিলেও চলিবে। সম্ভবতঃ অলিখিত পর্দ্দার আড়ালের হিসাবও আছে। বস্তুতঃ ইহা দেখা যাইতেছে যে, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে সুরু করিয়া ১৭৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই চৌদ্দ বছরে মুর্শিদাবাদ হইতে নিম্নলিখিত খাতে মোট ২৯ কোটী ৪৮ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯২ টাকা কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক লুট হইয়াছে। নিম্নলিখিত হিসাব তাহা সমর্থন করিবে।

| | |
|---|---|
| উপঢৌকন স্বরূপ | ২ কোটী ১৬ লক্ষ ৯৩ হাজার ৬ শত ৫০ টাকা |
| ক্ষতিপূরণ স্বরূপ | ৩ ,, ৪২ ,, ৮ ,, ২ ,, ৩০ ,, |
| সাময়িক ব্যয় স্বরূপ | ৫ ,, ৪০ ,, ২৩ ,, ৩ ,, ৩০ ,, |
| ছাঁকা রাজস্ব বাবদ | ১৮ ,, ৪৯ ,, ৮ ,, ৮ ,, ৮২ ,, |
| | ২৯ কোটী ৪৮ লক্ষ ৩৪ হাজার ০ শত ৯২ টাকা |

এই সকল কর্ম্মচারীগণ শেষ জীবনে বিলাতে তাঁহাদিগের বিপুল অর্থ ও বিত্তের জাঁকজমকে সে দেশের অধিবাসীর চক্ষু ধাঁধিয়া দিয়াছিলেন এবং বিলাতে ইঁহারা ভারতবর্ষের নবাব। (Indian Nababs) আখ্যা পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল সভ্য লুণ্ঠনকারীগণ খোস মেজাজে বহাল তবিয়তে তাঁহাদিগের পুণ্যার্জ্জিত ধন-সম্পত্তি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদিগের অপরাধ রাজদ্বারে গুরুতর শাস্তি পাইবার যোগ্য, কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জানিয়া শুনিয়াই ধ্যানস্থ ছিলেন। কারণ কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ তাঁহাদের মোটা লভ্যাংশ (Dividend) লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, যাহাতে অবাধ বাণিজ্য এবং সম্ভব হইলে রাজ্য লাভও ঘটে, সেদিকেই তাঁহাদিগের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ভারতবর্ষে কি দুর্ঘটনা ঘটিল, কি হাহাকার উঠিল, সে বিষয়ে দৃষ্টি দিবার অবকাশ বা ইচ্ছা তাঁহাদিগের ছিল না। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, লর্ড কর্ণওয়ালিশের পূর্ব্ববর্ত্তী কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ অনেকেই অখ্যাত কুলোদ্ভব ছিলেন, শুধু অসদুপায়ে উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা তাঁহারা দেশে ফিরিয়া কাঞ্চন-কৌলীন্য লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র। এদেশে উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে তাঁহারা বিবেকবর্জ্জিত ছিলেন। এরূপ নীতিহীন রাজত্বকাল ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায় নাই।*

* এই প্রবন্ধ রচনায় 'Indian Records between the British Government and the Nawabs Nazims', ও 'Murshidabad Mashnad' প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হইতে এবং ওর্ম, বক্তারিজ, মেকলে প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থ হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে। অঙ্কগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাউণ্ডে লেখা ছিল। দুশ টাকা হিসাবে পাউণ্ড ধরিয়া সেগুলি টাকায় রূপান্তরিত করা হইয়াছে।—লেখক

# কুম-ব্রত

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়

কুম-ব্রত কুমারী মেয়েদের ব্রত। ইহার অনুষ্ঠান নানা স্থানে নানা ভাবে সম্পন্ন হইয়া, নানা নামে প্রচলিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানেই ইহাকে কুম-ব্রত বা রাইল ঠাকুরের পূজা বলে।

এই ব্রতে মূর্ত্তি, মন্ত্র, নৈবেদ্য—সবই আছে; কিন্তু পুরোহিত নাই। মেয়েলি ছড়াই হইল এই ব্রতের মন্ত্র। মাঘ মাস ভরিয়া প্রতিদিন পুকুর পাড়ে এই ব্রতের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

আমাদের ছেলেবেলায় এই ব্রত যে সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইতে দেখিয়াছি, এখন আর তাহা নাই। এমন কি এখন আর ইহার অস্তিত্বের কথাই অনেকে জানেন না, কেবল অনেক বর্ষীয়ানদের স্মৃতিতে আর ঠাকুরমা স্থানীয়ারা তাঁহাদের নাতনীদের লইয়া কোথাও কদাচিৎ এই ব্রতের শেষ শিখাটীকে জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন মাত্র। এই ভাবে অনেক মেয়েলি ব্রত, ছড়া, কথা-কাহিনী একে একে আমাদের দেশ হইতে লোপ পাইয়া যাইতেছে।

আমাদের গ্রামে যে ভাবে ইহার অনুষ্ঠান দেখিয়াছি, সেই বাল্যস্মৃতিকে সম্বল করিয়াই এই ব্রত সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি।

এই ব্রতের বিশেষত্বটী ছিল এই যে, পাড়ায় বালক-বালিকাদের পরস্পরের সহযোগিতায়ই ইহা সম্পন্ন হইত, এবং সারল্যপূর্ণ ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ স্থাপনের ইহা ছিল একটী সূত্রপাত।

বৈকালে বালকবালিকারা মিলিয়া ফুলের সাজি লইয়া পাড়ায় ফুল সংগ্রহ করিতে বাহির হইত। এই ফুলের মধ্যে গাঁদা, অতসী, পলাশই ছিল প্রধান। ফুল সংগ্রহ হইলে যে যাহার বাড়ীতে গিয়া মূর্ত্তির জন্য পুকুর পাড় হইতে কাদামাটি তুলিয়া আনিত। পরে কাদা ছানিয়া একটি পিড়ির উপর অনেকটা বৌদ্ধস্তূপের মত প্রায় এক হাত পরিমাণ একটী মঠ প্রস্তুত করিত, ছোটবড় নির্ভর করিত যেদিন যতটা ফুল সংগ্রহ হয় তাহার উপরে। স্তূপটী ফুল গুজিয়া এমনভাবে সাজান হইত, যাহাতে কোন ফাঁকে মাটি দেখা না যায়, চূড়াতে থাকিত নবদূর্ব্বার গুচ্ছ। ইহাকেই বলে কুম, এই ব্রতের মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির গড়ন ও সাজাইবার মধ্যে ছিল সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয়, কোন্ রঙের ফুলের পর কোন্ রং সুন্দর মানাইবে, তাহার বিচার, আর চলিত ফুল সংগ্রহের ব্যাপার লইয়া হাসাহাসির পালা, কোন ছেলে কোথায় তাড়া পাইয়া হোঁচট্ খাইয়া কেমনভাবে পড়িল, কাহার কাপড় কোন খোঁটায় লাগিয়া ছিঁড়িয়া গেল—ইত্যাদি।

কাপড় ছেঁড়ার জন্য মা ও দিদিদের বকুনির ভয় তখন তেমনভাবে মনে স্থান পাইত না, দুঃসাহসিক কাজের আলাপ-আলোচনায় মন থাকিত ভরপুর। কুম সাজান হইলে, কোন উঁচু স্থানে খোলা শিশিরে রাখা হইত। মূর্ত্তি গড়া ও সাজানর কাজ করিত যে যাহার বাড়ীর উঠানে বসিয়া।

পরদিন খুব ভোরে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পাড়ার ব্রতচারিণীরা কুম ও নৈবেদ্য সঙ্গে করিয়া নির্দ্দিষ্ট পুকুর পাড়ে আসিয়া যে যাহার কুম জলের ধারে সারবন্দি করিয়া রাখিতেন—এইভাবে সমস্ত মাঘ মাসটী পাড়ার বালকবালিকা ও শিশুর আনন্দ কোলাহলে নীরব পুকুর পাড়টী একেবারে মুখরিত হইয়া উঠিত।

প্রত্যেক ব্রতচারিণীকে পাঁচ বৎসর এই ব্রত যাপন করিতে হইত, তাহার পূর্ব্বে যদি কাহারও বিবাহ হইত, তবে বাকি কয় বৎসর শ্বশুরালয়ে বা পিত্রালয়ে তাঁহাকে তাহা যাপন করিতে হইত। আমার বড় বৌঠাকুরাণীকে দেখিয়াছি, আমার বোনদের সঙ্গে তিনি আমাদের বাড়ীতে এক বৎসর কুম'ব্রত করিয়াছিলেন।

পুকুর পাড়ে সকলে আসিয়া জড় হইলে, আরম্ভ হইত সম সুরতালে ব্রতের মন্ত্র বা ছড়া, তাহাতে মেয়েরা যোগ দিত সকলেই।

সেই সব ছড়া এইখানে তুলিয়া দিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখ হয়। যাহা স্মরণ পথে জাগে, তাহাও এমন অসম্পূর্ণ ও অসংলগ্ন যে, যাহার কোন সূত্র খুঁজিয়া পাই না, প্রকৃতপক্ষে সেই সব ছড়ায় কোন ভাবসূত্র ছিল কিনা সন্দেহ, তবে পরিবারবর্গের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করিয়া, প্রত্যক্ষগত বস্তুর সঙ্গে এলোমেলোভাবে তুলনামূলক, তাহা ছিল সুরে ছন্দে গাঁথা। দুইটী অংশ এইখানে তুলিয়া ধরিতেছি।

যে দিন কুয়াশায় সব একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত, সেইদিন এই ছড়াটী হইত।

"ওঠ ওঠ সূর্য্য ঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া;
উঠিতে না পার, শিশিরের লাগিয়া—"

আর প্রতিদিন সব ছড়ার শেষে এই ছড়াটী হইত—

"আজ যাও না ওরে, কাল এয়ো
বৎসরে বৎসরে, একটী দেখা দিও—"

ছড়ার পালা সব শেষ হইলে, আরম্ভ হইত প্রতিমা বিসর্জ্জনের প্রতিযোগিতার পালা। কার প্রতিমা কে কত দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে তার জন্য চলিত প্রবল প্রতিযোগিতা। এই কাজটী ছিল বালকদের। ব্রতচারিণীরা যে যাঁহার প্রতিমা বিসর্জ্জনের জন্য বালকদের ভিতর হইতে যে যাহাকে মনোনীত করিয়া লইতেন—যাহার যখন প্রতিমা বিসর্জ্জন হইত, সেই তখন করজোড়ে একটী ফুল হাতে করিয়া দাঁড়াইতেন প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করিয়া ফুলটী জলে নিবেদন করিতেন।

এইভাবে একের পর একে প্রতিমা সব বিসর্জ্জিত হইয়া গেলে আরম্ভ হইত নৈবেদ্য বিতরণের পালা। সকলের চাল, কলা, কমলা, কুল, তিলা সব একত্র করিয়া মাখিয়া তাহা পুকুর পাড়ে উপস্থিত সকলের হাতে হাতে বিতরণ হইত। এইভাবে প্রতিদিন ভোরে পুকুর পাড়ের ব্রত শেষ করিয়া যে যাহার কাজে, পড়াশুনায় বসিয়া যাইত। আবার বৈকাল হইতে আরম্ভ হইত ব্রতের আয়োজন. এইভাবে চলিত প্রতিদিন সমস্ত মাঘ মাসটা। পাড়ার বালকবালিকা ও শিশুরা. হইয়া থাকিত একেবারে মাতোয়ারা, কারণ ইহার কর্তৃত্ব হইল সব তাঁহাদেরই।

মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিনে হইত এই ব্রতের সাঙ্গ, সেই অনুষ্ঠানটী হইত বাড়ীর আঙ্গিনায় সন্ধ্যার পর, সেই দিন হইত বেশ সমারোহ।

ভোরে আঙ্গিনাটী সমানভাবে নিকাইয়া দুপুরের পর হইতে আরম্ভ হইত আঙ্গিনা জোড়া আলিপনা। তাহাতে নানা রঙের গুড়াও ব্যবহার হইত, যেমন ইট, কাঠ কয়লা, হলুদ—রঙের মধ্যে পিটিলি গোলা, সিম প্রভৃতি পাতার রস—বিচিত্র রংয়ের সুন্দর আলিপনায় সমগ্র আঙ্গিনাটী শোভাতে একেবারে ভরিয়া উঠিত। এই কাজের জন্য ডাক পড়িত পাড়ার সেই সব মহিলাদের—যাদের চিত্রকলায় সৌন্দর্য্যবোধ আছে। সেইদিনের যে ব্রত, তাহার প্রধান অংশই ছিল আল্পনা—ব্রতচারিণীকে সমস্ত দিন উপবাস থাকিতে হইত। সন্ধ্যার পর পুরোহিত ঠাকুর আসিয়া পূজা করিয়া যাইতেন, শেষ দিনই ছিল একমাত্র পুরোহিত ঠাকুরের পূজা—সেই দিনের পূজাকে বলা হইত তারা ব্রত।

পূজা শেষে ব্রতচারিণী পাড়ার উপস্থিত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিবার সময় পূজনীয়, স্বর্গীয় সকলকে প্রণাম করিতেন। প্রসাদের পাত্র ছিল আলিপনাময় মাটির সড়া, তাহাতে মুড়কী, মোয়া, ফল থাকিত। সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ হইয়া গেলে, ব্রতচারিণী সমস্ত দিন পর আহার গ্রহণ করিতেন।

সেই দিনটী পাড়ার ছেলেমেয়ে, বালক, বৃদ্ধ সকল পূজা-বাড়ীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রসাদ গ্রহণ ও আলিপনা দেখিয়া বেড়াইতেন।

ইহাই হইল কুম-ব্রতের মোটামুটি কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই ব্রতের অনুষ্ঠান নানা স্থানে নানা নামে নানাভাবে হইয়া থাকে। ইহা কোন শাস্ত্রসম্মতভাবে না হইয়া দেশাচাররূপে হইয়া থাকে ইহার অনুষ্ঠান।

এখন গ্রাম হইতে এই ব্রত প্রায় লোপ পাইয়া গিয়াছে। পাড়ার বালকবালিকা ও শিশুরা মিলিয়া পরস্পরের সহযোগিতায় উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে মাস ভরিয়া যে ব্রতের অনুষ্ঠানটী করিত, তাহা ছিল সারল্যপূর্ণ মধুর সম্বন্ধে ভরপুর।

# যুদ্ধ ও ভারতীয় শিল্প-প্রসার

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

ইউরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একটা অনিশ্চিত আশঙ্কার ছায়াপাত হয়েছিল। শিল্প ও বাণিজ্যের বিভিন্ন বিভাগে আমরা বিদেশী বাজারের উপর যথেষ্ট মুখাপেক্ষী। ভারতে শিল্প-প্রসার সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে আজ একটা চৈতন্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখনও অনেক প্রয়োজনীয় শিল্পের দিক্ দিয়ে আমরা পশ্চাৎপদ হয়ে রয়েছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বলতে পারি যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের শিল্প, রাসায়নিক শিল্প ও যানবাহন প্রস্তুতের শিল্প প্রভৃতি আজ এদেশে একেবারেই গড়ে, ওঠে নি। যদিও কাঁচা মাল ও আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতির অভাবে বর্ত্তমানে ভারতের নানা শ্রেণীর শিল্প একটা বিশেষ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে তথাপি প্রয়োজনের তাগিদে ছোট-বড়-মাঝারি বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে আজ কাঁচা মাল ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করবার দিকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। বিদেশ থেকে আমদানী প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্যের অভাব হেতু আজ ভারতীয় শিল্পকে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে সত্য, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় শিল্প-প্রসারের একটা মহান্ সম্ভাবনাও আজ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। যুদ্ধের জন্য আজ বহু শিল্পোন্নত দেশ কিছুকাল শিল্পসাধনায় মনোযোগ দিতে পারবে না, বিদেশী প্রতিযোগিতার প্রভাব স্বভাবতঃই শিথিল হয়ে আসবে। যুদ্ধের কর্ম্মব্যস্ততায় বিদেশী শিল্পপ্রধান দেশগুলির নিশ্চেষ্টতার সুযোগে ভারতকে তার অর্থনৈতিক মুক্তির পথ খুঁজতে হবে।

যুদ্ধ বাধবার পর ভারতের কর্ত্তৃপক্ষমহল এদেশের প্রয়োজনীয় শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে প্রায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন বলা যায়। সম্প্রতি জনমতের চাপে ভারত সরকার এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি দিয়েছেন। ভারত সরকার সম্প্রতি 'বোর্ড অফ সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ্চ' নামে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছেন। দেশের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও কৃতী ব্যবসায়ীদের নিয়ে এই বোর্ড গঠিত হয়েছে। কিছুদিন হ'ল দিল্লীতে এই বোর্ডের প্রথম অধিবেশন হয়ে গেল। প্রকাশ, ভারতের বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় দু'শো গবেষণা স্কীম বোর্ডের সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল। বোর্ড বিশেষ বিবেচনার পর ১২টি গবেষণা স্কীম সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। যে সব বিষয়ে গবেষণার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে তার মধ্যে ক্ষারদ্রব্য ও সার তৈয়ারের শিল্প, ঔষধ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও গন্ধক প্রভৃতি প্রস্তুতের শিল্প স্থান পেয়েছে। তাছাড়া শিল্পের জন্য উদ্ভিজ্জ তৈল ও মাৎগুড় ব্যবহারের সুযোগ ও সুবিধা, কৃত্রিম রেশম তৈয়ারের কাঁচা মাল পাওয়ার সুব্যবস্থা এবং এদেশে রং প্রস্তুত সম্বন্ধে গবেষণার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধ প্রায় বৎসরকাল স্থায়ী হতে চলেছে। সম্প্রতি ভারত সরকার গত মার্চ্চ পর্য্যন্ত যুদ্ধের প্রথম সাত মাসে এদের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ এবং গত এপ্রিল পর্য্যন্ত আট মাসের বহির্ব্বাণিজ্যের বিবরণ প্রকাশ করেছেন। এই বিবরণী থেকে ভারতের শিল্প-ব্যবসায়ের গতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যেতে পারে।

## বস্ত্রশিল্প

ভারতের বিভিন্ন প্রকার শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্পের স্থান আজ সব দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধের ফলে এই শিল্পের বিস্তার ও উন্নতির একটা সুযোগ আসবে, একথা অনেকেই মনে করেছিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তা ঘটে ওঠে নি। ১৯৩৯-৪০ সাল আরম্ভ হওয়ার সময় থেকেই ভারতের কাপড়কলগুলিতে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় যথেষ্ট কম হচ্ছিল, যুদ্ধ বাধবার পরও এদিক দিয়ে কোন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। গত সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এই ছয়মাসে ভারতের কাপড়কলগুলিতে মোট ১৯৬ কোটী ৩৪ লক্ষ গজ কাপড় উৎপন্ন হয়েছে। অথচ ১৯৩৮-৩৯ সালের উপরোক্ত ছয় মাসে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ ছিল ২১২ কোটী ৮২ লক্ষ গজ। উৎপাদনের দিক দিয়ে ভারতীয় কলগুলির আজ এই অবস্থা। আমদানী ও রপ্তানীর ব্যাপারে সম্প্রতি কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৩৯ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত ৮ মাসে বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে ১০ কোটী ২৫ লক্ষ ৯ হাজার টাকার কাপড় আমদানী হয়েছিল। ১৯৩৯,৪০ সালের উপরোক্ত কয়মাসে ৯ কোটী ৫৬ লক্ষ ৮ হাজার টাকার কাপড় আমদানী হয়েছে। যুদ্ধের এই কয় মাসে আমদানীর অঙ্ক আরও হ্রাস পাবে আশা করা গেছিল কিন্তু তা হয়নি তবে রপ্তানী বাণিজ্যের দিক্ দিয়ে একটা আশার আলো আজ দেখা যাচ্ছে। ১৯৩৮-৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত ৮ মাসে

ভারতবর্ষ থেকে বাইরে ৪ কোটী ৬৭ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকার কাপড় রপ্তানী হয়েছিল, সেই জায়গায় ১৯৩৯-৪০ সালের উপরোক্ত সময়ে রপ্তানীর পরিমাণ ৬ কোটী ৩১ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকার উপর দাঁড়িয়েছে।

## চট শিল্প

চট শিল্পের উপর যুদ্ধের প্রভাব নানাদিক দিয়ে অনুকূল হয়েছে। যুদ্ধ সুরু হবার পর থেকে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কলগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। ১৯৩৮-৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসে ভারতীয় চটকলগুলিতে মোট ৫ লক্ষ ৫৪ হাজার টন ওজনের থলে ও চট উৎপন্ন হয়েছিল। এ বছর উপরোক্ত ছ' মাসে ৬ লক্ষ ৭৯ হাজার টনের উপর থলে ও চট উৎপন্ন হয়েছে। বিদেশে রপ্তানীর দিক দিয়েও গত বৎসরের তুলনায় যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। ১৯৩৮-৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত ৮ মাসে ১৭ কোটী ৯২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার থলে ও চট রপ্তানী হয়েছিল। এবার উপরোক্ত আট মাসে ৮ কোটী ২১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকার থলে ও চট বিদেশে রপ্তানী হয়েছে। সম্প্রতি বাংলা সরকারের অদূরদর্শিতার ফলে একটা হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পাটের বাজার চড়াবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি বাংলা গবর্ণমেণ্ট ৫৭।৫৮ টাকা দরে ৫০ হাজার বেল পাট ক্রয় করেছেন। এবার জগতে যত পাটের প্রয়োজন তার চেয়ে শতকরা ৬০ ভাগ বেশী পাট উৎপন্ন হবে। এই অবস্থায় মন্ত্রীমণ্ডলীর এই কার্য্যের ফলে কৃষককুলের যে কোন উপকার হবে তা আশা করা যায় না, বরং এর ফলে সরকারী রাজস্বের ১৪।১৫ লক্ষ টাকা অপচয় হবে।

## লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে এ দেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেরও কিছু উন্নতি দেখা গেছে। এখন পূর্ব্বের তুলনায় বেশী পরিমাণ লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন হচ্ছে। অধিকন্তু একদিকে ঐ শ্রেণীর দ্রব্যের আমদানী হ্রাস ও অপরদিকে তার রপ্তানী বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।

## শর্করা শিল্প

বর্ত্তমান যুদ্ধ শর্করা শিল্পের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করবে তা এখন বলা যায় না। ইউরোপীয় বাণিজ্য বাধা পাওয়ার ফলে ভারতে জাভা চিনির আমদানী বেশী পরিমাণ বাড়বার সম্ভাবনা আছে। এবারে গত বৎসরের তুলনায় ভারতে বেশী চিনি উৎপন্ন হয়েছে অথচ তত বেশী চিনি এ দেশে কাটতি হবার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া বিদেশী চিনির আমদানী প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে। যুদ্ধের ফলে বিদেশে ভারতীয় চিনি রপ্তানীর পক্ষে একটা অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে, বলা যেতে পারে।

## চা শিল্প

বর্ত্তমানে চায়ের রপ্তানী বাণিজ্যের উপরেই এই শিল্পের কল্যাণ নির্ভর করছে। এই দিক দিয়ে আজ আশান্বিত হয়ে ওঠবার কারণ ঘটেছে। কারণ বর্ত্তমানে বিদেশে চায়ের রপ্তানী উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত ৮ মাসে ভারত থেকে বিদেশে মোট ১৫ কোটী ৪০ হাজার টাকার চা রপ্তানী হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে এবার উপরোক্ত আট মাসে ১৮ কোটী ২০ লক্ষ ৪১ হাজার টাকার চা রপ্তানী হয়েছে।

## কয়লা শিল্প

যুদ্ধের সময়ে কয়লা শিল্পেরও উৎপাদন ও রপ্তানী সম্পর্কে উন্নতি সাধিত হয়েছে। গত ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৭ মাসে ভারতবর্ষে ১ কোটী ৪৬ লক্ষ ৭৩ হাজার টন কয়লা উৎপন্ন হয়েছিল, এবার উপরোক্ত সাত মাসে ১ কোটী ৫১ লক্ষ ৪৬ হাজার টন কয়লা উৎপন্ন হয়েছে। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৩৯ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত আট মাসে ভারত থেকে মোট ৯৮ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকার কয়লা বিদেশে রপ্তানী হয়েছিল। সে জায়গায় ১৯৩৯-৪০ সালের উপরোক্ত ৮ মাসে ১ কোটী ৩৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকার কয়লা বিদেশে রপ্তানী হয়েছে।

## কাগজ শিল্প

যুদ্ধের ফলে বিদেশী কাগজের আমদানী যথেষ্ট কমে গেছে। বর্ত্তমানে ভারতে বেশী পরিমাণ কাগজ উৎপাদনের চেষ্টা চলেছে। এদিক দিয়ে বর্ত্তমানে কিছু আশা ভরসার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। গত ১৯৩৮ সালেও সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ছ' মাসে ভারতবর্ষে ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার হন্দর পরিমাণ কাগজ উৎপন্ন হয়েছিল। ১৯৩৯-৪০ সালের উপরোক্ত কয় মাসে সেই জায়গায় ৭ লক্ষ ৪ হাজার হন্দর পরিমাণ কাগজ উৎপন্ন হয়েছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে News print তৈয়ারী করবার জন্য একটা প্রচেষ্টা চলেছে।

সাধারণভাবে দেখতে গেলে—যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের এই প্রধান প্রধান শিল্পগুলির কিছু উন্নতি হয়েছে; কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও যুদ্ধের ফলে নানা দিক্ দিয়ে উৎপাদনের ব্যয় বেড়ে গেছে এবং তার উপর আছে ট্যাক্সের গুরুভার—এই সব বহন করে ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নতির পথে কতদূর অগ্রসর হবে, তা বলা কঠিন। ভারত সরকার গত মার্চ্চ পর্য্যন্ত যুদ্ধের প্রথম সাত মাসের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ এবং গত এপ্রিল পর্য্যন্ত আট মাসের বহির্ব্বাণিজ্যের বিবরণ প্রকাশ করেছেন। বর্ত্তমান আলোচনা তারই উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, অক্টোবরের প্রায় শেষ ভাগ থেকেই ইউরোপীয় যুদ্ধের গতিবেগ মন্দীভূত হতে থাকে। সুতরাং এই সময় ভারতীয় আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যকে খুব বেশী বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। সরকারী রিপোর্টে এই ক'মাসে ভারতীয় আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের যে উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে উল্লসিত হবার কিছুই নেই। মার্চ্চ মাস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে আবার প্রচণ্ড সংঘর্ষ সুরু হয়েছে এবং এই কয় মাসে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের সন্মুখে একটা প্রবল বাধার সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের আগামী রিপোর্টে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রকৃত স্বরূপ অনেকটা পরিস্ফুট হতে পারে।

# রাজর্ষিত্বের সাধনা

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

জাতীয়তাবাদী ভারত আজ পশ্চিমের গণতন্ত্র ভাবের ভাবুক হইয়াছে। তাই রাজতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্র আজ ইউরোপীয় ইতিহাসেরই অনুরূপ অতীতের অন্ধ-যুগ-সুলভ রাষ্ট্রীয় সংস্কারেরই জের বলিয়া আমরা ঘোষণা করিয়া থাকি। এই feudal age-এর ধ্বংস-চিহ্ন সব এদেশে এখনও জাঁকিয়া রহিয়াছে ভাবিয়া আমরা নিজেরা লজ্জা অনুভব করি ও বহির্জ্জগতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াও থাকি। পক্ষান্তরে, স্বয়ং ইউরোপে গণদেবতার পূজা রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণে কোথাও সফলকাম হইলেও, প্রতিক্রিয়ায় ক্রমে ক্রমে যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে, তাহা দেখিলে কে না স্বীকার করিবে—ইহা মানবজাতির তপ্ত কটাহ হইতে অগ্নিকুণ্ডেই ঝম্পপ্রদান করা হইতেছে। ইউরোপে আজ যে ডিক্টেটারী শাসন, তাহা একচ্ছত্র রাজশক্তিকেও হার মানাইয়াছে। ইহা প্রকৃতির কোন নীতির প্রতিক্রিয়া—কিন্তু সে প্রতিক্রিয়া কি রুদ্র, নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর। সারা ইউরোপের মানচিত্র খুঁজিয়া দেখি—আটলান্টিকের উপকূল হইতে ভূমধ্যসাগর, ভূমধ্যসাগর হইতে উত্তরমেরু সমুদ্র ও প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ভূভাগে—ডিক্টেটর আর ডিক্টেটর—মুসোলিনী, হিটলার, ফ্রাঙ্কো, কমিনিউষ্ট রুষিয়ার ষ্ট্যালিন, মায় তাঁবেদার ডিক্টেটর মার্শ্যাল পেতাঁ পর্য্যন্ত—ইঁহাদের প্রভাবপ্রতিপত্তি অথবা একচ্ছত্র শাসন, ইহাই আজ ইউরোপীয় রাষ্ট্রের স্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান গণতন্ত্রের শিক্ষাগুরু ইউরোপে গণতন্ত্র আজ সমাহিত, কোন অতল ভূগর্ভে প্রলীয়মান কে বলিবে! যাহা আজ লক্ষ্য হয়, তাহা গণপতির মঙ্গলবিগ্রহ নয়, হস্তিতুণ্ডের শুণ্ডাস্ফালন। আমরা তটস্থ চিত্তেই ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

ভারতের রাষ্ট্রেতিহাসেও গণতন্ত্র একেবারে নূতন কথা নয়। বৌদ্ধ যুগ, তৎ-পূর্ব্ব আর্য্য-যুগেও যে নানা শ্রেণীর শাসনতন্ত্রের প্রচলন দেখা যায়, তন্মধ্যে গণতন্ত্র অন্যতম ছিল—ইহা অধ্যাপক জয়স্বাল, কাহা প্রমুখ ঐতিহাসিক গবেষণাকারিগণ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের প্রধানতম রাষ্ট্রনেতৃগণ এই শাসন-বিধির পরীক্ষায় সম্ভবতঃ পরিতুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাই গণতন্ত্রের আদর্শের পরিবর্ত্তে রাজচক্রবর্ত্তীর আদর্শই এদেশে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল এবং "এক ধর্ম্মরাজ্য-পাশে খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতকে" বাঁধিবার একটা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা আমরা স্বয়ম্ভূ মনু হইতে আরম্ভ করিয়া সম্রাট্ প্রতাপাদিত্য পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতে চলিয়া আসিয়াছে—ইহাই দেখিতে পাই। ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিভা গণতন্ত্র বনাম রাজতন্ত্র প্রশ্নের বিচারে শেষোক্তকেই যে বরণীয় সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, আমাদের কালজয়ী ইতিহাসই তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। ইংরাজ-গুরুর চরণতলে আজ আমরা অবশ্য নূতন ভাবে ভাবিতে সুরু করিয়াছি। এ শিক্ষা-নবীশীর পরিণাম কি, তাহা আমরা জানি না—এমন কোন মনীষীই নাই, যিনি এ সম্বন্ধে স্পর্দ্ধাভরে নিঃসংশয়িত ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারেন।

আমার আলোচ্য আজ এই প্রশ্ন নয়। ভারত-মাতৃকাকে ভালবাসিয়া, ভারতের শাস্ত্র, ঐতিহ্য, মর্ম্মকে বুঝিবার ও চিনিবার স্বতঃই একটা অনুপ্রেরণা শিশুকাল হইতে আমায় মাতাইয়া রাখিয়াছে। এই আকুল অনুপ্রেরণা লইয়া সর্ব্বত্র যাওয়া-আসা; সর্ব্বকর্ম্ম ও ঘটনার সূত্রে ভারত-কৃষ্টি ও সাধনারই মর্ম্মপরিচয় লওয়া। সেদিন পঞ্চম মাসিক প্রবর্ত্তক রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে পরম পূজনীয় সঙ্ঘগুরুর সহিত বর্দ্ধমানে আমাদের যাইতে হইয়াছিল ও এক রাত্রি, এক দিন বর্দ্ধমান মহারাজাধি-রাজার সাদর আতিথ্যে রাজভবনেই কাটাইতে হইয়াছিল—ঘটনার নেপথ্যে ভারতৈতিহ্যেরই একটা অনাবিল স্পর্শ রুদ্ধ চিন্তার দুয়ার খুলিয়া দিল—যে ভাবনা জাগাইল, তাহারই একটু আভাস এখানে দিব। অবশ্য ভাবনা

ভাবনা মাত্র, সিদ্ধান্ত নহে—ইহা গোড়ায় বলিয়া রাখা ভাল। তবে দেশ-সাধকদের রাষ্ট্রচিন্তা নিতান্ত অন্ধ গোঁড়ামীমূলক না হইলে, সকল প্রকার দিগ্দর্শনে কুণ্ঠিত হইবে না, ইহা নিশ্চয়ই আশা করিব।

বর্দ্ধমান রাজবংশ—খুব প্রাচীন রাজবংশ না হইলেও, প্রায় চারি শতাব্দীর ঐতিহাসিক বংশ। খৃষ্টীয় ১৭শ শতকের প্রথমভাগে লাহোর হইতে এক ক্ষত্রিয় রাজপুত বীর সপরিবারে পুরীধামে জগন্নাথ দর্শন করিতে যাত্রা করেন এবং ফিরিবার পথে বর্দ্ধমানের অনতিদূরে শস্য-শ্যামল ভূখণ্ডের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া "ইয়ে বৈকুণ্ঠ হৈ" বলিয়া সেই ক্ষেত্রেই নূতন বসতি স্থাপন করেন। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বৈকুণ্ঠপুরকে ঘিরিয়া ক্রমে ক্রমে বিশাল বর্দ্ধমানরাজ্য গড়িয়া উঠে জমিদার হইলেও, বাংলার ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে ধনে, মানে, প্রতিপত্তিতে বর্দ্ধমানাধীশ্বর সর্ব্বপ্রধান এবং মহারাজাধিরাজ তিলকচাঁদ হইতে বংশ-পরম্পরাক্রমে ভারত-গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহারা মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত হইয়া আসিতেছেন।

বর্দ্ধমান রাজপরিবারের পুরুষানুক্রমিক রাজপুরুষগণ

কাজেই বর্দ্ধমানপতিকে হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজশক্তির অন্যতম প্রতীকরূপে গণ্য করিলে অন্যায় হইবে না।

প্রবর্ত্তকের জয়ন্তী সভায় পৌরোহিত্য-পদ গ্রহণ করিয়া, মহারাজাধিরাজা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট পূর্ব্বেই বংশ-গোপাল টাউন-হলে উপস্থিত হইলেন। আমাদের সভার ব্যবস্থা তাঁহার মনোমত হয় নাই—তিনি স্বয়ং আসনগুলির অদল-বদল করিয়া লইলেন। নিজের সমৃদ্ধ চেয়ারখানি সরাইয়া দিলেন—শ্রদ্ধেয় অতিথির জন্য, কুমারের জন্য চিহ্নিত আসনখানিও এইরূপে কাড়িয়া লইলেন ও অন্য ব্যবস্থা করিলেন। তাঁর বিরাট্ উপস্থিতি ও অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য ঢালিয়া দেখিতে দেখিতে সমগ্র সভাক্ষেত্রটী ধর্ম্মগুরুর যোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধার আব্হাওয়ায় তিনি ভরপুর করিয়া তুলিলেন। ইহার কয়েক মিনিট পরেই শ্রদ্ধেয় মতিবাবু সভায় প্রবেশ করিলে, সভাসহ মহারাজা-ধিরাজ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন ও সশ্রদ্ধায় আসনে বসাইলেন। প্রধান বক্তার বক্তৃতাশেষে মহারাজা তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে সংক্ষেপে

সন্ন্যাসী বেশে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ্‌ মহাতাব

বলিলেন—"মতিবাবুর কথার সার মর্ম্ম—কর্ম্ম ব্রহ্ম। এই বিশুদ্ধ ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ করিয়া প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ ভাগবত জাতিগঠনে অগ্রসর হইয়াছে। এই সঙ্ঘের প্রকৃত ভাব—spiritকে—উপলব্ধি করিতে হইলে, ইহার মূলকেন্দ্রে গিয়া তাহা অনুভব করিয়া আসিতে হইবে। আর মতিবাবু আমাকে অগ্রজ বলিয়া মান্যদান করিয়াছেন, আমি এই রাখীপূর্ণিমার দিন উদাত্ত কণ্ঠেই ঘোষণা করিব—দ্বাপরে হলধর যেমন কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুজ হইলেও ভগবান বলিয়া পূজা করিয়াছিলেন, আমিও তাঁহাকে সেইরূপই হৃদয়ের সর্ব্বোত্তম শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।"

সভা শেষ হইয়া গেল। মহারাজাধিরাজ ভিন্ন যানে রাজবাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন—আমরাও তাঁহার মিনার্ভা-কারে যথাস্থানে ফিরিলাম। রাত্রে প্যালেস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সুরেনবাবু এক গুচ্ছ গ্রন্থ উপহার দিয়া গেলেন—মহারাজার স্বরচিত গ্রন্থ। সাহিত্যে—নাট্যে, কাব্যে—তাঁহার এই অবদানগুলির কথা আমার পূর্ব্বে জানা ছিল না—তাই একটু বিস্মিত হইয়াছিলাম। সাগ্রহে তখনই তাহা উল্টাইতে বসিয়া গেলাম।

যে মনীষী বলিয়াছিলেন মানুষকে হৃদয়-ভাব গোপন করিবার জন্যই ভগবান ভাষা দিয়াছেন, তাঁহার কথা অশ্রদ্ধেয়। একখানি বই খুলিয়া কয়েক পাতা চোখ বুলাইতেই এই কথা মনে জাঁকিয়া উঠিল। কৌতূহল ও আগ্রহ আরও বাড়িল। এই কবিতার অনাবিল নির্ঝরিণী ভাষার দিক্ দিয়াও যেমন মধুর, সুপাঠ্য, তেমনি অন্তর্নিহিত ভাবপ্রবাহে যে ভাবুকের প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও কি স্বচ্ছ গরিমাপূর্ণ! কাব্য ও নাট্য, উভয়ের মধ্য দিয়া ছন্দোবন্ধে একজনেরই প্রতিচিত্র—সে কি মহারাজা স্বয়ং? আমার মনে হইল—না—মহারাজা প্রতীক, এ প্রাচীন ভারতের কোন রাজর্ষির আত্মচিত্র। ভারতের রাষ্ট্রসাধনার পিছনে যে চিরন্তন রাজর্ষির তপস্যা ও আদর্শ, এই লেখার প্রতি ছত্রে তাহাই যেন রূপায়রে ফুটিয়া উঠিতে চাহিয়াছে। এ সাহিত্য শুধু কবির ভাব-বিলাস নহে, সাধকেরই মর্ম্মোচ্ছ্বাস, অন্তরের নৈবেদ্য—সাধনার অন্তর্দৃষ্টি লইয়া দেখিলে, ইহা ধরা পড়িতে একটুও বিলম্ব হইবে না। আমি শ্রদ্ধেয় লেখকেরই ভাষা ঋণ লইয়া আমার বলিবার কথাটী ব্যক্ত করার চেষ্টা করিব।
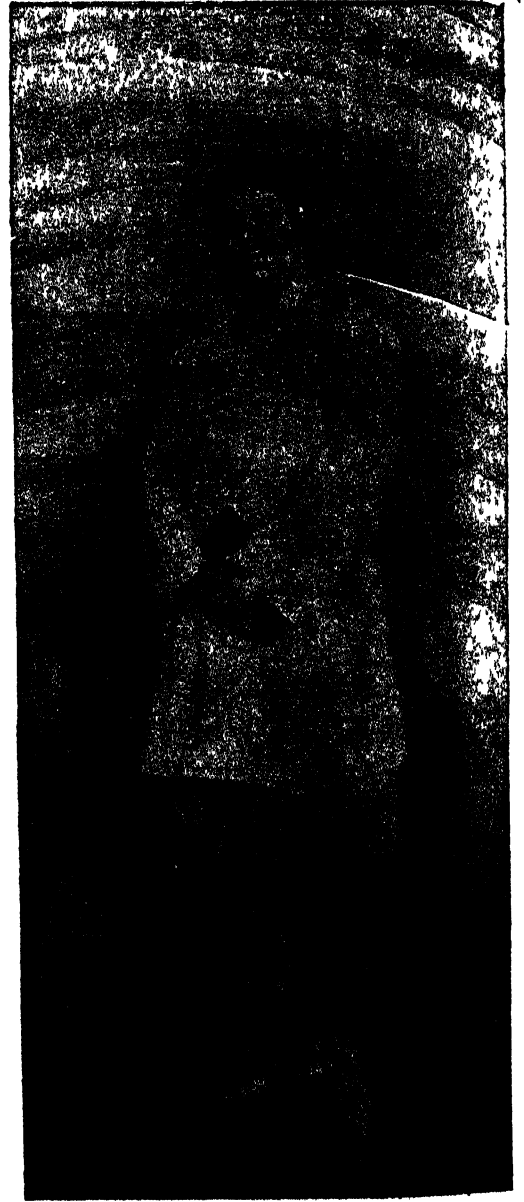
ব্রহ্মচারী বেশে মহারাজ বিজয়চাঁদ

## ২

ক্ষত্রদেহে যোগীর আত্মা লইয়া রাজর্ষির আবির্ভাব—ইহা ভারতীয় ইতিহাস ও পুরাণের কথা। ভারতে রাজশক্তির ইহাই শাশ্বত আদর্শ। রাজর্ষি মনু, ভরত,

জনক, অজাতশত্রু—ভারতের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত এক, দুই, দশ, শত নয়—সত্যই অসংখ্য। ১৩২০ বঙ্গাব্দে বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে প্রকাশিত "কমলাকান্ত" নাট্যে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ এক স্থানে এই আদর্শের কথাই উত্থাপন করিয়াছেন। নাটকখানি ক্ষুদ্রায়তন, ইতিহাসমূলক —নায়ক বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তেজশ্চন্দ্র সমসাময়িক প্রসিদ্ধ তন্ত্রসাধক কমলাকান্তের সহিত কথোপকথন প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"তোমরা সাধক…নিজেরা মুক্ত হয়ে যেতে পারলেই বাঁচ, তোমাদের ক্ষুদ্র প্রাণ আপনার গতির জন্যই ব্যস্ত—আর আমরা যোগভ্রষ্ট যোগী হয়ে নিজের লক্ষ্যপথ পলকে দেখতে পেয়েও এই ধর্ম্মের সংসার-রক্ষার জন্য, এই একটা রাজ্যের নাম দিয়া সেই বিশ্বেশ্বরেরই লক্ষ জীবের দুঃখ তাপ বিমোচন জন্য তাঁর মহাভাণ্ডার হতে মুক্ত হস্তে দিতে এসেছি। তাঁর উদ্দেশ্যসাধন জন্য নিজ মুক্তি করতলগত হলেও, পিঞ্জরাবদ্ধ থাকি। কোনটায় সুখ বেশী বা যাতনা বেশী, বল দেখি কমলাকান্ত?"

১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "চন্দ্রজিৎ" নাট্যখানিতেও এক হিন্দু রাজ্যপতি বিপথগামী রাজপুত্রকে রাজধর্ম্মে ফিরাইয়া, শেষ বয়সে—বানপ্রস্থ-গ্রহণের বিদায়-বাণী ব্যক্ত করিতেছেন—

"আগামী কোজাগর পূর্ণিমার দিন বৎস ইন্দ্রজিৎ, তোমাকে এই প্রাচীন হিন্দু রাজ্যে অভিষিক্ত করব। তোমার হস্তে রাজদণ্ড দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করব—এ আনন্দের দিন যে আমার হ'ল, বৎস, তা জানবে বহু তপস্যার ফলে। এ রাজ-সিংহাসনে বিনা তপস্যায়, বিনা যোগবলে যে বসবে, সেই ধসবে। বৎস, মনে রেখো, ইহা ধর্ম্মের সংসার; মনে রেখো, পুষ্পনগররাজ্যাধীশ্বর হওয়া কর্ম্মক্ষয় জন্য, কর্ম্মজয় জন্য, কর্ম্মবৃদ্ধি জন্য নহে। মনে রেখো, প্রজাবৃন্দ তোমার প্রকৃতই সন্তানস্বরূপ। তুমি এ রাজ্যের অধিপতি হলেও, তুমি তাঁর মহৎ দয়াময় নামের যাথার্থ্য প্রতিপাদন জন্যই তাঁর এই মহাভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ মাত্র। রাজা রজোগুণে ভূষিত হবেন সত্য, কিন্তু রজোগুণ কলুষিত হলেই তিনি মোহের অতল জলে ডুবিবেন। সত্ত্বগুণাবলম্বিত ও তৎসঙ্গে রজোগুণাবলম্বিত হলেই সব জয়—আত্মজয়, আত্মীয়-জয়, কর্ত্তা-জয়, কর্ম্ম-জয়, তমোজয়, তমিস্রা- জয়।"

হিন্দুর সংস্কার—হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজর্ষির সংস্কার—রাজদেহে ছদ্মবেশী যোগীর যোগ-সংস্কারের একটা ফল্গুধারা বর্দ্ধমান রাজবংশের কৌলিক চিত্তে প্রবহমান, এ ধারণা এই গ্রন্থগুলির মধ্য হইতেই পাইয়াছি। রাজকুমার প্রতাপচাঁদ—বর্ত্তমান ভাওয়াল মামলার ন্যায় যাঁহাকে ঘিরিয়াই একদিন বাংলায় জাল প্রতাপচাঁদের কাহিনী জনপ্রবাদে পরিণত হইয়াছিল—"কমলাকান্ত" নাট্যে তাঁহার অকালমৃত্যুর পিছনে যে একটা অলৌকিক রহস্যের সঙ্কেত পাওয়া যায়, তাহা শুধু নাটকীয় কল্পনা নহে, কেন না, রাজ-লেখক স্বয়ং উৎসর্গপত্রেও এই ভাবের বাক্য সমর্থন করিয়াই লিখিয়াছেন—"যে মহাযোগী বর্দ্ধমান রাজসিংহাসনে তেজশ্চন্দ্ররূপে বিরাজমান"—তিনিই "পুনঃ আফতাপচন্দ্র রূপে" অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং গ্রন্থের নীতিবাক্য (motto) এইটাই উদ্ধৃত হইয়াছে—

"যঃ পিতা স পুনঃ পুত্রো যঃ পুত্রঃ স পুনঃ পিতা"

অর্থাৎ এই রাজবংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সঙ্গম রায় হইতে জন্মজন্মান্তরে পিতা-পুত্র ক্রমে রাজর্ষি বা যোগীর আত্মাই কখনও ইহলোকে রাজ্যরক্ষা, কখনও ঊর্দ্ধলোকে যোগাসনে অলৌকিক তপস্যার ধারা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন—এইরূপ একটা রহস্যময় কুল-প্রত্যয় (mystic hereditary idea) সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, দেখা যায়। আমি এ সম্বন্ধে কোনই মন্তব্য এখানে করিব না। কিন্তু হিন্দু নরপতির রাজধর্ম্ম ভগবানের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন, এই শিক্ষাই এখানে স্মরণীয়। মহারাজ বিজয়চাঁদের কথা—

"এ রাজত্ব শ্রীভগবানের, আর আমি তাঁর প্রধান ধনাধ্যক্ষ, সেবাইত"
—এই প্রত্যয়ই ত খাঁটি হিন্দুরাজ মাত্রেরই শাশ্বত ঘোষণা।

মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ একজন দার্শনিক কবি। বলিয়াছি তাঁর এ কবিত্ব সাধনামিশ্রিত—তার সাধক-চিত্তের ইহা অকপট অভিব্যক্তি। কবিতাগুলি ধারাবাহিক পাঠ করিলে তাঁহার সাধন-জীবনের একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। একখানি কাব্য হইতে আমার বক্তব্যের প্রয়োজনে উদ্ধৃত করিব। "আবেগ" কাব্যের সূচনায় "আমি" শীর্ষক কয়েক ছত্র লেখা—

'কেহ ভাবে মোরে জ্ঞানী, কর্ম্মী, ধীর।
কেহ বা আলোতে দেখে ক্ষত্র বীর॥
কেহ বা রাজর্ষি, কেহ ভ্রষ্ট ঋষি।
কেহ বা নাহিক খুঁজে পায় তীর॥

আমি যে কি হই, সহজে কেমনে
বুঝিবেক তারা মোহাবৃত মনে,
আমি ত রয়েছি অনন্ত শয়নে
অনন্ত ধনুর লক্ষ্যভেদী তীর।
আমি সদা আছি হয়ে মধু মাছি,
প্রণবের চাকে করি খোঁচাখুঁচি,
সত্ত্ব-রজঃ-তমে দিই যবে মুছি
পূর্ণরূপে তবে হই আমি স্থির॥

বৈরাগী রাজ তাপসের আত্মবিচারের কথা ও ইঙ্গিত শুধু এই কবিতায় নহে, প্রতি কবিতায় পরিস্ফুট।

কোন প্রলোভনে বল রব হে সংসারী।
সুধা পেয়ে হব কি হে বিষের ভিখারী॥

আর ব্যাকুল প্রার্থনা—

"তুমি সব বুঝে লও, বুঝে মোরে ছেড়ে দাও।
এ বোঝা বহিতে আর চাহি না জীবনে॥"

কেন না,

সংসারের বিড়ম্বনা মানসে করে বিকল।

দৈনন্দিন জীবনের নানা বিপর্য্যয়ে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি গাহিতেছেন—
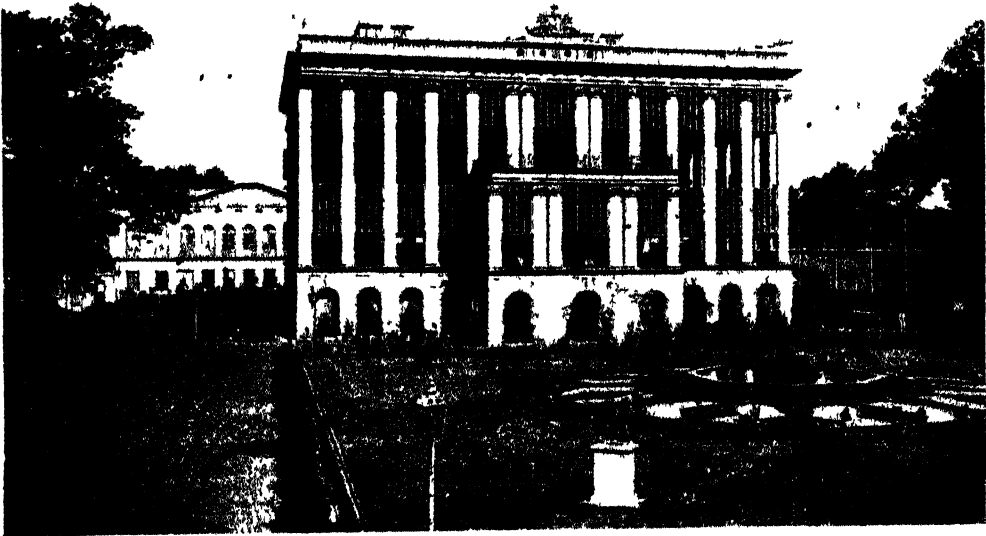
মহাতাব মঞ্জিল : মহারাজাধিরাজের বাসভবন

ডমরু লইব হাতে, কমণ্ডলু রবে সাথে,
ত্রিশূলে ত্রিশূলে দিব ত্রিগুণ লাঞ্ছিত সব।
লয়ে তব পূর্ণ রূপ, হইব হে বিশ্বভূপ;
প্রণবে জাগিয়া আমি প্রণবে বিলীন হব।

ইহা ছিল বুঝি রাজার প্রথম যৌবনেরই জীবন-স্বপ্ন। সে অর্জ্জুনতরুমূলে সাধকের সাধনা অন্তরে বৈরাগ্যের ব্রহ্মতন্ত্রী পুষ্ট করিয়া তাঁহাকে ভবিষ্যৎ রাজধর্ম্মেরই জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিল। প্রথমে, এই স্বপ্ন ছাড়িয়া রাজধর্ম্ম দীক্ষা হয় ত তেমন ভাল লাগে নাই—তাঁহার সাধনানুরাগী চিত্ত গুরু বৈষয়িক দায়িত্বভারগ্রহণে সংশয়ে ও আতঙ্কে দুলিয়া ও শিহরিয়া উঠিয়াছিল তাই প্রশ্ন—

অশেষ ভাবনা দিয়াছে আমারে
বহু কর্ম্মে বেঁধে, বহু কর্ম্ম ডোরে—
তবু তোমা যেন পাই ঘুরে ফিরে
লিখিও ইহাই ভালে।

কন্যার পীড়ায়, পারিবারিক অশান্তিতে বিপন্ন হইয়া কণ্ঠে ফুটিয়াছে—

ক্ষান্ত নাহি রহি দিয়া রাজ্যভার,
করিলে আমার পূর্ণ পরিবার,
তাই কি জায়ার, পুত্র, দুহিতার
মমতা কাটিতে ডাকিছে আমার॥

পরে আবার সংগ্রামের মধ্যেই কোথা হইতে অন্তরে নব বল সংগ্রহ করিয়াছেন—যেন সাহস পাইয়াই বলিতেছেন—

ধনের মাঝারে বসায়ে রেখেছ,
রাখিয়া সকল ছাড়িতে বলেছ।
এই মহাবল বিজয়ে দিয়েছ—
বলে'ই সাহস আসে তো মনে॥

এই অন্তর-বলের মূলে আছে সাধনারই দান—যুক্তিরই ব্যাকুল প্রার্থনা।

আজু পুনঃ রাজনীতি শুনিলাম, ভাবিলাম।
আত্মার অহিত ভাবি তোমাকে হে ডাকিলাম।
পূর্ব্ব হতে মম বুদ্ধি, লভিয়াছে সূক্ষ্ম শুদ্ধি;
বিবেক পেয়েছে বুদ্ধি, ইহা আজু জানিলাম।

তিনি আপনাকে চিরিয়া চিরিয়া দেখিয়াই যেন এইটুকু তৃপ্তি পাইয়াছেন—

রাজসিক ভাবে মগ্ন দুই দিন ছিনু আমি।
কিন্তু তাহে তমোভাব আসিতে দাওনি তুমি।
এইরূপ ক্রমোন্নতি ঘটিলে ফিরিবে মতি—
হবে শেষে ঊর্দ্ধ গতি, পাব হৃদে হৃদি স্বামী॥

তিনি বুকে জোর পাইয়াছেন ব্রহ্ম-ভাবনায়—তাই শ্রদ্ধার বাণীই এবার ফুটিয়াছে—

আমার আবার ভাবনা কিসের?
সংসার যখন বুঝেছি বিষের?
পেয়েছি খুঁজিয়া পাথের শেষের
শিখেছি আপন বলিতে তোমায়॥

কিন্তু তবু প্রাণের ক্ষুধা যেন কিছুতেই মিটে না। যে একবার ঈশ্বর-প্রেমের পরশ পাইয়াছে, সকল জড় পার্থিব সম্বন্ধে আর যেন তাহার শান্তি মিলে না। তাই ক্ষণে ক্ষণে চিত্তে বিরহের রাগিণীই ফুকারিয়া উঠে—সব ছাড়িয়া বৈরাগীর বেশে ছুটিয়া বাহির হইতে প্রাণ চায়—তাই এবার গান শুনি,

ভাবিনি যাহা স্বপনে, দিয়াছ তাহা জীবনে,
রেখে সুখে পুত্রধনে, দারা সুতাদিরে সব।
এ সবার মাঝ হতে চাহি আমি চলে যেতে
তব প্রেমধাম পেতে জাগাই প্রণব রব॥

তাই তো মন কর্ত্তব্যমুখর লোকসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া মাঝে মাঝে নীরব নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতাই চায়—

তোমারি কারণে বসি হে বিজনে,
বাসের ভবনে থাকি যথা বনে—
আমার জীবনে, শয়নে স্বপনে
তোমারি আলয় করিব।

যুগাবতার ঠাকুর রামকৃষ্ণ সংসারী সাধককে মাঝে মাঝে নির্জ্জনবাসের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। মহারাজ বিজয়চন্দ্রেরও কৈশোরের সাধন-কানন ঘেরিয়া "বিজয়ানন্দ-বিহার" প্রতিষ্ঠা এই উদ্দেশ্যেই। বর্দ্ধমানে এই সুরম্য বিহার সত্যই যেন পবিত্র তপোবনতুল্য। মহারাজার বৈরাগ্যদীপ্ত অন্তর্জ্জীবনে যে সিদ্ধ মহাতাপসদ্বয়ের তপঃ-প্রভাব প্রভূত শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, সেই বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি ও বাণী এখানেই তিনি স্থাপন করিয়াছেন। আর তাঁহার পরমারাধ্য জীবন-মন্ত্র "প্রণবে"র অপূর্ব্ব শ্রীবিগ্রহও এইখানেই প্রতিষ্ঠিত। এই প্রণব-বিগ্রহ দেখিয়া "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে"র শ্রীবিগ্রহের কথাও স্বতঃই মনে পড়িল। একই মহামন্ত্রের আকর্ষণ বাংলার সাধন-জীবন ওতঃপ্রোতঃ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে—এ সংযোগ তাই মাত্র আকস্মিক (accidental) বা বাহিরের বলা যায় না। ঘটনার পিছনে আত্মায় আত্মায় যে নিগূঢ় অধ্যাত্মযোগ সংঘটিত হয়, তাহা কল্পেরই মিলনদ্যোতনায় পূর্ণ—ইহা বলিলে কি অত্যুক্তি হইবে? জানি না। কিন্তু

হৃদয়ে বাসনা জাগে, প্রভাত অরুণরাগে,
বিহারে উত্তর ভাগে প্রতীক স্থাপন তরে॥

মহারাজের অন্তরোত্থিত এই দিব্য প্রেরণা যেদিন সফল হইয়াছিল আর তিনি তার স্বরে উল্লাসে গাহিয়াছিলেন—

অনেক দিনের আশা পুরালে হে ভগবান।
আজু বর্দ্ধমানাধীশ সত্য সত্য বর্দ্ধমান॥
তরুতলে বসে' ডাকি, বল ঈশ কত বাকি,
অন্তিমে দিও না ফাঁকি, আমি তো গো আগুয়ান॥
প্রণবশোভিত তুমি, প্রণব-সম্ভূত আমি,
প্রণবে তাই হে যাচি, পিতঃ, গুরু, গরীয়ান্॥

সেদিন তাঁহার সাধন-পূত ব্যষ্টিচিত্তে তরুণ হিন্দু-ভারতের সমষ্টিসাধনার মন্ত্রমূর্ত্তির সহিত কেমন করিয়া একটা গভীর ও নিবিড় অন্তরপরিচয় পূর্ব্বাহ্নেই ঘটিয়া গিয়াছিল, তাহা সত্যই অনির্ব্বচনীয় রহস্যময়! যে ডাক

তিনি শুনিয়াছেন, তাহা অধ্যাত্মভারতের সনাতন সাধনার ডাক—কিন্তু "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—ত্যাগের জন্য ভোগ নহে, ভোগের জন্যই ত্যাগ—জীবন-বাদের এই অপার্থিব ভূমিকা কি তাঁহার জীবনে অলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া ভবিষ্যৎ জাতির সম্মুখে অপূর্ব্ব সঙ্কেত ধারণ করিয়াছে!

সে কত দিন, কত বর্ষ আগে বৈরাগী রাজা আপন মনে গাহিতেন—

মনে হয় যাই চলে, কর্ত্তব্য কিন্তু গো বলে
কর্ম্ম ব্রহ্ম, কয়মই কর্ম্মক্ষয়কারী।

কিন্তু ইহা যে শুধু কর্ত্তব্য নয়, কর্ম্মক্ষয়ও নয়—একটা শাশ্বত আদর্শেরই অমোঘ, অব্যর্থ আহ্বান, অনিবার্য্য প্রেরণা, সে খেয়াল হয়ত তিনি রাখেন নাই। যে গুরুমন্ত্র তিনি পাইয়াছেন, তাহা অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে অনেক ঘুরাইয়াছে—ভাবাইয়াছে—মনকে তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন—

সাধনায় বদ্ধমূল তাই এই তরুমূল
হইয়াছে মোর মূল মানদণ্ড হে॥
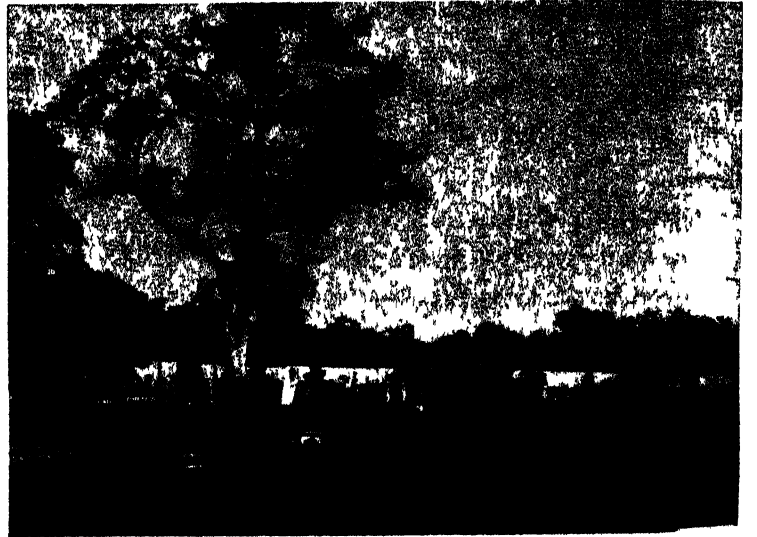
বিজয়ানন্দ বিহার: বর্ত্তমান মহারাজার সাধন পীঠ

বলিয়াছেন—

হতে হবে একদিন, তনু ত্যজি' তনুহীন,
ভাবি গো তাই শ্মশান, নিজ চিতাভস্ম চাই।

কিন্তু শঙ্কর-বুদ্ধের এই মায়াবাদ, শূন্যবাদের প্রভাব তাঁহাকে সাধারণ রাজবিলাস হইতে "লালসার কঠোরতা জনমাঝে সরলতা" দিয়া রক্ষা করিলেও, সন্দেহ হয়, বেদমূর্ত্তি ভারতজাতির পূর্ণ দিব্য জীবন—একাধারে মুক্তি-ভুক্তি, স্বরাজ্য ও সাম্রাজ্যের মহাস্বপ্ন হইতে প্রকারান্তরে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছে। মহারাজ বিজয়চন্দ্র কেন—রঘুপতি রামচন্দ্রের ন্যায় রাজকুলচক্রবর্ত্তীকেও ইহবিমুখ বৈরাগ্যের ডাকে কি মর্ম্মহারা, দিগভ্রান্ত হইতে হয় নাই? ভারতের ক্ষত্রিয়জাতির উপর অভিসম্পাত—কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানে, 'ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধিনা' জীবনে ভাগবত রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় তাঁহারা আদিষ্ট হইয়াও, আজও তাহা সিদ্ধ করিতে পারিলেন না। ভারতে রাজর্ষিত্বের সাধনাই চলিয়াছে—সিদ্ধমূর্ত্তি অনাগত। জ্ঞানযোগী কর্ম্মযোগী বিজয়চন্দ্র জ্ঞানবৈরাগ্যমুখী স্বভাবপ্রেরণার বশে ও মন্দিরে দৃষ্ট শ্রীগুরুর নির্দ্দেশে আজ সেই দ্বিতীয় আহ্বানেরই অপেক্ষা করিতেছেন—

"When the trumpet is sounded sommoning me to the second call and warning me of the approach of the Banaprastha of a would-be Rajarshi, the advent of the evening of the existence of this outer sheath, and when politics and state-craft must give way to Brahmaninada and Brahmadhyana."

কিন্তু ভারতাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চাহিয়াছিলেন—

"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"

ভারতসাধনার স্বপ্ন আছে—প্রতীক আছে—ভূভারতে ধর্ম্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা সে নব জাতিনির্ম্মাতা কোথায়?

# 'প্রবর্ত্তক' রজত-জয়ন্তী: বর্দ্ধমান

( পঞ্চম মাসিক অনুষ্ঠান )

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

অপরাহ্ণ তিনটায় ট্রেণ।

কাজের ভীড় ঠেলিয়া উঠিব উঠিব করিতেছি, এমনি সময়ে বিশিষ্ট এক সাহিত্যিক বন্ধু আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "গল্পটার কি হোল।"

"ফেরৎ" বলিয়াই বিনা বাক্যব্যায়ে গল্পটি লেখকের হাতে তুলিয়া ধরিলাম।

"হেতুটা শুনতে পারি কি?"

"সম্পাদকীয় বিভাগের অভিরুচি।"

মনে হইল সোজা কথাটা বন্ধুকে আঘাত করিল।

"ফেরৎ দিবার কোন হেতু নেই। আপনি পড়েছেন গল্পটা? কি আপনার অভিমত?" এক নিঃশ্বাস বন্ধু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন।

"গল্প হিসাবে মন্দ নয়। তবে জাতিগঠনের কোন উপাদান নেই।" ইচ্ছা 'কাট্ শর্ট' করা।

"তাহলেই সাহিত্য-পত্রিকার পক্ষে যথেষ্ট। রস-সৃষ্টিই তো গল্পসাহিত্যের মূল মর্ম্ম।"

বলিলাম, "সে যাই হোক, যুগ-প্রয়োজন উপেক্ষণীয় নহে। যে-রস জাতিকে ঐক্য দেয় না, বৃদ্ধি, ঋদ্ধি ও বাঁচার প্রেরণায় মাটিতে শিকড় গাড়ার শক্তি দেয় না, দেয় না পেটে অন্ন আর মেরুদণ্ডে বল, সে-রস আকাশ-কুসুমের মতই নিছক মানসিক বিলাস।"

সময় সংক্ষেপ। মনটাও চঞ্চল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, "বাংলার এই দারুণ দুর্দ্দিনে আজিকার চিন্তা-বিকার ভূমিছাড়া জাতিটাকে আরও শূন্যেই লাট্ খাওয়াবে। চিন্তা নায়ক সাহিত্যিকেরা একথাটা বুঝছে না, এইটাই দেশের বড় দুর্ভাগ্য। গল্প সাহিত্যেরই দান 'বন্দেমাতরম্' আজ জাতীয় মন্ত্র। সাহিত্যে 'প্রবর্ত্তক' এই জাগরণই কামনা করে।"

"যাই করুক, প্রবর্ত্তকের 'ডিক্টেশনে' কেউ লিখ্‌বে না।" বন্ধুর কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা।

চলিতে চলিতেই বলিলাম, "প্রবর্ত্তকের জন্ম, কর্ম্ম ও মিশনই যে স্ব-প্রতিষ্ঠ জাতি-গঠন! তাছাড়া তার বাঁচার কোন অর্থ হয় না।"

"ওঃ—বুঝেছি, এমনটি হলে শেষ পর্য্যন্ত 'প্রবর্ত্তক' মিশন প্রত্রিকাই হবে। শুধু ধর্ম্ম আর দর্শন।"

"সত্য দর্শন বিনা ঋতময় প্রতিষ্ঠা কি করে হয়, আপনিই বলুন? আর প্রবর্ত্তকর যে ধর্ম্মের সংজ্ঞা তাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমাজ-সাহিত্য-অর্থ-রাষ্ট্র কিছুই বাদ যায় না। ধর্ম্মের অন্তরে আছে প্রকাশপ্রবণতা; ধর্ম্ম তাই ক্রিয়াসাধ্য—ইহবিমুখ নয়। এই ভাবের সুষ্ঠু ও শুভ পরিবেশন করতে গিয়াই সাহিত্য ক্ষেত্রেও 'প্রবর্ত্তক' পাবে পূর্ণতা।"

তাচ্ছিল্য ভরেই যেন বন্ধু বলিলেন, "এই মাটি করেছে! ধর্ম্মকে আমি বড্ড ভয় করি। মধ্যযুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত যত অবিচার অত্যাচার সবই এই ধর্ম্মের নামেই সংঘটিত হয়েছে। তাই এ-যুগে ওটা বর্জ্জনই বাঞ্ছনীয়।"

"বর্জ্জনের নগ্নচিত্র আজ এ-দেশ ও-দেশে চোখের সমনেই উদ্ভাসিত। আসলে ধর্ম্মের অপরাধ নয়। ব্যবহারগুণেই ভাল-মন্দ ফলাফল। শুধু বস্তুর নামে কিছু করাটা ভণ্ডামী, কাজে না করলে রসাস্বাদন হয় না জান্‌বেন। ভারতের প্রাণস্বরূপ ধর্ম্মের এই ব্যভিচারেই জাতীয় আত্মা আজ পঙ্গু এবং পীড়িত। এর ঠাঁই 'প্রবর্ত্তকে'র আঙিনায় নেই।"

এতক্ষণে তিন তলার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ফুটপাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। বন্ধু সুর নামাইয়া বলিলেন, "জনপ্রিয় লেখকের অবদান-বঞ্চিত হ'য়ে প্রবর্ত্তক লোকপ্রিয়তা হারাবে। ও-পত্রিকা কেউ, বিশেষ তরুণ পড়্‌বে না।"

"যা প্রিয় সকল সময় তা শ্রেয়ঃ নাও হতে পারে। পত্রিকা পরিচালনা প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের ঠিক ব্যবসা নয়। কেউ না

পড়্‌লেও, যা জাতির পক্ষে কল্যাণকর বলে' আমরা অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করি, তা দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে প্রচার করে' যাব। এই জন্তই তো 'প্রবর্ত্তকে'র রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে এত সভা সমিতির ঘটা, বাংলার জেলায় জেলায় ঘুরে-ঘুরে প্রবর্ত্তক-সম্পাদকের বক্তৃতা দেওয়ার এত মাথা-ব্যথা! আজ ১লা ভাদ্র, সন্ধ্যায় বর্দ্ধমানে রজত-জয়ন্তী উৎসব। সেইখানেই চলেছি।"

বন্ধু কি বলিতে যাইতে ছিলেন, বাধা দিয়া বলিলাম, "আজকের মত নমস্কার, পরে কথা হবে।"

উৎসব-সভাপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীবিজয়চাঁদ মহাতাব্

কোন রকমে ট্রেণ ধরিলাম। নিউ কর্ড লাইন ধরিয়া গাড়ী চলিয়াছে। মহানগরীর মফঃস্বল বালি ছাড়াইতেই যেন এক নূতন রাজ্য অভিনন্দন জানাইল। সারা প্রান্তর জুড়িয়া সবুজের আলিপনা। শ্যামনৃত্যের ছন্দে কচি ধানের উপর ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল। মাঝে মাঝে ভাদ্রের ক্ষণ-বরিষণ। রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি। হেথা-হোথা মেঘাঞ্চল মুড়ি দিয়া পল্লীরাণী দূর আকাশের গায় কুণ্ডলীয়মান ধূঁয়ার কলঙ্ক-রেখা আ'লে আ'লে বিচিত্র পাখীর পুচ্ছসঞ্চালন। নারী-পুরুষের ধান্য-রোপণ। রেল লাইনের খালে পল্লী-বালকের মৎস্য-শীকার। কলসী কাঁখে পল্লীবালার সলজ্জ কৌতুক দৃষ্টি। পর্ণ কুটির। ধানের মাড়াই। গোয়ালে বাঁধা গরু। গৃহাঙ্গনে কর্ম্মরতা কুলবধূ। ভাবিলাম, এই আমাদের দেশ! এই তো জাতি! সহরবাসীর অভাবিত কত বিচিত্র সুখ-দুঃখ-ব্যথা-বেদনায়ই না জড়িত ইহাদের জীবন! অন্তরঙ্গ পরিচয়ের এক অখণ্ড ঐক্যের অতলে ডুবিয়া গেলাম। আপনার গতিতে গাড়ী চলিয়াছে। চোখ বুঁজিয়াও দেখি ঐ সুশ্যাম বাংলা মায়ের ছবি।

পাশের দুইজন 'ডেলি প্যাসেঞ্জারে'র অবান্তর আলাপনে কাণ ঝালাপালা করিয়া তুলিল। ভাবি, এই মুক্ত মাধুর্য্যময় পরিবেশের মধ্যেও এদের অন্তরাত্মা কি করিয়া খুঁটিনাটি তুচ্ছতায় তৃপ্তি পায়! অফিসের সাহেব, সিনেমা, কাননবালা, যুদ্ধ, পাটের বাজার, বৌ-এর সোহাগ, চা, পান এমন কত কি বিশৃঙ্খল কথার বিরাম নাই।

বর্দ্ধমান ষ্টেশন। সোজা বংশগোপাল টাউন হলে চলিলাম। এই মাত্র বিজয়কৃষ্ণের স্মৃতিবার্ষিকী সভা হইয়া গিয়াছে। প্রচুর লোকসমাগম। দলে দলে ছাত্র-তরুণ আসিতে লাগিল। হলে তিল ধারণের স্থান নাই। দু' পাশের বারান্দায়ও উৎসুক শ্রোতার ভীড়। ভীড়ের মধ্যে অনেক গণ্যমান্য প্রবীণকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অযাচিতভাবেই পাশের এক তরুণকে প্রশ্ন করিলাম, "হলটা তেমন বড় নয়, আরও প্রশস্ত স্থানে সভা করলে ভাল হ'ত।"

"আরে মশায়, বর্দ্ধমান জায়গায় এত ভীড় ইতি-পূর্ব্বে আর কোন দিন হয়নি। কোন রাজনৈতিক সভায়ও না।" বলিতে বলিতে ভদ্রলোক ভীড় ঠেলিয়া আগে চলিল।

আমার সাহিত্যিক বন্ধুর কথা স্মরণ হইল। প্রত্যয় হইল, ধর্ম্মভাব এদেশের মজ্জাগত, সহজে যাবার নয়।

নচেৎ সঙ্ঘ-গুরু শ্রীমতিলাল রায়ের নামে ও প্রবর্ত্তকের বাণী শুনিতে এত মানুষ কেন আসে ?

সন্ধ্যা ৭ টায় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহতাপ সি-সি-আই-ই মহোদয়ের পৌরহিত্যে 'প্রবর্ত্তক' মাসিক পত্রিকার পঞ্চম মাসিক উৎসব-সভা আরম্ভ হইল।

স্বামী অমৃতানন্দজী "ওঁ সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্ ·" শীর্ষক বৈদিক প্রশস্তি উদ্গান করিলেন। সুদর্শন নবীন সন্ন্যাসীর অমৃত-কণ্ঠের সুর ও ছন্দের মূর্চ্ছনা মধুবর্ষণ করিল। তারপর সভাপতিকে মাল্যদান প্রসঙ্গে সঙ্ঘের সাধারণ-সম্পাদক শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত প্রায় কুড়ি মিনিট বক্তৃতা করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বর্দ্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্বমঙ্গলা মায়ের বন্দনা, মহারাজের হিমালয় সদৃশ বিরাট্ হৃদয়, বর্ত্তমান যুগ-সঙ্কটে, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, ভাব ও আদর্শ এবং রজত জয়ন্তীর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। বক্তৃতা শেষে তিনি মহারাজকুমারের শুভেচ্ছাপূর্ণ পত্র পাঠ করিলেন।

ভগ্ডচারণ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের দরাজ গলার উদ্বোধন সঙ্গীত অনতিবৃহৎ হলঘরটিকে কম্পিত করিয়া সকলকে যেন সচেতন করিয়া তুলিল।

অসুস্থ শরীর লইয়াও নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র দেবশর্ম্মা অদ্যকার প্রধান বক্তার পরিচয় ও মাল্যদান কার্য্য সানন্দেই সমাধা করিলেন। দেবশর্ম্মা মহাশয় যে দরদী সুবক্তা, তাহা তাঁহার আবেগপূর্ণ অর্দ্ধ-ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতার বিশুদ্ধ ভাব ও প্রাঞ্জল ভাষা হইতেই বুঝা গেল। বক্তৃতায় স্বদেশী যুগ হইতে বাংলার রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও সাহিত্য-সাধনার গতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক তিনি দেখান যে, শেষপর্য্যন্ত পাশ্চাত্য প্রভাব ও মতবাদের আমদানীতে বাংলার জাতি-সাধনা দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র "প্রবর্ত্তক" পত্রিকা যখন সঙ্কল্পমূর্ত্তি পার্থসারথীর ছবি প্রচ্ছদপটে ধরিয়া আত্ম-প্রকাশ করিল, তখনই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে নির্ম্মাণযোগ্য মানুষের মত মানুষ একজন আসিয়াছে। ব্রহ্মবান্ধবের পরে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী মতিবাবু ও তাঁর কর্ম্মি সঙ্ঘের নীরব সাধনা ও সৃষ্টি বাংলার ভাব-অরাজকতাময় অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে দিগ্‌নির্ণয়ের আলোকপাত করিয়াছে। ১৯০৫ সালে বাংলা সাহিত্য জাতির প্রাণে অপূর্ব্ব সাড়া তুলিয়াছিল। বঙ্গদর্শনের পরে 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকা বাংলাসাহিত্যে শুদ্ধি ও শুচিতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এ কথা বিনা প্রতিবাদে বলা যায় বলিয়া বক্তা উল্লেখ করিলেন।

এইবার সভাপতির আহ্বানে দেশাত্মা শ্রীমতিলাল রায় বক্তৃতা দিতে উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভাগৃহের অসহিষ্ণু কলগুঞ্জন থামিয়া গেল। আকস্মিক এমনি স্পর্শনীয় নিস্তব্ধতায় সভাগৃহ নিঃশব্দ হইয়া উঠিল যে সূঁচের পতন-শব্দও শোনা যায়। ধর্ম্মগুরুর মর্ম্মবাণী শুনিবার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষমান শ্রোতার ধৈর্য্যের বাঁধ প্রায় ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছিল। অশ্রুতপ্রায় কোমল পর্দ্দায় তাঁহার বক্তৃতারম্ভ প্রথমটা নৈরাশ্যেরই সঞ্চার করিল। পাশের একজন প্রবীণ সঙ্গীকে বলিলেন, "পাঁচটা থেকে অপেক্ষাই দেখ্‌ছি বৃথা হ'ল।"

শ্রীমতিলাল রায়

"আর একটু দেখাই যাক্ না কি হয়।" সঙ্গী উত্তর দিলেন।

কিন্তু বেশীক্ষণ আর দেখিতে হইল না। পাঁচ মিনিট যাইতে না যাইতেই ক্রমোচ্চ গ্রামে সুর চড়িতে চড়িতে কড়িতে ঠেকিল। ছেদ নাই, বিরাম নাই, গানের একটা কলির মতই বক্তৃতার আরম্ভ আর শেষ। নিঃশব্দ গৃহের স্পন্দহীন বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীর অপলক দৃষ্টি বক্তার প্রতি নিবদ্ধ। একটু ইতস্ততঃ করিয়া পাশের প্রবীণের একাগ্র মনোযোগ ভঙ্গ করিলাম। বলিলাম, "বক্তৃতা কেমন লাগছে আপনার ?"

"তিন ঘণ্টা অপেক্ষা আমার সার্থক হয়েছে। বিপিন পালের পরে বাঙলাদেশে যে এমন ওজস্বী বাগ্মী আছে তা আমার ধারণাই ছিল না।" ভদ্রলোকের স্নিগ্ধ স্বরে তৃপ্তির প্রলেপ।

বিলম্বে বক্তৃতা আরম্ভ হওয়ায়, সময় সংক্ষেপ করিবার জন্য বক্তার মানসিক তাড়া আমি কিন্তু বেশ অনুভব করিলাম। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে 'তিনি দু'বার ঘড়ি দেখিলেন। সভাপতি তাঁহার পার্শ্বদেশ চাপড়াইয়া আরও বলিবার জন্য ইঙ্গিতে অনুরোধ করিলেন। বলিবার বিষয় তাঁর অফুরন্ত। দেওয়ার দরদে তাঁর দেহ-মন-আত্মা উচ্ছ্বসিত। ভারতের শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থনপূর্ব্বক তিনি সৃষ্টি-তত্ত্ব, মানুষ ও মানব-সভ্যতার বয়স পাশ্চাত্যের সহিত তুলনামূলকভাবে নির্ণয় করিয়া দেখাইলেন। আরও দেখাইলেন, শ্রুতি স্মৃতি-পরিবেশন করিলেন। তিনি বলিলেন, কোনও 'ইজমে'র উপর এ জাতি বাঁচিতে পারে না। হিমালয়ের অফুরন্ত তুষার স্তূপ যেমন গঙ্গোত্রী ধারাকে সঞ্জীবিত ও প্রবাহমান রাখিয়াছে, তেমনি ভারতের অপৌরুষেয় ধর্ম্মামৃতের উপরই ভারত-জাতি অমর প্রতিষ্ঠা পাইবার প্রচেষ্টা অতীতেও করিয়াছে এবং বর্ত্তমানেও তাহাই করিতে হইবে। এজন্য চাই বিশুদ্ধ সংগঠন। সংগঠন—আত্মজ্ঞান, স্বকীয় সত্ত্বা এবং ভারতের সমুন্নত চিন্তা, দর্শন ও ঐতিহ্যের অবধারণ। জীব ও ঈশ্বরের যুক্তি ব্যষ্টি ও

বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ কৃষ্ণসায়র ও তার পাড়ে আপতাপ-নিবাস

ন্যায়ের ত্রয়ী প্রস্থান, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়, শ্রুতিবাদ, যুক্তিবাদ জৈন ও বৌদ্ধবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন চিন্তাধারার বিকাশ ও পার্থক্য এবং গুণত্রয় ও চাতুর্ব্বর্ণ্যের নিগূঢ় অভিপ্রায়। হিন্দুর বিশাল চিন্তা ও দর্শনের সত্য মর্ম্মাবধারণ করাইবার আকুলতায় পূজনীয় বক্তা সময় সংক্ষেপজনিত কিছুরই বিষদ আলোচনা না করিয়া কেবল মাত্র ভূমিকাপাতটুকুই করিয়া গেলেন।

ভারতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া পূর্ণাঙ্গ জাতি-গঠনের প্রচুর উপকরণ পূজনীয় সদ্গুরু আধুনিক মনের বোধ্য ন্যায় ও যুক্তিসম্মতভাবে জাতিকে পূর্ণ এবং সার্থকমন্ত করে। এই যোগ সিদ্ধ হয় আত্মসমর্পণে। বাংলার গৌরবময় বৈষ্ণব-যুগে এই ঈশ্বরযুক্তিসিদ্ধ এক জাতি-গঠনের বিপুল প্রয়াস হইয়াছিল। শুধু ভাবে নয়, ন্যায় ও যুক্তির মধ্য দিয়া বৈষ্ণব দার্শনিক বলদেব বিদ্যাভূষণ ইহার সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। জাতিগঠনের ত্রয়ী নীতি (principle) ভক্ত, ভগবান আর ভক্তি। অতঃপর, ঈশ্বর যে কল্পনার বস্তু নয়; পরন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের 'মতই ন্যায় ও তর্কের দ্বারাও ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রমাণ করা চলে, তাহা বক্তা বহু-সঙ্গত যুক্তির অবতারণা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ বস্তু যেমন কর্ম্ম, কাল, প্রকৃতি, অহং-এর আরোহণমূলক শৃঙ্খলাক্রমে ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য পর্য্যায়। অতএব জাতীয়তার নামে ধর্ম্মকে উপেক্ষা ও দায়ী করিবার যে আজিকার মনোবৃত্তি, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আসলে জাতির বর্ত্তমান অবনতির জন্য ধর্ম্ম দায়ী নহে, পরন্তু ধর্ম্ম-বিকৃতি ও ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামীই ইহার জন্য মূলতঃ দায়ী। ধর্ম্ম চিত্তবিলাস বা ভাবতারল্য-জনিত চক্ষে অশ্রুবর্ষণ নয়; ইহা মানুষকে অভী করে, শ্রী-ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য দান করে। ভারতের সভ্যতা দিগ্বিজয়ী। সংশ্লিষ্ট জনের উপস্থিতি, শহরের মাথার মণি প্রায় সকলেরই আগমন এবং বিশেষ করিয়া ছাত্র-তরুণ ও মতনির্ব্বিচারের সর্ব্বশ্রেণী ব্যক্তিগণের যোগদান সভার সমগ্র আব্‌হাওয়াকে শ্রদ্ধাপ্লুত ও ধর্ম্মগুরুর বক্তৃতা প্রদানের অনুকূল করিয়া তুলিয়াছিল।

সভাশেষে শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য ঢালিয়া মহারাজা ও বর্দ্ধমানবাসীকে ধন্যবাদ জানাইলেন। সভাপতির 'অরডার' আনিবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইতিমধ্যেই অধৈর্য্য দর্শক যে-যার পথ ধরিতে সুরু

দিলখোস বাগান : মানস সরোবরের পাড়ে দলবাহার : বর্দ্ধমান

পঙ্গুত্ব পাপ। প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া নরের মধ্যে নারায়ণের জাগরণ সম্ভব। নিষ্কাম সেবা, স্বার্থত্যাগ ও পারস্পরিক ঐক্য একমাত্র পরমের সহিত যুক্তিতেই সম্ভব। অবশেষে বক্তা বলেন, প্রবর্ত্তক পত্রিকা দীর্ঘ ২৫ বৎসর এই বাণীই প্রচার করিয়া আসিতেছে।

পূজনীয় সঙ্ঘ-গুরুর বক্তৃতা শেষ হইলে সভাপতি সংক্ষেপে পুনরায় এই বক্তব্যের মর্ম্ম কথা বুঝাইয়া দিলেন। মহারাজার শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা ও ভাববিহ্বল হৃদয়ের অনাবিল স্পর্শ তাঁহার প্রতিটি কথায় স্পষ্ট হইয়া ধরা দিল। মহারাজাধিরাজের বিরাট্ ব্যক্তিত্ব, রাজপরিবার ও তৎ-করিয়াছে। সারাক্ষণ নিষ্পিষ্ট অবস্থায় ঠায় দাঁড়াইয়া আছি। ভীড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই সারা গৃহ-প্রাঙ্গণ ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল : গাইবো কি, শুনবে কে রে, আছে কি কারও প্রাণ......। প্রফুল্লদার প্রাণ-মাতান সমাপ্তি-সঙ্গীত। যে যেখানে ছিল উৎকর্ণ হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল : গানের অপূর্ব্ব আকর্ষণ!

গান থামিল। আবার প্রলম্বিত করধ্বনি। অগ্রসরমান জনৈক তরুণ কথা উঠাইলেন, "সত্যই তো, কৈ সে প্রাণ? ম্যালেরিয়া-পীড়িত বর্দ্ধমানে কি এ-প্রাণ জাগবে?"

"জাগ্‌বে বলে' আমার মনে হয় না।" সঙ্গী প্রত্যুত্তর

করিল, "জাগিয়ে রাখার ব্যবস্থা কৈ? এ ক্ষণিকের উত্তাপ আবার দু'দিনেই দেখিস্ যে-সেই…"

কথা শেষ হইল না, আর একজন বলিল, "কিন্তু হ্যাঁ মতিবাবুর 'মিলিট্যাণ্ট্ রেলিজিয়ন' বটে! লোকটার কথায় প্রাণ আছে—সুরে বিদ্রোহ।"

"তা যাই হোক, ধর্ম্মের 'ইণ্টারপ্রিটেশন'টা কিন্তু ভাই বেশ 'অ্যাপ-টু-ডেট্' ": সর্ব্বাগ্রের তরুণটি মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে মন্তব্য করিল: "এমন জাতিগঠনের বলিষ্ঠ 'কন্‌সেপশন্'‥"

প্রবাস-যাপনের যে মাধুর্য্য তাহা হইতে এ-যাত্রায় বঞ্চিতই হইতে হইল।

স্থানীয় সঙ্ঘ-কর্ম্মী প্রাণতোষ দাস সবেমাত্র এই আবাসের পত্তন করিয়াছে। প্রায় আশীজন অতিথির সমাগম; যেন এক মহোৎসব লাগিয়া গেল। আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে উপাসনা ও আহারাদি সারিয়া তীর্থযাত্রীর মতই বারান্দার এক কোণে শুইয়া পড়িলাম।

পরের দিন ২রা ভাদ্র। প্রাতে যার যার মত বাহির হইয়া পড়িল। বিলম্বিত অভ্যাস আমার। একা পড়িলাম। কি করি, ভাবিলাম প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যাউক। দুই মাইল পথ হাঁটিয়া তো চলিলাম, কিন্তু বাধা পাইলাম রাজপ্রাসাদের সশস্ত্র প্রহরীর নিকট। দ্বাররক্ষী বিনয়ের সহিত বলিল, "গুরু মহারাজজী তো অন্দরমেঁ হ্যায়, বিনা পাশ্‌ছে জানে কা হুকুম নেহি হ্যায়।" কি আর করা যায়! অবারিত দ্বার কয়েকটি ঠাকুর-মন্দির

দিলখোসাবাগান: জলবেষ্টিত উদ্যান-বিহার: বর্দ্ধমান

প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিলাম। ফিরিতে প্রায় ৮টা বাজিল। ইতিমধ্যেই বাড়ীটিকে সাজাইয়া-গুছাইয়া বেশ পরিচ্ছন্ন করা হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সঙ্ঘগুরু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তক ছাত্রাবাসের উদ্বোধন কার্য্য আরম্ভ হইল। স্থানীয় সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ দাস তাহার অভিভাষণে ছাত্রাবাসের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন:

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মূল লক্ষ্য—জাতি সংগঠন। এই সংগঠনের দুই দিক্—অন্তর ও বাহির, চরিত্র ও জীবন। জাতির ভবিষ্য আশা-কেন্দ্র ছাত্রমণ্ডলী যদি এই সংগঠন-সাধনায় সুযোগ লাভ না করে, তবে জাতি-গঠনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। আমরা এই জন্যই ছাত্রদিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া এই ছাত্রাবাসের সূচনা … বর্দ্ধমান জেলায় নানা

তরুণের শেষ কথাগুলি আর কানে পৌঁছিল না। মহারাজ ও ছোট কুমার সাহেবের চলমান ফিটন আমাদের দ্বিধা বিভক্ত করিল। তারপর প্রকাণ্ড এক মটরে চলিলেন জন কয়েক শিষ্যসহ সঙ্ঘগুরু।

পূর্ণিমা রাত্রি। মেঘোন্মুক্ত চাঁদিমায় শরতের শুভ্রতা। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় খানিকটা মনের আনন্দে ঘুরাফিরা করিয়া আসিয়া কেউ যে যার আস্তানায় ফিরিলাম। …

মতিবাবুর রাজকীয় সম্বর্দ্ধনা আর মহারাজার সাদরে আহ্বানে এবার তাঁর রাজাতিথ্য স্বীকারের সংবাদ পথিমধ্যে সঙ্গী গুরুভাই দিল। ভাবিলাম, গুরুসঙ্গে

হইতে সুকুমার ছাত্রমণ্ডলী এই সহরে স্কুলে ও কলেজে বিদ্যার্জ্জনের আগমন করিয়া থাকে। দূর গ্রাম ও পল্লীর গৃহস্থ কুটীরে থাকিয়া দিন তাহারা অধ্যয়নাদি করে, ততদিন তাহাদের পিতা, মাতা, ভাবকগণ যেমন সচ্ছন্দ ও নিশ্চিন্ত থাকেন, সহরে, প্রবাসে ছেলেদের কো পাঠাইয়া তাঁহারা সে নিশ্চিন্ত আশা-ভরসা আর পান না। রা যদি বুঝেন, তাঁহাদের ছেলেদের সুশিক্ষার সঙ্গে সুচরিত্র গঠনের টা আশ্রয়-ক্ষেত্র এই সহরেও আছে—যেখানে তাহারা পাইবে -দৃষ্টির সঙ্গে সুপথের নির্দ্দেশ—জীবন গঠনের সঙ্কেত—তাঁহারা খানি অন্তরে সান্ত্বনা ও নিশ্চিন্ততা পাইতে পারিবেন। আমরা ছাত্রাবাসে তাই সযতনে রক্ষা করিয়াছি—সুযোগ—এমন একটী বিত্র আবহাওয়া, যাহা পাইলে সন্তানদের সম্বন্ধে অভিভাবকরা নিঃশঙ্ক ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না, পরন্তু এই আশা ও বাসও পাইবেন যে, যুগের তরল, লঘু, চিত্তচাঞ্চল্যকর প্রতিবেশ ও বহাওয়ার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া তাঁহাদের সন্তানেরা যথার্থ ষ হইয়া উঠিবে—তাহারা হইবে গৃহস্থের আনন্দ, সমাজের আশা দীপ, স্বদেশের মঙ্গল-স্তম্ভ।

উদীয়মান তরুণদের জীবনে ভারতীয় ভাব ও শক্তি সঞ্চার করাই মাদের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। এই ভাব ও শক্তি বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষার মধ্য দিয়া তাহারা পায় না। সে শিক্ষা যাহা দেয়, তাহার মূল্য মাদের অবিদিত নহে। শুধু বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন ছাড়া ত্যাগ ও বিত্রতার ভিত্তি ছাত্রজীবনে চাই। এই ভিত্তি—ভারতের ধর্ম্ম ও গবৎ ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমাদের ছাত্রাবাসে ছাত্রগণ এই ত্যাগ পবিত্রতার শক্তি লাভ করিবে। শ্রীভগবানের করুণা লাভ করিয়া, হাতে জীবন পুণ্যময় ও ধন্য হয়, তাহার উপযোগী ব্যবস্থা ও সুযোগ খানে পাইবে। আর পাইবে সঙ্ঘের আচার্য্যগণের সাহচর্য্য ও ন্যতা, তাঁহাদের সহিত পরিচয়ে ও সম্বন্ধে ইচ্ছা করিলে উর্দ্ধমুখী ধ্যাত্ম জীবন গঠন করিয়া তুলিতেও পারিবে॥

সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা উদ্বোধনপ্রসঙ্গে বলিলেন: শিক্ষার দেশ্য মস্তিষ্ককোষের প্রকৃষ্ট গঠন। বাঙ্গালার যুবকদিগের শিক্ষ নানারূপ 'বাদে'র আরোপে বিকৃত হইয়া যাইতেছে, হাকে মোড় ফিরাইয়া ভারতীয় ভাবে গড়িয়া তুলিতে ইবে। ধর্ম্ম ও ভগবান যুবকদিগের নিকট ভয়ের কারণ ইয়া উঠিয়াছে—ইহাতে তিনি যুবকদিগের দোষ দেখেন না। সত্যই যদি ধর্ম্ম ও ভগবান যুবকদিগের অন্তরের আকাঙ্খাকে উদ্দীপত ও জীবন্ত করিতে না পারে, তবে তাহা একেবারেই পরিত্যাজ্য। ধর্ম্মের বিকৃতিই এই অনর্থক ভয়ের হেতু। ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ ফুটাইয়া তোলার প্রয়োজন। ঈশ্বরযুক্তিতে মানুষ পঙ্গু হয় না, পরন্তু ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও বীর্য্যবান্ হইয়া উঠে। সত্য, সংযম ও সম্বন্ধ, এই তিনটী আচারের দ্বারা যুবকদিগের জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে—এই মহান্ উদ্দেশ্য লইয়াই এই ছাত্রাবাস স্থাপিত হইতেছে। তিনি আশা করেন—বর্দ্ধমানবাসীর সৌজন্যে ও শুভেচ্ছায় ইহা অচিরেই একটী আদর্শ জীবনগঠনকেন্দ্র হইয়া উঠিবে।

উৎসবান্তে ছাত্রাবাসেই সমবেত মধ্যাহ্ন-উপাসনা সারিয়া, সঙ্ঘগুরু রাজপ্রাসাদে ফিরিলেন। হৈ-চৈ-এর মধ্যে স্নানাহার শেষ করিতে দুইটা বাজিল। বিগত বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তি দূর করিবার মানসে কেবল চোখ বুঁজিয়াছি আর কে যেন চীৎকার করিয়া উঠিল, ভগবানের চিঠি। লিখিয়াছেন : স্নেহের সন্তানগণ, রাজপ্রাসাদে দেহ বন্দী হলেও, আমার চিত্তমন তোমাদের কাছে পড়ে' আছে। তিনটায় রাজপ্রাসাদ দেখার ব্যবস্থা হয়েছে। সকলে এস।

জলছাড়া মাছের মতই অনরজ পরিমণ্ডলের বাহিরে তাঁর আত্মার অনারাম অন্তর দিয়া অনুভব ক'রলাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুতির ধুম পড়িয়া গেল।

'প্যালেস্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট' সযত্ন সতর্কতায় প্রায় পঞ্চাশ জন দর্শনার্থীকে সব কিছু দ্রষ্টব্য ঘুরাইয়া দেখাইলেন। যখন বাহিরে আসিলাম, মনে হইল এতক্ষণ কোন এক মায়াপুরীর যাদুপালঙ্কে শুইয়া যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। একে একে হাঁসপাতাল, শ্যামসায়ার, রাণীসায়ার, কৃষ্ণসায়ার, বিজয়ানন্দ বিহার, দিলখোস বাগান এবং তন্মধ্যস্থিত পশুশালা ও বিচিত্র পুষ্পবন ঘুরিয়া দেখিলাম। এ সব বিরাট্ কীর্ত্তি রাজা-মহারাজের পক্ষেই সম্ভব! হ্রদ সদৃশ্য এক একটা বিশাল দীঘি! অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও এই সবের মধ্য দিয়া রাজভাণ্ডার দেশের ও দশের কাছে অবারিত ছিল। ম্রিয়মান অগণিত দেব-মন্দির। বার মাসে তেরো পার্ব্বণ উপলক্ষে কোথায় সে জাগ্রত উৎসব-সমারোহ! বার বার কেবলই মনে হইল, পাশ্চাত্য মোহ কি দ্রুত পরিবর্ত্তনই না মাত্র এই কয় বৎসরে আনিয়াছে!

সোজা টাউন-হলে গেলাম। অপরাহ্ন ২টা হইতে 'বিজয়কৃষ্ণ শতবার্ষিকী' সভা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রধান বক্তা স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজী বক্তৃতা করিতেছেন। সুনির্ব্বাচিত শ্রোতার মধ্যে প্রৌঢ় ও প্রাচীনই অধিক। স্বামীজীর পরে সভাপতি পূজনীয় শ্রীমতিলাল রায় ঝাড়া এক ঘণ্টা দশ মিনিট বক্তৃতা দিলেন। জাতিগঠনে বিজয়কৃষ্ণের দান ও গোস্বামীজীর অপূর্ব্ব সাধন-রহস্যের উপর তিনি অভিনব আলোকপাত করিলেন। সভাপতির স্বকীয় অধ্যাত্মানুভূতির রঙে তাঁর কথা অনুরাগরঞ্জিত হইয়া শ্রোতার মর্ম্ম স্পর্শ করিল।

সাড়ে আটটায় ট্রেণ। শালপাতায় খেচরান্ন নাকে-মুখে গুঁজিয়া রওনা হইলাম। ট্রেণ ছাড়িল। যতক্ষণ দেখা যায় সহকর্ম্মিসহ প্রাণতোষ বিদায় সঙ্কেত জানাইল। বর্দ্ধমানে বাগেরহাটের সে করুণ-মাধুর্য্য ছিল না; কিন্তু বিশুদ্ধ রাজস উল্লাসে চিত্ত-মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

# আহত ইউরোপ

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

জ্বলেছে অগ্নি, নরকের শিখা,
সারা ইউরোপ জুড়িয়া জ্বলে;
দাউ দাউ জ্বলে, ছাই ক'রে দেয়
লক্ষ জীবন তাহারি তলে।
লক্ষ জীবন, কোটী কোটী প্রাণ,
কোটী নারী-নর তাহাতে পোড়ে;
পোড়ে কোটী শিশু,—তাজা কচি ফুল
প্রবল পবনে অকালে ঝরে।
জননী ক্ষুধিত শিশুর বয়ানে
স্তন্য দিতেছে সোহাগে চাহি',
সে শিশু সহসা বোমার আগুনে
হ'ল নিঃশেষ—নাহি রে নাহি!
এক সন্তান কৃতী হ'য়ে ফেরে
বহুদিন পরে প্রবাস হ'তে,
পিতামাতা তারে দেখিতে ব্যাকুল,
সে মরে আছাড়ি' সহসা পথে।
মধু-উৎসব বিবাহ বাসর—
শত শত লোক হাসে ও মাতে,
ব্যোমতল হ'তে বোমা এল নেমে,
সব হাসি মেশে ধূলার সাথে।
শান্তি-আবাস শতেক ভবন
কত সুখ-প্রেম-হাস্য-ভরা,
আশা-আনন্দ-মৈত্রী-পূরিত
কত বুক, যাতে জুড়াত ধরা,
বোমা ও গোলার ক্ষণিক স্ফুরণে
ভেঙ্গে গুঁড়া হয় নিমেষ মাঝে,
যেন রে ফুলের বাগানে নিমেষে
মরুভূমি জেগে বিকট রাজে।
লক্ষ জ্ঞানীর সাধনে রচিত
বিদ্যাভবন ধূলায় ঝরে;
গ্রন্থ-ভবন—জ্ঞানীর তীর্থ
আজিকে নিমেষে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

এ কি দানবের বিকট বিকাশ,
এ কি ক্ষুধা তার বিশ্বগ্রাসী!
ধ্বংস-লোহিত ভীষণ দৃষ্টি
হেরিয়া জগৎ উঠিছে ত্রাসি'!
তাহার বিরাট্ জঠরে যে ক্ষুধা
তাতে সবি যাবে, কিছু না রবে;
সে খাবে কচি ও তাজা যত কিছু,
ক্ষুদ্র বৃহৎ, জ্যান্ত শবে।
এ দানব এ কি সহসা জাগিল?
ইউরোপ তারে চেন না মোটে?
চেনে চেনে তারে মাতা ইউরোপ
স্তন্য দিয়াছে ইহারই ঠোঁটে।
এ যে তারই সুত, পালিল যতনে
এই ইউরোপ এই দানবে;
আজি সেই শিশু যুবক ভীষণ
জননীরে আজ ছিঁড়িয়া লবে।
যে লোভ, কামনা, হিংসা, লালসা,
এই দানবের মাঝারে হেরি,
সে-সব লুকানো ছিল থরে থরে
য়ুরোপ মাতার বক্ষ ঘেরি'।
নিজে যে আগুন করিল রচনা,
সে আজ মেলেছে লক্ষ জিহ্বা,
নিজে যে আঁধার করিল সূচনা
সে আজ নিবাবে তাহারি দিবা।
আজি যে দানবে সারা ইউরোপ
বর্ব্বর বলি' নিয়ত ঘোষে,
বর্ব্বরতার ফসলের বীজ
সেই ইউরোপ ফলাল চ'ষে।
স্বখাত সলিলে আজিকে ডুবিছে
সারা ইউরোপ, কাঁদন বৃথা;
তাহারি বক্ষে বিষময় তীর
হানিয়াছে আজ তাহারি মিতা।

# সংস্কৃতির সংঘর্ষ

( নাটিকা )

শ্রীমতিলাল রায়

### দ্বিতীয় দৃশ্যের নাট্যোল্লিখিত পাত্রগণ

ভৃগু মুনি—বিখ্যাত ঋষি; সুমন্ত—প্রধান আচার্য্য;
দত্তালি, পাণ্ডু মৃকণ্ডু—আশ্রমের ছাত্রগণ।
মুনিগণ, ব্রাহ্মণগণ, ভেরীবাদকগণ, সৈন্যগণ, মন্ত্রী।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### ভৃগু মুনির আশ্রম

(দুইজন ছাত্রের প্রবেশ; প্রথম ছাত্রের মাথায় ভারী বোঝা, বগলে লাঠী ও দুই হাতে পুঁটুলি।)

২য় ছাত্র—ভো ভো দত্তালি! বক্র মেরুদণ্ডে চলেছ কোথায়?

১ম ছাত্র—(বিকৃত মুখে) পরিহাস যতই কর, যজ্ঞভাগ কিছুতেই পাচ্ছ না!

২য় ছাত্র—তা' না পাই, সহপাঠীর সহায়ও তো হতে পারি। বোঝার ভাগ কিঞ্চিৎ দিয়ে, মেরুদণ্ডটা সোজা করে' নাও। একটু ঋজু বুঝেছ?

১ম ছাত্র—(মোট নামাইয়া) যা' বলেছ ভায়া। অর্থালঙ্কার-বিরহিতা হলে, সরস্বতীও বিধবার ন্যায় প্রতীয়মানা হন। ব্রাহ্মণের ছেলে যদি মূর্খ হয়, তার দুর্দ্দশা বড় কম নয়।

২য় ছাত্র—এ কেমন উপমা হ'ল দাদা? এটা সাংসিদ্ধিক না নৈমিত্তিক?

১ম ছাত্র—রাখ তোমার অলঙ্কারশাস্ত্রের সূত্রবিধি। শব্দ-সৌন্দর্য্যের মহিমা কীর্ত্তন করতে বের হইনি। বোঝা বয়ে মাথার খুলি ফেটে উঠেছে। ভাবের কিঞ্চিৎ স্বারূপ্য গ্রহণ করে' রেহাই দাও দাদা। অভিধানের বিগ্রহ উপাধ্যায়ের দাঁত-খিঁচুনি অনেক সয়েছি; তাই দু'দিন সয়ে যাচ্ছি; বাদ সেধ না ভাই।

২য় ছাত্র—আরে দত্তালি! আমিও তোমার সমধর্ম্মী। ধর্ম্মী দ্বয়ের প্রসিদ্ধের অন্যথা হলে যে বিপরীতোপমা হবে। আমায় সঙ্গে নাও ভাই। বলি, আচার্য্যের শ্বশুর-বাড়ীর দিকে যাত্রা তো?

১ম ছাত্র—ঠিক ধরেছ দাদা! তবু জ্যোতিষ পড়নি! সমাবর্ত্তন সামনে; অলঙ্কারশাস্ত্রে যেরূপ পাণ্ডিত্য হয়েছে, প্রত্যাবর্ত্তন ভাগ্যে নেই; কিন্তু যে পথ ধরেছি, সাফল্যের জয়-টীকা নিশ্চয় কপালে পড়বে।

২য় ছাত্র—কি রকম?

১ম ছাত্র—এই ভোরে উঠেই আচার্য্যের পদ-বন্দনা। তারপর তোমরা যখন সবাই অধ্যয়নে, আমি তখন আচার্য্যপত্নীর সশ্রদ্ধ সেবারত। তারপর পাক-শালার অনুলেপন থেকে অন্দিকায় অগ্নি-প্রজ্জ্বলন।

২য় ছাত্র—রোস ভায়া! শব্দ-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির অনাধিক্য হেতু, অন্দিকা শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না।

১ম ছাত্র—দাদার বুদ্ধি কিঞ্চিৎ স্থূল। ধর্ম্মের সাদৃশ্য হেতু অর্থ-বোধ অতি সহজ। পাকশালা, তারপর অন্দিকা—তারপর অগ্নি-প্রজ্জ্বলন। এ এক প্রকার বহূপমা; অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মে অর্থটা সহজেই অনুমেয় অর্থাৎ পাকার্থং অগ্নিস্থানম্।

২য় ছাত্র—অহো চুলা, চুল্লী, উনুনম্ ইতি ভাষা।

১ম ছাত্র—বাঢ়ম্—বাঢ়ম্। এখন এই গুরুভার মস্তকোপরি উত্তোলন করে' দাও দাদা! যথাস্থানে প্রস্থান করি। অপেক্ষমাণা আচার্য্যপত্নী যদি বিলম্বে রোষ-লোচনা হন, সমাবর্ত্তনে অন্তরম্ভা অবধারিত।

২য় ছাত্র—এ মহাদুঃখ তুমি একা সইতে পারবে না দত্তালি! দু'জনে ভাগাভাগি করে' নিই। সবচেয়ে এই হাল্কা বোঝাটা তোমার মাথায় তুলে' দিই। আর ভারী-ভারী দুটা পুঁটুলি আমার হাতে দাও। দু'দিন জিরিয়ে আসি চল। আবৃত্তির দায়ে মস্তিষ্ক-বিকৃতির উপক্রম হয়েছে।

১ম ছাত্র—হাল্কা মোটটী তুমিই নাও দাদা! ভারী দুটী আমায় দাও।

( তাড়াতাড়ি একটা মোট দ্বিতীয় ছাত্রের মাথায় তুলিয়া দিল )

২য় ছাত্র—( গুরুভারে ) আরে, কর কি, কর কি-ইঃ!

১ম ছাত্র—দাদা, ব্রাহ্মণের ছেলে, কদলীভক্ষণ করি বটে, কিন্তু চর্ব্বণ করি না। এখন চল, তুমি খাবে চূড়া-দধি; আমি খাব দধি-চূড়া। বিষয়-বস্তু একই; তবে বোঝার ওলটপালটের মত পদার্থের ইতর-বিশেষ কিছু হবে। ঐ উপাধ্যায়দিগের সহিত সহতীর্থেরা এই দিকেই আসে; একটু দ্রুত পদ-সঞ্চার প্রার্থনা করি।

( উভয়ের প্রস্থান )

( উপাধ্যায়গণের সহিত ছাত্রগণের প্রবেশ ও গীত )

নমস্তে দেবদেবেশ দেবারিবলসূদন।
সহস্রাক্ষ বিরূপাক্ষ শতজিহ্ব শতানন॥
ভবায় শর্ব্বায় নমঃ রুদ্রায় বরদায়—
চণ্ডায় মুণ্ডায় নমঃ ধরায় প্রচণ্ডায়॥
তুমি তপঃ, ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্মচর্য্য আর্জ্জব।
ভূতভব্য ভাবোদ্ভাব শ্রুতি-স্মৃতি বৈভব
প্রসীদ স মহাদেব পুণ্ডরীকাবলোকন॥

( ছাত্রগণ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উপাধ্যায়ের দক্ষিণ পদ ও বাম হস্ত দ্বারা বাম পদ স্পর্শ করিয়া উপাধ্যায়ের উপবেশনের পর সকলে উপবেশন করিল।)

উপাধ্যায়—অধীষ্ব ভো! আজ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন বিষয়।

ছাত্রগণ—( কৃতাঞ্জলীপুটে )—ওঁ, ওঁ এবমস্তু।

উপাধ্যায়—রক্ষং বলং হি জ্বরিতম্। লঙ্ঘিতং ভোজয়েদ্ভিষক্। অর্থাৎ ভিষক্‌গণ জ্বর-রোগের রোগীর বল-রক্ষা করে' তাকে উপোষিত রাখবে।

১ম ছাত্র—ঔষধের ব্যবস্থা কি হবে উপাধ্যায়?

উপাধ্যায়—৬ দিন শুণ্ঠির সহিত লাজ-মণ্ড ভোজন করাতে হবে। মুস্ত, পর্প্পট, উশীর, চন্দন ও উদীচ্য নাগরের সঙ্গে তিক্তশৃত জল পান করাবে, পুরাতন ষষ্টীক, নীবার, রক্তশালী দ্রব্য সকল জ্বরের উপকারক।

২য় ছাত্র—পথ্যের বিষয় কি হবে উপাধ্যায়?

উপাধ্যায়—যবের বিকার, মশুর, মুদ্গ, চনক, পটল, নিম্ব, দাড়িম অতি উত্তম পথ্য।

ছাত্র—অতিসারে?

উপাধ্যায়—শক্তু, গোধূম, যব, শালি, ঘৃত-দুগ্ধ দ্বারা সুপক্ক গোধূম অতি হিতকর।

ছাত্র—ঔষধ-ব্যবস্থা?

উপাধ্যায়—গোরোচনা ও মধু।

ছাত্র—শ্বাস ও হিক্কায়?

উপাধ্যায়—দধি, দাড়িমাদির সহিত মাতুলাঙ্গ রস বিশেষ উপকারী।

ছাত্র—কিন্তু উপাধ্যায়, আমার পিতৃস্বসার হিক্কারম্ভে এই ঔষধে কোনই উপকার হ'ল না!

উপাধ্যায়—তবে তার পঞ্চত্ব-প্রাপ্তির দিনে বুঝি ঔষধের ব্যবস্থা হয়েছিল।

ছাত্র—আজ্ঞা, হাঁ প্রভু।

উপাধ্যায়—ঔষধ ব্যাধির প্রতিষেধক—মৃত্যুর নয়, বৎসগণ।

ছাত্র—তবে যে মৃতসঞ্জীবনকর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ঋষিরা বলেছেন?

উপাধ্যায়—শাস্ত্র-প্রশংসায় ইহা অতিশয়োক্তি।

( আচার্য্যগণের সহিত প্রধান আচার্য্য সুমন্তু ও ভৃগুমুনির প্রবেশ )

ভৃগু—
চিন্তার বিকার মুনিগণ!
শ্রুতি স্মৃতি কর অন্বেষণ,
আর্য্যধর্ম্মে 'সমন্বয়'
এ বচন কভু না পাইবে।

সুমন্তু—
শ্রুতি যদি অপৌরুষেয় হয়,
যদি হয় ঈশ্বর-বচন,
সর্ব্ব-জন আশ্রয়-গ্রহণ
কেননা তাহাতে করে?
সর্ব্বভূত-মহেশ্বর যিনি,
বেদ-ধ্বনি তাঁর কণ্ঠে—
কি কারণ ভূতগণ
সে বাণী না করিয়া গ্রহণ
ধর্ম্ম-ভেদে জাতি-ভেদ সৃজে?
মত-দ্বৈধে, বিরোধ প্রবল করি'
রক্তপাতে ধরণী ভাসায়?

ভৃগু—
শুন মুনিগণ,
দিবাকর অরিন্দম করিছে কিরণ।

সমভাবে উদ্ভাসিত ধরণী সুন্দরী ;
কিন্তু হের বিচিত্র প্রকাশ
কিরণ আশ্রয় করি' স্থাবর জঙ্গমে
নানারূপে, বৈচিত্র্য-বিলাস।
ক্ষেত্র-ভেদ প্রকৃতি-বিকৃতি হেতু।
এ বিশ্ব বৈচিত্র্যময় ;
সমন্বয় মানবের হাত নহে।
স্বয়ং বিধাতা দায়ী বহুত্ব-ইচ্ছায়।

সুমন্ত— অপরূপ বাণী!
তবে কেন সমন্বয় সাধনের তরে,
জীবের সাধনা—
শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তির বিধান,
নিয়ে চলে একত্বের দিকে
নানাত্ব বর্জ্জন করি ?
সৃষ্টি যদি বৈচিত্র্য-নিদান,
এ প্রয়াস অকারণ তবে।

ভৃগু— শুন হে আচার্য্যবৃন্দ,
একত্বই সৃষ্টির কারণ।
সৃষ্ট জীবে মানব প্রধান—
মূল লক্ষ্য তার চিরদিন একে।
এক তত্ত্ব, তত্ত্বের অভ্যাস —
চিত্ত হ'তে বহুত্বের বিসর্জ্জন।
চিত্ত যবে হয় চিত্রহীন,
স্বরূপ বিকশি' উঠে—
চিদাভাসে একরূপ হয় দরশন।
শ্রুতি-মন্ত্রে এ সাধন
করে আর্য্য জাতি।
কিন্তু হের অন্যদিকে
কল্পে কল্পে জন্মি' বিশ্বপতি
মনুরূপে কর্ম্মের বিভাগে
ধর্ম্মাধর্ম্মে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করি'
পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি করিল নির্দ্দেশ।
কেহ প্রেয়, কেহ শ্রেয়ঃ চায়।
নানা রুচি নানা পথে ধায়,
যথা মতি, তথা গতি হয় লোকে'।
হিংসা ও অহিংসা
মৃদুতা, ক্রূরতা, সত্য, মিথ্যা
গুণের মিশ্রণ।
সৃষ্টির বিধান
অনাদি অনন্তকাল
চলে এই বৈচিত্র্য প্রবাহ ;
রাজা প্রজা নাহি মানে।

সুমন্ত— কোথা শান্তি ? কোথা
সমন্বয় তবে প্রভু ?

ভৃগু— জগতের ইতিহাসে
নাহি শান্তি, নাহি সমন্বয়।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়
স্রোতোরূপে বয়,
তরঙ্গ তাহার রীতি ;
গতি তার চৈতন্যলক্ষণ।
শান্তি, সমন্বয় ঐশ-ধর্ম্ম,
জীবধর্ম্ম নহে—
ইতিহাস প্রমাণ তাহার।
যবে শ্রুতি হইল প্রচার
কর্ম্মজ্ঞান দুটী ধারারূপে,
সাঙ্খ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক
ভিন্ন পথে চলিতে চাহিল—
এক বেদ করিয়া আশ্রয়
আর্য্যধর্ম্মে মত-ভেদ হয়,
শাস্ত্রবিদ্ জন
এ প্রমাণ অনায়াসে পায়।
তারপর পুনঃ দেখ
নাস্তিক্য দর্শন—
চার্ব্বাকাদি ঋষিগণ
করিল রচনা।
একত্ব সৃষ্টির মূল
যুক্তিবলে করি' উৎপাটন
বহুত্বের করিল ঘোষণা।
ভারতের বৌদ্ধবাদ
এই মত করিয়া আশ্রয়,

বস্তুর স্বরূপচিন্তা
কহি' অকারণ
নির্ব্বাণ পরম ধর্ম্ম
করিল প্রচার।

সুমন্ত— এই দ্বন্দ্ব আজিকার নহে।
অনাদি অনন্ত কাল
চলিছে সমান।

ভৃগু— এই নীতি বিধাতার।
বেদ ধর্ম্ম করি' অস্বীকার,
আর্য্যপুত্র ঋষভ প্রচার করে
যুক্তি-বলে জিন ধর্ম্ম
সমন্বয় লক্ষ্য করি'।
কিন্তু মুনিগণ,
এ ভারত বেদ-ভূমি।
বেদ শুধু দিতে পারে
অবাধ আশ্রয় নানান্তের।
কিন্তু যদি আশ্রিত ধর্ম্মের
হলে অভ্যুত্থান
ভারতের বেদ-ধর্ম্ম
হয় উপেক্ষিত,
বেদ-শক্তি রুদ্র মুর্ত্তি ধরি'
ধর্ম্ম-বিঘ্ন করে দূর।
বেদের মহিমা ক্ষুণ্ণ
তাই নাহি হয় কভু।

(পুত্রসহ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—এই যে মহর্ষি সম্মুখেই। ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। —নে বেটা, পায়ের ধুলো নে। নাক মল, কাণ মল। প্রতিজ্ঞা কর—এমন অনাচার জীবনে যেন না হয়।

পুত্র—কিন্তু—

ব্রাহ্মণ—কিন্তু কি আবার? দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক বিধবা কি নিঃসন্তানা নারী তার স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষ-গমনে নিয়োজিত হতে পারে না। তুই কি আর্য্যধর্ম্মের সীমা উল্লঙ্ঘন করতে চাস্?

পুত্র—কিন্তু—

ব্রাহ্মণ—আবার কিন্তু!

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥

অর্থাৎ একের স্ত্রীতে অন্যের নিয়োগ আছে, এবং শাস্ত্রে এমন বিধি কোথাও নাই যে, বিধবাগণের পুনর্বিবাহ হতে পারে। ব্রাহ্মণের ছেলে তুই কি পাষণ্ডধর্ম্মী হবি? মহর্ষি ভৃগু! কি সর্ব্বনাশ বেণের রাজ্যলাভে! প্রজাগণ অবাধে পাপাসক্ত হয়, কামাদি রিপুর বশীভূত হয়, বর্ণসঙ্করে দেশ ভরে' যায়, প্রতিকার করুন মহর্ষি।

ভৃগু—এ কি অত্যাচার রাজ্যমাঝে!

সুমন্ত—এই জন্যই প্রশ্ন করেছিলাম ঋষিপ্রবর, এই যে জাতি-বিচার, ধর্ম্মভেদ, আশ্রম-ভেদ, বেণ তা' সমূলে নির্ম্মূল করতে চায়। মহারাজ বেণ বর্ণাশ্রম ভাঙ্গে, দেবমন্দির চূর্ণ করে, অসবর্ণ বিবাহে উৎসাহ দেয়—আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনার সম্মুখে। আর্য্য-ধর্ম্ম যদি অমোঘ অব্যর্থ, আজই তার পরিচয় দিতে হবে।

ভৃগু— অঙ্গরাজ প্রব্রজ্যায় করিলে গমন
লোক-হিত করিয়া চিন্তন
রাজ্যে অভিষেক করিলাম বেণে।
জানিতাম মৃত্যুদেব মাতামহ তার—
কুমন্ত্রণা রাজকর্ণে দিবে।
বিশৃঙ্খলা হইবে রাজ্যের।
কিন্তু বীর-প্রসবিনী সুনীথা জননী
স্নেহভাবে কহিল আমারে—
রাজপুত্র বেণ
মাতৃ-আজ্ঞা করিবে পালন,
গো-ব্রাহ্মণে রক্ষিবে সতত।
প্রজাগণ একবাক্যে অমত করিল
বেণে দিতে সিংহাসন;
কিন্তু তারা ব্রাহ্মণের রাখিল সম্মান।
পৃথিবীর আধিপত্যে
বেণে অভিষেক করি।
নৃপাসনে বেণ সমাসীন—
সর্পভয়ে ভীত যথা মুষিকের দল,
প্রচণ্ড শাসনে, দস্যুগণ সতত সভয়।
শান্তিময় রাজ্যে পুনঃ প্রণয়-ঝঙ্কার—'

যজ্ঞানল উঠিল উজলি';
বাজিল মঙ্গল-শঙ্খ মন্দিরে মন্দিরে।

ব্রাহ্মণ— মিথ্যা এ কল্পনা ঋষিবর!
সিংহাসনে বেণরাজ
হইয়া আরূঢ়,
অষ্টৈশ্বর্য্য করি' লাভ
উদ্ধত হইয়া কহে—
আমি সুর, আমিই পণ্ডিত।
মহাভাগে অপমান করে।

(দুইজন ব্রাহ্মণের দেববিগ্রহ লইয়া প্রবেশ)

১ম ব্রাহ্মণ—রাজ্যমাঝে এইটুকুই আছে নিরাপদ্ স্থান। ব্রাহ্মণ-দুর্গ মহর্ষির আশ্রম। মহর্ষি, রক্ষা করুন। মহাবল বেণ ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ। নিরঙ্কুশ গজেন্দ্রের ন্যায় রাজ্যময় পর্য্যটন করে। আর্য্যধর্ম্ম নিশ্চিহ্ন করার জন্য তাঁর এই অভিযান। কত দেব-বিগ্রহ চূর্ণ বিচূর্ণ হল, তার ইয়ত্তা নাই। এই নারায়ণ-বিগ্রহটীকে রক্ষা করুন প্রভু!

ভৃগু— শুন বিপ্রগণ।
ব্রাহ্মণের অপমান, দেবতা-নিগ্রহ
ভগবান সহিবে না কভু।
আমি ভৃগু, মম বংশে
ধাতা বিধাতার জন্ম।
লোক-তারিণী শ্রীদেবী
বংশের তনয়া—
নারায়ণে পতিরূপে করিল বরণ।
বল ও উৎসাহ-সৃষ্টি
শ্রীদেবী হইতে।
আরও শুন, ঋষিগণ,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের দেবতা
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—
কেবা শ্রেষ্ঠ, বিচারের ভার
দেয় ভার্গবেরে।
চলে ভৃগুমুনি
ব্রহ্মা-সন্নিধানে।
ছদ্ম-আচরণে রুষ্ট ব্রহ্মা
তিরস্কার করে কটু।
তুষি' তাঁরে বিনয়-বচনে,
উপনীত হয় শিবস্থানে।
পরীক্ষার ছলে উপেক্ষিল শিবে।
শিবের নয়নে জলে প্রলয়-আগুন।
ভৃগুরে নাশিতে চাহে।
প্রশংসা-বচনে প্রসন্ন করিয়া তাঁরে,
আসি' হেরে—নারায়ণ
নিদ্রামগ্ন কুতূহলে।
জীব-ব্রহ্ম ঐক্য-জ্ঞানে,
চিরসিদ্ধ ভৃগুমুনি
বিষ্ণু-বক্ষে করে পদাঘাত।
নারায়ণ মেলে আঁখি।
ভৃগুরে হেরিয়া,
হাসিমুখে কয়—
বেদনা কি বাজিল চরণে?
পরীক্ষায় বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ—
ভৃগুপদ বক্ষে ধরি'।
শিরায় আমার এই ভৃগুরক্ত বহে।
ব্রাহ্মণ জন্মিল ভবে
বেদ-ধর্ম্ম-প্রচার কারণে।
অভয় দিতেছি সবে—
যাব আমি বেণের নিকট
বুঝাইব বিবিধ প্রকারে।
যদি মোরে করে অবহেলা,
মরীচি, পুলস্ত্য, ক্রতু ঋষিবংশধর
সবে মিলি ধরিব অশনি করে।
ধ্বংসিব বেণের দর্প।
শ্রী, বল, আয়ুঃ, কীর্ত্তি—
ব্রাহ্মণের দান
নিমেষে কাড়িয়া লব।
শান্তি-রাজ্য স্থাপিব ধরায়।

(বৃদ্ধ মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী— বৃথা চেষ্টা মুনিবর!
মৃত্যুদেব নায়ক তাহার।

ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী বেণ—
হিতবাণী শুনিবে না আর।
অঙ্গবংশ-ধ্বংস নাহি হয়,
তাই যত শুভবাণী করি উচ্চারণ।
আস্ফালন করি' বেণ কহে,—
শুনহে সচিব,
আমি রাজা—দেবতাপ্রধান—
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র—
মম দেহে রহে বর্ত্তমান।
মোরে উপদেশ
প্রগল্‌ভতার নাহি সীমা।
পরাজয় মানি' ঋষিবর,
প্রত্যাখ্যান করি রাজ-সেবা।
আর্য্য-ধর্ম্ম রাখিবারে চাহ যদি,
ব্রাহ্মণের অভ্যুত্থান
অচিরে সম্ভব কর।

(ভেরীবাদকদলের প্রবেশ)

ভেরীবাদকগণ—(ভেরীবাদন করিয়া সমস্বরে কহিল) সাবধান! সাবধান! ব্রাহ্মণগণ সাবধান! যাগ, দান, হোম সব বন্ধ কর। অধ্যয়ন, অধ্যাপনায়—রাজার বিধান—ব্রাহ্মণ, বিরত হও। আজ্ঞা-লঙ্ঘনে মৃত্যুদণ্ড হবে।

আচার্য্যগণ—অতি অত্যাচার, অতি অত্যাচার! আশ্রমে প্রবেশ করে ভেরীবাদকের দল!

(ছাত্রগণের মধ্য হইতে একজন)—ওরে পাণ্ডু!

২য় ছাত্র—বুঝেছি মৃকণ্ডু। আর দেরী নয়। নির্ঘাত অর্দ্ধচন্দ্র। ব্রাহ্মণ হীনবীর্য্য নয়।

(ভেরীবাদকদের প্রহার)

ভেরীবাদকেরা—গেলুম, গেলুম! ওরে বাবা, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে!

মৃকণ্ডু—সদ্য যমালয়ে প্রেরণ। পাণ্ডু! ঐ এক ব্যাটা সরে' পড়ে।

ভৃগু— কি কর, কি কর বৎসগণ!
রাজ্যভার ব্রাহ্মণ দিয়েছে বেণে।
রাজ্যের শাসন-দণ্ড
রাজকরে যতক্ষণ রহে,
রাজকর্ম্মচারী জনে
লাঞ্ছনা করিলে প্রজাগণ,
রাজদণ্ড পেতে হবে;
ক্ষমা নাই ব্রাহ্মণ বলিয়া।

(ভেরীবাদকগণ প্রস্থান করিতে করিতে বলিল) রদ্দার বদলে রদ্দা—মনে রেখ ঠাকুর!

সুমন্ত— ব্রাহ্মণ জন্মিল ধর্ম্মরক্ষা হেতু।
বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জগতে।
শুধু শ্রেষ্ঠ নহে,
ব্রাহ্মণের রক্তধারা
বিশ্বে প্রবাহিল—
নানা জাতি করিল সৃজন।
এক আর্য্যাদেবী হতে
পৃথক্ পৃথক্ দেহ করিয়া ধারণ
প্রাচ্য ও উদীচ্য
অম্বুবাক্ হতে মগধ, গোবিন্দদেশ
সুবিশাল প্রাচ্যভূমি—
ব্রাহ্মণের অধিকার।
সেই ব্রাহ্মণের অপমান
যদি হয় ভৃগুমুনি,
রাজা-প্রজা-বিচারের
কিবা প্রয়োজন?
ধ্বংস তার করিয়া সাধন
ব্রাহ্মণশাসন পুনঃ
প্রবর্ত্তিতে হবে।

ভৃগু— সত্য বটে। কিন্তু
ব্রাহ্মণের হিংসানীতি
নহে তো আশ্রয়।

সুমন্ত— ধর্ম্মরক্ষা হেতু হিংসার সাধন
মুনিগণ বিহিত বলিয়া
কীর্ত্তন করেছে শাস্ত্রে।

ভৃগু— আপৎ-কালের বিধি
সতত গ্রহণ যদি ব্রাহ্মণের হয়,
অহিংসার বীর্য্য হ'তে
ব্রাহ্মণ বঞ্চিত হবে।

হিংসা-রূপ মহাপাপে
ব্রাহ্মণত্ব যাবে।
যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ,
অধ্যয়ন, অধ্যাপনা—
বিধাতার অমৃত বর্ষণ ;
ব্রাহ্মণের দেহ যদি
হয় হিংসাময়,
জগতের হিতকর্ম্ম
কেমনে করিবে বিপ্রজাতি ?
তাই চাই দুর্দ্দিনের প্রতিকার
দয়া-ধর্ম্মে, ধৈর্য্যের সাধনে।

আচার্য্যগণ—(সমস্বরে) অহো কি দুর্দ্দৈব !

সুমন্ত— হের ভৃগুমুনি,
শ্রমবারি ঝরে অঙ্গে,
চক্ষে অশ্রুধারা,
শিবিকা বহিয়া চলে
ব্রাহ্মণের দল।
কত ধৈর্য্য ধরিবে ব্রাহ্মণে ?

(একদল ব্রাহ্মণের প্রবেশ ; পশ্চাতে মুক্ত অসি হস্তে রাজকর্ম্মচারী একজনের মাথার কেশ ধারণ করিয়া) আরে ধূর্ত্ত। ভৃগুর আশ্রম দেখে' শিবিকা ফেলে' পলায়ন! প্রহারেণ ধনঞ্জয় পুরস্কার তোদের।

ভৃগু— কোথায় ব্রহ্মণ্যদেব !
ব্রহ্মশক্তি করহ প্রকাশ।
বিষয়প্রসক্তিহীন
সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণের—
সতত সংযত চিত্ত।
।সদ্ধ দেহে পুণ্যশক্তি
করিয়া বিকাশ,
দুর্জ্জন নিধন কর।
ব্রাহ্মণের পুরুষার্থ
অজেয় ভুবনে।

পাণ্ডু—মৃকণ্ডু !

মৃকণ্ডু—কথা নয়, এই একেবারে পপাত ধরণীতলে।

(রাজকর্ম্মচারীর পতন ; অন্য দিক্ দিয়া ভেরীবাদকদলের সহিত একদল সৈনিকের প্রবেশ) ধর, ধর ! মার। মার।

মন্ত্রী— অকারণ করিও না
ব্রহ্মরক্ত-পাত।
আমি রাজমন্ত্রী,
অপ্রমত্ত হও সবে।
অপরাধী যদি
এই ব্রাহ্মণসংহতি,
লয়ে চল রাজার নিকটে।
আজ্ঞা মোর কর না লঙ্ঘন।

সৈনিক—তাই তো! অভিবাদয়ে! অভিবাদয়ে! নিয়ে চল, নিয়ে চল, মন্ত্রী মহাশয়ের হুকুমে নিয়ে চল। ব্রাহ্মণের গায়ে হাত দিস্ নে। নিয়ে চল রাজার কাছে।

(ব্রাহ্মণদের ধৃত করিয়া সকলে প্রস্থান)

(দত্তালির প্রবেশ)

দত্তালি—ওরে বাবা, এখানেও যে সব ভোঁ-ভাঁ। কৃতোপনয়ন হ'তে, মধু-মাংস-বর্জ্জনাদি বিধিপূর্ব্বক ব্রতসমূহ পালন করেছি। স্নান, দেব-ঋষি-পিতৃ-তর্পণ, দেবতাদের পূজা, সায়ং সন্ধ্যা, যথারীতি সমিধ্ দ্বারা হোম করেছি। তৈল, পাদুকা, ছত্র, কাম-ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জ্জন দিয়েছি। আর ব্রহ্মচর্য্য—ঐ গুরুপত্নীর চরণ-বন্দনা ছাড়া কোন নারীর মুখদর্শন করিনি। পরিবর্ত্তে বেণের প্রহরী এসে গুরুপত্নীকে হরণ করে' নিল। দাদা আমার ফলারের লোভে সঙ্গ নিয়েছিল, কোথায় যে লোপাট হয়ে গেল! ব্রহ্মবীর্য্য ধ্বক্ ধ্বক্ করে' মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। কি জানি বাবা, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। পুনর্ম্মাং এতু ইন্দ্রিয়ম্। পুনর্ম্মাং এতু ইন্দ্রিয়ম্।

(পাণ্ডু ও মৃকণ্ডুর প্রবেশ)

মৃকণ্ডু—এই যে দত্তালি !

দত্তালি—ওরে বাবা ! ছাড়ান নেই রে বাবা !

পাণ্ডু—দত্তালি ! সশরীরে দীপ্যমান আমাদের চিন্‌তে পারছ না ! অগ্নি-হোত্রাদি ধর্ম্মকর্ম্ম চুলোয় যাক; বুঝ্‌তে পারছি গুরুপত্নীকে যথাস্থানে পৌঁছে দিতে

পার নি। পরকালের হিতকামনা আর বেদতত্ত্বার্থ-নিরূপণ মাথায় থাক; আজ থেকে আমাদের অনধ্যায়। মৃকণ্ডু! চক্ষের সম্মুখে মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখে' ব্রাহ্মণের রক্ত বেদধ্বনিতে আর সান্ত্বনা পায় না। ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষমা, ধ্যান অনেক হয়েছে; এখন জাতির সম্মান রাখার জন্য কি ব্যবস্থা হয় বল।

দত্তালি—ত্রি-সন্ধ্যা স্নান, মৌনাবলম্বন আর উপবাস। প্রায়শ্চিত্ত দাদা, প্রায়শ্চিত্ত।

মৃকণ্ডু—পাণ্ডু! চল, এখনও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকুমারের ধমনীতে যৌবনের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। স্বধর্ম্মপরায়ণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের উপর মৃত্যু যেমন প্রভাব বিস্তার করে, রাজশক্তিও তেমনি ব্রাহ্মণ ধর্ম্মাত্মা বলে' আর মাথা নত করবে না। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ব্রাহ্মণকেই রাখ্‌তে হবে।

দত্তালি—আহা, আহা, ভুলে যাচ্ছ কেন দাদা, ধর্ম্মাত্মা মনুপুত্র ভৃগুর বচন স্মরণ কর—

অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।

বেদ অভ্যাস কর, সদাচারী হও; কর্ত্তব্যকর্ম্মে নিরলস হও। দূষিত অন্ন ভোজন কর না, মৃত্যুর বাবাও ঘেঁসবে না। ওরে বাবা, চতুরঙ্গ সেনা যে এই দিকেই ধেয়ে আসে!

মৃকণ্ডু—কিসের কোলাহল পাণ্ডু? (উঁকি মারিয়া) অস্ত্রহীন আমরা, কাষ্ঠাহরণের তীক্ষ্ণধার পরশুও তো আছে। চল পাণ্ডু, আমরা দুইখানা পরশু আনি। একদল দুর্ব্বৃত্ত রাজসেনা যেন এই দিকেই আস্‌ছে। পূর্ব্বে আত্মগোপন করেছি প্রতিশোধের প্রতীক্ষায়। সে সুযোগ সম্মুখেই উপস্থিত।

(দুইজনের দ্রুত প্রস্থান)

দত্তালি—বাবা পরশু চালাতে তো শিখিনি; বরং বিষ্ঠা-মূত্রত্যাগের পর লিঙ্গ থেকে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত তিন বার, সাত বার, দশ বার, দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ শুদ্ধি-সাধনায় শুচিতা রক্ষা করেছি। ব্রাহ্মণ-রক্ষক রাজা। আজ কি বিপর্য্যয় এসে পড়ল কে বাবা!

(লাঠালাঠি, মারামারি করিতে করিতে বহু লোকের প্রবেশ)

দত্তালি—আরে করে কি, করে কি? এসব বামুনের দল দেখ্‌ছি যে! ও সব দাদারা! কর্ম্মদোষ হতে জীবের গতি-প্রাপ্তি নরকে পতন। যম-যন্ত্রণা পর্য্যালোচনা কর, পর্য্যালোচনা কর। বিয়োগ, সংযোগ, অভিভব; উৎপীড়ন, উৎক্রমন—এই সব কর্ম্মদোষ হতে উদ্ভূত। পরমাত্মার সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠান—ব্রাহ্মণ, কর কি?

(জনৈক আহত ব্রাহ্মণ)—আত্মজ্ঞানহীন মূঢ়েরা আর্য্যবংশ বিনষ্ট করে। কে কোথায় আছ, বেদ-বিহিত কর্ম্মকাণ্ডপরায়ণ, সংযতাত্মা ব্রাহ্মণ, বেদ-মন্ত্র শস্ত্র কর, মার শত্রু, চূর্ণ কর রাজ-সিংহাসন।

(পরশু হস্তে পাণ্ডু ও মৃকণ্ডুর প্রবেশ)

পাণ্ডু—হত্যা কর, বিনাশ কর। নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আজ ব্রাহ্মণের কর্ম্ম।

(রাজসৈন্যগণের ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন)

একজন ব্রাহ্মণ—কে তোমরা? বজ্রধর দেবযূথ, ব্রাহ্মণের পরিত্রাণের জন্য পবিত্রপরশুধারী—তোমাদের নমস্কার!

দত্তালি—ভো, ভো ব্রাহ্মণগণ! ইনি পাণ্ডু আর উনি মৃকণ্ডু—আমারই গুরুভাই। রাজার হিতার্থে ব্রহ্ম-তেজোময় দণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন; আমার এই দুই গুরুভাই সে দণ্ড আজ কেড়ে নিয়েছেন। জয় ব্রাহ্মণের জয়।

মৃকণ্ডু—হাঁ দত্তালি, এই দণ্ড রাজকরে ব্রাহ্মণ দেয়, প্রয়োজন হলে সেই দণ্ড কেড়ে নেওয়ার শক্তি যে ব্রাহ্মণের নেই, তার নিষ্ফল হয় শিখা-সূত্র-ধারণ।

জনৈক ব্রাহ্মণ—ঠিক বলেছ ভাই। যে রাজা ভোগাভিলাষী, ক্রোধাদির বশীভূত, শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন, সে রাজার দণ্ডদাতা ব্রাহ্মণ যদি না হয়, শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান তবে কাপুরুষের ধর্ম্ম—ব্রহ্মতেজস্বামী ব্রাহ্মণের নয়।

২য় ব্রাহ্মণ—রাজা মূর্খ, লোভপর, প্রজাপীড়ক। থাক তার রাজদুর্গ, বিশাল সাম্রাজ্য। আজ সত্যই অন্তরীক্ষপতি ঋষি ও দেবতাদের উদ্যত মূর্ত্তি লক্ষ্যে পড়ে। মৃকণ্ডু, তুমি আমাদের সেনাপতি হও। ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ের রক্ষা-বিধান—প্রজাগণের সুখসম্পত্তির বিধান রাজ-ধর্ম্ম। আজ প্রজাবর্গের ঘরে ঘরে হাহাকার। সত্যভাষী কারাবন্দী। বেদধ্বনি রাজভয়ে পীড়িত, কুণ্ঠিত। দেবপূজা, দেবতার আরাধনা নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণজাতিকে উৎসন্ন দিবার জন্য জাতিভেদ ঘুচিয়ে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে এক সঙ্কর জাতি-সৃষ্টি—কুচক্রী রাজার এই অপকীর্ত্তি আমরা কিছুতেই সহ্য করব না।

পাণ্ডু—কিছুতেই না। এই গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, যমুনা, সরযূ, ইরাবতী—পুণ্যজলশালিনী, নদীবহুলা আমার জন্মভূমি—এই মাল, মগধ, বঙ্গেয়, মালদ, বিদেহ, ব্রহ্মোত্তর জনপদ। এই বিন্ধ্য, মন্দার, হিমালয়; পবিত্র গিরি-প্রান্তর-বনভূমি-পরিশোভিত দেশের প্রতি ধূলিকণায় কোটী কোটী বৎসরের ব্রাহ্মণের স্মৃতি-চিহ্ন মুছে দিতে আমরা দেব না। চল, যে ব্রাহ্মণ বেণের রাজ্যাভিষেকে "ওঁ স্বাহা স্বধা বষট্‌কার" মন্ত্র উচ্চারণ করেছিল, আজ তাকে সিংহাসনচ্যুত করে' আবার আর্য্যধর্ম্মী নূতন এক ক্ষাত্রবীরকে রাজসিংহাসনে সে-ই উপবেশন করাবে। যুগে যুগে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবীর্য্যে রাজ্য-বিবর্ত্তন হয়; বেণকে ধ্বংস করতে ব্রাহ্মণের বাহুবল আজও হীনপ্রভ নয়।

সকলে—জয় ব্রহ্মণ্যবীর্য্যের জয়। জয় হিমবর্ষ ভারতের জয়।

(সকলের প্রস্থান)

দত্তালি—ওরে দত্তালি, তুই এখন করবি কি? "আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী।" চিরকাল এই করেছি বাবা। ছন্দঃ, ব্যাকরণ, নয় নিরুক্ত—কালে ও ভাবে সপ্তমীর দৃষ্টান্ত 'বিষ্ণৌ নতে ভবেন্মুক্তিঃ'—কিন্তু আজ বাবা, মুক্তি-মন্ত্র ঘাড় নীচু করে' নয়; ঠাকুরের সুদর্শন চক্রটী কেড়ে' নিয়ে আত্মসংস্কৃতিরক্ষার রুদ্র অভিযান। পাণ্ডু, মৃকণ্ডু যে পথে, দত্তালিও তার বিপরীতে যাবে না! জয় জন্মভূমি! জয় ভারতবর্ষ! জয় ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম!

[ পটক্ষেপণ ]

## তৃতীয় দৃশ্য

### রাজপ্রাসাদ

(জনৈক সেনানায়কের সহিত বেণের প্রবেশ)

বেণ— বন্দী ভৃগু, তবু
কহে উপদেশ-বাণী?

সেনানায়ক—হাঁ, মহারাজ! প্রদীপ্ত অগ্নি সম
উদ্ধত ব্রাহ্মণ—
স্পর্দ্ধিত কণ্ঠের বাণী—
কহে—রাজ্যশ্রী, বিভব,
কীর্ত্তি-বল-বৃদ্ধি হবে,
রাজা যদি বেদ-ধর্ম্ম
শির পাতি' লয়।
আর্য্যধর্ম্ম অস্বীকার করে যেবা,
রাজ্য তার কভু নাহি রয়;
অনন্ত নিরয় ভাগ্যে
নিবারণ কেহ নাহি করে।

বেণ— প্রজা হয়ে এত স্পর্দ্ধা তার!
রাখ বন্দী সেনাপতি।
মৃত্যু তার হবে তিলে তিলে।
আমি রাজা, অন্নদাতা স্বামী।
মূর্খ মোরে ধর্ম্মবাণী শিক্ষা দেয়!
যাও, বল তারে—
বেদ আমি নাহি মানি।
নাহি মানি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,
সংখ্যাতীত বেদের দেবতা।
রাজদেহে বর্ত্তমান সব।
সর্ব্ব-দেবেশ্বর আমি।
বল তারে—সবার ঈশ্বর বেণ।

সেনাপতি—যথা আজ্ঞা, মহারাজ! (প্রস্থান)

(মৃত্যুদেবের প্রবেশ)

বেণ— কহ মাতামহ,
রাজ্যের কুশল-বার্ত্তা।
যতিগণ ধর্ম্মবার্ত্তা
করেছে প্রচার?

তপস্যার হোমানল
করিয়া নির্ব্বাণ
রাজধর্ম্ম ধরিছে কি
গ্রহণ সকলে ?

মৃত্যুদেব— এখনও প্রবল বাধা
সম্মুখে মোদের।
দীর্ঘদিন বিপ্রজাতি
বেদধর্ম্ম করিল প্রচার;
সে আচার সহজে না হয় দূর।
হের কূটবুদ্ধিবলে
খণ্ড খণ্ড করি' রাজ্যভাগ—
ভিন্ন ভিন্ন নৃপের শাসনে
প্রতিদিন প্রজাগণ
বেদধর্ম্ম পালে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সব
একে একে
করি আক্রমণ,
বিশাল সাম্রাজ্য বৎস—
করিব স্থাপন।
ধর্ম্মের প্রতিভূ রাজা
নহে বিপ্রজাতি।
ধর্ম্ম-আবরণে
দ্বিজাতি স্বজাতি পালে।
লক্ষ্য তার নহে ধর্ম্ম,
জাতিরূপে আধিপত্য চাহে লোকে।

বেণ— বুঝিয়াছি সে কপটনীতি।
কহে ধূর্ত্ত—বিশ্ব-সৃষ্টি
ব্রাহ্মণ কল্যাণে।
চিরদিন প্রচারে প্রচারে
বর্ণ-ধর্ম্মে জাতিরে করিয়া খর্ব্ব—
ক্ষাত্র, বৈশ্য, শূদ্র সম্প্রদায়
মাথা নত চিরদিন করে তারা—
ব্রাহ্মণ-চরণে।
বুঝাইতে হবে লোকে—
রাজশক্তি পূজ্য পৃথিবীতে।
কুলটা কামিনী যথা—
স্নেহবতী উপপতি প্রতি,
তথা নৃপরূপী ঈশ্বরেরে
করি' অস্বীকার
প্রজাকুল প্রণতি জ্ঞাপন করে
ব্রাহ্মণ-চরণে।

মৃত্যুদেব— নির্লজ্জ ব্রাহ্মণ জাতি
নিখিল মানবে করে'
সম্মোহিত বেদ-ধর্ম্মে।
মুক্তি দিতে হবে বৎস
মিথ্যার বন্ধন হতে মানবেরে।
প্রচার করিতে হবে—
ধর্ম্ম নহে স্বর্গ কিম্বা
অপবর্গ হেতু
ধর্ম্ম বটে জগতের সার—
কিন্তু তাহা মানবের
সর্ব্বসুখহেতু।

(জনৈক সেনানায়কের প্রবেশ)

সেনানায়ক—মহারাজ, ছিল যত যজ্ঞাগার
নিশ্চিহ্ন হয়েছে সব।
কিন্তু অদ্ভুত বারতা
সুমন্ত আচার্য্যে
নিক্ষেপিনু কূপে
মরণ অব্যর্থ জানি';
কিন্তু ধূর্ত্ত জপে ব্রহ্মনাম
বিগলিত অশ্রু ঝরে চোখে।
আরও এক সংবাদ ভীষণ—
ভৃগু মুনি কারাবন্দী হলে,
রাজসৈন্য সনে বিপ্রগণ
বাধাইল রণ।
সে অনল নির্ব্বাপিত ভাবি'
সৈন্যগণ নিশ্চিন্ত সকলে।
অকস্মাৎ অশনিসম্পাত সম
শস্ত্রধারী দ্বিজগণ
দলে দলে দুর্গ আক্রমণ করে।

অপূর্ব্ব বারতা রাজা,
করি নিবেদন।

বেণ— মাতামহ, কোথা সেনাপতি?
কোথা মোর চতুরঙ্গ সৈন্যদল—
অশ্ব, গজ, রথী ও পদাতি?

মৃত্যুদেব— স্থির হও বৎস।
ব্রাহ্মণের রোষানল
তৃণবহ্নি সম;
নিমিষে জ্বলিয়া
পুনঃ নিমিষে নিভিবে।
রহ সভাগৃহে;
আছে দুর্গে দুর্গে সেনা—
দুরাধর্ষ নিষাদ-বাহিনী।
প্রভঞ্জনে শুষ্ক পত্র সম
দূর হবে এ ক্ষুদ্র বিদ্রোহ।

( মৃত্যুদেবের প্রস্থান )

বেণ— এ কি ধর্ম্ম? মুক্তি-ইচ্ছা যদি—
যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়া কিবা লাভ?
কিবা ধর্ম্ম, কিবা ধর্ম্ম নহে,
অসৎ ও সতের বিচার—
মুক্তি ও বন্ধন কি কারণে ঘটে—
কোন যুক্তি নাই তার।
মূর্খ প্রজাগণে
করি' সম্মোহিত
মিথ্যার প্রভাবে
আপন প্রাধান্য হেতু—
কহে বেদ-ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের,
শূদ্রাদি অপর জাতি
অনুগত হবে তার।
কর্ম্মে কর্ম্মে উন্নীত হইবে সবে—
ধাপে ধাপে জন্ম-জন্মান্তরে।
কহে—বিশ্বসৃষ্টি ব্রহ্ম হতে।
নাহি যুক্তি—আপ্ত বাক্য
প্রমাণের সার।
যাহা সত্য নহে,
শূন্যে গৃহ-নির্ম্মাণের ন্যায়
জাতিকে করিয়া রাখে
নির্ব্বীর্য্য অধম
ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠারক্ষণ হেতু।

( দ্রুত কারারক্ষীর প্রবেশ )

কারারক্ষী— মহারাজ, মহারাজ,
দুঃসংবাদ অতিশয়!
যেন পৃথ্বী বিদারিয়া
অকস্মাৎ উৎস সম উঠে বিপ্রসেনা
কারাদ্বার আক্রমণ করে।
বাধিল ভীষণ রণ।
রাজসৈন্য পরাজিত।
সহস্র সহস্র বন্দী
জয়-কণ্ঠে বেদ-মন্ত্র
করি' উচ্চারণ
ধায় রাজপথে।
ঐ ভীম সমুদ্র-গর্জ্জন
বিরাট্ বাহিনী বুঝি
আসে এইদিকে।

বেণ— কোথা গেল রক্ষীদল মোর?

( মৃত্যুদেবের দ্রুত প্রবেশ )

মৃত্যুদেব— ধর অসি। রাজশক্তি করহ প্রকাশ।
ছত্রভঙ্গ রাজসেনা—
নৃপতির পাইলে অভয়
হবে শৃঙ্খলিত পুনঃ।
আকস্মিক এ বিপ্লব
মুহূর্ত্তে হইবে দূর।

বেণ—( অসিমুক্ত করিয়া ) কোথা সেনাপতি?
কোথা সৈন্যগণ?
রাজা আমি, ধর আজ্ঞা মোর—
বিদ্রোহ দমন কর ত্বরা।

( সম্মুখে ভৃগু মুনির প্রবেশ, পশ্চাতে অসি হস্তে ব্রাহ্মণ-সৈন্য )

ভৃগু— শুন নরপাল!
ব্রাহ্মণের ক্ষমা ধর্ম্মের [illegible]
যদি মোর উপদেশ [illegible]

করহ শ্রবণ,
অভয় দিতেছি আমি—
নিরাপদ্ সিংহাসন তব।

বেণ— কপট ব্রাহ্মণ!
যুগ যুগ কূট ষড়যন্ত্রে,
ক্ষাত্রশক্তি করি' নত
আপন প্রতিষ্ঠারক্ষা
করেছ নিয়ত।
শিখায়েছ মানবেরে
মিথ্যারে পূজিতে।
কহ সবে চিরদিন—
সত্য ও অহিংসা ধর্ম্ম;
যজ্ঞকর্ম্মে পশুহিংসা
কর কি কারণ?
যেই বাক্য, সেই কর্ম্ম
নহে রীতি ব্রাহ্মণের।
ধূর্ত্ততার আছে সীমা;
আজি তব প্রায়শ্চিত্ত হবে।

ভৃগু— শুন রাজা, বেদমন্ত্রে
ভ্রমজ্ঞান হয় দূর।
এ জগৎ অনাধার নহে।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ
তাই সম্মুখে তোমার।
মোহ দূর কর নরপতি—
শুন কথা, শ্রেয়ো লাভ
হইবে তোমার।

বেণ— সীমাহীন স্পর্দ্ধা তব।
মিথ্যাভাষী। নত শির
কর মোর কাছে।
বল মুখে যদি
অহিংসা ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম,
যজ্ঞকর্ম্মে পশুহিংসা
কেন ধর্ম্ম হয়?
অপরূপ যুক্তি ব্রাহ্মণের!
জালি' হুতাশন,
হবিঃ সমর্পণ কর;
মুগ্ধ মূর্খগণ ভাবে
দেবতা প্রসন্ন হবে
ঘৃত সহ শমীকাষ্ঠ
করিয়া ভক্ষণ।
শুন ওহে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ!
যজ্ঞস্থলে পশুবধ হ'লে
তার আত্মা স্বর্গগত হয়—
স্বর্গকামী হে ব্রাহ্মণ,
কেন পশুবধ?
জনকের প্রিয়কার্য্য কর,
পিতৃবধ কর যজ্ঞস্থলে।
শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণভোজনে
তৃপ্তি যদি পায় পিতৃগণ,
কি কারণ ভোজনের আয়োজন?
পুত্রগণ করিলে ভোজন,
আর্য্য পিতা পরিতৃপ্ত হবে।
বেদ-ধর্ম্ম তাই
বিসর্জ্জন দিতে চাই।
যুক্তি ও বিজ্ঞান
মানবেরে দিবে সত্য জ্ঞান।
প্রহেলিকা হবে দূর,
সুখস্থান হবে বিশ্ব।

ভৃগু— দুর্ম্মতি দিয়েছে বিধি—
উপলক্ষ্য মৃত্যুদেব।
প্রজ্ঞা, শ্রী, বিনষ্ট সকলি—
নাহি রক্ষা আর।
রেখ মনে আর্য্যধর্ম্ম
বেদপ্রতিষ্ঠিত।
সৃষ্টিকল্প হতে
বেদের বচনে
নাম-রূপ-কর্ম্ম লভি'
পৃথক্ পৃথক্ রূপে
জন্মে জীব যথা রূপে।
ব্রাহ্মণের কর্ম্মক্ষয়

কভু নাহি হয়।
যুগে যুগে তাই
ব্রাহ্মণের আবির্ভাব
লোকরক্ষাহেতু।
শুন বেণরাজ,
আর্য্যবংশোদ্ভূত তুমি—
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম
অবিচ্ছিন্ন রহে যদি,
মর্ত্ত্য হবে স্বর্গধাম।
যুগবিপর্য্যয়ে কিন্তু
বিপরীত ঘটিবে নিশ্চয়।
তুমি লোকপাল,
প্রজাপতি প্রিয়ব্রতের সন্তান।
বেদধর্ম্মরক্ষার কারণ
ব্রাহ্মণ দিয়াছে
তোমা রাজসিংহাসন।
বংশের গরিমা তুমি।
শুভাশুভ কর্ম্মে
জীবন্তের উত্থানপতন;
মিথ্যা ধর্ম্মে দাও বিসর্জ্জন,
পবিত্র ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম
করহ রক্ষণ রাজা।

মৃত্যুদেব— বহুবাক্য বেদমন্ত্র
ব্রাহ্মণ দিয়েছে।
বাক্যবলে ছলিয়াছে
যুগ যুগ বহুজনে।
সৈন্যগণ, প্রজাগণ,
আজি শুভক্ষণ,
বধ এ দুর্জ্জনে।
চিন্তার জগতে
লহ মুক্তি—ব্রাহ্মণের
মোহজাল ছিঁড়ি'।
দীর্ঘদিন মানবের
করি অপমান,
প্রতিভার সিংহাসনে
ব্রাহ্মণ সম্রাট্ হয়ে
করিল শাসন সবে—
মূর্খ করি' রাখে যত
ব্রাহ্মণ ব্যতীত জনে।
হের অনাচার!
প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতি—
মহামানবেরে যারা
পূজিতে চাহিল,
সমগ্র মানবজাতি,
সম জাতি বলে'
ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলী
কৌশলে হরিল শক্তি;
পহ্লব, পারদ নামে
করি' অভিহিত
ভারতের ক্ষাত্রশক্তি
করিল দুর্ব্বল।
পুনঃ হের বন্ধুগণ!
নারীর মর্য্যাদা
ব্রাহ্মণ-শাসনে
নিয়ত বিনষ্ট হয়।
নারী দাসীরূপে
পুরুষের করে সেবা।
ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
নিম্নবর্ণা নারী
পত্নীরূপে করিতে গ্রহণ—
কিন্তু ব্রাহ্মণের আভিজাত্য
লঙ্ঘিবে যে জন,
কি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত হবে তার
বর্ণিবার নাহি ভাষা।
বিপত্নীক হইলে পুরুষ,
পুনঃ নারী করিতে গ্রহণ
ব্রাহ্মণের প্রশস্ত বিধান রহে।
কিন্তু পতিহীনা নারী—
দুর্দ্দশার নাহি সীমা,
দাসীবৃত্তি প্রায়শ্চিত্ত তার।

ভৃগু— দুর্ম্মতি অপার!
শুন ম্লেচ্ছ মৃত্যুদেব।
দেবভূমি এ ভারত।
স্বার্থ-কাম করি বিসর্জ্জন
কর্ম্মে নর ব্রহ্মপথে ধায়।
নারী ক্ষেত্র মানব-সৃষ্টির।
জীবধাত্রী রমণীর
পবিত্রতা-রক্ষা হেতু
আছে শাস্ত্রে কঠোর বিধান—
মানব-কল্যাণ হেতু।
জাতির প্রসূতি নারী।
জাতির উন্নতি
মাতৃগর্ভ হতে।
তপস্বিনী নারীমূর্ত্তি
তাই ভারতের।
স্থূল বুদ্ধির বিচারে
শাস্ত্রের মাহাত্ম্যবাণী
বুঝিবে না তুমি।
কহি বেণরাজে
শাশ্বত ধর্ম্মের মূর্ত্তি
ব্রাহ্মণ সম্মুখে।
হয় বেদ, নয় নির্ব্বাসন—
অন্য পথ নাহি আর।

মৃত্যুদেব— রাজা তুমি বেণ,
এত স্পর্দ্ধা কি কারণ
সহিতেছ অনায়াসে?
আরে রে ব্রাহ্মণ!
শিরশ্ছেদ প্রায়শ্চিত্ত তব।

(মৃকণ্ডু আসিয়া মৃত্যুদেবকে অস্ত্রাঘাত করিল)

মৃত্যুদেব— উঃ, চিরশত্রু রহিল জগতে!

বেণ— মৃত্যুশেল ধর বুকে—
হে ব্রাহ্মণ, মৃত্যুদণ্ড
প্রায়শ্চিত্ত হোক। (অসি উত্তোলন)

(পাণ্ডু আসিয়া হস্ত ধারণ করিল, অসংখ্য ব্রাহ্মণগণ আসিয়া তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিল)

ভৃগু— কি করিলি তোরা?
পবিত্র ব্রাহ্মণধর্ম্মে
দিলি জলাঞ্জলী?

মৃকণ্ডু— এই কি ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম!
মুনিবর, হের
রাজসিংহাসনে বসি'
ক্ষত্রিয় নৃপতি
গুরুপত্নী করিছে হরণ;
ব্রাহ্মণের বৃত্তি কাড়ি',
ভাঙ্গি' জাতি-ভেদ,
বেদ-ধর্ম্মে করি' পদাঘাত,
ভারতের আর্য্য ধর্ম্ম
করিছে মলিন!
হেন অনাচার
বিধাতার বিধিরূপে
সহি' অনায়াসে,
ব্রাহ্মণ-সমাজ
শুধু আর্ত্তনাদে
ধ্বনিবে গগন?
প্রতিকারে হবে পরাঙ্মুখ?

ভৃগু— কিন্তু হে যুবক!
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে হিংসা,
নহে রাজহত্যা।

মৃকণ্ডু— নহে যদি, তবে কেন
ব্রাহ্মণের কণ্ঠে প্রতিবাদ?
ধর্ম্ম যায়, জাতি যায়,
আর্য্যকৃষ্টি হয় লোপ—
আতঙ্কে শিহরে প্রাণ।
রাজা যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জন,
আজ্ঞা তার অবশ্য পালন
ব্রাহ্মণে করিতে হবে।
বর্ণভেদ অকারণ মুনিবর!

ভৃগু— ধর্ম্মরক্ষাহেতু ব্রাহ্মণের
একমাত্র অস্ত্রবল—
নিষ্ঠা ও বিশ্বাস।

পশুবল ক্ষাত্রশক্তি—
ব্রাহ্মণের নহে।

সুমন্ত— ক্ষম মুনিবর!
প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন,
যজন, যাজন
ব্রাহ্মণের আত্মরক্ষাহেতু।
ক্ষীণশক্তি হয় যদি,
ক্ষাত্রধর্ম্ম করিবে গ্রহণ;
এ বিধান অপ্রসিদ্ধ নহে।

ভৃগু— বৃত্তি পক্ষে এ বাণী প্রশস্ত।
কুটুম্ব-পালনে বিপ্র
যদি অসমর্থ হয়
স্ববৃত্তি-সাধনে—
পুররক্ষা, দেশরক্ষা কর্ম্মে
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম
করিবে বরণ।
ইহাতেও অসমর্থ যদি হয়,
তবে বিপ্র জাতি
বৈশ্যবৃত্তি লইতে পারিবে।
কিন্তু আচার্য্যপ্রধান!
এই ক্ষেত্রে রাজহত্যা
ব্রাহ্মণের বৃত্তি নহে।
ধর্ম্ম-রক্ষা মোহে
হিংসার আশ্রয়
লইয়াছে বিপ্রজাতি।
স্ব ধর্ম্ম করিয়া নাশ
অভিশপ্ত হইল ব্রাহ্মণ।
অমর ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম—
ব্যর্থ নাহি হবে।
কর্ম্মদোষে ব্রাহ্মণ হইয়া যারা
হিংসাবৃত্তি করিল ধারণ আজি,
তুষারাদি জাতিরূপে
হবে তারা বিন্ধ্যাচলবাসী।
কর্ম্মক্ষয়ে পুনঃ
ব্রাহ্মণের আত্মা
ব্রাহ্মণ হইবে।
নব জাতি হইবে সৃজন।
এক পাপ নিবারিতে
মহাপাপ করিলে আশ্রয়—
এইরূপে দিনে দিনে
হয় ক্ষীণ বিপ্রজাতি।
কিন্তু নাহি ভয় তায়—
একজন গুণ-ধর্ম্মে
যথার্থ ব্রাহ্মণ যদি রয়,
ত্রিসংসার জয়
ব্রাহ্মণ করিবে সুনিশ্চয়।
বৎসগণ! একা আমি
পুনঃ এই পুণ্যভূমে
প্রবল ব্রাহ্মণজাতি
করিব সৃজন।

মৃকণ্ডু— হে আরাধ্য মুনিশ্রেষ্ঠ!
দুষ্কৃত জনেরে শাস্তি দিতে যদি
ব্রাহ্মণের শক্তি নাহি রয়,
বৃথা সংস্কৃতির জয় কণ্ঠে—
বৃথা ব্রহ্মতেজঃ।

ভৃগু— বীজধর্ম্মে ব্রাহ্মণাদি
জন্মিল জগতে।
বীজধর্ম্ম অবিকৃত
নাহি রয় যদি,
বীভৎস সঙ্কর-দোষে
শান্তি ও শৃঙ্খলাহীন
হইবে ধরণী।
পশুবল নহে
একমাত্র শক্তি মানবের।
ওরে, ধৈর্য্যহীন
কেন আজ ব্রহ্ম-বল বিকৃত করিলি?
ব্রাহ্মণের তপোবীর্য্য
নব ক্ষাত্রদেহে
যে শক্তি ছিল
সৃজনে ব্যাপৃত ছিল,

ক্ষুণ্ণ হ'ল হিংসার পীড়নে।
ব্রাহ্মণ ত্যজিল ধর্ম্ম;
অধর্ম্ম পশিল প্রাণ।

মৃকণ্ডু— বেদবিধি এই যদি হয়,
শির পাতি' লইব নিশ্চয়।
কিন্তু আজ উচ্চকণ্ঠে কহি—
শুন আর্য্যজাতি!
বেদ যদি হয় শাস্ত্র,
বেদ-বাণী মন্ত্র ব্রাহ্মণের,
বেদের সংস্কৃতি
যদি অমৃত ভুবনে,
সেই ধর্ম্ম যদি
ভারত রাখিতে চাহে—
বেদ-বিদ্ ব্রাহ্মণেরে
প্রয়োজনে সর্ব্বগুণ
ধারণ করিতে হবে।
প্রয়োজনে স্বধর্ম্মকারণ
পাষণ্ডে বধিতে হবে
দ্বন্দ্বহীন চিতে।
আজ গুরুদ্রোহী নাহি হব।
বিদায় লইয়া যাই,
দুঃখ নাহি তায়।
স্বধর্ম্ম-রক্ষণ তরে
আকল্প নিরয় যদি হয়,
নাহি ভয়। নাহি চাই
রাজার ঐশ্বর্য্য,
রাজসিংহাসন।
ভারতের ধর্ম্মরক্ষা তরে
বিন্ধ্যগিরি করিব আশ্রয়।
পুনঃ অসহায়
জাতি যদি হয়,
আর্য্যরক্তে নব জাতি
করিয়া গঠন,
ধর্ম্মরাজ্য করিব স্থাপন।
কণ্ঠে উঠে অপৌরুষেয় বাণী।
এত দিন ঋক্‌ধ্বনি
অবরুদ্ধ ছিল
ব্রাহ্মণের কণ্ঠে শুধু—
মুক্তি তার নেহারি নয়নে।
আসিবে সে দিন—
স্ব ধর্ম্ম-রক্ষণ হেতু,
যে বীর ধরিবে শস্ত্র,
দুর্জ্জননিধনব্রতে
নব ঋক্-মন্ত্র
উঠিবে তাহার কণ্ঠে
নিনাদি' ভুবন।
নব যুগ এ ভারতে
করিয়া স্থাপন,
বেদের সংস্কৃতি পুনঃ
বিশ্বেরে করিবে জয়।
জয় সেই অনাগত
দেবতার জয়।
প্রণমি চরণে দেব!
স্মৃতির বিধান
নহে অভিশাপ—
বর বলি' মানি।

(প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

সকলে— জয়, জয়, নব ব্রাহ্মণের জয়।
নব ঋষি মৃকণ্ডুর জয়।

(বহুলোক প্রস্থান করিল)

ভৃগু— এখনো দাঁড়ায়ে আছ?
এখনো সংশয়ে দুলিতেছে প্রাণ?
যাও মৃকণ্ডুর
হও গে সহায়।
আমি একা আজি।
মরীচি, পুলস্ত্য, ক্রতু
বশিষ্ঠাদি নব ঋষি—
আমি চাহি চাতুর্ব্বর্ণ্য-জাতি।
সংগ্রাম, শাসন-বল—
চির ক্ষাত্র-ধর্ম্ম।
ধনরত্ন-আহরণ,
কৃষি ও বাণিজ্য,
পশ্বাদি পালন—
বৈশ্যবৃত্তি সনাতন।
শিল্প ও দাসত্বে
শূদ্রজাতি ধরণীতে।
বিপ্লবী ব্রাহ্মণ
স্বধর্ম্ম লঙ্ঘন যদি করে,
ক্ষমা তারে কভু নাহি হয়।
পৌণ্ড্র, ওড্রভূমি,
দ্রাবিড়, কাম্বোজ,
পারদ, পহ্লব, চীন,
কিরাত, দরদ,
খস, শক, যবনাদি জাতি
কর্ম্মদোষে শূদ্রত্ব করিয়া লাভ
কেহ রহে ব্রাহ্মণ-শাসনে,

কেহ ভিন্ন দেশে
ভিন্ন জাতি হয়।
শক্তিহীন তবুও ব্রাহ্মণ নহে।
বীজোৎকর্ষে জাতির উৎকর্ষ।
হলে বিপরীত
অপকর্ষ পাবে জাতি।
হীন জাতি রাজ্য যদি পায়,
রাষ্ট্র-ধর্ম্ম নহে,
দস্যুবৃত্তি হয় তাহা।
সত্য ও অহিংসা,
সংযম, শুচিতা ব্রত
জাতিরক্ষাহেতু
আজি প্রয়োজন।
সে দায়িত্ব ব্রাহ্মণের।

দত্তালি—অবধান কর, অবধান কর, মনু-বচন অবধান কর। স্বকীয় শক্তি ও রাজশক্তি—"স্ববীর্য্যং বলবত্তরম্।" অতএব শত্রুনিগ্রহ স্বকীয় প্রভাবেই হবে। অর্থাৎ অবিচলিত চিত্তে অথর্ব্ব-বেদোক্ত আঙ্গিরসী শ্রুতি অর্থাৎ অভিচার-মন্ত্রাদি আবৃত্তি কর। ব্রাহ্মণের বাক্যই শস্ত্র। শত্রুবিনাশের পক্ষে উহাই যথেষ্ট। কেমন প্রভু, ইহাই সত্য নয়?

ভৃগু— সত্য, বৎস! শাস্ত্রের বিধান—
বাহুবল ক্ষত্রিয়ের—
শস্ত্রবল বাক্য ব্রাহ্মণের।

দত্তালি—জয় প্রভু! ব্রাহ্মণ জনসমাজের উপদেষ্টা, ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা। সর্ব্বভূতেই মিত্রভাব। হিংসা? আরে বাপ—ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।

ভৃগু— একি শুনি! আর্ত্তকণ্ঠে
শোকোচ্ছ্বাস উঠিয়াছে—
রোদনের রোল
আসে অন্তঃপুর হতে!

(মন্ত্রীর সহিত পৃথুর প্রবেশ)

মন্ত্রী— মহামুনি! করি নিবেদন।
বেণের নিধনবার্ত্তা
পৌঁছিয়াছে অন্তঃপুরে।
বেণ-পত্নী উন্মাদিনী।
জননী সুনীথা
শোকাতুরা অতিশয়।
হের মুনিবর,
বসুন্ধরা কম্পে ঘন ঘন।
রাজপথে উঠে কোলাহল,
রাজার মরণে,
দস্যুগণ পুলকিত অতি।
অঙ্গরাজ বেণ,
তাহার আত্মজ পৃথু—
ইনি যুবরাজ,
রাজপদে বরিয়া ইহারে
রাজ্য-রক্ষা কর মুনিবর।

(মুক্তভরবারি হস্তে খর্ব্বাকৃতি এক ব্যক্তির আবির্ভাব)

আগন্তুক— আমাদের বাহুবলে
রাজ-সৈন্য ক্ষয় হয়;
মৃকণ্ডু মোদের রাজা—
বেণ-বংশ নির্ব্বংশ করিব।

ভৃগু— ব্রহ্মবল হীনপ্রভ নহে।
মুনিগণ, তপোবল
করিয়া প্রয়োগ,
বিদ্রোহী শাসন কর।

মুনিগণ— (সমস্বরে) নিষীদ, নিষীদ।

(আগন্তুক পলায়ন করিল)

ভৃগু— শুন হে সচিব,
বিষ্ণুর পবিত্র অংশে
রাজার জনম।
আশীর্ব্বাদ করি—
পৃথুরাজ আজি হতে
রাজচক্রবর্ত্তী।
হে নব নৃপতি,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম তব
লোকরক্ষাহেতু।
লহ সিংহাসন।
রাজার মুকুট পর শিরে।

(ভৃগুমুনি পৃথুকে রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল)

[যবনিকা]

# ভাবরাজ্যে চীনের ক্রমবিকাশ

ডক্টর শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, পি-এইচ্-ডি

৩

কংফুচিউ-এর পর, অনেক মতের দার্শনিক উত্থিত হন। ইঁহাদের মধ্যে মোটি মোট্‌সু (মিকিয়ুস্) এক প্রকারের কম্যুনিজম ও সার্ব্বজনীন প্রেমের মত প্রচার করেন। মেংকো বলিতেন, ইয়াংচুস জগতকে বাঁচাইবার জন্য নিজের মাথার একটি চুলও ত্যাগ করিবেন না। কিন্তু মোট্‌সু ইচ্ছাপূর্ব্বক সবই দান করিবেন। কিন্তু মেংকো এই মতের ভীষণ প্রতিবাদ করেন।

ভীষণ আভিজাত শাসনের পোষকতা ও অহংবাদের চূড়ান্ত প্রচারের মধ্যে মোটির সাম্যবাদ ও বিশ্বজনীন প্রেম প্রচার চীনের এই সময়ের ইতিহাসে একমাত্র* পাদপাদপ মাত্র! চীনের সামন্ততান্ত্রিক ও তৎপর কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য স্থাপন প্রচেষ্টার মধ্যে সামাজিক স্তর-ভেদ ও অভিজাত শাসনের পরিপোষক মতসমূহ প্রচারিত হয় এবং অভিজাতদের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে ঐ মতসমূহ বদ্ধমূল করা হয়।

কংফুচিউ-এর মতের বাঁধাধরা নিয়ম কানুন এবং সংশয়বাদ ও নাস্তিকতার প্রতি বিরক্ত হইয়া মোটি (৫০০-৪২০ খৃঃ পূঃ) নিজের মত প্রচার করেন। ইনিই একমাত্র চীনবাসী যিনি একটা ধর্মস্থাপন করিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে (১)। ইঁহার মতের সহিত আজকালকার Utilitarianism ও Pragmatism-র সঙ্গে মিলে। ইনি বলেন, মানব প্রতিষ্ঠানসমূহ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সেইজন্য তাহাদের বাস্তব সফলতার উপর তাহাদের মূল্য ও অর্থ নির্ভর করে। কংফুচিউ-এর Determinism মত,—"জীবন ও মৃত্যু পূর্ব্ব হইতেই ঠিক হইয়া আছে; ধন ও সম্মান ভগবানের হাতে নির্ভর করে" (২)—মোটি অগ্রাহ্য করিয়া বলেন, "ব্যক্তির নিজের কর্ম্মের উপর তাহার উদ্ধার নির্ভর করে। Determinism বা অদৃষ্টবাদ নিন্দনীয়। কারণ, এতদ্দ্বারা রাষ্ট্রে অরাজকতা ও কলুষতা আসিবে। ইহা শিল্প-বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান করিবে না, কর্ম্মে অবহেলার প্রশ্রয় দিবে, এবং জগতের অনেক দারিদ্র্য ও কষ্টের জন্য দায়ী। এতদ্ব্যতীত ইহাদ্বারা শিক্ষা ব্যর্থ হইবে (৩)।

মোটির ধর্ম্মমত দুই শতাব্দী ব্যাপিয়া (৪৩০-২৩০ খৃঃ পূঃ) চীনে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই সময়ে ইহা কাংফুচিউয়ের মতের বিশিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। কিন্তু প্রথম চিনবংশীয় সম্রাট ও পরে হান রাজত্বের শাসন কালে পুনরুত্থিত কংফুচি-এর দলের লোকদের দ্বারা নিপীড়িত হওয়ায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত মোটির ধর্ম্মমত মস্তকোত্তোলন করিতে পারে নাই। কেবল বর্ত্তমান শতাব্দীতে কাংফুচিউএর মত ধর্ম, নীতি ও দর্শনের ভিত্তি বলিয়া অস্বীকৃত হওয়ায়, মোটির মত Neo-Motism (নূতন মোটিবাদ) আকারে চিন্তাশীল লোকদের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতেছে (৪)। চীনের চিন্তাক্ষেত্রে একমাত্র এই মতটি বিজ্ঞানানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে যখন মোটির মত প্রথমে উত্থিত হয়, তখন যুদ্ধ-বিগ্রহের যুগ। তাঁহার বিশ্বজনীন প্রেম ও অহিংসাবাদ তখনকার লোকদের উপযোগী ছিল না। হানফেই বলেন, "শত্রু বিনাশ করা ও দয়ার কথা বলা, সহর জয় করা ও সেই সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের কথা বলা একসঙ্গে চলে না। এই প্রকারে পরস্পর বিরোধী মতের দ্বারা কি প্রকারে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে?" (৫)

হানফেই-এর এই মত তাহার পূর্ব্ব সহপাঠী লি সজে (Li-Sze) গ্রহণ করেন। ইনি পূর্ব্বোক্ত চীন সম্রাট হুয়াংটির প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনিই খৃঃ পূঃ ২১৩ সালে সমস্ত স্বাধীন চিন্তাশীল লোকদের নির্য্যাতীত করেন ও সমস্ত পুস্তক পুড়াইবার হুকুম দেন। এক হাজার বৎসর পর্য্যন্ত চীনে এই ভীষণ প্রতিক্রিয়ার ফলভোগ করে। এই দীর্ঘ সময়ে চীনের চিন্তাক্ষেত্রে এমন একটা সংজ্ঞাহীন অবস্থা আসে যে ইহার মধ্যে একজনও মৌলিক গবেষণাকারী লোক উত্থিত হয় নাই (৬)।

চীনের রাষ্ট্রীয় অরাজকতা ও আভিজাত যথেচ্ছাচারিতার মধ্যে এই সকল দার্শনিক ও নৈতিক এবং ধর্ম্মের মত উত্থিত হয়। কংফুচিউ বলিয়াছিলেন, সমাজের নৈতিক অবনতির জন্যই চিন্তাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলতা আসিয়াছে এবং সমাজকে বহু শতাব্দী ধরিয়া ভিত্তিহীন করিতেছে।

---

* ইউরোপের প্রটেষ্টাণ্ট সংস্কার যুগে কালভিনের Pre-destination মত যেমন ধনী শ্রেণীর যথেচ্ছা উপায়ে ধনোপার্জ্জন করিয়া অবশেষে তদ্দ্বারা রাজশক্তি গ্রহণে সহায়তা করিয়াছিল, কংফুচিউ-এর মতও তদ্রূপ দুই হাজার বৎসর পর্য্যন্ত চীনের আভিজাতশ্রেণীর দ্বারা গরীবদের শোষণের সহায়তা করিয়াছিল।

১। Leang-Li.-P. 32.

২। Analects—Ch. XXI, 5.

৩। Leang-Li.-Pp. 31-32.

৪। Leaang-Li-P. 32.

৫। Har Fei Tze-Bk. XLIX.

৬। Leang-Li P. 34.

তাঁহার এই মত Ideological Interpretation of History (ভাবের দ্বারা ইতিহাসের ব্যাখ্যা) স্থায় প্রতীত হয়। কিন্তু তিনি ইহা বুঝিতে সক্ষম হয়েন নাই যে, চীনের সমাজ তখন একটা ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়া চলিতেছিল। সমাজে তখন অর্থনীতিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন হইতেছিল। এইজন্তই সমাজে "মাৎস্য-ন্যায়" আবির্ভাব হয়। সমাজের এই অবস্থার জন্তই ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার (Economic Interpretation of History) ফলে লাওট্সু ও কংফুচিউ-এর মতের উদ্ভব হয়। অভিজাত বংশগুলির রাষ্ট্রীয় শক্তি কাড়িয়া নিবার চেষ্টার মধ্যে টাওবাদ ও কংফুচিউ-এর মতবাদ তাহাদের শ্রেণী-প্রাধান্তের পোষকতা করিত বলিয়াই এই মতদ্বয় শাসকশ্রেণী গ্রহণ করে; আর নিপীড়িত নির্য্যাতিত ও শোষিতের ক্রন্দন-ধ্বনি যাহা মোটির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল—অভিজাতীয়দের দ্বারা তাহার কণ্ঠরোধ করা হয়। উচ্চ ও নিম্নস্তরের, ধনী ও গরীবের পার্থক্য ভগবানানুমোদিত ও স্বাভাবিক—এই মতটি অভিজাতবংশীয় কংফুচিউ-এর দ্বারা প্রচারিত হওয়ায় অভিজাতেরা তাহা গ্রহণ করিয়া প্রায় হাজার বৎসর সেই মতকে সনাতনরূপে কায়েমী করিয়া নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থ প্রণোদিত শাসন কায়েমী রাখে। লাওট্সুর মত অভিজাতীয়দের শোষণের সহায়তা করে, এবং কংফুচিউ-এর মত তাহার সমর্থন করে।

চীনের ইতিহাস অনুসরণ করিতে গিয়া আমরা তাহার এমন স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, যখন একটি একচ্ছত্র সম্রাট একটি অভিজাত-শ্রেণীও আমলাতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। চীনে প্রথম পাট্রিয়ার্কাল গোষ্ঠিগুলি কৌমে সংগঠিত হয়। প্রথম কৌমগত শাসন ছিল, পরে বিভিন্ন সামন্তদের রাষ্ট্র হয়। হুয়াংটি প্রথম একচ্ছত্র সম্রাট হন। ইনিই বর্ত্তমান চীনদেশের স্থাপয়িতা। এই সময় হইতে চীনদেশে রাষ্ট্র বর্ত্তমান আকার ধারণ করিতে থাকে। চীনের সমাজ ইহার পূর্ব্ব হইতেই অধিকার ও সুবিধাভোগী (privileged) শ্রেণী এবং অনধিকারী ও অসুবিধাভোগী (unprivileged) শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। নাইট্ হইতে অতি উচ্চ পর্য্যন্ত সমস্ত লোকেরা প্রথম শ্রেণীর লোক ছিল; এবং তাহাদের রাজদণ্ডের আইন (Penal Laws) হইতে অব্যাহতি ছিল। কিন্তু গণসমূহকে দণ্ড-আইনের অধীন থাকিতে হইত *। সমাজের এই দ্বৈত-ভাব সামন্ততান্ত্রিক যুগের পরেও বিদ্যমান ছিল। পরে পুরুষানুক্রমিক সুবিধাভোগকারীর পরিবর্ত্তে "ভদ্রলোক" ও কায়িক শ্রমজীবিদের "ক্ষুদ্রলোক" বলিয়া সামাজিক পার্থক্য সৃষ্ট হয়। পরে সমাজের মধ্যে বিবর্দ্ধিত বৈষম্যকে Sanction (অনুমোদন) জন্য কংফুচিউ তাঁহার দর্শনশাস্ত্র উদ্ভাবন করেন।

এতদ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে, প্রথমে কৌমগত প্রভাব বিনষ্ট হইলে, সামন্ততন্ত্র উদ্ভূত হয়। এই সময়ে কৌমের সর্দ্দার ও জ্যেষ্ঠদের হাত হইতে রাজনীতিক ক্ষমতা সামন্তদের হস্তে যায়; পরে একজন সামন্ত সার্ব্বভৌম সম্রাট হয়। এই সঙ্গে একটি আমলাতন্ত্রও সৃষ্ট হয়। কিন্তু এই আমলাতন্ত্র (mondarinate) একমাত্র অভিজাতীয়দের মধ্য হইতে সংগৃহীত হইত না।—শিক্ষিত লোকেরা Confusian Classics অর্থাৎ কংফুচিউ-এর পুস্তকসমূহ পাঠ করিয়া সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে গভর্ণমেন্টের চাকুরী পাইত। সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্য হইতে এই সকল কর্ম্মচারী সংগৃহীত হইলেও আমলাতন্ত্র বলিয়া তাহারা একটা অধিকার ও সুবিধা ভোগকারী শ্রেণী বলিয়া গণ্য হইত এবং উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত হইত।

অন্যান্য দেশের স্থায় চীনে সামন্ততন্ত্র পূর্ণমাত্রায় বিকাশলাভ করিতে পারে নাই। এইজন্য আমরা একটা সামরিক শ্রেণী ও তৎসঙ্গে উহার "নীতি" উদ্ভূত হইতে চীনে দেখি না। আবার সার্ফদের কথাও শোনা যায় না। কিন্তু দলবদ্ধ হইতে কৃষি কর্ম্মপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইয়া ব্যক্তিগত কৃষি, রায়ত ও জমিদাররূপ প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমে বিবর্দ্ধিত হয়। গরীবদের মুক্তি প্রচেষ্টার কোনও তথ্য এখনও আধুনিক ঐতিহাসিকেরা লোকগোচর করেন নাই। তবে প্রাচীনকালে ধর্ম্মের আবরণে শ্রেণী-সংগ্রাম চলিত বলিয়া কংফুচিউ-এর পদ্ধতি তাহার বিপক্ষে মোটির সাম্যবাদ ও বিশ্বপ্রেমের প্রচারের মধ্যে আমরা অভিজাতদের ও গরীবদের স্বার্থ ও আদর্শের সংঘর্ষ অনুমান করিতে পারি। চীনসম্রাট ও কংফুচিউ দলের মোটির শিষ্যদের দলন কার্য্যেও আমরা শ্রেণী দ্বন্দ্বের প্রমাণ দেখিতে পাই।

## চীনের অগষ্টীয় যুগ

হানবংশের পর নানা রাষ্ট্র-বিপ্লবও অল্পদিনের জন্য বিভিন্ন রাজবংশের উত্থানের পর 'টাং' বংশের (৬১৪-৯০৫ খৃঃ) উদয় হয়। হানবংশের স্থায় চীনবাসীদের স্মৃতি ও ভাষায় টাং বংশ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। চীনেরা যদি নিজেদের "হানের পুত্র" বলিয়া পরিচয় প্রদান করে, সেই সঙ্গে নিজেদের "টাং"-এর লোক (টাং যেন) বলে। এই বংশের প্রথম সম্রাট কাওট্সু যুদ্ধ-বিগ্রহ অপেক্ষা টাওবাদে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এই বংশের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত লোক ছিলেন সম্রাট টাইট্সুঙ্ (৬২৭-৬৫০ খৃঃ)। ইহাকে "চীনের অগসটুস" বলা হয় (১)। তাঁহার রাজত্বকালে পশ্চিমে কাস্পীয় সমুদ্র পর্য্যন্ত চীনের সৈন্যদলের প্রতিনিধি ছিল। এই সময়ে চীন-সাম্রাজ্য সর্ব্ববৃহৎ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। সিয়ানসিন নামক তাহার সুন্দর মনোরম রাজধানীতে পশ্চিমের গ্রীক্ সম্রাট ও পূর্ব্বের জাপান হইতে সাধু ও পণ্ডিতেরা আসিতেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, সিয়ানের লোকদের

* এই নিয়ম হিন্দুর স্মৃতির দ্বিজ ও শূদ্রের মধ্যে দণ্ডভেদ স্মরণ করাইয়া দেয়; উভয় দেশের নীতিই উৎপত্তি একস্থলেই—শ্রেণী প্রাধান্য।

১। Gowen and Hall—p. 116.

পোষাক-পরিচ্ছদের অনুকরণে জাপানী সাধু 'কোবোডাইসি' ও তাঁহার সঙ্গীগণ যে পোষাক তাহাদের দেশে প্রচলিত করে তাহাই আজ জাপানী জাতীয় পরিচ্ছদ হইয়াছে (১)।

এই সম্রাট কংফুচিউকে চীনাবাসীদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু ইঁহারই রাজত্বকালে বৈদেশিক ধর্ম্ম-প্রচারকেরা বিভিন্ন ধর্ম্মের বার্ত্তা নিয়া চীনে আসেন। পারস্যের জারথুষ্ট্রবাদ, আরবের ইসলাম, সিরিয়ার খৃষ্টান ধর্ম্ম, পারস্যের মনীর মানিকিয়বাদ প্রভৃতি এই সময়ে চীনে আসিয়া পরস্পর বিরোধ না করিয়া তাহার রাজধানী সিয়ানে শান্তিতে বাস করিত (২)।

কিন্তু 'টাং' যুগের পরিসমাপ্তির পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে চীনে বৌদ্ধ দলন আরম্ভ হয়। উটসুঙ্গ সম্রাট (৮৪১-৮৪৭ খৃঃ) এই নির্য্যাতনের হুকুম দেয়। সম্রাটের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, পুরুষ ও স্ত্রীলোক সন্ন্যাসীদের মঠে প্রবেশ করার ফলে নাগরিক জীবনের কর্ত্তব্য হইতে অনেক লোক অপসারিত হওয়ায় সামাজিক দুর্ব্বলতা ও সামরিক অনুপযুক্ততা চীনের সমাজে ঢুকিয়াছে।* আবার এই সঙ্গে পণ্ডিত 'হানছ' যিনি 'Memorial on the Bone of Buddha" (বুদ্ধাস্থি বিষয়ে আরজি) বিষয়ে একটি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাঁহার মত অনেকেই কুসংস্কার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়েন। অষ্টম শতাব্দী হইতে চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসার লাভ সম্পর্কে অধ্যাপক রস বলেন, সেনাপতিরা তাহাদের সৈন্যদল, মন্ত্রীরা তাহাদের দপ্তর, সম্রাট গোষ্ঠির লোকেরা তাহাদের প্রাসাদ, ব্যবসায়ীরা তাহাদের ব্যবসায় ও পরিবার ত্যাগ করিয়া মঠ নির্ম্মাণ করিয়া বা পুরাতন মঠে বাস করিয়া জগতের গোলমাল হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল।" ৮৪৫ খৃঃ উটসুঙ্গের হুকুমে চারি হাজার ছয় শত মঠ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, দুই লক্ষ ষাট হাজার সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসীনিদের সংসারে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, রাষ্ট্র কর্ত্তৃক মঠের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং মন্দির ও মঠের ঘণ্টা ও তাঁমার পাত্র সমূহ নগদ টাকায় পরিণত করা হয়। কিন্তু এই নির্য্যাতন উটসুঙ্গের মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীরা বন্ধ করিয়া দেয় (৩)।

এই সকল ঘটনাবলী হইতে আমরা ইহা বুঝি যে ভারতের ন্যায় চীনেও বৌদ্ধধর্ম্ম লৌকিক কুসংস্কারের সহিত একটা আপোষ রফা করিয়া গণসমূহকে করায়ত্ত করিতেছিল। এই জন্য 'বুদ্ধাস্থির' পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠান তাহাদের আকৃষ্ট করিতেছিল; সাধারণ লোকেরা সেই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অভিজাত অধ্যুষিত সমাজের সংগ্রাম হইতে পলাইতেছিল। অবশ্য সর্ব্বত্র যাহা হয়, উচ্চ শ্রেণীর অনেকে শ্রেণীচ্যুত হইয়া জনগণের সঙ্গে যোগদান করে এবং মঠে গিয়া সাম্যভাব অবলম্বন করিয়া পরকালের চিন্তায় ব্যাপৃত হয়। কিন্তু এই কর্ম্ম সাম্রাজ্য-বাদীদের রাষ্ট্র রক্ষার প্রতিকূল হয় বলিয়াই এই নির্য্যাতন অনুষ্ঠিত হয়। শোষকের শোষিত স্থানান্তরে গমন করিলে শোষণ কার্য্য কি প্রকারে চলিবে, তাহাকে ধরিয়া তাহার পূর্ব্ব কর্ম্মে নিযুক্ত করা চাই।

## সুঙ্গ যুগ

টাং বংশের পতনের পর চীনে আবার 'মৎস্য ন্যায়ে'র উদয় হয়। এই সময়ে অন্ততঃ পাঁচটি দুর্ব্বল বংশ সম্রাট শক্তি করায়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করে। এই সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতি সাধিত হয়। চীনে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী মুদ্রাযন্ত্র, ছাপিবার জন্য টাইপ (অক্ষর), ছাপার কালী, নানা রঙের ছাপিবার যন্ত্রের উদ্ভাবন হয়। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের কৃষি-বিভাগের গ্রন্থাধ্যক্ষ ওয়াল্টার স্বইনগেল বলেন, লিনো টাইপ যন্ত্র ব্যতীত ছাপিবার সব সরঞ্জামই চীনের লোকেরা উদ্ভাবন করে (১)। অনেকেই অনুমান করেন যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই সকল আবিষ্কার হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে তাহার উৎকর্ষ সাধনের প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশেষে সেনাপতি চাওকুয়াং ইন এই মৎস-ন্যায়ে'র অবসান করিয়া 'সুঙ্গ' বংশের প্রতিষ্ঠা (৯৬০-১২৭৯ খৃঃ) করেন। এই বংশের সহিত বাহিরের তাতারদের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ হয়। মোঙ্গল বীর তেমুচিন ওরফে জেঙ্গিস খাঁ এশিয়ার অধিকাংশ অংশ এবং অর্দ্ধ ইউরোপ জয় করিবার কালে চীন জয় (১২১২ খৃঃ) করেন এবং তথায় কিছু কালের জন্য মোঙ্গল শাসন প্রতিষ্ঠিত করে। খৃষ্টীয় ১২২০ সাল হইতে জেঙ্গিস খাঁ উত্তর চীনে এরূপ ধ্বংসের তাণ্ডব-লীলা চালায় যে উহা মরুভূমিতে পরিণত হয়। এতদ্দ্বারা বহু লক্ষ লোকের প্রাণনাশ হয়। এই ভীষণ নরহত্যাকারীর জীবনের কার্য্য যেমন নৃশংস ছিল মৃত্যুর পরও তাহার জীবনের অনুরূপ কার্য্য দ্বারা তাহার নশ্বর দেহের তৃপ্তি সাধন করা হয়। ১২২৭ খৃঃ ২৭ শে আগষ্ট চীনের সাঁসি প্রদেশে পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয় এবং মৃতদেহ স্বদেশে আনীত হয়। তথায় তাহার জন্মস্থানে যে বৃক্ষ জীবদ্দশায় তাহার অধিক পছন্দ হইয়াছিল সেই বৃক্ষের নীচে তাহার শব সমাধিস্থ করা হয়। এই সমাধি সময়ে উচ্চ বংশের চল্লিশটি কুমারী এবং এসিয়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা দামী ঘোড়া হত্যা করিয়া তাহার শরীরের সঙ্গে প্রোথিত করা হয়। তৎপর এই কবরের চারিদিকে বন স্থাপন করা হয় যাহাতে তেমুচিনের শেষ বিশ্রাম স্থল মানুষের চক্ষের অগোচর হয়।*

---

১। Gowen and Hall—p. 11.

২। Gowen and Hall pp. 118-120.

* Havell তাঁহার "History of Aryan Civilization in India" নামক পুস্তকে মগধের অধঃপতনের এই অনুষ্ঠানটি 'কারণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৩। Gowen and Hall p. 125.

১। Gown & Hall—p 113 দ্রষ্টব্য; T. F. Carter—"The Invention of Printing and its spread Westward". 1925 দ্রষ্টব্য।

* সভ্য ও উন্নত মুসলমান ধর্ম্মের লোকের কবর দেওয়ার সময় এই প্রথা অনুষ্ঠিত হইত, (Vide Neamatulla—I

মোঙ্গলেরা কিন্তু সহজে চীন জয় করিতে পারে নাই। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলে। অবশেষে জঙ্গিস খাঁর পৌত্র কুব্লাই খাঁ চীনে "ইউয়ান" (মৌলিক) বংশ স্থাপন করিয়া নূতন যুগের অবতারণা করে।

সুঙ্গ বংশের শাসনকাল কেবল যুদ্ধ ও বৈদেশিক আক্রমণেই পর্য্যবসিত হয় নাই। দুইজন বিশিষ্ট ভাবুকের চিন্তাক্ষেত্রের কলহে চীন দুইটি রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। প্রথমোক্তটি একজন বিশিষ্ট সোসালিষ্ট, দার্শনিক ও রাজনীতিবিশারদ। তাঁহার নাম—ওয়াং আন-সি; (১) আর দ্বিতীয়টি—ঐতিহাসিক সুমা কুয়াং। প্রথমোক্তটির প্রতিপক্ষদের মতেও তিনি সেই সময়ের একজন অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা বলিতেন যে, তিনি নিজের মুখ ধুইতেন না বা কাপড় পরিবর্ত্তন করিতেন না, নিজের ভুল স্বীকার করিতেন না, নিজের গোঁড়ামী দৃঢ় করিবার জন্য বিরুদ্ধবাদীদের মত পড়িতেন, উচ্চ ও সম শ্রেণীর লোকদের ঘৃণা করিতেন। কিন্তু নিজের নিম্নস্থানীয় লোকদের প্রতি হৃদয়ে মমতা পোষণ করিতেন।

ইনি কিয়াংসি প্রদেশে ১০২১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। পরে ১০৬৯ খৃঃ সম্রাটের রাষ্ট্রীয় উপদেশক পদে নিযুক্ত হন। প্রথম হইতেই ইনি চরমপন্থীর সংস্কারক ছিলেন, যদিচ প্রাচীন নজিরের উপর নিজের সংস্কার পদ্ধতি স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি প্রাচীন ক্লাসিক সমূহের নূতন সংস্করণ করেন, যাহাতে সাধারণে এই আইনের মর্ম্ম বুঝিতে পারে। ইনি সাহস করিয়া তখনকার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-প্রণালীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। কোনও চীনা লেখক বলেন, এমন কি গ্রাম্য স্কুলের ছাত্রেরাও তাহাদের তর্কশাস্ত্রের বই ত্যাগ করিয়া ইতিহাস, ভূগোল এবং অর্থনীতির প্রথম ভাগ পড়িতে আরম্ভ করে।

অনেক দিন পর্য্যন্ত উপরোক্ত দুই পণ্ডিতের কলহে চীন দেশ বিভক্ত ছিল। ওয়াং আন-সি মনে করিতেন, তাঁহার ব্রত হইতেছে পরিবর্ত্তন ও পুনরুত্থানকর। সুজুমাকুয়াং ইহার প্রতিবন্ধকতা করিতে ব্যগ্র ছিলেন। তিনি ক্রমাগত জাতির অতীতের ও স্থিতিশীল মনোবৃত্তির বিষয় লোকদের স্মরণ করাইয়া দিতেন।

এই বিবাদ এত তিক্ত হইয়া উঠে যে সম্রাট যেন ট্সুঙ্গের সিংহাসন অধিরোহণ করিবার পর, তিনি ওয়াংকে তাঁহার 'মত' কার্য্যকরী করিবার সুযোগ প্রদান করেন। ওয়াঙ্গের মূল তত্ত্ব ছিল যে, সম্রাট তাহার সকল প্রজাকেই অন্ততঃ জীবনের আবশ্যকীয় জিনিষপত্রাদি অর্জ্জন করিবার সুবিধা প্রদান করুক। তিনি বলিতেন, "শ্রমি[ক] শ্রেণীগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য এবং ধনীরা তাহাদের ধূলা/গুঁড়া হইয়া যাওয়া বন্ধ করিবার জন্য রাষ্ট্রের ব্যবসায়, শ্রম-শিল্প এবং কৃষিকার্য্যের সমস্ত ভার স্বহস্তে গ্রহণ করা উচিত।" এই জন্য তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতিকে বাস্তব কর্ম্মে খাটাইবার জন্য আহুত হইলে তিনি দেশের সর্ব্বত্র আদালত (Tribunal) স্থাপন করিয়া শ্রমিকদের দৈনিক মাহিয়ানা এবং সওদার জিনিষের দৈনিক দাম নিরূপিত করেন। জমি মাপ করিয়া সমান ভাগে ভাগ করা হয় এবং উর্ব্বরা শক্তি অনুযায়ী পর্য্যায় ভেদ করা হয়। এতদ্দ্বারা টেক্স (কর) আদায়ের নূতন ভিত্তি স্থাপন করা হয়। সরকারের তরফ হইতে চাষের জিনিষ বিক্রয়ের জন্য রাজধানীতে পাঠান বন্ধ করে। প্রথমতঃ ইহা টেক্সর জন্য ব্যবহৃত হইতে লাগিল; দ্বিতীয়তঃ জেলার স্থানীয় প্রয়োজনকল্পে ব্যয়িত হইতে লাগিল; তৃতীয়তঃ বাকী অংশ যতদূর সম্ভব সস্তায় গভর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রয় করা হইত কিংবা অন্য জেলার ব্যবহারের জন্য রক্ষা করা হইত। টেক্স ধনীদের নিকট হইতে আদায় হইত এবং গরীবদের তাহা হইতে রেহাই দেওয়া হইত। বৃদ্ধদের মাসোয়ারা বা ভাতা দিবার জন্য, বেকারদের সাহায্য ও সাধারণ অভাবগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য গবর্ণমেণ্টের হাতে অনেক টাকা সঞ্চিত থাকিতে লাগিল। পতিত জমিতে চাষ করিবার উদ্দেশ্যে বীজ বিতরণ করিবার জন্য অন্য প্রকারের আদালত স্থাপিত হয়। যাহাদের অন্য কোন কার্য্য নাই তাহারাই এই জমিতে চাষ করিবে। সর্ত্ত ছিল শস্য থেকে বীজের মূল্য ফেরৎ দিতে হইবে। বিদেশী শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য ওয়াং হুকুম দেন, যে পরিবারে দুইটি পুরুষ মানুষ আছে তাহাদের একজন সৈন্য হইবে এবং প্রত্যেক পরিবার গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ঘোড়া রাখিতে বাধ্য। প্রয়োজন কালে ইহা দ্বারা অশ্বারোহী সৈন্যদল গঠন করা হইবে (১)।

ওয়াং-আন-সির আরও অনেক মত ছিল যাহা আজকালকার দিনে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। কিন্তু তাঁহার সময়ে সেই সব মত যথাসময়ের পূর্ব্বেই আসিয়াছিল। তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতি দশ বৎসর পরে চীন জাতি দ্বারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। ওয়াঙ্গের এই কর্ম্মপদ্ধতি এক প্রকারের State Socialism (রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের) ছিল। ইহা বনিয়াদী স্বার্থের বিপক্ষে যাওয়ায় সম্পত্তিশালী শ্রেণীসমূহ যাহারা নিজেদের "জাতি" (Nation) বলিয়া অভিহিত করিত—ইহার বিরুদ্ধাচরণ করে। শ্রেণী-সংগ্রামের ফলেই ওয়াঙ্গের কর্ম্ম পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া যায়।

রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের (State Socialism) এই পরীক্ষা নষ্ট হইবার মূলে ওয়াঙ্গের বিপক্ষে বাস্তব রাজনীতি ক্ষেত্রে কতকগুলি বিঘ্ন উপস্থিত হয়। লোকে পূর্ব্বোক্ত Militia (অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক শ্রেণী) শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে রাজী হয় না। কারণ, চীনবাসীরা

---

of the Afghans; স্যার যদুনাথ সরকার—'ওসমান খাঁর সহিত মোগলদের যুদ্ধের বিবরণ')। বাঙ্গলার ঐতিহাসিক ওসমান খাঁর মৃতদেহের কবরের সময় তাহার ৪০টি স্ত্রী ও উপপত্নীকে হত্যা করিয়া তাহার কবর দেওয়া হইয়াছিল।

১। Re'musat—"Nouveaux Me'langes Asiatiques"; এবং A. I. Ivanova—Wang An-Shih and his Reforms." 1909 দ্রষ্টব্য।

১। Gowen and Hall—Pp. 140-142.

যোদ্ধার কর্ম্মকে ঘৃণা করে। কুসীদজীবিদের ব্যবসায় নষ্ট হওয়ায় তাহারা শত্রুতাচরণ করে। যে সব কর্ম্মচারী টেক্স আদায় করিত ও বীজ বিতরণ করিত তাহাদের অ-সততা, শক্তিশালী ও প্রতিপত্তিশালী রাজনীতিকদের (ওয়াঙের নিজের ভ্রাতা ওয়াং আন-কুও বিপক্ষে ছিল) বিপক্ষতাচরণ। সর্ব্বশেষে অনাবৃষ্টি, বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি নৈসর্গিক উৎপাত—এই সব একত্রিত হইয়া ওয়াঙের পরীক্ষা নষ্ট করিয়া দেয়।

ইহার পর ওয়াং-কে তাহার কর্ম্ম হইতে অপসারিত করা হয় এবং তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য নাংকিং-এর গভর্ণর করা হয়। তিনি ১০৮৬ খৃঃ মারা যান। ইহার বিশ বৎসর পরে, "কংফুচিউ-এর হলে" (Hall of Confucius) মেনকিউসের পর চীনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাবুক বলিয়া তাঁহার নাম লেখা হয়। কিন্তু শীঘ্রই তাহা অপসারিত করা হয়, তাহার স্মৃতি খাট করা হয় এবং অপবাদ দেওয়া হয়। এই পরীক্ষা নষ্ট হইবার পর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, চরমপন্থীদের মঙ্গোলিয়াতে নির্ব্বাসিত করা হয়। জনশ্রুতি বলে, তাহাদের অশান্ত প্রেতাত্মা সেই অবস্থা সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। ইহাতে জেঙ্গিস খাঁর উত্থান সম্ভব হয়।* ঐতিহাসিকেরা বলেন ওয়াং আন্-সি চীনে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন (১)।

এই প্রকারে চীনে তথাকথিত "রাষ্ট্রীয় সোসালিসম" প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রয়াসও ব্যর্থ হয়। সবহারাদের ক্ষমতাধীনে এই পরীক্ষা না হওয়াতেই সম্পত্তিশালী শ্রেণীরা তাহা ধ্বংস করিতে সুযোগ ও সুবিধা পায়। সম্পত্তিশালী শ্রেণী দ্বারা শাসিত রাষ্ট্রে সাম্যবাদী পরীক্ষা সম্ভব হইল না। চীনের কোটি কোটি ভাষাহীন মূক গণশ্রেণীর মুক্তির আর কোন আশাই রহিল না।

এই সময়কার রাজনীতিক মনস্তত্ত্বের অবস্থা নিম্নলিখিত ব্যাপারেই পরিস্ফুট হইবে। এই সময়কে 'নব-কনফুসীয়বাদের যুগ' বলা হয়। পণ্ডিতদের মতে, কনফুসীয় মতবাদের টীকাকারেরা তিন মতে বিভক্ত। ইহারা সকলেই কংফুচিউর মূল উপদেশ হইতে অতি দূরে সরিয়া গিয়াছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে অনেক জিনিষ গ্রহণ করিয়াছিল। সুঙ্গ ও পরবর্ত্তী যুগের দার্শনিকেরা কনফুসীয় মতবাদকে গভর্ণমেণ্টের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিত (১)।

এতদ্দ্বারা আমরা ইহা উপলব্ধি করিতে পারি যে, সাম্যবাদী বৌদ্ধধর্ম্ম যখন জনসাধারণের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন শ্রেণী-বৈষম্য সমর্থনকারী কনফুসীয় মতবাদের মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব আসিয়া পূর্ব্বোক্ত মতের নূতন ব্যাখ্যা দিয়া তাহা শ্রেণী-বৈষম্যকে বজায় রাখিবার উপযোগী করা হয়। এতদ্দ্বারা জনগণকে ধাপ্পাও দেওয়া হয় এবং উচ্চ শ্রেণীগুলির স্বার্থও কায়েম রাখা হয় (২)। (ক্রমশঃ)

* বাঙ্গালায় মুসলমান আক্রমণের সময়ে এই প্রদেশের ব্রাহ্মণদের দ্বারা নির্য্যাতিত বৌদ্ধদের ধারণার সহিত চীনের লোকদের এই ধারণার সাদৃশ্য আছে।

১। Gowen and Hall—Pp. 141-143.

১। Gowen and Hall—P. 145.

২। বর্ত্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে এবম্প্রকারের গোঁজামিল চলিতেছে। ধনতন্ত্রবাদী ফ্যাশস্ক্যালিজমের সহিত ইউরোপের উনবিংশ শতাব্দীর 'ইউটোপিয়ান' সোসালিষ্টদের "কুটির শিল্প মতবাদ"ও শরীরের উপকারার্থে "সমাজ সেবাবাদ" সংযোজিত করিয়া গণসমূহকে ধাঁধাঁ দেওয়া হইতেছে।

# শিশু

শ্রীঅমিয়া রায়চৌধুরী

ফুলের মতন কিবা শিশুরে দেখায়,
পেলব তনুটি যেন ফুলে গড়া হায়।
কুসুম সুষমা যেন গায়ে মাখা তার,
দেখিলে নয়নে জাগে আনন্দ অপার।

হাসিতে অমিয় ক্ষরে সরলতা ভরা,
অপরূপ রূপ কিবা চিত্ত মনোহরা!
নন্দনের পারিজাত বুঝি খসে' চুপে
পড়েছে ধরার বুকে দেব-শিশু-রূপে!

ব্যথিতের ব্যথা যায় শিশু বুকে লয়ে;
সব দুঃখ দূরে যায় শিশু-মুখ চেয়ে।
কি মহতী শক্তি দেখ শিশুর হৃদয়ে—
সবারে মোহিত করে পুলক-বিস্ময়ে।

# শরৎ-সাহিত্যের ভূমিকা

শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালের কাব্য বা রস-সাহিত্যের মূল উপাদান হইতেছে মানব-চরিত্র। বিভিন্ন পরিবেশ ও ঘটনাসংঘাতের মধ্য দিয়া মানবের হৃদয়বৃত্তিসমূহের রূপায়নই রস-সাহিত্যের প্রধানতম ধর্ম্ম। যুগে যুগে মানব-সভ্যতা নব নব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহার সমাজ-ব্যবস্থারও কত না পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু আদিমতমকালের যাযাবর মানব হইতে বর্ত্তমান যন্ত্র-সভ্যতা যুগের মানবের আজ পর্য্যন্তও, মূল হৃদয়ধর্ম্মসমূহের কোন পরিবর্ত্তনই দেখা যায় নাই। আদি-মানব প্রথম নারী-সান্নিধ্যে যে পুলক-চঞ্চল আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল, আপন সন্তানের প্রতি চাহিয়া তাহার হৃদয় যে স্নেহ-রসধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, ক্রৌঞ্চমিথুন-বিরহদুঃখ ঋষিকবির চিত্তে যে অপরিসীম বেদনা সঞ্চার করিয়াছিল, যে ভ্রাতৃপ্রেম রামানুজ লক্ষ্মণের আত্মবিলোপে ও যে রাজ্যলোভ ও ভ্রাতৃ-বিদ্বেষ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পরিসমাপ্তিলাভ করিয়াছিল, স্বর্ণলঙ্কা, ট্রয় হইতে আরম্ভ করিয়া সীতারামের সেদিনকার ক্ষুদ্র ভূষণা অবধি যে রমণী-রূপমোহে ধ্বংস হইয়া গেল—মানব চিত্তভূমি হইতে সে সমুদয় বৃত্তি আজও নির্ব্বাসিত হয় নাই। এই জন্যই বাল্মীকি, বেদব্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া কালিদাস, ভবভূতি, মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সকলের রচনাই মানব-হৃদয়ে কালাতিগ অক্ষুণ্ণ রস-পরিবেশন করিয়া আসিতেছে। এইজন্যই হোমার ও সেক্সপীয়রের, দান্তে ও গেটের, মোপাসাঁ ও মিল্টনের, বার্ণার্ড শ' ও গোর্কীর রচনা প্রতীচ্যের মত প্রাচ্যদেশবাসীর অন্তরও সমভাবে আন্দোলিত করে।

কালগত, দেশগত, জাতি ও ধর্ম্মগত ব্যবধানের মাঝেও সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মানবের হৃদয়বৃত্তিসমূহের কোনও রূপান্তরই ঘটে নাই। সকল কালের ও সকল দেশের উচ্চাঙ্গের কাব্য ও রস-সাহিত্যের মধ্যে আমরা আমাদের অন্তরস্থিত এই চিরন্তন হৃদয়ধর্ম্মসমূহের সাক্ষাৎ পাই, তাই এক যুগের সাহিত্য অপর যুগে এবং এক জাতির সাহিত্য অপর জাতির হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। ইহাই হইল সাহিত্যের সার্ব্বজনীন, সার্ব্বভৌম, শাশ্বত দিক্।

সাহিত্যের অপর দিক্‌ও আছে; প্রত্যেক দেশের সাহিত্যই তাহার রচনাকালের ভৌগোলিক পরিবেশ, সমাজ-জীবন, জাতির সংস্কারগত, ভাবগত ও কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠে। এই দিক্ দিয়া এক যুগের সাহিত্য হইতে অপর যুগের সাহিত্যের, এক জাতির সাহিত্য হইতে অপর জাতির সাহিত্যের পার্থক্য বিদ্যমান। সাহিত্যের ইহাই হইল স্ব-তন্ত্র দিক্।

সকল উচ্চস্তরের সাহিত্যের মত শরৎ-সাহিত্যেও এই দুইটা দিক্ই সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মানব-হৃদয়বৃত্তি বিশ্লেষণরূপ সাহিত্যের সার্ব্বজনীন শাশ্বত দিক্—ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধি-সময়ের, বাঙ্গালী সমাজ-জীবনচিত্র বাঙ্গালী বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করিয়া, শরৎ-সাহিত্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ ও দেবদাসে, পণ্ডিতমশাই ও চন্দ্রনাথে, পরিণীতা ও কাশীনাথে, বামুনের মেয়ে ও অরক্ষণীয়ায়, বৈকুণ্ঠের উইল ও বড়-দিদিতে, বিরাজ বৌ ও নিষ্কৃতিতে, স্বামী ও মেজদিদিতে, বিন্দুর ছেলে ও রামের সুমতিতে, পথ নির্দ্দেশ ও একাদশী বৈরাগীতে, দর্পচূর্ণ ও আঁধারে আলোয়, বিলাসী ও মামলার ফলে, মহেশ ও অভাগীর স্বর্গে আমরা যাহাদের সাক্ষাৎ পাই, বাঙ্গলার জল, বায়ু ও মাটি হইতে, বাঙ্গালীর শিক্ষা সংস্কার ও চিন্তা হইতে, তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার উপায় নাই; তাহারা একান্তই বাঙ্গালী, প্রাদেশিক বাঙ্গালী, অপর প্রদেশ ত' দূরের কথা এমন কি তাহারা বিহারীও নহে। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গালী বৈশিষ্ট্যের এই স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়াই শরৎচন্দ্রের রচনায় সাহিত্যের সার্ব্বজনীন ও চিরন্তন রস-বস্তুই রূপলাভ করিয়াছে।

আমাদের মনে হয় শরৎচন্দ্রের যথার্থ বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া

উঠিয়াছে তাঁহার ছোট উপন্যাস ও ছোট গল্পগুলির মধ্যে। সহর-সৌধবাসী ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজের মুষ্টিমেয় অসংযত বাঙ্গালীর যৌন-বিকারগ্রস্ত জীবন-চিত্র নহে—বাঙ্গলার পল্লীভূমিতে বাঙ্গলার তেলে জলে বর্দ্ধিত, বাঙ্গালীর নিজস্ব শিক্ষা, সংস্কার, ভাব ও কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যে স্ব-তন্ত্র, খাঁটি বাঙ্গালী নর-নারীর জীবন-চিত্রই শরৎ-সাহিত্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

নর ও নারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সকল সাহিত্যেরই অন্যতম মুখ্য উপাদান—শরৎ-সাহিত্যেও তাহার ব্যত্যয় ঘটে নাই। তীব্রতায় ও গভীরতায় পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রেমই শরৎচন্দ্রের লেখনীতে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং মিলনের মধ্য দিয়া এই প্রেমের সার্থকতা অপেক্ষা ব্যবধানজনিত ব্যর্থতার বেদনাই তাঁহার সাহিত্যের প্রায় সর্ব্বত্র গুমরিয়া উঠিয়াছে। অদম্য হৃদয়াবেগের দুঃসহ তীব্রতার মাঝেও শরৎ-সাহিত্যের নায়কনায়িকারা কোথাও অসংযত যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতায় দুর্দ্দাম হইয়া দেখা দেয় নাই। বিশেষ করিয়া শরৎ-সাহিত্যের নারী-চরিত্র অদ্ভুতভাবে সংগত। অপ্রতিদ্বন্দ্বী সমালোচক ও মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল শরৎ সাহিত্যের আলোচনায় এক স্থানে বলিয়াছেন :—

"আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শরৎচন্দ্রের উদ্দাম যৌবন-চিত্রেতে অসংযত যৌন-প্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়-লালসা ফুটিয়া উঠে নাই। তাঁহার যতটুকু আমি দেখিয়াছি, তাহাতে আদি-রসের প্রকট মূর্ত্তি দেখিতে পাই নাই। আনন্দমঠেও যেটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে, সন্ন্যাসীর আশ্রমে শান্তি ও জীবানন্দের হুড়োহুড়ি জড়াজড়িতে, ততটুকু পর্য্যন্ত, আমি যতটুকু শরৎচন্দ্রের রস-স্থষ্টি দেখিয়াছি, ইহাতে ফুটিয়া উঠে নাই।......শরৎচন্দ্রের নারী-চিত্র অপূর্ব্ব বস্তু, শরৎচন্দ্রের নায়িকারা নিজেরা অতিশয় সংযমী। ... তাঁহার স্থষ্টিতে কাম অপেক্ষা প্রেম বেশী ফুটিয়াছে।"

যে কোনও যুগের যে কোনও দেশের সাহিত্যে, যেখানেই যথার্থ-প্রেমের আমরা সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি, সেইখানেই ব্যর্থতার মাঝেও, একনিষ্ঠার সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর দণ্ডায়মান সেই প্রেম, অবিচলিত সংযমের অপূর্ব্ব শুচিতায় দীপ্যমান্ হইয়া দেখা দিয়াছে। এমন কি ঘৃণ্য পতিত জীবনও প্রেমস্পর্শে মহিমময় হইয়া উঠিতে আমরা দেখিয়াছি। যথার্থ-প্রেমের সহিত মঙ্গল ও কল্যাণের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। প্রেমাস্পদের শুভ-কামনায় প্রেমিক ও প্রেমিকা নিঃশব্দে ও নিঃশেষে আপন আত্মবিলোপ করিয়াছে, কিন্তু কোথাও তাহা যৌন-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে পরিসমাপ্তিলাভ করিতে চাহে নাই, সর্ব্বত্রই তাহা দেহধর্ম্মের উর্দ্ধে হৃদয়ধর্ম্মের বিজয়-বার্ত্তাই ঘোষণা করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যেও আমরা এই যথার্থ-প্রেমেরই সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি। এই জন্যই শরৎ-সাহিত্যের নায়কনায়িকারা প্রায় সর্ব্বত্রই যৌন-লালসা পরিতৃপ্তির উর্দ্ধে উঠিয়া, প্রেমাস্পদের মঙ্গলের নিমিত্ত অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের মহনীয়তায় প্রোজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছে। সাবিত্রী ও রাজলক্ষ্মী হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রমুখী ও বিজলী পর্য্যন্ত তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন।

আজ ছোট বড় সকলের মুখেই শুনিতে পাই শরৎচন্দ্রের পক্ষে সবচেয়ে গৌরবের কথা, তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় পরিচয় যে, তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়া অধঃপতিত এই বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের সংস্কার-সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখনী চালনায় সমাজ যদি ইতস্তত: কোথাও কিছু সংস্কৃত হইয়া থাকে ত' ভালই—যদি না হইয়াও থাকে তাহাতেও ক্ষোভের কোনও কারণ নাই। বাঙ্গালী সমাজ-জীবনের পটভূমিকার উপর রূপদক্ষ চিত্রকর শরৎচন্দ্র, বাঙ্গালীর সুখ দুঃখ, বিরহ ও মিলন, স্নেহ ভালবাসা, আনন্দ ও বেদনার কেন্দ্রে আপন তুলির স্পর্শ দিয়াছেন; তাই ভালোয় মন্দয়, দোষে গুণে মিশ্রিত বাঙ্গালীর সমাজ ও বাঙ্গালী-বৈশিষ্ট্যে স্ব তন্ত্র বাঙ্গালীর জীবন-চিত্রই তাঁহার তুলিকা স্পর্শে রূপবান্ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শাস্ত্রানুশাসন, অন্ধ-সংস্কার, সামাজিক বিধি-নিষেধ ও আচার-ব্যবহার হয় ত' অনেক স্থলে শরৎ-সাহিত্যের নরনারীর বাঞ্ছিত মিলন-পথে অন্তরায় হইয়া জীবনে তাহাদের ব্যর্থতা আনিয়া দিয়াছে, হয় ত' অনেক নিরপরাধ ও নিরীহ জীবন সামাজিক যুপকাষ্ঠে অনন্যোপায় হইয়াই আত্মবলি দিয়াছে, কিন্তু ইহা হইতে আমরা যদি সমাজ-সংস্কারই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-স্থষ্টির উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে উপলক্ষ্যকেই লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ

করা এবং তাঁহার বিরাট্ সৃষ্টি-প্রতিভাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিয়া তাঁহার গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করাই হয়।

যে কোনও যুগের, যে কোনওরূপ সমাজ-ব্যবস্থাযুক্ত সমাজই হউক না কেন, নর-নারীর প্রেমের পথ, জীবনের সার্থকতার পথ, কোথাও অবারিত বা কুসুমাস্তীর্ণ নহে। সকল যুগের ও সকল জাতির সাহিত্যেই নর-নারীর ব্যর্থতাজনিত দুঃসহ বেদনার মর্ম্মান্তিক ক্রন্দন আমাদের অন্তরকে ব্যথিত করিয়া তুলে। সর্ব্বক্ষেত্রে সামাজিক বাধাই যে এই ব্যর্থতার একমাত্র কারণ তাহা নহে—কত অভাবিতপূর্ব্ব ঘটনাচক্রে, কত তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র ভুল ভ্রান্তিতে, উপেক্ষণীয় কত মান অভিমানে—নর-নারীর স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত জীবন-গতিধারা অপ্রত্যাশিতভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিষাদঘন পরিণামের মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করে।

মেঘদূতে শাপগ্রস্ত যক্ষের প্রিয়াবিচ্ছেদ-কাতর বিরহী-হৃদয়ের যে মর্ম্মান্তিক ক্রন্দনে আমাদের অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠে—প্রভুসেবায় সামান্য অবহেলারূপ কত তুচ্ছতম কারণই না সেই বিচ্ছেদের মূলে আমরা দেখিতে পাই। প্রেমিক ও প্রেমিকার মিলন-বাধার যে বিষাদময় কাহিনীতে 'রোমিও জুলিয়েট' আমাদের চিত্তে অপরিসীম বেদনা সঞ্চার করে—দুইটি পরিবারের পরস্পরের মধ্যে তুচ্ছ বিবাদই তাহার একমাত্র কারণ। কৃষ্ণকান্তের উইলে ভ্রমর ও গোবিন্দলালের অতুলনীয় প্রেম সত্ত্বেও যে, দুইটি জীবন ব্যর্থতার মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিল, তাহাও ভ্রান্তধারণা ও দাম্পত্য-জীবনের সামান্য মান-অভিমানকে উপলক্ষ্য করিয়াই। নর-নারীর বাধাহত জীবনের বেদনা ও গতিকে মূর্ত্ত করিয়া, মানবের অন্তর-প্রকৃতিকে রূপবান্ করিয়া তোলাই কবির কাজ—বাধার কারণটা উপলক্ষ্য মাত্র।

শরৎচন্দ্রের রচনায়ও ব্যর্থ-জীবনের এই বেদনা ও গতির মধ্য দিয়া নর-নারীর অন্তরলোকের গোপন রহস্যই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালী সমাজের বাঙ্গালী জীবন-চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাই যে সকল বাধা বাঙ্গালী নর-নারীর জীবনে ব্যর্থতা আনয়ন করে বা করিতে পারে, সেই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত বাধা-সমূহই তাঁহার রচনায় আমরা দেখিতে পাইয়াছি। এই বাধাগুলিকে লোকচক্ষে উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়া সমাজকে কশাঘাতের দ্বারা বাধাসমূহ অপসারিত করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেন নাই,—প্রেমিক কবি-দৃষ্টিতে নর-নারীর প্রকৃতিভেদে তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনের অন্তর-স্বরূপকে তিনি যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার সাহিত্যে অকপটে তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। নীতিপ্রচার, উপদেশ বা সমাজ-সংস্কারের সসীমতায় তাঁহার সৃষ্টি খণ্ডিত নহে। ১৩৩৫ সালে ত্রিপঞ্চাশত্তম বাৎসরিক জন্মদিন উপলক্ষে দেশবাসী প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যে চরিত্র-সৃষ্টি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"এ ভাল কি মন্দ—আমি জানিনে, এতে মানবের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ অধিক হয় কিনা এ বিচার ক'রেও দেখিনি—শুধু সেদিন যাকে সত্য ব'লে অনুভব ক'রেছিলাম, তাকেই অকপটে প্রকাশ ক'রেছি।"

কোনও কারণ-বিশেষ বা সামাজিক বাধার মাপকাঠি দিয়া সকল মানুষের জীবন-গতির পরিমাপ চলে না; মানুষের জীবন গণিত-শাস্ত্রের মত সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুবর্ত্তী নহে। তাই দেখিতে পাই, অভিন্ন কারণ এবং সম-পারিপার্শ্বিকতা ও ঘটনাচক্রের মধ্যেও, দুইটি জীবনের গতি দুই বিভিন্নমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। যে ব্যর্থ-প্রেমের বেদনা দেবদাসের জীবনকে শোচনীয় পরিণামের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়াছে—তাহা প্রতাপ-চরিত্রের অবিচলিত ধৈর্য্যকে বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। যে অবরুদ্ধ ভোগবাসনায় বাল্য-বৈধব্যহত নিরুদিদির পদস্খলন ঘটিয়াছিল—বাল-বিধবা মৃণালের জীবনে তাহা কোনও বিক্ষোভই সৃষ্টি করিতে পারে নাই। হীন ও নৃশংস স্বামীর যে নিদারুণ অত্যাচারে অভয়ার জীবনে বিদ্রোহ ঘোষিত হইয়াছে—তাহা অপেক্ষা শত সহস্র গুণ অত্যাচারের মধ্যেও অন্নদাদিদিকে আমরা অবিচলিত পাতিব্রত্যের অপূর্ব্ব মহনীয়তায় নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার মত সমুজ্জ্বল দেখিয়াছি। অভিন্ন কারণজাত পরিণাম, ব্যক্তিগত প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন জীবনে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

সাধারণজনের দৃষ্টি হইতে কবির দৃষ্টির পার্থক্য আছে।

কবির একটি লোকোত্তর তৃতীয় নয়ন থাকে, সেই নয়নের দৃষ্টি হইতেছে প্রেমের দৃষ্টি। এই দৃষ্টির সাহায্যে তিনি দৃষ্টের সহিত অদৃষ্টকেও প্রত্যক্ষ করেন। শরৎ-সাহিত্যের আলোচনায় মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল বলিয়াছেন—

"যাহা দেখা যায়, তারই সঙ্গে যাহা দেখা যায় না চোখে, যাহা শুনি, তারই সঙ্গে যাহা শোনা যায় না কাণে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যেই যে অতীন্দ্রিয়ের সাড়া জাগিয়া আছে, আমরা তা'র সন্ধান পাই না। কবির অন্তরের অনুভূতিতে সে বস্তু কবির অজ্ঞাতসারেই জাগিয়া উঠে। ইহাই রসবস্তু। এই অতীন্দ্রিয় রসই কাব্যসৃষ্টির প্রাণ। ......কবি শব্দকে বাহন করিয়া ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিবিধ বস্তু বা বিষয়ের জাল বুনিয়া তাহারই আশ্রয়ে ও মধ্যে সেই রসকে আমাদের বোধের ও ভোগের বিষয় করিয়া তুলেন।"

শরৎচন্দ্রের সমস্ত সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে এই কবিজনের লোকোত্তর তৃতীয়-নয়নের প্রেমময় দৃষ্টি। এই প্রেমের দৃষ্টি দিয়াই তিনি বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং এইজন্যই ঘৃণ্য ও পতিতের অন্ধকার ঘন জীবনের অন্তরালে স্বমহিমপ্রোজ্জ্বল যে অন্তর-সত্তা আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহাও তাঁহার নিকট সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা প্রাকৃতজনের অপ্রেমিক স্থূল দৃষ্টিতে মানবের বহিরঙ্গটাকে প্রত্যক্ষ করি মাত্র; তাই রাজলক্ষ্মীকে বাইজি, সাবিত্রীকে মেসের সামান্য দাসী, চন্দ্রমুখী ও বিজলীকে ঘৃণ্য পতিতা, রোহিণীকে পরস্ত্রী-আসক্ত হীনচরিত্র এবং কিরণময়ী ও অভয়াকে উচ্ছৃঙ্খল ও সমাজদ্রোহিনীরূপেই দেখি, কিন্তু তাহাদের এই লৌকিক বহিরঙ্গের অন্তরালে যে শুচিশুভ্র প্রেম তাহাদের জীবনকে মহীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছে, তাহার সন্ধান পাই না। শরৎচন্দ্রের প্রেম তীক্ষ্নদৃষ্টি নর-নারীর বহিরঙ্গের এই আবরণ ভেদ করিয়া তাহাদের অন্তরলোকের গভীরতম প্রদেশের গোপনতম রহস্যটিকে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছে। "Love is blind" বলিয়া ইংরেজীতে একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে, কি অর্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে বলিতে পারি না, তবে প্রেমের মত চক্ষুষ্মান্ জগতে আর কিছু আছে বলিয়া আমরা জানি না।

প্রেমধর্ম্মে, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের পরস্পর বিভেদ-জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়া উভয়ে একাত্ম হইয়া উঠে। যে প্রেমের বলে, মাতা সন্তানের হৃদিতল অবধি দেখিতে পান, সুহৃদ সুহৃদের অন্তরের সুগোপন ব্যথাটি পর্য্যন্ত অনুভব করে, প্রণয়ী প্রণয়িনীর প্রতিটি পদক্ষেপের, তাহার নয়ন-পলকপাতের অর্থটি পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির উপর সঞ্চারিত ব্যাপকতর সেই প্রেমেরই বলে, শরৎচন্দ্র বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীকে দেখিয়াছিলেন ও বুঝিয়াছিলেন এবং এই দেখা ও বুঝাকে আপন মাতৃভাষায় তিনি যে রূপ দিয়া গিয়াছেন—তাহাই শরৎ-সাহিত্য।

## ছিদ্র ঘর

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

আত্মপ্রশ্ন—

দেহের পিঞ্জর ছিদ্র—ক্লিষ্ট বাতে তাতে,
ছিদ্র ঘর, সিক্ত ভূমি বারিবিন্দু পাতে।
অকালে আকাশ ছিদ্র, মগ্ন দিবাকর,
ছিদ্রময় কর্ণপথ, অভাব বিস্তর।
পূরণ করিতে ছিদ্র আয়ুঃ হ'ল গত,
তথাপি সকল ছিদ্র হ'লোনা পূরিত।
কর ছিদ্র নাশ ওহে নন্দের দুলাল।
অছিদ্র সম্পূর্ণ কর, ঘুচাও জঞ্জাল।

সমাধান—

ছিদ্রময় এ সংসার অখিল ভুবন,
অছিদ্র কেবল শুধু নিত্য নারায়ণ।
ছিদ্রময় বস্তু হয় অছিদ্র উত্তম,
সম্পূর্ণ বিশ্বাস তাহে করিলে স্থাপন।
পড়ে নাই বারিবিন্দু ছিদ্র কুম্ভ হ'তে,
ধরিলেন রাধা যবে পূর্ণ বিশ্বাসেতে।
অটল বিশ্বাসে হয় সাধনা সকল,
জপ তপ হয় শুধু বাহিরের ছল।

# রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ

শ্রীতারাকিশোর বর্দ্ধন

পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মত ঘটনাপুঞ্জের এত তীব্র গতিশীলতা আর কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। আলেকজাণ্ডার, সীজার, তাইমুর, চেঙ্গিসখাঁন অথবা নেপোলিয়ান কাহারও অভ্যুদয়কালে রাষ্ট্রমঞ্চে ঘটনার পর ঘটনা এত খরস্রোতে প্রবাহিত হয় নাই। ১৯৪০ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখে জার্ম্মাণী ডেনমার্ক দখল করে। আবার সেইদিনই বিভীষণ বাহিনী, (fifth column) প্যারাসুট ও বিমানবাহিনী সমভিব্যাহারে জার্ম্মাণ সৈন্যদল করিয়া সিডানে উপস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ অ্যাবিভালি নামক ইংলিশ চ্যানেলের তীরবর্ত্তী বন্দর দখল করে। এই ফ্রান্সের রণক্ষেত্র হইতে মিত্র সৈন্যগণের সাতিশয় বীরত্বপূর্ণ পশ্চাদপসারণের জন্যই তাহাদের লক্ষ লক্ষ সৈন্যের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। এই দুর্ব্বিপাকের জন্যই সেনাপতি গ্যামেলিনকে পদচ্যুত করিয়া ওয়েগাঁকে নিযুক্ত করা হয়।

৫ই জুন তারিখে হিটলার ফরাসীদেশকে পদানত করিবার জন্য অতিকায় কামানশ্রেণী ও বিমানবহরের
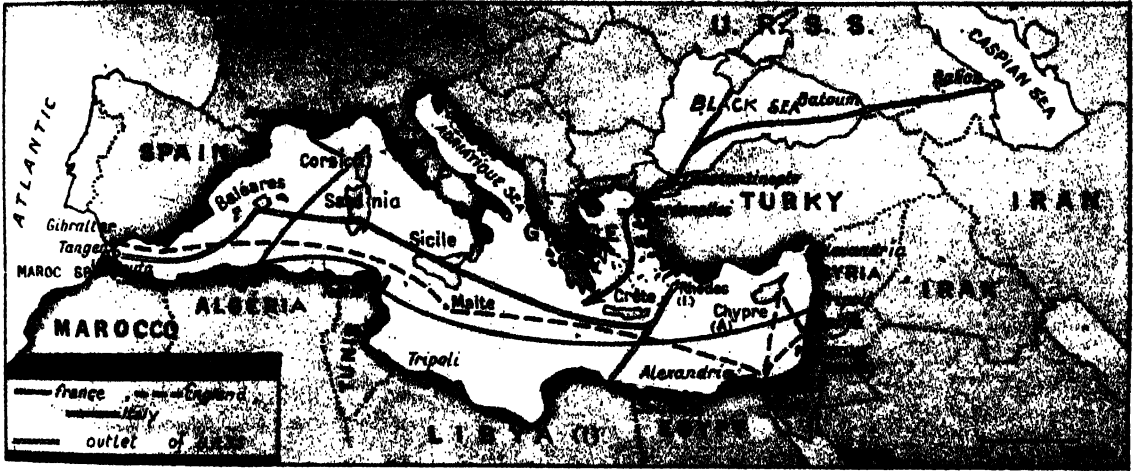
বর্ত্তমান মহাসমরের অন্যতম রঙ্গমঞ্চ ভূমধ্যসাগর: ব্রিটিশের 'লাইফ-লাইন' ভূমধ্যসাগরকে কেন্দ্র করিয়াই অবস্থিত

নরওয়ের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়ে। অল্পদিনের মধ্যেই মিত্র পক্ষের সৈন্যদল নরওয়ে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। উহাই এ বৎসর হিটলারের প্রথম আঘাত।

কিন্তু ১০ই মে তারিখেই প্রবল বেগে হিটলারের দ্বিতীয় ধাক্কা হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মের উপরে আসিয়া পড়ে। এ ক্ষেত্রেও পাঁচদিনের মধ্যেই জার্ম্মাণ ষ্টীম রোলারের (steam roller) প্রবল চাপে হল্যাণ্ড আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ১৮ দিনের মধ্যে বেলজিয়াম আত্মসমর্পণ করে, সেখানকার মিত্র সৈন্যদল ইঁদুর মারা কলে আবদ্ধ হয়, জার্ম্মাণ সৈন্যদল ম্যাজিনট লাইনের বর্দ্ধিতাংশ ভেদ সাহায্যে ফরাসীবাহিনীর প্রচণ্ডতম বাধা পদদলিত করিতে থাকেন। তাহার যান্ত্রিকবাহিনী ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ১৪ই জুন তারিখে প্যারিসে ও ভার্সেলিসে প্রবেশ করে। ১০ই জুন তারিখে ইটালী মিত্রশক্তির বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ২১শে জুন ফরাসীর সঙ্গে জার্ম্মাণী ও ইটালীর যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করা হয়।

ফরাসীর আত্মসমর্পণের ফলে সামরিক পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বৃটিশ-সাম্রাজ্যের পক্ষে অন্য কোনও মিত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নাই। বাল্টিক সাগর ও উত্তর সাগরের তীরবর্ত্তী দেশগুলির সঙ্গে ইংলণ্ডের ব্যবসায়

সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার সঙ্গে তাহার বাণিজ্য সম্পর্ক এখনও অব্যাহত আছে। ভূমধ্য-সাগরের পথে এখন আর সওদাগরী জাহাজ চলাচল করে না।

এখন শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্য—বৃটিশ-সাম্রাজ্য আক্রমণ করা। ইতিমধ্যে ইটালী বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড অধিকার করিয়া লইয়াছে। জার্ম্মাণী ইংলণ্ডের উপরে বিমান আক্রমণ চালাইতেছে। নৌ-শক্তিতে জার্ম্মাণী ও ইটালী বৃটেনের সমকক্ষ নহে। এজন্য উহারা বিমান পথের উপরে নজর দিয়াছে বেশী। কিন্তু উহারা এত তোড়জোড় সত্ত্বেও বৃটিশ বিমানবহরের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আকাশপথে শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত না করা পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর দ্বারা ইংলণ্ডের আক্রান্ত হওয়ার ভয় নাই। ইংলণ্ড বড় কঠিন ঠাঁই, এই উপলব্ধি হওয়ার পর জার্ম্মাণী বৃটেনের অবরোধে মনোনিবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার ফলাফল দেখিবার জন্য সমস্ত জগৎ উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে।

ব্রিটিশাধিকৃত জিব্রাল্টারের দুর্ভেদ্য শৈল-দুর্গ

বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে বল-পরীক্ষা করিতে হইলে—জিব্রাল্‌টার, মাল্টা, সুয়েজ, এডেন এবং সিঙ্গাপুর এই পাঁচটী গেট (gate) অতিক্রম করার প্রয়োজন। এই পাঁচটীকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মর্ম্মস্থল বলা যাইতে পারে। প্রথম ঘাঁটি হইল জিব্রাল্‌টার। উহা একটা দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য দুর্গ। প্রত্যেক ঘাঁটির উভয় পাশে নিজেদের অধিকৃত জনপদ না থাকিলে উহার নিরাপত্তার উপরে আস্থা স্থাপন করা যায় না। এখানে ঘাঁটি স্থাপন করিবার সময়ে উহার এক পাশে ছিল মরক্কো দেশ ও অন্য পাশে স্পেন। স্পেন সে সময়ে একটী তৃতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত। সুতরাং জিব্রাল্‌টার বেশ নিরাপদ্ স্থান বলিয়া বিগত ১৫০ বৎসর কাল অভিহিত হইয়া আসিয়াছে।

মাল্টাও প্রায় ১৫০ বৎসর ইংরাজের অধিকারে আছে। ঐ সময়ে ইটালীতে শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে নাই। সুতরাং উহারও নিরাপত্তা বিষয়ে কোনও প্রশ্নই উঠে নাই। ১৯১৪ সালে ইটালী একটী প্রবল শক্তি বলিয়া বিবেচিত হইলেও, তাহা ইংলণ্ডের পক্ষে আশঙ্কার স্থল বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কারণ মাল্টা হইতে সিসিলি ও আফ্রিকার উপকূল উভয় দিকেই প্রায় ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু সম্প্রতি মুসোলিনীর ইটালী একটী প্রথম শ্রেণীর সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায় এবং বিমানবহরের পরাক্রম সাতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় মাল্টার অবস্থানও শঙ্কাজনক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অন্যদিকে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর স্পেন যদি শত্রুপক্ষে যোগদান করে, তাহা হইলে জিব্রাল্টারের অবস্থানও শঙ্কাজনক বলিয়া পরিগণিত হইবে।

বৃটেনের নৌ-ঘাঁটিসমূহের মধ্যে সুয়েজ খালের গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। উহাকে সুরক্ষিত করিবার জন্যই ইজিপ্ট ও প্যালেষ্টাইন এই উভয় দেশে বৃটিশ সৈন্যের অবস্থান প্রয়োজন। এখানে বর্ত্তমানে প্রচুর সৈন্য-মোতায়েন আছে। তাহা ছাড়া এখানকার সমবেত নৌবহর ও বিমানবহর ইটালীর পরাক্রম পর্য্যুদস্ত করিতে সমর্থ হইবে আশা করা যায়। এডেনের ঘাঁটি আরও সুরক্ষিত রাখিবার জন্যই ওপারের বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড দখল রাখার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ইটালী উহা দখল করায় এডেনের নিরাপত্তার বিষয়ে দুশ্চিন্তার অবকাশ আছে। ইটালী ও জার্ম্মাণীর নৌবহরের পরাক্রমের পরিমাণ প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত জিব্রাল্‌টার, মাল্টা ও সুয়েজের ভবিষ্যৎ নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে না।'

এক্ষণে আমরা সিঙ্গাপুরের রঙ্গমঞ্চে যে নাট্যের অভিনয় হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিব। পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ কোনও মিত্রশক্তির হাতে থাকিলে সিঙ্গাপুর দুর্ভেদ্য। কিন্তু ঐ দ্বীপপুঞ্জ যদি জাপানের অধিকারে চলিয়া যায়, তবে তাহা সিঙ্গাপুরেরও আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তাহা ছাড়া প্রতিবেশী শ্যামরাজ্য যদি কোনও প্রবল শত্রুর করায়ত্ত হয়, তবে তো আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ থাকে।

সিঙ্গাপুরের সুরক্ষিত নৌবহর

কিন্তু কথা এই যে, উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করায় জাপানের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামরিক কি কি লাভ হইতে পারে।

পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পরিমাণ ফল ৭৩৪০০০ বর্গ মাইল অর্থাৎ জাপানের প্রায় পাঁচ গুণ। উহার লোক-সংখ্যা প্রায় ৭ কোটী। অধিবাসীদের অধিকাংশই জাতিতে মালয় এবং ধর্ম্মে মুসলমান। উহাদের মধ্যে বলিদ্বীপের লোকেরা হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়। পৃথিবীর যাবতীয় উপনিবেশের মধ্যে উহা সর্ব্বাপেক্ষা সম্পদ্-প্রসবিনী। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে রবার, টীন, কেরোসিন তৈল, পেট্রল্, চিনি, কাফি, চা, তামাক এবং বহুবিধ কৃষিজ ও খনিজ পণ্য। আমেরিকা উহার রবারের সর্ব্বাপেক্ষা বড় খরিদ্দার। রবার-শিল্পে আমেরিকা ওখানে যথেষ্ট অর্থ নিয়োজিত করিয়াছে। পেট্রলের সর্ব্বাপেক্ষা বড় খরিদ্দার হইতেছে জাপান। বৃটেন ও ফ্রান্স উহার উৎপন্ন দ্রব্যের মুখাপেক্ষী নহে। কিন্তু জাপান ও আমেরিকার পক্ষে উহার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। পাশ্চাত্য জাতির ফ্যাক্টরীতে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের বাজার হিসাবে এই দ্বীপপুঞ্জ ততটা মূল্যবান্ নয়। কারণ অধিবাসীরা খুব দরিদ্র। উহাদের পাশ্চাত্য দ্রব্যাদি খরিদ করিবার মতন অর্থ নাই। কিন্তু জাপানের তৈয়ারী সস্তা কাপড়ের বাজার হিসাবে উহার মূল্য জাপানের নিকট খুব বেশী। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সস্তায় বস্ত্র সরবরাহ করিয়া জাপান উহার বাজার দখল করিয়াছিল। কিন্তু ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য করায় জাপানের চেষ্টা ব্যাহত

হইয়াছে। এজন্য জাপানের একটী আক্রোশও রহিয়া গিয়াছে। ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্টের পতনের সুযোগের সদ্ব্যবহার জাপান করিতে পারে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

এক্ষণে ষ্ট্র্যাটেজি ও ট্যাক্‌টিক্‌সের দিক্ হইতে এই যুদ্ধের বিষয় আলোচনা করা যাউক। বিগত মহাসমরে জার্ম্মাণদের প্রধান অবলম্বন ছিল শ্লিফেন প্ল্যান। উহার উদ্দেশ্য—জার্ম্মান-বাহিনীর দক্ষিণ বাহুতে অধিক পরিমাণে সৈন্য সংস্থাপন করিয়া তীব্রগতিতে বেলজিয়ম অতিক্রম করিয়া মূল ফরাসীবাহিনীকে পশ্চাদ্ভাগে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করা। বিগত মহাসমরে জার্ম্মাণসেনাপতিগণ ঐ প্ল্যানের পরিচালনায় যে সব ভুল করিয়াছিলেন—তাহা "ইউরোপে মহাসমর" নামক পুস্তকে সবিশদ বর্ণনা করিয়াছি। এবারকার যুদ্ধে ঐ প্ল্যান বিশুদ্ধভাবে হিটলারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়াছে। ১৯১৪ সালে ট্যাঙ্কের আবিষ্কার হয় নাই। সুতরাং পরিখা-শ্রেণীর অন্তরালে অবস্থিত সৈন্যদল নিরাপদে থাকিতে পারিত।

এবারেও ম্যাজিনট লাইনের অন্তরালে অবস্থান করিয়া ফরাসীবাহিনী দুর্জ্জয় বলিয়া অভিহিত হইতেছিল। ঐ ম্যাজিনট লাইনকে উত্তর সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া ফরাসী ও ইংরাজবাহিনী নিশ্চিন্তভাবে "রণপয়োধির লহরী" গণনা করিতেছিলেন। কিন্তু ১০ই এপ্রিল তারিখে শ্লিফেন প্ল্যান অনুসারে পরিচালিত জার্ম্মাণ যান্ত্রিকবাহিনীর দক্ষিণ বাহু প্রবল বিক্রমে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম আক্রমণ করে এবং ১৪ই এপ্রিল তারিখে ম্যাজিনট লাইনের বর্দ্ধিতাংশ ভেদ করিয়া সিডানে প্রবেশ করে। এবারে উভয় পক্ষেই যথেষ্ট পরিমাণে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিয়াছে মিত্রপক্ষের ট্যাঙ্কগুলি ২০।২৫ টন ওজনের ছিল। কিন্তু ম্যাজিনট লাইনের বিপক্ষে এরোপ্লেনের আওতায় জা' ৭৫ টন ওজনের বৃহদাকার ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে। উহাতেই তাহারা ফরাসীদেশে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই হিটলার সিডানের ভিতর দিয়া ৫০ লক্ষ সৈন্য ফরাসীতে প্রেরণ করে। ঐ বিরাট্ বাহিনীর নিকট ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধে মিত্র-শক্তি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। কিন্তু তারপর শ্লিফেন্ প্ল্যান অনুসারে জার্ম্মাণ সৈন্যদল মূল ফরাসীবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে আক্রমণ করিয়া পর্য্যুদস্ত করিতে পারে—এই সম্ভাবনা প্রবলভাবে প্রকাশ পাইতে-ছিল। এবং এই সম্ভাবনার জন্যই পেঁতে গভর্ণমেণ্ট আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ব্রিটেনের বিখ্যাত কোলিয়ার জেঠি : সিঙ্গাপুর

এতদ্দেশে এক সম্প্রদায়ের লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন, যাঁহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, ফরাসী পুঁজিপতির দল সাম্যবাদী দলনের অজুহাতে ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মাণীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। তাহাদের শ্রেণীগত স্বার্থের জন্য তাহারা ফরাসী জাতীয়তার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছে। ঐ প্রচারিত মতবাদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারিতেছি না। এত দেশ থাকিতে হঠাৎ ফরাসী দেশের পুঁজিপতিগণ কেন বিশ্বাসঘাতকতা করিবে? ইটালী ও জার্ম্মাণীর পুঁজিপতিগণও তো বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইঙ্গ-ফরাসী পুঁজিপতির সঙ্গে মিলিত হইতে পারিতেন। সাম্যবাদী রুশিয়াই বা কেন গণতন্ত্রী শক্তিগুলিকে সহায়তা না করিয়া

জার্ম্মাণীকেই কূটনীতিক সহায়তা করিতেছে? আশা করি, এদেশের জনসাধারণ ঐ সম্প্রদায়ের প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত হইবে না। ফরাসী পুঁজিপতিগণ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন—এমন অপবাদ তাহাদিগকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট, এমন কি সেনাপতি দ্যে গল পর্য্যন্ত দেন নাই। ফল কথা এই যে, শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায় প্রমুখ উক্ত সম্প্রদায়ের নেতারা সামরিক ষ্ট্র্যাটেজি ও ট্যাকটিক্‌সের দিক্ হইতে বিষয়টীর পর্য্যালোচনা না করিয়া ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন।

যাহা হউক, ষ্ট্র্যাটেজির দিক্ হইতে শ্লিফেন প্ল্যান নির্ভুলভাবে অনুসরণ করায়, জার্ম্মাণী ফরাসী দেশকে পদানত করিয়াছে। এখন ইংলণ্ডের প্রতি তাহার ষ্ট্র্যাটেজি দুইটী পথ অবলম্বন করিতে পারে। প্রথমতঃ নরওয়ে হইতে ফরাসী দেশ পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ উপকূল ভাগে বিমান-ঘাঁটি স্থাপন করিয়া বিমান পথে ইংলণ্ডকে অবরোধ করা—যাহাতে ইংলণ্ডের আমদানী ও রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। অথবা দ্বিতীয় পথ এই হইতে পারে যে, জার্ম্মাণী ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিয়া তাহার স্থল-সৈন্যবাহিনী ইংলণ্ডে অবতরণ করাইবে। এই উভয় পথই অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল। ইংলণ্ডও সেজন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। বৃটানীয়া মহাসাগরের অধীশ্বরী। তাহার নৌবহর ও বিমানবহর অজেয়। তার উপর ইংলণ্ডে বিশ লক্ষ সৈন্য শত্রুকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মজুত আছে। জার্ম্মান বা ইটালীয়ান নৌবহর এখন পর্য্যন্ত বৃটিশ নৌবহরের মত উৎকর্ষ দেখাইতে পারে নাই। শত্রুর বিমানবহর সংখ্যায় অধিক হইলেও, বৃটিশ বিমানবহর ক্রমশঃ শক্তিবৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। আকাশ-পথেও যদি বৃটিশ বিমানবহর জার্ম্মাণীকে হটাইতে পারে, তবে জার্ম্মান ষ্ট্র্যাটেজির উল্লিখিত দুইটী পথই অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে।

যদি তাহাই হয়, তবে শত্রুপক্ষ জাপানকেও দলে ভিড়াইয়া এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশেই যুদ্ধ ছড়াইয়া দিবে। ঐ প্রকারের জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে, আমেরিকার পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা কঠিন হইবে।

জার্ম্মাণীর ইংলণ্ডাক্রমণের চেষ্টা ব্যতীত সম্প্রতি নিকট প্রাচ্যের রঙ্গমঞ্চে একটী মহানাট্যের অভিনয় হইবে, একথা সকলেই বলিতেছেন। বল্‌কান উপদ্বীপে ইংলণ্ডের মিত্রপ্রাপ্তির যে আশা ছিল, তাহা ফরাসীর পতনের পর বিদূরিত হইয়াছে। রুমানিয়া, গ্রীস ও তুরস্ক যদি মিত্রপক্ষে যোগদান করিত, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু ছিল না। কিন্তু জার্ম্মাণী তাহার বন্ধু ইটালী ও রুশিয়ার সঙ্গে যেভাবে কূটনীতির পরিচালনা করিতেছে, তাহাতে রুমানিয়া, গ্রীস ও তুরস্কের পক্ষে মিত্রপক্ষে যোগদানের সম্ভাবনা অল্প। বল্‌কান সম্পূর্ণরূপে রুশিয়া, ইটালী ও জার্ম্মাণীর সমবেত মৈত্রীর আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে। বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড ইটালীর অধিকারে আসিয়াছে। এক্ষণে ইটালীর সৈন্যদল একদিকে লাইবিয়া হইতে, একদিকে আবিসিনিয়া হইতে ও অন্যদিকে ভূমধ্যসাগর হইতে যুগপৎ সুয়েজ খাল আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিবে। অপরদিকে ইংরাজ সৈন্যদল প্যালেষ্টাইন ও ইজিপ্ট হইতে উহাদিগকে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিবে। সুয়েজ খাল ও এডেন গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। সুতরাং এই নিকট-প্রাচ্যের আসরে যুদ্ধটা জমিয়া উঠিবে।

এই আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, জার্ম্মাণীর পক্ষে ইংলণ্ড অবরোধ বা ইংলণ্ডে সৈন্য অবতরণ যদি সম্ভব হয়, তবেই যুদ্ধ সত্বর শেষ হইয়া যাইবে। আর যদি তাহা সম্ভবপর না হয়, তবে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে থাকিবে। যুদ্ধের স্থিতিকাল বিলম্বিত হইলে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই উহা ছড়াইয়া পড়িবে, এমন কি ভারতবর্ষে থাকিয়া আমরাও সম্ভবতঃ রণতাণ্ডব উপলব্ধি করিতে পারিব।

# ব্রহ্মসূত্র

## ৪

শ্রীমতিলাল রায়

পূর্ব্বোক্ত ১১টী সূত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্ম এবং তাঁহাতেই ঈক্ষণ-শক্তি প্রযুক্ত চিৎরূপে ব্রহ্ম কল্পিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মলিঙ্গ বাক্যগুলির সমাহার করা হইয়াছে। ব্রহ্ম আনন্দময়, প্রাণময়, জ্যোতিঃস্বরূপ। উপাসনা-ভেদে বহু বাক্যে এক অদ্বয় ব্রহ্মই যে উপাসিত হইয়াছেন, তাহাই অতঃপর প্রমাণিত হইবে। বাক্য-ভেদে উপাসনা-ভেদে, বিষয় ও উপাস্য যে অভেদ, শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মসূত্র-রচনায় ব্যাসদেব তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আনন্দময় শব্দের সূত্র ধরিয়া দ্বাদশ সূত্রের অবতারণা হইতেছে।

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥ ১২

আনন্দময়ঃ অভ্যাসাৎ।

অর্থাৎ ব্রহ্ম আনন্দময়। যেহেতু শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ ইহার পাঠ আছে।

সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ সম্মুখে রাখিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বিশদ করার নীতিই আশ্রয়ণীয় হইয়াছে। সংশয়—এই আনন্দময় শব্দ ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইয়াছে কিনা? তদুত্তরে বলা যায়—"আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ নো বিভেতি কুতশ্চন" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য ইহার প্রমাণ। অর্থাৎ সেই ব্রহ্মানন্দের সাক্ষাৎকার হইলে, কিছু হইতে আর ভয় থাকে না। ভৃগুও জানিয়াছিলেন "আনন্দ ব্রহ্মেতি"। আনন্দই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ, শ্রুত্যন্তরে এমন-অনেক কথাই আছে।

এইবার পূর্ব্বপক্ষ প্রশ্ন তুলিতে পারেন—তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে আনন্দময় শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, এইরূপ উপদেশ করিয়া বিজ্ঞানময়ের অন্তরে আনন্দময় কোষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে অন্নময় কোষাদির ন্যায় আনন্দময় কোষও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অমুখ্য, এইরূপ ধারণা অসম্ভব নহে। ইহা ব্যতীত তৈত্তিরীয় উপনিষদে আনন্দময়ের অবয়ব-কল্পনাও করা হইয়াছে। তাহাতেই সংশয় স্বাভাবিক যে, আনন্দময় যদি মুখ্য আত্মা বা ব্রহ্ম হইবেন, তবে তাঁহার শরীরাদি কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? শ্রুতিতে আছে "ইহ তু তস্য প্রিয়মেব শিরঃ" অর্থাৎ প্রিয়ই তাঁহার মস্তক।" প্রিয়াপ্রিয় বোধ যাহার আছে, তাহার ব্রহ্মত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রতিপক্ষের এই কথার উত্তরে ভাষ্যকারের এই যুক্তিই যথেষ্ট যে, মুখ্য বিষয় যদি অতি সূক্ষ্ম ও দুর্নিরীক্ষ্য হয়, তবে তৎসম্বন্ধে উপদেশ করিতে হইলে, তৎপূর্ব্বে পরিদৃশ্যমান অপেক্ষাকৃত স্থূলের দৃষ্টান্ত দিয়াই উহাতে উপনীত করাইতে হয়। অরুন্ধতী দর্শন করাইতে হইলে দম্পতিকে তাহার পূর্ব্বে বহু তারা দেখাইয়া যথার্থ অরুন্ধতী দর্শন করাইবার বিধির ন্যায়, অন্নময়, প্রাণময় প্রভৃতি গৌণাত্মার বিষয় অবগত করাইয়া সর্ব্বান্তর পরমাত্মার সন্ধানই শ্রুতি দিয়াছেন। আনন্দময়ের অবয়বাদি কল্পিত, বাস্তবিক নহে। এরূপ না হইলে, উপনিষদে এইরূপ কথা বলিবেন কেন—"তস্মাৎ এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ বৈ অন্যঃ—অন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ" অর্থাৎ আনন্দময় সর্ব্বান্তর। তাহার অন্তর আর কিছু নাই। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" প্রভৃতি সূত্রে সর্ব্বভূতের জন্ম-মৃত্যু এই আনন্দেই কথিত হইয়াছে। আনন্দময়ের রূপ-কল্পনা আনন্দেরই ছন্দঃ। প্রিয় তাহার শির, মোদ তাহার দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ তাহার বাম পক্ষ, আনন্দ তাহার আত্মা; অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তাহার পুচ্ছ। ইহা আনন্দেরই তরঙ্গ-হিল্লোল। ইহা সংসারী জীব-বিগ্রহ নহে; অতএব আনন্দময় শব্দ শ্রুতিতে এইরূপ পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হওয়ায়, তাহা ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, ইহাই স্থিরীকৃত হয়।

অভ্যাস-শব্দের শাস্ত্রাবৃত্তি ব্যতীত আর এক অর্থ আছে। "চিত্তস্যৈকস্মিন্নভ্যন্তরে বাহ্যে বা প্রতিমাদাবলম্বনে সর্ব্বতঃ সমাহৃত্য পুনঃ পুনঃ স্থাপনমভ্যাসঃ" চিত্তের একাগ্রতা - পরিণাম যদি আনন্দই হয়, তাহা হইলে

ব্রহ্মানুশীলনে ইহা হইয়া থাকে—শতকর্ণীর কাহিনীর ন্যায় ভারতের বহু মহাপুরুষের জীবন-দৃষ্টান্ত ইহার প্রমাণ।

তবুও প্রশ্ন উঠে—আনন্দের সহিত ময়ট্ প্রত্যয় সংযুক্ত থাকায়, ইহা বিকার অর্থেও গ্রহণীয় হয়। ময়ট্ প্রত্যয় স্বভাবতঃ বিকার অর্থেই সংযুক্ত হইয়া থাকে; অন্নময়, প্রাণময় প্রভৃতি বৈকারিক শব্দ; আনন্দময়ও কেন তাহা না হইবে? পরবর্ত্তী সূত্র এই জন্য অবতারিত হইতেছে।

বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥১৩॥

বিকারশব্দাৎ ন (বিকার শব্দ হেতু ময়ট্ প্রত্যয় নহে।) ইতি চেৎ ন (কেন ইহা নহে?) প্রাচুর্য্যাৎ (প্রাচুর্য্যার্থ হেতু)।

প্রাচুর্য্য অর্থেও ময়ট্ প্রত্যয় হয়। শ্রুতিও ইহার প্রমাণ। মনুষ্যানন্দ অপেক্ষা গন্ধর্ব্বানন্দ শতগুণ অধিক। এইরূপ উত্তরোত্তর আনন্দের কথা বলিয়া পরিশেষে শ্রুতি ব্রহ্মানন্দের নিরতিশয়ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। এই হেতু এখানে প্রাচুর্য্যার্থেই ময়ট্ প্রত্যয় ধরিতে হইবে।

তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥১৪॥

তস্য (আনন্দস্য কারণ) ব্যপদেশাৎ (নির্দ্দেশ হেতু চ। অর্থাৎ আনন্দের হেতু ব্রহ্ম, এইরূপ উপদেশ থাকায় আনন্দময় শব্দের ময়ট্ প্রত্যয় প্রচুরার্থে; বিকারার্থে নহে।

"এষহেবানন্দয়তীতি", ইনিই আনন্দ দান করিতেছেন; এইরূপ প্রসিদ্ধ শ্রুতিবাক্যের দ্বারা পূর্ব্ব যুক্তি সমর্থিত হইতেছে। আরও হেতু আছে—

মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥১৫॥

মান্ত্রবর্ণিকম্ (মন্ত্রপ্রোক্ত) এব চ গীয়তে (এইরূপ গীত হইয়াছেন।)

শ্রুতি বলেন, "সত্যং ব্রহ্ম, অনন্তং ব্রহ্ম। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও অনন্ত-স্বরূপ। ব্রহ্মবিৎ পরমকেই প্রাপ্ত হয়।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ; বেদের এই দুই ভাগ। মন্ত্র যাহা বলে, ব্রাহ্মণে তাহার তাৎপর্য্যবিস্তার হয়। অতএব মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অভিন্ন।

নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥১৬॥

ইতরঃ ন, কস্মাৎ? অনুপপত্তেঃ।

আনন্দময় ব্রহ্ম, জীব নয়। কেন নয়? আনন্দময়ের জীবত্ব উপপন্ন হয় না।

জীব আর ব্রহ্ম, এই সম্বন্ধে বিচার ব্রহ্মসূত্রে পরে ভাল করিয়াই পাওয়া যাইবে। উপস্থিত দেখা যাইতেছে—জীব ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম আনন্দময় এবং যিনি আনন্দময়, তিনি জীবরূপে উপপন্ন হয় না। আচার্য্য শঙ্কর জীবের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন। তিনি আত্মা ব্যতীত আর কিছু দেখেন নাই, আত্মা ও অনাত্মা মিলাইয়া যে লোকব্যবহার জগৎ তাহা তিনি ভ্রান্তি বলিয়াছেন—এ সকল কথা পরে আসিবে।

অন্য পক্ষেও ব্রহ্ম ও জীব সম্বন্ধে বহু বিচার হইয়াছে। আচার্য্য রামানুজ জীবকে চিৎ শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। এই জীব সূক্ষ্ম। তাঁহার মতে, ঈশ্বর স্বয়ং পুরুষোত্তম। চিৎ ও অচিৎ—বিশিষ্ট ব্রহ্ম। এ বিচারও এক্ষণে আমরা করিব না। ব্রহ্মসূত্র বলিতেছেন—ব্রহ্মাতিরিক্ত যাহা, তাহা আনন্দময় নহে। কেননা, আনন্দময়ের উপপত্তি হয় না। "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।" তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু রূপে জন্মিব—তারপর সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে এইরূপ অভিধ্যান স্রষ্টা ভিন্ন অন্য পক্ষে সম্ভব নহে।

অন্য পক্ষ বলিবেন—আনন্দ যদি ব্রহ্মভোগ্য হয়, জীবের পক্ষে তাহা হইলে আনন্দ-ব্যতিরিক্ত দুঃখই অনিবার্য্য। আচার্য্য শঙ্কর এই বিষয়ে নির্দ্বন্দ্ব-মত প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বরাতিরিক্ত বস্তুই যখন মায়া, তখন কাহার আর সুখ-দুঃখ হইবে? পূজ্যপাদ গৌড়পাদ বলেন—সতের উৎপত্তি নাই, অজাতই অমৃত।

কিন্তু জাত জীব—সুখ-দুঃখ কাল্পনিক, এই কথায় তৃপ্তি পায় না। সুখের অন্বেষণ তাহার স্বভাবে নিহিত। দ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের মীমাংসায় বরং কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা মিলে। ব্রহ্মের সগুণত্ব ও বিভুত্ব লইয়াই তাঁহাদের মতে সৃষ্টিবাদ। জীবের অণুত্ব উপপন্ন হইলেও, তাহা ব্রহ্মেরই পরিণতি। এই হেতু ব্রহ্মের ভোগ জীবে অনুস্যূত হওয়ার যুক্তি অস্বীকার্য্য নহে। জীবও আনন্দ ভোগ করে। তবে তাহা স্বয়ং-সিদ্ধ নহে। ব্রহ্মযুক্তির উপর ইহা নির্ভর করে। পরবর্ত্তী সূত্রে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥১৭॥

ভেদেন ব্যপদেশাৎ চ।

অর্থাৎ ভেদের দ্বারা ব্যপদেশ হইয়াছে এই আনন্দময় ব্রহ্ম, জীব নহে।

জীব ও ব্রহ্ম শ্রুতিতে ভিন্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "অয়ং আনন্দময় আত্মা রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতীতি" অর্থাৎ আনন্দময় ব্রহ্ম, তিনি রসস্বরূপ; এবং ইনি তাহা লাভ করিয়া আনন্দিত হন। "রসোবৈ সঃ" এই সব শ্রুতি-বচনের দ্বারা ব্রহ্ম ও জীব, দুইয়ের ভেদ পরিদর্শিত হইতেছে।

শ্রুতি আরও বলিয়াছেন "আত্মাঽন্বেষ্টব্যঃ"—আত্মা অনুসন্ধনীয়। "আত্মলাভান্নাপরং বিদ্যতে" আত্মলাভের পর কিছুই নাই। আত্মা এবং অন্য কিছু, এই দুইয়ের পৃথক্‌ত্ব ইহাতে সুপরিস্ফুট। যাহা আত্মা নহে, তাহা রসও নহে, আনন্দও নহে; অতএব উক্ত সূত্রে ব্রহ্মই যে আনন্দময়, ইহাই প্রমাণিত হইল। পরবর্ত্তী সূত্রে ব্রহ্মের আনন্দময়ত্ব দৃঢ়ীকৃত হইতেছে।

কামাচ্চনানুমানাপক্ষা ॥১৮॥

কামাৎ চ অনুমানস্থ অপেক্ষা ন।

অর্থাৎ জগৎ-কারণের কাময়িতৃত্ব নির্দ্দেশ থাকা হেতু ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুর অনুমানের অপেক্ষা নাই।

বহু হওয়ার সঙ্কল্প ব্রহ্মেরই—জীবের নহে। অতঃপর আনন্দময় ব্রহ্মের উপসংহার-সূত্র কথিত হইতেছে।

অস্মিন্নস্যচ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥১৯॥

অস্মিন্ ( আনন্দময় বিষয়ে ) অস্য ( প্রবুদ্ধ জীবের ) তৎ যোগম্ ( তদাত্মনা যোগং ) শাস্তি ( উপদিষ্ট হইয়াছে )।

অর্থাৎ আনন্দময় ব্রহ্মে জীবের মুক্তি শ্রুতিতে উপদিষ্ট হওয়ায়, জীব আনন্দময় নহে, ব্রহ্মই আনন্দময়, ইহাই প্রতিপাদিত হইল।

এখানে জীব ও ব্রহ্মের এক প্রকার ভিন্নতা স্বীকৃত হওয়ায়, দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে এই সূত্রার্থ লইয়া মত-বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্ম যদি আনন্দময় হন, তবে তাঁহার নির্গুণত্ব প্রতিপাদিত হয় না। দ্বৈতবাদীদের মতে, ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন। এই হেতু এই সূত্রগুলি তাঁহাদের যথেষ্ট মতানুকূল হইয়াছে। 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্নোতি' ইত্যাদি শ্রুতি জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদত্ব প্রতিপাদন করে না। ব্রহ্ম-সাদৃশ্যলাভই প্রমাণ করে; এক অন্যের সাদৃশ্য পাইলেই যে অভেদ হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। স্মৃতিও বলেন—তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় করিলে, আত্মার সাম্যলাভ হয়। ব্রহ্ম যখন আনন্দময়, তখন তত্ত্বোপলব্ধিতে জীব আনন্দই লাভ করিয়া থাকে; জ্ঞানসুখে জীবের দোষ-নিবৃত্তি হইয়া ব্রহ্মভাবই লাভ হয়।

কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্ম ও জীবের এই ভেদ স্বীকার করেন না। ব্রহ্মকে আনন্দময় বলায়, ইহার অর্থ তাঁহাকে অন্য প্রকার করিতে হইয়াছে। আনন্দময় শব্দ প্রচুরার্থে গ্রহণ করিলেও, উহাতে নিঃশেষ দুঃখ এমন বুঝায় না। ব্রাহ্মণ-প্রচুর গ্রাম বলিতে ব্রাহ্মণাধিক্যই বুঝায়। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য শ্রেণীরও স্থান সেখানে থাকে। ব্রহ্মকে আনন্দপ্রচুর বলিলেও এই দোষ হয়। এই হেতু তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন "আনন্দময়স্য যাদাহীতি শাস্ত্রে ব্রহ্মভাবম্ শাস্তি, অতো নির্গুণব্রহ্মৈক্যজ্ঞানার্থং জীবভেদানুবাদ ইত্যভিপ্রেত্যাহ"—অর্থাৎ শাস্ত্র যখন আনন্দময় ব্রহ্ম জানিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপদেশ করিয়াছেন, তখন এই আনন্দময় ব্রহ্ম সোপাধিক নহে, নিরুপাধিক শুদ্ধ-ব্রহ্ম। হেতু—এই সগুণ ব্রহ্মে মুক্তি লাভ সম্ভব নহে। আচার্য্য শঙ্কর মনে করেন—আত্মা নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, উপাধিশূন্য, তবে তিনি কর্ত্তা ও ভোক্তার ন্যায় উপাধিযোগে প্রতীত হন। উহা আর কিছুই নহে, ঘটাকাশাদির ন্যায় আত্মার ঔপাধিক মূর্ত্তি মাত্র। মিথ্যা বা মায়াই ইহার মূল। এই জন্য ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে তিনি ঈশ্বরবাচী এক তত্ত্বের বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর, এই দুই তত্ত্ব স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও, প্রথম অবস্থা নির্গুণ এবং দ্বিতীয় অবস্থাটিকে তিনি সোপাধিক সগুণ আখ্যা দিয়াছেন। সগুণ ঈশ্বরত্ব মায়িক। সৃষ্টিকর্তৃত্ব ইহা হইতেই উদ্ভূত। তুরীয় ব্রহ্মই মূলতঃ পারমার্থিক।

আচার্য্য রামানুজ, নিম্বার্ক প্রভৃতি এবং গৌড়ীয় পণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণ পর্য্যন্ত শঙ্করাচার্য্যের এই মায়াবাদ স্বীকার করেন না।

আচার্য্য শঙ্করের মায়াই তাঁহাদের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মশক্তি-রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। ইঁহাদের মতে, ঈশ্বর যে নিগুর্ণ, তাহা ইয়ত্তাহীন গুণেরই পরিচয়। অতএব ব্রহ্ম আনন্দময়। শ্রুতি তাই এই গুণপ্রচুর পরমাত্মায় সংযুক্তির কথা জীবকে উপদেশ দিয়াছেন। বন্ধন ও মোক্ষের কারণ জীবত্ব। ঈশ্বর হইতে ভেদ-বুদ্ধি ইহার কারণ। এই ভেদ-জ্ঞান দূরীকৃত হইলে, জীবের মুক্তিলাভ হয়। আচার্য্য শঙ্করের মতে, মুক্তি তুরীয়। দ্বৈত বা বৈশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মুক্তিকে বস্তুতন্ত্র ও নিত্য আখ্যা দিয়াছেন। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি আচার্য্য শঙ্করের মতেও অভেদ হইলেও, শক্তির নিত্যতা তিনি স্বীকার করেন না। এই হেতু সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ব্রহ্ম হইলেও, "স চ স্বাত্মভূতানেব ঘটাকাশস্থানীয়ান্ অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপকৃতকার্য্যকারণসঙ্ঘাতানুরোধিনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতীষ্টে ব্যবহারবিষয়ে।"

অর্থাৎ অবিদ্যাকৃত নামরূপোপাধিবিশিষ্ট যে ঈশ্বর, তিনি স্বকীয় আত্মভূত ঘটাকাশস্থানীয় অবিদ্যা কর্ত্তৃক প্রত্যুপস্থাপিত নামরূপের দ্বারা কৃত কার্য্য ও কারণের সংঘাতবিশিষ্ট যে জীব নামক বিজ্ঞানাত্মা, তার ব্যবহার বিষয়ে ঈশ্বর হইয়া থাকেন। তিনি এইরূপ বলিয়াছেন— কিন্তু শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সাধন করেন নাই। ব্রহ্মসূত্রের "ভেদব্যপদেশাচ্চ" সূত্র তাহার প্রতিধ্বনি।

অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥ ২০

অন্তঃ (মধ্যে) তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ (তৎপ্রতি ধর্ম্মোপদেশ হেতু)।

অর্থাৎ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে আদিত্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী পরমাত্মার উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে "এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ।" অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলে যে হিরণ্ময় পুরুষ পরিদৃষ্ট হন, তাঁহার শ্মশ্রু, কেশ, নখাগ্র পর্য্যন্ত হিরণ্ময়, সমস্তই হিরণ্ময়।

শ্রুতিতে এইরূপ কথা উক্ত হওয়ায়, প্রতিপক্ষেরা বলিতে পারেন—পরমেশ্বরের অসীমতা শ্রুতিপ্রমাণে সিদ্ধ হয় না; কেননা, তাহা হইলে তাঁহার সসীম রূপের কথা উপনিষদে উক্ত হইবে কেন? অথবা কোন জীবকে লক্ষ্য করিয়াই উপনিষদে এই কথা বর্ণিত হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে যদি শুধু পরমেশ্বরের রূপ-বর্ণনাই থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ সংশয়ের যুক্তি অবশ্যই স্বীকার্য্য হইত। কিন্তু ঈশ্বরের এই রূপ-কল্পনা করিয়া "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণঃ" প্রভৃতি। অর্থাৎ তিনি সমুদয়ের ঈশ্বর, তিনি ভূতাধিপতি, ভূতপালক; তিনি সমুদয় লোকের সেতুস্বরূপ বিধারক, এইরূপ উক্ত হওয়ায় এই পুরুষ জীব নহেন, ইহাই প্রমাণিত হইল।

এমনও মনে হইতে পারে যে, শ্রুত্যুক্ত এই পরমেশ্বর আদিত্যাদি দেবতার ন্যায় অন্য কোন দেবতাও তো হইতে পারেন। কিন্তু তাহাও নহে। কেন না, বৃহদারণ্যকে এইরূপ এই পুরুষ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, এই পুরুষ আদিত্যে থাকিয়াও আদিত্য হইতে অন্তর......। তিনিই অন্তর্য্যামী এবং অমৃতস্বরূপ আত্মা।

উপাসনার নিমিত্ত ছান্দোগ্য উপনিষদে কেবল আদিত্যের মধ্যেই এই পুরুষ-কল্পনা হয় নাই, অক্ষি-গোলকেও যে পুরুষ পরিলক্ষিত হন, সে কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা কেবল জীবের সাধ্যনিরূপণের ছন্দোবিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্মৃতিতে আছে, "মায়াহ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যতি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন ত্বং মাং দ্রষ্টুমর্হসীতি স্মরণাৎ।" অর্থাৎ হে নারদ, এই মায়া, যাহার দ্বারা তুমি আমাকে এইরূপ দেখিতেছ, তাহা আমারই সৃষ্টি। নতুবা আমাকে তুমি এইরূপ গুণযুক্ত দেখিতে পাইতেও না, স্মরণ করিতেও পারিতে না।

পরমেশ্বর এইজন্য নির্গুণ হইয়াও উপাসনার হেতু অথবা জীবকল্যাণ-হেতু সগুণ হইয়া থাকেন। জীব এবং ব্রহ্ম, ইহার ভেদ শ্রুতি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। এই ভেদ অগ্নিকুণ্ডের সহিত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় মনে করিতে হইবে। এই কথাই পরবর্ত্তী সূত্রে অধিকতর সুস্পষ্ট করার জন্য পুনরায় কথিত হইয়াছে।

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥ ২২

ভেদব্যপদেশাৎ চ অন্যঃ

অর্থাৎ ভেদব্যপদেশ হেতু অন্য।

শ্রুতিতে জীব হইতে ঈশ্বর ভিন্ন, এই উপদেশ হেতু আদিত্যশরীরাভিমানী জীব হইতে তিনি ভিন্ন হইলেন। শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মবোধক শব্দগুলি সবই ব্রহ্মবাচী। যথা—

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ২২ ॥

আকাশঃ তৎ-লিঙ্গাৎ।

অর্থাৎ আকাশই ব্রহ্ম, ইহা ব্রহ্মলিঙ্গ হেতু।

ছান্দোগ্যোপনিষদে ব্রহ্মবাচী আকাশ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। শালাবত্য নামক ব্রাহ্মণ ও জৈবলি নামক রাজার কথোপকথনে শালাবত্য প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন—এই সকল লোকের গতি কি? জৈবলি বলিয়াছিলেন—আকাশই এই সকল ভূতের জন্মক্ষেত্র; ইহারা আকাশেই অস্তমিত হয়, আকাশই ইহাদের আশ্রয়।

আকাশ অর্থে প্রথম ভূতও হইতে পারে। পূর্ব্ব পক্ষ এই হেতু বলেন—এই আকাশ ব্রহ্মলিঙ্গ কেন হইবে? আকাশ-শব্দে ভূতাকাশকেই বুঝাইতেছে। শব্দশাস্ত্রের নিয়মে শব্দোচ্চারণের সঙ্গে যদি বহু অর্থ প্রতীত হয়, উহা লোকব্যবহারে অচল হয়। এই হেতু শব্দোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যে অর্থ প্রথম প্রতীত হয়, তাহাই গ্রহণযোগ্য; ইহার অন্য অর্থ থাকিলে, তাহা গৌণার্থে গ্রহণ করা উচিত। অতএব এই ক্ষেত্রে আকাশ-শব্দের মুখ্যার্থ ভূতাকাশ হওয়াই উচিত। কিন্তু জৈবলি বলিয়াছেন "ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে" এই সমস্ত ভূতই আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়। ভূতাকাশ হইতে সর্ব্বভূত জন্মে না। এই কথার উত্তরে বলা যায় যে, শ্রুতিতে এইরূপ আছে "এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নি-রিত্যাদি।" অর্থাৎ আত্মা হইতে আকাশ। আকাশ হইতে বায়ু ও অগ্নি যাবতীয় ভূত জন্মিয়াছে। অতএব সর্ব্বভূত আকাশোদ্ভূত বলিলে আকাশ-শব্দ ব্রহ্মলিঙ্গ-রূপে গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। উপনিষদে আকাশ-শব্দের আরও ব্যাখ্যা আছে। আকাশ পরম পতি বলিয়া তাহা নশ্বর নহে, অনশ্বর। সেই অনশ্বর আকাশই উদ্গীথ, এইরূপে প্রস্তাব শেষ করা হইয়াছে। অতএব আকাশ যখন আত্মা হইতে উৎপন্ন হয় এবং আত্মাতে লয় পায়, তখন শ্রুত্যুক্ত শব্দ ব্রহ্মবিষয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই প্রমাণিত হইল।

ছান্দোগ্য উপনিষদের উদ্গীথ প্রকরণ লইয়া প্রাণ-শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে। পরবর্ত্তী সূত্রে তাহারই সমন্বয় হইতেছে।

অতএব প্রাণঃ ॥ ২৩

এই হেতু (পূর্ব্বোক্ত প্রকার হেতুর দ্বারা) প্রাণশব্দ(ও) ব্রহ্মপর।

প্রাণের আপাত অর্থে শ্বাস-প্রশ্বাসাত্মক বায়ুবিশেষ গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন "প্রাণস্য প্রাণঃ"—এই প্রাণ বায়ুবিকার নহে। শ্রুতি বলিতেছেন, "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসম্বিশন্তি।" এই সমস্ত ভূত প্রাণে গিয়া লীন হয়। আবার প্রাণ হইতে উদ্ভূত হয়। পিতার পিতা বলিলে যেমন প্রথম পিতা হইতে দ্বিতীয় পিতা স্বতন্ত্র বলিয়া অবধারণ করা শক্ত হয় না, তদ্রূপ "প্রাণস্য প্রাণঃ" এই শ্রুতিবচন দ্বারা, বায়ুবিকার-রূপ যে প্রাণ, তাহা হইতে এই প্রাণ পৃথক্ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। অতএব আকাশ-শব্দের ন্যায় এই প্রাণশব্দও ব্রহ্মবাচী।

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ২৪

জ্যোতিঃ চরণাভিধানাৎ।

অর্থাৎ জ্যোতিঃ-শব্দও ব্রহ্মবোধক। যেহেতু ঐ জ্যোতির পাদ, এইরূপ উক্তি রহিয়াছে।

শ্রুতিতে আছে "যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দ্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ অনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তদ্‌বদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ।" জ্যোতিঃ স্বর্গের উপরে। সমস্ত প্রাণিবর্গের উপরে। পৃথিব্যাদি সমুদয় লোকের উপরে, তদন্তর্গত উত্তমাধম সমুদয় লোকে দীপ্যমান। সেই উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃই এই জ্যোতিঃ। যে জ্যোতিঃ এই অন্তর-পুরুষে।

এই জ্যোতিঃ সূর্য্যের উদ্দেশ্যে অথবা ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে। শ্রুতিতে অগ্নিকেও জ্যোতিঃ-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। "জ্যোতির্দ্দীপ্যতে"—দীপ্তি থাকিলেই তাহার পশ্চাতে ভাস্বর রূপের অস্তিত্ব আছে। রূপহীন ব্রহ্মে তাহা সম্ভব হয় কি প্রকারে? আকাশ ও

প্রাণ ব্রহ্মধর্ম্ম-বিশিষ্ট হওয়ায় ব্রহ্ম-শব্দে অভিহিত হইয়াছে; কিন্তু এখানে জ্যোতির সহিত এইরূপ ব্রহ্মচিহ্ন নাই। ইহা ব্যতীত স্বর্গের উপরে দীপ্যমান, এই রূপ জ্যোতির সীমা নির্দ্দেশ হওয়ায়, নিরতিশয় ব্রহ্ম-শব্দে প্রযুক্ত হইতে পারে না। যদি বলা হয় যে, এই জ্যোতিঃ ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম তেজঃ মাত্র অথবা স্বর্গের ঊর্দ্ধে অত্রিবৃৎকৃত তেজঃ, তাহা হইলে এই তেজের উপাসনা নিষ্ফল হয়। কেননা, জ্যোতিঃ-শব্দ পঞ্চীকৃত তেজঃ অর্থে গৃহীত যদি না হয়, তবে তাহা জীবের উপাস্য হইতেই পারে না। উপাসনার জন্য সাবয়ব জ্যোতির প্রয়োজন। পূর্ব্বপক্ষ এইরূপে জ্যোতিকে ব্রহ্মপর হওয়া সঙ্গত নহে, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, প্রাণ ও আকাশ-শব্দের ন্যায় জ্যোতি-শব্দের সহিত ব্রহ্ম চিহ্ন-বাক্যনির্দ্দেশ নাই। কিন্তু গায়ত্রী বা "ইদং সর্ব্বং ভূতমিতি এইরূপ ছন্দের উল্লেখ আছে। অতএব গায়ত্রী যখন ব্রহ্ম-বিভূতি বলিয়া শ্রুতি-প্রমাণসিদ্ধ, তখন এই জ্যোতি-শব্দে ব্রহ্মই গ্রাহ্য হইল। চরণাভিধানাৎ অর্থে "পাদাভিধানাৎ" অবশ্যই গ্রহণীয়। এই সূত্রে চতুষ্পাদ ব্রহ্মই এই জ্যোতিঃ-শব্দে লক্ষিত হইতেছেন। যাঁহার এক পাদ এই বিশ্ব, অপর তিন পাদ "দিবি" অর্থাৎ দ্যুলোকে—এই দিব সম্বন্ধীয় ব্রহ্মই ব্রহ্মশব্দে বাচ্য হইতেছেন। ব্রহ্মই ভানস্বরূপ; তাই এই সকল ভাত হয়। অতএব জ্যোতিঃ ব্রহ্মপর হওয়ায় কোন বিরোধই নাই। শ্রুতিতে যে স্বর্গের উপরে জ্যোতিঃর স্থান-নির্দ্দেশ উক্ত হইয়াছে, তাহা উপাসনার্থই কল্পিত বলিয়া গ্রহণীয়, পরন্তু ব্রহ্মের দীপ্তি সর্ব্বব্যাপিনী। ঘটাকাশ বলিয়া আকাশের উপাসনা নির্দ্দিষ্ট সীমায় হইলেও, উহা আকাশ হইতে ভিন্ন নহে। জ্যোতিশব্দ ব্রহ্মবোধক। জ্যোতি-শব্দে ব্রহ্ম অর্থ বুঝাইয়া দিবার জন্য পূর্ব্ববাক্য ব্রহ্ম-চিহ্নিত হইলেও, অন্য বাক্যের অর্থবাদে উহা প্রযুক্ত হইতে পারে, এই দোষের দূরীকরণের জন্য পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে।

ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথাচেতোঽর্পণ-
নিগমাৎ, তথাহি দর্শনম্ ॥ ২৫

ছন্দোঽভিধানাৎ (ছন্দের অভিধান হেতু) ন (অর্থাৎ ব্রহ্মাভিহিত নহে) চেৎ (যদি এইরূপ আশঙ্কা হয়) ন (তাহার কারণ নাই) [কুতঃ?] তথাচেতোঽর্পণনিগমাৎ (তাহাতে ছন্দের দ্বারা ব্রহ্মে চিত্তসমাধানের উপদেশ আছে) তথাহি দর্শনম্ (শ্রুত্যন্তরে এইরূপ বিধানও দৃষ্ট হয়)।

অর্থাৎ পূর্ব্ববাক্যে ব্রহ্ম অভিহিত হন নাই, কেবল গায়ত্রী-ছন্দই কথিত হইয়াছে—এইরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। কেননা, সেই বাক্যেই ব্রহ্মে চিত্তার্পণ করার উপদেশ আছে। অন্য শ্রুতিতেও এইরূপ ব্রহ্মোপাসনার বিধান পরিলক্ষিত হয়। যখন বলা হইতেছে যে, গায়ত্রী বা "ইদং সর্ব্বং ইতি" তখন অক্ষরময়ী গায়ত্রী যে সর্ব্বময়ী, ইহা নির্ণীত হইতেছে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি" এই মন্ত্রের ন্যায় এই সমস্ত গায়ত্রী, একই প্রকার কথা। ব্রহ্ম ও গায়ত্রী এখানে শব্দান্তর মাত্র। অতএব গায়ত্রীবাক্যে শ্রুতি ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিয়াছেন, ছন্দঃপ্রতিপাদন করেন নাই। আরও যুক্তি আছে

ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তে শ্চৈবম্ ॥ ২৬

ভূতাদি (ভূত প্রভৃতিকে) পাদব্যপদেশ (পাদরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে) উপপত্তেঃ (তাহার উপপত্তির হেতু) এবম্ (এইরূপ অভিহিত হইয়াছে)।

বিশদার্থ—ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয়—শ্রুতিতে গায়ত্রীর এই চারিটী পদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। গীতাও এই কথা বলিয়াছেন "অহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"। আমি এই জগৎ একাংশে ব্যাপ্ত করিয়াছি। শ্রুতিতে আবার বলা হইয়াছে—যাহা এই জগৎ, তাহাই ব্রহ্ম। অতএব ঘটকে মৃত্তিকা বলিলে যেমন দোষ হয় না, তেমনি গায়ত্রী ও ব্রহ্ম একার্থে প্রযুজ্য হইতে পারে। এই হেতু জ্যোতির্ব্বাক্যে ব্রহ্মই অভিধেয় হইলেন।

উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ ॥ ২৭

উপদেশ-ভেদাৎ (উপদেশ ভেদ হেতু) ন (এইরূপ হইতে পারে না) চেৎ ন (যদি এইরূপ না হয় তবে?) উভয়স্মিন্ অপি অবিরোধাৎ (এই উভয় উপদেশে অবিরোধ হেতু)।

অর্থাৎ শ্রুতির উপদেশে—জ্যোতি-শব্দের সহিত দিবি, দিবঃ, এই দ্বিবিধ বিভক্ত্যন্ত পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই উভয়বাক্যোক্ত বিষয় বিভক্তিভেদে অন্য অর্থ জ্ঞাপন করে নাই, অর্থাৎ একই ব্রহ্মকে প্রকাশ করিয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন এক স্থলে "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"; আর অন্যস্থলে বলিয়াছেন "যদতো পরো দিবো জ্যোতিঃ" প্রথম দিব্ শব্দ সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত। পরে উহাই আবার পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত হওয়ায়, এইরূপ প্রতিবাদ হওয়া অসঙ্গত নহে যে, এক দিব্ শব্দ একবার আধার রূপে উল্লিখিত হইয়াছে, উহাই আবার পরে পঞ্চমীবিভক্ত্যন্ত হইয়া সীমারূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে; অতএব একই বস্তু এখানে প্রস্তাবিত হয় নাই। ইহার উত্তরে ভাষ্যকারগণের যুক্তি এই যে, পূর্ব্বাপর শ্রুতিপাঠ করিলে, শ্রুতিবাক্য সকল অবিরোধে একই ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছে দেখা যায়। বিভক্তির অনৈক্য দিব্-শব্দের অর্থহানি করে না। বিভক্তির অর্থ অত্যন্ত দুর্ব্বল, ইহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। বৃক্ষাগ্রে পক্ষী বা বৃক্ষোপরি পক্ষী, এইরূপ বিভক্তিভেদে মূল শব্দের অর্থভেদ হয় না। অতএব জ্যোতি-শব্দ ব্রহ্মপর, ইহাতে আর দ্বিমত নাই

### প্রাণাস্তথানুগমনাৎ ॥ ২৮

প্রাণঃতথা অনুগমনাৎ

প্রাণ ও ব্রহ্ম-প্রতিপাদন হেতু—ব্রহ্ম।

কৌশিতকী ব্রাহ্মণে প্রতর্দ্দন ও ইন্দ্র সংবাদ একটী আখ্যায়িকা আছে। সেই আখ্যায়িকায় ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে এই উপদেশ প্রদান করেন—"প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্বেতি" অর্থাৎ আমিই প্রাণ, আমিই প্রজ্ঞাত্মা, তুমি আমাকেই প্রজ্ঞাত্মা জানিয়া উপাসনা করিবে। এই প্রসঙ্গের শেষে উক্ত হইয়াছে—"স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ" অর্থাৎ সেই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর ও অমৃত। এই বাক্যে প্রাণ ব্রহ্ম, ইহাই কি প্রমাণিত হইল না? যদি হইয়া থাকে, তবে আবার সূত্রবৃদ্ধির প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে এ কথা বলিয়াছেন "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাদিত্যাদি" অর্থাৎ বাক্যকে জানিবার ইচ্ছা করিও না, পরন্তু বক্তাকেই জান। এই বাক্যে জীবাত্মাই লক্ষিত হইতেছেন। পরন্তু অন্যবাক্যে ব্রহ্মবোধ জ্ঞাপন করা হইতেছে। ইহা কিরূপ হয়? এইরূপ সংশয় দূর করার জন্য বক্ষ্যমাণ সূত্রের অবতারণা। প্রতর্দ্দন ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—যাহা পরম হিত, তাহাই উপদেশ করুন। ইন্দ্র পরম পুরুষার্থই প্রাণবাক্যে উপদেশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম ভিন্ন পরম-হিত-সিদ্ধি আর কিছুতেই হয় না। এখানে বক্তাকে জান অর্থে ব্রহ্মকে জান, এই অর্থই গ্রহণীয়। অতএব প্রাণনির্দ্দেশ এখানেও ব্রহ্মপর ছাড়া অন্য কিছু নহে।

### নবক্তুরাত্মোপদেশাদিতিচেৎ অধ্যাত্ম-সম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্ ॥ ২৯ ॥

বক্তুঃ (বক্তার) আত্মোপদেশাৎ (স্ব-স্বরূপ কথন হেতু) ন ইতি (প্রাণ ব্রহ্ম নয়) চেৎ (যদি এইরূপ আশঙ্কা হয়) হি (যেহেতু) অস্মিন্ (এই অধ্যায়ে) অধ্যাত্মসম্বন্ধ ভূমা (প্রত্যগাত্মা সম্বন্ধে বহুল উপদেশ পরিদৃষ্ট হয়)

অর্থাৎ ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বক্তাকে জানিতে বলায়, উক্ত সূত্রে প্রাণ-শব্দ ব্রহ্ম নহে, এইরূপ আশঙ্কার নিরসনের জন্য উক্ত সূত্রে বলা হইল—না, এইরূপ নহে। যেহেতু ঐ উপনিষদের ব্রাহ্মণ-ভাগে পরমাত্মবোধক উপদেশই অধিক দেখা যায়।

তবুও প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ব্রহ্মের বক্তৃত্ব না থাকায়, বক্তাকে জানিবার কথায় উহাতে শরীর-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ইন্দ্রকেই জানার কথা বলা হইয়াছে। ইন্দ্র স্বপ্রশংসা করিয়াছেন। বলের অধিষ্ঠাতা দেবতাই ইন্দ্র, এ কথা শাস্ত্রাদিতে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে—"প্রাণোবৈ বলমিতি হি বিজ্ঞায়তে বলস্য চেন্দ্রোদেবতা"। কিন্তু উক্ত আখ্যায়িকার উপসংহারে "স এষ প্রাণঃ" প্রভৃতি বাক্যে "সেই প্রাণই আমার আত্মা", এইরূপ বলায়, এই আমি অজর, অমর ও অমৃত। অতএব ইন্দ্র এইরূপ নহেন। ইন্দ্রাদি দেবতারাও উৎপত্তি-নাশ-শীল, একথা সর্ব্বজনবিদিত। তবুও যে আমাকে জান, এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহারও তাৎপর্য্য আছে, তাহা এইরূপ।

শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেববৎ ॥ ৩০

শাস্ত্র-দৃষ্ট্যা তু উপদেশঃ (শাস্ত্রজ্ঞানানুসারেই উপদেশ দিয়াছিলেন) বামদেববৎ (বামদেবের ন্যায়)

বামদেব যেমন পরমাত্মতত্ত্ব জানিয়া 'আমিই মনু, আমিই সূর্য্য' এইরূপ বলিতে কুণ্ঠা করেন নাই। শ্রুতি অন্যত্রও বলিয়াছেন "তদ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবদিতি" অর্থাৎ যে যখন যে দেবতায় প্রবুদ্ধ হয়, সে তখন তদ্রূপ হইয়া থাকে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বামদেবের ন্যায় গীতাকারও বলিয়াছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" অতএব যে বক্তাকেই জান বলিয়া ইন্দ্র আত্মনির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মোপদেশ ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

অতঃপর উপসংহারসূত্রে বলা হইতেছে

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতিচেৎ; নোপাসা-ত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ ॥ ৩১

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ ন (জীববোধক ও প্রাণবোধক লিঙ্গ দৃষ্ট হইতেছে—অতএব ইহা ব্রহ্মোপদেশ নহে) ইতি চেৎ ন (যদি এরূপ বল, তাহা নহে; কেন নহে?) উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ আশ্রিতত্বাৎ ইহ তৎযোগাৎ (তাহাতে উপাসনাত্রয়ের বিধান আশ্রয় হেতু ইহা ত্রিবিধ হইয়া থাকে)।

প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন যে, বহু অধ্যাত্মসম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বাক্য ব্রহ্মপর বলা যাইতে পারে না। বলা হইয়াছে যে, প্রাণ সেই প্রজ্ঞা। আবার 'বাক্যকে জানিও না, বক্তাকে জান।' এই সকল কথা স্পষ্টতঃ জীব-বোধক। যতদিন শরীর, ততদিন প্রাণ। সেই প্রাণই প্রজ্ঞা। উভয় অভিন্ন ধরায়, প্রাণের সহিত উহার উৎক্রমণ অসঙ্গত হইবে কেন? এই প্রজ্ঞা যদি ব্রহ্ম হন, তাহা হইলে এই ব্রহ্মপ্রাণও প্রজ্ঞার সহিত অভিন্ন হইবেন। এই ক্ষেত্রে ব্যাসদেব স্বয়ং প্রতিবাদচ্ছলে সূত্র রচনা করিয়া বলিতেছেন—এইরূপ অর্থ গৃহীত হইলে, একবাক্যে উপাসনার ত্রিবিধ বিধান গ্রহণ করিতে হয়; ইহা যুক্তি-বিরুদ্ধ। যেখানে বহু বাক্যের এক বিধেয়, সেখানে এক বাক্যই স্বীকার্য্য। কৌশিতকী ব্রাহ্মণে উপসংহারে এক বিধেয় নিরূপিত হইয়াছে। অতএব সমুদয় বাক্যের অর্থ ব্রহ্মবোধক। প্রাণ শরীরে সহবাস করে, উৎক্রমণ করে; এই কথা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ নহে। "প্রাণব্যাপারস্যাপি পরমাত্মায়ত্তত্বাৎ" প্রাণকার্য্য পরমাত্মার অধীন। শ্রুতিও কি বলেন নাই—"ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যোজীবতি কশ্চন ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতা-বুপাশ্রিতাবিতি" জীব প্রাণ বা অপানের দ্বারা জীবনবান্ হয় না—প্রাণাপান যাঁহার আশ্রিত, তাঁহার দ্বারাই মর্ত্ত্যগণ জীবিত থাকে। অতএব বক্তা যে বলিয়াছেন—'বক্তার প্রেরককে জান', তাহা ব্রহ্মার্থের অবিরুদ্ধ। প্রাণ শরীর সহবাসে উৎক্রমণ করে, ব্রহ্মপক্ষে সে কথা প্রযুক্ত নয়। প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা এবং তাহাই অমৃত—জীবধর্ম্ম, প্রাণধর্ম্ম উল্লিখিত থাকিলেও, ব্রহ্মবোধকতার ইহাতে ব্যাঘাত হয় নাই। উপাসনার প্রকার-ভেদে উপাস্যভেদ হয় না। ভূত সকল অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শাদির আধার আকাশ, বায়ু প্রভৃতি এই দশ পদার্থের নাম ভূতমাত্রা। চক্ষুঃ, শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং তাহাদের উৎপাদিত জ্ঞান-পঞ্চক প্রজ্ঞামাত্রা নামে কথিত। ভূতমাত্রা প্রজ্ঞামাত্রা হইতে ভিন্নও নহে, আবার প্রজ্ঞামাত্রা প্রাণে অন্বিত। এই প্রাণ সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বময় ব্রহ্ম। শ্রুতিও বলিয়াছেন—ব্রহ্ম মনোময়, প্রাণ-শরীরের নেতা। তিন প্রকার উপাসনা-বিধির একই উপাস্য—ব্রহ্ম। অতএব কৌশিতকী ব্রাহ্মণের 'প্রাণ ব্রহ্ম' অথবা 'বক্তাকেই জান', এই বাক্যের লক্ষ্য ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইন্দ্র ও প্রতর্দ্দনের প্রসঙ্গারম্ভে ও উপসংহারে প্রাণ-লিঙ্গ, প্রজ্ঞা-লিঙ্গ ও ব্রহ্ম-লিঙ্গ, এই তিনের একরূপতাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মলিঙ্গ বাক্যসমূহের সমাহার এইরূপেই করা হইল।

(ক্রমশঃ)

**কামানের মুখে নান্‌কিঙ্‌** —শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

বিষয়-নির্ব্বাচনে ও পুস্তকের নামকরণে গ্রন্থকার শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের পছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর 'মহাচীনে মহাসমর' এবং 'অবিসিনিয়া ফ্রন্টে' ইতিমধ্যেই যে লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে, আলোচ্য উপন্যাসখানি তাহাও ছাড়াইয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। নান্‌কিঙের সমর-পরিবেশের মধ্যে বাঙালী যুবক সরোজ ও তার ভগ্নী আয়েষা এবং দুই বন্ধু ডেভিড আর রণজিৎ শিংকে কেন্দ্র করিয়া লেখক এক সুদূরবিস্তারী কল্পনার সাহায্যে যে চমকপ্রদ আখ্যায়িকা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অবধারিত কিশোরমনকে আনন্দ, শিহরণ ও 'এ্যাডভেঞ্চারে'র প্রেরণা দিবে। পরিবেশনের প্রসাদগুণে এবং রোমাঞ্চকর ঘটনা-বৈচিত্র্যের জন্য পৌনে দু'শো পৃষ্ঠার বই একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে আর শেষ না করিয়া উঠা যায় না। কোথাও ভাষার যেমন আড়ষ্টতা নাই, তেমনি কল্পনার গতিও অবাধ। প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকায় গ্রন্থ স্থানে স্থানে বাস্তববিরোধী কল্পনা কিছু কিছু লক্ষ্যে পড়ে। মনস্তত্ত্বের দিক্‌ দিয়া একদিকে যুদ্ধের পাশবিক অনাচার ও নিষ্ঠুরতা, অপরদিকে দেশপ্রেমজনিত বীরোচিত প্রাণ-বিসর্জ্জনের চিত্র কিশোরচিত্তে গভীর রেখাপাত করিবে। লেখকের প্রকাশভঙ্গীও প্রশংসনীয় যেমন "মানুষের জীবনে মৃত্যুর সঙ্গে দু'বার পরিচয় ঘটে না; তার অভিজ্ঞতার ইতিহাসও কোথাও তাই মেলে না।" আয়েষার মৃত্যুর মধ্য দিয়া বইখানির বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তি হইলেও, সুদূর প্রবাসে সেবারত প্রাণে দেশপ্রেমের যে সমুজ্জ্বল ছবি লেখক ফুটাইয়াছেন, তাহা চির অমর হইয়াই রহিবে। বইখানির জননী-জন্মভূমিকে উৎসর্গ সার্থক হইয়াছে।

কয়েকখানি হাফ্‌টোন প্লেট, ত্রিবর্ণ প্রচ্ছদপট এবং ঝরঝরে ছাপা-বাঁধাই বইখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছে। এই সব বিবেচনায় এক টাকা মূল্যও সস্তাই বলিতে হইবে।

**জীবনের চলস্রোত**—শ্রীমতিলাল দাশ প্রণীত। শিব সাহিত্য কুটীর, ২৬।৮এ, হ্যারিসন রোড হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

জীবনের চলস্রোত জাগতিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে জটিল হইয়া উঠে। জীবন ও পরিবেশের এই বিরাট্‌ পটভূমির' উপর নায়িকা ইন্দিরার জীবনকে কেন্দ্র করিয়া গ্রন্থকার এক জটিলতম মনস্তত্ত্বপূর্ণ আখ্যায়িকা ফাঁদিয়াছেন। 'প্রেমের প্রশস্ত রাজবর্ত্মে' ইন্দিরার জন্ম হয় নাই; পরন্তু পিতার অবৈধ প্রণয়ের ফলে এক বিধবা রাজপুতানীর গর্ভে তার জীবনের হয় সূচনা। সম্পৎশালী পিতার তপোবিমুখ আধুনিক আবেষ্টনীর মাঝে ইন্দিরার উদীয়মান জীবন-গতি মসীময় হইল 'যোগেশদা'র সহিত জন্মতিথির জলযাত্রা উপলক্ষে। তারপর সত্যব্রতের সঙ্গে বিবাহ এবং পদ্মার জলে শেষ পর্য্যন্ত অনুশোচনাদগ্ধা ইন্দিরার আত্মবিসর্জ্জনের মধ্য দিয়া গ্রন্থকার হিন্দুমনের দ্বন্দ্বময় এক সুন্দর সুস্পষ্ট ছবি আঁকিয়াছেন। 'বিশ্বকে নূতন দীপ্তিতে ভাস্বর ও গরিমাময় ক'রে তুলবে' যে 'মাতৃত্বের গৌরব' তাহা পঙ্কিল নারীজীবনে সম্ভব নয়, এই 'ভারতীয় নিজস্ব সুরটি' লেখক নায়িকার মানসিক দ্বন্দ্বাবলম্বনে পুষ্ট করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে শীতাংশুর মুখে মতিবাবু উদ্ধার করিয়াছেন, "সমস্ত আর্টই sublimation of the sex-energy" এবং বইখানির আগাগোড়া ইহা প্রতিপাদন করিতে গিয়া ব্যাপকভাবে আর্ট, চিন্তা ও দর্শনের অবতারণার ফলে, স্থানে স্থানে মূল আখ্যায়িকার রসপুষ্টি ব্যাহত হইয়াছে। তবুও নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, মতিবাবুর মন ও মেধা বেশ শুদ্ধ শুভ্র ও ভারতীয় ভাবসম্মত। গ্রন্থমধ্যে যে সকল সমস্যা উত্থাপিত হইয়াছে, ইন্দিরার মৃত্যুর মধ্য দিয়া তাহার উপর গ্রন্থকার সহজ যবনিকা টানিয়াছেন; কিন্তু জীবন-সাধনার সমস্যার অগ্নি-বিশোধিত রূপান্তর সম্ভব করাইতে পারিলে, অধিকতর সৃষ্টিকরী প্রতিভার পরিচয় পাইতাম। আরও আত্মস্থ এবং ধীরচিত্ত হইলে লেখকের সে সম্ভাব্য আছে।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

**টাকার কথা**—শ্রীঅনাথগোপাল সেন কর্ত্তৃক লিখিত। মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য দেড় টাকা।

অর্থনীতি বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষীয় অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কীয় প্রবন্ধ-লেখক হিসাবে শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি ভারতীয় অর্থনীতি এবং সাধারণভাবে অর্থনীতি সম্পর্কে লিখিত ও ইতঃপূর্বে কতিপয় মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ-সংগ্রহ।

আধুনিক রাজনীতির মূলে অর্থনীতিক সমস্যাসমূহই সর্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে অর্থনীতির মূল বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রত্যেক শিক্ষিত নরনারীরই কথঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ইংরেজীভাষায় এইরূপ অসংখ্য সহজপাঠ্য সর্বজনবোধ্য পুস্তক-পুস্তিকা রহিয়াছে। বাংলাভাষায় এইরূপ ছিল না। শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল বাংলাভাষায় সেইদিক্‌কার অভাব অনেকটা মিটাইয়াছেন।

## শ্রীমোতিলাল রায়

### ১৭

যে পারিবারিক জীবনের স্বপ্ন লইয়া মাত্র পূর্ণ পঞ্চদশ র্ষ বয়সে এক নবমবর্ষীয়া বালিকাকে বধূরূপে ঘরে ানিয়াছিলাম, বাহ্যতঃ স্বদেশীযুগের অভ্যুদয়ে এবং ারিবারিক জীবনক্ষেত্রে আমার সর্ব্বপ্রথম কন্যা বৎসর র্ণ না হইতেই কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, বিধাতা সে াপ্ন জীবনক্ষেত্র হইতে একটী রেখা না রাখিয়াই মুছিয়া দতেছিলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, তাহাতে পারিবারিক জীবনের সুখস্মৃতি চিরদিনের জন্য মুছিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। অনাঘ্রাত কুসুমের মত দিগ্দেশ হইতে তরুণেরা আসিয়া আমায় ঘিরিয়া ধরিল। তাহারা ভুলিতে চাহিল পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজন, গৃহ, পরিবার; আমি স্ব-ধামে বসিয়া পারিবারিক জীবনের স্বপ্ন-সুখে কেমন করিয়া মগ্ন থাকিতে পারি? ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আত্মীয়-স্বজনবিরহিত হইয়া, স্বতন্ত্র সংসার-জীবন গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই সংসারে আপনার বলিতে ছিলেন শুধু জীবন-সঙ্গিনী। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইত—ইনিও তো আপনার জন। যাহারা সর্ব্বহারা হইয়া "প্রবর্ত্তকে"র স্বপ্ন সফল করিতে চাহে, তাহাদের নেতৃরূপে আপন জন লইয়া দাঁড়াইতে পারি কি প্রকারে? এই সময়ে এই দ্বন্দ্বে আমার চিত্ত সতত বিচলিত হইত। স্ত্রীর প্রতি ঠিক বিরক্তি না হইলেও, কর্ত্তব্যের দায়ে তাঁহা হইতে যত দূরে থাকিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতাম। আমার আচরণে ও ব্যবহারে যে ভাব প্রকাশ পাইত, তাহা যে তাহাকে কিরূপ মর্ম্মপীড়া দিয়াছে, তাহা আজ স্মরণ করিয়া হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব বেদনার শিহরণ উঠে; কিন্তু সে ব্যথার প্রতিকার আজ আর হইবার নহে। কেবল মনে হয়—
"আসিবে আবার তুমি, আসিবে আবার।"

আমি চাহি পরকে আপন করিতে, আপনকে পরের য় দেখিতে। এই নীতির আশ্রয়ে যাহারা আপন ছিল, তাহারা একে একে পর হইয়া গেল; কিন্তু একজনকে আর ছাড়া গেল না—তিনি যেন আমার জীবন-গতির মর্ম্ম বুঝিয়া পর হইয়াই আপন-রূপে সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। পরকে আপন করার তপস্যার চেয়ে আপনাকে পর করার যে কি ব্যথা, কি কঠোর সাধনা, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে হয়তো বলিতে পারিতেন, আমি মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা অনুভব করিতেছি।

আমার লক্ষ্য বহুদূরপ্রসারী। গতিপথে প্রতিপদে নিজের সঙ্কীর্ণ সংস্কার ধ্বংস করিতে করিতে পথ চলিয়াছি; আর একজন আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞা হইয়াও, আমার পায়ের দাগের উপর পা বাড়াইয়া চলিয়াছেন অতিশয় আশঙ্কায়; কেননা, তিনি বুঝিয়াছিলেন পথের এ-দিক্ ও-দিক্ পা পড়িলেই তিনি সঙ্গহারা হইবেন। আমার জীবনের সঙ্গে আপনাকে সম্মিলিত করিয়া দেওয়ার সে করুণ আকৃতি ভাষায় ব্যক্ত হইবে না।

পৃথিবীতে সম্বন্ধ-তত্ত্বের মহিমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ আর কিছু নাই। গুরু-শিষ্য, পিতা-পুত্র, প্রভু-ভৃত্য, সখা-সুহৃদ্, পতি-পত্নী—এই সকল সম্বন্ধের মধ্যে ইতর-বিশেষ বিচার চলে না। সর্ব্বত্র সম্বন্ধের অমৃতই ঝরিয়া পড়ে। সম্বন্ধের নাম ও প্রকার-ভেদে এই অপার্থিব রসের তারতম্য হয় না। আমি সে যুগে পতি-পত্নীর সম্বন্ধের বাহিরে রস-প্রত্যাশী হওয়ায়, এইখানে কিছু অন্ধ দৃষ্টি ছিল। তাই দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝি নাই। অমৃত-প্রবাহ কত যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যখন এই পবিত্র দাম্পত্য-জীবনের অমৃতাস্বাদে নূতন দৃষ্টিলাভ করিলাম, সেইদিনই দেখিলাম, বিগ্রহের অন্তর্দ্ধান। কিন্তু হৃদয় আমার শূন্য নহে। আত্মা যে অবিনাশী, তার প্রমাণ আমি স্বয়ং পাইয়াছি। সম্বন্ধের অমর বন্ধন মরণ জয় করে। সে অনুভূতি প্রতিমা-বিসর্জ্জনের ভিতর দিয়াই উপলব্ধিগম্য হইয়াছে। কত

প্রশ্ন—দিবা রাত্রি তাঁর কণ্ঠে শুনিয়াছি; প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সুযোগ মিলে নাই, অথচ কথার বিরাম নাই, লেখার বিরাম নাই। অবকাশ নাই শুধু স্ত্রীর প্রশ্নোত্তর দিতে, তাঁকে দুই দণ্ড সঙ্গে রাখিতে। কেন এত বিমুখতা তাঁর প্রতি? অনেক পীড়াপীড়ির পর হয়তো উত্তর দিয়াছি—কৈ না, তোমার তো কোন অভাব নাই; ভালই আছ প্রভৃতি। বাহিরে অনাড়ম্বর ঔদাসীন্যময় এই আচরণ; অন্তরের আকর্ষণ কিন্তু কি এক অনৈসর্গিক বিধানে হিয়ার পশ্চাতে যে হিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহাতে অবিভাজ্য যুক্তির রসায়ণই লেপন করিতেছিল—নতুবা পরবর্ত্তী যুগের বৈপ্লবিক বিবর্ত্তনেও দুইটী হিয়া শাশ্বত যুগের জন্য এক হইয়া রহিল কেমন করিয়া? মরণের ব্যবধানেও যুক্তির আনন্দ হইতে কি হেতু বঞ্চিত হইলাম না? প্রেমই মানুষকে অমর করিয়া রাখে। রূপ নয়, আচার-ব্যবহার নয়।

শরীর অসুস্থ হইয়াছে, আমি তো খেয়াল করি নাই, ধর্ম্মপত্নী সে খবর রাখিয়াছেন। তাঁর চক্ষুর সঙ্কেত না পাইলে, নিজের অসুস্থতাও তো বুঝিতে পারি না। কি খাইলে কি হয়, কি করিলে সুস্থ থাকি, কেমনটী থাকিলে শান্তি ও আনন্দ লাভ করি, ভিন্ন দেহ হইয়াও সে নির্ভুল দৃষ্টি কেমন করিয়া তিনি লাভ করিয়াছিলেন? এ রহস্যের মর্ম্মভেদ কেমন করিয়া প্রকাশ করা যায়, জানি না। তবে একজন যে আর একজনের জীবন-ভার লঘু করিতে পারে, তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যে লঘু হয়, সে সত্যই ভাগ্যবান্। যে লঘু করে, সে যে কতখানি আপনহারা হয়, তাহা বুঝিয়াছি বলিয়াই ভরসা করিয়া বলিতে পারি যে, এমন না হইলে, একজন অন্যে অন্বিত হয় না; পরকে আপন করার অপার্থিব নীতি সে বুঝিতে পারে না; এবং এইরূপ যেখানে হয়, সেখানে যে অমৃতোৎস বিকশিত হয়, তাহা শুখায় না জীবন-মরণ কোন অবস্থায়। একের সঙ্গে অন্যের এই প্রেম, এই ঐক্য আমার জীবনে শুধু বাক্য নয়, বস্তুতন্ত্র সত্য।

আমায় যে কেহ মলিন বসনে, মলিন পরিচ্ছদে দেখে নাই, তাহার জন্য আমি দায়ী নহি। শুধু আমার বেশ-ভূষা নহে; আমার কণ্ঠাস্থি যে বাহির হইয়া পড়ে নাই, চক্ষের কোলে যে মসীচিহ্ন স্থান পায় নাই, শরীরের স্বাস্থ্য, মনের শান্তি কিছুর জন্য আমি দায়ী ছিলাম না; ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছি ইহাই, জানিতাম। ঈশ্বরে শক্তি যে বিগ্রহরূপে আমার সঙ্গে সঙ্গে—এ কথা কি সেদিন বুঝিতে পারিয়াছিলাম?

কর্ম্মক্লান্ত হইয়া যদি দেখিতাম গৃহদেবীকে—নয়নে সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়-প্রাণ স্নিগ্ধ হইত। আমার অনাদরে সোণার কমল বিন্দুমাত্র মলিন মূর্ত্তি ধরিত না; কো অলক্ষ্যে ঐক্যের নির্ঝর ঝরিত। নয়নে বিকশি দেখিতাম করুণার অলৌকিক জ্যোতিঃ। অধরে অনিন্দ্য হাসির তাপহীন বিদ্যুৎ। কণ্ঠে অমৃত-শীতল বাণী। আ কোমল করপল্লবে সর্ব্বাঙ্গে পরশ দিয়া তিনি স্বাস্থ্য আনন্দের মধু লেপন করিতেন। মনে হইত—আ বিজয়ী। দৃঢ় প্রত্যয় হইত—আমার মৃত্যু নাই, আমা পতন নাই।

কোথা হইতে এই জয়-বার্ত্তা আমার হৃদয় উদ্ব করিত! আজ নিঃসংশয়ে বলিব—জাতির গৃহে গৃ একনিষ্ঠ পতিপ্রেমের বৈজয়ন্তী সতীমূর্ত্তি বিরাজ করুক তবেই বিপত্নীক হইলেও, পুরুষ বুঝিবে—সে হৃদয়হারা নহে আর নারী বুঝিবে—বৈধব্য-মূর্ত্তি পতির দেহান্তরের চিহ্ন ধারণ মাত্র, অন্তর তার শূন্য নহে।

এই অপার্থিব পতি-পত্নীর সম্বন্ধই পুরুষ ও নারী বিজয়িনী শক্তি দিতে পারে! সম্বন্ধের এই অমৃত দিয়াছে নূতন জন্ম—সঙ্ঘের পুরুষ ও নারীকে। সঙ্ঘে ভিত্তিতলে এই মহাশক্তি অশরীরিণী হইয়াও চিরা হইয়া রহিয়াছেন।

কর্ম্ম তখন ভীম প্লাবনের ন্যায় জীবনে অবতর করিয়াছে। আমার কিছু দেখিবার ও ভাবিবার সম নাই। শুধু আমার নহে, আমাকে ঘিরিয়া যে স গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহারও সবখানি "তাবান মহিমার" ন্যায় তাঁহাতেই বিধৃত হইতেছিল, আজি তাহার ব্যত্যয় হয় নাই।

অতএব আমার জীবন-কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষে যে শক্তির অনুসরণ, তাহাই জীবনসঙ্গিনীর সত্য কাহিনী হিন্দু নারীর পতি যদি দেবতা হয়, তবে নারীর আব

স্বতন্ত্র জীবন-প্রবাহ কি প্রকারে সম্ভব হইবে? সে যে তাহার সমস্ত অস্তিত্বের উৎসর্গে তাহারই দেবতাকে গড়িয়া তুলিতেছে। দেবতার আয়ুঃই তাহার আয়ুঃ, তাই সতী চিরায়ুষ্মতী।

আমার ইচ্ছা হয়—সেই ইচ্ছার পূরণ হয় কেমন করিয়া, সে বিজ্ঞান সে দিন জানিতাম না। অহমিকার আড়ালে অনেক দুঃস্বপ্নই দেখিয়াছি। জীবনের নায়েগ্রা-প্রপাত কোন উৎস-মূলে সংযোজিত, তাহা জানিবার দিন সেদিন আসে নাই। ইচ্ছা হইল রাজবন্দীর মুক্তি। এই ইচ্ছা মনোবিলাস নহে, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-প্রসূত। সেই ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য প্রাণ উধাও হইয়া ছুটিল। হিতাহিত জ্ঞান নিষ্ফল।

বিপ্লব-যুগের সঙ্গীদের মুক্তি চাই। প্রতিবাদ আমার ধর্ম্ম নহে। মুক্তির ইচ্ছাই সম্বল। তাহার ধ্যান-মূর্ত্তি যতটা সম্ভব "প্রবর্ত্তকে"র পাতা চিত্র-বিচিত্র করিল। ইউরোপের সংগ্রাম শেষ হওয়া মাত্র মাননীয় কিংস্ বেঞ্চের বিচারপতি মিষ্টার রাউলেটের নেতৃত্বে মাননীয় স্যার বেসিস্কট্, মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর কুমার স্বামী, মাননীয় স্যার ভারনিলভেট্ ও বাংলার প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রধুরন্ধর প্রভাসচন্দ্র মিত্রের সহযোগে রাউলাট বিল পাশ হইয়া গেল। এই সময়ে ভারতসচিব মিষ্টার মণ্টেগু এই বিলের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—বিলটী সত্যই ভারতের অপ্রিয়জনক হইয়াছে; কিন্তু ইহা অরাজকতা ও বিপ্লবক আন্দোলন দমন ছাড়া অন্য কিছুর জন্য ব্যবহৃত হইবে না। এ কথায় ভারতবাসী কোনই সান্ত্বনা পায় নাই। ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর রাষ্ট্রপন্থিগণ এই বিল কার্য্যকরী হওয়ার পূর্ব্বে ও পরে তুমুল আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন। এই রাউলাট বিল অবলম্বন করিয়া মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতে নব-রাষ্ট্রযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। একদিকে রাউলাট বিলের আন্দোলন, অন্য দিকে মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড নূতন শাসনসংস্কারপ্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টায় ভারতের রাষ্ট্রপ্রাণ আলোড়িত হইয়া উঠিল। এই রাউলাট বিলের বিষয়-বিশ্লেষণ করিতে করিতে বাংলার রাজবন্দীদিগের মুক্তি-প্রসঙ্গ লইয়া "প্রবর্ত্তকে" বিস্তৃত আলোচনা সুরু করিলাম। "প্রবর্ত্তকে"র বাণী যেমন দেশনেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তেমনই রাজকর্তৃপক্ষদিগকেও বিচলিত করিয়াছিল। সে পরিচয় আমরা পরে পাইয়াছি।

কলিকাতার টাউন হলে রাউলাট বিলের প্রতিবাদে এক মহতী সভার আয়োজন হয়। এই সময়ে পরলোকগত মিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী রাজবন্দীদের মুক্তিকামনায় বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি এই সভাটীর অধিনায়কত্ব করেন। এই সভায় মিষ্টার বি, সি, চ্যাটার্জি রাউলাট বিলের প্রতিবাদ করিয়া তাৎকালীন একখানি পাক্ষিক "প্রবর্ত্তক" বাহির করিয়া আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করেন—"এই কাগজখানির নাম 'প্রবর্ত্তক'। বাংলায় এমন কাগজ আর একখানিও নাই। আমি ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।" তারপর ১৩২৫ সালের ১৫ই পৌষে 'আমাদের কথা' শীর্ষক প্রবন্ধটী তিনি আগাগোড়া পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী চিত্রার্পিতের ন্যায় প্রবন্ধটী শ্রবণ করেন। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে, তিনি বলেন, "আমার বিশ্বাস—দৃঢ়বিশ্বাস—এ লেখা আর কাহারও কলম দিয়া বাহির হয় নাই। এ লেখা—শ্রীঅরবিন্দের।" সংবাদপত্রে ইহার পর সভার বিবরণ এইভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল—"On the mention of Aurobinda's name there was loud and prolonged cheers which lasted for minutes together."

অর্থাৎ অরবিন্দের নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্র জনগণের কণ্ঠে উচ্চ আনন্দধ্বনি কয়েক মিনিটের জন্য শুনা গিয়াছিল। একজন পত্রপ্রেরক আমায় লিখিয়াছিলেন—সে হর্ষধ্বনি নয়, সহস্র সহস্র নবীন হৃদয়ের কৃতজ্ঞতাসূচক এক অস্ফুট মহাসঙ্গীত...। যেন কোন অশরীরী আত্মা সকলকে আনন্দ-স্পর্শে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সমস্ত লোক মুগ্ধ কর্ণে শুনিতেছিল "প্রবর্ত্তকে"র বাণী। রাজবন্দীদের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষায় সেদিন যে লেখাটুকু "প্রবর্ত্তকে" বাহির হইয়াছিল, তাহার এক অংশ এখানে উদ্ধৃত করিব:—

"দেশের সম্মুখে আজ বড় বড় কাজ আসিয়া পড়িয়াছে, সেগুলি করিতে কত হাজার হাজার দেশভক্তের যে প্রয়োজন, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না এবং দেশের উন্নতি ঘটিলে, রাজশক্তিরও যথেষ্ট সহায়তা করা হইবে।

এইজন্য অতঃপর যুবকগণ যাহা করিবেন, খুব সম্ভব তাহাতে প্রতিষ্ঠিত রাজবিধির সহিত কোনই সংঘর্ষ হইবে না। এই অবস্থায় আমরা আশা করি, দেশের হাওয়া বুঝিয়া গভর্ণমেণ্ট যদি সাধারণভাবে একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে দেশের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ পুঞ্জীভূত হইয়া বিদ্বেষ-প্রচার হইতেছে, তাহা অচিরে দূরীভূত হইয়া যাইবে।

যুদ্ধকাল এবং তাহার পর ছয় মাস এই ভারত-রক্ষা আইন প্রচলিত থাকিবে। এক্ষণে রাউলাট রিপোর্ট পড়িয়া আমরা বুঝিয়াছি যে, শীঘ্রই এই আইন অন্যভাবে চিরস্থায়ী করিয়া তোলা হইবে। গভর্ণমেণ্টের শাসন-পদ্ধতির বিরুদ্ধে আমরা কোন কথাই বলিব না। যে নীতি রাজা ও প্রজাবর্গ স্বীকার করিয়া লইবেন, তাহা সমগ্র দেশবাসীকেই মানিয়া চলিতে হইবে। রাউলাট রিপোর্ট অনুসারে নূতন আইন দেশ যদি গ্রাহ্য করিয়া লয়, সেই-ভাবেই দেশকে চলিতে হইবে। কিন্তু যে সকল উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য দেশের যুবকগণ পাশ্চাত্য মোহে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বিকৃত পথ অবলম্বন করিয়াছিল, সেই সকল উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিয়া তুলিতে আজ বৃটিশ জাতিও যখন নূতনভাবে কার্য্য করিতে উন্মুখ হইয়াছেন এবং এই আশায় ভারতবর্ষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন, তখন রাজনীতিক বন্দী ও অপরাধীদের ছাড়িয়া দিতে দোষ কি? তাহারা ফিরিয়া আসিয়া যখন নূতন কর্ম্মক্ষেত্র পাইবে, নূতন আশায় নূতন পথে চলিতে পাইবে, তখন হিন্দু চরিত্রের বিরোধী কর্ম্মে তাহারা আর আপনাদিগকে কখনই লিপ্ত করিবে না, এ কথা আমরা বড় জোর করিয়া বলিতে পারি।

এতখানি অনুগ্রহও যদি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট দেখাইতে কৃপণতা করেন, তাহা হইলে সমগ্র দেশকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য অন্যায়কারীকে প্রচলিত আইনে দণ্ড দেওয়া হউক। যাহারা নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হইবে, তাহারা তাহা হইলে মুক্তি পাইতে পারে। কিন্তু দেশের এই নূতন প্রভাতে যদি নূতন আইনই প্রবর্ত্তিত করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের মনে হয়, একবার সমস্ত রাজনীতিক বন্দী ও অপরাধীদের ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। সাধারণ চোর, ডাকাত, হত্যাকারীর মত ইহারা পশু-প্রকৃতির নহে। বিদ্যায়, চরিত্রে, বুদ্ধিমত্তায় ইহাদের অনেকেই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগরবাসী অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। তবে যদি কেহ কেহ তাহাদের পূর্ব্ব স্বভাবের পরিচয় দেয়, রাজশক্তি তো দুর্ব্বল নহে, শাসন-দণ্ড ত নিরস্ত থাকিবে না, শেষে না হয় গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।"

"প্রবর্ত্তকে"র এইরূপ প্রচার হওয়ার পর, মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার-প্রবর্ত্তনে জাতীয় নেতৃগণের সহিত বৃটিশ পার্লামেণ্টের যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহাতে "প্রবর্ত্তকে"র অভিমত স্থান পাইয়াছিল। এই টাউনহল-সভার পর দেশবরেণ্য সুরেন্দ্রনাথ "প্রবর্ত্তকে"র ফাইল আমার নিকট হইতে চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বাংলার রাজবন্দীদের মুক্তি এবং নূতন শাসনসংস্কার বিধি প্রবর্ত্তনে "প্রবর্ত্তকে"র এই নীরব সেবার কথা অখ্যাতই রহিয়া গিয়াছে। ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্টে ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব ভারতবর্ষকে রাজনীতিক অধিকার দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ১৯১৯ সালের আগষ্টে যুদ্ধজয়ী ইংরাজের নিকট হইতে ভারতের নেতৃবর্গ নূতন শাসনসংস্কারলাভের আশা করিতেছিলেন। অন্যদিকে তখন রাউলাট বিল লইয়া মহাত্মাজীর আন্দোলন সুরু হইয়া গিয়াছে। তাঁহার দিল্লী প্রবেশ গভর্ণমেণ্টের আইনে বন্ধ হওয়ায়, তিনি জাতির নিকট অগ্নিময়ী ভাষায় বিদায়-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছেন। পাঞ্জাবের জালিওয়ানাবাগের দুঃসংবাদে জাতির প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা রাজনীতিক কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে সংগঠনের প্রেরণায় নূতন কর্ম্মক্ষেত্ররচনার পূর্ব্বে দেখিতে চাহিয়াছিলাম বাংলার রাজবন্দীদের মুক্তি—এইজন্যই "প্রবর্ত্তকে" নানা রাষ্ট্রীয়-প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতে হইয়াছিল। বাংলার ধীরপন্থী নেতারা মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার যথেষ্ট বলিয়া হাত বাড়াইতেছিলেন। চরমপন্থীদের উষ্মা ইহাতে বাড়িয়াই উঠিতেছিল। এই রাজনীতিক মতবাদ-সংঘর্ষের আবর্ত্তে রাজবন্দীদের মুক্তি-প্রসঙ্গ সমুদ্যত করিয়া রাখার জন্য সে যুগে "প্রবর্ত্তক" সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইতে পারিয়াছিল। রাজবন্দী শচীন্দ্রের ("সদার") করুণ আত্মহত্যার কাহিনী প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে "প্রবর্ত্তক" নিঃশঙ্ক চিত্তে চাহিতেছিল সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতসম্রাট্ ঘোষণা করিলেন 'রয়েল ক্লেমেন্সি'। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিলেন "...My Royal clemency to political offenders in the fullest measure which in his (Viceroy's) judgment may be compatible with public safety—" ইহার পর আমরা সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলাম এবং একে একে আমার পুরাতন বিপ্লবপন্থী বন্ধুগণ যুদ্ধে যাইতে লাগিলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া—"প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ" সংগঠনকল্পে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে অবহিত চিত্তে অগ্রসর হইল।

(ক্রমশঃ)
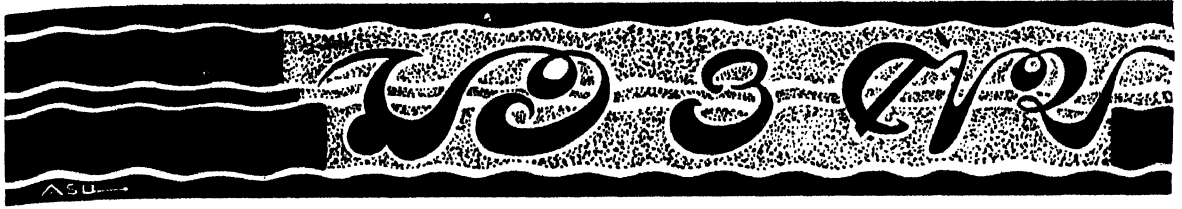
## মাধ্যমিক শিক্ষা-বিলের উদ্দেশ্য

এই বিলকে কোনও কোনও সাময়িক পত্রে শিক্ষা-সংস্কার বিলের পরিবর্ত্তে শিক্ষা-সংহার বিল বলা হইয়াছে। সাধারণভাবে শিক্ষা-সংহারের সঙ্গে যদি কেহ উহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্যুবাণ বলিয়া অভিহিত করিতেন, তাহা হইলেও আমরা হয়ত বিস্মিত হইতাম না।

যে মন্ত্রিমণ্ডলী এই বিলের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষ হইতে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব দীর্ঘ প্রস্তাবনায় বলিয়াছেন যে, স্যাডলার কমিশন এই প্রকার শিক্ষানিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্য যে, স্যাডলার কমিশন শিক্ষার প্রসার ও উন্নতিকল্পে যে নিয়ন্ত্রণ-নীতির আভাস দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শিক্ষার উপর গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব-প্রতিষ্ঠার কোন ইঙ্গিতই থাকে নাই। ঐ কমিশনে একটী স্বাধীন নিয়ন্ত্রণমণ্ডলী গঠন করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কাজেই স্যাডলার কমিশনের অভিমতকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্য লইয়া বর্ত্তমান বিলের পরিকল্পনা হয় নাই। হক-মন্ত্রিমণ্ডল যে বিলের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সমস্ত দেশবাসীর স্বার্থ লক্ষ্যে রাখিয়া স্যাডলার কমিশনের অভিমতকে রূপ দেওয়ার শুভ চেষ্টা থাকিলে, তাহার আদ্যোপান্ত নীতি ও ধারা অন্যরূপে গঠিত হইত।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, মন্ত্রিমণ্ডলের উদ্দেশ্য সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থদুষ্ট নহে, পরন্তু সত্য সত্যই অনিয়ন্ত্রিত, লক্ষ্যহীন মাধ্যমিক শিক্ষা-নীতিকে সুনিয়ন্ত্রিত, লক্ষ্যনিষ্ঠ করিয়া তোলাই তাঁহাদের যথার্থ অভিপ্রায়, তাহা হইলে তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্কুল-কমিটী আছে, তাহাকেই সুগঠিত বা পুনর্গঠিত করিয়া সে উদ্দেশ্য অনায়াসে সিদ্ধ করিতে পারিতেন। তাহাতে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়েরই ব্যবস্থাধীন রাখিয়া, দোষমুক্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত করা অসম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে, শিক্ষাবিভাগকে গভর্ণমেণ্টের হাতে তুলিয়া দিয়া জাতীয় মস্তিষ্ককে চির-শৃঙ্খলিত করিবার প্রয়োজন হইত না।

কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলের উদ্দেশ্য যদি হয় শিক্ষাতন্ত্রকে শাসন-শক্তির অধীন করিয়া এক শ্রেণীর দেশবাসীর দুর্গতিমোচন ও তাহাদের মধ্যে জাগ্রত সংহতির প্রতিষ্ঠা করা, সেখানে আমাদের বলিবার কিছু নাই। এ অধিকার তাঁহারা নিজ ভুজবলে না হউক, সাম্প্রদায়িক ভোটবলে অর্জ্জন করিয়াছেন; কাজেই সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা যদি বা সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে প্রয়োগ করেন, তাহাতে হিন্দু বা অন্য কাহারও ঈর্ষার কারণ নাই। আসলে, মুসলমানের প্রাণশক্তি আজ উদ্যত ও জাগ্রত, সুযোগ-সুবিধার আশ্রয়ে উহা যদি প্রকৃতই জাতির একাংশকেও সংযত ও সুগঠিত করিয়া তুলিতে পারে, তাহাতে চরমে আমাদের অকল্যাণ হইবে, ইহা না ভাবিতেও পারিতাম। অন্য দিকে তখন প্রশ্ন তুলিতাম, হিন্দু-প্রাণ আজ শুধু প্রতিক্রিয়ামূলক আন্দোলনেই ব্যয়িত হইলে তাহার ফলে আমরা কি অবশিষ্ট জাতিকেও সংগঠনের পথে অগ্রগামী করিয়া দিতে সমর্থ হইব?

## সাম্প্রদায়িকতার বিষমাত্রা

হক-মন্ত্রিমণ্ডল বিলের প্রকৃত প্রবর্ত্তনোদ্দেশ্য-সম্বন্ধে অকপট স্পষ্ট উক্তি না করিলেও, তাহার মধ্যে যে সাম্প্রদায়িকতার কিঞ্চিৎ রাসায়নিক মাত্রা আছে, তাহা ইউরোপীয়ান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে মিঃ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বিলটীকে সমর্থন করিতে গিয়াও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মিঃ রেজাউল করিম সাহেবও বলেন—"to any impartial reader, the Bill will appear to be a scheme for control over education with an over-dose of communalism in it" অর্থাৎ শিক্ষার উপর নিয়ন্ত্রণ-শক্তি প্রয়োগ করিতে গিয়া সাম্প্রদায়িক বিষ একটু নয়, একটু বেশী মাত্রাতেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কম হউক, বেশী হউক—বিষ বিষই, তাহা অমৃত নহে। কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলের সম্ভবতঃ মনোগত ধারণা—সমগ্র জাতি-দেহের না হউক, বাংলার মুসলমান-সমাজের শিক্ষাহীনতা রোগের প্রতিকারকল্পে এই তিক্ত বিষ-সেবনের প্রয়োজন আছে। করিম সাহেবের এইরূপ ধারণা নাই। বরং তিনি ঘোরতর আশঙ্কা পোষণ করেন—ইহাতে মুসলমান-সম্প্রদায়ের শিক্ষাহীনতার যথার্থ প্রতিকার হইবে না। তারস্বরে তিনি তাই প্রশ্ন তুলিয়াছেন, "But we ask in amazement, does the Bill of the Ministry advance the cause of the education of a back-ward community?" তাঁহার উত্তর—"More the control, less the education—that is the verdict of all renowned edu-

cationist of the world."—শিক্ষার উপর শাসন-কর্ত্তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে, যথার্থ শিক্ষা ক্ষুণ্ণ হইবে, ইহাই সর্ব্বত্র শিক্ষা-ধুরন্ধরগণের সিদ্ধান্ত। সুতরাং মুসলমানপ্রধান মন্ত্রিমণ্ডল যে উদ্দেশ্য লইয়া এই বিল প্রচলন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাই ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা আমরা করিতেছি। এই দিক্ দিয়াও বিলটী কি সত্যই মুসলমান-সম্প্রদায়েরই গ্রহণযোগ্য?

## ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের প্রশ্ন

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ এই মাধ্যমিক শিক্ষাবিল-সম্বন্ধে জনমত-সংগ্রহের প্রস্তাব সমর্থন করিতে গিয়া বলেন—যদি বিলটী অযৌক্তিক বলিয়া প্রত্যাহার করা না হয় এবং মন্ত্রিমণ্ডল উহা জোর করিয়া সকল সম্প্রদায়কে উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে চাহেন, তবে তাঁহারা হিন্দুদের স্বতন্ত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িবার অনুমতি গ্রহণ করুন। এই প্রস্তাব কার্য্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা দেখিলে আমরা আশান্বিত হইতাম। ইহা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। গত যুগে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়কে ইংরাজের নিয়ন্ত্রাধীন গোলামখানা বলিয়া পরিবর্জ্জন করিয়া, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবার প্রচেষ্টা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মিলিয়াও আমরা সুসিদ্ধ করিতে পারি নাই। হিন্দু নেতৃগণ যদি হিন্দুশক্তির অভ্যুত্থানে সত্য সত্য বিশ্বাসী হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে হিন্দু জাতিকে সংহত করিয়া দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠারই জন্য সর্ব্ব সামর্থ্য প্রয়োগ করিতে হইবে। নতুবা যদি অসাম্প্রদায়িক জাতি-গঠনই তাঁহাদের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে জাতীয়তার সেই নীতিকেই প্রবল ও জয়যুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে শাসনতন্ত্রে অধিকার বিস্তার করিয়া তদনুযায়ী শিক্ষানীতির প্রবর্ত্তনে উদ্যোগী হইতে হইবে। হিন্দু বাংলার প্রায় শতাব্দী ব্যাপী তপস্যার ফলস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়কে কোনরূপ বয়কট করিবার নীতি আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারি না। উহা আত্মহত্যার নামান্তর হইবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠন অথবা স্বতন্ত্র হিন্দু শিক্ষানীতির অনুসরণ বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়কে অধিকার করিয়াই কি সম্ভবপর করা যায় না? ইহার জন্য সংহত শক্তির আবশ্যক, কিন্তু তাহা বয়কট নীতি সুসিদ্ধ করিবার চেয়ে খুব বেশী আয়াস সাধ্য নহে।

## শিক্ষা ও রাষ্ট্রনীতি

দেশের শিক্ষানীতির উপর দেশের রাষ্ট্রনীতির কোন প্রাভবই থাকিবে না, ইহা আমাদের ধারণা নহে। রাষ্ট্রতন্ত্র ও শিক্ষাতন্ত্র পরস্পর সংশ্লিষ্ট। এক দিক্ দিয়া রাষ্ট্রশক্তি যেমন দেশের শিক্ষার ব্যবস্থা ও প্রসারে সহায়তা করিবে, তেমনি শিক্ষানীতিরও লক্ষ্য থাকিবে, প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড বিশুদ্ধ শক্তিমান্ করিয়া তোলা। রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষানীতি এইরূপ পরস্পর ভাবনাও পোষণ করিবে। প্রকৃত কার্য্যকরী শিক্ষানীতি তাহাই, যাহা এই উদ্দেশ্য সফল করে। নতুবা শিক্ষা শুধু মস্তিষ্কের উপর বোঝা চাপান, তাহা তরুণের জ্ঞান-শক্তিকে বিকশিত ও চরিত্রকে সংগঠিত করিয়া জাতিকে প্রবুদ্ধ করিবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি এই দিক্ দিয়া কতখানি সার্থক হইতেছে, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার ও উৎকর্ষবিধান এই কারণে কাহারও অনভিপ্রেত নহে। কিন্তু আমাদের দেশে বর্ত্তমানে যখন জাতীয় গভর্ণমেণ্ট বলিতে প্রকৃতপক্ষে কিছুই নাই, তখন রাষ্ট্রের হাতে সবখানি শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণ-ভার ছাড়িয়া দেওয়া শুভ হইবে না। বরং সেরূপ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র নিরপেক্ষমণ্ডলীর উপর শিক্ষানীতির নিয়ন্ত্রণ ভার অর্পণ করাই বিধেয়। আমরা এই কারণেই বর্ত্তমান অবস্থায় স্যাডলার কমিশনের নির্দ্দেশমত স্বতন্ত্র নিয়ন্তৃ-মণ্ডলীর গঠন-প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারি এবং প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রিমণ্ডলী যেহেতু জাতীয় গভর্ণমেণ্ট নহে, এই জন্য সমগ্র জাতির শিক্ষানীতির নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনে তাঁহারা অধিকারী নহে, তাহাও বলিব। পরন্তু বিশুদ্ধ রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভবের জন্যও এই কারণেই সতত প্রতীক্ষা করিব—নহিলে শুদ্ধ শিক্ষানীতির প্রবর্ত্তন সম্ভব হইবে না। অবশ্য রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করিবার প্রচেষ্টাও সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ও সাধনার উপর নির্ভর করে। ইহার জন্য জাতি-গঠনকারী শিক্ষা ও সাধনার একটা নীতি ও চেষ্টা দেশ-নেতৃদের বরণ করিতেই হইবে। এই নীতি ও চেষ্টা প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার চেয়ে সংগঠনমূলক হইলেই অধিকতর ফলপ্রদ হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু সে কথা স্বতন্ত্র আলোচ্য।

**রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতা**—পশ্চিম ভারত ফুটবল এসোসিএশন পরিচালিত বোম্বাই রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা সম্প্রতি শেষ হইয়াছে। আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার পরেই ফুটবল খেলায় ইহার স্থান। ইহাতে ভারতের বিভিন্ন স্থানের সৈনিক দল এবার যোগদান না করায় এই বৎসরের আই এফ এ শীল্ডের মত বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই, কিন্তু কলিকাতার দুইটী বিশিষ্ট দল মহামেডান স্পোর্টিং ও মোহনবাগান এই প্রতিযোগিতায় এই বৎসর যোগদান করায় ক্রীড়ামোদিগণ এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। মোহনবাগান ক্লাব ১৯২৩ সালে এই প্রতিযোগিতার শেষ খেলায় ডারহাম রেজিমেণ্টের নিকট ৪-১ গোলে পরাজিত হবার পর এইবার মাত্র ১৭ বৎসর পরে রোভার্স কাপে যোগদান করিল। এবারও তাহারা বোম্বাইএ কলিকাতার লীগ ও শীল্ডের খেলার মত তাহাদের সমর্থকদের নিরাশ করিয়াছে এবং নিজেদের সুনাম রক্ষা করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় রাউণ্ডে মোহনবাগান প্রথম খেলায় কৃতিত্বের সহিত ৫-১ গোলে জয়লাভ করিয়া তৃতীয় রাউণ্ডের খেলায় বোম্বাইএর হ্যার উড লীগের রানার্স আপ ওয়াই এম সি এর নিকট দুই দিন ড্র করিয়া তৃতীয় দিনে এক গোলে পরাজিত হইয়াছে। অন্যদিকে কলিকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন মহামেডান স্পোর্টিং দ্বিতীয় রাউণ্ডে ১ম খেলায় রয়াল এয়ার ফোর্সকে ৮-০ গোলে, তৃতীয় রাউণ্ডে হ্যাভি ব্যাটারীকে ৩-০ গোলে সেমি ফাইন্যালে হারউড লীগের চ্যাম্পিয়ন ওয়েলস রেজিমেণ্টকে ৩-০ গোলে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে ভূতপূর্ব্ব রোভার্স কাপ বিজয়ী বাঙ্গালোর মুস্লিম দলের সহিত খেলে। ফাইন্যাল খেলায় বাঙ্গালোর মুস্লিম দল উন্নততর ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেও তাহাদের মহামেডানের নিকট ১ গোলে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে। মহামেডান এই বৎসর প্রথম রোভার্স কাপ বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন করিল। ১৯৩৭ সালে মহামেডান স্পোর্টিং দল ফাইন্যালে বাঙ্গালোর মুস্লিম দলের নিকট এক গোলে পরাজিত হইয়াছিল। এবার মহামেডান তাহার প্রতিশোধ লইয়াছে। মহামেডান দল বোম্বাই হ্যারউড লীগ বিজয়ী ওয়েলচ রেজিমেণ্টকে সেমি ফাইন্যালে পরাজিত করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে কারণ ওয়েলচ রেজিমেণ্ট খুবই শক্তিশালী দল, এই দলে বিলাতের কয়েকজন নামজাদা পেশাদার খেলোয়াড়ও খেলিয়া থাকেন। মহামেডান এই রোভার্স কাপ বিজয়ী হওয়ায় বাঙ্গলার ফুটবলের সুনাম রক্ষিত হইয়াছে এবং সম্মান বৃদ্ধি হইয়াছে।

**জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতা ট্রেডস্ কাপ**—কলিকাতায় ফুটবল মরশুম শেষ হইয়াছে। আই এফ এ শীল্ড ছাড়া যে আর চারটী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবার তাহাতে আশানুরূপ প্রতিযোগী যোগ দেয় নাই। এই চারটী প্রতিযোগিতার মধ্যে ট্রেডস্ কাপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, আই এফ এ শীল্ডের পূর্ব্বে এই খেলা আরম্ভ হইয়াছে। ১৮৮৯ সালে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, আই এফ এ শীল্ডের খেলা আরম্ভ হয় ১৮৯৩ সালে। এই বৎসর মাত্র ২২টী দল এই ট্রেডস কাপে যোগদান করিয়াছে। এবার চতুর্থ বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ন রবার্ট হাডসন ফাইন্যালে দ্বিতীয় বিভাগের মেসারার্স দলকে পরাজিত করিয়া ট্রেডস কাপ বিজয়ী হইয়াছে।

**কুচবিহার কাপ**—কুচবিহার কাপেও এবার মাত্র ১৬টী দল যোগদান করিয়াছিল। এই প্রতিযোগিতাটীও ১৮৯৩ সাল থেকে আরম্ভ হইয়াছে। এবার স্পোর্টিং ইউনিয়ন দল ২-১ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করিয়া প্রথম বার এই কাপ বিজয়ী হইল। ইহার পূর্ব্বে স্পোর্টিং পাঁচ বার ফাইন্যাল খেলিয়া বিজয়ী হইতে পারে নাই। ৪৭ বৎসর এই খেলায় মোহনবাগান ১২ বার এই কাপ বিজয়ী হইয়াছে। এত অধিক কাল আর কেহ এই সম্মান লাভ করিবার গৌরব অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় নাই।

**ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতা**—যুদ্ধের জন্য সিমলায় গত বৎসর ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষগণ কিন্তু এবার এই খেলাটী দিল্লীতে খেলাইবেন স্থির করিয়াছেন। নবেম্বর মাসে এই প্রতি-যোগিতা হইবে।

# সাময়িকী

র্থ-কেন্দ্রে বর্দ্ধমান-মহারাজকুমার

জ্য-প্রতিষ্ঠাতার জন্মতিথি ও বর্দ্ধমানে জয়ন্তী উপলক্ষে বর্দ্ধমান রাজপরিবারের য পরিচয় হয়, তাহা পারস্পারিক ভাব- দিয়া ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতায় পরিণত

বর্দ্ধমান-মহারাজকুমার শ্রীঅভয়চাঁদ মহাতাব

হওয়ার ফলে ১২ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃ ৯টায় কনিষ্ঠ মহারাজ-কুমার শ্রীঅভয়চাঁদ মহাতাব্ মহোদয় গভীরভাবে সঙ্ঘের অর্থনৈতিক কর্ম্মধারার মর্ম্মাবধারণের জন্য বিভিন্ন অর্থ-নৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করেন।

প্রথমে প্রবর্ত্তক ভবনে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। তারপর কামারহাটি প্রবর্ত্তক জুট মিলে গমন করেন এবং ৯-২৫ হইতে ৯-৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নব-প্রতিষ্ঠিত মিলবাড়ী পরিদর্শন করেন। তথা হইতে ট্যাঙ্‌রা সঙ্ঘের দারুশিল্প-কারখানা ঘুরিয়া সাড়ে দশটায় ৫২।৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এবং হাফটোন বিভাগ পরিদর্শন করেন।

অতঃপর তিনি প্রবর্ত্তক ভবনস্থিত প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেডের অফিসসমূহ এবং প্রবর্ত্তক জুটমিল ও ব্যাঙ্কের আফিস দেখিয়া সামান্য জলযোগগ্রহণে সঙ্ঘ সভ্যদের আপ্যায়িত করেন। মাহারাজ কুমারের শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে কৌতুহল প্রচুর এবং জ্ঞানও তীক্ষ্ণ এবং প্রগাঢ়।

৺পণ্ডিত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব

গত ১৭ই ভাদ্র নবদ্বীপ স্মৃতি-সমিতি কর্ত্তৃক সুপণ্ডিত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের প্রথম স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। সংস্কৃত-সাহিত্যে ও জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের অবদানের নিকট বাঙালী ঋণী।

বর্ত্তমানের বহুবিধ সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর সম্যক চিন্তা ও জাতির প্রতি দরদ ও প্রীতি কুমারসাহেবের আলাপ-প্রসঙ্গে বেশ অনুভব করা গেল। তাঁর বিনয়-নম্র কথাবার্ত্তা ও অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হয়।

বেলা এগারটায় প্রবর্ত্তক ফার্নিসাসে সঙ্ঘের সভ্যগণ কুমারসাহেব শ্রীঅভয়চাঁদ মহাতাব্‌কে এক মানপত্র দ্বারা অভিনন্দিত করেন। উত্তরে কুমার সাহেব সঙ্ঘের এই নিষ্কাম কর্ম্মপ্রেরণার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বহুমুখী কর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া দেশ ও জাতির বেকার ও শিল্প-বাণিজ্য সমস্যা সমাধানের এই শুভ প্রচেষ্টার জয় কামনা করেন।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

পরিচালক ও প্রকাশক : শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ, প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

"দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে ."

সুতরসি! তরসে নমঃ।"

শিল্পী—শ্রীনরেন মল্লিক
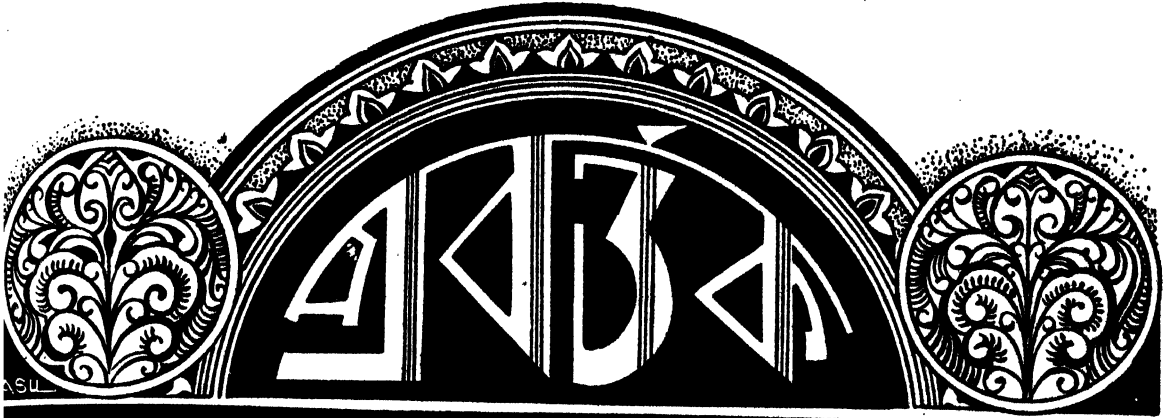
# রজত-জয়ন্তী

## প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের পূজাপার্ব্বণ

সঙ্ঘের প্রথম পর্ব্ব 'অক্ষয়তৃতীয়া'। পাঁজী দেখিয়া এই পর্ব্বানুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয় নাই। অক্ষয়তৃতীয়ার শুভদিনে সঙ্ঘ স্বতঃই স্বপ্রতিষ্ঠ হয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের অক্ষয়তৃতীয়া সঙ্ঘের ভিত্তিরচনার চির স্মৃতি হইয়া থাকিবে। অক্ষয়তৃতীয়া প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের পর্ব্বদিন। সত্যযুগের প্রথম যুগোৎপত্তি হয় এই অক্ষয়তৃতীয়ায়। ভারতের অহঙ্কৃত ক্ষাত্রবীর্য্য প্রশমিত করার জন্য এই অক্ষয়তৃতীয়াতেই মহামতি ভার্গব জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের আর্য্যসংস্কৃতি ধ্বংস করিতে মহারাজ বেণ উদ্যত হইলে, ব্রহ্মণ্যবীর্য্যে তাঁহার বিনাশসাধন হয়। তাহার পর নবযুগ-প্রবর্ত্তক পৃথু এই অক্ষয়তৃতীয়ায় লোকরক্ষা হেতু পৃথিবীর বুক চিরিয়া প্রথম শস্য উৎপাদন করেন হলমুখে। আবার এই অক্ষয়তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে মকর-বাহিনী ভাগীরথীর অবতরণ হয় ধূর্জ্জটীর শিরে। এইজন্য অক্ষয়তৃতীয়া হিন্দু ভারতের এক পুণ্য তিথি। জ্ঞান-বীর্য্য-প্রেম-সেবা ও সত্যপ্রতিষ্ঠার নব নব প্রচেষ্টা অক্ষয়তৃতীয়ায় ঘটিয়াছিল; সেই পুণ্যস্মৃতি রক্ষা করার জন্য হিন্দু ভারত আজিও প্রতি অক্ষয়তৃতীয়ায় বতীয় শুভকর্ম্ম সম্পাদন করে। সেবার অর্ঘ্য দিতে কলসী উৎসর্গের উৎসব এই অক্ষয়তৃতীয়ায় আজিও অনুষ্ঠিত হয়। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের জীবনচ্ছন্দে এই তিথি স্বরূপে জাতির অতীত স্মৃতি জাগ্রত করে। এই মহোৎসব বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়া হইতে বৌদ্ধ পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ দিন ধরিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ লোকসমাগমে কেন্দ্র সঙ্ঘের শ্রীমন্দির তীর্থশ্রী ধারণ করে।

তারপর ৬ই আষাঢ়। প্রবৃটের ঘনিমায় কোন এক অখ্যাত পল্লীতে যে নারী জন্মগ্রহণ করিয়া অসাধারণ ত্যাগ ও তপস্যার প্রভাবে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছেন, এই দিনে সেই মহীয়সী সঙ্ঘজননীর জন্মোৎসব সঙ্ঘমন্দিরে হইয়া থাকে।

তারপর ভারতের কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্যের ফুৎকারে যে মহামানব জাতিগঠনের নূতন মন্ত্র প্রদান করেন, সেই যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যপ্রেরণাবধারণের জন্য কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীতে সঙ্ঘসভ্যদের মহানিশাধ্যান এক অভিনব নীরব উৎসব। ইহার পর মহালয়া। মহালয়া অতীতের তর্পণ-পর্ব্ব। সুপ্রাচীন ভারতের পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিতে সঙ্ঘের আশ্রমে দলে দলে নারীপুরুষ এক হয়। অতীতের প্রতি এই পরম শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উৎসব সঙ্ঘের বিগতাত্মাদের আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করে। এই তিথিতেই 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ' জাতীয় আত্মার জাগরণকল্পে সুদূর ও অদূর অতীতের পূজা দিয়া মহাশক্তির আবাহন-মন্ত্র উচ্চারণ করে। মহালয়ার পর্ব্ব-সমাপ্তির শুক্লা প্রতিপদ হইতে ষষ্ঠীর বোধনমন্ত্র উচ্চারণকাল পর্য্যন্ত সঙ্ঘের মন্দিরে মন্দিরে সপ্তসতী চণ্ডীপাঠে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়। মহাপূজা হিন্দু বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ এই উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করে। সন্ধ্যার জ্যোৎস্নাবিধৌত দীক্ষাতীর্থে পুণ্য বিল্ববৃক্ষতলে

মহাষষ্ঠীর দিন শত নরনারী দেবীর আগমনপ্রার্থনায় দীপবলী দান করে। সম্মুখে পবিত্র জাহ্নবীর সফেণ তরঙ্গ-লীলা, পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ দেবমন্দির। বামে সঙ্ঘজননীর গগনচুম্বী স্মৃতি-মন্দির। দক্ষিণে নবপল্লবিত শ্রীতরুমূলে পবিত্র দীক্ষাতীর্থ। এই পুণ্যভূমিতে ষষ্ঠ্যাদি কল্পের অনুষ্ঠান শেষ করিয়া, বিল্বশাখা মাথায় বহিয়া অপরূপ শোভাযাত্রা ও বিটপিশাখায় দীপমালার শোভা মহাদেবীর আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করে। এই উৎসবের ইহাই প্রধান অঙ্গ।

সপ্তমীর পূজা, অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রি ও সন্ধিপূজার মহাহোম, নবমীর শক্তি-আরাধনা সঙ্ঘমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। পুষ্পে, পত্রে, ধূপধুনার গন্ধে মহাদুর্গার পূজা ও আরাধনা সঙ্ঘের জীবনে অভিনব উল্লাস সৃষ্টি করে। দশমীর বিসর্জ্জন, শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ, সন্ধ্যার ম্লান চন্দ্রালোকে মিষ্টান্নবিতরণ, প্রিয়সম্ভাষণ প্রভৃতি বিজয়ার উৎসব সশ্রদ্ধায় মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়।

অমল ধবল জ্যোৎসাস্নাত কোজাগর রাত্রিতে কমলার পূজা দিতে সঙ্ঘসভ্যদের সঙ্ঘমন্দিরে সমাবেশ হয়। আশীর্ব্বাদপূত নারীপুরুষেরা নবপ্রেরণালাভের পর সঙ্ঘের নব অভিযানে বাহির হয় এই দিন হইতে। এইরূপে মহাপূজার সমাপ্তি হয়।

২২শে অগ্রহায়ণ সঙ্ঘের মাতৃতিরোধান উৎসব। মাতৃমন্ত্র-জপের সহিত পূজা ও হোম, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সংযমে, উপবাসে পবিত্রচিত্ত হইয়া সঙ্ঘ সান্ধ্যসম্মিলনে মহাদেবীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে। তারপর সভামণ্ডপে সহস্র সহস্র নরনারীর সমাবেশ! ভাগবত প্রসঙ্গে, লীলা-কীর্ত্তনে পরিশেষে বিরাট্ হিন্দুসভার অনুষ্ঠান সপ্তাহকালব্যাপী মহাপর্ব্ব সমাপ্ত হইয়া থাকে।

২২শে পৌষ সঙ্ঘে যে উৎসবের আয়োজন হয়, তাহা সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের একটী সুষ্ঠু ব্যবস্থা। পৌষ উৎসবের পর ভারতীর পূজায় সঙ্ঘের বিদ্যামন্দিরগুলি মন্ত্রমুখরিত হয়। বালকবালিকাদের কলকণ্ঠে আশ্রমের বায়ুমণ্ডল মধুময় হইয়া উঠে। সঙ্ঘের জীবনে ভারতীয় সংস্কৃতির উৎসবচিহ্ন অনুলেপিত হইয়া সঙ্ঘশক্তি আত্মস্থ হয়।

ইহা ব্যতীত কালীপূজায় অন্ধকার রাত্রি আলোকিত করিয়া সঙ্ঘের ভবনে ভবনে দীপালী সজ্জা ও দোল-পূর্ণিমায় আবীরের তিলক ললাটে আঁকিয়া সঙ্ঘসম্মেলন—জাতীয় উৎসবের ছন্দঃ রক্ষা করে।

উৎসব জাতির প্রাণ। যে উৎসবে জাতি শক্তি অনুভব করে, আনন্দ অনুভব করে, তাহাই প্রকৃত উৎসব। কর্ম্মক্লান্ত চিত্ত উৎসবের প্রতীক্ষা করে—ক্লান্তি অপনোদন করিয়া নব রসে, নব ভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য। উৎসব এই হেতু জাতীয় জীবনের শক্তি জাগ্রত করার সুযোগ দান করে। সঙ্ঘের উৎসব জাতির ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হউক। সঙ্ঘের প্রতি কেন্দ্রে উৎসবের জয়বাদ্য উঠুক। উপাসনার মন্ত্রধ্বনির ন্যায় উৎসবের মধ্যেও যে প্রেম ও ঐক্য, তাহাই স্ফুরিত হউক—ইহাই আমার আকুতি।

জাতি শুধু বাঁচিবে না কর্ম্মের পথে দৃঢ়পণে চলিয়া। অর্থসাফল্য জাতিকে রক্ষা করিবে না। জাতির ভোগ ও অধিকার জাতিকে সঞ্জীবিত রাখিতে পারিবে না, জাতীয় উৎসবের প্রাণ যদি আমরা জাগাইয়া তুলিতে না পারি। উৎসবে আমরা আয়ুঃ পাই, উৎসাহ ও আনন্দ পাই। জাতীয় উৎসব চিরায়ুঃ না হইলে, জাতির প্রাণশক্তি হ্রাস পাইতেছে বুঝিতে হয়। জাতীয় উৎসবের মধ্যে যে অমৃতপ্রবাহ বহিয়া থাকে, তাহার সন্ধান করিতে না পারিলে উৎসব একটা প্রাণহীন প্রথারূপে পীড়ার কারণ হয় এবং ইহা বহুজনগৃহীত হইয়া দীর্ঘদিন অনুষ্ঠিত হইলেও, ইহার মধ্যে তরল ও লঘু বহু প্রকারের কদাচার প্রবেশ করে—উৎসবদেবতা কলঙ্কিত ও ধীরে ধীরে বিকৃত হয়।

জাতির উৎসব জাতীয় আত্মার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে নব নব মূর্ত্তি ধারণ করে। ভারতের জাতীয় উৎসবগুলির পরিবর্ত্তে নূতনের প্রবর্ত্তনপ্রয়াস কোনই কাজের হয় না। যাহা বহুদিন ধরিয়া বহুজনাদৃত উৎসবরূপে গণ্য, তাহার প্রতি ঔদাসীন্য জাতীয় প্রাণশক্তির হ্রাসের কারণ হয়। উৎসবদেবতাকে সঙ্ঘের জাগ্রত প্রাণশক্তির সহযোগে নূতন করিয়া জাতির সম্মুখে ধরিবার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে না। সঙ্ঘ নূতন কিছু করার অহমিকা রাখে না। প্রাচীনের সুচিন্তিত তপস্যার্জ্জিত উৎসবাঙ্গ রক্ষা করিয়া যে এই বিপুল জাতির জীবনে নূতন প্রাণস্রোতঃ বহিয়া আনিবে, এইরূপ আশা ও বিশ্বাস আমাদের আছে।

জাতি গড়ার কাজে যাহারা উদ্বুদ্ধ, জাতীয় উৎসবের অনুষ্ঠানে তাহাদের ঔদাসীন্য যেমন মারাত্মক, তদ্রূপ উৎসবদেবতাকে লইয়া অনাচারের প্রশ্রয়ে একটা হুজুগ সৃষ্টি করাও শ্রেয়ঃ নহে। উৎসবে আনন্দ আছে, উৎসাহ আছে। এই আনন্দ সাময়িক সুখ নহে। ইহা নিরবচ্ছিন্ন তৃপ্তির প্রবাহ। আর এই উৎসাহ ক্ষণিক উত্তেজনা নহে, অন্তরের অনির্ব্বাণ অগ্নিশিখা। উৎসবে জাতি যদি এই অমৃতের আস্বাদ না পায়, তবে তাহা উৎসবদেবতাকে আশ্রয় করিয়া ব্যষ্টি বা সমষ্টির স্বেচ্ছাচার ও এক প্রকার উঞ্ছ কামনাচরিতার্থতা ভিন্ন আর কিছু নহে। আমি জাতির অগ্রদূতদের ও প্রবর্ত্তক-কর্ম্মীদের বলিব—ভারতের উৎসব যেন আপাত সুখের উপলক্ষ্যস্বরূপ না হয়। গভীর চিন্তাশীলতার সহিত উৎসবের গুরুত্ব রক্ষা করিয়াই আমরা যেন ইহার মধ্য দিয়া অধিকতর প্রাণ সঞ্চয় করিতে পারি—লক্ষ্য আমাদের এইদিকে অবহিত হউক

# প্রশস্তি

সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়—অণু, পরমাণু, জীব প্রভৃতি যাবতায় ব্রহ্মাণ্ড এই তিন অবস্থার অধীন। আমি জন্মিয়াছি, আমি বাঁচিয়া আছি; আবার আমি মরিব। নিখিল সৃষ্টির পক্ষে এই একই বিধি। এই জন্য সৃষ্টির জন্মাদি হইতে লয় কাল পর্য্যন্ত যে অবস্থা, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি।

আমাদের চক্ষের সম্মুখে আজ যে জগৎ উদ্ভাসিত তাহার জন্মকাল আমরা গণিয়া দিতে পারি। ইহার আয়ুষ্কালও আমাদের অনধিগম্য নহে। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই অবস্থাত্রয়ের জন্য আমরা তিনটী প্রতীকের কল্পনা করি। সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা; স্থিতিকালে বিষ্ণু; আর প্রলয়ে শিব।

প্রলয়ের পর কিছুই থাকে না; কিন্তু সৃষ্টিবীর্য্য বিনষ্ট হয় না—এইরূপ হইলে পুনঃ সৃষ্টি হইত কেমন করিয়া? এই সৃষ্টিবীর্য্যের আমরা নাম দিয়াছি মহামায়া। এই বীজ হইতে সৃজনের প্রথম অঙ্কুর প্রজাপতি ব্রহ্মা। এই সৃষ্টি-চৈতন্য স্বতঃই চিন্তা করিয়াছিল নিজের আদি কথা। অর্থাৎ তাহার উৎপত্তির মূল কোথায়? আত্মধ্যান তাই জীবচৈতন্যের স্বভাবধর্ম্ম। এই ধ্যানযোগেই আত্মস্ত-কালের জ্ঞানোন্মেষ হয়। সেই জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত হইলে, আমরা বুঝিতে পারি—এক অপার্থিব শক্তি এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার স্তুতিমন্ত্র হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হইলে, অন্তরের মণিকোটায় যে নাদ উঠে, তাহার অর্থ "আমি নহি, আমি নহি, আমি সেই ঈশ্বরী নহি—এরূপ হইলে সৃষ্টিবীর্য্য লইয়া আমার এই বন্ধনদশা হইত না।" এই উক্তি আত্মশক্তির, এই শক্তির উন্মেষে দেবদর্শন হয়। জীব মৃত্যুদেবতার দিকে চাহিয়া বলে "তুমিই তবে সর্ব্বেশ্বর", তিনিও বিস্মিত হইয়া উত্তর দেন, "আমার আছে শুধু বিনাশ-শক্তি, তাহাও স্বাধীন শক্তি নহে; একজনের অধীন আমি।" সর্ব্ব দেবতার নিকট হইতে এইরূপ একই প্রকার উক্তি শুনিয়া আত্মতত্ত্বের মীমাংসায় যখন নিরুপায় হই, তখনই অন্তরবীণায় আত্মাশক্তির মহিমস্তুতি ঝঙ্কার দিয়া উঠে। সকল প্রচেষ্টা শুব্ধ হইলে, করুণাময়ীর সাক্ষাৎকার মিলে। তিনি মূর্ত্তিমতী দেবীরূপে আবির্ভূতা হইয়া সাধককে বলেন "সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের আদি আমি। জন্ম, মৃত্যু, স্থিতি আমারই ছায়া।" এই মাতৃদর্শনের পরে দিব্য সৃষ্টির প্রেরণা জাগে—নূতন জগৎ তবেই গড়িয়া উঠে। এই মহাশক্তিই সৃষ্টিযুগে, স্থিতিযুগে, লয়যুগে, আমার সঙ্গে সঙ্গেই বিরাজ করেন। তিনি আর আমি এই সংজ্ঞা ধরিয়াই বিশ্বভুবন। চণ্ডীতে এই কথারই প্রতিধ্বনি পাই—

"যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তুয়সে তদা॥"

* * *

আমার আত্মাশক্তি, মূলা প্রকৃতি শিবের সাধ্যে ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় না, তাই পুনঃপুনঃ আমার জন্ম। আমি অমর অবিনশ্বর। আমার এই আত্মপ্রকৃতির শক্তিই আমার রূপ দেয়, আয়ুঃ দেয়। সে রূপের শেষ নাই—সে আয়ুর অবধি নাই। আমি মহাকালের বুকে তাথিয়া তাথিয়া নাচি নিত্যকাল। আমার শক্তি হইতেই উৎপন্ন হয় ত্রি-নাদ ত্রি-বিন্দু। বিন্দু গুণবৈচিত্র্য। সাত্বিক হইতে অপঞ্চীকৃত শব্দাদি জ্ঞান। রাজসিক হইতে অপঞ্চীকৃত শব্দাদি শক্তি; আর তামস হইতে অপঞ্চিকৃত আকাশাদি পঞ্চতত্ত্ব। এই অব্যক্ত ভগবতী-শক্তি—সূক্ষ্মা, নিরাকারা। ইনিই নিত্যবীজরূপা ত্রি-দেবতার পরমারাধ্যা মহামায়া। আর পঞ্চীকৃত স্থূলরূপী ত্রিবিধ নাদ হইতে ত্রিবিধ বিন্দুর এই যে সাকারা স্থূলা বিশ্বশক্তি, ইনিই শ্রীদুর্গা। ইহারই আরাধনা ও পূজার মন্ত্রে মাতৃভূমি আজ মুখরিত। পূজার বাদ্যে আত্মভোলা জীবের আত্মশক্তির এই উপাসনা ও পূজা বড় রহস্যময়—মহালীলার আনন্দঘন এই রসসৃষ্টি। জীব ত্রিদশাগ্রস্ত হইয়াও এই অমৃতে অভিষিক্ত হয় প্রতিক্ষণ। এইরূপ অসংখ্য ক্ষণের ঘনীভূত কালই পর্ব্বরূপে দেখা দেয় প্রতি বৎসর এমনই দিনে। দশভুজার মহাপর্ব্ব উপস্থিত। পূজার বাদ্য ঘোষণা করে দেবীর আগমন। জীব শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়া অনুভব করে—"আমি ব্রহ্ম—তুমি কালী"—আবার উল্টাইয়া বলে "তুমি ব্রহ্ম, আমি কালি"—দুইয়ে এক, একে দুই, শক্তি-সাধনার এই অপূর্ব্ব যুক্তি হিন্দু বাঙ্গালী বুঝিবে না কি?

# পূজার কাহিনী

শ্রীমতিলাল রায়

কলিকাতার ধূলিধূমাচ্ছন্ন দূষিত বাতাস শ্বাসে শ্বাসে গ্রহণ করিয়া শ্বাস-যন্ত্র ভারী হইয়া উঠিয়াছে; মস্তিষ্কের জড়তায় সমস্ত দেহ অবসন্ন। পূজার অবকাশে একটু ফাঁকে বাহির হইয়া স্বাস্থ্যলাভের আশায় সারা বর্ষ দিন গণিয়াছি। সেদিনও আকাশ ঘনাইয়া প্রকৃতির বিশ্রী ধূসর মূর্ত্তি বাদ্‌লার পুনরাগমনে শ্বাস রুদ্ধ করিয়াছিল। তিন দিন পরে ছাদের টবে শিউলি ও গোলাপের শাখায় শরতের স্বর্ণ-রৌদ্র চক্ষের তৃপ্তি দিল। মেঘমুক্ত আকাশ স্বচ্ছ নীল মূর্ত্তি ধরিল। কিন্তু সহরের সমুচ্চ হর্ম্ম্যরাজীর হিজিবিজিতে এমন উদার আকাশও অপরিচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয়। প্রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া উড়োজাহাজের বিকট কর্কশ শব্দে কাণে তালা ধরিয়া যায়। বাহিরে যাওয়ার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি গৃহিণীর নিকট উপনীত হইয়া বলিলাম "আর নয়, জিনিষপত্র আজই গুছাইয়া লও, কল্যকার সূর্য্যোদয় গিরিশিরে দেখিব; নয় অসীম নীলাম্বর বুকে জ্যোতির্ম্ময় স্বর্ণথালির শোভা নিরীক্ষণ করিব—প্রস্তুত হও।"

আমার উৎকণ্ঠিত আকুল চিত্তের এই উক্তি গৃহিণীর বুঝি কাণে প্রবেশ করিল না। তিনি সাড়া দিলেন না—কথার গুরুত্ব উপলব্ধি না করিয়া, এক প্রকার অনাসক্ত চিত্তেই বলিলেন "যাও, এখন আমার কাজ আছে।"

কাজের সন্ধান কিছুই পাইলাম না। "প্রবর্ত্তকের" মলাটে একখানা অদ্ভুত ধরণের ছবি বাহির হইয়াছিল—পাঁচটী কঙ্কালময় নরমুণ্ডের উপর রত্ন সিংহাসনে রক্তবসনা এক দেবী আসীনা; কণ্ঠে তাঁর নরমুণ্ডমালা, চতুর্ভুজা। দুই করে বেদ ও অক্ষমালা। অপর দুই করে বরাভয় মুদ্রা। শঙ্খভূষিতা, ত্রিনয়নী, আলুলায়িত কেশপাশ, শিরে জ্যোতির্ম্ময় মুকুট। এমন অপূর্ব্ব দেবীপ্রতিমা আর কোথাও দেখি নাই।

গৃহিণীর চক্ষের সঙ্গে আমিও মুগ্ধ দৃষ্টিতে ছবিখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম। মনে মনে প্রশ্ন উঠিল—কে তুমি মা? মরণ রঙ্গে স্থিরাসনা, বরাভয়দায়িনী কে তুমি? হিন্দুর মূর্ত্তি-কল্পনার ভাব-গাম্ভীর্য্যে মন আকৃষ্ট হইল। অলক্ষ্য অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রাচীনেরা ধ্যানের তুলি দিয়া যে সব প্রতিমা আঁকিয়া গিয়াছেন, পৌত্তলিকতার অপবাদে এই সকল অনিন্দ্য সৃষ্টি বিসর্জ্জন দিয়া আমরা ক্রমেই যেন লঘু হইয়া পড়িতেছি। চিত্তচমৎকারী প্রাকৃত দৃশ্য দেখিয়া কোথাও কোথাও বিমুগ্ধ ও বিভোর হইয়াছি বটে কিন্তু মানসপটে নানা ছন্দে এই যে দেব-দেবীর মূর্ত্তি, তাহা শুধুই চিত্তবিনোদন করে না, চিত্তের পশ্চাতে মহাতত্ত্ব জাগায়। অনিমেষ নয়নে চিত্রখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম; চাহিয়া চাহিয়া রূপের সীমা খুঁজিয়া পাইলাম না। নয়নকোণে অশ্রু উদ্গত হইল। হৃদয়ের গুরুভার লঘু হইয়া গেল। একটা মুক্ত নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

গৃহিণী বলিলেন "কি বলছিলে, প্রস্তুত হতে?"

কথা তবে কাণে গিয়াছিল—সদুত্তর পাইলাম। নিজেই বলিলেন "হাঁ, আজই আমি প্রস্তুত হব। তুমি যাত্রার ব্যবস্থা কর।"

রৌদ্র-ছায়ার ন্যায় গৃহিণীর চরিত্র চিরদিনই রহস্যময়। আমিও এতটা প্রস্তুত হইয়া আসি নাই। তবুও তাঁর মনের ভাবটা বুঝিবার জন্য বলিলাম "এবার কোন দিকে যাবে? পাহাড় না সমুদ্র?"

খুব গম্ভীর স্বরে তিনি বলিলেন "পাহাড়ও নয়, সমুদ্রও নয়, এবার যাব গ্রামে। নিজের বাড়ী।"

কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। গ্রামে! কালও খবর পাইয়াছি ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ম্যালেরিয়ায় অনেকের দফা শেষ হইয়াছে। এই বর্ষার শেষে পাট পচার দুর্গন্ধে ও মশার কামড়ে শেষে কি প্রাণ লইয়া টানাটানি হইবে? আমি কপাল কুঞ্চিত করিয়া বলিলাম "বল কি তুমি? এই দুর্দ্দিনে গাঁয়ে যাবে? আর আজই?"

"কেন, কোন আপত্তি আছে?"

"ঘোরতর আপত্তি। প্রথম আপত্তি—রাস্তাঘাটের এখনও কাদা শুখায় নাই। দ্বিতীয় আপত্তি—ঘর-বাড়ীর অবস্থাও ভাল নয়। সব চেয়ে বড় আপত্তি—এই বয়সে ম্যালেরিয়ার সঙ্গে সংগ্রামে রাজী নই।"

"এখনি টেলিগ্রাম করে' দাও—২৪ ঘণ্টার মধ্যে যেন বাড়ী-ঘর পরিষ্কার করা হয়।"

কথায় হুকুমের সুর—একটু থামিয়া বলিলেন "জল কাদা ঘেঁটে', ম্যালেরিয়ায় ভুগে' আজও যারা টিকে আছে, তাদের দৌলতেই আমাদের এত সুখ। তাদের সঙ্গে দুদিন সমান দুঃখ ভোগ করলে, ঘিয়ের কলসী উল্টে যাবে না। আমি প্রস্তুত, তুমি প্রস্তুত হও।"

যে কথা, সেই কাজ। আমার ওজর-আপত্তি তাঁর বিচারে টিকিল না;. যথাসময়ে শেয়ালদহ ষ্টেশনে দু'খানা রিজার্ভ-করা বার্থে দুইজনে শুইয়া পড়িলাম। বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য যদু আমাদের সঙ্গেই ছিল।

ভোরে গাড়ী থামল। তখনও তেমন রৌদ্র উঠে নাই। এইমাত্র সূর্য্য উঁকি-ঝুঁকি মারিতে সুরু করিয়াছেন। সম্মুখে গলা সোণা ও রূপার ঢেউ তুলিয়া সুবিস্তীর্ণ নদী-প্রবাহ। কূলে শ্যামশোভা—চক্ষু জুড়াইয়া গেল। শস্য-শ্যামলা, নদীমেখলা বঙ্গজননীর এই রূপ বহু দিন দেখি নাই। গৃহিণীকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হইল। তাঁর গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া কথা বাহির হইল না—মনে হইল মায়ের এই মূর্ত্তি যে দেখিল না, সে সত্যই বঞ্চিত হইল। পোড়া স্বাস্থ্যের দায়ে মায়ের কোলে না আসিয়া ইতস্ততঃ ছুটা-ছুটী মরণই আগাইয়া আনে। রূপ দেখিয়া চক্ষেরও তৃপ্তি, মনও আনন্দে মাতাল হইয়া উঠিল।

ষ্টীমার ছুটিল। জেলিয়ারা ছোট নৌকা বাহিয়া মৎস্য শীকারে বাহির হইয়াছে। ঘাটে উলঙ্গ শিশুর দল, কেহ লাফালাফি করিতেছে, কেহ বাজি রাখিয়া ছুট্ দিতেছে; কেহ বা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে। পল্লী-বধূরা অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া কলসী কাঁখে তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘোমটার ফাঁকে ষ্টীমারের দিকে তাহাদের সতৃষ্ণ দৃষ্টি যাত্রীদের মনে পল্লী-গৃহের স্মৃতি জাগায়। কৃষকেরা, শ্রমিকেরা ভাটিয়াল সুরে গান গাহিতে গাহিতে মেঠো পথ ধরিয়া চলিয়াছে। বনকুঞ্জে শালিকেরা ঝগড়া সুরু করিয়াছে। ঘুঘু মৃদুমধুর তালে গানের মহড়া দিতেছে। শরতের প্রভাতে বঙ্গশ্রীর অতুলনীয় মাধুর্য্যে চিত্ত বিগলিত হইল। দেখিতে দেখিতে গ্রামের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বিস্মিত হইয়া দেখিলাম—আমাদের আগমনবার্ত্তা ইহারই মধ্যে গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। এক বিপুল জনতা আমাদের অভিনন্দন জানাইতে ঘাটে উপনীত হইয়াছে। ফুলের মালায় আমরা বিভূষিত হইলাম। পল্লীপথের দুই ধারে সোৎসুক নরনারীর প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি আমাদের মুগ্ধ করিল। ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলিতেছে। আলের ধারে সোণা ফুলের গাঁদি লাগিয়াছে। রাধাচূড়ার ডালে ডালে পীত কুসুমস্তবক শিহরণ তুলিয়াছে। কত ফুল যে ফুটিয়াছে গৃহস্থের প্রাঙ্গণে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মাঠে কাদা। কিন্তু বালি-মাটির পথ শক্ত, মসৃণ, কর্দ্দমশূন্য। এইবার চক্ষে পড়িল আমাদের গ্রামের বাটী। সম্মুখে প্রশস্ত দীর্ঘিকায় কালো জল টল্ টল্ করিতেছে। মাঝে মাঝে কুমুদকহ্লারের অপরূপ শোভা; দূর হইতেই মধুপায়ী মক্ষিকার অস্ফুট গুঞ্জন কর্ণে প্রবেশ করিল। ঋতুপরিবর্ত্তনের জন্য বিদেশভ্রমণে যে সুখ ও তৃপ্তি, পল্লীমায়ের কোলে ফিরিয়া ততোধিক আনন্দ অনুভব করিলাম। সন্তান যেন আজ মায়ের শ্যামাঞ্চলতলে আশ্রয় লইল। সে আনন্দ ভাষায় প্রকাশ হয় না।

ফটক পার হইয়া দেখি—দু'পাশের পুষ্পোদ্যান পরিচর্য্যা-ভাবে বনভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সরকার-গমস্তা-পরিচারকবর্গের চেষ্টায় উহা যত দূর সম্ভব পরিষ্কার করা হইয়াছে বটে, কিন্তু চতুর্দ্দিকে আগাছার অবাধ আত্মপ্রকাশ চক্ষে পড়িল। সতেজ মানগাছগুলি সুবিশাল পত্র বিস্তার করিয়া কতক স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ষার জল পাইয়া কদলীর ঝাড় বিস্তীর্ণ ভূমি দখল করিয়া লইয়াছে। কচুবনে নীলপীত মসৃণ পত্রকুঞ্জ ভীড় করিয়া আনন্দে দোল খাইতেছে। অসংখ্য প্রকার বনবৃক্ষের পাশে দাঁড়াইয়া দাড়িম্বকুঞ্জের মনোরম শোভা নয়ন আকৃষ্ট করিল। রক্ত-নীল পীত পত্রাবরাণের ফাঁকে কাঁচা-পাকা দাড়িম্ব দোল খাইতেছে। গৃহিণীর দিকে একবার চাহিলাম; তাঁহার হর্ষোৎফুল্ল নয়নের দৃষ্টি দেখিয়া বুঝিলাম—পল্লীদেবীর সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে তাঁহার চিত্তও উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। বহুদিন পরে বসতবাটীতে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখে শূন্য দালান। খিলানগুলিতে ফাটল ধরিয়াছে। সদ্য পরিষ্কৃত উঠান হইতে ভিজা শ্যাওলার গন্ধ উঠিতেছে।

আমি নাকে রুমাল দিলাম। গৃহিণী দ্রুতচরণে দালানে গিয়া উঠিলেন। কয়েক বৎসর হইল—মহাপূজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উয়ে-খেকো শূন্য কাঠামোটীর দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া, তিনি ভূমিষ্ট প্রণাম করিলেন সমবেত জনগণের কণ্ঠে অস্ফুটস্বরে 'ধন্য, ধন্য' রব কেহ বলিল "এতদিন পরে গৃহলক্ষ্মী স্বগৃহে ফিরিলেন।" কেহ বলিল "আহা, যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।" প্রাচীন পুরোহিত মহাশয় "জয় হোক, জয় হোক" বলিয়া গৃহিণীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন "আবার প্রতিমা আনতে হবে মা! পুজার সময়ে যখন এসেছ, এবার পূজার ধূমে মরা গাঁ মাতিয়ে তোল মা!"

৩

মধ্যাহ্নভোজনে বসিয়াছি। গৃহিণী পাখা হাতে চিরদিনের স্থায় আজও আমার ভোজন ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে নজির দিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন "এই সব ক্ষেতের জিনিষ। এই যে চাউলের অন্ন, ইহা কাল আমাদের তার পাইয়া মণ্ডলগিন্নী সদ্য ঢেঁকিতে ছাঁটাই করিয়াছেন। আর এই ক্ষেতের সোণা-মুগ সরকার মশাইয়ের বিধবা ভগ্নী নিজের হাতে বাছিয়া ভাজিয়া দাল প্রস্তুত করিয়াছেন। গাছের কদলী, বার্ত্তাকু, ঝিঙ্গা, কচু, ঢ্যাঁড়স, কুমড়া যত সব শাকসব্জী কিছুই বাজারের নহে।" পুকুরের মাছ যেন ওৎ পাতিয়া ঝোলের ঝালের বাটীতে ডুবিয়া ছিল, গৃহিণী তাহা নিজের হাতে পাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন "টাট্‌কা রুয়ের মুড়ো, রেলের পচা মাছ নয়।" দেখিয়াই তৃপ্তি, খাইবে কে এত সামগ্রী! তাহার উপর দুধের বাটী। কাঁথার মত এক ইঞ্চি হরিদ্রাভ সর পড়িয়াছে। গ্রাম হইতে প্রাণ-স্রোতঃ সহরে ছুটিয়াছে; গ্রাম প্রাণশূন্য। কিন্তু খাদ্য-সামগ্রীর এখনও যে প্রাচুর্য্য আছে, তাহা সহরে লোকের মনে লোভের সঙ্গে ঈর্ষ্যাও জাগায়।

দ্বিতলের কক্ষে ঈষৎ রৌদ্র-তপ্ত এলোমেলো বড় স্বাস্থ্যপূর্ণ বাতাস বহিতেছিল। বিশ্রামের আবেশে চক্ষু মুদিয়া আসিতেছিল। গৃহিণী আসিয়া বসিলেন। মৎলব ছিল; পুরোহিৎ মহাশয়ের শরনিক্ষেপ ব্যর্থ হয় নাই। কথা শুনিয়া খাড়া হইয়া বসিলাম। বলিলাম "সত্যই পাগল করা দেশ। চারিদিকে সবুজের মেলা। সারা আকাশে নীলের ঘটা, বনে বনে ফুলের হাট বসে' গেছে, নানা খেয়াল মানুষকে পেয়ে বসবে—আশ্চর্য্য কি! কিন্তু বল কি তুমি? এখনও জলটুকু মুখে দাওনি? রাত পোহালে প্রতিপদ। টাকার শ্রাদ্ধ না হয় হ'ল; প্রতিমা পাবে কোথায়?"

গৃহিণী বলিলেন "তোমার হুকুমের অপেক্ষা; ঘটে-পটেও পূজা হয়, প্রতিমা নাই হ'ল; তুমি রাজী আছ তো?"

আমি জানি—গৃহিণীর ঝোঁক যে কাজে, সে কাজ আমাকে দিয়া সারিবেনই; কোনদিন তাহার অন্যথা হয় নাই, আজও হইবে না। তাকিয়ায় চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলাম। চক্ষু বুজিয়া বলিলাম "আমার রাজী আর গররাজী, তোমার ইচ্ছাই বলবতী। আমার ঠেস্ না দিলেও ক্ষতি কি? ঘটে-পটে পূজা হয়, কর।" তিনি কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন "ইচ্ছা হয়েছিল, মায়ের ইচ্ছাই মনে ছোঁয়া দিয়েছিল; তুমি রাজী নও, পূজা বন্ধ থাক।"

ওকি! চাহিয়া দেখিলাম—নয়নকোণে অশ্রু। সর্ব্বনাশ তো এইখানেই; এই এক ফোঁটা চক্ষের অশ্রু আমার প্রকাণ্ড হৃদয়-মরুভূমি ভিজাইয়া দেয় এক নিমেষে। আমি রাজী নয়? খুব রাজী। প্রকাশ্যে বলিলাম "তোমার ইচ্ছা যখন হয়েছে, ওটা আমার ইচ্ছাই ধরে' নাও না।" তারপর আদর করিয়া বলিলাম "ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা হলে, শিবের বাবারও সাধ্য নাই সে ইচ্ছা রোধ করে।"

গৃহিণী বলিলেন "জোর-জবরদস্তীর কাজ নয়, তুমি যে কাজে রাজী নও, সে কাজে কোন দিন দেখেছ?"

এই মধ্যাহ্নকালে এখনই ঝগড়া বাধিয়া যাইবে। সে কাজের ফিরিস্তি বাহির করিয়া লাভ নাই। আসল কথা, কোন সৎ কর্ম্মে স্ত্রীর অনুরাগ দেখিলে, স্বামীর সাধ্য থাকিলে সে কাজ কোন ক্রমে বাধে না। সর্ব্বক্ষেত্রেই এইরূপ হয়। তিনি এমন কার্য্য কোন দিন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, যে কার্য্য আমার অপ্রিয়। কিন্তু মন ছাঁদা

খুঁজে। এমন কাজও অনেক আছে, যাহা আমার ঔদাসীন্যে বাধা মানে নাই। মনের ধর্ম্ম মন করিল—কিন্তু সে কথা তুলিবার ইচ্ছা হইল না। পূজাটা কেমন হয়, দেখিবার কৌতূহল হইল। পল্লীর পূজা ঘটে পটে, অন্নভোগের ব্যবস্থায় ব্যয়ের পরিমাণ বেশী হইবে না। আমি নির্ভয় ও প্রশস্ত চিত্তে গৃহিণীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলাম "পূজায় ষোল আনা রাজী, নিমন্ত্রণটা আমাকেও করতে হবে, আপনার লোক বলে বাদ দিলে চলবে না।" গৃহিণী ভূমিষ্ঠ প্রণামের পর পায়ের ধূলি লইয়া সহাস্যে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রভাতেই দালান হইতে কুণ্ডলী পাকাইয়া ধূপ-ধুনার গন্ধে সারা বাড়ী আমোদিত হইল। আর ব্রাহ্মণ-যুগলের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি উঠিল "দেবি প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়" প্রভৃতি। দিনের পর দিন এই পরিত্যক্ত পুরাতন বাসভবন নূতনভাবে ও শক্তিতে নূতন মূর্ত্তি ধরিল। লোক-কোলাহলে পল্লীজীবনে শক্তিসঞ্চার হইল। বাড়ীর আব্‌হাওয়ায় পবিত্রতার অনুভূতি পাওয়া গেল। সর্ব্বাপেক্ষা অপরূপ ভাব গৃহিণীর চরিত্রে। তাঁহার রূপের পরিবর্ত্তন দেখিলাম। আচরণে নূতন ছন্দঃ অনুভব করিলাম। দেবী আসিতেছেন আমার ঐ ভবনের জীর্ণ দালানে, না আমার ধর্ম্মসঙ্গিনীর জীবনে? তাঁহার উৎফুল্ল নয়নে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ ঠিকরিয়া পড়িল। বদনে সঙ্কল্প দৃঢ়-কাঠিন্যে অপরূপ-শ্রী প্রকাশ করিল। আবেণীবদ্ধ কুন্তলপাশ রুক্ষ জটে পরিণত হইল। প্রতিপদ হইতে প্রতিদিন তাঁহার পরিবর্ত্তন দেখিতে লাগিলাম। ষষ্ঠীর প্রাতে মনে হইল—এ আর সে মানুষ নয়। জ্যোতির্ম্ময় রূপশ্রী—নয়ন ঝলসিয়া দিল। নয়নের বিদ্যুতে শরীর শিহরিয়া উঠিল। নারী ভাববিহ্বলা। কিন্তু ভাবের গরিমায় তাঁহার এই অভাবনীয় রূপান্তর অতর্কিতে আমার মনে বিস্ময়ের সহিত ভয়েরও সঞ্চার করিল। আমি অতি সন্তর্পণে তাঁহার এই পূজার প্রতীক্ষায় রহিলাম। ছেলেদের তার করিয়া জানাইলাম—এই পূজার সংবাদ।

৪

সপ্তমীর প্রভাতে পূজার দালানে গিয়া দেখিলাম—প্রতিমা নাই, কিন্তু একখানি পেষ্ট-বোর্ডের মধ্যস্থলে 'প্রবর্ত্তকের' সেই নরমুণ্ডমালিনী মাতৃমূর্ত্তি অতি যত্নে একটী কাষ্ঠের সিংহাসনে সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহারই সম্মুখে আম্রপল্লবশোভায় সিন্দুররঞ্জিত মঙ্গলঘট বসান হইয়াছে। একখানি রক্ত-চেলি-পরিবেষ্টিত নবপল্লব ইহারই পার্শ্বে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুরোহিত বলিলেন "ইনিই নবদুর্গা।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আপন মনেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন "শ্রীফলশাখা, মঙ্গল কদলীতরু, জয়ন্তী, দাড়িম্ব, সুফলদায়িনী চামুণ্ডা-রূপিণী মান, কালিকা দেবীর প্রতীকস্বরূপ কচু, শোক-রহিত অশোকশাখা, ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীরূপিণী এই ধান্য-গুচ্ছ, আর হরিদ্রাবৃক্ষ শ্রীদুর্গার অধিষ্ঠান—ইহাই নব পাত্রিকা। নবদুর্গার আগমনসংবাদ এই সকল বনস্পতি-কাণ্ডেই ঘোষিত হয়। নব পত্রিকার পূজাই দুর্গোৎসবের প্রধান অঙ্গ।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "চিত্রে ঐ যে মাতৃমূর্ত্তি, উহাই কি দেবীদুর্গার স্বরূপমূর্ত্তি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন "ঐটি মায়ের কীর্ত্তি। মা ঐরূপেই ভগবতীকে ডাকিয়া আনিতেছেন। আর এই যে সম্মুখে মঙ্গল-ঘট ইহাও মা স্বহস্তে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এইবার অনুমতি করুন—পূজা আরম্ভ করি।"

পূজা আরম্ভ হইল, ঢাক ঢোল নবহৎ বাজিল। মায়ের প্রসাদ-বিতরণে গৃহিণী অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি ধরিলেন। উদয়াস্ত তাঁর মুখে অন্ন-জল উঠিল না। কিছু বলারও সাহস কাহারও নাই। আমিও নীরবে তাঁহার উন্মাদিনী মূর্ত্তি দেখিলাম। কখনও তিনি হাস্যময়ী মহাভৈরবী। কখনও বা ক্রোধোদ্দীপ্তা চণ্ডিকা। আবার কখনও উন্মাদিনী মহাকালী। ষোড়শী মূর্ত্তির অতুলনীয় দীপ্তি কখনও তাঁহার চক্ষে অপরূপ ঝিলিক দিয়া উঠিতেছে। দালানে পূজা চলিয়াছে—আমার নয়নে নয়নে দেবীর আসিতেছে। পূজার নিমন্ত্রণে, ছেলেরা কেহ আসিল, কেহ আসিল না। মেয়েরা আসিয়া মাকে ঘিরিয়া রহিল। অষ্টমীর মধ্যাহ্নে হবির গন্ধে প্রাণ আকুল হইল। দালানে গিয়া দেখি—অষ্টনায়িকা লইয়া জীবন্ত প্রতিমা মহাহোমে বসিয়াছেন। আমার মেয়ে দুইটীও মায়ের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। আর পাড়ার ছয়টী কুমারী হোমকুণ্ড ঘিরিয়া বসিয়াছে। ঊর্দ্ধশিখা অগ্নিকুণ্ডে আহুতি পড়িতেছে

দুর্গামন্ত্রে। আর ব্রাহ্মণের কণ্ঠে উদাত্ত মন্ত্রধ্বনি। কতক স্পষ্ট, কতক অস্পষ্ট, "ওঁ চণ্ডিকে, চণ্ডিকে" বলিয়া হোমকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে তিনি নৃত্য করিতেছেন।

অষ্টমীর দিন কোথা দিয়া কেমন করিয়া গেল, বুঝিলাম না। সারাদিন, সারারাত্রি উৎসবের আনন্দে সকলেই উদ্বুদ্ধ। অর্দ্ধ রাত্রিতে দীপমালা উৎসর্গ করিয়া আবার হোমকুণ্ড জ্বলিল, উঁকি মারিয়া দেখিলাম—আলুলায়িত-কুন্তলা গৃহদেবী মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আহুতি প্রদান করিতেছেন। ভোর রাত্রিতে সন্ধিপূজার জয়ঢাক বাজিল, পুরোহিতের কণ্ঠে উদাত্তকণ্ঠে ধ্বনি উঠিল—

কৃশোদরী দীর্ঘদংষ্ট্রা অতিদীর্ঘাতিভীষণা।

লোলজিহ্বা নিম্নরক্ত-নয়নারাবভীষণা ॥

সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। নবমীর পূজা কি ভাবে সমাপ্ত হইল, তাহাও বুঝিলাম না। কালী, কালী, মহাকালী রবে সমস্ত পল্লী নিনাদিত হইল। বুঝি বলির রক্তে পূজা-প্রাঙ্গণ ভাসিয়া যাইতেছিল। ঢাক-ঢোলের ভীষণ বাদ্যের সহিত ব্রাহ্মণদিগের কণ্ঠে মন্ত্র উঠিতেছিল—

হর পাশং হর ক্লেশং হর শোকং হরাশুভম্।

হর রোগং হর ক্ষোভং হর দেবি হরপ্রিয়ে ॥

থাকিয়া থাকিয়া পূজার ধূমে সমস্ত বাড়ীটাই যেন দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল। ধূসর সন্ধ্যামূর্ত্তি চক্ষে ঘনাইয়া আসিল। গগন-পটে ভাসিয়া উঠিল অর্দ্ধাকৃতি চন্দ্র। ম্লান জ্যোৎস্নায় পল্লীশ্রী যেন রোরুদ্যমানা মনে হইল। সানাইয়ে বেসুরা রাগিণী প্রাণে মোচড় দিতে লাগিল। সেই যে প্রতিপদের প্রভাতে পূজার অনুজ্ঞা লইয়া গৃহিণী উৎসবে প্রমত্তা হইয়াছেন, তাহার পর এই কয়দিন তার সঙ্গে দেখা-শোনা হয় বটে, কিন্তু তাঁহার আচারে, ব্যবহারে ও চক্ষের দৃষ্টিতে আমার সহিত তাঁহার যে কোন পরিচয় আছে, তাহা বুঝা যায় না। এ কেমন পূজা কে জানে? অভিমানে বুক ফুলিয়া উঠিল—পূজা শেষ হইলে হয়।

আরতির কাঁসরঘণ্টা বাদ্যযন্ত্র মহারবে বাজিয়া উঠিল; আমি ধীরে ধীরে দালানে গিয়া দেখিলাম—পেষ্টবোর্ডে আঁকা কঙ্কাল শিবের উপর মুণ্ডমালিনী ভগবতীর নয়নে বিদ্যুতের ঝিলিক উঠিতেছে। আর সেই দৃষ্টির সহিত একদৃষ্টি হইয়া গৃহিণী নিস্পন্দা। ওষ্ঠপুট প্রস্তরের অপেক্ষা যেন কঠিন প্রতীত হইল। বুকটা কেমন মোচড় দিয়া উঠিল—নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। হৃদয়ে বৃশ্চিক-দংশন অনুভব করিলাম। মনে হইল—ঐ রাক্ষসী প্রতিমা আমার এই হৃদয়রত্নকে কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে। আরতি থামিল। সকলে ভূনত প্রণাম করিল। গৃহিণী তবুও নির্ব্বাক্, স্তব্ধ। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মায়ের উপর দেবীর ভর হইয়াছে, আহা ইনিই সাক্ষাৎ দেবী।" আমি সান্ত্বনা পাইলাম না। একান্ত নিরুপায় হইয়া সারারাত্রি উঠানে পদচারণ করিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁর উত্থান কামনা করিতেছি—কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়। যোগ-সমাধির কথা শুনিয়াছি; একি সেই সমাধি? সারারাত্রি অতিবাহিত হইল। কেহ তাঁহাকে উঠিতে বলিল না—আমিও না। দশমীর করুণ প্রভাতে উৎসবভবনে হঠাৎ ক্রন্দনের রোল উঠিল—উন্মাদের ন্যায় বিকট চীৎকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিসের কান্না?" পুরোহিতের কণ্ঠে মন্ত্রধ্বনি উচ্চগ্রামে শোনা গেল, "গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চণ্ডিকে।" বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজিল। আমার কি হইল? বিজয়ার জয়তিলক অন্তর্দ্ধানের মন্ত্রে বিধাতা আমার ললাটে চিরাঙ্কিত করিলেন। নির্ম্মাল্য-জলপূর্ণ আধারে দর্পণ বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমারও যে হৃদয়-প্রদীপ নিভিয়া গেল। ব্রাহ্মণ করতলবাদ্যে গাহিলেন "ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে" সব আর শুনিতে পাইলাম না; আমার হৃদয়-প্রতিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম "হে আমার জীবন-বনস্পতি, তুমি উঠ; তুমি কথা বল।"

নিস্পন্দ প্রাণহীন আমার গৃহদেবীর দেহবল্লরী আমার বুকে লুটাইয়া পড়িল। আশ্চর্য্য বিসর্জ্জনের বাদ্য তবুও থামে না। ব্রাহ্মণ দেবীঘট তুলিয়া উহার জলে পল্লব দ্বারা শান্তি-বারি সেচন করিয়া উদাত্ত কণ্ঠে বলিলেন "ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু।" কি আর করিব? আমার হাহাকার কে শুনিবে সে দিন? দুর্গোৎসবের মহাধূমে পল্লীপ্রাণের সে কি আনন্দ! আমার বিহ্বল অবস্থা দেখিয়া ভৃত্য যদুনাথ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে পটখানা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। কিছু বলা হইল না। যদু বলিল—ঐ রাক্ষসী মাকে গ্রাস করিল। জাগ্রত প্রতিমার বিসর্জ্জন হইয়া গেল।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেই মঙ্গল-ঘট—পশ্চাতে দ্বিভুজ এক মাতৃমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছি। কমলদল-সুখাসনে এ দেবী-মূর্ত্তির পূজা এই দ্বাদশ বর্ষকাল ধরিয়া চলিয়াছে! কি নিষ্ঠুর বিসর্জ্জনের রঙ্গে এই দেবীর প্রতিষ্ঠা কেহ আর স্মরণেও আনে না; শুধু আমিই নীরবে সেই পূজার অগ্নিস্মৃতি বুকে রাখিয়া তিলে তিলে পুড়িয়া মরি। আজও নবপত্রিকাপ্রবেশকালে "আগচ্ছ মদ্গৃহে দেবি" বলিয়া যখন মন্ত্রধ্বনি উঠে, আমি সেই নবপূজার যুগ-প্রভাতের কথা স্মরণ করিয়া আনন্দে, বিস্ময়ে ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি!

# পূজারী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

১

বামনডাঙ্গার ঠাকুরবাড়ী—

কবে কোন্ কালে কে এই ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠা করেছিল, আজ তার নাম পাওয়া যায় মন্দিরের গায়ে ক্ষোদিত সংস্কৃত ভাষায় লেখা শ্লোকটী দেখে'। এই ক্ষুদ্র গ্রামের যেমন কোন প্রাচীন কাহিনী নাই, মন্দিরেরও তেমনই নাই। অখ্যাত একটী গ্রাম, তেমনই অখ্যাত এই দেবমন্দির; থেকেও যেমন লাভ নাই, কোনদিন ধূলিসাৎ হ'লেও বুঝি তার জন্য কেউ দুঃখ করবে না।

তবু এ আছে, এবং সব হারিয়েও জাঁকজমকের ছলনাটাও করা হয়। বহুকালের পুরাতন কাঁসর-ঘণ্টা আজও বাজে, পুরোহিতের হাতের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায় এবং লোকে আজও মন্দিরে পূজা দিতে আসে—বিশেষ ক'রে গ্রামের মেয়েরা; তারা ভক্তি-শ্রদ্ধা আজও হারায় নি।

মন্দির এককালে যখন নূতন অবস্থায় ছিল, তখন নাকি এখানে প্রতি বৎসর মাসে মাসে বিরাট্ মেলা বসত, কত দেশ-দেশান্তর হ'তে যাত্রীদল এসে দিন পনেরো এখানে থেকে যেত। এই মন্দিরের রঙ তখনও কালো হয়ে যায় নি; দেয়াল ফেটে তার মধ্য দিয়ে বট, অশ্বত্থ গাছ সহস্র বাহু বিস্তার করে নি। মস্ত বড় উঠানটায় প্রতি বৎসর যাত্রা, কথকতা হ'ত, ওধারের অতিথিশালায় যাত্রীরা স্বচ্ছন্দে থাকতে পারত।

আজ সে উঠান জঙ্গলে ভরে' উঠেছে।

পূজারী বিশ্বনাথ বা বিশু ঠাকুর—

সে একা আর কত পারে? তবু সে সেই জঙ্গল নিজের হাতে কেটে পরিষ্কার করে, মন্দিরে রীতিমত পূজারতি করে। দ্বাদশ মন্দিরের দ্বাদশ শিবও বাদ যান না। তারই সেবা-যত্নে মন্দির আজও টি'কে আছে, সে আছে বলেই দেবতা পূজা পান, নচেৎ এতদিন ধূলার জিনিষ ধূলাতেই মিশিয়ে যেত।



বিশু ঠাকুর একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা করে।

তার মামা ছিলেন পূজারী, পরম্পরায় মামার বংশই পূজা করে' এসেছে। তিনি নিঃসন্তান থাকায় ভাগ্নে বিশুকে যশোর জেলার চাঁচুড়িয়া গ্রাম হ'তে এনে নিজের কাছে রাখেন এবং মরবার সময়ে তাকে দিয়ে গেছেন শূন্যগর্ভ একটা রঙচটা টিনের বাক্স, কয়েকখানা বাসন ও দুই একটা ঠুনকো জিনিষ সহ ভাঙ্গা ঘরখানা, আর দিয়ে গেছেন এই মন্দিরের পূজারীর ভার।

বিশু ঠাকুর তাতেই খুশী।

মন্দির তার নিজের, দেবতা তার আপনার—বিশু ঠাকুর এই আনন্দেই আত্মহারা। ঠাকুরবাড়ীর যদিও একজন মালিক আছেন, তাঁর সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নাই; তিনি কলকাতাতেই থাকেন, গ্রামের সামান্য দু' চার জন লোক হয় তো তাঁকে চেনে। জমিদার হ'লেও, দেশের জমি-জমার সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্বন্ধ নেই। তবু হয় তো পিতৃপুরুষের ঠাকুর বলে'ই পূজার জন্য তিনি মাসিক বৃত্তিটা বন্ধ করেন নাই; প্রতি মাসে মাসিক পাঁচ টাকা ক'রে মন্দিরের দেবতার নামে মণি-অর্ডারযোগে টাকা আসে।

লোকে বলে বিশু ঠাকুর যে দুই বৎসর পূজার ভার নিয়েছে, এই দুই বৎসরে মন্দিরের চেহারা নাকি অনেক ফিরেছে। বিশু ঠাকুর নিজের মনের মত করে' ঠাকুর সাজায়, মন্দিরে সে নিজের হাতে মেরামত করে' চূণ দেয়, —তাতে মনে হয় মন্দির যেন দাঁত বার করে' হাসছে। লোকেও সঙ্গে সঙ্গে হাসে, বলে পাগলের পাগলামী; কিন্তু সে সব কথায় বিশু ঠাকুর কাণ দেয় না, সে নিজের খেয়ালেই থাকে।

বিশু ঠাকুর ঠাকুরকে ভাত রেঁধে নিজের হাতে খাওয়ায়, গান গেয়ে শুনায়, ঘুম পাড়ায়! ঠাকুর যেন ছোট্ট শিশু, একে নিয়ে খেলা করে' বিশু ঠাকুরের দিন কাটে।

২

এবারে কি শুভমতি হয়েছে—জমিদার ভূপেন্দ্র মিত্র কন্যা সহ গ্রামে আসছেন।

ভূপেন মিত্র নিজে ব্যারিষ্টার এবং এতে তিনি বেশ যশঃ ও অর্থ উপার্জ্জন করে' থাকেন। তিন বৎসর আগে একবার তিনি একদিনের জন্য মাত্র গ্রামে এসেছিলেন, এর মধ্যে তিনি আর আসেন নাই; সেজন্য বিশু ঠাকুর তাঁকে দেখে নাই, কেবল নামই শুনেছে।

কন্যা গায়ত্রী অতি আধুনিক মেয়ে। দুই বৎসর আগে যখন সে বি-এ পড়ে, তখন তার বিবাহ হয়েছিল এবং বিবাহের ছয় সাত মাস পরেই সে বিধবা হয়েছে। গত বৎসর বি-এ পাস করে' বর্ত্তমানে সে এম্-এ পড়ছে। পিতার সঙ্গে সে কয়েক বৎসর আগে একবার বিলেত ঘুরে'ও এসেছে। কাজেই ইংরেজী চালে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

জীবনে কোনদিনই সে বাংলার কোন পল্লীতে আসে নাই, এই প্রথম সে পিতার সঙ্গে আসছে। শোনা যায় পাঁচ-সাতদিন থাকবে।

বলা বাহুল্য, ম্যানেজার হ'তে আরম্ভ করে' সামান্য পাইক পেয়াদা পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

জমিদার বাড়ীতে পর্য্যাপ্ত চুণ-বালি এসে পড়ল, যথেষ্ট জন-মজুর এসে লাগল এবং অতি দ্রুতভাবে ভাঙ্গা-চোরা মেরামত ও চুণ-বালির কাজ সুরু হ'ল। গ্রামে ভীষণ হৈ হৈ পড়ে' গেল—জমিদারবাবু তাঁর কন্যা সহ এত কাল পরে দেশে ফিরছেন।

ছোট গ্রাম হ'লেও, লোকসংখ্যা নেহাৎ কম নয়, এবং আশপাশের গ্রামগুলির লোকসংখ্যা ধরলে অনেক বেশীই হবে।

পথের ধারে যে সব গাছগুলো এতদিন নির্ব্বিবাদে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে' দাঁড়িয়েছিল, সে সব কাটা হ'ল। ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করা হ'তে লাগল। এক কথায় বলতে গেলে দু' চারদিনের মধ্যে গ্রামখানা যেন কতকটা মার্জ্জিত হয়ে উঠ্ল।

জমীদার বাড়ীর খানিকটা দূরে অমার্জ্জিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল শুধু জমীদারেরই কোন পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির, তার দিকে কেউই দৃষ্টিপাত করলে না—তার জঙ্গল পরিষ্কার হ'ল না, মন্দির মেরামতও হ'ল না। ম্যানেজার নরহরিবাবু জানতেন—জমীদার ও তাঁর মেয়ে দু'জনেই বিলাত-ফেরত, এঁরা সম্পূর্ণরূপে বিদেশী চালচলনে অভ্যস্ত, ঠাকুরবাড়ীর জন্য যে কোন কৈফিয়ৎ তলব করবেন না—সে জানা কথা।

কাজেই ঠাকুরবাড়ীর কোন ব্যবস্থা হ'ল না।

বিশু ঠাকুর শুনলে ঠাকুরবাড়ীর মালিক আসছেন—সেজন্য তাকে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হ'তে দেখা যায়নি। তবু যখন চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'তে দেখলে, তখন ঠাকুর-বাড়ীর পানে তাকিয়ে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল—সব পরিষ্কার হ'ল, তার ঠাকুরবাড়ীই শুধু অপরিষ্কার থেকে গেল!

পথে নরহরিবাবুর সঙ্গে দেখা হ'তে সে সবিনয়ে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে বললে, "ঠাকুরবাড়ীটা একটু মেরামত করে' যদি চুণকামটা করিয়ে দিতেন, তাতে এমন কিছু বেশী খরচ হ'ত না, অথচ দেখতে ভাল দেখাত। ওঁরা যদি এসে ঠাকুরবাড়ী দেখতে চান—"

নরহরি বাধা দিলেন, "আরে, তুমি ক্ষেপেছে বিশু ঠাকুর, ওঁরা যাবেন ঠাকুরবাড়ীতে তোমার ওই নৃসিংহ ঠাকুর দেখতে? শোননি—ওঁরা সাহেব মানুষ, ঠাকুর-টাকুর দেখেনও না, পছন্দও করেন না।"

বিশু ঠাকুর খানিক বিস্ফারিত চোখে তাঁর পানে চেয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে ফিরল—

নরহরি ডাকলেন, "শোন, আর একটা কথা তোমায় আগে হ'তেই বলে' রাখি। এই ত জমীদারের বাড়ী, ধরতে গেলে সামনেই মন্দির; ওঁরা যে ক'দিন থাকবেন, যেন মন্দিরে হৈ-হৈ করো না বাপু, তোমার ঘণ্টা-কাঁসরের শব্দ আর ঠাকুরকে গান শোনানোটা সে ক'দিন বন্ধ রেখো। ওঁরা সাহেব মানুষ, কয়টা দিনের জন্যে আসছেন, কাণের কাছে ওই চেঁচামেচি আর বাজনা শুনে' চটে' যাবেন; হয় তো মাসে যে টাকাটা পুজোর জন্যে দেন, তাও বন্ধ করবেন।"

চটে উঠে বিশু ঠাকুর বললে, "দেন দেবেন, ভারি তো পাঁচটা টাকা, না দিলেও ঠাকুরের সেবার বিঘ্ন হবে না, আমি ভিক্ষে করে' এনে ঠাকুরের পুজো করব। বামুনের

ছেলে, ভিক্ষে চাইতে আমার এতটুকু বাধবে না, আপনারাও না দিয়ে পারবেন না। তাই বলে ওঁদের মন রাখবার জন্যে আমি পূজোর সময়ে শাঁখ-ঘণ্টা বাজাব না, গান গাইব না, এ হ'তে পারবে না, তার জন্যে যাই হোক।"

অত্যন্ত রাগ করে'ই সে চলে' গেল।

মাথাপাগলা লোক—তাকে নিয়েই হ'ল নরহরির ভাবনা। কিন্তু ঠাকুরকে চিনতে গ্রামের লোকের কারও বাকি নাই। হয় তো কোনদিন মন হবে—কীর্ত্তনীয়া দল এনে ফেলে মহাসমারোহে কীর্ত্তনপালা জুড়ে দেবে, নিজেও তাদের দলে যোগ দেবে। অন্য সময়ে সে যা করে করুক, কিন্তু জমীদার যে কাণের কাছে এই গোলমাল বরদাস্ত করবেন না—সে জানা কথা।

৩

ব্যাপারটা ঠিক ঘটলও তাই।

জমীদার ও তাঁর মেয়ে এসেছেন জেনেও বিশু ঠাকুর দমল না।

এই সময়ে একটা কীর্ত্তনীয়া দলও পাশের গ্রামে এসেছিল বারোয়ারীতলায়, বিশু ঠাকুর অনেক আগেই তাদের নিমন্ত্রণ করেছিল, তারাও ঠিক এই সময়ে এসে জুটল।

বিশু ঠাকুর নিজের ভাঙ্গা ঘরে তাদের জায়গা ঠিক করলে এবং দিনরাত সঙ্কীর্ত্তনের পালা সুরু হ'ল।

ভূপেন মিত্র অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন, গায়ত্রী হ'ল তার চেয়েও বেশী। কাণের কাছে অবিশ্রান্ত খোল-করতালের শব্দ, তার সঙ্গে মিলিত ভাবে কুড়ি-পঁচিশ জনের চীৎকারে টেঁকা দায়।

সঙ্গে এসেছিলেন গায়ত্রীর বন্ধুস্থানীয় মিঃ চৌধুরী,—অর্থাৎ অতুল চৌধুরী; লোকে বলে যাঁর সঙ্গে গায়ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের কথা চলছে এবং এতে পাত্র ও পাত্রী উভয়েরই সার্ব্বজনীন সম্মতি আছে।

মিঃ চৌধুরী উষ্ণভাবেই বললেন, "কাণের কাছে দিনরাত এ রকম ভাল লাগে না, এর যা হয় একটা প্রতিবিধান করা উচিত।"

ভূপেন মিত্র ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালেন—

নরহরি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন, তবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে?"

গায়ত্রী রুক্ষকণ্ঠে বললে, "যত রাজ্যের পাগল এনে জুটিয়েছেন, আমাদের যে অতিষ্ঠ করে' তুললে, এর যে কোন ব্যবস্থা করুন, নচেৎ আমাদের যে এ ব্যাপারে হাত দিতে হয়।"

মিঃ চৌধুরী বললেন, "ব্যাপার কি বলুন তো, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে। দিনরাত যদি এমনি করে' চীৎকার আর বাজনা শুনতে হয়, তা'হলে তো সত্যিই এখানে টেঁকা দুষ্কর হয়ে ওঠে।"

নরহরি শুধু মাথা চুলকালেন, বললেন, "আমি তাকে আপনার কাছে আসতে বলি, আমার কথা সে পাগলা কাণে নেয় না।"

গায়ত্রী বিদ্রূপ করলে, "এই ক্ষমতা নিয়ে আপনি জমীদারি চালান—সামান্য একজন পূজারী বামুন আপনার কথা শোনে না?"

নরহরি একটু হাসলেন, বললেন, "সেই রকমই বটে মা লক্ষ্মি—তবে সে পূজারী বামুনকে সামনে পেয়ে কথা বললে হয় তো আপনারও ধারণা ঘুচতে পারে, কারণ সত্যই সে সাধারণ হ'তে একেবারে পৃথক্। আমি তাকে এখনই এখানে আনবার ব্যবস্থা করছি।"

তিনি তখনই লোক পাঠালেন—বিশু ঠাকুরকে এখনই আসতে হবে।

তাকে পাগল বলে' উড়িয়ে দিতে চাইলেও, নরহরি শুধু নয়, গ্রামের প্রত্যেক লোকই শ্রদ্ধা করত—ভালবাসত। মরা ঠাকুর তার পূজায় প্রাণ পেয়েছেন, ভাঙ্গা মন্দির তার আগমনে জমজমাট হয়ে উঠেছে; সেই ভাঙ্গা মন্দিরেই চলে পূজার সমারোহ—ওঠে আনন্দ-কোলাহল।

শুধু এরই জন্য নয়, এই সুদর্শন ছেলেটী এর মধ্যে গ্রামের সকলের আপনার জন হয়ে দাঁড়িয়েছে—প্রত্যেকের প্রত্যেক কাজে তাই আগে তাকেই দরকার। শুধু উৎসবে নয়—রোগশয্যার পাশে সে বিনিদ্র বসে' থাকে, শ্মশানের সঙ্গী বিনা আপত্তিতে সে-ই হয়। মাত্র দুই

বৎসরের মধ্যে সে গ্রামের একান্ত আপনার জন হয়ে দাঁড়িয়েছে, আজ তাকে তাই বাদ দেওয়া চলে না।

যে লোক ডাকতে গিয়েছিল, সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে জমীদারের আদেশ জানালে।

বিশু ঠাকুর গম্ভীরভাবে কেবল বললে—"হুঁ"।

লোকটী ভেবেছিল সে নিশ্চয়ই আপত্তি তুলবে; কিন্তু সে আপত্তি করলে না, কীর্ত্তনীয়াদের সমভাবে গান চালাতে বলে' সে এগিয়ে পড়ল।

গায়ত্রী মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে কেবলমাত্র বেড়াবার অভিপ্রায়ে বার হচ্ছিল, এমনই সময়ে খবর মাত্র না দিয়ে বিশু ঠাকুর একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াল; নমস্কার করার বালাই তার ছিল না, স্পষ্টভাবেই জিজ্ঞাসা করলে, "আমাকে আপনারা ডেকেছেন?"

দীর্ঘাকার বিশু ঠাকুরকে হঠাৎ একেবারে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে গায়ত্রী থতমত খেয়ে গিয়েছিল; মিঃ চৌধুরীও প্রথমটা কথা না বলে' তীক্ষ্ণদৃষ্টি তার পরে বুলিয়ে নিলেন।

অনাবৃত দেহ, শুভ্র বুকের পর দিয়ে শুভ্র পৈতাগুচ্ছ লতিয়ে পড়েছে এবং সেই পৈতাগুচ্ছই তার পরিচয় দেয়, তার মুখের ভাব তার দৃঢ়তার পরিচয় দেয়, তার সাহসের পরিচয় দেয়।

বড় বড় দুইটী চোখের পানে চেয়ে গায়ত্রী একটা অস্ফুট শব্দ প্রকাশ করলে মাত্র।

কাউকে কোন কথা বলতে না দেখে' বিশু ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করলে—"আপনারা আমায় ডেকে-ছিলেন?" ঘর হ'তে ভূপেন মিত্র ডাকলেন, "ওরা ডাকে নি, ডেকেছি আমি—আপনি ঘরে আসুন—।"

সাধারণ একটী শীর্ণকায় খর্ব্বাকৃতি ব্রাহ্মণকে দেখার আশাই তিনি করেছিলেন,—বিশু ঠাকুর যখন সামনে দাঁড়াল, তিনি বিস্মিতভাবে তার পানে চাইলেন; অবহেলার সুরে তিনি কথা বলতে পারলেন না, সম্ভ্রমের সহিত বললেন, "বসুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে।"

বিশু ঠাকুর বললে, "আমার বসবার সময় এখন হবে না, কেবল ডাকছেন শুনে'ই আমি এসেছি।"

ভূপেন মিত্র একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "আমি বলছি—আপনি ওই যে দিনরাত গোলমাল, গানবাজনা চালিয়েছেন, অন্ততঃপক্ষে আমরা যে কয়দিন এখানে থাকি, বন্ধ করে' দিতে হবে।"

বিশু ঠাকুর কেবল গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লে, বললে, "না, এখন তা' হ'তে পারে না।"

গরম হয়ে ভূপেন মিত্র বললেন, "কেন হ'তে পারে না?"

বিশু ঠাকুর উত্তর দিলে, "হ'তে পারে না অনেক কারণে, সে সব কারণ আমি এখন আপনাকে বলতে পারি নে, এর পর বরং বলব। কেবল এই কথা বলবার জন্যেই ডেকেছিলেন তো—আপনার কথা শেষ হয়ে গেছে, আমি এখন যেতে পারি?"

ভূপেন মিত্র নিস্তব্ধে তার পানে চেয়ে রইলেন—বিশু ঠাকুর যেমন এসেছিল, তেমনি বার হয়ে গেল।

## ৪

ঠাকুরের মাথায় তুলসী চাপাতে চাপাতে বিশু ঠাকুর গুণ্-গুণ্ করে' সুর ধরেছিল—"প্রাণ-গৌর নিত্যানন্দ, প্রাণ-গৌর নিত্যানন্দ—"

পিছনে দরজার উপরে গায়ত্রী যে কখন এসে দাঁড়িয়েছিল, তা' সে জানতে পারেনি।

নিস্তব্ধে গায়ত্রী তার পানে চেয়েছিল।

এতটুকু বেলা হ'তে সে মানুষ হয়েছে বৈদেশিক শিক্ষা, সভ্যতা ও আব্‌হাওয়ার মধ্যে, সেখানে ভক্তি, শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠার বালাই নাই। হঠাৎ কাল এই লোকটীকে সামনে দেখে' সে প্রথমটায় কেমন যেন থতমত খেয়ে গিয়েছিল, ভক্তি বা শ্রদ্ধার ভাব একে বলে না, বিপরীত দিক্‌কার একটা ধাক্কা লাগায় সে হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠছিল।

কাল দিন এবং রাত্রি অনেকের মধ্যে গোলমাল ও আনন্দ করে' কাটালেও, এই লোকটীর কথা সে ভুলতে পারে নি, সকলের মধ্যে থেকেও সে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। তার সে অন্যমনস্কতা আর কারো চোখে না পড়লেও, মিঃ চৌধুরীর চোখ এড়াতে পারে নি।

নিজের অন্যমনস্কতা নিজেরই কাছে ধরা পড়ে' গিয়ে সে লজ্জিতা হয়ে উঠেছে বড় কম নয়; নিজের 'পরে রাগও

য়েছে আর রাগ পড়েছে সেই লোকটার উপরে, যে তাকে নর্থক তার সম্বন্ধে সচেতন করে' তুলেছে।

এই লোকটাকে দেখে হঠাৎ সে চমকে উঠেছিল—আশ্চর্য্য চোখের সাদৃশ্য—অবিকল সুষীমের মত।

সুষীম—যে চলে' গেছে আজ এক বৎসর কয়মাস মাত্র, দেড় বৎসরেরও কম সময়।

গায়ত্রী অন্যমনস্ক হয় বড় বেশী রকম।

কি নিবিড় ভাবেই না সুষীম তাকে ভালবাসত। একদিন তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল—কেউ কাউকে হারিয়ে বাঁচতে পারবে না, আজ কোথায় রইল সে পণ? গত বৎসরে মাঘ মাসে সুষীম যখন মারা যায়, তখন স্ত্রীর মুখখানা নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আর্দ্রকণ্ঠে সে বলেছিল, "আমি তোমায় মুক্তি দিয়ে গেলুম গায়ত্রি—আমি তোমায় অনুরোধ করছি, আমার কথা মনে জাগিয়ে রেখে তুমি কষ্ট পেয়ো না; তুমি যদি ইচ্ছা কর—বিয়ে করে' সুখী হয়ো।"

সেদিন গায়ত্রী বাঁচতে চায়নি, নিজেকে একেবারে নিঃস্ব, একেবারে ব্যর্থ বলে' তার মনে হয়েছিল, সেই সময়ে, সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে স্বামীর বন্ধু মিঃ চৌধুরী তাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিলেন।

গায়ত্রীর ওষ্ঠ কাঁপতে থাকে—

কেমন করে' কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সে ভুলে' গেল তার স্বামীকে—তার বহুকালের সাথী সুষীমকে? মাত্র এক বৎসরের ব্যবধান—বেশীদিন তো নয়—এর মধ্যে কোথায় গেল সুষীমের স্মৃতি—কোথায় হারিয়ে গেল সে?

বিশু ঠাকুর সামনে তখন মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করছে—"নাও ঠাকুর, আমার সব নাও, আমার সাধ-আহ্লাদ, আমার সুখ-দুঃখ, কামনা-বাসনা, সব তুমি গ্রহণ কর দেবতা, আমায় শুধু প্রেম দাও, ভালবাসতে শিখাও।"

প্রণাম-শেষে মাথা তুলে' পিছনে ফিরে সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল—দরজায় দাঁড়িয়ে গায়ত্রী, নিঃশব্দে তার চোখ দিয়ে দর্-দর ধারে জল গড়িয়ে পড়ছে।

বিশু ঠাকুর তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, সেই মুহূর্ত্তে গায়ত্রীর চোখ তার উপর পড়তেই সে ক্ষিপ্র হস্তে চোখ মুছে' ফেলে বারান্দায় চলে' গেল, নিজেকে সে গোপন করতে চায় এই দুর্ব্বলতাপ্রকাশের লজ্জা হ'তে।

বিশু ঠাকুরও বারান্দায় এসে দাঁড়াল, উৎসাহিতভাবে বললে, "আপনি আজ নিজে মন্দির দেখতে এসেছেন, এ যে আমার কতখানি আনন্দের কথা, তা' আমি আপনাকে বলে' বুঝাতে পারছি নে গায়ত্রীদেবি! ভগবান আপনার মনে শান্তি দিন, আপনি তাঁর ভক্ত হয়ে—"

গায়ত্রী ধমক্ দিল, "কি যা'-তা' বল্‌ছেন বলুন দেখি? আপনার ঠাকুর আপনারই থাক্, আমি এমনই একবার দেখতে এসেছি, আপনার ঠাকুরের ভক্ত হ'তে আসিনি।"

বিশু ঠাকুর যেন থতমত খেয়ে গেল, মাথা চুলকিয়ে বললে, "আপনি যখন নিজেই এসেছেন, নিজের চোখে মন্দির আর ঠাকুর দেখে' যান, আপনার হুকুমে এসব মেরামত হ'তে একদিন দেরী লাগবে না। আমি নরহরি বাবুকে বলেছি, তিনি ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছেন—"

গায়ত্রী বাধা দিয়ে বললে, "ধমক দেওয়ারই কথা। আপনার এই পচা ভাঙ্গা মন্দির মেরামত কোন রকমেই চলতে পারে না। এর জন্যে অনর্থক খরচ করার মত টাকা আমাদের নেই, কাজেই কিছুই হবে না জেনে' রাখবেন।"

বিশু ঠাকুর গরম হয়ে উঠেছিল, রুক্ষকণ্ঠে বললে, "তা' জানি, মন্দিরের ঠাকুরের সেবার জন্যে আপনারা এক পয়সাও খরচ করবেন না, অথচ কোন পার্টি দিতে, নাম করতে একদিনে হাজার হাজার টাকা খরচ করতে পারেন। একটা কথা বলি গায়ত্রীদেবি, লোকে যা' বলেছিল, আমি আগে তা' বিশ্বাস করিনি; কারণ মানুষ যে আকারে ভদ্র হয়েও প্রকৃতিতে এত ছোটলোক হ'তে পারে, তা' আমি জানতুম না!"

"ছোটলোক—"

গায়ত্রী প্রায় চীৎকার করে' উঠল, তার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল।

বিশু ঠাকুর মাথা কাত্ করে' বললে, "একশো বার ছোটলোক, হাজার বার ছোটলোক, ছোটলোক নইলে এমন মতিগতি হয়? এই মন্দির আপনারই পূর্ব্বপুরুষের তৈরী, এই ঠাকুরও তাঁদেরই প্রতিষ্ঠিত, আপনারা কেউ

কোনদিন এর কথা কাণে নিয়েছেন, এর পানে চেয়েছেন? তারপর এই যে আপনি বিধবা মানুষ, কোথায় এসব দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণ করা, এসব আপনারই কাজ, আপনি কিনা আবার বিয়ে করতে চ'লেছেন? আমাদের ঘরেও তো বিধবা ছিল, তারা ইচ্ছে করলে হয় তো বিয়ে করতে পারত, কিন্তু কেন করেনি জানেন?"

কম্পিত কণ্ঠে গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করলে, "না—কেন?"

বিশু ঠাকুর হাসলে—"তাও জানেন না? এক ফুল দিয়ে দুই তিন ঠাকুরের পুজো হয় না, তাও জানেন না? ফুল একবারই উৎসর্গ করা চলে, সে ফুলে আর পুজো হয় না। আপনার যে দেহ, যে প্রেম আপনি এক দেবতাকে উৎসর্গ করে' দিয়েছেন, তা' আর কাউকে দেওয়া চলে না, আপনার শিক্ষা আপনাকে এ জ্ঞান দেয়নি?"

গায়ত্রী চোখ তুলে' তার পানে একবার চাইলে মাত্র, একটী মাত্র শব্দ সে উচ্চারণ করলে না, আস্তে আস্তে উঁচু বারান্দা হ'তে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল।

বারান্দা হ'তে উচ্চকণ্ঠে বিশু ঠাকুর কেবল মাত্র বললে, "গরীবের কথাটা মনে রাখবেন—ভুলবেন না যেন—"

গায়ত্রী ফিরেও চাইলে না।

কথাটা ভূপেন মিত্রের কাণে পৌঁছাল।

মিঃ চৌধুরী যে সেই মুহূর্ত্তে মন্দিরের দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছেছিলেন, তা' গায়ত্রী বা বিশু ঠাকুর জানতে পারেনি, তিনি বাড়ী এসে জানালেন—পূজারী বিশ্বনাথ জমিদার-কন্যা গায়ত্রীকে অপমান করেছে।

—"অপমান—"

ভূপেন মিত্রের দুই চোখ দিয়ে আগুন বার হ'তে লাগল। তিনি রুক্ষকণ্ঠে চীৎকার করলেন—"এই তেওয়ারী, দোবে, চোবে, মিশির, ইধার আও, জল্‌দী আও।"

তারপরই গায়ত্রীর দিকে ফিরে' জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমায় অপমান করেছে সেই ভিক্ষুক বামুণ—মন্দিরের পূজারীটা, এত বড় স্পর্দ্ধা তার হ'ল?"

গায়ত্রীর চোখ দুটী হঠাৎ সজল হয়ে উঠল, সে দ্রুত নিজের ঘরে চলে' গেল।

সে জানতে পারলে না—দারোয়ানেরা বিশু ঠাকুরকে ধরে' এনেছে এবং সে রাত্রে জমিদারের আদেশে তাকে একটা ঘরে বন্ধ করে' রাখা হয়েছে।

সে রাত্রে গায়ত্রী জলস্পর্শও করলে না।

বিশু ঠাকুরের কথাগুলো তার মনে জাগছিল।

মিঃ চৌধুরী তার সঙ্গে পূর্ব্বের মতই কথাবার্ত্তা বলবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু গায়ত্রী সে কথাবার্ত্তায় যোগ দেয় নাই।

দেবতার উৎসর্গ-ফুল—

পূজারী ব্রাহ্মণের মুখে এ কত বড় জ্ঞানের কথা; সে জ্ঞান সে অনেক লেখাপড়া শিখে, দেশবিদেশে ঘুরে'ও আহরণ করতে পারে নাই, বরং তার আরও অধঃপতন ঘটেছে। কোন দিন সামনে এমন কোনও দৃষ্টান্ত পায়নি, যা' দেখে সে নিজেকে গড়ে নিতে পারে। চিরদিন সে ঠাকুর-দেবতা, পূজার্চ্চনা হেসে উড়িয়ে দিয়ে এসেছে, কুসংস্কার বলে' অবজ্ঞা করেছে, আজ তাতেই কেমন করে' অভিভূত হয়ে পড়ল, তাই সে ধারণা করতে পারে না। কোনদিন সে যে পরলোককে বিশ্বাস করতে পারেনি, আজ হঠাৎ সেই পরলোককে বিশ্বাস করার প্রবৃত্তি তার মনে জেগে উঠল কি করে?

তুমি ইহলোকে নেই, পরলোকে আছ—

আজ এই কথা বিশ্বাস করতে তার প্রাণ চায়, তার মন জোর করে' আজ এই কথা বলতে চায়।

একি ভুল—একি ভ্রান্তি—!

অকস্মাৎ সে কঠোর হয়ে ওঠে।

ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের স্পর্দ্ধা, সত্যই তাই! তার চোখ দেখে' গায়ত্রীর মনে পূর্ব্বস্মৃতি জেগে উঠেছিল, সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, সে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল, সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে এই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ তাকে বড় কম অপমান করেনি!

গায়ত্রী উত্তেজনায় ঘুমাতে পারেনি, ভোরের দিকে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুম ভাঙতে অনেক দেরী হয়ে গেল।

পিতার সঙ্গে যখন দেখা হ'ল, তিনি বললেন,—"ভিক্ষুক বামুনটাকে আচ্ছা জব্দ করে' ছেড়েছি গায়ত্রী, স্পর্দ্ধা তার ভয়ানক বেশী রকম বেড়ে' উঠেছিল। কাল তোমাকে

পর্য্যন্ত অপমান করতে সাহস করেছিল! কাল সমস্ত রাত তাকে এখানে আটক করে' রেখেছিলুম, আজ সকালে ক্ষমা চেয়ে গেছে।"

গম্ভীর হয়ে গায়ত্রী বললে, "আপনি এক কথায় তাকে ক্ষমা করলেন বাবা?"

পিতা যেন আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, বললেন, "ক্ষমা না করে'ও তো উপায় নেই, ঠাকুরবাড়ীর ভার তার 'পরে যে—"

গায়ত্রী ঔদাস্যের সঙ্গে বললে, "টাকা দিলে পুরুত ঢের মেলে বাবা—"

ভূপেন মিত্র বললেন, "টাকা দিলে বামুণ পাওয়া যাবে জানি, কিন্তু এতখানি আন্তরিকতা তো তাদের থাকবে না গায়ত্রি, এতখানি দরদ, এতখানি ভালবাসা দিয়ে কেউ ঠাকুরের সেবা করবে না!"

গায়ত্রী দৃপ্ত হইয়া বলিল, "কে কতখানি দরদ দেয়, ভালবাসে, তা' দেখবার দরকার আমাদের নেই বাবা; মোট কথা, যে আমায় অত বড় অপমান করেছে, তাকে আমি কিছুতেই আমাদের কাজ করতে দেব না।"

রাগতভাবে সে বার হয়ে গেল, পিতা কেবল নিস্তব্ধ ভাবে তাকিয়ে রইলেন।

৬

ডেকে পাঠানো সত্ত্বেও যখন বিশু ঠাকুর এল না, বলে' পাঠাল সময় নাই, তখন গায়ত্রী আর কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারলে না, সে নিজেই এগিয়ে পড়ল!

সেই মন্দির, সেই দেবতা—

সাম্‌নে নির্ব্বাক্‌ বসে' আছে বিশু ঠাকুর, তার চোখ দিয়ে নিঃশব্দে কেবল জল ঝরে' পড়ছে

গায়ত্রী রুক্ষকণ্ঠে ডাকলে, "ঠাকুরমশাই, একবার বাইরে আসুন, বিশেষ কথা আছে

বিশু ঠাকুর চম্‌কে উঠে পিছন ফিরলে; শান্তভাবে বললে, "আমাকে ডাকছেন?"

গায়ত্রী উত্তর দিলে, হ্যাঁ, এদিকে আসুন।"

মা করে' বিশু ঠাকুর বাইরে এসে দাঁড়াল।

গায়ত্রী পার্শ্ববর্ত্তী রামসিং দ্বারোয়ানকে আদেশ করলে, "দরজায় তালা চাবী বন্ধ কর—"

তারপর বিশু ঠাকুরের দিকে ফিরে বললে, "কাছারী বাড়ীতে যাবেন, আপনার যা' কিছু পাওনা আছে, নরহরি-বাবুর কাছ হ'তে মিটিয়ে নেবেন।"

সে দ্রুত নেমে' গেল, দ্বারোয়ান দরজায় তালা বন্ধ করে' তার সঙ্গে চলে' গেল।

বারান্দায় নির্ব্বাক্‌ দাঁড়িয়ে রইল বিশু ঠাকুর, তার চোখে পলকও যেন পড়ে না।

সে বুঝতে পারে না—সে কি করেছে, জমিদার-কন্যাকে কি অপমান করেছে! যা' প্রকৃত কথা, তাই সে বলেছে মাত্র, এর নাম কি অপমান করা?

বিশু ঠাকুর রুদ্ধ দরজার দিকে ফিরল—

উদ্বেলিত অশ্রু আর মানা মানে না।

"ঠাকুর—আমার ঠাকুর!"

ক্ষুদ্র বালকের মত কেঁদে' সে ডাকছিল, "তোমায় পূজো করবার অধিকারটুকুও ওরা আমায় দিলে না দেবতা, ওরা তোমায় বন্ধ করে' রাখলে, তোমার আমার মাঝে লোহার দরজা ব্যবধান রইল!"

অনেকক্ষণ কেঁদে সে উঠে দাঁড়াল—

পথ বেয়ে সে কোথায় চলে' গেল, তা' কেউ জানতে পারলে না

সন্ধ্যাবেলায় মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টার শব্দ আজ শোনা গেল না, মন্দিরে প্রদীপও জ্বলল না।

গায়ত্রী শুনতে পেলে—বিশু ঠাকুর কোথায় চলে' গেছে, সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

ভূপেন মিত্র অনেক ক্ষণ চুপ করে' থেকে তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "কাজটা ভাল হ'ল না গায়ত্রি; বেচারা বিশু ঠাকুর—সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে' দিয়েছিল ওই মন্দিরের 'পরে, ওই ঠাকুরকে সে যে কতখানি ভালবেসেছিল তা' যদি বুঝতে—"

গায়ত্রীর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, সে নতমুখে বসে' রইল।

৭

এক বৎসর পরে—

ভূপেন মিত্র দুইদিনের জন্য আবার গ্রামে এসেছেন—তাঁর সঙ্গে এসেছে গায়ত্রী।

এক বৎসর পূর্ব্বের গায়ত্রীর সঙ্গে এ গায়ত্রীর প্রভেদ যথেষ্ট দেখা যায়। সে বিলাসিনী দাম্ভিকা গায়ত্রীর মৃত্যু হয়েছে—এ গায়ত্রী শান্ত সংযতভাবে সেবাধর্ম্মে চিত্ত-সংযোগ করেছে।

মন্দির-সংস্কার হয়েছে—গায়ত্রী নিজে টাকা দিয়েছে। মহাধুমধামে পূজা হচ্ছে।

আসনে পূজারী বসে' মন্ত্র পড়ছে। গায়ত্রী শূন্য চোখে চেয়ে রইল।

কার আসনে আজ কে বসে' পূজা করছে? সে পূজারী কই—যে একান্ত নিষ্ঠা, ভালবাসা, একাগ্র সাধনা দিয়ে মরা দেবতাকে বাঁচিয়েছিল?

গায়ত্রী দেবতার পানে চাইলে—

প্রাণহীন দেবতা দাঁড়িয়ে আছেন। গায়ত্রীর অর্থ বৃথাই নষ্ট হয়েছে, যে দেবতা পূজারীর প্রাণপূর্ণ সাধনায় জেগে উঠেছিলেন, তার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

এই নিদ্রিত দেবতাকে জাগাবে কে—কোথায় সে সাধক, নিজের চিন্তা ভুলে', জগৎ ভুলে' সমাহিত চিত্তে নির্জ্জনে যে একদিন প্রাণ ভরে' গেয়েছিল—

স্মর গরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং;

তাকে অনেকে খুঁজেও পাওয়া যায় নি, বাধ্য হয়ে অন্য পূজারী রাখতে হয়েছে।

গায়ত্রীর দুটি চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে' জলধারা ঝরে' পড়ল।

সেইদিনই বাড়ী ফিরে' সে প্রস্তাব করলে—"কলকাতায় যাব, গ্রাম ভাল লাগছে না।"

পিতা কন্যার পানে শুধু চেয়ে রইলেন—এ মেয়েকে বোঝা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

---

# বোধন-গীতি

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

শস্য শ্যামল বসুন্ধরায়
মা যে আবার আসে
অরুণ আলোর রং লেগেছে
শিশির-ভেজা ঘাসে।
আসে মা ঐ দশভুজা
অন্তরে তার হবে পূজা,
চিত্ত-কমল ফুটেছে তাই
জল-কমলের পাশে।

মন্দিরে মা'র আসন পাতা
দীপের শিখা জ্বলে
হৃদয়-বীণার ভৈরবীতে
অশ্রু ছলছলে।
এস মাগো ধ্যানের ধূপে
এস মা আজ জ্ঞানের রূপে,
চন্দনেরি গন্ধ সুধায়
এস ফুলের বাসে।

# দুর্গোৎসব

৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

## দেবী দুর্গা

বাঙালীর একান্ত নিজের জিনিস বলিয়া গৌরব করিবার যেমন 'নব্য-ন্যায়' আর 'কীর্তন-গান', বাঙলার তেমনই একান্ত নিজস্ব 'দুর্গোৎসব'। দুর্গোৎসব জাতীয় উৎসব, মহামহিমান্বিত উৎসব, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব—বাঙালীর পরম শ্লাঘার কথা এই যে, ইহা একমাত্র বাঙালীরই উৎসব। বাঙলার বাহিরে দুর্গোৎসব কোথাও জাতীয় উৎসব নয়। বঙ্গ, বিহার ও কামরূপে যত উৎসব হয়, তাহাদের মধ্যে দুর্গোৎসব সকলের চেয়ে বড়। ধর্মানুষ্ঠানে এত বড় জাঁকাল উৎসব বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র ভারতে কোথাও নাই। তাই স্মার্ত পণ্ডিতেরা ইহাকে 'কলির অশ্বমেধ' নাম দিতেও ছাড়েন নাই। বাঙলার বাহিরে ভারতের সর্বত্র এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তবে এক এক জায়গায় এক এক নাম। পশ্চিম ভারতের কোথাও কোথাও এবং নেপালে 'নবরাত্র' বা 'নব-পত্রিকা'র উৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসবে পূজা করিবার সময় কদলী, দাড়িম, ধান্য, হরিদ্রা, মান, কচু, বিল্ব, অশোক ও জয়ন্তী—এই নয়টী গাছ একত্র করিয়া তাহার উপর পূজা করিতে হয়। এ পূজায় কোন প্রতিমা থাকিবার ব্যবস্থা নাই। দেবী কাশ্মীরে 'অম্বা' নামে, গুর্জরে 'হিঙ্গলা' বা 'রুদ্রাণী' নামে, কান্যকুব্জে

একটী পিত্তল-নির্মিত প্রাচীন মহিষমর্দিনী মূর্তি

'কল্যাণী', নামে দাক্ষিণাত্যে 'অম্বিকা' বা 'অম্বা' নামে, মিথিলায় 'উমা' নামে পূজিতা। দুর্গা আনন্দদায়িনী ব্রহ্মময়ীরূপে হিমাচল হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত কত কাল

হইতে কত জাতি তাঁহারা কতভাবে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন, তাহার ইতিহাস এক বিরাট্ ব্যাপার।

স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। তিনি দুইখানি নিবন্ধ-গ্রন্থ রচনা করেন। একখানির নাম 'দুর্গোৎসব-তত্ত্ব', আর একখানির নাম 'দুর্গাপূজা-তত্ত্ব'। এই দুইখানি গ্রন্থে দুর্গার মৃন্ময়ী মূর্তি-গঠনের অনেক খুঁটিনাটির আলোচনা আছে। সেগুলি আজকালকার মূর্তিগঠনের সহিত হু-ব-হু মেলে। তবে রঘুনন্দন এই বিধির প্রবর্তক নন। তিনি ভবিষ্য, বৃহন্নন্দীকেশ্বর ও কালিকাপুরাণ হইতে মৃন্ময়ী মূর্তিগঠনের অনেক প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের অন্তর্গত মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে শরৎকালে পূজিতা বাসন্তীদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমারচনার ইঙ্গিত আছে। বাচস্পতি মিশ্রের 'কৃত্যচিন্তামণি'র নজির দিয়া রঘুনন্দন বাসন্তীর মৃন্ময়-মূর্তিপূজার উল্লেখ করিয়াছেন। এই কৃত্যচিন্তামণিতে 'দুর্গা' নামও পাওয়া যায়।

মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ১৪৭৯ খ্রীস্টাব্দে 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' রচনা করেন। ইহাতেও দুর্গাদেবীর মৃন্ময়-মূর্তিপূজার বিস্তৃত বিবরণ আছে। রঘুনন্দনের মতের সহিত এই গ্রন্থের মতের কোথাও কোথাও মিল নাই। কিন্তু বঙ্গদেশে অনেক শাক্ত পরিবার এই মতের অনুবর্তী। অতঃপর রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি-কৃত 'দুর্গোৎসব-বিবেকে' মৃন্ময়মূর্তি-পূজার কথা পাওয়া যায়। জীমূতবাহন তাঁহার 'দুর্গোৎসব-নির্ণয়ে' দেবীর মৃন্ময়মূর্তি-পূজার উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি শ্রীনাথের পিতা শ্রীকরের আত্মীয়, সম্ভবতঃ শ্যালক। শ্রীকরের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তবে রঘুনন্দন, জীমূতবাহন ও শূলপাণি তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। শূলপাণি জীমূতবাহনের সমসাময়িক ও শ্রীনাথের গুরু। ইনি রাঢ়ী শ্রেণীর ভারদ্বাজ-গোত্রীয় বাঙালী ব্রাহ্মণ।

শূলপাণির পূর্বে এক নিবন্ধকারের কথা জানিতে পারা যায়। ইহার নাম জিকন। জিকনের গ্রন্থ হইতে শূলপাণি তাঁহার 'দুর্গোৎসববিবেকে' অনেক বচন উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল বচন হইতে দুর্গার মৃন্ময়মূর্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। জিকন সপ্তম্যাদিকল্পের কথা বলিয়াছেন। সপ্তম্যাদিকল্প আজও বাঙলায় প্রচলিত, বালকের নিবন্ধ হইতেও শূলপাণি অনেক বচন উদ্ধার করিয়াছেন। বালক শারদীয়া পূজার ও মূর্তির যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে দুর্গার মৃন্ময়মূর্তিই প্রকাশ পাইয়াছে। জীমূতবাহন তাঁহার 'দায়ভাগে' ইঁহাদের নাম করিয়াছেন। বাঙলার সর্বপ্রধান নিবন্ধকার ভবদেব ভট্ট তাঁহার 'প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণে কয়েকবার জিকন ও বালকের নিবন্ধ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। ভবদেব রাজা হরিবর্মদেবের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। হরিবর্মদেবের সময় খ্রীঃ দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদ। ইহারও পূর্বে জিকন ও বালক জীবিত ছিলেন। জিকন ও বালক দেবীর মৃন্ময়-মূর্তির উপর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে ৯০০।১০০০ বৎসর পূর্বেও মৃন্ময়-মূর্তিতে বঙ্গদেশে শারদোৎসব হইত।

দেবী দুর্গাকে লইয়া ও দুর্গাতত্ত্ব উপলক্ষ্য করিয়া অনেকে অনেক গবেষণাও করিয়াছেন। দেবী দুর্গা কোথা হইতে আসিলেন, তিনি বৈদিক দেবতা কিনা, এই সকল প্রশ্ন লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু কিছু আলোচনাও হইয়াছে। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর লিখিলেন, দুর্গা বৈদিক দেবতা নন। তিনি মত দিলেন, অনার্যদের দেবতা দুর্গা আর্য দেবতা বলিয়া হিন্দু-সমাজে চলিয়া যান। এই মত প্রচারিত হইবার পর হইতেই আমাদের দেশের কয়েক জন পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কতকগুলি নজির বাহির করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিলেন যে, পূর্বে আর্য-দেবতাদের গণ্ডীর মধ্যে দুর্গাদেবীর স্থান ছিল না। তাঁহারা জোর করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন, দুর্গাদেবী বৈদিক নন।

আমরা এই দেবীর প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

ঋগ্বেদ ( ৩. ২৭. ৯ ) উপদেশ করিতেছেন—

'ওঁ ধিয়া চক্রে বরেণ্যো
ভূতানাং গর্ভমাদধে।
দক্ষস্য পিতরং তনা॥'

বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দক্ষ বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগে যজ্ঞবেদী বা কুণ্ডের নাম যে 'দক্ষতনয়া' ( দক্ষ-তনা )

ছিল, এইটা বোধ হয় তাহার একটী কারণ। যজ্ঞবেদীতে অগ্নি থাকিত বলিয়া, অথবা তাহা অগ্নি আলিঙ্গন করিত বলিয়া লোকে বৈদিক যুগের শেষ দিকে ধারণা করিয়া লইল যে, দেবী দুর্গার পতি মহাদেব। মহাদেব অগ্নি-ব্যতীত আর কেহ নন। কেননা 'রুদ্র' শব্দে অগ্নি ও মহাদেব উভয়ই বুঝাইত। তা'ছাড়া, শতপথ-ব্রাহ্মণে অগ্নির পৌরাণিক আখ্যায়িকায় যে অষ্টমূর্তির নাম রুদ্র, সর্ব, পশুপতি, উগ্র, অশনি, ভব, মহাদেব ও ঈশান পাওয়া যায়, সেই আখ্যায়িকার মূল এই বৈদিক ব্যাপার। শিবের সহিত দক্ষকন্যা সতীর বিবাহ হইয়াছিল, অগ্নির সহিত বেদী অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, এইটুকু বুঝাইবার জন্য বোধ হয় শিব-দুর্গার বিবাহ-ব্যাপার।

বেদী কিরূপে দুর্গাতে পরিণত হইলেন? এ-সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে আমাদিগকে প্রাচীন ভারতের একটা ঘটনা স্মরণ করিতে হইবে। প্রাচীন ভারতে এমন এক দিন আসিয়াছিল যখন ঋষিরা অগ্নি প্রজ্জলিত না রাখিয়া তাহা নিবাইয়া রাখিতেন। সে সময়ে তাঁহারা অগ্নির আরাধনার জন্য কোনই অনুষ্ঠান করিতেন না। তবে তাঁহারা সযত্নে বেদী রক্ষা করিতেন। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ ঋগ্বেদের বাণী উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদ (১. ১৩৬. ৩) উপদেশ করিতেছেন—

'জ্যোতিষ্মতীমদিতিং ধারয়ৎক্ষিতিং স্বর্বতীমা।'

—যজমান জ্যোতিষ্মতী সম্পূর্ণলক্ষণা স্বর্গপ্রদায়িনী বেদী প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

ঋষিরা এই বেদী বা কুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। তার পর আবার যখন দেশের গতি ফিরিয়া গেল, তখন তাঁহাদের অগ্নির নিকট হবিঃ প্রভৃতি দানের দরকার হইল। ঋষিরা কিন্তু পুনরায় অগ্নি প্রজ্জলিত না করিয়া কুণ্ডের উপর অর্থাৎ 'দক্ষকন্যা'র উপর পীতবর্ণের মূর্তি স্থাপন করিতেন। এই মূর্তিকে তাঁহারা অগ্নি বলিয়া বুঝিতেন এবং অগ্নির নামানুসারে ইহাকে 'হব্যবাহনী' বলিতেন। ঋগ্বেদেও (১০. ১৮৮. ৩) তাই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে—'যা রুচো জাতবেদসো দেবত্রা হব্যবাহনীঃ। তাভির্নো যজ্ঞমিন্বতু।' অগ্নির এই নাম হইবার কারণ, তিনি দেবতার নিকটে হব্য বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিতেন। এই মূর্তিই আমাদের দুর্গা। কুণ্ডের দশ দিক্ দুর্গার দশ হাত। কুণ্ডে ছোট ছোট কয়েকটী দেবতার সংস্থানের ব্যবস্থা আছে। ইহাদের এক জন যোদ্ধা কুণ্ডকে রক্ষা করিয়া থাকেন, এক জন যজ্ঞের সূচনা করিয়া দিয়া থাকেন, তাঁহার চারি হাত। একটী দেবী যজ্ঞজ্ঞানদাত্রী, আর এক জন যজ্ঞের জন্য অর্থাগমের সাহায্য করিয়া থাকেন। দুর্গার সঙ্গে আরও কয়েকটী ছোট দেবতা থাকায় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহা বৈদিক কুণ্ডের পূর্ণ স্বরূপ। মূর্তিমৎ বেদজ্ঞান হইতেছেন—সরস্বতী। যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তাহারই সাহায্য করিবেন অন্য এক দেবী। হব্যবাহনীর এই বর্ণনা এবং কয়েকটী ছোট দেবদেবীর বিবরণ হইতে দুর্গাদেবীর পীতবর্ণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অস্তিত্বও ইহা দ্যোতিত করিতেছে। আবার ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের প্রথম ঋক্ হইতে জানিতে পারা যায় যে, অগ্নি-দেবতার নিকট অসুরদিগকে বলি দেওয়া হইত। এই বলিদানকালে ঋঙ্‌মন্ত্র ঈরিত হইত। 'ওঁ বি পাজসা পৃথুনা শোশুচানো বাধস্ব দ্বিষো রক্ষসো অমীবাঃ।' আমরা সামবেদ হইতে দুর্গোৎসবে যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকি, তাহা হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতে পারে যে, দুর্গা ও অগ্নি অভিন্ন। বৈদিক সাহিত্য হইতেও ইহাদের অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে। বৈদিক যুগের শেষ দিকে 'দক্ষতনা' 'উমা'তে পরিণত হন, 'উমা' আবার 'অম্বিকা'তে এবং 'অম্বিকা' 'দুর্গা'তে পরিণত হন।

শুক্লযজুর্বেদ (৩.৫৭) রুদ্রকে সম্বোধন করিতেছেন এবং তাঁহাকে তদীয় ভগিনী অম্বিকার সহিত যজ্ঞাহুতি আস্বাদন করিবার জন্য বলিতেছেন—'এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রা অম্বিকয়া তং জুষস্ব স্বাহা।' তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গা, মহাদেব, কার্তিক, গণেশ ও নন্দিকে একত্র একসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। আরও জানিতে পারা যায় যে, এই সময়ের মধ্যে রুদ্র—মহাদেব হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, আর উমা, অম্বিকা ও দুর্গা তখন ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে বুঝাইত না—তাঁহারা তখন এক হইয়া গিয়াছিলেন। এই

সময়ের সাহিত্যে মহাদেব রুদ্র—উমাপতি, অম্বিকাপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

'পুরুষস্য বিদ্মহে সহস্রাক্ষস্য ধীমহি।
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। পুরুষায় বিদ্মহে
মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।
তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি।
তন্নো দন্তি প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায়
বিদ্মহে চক্রতুণ্ডায় ধীমহি।' [ ১০.১.৫ ]
'তন্নো নন্দিঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায়
মহাসেনায় ধীমহি। তন্নো ষন্মুখঃ
প্রচোদয়াৎ।' [ ১০.১.৬ ]
'কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্য-
কুমারী ধীমহি। তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ। [ ১০.১.৭ ]
নমো হিরণ্য বাহবে হিরণ্যবর্ণায়
হিরণ্যরূপায় হিরণ্যপতয়েম্বিকা-
পতয়ে নমো নমঃ।' [১০.১.৮ ]

বৃহদ্দেবতা বেদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে অদিতি, বাক্‌, সরস্বতী ও দুর্গা যে অভিন্ন, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা যে দুর্গাকে পূজা করি, তিনি সিংহোপরি দণ্ডায়মানা। আর এই বাক্‌ও সিংহাকৃতি ধারণ করিয়াছেন। এই সিংহীভূতা বাক্‌ দেবতাদের প্রার্থনায় তাঁহাদের নিকট যাইতেন। দুর্গা এবং বাকের অভিন্নত্ব-সম্বন্ধে নিঃসংশয় প্রমাণও বর্তমান। বৃহদ্দেবতা প্রমান করিয়াছেন যে, যিনি বাক্‌ তিনিই দুর্গা। সুতরাং দুর্গার সহিত সিংহের সম্বন্ধ কিয়ৎপরিমাণে স্থির করা যাইতে পারে।

ঋগ্বেদের খিলসূক্তে ( ২৫ ) দুর্গাকে রাত্রিদেবী বলা হইয়াছে। আবার এই একই মন্ত্র তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে (১০. ১) দেখিতে পাওয়া যায়। এই আরণ্যকে তাঁহাকে হব্যবাহনী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। গৃহ্য-সংগ্রহে পাওয়া যায় যে, দেবী—কালী করালী প্রভৃতি সপ্তজিহ্বায় হব্য গ্রহণ করিতেছেন। অতএব, দুর্গা ও অগ্নি যে এক সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

## দুর্গাপূজা—শারদোৎসব

আমাদের দুর্গাপূজা শারদোৎসব। এই উৎসব বৈদিক যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বৈদিক যুগে 'ইষ' বলিতে 'আশ্বিন' বুঝাইত, 'উর্জ' শব্দের মানে ছিল 'কার্ত্তিক'। বৈদিক ঋষিরা 'শরৎঋতু' বলিতে এই দুই মাসই বুঝিতেন। তাই তাঁহারা বাজসনেয়ি-সংহিতায় উপদেশ দিয়াছেন—

'ইষশ্চোর্জশ্চ শারদাবৃতু—১৪.১৬।'

তৈত্তিরীয়-সংহিতা (৪. ৪. ১১. ১), মৈত্রায়ণী-সংহিতা (২. ৮. ১২ ; ১১৬. ৯), কাঠক-সংহিতা (১৭. ১০ ; ৩৫. ৯) ও শতপথ-ব্রাহ্মণ ( ৮. ৩. ২. ৬ ) ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া প্রচার করিয়াছেন—আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ।

শাস্ত্রের নির্দেশ—'শরদুত্তরঃ পক্ষঃ'। —তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ, ৩. ১০. ৪. ১ ; তৈত্তিরীয়-আরণ্যক, ৪. ১৯. ১।

শরৎঋতু উত্তর বা অপর পক্ষ। পিতৃযজ্ঞ, পিতৃশ্রাদ্ধ, পিতৃতর্পণ প্রভৃতি অপর পক্ষের কৃত্য। কাজেই এগুলি শরৎঋতুতেই করিতে হয়। শরৎঋতুই দেবার্চন প্রভৃতির প্রশস্ত কাল।

'শারদেন ঋতুনা দেবাঃ'—এই বাক্যে বাজসনেয়ি-সংহিতা (২১. ২৬), মৈত্রায়ণী-সংহিতা (৩. ১১. ১২ ; ১৫৯. ৭), তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ (২৬. ১৯. ২) প্রভৃতি শাস্ত্র দেবপূজনে শরতেরই ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন।

শতপথ-ব্রাহ্মণ ( ২. ২. ১. ৯ ) বলেন—আদিত্যই সমস্ত ঋতু। যখন ইনি উদিত হন তখন বসন্ত, যখন গাভীরা দোহনের জন্য সম্মিলিত হয় তখন গ্রীষ্ম, যখন দিনের মধ্যভাগ উপস্থিত হয় তখন বর্ষা, যখন অপরাহ্ণ তখন শরৎ, যখন সূর্য অস্ত যান তখন হেমন্ত।

'যদা পরাহ্ণোঽথ শারস্তা'—এই বচনে শরৎকে অপরাহ্ণ নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। অপরাহ্ণে পিতৃগণের সম্যক্‌ অর্চনা করা উচিত। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ এই বিধি দিয়াছেন। সুতরাং অপরাহ্ণ বা শরৎ ঋতুই যে ইহার উপযুক্ত কাল তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

আমাদের দুর্গাপূজাও শারদীয়া পূজা। শরৎঋতুতেই ইহার অনুষ্ঠান। তফাৎ এইটুকু—তখন শরৎ ছিল আশ্বিন ও কার্ত্তিক, এখন হইতেছে ভাদ্র ও আশ্বিন। বেদে একটা বৃহৎ শারদীয় অনুষ্ঠানের ব্যাপার আছে, তাহার নাম 'একাষ্টকা'। একাষ্টকা 'সংবৎসরে'র পত্নী। সংবৎসর ও একাষ্টকা সেই রাত্রে একত্র বাস করেন।

'এষা বৈ সংবৎসরস্য পত্নী যদ্ একাষ্টকা
এতস্যাং বা এতাং রাত্রিং বসতি।'

যাঁহারা একাষ্টকার নিকট বলি দেন তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে আর্ত সংবৎসরের নিকট বলি দিয়া থাকেন। শারদীয়া দুর্গাপূজা যে বৈদিক পূজা একাষ্টকা তাহার একটা প্রমাণ এবং আমার বোধ হয়, অষ্টভুজা মূর্তির কল্পনাটুকুও এই একাষ্টকা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈদিক যুগে অনেকগুলি স্ত্রীদেবতা সম্পূজিতা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন দেবতা এই যুগের শেষ দিকে দুর্গা নামে প্রচারিত হইয়া থাকিবেন। বাজসনেয়ি-সংহিতায় দেখি, অম্বিকা রুদ্রের ভগিনী; তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে (১০. ১৮) তিনি রুদ্রের পত্নী হইয়াছেন; আবার এই আরণ্যকেই দুর্গাদেবীর আরাধনা আছে—সেখানে দুর্গা, রুদ্র-মহাদেব, গণেশ, কার্ত্তিক, নন্দী একসঙ্গে আছেন। ইঁহাদের সকলকেই আরাধনা করা হইতেছে। এই আরণ্যকে আরও দুটী নাম পাওয়া যায়—কন্যকুমারী ও কাত্যায়নী। এই সমস্ত উক্তি হইতে দেখা যাইতেছে যে, অম্বিকা ও কাত্যায়নী প্রভৃতি দেবতা দুর্গা নামেই পূজিতা হইয়াছেন। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, অম্বিকা শব্দের অর্থ শরৎ ঋতু। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ (১৬. ১০. ৪) বলিতেছেন—

'এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়েত্যাহ।
শারদা তস্যাম্বিকা স্বসা, যো বা এষ হিনস্তি
যং হিনস্তি তয়ৈবেনং সময়তি।'

এই ব্রাহ্মণের বচন হইতে বুঝা যাইতেছে, রুদ্রভগিনী অম্বিকা শরৎঋতু। শরৎঋতুর পূজা বা অম্বিকার পূজা একই কথা। যখন অম্বিকা দুর্গায় পরিণত হইলেন, তখন শরৎঋতুই তাঁহার পূজার প্রশস্ত কাল হইল। শারদোৎসবের মূল কি ঠিক বলিতে পারা যায় না। তবে শাস্ত্রের মধ্য দিয়া যতটুকু সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে তাহার কিছু ইঙ্গিত দিবার জন্যই ইহা লিখিত হইল।

## দুর্গাপূজার প্রবর্তন

দুর্গার স্তব বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মহাভারতে অর্জুন দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন। কিন্তু মূর্তি নির্মাণ করিয়া দুর্গা-পূজার প্রবর্তন বহুকাল পূর্বে হইয়াছিল কিনা তাহা স্থির করা কঠিন। পুরাণে এ-সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পাওয়া যায় যে, সর্বপ্রথম দেবী গোলোকে রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক পূজিতা হইয়াছিলেন। ইহা সৃষ্টির আদিকালের কথা। বৃন্দাবনেও তিনি কর্তৃক পূজিতা হইয়াছিলেন।

'প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
বৃন্দাবনে চ সৃষ্ট্যাদৌ গোলোকে রাসমণ্ডলে॥'

অতঃপর দ্বিতীয়বার দুর্গা পূজিতা হন ব্রহ্মা-কর্তৃক। ব্রহ্মা মধুকৈটভ-ভীতিবশতঃ দুর্গার পূজা করেন।

'মধুকৈটভভীতেন ব্রহ্মণা সা দ্বিতীয়তঃ।'

তার পর তিনি ত্রিপুরারি মহাদেব-কর্তৃক ত্রিপুরের বিনাশের জন্য পূজিত হন।

'ত্রিপুর প্রেষিতেনৈব তৃতীয়া ত্রিপুরারিণা।'

ইহার পর দুর্বাসার শাপে শ্রীভ্রষ্ট মহেন্দ্র দেবীর অর্চনা করেন।

'ভ্রষ্টশ্রিয়া মহেন্দ্রেণ শাপাদ্দুর্বাসসঃ পুরা।
চতুর্থে পূজিতা দেবী ভক্ত্যা ভগবতী সতী॥'

দেবী-ভাগবতও একটু পরিবর্তিতাকারে এই উক্তিরই সমর্থন করিয়াছেন।—৩. ৩০. ৩১। ইঁহার মতে, প্রথমে বিষ্ণু, তৎপরে মহাদেব, তার পর ব্রহ্মা, অতঃপর ইন্দ্র শুভ নবরাত্র-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

দেবী-ভাগবত বলেন, নারায়ণ মধুকৈটভ-বিনাশের জন্য এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

'হরিণা মধুনাশায় কৃতং মেরৌ মহামতে।
বিষ্ণুনা চরিতং পূর্বং মহাদেবেন ব্রহ্মণা।
তথা মঘবতা চীর্ণং স্বর্গমধ্যস্থিতেন বৈ॥' [৩০.৩.২]

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ-অনুসারে ইন্দ্রের দুর্গাপূজার পর হইতেই (তদা 'মুনীন্দ্রৈঃ সিদ্ধেন্দ্রৈ দেবৈশ্চ মনুমানবৈঃ') দেবী দুর্গা সম্পূজিতা হইয়াছিলেন।* দেবী-ভাগবতকার (৩. ২০. ২৫) বলেন—পরে বিশ্বামিত্র, ভৃগু, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ নবরাত্র-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

* দেবীভাগবত-মতে (৩. ৩০. ২৬) বৃত্রনাশের জন্য ইন্দ্র দেবীর পূজা করেন ('ইন্দ্রেণ বৃত্রনাশায়কৃতং ব্রতমনুত্তমম্')।

'বিশ্বামিত্রেণ কাকুৎস্থঃ কৃতমেতন্নসংশয়।
ভৃগুণাথ বশিষ্ঠেন কশ্যপেন তথৈব চ॥'

সোম যখন সুরগুরুর ভার্যা তারাকে হরণ করেন, তখন তিনিও এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় পত্নী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কালান্তরে স্বারোচিষ মন্বন্তরে ভারতের পুণ্যক্ষেত্র মেধসাশ্রমে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি নদীতটে দুর্গা-দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্তির পূজা করেন ও পূজান্তে সেই মৃণ্ময়ী মূর্তি গভীর জলে বিসর্জন দেন।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

মাটির ঠাকুর গড়িয়া দুর্গামূর্তিপূজার ইহাই নিদর্শন। দেবী-ভাগবত দেবীর পূজকের নাম করিয়াছেন। এই পুরাণ-মতে সুযজ্ঞ ভারতবর্ষে প্রথম দুর্গাপূজা করেন। ইহাতে আর একটী উপাখ্যান আছে। ইক্ষাকু-বংশীয় পুষ্প নামক রাজার পুত্র ধ্রুবসন্ধি কোশলরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। ইঁহার দুটী পত্নী—প্রধানা মনোরমা, দ্বিতীয়া লীলাবতী। মনোরমা কলিঙ্গরাজ বীরসেনের কন্যা, লীলাবতীর পিতা উজ্জয়িনীরাজ যুধাজিৎ। মনোরমার পুত্র সুদর্শন, লীলাবতীর পুত্র শত্রুজিৎ। একদা মৃগয়া করিতে গিয়া ধ্রুবসন্ধি সিংহ-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। উভয় মাতামহ নিজ নিজ শিশু দৌহিত্রকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করেন। ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয়। বীরসেন যুদ্ধে নিহত হইলে শত্রুজিৎ অযোধ্যার সিংহাসন লাভ করেন। মনোরমা মতিমান্ মন্ত্রী বিদল্লের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক পলায়নই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। পুত্র ও পরিচারিকার সহিত রথে আরোহণ করিয়া বিদল্লের সহিত মিলিত হইয়া তিনি নগরের বহির্দেশে নির্গত হইলেন। দীনা মনোরমা যুধাজিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পিতার অগ্নিসংস্কারাদি শেষ করিলেন এবং ভয়ব্যাকুলচিত্তে সত্বর গমন করিয়া দুই দিনের পর ভাগীরথীর তীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে নিষাদগণ তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইল। নিরুপায় হইয়া বস্ত্রমাত্র সম্বল এই অবস্থায় মনোরমা নৌকাযোগে ভাগীরথী পার হইয়া ত্রিকূট পর্বতে গমন করিলেন। ভরদ্বাজ তাঁহাকে একটী পর্ণকুটীর প্রদান করিলেন। মনোরমা বিদল্ল ও দাসীর সহিত ভরদ্বাজ-আশ্রমে অবস্থান করিয়া সুদর্শনকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বালক সুদর্শন ঋষি-কুমারদের সহিত ক্রীড়া করিত। তাহারা তাহাকে 'ক্লীব' বলিত। সুদর্শন সম্পূর্ণ উচ্চারণ করিতে পারিত না—'ক্লী' বার বার উচ্চারণ করিত। ক্রমে তাহাই জপ করিতে লাগিল। ঋষিগণের নিকট বিদ্যালাভের সময় ক্রমশঃ 'ক্লী' বীজের তাৎপর্য উপলব্ধি করিল এবং সর্বদা তাহাই ভক্তিভরে জপ করিতে লাগিল। এক দিন দেবী স্বয়ং দর্শন দিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিলেন। আর এক দিন জগজ্জননী তাহাকে বনমধ্যে শরাসন, শিলাশাণিত শর, তূণীর ও কবচ প্রদান করিয়াছিলেন। তখন হইতে সে আরও ভক্তির সহিত দেবীর নাম করিতে লাগিল।

এদিকে এই সময়ে কাশীরাজ সুবাহুর কন্যা অসামান্য রূপলাবণ্যবতী শশিকলা স্তুতিপাঠকের মুখে শুনিলেন যে, সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন শৌর্যসমন্বিত পরম সুন্দর রাজপুত্র সুদর্শন বনমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। সুদর্শনের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি তাঁহাকে মনে মনে কামনা করিলেন এবং তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। তার পর এক দিন রাত্রিশেষে জগদম্বা শশিকলাকে স্বপ্নযোগে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর, সুদর্শন আমার ভক্ত—সে আমার কথায় তোমার সকল কামনা পূর্ণ করিবে। এক দিন রাজকন্যা উপবনে পুষ্পচয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন—এক ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে আগমন করিতেছেন। কৌতূহলবশতঃ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি কোন্ দেশ হইতে আসিতেছেন। উত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, তিনি ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম হইতে আসিতেছেন। শশিকলা বলিলেন, সেই আশ্রমে অলৌকিক ও অবর্ণনীয়, বিশেষতঃ দেখিতে অতি সুন্দর এমন কোন বস্তু আছে কি? ব্রাহ্মণ বলিলেন, সেখানে ধ্রুবসন্ধি নৃপতির সুদর্শন নামক পুত্র আছেন। তিনি পুরুষমধ্যে পরম সুন্দর—যে ব্যক্তি রাজকুমার সুদর্শনকে দেখে নাই, তাহার লোচন নিতান্ত নিষ্ফল। কল্যাণি! আমার মনে হয়, বিধাতা সকল গুণের আকর দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া সমস্ত গুণই কুমারে একাধারে নিহিত করিয়াছেন। এই কুমারই তোমার

যোগ্য পতি। আমার মনে হয়—বিধাতা নিশ্চয়ই মণি-কাঞ্চনের ন্যায় তোমাদের মিলন স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

ইহার পর কাশীরাজ শশিকলার পতি-নির্বাচনের নিমিত্ত স্বয়ংবর-সভার উদ্যোগ করিলেন। শশিকলা নিরুপায় হইয়া গোপনে সুদর্শনকে দেবী ভগবতীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানাইয়া তাঁহার পাণিপ্রার্থিনী হইলেন। অতঃপর শশিকলা স্বয়ংবর-সভায় কামুক নৃপতিদের সম্মুখে যাইতে অস্বীকার করিয়া সুদর্শনকে বিবাহ করিলেন। ইহাতে যুধাজিৎ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যান্য রাজগণের সহিত সুদর্শনকে আক্রমণ করিলেন। দেবীর প্রসাদে সুদর্শন রাজগণকে পরাস্ত করেন এবং যুধাজিৎকে নিহত করিয়া অযোধ্যা অধিকার করেন।

## দুর্গামূর্তি

আমাদের শাস্ত্রে দুর্গাদেবীর মূর্তির বর্ণনা আছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারতীয় মন্দিরসমূহে বহু প্রকারের দুর্গামূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্গার উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে হইলে বেদেই খুঁজিতে হইবে। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদে দুর্গার উৎপত্তির কথা আছে। অতঃপর দুর্গার পূর্ণ পরিণতির ব্যাপারের সন্ধান পুরাণে ও তন্ত্রে লইতে হইবে।

ঋগ্বেদের খিলসূক্তে সর্বপ্রথম আমরা দেবীর কথা পাই। ইহাতে দুইটী সূক্ত আছে—'দেবী-সূক্ত' ও 'রাত্রি-সূক্ত'। প্রাচীন আর্যগণ দেবী-সূক্ত বলিলে দুর্গাসূক্তই বুঝিতেন। রাত্রি-সূক্তে দুর্গার স্তুতি আছে। খিলসূক্তে রাত্রিদেবীই দুর্গার নামান্তর। ঋগ্বিধান-ব্রাহ্মণে ( ৪. ১৯ ) রাত্রিসূক্ত উচ্চারণ করিবার আদেশ আছে। রাত্রিদেবী ও দুর্গা অভিন্না। রাত্রিসূক্তে (ঋক্‌খিলসূক্ত ১.১২৭.৫) সুস্পষ্টভাবে দুর্গার উল্লেখ আছে—

> 'স্তোষ্যামি প্রযতো দেবীং
> শরণ্যাং বহ্বৃচপ্রিয়াম্।
> সহস্রসম্মিতাং দুর্গাং জাতবেদসে
> সুনবাম সোমম্।'
> 'তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
> বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
> দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
> সুতরসি। তরসে নমঃ।'— ঋক্‌খিলসূক্ত, ১. ১২৭. ১২ ;
> তৈত্তিরীয়-আরণ্যক, ১০. ২. ১ ; মহানারায়ণ-উপনিষৎ, ৬. ৩।

প্রাচ্যশাস্ত্রজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই বচনটীকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে চান। কিন্তু ইহা যে প্রক্ষিপ্ত নয়, তাহা তাঁহারাই অন্যত্র প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে এই পণ্ডিতেরা অতি প্রাচীন বলিয়াই মানিয়া লইয়াছেন। ইহার কোন অংশই যে প্রক্ষিপ্ত নয়,

একটী প্রাচীন শক্তিমূর্তি

তাহাও তাঁহারা বলিয়াছেন। কিন্তু এই আরণ্যকে ( ১০. ২১ ) এই সূক্তটী পুরাপুরি উদ্ধৃত হইয়াছে। তার পর মহানারায়ণ-উপনিষদের বচনগুলি যে খাঁটি উপনিষদ্‌বচন তাহাও কেহই অস্বীকার করেন না। কেহ কোন দিন এ-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশও করেন নাই। এই মহানারায়ণ-উপনিষদেও ( ৬. ৩ ) এই বচনটী সম্পূর্ণ স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু এই দুটী থেকে আমরা দুর্গামূর্তি কি রকম ছিল তাহার কোন ধারণাই করিতে পারি না।

তৈত্তিরীয়-আরণ্যক দুর্গাদেবীর একটী গায়ত্রী উপদেশ দিয়াছেন। সেটী এই—

'কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্য-
কুমারীং ধীমহি।
তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।' [১০.১.৭]

সায়ণ তাহার ভাষ্যে কাত্যায়নী দুর্গার আরাধনার কথা বলিয়াছেন—দুর্গার মূর্তি কনকোজ্জ্বল, তাঁহার ললাটদেশে অর্ধচন্দ্র বিরাজিত। কিন্তু এ ব্যাখ্যার কোন নজির না থাকায় এ-সম্বন্ধে কোন কথাই বলা চলে না।
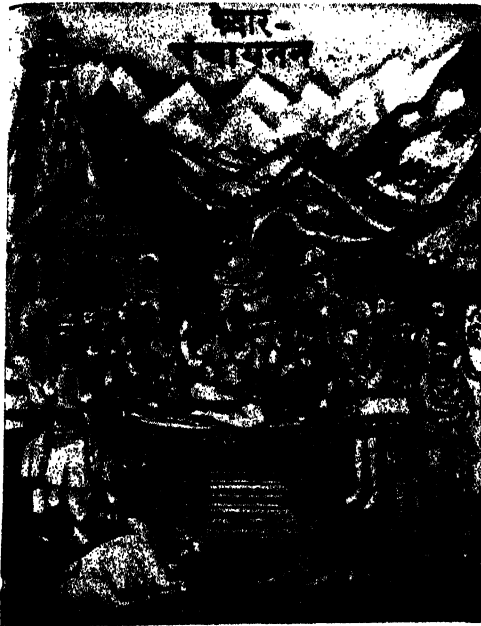
শিব-দুর্গা—কেদার-পঞ্চায়তন—কেদারনাথ

## মহাকাব্যে দুর্গা

রামায়ণে দুর্গামূর্তির কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু রামচন্দ্র দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন, ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা মহাভারতের বনপর্বে ২৮-৩০শ অধ্যায়ে পাই। ৩০ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, রামচন্দ্র নবরাত্র-ব্রত অনুষ্ঠান করিবার পর দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন।

মহাভাগবতে (৩৬-৩৮ অধ্যায়), কালিকাপুরাণ (৬০ অঃ) ও দেবী-ভাগবতে ( ৩য় সর্গ, ২৭-৩০ অঃ ) রামচন্দ্র-কর্তৃক দুর্গাপূজার ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থগুলি কিন্তু মহাভারতের বহু পরবর্তী। এগুলি হইতে বৈদিক দুর্গার কোন সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মহাভারতে দুর্গামূর্তি-পূজারও বর্ণনা আছে। যুধিষ্ঠির, অর্জুন প্রভৃতি দুর্গার আরাধনা করিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ মহাভারতে আছে। দুর্গোৎসব সে সময়ে প্রচলিত ছিল। যুধিষ্ঠিরের সময়ে বিন্ধ্যবাসিনী দেবী পূজিতা হইতেন।

দেবী যে দশভুজা, ষোড়শভুজা প্রভৃতি ছিলেন, পুরাণে ও তন্ত্রে দেবীর মন্ত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা দশভুজার পূজা করি। গোপীনাথ রাও, কৃষ্ণশাস্ত্রী প্রভৃতি মূর্তিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পুরাণ ও তন্ত্রবর্ণিত ধ্যানমূর্তির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। সেগুলির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মহাভারত-পাঠকালে দেবীর নানাবিধ মূর্তির আলোচনা করিতে করিতে আমি দেবীর একটী বিশেষ মূর্তির পরিচয় পাই। ১৩ বৎসর পূর্বে আমি তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। সে মূর্তির কথা পূর্বে কেহ উল্লেখ করেন নাই। এ-সম্বন্ধে আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। এখানে সেই প্রসঙ্গে কিছু বলিব।

## – ব্যাঘ্রাননা দুর্গা –
## ইজিপ্‌টে নবাবিষ্কার

কয়েক বর্ষ পূর্বে ইজিপ্টে এক দেবীমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। দুর্গামূর্তির সঙ্গে তাহার কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। মূর্তিটী সিংহোপরি দণ্ডায়মানা। এই দেবীর দুই দিকে দুইটী স্ত্রী-মূর্তি। দক্ষিণে একটী অতি সুন্দর পুরুষ-মূর্তি। এই মূর্তির চারি দিকে চালচিত্রের অনুরূপ পট আছে। এই মূর্তিটী দেখিলেই দুর্গামূর্তির কথা মনে আসে। কিন্তু এই মূর্তির মুখখানি ব্যাঘ্রের মুখের অনুরূপ। এই মূর্তির নিম্নদেশে একটী ছোট ক্ষোদিত লিপি আছে। Egyptologistগণ তাহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহাদের পাঠ-অনুসারে মূর্তির নিম্নদেশে যাহা ক্ষোদিত আছে তাহা 'দুগ্‌গম্মা'। দুগ্‌গম্মা সম্ভবতঃ 'দুর্গাম্বা' শব্দের অপভ্রংশ। 'অম্বা' শব্দের অর্থ 'মাতা'। সুতরাং দুর্গাম্বা বলিলে 'দুর্গামাতা' বুঝায়। যদি দুগ্‌গম্মা দুর্গা হন, তাহা হইলে স্ত্রী-মূর্তি দুইটী লক্ষ্মী ও সরস্বতীর হওয়া সম্ভব। পুরুষ-মূর্তিটী ৪৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের।

## পুরীতে দুর্গা

অনেকেই পুরীতে দুর্গোৎসব দেখিয়া থাকিবেন। আমিও অনেকবার সেখানে দুর্গোৎসব দেখিয়াছি। প্রাচ

১৬ বৎসর পূর্বে পুরীতে আমার সম্মুখ দিয়া কয়েকখানি দুর্গামূর্তি বিজয়া-দশমীর দিন বিসর্জনের জন্য যাইতেছিল। সেগুলি আমাদের বাঙলাদেশের মূর্তির মত। কিন্তু আমি তন্মধ্যে তিনখানি মূর্তি দেখিলাম ব্যাঘ্রাননা দুর্গার। পথে অনেককেই জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাঘ্রাননা দুর্গা হইবার কারণ কি? কেহই সদুত্তর দিতে পারিল না। শেষে একটী বৃদ্ধ আমাকে বলিলেন, দেবীর ব্যাঘ্রাননা মূর্তিই আসল মূর্তি, হালে অন্য সব মূর্তির চলন হইয়াছে। তাঁহারা ছেলেবেলা থেকে ব্যাঘ্রাননা মূর্তিই দেখিয়া আসিতেছেন।

## বিন্ধ্যাচলের দুর্গামূর্তি

ফিরিবার পথে বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী-মূর্তিই আমার মনে পড়িল। তাঁহার মূর্তি ভীষণা—তিনিও ভয়ঙ্করী ব্যাঘ্রাননা।

## মহাভারতের ব্যাঘ্রাননা

এই ব্যাঘ্রাননা দুর্গার উল্লেখ মহাভারতে আছে। মহাভারতে অর্জুন-কর্তৃক উচ্চারিত দুর্গার স্তব হইতে তাহা জানা যায়। এই স্তবে অর্জুন মন্দারবাসিনী সিদ্ধসেনানীর ধ্যান করিয়াছেন—কুমারী, কালী, কপালী, কপিলা, কৃষ্ণপিঙ্গলার ধ্যান করিয়াছেন, আর করিয়াছেন উমা শাকম্ভরীর ধ্যান। সঙ্গে সঙ্গে করিয়াছেন—কৌশিকীর ধ্যান।

'মহিষাসৃক্‌প্রিয়ে নিত্যং কৌশিকি পীতবাসিনি।
অট্টহাসে কোকমুখে নমস্তেস্তু রণপ্রিয়ে।'

এই শ্লোকটী ভীষ্মপর্বের ২৩ অধ্যায়ের। 'কোক' শব্দের অর্থ বৃক, ব্যাঘ্র। কোক শব্দের অন্য কোন অর্থ এখানে হয় না। কোক অতি প্রাচীন শব্দ। বেদেও ইহার প্রমাণ আছে। ঋগ্বেদ ৭.১০৪.২২; অথর্ববেদ ৫.২৩.৪ ইত্যাদি মন্ত্রে কোক শব্দ আছে। এই শব্দের বৈদিক অর্থ—অতি ভীষণ জন্তু, ব্যাঘ্র হওয়া অসম্ভব নয়।

তিব্বতে কালীর মত বহু মূর্তি আছে। এই সকল মূর্তির মধ্যে ব্যাঘ্রের মুখওয়ালা মূর্তিও আছে। Foucher-এর Iconographie Boudhique-এ এই রকম মূর্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। কাঙড়া-চিত্রকলায় মহাকালের মূর্তি আছে। মহাকালের এই চিত্র বিষ্ণু ও শিবের সম্মিলিত মূর্তি। এই মহাকালের মুখ বাঘের। শিব ও দুর্গার সঙ্গে বাঘের কি কোন সম্পর্ক আছে? শিব পরেন ব্যাঘ্রচর্ম, আর দুর্গা ব্যাঘ্রাননা। সাঁওতাল ও অসভ্য-জাতিরা বাঘের পূজা করে। মির্জাপুরে ব্যাঘ্রেশ্বরের পূজা হয়। রাজপুত ও ভীলেরা আপনাদিগকে ব্যাঘ্রের সন্তান বলিয়া দাবী করে।—Crooke, ii. 211. ব্যাঘ্রবংশের উৎপত্তির কথার সঙ্গে শিবদুর্গার কাহিনী জড়িত আছে। নেপালে বাঘযাত্রা খুব বড় উৎসব।
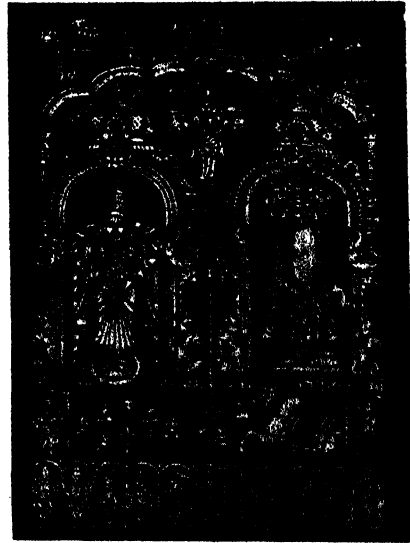
মাদুরায় শিব ও দুর্গা

## শিলালিপিতে দুর্গা

৬৮৭ বিক্রমাব্দে বর্মলাটের বসন্তগড় শিলালিপিতে দুর্গার সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়। তার পর ৯৯১ শকের বনপাতের দীর্ঘাসি-লিপিতে দুর্গার মন্দিরের উল্লেখ আছে। লিপিটী তেলেগু অক্ষরে ক্ষোদিত। ইহা অনন্তবর্মার সময়ের। গঞ্জাম জেলার কলিঙ্গপটমের ৪ মাইল উত্তরে দীর্ঘাসি অবস্থিত। দীর্ঘাসি গ্রামের সীমান্তে একটী ছোট পাহাড় আছে। এই পাহাড়কে লোকে 'দুর্গামাতা' বলে। এখানে মন্দিরের বহু ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের কাছে

পাথরের দুর্গা, নন্দি ও লিঙ্গও পাওয়া যায়। একটা ছোট গুম্ফা আছে, সেখানে আজও দুর্গামূর্তির পূজা হয়।

## প্রসিদ্ধ দুর্গামন্দির

ভারতে দুর্গামন্দিরের অভাব নাই। কয়েকটী প্রসিদ্ধ মন্দিরের নাম করিতেছি। দক্ষিণভারতে কৃষ্ণা জেলার বন্দর তালুকে তলগদদেবীর নিকট একটী গ্রাম আছে—নাম গণপেশ্বরম্। এখানে 'দুর্গাম্বা' মন্দির আছে।

দেওগড়ে তিনটী দুর্গামন্দির আছে।

বারাণসীর দুর্গামন্দির শিল্প-নৈপুণ্যে খুব সাদাসি রকমের। মারাঠারা ১৭শ শতকে এই মন্দির তৈরী করেন

বেহারে হাজারিবাগ জেলায় কালুহা পাহাড়ের উপ 'কুলেশ্বরী' নামে দুর্গার মন্দির আছে। এখানে আশ্বি আর চৈত্র মাসে মেলা হয়।

গোয়ালপাড়া জেলায় হাবড়াঘাট পরগনায় তক্রেশ্বরী উপরে একটী দুর্গামন্দির ছিল। ১৮৯৭ সালে ভূমিকম্পে সেটী নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আদ্যা শক্তি—নেপাল

যবদ্বীপে দুর্গা

অজয়গড়রাজ্যে গঞ্জ হইতে এক ক্রোশ দূরে নাচনায় দুটী দুর্গামন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। মন্দিরটী খুব প্রাচীন—গুপ্ত যুগের—৪র্থ-৫ম শতকের।

উত্তর-ভারতে শ্রীনগর হইতে প্রায় ১৯ মাইল দূরে পয়েচ নামে একটী ছোট গ্রাম আছে। এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা প্রভৃতির মূর্তি কয়েকটী প্রাচীন মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। Cunningham বলেন, এগুলি নরেন্দ্রাদিত্যের সময়ের (৪৮৩-৪৯০ খ্রীস্টাব্দে)।

## নেপালে দুর্গা

নেপালীরা বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম বেশ উদারভাবে মিলাইয়া-মিশাইয়া লইতেছে। তাহাদের 'নেপাল-মাহাত্ম্য' নামে এক খানি ধর্মগ্রন্থ আছে। ইহাতে লেখা আছে—বুদ্ধকে পূজা করিলে শিবকে পূজা করা হয়। এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধ ও হিন্দুরা একই দেবতাকে বিভিন্ন নামে পূজা করে। নেপালে দুর্গা ও আদি বুদ্ধ অভিন্ন বলিয়া পরিচিত।

আবার দুর্গাকে প্রজ্ঞাপারমিতার অবতার বলা হইয়া থাকে।

### যবদ্বীপে দুর্গা

যবদ্বীপে প্রম্বমে আটটী মন্দির আছে। তাদের চারটী ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু ও নন্দীর। শিবের মন্দির সকলের চেয়ে বড়। ইহাতে চারটী মন্দির আছে—শিবের দুটী (একটী মহাদেবের, আর একটী গুরুর) আর দুইটী দুর্গা ও গণেশের।

সিঙ্গসিরি-মন্দিরের এক দিকে প্রজ্ঞাপারমিতা, মঞ্জুশ্রী ও তারার মূর্তি, আর অপর দিকে লিঙ্গ, শিব, দুর্গা ও ব্রহ্মার মূর্তি। যবদ্বীপের দুর্গামন্দিরগুলি একেবারে অন্য রকমের। হিন্দু-মন্দিরে যেমন দুর্গাকে ভক্তিভরে পূজা করা হয়, এ মন্দিরগুলিতেও দুর্গাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা হয়। তবে মন্দিরগুলি দুর্গার নামে উৎসর্গীকৃত নয়—ভূত-যোনির নামে উৎসৃষ্ট।

### জাপানে দুর্গা

স্ত্রী-সম্রাট্ সিন্‌কোর রাজকালে (৫৯৩-৬২৮ খ্রীঃ), জাপানে বৌদ্ধধর্ম-প্রবর্তনের প্রায় ৪০ বৎসর পরে 'কন্নোন' নামক দেবতার পূজা প্রবর্তিত হয়। ইনি করুণাদেবী—চীনাদের 'কুয়ন্-য়িন্' দেবতা হইতে অভিন্ন। কুয়ন্-য়িন্ অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্যন্তর। জাপানীদের সাতটী কন্নোন দেব একটী দেবী আছে। এই দেবীকে তাহারা জুন্-তেই-কন্নোন বলিয়া থাকে,—সংস্কৃতে 'চুন্তী'। জাপানীরা ইহাকে কোটীশ্রীও বলে—সপ্তকোটিবুদ্ধমাতৃ-চুন্তীদেবীও বলে আবার শুধু চুন্তীদেবীও বলে। জাপানীরা ইহাকে ৭০,০০০ বুদ্ধের মাতা ও দুর্গাদেবীর সহিত অভিন্না বলিয়া বিশ্বাস করে। আমার মনে হয়, চুন্তী=চণ্ডী=দুর্গা।

### কম্বোজ ও চম্পায় দুর্গা

কম্বোজ ও চম্পায় খ্রীঃ ৫ম শতকে হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। এখানকার অধিবাসীরা খুব সভ্য। এ সময় বৌদ্ধ প্রভাবও এখানে ছিল। অধিবাসীরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী প্রভৃতির পূজা করিত। শিব তাঁহাদের সকলের বড় দেবতা, দুর্গা তাঁহার দেবী। এই দুই দেবতার প্রতি তাহাদের অসীম শ্রদ্ধা-ভক্তি।*

* মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার যাবতীয় দুর্গা-সম্বন্ধীয় সংগ্রহ একত্র করিয়া নূতনভাবে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই গবেষণার যেটুকু পাণ্ডুলিপি তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার একাংশ এখানে প্রকাশিত হইল।—প্রবর্ত্তক-সম্পাদক।

# আগমনী

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন,
নিত্যা হ'য়ে রইবি ঘরে হবে না তোর বিসর্জ্জন।
সকল জাতির পুরুষ নারীর প্রাণ
সেই হবে তোর পূজাবেদী মা তোর পীঠস্থান,
(সেথা) শক্তি দিয়ে, ভক্তি দিয়ে
পাতব মা তোর সিংহাসন।
(সেথা) রইবে নাকো ছোঁয়াছুঁয়ি উচ্চনীচের ভেদ
সবাই মিলে উচ্চারিব মাতৃনামের বেদ।
(মোরা) এক জননীর সন্তান সব জানি
ভাঙ্‌ব দেয়াল ভুল্‌ব হানাহানি,
দীন দরিদ্র রইবে না কেউ সমান হবে সর্ব্বজন,
বিশ্ব হবে মহাভারত, নিত্য প্রেমের বৃন্দাবন।

# শীতলবালার সংবাদ

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

বাপ মা নাম রেখেছিল শীতলবালা; কিন্তু বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ীর লোকে একটু হেসে শীতলবালা নাম বদ্‌লে নাম রাখ্‌ল' সুহাসিনী।

বাপ মায়ের প্রাণে প্রবল কন্যাতৃষ্ণা ছিল—তিন ছেলের পর মেয়ে হ'লে সে-তৃষ্ণা শীতল হ'ল বলে' তারা মেয়ের নাম রাখ্‌ল' শীতলবালা—তা' সম্ভব। আবার এটাও সম্ভব যে, শীতলবালা শৈশবে বড় শান্ত ছিল—কান্নাকাটি ছিল খুবই কম—ক্ষিদে' পেলে কেবল একটু হাঁ হুঁ করে' দুঃখ জানাত'। তা'-ই তার মা তার নাম রেখেছিল ঠাণ্ডামণি। তার বাপ চিন্তামণি মেয়ের ঠাণ্ডামণি নাম পছন্দ করল' না; বল্‌ল, "ঠাণ্ডামণি নাম কি এ-ঘরে চলে! তুমি যদি ঠাণ্ডাই চাও তবে শুদ্ধ ভাষায় নাম রাখো। শীতলবালা নামটি মন্দ নয়"। তখন থেকে ঠাণ্ডামণি হ'ল শীতলবালা।

তারপর শ্বশুরালয়ে এসে শীতলবালা হ'ল সুহাসিনী। শীতলবালা নাম সে-ঘরে চল্‌ল' না। কিন্তু শীতলবালার হাসি দেখে' তার সুহাসিনী নামটা মনে হয় ঠাট্টা। হাস্‌লে' তার দন্তমাংস বেরিয়ে পড়ে—মাড়ি কালো হ'লে দেখ্‌তে খুবই খারাপ হ'ত, কিন্তু তা' লাল বলে' সাদা দাঁতের সংযোগে দৃশ্য কিছু সংশোধিত হয়েছে। তবু হাসির শোভা তেমন ফোটে না যেমন করে' ফুট্‌লে নাম রাখা যায় সুহাসিনী। শীতলবালা তা' জানে কিনা কে জানে, কিন্তু স্বাধীনা হ'য়ে সে সুহাসিনী নাম নাকচ করে' পুনরায় শীতলবালা নামটি চালিয়ে দিল। ভাড়াটে'কে যে রসিদ দিতে হয়, তা'তে সে নাম ছাপাল শ্রীশীতলবালা দাসী। রসিদ কেন লোককে দিতে হবে সে-কথা আস্‌বে পরে।

শীতলবালার বিয়ে হয়েছিল কালীচরণ দত্তর সঙ্গে। কিন্তু শীতলবালা চিরকালই স্বাধীনা, অর্থাৎ তার মতেই স্বামীর মত, স্বামীর মতে তার মত নয়। কালীচরণের অনুজ করালীচরণ এখন বিদেশে কাজ করে—এদিকে বড় আসে না। দাদার সঙ্গে তার প্রণয় ছিল না।

শীতলবালার 'সন্তানাদি' নাই; তার গর্ভের ছ সন্তানের একটি সন্তানও একদিন কি দু'দিনের বে জীবিত থাকে নাই। কি দোষে এমন ঘট্‌ছে তা' বুঝ না পেরে অবাক্ অবস্থাতেই শাশুড়ী মারা গেছেন- তারপর মারা গেল কালীচরণ। মারা যাবার পূ শাশুড়ী শীতলবালার ঐ দোষের চিকিৎসা, এ নিরাকরণের উদ্দেশ্যে দৈবশক্তির আবাহন করেছিে বহু, অর্থাৎ মাদুলী ধারণ করতে দিয়েছিলেন ঢে কিন্তু চাঁদ ধরতে হাত বাড়ানোর মতো সেই চিকিৎ এবং মাদুলী নিষ্ফল হয়েছে। তাঁর মানত্ মানতই র' গেছে চিরকাল।

কালীচরণ কাজের লোক ছিল—সে গ্রামে গ্রা বাসন ফেরি কর্‌ত, এবং তার সঙ্গে কর্‌ত চোরাই বাস সংগ্রহ। সদর দরজা দিয়ে যে পরিমাণ টাকা আস্‌ত খিড়কি দিয়ে আস্‌ত' তার অনেক বেশি। কাজে মৃত্যুকালে বয়স খুব পরিপক্ক না হ'লেও কালীচরণ রে গেছে বেশ; স্মরণ করে' সুখ আছে যে, স্ত্রীকে পরাধী করে' রেখে যাওয়ার নিদারুণ অপরাধ সে ক যায় নাই। নগদ টাকার হিসাবে কাজ নাই; কি শীতলবালা একটা বাড়ী যা' পেয়েছে তা' বেশ জুত্‌স করে' তৈরী। —অল্প টাকায় যারা ভাড়ার বাড় খোঁজে—তাদেরই মনের মতন। কালীচরণের অক্ষ কীর্ত্তি সেটা।

একটা বাড়ীকে চমৎকার কৌশলে চার ভাগ কর হয়েছে। মাঝখানে উঠান রেখে' সাম্‌নাসাম্‌নি সুবৃহ একই রকমের দু'খানা ঘর—প্রত্যেক ঘরে দু'টি করে কুঠরি—এই কুঠরি দু'টিই ভাড়াটে'র বাসের ঘর একখানা ঘরের লম্বা একটানা বারান্দাকে এবং উঠানকে দুই ভাগে ভাগ করে' প্রাচীর গিয়ে উঠেছে অপর ঘরখানা বারান্দায়। আর একটা প্রাচীর উঠানকে আবার ভা করেছে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীরটার সঙ্গে দু'দিক থেকে সমকো মিলিত হ'য়ে। উঠানের ঠিক্ মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড ইঁদারা-

প্রাচীর দু'টি ইঁদারা পার হ'য়ে তাকেও চার অংশে বিভক্ত করেছে—

প্রত্যেকের জন্যই রান্নাঘর নয় রান্নার স্থান দেওয়া আছে ; ঘরে বড় বড় জানালা আছে ; প্রত্যেক ভাড়াটের বাইরে বেরুবার দরজা আলাদা ; ড্রেনের এম্‌নি সুবন্দোবস্ত যে, কারো বাড়ীর জল কারো বাড়ী যায় না—আগাগোড়া সিমেণ্ট দিয়ে পাকা আর মজবুত করা……

কিন্তু ভাড়া মাত্র সাড়ে সাত টাকা প্রত্যেক অংশের —অংশ আবার নম্বর দিয়ে চিহ্নিত—১নং, ২নং, ৩নং, ৪নং। চার অংশেই ভাড়া বসে' গেলে শীতলবালার মাসিক আয় তা' থেকেই ৩০৲।

সাড়ে সাত টাকা ভাড়া প্রত্যেকেরই দেয় ; কিন্তু একদিন ৩ নম্বরের এক ভাড়াটে' বড় তর্ক তুল্‌ল' ; বল্‌ল', দক্ষিণদ্বারী ঘরের যে-ভাড়া, উত্তরদ্বারী ঘরের সে ভাড়া হ'তেই পারে না। পূর্ব্বে, অর্থাৎ মুসলমান আমলেও, ঘর উত্তরদ্বারী হ'লে তার খাজ্‌নাই লাগত' না—এখন স্থানাভাব বশতঃই নাচার হ'য়ে উত্তরদ্বারী ঘরেও বাস করতে হ'চ্ছে।—বলে' সে শীতলবালাকে সে ভেবে' দেখ্‌তে অনুরোধ কর্‌ল'……

ভেবে' দেখে' শীতলবালা উত্তরদ্বারী ঘরের ভাড়া কমিয়ে করল ৭৲ এবং দক্ষিণদ্বারী ঘরের ভাড়া বাড়িয়ে কর্‌ল ৮৲। ১নং এবং ২নং-এর কারো আপত্তি সে শুন্‌ল' না।

শীতলবালা লোকটি বেশ—বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি সে নিজে করে না—কোথাও হ'লে সে বিরক্তই হয় ; ন্যায়ের ভয়ঙ্কর পক্ষপাতী সে—ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করতে যদি গোল বাধে তা'তে সে পিছ্‌পা হবে না। ৩৫-এর বেশি তার বয়স নয় ; বিধবা হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই সে মোটা হ'তে সুরু করেছিল—ইদানীং মেদ খানিক কষ্টকরই হ'য়ে উঠেছে—পিঠে মাংসের ভাঁজ পড়েছে। এলানো চুলের সৌখিনতা কিংবা কবরী-রচনা পতিশোকাতুরার শোভা পায় না বলে' সে চুল খুব খাটো করে' কেটে' ফেলেছে। পাড়ার ভিতর ঘোমটা দেওয়ার দরকার আছে বলে সে মনে করে না, এবং ঘামাচির যন্ত্রণা হয় বলে' গরমের দিনে পিঠে সে কাপড় রাখে না। তার খাটো চুল, আর, কালো মাংসল পিঠে কাপড় নাই দেখে' তা'কে নিষ্ঠাবতী, প্রকৃতভাষিণী আর দুর্জ্জয় মনে না করে ভাড়াটের ভিতর স্ত্রী-পুরুষ এমন কেউ নাই।

শীতলবালা ভাড়াটেদের কাছে অবাধে যাতায়াত করে, কিন্তু বসে না প্রায়ই ; দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করে, খবর কি তোমাদের ?

বউয়েরা কৃতার্থ হয়ে বলে, খবর ভালোই একরকম…

শুনে' শীতলবালা বলে, খবর ভাল হ'লেই ভাল। কিন্তু ব্যাপার কি বল ত' ?

৩নং-এর ছোট্ট বউটি চম্‌কে' ওঠে : কি বল্‌ছেন, মাসিমা ?

—ছেলেটার নাকে পোঁটা ঝুল্‌ছে, মুখে ঢুক্‌ছে পোঁটা —দেখো না কেন ?

বউটি লজ্জিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি ছেলের মুখ পরিষ্কার করে' দেয়।

তাকে লোকে সমীহ করুক, সেদিকেও তার লক্ষ্য যথেষ্ট।

একবার এক ভাড়াটে' এল—দুই ভাই, এক বউ আর এক মাস্‌শাশুড়ী।

তাদের ১ নম্বরে একদিন তুমুল হাসির শব্দ শুনে' শীতলবালা এল দেখ্‌তে। দেখ্‌ল, দেওরটি তার বউদির হাতের মুষ্টি খুলে' কি একটা জিনিস হস্তগত করবার চেষ্টা করছে খুব—বাঁ হাতে বউদির কব্‌জি ধরে' টান্‌ছে, আর, ডান হাতে কাট্‌ছে বউদির মুষ্টির উপর চিম্‌টি—হু-হু, হা-হা হাসি চল্‌ছে বেজায়……

দেওর বল্‌ছে, দাও শীগ্‌গির—

বউ বল্‌ছে, কিছুতেই দেব না।

টানাটানিতে বউটির চুল গেছে খুলে', মাথার কাপড় গেছে পড়ে' এবং আঁচল গেছে মাটিতে লুটিয়ে… …

দেখে' শীতলবালা থম্‌কে' দাঁড়াল'—জিজ্ঞাসা কর্‌ল', ব্যাপার কি তোমাদের ?

দেওর বল্‌ল,—চিঠি দেখ্‌ব। দাদার হাজারখানেক চিঠি আছে বৌদির বাক্সে…

বউটি বল্‌ল,—দেখুন ত' অত্যাচার! আমার চাবি কেড়ে' নিয়ে ও বাক্স খুল্‌বে। কত বড় ফাজিল দেখুন!

তারপরই কাড়াকাড়ি বন্ধ হ'ল—দু'জনাই হাঁপা'তে লাগ্‌ল···

শীতলবালা বল্‌ল,—তোমার দেওরটি ত' ছোট নয়, তুমিও বুড়ো হওনি'। অত ইয়ারকি ভদ্দর ঘরে ভাল নয়। বাবু আসুক, বল্‌ব'। শ্বাউড়ী কোথা' তোমার ?

বউটি খুব থতমত খেয়ে গেল, বল্‌ল,—নাইতে গেছেন পুকুরে।

—হুঁ।

কেবল ঐ একটি শব্দ উচ্চারণ করে' শীতলবালা চলে' এল। কত অর্থ যে ঐ "হুঁ" শব্দটির, তা' ওরা দু'জনাই উপলব্ধি করে' ভারি ভয় পেল'।

শীতলবালার একটি মহৎ গুণ এই যে, এ-র কথা ও-র কাছে সে বলে না—এ-র নিন্দা ও-র কাছে করে না—ভাড়াটেদের ভিতর ঝগড়ার কারণ ঘটলে তৎক্ষণাৎ বাধা দেয় কিংবা প্রতিকার করে।

একবার গোলমাল হ'ল চিঠি নিয়ে।

ভাড়াটে'দের চিঠি আসে "শ্রীমতী শীতলবালা দাসীর বাড়ী", এই ঠিকানায়। কিন্তু নূতন পিওন জানে না, কোন্ নামের লোক শীতলবালা দাসীর কোন্ বাড়ীতে বাস করে। আগেকার পিওন ঠিক্ ঠিক্ দিত, এই নূতন লোকটি খোলা দরজা দিয়ে চিঠি ফেলে' দিয়ে যায়—কার চিঠি কার হাতে পড়ে তার ঠিক থাকে না। তা-ই নিয়ে বাধ্‌ল' একদিন গোলমাল। একজনের একখানা দরকারী চিঠি বিলি হ'ল, অর্থাৎ পিওন দিয়ে গেল অন্য বাড়ীতে, বেলা দশটায়। তারা সেই চিঠি তাদের নয় বলে' আসল লোকের হাতে দিল বৈকাল পাঁচটায়। সঙ্গে সঙ্গেই চিঠি কেন দেওয়া হয় নাই এই নিয়ে সুরু হ'ল বচসা, আগে অল্প স্বল্প, তারপর জোরে জোরে আর অনর্গল......

যার চিঠি সে বলল, চিঠি আটুকে' রেখে লাভটা হ'ল কি ?

অপর পক্ষ বল্‌ল, লাভ-লোকসানের কথা কেন বলছেন ? আর যদি ঝগ্‌ড়াই করেন তবে বল্‌ব, চিঠি বিলি করার দায় কি আমাদের ? আমাদের নয় বলে' যে ছিঁড়ে ফেলে' দেইনি' এ-ই যথেষ্ট।

—ভদ্রতার জ্ঞান অল্পই দেখ্‌ছি।

—উঃ, কি রাজরাজেশ্বর লোক উনি। সকালের চিঠি বিকেলে পেয়ে ওঁর রাজত্বের এক কোণা ধসে' গেছে একেবারে···

এবং আরো অনেক কথাই দু'পক্ষ বল্‌ল'।

শীতলবালা দৌড়ে এল ; তাদের থামিয়ে দিল ; এবং সেইদিনই নিজের বাইরের দরজায় দিল চিঠির বাক্স বেঁধে, নিজের খরচে। সেই বাক্সে লাগিয়ে দিল তালা, আর চাবি রাখলে' নিজের কাছে। ঠিক সাড়ে দশটার সময় শীতলবালা সেই বাক্স খুলে' যার চিঠি তাকে, কিংবা তার বাড়ীতে দিয়ে আসে।

৫।৭ বৎসর এই বন্দোবস্ত চলে' আস্‌ছে ; আর গোল বাধে নাই।

কিন্তু ভিতরে গোল আছে—পোষ্টকার্ডের চিঠিগুলি শীতলবালা দেওয়ার আগে পড়ে। খামের চিঠি খুলে' ফেলার লোভ হয় খুব—কিন্তু লোভ সে দমন করে, কাজটা নেহাতই অন্যায় বলে' নয়, ধরা পড়ার ভয়ে। খোলা খামের মুখ জোড়া মুশ্‌কিল—আর, বাক্সের চাবি থাকে তারই কাছে ; গাপ করলে পরে লোকে খোঁজ যদি করে। সুতরাং কাজ নাই।

কিন্তু যে অমূল্য রসের সন্ধানে শীতলবালা পরের চিঠি পড়ে সে-রস মেলে কই ! সর্দ্দিজ্বর, পেটের অসুখ, গরম মাড় পড়ে' হাতে ফোস্‌কা পড়েছে, ইত্যাদি তুচ্ছ খবর শত শত—খবরের মতো খবর কই আর আসে !···বাড়ীর ওদিকে রয়েছে রাসবিহারী স্যাক্‌রা, প্রাণকেষ্ট নাপিত, নন্দেরচাঁদ ঘোষ, তার দক্ষিণে ভূপতি কবিরাজ, কলের গানের এজেন্ট কার্ত্তিক দত্ত, ইত্যাদি—আর রয়েছে ভাড়াটেরা চার ঘর। সবাই বিদেশী ; কিন্তু তেমন খবর কারুরই আসে না···

ভাল আছি, কেমন আছ ? অমুকের জ্বর হয়েছিল, অন্ন পথ্য করেছে, অমুকের বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে,

ইত্যাদি নেহাত পান্‌সে মামুলি খবর লোকে পয়সা খরচ করে' দিচ্ছে !

একবার এক ভাড়াটে এল, ছোট্ট একটি ছেলের যকৃৎ-ঘটিত অসুখ সারা'তে। বৌটিও রোগা। সে পেরে' ওঠে না দেখে শীতলবালা এগিয়ে এল—যথাসাধ্য শুশ্রূষা করে', নিজের খরচে পথ্য জুগিয়ে ছেলেটিকে সুস্থ করে' তুল্‌ল'—একদিনও কামনা করল' না যে, খবর খারাপ হ'য়ে উঠুক চোখের উপরেই। মৃত্যুর প্রকৃত অবস্থা চোখে দেখা শীতলবালার মেজাজে সয় না।

কিন্তু চিঠিতে কেন অবিরাম কুশল সংবাদই আসে! শীতলবালার ভালো লাগে না···

খবর এসেছিল একবার সেই কতদিন আগে—বছর দুই আগে; কিন্তু এখনো তা' শীতলবালার জাজ্বল্যমান মনে আছে। সংবাদবাহী পত্রখানা বউটির হাতে এনে দিয়েছিল সে নিজেই। তারই ভাড়াটে', একটি যুবক, তার যুবতী স্ত্রী, আর তাদের একটি শিশু সন্তান—শীতলবালা তা' চোখেই দেখে; এবং বউটির মুখে শুনেছে যে, বউটি মামার বাড়ীতে মানুষ, বাপ মা, ভাই বোন্, খুড়ো জ্যাঠা, কেউ নাই; মামাই তার বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেটি ভালো—এক পয়সা পণ নেয় নাই। তারও এক খুড়ো বই কেউ নাই। খুড়ো অন্ধ; আর, খুড়োর নাবালক ছেলেরা বড়লোক ভগিনীপতির সাহায্যপ্রার্থী, অর্থাৎ ভগিনীপতি পাঁচ দশ টাকা পাঠালে তবে তাদের তেল নুনের খরচ চলে—ধান এবং অন্যান্য ফসল জমি থেকে কিছু কিছু পাওয়া যায়; কিন্তু সে-পাওনাও দিন দিন কমে' আস্‌ছে·

এই রকম অবস্থায় ভগবান্ মুখ তুলে' চেয়েছেন—অনেক চেষ্টায় ছেলেটি আদালতে শিক্ষানবিস্ হয়েছে—মাইনে ৩৫৲।

এখন ওরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে সুখেই আছে—আর, ছেলেটি হয়েছে···

বলে' বউটি তৃপ্তিভরে হাসে—

শীতলবালা বলে, ভগবান্ আছেন, মা; বেঁচে' বর্ত্তে' থাক্‌...

বউটি বলে, যেমন অদৃষ্ট, মা, সুখের কথা ভাবতেই আমার ভয় হয়।

শীতলবালা বলে, তোমাকে ভূতে ধরে' আছে।

—কেন, মা?

বউটীর মুখের 'মা' শব্দটির উচ্চারণ ভারি মধুর।

শীতলবালা হেসে' বলে,—তা' নয়তো কি! দুঃভাবনার কারণ নেই, অথচ তোমার দুঃভাবনা ঘুচ্‌ছে না—দুঃভাবনার ভূত তোমার ঘাড়ে চেপে' আছে। আমি হ'লে মোটেই ভাবতাম না।

বধূটিকে ঠিক মা জেঠীর মতো ভর্ৎসনার সুরে সান্ত্বনা দিয়ে আর সাবধান করে' দিয়ে শীতলবালা তাকে খুশী করে' তোলে।·· পিতৃকুলে শ্বশুরকুলে এর কেউ নাই; আত্মীয়তার বন্ধন-সুখ, প্রীতির পরিবেশন আর প্রীতি গ্রহণের প্রফুল্লতার অভাব এই বধূটি অনুভব করে; তবু স্বামীর প্রণয়-সুখে আর শিশুটিকে কোলে পেয়ে সে ধন্য বিভোর হ'য়ে আছে···

ছেলেটির নাম বনবিহারী।

কাছারী তিনদিন বন্ধ। বনবিহারী বল্‌ল', মাসিমা, আমি একবার দেশে যাব।

মাসীমা অবশ্য শীতলবালা—

শীতলবালা বল্‌ল', যাও বউয়ের খবরদারির কথা বল্‌ছ ত'? তা' বুঝেছি। আমি আছি। তোমার চাইতে ভালই পারব' তা'।

বনবিহারী বল্‌ল, কাকাকে দেখার জন্যে মনটা বড় চঞ্চল হয়েছে। বড় দুঃখী তিনি।

শীতলবালা বল্‌ল, তুমি যাও রাত্তিরে আমি এসে থাকব, যদি দরকার মনে করো!

শীতলবালার রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিশ্রুতিতে নির্ভয় হ'য়ে বনবিহারী অন্ধ কাকাকে দেখ্‌তে দেশে গেল···

কিন্তু যেদিন তার ফিরবার কথা সেদিন এল চিঠি: বনবিহারী সেখানে পৌঁছেই কলেরা হ'য়ে মারা গেছে।

চিঠির বাক্স খুলে' শীতলবালা পোষ্টকার্ডের চিঠি পড়্‌ল'—সংবাদ অবগত হ'ল। বেলা তখন সাড়ে দশটা প্রায়। যেন কিছুই জানে না, চিঠি সে পড়ে নাই, এম্‌নি নির্লিপ্তভাবে শীতলবালা চিঠিখানা বউটির হাতে দিতে নিয়ে এল·

রান্নার কাজ অনেক আগেই শেষ হ'য়ে গেছে—শিশুটি

বারান্দায় মশারির ভিতর ঘুমচ্ছে—বউটি স্নান করে' এসে নূতন করে' সিঁদুর পরেছে—মাজা মুখখানা ঝক্‌-ঝক্ কর্‌ছে—সিঁদুরের ফোঁটাটি ফুটে' আছে অতি উজ্জ্বল হ'য়ে, তার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী। অতুল অন্তরের অমলিন দীপ্তির মত ; ভিজে চুল সে পিঠের উপর এলিয়ে দিয়েছে···

শীতলবালা যখন চিঠি দিতে এল, তখন বউটি খেতে বস্‌বে—জল নিয়েছে গেলাসে, পিঁড়ে পেতেছে—ভাত বাড়তে যাবে···

শীতলবালার চিঠিখানা এগিয়ে ধরে' বল্‌ল, চিঠি আছে তোমার।

—দিন। বলে' বউটি হাসিমুখে হাত বাড়াল'···

হাত বাড়িয়ে শীতলবালার হাত থেকে চিঠিটা সে নিল ; এবং পড়ল'—

পড়ে' সে চেঁচিয়ে উঠল না—মুখ তার সাদা হ'য়ে গেল, থর্ থর্ করে' ঠোঁট কাঁপতে লাগল', তারপর কাঁপ্‌তে লাগল' তার সর্ব্বাঙ্গ, চোখ বন্ধ হ'য়ে গেল, চিঠি হাত থেকে খসে' মাটিতে পড়ল'···

পড়ে' যায় দেখে' শীতলবালা তাকে ধর্‌ল', ধরে' তার অসাড় দেহ আগে বসিয়ে দিল, তারপর শুইয়ে দিল···

ঐটুকুই মনে রাখার মত—শীতলবালার তা' মনে আছে। তারপর কি ঘট্‌ল' তা' অবান্তর প্রসঙ্গে দাঁড়িয়ে গেছে।

শীতলবালার মনে হয়, চিঠিতে খবর যদি আসে, তবে কিছুদিন পর ঐ রকম খবরই আসা উচিত—হাঙ্গামা নাই, কলরব নাই, ছুটাছুটি নাই, প্রস্তুত হওয়া নাই ; অথচ খবর এমনই যে, এক মুহূর্ত্তেই চৈতন্য হরণ করে' পাষাণ করে' দেয়—মর্ম্ম ভেঙে' আর রস নিংড়ে' মানুষকে চির-জীবনের মতো পঙ্গু, রিক্ত, অচল করে' তোলে···

তারই অভাবে শীতলবালার মনে হয়, পৃথিবীর স্বাদ নষ্ট হ'য়ে গেছে ; পৃথিবী যেন বদ্ধ জলের মত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে—তার ভিতর কেবল বুদ্বুদ উঠ্‌ছে—তুচ্ছ দৈনন্দিন ওঠা-বসা, কাজ-কর্ম্ম, নাওয়া-খাওয়া, দেওয়া-লওয়া, কথা-আলাপ ইত্যাদি। তা'তে রস কই ! নিশ্চল আবদ্ধ পৃথিবীতে ঝড় নাই, তরঙ্গ নাই—আকাশ ভেঙে' পড়ছে না—টলন নাই, দোলন নাই—

একি নীরস দুর্ব্বল স্তিমিত জীবন !

শীতলবালার বর্ত্তমান জীবন বড় একঘেয়ে—তার ভালো লাগে না।

শীতলবালা পাটি পেতে শোয়—শু'য়ে শু'য়ে ভাবে, সময় আর কাটে না যেন ; এমন করে' একই কথার পুনরাবৃত্তি, একই দৃশ্যের প্রাত্যহিক উদ্ঘাটন, একই তরকারী রোজ রোজ খাওয়ার মতো অরুচিকর নয়তো কি! অদৃষ্ট যেন আঘাত কর্‌তে আর দুঃখ দিতে ভুলে' গেছে !

কিন্তু পত্রের মারফৎ আঘাত একটা এল।

শীতলবালা ভাড়াটেদের বাড়ীর নম্বর দিয়েছে, ১ নং, ২ নং, ৩ নং, ৪ নং, তা' পূর্ব্বেই ব'লেছি। ৪ নম্বরে বাস করে হরেন সেন—সেই হরেন সেনের স্ত্রী বসন্তের নামে এল গুরুত্বপূর্ণ চিঠি। ওরা মাত্র দিন পাঁচেক হ'ল এসেছে। ৪।৫টি ছেলেমেয়ে নিয়ে বউটিকে ঝঞ্ঝাট পোয়াতে আর তাল সাম্‌লাতে হয় অনেক—তার মধ্যে একটার আবার 'সর্দ্দিকাশি গা গরম' লাগাই থাকে···তবু বউটি বেশ হাসিখুশির উপরেই আছে—

তারই নামে এল চিঠি।

বাক্স থেকে চিঠি বা'র ক'রে পড়্‌তে সুরু করেই শীতলবালা দেখ্‌ল', মৃত্যু-সংবাদই এসেছে :

"পরম কল্যাণীয়াষু,

মা, বসন্ত, অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, তোমাদের মাতাঠাকুরাণী গতকল্য আমাদের মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মাত্র চার দিন জ্বর রোগে ক্লেশ পাইয়া এবং শয্যাগতা থাকিয়া সজ্ঞানে ইষ্ট নাম স্মরণ করিতে করিতে পুণ্যবতী সতী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।" ইত্যাদি।

উপসংহারে পত্রলেখকের নাম নাই, কেবল পরিচয় দেওয়া আছে : "ইতি। আশীর্ব্বাদক তোমার বাবা।"

শীতলবালা চিঠি নিয়ে ৪ নম্বরে ঢুক্‌ল।

বসন্ত তখন ছেলেদের খাওয়াচ্ছে—হরেন বেরিয়ে

গেছে। ছেলেদের খাওয়ানো যে কি হুটোপুটি হুজ্জতের ব্যাপার তা' বসন্তই জানে। বসন্ত তখন যেমন সঙ্কটে পতিত তেম্‌নি ব্যস্ত...

"তোমার চিঠি এসেছে"—বলে' দরজা থেকেই চিঠি আসার খবর দিয়ে শীতলবালা অমায়িকভাবে এগিয়ে এসে কাছেই দাঁড়াল'—তার ডা'ন হাতে চিঠি রয়েছে।

বসন্ত তাকিয়েই হাতের লেখা চিন্‌ল'—

বল্‌ল, বাবার চিঠি। অনেক দিন পরে মনে পড়েছে...

—কিরে, তোরা এত উপদ্রব কর্‌ছিস্ কেন? খাবি, তা-ও সাধতে হবে, ধম্‌কাতে হবে! শীতলবালা ছেলেদের উদ্দেশ করে' ঐ কথা বল্‌ল, কিন্তু উদ্দেশ্য তার বুঝতে দেওয়া যে, চিঠির খবর সে কিছুই জানে না—জান্‌লে কি এমন উদাসীন থাকৃতে পারে!

শীতলবালাকে বসন্ত এঁটো-হাতে ছোঁবে না, শীতলবালা চিঠিখানা নামিয়ে দিল—বসন্ত বাঁ হাতে করে' তা' তুলে' নিল...আর, শীতলবালা হ'ল ভারি উৎসুক আর অবহিত—কি ঘটবে তা' ত' বুঝাই যাচ্ছে—তবু ঘটার সেই রকমটা খুবই দ্রষ্টব্য...

বসন্ত চিঠি পড়তে সুরু কর্‌ল'—

শীতলবালা রইল একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে, যেন ইহলোকের অনেক-কিছুই নির্ভর করছে ঐ চিঠি পড়ার ফলাফলের উপর।

চিঠি পড়তে পড়তে বসন্তের মুখখানা বিষণ্ণ হ'য়ে এল—আর কিছু না। চিঠি পড়া শেষ হ'ল; চিঠি নামিয়ে রেখে' সংবাদ জ্ঞাপনার্থে বসন্ত বল্‌ল—আমার সৎ মা মারা গেছেন। বড় কট্‌কটে' মুখরা মানুষ ছিল। বড় বড় বেটা আর বউ আর নাতি নাত্‌নী থাক্‌তে বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন একেবারে নাছোড়বান্দা হ'য়ে।... তিনিও বাঁচ্‌লেন আমরাও বাঁচলাম। বলে' বসন্ত বাঁচার সুখে একটু হাস্‌ল'...

কিন্তু শীতলবালার তৎক্ষণাৎ শাস্তি হ'ল খুব—এমন হতাশ সে জীবনে হয় নাই; এমন হতাশ সে হ'য়ে গেল যে তা' বল্‌বার নয়—হতাশার এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে তার ভুরু দু'টি কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল—তারপর সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল; একটি কথাও তার মুখে এল না।

# তোমার শোভে না পূজা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সেদিন বিগত হোলো, তবু তার স্মৃতি জাগে পুষ্প উপচারে,
এমনি শারদ প্রাতে সুরভি নিঃশ্বাসে ছিল বেদনা মন্থর।
মলিন আননে একা অশোক-কাননে সীতা মৌন অশ্রুভারে
ছিন্ন কুসুমের সম অন্ধকারে ভুলুণ্ঠিতা ছিল নিরন্তর।
সেদিনের শূন্যপথে কেঁদেছে বনের পাখী অশ্রু পারাবারে,
সেদিন কেঁদেছে বিশ্ব বিরহ বাদল ক্ষণে দুর্য্যোগ সঙ্কটে।
দেবীর বোধন-ঘট অযোধ্যার চিত্ত-সূর্য্য সীতার উদ্ধারে
পাতিয়া করেছে পূজা বীর্য্য দিয়া ভারতের শ্যাম সিন্ধুতটে।
এ পূজার মন্ত্রবলে আর্য্যের গরিমা জাগে স্বর্ণলঙ্কা জয়ে,
অনার্য্য সভ্যতা সনে আর্য্য সভ্যতার রণ হেরিনু বিস্ময়ে!
নারীর অঞ্চল ধরি সেদিন ছিল না বিশ্ব কামের সম্ভোগে,
নারীরে উপাস্য করি' মাতৃমূর্ত্তি জাগায়েছে ভারত সন্তান।
আদর্শের অর্চ্চনায় প্রবুদ্ধ ভারত ছিল জ্ঞান-কর্ম্ম যোগে
ভক্তির ভৃঙ্গারে তার ত্রিদিবের মন্দাকিনী নিয়েছিল স্থান।
সে ভারত মৃত আজি, হীনতার পটভূমে জাগে বিভীষিকা,
ভক্তিহীন সাধনার শক্তিহীন মন্ত্রে শুধু শক্তি পূজা শোভে।
এ পূজার অভিনয়, ঐশ্বর্য্যের প্রদর্শনী হেরিয়া বিক্ষোভে—
লুপ্ত করে দিতে চাই দেবীর বোধন-পীঠে প্রদীপের শিখা।
আদর্শবিহীন জাতি! অসত্যের উপাসক! আত্ম-অবিশ্বাসী
তোমার শোভে না পূজা। আমি যে দেখেছি তব হীন আচরণ
পদে পদে প্রতারণা কুটিল হিংসায় ভরা বিদ্রূপের হাসি।
আজিও অন্তরে তব রহিয়াছে আসুরিক ছদ্ম আবরণ।
সুদূর সাগরপারে চেয়ে দেখ,শক্তি পূজা, করহ প্রণাম
তোমার বোধন ঘট ভগ্ন করি' পুরাইব আজি মনস্কাম।

# সেকালের লোকশিক্ষা

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে, জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের যে সমস্ত ব্যবস্থা ছিল, সেই সকল ব্যবস্থা কাল সহকারে লোপ পাইতে বসিয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা শাস্ত্রানুশীলন করিয়া ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইতেন। কিন্তু কোন সমাজেই শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক থাকে না, অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাই অধিক থাকে। এদেশেও শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অধিক ছিল না, অল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাই অধিক ছিল। অথচ ঐ সকল অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোক সাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান বর্জ্জিত বা পৌরাণিক জ্ঞান বর্জ্জিত ছিল না। শিক্ষিত লোকেরা অশিক্ষিত লোকের মনে ধর্ম্মবুদ্ধি জাগরূক রাখিবার জন্য এমন সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, সেই ব্যবস্থার ফলে, একই সময়ে শত সহস্র ব্যক্তি আনন্দের সহিত ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিত। সেকালের ধর্ম্ম প্রচার একালের ধর্ম্ম প্রচারের ন্যায় নীরস, শুষ্ক উপদেশ মাত্র ছিল না।

চৈতন্যমঙ্গল, চণ্ডীর গান, রামায়ণ গান, কথকতা, যাত্রা, পাঁচালী, এমন কি কবির গান, তরজা ও প্রাথমিক যুগের থিয়েটারে নাটকাভিনয়ও জনসাধারণের মনে ধর্ম্ম-জ্ঞান বিস্তারের প্রধান সহায় ছিল। যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনেই রচিত ও গীত হইত। কথকদিগের সমস্ত পালাই, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত এবং দেবীপুরাণ প্রভৃতি পুরাণ হইতে রচিত হইত। পূর্ব্বে এদেশে যাত্রার প্রচলন ছিল না, দেড়শত বা দুই-শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে যাত্রা ছিল না, কবিগান, তরজা, কথকতা প্রভৃতি যাত্রার অপেক্ষা বহু প্রাচীন। পুরাণ পাঠ তদপেক্ষাও প্রাচীনতর।

পুরাণপাঠকেরা শত সহস্র শ্রোতার মধ্যে বসিয়া রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবৎ প্রভৃতি পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন, পুণ্যসঞ্চয়ের আশায় শ্রোতৃবর্গ অবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ করিত। ধনবান্ ব্যক্তিরা পুরাণ পাঠের ব্যয়ভার আনন্দচিত্তে বহন করিতেন, অনেক সময় দুই আনা, চারি আনা চাঁদা সংগ্রহ করিয়াও পুরাণ পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইত। এই পুরাণ পাঠের ব্যয় বহন করা লোকে পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করিত। শ্রোতারাও নিবিষ্ট চিত্তে নিয়মিতভাবে পাঠ-শ্রবণকেও পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করিত।

এইরূপ পুরাণ-পাঠ শ্রবণে, জনসাধারণের মধ্যে পৌরাণিক জ্ঞানের বিস্তার ঘটিত বটে, কিন্তু ঐ ব্যবস্থা বোধ হয় অশিক্ষিত শ্রোতৃবর্গের চিত্ত আকর্ষণে বিশেষ সফল হইত না। যাহাতে জনসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান লাভের সহিত আনন্দ লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিলেন কথক মহাশয়েরা। তাঁহারাও পৌরাণিক ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়াই কথকতা করিতেন, উপরন্তু মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত এবং শান্ত, করুণ, বীর, বীভৎস, হাস্য প্রভৃতি রসের সহযোগে তাঁহাদের বক্ষ্যমান বিষয়কে একান্ত হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিলেন। পুরাণপাঠকেরা কেবল পুরাণের শ্লোক পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিতেন, কথকেরা পুরাণের শ্লোক অল্পই আবৃত্তি করিতেন, কিন্তু সেই সকল শ্লোকের সমর্থক গান, গল্প, উদাহরণ প্রভৃতি এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতৃসুলভ অঙ্গভঙ্গী, কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন ও সময়োপযোগী বর্ণনা দ্বারা বিষয়টি এতই হৃদয়গ্রাহী ও মনোরম করিতেন যে, কি শিক্ষিত আর কি অশিক্ষিত, সকল শ্রোতাই আত্মবিস্মৃত হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত কথকের বাক্য শ্রবণ করিত। এক কথায়, পুরাণপাঠকগণের অপেক্ষা কথকগণ শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় অধিকারে সমধিক সমর্থ হইয়াছিলেন। যে সকল কঠিন বিষয়, পুরাণপাঠক-গণের মুখে শ্রবণ করিয়া অশিক্ষিত লোকে সহজে বুঝিতে পারিত না, কথক মহাশয়েরা গান, গল্প, উদাহরণ প্রভৃতি দ্বারা তাহা জলের মত সহজ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহারা ঐ সকল কঠিন বিষয় যে কেবল বুঝাইয়া দিতেন তাহা নহে—এরূপ সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে, শ্রোতার হৃদয়ক্ষেত্রে তাহা বদ্ধমূল হইয়া থাকিত।

কথকেরা ব্যাসাসনে অর্থাৎ বেদীতে বসিয়া যে সকল গান করিতেন, তাহা বাদ্যযন্ত্র নিরপেক্ষ; সেই সকল গানের সহিত কোনরূপ বাদ্যধ্বনি করা হইত না, অথচ শ্রোতাদের মধ্যে সকলেই যে সঙ্গীত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিত তাহাও নহে। সঙ্গীতজ্ঞ শ্রোতাদের জন্য কথকদিগকে রাগরাগিণী এবং তাল, সম, লয় প্রভৃতিও শিক্ষা করিতে হইত। কথকেরা, বেদীতে বসিয়া যে সময়ের বর্ণনা করিতেন, তাহা সেই সময়ে গেয় রাগিণীতে গান করিতেন। অপরাহ্নের বর্ণনা পূরবী বা মূলতানে, সন্ধ্যা বর্ণনা ইমনে, নিশীথ বর্ণনা বেহাগ, শঙ্করা বা খাম্বাজে, প্রভাত বর্ণনা ললিত, ভৈরোঁ প্রভৃতি প্রভাতী রাগরাগিণীতে গান করাতে সেই সময়ের বর্ণনাটা শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে সত্য সত্যই সেই সময়ের চিত্র অঙ্কিত করিত। আমার মনে আছে, আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন আমাদের বাটিতে একজন কথক কথকতা করিতেন। অহল্যা-উদ্ধার পালাতে তিনি এমন সুন্দর প্রভাতী রাগিণীতে প্রভাত বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, শ্রবণকালে আমাদের ধারণা হইয়াছিল যে, বুঝি সত্য সত্যই রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। এইরূপে শ্রোতাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া কথকেরা সরল ভাষায় অতি দুরূহ দার্শনিক-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেও, শ্রোতাদের তাহা হৃদয়ঙ্গম হইত। এইরূপে ধর্ম্মের দার্শনিক ব্যাখ্যাও নিরক্ষর অশিক্ষিত ব্যক্তির চিত্তে প্রস্তরে খোদিত চিত্রের মত স্থায়ী হইত এবং তাহা সমাজের নিম্নতম স্তরে পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিত। রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবতের আখ্যান ভাগ জানিত না, এরূপ লোক হিন্দুসমাজে অশিক্ষিত জনগণের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যাইত না। যে সকল পাশ্চাত্য মনিষী দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে বাস করিয়া এ দেশের সকল স্তরের লোকের সহিত ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতীয় হিন্দুদিগকেই দার্শনিক জাতি—nation of philosophers বলিয়া উল্লেখ করেন। বাস্তবিক, অনেক সময়ে এ দেশের অশিক্ষিত লোকের মুখে এরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায় যাহা অন্য দেশের দার্শনিক পণ্ডিতগণের মুখেই শোভা পায়। "হিতবাদী"র ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক, সুকবি ৺মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে, তিনি কালীঘাটে, শ্মশানের অতি দূরে অন্যমনস্কভাবে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে আসিয়া মুনীন্দ্রবাবুর নিকটে উপবেশন করিল এবং তাঁহাকে কোন আত্মীয়-বিয়োগ-শোক-কাতর মনে করিয়া সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে জীবনের নশ্বরতা ও ভগবানের সকল কার্য্যই যে মঙ্গলকর, তাহার উল্লেখ করিয়া মুনীন্দ্রবাবুকে শোকে তাপে ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে অনুরোধ করিল। মুনীন্দ্রবাবু তাহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সেই লোক চব্বিশ পরগণার কোন পল্লীগ্রামের নিরক্ষর ঘরামি, কলিকাতায় কালীদর্শন করিতে আসিয়াছে। সেই নিরক্ষর শ্রমিকের মুখে উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা শুনিয়া মুনীন্দ্রবাবু বিস্মিত হইয়াছিলেন।

এই যে সমাজের নিম্নতম স্তরে পর্য্যন্ত, ঈশ্বরকে মঙ্গলময় জানিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ, এ শিক্ষার শিক্ষক কে? পুরাণ পাঠক ও কথকেরাই কি জনসাধারণের মধ্যে এই শিক্ষার বিস্তার করেন নাই?

সে কালের যাত্রাও এইরূপ ধর্ম্মশিক্ষা বিস্তারে কম সাহায্য করে নাই। যাত্রাতে অভিনীত পালাগুলিও প্রধানতঃ পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনেই রচিত হইত। কথকেরা একাই সকল ভূমিকা গ্রহণ করিতেন, পুরুষ বা বীরের ভূমিকায় পরুষ কণ্ঠে উচ্চৈস্বরে কথা কহিতেন আবার পর মুহূর্ত্তে নারীর ভূমিকা গ্রহণপূর্ব্বক রমণীসুলভ মৃদু ও কোমল কণ্ঠে কহিতেন, করুণ রসের অবতারণা করিয়া শ্রোতাদিগের হৃদয় বিগলিত করিতেন, তাহাদের নয়নে অশ্রু বহাইতেন, আবার তখনই বিদূষকের অভিনয়ে শ্রোতৃবর্গকে হাসাইয়া অস্থির করিয়া তুলিতেন। যাত্রাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করিত, যে যখন যে ভূমিকা গ্রহণ করিত, তখন সেই ভূমিকার উপযোগী পরিচ্ছদে ভূষিত হইত, গানের সময়ে নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইত, দর্শক ও শ্রোতাদিগের দৃষ্টির অন্তরালে অভিনেতারা সাজসজ্জা করিত। এই সকল ব্যাপারের জন্য কথকতা অপেক্ষা যাত্রা অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী ছিল। তবে, কথকতা শ্রবণকে জনসাধারণ যেরূপ পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করিত, যাত্রা অভিনয়কে সে ভাবে গ্রহণ না

করিয়া আমোদ প্রমোদরূপেই গ্রহণ করিত। সেই জন্য কথকতা অপেক্ষা যাত্রা শুনিবার জন্য অধিক লোকের সমাগম হইত, দুই তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতেও শত শত ব্যক্তি যাত্রাস্থলে সমবেত হইত। শ্রোতারা যাত্রা শ্রবণকে পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে না করিলেও, যে উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্ম হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্য —অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার বিস্তার ব্যর্থ হয় নাই। পুরাণপাঠক বা কথকেরা যেরূপ জনসাধারণের মধ্যে পৌরাণিক জ্ঞান বিস্তার করিতেন, যাত্রার দলের অধিকারীরা তাহার অন্যথা করেন নাই। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্রের বনগমন, পতিনিন্দা শ্রবণে সতীর দেহত্যাগ, অধার্ম্মিক রাবণ ও দুর্য্যোধনের সবংশে বিনাশ, প্রহ্লাদের ভক্তি, ধ্রুবের কঠোর সাধনা, কর্ণের দানশীলতা প্রভৃতি সেকালে কোন লোকেরই অজ্ঞাত ছিল না।

আমরা দেখিতে পাই যে, সেকালের যাত্রার মধ্যে একমাত্র বিদ্যাসুন্দরের পালাই অপৌরাণিক ছিল, এই একটি মাত্র পালা ব্যতীত যাত্রার কোন পালাই ধর্ম্ম ও নীতি উপদেশশূন্য ছিল না। অবশ্য প্রহসন হিসাবে, মূল পালার অভিনয়ের পর কোন কোন যাত্রাতে হাস্যরসাত্মক একাঙ্ক নাটিকা অভিনীত হইত। সেই সকল নাটিকাও প্রধানতঃ সামাজিক বা পারিবারিক কলঙ্ক উপলক্ষ্য করিয়াই লিখিত হইত, তাহাতেও যে সকল কদাচার সমাজদেহে পীড়ারূপে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার অপকারিতা প্রদর্শন করা হইত। বহুবিবাহ, বৃদ্ধের বালিকা বিবাহ, কৌলীন্য রক্ষার জন্য অযোগ্য পাত্র বা পাত্রীর পরিণয় এবং তারকেশ্বরের ভূতপূর্ব্ব মোহান্ত মাধবগিরির লাম্পট্যের পরিণাম প্রভৃতি সমাজদেহের দুষ্টব্রণই লোকসমাজে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখান হইত। মোটের উপর কি পৌরাণিক আর কি সামাজিক, সকল অভিনয়েই পরিণামে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় দেখান হইত।

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে, কলিকাতায় যখন প্রথম জনসাধারণের জন্য রঙ্গালয় স্থাপিত হয়, তখন তাহাতে প্রধানতঃ পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে রচিত নাটকেরই অভিনয় হইত। সে কালের থিয়েটারে, "নলদময়ন্তী", "শ্রীবৎস-চিন্তা", "প্রভাসমিলন", "নন্দবিদায়", "প্রহ্লাদ-চরিত্র" প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক এবং মহাকবি গিরিশ চন্দ্রের "চৈতন্যলীলা" নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া সহস্র সহস্র নরনারীর হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইত। তদানীন্তন "বেঙ্গল থিয়েটারে" "প্রহ্লাদ চরিত্র" এবং "ষ্টার থিয়েটারে" "চৈতন্যলীলা"র অভিনয় দর্শনে, ভক্তি অশ্রুতে কপোল প্লাবিত হইত না, এরূপ দর্শক বোধ হয় একজনও থাকিত না।

সেকালের পাঁচালীও জনসাধারণে মনে ধর্ম্মবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করিতে অল্প সাহায্য করে নাই। পাঁচালীওয়ালাদিগের মধ্যে স্বর্গীয় মহাকবি দাশরথী রায়ই ছিলেন সকলের শ্রেষ্ঠ তাঁহার রচিত পৌরাণিক পালাগুলিতে সকল রসের সমাবেশ থাকাতে শ্রোতারা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পাঁচালী শ্রবণ করিত। কথকতার মত পাঁচালীও এক জনের দ্বারা পঠিত এবং যাত্রার মত একাধিক বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে, একাধিক গায়কের দ্বারা গীত হইত। সেকালে সুদূর মফঃস্বলে, বোধ হয় এরূপ কোন গ্রাম ছিল না যে গ্রামে, অশিক্ষিত নিরক্ষর কৃষক ও শ্রমিকদিগের মুখেও যাত্রা বা পাঁচালীর গান শুনিতে পাওয়া যাইত না ৺মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর যাত্রার "সতীনাটক" পালার—

"ধর গো তোমরা ধরে তোল, কি হ'ল হায় সতীর কি হ'ল,
পতি নিন্দা শুনে বুঝি সতী আমার প্রাণে মো'ল।"

অথবা দাশরথী রায়ের রচিত "শ্রীরামচন্দ্রের দেশে আগমন" পালার

"চল সবে ভার লয়ে যাই অযোধ্যায় রাম রাজা হবে
বিনা সে ভূভারহারী রাম বিনা ভার আর কে ল'বে;
দিয়ে ভার ললে শরণ, বলব তাঁর ধরে চরণ
এবার ভার বইলাম যেমন, (আর) এমন ভার দিয়োনা ভবে।"

প্রভৃতি গান সেকালে ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পুরুষ স্ত্রী-নির্ব্বিশেষে অনেকেরই জানা ছিল। এই শ্রেণীর গানের মধ্য দিয়া স্ত্রীলোকের পতিভক্তি বা ভগবানে আত্মসমর্পণের যে ভাব প্রকটিত হইত, তাহা লোকশিক্ষার পক্ষে কি অতুলনীয় নহে?

একালে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, যাঁহারা এতদিন অশিক্ষিত নিরক্ষর পল্লীবাসীদিগের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া, কৃপণের মত আপনাদের অর্জ্জিত বিদ্যা জনসাধারণের মধ্যে

প্রচারে বিরত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখন নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, কৃষক ও শ্রমিকদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য, অবসর মত পল্লীগ্রাম অঞ্চলে গিয়া সফর করিতেছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধু, তাহাতে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু বর্ণপরিচয় বা নাম স্বাক্ষর করিতে পারাই কি মনুষ্যত্ব? যে ধর্ম্মবুদ্ধি মানুষকে প্রকৃত মানুষ-পদবাচ্য করে, সেই ধর্ম্মবুদ্ধি উন্মেষের কোন চেষ্টা হইতেছে কি? পূর্ব্বে, পুরাণ পাঠ, কথকতা, যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি দ্বারা জনসাধারণ যে শিক্ষা লাভ করিত, যে সদুপদেশ প্রাপ্ত হইত, বর্ত্তমান কালের কোন ব্যবস্থায় তাহা হয় কি? আমার মনে আছে, সাতষটি বৎসর পূর্ব্বে, আমার পিতা যখন বীরভূম জেলার সদর সিউড়ীতে শিক্ষকতা করিতেন, তখন স্থানীয় একজন বৃদ্ধ উগ্রক্ষত্রিয় আমাদের বাসাতে ভৃত্যের কার্য্য করিত সে সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিল। আমাদের বয়স তখন ছয় সাত বৎসর মাত্র। সেই বৃদ্ধ ভৃত্য প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার পর আমাদিগকে ঘুম পাড়াইবার জন্য রামায়ণ বা মহাভারতের গল্প বলিত। একদিন আমার জননী তাহাকে মহাভারতের একটা আখ্যান বলিতে শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি ত লেখা পড়া শিখ নাই, এ সব গল্প কোথায় শুনিলে?" সে বলিল "কথক ঠাকুরের মুখে শুনেছি, আর কোথায় শুনবো মা?" চন্দননগরে আমাদের বাটীর পার্শ্বেই উদয় মিস্ত্রী নামক আমাদের একজন প্রজা ছিল। সে লেখাপড়া জানিত না, জাতিতে বাগ্দী, রাজ-মিস্ত্রীর কার্য্য করিত। তাহার মত ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও নির্ম্মল চরিত্র লোক কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ধূম-পান ব্যতীত অন্য কোনরূপ মাদকদ্রব্য সেবন করিত না, মাংস খাইত না, প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে, কোন প্রতিবেশীকে দিয়া নিজের কুটীরের দাওয়াতে সন্ধ্যার পর কৃত্তিবাসী রামায়ণ অথবা কাশীদাসী মহাভারত নিয়মিত ভাবে পাঠ করাইত। তাহার অধীনে যে সকল শ্রমিক রাজ অথবা মজুরের কার্য্য করিত, তাহাদের মধ্যে আট দশজন প্রত্যহ সেই "পাঠ" শুনিবার জন্য অঙ্গনে সমবেত হইত। এই স্থলে একটা কথার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, চন্দননগর, চুঁচুড়া ও হুগলী প্রভৃতি আমাদের এ অঞ্চলে বাঙ্গালী ব্যতীত কোন অ-বাঙ্গালী রাজমজুর ছিল না; দুলে, বাগ্দী, চাঁড়াল, ডোম, হাড়ী প্রভৃতিই রাজমজুরের কার্য্য করিত। এই কার্য্যে বাঙ্গালী মুসলমানও ছিল, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। আজকাল আমাদের ও-অঞ্চলে বাঙ্গালী রাজমজুর নাই বলিলেই হয়, বিহারী মুসলমানগণই গৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। আমাদের প্রতিবেশী উদয় মিস্ত্রির কাছে একজন প্রৌঢ় মুসলমান রাজের কাজ করিত। সেই মুসলমান রাজও মধ্যে মধ্যে মিস্ত্রির বাটীতে "পাঠ" শুনিতে আসিত। দুই চারিদিন অনুপস্থিতির পর, একদিন আসিয়া সে মিস্ত্রিকে বা অপর কোন রাজকে জিজ্ঞাসা করিত—"রাবণ এসে সীতাকে চুরি করে নিয়ে গেল, সেদিন এই পর্য্যন্ত শুনেছিনু, তারপর কি হ'ল?" তখন মিস্ত্রি বা অন্য কেহ তাহার কাছে বালী বধ, সাগর বন্ধন ও লঙ্কাদহনের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বলিত "আজ রাম রাবণে যুদ্ধ আরম্ভ হবে।"

আমি আমার দেখা এই একটি উদাহরণ দিলাম, এইরূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারত পাঠ প্রায় প্রতি পল্লীতেই হইত। সূত্রধরের কারখানা, তাঁতীর তাঁতশালা, স্বর্ণকারের ও মুদীর দোকানে এইরূপ রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ হইত, পঞ্চান্ন বা ষাট বৎসর পূর্ব্বে আমরা ইহা দেখিয়াছি। সেকালে বাঙ্গালীর চরিত্র-গঠনে এই দুইখানি বাঙ্গালা মহাকাব্য যে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইয়াছে, পৃথিবীর কোন দেশে, কোন সমাজে কোন পুস্তক সেরূপ ক্ষমতা দেখাইয়াছে কি না সন্দেহ। সেকালে এরূপ কোন ভদ্র গৃহস্থের বাটী ছিল না, যেখানে, বটতলার ছাপা কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মহাভারত দেখিতে পাওয়া যাইত না। আজকাল স্কুল কলেজের ছাত্রেরা রবীন্দ্রনাথের বা শরৎ চাটুয্যের নবপ্রকাশিত পুস্তক যেরূপ আগ্রহ সহকারে পাঠ করে, আমরা সেইরূপ আগ্রহ সহকারে ছাত্রাবস্থায়, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পাঠ করিতাম। এগার বৎসর বয়সে, ইংরাজী স্কুলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমি রামায়ণ শেষ করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে, পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য বা নীতি-উপদেশ গ্রহণের

জন্য আমরা রামায়ণ মহাভারত পড়ি নাই, পড়িয়াছিলাম সরল গল্প পাঠের আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য। শর্করা-মণ্ডিত ঔষধের ন্যায়, অবাস্তব এবং অদ্ভুত কাহিনী সমন্বিত রামায়ণ বা মহাভারত আমাদের চরিত্র-গঠনে কি কিছুমাত্র সাহায্য করে নাই? ঐ দুইখানি মহাকাব্য হইতে আমরা যাহা পাইয়াছিলাম, তাহা কি কেবলই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ?

আমার মনে হয়, এখন যে সকল সভা-সমিতি বা প্রতিষ্ঠান হইতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য মফঃস্বলে শিক্ষিত যুবকদিগকে প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই সকল সমিতি বা প্রতিষ্ঠান যদি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে কথকতা এবং রামায়ণ, মহাভারত পাঠের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। প্রতিষ্ঠান হইতে প্রেরিত স্বেচ্ছা-শিক্ষকগণই একাধারে শিক্ষক-কথক বা শিক্ষক-পাঠক হইবেন। যাঁহাদের সঙ্গীতে সাধারণ জ্ঞান এবং বক্তৃতা-শক্তি আছে, তাঁহারা শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে কথকতাও করিবেন; আর যাঁহাদের সে শক্তি নাই, তাঁহারা শিক্ষকতা এবং রামায়ণ মহাভারতের অংশ-বিশেষ পাঠ করিবেন। অংশ বিশেষ বলিলাম, কারণ সমগ্র রামায়ণ বা সমগ্র মহাভারত পাঠ দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ, তত সময় ব্যয় করা হয়ত তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

এই ব্যবস্থায় অনেকে হয়ত এই বলিয়া আপত্তি করিতে পারেন যে, মফঃস্বলে বিশেষতঃ পূর্ব্ব বঙ্গ ও উত্তর বঙ্গে যেখানে মুসলমানের সংখ্যা অধিক সেখানে কথকতা ও রামায়ণ মহাভারত পাঠের ব্যবস্থা কি করিয়া হইবে? উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, আমি হিন্দু-সমাজের লোক-শিক্ষার কথা বলিতেছি, মুসলমান-সমাজের কথা বলিতেছি না। বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজে বাঙ্গালা পুরাণ রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় বাঙ্গালী মুসলমান-সমাজের উপযোগী কোন পুস্তক আছে কিনা তাহা আমি জানি না। মুসলমান-সমাজের চরিত্র গঠন ও লোক-শিক্ষার বিষয় শিক্ষিত মুসলমান যুবকগণ বিবেচনা করিবেন। পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ না করিয়াও যে ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করা যায়, তাহা সেকালের পুরাণপাঠক ও কথকগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং এখন মফঃস্বলে কথকতা বা রামায়ণ মহাভারত পাঠের ব্যবস্থা হইলে, অহিন্দুদিগের তাহাতে আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, যখন স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলন হয়, তখন মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, ব্যারিষ্টার মিঃ রসুল, মুন্সি দেদার বক্স, মৌলবী আবুল কাসেম, মৌলানা আক্রাম খাঁ, ডাক্তার গফুর, মৌলবী আবুল হোসেন প্রভৃতি মুসলমান নেতৃবর্গ সেই আন্দোলনে যোগদান করিয়া মফঃস্বলে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। সেই সময়ের বহু সভাতে, বক্তা হিসাবে বা শ্রোতা হিসাবে যোগদানের সুযোগ এই প্রবন্ধ লেখকের হইয়াছিল। মৌলবী আবুল হোসেন সাহেব বক্তৃতাকালে কথায় কথায় বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারত হইতে অজস্র কবিতা এবং দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দিতেন। তিনি একবার চন্দননগরে একটা সভাতে বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহই তাঁহাকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পাঠে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, বৃদ্ধ বলিতেন, "যদি মানুষ হইতে চাও ত রামায়ণ-মহাভারত পড়।" অথচ সেই বৃদ্ধ মুসলমান ইস্লাম ধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। তিনি পৌত্রকে "মানুষ" করিবার জন্যই রামায়ণ-মহাভারত পড়াইয়াছিলেন, পৌত্রের পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য নহে।

সেকালে লোক-শিক্ষার যে সকল ব্যবস্থা ছিল, তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। কবির লড়াই ও তরজা আর নাই, পাঁচালীর কথাও আর বড় শুনিতে পাই না। যাত্রাদলের সংখ্যা এত কমিয়া গিয়াছে যে, খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়; কথকের সংখ্যাও বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে, যে কয়জন কথক আছেন, তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা মহিলাগণের ধর্ম্মবুদ্ধির উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়; কথকের সংখ্যা যেরূপ দ্রুতগতিতে হ্রাস পাইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, আর পঁচিশ বা পঞ্চাশ বৎসর পরে লোক-শিক্ষার এই অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠানও বিলুপ্ত হইবে। পুরাণপাঠ কথকতা অপেক্ষাও শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। থিয়েটারে পৌরাণিক

নাটকের অভিনয় হইলে টিকিট-বিক্রয় হয় না। এখন দেশী ও বিলাতী সিনেমা, লোক-শিক্ষার নহে, লোকের চিত্তরঞ্জনের ভার গ্রহণ করিয়াছে। যে সিনেমাতে ষোড়শী সুন্দরী ও সুকণ্ঠী গায়িকার সংখ্যাই অধিক এবং নৃত্যগীতের অঙ্গ-সঞ্চালনে ও কটাক্ষের ছড়াছড়ি, যে সিনেমাতে পিতাপুত্র বা ভ্রাতাভগিনী একত্র বসিয়া দেখিতে সঙ্কোচ বোধ হয়, সেই সিনেমা হইতে দর্শকদিগকে স্থানের অভাবে ফিরিয়া যাইতে হয়। ইহা হইতেই বর্ত্তমান সমাজের রুচি ও শিক্ষা-দীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়।

---

# যুগান্তর

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

সুধা যদি নিরাকৃত না করে গরল,
অমৃতে তা হ'লে কি বা ফল?
হিংসা দ্বেষ জিঘাংসাই সত্য শুধু এ মর জগতে?
প্রেম মিথ্যা, ক্ষমা শুধু দুর্ব্বলতা, চির দাসখতে
বিকাতে কি হ'বে শির বাহুবল বিনা?
ভাগ্যলক্ষ্মী নৃশংসের পরাক্রমাধীনা,
অত্যাচারী হয় শুধু বীর,
কাপুরুষ সে কেবল যে প্রেমিক অহিংস্র সুধীর?

ধর্ম, ন্যায়, সত্য শুধু অশক্তের 'আত্ম প্রবঞ্চনা,
সহিবে সে নিরবধি নিগ্রহ লাঞ্ছনা
নিষ্ঠুরের হাতে
এই বিধিলিপি শুধু আছে লিখা ঐতিহ্যের পাতে?
দুর্ব্বলের রক্তে লেখা প্রবলের রুদ্র লেখনীতে,
নিখিল সাম্রাজ্য লাভ হয় শুধু শাণিত অসিতে?

স্নেহবিগলিত স্তন্যে মাতৃ-বক্ষে পরিপুষ্টি যার,
বলিষ্ঠ সে হয় যবে নৈষ্ঠুর্য্যে কি আত্মরক্ষা তার
দুর্ব্বলেরে নিষ্পেষিত করি'?
জীবিকা-সংগ্রহ তার হয় শুধু দস্যুবৃত্তি ধরি'?

গত্যন্তর কিছু তার নাই আর স্বরচিত মানব সমাজে?
শাকান্নে উদর পূর্ত্তি করে যারা শ্রমসাধ্য কাজে
নিয়োজিত করি' দেহ মন,
তারা শুধু জোগাবে ইন্ধন
শক্তিশালী মানবের লালসার বহ্নি কুণ্ড মাঝে?
গৃধ্নু তার সীমানা কোথা যে
ভেবে নাহি পাই!

খাদ্য-খাদকের যোগ ছাড়া অন্য সম্পর্ক কি নাই
মানবে মানবে,
অতুল ঐশ্বর্যে ভরা এ বিপুল ভবে?
বিদ্যাবুদ্ধি বলে নর শক্তিধর হ'ল কি কেবল
অশক্তের রক্ত স্রোতে প্লাবিতে শ্যামল ধরাতল?

এ প্রশ্নের মীমাংসা না জানি।
বিষে হয় বিষক্ষয়,—আছে বটে পুরাতনী বাণী
আয়ুর্ব্বেদে কয়।
আত্মমেধ যজ্ঞে বুঝি নর দানবত্ব পায় লয়
আত্মীয় নিধনে
হিংসা দ্বেষ উদ্গীরিত শোণিতের উষ্ণ প্রস্রবণে।

আপন অজ্ঞাতসারে শুদ্ধ সত্ব করে আপনারে
ভ্রান্ত নর, ঈর্ষ্যা ঘৃণা আহুতি - সম্ভারে
দেয় ঢালি দ্বন্দোদ্ভূত বহ্নি কুণ্ড মাঝে
ভস্মীভূত করে সবে পুঞ্জীভূত পাপের বোঝা যে!
আত্মনিবেদিল যারা রণে
তাহাদের সবাকারি মরম গহনে
আছে প্রেম-ক্ষমা-করুণার
অমৃত-ভাণ্ডার।
এ জীবনে লাগিল না যাহা আত্মপর সংরক্ষণে
তাদের মরণে
প্রেম - রাজ্য প্রতিষ্ঠার হেতু
আসিবেন তাঁরা যাঁরা ইহ - পরকাল মাঝে সেতু।
মৈত্রীর বন্ধনে
বাঁধিবেন তাহাদেরে যুগান্তের অরুণ - কিরণে,
যাহারা উঠিবে জাগি' প্রেমোদ্বুদ্ধ নব - চেতনায়,
অতীতের ধ্বংসস্তূপ হ'তে প্রাণ পুনর্জন্ম পায়।

# তুমি কি আসিবে !

শ্রীইন্দিরা দেবী

বছর ঘুরিয়া আসিল। আবার আসিল শক্তিস্বরূপিণী মায়ের মহাপূজার মহালগ্ন। চারিদিকে আনন্দ কোলাহল জাগিল। সন্তান বড় আশায় মায়ের আগমন-প্রতীক্ষা করিয়া আছে—সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, অতীব অনটনের ভিতর চাহিয়া আছে মায়ের অমর আশীর্ব্বাদের মুখ চাহিয়া। এবার মা আসিতেছেন নিতান্ত দুর্দ্দিনে, সন্দেহ ও সংঘাতের ভিতর। মায়ের বোধন-বাণী পদ্মের মত যেন দিকে দিকে সহস্র দল মেলিয়াছে, কিন্তু নগরীর আনন্দ কোলাহলে মন সাড়া দেয় না, গুমরিয়া মরে। এত দীপালোকের ভিতর, এত আলোর উজ্জ্বলতার ভিতর, আমাদের গৃহও আজ আলোহীন, নিরন্ধ্র আঁধারে ভরা। আনন্দ কোলাহলের পরিবর্ত্তে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা চারিদিকে। মনে শান্তি নাই, দেহে শক্তি নাই, চক্ষে উৎসাহ-প্রেরণার জ্যোতিঃ নাই। তবে কি আমরা মৃত ? এ সমস্তই মৃতের লক্ষণ, সজীব আনন্দ আমাদের দেহ মনকে আর চঞ্চল করে না। এ যে নির্জ্জীবিত অবস্থার চিহ্ন !

অত্যাচার, অনাচার, অভাব, অনটন, দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা, বেদনা, আশাভঙ্গ, দারিদ্র্য, নিরন্নতা আমাদের জীবনের পরম ভূষণ। উৎপীড়িতের আর্ত্তনাদ, দুর্ব্বলের কাতর আর্ত্তনাদ, অভাব-অত্যাচারের উৎকট নৈরাশ্য আমাদের মন - প্রাণ - দেহকে ক্লীব করিয়াছে, সমাজ ব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়াছে, জাতীয় জীবনকে হীন করিয়াছে।

এই আমাদের যেন সত্যিকারের পরিচয়।

আমরা আমাদের মরণের পথে স্বেচ্ছায় চলিয়াছি, যাহারা আমাদের পিছনে আসিতেছে তাহাদেরও এই ক্লীবত্বের ভিতর এই প্রাণহীনতার ভিতর আমরা টানিয়া আনিতেছি।

জীবন আমাদের দুর্ব্বহ, মরণোন্মুখ প্রাণ আমাদের অভাবক্লিষ্ট। মেধা, শক্তি সাহস কিছু নাই। না আছে উৎসাহ-প্রেরণা। কোথায় সে জীবনের স্পন্দন ? তাই সমাজে এত অবিচার-কুবিচার, এত আশাভঙ্গের করুণ কাহিনী—নারীর আর্ত্তনাদে পুরুষের কাল ঘুম ভাঙ্গে না, অত্যাচারের স্রোত অবিরাম অবাধ বহিয়া যায়। পরিত্রাণ দিবার জন্য কেহ পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায় না। নারী মরে সমাজের অবহেলা—অত্যাচারে, দুঃখী মরে দুঃখে, শিশু মরে পুষ্টির অভাবে, পুরুষ মরে ক্লীবত্বায় ও জড়তায়। দেশ ও জাতি—এইভাবে দ্রুতগতিতে মৃত্যুর পথে চলিয়াছে।

এ মরণ-তরঙ্গ রোধিবে কে ?

এই নিদারুণ বাস্তবতার ভিতর, এই আনন্দহীন অবিচারের ভিতর, মরণের তাণ্ডব নৃত্যের ভিতর, যুগসঞ্চিত কুসংস্কার ও অন্ধ অবিচারের ভিতর, পুঞ্জীভূত ব্যর্থতা ও কাতর ক্রন্দনের ভিতর—এসো মা আনন্দময়ী মহাজীবনের নববার্ত্তা লইয়া, এসো শক্তিস্বরূপিণী, এসো মহামায়া ! শান্তি দাও, বিদ্যা দাও, জ্ঞান দাও—এসো শান্তির, তৃপ্তির ও আশার অঞ্চল বিস্তার করিয়া, এসো মুক্তির ও জীবনের বাণী বহন করিয়া—এসো তুমি !

সমস্ত দেশ, সমগ্র জাতি তাহাদের নিষ্প্রভ আঁখি তোমার আসার পথে বিছাইয়া আকুল চক্ষে চাহিয়া আছে।

মরণের অন্ধকারের ভিতর, জ্যোতিঃহীন জীবনের ভিতর, ছন্দোহীন প্রাণের ভিতর তুমি এসো জীবনের অমৃত আলো ও নবজীবনদাত্রী রূপে। তোমার পদপরশে এ পৃথিবীর যুগগত জড়তা, ক্লীবতা দূর হোক।—

মোহ দূরে যাক। মুক্তি দাও, সমাজের কুবিচার, অনাচার, কুসংস্কার ও পরাধীনতা থেকে জীবনের জড়তা থেকে।

সমস্ত জাতি করুণ কণ্ঠে আর্ত্তস্বরে পরিত্রাণের জন্য তোমায় ডাকে মা, কাণ পাতিয়া শোনো তাহাদের কাতর ক্রন্দন ! অসত্যরূপী ও অত্যাচারী অসুরকে হনন করিয়া তুমি সমস্ত পৃথিবী পাপমুক্ত করো। রুধিরাক্ত মাটির প্রার্থনায় তুমি আমাদের যত আধি, ব্যাধি, অপমান, অত্যাচার, জড়তা, প্রণাহীনতা ও পরাধীনতার কারাগার হইতে আমাদের উদ্ধার করো, আমাদের মুক্তি দাও মা। এসো বৈরাগ্যের গৈরিক পতাকা দিকে দিকে উড়াইয়া, এসো আনন্দ, তৃপ্তি ও পরিত্রাণের অভয় ইঙ্গিত লইয়া; সজীবতার ও আনন্দের বাণী বহিয়া তুমি এসো মা ! সমস্ত সন্তান তোমার আশাপথ চাহিয়া আছে। তুমি এসো, তোমার মহা আবির্ভাবে সব মিথ্যা বিদূরিত হোক, ক্লীবতা দূরে যাক, কালনিদ্রা হইতে দেশ ও জাতিকে জাগাও। প্রাণ দাও, শক্তি দাও, উৎসাহ দাও, দাও পরিত্রাণের চেষ্টা। এই অধঃপতিত অবহেলিত জাতির জীবনে তেমনি এসো, মরণের মাঝে এসো মহাজীবনের অভয় মন্ত্র লইয়া। তুমি এসো মা মহামায়া, সন্তানেরা আজও তেমনি করিয়া কাঁদিতেছে।

তুমি কি সত্যই আসিবে মা ?
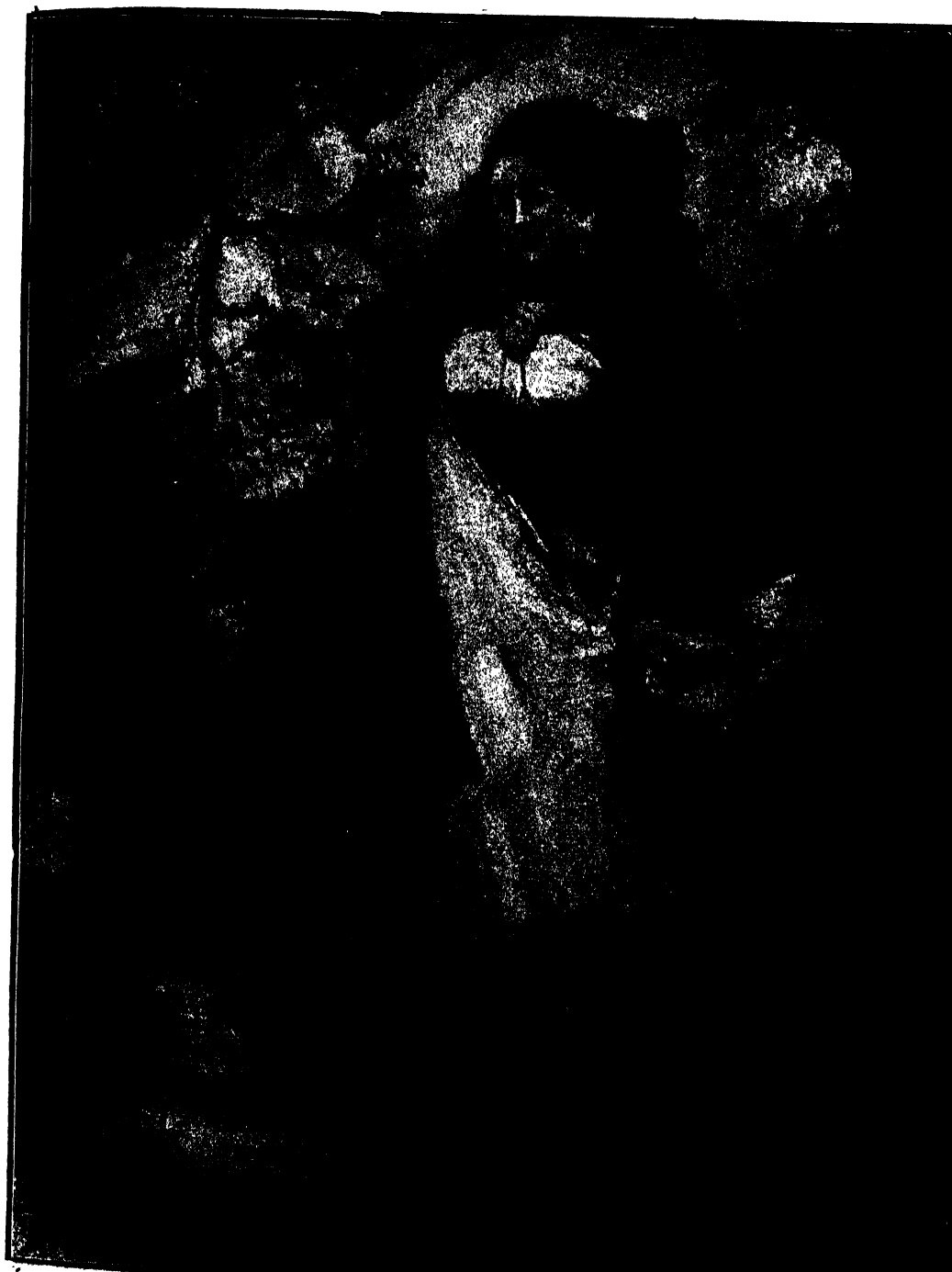
পাষাণের প্রাণ

[ শিল্পী : শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

## ভয়ের কথা ?

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

চরিত্রে মোর বৈষ্ণব সম
বিনয় নাহি ত আর,
দেখি দিন দিন বাড়িয়া উঠিছে
কেবলি অহঙ্কার।
বংশ-লতিকা পানে যবে চাই,
অহঙ্কারের অন্ত যে নাই,
দেবতার সাথে সংযোগ মোর ?
এত গৌরব কার !

শ্রীভগবানের করের পরশ
রয়েছে আমার গায়,
সে বিশ্বরূপ পানের পিয়ালা
আঁখি হয়ে শোভা পায়।
সেই সুধা নাম ডাকার নকীব—
রয়েছে বদন, রহিয়াছে জিভ্
স্মরণের লাগি এ মন রয়েছে
বেশী কিবা দরকার।

এত সম্পদ্, এত কৃপা দয়া
কাহার ভাগ্যে জোটে,
সুধাপান আমি করেছি তাহার
কস্ লেগে আছে ঠোঁটে।
শত ভক্তের চরণের ধূলি
ভরেছে আমার জীর্ণ এ ঝুলি,
বক্ষে রয়েছে হরির পাঞ্জা
বিশ্বনাথের ছাড়।

ভক্ত না হই, হা গৌরাঙ্গ
বলে আমি দিন ডাকি
নরোত্তমের সঙ্গ যে পাই,
কি সৌভাগ্য বাকি !
গর্ব্বেতে বুক ফুলে মোর রয়
কোন ক্রমেই এলো না বিনয়,
ভয়ে থাকি তাই জোড় করি কর
রুদ্ধ করিয়া দ্বার।

## পথ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

অকারণে আর ঘর বাঁধিবার দেখিনাক প্রয়োজন,—
পথের কিনারে বসে' আছি তাই পথে রেখে দু'নয়ন।
কতদূর থেকে এসেছে এ পথ, কোথা গেছে নাহি জানি,
পায়ে-পায়ে কত জানা অজানার আঘাতের জের টানি'।
এরি বুকে দেখি, অবিরাম গতি ছুটিয়াছে দিবারাতি
বাম হ'তে ডানে, ডান হ'তে বামে চলার নেশায় মাতি'।
আমি বসে' আছি, তারি কাছাকাছি গতিহীন যতিহীন
ছবির মতন শুধু এ নয়ন চেয়ে আছে উদাসীন।

মনে হয় যেন, জগৎ জুড়িয়া পড়ে' আছে এই পথ
চিরদিন ধরে' যার বুক বেয়ে চলেছে কালের রথ ;
এই পথপাশে যারা যায় আসে, তাদের গতির মাঝে
পথের এবং পথের রাজার জয়ধ্বনিই বাজে।
তাহাদেরই ধারা বজায় রাখিতে পথিকের প্রয়োজন,
তাই নরনারী করে মারামারি আসা-যাওয়া অকারণ।
এই ঘর-বাড়ী গড়ি' আর ছাড়ি,—পথেই চলেছে বাস,
চলেছে জগৎ সাথে লয়ে পথ, পথের নাহিক নাশ।

দীর্ঘ পথের দুই দিকে দ্বার—প্রবেশ নিষ্ক্রমণ !
আসে নরনারী যায় নরনারী—জানে না সে কি কারণ,
পথে পথে চলে ক্ষণিক আলাপ, পথে পথে মেলামেশা,
ভালবাসা আর প্রণয় যা বলি, চলেছে তাহারি নেশা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম ক্ষণিকের মাতামাতি,
চলিতে চলিতে কেউ বা ক্ষণিক—কেউ দু'দিনের সাথী,
যেথায় যাহার দ্বিতীয় দুয়ার, সেথায় সে যায় চলে',
যেমন একেলা এসেছিল পথে, তেমনই কথা না বলে'।

# রহস্যময় ভবন

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রাসাদও বলা চলে। গ্রামের প্রান্তভাগে নির্জ্জন স্থানে বাড়ীটি দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ীটির প্রায় তিন দিক্ ঘেরিয়া অতি প্রকাণ্ড ঝিল। ঝিলটি চওড়াও কম নহে। যেন একটি দুর্গ বেষ্টন করিয়া অনেকটা পরিখার মতই ঝিলটি রহিয়াছে। বাড়ীটিও আকারে-প্রকারে দুর্গ বিশেষ। অতি সুদৃঢ় এবং অতি বৃহৎ তাহার আয়তন। যে সুউচ্চ এবং অতি স্থূল প্রাচীর তাহার চারিদিক্ ঘেরিয়া ছিল, তাহার বহু স্থান ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং সেখানে অজস্র বন্যলতা উদ্দাম স্বচ্ছন্দ গতিতে ঘন আবরণ রচনা করিয়াছে। প্রাচীরের এইরূপ এবং আরও অনেক ভগ্ন স্থান দিয়া বাড়ীটি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সব ভগ্ন স্থান দিয়া বাড়ীটির যাহা দেখা যায় তাহাতেই বুঝা যায়, ইহা প্রাচীন কোন বনিয়াদী বংশের উপযুক্ত বাড়ী ছিল। কতদিন বেড়াইতে বেড়াইতে বাড়ীটির মোটা মোটা থাম, রুদ্ধ দরজা জানালা, ভগ্নপ্রায় ছাদ ও আলিশা এবং লোহার বড় বড় পেরেক মারা অতি প্রশস্ত জীর্ণপ্রায় দরজার দিকে তাকাইয়া বিস্ময় অনুভব করিয়াছি। বাড়ীটির আশে-পাশে আর কোনও গৃহের চিহ্ন দেখা যায় না। এদিকে ওদিকে ঝোপ, জঙ্গল, ডোবা,—আর দিনের বেলায়ও প্রাচীরের আশে-পাশে শেয়ালের অবাধ গতিবিধি দেখিয়াছি। গ্রামের এমন শেষভাগে এত প্রকাণ্ড বনিয়াদী বাড়ী, অথচ একেবারে পরিত্যক্ত! কি যেন একটা রহস্যের প্রভাবে বাড়ীটা আচ্ছন্ন।

বাড়ীটা সম্বন্ধে দুই একটা কথা যে আমার কাণে না আসিয়াছিল এমন নহে। মাত্র দুই মাস ষ্টেশনমাষ্টারীর চাকরীসূত্রে আমি এই গ্রামে আসিয়াছি। যে গ্রামেই আমি যখন গিয়াছি, তখনই তাহার লোকজনের সঙ্গে বেশী মেলামেশা অপেক্ষা আমি তাহার অতীত গৌরবের ভগ্নাবশেষ বারবার দেখিয়া বেড়াইয়াছি। বাঙ্গালীর জীর্ণপ্রায় জীবনের অবসাদ আমাকে অভিভূত করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অতীত মহত্ত্বের অনুভূতি আমাকে সজীব ও আনন্দময় করিয়াছে। বহু বহু অট্টালিকার ভগ্ন স্তূপের পাশে বসিয়া, নদীতীরস্থ শ্মশানের উপর দাঁড়াইয়া আমি আমার অতীত বঙ্গজননীকে বারংবার প্রণাম করিয়াছি। কিন্তু যাক্ সে কথা।

যে গ্রামের কথা বলিতেছিলাম তাহার নাম মহেন্দ্রপুর। বাঙ্গলার নবাবদের আমলে এই গ্রামের জমীদার ছিলেন মহেন্দ্র চৌধুরী। তিনি যেমন বলশালী তেম্নি দুর্দ্দান্ত ছিলেন। তিনিই গ্রামের প্রান্তভাগে ঝিল কাটাইয়া এই বৃহৎ দুর্গসম অট্টালিকা তৈয়ারী করান। তাঁহার পুত্রের নাম ছিল রণেন্দ্র। তিনি পিতার যোগ্য সন্তান ছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য এবং বল প্রচণ্ড ছিল। তাহা ছাড়া তিনি অসাধারণ বিলাসী ছিলেন। বাড়ীর ভিতরে গৃহগাত্রে নাকি অপূর্ব্ব কারুকার্য্য ছিল, তাহা তাঁহারই বিলাসী মনের পরিচয়, এবং বাগানটি নাকি নন্দনকাননের মতই ছিল। ইহাই বৃদ্ধ গ্রামবাসীদের নিকট হইতে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম। আর জানিতে পারিয়াছিলাম যে, তাঁহার সুরম্য শয়ন-গৃহের একটি দরজা ছিল বাগানের দিকে। সেই দ্বার দিয়া নামিলেই একটি চমৎকার নিভৃত এবং সুদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত ক্ষুদ্র কক্ষ; তাহাতে বিবিধ ফুলের গাছ। সেটি ছিল তাঁহার এবং তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীর বিশ্রাম-গৃহ বা বিলাস-গৃহ। আজ এই ইন্দ্রভবন পেঁচা, বাদুড় ও সাপের আবাস এবং অসংখ্য বন্যবৃক্ষ ও লতার লীলাভূমি হইয়া রহিয়াছে। গ্রামবাসিগণ আর একটি কথা বলে,—অতি গভীর রাত্রিতে রণেন্দ্রের বিলাস-গৃহ হইতে কেমন একটা আর্ত্তনাদ উঠে, এবং কে যেন বলিতে থাকে—"দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও।" খাপছাড়া ভাবে এবং অনেক ব্যক্তির নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া এই রহস্যময় বাড়ীটির এইটুকু ইতিহাস আমি জানিতে পারিয়াছিলাম।

সেদিন দুপুরবেলা আহারাদি সারিয়া আমার আপিস-ঘরের বড় টেবিলটির উপর একটু গড়াইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে এক বৃদ্ধ লাঠি হাতে করিয়া ষ্টেশনে আসিয়া হাজির। গাড়ী আসিতে তখনও প্রায় দেড় ঘণ্টা বাকী। বৃদ্ধের কাঁধে একখানি গামছা; দেহের ও হাতের

চাঁড়া বহু স্থানে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধ আমার দরজার সামনে লাঠি রাখিয়া বসিয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল—বাবু, গাড়ী কখন আস্‌বে?

আমি বলিলাম—গাড়ীর তো এখন ঢের দেরী, কর্ত্তা। তোমার বাড়ী কোথায়?

বৃদ্ধ বলিল—আমার ঘর, বাবু? আমার ঘর তো এই গাঁয়েই। ভরত সর্দ্দারের নাম শুনেছেন কি? আমিই ভরত বাগ্‌দী।

আমি আনন্দে বলিলাম—খুব শুনেছি। অনেকবার শুনেছি। তোমাদেরই কে নাকি ঐ জমীদার মহেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ী চাকরী কর্‌ত?

ভরত—হাঁ, বাবু, আমার ঠাকুরদা লক্ষ্মণ সর্দ্দার ছিল মহেন্দ্র চৌধুরীর ছেলে রণ চৌধুরীর পেয়ারের চাকর। আমরা যে দু' মুঠো খেতে পাই সবই তো ঐ চৌধুরী বাবুর দৌলতে। আমরা বাগ্‌দী হ'লেও জমীদার ঠাকুরদাকে এত ভালবাস্‌তেন যে, বাড়ীর ভেতর ঠাকুরদার অবাধ যাওয়া-আসা ছিল। চৌধুরী বাবুর মত লোক কি আর এ অঞ্চলে হবে, বাবু?

আমি বলিলাম—আচ্ছা, ভরত, তুমি চৌধুরীদের কথা কিছু জান কি?

ভরত বলিল—তা, বাবু, কিছু কিছু জানি বৈকি। কিন্তু সব কথা তো জানি না। আমার বাপ-পিতাম'র তাঁরা যখন মনিব ছিলেন তখন কতক কতক জানি বৈকি।

ইহা বলিয়া ভরত চুপ করিয়া রহিল। রহস্যময় ভবনের রহস্য ভেদ করিবার জন্য আমার কিন্তু কৌতূহল বাড়িয়া গেল। তবে আমি বিদেশী লোক, সে গ্রামের বাসিন্দা নহি,—ভরত আমাকে সব কথা বলিবে কি? তবু জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কি রণেন্দ্র চৌধুরীকে দেখেছিলে, ভরত?

ভরত বলিল—দেখেছি, বাবু। খুব ছেলেবেলায় ঠাকুরদার সঙ্গে আমি যে অনেকবার ও-বাড়ীতে গেছি। তারপর ঠাকুরদা যখন নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল তখন আমার বাপের কাছ থেকে এ বাড়ী সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। কিন্তু সব কথা তো পর পর ঠিক জানি না, বাবু।

আমার কৌতূহল তখন বাড়িয়া গিয়াছে, আমি নাছোড়বান্দা। ভরতকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। সে কিন্তু জবাবে মাঝে মাঝে অনেক কথা চাপিয়া যাইতে লাগিল। আমার সুবিধা এই ছিল যে, আমি ছিলাম পৈতাধারী ব্রাহ্মণ, আর ভরত ছিল বাগ্‌দী। সুতরাং পৈতার দোহাই দিয়া যখন আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, গোপন কথা কাহাকেও বলিব না, তখন ভরত তাহার বাপের কাছ হইতে শোনা কথাগুলি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আমাকে জানাইল। ভরতের কথাগুলি গুছাইয়া দাঁড় করাইয়া যাহা হইল তাহা এই।—

জমীদার মহেন্দ্র চৌধুরী নিজের প্রবল শক্তিতে বাঙ্গলার অনেক দুর্দ্দান্ত জমীদারকে শাসন করিয়া বাঙ্গলার নবাবের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রণেন্দ্রও পিতার সুখ্যাতি বজায় রাখিয়াছিলেন। দুষ্টের দমনে তিনিও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। একবার এক অশিষ্ট ও অসাধু জমীদারকে শাসন করিতে গিয়া তিনি ব্যর্থমনোরথ হন। জমীদার তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যান। বহু দেশ-বিদেশে তাঁহার সন্ধানে চর পাঠাইয়াও রণেন্দ্র চৌধুরী তাঁহার সন্ধান পান নাই। সেই নিরুদ্দিষ্ট জমীদারের পরিবর্ত্তে তাঁহার যুবক পুত্র রজত রায়কে তিনি বন্দী করিয়া আনেন। তাঁহার বৃহৎ ভবনের বহির্ব্বাটীর এক অংশে রজতের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। রজতের প্রতি বন্দীর মত ব্যবহার করা হইত না। বহির্ব্বাটীতে সে মুক্ত ভাবেই বিচরণ করিত। তবে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য দারোয়ানদের উপর গোপন আদেশ ছিল।

এক বৎসর পরে দেখা গেল, রজতের চরিত্রে তাহার পিতার অসাধুত্ব তো নাই-ই, বরং পিতৃ স্বভাবের বহু গুণে সে সমন্বিত। অধ্যয়নে তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাহারা মূলতঃ ছিল পাঞ্জাবী, কিন্তু কয়েক পুরুষ বাঙ্গলা-দেশে থাকায় তাহারা বাঙ্গালীই হইয়া গিয়াছিল। তথাপি পঞ্জাবের সাহিত্য বিষয়ক পুস্তক ও সেখানকার ভাস্কর্য্যের কিছু কিছু নিদর্শন তাহার ঘরে পরম যত্নে রক্ষিত ছিল। চেহারায় সে ছিল সুদর্শন, আকারে দীর্ঘ, স্বাস্থ্যে সুঠাম এবং বর্ণে গৌর। মোটের উপর, তাহাকে সুপুরুষ বলিলে অন্যায় হইত না। অধ্যয়ন এবং ভ্রমণ তাহার

বিলাস ছিল। এক বৎসর পরেও যখন রণেন্দ্র দেখিলেন যে, রজতের স্বভাবে আপত্তিজনক কিছু নাই, তখন তিনি তাহাকে অল্প একটু স্বাধীনতা দান করিলেন; অর্থাৎ, রজতের ইচ্ছানুযায়ী তাহাকে সন্ধ্যাবেলা ঝিলের ধারে বেড়াইতে দেওয়া হইত। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি প্রায় দশটা অবধি রজত ঝিলের ধারে বেড়াইয়া ও বসিয়া নিঃসঙ্গভাবে সময় কাটাইয়া দিত। ঝিলের ছোট ছোট ঢেউগুলির নৃত্যলীলার উপর দৃষ্টি রাখিয়া সে কি ভাবিত তাহা কে জানে? কখনও ঝিলের পরপারে আকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সে উদাস মনে বসিয়া থাকিত। পিতামাতার স্নেহ হইতে সে বঞ্চিত, গৃহের আরাম সে হারাইয়াছে, মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ গতিবিধি তাহার নিষিদ্ধ। পিতা কোথায়, জননী কেমন আছেন, তাহা সে জানে না। এই বিড়ম্বিত, লাঞ্ছিত জীবন সে কত দিন বহন করিবে? কবে আবার সে মাতৃক্রোড়ে, গৃহের মধুর বন্ধনে ফিরিয়া যাইবে? রণেন্দ্র চৌধুরীর উপর সে প্রতিশোধ লইবে কি? কিন্তু রণেন্দ্র তাহাকে বন্দী করিলেও যথেষ্টই যত্ন-স্নেহ করিয়া থাকেন। আর প্রতিশোধ লইবার তাহার শক্তি কোথায়? সে পলাইবেই বা কোথায়? রণেন্দ্রের দৃষ্টি শ্যেন পক্ষীর দৃষ্টির মত। সে দৃষ্টি এড়াইয়া সে থাকিবে কোথায়? পুনরায় ধরা পড়িলে যে শাস্তি ও লাঞ্ছনা ঘটিবে তাহা ভাবিলেও ভয় হয়।

এমনই চিন্তায়, এমনই ঔদাস্যে রজতের দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। রজতের স্বভাবে চাঞ্চল্যের অভাব দেখিয়া রণেন্দ্র তাহার গতি-বিধির স্বাচ্ছন্দ্য আরও কিছু বাড়াইয়া দিলেন।

•

আশ্বিন মাসের শেষাশেষি। চৌধুরী বাড়ীতে পূজার আনন্দ ও গোলমাল সবেমাত্র থামিয়াছে। আত্মীয়-স্বজনেরা সকলেই প্রায় চলিয়া গিয়াছেন, দুই একজন মাত্র আছেন। রণেন্দ্র চৌধুরী তাঁহার নিয়ম মত জমীদারীর কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। অতি প্রাতঃকালে তিনি শয়ন-গৃহ ত্যাগ করিয়া সদর বাটীতে আসিতেন। সেইখানে লোকজনের সঙ্গে দেখাশুনা ও জমীদারীর কার্য্য সারিয়া মধ্যাহ্নে মাত্র আহার করিবার জন্য একবার অন্তঃপুরে আসিতেন। তাহার পর আবার সদর বাটীতে গিয়া দিনের অবশিষ্ট সময় কাটাইয়া সন্ধ্যা হইতে সেখানে পাশা খেলায় মশগুল হইতেন। রাত্রি বারোটার পূর্ব্বে পাশা খেলা শেষ হইত না। বারোটার পর তিনি অন্তঃপুরে বা শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিতেন। তাঁহার পত্নী লক্ষ্মী স্বভাবেও লক্ষ্মী ছিলেন। পত্নীর কোনও আচরণের কোনও ত্রুটির কথাই রণেন্দ্রের কাণে কখনও আসিত না। সদর বাটীতে বসিয়াই তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত চাকর লক্ষ্মণ সর্দ্দার আর দাসী শ্যামার দ্বারা এমন খবরাখবর লইতেন যে, অন্তঃপুরের কোনও দিনের কোনও ঘটনাই তাঁহার অজ্ঞাত থাকিত না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর শাসক এবং ধীর বিবেচক। সুতরাং তাঁহার বাড়ীর এবং জমীদারীর সকলেই তাঁহাকে সমান মাত্রায় ভয় এবং শ্রদ্ধা করিত।

এই প্রবল নিষ্কণ্টক জমীদারের জীবনের যে অদ্ভুত ও স্মরণীয় রাত্রির কথা এইবার বিবৃত করিব, তাহা একবারেই আকস্মিক।

সেদিন সোমবার। রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। রণেন্দ্র চৌধুরী পাশা খেলা সারিয়া ধীর পদবিক্ষেপে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল—অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া শয়ন-গৃহের কাছাকাছি আসিয়া শ্যামাকে ডাক দিতেন। শ্যামা আসিলে প্রায় তাহার পিছনে পিছনে শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিতেন। সেদিন কি যেন খেয়ালে তিনি শ্যামাকে ডাকিতে ভুলিয়া গেলেন। গম্ভীর-মন্থর পদধ্বনি করিতে করিতে তিনি শোবার ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ধীরে ধীরে তাহার দরজা খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার শয়ন-গৃহের সঙ্গেই এক বিলাস গৃহ ছিল, তাহা বলা হইয়াছে। সেই গৃহকে রণেন্দ্র "আরাম-ঘর" বলিতেন। তাহাতে প্রবেশ করিবার দরজা তাঁহার শোবার ঘরের মধ্যেই ছিল।

শোবার ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলার সময়ে রণেন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার "আরাম-ঘরে"র দরজা যেন একটু নড়িয়া উঠিল। তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মী শয্যার উপর বসিয়াছিলেন। এক মুহূর্ত্ত পরেই শ্যামা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। রণেন্দ্র একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে শ্যামার ও তাঁহার পত্নীর মুখের দিকে একবার তাকাইলেন। মনে হইল, পত্নীর

মুখে কেমন একটা যেন সন্ত্রস্ত ভাব; স্বাভাবিক আনন্দ-ভাবের যেন অভাব।

লক্ষ্মী ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে কহিলেন—আজ তোমার এত দেরী হ'ল যে?

রণেন্দ্র কোনও জবাব দিলেন না। স্থির দৃষ্টিতে তিনি কিছুক্ষণ "আরাম-ঘরের" দরজার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর গম্ভীরভাবে তিনি এক জানালা হইতে অপর জানালার ধারে পায়চারি করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মী ভীতকণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—কোনও কিছু খারাপ খবর পেয়েছ কি? তোমার শরীর খারাপ নয় তো?

রণেন্দ্র তথাপি নীরব। তেমনি গম্ভীর মুখে তিনি পায়চারি করিতে লাগিলেন।

দাসী শ্যামা তখন কর্ত্তার পান ইত্যাদি সাজাইয়া রাখিতেছিল। লক্ষ্মী স্বামীর মুখ দেখিয়া গোলযোগের আশঙ্কা করিলেন। সুতরাং দাসীর সাম্‌নে তাহা ঘটিতে দেওয়া ভাল হইবে না। শ্যামাকে তিনি বলিলেন—তুই এখন যা, আমি সব গুছিয়ে রাখব।

শ্যামা চলিয়া গেল। তখন অতি ধীর সুদৃঢ় পদক্ষেপে রণেন্দ্র পত্নীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন—লক্ষ্মী, আরাম-ঘরে কোনও লোক আছে বলে আমার মনে হচ্ছে।

লক্ষ্মীর দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর স্থির,—তিনি বলিলেন—না, ও-ঘরে কেউ নেই।

স্ত্রীর এই বাক্যে স্বামী বিশ্বাস করিলেন না। অথচ লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া রণেন্দ্র তাঁহাকে যেন পবিত্র বলিয়াই মনে করিলেন, যেন অন্য দিনের অপেক্ষাও পবিত্র মনে হইল। কিন্তু জমীদার রণেন্দ্র এত সহজ পাত্র নন। তিনি ধীরে ধীরে আরাম-ঘরের দরজার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। লক্ষ্মী অবসন্ন ব্যাকুল দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া তাঁহার একটি হাত ধরিয়া আবেগভরে বলিলেন—দেখ, যদি ঐ ঘরে কেউ না থাকে, তবে কত বড় সন্দেহের কলঙ্কে আমাকে ফেল্‌বে?

রণেন্দ্র থামিলেন। বলিলেন—দেখ, তোমার কথাই থাক্; আমি ও-ঘরে যাব না। আচ্ছা, এই তো আমাদের গৃহদেবতা শিবের ছবি রয়েছে, সেটা ছুঁয়ে তুমি বল যে, ও-ঘরে কেউ নেই।

লক্ষ্মী বিহ্বল দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া, ধীরে ধীরে শিবের ছবির দিকে হাত বাড়াইয়া তাহা স্পর্শ করিলেন। রণেন্দ্র বলিলেন—বলো, আমি যা বল্‌ছি বলো—বলো।

লক্ষ্মী বলিলেন—আমি শপথ ক'রে বল্‌ছি—

রণেন্দ্র কিছু তপ্ত কণ্ঠে বলিলেন—হ'ল না, বলো—"আমি শপথ ক'রে বল্‌ছি ও ঘরে কেউ নেই।"

রণেন্দ্র বলিলেন—বেশ, বোস।

লক্ষ্মী শয্যায় বসিলে তিনি ঘরের চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ এক তাকের কোণ হইতে একটি ছোট শাদা বুদ্ধ মূর্ত্তি তিনি তুলিয়া লইলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ওটা কোথা থেকে এল? আগে তো দেখিনি?

লক্ষ্মী বলিলেন—নায়েব মশাইরা কোন্ দেশ থেকে—পাঞ্জাব না কোন্ দেশ থেকে ওটা আনিয়েছিলেন। তাঁদের বাড়ীতে পূজার সময় গিয়ে ওটা এনেছিলাম।

এমন সময়ে বাহিরে কাহার পদধ্বনি শোনা গেল। পদশব্দ রণেন্দ্রের অপরিচিত নয়। তিনি বলিলেন—কেরে, লক্ষ্মণ?

হাঁ, হুজুর, আমি—বলিয়া ভীমাকৃতি লক্ষ্মণ সর্দ্দার দরজার বাহিরে দূরে দাঁড়াইল।

কি খবর তোর এত রাত্তিরে? বিরক্ত কণ্ঠে রণেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন।

লক্ষ্মণ বিনীত স্বরে বলিল—হুজুর, খবর আছে। রজতবাবুর কাছে যে দারোয়ান রাখা হয়েছে সে এই মাত্র আমাকে বল্‌লে যে, রোজকার মত আজও বিকাল বেলা রজতবাবুর ঝিলের ধারে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু এই রাত দেড়টা অবধি ফেরেননি। দরোয়ান তন্ন তন্ন ক'রে সন্ধান করেছে, কিন্তু তাঁর খোঁজ পায়নি।

দৃপ্ত কণ্ঠে রণেন্দ্র বলিলেন—কাল সকালে দারোয়ানের সঙ্গে বোঝাপড়া হবে। আজ সমস্ত রাত তল্লাস কর্‌তে বল্।

লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। রণেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন; দাঁতে ওষ্ঠ চাপিয়া তীব্র ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

তিনি কিয়ৎক্ষণ কি যেন ভাবিয়া লইলেন। আহত ব্যাঘ্রের মুখে যে নিদারুণ আক্রোশ দেখা যায়—দুর্দ্দান্ত জমীদার রণেন্দ্র চৌধুরীর মুখে সেই ভাব ফুটিয়া উঠিল। প্রকাণ্ড ও পরুষ কণ্ঠে ঘর কাঁপাইয়া তিনি ডাকিলেন—লক্ষ্মণ, শুনে যা।

লক্ষ্মণ সর্দ্দার কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। রণেন্দ্র বলিলেন—লক্ষ্মণ, চাকর-বাকর কেউ জেগে আছে?

—দু' একজন আছে।

—তাদের এখনই শুতে যেতে বল্। কেবল শ্যামা আর তুই ঘরে আয়।

লক্ষ্মণ কর্ত্তার আদেশ পালন করিয়া আসিল। শ্যামাও আসিল। রণেন্দ্র বলিলেন—লক্ষ্মণ, তুই রাজমিস্ত্রীর কাজ তো জান্‌তিস্, এখনও সে কাজ পারিস্?

—পারি, হুজুর।

—তবে এই রাত্রিতে নিঃশব্দে বাগানের ঘর থেকে ইট ও মশলা এনে এই যে আমার আরাম ঘরের দরজা দেখ্‌ছিস্ ওটার ওপর ভাল ক'রে ইট গেঁথে ওটা ঢেকে ফেল্‌তে হবে। পার্‌বি তো?

এত রাত্রে এমন একটা অদ্ভুত কাজ কেন করিতে হইবে, সে বিষয়ে লক্ষ্মণ বিন্দুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করিল না। বলিল—নিশ্চয়ই পার্‌ব, হুজুর।

—যা, তবে এখনই সব ঠিক ক'রে ফেল্। আর এক কথা,—শোন্।—বলিয়া লক্ষ্মণকে ও শ্যামাকে তিনি তাঁহার বৃহৎ কক্ষের এক কোণে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। এত চাঞ্চল্যের মধ্যেও তিনি কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছিলেন। ঘরের কোণে স্ত্রীর কাছ হইতে দূরে আসিয়া তিনি নিম্ন স্বরে বলিলেন—শোন্ লক্ষ্মণ, শোন্ শ্যামা,—আজকের রাত্রিতে যা ঘট্‌ছে তার বিন্দু বিসর্গ কাউকে বল্‌তে পার্‌বি না। বল্‌লে তোদের শির উড়িয়ে দেবো। লক্ষ্মণ, তোকে আমি হাজার টাকা দিচ্ছি, কাজ শেষ হ'লে তুই সেই টাকা এই রাত্রেই তোর ছেলের কাছে দিয়ে আয়, আর ব'লে আয়—আমার হুকুমে কালই তোকে বিদেশে যেতে হবে, কবে ফির্‌বি তার ঠিক নেই। বাড়ীতে একথা বল্‌বি বটে, তোর ফেরা কিন্তু আর হবে না; বিদেশেই তোকে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে। তার খরচ আমি তোকে দিয়ে দেবো।—আর শ্যামা, তোকেও ঐ কথা। তোকে আমি পাঁচশ' টাকা দিচ্ছি, তোর ভাইপোকে দিয়ে আয়, আর ঠিক ঐসব কথা ব'লে আয়।—নে লক্ষ্মণ, আর দেরী নয়।

রণেন্দ্র চৌধুরীর হুকুম এড়াইয়া চলা দাস-দাসীর সাধ্যাতীত। সুতরাং হুকুমানুযায়ী কাজ আরম্ভ হইল।

লক্ষ্মণ একখানির পর একখানি ইট গাঁথিয়া তুলিতেছিল—খুব দ্রুত ভাবে। রণেন্দ্র নির্ব্বাক্ ভাবে তাহা লক্ষ্য করিতেছিলেন। লক্ষ্মীও নির্ব্বাক্। তিনি কাতরতা না দেখাইয়াই যেন আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতেছিলেন। শ্যামা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ছিল এবং মাঝে মাঝে লক্ষ্মণকে তাহার কাজে সাহায্য করিতেছিল।

ইট গাঁথা যখন প্রায় শেষ হইয়াছে, দরজার মাথা সমান যখন প্রাচীর প্রায় উঠিয়াছে তখন সেই গাঁথা দরজার ভিতরে কে যেন করাঘাত করিল,—চাপা গলায় কাতর স্বরে কে যেন বলিল—"দরজা খুলে দাও

ঘরের ভিতরকার চারিটি নির্ব্বাক্ মানুষের কাণে এই চাপা কণ্ঠস্বর যেন বজ্রধ্বনির মত বাজিল। চার জনেই শিহরিয়া উঠিলেন। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের দৃষ্টি দিয়া রণেন্দ্র তাঁহার স্ত্রীর দিকে চাহিলেন। লক্ষ্মী তখন শয্যায় বসিয়া কাঁপিতেছিলেন। শ্যামা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। লক্ষ্মণ কি করিবে স্থির করিতে পারিতেছিল না। নিষ্কম্প রণেন্দ্র বিহ্বল লক্ষ্মণকে ভৎর্সনা করিয়া অতি শীঘ্র ইট গাঁথা শেষ করিতে বলিলেন। কয়েক মিনিটে গাঁথা শেষ হইয়া গেল। আবার যেন সেই মৃদু করাঘাত! লক্ষ্মী কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। রণেন্দ্র ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। লক্ষ্মণ ও শ্যামাকে প্রতিশ্রুত অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন।

খানিক পরে লক্ষ্মীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাতজোড় করিয়া তিনি স্বামীর দিকে আসিবার চেষ্টা করিলেন। অটল, নির্ম্মম, কঠোর রণেন্দ্র বলিলেন—দাঁড়াও, এস না। তুমি তো ঠাকুরের ছবি ছুঁয়ে বলেছ, ও ঘরে কেউ নেই!!*

* ফরাসী লেখক Balzacএর অনুসরণে।

# হিংসা ও অহিংসা

শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার

মানুষের জীবন যাত্রায় হিংসা ও অহিংসার কথা আজ আমাদের সামনে বেশ বড় হয়ে উঠেছে। কথাটি অতি প্রাচীন; দৈনন্দিন ব্যবহারেও এই সমস্যাটি দেখা যায়। অভিব্যক্তির ধারা আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে মানুষ অহিংসা ব্রতসম্পন্ন হতে চাইলেও ইচ্ছানিচ্ছাকৃত হিংসা এসে পড়ে। হিংসা-অহিংসা ব্যাপার প্রাণধর্ম্মের কথা—আত্মধর্ম্মের কথা নহে। মানুষের স্বরূপ আনন্দ-জ্ঞানপূর্ণ হলেও, মানুষের প্রাণস্তরে আত্মরক্ষার আস্পৃহা আছে। এই স্তরেতেই বেঁচে থাকবার ইচ্ছা (will to live) হতে হিংসা-অহিংসার কথা উঠে। উদার প্রশান্ত সত্তার ভিতর হিংসার কথাও নাই, অহিংসার কথাও নাই। সার্ব্বভৌমিক চেতনা-রাজ্যে আছে শান্তির সংবাদ, আনন্দের সংবাদ। অভ্যুদয়ে প্রাণের সঙ্কুচিত স্তর হতে মুক্ত হয়ে সমষ্টি মন বিরাটে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সোপেনহাওয়ার বলতেন, মানুষের ভিতর বাঁচবার ও ভোগের আস্পৃহা (will to live) মানুষের প্রাথমিক স্বরূপ। এর জন্যই মানুষ প্রাণের সঙ্কোচ হতে মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু প্রাণস্তরেই বদ্ধ থাকলে তার প্রকৃত স্বরূপের সহিত পরিচয় হয় না এবং মানবিকতার পূর্ণ স্ফূর্ত্তিরও ব্যাঘাত হয়। সোপেনহাওয়ার শক্তিবাদী হলেও তাঁর দৃষ্টি ত্যাগধর্ম্মের মহিমা অতিক্রম করেনি। তিনি will 'to deny' স্বীকার করেছেন এবং এই পথে বুদ্ধত্ব ও খৃষ্টত্বের বিকাশ হয়, এই কথাই বলেছেন।

হিংসার উৎপত্তি 'will to live'এ, অহিংসার উৎপত্তি 'will to deny'এ। অহিংসার ভিতর দিয়েই প্রাণের সঙ্কোচ দূরীভূত হয়, সূক্ষ্মতর ব্যাপকতর জীবনের বিকাশ হয়। জীবন-স্পন্দন সেখানে স্বচ্ছ, রমণীয়, সঙ্কোচহীন, প্রসারশীল। হিংসার পথে জীবন সঙ্কুচিত হয়ে ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসে, এবং অখণ্ড মানবত্বের অনুভবে বাধা জন্মায়। বিষয়টি নিত্যপ্রত্যক্ষসিদ্ধ।

যাঁরা জীবনে আধ্যাত্মিক বিকাশের দিকে অগ্রসর তাঁরা সার্ব্বভৌম অহিংসা ব্রতকেই গ্রহণ করেন। পূর্ণ অহিংসায় চিত্ত উদ্বুদ্ধ না হলে বিশ্বে বিরাটের জ্ঞান অনুভূত হয় না। এই জন্যই প্রাচীনেরা কি জ্ঞানবাদী, কি ভক্তিবাদী, কি অধ্যাত্মযোগী, সার্ব্বভৌমিক অহিংসাকে কল্যাণের পথ রূপে গ্রহণ করেছেন। যাঁরা নিবৃতকাম, তাদের অন্তর বিরাটের ছন্দে স্বতঃ স্ফূর্ত্ত। এই জন্যই ভাগবৎকার বলেছেন, ভগবান নিবৃতকাম ব্যক্তিত্বের ভিতরে অধিষ্ঠিত হন এবং তাঁরাও তাঁর যশোগান করে অকিঞ্চন হয়েও শ্রেষ্ঠতম সুষমা প্রাপ্ত হন। সত্যের ধৃতি, কল্যাণের কান্তি, আনন্দের সাবলীল গতি তাঁদের নিত্য সম্পদ।

জীবনের এই গতিই পরম গতি। হিংসাব্রতী এই গতি লাভ করতে পারে না।

কথাটা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে অতি সত্য হলেও জাতির ও সমষ্টির পক্ষে সার্ব্বভৌমিক অহিংসাব্রতের স্থান কোথায়? এটা আজ ভাব্‌বার বিষয় হয়ে পড়েছে। সমষ্টির ভিতর অহিংসা-সাধনা বিশ্ববিধানে অত্যন্ত কল্যাণকর। কিন্তু সমষ্টির প্রাণভূমিকায় যে সঙ্কোচরাশি এখনও কার্য্যকরী তাহার বিনাশ না হলে সমষ্টিগত অহিংসাব্রত সিদ্ধ করা অসম্ভব। বুদ্ধের ন্যায় কল্যাণে উদ্বুদ্ধ মহাপুরুষেরাই বিশ্বমৈত্রীতে জাগ্রত। কেন না, প্রাণের সব সঙ্কোচ হতে তাঁহারা মুক্ত। নিত্যোদ্ভাসিত জ্ঞানে প্রাণের প্রসারতা ও উদারতা প্রতিষ্ঠিত। প্রাণ সেখানে ছন্দোযুক্ত বলেই সমস্ত ক্লেশ হতে উত্তীর্ণ। এইরূপ পুরুষপুঙ্গবেরা জীবনের পথে আলোকসম্পাত করে মানুষকে উর্দ্ধগতিসম্পন্ন করেন। কিন্তু মানুষের ভিতর সত্তার নিম্নস্তরের আকর্ষণ এত জাগ্রত যে, এইরূপ অহিংসাব্রত সমষ্টিগত মানব এখনও গ্রহণ করতে পারেনি। মানুষের ভিতর 'will to live' এখনও এত কার্য্যকরী বিশেষতঃ আজকালকার বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ এত শক্তি পেয়েছে যে, জীবনের পথে সার্ব্বভৌমিক অহিংসা এবং সমষ্টি কল্যাণ ধীরে ধীরে মানুষের দৃষ্টিপথে ম্লান হয়ে পড়ছে।

পাশ্চাত্যদেশে বিজ্ঞানের শক্তি এবং দর্শনের প্রাণবাদ

এত জাগ্রত যে, আস্পন্দীভূত প্রাণের সজীবতাই সেখানে ক্রীয়াশীল; প্রশান্ত সমাহিত প্রাণের মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠার পরিচয় সেখানে নেই। নীট্‌শের অতিমানবে গভীর শক্তির উচ্চতার পরিচয় আছে, কিন্তু পরিচয় নাই জ্ঞানের প্রশান্তি ও প্রসারতার। সোপেনহাওয়ারের 'will to live' অবলম্বন করে জাতি ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় পাশ্চাত্য জাতিসমূহ তৎপর। এই সমষ্টিগত 'will to live' ও-দেশের সমস্ত রাষ্ট্রের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। এর জন্য সমষ্টিগত হিংসাকে তারা ধর্ম্ম বলে বরণ করেছে।

আমাদের দেশে যাঁরা সন্ন্যাসমার্গে বিচরণ করেন তাঁরা ছাড়া রাষ্ট্রে ও সমাজে বৈধী হিংসার ব্যবস্থা বেদমার্গসম্মত। বৈধী হিংসা হিংসা নয়—আত্মরক্ষার উপায়। আত্মরক্ষা সমাজগত ও রাষ্ট্রগত ধর্ম্ম। কিন্তু এই বৈধী হিংসাকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে হিংসাতীত হবার জন্য। রাষ্ট্র ও সমাজকে বিরাটের বোধে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা বরাবর হয়েছে, যদিও আত্মরক্ষার জন্য কখন কখন হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করারও আবশ্যক হয়েছে। অহিংসা ও লোক-কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত অশোকের সাম্রাজ্য বিশ্ববিধানে চিরস্থিতি লাভ করে নাই, কিন্তু এর ভিতর যে সমাজ ও রাষ্ট্র বিধানের একটা আদর্শ নিহিত ছিল তাতে সন্দেহ নাই।

মানব-জগতের পারিপার্শ্বিকতা ছেড়ে শুধু একটা abstract নীতিবাদের উপর সমাজ-ব্যবস্থা রচনা করা মানুষের পক্ষে কঠিন, কারণ যে মানুষের ইচ্ছা ও আদর্শের দ্বারা সমগ্র মানব-জগৎ চালিত হতে পারে এরূপ মানুষ-সমাজে অতি বিরল।

যেখানে বিশ্ববিধানের মঙ্গল (cosmic ends) মূর্ত্ত হয়ে প্রকাশিত হয়, সেখানে জীবনাবেগ সম্পূর্ণ অহিংসাতে প্রতিষ্ঠিত। লোকোত্তর পুরুষেরাই, যেমন বুদ্ধ ও যীশু, এইরূপ কল্যাণব্রতে উদ্বুদ্ধ! জীবনের পথে যে আলোক-সম্পাত তাঁরা করেছেন, মানুষ হয়ত অভ্যুদয়ে সেই পথই অবলম্বন করবে। যাদের আধার স্বচ্ছ ও শুদ্ধ তাদের ভিতর এই শক্তি প্রতিফলিত হয়ে ক্রিয়াশীল হ'তে পারে। কোন শক্তিরই বিনাশ হয় না। আধারের স্বচ্ছতায় ও নমনীয়তায় তার বিকাশ হয়। কিন্তু ইহাও সত্য যে, এইরূপ পুরুষের শক্তি সর্ব্বত্রই বিচ্ছুরিত হয় না। বিশ্ব-বিবর্ত্তনে কখন কখন সত্যের ও কল্যাণের রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসের ভিতর দিয়েও সমষ্টিগত মানব সমাজ কখন কখন এরূপ আদর্শকে গ্রহণ করে মানব জাতিকে মানবধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনে এই সার্ব্বভৌমিক মানব-ধর্ম্ম কখন কখন আবৃত হয়। সমষ্টিগত মানবের কল্যাণ তারাই চেয়েছেন যারা অখণ্ড মানবত্বের মহিমায় উদ্বুদ্ধ। সমষ্টি মানব-সমাজের কল্যাণবোধ আমরা ষ্টইক্‌স্-এর ভিতর, দান্তের ভিতর, হিন্দুদের ভিতর, বৌদ্ধদের ভিতর দেখতে পাই। দান্তে World Empire-এর স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু মানব সমাজের ইতিহাসে এখনও এ-স্বপ্ন পরিপূর্ণ কার্য্যকারী হয় নাই। মানুষের মধ্যে এমনই বৃত্তি আছে যে এরূপ স্বপ্ন দর্শনকেও বাধা দেয়। এই জন্যই সমাজগত জীবনে সমাজ ও রাষ্ট্রে হিংসার বৃত্তি থেকেই যাচ্ছে।

আজকালকার রাষ্ট্রে যে পরিমাণ হিংসার বৃত্তি জাগরূক হয়েছে, তাতে জাতিতে জাতিতে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে একটা বিরাট্‌ সংঘর্ষ উপস্থিত। হিংসার মূল উৎস জাতিগত অধিকার নিয়ে। একটা জাতির অপর একটা জাতির উপর অধিকার ও সাম্রাজ্য-পিপাসা হিংসার কারণ হয়ে থাকে। মানুষের দৃষ্টি যতক্ষণ জাতি-কেন্দ্রকে অতিক্রম করে বিশ্ব-কেন্দ্রে স্থাপিত না হয়, ততক্ষণ হিংসা স্বাভাবিক। গত যুদ্ধের পরে একটা জাতিসঙ্ঘ তৈরী হয়েছিল। মানব-জাতির অধিকারের বৈষম্য ধীরে ধীরে দূরীভূত করে সমতার বেদীতে এক অখণ্ড রাষ্ট্রের বীজ প্রতিষ্ঠা করতে, কিন্তু তাহা আংশিকভাবেও কৃতকার্য্য হয় নাই। কারণ সত্যি করে অহিংসা ও প্রেমের উপর এই সঙ্ঘ স্থাপিত হয়নি। এই জন্যই বর্ত্তমান যুদ্ধের অবতারণা। বর্ত্তমান যুদ্ধের বীজ জাতিগত অধিকারের ভিতরেই নিহিত।

রাশিয়া সমষ্টির মানব-কল্যাণব্রত গ্রহণ করলেও, তাহা অর্থনৈতিক দৃষ্টিতেই নিবদ্ধ এবং যখনই আবশ্যক হয় তখনই হিংসাকে অবলম্বন করিতে তারা পরাঙ্মুখ হয় না। প্রকৃত অহিংসার ভিত্তি সেখানে নাই, থাকতেও পারে না। সমষ্টিগত মানবসত্তার অখণ্ডবোধ হতেই অহিংসার উৎপত্তি হয়। এই বোধ যেখানে স্ফূর্ত্ত নয়, সেখানে অহিংসা

অসম্ভব। বুদ্ধি দ্বারা অহিংসার কার্য্যকারিতা বুঝলেও প্রাণের সঙ্কোচ থেকে হিংসার উদয়। বুদ্ধির সহিত প্রাণের সম্যক্ উন্মেষ না হলে বিশ্বগত অহিংসার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। ভারতবর্ষ আজ তার রাষ্ট্রবিধানে অহিংসাকে অবলম্বন করে অগ্রসর হতে চাইছে। এটা কখন কখন স্বপ্নের বিলাস বলে মনে হয়। একটা জাতিকে সম্পূর্ণরূপে অহিংস করে তোলা অত্যন্ত কঠিন। যদি কোন জাতি সমষ্টিভাবে এইরূপ অহিংসাব্রত প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সে হয়ত বিশ্বের অন্তরে একটা বিরাট্ শক্তির উদ্বোধন করবে। যে পরিমাণ হিংসার বিকাশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাতে মানুষের অবচেতনার ভিতরে অহিংসার স্বতোদ্ভাসিত হবার সম্ভাবনা আছে। জীবনের ভিতর আছে একটা প্রসারের বৃত্তি। যখন জীবনের বৃত্তি অত্যন্ত সঙ্কোচশীল, তখন বিপরীত বৃত্তি প্রসারিত ও ক্রিয়াশীল হয়। অন্তর-চেতনার ধর্ম্মই এই। চারিদিকে যেমন জীবনের সঙ্কোচলীলা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তা থেকে মুক্ত হবার জন্য জীবনের একটা চেষ্টা স্বতঃই হবে। এই চেষ্টাই হবে অহিংসার প্রতিষ্ঠার মূল কারণ। ভারতবর্ষে যে অহিংসার সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে তার মূলে আছে এই আবশ্যকতা। রাষ্ট্র ও সমাজের নিপীড়িত জীবন হতে এই উদার বৃত্তি দেবে মানুষকে নিষ্কৃতি। মানব সমাজের সব স্তরে হয়তো এ নীতি প্রত্যাখ্যাত হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের যাঁরা বিধানকর্ত্তা তাঁদের ভিতর এই নীতির উদ্বোধন খুব অসম্ভব কথা নহে। ভাবনায় বিশুদ্ধিতা ও উৎকর্ষ মানুষের অন্তর জীবনের ভিতর এই দীপ্তি এনে দিতে পারে। হিংসার উৎপত্তি ভয়ে ও অধিকারচ্যুতিতে। অহিংসা অভয়। অহিংসার সমষ্টিগত দৃষ্টি ও প্রাণের প্রশান্তিতে ভয় তিরস্কৃত হয়।

বিশ্বে আজ এই অহিংসার বাণী অত্যন্ত আশাপ্রদ। মানব সমাজের নিকটে এই বাণী অন্ধকারে আলোক স্বরূপ। এই বাণী যেখানে মূর্ত্ত সেখান থেকে অনন্ত দীপ-শিখার ন্যায় ইহা দেশবিদেশে মানবের ভিতর প্রজ্জ্বলিত হয়ে মানব সমাজের শান্তির বিধান করবে। শক্তির নগ্ন-বিকাশে বিশ্ব কম্পমান; শক্তির কল্যাণ মূর্ত্তি এই অহিংসার রূপ নিয়ে বিশ্বের শান্তি ও পুষ্টির বিধান করুক, ইহাই আজ আর্ত্ত মানব-হৃদয়ের সকাতর প্রার্থনা।

---

# জ্যোতির্ম্ময়

শ্রীলীলা দেবী

পোহাল কি আজ অমানিশি ঘন ঘোর
বাজিল কি গান সুপ্রভাতের সুরে?
জীবন-বন্ধু! টুটিল কি ঘুম ঘোর
তোমার আলো কি হাসিল হৃদয়পুরে?

বহুদূর হ'তে বহু দুর্দ্দিন বহি'
চলিতেছিলাম একাকী অন্যমনে
সুমুখে আসিলে কি যে সান্ত্বনা কহি'
সুন্দর হ'য়ে দেখা দিলে এ জীবনে।

তোমারে চিনিল হিয়া মোর আশ্বাসে,
বাজিয়া উঠিল আহত-বীণার বুকে
চির জীবনের সুখ দুঃখের গান
তোমারে সঁপিতে নমিল শান্ত মুখে।

একটি প্রণাম ঘেরি' দুটি শ্রীচরণ
মঞ্জীর সম বাজিল চিরন্তন।

# রত্নাকর

( অপ্রকাশিত রচনা )

৺ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

কি সুধা লুকা'য়ে রাখ লবণাক্ত অম্বুর ভিতর?
বক্ষের গোপন কক্ষে কি অমৃত গুপ্ত নিরন্তর
গূঢ় মর্ম্ম তলে?
নক্ষত্র-খচিত নভ, মেঘপুঞ্জ, তটশৈলচয়,
বিম্বিত হইয়া তব চিত্ত-পটে, কি সন্ধান লয়
ওই স্বচ্ছ জলে?
ধূলিময়ী ধরণীর উচ্ছ্বসিত আবিল হৃদয়
নদী-নদে প্রবাহিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে বেগময়
কেন তব বুকে?
লুকা'য়ে রেখেছ প্রাণে গাঢ় ঘন কি মধু-ভাণ্ডার,—
বিন্দু যার সুধাপানে লক্ষ উর্ম্মি হ'য়ে মাতোয়ার
হাসে ফেন-মুখে?
কি অজ্ঞাত অ-স্বাদিত সুধা-ভাণ্ড অভ্যন্তরে তব,
যার লাগি' মন্থনিতে সমুদ্যত সুরাসুর সব
বাসুকি-মন্দরে?
ঐরাবত, পাঞ্চজন্য, লভি' পুনঃ সিন্ধু-তুরঙ্গম,
ক্ষান্ত না হইল তবু, পুষি' মরি, কহ মহোত্তম,
কি আশা অন্তরে?

সামান্য মানব মোরা; কেহ ডুবি' সলিলে তোমার
মণি মুক্তা প্রবালাদি ল'য়ে শুধু রহে মাতোয়ার
ক্ষুদ্রত্বে আপন;
তরঙ্গের নৃত্য হেরি' মুগ্ধ নেত্রে কেহ চে'য়ে রয়;
তপন উদীয়মান, অস্তমান ভাস্বর বিলয়
হরে কারো মন;
কেহ পুনঃ বারি-বক্ষে গগনের বিরাট্ বিম্বন,
আলোক মেঘের খেলা, নীর মাঝে ছায়ার কম্পন
হেরে বার বার;
বাহ্য প্রকৃতির রূপে হারাইয়া ফেলি' আপনায়
উর্ম্মির গভীর মন্দ্রে আত্মহারা কেহ ধীরে চায়
নভ, পারাবার;

অকূল অসীম তব অন্তহীন সলিল-প্রসার
সুক্ষীণ সসীম সান্ত নেত্রে কার অন্ত-শূন্যতার
আনে ক্ষীণাভাষ,
অনন্তের ক্ষীণ ছায়া ধরি' প্রাণে পরিপূর্ণ-হিয়া
তোমার সে অন্তরের গুপ্ত সুধা লইতে লুটিয়া
না করে তিয়াষ।

৩

ওহে কামরূপী সিন্ধু! ভুলাইতে মানব অন্তর
অনন্ত বিরাট্ রূপ ধরি' তার চক্ষের উপর
রহ নিরন্তর;—
আকষি, কটিতে তব ধরিয়াছ বিচিত্র অম্বর,
শিরসি আলোক-গঙ্গা ঝরে কিবা জটাজূট'পর
তুলিয়া লহর;
লক্ষ লক্ষ ভুজঙ্গম উত্তোলিয়া ফেন-ফণাচয়
উচ্ছ্বসিত বীচি-ভঙ্গে, কর্ণ মূলে, কণ্ঠ-বক্ষময়
গর্জ্জে অবিরল;
বিরাট্ তাণ্ডব-পর! তরঙ্গের কোটি বাহু তুলি'
উন্মত্ত নর্ত্তনে রত, আপনার অসীমত্বে ভুলি'
আপনি বিহ্বল!
হেরি' সে উদ্দণ্ড নৃত্য বসুন্ধরা কাঁপে থরথর,
ভীমকান্ত সে মুরতি-দরশনে মানব-অন্তর
স্তম্ভিতের প্রায়
বিস্ময়ে বিরাট্ বপু হেরে পুনঃ চাহে আরবার,
ভুলে' যায়—নর-চক্ষে মায়া-মূর্ত্তি অনন্ত আকার,
আনন্দ না পায়!

৪

কভু স্নিগ্ধ জ্যো'স্নাময়ী রজনীতে সুপ্ত রহ তুমি;—
মোহিনী মূরতি ধরি' কে যেন রে উঠে মর্ত্ত্যভূমি,
ভেদি' জলস্তর!
গগনের সোণাশশী বিগলিয়া ঝরে এলোকেশে,
জ্যো'স্নার মালতী-মালা বিজড়িত রহে শিরোদেশে
লুটে নীলাম্বর;

চটুল চরণ দুটি রঙ্গে ভঙ্গে ভঙ্গের উপর
বিচিত্র লাস্যের লীলা তুলে মরি অভঙ্গ সুন্দর,
স্মিত ওষ্ঠাধার !—
কভু বা, নামিলে সন্ধ্যা, মৃদু চন্দ্র উদিল গগনে,
করুণ মূরতি কার ভেসে' আসে তরঙ্গের সনে,
বিহ্বল অন্তর ;
মধুর মূর্চ্ছনা মরি মূরছয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে তার,
অতি মৃদু বেণু বীণা বীচি-মুখে ক্বণে বারবার
কুলু কুলু স্বন ;—
কভু বা পাগলী-বেশে কে রমণী ধায় দিশাহারা,
কল কল করে জল, খল খল হাস্যে হয় সারা,
কখনো ক্রন্দন !

৫

সে বিচিত্র রূপ-মোহে ধীর-চিত্ত যদি কোন জন
আপনারে নাহি ভুলে,—ধরি' রুদ্র মূরতি ভীষণ
নাচো দিগম্বরী ;
বহে ঝঞ্ঝা খর বেগে, উড়ে তাহে তিমির-কুন্তল
নভোময়, বক্ষ'পরে মুণ্ডমালা দুলে অবিরল,
গরজে লহরী,
দেব-নেত্র নিভে নভে, খুলে' যায় শত বারি-দ্বার,
বহ্নিমুখী তুরঙ্গিণী শত শত বড়বা-আকার
ছুটে দিশি দিশি ;
মকর, কুম্ভীর, কূর্ম্ম, ভীমকায় তিমি, তিমিঙ্গিল,
যোজন-বিস্তৃত-বপু ভুজঙ্গম আলোড়ি' সলিল
ধায় সারানিশি ;
প্রকাণ্ড তুষার-শৈল—হিমস্তূপ, বিরাট্ শরীর,—
পরস্পর সংঘর্ষণে তুলি' প্লুত স্তনিত গম্ভীর
আছাড়িয়া পড়ে ;
নিমজ্জিত গুপ্ত শৈলে ঘূর্ণাবর্ত্ত ঘুরে অবিরাম,
মানব চকিত ভীত ভুলে' যায়—কি আনন্দ-ধাম
তব অভ্যন্তরে !

৬

ওরে ভ্রান্ত ! ওরে মুগ্ধ ! রূপ-মোহে না ভুলিও আর,
ওরে ভীত ! ওরে শুদ্ধ ! বৃথা শঙ্কা হৃদয়ে তোমার
নাহি দিও স্থান ;
মধুর ভীষণ রূপে কাল-সিন্ধু চৌদিকে তোমার
অনন্ত উচ্ছ্বাসে দোলে ; অতিক্রমি' অতলতা তার
করহ সন্ধান
অভ্যন্তরে, নেহারিবে—অন্তর্গূঢ় তোমারি ভিতর
নাম-রূপ-বিবর্জ্জিত উর্ম্মি-হীন নিত্য নিরন্তর
চিন্ময় সাগর
ওতপ্রোত অচঞ্চল ; সচেতন প্রতি বিন্দু তার
মহাভাব-প্রপূরিত ; নাহি তায় কামনা-ঝঙ্কার,
রুদ্র নৃত্যপর
বাসনার ঘোর ঝঞ্ঝা, হরষের ঘন আন্দোলন,
নিরাশার গুপ্ত শৈল, রোষ-দ্বেষ জল-জন্তুগণ
লালসা তুষার,
কর্ম্মরূপী ঘূর্ণীচক্র, আসক্তির ষোড়শী মূরতি,
ভৈরবী বিরাগময়ী বিষাদিনী, না করে বসতি
ধূমা মত্ততার।

৭

স্থূল-নেত্র-অন্তরালে—ইন্দ্রিয়ের তরঙ্গের তলে—
দেহের বিলয় ভূমে—অন্তরের সুসূক্ষ্ম কমলে
নিত্য বিরাজিত
চিন্ময় শরীরখানি হের—হের পরমা বিস্তার,
অঞ্জন-বিহীন কণ্ঠে ওই শোন অঘোষ ওঙ্কার
নিয়ত ঝঙ্কৃত ;
বাহিরে প্রকৃতি যিনি মায়াময়ী নিত্য রূপান্তর,
বিদ্যার মূরতি ধরি' চিদন্তরে রন্ নিরন্তর
দীপ্ত আপনায় ;
সে সৌন্দর্য্য অফুরন্ত, সে সুরভি অমর-অক্ষয়,
অনন্ততা নিজে যেন আপনাতে পাইয়াছে লয়,
কাল টুটে' যায় ;
অনশ্বর-জ্যোতিঃপুঞ্জ-বিনির্ম্মিত কর-পদ্মে তাঁর
বিরাজে আনন্দ-কুম্ভ, পূর্ণ ঘন সম-রসতার
সুধা-ভরপূর ;
চুমুকে চুমুকে পিও সে অমৃত, মধুর, অ-ক্ষর,
সে আনন্দ-সুধাপানে জন্মমৃত্যু-বন্ধন সত্বর
কর, কর দূর ;—
নাহি সিন্ধু, নাহি বিদ্যা, এক আত্মা অখণ্ড মধুর !

# একালের জনশিক্ষা আন্দোলন

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

একশত বৎসরের অধিক কালের চেষ্টার ফলেও দেশের মধ্যে সামান্য লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা নগণ্য রহিয়া গেল। ইহার জন্য রাষ্ট্র যেমন দায়ী, সমাজও তেমনি দায়ী। গ্রামের সামাজিক জীবনের ঐক্য ও সংগঠন ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় গ্রাম্য বিদ্যালয়সমূহ একদিকে লোপ পাইল; অথচ সরকারী সাহায্যের অভাবে গ্রামে গ্রামে নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হইল না। যাত্রাগান, কথকতা, মঙ্গল-কাব্যসমূহের গান ক্রমে ক্রমে লোপ পাওয়ায় জনগণের সহজ শিক্ষার উপায় নষ্ট হইল এবং শিক্ষালাভের অনুপ্রেরণাও কমিয়া গেল। প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীরা লেখাপড়া শিখিবার প্রয়োজনীয়তা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। লেখাপড়া শেখাটা কেবলমাত্র ছোট ছেলেমেয়েদের কাজ এই ধারণা কেমন করিয়া যুগপৎ লোকের ও সরকারের মনে স্থান পাইল। যেখানে মাতা-পিতার মনে ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে কিছু উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আছে এবং কাছাকাছি কোন জায়গায় বিদ্যালয় আছে, সেখানে শিশুরা লেখাপড়া শিখিতে গেল। কিন্তু চাষী-মজুরের ছেলেরা দুই এক বৎসর লেখাপড়া করিয়া একটু বড় হইলেই ক্ষেতের বা কলের কাজে মন দেয়। বাড়ীতে লেখাপড়ার চর্চ্চা একেবারে নাই; তাই অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা বিদ্যালয়ে যেটুকু শেখে তাহা ভুলিয়া যায়। এইরূপে কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও, লেখাপড়া আশানুরূপভাবে বিস্তৃত হইতেছে না। এখন অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করা দরকার। শিশুরা লেখাপড়া শিখিয়া বড় হইয়া আবার তাহাদের নিজেদের ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে অধিকতর মনোযোগী হইবে এ আশা যদি সফল হইবার হইত তাহা হইলে এতদিনে দেশের মধ্যে শিক্ষা যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিত।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শাসনবিধি অনুসারে ভোট দিবার অধিকার প্রাপ্ত নরনারীর সংখ্যা খুব বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের লোক-গণনা অনুসারে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ ভারতে সাত কোটী বিশ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও ছয় কোটি চৌষট্টি লক্ষ নারী আছে। তাহাদের মধ্যে প্রায় তিন কোটি পুরুষ অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের শতকরা ৪২ জন এবং ষাট লক্ষ নারী অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কা নারীর মধ্যে শতকরা দশজন ভোট দিবার ক্ষমতা পাইয়াছে। অথচ লিখিতে পড়িতে জানা লোকের হার বেশী কিছু বৃদ্ধি পায় নাই। ইহার মানে হইতেছে এই যে, বহু নিরক্ষর নরনারী ভোটার হইয়াছে। ইংলণ্ডের পার্ল্যামেণ্টের ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের সংস্কার অনুসারে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহার পর পরই ইংরাজ রাজনৈতিকেরা ধূয়া তুলিয়াছিলেন যে, "আমাদের প্রভুদের এইবার লেখাপড়া শিখাইতে হইবে", সেইজন্য ঐ সংস্কার সাধিত হইবার পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসনবিধি প্রবর্ত্তনের পর প্রায় অনুরূপ কাল উত্তীর্ণ হইতে চলিল; কিন্তু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা এখনও ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয় নাই। গণতন্ত্র চাহিব, অথচ ভোটারদের নিরক্ষরতা দূর করিবার চেষ্টা করিব না, এরূপ অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চলিতে পারে না। তাই আজ বিভিন্ন প্রদেশে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কি কৃষির উন্নতি, কি শিল্পের উন্নতি কিছুই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ব্যতিরেকে হওয়া অসম্ভব। কি ভাবে কাজ করিলে জনশিক্ষা আন্দোলন সর্ব্বাপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে সুফল প্রদান করিতে পারে, সে সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা লিখিতেছি। বিহারে এই আন্দোলন প্রথম আরম্ভ হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে যথেষ্ট সাফল্যও লাভ করিয়াছে। এই আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ও বিহার প্রাদেশিক জনশিক্ষা সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (Prof. B. B. Mukherjee) মহাশয়ের সাহচর্য্য লাভ করিয়া আমার যে ব্যক্তিগত

অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহা হইতে অনায়াসেই আমি এই কথা বলিতে পারি।

জনশিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে সরকারের উদ্যোগ, সহানুভূতি ও অর্থসাহায্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। সরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন যেমন ব্যাপক তেমনি শক্তিশালী। শিক্ষার প্রসারের জন্য ইহাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাইতে হইবে। বিহারের শিক্ষামন্ত্রী জনশিক্ষা সমিতির সভাপতিরূপে বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়া এই আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহযোগীতার প্রতিশ্রুতি পান। তিনি শিক্ষা বিভাগের সমস্ত শিক্ষক, অধ্যাপক ও কর্ম্মচারীকে এই বিষয়ে উদ্যোগী হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ দেন। ইহার ফলে ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনষ্ট্রাকশন্ হইতে আরম্ভ করিয়া মহকুমার স্কুল-পরিদর্শক পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই অভূতপূর্ব্ব উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। ইঁহারা যে কেবল প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্যই কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন তাহা নহে; জাতি-সংগঠনে শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া এবং জনসাধারণের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপনের সুযোগ পাইয়া ইঁহারা কার্য্যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। মানুষের মনে যে কল্যাণবুদ্ধি রহিয়াছে তাহাকে জাগরিত করিতে পারিলে অনেক দুরূহ কাজও সহজে নিষ্পন্ন হয়। বিহারে শিক্ষামন্ত্রীর অবলম্বিত নীতির পিছনে সমগ্র প্রাদেশিক সরকারের পূর্ণ সহযোগীতা বর্ত্তমান ছিল। তাই কি জেল বিভাগ, কি পুলিশ বিভাগ, কি সাধারণ শাসন বিভাগ, সকল বিভাগের কর্ম্মচারীরাই জনশিক্ষা প্রসারের জন্য আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অবশ্য শুধু কথায় চিড়ে ভিজে না। এত বড় একটা কাজের জন্য অর্থেরও প্রয়োজন। কিন্তু টাকা খরচটাই বড় কথা নহে। টাকার অভাবে কোথাও কোন বড় কাজ আটকাইয়া থাকে না—আটকাইয়া থাকে প্রাণশক্তির অভাবে। সেই প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে অতি অল্প ব্যয়ে যে কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করা যায়। বিহার সরকার ১৯৩৮-৩৯ সালে মাত্র ৬৩৩৬৮ টাকা এবং ১৯৩৯-৪০ সালে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করেন। বর্ত্তমান বৎসরেও ব্যয়ের পরিমাণ দুই লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই টাকা হইতে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বই, শ্লেট প্রভৃতি কিনিয়া দেওয়া হয়, যেখানে যেখানে বিদ্যালয় আছে সেখানে একখানি করিয়া পাক্ষিক পত্রিকা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়, আলো ও অফিসের খরচ বাবদ সামান্য সামান্য সাহায্য দেওয়া হয়, আলোকচিত্র তৈয়ারী করিয়া

শ্রমজীবিনী নারীদের শিক্ষাকেন্দ্র : জেমসেদপুর

ম্যাজিক ল্যান্টার্ণের সাহায্যে বক্তৃতা দেওয়া হয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে নিরক্ষর ব্যক্তিকে লিখিতে পড়িতে শিখাইতে পারিলে মাথাপিছু পাঁচ আনা হারে পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। এত অল্প টাকায় এত রকম কাজের খরচা কিরূপে কুলায় তাহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। প্রথমে বইয়ের কথাই বলি। ধরুন, এক বৎসরে বিশ হাজার বিদ্যাদানের কেন্দ্র খোলা হইল। প্রত্যেক কেন্দ্রে এক একখানি করিয়া বড় বড় হরপে লেখা অক্ষরের ও সরল বাক্যের চার্ট রাখা হইল। সরকার একযোগে বিশ হাজার চার্ট ছাপাইলে প্রতি চার্টের খরচ চার পয়সার বেশী পড়ে না। সুতরাং এ বাবদ সর্ব্বসাকুল্যে

১২৫০৲ টাকা মাত্র খরচ হইল। তারপর ধরুন প্রতি কেন্দ্রে যদি গড়ে ২৫ জন ছাত্র পড়ে, তাহা হইলে একুণে ৫ লক্ষ লোক শিক্ষা পাইতে পারে। অক্ষরজ্ঞান লাভ করিবার পর ইহাদিগকে ৩২ পৃষ্ঠার একখানি বই পড়াইতে হইবে। এই যুদ্ধের বাজারে দুই ফর্ম্মার বই কেহ দুই আনার কমে বাজারে বিক্রয় করিতে চাহিবে না। কিন্তু সরকার একযোগে পাঁচ লক্ষ বই কিনিবেন জানিলে, যে কোন পুস্তক প্রকাশক দুই পয়সা হারে ফর্ম্মা বিক্রয় করিতে রাজী হইবেন, কেননা তাঁহাকে কাহাকেও কমিশন দিতে হইবে না, বই অবিক্রীত হইবার ভয় থাকিবে না, টাকা

রাঁচি জেলার আদিম অধিবাসীদের একটি শিক্ষাকেন্দ্র। একজন ভারতীয় খৃষ্টান মিশনারী শিক্ষাদান করিতেছে

বেশীদিন পড়িয়া থাকিবে না। তাহা হইলে পাঁচ লক্ষ বইয়ের দরুণ সরকারের খরচ হইবে ৩১ হাজার ২৫০ টাকা মাত্র। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা তিন মাসের মধ্যেই বইখানি শেষ করিতে পারে। তাহাদের হাতে এত অল্প সময়ের মধ্যে বই নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা অল্প। সুতরাং শিক্ষক মহাশয় চেষ্টা করিলে এক বই দিয়া দুইজনকেও অনায়াসে পড়াইতে পারিবেন। এক শ্লেটে যদি দুইজন ব্যক্তি লিখিতে শেখে, তাহা হইলে দুই আনা হারে আড়াই লক্ষ শ্লেটের দাম আর ৩১২৫০ টাকা হইবে। তারপর যাহারা এইরূপে তিনমাসে চার্ট ও তিনমাসে প্রথম ভাগ শিখিল তাহারা ঐ বৎসরেই বা পরের বৎসরে আর একখানি দুই তিন ফর্ম্মার বই পড়িবে। পাক্ষিক সংবাদপত্র ছাপিবার ও বিতরণ করিবার ব্যয় দুই হাজ টাকার বেশী হইবে না। মোটের উপর এক লক্ষ টাক মধ্যে বই, শ্লেট, খবরের কাগজ প্রভৃতির সংস্থান ক যাইতে পারে।

শিক্ষকদের মধ্যে সকলেই যে পারিশ্রমিকের বিনিম শিখাইবেন তাহা নহে। বিহারে প্রথম বৎসরে ৬৫০২ জন ব্যক্তি জনশিক্ষা আন্দোলনে শিক্ষকের কা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র ২০২৩ জন ব্যা ছিলেন ব্যবসায়ে শিক্ষক, আর বাকী ৪৪৭৯ জন কলেজে ছাত্র, পেন্সনপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী, গ্রামের সঙ্গতিসম্প ভদ্রলোক প্রভৃতি। সুতরাং ইঁহারা পয়সার খাতি এই কাজে যোগ দেন নাই। এইরূপ উদার হৃ ব্যক্তির সহযোগীতা যত অধিক পরিমাণে ল করা যাইবে, আন্দোলন তত দ্রুতগতিতে সাফল মণ্ডিত হইবে। বিহারে অনেক ব্যবসায়ী, উকি ডাক্তার, কারখানার মালিক ও জমীদার স্বেচ্ছ বিদ্যালয়ের তেলের খরচ, শ্লেট, বই প্রভৃতির ব নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বছরে মাত্র পাঁচ ল লোককে লেখাপড়া শিখাইলে এক একটি প্রদে নিরক্ষরতা দূর করিতে কত কাল লাগিবে? ইহ উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, দেশব্যাপী উৎসাহ উত্তেজনার সঞ্চার করিতে পারিলে দশ বৎসরে মধ্যে সকল নরনারীকে লিখিতে ও পড়িতে শেখ যাইবে। যে সব প্রাপ্তবয়স্ক বিদ্যালয়ে লিখিতে পড়ি শিখিবে, তাহারাই আবার অন্যকে শিখাইবে। তাহা শিখাইতে গেলে নিজেরা চর্চ্চা রাখিবে ও ভা করিয়া শিখিতে পারিবে এবং তাহাদের নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবে। শ্রীচৈতন্যে যেভাবে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণের সময় হরিনাম প্রচ করিয়াছিলেন, জনগণের নায়কগণের মনে উৎসাহের ব ডাকিলে তেমনিভাবে দেখিতে দেখিতে শিক্ষা প্রসারল করিবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে শ্রীমন্মহাপ্রভু পথের মাঝে কোন ভাগ্যবান্ পথিক দেখিলে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মধ্যে শ

সঞ্চার করিতেন, তারপর তাহারই দ্বারা কত শত লোক কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিত।

কথোদূরে বহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
সেই জন নিজ গ্রামে করয়ে গমন।
কৃষ্ণ বোলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ॥
যারে দেখে তারে কহে- কহ কৃষ্ণ নাম।
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম॥
গ্রামান্তর হৈতে দেখে আইসে যতজন।
তাহার দর্শন-কৃপায় হয় তার সম॥
সেই যাই নিজ গ্রামে বৈষ্ণব করয়।
অন্য গ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয়।

আমরা যদি এইরূপ উৎসাহের এক-দশমাংশও সঞ্চার করিতে পারি, তাহা হইলে দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর করা অত্যন্ত সহজ হয়।

কয়েদীদিগের শিক্ষাকেন্দ্র: গয়া সেণ্ট্রাল জেল

তিন মাসে বা ছয় মাসে যাহারা লিখিতে পড়িতে শিখিবে, তাহারা যাহাতে পরে আবার সব ভুলিয়া না যায় তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। এই জন্য অনেকগুলি ছোট ছোট পাঠাগার স্থাপন করিতে হইবে। বিহার জনশিক্ষা সমিতি অল্প ব্যয়ে কয়েক হাজার লাইব্রেরী স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহারা সহজ ভাষায় চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে শ্রমিক ও কৃষকদের পাঠের উপযোগী ষোল হইতে বিশ পৃষ্ঠার একশত পুস্তক লিখাইয়াছেন। প্রত্যেক পুস্তকের কয়েক সহস্র খণ্ড দুই পয়সা হারে খরিদ করিয়া প্রত্যেক লাইব্রেরীতে এক এক খণ্ড পুস্তক দেওয়া হয়। বিহারে হিন্দী, উর্দ্দু, বাংলা, সাঁওতালী, মুণ্ডা প্রভৃতি নানা ভাষায় বই ছাপাইতে হয় বলিয়া খরচ কিছু বেশী পড়ে! বাংলা দেশে শুধু এক ভাষাতেই বই ছাপিলে চলিবে—খরচ কম পড়িবে। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে ছোট ছোট কাঠের বাক্স দেওয়া হইয়াছে। ঐ বাক্সের মধ্যে বইগুলি রাখা হয়। বাক্সসমেত বই হয় গ্রামের শিক্ষকের নিকট নতুবা কোন ভদ্রলোকের নিকট থাকে। তিনি বইগুলি পঠনেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে পড়িতে দেন। যে সব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিলে চাষী ও মজুর নিজেদের স্বাস্থ্যের ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে, সেই সেই বিষয়ে বই লেখান হইয়াছে। প্রদেশের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে খ্যাতিমান্ তাঁহারা স্বেচ্ছায় এই সব বই লিখিয়া দিতেছেন। পাঁচ বৎসর এইভাবে গ্রামের লাইব্রেরীতে বই দিলে, প্রত্যেক লাইব্রেরীতে পাঁচশতখানি করিয়া বই হইবে। গ্রামের লোকের মধ্যে বই ও সংবাদ-পত্র পড়িবার আনন্দ একবার পরিবেশন করিতে পারিলে, আশা করা যায় যে, পরে তাহারাই সমবায় প্রণালীতে নিজেরা বই কিনিয়া পড়িবে। মোটের উপর কথা হইতেছে এই যে, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী স্থাপন করিতে না পারিলে জনশিক্ষা আন্দোলন কোন স্থায়ী সুফল প্রসব করিতে পারিবে না।

বিহার সরকারের প্রচেষ্টায় অধিকাংশ জেলের কয়েদীরা লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে। সরকার কোন নিরক্ষর চৌকিদার রাখিবেন না ঘোষিত হওয়ায় প্রায় সকল চৌকিদারই মোটামুটি লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছে। বাংলাদেশের সরকারও বিহারে অবলম্বিত কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করিয়া দেশের নিরক্ষরতা দূর করিবেন এই আশা পোষণ করিতে আমরা পারি না কি? মোটা টাকা বরাদ্দ করিয়া বড় বড় কর্ম্মচারীর বেতন ও সফরের খরচ জোগাইলে বিশেষ কোন কাজ হইবে না। দেশের লোকের মধ্যে ও সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে শুভেচ্ছাভাব জাগরিত করিতে পারিলে তবে এই মহৎ কার্য্য উদ্‌যাপিত হইতে পারে। এই কার্য্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কোন ভেদ নাই। বাংলার সরকার নিঃস্বার্থভাবে এই কার্য্যে দেশের যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবেন কি?

# কান্নার মত করুণ

শ্রীসত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

সূর্য্য মধ্যাকাশে; আমরা ফিন্ সীমান্ত অতিক্রম করলাম। আমাদের ঘোড়াগুলি অনায়াসে সীমান্তের বেড়া ডিঙ্গিয়ে গেল। ক্ষণিকের জন্য কয়টা রাইফেল্ আমাদের বামপাশে গর্জ্জে উঠল; অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা শান্ত হ'য়ে গেল চিরদিনের মত। আমরা এগিয়ে চললাম।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই আমাদের এ অভিযান; সাধারণ ফিন্‌রা আমাদের শত্রু নয়—তবুও ফিন্-কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে তারা সীমান্তের গ্রামগুলি ছেড়ে যেতে বাধ্য হ'য়েছে। জনহীন গ্রামগুলিতে যেন শ্মশানের স্তব্ধতা। আমরা এমনি একটা গাঁয়ের পথে চলেছি। কুকুরগুলি মানুষের মত মায়া কাটাতে জানে না বলেই বোধ হয় তখনও প্রভুর ভিটায় পাহারা দিচ্ছিল। তারা অশ্বারোহী রুশ সৈন্যদের দেখে ঘেউ ঘেউ করছিল।

অনেকক্ষণ চলার পরেও শত্রুর অস্তিত্বের কোনও লক্ষণ দেখলাম না। পরিত্যক্ত গ্রামের দোর জানালাগুলি পার হ'তেই আমার বুকের ভিতর টিপ্ টিপ্ করছিল—এখানেই বুঝি লুকিয়ে আছে শত্রু, এখনই হয়ত ক্ষুধার্ত্ত বাঘিনীর মত তারা আমাদের উপর লাফিয়ে পড়বে। সঙ্গীন বন্দুকের মাথায় চাপান ছিল, 'ট্রাইগারটি' আঙ্গুলে টিপে আমরা চলেছি। পাশের বাড়ী হ'তে ঢং ঢং করে ঘড়ি বেজে উঠল, আমার কাণে তা রাইফেলের আওয়াজের মত লাগল। আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম। এই আমার জীবনে প্রথম যুদ্ধ-যাত্রা, উত্তেজনায় আমার প্রতিটি লোমকূপ পর্য্যন্ত রি রি করছিল।

গাঁয়ের শেষে ছোট নদী। নদী পার হ'তে আমাদের ঘোড়াগুলি জল খেয়ে নিল। নদী পার হ'তেই একটা ছোট সহর আমরা দেখলাম। সহরের গীর্জ্জা ঝাউ গাছের ফাঁকে আকাশের দিকে উঠে গেছে, দালান ও টালির ঘর-গুলি গাছের ফাঁকে আমাদের দিকে যেন ভিতিবিহ্বল দৃষ্টি মেলে চাইছিল।

গ্রামের নাম 'মোরোলোভ্‌কা'। আমরা আক্রমণের জন্য গ্রামের আড়ালে প্রস্তুত হতে লাগলাম। লেফ্‌টেন্যাণ্ট রেডিওতে ব্যাটারী লাগিয়ে হেড্‌কোয়াটারের আদেশের অপেক্ষা করতে লাগল। ঘড়্‌ঘড়্ করে রেডিও বেজে উঠল। আমরা উৎকর্ণ হ'য়ে শুন্‌তে লাগলাম্। মস্কো বেতার কেন্দ্র ফিন্ জনসাধারণের প্রতি ঘোষণা কর হচ্ছিল—"আমাদের ফিন্ কম্‌রেড্‌দের উদ্দেশ্য করে আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি; জানিনা তা আপনাদের কাছে পৌছাবে কিনা! লালফৌজের ফিন্‌ল্যাণ্ড আক্রমণের উদ্দেশ্য রাশিয়ার সাম্রাজ্য লিপ্সা নয়, বা, এ অভিযান ফিন্ জনসাধারণের বিরুদ্ধেও নয়—আমাদের চরম লক্ষ্য ফিন্‌ল্যাণ্ডের পুঁজীবাদী শাসক সম্প্রদায়ের বিলোপসাধন করে' তৎস্থলে ফিন্‌দের মনোনীত গভর্ণমেণ্ট স্থাপন। বর্ত্তমান শাসকবর্গ চায় ম্যানারহাইম লাইনকে ভবিষ্যতে রাশিয়াকে আক্রমণের কেন্দ্র করে' তুল্‌তে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে বিচ্ছেদের আগুন। প্রত্যেক ফিন্‌ল্যাণ্ডবাসীর উচিত শাসকদের এ সর্ব্বনাশা মনোভাবকে অঙ্কুরেই বিনাশ করা। লালফৌজ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা বারুদের কারখানা ছাড়া প্রত্যেক শিল্প ও কৃষি প্রতিষ্ঠানকে তীর্থের মত শ্রদ্ধা করবে। নিরস্ত্র ফিন্‌দের সঙ্গে তারা ব্যবহার করবে ভাইয়ের মত, বন্ধুর মত।..."

একটা অস্পষ্ট শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। সম্ভবতঃ ফিন্‌ল্যাণ্ডের বেতার কেন্দ্র হ'তে তা' নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছিল। আমরা তখন আদেশের অপেক্ষায় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছি। আমাদের ট্যাঙ্কবাহিনী তখন নদী পার হচ্ছিল। লেফ্‌টেন্যাণ্ট ঘোড়ার বল্গা শক্ত করে ধরে উন্মুক্ত কৃপাণ তুলে ধরল ও বজ্রকণ্ঠে আমাদের সম্বোধন করে বলল—"

সমগ্র বাহিনী একবার চাড়া দিয়ে উঠল।

আবার আদেশ এল—"সঙ্গীন উচিয়ে ধর।...এগিয়ে চল...কদমে.. ।"

ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে বসুমতী যেন আর্ত্তনাদ করে উঠল। শত শত ঘোড়ার পদ শব্দে কাণ তালা মেরে গেল। শত্রুর পরিখা হ'তে গর্জ্জে উঠল শত শত মৃত্যু

দানব। ঘোড়ার নিঃশ্বাসে যেন ঝড় বইতে লাগল। আমার মাথার উপর দিয়ে শাঁ শাঁ করে' চলে গেল এক ঝলক্ গুলি। মাথাটা যতদূর সম্ভব নীচু করে ছুটে চলেছি। শত্রু পরিখার কাল রেখা আমাদের দৃষ্টি পথে পড়ল। ফিন্ সৈন্যদের শিরস্ত্রাণগুলি সূর্য্যকিরণে ঝক্‌মক্ করছিল।

চারিদিকে আরম্ভ হ'য়েছে মরণের মহোৎসব। সওয়ার পড়েছে গুলির আঘাতে, দিশে হারা ঘোড়া ছুটে চলেছে নক্ষত্র বেগে। কোথাও ঘোড়া ঢলে পড়েছে মরণের মুখে, সওয়ার লাফিয়ে পড়ল মাটিতে; সঙ্গে সঙ্গে হতভাগার মাটির শরীর শত ক্ষুরের আঘাতে লুটিয়ে পড়ল ধূলায়। সাম্‌নে চেয়ে দেখলাম, শত্রু পালিয়ে যাচ্ছে নগরের দিকে। আমার উৎসাহ বেড়ে গেল শতগুণে। সেই দুর্দ্দমনীয় উন্মাদনা আমায় বাতাসের বেগে তাড়িয়ে নিল শত্রু পরিখার দিকে। আমিই প্রথম পরিখায় গিয়ে পৌছলাম।

চোখ পর্য্যন্ত টুপীতে ঢাকা একজন ফিন্ সৈনিক আমায় তাক্ করে গুলি ছুঁড়ল। গুলি আমার মাথার পাশ ঘেসে বেরিয়ে গেল। উত্তেজনায় সারা দেহ আমার কাঁপছিল। কৃপাণ খুলে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি তাকে আঘাত করলাম। কৃপাণ তার পিঠের দিক্‌টা ফালি করে' দিল। হাত পা ছড়িয়ে ফিন্‌টা ছিট্‌কে পড়ল পরিখার দেয়ালে।

ফিন্ সৈন্যেরা তখন সহরের রাস্তা দিয়ে পালাচ্ছিল। ঘোড়ার বল্গা টেনে তার গতি ফিরিয়ে দিলাম সহরের দিকে। বুটের ঠোক্কর খেয়ে ঘোড়া ছুট্‌ল কদমে।

লোহার বেড়ার পাশ দিয়ে পালাচ্ছিল একজন ফিন্ সৈনিক। সে আমাকে দেখে তার রাইফেল ফেলে বেড়ার পাশ ধরে' ছুট্‌তে লাগল। আমি তার পিছু তাড়া করলাম। তার ভীতিবিহ্বল দৃষ্টি সে আমার দিকে তুলে ধরল—তাতে কত কাকুতি, কত মিনতি! আমি তাকে আঘাত না করে পারতাম; নিরস্ত্র ফিন্‌দের বন্ধুর মত ব্যবহারের নির্দ্দেশও আমাদের দেওয়া ছিল। কিন্তু আমার মাথায় তখন খুন চেপে গেছে। জীবনে এই আমার প্রথম যুদ্ধ; প্রথম রক্তের আস্বাদ আমায় ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। পাদানীর উপর নীচু হ'য়ে তার শির লক্ষ্য করে' চালিয়ে দিলাম আমার কৃপাণ। দারুণ আঘাতের নির্ম্মম ব্যথায় সে ক্ষত স্থানে হাত দিয়ে বেড়ার উপর কাৎ হ'য়ে পড়ল। আমার পশু প্রবৃত্তি তখন চাইছিল আরও রক্ত।

ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে আমি স্কোয়ারের দিকে চললাম। ভীত, ত্রস্ত নাগরিকরা স্কোয়ারে ভীড় জমিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মুখ ছাইয়ের মত মৃত্যু ভয়ে ফ্যাকাশে। তাদের আতঙ্কিত দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ। রাস্তায় উঠে আবার আমি ফিন্ সৈনিকের দিকে ফিরলাম। আমার কৃপাণ তার মাথার এক পাশে লেগে এক খণ্ড মাংস তার মুখের উপর ঝুলে পড়েছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল তার সারা দেহ। মরণের ছায়া তার মুখে নেমে আস্‌ছে ধীরে। তার আতঙ্কিত দৃষ্টি তখনও আমার উপর; তার অন্তর যেন আমার বিবেকের নিকট জানাচ্ছিল মূক ভাষায় কত অভিযোগ। বিবেক আমার নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে গেছে। দু' এক পা করে' তার কাছে ফিরে গেলাম। হাতখানি যেন আমার অলক্ষ্যেই কৃপাণের হাতলে গিয়ে উঠল। তার ফিন্‌কী দেওয়া রক্তের স্রোত আমার রক্তে জ্বালাল আগুনের শিখা। সোজা এবার ঘাড়ের উপর তাকে প্রচণ্ড আঘাত করলাম। শিথিল হাত দু'খানি তার ঝুলে পড়ল; মাথাটি ধুপ্ করে মাটিতে পড়ল। ঘোড়া একটু চম্‌কে উঠল।

ইতস্ততঃ তখনও গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মুখে ফেনা ছড়াতে ছড়াতে একটা ঘোড়া একজন মৃত কশাক্‌কে নিয়ে আমার পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। পাদানীতে তার একখানা পা আট্‌কে আছে; সারা দেহ পথের পাথরের আঘাতে শত ছিন্ন। লাসটিকে রাস্তায় টান্‌তে টান্‌তে ছুটেছে ঘোড়া। আমি কশাক্ সৈন্যটির দিকে চাইলাম, তাকে চিন্‌তে চেষ্টা করলাম; কিন্তু কামিজের উপর গাঢ় রক্তের কয়টি দাগ ছাড়া কিছু দেখতে পেলাম না! আমি তখন মোড়ের মুখে দাঁড়িয়ে আছি।

আমাদের একদল ফৌজ একটা মৃত সৈনিককে ঘাড়ে করে কতগুলি বন্দী তাড়িয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। বন্দীদের মুখগুলি আমি ভাল করে দেখলাম, তাতে নেই এক বিন্দু আশার আলো, প্রত্যেকটি মুখ মরার মত ফ্যাকাশে, দেহে যেন তাদের প্রাণ নাই, যেন কতকগুলি যন্ত্র চলে যাচ্ছে।

আমার সারা দেহ ঝিম্ ঝিম্ করছিল, উত্তেজনার অবসান হ'ল জ্বর ছাড়ার মত ঘাম দিয়ে।

বন্দী ফিন্‌রা চলে গেল, আমার মনে রেখে গেল বেড়ার পাশে নিহত ফিন সৈনিকের ব্যথাতুর মুখচ্ছবি। কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণ আবার আমায় তার কাছে টেনে নিল। লোহার বেড়ার কাছে যেখানে তাকে শেষ আঘাত করেছিলাম, সেখানেই তার প্রাণহীন নিষ্পন্দ দেহ পড়েছিল। তার রক্তাক্ত হাত দু'খানা এমন ভঙ্গীতে ছিল, যেন সে করজোড়ে আমার কাছে চাইছে প্রাণ ভিক্ষা। আমি ঝুঁকে পড়ে তার মুখের দিকে চাইলাম। বয়সে সে ছিল তরুণ, সবে মাত্র গোঁফের রেখা পড়েছে। বেদনার নিষ্ঠুর আঘাত তার সুন্দর মুখখানা বিকৃত করে' ফেলেছে। মৃত্যুমলিন চোখ দু'টি আমার দিকেই চেয়েছিল,—যেন আমি তার কতদিনের চেনা। সারা দেহ আমার কাঁপছিল, পা দু'খানা মনে হচ্ছিল অসম্ভব রকম ভারী। কোনও রকমে ঘোড়ায় চেপে বসলাম; ঘোড়া তার ইচ্ছা মত চল্‌তে লাগল।

উত্তেজনা শেষের সঙ্গে সঙ্গেই আমার রক্তের নেশা কেটে গেল। পশুর মত রক্তপিপাসা অধিকার করেছিল আমার অন্তর; তার হাত হ'তেও আমি রেহাই পেলাম। অন্তরে আবার সুপ্ত বিবেক আর্ত্তনাদ করে জেগে উঠল। আবার আমি মানুষ হ'য়েছি। চোখ দু'টি হ'তে ঝরে পড়ল দু'টি ফোঁটা।

রাত্রে ঘুমোতে পারি না, দুনিয়ার যত দুঃস্বপ্ন এসে ভীড় জমায় মনের দোরে। দুঃস্বপ্ন আমার তন্দ্রাজড়িত চোখ দু'টিকে টেনে খুলে ফেলে; জেগেও আমি যেন শুন্‌তে পাই সেই সৈনিকের বেদনা ও মিনতির সুর। বিজয়োৎসবে মেতে থাকৃতে চাই—সঙ্গীত আমার কাছে পতিপুত্রহারাদের বিলাপের মত লাগে। বাতাসও যেন বয়ে নিয়ে আসে ব্যথিতের চাপা সুর—"আমায় মেরো না···আমি নিরস্ত্র···নিরপরাধ···"

পরের দিন বাবার চিঠি পেলাম। আপন জনের চিঠি চিত্তচাঞ্চল্য দূর করে' তাতে দিয়ে যায় কল্পনার প্রলেপ। চিঠিখানা অজস্র চুমু খেয়ে খুললাম; কিন্তু একটি লাইনের বেশী পড়তে পাড়লাম না—প্রতিটি অক্ষরের অঙ্গ হ'তে ফিন্ সৈনিকের মত ফিন্‌কী দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল। রক্তে যেন দৃষ্টি আমার ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেল। তবুও বার বার চেষ্টা করে যতটুকু পড়লাম, তাতে জানলাম—"আমার খোকা নেই···সেই দিনই··· সেই সময়েই····· সেও আমায় ছেড়ে গেছে······"

# গান

শ্রীমমতা ঘোষ

মোদের মিলন নহে তো কেবল
চন্দ্রাতপের তলে,
মালা বিনিময় হয় নাই শুধু
নিয়ম রাখার ছলে।
কত জনমের ছিল পরিচয়,
তাই তো পলকে এসেছে প্রণয়,
অচেনা তো নহ, যুগ যুগ ধ'রে
মিলনের লীলা চলে।

ফুরাতে দেবে না মধু যামিনীর
মদিরার মত মধু,
কুসুম বিছানো জীবন-বাসরে
আমি যে তোমার বধূ।
তব সাথে ফিরে হ'ল পরিচয়
অপরূপ একি, একি বিস্ময়!
কত জনমের কাহিনী বহিয়া
এসেছি ভাগ্যফলে।

# সেকালের মহাপূজা

**শ্রীজহরলাল বসু**

প্রাবৃটাপগমে প্রকৃতিরাণী যখন মেঘের [প্র]সারিত করিয়া ধীরে ধীরে ধরিত্রীর বুকে স্নিগ্ধোজ্জ্বল [শো]ভা বিকাশ করেন, নদীসমূহ যে সময় কানায় কানায় [পূ]র্ণ হইয়া ক্ষুদ্র তটসীমানার মধ্যে আর নিজেকে ধরিয়া [রা]খিতে পারে না, দিগন্তপ্রসারী মাঠসমূহ যখন নবীন [শস্যে] পরিপূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শ্যামলিমায় সুশোভিত হয়, [জ]লপূর্ণ তড়াগে কমল নিকর বিকশিত হইয়া যখন শরতের [আ]গমনবার্ত্তা দিকে দিকে প্রচার করে—সেই সময়েই [আ]মাদের দেশে মা আনন্দময়ীর পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া [থা]কে। প্রকৃতির তখন অপূর্ব্ব মোহিনী শোভা। শরৎকালে [আ]মাদের দেশে যত ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, বোধ হয় [এ]ত ফুল আর কোন সময়ে ফুটে না। প্রকৃতির আনুকূল্যে [মা]নবের মনেও এক অপূর্ব্ব স্পন্দন জাগিয়া উঠে। একমাত্র বঙ্গদেশই মা আনন্দময়ীকে আদরের দুহিতার [ম]ত আহ্বান করিয়া আনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। [মা] আনন্দময়ীর আগমনে শুধু যে প্রকৃতির মোহিনী শোভা [দে]খিতে পাওয়া যায় তাহা নয়; এই উপলক্ষে দেশের [ছে]লে মেয়েদেরও নূতন পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করানর রীতি প্রচলিত আছে।

চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি—মাকে গৃহে আনিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবার জন্য গৃহস্থের কি একটা ব্যাকুল বাসনা ছিল, আর প্রতিবেশীদেরও সে অনুষ্ঠানে কেমন সহৃদয় অনুকূলতা থাকিত! কিন্তু আজকাল আমরা অধিক হিসাবী বলিয়াই হউক, বা সেকালের লোকেদের মত ভক্ত বা বিশ্বাসী নয় বলিয়াই হউক, অথবা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার রিক্ততাবশতঃই হউক—আজকাল পূজাতে আর সেরূপ আন্তরিকতা, ব্যাকুলতা, একনিষ্ঠতা বা ভক্তিপরায়ণতা দেখিতে পাওয়া যায় না।

তখন চাকুরীর খাতিরে যাঁহারা বিদেশে থাকিতেন তাঁহারা অন্ততঃ ৺পূজার সময় দেশে আসিতেন, আর এখন অনেক সম্পন্ন গৃহস্থ স্বাস্থ্যের অজুহাতে ৺পূজার সময় বিদেশ ভ্রমণে বাহির হ'ন; এমন কি যাঁহাদের গৃহে বহুদিন হইতে ৺পূজার বন্দোবস্ত আছে তাঁহারাও সুযোগ পাইলে ৺পূজার ভার অপর হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে প্রবাসে পরম সুখ উপভোগ করেন।

এই শারদীয়া পূজা কলির মহাযজ্ঞ; ইহার এত ছোটখাট উপচারের প্রয়োজন যাহার ব্যবস্থা বিধানের জন্য ভক্ত গৃহস্থকে তখনকার দিনে সদাই সচেষ্ট থাকিতে হইত। তখনকার দিনে পূজার কায়েমী বন্দোবস্ত ছিল। পূজার দালান উঠান প্রভৃতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবার জন্য, প্রতিমা-গঠনের জন্য কুম্ভকারকে, তারপর ঢাকী-ঢুলীকে, পুরোহিতকে, তন্ত্রধারকে, এইরূপে পূজায় প্রয়োজনীয় প্রত্যেক ব্যক্তিকে জমিজমা দিয়া তখনকার লোকেরা এমন সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বংশধরকে তজ্জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। কিন্তু আজকাল ইহার যথেষ্ট ব্যতিক্রম দেখা যায়। বছর দুই নূতন নূতন জায়গায় প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা দেখা যায়। আবার অনেক স্থলে পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রবর্ত্তিত পূজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে; মা আনন্দময়ী পূজার দালান রুদ্ধ দেখিয়া রিটার্ণ টিকিট কাটিয়া কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এখনকার মনোবৃত্তি কিরূপ হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। কোন পল্লীর এক ধনীর গৃহে অন্যান ১২০ বৎসর ধরিয়া ৺পূজার অনুষ্ঠান হইত। শেষ সময়ে ঐ বংশের এক বিধবা মহাপূজা চালাইতেছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য দেবর যথাসর্ব্বস্ব উড়াইয়া শেষে ব্রহ্মচারী হ'ন। বৃদ্ধা মৃত্যুকালে ঐ দেবরের পুত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন—"বাবা, আমাদের এই দালানে বহুকাল হইতে মহাপূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে; এক্ষণে এই দালান তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। আমার মরণান্তে তুমি আমার বিষয় সমস্ত লইও; কিন্তু আমার একটি অনুরোধ, ইহার উপস্বত্ব হইতে বার্ষিক মহাপূজার অনুষ্ঠানটি বজায় রাখিও।" দেবর পুত্র বিষয় লইলেন, কিন্তু এক বৎসর বাদেই পূজা বন্ধ করিয়া দেন।

বাস্তবিক এই ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যেই দেখিতে

পাইতেছি—অনেক প্রাচীন বাড়ীতে ৺পূজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে; তাহার সব স্থলেই যে অর্থাভাব তাহা নয়। বারোয়ারী পূজা তখন ২।১টী ছিল। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বাঁকুড়ায় বারোয়ারী দুর্গাপূজা দেখিয়াছিলাম সেখানে বড় ষোল আনা, ছোট ষোল আনা প্রভৃতি বারোয়ারী ৺দুর্গাপূজা দেখিয়াছিলাম, মনে আছে। তবে সেখানে প্রতিমারও কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। সেখানের প্রতিমা শুধু হরগৌরীর ক্রোড়ে কার্ত্তিক গণেশ। প্রতিমার গড়ন অতি সুন্দর ও সুবৃহৎ। কিন্তু এখন যেমন পল্লীতে পল্লীতে "সার্ব্বজনীন" বা "সর্ব্বজনীন" দুর্গাপূজার ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়—তখন তাহা ছিল না। ইহা এখন একটা ফ্যাসানের মত দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু আমার মনে হয়, ইহার মধ্যে আন্তরিকতার চেয়ে আড়ম্বরের ভাগটাই সমধিক। এক পাড়ার সঙ্গে অন্য পাড়ায় বা এক পাড়াস্থিত দুই বিভিন্ন দলের মধ্যে এখন প্রতিযোগিতা পুরাদমে চলে।

তখনকার দিনে ভক্ত গৃহস্থ সারা বৎসর ধরিয়া একটি একটী করিয়া মহাপূজার উপচার সংগ্রহ করিতেন। পাছে কোন অনুষ্ঠানের ক্রটী নিবন্ধন গৃহের অমঙ্গল হয় তাই পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতেন। অনেক স্থলে জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো প্রতিষ্ঠা হইত। তারপর ধীরে ধীরে একমেটে, দোমেটে হইয়া প্রতিমার মুণ্ড বসান হইত, তখন পাড়ার ছেলেদের কি আনন্দ! ধনীগৃহে সবার অবাধগতি থাকিত না, কিন্তু মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে সবার অবাধগতি থাকিত; ঐরূপ গৃহে বাড়ীর ছেলেদের চেয়ে পাড়ার ছেলেমেয়েদের আনন্দ বা উৎসাহ কোন অংশে কম ছিল না। আমার বেশ মনে পড়ে—ছেলেবেলায় আমরা প্রতিমাকারদিগকে যেন বেশ সম্ভ্রমের চক্ষেই দেখিতাম; এমন কি তাদের ছোট ছোট "ফায়ফরমাজ" তামিল করিতে পারিলে তখন নিজেদের ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতাম। এমন কি, তখনকার দিনে দুরন্ত "ছটফটে" ছেলেরা অসাবধানতাবশতঃ প্রতিমা (অসম্পূর্ণ অবস্থাতেও) পাছে স্পর্শ করিয়া ফেলে তজ্জন্য সদা সতর্ক থাকিত। তারপর সাদা খড়ির রং ও আসল রং দেওয়া হইলে অদূর ভবিষ্যতে পূজার উৎসব ভাবিয়া সবার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিত! মহাষষ্ঠীর দিন বাদ্যকারগণ আসিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলে আমরাও আহ্লাদে তালে তালে নাচিতাম।

এদিকে পূজার ২।১ দিন পূর্ব্ব হইতেই 'ভিয়ান' বসিত; খাজা, গজা, বোঁদে, নারিকেল নাড়ু, মেঠাই মুড়কী প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে তৈয়ার হইত। ষষ্ঠীর দিন বিকাল হইতেই যে যার নূতন কাপড় পরিতাম। তখনকার পূজার পোষাকের এখনকার মত এত আড়ম্বর ছিল না। একখানা তাঁতের বা কলের ধোয়া ধুতি, একটা শার্ট (পাঞ্জাবীর তখনও ততটা চলন হয় নাই), আর এক জোড়া চীনের বাড়ীর জুতা—এই ছিল সাধারণ গৃহস্থের ছেলের পূজার পোষাক; তারপর অবস্থা ভেদে সার্টিন বা গর্ণেটের জামা বা জরি দেওয়া মখমলের জামা।

একটা লক্ষণীয় ছিল—তখনকার যে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীতে পূজার আয়োজন হইত, সে বাড়ীর কর্ত্তা বা গৃহিণীর পরিচ্ছদের পারিপাট্য মোটেই থাকিত না। কলিকাতায় লোহাপটীর কোন বড় দোকানদারের বাড়ীতে দুর্গোৎসবের কথা মনে পড়ে; তিনি ব্রাহ্মণ; নিজের হাঁটুর উপরে কাপড় গুটাইয়া দেশের চাষাভূষো লোককে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইতেন; কে আসিল না—নিজে তাঁহার খোঁজ লইতেন। সকল দিকে নিজে দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার অনাড়ম্বর পরিচ্ছদ দেখিলে এখনকার দিনে সহসা কেহ মনে করিতে পারিবেন না যে তিনিই বাড়ীর কর্ত্তা বা তিনি অত টাকার মালিক। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখন আর সে অনাবিল আনন্দ, সে অমিত উৎসাহ, সে আন্তরিক আদর-আপ্যায়ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সব ঘরের পূজা দেখিয়া তখন মনে হইত—সত্য সত্যই মা বৎসরে বৎসরে ইঁহাদের ঘরে আসেন—আর ইঁহাদের মহাপূজা সার্থক।

অবশ্য তখনকার দিনেও রাজসিক বা তামসিক অনুষ্ঠানেরও অভাব ছিল না। তবে সে সব সাধারণতঃ ধনীগৃহে—যেখানে সাধারণে প্রাণ খুলিয়া যোগদান করিতে পাইত না। প্রথমতঃ বড় বড় আসাসোটাধারী ভোজপুরী দৌবারিকদের ভয়ে অনেকে ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস করিত না; প্রবেশ করিলেও অর্দ্ধচন্দ্র লাভের আশঙ্কা

থাকিত। বাবুদের মেজাজ 'সরিফ' থাকিলে ভাল, নতুবা মুস্কিল। ধনীগৃহে পূজার সময়ে সন্ধ্যার পর প্রচুর আমোদ প্রমোদেরও ব্যবস্থা থাকিত। কিন্তু তাহা অবারিতদ্বার নহে। বাইনাচ, বৈঠকী গান, যাত্রা ইত্যাদি খুব চলিত। বাছা বাছা লোক সেখানে প্রবেশলাভ করিতে পারিতেন।

বড়লোকের বাড়ীর বলিদানের ব্যাপারটাও উল্লেখ-যোগ্য। ইক্ষু, শসা, কুমড়া বলি ছাড়া, পাঁঠা বলি হইত, সংখ্যায়ও অনেক, তার উপর ভেড়া বা জোড়া মহিষও বলি হইত। মহিষ-বলি ছিল একটা বীভৎস ব্যাপার। রক্তের নদী বহিয়া যাইত। বাবুরা হয়ত অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেই রক্ত লইয়া মাখামাখি করিতেন! শুনিতে পাওয়া যায়, বাগবাজারে ৺নন্দলাল বসু মহাশয়ের বাড়ীতে পশুবলি বন্ধ হয় গিরিশবাবুর "বুদ্ধদেব" অভিনয় দেখার পর হইতে।

সন্ধিপূজার দিনে ও ক্ষণে সস্ত্রীক গৃহস্বামীকে খুব ভাবনায় থাকিতে হইত—পাছে অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটি হয়। সে সময়ে ঠাকুরদালানে কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় গুরুগম্ভীর ভাব পরিলক্ষিত হইত। নির্ব্বিঘ্নে পূজা সমাপ্ত হইলে তবে গৃহস্বামী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেন।

তখনকার দিনে বৈষ্ণব বাবাজীদের আগমনী গান প্রাণে একটা স্পন্দন জাগাইয়া দিত। এখন আর সে সব বড় একটা শোনা যায় না। আবার মহানবমীর দিনে "নিশি গো তুমি আজ যেন পোহাইও না" গানটী বড়ই মর্ম্মস্পর্শী শুনাইত; যেন তখন হইতেই বিসর্জ্জনের ভাবী ব্যথা সকলের প্রাণে জাগাইয়া দিত। বিজয়ার দিনে যখন গৃহস্বামী স্বয়ং ও বাড়ীর সকলে মিলিয়া মাকে বরণ করিয়া বিদায় দিতেন তখনকার মনের অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সমবেত সকলেই শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িতেন। বিসর্জ্জন ব্যাপারটীও বড় সোজা ছিল না। বিসর্জ্জনের বাজনাতেই মনে বিষাদ জাগাইয়া তুলিত। তারপর মহামিলনের পালা। কিন্তু বিসর্জ্জনের পর শূন্য দালানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সে সময়ে মনে যে, মর্ম্মস্পর্শী বেদনা ও দারুণ রিক্ততা অনুভব করিতাম, তাহা লেখনীমুখে ব্যক্ত করা যায় না।

একবার বিষ্ণুপুরে বেড়াইতে গিয়া শুনিয়াছি—সেখানে ৺মৃন্ময়ীর মন্দিরে প্রতি বৎসর যে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে, তাহার সন্ধিপূজায় সন্ধিক্ষণের জন্য ঘড়ির সাহায্যে সময় অবধারণ করিতে হয় না। পূজার সময়ে ধূপধূনায় ঘর পরিপূর্ণ থাকে, ঘরে একটা অনির্ব্বচনীয় গুরুগম্ভীর ভাব পরিলক্ষিত হয়; একখানা বৃহৎ রূপার থালায় সিন্দুর ছড়াইয়া তদুপরি পট্টবস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া হয়। ঠিক সন্ধিক্ষণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতেই গৃহমধ্যে একটা রাম রাম ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়, এবং অনতিকাল মধ্যে অদূরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ লালবাঁধের জলাভ্যন্তর হইতে অমানুষসম্ভব কামান-ধ্বনি নিনাদিত হইয়া সন্ধিক্ষণ বিঘোষিত করিয়া দেয়। তদনন্তর সেই রূপার থালার আবরণ উন্মোচন করিলে নাকি মায়ের পদচিহ্ন তদুপরি পরিলক্ষিত হয়! পূজার সময়ে সেখানে যাইয়া ইহার তথ্য অবধারণের সৌভাগ্য লেখকের কখনও ঘটে নাই; তত্রত্য লোকমুখে শ্রুত বৃত্তান্ত মাত্র।

# নিবেদন

শ্রীচিত্রা দেবী

প্রভু হে! আমার জীবন দেবালয়ের পূজা-বেদীর 'পরে
জ্বালিয়ে দিয়ে প্রেমের প্রদীপ এস ক্ষণেক তরে।
তোমার মাঝে হয়ে হারা
ধূপের মত হবো সারা,—
আমায় দিয়ে তোমায় তবু পাবো হৃদয় ভরে'।

# বাংলার কৃষক ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা

অধ্যাপক শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েক মাস পূর্ব্বে বাংলার ভূমি-রাজস্ব কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে আলোচনা এত কম হইয়াছে যে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ফ্লাড্ কমিশনের মন্তব্যসমূহের গুরুত্ব অনেকের নিকট স্পষ্ট নয়; কিম্বা এই সকল আলোচনা ও গবেষণা নিতান্তই রাজনৈতিক চাল বলিয়া হয়ত প্রতীয়মান হইয়াছে।

১৯৩৮ সনে যখন বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন দ্বারা মন্ত্রীমণ্ডল তাঁহাদের নির্ব্বাচনী-ইস্তাহার-অনুযায়ী কয়েকটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পালন করান (যথা, 'আবওয়াব' বা উপরি-গ্রহণ বন্ধ, দশ বৎসরের জন্য খাজনা বৃদ্ধি বন্ধ, সেলামী প্রথা স্থগিত) তখনই ভূমি-রাজস্ব কমিশনের নিয়োগের সংবাদও ঘোষিত হয়। প্রায় দেড় বৎসর পর কমিশন যে সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে বাধ্য। ১৭৯৩ সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিল করিবার পক্ষে অধিকাংশ সভ্যের সমর্থনে ফ্লাড্ কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন; ইহার ফলাফলও কিয়ৎপরিমাণে তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াই এই সুপারিশ করিয়াছেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সহিত শতাধিক বৎসরের বাংলার সামাজিক রূপ ও রীতি, শিক্ষার ও মতামতের হেরফের, অর্থনৈতিক নানা সুযোগ ও কয়েকটি অবহেলিত দিক্— নিবিষ্টভাবে যুক্ত। ১৭৯৩ সনের পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যদিও ভারতবর্ষে সাধারণতঃ পড়্তি পণ্যমূল্যের যুগ ছিল, তবুও বাংলার অর্থনৈতিক প্রসার ও জনসংখ্যার প্রসার সে সময়েও হয়। তাহার পর তো দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা, পাটের চাহিদা ও বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিপোষকতায় জমিদারকুল ক্রমে তাঁহাদের উৎসাহে, তাঁহাদের লভ্যাংশে বহু মধ্যস্বত্ব অংশীদার সৃষ্টি করিয়া এবং অর্থানুকূল্যে এক নূতন সমাজকে কয়েদী করিয়া তুলিয়াছেন। ইংরেজী শিক্ষা দীক্ষা ও চাকুরীজীবি সম্প্রদায় সৃষ্টি একদিকে ও জমিদারী প্রথার ব্যবস্থা আর একদিকে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজকে—বিশেষতঃ হিন্দুকে —পরমুখাপেক্ষী, পরানুগ্রহ-প্রার্থী ও সমাজ জীবনের পরগাছাশ্রেণীপর্য্যায়ে প্রায় আনিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের শিল্পোন্নতিতে পশ্চাৎপদ হইয়া যাওয়াতে যে শিক্ষা এতদিনে হওয়া উচিত ছিল, সেই স্বাবলম্বনের শিক্ষা ক্রমশঃ বিলীয়মান জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের সঙ্গে বাধ্য হইয়া লইতে হইবে।

ভূমি-রাজস্ব কমিশন ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের নির্দেশ মত জমিদার ও অধস্তন মধ্যস্বত্বের অধিকারীদের ক্ষতিপূরণের হিসাব দিয়াছেন। ক্ষতিপূরণের আসল যদি এখনই দেওয়া না যায় তবে ক্রমশঃ পরিশোচনীয় ব্যবস্থায় শতকরা ৪ টাকা সুদে 'বণ্ড' বা অঙ্গীকারপত্র দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ১০ গুণ, ১২ গুণ, ১৫ গুণ পর্য্যন্ত বার্ষিক নিট্ মুনাফার আয় দিলেও কমিশনের মতে আদায়ের খরচ প্রভৃতি বাদ দিয়া বাংলা সরকারের সামান্য লাভ হয়; ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে প্রচলিত খাজনা কোনক্রমেই কমান হইবে না। বলা বাহুল্য, একাধিক সমালোচক কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে আপত্তি হইয়াছে, সরকারী খরচের হিসাবে এবং আয়ের হিসাবে খুঁত দেখান হইয়াছে। বাংলার মন্ত্রিমণ্ডল তো এ বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করিয়া ফ্লাড্ সুপারিশের ফলাফল আনিবার জন্য একজন বিশেষজ্ঞের হাতে আপাততঃ সমস্যা তুলিয়া দিয়া কিছুদিনের জন্য রেহাই লইয়াছেন। বিত্তশালীদের ক্ষতিপূরণ-সংশ্লিষ্ট আলোচনা এ প্রবন্ধে করিব না। কিন্তু যে বিত্তহীন কৃষকের প্রতি দরদ দেখাইয়া এই সকল সুপারিশ তাহাদের দিক হইতে সমস্যার আলোচনা করি।

কৃষকের যেমন একদিকে 'উপরি' আদায়ের অনাচার হইতে মুক্তি হইয়াছে, তেমনি নানা সেস্-এর উৎপাত তাহার ঘাড়ে চাপিয়াছে। অধুনা-প্রচলিত কৃষি-খাতক আইন প্রভৃতি তাহার ঋণভার লাঘব করিয়াছে বলিয়া শুনি কিন্তু ঋণের প্রয়োজনই যাহাতে কমে সেইরূপ আয় বাড়াইবার ব্যবস্থা কয়টি হইয়াছে। ঋণ প্রাপ্তির সুবিধাই বা নূতন করিয়া কি সরকার করিয়াছেন? কৃষকের

দেয় ভূমি-রাজস্ব অন্যান্য প্রদেশের অনুপাতে কম বলিয়া দেখান হইয়াছে: কিন্তু কমিশনের জনৈক সদস্য হিসাব করিয়াছেন যে, পাঞ্জাবের চাষী প্রতি একর জমিতে খাজনা, জলসেচ সেস্, জিলাবোর্ডকে দেয় ও 'লম্বরদারে'র আদায়ী খরচসহ একুনে ৩ টাকা ২ আনা দেয়, বাঙালী চাষী প্রতি কষিত একর পিছু রাস্তাসেস্, চৌকিদারী টেক্স এবং পাট-রপ্তানী-শুল্কের অংশ হিসাবে ধরিলে দেয় ৬ টাকা ৫ আনা। শুধু তাই নয়। প্রতি কৃষকের মাথা পিছু জমি ০·৮৭ একর এবং বার্ষিক আয় ৪৬ টাকা। অন্যান্য প্রদেশের মাথা পিছু আয়:—

| | | টা | আ |
|---|---|---|---|
| বিহার ও উড়িষ্যা | — | ২৯ | ৯ |
| বোম্বাই | — | ৬৫ | ০ |
| পাঞ্জাব | — | ৫৩ | ০ |
| মাদ্রাজ | — | ৫৫ | ৭ |
| যুক্তপ্রদেশ | — | ৩৫ | ৭ |

শতকরা ৭০ জন চাষীর অবস্থা বাঙ্গালায় সঙ্গীন: এবং এই প্রদেশের জমির শস্যশ্যামলা বলিয়া খ্যাতি আছে, ফসল বহু স্থানে বৎসরে দুই বা ততোধিকবার জন্মান যায়।

এ অবস্থার জন্য যে ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা দায়ী, ইহা বলা বাহুল্য। কমিশনের মতে ইহাই মুখ্য কারণ। কিন্তু সত্যই কি তাই? বাংলার মত দেশে সরকারের শিক্ষা পিছু খরচ, কৃষির উন্নতির জন্য খরচ, শিল্পোন্নতির জন্য ব্যয়—অপরিমিত ভাবে কম। উন্নতি সম্ভব করাইতে হয়—যেমন জাপানে সরকার করিয়াছে। যেমন সামুরাইরা জাপানে তাঁহাদের 'ফিউড্যাল' (feudal) অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন,—এ দেশের জমীদারেরা না হয় তাহা ছাড়িলেন বা ছাড়িতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু ফলে যদি চাষীর দেয় রাজস্ব-ভার না কমে, যদি অজ্ঞ কৃষককে হাত ধরিয়া সমবায় পদ্ধতি ও সমবায় প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া সরকার উন্নততর জীবনের দিকে না লইয়া যান, যদি বাংলার ছয় কোটির উন্নতির ও কৃষ্টির জন্য দেশের কর্ণধারগণ সচেষ্ট না হন, তবে মাত্র দুই কোটির বিত্তহানী করিয়া রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি ভিন্ন কি হইতে পারে?

বাংলার কৃষকের বন্ধু কি কেহ সত্যই আছেন—একথা মনে উঠে। যদি না থাকে, তবে কৃষককুল হইতেই নূতন প্রচেষ্টা উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। পরগাছা 'বাবু' সমাজকে মুকুন্দ দাসের প্রস্তাব মত চাষার দলে মিশিয়া যাইতে হইবে। ফ্লাড-রিপোর্টের ইঙ্গিত বাংলার সমাজ-জীবন, কৃষকের কৃষির পদ্ধতি, সরকারের দৃষ্টি-ভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তন। আজ যদি কিছু না ও হয়, কাল এই পরিণতি আসিবেই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্থায়ীত্ব চিরকাল থাকিতে পারে না, ইহা সমাজতত্ত্ববিদ মাত্রেই বুঝিতেন; কিন্তু নূতন ব্যবস্থা শুধু তো ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কেই হইতে পারে না, তাহা ব্যাপকভাবে হওয়া উচিত ও হইবে। সমাজজীবনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্বীকৃত তথ্য, সেই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী কোথায়, যাহা নব জীবনের জোয়ার লইয়া আসিবে? ফ্লাড্-রিপোর্ট সেই আংশিক চাহনি ও তাহারি ফলে ঈর্ষাদোষ ও রাজনৈতিক কারণে জোড়াতালির চেষ্টায় পঙ্গু; তবুও জমিদার, হিন্দু সমাজ ও মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং কৃষকের হিতেচ্ছু ব্যক্তিবর্গের ঘর সামলাইবার চেয়ে নূতন সমাজের ভিত্তিস্থাপনের চিন্তা ও প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত।

# গান

শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত

আমারে তোমার বাঁশী করে লহ, হে মোর গায়ক বন্ধু,
তোমার নাচের নূপুর শুনিয়া উথলে নয়ন সিন্ধু।
নৃত্যের তালে দুলিছে বিশ্ব
তারি নিক্বণে হয়েছি নিঃস্ব,
ওগো ও মায়াবী, প্রেমী যাদুকর, দাও হে প্রেমের বিন্দু।

# শিল্প-পরিচয়

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

গতানুগতিক শিল্প সমালোচনার আমাদের দেশে অভাব নাই। ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় কলাপদ্ধতি লইয়া বাদানুবাদ, দৈনিক ও মাসিক পত্রিকাগুলিতে মুখরিত এবং সে বিষয়ে কিছু কিছু পুস্তকও বাংলায় ও ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। নানাদেশীয় কলাপদ্ধতি জানা পণ্ডিত লোকের এদেশে মোটেই অভাব নাই। তাঁহারা চিত্রদর্শন মাত্রেই বলিতে পারেন চিত্রখানিতে কতটুকু ভারতীয় ও কতটুকু বিজাতীয় প্রভাব রহিয়াছে এবং কি ভাবে শিল্পের অনুশীলন করিলে ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি বিজাতীয় পদ্ধতি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহারা অজ্ঞ শিল্পীদের এ বিষয়ে জ্ঞাত করাইতে প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু এ প্রকার শিল্পালোচনার পরেও শিল্পীদের কোন উন্নতি হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত লোকেরও বিশেষ উন্নতি হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। এইরূপ শিল্পবিচার ছাড়া ছবির সত্যিকারের পরিচয় কি, তৎসম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান শিক্ষিত লোকের মধ্যেও অভাব। এটা 'রঙিন' ছবি, এটা 'সাদা-কালো' ছবি শুধু এরূপ জ্ঞান থাকাটাও অজ্ঞতারই পরিচয় দেয়। 'ছবি কিছুই বুঝি না' একথা পূর্ব্বের মত আজকাল বড় একটা শোনা যায় না, কিন্তু শিল্পের নানা প্রকার রূপগুলি সম্বন্ধে অন্ততঃ সাধারণ ধারণা না থাকিলে সত্যিকার রস যে উপলব্ধি করা যাইবে না, ইহা নিশ্চিত। আমি চিত্রশিল্পের যে যে বিষয়গুলি সংক্ষেপে বলিব তাহার প্রত্যেকটির স্বাতন্ত্র্য কি তাহাই আমার এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়।

প্রাচীন কাল হইতে শিল্পীরা পাথর, মাটি, কাঠ, ইট এবং নানা প্রকার রঙ প্রভৃতি দিয়া দেয়ালে, কাপড়ে, কাঠে, কাগজে যে নানাভাবে শিল্প সৃষ্টি করিলেন এবং যাহাতে এই পৃথিবী আমাদের নিকট শিল্পকলায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল তাহার পরিচয় আমরা সঠিক না পাইলে শিল্পের ভাব ও ভাষা বুঝিতে পারিব কি? সংক্ষেপে চিত্রের এই শ্রেণী-বিভাগ বর্ণনার চেষ্টা করিব। ছবিতে এই সব বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়:—1. Fresco Painting, 2. Tempera Painting, 3. Water Colour, 4. Oil Colour, 5. Wood Cut 6. Colour Wood Cut, 7. Wood Engraving 8. Lino Cut, 9. Lithograph, 10. Etching 11. Drawing.

### Fresco Painting—প্রাচীর চিত্র

ভারতবর্ষে 'অজন্তা' ও বাঘ গুহায় অতি প্রাচীন ফ্রেস্কো চিত্র এখনও রহিয়াছে। সমস্ত দেয়ালে ও ছাদে অসংখ্য ছবি আঁকা হইয়াছে। পাথরের দেয়ালে এক প্রকার আস্তর লাগাইয়া তাহার উপর রঙ দিয়া এই চিত্র করা হইয়াছে। চিত্রগুলি আকারে সাধারণ জলরঙ ও তৈলরঙের চিত্র হইতে অনেক বড়। তাহা এমন রঙে আঁকা হইয়াছে যাহা এই বহুকালের ব্যবধানেও মলিন হয় নাই। দুষ্প্রাপ্য নানা প্রকার রঙিন পাথর হইতে ও মাটি হইতে এই রঙ তৈরী করা হইয়াছে। ফ্রেস্কো-চিত্রে রঙের স্বল্পতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। অল্প কয়েকটি রঙে আঁকা হইলে যে গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দেয় বেশী রঙে আঁকা হইলে তাহা হয় না। দেয়ালের উপর আঁকা হয় বলিয়া তাহাতে দেয়ালের সমতল ভাবের একটা সত্তা থাকা উচিৎ অর্থাৎ সাধারণ ছবির মত ইহাতে দর্শককে সামনে হইতে দূরে লইয়া যাইতে চায় না। দর্শকের দৃষ্টিকে সমগ্র ছবির উপর সমানভাবে আকর্ষণ করাই ইহার রীতি। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষে অন্য প্রকারেও ফ্রেস্কো করা হইয়াছে। জয়পুরে আমরা দেখিতে পাই দেয়ালের আস্তর তৈরী করিয়া সেই আস্তর ভিজা থাকিতে থাকিতে চিত্রটি আঁকা হইয়াছে। পরে শুকাইবার পূর্ব্বেই কর্ণিক দিয়া পিটিয়া ও পাথর দিয়া ঘষিয়া চক্চকে করা হইয়াছে। একদিনে যতটুকু কাজ করা সম্ভব ততটুকুই আস্তর লাগাইতে হয়। দেয়ালের আস্তরে চুণ, বালি ও মার্ব্বেল পাথরের গুঁড়া ব্যবহার করিতে হয় এবং খুব পাতলা রঙ-এ

শুধু জল দিয়া আঁকা হয়, কাজেই ভিজা আস্তরের সঙ্গে মিশিয়া উহা দেওয়ালেরই অঙ্গ হইয়া যায়। ইহাকে 'জয়পুরী ফ্রেস্কো' রীতি বলা হয়। এই জয়পুর ফ্রেস্কোর সঙ্গে ইতালীয় ফ্রেস্কো পদ্ধতির খুব সাদৃশ্য আছে—যাহাকে Wet Process বা ভিজা পদ্ধতি বলে অর্থাৎ ভিজা থাকিতে থাকিতে যাহাতে আঁকিতে হয়। তবে তাহাতে জয়পুর ফ্রেস্কোর মত দেওয়ালে মার্বেলের গুঁড়া ব্যবহার হয় না এবং কাজ করার পর পিটান কিম্বা পালিশ পাথর দিয়া ঘষা হয় না। কাজেই তাহা চকচকে হয় না। ইতালীয় ফ্রেস্কো পদ্ধতিতেও রঙের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। হয়। তৈলরঙে অথবা রঙের সঙ্গে ডিম মিশাইয়া আঁকা হইবার পর ক্যানভাসটি অথবা অ্যাস্‌বেষ্টো বোর্ডটি দেয়ালে জুড়িয়া দেওয়া হয়।

## টেম্পারা পেণ্টিং

পারস্য, রাজপুত ও মোগল চিত্রাবলীকে টেম্পারা পেণ্টিং বলা হয়। টেম্পারাকে জলরঙ বলা যায়। তবে প্রত্যেক রঙটিকে সাদা রঙের সংমিশ্রণে ঘন করিয়া লাগাইবার জন্য তাহাতে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। ছবির প্রত্যেকটি রঙ প্রত্যেকটি হইতে ভিন্নভাবে তৈরী করিয়া সমানভাবে

খৃষ্টের দেহাবশেষ ( ফ্রেস্কো ) শিল্পী—ফ্রান্সেস্‌কো রেরোলিনি

ভিজা চুণ-বালির দেয়ালের উপর আঁকার দরুণ বিশেষ বিশেষ রঙ ছাড়া অন্য কোন রঙ ব্যবহার সম্ভব হয় না। স্থায়ী রঙ ছাড়া অন্য কোন রঙ অল্প সময়েই মলিন হইয়া যায়। এখানে বলা আবশ্যক যে, জয়পুরী ফ্রেস্কো পদ্ধতি প্রাচীন ইতালীয় পদ্ধতির তুলনায় কম প্রাচীন নয়। এই তিন প্রকার ফ্রেস্কো ছাড়া অন্য কয়েক প্রকার দেয়ালচিত্র Mural Paintingএর প্রচলন আছে। চুণ-বালি অথবা সিমেণ্টের আস্তরের দেয়ালে গুঁড়া রঙের সঙ্গে ডিম মিশাইয়া এক ধরণের দেয়াল-চিত্র অঙ্কনের পদ্ধতি প্রচলন আছে। ইহা শুকনো দেয়ালের উপর আঁকা হয়। অন্য ধরণের দেয়াল-চিত্র ক্যানভাস্‌ বা অ্যাস্‌বেষ্টোর উপর করা লাগাইতে হয়। ইহাতে সেজন্য আলঙ্কারিক ( Decorative ) ভাবটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। কলিকাতার যাদুঘরে এইরূপ ছবি দেখিতে পাওয়া যাইবে। তিব্বতের পতাকাচিত্রও টেম্পারা পেণ্টিংএর পর্য্যায়ে পড়ে। বাঙলার পুঁথির পাটা ও পট এইভাবেই আঁকা হয়। রাজপুত মোগল চিত্রগুলি কাগজের উপর করা হইয়াছে। এই কাগজও শিল্পীরাই এই জন্য বিশেষভাবে তৈরী করিতেন। কিন্তু তিব্বতীয় পতাকার চিত্র কাপড়ের উপর করা হয়। ইতালীয় অতি প্রাচীন চিত্রাবলীও টেম্পারাতেই করা হইয়াছে। তাহারা কাঠের তক্তার উপর এবং কাপড়ের উপর এই টেম্পারা পেণ্টিং

করিয়াছেন। এই ধরণের ছবিগুলি দেখিলেই বোঝা যায় যে, ছবির রঙগুলি পাথর বসানর মত আলাদা আলাদা ভাবে লাগান। এই টেম্পারা ছবিগুলির সঙ্গে ফ্রেস্কো পদ্ধতির বিশেষ সাদৃশ্য আছে, কারণ উভয় কাজেই রঙএর প্রয়োগ একইভাবে করা হয়।

## জলরঙ চিত্র

সত্যিকার জলরঙের চিত্রাবলী টেম্পারা পেন্টিং হইতে ভিন্ন। কারণ ইহা পাতলা জলরঙে আগাগোড়া আঁকা। এই ছবির রঙ ঘন হইতে একেবারে হাল্কা হইয়া কাগজের সঙ্গে মিশিয়া যায়, কোথাও রঙটি ভারী করিয়া লাগান হয় না। সাদা রঙটি কাগজের অথবা কাপড়েরই থাকিয়া যায়। বাঙলা দেশে পুরাতন ছবিতে কেবল কালীঘাটের পটে এই জলরঙের ছবির চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমাদের আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার বেশীর ভাগ ছবি টেম্পারা বা জলরঙের মিশ্রণে করা হইয়াছে। এই ছবিগুলি প্রথমে পাতলা জলরঙে আরম্ভ করিয়া পরে ঘন রঙে অর্থাৎ শাদা মিশাইয়া টেম্পারা ধরণের করা অথবা প্রথম টেম্পারা ধরণের আরম্ভ করিয়া পাতলা রঙের washএ শেষ করা হইয়াছে। চীন ও জাপানের চিত্রেও জলরঙ ও টেম্পারা পেন্টিংএই করা হয়। তবে সিল্ক অথবা কাগজের উপর শিল্পীরা জোর তুলির আঁচড়ে ছবিখানি প্রায়,একবারেই আঁকিয়া থাকেন।

## তৈল চিত্র

প্রথম যখন তৈলরঙে আঁকা ছবির প্রচলন আরম্ভ হয় তখন গুঁড়া রঙের সঙ্গে তিসির তৈল মাড়িয়া লইয়া আঁকা
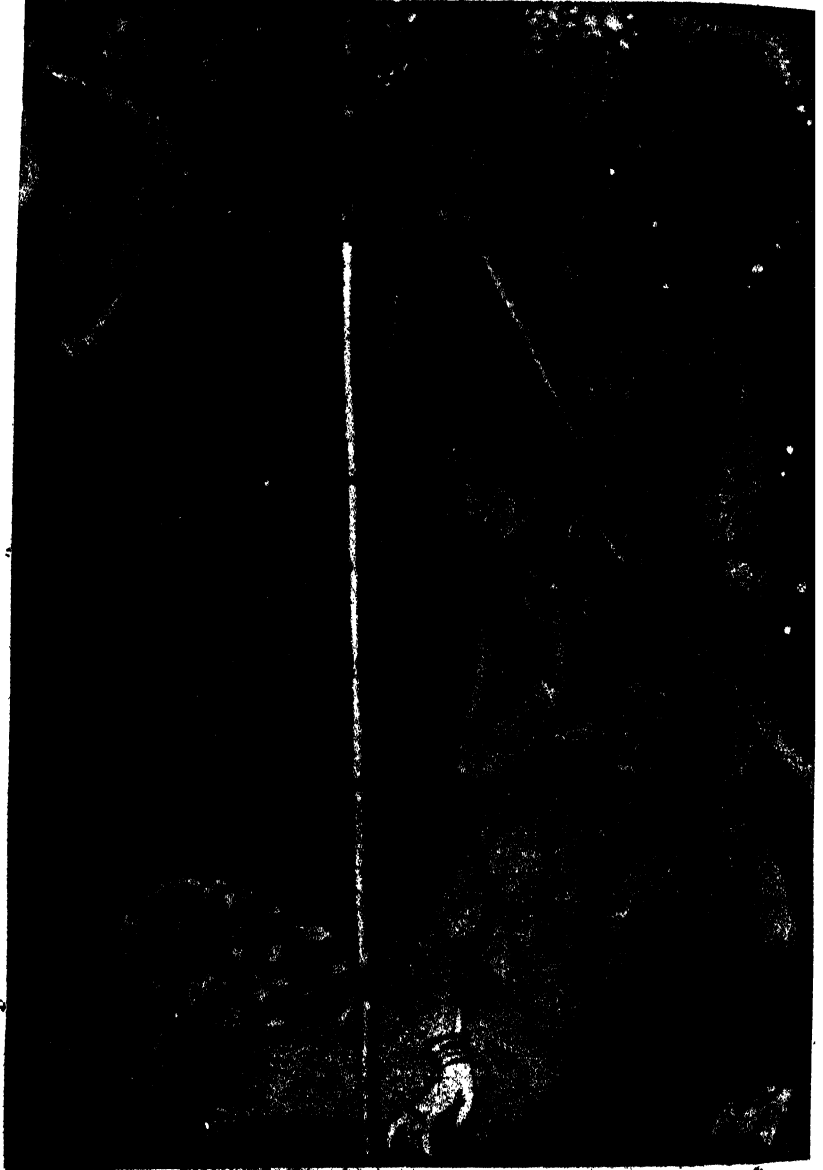
জলরঙা ছবি : বেদুইনের ঘর

হইত। শিল্পীরা নিজেরাই এ কাজ করিতেন। তৈলরঙে আঁকা পদ্ধতি বাহির হইবার পর ইহা ক্রমে ক্রমে এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র বেশীর ভাগ শিল্পী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে। এখন তৈরী রঙ টিউবে পাওয়া যায়:—

যাহাতে গুঁড়া রঙের সঙ্গে তৈল মিশাইবার জন্য আর বিশ্রম করিতে হয় না, এবং যেখানে ইচ্ছা এই রঙ লইয়া যাইতে পারা যায়। এই তৈলরঙ শুকাইতে সময় লাগে কম্ব শুকাইলে তাহার উপর আবার নূতন রঙ লাগাইতে পারা যায়। এই প্রকার সুবিধা টেম্পারা কি জলরঙে পাওয়া যায় না। কাজেই মূর্ত্তি গঠনের মত ইহাতে ক্রমে ক্রমে গড়িয়া তোলার সুযোগ পাওয়া যায় এবং এই কারণেই পৃথিবীতে ইহার এত বেশী প্রয়োগ। এই তৈল-রঙ-এর প্রচলনের পর হইতে রিয়েলেষ্টিক আর্ট উন্নত হইতে থাকে। পরিষ্কারভাবে এইরূপ বলা যায় যে, তৈল-রঙে কাজ করিবার বিস্তৃত পরিধির জন্য ওস্তাদ শিল্পীরা আলোছায়ার নব নব বর্ণ সমাবেশকে যেমন খুসী ফোটাইতে সক্ষম হইলেন এবং তাঁহাদের নিকট এই বিস্তৃত পৃথিবীর দৈনন্দিন কার্য্যাবলী ও দৃশ্যাবলী চিত্রের বিষয়বস্তু হইয়া উঠিল।

### Wood cut বা কাঠে কাটা ছাপের ছবি

এই ছাপের ছবির দৃষ্টান্ত দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, ইহা কি। কেবল শাদা কালোর প্রয়োগে ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহা কাঠের তক্তার উপর নরুণ জাতীয় একপ্রকার যন্ত্রদ্বারা কাটা ব্লক্ হইতে ছাপ লওয়া। এই প্রকার জিনিষ করিতে শিল্পীকে কারিগরের মত সব কাজই করিতে হইয়াছে। বাঙলাদেশে দু'তিন প্রকারের কাঠ পাওয়া যায় যাহাতে এই কাজ সুন্দরভাবে করা চলে—যেমন গাম্ভার, চাকুন্দে ও কাঁঠাল কাঠ। যে ছবিটি করা হইবে তাহার একটি খসড়া সাদা কালোয় কাগজে করিতে হইবে। সেই খসড়া হইতে Trace করিয়া কাঠে উঠাইতে হইবে এবং কালি দিয়া কাঠের উপর মোটামুটি ছবিটি আঁকিয়া লইতে হইবে। এখন কাটা আরম্ভ হইবে—কাঠে যে যে লাইন কালো থাকিবে সেগুলি না কাটিয়া শাদা যায়গাগুলি নরুণ যন্ত্র দিয়া ও বাটালি দিয়া কাটিয়া নীচু করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলেই কালো যায়গাগুলি উঁচু হইবে এবং সাদা স্থানগুলি নীচু হইয়া যাইবে। এই ভাবে কাটা শেষ হইলে একটি ছোট 'inking roller' দিয়া ব্লকটির উপর কালি লাগাইতে হয় পরে ব্লকটির উপর কাগজ রাখিয়া চামচের পিঠ দিয়া অথবা অন্য প্রকার ঘষিবার জিনিষ দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া ছাপটি কাগজে উঠাইতে হয়। এই ছাপার কাজে ছাপিবার উপযুক্ত হাতে তৈরী বিশেষ কাগজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে নেপালী কাগজ এই কাজের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। এই কাঠের ছাপের ছবির বিশেষত্ব এই যে, কাঠে কাটা হওয়ার দরুণ ইহার প্রত্যেকটি লাইন কাটা কাটা এবং ঘষিয়া লওয়া হয় বলিয়া কাগজের ছাপটি একেবারে বসিয়া যায়। তুলিতে আঁকা শাদাকালো ছবির সঙ্গে যে তাহার অনেক পার্থক্য আছে তাহা বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন। Wood cut এ সাধারণতঃ শাদার উপর কালো লাইনের কাজই দেখা যায়।

### Colour wood cut বা রঙীন উড্‌কাট্

প্রথমতঃ জাপানে এই রঙীন উড্‌কাটের প্রচলন হয়। এখন ভারতবর্ষে ও ইউরোপে জাপানী প্রথায় রঙীন্ উড্‌কাট্ করা হইতেছে। পূর্ব্বে উড্‌কাট সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা রঙীন্ উড্‌কাট্‌এর গোড়াকার কথা। ভিন্ন ভিন্ন কাঠে ভিন্ন ভিন্ন রঙের Block কাটিয়া পর পর একই কাগজে ছাপা হইলে যে ছবি প্রস্তুত হয়, তাহাই রঙীন্ উড্‌কাট্। ইহা যত অল্প রঙে কৃতকার্য্যতার সহিত করা সম্ভব হয় ততই সুন্দর দেখাইবে।

ইহা হাতে ছাপার জন্য, সকল ছাপের ছবিগুলি ঠিক একই প্রকার হয় না। প্রত্যেকটিতেই বিশিষ্টতা থাকে। ২০ কি ৩০টির বেশী ভাল ছাপ তুলিতে পারা যায় না, কারণ প্রত্যেকবার ছাপটি ঘষিয়া তোলার দরুণ কাঠের Sharpness ক্ষয় হইতে থাকে। এই সব ছাপের ছবিকে সেজন্যই Original Print বলা হয়।

### Wood-engraving
### কাঠ খোদাইয়ের ছাপের ছবি

উড্‌কাটে যেমন কাঠের তক্তা ব্যবহৃত হয়, কাঠ খোদাই-এ তা হয় না। গাছটিকে খাড়াভাবে রাখিয়া আঁখ যেমন করিয়া কাটে তেমন করিয়া টুক্‌রা করিয়া কাটিতে হয়—সেই টুক্‌রাগুলিই খোদাই করার পক্ষে প্রয়োজনীয়।

এই টুক্‌রা কাঠে কিন্তু নরুণ অথবা ছুরি দিয়া কাটিতে পারা যায় না। ইহার জন্য অন্য প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে। এই যন্ত্রগুলি দিয়া খোদাই করিতে হইবে। কাঠ খোদাইএও wood cut-এর মত শাদা
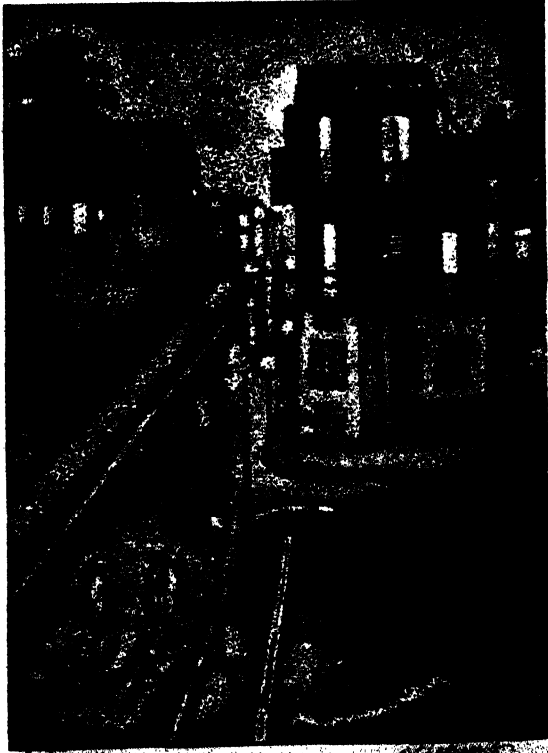
বর্ষায় ডোভার লেন কাঠ খোদাই

কালো ছবি করা হয়। Wood-cut-এ যেমন শাদার উপর কালো লাইনের ছবি হয় wood engraving-এ তেমন কালোর উপর শাদা লাইনের প্রভাবই তার বিশিষ্টতা। কাঠ খোদাই-এ সূক্ষ্ম কাজ করিতে পারা যায় বলিয়া ইহাতে আমরা আলো-ছায়া (light and shade) এবং নানা প্রকার tone-এর বৈচিত্র্য পাই। ইহার ছাপ ঠিক wood-cut-এর ছাপ লওয়ারই মত। অর্থাৎ শিল্পীকে নিজেই ছাপ তুলিতে হইবে।

## লিনোকাট

লিনোলিয়াম—এক প্রকার রবারের মিশ্রণ; ইহার ব্যবহার অন্যান্য অনেক কাজেই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাকে শিল্পীরাও তাহাদের কাজে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইহাকে নরুণ অথবা ছুরি দিয়া কাটা যায় এবং নরম বলিয়া ইহা উড্-কাটের চাইতে কাটা সহজ। কাটা সহজ হইলেই কিন্তু কাজটি সহজ হয় না। ওস্তাদ শিল্পীর হাতে যেমন মনোরম কাটা ও ছাপা হয় অনভিজ্ঞ শিল্পীর পক্ষে তাহা সম্ভব নহে।

বালি ব্রীজ লিনো কাট্

এই লিনোলিয়াম-এ ছোট ছেলেমেয়েরা নানা প্রকার ফুল, লতা, পাতা, পাখী ইত্যাদি আঁকিয়া সহজেই কাটিতে ও ছাপিতে পারিবে। ছাপার কাজ wood-cut ছাপারই মত।

## লিথোগ্রাফ

লিথোগ্রাফ ছবির কথা বোধ হয় আপনাদের নিকট অপরিচিত নয়। বাজারে এক সময়ে রবি বর্ম্মার ছবির ও চোরবাগানের Chromolithograph অর্থাৎ রঙিন লিথোগ্রাফের খুব কাটতি ছিল এবং এখনও অল্প বিস্তর তাহার চলন আছে। সম্প্রতি সিনেমা ও রেলোয়ের রঙিন বিজ্ঞাপন লিথোগ্রাফে ছাপা হয়, তাহা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে যে ভাবে

লিথোর চলন আছে তাহা হইতে শিল্পীদের কাজে যে লিথো ছাপার কাজ হইতেছে তাহা অনেকটা তফাৎ। লিথো পাথরের উপর চর্ব্বিযুক্ত কালি অথবা চর্ব্বিযুক্ত পেন্সিলে ছবিটি আঁকা হয়। এই লিথো পাথরের গুণ এই যে, পাথরটি ভাল করিয়া পরিষ্কার করা হইলে তাহার যেখানেই তৈলাক্ত পদার্থ লাগিবে সেখানেই উহা দাগ লাগিয়া যাইবে। কাজেই খুব সাবধানে কাজ করিতে হইবে যাহাতে পাথরের কোথাও হাতের চাপ না লাগে। কাজটি Litho পাথরের উপর সম্পূর্ণ আঁকা হইলে পর গঁদের সঙ্গে নাইট্রিক এসিড্ মিশাইয়া তাহার উপর বুলাইয়া দিতে হইবে। এই গঁদ ও এসিড শুকাইবার পর জল দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। তখন চর্ব্বিযুক্ত কালিলাগা স্থানগুলি ছাড়া এসিডের ক্রিয়ায় অন্য সব যায়গাগুলি অল্প নীচু হইয়া যাইবে। এই Lithograph ছাপিতে Pressএর প্রয়োজন হয়। পাথরটি এইভাবে তৈরী হওয়ার পর মোটা রুলার দিয়া তাহার উপর কালি লাগাইতে হইবে। কালি লাগান হইলে পাথরটির উপর কাগজ রাখা হয় এবং তাহা প্রেসের ভিতর দিয়া চালান হয়। শিল্পীরা এই ছাপার কাজ অনেক সময় নিজেরাই করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে লিথোগ্রাফের ছাপা ছবির একটা নিজস্বতা ছিল না। অল্পদিন হইল শিল্পীদের হাতে পড়িয়া ইহাতে নূতন রূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

## এচিং

যে প্রণালীতে তামার পাতে ছবি আঁকা হয় ও তাহা হইতে ছাপা হয় সেই প্রণালীকে এচিং বলে। এচিং নানা প্রকারের। Etching, Dry Point, Aquatint, Mezzotint ইত্যাদি। (এচিং, ড্রাই-পয়েন্ট, একোয়াটিন্ট ও মেজ্জোটিন্ট)।

**Etching**-ই প্রাচীন পদ্ধতি। তামার পাতে প্রথমতঃ খুব পাতলা একটি মোমের প্রলেপ দেওয়া হয়, তাহার পর ছুঁচের সাহায্যে তাহাতে আঁচড় কাটিয়া লাইন দিয়া ছবিটি আঁকা হয়। প্রত্যেকটি আঁচড়ে মোম উঠিয়া যাইবে এবং তামার পাতটি প্রতি লাইনের ভিতর দিয়া চক্‌চক্ করিতে থাকিবে। ছবিটি এমনভাবে আঁকা হইলে পর, তামার পাতটিকে Nitric acid-এর জল-এ ডুবাইয়া দেওয়া হয়, তখন এসিড প্রত্যেকটি লাইনের ভিতর দিয়া তামার পাতটিকে খাইয়া গভীর করিতে থাকিবে। কতখানি গভীর হইলে ছাপাটি পরিষ্কার উঠিবে তাহা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। যাহা হউক যখন প্রয়োজনমত এসিডের ক্রিয়া হইয়াছে মনে হইবে, তখন তামার পাতটিকে তুলিয়া লইয়া কেরোসিন তেলে পরিষ্কার করিয়া কালি লাগাইতে হইবে। Wood Engraving

ঘুমন্ত শিশু ড্রাই পয়েন্ট

কি Wood-cutএ যেমন উঁচু জায়গায় কালি লাগে ইহাতে কিন্তু ঠিক বিপরীত অর্থাৎ গভীর যায়গায় কালিটি লাগিবে এবং তাহাতেই প্রত্যেকটী লাইনের ছাপ কালো হইয়া উঠিবে। কালি সমানভাবে সমস্ত তামার পাতে প্রথম লাগাইয়া হাত দিয়া মুছিয়া surfaceএর কালিটি তুলিয়া লইতে হয় এবং এমনভাবে বার বার মুছিতে মুছিতে শুধু কেবল গভীর লাইনগুলির মধ্যে কালিটি আটকাইয়া থাকে। ইহা ছাপিবার জন্য এচিং-প্রেসের প্রয়োজন।

## ড্রাই-পয়েণ্ট্

ইহাতে তামার পাতের উপর কোন মোমের প্রলেপের প্রয়োজন হয় না। একেবারেই ছুঁচ দিয়া পাতটিকে কাটিয়া লাইন দিতে হইবে। কাজটি হওয়ার পর ঠিক এচিং ছাপার মতনই ছাপা হয়। এচিং ও ড্রাই পয়েণ্টের বিশেষত্ব এই যে, এচিং-এর রেখাগুলি এসিডে ক্ষয় হওয়ার দরুণ সমান ভাবের হয়, আর ড্রাই-পয়েণ্টের রেখাগুলিতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা লাইন এবং যায়গায় যায়গায় কালি বেশী ধরিয়া বেশ নরম রেখাপাত হয়।

## অ্যাকোয়াটিণ্ট্

Etching ও Dry-pointএ যেমন লাইনেরই বিশেষত্ব, Aquatintএ তেমন রকম রকম Toneএরই বিশেষত্ব। শাদা হইতে Toneগুলি পর পর অল্প কালো ও বেশী কালো হইয়া যায়।

হাঁস অ্যাকোয়াটিণ্ট

এই toneগুলি কি করিয়া করা যায় তাহা বলিতেছি। তামার পাতে সমানভাবে রজনের, মিহি গুঁড়া ফেলিতে হয় এবং অল্প আগুনের আঁচে তামার পাতটি গরম করিলে সেই রজনের গুঁড়াগুলি তামার পাতে শক্ত হইয়া আটকাইয়া যায়। তখন ছবির 'টোন' অনুযায়ী শাদা যায়গাগুলিতে একটি তুলি দিয়া বার্ণিশ লাগান হয়। তারপর তাহা এসিডে ডুবান হয়। একটু পরেই আবার এসিড হইতে তুলিয়া শাদা যায়গার পরের 'টোন্'টি বার্ণিশ দিয়া ঢাকিতে হয়। এইরূপ বারবার প্রত্যেকটি 'টোন্' এসিডে খাওয়াইতে হইবে। এমনভাবে যে 'টোন্'টি সব চাইতে বেশীবার এসিডে ক্ষয় করা হইবে তাহারই সব চাইতে কালো ছাপ উঠিবে। ইহা ছাপার কাজ ঠিক Etching ছাপার মতনই।

## মেজ্জোটিণ্ট

Mezzotintএর ছাপের ছবি অনেকটা Aquatint-এরই মত। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে বেশ পার্থক্য বোঝা যায়। ইহাতে এসিডে ডুবাইবার প্রয়োজন হয় না। ড্রাই-পয়েণ্ট্ করার মত তামার পাতটির উপর কোন মোমের আস্তর কিম্বা রজনের গুঁড়ার আস্তর না দিয়া সোজাসুজী কাজ করিতে হইবে। তামার পাতটির উপর একটি ছুরির মত যন্ত্র দিয়া নানা দিক দিয়া কাটিয়া কাটিয়া ইহার উপরটি মিহি শিরিষ-কাগজের মত করিতে হয়। এই অবস্থায় যদি কালি লাগাইয়া ছাপ লওয়া যায় তবে একেবারে ঘন কালো ছাপ উঠিবে। এখন ধারাল ছুরি দিয়া তামার পাতের গুঁড়াগুলি চাঁচিয়া চাঁচিয়া বাহির করিতে হইবে। একেবারে যে স্থানটি প্রায় পালিশ করা হইবে তাহা একেবারে সাদা হইবে এবং কমবেশী scrape করা যায়গাগুলি কম বেশী সাদা-কালো হইবে এবং

যে যায়গাটি খস্‌খসে করা হয় নাই তাহা একেবারে কালো হইবে। এচিং ছাপার মতই ইহা ছাপিতে হয়।

## ড্রয়িং

এবার ড্রইং সম্বন্ধে অল্প কিছু বলিব। ড্রইংএর একটা নিজস্বতা সত্ত্বেও খসড়া ( sketch ) প্রস্তুত করিতে নানা ভাবে ইহার সাহায্য লইতে হয়। রঙিন ছবি ও একরঙা ছবি আঁকিবার পূর্ব্বে খসড়া প্রস্তুত করিতে হয়। এই খসড়াকে ড্রইং বলে।

Drawing তুলি দিয়াও আঁকা যায়। এই প্রকার

## মূর্ত্তি গঠন

ছবি এবং ছাপের ছবি সম্বন্ধে এতক্ষণ বলিবার পর মূর্ত্তি সম্বন্ধে অল্প কিছু বলিতে চাই। মূর্ত্তিশিল্প কত প্রকারের হয় তাহা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। পাথরে খোদাই করা মূর্ত্তি পৃথিবীতে অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। নানা প্রকার পাথরে নানা প্রকার মূর্ত্তির গঠন সম্ভব হইয়াছে। আমাদের দেশের মন্দির ও গুহাতে অতি প্রাচীন মূর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।

হ্যাম্‌ষ্টেড্ হিথ—লণ্ডন ( এচিং—অ্যাকোয়াটিণ্ট্ )

তুলির ড্রইং আমরা পারসিক, মোগল ও রাজপুত ছবিতে অনেক দেখিতে পাই। ফ্রেস্কো ও টেম্পারা ছবির জন্যও তুলিতে ড্রইং হইয়া থাকে।

## Pen and Ink

অর্থাৎ কলমের সাহায্যে কালি দিয়া যে কাজ হয়। ইহা অনেকটা এচিংএর মত দেখিতে হয়। বড় ছবি করার জন্য খসড়া প্রস্তুত করিতে এই Pen & Ink Drawingএর চলন আছে—তাহা ছাড়া বইএর ভিতরকার ছবির জন্যও ইহার ব্যবহার আছে।

কাঠ কয়লা, ক্রেয়ন ও পেন্সিলেও ড্রইং হইয়া থাকে।

'ব্রোঞ্জ' এক প্রকার মিশ্রিত ধাতু, তাহাতে অতীত যুগ হইতে কত প্রকারের মূর্ত্তির গঠন হইয়াছে জানিয়া অবাক হইতে হয়। মাদ্রাজের নটরাজ মূর্ত্তি ব্রোঞ্জ-এ তৈরী—তাহা পৃথিবীতে একটি আদর্শ ব্রোঞ্জ শিল্পকলার নিদর্শন।

Terracota অর্থাৎ মাটির মূর্ত্তি অথবা কারুকার্য্য, যাহা পুড়াইয়া লওয়া হইয়াছে—যেমন ইট পুড়ান হয়। ইহাও বহুকাল স্থায়ী হয়। বীরভূমে বহু পুরাতন মন্দিরের গায়ে এই প্রকার Terracotaর চমৎকার কাজ আমাদের চোখে পড়ে। হাজার হাজার বৎসরের

Terracotaর কাজ পৃথিবীর অনেক স্থানে পাওয়া গিয়াছে ও যাইতেছে।

নিবিষ্টা স্কেচ্ ড্রইং

এই পাথর, Bronze ও Terracota ছাড়াও প্যারিস-প্লাষ্টার ও সিমেণ্ট-এ মূর্ত্তি ঢালাই করা হয়। অবশ্য এইগুলি আধুনিক কালেই সাধারণ কাজের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। পাথর কি 'ব্রোঞ্জ' অথবা পোড়ামাটির মত ইহা স্থায়ী হয় না। বর্ত্তমানকালেও স্থায়ী কাজের জন্য পাথর ও ব্রোঞ্জ-এর মূর্ত্তিই তৈরী হয়।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আমি শিল্পের যতগুলি রূপের পরিচয় সংক্ষেপে দিলাম তাহার প্রত্যেকটিই নিজ নিজ বিশিষ্টতার জন্য শিল্পজগতে স্থান পাইয়াছে। কোন্ শিল্পটি ভাল, কোন্ শিল্পটি তাহার চেয়ে নিকৃষ্ট ইহা কেবল গুণের দ্বারা প্রকাশ পায়। তৈলরঙের ছবির চাইতে জল-রঙের ছবি ভাল অথবা এচিং উড্‌কাট হইতে উন্নত শিল্প ইহা বলার কোন সার্থকতা নাই। দেখিতে হইবে—যে জিনিষটি সৃষ্টি হইল তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে কিনা। একটি ছোট Terracotaর মূর্ত্তি ও একটি বিরাট্ পাথরের মূর্ত্তি শিল্পরসিকের নিকট পূর্ণতার দিক্ দিয়া সমান স্তরেই বর্ত্তমান। আমরা যদি এই শিল্পকলার নানা রূপ সম্বন্ধে সজাগ থাকিয়া প্রত্যেকটি জিনিষই দেখিয়া ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে যেমন আমরা প্রকৃতির মধ্যে বাস করিয়া তাহার রূপের পরিচয় পাইয়া জীবনকে সুন্দর করিতে পারি, সেইভাবে শিল্পবোধ জাগ্রত হইলে আমাদের জীবন অধিকতর সুন্দর এবং আমাদের রুচি অধিকতর উন্নত হইবে। *

* এই প্রবন্ধের মধ্যেকার একমাত্র খৃষ্ট-মূর্ত্তি ছাড়া অন্যান্য ছবিগুলি প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর আঁকা। —প্রঃ সঃ।
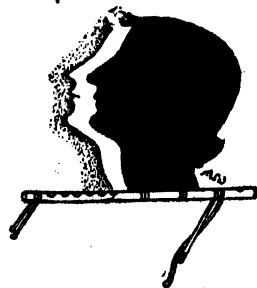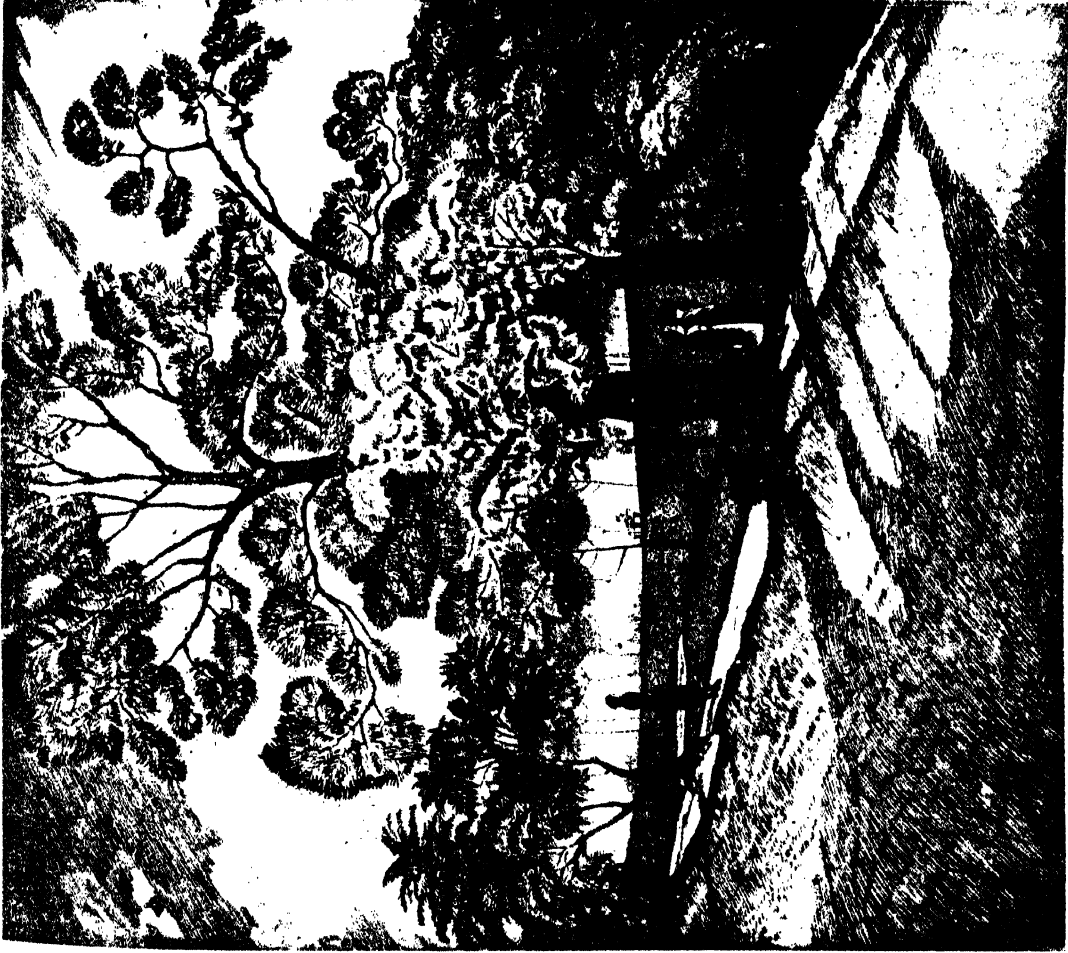
এচিং পার্লামেণ্ট হিল্‌স্ লণ্ডন

গ্রাম-সীমান্তে লিথোগ্রাফ

—শ্রীরমেন্দ্র ঠী দ্র পরিচয় প্রবন্ধ দ্র

পল্লী-প্রান্তরে

# কাঁচের চুড়ি

## শ্রীসুকৃতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

তারাপদর এতদিন পরে একটা কাজ জুটিয়াছে। জ তেমন কিছুই নয়। স্থানীয় জমিদারের জমি জমার দ্বিরাদি করা। তবু, যাহোক করিয়া উদরান্নের সংস্থান হবে তো। এই ভাবিয়াই আপাততঃ একবার নিরুদ্বিগ্ন ত্তে হুঁকার জল বদলাইয়া টিকার খোঁজে উঠিয়া গেল। কা আনিতে গিয়া দেখে একখানি টিকাও নাই। নিরাশ নে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় জলচৌকির উপর চাপিয়া ই হাঁটুর মাঝে মুখ গুঁজিয়া গতকাল এবং আগামী লের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। আগামী কালের বিপানা নেহাৎ মন্দ নয়। ভবিতব্য যাহাই লিখুক, ন্তুষ নিজের রুচিমত আঁকিয়া-জুঁকিয়া মনের মত করিয়া য় বলিয়া অত্যন্ত নিরাশ করে না। কিন্তু গতকালের টনা যখনই ছায়াছবির মত আসিয়া চোখের সুমুখে জির হয়, মনে হয়, এ-যেন জীবন্ত। এ-যেন আমারই কান্ত চেনা শোনা দিনগুলির প্রতিবিম্ব। কে যেন াড়ালে বসিয়া এই নগণ্য জীবনধারাকে অবলম্বন করিয়া বরাট্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছে।

তারাপদর বয়স তখন সতের। বাপ্ হঠাৎ হাট ইতে ফিরিয়া সেই যে শয্যা লইলেন আর উঠিলেন না। ামান্য জমিজমা যা কিছু ছিল, নানান্ দিক হইতে াওনাদারেরা আসিয়া নীলাম করিয়া যে যার প্রাপ্য ঝিয়া লইল। সামান্য কাঠা তিনেক জমির উপর খড়ের লা। বর্ষাকালে ঘরে জল থৈ থৈ করে। রাত্রে শুইয়া মাকাশের চাঁদ দেখা যায়। তা হোক—সর্ব্বাণী মনে করিলেন, অকূল সমুদ্রে ভগ্ন তরীরও মূল্য আছে। অনিবার্য্য ডুবিতে হইবে, তবু যদি কোন রকমে ভাসিয়া ভাসিয়া কিনারায় পৌঁছাইতে পারি; এই মনে করিয়াই মস্ত সঙ্কোচ এবং আত্মসম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বাণী পাওনাদারগণের হাতে পায়ে ধরিয়া সন্তান দুটির মাথা গুঁজিবার জন্য এই খোড়ো চালাটুকু ভিক্ষা করিয়া লন। এর-ওর কাছ হইতে খড় চাহিয়া কোন রকমে ঘরখানাকে দাঁড় করান। কিন্তু বেশীদিন তাঁহাকে দুঃখ সহিতে হয় নাই। বছরখানেক পরে তিনিও মারা যান,—সে কথাও আজ তার মনে পড়িল।

বর্ষাকাল। সর্ব্বাণী একাদশীর দিন মারা গেলেন। রোগটা নাকি ছোঁয়াচে,—অতএব তেমন কাহাকেও পাওয়া গেল না। তারাপদ দূর গ্রাম হইতে একজনকে ডাকিয়া আনিয়া মাকে পোড়াইতে গেল। শুক্‌নো কাঠের অভাবে চিতা নিভিয়া গেল ও বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ছাটে একাকার করিয়া দিল। বৃষ্টি থামিলে সে শুক্‌নো কাঠের খোঁজে গ্রামান্তরে গেল কিন্তু কোথাও মিলিল না দেখিয়া ক্ষুব্ধ মনে যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল চিতার কাঠ সব লণ্ডভণ্ড করিয়া ছড়ান। শ্মশানবন্ধুটিও নাই। দূরে একপাল শকুন মিলিয়া নৃত্য করিতেছে। সর্ব্বাণীর বুকের উপর বসিয়া শকুনের নৃত্য, এ দৃশ্য সে আর দেখিতে পারিল না। কোনরকমে কচুড়ি পানা সরাইয়া একটা ডুব দিয়া যখন উঠিল, দেখে, সর্ব্বাণীর এক বিন্দু চিহ্নও আর পৃথিবীতে নাই। তার দু'চোখ বহিয়া জর্জ্জরিতা জননীর জন্য জল গড়াইয়া পড়িল।

গ্রামের ভিতর তারাপাদ নকুল পণ্ডিতকে সবচেয়ে শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার নিকট আসিয়া সমস্ত জানাইলে, তিনি সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, কিচ্ছু ক'রতে হবে না তারা। প্রায়শ্চিত্ত ক'রবার সুযোগ জীবনে অনেক পাবে। তখন এই কথাটাই মনে রে'খ, আজ যেমন তোমার মায়ের চিতা কাঠের অভাবে জ্বল্‌ল না, তেমনি প্রতিদিন কত মায়েরই চিতা যে নিভে যায়, তার ঠিক কি! পার তো সেদিন কাঠ জুগিয়ে আজকের দুঃখ পূরণ ক'র। স্বার্থপর মানুষ কোনদিন কারও উপকারে লাগে না। আজ যদি একদল ক্ষুধিত শকুন তাকে পেয়ে আনন্দ করে, তাতে অসার্থক হয়নি তোমার মায়ের জীবন। যাও—বেলা প'ড়ে এসেছে।"

তার পরের ঘটনাটি অত্যন্ত সাধাসিধে।

বছর চারেক পরেই তারাপদ সুষমাকে বিবাহ করিয়া আনে। রাধারাণীর বয়স তখন সাত। একটি মাত্র বোন। তাহাকে যাহাতে অযত্ন বা অবহেলা না করা হয়, তার জন্য সুষমাকে তারাপদ ছোটখাট একটা উপদেশও দিয়া দিয়াছিল। অনেকে অনুমান করিয়াছিল, সুষমার এক আধটা ছেলে-পিলে হইলে রাধারাণীর স্থান তখন হইবে ঐ আস্তাকুঁড়ে। কিন্তু এমনি মজা, আজ তিন-চার বছরের ভিতর কিছুই হইল না। না হইয়া ভালই হইয়াছে। আজ একটি বছর সে ঠায় বেকার। কোন রকমে পূজা-পাঠ করিয়া, কথকতা করিয়া যৎসামান্য যা আনে, তাহাতে কোন রকমে চলিয়া যায়।

কল্য হইতে চাল বাড়ন্ত। সামনেই আবার আষাঢ় মাস। অনেকদিন ঘর ছাওয়া হয় নাই। সুষমার পরণের বস্ত্র কোন রকমে তালি-তুলি দিয়া চলিতেছে। কিন্তু তাহার জন্য সুষমার কোন দুঃখ বা অভিযোগ নাই। এই দিক্ দিয়া তারাপদ সৌভাগ্যবান্ যে, সাধারণতঃ দরিদ্রের ঘরে যে সমস্ত স্ত্রী আসে, তাহারা সংগ্রামে অপটু, কলহ-প্রিয়—অল্পতেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। স্বামীর বিরুদ্ধে পাড়ায় পাড়ায় অভিযোগ করিয়া বেড়ায়। দিতে-থুতে না পারার গঞ্জনায় অস্থির করিয়া তোলে। অকর্ম্মণ্য অপদার্থ বলিয়া নিজের স্বামীকে অপরের নিকট হীন প্রতিপন্ন করিতে পারিলে গর্ব্ববোধ করে। সুষমা এইখানে স্বতন্ত্র। অল্পই সে লেখাপড়া জানে। বাপও তার কেউ-কেটা নয়—এ কথা জানে। অত্যন্ত লজ্জাবতী, মৃদুভাষিণী সে। যেটুকু বলে, তাহার ভিতর কথনও ছন্দঃ ব্যাহত হয় না। তাহার নিকট দৈহিক, মানসিক বা আর্থিক সংবাদ চাহিলে, সে কথনও মুখভার করিয়া দুঃখের গান গাহিবে না। বরঞ্চ হাসিমুখে জবাব দেয়, ভালই আছি। স্ত্রীভাগ্যটা তারাপদর মন্দ নয়—এমনি নানান্ অবান্তর চিন্তাসূত্র আসিয়া তার হুঁকা ও টিকার কথা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াছে। হঠাৎ ঘাড় তুলিতেই দেখে, রৌদ্দুর সজনে গাছের পাতার ফাঁক দিয়া চালের উপর দিয়া আসিয়া একেবারে চৌকাঠের নীচে নামিয়াছে। সুষমা উনুন ধরাইয়া দিয়া কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া ঘর হইতে চাল আনিয়া থালায় ঢালিয়া দিয়া রাধারাণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'খুদ-কুঁড়োগুলো সব বসে বসে বাছ তো ঠাকুর-ঝি।'

বলিয়াই সুষমা ঘরে গেল।

হঠাৎ বাহিরে একটা কিসের ডাক শুনিয়া রাধা কোলের থালা নামাইয়া রাখিয়া এক লাফে একেবারে বাহিরে আসিয়া হাজির। সেখানে পাড়ার অন্যান্য ছেলেমেয়েরা ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

নীলমণি হাজরা এই সময়ে প্রায়ই কাঁচের চুড়ি, শাঁখের শাঁখা, মাথার কাঁটা, ফিতা প্রভৃতি বিক্রয় করিতে সুদূর নদী পারাপারের গ্রাম হইতে আসে। এবং প্রত্যহই রাধা খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করে, 'এটার দাম কত, এই পুতুলটা?'

'চার আনা। নেবে?'

'চা-র-আ-না? না, থাক্। আচ্ছা ঐ চুড়ির দাম কত?'

'চার পয়সা। দেব?'

এবারেও রাধাকে ঘাড় নাড়িয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতে হয়, 'না, থাক্।'

নীলমণি বিরক্ত হইয়া বলে, 'নেবে না, কিছু না, কেবল হ্যাংলার মত এটা—ওটার দাম ক'য়ে হবে কি?'

রাধারাণী শিশু হইলেও, আঘাত বোঝে। তখন অগত্যা বৌদির অতিকষ্টে সঞ্চিত পয়সা হইতে একটি পয়সা চুরি করিয়া আনিয়া বলে, 'কাঁচ পোকার টিপ্ আছে?'

'আছে।'

'এক পয়সার দাও।' বলিয়া একবার চুড়িগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া আসে।

এ ঘটনা দিন সাতেক আগেকার। সুষমা ডাল কিনিবার জন্য পয়সা ক'টি রোয়াকে রাখিয়া নদীতে চান করিতে গিয়াছিল, সেই অবসরে রাধা একটি পয়সা লইয়া টিপ্ কিনিয়া বসে। তারাপদ বাড়ী ফিরিয়াই শোনে এই কাণ্ড।

স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিল, 'কোথায় সে দেখি, একবার। দু' ঘা দিলেনা কেন? অত বড় ধাড়ী মেয়ের এতটুকু বুদ্ধি নেই?'

সুষমা হাসিয়া বলিল, 'সত্যিই তো, বোনের তোমার বয়সও তো কম হল না। বারো বছর—ও! বাঙালীর ঘরের মেয়ে—আমার হালিসহরের ঠাকুমা বারো বছরে ছেলের মা হন। নেহাত কলিকাল ব'লে,—আচ্ছা, আজকের দিনটে যেতে দাও বাপু। ঠাকুরঝি বেরিয়ে এস ভাই। ঠাকুর-জামাই আসুন, তারপর তাকে দেখে লজ্জা ক'রো।'

অতঃপর রাধারাণী কপালে টিপ আঁটিয়া গম্ভীরভাবে আসিয়া প্রশ্ন করিয়া বসিল, 'বড়িগুলো গুঁড়িয়ে না দিলে কচুর শাক ভাল হয়না, না, বৌদি ?'

তারাপদ হুঁকায় শেষ টান দিয়া কহিল, 'হুঁ, বৌদি।'

তারপর স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, 'যাই বল বাপু, পোড়ামুখীকে মানিয়েছে কিন্তু।'

রাধারাণী কহিল, 'দাদা, আমায় এক জোড়া কাঁচের চুড়ি কিনে দেবে ?'

তারাপদ বলিল, 'দেব।'

কিন্তু নানান্ আর্থিক দুর্গতির জন্য আর পাঁচটা সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুটা যেমন কেনা হয় নাই, তেমনি রাধারাণীর চুড়িও আর আনে নাই।

আজ আবার রাধারাণী সেই একই অপরাধ করিয়া বসিল।

প্রতিবেশিনী মোক্ষদাঠাকুরুণ আজ ক'দিন ধরিয়া ক্রমাগত পয়সা চারটের তাগাদা দিতেছে। সেদিন কয়টা কড়া কড়া কথাও শুনাইয়া দিয়া গেল। তাই, সুষমা নানান্ দিক্‌কার খরচ বাঁচাইয়া চারটি পয়সা যোগাড় করিয়া রাধার আঁচলেই বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।

নীলমনি হাজরার ডাক শুনিয়া রাধা এক লাফে একেবারে বাহির হইয়া যখন গেল, তারাপদ বলিল, 'রাধা, একটু আগুন দিয়ে যা-না রে।'

কে কার কথা শোনে! রাধা তখন দেখিয়া শুনিয়া দু'হাতে চারগাছা করিয়া কাঁচের চুড়ি পরিয়া হাসিতে হাসিতে হাত দু'খানি তুলিয়া ধরিয়া নিকটস্থ একজন মহিলাকে প্রশ্ন করিল, 'কেমন মানিয়েছে বল তো, রাঙাদি ?'

মোক্ষদা তখন ঐ পথ দিয়া কি একটা শুভ উদ্দেশ্যে ঘটি-হাতে দাঁতে মিহি ঘষিতে ঘষিতে যাইতেছিল। সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া টিপ্পনী কাটিয়া বলিল, 'বেশ মানিয়েছে লো! দাদাকে বর দেখতে বল।'

'আ-হা! আচ্ছা বেশ! আমি যেন ওনাকে বলছি ?'

বলিতে বলিতে রাধা আঁচল খুলিয়া ডালার উপর পয়সা ক'টি রাখিয়া দিয়া পুনরায় যথাস্থানে আসিয়া মনোযোগের সহিত কাজ করিতে করিতে লুকাইয়া হাতখানাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া লইল। বেশ চুরিগুলি, না ?

মোক্ষদা ঠাকুরুণ এমনি সময়ে কি মনে করিয়া আসিয়া হাজির।

'কৈ গো বামুন বৌমা, পয়সা ক'টা দেবে বল্লে যে ? দাও বাপু, ভয়ানক টানাটানি বলে'ই এলাম। নইলে বিকেলেই আসতাম।'

সুষমা কপাটের আড়াল হইতে রাধাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, 'ঠাকুরঝি, পয়সা ক'টি ওঁকে দিয়ে দাও তো।'

রাধা যেন শুনিতে পায় নাই, এমনিভাব করিয়া হাত দু'খানিকে আঁচলের নীচেই লুকাইয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত খুঁদ-কুঁড়ো বাছিতে লাগিল।

মোক্ষদা রাধাকে লক্ষ্য করিয়াই কহিল, 'পয়সাকড়ি এমনি জিনিষ বাপু, দিতে গেলেই প্রাণে বাজে। তা' এমনি তো ভিক্ষে দেবে না। আমার ন্যায্য পাওনা চুকিয়ে দিলেই তো হয়। আজকাল কাউকে ধার দিলে সহজে পাওয়া যায় না।'

রাধা তথাপি নিরুত্তর।

মোক্ষদা সুষমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'কৈ গো বৌমা, দাও ? ও তোমার পয়সা দেবে ? তা হলেই হয়েছে! ননদ তোমার সখ ক'রে চুড়ি কিনেছেন। ধার ক'রে সখ, এ আমার বাপের কালেও শুনিনি।'

মোক্ষদার গলাটা যেন কাঁসার মত। সুষমা অপমানে ও লজ্জায় যেন ফাটিয়া পড়িল। স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'শুনেছ, তোমার বোনের কাণ্ড ? পরের পয়সা দিয়ে চুড়ি কিনে ব'সে আছে। অত বড় মেয়ে এতটুকু বোঝে না! বলি, দাঁড়িয়ে এমনি কথা শুনতে হবে নাকি ?'

তারাপদ মুখ হইতে হুঁকা নামাইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, 'রাধা ?'

রাধা মুখ নামাইয়া তেমনি অপরাধীর মত জবাব দিল, 'কি !'

'কথা কাণে যাচ্ছে না, না ? পয়সা কি করলি ?'

'আমি চুড়ি কিনেছি।'

'কি !' তারাপদ যেন ক্রোধে ফাটিয়া পড়িল। রাধা তারাপদকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চুড়ি ক'গাছা খুলিয়া একপাশে বাটী-চাপা দিয়া রাখিল। তারাপদ আজ অবধি কখনও বোনের গায়ে হাত তোলে নাই। আজ এই প্রথম সে তুলিল। সুষমাও নিষেধ করিল না। সে শুধু মোক্ষদাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'কাল এসে নিয়ে যাবেন। যেমন করে' হোক দেব।'

মোক্ষদা একবার কটাক্ষপাত করিয়া বাহির হইয়া আসিল। তখনও রাধারাণীর কম্পিত কণ্ঠের মার্জ্জনার সুর এবং পুনশ্চ না করিবার প্রতিশ্রুতি তারাপদের নিকট বার বার নিবেদন জানাইয়া ফিরিতেছিল।

দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে। তারাপদ ভাতের থালাটা সবেমাত্র টানিয়া বসিয়াছে, শুনিল রাধা চুড়ি ক'গাছা তোরঙ্গের উপর রাখিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সুষমার মুখখানাও ভার। নেহাৎ অপরাধীর মত সে যেন তারাপদর আশ-পাশ দিয়া আনাগোনা করিতেছে। হঠাৎ তারাপদ গেলাসে হাত ডুবাইয়া উঠিয়া পড়িল দেখিয়া সুষমা বিস্ময়ে ভাঙিয়া পড়িল। বলিল, 'ও কি, উঠলে যে বড় ?'

'আগে মুখপুড়ীটাকে দেখি কোথায় গেল' ;—বলিয়া সে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল ; এবং বাড়ীর পিছনে বকুল গাছটার কাছে আসিতেই দুঃখে ও অনুতাপে তার দু'চোখ বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। রাধা তার উপর অভিমান করিয়াই আজ জলস্পর্শও করে নাই। নেহাৎ অপদার্থ ভাই মনে করিয়া না জানি সে কত দুঃখই করিয়াছে। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে সে এ-বাড়ী ও-বাড়ী সংবাদ লইয়া শেষে মঙ্গল চণ্ডীর মণ্ডপের সুমুখে আসিয়া দেখে, রাধা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অভিমান ও চোখের জলের দাগ স্পষ্টই ফুটিয়া আছে। তারাপদ এমন ভাবে তাকে কোলে তুলিল যে, রাধা কিছুই জানিল না। ঘুম ভাঙিতেই দেখে, যাদুকরের যাদুর মন্ত্রে সে মন্দিরে, সে নির্জ্জন অরণ্যের পথিক-বিবর্জ্জিত পথের ধারে সে ঘুঘুর ডাকও নাই, কপোত-কপোতীর কলহ-মুখরিত সে মণ্ডপও নাই। সুমুখে বসিয়া সুষমা পুরাণ ব্লাউজ সেলাই করিতেছে।

সুষমা ডাকিল, 'ঠাকুর-ঝি, খাবে এস।'

রাধা তেমনি শুইয়াই রহিল দেখিয়া সুষমা ভৎ'সনা করিয়া বলিল, :'ছিঃ, আর ছেলেমানুষী কোরো না। তোমার দাদা না খেয়ে উঠে গেছে। আমার কথা না হয় ছেড়েই দাও—পরের মেয়ে না খেয়ে মরি, তোমার কোন ক্ষতি হবে না। দাদার বিয়ে দিয়ে আবার নতুন বৌদি আনবে। আমি কেবল বকি ঝকি, কিছুই দিতে পারিনে। আর সে তোমাকে কত কি দেবে থোবে।' বলিতে বলিতে সুষমা আঁচলের খুঁটে চোখ দুটো মুছিয়া লইল।

রাধা থতমত খাইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, 'দাদা কোথায় গেছে বৌদি ?'

'তোমার জন্যে চুড়ি আনতে।'

এমনি সময়ে তারাপদ'র গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, 'রাধা, খেয়েছিস্ ? লক্ষ্মী দিদি আমার, খেয়ে নে। সারা পাড়া ঘুরে কারও কাছে চারটি পয়সা পেলুম না। কাল কাজে বেরুবো। বাবুর কাছ থেকে আগাম দুটো টাকা চেয়ে নেব। তোর চুড়ি, তোর বৌদির কাপড়, সব এনে দেব। ওঠ্ লক্ষ্মীটি—'

রাধারাণীর চোখ দুটিও যেন ভার হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে কহিল, 'আমার চুড়ি তো ভাঙেনি দাদা। তোমার ভয়ে আগে থাকতেই আমি বাটি-চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। বৌদির কাপড় যদি কাল না এনে দাও, তখন দেখ্‌বে।'

তারাপদ গাড়ুর জল পায়ে ঢালিতে ঢালিতে হাসিয়া স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'শুনলে তোমার ননদের কথা ? ওর ওপর আবার কেউ রাগ করে ? পোড়ামুখী ভারি চালাক। পাছে ভাঙে, তাই বাটি চাপা দিয়ে রেখে গেছে। লোক দেখান একগাছা চুড়ি বাক্‌সের উপর রেখে গেছে। মুখপুড়ি কোথাকার !'

বলিয়াই সে আপন মনে হাসিয়া উঠিল।

সুষমা ভাতের থালা নামাইয়া দিয়া কহিল, 'ঠাকুর-ঝি, খাবে এস।'

'আসছি বৌদি। আগে চুড়ি ক'গাছা পরি। কি সুন্দর চুড়ি দেখেছ?' বলিতে বলিতে সে চুড়ি পরিতে গেল।

এত দুঃখেও সুষমা হাসিয়া উঠিল, কহিল, 'আচ্ছা পাগল যা হোক্!'

* * * *

এর পর এ কাহিনীর মাত্র আর একটি পরিচ্ছেদ বাকী।

সে-বার কি একটা কার্য্যোপলক্ষে গ্রামের জমিদার বাড়ীতে শহর হইতে কোন এক অপেরা পার্টি 'কালীয়দমন' অভিনয় করিতে আসিয়াছিল। তারাপদকেই সব দেখাশোনা করিতে হয়। তার কথায় বার্ত্তায় অপেরা পার্টির মালিক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। এবং ধারে দোরে সর্ব্বশেষে এই কথাটাই জানাইয়া দিলেন যে, কাল কোন প্রকারে তিনি অভিনয়ের সময়ে তারাপদর স্ত্রীকে এবং রাধাকে দেখিয়া ফেলিয়াছেন। সেই অবধি তলে তলে অনেক খোঁজ খবর লইয়া শেষে জমিদারের কাছে একটু আভাষ দিলেন মাত্র।

নীরোদবাবু শুনিয়া মহাখুসী।

'বলেন কি, মুখুয্যে মশাই। আপনার ছেলের সঙ্গে তারাপদর বোনের বিয়ে হবে, এ তো তার ভাগ্যের কথা। কলকাতায় যার কোঠাবাড়ী। তারপর এত বড় একটা দল, এত উপার্জ্জন, য়্যাঁ? ছেলেটিকে এই কাজে দিয়েছেন তো?'

মুখুয্যে মশাই হাসিয়া বলিলেন, ক্ষেপেছেন চৌধুরী মশাই? এ লাইনে আবার ভদ্রলোক আসে? নেহাৎ পেটে ক'মাংস ছিল না, তাই এ পথে নেমেছিলাম। ছেলেটাকে ঢুকিয়েছি এক জার্ম্মাণী ফার্ম্মে। যা হোক, সৎপথে থেকে ত্রিশ-চল্লিশ-কি বলুন?'

সজোরে মাথা নাড়াইয়া চৌধুরী মশাই জবাব দিলেন, 'হুঁ, হুঁ। বেশ করেছেন। গোলামী করতে হয় তো সাহেবদেরই করা উচিত। সময়ে মাইনে পাওয়া যায়। উন্নতি আছে। সত্যিই তারাপদর ভাগ্যি ভাল।'

সেই বছরেই রাধারাণীর বিবাহ হইয়া গেল। চৌধুরী মশাই আর একবার বিনা পয়সায় কালীয়দমন দেখিবার আশা পোষণ করিয়া বর বধূকে যথারীতি শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। রাধারাণীকে কলকাতায় রাখিয়া তারাপদ ফিরিয়া আসিতে আসিতে সারাপথ আর একবার ভবিষ্যতের ছবিখানা স্মরণ করিল।

ছ' মাস পরে রাধারাণী শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিল। তারাপদর কাজের অন্ত নাই। আনন্দেরও সীমা নাই। সংসারীর প্রথম কর্ত্তব্য সে যে নিখুঁতভাবে সমাপন করিয়াছে—আজ যদি মাকে একবার ডাকিয়া বলিতে পারিত, মা, তোমার রাধার বধূবেশ একবার দেখিয়া যাইও। কেমন ছেলে! কমল তো কমল! আই-এ অবধি পড়িয়াছিল। ইংরেজি বলে কি, যেন জলের মত। আর বাড়ী?

তারাপদ বাড়ী বাড়ী বোনের সুখ-ঐশ্বর্য্যের কথা বলিয়া ফিরিল। যে শোনে সেই বলে, এই তো ভাই!

নীলমণি হাজরার বাড়ী আসিবার পথে, সাঁকোটার কাছে দাঁড়াইয়া একবার দূরের বাঁকের মুখে শশ্মানটার দিকে চাহিয়া দেখিল। ছোট্ট একখণ্ড পোড়া কয়লার পোড়ো জমী। শৃগাল আর শকুনের ভীড়। আজ তার মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। মনে মনে বলিল, 'মা, সবাই দেখল, ভালও বলল। তুমিই শুধু কিছু বললে না ব'লে মনে আমার তৃপ্তি নেই। কেবল ত্রুটির ভয়ে তটস্থ।'.........নীলমণিকে ভাল করিয়া বলিয়া দিল, 'ভাল দেখে দু'জোড়া চুড়ি নিয়ে এস। আগাম কিছু নেও বাপু। শেষে যদি মনে না থাকে।' দামটা দিয়া সে দ্রুতপায়ে অগ্রসর হইল। ওদিকে বেলাও বাড়িয়া আসিতেছে।

দিন কয়েক আরও গিয়াছে। রাধা ভোরে উঠিয়া কাপড় কাচিয়া আসিয়াছে শুনিয়া সুষমা জিজ্ঞাসা করিল, 'অত ভোরে ওঠবার কি দরকার ছিল? বেলা হলে কাপড় কাচলেই তো পারতে!'

রাধা ঠোঁট নাড়িয়া কহিল, 'চারিদিকে গিজ্ গিজ্ করছে লোক। খোলা জায়গা। তার মাঝে গিয়ে আমি চান করি আর কি? কি যে বল বৌদি, তার ঠিক নেই।'

কথাটা সুষমার কাণে আসে নাই। সে তখন জলের ঘটিটা আনিয়া কমলের ঘরের সামনে দাঁড়াইয়াছে। কমল

তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সিগ্রেট্টা ফেলিয়া দিল। সুষমা কহিল, 'ও কি করলেন ঠাকুর-জামাই? আমাকে দেখে লজ্জা? বয়সে বড় হলে সম্পর্কটা কিন্তু গুরুজনের মত নয়। দরকার পড়লে আমরাও খেয়ে থাকি।'

কমল অপ্রতিভ ভয়ে' বলিল, 'তাই নাকি? তবে একটা খান বৌদি'—বলিয়া একটা সিগ্রেট বার করিয়া দিল।

সুষমা হাত বাড়াইয়া লইয়া কহিল, 'আমার খাবার লোক আছে, তাকেই দেব।'

'তা হবে না। আপনাকে খেতেই হবে।'

খপ্ করিয়া কমল তার আঁচলখানা চাপিয়া ধরিল। সুষমা ঈষৎ রক্তিম কণ্ঠে দাঁতের অগ্রভাগে ঠোঁট চাপিয়া হাসিয়া কহিল, 'লাভ হবে না ভাই। এ জন্মে আর দ্রৌপদী হ'তে পারলুম না!'

কমলও কি একটা প্রত্যুত্তর দিতে যাইতেছিল, সহসা সুমুখে রাধার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে থামিয়া গেল।

'দাদার পাগলামী দেখেছ বৌদি? কাঁচের চুড়ি এনে আমাকে দিতে এসেছে। আমি ফিরিয়ে দিলাম। দূর, শহরে এ সব পরলে লোকে ভূত বলবে যে! চুড়ির আমার কি অভাব আছে? কাঁচের চুড়ি আবার মানুষে পরে নাকি? আমার বড় ননদ এক সেট দিয়েছে ব্রেসলেট্। শাশুড়ী দিয়েছেন ভাল দেখে আর্মলেট······' বলিয়া রাধারাণী ভায়ের নির্ব্বুদ্ধিতার কারণ দেখাইয়া হাসিয়া উঠিল।

বাহিরে আসিতেই সুষমা দেখিল—তারাপদ কাগজের একটা মোড়ক পাড়ার একটা ছেলেকে ডাকিয়া দিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'কি, ওটা?'

'কাঁচের চুড়ি। রাধার জন্যে এনেছিলাম। ও নিলে না। তাই ভানুকে ডেকে দিয়ে দিলাম। ও ঘুঁড়ির সুতোতে ধার দেবে ব'লে কাঁচ খুঁজছিল কি না, তাই। কাঁচ গুঁড়িয়ে ছেঁকে নিলে সুতোর খুব ধার হয়। এখুনি আসছি।' বলিয়া সে আনত মুখে বাহির হইয়া গেল। বছর কয়েক আগে যে একটা তুচ্ছ কলহের ছবি বাড়ীর পিছনের এই বকুলতলায় দাঁড়াইয়া ভাবিয়া অনুতাপে চোখের জল দুই গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছিল, আজ অনেক দিন পরে কোঁচার খুঁটটি তুলিয়া চোখের জল মুছিতে গেলে সেইদিনের অস্পষ্ট ছবিটি ফুটিয়া উঠিল।

সেদিন কি একটা লঘু অপরাধে, মাত্র এক আনা পয়সা দিয়া চুড়ি কিনিয়াছিল বলিয়া, তারাপদ রাধারাণীকে মারিয়াছিল। এমনি আজিকার মত সেদিনও উপবাসিনী পলাতকা বোনের জন্য অনুতপ্ত চোখের জল এইখানে আসিয়া হৃদয়ের সহিত অর্থের সম্পর্ক স্থির করিয়াছিল।

আর আজও হু-হু করিয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের পরাজয়ে নেহাৎ বালকের মত সে কাঁদিয়া ফেলিল!

# শরৎ আজি এল

শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায়, বিদ্যাবিনোদ

শরৎ আজি এল আমার প্রাণে।
আকাশ-বাতাস মুখর হল,
পাখীর গানে গানে।

বেতস-বনটী হাওয়ায় দোলে
খেলচে খেলা নদীর জলে,
যুঁই-মালতী-শেফালিকার
লুকোচুরি চাঁদের সনে।

তা'রা আমার সাথী হলো,
গানে গানে মন ভোলাল,
আগমনীর সুরটী আমায়
দিলে কাণে কাণে।

আয়রে শুচি, আয় অশুচি,
অশ্রু-বেদন আয়রে মুছি',
মায়ের পূজা করব মোরা
হরষ ভরে প্রাণে।

# জাতি-গঠন

শ্রীমতিলাল রায়

দেখিতে দেখিতে যুদ্ধের অবস্থা বেশ ঘোরাল হইয়া উঠিল। এবার ইউরোপের রণরঙ্গে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, পাশ্চাত্যের যে সকল মতবাদ ভারতের চিত্ত এতদিন বিচলিত করিতেছিল, সেই সকল 'বাদ'-এর মূলে এক ছটাকও সত্য নাই। রুশের মার্ক্সিজম্ মাথা তুলিতে না তুলিতে জার্ম্মাণীর নাজিজম্ প্রলয়-মূর্ত্তি ধরিল। মার্ক্সিজ্‌মের প্রতিবাদ যে নাজিজম্, হিট্‌লারের 'মে ক্যাম্প' পুস্তক যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি তাহা বুঝিবেন। অথচ জার্ম্মাণী যখন গণতন্ত্রমূলক সাম্রাজ্যবাদী বৃটনের সহিত সংগ্রামরত, তখন মার্ক্সিজ্‌মের বিগ্রহ রুশ নীরব, নিস্তব্ধ। বৃটনের গণতন্ত্রবাদী রাজশক্তি সমাজতন্ত্রী ফরাসীর সহায়তা-বঞ্চিত হইল। কিন্তু আটল্যাণ্টিকের পারে বসিয়া যুক্তরাষ্ট্র বৃটনের সাম্রাজ্যবাদের আড়ালে যে গণতন্ত্রবাদ, তাহার আদর্শরক্ষাকল্পে সহায়তায় উদ্বুদ্ধ হইতেছেন। গণতন্ত্রবাদের সুমহান্ আদর্শের প্রতি ইহা অনুরাগ-লক্ষণ। পক্ষান্তরে চীনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ঔদাসীন্য আবার তাহার গণতন্ত্রবাদের প্রতি সংশয় উপস্থাপিত করে। ফলতঃ, ইউরোপের জাতি-সঙ্ঘের সহিত আমেরিকানদের রক্ত-সম্বন্ধই ইউরোপের যে কোন একটা বাদের প্রতি তাহাকে পক্ষপাতী করিয়াছে; নতুবা এসিয়া মহাদেশের গণতন্ত্র রাজ্যের ভিত্তি-রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি নাই কেন?

এ সকল কথা বলিয়া লাভ নাই। জাগিয়া যাহারা ঘুমায়, তাহাদের কাণের কাছে ঢক্কানিনাদও নিরর্থক হয়। তবে আমরা চিরদিনের মত আজও মুক্ত কণ্ঠে বলিয়া রাখি—প্রত্যেক দেশ ও জাতির প্রাণশক্তি থাকিলে, উহা যখন যে মতবাদ আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশের সুবিধা পায়, তখনই তাহা করিয়া থাকে। ফ্রান্স একদিন সাম্রাজ্যবাদের দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া পৃথিবীজয়ের স্বপ্ন দেখিয়াছিল। তারপর প্রজাতন্ত্রবাদের স্রোতে তাহাদের জীবন-তরী বুঝি দেড় শত বৎসর চলিল না। আজ পেতাঁ্যা গভর্ণমেণ্টের নূতন আদর্শবাদের কথা আমাদের কর্ণগোচর হয়। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ত্রিবর্ণ পতাকা নামাইয়া তাঁহারা বলিতেছেন "পিতৃভূমি, শ্রম ও পারিবারিক জীবন"—ইহারই উপর ফরাসী জাতির নব অভ্যুত্থান নির্ভর করে।

দুর্ভাগা ভারতের হিন্দুজাতির। তাহারা যেন জগতের বর্ব্বরতম আদিম অধিবাসী। নিজস্ব কিছুই বুঝি তাহাদের নাই। যখন যে পথে সুবিধা, সেই পথই তাহারা ধরিয়া চলে। ভারতবাসীকে আমরা যদি সুবিধাবাদী বলি, বোধহয় কেহ আপত্তি করিবেন না।

কিন্তু হিন্দুর একটী বিশিষ্ট মতবাদ আছে। উহা ব্যবহারিক নহে, আধ্যাত্মিক। ব্যবহারোপযোগী কোন বাদ চিরস্থায়ী হয় না। জগতের ইতিহাস তাহা আজও প্রমাণ করিতেছে। কিন্তু অধ্যাত্ম মতবাদ চিরস্থায়ী, সনাতন। আমরা বিশ্বাস করি, এই ক্ষেত্র হইতেই ভারতের অভ্যুত্থান সম্ভব হইবে। আমরা প্রায় হাজার বৎসর রাষ্ট্রশক্তিহীন পতিত জাতি। উঠিবার প্রচেষ্টা করিয়াছি আঘাতের প্রত্যাঘাতে; কিন্তু তাহাতে আমাদের নিরাময় অভ্যুত্থান সম্ভব হয় নাই। সাময়িক উত্তেজনার আগুন জ্বলিয়াছে, নিভিয়াছে। জাতীয় অভ্যুত্থানের অনির্ব্বাণ অগ্নিশিখা যদি জ্বালিতে হয়, এই অধ্যাত্মমতবাদের আজ প্রয়োজন হইয়াছে।

বাস্তবতঃ আমাদের যে শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে এইরূপ চিন্তা নিরর্থক মনে হয়। কিন্তু দুরবস্থার ভিতর দিয়াই ভগবানের কল্যাণপ্রদ বরহস্ত প্রসারিত হয়। ঘন মেঘাচ্ছন্ন আকাশেই বিদ্যুৎ-রেখায় পথহারা পথের সন্ধান পায়। বিশ্বের অতি বড় দুর্দ্দিনেই ভারতের হিন্দু জাতিকে এক পথের সন্ধান করিতে হইবে।

" আমি হিন্দুজাতির কথাই বলিতেছি। ইহা ব্যতীত আমি অন্য কিছু বলিতে পারি না। কেননা, আমার প্রতি শিরায় হিন্দুজাতিরই কৃষ্টি ও সংস্কৃতির রক্তধারা বহিতেছে। বস্তুতঃ যাহা আমি, তাহা ব্যক্ত করার বাধা দুইটী। বাংলায় আজ হিন্দু বলিলে রাষ্ট্রশক্তিলাভের পথে হিসাবের অঙ্কে পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়ার সংখ্যা মিলে না। দ্বিতীয়তঃ অবস্থার পীড়নে ও পরকীয় প্রবল শক্তির প্রভাবে

হিন্দুত্বটা অবচেতনার গভীর গর্ত্তে লুকাইয়া থাকে। আজ রাষ্ট্রশক্তিলাভের পূর্ব্বে জাতীয়জীবন গঠনের প্রয়োজন আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য মনে হইতেছে। আর অমর হিন্দুত্বকে অবচেতনার স্তর হইতে উঠাইয়া বিশ্বের সম্মুখে সর্ব্বমতবাদের উর্দ্ধে যে ইহার স্থান, ইহা প্রমাণ করার প্রেরণায় সকল অবস্থা ও পরপ্রভাবের গুরু আবরণ বিদীর্ণ করার ইচ্ছা হইতেছে। এই ইচ্ছা রক্তেরই স্বভাব। যে জাতির শিরায় যে রক্ত বহে, তাহারই অভিব্যক্তি সেই জাতিকে দিতে হয়। জাতীয় অভ্যুত্থান তাই আত্মারই জাগরণ। আত্মা যখন জাগে, তখন ইহার গতি অবিরোধী ও অপ্রতিবাদী হয়। রক্তের গুণধর্ম্মে স্বধর্ম্মনিষ্ঠা থাকিলে, উহা প্রত্যেক জাতিকে অবারিত আত্মপ্রকাশেই সহায়তা করে। আত্মবিস্মৃত জাতিই স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া পর ধর্ম্মের আশ্রয়ে বাঁচিতে চাহে। বিধাতার অভিশাপ এই ক্ষেত্রেই মরণের বজ্র হইয়া সে জাতির অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া দেয়। আত্মা যেমন প্রতি রক্তবিন্দুকে জাগ্রত, উদ্বুদ্ধ করিবে, তেমনি ভিন্ন ধর্ম্মীকেও বলিবে, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ"—তোমরাও উঠ, জাগ। যদি মিলনের প্রয়োজন হয়, স্বধর্ম্মে জাগ্রত জীবনেই তাহা সিদ্ধ হইবে। আর সংগ্রাম যদি ঈশ্বর-বিধান হয়, জাগ্রত জাতির সহিত জাগ্রত জাতির সে-সংগ্রামে কোন জাতির সত্তা ম্লান হইবে না। সংগ্রাম বাহ্যতঃ মরণ লক্ষণ প্রকাশ করে; কিন্তু তাহার মধ্য দিয়াই জাতির আত্মশক্তির স্ফূর্ত্তি ও জয়মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। পরাজিত পক্ষও বাহ্যতঃ ম্রিয়মাণ হয় বটে, কিন্তু আত্মা তার উর্দ্ধগতি লাভ করে। মিলন অথবা সংঘাত, এ সমস্যা এখন নহে—জাতির জাগরণ অমোঘ ও অব্যর্থ লক্ষ্য হউক। পরস্পরবিরোধী ধর্ম্ম-জীবনের সমাধান পরে হইবে।

বিষয়টা বিশদ করিতে গিয়া ভাষা জটিল করিব না। কেবল হিন্দু-সংগঠনের গোড়ার কথাটাই বলি। যাঁহারা নিজেদের হিন্দু বলিবেন, তাহাদের সমকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, হিন্দু কর্ম্মবাদী এবং জন্মান্তরবাদী। নৈষ্কর্ম্ম্য ধর্ম্ম নহে। অনাত্মবাদী হিন্দু নহে। হিন্দু কর্ম্মবাদী—এই হেতু তার কর্ম্মমীমাংসা চাই; সে জন্মান্তরবাদী—এই হেতু তার আত্মবিচার চাই। বেদ-বিশ্বাসী হিন্দু—বেদের মর্ম্ম বুঝিবার জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যায় কর্ণপাত করিবে না। তাহা যদি করে, ব্যাখ্যা-ভেদে আমাদের বুদ্ধি-ভেদ, হৃদয়-ভেদ, জাতি-ভেদ কিছুরই অভাব হইবে না। হিন্দু এইখানে ঔদার্য্য দেখাইতে গিয়া ছন্নছাড়া হইয়াছে। জাতি-হিসাবে হিন্দু যদি মাথা তুলিতে চায়, তাহা হইলে শ্রুতি হইবে তাহার সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ এবং ইহার ব্যাস-ভাষ্য হইবে তাহার একমাত্র ব্যাখ্যা। হিন্দুর মধ্যে যদি কেহ স্বাতন্ত্র্য চায়, সম্প্রদায় চায়, তাহাকে জৈন ও বৌদ্ধবাদীদের ন্যায় হিন্দু নাম পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমি হিন্দু নামে পরিচয় দিব অথচ শ্রুতিব্যাখ্যা স্বেচ্ছামত করিব; হিন্দু হইয়া হিন্দুর আচার উপেক্ষা করিব। একটা অতি প্রাচীন বিশাল জাতির উপর এরূপ অত্যাচার হিন্দুজাতি অতঃপর সহিবে না।

যে মতবাদের উপর জাতিপ্রতিষ্ঠা, তাহার পশ্চাতে রাষ্ট্রশক্তি না থাকিলে, উহার মর্য্যাদারক্ষা সম্ভব নহে। রাজদণ্ড না থাকিলে, বলবান্ যেমন দুর্ব্বলদের অতিশয় যাতনায় দগ্ধ করে, শ্রেষ্ঠ জাতীয়েরাও সংহতিবদ্ধ নিকৃষ্টদের দ্বারা পরাভূত হয়, তদ্রূপ রাজশক্তির অভাবে জাতির অখণ্ড মতবাদের উপর স্বেচ্ছাচার করার লোকের অভাব হয় না। মনু সত্যই বলিয়াছেন "দানব, গন্ধর্ব্ব, নিশাচর, পক্ষী, সর্পাদিও ঐশিক দণ্ড ভয়ে সতত জগতের অপকার-সাধনে বিরত থাকে।" রাষ্ট্রশক্তি নাই বলিয়াই হিন্দু-ধর্ম্মের এই দুর্দ্দশা। এখনও যে আমরা কোটী কোটী ভারতবাসী হিন্দু নামে পরিচয় দিই, উহা শুধু রক্তের দায়ে। এই রক্তধারাই আজ আমাদের সহায়, আর আছে হিন্দুসত্তার অমৃতময় বীর্য্য।

আমি হিন্দু। আমার কর্ম্মবাদ স্বেচ্ছাচারতন্ত্র না হয়, এই জন্য শ্রুতিই আমার আত্মকর্ম্ম যাচাইয়ের কষ্টি পাথর। শ্রুতি-সহায় ভারতের স্মৃতিশাস্ত্র আমায় পথের সন্ধান দিবে। শ্রুতি-স্মৃতির অনুকূল যুক্তি আমায় সাহস দিবে, বল-বুদ্ধি দিবে। এই সম্মিলিত সাধনা-জাত অনুভূতি পরিণামে অমৃতে অভিষিক্ত করিবে। এইজন্য আমি যে জাতিটাকে হিন্দু নামে মাথা তুলিতে বলিতেছি, তাহাদের আত্মগঠনের শিক্ষা শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তিমূলক হইবে। আত্মানুভূতিই হইবে হিন্দুত্বের চরম পরীক্ষা।

এই হিন্দুজাতির সংখ্যা অত্যল্প হইলেও, নৈরাশ্যের কারণ নাই। মুষ্টিমেয় লোকসমন্বিত এক একটি বীর জাতি বহু কোটী জগদ্বাসীর উপর আধিপত্য-বিস্তারের প্রেরণা পায় কোথা হইতে? স্বধর্ম্মনিষ্ঠাই তার মূল কথা।

পতিত হিন্দুজাতির উত্থান-কামনায় সর্ব্বপ্রথম একটী অটুট সংহতির প্রয়োজন। সেই সংহতির প্রত্যেকের একটী বিশেষ সাধনা আছে। আজ যাঁহারা হিন্দুজাতির অস্তিত্ব-লোপের আশঙ্কায় আপনাদের অধিকার-রক্ষায় প্রযত্নবান্, তাঁহাদের কর্ম্মের প্রশংসা আমরা করিব। কিন্তু আমি যে হিন্দু-প্রগতির কথা বলিতেছি, তাহার দিকে যদি উদীয়মান জাতির দৃষ্টি নিবদ্ধ না হয়, রাষ্ট্রক্ষেত্রে হিন্দুজাতির ঐরূপ বহিঃপ্রচেষ্টা যেমন নিস্ফল হইয়াছে, এই ক্ষেত্রেও তাহার অধিক কিছু হইবে না।

হিন্দু-সংগঠনের ভিত্তি-রচনার জন্য আমি এক সংহতির কথা বলিতেছি। সেই সংহতির প্রত্যেকের পাঁচটী সাধন-স্তর অতিক্রম করিতে হইবে। ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ হিন্দু-সাধন। হিন্দু জাতির ব্রাহ্মণবর্ণ ছিল এই সংহতি। তাই উক্ত সাধন ছিল ব্রাহ্মণের সাধ্য। আজিকার ব্রাহ্মণ তাহা ভুলিয়াছে। এক্ষণে নূতন করিয়া ইহার ভিত্তি-সৃষ্টির তাই প্রয়োজন হইয়াছে। জাতির শ্রেয়ঃ-সাধন যে সংহতির দ্বারাই সিদ্ধ হউক, নিখিল জাতি তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজা দিবে। ব্রাহ্মণ একদিন তাই জাতির পূজ্য ছিলেন।

এইবার আমি প্রথম সাধনার কথা বলিতেছি। অভ্যুত্থান-কল্পে এইরূপ সংহতির প্রতি ব্যষ্টিকে কাম-সঙ্কল্পবর্জ্জিত হইতে হইবে। ইহাই চরিত্রগঠনের প্রথম সঙ্কেত। শ্রুতিমুখে ইহাই প্রথম ভূমি **"গবাদিদ্বিববাঙ্-নিরোধঃ"**।

দ্বিতীয় সঙ্কেত—চিত্ত অনাসক্ত করিতে হইবে। চিত্তের লয় না হইলে, নবজাতির ভূমি দৃঢ় হইবে না। শ্রুতি এই দ্বিতীয় ভূমিকেই বলিয়াছেন **"বালমুগ্ধাদিদ্বিব নির্ম্মস্তং"**। তারপর নিরহঙ্কার হওয়া। অহঙ্কার থাকিতে হিন্দুজাতির ভিত্তিরচনার প্রাণ সম্ভব নহে। এই তৃতীয় ভূমি—**"উন্মত্তাদিদ্বিবাহঙ্কাররাহিত্যং"**। তারপর সর্ব্বকর্ম্মে হর্ষ-বিষাদ-রহিত, নির্দ্বন্দ্ব, বিমৎসর হইতে হইবে। এই চতুর্থ ভূমির মন্ত্র—**"সুষুপ্তাবিব মহত্ত্বরাহিত্যং"**।

ইহার পর নবজন্মগ্রহণের কথা। ইন্দ্রিয়জয়ী, নিরাসক্ত-চিত্ত, নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব মানবচরিত্র হিন্দুত্বের সিদ্ধভূমি। ঈশ্বরের আরাধনা-রূপ জীবনের ক্ষেত্রেই নব জাতির সৌধ-রচনা হইতে পারে। গীতার এই বাণী এইখানে প্রযুজ্য—**"জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ"**।

আমি যে হিন্দু জাতির স্বপ্ন দেখিয়াছি, সেই হিন্দু জাতির ভিত্তিতে পঞ্চশিখের ন্যায় এইরূপ হিন্দুও পাঁচ জন বাংলায় যদি জন্মগ্রহণ করে, তবেই ইহা নিশ্চয় সম্ভব হইবে। সেই জাতি-সাধনায় হিন্দুর প্রাণ জাগিবেই। হিন্দুস্থানে জাগরণের এই ভেরীনিনাদ আমার কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করে। আমি নির্ভয় কণ্ঠে বলিব—স্বাধীনতা আগে নয়, জাতি আগে। আমি হিন্দু জাতির কথাই বলিতে পারি। এই হিন্দু-জাতি সম্প্রদায় নহে, বিশ্ব-মানবতার বীজমূর্ত্তি। জাতীয় সাধনার উপরোক্ত মন্ত্রবীর্য্য যে ক্ষেত্রেই সিদ্ধ হউক, সেই ক্ষেত্রেই দিগ্বিজয়ী বীর-জাতির অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। বাংলারই সহস্র সহস্র মনীষী, দেশহিতৈষী রাষ্ট্রীয় অধিকারার্জ্জনের জন্য ক্লেশ বরণে কুণ্ঠিত নয়। সেই বাংলায় এই অধিকার স্বতঃ-স্ফুরিত রূপে যাহাতে আবির্ভূত হয়, সেই নূতন জাতি-গঠনের আন্দোলনে বাংলার তরুণ কি সাড়া দিবে না? হিন্দু জাতি কি আত্মিক শক্তি উপেক্ষা করিয়া, তাহার অবান্তর অভিব্যক্তির প্রতি প্রলুব্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিক্রিয়া অবসাদে আচ্ছন্ন হইবে? বিশ্বস্রষ্টার সহিত বিশ্বমানবের প্রভেদ দূর করাই হিন্দুত্ব। ইহার জন্য তাহার কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ। ঋষিপ্রণীত মীমাংসা দর্শনে এই তত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। যুক্তিশাস্ত্রে হিন্দুর মতবাদ সুনির্ণীত হইয়াছে। হিন্দুর জীবনধর্ম্ম স্মৃতিসঙ্গত করিয়া সংহতি-রক্ষারও আয়োজন এদেশে হইয়াছে। হিন্দু বীর-ধর্ম্মী, সে অমৃতের পুত্র, তার অনুত্থান শুধুই আত্ম-বিস্মৃতির দুঃস্বপ্ন। আমরা হিন্দুজাতির ভিত্তিরচনার অব্যর্থ সঙ্কেত দিলাম। বীর পুত্র যদি কেহ থাকে, এই অভিনব প্রগতির পথে অগ্রসর হইবে; হিন্দু জাতির পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী হইবে। (সোনার বাংলা)

# শ্রীমতী প্রীতি পাইন এম, এ

## শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তাই অশ্রুকণা এসেছিলো। ঘড়ির কাঁটায় রাত্রি কিছুটা গভীর হ'য়ে এসেছে, উৎসবের অবারিত স্রোতঃ অনেকটা স্তিমিত প্রায়, অনেকেই চ'লে গেছেন, এখানে ওখানে তাঁদেরই চ'লে যাওয়ার টুক্‌রো আভাস, প্রীতি অশ্রুকণার হাত ধ'রে তাকে ওপরের ঘরে নিয়ে এলো।

"ভাগ্যে তোকে আমি সেদিন আবিষ্কার ক'রেছিলুম কণা" প্রীতি একটা সোফার ভেতরে ডুবে গেল, "তাই তো তোকে আন্‌তে পারলাম, উনি যে কি খুসী হ'য়েছেন!

অশ্রুকণা হাস্‌লে, বল্‌লে "হ্যাঁ, আবিষ্কারই ক'রেছিস বটে, এতোদিন এক রকম ডুবেই গিয়েছিলুম বলা যায়, ভাগ্যে লাইট হাউসে গিয়েছিলি সেদিন!"

প্রীতি হেসে বল্‌লে, "যাই হোক, তোকে যে আজকের দিনে পেলাম, এই আমার সব থেকে বড় আনন্দ।"

ঘরের একধারে বিছানার ওপরে খোকা ঘুমিয়ে প'ড়েছে, শুভ্র একরাশি ফুল কে যেন সারা বিছানাটা ভ'রে ছড়িয়ে রেখেছে, ঘুমুতে ঘুমুতে খোকা হাস্‌ছে, ঠোঁট থেকে, গাল থেকে ফেটে পড়ছে উষ্ণ রক্তের লাল আভা, মুগ্ধ চোখে অশ্রুকণা চেয়ে রইলো।

"অবিকল" অশ্রুকণা বল্‌লে, "অবিকল তোর মত হ'য়েছে প্রীতি—শুনেছি মার মত হ'লে ছেলের সৌভাগ্য সীমাহীন হ'য়ে ওঠে।"

প্রীতি: "আজকের দিনে—খোকার এই প্রথম বার্ষিক জন্মদিনে সেই আশীর্বাদই করিস কণা—" "আশীর্বাদ নয়" অশ্রুকণাও এক ঝলক অশরীরী হাস্‌লো, "শুভকামনা,—আমরা শুধু শুভকামনাই করতে পারি প্রীতি, বুঝ্‌লি?"

নির্বাক প্রীতি হেসে খোকার দিকে চাইলো একবার।

"আজ, হঠাৎই, একটা কথা মনে পড়ছে, কিছু মনে করবি না তো?" অশ্রুকণা প্রীতির দিকে চাইলো, "বল্‌বো?" "নির্ভয়ে—" প্রীতি আবার হাস্‌লো। অশ্রুকণার মুখ গম্ভীর হ'য়ে এলো, আস্তে আস্তে বল্‌লে, "তোকে আজ আমার ভারী অদ্ভুত লাগ্‌ছে—ভারী অদ্ভুত—এখানে না দেখ্‌লে তোকে যেন চিন্‌তেই পারতাম না প্রীতি"।

প্রীতি অশ্রুকণার চোখের দিকে চেয়ে এবারে শব্দ করে হেসে উঠলো, "তোর ছেলেমানুষী আজো যায়নি দেখছি—কি?—কি এমন দেখলি আমার?"

"শুন্‌বি?" অশ্রুকণাও ম্লান হাস্‌লো। "আজ তোকে দেখে আমার কেবল সেই উনিশ্‌ শো তেত্রিশ সালকে মনে পড়ছে।"

"মানে?" প্রীতি সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে থেকে প্রশ্ন করলো। "মানে, যখন তুই আমাদের সঙ্গে পড়িস, মনে আছে? মানে, যখন নারী-কল্যাণ সঙ্ঘের সম্পাদিকা ছিলি।"

"ও—" প্রীতি এতক্ষণে কূল পেলো, হেসে বল্‌লে, "এই কথা, এই কথার জন্যে তোর এত সঙ্কোচ?"

"সঙ্কোচ নয়" অশ্রুকণা ঝরণার মত বেজে উঠলো "দুঃখ, তোকে দেখে আজ আমার দুঃখ, প্রীতি।" একটু থেমে আস্তে আস্তে বল্‌লে, "আজ এই দেখে অবাক্ হই, তোর সেই অমিত শক্তি কোথায়?—কোথায় তোর চোখে সেই অপলক নির্মল বিদ্যুৎ-বিভা? কোন্ অন্ধকারে তাদের ধুয়ে মুছে নিঃশেষ করে দিয়েছিস, দিয়ে আজ চ'লে এসেছিস্ এই সংসারের নির্জ্জনতায়, এই আত্মকেন্দ্রিকতায়—" অশ্রুকণা একটু উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো, "যেখানে তুই আর শুধু তোর সংসার—"

প্রীতি অবাক্ হ'য়ে অশ্রুকণার মুখের দিকে চাইলো কিছুক্ষণ, তারপরে বল্‌লে, "একটু ভুল ক'রেছিস্ কণা।"

"না ভুল নয়"—অনেক অপরিচয়ের অন্ধকারের মধ্যে থেকে যেন অশ্রুকণা কথা কইলে, "ঠিকই বুঝেছিলাম, মনে হ'য়েছিলো তুই একদিন আগুনের মত জ্বলে' উঠ্‌বি, শিখায়িত হ'য়ে উঠ্‌বি তোর সাধনার তুঙ্গ শিখরে, আমরাও অগ্রসর হ'ব তোর পিছনে; দূর-যাত্রার দীপবর্তিকা হাতে, সেই মন্ত্রই তো দিয়েছিলি আমাদের; আজ আমার দুঃখ তোর এই অপমৃত্যুতে—বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পর্যন্ত তুই এই জন্যেই হেঁটেছিলি প্রীতি? তাই—" অশ্রুকণা কথার শেষে এসে পৌছল, "তাই তোর বিয়ের চিঠি পেয়েও আমি আসিনি।"

"তুই মিছিমিছি রাগ করছিস্ কণা" প্রীতি হাস্‌লো কি কাঁদলো, ঠিক বোঝা গেল না, "আমি যে সে-পথ থেকে সম্পূর্ণ স'রে এসেছি এমন প্রমাণ তো পাস্‌নি এখনও ?"

"পাইনি ?" অশ্রুকণার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠ্‌লো, "একে তুই প্রমাণ বলিস্ না, তোর আজকের এইরূপ থেকে, তোর আজকের এই জীবন থেকে, তুই-ই বল, আমি কি তাই মনে করতে পারি না প্রীতি ? সেই জন্যেই তো-" অশ্রুকণা গভীর হতাশার অন্ধকার থেকে কথা কইলে, "সেই জন্যেই তো আমার আজ উনিশ শো তেত্রিশ সালকে মনে পড়ে।"

"ভুল করছিস্—তুই ভুল করছিস্ কণা" প্রীতি বোঝাতে চেষ্টা করলো।

"একটুও নয়" অশ্রুকণা সোজা হ'য়ে বস্‌লো, "আজ আমি দেখ্‌তেই পাচ্ছি নিদারুণ অন্ধতার মধ্যে তুই আকণ্ঠ বে গেছিস, আ—কণ্ঠ, তাই আজ তোর সমস্ত শরীর রে সেই অন্ধতার চিহ্ন পাখা মেলেছে।"

"না—" গম্ভীর কণ্ঠে প্রীতি কথা কইলে, "এ আমার থ চলবার একটা সহজ অনুক্রমণ—শৃঙ্খলা রেখে অগ্রসর 'বার একটা সহজ পন্থা—অস্বাভাবিকতা আমি কোনো-নই ভালোবাসিনা—আমি কোনোদিনই নিজেকে ভুলিনি ণা—" প্রীতির কণ্ঠে উত্তাপের আভাস ফুটে উঠ্‌লো।

"এই তার চমৎকার প্রমাণ, কি বল ?" অশ্রুকণা ঙ্গের একটা সহজ ভঙ্গী করলো, "বল্‌তে তোর লজ্জা ওয়া উচিত ছিলো প্রীতি। লক্ষ্য আছে, আজ তুই কাথায় নামিয়েছিস নিজেকে, কোন্ অন্ধকারে।—তোর ই ছেলে, তোর এই সংস্কার—"

"সংস্কার—?" প্রীতি উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো, চোখ টো তার জ্বালা করছে, এইখানে আঘাত করলে প্রীতি কানদিনই শান্ত থাক্‌তে পারেনি, বল্‌লে, "সংস্কার ? আজ আমার সমস্ত পরিবেশের মধ্যে তুই দেখ্‌লি সংস্কারের চিহ্ন ?—জানিস্ ?"—একটা অভিনব ভঙ্গী ক'রে প্রীতি খোকার বিছানার দিকে এগিয়ে গেল, খোকাকে দেখিয়ে বল্লে "জানিস্ ? আজ যদি ও এখুনি মরে যায়, তাহ'লে আমি সেই দুর্ঘটনাকে খুব সহজে নিতে পারি—খুব সহজে নেবার সেই অমিত শক্তি আমার আছে।—"

"প্রীতি—" অশ্রুকণা যেন অন্ধকারে ভয় পেয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠ্‌লো, "ছিঃ, ছিঃ,—একি, একি বল্‌লি তুই ?—আজ, ওর জন্মদিনে ?"

"ঠিকই বলেছি" প্রীতির সমস্ত মুখে চোখে উত্তেজনার আভা ছড়িয়ে প'ড়েছে, "বল্‌লেই মানুষে কিছু মরে না—"

মুহূর্তে ঘরের মধ্যে যেন যুগান্তের স্তব্ধতা নেমে এলো, অশ্রুকণা একেবারে ম্লান নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে, ভাঙা, ঠাণ্ডা পাথরের মত ভয়ার্ত গলায় বল্‌লে, "আমাকে ক্ষমা কর প্রীতি—অকারণ কতগুলি প্রশ্নে তোকে আমি উত্তেজিত ক'রেছি—অনেক দিনের চাপা আগুন হঠাৎ জ্বলে উঠেছিলো, আজ এতো সহজে তার নির্লজ্জ প্রকাশের জন্যে আমি লজ্জিত—আমাকে ক্ষমা কর—আমাকে ক্ষমা কর প্রীতি—" অসহায় ভাবে অশ্রুকণা প্রীতির দুটো হাত জড়িয়ে ধরলো।

"এতে ক্ষমার কি আছে" প্রীতি হাত দুটো ছাড়িয়ে নিলে, "যা সত্যি কথা তাই বলেছি, মনে রাখিস্ আমি দুর্বল নই,—শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, উনিশ্ শো তেত্রিশ সালকে ভোলার প্রয়োজন হয় নি তোর আজও।"

অশ্রুকণা মাথা নীচু করলো।

সমস্ত বাড়ীটায় যেন মৃত্যুর মত ঘন অন্ধকার নেমেছে। অশ্রুকণা চ'লে গেছে। অজিত মিসেস সেনকে পৌঁছে দিয়ে ফিরেছে অনেকক্ষণ ক্লান্ত সে। সমস্ত দিনের উৎসব আয়োজনের প্রবল ঝঞ্ঝায় প্রায় বিধ্বস্ত; বিছানায় ঘুমের অবলুপ্তিতে অজিত যেন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে এখন।

চারদিকে মৃত্যুর মত ঘন অন্ধকার, ঘুম আর আসবে না। প্রীতি সুইচ্ টেনে আলোটা জ্বাল্‌লে। সমস্ত রাত ভ'রে তাকে বোধ হয় এই ভাবেই ব'সে থাক্‌তে হ'বে। আজকের তার এমন সাধের দিনে কি যে একটা বিশৃঙ্খল কাণ্ড ঘ'টে গেল!—যেন স্বপ্নে দেখা কোন একটা দুর্ঘটনার মত—একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে থেকে আকস্মিক বিপৎপাতের মত অশ্রুকণা এসেছিলো—আর এসে তাকে মুহূর্তে ভেঙে-চুরে দিয়ে গেল।

প্রীতি খোকার বিছানার দিকে চাইলে—খোকা সেই ভাবেই ঘুমুচ্ছে—ছোট দুটী হাতের মুঠি শিথিল হ'য়ে

প'ড়েছে—লাল টুক্‌টুকে দুটী গাল—চোখ দুটী বোজানো—নির্বিকার—কি উদাসীন আর নির্লিপ্ত চেহারা। ছিঃ, ছিঃ, সামান্য একটা তর্কের আবর্তের মধ্যে পড়ে প্রীতি কি কথাই যে উচ্চারণ করলো—আজ ওর এই জন্মদিনে সবই ওই হতভাগী—প্রীতি মনে মনে অশ্রুকণাকে নখে ছিঁড়ে ফেল্‌তে চাইলো—ওই হতভাগী কণার জন্যেই—কেন যে মরতে সেদিন দেখা হলো সিনেমায়, আর যদি দেখাই হোল, কেনই বা নেমন্তন্ন করলো প্রীতি ওকে ?—হতভাগী তো নিজে ম'রেইছে—ঘৃণায় প্রীতির সমস্ত মুখমণ্ডল কুঞ্চিত হ'য়ে এলো, বম্বে না কোথায় একটা ফিল্‌মে ঢুকেছে—শূন্যগর্ভ লেক্‌চার—বড় বড় সব বাণী—" রাগে প্রীতির সারা শরীর রি রি ক'রে উঠ্‌লো।

বিছানা থেকে নেমে আস্তে আস্তে সে জান্‌লার ধারে এসে দাঁড়ালো—নিস্তব্ধ, মৃত অন্ধকারে—পাথরের মত ভারী রাত্রি, খোকার প্রত্যেকটী নিঃশ্বাস পতনের শব্দ প্রীতির কাণে স্পষ্ট ভেসে আস্‌ছে—খোকা তখনও মাঝে মাঝে হাস্‌ছে—মুখে, ঠোঁটে প'ড়েছে তারই অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য। আস্তে আস্তে প্রীতি খোকার বিছানার দিকে এগিয়ে এলো।

অনেক—অনেক দিন পেরিয়ে পুরোনো একটা আব্‌হাওয়ায় প্রীতি ফিরে গেল, তখন সে এম, এ ক্লাশে পড়ে, একটা দুর্বার কিছু—দুর্দাম কিছু করার প্রেরণায় প্রীতির সমস্ত স্নায়ু-শিরা-উপশিরা তখন মুখর, তাই, সেই প্রেরণা থেকেই তখন সে গ'ড়েছিলো নারী-কল্যাণ সঙ্ঘ—সমস্ত দেশের অসহায়াদের জন্যে সেই প্রথম এনেছিলো আন্দোলন, তারপরে—প্রীতির সেই সূর্যের মত দীপ্ত উৎসাহ হঠাৎই নিষ্প্রভ হ'য়ে এসেছিলো—গ্রীষ্মের শুষ্ক নির্ঝরিণীর মত সেই হঠাৎ-আসা প্রেরণা নিশ্চিহ্ন হ'য়েছিলো। প্রীতি ভেবে দেখেছে সঙ্ঘ-শক্তি ওদের মধ্যে নেই—নেই কোন বলশালী ফলবান্ সম্ভাবনা—খালি কতগুলি ফেনময় বুদ্‌বুদ্—তাই প্রীতি ভেঙে প'ড়েছিলো, ইচ্ছে ক'রেই নিরুৎসাহ হ'য়েছিলো বলা যায়, আর, যাদের মর্মমূলে নেই প্রাণ-চেতনা—যাদের বাঁচবার নেই সামান্যতম আগ্রহ, তাদের দীর্ঘজীবন কামনা করার থেকে হাস্যকরই বা আর কি আছে !

অতীত থেকে বর্তমানের মাটীতে প্রীতি পা ফেল্‌লো—আজ সেই সব দিন কেটে গেছে—সেই সব পাগ্‌লামী ভরা ছোট ছোট বিলাসী দিন—কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে—মা হ'য়ে ছিঃ, ছিঃ—কেন সে উচ্চারণ করলে ও-কথা? কেন তার এই নির্বুদ্ধিতা? রাগ আর উত্তেজনা এমনি জিনিষ—যা নয় তাই ঘটে যায় এর থেকে, প্রীতি খোকার ফুলো ফুলো দুটি সুন্দর গালের ওপরে আস্তে ঝুঁকে পড়্‌লো তারপরে তার সারা শরীরে হাত বুলোলো একবার!

"একি!" প্রীতি একেবারে শিউরে চম্‌কে উঠ্‌লে, "ঈশ্, গাটা যে গরম লাগ্‌ছে খোকার"—প্রীতি ভাল ক'রে তার কপালে হাতটা রাখ্‌লে, নাঃ গা ত বেশ পুড়ে যাচ্ছে, জ্বরই হ'য়েছে তো—"ওগো" প্রীতি এসে অজিতকে ঠেলা দিলো, "ওগো ওঠো না, খোকার যে ভীষণ জ্বর।"

ঘুমের অগাধ পরিব্যাপ্তির মধ্যে অজিত একবার পাশ ফিরলে। "ওগো—" প্রীতি তখনো সমানে অজিতকে ডাকছে "ওঠো না একবার—" অজিত এইবার নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে সাড়া দিলে, বল্‌লে "কি হ'য়েছে কি? ঘুমুতেও দেবে না আমাকে রাত্তিরে?"

"খোকার যে জ্বর হয়েছে—ভীষণ জ্বর হ'য়েছে—"

"কত?" ঘুমের তন্দ্রালুতার ভেতর থেকে অজিত কোন রকমে কথা বল্‌লে।

"তা' আমি দেখিনি—কি করি এখন বল তো?"

অজিত ইতিমধ্যেই আবার ঘুমের অতলতায় ডুবে গেছে—তার আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

প্রীতি খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। জোরে জোরে খোকা নিঃশ্বাস নিচ্ছে, সমস্ত গা যেন আগুন—জলপটী—জলপটী লাগাবে নাকি কপালে প্রীতি?

"খোকোন" প্রীতি অত্যুগ্র আগ্রহে খোকার ওপরে ঝুঁকে পড়লো, খোকোন—"

খোকা আস্তে—অতি ধীরে চোখ মেল্‌লো—চোখ দুটো লাল, "কষ্ট হচ্ছে তোমার? কষ্ট হচ্ছে বাবা?" প্রীতি খোকাকে নিজের কোলের ভেতরে তুলে নিলে, প্রীতির বুকের মধ্যে যেন কেমন করছে, খোকা কোনো উত্তর দিলে না, শুধু তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

কি করে—কি করে এখন প্রীতি: খোকাকে আস্তে আস্তে সে বুকের ওপরে তুলে নিলে—তারপরে দরজা খুলে

ঢুকলো পাশের ঘরে। দেয়ালে একটা ছবি টানানো ছিলো মা দুর্গার, দীর্ঘদিনের অযত্ন-সঞ্চিত ধূলি-মলিন সেই ছবি—তারি তলায় গিয়ে প্রীতি কান্নায় ভেঙে পড়লো: "মা, তুমি আমায় রক্ষে কর। কি বল্‌তে কি বলেছি—আমি অবোধ—আমার অপরাধ নিয়ো না, মাগো তোমার পায়ে—তোমার পায়ে আমি মাথা কুটে মরবো নয়তো!" প্রীতি খোকাকে মাটীর ওপরে শুইয়ে দিলে, "তোমার পায়েই আমি একে ছেড়ে দিলাম মা।"

তারপরে আস্তে আস্তে সে খোকনকে তুলে নিলে, চারদিকেই যেন মৃত্যুর মত ঘন অন্ধকার, প্রীতির সমস্ত শরীর যেন অবশ হ'য়ে আস্‌ছে—চারদিকেই মৃত্যুময় অদ্ভুত স্তব্ধতা—কত রাত কে জানে—প্রীতি এসে আবার বিছানার ওপরে বস্‌লো। "মাগো, তুমি আমায় রক্ষে কর মা—"

খোকন হঠাৎ কথা কইলে, "মা—জোল"

"জল খাবে বাবা?" প্রীতি তাড়াতাড়ি একটা ছোট গ্লাসে জল নিয়ে এলো, "কষ্ট হচ্ছে—কষ্ট হচ্ছে তোমার?" খোকন আর কোনো উত্তর দিলে না।

ছিঃ, ছিঃ, একটা অন্ধ উত্তেজনায় কি সে বলেছে, কি সে বল্‌লো আজ—সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগে—সম্পূর্ণ অবলীলায় কি ক'রে এ কথা উচ্চারণ করলো তখন।

প্রীতি আবার খোকনের গায়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগ্‌লো। এবারে প্রীতি দেখ্‌লে, এবারে খোকন চোখ বুজছে—হয়তো জরটাও কমবে—আঃ জরটা কমলেই প্রীতি বাঁচে—কালকেই—কালকেই সে পাঁচ সিকের পূজো পাঠাবে কালীঘাটে—মা তাকে রক্ষা করেছেন—মা তাকে বাঁচিয়েছেন। প্রীতি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো—মা তাকে বুক দিয়ে আগ্‌লে আছেন দিনরাত—এই তো—তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ!

প্রীতির নিজের থেকেই সেই হারানো ধূলিমলিন মাতৃ-মূর্ত্তির ছবির নীচে মাথা নত হ'য়ে এলো, করজোড়ে সে ওপরের ছবির দিকে চাইলো। কৃতজ্ঞতায় ভরা তার দুটি চোখ।

# শরৎ

(মহাকবি কালিদাস-বিরচিত ঋতু-সংহারের বঙ্গানুবাদ)

শ্রীনন্দ ঘোষ

দেখ্‌ছ প্রিয়ে! অরূপ রূপে শরৎ এল আজ,—
নববধূর মত তাহার অঙ্গ-ভরা সাজ।
চন্দ্রধবল কাশকুসুমের সূক্ষ্ম চীনাংশুক,—
প্রস্ফুটিত কমল সম মনোহরণ মুখ।
মদমুখর হংসরবের নূপুর বাজে পায়,
শালিধানের রূপমাথা তার অঙ্গ-লতিকায়।

মধুর শরৎ করেছে আজ ধবল সবার গা—
কাশের ফুলে শ্বেত হয়েছে মাটীর বসুধা।
সিক্ত শিশির জ্যোৎস্নাতে রাত শুভ্র-সুনির্ম্মল—
হংসযূথ শ্বেত করেছে নদীর কালো জল।
শ্বেত কমলের রঙ লেগেছে সরোবরের গায়,
কুসুম নত-পর্ণে-ভরা কানন শ্বেতকায়।
মালতী আজ শুভ্র করে সকল উপবন
আপন রূপে, গন্ধে, তারা আনন্দে মগন।

রূপসীদের অঙ্গ যেমন দক্ষ রতিতে,
তটিনী আজ চলছে তেমন মন্দ গতিতে।
সফরীদের লম্ফ দেখে স্বতঃই মনে হয়—
কাঞ্চীদামের শোভায় ভরা সকল নদীময়।
দুই কূলে ঐ শ্বেত মরালের কণ্ঠ আভরণ
সৈকতে তার দেখছি যেন নিতম্ব জঘন।

দেখ্‌লো প্রিয়া,—কে যেন আজ চামর দিয়ে হায়-
রাজার মত ব্যজন করে নীল আকাশের গায়।
জলহারা ঐ ছিন্ন মেঘে রজত ভ্রম লাগে,—
শঙ্খ এবং মৃণাল যেন শোভে পূজার আগে।

দেখছি যেন ব্যোমরূপে ঐ রাজেন রাজেশ্বর—
অঙ্গে তাহার ব্যজনরত অসংখ্য চামর।

মেঘাঞ্জনের কান্তিমাখা সুনীল নভোতল,
জবাকুসুম-রক্ত-রাঙা এই যে ভূমণ্ডল,—
পাকাধানের স্বর্ণশোভা—যেথায় শোভমান
তাহার পানে দেখলে চেয়ে গলে না কার প্রাণ?

আজকে মধুর শরতে ঐ কনকফুলের গাছ—
কাহার কঠিন চিত্তে তারা করছে না বিরাজ?
মন্দগতি, মিষ্ট অতি, সমীর হিল্লোল,
আকুল হয়ে ডাকছে তারে শাখায় দিয়ে দোল।
পল্লবেতে ফুল ফুটেছে—গণনা তাই তার
মত্ত অলি মধুপানে আসছে বারংবার।

যৌবনেরই ছোঁয়াচ লাগা কিশোরীদের মত,
জ্যোৎস্না-স্নাত নিশীথিনী বাড়ছে অবিরত।
উজল তারার জ্যোতিঃ তাহার দেহের বিভূষণ,
মেঘহারা ঐ চন্দ্র যেন—প্রফুল্ল-বদন।
শারদ-নিশা পরেছে আজ চন্দ্রিকারই বাস,
অপূর্ব্ব তার শ্রী খুলেছে—কহেন কালিদাস।

শরৎকালের স্রোতস্বিনী—তুলনা নাই তার,
দেখলে তারে দগ্ধ-হৃদয় জুড়ায় না'ক কার?
পাঁতিহাসের দল ভেসে যায় ঢেউয়ের তালে তালে
সৈকতে ঐ করছে সভা সারসে-মরালে।
পদ্মপরাগ সমাবৃত তটভূমির বুকে—
কলমুখর হংস আজি ডাকছে হাসিমুখে।

তুলনা নেই, শরতের এই অতুল সুষমার—
তারে দেখে দগ্ধ হৃদয় জুড়ায় না'ক' কার?

হৃদয়হারী কিরণমালার—অতুল্য-শোভন,
শিশির ঝরা ধরার হরষ, নয়ন সুমোহন।
চন্দ্রিকা ঐ বিরহিনীর ব্যথা-বিধুর হিয়া,
আজ নিশীথে দাহন করে কামনানল দিয়া।

'ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়'—শারদ সমীরণ
পুষ্পানত তরুলতা নৃত্যেতে মগন।
কাঁপছে আজি মৃণালিনী, কাঁপছে শতদল—
এমন দিনে কাহার হৃদয়—হয় নারে চঞ্চল?

সরোবরের শোভা—সে আজ চিত্ত বিমোহন,
হংসমিথুন কেলি দেখে অধীর আমার মন।
কমলদলের ভূষণ তাহার; প্রভাত কালের বায়—
রবির আলো নাচে তাহার তরঙ্গ দোলায়।

কোথায় গেল ইন্দ্রধনু আকাশ ছেড়ে হায়—
জলদ-রাহু আজকে বুঝি গ্রাস করেছে তায়।
বর্ষারাণীর—বিজয়রাণীর নাই সে ধ্বজা নাই—
সৌদামিনীর স্বর্ণশোভা খুঁজেও নাহি পাই,—
কাঁপিয়ে পাখা বকের পাতি নীল আকাশের তলে,—
বাতাস দিতে উড়ছে না আজ তেমনি দলে দলে।
নীলকণ্ঠেও কণ্ঠ তুলি জলদ ভরা নভে
চায় না তারা তেমন করে' মধুর কেকা রবে।

নাচে না আর, শিখী তাহার পায়ের তালে তালে,
তেমন করে ফুল ফোটে না কুরচী-কদম ডালে।
অনঙ্গ তাই ফুটায় কুসুম, ছাতিম গাছে গাছে—
ফুলশরের তীর হানিতে মরালযূথ মাঝে।

উপবনের শোভায় মরি,—পুরুষ হৃদয় যত—
ব্যাকুলতায় ভারে সখি হচ্ছে অবনত।
শেফালিকার সৌরভে হায় উতল সারা বন—
পাখীর গানে মুখরিত অরণ্য কানন।
বনের ধারে সবুজ তৃণের শয্যাখানি পাতি'
বন্য হরিণ শয়ন করে সঙ্গে নিয়ে সাথী।
হরিণে আর হরিণীতে কমল-চোখে চায়—
উপবনের রূপ ধরে না শিউলি সুষমায়।

পবনে আজ দেখছি সখি—বিচিত্র বিলাস—
মনে আমার জেগেছে তাই ব্যথার দীর্ঘশ্বাস।
সরোবরের সরোজে আর কুমুদ ও কহ্লারে—
প্রভাত-সমীর কাঁপন দিতে আসছে বারে বারে।
হয়েছে তাই ভোরের হাওয়া অধিক সুশীতল—
তরুলতার শিশির-কণা ঝরছে অবিরল।

গাঁয়ের শেষে দৃষ্টি দিলে জুড়ায় আহা প্রাণ—
মাঠের বাটে ধরে না আজ তৃণের শালিধান।
সুস্থ সবল ধেনুর পালে দিক করেছে আলো—
হংসরাজির কলধ্বনি লাগছে বড় ভালো।
এমন কে সে আছে ধরায়—হৃদয়খানি যার—
প্রকৃতির এই রূপে পাগল হয় না'ক একবার?

সুন্দরীরা হার মেনেছে, শরতের এই রূপে
দেখবে যদি প্রিয়তমা, দাঁড়াও চুপে চুপে।
মত্তমদে মন্দ অতি—মরাল গতি সম,—
শরৎরাণীর সুললিত গমন অনুপম।
আননে তাঁর লাবণ্য দেয় ফুল্ল শতদল—
মদবিলোল দৃষ্টি তারে দেছে নীলোৎপল।

কুসুম-নত পল্লবিনী—শ্যামা লতার বন,—
তাদের কাছে হার মেনেছে নারীর সুগঠন।
মালতী আর কাঞ্চলী তার দশন পরিপাটী,
শরৎ যেন সেজেছে আজ সোনার প্রতিমাটী।

রূপসীগণ কেশদামের শিথিল কবরীতে—
মালতী ফুল দিচ্ছে গুঁজে—আনন্দিত চিতে।
কর্ণে তাদের দুলছে কনক-কর্ণ-আভরণ—
তাহার সাথে—নীল শতদল জুড়ায় দু'নয়ন।

আনন্দে আজ আত্মহারা সুন্দরীদের মন,
চন্দনে তাই সিক্ত করে—সুঠাম দুটী স্তন।
কাঞ্চীভূষণ পায় যে শোভা নিতম্বেতে হায়—
শিঞ্জামুখর নূপুর বাজে অলক্ত রাঙ্গা পায়॥

আকাশ আজি মেঘ-হারা, তাই চন্দ্রতারায় ভরা
জলাশয়ের মূর্ত্তি আহা, বড়ই মনোহরা।
ফুটেছে ঐ থরে থরে, কতই শতদল
মুক্তাহারে দীপ্ত যেন সরোবরের জল।

কুমুদ শীতল শারদ বায়ে উতল ধরাতল,
এই বাতাসে হৃদয় আমার হয়েছে চঞ্চল।
আকাশে আর যায় না ভেসে কৃষ্ণ-মেঘ-ভার,
সলিল আজি আবিল কোথা শুষ্ক বসুধার?
চাঁদের আলোয় উজল করা—তারায় ফুলে সাজি'—
কেমন তাহার রূপ হয়েছে, দেখবে এস আজি।

যৌবনে ঐ রঙ্গে ভরা রূপসীদের মত
তপন-প্রিয়-স্পর্শে কমল হচ্ছে বিকশিত,
যেমন করে' লুকায় হাসি সদ্য বিরহিনী
তেমনি করে' চন্দ্রে বিদায় দিচ্ছে কুমুদিনী।

প্রিয়তমার বিরহে আজ পান্থজনের মন,
কত ব্যথায় কাতর হয়ে কাঁদছে অনুক্ষণ।
শতদলে দেখছে খুঁজে প্রিয়ার দু'নয়ন,—
হংসরবে বাজছে কিনা দেহের আভরণ।
রক্তজবায় স্মরণ করে—প্রিয়ার ওষ্ঠাধর—
আপন ভোলা পথিক—প্রিয়ার বিরহে কাতর॥

রঙ্গিনীদের অঙ্গ ভরি শারদসুষমায়—
কে যেন ঐ চাঁদের শোভা প্রলেপ দিয়ে যায়।
দুই নূপুরে হংসগীতি বেঁধেছে তাই বাস—
ওষ্ঠাধরে লাল করবীর রক্তিম প্রকাশ।

কামাতুরা বামার মত ফুল্ল-কমল-মুখী,
প্রস্ফুটিত ঐ যে সখি নীলোৎপলা আঁখি,
বিকশিত শুভ্র কাশের বসন পরিহিতা—
কুমুদসমা 'শরৎ' তোমায় করুক আনন্দিতা।

# 'প্রবর্ত্তক' রজত-জয়ন্তী

( ষষ্ঠ মাসিক অনুষ্ঠান )

"প্রবর্ত্তক" পত্রিকার ষষ্ঠ মাসিক রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় সদলবলে ১৬ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম মেলে ময়মনসিংহে আসিয়া উপস্থিত হন। শত শত লোক তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে—"বন্দেমাতরম্" ও শঙ্খধ্বনিতে প্ল্যাট্‌ফরম্ মুখরিত হয়। স্থানীয় গুরুদ্বারের শিখেরাও কৃপাণ হস্তে মতিবাবুকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৬৷৹ ঘটিকায় স্থানীয় দুর্গা-বাড়ীতে প্রবর্ত্তক রজত জয়ন্তীর সভাধিবেশন হয়। সহস্র সহস্র নরনারী এই সভায় যোগদান করেন। মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় সভায় পৌরোহিত্য করেন।

বালিকারা "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত গাহিলে স্বামী অমৃতানন্দজী উদাত্ত কণ্ঠে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেন, চারণ প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গীত শেষ হইলে, সঙ্ঘ সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত সভাপতি বরণ করেন। সভাপতি অভিভাষণে বলেন—প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের আদর্শ ও মতবাদ জাতির মধ্যে প্রচারার্থ প্রবর্ত্তক পত্রিকার আবির্ভাব। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা দেশে নূতন আদর্শে জাতিকে গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তিনি কেবল জাতি গঠনের মন্ত্র শুনাইয়া কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, তিনি গঠনমূলক কর্ম্মের মধ্য দিয়া ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীকে কর্ম্মশীল করিয়া তুলিবার জন্ম প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহাঁর মূলে আত্মিক-শক্তি আছে। সঙ্ঘকে কেন্দ্র করিয়া একদল কর্ম্মী কর্ম্মযোগীর ন্যায় জাতীয় গঠন-মূলক কার্য্যে নিয়োজিত আছেন। এই জন্যই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ ২৫ বৎসরের মধ্যে এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আজ মতিবাবু তাঁহার সেই সিদ্ধির বাণী শুনাইবার জন্য বাঙ্গালার ঘরে ঘরে অভিযান করিয়াছেন। আমি আশাবাদী, কোন ক্ষেত্রে জীবনের স্পন্দন দেখিতে পাইলে আশান্বিত হই। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মোহ, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও সামাজিক আভিজাত্য দূরে ফেলিয়া বর্ত্তমানে আমাদিগকে জাতীয় চেতনায় অভিষিক্ত হইতে হইবে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়া দেশে এক নূতন প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে। প্রবর্ত্তক জয়ন্তী তাই আজ জাতীয় উৎসব।

মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য বাহাদুর

সভাপতির অভিভাষণের পর প্রবীণ উকিল শ্রীশ্রীশচন্দ্র গুহ মহাশয় সঙ্ঘের ও শ্রীযুক্ত রায়ের পরিচয় প্রদান করেন। তারপর সহস্র সহস্র লোকের উচ্ছ্বাস প্রকাশের সহিত করতালি বাদ্যের মধ্যে শ্রীযুক্ত রায় তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করেন।

তিনি বলেন—হিন্দুর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বিগত দুই বৎসরের মধ্যে শেষ হইয়াছে তবুও চৈতন্য হয় নাই, ক্রমে তার গৌরবের বস্তু ভূমি, ধন আর সাধের বিশ্ববিদ্যালয় যায়। বাঙ্গালী আজ সচেতন হইয়া বাঁচার পথ অন্বেষণ করে, রোগে রউপসর্গ ধরিয়া চিকিৎসা করার মত বাঙ্গালী জাতির উপর আঘাত অনুসরণ করিয়া প্রতিকার চাহিয়াছে, রোগের নিদান অন্বেষণ সে করে নাই। এই অর্দ্ধ শতাব্দীর

সাধনা তার ব্যর্থ হয়, আজও যদি ক্ষয়রোগীর স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য, বল-বীর্য্য নাশের পশ্চাতে রোগ-নিরাময়ের দিকে বাঙ্গালী দৃষ্টি না দেয়, তার মৃত্যু অনিবার্য্য।

এই দিক্ দিয়া আজ সকল "ইজম্" ছাড়িয়া "হিন্দু-ইজম্"কে ধরিতে হইবে। সে হিন্দুত্ব শ্রুতি-প্রসিদ্ধ কর্ম্মবাদ, জন্মান্তরবাদ। বাঙ্গালীকে কর্ম্ম করিতে হইবে—বাঙ্গালীকে আত্মবিশ্বাসী হইতে হইবে।

বাংলায় বাঁচার ইচ্ছা জাগাইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে চাই এক দল নূতন নেতা। এই নেতৃ সংখ্যা অল্প হইলেও, ক্ষতি নাই। জাতির মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মের অমৃত-স্রোতঃ ফিরাইয়া আনার উপর তার সৌন্দর্য্য, বীর্য্য, জয় সম্পদ ও ধর্ম্মের পুনঃ প্রকাশ হইতে পারে। মতিবাবু প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল হিন্দুধর্ম্মের মৌলিক তত্ত্ব প্রাঞ্জল ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেন। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার বাণী শ্রবণ করেন। উপসংহারে তিনি বলেন, নেতা যাঁরা হইবেন, তাঁদের ইন্দ্রিয়জয়ী হইতে হইবে, নিরাসক্ত হইতে হইবে, অহংকার ত্যাগ করিতে হইবে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখ বরণ করার শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে—আর ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইতে হইবে। হিন্দু বলিতে, হিন্দুর রক্তধারায় যে সংস্কৃতি, তারই অনুশীলনে জাতির অভ্যুত্থান আনিবে। সংখ্যা দেখিয়া বাঙ্গালীর নৈরাশ্যের হেতু নাই। অন্তর শক্তির সন্ধানে বাঙ্গালী যদি উদ্বুদ্ধ হয়, আগামী দশ বৎসরে বাংলায় নব-যুগ দেখা দিবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় মহোদয় সভাপতি ও ময়মনসিংহবাসীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অনন্তর চারণ প্রফুল্লচন্দ্রের উদাত্ত সঙ্গীতের পর সভা শেষ হয়।

ময়মনসিংহে সঙ্ঘের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। সহরে মতিবাবুর আগমনে খুবই সাড়া পড়িয়াছে।

---

# প্রবর্ত্তকের প্রতি

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

( ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে )

হে নর্ত্তক, প্রবর্ত্তক, জগৎ আজ তোমায় চায়!
নূতন লোক সৃজন হোক্ তোমার তাণ্ডবের ঘায়!
ভাঙ্গার কাজ চালাও জোর, গড়ার কাজ অতঃপর;
জগাও ভীম প্রভঞ্জন, উড়াও সব তাসের ঘর!
প্রাসাদ সব হউক্ চূর্, উঠাও ঘোর ভূকম্পন!
জলোচ্ছ্বাস ভীষণ চাই, ধোয়াও হীন মলিন মন!
শোভন হোক্ সকল দেশ, উদার হোক্ জাতির প্রাণ;
নূতন যুগ-প্রবর্ত্তন আশায় গাই শিঙার গান।

পচনশীল ধরায়, হায়, তিলেক সুখ কোথায় পাই!
হাঁপায় দীন কাঙাল জন, কারুর আর কিছুই নাই!
হৃদয়হীন ধনিকদের শোষণ খুব, অভাব ঘোর;
শ্রমিকদের সমুত্থান, শুভঙ্কর, মুছাও লোর!
প্রাচীন পথ, প্রাচীন মত, ঘুচাও চালবাজির দিন!
বাঁচাও দুই বিরাট্ দেশ—ভারত আর বৃহৎ চীন!
ভুলাও দ্বেষ বিভেদ আজ, ফুলাও ফের তাদের বুক!
ক্ষতের 'পর বুলাও হাত; বিলাও, শিব, গভীর সুখ!

মানুষ চায় নূতন রূপ, নূতন প্রাণ, নূতন সব;
বিলয় পা'ক্ প্রাচীন, হোক্ মহত্ত্বের সমুদ্ভব।
জীবন ভোগ করার সাধ মাতায় সব জাতির মন,
স্বাধীন মত প্রকাশ চায় স্বাধীন এই মানবগণ।
কেহই আর স্বাধীন নয়, সবাই ন্যায় প্রীতির দাস;
রূপের আজ আদর চাই, রূপার চাই খাতির নাশ।
জমাট চাই প্রণয় প্রেম, তাতেই মান, মনের মিল;
প্রেমের জয় আবার হোক্, মহেশ্বর, মাতাও দিল্!

বিধান চাই মরণময় সমাজটার ব্যবস্থায়,
উপর নীচ সমান হোক্, আলোক দাও তমিস্রায়!
পুলক দাও ভূলোকময়, দ্যুলোক হোক্ আবির্ভাব;
খেদাও ক্ষয় ক্ষতির ক্ষোভ, তাতেই সুখ, তাতেই লাভ।
আনন্দের জোয়ার আজ ডুবাক্ দিক্ দেশের চিন্,
মানুষ সব মিলুক্, শ্বেত নিশান হোক্ সমুড্ডীন।
তোমার নাম থাকুক্ তায়, সকল লোক নোয়াক্ শির;
পুনর্ব্বার, প্রবর্ত্তক, জুড়াও বুক ধরিত্রীর!*

* ময়মনসিংহ ৬ষ্ঠ মাসিক রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে বিরচিত।

# সমালোচনা

**গো-জীবন**—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ৪৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—পোঃ মহানদ, জেলা হুগলী।

গ্রন্থখানির ৬ষ্ঠ সংস্করণ হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বইখানি দেশের একটা প্রয়োজন পূরণ করিয়াছে। বাংলার কি গার্হস্থ্য জীবন, কি সামাজিক ও জাতীয় জীবনে গো-মাতার যথার্থ স্থানটী যে কত বড় ও গুরুতর, সে সম্বন্ধে সম্ভবতঃ কোনও দ্বি-মতই সম্ভব নহে। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে গো-পালন ও গো-সেবা বিষয়ক কোনও পূর্ণাঙ্গ তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ না পাইয়া যাঁহারা অভাব বোধ করিতেন, আমাদের বিশ্বাস, বর্ত্তমান বইখানি তাঁহাদের সকলেরই সন্তোষ বিধান করিবে। গো-জাতি সম্বন্ধীয় যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, গো-জাতির ব্যাধি এবং প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ ও হোমিওপ্যাথিক মতে সুচিকিৎসা এবং প্রাসঙ্গিক অন্য বহুবিধ বিষয় স্বকীয় বস্তুতন্ত্র অভিজ্ঞতার আলোচনা ইহাতে সুপ্রণালীতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে—ইহা এ বিষয়ে একটী সমাচারের খনি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"আমি বাল্যকালে যে গো-রক্ষা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম, এতদিন পরে সেই ব্রত উদ্‌যাপন হইল।" আমরাও তাঁহাকে অভিনন্দন পূর্ব্বক বলি—"বাঢ়ম্"।

—শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

**করনীতি**—শ্রীঅনাথগোপাল সেন কর্ত্তৃক লিখিত এবং মডার্ণ্ বুক্ এজেন্সী, ১০নং কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত। মূল্য—এক টাকা।

শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন অর্থনীতির দুরূহ সমস্যা সমূহকে বাংলা-ভাষায় মনোরম করিয়া লিখিয়া ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার "টাকার কথা-র" ইতিমধ্যেই তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে।

আলোচ্য পুস্তকটিতে কর-নীতি সম্পর্কীয় সর্বপ্রকার আলোচনাই করা হইয়াছে। প্রথম অংশে কর-নীতি বা রাষ্ট্রের Taxation-এর সাধারণ বিষয়গুলি এবং দ্বিতীয় অংশে ভারত সরকারের অনুসৃত কর-নীতির আলোচনা নিরপেক্ষভাবে করা হইয়াছে।

অনাথবাবু বাংলাভাষায় এই বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বাংলা পরিভাষার সাহায্যে সহজবোধ্য উপায়ে লিখিত হওয়াতে সাধারণ পাঠক পুস্তকটি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামোয় কর-নীতি কিরূপ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আলোচনা থাকিলে পুস্তকটি অধিকতর মূল্যবান হইত।

—শ্রীনির্ম্মল ঘোষ

**রাজা**—শ্রীশিবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এস্‌সি, প্রণীত, মূল্য দশ আনা, ভদ্রকালী মধুচক্র হইতে প্রকাশিত, পোষ্ট কোতরং, জেলা হুগলী।

বঙ্গভাষায় নাটকের অভাব না থাকিলেও, ক্ষুদ্র নাটিকা খুব বেশী নাই। আলোচ্য নাটিকাখানি লেখকের প্রথম উদ্যম হিসাবে প্রশংসাযোগ্য। আমরা নবীন গ্রন্থকারের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

—শ্রীজহরলাল বসু

**গৃহকর্ম্ম**—শ্রীহরিদাস মজুমদার প্রণীত। অমৃত পাবলিশিং হাউস, ৬ নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

পাশ্চাত্য প্রভাব যেদিন হইতে এ-দেশের অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে সেইদিন হইতেই আমাদের সত্যকার পরাজয় হইয়াছে সুরু। সুসংহত পবিত্র পারিবারিক জীবন সামাজিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টির পরিচায়ক। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার এত বড় আদর্শ সত্ত্বেও ফরাসীজাতির বর্ত্তমান শোচনীয় পরাভবের বৃহত্তম হেতু তার পারি-বারিক জীবনে শৈথিল্য ও অনাচার। পরানুকরণপ্রিয় পঙ্গু বাঙালী জাতি ও-দেশের উচ্ছিষ্টাদর্শের মোহে আজ একথা ভুলিতে বসিয়াছে। যে পরম গার্হস্থ্যাদর্শ এই সুপ্রাচীন বিশাল হিন্দুজাতিকে শত পরিবর্ত্তনের মাঝেও সহস্র সহস্র বৎসর সঞ্জীবিত রাখিয়াছে তাহারই কাঠামোর উপর ভিত্তি করিয়া আলোচ্য পুস্তকখানি রচিত। চিন্তাবিকারগ্রস্ত অর্ব্বাচীন যুগের লঘু আব্‌হাওয়ার মধ্যে এমনি ধরণের শুভ ও সুস্থ উদ্দেশ্যমূলক গ্রন্থের আবির্ভাব আশার সঞ্চার করে। গৃহসজ্জা, শিশুচর্য্যা, গো-সেবা প্রভৃতি নিত্য গৃহকর্ম্মের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে ৺দীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর দুইটি প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ, মেয়েদের উপযোগী শিক্ষা-পরিকল্পনা এবং টোট্‌কা চিকিৎসার সঙ্কলন সচিত্র এই বইখানির উপযোগীতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। গৃহপঞ্জীর মতই বইখানি ঘরে ঘরে (বিশেষ সহরে) স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া মনে করি।

**শ্রী শ্রী গুরুগীতা** (২য় সংস্করণ)—শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত। প্রকাশক—দেব লাইব্রেরী, ২৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম চারি আনা।

মূল, পদ্যানুবাদ ও যোগার্থ সম্বলিত এই পকেট সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরু-গীতা হিন্দু মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। অনুবাদ বেশ সরল ও সহজবোধ্য হইয়াছে।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
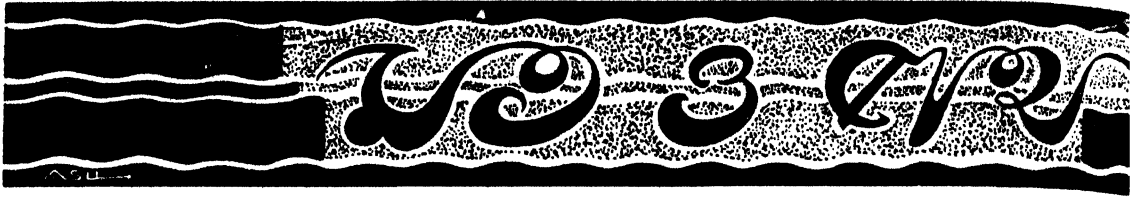
## মহাত্মার নেতৃত্ব-গ্রহণ

দিল্লী-পুণার রাষ্ট্রনৈতিক প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া বোম্বাই বৈঠকে নিখিল ভারত রাষ্ট্র-সমিতি আবার রামগড়ের পরিস্থিতিতে প্রতিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং মহাত্মা গান্ধীজি পুনরায় কংগ্রেসের সর্ব্বময় নেতৃত্ব-পদে বৃত হইয়াছেন। ভারতের বিষাদখিন্ন রাষ্ট্র-প্রাণে ইহা আর একবার নূতন আশা ও উৎসাহ সঞ্চার করিবে, সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রক্ষেত্রে অহিংসা নীতির প্রয়োগ লইয়া তাঁহার প্রধান ভক্ত-সেনানীগণ ইতিপূর্ব্বে দিল্লীতে তাঁহারই সহিত যে মতভেদ ও পথভেদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহারা প্রত্যাহার করিয়াছেন। বোম্বাই বৈঠকে যে প্রস্তাব ঘোষিত হইয়াছে, তাহাতে যেমন একদিকে, রাষ্ট্র-নীতির উপর মহাত্মার অধ্যাত্মনীতির অপ্রতিহত বিজয়-লাভ ঘটিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে পূর্ণ অহিংসা মন্ত্রের দিগ্দর্শন লইয়া ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে মহাত্মাকে পুনবতরণ করিতে দেখিয়া জাতির রাষ্ট্রসাধনা যে বর্ত্তমান অবরুদ্ধ গতি হইতে মুক্তি পাইবে, এ সম্ভাবনায় অধিকাংশ ভারতবাসীই আশান্বিত হইয়া উঠিবেন, ইহাও নিঃসংশয়।

মহাত্মাজী কংগ্রেসের প্রধান সেনাপতিরূপে বরিত হওয়ার প্রাক্কালে তাঁহার যে মনোভাবের স্পষ্ট অভিব্যক্তি দিয়াছেন, তাহা একাধিক দিক্ দিয়া শুধু কংগ্রেসপন্থিগণের নহে, সকল ভারতবাসীরই প্রণিধানযোগ্য ও বিচারযোগ্য। তিনি অভ্রান্ত কণ্ঠেই বলিয়াছেন—"যে ইংরাজজাতির নিজেরই স্বাধীনতা আজ বিপন্ন, সে ইংরাজজাতির নিকট হইতে আমরা স্বাধীনতা চাহিতে পারি না।" তাঁহার দৃঢ় ধারণা—"স্বাধীনতা পাইব আমাদেরই আত্মশক্তির সাহায্যে—নিজেদের সংহতিবলে, ঐক্যবলে।" নিজের সহজ-বোধের সাক্ষ্যেই তিনি যেমন বলিতে পারেন "আমায় ওরা কিছুতে জেলে রাখিতে পারিবে না", তেমনি তিনি জাতিকেও বলেন "তোমাদের চিন্তা অমোঘ, সত্যপূর্ণ হউক। তবেই তোমরা স্বরাজের আগমন অচিরে সম্ভব করিয়া তুলিবে—সমগ্র জগৎ বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও। আজ ইংলণ্ড যেমন সারা ইউরোপের বিরুদ্ধে একা দাঁড়াইয়াছে, সেইরূপই।"

ইহা বিশ্বাসের কথা, আত্মপ্রত্যয়েরই কথা। এমন জলন্ত আত্মপ্রত্যয় না জাগিলে, কোন জাতিই স্বাধীনতা সংগ্রামে যথার্থ অধিকারী হয় না। আজ ৭২ বর্ষীয় বৃদ্ধ জননেতা কি অগাধ আত্মপ্রত্যয়ের মহাবীর্য্য অন্তরে ধারণ করিয়া বলিতেছেন—I have got strength and resourcefulness enough to lead this battle." তাহা সমগ্র জাতিকে গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিতে বলি। তাঁহার নেতৃত্বে এই অদম্য মহাশক্তি যদি জাতির একাংশের অন্তরেও জাগ্রত হয়, তাহার অবর্থ্য আত্মপ্রকাশে শুধু রাষ্ট্রমুক্তি কেন, যে কোনও মহৎ অভীষ্ট লাভও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে না।

## বিশ্বাস—সাময়িক ও জীবনব্যাপী

মহাত্মা নেতৃরূপে প্রত্যেক রাষ্ট্র-সৈনিকের নিরঙ্কুশ আনুগত্য প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি জানেন যে, সকলে ঠিক তাঁহার ন্যায় অহিংসা মন্ত্র জীবনের পরম সাধ্যরূপে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু যতক্ষণ কোনও নীতি সমষ্টির সংগ্রামনীতি বলিয়া পরিগৃহীত হয়, ততক্ষণ তাহার প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য চাই—নহিলে রাষ্ট্র-সংগ্রামই ব্যর্থ হয়। এ সম্বন্ধে তিনি এবার আর কোনও কুজ্ঝটিকার অবসর রাখেন নাই—কাহারও উপর আশাতিরিক্ত দাবীও করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—"My creed holds me for life; yours so long as you hold it. Resign from the Congress and you are free from it.

স্পষ্ট, অভ্রমযোগ্য নির্দ্দেশ—তাই আশা করা যায় যে, তাঁহার নিজ অনুবর্ত্তী শিষ্যগণ অথবা সাধারণ কংগ্রেস্-সভ্যবৃন্দ, কাহারও পক্ষে এবার "ক্রীড" লইয়া আর কোনওরূপ দ্বন্দ্বের আবর্ত্তে পড়িতে হইবে না। সংগ্রাম-যুগে সেনাপতির রণনীতি ও নির্দ্দেশ পালনে বিশ্বাসের দ্বিধা

রাখা চলে না—সে বিশ্বাস জীবনব্যাপী হউক বা না হউক —এ কথা সত্য। তাই সমগ্র কংগ্রেস দলনির্ব্বিশেষে অকুণ্ঠ চিত্তে সাময়িকভাবেও তাঁহার নেতৃত্ব-গ্রহণে প্রস্তুত হওয়ার কোনও বাধা দেখা যায় না। অতঃপর আশা করা যায়, বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ "ক্রীড" লইয়া কংগ্রেসের অকপট সেবকগণের মধ্যেও যে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব, কলহ ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়া অতিশয় তিক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাইয়াছে ও যাহা এখনও মতভেদে, পদভেদে জাতীয় রাষ্ট্রসমিতিকে বিভক্ত ও কুণ্ঠিত করিয়া তুলিতে নিবৃত্ত নহে, তাহার শীঘ্রই অবসান ঘটিবে। কংগ্রেসের প্রতিভূ-স্বরূপ যে বিশ্বাসের আত্মপ্রকাশে জাতির স্বাধীনতা প্রতিপন্ন করিতে মহাত্মাজী বৃটিশরাজপ্রতিনিধির সহিত শেষ সাক্ষাৎকার করিতে চলিয়াছেন, সামান্য অন্তর্ভেদের জন্য সেই বিশ্বাসের ভূমিকায় যাহাতে কংগ্রেসনিষ্ঠ দেশ-পূজারীগণ মর্য্যাদার সহিত স্থান পাওয়ায় কোনও প্রকারে বঞ্চিত না হন, কেহ কাহাকেও অসহিষ্ণুভাবে বিতাড়ন না করেন, সেদিকে মহাত্মা স্বয়ং দৃষ্টি দিলে আমরা সুখী হইব।

## মহাত্মার শেষ প্রশ্ন

মহাত্মা বড়লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যে শেষ প্রশ্নের সমাধান চাহিবেন, তাহা হইতেছে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিশ্বাসের অর্থাৎ মত প্রকাশের স্বাধীনতা। বৃটেনের জীবন-মরণ মহাসঙ্কটে ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার দাবী লইয়া তিনি এবার যাইতেছেন না। জাতীয় গণ-পরিষৎ বা কেন্দ্রীয় জাতীয় শাসনতন্ত্রের দাবীও এখন তাঁহার নহে। পরন্তু তিনি শুধু সর্ব্ব স্বাধীনতার মূল ভিত্তিস্বরূপ আত্মবিশ্বাস ও প্রচার করার অবাধ অধিকারটুকুই যাজ্ঞা করিবেন বড় লাটের কাছে—তিনি শুধু চাহিবেন অহিংস থাকিয়া ভারতের জন-সাধারণকে বলিতে ও বুঝাইতে যে, ইউরোপের-রক্ত সংগ্রামে তাহারা স্বেচ্ছায় যোগদান করিবে না। অবশ্য মহাত্মাজী আন্তরিক অকপটতার সহিত বিশ্বাস করেন এবং সেই কথা তিনি বলিয়াছেনও যে, ইহা দ্বারা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত করার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য তাঁহার আদৌ নাই। তিনি মনে করেন, অন্ততঃ এইটুকু অধিকার না দাবী করিলে, কংগ্রেসের তথা ভারতের জাতীয় ভাবের অস্তিত্ব রক্ষাই অসাধ্য হইয়া উঠে। আমরা এই কথাটী ঠিক স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। কংগ্রেসের, তথা ভারতের জাতীয় ভাব-বীর্য্য এইভাবে আত্মপ্রকাশ বা আত্মপ্রচার না করিলেই, তাহার অস্তিত্ব বিপন্ন বা নিরর্থক হইবে কেন? আর ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়, বস্তুতন্ত্র ক্ষেত্রে বৃটনের হাতে ভারতের শাসন রজ্জু যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ তাহার জীবন-মরণ সংগ্রামের প্রতিকূল ঘোষণা বা আচরণে সম্মতি-দান তাহার পক্ষে সম্ভব নহে, সমীচিনও নহে। মহাত্মার ইচ্ছা না থাকিলেও, বৃটনকে তিনি বিব্রতই করিবেন—সঙ্কটেই ফেলিবেন, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এরূপ ক্ষেত্রে একটা সংঘাত অনিবার্য্য। আর তখন ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মহাত্মাজী তথা কংগ্রেসের আসল লক্ষ্য কথা বা প্রচারের স্বাধীনতা-রক্ষা নহে, পরন্তু লবণ-আইন উপলক্ষ্য লইয়া যেমন সত্যাগ্রহ ঘোষণাই একদিন কংগ্রেস করিয়াছিল, তেমনি এই বাণী বা লেখনীর স্বাধিকার প্রতিপাদনের অছিলায় একটা সংঘর্ষ-সৃষ্টি করাই এবারেও কংগ্রেসের লক্ষ্য। ইহাতে আর কিছু হউক না হউক, বৃটনকে বিব্রত করা বা বিপন্ন করা হইবে, তাহা অবধারিত, সুতরাং মহাত্মার আন্তরিক উদ্দেশ্য বিভিন্ন রাজনৈতিক ফল প্রসব করায়, তিনিই হয়ত একদিন আবার সুক্ষ্মতর বিবেকের দংশনে শিহরিয়া উঠিবেন এবং সংঘর্ষের ব্যর্থতায় ও সত্যের পথে আর একটা হিমালয় প্রমাণ ভ্রান্তির আবিষ্কারে দেশে ঘোরতর প্রতিক্রিয়াই দেখা দিবে। আমাদের এই আশঙ্কা অমূলক হইতেও পারে—ঘটনার পরিস্থিতি কোন্ দিকে জাতিকে টানিয়া লইয়া যাইবে, তাহা কেহই আজ বলিতে পারে না। কিন্তু আমাদের বিগত দুই যুগের দীর্ঘ জাতীয় ইতিহাসের অভিজ্ঞতাও উপেক্ষণীয় নহে। কাজেই মহাত্মাজীর শেষ প্রশ্নের উত্তরে বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি কি বলিবেন, তাহা জানিবার প্রতীক্ষায় যেমন সারা দেশবাসী উদ্‌গ্রীব থাকিবে, তেমনি আমরা মহাত্মাজীকেও অনুরোধ করিব—কোনও চরম-নীতি-গ্রহণের পূর্ব্বে আরও গভীর ভাবে সকল কথা বিবেচনা করিবেন। কারণ, একবার নীতি স্থির হওয়ার পর, আর প্রত্যাহার বা প্রত্যাবর্ত্তন শুধু লজ্জাকর নয়, এবার মারাত্মকই হইবে।

# সার্থক পূজা

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী

ভাদ্রের শেষাশেষি। রত্নপুরের জমীদার বাড়ী পূজার উদ্যোগ চলিতেছিল। উন্মুক্ত আঙিনায় পাশা খেলার ধুম পড়িয়াছে। শুক্লা তিথি। নীলাকাশে চাঁদের হাসি আর দিগ্‌দিগন্তে জ্যোৎস্নার প্লাবন।

"ভারী সুন্দর রাতটি কিন্তু!" সান্যাল আকস্মিক প্রশ্ন করিয়া বসিলেন।

ভট্টাচার্য্য: "বর্ষাবসানে পূজোর আগমনী-রেস মনকে পুলক-শিহরিত করে।"

জমিদার রমেশ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "খুব সত্যি।"

সান্যাল প্রশ্ন করিলেন, "এবার থিয়েটার হচ্ছে তো, মুখুজ্যে মশায়?"

জমিদার: "এখনও কিছু ঠিক হয়নি।"

ভট্টাচার্য্য: "গান-বাজনা-আমোদ-আহ্লাদ না হলে পূজোটাই বৃথা। ক'টা দিন কি আনন্দে যে কাটে!"

গম্ভীর গলায় মাণিক রায় বলিলেন, "পূজোটাই মুখ্য, আমোদটা গৌণ। হ্যাঁ, নন্দগ্রামের বাড়ুজ্যে বাড়ীর পূজো বটে! অনাড়ম্বর কিন্তু শ্রদ্ধাপ্লুত সাত্ত্বিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দেবীর আবির্ভাব যেন অনুভব করা চলে।"

জমিদার: "কোন্ বাড়ুজ্যে?"

"দুর্গাশঙ্কর—আপনারই প্রজা।"

"পাশা খেলা আজকের মত থাক্" সহসা মন্তব্য করিয়াই জমিদার রমেশ মুখোপাধ্যায় নির্ব্বাক্ উঠিলেন।

## ২

মহা অষ্টমী। সাধারণ ছদ্মবেশে মাণিক রায়ের সঙ্গে রমেশবাবু পদব্রজে দুর্গাশঙ্করের বাড়ীতে পূজা দেখিতে আসিলেন। মোটর রহিল দূরে।

একটি কিশোরী ও একটি বালক সমস্বরে স্তোত্র পাঠ করিতেছিল:—

> "নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে।
> নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে।"

পাঠশেষে প্রতিমা প্রণাম করিয়া মেয়েটি ফুল বিল্বপত্র সাজাইতে লাগিল। ভ্রমরকৃষ্ণ দীর্ঘ কেশ পৃষ্ঠদেশে এলায়িত। পরিধানে লাল চেলি। মুখে স্বর্গীয় সুষমা। ছেলেটি মস্ত বড় একটা পিতলের ধুনুচিতে ধূপ নিক্ষেপ করিতেছিল। অবাক্ দৃষ্টি ফেলিয়া জমিদার কিশোরীর দিকে চাহিয়া রহিল—যেন একখানি জীবন্ত প্রতিমা!

দুর্গাশঙ্কর স্বয়ং পূজায় বসিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা তন্ত্রধারক। দেবীর মুখে প্রসন্ন হাসি।

পূজার পরে ভোগ হইল। ভোগান্তে প্রসাদ পাওয়ার ধুম পড়িয়া গেল। চাষী-প্রধান নন্দগ্রামে পূজার এই তিন দিন অরন্ধন।

দুর্গাশঙ্কর স্বয়ং আসিয়া অভ্যাগত রমেশবাবুদের আহারের জন্য অনুরোধ করিলেন।

জমীদার বলিলেন, "সন্ধি পূজার আগে আমি খাইনে।"

"আপনি একে অতিথি, তায় ব্রাহ্মণ—উপবাসী ফিরলে কেমন দেখায়!"

"—দুঃখিত হবেন না! আজ আপনার পূজো দেখে আমার যে তৃপ্তি হয়েছে, তার কাছে আহার অতি তুচ্ছ! তবুও এমন পূজোর প্রসাদ আমাকে পেতেই হবে। কাল এসে আমি প্রসাদ পেয়ে যাব।" বলিয়াই রমেশবাবু যাবার উদ্যোগ করিল। এমনি সময়ে কিশোরিটি আসিয়া বলিল, "বাবা! সন্ধি পূজোর জোগাড় কী এখন করবো?"

"আর একটু পরে। তোমার ছেলেমেয়েদের খাওয়া শেষ হলো?" বাড়ুজ্যে প্রশ্ন করিলেন।

"—হ্যাঁ!"

"এঁকে প্রণাম করো" দুর্গাশঙ্কর আঁখি কোণে ইশারা করিলেন।

রমেশবাবুকে ভূনত প্রণাম করিয়া মেয়েটি চলিয়া গেল।

"এটী কী আপনার কন্যা?" জমিদারের সাগ্রহ প্রশ্ন।

"হ্যাঁ"।

"বিয়ের জোগাড় করছেন?"

"করছি কিন্তু কূল-কিনারা পাই কৈ। যে কঠিন দিন—দাবী পূরণের সাধ্য আমার নেই। দেখা যাক মায়ের কি ইচ্ছা।" দুর্গাশঙ্কর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

"এমন প্রতিমার মত মেয়েরও আবার বিয়ের ভাবনা!"

"রূপ-গুণের খনি হলেও বা আর দেখে কে? টাকাই এ-যুগের বড় কথা এবং সেইটারই আমার অভাব। মহামায়ার ইচ্ছায় একটা ব্যবস্থা হবেই, এই যা আমার ভরসা।" বলিয়া দুর্গাশঙ্কর প্রতিমার দিকে চাহিলেন।

## ৩

বিজয়ার পর দিন। সকাল বেলা একখানি মোটর দুর্গাশঙ্করের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের কাছারির গমস্তা হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিল। চারিদিক ঘিরিয়া উৎসুক জনতার ভীড়।

ত্রস্তব্যস্ত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক দুর্গাশঙ্কর বলিলেন, "আসুন! আসুন! সে দিন নিজের পরিচয় দেননি, পরে তা জানতে পেরেছি। মায়ের পূজো নিয়ে এমনি ব্যস্ত ছিলাম যে, উপযুক্ত সমাদরও ক'রতে পারিনি। আমার এ দরিদ্রের কুটিরে যে পদধূলি দিয়েছেন—সেটা আপনার অহেতুক কৃপা।"

হাসিয়া রমেশ বাবু বলিলেন, "অতখানি বিনয় যদি দেখান, তা হ'লে কিন্তু আমাকে এখান থেকেই ফিরতে হয়! বিজয়ার নমস্কার কোলাকুলি আর আশীর্ব্বাদের জন্যেই এসেছিলুম আমি।"

"আমার অতি বড় সৌভাগ্য!" দুর্গাশঙ্করের কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

পারস্পরিক অভিবাদনান্তে দুর্গাশঙ্কর ভিতরে গিয়া কন্যা মায়া এবং পুত্র সুধাংশুকে ডাকিয়া আনিলেন।

একহাতে একখানি শ্বেত পাথরের রেকাবীতে নারিকেলের রসকরা এবং চন্দ্রপুলি, অপর হাতে শ্বেত পাথরের গেলাসে জল লইয়া মায়া আসিল এবং রমেশবাবুর সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে ভূনত প্রণাম করিল।

রমেশবাবু মায়াকে সস্নেহে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "আমার মা হ'তে হবে কিন্তু তোমাকে। অতো দূরে থাকলে তো চ'লবে না আর!"

দুর্গাশঙ্কর বলিলেন, "আপনি আশীর্ব্বাদ করুন আমার মায়াকে!"

"আপনার মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করতেই তো এসেছি, বাঁড়ুয্যে মশাই! তাই তো বললুম্ আমার মাকে!"

রমেশবাবু পকেট হইতে একগাছি নেকলেশ্ বাহির করিয়া মায়ার গলায় পরাইয়া দিলেন।

"ও আবার কেন দিচ্ছেন! আপনার আশীর্ব্বাদই ওর যথেষ্ট!" দুর্গাশঙ্করের স্বরে বিস্ময়।

হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি দুর্গাশঙ্করের দিকে তুলিয়া জমিদার রমেশচন্দ্র বলিলেন,—"আমার ছেলের পাত্রীকে কি শুধু হাতে আশীর্ব্বাদ ক'রব, বাঁড়ুজ্যে মশাই? আমাদের বংশের নিয়ম তো তা নয়! তাই আজ তুচ্ছ হারগাছটি দিয়েই সারলুম এ কাজ! এরপর পুরোহিতকে নিয়ে আসবো যে দিন, সেই দিন মায়ের উপযুক্ত অলঙ্কার-আভরণ দিয়ে মাকে সাজাবো। অগ্রহায়ণের দোস্‌রা যে বিয়ের দিনটি আছে, সেই দিনেই এ শুভ কাজ হবে, কি বলেন?"

আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া দুর্গাশঙ্কর রমেশ বাবুর দু'খানি হাত জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, "আপনি সত্যিই মহৎ।"

রমেশ বাবু বলিলেন, "উল্টো বলছেন বাঁড়ুজ্যে মশায়। সত্যিকার ধনের অধিকারী আপনি আর আপনার এই কন্যা মায়া। আপনার মেয়েকে আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আমার ঘরেও ভক্তি বিশ্বাসের বীজ রোপণ করতে চাই আমি! তবেই সার্থক হবে আমার মায়ের পূজা!"

---

# অভিসার

**শ্রীক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য্য**

আজি বরষা ভরা ভাদরে
ঝুরে বিরহী আঁখি অঝোরে;
দেখি আকাশ কাল সঘন
মাগে পরাণ- বঁধু মিলন।

পারে মেদুর রবে মাদল,
করে বিরহী হিয়া মাতাল,
পথ পিছল ভারি মাঠাল
তাহে আঁধার ঘন ঘোরাল।

ভরা বেথুয়া* আজি প্রখরা
ঝরে ভাদর ধারা অঝোরা।
মেঘে গরজে ঘোর করকা
তবু লছিয়া চলে অরোখা।

বন পাথারে ডাকে দাদুরী,
গাহে ঝিঁঝিরা সাথে ঝিবুরি।
চুপি লছিয়া† চলে চমকি
দেখি বিজুরি হাসে মুচকি।

ঘোর ঘুরনি পাকে বেথুয়া,
চলে উছল ছল রুখিয়া।
ঝর নিঝর ঝরে বরষা
রোষে শ্বসিছে নিশা তমসা।

দূরে ওপারে তার বসতি,
ঘন আঁধার রাত নিশুতি,
কাঁপে তরুণী হিয়া তরাসে
চলে চরণ তবু পিয়াসে!

তীরে থমকি থামি কিশোরী
যেন ক্ষণিক থির বিজুরী।
ঝপ ঝাঁপিয়ে নীরে প্রবেশে
নিশি মুদিল আঁখি তরাসে!

---

* বেথুয়া—একটি পাহাড়ে নদী। † লছিয়া—কুলী রমণী।

# স্মৃতির পটে মেলেন্দহ

[ সঙ্ঘ-সেবক ]

জীবনের ধর্ম্ম সৃষ্টি। এই সৃষ্টিমন্ত্রে দীক্ষিত প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ জাতি সাধনার নব প্রবাহ বাংলায় বহিয়া আনিয়াছে। সেই একই প্রবাহ চন্দননগর, কলিকাতা, চট্টলের পুণ্যক্ষেত্রে সঞ্চারিত হইয়া যে নব জাতিগঠনের শক্তিপীঠ রচনা করিয়াছে, তাহা আজ আর দেশের কাছে অপরিচিত নহে। দীর্ঘদিনে শুধু ভিত্তি-প্রতিষ্ঠাই হইয়াছে—এ ভিত্তি সঙ্ঘজীবনের, কেন না সঙ্ঘই জাতির ভ্রূণমূর্ত্তি। সঙ্ঘের আদর্শ জাতি—ভাগবত জাতি। ভারতে এই দিব্য জাতীয়তার কল্প-স্বপ্নই সঙ্ঘ দেখিয়াছে। যাহা কল্পে দৃষ্ট, তাহা স্থানে, কালে অনিবার্য্যক্রমে প্রকাশ পাইবেই। ধীর ও বীর সাধক সে প্রেরণাকে অন্তরের বিশুদ্ধ ক্ষেত্রে ধারণা করিতে পারিলেই হইল—অন্তর-ধৃত বীর্য্য উৎসর্গের ক্রম ধরিয়া ধীরে, ক্ষিপ্রে আত্মপ্রকাশ করিবেই। মরণের ব্যবধানেও বুঝি এ উৎসর্গের আকৃতি আত্মপ্রকাশে বিরত হয় না।

ইষ্টের নির্দ্দেশ ছিল—বাংলার পঞ্চ রাজনৈতিক বিভাগে পাঁচটি ধর্ম্মবীর্য্যের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সী ও চট্টগ্রাম বিভাগে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের এই গুরুনির্দ্দেশ রূপ লইয়াছে। অসংখ্য অগ্নি-পরীক্ষায় কষিয়া যে সৃষ্টি রূপ, তাহার মধ্যে ভেজাল কিছুই নাই—তাই শত বিপর্য্যয়ে আবর্ত্তনেও এই অচল অটল সঙ্ঘ-কেন্দ্রগুলি ভারতের সনাতন কৃষ্টি ও সাধনার যে উজ্জ্বল হোমশিখা জ্বালাইয়াছে, তাহা সহজে নিভিবার নহে। জাতির বাঁচার ইচ্ছাই আজ জাগ্রত, বৃহবদ্ধ হইতে চায়। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ ইহারই অগ্রণী—সংহতি-যন্ত্র।

আমরা বাঁচিব—জাতি-রূপে বাঁচিব। সাধনা বাঁচিবারই জন্য। যেখানে বাঁচিবার ইচ্ছা, সেখানে সঙ্ঘের সাধনা অভিপ্রকাশ করিবেই। কেননা, সঙ্ঘই আজ বঙ্গীয় হিন্দু চৈতন্যের ঘনীভূত প্রকাশ মূর্ত্তি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সঙ্ঘ বাংলা ও বাঙালী হিন্দুর বাঁচিবার অমর ইচ্ছা বুকে ধারণ করিয়া দেশের তিনটি বিভাগে কেন্দ্রস্থ হইলেও অপর দুই রাজনৈতিক বিভাগ—ঢাকা ও রাজসাহী ডিভিশনে—এখনও স্বপ্রতিষ্ঠ কেন্দ্র স্থাপন করিতে পারে নাই। এই অপূর্ণ আকৃতি পূরণ করার স্বতঃ-প্রেরণা এক গৃহস্থ আত্মায় ফুটিয়াছিল, সে আত্মা আজ বহু দূরে—মরণের পরপারে। কিন্তু তাহার মরণজয়ী সাধনা ধীরে ধীরে যোগ্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে। এই উৎসর্গের অবদানে তীর্থ রচনা বলিয়াই তো প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সংগঠন-তপস্যা এত দীর্ঘসূত্রী, তাহাতে কর্ম্মের আগে, মাঝে ও পরে ধ্যান-ধৃতিরই এত গূঢ় রঙ্গ।

এবার মৈমনসিংহে প্রবর্ত্তক রজত-জয়ন্তী উৎসবের ষষ্ঠ মাসিক অনুষ্ঠানোপলক্ষে গিয়াছিলাম—বিশেষ এই একটী অভিলাষও অন্তরে লইয়া যে, সহতীর্থ যোগেন্দ্র-নাথের স্মৃতি-তীর্থ দর্শন করিব। গৃহস্থ-সন্তান যোগেন্দ্র-নাথ। মৈমনসিংহ সহর হইতে রেলপথে প্রায় ৪১ মাইল দূরে, এক নিভৃত পল্লীক্ষেত্র মেলেন্দহে তাহার জন্ম ও কর্ম্ম নিবদ্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সিংহজানি জংশন হইতে মিটার গেজ রেলে দুইটী মাত্র ষ্টেশণ পরে দাগী ষ্টেশন। ইহারই উপান্তে মেলেন্দহ। সহরের উৎসব শেষ হইলে, আমরা কয়েকজনে এই মেলেন্দহে গিয়া কয়েক রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম। একদিন এই মেলেন্দহ জনবহুল, সমৃদ্ধ পল্লীই ছিল। তখন লোহ-জঙ্ঘা তটিনীর তীরে তীরে মৈমনসিংহের বিখ্যাত জমিদারগণের বিশাল অট্টালিকা বসতবাটী প্রতিষ্ঠিত ছিল। অনতিদূরে ব্রাহ্মণ পল্লী—এখানে শত শত বিদ্যাজীবী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সপরিবারে বাস করিতেন। পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর ও কোটালীপাড়ার পরেই এই স্থানটীর সংস্কৃত বিদ্যা চর্চ্চার জন্য সুখ্যাতি ছিল। শস্যশ্যামল উর্ব্বর ক্ষেত্রে পাট, ধান ও পানের বরজ পল্লীবাসীর শ্রী-সম্পদের উৎস ছিল। মেলেন্দহের সে সুখ-সৌভাগ্যের দিন শেষ হইল, যেদিন ১৩০৪ সালের দারুণ ভূকম্পে, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে লোহজঙ্ঘা তটিনী দিক্-পরিবর্ত্তন করিল। ধনী জমিদারগণ পল্লী-ভবন ছাড়িয়া সহরে প্রস্থান করিলেন। অট্টালিকা ধ্বংসাবশেষে পরিণত—পল্লীর শ্রীমূর্ত্তিও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল।

এমন করিয়া ভৌগোলিক বিপর্য্যয়ে, নদ-নদীর গতি পরিবর্ত্তনের সহিত বাংলায় পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের কত সোণার ক্ষেত্র শ্মশান হইয়া গিয়াছে, তার ইয়ত্তা কে রাখিয়াছে।

২১ বছর আগের কথা। এই মেলেন্দার সম্পন্ন লোহ-পরিবার হইতে যুবক যোগেন্দ্রনাথ "প্রবর্ত্তকে"র ডাক শুনিয়াছিল। "প্রবর্ত্তকের" "পাগলের চিঠি"র মধ্যে যে আকুল করা আহ্বানের সুর ছিল, তাহাই তাহাকে পাগল করিয়া ঘরের বাহির করাইল। তারপর স্বপ্নদৃষ্ট মহাগুরুর সন্ধানে তিন বন্ধু রওনা হইয়া, পরিশেষে "প্রবর্ত্তকে"র জাগ্রত বিগ্রহের দুয়ারে উপনীত ও সেইখানেই অপার্থিব দীক্ষালাভ—এ সব কাহিনী নহে, সত্য ইতিহাস তাহারই মনের আলিপনায় "প্রবর্ত্তকে"র বুকেই আঁকা আছে।
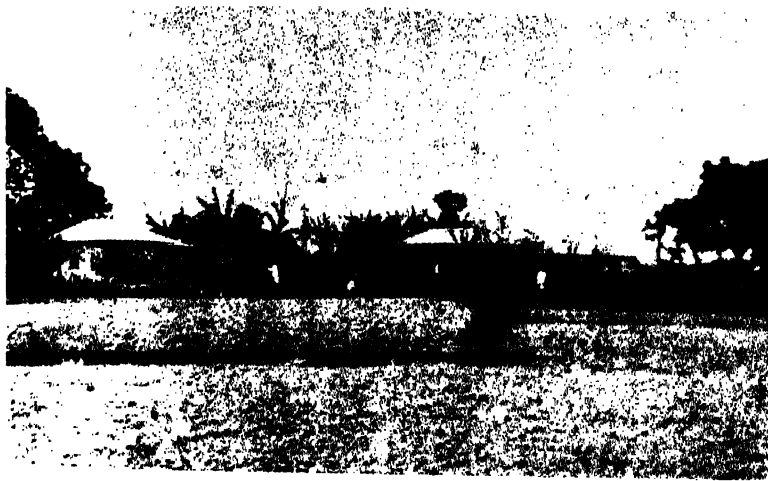
প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ মেলেন্দহ আশ্রম, ময়মনসিংহ

যোগেন্দ্রনাথের কথা "ভাই, স্বপ্ন আমার প্রত্যক্ষ হয়েছে। আমি আজ সেই কল্পের নিধিকে প্রত্যক্ষের সঙ্গে মিলিয়ে নিতেই ব্যস্ত—দীক্ষা আমার ব্যর্থ হয় নি! ধনসম্পদ্ তুচ্ছ, সব দিয়ে, হৃদয়ের অনুরাগ নিঃশেষে ঢেলে আমি যে মহামৃতের আস্বাদ পেয়েছি, তা আমার জন্মজন্মান্তরের পাথেয়।"

যোগেন্দ্রনাথের উৎসর্গ সত্যই সার্থক হইয়াছে। দেখিলাম—তার পৈতৃক বাস্তুভিটা সমূলে উৎখাত হইয়া, উহা আজ পাটের ক্ষেত্রে পরিণত। লোহ-পরিবার স্থানান্তরিত, আশ্রম-সন্নিহিত নব গৃহে তাহারা উঠিয়া আসিয়াছে। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র—সকলেই অখণ্ড ভক্তিসূত্রে তাহার স্মৃতি-রক্ষার্থে নব ক্ষেত্রে সম্মিলিত। আর তাহারই স্বপ্ন-সৃষ্টির আকৃতি অন্তরে বহন করিয়া পতির উৎসর্গ-দীক্ষিতা ধর্ম্মপত্নীট মেলেন্দহে আশ্রমের বেদীরক্ষায় নিয়োজিতা। এ কি অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা-তর্পণ!

মেলেন্দহের আর একটী স্মৃতি ভুলিবার নয়। ভক্ত রোহিণী বন্দ্যোর পূজাগৃহ—নিভৃত পল্লীকোণে তার উপাসনার আসন। রোহিণী যোগেন্দ্রনাথেরই এক দূর প্রতিবেশী—নিরক্ষর দরিদ্র গৃহস্থ সন্তান। যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গ তার প্রাণে পুণ্যপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আট বৎসর পূর্ব্বে সে সঙ্ঘের উপাসনা-মন্ত্র কবে কখন হৃদয় দিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল, কে জানে! আপন মনে, ঘরের কোণেই সে আসন পাতিয়া নিয়মিত উপাসনা করিত। দরিদ্রের কুটীর—বুঝি স্থানের অকুলান হওয়ায়, সে একদিন গ্রামের বারোয়ারী তলায় একখানি কুটীর বাঁধিয়া, সেইখানেই নীরবে আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিল! যোগেন্দ্রনাথ তখন আর ইহলোকে নাই। পাড়ার মাতব্বরের তাহার এই সরল ভক্তিমূলক আচরণে দুষ্ট স্বার্থ আবিষ্কার করিয়া, তাহার উপর যথেষ্ট উৎপত্তি ও অত্যাচারে কুণ্ঠা করে নাই—কিন্তু ভক্ত রোহিণী ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। আজ প্রভুর কৃপায়, সে সকল বাধামুক্ত হইয়া, সেই পল্লীকুটীরে, স্নিগ্ধ মনোরম প্রেমের পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে। রোহিণী বন্দ্যো আজ সঙ্ঘগুরুর আহ্বানে সঙ্ঘের তীর্থেই আনুষ্ঠানিক মন্ত্র-দীক্ষা লাভ করিয়াছে। তাহার ইষ্টদেবতার প্রদত্ত রুমালখানি একটী কৌটায় ভরিয়া চির-বরণীয় আশিষেরই চিহ্নস্বরূপ আসনের উপর সাজাইয়া রাখিয়াছে। আর আসনের মধ্যকেন্দ্রে ধূপধূনা-চর্চ্চিত ও পুষ্পপূজিত সঙ্ঘগুরু ও সঙ্ঘ-জননীর দুইখানি পটচ্ছবি সযত্নে সংস্থাপিত। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের দীক্ষামন্ত্র কোন নিগূঢ় সূত্রে পল্লীহৃদয়ে সংক্রামিত হইয়া, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে তার অধ্যাত্ম-করুণা ও আশীর্ব্বাদের ধারা ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত করিয়া তুলিতেছে—রোহিণীর এই উপাসনার আসনই তার একটি অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত। এ অনন্যসাধারণই সাধারণ হওয়ার সম্ভাবনা আমি দেখিতেছি। বিনা আড়ম্বরে, কোনরূপ ঘটা না করিয়া, পল্লীর কুটীরে কুটীরে যে ভক্তি-নিষ্ঠার উৎস-সৃষ্টি আমার চক্ষে আজ ভাসিতেছে, তাহারই অগ্র-প্রতীক রোহিণী বন্দ্যো।

বৃক্ষকুঞ্জ-শোভিত শান্ত, সুন্দর আশ্রমটী। চারিদিকে খোলা মাঠ। আশ্রমের ভিতরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—ঠিক যেন একটী প্রাচীন তপোবন। কেন্দ্র স্থানে উপাসনা মন্দির। একটু দূরে দুই প্রস্থ আবাস-কুটীর। তাহারই পার্শ্বে অঙ্গন। অঙ্গনে বিশাল বটবৃক্ষ—তলদেশ প্রস্তর-বেদী বেষ্টিত। এইখানেই যোগেন্দ্রনাথের দীর্ঘ স্মৃতিস্তম্ভ। স্থানটী বেশ স্নিগ্ধ, সুগম্ভীর। সহজেই মন ধ্যাননিমীলিত হইয়া আসে। আশ্রম-রক্ষার ভার-প্রাপ্ত তরুণ জিতেন্দ্রনাথ—ভোরে ৪৷৷০ টায় উঠিয়া উদাত্ত কণ্ঠে যখন উপাসনা-মন্দিরের চারিদিকে মুখ ফিরাইয়া শঙ্খধ্বনি সহ চারিবার বেদ-মন্ত্রের উদ্গান তুলিল, মনে হইল মেলেন্দার নৈশ আকাশ, বাতাস, কানন, প্রান্তর, ঝঙ্কারিত, প্রকম্পিত করিয়া মুমূর্ষু হিন্দুর ঘুমন্ত প্রাণে তাহা ঘা দিতেছে। এমন দিনের পর দিন রোজ অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীতে মুসলমানের আজান ধ্বনিরও আগে হিন্দুর যৌবন-কণ্ঠে এই যে জাগরণের তূর্য্যনাদ—এর যে কত বড় স্থায়ী ও দূরব্যাপী প্রভাব তাহা এখানে না আসিলে ঠিক বুঝা যায় না। চতুর্দ্দিকে মুসলমান বসতি—তারই মাঝখানে এই প্রায় নির্জ্জন হিন্দু আশ্রম—একটী হিন্দু তরুণের কণ্ঠে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ এখানে দিনের পর দিন জাগরণের শঙ্খ প্রথম প্রভাতেই ফুৎকার দিয়া যায়—মন্ত্রের মহিমা-প্রভাবে একজন হিন্দুই হিন্দু-জীবনের শক্তি ও গৌরব রক্ষা করে! দেখিয়া মনে বড় গর্ব্ব ও আনন্দ হইল! রাজনীতি, সমাজনীতি, এমন কি অর্থনীতিও গৌণ কথা—সঙ্ঘ ঠিক নীতিই ধরিয়াছে—এই অধ্যাত্মজাগরণই সর্ব্বপ্রথম চাই। ইহা যদি সিদ্ধ হয়, হিন্দুর প্রাণশক্তির স্বচ্ছ স্বতঃস্ফুরণে এই ধর্ম্মনীতিকেই ঘিরিয়া তাহার ঋদ্ধি, সিদ্ধি সবই আবার ফিরিয়া আসিবে।

অপরাহ্নে আশ্রমে পল্লীসভা বসিল। ঠিক সভা নয়, বৈঠক। সময়ের অভাবে অদূর পল্লীপ্রান্ত হইতে প্রায় ৩০।৩২ জন সঙ্ঘের অনুরাগী সুহৃদকে লইয়া আশ্রম-সংলগ্ন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টীর সুপরিচালনার ব্যবস্থার জন্য এই বৈঠকের আহ্বান স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ করিয়াছিলেন। মৈমনসিংহ জেলার অন্য সর্ব্বত্রের ন্যায় মেলেন্দহেরও শতকরা ৯০ জন হিন্দু আজ শত-করা ১৫ জনে ঠেকিয়াছে। ইহারা তাহাদেরই প্রতিভূ। পল্লীর এই কয়েকজন হিন্দু প্রতিনিধিকে দেখিয়া ও তাঁহাদের কথা শুনিয়া প্রাণে কিছু আশার আলো ঝিলিক্ দিল। সঙ্ঘের দুর্জ্জয় প্রাণের তাঁহারা আশ্রয় চাহেন—এই বাঁচিবার অমর ইচ্ছার সহিত যুক্ত হইতে পারিলেই তাঁহারাও আশা পান, উৎসাহ পান। শুধু বুঝিলাম—প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ রাষ্ট্রনীতি দূরে রাখিয়াও, ভূয়া কথায় নহে, প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দনেই হিন্দু-সমাজে যে সাড়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাই হিন্দুকে সত্যই জীবনের অমৃতাস্বাদ দিবে—তাহাকে শক্তিমান্ করিয়া তুলিবে। ক্ষুদ্র গ্রাম্য-বিদ্যালয়টী রক্ষা ও উন্নত করা উপলক্ষ্য—এই উপলক্ষ্য ধরিয়া পল্লীর হিন্দুপ্রাণ আপন বাঁচিবার ইচ্ছাই উজ্জ্বল, পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছে। কর্ম্ম ও আত্মবাদী হিন্দুজাতি সঙ্ঘের সংস্পর্শে কর্ম্মেরই নব দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অধ্যাত্ম-জাগরণের অমর দ্যোতনায় বিনা প্রতিবাদ বা প্রতিরোধমূলক আন্দোলনে পূর্ব্ব-পশ্চিম উভয় বঙ্গেই স্বাধিকার ও স্বপ্রতিষ্ঠা সৃজন করিয়া লইবে। এই তো নির্ম্মাণের আহ্বান। এই তো সঙ্ঘের সংগঠন-নীতি। মেলেন্দায় সংগঠনের বীজশক্তি পড়িয়াছে। এই পল্লী হইতেই প্রাণাগ্নির স্ফুলিঙ্গ নগরে, সহরে একদিন ছড়াইয়া পড়িবে। আগে পল্লীরক্ষা, তারপর নগরীর সংগঠন ও সংরক্ষণ। সঙ্ঘের এই ক্রমই চন্দননগরে ও চট্টলে স্বতঃ অনুসৃত হইয়াছে; মৈমনসিংহের ক্ষেত্রেও এই একই নীতি সফল হওয়ারই সম্ভাবনা। ভিতরে এই আশার কথাই জাগিতে লাগিল—যোগেন্দ্রনাথের আত্মদান তো নিরর্থক হইবার নহে, মেলেন্দহের মাটীতে যে উৎসর্গের ধর্ম্মবীর্য্য পড়িয়াছে—ধৃতিমান্ সাধকের আশ্রয়ে সমস্ত পল্লীপ্রাণকেই ব্যূহবদ্ধ করিয়া, হিন্দুর সংহতিবদ্ধ জাতীয় জীবনের তাহা কি অন্যতম বেদী-রচনা করিয়া তুলিবে না?

# শারদশ্রী

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

নন্দন বনতলে প্রস্ফুটিতা নির্ম্মল গগনের অঙ্গনে
চন্দন পঙ্কিলে উচ্ছ্বসিতা। নির্জ্জন কাশবনে সঙ্গোপনে।
সন্ধ্যার স্নিগ্ধ বাসে শারদীয়া সন্ধ্যার লক্ষ দলে।
মঞ্জুল মন্দার মুগ্ধ হাসে। বিকশিত হ'ল ধরা বক্ষ তলে॥

# সাময়িকী

## কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

পূজার এই আনন্দকোলাহলের মধ্যে বাংলার মুকুটমণি রবীন্দ্রনাথের আকস্মিক অসুস্থ সংবাদ দেশের চিত্ত ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।
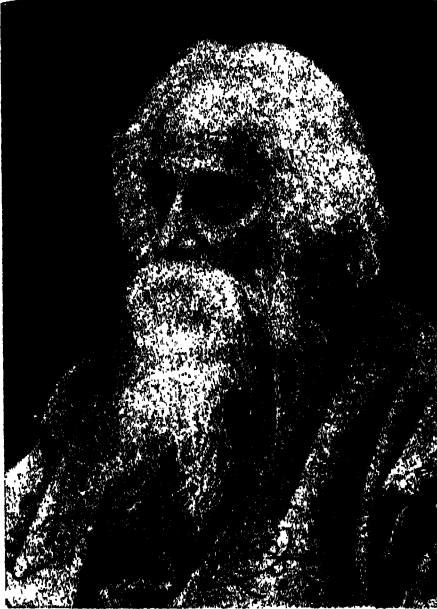
কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা প্রার্থনা করি, তিনি অচিরে আরোগ্যলাভ করুন এবং শতায়ু হউন।

## প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেডের বার্ষিক অধিবেশন

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার প্রবর্ত্তক ভবনে প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেডের সভ্যগণের বার্ষিক অধিবেশন হয়। উক্ত কোম্পানীর স্থায়ী সভাপতি পূজনীয় শ্রীমতিলাল রায় সভাপতিত্ব করেন। সেক্রেটারী মহোদয় কর্ত্তৃক গত বর্ষের কার্য্যবিবরণী এবং আয় ব্যয়ের হিসাব পঠিত হইলে, আগামী বর্ষের জন্ম শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীরাধারমণ চৌধুরী, শ্রীইন্দুভূষণ রায়, শ্রীফণিভূষণ রায়, শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক, স্বামী অমৃতানন্দ ও স্বামী বোধানন্দ ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় সঙ্ঘের অর্থ-সাধনার জাতি-গঠনমূলক উদ্দেশ্য, ভাব ও আদর্শের কথা দৃঢ়তার সহিত অভিব্যক্তি দেন।

## বালক যাদুকর দেবকুমার ঘোষাল

স্বাভাবিক প্রবণতা মানুষের যে জন্মসিদ্ধ সে পরিচয় বালক যাদুকর শ্রীমান দেবকুমারের মধ্যে আমরা পাই। মাত্র ১২ বৎসর বয়সে যাদুবিদ্যা সম্বন্ধীয় যে প্রবণতা তার মধ্যে পরিস্ফুট হয়, সৌভাগ্যক্রমে বিখ্যাত যাদুকর গণপতির সংস্পর্শে আসিয়া অচিরকাল মধ্যেই তার সফল বিকাশ হইবার সুযোগ ঘটে। বর্ত্তমানে শ্রীমানের বয়স মাত্র ষোল, কিন্তু সুনিপুণ কুশলতায় অনেক অভিজ্ঞকেও শ্রীমান ছাড়াইয়া গিয়াছে

শ্রীদেবকুমার ঘোষাল

বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না। সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ এখনও শ্রীমানের সম্মুখে। সনিষ্ঠ ও আত্মস্থ হইয়া সাধনা করিলে উন্নতির চরম শিখরে উঠিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা তার আছে।

## প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ কলিকাতা-অর্থকেন্দ্রের নবম বার্ষিক উৎসব

১৪ই সেপ্টেম্বর শনিবার সায়াহ্নে বৌবাজার ষ্ট্রীটস্থ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ কলিকাতা অর্থকেন্দ্রের নবম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এক জনসভা হয়। রায় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী এম, এল্, এ, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় এক সুচিন্তিত বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। তাহাতে দেখা যায়, সঙ্ঘের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতেছে। প্রবর্ত্তক জুট মিল চালাইবার মত সকল ব্যবস্থা সমাপ্ত হইয়াছে। প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক গত বৎসর শতকরা ৫৲ টাকা ডিভিডেণ্ড দিয়াছে এবং শীঘ্রই তাহাকে সিডিউল্‌ড (scheduled) ব্যাঙ্কে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। প্রবর্ত্তক কার্ণিশার্সকে আরও বৃহৎ ভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য যৌথ কারবারে পরিণত করা হইতেছে। অবশ্য যুদ্ধের জন্য এই বৎসর ব্যবসায়ে অসুবিধাও অনেক ভোগ করিতে হইয়াছে, বিশেষভাবে প্রবর্ত্তক মেসিনারী বিভাগের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিঘ্নিত হইয়াছে। রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় যে, সঙ্ঘের কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানসমূহে ন্যূনকল্পে দুই হাজার পরিবারের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিদেশী শাসনকর্ত্তৃপক্ষের ও দেশের স্বার্থ মূলতঃ বিভিন্ন হওয়ায় বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগে ভারতে আশানুরূপ স্থায়ীভাবে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারলাভ সম্ভব হয় নাই। যদিও যুদ্ধোপকরণ-নির্ম্মাণজনিত গৌণভাবে কিছু লোকের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। পাটের মূল্য হ্রাসজনিত কৃষিপ্রধান বাংলার আর্থিক পরিস্থিতি ভয়াবহ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা। জাতীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী ও ঔদাসীন্যের ফলে বাংলার সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক জীবনে এক বিষময় প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। নেতৃমণ্ডলীও সঠিক নির্দ্দেশ দিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের বাণীতেও জাতির মৌলিক কৃষ্টি-বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি-স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধীয় সঙ্কেত সুস্পষ্ট নয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙালীর পশ্চাতে পড়িয়া থাকার কারণ: আত্মবিশ্বাস ও সংহতি শক্তির অভাব, শ্রমের ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগের কুণ্ঠা, বাস্তবকে অবহেলা করিয়া ভাবপ্রবণতা ও রাষ্ট্রীয় আদর্শবাদের দিকে অধিকতর আকর্ষণ এবং সর্ব্বশেষে ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞতা।

সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় মহাশয় সঙ্ঘের এই কর্ম্মের পিছনে যে শক্তি ও সাধনা আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন এবং জাতি-গঠন কল্পে ১০ বৎসরের একটী গঠনমূলক পরিকল্পনার উল্লেখ করিয়া ২ কোটী ২২ লক্ষ হিন্দুকে বাঁচাইবার ও সঙ্ঘবদ্ধ করিবার উপায় নির্দ্দেশ করেন। ইহার জন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট ১০ লক্ষ টাকার জন্য আবেদন করেন এবং বলেন যে, এই জাতিগঠনের জন্যই সঙ্ঘের অর্থ-সাধনাকে ব্যাপকতর করিয়া তুলিবার এত প্রচেষ্টা করা হইতেছে। হিন্দুর সেই বেদমূলক কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করিয়াই হিন্দু দাঁড়াইবে। দক্ষিণেশ্বরের সাধনা ব্যর্থ হইবে না—তাহার মর্ম্মোপলব্ধি করিয়া হিন্দু-সংগঠনের নূতন মন্ত্র প্রচার করিতে হইবে।

সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় এক সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—প্রবর্ত্তকের বৈশিষ্ট্য, হিন্দুর জীবন নূতনভাবে এক অভিনব গঠনমূলক কর্ম্মপ্রণালীর মধ্য দিয়া গঠন করতে চান। আর কোন সংহতির এমন বাণী আছে বলে' আমি বিশ্বাস করতে পারি না। প্রবর্ত্তক সুদীর্ঘ সাধনা-যুগের অভিজ্ঞতায় বুঝেছে, চরিত্র-গঠন ও দুর্ব্বলতাকে পরিহার
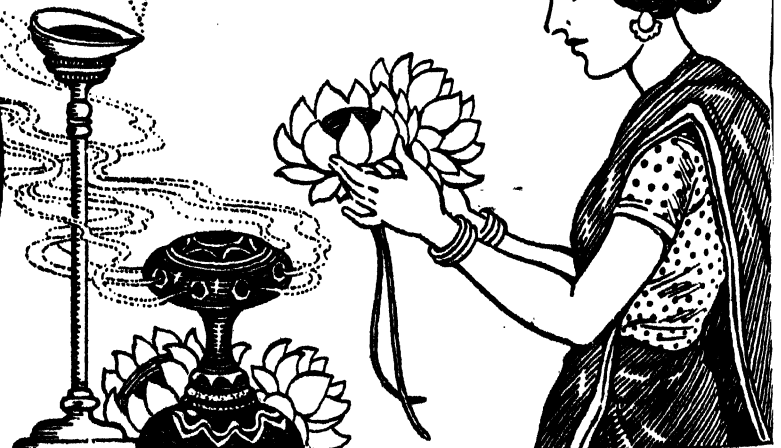
এবং এই গঠিত চরিত্রের উপর কর্মধারার নিয়ন্ত্রণই জাতিগঠনের প্রাথমিক ভিত্তি। বিগত শতাব্দী হইতে হিন্দু বাঙালী-জীবনের ভিত্তি ছিল ভূমি, ধন আর ইংরেজি শিক্ষা। ইহাকে আশ্রয় করেই সে এতদিন নিরাপদ স্বচ্ছন্দে চলে এসেছে। বাইরের আঘাতে আজ এই ভিত্তি-ভূমির ভাঙন ধরেছে। কোন বহিরাশ্রয় তাকে রক্ষা করতে পারবে না। হিন্দু যদি তার অন্তরের ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি করতে পারে, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করতে পারে তবে এ দুর্দ্দিন আবার কেটে যাবে। প্রবর্ত্তকের বাণীর মধ্যে তাই ভরসা পাই। শুধু বাণী নয়, সুচিন্তিত কর্ম্মপ্রণালীরও নির্দ্দেশ মিলে।

অতঃপর কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলে পর সভা ভঙ্গ হয়। কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

### কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রথম প্লাবন মুখে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রজ্ঞেরাও পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছিল। আমরা লক্ষ্য করিয়া আশান্বিত হইয়াছি যে, বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার যুগে ক্রমশঃ এঁরা আত্মসচেতনতায় ফিরিয়া আসিতেছেন। কবিরাজদিগের মধ্যে অনেকেই বিশেষ বিষয়ে গবেষণা ইত্যাদির দ্বারা আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিতেছেন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ সভার সভ্য কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রী হৃদরোগ, পিত্তশূল, সূতিকা, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে তাঁর ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতায় কতকগুলি ফলপ্রদ ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। বিদেশী উপাদানে প্রস্তুত ঔষধাবলীর চেয়ে দেশজাত দ্রব্যে তৈয়ারী ঔষধ যে এ-দেশীয় লোকের অধিকতর ধাতুসহ হইবে, নিঃসন্দেহে বলা চলে।

কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

### প্রবর্ত্তক কর্ম্মি-সঙ্ঘ

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানসমূহে যাঁহারা শ্রম দেন তাঁদের ও কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে একটা সহৃদয় সম্বন্ধ স্থাপনোদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তক কর্ম্মি-সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। ১৫ই সেপ্টেম্বর এই সঙ্ঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায়। সভায় কার্য্যকরী সমিতির বিলোপসাধন ও পুনর্নির্ব্বাচন হয়। আগামী বর্ষের জন্য সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন যথাক্রমে

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অর্থসাধনার মুখ্য অভিপ্রায় সম্বন্ধে সভাপতি বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, অর্থ সঙ্ঘের লক্ষ্য নয়—উপায়। সঙ্ঘ-সাধকের বড় ত্যাগ তার সুকুমার বৃত্তি ও প্রজনন শক্তির অস্বীকার। জাতি-গঠনের প্রথম ধাপ ভাব ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা। সঙ্ঘ তা করার পর অর্থ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। ঋষিকুলের রক্তধারার অধিকারী এ জাতি। বৈদিক সভ্যতাকে অস্বীকার করা অর্থেই পিতা-প্রপিতামহকে অস্বীকার। পরকীয় প্রভাবজাত অর্ব্বাচীন মনোবৃত্তি দেশ ও জাতির সর্ব্বনাশ করছে।

জাতির পুনরভ্যুত্থানকল্পে শুধু creative energyই যথেষ্ট নয়—চাই platform. অর্থের প্রয়োজনও এই সংস্কৃতিকেই জাগানোর জন্য। সঙ্ঘের সংস্কৃতি ভারতেরই জাতীয় সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে যাঁরা শ্রদ্ধা করে তাঁরাই প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের মানুষ। সঙ্ঘের জুট মিল, ব্যাঙ্ক সব কিছুই এই উদ্দেশে নিয়ন্ত্রিত। কর্ম্মি-সঙ্ঘকে এ বিষয়ে অবহিত হতে হবে। এ-জন্য সত্য, সংযম ও সম্বন্ধের আচরণ জীবনে অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। একটা সমষ্টি জীবনে ইহা সিদ্ধ হলে শুধু এই জাতি ধন্য হবে না, বিশ্বমানবও আলো পাবে।

## সঙ্গীত-পরীক্ষায় গীতশ্রী উপাধি

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যতীত কোনো কিছুর মাপকাঠি নির্ণীত হয় না। সঙ্গীতানুশীলনের ব্যাপকতার সঙ্গে এই পরীক্ষা ও উপাধিরও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। সঙ্গীত সম্মিলনীর উদ্যোগে গীতশ্রী উপাধিদানের ব্যবস্থা হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। সম্প্রতি যে অতিরিক্ত পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে শ্রীমতী নন্দরাণী দেবী প্রথম, শ্রীমতী বেলারাণী চৌধুরী দ্বিতীয় এবং শ্রীমতী নীহারিকা দেবী তৃতীয় স্থানাধিকার করিয়া গীতশ্রী উপাধি পাইয়াছেন। ইঁহারা তিনজনই সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ছাত্রী। পরীক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল, ওস্তাদ দবীর খাঁ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ আছেন।

শ্রীমতী নন্দরাণী দেবী

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী



পরিচালক ও প্রকাশক: শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীকালী

[ শিল্পী: নরেন মল্লিক
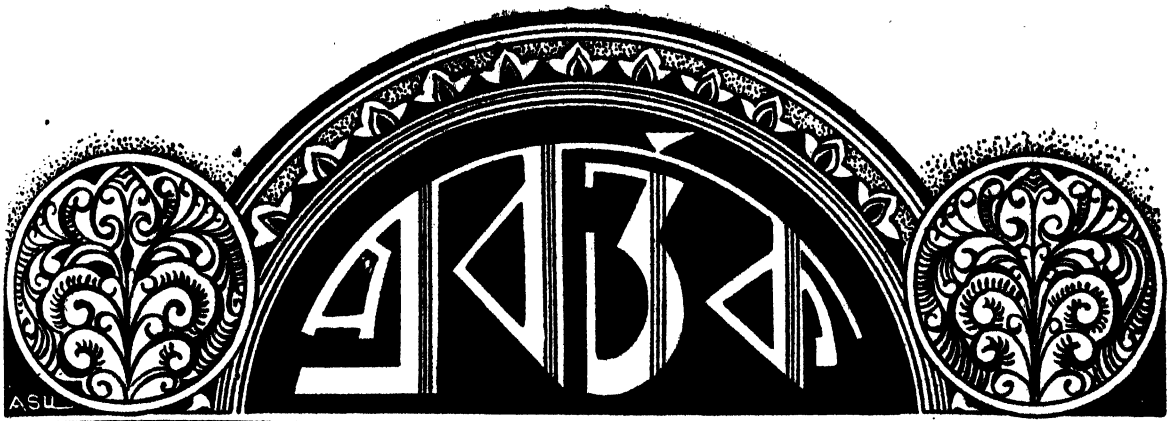
# রজত-জয়ন্তী

## প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ভাব ও কর্ম্মনীতি

সাধনা রক্তের। রক্ত যতক্ষণ বিকৃত, ততক্ষণ সিদ্ধ কর্ম্ম সম্ভব হয় না। রক্ত-বিকৃতি দৈহিক ব্যভিচারে ঘটে, এবং মনের বিকৃতিও রক্ত অশুদ্ধ করে। এই জন্য রক্ত বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে, দেহের চাই স্থৈর্য্য, মনের চাই প্রসন্নতা।

সঙ্ঘের ভিত্তি-রচনা যাহাদের লইয়া, তাহাদের ধ্যান ও উপাসনা, নিয়ম ও আচার স্থিরাঙ্গ হওয়ার জন্য। শরীর স্থূল বস্তু। ইহাকে নিয়মিত ও শৃঙ্খলিত করার জন্য সদাচার অবশ্যগ্রহণীয়। "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ" সত্য, সংযম ও সম্বন্ধের সাধনায় তাহা উপলব্ধি করিয়াছে।

মনের প্রসন্নতা রাখিতে হইলে, আরও কয়েকটী নীতি অবশ্যপালনীয়। শরীরের ন্যায় মনেরও আয়তন আছে। শরীর জড়ধর্ম্মী। মনেরও সূক্ষ্ম রূপ আছে। মনের শোধনের জন্য ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের সঙ্কল্পের দ্বারা স্বভাবজ কাম-সঙ্কল্পকে রূপান্তরিত করিতে হইবে। যে মন জড়-জগতে ছড়াইয়া আছে, তাহাকে গুটাইয়া ঈশ্বর-চৈতন্যে সংযুক্ত করিতে হইবে। নিরাসক্তির সাধনায় এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তারপর মন ঈশ্বরে সতত সংযুক্ত রাখার উপায় —নিরহঙ্কার হওয়া। তন্দ্রাদি-কালে আমি ও আমার বোধ যেমন থাকে না, জাগ্রতে তদনুরূপ অবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। দেহ-মনের অহঙ্কারই অহঙ্কারের সবখানি নয়; এই উভয় ক্ষেত্র হইতে অহঙ্কার-ত্যাগের সাধনা এক প্রকার কৃত্রিম বিনয়ের ছদ্মবেশে কার্য্য করে। তাই অহঙ্কারের বীজভূমি মনের মন যে মহত্তত্ত্ব, তাহার সাধন প্রয়োজন। ইহার জন্য হর্ষ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিতে নির্দ্বন্দ্ব ভাব অবলম্বনীয়। অতএব দেখা যায়—চিত্ত প্রসন্ন রাখার উপায় কামসঙ্কল্প বর্জ্জন করা; নিরাসক্ত, নিরহঙ্কার ও নির্দ্বন্দ্ব হওয়া। এই সাধন-চতুষ্টয় যে পরিমাণে পূর্ণাঙ্গ হইবে, সেই পরিমাণে সঙ্ঘ ভাগবত-জীবন লাভ করিবে। পরিপূর্ণ ভগবানে অবস্থিতি পরিপূর্ণ রক্ত-বিশুদ্ধি ব্যতীত হয় না। "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ" 'মদ্ভাব' অর্থাৎ ঈশ্বর-ভাব শুধু চাহে নাই, 'মদ্গতি'ও চাহিয়াছে। অর্থাৎ ভাগবৎ জীবনের অধিকারী হইতে সে দীক্ষাপ্রার্থী। ভাব বস্তুরূপে পরিণত না হইলে, ইহা সম্ভব নহে। তাই যে সাধনা এতদিন অধ্যাত্ম ছিল, তাহা আমি রক্তে রূপায়িত করিতে চাহি।

প্রশ্ন উঠিয়াছে—সঙ্ঘের যদি জীবন-ভিত্তি ইহাই হয়, তাহা হইলে এই 'সঙ্ঘ' বিশ্বমানবজাতির সমস্যার সমাধান

করিবে কি প্রকারে? মানবধর্ম্ম সাধারণতঃ এইরূপ উচ্চগ্রামে সুর বাঁধিয়া চলে না। 'সঙ্ঘ' যদি উক্তরূপ লক্ষ্যাই জীবনে সিদ্ধ করিতে চাহে, জাতি-সমস্যার ক্ষেত্রে তাহার সাধন কি ব্যাহত হইবে না? এবং তাহা না হইলেও, উক্তরূপ সঙ্ঘ-জীবনের সহিত সমাজ ও জাতি-জীবনের সামঞ্জস্য কোথায়?

উত্তর দিতেছি।

প্রথম প্রশ্ন—জাতি-জীবনের সমস্যা-সমাধানে সঙ্ঘের অভিযান আত্মসাধনার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে কিনা?

ধর্ম্ম যদি সাধ্য হয় এবং ধর্ম্মের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া দিব্য জীবন-গতি লাভ করিতে হয়, তবে ধর্ম্ম-বস্তুটীর সম্বন্ধে সঙ্ঘের প্রকৃষ্ট ধারণা থাকার দরকার। ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ব্যক্তিগত কল্পনা-মূলক হইলে চলিবে না। যে দেশ, যে জাতি ও যে রক্তধারা আমাদের অতীতকে বর্ত্তমানের সহিত যুক্ত রাখিয়াছে, সেই সকলের মৌলিক বিশুদ্ধ চিন্তাধারা অপৌরুষেয় বাণীমন্ত্ররূপে যে ধর্ম্মব্যাখ্যার অনাহত ধ্বনি সৃজন করিয়াছে, তাহার উপরই আমাদের প্রত্যয় স্থির করিতে হইবে।

ধর্ম্ম—জীবের বৃত্তি। ইহা হইতেই আমরা কর্ম্মচোদনা লাভ করি। যাহা শ্রেয়ঃ দেয়, তাহাই কর্ম্ম, তাহাই ধর্ম্ম। যাহা শ্রেয়ঃ নহে—তাহা অকর্ম্ম, অধর্ম্ম। এই এক ধর্ম্মব্যাখ্যা।

আর এক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা আছে। যাহা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স দেয়, তাহাই ধর্ম্ম। উভয় ব্যাখ্যাই একার্থবাচক। শ্রেয়ঃ অভ্যুদয় ও মুক্তির হেতু। অতএব শ্রেয়োমূলক কর্ম্মচোদনা যাহা, তাহাই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম আমার ধর্ম্ম। আমি বলিতেছি, এই হেতু আমার। আমার সংজ্ঞা আছে, আমি হিন্দু—এই হেতু ইহা হিন্দুধর্ম্ম। কিন্তু ধর্ম্মের লক্ষ্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহা মানবের ধর্ম্ম, মানবজাতির ধর্ম্ম। তাই হিন্দুধর্ম্মকে সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম বলিতে কুণ্ঠা বোধ করি না।

ধর্ম্ম—কর্ম্মপ্রেরণা দেয়; আমি তাই কর্ম্মবাদী। যাহা জগদ্ধিতায়, বহুজনহিতায়, তাহা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর কর্ম্ম আর কি হইতে পারে? মানবজাতির অভ্যুদয়-কামনা আমার ধর্ম্ম। এই সাধনা আমার অধ্যাত্ম, সাধন-পথ এই হেতু বিস্মিত হওয়ার কারণ নাই। প্রথম প্রশ্নের এই উত্তর।

দ্বিতীয় প্রশ্নের কথা।

'সঙ্ঘ' যে উচ্চগ্রামে সুর বাঁধিতে চাহিয়াছে, প্রচলিত সমাজ ও জাতি-জীবন তাহা করিতেছে না। এই বেসুরা জীবন-ক্ষেত্রে 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ' সামঞ্জস্য রক্ষা করিবে কি প্রকারে?

জাতির বাহিরটাই সবখানি নহে। সে তার অবিশুদ্ধ চেতনায় যাহা করিতেছে, তাহার মধ্যে সত্যের বীর্য্য নাই। সম্মুখে যে পথ আশার আলোয় ভরে, লক্ষ্য স্থির না করিয়াই সেই পথেই সে ধাবিত হয়। তার সমস্ত জীবনটাই তাই গোলযোগপূর্ণ। গোলযোগ যাহা, তাহার সামঞ্জস্য নাই। 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে' ইহাই বড় সুবিধা, গোলযোগের সামঞ্জস্য করার অন্ধ দৃষ্টি লইয়া চলিলে পদে পদে সে ব্যর্থ হইত। সে সামঞ্জস্য চাহিতেছে বিশুদ্ধ প্রকৃতির বিচিত্র গতির মধ্যে। এইখানে সামঞ্জস্যের এক সনাতন ক্ষেত্র আছে। সেই ক্ষেত্রের উপর মানবাত্মার উঠিয়া দাঁড়াইবার আকাঙ্ক্ষাই মৌলিক প্রেরণা। এইখানেই সঙ্ঘের জাতি-গঠনের কাজ নিহিত। আর এই ক্ষেত্রে অধ্যাত্মশক্তিপূত প্রবল জাতি যদি গড়িয়া উঠে, বিশ্বমানবের অপূর্ণ স্বভাব-বশতঃ অসংখ্য জটিল সমস্যা যতই থাক, ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠ জাতি তাহার সমাধান নাই, এই জ্ঞানে যে নীতি প্রবর্ত্তিত করিবে, তাহাতে ক্রমবিকাশমান মানবজাতি অপূর্ণ স্বভাব হইতে পূর্ণতর স্বভাবে উপনীত হওয়ার সুপথ খুঁজিয়া পাইবে। বিশ্ব-রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে নব-নীতি-প্রবর্ত্তনের আকুলতা রুদ্রমূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে, সেই 'নিউ অর্ডার' পূর্ণ-স্বভাব ভাগবতগতিপ্রাপ্ত মানুষই আনিতে পারে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ক্ষুদ্র পরিস্থিতির মধ্যেও এই অম্লান বৃহত্তর স্বপ্নটী দেদীপ্যমান। তাহাকে আত্মশক্তির সাহায্যেই শনৈঃ শনৈঃ ব্যাপ্তির পথে আগাইতে হইবে। অতএব দ্বিতীয় প্রশ্নের এই উত্তরই আমি উপস্থিত যথেষ্ট মনে করি।

আরও একটী অবান্তর প্রশ্ন আছে। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সনাতনধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাখ্যা; আত্মসমর্পণযোগীর ধর্ম্মের লক্ষ্যও কি ইহাই? এই কথার উত্তরে বলা যায়—

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-লাভের উপায়ের কথাটা স্মরণ করিতে হইবে। ধর্ম্ম বিনা শিক্ষায় ও দীক্ষায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে না। ধর্ম্মশিক্ষার দুইটী ধারা আছে। এক পরা ও আর এক অপরা। পরা নিঃশ্রেয়স দেয়। অপরা অভ্যুদয় আনয়ন করে। ইহাই ভারতীয় শিক্ষা। আমি বলি—ইহা সার্ব্বজনীন শিক্ষা। মানব মাত্রেই ইহা মানিয়া লইবে। আত্মসমর্পণযোগী ঈশ্বর-যুক্তিতে শ্রী, জয়, ঐশ্বর্য্যাদি লাভ করে। ইহাই অভ্যুদয়ের লক্ষণ। আর পায় পরম পদ, পরম ধাম, পরম গতি। ইহাই জীবের স্বস্থানপ্রাপ্তি, নিঃশ্রেয়স। অপরা ও পরার ইহাই পরিণাম। এই হেতু আত্মসমর্পণ-যোগ সনাতন ধর্ম্মকে অতিক্রম করিতেছে না। বরং আত্মসমর্পণযোগের ভিতর দিয়াই আমরা পাইতেছি সত্য ধর্ম্ম—ভারতের বেদ যাহার ভাষা দিয়াছে।

পরা ও অপরা দ্বিবিধ সাধন। আত্মসমর্পণযোগও সাধন, সিদ্ধি নহে। সাধনপথেরই প্রশ্ন। সিদ্ধ দিব্য জীবনে প্রশ্ন নাই। সাধন-কালে যে প্রশ্ন, তাহা শুধু প্রচলিত অন্য সব কিছুর সঙ্গে কেন, নিজের ও নিজেদের মধ্যেই বিরোধ সৃষ্টি করে, সামঞ্জস্যের পথ খুঁজিয়া পায় না। আমি সিদ্ধ জীবনের সঙ্ঘের কথাই বলিতেছি। সে জীবনে পরা, অপরার প্রভাব ব্যতীত আর এক তৃতীয় শক্তি অধিগত হয়; যাহাকে শ্রুতি বলিয়াছেন—"অক্ষরাৎ পরতোপরঃ"।

এই পরাপর বিদ্যাই সাধ্য। সাধ্য কালে যাহা, সিদ্ধ-কালে তাহার প্রয়োজন হয় না। এই পরাপরের উপরে, জীবের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের ঊর্দ্ধে অমৃতের উৎস আছে। সেই উৎস-পথের তীর্থযাত্রীদের নব পথ নির্ম্মাণ 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের' অনিবার্য্য কর্ম্ম। এই কর্ম্ম রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে, সমাজে, সব কিছুকে লইয়া।

এই কাজে অবস্থাভেদে সকলেই কর্ম্মরত। এই জন্য দেখা যায়, রাষ্ট্রক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন নাম লইয়া কয়েক শ্রেণীর শক্তির বরপুত্র চলিয়াছেন সর্ব্বস্ব পণে। ধর্ম্মক্ষেত্রেও যাত্রীর সংখ্যা কম নহে। আর এক শ্রেণীর পথযাত্রী লক্ষ্যে পড়ে। যাহারা অধ্যাত্ম-ধর্ম্মে উন্নীত হইয়াও, অতীতের কর্ম্মপ্রণালী ছাড়িতে পারেন নাই। ইহারাই নব যাত্রীদের মধ্যে অতিশয় অস্পষ্টতা ও ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করেন। আমরা দেশের শাসকজাতিকেও আর এক শ্রেণীর তীর্থ-যাত্রী বলিয়া স্বীকার করি। লক্ষ্য সকলেরই—জীবনগতির নব-নীতির প্রবর্ত্তন। এই চারি শ্রেণীর গতিপথ ছাড়িয়া 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ' ভিন্ন গতি ধরিয়া চলিয়াছে। সকল শ্রেণীর যাত্রী শক্তির ঈষণায় চলিয়াছে; তাই 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ' কোন গতির বিরুদ্ধবাদী নহে। সে অবলম্বন করিয়াছে অপ্রতি-বাদী স্বভাব। লক্ষ্যপথে ভিন্ন গতির অবলম্বন হেতু কাহারও দোষ দর্শন করা, কাহারও নিন্দা করা, প্রত্যক্ষে বা অপ্রত্যক্ষে হিংসানীতি আশ্রয় দেওয়া সঙ্ঘধর্ম্মীর স্বভাব নহে। জাতির মধ্যে নূতন জীবন-নীতি প্রবর্ত্তিত করার কাজে সে শনৈঃ শনৈঃ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। অন্য কাহারও প্রতি তাহার বিদ্বেষবুদ্ধি ও অপ্রতিবাদী মনোবৃত্তি থাকিলেও, অন্যে তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে, তাহার গতিপথে বাধা দিতে পারে—'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ' কিন্তু তাহার কোন প্রতিবাদ করিবে না। বাধার সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য সে শক্তি ও সময় ক্ষয় করিবে না। আপন জীবন-নীতির অব্যর্থ লক্ষ্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা থাকায় এবং আত্মপ্রত্যয়ের অনির্ব্বাণ অগ্নি বুকে প্রজ্জ্বলিত থাকায়, সঙ্ঘের অমোঘ গতি-পথে অপরিণত অশুদ্ধ মনো-বৃত্তির বিঘ্নসৃষ্টি স্বপ্নের ন্যায় অলীক বলিয়া, তাহাকে সে পাশ কাটাইয়া অনায়াসেই অগ্রসর হইতে পারিবে। 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ' আজ ঠিক এই পথে। তাহার ক্ষুদ্র এই সমষ্টিচক্র ব্যাপ্তির প্রসারণে স্পন্দিত। সঙ্ঘধর্ম্মীদের আমি আত্মস্থ হইয়া অগ্রসর হইতে বলি।

## বিজয়া

উৎসবে জাতির প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ মহাপূজা হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান জাতীয় উৎসব। গীতার পুরুষোত্তমের পূজাও চণ্ডীর মহামায়ার পূজার ন্যায় এ জাতির জীবনে গভীর শিকড় গাড়িতে পারে নাই। মানুষ পিতৃত্বের অপেক্ষা মাতৃত্বের প্রতি অধিক অনুরাগী। বাঙ্গালীজাতি মাতৃ-সাধনায় সিদ্ধ। বাংলাদেশ মাতৃতীর্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে অসুরনাশিনী মহাদুর্গার কীর্ত্তিকথা মহর্ষি মেধসের মুখে শুনিয়া নরপতি সুরথ ও বৈশ্য সমাধি মাতৃ-দর্শনের জন্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা নদীতটে সমাসীন হইয়া সর্ব্বার্থসাধক দেবীসূক্ত জপপুরঃসর তপশ্চরণের পর শুদ্ধ চিত্তে অন্তরে শক্তির বরণীয় মূর্ত্তি সন্দর্শন করেন এবং সেই দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ধূপ-দীপাদি তর্পণের দ্বারা একাগ্রচিত্তে তিন বৎসর মায়ের আরাধনা করেন। মহামায়া পরিতুষ্টা হইয়া চিন্ময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদের নিকট আবির্ভূতা হন। রাজা চিরস্থায়ী রাজ্য ও শত্রুজয়ী শক্তি প্রার্থনা করেন। বৈশ্যের ভোগপূর্ত্তি ছিল না, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দেবী দুইজনকেই অমর বর প্রদান করেন। রাজাকে দীর্ঘ যুগের জন্য রাষ্ট্রশক্তিধর করিলেন। আর বৈশ্যকে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে ধন্য করিলেন। এইদিন হইতেই দেবীমাহাত্ম্য হিন্দুর ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হয়, আর জগন্মাতার মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া হিন্দুভারত কোটী কণ্ঠে প্রার্থনা করে—

রূপং দেহি, জয়ং দেহি,
যশো দেহি, দিষো জহি।

বাংলায় এই পূজা নূতন করিয়া প্রবর্ত্তন করেন রাজা কংসনারায়ণ। ইহার পূর্ব্বেও বাঙ্গালী মহাপূজায় ব্রতী হইত। ষষ্ঠীতে মায়ের বোধন বসাইয়া, সপ্তমীতে নিয়মিতাহারী মাতৃসাধকেরা মায়ের চরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিত—অষ্টমীতে নিরাহারী হইয়া, তন্মনাঃ হইয়া মাতৃনাম জপ করিত—অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে সেন্দ্রিয় মায়ের উদ্দেশ্যে বলিস্বরূপ অর্ঘ্যদান করিয়া সন্তানব্রতী হইত—দশমীর প্রভাতে বাংলায় প্রেম ও ঐক্যের জয়োল্লাসের মহারব উঠিত। সে পূজা বাঙ্গালী আজ আর করে না। পূজার অবকাশে বাঙ্গালী বায়ুপরিবর্ত্তনে ছুটে। সার্ব্বজনীন পূজার ধূমে বাঙ্গালী আত্মঘাতী হয়। গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে শীর্ণমূর্ত্তি ব্রাহ্মণের উপর পূজার ভার দিয়া গৃহী নিশ্চিন্ত থাকে। মাতৃ-পূজার উৎসাহ ও আনন্দের পরিবর্ত্তে কোথাও নির্জ্জীব প্রাণের পরিচয় পাই। আর অর্ব্বাচীন যুগের তরুণেরা সার্ব্বজনীন পূজার নামে আড়ম্বর ও উত্তেজনায় আত্মবলির রক্তে অহঙ্কার নিরসন করে না। দেবীর বরাভয় করও তাই প্রকাশ পায় না। মায়ের আরাধনার নিগূঢ় রহস্য আজ কৌতুকের ন্যায় আমোদ-আহ্লাদের কারণ হইয়াছে। বিজয়ার জয়শ্রী জগদীশ্বরীর মূর্ত্তিতে আর প্রকাশিত হয় না। বাদ্যভাণ্ডের তালে তালে সিদ্ধির নেশায় তাণ্ডবনৃত্য করিয়াই পূজা শেষ করি। যে মাতৃনাম-সুরা পান করিয়া ভারতের শৌর্য্য-বীর্য্য, জ্ঞান-প্রতিভা, তাহা দুর্লভ হইয়াছে। বাঙ্গালীর এই জাতীয় মহোৎসব ভক্তি ও শ্রদ্ধার অভাবে ক্রমেই প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছে।

বাঙ্গালীজাতির অমরসত্তা এই মহামাতার আরাধনার ফল্গুধারা কোথাও কোথাও অনাড়ম্বরে নীরবে এখনও বহন করে, নতুবা বাঙ্গালীজাতি এতদিন নিশ্চিহ্ন হইত। আমরা প্রতি বৎসর মাতৃ-পূজায় এই কয়দিন অনন্য-চিত্ত হইয়া, মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া পূজার আনন্দ উপভোগ করি। তদাত্ম হওয়ার জন্য অষ্টমীর মহানিশায় প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে শ্রদ্ধার্ঘ্যতর্পণ করিয়া বলি—"দেবি, জাগ। বল দাও, বীর্য্য দাও, অমৃত দাও।" সন্ধিপূজায় হোমকুণ্ডে মাতৃমন্ত্রের আহুতি দিতে দিতে বলি—"এস

শক্তিরূপে, জাতিরূপে, কান্তি, শান্তি, শ্রদ্ধারূপে। এস! স্মৃতি, বৃত্তি, লক্ষ্মীরূপে। এস মা, তুষ্টি, পুষ্টি, দয়ারূপে মহাদেবি!

নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ"

বিজয়ার প্রভাতে শান্তিবারি-সিক্ত হইয়া হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেম ও ঐক্যের অমৃতে অভিষিক্ত হই। সঙ্ঘের কেন্দ্রে কেন্দ্রে মহাপূজার অনুপ্রেরণা এবার মূর্ত্তি লইয়া যে মহোৎসবের অনুষ্ঠান সিদ্ধ করিয়াছে, বিশেষ করিয়া রায়নার ন্যায় সঙ্ঘের সুদূর পল্লীকেন্দ্রেও এ বৎসর পল্লীবাসীর প্রাণে মায়ের আরাধনায় যে অমৃত পরিবেশন করিয়াছে, তাহার জন্য সঙ্ঘধর্ম্মীদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি প্রার্থনা করি।

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ, আলিঙ্গন, প্রীতিসম্ভাষণ যথাবিধি পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি জ্ঞাপন করিয়া আবার "প্রবর্ত্তকের" যাত্রা সুরু করিলাম।

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গযজুষাং নিধান-
মুদ্ গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী॥

## হিমালয়ের ক্রোড়ে জয়ন্তী

"প্রবর্ত্তকের" 'রজতজয়ন্তীবর্ষের' প্রথম সংখ্যা প্রকাশ-কালে কয়েক জন অনুরাগী বন্ধুদের সহিত একত্র হইয়া শুভ ১লা বৈশাখে একটী প্রীতিসম্মিলনের আয়োজন হয়। "প্রবর্ত্তকের" উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। প্রবর্ত্তকের বাণী রূপ লইয়াছে "সঙ্ঘে"। "প্রবর্ত্তক" সম্পাদন-পর্ব্ব জয়ন্তী উৎসববর্ষের সহিত সমাপন করিব—এই কথার সহিত প্রতি মাসের ১লা তারিখে বাংলার ১২টী জেলায় দ্বাদশ জয়ন্তীর অনুষ্ঠান করিব—এইরূপ কথা মুখ দিয়া বাহির হয়। এই জয়ন্তী উৎসব ক্রমে যে এমন বিপুল মূর্ত্তি ধরিবে, তাহা ভাবিতে পারি নাই। সপ্তম জয়ন্তী হিমালয়ের ক্রোড়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কোথায় কোন জয়ন্তী হইবে, তাহার চিন্তা করিতে হয় না; কোন এক অশরীরিণী শক্তি মাসের পর মাস চিহ্নিত স্থানে লইয়া চলে। আমরা যেন জয়ন্তীরাণীর ক্রীড়নক।

সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা বঙ্গরাণী সত্যই তুষার-কিরীটিনী। দুর্জ্জয়লিঙ্গে জয়ন্তী করিতে গিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। নীলসিন্ধুজল একদিকে যাঁর চরণতল ধৌত করিতেছে, অন্যদিকে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যচন্দ্রকরোজ্জল-মুকুটমালা শিরে ধারণ করিয়া জননী জগদ্ধাত্রী সপ্তকোটী সন্তান-জননী হইয়া স্বমহিমায় যে মূর্ত্তিমতী, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলাম।

হিমালয়ের বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। রাজা পুরূরবা ইরাবতী নদী অতিক্রম করিয়া হিমগিরি সন্দর্শন করিয়াছিলেন। আমরা মহানন্দা অতিক্রম করিলাম। সে মহানন্দা আর নাই। সে প্রবল অমৃত-সম স্বাদুস্রোতঃ আজ মন্দীভূত। চঞ্চল বীচিমালায় মহানন্দার বক্ষ আজ আর উদ্বেলিত নয়। মহানন্দার উভয় তটে বনানীশ্রেণী আজিও আছে বটে, পাখীর কূজনে কর্ণ শীতলও করে, কিন্তু সেই বিস্তীর্ণতীরা, মনোহরা, হংস-সারস-শোভিতা, কমলকুলশোভাশালিনী নদীর সে শ্রী নাই। যে পুণ্যতোয়া নদীর তীরে তীরে সুগন্ধ কুসুমে সুশোভিত তরুশ্রেণী ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত থাকিত, যাহার তীরভূমে ঋষিকণ্ঠে সামরবে মুগ্ধ মৃগ-যূথ রতিসুখে রত থাকিত, যাহার জল-ধারায় পারিজাত তরুমঞ্জরীতে ব্যাপ্ত সূর্য্যকিরণতাপে হ্রাস-বৃদ্ধিহীন, সিতাংশুসম পূর্ণগর্ভা জলশালিনী সেই মহানন্দা আর নাই। মহানন্দা বহিয়া চলিয়াছে বন্ধুর পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া, কাশকুসুমের ঢেউ উঠিয়াছে তীরে তীরে। সর্পগতি ধরিয়া কানন-কুন্তল, বনফুল-ভূষিত হিমগিরি পরিক্রমণ করিতে করিতে গাড়ী আসিয়া দার্জ্জিলিঙে পৌছিল। "প্রবর্ত্তকের" ভিতর দিয়া এই সুদূর গিরিশৃঙ্গে এতগুলি সুহৃৎ মিলিয়াছে দেখিয়া আনন্দ হইল। সমবেত বন্ধুগণের শ্রদ্ধার্ঘ্য সাদরে গ্রহণ করিয়া জনাকীর্ণ সহরে প্রবেশ করিলাম। এই না সেই হিমালয়? সুরনর-বন্দিত, বিবিধদ্রুমদলমণ্ডিত, নীরদশ্যাম শৈলরাজ—যার অমিয়ধারাস্নাত গিরিকন্যা এই আমার সোণার ভারতবর্ষ। জনবহুল দুর্জ্জয়লিঙ্গের সে আদর্শ মূর্ত্তি চক্ষে পড়িল না; কিন্তু দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সেই অদ্রির পর অদ্রি—হিমগিরির সনাতনরূপ চক্ষে পড়িল। সহরের বাহিরে

গিয়া দেখিলাম—সেই কনককিরীটী হিমালয় পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মূর্ত্তিমান্। শাল, তাল, তমাল, হরিদ্রুম-দেবদারু, অর্জ্জুন, সুপুষ্পিত কবিদার, সেই কিংশুক, বেতস, অশোকের বনরাজী। সেই পুষ্পাকুল কদম্ব, বকুল, কুঙ্কুম নানা জাতীয় কুঞ্জপুঞ্জ, স্তবকে স্তবকে বনকুসুমের তরঙ্গভঙ্গী, নানা বর্ণ ও মনোজ্ঞগন্ধবিশিষ্ট কুসুমাকীর্ণ বনভূমি। বিবিধ গিরিপুষ্প—নয়নপ্রীতিকর নীলোৎপল-শোভা। তরুগুল্ম-লতা-ফল-মূল মুনিজনভোগ্য—হিমালয়ের সে অপূর্ব্ব শ্রীর ইয়ত্তা হয় না। ভারতের পিতৃরূপী হিমবান্ ত্রিলোকে অনুপমেয়। অরণ্যে এমন কোন ঔষধ নাই—ধান্য, শস্য, শাক, ফল, কন্দ-পুষ্প—যাহা হিমালয়ে বিদ্যমান নাই। নানাপশু-পক্ষী-বিরাজিত, জলপ্রপাতস্নিগ্ধ শৈলরাজ নয়নের প্রীতিদান করিয়াই অতিথিকে তৃপ্তি দেয় না, প্রাণে আনিয়া দেয় অপার্থিব আলো ও শান্তি। শৈল-নিতম্বে বিপুলজনপদ। গো, মহিষ, অসংখ্য অজা নিয়ত ক্ষীরক্ষরণ করিয়া মানবের তুষ্টি ও পুষ্টি দিতেছে। স্বচ্ছসলিল-নদীনিচয়ে পর্ব্বতরাজ যেন মুক্তামালায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। শৈলশিখরের কোলে কোলে সুরম্য উপত্যকা। গিরিবর চিরযৌবনযুক্ত। এমন শিখর-দেশ নাই, যাহা রুক্ষ পাণ্ডুবর্ণ। শিলাসমূহের আহ্বানে মেঘগণ গিরিশির চুম্বন করিয়া নিয়তবর্ষণ করিতেছে। চন্দ্রবিম্বের ন্যায় রাশি রাশি হিমপুঞ্জ গিরিবরের কোলে কোলে আশ্রয় লইয়াছে। সরিৎ-সাগরের শোভা ধরিয়া দর্শকের নয়ন স্নিগ্ধ করিতেছে। আর দেখিলাম সমুন্নতশির, রৌদ্রকরোজ্জ্বল, গিরিবর কাঞ্চনশৃঙ্গ। মহাকালের মন্দিরে দাঁড়াইয়া, হিমগিরির সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া কণ্ঠে স্রষ্টার মহিম্নস্তুতিই উদ্গীত হইল। আজ সত্য মনে হইল—ভারত শ্রেষ্ঠ। ভারতের উন্নতশির ঐ হিমাচল। স্বর্গ ও মোক্ষের ঊর্দ্ধগতিপথ এই হিমালয়ই বটে। তাই ঋষি গাহিয়াছেন

> "গায়ন্তি দেবাঃ কিলগীতকানি
> ধন্যাস্তুতে ভারতভূমিভাগে।"

জয়ন্তীসভা যথারীতি সম্পন্ন হইল। সাহিত্যানুরাগীদের অনুরোধে সুর-গির্ শব্দ-মাতৃকার আদিকথা গাহিলাম। সংহতি-রচনার মর্ম্মবিজ্ঞান জানিবার জন্য বন্ধুদের আকুতি পূর্ণ করিলাম। বাণী নামিয়া আসে প্রাণে হিমালয়শির বহিয়া, ধমনীতে শিহরণ উঠে, কণ্ঠে উচ্চারিত হয় অজানার মহিমগীতি।

চাহিলাম হিমালয়ের অণুপরমাণু হইতে অনাদি-যুগের অশ্রুত বাণী ছানিয়া লইতে। সুহৃৎদের আদর ও অনুরাগের আতিশয্যে আমার কোন দাবীই অপূর্ণ থাকে নাই। আমি হিমালয়ের গভীর কোলে, নিরালা বনকুঞ্জেও নীরব অবস্থানের সুযোগ পাইলাম।

সূর্য্য উঠিত, বনভূমি আলোকিত হইত। পর্ব্বতের কোলে কোলে মেঘমালা খেলিয়া বেড়াইত; আবার দেখিতে দেখিতে ধূসর নীহারিকাপুঞ্জে দশদিক্ ছাইয়া যাইত। সর্ব্বশরীরে দেবতার স্নেহশীতল স্পর্শ অনুভব করিতাম। অতি প্রত্যুষে বাহির শিলায় গিয়া অরুণরাগ-রঞ্জিত কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে চাহিয়া চাহিয়া নয়ন গলিয়া যাইত। বনানীকুঞ্জের ভিতর দিয়া সুরভি সমীরণ বাণীর পর বাণী বহিয়া আনিত। হৃদয় উদ্বুদ্ধ হইত। মূক মৌনব্রতী আমি। ভাবিতাম—দক্ষিণা বাতাসে তরু মুঞ্জরিত হয়, কুসুমিত হয়, আলোর ঝরণায় দশদিক্ ভাসে—উচ্ছল যৌবনতরঙ্গে শিরায় শিরায় রক্তের বন্যা বহে; কিন্তু হিমালয়ের এই শান্তিশীতল উত্তর বাতাসে তপস্যার নির্ঝর ঝরিয়া পড়ে, নব নব ঝলকে হৃদয় ভরিয়া যায়, প্রাণে নব নব প্রেরণার মূর্চ্ছনা উঠে। জগৎসভ্যতার আদি রব যে বেদমন্ত্র, তাহা বুঝি এই হিমালয়েরই দান। হিমালয় বিশ্বের তীর্থ, নিখিল মানবজাতির গুরুধাম। সিংহাচল, ব্যাঘ্রাচল, হিমালয়ের অসংখ্য শৃঙ্গের কত নাম, তাহার সংখ্যা কে করিবে? ব্যাঘ্রাচলে রাত্রিশেষে দাঁড়াইয়া দেখিলাম আকাশের কোলে রংয়ের মেলা—স্বর্গের দৃশ্য! হিমালয়ের সুবর্ণশৃঙ্গের পশ্চাতে গৌরীশৃঙ্গের ত্রিশূল-চিহ্ন পরমধাম-প্রার্থীর সম্মুখে ত্রিমার্গযোগের বাণী প্রচার করে। আমি হিমালয়কে প্রণাম করিয়া, জাহ্নবীচুম্বিত সমতলে আসিয়া, যাহা প্রারব্ধ, যাহা সঞ্চিত, তাহা ক্ষয় করিতে, ব্যয় করিতে পুনঃ প্রবৃত্ত হইয়াছি; কিন্তু হিমলয়ের কন্দরে কন্দরে পবন-সঞ্চলিত যে বাণীমন্ত্র মুখরিত হইয়া আমায় নূতন প্রেরণা দিয়াছে, তাহা যুগান্তকাল স্থায়ী হইবে।

"প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ" নীলসিন্ধুকোলের উর্ব্বর তটে, আরাধনার বেদী-রচনা করিয়াছে। চটুল, সুন্দরবন নয়নে আলোর প্রলেপ লেপিয়াছিল; আর মনে হইল—শান্ত সমাহিত চিত্তে ঐ গগনচুম্বিত গিরিরাজের কোলে বসিয়া নিত্য নূতন কর্ম্মৈষণা লাভ করি। নূতন মন্দির রচনা করিয়া জাতিকে বলি—হিমাচল স্বাস্থ্যনিবাস নহে, অধ্যাত্মশক্তি-সঞ্চয়ের মহাতীর্থ। ভারতে কত তীর্থ আছে, সর্ব্বতীর্থ-শ্রেষ্ঠ এই হিমগিরির পরিচয় ভারত কবে পাইবে? বাঙ্গালী কবে বুঝিবে দিগ্‌ভুজা জননী সত্যই প্রতি বৎসর শারদপ্রভাতে এই শৈলশিখর হইতে সমতল জনপদে গিয়া বিজয়ার জয়টীকা বাঙ্গালীর ললাটে পরাইয়া আসেন। আমার মনে হইল—পূর্ব্ব হিমালয় বাংলার জাগ্রত প্রত্যক্ষ মহাদেবতা। বাঙ্গালী এই হিমালয় স্মরণ করিয়া যে প্রেরণা পাইবে, তাহা জগজ্জয়ের কারণ হইবে। হিমালয়-দুহিতার বরপুত্র বাঙ্গালী! আজ আমি নির্ভয়ে তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি—বাঙ্গালী জয়তু।

## সুন্দরবনে সপ্তম সঙ্ঘাধিবেশন

১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভারতের ধর্ম্মবীর বাংলার মুকুটমণি সিংহগ্রীব নরেন্দ্রনাথ দেহ রাখিলেন। কি এক অশরীরিণী প্রেরণায় প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইল। সাধনার প্রকরণ নেতি, ধৌতি, নাসপান, আসন, প্রাণায়াম, ভৈরবী-চক্র, সব কিছুর বাঁধন ছিঁড়িয়া জাহ্নবীস্রোতে যে অগ্নিবাণী সেদিন উজানে ছুটিতেছিল, তাহারই তাপহীন অমর স্পর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া নরনারায়ণের সেবায় জীবন উদ্যত করিলাম। তারপর নব ভগীরথের শুভশঙ্খনিনাদে স্বদেশপ্রীতির গঙ্গোত্রীধারা বহিল আমাদেরই আঙ্গিনা ভাসাইয়া। ভাসিয়া গেল সে প্লাবনে দরিদ্রনারায়ণের সেবাব্রত। দেশযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে ধমনীতে ধমনীতে প্রতি রক্তবিন্দু মাতাল হইয়া নৃত্য সুরু করিল। তারপর শ্রীঅরবিন্দের দেশপ্রীতির ধারায় আত্মসমর্পণের অমৃত-মিশ্রণ—'ধর্ম্মে' 'কর্ম্মযোগিনে' নূতন মন্ত্রপ্রচার। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের বাংলাত্যাগ। বাঙ্গালীর আত্মার জাগরণ লক্ষ্যে রাখিয়া আমারও হইল সেই দিন হইতে অগস্ত্যযাত্রা। ইহার পর দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষান্তে অতীতের আবর্ত্ত বিদীর্ণ করিয়া কর্ম্মজ্ঞানের তীর্থ এই সঙ্ঘসৃষ্টি। তারপর এই দীর্ঘদিন জাতিগঠনের অমৃতময় বিগ্রহরচনায় অতিবাহিত হইল। 'ততঃ কিম্' বলিয়া আমার কোনদিন দুর্ভাবনা উপস্থিত হয় নাই। এ গতি ঈশ্বরগতি, কেননা কোথাও ইহার প্রত্যবায় হয় নাই। লক্ষ্য আমার পরম ধাম। সে ধাম কিছুকে ছাড়িয়া কিছু নহে। সে ধাম অদ্বয়, অখণ্ড, অমর্ত্ত্য, অমৃত। আমার তাই নৈরাশ্য নাই। কর্ম্ম যারা বন্ধন মনে করে, আমি তাদের ভারতের মানুষ বলিয়া মনে করি না। তারা ভারতধর্ম্মী নহে। কর্ম্ম শাশ্বত। সৃষ্টি অনাদি। কর্ম্মবিরতি অতি বড় জড়ত্ব অথবা বিকৃতমস্তিষ্কের অভিব্যক্তি। কর্ম্মের ভিত্তি ভারতের শ্রুতি-স্মৃতি দৃঢ় করে, যুক্তি তার অনুকূল হয়, অনুভূতি বিশ্বাস জাগ্রত করে। সেই কর্ম্ম—হেয় পরিত্যাজ্য, যাহা আসক্তি-প্রসূত। মানব আসিয়াছে আসক্তিতে অভিষিক্ত জীবনের অপব্যবহার হেতু নহে, তাহা ঈশ্বরে অন্বিত করিয়া, উত্তম ভোগ হেতু। উপনিষদের সেই বাণীই জীবন সার্থক করে "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা।"

যে কর্ম্ম দুঃখময়, সেই কর্ম্মই বন্ধন। যে কর্ম্মে সুখের নৈরন্তর্য্য, সেই কর্ম্ম মর্ত্ত্যজীবনে শতবর্ষব্যাপী চলে। কর্ম্ম যার ক্লিষ্ট, সেই ক্ষীণায়ুঃ হয়। অকাল মৃত্যু তাহারই ঘটিয়া থাকে। ধর্ম্মপ্রাণ কর্ম্মী "জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ—" শতবর্ষ জীবিত থাকে। আদি মনুর প্রখ্যাত সন্তান প্রিয়ব্রত। তিনি ঐতিহাসিক নরপতি। আমরা তাঁহারই বংশধর। এই নরপতির রথচক্রে আবর্ত্তিত হইত সপ্ত সমুদ্র-বেষ্টিতা এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী। অর্থাৎ তিনি ছিলেন মর্ত্ত্যের অদ্বিতীয় অধিপতি। প্রিয়ব্রতের অগ্নীধ্রাদি ৯ জন পুত্র। দুইজন স্থান না পাইয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করেন—এই প্রতিক্রিয়াময় জীবনের মোক্ষবাদপ্রচারের আদি উৎসরূপে। অন্য সাত পুত্র সপ্তদ্বীপের অধিপতি হন। অগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপ লাভ করেন। ইহারও ৯ পুত্র। জম্বুদ্বীপ এই জন্য ৯ ভাগে বিভক্ত হয়। এক এক ভাগ এক একটী বর্ষ নামে আখ্যাত হয়। পরে ভরত হইতে

ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ আমাদের দেশ, আমরা ভারতের জাতি। এই জাতি নিশ্চিহ্নের পথে, কেননা সে জাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। ধর্ম্ম ভাব ও বস্তু দুইই লইয়া। বস্তুধর্ম্মের ব্যাখ্যা জৈমিনি করিয়াছেন। বস্তুধর্ম্ম কর্ম্মবাদ। যুগভেদে কর্ম্মভেদ হইবে, কর্ম্মনাশ হইবে না। ভাবধর্ম্ম বেদব্যাসের ব্রহ্মসূত্র। ভাব অস্থূল, তাই তাহা অপরিণামী। জগৎ ভাব হইতে বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। ভারত এই কথা জানে বলিয়াই কর্ম্মবাদ তার মজ্জাগত ধর্ম্ম। ভারতের শ্রুতি, স্মৃতি শুধু নহে, পুরাণও বলিয়াছেন "জম্বু দ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ। কেননা, ইহা কর্ম্মভূমি। আর সব ভোগভূমি"—

অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ॥

অতঃপর তুমি যতি হও, ব্রহ্মচারী হও, সন্ন্যাসী হও, গৃহী হও, যতক্ষণ ধরিত্রীর স্তন্যধারায় পীযূষপানে জীবনধারণ কর, ততক্ষণ এই মর্ত্ত্যধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা করিও না। কর্ম্ম প্রবৃত্তিমূলক, আসক্তিমূলক—অনুন্নতের ইহা স্বভাব, অধ্যাত্মসাধকের নহে। এইরূপ দুর্ব্বাক্য উচ্চারণ করিও না। উদীয়মান সিদ্ধ জাতি এইরূপ তোমায় বলিতে দিবে না। কর্ম্ম ব্রহ্মে অর্পণ কর, দেখিবে ব্রহ্মকর্ম্ম অনাহত, অক্ষয়। কর্ম্মবাদ হিন্দুধর্ম্ম, ভারত-ধর্ম্ম।

ধর্ম্মের ভিত্তির উপর যে দিব্য কর্ম্ম, তাহা জাতির অভ্যুত্থান আনিবে, মুক্তি আনিবে। ধর্ম্মের ইহাই শাস্ত্রসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত কথা ও যুক্তি। তাই 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ' ধর্ম্মাশ্রয়ে অক্ষয় কর্ম্ম লাভ করিয়াছে।

ধর্ম্ম-সাধনার ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া যে জীবন, তাহাই মানুষের নবজন্ম। এইরূপ ব্যক্তিসমষ্টিই সঙ্ঘ। সঙ্ঘ অতঃপর সমাজে রূপায়িত হইতে চাহে। জাতিগঠনের ইহাই অনিবার্য্য নীতি। এই বৈজ্ঞানিক অধ্যাত্মপথ আর বিস্পষ্ট ও ধূমাচ্ছন্ন নহে; এ ঘোষণা আমরা উচ্চকণ্ঠে করিতে পারি।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ' চন্দননগরের আশ্রমে জাতিসৃষ্টির পথের আলোচনা হয়। সেদিন সঙ্ঘ-সভ্যেরা বিষয়টী তলাইয়া বুঝে নাই। দ্বিতীয় বৎসর চন্দননগর সঙ্ঘেই এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা চলিয়াছিল। সঙ্ঘের আবর্ত্ত উদ্ভিন্ন করিয়া সঙ্ঘাত্মারা সেদিনও এই প্রেরণার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তৃতীয় বৎসর কলিকাতার মহানগরীর 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে' ইহার পুনঃ অধিবেশন হয়। সেদিনও বিষয়টা তেমন স্পষ্ট হয় নাই। চতুর্থ বৎসরের অনুষ্ঠানে এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সঙ্ঘ সামান্যভাবে অনুপ্রাণিত হয়। তার পরে চট্টলের যাত্রামোহন হলে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ সম্মিলনের পঞ্চম অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের উদ্দেশ্য বিশদ হইয়া উঠে। বর্দ্ধমানের রায়না গ্রামে ইহার ষষ্ঠ অধিবেশন হয়। জাতির প্রাণ সঙ্ঘের আহ্বানে এইখানেও সাড়া দেয়। এই বার সঙ্ঘের সপ্তম অনুষ্ঠান সুন্দরবনে। এই নিখিল-বঙ্গ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সপ্তম অধিবেশনের কথা বলিবার জন্য এতখানি গৌরচন্দ্রিকা করিতে হইল। তাহার কারণ, হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম মোহ ও অক্ষমতা বশতঃ আমরা আর অবধারণ করিতে পারি না। সঙ্ঘের এই যোগপ্রেরণা সাধারণ কর্ম্মপ্রেরণার সহিত অনেকে এক করিয়া দেখেন।

আমাদের সুন্দরবনের সঙ্ঘতীর্থ মহারাজ ৺মণীন্দ্রনাথ নন্দীর ফ্রেজারগঞ্জ লাটের অন্তর্গত। বাংলার বিশাল ভূমিখণ্ডের সহিত বিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ নদী ও সমুদ্রবেষ্টিত ইহা একটী উপদ্বীপ মাত্র। হিংস্র বন্যপশুর আরণ্যভূমির মধ্যে একখণ্ড জমি লইয়া প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ কৃষিচর্চ্চা আরম্ভ করে। বিশ বৎসর প্রচুর শ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া আজ ফ্রেজারগঞ্জ আবাদি হইয়া উঠিয়াছে, জনবহুল হইয়াছে। নিরক্ষর অধিবাসীদের সন্তানেরা লেখাপড়া শিখিয়াছে। আমাদের সংগঠন-কর্ম্মের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র এই সুন্দরবন। আমরা অতঃপর চাহিতেছি, এই অঞ্চলে বৎসরে দুইবার ফসলসৃষ্টি। আমরা চাহিতেছি, কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যে ধর্ম্মামৃতবিতরণের ব্যবস্থা। আমরা চাহিতেছি, দিব্য ভিত্তির উপর সমাজপ্রতিষ্ঠা; শিক্ষা-নিকেতনগুলির উন্নতি। এই উদ্দেশ্য লইয়া সঙ্ঘের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন। এই ক্ষেত্রই আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। লাটের তরুণ নায়েব শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র আচার্য্য অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি হইয়াছেন। সঙ্ঘের প্রবীণ সাধক শ্রীনারায়ণচন্দ্র দত্ত সম্পাদক এবং প্রবর্ত্তক

সঙ্ঘের অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী কোষাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ফ্রেজারগঞ্জের শতাধিক প্রধান প্রধান পুরুষেরা সমিতির সদস্য হইয়াছেন। সহস্র সহস্র নর-নারী এই অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও প্রবর্ত্তক ট্রাষ্টের অন্যতম পরিচালক শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ফ্রেজারগঞ্জের মৌজায় মৌজায় গিয়া "প্রবর্ত্তকের" বাণী প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। দেশের এই অমিশ্র সংগঠনমূলক কর্ম্মগুণে অন্বিত যোগশক্তির লীলামূর্ত্তি দেখিবার ও ইহার মর্ম্ম বুঝিবার জন্য সঙ্ঘ-সভ্যদের সহিত সঙ্ঘের অনুরাগী সুধীবর্গকেও আমরা সাদরে আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছি।

আগামী ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর সঙ্ঘের অধিবেশন হইবে। সপ্তাহকালব্যাপী কৃষি ও সংস্কৃতিমূলক প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। যাঁহারা সত্যই কৃষক ও শ্রমিকের আত্মার জাগরণকামী, তাঁহারাই আমাদের এই তপস্যার মর্ম্ম অনুভব করিবেন। সমুদ্রতটে সঙ্ঘতীর্থকে কেন্দ্র করিয়া নিখিল প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের এই সপ্তম অধিবেশনে আমরা দেশবাসীর সহযোগিতাপ্রার্থী। কর্ম্মবাদ জাতির অভ্যুত্থান ও মুক্তির একমাত্র কারণ বলিয়া যাঁহারা প্রত্যয়বান্, তাঁহাদের এই অধিবেশনে যোগদান কর্ত্তব্য। বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য সম্পাদক প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ, চন্দননগর, এই ঠিকানায় পত্র প্রেরণ করিতে হইবে।

## বাংলার নেতৃশক্তির অভাব মনে হয় কেন?

বর্ত্তমান বাংলার অবস্থা দেখিলে, সহজেই মনে হইবে —বাংলার নেতার অভাব হইয়াছে। কথাটা একটু তলাইয়া বুঝিবার জন্য আমরা চিন্তা করিয়াছি। চিন্তার ফল যাহা, তাহাই ব্যক্ত করিব।

বাংলার নেতা বলিতে সুরেন্দ্রনাথের কথাই মনে উদয় হয়। রাষ্ট্রপ্রাণের জাগরণ-যুগ হইতেই নেতার প্রয়োজন হইয়াছিল। বাংলায় রাজা রামমোহনের পর প্রসিদ্ধ বহু ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। লোকনেতা বলিয়া এমন প্রসিদ্ধি কেহ লাভ করেন নাই। শিক্ষাক্ষেত্রে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর ছিলেন, সাহিত্যসম্রাট্ ছিলেন ঋষি-বঙ্কিম, হেমচন্দ্র-মধুসূদন কবি ছিলেন। এমন কত নাম করিব! ইঁহারা কেহই লোকনেতা ছিলেন না। সুরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে রাষ্ট্রক্ষেত্রে রামগোপাল ছিলেন, কৃষ্ণদাস পাল ছিলেন। 'মীরার' সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু ছিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় সম্মান ইঁহারা কেহই লাভ করেন নাই। দেশনেতা বলিয়া সর্ব্বজন-পূজা পাইয়াছেন সর্ব্বপ্রথম রাষ্ট্রবীর সুরেন্দ্রনাথ। তারপর বিপিনচন্দ্র অগ্রগামী জাতির নেতৃত্ব লইয়াছিলেন। উপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর, পাঁচকড়ি, এমন কি শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়াসাহস দিয়াছেন, উৎসাহ যোগাইয়াছেন। ইহার পর শ্রীঅরবিন্দই লোকনেতার অত্যুচ্চ শৃঙ্গে অধিরোহণ করেন। উহা ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণিক দীপ্ত। তারপর অপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশনেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানে নেতৃত্বের আসন লইয়া দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের মধ্যে বীভৎস দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। যতীন্দ্রমোহন আজ নাই, সুভাষচন্দ্রই আজ দেশনেতা। তদীয় ভ্রাতা শরৎচন্দ্রের নামও উল্লেখযোগ্য।

তবুও কেন দেশনেতার অভাব মনে হয়? সুরেন্দ্রনাথ হইতে দেশবন্ধুর নেতৃত্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর মনোভাবের সমূহ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই সময়ে নিখিল ভারতের রাষ্ট্রশক্তি বাংলার নেতৃশক্তির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিত। বাঙ্গালী জাতিও নেতার কথায় প্রাণ দিতে কুণ্ঠা করিত না। সংবাদপত্রে নেতার আজ্ঞা বিজ্ঞাপিত হইলে, সমস্ত দেশ তাহা পালন করিতে উদ্বুদ্ধ হইত। এখন তাহার অন্যথা হইয়াছে, ইহা অস্বীকার্য্য নহে। এখন বাংলায় নেতৃত্ব বজায় রাখিতে ভাড়াটিয়া কর্ম্মীর প্রয়োজন হয়, আর সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের ঢাক পিটিতে হয়। দেশনেতার প্রতি নিখিল দেশবাসীর সে শ্রদ্ধা দেখা যায় না, ইহা মিথ্যা নহে। অথচ দেখা যায়, যাঁহারা আজ নেতার আসন অধিকার করিতে চাহেন, তাঁহারা পূর্ব্বনেতৃগণের অপেক্ষা ত্যাগধর্ম্মে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে কোন অংশে ন্যূন নহেন। তবুও নেতার সম্মান এমন করিয়া ক্ষুণ্ণ হয় কেন? আমরা তাহার দুইটী কারণের দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। প্রথমতঃ

দেশসেবার পথের সন্ধান দেওয়া অপেক্ষা নেতৃগণ নেতৃত্বের আসন অধিকার-করার দিকে বড় বেশী ঝুঁকিয়া চলেন। আর সংবাদপত্র নিজ নিজ মনোনীত নেতাকে অতিরঞ্জিত করিতে গিয়া তাঁহাদের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধার অপলাপ করিয়া থাকেন। ইহাতে এমন হইয়াছে যে, দেশের নেতৃশক্তির কর্ম্মকলাপের বিবরণ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী জনগণ ব্যতীত দেশের মনীষিবৃন্দ আর পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হন না। দেশের গতি ও অভ্যুত্থানের নির্দ্দেশ না থাকায় নেতৃগণের বক্তৃতার একঘেয়ে উক্তিতে সংবাদপত্রপাঠও বিরক্তিকর হইয়া উঠে। নেতার আসন নেতৃশক্তিধর পুরুষেরা স্বয়ং কতকটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন আর সংবাদপত্র তাঁহাদের সহায়তা করিতে গিয়া তাহার উপর আরও অধিক রং চড়াইয়া দিয়াছেন।

ইহা ব্যতীত আর একটী বড় কারণ আছে, উহাই অনুধাবনযোগ্য। দেশের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মপ্রেরণা আশ্রয় করিয়া অসংখ্য সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সংহতি-গুলি কম বেশী দেশময় নিরন্তর ধারায় কর্ম্ম করিয়া চলিয়াছে। সংবাদপত্র রাষ্ট্রসংঘর্ষমূলক সংবাদ যেমন আগ্রহ-সহকারে প্রকাশ করেন, এই সকল সংহতির কর্ম্মপ্রচেষ্টা প্রকাশ করা তাঁহারা হয়তো সঙ্গত মনে করেন না, অথবা ইহাদের খবরও রাখেন না। সংবাদপত্রে এই সকল সংবাদ প্রচারিত হইলে দেখা যাইত—দেশের প্রাণ এই সব ক্ষুদ্র বৃহৎ সংহতি রক্ষা করিতেন। ইহাদের নিয়ত প্রচেষ্টা লোকমুখে বিস্তৃতভাবে ঘোষিত হয়, প্রচলিত সংবাদপত্র-গুলিতে ইহাদের প্রচার না হইলেও ইহাতে সর্ব্বত্র তাঁহারা ব্যাপ্তির প্রচুর খোরাক পাইতেছে। এই সব ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া প্রতি সংহতির কেন্দ্রে এক একজন শক্তিধর পুরুষ আছেন। সংহতির আয়তন ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ হউক, এইরূপ প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্য-সংখ্যা নিতান্ত কম নহে এবং দেশের মধ্যে নিরন্তর কর্ম্মের ফলে বহু লোকের উপর ইহাদের প্রভাব ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই অবস্থায় বাংলায় যোগ্যতর যে কোন নেতাই আবির্ভূত হউন না, পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার সঙ্কেতধ্বনি শুনিয়া দেশব্যাপী সাড়া উঠা আর সম্ভব নহে। এই কারণে দেশের নেতৃ-শক্তি যোগ্যতর হইলেও, বাঙ্গালী জাতিকে জাতীয় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তাঁহার পরিচালনা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সংবাদপত্রে নেতৃত্বের প্রচারবাদ্য শূন্য কুম্ভের ঝনৎকারের মত নিষ্ফল হইতেছে।

অবজ্ঞাত অবস্থার কথাও জনগণের সমক্ষে উপস্থিত করাই বড় কাজ নয়। এই অবস্থার প্রতিকার করার উপায় কি? এই কথার উত্তর দিতে হইলে আর একটু অপ্রিয় কথার অবতারণা করিতে হইবে।

ভারতের বর্ত্তমান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা মহাত্মা গান্ধী। তিনি জাতির মুক্তি-সাধনের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। জাতি তাঁর উপর নির্ভর করিয়া অনুদ্বিগ্ন থাকিলে, অর্থাৎ তাঁহার উপরই দৃঢ় প্রত্যয় রাখিতে পারিলে, নিখিল জাতির শক্তি তাঁহাতেই উপচিত হইয়া কর্ম্মসিদ্ধি আনিবে—ইহা অধ্যাত্মজগতের সূক্ষ্ম যুক্তিশাস্ত্রসঙ্গত কথা। কিন্তু সমস্ত জাতির নির্ভরতা তিনি পাইতেছেন বলিয়া আমরা মনে করি না। এমন কি ভারতের রাষ্ট্রসভার সকল সভ্যদের আত্মপ্রত্যয় তাঁহার উপর নির্দ্বন্দ্বে অর্পিত যে হয় নাই, ইহা প্রত্যক্ষ। অতএব যে বিপুল কর্ম্মসাধনের তিনি সঙ্কল্প করিয়াছেন, আত্মশক্তির সহিত যে পরিমাণে দেশ-প্রতীকের শক্তি সংযুক্ত হইলে তাহা সিদ্ধ হয়, তাহার অভাব থাকিতে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে না। অধ্যাত্মসাধনক্ষেত্রের বিজ্ঞান যথাসম্ভব অধিগত করিয়াই আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, এই অবস্থা মহাত্মা বুঝিয়াছেন এবং তাই আর এক পথ আবিষ্কার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সে পথ পরিপূর্ণ আত্মশক্তির উপর নির্ভরতা। এইরূপ সাধনার অভিব্যক্তি তিনি জানুন আর নাই জানুন, তাঁহার বর্ত্তমান কর্ম্মপ্রণালীর মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। তিনি গণশক্তিকে দূরে রাখিয়া তাঁহার আত্মপ্রভাবের অস্ত্র-ব্যবহারে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু রাষ্ট্র ব্যক্তির নহে—বহুজনের ইহা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু; সে বস্তু ব্যক্তির সিদ্ধিরূপে আসিতেই পারে না। এমন অসম্ভবও যদি বিশ্বরাজ্যে ঘটে, তাহা হইলেও সে বস্তু সাধারণের ভোগ্য হওয়া ধর্ম্মতঃ বাধিবে। পরধনপ্রাপ্তি সহজলভ্য হইলে, বুভুক্ষু তাহার আদর যেমন বুঝে না এবং বস্তুর অপব্যবহার করে, তেমনই মহাত্মার ব্যক্তিসিদ্ধি

মুমুক্ষু জাতির ভোগে ও অধিকারে কার্য্যকরী হইবে না। ইহা যুক্তি।

আমরা কি রাষ্ট্র, কি ধর্ম্ম, সর্ব্বত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলেই দেখিব—ধর্ম্মসিদ্ধিরও উত্তরসাধক থাকে। ধর্ম্মও সম্প্রদায়-গত হয়, রাষ্ট্রও তাই। এক শ্রেণীর মানুষই রাষ্ট্রশক্তি ধারণ করে ও ভোগ করে। গণসংহতি-গঠনের স্বপ্ন এই নীতি অতিক্রম করিয়াছে। এই চেষ্টা ইউরোপের; তাহা স্থায়ী হইয়াছে বা হইবে, এ আশা আজিও করা যায় না। তবে রাষ্ট্র যে ব্যক্তির সিদ্ধি নহে, একটা শ্রেণীকে উহার জন্য অসাধারণ ত্যাগ করিতে হয়, শ্রম দিতে হয়, তাহা অবধারিত। প্রকৃতির বিধানে কংগ্রেস তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রাষ্ট্রসাধনার বিপরীত আচরণে উহা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বাংলা এইরূপ দুই এক টুকরা কুড়াইয়া রাষ্ট্রসমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইতে চায়; ইহা আদৌ সম্ভব নহে।

বাংলার এই অবস্থায় রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে, বিবিধ প্রকার কর্ম্মে অসংখ্য প্রকার সংহতির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের গলা টিপিয়া মারিবারও উপায় নাই, আর সে নীতি বাঞ্ছনীয়ও নহে। এই সত্য অবস্থার উপর দাঁড়াইয়া আমাদের পথ আবিষ্কার করিতে হইবে। ইহার জন্য কংগ্রেসের আশ্রয় যদি কিছুদিনের জন্য ছাড়িতে হয়, কেবল তাহা কেন, এমন কি রাজনীতিক সাধনার ভঙ্গীও যদি বদলাইতে হয়, তাহাও বাংলার আত্মগঠনের প্রয়োজনে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

বাঙ্গালী রাষ্ট্রক্ষেত্রে সংহতিবদ্ধভাবে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। অন্যায়ের প্রতিবাদে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সন্ধান দিয়াছে; সশস্ত্র বাধার সৃষ্টিও করিতে কুণ্ঠা করে নাই। বাংলার যে রাষ্ট্রশক্তির মালিন্য, তাহার হেতু বাঙ্গালীর মেধা নাই, বিদ্যা, বুদ্ধি বা শক্তি নাই, এমন নহে। বাংলার অভ্যুত্থানের সাধনায় একটা নূতন পর্য্যায় দেখা দিয়াছে। এই পর্য্যায়ে নেতৃত্বের স্থান কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকিবে। বাংলার সমস্ত সংহতিগুলির মধ্যে অহমিকা ও আসক্তিবর্জ্জনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এখনও দেখা যায় না এবং এইগুলির পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অবিদ্বেষী মনোবৃত্তিসম্পন্ন, এমনও মনে হয় না। এই অবস্থায় বাংলার অখণ্ডপ্রাণ কোন এক নেতার অধীন হইবে, ইহা সম্ভব নহে। দেশের প্রাণশক্তি কেবল কংগ্রেসেই নহে, হিন্দুসভা ও দেশের অনেক অখ্যাত সংহতি বর্ত্তমানে বাংলার প্রাণশক্তিরূপে পুঞ্জে পুঞ্জে জড়াইয়া পড়িয়াছে। সকল ক্ষেত্রের মূলগত আদর্শ ও লক্ষ্য—জাতির সেবা, জাতির অভ্যুত্থান ও মুক্তি। জাতীয় সম্প্রদায়ভেদের ন্যায় সংহতিভেদে জাতীয় উন্নতির পথে উপস্থিত নূতন বাধাসৃষ্টি হইয়াছে। কংগ্রেস, হিন্দুসভা অথবা জাতীয় সংবাদপত্রগুলি অন্যান্য সংহতিগুলিকে আমলে না আনিলেও, এই সকল শক্তিব্যূহই প্রকৃতপক্ষে মধুচক্রের ন্যায় দেশব্যাপী হইয়াছে। গণসংহতি বাংলায় তাই শীঘ্র গড়িয়া উঠা সম্ভব হইবে না। সংহতিপতিগণকে লইয়া যদি কর্ম্মচক্র গড়ার সম্ভাবনা থাকে, এই কার্য্যে নেতৃশক্তিধর পুরুষদের প্রথম অগ্রসর হইতে হইবে। বাংলার জনগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রভাবশালী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর অথবা রাষ্ট্রবীরের আনুগত্যে সন্নিবদ্ধ। এই সকল বীরের সংহতি-সৃষ্টি যতদিন না সম্ভব হয়, ততদিন বাংলাকে এই ভাবেই চলিতে হইবে। সংহতির পুষ্টি ক্ষুদ্রত্বে নাই; তাহাকে বিরাটের অনুসরণ করিতেই হইবে। সে বিরাট্ হয় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব অথবা শক্তিশালী চক্র। আমরা ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা চক্রশক্তির অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা অধিক দেখিতেছি।

ইহা ব্যতীত অন্য এক ছন্দে শক্তির স্পন্দন অনুভূত হয়। এই স্পন্দন অনুভব করার বিজ্ঞান বিবৃত করিলে, প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে। এমনও হইতে পারে যে, বাংলার কোন একটী সংহতিশক্তি স্বপরিমাণ ও স্বশক্তিতে জাতির আত্মিক শক্তিকে শোষণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে রাষ্ট্র, ধর্ম্মে ও সমাজে। আমরা বাংলার উপরোক্ত সম্ভাবনাগুলি লক্ষ্য করিতেছি। ব্যক্তিপ্রাধান্য ও ব্যক্তির নেতৃত্ব বাংলায় কিন্তু চিরান্ত হইয়াছে, উহার অভ্যুদয় স্বয়ং ইন্দ্র-চন্দ্রের উদয়েও কেহ অর্দ্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে দেখিবেন না, ইহা বলা যায়। বাংলায় যে খিচুড়ী-রন্ধন চলিয়াছে, তাহার পরিসমাপ্তির একটা নির্দ্দিষ্টকাল আছে। বাংলার এই অবস্থা বুঝিয়া মনীষীদের কর্ম্ম-সিদ্ধির আকূতি আমরা পোষণ করি।

## বর্ত্তমান মহাসমর

ইটালী ও স্পেনের সহিত হিটলারের সম্প্রতি নিগূঢ় মন্ত্রণার পর ইউরোপের মহাযুদ্ধ নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ইটালী ও স্পেন হিটলারের ক্রীড়ণক, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। ফ্রান্সের নাটকীয় পরাজয় না ঘটিলে, জার্ম্মাণী ইটালী ও স্পেনকে লইয়া এমন কন্দুক-ক্রীড়া করিতে সমর্থ হইত না।

হিটলারের ইংলণ্ড-বিজয় যখন সম্ভব হইল না, তখন তাঁর অভিযান ভূমধ্যসাগরের দিকে প্রবল বেগে প্রধাবিত হওয়ার কথা। ভিসি গভর্ণমেণ্টকে স্বেচ্ছাধীনে আনিয়া এক হস্তে ইটালীকে, অন্য হস্তে স্পেনকে হিটলার নাচাইতে সুরু করিয়াছেন। ইটালীর গ্রীস-আক্রমণ এই নৃত্য-লক্ষণ। স্পেনের পাঁয়তাড়া কসার যুগ এখনও শেষ হয় নাই।

নরওয়ে হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত হিট্‌লার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। রুষের স্তম্ভিত মূর্ত্তি দেখিয়া অনেকের ধারণা—জার্ম্মাণীর বিস্তৃতি নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহির হইলেই রুশ নখদন্ত বিস্তার করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিবে। এ ধারণা আমাদের নাই। রুশের বলশেভিজমবাদের ভিত্তি যে অতি অদৃঢ়, এ কথা আমরা চিরদিনই বলিয়া আসিতেছি। শক্তিবাদই ভিন্ন ভিন্ন নাম ধরিয়া জাতির অভ্যুত্থান আনয়ন করে। রুশের অভ্যুত্থান এই নীতিই আশ্রয় করিল, তাহার প্ররোচনায় পরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে।

রুশের শক্তি অপরীক্ষিতও নহে—ফিন্‌-যুদ্ধে সে পরিচয় আমরা পাইয়াছি। রুশ জার্ম্মাণীর তীক্ষ্ণ করাল দংষ্ট্রার সম্মুখে নতি স্বীকার করিবে, বলকান-সমস্যায় রুশের আচরণে তাহার আভাস পাই। আমরা তুর্ক ও বুলগারকে বৃটনের সাহায্যে আসিতে পারে বলিয়া হিসাবের অঙ্ক এখনও পূরণ করি নাই। গ্রীস ইটালী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তুর্কের অবস্থা এখনও সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত নহে। বুলগার ও যুগস্লাভিয়ার কথা না বলিলেও চলে।

তারপর সুদূর প্রাচ্যের দিকে দৃষ্টি পড়ে। চীন ও জাপানের মধ্যে দীর্ঘদিনব্যাপী সংঘর্ষ ক্রমে দুর্জ্জেয় রহস্যময় হইয়া পড়িতেছে; ইন্দোচীনের উপর জাপানের আধিপত্যে চীন-জাপান যুদ্ধের ছন্দঃ-পরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে। সম্প্রতি মস্কো হইতে মল্টভের বার্লিনে আগমনে চীন-জাপানের সংগ্রাম একটা নূতন মূর্ত্তি ধরিতে পারে। আমরা তাই প্রাচ্যখণ্ডে জাপানের প্রতাপ ক্ষুণ্ণ করার জন্য চীনের উপর বেশী আস্থা স্থাপন করি না। যদি বাহিরের আশা বৃটনের কোথাও থাকে, তবে তাহা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। মিষ্টার রুজভেল্ট ইংলণ্ডের পরম মিত্র। তিনি পুনর্ব্বার রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় আশার মাত্রা বাড়িয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে রণসম্ভার সাহায্যরূপে মিলিবে, এ বিষয়ে আর সংশয় নাই; কিন্তু আমেরিকার প্রাণশক্তি এই সংগ্রামে বৃটনের শক্তিবৃদ্ধি কতখানি করিবে, সে বিষয়ে সংশয় আছে। প্রতিবাসী আয়র্লণ্ডের 'হাতী দঁকে পড়িলে ভেকের হুমকী'র ন্যায় নীতি উপভোগ্য। এই সকল দেখিয়া বর্ত্তমান সংগ্রামে একক বৃটনের শত্রুশক্তির সম্মুখে অটল পদে দাঁড়াইয়া থাকা অতি বড় বিস্ময়কর ব্যাপার। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব—সাবাস্ বৃটন!

বৃটনের সহিত ভারতের দৃঢ় সম্বন্ধ। দীর্ঘ দিনের পরিচয়। আমরা যখন সবে মাত্র আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করিয়া আমাদের মুক্তির পথ পরিষ্কার করিতে আগাইতেছিলাম, ঠিক সেই সময়ে এই সংগ্রাম তাহা ব্যাহত করিয়া দিল। বৃটনের যদি পরাজয় হয়, ভারতের যে কি দুর্দ্দশা হইবে তাহা চিন্তায় কুলায় না; কিন্তু যুদ্ধজয়ে বৃটনের সহিত ভারতের সম্মানজনক সম্বন্ধ-স্থাপনের ষোল আনা আশা আছে। ভারতবাসী এই জন্য এই যুদ্ধে বৃটনের জয় চায়। বৃটনও বর্ত্তমান সংগ্রামে বিজয়ী হইলে, অগ্নিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় বৃটনের সে দিব্য শক্তি ভারতের হিতসাধনে প্রযুক্ত হইবেই—অতীতের জটিল কাহিনী বিদীর্ণ করিয়া নিঃসঙ্কোচে এই ভবিষ্যদ্বাণী আমরা করিতে পারি।

এই যুদ্ধজয়ের জন্য সম্পূর্ণরূপে রাজশক্তিই দায়ী। আন্তর্জ্জাতিক চালবাজীর উপর নির্ভর করিয়া বৃটিশজাতি ভারতকে সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য তুল্যভাবে যোগ্য করেন নাই। এই জন্য ভারতের দান যেরূপ হওয়া উচিত ছিল, তাহার অন্যথা হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সংগ্রামে রাজশক্তির প্রতি প্রজাসাধারণের নানা কারণে মনোভাব যেমনই হউক না, এই সংগ্রামের ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া ইংলণ্ডের সহায়তার জন্য ভারতের লোক, অর্থ ও পদার্থ-বল সাধ্যমত নিয়োগ করা উচিত—ইহাতে ভারতের অশ্রেয়ঃ হইবে না।

বিজয়ী ইংরাজ ভারতের শ্রেয়ঃ-সাধনে মনোবৃত্তির সঙ্কীর্ণতায় যদিও পরাঙ্মুখ হয়, ভারতের আজিকার এই দানশক্তি তাহাকে ভারতের মুক্তির জন্য তদনুকূল কর্ম্ম করিতে বাধ্য করিবে। এই সংগ্রামে ভারতের রাষ্ট্রসাধনার দিক্-পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়।

বর্ত্তমান যুদ্ধের যে বিপুল ব্যয়ভার যুদ্ধরত জাতিগুলিকে বহন করিতে হইতেছে, তাহা কিরূপে সম্ভব হয়, আমরা তাহা ভাবিয়া পাই না। যুদ্ধরত ব্যক্তি ভিন্ন অসামরিক নাগরিকদের উপর কেমন করিয়া মৃত্যুবজ্র নিক্ষেপ করা যায়, তাহাও আমাদের চিন্তার সীমা ছাড়াইয়া যায়। স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমাজের বুক হইতে পিতামাতার স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া, লক্ষ লক্ষ শিশুদের নিরাপত্তির জন্য স্থানান্তরে প্রেরণ করা আমাদের ধারণায় আসে না। আমরা ভাবিয়া পাই না জনবহুল উৎসবমুখর নগরীর ভূগর্ভে লক্ষ লক্ষ নরনারী কেমন করিয়া বিগত দুই মাস কাল বাস করিতে পারে! আমরা দীর্ঘদিনের পরাধীন জাতি—আদার ব্যাপারীর ন্যায় জাহাজের খোঁজ আমাদের রাখিতে হয় না। আমরা ইংরাজের শিক্ষা লাভ করিয়া, মুক্তিকামনায় বড় জোর আন্দামানে অথবা কারাগৃহে কয়েক বৎসর বন্দী থাকিতে শিখিয়াছি, কিন্তু দেশ ও জাতির মর্য্যাদারক্ষার দায়ে জগতের স্বাধীন জাতিরা কি অসাধারণ ত্যাগ ও ক্লেশ সহিতে পারে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অবশ্য এই অবস্থার শিক্ষা আমরা পাই নাই, এই জন্যই এই দুর্দ্দিন-চিত্র আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করে। স্বাধীন জাতির চরিত্রবলের হিসাব আমাদের অঙ্কশাস্ত্রে নাই।

আমরা কেন্দ্র-সভায় অর্থসচিব স্যার জার্ম্মী রেজম্যানের মুখে শুনিলাম—ভারতরক্ষার জন্য সামরিক ব্যয় ৭৫ কোটী টাকা এক বৎসরে প্রয়োজন হইবে অর্থাৎ ২০ লক্ষ টাকা প্রতিদিন। ইহাতে ৫ লক্ষ সৈন্য গঠিত হইবে। ইহারই মধ্যে ৬০ হাজার সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হইয়াছে। ৮৫টী যান্ত্রিক চালানী ইউনিট ইহার মধ্যেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ৫ হাজার সামরিক মোটর-যান ৩০ হাজারে উঠিয়াছে। ইহা ব্যতীত গোলাগুলি, বারুদ, সামরিক উড়োজাহাজ, কত যে বিপুল ব্যবস্থা—স্বাধীনতান্দোলনকারী এজাতি এই সকল কল্পনা করিতে পারে না। স্বাধীন জাতি হইলে, এই সমরজয়ের জন্য ধনপ্রাণ দিতে আমাদের কুণ্ঠা হইত না। আমরা শিক্ষা পাইয়াছিলাম কেরাণীগিরি, জজীয়তী, ওকালতী প্রভৃতির আর মেকলে, বার্ক প্রভৃতির কৃপায় মুক্তিপ্রার্থী হইয়া চীৎকার করিতে অথবা সাদা কাগজে কালী ঘসিতে। আজ এই মহাসমর লক্ষ্যে রাখিয়া অমরা যেন দৃঢ় সঙ্কল্প করি—ইংরাজের জয় হউক। বিজয়ী হইয়া ইংরাজ ভারতের মুক্তিসাধনায় সর্ব্বাগ্রে এইরূপ বীরচরিত্র গঠন করার সুবিস্তৃত পথ ও সুযোগ যেন আমাদের দেন। আমাদের স্বাধীনতার সত্য দীক্ষা—ভারতে বীরজাতির সৃষ্টিতেই।

---

# কোজাগরী

শ্রীহলধর মুখোপাধ্যায়

আস্‌ছে ভেসে ফুলের সুবাস
জ্যোৎস্না-ধারায় স্নান করি'
জ্ব'লছে প্রদীপ মন্দিরেতে
দেখ্‌রে চেয়ে প্রাণ ভরি'।
মায়ের মধুর মূর্ত্তিখানি,
হস্তেতে তাঁর অভয়বাণী—
চরণতলে কমল শোভে
কণ্ঠে দোলে সাতনরী।

মঙ্গল শাঁখ বাজছে ঘন
দগ্ধ-ধূপের ধোঁয়ায় গো,
আনন্দেরি উৎস রসে
প্রণামখানি নোয়ায় গো,
কোজাগরের মিলন রাতে
মায়ের আশীষ নেরে মাথে,
সারানিশি আয় জেগে সব
মায়ের পূজার গান করি।

# পণ্ডিত ৺পঞ্চানন তর্করত্ন

শ্রীমতিলাল রায়

আমার মত সমাজ ও ধর্ম্মবিপ্লবীর সহিত খাঁটী সনাতনী ভারতবরেণ্য ৺পঞ্চানন তর্করত্নের একাত্মতা লাভ করা অনেকেই স্বপ্ন মনে করিবেন। আমি জানি, বর্দ্ধমান জয়ন্তীতে কোন এক শ্রদ্ধেয় সনাতনী আমার মত পাষণ্ডের সংস্পর্শে আসা নিরয়গমনের ন্যায় পাপের মনে করিয়া দূরে সরিয়া ছিলেন। কিন্তু গর্ব্বের কথা,

পণ্ডিত ৺পঞ্চানন তর্করত্ন

১৩৪৬ সালের কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় তিনি আমার মস্তকে শীর্ণ হস্ত স্থাপন করিয়া 'হিন্দুগৌরব' আখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁর সে অমর আশীর্ব্বাদ আমার জীবনে ব্যর্থ হইবে না।

তাঁর সে মৃত্যুশয্যায় আমার উপস্থিতির হেতু "প্রবর্ত্তকে" ব্যক্ত করিয়াছি। স্থান ও সময়ের অভাবে তাঁর পূতকথা বিস্তৃত লেখা সম্ভব হইল না। আর তাহাতেও আমার তৃপ্তি নাই। আমার অন্তরের বীণায় তাঁহার আশীর্ব্বাণী অন্তরেই গুঞ্জন তুলিবে যুগ যুগ। সে বাণীর প্রকাশে সেই পবিত্র শক্তির গুরুত্ব ও মহিমার লাঘব হইবে। আমি তাই আমার হৃদয়োত্থিত কয়েক ছত্র শ্রদ্ধার বাণী উচ্চারণ করিয়াই তর্করত্ন মহাশয়ের অমৃতময় স্মৃতি "প্রবর্ত্তকের" পৃষ্ঠায় রক্ষা করিতেছি।

"প্রবর্ত্তক" পড়িয়া সনাতনী সমাজে আমার কুখ্যাতি রটিয়াছিল। "প্রবর্ত্তকের" ভাষা ও বাণী বোধ হয় গভীরভাবে অনেকে অবধারণ করেন নাই। তর্করত্ন মহাশয় অন্তর্দ্দর্শী ছিলেন; তাই তাঁহার সুদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হই নাই। 'প্রবর্ত্তকের' খ্যাতিপত্র আমি তাঁর পাইয়াছি; তাহা সময়-মত প্রকাশ করিব। বড় দুর্দ্দিনে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়। আমার পত্নীবিয়োগের পর তাঁর শ্রাদ্ধ-বাসরে বাংলার ব্রহ্মণ্যকুলতিলক তর্করত্নের সর্ব্বপ্রথম শুভাগমন হইয়াছিল। সনাতনী সমাজ ইহাতে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তর্করত্ন সনাতনী ছিলেন। সত্যের পূজা তিনি নির্ভীক ভাবেই করিতেন। তিনি আসিয়াছিলেন সতীর সম্মান দিতে। সে শ্রাদ্ধবাসরে সতী-বন্দনার ঋক্ এখনও স্তব্ধ হয় নাই। সতী-তীর্থের উন্নত মন্দির-চূড়া পণ্ডিতবরের আশীর্ব্বাদ দৃপ্ত বলিতে বাধে না।

"প্রবর্ত্তক" সঙ্ঘে হিন্দুসভার প্রতিষ্ঠা যুগে তর্করত্ন মহাশয়ের অবদান আমাদের চিরস্মরণীয়। মহাত্মাজীর অস্পৃশ্যতাদূরীকরণের যুগে তাঁর অনশন-সঙ্কল্প ভঙ্গ করার হৃদয় লইয়া আমার সহিত তাঁর সুদূর যারবেদায় যাত্রা জাতির জীবনে এক ঐতিহাসিক ঘটনা; সে কথার বিস্তৃত বিবরণ আমি পরে লিখিব।

আমি দেখিয়াছি—এই তেজস্বী ব্রাহ্মণের ললাটে শাস্ত্রনিষ্ঠার অপার্থিব জ্যোতিঃ-রেখা। আমি দেখিয়াছি—এই পণ্ডিতাগ্রগণ্যের ওষ্ঠপুটে হিন্দু-জাতিগঠনের দুর্জ্জয় সঙ্কল্প। আমি দেখিয়াছি—তাঁর নয়নের দীপ্তিতে ভারতের মুক্তি-যজ্ঞের প্রজ্জ্বলিত হুতাশন। আমি মুগ্ধ হইয়াছি—হিন্দুর আচারে ও হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসে তাঁর আপ্রাণ অনুরাগ দেখিয়া। তর্করত্ন মহাশয় বাঙ্গালী জাতির কর্ণে শাস্ত্রবাণী প্রচার করিয়াছেন অক্লান্ত পরিশ্রমে। বাঙ্গালী জাতিকে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার জন্ত বেদান্তের শক্তিভাষ্য দিয়াছেন,

গীতার নূতন ব্যাখ্যা রাখিয়া গিয়াছেন, চণ্ডীর মর্ম্মকথা বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রস্তরবেদী তর্করত্ন মহাশয় সারা জীবন ধরিয়া রচনা করিয়াছেন। সে সন্ধান জাতিকে একদিন করিতেই হইবে। পুরাণ-সংহিতা, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি অনুধাবন করিতে হইলেও, বাঙ্গালী জাতিকে পঞ্চানন তর্করত্নের স্মরণ লইতে হইবে। তাঁহার রক্তধারায় ব্রহ্মণ্য-বীর্য্যের অগ্নিস্রোতঃ বহিত। তিনিও স্বাধীনতাকামীদের ন্যায় একদিন কারাবরণে কুণ্ঠা করেন নাই। হিন্দুজাতির অন্তঃপুর কলুষিত করিয়া জাতিকে চির মলিন করার সন্ধাবিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াও যখন সফলকাম হইলেন না, তখন তিনি গভর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত মহামহোপাধ্যায় উপাধি নিষ্ঠীবনের ন্যায় পরিত্যাগ করিলেন। ধর্ম্ম ছিল তাঁর প্রাণ, আর সে ধর্ম্ম শাস্ত্রসম্মত হিন্দু ধর্ম্ম। ইহার জন্য তিনি সৌভাগ্য-সম্মান সবকিছু পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা করিতেন না। আমরা এই হিন্দুপ্রাণ ভট্টপল্লীর গৌরব-সূর্য্যের অন্তর্দ্ধানে অতিশয় ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। তাঁহার পবিত্র নিঃশ্বাস-পবনে অতর্কিতে বাংলার ক্ষীয়মাণ হিন্দুজাতি তবুও কিছু পুষ্টি পাইতেছিল, সে ভাগ্যও বিধাতা সহিলেন না। আমরা তাঁর যোগ্যপুত্র শ্রীজীব ও তদনুজদের সহিত গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহাদের পিতৃশোকের অংশগ্রহণের সৌভাগ্য আমাদের নাই, কিন্তু আমাদের সহানুভূতি অকপট ও অকৃত্রিম। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীজীবের পত্রাংশটুকু এইখানে উদ্ধৃত করিয়া এই মহা-পুরুষের উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছি—

"তিনি আপনাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন—আপনার কর্ম্মশক্তির জন্য। নিজেও ছিলেন কর্ম্মব্রহ্মের উপাসক। তিনি আমাকে বহু বার বলিয়াছেন "আলস্যাদন্ন-দোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি, ভারতের অধঃপতন আলস্যে বা কর্ম্মশক্তির অভাবে।" এইজন্য তিনি প্রতিকার্য্য যথাকালে সম্পন্ন করিতেন। এমন কি শেষ দুইদিন আসনে বসিয়া যথাসময়ে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে তিনি পারেন নাই বলিয়া আমার নিকট দুঃখ করিয়াছিলেন; আপনি কর্ম্মী, উৎসাহী, আপনার প্রতি তাঁর বড় অনুরাগ ছিল।

তিনি সনাতনী হইলেও, আলস্য-পরায়ণ সনাতনী অপেক্ষা উৎসাহী কর্ম্মদক্ষ কিঞ্চিৎ মতান্তরপ্রবিষ্ট হিন্দুদ্বারা কল্যাণের আশা অধিক করিতেন।

তাঁহার মৃত্যুও অপূর্ব্ব। এই বাড়ীভাড়া লইবার রহস্য আপনাকে জানাইতেছি, এই বাড়ীটী উদয়পুর ষ্টেটের সম্পত্তি। উদয়পুরের মহারাণা ফতে সিং তাঁহার সুপরিচিত ছিলেন, তাঁহার প্রকৃতিতে ক্ষত্রিয়ভাব তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারই অধিকারভুক্ত স্থানে দেহত্যাগ করিবেন, ম্লেচ্ছ-রাজ্যে করিবেন না—ইহাই ছিল অন্তর্গত ভাব। এই ভাব লইয়া তিনি নিজ বাটী ত্যাগ করিয়া, ভাড়া লইয়া এই বাড়ীতে পড়িয়াছিলেন। চতুঃষষ্টি যোগিনী মা দুর্গা ও গঙ্গার সান্নিধ্য, কাশী ও ক্ষত্রিয়াধিকার, এই চতুষ্টয়গুণযুক্ত স্থানে 'ব্রহ্মময়ী দুর্গা' নাম ও গায়ত্রী জপ করিতে করিতে কুশাসনে শয়ান হইয়া তিনি সুপবিত্রভাবে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমরা দুই ভাই এখানে ছিলাম, তৃতীয় ব্যক্তি তাঁহার শবদেহ স্পর্শ করিতে পায় নাই, তাঁহার নিষেধ ছিল। পুত্র-কর্ত্তব্য পুত্রই করিবে, ইহাই ছিল নীতি। দিয়াশালাইএর অগ্নি অপবিত্র, এজন্য চকমকি ঠুকিয়া অগ্নি বাহির করিয়া চিতায় দেওয়া হয়। মণিকর্ণিকার ব্রহ্মনালে দেহ-দাহ হইয়াছে। প্রাতঃকালে হস্তের অঙ্গুরীয় দেখাইয়া দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—স্বর্ণখণ্ড আবশ্যক হইলে, ইহা হইতে লইবে।

এমন অনায়াস মরণ কখনও দেখি নাই, শেষে যেন নিদ্রামগ্ন হইলেন। মুখে এতটুকু বিকৃতি ছিল না—কোন প্রকার চাঞ্চল্য দেহে দেখা যায় নাই! তিনি গঙ্গামৃত্তিকার উপরে কুশাসনে শয়ন করিয়া ধীরে ধীরে প্রাণবায়ু বাহির করিয়া দিয়াছেন।

# আলো-ছায়া

শ্রীনমিতা মজুমদার

মোরা আছি ধরণীর ঘরে
হেলাভরে।
দিনান্তে কাটিয়া যাবে জীবনের বেলা
বালু লয়ে খেলা—
দু'হাতে ছুঁড়িয়া ফেলি' যাব পথ-পাশে
বৃহতের আশে।

নহে, সত্য নহে—
ধরণীর চঞ্চলতা, হাসিকান্না, এ কথা কে কহে?
কে বলিতে পারে
অনন্তকালের হাতে কি অলক্ষ্য হারে
একসূত্রে গাঁথা হয় জীবন-মরণ
নানা আয়োজন।
মুহূর্ত্তের হাসিকান্না, মুহূর্ত্তের আলো
মন্দ-ভালো
এই পৃথিবীর।

কে রয়েছে স্থির?
রয়েছে কি স্থিরতায় লীন
এই নিশিদিন?
এই গ্রহ-তারা
হারায়ে ফেলেছে তার চলিবার ধারা?
প্রতিদিন
সন্ধ্যা আসে, নিত্য রবি লীন,
নিত্য তার উদ্ভাসিত দিগন্তে উদয়—
নিত্য জন্ম, নিত্য নিত্য ক্ষয়।

এক প্রান্তে পর্ণকুটীরের খোলা দ্বার—
কে জন করিছে যাত্রা, রাত্রি অন্ধকার।
অকস্মাৎ
শয্যা হ'তে জাগি'।
ফিরিবার লাগি'
বাড়ায়েছে হাত
প্রাণপণ বলে, প্রেয়সী তাহার
'ছাড়িব না, ছাড়িব না' বলে বারবার
ব্যগ্র বাহু ধরেছে আঁকড়ি'।
তবু দিতে হবে ছাড়ি'।

এ-কি সত্য নহে—
এই চলে-যাওয়া শুধু এই রহে?
মাতৃক্রোড় শূন্য সেকি, ব্যাকুল উৎসুক
প্রেয়সীর বাহু, সন্তানের শুভ্র কচিমুখ,
এই আলো, এই আশা
এই ভালবাসা—
এই থাকা,
একান্ত আপন করি' এই কাছে ডাকা—
চোখে চোখে রাখা
সে কি শূন্যে ভরা!
একদিন যে কণ্ঠের কলরবে পূর্ণ ছিল ধরা
যে প্রাণ ভরিয়াছিল দুঃখ-সুখ-দোলে,
হাসিকান্না রোলে—
অজস্র কর্ম্মের বেগে অসংখ্য গতিতে
ভাবের নতিতে
সে কি মিথ্যা হবে শুধু চলিবার কালে?

জীবনের জালে
পাকে পাকে, ফেরে ফেরে কত রত্ন-ধন,
কত আয়োজন!
বাল্য-যৌবনের ঘন দোলা
শঙ্কা-ভীতি-ভোলা,
দিনান্তে নিস্তব্ধতা জাগে
বিদায়ের আগে।

এখনো রয়েছি চেয়ে বহু বর্ষ দূরে
গ্রামপ্রান্তে যে বিজন পুরে
যে শিশু করিছে খেলা
লয়ে মাটি ঢেলা
নদীতীরে
আসিবে না ফিরে'—
সে শিশু গিয়েছে ভেসে যৌবনের বেগে
রক্তরাগ লেগে'।

তবু সত্য সেই কত
সেই মত
যে মুহূর্ত্তে জানি আমি নাই—
সে মুহূর্ত্তে জানি হেথা পূর্ণ ছিনু তাই।

# শক্তি-তত্ত্ব

( অপ্রকাশিত রচনা )

৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

আমাদের বঙ্গদেশে যে দুর্গাপূজা হইয়া থাকে, তাহা প্রধানতঃ বৃহন্নন্দীকেশ্বর, কালিকা ও দেবী এই তিনখানি উপপুরাণ-প্রোক্ত ক্রম, পদ্ধতি বা ধারা অনুসরণ করিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী'র ক্রমও অনুসৃত হয়। সকল পদ্ধতিতেই দেখা যায়, দেবী 'কৈলাসবাসিনী শিব-শক্তি ভবানী বা মহেশ্বরী অথবা মেনকানন্দিনী উমা হৈমবতী'। সাধারণতঃ এই সকল বা এইরূপ কথা আমরাও বলিয়া থাকি। বেশ ভাল করিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে, এই সকল পদ্ধতির মূলে যাহা তাহা 'শক্তি-তত্ত্ব'। শক্তি কি তাহাই আমাদের বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন শক্তি বলিলে কোন দেবের প্রভাব বোঝায়– বিশেষতঃ বিষ্ণু বা শিবের। এই শক্তি তাঁহার অর্ধাঙ্গ, এই শক্তিই সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি। কয়েকখানি তন্ত্রে সাধারণের বিশেষ পরিচিত শক্তি—পার্বতী, ভবানী বা দুর্গার অনেক কথাই আলোচিত হইয়াছে। শাক্তেরা বেশীর ভাগ তাঁহার পূজা করিয়া থাকে।

শাক্ত-ধর্ম সনাতন হিন্দুধর্মের একটী বিশেষ শাখা। আমরা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলি, অতি প্রাচীনকালে এ দেশে তাহার অস্তিত্ব ছিল না। হিন্দু নাম কেমন করিয়া আসিল, তাহা এক ঐতিহাসিক সমস্যা, সে সমস্যা পুরাণের বরাত পণ্ডিতদের উপর রহিল। যে ভাষা হইতেই হিন্দু নাম আসুক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। বৈদিক ধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম ভারতবর্ষের আদি ধর্ম হউক বা অন্য স্থান হইতে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া থাকুক, অতীব প্রাচীনকালে এই ধর্ম ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সনাতন হিন্দুধর্ম এই বৈদিক ধর্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে আদিম জাতিদিগের মধ্যে তাহাদের নিজস্ব ধর্ম প্রচলিত ছিল। অনেকের অনুমান এই ধর্ম ভারতবর্ষের আদিম ধর্ম। অনেকের অনুমান বৈদিকধর্ম এবং আর্যজাতীয় মনুষ্যেরা এক সময় ভারতের বহির্ভাগ হইতে এ-দেশে উপনীত হইয়া এ-দেশের আদিম অধিবাসীদিগের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। প্রচলিত হিন্দুধর্ম আর্য ও আদিম জাতির মিশ্রিত ধর্ম। সে কথা যাক। তবে খাঁটি বৈদিকধর্মের একটা বৈশিষ্ট্য ধরিয়া হিন্দুধর্ম হইতে খাঁটি বৈদিক ধর্মকে খুঁজিয়া বাহির করা যায়। আমরা এখন হিন্দুধর্মকে যে আকারে পাই, তাহা অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া সমগ্র ভারতে সুবিস্তৃত। শক্তি-উপাসনা ইহার একটী শাখা। হিন্দুধর্মের যতগুলি শাখা-প্রশাখা আছে, তাহাদিগের মূলানুসন্ধান করিলে প্রাচীন বেদে তাহাদিগের বীজের সন্ধান পাওয়া যায়। সকল হিন্দুর পক্ষেই বেদ অতি পবিত্র জিনিস। বেদের দোহাই না দিয়া হিন্দুর কোন শাস্ত্রকেই রক্ষা করা যায় না। কিন্তু প্রচলিত হিন্দুধর্মে এমন অনেক অংশ আছে, যাহা বেদ-বহির্ভূত। শক্তি-উপাসনার বীজ বেদে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রচলিত শাক্তমতে বেদ-বহির্ভূত অনেক ধর্মমত মিশাইয়া আছে। কোন কিছু উৎপন্ন হইতে গেলে, বহু স্থান হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া উৎপন্ন হয়। বস্তুর সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বীজভূত অবস্থা স্থূল দৃষ্টির গোচরীভূত হয় না। বস্তু যখন বৃহদাকার ধারণ করে, তখনি তাহা দৃষ্টিগোচর হয়। প্রচলিত হিন্দুধর্ম অব্যক্তাকারে কি ছিল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। এখন ইহা প্রকাণ্ড বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া বহু সংখ্যক শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বৃক্ষের বীজ বেদরূপ বৃক্ষ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাকে তৎকালে প্রচলিত আর্যধর্ম-বহির্ভূত আদিম-জাতির ধর্ম হইতেও যে না উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট হইতে হইয়াছে, তাহা নয়। পরে বৌদ্ধ-দিগের নিকট হইতেও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইহা বিপুলকায় ও বহু অবয়বসম্পন্ন হইয়াছে। আশ্চর্যের

বিষয় এই যে, হিন্দুধর্মের পরিপুষ্টির জন্য যতকাল যে ধর্মভাবের অস্তিত্বের প্রয়োজন হইয়াছে, ততকাল সেই ধর্মভাব ভারত হইতে উচ্ছিন্ন হয় নাই। দেখা যায়, যতকাল হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কলেবর পরিপুষ্টির জন্য বৌদ্ধধর্ম হইতে উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন হইয়াছে, ততকাল বৌদ্ধধর্ম ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় নাই।

সকলেই অনুমান করেন, ঋগ্বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঋগ্বেদে স্ত্রীদেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল না। শক্তি-উপাসকেরা শিবপত্নীরূপিণী দেবী, দুর্গা এবং কালী প্রভৃতির উপাসক; সুতরাং শক্তি-উপাসনা স্ত্রীদেবতার উপাসনা। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, ঋগ্বেদে প্রচলিত শাক্তমতের উদ্দেশ পাওয়া যায় না। কিন্তু বিষ্ণুর ও রুদ্রের নাম ঋগ্বেদেও আছে। ব্রহ্মা ও ইন্দ্রই ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা ছিলেন, বিষ্ণু ও রুদ্রের বিশেষ প্রাধান্য ছিল না। ঋগ্বেদের রুদ্র পরবর্ত্তী কালে যখন শিবাকারে পূজিত হন, তখন তাঁহার বিশেষ প্রাধান্য ঘটিয়াছিল। ইন্দ্র ও ব্রহ্মার সবিশেষ প্রাধান্য থাকিলেও পূজিতা দেবীরূপে ইন্দ্রাণী ও ব্রহ্মাণীর কখনও প্রাধান্য হয় নাই। ইহার কারণ কি? পরবর্ত্তী উত্তরকালে ইন্দ্র ও ব্রহ্মার পূজাই শিথিল হইয়া পড়িল কেন? ইহার এক কারণ এ-দেশের আদিম জাতিদের সংঘর্ষ। শিব ব্রাত্যদিগের দেবতা, তিনি ভূতপ্রেত নাচাইয়া শ্মশানে-মশানে ফিরিতেন। আর্য্যজাতি যখন ব্রাত্যদিগের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে থাকিলেন, তখন তাঁহারা ব্রাত্যদিগের শিবের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের বৈদিক দেব রুদ্রের সহিত শিবের সাদৃশ্যবশতঃ তাঁহারা তাঁহাদের রুদ্রকে শিবে পরিণত করিলেন। সুতরাং বৈদিক যুগের শেষাশেষি শিবমূর্তি বৈদিক রুদ্র, ইন্দ্র ও ব্রহ্মাকে অতিক্রম করিলেন। ব্রাত্যদিগের শিব আর্য সংস্পর্শে আসিয়া সভ্য হইলেন ও আর্যসুলভ গুণগ্রামে বিভূষিত হইলেন। ফলে ক্রমশঃ শৈব-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। মানব-মন জগৎ-সম্বন্ধে যত প্রকার ধারণায় উপনীত হইতে পারে, শৈব-মতে তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। যে অনির্বচনীয় ও অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা সমগ্র বিশ্ব নিয়মিত, তাহা শৈব-শক্তি। সেই শক্তিতে এক দিকে যেমন সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হয়, তেমনিই আর এক দিকে সেই শক্তি বিনাশক্ষম। সৃষ্টি এবং বিনাশ দুই পৃথক্ ব্যাপার নহে। কার্যের সহিত কারণের সম্বন্ধ, তেমনি সৃষ্টির সহিত বিনাশের ও বিনাশের সহিত সৃষ্টির সম্বন্ধ।

যে কারণ হইতে জীবের জন্ম হয়, তাহাই সৃষ্টির প্রবর্তক। তাহা জীব-জগতে চিরকাল আছে, তাহার আরম্ভও নাই, শেষও নাই। আসঙ্গলিপ্সার ফলে জীবের জন্ম হয়, কিন্তু জীবের পরিপোষণের জন্যও প্রকৃতিতে বিস্ময়জনক বিধানের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, অতি নিকৃষ্ট জীবকেও তাহার সন্তান পরিপালনের জন্য যত্ন করিতে ও কৌশল অবলম্বন করিতে দেখা যায়। নিকৃষ্ট জীবকে স্নেহ-মমতা কে শিখাইল? কৌশল কে শিখাইল? স্নেহ-মমতা যেন প্রকৃতিরই কৌশল—জীবের পরিপালন ও রক্ষার জন্য অদ্ভুত কৌশল। যে শক্তি সৃষ্টি করেন, সেই শক্তিই বিনাশ করেন, সেই শক্তি স্নেহে সৃষ্টি করিয়া ক্রোধে বিনাশ করে না। তাহার স্নেহও নাই, ক্রোধও নাই। জ্ঞানী ব্যক্তি ধ্বংসের মূর্তি দেখিয়া শিহরিয়া ওঠেন না। ধ্বংস সৃষ্টির বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া সৃষ্টিকার্যে সহায়তা করিয়া থাকে। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা জগতে সৃষ্টিও দেখেন না, বিনাশও দেখেন না। সৃষ্টি ও বিনাশ গতিশীল জগতের গতির সহায়তা করে মাত্র। ইহারা জাগতিক গতিকে রক্ষা করে। ডিম্বের সৃষ্টি হয়, কিন্তু ডিম্বের নাশে পক্ষীর জন্ম হয়। তেমনি ভ্রূণের বিনাশে শিশুর জন্ম হয়, আবার শৈশবের নাশে মানবত্ব। জগতে একটীর নাশ আর একটীর উদ্ভবের কারণ। তত্ত্বদর্শীরা বলেন, মৃত্যু একটী পরিবর্তনমাত্র। জগৎ পরিবর্তনশীল, জগৎ বিনাশশীল নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক চিন্ময়ী শক্তির লীলা। বিশ্বের গতি ও উন্নতি-বিধানের জন্য জন্মের যে রূপ আবশ্যকতা, মৃত্যুরও সেইরূপ আবশ্যকতা।

যে শক্তি জগতের মূলে থাকিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কার্যে সহায়তা করিতেছে তাহা শৈবশক্তি। শক্তি-উপাসকেরা এই শিব-শক্তিকে দুর্গা, কালী, মহাদেবী প্রভৃতি মূর্তিতে পূজা করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ দেবী

ভীষণ মূর্তিতে পূজিতা হন। তিনি জীব-শোণিতে পরিতুষ্টা। শিবমন্দিরে শক্তি-পূজা শিব-পূজার অঙ্গ হইলেও শিবেরই সেখানে প্রাধান্য। কিন্তু শক্তি-পূজক শিব-শক্তিরই উপাসক। দেবী-উপাসনা ভারতীয় অনেক ধর্মসম্প্রদায়ের অঙ্গ হইলেও সম্প্রদায়ের সহিত ইহা বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

শৈব-শক্তি-সম্বন্ধে সমুচ্চ ধারণা সুগভীর দার্শনিক আলোচনার ফল, কিন্তু শৈব ও শাক্তেরা একেবারেই এই সমুচ্চ ধারণায় উপনীত হইতে পারে নাই। শক্তি-সম্বন্ধে সমুচ্চ ধারণায় উপনীত হইতে বহুকাল লাগিয়াছে।

যজুর্বেদে অম্বিকাদেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি রুদ্রের সহিত একত্র থাকিতেন। কিন্তু যজুর্বেদে অম্বিকা রুদ্রের পত্নী নহেন। ইনি রুদ্রের ভগিনী। সমধিক প্রাচীন যুগে এই অম্বিকার পর্বতের সহিত সংস্রব ছিল। এই অম্বিকাকে ক্রমশঃ আমরা পার্বতী নামে অবিহিতা হইতে দেখি, এবং ইনিই পরে উমা ও হৈমবতী নামে অভিহিতা হন। হিমালয়ের শিখর-বিশেষ কোন সময়ে দেবীরূপে পূজিতা হইত, এবং এই দেবীই হৈমবতী আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনিই হিমালয়ের শিখররূপে পর্বত-কন্যা, সুতরাং ইনি পার্বতী। পুরাণোল্লিখিত উমা হিমালয়কন্যা। তিনি এবং হৈমবতীও পার্বতী নামে অভিহিতা। দেখা যাইতেছে, অথর্ববেদে রুদ্র ঠিক শিবে পরিণত হন নাই। অম্বিকা তাঁহার সহচারিণী ভগিনীমাত্র ছিলেন। কিন্তু অম্বিকাই পার্বতী, হৈমবতী, উমা আখ্যা প্রাপ্ত হন।

শক্তি-উপাসকেরা শিব-শক্তির উপাসক। শক্তি মূর্তিমতী হইয়া দেবীরূপে প্রকাশময়ী। শিব ও শক্তি স্বতন্ত্রভাবে চিন্তিত হইলেও স্বরূপতঃ এক। যিনি পরমাত্মা—পরমপুরুষ, তিনি স্বয়ং নিশ্চেষ্ট। তাঁহার সকল চেষ্টা দেবীরূপিণী শক্তির সাহায্যে। শাক্তদিগের শক্তিকে মায়ার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, জগতের উদ্ভব মায়া হইতে। কিন্তু বৈদান্তিকের মায়া ও শাক্তের শক্তিতে প্রভেদ আছে। বৈদান্তিক মায়া হইতে সরিয়া পড়িতে চায়, কিন্তু শাক্ত শক্তির উপাসক। সাংখ্য-দর্শনের প্রকৃতির সহিত শাক্তের শক্তির সাদৃশ্য আছে। সাংখ্য-মতে প্রকৃতি স্ত্রী, আত্মা পুরুষ। পুরুষ নিশ্চেষ্ট, কিন্তু প্রকৃতি চেষ্টাশীলা। প্রকৃতি পুরুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে এবং কর্মই পুরুষের দুঃখের সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রকৃতি এক দিকে যেমন পুরুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করিয়া পুরুষের দুঃখময় সংসার সৃষ্টি করে, আর এক দিকে তেমনি প্রকৃতিই পুরুষের মুক্তির কারণ হয়। সাংখ্য-দর্শন যে দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখিয়া থাকেন, শাক্তেরা ঠিক সেই দৃষ্টিতে শক্তিকে দেখেন না। শাক্তেরা শক্তির পূজা করিয়া থাকেন, শক্তির সাধনা করিয়া থাকেন। সাংখ্য-দর্শনে প্রকৃতি-সম্বন্ধে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং শক্তি, মায়া ও প্রকৃতি পরস্পরসাদৃশ্য প্রতীয়মান হইলেও, শক্তি, মায়া ও প্রকৃতি ঠিক এক জিনিস নয়।

কিন্তু শাক্ত, বৈদান্তিক ও সাংখ্যেরা বিভিন্ন পথাবলম্বী হইলেও সকলেরই লক্ষ্য এক। হিন্দুরা সংসার ও জীবনকে দুঃখময় জানিয়া সংসার ও জীবন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চায়। তাহারা বস্তুতত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিতে চায় না, দুঃখ-নিবৃত্তিই তাহাদিগের লক্ষ্য। বৈদান্তিক বলেন, ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই—জগৎ মায়া। শাক্ত বলেন, শক্তি ও শিবে প্রভেদ নাই, শক্তিই শিব, শক্তিই ব্রহ্ম—পরব্রহ্ম, পরাৎপরা। শক্তি-সাধনার দ্বারা মানুষ শক্তিমান হইতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে মুক্তও হইতে পারে।

সাংখ্যের সহিত শক্তি-তত্ত্বের সাদৃশ্য এই যে, সাংখ্যে পুরুষ ও শক্তির শিব, ক্রমান্বয়ে প্রকৃতি ও শক্তির সহকারিতা-ব্যতীত সকল কার্যে অপ্রবৃত্ত, সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট। অদ্বৈতবাদ ও শক্তিতত্ত্বে সাদৃশ্য এই যে, উভয় তত্ত্বেই ব্রহ্মসত্তায় বিমুক্তি। শাক্তের শিব, অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম। অধিকন্তু শাক্ত দেখেন শক্তিই শিবের সর্বস্ব, শক্তিকে বাদ দিলে শিবের কিছুই থাকে না।

কাজেই শাক্ত শক্তিরই উপাসক হইয়া পড়েন। শাক্তের কাছে শক্তিরই প্রাধান্য, কিন্তু অদ্বৈতবাদীর কাছে ব্রহ্মেরই প্রাধান্য। অদ্বৈতবাদী মায়া হইতে অব্যাহতি পাইতে চান। অদ্বৈতবাদীর মতে মায়া হইতে অব্যাহতি পাইলে ব্রহ্মে নির্বাণ সিদ্ধ হয়। কিন্তু শাক্ত শক্তিকেই অবলম্বন করিয়া পরমপুরুষার্থসিদ্ধির প্রত্যাশী।

তন্ত্রই শাক্তদিগের প্রধান শাস্ত্র। শ্রুতির ভাগত্রয়ের মধ্যে তন্ত্র উপাসনাকাণ্ডের আংশবিশেষ। সাধন, ভজন ও যোগকেই তন্ত্র বলিতে পারা যায়। ইহার যাহা কিছু সমস্তই আনুষ্ঠানিক (practical)। তন্ত্র সংখ্যায় বহু। তন্মধ্যে মহানির্বাণ, সারদাতিলক, যোগিনী, কুলার্ণব ও রুদ্রযামলই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তন্ত্র আগম ও নিগম-ভেদে দুই প্রকার। আগমে শক্তির প্রতি শিবের উক্তি ও নিগমে শিবের প্রতি শক্তির উক্তি নিবদ্ধ আছে। আর এক প্রকার তন্ত্র আছে, তাহাকে প্রপঞ্চসার-তন্ত্র বলে। প্রপঞ্চসার-তন্ত্র নারায়ণের প্রত্যাদেশ বলিয়া উক্ত হয়। এ-ছাড়া বৌদ্ধতন্ত্র ও অন্যান্য তন্ত্রও আছে।

শাক্ততন্ত্র-মতে শক্তি বিশ্বব্যাপিনী। বিশ্ব বৃহদ্-ব্রহ্মাণ্ড ও মানব-শরীর ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। মানব-শরীরে শক্তি কুণ্ডলিনীরূপে বিরাজিতা। সাধনার একটী অঙ্গ এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করা। শব্দমধ্যেও কুণ্ডলিনী অবস্থিতা। শব্দ মন্ত্ররূপে বিধিপূর্বক উচ্চারিত হইলে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হন।

তন্ত্রে শরীরকে (এক বিশেষভাবে) কতকগুলি স্নায়বিক কেন্দ্রে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই কেন্দ্রসকল ভেদ করিয়া সূক্ষ্ম প্রণালীসকল সঞ্চারিত হইয়াছে। এই সকল প্রণালীই শক্তির গতিপথ।

তন্ত্রমতে সিদ্ধি সাধন-সাপেক্ষ। কিন্তু তন্ত্র-সাধনায় গুরুর প্রয়োজন। উপযুক্ত গুরু-ব্যতীত তান্ত্রিক সাধনা অসম্ভব। তন্ত্রমতে সকল মানুষ সমান নয়। মানুষের প্রকৃতিবিশেষে অনুষ্ঠানবিশেষের উপযোগিতা তান্ত্রিকদিগের দ্বারা স্বীকৃত। তন্ত্রমতে মানুষের ভিতর প্রধানতঃ পশু, বীর ও দৈব বা দিব্য এই তিনটী ভাব দৃষ্ট হয়। এই তিনটী ভাব ক্রমান্বয়ে যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্ধক্যে প্রতিফলিত হয়। তন্ত্রমতে অ-তান্ত্রিকেরা পশুভাবাপন্ন, সাধারণ তান্ত্রিকেরা বীরভাবাপন্ন ও প্রধান তান্ত্রিকেরা দিব্যভাবাপন্ন। মানুষের এই ত্রিভাব তমঃ, রজ ও সত্ত্ব—এই ত্রিগুণের সহিত সম্পর্কিত। সাধারণতঃ তান্ত্রিকদিগকে দক্ষিণাচারী ও বামাচারী এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। কিন্তু শাক্তেরা এই বিভাগকে সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। কারণ দক্ষিণাচারীরা বামাচার-অবলম্বী না হইলেও, বামাচারীদিগের আচারের বিরুদ্ধবাদী নহেন। শাক্তদিগের মতে, সাধনা সপ্তস্তরে বিভক্ত। বৈদিক, বৈষ্ণব ও শৈব এই তিনটী নিম্নস্তরের সাধনা। দক্ষিণাচারীর সাধনা এক অপূর্ব সাধনা। এই সাধনায় দেবীর প্রকৃতি-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়। এই চারি প্রকারের সাধনাকে প্রবৃত্তিদায়িকা সাধনা বলা হয়। আরও তিন প্রকার সাধনার প্রয়োজন হয়। সে তিন প্রকার সাধনা নিবৃত্তিদায়িকা। শেষোক্ত সাধনার জন্য বিশেষ দীক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু শাক্তমতে প্রবৃত্তির পথে নিবৃত্তির সাধনা করিতে হয়। বামাচার পঞ্চম সাধনা, ইহাকে পঞ্চমাচার সাধনা কহে। ষষ্ঠ সাধনা সিদ্ধান্তাচার, এই সাধনায় ক্রমে ক্রমে সিদ্ধি-পথে আসিতে হয়। সপ্তম সাধনা কৌলাচার, এই সাধনায় উৎকর্ষ সাধিত হয়। কৌলসাধক সাম্প্রদায়িক ভাব অতিক্রম করেন, তিনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন।

সম্মোহন-তন্ত্রের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ৬৪ তন্ত্র, ৩২৭ উপতন্ত্র, বহু যামল, ধামর, সংহিতা প্রভৃতি শাক্তমতের অন্তর্গত বলিয়া বিবৃত হইয়াছে; ৩২ তন্ত্র, ১২৫ উপতন্ত্র, যামল প্রভৃতি শৈবমতের; ৭৫ তন্ত্র, ২০৫ উপতন্ত্র, যামল প্রভৃতি বৈষ্ণবমতের। এ ছাড়া অনেক তন্ত্র উপতন্ত্র সৌরমতের, গাণপত্যমতের, বৌদ্ধমতের, চীনাগম, জৈন, পাশুপত, কাপালিক, ভৈরব ইত্যাদি অনেক তন্ত্রের উল্লেখ আছে। বেদবারিধির ন্যায় তন্ত্রও এক বিশাল বারিধি। বৈষ্ণব-তন্ত্রের পঞ্চরাত্রাগম প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। শতাধিক গ্রন্থের উল্লেখ পণ্ডিত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী করিয়াছেন। Dr. Otto Schrader-সম্পাদিত অহির্বুধ্নসংহিতার ভূমিকায় বহু বৈষ্ণবতন্ত্র ও সংহিতার উল্লেখ আছে। কাশ্মীরে শৈবতন্ত্রের উত্তরাম্নায় বিশেষ বিকাশলাভ করিয়াছিল। শাক্ততন্ত্রেরও অনেকগুলি আম্নায় ও সম্প্রদায়। অনেক তন্ত্রেই বেদ বা শ্রুতির প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

বৈদিক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের আর্যধর্ম নিবদ্ধ। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে, কালগত প্রয়োজনের সঙ্গে, পর পর যুগে এই ধর্মে বহু পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছে—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু আশ্চর্য, সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে প্রাচীন বৈদিক ধারা অক্ষুণ্ণ

রহিয়া গিয়াছে। দেশ, কাল, পাত্র-অনুসারে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনকে কেহ বাধা দিতে পারে না। কিন্তু বেদ-সম্মত ক্রমের অনুকূলে ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত থাকায় বৈদিক ধর্ম হইতে পরবর্তী ধর্মের বিচ্ছেদ ঘটিবার অবকাশ হয় নাই। সুতরাং বৈদিক ধারা সতত অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং অনবরত তাহাতে সুস্নাত হইয়া পরবর্তী যুগের ধর্ম 'সনাতন ধর্ম' নামেই পরিচিত রহিয়াছে। কালক্রমে এই সনাতন ধর্মের ধারা অতীব ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। আচার্য শঙ্কর প্রভৃতি কেহ কেহ এই সনাতন অবিভক্ত ধারাটীকে আবার বহাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ঠিক আগেকার মত সরলভাবে, গভীরভাবে, সতেজভাবে সে স্রোত আর বহে নাই। যতই অধিকারী-সম্বন্ধে বাচবিচার করিতে যান না কেন, গৌড়পাদ, শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ এবং রামানুজ, মাধ্ব, বল্লভ প্রভৃতি আচার্যগণের প্রবর্তিত ভক্তিবাদ ভারত-বর্ষের ধাতে অনৈহিকতার ঝোঁকটাকে পূর্বের মত সংযত ও সুসমঞ্জস করিয়া দেয় নাই। কুমারিল ভট্ট, আচার্য শঙ্কর, আরও অনেকে সংস্কারের জন্য চেষ্টিত থাকিলেও প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্মের পাকা ভিত্তিটার তেমন সংস্কারের সাধন হইয়া ওঠে নাই। হাজার বছরের উপেক্ষায় ও প্লাবনে বুনিয়াদ দমিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে আবার তেমন খাড়া ও দৃঢ় করিয়া কেহ উঠাইতে পারেন নাই। অনধিকারী সন্ন্যাসীর দল, বৈরাগীর দল উত্তরোত্তর বাড়িয়া গিয়াছে বই কমে নাই। যে বিশাল জনসঙ্ঘ ব্যবহারিক জীবনটাকে ধরিয়া রহিয়াছে তাহাদের মুষ্টিও ক্রমে শিথিল হইয়া আসিয়াছে। প্রাণের উপাসনায় বিরত হইয়া তাহারা প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তাহাদের জীবন সাংসারিক হিসাবেও ব্যর্থ, ত্যাগ ও সন্ন্যাসের দিক্ দিয়াও ব্যর্থ। এক কথায় সে জীবনের লক্ষ্য, কার্পণ্য, দৈন্য, ক্লৈব্য।

বরং তন্ত্রের সমন্বয় (synthesis) নানা দিকে নানা ব্যভিচার সত্ত্বেও সেই পূর্বের সামঞ্জস্য ও স্বাস্থ্যটিকে আবার ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া আংশিকভাবে কৃতকার্য হইয়াছিল। এই সমন্বয়ের মূল কথা—জীবকে সকল অবস্থার ভিতরেই, ভোগে ও যোগে নিজের মধ্যে শিব-শক্তির মিলন করিতে হইবে। মহাশক্তি নিজের মধ্যেই রহিয়াছে—শক্তিস্বরূপই নিখিল বস্তু। এই শক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে; তাহার ফলে সিদ্ধিই শুধু করতলগত হইবে এমন নয়, জীব নিজের শিব-শক্তির অভিন্নভাব উপলব্ধি করিয়া পরম কৈবল্য লাভ করিবে। মায়া বলিয়া কিছু উড়াইয়া দিবার প্রয়োজন নাই—সকল কর্ম ও সকল তত্ত্বের মধ্যেই ব্রহ্ম বা শিব-শক্তির অবিনাভাব দেখিতে হইবে। সমস্তই আনন্দময়ীর লীলাবিলাস। সাধককে তাই ধীরভাবে ভোগের মধ্য দিয়াই যোগারূঢ় হইতে হইবে। পশুভাব পাশবদ্ধ অবস্থা; এভাবে জীব নিজেকে শৃঙ্খলিত, নিরুপায় মনে করে—নিজেকে আনন্দ-বিগ্রহ, লীলাসমর্থরূপে জানিতে বুঝিতে পারে না। বীরের সাধনে, কুলার্ণবতন্ত্রের ভাষায় 'ভোগো যোগায়তে, মোক্ষয়তে সংসারঃ'। এমন কি, পঞ্চতত্ত্ব—যাহাতে পশুজীবের সচরাচর পতন—তাহাকেই তিনি মোক্ষ পাওয়ার সোপান করিয়া লইয়াছেন। মহানির্বাণতন্ত্র অবধূতকে যে মন্ত্রে সন্ন্যাস-গ্রহণের আবশ্যক হোম করিতে বলিতেছেন, সেই মন্ত্রই তন্ত্রোক্ত জীবনের মূলমন্ত্র—

'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম সমাধিনা॥'

কথা এই যে, তন্ত্রের পথ, বেদের নির্দিষ্ট পথ হইতে আপাতদৃষ্টিতে বাহ্যতঃ কতকটা আলাদা হইলেও, বেদোক্ত সেই সনাতন মার্গের ধরণ ঠিক বজায় রাখিয়াছে। এক-লক্ষ্যানুবর্তিতা তো আছেই। মহানির্বাণতন্ত্র প্রভৃতি কলিযুগের জন্য বৈদিক বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাটীকে কতকটা ঢালিয়া সাজিয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই প্রাচীন ব্যবস্থার প্রাণ (spirit) অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন বলিয়াই, হিন্দুর ক্রোড়ে বেদ ও আগমের নিবিড় মিলন হইয়া গিয়াছে।

( আগামীবারে সমাপ্য )

# বিজয়ার আশীর্ব্বাদ

শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ

*বিমল আজ প্রায় এক বৎসর বাড়ীছাড়া।*

অতি সাধারণ ঘটনা। বিবাহিত জীবনে ইহা প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার। বিমলেরও এমন যে আর পূর্ব্বে ঘটে নাই,—তা' নয়! মান অভিমানের পালা অনেকই হইয়া গিয়াছে; আর, প্রতিবারই 'দাম্পত্যকলহে চৈব' এই মহাজন বাক্যের মর্য্যাদাও রক্ষিত হইয়াছে। এবার কিন্তু, ক্ষণের দোষে অভিমান তীব্র বেদনার কারুণ্যে রাঙা হইয়া দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে।

বিমল চাকুরী করে। আর, সেই জন্য তাহাকে সুদূর প্রবাসে জীবনের বেশী সময়ই কাটাইতে হয়। ছুটি পাইলেই সে ছুটিয়া আসে, ছুটির দিন কয়টা কৃপণের ধনেরই মত আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। দেশের বন্ধুরা অনুযোগ করে, 'কুণো' বলে। কর্ম্মস্থলে সহকর্ম্মীরা বলে অসামাজিক। কোন আমোদ প্রমোদে সে যোগ দেয় না; কারও সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হয় না—হইলে একাই ঘুরিয়া বেড়ায়। বাসায় একা বসিয়া থাকিতেই ভালবাসে। কেহ ঘরে আসিলে মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে।

বাড়ীর লোকে এবং পাড়াপড়শীরা বলে স্ত্রৈণ।

যখন-তখন যেখানে-সেখানে স্বামীর এই নিন্দাবাদ অর্পিতার কাণে আসে। অনেকে যেন তাহাকে শুনাইবার জন্যই এ-প্রসঙ্গের অবতারণা করে। তার চোখ ফাটিয়া জল আসে; বুক দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সে স্বামীর উদার প্রেমপ্রবণ চিত্তকে ভাল করিয়া জানে। সে মনে করে—জন্মান্তরের প্রভূত সুকৃতির ফলে তার এমন স্বামী মিলিয়াছে। যে কয়দিন স্বামী বাড়ীতে থাকে, তার মনে মহোৎসবের আনন্দ। রাত্রে বুঝি ঘুমায়ই না; নিদ্রিত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। বিমল কোন সময়ে জাগিয়া জিজ্ঞাসা করে—'তুমি ঘুমোও নি অর্পিতা!' অর্পিতার নেত্রপ্রান্তে দুই ফোঁটা শুভ্র অশ্রু টল টল করে। সে মুগ্ধ কণ্ঠে আবৃত্তি করে—

'জনম জনম হাম ও রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল'

এই গানের জন্য অর্পিতাকে কম 'খোঁটা' খাইতে হয় নাই।—'ভদ্র গৃহস্থের কুলবধূ আবার গান গাহিবে কি গো! এত ঢলাঢলি কেন বাপু! আর কি জগতে স্বামীস্ত্রী নাই?

পাড়া গাঁ; সুতরাং এরূপ গঞ্জনা সেখানে অস্বাভাবিক মোটেই নয়। শুনিয়া অর্পিতার বড় দুঃখ হয়। সে সঙ্কল্প করে, আর কখনও গাহিবে না। কিন্তু স্বামী যে তার কীর্ত্তন বড় ভালবাসে। দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর, অল্প যে কয়টা দিন সে স্বামীকে কাছে পায়, তার প্রতি পলটি স্বামীর প্রিয় কার্য্যে সার্থক করিবার জন্য চিত্ত তার নিয়ত উন্মুখ থাকে। গঞ্জনা বা খোঁটার কথা সে ভুলিয়া যায়।

অর্পিতার বাপ ছিলেন মনোহরশাহী পরগণার বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া। ছেলেবেলা হইতেই অর্পিতা বাবার কাছে কীর্ত্তন বেশ ভাল করিয়াই শিখিয়াছিল। তার চিত্তের দরদ প্রাণমাতানো সুরঝঙ্কারে মিশিয়া বিমলের প্রাণে তুলিত এক অপরূপ পুলক-শিহরণ। প্রেমিক চিত্তের চিরন্তনী মর্ম্মগীতিকা—বিরহমিলনের ভুবনভুলানো পুণ্য-কাহিনী বিমলের স্বভাবকোমল চিত্তকে ব্যথিত, মথিত, রসায়িত করিয়া তুলিত। শুনিতে শুনিতে তার চোখ দুটি মুদিয়া আসিত; গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিত। গাহিতে গাহিতে বহুবার অর্পিতার কণ্ঠ বাষ্পনিরুদ্ধ হইয়া উঠিত; থামিয়া আবার ধরা গলায় তার কীর্ত্তনকে সে করুণমাধুর্য্যে ভরিয়া তুলিত।

যেদিন বিশেষ গঞ্জনা খাইত, সেদিন অর্পিতা বলিত—আমি গাইব না। বিমল অনুনয় করিত; শেষে অভিমান করিত। অর্পিতা বলিত, আমার পানে ত' তাকাবে না! লোকে আমায় নিষ্ঠুরভাবে ক'রবে আঘাত, আর তোমার বড় ভাল লাগ্‌বে তা! আমি কিছুতেই গাইব না, যাও। বিমল চোখ বুজিয়া নীরবে বিছানায় পড়িয়া থাকিত। বেশীক্ষণ অর্পিতা এই নির্ম্মম নীরবতা

সহ্য করিতে পারিত না। স্বামীর পা দুটি তুলিয়া কোলে লইয়া ব্যথাকাতর কণ্ঠে গাহিত,—

এ কুলে ও কুলে দু-কুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কমল পায়॥

বিমল উঠিয়া অর্পিতার মাথাটি বুকের উপর টানিয়া লইয়া বসিত, আর আকম্পিত-মধুস্রাবি-কণ্ঠে অর্পিতা গাহিয়া চলিত,—

ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে আর কেহ মোর আছে।
রাধা ব'লে কেহ শুধাইতে নাই দাঁড়াব কাহার কাছে॥

কখনও বা অভিমানিনী অর্পিতাকে বুকে টানিয়া চোখের জলে বিমল তার অভিমান ধুইয়া দিত।

এমনি ছোটখাটো ছিল তাহাদের অভিমানের হেতু,—তার স্থায়িত্বও ছিল এমনি ক্ষণিক, আর পরিণামও এমনি রমণীয়—মধুময়।

পূজার বন্ধ ফুরাইয়া গিয়াছে। পরদিন ভোরে বিমল চলিয়া যাইবে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ীর মধ্যে অর্পিতা স্বামীর জিনিষ-পত্র গোছ-গাছ করিতেছিল। বিমল তাহার শুইবার ঘরে পঞ্চবর্ষীয় পুত্র সুনির্ম্মলকে লইয়া শুইয়াছিল। সমস্ত শেষ করিয়া আসিতে অর্পিতার একটু দেরী হইল। ততক্ষণ বিমল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অর্পিতার মনে হইল, ইহা নিতান্তই অস্বাভাবিক। কা'ল যে প্রবাসে চলিয়া যাইবে স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া, তার মনে একটা বেদনা জাগা ত' দূরের কথা,—নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া পড়িল! হঠাৎ অর্পিতার মনে হইল স্বামীর স্নেহে ভাটা পড়িয়া আসিয়াছে। সেও আর ডাকিল না; অভিমান ভরে আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু, সারা রাত্রির মধ্যে তাহার ঘুম হইল না।

ভোরের দিকে হঠাৎ জাগিয়া বিমল ডাকিল, অর্পিতা! অর্পিতা জবাব দিল, যাবার সময়ে এমন একটা প্রাণহীন লৌকিক ডাক না দিয়ে গেলে কি চল্‌তো না! তার কণ্ঠস্বর শক্ত, গম্ভীর। বিমলের বুকে কথা কয়টা সজোরে একটা ধাক্কা দিল। গাড়ীর সময় হইয়া আসিয়াছে; সুতরাং বিমল তার হৃদয়ের প্রকৃত ব্যাখ্যা অর্পিতাকে শুনাইবার অবকাশ পাইল না। অর্পিতাও অভিমানভরে সম্ভাষণ করিল না। বিমল ভারাক্রান্ত মনে চলিয়া গেল। অর্পিতা কাঁদিয়া চোখ দুইটা রাঙা করিল।

সামান্য ভুলের জন্য দুইটি দরদী চিত্ত এমনি করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

কর্ম্মস্থানে আসিয়াই বিমল প্রথমে সংবাদ দেয়; বাড়ীর সংবাদ তার উত্তরে পায়। এবার সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল। বিমল কোন সংবাদ দিল না। বাড়ী হইতে দু'চার বার তাড়া আসার পর একখানা সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, কিন্তু অর্পিতাকে কোন কিছু লিখিল না। অর্পিতাও কোন পত্রাদি দিল না।

এমনি করিয়া প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। আবার পূজা আসিল। দীর্ঘ নীরবতার পর ভাদ্রের মাঝামাঝি বিমল বাড়ীতে একখানা চিঠি দিয়াছে,—তার শরীর নিতান্ত খারাপ; ডাক্তারের পরামর্শে তা'কে কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে যাইতে হইবে। সুতরাং পূজার বন্ধে বাড়ী আসা হইবে না।

বৈকালের দিকে চিঠিখানা যখন আসে, তখন অর্পিতা ঘাটে গিয়াছিল কাপড় চোপড় কাচিতে। বাড়ীর অন্যান্য সকলে চিঠির কথা লইয়া নানান্ আলোচনা করিতেছিল এবং সকলে অর্পিতাকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার 'ঢঙ' সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল। সুনির্ম্মল সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। সে শুনিল; কতক বুঝিল, কতক বা বুঝিল না। তবে এইটুকু বুঝিল যে, বাবা পূজাতেও বাড়ী আসিবে না।

সুনির্ম্মল আজকাল কেমন যেন হইয়া গিয়াছে। সেই কমনীয় আনন্দ-চঞ্চল মূর্ত্তি আর নাই; দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে। প্রায়ই অর্পিতাকে জিজ্ঞাসা করে, 'বাবা কবে আসবে মা?' অর্পিতা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া আশ্বাস দেয়, 'এই ত' পূজো আর এসে পড়েছে বাবা—পূজোতে নিশ্চয়ই আসবেন।' কিন্তু পূজাতেও বাবা আসিবে না জানিয়া বালকের মন হতাশতার গ্লানিতে ভরিয়া উঠিল।

সে মুখটি নীচু করিয়া বাহির বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল এবং অর্পিতা ঘাট হইতে আসিতেই তার আঁচল ধরিয়া

ছল ছল চোখে বলিল—'মা, পূজোতেও বাবা বাড়ী আসবে না; চিঠি এসেছে'।

অর্পিতা চিঠিপত্রের কথা সুনির্ম্মলের কাছ হইতেই কিছু কিছু জানিতে পারে। বাড়ীর কেউ বড় একটা তাহাকে সে সংবাদ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। প্রসঙ্গতঃ কোন সময়ে যদি চিঠির কথা আসিয়া পড়ে, তবেই শুনিতে পায়।

ছেলের ব্যথায় অর্পিতার সমস্ত অন্তঃকরণটা টনটন্ করিয়া উঠিল। সিক্তবস্ত্রেই পুত্রকে তুলিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। কোন কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। নূতন দুঃখের আকস্মিক নিষ্ঠুর আক্রমণে তার কণ্ঠ বদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। কারণ পূজার সময়ে যে বিমল আসিবেই—এ বিশ্বাস তার মনে দৃঢ় ছিল; আর, সেই আশার ক্ষীণ রশ্মিটুকু অবলম্বন করিয়া সে কোন প্রকারে দিন গণিয়া আসিতেছিল। আজ তার সে আশাও নির্ম্মূল হইল!

রাত্রে শুইতে গিয়া নিরিবিলিতে অর্পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল,- হাঁ রে, তোর কথা কি আমার কথা কিছুই লেখেন নাই?

সুনির্ম্মল শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। তারপর ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মায়ের কোলে মুখ গুঁজিল। আহা! বালকহৃদয়ের রঙীন আশার রঙ্‌মশাল নিবিয়া গিয়াছে; পুত্রকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া নিজের চোখে যে অশ্রুর ঝর্ণা ছুটিল, তাহার অবিরাম গতিকে রোধ করিতে অর্পিতাকে অনেকখানি বেগ পাইতে হইল।

আজ দীর্ঘ একটি বৎসর বিমলের সহিত অর্পিতার কোন পত্র-বিনিময় হয় নাই। বাড়ীতে যা' দু' একখানি চিঠি বিমল দিয়াছে, তা' নিতান্ত সংক্ষিপ্ত; সেই প্রাণহীন মামুলী উপদেশ,—সেই গুরুজনকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম, বয়ঃকনিষ্ঠদিগকে আশীর্ব্বাদ, ইত্যাদি। প্রথম প্রথম অর্পিতা ভাবিয়াছিল,—স্বামী নিশ্চয়-ই পত্র দিবে। মনে মনে মতলব আঁটিয়া রাখিয়াছিল,—প্রথমে দু'একখানার জবাব সে দিবে না; পরে ঔদাসীন্যের অভিনয় করিয়া নিতান্ত সংক্ষিপ্ত একটা উত্তর দিয়া স্বামীকে দিবে একটা নিষ্ঠুর আঘাত। এবার সহজে সে আর আত্মসমর্পণ করিতেছে না। কিন্তু, তা'র সে সাধ মিটিল না। অপর পক্ষও ঠিক এই রকমটাই মনে করিতেছিল। এমনি করিয়াই তাহাদের সাধ করিয়া টানিয়া দেওয়া যবনিকাটা কালো হইয়া উঠিল পরস্পরের উপর আরোপিত একটা কল্পিত নৈষ্ঠুর্য্যের কালি মাখিয়া।

সুনির্ম্মল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অভিমানী বালক, প্রাণে তা'র লাগিয়াছে বড় বেশী। গণ্ডে শুষ্ক অশ্রুর দাগ; চোখের পাতা দু'টি এখনও অল্প অল্প সিক্ত। থাকিয়া থাকিয়া ঠোঁট দুটি কাঁপিয়া উঠিতেছে। একটা দীর্ঘ-শ্বাসের শব্দে অর্পিতা পুত্রের মুখের পানে চাহিল। বুঝিল, ঘুমাইয়া পড়িলেও বালকের প্রাণে বেদনা জাগিয়া আছে।

অর্পিতার সমস্ত অন্তরটা ব্যথায় মোচড় দিয়া উঠিল। সত্যই কি আসবে না! আমার অপরাধকে সে ত কখনও অপরাধ মনে করে নাই। আমার রাগ, আমার অভিমান, সবই যে তার চোখে সুন্দর ছিল! আমার হাজার ত্রুটী হইলেও ক্ষমা চাহিবার অবকাশ দেয় নাই; অপরাধের দ্বিগুণ ক্ষমা চাইবার আগেই যে পেয়েছি! হায় নিজের দোষে আজ আমার সকল গৌরব ধূল্যবলুণ্ঠিত!

কি নিষ্ঠুরতাই করেছি! যাবার বেলা অভিমান ক'রে তা'র বিদায়ের বেদনায় রাঙা বুকটায় নির্ম্মম আঘাত দিয়েছি যে!—ওগো, সত্যিই কি তুমি আসবে না! আমার পানে না তাকাও, খোকার বেদনাকরুণ মুখখানাও কি তোমার বুকে আলোড়ন আনে না? তাকে একবার দেখা দিয়ে যাও। দেখবে এসো, নিষ্ঠুর, তার কচি বুকটায় ব্যথার কি তরঙ্গ তুলেছ! তুমি পূজোতেও আসবে না শুনে সে বিকাল থেকে কিছুই খায় নাই; কেবল কাঁদে!—

অর্পিতার চোখে অশ্রুর বান ডাকিল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বামীকে চিঠি লিখিতে বসিল; চোখের জলে চিঠি-খানা ভিজিয়া কালি-জোবড়ানো হইয়া গেল। সব কথা গুছাইয়া লেখা হইল না। ছিঁড়িয়া ফেলিল চিঠিখানা। এমনি করিয়া চার পাঁচখানা চিঠি সে লিখিল, ছিঁড়িল। শেষে বিরক্ত হইয়া দোয়াত কলমটা দূরে ফেলিয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। চিঠি লেখা হইল না।

'পূজাতে বাড়ী আসা হইবে না' সে লিখিলেও, অর্পিতার মনের কোণে একটু ক্ষীণ আশার স্তিমিত আলোক তখনও ছিল। সে ভাবিয়াছিল, তাঁর বেদনা নিবিড়তম করিবার জন্যই বিমল পূজাতে বাড়ী না আসার কথা লিখিয়াছে। কিন্তু, পঞ্চমীর দিন যখন ইন্‌সিওরেন্সযোগে পূজার খরচের টাকা আসিল, তখন সে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তবে কি সত্যই শরীর খারাপ! সত্যই অসুখ! দুঃখ, বেদনা, অভিমান, সব ছাপাইয়া আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তার স্বাভাবিক স্থৈর্য্য লুপ্তপ্রায় হইল। প্রতি মুহূর্ত্তে আত্মপ্রকাশের বিড়ম্বনা চাপিতে গিয়া অধিকতর ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। এই উৎকট অবস্থা অপেক্ষা মৃত্যুও অর্পিতার কাছে প্রিয় মনে হইতেছিল।

সপ্তমীর সকাল। ঢাক ঢোল নহবতে চণ্ডীমণ্ডপ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ধূপ ধুনার গন্ধে, পুষ্পচন্দনের সুবাসে বায়ু আমোদিত। ছেলেমেয়ের দল মণ্ডপ-প্রাঙ্গণকে নূতন জামা কাপড়ের বিচিত্র বর্ণে রঙাইয়া তুলিয়াছে।

বিমলদের কুলপ্রথা, অদূরবর্ত্তী নদীতে নবপত্রিকা স্নান করাইয়া পূজামন্দিরে স্থাপন করা। বাড়ীর ছোট ছেলেরা ছোট একটি দোলা কাঁধে লইয়া নদীতে গেল এবং স্নাতা নবপত্রিকারূপিণী জননীকে আবাহন করিয়া পূজা মন্দিরে লইয়া আসিল। ছোট ছেলের কাঁধে মা আসিতেছে, বালকের সরল প্রাণের অনাবিল আনন্দের দোলায় বিশ্বার্ত্তিহারিণী জগজ্জননী আসিতেছে, এ দৃশ্যে ইতর প্রাণীরও নেত্র অসিক্ত রহিল না, মানুষের কথা ত দূরে।

বহু সাধ্যসাধনার পর শেষে বেদনাকরুণ নেত্রে সুনির্ম্মল আসিল পূজা মণ্ডপে মাকে আবাহন করিতে। তার বাবা আসে নাই; সমস্ত অন্তঃকরণটা তার দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। নূতন জামা কাপড় পরে নাই; পুরাণো একখানা কাপড় শুধু পরিয়া খালি গায়ে দীন বেশে চোখের জলে মাকে সে আবাহন করিয়া আনিল। অর্পিতা মাকে বরণ করিতে। বাম কক্ষে সপল্লব পূর্ণ কুম্ভ, হস্তে জলপূর্ণ ভৃঙ্গার, আনত চক্ষে অশ্রুর অবিশ্রান্ত ধারা। ভৃঙ্গার জলের ধারার সঙ্গে চোখের জলের ধারা দিয়া সে মাকে মণ্ডপে আনিয়া বরণ করিল। বৃদ্ধ পুরোহিত কম্পিত কণ্ঠে আবাহন গাহিলেন—চণ্ডিকে চল চল, চালয় চালয়, শীঘ্রং পূজালয়ং প্রবিশ!

আজ মাতাপুত্রের চোখের জলের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে স্নান করিয়া বিশ্বজননী পূজা মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

মাতাপুত্রের অশ্রুধারা সমাগত সকলের প্রাণে কারুণ্যের প্লাবন বহাইল, করুণার ছোঁয়াচ বুকে লাগিয়া তাহাদের চোখ সজল করিয়া তুলিল। বৃদ্ধ পুরোহিত সাশ্রু নয়নে কম্প্রকণ্ঠে অর্পিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—মা এসেছে বউমা, তোদের মাতাপুত্রের চোখের জলে, প্রাণের আবাহনে, মা ছুটে এসেছে ঐ দেখ! মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে চিন্ময়ী মা'র আবির্ভাব আজ তোরাই সম্ভব করেছিস্ মা!

বস্ত্রাঞ্চল কণ্ঠে জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অর্পিতা মাকে প্রণাম করিল; মায়ের দেখাদেখি সুনির্ম্মলও প্রণাম করিয়া মা'র কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। অর্পিতা পুত্রকে কোলে লইয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

আজ বিজয়া। পূজা মন্দিরে পুরোহিত বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে মন্ত্র পড়িতেছে—

রাজ্যং শূন্যং গৃহং শূন্যং সর্ব্বং শূন্যং দরিদ্রতা।
ত্বামৃতে ভগবত্যম্ব! কিং করোমি বদস্ব তৎ॥

অর্পিতা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। আজ যে নিতান্ত নিঃসহায় সে! এ কয়দিন প্রাণের ব্যথা অনেকখানি লঘু করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, ওই মৃন্ময়ী মার পদপ্রান্তে অন্তরের আকুল আবেদন জানাইয়া। আশা করিয়াছিল, মার কাছে জানাইলে, আনিয়া দিবে তার প্রাণের দেবতাকে! সে রাত্রি জাগিয়া চোখের জলে কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছে; মৃন্ময়ী মূর্ত্তি ত' কই তার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না! মা আসিয়াছে, হয়ত সেও আসিবে, এই ক্ষীণ আশা তার মনের এক কোণে উদিত হইয়াছে। আর সেই আশার অনুপ্রেরণায় সে খাটিয়াছে সারা দিন, অবিশ্রান্ত রাঁধিয়া-বাড়িয়া নিমন্ত্রিতদের খাওয়াইয়া দিনান্তে এক মুষ্টি ভাত চোখের জলে মাখাইয়া সে খাইবার চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু কে যেন ভিতর হইতে দু'হাত দিয়া

তার ভুক্ত গ্রাস ঠেলিয়া দিয়াছে। পূজার কয়দিনই তার কাটিয়াছে এইভাবে। আজ মাও চলিয়া গেল! অর্পিতার প্রাণের ক্ষত আবার দুঃসহ বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল।

মার কাঁধ ধরিয়া সুনির্ম্মল দাঁড়াইয়াছিল দীন নয়নে। এ কয়দিন তার মুখে হাসি কেউ দেখে নাই। শিশুর চঞ্চল গতি কে যেন জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কেউ পারে নাই তাকে নূতন জামা কাপড় পরাইতে। গ্রামের ছেলেমেয়ের দল কোলাহল করিয়াছে মণ্ডপ-প্রাঙ্গণে চার দিন ধরিয়া। সে বাহিরে আসে নাই একবারও। সর্ব্বদাই মার আঁচল ধরিয়া ঘুরিয়াছে। মার চোখের জল বালকের মনে দুঃখের নূতন তরঙ্গ তুলিয়াছে।

রাত্রে প্রতিমাবাহী লোকজনদের খাওয়াইয়া অর্পিতা যখন শয়ন করিতে আসিল তখন দশমীর চাঁদ পশ্চিম দিগ্‌বলয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। বিজয়ার করুণ গীতি থামিয়া আসিয়াছে। মাঝে মাঝে গ্রামান্তরের বিসর্জ্জনের বাজনার ক্ষীণ শব্দ কাণে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। সুনির্ম্মল আগেই আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অর্পিতা শয্যার পাশে আসিয়া অস্ফুট স্বরে 'মাগো' বলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। ব্যথাহত হৃদয়ের সেই উৎকট অবস্থা, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম আর অনাহার তার দেহ-মনে আনিয়া দিয়াছিল একটা দারুণ অবসাদ।

বিবাহের পর বিজয়ার দিনে কখনও সে স্বামী ছাড়া হয় নাই। অর্পিতার মনের মহোৎসব ছিল এই বিজয়ার রাত্রি। বিজয়ার প্রণামান্তে স্বামীর আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাকে সে সারা বৎসরের পাথেয় করিয়া রাখিত। উচ্ছ্বসিত আবেগে তাহাকে বুকে জড়াইয়া স্বামী যখন গলদশ্রু নেত্রে নীরব আশীর্ব্বচনের জাহ্নবী ধারা ঢালিত, তখন সে আত্মহারা হইয়া পড়িত। তার আনন্দাবশ দেহবল্লী ঢলিয়া পড়িত স্বামীর বুকে।

অতীত দিনের সেই মধুময়ী স্মৃতি আজ অর্পিতার চিত্তকে বেদনার আঘাতে রাঙা করিয়া তুলিল। বস্ত্রাঞ্চল গলায় জড়াইয়া সে স্বামীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল।

উচ্ছ্বসিত আবেগে অর্পিতার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল; সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

—অর্পিতা!

চমকিত হইয়া অর্পিতা জানালার বাহিরে তাকাইল।

—অর্পিতা!

—তুমি! এসেছ! এসেছ আমায় বিজয়ার আশীর্ব্বাদ দিতে! যাই, যাই, ওগো যাই!

স্রস্ত বসনা অর্পিতা তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দরজা খুলিয়া স্বামীর পায়ে আছড়াইয়া পড়িল।

বিমল তাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া তুলিল। চোখের জলে অর্পিতা স্বামীর বুক ভাসাইতে লাগিল

উপরে আসিয়া আলোতে স্বামীর মুখ দেখিয়া অর্পিতা শিহরিয়া উঠিল। ছি! ছি! শরীরটাকে এম্নি করে খারাপ করেছ! অসুখ করেছিল?

বিমলেরও কাতর চোখ দুটি ঠিক একই প্রশ্ন করিতেছিল।

—বাবা!

সুনির্ম্মল জাগিয়া উঠিল। বিমল পুত্রকে বুকে তুলিয়া লইয়া শিরশ্চুম্বন করিল।

বালক নিঃশেষে নিজেকে পিতার বক্ষে ছাড়িয়া দিল।

# আর্য্য-জ্যোতিষ

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, তত্ত্ববাচস্পতি

জ্যোতিঃশাস্ত্র, বেদের একটী অঙ্গ। জ্যোতিষ বিদ্যা দ্বারা পরমেশ্বরের নির্ম্মিত এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও তত্রস্থ জীবের কর্ম্মফল প্রকাশক জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের ব্যবস্থা বিষয়ক স্বরূপের জ্ঞান হয় বলিয়া ইহা বেদের নেত্রতুল্য; তদ্ভিন্ন এই বিদ্যার কার্য্য সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা দৃষ্ট হয় বলিয়া ইহাকে প্রত্যক্ষরূপে গ্রহণ করা যায়।

বেদশাস্ত্র—মানবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি দ্বারা যাহার উপায় হয় না—তাহারও উপায়। অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহার অপর নাম ব্রহ্ম হইয়া থাকে। বেদশাস্ত্র অপর শাস্ত্রসমূহের মূল কারণ; এইজন্য যে সকল গ্রন্থ বেদের অবিরোধী তাহাই শাস্ত্র এবং যাহা বেদবিরোধী তাহা অশাস্ত্র হইয়া থাকে।

বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা ও স্মর্ত্তাকে ঋষি বলে। ঋষিগণ মন্ত্রসমূহকে দর্শন (সাক্ষাৎ) করিয়াছিলেন। ঋষিগণ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। প্রথম—এরূপ ঋষিগণ জন্মিয়াছিলেন যাঁহারা সৃষ্টিকালে আবির্ভূত হইয়া পূর্ব্বকল্পে (সৃষ্টিতে) অনুভূত সর্ব্ববিজ্ঞানাধার বেদকে তপস্যা দ্বারা সংস্কার, সম্মান ও স্মরণ দ্বারা সুপ্ত প্রবুদ্ধ তুল্য —পূর্ব্ববৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন;—ইহারাই ধর্ম্ম-বিধায়ক বেদ মন্ত্রের দ্রষ্টা ও ঋষি নামে পরিচিত। আর যাঁহারা ধর্ম্মের সাক্ষাৎলাভ করেন নাই এবং যোগ্যতায়ও পশ্চাৎপদ ছিলেন তাঁহাদিগের নিকট বেদমন্ত্রের উপদেশ করিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ঋষিগণ তাঁহাদের নিকট হইতে বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তপস্যা দ্বারা বৈদিক কোষ, ব্রাহ্মণ গ্রন্থ (বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও ব্যাখ্যান ভাগ) এবং বেদাঙ্গ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

পরমেশ্বর, বেদ দ্বারা যেরূপ নাম রূপাদি বিদ্যা ও কর্ম্মের প্রকট করিয়াছেন, সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণও তদ্রূপ তপস্যা দ্বারা ঐ সকল বিষয় যথারীতি প্রকাশ করায়, তাঁহাদের রচিত জ্যোতিঃশাস্ত্র অভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ হয়। উপাঙ্গস্বরূপ ছয় দর্শন হইতে আমরা আর্য্যঋষিগণের অসাধারণ ধীশক্তির অনুভব করিতে পারি।

"আর্য্য" এই নাম অপভ্রংশ হইয়া যেরূপ "হিন্দু" নাম হইয়াছে; তদ্রূপ "আর্য্য-জ্যোতিষ" নাম অপভ্রংশ হইয়া "হিন্দু জ্যোতিষ" নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হিন্দু জ্যোতিষের অধিকাংশ বিষয় এবং বচন নিষ্ফল হইলেও, "আর্য্য জ্যোতিষ" বিদ্যা এবং আর্য্যঋষিগণের মর্য্যাদা হানি হইতে পারে না। কারণ, দেশে বারম্বার বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় বহু বিদ্যা ও বিজ্ঞানের হানি এবং আর্য্য-জ্যোতিষ ও অন্যান্য উত্তম উত্তম গ্রন্থের বিনাশ হইয়াছে; এই জন্য দেশে পরম্পরা ক্রম বিনষ্ট হইয়া অন্ধপরম্পরা ক্রম বৃদ্ধি এবং ভিন্ন ভিন্ন মতান্তরের প্রকাশ পাইয়াছে।

আর্য্য-জ্যোতিষের হানি হওয়ায় তাৎকালীন পণ্ডিতগণ স্ব স্ব প্রকৃতি পরতন্ত্রানুসারে ঋষি, মুনি এবং বিষ্ণুগুপ্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ভোজরাজা বা যামলতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থের নাম দিয়া বহু গ্রন্থ ও বচন রচনা করতঃ প্রকাশ করিয়াছেন; এই জন্য যে কোন উত্তম বিদ্বান ব্যক্তি ঐ সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করতঃ তৃপ্তিলাভ করিতে অসমর্থ হইয়া ফলিত বিদ্যাকে অস্বীকার করিয়া থাকেন।

মহামতি চাণক্য (বিষ্ণুগুপ্ত) যে সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, সেই সময়েও আর্য্য-জ্যোতিষের অন্ততঃ কিছু অস্তিত্ব ছিল; নতুবা তাঁহার ন্যায় বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি এই বিদ্যাকে বিশেষভাবে প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। বরাহ-মিহিরের পূর্ব্বে "আর্য্য-জ্যোতিষ" প্রায়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল; তাহার ফলে বিষ্ণুগুপ্ত, যবন মনিথ ভদন্ত (সত্যাচার্য্য), দেবস্বামী সিদ্ধসেন ও জীবশর্ম্মা প্রভৃতি পণ্ডিতগণের ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ পাইতে থাকে। তদ্ভিন্ন, শক ও যবনগণ যে সময়ে জ্যোতিষ বিদ্যায় অধিক পারদর্শী হইয়াছিল, সেই সময় অপর জ্যোতিষীগণও উহাদের অনুসরণ করাতে সমস্ত ভারতবর্ষে তাহাদিগের মত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; এই জন্য এক একটী বিপ্লবের পর যে যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থে তৎকালোচিত ছায়া বিদ্যমান রহিয়াছে।

বরাহ মিহির, সত্যাচার্য্যকে আমুর্দায়ের ঋষি স্বীকার

করিয়াছেন। অর্থাৎ, বাদরায়ন, বিষ্ণুগুপ্ত, যবন দেবস্বামী ও সিদ্ধসেন প্রভৃতি জ্যোতিষীদিগের মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। বরাহ মিহিরের পরবর্ত্তী শ্রীপতি প্রভৃতি পণ্ডিতগণও বরাহ মিহিরের সুরে সুর মিলাইয়াছেন। বরাহ মিহির আয়ুর্দ্দায় বিচারে যবনের মত নিকৃষ্ট বলিয়াও নাভস যোগে যবন মতের প্রাধান্য করিয়াছেন।

জ্যোতিষবিদ্যা নিষ্প্রভতুল্য দেখিয়া কেশব দৈবজ্ঞ শ্রীপতি ও প্রজাপতি দাশ প্রভৃতি সকলেই বরাহ মিহিরের অনুসরণ করিতে থাকেন। কিন্তু আয়ুগণনায় নিষ্ফলতার ভাব দেখিয়া ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক ভেদ কল্পনা দ্বারাই তৃপ্তিলাভ করিতে বাধ্য হন। অথচ ফলিত বিদ্যা বিষয়ে আয়ু ও লোকযাত্রা এই দুই বিষয়ই মূল কারণ হয়।

তাজক গ্রন্থকর্ত্তা নীলকণ্ঠ দৈবজ্ঞ বলিয়াছেন যে—তাঁহার পিতা অনন্ত দৈবজ্ঞ দুষ্ট মত নিরস্ত করিয়া "জাতক পদ্ধতি" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রজাপতি দাশও ঐরূপ ভাবের কথা বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আর্য্য-জ্যোতিষের ধ্বংস হওয়ার পশ্চাৎ বহু দুষ্ট মতের প্রকাশ হইতে থাকে।

কেশব দৈবজ্ঞের পৌত্র নৃসিংহ দৈবজ্ঞ এবং নীলকণ্ঠ ও সমর সিংহ প্রভৃতি এক শ্রেণীর জ্যোতিষী ছিলেন; যাঁহারা হিন্দু জ্যোতিষের নিষ্ফলতা প্রত্যক্ষ করিয়া তাজিকের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নৃসিংহ দৈবজ্ঞের পৌত্র ঢুণ্ঢিরাজ দৈবজ্ঞ এবং পুঞ্জরাজ মিশ্র ও গণেশ প্রভৃতি এক শ্রেণীর জ্যোতিষী ছিলেন; যাঁহারা উভয় মতের গ্রহণপূর্ব্বক মিশ্র জ্যোতিষের গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন।

যবন ও মানসাগর প্রভৃতি এক শ্রেণীর জ্যোতিষী ছিলেন, যাঁহারা দশা গণনায় ফলের বৈপরীত্য দেখিয়া দশা ব্যবহারের এক একটী নূতন ব্যবস্থার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

ইহাদিগের বহু পশ্চাতে এক শ্রেণীর জ্যোতিষী ছিলেন, যাঁহারা একদেশদর্শী হইয়া নিজেদের পরিকল্পনার ভিতর দিয়া "উডুদায় প্রদীপ" ও "সুশ্লোক শতক" প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে এবং ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই এক শ্রেণীর জ্যোতিষী ছিলেন, যাঁহারা "পাঁচ ফুলে সাজি ভরা" তুল্য বহু গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া সেই সেই গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ নিয়ম পরিত্যাগ করতঃ ব্যর্থশ্রম করিয়াছেন। এই সকল জ্যোতিষী সত্যাসত্য নির্দ্দেশ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

উল্লিখিত প্রকারে বিষ্ণুগুপ্তের পর এবং বরাহ, মিহিরের পূর্ব্বে তথা বরাহ, মিহিরের পরবর্ত্তী ভোজরাজা, গণেশ, দেবকুমার, রণবীর, শম্ভুসিংহ, কল্যাণবর্ম্ম, নরচন্দ্র উপাধ্যায় ও মহীধর শর্ম্মা প্রভৃতি জ্যোতিষীগণ আর্য্য, যবন ও তাজিক মতের সংমিশ্রণ রূপে বহু হিন্দু জ্যোতিষের গ্রন্থ, রচনা বিস্তৃত করিয়া প্রকাশ করিতে থাকেন। তদ্ভিন্ন পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্যোতিষীদিগের গ্রন্থ পরস্পর পরস্পরের অনুসরণ করতঃ ইতরেতর গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

মানসাগর, স্মার্ত্ত-চণ্ডেশ্বর, ষষ্ঠীদাস ও সত্যাচার্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষীগণ নিজের নাম দিয়া গ্রন্থের নামকরণ পূর্ব্বক স্বীয় নামের গৌরব প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। চণ্ডেশ্বর এবং রঘুনন্দনের ন্যায় বহু স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণও পাঠান রাজ্য সময়ে স্মৃতি ও জ্যোতিষের গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যে যে সময়ে স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হয়, সেই সেই সময়ে জ্যোতিষের গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। খৃষ্টীয় ১০ম হইতে ১২শ শতাব্দীর মধ্যেও বহু স্মৃতি ও জ্যোতিষের গ্রন্থ লিখিত হয় এবং মত মতান্তরের বিস্তৃতি হইতে থাকে। কারণ, যেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তার অনুমোদন দেখা যায়, সেইখানেই সত্যের অন্তরায়স্বরূপ মতমতান্তরের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ফলিত বিদ্যাকে মূর্খ এবং সাধারণ ব্যক্তিগণ অস্বীকার করিলে বিশেষ ক্ষতির কারণ হয় না। কিন্তু গবেষণাপরায়ণ কোন বিদ্বান ব্যক্তি অস্বীকার করিলে বিদ্যার অবমাননা হইয়া থাকে। কারণ, বিদ্যার মহিমা এই শ্রেণীর ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়; এইজন্য ইহাদিগের কথা মূল্যবান্ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিষ্ণুগুপ্তের (চাণক্যের) সময়ে আর্য্য ঋষিগণের ফলিত বিদ্যার অস্তিত্ব এরূপ পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, যাহাতে তিনি ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুগুপ্তের পর

হইতে "আর্য্য জ্যোতিষ" বিদ্যা ক্রমে ক্রমে এরূপভাবে বিকৃত হইয়াছিল যে, উহাকে "আর্য্য জ্যোতিষ" রূপে স্বীকার করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে, এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল গ্রন্থেই প্রায় বৈদেশিক বহু শব্দ পারিভাষিক শব্দে পরিণত হইয়া "হিন্দু জ্যোতিষ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীর সময়ে উক্ত হিন্দু জ্যোতিষের গ্রন্থ সকল এরূপ বিকৃত হইয়াছিল যে, তাঁহার ন্যায় সত্যানুসন্ধিৎসু বিদ্বান ব্যক্তির ঐ সকল গ্রন্থকে শাস্ত্রগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করা একেবারেই অসম্ভব হইয়াছিল। কারণ, ঋষি মুনি ভিন্ন সাধারণ ব্যক্তির লিখিত কিম্বা সংগৃহীত গ্রন্থ প্রায়ই ভ্রমাত্মক হয় বলিয়া উহা কখনও শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে পারে না। দ্বিতীয়—ঋষি মুনিদিগের নাম দিয়া যে সকল বচন ও যে কয়েকটি গ্রন্থ দেখা যায়, উহাও শাস্ত্রবাহ্য লক্ষণ বিশিষ্ট। তৃতীয়—জ্যোতিষীগণের ফল নির্দ্দেশে অক্ষমতা ইত্যাদি।

অধুনা ব্যবসায়ী জ্যোতিষীগণের মধ্যে যাঁহাদের খ্যাতি রহিয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ জ্যোতিষী মনোজ্ঞ বিদ্যা (থট্ রিডিং) দ্বারা কোষ্ঠী বা ঠিকুজিকে উপলক্ষ্য করিয়া গত বিষয় জীবন চরিতের সহিত মিলাইয়া সাধারণ ব্যক্তিদিগকে আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হন বটে; কিন্তু ভবিষ্যৎ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকে; ইহার ফলে অনেকের ধারণা হয় যে, জ্যোতিষ বিদ্যা দ্বারা গত বিষয় বলা যায়, কিন্তু ভবিষ্যৎ বলা যায় না। আবার অনেকের ধারণা এই যে, জ্যোতিষ বিদ্যা কিছুই নহে। কারণ আমি বড় বড় জ্যোতিষীর নিকটে গিয়া উহার পরিচয় উত্তম রূপে জানিয়াছি ইত্যাদি; এইরূপে অনেকে অনেক রকম ধারণা করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষীদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনোজ্ঞ বিদ্যা (থট্ রিডিং) দ্বারা হস্তরেখাকে উপলক্ষ্য করিয়া নষ্ট কোষ্ঠী অর্থাৎ জন্ম সন, মাস, দিন ও সময় এবং জন্ম-কুণ্ডলী বলিয়া দেন। কোন কোন জ্যোতিষী স্বরশাস্ত্রের বিষয় অভ্যাস দ্বারা জন্মকুণ্ডলী কিম্বা হস্তরেখা উপলক্ষ্য করিয়া শুভাশুভ নির্ণয় করিয়া থাকেন; এইরূপে জ্যোতিষীগণ অর্থসঞ্চয়ের জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা মহোদয় হিন্দু জ্যোতিষের কিছু গ্রন্থ ও বিষয় অধ্যয়ন করিয়া ফলিত বিদ্যাকে তাদৃশ স্বীকার করণোপযোগী উপাদান রূপে প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই; এইজন্য তিনি এই বিদ্যাকে অস্বীকার করিয়াছেন। ইহা নিশ্চয় যে, দয়ানন্দ সরস্বতী জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন না; এইজন্য এই বিদ্যার যথার্থ স্বরূপ তাঁহার পক্ষে জানা অসম্ভব হইয়াছিল। আর জানিলে তাহার সংস্কার করা তাঁহার ন্যায় বিদ্বান্ পুরুষের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি কেবল জ্যোতিষ বিষয়ে গ্রন্থধারী ছিলেন বলিয়া এই বিদ্যাকে অস্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা মহোদয় সম্বন্ধেও এই প্রকার বলা যায়। শাস্ত্রকীট পুরুষের রচিত গ্রন্থ অত্যন্ত ভয়াবহ। কারণ, এতাদৃশ পুরুষ, অজ্ঞাত শাস্ত্রের ইঙ্গিত মাত্রেই কীটদংষ্ট্র বস্তুর ন্যায় শাস্ত্রগ্রন্থের বা বিষয়ের রূপান্তর করিয়া থাকেন। বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী প্রাচ্যতত্ত্বসাগর মহাশয় নিজের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য "আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ পদ্ধতি" নামক গ্রন্থে জ্যোতিষ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, উহা দ্বারা শাস্ত্রকীটের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

জগতে এরূপ কোন মনীষী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং করিবেন না—যিনি এই বিদ্যার যথার্থ স্বরূপকে আচ্ছন্ন করিতে বা অস্বীকার করিতে সমর্থ হন।

ইদানীং মান-মন্দিরে ভূমিকম্প নির্ণায়ক প্রভৃতি বহুমূল্য যন্ত্রের সন্নিবেশ রহিয়াছে বটে, কিন্তু "আর্য্য জ্যোতিষ" বিদ্যা অনুসারে উহার কিছুই মূল্য হয় না। কারণ, উহা ভবিষ্যৎ কালের নির্ণায়ক নহে। (১)

ঋষি প্রণীত যে সকল গ্রন্থ তাহাকে আর্ষ্য বা শাস্ত্রগ্রন্থ বলে, উহা নির্ভ্রম। ঋষি বাক্যের নাম আপ্ত বাক্য; এই আপ্ত বাক্য সত্য ও নির্ভ্রম বলিয়া কপিল এবং গৌতমাদি উপাঙ্গী গ্রন্থের প্রণেতা মুনিগণও যখন স্বীকার করিয়াছেন, তখন অন্যের সম্বন্ধে আর কথা কি?

(১) ভবিষ্যৎ ভূমিকম্প নির্ণয় সম্বন্ধে আর্য্য জ্যোতিষের দৃষ্টান্তরূপে ইংরাজী ১৯৩৯ সালের ২৯শে মে তারিখের সাপ্তাহিক "অবতার" পত্রিকা প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায়।

আর্য্য জ্যোতিঃশাস্ত্র, গণিত, ফলিত ও ব্যবহার এই তিন ভাগে বিভক্ত; উহার মধ্যে আবার ফলিত বিদ্যা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যথা—সঙ্কীর্ণ ও নিশ্চয়। সঙ্কীর্ণ অর্থে লগ্নাদি দ্বাদশভাবে গ্রহ সন্নিবেশ মাত্র দ্বারাই সমুদয় জীবনচরিত নির্দ্দেশ করা; ইহা স্থূল ভাব। নিশ্চয় অর্থে গ্রহস্ফুট ও ভাবস্ফুট দ্বারা বলাবল নিশ্চয় করিয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট শুভাশুভ ফলের পরিমাণ নির্দ্দেশ এবং ফলভোগের স্থূল সময়কে সূক্ষ্ম সময়ে আনীত করা। "যো বেত্তি সম্যগে তত্ত্ব দৈবজ্ঞঃ স উদাহৃতঃ" অর্থাৎ উক্ত সঙ্কীর্ণ ও নিশ্চয় এই দুই ভাগ যে ব্যক্তি সম্যকরূপে জানিয়া জীবনের শুভাশুভ ফল ভোগ সম্বন্ধে স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হয়, সেই ব্যক্তি দৈবজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গ্রহস্ফুট, ভাবস্ফুট ও বলের তারতম্য ভেদে ফলের স্বল্পতা এবং আধিক্য হইতে পারে; কিন্তু ফলের হানি হওয়া সম্ভব নহে।

কর্কট বৃশ্চিক ও মীন এই তিন বিপ্রবর্ণাত্মক রাশিতে গ্রহগণ সম্পূর্ণ অংশ (৩০ অংশ) পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্ব রাশির ফল প্রদান করে না।

মেষ, সিংহ ও ধনু এই তিন ক্ষত্রিয় বর্ণাত্মক রাশিগত গ্রহ শেষাংশে থাকিলে যদি বৃষ, কন্যা ও মকর এই তিন বৈশ্য বর্ণাত্মক রাশির প্রথমাংশে অপরাপর গ্রহ থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ব রাশিগত গ্রহের সমীপস্থ হেতু সেই গ্রহের যোগফল প্রদান করে—নতুবা নহে। আর মিথুন, তুলা ও কুম্ভ এই তিন শূদ্র বর্ণাত্মক রাশির শেষাংশে কোন গ্রহ থাকিলে যদি কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন এই তিন রাশির প্রথমাংশে অন্য গ্রহ যথাক্রমে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে মিথুনাদি রাশির সমীপস্থ কর্কটাদি রাশিগত গ্রহের যোগজ ফল ঘটিয়া থাকে; অন্যথায় অবস্থিত রাশিগত গ্রহ সেই রাশির সম্পূর্ণ অংশ পর্য্যন্ত সেই রাশিরই ফল প্রদান করে। ইত্যলম্।

## দু'মুঠো অন্ন চাই

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সরকার

শারদ অতিথি এসেছে আবার
নহেকো সে পথভোলা,
কাননে কাননে পেতেছে নূতন
মঞ্জুল ফুলদোলা।
সোণালী রূপালী কত না বাহার
ছড়ায়েছে তরুলতা,
প্রকৃতি-পিয়ারী শিহরে পুলকে
লভি' হৃদে সরসতা।
ফুল-রেণু মাথা বাতাস কহিছে
মানব দুয়ারে আসি',
শ্বেত শতদল ফোটাও হরষে
আননে ঝরুক হাসি।

চিদাকাশে যার দুখের পশরা
নয়নে বাদর ধারা,
ক্ষুধার যাতনা অসহ যাহার
যে জন পাগলপারা,—
সেকি চাহে আজ ভাসাতে তাহার
রূপ-রস মাঝে ভেলা।
দীনতার মাঝে চারিদিকে তার
অশ্রুসায়র মেলা।
বাতাসের কাণে কহিছে মনুজ—
ফিরে যাও তুমি ভাই
দেউলে আমার হাহাকার শুধু
দু'মুঠো অন্ন চাই।

# মুন-সেনের মোহ

শ্রীমতিলাল দাশ

দক্ষিণ-জার্মাণির সংস্কৃতির কেন্দ্র মুনসেন—ইংরেজেরা বলে মিউনিক। দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তির শেষে হোটেল মেট্রোপলে উঠিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলাম। আলোক-দীপ্ত নগরের দিকে চাহিয়া চোখ জুড়াইল। হৃদয় তবু গৃহের কথা ভাবিতে বসিল। বিচিত্র বিরাট পৃথিবী—দেশে দেশে তার কত আয়োজন। কিন্তু সুষমার এই অর্ঘ্য অন্তরে সাড়া দেয় না, যদি না স্নেহের স্পর্শ, প্রেমের প্রলেপ তাহাকে সমৃদ্ধ করে। ন গৃহ গৃহমুচ্যতে গৃহিণী গৃহমুচ্যতে—কে কবি এই শ্লোক লিখিয়াছিলেন—আজ কেহই তাহাকে রসিক-শেখর বলিয়া সম্মান করে না। কিন্তু কবি যাহা বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সত্য। মানুষের প্রীতি প্রকৃতির পরিবেশকে মহিমামণ্ডিত করে, যেখানে তাহার অভাব সেখানে সৌন্দর্য্যের বিকচ শতদল ম্লান ও নিষ্প্রভ মনে হয়।

হোটেলে বসিয়া মিউনিক সম্বন্ধে কয়েকটী পুস্তিকা পড়িয়া লইলাম। লর্ড মেয়র যে আহ্বান-লিপি পাঠাইতেছেন তাহাতে লিখিয়াছেন—"Munich Coveted goal of the world-traveller. A conception which obliges. Munich is unique and with her wealth of treasures of art and culture and history merely claims to be and to remain—Munich the city of the joy and source of life."

ইহা উদ্ধত আত্মস্পর্দ্ধা নয়। আল্পস পর্ব্বতমালার কোলে ব্যাভেরিয়া। মুনসেন ব্যাভেরিয়ার রাজধানী—সত্যই শিল্প-কলায় সমৃদ্ধ। মুনসেনের কৃষ্টির বার্ত্তা জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—তাই দেশ দেশান্তর হইতে তীর্থযাত্রী আসিয়া এখানে ভিড় করে। ন্যাশন্যাল-সোস্তালিজম এখানেই আত্মপ্রকাশ করে। ইহার লোক-সংখ্যা ৭২ লক্ষ—সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ১৭০০ ফিট। ১১৫৮ খৃষ্টাব্দে বীরকেশরী হেনরী এই নগর স্থাপন করেন। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথম পৌরশাসনের অধিকার লাভ করে। মধ্যযুগে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ইহা ব্যাভেরিয়া জনপদের রাজধানীতে পরিণত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজা লুই এবং তাহার বংশধরগণ ইহার বর্ত্তমান গৌরব ও অভ্যুদয় প্রতিষ্ঠায় যত্নপরিকর হন।

পরদিন উঠিয়া ডাক্তার থিয়ের ফিল্ডারের সন্ধানে চলিলাম। মুনসেনে যে India Institute of the Deutsche Akademie আছে, তিনি তাহার অবৈতনিক সম্পাদক। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের সহিত প্রীতি ও কৃষ্টির সম্বন্ধ বিবর্দ্ধন। ভারতবর্ষ হইতে তাহার সহিত পত্র বিনিময় হইয়াছিল। ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট বৎসর বৎসর ভারতীয় ছাত্রদের নানা বিষয়ে বৃত্তি দেয়। আমাদের দেশের যে সব ছাত্র গোলামির ভরসা করে না—জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্পকলায় নানা বিভাগে নূতন নূতন তত্ত্ব অর্জ্জন করিতে চান, তাহারা এই সব বৃত্তি গ্রহণ করিয়া জার্ম্মাণীতে গেলে ভাল হয়। আমার মনে হয়, দেশের তীক্ষ্ণধী এবং প্রতিভাবান ছাত্রেরা এই সব বৃত্তির সুযোগ গ্রহণ করেন নি।

মুনসেনে থাকিবার খরচও খুব কম। বিলাতের অর্দ্ধেক খরচায় এখানে বেশ ভদ্রভাবে থাকা চলে। ছাত্রদের নিকট শুনি যে, ১০০ মার্ক অর্থাৎ ৬ পাউণ্ড বা ৮০ টাকায় এখানে চলিয়া যায়।

এখানকার universitat লাডভিগ রাজপথে অবস্থিত। যাইবার পথে Franenkirche দেখিয়া লইলাম। এটা গির্জ্জা—যীশুমাতা মেরীর নামে উৎসৃজিত—ইহা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে গথিক স্থাপত্যরীতিতে নির্ম্মিত হয়। ইষ্টক-প্রাসাদ। স্থপতির নাম Jörg Ganghofer।—ইহার দুইটি উচ্চ গুম্বজ আছে। প্রত্যেকটি ৩২৫ ফিট উচ্চ—গুম্বজ দুইটির মাথা তামার মোড়া। নিকটেই পড়িল পৌরভবন Rathans—নূতন ও পুরাতন বাড়ী পাশাপাশি চলিয়াছে। নূতন বাড়ীটি মাত্র ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে

শেষ হইয়াছে। এখানে গথিক রীতির খুব চলন। আমাদের হাইকোর্টের গঠন যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা গথিক রীতির বৈশিষ্ট্য কতকটা অনুভব করিতে পারিবেন। এই পৌর ভবনে ঘণ্টাগুলি বেলা ৯টা এবং ১টার সময় ঐক্যতান সঙ্গীতে ধ্বনিত হইয়া শ্রোতাকে আনন্দ দান করে। বৈদ্যুতিক এলিভেটরে করিয়া ইহার উপর উঠিলে সহরের একটি সুন্দর ছবি নয়নপথে পড়ে।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের ভীড়--জার্ম্মাণ ভাষা জানি না; ইংরাজী-জানা বন্ধুরও সন্ধান সহসা মিলিল না। য়ুরোপে সাধারণতঃ মানুষ আত্মকেন্দ্র—অপরের খোঁজ খবর বড় একটা রাখেনা। একটি জার্ম্মাণ ছেলের সহিত আলাপ হইল। সে শিল্প-কলার ইতিহাস পড়ে। নানা স্থানে সন্ধান লইয়া ছাত্রটি বলিল যে, ডাক্তার থিয়ের ফিল্ডার ম্যাক্সি মিলিনিয়ামে থাকেন।

ডাক্তারের চিঠি আমার নিকট ছিল—তাহাতে তাহার ঠিকানা ছিল, কিন্তু আমি ভাবিয়াছিলাম—দুটি এক স্থানেই অবস্থিত। কিন্তু আসলে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট প্রায় দুই মাইল দূরে। ছাত্র বন্ধুর নির্দ্দেশ মত ট্রামে চড়িয়া ম্যাক্সি মিলিনিয়ামে চলিলাম। ইসার নদীর অপর পারে অবস্থিত—সেতুর উপর দিয়া ট্রাম চলিল। ম্যাক্সি মিলিনিয়ামের বাড়ীতে আসিয়া আবার সন্ধান পাওয়া ভার হইল। দরজার কড়া নাড়িয়া কাহাকেও পাইলাম না। অনেকক্ষণ পরে একজন ভৃত্য আসিল—কিন্তু সে কিছু বুঝিতে না পারিয়া চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে একজন ছাত্র আসিল। তাহার নির্দ্দেশ মত ডাক্তার থিয়ের ফিল্ডারের আফিসে গেলাম। আমার কার্ড পাইয়া একটী তরুণী আমাকে আমার চিঠিপত্র আনিয়া দিলেন এবং বলিলেন—ডাক্তার একটু ব্যস্ত, পরে সাক্ষাৎ হইবে। উঁহাদের বসিবার ঘরে বসিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পত্রিকাগুলির উপর চোখ বুলাইয়া লইলাম। ডাঃ থিয়ের ফিল্ডারের সহিত আলাপ হইল। ব্যস্ত মানুষ, অধিক সময় ক্ষেপের অবসর নাই। বলিলেন—"আপনার বক্তৃতার আয়োজন করতে পারলে খুব খুসি হতাম—কিন্তু এখন তার সম্ভাবনা নেই—তবে হিন্দুস্থান ক্লাবে যান। সেখানে ডাঃ মেটার সঙ্গে আলাপ করুন।"

বলিলাম—"মুনসেনের বহিঃরূপ দেখে আমি ফিরতে রাজি নই—এর অন্তরের শক্তির ও মনুষ্যত্বের উৎস দেখতে চাই।"

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন—"এত অল্প সময়ে সে পরিচয় কি সম্ভব? ভ্রাম্যমানের চঞ্চল মন নিয়ে গভীর অন্তর্নিবেশ কেমন করে দেবেন।"

জবাব দিলাম—"তা সত্য, তবু যতটুক হয়—এখানে ত P. E. N. নেই। অন্যস্থানে তাদের সহায়তায় কবি ও মনীষিদের সাক্ষাৎ পেয়েছি।"

ডাক্তার এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিলেন না। অন্য একজন অধ্যাপকের নিকট চিঠি দিলেন।—কিন্তু চিঠির সদ্ব্যবহার করা আর সম্ভব হইল না।

এইস্থানে সাদেক বলিয়া একজন ভারতীয়ের সহিত আলাপ হইল। তিনি এখানে গবেষণা করিতেছেন। ভদ্রলোক হিন্দুস্থান ক্লাবের ঠিকানা দিয়া বলিলেন, সেখানে পরে আলাপ হইবে।

সেখান হইতে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিলাম। দেশের ঘর বাড়ী দেখিলে দেশকে চেনা যায় না—দেশের যারা প্রতিনিধিস্থানীয়—যে সব মহাত্মাদের মধ্যে দেশাত্মা আপন মূর্ত্তি প্রকাশ করেন তাহাদের সঙ্গ না পাইলে দেশ-ভ্রমণ মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। সংস্কৃতির এই কেন্দ্রে তাহার কোনও সুবিধা না থাকায় আন্তরিক দুঃখিত হইলাম। এখান হইতে হাটিয়া জার্ম্মাণ-মিউজিয়ামে গেলাম। এই কলা-ভবনের নব স্থাপত্য রীতিতে নির্ম্মিত প্রাসাদ হৃদয় হরণ করে। অধ্যাপক নেব্রিথিল ভন সিড্‌ল ইহার পরিকল্পনা করেন। শিল্প-ভবনের আয়োজন, ব্যবস্থা এবং পরিবেশ অপূর্ব্ব ও অনবদ্য। মুনসেনে আসিলে জার্ম্মাণ মিউজিয়াম না দেখিলে আসাই বিফল। এখানে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির যে সব নিদর্শন আছে সেগুলি নিরতিশয় শিক্ষাপ্রদ। ভবনটি ইসারের বক্ষের উপর উত্থিত চরের উপর প্রতিষ্ঠিত। উঁহারা বলে, পৃথিবীতে এত বড় প্রদর্শনী-গৃহ আর নাই। টলেমির মতানুসারে আকাশের সত্যকার অবস্থা দেখাইবার চমৎকার ব্যবস্থা এখানে আছে। তাহা ছাড়া অন্যান্য অনেক বিষয়ের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া পরিদর্শনের বন্দোবস্ত আছে। অল্প সময় ধরিয়া এই

বিরাট শিল্প-ভবনের কিছুই দেখা যায় না। এই গৃহের অভ্যন্তরে মধ্যাহ্ন ভোজ করিলাম। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই—বোধ হয় এটি এখানকার কর্ম্মচারীদের আহারের জন্য স্থাপিত সরাই। অপরিস্কৃত স্থান—মন ঘিন্-ঘিন্ করিতে লাগিল। কিন্তু আসিয়া পড়িয়াছি—ক্ষুধাও লাগিয়াছে; কাজেই কিঞ্চিৎ 'আক্কেল-সেলামী' দিয়া পুনরায় দেখিতে আরম্ভ করিলাম।

এই কলা-ভবনটিকে আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। ভারতবর্ষের কোথাও এরূপ কোনও প্রতিষ্ঠান নাই। বর্ত্তমান যুগ কলকব্জার যুগ। যন্ত্রদানবের পূজা না করিয়া যাহারা বিজয় রথ চালাইতে চাহে, তাহারা ভুল করে—কারণ কালের গতিকে কেহ রোধ করিতে পারে না। যন্ত্রদানবের রথ-চক্রের ঘর্ঘর ধ্বনিকে আজ্ঞা করিয়া আমরা সাম-মুখরিত আশ্রম-ভবন নির্ম্মাণ করিয়া রহিব—এ কল্পনা একান্ত মূঢ়তা। কলিকাতায় বর্ত্তমানে Commercial musium হইয়াছে—এখনও দেখিবার অবসর হয় নাই। এই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি আদর্শ ও কার্য্যকরী সংগ্রহশালা করিলে দেশের প্রভূত উপকার হইবে।

সেখান হইতে ফিরিয়া পোষ্ট অফিসে গিয়া চিঠি লিখিলাম। তারপর Verkehrsveren অফিস হইতে নিয়মিত আহার-শালার সন্ধান নিলাম। সেখানে গিয়া পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করিলাম। তারপর হিন্দুস্থান ক্লাবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। Königsplatz-এ ফুরের-ভবন এবং ন্যাশন্যাল-সোস্যালিষ্ট দলের বাড়ী দেখিলাম। এখানেই নব-নির্ম্মিত কীর্ত্তিমন্দির—নবজাগ্রত জার্ম্মাণীর তীর্থক্ষেত্র। এখানেই ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর হিটলার-পন্থীদের হত্যা সংঘটিত হয়। তাহাদের স্মৃতির তর্পণে নির্ম্মিত এই কীর্ত্তি-মন্দির—গ্রীক-স্থাপত্য রীতিতে রচিত অনুপম আয়তন। ১৯৩৫ সালের একটা বক্তৃতায় হিটলার ইহাদের সম্বন্ধে বলেন—"These temples are not tombs but eternal guards. Here they stand for Germany and guard our nation. Here the fallen heroes rest as faithful witnesses."—এত কবর নয়, মন্দির—যেখানে মৃতেরা রয়েছে চিরন্তন প্রহরী। তাহারা জার্ম্মাণী এবং জার্ম্মাণ জাতির গৌরবরক্ষী, চির বিশ্বস্ত দেশাত্মবোধদীপ্ত সাক্ষী।
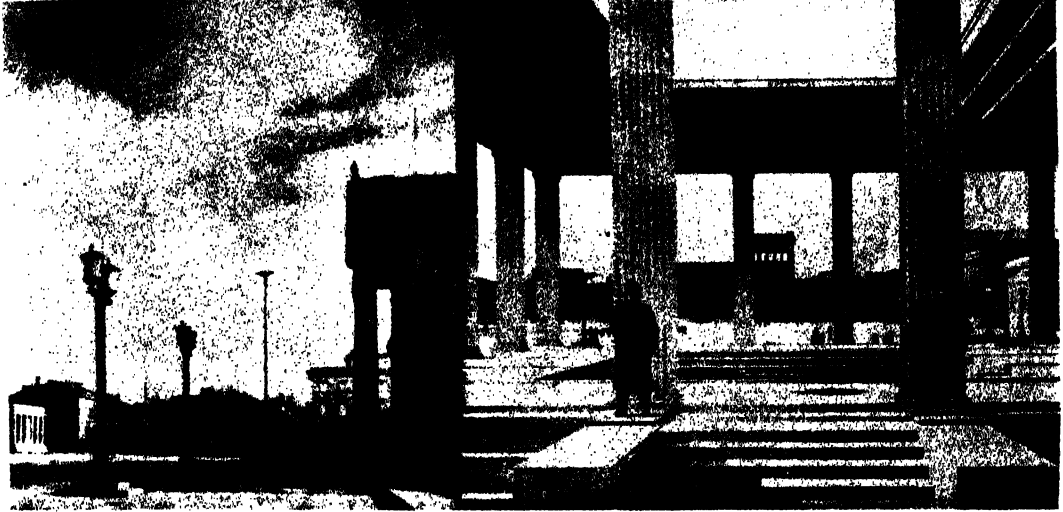
আধুনিক নাজী জার্ম্মাণীর জাতীয় মন্দির কনিংস্‌প্লাজা: নব-জাগ্রত জার্ম্মাণীর তীর্থক্ষেত্র

দু'জন সজ্জিত সৈন্য নির্ব্বিকার নিশ্চল মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া এই গম্ভীর শ্রদ্ধাদীপ্ত মন্দিরের গাম্ভীর্য্য বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

এই কীর্ত্তি-মন্দির শান্তির প্রতীক নয়। আমার মনে দুঃখ লাগিল। কিন্তু যে দেশপ্রেম পদদলিত, নির্য্যাতিত

জার্ম্মাণীকে জগৎসভায় বীর্য্যের ও সম্মানের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহার মূর্ত্ত প্রতীকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার দুর্ল্লভ ও অপরাজেয় বিক্রমের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া রহিলাম। অজ্ঞানিত হৃদয়ের অর্ঘ্য এই সমস্ত বীরপুঙ্গবদের উদ্দেশে নিবেদন করিলাম।

হিন্দুস্থান ক্লাব বসে একটি রেস্তঁরায়। এইদিন ইহাদের একটি বিশেষ অধিবেশন ছিল। আয়েঙ্গার নামক একটী যুবক বিষ-পানে আত্মহত্যা করিয়াছে—

অলটপিনাকোথিক : ইউরোপের সুপ্রাচীন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশালা : মিউনিক

তাহার শব সৎকারের খরচের চাঁদা সংগ্রহের জন্য সমিতির অধিবেশন হইতেছিল। আমি যখন গেলাম, তখন এক্জন মাত্র সভ্য উপস্থিত—অপরে আসে নাই। ডাঃ মেটার সহিত আলাপ হইল। তিনি বলিলেন, একজন হিন্দু বিদেশে বিনা সৎকারে মরিবে, ইহা বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি নিজ দায়িত্বে সে ভার লইয়াছিল—শ দেড়েক মার্ক লাগিল। একজন সভ্য বলিল—'যে আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহার প্রতি সমবেদনা দেখাইবার প্রয়োজন নাই।' অবশ্য অধিকাংশ এ প্রস্তাব সমর্থন করিল না, আমি পাঁচ মার্ক চাঁদা দিলাম।

ডাঃ মেটা বলিলেন, "আপনি যদি ৭ মার্ক দেন তবে ভাল হয়—" তাঁহার কথা রাখিতে হইল।

এই দুর্ঘটনার ইতিহাস অত্যন্ত দুঃখের। ইহারা দুই ভাই এদেশে আসে। দু'জনে ধনী বংশের সন্তান—দেখিতে সুন্দর ও কান্তিমান্। প্রথমটী একটী জার্ম্মাণ যুবতীর প্রেমে পড়ে। তাহাকে লইয়া আল্পস্-বিহারে যায়। সেখান হইতে সে আর ফেরে না। তাহার মৃত্যু রহস্যময় রহিয়া গিয়াছে।

বাঙালী বন্ধু যিনি পাশে ছিলেন, বলিলেন—"লোকে বলে পা পিছলে সে খাদে পড়ে—কিন্তু তা আমার বিশ্বাস হয় না—!

প্রশ্ন করিলাম—"আপনি কি মনে করেন?"

বন্ধু উত্তর দিলেন—"আমার মনে হয় উহাকে হত্যা করা হয়েছে—ও যে মেয়েটিকে ভালবাসিত সে বড় বংশের মেয়ে—হয়ত প্রেমের প্রতিদ্বন্দী হত্যা করেছে, নয়ত— "

"নয়ত?"

বন্ধু চারিদিক চাহিয়া লইয়া বলিলেন, "নয়, মেয়েটির ভাই ওকে মেরেছে?"

কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কারণ?"

"এখন জার্ম্মাণীতে ভারতীয় বিদ্বেষ খুব চলছে—ওরা চায় না যে, কোনও জার্ম্মাণ মেয়ে কোন ভারতীয়কে বিয়ে করে—ভারতীয়কে ওরা আর্য্যজাত বলে আমল দিতে চায় না—"

সে কথা সত্য। জার্ম্মাণের আর্য্যসভ্যতার পুরাতন কীর্ত্তি উদ্ধারে অগ্রণী, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি সে শ্রদ্ধা ক্রমে চলিয়া যাইতেছে। থিয়ের ফিল্ডার আমার বক্তৃতার আয়োজন করেন নাই, বোধ হয় তাহার পিছনে তখনকার ধূমায়মান ভারতীয়-বিদ্বেষ অন্যতম কারণ।

বিগত মহাযুদ্ধের পরে যখন বিশ্বশান্তির স্বপ্ন মানুষ দেখিল, তখন মনে হইল—বর্ণ-বিদ্বেষ—জাতি-বৈরতা হয়ত দূর হইবে। কিন্তু মানুষের মধ্যে ঘুমন্ত দানব জাগিয়া

আছে। কবির স্বপ্ন, ভাবুকের আদর্শ সেই রক্তপিশাচের কলুষ-দৃষ্টিতে কালিমাময় হইয়া যায়।

দেশে দেশে মানুষ মানুষকে কেবল মানুষ হিসাবে আত্মীয় বলিয়া মনে করিবে—এই মতবাদ, এই বিশ্ব-মানবতার কল্পনা আজিও স্বপ্নবিলাসীদের ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে—কিন্তু বাস্তব জগতে তাহার বিপরীত দেখিতেছি। উন্মাদ বৈরী-ভাব আপন লেলিহান জিহ্বা মেলিয়া ধরিত্রীর সভ্যতাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে—তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় কোথায় কে বলিবে?

জগৎ কাতর—দুর্জ্জনের দৃপ্ত অহঙ্কার আজ হুঙ্কার দিতেছে—তথাপি এই ঘনান্ধকার হয়ত নব প্রভাতের সূচনা করিতেছে।

সেখান হইতে তাড়াতাড়ি বিদায় লইলাম। মেটা বলিলেন, "কিছু পান করুন"।

বলিলাম—"ধন্যবাদ, পানীয় বলিতে যুরোপে যা বুঝায় সেটা চলে না—"

"নিন না এক কাপ ল্যাগার—এটা আর কিছু নয়—আপেলের তৈরি—"

"মাপ করবেন—আপেলের হোক আঙুরের হোক ওটা আমার অস্পৃশ্য—"

"ধন্যবাদ, আপনি আমাদের খুব উপকার করলেন—"

উত্তর দিলাম না—নমস্কার জানাইয়া বিদায় লইলাম। একজন অপরিচিত পরিব্রাজক নানা উপদেশ দিয়া ভ্রমণের সাহায্য করিয়া ইহারা উপকার করিতে পারিতেন, কিন্তু হিন্দুস্থান-ক্লাবের সদস্যদের কেহই সেদিক্‌ দিয়া গেলেন না। এই সমস্ত ক্লাবের প্রয়োজনীয়তা এই দিক্‌ দিয়া বেশী—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান প্রায়ই কর্ম্মী কোনও যুবকের ব্যক্তিগত সাধনার কেন্দ্র—তাহার নিকটতম বন্ধুদের সহায়তায় ইহা চলে।

সঙ্ঘ বলিতে যাহা বুঝায়—organisation বলিতে যাহা বুঝায়—তাহা আমাদের ধাতে খাপ খায় না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, জার্ম্মাণীর সত্যকার প্রতিভা সংগঠন শক্তিকে জার্ম্মাণ-প্রবাসী হইয়াও আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। সংগঠনের মূলমন্ত্র নিয়মানুগত্য—আমাদের চরিত্রে ইহার একান্ত অভাব। নিয়ম আমরা জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক কিছুতেই মানিব না। ভাঙিলে তাহার কৈফিয়ৎ দিতে বুদ্ধিজীবী আমাদের বাধে না।

হিন্দুস্থান ক্লাবে একটী সন্ধ্যা কাটিল—না পাইলাম আনন্দ, না হইল উৎসাহ। ইহারাই দেশে ফিরিয়া নানা
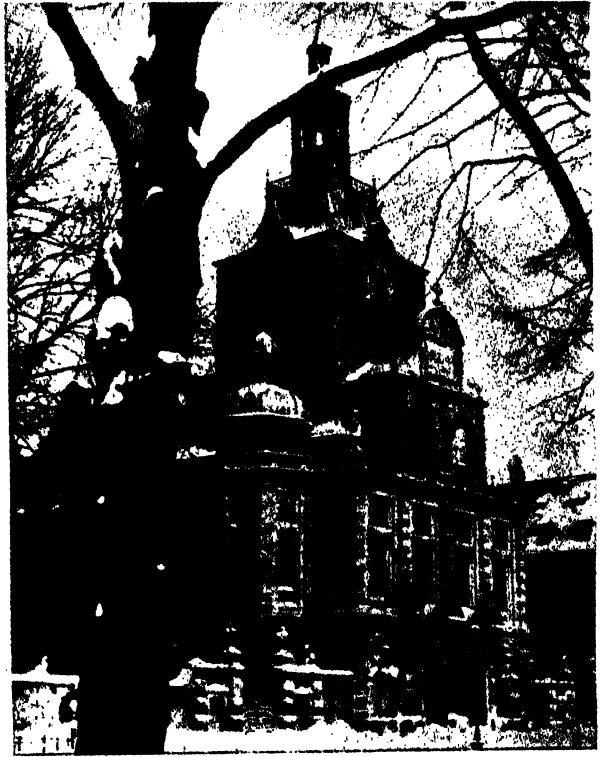
মুনসেনের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রহশালা

কর্ম্মে নেতৃত্বের দাবী করিবে—অথচ সংগঠনের কিছুই ইহারা শিখিল না। অনুকরণে যে জিনিষ খাড়া করিয়াছে—তাহার সহিত অধিকাংশের হৃদয়ের কোন যোগ নাই। বাসায় ফিরিয়া চিঠিপত্র লিখিয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়িলাম।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩৬। সকালে উঠিয়া ইহাদের চিত্রশালা দেখিতে চলিলাম। পুরাতন চিত্র সংগ্রহের নাম Old Pinaksthek—এখানে পুরাতন ফ্লেমিশ, ডাচ ও জার্ম্মাণ চিত্রকরদের নানাবিধ চিত্র সংগৃহীত করা

হইয়াছে। চিত্রবিদ্যার যে ছন্দ ও সুর তাহা জানি না—নানা চিত্রশালার সুষমার আড়ম্বরের মাঝে রস গ্রহণ করিবার দক্ষতা হারাইয়া ফেলি। তখন কেবল দেখিবার জন্য চোখ বুলাইয়া লই। এখান হইতে New Pinaksthek নামক চিত্র-ভবনে গেলাম। এখানে গ্রাফিক চিত্রের প্রদর্শনী নূতন ও মনোহরণ বলিয়া মনে লাগিল। তারপর Gleyhothek বা ভাস্কর্য্য-ভবন দেখিলাম। এখানে প্রাচীনকালের ভাস্করদের শ্রেষ্ঠ অবদানগুলি সমাবেশ করা হইয়াছে। ইহার পাশেই ইহাদের চিত্রবিদ্যা-ভবন—সময়াভাবে গেলাম না।

ডয়েট্‌স্ মিউজিয়াম: প্রকৃতি-বিজ্ঞান (National science and technology)-বিষয়ক শ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালা

ওখান হইতে ট্রামে করিয়া ন্যাশন্যাল মিউজিয়াম দেখিতে গেলাম। এটা Prinzregenten strass নামক বড় রাস্তার নিকটেই অবস্থিত—এখানে নৃ-তত্ত্বের ও ঐতিহাসিক সংগ্রহ আছে। সেগুলি দেখিলে ব্যাভেরিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। এই যাদুঘরের পাশেই Schack gallery নামক একটি চিত্রশালা আছে। এই চিত্রশালায় সুইণ্ড, ফুয়েরবল, বকলিন প্রভৃতি আধুনিক চিত্রকরদের ছবি আছে। চিত্রশালা দেখিয়া তারপর হোটেলে ফিরিলাম। আহার শেষ করিয়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বিচারালয়ে গেলাম। এই ব্যবহার-সৌধ দেখিতে জাঁকজমকশালী—কেবল একবার ঘুরিয়া আসিলাম। অপেক্ষা করিবার মত আনন্দ বা পরিচয় জুটিল না।

এখান হইতে ছায়া-ছবি দেখিতে চলিলাম। গল্পটী রোমাঞ্চকর, কিন্তু তাহাতে সত্যকার রস-শিল্পের অভাব আছে বলিয়া মনে হইল। বৈকালিক আহারাদি শেষে রাত্রে Deutsch থিয়েটারে Variety performance দেখিলাম।

মিউনিকে আমোদ প্রমোদের আয়োজন অফুরন্ত—সমস্তগুলি দেখার সুযোগ বা সুবিধা হয় নাই। এখানে বছর বছর মেলা হয়—নিদাঘসময়ে অনুষ্ঠিত এই সকল মেলায় ওয়াগনার ও মোজার্টের অমর গীতাভিনয়গুলি অভিনীত হয়।

ডয়টস্ থিয়েটারে সাধারণতঃ বিদেশীরা আসিয়া অভিনয় করে কিন্তু সে খবর তখন জানিতাম না।

Revue গুলিতে নাচ, গান, কৌতুকাভিনয় প্রভৃতি নানাবিধ আমোদের ব্যবস্থা থাকে। এগুলি অবসর-বিনোদনের পক্ষে মন্দ নয়। রাত্রি এগারোটায় বাসায় ফিরিলাম।

১৭ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার। সকালে উঠিয়া ম্যাক্সিমিলিনিয়ামে গেলাম—সেখানে হরিহর দাদার চিঠি ও "প্রবর্ত্তক" পেলাম। তরু দত্তের জীবনী লিখিয়া দাদা সাহিত্য-জগতে চিরন্তন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। অক্সফোর্ডের বি-লিট ডিগ্রি নেওয়ার পর ডি, ফিল, ডিগ্রি নেওয়ার জন্য থিসিস্ দেন—সে থিসিস্ বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রহণ করে না। ইহাই তাহার জীবনের কাল হইল—সেই অবধি আজও থিসিস্ লিখিতেছেন। দীর্ঘ ১৭ বৎসর ধরিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া বিদেশে দিন যাপন করিতেছেন। বৃহৎ কর্ম্মশক্তিদীপ্ত প্রতিভা কেবল ডিগ্রির মোহে নিজের উজ্জ্বল জীবন নষ্ট করিলেন, ইহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে। ওখান হইতে ফিরিবার পথে একটি চিত্রশালা দেখিতে চলিলাম। মাত্র ৪।৫টি ঘরে নূতন শিল্পীদের নূতন ও অপূর্ব্ব উদ্যমগুলিকে নিন্দুক জনসমাজের চক্ষে উন্মুক্ত করা হইয়াছে।

সেখান হইতে হাঁটিয়া Residentz museum দেখিতে এলাম। ইহা পুরাতন রাজবাড়ী—ম্যাক্স জোসেফ স্কোয়ারের উপর অবস্থিত। ইহার সজ্জিত সুদৃশ্য কক্ষগুলির ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে অতীতের কথা মনে জাগিল। সুন্দরীদের চরণ-ধূলি একদিন যেস্থানে গর্ব্বে বক্ষে ধারণ করিত, আজ তাহা কৌতূহলী নর ও নারীর ভীড়ে কলুষিত। এখানকার চিত্রশালার কতকগুলি ছবি খুব ভাল লাগিল। তাহাদের প্রতিরূপ কিনিয়া লইলাম।

এখান হইতে বোটানিক গার্ডেনে গেলাম—সহরতলীর উপর একটু বেড়ানো হইল। এই উদ্যানের ভিতর প্রবেশ করা হইল না—ইহারা ত প্রচার করে যে এই উদ্যান পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম—এখানকার সুবৃহৎ কাঁচের ঘরে পৃথিবীর নানা দেশের পুষ্পলতার আশ্চর্য্য সমাহার আছে।

সেখান হইতে ফিরিয়া আর ঘুরিতে ভাল লাগিল না বলিয়া একটি রূপ-বাণীতে ছবি দেখিতে গেলাম। ছবিটি ভিয়েনায় তোলা—এক রাজপুত্র গরীবের সঙ্গীত-নিপুণা মেয়েকে ভালবাসে—সেই প্রেমের দ্বন্দ্বের উপর গল্পটি তৈরী; মন্দ লাগিল না।

ইহাদের ন্যাশন্যাল থিয়েটারে জার্ম্মাণ নাটকের অভিনয় দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রাত্রি জাগিবার ভয়ে সে বাসনা ত্যাগ করিলাম। পরদিন জেনিভা যাইতে হইবে বলিয়া সকাল সকাল শয়নে পদ্মলাভ করিবার ইচ্ছায় গৃহে ফিরিলাম।

পরদিন ভোরে তুষারাবৃত সুন্দর মুনসেনের উপর চোখ বুলাইয়া বিদায় লইলাম। তুষার-কণা, ভবন-শিখর ও বলভিকে যেন মায়ারাজ্যের পুরী গড়িয়া তোলে। কিন্তু সে মায়ায় ভুলিয়া থাকিবার সময় কই। দূরান্তের আহ্বান আসে। গৃহে যে বিরহিনী নীল আকাশের দিকে ক্ষুধিত দৃষ্টি মেলিয়া শোকবিধুর দিন যাপন করিতেছে—তাহার ডাক কিছুতেই ভোলা যায় না। কন্যাহারা জননী বেদনা বক্ষে চাপিয়া রাখিয়াছে—গুরুজনের আদেশে সে বেদনার অংশী আমাকে করে নাই। রেলপথে ১২ ঘণ্টার যাত্রা। দু'পাশের নিসর্গ দৃশ্য খুব চমৎকার লাগিল।

মধুর স্নিগ্ধ শষ্পরাজী দিগন্তে মিলাইয়াছে—মাঝে মাঝে পাহাড় কালো রূপে নয়ন ভোলায়।

গাড়ী চলে। চিরন্তন পথিক চলে। সে পথ আজ শেষ হইয়াছে। গৃহের আরাম-আসনে বসিয়া শ্রাবণ-ধারা দেখি আর দুরন্ত বাতাসের গর্জ্জন শুনি।

কালো কালো মেঘেরা কোন দূরান্তে যাত্রা করিতেছে কে জানে, তাহাদের সাথে সাথে আমার অন্তরও গাহিয়া উঠিতেছে:

'আমি চঞ্চল হে—আমি সুদূরের পিয়াসী'

মুনসেন চোখে যে মাধাকাজল দিয়াছিল—সে মোহ আজিও ডাকে, বলে—"ওগো পথিক, শ্রান্তির নীড় তোমার নয়—বিশ্বের পথ ডাকিতেছে—বাহির হও।"

সে আহ্বানে আর সাড়া দিতে পারিব কিনা জানি না—তবু উতলা মনের ব্যাকুলতাকে উপেক্ষা করিতেও পারি না।

# রসায়নের আদিযুগ

অধ্যাপক শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের বিকাশ ও প্রসারের কথা বলতে গেলে, মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের কথা আপনিই এসে পড়ে। সভ্যতার আদিম প্রভাতে, যখন মানুষ সবেমাত্র পাথরের তৈরী প্রহরণ ইত্যাদির ব্যবহার শিখছে তখন থেকেই বিজ্ঞানের আরম্ভ। আদিমানব যখন অগ্নির ব্যবহার শিখলে তখন ধাতুযুগের আরম্ভ হ'ল। তামা, ব্রোঞ্জ, লোহা প্রভৃতি শুদ্ধ ও সংকর (alloy) ধাতুর প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিষ্কাশন আর নির্ম্মাণকৌশলের উদ্ভাবন হ'তে লাগল। এমনি ক'রে মানুষের দৈনিক জীবন যাপনের সুখ সুবিধার জন্যে বিজ্ঞানের বিকাশ হতে লাগল।

চীনের (৩০০০ খৃঃ পূঃ, আসিরিয়া ও ব্যাবিলোনের (৫০০০ খৃঃ পূঃ) সভ্যতা প্রাচীনতম সভ্যতা। চীনে ও ব্যাবিলোনে, খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩০০০ বছর আগে, শিল্প ও কৃষি-বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হ'য়েছিল। চীনের আলেখ্য, প্রাচীর শিল্প, ভাস্কর্য্য ও খোদাইয়ের কাজের সমৃদ্ধি তখনই হ'য়েছিল। সিল্কের প্রচলন ও ব্যবহার চীনদেশেই প্রথম হয়; খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৫০ সালে এক চীনরাজকুমারী জাপানে সিল্ক তৈরীর ব্যবস্থা ক'রে দেন, তারপর ধীরে ধীরে সমগ্র এসিয়ায় তা' ছড়িয়ে পড়ে, আর ইটালীতে মাত্র তৃতীয় শতাব্দীতে (খৃঃ অঃ) চীনাংশুকের (সিল্কের) প্রথম প্রবর্ত্তন হয়, আর ৬০০ খৃষ্টাব্দে গুটিপোকার রীতিমত চাষ ইউরোপে সুরু হয়। চীনদেশে বিজ্ঞানের যে কতদূর উন্নতি সাধিত হ'য়েছিল তার প্রমাণ ৬৬০ (খৃঃ পূঃ) সালে তার কাগজ-শিল্পের উদ্ভাবন। তারপর খনিজ পদার্থের বিগলন, কাঠের কাজ, চর্ম্ম-শিল্প, বার্ণিশ ও চীনামাটির বাসন-শিল্প প্রভৃতির সম্যক উন্নতি হ'য়েছিল। চীনামাটির বাসন তৈরী করা ইউরোপে সুরু হয়েছে মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে, তার প্রায় এক হাজার বছর আগে চীনামাটির প্রচলন হ'য়েছিল চীনদেশে। ইউরোপে রসায়নের নিয়মিত চর্চ্চা আরম্ভ হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে; অম্লজান গ্যাসের গুণ কিম্বা জলের রাসায়নিক সংযুতি সম্বন্ধে ইউরোপে আলোচনা হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। ডাকওয়ার্থ (Duckworth, ১৮৮৭) দেখান যে, তার বহু পূর্ব্বে চীনারা এ বিষয় অবগত হ'য়েছিলেন।

চীনদেশের প্রাচীনতম সভ্যতার বিকাশের পরেই, বিজ্ঞানের দিকে বিশেষ বিকাশ হ'য়েছিল মিশর দেশে। চীনের সমসময়ে মিশরে খনিজ পদার্থ থেকে শুদ্ধ ধাতু নিষ্কাশন, সংকর ধাতু নির্ম্মাণ পদ্ধতির ব্যবস্থা হ'য়েছিল। রঞ্জনশিল্প, কাঁচশিল্প, ঔষধপ্রস্তুত বিদ্যাতে মিশরবাসীরা পারদর্শী হয়েছিলেন। রসায়নবিদ্যার অনেকাংশে বিকাশ আর প্রসার মিশরে বেশি হয়েছিল। মিশরবাসী পুরোহিতেরা কেবল রসায়ন-বিদ্যার অধিকারী হ'তেন। মন্দিরের ভিতর, লোকচক্ষুর অন্তরালে রসায়ন পরীক্ষার কাজ চলত। রসায়নশাস্ত্রের ইংরাজী নাম "কেমিষ্ট্রি" (Chemistry) কথাটি বোধ হয় এসেছে 'কিমিয়া' (Chemia) থেকে। মিশরীয় ভাষায় 'কিমিয়া'র অর্থ হ'ল কাল মাটি। মিশরদেশের মাটির রং নাকি কাল, তার থেকে ঐ নামের উৎপত্তি। রসায়নশাস্ত্রের গোড়া-পত্তন হ'ল মিশরে, তারপর গ্রীক, রোমান আর আরবেরা তা' আনলেন ইউরোপে। কিমিয়া বলতে ইউরোপবাসী বুঝতেন মিশরীয় বিজ্ঞান। মহাবীর কনস্টানটাইনের (Constantine the Great, ৩২৫ খৃঃ অঃ) সময়ে রচিত জ্যোতিষের পুস্তকে কিমিয়া বিদ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রন্থকার বলছেন যে, শনির কাছে চন্দ্র থাকাকালীন যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে, সে কিমিয়া বিদ্যা পারদর্শী হবে। সম্রাট ডায়োক্লেশিয়েন (Diocletian) ৩০০ খৃঃ অঃ গর্ব্ব করে প্রচার করছেন যে, তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্য ধাতু-বিদ্যা বর্ণিত সব মিশরীয় পুস্তক ভস্মসাৎ করেছেন।

শবদেহ যে বাতাসের সংস্পর্শে গলিত হ'তে পারে, সে কথা মিশরবাসী জানতেন। তাই বায়ু সংস্পর্শ হ'তে পৃথক্‌ভাবে তাঁরা মৃতদেহ রক্ষা করেছিলেন। তাঁদের

অতি প্রাচীন যুগের শব-সংরক্ষণপ্রণালী আধুনিক বৈজ্ঞানিককেও বিস্মিত করেছে। খৃষ্টের দেড় হাজার বছর পূর্ব্বেও তাঁরা বিভিন্ন রঙের ব্যবহার জানতেন। জিপস্যনে (gypsion) মধু বা ডিম গুলে সাদা রং, হরিতালে হলদে, সিঁদুরে লাল, তুঁতেতে নীল আর অঙ্গারে কালো রং তৈরী করতেন। কাঁচের বাসনের জন্যে প্রাচীন মিশর বিখ্যাত ছিল। সোডা, পটাশ, ফট্‌কিরি, শোরা, লোহা, তামা, টিন, শিশা, সোণা আর রূপার ব্যবহার মিশর দেশে প্রচলিত ছিল। মিশরের বিজ্ঞান আলোচনার কেন্দ্র ছিল আলেকজান্দ্রিয়া (Alexandria) সহর।

মিশরীয় সভ্যতার সঙ্গে গ্রীক সভ্যতা জড়িত। গ্রীকদের বিদ্যা মিশরীয় সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। প্রাচীন মিশরে যেমন ফলিত বিজ্ঞানের প্রসার হ'ল, তেমনি গ্রীস দেশে বিজ্ঞানের তত্ত্বের (theory) দিক্‌টার বিকাশ হ'ল। গ্রীসদেশবাসী থেল্‌স্ (Thales, ৬০০ খৃঃ পূঃ) ব'লেছিলেন জল থেকেই বিশ্বের গঠন হ'য়েছে। তার ৫০ বছর পরে এনাক্সিমেন্স (anaximenes) বললেন যে, জল নয়, বায়ু হ'ল আদিম বস্তু। তারও প্রায় ৫০ বছর পরে হেরাক্লিটস (Heraclitus) ঘোষণা করলেন যে, অগ্নি হ'ল বস্তুর সার ভাগ আর উৎপত্তির কারণ। এই সব গোলমেলে তত্ত্বের মাঝ থেকে লিউকিপস (Leucippus) বিশ্বের অসীমতা, আর বিশ্ব যে ক্ষুদ্রতম পরমাণুর সমষ্টিতে সংগঠিত তার ধারণা করলেন। এখানে উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ভারতে মহর্ষি কণাদও পারমাণাবিক তত্ত্বের (Atomic theory) অবতারণা করেছিলেন। এমনি যখন গ্রীসদেশে বিজ্ঞানতত্ত্বগত অবস্থা তখন প্লেটোর (Plato) সুযোগ্য শিষ্য এরিষ্টটল (Aristotle) প্রাচীন মনীষীদের সব ধারণার সমন্বয় করে প্রচার করলেন যে, পদার্থ সকলের কতকগুলি ধর্ম্ম আছে—উত্তাপ, শৈত্য, আর্দ্রতা আর শুষ্কতা। চতুর্ধর্ম্মের, যুগ্ম-বিন্যাসে চারটি মৌলিক পদার্থের উৎপত্তি হয়।

| আর্দ্র | অপ | শীতল |
|---|---|---|
| মরুৎ | | ক্ষিতি |
| তপ্ত | অগ্নি (তেজ) | শুষ্ক |

অপ বা জল হ'ল আর্দ্র ও শীতলধর্ম্মী পদার্থ, অগ্নি হ'ল তপ্ত এবং শুষ্কধর্ম্মী। তপ্ত ও আর্দ্রধর্ম্মী পদার্থের মরুতাকার, শুষ্ক ও শীতলধর্ম্মী হ'ল ক্ষিতি। এর সঙ্গে আবার এক নির্বস্তুকের অবতারণা তিনি করলেন, তাকে আমরা ব্যোম বা আধুনিক বিজ্ঞান-অবধারিত ইথর (ether) বলতে পারি। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, প্রাচীন ভারতীয় দর্শন থেকে গ্রীক দর্শন গড়ে উঠেছিল। ভারতীয়ের ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম তত্ত্ব থেকে গ্রীকের আদিম বা মৌলিক পদার্থ তত্ত্বের বিকাশ হয়েছে।

আদি যুগের পরীক্ষামূলক এ্যালকেমির ব্যঙ্গ চিত্র। ছবিখানিতে যুগ-সাধনার আন্তরিকতা ও পরিহাস সুপরিস্ফুট।

মিশর সভ্যতার প্রভাবে রসায়নশাস্ত্রের প্রচার হ'ল আরবদেশে। মিশরীয় কিমিয়া বিদ্যায় আকৃষ্ট হ'য়ে আরবেরা স্বর্ণ আর রৌপ্যশিল্প শিক্ষা করবার চেষ্টা করে। আরবী পরিভাষায় 'কিমিয়া' 'আল্-কিমিয়া'তে (বর্ত্তমান ইংরেজী অ্যালকেমী, alchemy) রূপান্তরিত হ'ল। গ্রীক দার্শনিক Aristotle বর্ণিত মৌলিক পদার্থগুলি হ'ল, আদিম বস্তুর চারটি রূপান্তর মাত্র। একের অন্যে রূপান্তর করণে, একের ধর্ম্মের অন্যের ধর্ম্মে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। এখান থেকেই আলকিমিয়া (alchemy) বিদ্যার সূচনা। আরবের শ্রেষ্ঠ আলকিমিয়াবিদ্ হলেন জবীর (Geber) এরিষ্টটলের (Aristotle) তত্ত্বের ধারণা করে জবীর

অবর বা নিকৃষ্ট ধাতু (base metal) থেকে বর বা শ্রেষ্ঠধাতু (noble metal) স্বর্ণ প্রস্তুত প্রণালী বিষয়ে গবেষণা করতে লাগ্‌লেন। তিনি বললেন, প্রত্যেক ধাতুতে বিভিন্ন অনুপাতে দু'টি পদার্থ বর্ত্তমান—এ দুটি পদার্থ হ'ল পারদ আর গন্ধক। পারদের জন্যে বস্তুতে গালন, প্রসার্য্যতা প্রভৃতি ধাতু উচিত ধর্ম্ম অর্শায় আর দহনে ধাতুর যে সকল রূপায়ন হয়, তা হয় গন্ধকের জন্যে। জবীর আরও বললেন, সোণা ও রূপা যে উজ্জ্বল, তার কারণ হ'ল এই ধাতুতে পারদের পরিমাণ অধিক মাত্রায় আছে, সোণার

৩০০ বছর পূর্ব্বেকার এ্যালকেমির গবেষণাগার। তখন আর এখন—কত তফাৎ!

হলদে রং হয়েছে পীত গন্ধকের জন্যে, রূপা সাদা—শ্বেত গন্ধকের জন্যে। জবীর কেবল ধাতুর পারদ-গন্ধক তত্ত্ব নয়, চুল্লী, বকযন্ত্র প্রভৃতি রাসায়নিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারও প্রচার করেছিলেন। দ্রব্যাদির শোধনের জন্যে তিনি তির্য্যকপাতন (distillation), কেলাসন (crystallisation) ঊর্দ্ধ পাতন (sublimation), দ্রাবণ (solution) প্রভৃতি রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহার করতেন বলে জানা যায়। পারদের অনেক যৌগিক পদার্থও তিনি তৈরী করেন। নাইট্রিক এসিড আর স্বর্ণ দ্রাবণের জন্যে নাইট্রিক এসিড মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক এসিড (agua regia) প্রস্তুত ও ব্যবহার তিনি করেন। জবীরের প্রায় সমসময়ে কি জবীরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নাগার্জ্জুন কিমিয়া বিদ্যার প্রসার করেন। ওষুধে পারদঘটিত পদার্থের ব্যবহার, রসকর্পূর, স্বর্ণসিন্দুর ইত্যাদি তাঁরই সময়ে প্রচলিত ব'লে মনে হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরবীয় আলকিমিয়া বিদ্যার এত বেশী প্রসার হ'য়েছিল যে, ইউরোপের প্রধান দেশগুলিতে—স্পেনে, ফরাসীদেশে, ইটালীতে, জার্ম্মাণীতে সব আলকিমিয়াবিদের নাম শোনা যেত। ঐ সময়কার আলকিমিয়াবিদ্‌দের চালচলন পোষাক ইত্যাদি লোকচক্ষে অদ্ভুত ঠেকত। অবর ধাতুকে স্বর্ণে রূপায়নের প্রয়াসী আলকিমিয়াবিদ্‌ বাবরী চুল আর লম্বা দাড়ি রাখতেন, ঢিলা পোষাক পরতেন আর অহর্নিশ পরীক্ষাগারে কর্ম্মরত থাকতেন। তাঁরা সবাই খুঁজে ফিরতেন পরশপাথর, যার স্পর্শে যে কোন ধাতুই সোণা হ'য়ে উঠবে, যার প্রভাবে বৃদ্ধের জরা খসে যাবে, ফিরে আসবে তার হৃত যৌবন।

অনায়াসে রাতারাতি বড়-লোক হবার আকাঙ্ক্ষা সাধারণ মানুষের একটা মজ্জাগত দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে অনেক জাল আলকিমিয়াবিদ্‌ অনেককে ঠকিয়ে খেতেন। মধ্যযুগের অনেক রাজা জমীদারেরা অবরধাতু থেকে স্বর্ণ তৈরী করাবার জন্যে আলকিমিয়াবিদ নিযুক্ত করেন। এখনও নাকি প্রাগের (Prague) দুর্গের কাছে রাজা দ্বিতীয় রুডল্ফ (Rudolph II) নির্ম্মিত কিমিয়া পরীক্ষাগারের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

আলকিমিয়াবিদের পরীক্ষাগারের আবহাওয়া লোকমনে কৌতুহল ও শঙ্কার উদ্রেক করত। অন্ধবিশ্বাসী আলকিমিয়াবিৎ তাঁর চোলাই করবার পাত্র, বকযন্ত্র আর

চুল্লী নিয়ে, এঁদোপড়া, সেঁতা অন্ধকার নিভৃত গুহায়, অপ্রাপ্য পরশপাথরের খোঁজে এটা ওটা মিশিয়ে, এটাতে ওটা ঠেকিয়ে জীবন ক্ষইয়ে দিতেন। তাঁর অভিলাষ আকাশ ছোঁয়া, তিনি পেতে চান এমন জিনিষ, যাতে কাল হবে পরাজিত, যার যাদুস্পর্শে যৌবন-প্রবাহ হ'য়ে যাবে স্থির, সব ধাতু পীতাভ স্বর্ণে রূপায়িত হবে। ষোড়শ শতাব্দীতে প্যারাসেলসাস (Paracelsus) আলকিমিয়াবিদ্‌দের সোণা তৈরীর ঝোঁকটার মোড় ফিরিয়েছিলেন; তাঁদের দিয়ে ওষুধ-বিজ্ঞান আলোচনা সুরু করিয়েছিলেন। তাঁর বিবরণে পাওয়া যায়, স্বল্পালোকিত সাধারণের অব্যবহার্য্য স্থানে আলকিমিয়াবিৎ তাঁর পরীক্ষাগার স্থাপন করতেন। গভীর অভিনিবেশ সহকারে অহর্নিশ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে প্রজ্জ্বলিত চুল্লীর ধারে তিনি কাজ করে চলতেন। কামারশালার চাইতেও তাঁর পরীক্ষাগার ধুলামলিন থাকত। লোকচক্ষুর অন্তরালে কর্ম্মনিরত থাকতে তিনি ভালবাসতেন। পরীক্ষাগারের চারিপাশে অদ্ভুত আকৃতির পাত্রাদি, ধাতু-গলাবার মুচি, পাথরের তৈরী বোতল, হাপর, সব এলোমেলো; বড় বড় হিজিবিজি লেখা পাততাড়ি, দেয়ালে টাঙ্গানো থাকত সময় নির্দ্ধারণ যন্ত্র, দুর্ব্বোধ্য সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা আলকিমিয়া বিদ্যার বিবরণ। সব মাকড়সার জাল, ধুলা, চুল্লী থেকে ওড়া ছাইয়ে ভর্ত্তি।

অবর ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করার প্রচেষ্টা যে নিষ্ফল এবং কেবল লোক ঠকানো, তা' তখনকার লোকে বুঝে উঠতে পারত না এই জন্যে যে, পদার্থ বিশেষের যোগে অনেক সময় সংকর ধাতুর রং স্বর্ণাভ হত। লাল তামাকে জবীর দস্তার সাথে গালানোতে স্বর্ণাভ পিত্তল প্রস্তুত হ'ল। হলদে রং দেখে লোকে ভাবল যে সোণা প্রস্তুত হয়েছে। হরিতালের সাথে তামাকে গলিয়ে যে যৌগিক ধাতু পাওয়া গেল তার রং হল সাদা, রূপার মত। সীসাঞ্জনের (galena, a lead ore) সাথে রূপা মিশে থাকে, তাই সীসাঞ্জন নিষ্কাশনে দু'চারটে রূপার বোতাম পাওয়া যেত, আবার মাক্ষিক (pyrites) থেকে একই উপায়ে দু'চারটে দানা সোণাও আবিষ্কৃত হত। আলকিমিয়াবিদেরা বড় রূপক বহুল ভাষা ব্যবহার করতেন। জবীর লিখে রাখলেন, "আমার কাছে ছয়জন কুষ্ঠ রোগীকে আন, আমি তাদের ব্যাধি দূর করব।" তার অর্থ হল, তখনকার দিনে জানা ছয়টা অবর ধাতুকে তিনি স্বর্ণে রূপায়িত করতে চাইছেন। আলকিমিয়াবিদ্‌দের সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলিও বড় অদ্ভুত। ধাতুর সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি সব গগনপথচারী গ্রহ চিহ্ন।

সূর্য্য—সোণা, চন্দ্র—রূপা, শনি—সীসা, মঙ্গল—লোহা, শুক্র—তামা। ধাতুর সঙ্গে গ্রহাদির যোগের উৎপত্তি হয়েছিল ব্যাবিলোনিয়ায়। এখনও ইংরেজীতে পারদকে মার্কুরী (mercury—বুধগ্রহ) বলা হয়। সিলভার নাইট্রেটের (Silver nitrate) অপর নাম লুনার কষ্টিক্ (lunar caustic, Lune—the moon).

ষোড়শ শতাব্দীর পুরোভাগ পর্য্যন্ত আলকিমিয়াবিদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। তারপর সুইস (Swiss) আলিকিমিয়াবিৎ প্যারাসেলসাস (Paracelsus) সোণা খোঁজার পালা শেষ ক'রে, মানব-জীবন রক্ষণকারী ভেষজের সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। সেইদিন থেকে ভেষজ বিজ্ঞানের নবজন্ম আর প্রকৃত রসায়ন বিজ্ঞানের সূচনা। তাই দেখি—১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে হামবুর্গের আলকিমিয়াবিৎ ব্রাণ্ড্ট (Brandt) মূত্র থেকে ফসফোরস আবিষ্কার ক'রেছেন। ফসফোরস প্রস্তুতের আধুনিক প্রণালী অনেকটা ব্রাণ্ড্ট আবিষ্কৃত পদ্ধতিরই মত। তারপর আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রের আলোচনার সূচনা ও ক্রমবিকাশের সাথে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আলকিমিয়া বিদ্যার সম্পূর্ণ অবসান হ'ল। অবসান বলার চাইতে বলব রূপান্তর; বলব মিশরীয় কিমিয়া বিদ্যার গুটি কেটে, গুটিপোকা রাসায়নিক প্রজাপতিরূপে ধীরে ধীরে পক্ষ বিস্তার করল। তখনকার নিরালা আঁধার ঘরের কিমিয়াবিৎ হলেন, আজ জনসমাজের জ্ঞানালোকিত পরীক্ষাগারের, আদৃত, সম্মানিত রাসায়নিক। জবীর, নাগার্জ্জুন যে বিজ্ঞানের দীপবর্ত্তিকা জ্বেলেছিলেন, আজ তাই প্রসারিত, উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে আধুনিক রাসায়নিকের হাতে। ইংলণ্ডে রাসায়নিক মহলে কিমিয়া বিদ্যার অবসান মুহূর্ত্তটি বড় করুণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটির সভ্য, জেম্‌স প্রাইস

(James Price) ঘোষণা করলেন যে, প্রাচীন কিমিয়াবিদের অবরধাতুকে সুবর্ণে পরিণত করার স্বপ্ন তিনি সফল করেছেন। এমন কি তিনি তাঁর নির্ম্মিত সুবর্ণের কিছু নমুনা তৎকালীন রাজা তৃতীয় জর্জ্জকেও উপঢৌকন স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। প্রাইসকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টর উপাধি দান করে সম্মানিত করলেন। অনেক অবিশ্বাসীর মন এতে ভিজলো না, তাঁরা প্রাইসের কাছ থেকে হাতে কলমে প্রমাণ চাইলেন। প্রাইস নানা অজুহাতে প্রমাণ দেবার ব্যাপারটা এড়াতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু বিধি বাম, মাস ছয় পরে একদিন এক অশুভ মুহূর্ত্তে প্রাইস তাঁর পরীক্ষার যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যসম্ভার নিয়ে লোক সমক্ষে পাদপীঠে উপনীত হলেন। পরীক্ষা আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি এক চুমুক জলপান করলেন। যখন তাঁর ভক্তেরা গলিত পীতাভ সুবর্ণের প্রতি মানস অভিসার করছিলেন, যখন অবিশ্বাসীরা উপহাসের হাসির উপক্রম করছিলেন, তখন সবাই বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে দেখলেন প্রাইসের মুখমণ্ডল নীল হ'য়ে উঠেছে। সর্ব্বলোক সমক্ষে আশু অপমান আশঙ্কায় প্রাইস বিষ পান ক'রেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সাথে ইংলণ্ডে আলকিমিয়া যুগের শেষ অবসান হ'ল।

# সমান্তরাল

রোমানফ্ঃ শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক রুচিসম্মত সুসজ্জিত একটি ঘর।

ভেতরে লেখবার টেব্‌লের কাছে একটি যুবক বসে আছে। টেবলের ওপর রয়েছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি বই আর সংবাদপত্র। যন্ত্রচালিতের মত সে ধীরে ধীরে সুমুখ থেকে একটা দোয়াতদানি তুলে নিল—দৃষ্টি তারই পরে নিবদ্ধ হয়ে রইল।

এতদিন সে দেখে এসেছে যে ম্যারিয়া রোজ একান্ত অসহিষ্ণুভাবে তার প্রতীক্ষায় বসে' থাকত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আজ সে বাড়ীতে পর্য্যন্ত নেই। বাড়ীর চাকরটি জানিয়ে গেল যে, তিনি সন্ধ্যার পরই বেরিয়ে গেছেন—কিন্তু কোথায় গেছেন তা জানিয়ে যাননি।

তাদের উভয়ের এতকালের বন্ধুত্বের মধ্যে এই প্রথমবার ম্যারিয়া তাকে ব্যর্থ করল। সন্ধ্যাবেলাতেই সে ফোনে তাকে জানিয়েছিল যে, সম্ভবতঃ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে আসবে। সৌভাগ্যের বিষয়, সেই সম্ভাব্যটা নিশ্চয়তায় পরিণত হ'ল। সাতটার মধ্যেই সে সমস্ত কাজের থেকে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে পড়ল এবং দেখল তার স্ত্রীও বেড়াতে বেরিয়েছে।...

রাত এগারটা বেজে গেল...

—সে অপেক্ষা করে রইল।...

—বারটা বাজল...

—সে তখনও বসে।...

কিন্তু একটা বাজতেই সে অস্থির হয়ে উঠ্‌ল: ম্যারিয়া এখনও ফিরে এল না! একবার ভাবল চলে যাবে—যাওয়া হ'ল না: বরং তার মনে জেদ চেপে গেল—যতক্ষণ না ফেরে, সে অপেক্ষা করবে। দেখাই যাক না কত রাত করে।...গেলই বা কোথায়!

তারপর প্রায় রাত দুটোর সময়ে নীচের থেকে কলিং-বেলের শব্দ এল। কে যেন দরজা খুলে দিলে। একজন যে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, তাও সে বুঝতে পারল। অপেক্ষা ক'রে ক'রে বিরক্তিতে তার মুখের অভিব্যক্তি

এমন হয়ে আছে যে, তা কখনই প্রিয় বান্ধবীকে অভ্যর্থনা করবার মত নয়।

পর্দা সরিয়ে একটি তরুণী প্রবেশ করল। তার কাঁধের স্থানে স্থানে তুষার জমে রয়েছে, আর নীল টুপিটিও একেবারে সাদা হয়ে গেছে তুষারে। এতক্ষণ বাইরে থাকার দরুণ ঠাণ্ডায় তার পাত্‌লা ঠোঁট দুটি কাঁপছে থরথর ক'রে: ভোমরার মত কালো চোখের মাঝে উত্তেজনার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

'আরেঃ, তুমি কখন এলে?' খুসীর উচ্ছ্বাসে তার কণ্ঠস্বর যেন ঝলসে উঠ্‌ল। কিন্তু যুবকটির কাছে মনে হ'ল সেটা কৃত্রিম, 'তুমিতো আজ আসবেনা বলে ছিলে! কথাটা বলে ঘরের চারপাশে সে তার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি মেলে ধরল।

'না, আমি বলেছিলাম', দোয়াতদানিটা টেব্‌লের ওপর রেখে দিয়ে যুবকটি বললে, 'আসতেও পারি, না আসতেও পারি—ঠিক ছিলো না কিছুরই।'

'হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে যদি আস, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে'—

'মানলুম', বাধা দিয়ে যুবকটি বললে, 'কিন্তু তাই বলে রাত দুটো পর্য্যন্ত তুমি বাইরে কাটিয়ে আসবে? কোথায় গেলে তা একবার জানিয়েও গেলে না!'...

'ওঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ', ম্যারিয়া তাড়াতাড়ি বললে, 'আমি থিয়েটারে গিয়েছিলুম।'

মাথা থেকে টুপিটা খুলে তা থেকে তুষারকণাগুলো ঝেড়ে ঝেড়ে ও কার্পেটের ওপর ফেলতে লাগল। তারপর ক্ষণিক ইতস্ততঃ করে' একটা স্কার্ফ দিয়ে কাঁধটা মুছে ফেললে।

যুবকটি তার দিকে তাকিয়ে একবার ঘাড় নাড়ল: তার চোখমুখের অভিব্যক্তি সূচনা করছিল ঝড়ের পূর্বলক্ষণ। তবুও ও এগিয়ে এসে ম্যারিয়ার ওভারকোট খুলতে সাহায্য করল। আড়চোখে ওকে একবার দেখে নিয়ে ম্যারিয়া নিজের মুখের ভাব একেবারে বদলে ফেললে।

'এও কি সম্ভব যে, তুমি আমায় অবিশ্বাস করছ, ডার্লিং'? কোমল স্বরে কথাগুলি বলে' সে যুবকটির গা ঘেঁষে দাঁড়াল: তার সারা শরীরে বাইরের জোলো আব্‌হাওয়ার সোঁদা মিঠে গন্ধ। ধীরে ধীরে নিজের মৃণালভুজ দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরল পরম আদরে। যুবকটির কিন্তু মনে হ'ল ম্যারিয়ার এই চালচলন, এই ক্ষণ-রূপান্তর সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত, অনেকটা জোর-ক'রে-করা।

'আমি আজকের সন্ধ্যের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তের ইতিহাস বলে যেতে পারি', ম্যারিয়া বলতে লাগল, 'প্রায় সাড়ে ছটার সময়ে আমার এক বান্ধবী তাঁর প্রেমিককে নিয়ে এখানে এলেন, তাঁরা যাচ্ছিলেন থিয়েটার দেখতে। একখানা এক্স্‌ট্রা টিকিট ওঁদের সঙ্গে ছিল, অনেক করে' আমায় অনুরোধ করলেন। তাই......'

'কিন্তু, এত রাতে থিয়েটার থেকে?'

'হ্যাঁ, থিয়েটার থেকে। তাতে হয়েছে কি?'

'না, হয়নি কিছুই। কিন্তু, এত রাতে থিয়েটার?' শেষের কথাগুলি সে অস্ফুট স্বরে বললে।

ম্যারিয়া ওর কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে আনল—ও তা একবারও স্পর্শ করেনি। নিজের বিপর্য্যস্ত কেশ-পাশ বিন্যস্ত করবার জন্য সে ড্রেসিং টেবলের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর সহসা আবার পেছন ফিরে সমস্ত ঘরের মধ্যে একবার দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিলে। যুবকটির চোখ তার দিকে স্থিরনিবদ্ধ। দু'জনে চোখোচোখি হ'ল, ম্যারিয়া তার চোখ নামালে। নিজের জায়গায় অটল থেকে যুবকটি তার চোখ দুটি কুঞ্চিত করে' ওকে পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগল একমনে। আজ তাকে যেন লক্ষ্যই করছে না, এমন ভাব দেখিয়ে ম্যারিয়া একমনে চুলে ব্রুশ চালাতে থাকল।

যুবকটির মনে তখন প্রশ্নের ঢেউ জেগে উঠেছে। সে বিস্ময় বোধ করল এই ভেবে যে, যখন কোন প্রেমিক প্রেমিকা থিয়েটারে যায়, তখন তাদের কাছে এক্স্‌ট্রা টিকিট থাকতে পারে কি ক'রে!

'কিন্তু আজকের সন্ধ্যা আমায় একেবারে হতাশ করেছে।' যুবকটির দিকে তাকিয়ে একটা আর্ম চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিয়ে সে বললে, 'কি যেন একটা গোলমাল ঘটেছিল, তাই অভিনয় সুরু হ'ল প্রায় ঘণ্টাখানেক

দেরীতে। দর্শকরা হৈ-চৈ করতে লাগল,—সমস্ত অডিটোরিয়াম তাদের হাততালি, শিষ আর গালাগালির শব্দে মুখর হয়ে উঠ্‌ল।..হ্যাঁ, তুমি বোধ হয় এই বইটা দেখনি এখনও?

যুবকটি সেই জায়গায়ই দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখে মুখে এমন এক ব্যঞ্জনা ফুটে উঠ্‌ল, যা নির্জ্জলা মিথ্যা কথা শুনতে হ'লে যে কোন মানুষেরই মুখে ফুটে ওঠে।

তা লক্ষ্য না করে'ই ও আবার সুরু করল, 'প্লটটা নিতান্ত সাধারণ—অভিনয়ও প্রায় তাই। কোথাও প্রাণের ছোঁয়াচ পর্য্যন্ত নেই। সবাই প্লে করছিল কলের পুতুলের মত। হ্যাঁ, তবু ওরি মধ্যে একটা ছোট্ট ভূমিকা মন্দ হয়নি—নেমেছিল একজন নতুন অভিনেত্রী'।

ধীরে ধীরে তার দিকে তাকিয়ে যুবক বললে, 'তুমি যে থিয়েটারে গিছলে, এ সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহলই নেই, সন্দেহও নয়। কাজেই—'

কি বলছ তুমি? তুমি যদি চাও, তা হলে আমি থিয়েটারের টিকিটও দেখাতে পারি। সে তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুললে এবং একটুও ইতস্ততঃ না ক'রে সটান একটা টিকিট বার করে' দিলে। যন্ত্রচালিতের মত ও তা গ্রহণ করল।

'ব্যাপারটা কি যে ঘটেছে, আমি তার কিছুই বুঝতে পারছিনে', যুবকটি বললে, 'কিন্তু কিছুক্ষণ থেকে এটা বেশ বুঝতে পারছি যে, আমাদের দু'জনের মাঝখানে ভাঙন ধরেছে'।—

'ভাঙন! ভাঙন বলতে তুমি কি 'মিন' করছ?' শোয়া অবস্থাতেই মেয়েটির স্বর ঝলসে উঠ্‌ল: কিন্তু ভ্রূ দুটি তার তখন বিস্ময়ে বেঁকে উঠেচে।

'তোমায় আমি ঠিক বোঝাতে পারব না, মেরী—কিন্তু এটা সত্যি। তোমার কাছে আমার শুধু এই মিনতি যে, আমাদের পরস্পরের মাঝে মিথ্যা যেন ভুলেও স্থান না পায়। এতদিন ধরে' যে সত্যিকারের একটা সম্বন্ধ আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে—মিথ্যার স্পর্শ আজ যেন তাকে কলঙ্কিত করে না তোলে। প্রেমের কাছে প্রতারণার চেয়ে ঘৃণিত আর কিছুই নেই। যাক, এ নিয়ে আজ আর কোনও কথা নয়,—কাল, হ্যাঁ, কাল আমায় ফোন করো, আমি আসব আর তোমার যা বলবার আছে তুমি তা বলবে। কিন্তু মনে রেখো আমরা দু'জনেই স্বাধীন এবং মুক্ত—প্রেমই যদি না থাকে, তাহলে তার বাঁধন বয়ে বেড়ানোর চেয়ে হেয় জগতে আর কিছু নেই।'

তারপর এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করে' নিজের কোট আর টুপি তুলে নিলে এবং ম্যারিয়াকে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই বেরিয়ে গেল।

বাড়ী যেতে যেতে সে ম্যারিয়ার সমস্ত কিছুই বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে লাগল—তার থিয়েটারের কৈফিয়ৎ থেকে মৃদুতম অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে ঘৃণিত প্রতারণাময় বলে বোধ হ'ল। ম্যারিয়া কি ভাবে তাকে? ওকি ঘাসে মুখ দিয়ে চলে নাকি? বয়ঃস্থ লোক যেমন ছোট ছেলেকে ভোলায়, তেমনি করে ম্যারিয়া ওকে থিয়েটারের গল্প বলে' ভোলাতে চেয়েছিল। ওকি একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু?

যখন কোন মেয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন সে এমনিই করে বটে, ও ভাবল। থিয়েটারের গল্পটাও এমন অস্পষ্টভাবে করছিল যেন অনেকদিনের পুরোণো একটা ঘটনার আবৃত্তি করছে!...আর দেরী করে ফেরবার অজুহাতস্বরূপ বললে কিনা, অভিনয় সুরু হয়েছিল দেরীতে! পাবলিক থিয়েটার যেন একটা ছেলেখেলা! টিকিট? হ্যাঁ...হ্যাঁ সে তো সহজেই একটা টিকিট কিনতে পারে এবং তারপর প্রয়োজন মত এক অঙ্ক দেখেই উঠে আসা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। তারপর...

সহসা তার মাথায় একটা প্রশ্ন উঁকি দিল। একটা আলোর নীচে ও দাঁড়িয়ে পড়ল এবং পকেট থেকে বার করল সেই টিকিট।

'উঃ কি মিথ্যেবাদী! নীল রঙের কাগজের টুকরোটা একবার দেখেই সে প্রায় চমকে উঠ্‌ল, 'উঃ কি মিথ্যেবাদী! ক'দিনকার পুরোণো একটা টিকিট! বেমালুম আমায় ধাপ্পা দিলে! আজ মাসের উনত্রিশ—এটা হচ্ছে পয়লার। মিথ্যেবাদী! মিথ্যেবাদী!'

একবার ভবলো এই মুহূর্ত্তে ওই ঘৃণিত কাগজের টুকরোটা ছিঁড়ে কুচি কুচি ক'রে ফেলে—কিন্তু কি ভেবে আস্তই পকেটে রেখে দিলে।

'মিথ্যে···মিথ্যে···সব স্রেফ মিথ্যে কথা। আমার সাথে এতক্ষণ শুধু প্রতারণা ক'রে এসেছে...শুধু প্রতারণা, ...শুধু প্রতারণা 'উঃ?'

বাড়ী পৌঁছে সে দেখলে তার ঘরের ঝিলিমিলি দিয়ে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে না। বোধহয় স্ত্রী ফেরেনি এখনও। যাক, সৌভাগ্যের কথা,—বলতে পারবে যে, সমস্ত সন্ধ্যেটা সে একা ঘরের মধ্যে ক্লান্তভাবে নিঃসঙ্গ অবস্থান করছে।

কিন্তু হঠাৎ শোবার ঘরের জানালায় আলোর ঝিলিক্ দেখা দিল, তাহলে স্ত্রী এই মাত্র বাড়ী ফিরেছে—তার আসবার মিনিট পাঁচেক আগে।

ধীরে ধীরে ও সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌তে লাগল, স্ত্রীর কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবে মনে মনে তার একটা মহড়া দিতে দিতে। ঘরে ঢোকা মাত্রই তার স্ত্রী শোবার ঘর থেকে ড্রেসিং গাউনের ফিতে আঁটতে আঁটতে ছুটে এল।

'তোমার এত দেরী হ'ল যে ডার্লিং, কি হয়েছিল? আমি তো ভেবেই অস্থির। সারা সন্ধ্যেটা একলা চুপচাপ এখানে বসে আছি। গেছলুম বটে এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু ফিরে এলুম এক ঘণ্টার মধ্যেই—ভাবলুম আজকের সন্ধ্যেটা তোমার সঙ্গে কাটিয়ে মধুময় ক'রে তুলব। কিন্তু'—

'কিন্তু আমি ভেবেছিলুম তোমার আসতে রাত হবে। প্রায় ঘণ্টাখানেক একা একা চুপচাপ বসেছিলুম,···ভাল লাগল না। ভাবলুম যাই একবার থিয়েটারে—অনেকদিন যাওয়া হয়নি', ও বললে।

'থিয়েটারে? কিন্তু এত দেরী হ'ল যে?'

'ওঃ, সে কেলেংকারির কথা আর বল কেন! কি যেন একটা গোলমাল ঘটেছিল, তাই অভিনয় সুরু হ'ল প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরীতে। দর্শকরা হই-চই করতে লাগল, সমস্ত অডিটোরিয়াম তাদের হাততালি, শিষ আর গালাগালির শব্দে মুখর হয়ে উঠ্‌ল।'

তারপর কোন রকম দ্বিধা না ক'রে একান্ত ক্লান্তভাবে পকেট থেকে সেই কোঁকড়ানো নীল টিকিটটা বার ক'রে টেব্‌লের ওপর ছুঁড়ে দিলে।

'হ্যাঁ, তুমি বোধ হয় বইটা দেখনি এখনও? প্লটটা নিতান্ত সাধারণ—অভিনয়ও প্রায় তাই, কোথাও প্রাণের ছোঁয়াচ পর্য্যন্ত নেই। সবাই প্লে করছিল কলের পুতুলের মত। ··· হ্যাঁ, তবে ওরি মাঝে একটি ছোট্ট ভূমিকা মন্দ হয়নি—নেমেছিল একজন নতুন অভিনেত্রী! ······ তা আমি যদি জানতুম যে, তুমি একঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবে, তাহলে আমি ওই প্রথম অঙ্ক দেখেই পালিয়ে আসতুম।' একটা চেয়ারে নিজের দেহ এলিয়ে দিয়ে ও আবার বললে, 'আজকের সন্ধ্যেটা আমায় একেবারে হতাশ করেছে!'

যুবকটির অজ্ঞাতেই তার স্ত্রীর বুক থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বার হয়ে এল: যাক, ওকে আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। *

* স্বাধীন অনুবাদ।

# মিনতি

মতিউল ইস্‌লাম

এতদিন ছিনু তোমাদের মাঝে জানি,
আজি যদি সেই সোণার স্বপনখানি
সুপ্তি বিহীন রাত্রির আলেয়ায়
মিশে গিয়ে দিবালোকে নাহি দেখা যায়
তখন আমারে ভেবনা অলক্ষুণে!
উদীচী আলোর রক্তিম চুম্বনে
নূতন করিয়া যদি পাও পরিচয়,
আপনার সুরে করে নিও সুরময়।

# গ্রন্থাগার

শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য, সাহিত্যভূষণ

গ্রন্থাগার জাতীয় উন্নতির প্রধান উপাদান। যে কোন জাতিকে শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত করিয়া জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ করিতে হইলে জাতির বাস্তব জীবন গঠনের জন্য শিক্ষা দিতে হইবে। আমাদের দেশে অল্প লোকই আছেন যাঁহারা বিভিন্ন রুচির গ্রন্থ ক্রয় করিয়া পড়িতে সমর্থ। সমবায়ের সঙ্ঘশক্তিতে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা হয় সমষ্টির জ্ঞান উপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট ভাণ্ডার।

গ্রন্থাগার ও সৎসাহিত্য সম্বন্ধে রোমান পণ্ডিত সিসিরো বলিয়াছেন—A room without books is a body without soul. কারলাইলও বলিয়াছেন—A collection of books is a real university.

গ্রন্থাগারের সর্বপ্রথম কর্তা কে বা কোন্ যুগে ইহার সৃষ্টি তাহার বাস্তব কোন নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নাই। হিন্দু-পুরাণে আদিযুগের ইতিবৃত্তান্তে একটি উপাখ্যান পাওয়া যায় যে, একদা অসময়ে ব্যাসদেব তাঁহার জননীকে উলু-ধ্বনি করিতে দেখিয়া ইহার তত্ত্ব জানিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ব্যাস-মাতা পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ব্যাস-দেবের অনধীত গ্রন্থে ইহার তত্ত্ব আছে বলিয়াছিলেন। ব্যাসদেব সেই অমূল্য গ্রন্থখানির সন্ধানের নিমিত্ত সরস্বতী দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলে, এই গ্রন্থ ব্যাসদেবের গ্রন্থাগারেই আছে বলিয়া সরস্বতী দেবী স্বপ্নে নির্দেশ করিয়াছিলেন। ভারতের এই পৌরাণিক ইতিবৃত্ত ছাড়া জগতে খৃষ্টের জন্মের বহু শত বৎসর পূর্বে যে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ছিল—তাহা আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণের নিকট হইতে আমরা জানিতে পারি। মিশরে নিপুনগরে একটি গ্রন্থাগার আবিষ্কৃত হইয়াছে—যাহা চারি হাজার বৎসরের পূর্বের বলিয়া অনুমিত হয়। গ্রীস সভ্যতার চরম উন্নতিতে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারই পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। এথেন্সের গ্রন্থাগারে যে সকল পুস্তক ছিল তাহাদের সংখ্যা প্রায় চারি লক্ষ। চীনদেশেও বহু হস্তলিখিত পুস্তক সংগৃহীত ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে চীনদেশে যে বিরাট্ গ্রন্থ ছিল তাহা এগার হাজার খণ্ডে ছিল সম্পূর্ণ। প্রাচীন পারস্য, ইটালী প্রভৃতি দেশের উন্নত ও সভ্যতার যুগে এইরূপ অনেক গ্রন্থাগার বিদ্যমান ছিল।

ভারতের অতীত ইতিহাস বর্ণনা করিতে গিয়া দেখা যায় যে, খৃঃ পূঃ সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া যায়। তখন এই পুস্তক সকল দেবমন্দিরে পবিত্রতম বস্তু হিসাবে অতি যত্নে রাখা হইত এবং ইহাকে "সরস্বতী ভাণ্ডার" বলা হইত। জৈন ও বৌদ্ধযুগে গ্রন্থাগার জৈন মন্দিরে, উপাশ্রয়ে, বৌদ্ধ-বিহারে, সংঘারামে, হিন্দুমঠে প্রতিষ্ঠিত হইত। নালন্দা, বিক্রমশীলা, উদণ্ডপুরী ও তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল বিশ্রুতনামা গ্রন্থাগার ছিল তাহা হইতে সুদূর চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের বিদ্যার্থিগণ আসিয়া পুঁথি নকল করিয়া লইতেন। তখন-কার নৃপতিগণ নগরীর ভোজ রাজা, রঙ্গপট্টমের বিশালদেব, রাজমন্ত্রির রাজারাজ, দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজ, বিজয় নগরের প্রতাপদেব রায়, বঙ্গদেশের ১ম ও ২য় গোপালদেব, উত্তর ভারতের হর্ষবর্দ্ধন, সমুদ্র গুপ্ত তাঁহাদের অন্যতম।

নিজামের ওয়াড়ির নাগই গ্রামে প্রাপ্ত একাদশ শতাব্দীর শিলালিপি দুইখানা হইতে জানা যায় যে, সেখানে একটি ঘটিকাশালা ছিল। তাঁহার নিকটে যে গ্রন্থাগার ছিল তাহা এত প্রকাণ্ড যে, তাহাতে ছয়জন গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ ছিলেন। ইহাকে "সরস্বতী ভাণ্ডার" বলা হইত। রাজ-পুতনার জয়সলমীর, ভাটন ও গুজরাটের—আহমেদাবাদ, সুরাট, কাম্বে প্রভৃতি স্থানে জৈন উপাশ্রয়গুলির নিকট যে গ্রন্থাগার ছিল তাহাদিগকে ভারতী ভাণ্ডার বলা হইত। কোন কোন ভারতী ভাণ্ডারে দশ হাজারের অধিক গ্রন্থ ছিল। নালন্দায় "রত্নোদধি" নামে নয়তল বিশিষ্ট প্রাসাদে একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল। এতদ্ব্যতীত—বারাণসী, বিক্রমশীলা জগদ্দলবিহার, উদণ্ডপুরী

বৃহৎ বৃহৎ পাঠাগার ছিল। উদণ্ডপুরীর পাঠাগার এত প্রকাণ্ড ছিল যে, বক্তিয়ার খিলিজি ইহাকে বাঙ্গালার রাজধানী মনে করিয়া সর্বপ্রথম এই পাঠাগারই আক্রমণ করেন। ভারতের অতীত স্মৃতির কথা মনে করিয়া লোক-শিক্ষার প্রসারার্থে আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের নিতান্ত প্রয়োজন। আমেরিকার একমাত্র দানবীর কানের্গীর অর্থে ৯৮টী গ্রন্থাগার পরিচালিত হইতেছে। আমাদের দেশে বরদা রাজ্যের গায়কোঁয়াড় বর্তমান ভারতের গ্রন্থাগারের প্রাণদাতা। গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য তিনি ১৯২০ খৃঃ অঃ মিঃ বোর্ডের নামক জনৈক আমেরিকান গ্রন্থাগার-বিশেষজ্ঞকে আনয়ন করেন। মহারাজার অপরিসীম উদ্যম ও প্রভূত অর্থ ব্যয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক নব চেতনা সঞ্চার হইয়াছে। এই আন্দোলন দ্বারা লোকশিক্ষায় তিনি বিশেষ কৃতকার্য হইয়াছেন। মান্দ্রাজ ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী।

## গ্রন্থাগারের লক্ষ্য

লোকশিক্ষাই গ্রন্থাগারের প্রধান লক্ষ্য। গ্রন্থাগারে বিভিন্ন রুচির গ্রন্থ থাকা চাই। গ্রন্থাগার হওয়া চাই সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সাধনা কেন্দ্র। ইহা হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই মিলন ক্ষেত্র। সুতরাং সকল ধর্মের তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ থাকা প্রয়োজন। আবার শুধু ধর্ম-গ্রন্থে গ্রন্থাগারের পরিপূর্ণতা হয় না। ইহাতে থাকা চাই জাতির উন্নতি অবনতির ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতির নিদর্শন পত্র। আজকাল প্রায়ই দেখা যায় যে, অধিকাংশ গ্রন্থাগারই কতকগুলি জঘন্য উপন্যাসে পূর্ণ; ইহা জ্ঞানমন্দির, সুতরাং জাতিগঠনের গ্রন্থই যাহাতে গ্রন্থাগারে থাকে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

## ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার

ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার লোকশিক্ষার প্রধান সহায়। রাশিয়া অল্পদিনের মধ্যেই ইহার দ্বারা দেশে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বরদা রাজ্যেও এই পন্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। ভারতের সর্বত্র যাহাতে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের প্রচলন করা যায় তাহার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।

গ্রন্থাগারের উপাদান—সংবাদপত্র, চিত্রাবলী। প্রত্যেক গ্রন্থাগারে সর্বপ্রকার দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। ইহা হইতে শিক্ষার আদর্শ ও বাস্তবজীবনের সন্ধান পাওয়া যায়। সংবাদপত্র পৃথিবীর মনীষীবৃন্দের চিন্তাধারা সর্বত্র প্রচার করিয়া মানবকে সত্যের সন্ধান দিয়া থাকে। সৎ চিত্রাবলীর দ্বারা গ্রন্থাগার সুসজ্জিত করিয়া রাখিলে অতি সহজে লোক-শিক্ষা হয়।

## গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য

গ্রন্থাগারিকের কাজ দায়িত্বপূর্ণ। পুস্তকের সংখ্যা যাহা হউক না কেন, উহার তত্ত্বাবধান করা গ্রন্থাগারিকের প্রধান কর্ম। পুস্তকের তালিকা করা, উহা বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস করা, শ্রেণী বিভাগ করাও শিক্ষা-সাপেক্ষ। পাঠকের রুচি অনুযায়ী পুস্তক বিতরণ না করিলে পণ্ডশ্রম হয় মাত্র। বালক, যুবক, বৃদ্ধ প্রত্যেকের উপযোগী গ্রন্থ ঠিক করা গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য। সর্বাগ্রে চাই গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগারের জ্ঞান-ভাণ্ডার আয়ত্ত করা, তৎপরে গ্রন্থাগারিকের পদগ্রহণ করিয়া দেশের সেবা করা।

## গ্রন্থাগারের স্থল

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই জনবহুল স্থানে, সহর বা পল্লীর কেন্দ্রে। গ্রন্থাগার পল্লী বা সহরের প্রান্তে নীরব আলয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

## দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলনের প্রয়োজন

লোকশিক্ষার্থে গ্রন্থাগারের প্রবল আন্দোলন করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে আমাদের দেশে শতকরা শিক্ষিত মাত্র ৭ জন। আমেরিকার নিগ্রোদের মধ্যেও শতকরা ৭০ জন শিক্ষিত। হায়! আমাদের স্থান কোথায়, আমরা যে জগতে সকলের অধম! এই পবিত্র কর্মের সাধনসিদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে শিক্ষিত যুবক

সম্প্রদায়ের উপর। প্রত্যেক নগরে, পল্লীতে, মঠে, আখড়ায়, দেবালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে হইবে। ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিগণ অনায়াসে আপন আপন পল্লীতে বা সহরে একেকটী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। প্রত্যেক বৎসর বাৎসরিক পরীক্ষার পর নূতন পুস্তক ক্রয় করিবার কালে গ্রন্থাগারের জন্য একেকখানা গ্রন্থ ক্রয় করিলে অতি সহজে একটী গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠিতে পারে। গ্রামবাসী মুষ্টি-ভিক্ষা বা সমবায়ের অর্থে দুই চারিখানা সংবাদপত্র আনাইতে পারেন। আমাদের বারমাসে তের পার্বাণে গ্রন্থাগারের জন্য কিছু অর্থ দান করা যায়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রাণদাতা কুমার মুনীন্দ্রকুমার দেবরায় মহাশয়ের কর্ম আদর্শনীয়। তাঁহারই একমাত্র চেষ্টায় গ্রন্থাগার আন্দোলন দিনদিন প্রসার লাভ করিতেছে। আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন যাহাতে প্রসার লাভ করিয়া লোকশিক্ষা বিস্তারে সহায় হয় তৎপ্রতি দেশসেবক ও ছাত্রবন্ধুগণের অবহিত হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য।

### পৃথিবীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার সমূহের বিবরণ

| নাম | পুস্তক সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|
| ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী (প্যারিস) | ৪৪ লক্ষের অধিক | ৫ লক্ষ মানচিত্র, ১ লক্ষ ২২ হাজার হস্তলিখিত। |
| লাইব্রেরী অব কংগ্রেস (আমেরিকা) | ৩৫ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭৬৭ | |
| ব্রিটিশ মিউজিয়ম | ৩২ লক্ষ | |
| হার্ভার্ড কঃ লাইব্রেরী (আমেরিকা) | ২৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৭ শত | |
| ষ্টেট লাইব্রেরী, বার্লিন | ২১ লক্ষ ২৮ হাজার ৪ শত | |
| ইয়েল লাইব্রেরী (আমেরিকা) | ১৮৩৭০৯৯ | |
| অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি | ১২৫০০০০ | প্রাচ্য হস্তলিখিত পুস্তক সম্বন্ধে ইহাই শ্রেষ্ঠ |
| কেমব্রিজ ইউঃ | ১০ লক্ষ | |
| ন্যাশন্যাল লাঃ হেগ, হল্যাণ্ড | ১০ লক্ষ | |
| রয়েল লাঃ কোপেনহেগেন | ৮ ,, ৫০ হাজার | |
| ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রেল অব ফ্লোরেন্স | ৭ ,, ৫০ ,, | |
| অস্লো ইউঃ লাইব্রেরী | ৭ ,, | |
| ইম্পিরিয়েল কেবিনেট (টোকিও, জাপান) | ৫০৭৬০০ | |
| ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল ভিক্টোরিয়া ইমানুয়েল (রোম) | ৪ লক্ষ ৯০ হাঃ | |
| ভ্যাটিকান (রোম) | ৩ ,, ৫০ ,, | |
| ইম্পিরিয়েল লাঃ (কলিকাতা) | ১৪২০০০ | ভারতের প্রধান লাঃ |
| ঢাকা ইউঃ লাইব্রেরী | ৮০ হাজার | ১৮ হাজার হস্ত-লিখিত |
| প্রেসিডেন্সী কলেজ লাঃ | ৫৮ হাজার | |

## গান

(বাগেশ্রী)

মসুদ-বিন-জাকারিয়া

ব্যথার জ্বালা ভুলতে আমি কথায় মালা গাঁথি।
সঙ্গ দেবে কে আমারে, সঙ্গী গহন রাতি।
মোর বনে আর ফোটে না ফুল,
আর গাহে না গান বুলবুল;
গন্ধ-নাওয়া মন্দ-হাওয়া বেড়ায় না আর মাতি'।

মনে জাগে ফেলে আসা অনেক দিনের স্মৃতি,
অনেক হাসি, অনেক কথা, অনেক মধুর গীতি।
তন্দ্রাহারা তারার চোখে
দিল এমন নীল আলোকে—
জ্বালতে ভুলি চাঁদের আশে আঁধার ঘরের বাতি।

# বামা ক্ষ্যাপা

শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়

১২৪১ বঙ্গাব্দে বীরভূম জিলার অন্তর্গত আটলাগ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ সর্ব্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পর্ণকুটীরে বামা ক্ষ্যাপার জন্ম হয়। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সমসাময়িক। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের (লুপ লাইন) মল্লারপুর ষ্টেশন হইতে আটলা গ্রামে যাইতে হয়। ক্ষ্যাপা পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সর্ব্বানন্দ ঠাকুর একজন বিশেষ নিষ্ঠাচার ব্রাহ্মণ ছিলেন। কনিষ্ঠের নাম রামচন্দ্র। ক্ষ্যাপার আসল নাম ছিল বামাচরণ। আমরা আর্য্যসন্তান, তাই জোর করিয়া বলিতে পারি—ক্ষ্যাপার এই জন্মই শেষ জন্ম। অন্যান্য জন্মে ক্ষ্যাপা সব কাজ শেষ করিয়া এই জন্মটা 'মায়ের' আদর খাইবার জন্য, মায়ের সঙ্গে নিভৃতে দুটো মনের কথা কহিবার জন্যই রাখিয়াছিল। পরমহংসদেবের ন্যায় শৈশব হইতেই ঐহিকে বীতস্পৃহ, লেখাপড়ায় অমনোযোগী ও বাল্যের ক্রীড়াতেও সেই স্বরগ-পুরের আভাস। ক্ষ্যাপা কালী, জগদ্ধাত্রী, রামলীলা সং গড়িয়া পূজো-পূজো খেলিত—যেমন আমাদের মেয়েরা 'রাঁধি-বাড়ি' এবং 'বউ-বউ' খেলে। যাহাকে ভবিষ্যতে যা খেলিতে হইবে, বাল্যকাল থেকেই সেই খেলা আরম্ভ হয়। জাপানী বালকেরা নাকি 'যুদ্ধ-যুদ্ধ' খেলে। সর্ব্বানন্দ ঠাকুর কিন্তু পুত্রের ধর্ম্মপ্রাণতায় বাধা না দিয়া উৎসাহ দিতেন। সুখের চেয়ে দুঃখ ভাল শিক্ষক। শৈশবেই ক্ষ্যাপার পিতৃবিয়োগ হয়। ক্রমশঃ সংসার চলা ভার হইয়া পড়িল। জননীর তাড়নায় ক্ষ্যাপা চাকুরীর যোগাড় করিতে ছুটিল। কিন্তু ক্ষ্যাপা লেখাপড়া জানেন না। সাহেব-সুবা ও বড়লোক মুরুব্বী ধরা সম্ভব হইল না। মায়ের কাছে গিয়া হৃদয়ের বেদনা জানাইয়া বলিলেন, পূজাদি করিয়া উপার্জ্জন করিবার কথা। কিন্তু ক্ষ্যাপার তাহা পুষাইল না। নিজেদের জমীর চাষ আবাদ দেখিলেও সাংসারিক দুঃখ ঘুচিত। ক্ষ্যাপা তাও পারিল না। ক্ষ্যাপা যৌবনেও ক্ষ্যাপাই রহিল। সকলে বুঝিল, সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র পাগল। এই সময়েই সকলে তাহাকে 'টাইটেল' দিল 'বামা ক্ষ্যাপা'।

সাধক বামা ক্ষ্যাপা

পিতৃপরিচয়ই আমরা সাধারণতঃ দিয়া থাকি। কিন্তু ক্ষ্যাপা মাতৃগত প্রাণ বলিয়া ক্ষ্যাপার মায়ের পরিচয় দিতে হইল। দ্বারকা নদীর তীরে নিকটবর্ত্তী তারাপুর গ্রামের তারা দেবী বহু প্রাচীন। এখানে বশিষ্ঠদেব চীনদেশ হইতে তারানাথের মহামন্ত্র লইয়া আসিয়া সাধনা করিয়া-ছিলেন বলিয়া পুরাণে কথিত। তারপর কিম্বদন্তী আছে, রত্নাগড়ের প্রসিদ্ধ বণিক রমাপতি চন্দ্রচূড় মহাদেব ও তারা দেবীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কালে যখন রাজসাহীর জমীদারেরা বীরভূমের কিয়দংশ তাহাদের জমীদারীভুক্ত করিয়া লন, তখন রামজীবন নামক এতদ্দেশের জমীদারের

উপর এই জমীদারীর ভার অর্পিত হয়। রামজীবন বড় ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিল। রাজসাহীর জমীদার উদয়-নারায়ণের সময়ে এই রামজীবন কর্ত্তৃক চন্দ্রচূড় মহেশ্বর ও তারাদেবীর পুনঃসংস্কার হয়। রাজসাহীর কিয়দংশ পরে নাটোরের অধিকারভুক্ত হয়। রাণী ভবানী দেবদেবীর সম্মান রক্ষা করিতেন, তিনি বীরভূম-রাজ আসাদুল্লা খাঁকে নিকটবর্ত্তী মৌজা প্রদান করিয়া তারাপুর নিজের অধীনে প্রবর্ত্তিত করিয়া লন। পরে রাজা রামকৃষ্ণের সাধনার জন্তই বোধহয় মা তাঁকে দিয়া এই কার্য্য করাইয়াছিলেন।

৫১ পীঠের মধ্যে এক বীরভূম জেলায় পাঁচটী পীঠ। সুদর্শন চক্রের দ্বারা কর্ত্তিত গৌরীদেবীর তারা এখানে পড়িয়াছিল বলিয়া এই গ্রামের নাম নাকি তারাপুর হইয়াছে। এই জেলায় বীরাচারের প্রাবল্য হওয়াতেই বীরভূম নাম হইয়াছিল।

তারাপীঠে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। অনেকেই এই স্থানের মাহাত্ম্যে আকর্ষিত হইয়া, এইখানেই সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। গুণগ্রাহী সাধক-প্রবর রাজর্ষি রাজা রামকৃষ্ণের পণ্ডিত আনন্দনাথ এখানকার প্রধান কৌলের পদে নিযুক্ত হইয়া রাজাদেশে ও রাজব্যয়ে মন্দিরের তত্ত্বাবধান ও নিত্য পূজা করিতে লাগিলেন। প্রাচীন বীরভূমে শাক্ত-বৈষ্ণবের সমন্বয়-চেষ্টা স্রোতের স্থায় চলিয়া আসিতেছিল। আনন্দনাথ উহাতে অনেকখানি ফলবতী হইয়াছিলেন। মাণিকরাম নামে এক উচ্ছৃঙ্খল যুবক প্রবৃত্তির বল্গা শিথিল করিয়া দিয়া ভোগতৃপ্তি লাভ করিতে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থমনোরথ হইয়া আত্মার শান্তিকামনায় তারাপুরে আসিয়া আনন্দনাথের শিষ্যত্ব যাচ্ঞা করে। আনন্দনাথের অন্তর্দৃষ্টি বুঝিল, মাণিক-রামের যথার্থই সহজ বৈরাগ্য উপস্থিত। রাঙা ফল সে খাইয়া দেখিয়া গরলে পুরিত বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে। অতএব তাহাকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া মোক্ষদানন্দ নাম দিলেন। এই মোক্ষদানন্দই ১১৬১ সালে আনন্দ-নাথের দেহ-সম্বরণ হওয়ার পর তারাপীঠের প্রধান কৌলের পদে নিযুক্ত হন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে বামাচরণ গৃহত্যাগ করিয়া মোক্ষদানন্দের কাছে যাওয়া-আসা করিতেন। বামাচরণ লৌকিক হিসাবে ক্ষ্যাপা হইলেও, মোক্ষদানন্দের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এড়াইতে পারেন নাই। শীঘ্রই মোক্ষদানন্দ বুঝিল, এ ক্ষ্যাপা বিষয়বুদ্ধিহীন সরল বিশুদ্ধ আত্মা, ঊর্দ্ধরেতা মাতৃগত প্রাণ মায়ের পাগলা ছেলে। মায়ের মুখখানি ছাড়া সে কিছুই জানে না। সেইজন্য বামাকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেন। ইনিই বামার গুরু।

বামার বয়ঃক্রম যখন অষ্টাদশ বৎসর, তখন মোক্ষদা-নন্দের মৃত্যু হয়। বামা মোক্ষদানন্দের পদে নিযুক্ত হইলেন। মায়ের আদুরে ছেলে বামা অহর্নিশ মাতৃ-সন্নিধানে কাটাইতে লাগিলেন, আর 'তারা, তারা" রবে নির্জ্জন শ্মশানভূমি মুখরিত রাখিলেন। কখন পিশাচবৎ, কখন জড়বৎ, কখন কঠিন ভীমভাব, কখন দয়ার আধার মুর্ত্তিমতী কোমলতা; কখনও জগদ্‌গুরুভাবে উপস্থিত ভক্তকে শিক্ষাদানরত, কখন আপনার ভাবে আপনি ভোলা, দিগম্বর বালকবৎ, নানাভাবে ক্ষ্যাপা বিচরণ করিতে লাগিলেন। কোন ভক্ত উপস্থিত হইবামাত্র জিজ্ঞাসা করিতেন, "কারণ-টারণ এনেছিস্?" পরমহংসদেব মাতৃ-সন্নিধানে গিয়া পীযূষধারা চাহিয়া ভবের তৃষিত তাপিত লোকদিগের নিকট অজস্র ধারায় বর্ষণ করিতেন। ক্ষ্যাপার কিন্তু অন্ত ভাব। ক্ষ্যাপার ইচ্ছা হইল দুটো কথা বলিলেন, না হয় নিজের খেয়ালেই রহিলেন। "শালা" আর "বেদো" (অর্থাৎ বেজন্মা) গালি দুইটী তাঁহার মুখের অগ্রে থাকিত। এত কারণ খাইতেন, কিন্তু পা টলিত না। কেহ পরীক্ষার ছলে একদিন পচা মড়ার মাংস খাওয়াইয়া দেখিয়াছিল, ক্ষ্যাপার কিছুই হয় নাই। ক্ষ্যাপা তাঁহার প্রিয় কুকুর কালুকে যাহাকে ডাকিয়া আনিতে বলিতেন, কালু তাহার বাটীতে গিয়া চীৎকার করিত ও ডাকিয়া আনিত।

ক্ষ্যাপা বলিতেন 'জপাৎ সিদ্ধি'—একমনে জপ কর, ক্রমশঃ সিদ্ধি লাভ করিবে। ইহার দু'চারিটী কথা যা' পাওয়া যায়, তা' পরমহংসদেবের স্থায়, যথা 'মরা-মরা' থেকে 'রাম-রাম', তেম্‌নি গীতাও উল্টো করে পড়তে হয়। ধর্ম্মের ভানও ভাল, ক্রমে আসলে মন যেতে পারে। জ্ঞানীর কাছে যিনি নিরাকার, ভক্তের কাছে তিনি সাকার। ব্রহ্ম ও কালী অভেদ—যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা

শক্তি, ভগবানে স্ত্রীত্ব আরোপ শীঘ্র ফলদায়িকা ইত্যাদি। বেশীক্ষণ কথা কহিলে, অনেক ক্ষণ মাতৃসন্নিধান হইতে দূরে থাকিলে, মায়ের মুখখানি মনে পড়ায় ব্যাকুল হইয়া ক্ষ্যাপা মায়ের কাছে ছুটিতেন। পূজকভাবে বামাকে একদিন তারাদেবীর পূজা করিতে হয়। "এই বেলপাতা নে মা, এই অন্ন নে, এই ফুল নে" ইত্যাদি। অভাবক্লিষ্ট কনিষ্ঠ রামচরণের মুখ চাহিয়া ক্ষ্যাপা প্রথম প্রথম অর্থ গ্রহণ করিতেন; কিন্তু রামচরণের মৃত্যুর পর আর করেন নাই।

ক্ষ্যাপার জীবনের কতগুলি অলৌকিক ঘটনা বিবৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ শেষ করিব। মাতৃ-শ্রাদ্ধে কনিষ্ঠকে আদেশ করিলেন—সমস্ত গ্রাম নিমন্ত্রণ করিতে। কনিষ্ঠ বাতুলতা মনে করিয়া কিছুই করিল না। তখন নিজেই তিনি তাহা করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে কোথা হইতে সব দ্রব্যসম্ভার আসিয়া জুটিল, তাহা কেহই ঠিক করিতে পারিল না। সমাধির অবস্থায় মায়ের মন্দিরে একদিন প্রস্রাব করিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে ভোগ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল। তিন চারিদিন পর্য্যন্ত ক্ষ্যাপা অনাহার। তারপর নাটোর হইতে হঠাৎ প্রধান কর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত। রাণী স্বপ্ন দেখিয়াছেন, মায়ের খাওয়া হয় নাই। তদন্ত করিয়া সবিশেষ বুঝিয়া, রাজকর্ম্মচারীদের ভর্ৎসনা করিয়া, ক্ষ্যাপাকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া চলিয়া গেলেন। একটী দুরারোগ্য যক্ষ্মাকাশরোগীকে অনেক অনুনয়ের পর ক্ষ্যাপা সঞ্জীবনী কারণ খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া দিয়াছিলেন।

কোনও একটী বড়লোক তারাপীঠ দর্শনে আসিয়া দ্বারকা নদীতে স্নান করিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন। ক্ষ্যাপা তাহার গায়ে জলছিটা দিতে লাগিলেন। বাবু বিরক্তি প্রকাশ করায় ক্ষ্যাপা বলিয়া উঠিলেন "আহা ভারি জপ করছ, কোম্পানীর বাড়ী জুতো কিনছ" সত্য সত্যই ঐ বাবু মহাশয় ঐ সময় ঐ কথা ভাবিতেছিলেন।

ক্ষ্যাপা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গ অতি সহজে বুঝাইতেন। বলিতেন, যেন সধবা আর বিধবার পতিসেবা।

ক্ষ্যাপা আজ প্রায় চারি বৎসর হইল—নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া পুণ্যময় দেশে চলিয়া গিয়াছেন। তারাপীঠ শূন্য হইয়া পড়িয়া আছে। রাজা রামকৃষ্ণ, আনন্দনাথ, মোক্ষদানন্দ, সাধক বামারচণ ক্রমান্বয়ে এই তারাপীঠে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। উপযুক্ত রাজার অভাবে সিংহাসন এখন শূন্য।

# ভাবরাজ্যে চীনের ক্রমবিকাশ

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, পিএইচ-ডি

## মঙ্গোল বংশ (১২৭৯—১৩৬৮ খৃঃ)

জেঙ্গিসখাঁর বংশ চীন বিজয় করিয়া "ইউয়ান" নাম ধারণ করতঃ শাসন করে। তাহারা বাহ্যত কনফুসীয় আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে বটে, কিন্তু প্রথম মঙ্গোল সম্রাট কোবলাই খাঁন যিনি সি টসু এই চীনা নামে চীনে পরিচিত, তিনি বস্তুতঃ তিব্বতের লামার মতে বিশ্বাসী ছিলেন (১)। জেঙ্গিস খাঁর সাম্রাজ্য অর্দ্ধ ইউরোপ ও বেশীরভাগ এশিয়া জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। দ্বিতীয় মুসলমান কর দানে বশ্যতা স্বীকার করিয়া মঙ্গোল অভিযানের প্রলয়ঝটিকা আসিতে বন্ধ করে। এই বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী তাহার পৌত্র কোবলাই হয়। কোবলাই, "খান বালিখ" নাম ধারণ করিয়া চীনে তাহার নূতন রাজধানী স্থাপন করে। ইহাই বর্ত্তমান সময়ে "পিকিং" নামে পরিচিত। শিল্প-কলা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তিব্বতীয় লামাদের দ্বারা মঙ্গোল ভাষার জন্য উদ্ভাবিত অক্ষর চীনে প্রচার করিবার চেষ্টা অন্যতম (২)। লামাবাদীয় ধর্ম্মে বিশ্বাসী হইলেও ধর্ম্মক্ষেত্রে

১। Gowen and Hall P. 15

২। যেখানে ভারতীয় বৌদ্ধেরা গিয়াছেন সেখানেই তাঁহারা ভারতীয় ব্রহ্মলিপি হইতে স্থানীয় লিপির উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিব্বতের এবং কোরিয়ার লিপি এই প্রকারে সৃষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্ম, শ্যাম, যাভা এমন কি সুদূর ফিলিপীন দ্বীপপুঞ্জে মুসলমান মরোদের লিপিও ভারতীয় পদ্ধতিতে গৃহীত।

ইনি রাজনীতিক সুবিধানুযায়ী চলিতেন। ইহার দরবারে সর্ব্বধর্মের প্রচারকই আসিত। সুবিখ্যাত ইতালীয় পর্য্যটক মার্কোপোলো ইহার দরবারে ছিলেন এবং খান (কুবলাই) তাঁহাকে একশত পাদরী আনিবার অনুমতি দেন। কিন্তু ইউরোপ হইতে এতদূর যাইতে কেবলমাত্র দুইজন পাদরী স্বেচ্ছা প্রকাশ করে। তাহারাও শেষ পর্য্যন্ত গন্তব্য স্থলে আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই।

জেঙ্গিসখাঁর উত্থানের সংবাদ যখন ইউরোপে পৌঁছে, তখন হইতেই রোমের পোপ মঙ্গোলদের হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই উত্থানের সংবাদ এইভাবে ইউরোপে পৌঁছায় যে, মধ্য এসিয়ার খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী তাতারেরা দলবদ্ধ হইয়া একটা বৃহৎ সাম্রাজ্য সংগঠন করিয়াছে এবং তাহাদের নেতা Prester John রোমের পোপকে পাদরী পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছেন। প্রেষ্টার জনের চিঠি ইউরোপের ইতিহাসের একটা বড় প্রশ্ন। আজকাল অনেকে বলেন—উহা জাল; আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কোবলাইকেই প্রেষ্টার বলিয়া অনুমান করা হয়। আসল কথা এই, এই যুগে পশ্চিম এসিয়াতে আরবদের পতনের পর, তুর্কিরা মুসলমান হইয়া প্রবল হইতেছিল; ইউরোপের খৃষ্টানেরা তাহাদের বিপক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধে (Crusade) দ্বারা তাহাদের বর্দ্ধমান শক্তি খর্ব্ব করিতে পারিতেছিলেন না। তুর্কিরা যেমন মুসলমান হইয়া ইসলামের ক্ষয়িষ্ণু শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, তদ্রূপ মধ্য এসিয়ার উদীয়মান মঙ্গোলেরা উত্থান কাল হইতে মুসলমান বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছিল। তাহারা যদি খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ঐস্লামিক শক্তির প্রভাব ও প্রতিপত্তি খর্ব্ব করিতে পারে, তাহা হইলে পাশ্চাত্য খৃষ্টানদের সুবিধা হয়। কিন্তু কোবলাই-এর ইচ্ছাপূরণ করিতে পাশ্চাত্য খৃষ্টানেরা পারে নাই; সেইজন্য বিশেষ ফল হয় নাই। জেঙ্গিশ খাঁর বংশধরেরা পরে বিভিন্ন দেশে অবস্থান করতঃ শাসন করিয়া তত্তদ্দেশীয় শাসিতদের ধর্ম্মগ্রহণ করে। পূর্ব্বে কোবলাই-এর পুত্রগণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। পারস্যে হালাকুর পুত্রেরা মুসলমান হয়।

চীনে মঙ্গোল আক্রমণ দ্বারা একটি বিজাতীয় শাসকশ্রেণী সৃষ্ট হয়। রণদুর্দ্ধর্ষ মঙ্গোলেরা মাণ্ডারীন (mandarin) পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া সামরিক গভর্ণরসমূহ নিযুক্ত করে। এতদ্দ্বারা চীনের literate (শিক্ষিত) শ্রেণীকে চিরকালের জন্য বিরুদ্ধবাদী করিয়া রাখে। ১২৩৭-১৩১৭ খৃঃ মাণ্ডারীন নিযুক্ত করিবার জন্য পরীক্ষা বন্ধ করা হয়। সহরগুলিতে সৈন্যশিবির স্থাপন করা হয়, আর কৃষকদের মধ্যে সৈন্য "তত্ত্বাবধায়ককারী" নিযুক্ত করা হয়। এরা এতই উদ্ধত হয় যে, লোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য খাইবার ও পরিবারের নবপরিণীতা বধূর সহিত রাত্রি যাপন করিবার দাবী করিত। অতঃপর ১২৮৬ সালে সমগ্র চীনবাসীদের নিরস্ত্র করা হয়।

এইসব সংবাদ দ্বারা আমরা এই বুঝি যে, বিজাতীয় বিজেতারা একটা অভিজাত শাসকশ্রেণীতে পরিণত হয়, আর বিজিতদের পদদলিত করে। এই সংঘর্ষের ফলে, মঙ্গোলদের কৃতিত্ব বিনষ্ট হয়। তাহারা চীন-সভ্যতা এবং ধর্ম্মগ্রহণ করিলেও, বিদেশীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। অবশেষে; দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, চু ইউয়ান চাঙ্গ নামক জনৈক বৌদ্ধ-পুরোহিতের নেতৃত্বে চীন মঙ্গোল শাসনমুক্ত হইয়া স্বাধীন হয়।

মঙ্গোলদের পতন অতি শোচনীয়রূপেই হয়। নূতন "ভিক্ষুক রাজা" উত্তরের রাজধানী জয় করিবার সময়ে তাঁহার সেনাপতিকে বলিয়াছিলেন, "বেপরোয়াভাবে হত্যা করিও না, লোকদের ঘর-বাড়ী পুড়াইও না, বাধা না দিলে মঙ্গোলদের হত্যা করিও না।" কিন্তু শেষ মঙ্গোল সম্রাট্ বাধা প্রদান করিবার জন্যও তাহার দেরী সয় নাই। "গভীর রাত্রে, উত্তরের একটা ফটক খোলা হয়, এবং সে সদলবলে সেই দিকে পালায়, যেদিক্ হইতে তাহার বিজেতৃ পূর্ব্বপুরুষেরা আসিয়াছিল (১)। এইরূপে জেঙ্গিশ খাঁর বংশের শোচনীয় পরিণাম ও চীনের শেষ স্বদেশী রাজবংশ মিঙ্গদের অভ্যুত্থান হয়।

## মিঙ্গবংশ (১৩৬৮-১৬৪৪ খৃঃ)

মিঙ্গবংশের অধীনে চীন আবার গৌরবশালী ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। এই বংশের শাসনকালে, পুরাতন পদ্ধতিসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। নূতন সম্রাট্ "মাণ্ডারী শাসন" পুনঃস্থাপিত করে। লোকদের চীনা পোষাক পরিধান করিতে বাধ্য করে এবং পুরাতন ক্রিয়াকাণ্ডসমূহ পুনঃ প্রচলন করে (২)। এই বংশের রাজত্বকালে উচ্চ শ্রেণীর লোক দ্বারা শাসকবর্গ সৃষ্ট হইয়া চীনে আবার স্বদেশী রাষ্ট্রে বৈষম্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের সম্রাট্ ইয়ুংলির সময়ে চীনের আধিপত্য যেমন কোচিন চীন ও তাতারীয় মরুভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তেমন চীন ভাষায় পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বিশ্বকোষ (Encyclopaedia) প্রকাশিত হয়। এই সম্রাট্ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের বৌদ্ধ ধর্ম্মে অত্যন্ত ভক্তির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বৌদ্ধদের নির্য্যাতন করেন এবং অনেক সন্ন্যাসীকে পুনরায় গৃহে পাঠাইয়া দেন। এই সঙ্গে তিনি টাওবাদীদের পুস্তক পুড়াইয়া দেন এবং অমৃতের (Elixir of life) বৃথা সন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিতে তাহাদের নিষেধ করেন। ইনি বহুদূর হইতে রাজদূত ও কর প্রাপ্ত হন। বাঙ্গলা হইতেও একটা গণ্ডার উপঢৌকন পান(৩)।

---

১। Mc. Gowen—"Imperial History of China. P. 464

২। ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্থাপনকালে বৌদ্ধ শকদের অবস্থা এই প্রকারের হয়। তাহারা ভারতীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করিলেও, গুপ্তেরা তাহাদের বিদেশীয় বলিয়া গণ্য করিয়া উচ্ছেদ করে এবং প্রাচীন প্রথা ও ক্রিয়াসমূহ পুনঃ প্রচলন করে। জাতীয় প্রতিক্রিয়ার সময়ে সর্ব্বদেশের শাসক শ্রেণী একই মনস্তত্ত্বের পরিচয় প্রদান করে।

৩। Gowen and Hall—p. 162.

প্রথম মিঙ্গ সম্রাট্‌ চু উয়ান-চাঙ্গ সম্রাট্‌ হুংউ নামে অভিহিত হইতেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা রাজকর্মচারী নিযুক্ত করার প্রথা যাহা কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বিদ্যমান ছিল, তাহা অনেকের দ্বারা হয় নিন্দিতও হইয়াছে, না হয় প্রশংসিত হইয়াছে। এই ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষার সর্ত্ত ছিল—একটি প্রবন্ধ লিখিতে হইবে; এই প্রবন্ধের বিষয় ক্লাসিক্‌স হইতে মনোনীত করিতে হইবে। এই প্রবন্ধকে তাহার প্যারাগ্রাফের আকার ও সংখ্যানুযায়ী তাহাকে "অষ্টপদ" বলা হয়। এই প্রবন্ধ লিখিতে হইলে চীনের প্রাচীন লেখকদের রচনার সংবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে হয়, কিন্তু স্বাধীন চিন্তা ও মতের বিকাশ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া থাকে।

মিঙ্গ সম্রাট্‌দের দ্বারা সতেজে মাণ্ডারীন শ্রেণী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা এবং উপরোক্ত ক্লাসিকসে পরীক্ষা দ্বারা, মাণ্ডারীন নির্ব্বাচন প্রথা দ্বারা চীনকে তাহারা কনফুসীয় মতানুযায়ী বৈষম্যের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া রাখে। প্রতিক্রিয়াশীল মিঙ্গেরা তাহাদের স্বদেশীয়ানার পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্ত কনফুসীয় প্রথা আঁকড়াইয়া ধরিয়া চীনকে নব জাগরণের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত গতিহীন স্থাণুবৎ করিয়া রাখিয়াছিল। এতদ্দ্বারা চীনের গতিশীল (dynamic) শক্তির প্রতিরোধ করিয়া তাহাকে উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থের বেদীতে বলি দেওয়া হয়। চীনের নব প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন স্বদেশী রাষ্ট্র প্রপীড়িত গণসাধারণের মুখ না চাহিয়া আবার অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করে। আর তাহাদের স্বার্থকে কায়েমী করিয়া রাখিবার জন্ত কনফুসীয় পদ্ধতিকে আরও সতেজে আশ্রয় করে। গরীব গণশ্রেণীসমূহ বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত এই অভিজাতপদ্ধতির নিগড় ভাঙ্গিয়া মাথা তুলিবার সুযোগ পায় নাই। সনাতন পদ্ধতি ও প্রাচীন শাস্ত্রকর্ত্তাদের দোহাই দিয়া তাহাদের ভুলাইয়া রাখা হইয়াছিল(১)।

সম্রাট্‌ উট্‌সুঙ্গের রাজত্বকালে (১৫০৬-১৫২২ খৃঃ) সমুদ্র দিয়া ইউরোপীয়েরা প্রথম চীনে আগমন করে। কোনও এক প্রাচীন চীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে(২) "চিঙ্গটির (উট্‌সুঙ্গ) রাজত্বকালে পশ্চিম হইতে 'ফা-লান-কি' (ফ্রাঙ্ক) নামে বৈদেশিকেরা হঠাৎ বেগে প্রবেশ করে এবং তাহাদের ভীষণ গর্জ্জনকারী কামান দ্বারা চারিদিক কাঁপাইয়া তোলে। রাজদরবারে এই সংবাদ পৌঁছান হয়। তাহারা বলে যে, তাহারা রাজকর লইয়া আসিয়াছে। তাহাদের তৎক্ষণাৎ তাড়াইয়া দিবার জন্ত ও তাহাদের ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্ত হুকুম আসে। প্রায় এই সময়ে হল্যাণ্ডারেরা (প্রাচীন কালে ইহারা জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে বাস করিত এবং চীনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না) দুই তিনটি জাহাজে মাকাওতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদের কাপড় ও চুল লাল বর্ণের, দেহ লম্বা, তাহাদের নীল চক্ষু মাথার ভিতর ঢুকিয়া আছে। তাহাদের পায়ের তলা প্রায় বিশ ইঞ্চি লম্বা; তাহাদের অদ্ভুত আকৃতি লোকের ভয় সঞ্চার করে।" এই প্রকারে বাহিরের বর্ব্বরেরা প্রথম চীনে আগমন করে।

সম্রাট্‌ ওয়ানলির রাজত্বের শেষকালে উত্তর হইতে তাতারাক্রমণের উদ্যোগ-পর্ব্ব চলে। নিউচে তাতারদের মাঞ্চু শাখার সর্দ্দার নুরহাচু ১৫৮২ খৃঃ উত্তর চীনের লিয়াও-টুঙ্গ উপদ্বীপ জয় করে। তিন বৎসর পরে সমস্ত তাতার সর্দ্দারদের সংঘ তাঁহাকে তাহাদের রাজা বলিয়া মানিয়া লয়। তৎপর তিনি চীন আক্রমণের উদ্যোগ করেন। ১৬১৭ খৃঃ তিনি তাঁহার বিখ্যাত "চীনাদের বিপক্ষে তাতারদের সাতশ ঘৃণা" প্রকাশ করেন। এই ঘোষণাপত্রের শেষে তিনি বলিতেছেন—"এই সব কারণে আমি তোমাদের অত্যন্ত ঘৃণা করি এবং আমি তোমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছি (৩)।" চীনের অভ্যন্তরে তাঁহার সৈন্ত যাইবার পূর্ব্বে নুরহাচু মারা যান। তাঁহার পুত্র ১৬৩৬ খৃঃ পিকিং-এর নিকট দিয়া তাঁহার সৈন্তদল পরিচালনা করেন।

চীনের গৃহবিবাদের ফলে মাঞ্চু তাতারেরা চীন-বিজয় করে। শেষ মিঙ্গ সম্রাট্‌ মনোকষ্টে সপরিবারে আত্মহত্যা করেন। মিঙ্গ বংশ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বংশগুলির ন্তায় শেষে অশেষ ঘৃণার পাত্র হয়। বাহিরের ও আভ্যন্তরীণ কারণের জন্ত রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইহার মধ্যে খোজাদের প্রভাব একটি বড় কারণ (৪)। এই জন্তই বিংশ শতাব্দীর প্রথমে মাঞ্চু সম্রাটের মাতা (Empress Dowager) তাঁহার মৃত্যুর সময়ে বলিয়াছিলেন, "খোজাদের শাসনসম্পর্কীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দিও না, খোজাদের দ্বারাই মিঙ্গ বংশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে; তাহাদের পরিণাম আমার স্বজনদের যেন সতর্ক করিয়া দেয় (৫)।"

---

১। ভারতেও শকদের বিরুদ্ধে অতীতের গুপ্ত সাম্রাজ্য ও মোগলদের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য এইরূপে স্বদেশীয়ানার নামে স্মৃতি ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দোহাই দিয়া গণসাধারণকে নিগড়-বদ্ধ করিয়া শোষণ করিত। বৈদেশিক প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলে পুরাতন পদ্ধতির মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া জনসাধারণকে শোষণ করা সুবিধা। এবম্প্রকার অবস্থার পৃথিবীর সর্ব্বত্র একই মনস্তত্ত্বের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

২। S. Wells Williams—"The Middle Kingdom." Vol. II. p. 427.

৩। Gowen and Hall—p. 170.

৪। Backhouse and Bland—"Annals and Memoirs of the Court of Peking" দ্রষ্টব্য।

৫। Gowen and Hall—p. 180.

# যুদ্ধ ও বাণিজ্য

শ্রীসুধীরকুমার চক্রবর্ত্তী

যুদ্ধের নাম শুনিলেই আমরা শিহরিয়া উঠি। ধ্বংসের বিভীষিকায় আমাদের মন আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। একথা সত্য যে, যুদ্ধ ধ্বংসের বার্ত্তাই বহন করিয়া আনে। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, যুদ্ধের সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতিশীলতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

আধুনিক কালের সকল যুদ্ধই অল্পবিস্তর অর্থনৈতিক কারণেই সংঘটিত হয়। যে দেশে লোক সংখ্যা বাড়িয়া উঠে, সে দেশের অর্থানুকূলতার প্রয়োজন এত বেশী হইয়া উঠে যে, সেই দেশের বাণিজ্য-সম্পদবৃদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত গত্যন্তর থাকে না। বলপূর্ব্বক হউক বা আপোষেই হউক ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কোন স্বাধীন দেশ নিজের স্বার্থহানি করিয়া অন্য দেশের বাণিজ্যের প্রসার হইতে কস্মিন্ কালেও দেয় না। না দেওয়াই স্বাভাবিক। এই অর্থনৈতিক কারণ হইতেই যুদ্ধের সূচনা।

অর্থনৈতিক কারণ বাদেও রাষ্ট্রনৈতিক কারণেও যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। পাশাপাশি দুইটী সাম্রাজ্যের মধ্যে রাষ্ট্র-নৈতিক মতভেদ লইয়া সংঘাত বাধে, তারপর সে সংঘাতের ফলে ধীরে ধীরে সমরাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। এই জন্য আধুনিক রাষ্ট্রনীতিবিদেরা যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, "Modern warfare is conflict between different idelogies." আধুনিক ফ্যাসিষ্ট-বাদের সঙ্গে ডিমোক্রেসীর সংঘাত ক্রমাগতই এই সাক্ষ্যই দিতেছে। ফ্যাসিষ্টবাদেরা সংগ্রাম চায়, কিন্তু ডিমোক্রেসী যুদ্ধ চায় না। জগতের শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যেই সভ্যতার প্রসার—শিল্পকলা, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ দেখা দেয় শান্তির সময়ে। যুদ্ধবিগ্রহ শিল্পকলাকে ধ্বংস করিয়া মানবজাতির মহা অকল্যাণ সাধন করে। সেই-জন্যই আমরা যুদ্ধের নামে শিহরিয়া উঠি। যুদ্ধকে ধ্বংসের দানব বলিয়াই ঘৃণা করি।

যুধ্যমান জাতি মারণাস্ত্র নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়। আধুনিক যুদ্ধের উপকরণই হইতেছে লৌহ, ট্যাঙ্ক, কামান, বন্দুক, টোটা, বুলেট, মোটর, এরোপ্লেন প্রভৃতির নির্ম্মাণকল্পে প্রচুর লৌহের প্রয়োজন। যুধ্যমান জাতিকে লৌহ সরবরাহ করিয়া ও নির্ম্মিত অস্ত্রাদি সরবরাহ করিয়া অন্যান্য জাতি বেশ দু' পয়সা রোজগার করিয়া লয়। যুদ্ধের সময় পাটেরও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। বোমা ও গুলি যাহাতে মাটিতে পড়িয়া না ফাটে, সেইজন্যই বালুকা-ভর্ত্তি পাটের বস্তা ইমারত ও কোঠার উপর এবং ট্রেঞ্চ-যুদ্ধে ট্রেঞ্চের সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং পাটের মূল্য বৃদ্ধি পায় ও যে দেশে যত বেশী পাট উৎপন্ন হয়, সেই দেশ তত লাভবান্ হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধের চেয়েও গত যুদ্ধে পাটের প্রয়োজনীয়তা ছিল বেশী, কারণ গত মহাসমরে ট্রেঞ্চ-লড়াই হইয়াছিল বেশীর ভাগ।

অবশ্য একথা সত্য যে, রপ্তানী করিয়া কোন জাতি কেবল লাভবান হইতে পারে না। কোন দেশে সকল জিনিষই প্রস্তুত হয় না। বিদেশের আমদানী দ্রব্য-সম্ভারের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। গত মহাযুদ্ধের সময়ে কার্পাস বস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া চিনি ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য ও ডাক্তারী জিনিষপত্রের এত অধিক দাম বাড়িয়া গেল যে, প্রচুর পাট রপ্তানী করিয়াও, সে অভাব দূর করা ভারতের পক্ষে অসম্ভব। তুলা ও বস্ত্রাদি তখন ইংলণ্ডই সরবরাহ করিত। ভারতের কার্পাস-শিল্প বিদেশীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নষ্ট হইয়াই গিয়াছিল। যুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে ইংল্যাণ্ড যে পরিমাণ বস্ত্র সরবরাহ করিত, সে পরিমাণে আমদানী করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। একান্ত দায়ে পড়িয়া বাধ্য হইয়া ভারতে মিল ও ফ্যাক্টরী খুলিবার প্রচেষ্টা চলিল। সেই প্রচেষ্টার ফলেই আজ আর বস্ত্রের জন্য বিদেশীয়দের দিকে চাহিয়া বাংলার বসিয়া থাকিতে হয় না। মহাযুদ্ধের সময়ে এই প্রেরণা

না আসিলে বোধ হয় ভারতীয় বস্ত্রশিল্প এত শীঘ্র এত বৃদ্ধি পাইতে পারিত না।

শুধু যে বস্ত্রশিল্প তাহা নহে, গত যুদ্ধের পর হইতেই ভারতে বহু রকমে মিল ও ফ্যাক্টরী সৃষ্টি হইয়াছে। গতানুগতিক জীবন-ধারা বরাবর চলিতে থাকিলে ভারতবর্ষ আজ আরও একশত বৎসরের মধ্যে এ শিল্প-বাণিজ্যের দিক্ দিয়া এত উন্নতি করিতে পারিত না। যুদ্ধের সময়ে টাকার লেনদেন অসম্ভব বাড়িয়া যায়। বহির্বাণিজ্য যত না হউক, অন্তর্বাণিজ্য বিশেষভাবেই বৃদ্ধি পায়। সরকার টাকার অতিরিক্ত নোট চালাইতে সুরু করেন; ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, যাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতিশক্তি অচল না হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহার কুফলও আছে। যুদ্ধের সময়ে অতিরিক্ত নোটের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু যুদ্ধান্তে এই অতিরিক্ত নোট লইয়া গোলমাল বাধে। কারণ বাজারে টাকা বেশী প্রচলন হওয়ার দরুণ জিনিষপত্রের দাম বাড়ে না, অথচ যুদ্ধের সময়ে অতিরিক্ত যে টাকার দরকার থাকে, স্বাভাবিক অবস্থায় সে টাকার দরকার থাকে না। সেইজন্য গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা অতিরিক্ত নোটের প্রচলন বন্ধ করিতে বাধ্য হন। যুদ্ধের সময়ে লাভের আশায় যে অতিরিক্ত মালপত্রের আমদানী হয়, যুদ্ধান্তে তাহার বাজার দর পড়িয়া যাওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা হইয়া পড়ে। গত মহাযুদ্ধের পর ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা ভাব বহু দিন ধরিয়া চলিয়াছে।

ভারতবর্ষের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতে যে সমস্ত মিল ও কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিতে এখনও পারে নাই। অতি কষ্টে বিদেশীর প্রবল প্রতি-যোগিতা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে ভারতের বাণিজ্য-সম্পদ্ যে বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহার একমাত্র কারণ ভারতের কাঁচা মালের প্রাচুর্য্য। কাঁচা মালের জন্য ভারতবর্ষকে অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। কিন্তু যে পরিমাণে ভারতে কাঁচা মাল আছে, সে পরিমাণে ব্যবসার উন্নতি হয় নাই। অবশ্য ইহার যুক্তি খুঁজিতে বেশী দূর যাইতে হয় না। জাপানে যেমন সরকার ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, ভারতে সেইরূপ ব্যবস্থা নাই। সরকারী সাহায্য ব্যতীত কোন জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যে আশাতীতভাবে উন্নতি করিতে পারে না।

বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রাক্কালেই ভারতে যে কাঁচা মালের দাম বাড়িয়া উঠিতেছিল, সরকার তাহা জোর করিয়া নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিতেছেন, উদ্দেশ্য যে যুদ্ধের সময়ে ভারতের নিকট হইতে সস্তায় মাল পাওয়া যাইবে। এই যুদ্ধের বাজারে জাপান ও আমেরিকা বেশ দুই পয়সা করিয়া লইয়াছে; কিন্তু ভারতের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। মালপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করিয়া ভারতের অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হইয়াছে। ব্যবসায়ীর প্রেরণা ও উৎসাহ নষ্ট হওয়ায় মাল-সরবরাহের ক্ষতি হইয়াছে। যুদ্ধের সময়েও জার্ম্মাণী বা ইংল্যাণ্ড নিজেরা চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে বহির্বাণিজ্যের ক্ষতি না হয়। যুদ্ধ বাধিবার পর গত আট মাস পর্য্যন্ত ইউরোপীয় বহি-র্বাণিজ্যের কোনই ক্ষতি হয় নাই। তবে বর্ত্তমান যুদ্ধের গুরুতর পরিস্থিতির জন্যই বহির্বাণিজ্যে ভাটা পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য হইতে বাণিজ্যবাহী জাহাজের গমনাগমন এক প্রকার স্থগিত আছে বলিলেই হয়। ভারতের পণ্যও বিদেশে যাইতে পারিতেছে না। ইটালী ও জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক সমুদ্র পথ অবরুদ্ধ হওয়ায়, আজ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এক গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে।

ভারতের অনেক প্রয়োজনীয় মাল আজও বন্ধ রহিয়াছে। অথচ দৈনন্দিন জীবনে তাহার প্রয়োজনীয়তা কম নহে, ছুরি কাঁচি, বোতাম, সেফ্‌টীপিন, ক্ষুর, ঘড়ি তারপর কল কারখানার যন্ত্রাদি, ডাক্তারী তৈজসপত্র, কেমিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল মাল পত্রের সরবরাহ না হওয়ায় এই সব জিনিষের অত্যধিক দাম বাড়িয়াছে। ভারতে যদি এই সব জিনিষ প্রস্তুতকরণের প্রচেষ্টা না হয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতি পদে পদে ইহার অভাব লইয়াই চলিতে হইবে। অথচ ইহাই প্রকৃত সময়। সরকারী সহানুভূতি ও দেশীয় ধনিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইলে, ভারতের পক্ষে কল্যাণের সম্ভাবনা।

# আর্য্য ভারত

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

বেদগ্রন্থে মারামারি, হানাহানির বিষয় সমাবেশিত রহিয়াছে। রামরাবণ ও কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া রামায়ণী ও মহাভারতীয় যুগের ঘটনাসমূহ সম্ভূত হইয়াছে। এতৎপ্রকার উক্তি প্রকাশ করিয়া আধুনিক কালের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, অতীত ভারতের প্রতি ভারতীয় জনসাধারণ কর্ত্তৃক যে শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয়, তাহা সর্ব্বাংশে যুক্তিবলাশ্রয়ী নহে। প্রাচীন ভারতে যুদ্ধবিগ্রহ প্রচুর পরিমাণেই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতীয় আর্য্যগণে জ্ঞানের সে বিমল রশ্মি পরিস্ফুরিত হইয়াছিল, তাহাও অস্বীকার করিবার বিষয় নহে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যশ্রেষ্ঠগণের কাহিনী যদি আমাদের সুখস্মৃতি কিঞ্চিন্মাত্রও উজ্জীবিত করিতে সমর্থ হয়, তবে তৎস্মৃতিনিহিত আমাদের সংস্কারে সে সত্যের সমাবেশ আছে, ইহাই প্রমাণিত হইয়া যায় নাকি? গৃহপরায়ণতায় অধিষ্ঠিত থাকিয়াও আত্মানুসন্ধানের ব্যাকুলতায় ভারতীয় আর্য্যশ্রেষ্ঠগণ যে পরমতত্ত্ব লাভ করিয়া পারিপার্শ্বিক জনগণের পক্ষে আদর্শ মানবরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন, সেই পরমতত্ত্ব ভারতীয় জনগণকেও যে তৎক্ষুধ করিয়া তুলিয়াছিলেন, আর্য্যগ্রন্থসমূহের প্রতি অহেতুক বিদ্রোহী হইয়া না উঠিলে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সে চিন্তা ও কর্ম্মসংঘাতে আধুনিক যুগের সমাজ "ঋত" হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া অফুরন্ত বহির্ম্মুখী বৈচিত্র্যে পরিশোভিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই চিন্তা ও কর্ম্মসংঘাত কালপ্রবাহের তারুণ্যে স্বতঃই অল্পতররূপে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণ জ্ঞানের ভাণ্ডার হইতে প্রচুর রশ্মি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যুক্তিবিজ্ঞানের বিচারে ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে আর্য্যভারত যে জ্ঞানসাম্রাজ্য রচনা করিয়া তাহায় বিমল জ্যোতিতে জগৎকেও সমুদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাও অবনত মস্তকেই স্বীকার করিতে হয়।

যে ব্যবহারিক বিদ্যাকে এক্ষণে বিজ্ঞান নামে অভিহিত করা হইতেছে, ভারতীয় আর্য্যগণ তৎবিজ্ঞানের আলোচনায় যে অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছিলেন, তাহা ত নিঃসংশয় চিত্তে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যে আর্য্যগণ ব্যবহারিক বিদ্যার পরিকল্পনামূলে সহর গঠন করিতেন, বাড়ীতে স্নানাগার, শৌচাগার, ভূপ্রোথিত নর্দ্দামা নির্ম্মাণ করিতেন, তাহাদের মধ্যে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রচলিত ছিল। যুদ্ধকে যদি বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মধ্যে একটা বিজ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার প্রতিযোগিতা বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, যে জাতি যতখানি বিজ্ঞান-বুদ্ধিমত্তায় পারদর্শী হইবেন, সে জাতি ততখানি যুদ্ধকৌশল লাভ করিতে সমর্থ হইবে। এই তথ্য হইতে আর্য্যগণের যে রণবিজ্ঞানকুশলতা প্রকাশিত হয়, তাহার মূলে আর্য্যগণের বৈজ্ঞানিক গবেষণাবোধকে অস্বীকার করা যাইতে পারে না। বৈদিক আর্য্যগণ পরাদ্ধ পর্য্যন্ত সংখ্যার (১০০,০০০,০০০,০০০) যে পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, যুগ্ম ও অযুগ্ম (even ও odd), ঋচ ও অনৃচ (positive ও negative) সংখ্যার যে বিভিন্নতা সাধন করিয়াছিলেন এবং জ্যামিতি, গণিত, জ্যোতিষ ও নক্ষত্র-বিদ্যায় যে পারদর্শিতার পরিচয় পরিস্ফুরিত করিয়াছিলেন, তাহা আর্য্যভারতের বিজ্ঞানচর্চ্চার সাক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের ভিতর দিয়া যে ঐশ্বর্য্য আহরিত হইয়া দেশের অখণ্ড সমাজকে নবনব বোধে দীক্ষিত করিয়া কর্ম্মসংসাধনে কুশলতা প্রদান করে, সেই ঐশ্বর্য্যের উৎপাদন আহরণমূলে ভারতীয় আর্য্যগণ যে প্রচুর প্রতিভা বিনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় বেদগ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত ও মনুসংহিতায় পর্য্যাপ্তরূপে পরিস্ফুট। সম্পদ্, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্য পৃথিবীর কোন কোন দেশে এমনি প্রকারে উৎপাদিত ও আহরিত হইয়া শত সহস্র বৎসরের ব্যাপ্তিতে স্থিতিশীল ও বর্দ্ধনশীল ছিল, যদি তাহার নাম উল্লেখ করিতে হয়, তবে আর্য্যভারতের নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। আমাদের অস্তিত্ব ও বৃদ্ধি ধরিয়া রাখে যাহা, ভারতীয় আর্য্যগণ সেই ধর্ম্মকে বাস্তব বোধে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা একদিকে যেমন জ্ঞানবিজ্ঞানের জয়ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছিলেন, অপরদিকে অর্থ, বিত্ত ও ঐশ্বর্য্যের উৎপাদন ও আহরণে ভারতভূমিকে রূপান্তরিত করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা কি আমরা অস্বীকার করিব?

# জীবন-সঙ্গিনী

শ্রীমতিলাল রায়

১৮

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেব নূতন শাসনসংস্কারের আশাবাণী উচ্চারণ করেন। বাংলায় বিপ্লবপন্থীদের দলে এই আশাবাণী নানাপ্রকার মতবাদের আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বিদায়সভায় লর্ড হার্ডিঞ্জ বলিয়াছিলেন—ভারতে স্বাধিকার-লাভের দিন যে কত দূরগত, তাহা তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। ভারতের ভাগ্যবিধাতাদের মুখে তৎকালে এইরূপ নৈরাশ্যের কথাই বাহির হইত। অকস্মাৎ ভারতসচিবের আশাবাণী বাংলার ক্ষুণ্নপ্রাণে শান্তির প্রলেপ দিয়াছিল। তারপর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর রয়েল ক্লেমেন্সির ঘোষণায় নূতন প্রাণ-সঞ্চার হইয়াছিল। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে জাতীয় সাধনার নব যুগপর্ব্বের নিঃশব্দ পদসঞ্চার আমরা অনুভব করিয়া-ছিলাম। এই জন্যই আমি বাংলার বিপ্লবীদের অতীতের ক্ষোভ ও ক্ষুণ্নতা মুছিয়া, নূতন ক্ষেত্রে জাতীয় সাধনার যজ্ঞকুণ্ড জ্বালিয়া, নূতন মন্ত্রে আত্মাহুতি দিবার সাড়া তুলিয়াছিলাম। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর বাংলার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা অতীতের বিচ্ছিন্ন প্রাণের হাউইবাজীর ন্যায় ক্ষণিক বিকাশ মাত্র। বাংলার জাতীয় সাধনা ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে যে পরিবর্ত্তন সূচনা করিয়াছে, তাহা বহুজনগ্রাহ্য হইতে বিলম্ব হইবে, ইহা জানিয়াই কয়েক জন সর্ব্বত্যাগী দেশব্রতীকে লইয়া আমি জাতিগঠন-কর্ম্মে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করি। ভারত-রক্ষা আইনে আমার সহিত যে কয় জন চন্দননগরে বন্দী ছিল, তাহাদের উপর ভর করিয়াই আত্মরক্ষার দায়ে যে কয়টী অর্থপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই বৃহৎকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। জাতিগঠন দূরের কথা, ইহার ভিত্তিনির্ম্মাণের জন্য যে শ্রম ও সম্পদের প্রয়োজন, তাহার হিসাব করিলে থৈ পাওয়া যায় না। তাই শ্রমকে মূলধন করিয়াই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম। কিন্তু হৃদয়ের তারে মীড়ে মীড়ে যে প্রেরণা পাইতাম, তাহাতে আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইত। শ্রীঅরবিন্দের জীবনযাপনের অর্থসঞ্চয়ের পথে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার এই প্রত্যয় দৃঢ় হইয়াছিল যে, কোন ধনকুবের আমার স্বপ্ন সফল করার জন্য মুক্তহস্ত হইবেন না। আমি অর্থ-সংগ্রহের এক নূতন পথ অবলম্বন করিলাম—ইহা সম্পদ্ কি বিপদ্, তাহা আজিও স্থির করিতে পারি নাই। তবে এই প্রত্যয় লাভ করিয়াছি যে, পরাধীন জাতির জীবন-গতি কোনদিন নিরাপদ্ হইবে না। শুধু রাষ্ট্রবিপ্লবের পথেই সংঘর্ষ নাই, সংগঠনের পথেও গুরুতর সংঘাত থাকিবে, ইহা জানিয়াই আমি এক গুরুতর দায়িত্ব লইয়া অর্থসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম। দেশের কাজের জন্য শতকরা ৯৲ সুদ হিসাবে ১ লক্ষ টাকা ঋণ করিয়া বসিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল—যে কয়টী কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, আরও কয়েকটী ঐরূপ মূলধনের সাহায্যে গড়িয়া তুলিব এবং এই সকল কর্ম্মক্ষেত্রের আয় হইতে সুদ ও আসল ঋণ-পরিশোধের সঙ্গে দেশের শিক্ষা ও সাধনার বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিব।

আমি কোনদিন দাতার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে পারি নাই। প্রথম কারণ, এই বিষয়ে ধৈর্য্য সহায় হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ, আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, কোন শুভকর্ম্মে দাতা যদি তদনুকূল মনোবৃত্তি-পরায়ণ না হইয়া অর্থদান করে, সেই অর্থে যে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে, তাহা দাতার প্রতিকূল মনের গুণে শ্রেয়ঃ লাভ করিবে না। অলক্ষিত বাধায় প্রতিষ্ঠান কালে প্রাণহীন হইয়া পড়িবে। ইহা ব্যতীত আর একটী কারণে ঋণ করিয়া দেশকর্ম্মসাধনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলাম। যে অর্থ অনায়াসলভ্য, যে অর্থের হিসাব বা জবাবদিহি করিতে হয় না, সে অর্থব্যয়ে দায়িত্ব না থাকায় উহাতে

চরিত্রবলের পরীক্ষা হয় না এবং ব্যয় করার বিচারবুদ্ধিও থাকে না; উহা একপ্রকার বিলাসের স্থায় নিরর্থক ক্ষয় হইয়া যায়। স্বদেশী যুগের পর বহু জাতীয় প্রতিষ্ঠানের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে, সচক্ষে দেখিয়াছি।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এই ঋণগ্রহণ সঙ্ঘের জীবনে যেমন একটী চিরস্মরণীয় ঘটনা, সেইরূপ চন্দননগরের রাষ্ট্রক্ষেত্রে সঙ্ঘের অভিযানও চিরদিন স্মরণে থাকিবে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফরাসী ভারতের রাষ্ট্রপ্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের নবযুগ বলিতে হইবে। মহাযুদ্ধের পর এই নির্ব্বাচনের ফলই ফরাসী সাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের কারণ বলা যাইতে পারে। এই গুরুত্বপূর্ণ নির্ব্বাচন ব্যাপারে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের নিয়োজিত করিয়াছিল।

চন্দননগরের লোকসমাজে আমরা রাজার সংশয়ভাজন বলিয়া ঠাঁই পাইতাম না। দেশহিতৈষীদের মধ্যে আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকিলেও, পুলিসের ভয়ে তাহা প্রকাশ করিতে তাঁহারা ভয় পাইতেন। এমন হইয়াছে, আমাদের পল্লীতে এক বৎসর চড়কের উৎসবে পুলিসের ভয়েই লোক-সমাগম হয় নাই; উৎসবকর্তৃপক্ষগণ ইহার জন্য আমাদের প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলার নব যুগ-সূর্য্যের অরুণরাগে আমাদের ললাট উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। নূতন কর্ম্মপ্রবাহ সৃজনের জন্য হিসাবের অঙ্ক না কষিয়াই যেমন ঋণ করিতে বাধে নাই, সেইরূপ জনপ্রতিনিধির পদে সঙ্ঘসভ্যদের নিয়োগ করিয়া গণ-ভোটের প্রার্থী হইয়াছিলাম। ভগবান আমাদের এই দুই দিকই সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। ঋণলাভও সম্পূর্ণ হইয়াছিল; আর "প্রবর্ত্তকের" আমার ছদ্মবেশী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ নায়েক এবং পরলোকগত স্বামী চিদানন্দ ওরফে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বক্সী একজন কঁসেই জেনারেল ও অন্য জন লোকাল কাউন্সিলের সভ্যপদে বহু সংখ্যক ভোটাধিক্যে নির্ব্বাচিত হন।

নির্ব্বাচনে জয় হইল। ঋণকৃত অর্থও শূন্য থলি পূর্ণ করিল। কর্ম্মের দায়িত্ব অতিমাত্রায় বাড়িল। দিবারাত্রি শ্রমের অপেক্ষা চিন্তাস্রোতে অধিক মাত্রায় হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম।

শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় এই সময়ে বোধ হয় রাজস-অহংকার হইতে সাত্ত্বিক অহঙ্কারের কোঠায় পা ফেলিয়াছি। কর্ম্ম-প্রেরণায় অন্তর বাহির উদ্বুদ্ধ। সৃষ্টিশক্তির অফুরন্ত প্রাণের অনুভূতি আমায় যেন মাতাল করিয়া রাখে। বাংলার নবযুগের আমিই যেন ভগীরথ, আমার হাতেই যেন ভগবান জাগরণের শঙ্খ তুলিয়া দিয়াছেন। শত বাধা পদদলিত করিয়া বুকে অগ্নিময়ী আকাঙ্ক্ষা জ্বলিয়া উঠে। এরূপ না হইলে, দেশযজ্ঞ আরম্ভ করার জন্য নিজের উপর দায়িত্ব লইয়া ঋণ করার ভরসা হয় কেমন করিয়া? আমি জানি কোন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবার দুই চারি হাজার টাকার ঋণভারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়; আর আমি লক্ষ মুদ্রা ঋণ করিলাম—শূন্য হস্তে, দেশমাতৃকার সেবার জন্য! ঋণ পাইলাম। ইহা কর্ম্মফল অথবা অধ্যাত্মশক্তির যোগাযোগ —সে বিচার কে করিবে!

বাহিরের জগতে যে ছন্দে দেশের সেবা চলিয়াছে, তাহার সহিত আমার বিযুক্তি "প্রবর্ত্তকের" পাতায় পাতায় ঘোষিত হয়। দেশের মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন যে সকল ধর্ম্মপ্রেরণার প্রবাহ ছুটিয়াছে, সেইগুলির সহিতও আমার ধর্ম্মজীবনের ঐক্য আর খুঁজিয়া পাই না। দেশ-সেবার সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়া যেমন স্বকর্ম্মসাধন করিয়া চলি, সেইরূপ দেশের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমতের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রাখিয়াই "প্রবর্ত্তকে" নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করি। অবকাশহীন জীবন। কাহারও সহিত বিরোধ-বিসম্বাদ করার সময় নাই। সেরূপ কর্ম্মে শক্তিরও প্রেরণা নাই। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যোগশক্তির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া নূতন অর্থনীতিক ক্ষেত্র রচনাই আমার লক্ষ্য। যোগপ্রতিষ্ঠ জীবনের ভিত্তির উপর এক নবজাতির সৌধ রচনাই আমার জীবন-মন্ত্র। বাহিরের প্রচলিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম আমার পথে অন্তরায় নয়; তাই এই ক্ষেত্রে কোন সংঘর্ষই আমায় স্পর্শ করে নাই।

অর্থ আমার ব্যক্তিগত দায়িত্বে সংগৃহীত হইল। কিন্তু ইহা বণ্টিত হইল যে প্রকারে, তাহা যেমন বিচিত্র, তেমনই অভিনব। অর্থ ঋণকৃত হউক অথবা উপার্জ্জিত হউক, সকল অর্থেরই মূল কুবেরের অফুরন্ত ভাণ্ডার, উহা প্রাপ্তির ছন্দঃ যেমনই হউক না, তাহা ভালমন্দ বিচারের অধিকার

আমার কি আছে? অর্থ আসিয়াছে এবং উহা পুনঃ প্রত্যর্পণ করার চুক্তিও ঋণদাতার সহিত করা হইয়াছে। অর্থপ্রাপ্তির এই ভঙ্গী ঈশ্বরেচ্ছাপ্রসূত। আত্মসমর্পণ-যোগীর ইহা ব্যতীত অন্যরূপ চিন্তার অধিকার নাই। এই অর্থ যোগপ্রতিষ্ঠ জীবনের উপর দিয়া বহিলে, উহাতে গুণান্বিত হইয়া অর্থশক্তির বিপুল মূর্ত্তি প্রকাশ পাইবে, উহা জাতিকেই প্রবুদ্ধ করিবে। ঋণগ্রহণ ও ঋণকৃত অর্থের ব্যবহারে আমি এই নীতিই আশ্রয় করিয়াছিলাম। ঋণগ্রহণ ও ঋণকৃত অর্থের বণ্টন, এই দুইয়ের মধ্যে কিন্তু সামঞ্জস্য রাখিতে পারি নাই। অহঙ্কার থাকিতে দিব্য পূর্ণাঙ্গ কর্ম্ম যে সম্ভব হয় না, অর্থসাধনা করার পথে দুঃখের অভিজ্ঞতায় তাহা ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিলাম। অহঙ্কার রাজসিক অথবা সাত্ত্বিক হউক, উভয় ক্ষেত্রেই অন্ধকার থাকিয়া যায়। অহঙ্কার হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া কর্ম্মসৃষ্টি হয়, এ বিশ্বাস আমার নাই। কর্ম্মবাদী ভারত কর্ম্মের ভিতর দিয়াই অহঙ্কার-মুক্ত হয়; এই বিশ্বাসেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাঁহারা ঋণ দিলেন, তাঁহাদের সে ঋণ পরিশোধ করার ভার আমার উপর। কিন্তু আমি যাহাদের হস্তে এই অর্থ ব্যবসাদির জন্য বণ্টন করিয়া দিলাম, তাহাদের উপর নির্ভর করি নাই, আত্মবিশ্বাসেই এইরূপ দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। আমার সহিত তাহাদের যোগ সিদ্ধ হইলে, আমার অগ্নি-বিশ্বাস হয়তো তাহাদের কর্ম্মসিদ্ধি আনিত; কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় নাই। অহঙ্কার দৃষ্টি অন্ধ করিয়াছিল। আমি ইহার জন্য দুঃখ পাইয়াছি অনেক। তিন বৎসরের মধ্যেই ঋণকৃত সমস্ত অর্থ কোথায় অন্তর্হিত হইল, তাহার নিরাকরণ হইল না; অর্থনাশের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মীরাও একে একে অন্তর্দ্ধান করিল। ঋণ রহিল, পরিশোধের উপায় রহিল না। সে দুঃখের কথা বলিয়া লাভ নাই। অহঙ্কার থাকিতে দেবকর্ম্মে যে দুঃখ, তাহা তনু-মনকেই ক্লিষ্ট করে; নিরহঙ্কার চৈতন্যে কর্ম্মের অভি-ব্যক্তি তপস্যা; উহাতে সত্তার আনন্দ আছে। কর্ম্মক্লান্ত তনু-মন পুনঃ পুনঃ অমৃতাভিষিক্ত হইয়া সঞ্জীবিত হয়। কিন্তু ইহার জন্য দুঃখক্লেশের সাধনা অনিবার্য্য।

সঙ্ঘের ইতিহাসে আমার এই ঋণপর্ব্বের গুরুত্ব কম নহে; কেননা, পরবর্ত্তী যুগে ঋণপরিশোধের কর্ত্তব্য-বুদ্ধিই সঙ্ঘসভ্যদের অক্লান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছে। ঋণ আমার। যাহারা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করিয়া ভাগবৎ-ধর্ম্মে, ঈশ্বরকর্ম্মে দীক্ষা লইতে আসিয়া-ছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা এই দায়ভার বহিল না, তাহারা আমার কেহ নহে। আর যাহারা আমার কর্ত্তব্য-বোধ নিজেদের বলিয়া এই বোঝা সমবেত ভাবে মাথায় চাপাইয়া লইল, তাহাদের সহিত বস্তুগত একাত্মানুভূতির উপরই সঙ্ঘ অটলপ্রতিষ্ঠ হইল। এ সকল কথা এখন থাক।

নির্ব্বাচনে জয়ী হইলাম; কিন্তু রাজবন্দী মণীন্দ্রনাথ প্রজাপ্রতিনিধিরূপে পণ্ডিচারী কাউন্সিলে যোগ দিবে কি প্রকারে, ইহাও এক সমস্যায় পরিণত হইল। ভোট-দাতৃগণ আমরা কি করি, ইহাই দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। কেহ মনে করিলেন—প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ যখন প্রতিনিধি-পদে সভ্য নিয়োগ করিয়াছে, তখন কর্ত্তব্যের অপলাপ হইবে না। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট মণীন্দ্রনাথ বাহির হইলে কি করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে তাহারই আন্দোলন চলিতে লাগিল। কেহ ভাবিলেন—প্রতিনিধি পদে মণীন্দ্রনাথকে নির্ব্বাচিত করিয়া ভোটদাতৃগণ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন। মণীন্দ্রনাথ কাউন্সিলে যোগ দিবার পূর্ব্বেই বৃটিশ পুলিস তাঁহাকে ধৃত করিবে অথবা মণীন্দ্রনাথ আদৌ বাহির হইবেন না।

সহরে এইরূপ আলোচনা আন্দোলন যখন চলিয়াছে, তখন আমি শ্রীঅরবিন্দের নিকট হইতে এই উত্তরটুকু পাইলাম। মণীন্দ্রনাথকে ভোট-যুদ্ধে নামাইয়াই আমি শ্রীঅরবিন্দের পরামর্শ চাহিয়াছিলাম। তিনি জানাইলেন—চন্দননগরের এড্‌মিনিষ্ট্রেটারের নিকট হইতে নিরাপত্তির পত্র লইয়া বাহির হইলে, ফরাসী গভর্ণমেণ্টের কাজে প্রজাপ্রতিনিধিরূপে মণীন্দ্রনাথ কোন বাধাই পাইবেন না। আমিও দুর্ভাবনামুক্ত হইলাম।

২৩শে ডিসেম্বর ১৯১৯ রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইলেও, উহা কার্য্যে পরিণত হইতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল এবং এক কালে সকল রাজবন্দী মুক্তি পান নাই। পণ্ডিচারী হইতে আমার প্রিয়বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ নাগ মুক্তারক্ষে

বাহির হওয়ায়, ভারতরক্ষণ আইনে বন্দী হন। তিনি তখনও মুক্তি পান নাই। কিন্তু মণীন্দ্রনাথের পণ্ডিচারী যাওয়ার দিন স্থির হইলে, তাহার পূর্ব্বদিন স্থানীয় বৃটিশ গোয়েন্দাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত একজন কর্ম্মচারী আসিয়া আমায় জানাইলেন—রাজানুগ্রহে আমার সহিত সকল সঙ্ঘসভ্যই চন্দননগরের বাহিরে যাওয়ার অনুমতি পাইয়াছে। হঠাৎ মুক্তির সংবাদে মনে মনে আনন্দ কম হইল না। ঈশ্বরেচ্ছার পূর্ব্বাভাষ পাইয়াছিলাম ভাবিয়া আত্মসাধনার প্রতি শ্রদ্ধার মাত্রা বাড়িল। ঋণসংগ্রহ ও ফরাসী রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রতিনিধিনির্ব্বাচনে যোগদান মুক্তি-সংবাদ পাওয়ার পূর্ব্বেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এক্ষণে এই সংবাদ ঈশ্বরের দান বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। আমরা মুক্তি পাইলাম। এই সঙ্গে আর একজনের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা আমায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে স্বদেশীযুগের এক সহতীর্থ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বাংলাদেশে ভারতরক্ষা আইনে সর্ব্বপ্রথম বন্দী হন। স্থানীয় পুলিসকর্ম্মচারীকে আমি ইঁহার কথা জানাইলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন "আপনি শ্রীশবাবুরও মুক্তি চান?" এই সময়ে আরও অনেকের কথাই আমার মনে পড়িল। তাঁহারা রাজবন্দী নহেন। দেশসেবার দায়ে গৃহ-সংসার হইতে বিদায় লইয়া আত্মগোপন করিয়া বন্য পশুর ন্যায় আশ্রয়হীন, তাঁহাদেরও মুক্তিপ্রার্থী আমি। তাঁহাকে কিছু বলিলাম না। ২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার সময়ে শ্রীশচন্দ্র মুক্তিলাভ করিয়া শনিবার প্রাতঃকালে আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘ ৫ বৎসর পর তাঁহার মুক্তি। তিনি বন্দী অবস্থাতেই মুমূর্ষু মাতাকে দেখার দুই ঘণ্টা মাত্র সময় পাইয়াছিলেন; তারপর প্রজ্জলিত চুল্লীর উপর শ্মশানে মাতৃদর্শন করিয়া শ্রীশচন্দ্র কিরূপ চঞ্চলচিত্ত হইয়াছিলেন, তাহা অবধারণ করা শক্ত নহে। সোমবার সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা যায়; মঙ্গলবার আমরা তাঁহার ক্ষিপ্ত মূর্ত্তি দেখি। শ্রীশচন্দ্রের কথা সঙ্ঘের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। শ্রীশচন্দ্র সুস্থ হইয়া সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠার সর্ব্বপ্রথম আয়োজনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হইতেই আমার ছাত্র-বন্ধুরা একে একে গৃহত্যাগ করিয়া আমার ক্ষুদ্র সংসারভুক্ত হয়। এই সকল কথার সামান্য উল্লেখ করিয়া রাখিলাম মাত্র।

সঙ্ঘরচনার আদিপর্ব্বে অন্তরবিপ্লবের সহিত বাহিরেও একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সৃষ্ট হইয়াছিল। অরুণচন্দ্র বিধবার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সন্তান। জননীর সমস্ত ভবিষ্যতের আশা নির্ম্মূল করিয়া সে সঙ্ঘের ভিত্তিরচনায় আত্মদান করিল। সমাজে প্রলয়-ঝড় উঠিয়া, আমার মাথার উপর দিয়াই সে ভীম ঝটিকাবর্ত্ত বহিয়া গেল। নলিনচন্দ্র পিতৃমাতৃহীন, মাতামহীর নয়নমণি—সেও অতীতের সম্বন্ধ ঘুচাইয়া সঙ্ঘে আত্মদান করিল। নির্ম্মলচন্দ্র বৃদ্ধ পিতামাতার একমাত্র অবলম্বন, সেও সঙ্ঘমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া পূর্ব্বগোত্র পরিত্যাগ করিল। একে একে এমনই স্থানীয় পল্লীসমাজের বরণীয় সন্তানগণ সঙ্ঘের কাছে আত্ম-নিবেদন করিয়া, অতীতকে বিসর্জ্জন দিল। বিপ্লবী হওয়ায় সমাজপুরুষেরা এতদিন পুলিসের ভয়েই আমায় দূরে রাখিয়াছিলেন, উপরোক্ত ঘটনায় সমাজজীবনে হাহাকার উঠিল। অসংখ্য পিতামাতার কঠোর অভিশাপে ও কটু তিরস্কারে আমি জর্জ্জরীভূত হইলাম। কিন্তু চিত্ত বিচলিত হইল না; ঈশ্বরেচ্ছাই সঙ্ঘকেন্দ্র রচনা করিতেছিল আমায় কেন্দ্র করিয়া। আমি নিঃশঙ্ক ও নিরুদ্বেগে স্বকার্য্যসাধনে অধিক মাত্রায় উদ্বুদ্ধ হইলাম।

এই অবস্থায় জীবন-সঙ্গিনীর সংবাদ রাখিবে কে? যে প্রাণ অগ্নিবেগে কোন এক বিশেষ লক্ষ্যে ধাবিত হইয়াছে, তাহার আর কোন দিকে লক্ষ্য থাকে কি? জীবন-সঙ্গিনী লিখিতে বসিয়া সংক্ষেপে আত্মচরিতই লিখিতেছি। পাঠকদের এইরূপ মনে হওয়া বিচিত্র নহে যে, এই সন্দর্ভের নাম জীবন-সঙ্গিনী না দিলেই ভাল হইত। কথাটা একদিক্ দিয়া খুবই সত্য। কিন্তু ইহার একটা অন্য দিক্ও আছে; তাহা হইতেছে আমার জীবন-প্রবাহ ছুটিয়াছে যে ছন্দে, তাহারই রূপ ফুটাইতে তুলি চলিয়াছে রঙে-রেখায়। ভাবি—এই সঙ্গেই কি সহকারিণী শক্তি অলক্ষ্যে আমার সহিত সংযুক্তা নহেন? বাহিরের অসংখ্য প্রকার কর্ম্মে অবসন্নচিত্তে ম্লান মুখে যখনই ঘরের দিকে চাহিয়াছি, উৎফুল্ল নয়নের সুধাধারায় সকল অবসাদ যে দূর হইয়া গিয়াছে, তাহা কি গৃহলক্ষ্মীর অপার্থিব প্রেমের

মহিমায় নয়? যখন চতুর্দ্দিক্ হইতে অভিশাপ, তিরস্কার, নিন্দা, অখ্যাতি কর্ণ বধির করিয়াছে, কঠোর কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত হওয়ার দৌর্ব্বল্যে হৃদয় নিপীড়িত হইয়াছে, তখন কে সেই স্নিগ্ধ চিত্তে, ভগ্ন হৃদয়ে আশার ও উৎসাহের বাণী দিয়া পুনঃ পুনঃ অমৃত সিঞ্চন করিয়াছে? কুললক্ষ্মীর জীবনকাহিনী বিচিত্রঘটনাবহুল নহে। সে একটানা ফল্গু-প্রবাহ বন্ধুর অমুর্ব্বর পুরুষ-হৃদয়ের তলে তলে বহিয়া, পতিকে সাহস দিয়াছে, সঞ্জীবিত রাখিয়াছে—তাই আত্মজীবনরঙ্গের বিচিত্র ঘটনারাজীর মধ্যেই গৃহলক্ষ্মীর মহিম্নস্তুতি মীড়ে মীড়ে ঝঙ্কার দিয়া চলে। হিন্দুর স্বামি-স্ত্রী—একজন কায়া আর একজন তার অনুসরণ করে ছায়ার ন্যায়। কায়া বিগ্রহ, এই চিরসঙ্গিনীর নিত্য আশ্রয়। তাই জীবনের ঘটনা ব্যক্ত করিতে গিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন-সঙ্গিনীর সুধাময় স্পর্শ অনুভূত হয়। তাঁহাকে বাদ দিয়া কোন কর্ম্মই সুসিদ্ধ হয় নাই। যেখানে তিনি অবজ্ঞাতা হইয়াছেন, সেইখানেই পরাজয়ের আশঙ্কায় চিত্ত অভিভূত হইয়াছে। যে কর্ম্মে তাঁর সমর্থন সম্মতিসূচক হাসির রেখায় ওষ্ঠপুটে বিকশিত হইয়াছে, সেইখানেই জয়ের পর জয় আমায় প্রাণ দিয়াছে, গতি দিয়াছে। সহস্র কর্ম্মের মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় তিনি আমার সঙ্গেই থাকিতেন। মুখে কথা নাই, দেহের আসঙ্গ নাই; হাস্য-পরিহাস কিছুই নাই। আমি যেন দিগ্বিজয়ে বাহির হইতে চাই—তিনি বীর-সজ্জায় যেখানে যেমনটী হইলে মানায়, অবহিত হইয়া তেমন করিয়াই আমায় সাজাইয়া দিতেছেন। কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রের ধূলি-কাদা মাখিয়া আমি যত বার অপরিচ্ছন্ন হইয়া যাই, তত বার তাঁর স্নেহশীতল করস্পর্শে শুচিশুভ্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করি। তাঁর পাবনী মূর্ত্তি আমার জীবন-ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে অলক্ষ্যে। তিনি তো নিজে কোথাও ব্যক্ত হইতে চাহেন নাই। তিনি সতত প্রকাশ হইতে চাহিয়াছেন আমাতে। আমি সরল, ঋজু, পুষ্পপত্রহীন, রুক্ষ শালতরু; তিনি পত্রপুষ্প-ভারাবনতা বল্লরী। পতির জীবন লইয়া সতীর মহিম্ন-স্তুতি যদি কোথাও অনাহত রাগিণী তুলিয়া থাকে, সে আমার গৃহদেবীর চরিত্রেই সুস্পষ্ট দেখিয়াছি। তিনি শুধু আমার সেবায় অক্লান্তহস্তা হন নাই, আমার কর্ম্মকে, আমার সংহতিকে আমার চেয়ে তিনিই বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। তাই এত কর্ম্ম করিয়াছি, ক্লান্তি অনুভব করি নাই। আত্মবিস্তৃত, অপার্থিব সংহতির সৃষ্টি হইয়াছে—কত বাধা, কত বিঘ্ন, কিন্তু নৈরাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়ি নাই। তাহার জন্য দায়ী ছিলেন গৃহদেবীই। পুরুষ কর্ম্ম। নারী শক্তি। পতি-পত্নীর এই সম্বন্ধ আমার প্রত্যক্ষ বলিয়াই আত্মকাহিনীর মধ্যেই তাঁর অনিন্দ্যচরিত্র বিকশিত হইতেছে, এই আমার ধারণা।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে মিলনের এই দৃঢ় গ্রন্থি যেন শিথিল হইয়া পড়িল। পণ্ডিচারীর প্রেরণায় চলার গর্ব্বও সঙ্গে সঙ্গে মলিন মূর্ত্তি ধরিল।

আত্মশক্তিকে উপলব্ধি করার ব্যথা কি নিষ্করুণ, তাহা আমার মত অন্যে বুঝিবে কি না সন্দেহ। শক্তির আরোপে যে সম্পদ্-সৃষ্টি, আত্মপরীক্ষার অগ্নিক্ষেত্রে তাহা যে কিরূপ ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়, তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই দুর্দ্দিনে চির অবজ্ঞাতাকে অশ্রু-অর্ঘ্যে বরণ করিয়া সান্ত্বনা পাইতে না পাইতে যে অধিকতর কঠোর সত্যের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, সেই অতি করুণ কাহিনীর সূচনাসঙ্গীত দিতে আরম্ভ করিব।

মণীন্দ্রনাথ ও নির্ম্মলচন্দ্র সদলবলে পণ্ডিচারী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। শ্রীঅরবিন্দের অনুরাগে তাহারা নূতন রূপ লইয়া দেখা দিল। আনন্দের অবধি রহিল না। পৃথিবীতে যেন আর কিছু নাই; শুধু অরবিন্দ আর আমি। যাহা কিছু করি, যাহা কিছু হয়—শ্রীঅরবিন্দ ছাড়া নয়। শ্রীঅরবিন্দের বাণী আমার জীবন-বাণী। তাঁর কথিত অকথিত প্রেরণাই আমার জীবনী-শক্তি, আমার জীবন-গতি। তিনি যাহা বলেন, মৃত্যুপণে তাহা করি। কোথাও ইতস্ততঃ করি না। যাহা বলেন না, তাহাও করিয়া চলি। ১৯১০ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোনদিন তাঁহার মুখে কোনরূপ বিপরীত বাণী শুনি নাই। সহতীর্থদের মুখেও শ্রীঅরবিন্দের উপদেশ-বাণী শুনিলাম। প্রাণ আরও গুণান্বিত হইয়া উঠিল। ঠিক এই সময়ে বাংলার বড় সাধের দুলালেরা আন্দামান হইতে ঘরে ফিরিল। সেই আলিপুর বোমার মামলার বারীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রনাথ, অবিনাশ, উল্লাসকুমার প্রভৃতি ঘরে

ফিরিয়াছেন, সংবাদ পাইলাম। আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়ে এই সুসংবাদ আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। মনে হইল—পাখী হইয়া উড়িয়া যাই, বারীন্দ্রকুমারকে লইয়া আসি। আমার যাহা কিছু, সবই শ্রীঅরবিন্দের। বারীন্দ্রকুমার শ্রীঅরবিন্দের অনুজ। তাঁহার স্থান আর কোথায় হইবে? এমনই ছিল আমার অন্তরের আকৃতি। পৃথিবী যে বৈচিত্র্যের লীলাক্ষেত্র, শ্রীঅরবিন্দের অভিভবে সে জ্ঞান হারাইয়াছিলাম। অন্তরে বাহিরে শ্রীঅরবিন্দের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে, তাঁহার যেখানে যাহা কিছু আছে, তাহা আমারই—এমনই প্রত্যয় বুকে জাঁকিয়া বসিয়াছিল। বারীন্দ্রকুমারের সহিত যুক্তির আকাঙ্ক্ষায় আকুল হইলাম।

দুইজনে সাক্ষাৎকার হইল। প্রথম শিষ্টাচার, 'আপনি, আজ্ঞে'; তারপর দুই ভাইয়ের সম্বন্ধ; 'তোমাকে, আমাকে' সম্বোধনে আপ্যায়িত হইলাম। উপেন-দাদাও জানাইলেন "দাদা, প্রাণে এমনই করিয়া গাঁথিয়া গিয়াছ, নূতন করিয়া কিছু করার নাই। প্রাণে সর্ব্বদা আছ, এ কথা বিশ্বাস করিও" ইত্যাদি। একটা নূতন প্রীতির জগৎ সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। বৃহৎ কর্ম্মসাধনের জন্ম প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। শ্রীঅরবিন্দের আপনার বলিতে যাঁহারা, তাঁহাদের সকলকে বুকে টানিয়া এক করার আনন্দে হৃদয় উদ্বুদ্ধ হইল। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্র যে জটিল, সেই জটিলই রহিয়া গেল। কর্ম্মভেদ দেখা দিল, সাধ মিটিল না। নিরাশ হইলাম। শ্রীঅরবিন্দের নিকট অভিযোগ তুলিলাম—এক অখণ্ড মণ্ডলী গঠন করার বিপরীত কর্ম্মের আভাসে। বারীনের আগমনের পর শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র করিয়া বাংলায় যে বৃহৎ কর্ম্মচক্র-রচনার স্বপ্ন আমার ছিল, তাহা সম্ভব হইল না। বারীনদাদার মনেও এইরূপ সংশয় যে না হইয়াছিল, এমন নহে। এই নূতন পরিস্থিতির সামঞ্জস্য-রক্ষায় শ্রীঅরবিন্দও পথের সন্ধান করিতেছিলেন। বারীনের নিকট তাঁহার দীর্ঘ পত্র তাহার প্রমাণ। তিনি আমাকেও ঐ সময়ে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের কর্ম্ম-প্রেরণা যে ভাবে বহিতেছিল, তাহা অকস্মাৎ কোথা হইতে যেন বাধা-প্রাপ্ত হইল। আমি একটু বিচলিত হইয়াছিলাম। বারীন পণ্ডিচারী হইতে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি 'নারায়ণের' ভার লইলেন—নূতন কর্ম্মকেন্দ্র-সৃজনে উদ্বুদ্ধ হইলেন। আমারও ডাক আসিল। চন্দননগরে এই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া যে সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার সম্মুখে একটা দাঁড়ি টানিয়া আমি পণ্ডিচারীর দিকে ছুটিলাম। সেদিনের বিদায়-দৃশ্য আমার চিরস্মরণীয় থাকিবে। অকস্মাৎ আমার সঙ্গবর্জ্জিত হইয়া গৃহদেবীর সেই মলিন বিষাদ-মূর্ত্তি আজিও হৃদয়ে আঁকিয়া আছে। এই যুগ-সন্ধিক্ষণের করুণ কাহিনী ক্রমে বলিতেছি।

ক্রমশঃ

# মৃত-তারা

( Nora Nisbet-এর ছায়া অবলম্বনে )

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

শুনি তো জগতে সবই সুন্দর আছে,
সুন্দর শুনি—লাল অরুণিমা ভাতিছে যা গাছে গাছে

শুনে থাকি—পরী, জরীর ওড়না পরে' চলে অভিসারে;
চকোর চাঁদের নেশায় ঝিমায় ক্ষীর সাগরের পারে!
শুনে থাকি—কত, মধু ঝরে মৌচাকে,
বিজন-বনানীকুঞ্জ বিছায় ধীরে ধীরে থাকে থাকে!

কিন্তু আমার জন্ম যে হায় মৃত-তারাদের পাশে,
আমি গতি-হারা বিতাড়িত-স্রোত ছুঁতে চাই নীলাকাশে!
চাঁদের শ্রান্তি-ভুলানো আঘাতে আঁধারেই হই হারা;
আকাশের সীমা আমার সে নহে—শঙ্কারই রচে কারা!

# হিমাচল তীর্থে জয়ন্তী-উৎসব

### শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

যেন এক দীর্ঘ বিস্মৃতির যবনিকা উঠিল।

একদা হারানো সেই চিরপরিচিত দেশ! বিরাট্ বোধে প্রতিষ্ঠিত আমারই স্ব-রাজ্য! আপনার জন অনাবিল প্রেমে আমায় ঘিরিয়া ধরিল। নিমীলিত নয়নেই যেন নিজের চেহারা চোখে পড়িল। নিজের পরিচয় পাইলাম নূতন করিয়া। প্রতি রূপে আমারই স্ব-রূপ মুকুরিত। বিস্ময়-বিমূঢ় নয়ন-পল্লব উন্মীলিত হইল। ভাব-বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া দেখি—এক চিন্ময়ী শক্তির পরিমণ্ডল। তাহারই মধ্যে কনক-সিংহাসনোপবিষ্ট দিব্যকান্তি চৈতন্যঘন এক পরম পুরুষ—ধীর, স্থির, নিশ্চল। ভূনত প্রণতি জ্ঞাপন করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে যেন অবলুপ্ত হইল আমার অস্তিত্ব। আমি যেন শুধু এক অখণ্ড অনুভূতি মাত্র। সৃজন-প্রেরণায় অন্তর শিহরিত হইল। বুদ্বুদের মতই পুনঃ ভাসিয়া উঠিলাম। লক্ষ্যে পড়িল, জ্যোতির্ম্ময়ী পটভূমিকায় বহুমুখী জীবনাবেগের বিচিত্র আলিপনা। ছন্দায়িত একটি বিকাশের ধারা ধরিয়া আমি চলিয়াছি। চলিতে চলিতে শুনিলাম, অসীম ব্যোমব্যাপী আনন্দের ঐক্যতান। দেখিলাম, সর্ব্বত্র স্থূলত্ববিহীন নৈর্ব্যক্তিক অস্তিত্ব প্রাণাবেগে প্রবাহমান। সবই একটি সুরে বাঁধা—স্বচ্ছাবয়ব; অনুভব করা যায়, কিন্তু স্পর্শ করা চলে না। শব্দহীন, ভাষাহীন, দ্বন্দ্বহীন, অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয় এক চেতন-ভূমির উপর দিয়া উল্কার বেগে যেন আমি বিচ্ছুরিত হইয়া চলিয়াছি। বিদেহী বৃক্ষ-প্রাণী, জীব-অজীব ঐকান্তিক আত্মীয়তায় চলার পথে আলিঙ্গনাবদ্ধ। আরও দূরে ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিল বিচিত্র পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গের নিঃশঙ্ক সঞ্চরণ। তারপর কত অনামী পুষ্প-লতা ভগিনীর স্নেহ-সম্ভাষণ; কত অচেনা ভাই, শাল্মলী-তরুর নির্ব্বাক প্রীতি-জ্ঞাপন; অগণ্য অজানা মানুষের প্রেম নিবেদন আর গগনস্পর্শী গিরিশ্রেণীর মহিমময় আবেদন অন্তরে আমার পুলক-শিহরণ তুলিল।

কিন্তু কতক্ষণ

সুষুপ্তির ঘোরে বুঝি সংস্কারের জের কাটে নাই। আকস্মিক মন আমার উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। সন্দিগ্ধ হইয়াই যেন গাত্র-মুখ স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ভূমার ভূমি হইতে নিঃশব্দ পতন। চোখ চাহিয়া দেখি, নস্থ গা-ঠেলিয়া ডাকিতেছে, রমণদা, উঠুন শিলিগুড়ি ষ্টেশন যে এসে গেল।

ভোরের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল।

ধড়মড় করিয়া বেঞ্চির উপর উঠিয়া বসিলাম। তন্দ্রার ঘোর তখনও কাটে নাই। উপরন্তু বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তি। শিয়ালদহ—শিলিগুড়ি। প্রায় পৌণে চারশো মাইল পথ দার্জ্জিলিং মেলের তৃতীয় শ্রেণীতে বস্তাবন্দী অবস্থায় ঠায় বসিয়া কাটাইয়াছি। নেশার ঘোরে যেন মাথা টলিতে লাগিল। চলন্ত ট্রেণের উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে ঝুঁকিয়া পড়িলাম।

চমৎকার! দৃষ্টির সম্মুখেই ভাসিয়া উঠিল এক মায়াপুরী —বুঝি বা আমারই সেই রূপায়িত ভোরের স্বপ্ন! বামে দক্ষিণে দিগন্তবিস্তৃত সমতল ভূমি। আর তাহারই সমান্তরাল রেখায় ক্রমোচ্চ গিরিসজ্জা। কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা নাই। ঘনবনানীবেষ্টিত শৈলশীর্ষে প্রভাত-রবির অরুণাভা। হৃদয় আমার অহেতুক অনুরাগরঞ্জিত হইয়া সশ্রদ্ধায় করযোড়ে তখনও অলক্ষ্য দেবাত্মা হিমগিরির উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাইলাম।

হুস শব্দে ট্রেণ প্ল্যাট্‌ফর্মে ধরিল। দীর্ঘ পথশেষে যেন গাড়ী আরামের নিঃশ্বাস ছাড়িল। প্রায় বার ঘণ্টা পরে মাটির স্পর্শে আমরাও স্বস্তি বোধ করিলাম। শিলিগুড়ির প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও 'প্লাণ্টার' শ্রদ্ধেয় সতীশ চন্দ্র কর মহাশয় আমাদের ষ্টেশনে অভ্যর্থনা জানাইলেন।

প্রথম শ্রেণীর 'ওয়েটিং রুমে' মালপত্র রাখিয়া আমরা ছয়জন সহযাত্রী সতীশদার অনুসরণ করিলাম। মাইল-খানেক দূরে তাঁর বাসায় পরিতৃপ্তি সহকারে স্নান ও বিশুদ্ধ ঘৃত সংযোগে ভোজনাদি ব্যাপার শেষ করিয়া যেন তাজা

হওয়া গেল। সুস্থ দেহ-মনে ও প্রফুল্লচিত্তে আমরা পুনরায় ডি, এইচ্-আরের ট্রেণ ধরিলাম। ব্যবস্থা হইল, আগামী কল্য সতীশদা ঠাকুর-চাকর এবং চাল-ডাল সহ উপস্থিত হইবেন, আর স্বামী অমৃতানন্দজী আজ পৌঁছিয়া ইতিমধ্যে বাসার ব্যবস্থা করিবেন। এবারের দার্জ্জিলিং-প্রবর্ত্তক-রজত-জয়ন্তী উৎসবের প্রধান নায়ক স্বামীজী ও সতীশদা। ব্যবস্থার দুর্ভাবনায় ভ্রমণের আনন্দকে ম্লান করিবার ইচ্ছা হইল না—অবসরও ছিল না। শুধু উপভোগের জন্য ত্বরিতগতি বাসের চেয়ে শ্লথগতি ট্রেণে ভ্রমণই আমরা পছন্দ করিলাম।

ব্রড্-গেজ-এ অভ্যস্থ আমাদের চোখে দু'ফুট গেজ-এর দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথের ছোট গাড়ী ও লাইন ভারী কৌতুকপ্রদ ঠেকিল। ঝক্-ঝক্ কড়্-কড়্, কত বিচিত্র রব তুলিয়া ট্রেণ ছুটিল। পথিমধ্যে পড়িল পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী মহানন্দা—বিগতযৌবনা। দু'পাশে চোখ-জুড়ানো চা-বাগান আর ধান ক্ষেতের চিত্তহারী দৃশ্য।

পরের ষ্টেশন শুকনা। প্রায় সাত মাইল পথ সরল রেখার মতই সোজা। পাহাড়ের ঠিক সানুদেশেই ষ্টেশনটি অবস্থিত। এখানে ট্রেণখানিকে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া, দুইখানি এঞ্জিন দুইটি খণ্ডকে লইয়া যাত্রা করিল সুরু। তোড়জোড় দেখিয়া মনে হইল, হাঁ, দুর্গম যাত্রা বটে! সামনে নিশ্চয়ই রোমাঞ্চকর একটা কিছু আছে! লাইনের ক্রমোচ্চতা ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গভীর শালবনের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিলাম। গাড়ীর মধ্যে বসিয়া না থাকিলে, এখানে আসাটা বড় রকম 'এ্যাড্ভেঞ্চার'ই হইত। উপরে—আরও উপরে পাহাড়ের গা-বহিয়া সর্পিল গতিতে ট্রেণ আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিল। বাঁকে বাঁকে পট-পরিবর্ত্তন। অনেকখানি উৎরাই আবার ঈষৎ ঢালু। কখনও বা অথই খাড়াইয়ের ঠিক ধার ঘেঁষিয়া ট্রেণ চলিয়াছে! নীচের দিকে তাকাইতেই শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। পাহাড় ঘুরিতেই আবার নয়নের সামনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে দিকচক্রবাল ঘেরা বাংলার শস্যশ্যামল সমতল ভূমি।

একেবারে নূতন—নূতনতর পরিবেশ! অভিনব অভিজ্ঞতা! সমগ্র ট্রেণময় যাত্রীর পুলক-চাঞ্চল্যে নির্জ্জন বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। এ্যামেচার নসু আর স্বামীজী ক্যামেরা লইয়া ব্যস্ত। ফণীদা নির্ব্বাক। হলধরের স্ফূর্ত্তি সর্ব্বাঙ্গে উপচিয়া পড়িতে লাগিল। মনের সর্ব্বদ্বার মুক্ত করিয়া এ দৃশ্য আকণ্ঠ পান করিতে লাগিলাম।

রংটং, চুনভাটি, তিনধরিয়া, গয়াবাড়ী ষ্টেশন। তিনধরিয়ায় (উচ্চতা ২৮২২ ফুট) ডি, এইচ, আর-এর সুবৃহৎ কারখানা অবস্থিত। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি বসতি স্থাপিত হইয়াছে। গয়াবাড়ী ছাড়াইয়া উচ্চতাকে অতিক্রম করার কত বিচিত্র কৌশলই না অবলম্বিত হইয়াছে! এই রেলপথ পূর্ত্তবিদ্যার এক চরমোৎকর্ষের নিদর্শন। মানুষের বিজ্ঞান-বুদ্ধির প্রশংসা আপনা হইতেই অন্তরে জাগে। এতটুকু স্থানের মধ্যে এত প্যাঁচ ঘুরিয়া ট্রেণকে আসিতে হয় যে, মনে হয় যেন গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরিতেছি। সামনে আগাইয়া আবার পশ্চাতে হটিয়া (reverses) ট্রেণের পাহাড় আরোহণ ও অবরোহণ দৃশ্য যাত্রীমাত্রেই উপভোগ করিল। পথিমধ্যে 'পাগলা-ঝরা'র জলে ট্রেণ তৃষ্ণা নিবারণ করিল। ঘন ঘন এঞ্জিনের চাকা-পরীক্ষা ও তৈল-প্রদান চলিতে লাগিল। এমনিই তো রুগ্ন এঞ্জিন, তার উপর প্রতি পদক্ষেপে ট্রেণকে যেন কুস্তি করিয়া চলিতে হইতেছে। তাই এত তোয়াজ সত্ত্বেও কষ্টেসৃষ্টে ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে ট্রেণ চলিয়াছে। কড়াকড়, খটাখট্ শব্দে ট্রেণের হাড়-পাঁজড়া যেন পিষিয়া যাইতে লাগিল। হুসহাস্—ইঞ্জিনের দীর্ঘশ্বাস ঘনঘন শ্রুত হইল। গাড়ীর বুকফাটা আর্ত্তনাদ অন্তরে কেমন একটা সমবেদনার উদ্রেক করিল। অনুভব করিলাম, যন্ত্রদানব হইলেও, বুঝিবা উহার প্রাণ আছে, আছে ব্যথা-বেদনা বোধ। আর কে জানে—চালকের সহিত অলক্ষ্য প্রাণের সংযোগে এঞ্জিনও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে কিনা।

বেলা তিনটায় কর্শিয়াং ষ্টেশনে ট্রেণ পৌঁছিল। স্বামীজী জননায়ক শরৎ বসু মহাশয়ের বাড়ী দেখাইলেন। কার্শিয়াং ৪৮৬৪ ফিট উচ্চে অবস্থিত। বেশ শীত অনুভব হইতে লাগিল। চার ঘণ্টার মধ্যে আবহাওয়ার বিচিত্র পরিবর্ত্তন! গাড়ীতে বেশ-বদ্লানোর ধুম পড়িয়া গেল। কার্শিয়াং দার্জ্জিলিং জেলার মহকুমা সহর। প্রীতিপ্রদ এখানকার আবহাওয়া। গাড়ীতে বসিয়াই সমতলভূমির

অপরূপ দৃশ্য দৃষ্টি বন্দনা করিল। বালাসান উপত্যকার মনোহর রূপ এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ দৃশ্য, এই সব মিলিয়া কার্শিয়াংকে বাঞ্ছনীয় স্বাস্থ্যনিবাস করিয়া তুলিয়াছে।

কার্শিয়াং ষ্টেশনে পাহাড়ীদের সমাগম খুবই। যাত্রীর ভীড়ে গাড়ী ভর্ত্তি হইল। স্থান লইয়া একজন মিশ্র-পাহাড়ীর সঙ্গে আমাদের এক খণ্ডযুদ্ধই হইয়া গেল। জনৈক রেল-কর্ম্মচারী আসিয়া লোকটিকে আমাদের পশ্চাদ্‌গামী অন্য খণ্ড ট্রেণে উঠাইয়া দিলেন। পাহাড়ীটি সক্রোধে বলিয়া গেল, দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে 'ফাইট' হইবে।

ট্রেণ ছাড়িল। উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে ট্রেণ অধিরোহণ করিতে লাগিল। দার্জ্জিলিঙের বাকী আর মাত্র উনিশ মাইল রাস্তা। এত শীঘ্র এ-যাত্রা শেষ হয়, মন চাহিতেছিল না। দূরের অজানা রহস্য মনকে আকর্ষণ করে। দুর্লঙ্ঘ্যকে লঙ্ঘন করার আকুতিতে তাই তো মানুষের প্রাণবিসর্জ্জন! টুং (উচ্চতা ৫৬৫৭ ফুট), সোনাদা, ঘুম (উচ্চতা ৭৪০৭ ফুট) ষ্টেশন আসিল ও গেল। ট্রেণের গতির সঙ্গে চলচ্চিত্রের মত বিচিত্র দৃশ্যের আসা-যাওয়া, পাহাড়ের গায়ে গায়ে মেঘের লুকোচুরী, বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে অস্তগামী রবি-রশ্মির ঝিলিমিলি, কুয়াসার ঘন ঘন রূপ-পরিবর্ত্তন, নব নব নাম-না-জানা বৃক্ষ-লতা-গুল্মের অভিনন্দন নয়ন-মনকে সারাটি সময়ের জন্য তন্ময় করিয়া রাখিল। ঘুম হইতে ঢালু ধরিয়া ট্রেণ অবতরণ করিতে লাগিল। মনটা অকারণ উদাসী হইয়া উঠিল। নামিতে মন চাহে না। পিছনে পিছনে আর একখণ্ড ট্রেণ আসিতেছে। মনে হয়, কখন বা হুমড়ী খাইয়া হুড়মুড় করিয়া আমাদের ট্রেণের ঘাড়ে পড়ে! শিলিগুড়ি—দার্জ্জিলিং, ৫২ মাইল পথ যেন একটা স্বপ্নের মধ্য দিয়া কাটিল। ধীর মন্থরগতিতে গাড়ী আসিয়া দার্জ্জিলিং ষ্টেশন-শেডের নীচে থামিল। পাহাড়ী কুলী পীঠে লটবহর চাপাইয়া আমরা বাহিরে আসিলাম।

সায়াহ্নের ধূসরতা ঘনাইয়া আসিয়াছে। মিট-মিট করিয়া উপরে নীচে চারিদিকে বিজলী বাতি জ্বলিয়া যেন আমাদের অভ্যর্থনা করিল। সাঁঝের ঘোরে হিমাচলের এ অপরূপ দৃশ্য বিভোর হইয়া দেখিতে দেখিতে আমরা স্বামীজীর অনুসরণ করিলাম।

কিন্তু একটু পরেই বাস্তবের রূঢ় আঘাতে এই মানস-বিলাস ঠুন্‌কো কাঁচের মতই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল। আমাদের পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মশালার ঘরটি ইতিমধ্যেই অন্য যাত্রী দখল করিয়া বসিয়াছে। ধর্ম্মশালার বিল্ডিং-এই চন্দননগরের মেসার্স ডি, পি, ঘোষ এণ্ড সন্সের বইয়ের দোকান। এই দোকানেই আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। শুনিলাম, এবার নাকি দার্জ্জিলিঙে অতিরিক্ত যাত্রীর ভীড়। রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও স্বামীজী ঘর ঠিক করিতে পারিলেন না। অগত্যা সঙ্ঘের পরম সুহৃদ সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আশ্রয় লওয়া গেল। তিনি সাদর অভ্যর্থনা করিলেন।
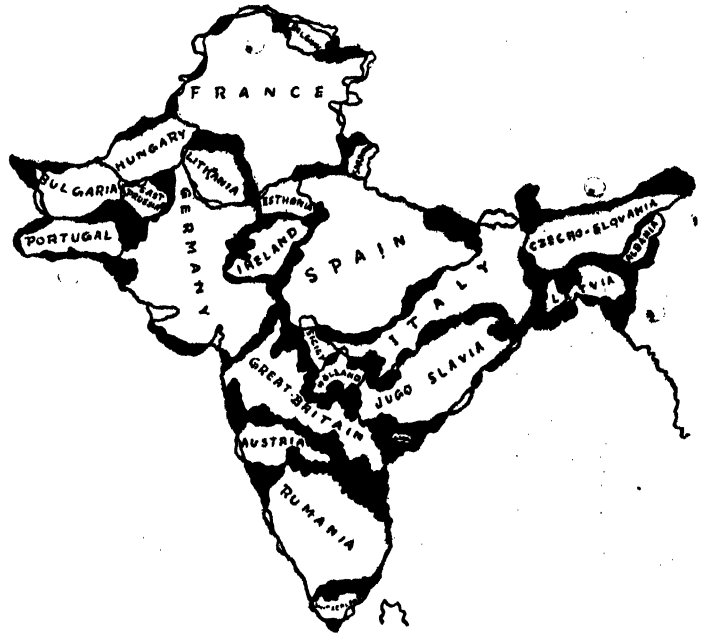
পরের দিন সতীশদা খাদ্য দ্রব্যাদিসহ ঠাকুর-চাকর

ভারতবর্ষ রাশিয়াবিযুক্ত ইউরোপ মহাদেশের সমতুল্য
[ মানচিত্রখানি দার্জ্জিলিঙের হস্তলিখিত 'প্রবাস' পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত ]

লইয়া উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মশালার একটি ঘরও মিলিল। হিন্দু টি অফিসটিও কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত জীতেন মিত্র মহাশয় আমাদের জন্ম ছাড়িয়া দিলেন। স্থিতবিৎ হইয়া স্বামীজী উৎসবের কাজে মন দিলেন, আর আমরা মনের আনন্দে যথেচ্ছা ঘুরাফিরা করিতে লাগিলাম।

দুর্জ্জয়লিঙ্গের শীর্ষদেশে দাঁড়াইয়া মনে হইল, সত্যই বিচিত্র এই ভারতবর্ষ! যাহা নাই এই ভারতে তাহা নাই এই ভূমণ্ডলে! আয়তন এবং লোকসংখ্যায় ভারতবর্ষ রুশিয়াবিযুক্ত ইউরোপের সমান হইলেও, প্রকৃতির অকৃপণ তথা আধুনিক বিজ্ঞানের তারিফ না করিয়া পারা যায় না। দেবতার লীলাভূমি স্বর্গের কামাতুরা অপ্সরার মতই শান্ত, শুভ্র, সবুজ হিমালয়ের ক্রোড়ে রূপসী আধুনিকা দার্জ্জিলিং নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে। জীবনের তীব্র সৌরভ-সমারোহের মাঝে এখানে আসিলে সত্যই মনে হয়—

'এ সুন্দর ভুবনে মরিতে চাহি না আমি'।

সমতলের প্রাচীন কীর্ত্তির সমাধি—শ্মশানের উপর দাঁড়াইয়া যেমন মৃত্যু-বিভীষিকা বুকে মর্ম্মন্তদ হাহাকার জাগায়, তেমনই এখানকার উপভোগ্য পরিবেশের মধ্যে মানসপটে ফুটিয়া উঠে ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন, আর প্রাণ

চির তুষার-শুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার মহিমময় দৃশ্য

দানে ভারতের যে বৈচিত্র্য তাহা ইউরোপে নাই। পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ গৌরীশঙ্করের কৌলীন্য-মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হইবার নয়। এই হিমগিরির মহিমময় শৃঙ্গেই যেমন প্রথম প্রভাতের উদয়, তেমনি মানব সভ্যতার প্রথম আলোর উৎসও এই হিমাচল-তীর্থ। প্রথম সাম-গান, ঋষির কণ্ঠে প্রথম অমৃত বাণী এই হিমবর্ষের অঙ্গনেই সর্ব্বপ্রথম উচ্চারিত হয়। শিল্প, সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি মানব মনের সুকুমার প্রেরণার অফুরন্ত উৎস এই চিরন্তন রহস্য-রাজ্য। ধ্যানস্থ হইয়াই মানস নয়নে দেবভূমি হিমালয়ের এই অরূপ রূপ সন্দর্শন করিলাম।

জাগ্রত দৃষ্টিতে কিন্তু দার্জ্জিলিঙের প্রতিষ্ঠায় ইংরাজ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—বাঁচার ও বৃদ্ধির আশায়। চলিতে ফিরিতে প্রতি পদক্ষেপে হিমস্নিগ্ধ সুনির্ম্মল আলো-বাতাস তনু-মনে স্বাস্থ্যের উল্লাস-শিহরণ সঞ্চার করে। আব্‌হাওয়ার এই অমৃত আহরণ করিয়া হিমাচলের আদিম অধিবাসী যে অনলস কর্ম্মশক্তি ও অটুট স্বাস্থ্য লাভ করে, তার বুঝি তুলনা কোথাও মিলে না।

কয়দিন নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় এখানকার যাহা কিছু দ্রষ্টব্য সবই ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। দেখিয়া আনন্দ হইল যে, বাঙালীর প্রভাব এখানে প্রচুর এবং সহর-সৃষ্টিতে বাঙালীর স্থান ও দান শ্বেতাঙ্গের সমতুল্য না হইলেও তাহার নীচেই। কিন্তু ভাব, ভাষা ও শিক্ষাপ্রচারের মধ্য

দিয়া বৃহত্তর বাংলা এবং বাঙালীকরণে বাঙালীর ঔদাসীন্য বড় করিয়া চোখে ঠেকিল। শ্বেতাঙ্গ মিশনারীর এই প্রচেষ্টা আমাদের অনুকরণীয়। 'দার্জ্জিলিঙের বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের' দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি।

প্রবর্ত্তক রজত-জয়ন্তী উৎসবের তোড়জোড় চলিলেও উৎসবের আগমনী-সুর মুখর হইয়া উঠিল সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা পূজনীয় শ্রীমতিলাল রায়ের আগমনে। ১৫ই অক্টোবর মধ্যাহ্নে দলবলসহ তিনি দার্জ্জিলিঙ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। প্রতিনিধি স্থানীয় কতিপয় দার্জ্জিলিঙবাসী অনাড়ম্বর আন্তরিক সম্বর্দ্ধনায় তাঁহাকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বাসস্থান শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী 'যোগনিবাসে' লইয়া গেলেন। প্ল্যাটফরমের বাহিরে আসিবার সময়ে পার্শ্বে দণ্ডায়মান কয়েকজন সাহেবও তাঁহাকে সসম্ভ্রমে টুপি খুলিয়া অভিবাদন জানাইল। হেতু বুঝিলাম না। সম্ভবতঃ তাঁর বেশ-ভূষা, মুখ-চোখের অসাধারণত্বের জন্যই হইবে। পূজনীয়ের আগমনে 'যোগনিবাস' যেন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। সর্ব্বদা দর্শনার্থীর আগম-নির্গমে বাড়ীখানি সরগরম হইয়া উঠিল। নিয়মিত উপাসনার ধ্বনি পাহাড়ের গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনি তুলিল। সাধনানুরাগী কয়েকজন বন্ধুও উপাসনায় নিয়মিত যোগদান করিতে লাগিলেন। প্রতি সন্ধ্যায় ভজন-প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। বস্তুতঃ সঙ্ঘগুরুকে কেন্দ্র করিয়া ঐ-অঞ্চলটা যেন উৎসবময় হইয়া উঠিল।

যোগনিবাসের একটু নীচেই শ্রীযুত অনুপলাল গোস্বামী (ন্যাড়া বাবু) ও শ্রীযুত হারানচন্দ্র বসুর (হারুবাবু) বাড়ী। প্রায় সর্ব্বক্ষণের জন্য সর্ব্বকর্ম্মে হারুবাবু ও ন্যাড়াবাবু আছেন। এই যুগ্মাত্মার সযত্ন সতর্কতা যেমন স্বামীজীর সকল কাজের বিলি-ব্যবস্থা সহজ ও সুচারুসম্পন্ন করিয়া উঠাইল, তেমনই তাঁদের সরস হাস্য-পরিহাস উৎসবের গুরুভারকে লঘু ও আনন্দময় করিয়া তুলিল। সভার মাত্র দুইদিন বাকী। ইহার মধ্যে উৎসব-স্থান 'নৃপেন্দ্রনারায়ণ হিন্দু পাব্লিক হল'টিকে সুসজ্জিত করা হইল। সঙ্ঘ-কৃষ্টির পরিচয়মূলক বিবিধ চার্ট ও সঙ্ঘ-পতাকালাঞ্ছিত হইয়া হল ঘরটির আবহাওয়া শিক্ষাপ্রদ ও সুগভীর শ্রদ্ধাপূত হইয়া উঠিল।

১৮ই অক্টোবর (১লা কার্ত্তিক) নির্দ্দিষ্ট ঠিক সাড়ে পাঁচটায় ৭ম মাসিক প্রবর্ত্তক রজত-জয়ন্তী উৎসব আরম্ভ হইল। পৌরোহিত্য করিলেন হিন্দুপ্রাণ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু। সুললিত কণ্ঠে স্বামী অমৃতানন্দজী বৈদিক-প্রশস্তি উদ্গান করিলেন। সঙ্ঘ-চারণ শ্রীপ্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত গীত হইবার পর, সঙ্ঘ-সম্পাদক শ্রীযুত অরুণচন্দ্র দত্ত সভাপতি-বরণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন এবং শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিকে মাল্যদান করিলেন। তারপর স্যানাটারিয়ামের সুপারিন্টেন্ডেন্ট জনপ্রিয় প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার
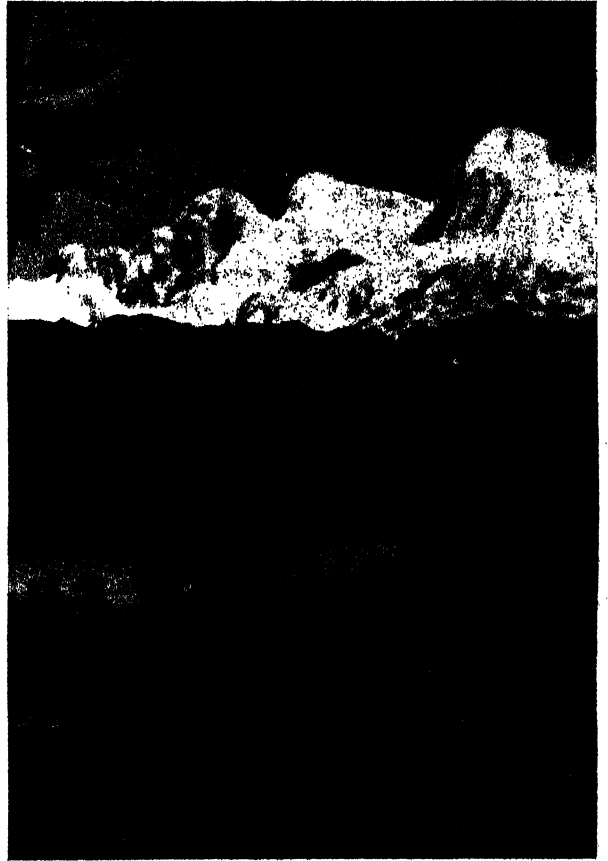
সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর

পাল মহাশয় শ্রীযুক্ত রায়কে মাল্যভূষিত করিলেন। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সভারম্ভ ব্যাপারটা একটু ঘুরাইয়া হইলেও, সকলেই দুই চারি কথায় বক্তব্য শেষ করার জন্ম সময় খুব বেশী লাগিল না।

অতঃপর স্থানীয় 'বেঙ্গলী এসোসিয়েশন'-এর সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন দার্জ্জিলিঙ্‌বাসী বাঙালীর পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত মানপত্রখানি শ্রীযুক্ত রায়কে প্রদান করিলেন:

হে মহানুভব!

তুষার কিরীট অভ্রভেদী হিমালয় অবস্থিত অপরূপ রূপলাবণ্যবতী দার্জ্জিলিং নগরীর বাঙালী আমরা আজ আমাদের অন্তরের ভক্তি অর্ঘ্য দ্বারা আপনাকে আহ্বান ও অভিনন্দন করিতেছি।

হে বরেণ্য, আপনার প্রতিভার প্রোজ্জ্বল প্রভায় দশদিক উদ্ভাসিত। হে পথদ্রষ্টা, আপনার জ্ঞানবর্ত্তিকার স্বর্ণ-আভায় আমাদের সম্মুখে নব নব পথের সন্ধান পাই।

হে অক্লান্তকর্ম্মা, দিবসের প্রতিটি মুহূর্ত্ত আপনি নিপীড়িত মানবের কল্যাণে ব্যয়িত করিয়া থাকেন। হে কর্ম্মবীর, আপনার অন্তরের আদর্শ সর্ব্বদাই কার্য্যে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। বাঙলার নব নব কর্ম্মক্ষেত্র আপনার আদর্শে ও প্রতিভায় ধন্য হউক।

হে বাণীর বরপুত্র, শৌর্য্যদীপ্ত ভানুর মত আপনার প্রকাশ। ভারতের প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির জ্যোতির্ম্ময় বর্ত্তিকা আপনি বহন করিয়া চলিয়াছেন, সে উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা আমাদের অজ্ঞতার অন্ধকারময় পথ আলোকিত করিতেছে। আপনার জীবনের আদর্শ ও অনুভূতি আমাদিগের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের হৃদয়ে ধর্ম্মের ও কর্ম্মের অনুপ্রেরণা জাগাইয়া তুলুক, ইহাই আমাদের একান্ত কামনা।

শ্রীভগবানের করুণায় আপনি দীর্ঘজীবি হইয়া সুস্থ দেহে দুঃস্থ মানবের কল্যাণে আপনার জীবন অতিবাহিত করুন, ইহাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা। ইতি

ইহার পরই সভাপতি তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন:

"মতিবাবুকে introduce করা সভাপতির কর্ত্তব্য হলেও আমি তা করব না। যেহেতু তা করবার প্রয়োজন হবে না। কোনও certificate-এর অপেক্ষা তিনি রাখেন না।

বাঙালী হিন্দুর কাঁদুনি শুনে আসছি যে তার অবস্থা দারুণ খারাপ হয়েছে। ইহার মূল অন্বেষণ করতে হবে। আমার মনে হয় দুরবস্থার কারণ দু'টি। প্রথম, sense of discipline-এর অভাব। স্থির বিশ্বাস ও শৃঙ্খলার অভাব হলে কোন জাতিই বড় হতে পারে না। দ্বিতীয়, ধর্ম্মভাবের অভাব। ধর্ম্ম এখন দাঁড়িয়েছে দুঃস্বার্থে। এ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মৈমনসিংহ সেরপুর সহরে এবার একস্থানে সাড়ম্বরে দুর্গা পূজা হল। পূজার জন্ত যারা আপ্রাণ খাটলো সেই তথাকথিত বর্ণেতর জাতিকে পূজা মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হল না। ফলে প্রতিমা বিসর্জ্জনের সাহায্য কেউ করলে না। বাবুদের প্রতিমা বহিবার সামর্থ্য নেই। ঠাকুর শেষ পর্য্যন্ত গেল নর্দ্দমায়! এই এরা, যারা আমাদের মায়েদের সতীত্ব রক্ষা করে, তাদেরই দূরে রেখে দিয়েছি। মনে হয় ধর্ম্মের আসল জিনিষ হতে আমরা দূরে সরে এসেছি। 'সত্য কথা বলবে', 'চুরি করবে না'—এ সব ধর্ম্মেই আছে। হিন্দু ধর্ম্মের মূল কথা: আত্মশক্তি বিশ্বশক্তির অংশ। আত্মা অবিনশ্বর—মৃত্যু নেই। কেহ আঘাত করে তার কিছু করতে পারে না। প্রয়োজন সঙ্ঘ ও সংহতির। সমগ্র হিন্দুর জীবনে এখন "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি......" মন্ত্র সিদ্ধ করার দরকার। এরূপ ঐক্যবদ্ধ প্রাণকে দাবিয়ে রাখার সাধ্য কাহারও নেই। পেশোয়ার কি চাঁদপুরে একজন হিন্দুর উপর অত্যাচার হলে সকলের প্রাণে ব্যথা জাগা চাই। 'ভারত সেবাশ্রম' ও 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ' হিন্দুর আত্মশক্তি জাগরণের ও সংহতিবদ্ধ করার দিক দিয়ে বিশেষভাবে চেষ্টা করছে এবং অনেকখানি সফলও হয়েছে।
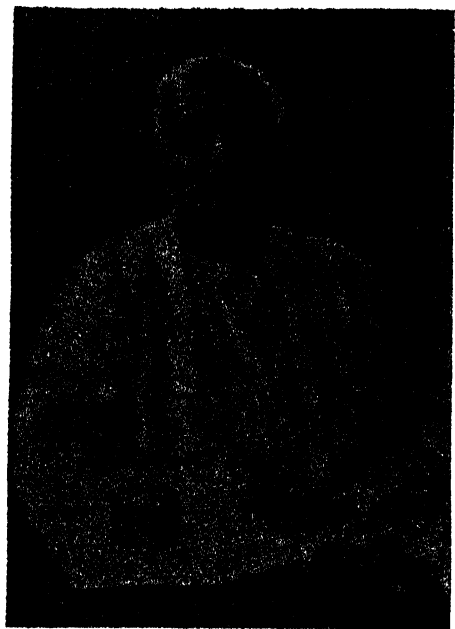
উৎসব-সভাপতি শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু

নাগপুরে দেখে এলাম, হিন্দু উকীল, ব্যারিষ্টার, মিলওনার, লেবার একত্র মিলিটারী ট্রেণিং নিচ্ছে ও মিলিটারী ম্যানুভারিং করছে। এর কমাণ্ডার একজন কলেজের ছাত্র। ডাঃ মুঞ্জে বললেন, একদিন তিনি ক্লান্ত হয়ে শুয়েছেন আর কমাণ্ডারের হুকুম এল, অমুক জায়গায় যেতে হবে। এই বুড়ো বয়সেও একজন কলেজের ছোকরার হুকুমে রাত্রি বারোটার সময়ে তাঁকে পাহারা দিতে যেতে হল। সি, পি এবং বোম্বেতে মোট এক লক্ষ সভ্য হয়েছে। পতাকাই এই সংহতির গুরু। দেখলাম, ওয়ার্দ্ধায় একদিনেই গুরু প্রণামী উঠলো ৬২০০৲ এবং বিজয়া দশমীর দিন নাগপুরে উঠলো ১২০০০৲ টাকা। ২৫ বৎসর আগে একজন dreamer যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজ তা অতি বৃহৎ কার্য্য সিদ্ধ করেছে। আমি তাই মতিবাবুকে বলছি যে, বাংলার সব

সঙ্ঘে এক সঙ্গে মিলিত হয়ে হিন্দুসভার সঙ্গে affiliated হওয়া বাঞ্ছনীয়। সর্ব্বশেষে আমি এই প্রস্তাবই মতিবাবুর সামনে উপস্থিত করছি।”

সভার রীতিক্রম ভঙ্গ করিয়া সভাপতির বক্তৃতা প্রদান অবশ্য অপ্রত্যাশিত নহে। আগের দিন প্রোগ্রাম স্থির করিবার সময়ই তিনি ইচ্ছা করিয়াই ইহা প্রোগ্রামভুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় নরেনবাবু উচ্ছ্বসিত হাসির সঙ্গেই বলিয়াছিলেন, “মতিবাবুর পরে বক্তৃতা দিতে উঠিয়া আমি বোকা বনিতে পারিব না। He speaks like a man as if possessed.” পূর্ব্বাহ্নেই ছাপা প্রোগ্রাম বিলি করা হইয়াছিল বলিয়া ইহা আকস্মিক ঠেকিল না।

সভাপতির পরে আবার সঙ্ঘ-সুহৃদ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় সঙ্ঘ-পরিচয় প্রসঙ্গে বলিলেন:

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ স্বকীয় বিকাশে এমনিই আলোকিত যে, তার পরিচয় দেওয়া আর সূর্য্যকে লজ্জা দেওয়া একই কথা। বিশ্বজগৎ যে নিয়মে চলেছে, আমাদের অন্তর জগতও সেই নিয়মেই চলেছে। জগতে যেন দেবাসুর সংগ্রাম চলেছে। দেবতারা অমৃত আহরণ করে আর অসুরেরা বঞ্চিত হয়। এই শাশ্বত, সনাতন, সত্য আদর্শ ধরে ভারত আজও বেঁচে আছে। এদেশে ওসব ফ্যাসিজম্, মিলিটারিজম্-এর বুলি চলবে না। সত্যই what is true of macrocosm is also true of microcosm. আমাদের শিরায় সেই প্রাচীন ঋষির রক্তধারা বইছে। আমরা আজও মরিনি। ভারতের আর একটি সত্য—Trinity—বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ। চিরন্তন সেই একই দেবাসুর সংগ্রাম চলেছে। সেই সনাতন ধর্ম্মের ধারাকে রক্ষা করার জন্যই যুগে যুগে বুদ্ধের আবির্ভাব। নূতন কিছু নয়। রামকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্যও নূতন নয়। আজ আমি বুদ্ধকে আমার সামনেই প্রত্যক্ষ করছি। আজিকার ভাব-অরাজকতার দিনে পূজনীয় মতিবাবুর মত বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল। প্রাচীন আদর্শকে revive করে এবং নব জাগরণের electric charge করে জাতিকে নবজীবন দিবার জন্যই তিনি ধর্ম্ম আশ্রয় করেছেন এবং সঙ্ঘ সৃষ্টি করেছেন। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও প্রাচীন ঋষি-প্রদর্শিত ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সাধনা করছেন। আমার বিশ্বাস, সঙ্ঘের এই শুভ প্রতিষ্ঠা জাতিকে সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি দিবে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ ধ্বংসবাদী নয়, সত্যই they are out, not to destroy but to construct.

শ্রদ্ধেয় ইন্দুবাবুর ভাবাপ্লুত কণ্ঠনিঃসৃত কথাগুলি আন্তরিকতায় এমনই সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল যে, বিলম্ব হইলেও ইহা শুনিতে অধৈর্য্য বোধ হইল না।

অনন্তর সভাপতির আহ্বানে শ্রীযুত রায় অপূর্ব্ব প্রেরণাময়ী ভাষায় একটানা ঘণ্টাবধি তাঁহার মর্ম্মবাণী ব্যক্ত করিলেন। বক্তৃতার বিষয়ও যেমন গভীর তত্ত্বমূলক তেমনই সাবলীল বাগ্মীতা ও লালিত্যপূর্ণ ভাষা। আগাগোড়া নোট নেওয়া সম্ভব হইল না। সাদাসিধা ভাষায় তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্মাংশ এইরূপ:

দার্জ্জিলিংবাসী আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরা সত্যকেই মহৎ বলে এই সম্মান দিয়েছেন। আমি একজন নগণ্য দীন সেবক। আমি জানি, এ নশ্বর শরীর নষ্ট হয়ে যাবে। ভারতের অমর কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে প্রবাহমান রাখতে যে সাধনা করে সেই সাধক চিরজীবী হবে। ভারতের হিন্দু-তত্ত্বকে ম্লান করবার নয়। ইহার গতি ও প্রকৃতিকে কেহ রোধ করতে পারে না। হিমালয় উৎসরিত গঙ্গোত্রী ধারার ন্যায় বহু বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করে কখনও ঋজু, কখনও বঙ্কিম গতিতে, কত শস্যশ্যামল সমতল ক্ষেত্রের বুক কাড়িয়া উহা লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিয়াছে। ধর্ম্ম মানুষকে পঙ্গু বা দুর্ব্বল করে না, পরন্তু অফুরন্ত শক্তির উৎসে যুক্তি দিয়া তাকে বলিষ্ঠ ও বীর্য্যবান করে তুলে। যেখানে পার্থ ধনুর্দ্ধর আর যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মিলন, সেখানে সুনিশ্চিত শ্রী, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, মাধুর্য্য ফুটে উঠবে। ধর্ম্মের ইহাই লক্ষণ। হিন্দুর লক্ষ্য মুক্তি, মোক্ষ, নির্ব্বাণ নয়। আমি যে ধর্ম্মের ইঙ্গিত দিব তা হিন্দুর শাস্ত্রবহির্ভূত নয়। এই ধর্ম্ম সমাজ ও জাতীয় জীবনে দিবে সু-নীতি, জ্ঞান ও সুকর্ম্মকৌশল। কোন মানুষ তা সে যত বড়ই হ'ক,
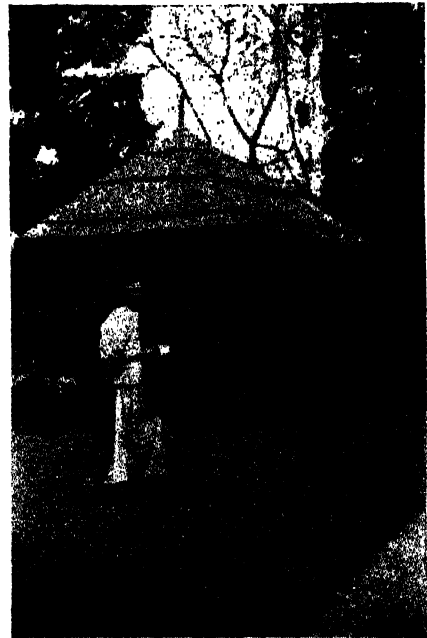
বোটানিক্যাল গার্ডেন: বিশ্রাম ঘর ও উহারই সামনে দণ্ডায়মান স্বামী অমৃতানন্দজী

অবতার বা ইনষ্টিটিউশনের স্বকপোলকল্পিত মতবাদ গ্রাহ্য নহে। ইহা জাতীয় জীবনে যুগে যুগে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। তাই হিন্দু জাতির মধ্যে শৃঙ্খলা ও সংহতি সৃষ্টির জন্যই প্রাচীন ঋষিগণ শ্রুতি ও স্মৃতির শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং এই বিধানের যুক্তিবাদই ভারতের ন্যায়প্রস্থান বা দর্শন শাস্ত্র। একমাত্র ইহার সহিত অনুভূতির সম্মেলনেই আবার হিন্দুর সমাজ, অর্থ ও রাষ্ট্র অবিসংবাদিত ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। হিন্দুর ধর্ম্ম আদৌ কাল্পনিক বা রহস্যাচ্ছন্ন নয়। ইহার মূলনীতি নিত্য কর্ম্মের মধ্য দিয়া জীবনে আচরণীয়। একটা ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা ধরে' বৈজ্ঞানিক নীতিতে ইহা জাতীয় জীবনে বিকশিত হয়ে চলেছে। যেমন পিতা মাতা বা সমাজকে অস্বীকার করা যায় না, তেমনি শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়ও অস্বীকার্য্য নয়। আজও বিবাহাদি জীবনের সর্ব্ব ব্যাপারে হিন্দু তার পূর্ব্বপুরুষ গৌতম, ভরদ্বাজ, কশ্যপাদি ঋষির নাম স্মরণ করে থাকে। ইতিহাস ও পরিচয় বিস্মৃত হবার ফলেই সমাজ-জীবনে সমন্বয়ের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়েছে। পলিটি-

ক্যাল হিস্টরীর পরিবর্ত্তন হলেও ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার মধ্য দিয়াই জাতি বাঁচিয়া থাকে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা অন্বেষণ করিলে এই সংস্কৃতি রক্ষার একটা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা লক্ষ্যে পড়ে। ৮০০ বৎসর পূর্ব্বেও হিন্দুর ইতিহাস ছিল। বৈদিক যুগে ঋষিকণ্ঠে সেই যে প্রথম প্রশ্ন—

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মন

কেন প্রাণঃ প্রথম প্রৈতি যুক্ত"

—হিমালয়-ক্রোড়ে প্রথম উদ্গীত হয়েছিল, সেই ঋককে মূর্ত্তি দিবার তপস্যার পরবর্ত্তীকালে ষড়দর্শনে ব্রহ্ম জ্ঞানঘন রূপে প্রতিষ্ঠা পায়। সুদয়ধর্ম্মে জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ-তত্ত্ব আবিষ্কারই তার পরের পর্য্যায়। ধিদলে প্রতিষ্ঠিত চেতনাই ব্রাহ্মণ, হৃদয়ে ক্ষত্রিয়, প্রাণে বৈশ্য এবং দেহে শূদ্র—আধারে এই চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি নিখিল মানবের পক্ষেই সার্ব্বজনীন সত্য। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি সম্বন্ধ-তত্ত্বকে সমাজ জীবনে বিগ্রহান্বিত করে তুলবার যে ভাব-সাধনা তাহাও টিকলো না। তারপর এলেন মহাভারতের যুগে শ্রীকৃষ্ণ। তিনি দিলেন

বাঙ্গালীর গৌরব হ্যাপি ভ্যালি চা-বাগানের 'উইণ্ডসর লজ': বাগানের মালিক মিঃ টি, এন, ব্যানার্জ্জি 'লজটি' শ্রীযুত রায়ের মৌন-বাসের জন্ম আগ্রহে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন

জীব ও ঈশ্বরের যুক্তি-বিজ্ঞান; কিন্তু তবুও সমাজ রক্ষা হল না। ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্ম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পাণ্ডবকে নির্ব্বাচন করলেন। পাণ্ডবের বৈরাগ্য ও মহাপ্রস্থানের ফলে তাঁর ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও সার্থক হল না। আত্মসমর্পণ মন্ত্র অসিদ্ধই রহিয়া গেল। জাতির জীবনে এ অধ্যায় বড়ই মর্ম্মান্তিক ব্যর্থতা। শ্রীকৃষ্ণের প্রয়াণ মস্তবড় একটা ট্র্যাজেডি। পরবর্ত্তী আবির্ভাব বুদ্ধ, শঙ্করের। তারপর নবদ্বীপ, হালিসহরে এই আত্মসমর্পণ মন্ত্রেরই সাধনা হয়েছে। মন্ত্র মূর্ত্তি নিল দক্ষিণেশ্বরে—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুক্তির মধ্য দিয়া। ইহাই জাতি-সাধনার সিদ্ধ মন্ত্র।

এখন সভায় সুযোগ্য পুরোহিত আমায় যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর দিচ্ছি। উত্তরের পূর্ব্বে আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে হিন্দুধর্ম্মের মূল বীর্য্য কি? জাতির মূলবীর্য্য তার সংস্কৃতি। শুধু সংখ্যা গুণে একটা জাতি বাঁচে না বা বড়ও হয় না। জার্ম্মান বা জাপান জাতির দিগ্বিজয়ী বীর্য্য ও স্পর্দ্ধাই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অতএব প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ হিন্দু মহাসভা বা কংগ্রেসের সহিত সংযুক্তভাবে কর্ম্ম করিতে পারে কিনা, তদ্বিষয়ে চিন্তা করবার পূর্ব্বে এই কথাটাই বিশেষভাবে তাহাদিগকে বিবেচনা করতে হবে যে, বাহিরের ঘটনা বা উপলক্ষ্য লইয়া জাতির অন্তরে জাগরণের বিদ্যুচ্ছক্তি স্ফুরিত হতে পারে কি না। আজ সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারা নাকচ করা বা রাষ্ট্রীয় অধিকারের ক্ষেত্রে নিজ স্বার্থ বজায় রাখতে চেষ্টা করবার জন্ম যদি হিন্দুর আত্মসত্তাই জাগ্রত হত, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ অনায়াসেই আপন বৈশিষ্ট্য বর্জ্জন করে বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানে আত্মোৎসর্গ করত। কিন্তু হিন্দুর ঐক্যশক্তি এইরূপ বাহিরের আন্দোলনে নহে। হিন্দুকে ঐক্যবদ্ধ হতে হলে, বিভিন্ন ব্যক্তি বা সমষ্টিকে সমান আচার গ্রহণ ও জীবনে পালন করতে হবে। এই সম আচারই সম প্রাণ সৃষ্টি করবে। সম-আচারপরায়ণ জীবনই শক্তির উৎস, সংহতি বা ঐক্যবন্ধনের প্রাণ-স্বরূপ। এই সমপ্রাণ, সমান আচার-নীতি প্রবর্ত্তনের জন্ম আমিও হিন্দু মহাসভা তথা সমগ্র হিন্দু-জাতিকে আহ্বান করছি।

সেবা-শক্তি-প্রেম জ্ঞানমূলক চতুরঙ্গ সাধনার প্রেরণা নিয়েই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ পূর্ণাঙ্গ জাতিগঠনে ব্রতী হয়েছে। ইহার যথাযথ সাধনে জাতি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অধিকারী হবে। এই বিশুদ্ধ জাতিগঠনের আকুলতা নিয়েই আমি বাঙালীর দ্বারে দ্বারে ঘুরবার সঙ্কল্প করেছি। দুই কোটি ২৩ লক্ষ হিন্দুর চেতনা আমি জাগিয়ে তুলতে চাই। আমি চাই সংগঠন। হিন্দু শ্বাসে শ্বাসে ঈশ্বর-চেতনা রক্ষা করবে। অনাঘ্রাত কুসুমের মত উত্তম পিতামাতা সৃষ্টি করবে উত্তম সন্তান। উত্তম জননী সৃষ্টির জন্ম কামনা-বিক্ষত হবার পূর্ব্বেই ১৪ বৎসর বয়সের মধ্যেই কুমারী কন্যার বিবাহ দিতে হবে। এই সংগঠন কর্ম্ম সিদ্ধ করতে আমি চাই একশত বিশ্বাসী মানুষ, যাঁরা হবেন জাতির ভবিষ্যৎ নেতা। এই শত দরদী নরনারী প্রত্যেকে ১০১৲ টাকা দান করে সঙ্ঘের এই বিরাট গঠন-পরিকল্পনা কার্য্যকরী করে তুলবেন। এইরূপ মানুষ প্রস্তুতির জন্ম সর্ব্বশেষে আমি তিনটি ব্রত দিয়ে যাচ্ছি। উহা সত্য, সংযম আর সম্বন্ধ রক্ষা করা।

সত্য রক্ষার জন্ম চাই একটি কেন্দ্র—যেখানে সত্য নিত্য অকুণ্ঠ অনুশীলিত হতে পারবে। যে যা তাই আচরণ করাই সংযম, আর নিয়মিত উপাসনা ঈশ্বর-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা দিবে।

দেবভূমি হিমালয় হিন্দু সংস্কৃতির আদি ভূমি। এখানে এসে আমি মাতৃশক্তির অনুভূতি পেয়েছি এবং ভারতাত্মার প্রেরণাও অনুভব করেছি। দিব্য কর্ম্মৈষণার অফুরন্ত উৎস এই হিমতীর্থ। ইহা স্বাস্থ্যাবাস নহে। ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির এই প্রতীক পীঠে আমি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে নিত্য উপাসনার শঙ্খধ্বনি অনির্ব্বাণ রাখতে চাই।

ইহার পর, দার্জ্জিলিঙবাসীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত হারাণ-চন্দ্র বসু এবং প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় পারস্পরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে, সঙ্ঘচারণ শ্রীপ্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য সমাপ্তি সঙ্গীত গাহিলেন। কিন্তু সভা সমাপ্ত হইল না। তাঁর যন্ত্রছাড়া কণ্ঠসঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া শ্রোতৃবৃন্দ পুনরায় 'বন্দেমাতরম্' গানখানি গাহিতে অনুরোধ করিলেন। 'বন্দেমাতরম্' গান হইয়া সভা-ভঙ্গ হইল।

সভায় দার্জ্জিলিঙের প্রায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মেজর বর্দ্ধন, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সান্যাল প্রমুখ বাংলার সকল জেলার মনীষীগণ ঘটনার যোগাযোগে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পরের দিন ১৯শে অক্টোবর, উক্ত সভাক্ষেত্রেই স্থানীয় "বেঙ্গলী এসোসিয়েশন"-এর সাহিত্য শাখার সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক পুনরায় একটি সভার আয়োজন করা হয়। সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক সুকবি শ্রীযুত অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় প্রবর্ত্তক-সম্পাদক পূজনীয় শ্রীমতিলাল রায়কে নিম্নের সুলিখিত মানপত্রে অভিনন্দিত করিলেন :

বাংলা সাহিত্যে জোয়ার যাঁরা এনেছেন, তুমি তাঁদের অন্যতম; তোমাকে আমরা প্রণাম করি।

সাহিত্যধারার মধ্যে দিয়ে তুমি যে ধর্ম্মের ও কর্ম্মের সংগঠনকারী প্রবাহ তুলেছো, তা' আমাদের মুগ্ধ করেছে। সাহিত্য অনুশীলন তোমার কাছে শুধু ভাবের বিলাস নয়, তুমি সাহিত্যে কর্ম্মের প্রেরণা জাগরিত করে, প্রাণশক্তি সঞ্চার করে আমাদের ভক্তিভাজন হয়েছো।

তোমার সত্য, সংযম ও ভগবৎ-সম্বন্ধে চেতনার দীপ্তবাণী কেবল সঙ্ঘে, কর্ম্মক্ষেত্রে বিচ্ছুরিত হয় নি, তোমার সৃষ্ট সাহিত্যে তা' সুপ্রকাশিত হ'য়েছে। বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে তোমার দান অপরিমেয়, সে দান আমাদের সংস্কৃতির ভাণ্ডারে অক্ষয় সঞ্চয় হয়ে থাকবে।

ভাষার ওজস্বিনী প্রকাশভঙ্গীর প্রাণবন্ত ধারা তুমি পুষ্ট করেছো। মৃদুচ্ছন্দা, লঘুগতি বেণুধ্বনি বাংলা ভাষাকে তুমি গুরু গম্ভীর পাঞ্চজন্য নিনাদী ক'রে তুলেছো, তোমাকে আমরা প্রণাম করি।

তোমার জীবন আমাদের অনুসরণীয়; তোমার প্রাণের স্পর্শে আমাদের এই নবজাত সমিতি সাহিত্য সেবার উদ্বুদ্ধ ও জাগরিত হ'য়ে উঠুক, এই আমাদের একান্ত কামনা। ইতি

উপস্থিত সাহিত্যিকমণ্ডলীর অনুরোধে প্রবর্ত্তকের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত এবং প্রবর্ত্তক-পরিচালক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী যুগ-সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে পর, শ্রীযুত রায় আত্মস্থভাবে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল সাহিত্যের মূল উৎস ও তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। সুনির্ব্বাচিত শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার কথা শুনিলেন। ধন্যবাদ প্রসঙ্গে সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য্য এই বক্তৃতার মর্ম্মটি সুন্দর অভিব্যক্তি দিলেন : "তুমি আজ সাহিত্যের জনমেতিহাস, আত্মিক রূপ, ধারা, গতি ও লক্ষ্যের যে অভিনব ব্যাখ্যা শুনাইয়াছ তাহা সাহিত্য-রসধারায় প্রবাহিত হইয়া আমাদের প্রাণে অমরানন্দের সৃষ্টি করিয়াছে। যে আনন্দ দিয়াছ, রীতিগত ধন্যবাদ দান প্রথায় তা' প্রকাশ অসম্ভব। হে ঋষি, তুমি আমাদের অন্তরের আনন্দের উৎসের সহিত আমাদের সাশ্রু ও বিনীত প্রণাম গ্রহণ কর। তোমার আদর্শে যেন আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে।"

সাহিত্য বৈঠকের পরে শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত "ভারতীয় সভ্যতা" সম্বন্ধে আলোক-চিত্র সহযোগে একটি বক্তৃতায় ভারতের ঐতিহাসিক মিশনের উপর নূতন আলোকপাত করিলেন।

অনুরাগী বন্ধুদের আগ্রহে ২০শে অক্টোবর একটি রবিবাসরীয় সান্ধ্য-বৈঠক পুনরায় অনুষ্ঠিত হইল। এই সুনির্ব্বাচিত বৈঠকে "হিন্দু-সংগঠন ও সংহতি-সাধনা" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রায় প্রায় দুই ঘণ্টাকাল আলোচনা করেন।

বার্চহিলে ভ্রমণরত সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায়

তাঁর পূর্ব্ব দুইদিনের প্রদত্ত বক্তৃতার ভাব এইদিন আরও ঘনীভূত ও বস্তুতন্ত্র আকারে পরিস্ফুট হওয়ায়, ইহা উপস্থিত সকলেরই হৃদয়ঙ্গম করিবার বিশেষ অনুকূল হইল।

প্রবর্ত্তক রজত-জয়ন্তী উৎসবের সূচনা-পর্ব্ব হইতে ছয় মাসের মধ্যে একই স্থানে সঙ্ঘ-গুরুর পর পর তিনটি বক্তৃতা প্রদান দার্জ্জিলিঙেই প্রথম। ভারতীয় বিভিন্ন ভাব ও চিন্তাধারাগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া অথচ কাহারও বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপন না করিয়া, তিনি সমাজ তথা জাতিগঠনের যে সুস্পষ্ট মৌলিক দর্শন এই সকল বক্তৃতার মারফত পরিবেশন করিলেন তাহার আবেদন যেমন গভীর, তেমনই সুদূরপ্রসারী দিগ্‌দর্শনের সহায়ক। জগৎ-

ব্রহ্ম, জীবন-মৃত্যু, ত্যাগ-ভোগ, শক্তি-দুর্ব্বলতা সম্বন্ধীয় বিচিত্র ও বিপরীতমুখী তত্ত্বের জটিল সমাবেশে ভারতের মন আচ্ছন্ন এবং বিভ্রান্ত। কেবলমাত্র বিশুদ্ধ তত্ত্ব লইয়া জাতিগঠন চলে না। বাস্তব মর্ত্ত্য জীবনের রক্ত-মাংসের সহিত তত্ত্বের সুষ্ঠু সমন্বয় ও পরিচয় যদি না হয়, তবে কোন ব্যক্তি বা জাতির জীবনে শ্রী, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, মাধুর্য্য ফুটিতে পারে না। প্রচলিত চিন্তা ও দর্শনের এই রিক্ততাই জাতিকে শ্রীহীন ও ইহবিমুখ করিয়াছে। চিন্তা ও ভাবের জটিলাবর্ত্ত বিদীর্ণ করিয়া শ্রীযুত রায় জীবন ও তত্ত্বের বোঝাপড়ামূলক যে আলো দিলেন, তাহাতে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনগঠনের এক সরল রাজপথ যেন আবিষ্কৃত হইল। ঐ পথের তাত্ত্বিক প্রশস্ততা শুধু হিন্দুরই নয়, পরন্তু বিশ্বমানবের বরণীয় ও গ্রহণীয়। বস্তুতঃ, দার্জ্জিলিঙে আসিয়া মর্ম্ম দিয়াই অনুভব করিলাম, পূজনীয় শুধু প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ-গুরুই নহেন, তিনি যুগগুরুও বটে। প্রথমটা অভিমান হইয়াছিল যে, প্রবর্ত্তক রজত-জয়ন্তী করিতে আসিয়া প্রবর্ত্তক পত্রিকা সম্বন্ধে একটি কথাও উচ্চারণ তিনি করিলেন না। পরে বুঝিলাম, তাঁর বিশ্বগ্রাসী প্রেরণা প্রবর্ত্তককে ছাড়াইয়া বহুদূরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। রজত-জয়ন্তী আন্দোলন সারা জাতিকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে মাসের পর মাস তাই বিপুল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। তিনি দীন কাঙালের মতই প্রেম ভিক্ষার জন্য এই সুদূর হিমালয়ের ক্রোড়ে আসিয়াছিলেন এবং দার্জ্জিলিঙ্‌বাসীও তাঁর এই ভিক্ষার ঝুলি অপূর্ণ রাখেন নাই। তিনি ফিরিলেন প্রেম, প্রীতি ও প্রতিষ্ঠার হিমালয় লইয়া।

ইহার পরের ঘটনা যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি মর্ম্মান্তিক শোচনীয়। উৎসবানন্দের হাট ভাঙিল। একে একে সকলেই প্রস্থান করিতে লাগিলেন। অঙ্গ-ভরা সাজ-সজ্জা লইয়াও বিরহিনী নববধূর মতই দার্জ্জিলিং ম্রিয়মাণ মূর্ত্তি ধরিল। ব্যবস্থা হইল, বাকী দিনগুলি মৌনভাবে কাটাইয়া পূজনীয় ২৬শে অক্টোবর সতীশদার চা-বাগান হইয়া কলিকাতায় ফিরিবেন। বন্ধুবর ক্ষীরোদবাবুর সাদর আতিথ্য ও সঙ্গ-সুখের মায়া কাটাইয়া আমাকেও পূজনীয়ের সঙ্গে নির্জ্জনাবাসে যাইতে হইল। তিনদিন মৌন থাকিয়া হিমগিরির আত্মার ঐক্য ও পরিচয় লাভ করিবার জন্য পূজনীয় 'যোগনিবাস' ছাড়িয়া সহরের বাহিরে 'উইগুসর লজে' চলিলেন। 'যোগনিবাসে'র সমগ্র পারিবারটি বিরহাশ্রু মুছিতে মুছিতে সঙ্ঘ-গুরুকে বিদায় দিলেন। হারুবাবু, ক্যাড়াবাবু, প্রফুল্লবাবু নূতনাবাসের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া পূজনীয়কে ভক্তিপূত প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক বিষাদ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় লইয়া ফিরিলেন। স্বামীজী ও নমু বাজার করিবার জন্য তাঁদের সঙ্গ লইলেন।

'লজে'র প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে বসিয়া এই মর্ম্মান্তিক বিদায়-দৃশ্য নির্ব্বাক প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম। বেদনাতুর ঘরের রুদ্ধ হাওয়ায় অন্তর গুমরিয়া উঠিল। নির্জ্জন গৃহে আর কেহ নাই, শুধু আমি আর পূজনীয়। চোখ চাহিয়া দেখি, প্রভুর মস্তক অবনত—মুখে অসাধারণ গাম্ভীর্য্য। তাঁর সুগৌর কপাল ও কপোল বাহিয়া যেন রক্ত ছিটকাইয়া পড়িতেছে। তিন মিনিটও গত হয় নাই, তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, রমণ, প্রফুল্লকে ডাকো।

দৌড়াইয়া বাহিরে আসিলাম। দেখি, অদূরে টিলার গা-বাহিয়া তাঁহারা উপরে উঠিতেছেন। প্রফুল্লবাবু সর্ব্ব পশ্চাতে। আমার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে ধীর-কম্পিত পদক্ষেপে তিনি নামিয়া আসিলেন। আসিলেন, কিন্তু ঘরে আর প্রবেশ করিতে পারিলেন না—ঘেরা বারান্দায়ই কান্নায় ভাঙিয়া পড়িলেন। সান্ত্বনা দিব কি, তাঁর হৃদয় বিগলিত অশ্রুর ছোঁয়া লাগিয়া আমারই অশ্রুসাগর উথলিয়া উঠিল—আঁখি হইল বাষ্পাচ্ছন্ন—রুদ্ধ হইল বাক্‌।

প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলাম। ব্যর্থ হইয়া অগত্যা পূজনীয়কে এই সংবাদ দিলাম। বিহ্বল হইয়া তিনি নিজেই ছুটিয়া আসিলেন। বুকে ধরিয়া সস্নেহ বাক্যে তাঁকে পরিতোষ করিলেন। বলিলেন, "আরও বেশী দিন তোমার বাসায় থাকিলে অধ্যাত্ম সংবেগ পারিবারিক জীবনে বিপর্য্যয় ঘটাতে পারতো ভেবে তোমার মঙ্গলের জন্যই এই নির্জ্জনাবাসে চলে এসেছি। প্রত্যহ সকালে এসে ধ্যান করে যেও।"

মৌন—নির্ব্বাক—স্তম্ভিত—বিস্মিত প্রফুল্লবাবু। একটি কথাও মুখ দিয়া সরিল না। তাঁর অন্তরের সংগোপিত কামনা এমনি অতর্কিতে সিদ্ধ হইবে, বুঝিবা তাঁর প্রত্যাশার বাহিরে ছিল। তাই যেমন নির্ব্বাক আসিয়াছিলেন তেমনই নির্ব্বাক প্রস্থান করিলেন। চোখে মুখে তাঁর পূর্ণতার তৃপ্তি।

কান্নার চেয়েও করুণ এ-দৃশ্য অপার্থিব এবং অহেতুক! অন্তরের অভিভব কাটাইতে অনেকক্ষণ সময় লাগিল। মনে হইল, দার্জ্জিলিঙের অনুরাগী সুহৃদবৃন্দের অনাবিল প্রেম-প্রীতির প্রতীক রূপে এই ঘটনা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। ভাগবৎ প্রেমের আধ্যাত্ম মহিমা বুঝি দার্জ্জিলিঙকে তীর্থে পরিণত করিল। এবারকার জয়ন্তী উৎসবের চরম এবং পরম সার্থকতাই এইখানে। *

* প্রবন্ধের ছবিগুলি স্বামী অমৃতানন্দজী ও নবীন কর কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো হইতে।

# লগ্ন যদি হয় অনুকূল

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী

বি-এ পরীক্ষার পর প্রেমকমল বাড়ী এলেও, গোধূলির সঙ্গে কুচবিহার যাবার ইচ্ছেটাই ওর আন্তরিক ছিল। ওর শিক্ষা-মন্দিরের রিটায়ার্ড প্রফেসর মিঃ ভাদুড়ীর নাত্‌নী ছিল ওই গোধূলি, ছিল ওর সহধ্যায়িনী, ছাত্রী এবং বন্ধুনীও বলা চলে। প্রফেসর ভাদুড়ী কলেজে থাকা-কালীন কো-এডুকেশনকে যথেষ্ট অবজ্ঞা করলেও এবং কো-এডুকেশন মানে প্রেমের শিক্ষা করা, অর্থাৎ কৈশোরের সুপ্ত প্রেমকে জাগ্রত করে' তোলা প্রভৃতি বল্‌তে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত না হলেও, ওঁদের কলেজে যখন প্রেমকমল ভর্তি হ'ল, তখন ওর মেধা ও প্রতিভার এক আশ্চর্যতম পরিচয় পেয়ে তিনি সত্যিকারের মুগ্ধ হয়েছিলেন, এবং তারই পরের বৎসর গোধূলি ডাইওসেসান স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করলে নাত্‌নীটিকে ওই কলেজে ভর্তি করবার লোভ সংবরণ করতে তিনি পারেন নি। কারণ, সঙ্গই যে মানব মনকে উন্নত ও অবনত করবার একটী প্রকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট পথ, এ ধারণা তাঁর অন্তরে বদ্ধমূল ছিল এবং সেইজন্যই বোধকরি, তিনি রিটায়ার্ড হওয়ার কিছু পূর্বে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র প্রেমকমল মৈত্রকে একান্ত সঙ্গোপনে ডেকে মিনতির স্বরেই বলেছিলেন, "সত্যি প্রেমকমল, তোমার প্রতিভা দেখে আমি ভারী মুগ্ধ হয়েছি, তুমি যদি অবসর-মত ধূলিকে পড়াশুনাটা বুঝিয়ে দাও তো আন্তরিক খুসী হব।"

অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁর অনুরোধে প্রেমকমল সম্মতি প্রদান করেছিল।

সেই হ'তে আজ তিনটী বৎসর ওরই সহায়তায় গোধূলির শিক্ষার্জন সার্থক হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ লম্বা ছুটীগুলো গোধূলি কুচবিহারে দিদির বাড়ীতেই উপভোগ করে' থাকে। এ বৎসর ডাক্তারের আদেশে দাদু অর্থাৎ প্রফেসর ভাদুড়ীর হার্টের অসুখটা বেড়ে যাওয়াতে তাঁর নীচে নামা বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ দিদির বিরহে গোধূলির মনের মণিকোঠা পাথরের মত ভার হয়ে উঠেছে। ও বল্‌লে প্রেমকমলকে, "দাওনা প্রেমদা, দিদির ওখানে আমাকে পৌছে; দাদুর ওই এক বিশ্রী প্রেজুডিস, একা জার্নী করতে কিছুতেই দেবেন না—"

দাদু ওইখানে বসেই কাগজ পড়ছিলেন, চোখ তুলে প্রেমকমলের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "সত্যি প্রেম, আমি মেয়েদের অতি-স্বাধীনতা মোটেই ভালবাসি না, আমার কি মনে হয় জান, মেয়েরা চিরকালই মেয়ে; শিক্ষাই বল, প্রগতিই বল, তার গৌরব তো আর মেয়েদের নারীত্বটুকু বাদ দিয়ে দিতে পারবে না। পুরুষ চিরদিন মেয়েদের ভোগের বস্তু বলে জেনে এসেছে—জানবেও। হয়তো তাদের শিক্ষা আর অশিক্ষার পার্থক্য কিছু তার মাঝে থাকবে। সেইজন্যেই আমি মেয়েদের একা পথেঘাটে ঘোরাফেরাটা ভালবাসি না; দুষ্ট, দুর্বৃত্তদের সর্বত্রই অবাধ গতিবিধি।"

প্রেমকমল একটু হেসে বল্‌লে, "দাদু, এ যে নূতন যুগের নূতন হাওয়া, আপনি কি এর প্রতিরোধ করতে পারবেন? ওই হাওয়াতেই যে মেয়েরা এখন ভেসে বেড়াচ্ছে এবং হয়তো আরও কিছুদিন বেড়াবে।"

"তা' মিশুক, কিন্তু মেশাটা সার্থক হবে সেইদিন—যেদিন মেয়েরা তাদের সন্তানপ্রসবের ভার পুরুষের হাতে তুলে' দিতে পারবে। তবেই তারা পুরুষের সমকক্ষতাও অর্জন করবে।"

এমনি ভাবেই দাদু ও প্রেমকমলের তর্ক ও আলোচনা চলে। প্রেমকমল কিন্তু কোনও মতেই প্রফেসর ভাদুড়ী ও গোধূলির অনুনয় রক্ষা করতে পারলে না, বাড়ী ও দুই বৎসর যায় নি—এবার যাবেই। বৌদি একান্ত মিনতি ক'রে লিখেছেন:

"ভাই প্রেম ঠাকুরপো, তুমি দুই বৎসর বাড়ী আস নি—এবার পরীক্ষার পর আস্‌তেই হবে, লক্ষ্মী ভাইটী, আমার অন্যথা কর না যেন—এস, তোমার প্রতীক্ষায় রইলেম।"

তবে বৌদির এই অনুনয়মাখা লিপিখানি যে প্রেমকমলকে গৃহের প্রতি আকৃষ্ট করেছে, তা' নয়। এ কথা সত্য, ওর জীবনে গোধূলির প্রেমই সবচেয়ে মহনীয়। এই গোধূলিকে ওর পথ চলার নিবিড়তম সাথীরূপে পেতে হ'লে চাই বৌদির একান্ত সহায়তা, চাই দাদার মত ও ভালবাসা। ওর অর্থের স্বাচ্ছন্দ এমন স্রোতমুখর নয়, যার আবর্ত্তে ও আত্মীয় স্বজনকে দূরে সরিয়ে দিয়ে গোধূলির সান্নিধ্যে এক স্বপ্নময় নীড় রচনা করতে পারবে। গোধূলি ওকে বলেছে, সে প্রেমকমলকে ভালবাসে—আর ওর কাননে গোধূলি স্বর্গের পারিজাত ফুলটী। অতএব এ-ক্ষেত্রে ওদের মিলনে বাঁধন দেবে দাদা ও বৌদি। প্রফেসর ভাদুড়ীর সম্মতি তো আছেই।

পল্লীর ছায়া-ঘেরা গৃহাঙ্গণের এক কোণে একখানি আরামকেদারায় আলস্যমধুর দেহখানি এলিয়ে আনমনে প্রেমকমল ঘন ঘন সিগ্রেট টান্‌ছিল। অস্তরবির এক ঝলক আলো ওর স্বপ্নমাখা মুখখানিকে রঙিন করে' তুলেছিল। এই আবেশময় গোধূলি-লগ্নের অপূর্ব মাধুরিমায় প্রেমকমল গোধূলির স্বপ্নই দেখছিল। আকস্মিক তার সে দিবা-স্বপ্ন ভাঙ্গল ব্রততী: এই যে আপনার সিগ্রেট-কেস্। বুলু আমায় দিয়ে পালাল।

প্রেমকমল চোখ খুলল। পাশেই ব্রততী দাঁড়িয়ে। ব্রততী ওর বৌদির যেন কি রকম বোন হয়, সম্প্রতি এখানে এসেছে। এই মেয়েটীর বিষয় প্রেমকমল আর কিছু জানে না। অবশ্য বৌদি সময়ে অসময়ে বোনটীর রূপ-গুণে পঞ্চমুখ। ও ভাল ভাবেই জানে—বৌদি এই অশিক্ষিতা, অমার্জ্জিতা মেয়েটী তারই গলায় গাঁথ্‌তে হাজির করেছেন। রুক্ষ গলায় প্রেমকমল বল্‌লে, "রেখে যাও ওইখানে।" কেস্‌টি রেখে নির্বাক ব্রততী প্রস্থান করলে।

পূর্ণিমা তিথি, সন্ধ্যের পর ওদের গৃহে কৃষ্ণার্চনা হবে। ব্রততী ধূপ-দীপ-চন্দন-নৈবেদ্য থরে থরে সাজিয়ে রেখে নেমে এল উঠানের এ প্রান্তে—বাঁশের কঞ্চি-ঘেরা পুষ্প-কাননে। পরিধানে তার গরদের শাড়ী। পুষ্পচয়নরতা ব্রততীকে দেখে প্রেমকমলের মনে হ'ল: বৌদি বলেন, এই মেয়েকেই ওর জীবনের সঙ্গিনী করতে হবে। ছোঃ, এরা জানে প্রেম? জানে ভালবাসা? মনে করে—সংসারকে নিপুণ হাতে গড়ে' তোলাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য; প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা ওগুলি নিতান্তই গৌণ। ওই জন্যেই তো জীবনের সুন্দর প্রভাতেই ওরা ভেঙ্গে পড়ে, ক্লান্ত হয়; যা' কিছু মনের মাধুর্য দৈনন্দিন টানা সুরের ভেতর হারিয়ে ফেলে, অপরকেও ক্লান্ত করে।

—"একা একা বসে কি ভাবছ ভাই প্রেম ঠাকুরপো?" ভিজে চুল গামছায় মুছ্‌তে মুছ্‌তে দীপ্তি বল্‌লে, "আমার বোনের মত এমন কর্ম্মী মেয়ে তুমি আর দেখেছ কখনও?"

বৌদির এ প্রসঙ্গ চাপা দিবার উদ্দেশ্যেই বোধহয় প্রেমকমল বল্‌লে, "কি বিশ্রী প্রেজুডিস তোমাদের বউদি, ভোগ রাঁধবে বলে' এই অবেলায় স্নান ক'রে এলে!"

—"ভাই, সংস্কারের কি কোন ধরাবাঁধা রূপ আছে? এগুলি যে মানুষেব নিজের নিজের রুচি-মত বিশ্বাসের দৃঢ়-মূলে মনের সঙ্গোপনে নিবিড় হয়ে ওঠে। তুমি যাকে বল্‌বে হয়তো তুচ্ছতম সংস্কার—তাকেই হয়তো আমি বলব আমার ধর্ম।" প্রেমকমল যেন কি উত্তর দিতে যাচ্ছিল, স্নিগ্ধ হাসির উৎসে ওকে নীরব করে' দীপ্তি বল্‌লে, "ভাই, মিছে তর্ক ক'রে কোনও ফল নেই, মত যেখানে অমিল, তর্ক সেখানে সীমাহীন। আমি চল্‌লুম তোমার চা আন্‌তে।" দীপ্তি চা আন্‌তে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, ব্রততী একখানা রেকাবে ফল মিষ্টান্ন গুছিয়ে কাপে চা ঢাল্‌ছে। সোহাগ-ভরে ওর চিবুকটা নেড়ে দিয়ে পরিহাসের গলায় দীপ্তি বল্‌লে, "কুণো মেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে রয়েছেন—চাটাও দিয়ে আস্‌তে পারিস্ নি নেকী? লজ্জা দেখে আর বাঁচি নে।" দীপ্তি চা নিয়ে ঘরের বাহিরে গেল। ব্রততী স্বগতই উত্তর দিল, "লজ্জা এ নয়, অসহায়ার অপমানকে পরিহার।"

হঠাৎ প্রেমকমলের উচ্চ কণ্ঠে ব্রততীর চিন্তার সূত্র ছিন্ন হ'ল। ও শুনল: প্রেমকমল বল্‌ছে, "বলেছি তো বৌদি, এই বৈশাখেই আমি বিয়ে করবো—তবে তোমার নির্বাচিতা মেয়েটীকে নয়, প্রফেসর ভাদুড়ীর নাত্‌নী গোধূলিকে।"

দীপ্তি বল্‌লে, "তোমায় তো কত বার বল্‌লেম

প্রেম, ও বিয়ে হ'তে পারে না; গোধূলি ধনীর মেয়ে—ও কি আমাদের এই গেরস্থর সংসারে খাপ খাইয়ে চল্‌তে পারবে? জাত, ধর্ম, অবস্থার অসামঞ্জস্যই বিবাহকে দুর্বিসহ ক'রে তোলে, প্রেমকে মলিন করে।"

দৃপ্তস্বরে প্রেমকমল বল্‌লে, "কেন বৌদি, দুর্বিসহ হবে আমাদের প্রেম? গোধূলি কি আসবে আমার সংসারে কাপড় কাচ্‌তে, বাসন মাজ্‌তে, জল তুল্‌তে, হাঁড়ীর কাণা গলায় বেঁধে উনুনের ধারে বসে' থাক্‌তে? তুমি কি মনে কর রাঁধুনী ঠাকুর, চাকর-চাকরাণী রাখবার আমার কখনও সামর্থ্য হবে না?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হেসে উঠে বৌদি বল্‌লেন, "তাই কি আমি বল্‌ছি ঠাকুরপো? দাস-দাসী রাখবার সামর্থ্য নিশ্চয়ই তোমার হবে—এবং এটাও জানি, তোমাদের মত নব্য তরুণদের সামর্থ্য যাদের হয় দাসদাসী রাখবার, তারাই বিবাহ করে; আর যাদের হয় না, তারা চিরকৌমার্যের ব্রত অবলম্বন করে। এই জন্যেই তোমাদের তরুণদের কাছে বিবাহ-সমস্যাটা বড়ই গুরুতর রূপ ধরেছে। তোমরা স্ত্রীকে কামনা কর শুধু প্রিয়ারূপে; কিন্তু ভাই, ফাগুনের চঞ্চল সমীরণ যেমন প্রকৃতিরাণীকে সম্পূর্ণ বিকশিত ক'রে তুল্‌তে পারে না—হেমন্ত-বর্ষার শ্যামল স্নিগ্ধতারও প্রয়োজন আছে। সংসারে মেয়েরা গৃহলক্ষ্মী হ'তে না পারলে, প্রজাপতির মত তাদের চপলতা পুরুষকে হয়তো দিতে পারে ক্ষণিক সুখ, তার জীবনের পরিপূর্ণতায় সার্থক করতে পারে না।"

কয়েক দিন হ'তে প্রেমকমলের অপ্রিয় ওজর-আপত্তি শুনতে শুনতে দীপ্তির একান্তই অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ওষ্ঠও যেন কি বল্‌তে যাচ্ছিল, এমনি সময়ে দ্বারপ্রান্তে কার আহ্বান: "প্রেম, বাড়ী আছ হে?"

—"অমিয় নাকি, যাচ্ছি দাঁড়া" বলেই প্রেমকমল উঠলো।

অনেকক্ষণ হ'ল নারায়ণ পূজা সমাপ্ত হয়ে গেছে। দীপ্তির স্বামী মহালে গিয়েছেন। পূজারী ব্রাহ্মণকে খাইয়ে, গ্রামের ছেলেদের প্রসাদ বিতরণ ক'রে প্রেমকমলের অপেক্ষায় দীপ্তি রান্নাঘরে উনুনের পাশে বসে' ঝিমুচ্ছিল, কখনও বা উৎকর্ণ হয়ে উঠছিল। প্রেমকমল সেই যে বন্ধুর সহিত বাইরে গেছে, এখনও ফেরেনি; ও এলে ওকে খাইয়ে দীপ্তি দিনমানের শ্রান্তির পর বিশ্রাম পাবে।

ব্রততী দ্বিতলে শয্যা রচনা করছিল। আকস্মিক তন্দ্রা থেকে জেগে উঠে দীপ্তির মনে হ'ল, রাত্রি যেন শেষ হয়ে গেছে, প্রেমকমল হয়তো না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। দীপ্তি সটান দ্বিতলে প্রেমকমলের শয়নকক্ষে প্রবেশ ক'রেই দেখলে—পাষাণপ্রতিমার মত ব্রততী দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করল, "কিরে ব্রতী, চুপ করে' এখানে দাঁড়িয়ে যে—প্রেম এখনও ফেরেনি?"

নির্ব্বাক্ ব্রততী এক টুকরা কাগজ দিদির হাতে তুলে' দিল। প্রেমকমল লিখেছে 'বৌদি, তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে পারলেম না, আমায় ক্ষমা ক'র—" এর পর আর পড়বার প্রবৃত্তি দীপ্তির হ'ল না, শুধু দৃপ্তকণ্ঠে বলে' উঠল, "সেই কলকাতার মেস, আর সেই রূপসী, বিদুষীর দুয়োর ছাড়া..."

বাধা দিল ব্রততী, "যা' ঘটবার ঘট্‌ল। আমিই এই অনর্থের মূল। এইবার লক্ষ্মীটি দিদি, আমায় বিদায় দে ভাই। আমি কলকাতায় আবার বি-এ পড়াই সুরু করি।"

বুকে টেনে নিয়ে দীপ্তি ওর ভিজে চোখ দু'টি অঞ্চলপ্রান্তে মুছিয়ে দিলে।

গোধূলি-ম্লান অপরাহ্ন। কুচবিহার ষ্টেশন। পাঁচটার গাড়ী হ'তে নেমে শ্রান্ত-ক্লান্ত-বিনিদ্র প্রেমোৎপল ধূলি-মলিন ঘোড়ার গাড়ীতে চলেছে। উদাসী সে—যেন গন্তব্যের কোন স্থিরতা নেই। রাজপ্রাসাদ—সেই পরিচিত সাগরদীঘি! আকস্মিক আনমনা প্রেমোৎপলের কাণে অমৃতবর্ষণ হ'ল: "হ্যালো কমলদা, এইও গাড়ী রোখো।" স্বপ্নে শ্রুত যেন কত দিনের পরিচিত প্রিয়কণ্ঠ! চমক ভেঙে ও চেয়ে দেখল, গোধূলি আর তারই পাশে দাঁড়িয়ে সাহেবী পোষাকপরা এক তরুণ।

—"আপনাকে দেখে' ভারী খুশী হ'লাম প্রেমদা!" পাশের যুবকটিকে দেখিয়ে পুনরায় গোধূলি যেন আনন্দে ফেটে পড়লো, : "ইনি মিঃ মেহেটা। সম্প্রতি বিলেত থেকে ডিগ্রী নিয়ে ফিরেছেন। পথের পরিচয় একটি দিনের সাহচর্য্যেই নিবিড় হয়ে উঠেছে। ভারী স্মার্ট আর আপ্-টু-ডেট্। অবশ্য শুধু আমার টানেই উনি এখানে আসেন নি, রয়েল ফ্যামিলিতে ওঁর রিলেশন আছে।"

প্রেমোৎপলের সাধের স্বপ্ন বুঝি খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। ভেবে পায় না—এরই মধ্যে 'তুমি' সম্বোধন 'আপনি'তে পরিণত হ'ল কি ক'রে। মুখে কথা সরে না।

অভিনয়ের ভঙ্গীতে ঘাড়টা ঈষৎ হেলিয়ে গোধূলি বললে, "আর বুঝলেন, মিঃ মেহেটা, ইনিই হ'লেন দাদুর সেই ফেভারিট্ ষ্টুডেণ্ট প্রেমোৎপল মৈত্র। আমার বন্ধু। ভারী ব্রিলিয়েণ্ট......" এর পরের কথা আর ওর হাসির উচ্ছ্বাসে শোনা গেল না।

প্রেমোৎপলকে অভিনন্দন জানিয়ে মিঃ মেহেটা বলল, "আসুন, আমার গাড়ীতে আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।"

নির্ব্বাক্ প্রেমোৎপল প্রত্যভিনন্দন করতে ভুলে'গেল। বার বার কেবলই মনে হচ্ছিল, ডাউন-ট্রেণে ফিরে যায়।

—"না, প্রেমদা আজ আমাদেরই অতিথি" বলে' একরকম আদেশের সুরেই গোধূলি প্রেমোৎপলকে গাড়ীতে উঠে বসতে বলল।

যন্ত্রচালিতের মতই প্রেমোৎপল গাড়ীতে গিয়ে উঠল। আর গোধূলি নৃত্যভঙ্গীতে সামনের সীটে মেহেটার পাশে গিয়ে বসল।

ঈষৎ মাথার ঝাঁকানিতে গোলাপী কপোলের উপর এলিয়ে পড়া চুলের গুচ্ছটা পিছনে সরিয়ে দিয়ে গোধূলি আবদার ধরল : "আজ আমাকে ড্রাইভিং-এ ট্রায়াল দিতেই হবে, মিঃ মেহেটা।"

গাড়ী চলেছে। অসহায় দৃষ্টি ফেলে প্রেমোৎপল চেয়ে থাকে ষ্টীয়ারিং-এর উপর রাখা গোধূলির রক্তরাগ আঙুলগুলির দিকে আর মেহেটার বুকের উপর প্রায় হেলিয়ে পড়া তার তন্বী তনুলতার পানে। একটা অকারণ অসাড় বুকফাটা বেদনা সে অনুভব করে। কেবলই ওর মনে হয়, 'গাড়ী থামিয়ে নামিয়ে দিলে যেন ও স্বস্তি পায়।'

ডাক্তার রায়চৌধুরীর বাংলোর সামনে গাড়ী এসে থামল। গোধূলি নামল, প্রেমোৎপল তাকে অনুসরণ করল। ধূলিকে পরের দিন টেনিস পার্টির আমন্ত্রণ জানিয়ে মেহেটা সজোরে গাড়ী হাঁকিয়ে দিল।

ক'দিন হতেই গোধূলির দিদি ধূমার শরীর ভাল যাচ্ছিল না। আজ শয্যাগত। পুরাতন ভৃত্যটি অসুস্থ, পাচকও পলায়িত। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে, ঠাকুর-ঘরে দীপ পড়েনি। নবনিযুক্ত সাঁওতাল ভৃত্যকে দিয়ে এ কাজ হয় না। উদ্বিগ্ন চিত্তে ধূমা এই চিন্তাই করছে। একবার উঠতে চাইলেন, পারলেন না—সমস্ত শরীর ব্যথার যন্ত্রণায় ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। ঘরের একপ্রান্তে সদ্য প্রত্যাগত স্বামী ডাক্তার প্রবাল ষ্টোভে পাম্প দিচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য, দিনমান অভুক্তা স্ত্রীর জন্যে একটু বার্লি আর নিজের চা তৈরী করবেন। এই কর্ম্মক্লান্ত মানুষটীকে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালতে বলতে ধূমার মমতা হ'ল। ঠিক এমনি সময়ে বাইরের বারান্দায় জুতোর হিলের খট্ খট্ শব্দ হ'ল। গোধূলি এসে ঘরে প্রবেশ করল। হাতের উল্টো পিঠে দিদির ললাটের উত্তাপ অনুভব করে', ঈষৎ রুক্ষ স্বরে সে প্রবালকে বল্লে : "আজকেও একটা রাঁধুনী বামুনের সন্ধান পেলেন না তো প্রবাল-দা?" প্রবালের উত্তর দেবার পূর্ব্বেই দিদি বল্লেন মোলায়েম সুরে, "না ভাই ধূলি, এত টাকা পয়সা দিতে চেয়েও একটা ঠাকুরের সন্ধান আর পাওয়া যাচ্ছে না, তা' না হয় না যাক্, আমাদের মত সাধারণ বাঙালীর ঘরে ঠাকুর নামেই রাখা; ওদের উপর তো আর সংসারের ভার সম্পূর্ণ তুলে' দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। আর থাকাটাও এমন কিছু গৌরবের কথা নয়। তা' তুই এলি—দু'দিন যে একটু নিজে হাতে রেঁধে বেড়ে খাওয়াব, তা'ও ঈশ্বর বাদ সাধলেন। রোজ-রোজ ওই হোটেলের কেনা ভাতগুলো খেতে আর কার ভাল লাগে!"

"না, না—তা' নয় দিদি"—গোধূলি জুতোর হিলটা বার দুই মেঝেয় ঠুকে কৃত্রিম চাঞ্চল্যের ভঙ্গীতে দিদির কথার ভেতরই বলে' উঠল : "প্রেমকমল-দা এসেছে কিনা, তাই বলছিলুম।"

"প্রেমকমল এসেছে?" অভাবিত আনন্দে দিদির রোগ-যন্ত্রণা যেন কর্পূরের মতই উবে' গেল। শয্যাপ্রান্তে উঠে বসে উৎফুল্ল কণ্ঠে স্বামীকে বল্লেন, "ওগো শুনছ', প্রেমকমল এসেছে—ওকে তুমি ডেকে নিয়ে এস, আর কাল্লুকে বলে দিও উনুনে যেন আঁচ দিয়ে দেয়।"

—"উনুনে আঁচ কি হবে দিদি? তোমার তো ১০৩ ডিগ্রি জ্বর, কে রাঁধবে? তার চেয়ে প্রবাল দা' আপনি চাকরটাকে বলে' দিন্ আর এক মীলের কথা যেন হোটেলে বলে' দিয়ে আসে।"

—"ছিঃ ধূলি, প্রেমকমলকে কি হোটেলের খাবার খেতে দিতে পারি? তুই যা' লক্ষ্মী বোন্‌টী আমার, সামান্য কিছু আলুর দম, বেগুন ভাজা, আর খানকয়েক লুচি ভাজ গিয়ে, আমি দোকান থেকে দই, রাবড়ী, মিষ্টি আনিয়ে দিচ্ছি।"

মুহূর্তে গোধূলির মুখটা বিরক্তির রেখায় কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। রুক্ষ গলায় ও বল্লে, "লুচি তো আমি বেল্‌তে জানি নে দিদি, কেউ যদি বেলে দেয় তো আমি ভেজে' দিতে পারি"।

"তাই চল ওগো বীরাঙ্গনা নারী, করি মিনতি
তব সমরে হব আমি সাথী, হব সারথি।"

হাস্‌তে হাস্‌তে প্রবাল এনামেলের কাপে ঢেলে' খানিকটা বার্লি স্ত্রীর হাতে তুলে' দিলেন, বাকীটুকু থারমো-ফ্লাস্কে রাখ্‌তে রাখ্‌তে গোধূলির মুখের পানে তাকালেন।

বাহিরে ক্রোণের আড়ালে প্রেমকমল দাঁড়িয়েছিল। গাড়ী থেকে নেমে গোধূলি ওকে বলেছিল, "আসুন প্রেমকমল-দা"। ও এসেছিল গেট, বাগান, বারান্দা, সিঁড়ি অতিক্রম করে' দ্বিতলে, কিন্তু ঘরের ভেতর প্রবেশ করতে ও ভয়ানক সঙ্কোচ বোধ করছিল। গোধূলির মধুমাখা বাণীগুলো ওর শ্রুতিমূলে তীরের মত বিঁধছিল, তবু ও দাঁড়িয়েছিল যেন আত্মসমাহিত, আত্মবিভ্রান্ত; হয়তো দৃষ্টির সুমুখে ব্রততীর সেই কর্মচঞ্চল হাত দু'খানি মূর্ত হয়ে উঠেছিল। জঠরের অগ্নিদহন মর্মে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করল—প্রিয়ার চেয়ে যেন গৃহলক্ষ্মী রূপটাই মেয়েদের সত্যিকারের সমৃদ্ধ ক'রে তোলে—ও এমনিতর আরও কত আবোল-তাবোল ভাব্‌ত কে জানে, কিন্তু চিন্তা-তন্ত্রী ছিন্ন হ'ল গোধূলির বাক্যবাণে: "প্রবাল-দা, আপনাকে কিন্তু ময়দাটা মাখ্‌তে হবে, না হয় চাকরটাকে—" আর শোনবার ধৈর্য প্রেমকমলের হ'ল না, অপমান আর বেদনার অশ্রুজলে ওর দুটী চোখ নিবিড় হয়ে উঠল। ভিজে চোখ দুটী ও রুমালে মুছে ফেল্‌ল। এমনি সময়ে গোধূলি প্রবালের পিছু পিছু পিঠের উপর দোলায়মান শাড়ীর আঁচলটা কোমড়ে জড়াতে জড়াতে বাহিরে এল। নিতান্ত আচম্‌কা ভাবে সুমুখে প্রেমকমলকে দেখে যথেষ্ট অপ্রতিভ হয়ে উঠল; কিন্তু দেহভঙ্গীর একটা কৃত্রিম চঞ্চলতায়, কণ্ঠের কৃত্রিম অজস্রতায় ও ভাবটাকে চাপা দিয়ে বেশ সহজ কণ্ঠেই প্রেমকমলকে বল্লে, "ও সরি, আপনাকে বস্‌তে বল্‌তে একদম ভুলে' গেছলাম!"

"তোমার সব কাজেই ওই রকম ভুল হয় ধূলি," প্রবালবাবু সামলিয়ে নিয়ে বললেন: "আপনি কিছু মনে করবেন না প্রেমকমল বাবু, আমাদের এই খেয়ালী মেয়েটী ওইরকমই পাগল—" বল্‌তে বল্‌তে প্রবাল সুমিষ্ট অভ্যর্থনায় প্রেমকমলের দুটী হাত ধরে' ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন, স্ত্রীর পানে চেয়ে বল্লেন, "এই যে গো প্রেমকমলবাবু এসেছেন, গল্প কর।—বুঝ্‌লেন কমলবাবু, ইনি আপনার দিদি হন, গল্প করুন আমি এখুনি আস্‌ছি।"

এর প্রত্যুত্তর প্রেমকমলের রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ হ'তে নিঃসৃত হ'ল না, একটু নীরস হাসি ওর মেঘ-মলিন মুখে ভোর বেলার ম্রিয়মাণ চাঁদের মতই পাণ্ডুর হয়ে উঠল। ও স্বপ্নোত্থিতের মতই দিদির পদধূলি গ্রহণ ক'রে তাঁকে প্রণাম করল। দিদি ওর স্বাস্থ্য-সুন্দর শ্যাম-স্নিগ্ধ কমনীয় মুখটার পানে দু' মুহূর্ত মুগ্ধ আঁখি বুলিয়ে নিয়ে বস্‌তে অনুরোধ করলেন। হয়তো বা ভাব্‌লেন, সত্যিই অপর্যাপ্ত ধনী তাঁর অনুজাটীর ভাগ্যলিপি। জিজ্ঞেস করলেন স্নেহমধুর কণ্ঠে, "তুমি এইবার বি, এ পরীক্ষা দিয়েছে বুঝি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"পাস করলে কি পড়বে, ঠিক করেছ নাকি?"

—দিদির এই স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণে মুহূর্তে প্রেমকমলের ঝটিকাক্ষুব্ধ চিত্তাকাশ শান্ত রূপ ধারণ করল, প্রফুল্ল হয়ে উঠল, চেয়ারটায় বেশ ক'রে গুছিয়ে

বসে' স্বেদসিক্ত মুখটা রুমালে মুছে ফেলে নম্রকণ্ঠে বল্লে, "আমার ইচ্ছে দিদি, এইখানেই এম-এটা পড়ব; কিন্তু গোধূলি দেবী বলেন, "ওদেশ থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে আসতেই হবে। কিন্তু—"

—"কিন্তু কি ভাই! প্রবল ইচ্ছার মুখে কিছুই আটকায় না।" এমনি ভাবে দিদি ওর শিক্ষার, বাড়ীঘরের প্রত্যেকটী খবর খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। ও বুঝ্‌লে, এ প্রশ্নের ইঙ্গিত কোথায়? হয়তো বা ওর অন্তরের অন্তরতম স্থানটী এবার সুখে একটু রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। কারণ ওর যৌবনপুষ্প সবেমাত্র প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে, ওর প্রেম ভোরের আকাশের মতই নির্ম্মল, বাতাসের মতই শুচি; তাই ও প্রেমকে উপেক্ষা করতে পারে না, প্রত্যাখান করে না, যাকে ভালবাসে—তার মর্য্যাদা ওর অন্তরে চির অটুট হয়ে থাকে। ও মনে মনে ভাব্‌লে, গোধূলি নিশ্চয়ই ওই অবাঙ্গালী যুবকটীকে ভালবাসে না, ধনী সমাজের ভদ্রতা বজায় রাখ্‌তে হ'লে ওটুকু করতে হয়—ভাল সে তাকেই বাসে। ও খুসী মনে দিদির প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে মুখরিত হয়ে উঠল। গল্প করতে করতে একটী ঘণ্টা অতিক্রম হ'ল, এমনি সময়ে অত্যন্ত চঞ্চল পায়ে প্রবাল ঘরে এসে জানালেন, "তাঁর জরুরী কেস্ এসেছে, বেরুতে হচ্ছে, প্রেমকমলের যত্নের যেন কোনও ত্রুটি না হয়, ফিরতে হয়তো তাঁর দেরী হবে।"

—"খাবার দিতে বলব প্রেমদা?" ধূলি ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকেই বললে।

"একটু পরে, আগে মুখ হাতটা ধুই তারপর।" প্রেমকমল বল্লে।

গোধূলি সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার করলে, "এ বয়, ইয়ে বাবু-সাব্‌কো গোসল-ঘর দেখলাও, গোসল হো যানেসে খানা ঘরমে লে যাও, সমঝো।"

প্রেমকমল নীরবে ভৃত্যের অনুসরণ করল।

—"ছেলেটী বেশ চমৎকার, নয়রে ধূলি, রূপে গুণে যেন কার্ত্তিক। তাহলে এই জ্যৈষ্ঠতে বিয়ের ঠিক করি, কি বলিস?"

—"বিয়ে!"—গম্ভীর কণ্ঠে গোধূলি বল্লে, : "তোমার এ কথার বলার মানে কি দিদি?"

—"কেন দাদুই তো লিখেছেন, তুই প্রেমকমলকে ভালবাসিস্। তোদের বিয়ে—"

—"দাদুর অনুমান মিথ্যা নয়। আমি ভালবাসি প্রেমকমলকে; ভালবাসলেই বিয়ে করতে হবে, এর কি অর্থ আছে! শ্রদ্ধা, স্নেহ, বাৎসল্য, এগুলিও ভালবাসা। তোমাদের মনের একটা বিশ্রী কুসংস্কার আছে, নরনারীর প্রেমে সেই এক আদিমতম সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে, প্রেমের প্রকৃত রূপকে তোমরা দেখতে পাও না। কিন্তু মনের গভীর অনুভূতি দিয়ে যদি প্রেমকে অনুভব করতে পার, তা'হলে সহজেই বুঝ্‌তে পারবে, আমি শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে প্রেমকমলকে ভালবাসি।"

—"যদি তাই হয়, তবে তুই কেন ওকে তোর পারিবারিক জীবনের সাথে মিশ খাইয়ে নিতে ওকে ব্যারিষ্টারী পড়তে বলেছিলি? এও কি ওর প্রতি তোর নিঃস্বার্থ প্রেম নাকি?" ধূমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। আর বাক্য সর্‌ল না। নিজেকে সংযত করে' ধূমা কোমল কণ্ঠে বললেন, "কিন্তু ভাই ধূলি, এই ছেলেটী তোকে সত্যিকারের সুখী করতে পারত।"

—"তুমি জান না বোধ হয় মিঃ মেহেটার সঙ্গে আমার এন্‌গেজমেণ্ট—" গোধূলি নত মস্তকে উত্তর করল।

—"মিঃ মেহেটার সঙ্গে এন্‌গেজমেণ্ট!" ধূমা নিদারুণ-ভাবে চম্‌কে উঠলেন: "সে কিরে, মেহেটা যে বাঙ্গালীও নয়!"

—"তাতে কি হয়েছে, আজকাল অমন ইণ্টার-ন্যাশন্যাল ম্যারেজ ঘরে ঘরে হচ্ছে।"

ধূমার অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে এল। এমনি সময়ে বয় সংবাদ দিল: "মাজী, নয়া বাবুজি তো বাক্স্ আউর বিস্তানা লে কর টিশন্ মে চলা গিয়া—"

ভৃত্যের উক্তি ধূমার শ্রুতিমূলে হয়তো প্রবেশই করল না। তিনি তখন ভাবছিলেন: এইজন্য বিবাহ-সমস্যাটা আজকের নব্যা মেয়েদের মাঝে গুরুতর রূপ ধারণ করেছে। ওরা চায় ঐশ্বর্য্য, চায় জীবনের হাল্‌কা বিলাস। দৈনন্দিন জীবনের নিষ্ঠা ও মাধুর্য্য তারা বোঝে না। সমর্পণের মধ্য দিয়া জীবনকে সার্থক ক'রে তোলায় ইঙ্গিত ওদের শিক্ষায়

নেই। এ যৌবন-চাপল্যের কি পরিণাম কে জানে! ধুমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হ'ল প্রবালের গৃহপ্রবেশে। প্রবাল ধমকের সুরেই বললে, "রাত অনেক হয়ে গেল, তুমি এখনও শোওনি

অন্য কক্ষে গোধূলি মিঃ মেহেটার সঙ্গে তোলা একখানি ফটো মুগ্ধ নয়নে নিরীক্ষণ করছে। প্রেমকমল ততক্ষণ একখানি চলন্ত ট্রেণের কামরায় বসে' আধ-আলো, আধ-ছায়ায় ঘেরা বাহিরের উন্মুক্ত প্রান্তরের পানে চেয়ে আছে। হয়তো বা ভাবছে গোধূলির প্রেমসম্বন্ধের সুস্পষ্ট উক্তিগুলি, কিছু পূর্বে যেগুলি ও স্বেচ্ছায় শুনেছিল দ্বারের অন্তরাল হ'তে; শুনেছিল মনের ভিতরে সুপ্ত সন্দেহ আবার জাগ্রত হয়ে উঠেছিল বলে'।

গাড়ী থাম্‌লো এসে গিধালধাও জংসনে।

প্রেমকমল নামলো কিন্তু তার একটানা চিন্তাস্রোত বয়ে চলেছে। "কুলী, শোন আমার মালগুলো গাড়ীতে উঠিয়ে দাও তো!" হঠাৎ মেয়েলী কণ্ঠস্বর প্রেমকমলের চিন্তা-ধারাকে এলোমেলো করে' দিল। ও চোখ মেলে দেখল' সুমুখে প্ল্যাটফর্মের উপর ব্রততী দাঁড়িয়ে, আর তার জিনিষপত্রগুলি কুলী ট্রেণে উঠাচ্ছে।

ব্রীড়াবনত ব্রততী ভূনত হয়ে প্রেমকমলের পদস্পর্শ করলে।

প্রেমকমল একান্ত আত্মীয়ের মতই প্রিয়কণ্ঠে সম্ভাষণ ক'রে বললে, "একা কেন চল্‌ছ? দাদা কোথায়?"

"দাদাবাবু মফঃস্বলে। কলেজ খুলে' গেছে, কি করি, পরে হয়তো সীট পাব না। চিঠি দিয়েছি, ষ্টেশনে লোক আসবে।" বেদনাসিক্ত ব্রততীর কণ্ঠস্বর।

সস্নেহে ব্রততীর হাত ধরে' প্রেমকমল তাকে ট্রেণে উঠায় সাহায্য করলে।

ট্রেণ ছাড়ল। ব্রততীর নিঃসঙ্গ মন অনুসন্ধান করে' ফিরতে লাগল, প্রেমকমলের আকস্মিক এ পরিবর্তনের হেতু কি।

আর পল্লীর নির্জন পথে চলতে চলতে প্রেমকমলের কেবলই মনে হ'তে লাগল: গোধূলির প্রেম সাগরের মত উদ্দাম, বিদ্যুতের মত দীপ্ত ও চঞ্চল; আর ব্রততী—যেন ব্রতচারিণী। প্রেম তার জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ আর প্রশান্ত। ফল্গুধারাব মতই ওর প্রেম অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবাহিত।

ভার-মুক্ত প্রেমকমলের চিত্ত-মন অনাকারণ প্রসন্ন হয়ে উঠ'লো।

---

# ভাই-ফোঁটা

শ্রীসুরবালা বিশ্বাস

আজ বরষের পরে আসে ভাই-দ্বিতীয়ার পুণ্য পরশ,
ভাই-ভগিনীর মধুর মিলন, কতই প্রীতি, কত হরষ!
এ যে গভীর স্নেহের বাঁধন, তুলনা তার কই বা মেলে;
মাতৃ-গর্ভে ভিত্তি যে এর, বড়ই কঠিন যায় না গলে'।
যম-যমুনার এই যে প্রীতি, মানব যে তা' নিল বরি'—
বরষ পরে ঘরে ঘরে উৎসবের এই ছড়াছড়ি।
যমের দ্বারে কাঁটা দিয়ে ফোঁটায় করে বিপদ্ হরণ,
মায়ের পেটের ভাই যে আমার, ভগিনীর সে বড়ই আপন!
হোক্ না কেন অমিল যত, সেদিন তবু বাজবে প্রাণে
শৈশবেরি মধু-স্মৃতি, সোনার স্বপন এই লগনে।

বিধির বাঁধন, কালের বশে কারো কারো যায় বা খুলে',
কেউ বা রাখে চিরতরে, সত্যি বা কেউ গেছে ভুলে'।
ভাইয়ের দুখে দুখটি বড়, ভাইয়ের সুখে বুকটি ভরে,
ভাইয়ের চোখে জল দেখিলে চোখ থেকে জল আপনি ঝরে।
এতই মধু, এমন মধুর' হয় সে গরল কেমন করে'!
এক আধারে, এক আগারে, এক সুধাতে জীবন গড়ে।
সমান ব্যথার ব্যথী সে ভাই, বোন তো অপর করতে নারে—
চির স্নেহের আসন পাতা বোনের বুকে গোপন ঘরে।
'ভাই' কথাটি বড়ই স্নেহের, বল্লে পরে জগৎ ভোলে।
ভাইটি বলে' ডাক্‌লে পরে কেউ পড়ে না কোন গোলে।

ভেবে দেখ নীলাচলে ভাই-ভগিনীর মধুর মিলন—
বহু যুগের সাক্ষিরূপে জুড়ে' আছে বিশ্বভুবন।

# ব্রহ্মসূত্র

( দ্বিতীয় পাদ )

শ্রীমতিলাল রায়

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের চারিটী পাদে বেদান্তের ব্রহ্মলিঙ্গ শব্দগুলি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুর বাচক নহে, ইহাই প্রমাণ করা হইয়াছে। প্রথম পাদে ব্রহ্মই জগৎকারণ, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী নিত্য ও সর্ব্বজ্ঞ, এইরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। শ্রুত্যুক্ত যে শব্দ অন্য অর্থে যুক্ত হইতে পারে, এইরূপ সংশয়ের সম্ভাবনা আছে, হেতু-প্রদর্শন দ্বারা তাহা ব্রহ্মপর প্রমাণ করা হইয়াছে। অতঃপর যে সকল শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মভাব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে না, যেগুলি সহজেই ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নির্দ্দেশ করিতেছে বলিয়া সন্দেহের উদ্রেক হয়, সেই সকল শ্রুতি-বাক্যের ব্রহ্মপরতা-নির্ণয়ের জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদের অবতারণা করা হইতেছে। যথা—

### সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥১॥

সর্ব্বত্র ( সর্ব্ববেদে ) প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম উপদেশাৎ ( প্রসিদ্ধ ব্রহ্মই উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে),—এই হেতু উপনিষদে ব্রহ্মই উপাস্য, অন্য কিছু নহে, ইহাই নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

ছান্দোগ্যোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" ইত্যাদি। অর্থাৎ এই সবই ব্রহ্ম। কেন? তজ্জ—তাঁহাতেই জন্ম। তল্ল—তাঁহাতেই লীন। তদন্—তাঁহাতেই স্থিত হয়। এই হেতু শান্ত সমাহিত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে।

উপনিষদের এই উপদেশ পরম ব্রহ্মের উপাসনা না হইয়া শান্ত সমাহিত চিত্তে জীবের উপাসনা, এইরূপ সংশয়ও হইতে পারে। কেননা, শ্রুতি বলিয়াছেন "এষ আত্মাঽন্তর্হৃদয়ে ঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বেতি"—হৃদয়মধ্যস্থিত আত্মা ব্রীহি বা যব অপেক্ষা সূক্ষ্ম। এই উক্তি অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মে কেমন করিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে? উত্তরে বলা যায়—উপনিষদে একথাও আছে, তিনি পৃথিবী অপেক্ষা, আকাশ অপেক্ষা বড়, পরিচ্ছিন্ন জীবে ইহাও তো উপপন্ন হয় না। ইহার প্রত্যুত্তর—একই বস্তুতে পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ সম্ভব হইতে পারে না; হয় অণুত্ব নতুবা বৃহত্ত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। "প্রথমশ্রুতত্বাদণীয়স্ত্বং যুক্তং" অর্থাৎ প্রথম-শ্রুত ব্রহ্মলিঙ্গ অণুত্ব শব্দে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। অতএব বৃহত্ত্ব-ধর্ম্মটীকে আপেক্ষিকরূপে গ্রহণ করিয়া, জীবে ব্রহ্মভাব থাকায় জীবকেই বড় বলা হইয়াছে, ইহাও সিদ্ধান্ত হইতে পারে। তাই এইরূপ শ্রুতিবাক্য জীববোধক, ব্রহ্মবোধক নহে। পূর্ব্বপক্ষের এই কথার উত্তরে বলা যায় যে, সমুদয় বেদান্তে জগতের জন্মহেতুতারূপ প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবাক্যের উপদেশ আছে, তাহা জীবের পক্ষে প্রযুজ্য নহে। এই হেতু উপাসনা জীবের নহে, ব্রহ্মেরই।

শ্রুতি সর্ব্বত্র বলিয়াছেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" সমস্ত বেদান্তে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের কথাই উপদিষ্ট হইয়াছে। যিনি জগৎকারণ, মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট, তাঁহারই উপদেশ করা হইয়াছে। তিনি সর্ব্ব; এইহেতু অণুত্ব ও বৃহত্ত্ব বিশেষণ তাঁহাতে বিরুদ্ধ ভাব সৃজন করে না—যেমন জগৎপতিকে অযোধ্যাপতি বলা দুষ্য নহে; বরং সর্ব্ববেদে ব্রহ্মবাচক শব্দকে জীববাচক বলায় প্রকৃত-হান ও অপ্রকৃত-প্রক্রিয়া দোষ জন্মে। এই হেতু উপাস্য জীব নহে, ব্রহ্ম।

### বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥২॥

বিবক্ষিত ( উপাসনার্থ বর্ণিত ) গুণাঃ ( গুণসকল ) উপপত্তেশ্চ ( তাঁহাতেই উপপন্ন হয় )।

অর্থাৎ উপাসনার্থ যে সকল গুণ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা পরম ব্রহ্মেই সঙ্গত হয়, এই হেতু।

স্মৃতিতে আছে "মনোময়স্ত্বং হ্যমনাস্ত্বমেব মনোবিশিষ্টঃ পুনরেব দেব।" অর্থাৎ হে দেব, তুমিই মনোময়, তুমি অমনাঃ; আবার তুমিই মনোবিশিষ্ট। এইরূপ গুণবিবক্ষা শব্দ-ব্রহ্মের উদ্দেশেই উক্ত হওয়ায়, মনোময়, প্রাণময়, চৈতন্যঘন প্রভৃতি গুণবর্ণনা পরম ব্রহ্মেই উপপন্ন হইয়াছে।

বেদ অপৌরুষেয়। "বক্তুরিচ্ছা বিবক্ষিতাঃ।" বক্তার

অভীষ্টরূপে কথিত যাহা, তাহাকেই বিবক্ষিত বলা যায়। বেদের বক্তা নাই, গুণবিবক্ষা তবে কাহার? ইহার উত্তর—যাহা উপাদেয়, তাহাই লোকব্যবহারে বিবক্ষিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে। শব্দজ্ঞাপ্য বস্তুই উপাদেয়। বেদে যাহা উপাদেয়, তাহাই বিবক্ষিত হইয়াছে। অতএব শ্রুতিতে যে সকল গুণ বিবক্ষিত, তাহা ব্রহ্মেই প্রযুজ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন "তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমিই কুমারী" ইত্যাদি। আবার বলিয়াছেন, "সর্ব্বতঃপাণিপাদস্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।" আবার এ কথাও শ্রুতিতে উক্ত আছে, তিনি অপ্রাণ, অমনাঃ ও শুভ্র। আবার তাঁহাকে মনোময়-প্রাণশরীরও বলা হইয়াছে। শ্রুতির এই যে গুণবিবক্ষা, উহা পরম ব্রহ্মের উপাসনার জন্যই উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

## অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥৩॥

তু (অবধারণার্থে) অনুপপত্তেঃ (যেহেতু মনোময়াদি গুণ জীবে উৎপন্ন হয় না, সেই হেতু) ন শারীরঃ (উপাস্য পুরুষ জীব নহে।)

পূর্ব্বে ব্রহ্মে বিবক্ষিত গুণের সঙ্গতি দেখান হইয়াছে, সেই সকল গুণ জীবে সম্ভব নহে। সর্ব্বগত, নিত্য বা নিত্যতৃপ্ত, পৃথিব্যাদি হইতে জ্যেষ্ঠ—এই সকল গুণ জীবস্বভাবে সম্ভব নহে। যদি বলা যায়—ঈশ্বর যখন সর্ব্বময়, তিনিও তো শারীর হইতে পারেন। ইহা সত্য বটে; কিন্তু তিনি শরীরের বাহিরেও আছেন। জীব কিন্তু কেবল মাত্র শরীরে, অন্যত্র নাই। জীব ভোগাধারে বদ্ধ, অন্যত্র বিস্পষ্ট। এই জন্যই জীব শারীর। ঈশ্বর অন্তরীক্ষ অপেক্ষা বড়, আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য।

## কর্ম্ম-কর্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥৪॥

কর্ম্ম-কর্ত্ত (প্রাপ্য ও প্রাপক) ব্যপদেশাৎ (কথিত হইয়াছে, এই হেতু) উপাস্য ব্রহ্ম জীব নহে।

অর্থাৎ শ্রুতিতে উপদেশ আছে—আমি দেহপাতের পর ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই কথায় উপাসক জীবের প্রাপকত্ব ব্যক্ত হইতেছে। এই হেতু বুঝিতে হইবে—জীব ও ব্রহ্ম পরস্পর ভিন্ন না হইলে, উপাস্যোপাসক ভাব সংঘটিত হয় না। অতএব উপাস্য ব্রহ্ম জীব নহেন।

## শব্দবিশেষাৎ ॥৫॥

শব্দ অর্থাৎ (শারীর শব্দ হইতে) বিশেষাৎ মনোময়ত্বাদি-বিশিষ্ট উপাস্য শব্দের ভিন্নতা হেতু।

অর্থাৎ "এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়ে"—শ্রুতি বলিতেছেন, এই আত্মা আমার হৃদয়ে। 'মে' এই শব্দ ষষ্ঠীবিভক্তিযোগে সাধিত হইয়াছে। আর আত্মা প্রথমাবিভক্ত্যন্ত। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, শব্দের প্রয়োগভেদ থাকায় জীব ও ব্রহ্ম পরস্পর ভিন্ন। এই হেতু মনোময়ত্বাদি গুণ জীবে লক্ষিত হয় নাই। জীব কখনও জীবের উপাসনা করে না; অতএব উপাস্য পরমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে।

## স্মৃতেশ্চ ॥৬॥

স্মৃতিতেও এই কথা আছে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুনতিষ্ঠতি" অর্থাৎ ভগবান সমুদয় জীবের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন এবং "ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া" অর্থাৎ তিনি যন্ত্রারূঢ় সমস্ত ভূতকে মায়ার দ্বারা পরিচালিত করিতেছেন। ইহা হইতেও জীব ও ব্রহ্ম উভয়ের ভেদ সুস্পষ্ট হয়।

## অর্ভকৌকস্ত্বাৎ তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতিচেৎ,

## ন নিচায্যত্বাদেবং; ব্যোমধচ্চ ॥৭।

অর্ভকত্ব (অল্পত্ব) ওকস্ত্ব (নীড়ত্বরূপে) তদ্ব্যপদেশাৎ (সেই ব্রহ্মের কথন হেতু) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না, বলিতে পার না।) (কেন?) নিচায্যত্বাৎ (যেহেতু তিনি হৃৎপদ্মমধ্যে উপাস্যরূপেও উপদিষ্ট হন) এবং ব্যোমবৎ চ (আকাশদৃষ্টান্তেও সঙ্গত হইয়া থাকেন)।

অর্থাৎ—আত্মা ব্রীহি অপেক্ষাও অল্প। এইরূপ শ্রুতি-বচন থাকায় কেহ যদি মনে করেন—সূক্ষ্ম জীবই শ্রুতির উপদেশ্য, এই সূত্রে সেই ভ্রান্তি নিরসিত হইয়াছে। ব্রহ্ম সর্ব্বগত। আকাশের ন্যায় বৃহৎ। তবে যে তাঁহার হৃদয়পদ্ম মধ্যে সন্দর্শনের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, উহা আর কিছুই নহে; যেমন শালগ্রাম শিলার উপর সহস্রশীর্ষ পুরুষ বিষ্ণুবুদ্ধি জাগ্রত করার প্রয়াস করা হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ। হৃৎপ্রদেশ জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। সর্ব্বগত ঈশ্বরের ধারণা এই স্বল্পস্থানে স্থির করিয়া, জীব বিরাটের

অনুভূতি লাভ করে; পরন্তু জীবের উপাসনা শ্রুতিতে নাই, পরম ব্রহ্মের উপাসনার কথাই বেদ-প্রসিদ্ধ।

এই সাতটী সূত্র দ্বিতীয় পাদের মূল ভিত্তি। অবশিষ্ট-গুলি গৌণ। এই কয়টী সূত্রে জীবে ও ব্রহ্মে যথেষ্ট ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্মে যে ঐক্য, তাহা ভাবৈক্য, বস্তুতঃ নহে। অথচ ব্রহ্মের সগুণত্ব, বিভূত্ব ও বিশেষত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্ম বিরাট্; জীব অণু। ব্রহ্মস্বভাব জীবের সাধ্য।

ব্রহ্মস্বভাব জীবে যদি সম্ভব হয়, তবে তাহার দুঃখ কিসের? ব্রহ্ম চিদানন্দময়। একথা শ্রুতিসিদ্ধ। তবে জীব কেন তাহার অধিকারী না হয়? তাহার কারণ—ব্রহ্মস্বভাবপ্রাপ্তির অভাব হেতু এরূপ হয়। এই অভাব-নিরসনের উপায় ক্রতু। ক্রতু অর্থে ধ্যান বা উপাসনা। ঈশ্বরভক্তিরূপ আত্মসমর্পণ ইহার পরিণাম। জীবের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির কথা গীতায় বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। জীবের তুচ্ছত্ব খণ্ডন করিয়া, তাহার স্বরূপকে পাওয়ার সন্ধান ব্রহ্মসূত্র দিয়াছে। এই সাতটী সূত্রে জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য নিরূপণ করিয়া এই তত্ত্ব সবিশেষ বুঝাইবার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হইল।

প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্ম ভিন্ন যখন বস্তু নাই, তখন জীবের সহিত পরমাত্মার বৈশিষ্ট্য থাকে কেমন করিয়া? ইহার উত্তর পরবর্ত্তী সূত্রে মিলিবে।

জীবে ও ব্রহ্মে যে যুক্তি, তাহা একে অন্যের লয় নহে। মোক্ষ ও মায়াবাদের কুহকে সাধনপথে এই মারাত্মক ভুল করিয়া একটা জাতি আজ উৎসন্নের পথে। মূলতঃ এক যে বহু হইয়াছে, তাহা বহুর ইচ্ছায় নহে, একেরই ইচ্ছায়। এক বহুত্বে রূপায়িত হয় মাত্র। একের সহিত বহুর যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহা শাশ্বত। কেননা, ইহা অনাদি ইচ্ছাপ্রসূত।

বহুর মধ্যে সেই একই আছেন, ইহা সত্য। কিন্তু সেই বহুগত একের অর্থাৎ বহুর মধ্যে যিনি অণু, তাহার বিভুত্ব নাই, আছে সেই অদ্বয় একের স্বভাবত্ব ও দাসত্ব। এই বোধই পরম বিদ্যা। ক্রতুর দ্বারা এই বোধের উন্মেষ যেখানে হয়, জীব পায় পরম গতি, ব্রহ্মভাব। মর্ত্ত্যজীবের ইহাই লক্ষ্য। অতঃপর জীব ও ব্রহ্মের প্রভেদ প্রদর্শিত হইতেছে।

### সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতিচেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ ॥৮॥

সম্ভোগপ্রাপ্তি (সুখদুঃখাদিপ্রাপ্তি হয়) ইতি চেৎ (এরূপ যদি বলি?) ন (তাহা বলিতে পার না) (কেন?) বৈশেষ্যাৎ (যেহেতু জীব ও ব্রহ্মে পরস্পর পার্থক্য আছে) ভোগেরও পার্থক্য এই হেতু।

শ্রুতি বলিয়াছেন, "পরমাত্মা ভিন্ন পৃথক্ দ্রষ্টা ও শ্রোতা নাই।" এই কথায় কি ইহাই বুঝায় না যে, জীবের মত পরমাত্মারও ভোগ আছে? হাঁ, আছে বটে, কিন্তু এই ভোগের প্রকারভেদ আছে। কেননা, জীবের সহিত ব্রহ্মের যে প্রভেদ, তাহাতে জীবভোগ ব্রহ্মে নাই। জীব যে ভাব, ব্রহ্ম তাহার অতীত। অতএব জীব ও ব্রহ্মের ভোগ আকাশপাতালের ন্যায় ভেদযুক্ত। 'তত্ত্বমসি' বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এই মহামন্ত্রে জীব আত্মস্বরূপের সাধন করে। যেহেতু, জীবের স্বরূপ ব্রহ্ম। এই চৈতন্য জাগ্রত হইলে, জীব ও ব্রহ্মে অভিন্ন বোধ জন্মে, পরন্তু জীব ব্রহ্ম হয় না। জীব-স্বভাবের নিবৃত্তিই ব্রহ্ম-বোধের হেতু। যেমনটী হইলে ব্রহ্মের জীবত্ব ঘটে, ব্রহ্ম তেমনটী হইয়াই জীবজন্ম গ্রহণ করেন। জীব ও ব্রহ্ম এক নয়—পরস্পর যে বৈশিষ্ট্য, তাহাই সৃষ্টিলীলা। ব্রহ্মের ইহা ভ্রম বা কল্পনা বলিতে পার। কিন্তু ইহা ব্রহ্মের সনাতন ইচ্ছা। ভ্রমকল্পিত সর্প যেমন রজ্জু হইতে পারে না; ব্রহ্মকল্পিত জীব তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে পারে না। জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য চিরাচরিত নিত্য।

আরও দৃষ্টান্ত আছে।

### অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥৯॥

অত্তা (যিনি ভক্ষণ করেন, তিনিই অত্তা। কি ভক্ষণ করেন?) চরাচর (স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই চরাচর জগৎ) গ্রহণাৎ (ভক্ষণাৎ) (ভক্ষণ করেন) অর্থাৎ আত্মসাৎ করেন, এই হেতু অত্তা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ নহেন।

কঠোপনিষদুক্ত যে ব্রহ্মের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ওদন-স্বরূপ এবং মৃত্যু উপসেচন সেই ব্রহ্মকে কিম্বা তাঁহার

অবস্থান-ক্ষেত্র কে জানিতে সমর্থ হয়? এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জগৎ-শব্দের উপলক্ষ্য স্বরূপ হইয়াছে। মৃত্যুর উপসেচনে এই ভক্ষক পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কর্ত্তা পরমাত্মা, সমুদয় বেদান্তেই এ কথা প্রসিদ্ধ। জীব পরিমিত—তার ভোগও পরিমিত হইয়া সুখ-দুঃখাদি রূপ ধরে। ঈশ্বর ভোক্তা সে ভোগে দ্বন্দ্ব নাই—উহা আনন্দ, ব্রহ্ম তাই আনন্দভুক্।

## প্রকরণাচ্চ ॥১০॥

এইরূপ প্রকরণ শ্রুতিতে দেখা যায়।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ। সেই বিপশ্চিৎ জন্মেন না, মরেনও না। যিনি প্রকৃত প্রকরণ-প্রতিপাদ্য, তিনিই অত্তা।

## গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥১১॥

গুহাং (হৃদয়গুহায়) প্রবিষ্টাবাত্মানৌ (দুইটী আত্মার অবস্থিতি) হি (যেহেতু) তৌ (তাহারা দুইজনেই আত্মা—এক জীব, অন্য ব্রহ্ম) তদ্দর্শনাৎ (তাহা শ্রুতিতে উল্লিখিত হেতু)।

অর্থাৎ কঠশ্রুতি জীব ও ব্রহ্ম, দুইটীকেই গুহা-প্রবিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। কিন্তু ছায়া ও আতপের ন্যায় ইহারা পরস্পরবিশিষ্ট। এ কথাও উহাতে উক্ত হইয়াছে। একটী জীব। অন্যটী কি পরমাত্মা? এই সংশয়-নিরসনের জন্য শ্রুতির বচনই স্মরণীয়। 'অদিতি দেবতাময়ী গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী' ইত্যাদি অর্থাৎ দেবতাময়ী অদিতি গুহায় প্রবেশ করিয়া অবস্থিতি করেন। তারপর গুহাহিত চিরবিদ্যমান দেহমধ্যে অবস্থিত যিনি, ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে মনন করিয়া হর্ষ-শোক পরিহার করেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, এই দুই আত্মা জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। আরও প্রমাণ আছে। যথা—

## বিশেষণাচ্চ ॥১২॥

গন্তা ও গন্তব্য এবং মন্তা ও মন্তব্য রূপে বিশেষিত হওয়া হেতু জীব ও পরমাত্মা সম্বন্ধেই সঙ্গত হয়। অর্থাৎ জীবই গন্তা। পরমাত্মা তাহার গন্তব্য। 'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ' ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা শরীর-বুদ্ধি-মনাদি-সমন্বিত জীবাত্মাকে গন্তারূপে পরিকল্পিত করিয়া "সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মাকেই গন্তব্যরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এবং "তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি" অর্থাৎ ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগসাহায্যে সেই দুর্দ্দর্শনীয়, রহস্যময়, শরীরমধ্যস্থিত গুহাহিত পুরাণ পুরুষশ্রেষ্ঠকে জানিয়া হর্ষ ও শোক হইতে মুক্ত হন। এই প্রকরণে মন্তা বা মননকর্ত্তা জীব এবং মননের অবলম্বন রূপ ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন।

## অন্তর উপপত্তেঃ ॥১৩॥

অন্তর (অক্ষির অন্তর পরমাত্মা, কেন?) উপপত্তেঃ (ইহাই উপপন্ন হইতেছে)।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে; এই যে পুরুষ নেত্রগোলকে দৃষ্ট হইতেছেন, ইনিই আত্মা! ইহাকেই অমৃত, অভয় ও ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। এই অক্ষি-পুরুষকে অন্য কিছু মনে করার হেতু নাই। জীব বা অন্য কিছুতে ব্রহ্মত্ব ও অমৃতত্ব প্রতিপন্ন হয় না। বৃহদারণ্যকেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

## স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥১৪

আদি শব্দের দ্বারা স্থান, নাম ও রূপাদি গ্রাহ্য হইতেছে, এইরূপ কথন থাকা হেতু।

শ্রুতিতে ধ্যানের জন্য স্থান, নাম ও রূপের উপদেশ আছে। এ ক্ষেত্রে স্থান বিশেষের যে উল্লেখ, তাহা উপাসনার জন্যই বলা হইয়াছে। প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন—আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম চক্ষুঃ-রূপ অল্প স্থানে বাস করেন কেমন করিয়া? এইরূপ উপদেশ বহু ক্ষেত্রেই আছে। যিনি চক্ষুর মধ্যে, তিনি আবার সর্ব্বব্যাপী। পৃথিবীপতি অযোধ্যাপতি যেমন হইতে পারেন; সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নয়নমণি হইবেন না কেন? স্মৃতিও বলিয়াছেন, আমিই চক্ষু, আমিই দৃষ্টি ইত্যাদি।

## সুখবিশিষ্টাভিধানাদেবচ ॥১৫॥

সুখবিশিষ্ট (সুখগুণযুক্ত ব্রহ্ম) অভিধানাৎ এবচ (এইরূপ কথন হেতুও)।

অগ্নিদেবতা উপকোশলের প্রশ্নে সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মই প্রাণ, ব্রহ্মই আকাশ, ব্রহ্মই সুখ।

তারপর বলেন, গুরু তোমায় ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ বলিবেন। গুরু চক্ষুস্থ পুরুষের উপদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন "যঃ এষোঽক্ষিণি"। এই হেতু এই স্থাননির্দ্দেশ অক্ষিতে জীব প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করিয়া নহে। চক্ষুঃস্থ সেই পুরুষ, যিনি চক্ষুও বটেন, দৃষ্টিশক্তিও বটেন; অন্য কেহ নহেন। তিনিই সুখ ব্রহ্ম—কেননা "প্রকৃত পরিগ্রহস্য ন্যায্যত্বাৎ" অর্থাৎ যাহা প্রকৃত যাহার প্রস্তাব তাহাই তদনুসঙ্গিক বাক্যের অর্থ—ইহা ন্যায় সঙ্গত। গীতায়ও আছে "সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে"।

শ্রুতোপনিষৎক-গত্যভিধানাচ্চ ॥১৬

শ্রুত উপনিষৎ (উপনিষৎ-রহস্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তির) ক গতি (যে গতি) অভিধানাৎ (তাহারও সেই গতি এইরূপ কথিত হওয়া হেতু।

চক্ষুঃস্থ পুরুষ ব্রহ্ম। ইহা সিদ্ধ হইল। যে পুরুষকে সূর্য্য বা অগ্নি বলা হইয়াছে, সেই পুরুষই চক্ষুঃস্থ, এই কথাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গের উপসংহারসূত্র—

অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥ ১৭

ইতর ন অপর (অর্থাৎ প্রতিবিম্ব বা অপর কেহ নহেন) অনবস্থিতেঃ (উহাদের কেহই নিত্য অবস্থিত নয়) চ (আরও) অসম্ভবাৎ (পূর্ব্বে যে অমৃতত্বাদি গুণ বলা হইয়াছে, তাহাও উহাতে সম্ভব হয় না)।

চক্ষে কাহারও যখন প্রতিবিম্ব পড়ে, সে সর্ব্বদা সম্মুখে থাকে না। জীবাত্মা বা সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ সতত চক্ষুতে অবস্থিত নহে। এই চক্ষুঃস্থ বস্তু ব্রহ্ম বলার মূল কারণ "চক্ষুষঃ চক্ষুঃ"—নয়নের সেই দৃষ্টিশক্তির মূল উৎসকেই বলা হইয়াছে। ইনি অন্তর্য্যামী পরম ব্রহ্ম।

অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাধিলোকাদিষু তদ্ধর্ম্ম-
ব্যপদেশাৎ ॥১৮॥

অধিদৈবাদিষু (পৃথিবী-দেবতাদি অধিষ্ঠানে) অন্তর্য্যামী (নিয়ন্তা পরমেশ্বর)। (কেন?) তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ (পরমেশ্বরের ধর্ম্মনির্দ্দেশ হেতু)।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে অন্তর্য্যামী নামে যে শব্দ কথিত হইয়াছে, তাহা পরমেশ্বর নামেই প্রযুজ্য; যেহেতু এই উপনিষদে অন্তর্য্যামীর যে সকল গুণ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরেরই গুণ। শ্রুতি বলেন, যিনি ইহলোক, পরলোক ও ভূতসকল নিয়ন্ত্রিত করেন, যিনি পৃথিবী হইতে ভিন্ন অথচ পৃথিবীতেই অবস্থান করেন, পৃথিবীর যিনি অন্তর এবং বাহির অথচ পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, তিনিই পৃথিবীকে নিয়মিত করেন; তিনি তোমার আত্মা, অমৃত, ও অন্তর্য্যামী।

এই অন্তর্য্যামী অধিদৈবাদি বলায় অধিলোক, অধিবেদ, অধিযজ্ঞ, অধিভূত ও অধ্যাত্ম অধিদেবের সহিত কোন এক পদার্থকে অন্তর্য্যামী নামে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে কিনা, এই সংশয় খুবই স্বাভাবিক। যিনি সকল দেবতায় আছেন, তিনি অধিদৈবত। সকল লোকে যিনি বিদ্যমান, তিনি অধিলোক। বেদে অবস্থিত যিনি, তিনি অধিবেদ। সমস্ত যজ্ঞে যিনি অবস্থান করেন, তিনি অধিযজ্ঞ। সকল ভূতে যিনি, তিনি অধিভূত। আত্মায়, প্রাণে, মনে ও বুদ্ধিতে যিনি, তাঁহাকেই অধ্যাত্ম বুঝায়। অন্তর্য্যামী শব্দটীর সহিত পরিচয় এই প্রথম। কাজেই এই অন্তর্য্যামী পরমাত্মা কিনা, তাহার বিচারের প্রয়োজন আছে।

কিন্তু নামটী অপ্রসিদ্ধ ও অপরিচিত হইলেও, উহার স্থান অন্তরে; এবং উহার কর্ম্ম নিয়মিত করা—এই দুই গুণ থাকায় ইনি একেবারেই অজ্ঞাত নহেন। তবে এই নাম পরমাত্মার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা, তাহাই বিচার্য্য। শ্রুতিতে এ কথাও আছে—'পৃথিব্যেব যস্যায়তনমগ্নির্লোকো মনো জ্যোতিঃ'—পৃথিবী যাঁহার শরীর, অগ্নি চক্ষু; জ্যোতিঃ মন ইত্যাদি। এইরূপ কোন দেবতার অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত করা অযুক্ত নহে। ইহা ব্যতীত যোগীও সর্ব্বশরীরে প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। এই হেতু অন্তর্য্যামী হয় কোন দেবতা, নয় কোন যোগী হইবেন। অধিদৈবাদি শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনিই আত্মা ও অমৃত বলিয়া উক্ত হওয়ায়, কোন বিশেষ দেবতায় অন্তর্য্যামী শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না। যিনি সকল দেবতায়, সকল লোকে ও বেদাদিতে, তিনি কোন

প্রধান দেবতা কেমন করিয়া হইবেন? ইহা পরমাত্মারই গুণ, এই হেতু ঐ অন্তর্য্যামী পুরুষ পরমেশ্বর বিনা অন্য কেহ নহেন।

নচ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাচ্ছারীরশ্চ ॥১৯

স্মার্ত্তং (সাঙ্খ্যস্মৃত্যুক্তং প্রধানং) ন (অন্তর্য্যামী শব্দের দ্বারা তাহা হইতে পারে না। (কেন হইতে পারে না?) অতৎ-ধর্ম্ম (অপ্রধানের ধর্ম্ম) অভিলাপাৎ (কথিত হইয়াছে)।

অর্থাৎ সাঙ্খ্যদর্শন এবং স্মৃতিশাস্ত্রের প্রধান এই অন্তর্য্যামী হইতে পারেন না। অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কেহ শুনিতে পায় না; তিনি কিন্তু সকলকেই দেখেন, সকলই শুনিতে পান। তিনিই দ্রষ্টা ও শ্রোতা, তিনি ভিন্ন আর কোন বিজ্ঞাতা নাই। এই হেতু সাংখ্যকথিত জড়স্বভাবা প্রকৃতি অন্তর্য্যামী নামে অভিহিত হইতে পারে না।

শারীরশ্চোভয়েঽপিহিভেদেনৈনমধীয়তে ॥২০

শারীরশ্চ (জীবেরও অর্থ অন্তর্য্যামী নহে, কেন নহে?) উভয়েঽপি (উভয় শাখাতেই অর্থাৎ কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন সম্প্রদায়ে) ভেদেন (বিভিন্নরূপে) এনং (জীব) অধীয়তে (পঠিত হইয়া থাকে)।

জীবেরও দ্রষ্টৃত্বাদি গুণের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু উপাধিপরিচ্ছিন্ন জীব অধিদৈবাদিতে প্রবেশও করিতে পারে না, তাহার পক্ষে নিয়ন্ত্রণেও সম্ভব নহে। ইহা ব্যতীত জীব যে অন্তর্য্যামী নহে, তাহার অন্য হেতুও আছে।

বৃহদারণ্যকে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন এই দুই শাখায় অন্তর্য্যামী হইতে জীব বিভিন্ন বলিয়া গীত হইয়াছে। অতএব জীবকে অন্তর্য্যামী নামে অভিহিত করিলে শ্রুতি-বিরুদ্ধ হইবে।

অদৃশ্যত্বাদি গুণকোধর্ম্মোক্তেঃ ॥২১

অদৃশ্যত্বাদিগুণকো (অগ্রাহ্যত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট) ধর্ম্মোক্তেঃ (পরমেশ্বর-ধর্ম্ম কথন হেতু অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর)।

মুণ্ডক শ্রুতিতে যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য প্রভৃতি বিশেষণে কথিত হইয়াছেন, তিনি পরমেশ্বর। কেননা, ঐ শ্রুতিতে পরমেশ্বরের অসাধারণ ধর্ম্মেরই উপদেশ আছে; তিনি 'অগোত্রং', 'অবর্ণং' এবং 'ভূতযোনি'। ভূতযোনি বলায়, ইহা প্রধান অর্থেও গৃহীত হইতে পারে। জীবও ভূতযোনি, কেননা জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মই ভূতোৎপত্তির নিমিত্ত কারণ। এরূপ অর্থ অবান্তর; কেননা, শ্রুতিতে এইরূপ উপদেশ আছে, সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্ পরমাত্মা হইতেই ত্রিগুণাত্মক প্রধানের অবস্থান হইয়াছে। অতএব ইনি সেই পরম ব্রহ্মই। কেননা, প্রধানও অচেতন, জীবও উপাধিপরিচ্ছিন্ন—এই হেতু জীবের ও প্রধানের সর্ব্বজ্ঞতা অসম্ভব। এই ভূতযোনি ব্রহ্ম, তাহা সনৎকুমারের উপদেশেও ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "অক্ষরাৎপরতঃপরঃ"—অক্ষরের পরবর্ত্তী যিনি তিনিই পর।

শ্রুতিতে দুই প্রকার বিদ্যার কথা আছে—পরা ও অপরা। অপরা বিদ্যা ঋগ্বেদাদিরূপা। আর পরা—যাহার দ্বারা অক্ষর পুরুষ অবগত হওয়া যায়। অপরা বিদ্যায় অভ্যুদয় ও পরা বিদ্যায় নিঃশ্রেয়স্ বা মুক্তিলাভ হয়। গীতায় ক্ষর ও অক্ষর ব্রহ্মের কথা আছে। অপরা বিদ্যায় পর ব্রহ্ম ও পরা বিদ্যায় অক্ষর ব্রহ্ম উপলব্ধিগম্য হয়।" "অর্থ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" অর্থাৎ যাহারা সেই অক্ষর অবগত হয়, তাহাই পরা—

এই অক্ষরই কি ভুত যোনি—শ্রুতি ইহাকে নিত্য বিভু সুসূক্ষ্ম বলিয়াছেন। ভুতযোনি প্রধান নহে, কেননা সহাকেই শ্রুতি বলিয়াছেন 'অদৃষ্টো দ্রষ্টা" প্রধানের দ্রষ্টৃত্ব নাই।

আচার্য্য শঙ্কর এই ভুত যোনিকে অক্ষর বলিয়াছেন তাঁর যুক্তি—বিদ্যা যখন পরাপর ব্যতীত তৃতীয় নাই তখন পর বিদ্যায় যে অক্ষর ব্রহ্ম জানা যায় সেই অক্ষরই ভুত যোনি—

এই যুক্তি সমিচীন নহে, আচার্য্য মায়াবাদী, তিনি নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্ম অতিক্রম করিয়া "অক্ষরাৎ পর" তে উপনীত হইতে ইচ্ছা করেন নাই। অধ্যাকৃত নামরূপ বীজশক্তিরূপ সূক্ষ্ম অক্ষর ব্রহ্ম—ঈশ্বর আশ্রয়ে উপাধিভূত হইয়া করে পরিণত হন—এই অক্ষরের অতীত যিনি তিনিই শ্রুতির ভূতযোনি পরমাত্মা। শ্রুতিতে বলিতেছেন "তস্মাৎ পরতঃপর ইতি ভেদেন ব্যপদেশাৎ পরমাত্মানঃ ইহ বিবক্ষিতং দর্শয়তি"—এই পরমাত্মাই

গীতার পুরুষোত্তম ? জীব ও প্রধান ক্ষরাক্ষররূপে গীতায় কথিত হইয়াছে। পরা ও অপরা বিদ্যা ব্যতীত আর বিদ্যা নাই, ইহা সত্য; এই দুই বিদ্যাই জীবের কাম্যফলসিদ্ধির উপায়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "অবিদ্যয়া মৃত্যুংতীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃত্যুমশ্নুতে।" প্রথমটী জীবযন্ত্রণা হইতে মুক্তির উপায়। মৃত্যুংতীর্ত্বা। দ্বিতীয়ে আত্মজ্ঞানলাভ হয় (অমৃতমশ্নুতে)। ইহার পরও যে বিদ্যা, তাহাই ব্রহ্ম-বিদ্যা। এই বিদ্যায় অপরাকথিত সকল বৈদিক কর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্মরূপে পরিণত হইয়া জ্ঞান সমুচ্চয়িত হয়। গীতায় এইখানেই পুরুষোত্তমের দর্শন জীবের ব্রহ্ম প্রাপ্তির পরম লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে॥

উল্লিখিত শ্লোকোক্ত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত তত্ত্ব পুরুষোত্তমাতিরিক্ত কেহই হইতে পারে না; কারণ প্রকৃতি বা জীবের উক্ত বিশেষণসমূহের একান্ত অসম্ভাবই শ্রুত হইয়া থাকে।

বিশেষণ ভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ ॥২২॥

ইতরৌ চ (প্রধান বা জীব) ন (হইতে পারে না। কেন ?) বিশেষণ ভেদব্যপদেশাভ্যাম্ (বিশেষণের দ্বারা ভেদনির্দ্দেশ থাকা হেতু)।'

য সর্ব্বজ্ঞঃ—দিব্যহ্যমূর্ত্তপুরুষ' এই যে শ্রুতিবাক্য প্রকৃতি ও জীব হইতে ভেদই প্রতিপাদিত হইতেছে।

রূপোপন্যাসাচ্চ ॥২৩॥

রূপোপন্যাসাৎ চ (রূপের কথন হেতু ভূতযোনি পরমেশ্বর, ইহাই প্রমাণিত হয়)

শ্রুতি বলেন, স্বর্গ তাঁহার মূর্দ্ধা, চন্দ্র-সূর্য্য তাঁহার চক্ষুঃ ইত্যাদি যে রূপসৃষ্টি, তাহা হিরণ্য, শ্রুতি প্রসিদ্ধ অন্বয় ব্রহ্মেরই বর্ণনা। এ সমস্তই পুরুষ। এইরূপ উক্তি থাকায়, ভূতযোনি পরমেশ্বর ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

বৈশ্বানরঃ সাধারণ-শব্দ-বিশেষাৎ ॥২৪॥

বৈশ্বানরঃ (পরমেশ্বর) সাধারণ শব্দ (সাধারণ শব্দ হইলেও) বিশেষাৎ (বিশেষত্ব আছে)।

বৈশ্বানর শব্দটী শ্রুতিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈশ্বানর শব্দের অর্থ জঠরাগ্নি ও প্রসিদ্ধ অগ্নি এবং অগ্নিদেবতাকেও বুঝায়। শ্রুতি একথাও বলিয়াছেন, সেই অগ্নি বৈশ্বানর, যে অগ্নি দেহাভ্যন্তরে আছে ও যে অগ্নি ভুক্ত পরিপাক করে। এ ক্ষেত্রে বৈশ্বানর জঠরাগ্নিকেই বলা হইতেছে। আবার শ্রুতিতে ইহাও আছে—দেবতারা ভুবনের নিমিত্ত বৈশ্বানর অগ্নিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা ভূতাগ্নি। অন্যত্র আছে—বৈশ্বানর ভুবনের রাজা, ঈশ্বর ও সুখদাতা। এখানে বৈশ্বানরের অর্থ অগ্নিদেবতা। এইজন্য এই সূত্রের অবতারণা। যদিও বৈশ্বানর শব্দ তিনের বোধক, কিন্তু শ্রুতিতে যেমন বলা হইতেছে ঐ স্বর্গ বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, তখন এই বিশেষ উক্তি থাকাতে এই ক্ষেত্রে বৈশ্বানর পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ নহেন।

স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি ॥২৫॥

স্মর্য্যমাণং (স্মৃত্যুক্তরূপং) অনুমানং (শ্রুতি অনুমান করায় অতএব) স্যাৎ ইতি (বৈশ্বানর পরমেশ্বর, এই হেতু। এইখানে ইতি শব্দ হেত্বর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থ এই যে, যেহেতু স্মৃতি মূলশ্রুতির অনুমাপক ও পরমেশ্বর-বোধক, সেই হেতু বৈশ্বানর পরমেশ্বর।

শব্দাদিভ্যোঽন্তঃ প্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি চেৎ,
ন তথা, দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি
চৈনমধীয়তে ॥২৬॥

শব্দাদিভ্যোঃ (শব্দাদির হইতে অর্থান্তর প্রসিদ্ধ) তথা অন্তঃ প্রতিষ্ঠানাৎ (পুরুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত, এইরূপ উক্ত হওয়ায়) ন (বৈশ্বানর পরমেশ্বর নহে) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল), ন (ইহা বলিতে পার না)। (কেননা) তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ (সেই ক্ষেত্রে বৈশ্বানর পরমেশ্বরের দৃষ্টিরূপে উপদিষ্ট হওয়ায়) অসম্ভবাৎ (পরমেশ্বরত্ব-সিদ্ধি সম্ভব নহে) এবং পুরুষমপি চ অধীয়তে (বরং এই বৈশ্বানর পুরুষ রূপেই অভিহিত হইয়া থাকে)।

ইহার বিশদার্থ—বৈশ্বানর ও অগ্নি শব্দ পরমেশ্বর অর্থের বোধক নহে, বলিতে পার না—কেননা, ঐরূপ বলিলে শ্রুতিতে যে বৈশ্বানরকেই পরমেশ্বর বলা হইয়াছে, তাহাতে দোষ জন্মে।

পূর্ব্বপক্ষ বলিতে পারেন, বৈশ্বানর পরমেশ্বর নহেন। শব্দ ও অন্তরে তাঁর অবস্থান, শ্রুতির বাণী এই দুই কারণে বৈশ্বানর অন্য অর্থে প্রসিদ্ধ হইবে, পরমেশ্বরবোধক হইবে না। সূত্রে আদি শব্দ আছে, ইহাতে হৃদয় ও গার্হপত্যাদি গ্রহণীয়। শ্রুতিতে আছে—পুরুষের অন্তরে বৈশ্বানর। ইহা জঠরাগ্নির পক্ষেই সঙ্গত। আরও বলা হইয়াছে—স্বর্গ যাঁহার মস্তক। অতএব বৈশ্বানর পরমেশ্বর। পরমেশ্বর ও বৈশ্বানর দুই-ই বিশেষ। প্রথমটীতে গ্রাহ্য না হইয়া অন্য বিশেষ বৈশ্বানর অগ্রাহ্য হইবার হেতু কি আছে? উহা তো ভূতাগ্নিও হইতে পারে। বেদে অন্তরে ও বাহিরে ভূতাগ্নির বিদ্যমানতার কথাও আছে। স্বর্গলোক সম্বন্ধে কাহারও অবিদিত নাই। অতএব বৈশ্বানর অগ্নিদেবতার দ্যোতক। ইহার বিরুদ্ধে বক্তব্য—এইরূপ মনে করিবার হেতু নাই। বেদে যেমন ইহাও আছে—মনই ব্রহ্ম, এইরূপ ধারণায় ব্রহ্মের উপাসনা কর; এইরূপ জঠরাগ্নিতে উপহিত ঈশ্বরের উপাসনাও বেদে কথিত আছে। বৈশ্বানর জঠরাগ্নি হইলে, পুরুষান্তপ্রতিষ্ঠিত বলা যায় বটে, কিন্তু তাহাকে পুরুষ বলা যায় না। বৈশ্বানর দেবতা ও ভূতাগ্নি, এই দুই অর্থের বোধকও নহে। যজুর্ব্বেদের এই সূত্রই তাহা প্রমাণ করিবে। "স এষোঽগ্নির্ব্বৈশ্বানরো যৎ পুরুষঃ, স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ ইতি।" অর্থাৎ সেই এই অগ্নি বৈশ্বানরকে জানে ও উপাসনা করে, সে সর্ব্বভোগী হয়। এই কথার পর বৈশ্বানর জঠরাগ্নি প্রভৃতি আর হইতে পারে না।

অতএব ন দেবতা ভূতং চ ॥২৭॥

অতএব (এই হেতু অর্থাৎ ঐ সকল কারণে উক্ত) বৈশ্বানর ন দেবতা ন ভূতং চ (দেবতা ও অগ্নি, দুইই নহে।)

ভূতাগ্নি জড় বস্তু। আর দেবতাদির যে ঐশ্বর্য্য, তাহা পরমেশ্বরেরই অধীন। পরমেশ্বর সর্ব্বময়, সর্ব্বাত্মা; আর এই পরমেশ্বরকেই যজুর্ব্বেদে পুরুষবিধ বলা হইয়াছে। পুরুষবিধ শব্দের অর্থ পুরুষ-তুল্য। পুরুষের মস্তকাদি আছে, বৈশ্বানরেরও মস্তকাদি কল্পনা করা হইয়াছে। অতএব শ্রুত্যুক্ত বৈশ্বানর পরমাত্মা।

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥২৮॥

সাক্ষাদপি (জঠরাগ্নি-সম্বন্ধ বিনাও) অবিরোধং (ঈশ্বরোপাসনার বিরোধ হয় না) ইতি জৈমিনিঃ।

অর্থাৎ জঠরাগ্নিরূপ প্রতীক অবলম্বন না করিয়াও সাক্ষাৎভাবে পরমাত্মার উপাসনার ব্যবস্থা হইতে পারে, জৈমিনি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যিনি পুরুষ-বিধ ও পুরুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত বৈশ্বানরকে জানেন, এই কথায় বৈশ্বানরকে পুরুষ-তুল্যই বলা হইয়াছে। জঠরাগ্নি এই শ্রুতি বাক্যে প্রমাণিত হয় না। বৈশ্বানর শব্দের ব্যুৎ-পত্তি বিশ্ব অর্থাৎ সমস্ত নর-জীব—তদাত্মক যিনি, তিনিই বৈশ্বানর। অগ্নি শব্দ পরমেশ্বর অর্থে নীত হয়। অগ্‌+নি —অঙ্গয়তি প্রাপয়তি, কর্ম্মণঃ ফলং ইতি অগ্নিঃ। অতএব অগ্নিও পরমেশ্বরের তুল্য। এই সকল কারণে শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে যে, পুরুষ বৈশ্বানরকে জানে ও উপাসনা করে, সে সর্ব্বভোগী হয়, সে অগ্নি বা বৈশ্বানর পরমেশ্বর।

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥২৯॥

আশ্মরথ্যঃ (আশ্মরথ্য মুনি বলেন) অভিব্যক্তেরিতি (অভিব্যক্ত হওয়া হেতু তিনি প্রাদেশপ্রমাণ হন)।

ঈশ্বর অতিমাত্র সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু তিনি প্রাদেশ-প্রমাণ হৃদয়ে প্রকাশ হইতে পারেন। ইহা কিছু আশ্চর্য্য কথা নহে। গগনে সূর্য্যকেও আমরা থালির মধ্যের সন্দর্শন করিতে পারি। ঈশ্বরের সর্ব্বত্র বিদ্যমানতা হেতু জীব-হৃদয়ে তাঁহার নিবিষ্ট হওয়া এই জন্যই শ্রুতিসিদ্ধ হইয়াছে।

অনুস্মৃতের্বাদরিঃ ॥৩০॥

বাদরিঃ (আচার্য্য বাদরি বলেন) অনুস্মৃতেঃ (তিনি অনুস্মৃত হন, অর্থাৎ তিনি প্রাদেশপরিমাণ হৃৎপদ্মে ধ্যান-ঘন মূর্ত্তি ধরিয়া অবস্থান করেন।

শ্রুতি পরমেশ্বরকে প্রাদেশ প্রমাণ বলিয়াছেন 'প্রাদে-শেতি' যবের স্বগত পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও প্রস্থপরিমিত যব প্রস্থ নামে অভিহিত হয়। পরমেশ্বর পরিমাণরহিত হইলেও প্রাদেশ- প্রমাণ হৃদয়ে ধ্যেয়রূপে প্রাদেশপ্রমাণ বলিয়া কথিত হইবেন, ইহা কিছু অসঙ্গত কথা নহে।

**সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি ॥৩১॥**

জৈমিনিঃ (জৈমিনি মুনি বলেন) সম্পত্তেরিতি (প্রাদেশ শ্রুতি সম্পত্তি অনুসারে) যতঃ তথাহি দর্শয়তি (সেইরূপ উপদেশ করিয়াছেন)।

সম্পত্তি অর্থে কোন অকল্পিত দ্রব্যের সহিত কল্পিত পদার্থের ভেদজ্ঞান নিবারিত করা; ইহা যত্নসাধ্য। যেমন শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুবুদ্ধি আরোপ করিয়া বিষ্ণুবুদ্ধিই জাগ্রত হয়, শালগ্রামবুদ্ধি আর থাকে না। বিষ্ণু ও শালগ্রাম অভেদ হইয়া যায়; শালগ্রামজ্ঞান বিষ্ণুজ্ঞানে পরিণত হয়। বাজসনীয় ব্রাহ্মণে এতৎসম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে, অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরকে কল্পিত পরিচ্ছিন্ন সম্পত্তির দ্বারা যেরূপে বিদিত হইয়াছিলেন, সেই প্রকরণ এইরূপ। স্বর্গাবধি পৃথিবী পর্য্যন্ত স্থান লোকমূর্ত্তি বৈশ্বানরের অঙ্গরূপে উপদিষ্ট হওয়ায় শ্রুত্যুক্ত রাজা উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন, এই স্বর্গলোক বৈশ্বানর আত্মারই মস্তক। তিনি চক্ষুঃ দেখাইয়া বলিতেছেন—ইহা সুতেজা বৈশ্বানর। এইরূপ নাসিকা, মুখাকাশ, মুখের লালা, চিবুক প্রভৃতি দেখাইয়া তিনি বৈশ্বানরের প্রাণ, আকাশ, জল, পৃথিবীর উদাহরণ দিয়াছেন। মস্তকে বৈশ্বানর আত্মার মস্তক বলার সঙ্গে সঙ্গে উপদেষ্টার মস্তকজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে। ইহাই সম্পত্তি-জ্ঞান। ধ্যান ও ধারণার দ্বারা অকল্পিত বস্তুর সহিত কল্পিত বস্তুর অভেদ-নিষ্পত্তি হইলেই এই সম্পত্তিলাভ হয়।

**আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ॥৩২॥**

এনং (পরমেশ্বরকে) অস্মিন্ (প্রাদেশপরিমিতে) আমনন্তি (উপদেশ করা হইয়াছে)।

জাবাল উপনিষদেও প্রাদেশপ্রমাণ স্থানে পরমেশ্বরের উপদেশ আছে। এই প্রাদেশ মূর্দ্ধা ও চিবুক, এতন্মধ্যবর্ত্তী স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভ্রূ ও ঘ্রাণ, এই দুইয়ের সন্ধিস্থান স্বর্গ বা বারাণসী। দেহের মধ্যে যেমন বারাণসী, আবার দেশের মধ্যেও এক বারাণসী আছে। এই বারাণসীর একদিকে বরুণা ও অন্যদিকে নাসী। মধ্যে বারাণসী। বরণা শব্দের অর্থ ভ্রূ। নাসী শব্দে নাসিকা। এই অধ্যাত্ম বারাণসীর অনুকৃতি কাশী। এই স্থান জীবস্থান বা মনঃ-স্থান। জীবের অন্য নাম অবিমুক্ত। জাবাল শাখাধ্যায়ীরা এইরূপ ব্যাখ্যা করেন অর্থাৎ কামাদির দ্বারা বদ্ধ, তাই অবিমুক্ত। কাম—ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রেরণা। জীব অণু, ব্রহ্ম বিভু, বিরাট্। জীবে ব্রহ্মাধ্যাস সম্পূর্ণ হইলে, অভেদনিষ্পত্তি হয়; তাই 'অহংব্রহ্ম' এইরূপ ধ্যান ভ্রূ-মধ্যে করিতে হয়। ভ্রূ-মধ্যে ব্রহ্মধ্যান অর্থে, এই প্রাদেশগত ব্রহ্ম বলিতে হইবে। অপরিমিত ব্রহ্ম এইহেতু প্রাদেশ পরিমাণ হওয়া শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। অতএব শ্রুতি যে বৈশ্বানরকে প্রাদেশপ্রমাণ বলিয়া ধ্যানোপদেশ করিয়াছেন, তাহা পরমেশ্বর ভিন্ন আর কি হইবে? প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে শ্রুত্যুক্ত কয়েকটী ব্রহ্মবাচক শব্দের ব্রহ্মপরতা এইরূপে সিদ্ধান্ত করা হইল।

# ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি

**শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়**

আমি রচি গাথা, তুমি দাও সুর,
লোকে গায় সেই গান;
রাগে অনুরাগে মিলে হয় অভিমান।
আমার গগনে তুমি নীল মেঘ,
তোমার নয়নে তাই
সারা পৃথিবীর প্রতিমা দেখিতে পাই।

আমার বেদনা তব আঁখি কোণে
অশ্রু হইয়া ঝরে,
সে ব্যথা জাগিছে অরণ্য-মর্ম্মরে।
আমার নিরাশা পায় নবরূপ
পেয়ে তব ভালবাসা;
মূক কামনার কণ্ঠে ফোটে যে ভাষা

# আধুনিক আভিজাত্য

শ্রীঅনুপলাল গোস্বামী

আমাদের দেশের উপর দিয়ে আজকাল ব্যাপকভাবে একটা প্রবল ঢেউ বইছে—সেটী হচ্ছে "আভিজাত্য ঢেউ।" রাস্তায়, ঘাটে, 'ঘরে বাইরে যেদিকেই আমরা তাকাই, দেখি শুধু আভিজাত্যের ছাপ। কাহাকেও আর বাইরের থেকে টের পাওয়া যায় না—তিনি কে? প্রথম ধাক্কায় মনে হয় যে 'কেষ্ট-বিষ্টু' নিশ্চয়ই একজন কেউ হবেন। এ ধাক্কা অবশ্য পাই পোষাকপরিচ্ছদ দেখে। তারপর পাই দ্বিতীয় ধাক্কা যখন সেই পোষাক-পরিচ্ছদ-পরিহিতের মুখ থেকে ফুটে ওঠে বাণী—শুনি বড় বড় চোস্ত চোস্ত কথা। এ ধাক্কা সাম্‌লাতে না সাম্‌লাতেই আসে তৃতীয় ধাক্কা—যা একেবারে ধরাশায়ী করে' ফেলে। এই প্রচণ্ড ধাক্কাটী হচ্ছে—ব্যবহার। উপস্থিত এই তিনটী ধাক্কা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক্।

প্রথম ধাক্কা—পোষাক-পরিচ্ছদ। আজকাল বেকার-সমস্যাসমাধানের জন্য অনেক ভদ্র-সন্তান দরজীর কাজ শিখেছেন—উপকার হয়েছে নিশ্চয়ই। ফলে হয়ত দরকারের চাইতে বেশী দরজীর সৃষ্টি হয়েছে। দরকারের চেয়ে বেশী বল্‌ছি এই জন্য—যে মামুলী দরজীতে আর দেশের কারও মন ওঠে না। কারণ মামুলী শার্ট-পাঞ্জাবী, ফতুয়া ছাড়া ত আর তারা ভাল ছাঁটু-কাটের কোট্, ব্রীচেস্ ইত্যাদি তৈয়ার ক'রতে পারে না। তাই চাই আধুনিক দরজী। আবার বাজার-ভরা প্রতিযোগিতা—সুতরাং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মজুরী যথাসম্ভব কম না নিলে খদ্দের পাওয়া মুস্কিল। আবার সমস্ত ভদ্র দরজীর ত সহরে দোকান করে' চালান সম্ভব হয় না; কাজেই বাধ্য হ'য়ে নিজ নিজ গ্রামে আধুনিক দরজীর দোকানপ্রতিষ্ঠা। এই রকম নানা প্রকারে আধুনিক পোষাকপরিচ্ছদ সহজ-প্রাপ্য হ'য়ে প'ড়েছে। তাই দেখতে পাই—প্রায় সকলের অঙ্গেই ফিট্‌ফাট পোষাকপরিচ্ছদ। এটা হয়ত খুব ভালই—কিন্তু আমাদের অজ্ঞাতসারে এই সকল পোষাক-পরিচ্ছদের মান রাখবার জন্য আমাদের প্রকৃতিটাও সেই রকমের তৈরী হচ্ছে নাকি? দেখা যাক, এইগুলির দোষগুণ একটু বিচার করে'।

কোট্—এর বোধ হয় বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়া ব্যবহারের আর মোটেই দরকার নেই। বিশেষতঃ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে। কোট্‌পরিহিত একটা বিশেষ জাতিকে চেনা শক্ত। কোট্ বাঙ্গালীও পরে, পশ্চিমাও পরে—মাড়োয়াড়ী, মাদ্রাজী প্রভৃতি কাপড়পরিহিত সমস্ত জাতিই পরে; হিন্দুও পরে, মুসলমানও পরে, সুতরাং তার বিশিষ্টতা কোথায়? বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার ছাপ আমরা প্রায় সর্ব্বত্রই দেখতে পাই—শুধু পাই না তার আজ-কালকার পোষাকে। বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক কি এ সম্বন্ধে কোন প্রকার সাহায্য ক'রতে পারে না?

তারপর উপরের কোট্-পরিধানের ফলে ভিতরকার মনটাও সেই সামঞ্জস্যটুকু রাখবার জন্য একটু দেশছাড়া ভাবেই গড়ে' উঠছে। প্রকৃতি আমাদের বদ্‌লে যাচ্ছে—বিশিষ্টতার ছাপ হারিয়ে আমরা গাদার মড়া হ'য়ে যাচ্ছি—এটা কি ভাল? আবার গলা-খোলা কোটের মান রাখবার জন্য একটা স্কার্ফ (scarf) বা মাফ্‌লার চাই, নতুবা ঘাড়ের ময়লায় কোটের কলার নষ্ট হবার ভয় থাকে—এ আবার আর এক উপসর্গ! আবার এই স্কার্ফ বা মাফ্‌লার একটা হ'লে চল্‌বে না—কেননা, মাঝে মাঝে তাদের কাচা দরকার; সুতরাং অভাব পক্ষে চাই দুটো। অথচ এগুলো অন্য কোন পার্থিব ব্যবহারেই লাগে না; তারপর ভাল কোটের সঙ্গে মানিয়ে পরতে হ'লে নিশ্চয়ই চাই ভাল ধুতি। তাও আবার সপ্তাহে এক জোড়ায় চলা শক্ত—কারণ ময়লা, বাড়ীতে কাচা ইস্ত্রিবিহীন (curshed) কাপড় পরলে কোটের সঙ্গে মানায় না—বড়ই গরীব-দাস, গরীব-দাস দেখায়। তাই চাই অন্ততঃ দুইজোড়া বেশ

ধোপ-দুরস্ত, রং-মেলান, পাড়ওয়ালা ধুতি। কোটের সঙ্গে আবার উড়ো কোঁচা মানায় না—কাজেই মালকোচার উপর আজকাল সাধারণের একটা আসক্তি জন্মেছে—আবার সেটা হওয়া চাই আধুনিক মোগ্‌লাই, ভোজপুরী, কাবুলে মালকোঁচা—লড়াইএর মোরগের মতন। সেকেলে সাধারণ বাঙ্গালী মালকোঁচায় চলবে না। অন্ততঃ পায়ের কব্জী পর্য্যন্ত পড়ে' থাকা চাই, নতুবা ঠিক মানায় না। সুতরাং মামুলী বহরের কাপড়ে চ'লবে না, চাই বেশী বহরের ধুতি।

এইবার শ্রীচরণ। এঁদের ত আর সাবেকী সম্মান নেই। শ্রীচরণ আর 'কমলেষু' নন,--তাঁরা এখন 'ঘাঁটায়েষু'। সুতরাং ঘাঁটার প্রসবী চরণকে আবরিত ক'রতে চাই বেশ চোস্ত পাদুকা—পাদুকা-শিল্পীর হাতের তৈয়ারী হ'লেই বেশ ভাল হয়, কারণ কল্যাবিদ্যা এখন জুতাতেও প্রবেশ করেছে কিনা তাই।

এত ক'রেও আজকাল আমাদের তৃপ্তি হচ্ছে না। সব জাতিরই শিরস্ত্রাণ আছে, শুধু আমাদেরই নেই—ভারী ক্ষোভের বিষয়। সুতরাং কেহ-বা গান্ধী-টুপী, কেহ-বা কাশ্মীরী টুপী, কেহবা Balaclava, সাহেবী হ্যাট্‌, কেহ-বা অপর কোনও রকম আপ্‌রুচি টুপী পরে' থাকি। আবার শ্রীভগবানের মার্‌—স্বাস্থ্যাভাবে এবং নানাপ্রকার আধুনিক কেশপ্রসাধনের সামগ্রীর কৃপায় টাক-জাতীয় মস্তকের দৈন্যগোপনের জন্যও চাই টুপী।

আরও জাপানী ব্যবসায়ের কৃপায় পরণপরিচ্ছদের অপরাপর আনুসঙ্গিক সামগ্রীর দাম খুব সস্তা হওয়ায়, আমাদের চাল বাড়াবার সুবিধা আরও বেশী 'হয়েছে। কাজেকাজেই আধুনিক আভিজাত্যের প্রধান মূলধন পোষাক-পরিচ্ছদ সহজপ্রাপ্য এবং অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়েই সংগ্রহ হচ্ছে। সাবেক কালে সত্যিকারের ধনীরাই কেবল দামী পোষাকপরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন। এই রকম খুঁটিনাটি সম্বন্ধে ভাববার কথা অনেক আছে। যাঁরা সমাজের উন্নতি চান, তাঁরা দয়া করে' মাথা ঘামালে ভাল হয়।

আধুনিক আভিজাত্যের দ্বিতীয় মূলধন হচ্ছে—চোস্ত চোস্ত কথা। কিছুদিন পূর্ব্বেও অর্থাৎ বিশ বৎসর আগেও আমাদের সাহিত্যের প্রগতি এত দ্রুত না থাকায়—কেবল মাত্র সত্যিকারের বিদ্বান্‌ ব্যক্তিরাই চোস্ত চোস্ত কথা বলবার অধিকারী ছিলেন—কারণ আমাদের দেশীয় সাহিত্য তখন একটু বেশ ঘন-পাকের ছিল। সংস্কৃত-বহুল, বিদ্যাসাগরী বঙ্কিমী ভাষাই ছিল তখন ভাব-বাহী ভাষা। পৃথিবীর নানাদেশের ভাবধারার সঙ্গে সাধারণের খুব বেশী পরিচয় ছিল না। আধুনিক সাহিত্য-যুগের প্রধান ঋষি ও স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ দেশে প্রতিষ্ঠা ক'রলেন এক সাহিত্য-যাদুঘর। তাঁর ভক্ত এবং অভক্তেরা সংগ্রহ ক'রতে লাগলেন সাহিত্যের নানা রকম নমুনা (specimen) ও তাই দিয়ে ভর্ত্তি 'করতে লাগলেন সেই যাদুঘরটিকে। মানবের জ্ঞান-প্রসারের এই যাদুঘর খোলা রইল ক'লকাতার মিউজিয়মেরই মতন—সাধারণের নিকট। কাজেই এখানে জ্ঞানী অজ্ঞানীর অবাধ প্রবেশ চ'লতে লাগল। স্বীয় ক্ষমতা ও রুচি অনুযায়ী লোকে শিক্ষা পেতে লাগল। ভাল কি হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছে—কিন্তু সাধারণের কি হয়েছে? পৃথিবীর সব জায়গার, সব রকমের জ্ঞানবিজ্ঞানের ঘোলাটে ছায়া এসে প'ড়েছে তাদের মাথার sensitive plateএর উপর। এখন সেই অপরিস্কার নেগেটিভ্‌ থেকে বেরোচ্ছে অনুপযুক্ত প্রতিলিপি—হাজারে হাজার। ঠিক্‌ যেমন কোন অপরিপক্ব amateurএর তোলা ফটো নেগেটিভ এর প্রিণ্ট্‌।

এমন সহজসাধ্য, সহজলব্ধ জ্ঞানের অধিকারী যে ব্যক্তি, সে তার সম্পত্তির একটা কুচ্‌কাওয়াজ (parade) না করে'--আর কি করে! তাই আজকাল পথে ঘাটে সর্ব্বদাই শুনতে পাওয়া যায় লঘু-গুরুভাবগম্ভীর চোস্ত চোস্ত বাক্য। আবার পরাধীন-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন, আমাদের স্বাধীনতার পরিচয় দেবার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে—এই বাক্য। তাই চোস্ত চোস্ত বুলি দিয়ে আমাদের বেপরোয়া ভাবটা প্রকাশ করবার প্রবৃত্তিটা বেড়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত বক্তৃতা দেওয়াটা একমাত্র জ্ঞানী ও বিদ্বান্‌ সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন সস্তা জ্ঞান-বিদ্যার প্রভাবে চোস্ত বুলির অধিকারী আমরা প্রত্যেকেই বক্তৃতা দেবার স্পর্দ্ধা ক'রে থাকি।

এইবার তৃতীয় মূলধনটার একটু আলোচনা করা যাক্‌।—এটা হচ্ছে ব্যবহার। এখানে ব্যবহার মানে আমি

ধরছি—সাধারণ আদব-কায়দা, চাল-চলন যার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে মনোবৃত্তির সঙ্গে।

চাল-চলনটা আমরা সাধারণতঃ শিখতাম—প্রাচীন রীতি নীতি (Tradition), বাড়ীর এবং দেশের স্বাভাবিক আবেষ্টন এবং সামাজিক মেলামেশার ভিতর দিয়ে। এখন সে সব পুরাণো হ'য়ে গিয়েছে—পেছনে ফেলে আসা রেলওয়ে ষ্টেশনের মত। এখন গতিযুগ—স্রেফ্ চাই অগ্রগতি বা প্রগতি। সুতরাং সাম্‌নে যেটা পড়ে তাই মাত্র আমরা দেখি। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান যুগে সেটা আবার খুবই সোজা হয়ে প'ড়েছে, অনেক রকমে। তার মধ্যে উপস্থিত বেছে নেওয়া যাক্, থিয়েটার সিনেমাকে। ব্যবহারটা সাধারণতঃ দেখে শিখি—আর সেই দেখে শেখাটা চট্ করে হয়ে যায় থিয়েটার সিনেমায়।

থিয়েটার সমাজের অনেক উপকার করেছে এবং ক'রবেও। সাধারণকে শিক্ষা দিতে, জাতির দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনকে পরিচালনা করতে—ভাবের জাগরণ করিয়ে দিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। কিন্তু খারাপও কি করেনি? যেমন তেমন ক'রে, কোন রকমে সেজগুজে, মঞ্চে জমা হয়ে, নাট্যকারের বক্তব্যগুলো শ্রোতাদের শুনিয়ে দেওয়াই হ'ল—বেশীর ভাগ সৌখীন সম্প্রদায়ের থিয়েটার করা। অল্প বয়সের দর্শক সংখ্যাই বেশী। মঞ্চে অভিনেতাদের অস্বাভাবিক প্রলাপাভিনয় তাদের কচি মনের উপর গভীর দাগ বসিয়ে দেয়। ক্রমে ক্রমে সেই সমস্ত থিয়েটারী আচরণ ভঙ্গী তাদের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। এই বিশেষ কারণে সংযত অভিনয় করা এবং দেখা দরকার। সংযমের ভিতর দিয়েই অসংযত ব্যবহার চুঁইয়ে (Filtered) যখন বাহির হয়, তখন তার রূপ ব'দ্‌লে যায় তাহাই হয় কৃষ্টি (Culture and Refinement)। পোষাকী ভদ্রলোক সৃষ্টি করে দরজী, কিন্তু তার আসল ভদ্রতা প্রকাশ পায় তার ব্যবহারে যে জিনিষটা পয়সা খরচ করে কেনা যায় না।

এবার সিনেমা সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলি। আজকাল সিনেমার বেশীর ভাগ ভক্ত দর্শক হচ্ছে তরল প্রকৃতির ও কিশোর বয়সের যুবক। থিয়েটারের মত সিনেমায়ও শিক্ষার যথেষ্ট আছে, এবং এদের সাহায্যেই সাধারণ শিক্ষা অতি দ্রুত হয়। অনেক দেশে তা হয়েছেও, যথা—রাশিয়া। কিন্তু এর খারাপের দিক্‌টা একটু ভেবে দেখতে বল্‌ছি কারণ জীবন গঠনের উপর এর প্রভাব অত্যন্ত বেশী অমোঘ বল্লেও চলে।

সিনেমা জগতে আমেরিকান্ ছবির চাহিদা সব চাইতে বেশী। কারণ, এর মধ্যে মনের খোরাকের চাইতে বেশী আছে যৌন আবেদন। দিগম্বর দিগম্বরীদের অতুল লোভনীয় অঙ্গ সঞ্চালন ও হাব ভাব আমাদের নির্ম্মল (?) ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অফুরন্ত খোরাক যোগায়। আর ক্রমশঃ আমরা ব্যাপারটাকে এতই সহজ করে এনেছি যে, ছবিটা যতই ইন্দ্রিয়মোহন হোক না কেন, আমরা অপরিণতদের সেই ছবি দেখতে যেতে আপত্তি করি না বরং সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে অসোয়াস্তির আনন্দ (?) উপভোগ করি। কারণ ঐ সব ছবি দেখার ছাড়পত্র আমরা আপনা-আপনিই পেয়েছি। বারবণিতার গৃহে প্রকাশ্য ভাবে যাওয়া অত্যন্ত লজ্জাজনক ও চরিত্রহীনতার পরিচায়ক; কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর ব্যাপার, সিনেমায় গিয়ে উপভোগ করবার রীতিটা—অবাধে চলন হয়ে যাচ্ছে। ফলে অলক্ষিতে আমাদের নৈতিক জীবনের উপর ছাপ্ প'ড়তে সুরু হয়েছে। দেহ মন থেকে সংযম সরে প'ড়ছে। কাজে কাজেই আমাদের ব্যবহার এদেশের বিশিষ্টতা হারিয়ে গড়ে উঠ্‌ছে—অন্য প্রকারে। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই একটু একটু ক'রে ভাবলে কেমন হয়?

জাতি ও সমাজ কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় যে লাভ লোকসান কেউ একলা ভোগ করবে। আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য জাতি ও সমাজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে তাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া। যে পথে আমরা চলেছি তাতে উন্নতি না হয়ে অবনতিই হচ্ছে। সুতরাং আধুনিক আভিজাত্যের মূলধন তিনটাকে মূলধন বলে ধরে রেখে, আসল মূলধন—অর্থাৎ জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে হারালে আমরা যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।
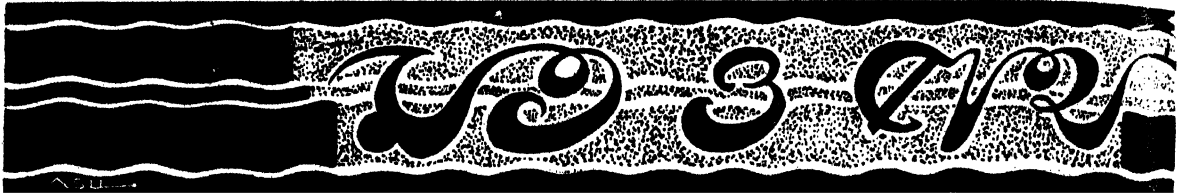
## মতের স্বাধীনতা ও ঐক্যনীতি

মত বিচিত্র। পথও অসংখ্য। অথচ একমত হওয়ার উপরেই শক্তির প্রবলতর অভিব্যক্তি নির্ভর করে। একমত হইলে, কার্য্যতঃ বহু পথ ধরিয়া শক্তির প্রবাহ বহিয়া চলিতে পারে; কিন্তু বহু মত লইয়া প্রবল, বিজয়ী শক্তির অভ্যুদয় সচরাচর দেখা যায় না। একমত, একবুদ্ধি না হইলে, কোনও দুরূহ কার্য্য সিদ্ধ হয় না। অথচ মানুষের গঠন এরূপ, যাহাতে বুদ্ধিগত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যই অত্যন্ত স্বাভাবিক। দুইটী মানুষের চেহারা যেমন কদাচিৎ মিলে না, তেমনি দুইজনের স্বাভাবিক বুদ্ধিও বিচিত্র হয়, দৃষ্টিভঙ্গী হয় বিভিন্ন। এই অবস্থায়, প্রত্যেকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-জনিত বুদ্ধিভেদ বিলীন করিয়া, একমত ও পথের নিরাকরণ বড় সহজ কথা নহে। এইজন্যই এখানে স্বভাবকে অতিক্রম করার কথা আসিয়া পড়ে। সহজ, সহজাত, আমাদের যে স্ব-তন্ত্র স্বভাব, স্ব-তন্ত্র বুদ্ধি, তাহার সেই প্রাকৃত ভাব, প্রাকৃত ক্রিয়ার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া একটী নূতন ভাব, অভিনব গতির প্রবর্ত্তন করা বিশেষ সাধন-সাপেক্ষ। এই সাধনা শুধু কঠিন নয়, মনে হইতে পারে ইহা অস্বাভাবিকও। অস্বাভাবিক—কিন্তু স্বভাব জয় করার ইঙ্গিত বা প্রেরণা আবার স্বভাবের মধ্যেই নিহিত থাকে। এই নিগূঢ় অন্তর-প্রেরণা আশ্রয় করিয়াই মানুষ পরম পুরুষার্থের পথে চলার সাহস পায়, স্পর্দ্ধা ও শক্তি সঞ্চয় করে।

এই দুর্গমের পথে অভিযান—মানুষের সহজাত স্বভাব-সংস্কারের প্রতিকূল যাত্রা বলিলে অসঙ্গত হয় না। বিরুদ্ধ যাত্রার শক্তি যোগায় যে ঊর্দ্ধতন স্বভাব, যে আর একটা প্রকৃতি, তাহাও মানবজাতি চিরদিন অস্বীকার বা উপেক্ষা করিতে পারে না। আদর্শবাদীর জগৎ আজও না গড়িয়া উঠুক, জগতে আদর্শবাদীর সংখ্যা বিরল হইলেও, একেবারে শূন্য নহে। এই মুষ্টিমেয় আদর্শবাদিগণই যুগে যুগে যুগ-ভাব নিয়ন্ত্রিত করেন, জীবন-স্রোতের পরিবর্ত্তন আনিবার প্রধান যন্ত্র তাঁহারাই। দুই রকম আদর্শবাদী পৃথিবীতে আসেন—এক, যাঁহারা নিছক স্বপ্নদ্রষ্টা, ভাবুক। ইঁহাদের ভাব কর্ম্মক্ষেত্রের কঠোর বাস্তব সত্যের ধাক্কা খাইয়া আহত হয়; কখনও বা মুমূর্ষু হইয়া পড়াও অসম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, অপর শ্রেণীর আদর্শবাদী স্বপ্নদৃষ্টির অধিকারী হইয়াও, কর্ম্মী—ইঁহারা একাধারে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। যুগপৎ ভাব ও রূপ, জ্ঞান ও কর্ম্ম, স্বপ্ন ও বাস্তব লইয়া দুই হাতে দুইখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারি-চালনার মত ইঁহারা সিদ্ধ ও সুদক্ষ জীবন-শিল্পী। ভারতে আজ অন্ততঃ এমন কয়েক শত জীবন-শিল্পীরই প্রয়োজন হইয়াছে, যাঁহারা শুধু বড় বড় কথা না কহিয়া পরিদৃষ্ট ভাব বা স্বপ্নকে বস্তুতন্ত্র জগতে বিগ্রহান্বিত করিয়া তুলিতে—কাহারও প্রভাব বা পরামর্শের বশবর্ত্তী হইয়া নহে—ভারতের স্বভাব-প্রেরণাবশেই উদ্বুদ্ধ হইবে।

একমত হইতে হইলে, একটী লক্ষ্য বা আদর্শে গভীর বিশ্বাস থাকা চাই। বিশ্বাস হৃদয় হইতে অথবা বুদ্ধির উপর হইতে আসে। এই বুদ্ধি বিচার-বুদ্ধি—যুক্তিতর্কমূলক সহজ বুদ্ধি। ইহা বৈচিত্র্যমূলক। অহঙ্কার ইহার বৈশিষ্ট্য। আমরা যাহাকে মতের স্বাধীনতা বলি, তাহা এই অহঙ্কারী বুদ্ধিরই বিচার বা সিদ্ধান্ত। তাহা ভেদমূলক, বিশিষ্টতা-পূর্ণ হইবেই। তাই এখানে বিশ্বাসের ঐক্য নাই, ঐক্য-মত্যও অসম্ভব। আমাদের হৃদয় অন্য দিক্ দিয়া একটা ঐক্যের অনুভবে সাড়া দেয়। হৃদয়ের প্রেরণায় মনের ও মতের মিল অনেক ক্ষেত্রে হয়। সেখানে হৃদয়ের মমতা দিয়া আমরা বুদ্ধির বৈশিষ্ট্যকে কতকটা আত্মসাৎ করিয়া, অন্যকে আত্মীয় অর্থাৎ আপন করিয়া তুলি। ইহাই প্রেমের মিলন। যেখানে প্রেমের দাবী, সেখানে মতের স্বাধীনতা বলি দিতেও বাধে না। এরূপ ক্ষেত্রে বুদ্ধি যে স্বাধীনতা হারায়, হৃদয় তাহা বিস্তৃতি দিয়া কতকাংশে পূরণ করিয়া লয়।

কিন্তু মতদ্বৈধের ঝঞ্ঝা কাটাইয়া, যে হৃদয় ঐক্যের অন্বেষণ করে, তাহা সত্য ঐক্য নীতি খুঁজিয়া পায় বুদ্ধির

অতীত ক্ষেত্রে, যে বুদ্ধি অহঙ্কার ছাড়াইয়া আত্মার নিগূঢ় মর্ম্মে আকৃষ্ট হয়। আত্মার সত্যই জীবনের পরম সত্য। ইহা একবার দর্শন করিলে বুদ্ধি জ্যোতির্ম্ময় হয়, স্পর্শে জীবন অমৃতময় হইয়া উঠে। আত্মার স্বরূপ সত্য— শ্রীভগবানের ইচ্ছা। বহু আত্মার বহু ইচ্ছা এই একই ভাগবত ইচ্ছায় সূত্রবদ্ধ। তাই সকল ইচ্ছাই মূলে এক। কার্য্যতঃ বহুমুখী বেগ ও প্রবাহসম্পন্ন। ঈশ্বরেচ্ছায় যোগ-যুক্ত হইয়া, আমরা বিভিন্ন মন ও মতের সীমা অতিক্রম করিয়া আত্মার পরম ঐক্য ফিরিয়া পাইব। এরূপ যুক্ত আত্মার সমষ্টিই ভারতের আদর্শ সংহতি ও জাতি। ঈশ্বর-যুক্তির মানুষ শুদ্ধ দেহ-মন সংগঠন করিয়া, আত্মার ঐক্যই জীবনের প্রতি চিন্তায় ও কর্ম্মে প্রতিফলিত করিয়া তুলে। মন ও মতের এখানে বলি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়, এমন কি রক্তমাংসের দেহ পর্য্যন্ত সর্ব্বাধারে ঈশ্বরেচ্ছার বিদ্যুদ্বীর্য্য আশ্রয় করিয়া নবজন্ম লাভ করে। এমন নূতন ভাব-সিদ্ধ মানুষ আত্মার একত্বে অভিষিক্ত হইলেও, উদ্দেশ্যের প্রয়োজনভেদে বিচিত্র কর্ম্মী—তাঁহারা অভেদ হইয়াও স্বাধীন। ইহা তথাকথিত গণতন্ত্র নহে, ঈশ্বর-তন্ত্রেরই সিদ্ধ নীতি। ভারতের জাতীয়তা এই ঈশ্বর-তন্ত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

## সিন্ধুদেশে অরাজকতা

সিন্ধুদেশে ধারাবাহিক হিন্দুদলন—তথা হিন্দু প্রজার খুন-জখম চলিয়াছে। এই হত্যাকাণ্ড যেমন একটার পর একটা পর পর চলিয়াছে, তাহাতে ইহা যে ব্যক্তিগত খাপ-ছাড়া কাজ নহে, পরন্তু রীতিমত সুকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ বোধ হয় আর কাহারও নাই। হত্যাকারীরা আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিতেছে। বাছিয়া বাছিয়া হিন্দু নেতা ও হিন্দু অধিবাসীর উপর এই অস্ত্র-প্রয়োগ চলিয়াছে অবাধে—পুলিস ইহার কোনই হদিস বা কিনারা এ পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। যেন অরাজক দেশ! সিন্ধু অভ্‌সার্ভার আর্ত্তকণ্ঠেই বলিতেছেন— "Either govern or go out"—"হয় রীতিমত শাসন কর, নতুবা শাসনের ভার ছাড়িয়া দাও।" অবশ্য প্রধান মন্ত্রীর কথা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি এই অনর্থের জন্য খুব চিন্তিত আছেন এবং আন্তরিকভাবেই অবস্থার প্রতীকার করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যাহা করিলে ষড়যন্ত্র উদ্ভিন্ন হইয়া, হত্যাকারীরা ধরা পড়ে ও আদর্শ-রকমের সাজা পায়, তাহার কোনরূপ উপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। খুনীর দলকে নিশ্চয়ই কেহ না কেহ ধর্ম্মান্ধতা বা অন্য কোন অন্ধ স্বার্থমূলক অনুপ্রেরণায় পিছন হইতে উস্কানি দিতেছে। অন্ততঃ সারা ভারতের মুসলেম নেতৃবৃন্দ ত এ পর্য্যন্ত কঠোর কণ্ঠে এই অনুষ্ঠিত অপরাধগুলির গুরুত্ব উল্লেখ করিয়া কোনই মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। লীগ-নেতা মিঃ জিন্না, এমন কি বাংলার প্রধান মন্ত্রীও মধ্য ভারতের ব্যাপার লইয়া মহাত্মা গান্ধীকে পর্য্যন্ত শ্লেষ-বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই। সিন্ধুর নির্ম্মম হত্যাপরম্পরা নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতায় তাহাপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। এ ব্যাপারে তাঁহাদের মুখে একটা নির্ব্বেদ বা সান্ত্বনার বাণীও আমরা শুনিবার আশা রাখি। পরিশেষে সিন্ধু গভর্ণমেণ্ট যদি স্থানীয় অশান্তিদমনে সত্যই অক্ষম হন, আমরা ভারতগভর্ণমেণ্টকে অতঃপর এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াই অনুরোধ করিব। সিন্ধু সম্বন্ধে আর কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নীরব থাকা কোন মতেই সমীচিন নহে। এ অরাজকতা অবাধে চলিলে, সিন্ধু হইতে ভারতের অন্যত্র তাহার বিষক্রিয়া ছড়াইয়া পড়া বিচিত্র নহে।

## বাংলায় হিন্দু-নির্য্যাতন

যে প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা স্বাভাবিকভাবে আমাদের বাংলাদেশে ইতিপূর্ব্বেই বুঝি দেখা দিয়াছে, এরূপ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। সম্প্রতি সিরাজগঞ্জ হইতে যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, প্রায় একশত মুসলমান চড়াও হইয়া স্থানীয় হিন্দুদের কৃষ্ণযাত্রাভিনয় ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়—তাহারা যাত্রার আসরে প্রবেশ করিয়া লাঠীর দ্বারা হিন্দুদের বিষম প্রহার করে, সামিয়ানা ছিঁড়ে, বাদ্যযন্ত্রাদি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করে। ইহার পর, কলিকাতার উপকণ্ঠে বারাসতে হিন্দুদের এক ধর্ম্মসভায় মুসলমান গুণ্ডার আক্রমণের কথা শুনা যায়। এইরূপ পর পর খবর হইতে হিন্দু জনসাধারণের পক্ষে এ আশঙ্কা খুবই স্বাভাবিক যে, বাংলায় হিন্দু-নির্য্যাতন সিন্ধুরই মত বুঝি আর এক পালা সুরু হইতে চলিয়াছে। বাংলার গত আদমসুমারী মুসলমানের সংখ্যাধিক্য ঘটাইয়া তাহাদের মধ্যে যে প্রাধান্যবোধের উদ্ভব করিয়াছে, তাহার নানা আকারে এরূপ প্রতিক্রিয়া-সৃষ্টি হইয়া চলিলে, হিন্দু প্রজার ধন-প্রাণ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, পূজা-পার্ব্বণ, আমোদ-আহ্লাদ, এমন কি ঘরের নারীকে লইয়াও আর শান্তি ও স্বস্তিতে বসবাস করা বিপজ্জনক হইয়া উঠে। আমাদের এই শেষোক্ত কথাও যে নিতান্ত অমূলক নহে, তাহা বাংলায় নারী-হরণের লোমহর্ষণ কাহিনীগুলি পড়িলেই প্রতিপন্ন হইবে। চাঁদপুরে সুখদাসুন্দরীর হরণের পর, পুলিস তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল ও আসামীকে চালান দিয়াছিল—ইহাতে জনসাধারণ যেটুকু আশ্বস্ত হইয়াছিল, তাহার দ্বিতীয়বার হরণে সে আশ্বাস আবার

ঘোরতর সন্ত্রাসে পরিণত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের কথা, এবার দিনের আলোয়, তাহার আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে দুর্ব্বৃত্ত দল সুখদাকে অপহরণ করিয়াছে। অপহৃতা নারী ও হরণকারীর সন্ধান পুলিস এখন পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। তারপর, ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট হইতেও যদি হিন্দু নারীর অপহরণ সম্ভব হয়, তবে আর বাঙালী হিন্দু পরিবার-পরিজন লইয়া বাঁচিবে কি ভরসায়? বাংলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও আজ আর বিরল নহে। মন্ত্রিমণ্ডলের বড় গর্ব্ব—কংগ্রেসী শাসনের তুলনায় তাঁহারা বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা হইতে রক্ষা করিয়াছেন; তাঁহাদের সে গর্ব্ব বুঝি আজ ধূলায় ধূলিসাৎ হইয়া যায়!

ছাত্রাবাসে হিন্দু ছাত্রেরও আজ কারণে অকারণে প্রাণ টানাটানি পড়ে। বর্দ্ধমানের প্রতিমাবিসর্জ্জনে বাধাসৃষ্টি লাগিয়াই থাকে। এই সব ঘটনার পর ঘটনায় বাঙ্গালী হিন্দু যদি সন্ত্রস্ত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং সে বিক্ষোভ কোথাও কোথাও সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। আমরা এই জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে পুনঃ পুনঃ সনির্ব্বন্ধ মর্ম্মনিবেদন জানাইতেছি—যেন তাঁহারা যে কারণে এই প্রকার বিষাক্ত আব্‌হাওয়া ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, সেই কারণগুলি সমূলে নির্ম্মূল করেন। তাঁহাদের উপর যে ন্যায় ও শৃঙ্খলারক্ষার গুরুদায় নির্ভর করিতেছে, তাহা যেন ধর্ম্ম ও ধর্ম্মিবিশেষের নির্য্যাতন ও তাহাদের প্রতি অত্যাচারনিবারণে কোনও কারণেই কুণ্ঠিত না হয়, অক্ষম না হয়। সিন্ধুদেশের ন্যায় যেন এ প্রদেশেও দুষ্ট লোকে এই ধারণা সৃষ্টি করিতে না সমর্থ হয় যে, এখানে অত্যাচার উপদ্রব করিয়াও অবাধে আত্মগোপন করিয়া থাকা যায়—যেন পাষণ্ডগণ পবিত্র শাসনদণ্ডের বিভীষিকায় উৎকণ্ঠিত হইয়া মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারে যে, কর্ত্তৃপক্ষ অপরাধীকে মুসলমান বলিয়া ক্ষমা করিবেন না, যোগ্য শাস্তি দিতে বিরত হইবেন না। যে রাজ্যে পাপ দণ্ডের ভয়ে আতঙ্কিত নহে, পরন্তু প্রয়োগের শৈথিল্যকে প্রশ্রয় বলিয়াই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে, সে রাজ্যে সুশাসনের উপর প্রজা-সাধারণের আস্থা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবেই। হিন্দু বাঙ্গালীর আর্ত্ত নিবেদনে কি কর্ত্তৃপক্ষ এখনও কাণ দিবেন না?

## আদমসুমারীতে কর্ত্তব্য

আগামী আদমসুমারীর কার্য্য ইতিমধ্যেই সুরু হইয়াছে। প্রতি জেলায় একজন করিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা প্রত্যেক ইউনিয়নে ইউনিয়ন-বোর্ডের মারফৎ গণনাকারী ও গৃহ-চিহ্নকারী নিয়োগ করিতেছেন। এই কর্ম্মচারিগণের উপর যে গুরু কর্ত্তব্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে সমধিক সচেতন করাইবার জন্য হিন্দু মহাসভার কর্ত্তৃপক্ষ গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতার প্রস্তাব করিয়া সকলেরই আস্থাভাজন হইয়াছেন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, আদমসুমারী বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভাকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, মহাসভা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যত সংখ্যক অবৈতনিক কর্ম্মী দিতে পারিবেন, তিনি সানন্দে তাহাদিগকে আদমসুমারীর কার্য্যে গ্রহণ করিবেন। সভা কর্ত্তৃক মনোনীত কোন অবৈতনিক কর্ম্মীকে গ্রহণ করিতে যদি জেলা-কর্ত্তৃপক্ষ অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার কার্য্যালয় ও বঙ্গীয় আদমসুমারী বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট জানাইতে হইবে।

হিন্দু মহাসভা বাংলায় হিন্দু-অধিবাসীর যথার্থ সংখ্যা-নির্দ্ধারণের জন্য বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। তাঁহাদের প্রত্যেক মুসলমান গণনাকারীর সহিত একজন করিয়া হিন্দু গণনাকারী নিয়োগ করার প্রস্তাবও আমাদের সমর্থনযোগ্য। ইহাতে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা যদি কোথাও থাকে, তবে তাহা অনেকটা নিরস্ত হইবে। মহাসভার কর্ম্মিগণ সরকারী কর্ম্মচারিগণের সহিত সংযুক্ত ভাবে কার্য্য করিলে, শুধু পরস্পর সংশয়ের নিরসন নহে, কার্য্যতঃ জনগণনায় অধিকতর ঠিক ও নির্ভুল অঙ্কে উপনীত হইতে সহায়তাই করা হইবে। হিন্দু মহাসভার কর্ত্তৃপক্ষ উদ্যোগী হইলে, তাঁহাদের পক্ষে হিন্দু জনসংখ্যার একটা বেসরকারী হিসাব গ্রহণ ও তাহার তালিকা-রক্ষাও আমরা খুব অসম্ভব মনে করি না। এই কার্য্য করিতে গিয়া হিন্দু-জনসাধারণের সহিত আত্মসংহতি ও রাষ্ট্রীয় শিক্ষামূলক পরিচয়েরও কিছু ব্যবস্থা হইতে পারে। এইরূপ পরিচয়ের সুযোগ ও উপকারিতার মূল্য বড় কম নহে। হিন্দু গণশক্তির সেবায় উদ্বুদ্ধ মহাসভার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। হিন্দু মিশনের স্বামী সত্যানন্দও ইহার জন্য যে বিজ্ঞপ্তি সম্প্রতি প্রচার করিয়াছেন, আমরা তাহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি।

## সাভারকরের প্রতিবাদ

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার নির্ভীক সভাপতি বীর সাভারকর মহাত্মা গান্ধীর লিখিত একটী প্রবন্ধে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে গোঁড়া মুসলমানদিগকে ভারতে মুসলেম রাজ্য-স্থাপনের জন্য যে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রতি হিন্দু জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং উহার তীব্র নিন্দাবাদ করিয়াছেন। গান্ধীজীর উপরোক্ত লেখাটী আমাদের চক্ষে এখনও পড়ে নাই। কিন্তু বীর সাভারকরের প্রতিবাদ-পত্র হইতে বুঝা যায় যে, উহাতে মহাত্মা

লিখিয়াছেন—এই স্বাধীন মুসলেম রাজ্যস্থাপনের জন্য মুসলমানগণ ঠিক সময়ে আঘাত হানিতে পারিলে, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং এই চেষ্টা নৈতিক ও রাজনৈতিক দিক্ হইতে সমর্থনও করা যাইতে পারে। বীর সাভারকরের বিবৃতি হইতে ইহাও জানা যায় যে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ইঙ্গ-জার্ম্মাণ মহাযুদ্ধকালেও, মুসলেম নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক আফগানিস্থানের আমীর আমানুল্লাকে ভারতাক্রমণের জন্য আমন্ত্রণের ষড়যন্ত্রে গান্ধীজি এইরূপ উৎসাহ দিয়াছিলেন। পরলোকগত স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী সে কথা বিশ্বাস করিতেন এবং শ্রীযুক্ত এ, জে, কারাণ্ডিকরও এ বিষয়ে "কেশরী" ও "মারাঠা" পত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

এবার আমীর আমানুল্লা নহে, হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর দৃষ্টি-কেন্দ্রে ফুটিয়াছেন এবং গান্ধীজি নাকি বলিয়াছেন—"সীমান্ত জাতিগুলির সাহায্যপ্রাপ্ত নিজামই স্বাধীন ভারতের যোগ্যতম ভবিষ্য সম্রাট্—কারণ তাঁহার রাজত্ব হইবে পুরাদস্তর ভারতীয় রাজত্ব।" তিনি আরও নাকি বলিয়াছেন—"ঘটনাচক্রে যুদ্ধে বৃটেনের যদি পরাজয় হয় এবং অন্য কোনও বহিঃশক্তি ভারতের উপর প্রভুত্ব না করে, তাহা হইলে দেশের শ্রেষ্ঠ শক্তি নিজাম শাসনকর্ত্তা হইবেন এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গের লোপ হইবে।"

কথাগুলি যদি সত্যই মহাত্মাজীর লেখনী হইতে বাহির হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা সমগ্র হিন্দুজাতির পক্ষ হইতে বীর সাভারকরের সহিত সমকণ্ঠে বলিব—ইহা প্রতিবাদযোগ্য। শুধু হিন্দু জনসাধারণ নহে, হিন্দু রাজন্যবৃন্দও এই কল্পনার প্রতিবাদ করিবেন। তবে সৌভাগ্যক্রমে, ইহা কল্পনামাত্র। এই কল্পনা বাস্তব ক্ষেত্রে সত্য হওয়ার কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না। মহাত্মাজীর ন্যায় কেহ যে এরূপ দিবা-স্বপ্নের প্রশ্রয় দিতে বা কল্পনা করিতে পারেন, ইহা অভাবনীয়। বীর সাভারকর ঐতিহাসিক পার্সিভ্যাল ল্যাণ্ডনের উক্তি তুলিয়া বলিয়াছেন—"নেপাল হয়ত একদিন ভারতের ভাগ্যনির্ণয়ের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিবে। এই সকল কথা কল্পনা হইলেও, গান্ধীজির দুর্ব্বল কল্পনা হইতে শ্রেষ্ঠ।"

ভারতের চব্বিশ কোটী হিন্দু এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীজিকে নহে, বীর সাভারকরকেই সমর্থন করিবে।

## পরলোকে পণ্ডিত তর্করত্ন

বাংলার মহাগৌরব শান্তমূর্ত্তি পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় গত ২৫শে আশ্বিন শুক্রবার রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিটের সময়ে ৺কাশীধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। বারাণসীর মণিকর্ণিকা ব্রহ্মনালায় কলেক্টরের বিশেষ অনুমতিক্রমে তাঁহার অন্তিমক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দীর্ঘ রোগভোগের পর, ৭৫ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার বাঞ্ছিত শিবধামে তিনি মহাপ্রস্থান করিলেন। আমরা খবর পাইয়াছি—গত মহাপূজায় মহানবমীর দিন অপরাহ্নে তাঁহার ভট্টপল্লীর ভবনে যখন ৺মহামায়ার পূজা হইতেছিল, তখন তাঁহার তার আসিল—"মহামায়ার পূজার দক্ষিণান্ত হইয়াছে কি না, শীঘ্র উত্তর দাও"; তৎক্ষণাৎ উত্তর গেলে, তিনি একাদশীর দিন নিশ্চিন্ত চিত্তে ইষ্টচিন্তায় সমাহিত হন।

বেদান্তের "শক্তিভাষ্যের" গ্রন্থকার মহাশক্তির পূজার শেষ দক্ষিণান্তের আশ্বাস লইয়াই তবে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন।

পরম শ্রদ্ধেয় তর্করত্ন মহাশয় শুধু বাংলা তথা সমগ্র হিন্দু ভারতের সমুজ্জ্বল গৌরবস্তম্ভ ছিলেন না, তিনি আমাদের সঙ্ঘ-পতি ও সঙ্ঘের অতি আপনার জন ছিলেন—তাঁহার সহিত এই বিমল স্নেহ-সম্বন্ধের অধ্যাত্ম-গৌরবে আমরা চির ধন্য। সেদিনও তিনি রোগশয্যা হইতে "প্রবর্ত্তকে"র রজত-জয়ন্তী উৎসবে তাঁহার আশীষ-লিপি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। এক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে স্বয়ং সঙ্ঘপতির সঙ্গে আমরা কাশীধামে গিয়া তাঁহার পবিত্র চরণধূলা ও অমায়িক আশীর্ব্বাণী লইয়া আসিয়াছি।

পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অধ্যাত্ম-জননীর তিরোভাবোৎসবে স্বয়ং পৌরোহিত্য করিয়া আমাদের অশেষ সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন। তারপর, আর একবার তিনি সঙ্ঘে শুভাগমন করেন। সেই সময়েই প্রবর্ত্তক হিন্দু-সম্মেলনের সভাপতিরূপে তিনি পূজনীয় সঙ্ঘ-সভাপতির সহিত একত্র ভারপ্রাপ্ত হইয়া, অস্পৃশ্যসমস্যার মীমাংসার জন্য পুণার রাজকীয় জেলে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎকার করিতে গমন করিয়াছিলেন। গুরুভায়ুর মন্দিরের সেই ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারও যুগের ইতিহাসে চির স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

তর্করত্ন মহাশয়ের "পুরাণ" সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও তাঁহার সহিত হিন্দু কৃষ্টি ও সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের "প্রবর্ত্তকে" প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবন ও বাণী সঙ্ঘের আত্ম-নিষ্ঠায় প্রবল শক্তি ও উৎসাহ সঞ্চার করে। সনাতন ভারতের শান্তমূর্ত্তি, তপোমূর্ত্তি রূপেই তিনি এই নবীন ভারতের উদীয়মান সংহতিকে চিরদিনের জন্য তাঁহার স্নেহানুরাগে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। ইহার অভ্যুদয়ের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মর্ম্মোত্থিত সুধা-ধারার ন্যায় আজও আমাদের অভিষিক্ত করিতেছে ও চিরদিনই অমৃত-লোক হইতে করিবে। আমরা এই মহাপুরুষের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে সমগ্র সঙ্ঘের বন্দনা ও প্রণতি জ্ঞাপন করি। ওঁ শান্তিঃ!

# সাময়িকী

## একটী আন্তঃপ্রাদেশিক সামাজিক অনুষ্ঠান

সারা ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রকাশ বহুভঙ্গিম হইলেও, সামাজিক আত্মা বুঝি একই। নহিলে একই সমাজপ্রথা অবিকল একই আকারে কেন ভারতের সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়? আর্য্যাবর্ত্তে যে পারিবারিক রীতি-নীতি-অনুষ্ঠান প্রচলিত, দাক্ষিণাত্যেও ঠিক তাহাই। একজন বাংলা-ভাষী বা হিন্দীভাষী গৃহস্থ যেমনভাবে সন্তানের বিদ্যারম্ভ

শ্রীমান্ সুন্দর রাজনের বিদ্যারম্ভ

সংস্কার সম্পন্ন করেন, তামিল বা তেলেগুভাষী পরিবারেও ঠিক অনুরূপ অনুষ্ঠানই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আবার কলিকাতার হিন্দু পরিবারেও উহা যেমন, পণ্ডিচেরীর খৃষ্টান পরিবারেও ইহা তেমনি ভাবে পরিলক্ষ্য হওয়ায়, এ সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক যে, ভারতের ধর্ম্ম বা রাষ্ট্রবিধান যাহাই হউক, সমাজ-বিধান বিভিন্ন নয়, একই।

সেদিন বিজয়ার প্রাতঃকালে, চন্দননগরের স্থানীয় প্রধান সরকারী ফরাসী - চিকিৎসক পণ্ডিচেরীবাসী ডাঃ কাণের ৪র্থ বর্ষীয় বালক পুত্র শ্রীমান্ সুন্দর রাজনের বিদ্যারম্ভ উৎসবে মঙ্গলাশীর্ব্বাদপ্রার্থী হইয়া ডাক্তার সাহেব প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীমতিলাল রায় মহাশয়কে আমন্ত্রণ করেন। বিজয়ার দিন সুহৃদের এই আন্তরিক আমন্ত্রণ তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। ডাঃ কাণে শ্রদ্ধেয় মতিবাবুর উপরই এই উৎসবের পৌরোহিত্যের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন। পরদিন মতিবাবু সঙ্ঘের আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাংখ্যকাব্যতীর্থ ও কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্ঘ-সভ্যকে লইয়া ডাক্তারের বাটীতে উপস্থিত হন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ যথারীতি শাস্ত্রীয় বিধানে শ্রীমান্ সুন্দর রাজনের "হাতখড়ি" দীক্ষা সম্পাদন ও সঙ্ঘগুরু আশীষমন্ত্র উচ্চারণ করিলে, এই উৎসব সুসম্পন্ন হয় ও কাণে পরিবার ইহাতে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। এই উৎসবে স্থানীয় ফরাসী রাজকর্ম্মচারী মঃ গ্রেফিয়ে ও মঃ পণ্ডিত সাহেবও উপস্থিত ছিলেন ও এই ভারতীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া বিভিন্ন প্রদেশবাসী ভারতসন্তানের মধ্যে যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর হয়, তাহাতে যোগদান করিয়া আন্তরিক আনন্দিত হইয়াছিলেন।

## শ্রীপাট অম্বিকায় স্মরণোৎসব

শ্রীপাট অম্বিকায় সম্প্রতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বিরহ-তিথি স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব-বাসরে পৌরোহিত্য করেন বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুত অজিতকুমার গোস্বামী মহাশয়। এই উপলক্ষে ভাগবৎ-প্রসঙ্গ ও কীর্ত্তনাদিও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালীর জীবনে তত্ত্বামৃত অভিসিঞ্চন করিয়া কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় অমর হইয়াছেন। জাতীয় জীবনে এইরূপ স্মরণোৎসব বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

নৃত্যভঙ্গীতে নরনারায়ণ ও কন্যাকুমারী

বাংলা তথা ভারতীয় নৃত্যাসরে উদীয়মান নর্ত্তক শ্রীমান নরনারায়ণ তাঁহার ভাবী প্রতিষ্ঠার আভাষ সাম্প্রতিক কয়েকটি নৃত্য-প্রদর্শনীতে দিয়াছেন। তাঁর সুঠাম শরীর গঠনও বেশ নটোচিত।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

পরিচালক ও প্রকাশক: শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

[ শিল্পী: অবনী সেন

ঘুমন্ত শিশু

# রজত-জয়ন্তী

## প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের প্রশ্নোত্তর ও কার্য্যক্রম
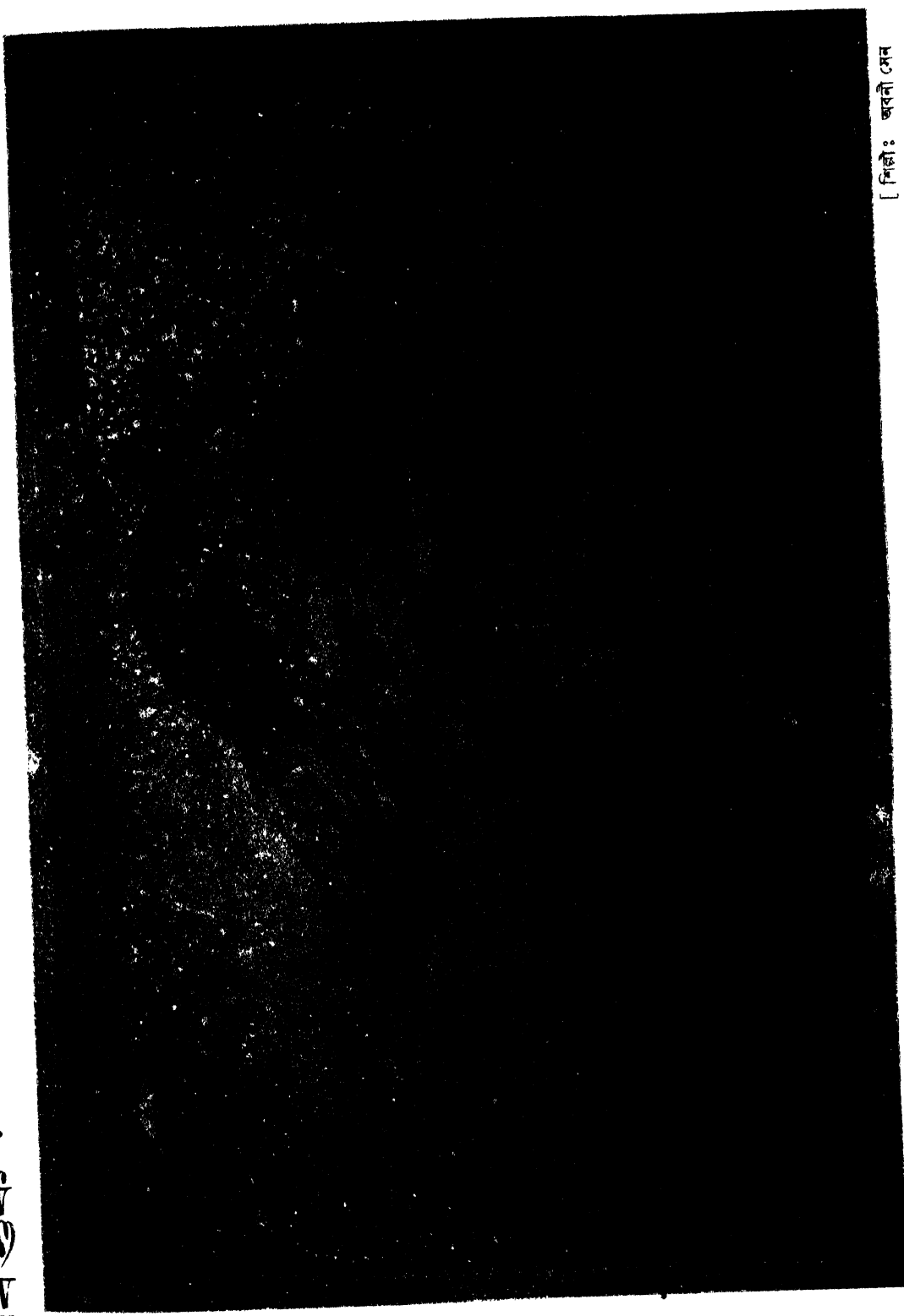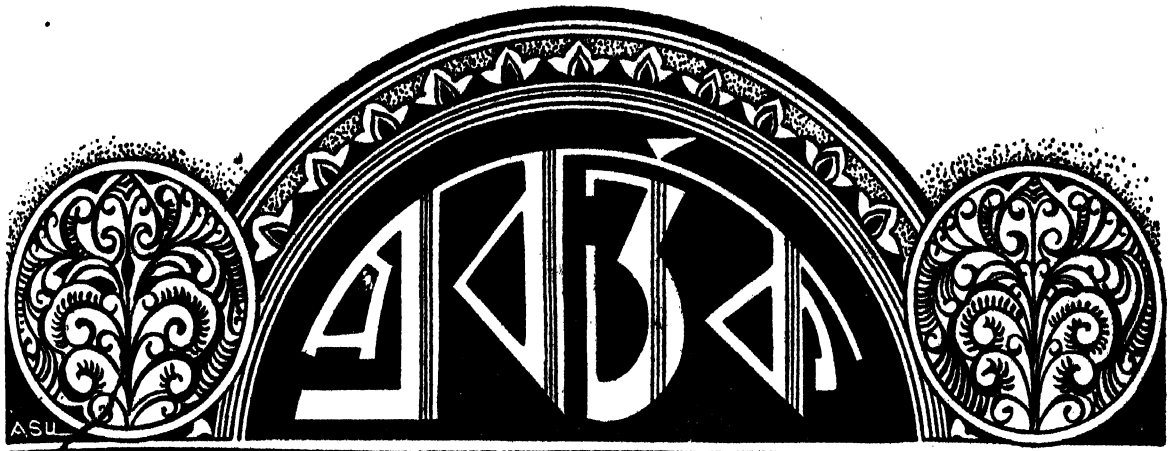
প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ স্বাধীন রাষ্ট্র চায়। আত্মবিধৃত সত্যপূত সমাজ চায়, শ্রম ও শক্তিসিদ্ধ অর্থপ্রতিষ্ঠান চায়। প্রশ্ন—ইহার মধ্যে সাম্যবাদের স্থান আছে কি না? প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু করে নাই, অর্থ-সাধনার দিক্ দিয়া সমাজতন্ত্রীদের ন্যায় সাম্যবাদকেই প্রশ্রয় দিয়াছে—যে হেতু প্রবর্ত্তকসঙ্ঘীদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অর্থ ভাণ্ডার নাই, তাহার অখণ্ড অন্নক্ষেত্র, সেই হেতু সঙ্ঘের সাম্যবাদই কি ইহাতে সিদ্ধ হইতেছে না?

উত্তরে বলিব—ধর্ম্মের ভিত্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া সঙ্ঘ উপরোক্ত ক্ষেত্রত্রয়ে নিয়ত কর্ম্ম করিতেছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রচলিত রাষ্ট্র-কর্ম্মের অনুরূপ কর্ম্ম তাহার নহে, তাই সঙ্ঘকে রাষ্ট্রসাধনবিমুখ বলিয়া মনে হইতেছে। সঙ্ঘের অর্থসাধনা নব সমাজ-প্রবর্ত্তনেরই সূত্রপাত। এই অর্থসাধনায় সাম্যবাদের যে লক্ষণের প্রশ্ন উঠিয়াছে, উহা হেতুমূলক, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি।

পৃথিবীর বর্ত্তমান অনেক জাতির আয়ুষ্কাল এখনও শেষ হয় নাই, বরং কাহারও কাহারও মধ্যযুগ চলিতেছে। কিন্তু ভারতের হিন্দু বা আর্য্যজাতির মৃত্যু হইয়াছে, তাহার বিরাট্ শবদেহ ক্রমে গুটাইয়া ভারতেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে। ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির ইহা দুর্গতির লক্ষণ মনে করিলে ভুল হইবে। ইহা প্রকৃতির অকাট্য বিধান; ভারতজাতির অতীত মাহাত্ম্য এই হেতু যাঁহারা দোষযুক্ত মনে করেন, তাঁহাদের চিন্তাশক্তির গভীরতা নাই বলিতে হইবে। কেন না, যাহা কিছু সৃষ্ট, অণুপরমাণু হইতে জীব-জগৎ, জাতি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি সবেরই একটা নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃ থাকিবে এবং আয়ুঃ শেষ হইলে উহার অস্তিত্ব লোপ পাইবে। কিন্তু এই লোপ অর্থে ইহার অবসান নয়, পরন্তু চরম পরিণতির পর নূতন মূর্ত্তিতে পুনরুত্থান। ভারতের আর্য্যজাতির জন্ম হইয়াছিল, পরিণত রূপ প্রাপ্ত হইয়া উহার অন্তদশা

আসিয়াছে। অতঃপর তাহার পুনরুত্থানের যুগ সমাগত। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ এই নব যুগের সর্ব্বপ্রথম যাত্রী। অতি দীর্ঘ দিন তাহাকে অতীতের ভস্মস্তূপ সরাইয়া স্বভাব ও স্বধর্ম্মকে আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। এই আত্মভাবের উপর দাঁড়াইয়াই তাহার আজ প্রয়োজন হইয়াছে পুষ্টি ও ক্রমবৃদ্ধির। অর্থ-সাধনা এইরূপ জীবন-গতির প্রথম পদক্ষেপ।

এই ক্ষেত্রে যে লোকসমষ্টি লইয়া কর্ম্ম, তাহা সংখ্যাধিক্যযুক্ত নহে। ইহা হইতেও পারে না, হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নহে। প্রবর্ত্তকের ভাব বিশ্বগ্রাসী; কিন্তু তাহার কর্ম্ম বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ। ইহাই গতিচ্ছন্দঃ। বাংলাকে আমরা তত দূরবর্ত্তী মনে করিব, যত দূর পর্য্যন্ত বাঙ্গালী বাস করে। এই বাংলা বর্ত্তমান পঞ্চবিভাগযুক্ত। একদিকে শ্রীহট্ট, কাছাড়। অন্য দিকে মানভূম, সিংহভূম, ধলভূম ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়া লইতে হইবে। বাঙ্গালীজাতির ইহাই মাতৃভূমি। এই অখণ্ড বাংলাদেশকে আমরা শাসনসৌকর্য্যে খণ্ডিতাকারে দীর্ঘ দিন থাকিতে দিব না।

আমাদের প্রথম কাজ এই বাংলায় ইচ্ছাশক্তি ও সৃজনীশক্তির প্রতিষ্ঠা; ইহার জন্য যে অল্পসংখ্যক মানুষ লইয়া আমাদের কার্য্যারম্ভ, তাহাই আমি যথেষ্ট মনে করিয়াছি। এই মানুষগুলির সর্ব্বতোভাবে সংহতিবদ্ধ জীবনের প্রয়োজন থাকায়, ইহাদের মন্ত্র এক, আকৃতি এক, হৃদয়, মন, প্রাণ সবই এক করিতে হইয়াছে। আত্মবিধৃত সমষ্টিশক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তিই সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘের অর্থস্বাতন্ত্র্য অনাবশ্যক। ইহা অখণ্ডত্বের পরিপন্থী। সঙ্ঘের ভাবে ও বস্তুতে ভেদবুদ্ধি এই বৃহৎ কর্ম্মসিদ্ধির প্রতিকূল হইবে। অতএব সঙ্ঘের মধ্যে একান্নবর্ত্তিতা সাম্যবাদের আদর্শ নহে; পরন্তু ইহা ঐক্যবদ্ধ সংহতির সত্য রূপ ও পরিচয়।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ অর্থসাধনার ক্ষেত্রে সাম্যকে স্বীকার করে না। সাম্য জাগতিক ধর্ম্ম নহে, উহা এক প্রকার চিত্তবৃত্তির অভিব্যক্তি। ইহাতে অনেক অক্ষম ও অজ্ঞকে ধনসাম্যের নামে বিপুল সমষ্টিবদ্ধ করিয়া, উহার সহায়ে দুই চারি জন বুদ্ধিমানের স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা হইয়া থাকে। বৈষম্য—সৃষ্টির আদি ও অকৃত্রিম নীতি। এই বৈষম্য অর্থে এক হইতে অন্যের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য, দুঃখ ও দুর্গতি নহে। ধনসাম্য আকাশকুসুম। স্বপ্ন যতক্ষণ, ততক্ষণ তার ঘোষণা। যাহা সনাতন, তাহাই আমাদের আশ্রয়ণীয়।

বৈষম্য আকৃতি, প্রকৃতি ও গুণের তারতম্যবশতঃ হইয়া থাকে। এক হইতে অন্যের ভিন্নতার মূল—কর্ম্ম। কর্ম্ম অনন্ত। ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি, প্রকৃতি ও গুণের উৎকর্ষ-অপকর্ষ সাধিত হইতেছে কর্ম্মে। বর্ত্তমান সঙ্ঘ এই ক্ষেত্রে সেই কর্ম্মই সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছে, যাহা অভ্যুত্থানমূলক ও মুক্তিপ্রাপক। বিশ্বকর্ম্মে সঙ্ঘের এই প্রথম পর্য্যায় প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আজিকার তার যে পরিচয়, তাহা লক্ষ্যসিদ্ধ করার প্রথম প্রকরণ; ইহা চরম বলিয়া অবধারণ করা সঙ্গত হইবে না।

সঙ্ঘ জাতি গড়িতে চায়। সঙ্ঘ জাতির ভ্রূণ-মূর্ত্তি। প্রশ্ন হয়—এই জাতি কি তবে অমিশ্র হিন্দুজাতি? ইহার উত্তর দিতেছি।

জগৎ নিরাকার নয়, একাকারও নয়। আকৃতিগত বৈষম্যে জল, স্থল, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি স্থানভেদ ও বর্ষ, যুগ, মন্বন্তর প্রভৃতি কালভেদ ইহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। যাহা মনঃকল্পিত নহে, তাহা সর্ব্বজনস্বীকৃত হইবে। ধর্ম্ম খণ্ড মনের বিষয় যদি হয়, তবে তাহা লইয়া মিশ্রামিশ্র বিচার চলে। অবশ্য ধর্ম্মের গুণ ও আকৃতি আছে; তাহার নামও আছে। সে নাম আমা হইতেই উদ্ভূত। আমাকে যত দূর সম্প্রসারিত করিলে এই নাম সম্প্রসারিত হইতে পারে, ততদিন আমি ইহা হিন্দুধর্ম্মই বলিব। আমি অনন্ত গতিপ্রাপ্ত। সেই গতির সঙ্গে নামের অন্ত যদি হয়, ধর্ম্মের নামও তখন অন্য হইবে। সে কথা এখন নহে। সে অবস্থায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ এখনও উপনীত হয় নাই।

সব চেয়ে বড় প্রশ্ন—যাঁহারা মানবজীবনের মধ্যে এক অভিনব দিব্য প্রেরণা সঞ্চার করিয়া জগতের গতানুগতিক পথের পরিবর্ত্তনকামী, তাঁহাদের সংস্কারগত জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভব কি না? মানবসংস্কার হইতে মুক্ত জীবন-সংহতিই সঙ্ঘ। মুক্ত-জীবন অর্থে ভাগবত জীবন। জীবত্বে ঈশ্বরত্ব সম্ভব হয় কি?

উত্তর। ভারতের—ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ। বেদ হইতে আমরা ভাষা পাইয়াছি; গতিও পাইয়াছি। ভাষা হইতে অসংখ্য শাস্ত্রাদি প্রণীত হইয়াছে এবং গতি

হইতেই অনুশাসনমূলক বিধি-নিষেধের প্রবর্ত্তন। যদৃচ্ছা ভাব ও গতি নিয়ন্ত্রণ করে শাস্ত্র ও অনুশাসন। বেদ ইহার মূল। বেদকে আমরা পাই ব্যাসদেব হইতে। এই ক্ষেত্রে তাঁহার অনন্ত দাবী। ইনি বেদব্যাস। আমরা অবান্তর শাস্ত্র ও অনুশাসননীতি অনায়াসেই দূরে রাখিয়া তাঁহার অনুসরণ যদি করি, তাহা হইলে আমরা যে জীবনের সন্ধান পাই, তাহার ভিতর দিয়াই আমাদের সংশয় দূর হইতে পারে। আমি বহু পথ ঘুরিয়াছি। বহু কর্ম্ম ও গুণের সাধনায় বিচিত্র অভিজ্ঞতাও অর্জ্জন করিয়াছি। আমি প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘকে অকম্পিত কণ্ঠে বলিব—ধর্ম্ম-জীবনের জন্য ভারতের প্রসিদ্ধ তিনখানি গ্রন্থ আশ্রয়ণীয়—উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা। এই শাস্ত্রত্রয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান আছে। এই তিনখানি গ্রন্থের অনুশীলন ও প্রণয়ন একজন অথবা সমপন্থীদের দ্বারা করা হইয়াছিল। উপনিষদের তত্ত্বই ব্রহ্মসূত্রে যুক্তিযুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। উপনিষদের লক্ষ্যই গীতায় প্রাপ্তিযোগ্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। অতএব এই প্রস্থানত্রয়ের সাহায্যেই আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি—জীবসংস্কার হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারি না বটে, কিন্তু স্বভাবসংস্কার হইতে মুক্তি পাইয়া আমরা এক অসাধারণ মহাভাব লাভ করিতে পারি—উহাই আমাদের পরম গতি দেয়—এইখানে বিদূরিত হয় সকল কামসংস্কার, জীবত্বে পায় ঈশ্বরত্বের ভাব এবং এই ভাব বস্তুরূপে ঘনাইয়া তুলিতেও পারে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের অগ্রণীদের এই সত্য স্বভাব ও স্বরূপের জন্য সাধন করিতে হইবে। হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইলেই আমরা লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইব।

সংস্কারপূর্ণ স্বভাবজীবন ভাগবত হইতে পারে কিনা, এরূপ খণ্ড সংশয় খণ্ড মনের। মনের ঊর্দ্ধে চৈতন্যের আর এক ক্ষেত্র আছে—ঐখানে ভাগবত-জীবন সম্ভব হইতে পারে। অতএব প্রশ্নের উত্তর এইখানেই শেষ হইল।

বর্ত্তমান ধন ও শ্রমসমস্যার আন্দোলনে রাষ্ট্রসমস্যা দেখা দিয়াছে। তাহার সমাধানে সঙ্ঘের কোন কর্ত্তব্য আছে কিনা—ইহাও একটা প্রশ্ন।

ধর্ম্মের ভিত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিলে, সমস্যার সমাধান লক্ষ্যে পড়ে। "প্রবর্ত্তকে" ধর্ম্ম শব্দের যে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার, ইহার মর্ম্মার্থ—ধর্ম্ম আচার-বিশেষ। স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে আচার আবার পরিবর্ত্তনশীল। ধর্ম্মও পরিবর্ত্তনশীল। এ কথা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। ধর্ম্ম অধ্যাত্মগতির লক্ষণ। ভিতরের পরিবর্ত্তনানুযায়ী ধর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন হইবে। অতএব আজ যাহা আমায় অবধারণ করে, তাহা আত্মারই অভিব্যক্তি, উহাই আজ ধর্ম্মরূপে অভিহিত। এই ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বলা যায়—বর্ত্তমান যুগে যে যে বস্তু লইয়া আন্দোলন ও সমস্যার সৃষ্টি, তাহা মনঃকল্পিত। মনের সৃষ্টি যাহা, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, এরূপ বলিতেছি না। তবে এই ক্ষেত্রে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কর্ম্ম-নির্দ্দেশ নাই। শ্রম ও ধন আত্মার প্রকাশ-মূর্ত্তি যাহাতে হয়, তাহারই সাধনা প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ গ্রহণ করিয়াছে। সঙ্ঘ পরিচিত সর্ব্ব-প্রকার কর্ম্মপ্রচেষ্টা হইতে অমিশ্র জীবন-গতি ধরিয়া চলিবে। শ্রম ধনদায়ক; ধন সমাজের শ্রী ও শক্তি। সমাজই রাষ্ট্রের দৃঢ় ভিত্তি। এই হেতু প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ এই তিন ক্ষেত্র বাহিরের সমস্যায় বিজড়িত মনে করে না, বিশ্বাসও করে না; বরং এই তিনের অভাবে জাতি অধঃপতিত হইয়াছে বলিয়া, যে কারণে এই তিনটী ক্ষেত্রে আমরা সচেতন নহি, সেই কারণটীকেই জাতি-জীবনে প্রতিষ্ঠা দিতে চায়। শক্তি—শ্রমের মন্ত্র। অর্থ—শ্রমের অনুবাদ। এই হেতু শক্তিই জাতির সাধ্য। উহা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া যে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ, তাহার কারণ আমরা ভিতর হইতে বাঁচিতে চাহি না। ভিন্ন দিক্ হইতে কর্ম্ম করার জন্য প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ জাতিকে সচেতন করিবে, আত্মশক্তি জাগ্রত করার সাধনায় একনিষ্ঠ করিবে। এই শক্তি-সাধনাই সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তন আনিবে। আমি ইহার জন্য পর পর তিনটী সাধনার স্তরের ভিতর দিয়া জাতিকে উন্নীত করার প্রকরণ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকে অবলম্বন করিতে বলিব।

প্রথম দশ জন, বিশ জন, শত জন যাঁহারা আজ অমিশ্র সংগঠন-মন্ত্র লইয়া সঙ্ঘ বুলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের খণ্ড মন হইতে মুক্তি লইয়া বিজ্ঞানঘন চেতনায় উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

দ্বিতীয়, যাঁহারা এই অধ্যাত্মসাধনার ভিতর দিয়াই জাতিরও সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও শ্রী কামনা করেন, তাঁহাদের লইয়া একটী স্বতন্ত্র সংহতি গড়িয়া লইতে হইবে।

তৃতীয়, এই বৃহৎ সংহতির সহিত সঙ্ঘশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে একাত্ম হইয়া বাংলার সর্ব্বত্র সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে সম-আচার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। প্রত্যেক দেশবাসী আত্মশক্তি শ্রমে পরিণত করার সুযোগ যাহাতে পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই শ্রমের অনুবাদই অর্থ। শ্রমভেদে অর্থের পরিমাণ সর্ব্বক্ষেত্রে তুল্য হইবে না, ইহা বুঝাইয়া স্ব স্ব অবস্থায় মানুষের চিত্ত সন্তোষে অভিষিক্ত করিতে হইবে।

এই সন্তোষ সত্যপ্রতিষ্ঠ সমাজের ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান উপাদান; এই সন্তোষ অবস্থার দায়ে নষ্ট হয় না। সন্তোষ নষ্ট হয় বলিয়াই অবস্থার দায়ে পড়িতে হয়। জাতিকে আমরা যে পরিমাণে অধ্যাত্ম-ভিত্তির উপর তুলিয়া ধরিতে পারিব, সেই পরিমাণে যুগের আন্দোলন ও সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ এই পথে কর্ম্মরত হইলে, সাফল্য লাভ করিবে।

---

# দীনেশ-তর্পণ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ

সাহিত্য-হিমাদ্রি-চূড়ে ওই তব কীর্ত্তি কিরীটিনী
উজলিয়া বিশ্ব-নভ রাজে ভাব-মুকুতা খচিত;
হে মহান্! দীপ্ত তব প্রতিভার পবিত্র তটিনী
মানবের চিত্ত-তট নব ভাবে করে উদ্বেলিত।

ভ্রমিয়া মরুর দেশে পথ-ভ্রান্ত তৃষ্ণার্ত্ত পথিক
যখনি চরণতলে বসে আসি হে পান্থ-পাদপ!
হৃদয় নিঙাড়ি' তব কণ্ঠে তার হে রস রসিক!
ঢাল সে অমৃত পয়ঃ সঞ্জীবিত হয় যাহে শব।
শাখে শাখে বহাইয়া তৃপ্তি-ভরা অদৃশ্য সমীর
জুড়ায়েছ ঘর্ম্ম তার; তুলিয়াছ পত্রের মর্ম্মরে
কি করুণ 'রামায়ণী-কথা'; ঝরায়েছ অশ্রুনীর
'সীতা'র করুণ গানে পাষাণেরো দুটি চক্ষু ভরে'।

বঙ্গের পূরবাকাশে উরি তুমি চলিলে পশ্চিমে
তোমার অরুণ স্মৃতি মিশে গেল অনন্ত অসীমে।

## বাংলার ভবিষ্যৎ সাধনা

ভারতের আর্য্য সভ্যতার ইতিহাস খুলিয়াই দেখি বিশ্বসম্রাট্ প্রিয়ব্রতের নাম পুরোভাগে। পৃথিবী পর্য্যটন-কালে তাঁহার রথচক্রে আবর্ত্তিত হইয়া সপ্ত সমুদ্র উথলিয়া উঠিত। সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ইঁহারই শাসনাধীনে ছিল। তাঁহার ৯ পুত্র। ৭ পুত্র এক একটী দ্বীপের অধিপতি হইলেন। দুই পুত্র বৈরাগ্যের ঝাণ্ডা উড়াইয়া জগতে সর্ব্বপ্রথম সন্ন্যাসধর্ম্মের বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন।

অগ্নীধ্র নামে পুত্র পাইলেন জম্বুদ্বীপ। ইহাই এসিয়া নামে অভিহিত। ইনি অপুত্রক ছিলেন। ইহার পর দশ হাজার বৎসরের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না; তার পর নাভি নামে এক প্রসিদ্ধ সম্রাটের নাম পাওয়া যায়। ইনি অগ্নীধ্রের বংশধর বলিয়া প্রখ্যাত হন। হিমালয়ের দক্ষিণে হিমবর্ষ নামে ইনি এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, ইঁহার পুত্র ঋষভ। ঋষভ জৈনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। ঋষভের পুত্র ভরত। এই ভরত হইতে ভারত। ভরতের পুত্র সুমতি। সুমতির পুত্র শক্তিশালী ভারতসম্রাট্ বিশ্বজ্যোতিঃ। বৃহত্তর ভারত ইনি ৯ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহার ৯ জন পুত্রকে প্রদান করেন। তদীয় পুত্র ক্ষেম সেই বিভক্ত ভারতের অধিপতি হয়েন। ইহার পর ভারতের ইতিহাস আর স্পষ্ট নহে। একেবারে বেণের রাজত্বকাল ভারতে পরিলক্ষিত হয়। তারপর ভারতের ধারাবাহিক একটা ইতিহাস আছে, সে দীর্ঘ কাহিনী আমাদের আলোচ্য নহে। আমরা দেখি—প্রিয়ব্রত হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সংস্কৃতি, তাহা বৈদিক সংস্কৃতি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলে, ভারতের কুরুক্ষেত্রসংগ্রাম বর্ত্তমান যুগের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। এই কুরুক্ষেত্র সংগ্রামের কালনির্ণয় সমস্যা আর নাই। কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য সকল মনীষীই উহা খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ বৎসর ধরিয়া লইয়াছেন। অতএব আমরা ভারতে এই ৫ হাজার বৎসর যে সংস্কৃতির প্রভাবাধীন আজও ২৪,২৫ কোটী লোককে দেখি, তাহা সেই সুদীর্ঘ অতীতের বৈদিক সংস্কৃতি। কুরুক্ষেত্র-যুগের ব্যাসদেব বৈদিক সভ্যতার পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। এই ব্যাস ব্রাহ্মণের ঔরসে, অস্পৃশ্যা নারীর গর্ভজাত। আবার এই ব্যাসের ঔরসেই ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে ভারতের প্রাচীন রাজবংশের উৎপত্তি। যুধিষ্ঠিরাদি হইতে রাজা পরীক্ষিতের রক্তধারা বিগত হাজার বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। এই রাষ্ট্রশক্তির সমর্থনে সেদিন পর্য্যন্ত বৈদিক সভ্যতা চলিয়া আসিয়াছে; আজও নানা ভাবে তাহাই চলিতেছে।

এক্ষণে বৈদিক সভ্যতা কি, ইহা আমাদের দুই এক কথায় বুঝিয়া লইতে হইবে। বেদ আর্য্যজাতির গ্রন্থ। এই গ্রন্থে জ্ঞান ও কর্ম্মের পথ দেখান হইয়াছে। জ্ঞানের লক্ষ্য ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিরতিশয় বৃহৎ। এই ব্রহ্মের অন্তর্গত বিশ্বজগৎ। ব্রহ্মে—জগৎ। জগতেও ব্রহ্ম। কিন্তু তিনি জগদতীত। এই ব্রহ্ম আবার আত্মা নামেও অভিহিত হইয়াছেন। তাই আত্মাও সর্ব্বগত। কর্ম্ম দেখাইয়াছে স্বর্গাদি কর্ম্মফলের ভিতর দিয়া জ্ঞানপ্রাপ্তির সোপান। অতএব কর্ম্ম ও জ্ঞানের তত্ত্ব বেদবস্তু। জ্ঞান দিয়াছে অমৃত—জগদতীত অমর্ত্ত্যকে। কর্ম্ম দিয়াছে এই শ্রেয়ঃপথে চলার শক্তি ও সাহস। অনায়াসে তাই বলা যায়—বৈদিক সভ্যতা এক অখণ্ড জীবনবাদের তপস্যা। যে জীবন ভূমার লক্ষ্যে নিরন্তর গতিশীল।

বেদের এই ধর্ম্ম, এই সংস্কৃতি জীবনগত করার বহু প্রকার সঙ্কেত যুগে যুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যুগের পরিবর্ত্তনে সাধনার পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছে। কিন্তু বেদের লক্ষ্য এ জাতি হারায় নাই। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ব্যাসদেব জাতিকে এই ধর্ম্মলক্ষ্যসাধনের নির্দ্দেশ দিতে যে শ্রম ও তপস্যা করিয়াছেন, পরবর্ত্তী যুগে নানা আকারে তাহারই ধারাবাহিকতা-রক্ষা হইয়াছে। মধ্য যুগে বেদের

ব্রহ্মসাধনায় জাতিকে রাজযোগ, হঠযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতির আশ্রয় লইতে দেখা যায়। আমরা এই যুগটীকে অতিক্রম করিয়া পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বের বাংলার দিকে দৃষ্টিপাত করি। দেখি—বেদের ধর্ম্মই ব্রহ্ম বা আত্মা নাম ছাড়িয়া ভগবানের লক্ষ্যে অভিনব জীবন-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে—লক্ষ্য সিদ্ধ করার বস্তুতন্ত্র জীবন-নীতি আশ্রয় করিয়াছে। আমরা নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ব্রহ্ম-সাধনায় জাতি জ্ঞান পাইয়াছিল; কর্ম্ম-সাধনায় শক্তি পাইয়াছিল—তবুও ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কিছু প্রয়োজন ছিল। বাঙ্গালী সেই প্রয়োজন মিটাইয়াছে শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তিতে। বাংলার অভিনব আবিষ্কার—উহাই প্রেমধর্ম্ম।

প্রেম জীবের হৃদ্‌বস্তু। প্রেমলাভের পর, উহার প্রয়োগ-বিধি অন্বেষণ করিতে গিয়া পরবর্ত্তী যুগে সাধন-শক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে হালিসহরে। কর্ম্ম যে শক্তির অনুবাদ, সাধক রামপ্রসাদের জীবন তাহার দৃষ্টান্ত। খাওয়া, শোওয়া, চলাফিরা, সকল কর্ম্মই শক্তিকে লক্ষ্য রাখিয়া হওয়ার নির্দ্দেশ হালিসহরের অমৃতপরিবেশন। এই প্রেম ও শক্তির সাধনা ইহার পর মূর্ত্তি লইল দক্ষিণেশ্বরে—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মিলনে। ব্যাসদেব উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের জীব ও ব্রহ্মের কৃষ্ণ-পার্থের অনুবাদে যে ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে তাহার বিগ্রহ দেখা দিল। তারপরও যে আরও কিছু থাকিয়া যায়, জীবনবাদী ভারতের করণীয়রূপে; কেননা ভারতের তবুও অভ্যুত্থান হয় নাই। হোমাগ্নি জ্বলিতেছে যেন পূর্ণাহুতির প্রতীক্ষায়। আমরা সেই সমাপ্তিমন্ত্রের সন্ধান করিতেছি। আমাদের অন্বেষণের স্পৃহা ব্যর্থ হয় নাই, নতুবা মন্ত্রসাধন চলে কেমন করিয়া?

প্রেম, শক্তি ও আত্মসমর্পণ ভাগীরথীতীরে বাংলা-দেশের মর্ম্মক্ষেত্রে সংসাধিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী পূর্ণাহুতির অনুষ্ঠানও এই বাংলাতেই হইবে। এই ভাগীরথীতীরেই সে তীর্থ গড়িয়া উঠিবে। বেদের অভিধেয় জীবনে অনুবাদ করার জন্য বাঙ্গালী এই পাঁচ শত বর্ষ যে তপস্যা করিয়াছে, তাহা আমরা অতি শীঘ্র মূর্ত্ত হইতে দেখিব।

বাঙ্গালী বৈদিক সংস্কৃতি জীবনে ফলাইবার জন্য প্রেম-ঘন মূর্ত্তি ধরিয়াছে নবদ্বীপে, শক্তির সন্ধান পাইয়াছে হালিসহরে আর আত্মসমর্পণের বিগ্রহ দর্শন করিয়াছে দক্ষিণেশ্বরে। আমরা এইবার জাতি-জীবনে ভারতের অপৌরুষেয় তত্ত্বকে রূপ দিব। তাহা আর প্রেম-শক্তি-আত্মনিবেদন শুধু নয়; খণ্ড মনের ধর্ম্ম নীচে রাখিয়া বিজ্ঞানালোকে একদিকে আনন্দের গঙ্গোত্রীধারাকে নামাইয়া আনিব মর্ত্ত্যে, অন্যদিকে শরীর-প্রাণ-মনের চেতনাকে উর্দ্ধে টানিয়া আনিব এই অমৃতে অভিষিক্ত হইতে—বাঙ্গালীকে আজ কৃচ্ছ্রতামূলক যোগাদির মৃত কঙ্কালের আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইতে হইবে। প্রেম ও শক্তি-সাধনার ভাবমাধুর্য্য ও অনুষ্ঠানাদির আবর্ত্ত ভেদ করিতে হইবে। বিজ্ঞানের সাধনা অতীতের অনুরূপ নহে; সে নব বিধান আজিও ভাষায় বর্ণনার নহে, উহা সাধ্য। বাঙ্গালী আত্মচেতনা যদি লাভ করে, ইহার শিক্ষা ও দীক্ষা বাঙ্গালী অন্তরচেতনায় লাভ করিবে। সাধনার এই নব যুগ ব্যর্থ হইবে না। আমরা তাই ভারতের আসন্ন মুক্তি ও অভ্যুত্থান অনিবার্য্য মনে করি।

## ভারতের নিজস্ব মতবাদ ও উন্নতির সোপান

একটা কথা শুনা যায়, জগতে দুইটী জাতি আছে—একটী ধনিক, আর একটী শ্রমিক। ধনিকের প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছে, অতঃপর শ্রমিকদের অভ্যুত্থান-যুগ। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্যের মার্ক্সিজমই এই অভিনব আন্দোলনের ভিত্তি। এই আন্দোলনের ফলে মানব-জগতে শ্রেণীযুদ্ধের সৃষ্টি এবং এই যুদ্ধ রুশে সাফল্য-মণ্ডিত হওয়ায় জগতে সকল শ্রমিকের মধ্যেই উত্তেজনার সাড়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ ভারতে।

ভারত বলিতেছি, কেননা রুশের প্রতিবাসী জার্ম্মাণী ইহার পরিপন্থী। আজিকার বিজিত ফরাসী জাতিও এইরূপ শ্রেণীযুদ্ধের পক্ষপাতী ছিল না। বৃটেন, ইটালী মার্ক্সিজমের সমর্থন করে নাই; স্পেনে রুশের নীতি স্থান

পাইল না; প্রাচ্যখণ্ডের জাপানেও না। বলিতে হইলে রুশ ছাড়া জগতের কোথাও মার্ক্সিজমের ঠাঁই হয় নাই। ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা—ভারতের এক শ্রেণীর লোক ইহা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, বিশেষতঃ তরুণদের মধ্যে এই মতবাদ দৃঢ় শিকড় গাড়িয়াছে।

আমরা বলিতে চাই, অতীত ভারতের ইতিহাসে সুস্পষ্টই দেখা যায় যে, মধ্যযুগের বৌদ্ধবাদ ভারতের যে সকল স্থানে বিপুল স্থান করিয়া লইয়াছিল, বৌদ্ধবাদের মর্য্যাদা ও গুরুত্ব যে কোন কারণেই হউক, ভবিষ্যতে নষ্ট হইলে, ঐ সকল ক্ষেত্রেই মুসলমান ধর্ম্ম আশ্রয় পাইয়াছিল। ধর্ম্মক্ষেত্রে যাহা হইয়াছিল, রাষ্ট্রক্ষেত্রেও তাহা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমাদের আজ ভাল করিয়া দেখিতে হইবে—এই বিদেশী মতবাদ কোথায় কতখানি প্রসার লাভ করিতেছে, এবং তাহা দেখিয়া নিঃসংশয়ে রায় দেওয়া যাইবে যে, ঐ সকল ক্ষেত্রে মার্ক্সিজম যতটা ফলপ্রসূ হউক আর নাই হউক, প্রচলিত জাতীয় সংস্কৃতির উচ্ছেদসাধন হইবেই ও ইহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন উড়ো আদর্শবাদ আসিয়া প্রাধান্য বিস্তার করিবে। দুঃখের বিষয়, হিন্দু-জাতির মধ্যেই রাষ্ট্র-বুদ্ধি বিস্তৃত আকার লওয়ায় মার্ক্সিজমের প্রভাব এইখানেই অধিক দেখা যায়। ফলে, ভবিষ্যতে হিন্দু-জাতির সংখ্যা ও গুণশক্তি হ্রাস পাইবে, ইহা অনায়াসে বলা যায়।

কেন এমন হয়! এই হিন্দু-জাতিকে বিচ্ছিন্ন বিভক্ত করিয়া নানা জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দু-জাতির বিশালতা হেতু তাহার আকৃতিগত ক্ষীণতা স্পষ্ট অনুভূত না হইলেও, যুগে যুগে বিপথগামী হওয়ার ফলে সে ক্রমেই শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। লোক-গণনার হিসাবের দিক্‌টা দেখিয়া রাজ-নীতিক অধিকারের দায়ে হিন্দু-জাতির মধ্যে কোথাও কোথাও আত্মস্থ হইয়া সংহতিবদ্ধ হওয়ার জন্য কিছু কিছু প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে বটে; কিন্তু সে প্রচেষ্টার মূলে আত্ম-সংস্কৃতিগত প্রস্তর-ভিত্তি নাই; আছে অতি লঘু শিথিল বালুস্তর। আমরা তাই এই প্রচেষ্টা সবিশেষ কার্য্যকরী হইবে কিনা, সংশয় করি।

প্রথম মার্ক্সিজমের মতানুবর্ত্তী তরুণদের আমরা একটা কথা স্মরণ রাখিতে বলি—অতীতের পাতা উল্টাইলে দেখা যায় যে, প্রতি দেশের, প্রতি জাতির একটা না একটা বৈশিষ্ট্য থাকে, কোন এক দেশ ও জাতি অন্য দেশ ও জাতির উপর তাহাদের স্ব স্ব প্রভাব স্থায়ী করিতে পারে না; এবং করিলেও, তাহা কিছুদিন বলবৎ থাকিয়া পুনঃ সংহৃত হইয়া যায়। ফরাসীর সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা রুশ ও জার্ম্মাণীতে কি শক্তি-বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল? বৃটেনের রাজ-তান্ত্রিক গণতন্ত্র কি ইউরোপের অন্য কোন দেশে এইরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে? রুশে যাহা সম্ভব, তাহা ভারতে সাফল্যমণ্ডিত হইবে—এইরূপ আশা দুরাশা নহে কি? ভারতের রক্তধারায় যে সংস্কৃতির স্রোতঃ, তাহার কি কোনই শক্তি নাই? তাহার ঘাড়ে বৈদেশিক মতবাদ-প্রয়োগের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার বিপরীতে স্বকীয় অধ্যবসায় কোন কাজেরই হইবে না, এরূপ মনে করা অদূরদর্শিতার পরিচয় নহে কি? জগতে মানবজাতির মধ্যে মাত্র দুইটী শ্রেণী আছে বলিয়া যে ঘোষণা, তাহা অর্থবাদের আপাত ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে যাহারা, তাহাদের প্রাণে আজ হয়তো কিছু সাড়া তুলিতে পারে, কিন্তু কাল সুবিধার দিন আসিলে এই ক্ষণিক অর্থবাদ আবার যে ধনবাদে রূপান্তরিত হইবে না, তাহা কে বলিবে? ইহার দৃষ্টান্ত বহু সাম্যবাদী কৃষক ও শ্রমিক নেতাদের মধ্যে প্রদর্শন করা যাইতে পারে। অবস্থা ও সাধনার সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ক্ষণিক মতবাদ প্রবর্ত্তিত হয়। ফরাসী ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া ছিল—তাহা আজ শ্রম, পরিবার ও রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয় অবস্থার পীড়নে। অবস্থার পর অবস্থা নব নব ঘটনা ও প্রবৃত্তির কারণ হয়। অবস্থাবিশেষের সুবিধা লইয়া জাতির জয়-ঘোষণা বিচক্ষণতার পরিচয় নহে। আমাদের শিরায় যে মানবতার রক্ত, তাহা তো শুধু শ্রমিক ও কৃষকের নহে; মানব মাত্রেরই রক্ত ইহাতে প্রবহমান। এই রক্তের স্বভাব ও স্বধর্ম্ম ধরিয়া সম্প্রদায়বিশেষের ন্যায় শ্রেণীবিশেষের মধ্যেও সংঘর্ষসৃষ্টির প্রচেষ্টা ক্ষণিকের। নেশা ভাঙ্গিলে, আমরা সাম্যই পাইব। শ্রেণীসংগ্রাম আমাদের স্থায়ী সৌভাগ্যের কারণ হইবে না। এই সাম্য দেশ ও জাতিগত হইবে।

আমাদের নিজস্ব মতবাদের উপরেও দাঁড়াইবার চেষ্টা

বাঞ্ছনীয়। একবার নেপোলিয়নের একতন্ত্রবাদে রক্ত গরম হইয়া উঠিবে, আবার ম্যাজ্জিনি ওয়াশিংটনের উত্তাপেও আমরা অসহিষ্ণু হইয়া পড়িব। তারপর রুশের মার্ক্সিজম আমাদের অভাবাত্মক বুদ্ধি-বৃত্তিকে আজ পূরণ করিবে, কাল হয়তো দেখিব যদি নাজিজিমের জয় হয়, আমরা সব নাজি হইয়া যাইতেছি। অন্য পক্ষে, বৃটন বিজয়ী হইলে, আমাদের এইখানে ক্ষত আছে বলিয়া উহা আমলে আনিব না; কিন্তু কিছুকালের জন্য শূন্যে প্রলম্বিত হইয়া থাকিব। আমরা কি এইরূপ গড্ডলিকাপ্রবাহ? আমাদের আত্ম সত্য বলিয়া কি কোন বস্তু নাই?

আমরা স্পষ্ট দেখি—এই পতিত জাতিকে নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে হইলে তাহার অনেক কিছু করার আছে, তাহার জন্য বাংলাদেশে হাজার হাজার কর্ম্মীর প্রয়োজন। এই সকল কাজ এখন হইতে না করিলে, দশ বিশ বৎসর পরে আমাদের হাড়ে ঘুণ ধরিবে, সেদিকে লক্ষ্য নাই কেন?

ধর্ম্মের কথাই বলি। যাঁহারা বলেন—রাষ্ট্রে ধর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়টা কি তলাইয়া দেখিয়াছেন? জাতি যদি মুক্তির দিশারী হয়, ধর্ম্মই তার আলম্বন হইবে। ধর্ম্ম আচার দেয়, শীল দেয়, সংহতি দেয়। যদৃচ্ছ আচারের শৃঙ্খলারক্ষা ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুতে হয় না। ধর্ম্মই ভাষা, ভাব ও বস্তুগত ঐক্যের প্রতিষ্ঠা দিতে পারে। সদাচার ধর্ম্ম। জাতিতে সম-আচারপরায়ণ করে ধর্ম্মে। জাতির জন্মকাল হইতে মরণকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেকে যদি ভিন্ন ভিন্ন পথচারী হয়, স্বার্থ তাহাদের সম হইলেও, উহা সাধন করিবার সময়ে শক্তিপ্রয়োগকালে দেখা যাইবে—তাহারা এমন যথেচ্ছাচারী হইয়াছে যে, জগন্নাথের রথকে পথ হইতে নানা মতপ্রভাবে উহা বিপথেই লইয়া চলিবে; লক্ষ্য-স্থানে জাতির জীবনতরী কোনদিন পৌছিবে না। ধর্ম্ম আমাদের এক-মতাশ্রয়ী করে। আমরা ধর্ম্মবাদ চাহিতেছি না, ধর্ম্ম চাহিতেছি—যাহা বস্তুতঃ আমাদের সংহতিবদ্ধ করিবে, উন্নতির কারণ হইবে, অবধারিত মুক্তি দিবে।

আরও বড় কাজ—সমাজসংস্কার। অর্থবাদের সমস্যার রাষ্ট্রসাধনায় সমাধান হইতে পারে, এই প্রত্যয় আমাদেরও আছে। কিন্তু সৃষ্টি-সামর্থ্য যদি আমাদের না থাকে, অর্থবাদ ভুয়া কথা হইবে। জাতির সৃজনীশক্তি সর্ব্বত্র উপেক্ষিত, তাই দেশের সঞ্চিত ধনের উপর রাহাজানি—অর্থসাম্যের আদর্শ মনে হয়। গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিবার আগ্রহ সুবুদ্ধির পরিচয় নয়। অর্থস্পৃহা শক্তিরূপে জাতির জীবনে জাগাইয়া তুলিতে হইবে, সমাজজীবনের দাবী তবেই বস্তুতন্ত্র হইবে। অর্থই সমাজের শক্তি। খাঁটী সমাজপ্রাণের দাবীই জাতীয় আর্থিক উন্নতির কারণ হইতে পারে। আজ যে সব অর্থপ্রতিষ্ঠানের পরিচয় আছে, তাহা ব্যক্তিগত জীবনের দাবী—ঠিক সংহতিবদ্ধ সমাজশক্তির প্রাণ এই ক্ষেত্রে জাগে নাই। ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিত সমাজের দিক্ হইতে এই প্রচেষ্টা যখন হইবে, তখন দেখিব, সমাজের চেয়ে এই অধ্যাত্মশক্তিপূত সংহতি-শক্তির অর্থসৃষ্টি শতগুণ হইয়াছে। জাতি এই অবস্থায় রাষ্ট্রসাধনার প্রেরণা সফল করিতে পারে। আমরা এই হেতু ধর্ম্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে জাতির মহাপ্রাণ যাঁহারা, তাঁহাদের চিন্তা, শ্রম ও শক্তি সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করিতে বলি। সত্যই দেশে মানুষ নাই; যে কয়টা কাজের মানুষ আছে, তাহারা পরকীয় প্রভাবে যদি দিন দিন বিভ্রান্ত হইয়া চলে, নিজেদের গড়িয়া তোলার সুযোগ আমরা হারাইব—এখনও জাতিগঠনের যেটুকু কর্ম্মক্ষেত্র আছে, তাহাও আমরা নষ্ট করিব।

কাজের লোক তাহারাই, যাহাদের অন্তর অধ্যাত্ম-সম্পদে পূর্ণ। এরূপ না হইলে, দেশসাধনার অধিকারী হওয়া যায় না। আজ দাবীর কণ্ঠ ছাড়িয়া কেবল জাতি হিসাবে বাঁচার প্রেরণা সফল করিতে আমাদের অবহিত হইতে হইবে। অন্ততঃ দশটা বৎসর এইভাবে কর্ম্ম করিলে, আমরা জাতীয় জীবনের ভিত্তি পাইব। দৈন্যে, শিক্ষার অভাবে, দুরাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ লোকসংখ্যাই বাড়িতেছে; কাজের লোক গড়িয়া উঠিতেছে না। জাতিকে আমরা বলি—ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মীর আসন এখনও শূন্য রহিয়াছে, তাহা পূরণ করার জন্য বহু দেশব্রতী নারী-পুরুষ উভয়কেই আগাইয়া দাঁড়াইতে হইবে। অমিশ্র জাতীয় সাধনায় নিরলস কর্ম্ম ও নিঃসঙ্গ শুদ্ধ আত্মদান একদল লোককে করিতে হইবে—নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।

## জাতীয় সাধনার দলসৃষ্টি

অর্দ্ধ শতাব্দীর রাষ্ট্রসংহতি কংগ্রেস। বাংলার সুরেন্দ্র নাথ, উমেশ চন্দ্র, বোম্বাইয়ের ওয়াচা, মেটা, পুণার গোখলে, তিলক প্রভৃতি মনীষিগণের কংগ্রেস বিগত বিশ বৎসর মহাত্মা গান্ধির করতলগত। যে দিন কংগ্রেস কলিকাতায় ফাটল ধরিয়া সুরাটে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, সেদিন অনেকেই মনে করিয়াছিলেন কংগ্রেসের শক্তি খর্ব্ব হইল, কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃগণের অধ্যবসায়ে ইহা নবমূর্ত্তি ধরিল, অতীতের ধীরপন্থিগণ কংগ্রেসের আর নাগাল পাইলেন না। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর গান্ধিজী কংগ্রেসকে নূতন রূপ দিয়াছেন। এই রূপরঞ্জনে দেশবন্ধুর রক্ত আছে। কংগ্রেসের বিজয়ী মূর্ত্তি বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মদানে গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী আজ কংগ্রেসে যোগ্য স্থান পাইতেছে না। কংগ্রেসের কর্ণধারগণের মধ্যে বাংলার অতি শীর্ণ ম্লান মূর্ত্তিই লক্ষ্যে পড়ে। বাংলায় যেমন বাঙ্গালী জাতির কংগ্রেসে স্থান অতি সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, অন্যান্য প্রদেশে অনেক শক্তিশালী পুরুষও কংগ্রেসে স্থান পাইতেছেন না। কংগ্রেস ব্যতীত অসংখ্য দলকেও মাথা তুলিতে দেখা যায়। কংগ্রেস একদিন হিন্দু-মুসলমানের রাষ্ট্রসংহতি বলিয়া বিবেচিত হইত। মহাত্মাজী খিলাফৎ আন্দোলন পক্ষপুটে ধরিয়া হিন্দু-মুসলমানের অখণ্ড সংহতিরূপে কংগ্রেসকে গড়িতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু জাতির মধ্যে মতভেদ, ধর্ম্মভেদ, সম্প্রদায়ভেদ থাকা হেতু কংগ্রেস তাহা হইতে পারে নাই। হিন্দুর দল, মুসলমানের দল যথারীতি গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার এইগুলির মধ্যেও ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেকগুলি দল মাথা তুলিতেছে। মত থাকিলে, তদনুযায়ী দল গড়িয়া উঠে। মতের অস্পষ্টতায় অনেকে কোন এক দলে গোঁজামিল দিয়া চলে। ভিন্ন মত যখন স্পষ্ট হয়, তখন ভিন্ন ভিন্ন মতবাদীরা স্ব-স্ব পথ দেখিতে থাকে। মহাত্মাজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের এই অবস্থা দেখা যায়। কিন্তু এখনও কংগ্রেস অমিশ্র গান্ধীপন্থী নহে—বর্ত্তমান কংগ্রেসের মূলগত মতের সহিত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অনেকগুলি বিভিন্ন মতবাদী দল আত্মস্বাতন্ত্র্যঘোষণার অপেক্ষা কংগ্রেসের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া চলার পক্ষপাতী। এই জন্য কংগ্রেসকে একমতাবলম্বী লোকসংহতি বলা যায় না, এবং কংগ্রেস ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রসংহতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবাদ প্রবল থাকা হেতু কংগ্রেসকে ভারতের অদ্বিতীয় রাষ্ট্রসংহতিও বলা চলে না। তাই কংগ্রেসের গতি ও প্রকৃতির নূতন রূপ লক্ষ্যে পড়ে।

দল হইলেই যে তাহা উদ্দেশ্যসিদ্ধির শক্তিবিগ্রহ হইবে, এমন নাও হইতে পারে। কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা যেদিন লক্ষাধিক হইয়াছিল, কংগ্রেসের শক্তি যে তাহাতে অধিক বাড়িয়াছিল, এমন কথা বলা যায় না। রাষ্ট্রনেতা গান্ধিজী তাহা ভাল করিয়াই জানেন। তিনি এইজন্য ধীরে ধীরে কংগ্রেস-সভ্যের সংখ্যাহ্রাস করিয়া ইহাকে শক্তিশালী করিতে চাহিলেন। শক্তিপূত ব্যষ্টির সংহতিই শক্তির বিরাট্ বিগ্রহ হয়। গান্ধিজী পার্থিব শক্তির প্রতি ততটা প্রত্যয়ী নহেন, যতটা বিশ্বাস আধ্যাত্মিকতার উপর করেন। এইজন্য তিনি কংগ্রেসকর্ম্মীদের সত্য ও অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন, এবং এই মানসসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশসেবার সঙ্কেতরূপে শ্রমের নামে কংগ্রেস-সভ্যদের চরকা কাটিতে বলিলেন। ক্রমে এমন হইল যে, চরকা না কাটিলে এবং অন্তরে বাহিরে অহিংস না হইলে, কেহ কংগ্রেস-সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেন না। বর্ত্তমানে এই কংগ্রেসকে লইয়া গান্ধিজী রাষ্ট্রসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এইবার মহাত্মাজী রাষ্ট্রসাধনায় এই দলটীকে অধিকতর নিখুঁৎ ও শক্তিশালী করিবার জন্য এক সুন্দর পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। গান্ধিজীর নেতৃত্বে শাসন-পরিষদে কংগ্রেসের প্রবেশ যাঁহারা এতদিন বক্র ও অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়া তাঁহার লক্ষ্য সম্বন্ধে নানা অপ্রিয়-বাণী উচ্চারণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের অগভীর চিন্তাধারার অসারত্ব আজ প্রমাণিত হইতেছে। আজিকার ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে মহাত্মাজী বাছিয়া বাছিয়া শাসনপরিষদের কংগ্রেসী সভ্যদের, মন্ত্রী, স্পীকার ও সদস্যদের একে একে জেলের

কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইতেছেন। তিনি কয়েক সহস্র তাঁহার মতাবলম্বী পরীক্ষিত লোকসমষ্টি যদি এইরূপে বাছিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতাকামী জাতির একটা সুদৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া লইলেন বলিব। যাঁহারা মনে করেন—বিপুল জনবল লইয়া রাষ্ট্র-বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা আমরা করিব না। পরাধীন জাতির পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ বৈপ্লবিক অনুষ্ঠান স্বাধীনতালাভের অনুকূল বলিয়া যে ধারণা, তাহা আজ নির্ভুল নহে—বরং এ পথ রুদ্ধই বলিব। জাতি সংহতিবদ্ধ হইলে এবং শাসনশক্তি-ধারণ-সামর্থ্য লাভ করিলে স্বাধীনতালাভ হইবে, ইহাই আমাদের ধারণা। ইসলামধর্ম্মীরা সুসংহত হইয়া জাতিরূপে যদি দাঁড়ায়, বিনা বিপ্লবে তাহারা পাকিস্থানও পাইতে পারে। মহাত্মাও একটী কংগ্রেস-জাতি গড়িতেছেন, ইহা খুব সুস্পষ্ট। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, তাঁহার অর্থাৎ কংগ্রেসের জাতিবাহুল্য যে প্রদেশে, সেই প্রদেশেই তিনি কংগ্রেসের আধিপত্য বিস্তার করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। হিন্দু-সংস্কৃতির ক্ষুণ্ণতা তিনি স্বীকারের মধ্যে আনেন নাই। এক্ষণে কথা হইতেছে—সমস্ত জাতি যদি কংগ্রেস-জাতিতে পরিণত হইতে না চাহে, তবে ভারতে এক জাতি হওয়ার আদর্শ-বাদ যত বড়ই হউক, ভারতে পৃথক্ পৃথক্ জাতি-সংহতি গড়িয়া উঠিবে। ইহাতে স্বজাতির মধ্যেই হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষের ন্যায় সংঘর্ষসৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলার সাধ্য আমাদের নাই। রাজশক্তি জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, এইরূপ সংহতি-গঠনের পথ ছাড়িয়া দিতেছেন। দোষগুণ ইহাতে কিছু নাই, বিধিই বলবান্। মানুষের ইচ্ছা যদি ইহার অধিক বলবতী হইত, তবে আমরা দেখিতাম—পাকিস্থানের পরিকল্পনার প্রতিবাদ বৃটিশ পার্ল্যামেন্টের সদস্যগণের কণ্ঠে উঠিত। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড চির প্রচলিত রাষ্ট্র-নীতি। ভারতে আজ ইস্‌লামজাতি, হিন্দুজাতি, কংগ্রেসজাতি, শ্রমিক ও কৃষাণ জাতি—এমন অনেক জাতির অভ্যুদয় দেখিব। রাজশক্তি এই সবের পক্ষপাতী। কিন্তু তত্রাচ এই দলশক্তি যদি রাজশক্তিধারণে সামর্থ্য লাভ করে, তবে হয় একটী দল, অথবা দুইটী দল নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রাখিয়া ভবিষ্যতে একত্র হইবে, এবং রাষ্ট্রশক্তিলাভের দাবী যথাযোগ্য ভাবে প্রকাশ করিবে। সে কথা এখন নহে। এখন দলের যুগ। দেশবাসী এখনও একথা ভাল করিয়া বুঝিতেছে না। ছোট-বড় দল গড়ার পথে বিধাতা যখন অনুকূল, তখন ইহা যত গড়িয়া উঠে, ততই ভাল; অসংখ্য দলের মধ্যে শক্তিশালী দল দুই চারিটাই হইবে। তখন অবশিষ্ট দলগুলিকে কোন এক শক্তিশালী দলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেই চলিবে। বাংলার জাতীয় সংবাদপত্রগুলি ক্রমেই জাতির মুখপত্র না হইয়া দলের মুখপত্র হইয়া পড়িবেন, যদি বাংলার জাতীয় সত্তার দিগ্-নির্দ্দেশ তাঁহারা করিতে না পারেন। আমরা বাংলায় দলাদলির ব্যাপারে আদৌ নিরাশ হই না; তবে আমাদের বক্তব্য—যেখানে শক্তি, সেখানে দলসৃষ্টি হউক। শক্তিকে প্রভাবিত করার উপায় অবিদ্বেষী মনোবৃত্তি বজায় রাখিয়া চলা। দল-বাহুল্যে আমাদের অন্তরগ্লানি যেন না বর্দ্ধিত হইয়া জাতিকে মসীময় করে, এই দিকে শক্তিশালী কেন্দ্র-পতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রাখিলাম।

## সমরসমস্যায়

১৯৪০ খৃষ্টাব্দ শেষ হয়, যুদ্ধক্ষান্তির লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না। দ্বৈরথ যুদ্ধে গ্রীস ও ইটালী ব্যাপৃত। পোল্যাণ্ড ও নরওয়ের পতনের ন্যায় বা ইটালীর আলবেনিয়াধিকারের ন্যায় গ্রীস-জয় সহজ হইল না। ইটালীর বীর্য্য-পরীক্ষা চলিতেছে। গ্রীসের বীর সৈনিকেরা ইটালীয়ান্ সৈন্যবাহিনীকে পদে পদে পরাভূত করিতেছে। মুসোলিনী সেনাপতির পর সেনাপতি পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রীসের পাল্টা আক্রমণ রোধ করিতে পারিতেছেন না। পোল্যাণ্ড অথবা নরওয়েকে বৃটেন সাহায্য করিতে পারেন নাই; সাহায্য করা সম্ভব হয় নাই। অর্থ, অস্ত্র ও লোকবল-প্রেরণ বৃটনের এই ক্ষেত্রে সহজসাধ্য হইয়াছে; গ্রীসের পরাজয়ে এক অর্থে বৃটনের পরাজয় হইবে, তাই গ্রীস-ইটালীর যুদ্ধফল দেখিবার জন্য সারা বিশ্ব উদ্গ্রীব হইয়া আছে।

জার্ম্মাণী ইংলণ্ডের উপর ভীষণ বোমা-বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে; প্রত্যুত্তরে জার্ম্মাণীর উপরও বৃটনের এইরূপ আক্রমণ অবাধে চলিয়াছে। এই অন্তরীক্ষ-যুদ্ধে আমাদের সেই প্রবাদ-বাক্যই সিদ্ধ হইতেছে যে, "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু-খাগড়ার প্রাণ যায়।" সংগ্রামকালে সমর-রত শ্রেণী প্রাণ হারায় না; নিরীহ প্রজাকুলই উৎসন্ন যায়। ইউরোপের বর্ত্তমান যুদ্ধে এই দুঃখের দিনই ঘনাইয়া আসিয়াছে। এ প্রচণ্ড আহবে যুদ্ধবিরত নারীপুরুষের মুক্তি নাই; ইহার অর্থ, রাষ্ট্রের দায়ে চিহ্নিত কোন এক শ্রেণী বিপন্ন নহে, জগতের প্রতি মানুষই জ্ঞানে অজ্ঞানে মৃত্যুপণ করিয়াছে, যুদ্ধ লক্ষ্যে। এমন নৃশংস যুদ্ধ-নীতি ইতিহাসে আর নাই।

জার্ম্মাণী রুশমন্ত্রী মলটভের সহিত পরামর্শ করিয়া নিজের অভীষ্ট-সিদ্ধির পথ খুঁজিয়াছিল। হিট্লার প্রচণ্ড সংগ্রামের পশ্চাতে কূট-মন্ত্রণায় সাফল্য কামনা করিতেছেন। মলটভ-হিট্লার সম্মিলনে একটা যুগান্তকারী নূতন পর্য্যায়ের সম্ভাবনায় আমরা সন্ত্রাসিত হইয়াছিলাম; কিন্তু বলকান্-সমস্যায় তুর্কী ও বুলগেরিয়ার নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যসংরক্ষণের স্পর্দ্ধা দেখিয়া এবং চীনে জাপানের রাষ্ট্র-নীতিক চাল দেখিয়া আমরা অনায়াসেই মনে করিতে পারি—হিট্লার-মলটভের সাক্ষাৎকারে কিছু ফল হইলেও, হিট্লার আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারেন নাই।

যুদ্ধের বর্ত্তমান গতি দেখিয়া এইরূপ অনুমান হয় যে, যুদ্ধারম্ভে জার্ম্মাণী যত সহজে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়া শক্তিবৃদ্ধির সুবিধা পাইয়াছিলেন, ক্রমে তাহা সম্ভব হইতেছে না। ইটালীর সংগ্রামশক্তি হিট্লারের আশানুরূপ নহে। ইহা দেখিয়াই হিটলার রুশ-জাপানের মধ্যে একটা চুক্তির চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। তাহা না হইলে, জাপান নান্‌কিংয়ে চীনের পরাভূত একাংশকে লইয়া জাতীয় রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবেন কেন? এবং কমিউনিজমের ভিত্তি চীন হইতে উপাড়িয়া ফেলিবেন, এইরূপ ঘোষণা করিবেন কেন? ঘটনা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়—রুশ কোন দলেরই পক্ষপাতী নহেন; স্বশক্তিবৃদ্ধির দিকেই তাহার দৃষ্টি ক্ষুরধার হইয়া রহিয়াছে। আমেরিকার ন্যায় রুশও চীনের জাতীয় আত্মা চিয়াংকাইশেককে সাহায্য করিতেছেন। থাইল্যাণ্ডের সহিত ফরাসী ইণ্ডো-চায়নার সংঘর্ষ-সংবাদ ফরাসী আদালতের 'স্যাম্পেল কেস' বলা যাইতে পারে; ইহা জাপানেরই চালবাজী। কিন্তু গ্রীসের ন্যায়, তুর্কীর ন্যায় থাইল্যাণ্ড বৃটনের নিকট হইতেই প্রয়োজনোপযোগী পুষ্টি পাইবে। প্রতিপক্ষের এই ক্ষেত্রে জয়াশা সহজ নয়।

আমেরিকা বৃটনের অকৃত্রিম সুহৃৎ। কিন্তু অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য ব্যতীত আরও তাহার যে সাহায্যের প্রয়োজন, তাহা এখনও সম্ভব হইতেছে না। তাহার কারণ জাপানের প্রতিবন্ধকতা। জাপানের বৈদেশিক মন্ত্রী মিষ্টার মৎসুকা স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন—আমেরিকা যে মুহূর্ত্তে বৃটনের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবে, সেই মুহূর্ত্তে জাপান অস্ত্র ধরিয়া তাহার প্রতিবাদ করিবে। কাজেই আমেরিকাকে অধিক অগ্রসর হইতে হইলে, বিশেষভাবে হিসাব করার প্রয়োজন হইবে। জাপানের এই কথার সারবত্তা কতখানি, তাহার পরীক্ষাকাল না আসিলে বুঝা যাইবে না। আমরা ইটালীর প্রতিপদে পরাজয় দেখিতেছি; কিন্তু মুসোলিনির বন্ধু হিট্লার এখন সে বিষয়ে উদাসীন। ইহার কারণ—হয় হিটলার রুশের চিত্তবৃত্তির গতিনির্ণয় করিতে এখনও সমর্থ হন নাই, নতুবা ফ্রান্সের সহিত তাঁহার বিজিত বিজেতার সম্বন্ধ দৃঢ়ীকৃত করিয়া বৃটনের সহিত শান্তি-কামনাও করিতে পারেন। বৃটনের সহিত জার্ম্মাণীর শান্তিপ্রতিষ্ঠার অস্পষ্ট কাণাঘুষা যেন চলিয়াছে মনে হয়। এরূপ হইলে, ইটালী হাটে মামা হারাইবে, ফ্রান্সের রক্তমোক্ষণে ইটালীর পুষ্টি-আকাঙ্ক্ষা হিট্লারের যদি মনঃপূত না হয়, এমন অঘটন সংঘটন হওয়া রাষ্ট্র-জগতে বিচিত্র কথা কিছু নহে।

সংগ্রাম যত দীর্ঘদিন চলিবে, হিটলার বুঝিয়াছেন—ইংলণ্ড তত শক্তিশালী হইবে। আমরা মিষ্টার এটলীর মুখে শুনিয়াছি—বিগত ভার্সাই সন্ধিযুগে ইংলণ্ডের বিমানপোত-ধ্বংসের একটী মাত্র কামান ছিল, যুদ্ধারম্ভের অনতিকাল পূর্ব্ব হইতেই বৃটন প্রস্তুত হইতেছে, সংগ্রাম চালাইতে হইলে সে প্রস্তুতির মাত্রা আরও বাড়াইতে হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু এ কথা শুধু এক পক্ষের জন্যই নয়, জার্ম্মাণীর পক্ষেও এই কথা প্রযুজ্য। জার্ম্মাণী পররাজ্য জয় করিয়া

শক্তিবৃদ্ধি করিতেছেন, বৃটন স্বাধীকৃত স্ব-রাজ্যের শক্তি সঞ্চয় করিতেছেন। অধিক সুবিধা বৃটনেরই। ভারতের শক্তিসঞ্চয়ে কংগ্রেসের বাধা আছে; কিন্তু উহা নাম মাত্র। কংগ্রেস উহার ধর্ম্মরক্ষা করিতেছে মাত্র। কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কেবল তাহার সঙ্কল্পের মর্য্যাদা রাখিয়া চলা ছাড়া অন্য কিছু নহে। রাজশক্তিও তাহার তাল রাখিয়া চলিয়াছেন। কংগ্রেস যে এখনও সেই জাতি নহে, যে জাতি বিরোধী হইলে জাতীয় শক্তিও প্রতিকূল হয়। কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলন একদিক্ দিয়া জাতির এই ধারণাই সুস্পষ্ট করিয়া দিতেছে যে, একটা বিপুল দেশের জাতীয় রাষ্ট্রনেতৃগণ যুদ্ধবিরতি প্রচার করা সত্বেও, জাতীয় শক্তি তাঁহাদের অনুগামী নয়। উপরন্তু ভারতের রণসম্ভার-সংগ্রহের পরামর্শ কার্য্য শেষ হইলে দেখা গেল—ভারত হইতে বৃটন যুদ্ধোপকরণের সহিত প্রচুর লোকবল ও অর্থবল পাইবে। ভারতের শ্রমিক ও কর্ম্ম-কুশলিগণ প্রয়োজন হইলে ইংলণ্ডে গিয়াও কর্ম্মতৎপর হইবে এবং তাহারা বৃটনের কর্ম্মচারীদের ন্যায় তুল্য অধিকার ও বেতন পাইবে। এত বড় প্রচণ্ড সংগ্রামে বীরজাতির ধর্ম্মদীক্ষা লাভ করা ভারতের পক্ষে অতিশয় কার্য্যকরী। কংগ্রেস যে ঘোষণা করিয়াছে, তাহার মর্য্যাদা-রক্ষা করিতে সে আকুল; ইহা সংহতির ধর্ম্ম। কংগ্রেসের বাহিরে যে বিশাল জাতি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার পক্ষে সর্ব্ব-প্রকারের রণবিদ্যা ও আনুসঙ্গিক বিজ্ঞান আয়ত্তে আনার এই সুবিধা লওয়া উচিত এবং বৃটনেরও এই দিকে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে সুবিস্তৃত পথ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হিতকর হইবে। ইহাতে উভয় জাতির মধ্যে দৃঢ় স্থায়ী সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হইবে এবং এই দুর্দ্দিনে পরস্পর সহযোগিতার ফলে ভারতের মুক্তির দাবী ভবিষ্যতে সত্য অধিকার বলিয়া গণ্য হইবে।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য—পৃথিবীতে সকল ঘটনাই তৃতীয় হস্তের। মানুষ তার উপলক্ষ্য। এই সংগ্রামের ফলে আসন্ন পরিবর্ত্তন আমাদের সম্মুখে।

দেবগুরু বৃহস্পতি হিটলারের যে ভাগ্যকক্ষে আজিও অবস্থিত রহিয়াছেন, তাহা আগামী পাঁচ মাস পরে অপ-সারিত হইবেন। মানুষের কর্ম্মবিধি নির্দ্দিষ্ট হইলেও, প্রাক্তনক্ষয়ের জন্য তাহার যে একটা ক্রিয়মাণ অবস্থা আছে, তাহার মধ্যে যে নূতন সঞ্চয়, তাহাতে শুভাশুভ ফলের বিধাতা মানুষই হইয়া থাকে। ভারতের ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের যুগও এই সঙ্গে গ্রথিত আছে; বৃটনেরও এই দিকে সচেতন হওয়া উচিত। যদি বৃটন তার অধিকৃত সাম্রাজ্যশক্তির সহিত বলপ্রদ যুক্তি এই সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিতে পারেন, বৃটনের জয়-সম্ভাবনার আশা অত্যধিক আছে। আমরা যে অবস্থায় আছি, তাহাতে রাজশক্তির প্রতি আমাদের এই কল্যাণ-অভিমতই ঘোষণা করিতে পারি। ভারতও ভাগ্য-পরিবর্ত্তন চায়। ভারতসত্তার এই মর্ম্ম উপলব্ধিগম্য করিয়া, বৃটন অজেয় হউন—ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি।

## শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যাবলম্বনে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা

শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যাবলম্বনে শ্রীঅনিলবরণ রায় শ্রীমদ্ভাগবত গীতার একটী সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর নিকট হইতে পুস্তকখানি সমালোচনার জন্য কয়েক মাস পূর্ব্বে পাইয়াছি। সময়াভাব প্রযুক্ত আমার বক্তব্য প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইল। এই অনিবার্য্য ত্রুটি অবশ্যই মার্জ্জনীয়।

ভারতের ধর্ম্ম বেদপ্রবর্ত্তিত। ধর্ম্ম বিশেষিত না হইলে, উহা এক ও অখণ্ড হইয়া পড়ে। তখন আর ধর্ম্মের প্রয়োজন হয় না। ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় তাই ঋষিরা বলিয়াছেন, উহা ক্রিয়ানিষ্পাদ্য। ক্রিয়ার যন্ত্র শরীর ও মন। একের শরীর-মন অন্যের তুল্য নহে। কাজেই একের ধর্ম্ম ক্রিয়াগুণে ভিন্ন হয়। তাই গীতায় স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ বলা হইয়াছে। ধর্ম্ম যখন সাধ্য আর উহার করণ যখন আত্মপ্রকৃতি, তখন ধর্ম্মের বিচার অনাবশ্যক। কিন্তু তবুও

মানুষ সংহতি চায়, সম্প্রদায় চায়। মোটামুটী মানব-প্রকৃতির কতকটা সমতার উপর ধর্ম্মের ঐক্য রক্ষিত করিয়া, সকল দেশেই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ভারতেও তাহা হইয়াছে। ধর্ম্ম লইয়াই যখন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি আর সম্প্রদায় অর্থে যখন এক হইতে অন্যের ভেদ, তখন একই ধর্ম্মগ্রন্থের বিচিত্র ভাষ্য হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র কথা নহে। গীতাশাস্ত্র বেদের প্রামাণ্য গ্রন্থ, তাহার কারণ আর অন্য কিছু নহে, বেদ ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া যে জাতি স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, সেই জাতিরই এক প্রাচীন মনীষী বেদ-বিভাগ করিয়া বেদবাক্য প্রমাণসঙ্গত করার জন্য যেমন ব্রহ্মসূত্র-রচনা করেন, বেদবাণী জীবনগত করার বিজ্ঞান-প্রকাশের জন্য তিনিই কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ প্রচার করিয়াছেন—ব্রহ্মসূত্র ও গীতা এই হেতু পরস্পর অবিরোধী।

শ্রীঅরবিন্দ গীতার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভায় ধরা পড়িয়াছিল—বেদান্তব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্য উদ্দেশ্যমূলক। কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্য ও ব্রহ্মসূত্র ভারতের অধিকাংশ লোকই এক বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়ার জন্য বেদান্ত মায়াবাদীর বলিয়া প্রত্যয় করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মসূত্র ও আচার্য্যের ভাষ্য এক বস্তু নহে। এই কথাটা যদি আমরা স্মরণে রাখি, তাহা হইলে দেখি—ব্রহ্মসূত্রের লক্ষ্য ব্রহ্ম-প্রতিপাদন করা। উপনিষদাদির প্রত্যেক ব্রহ্মাভিধেয় বাক্যটী যে ব্রহ্মপর এবং বেদের ভিত্তির উপর ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সকল শাস্ত্রনির্দ্দেশ যে একই অদ্বয় ব্রহ্ম-তত্ত্বের সমর্থন করে, ব্রহ্মসূত্রে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। বেদান্তবাক্যের সমন্বয় বেদমূলক শাস্ত্রাদির সমন্বয়। ব্রহ্মসাধনা ও ব্রহ্মপ্রাপ্তি-রূপ অবস্থা ব্রহ্মসূত্রেরই বিষয়বস্তু। শ্রীঅরবিন্দের গীতা ভারতের বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের পর মায়াবাদখণ্ডনের বলপ্রদ অস্ত্র।

কুরুক্ষেত্রসংগ্রামের পর যে ধর্ম্মবন্যা ভারতে বহিয়া গিয়াছে, তাহা একটা সংস্কৃতির মৃত্যুর পর পুরাতনের ছায়া-মূর্ত্তি; উহা ঠিক জীবন নয়। তাই দেখি—উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্র আশ্রয় করিয়া কল্পিত অদ্বৈতবাদপ্রতিষ্ঠার হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম। মহামতি শাক্যসিংহও ভারতের পুরাতন অধ্যাত্মবাদের অনুশীলন যথেষ্টই করিয়াছিলেন। তিনিও চাহিয়াছিলেন ভারতসংস্কৃতির রূপান্তর বা নব জন্ম। তাঁর এই চাওয়াটাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান; তিনি যাহা করিয়া-ছিলেন তাহা ভারতে স্থান পায় নাই। অতএব বুঝিতে হইবে—তাঁহার মতবাদ এ জাতির উপযোগী নহে। এ দেশের জলে হাওয়ায় যে ধর্ম্ম শুধু দীর্ঘায়ুঃ নয়, পরন্তু শাশ্বত বলিয়া স্বীকৃত হয়, তিনি তাহা দিতে পারেন নাই। অর্থাৎ বেদকে তিনি অস্বীকার করিয়াই নূতন অধ্যাত্ম-তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভারতীয় ধর্ম্মক্ষেত্রে উহা ক্রমে কণ্টকস্বরূপ হইয়াছিল, তাই আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাব। বৌদ্ধপ্রভাব হইতে ভারতকে মুক্তি দেওয়ার শক্তি আচার্য্যদেবকে চিরায়ুঃ করিয়া রাখিয়াছে। পরন্তু তাঁহার মায়াবাদ বৌদ্ধবাদের প্রায় সমতুল্য; উহা ভারতীয় জীবনকে পুষ্টি দেয় নাই, ভারতের অবনতিই আনিয়াছে। পরবর্ত্তী যুগে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ অর্থ অবধারণ করিয়া জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধের কথাই প্রচার করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্য এই শ্রেণীর আচার্য্য-গণের মধ্যে বাংলায় বিশেষ স্থান পাইয়াছিলেন। তাঁহার ভাষ্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব মাথায় তুলিয়া লওয়ায় ইহা তাঁহার অক্ষয় খ্যাতির কারণ হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের ভাষ্য প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মায়াবাদখণ্ডনের প্রয়াসকে অতিশয় সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে। অধিকন্তু পুরাতনের চেতনার স্তর হইতে উঠিয়া জাতিকে আর এক নূতন চৈতন্যের ক্ষেত্রে উঠিয়া দাঁড়াইবার উহা পথ দেখাইয়াছে। তাঁহার এই অপূর্ব্ব অধ্যাত্মদান বিদেশীয় ভাষায় হওয়ায়, বিশুদ্ধ জাতীয় মস্তিষ্কে উহা এখনও তেমন দৃঢ় শিকড় গড়িতে পারে নাই। অনিলবরণ প্রমুখ শ্রীঅরবিন্দের ভক্তেরা ইহার জন্য যে প্রয়াস করিতেছেন, তাহা ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত অনিলবরণের এই প্রচেষ্টা অতিশয় প্রশংসনীয়।

অনিলবরণ বাবু সত্যই বলিয়াছেন, গীতায় পরাপ্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপটী আচার্য্য শঙ্কর দেখেন নাই। পরাপ্রকৃতি ও জীবকে তিনি এক করিয়া দেখিয়াছেন। গীতায় ইহার সমর্থন নাই, কেননা পরাপ্রকৃতি জীবভূতা। পরাপ্রকৃতি সত্যই ঈশ্বরপ্রকৃতি; জীব অংশ। ঠিক এই চেতনার ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া শ্রীঅরবিন্দের গীতাব্যাখ্যা অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হইবে। গীতা যে শিক্ষা আমাদের দেয়,

তাহাই উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের শিক্ষা। ভারতের সংস্কৃতির জন্মদাতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; তাই বেদকে আমরা অপৌরুষেয় বলি। কিন্তু যে সংস্কৃতির প্রচার শ্রীঅরবিন্দ করিতেছেন, অনিলবরণ প্রমুখ মনীষীরা যে গুরু কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার উৎসমূল সেই ব্যাসকে আমাদের স্বীকার করিতে হয়। তিনি শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়, এই প্রস্থান-ত্রয়ের মধ্য দিয়া ভারতের শাশ্বত ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। এই হেতু বেদ, উপনিষদাদি, ব্রহ্মসূত্র ও গীতার মধ্য দিয়া যে ধর্ম্মপ্রচার হইয়াছে, তাহা একান্ত নিরাকার নয় এবং একাকারও নয়। এইজন্য অনিলবরণের এই কথাটী একটু ভাবিয়া দেখিতে হয়। তাঁহার ভূমিকায় দেখি "যে কোন শাস্ত্র বা নীতিতে বিশ্বাস থাকিলে" তদনুসরণ করিয়া কর্ম্মে কাম-ক্রোধের বেগ প্রশমিত হয় ও শ্রদ্ধা জন্মে, ইহা ব্যাখ্যাকারী ঠিকই বলিয়াছেন। কিন্তু ব্যাসদেব যে গ্রন্থের রচয়িতা, সে গ্রন্থে যদি শাস্ত্র-স্বীকৃতি থাকে, সেই শ্লোক-ব্যখ্যায় এইরূপ উদার অভিব্যক্তি সর্ব্বজনপ্রিয় হইতে পারে, কিন্তু ব্যাসদেবের উদ্দেশ্য তাহাতে সিদ্ধ হইবে না। গীতায় যে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" কথাটী আছে, তাহার অর্থ—ভারতের ধর্ম্মবীর তাঁহার অভ্রান্ত বিশ্বাসের পথেই নিখিল মানবজাতিকে আহ্বান দিয়াছেন। "মামেকং শরণং ব্রজ"—এই সাধনা সিদ্ধ করিতে হইলে, চাই শাস্ত্র যুক্তি ও অনুভূতি। সেই শাস্ত্রাদি বেদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা। জীব ও ব্রহ্ম কল্পান্তকাল ভেদ-ব্যাপদিষ্ট। জীব পরম গতি পাইয়া পৃথিবীপতিও হইতে পারে, কিন্তু জীব থাকিয়াই তাহা হইবে। তদ্রূপ ভারতের ধর্ম্মনিষ্ঠা একান্ত ভারতীয় বলিয়া বিশ্বের পূজাও পাইতে পারে, সেখানে মিশ্রণ কিছু চলিবে না। ধর্ম্মবিশ্বাসে আপোষ নাই, এবং কাহারও অবস্থা-ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিও নাই। গীতার ধর্ম্ম সেইভাবে সার্ব্বজনীন, অর্থাৎ সর্ব্বজন যদি ইহার সবখানিকে স্বীকার করিয়া লয়।

ভারত এই অমৃতই পাইয়াছিল, অন্য দেশও পাইয়াছিল বা পাইতে পারে, এরূপ প্রশ্ন এই ক্ষেত্রে অবান্তর। ভারতের অমৃতপ্রাপ্তি যদি হেঁয়ালী না হয়, অমৃতই হয়, তবে গীতাকার নির্ভয়ে কেন বলিলেন না, সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই আশ্রয় কর, আমি তোমায় শ্রী দিব, বিজয়-সম্পদাদি দিব এবং সে ধর্ম্মচেতনার যতই উচ্চ স্তরে জীবের অধিরোহণ হউক, শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত কোনদিন অস্বীকার করিব না; ইহা হইলেই তো গীতার সেই কথাই স্মরণে পড়ে—

"উৎসীদেয়ুরীমে লোকাঃ নো কুর্য্যান্কর্ম্মচেদহম্"

এই কর্ম্মের এক রূপ—শাস্ত্র, একথা বেদপ্রসিদ্ধ। আর এক ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মবিদ্ প্রভৃতি। শাস্ত্রবিহীন জীবন কোন অবস্থায় ব্রহ্মভাবযুক্ত থাকিতে পারে না। এই হেতু গীতার শিক্ষায় যতই উচ্চতর চৈতন্যে জন্মলাভ হয়, এবং সে জীবনে যতই দিব্যকর্ম্ম অভিব্যক্ত হউক, তাহা যেমন ঈশ্বরকে অতিক্রম করিতে পারে না, শাস্ত্রকেও তাহা তদ্রূপ অতিক্রম করিতে পারিবে না। এ জাতি ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়াছে, ব্রহ্মভাবও পাইয়াছে। যতদিন না ব্রহ্মগতি পায়, ভারতের প্রস্থানত্রয় বৃষল হইয়া থাকিবে। শ্রীঅরবিন্দের গীতায় ও যোগব্যাখ্যায় এই তত্ত্ব যত সুস্পষ্ট হইবে, জাতি ততই অধিকতর উপকৃত হইবে। শ্রীঅরবিন্দ চাহিয়াছেন জীবন—ভাগবত জীবন। তাহাই বেগবতী মন্দাগতি। এই গতি যদৃচ্ছা না হয়, তাহার জন্যই শাস্ত্র। এবং সে শাস্ত্র যদৃচ্ছ হইলে, কর্ম্মসাফল্য নাই। ইষ্টনিরূপণের ন্যায়, জীবনেরও কেন্দ্র ক্ষেত্র আছে। আমরা অরবিন্দের গীতা ব্যাখ্যায় সেই সীমানা অতিক্রম করি। শ্রীঅরবিন্দের কথাই এইখানে উদ্ধৃত করিয়া বলিব "আমাদের কারবার শুধু নিরাকার আত্মা নিয়ে নয়, জীবনকেও চালাতে হবে। মূর্ত্তি ভিন্ন জীবনের effective গতি নাই; তাই শ্রীঅরবিন্দের গীতাভাষ্যপ্রচারকল্পে অনিলবরণের সাধু প্রচেষ্টায় আমরা সাফল্য কামনা করি, ইহার বহুল প্রচারে জাতির শ্রেয়ঃ হইবে।

# ৺পঞ্চানন তর্করত্ন

## —"চিত্রকীর্ত্তি"—

প্রদীপ নিবিয়া গেল তুলসীর মূলে—
আঁধারে মিশা'ল স্নিগ্ধ শিখা;
বিদারিছে অন্ধকার অম্বরের কূলে,
তীক্ষ্ণগতি তাড়িত ছুরিকা।
নয়নে নাহিক জ্যোতিঃ,
আলোকে পূরে না ক্ষতি,
অনলের সহায়তা চাই,
পুড়ে মরি অকস্মাৎ—দৃক্‌পাত নাই।

সুরাসিক্ত-বাস্তবের বিশাল চিতায়
জ্বলিতেছে দম্পতীর শব।
শ্মশান-বৈরাগ্যে বুকে—মুখে ভেসে যায়
ব্যথার অস্ফুট অনুভব।
পুরুষ, বিরাট্ দেহ,—
নারী, মূর্ত্তিমতী স্নেহ,
অতীতের কোলে ভবিষ্যৎ,
স্ফুলিঙ্গ নির্দ্দেশে শূন্য সংস্কৃতির পথ।

সহজে বামন—কভু নহে ত্রিবিক্রম—
তবু নিজ পদাঙ্ক রাখিতে;
গর্ব্বভরে স্বভাবের লঙ্ঘিয়া নিয়ম,
বিশ্বে খর্ব্ব করে আচম্বিতে।
প্রকৃতির প্রতিশোধ,
মরমে না মানে বোধ—
কর্ম্মের বিরোধী নাকি জ্ঞান?
বলিহারি কৌশলের লৌহ তনুত্রাণ।

তুঙ্গ কালকূট-সিন্ধু করিছে গর্জ্জন,
বাড়বাগ্নি ভীষণ বিস্তার,—
আত্মকেন্দ্র তীব্রবেগে নিত্য-আবর্ত্তন,
ঊর্দ্ধে ব্যাপ্ত ভস্ম ধূমাসার।
নীলকণ্ঠ শিব পায়—
কে আর জীবন চায়?
হৃদয়ের অনন্ত শয়ন;—
সত্য-সাধনায় মত্ত মৃত্যু-আলিঙ্গন।

এমনি প্রলয়দিনে গগনের গায়,
ধ্রুবতারা জলদে লুকায়।
সংসার প্রসারলুব্ধ—সুদূরে না চায়,
অচেতন—কি ধন হারায়।
মগ্ন মন রণভূমে,
উগ্র বারুদের ধূমে—
দীপনির্ব্বাণের গন্ধ লীন।
দুর্ন্নিমিত্ত! শিব! শিব!—আয়ুঃ হ'ল ক্ষীণ!

ক্ষতি যার, চিত্ত তার তাণ্ডব-বিহ্বল,
মোর কেন আতপ্ত নিঃশ্বাস?
"গলা ধরে' কাঁদি যার চোখে নেই জল"—
নিয়তির সাধু পরিহাস।
গেল নিষ্ঠা, গেল জ্ঞান,
অবসান হ'ল ধ্যান,
বিভাহীন ভারতীর তনু,
রূপ লুপ্ত—রতি গুপ্ত—ক্ষিপ্ত ফুলধনু।

প্রাচী'র প্রাচীন প্রাণ স্বচ্ছ কাচমণি,
পৃষ্ঠে তার বিজ্ঞানপারদ,
দর্পণে বিম্বিত পূত আত্ম-রত্নখানি
পরাজিত গগন শারদ।
মহার্ণবে সনাতন
বটপত্রে উৎপ্লাবন
লক্ষ্য তব প্রতিষ্ঠা তাঁহার
জীবৌষধি-বীজ শক্তি মুমূর্ষু ধরার।

সুকঠোর পঞ্চতপা প্রকৃতি-কন্দরে,
—নহে মাত্র পুরুষে জাগাতে—
বিরচিতে মনুমার্গে অক্ষুণ্ণ অক্ষরে
সৃষ্টিগীত স্বভাবের পাতে—
একক চলিলে প্রভু!
চরণ না টুলে তবু—
-অগ্নিহোত্র আরব্ধ সত্বর,—
সবল জীবন হ'ল বিপুল চত্বর।

বিশ্বাস গভীর, সত্য সঙ্কীর্ণ পরিধি—
আজিকার উপযুক্ত নয়,
ত্রিশঙ্কুর নব স্বর্গে—স্বল্প স্থান বিশ্বে;
ক্ষুদ্রে কোথা মঙ্গল-নিলয়?
বিতর্ক বিবিধ আছে,
নিশ্চয় না আসে কাছে,
এ সংসার ঔদার্য্য-নিঃসার;
তব শ্রম—তব ভ্রম—শুধুই তোমার।

সমাজ ধ্বংসিবে আজ নিয়তি নির্ম্মম,
নব স্বর্গ করিতে পত্তন।
ব্যর্থতার ব্যথা বহি বৃথা এ যতন—
পাংশুমুখে স্বাত্যম্বর্ষণ।
আনুগত্য দূরে রো'ক্,
বন্দনাও বন্ধ্যা হো'ক্,—
একবিন্দু তিক্ত অশ্রুজল—
রূঢ়-মূঢ়-মেচ্ছে—তারও প্রত্যাশা নিষ্ফল?

পাণ্ডিত্যের এই শেষ—প্রাচ্য-প্রতিভার
রাঢ়বঙ্গে বন্ধ হ'ল দ্বার;
নিখিল নির্ম্মল রবি—খদ্যোতিকা-হার,
পা'ক্ প্রভা ধম্মিল্লে নিশার।
'শ্রীপতিপ্রতিম' শব্দ,
অভিধানে হো'ক স্তব্ধ,—
সাধনার রুদ্ধ যজ্ঞাগার;
ব্রাহ্মণ্য বিদায় নিল—প্রজ্ঞা পাছে তার।

করিলে কলির কালো কলঙ্কমোচন,
বিরচিলে অমরমঙ্গল;
কার্য্যকারণের তত্ত্ব—শক্তিনিরূপণ
দিব্যদর্শী! সকলি প্রোজ্জ্বল।
ধর্ম্মহেতু অহরহ—
মর্ম্মে জ্বলি', যুগাসহ
রাজকৃপা করিলে লঙ্ঘন—
হাস্যমুখে কারা মুখ করিলে দর্শন।

গড়িলে ব্রাহ্মণ-সভা—প্রণবে ক'জন
তোমা সম স্মরণপাবন?
নিজ প্রতিবিম্ব বিধি সৃজিতে অক্ষম—
মায়ামুগ্ধ মানবে বিভ্রম।
সমষ্টি উদাস চাহে,
ব্যষ্টি মরে ঈর্ষ্যাদাহে,
অদৃষ্টের অদ্ভুত লাঞ্ছনা;
জ্যোতিঃপুঞ্জ কলেবর—হৃদয়ে যন্ত্রণা।

পূর্ণলগ্ন—সমাগত জাহ্নবীর তটে
সুরবহ ভাস্বর বিমান,
নয়ন নিক্ষেপি' বসুধার দধিঘটে
এস বীর! করহ প্রয়াণ।
জানি, ফিরিবে না আর—
একপাশে কারাগার,
অন্যদিকে সমর তুমুল;
আজিকার বিশ্ব হ'ল অশুচি-সঙ্কুল।

চরণে ঠেলিয়া তাই কারার আহ্বান
—গন্ধময় গরলের শূল—
ছায়াহীন মায়ালোকে কর অধিষ্ঠান।
—রূপবৃন্তে অরূপের ফুল।
উত্তরিলে একেবারে—
তমসার পরপারে,
সেথা হ'তে দেখো তবু কবি!
অনন্তের এই পারে দাবানল-ছবি।

নূতন ফুটিবে যত ভবিষ্য-মুকুল
পুণ্য নাম হবে বিস্মরণ!
সকলি সমান তব—ভেদ অনাকুল,
জিতদ্বন্দ্ব! আর্য্য পঞ্চানন!
তেজে মিলে মধুরিমা,
ভূমায় মিশিল সীমা,—
ব্রহ্মবিদ্! প্রণাম তোমায়
রোদসী ব্যাপিয়া স্থিত অমৃত-বিভায়।

# মজুমদারের গড়

( জনপ্রবাদমূলক গল্প )

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

১

প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী চন্দননগরে, বোড় কৃষ্ণপুর নামক পল্লীতে নটনারায়ণ ঘোষ * নামক একজন ধনশালী কায়স্থ বাস করিতেন। নবাব সরফরজ খাঁর সেনাপতি ও বিহারের শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দী খাঁ ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, নটনারায়ণ সেই চক্রান্তের মধ্যে ছিলেন। নবাব সরফরাজ খাঁ স্বয়ং রাজকার্য্য বিশেষ দেখিতেন না, তাঁহার কয়েক জন উজীরের হস্তে তিনি ক্রীড়া-পুত্তলীবৎ ছিলেন। ঐ সকল উজীর নবাবকে যেরূপ বুঝাইতেন, নবাব সেইরূপই বুঝিতেন, উজীরেরা নবাবের নামে কোন অন্যায় কার্য্য করিলে, নবাব তাহার প্রতিবাদ না করিয়া বরং সম্মতি প্রদান করিতেন। নবাবের এইরূপ কার্য্য আলিবর্দ্দী খাঁর ভাল লাগিত না। যৌবনের প্রারম্ভ হইতে আলিবর্দ্দী খাঁর হৃদয়ে এই উচ্চাশা ছিল যে, তিনি যদি কখনও বঙ্গের মসনদ অধিকার করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি নিজের বাহুবলেই হউক বা অন্য কোন শক্তির সাহায্যেই হউক, দিল্লীর অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া বঙ্গদেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করিবেন এবং সম্ভব হইলে, গৌড়ের পাঠান বাদশাহগণের মত স্বয়ং বঙ্গদেশের সম্রাট্ হইবেন।

দিল্লীর মোগল সম্রাট্ বাহাদুর শাহের পৌত্র মহম্মদ শাহ ১৭১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি আরামপ্রিয় ও যুদ্ধবিগ্রহে বিমুখ ছিলেন। তাঁহার এই দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া দাক্ষিণাত্যে হায়দ্রাবাদ এবং আর্য্যাবর্ত্তে অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, ফরক্কাবাদ এবং বঙ্গবিহারের শাসনকর্ত্তারা নবাব উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক নাম মাত্র বাদশাহের অধীন থাকিয়া কার্য্যতঃ স্বাধীন হইয়াছিলেন। বঙ্গবিহার যে নামেও দিল্লীর অধীন থাকে, আলিবর্দ্দী খাঁর তাহাও অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি নবাব সরফরজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে, নবাব বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন। আলিবর্দ্দী খাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, তিনি বঙ্গবিহারের নবাব হইলেন।

এই বিদ্রোহে যে সকল রাজপুরুষ আলিবর্দ্দী খাঁকে লোকবল, ধনবল বা বুদ্ধিবল দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, নূতন নবাব তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কারে পুরস্কৃত করিলেন। নটনারায়ণ নবাবের নিকট হইতে বিস্তীর্ণ জাইগীর এবং "মজুমদার" উপাধি লাভ করিলেন। রাজসম্মানে সম্মানিত হইয়া নটনারায়ণ চন্দননগরে স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শান্তিতে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সঙ্কল্পসিদ্ধির পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইল। "বর্গী" নামে অভিহিত মারাঠা যোদ্ধারা বারংবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া নবাবকে একান্ত বিব্রত করিয়া তুলিল, বর্গীদের অত্যাচারে পশ্চিম বঙ্গ থরহরি কম্পান্বিত হইল। বর্গীর উৎপাতে প্রাচীন বন্দর সপ্তগ্রাম জনশূন্য হইয়া ক্রমে ক্রমে গভীর অরণ্যে পরিণত হইল। সপ্তগ্রামের উপকণ্ঠ হলুদপুর প্রভৃতি গ্রামের তন্তুবায়গণ বর্গীর ভয়ে বাসগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফরাসী চন্দননগরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন চন্দননগরে ফরাসীদের "দে অর্ল্যাঁ" নামক দুর্গ ছিল, দুর্গে কামান ছিল, ফরাসী সৈনিক ও দেশীয় সিপাহী ছিল। সুতরাং চন্দননগরে বর্গীরা সহসা কিছু করিতে পারিবে না, এই ভরসায় চন্দননগরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম-সমূহ হইতে ধনবান্ লোকেরা চন্দননগরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ফলে চন্দননগরের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল; কিন্তু উহার সন্নিহিত গ্রামসমূহ ক্রমশঃ শ্রীহীন হইয়া পড়িল।

নটনারায়ণ রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণরামকে নিজের কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য নবাবের কাছে প্রার্থনা করিলেন। নবাব তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্যের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। নটনারায়ণ কনিষ্ঠ পুত্রকে

* প্রাচীন দলিলে ইঁহার নাম Noto Karum বলিয়া লিখিত আছে।

রাজধানী মুর্শিদাবাদে রাখিয়া স্বয়ং চন্দননগরে আগমন করিলেন।

চন্দননগরে তাঁহার বাটীর সংলগ্ন অন্যূন কুড়ি বিঘা জমি নটনারায়ণ পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেকালে ধনবান্ ব্যক্তিরা নিরাপদে বাস করিবার জন্য পরিখা বেষ্টিত আবাসে বাস করিতেন। নটনারায়ণ ঐ কুড়ি বিঘা জমির মধ্যস্থলে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপরাম চন্দননগরে থাকিয়া ঐ অট্টালিকার নির্ম্মাণকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণরাম মুর্শিদাবাদে পিতার কাছে থাকিতেন। প্রাসাদের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে, রূপরাম বাটীর চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন আরম্ভ করাইলেন। এই সময়ে নটনারায়ণ নবাব সরকারের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় বাটীতে বাস করিবার জন্য চন্দননগরে আগমন করিলেন।

২

নটনারায়ণের গৃহদেবতা ৺গোবিন্দ রায় ও শ্রীরাধার পৃথক মন্দির ছিল না, নটনারায়ণের অট্টালিকারই এক পার্শ্বেরই একটি কক্ষে ঐ যুগল-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নটনারায়ণ বাটীতে আসিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহার বাটীর অবিদূরে, সদর দ্বারের একপার্শ্বে শ্রীরাধাগোবিন্দের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন। পুত্র রূপরামের সহিত মন্দিরের স্থান নির্ব্বাচন সম্বন্ধে পরামর্শ চলিতেছিল, এমন সময়ে মুর্শিদাবাদ হইতে সংবাদ পাইলেন যে, বর্গী দলপতি ভাস্কর পণ্ডিতের কয়েক সহস্র অশ্বর উড়িষ্যা হইতে মেদিনীপুরে প্রবেশপূর্ব্বক দেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে গঙ্গার পশ্চিম কূল ধরিয়া ত্রিবেণীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। বর্গীরা বীরভূমের ভিতর দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর না হইয়া, দক্ষিণ দিক্ হইতে বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। যদি তাহারা গমনপথে কোথাও বাধা না পায়, তাহা হইলে চন্দননগর তাহাদের গমন পথের মধ্যে পড়িবে। সুতরাং বর্গীরা আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই চন্দননগর ত্যাগ করিয়া গঙ্গার তীর হইতে কিছু দূরে, কোন পল্লীগ্রামে গিয়া গোপনে বাস করিলে ভাল হয়।

পুত্রের নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া নটনারায়ণ ও রূপরাম যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বর্গীরা সাধারণতঃ অশ্বারোহী ও পদাতিক, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; তন্মধ্যে অশ্বারোহীর সংখ্যাই অধিক। তাহাদের অস্ত্রের মধ্যে বর্শা, তরবারী ও ঢাল, কদাচিৎ দুইচারিটা বন্দুকও থাকিত। চন্দননগরে গঙ্গার ধারে ফরাসীদের দুর্গ আছে, ইহা বর্গীরা জানিত। চন্দননগরের উত্তরে বা দক্ষিণে গঙ্গার পশ্চিম কূলে আর কোথাও দুর্গ নাই। সুতরাং কোন স্থানেই দুর্গ হইতে গোলাবর্ষণের ভয় তাহাদের ছিল না, সে ভয় ছিল একমাত্র চন্দননগরে। চন্দননগর দুর্গের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে জনবহুল পল্লী, হাট, বাজার, পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী। দুর্গের অধিকাংশ কামান গঙ্গার ধারে স্থাপিত। নটনারায়ণের বাটী দুর্গের উত্তরে কিঞ্চিন্ন্যূন অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপী স্থান চন্দননগরের বাণিজ্য-কেন্দ্র লক্ষ্মীগঞ্জ। বর্গীরা যদি চন্দননগরের দক্ষিণ দিক হইতে না আসিয়া চন্দননগরের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া ঘুরিয়া উত্তর দিক্ দিয়া প্রবেশ করে, তাহা হইলে দুর্গস্থিত কামান ও ফরাসী সেনারা সহসা তাহাদিগকে বাধা দিতে পারিবেন না। কারণ বর্গীরা রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত না, তাহারা ব্যাঘ্রের মত সহসা লম্ফ দিয়া পতিত হইত এবং দুই তিন দণ্ডের মধ্যেই লুণ্ঠন করিয়া বিদ্যুৎগতিতে অশ্বারোহণে অদৃশ্য হইয়া যাইত। একবার ফরাসী সীমা পার হইয়া নবাবের এলাকায় প্রবেশ করিলে, ফরাসী সেনারা আর তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এই বর্গীদিগের উৎপাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চন্দননগরের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করাইতেছিলেন, পরিখা তখন কেবল দক্ষিণ দিকে ও পশ্চিম দিকে কিছুদূর পর্য্যন্ত খনন করা হইয়াছিল, পশ্চিমের বাকী অর্দ্ধেক এবং উত্তর দিক্ সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল। এদিকে নটনারায়ণের বাটীর পরিখা খননও তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। যদি বর্গীরা উত্তর দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহার আবাস আক্রমণ করে, এবং সেই সংবাদ পাইয়া ফরাসী দুর্গ হইতে সিপাহীরা কামান লইয়া বাহির হয়, তাহা

হইলেও তাঁহার রক্ষার আশা কোথায়? ফরাসী সেনারা কৃষ্ণপুরে উপস্থিত হইতে না হইতেই বর্গীরা নটনারায়ণের সর্ব্বনাশ করিয়া প্রস্থান করিবে। দুর্গের প্রাচীরের উপর হইতেও গোলা বর্ষণ ব্যর্থ হইবে; বড় বড় অট্টালিকা-শোভিত জনবহুল পল্লীর মধ্যস্থিত পথ দিয়া বর্গীরা গমনাগমন করিলে, দুর্গপ্রাচীরের উপর হইতে গোলা বর্ষণ করিলেও তাহাদের কণামাত্র ক্ষতি হইবে না; সুতরাং চন্দননগর পরিত্যাগ ব্যতীত আর কোন উপায়ই নটনারায়ণ বা রূপরাম দেখিতে পাইলেন না।

চন্দননগর পরিত্যাগই যখন যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইল, তখন নটনারায়ণ ভাবিলেন, ফরাসী দুর্গের দেওয়ান রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে একবার ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা উচিত। তিনি পরদিন রূপরামকে সঙ্গে লইয়া চৌধুরী মহাশয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক বর্গী-দিগের আগমনের সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, চৌধুরী মহাশয় বলিলেন "আমার অগ্রজ রাজা রাম চৌধুরীর নিকট হইতেও আমি এই সংবাদ পাইয়াছি। আমি দুর্গাধ্যক্ষকেও সে কথা জানাইয়াছি। দুর্গাধ্যক্ষ বলেন যে, ফরাসীর চিরশত্রু ইংরাজের সহিত শীঘ্রই হউক বা কিছু দিন পরেই হউক, আমাদের যুদ্ধ অনিবার্য্য। এ অবস্থায় আমরা অগ্রসর হইয়া মারাঠাদিগকে দমন করিতে যাইব না। তবে যদি মারাঠারা আসিয়া আমাদের কুঠী আক্রমণ করে বা আমাদের কোন প্রজার উপর অত্যাচার করে, তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল দিতে ত্রুটী করিব না। সুতরাং আমার মনে হয় যে, আপনার ধনরত্নাদি লইয়া কিছুদিন পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করাই শ্রেয়ঃ। আমি দুর্গের দেওয়ান বলিয়া আমার বাটী সশস্ত্র সিপাহীদের দ্বারা সুরক্ষিত। আমি চন্দননগর ছাড়িয়াও বাহিরে কোথাও যাইতে পারি না, কারণ, দুর্গের ব্যবস্থার ভার আমার উপরে অর্পিত। আর আমাদের দুর্গে সিপাহীর সংখ্যাও এত অধিক নাই যে, চন্দননগর প্রত্যেক লোকের বাটী রক্ষায় তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারা যায়। তবে ইহা স্থির যে, চন্দননগরে ফরাসী সম্রাটের কোন প্রজার বাটী যদি বর্গীরা আক্রমণ করে, তাহা হইলে আমরা বর্গীদিগকে বাধা দিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিব। আমি পরাধীন, ফরাসী কোম্পানীর কর্ম্মচারী, আমার পক্ষে চন্দননগর ত্যাগ করিয়া যাওয়া অসম্ভব। আপনি স্বাধীন, আত্মরক্ষার জন্য আপনি যে কোন স্থানে যাইতে পারেন, আমি সেরূপ পারি না।"

চৌধুরী মহাশয়ের কথায় নটনারায়ণ বুঝিলেন যে, ফরাসী কোম্পানীর নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্তির আশা দুরাশা মাত্র। তাঁহাদিগকে চন্দননগর ছাড়িয়া অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য অন্যত্র যাইতে হইবে। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? গঙ্গা পার হইয়া গঙ্গার পূর্ব্ব দিকে যে কোন স্থানে যাইলে বর্গীদের আক্রমণের আশঙ্কা অপেক্ষা-কৃত অল্প, কারণ বর্গীদিগকে গঙ্গা পার হইতে হইবে। কিন্তু যাহারা উড়িষ্যার দিক হইতে সুবর্ণরেখা, বৈতরণী, রূপনারায়ণ, দামোদর প্রভৃতি নদ নদী অতিক্রমপূর্ব্বক গঙ্গার পশ্চিম কূলে উপস্থিত হইতে পারে, তাহাদের পক্ষে গঙ্গা পার হওয়া অসম্ভব নহে। এইরূপ অনেক যুক্তি-তর্ক আলোচনার পর স্থির হইল যে, গঙ্গার পশ্চিম দিকে চন্দননগর হইতে কিছু দূরে কোন অখ্যাতনামা পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করাই ভাল। নটনারায়ণ নবাবের নিকট হইতে যে জাইগীর পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে পালাড়া, বিঘাটি ও জারুয়া বা জাতকো এই তিন গ্রাম চন্দননগরের পশ্চিমে দুই তিন ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত। ঐ সকল গ্রাম, প্রধানতঃ দরিদ্র কৃষকদিগের দ্বারা অধ্যুষিত। লুণ্ঠনকারী বর্গীরা ধনরত্নই লুণ্ঠন করিয়া থাকে, সুতরাং যে গ্রামে ধনবানের বাস নাই, তাহারা সে দিকে বড় যায় না। আহার্য্যের জন্য তাহারা হাট বাজার, গঞ্জগোলা লুণ্ঠন করে, দরিদ্র কৃষকের বাটী লুণ্ঠন করিয়া শক্তির অপব্যয় করে না।

দুই তিন দিন পরে, রূপ রাম পিতার আদেশে ঐ তিনখানি গ্রাম পরিদর্শন করিয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন যে, পালাড়া গ্রামটি তাঁহার পছন্দ হইয়াছে। ভদ্রেশ্বরের প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিমে ঐ গ্রাম অবস্থিত। বঙ্গের অন্যান্য গ্রামের ন্যায় পালাড়াও কৃষক প্রধান গ্রাম। ঐ গ্রামে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ প্রভৃতির বাস আছে। পালাড়ার পশ্চিম দিকে কিছু দূরে সরস্বতী নদী। গ্রামে বাটীনির্ম্মাণের উপযোগী যথেষ্ট ভূমি আছে।

পুত্রের কথা শুনিয়া নটনারায়ণ পালাড়ায় গিয়া বাস করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি রূপরামকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনিই যে ঐ অঞ্চলের ভূস্বামী নটনারায়ণ মজুমদারের পুত্র রূপরাম মজুমদার, ওকথা গ্রামবাসীদের নিকটে আপাততঃ যেন প্রকাশ করা না হয়। গ্রামবাসীরা রূপরামকে প্রশ্ন করিয়া এইটুকু জানিতে পারিল যে, চন্দননগর হইতে এক ঘর ভদ্র কায়স্থ এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি গৃহ নির্ম্মাণের স্থান মনোনীত করিয়া ভূস্বামীর নিকট হইতে ঐ জমি মৌরসী জমা করিয়া লইবেন্। নটনারায়ণও একদিন রূপরামের সঙ্গে গিয়া গৃহ নির্ম্মাণের স্থান দেখিয়া আসিলেন।

গৃহ-নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। কিছুদিনের জন্য গোপনে বাস করিতে হইবে, সুতরাং সুবৃহৎ অট্টালিকার প্রয়োজন নাই, ইষ্টক প্রাচীরের উপর তৃণাচ্ছাদিত চার পাঁচখানি গৃহ নির্ম্মিত হইল। এখনকার মত সেকালে লোকে কথায় কথায় ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করাইতেন না, সেকালে পল্লীগ্রাম ত দূরের কথা, সহরেও অধিকাংশ ভদ্রলোক তৃণাচ্ছাদিত গৃহে বাস করিতেন। কদাচিৎ কোন কোন গ্রামে ধনবান্ ভূস্বামীরা ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতেন। অনেক ধনবান্ ব্যক্তি সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যপূর্ণ তৃণাচ্ছাদিত সুবৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপ বা বৈঠকখানা নির্ম্মাণ করাইতেন।

যাহা হউক, পালাড়ায় গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে, নটনারায়ণ শুভ দিন দেখিয়া, সপরিবারে নূতন গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঞ্চিত বিপুল ধন ও রত্নালঙ্কার অতি গোপনে চন্দননগর হইতে আনাইয়া মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। সেকালে দস্যু তস্করের ভয়ে সকল গৃহস্থই এইরূপ টাকাকড়ি ঘরের মেঝেতে বা গৃহ সংলগ্ন উদ্যানে গোপনে পুঁতিয়া রাখিতেন।*

৩

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে বর্গীর আক্রমণের আশঙ্কায় নটনারায়ণ চন্দননগর ত্যাগ করিয়া পালাড়ায় গিয়া বাস করেন। পালাড়ায় যাইবার পর প্রায় এক বৎসর নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল, বর্গী আসিল না। তিনি কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণরামের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন যে, উড়িষ্যার দিক্ হইতে যে বর্গীর দল ত্রিবেণী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তাহারা গঙ্গার দিকে না গিয়া মেদিনীপুরের ভিতর দিয়া বর্দ্ধমানে গিয়া ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত মিলিত হইয়াছিল। ভাস্কর পণ্ডিত নাগপুর হইতে বাহির হইয়া সিংভূমের মধ্য দিয়া বাঁকুড়ায় গমন করেন। বাঁকুড়ায়, বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল রায় ভাস্কর পণ্ডিতের গতিরোধ করিলে, বিষ্ণুপুরের অদূরে এক তুমুল যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বিষ্ণুপুর রাজের উপাস্য দেবতা মদনমোহন স্বয়ং নরদেহ ধারণপূর্ব্বক "দলমাদল" নামক সুবৃহৎ কামান হইতে অগ্নিবর্ষণপূর্ব্বক মারাঠা যোদ্ধাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পরাজিত করেন। ভাস্কর পণ্ডিত তাঁহার হতাবশিষ্ট সৈন্যদলকে লইয়া বর্দ্ধমানে গমন করেন এবং তথায় উড়িষ্যা হইতে সমাগত স্বীয় অনুচরদিগের সহিত মিলিত হইয়া মুর্শিদাবাদে গমন করেন। নবাব আলিবর্দ্দী ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন। কিন্তু বর্গীর উৎপাত বন্ধ হইল না, প্রতি বৎসরই বাঙ্গালায় বর্গীর উৎপাত সমভাবে চলিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে, নটনারায়ণ মুর্শিদাবাদ হইতে সংবাদ পাইলেন যে, প্রজাবৎসল নবাব বঙ্গদেশকে বর্গীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য মারাঠাদিগকে উড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া ও চৌথ বাবদ বার্ষিক বার লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত সন্ধি করেন। এই সংবাদ পাইয়া নটনারায়ণ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি মনে করিলেন যে, যখন মারাঠাদিগের সহিত সন্ধি হইল, তখন, আর বর্গী দেশ লুণ্ঠন করিতে আসিবে না। সুতরাং এখন তিনি চন্দননগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিরুদ্বেগে তথায় বাস করিতে পারিবেন।*

কিন্তু তাঁহার সে আশাও পূর্ণ হইল না। যখন তিনি চন্দননগরে প্রত্যাবর্ত্তনের কল্পনা করিতেছিলেন, সেই

* নটনারায়ণের বংশধরগণ বলেন যে, নটবর্ম্ম ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে চন্দননগর হইতে পালাড়াতে গিয়া বাস করেন। কিন্তু ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে বর্গীর উৎপাত হয় নাই, হইয়াছিল ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ও তাহার পর, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর রাজত্বকালে।

* ইতিহাস-পাঠকগণ অবগত আছেন যে, ভাস্কর পণ্ডিত সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে, নবাব তাঁহাকে কৌশলে নিজ শিবিরে আনয়ন করিয়া হত্যা করেন।

সময়ে একদিন রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন—এক নবজলধর কিশোর মূর্ত্তি, রূপের প্রভায় দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বীণানিন্দিত সুমধুর স্বরে বলিলেন, "নটনারায়ণ, আমি তোমার গৃহদেবতা গোবিন্দ রায়। তুমি আমাকে আর এইস্থান হইতে কোথাও লইয়া যাইও না। এইখানেই আমাকে মন্দির করিয়া দাও, আমি সেই মন্দিরে বাস করিব। তুমিও এইস্থান ত্যাগ করিও না। তোমার মঙ্গল হইবে।" এই বলিয়াই দেবতা অন্তর্হিত হইলেন।

তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন—রাত্রি শেষ হইয়াছে। শেষ রাত্রির স্বপ্ন সত্য হইয়া থাকে, এই কিম্বদন্তী তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া স্নান সমাপন পূর্ব্বক প্রত্যহ যেরূপ দেবতাকে প্রণাম করিবার জন্য ঠাকুর ঘরে যাইতেন, সেদিনও সেইরূপ ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেবমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই তিনি পুলকে, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রত্যহ যে মূর্ত্তি দর্শন করেন, এত সে মূর্ত্তি নহে, এ যে স্বপ্নে দৃষ্ট সেই মনোমোহন কিশোর কৃষ্ণ-মূর্ত্তি! তিনি ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মূর্চ্ছা ভঙ্গে দেখিলেন, তাঁহার পত্নী, পুত্র, পুত্রবধূ প্রভৃতি তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন, কেহ তাঁহার মুখে জল দিতেছেন, কেহ বাতাস করিতেছেন। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া দেবতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন—প্রত্যহ যে মূর্ত্তি দর্শন করেন, সেই মূর্ত্তি, এতো সেই স্বপ্নে দৃষ্ট মদনমোহন কিশোর মূর্ত্তি নহে। তিনি দেবতাকে প্রণাম করিয়া নিজ কক্ষে গমন করিলেন। সেখানে পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার চন্দননগরে যাওয়া হইবে না, দেবতার আদেশ আমাকে এইখানেই বাস করিতে হইবে।"

এই বলিয়া তিনি পূর্ব্ব রাত্রির স্বপ্ন-বৃত্তান্ত এবং প্রাতঃকালে দৃষ্ট গোবিন্দ রায়ের অপূর্ব্ব মূর্ত্তির কথা প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন, "ঠাকুর নিজে যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তার অন্যথা হবে না। তুমি এইখানেই তাঁর মন্দির করে' দাও। বাবার হুকুম, আমরা এই গ্রাম ছেড়ে কোথাও যাব না।"

রূপরামও এই কথার সমর্থন করিলেন। দেবতার আদেশ কে প্রতিবাদ করিবে?

নটনারায়ণ বর্গীর ভয়ে এতাবৎ গ্রামবাসীদিগের নিকটে আপনার প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি সেইদিন অপরাহ্ণকালে গ্রামবাসীদের নিকটে আপনার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেন। গ্রামবাসীরা যখন শুনিলেন যে, তাঁহাদের নূতন প্রতিবেশী অন্য কেহ নহেন, তাঁহাদেরই ভূস্বামী নবাবের অনুগ্রহভাজন মহামান্য নটনারায়ণ মজুমদার, তখন তাঁহাদের আর আনন্দের অবধি রহিল না। জমিদার যে গ্রামে বাস করেন, সে গ্রামে জলকষ্ট, পথকষ্ট থাকে না, কেহ অনাহারে থাকে না, কেহ বিনা চিকিৎসায় মরে না, সুতরাং প্রজাদের আনন্দ হইবে না কেন?

অচিরকাল মধ্যে পালাড়ায় নটনারায়ণের প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল, রাধাগোবিন্দের মন্দির নির্ম্মিত হইল, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা হইল, কায়স্থ জমিদারের আমন্ত্রণে কয়েক ঘর নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের বাস হইল। সকল দিক্ দিয়াই গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হইল।

রূপরাম এবং কৃষ্ণরামের বংশধরগণ এখনও পালাড়া ও নিকটবর্ত্তী গ্রামে বাস করিয়া পূর্ব্ব পুরুষের অর্জ্জিত জমিদারী ভোগ করিতেছেন। এখন তাঁহারা সাধারণতঃ "মজুমদার" উপাধি ব্যবহার না করিয়া "ঘোষ" উপাধি ব্যবহার করিতেছেন বটে, তবে দলীলপত্রে বা প্রজাদিগকে দত্ত কবচে "ঘোষ মজুমদার" উপাধি ব্যবহার করেন। নটনারায়ণের অধস্তন অষ্টম পুরুষ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় কিছুকাল যাবৎ চন্দননগর ষ্টেশন রোডের উপর বাস করিতেছেন। নটনারায়ণ যেখানে অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও পরিখা খনন করাইয়াছিলেন, সেই কুড়ি বিঘা জমি এখনও নটনারায়ণের বংশধরদিগের দখলে আছে। সেই স্থান এখনও "**মজুমদারের গড়**" নামে পরিচিত।

# ভগবৎ-তত্ত্ব

শ্রীঅবনীনাথ রায়

আমাদের এলাহাবাদের সাহিত্য-সভায় উপর্যুপরি দুইবার ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করা হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রবন্ধকার যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, ভগবান নিশ্চিতই আছেন; তাঁহাকে অস্বীকার করার অর্থ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির জোর করিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকিবার মত ইত্যাদি।

এই সব আলোচনার প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের উপর কি হয় তাহা আমি উৎসুক চিত্তে লক্ষ্য করিয়াছি। সভায় প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত যে সকল মতামত এই সম্পর্কে আমি শুনিতে পাইয়াছি, তাহাকে দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি:—(১) কেহ কেহ বলিয়াছেন—সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে ভগবান আছেন কি নাই এই সমস্যা লইয়া বহু লোক মাথা ঘামাইয়াছেন, বহু গবেষণা করিয়াছেন, বহু শাস্ত্র এবং দর্শন রচিত হইয়াছে; কিন্তু তথাপি এ সমস্যার নিরাকরণ হয় নাই। ভগবান আছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন, এমন একদল লোক যেমন সকল দেশে চিরকালই আছেন এবং থাকিবেন, ভগবানের সত্তায় বিশ্বাস করেন না, এমন একদল লোকও সকল দেশে চিরকাল আছেন এবং থাকিবেন। অতএব সাহিত্য-সভার ক্ষুদ্র দুইটি অধিবেশনে সকলে একত্র হইয়া এই বিষয় লইয়া বিচার করিলে বিশেষ কিছু লাভ হইবে না, সেই দিক্ দিয়া এ আলোচনা নিরর্থক। (২) অপর পক্ষ বলিয়াছেন—ভগবান গভীর ধ্যানের এবং অনুভবের সামগ্রী, তিনি আলোচনার বস্তু নহেন। সুতরাং তিনি সাহিত্য-সভার আলোচনার পর্যায়ে পড়েন কিনা সন্দেহ। সাহিত্য-সভা বরঞ্চ রোমান্টিক সাহিত্য অর্থাৎ ছোট গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লইয়া কারবার করিবে, ভগবানের অস্তিত্ব সপ্রমাণ অথবা অপ্রমাণ করিবার ভার তাহার গণ্ডীর এবং নাগালের বাহিরে।

উপরের মন্তব্য হইতে এতটা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবান আমাদের নিকট এক অনির্দেশ্য বস্তু এবং ভগবান সম্বন্ধে সর্বপ্রকার আলোচনা আমরা এড়াইয়া চলিতে পারিলেই স্বস্তি বোধ করি। ভগবান সম্বন্ধে চিরকাল গবেষণা করিয়াও মানুষ কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই অথবা ভগবান কেবল মাত্র অনুভবযোগ্য, আলোচনাযোগ্য নহেন—এ সব মন্তব্যের ভিতরকার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র একটি। তাহা এই যে, ভগবান সম্বন্ধে আলোচনা বা চিন্তা সর্বপ্রযত্নে স্থগিত রাখা। অর্থাৎ ভগবান সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের রসবোধের পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছায় নাই—সাহিত্য, বিজ্ঞান, খেলা-ধূলা, আমোদপ্রমোদ আমাদের জীবনে যতটা রস সঞ্চার করিতে পারিয়াছে, ভগবান সম্বন্ধে আলোচনা তাহার কিছুই পারে নাই। সে আলোচনা আমাদের কাছে নীরস বোধ হয়, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে একটা অকারণ ভীতি এবং বিরক্তিরও উদ্রেক করে।

কিন্তু এই সত্য যদি আমাদের কাছে স্পষ্ট হইত যে, ভগবান আমাদের নিকট হইতে দূরে নাই, আমাদিগকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং তিনি আমাদের কাছে কালেভদ্রে আসেন এমন নয়, তিনি সর্বকালে, সর্বদেশে সর্বদা আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন, তাঁহাকে বাদ দিয়া এক মুহূর্ত আমাদের সত্তা সম্ভব নয়—তাহা হইলে এ প্রসঙ্গ বোধ হয় আমাদের কাছে তিক্ত লাগিত না। অন্ততঃ মনে করিতাম—ইচ্ছা করিলেও যে ব্যক্তির সঙ্গ আমরা পরিহার করিতে পারিব না, তাহার সম্বন্ধে আর কিছু না হোক, কৌতূহল একটা আমাদের হওয়া স্বাভাবিক যে, ব্যক্তিটা কে, কি তাহার ধরণধারণ, কি সে চায়, কি সে আমাদের করিতে বলিতেছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সত্য আমাদের কাছে একেবারে ঝাপ্সা, অস্পষ্ট—তাই জীবনের বহু উপকরণ আমাদের না হইলে চলে না কিন্তু ভগবান আমাদের না হইলেও চলে। আর সেই পরম পুরুষের সহিষ্ণুতা এমনি নিদারুণ যে, তাঁহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া যদি আমরা চিরদিন থাকি কিংবা তাঁহাকে তারস্বরে অস্বীকার করি, তবে তাঁহার বিন্দুমাত্র ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না, ক্রোধ হয় না,

ক্ষোভ হয় না—এমন ইচ্ছাও হয় না যে, আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেন যে, তিনিই আমাদের জীবনের মধ্যস্থলে বিরাজ করিতেছেন। তিনি চান যে, আমরা তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব—তিনি পলাইয়া বেড়াইবেন, আর আমরা তাঁহাকে ধরিব। এই তাঁর লীলা।

সৃষ্টির আদি যুগ হইতে এই লীলা চলিতেছে—ভগবান বলিতেছেন, আমি আমার এই সৃষ্টির মধ্যেই লুকাইয়া রহিয়াছি। জলে রহিয়াছি, স্থলে রহিয়াছি, অন্তরীক্ষে রহিয়াছি, মানুষে রহিয়াছি, পশুতে রহিয়াছি, বৃক্ষ পত্র পল্লবে রহিয়াছি, তোমাতে রহিয়াছি—কই আমাকে খুঁজিয়া বাহির কর ত! মানুষ কখনো ভুল করিয়া বলিতেছে, প্রভু, এই তুমি—আবার আর একটা খণ্ড বস্তু ধরিয়া বলিতেছে, প্রভু, এই তুমি। তিনি হাসিতেছেন—বলিতেছেন, হইল না; আবার খোঁজ। এই লুকোচুরি এবং অন্বেষণের লীলায় বিশ্বনাট্য জমিয়া উঠিয়াছে। এই অন্বেষণ চিরকাল সমানভাবে চলিবে—কেননা, এই অন্বেষণ-স্পৃহার নিবৃত্তি হইলে মানুষের জন্মেরও কোন অর্থ হয় না, সৃষ্টিরহস্যেরও কোন অর্থ থাকে না।

ভগবান যে অনুভবসাপেক্ষ, আলোচনার বিষয়ীভূত কোন থিয়োরি মাত্র নয়, ইহা অংশতঃ সত্য। কেননা, তিনি সজীব চিৎশক্তি—কে তাঁহাকে চাহিতেছে, কার কাছে তিনি ধরা দিবেন, তাহা তিনি জানেন। এখানে তিনি ফাঁকি ধরিতে পারেন। তাহা না হইলে যাঁহারা বড় বড় পণ্ডিত, ভগবান সম্বন্ধে যাঁহারা শাস্ত্র এবং পুঁথি লিখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ভগবানকে লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহাকে লাভ করিবার মানদণ্ড অনুরাগ, আন্তরিকতা, আকুতি, উৎসর্গ। তিনি যদি abstract আইডিয়া মাত্র হইতেন, তবে গবেষণা এবং আলোচনার দ্বারা তাঁহাকে ধরা সম্ভব হইত। কিন্তু তিনি সজীব প্রাণী; তাই প্রাণধর্মের পথেই তাঁর নিকট যাওয়া যায়। তবে এ কথার অর্থ ইহা নয় যে, ভগবান সম্বন্ধে কোন চিন্তা, আলোচনা বা গবেষণা করিতে হইবে না। আমাদের হাত পা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি, মন সবই আমরা ভগবানের নিকট হইতে লাভ করিয়াছি। এ সমস্তই তিনি আমাদের দান করিয়াছেন তাঁহাকে ধরিবার সহায় হইবে বলিয়া। সুতরাং আমাদের বুদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা করা। সেই হইবে আমাদের বুদ্ধির প্রকৃত প্রয়োগ ক্ষেত্র। কেবল এইটুকু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি বুদ্ধির অতীত অতএব কেবল মাত্র বুদ্ধির পরিচালনায় তাঁহাকে জানা সম্ভব নয়। বুদ্ধির সহিত ইন্ধন দিতে হইবে অনুরাগের, দরদের এবং সর্বস্ব-সমর্পণের।

বিংশ শতাব্দী জড়প্রধান যুগ। পৃথিবীর কোন দেশেই এ যুগে ধার্মিকতা বা ভগবৎ-প্রসঙ্গের সমাদর দেখা যায় না। এ যুগের একচ্ছত্র সম্রাট বিজ্ঞান। ভারতবর্ষ ধর্মের পীঠস্থান—যুগ যুগান্তর হইতে এ দেশে ধর্মের এবং ঈশ্বর-লাভের বহু চর্চা হইয়াছে এবং বহু পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে এ দেশের আকাশে বাতাসে ঐ চিন্তা ভাসিয়া বেড়াইতেছে—ভারতবর্ষের উদাত্ত বাণীই হইল ধর্মের বাণী। কিন্তু ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় জীবনে পরাভূত। পরাভূত জাতির বাণী কেহ শুনিতে চাহে না। কেননা, তার নিজের বাণীর মধ্যেই পরাজয়ের ব্যর্থতা আত্মগোপন করিয়া আছে। এই কারণেই জগন্ময় প্রচারিত জড়বাদের স্রোত ভারতবর্ষেও আসিয়া পৌছিয়াছে। এবং আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রের এবং শিক্ষা-প্রণালীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া দেশের পৌর-জনের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছে।

বিজ্ঞানের একটা প্রকাণ্ড দাবী হইল এই যে, ইহা বিশ্বাস করিতে শেখায় যে, মানুষই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, মানুষই সব চালায়, মানুষকে কেহ চালায় না। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি যে, বিজ্ঞানের যে হারে দ্রুত উন্নতি হইতেছে, তাহাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে মৃত্যুর রহস্যও বিজ্ঞানের নিকট পরাজিত হইবে। অর্থাৎ বিজ্ঞান মানুষের জন্মকে ত নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেই, এইবার তাহার মৃত্যুকে জয় করিবার পালা। সে এমন কিছু একটা সৃষ্টি করিবে, যার ফলে মানুষ মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারিবে—মানুষ চিরজীবী হইয়া থাকিবে। কথাটা কেহ কেহ হয়ত স্থূলভাবে বলেন; কিন্তু তথাপি এই বিশ্বাস এবং এই আশা যে অনেকের মন ছাইয়া আছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

মৃত্যুর মহৌষধি আবিষ্কৃত হইলে কিংবা সৌরজগতে গ্রহ হইতে গ্রহে, উপগ্রহে, তারকায় কিংবা নীহারিকাপুঞ্জে পরিভ্রমণ করা সম্ভব হইলে বিজ্ঞানের জয়জয়কার হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটা ফাঁক থাকিয়া যাইতেছে, সেই কথাটা প্রণিধানযোগ্য। আমরা মনে করি—আমরা সব জানি, সব বুঝি; কিন্তু ইহা যে সত্য নয়, সেই কথাটা বিশ্লেষণ করিয়া সর্বদা অনুভব করা প্রয়োজন। আমরা মনে করি যে, আমরা নিজেদের চেষ্টায় বা সতর্কতার দ্বারা বা ঔষধ পথ্যের জোরে বাঁচিয়া আছি কিন্তু আমরা একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব যে, আমাদের নিদ্রার সময়ে কে আমাদের দেখে, আমাদের সতর্কতা কোথায় যায়? আমি যখন গভীর সুপ্তিতে মগ্ন তখন যে বাড়ীটা আমার ঘাড়ের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবে না, বা একটা সাপ আমাকে কামড়াইবে না, বা কোন আততায়ীর ছুরিকা আমার বুকে বসিবে না, বা ভূমিকম্প হইবে না, ইহা কি আমি বলিতে পারি? অথচ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এই সকল আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক বিপদ-আপদ সত্ত্বেও দিব্য আমি খোস মেজাজে বাঁচিয়া আছি, এর কেরামতি কি আমারই প্রাপ্য? আমরা বলি চেষ্টা করিলেই ফল লাভ হয়; কিন্তু ইহা কি সম্পূর্ণ সত্য? চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছি সমান প্রতিভার দুইটি ছাত্র একসঙ্গে পড়িতেছে, সমান পরিশ্রম করিতেছে; কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল একজনের সাফল্য আর একজনের বিপরীত। চাকরি-জগতে এই বিধান আরও সুস্পষ্ট। একই চাকরির জন্ত সমান গুণবিশিষ্ট দুইজন বা ততোধিক মানুষ প্রতিযোগিতায় নামিল; কিন্তু জয়লক্ষ্মী বরমাল্য দিলেন একজনকে। আমি জানি এর মধ্যে তর্ক তুলিবার অনেক ফাঁক আছে। কেহ বলিবেন ছাত্রদের প্রতিভা সমান ছিল না, কেহ বলিবেন তাহাদের মেহন্নতের পরিমাণ এক ছিল না, কেহ বলিবেন চাকরির ক্ষেত্রে মুরুব্বির বা পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা এক রকম ছিল না। বলা বাহুল্য process of elimination দ্বারা এই সকল ঘটনার কার্য এবং কারণকে পৃথক করিয়া দেখা অসম্ভব। সুতরাং ইহার নিদান কতকটা বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই বহুদিন রহিয়া যাইবে। তাই আমার মন বলিতেছে যে, এই সব ঘটনার কোনটাই accident নয়, এ সবই এক বিরাট পুরুষের পূর্ণ জ্ঞানের ফল মাত্র, যার পরিসরক্ষেত্র কেবলমাত্র বর্তমানে সীমাবদ্ধ নয়, যাহা অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যেও প্রসারিত হইয়া আছে।

আমরা একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব যে, আমরা নিজে কাজ করিতেছি বলিয়া আমাদের যে অভিমান তাহা কতদূর অলীক। যে হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ের গর্ব আমরা করি তাহা যে প্রতিদিন সচল থাকিবে তাহার স্থিরতা কি? আমাদের হস্তপদাদি যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইতেছে না, মস্তিষ্ক যে বিকৃত হইতেছে না ইহা কি আমাদের কোন সজ্ঞান চেষ্টার ফলে, না অপর কোন ব্যক্তির নির্ভুল ব্যবস্থার ফলে বা তাঁহার অকারণ দয়ার ফলে? আমি যখন প্রতিদিন আপিসে যাই, তখন যে একটা প্রকাণ্ড মোটর আমার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে না কিংবা আমি যে গাড়ীতে চড়িয়া যাইতেছি, তাহা যে পথের মধ্যে বিকল বা বিধ্বস্ত হইয়া যায় না, ইহা কি আমার কোন সজ্ঞান চেষ্টার ফলে? এইরূপে যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবন বিশ্লেষণ করিয়া দেখি তবে বুঝিতে পারিব যে, এই দৃশ্যমান জগতে আমরা নিজেরা চলিতেছি ভাবিলেও তাহা সত্য নয়, প্রতিনিয়ত আমাদের কেহ চালাইতেছেন। এই জগৎ-ব্যাপারের পরিচালক আমরা নয়, পরিচালক অপর কেহ যাঁহাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি না কিন্তু যাঁহার কার্যের পরিচয় প্রতিনিয়ত আমরা পাই।

আমরা মানুষের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই, মানুষের দানশক্তির প্রশংসা করি, মানুষের উদারতায়, সহিষ্ণুতায়, তিতিক্ষায় সাধুবাদ প্রদান করি। কিন্তু আমরা যদি স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখি, তবে বুঝিব ভগবানের সৌন্দর্যের সীমা নাই, ভগবানের দানশক্তির শেষ নাই, ভগবানের তিতিক্ষার ক্ষয় নাই। যুগে যুগে মানুষের মুখের লালিত্য, সৌকুমার্য আমাদের পাগল করিয়াছে কিন্তু আমরা কোনদিন ভগবানের সেই সৌন্দর্যের দিকে চোখ তুলিয়া তাকাই নাই যে, সৌন্দর্যে সূর্য চন্দ্র-গ্রহ-তারকা, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী রূপে রূপে, আলোকে আলোকে ঝলসিত হইয়া উঠিতেছে—যে সৌন্দর্যে নদী - গিরি - কান্তার - জলধি উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ,

লতা, গুল্ম শ্যামায়মান—পশু, পক্ষী, মানুষ প্রভৃতি জলচর এবং স্থলচর প্রাণী প্রাণধর্মে উল্লসিত, কলহসিত, মুখরিত। মানুষ দশ হাজার টাকা দান করিলে আমরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হই; কিন্তু ভগবানের দানের অজস্রতার তুলনায় এ দান কতটুকু? আমার বাসার পিছনে একটা মধুমালতী লতার পুঞ্জ পত্রে, পুষ্পে, গন্ধে, মাধুর্যে একেবারে বাড়ীর পিছনটাকে ভরাইয়া মথিত করিয়া তুলিয়াছে—সে সৌন্দর্য কেহ দেখে না, সে গন্ধ কেহ গ্রহণ করে না, সে শ্যামলিমার সমারোহ কাহারো মনে রেখাপাত করে না, কিন্তু তাই বলিয়া সে দানের অজস্রতার কি এতটুকু বিরতি আছে? দিনের পর দিন, ঋতুর পর ঋতু সেখানে ফুল ফোটার উৎসব লাগিয়াই আছে—অনাদৃত, অবাঞ্ছিত, অপ্রতীক্ষিত বলিয়া তাহার বিরাম নাই, কুণ্ঠা নাই, কার্পণ্য নাই। ব্যাঙ্ক ফেল করিয়া কেহ সর্বস্বান্ত হইলে কিংবা উপার্জনক্ষম পুত্র হারাইয়া তবুও কর্মক্ষম থাকিলে আমরা তাঁহার সহিষ্ণুতার প্রশংসা করি, শত্রুর সহিত বৃথা দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত না হইয়া ন্যায্য সত্ব ছাড়িয়া দিলে আমরা তাঁহার তিতিক্ষার প্রশংসা করি; কিন্তু যে ভগবান হইতে আমরা সমস্ত শক্তি, সমস্ত জ্ঞান, অবলীলায় পাইয়াছি, তাঁহার কথা দিনান্তে একবারও স্মরণ না করায় আমাদের যে অপরাধ হয়, তাহার ক্ষমার পরিমাণ কত গুরুতর? যে আহার্য তিনি না দিলে আমরা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিতাম না, সেই আহার্য গ্রহণ করিবার সময়ে বস্তুই বড় হইয়া উঠে, দাতার কথা একবারও মনে পড়ে না। এইরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে। যে জড়পিণ্ডটা চোখে আসিয়া ঠেকে, তাহাই আমাদের চিত্তকে অভিভূত করে; কিন্তু যে চিৎশক্তি পিছনে থাকিয়া সেই জড় বস্তুকে আমার হাতের সামনে ঠেলিয়া দেন তিনি বিস্মৃতির গর্ভে পিছনেই রহিয়া যান চিরদিন। এই বিস্মৃতির পাথেয় লইয়া মানুষ পাড়ি দিয়া চলিয়াছে জন্ম হইতে জন্মান্তর, কল্প হইতে কল্পান্তর; কিন্তু সে যাত্রার শেষ হয় নাই। এ পথ চলার শেষ হইতে পারে না, কেন না এ পথের প্রান্তে কোন সত্যিকারের মূলধন সঞ্চিত হইয়া উঠে নাই।

মানুষের সঙ্গে মানুষের যে বিরোধ, যে দ্বন্দ্ব, যে অন্তর্বিপ্লব, তাহারও মূল ঠিক ঐখানে ভগবানকে না পাওয়ার ভিতর। ভগবান স্বয়ং পূর্ণ জ্ঞান—মানুষ ছিটেফোঁটা জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছে মাত্র। তাই একজনের দেখা আর একজনের দেখার সঙ্গে মেলে না, একজনের জানা আর একজনের জানার সঙ্গে মেলে না। কেননা, দুইজনেই আংশিক দেখে মাত্র, অংশতঃ জানে মাত্র—পরিপূর্ণ দেখেও না, পরিপূর্ণ জানেও না। এই কারণে একের উপলব্ধি অন্য হইতে ভিন্ন, একের অভিজ্ঞতা অন্য হইতে স্বতন্ত্র। আর সেই অভিজ্ঞতার এবং উপলব্ধির সামঞ্জস্য না হইলেই বাধে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া, মনোমালিন্য এবং আসে বিচ্ছেদ।

ভারতবর্ষে একদিন এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়াছিল, যেদিন ভারতবর্ষ বলিয়াছিল যে, মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—ভগবানকে লাভ করা। ভারতবর্ষ সেদিন জীবনের গতি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল আদর্শের প্রতিষ্ঠা দ্বারা। ভারতবর্ষ রাজ্য চাহে নাই, পরের রাজ্য গ্রাস করিতে চাহে নাই, অর্থ চাহে নাই, প্রতিষ্ঠা চাহে নাই—চাহিয়াছিল একমাত্র ভগবানকে। তাই সেদিন সে আদর্শের উপলব্ধিভূমি ছিল তপোবন—কোলাহলমুখর সহরতলী নয়। আজ যদি আমাদের কেহ বলে—গ্রামে ফিরিয়া চল, আমরা ভয়ে আঁত্‌কাইয়া উঠি। কেননা জানি সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমার প্রয়োজন এক পেয়ালা চায়ের এবং একখানা খবরের কাগজের। পাড়াগাঁয়ে হয়ত এ সব মিলিবে না। আর যদি প্রতিদিন জানিতেই না পারিলাম পৃথিবীর কোথায় কি হইতেছে, কোন্ রাজ্য উঠিল, কোন্ রাজ্যের পতন হইল, বিজ্ঞানে কি নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইল, অর্থনীতির এক্‌স্‌চেঞ্জের হারে কাহার কত লাভ হইল, তবে পাড়াগাঁয়ের এক কোণে কূপমণ্ডূক হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার সার্থকতা কোথায়? ইহা জীবনের একটা দিক্ সত্য; কিন্তু একমাত্র দিক্ নয়। ইহা উত্তেজনার দিক, রজোধর্মের দিক্। কিন্তু ইহা ব্যতীত জীবনের শান্তরসাস্পদ একটা দিক্‌ও আছে। সেই পথের পথিক হইলে দেখা যায়, আমার প্রভুর অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, তাহার কোথাও একটা জনভূমির উত্থানে আর একটা জনভূমির পতনে বিন্দুমাত্র আলোড়ন হয় না। যে মানুষের সহিত আমরা এত গভীর প্রীতি এবং স্নেহের সম্বন্ধে আবদ্ধ, সেই মানুষকে খাওয়াইয়া, ভালবাসিয়াও

যে সুখ, গৃহপালিত একটা গাভী বা বনের একটা পশুকে খাওয়াইয়া এবং ভালবাসিয়াও সেই সুখ। মানুষ যেমন বন্ধুর কাছে সুখ-দুঃখের নানা কথা বলে এবং শোনে, শুনিয়া শান্তি পায়, তেমনি বৃক্ষ-লতা-বল্লরীর সঙ্গেও মিতালি হয় এবং তাহাদের বাণীও শুনিতে পাওয়া যায়। এই জগতের কোথাও কিছুই নিরর্থক নয়। সেই অ-দেখা জগতের দর্শন পাইলে, সেই অ-জানা জগতের জ্ঞানলাভ করিলে, সেই অ-শ্রুত সঙ্গীতের অনাহত ধ্বনি কাণে আসিয়া প্রবেশ করিলে, এই দৃশ্যমান জগতের ভাঙ্গাগড়া, সুখ-দুঃখ, আদান-প্রদান তুচ্ছ এবং ছেলেখেলা বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষ এই পথে সকলকে ডাক দিয়াছিল, কেননা সে জানিয়াছিল এই সর্বোত্তম পথ। মানুষ সে পথে সহসা যাইতে পারে নাই, যাওয়ার বাধা তাহার নিজের মধ্যেই বহু; কিন্তু তথাপি এই আহ্বান ব্যর্থ নয় এবং এই পথই চিরদিন আকর্ষণের সামগ্রী হইয়া তাহার আদর্শকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে।

---

# প্রাচীন চীনের সামাজিক ভিত্তি

৫

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম.এ., পি-এইচ.ডি.

## মাঞ্চু-শাসন (১৬৪৪-১৯১১)

যখন বিনা রক্তপাতে মাঞ্চুরা পিকিং দখল করে, তখন তথাকার ব্যবসায়ী গিল্ডই(১) চীনজাতির মধ্যে প্রথমে মাঞ্চু-শাসন স্বীকার করিয়া নেয়। দীর্ঘ অন্তর্বিপ্লবে বিরক্ত হইয়া, ব্যবসায়ের জন্য যাহারা তাহাদিগকে নির্বিঘ্নতা ও নিশ্চয়তা দিতে পারিবে এবং করগ্রহণের সুবিধাজনক নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিবে, তাহাদেরই রাজা বলিয়া মানিতে ইহারা রাজী ছিল। এই প্রকারের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মধ্যে মধ্যে চীনের গিল্ডের প্রভাব ইতিহাসে প্রকাশ পায়। মাঞ্চুরা চীনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তথাকার অধিবাসীদের বশ্যতার চিহ্নস্বরূপ মস্তকের সম্মুখের অংশ মুণ্ডন করিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করে।

মাঞ্চুরা যখন চীনে প্রবেশ করে, তখন তাহারা সভ্যতার প্রথম স্তরে অবস্থিত ছিল। চীনে আসিয়া তাহারা চীনবাসীর প্রায় সমস্ত আচার-ব্যবহার ও প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রহণ করিয়াছিল, কেবল তাহাদের সহিত বিবাহসম্বন্ধাদি নিষিদ্ধ ছিল। চীনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া মাঞ্চুরা খোজাদের প্রভাব কমাইয়া দেয়, যতটা সম্ভব চীন-আইনে তাহাদের শাসন করিতে থাকে। তাহারা একটি বৃহৎ পরিষদ (Grand Council) গঠন করে; তন্মধ্যে মাঞ্চু ও চীনা সভ্য গ্রহণ করা হয়। সমস্ত বোর্ডগুলি একজন সভাপতির অধীনে পুনর্গঠিত হয়; যাহাতে চীনা ও মাঞ্চু সমানভাবে স্থান পায়, সেইজন্য এইসব বোর্ডে দুই জন করিয়া সহকারী সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। এতদ্ব্যতীত মাঞ্চুরা মাণ্ডারীন পদ্ধতি যে ভাবে সমর্থন করে, এমনভাবে আর কোন বৈদেশিক রাজবংশ করে নাই। (২)

মাঞ্চুদের রাজত্ব চীনের উত্তরে শীঘ্র সুদৃঢ় হয়। কারণ বিজেতারা গিল্ড ও ভদ্রলোকদের হাত করে এবং তাহাদের পুরাতন ও নূতন কর্ম্মচারীদের মধ্যস্থ নিযুক্ত করিয়াই ইহা সম্ভব হয়। কিন্তু সমস্ত চীন মাঞ্চুদের করায়ত্ত হওয়ার পর, দাস-শ্রেণী খুব বাড়িয়া যায়। গোলামী পূর্ব্বেও ছিল; কিন্তু মাঞ্চু আক্রমণের বিশৃঙ্খলতা ও বিজিত লোকদের দুঃখময় অবস্থার জন্য গোলামী অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। একদল চীনা স্বাধীনভাবে জীবিত থাকা বিষয়ে নিরুপায় হইয়া বিজেতাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। একদল যুদ্ধের কয়েদী ছিল; ইহাদিগকে যাহারা কয়েদ করিয়াছিল, ইহারা তাহাদের সম্পত্তি হয়। একদল তাহাদের পিতামাতা লালন-পালন করিতে না পারায়, তাহাদের দাসরূপে বিক্রীত হয়। (৩)

ইহা ছাড়া, যে সব জমি "মালিক-বিহীন" ছিল, সেইগুলি কাড়িয়া মাঞ্চুদের বাস্তুভূমিতে পরিণত করা হয়। এই অজুহাতে ভাল ভাল জমি চীনা মালিকদের হাত হইতে কাড়িয়া নিয়া মাঞ্চুদের প্রদান করা হয়। মাঞ্চু সৈন্যদের যুদ্ধ বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকিবার জন্য পেন্সন (ভাতা) প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু এতদ্দ্বারা একটি বৃহৎ অলস-শ্রেণী সৃষ্ট হয়, যাহাদের প্রভাব বিজেতা ও বিজিত উভয়ের উপর পড়ে। (৪)

সম্রাট্ কাং-সির সময়ে মাথা-গুণতি কর (Capitation Tax)

---

১। Gowen and Hall—p. 184.

২-৩-৪। Gowen and Hall—p. 186, 198, 198.

বন্ধ হয়; এবং যে সব জমি কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

আমরা দেখিতে পাই যে, মাঞ্চুশাসন চীনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বর্ব্বর জাতির ন্যায় তাহারা (মাঞ্চুরা) বিজিত চীনের উচ্চতর সভ্যতা গ্রহণ করে। কিন্তু নিজেদের শাসকশ্রেণীরূপে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে বিজিতদের হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার জন্য তাহাদের সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করে নাই। এতদ্দ্বারা মাঞ্চুরা একটি পৃথক্ অভিজাত জাতিতে পরিণত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বার্থের খাতিরে তাহারা বিজিত জাতির উচ্চ শ্রেণীর লোকদের সহিত অনেকাংশে সাম্য ভাব অবলম্বন করে। ইহাদিগকে নিজেদের স্বার্থের সমভাগী করে। ইহার ফলে, বিজিত জাতির মধ্যে একটি শ্রেণী সৃষ্ট হয়, যাহাদের স্বার্থ এবং শাসকদের স্বার্থ এক। বিজেতারা নিজেদের স্বার্থোদ্দেশ্যে বিজিতদের মধ্য হইতে একটা খয়েরখাঁর দল সৃষ্টি করে। এই প্রকারে উভয় জাতির উচ্চশ্রেণীদের স্বার্থ একীভূত হয়। কিন্তু বিজিত জাতির নিম্নশ্রেণীদের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিল, বরং দেশে দাসশ্রেণীর দল বাড়িয়া যাওয়ার ফলে পতিতের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

সম্রাট্ ইউঙ্গ চেঙ্গের সময়ে (১৭২২-১৭৩৬ খৃঃ) চীনা গুপ্ত সমিতিগুলি বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে। চীনবাসীদের গুপ্তভাবে দল সংগঠন করিবার শক্তি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বোধ হয় কেহই এইগুলি সম্বন্ধে তলাইয়া আসল ইতিহাস বাহির করিতে সমর্থ হন নাই (১)। হয়ত প্রথমে এই গুপ্ত সমিতিগুলি সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ব্যাপার নিয়া আরম্ভ হইয়া, পরে শক্তিশালী রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত সংঘে পরিণত হয়। এই সম্রাটের সময়ে এই সংঘগুলি মাঞ্চু রাজবংশের বিরুদ্ধবাদী দলরূপে বিশেষ প্রকাশ পায়। মাঞ্চুবিদ্বেষ এই সময়ে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিতে অসমর্থ হয়; কিন্তু উহা শাসকদের অন্তরালে থাকিয়া ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে থাকে এবং মাঞ্চু-শাসনকে নানা উপায়ে বাধা দিতে সমর্থ হয়। এই গুপ্ত সমিতিগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত হইতেছে "শ্বেত পদ্ম", "ত্রিমূর্ত্তি", "বড় ভাইয়ের দল" এবং "স্বর্গ ও পৃথিবী সমিতি"। এইগুলির মধ্যে "শ্বেত পদ্ম" সংঘ চতুর্থ শতাব্দীতে স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু ইহাও অনুমান হয় যে, মঙ্গোল বংশের রাজত্বের প্রারম্ভকালে ইহা স্থাপিত হয়। মিঙ্গ বংশের স্থাপয়িতা ইহার সভ্য ছিল। এই মঙ্গোলদের সময়েই বোধ হয় সাও-লিন মঠের মুষ্টি-যুদ্ধ খেলোয়াড় সন্ন্যাসীদের দ্বারা "ত্রিমূর্ত্তি" সংঘ স্থাপিত হয়। "বড় ভাইয়ের দলকে" (কো-লাও-হুই) চীনের কুক্লুক্স দল বলা যায়। এই দল মাঞ্চুদের সময়ে উদয় হয়। বোধ হয়, বিংশ শতাব্দীর **'বক্সার আন্দোলন'** ইহারই একটি শাখা।

এই প্রকারে ইউঙ্গ চেঙ্গের রাজত্বের বিরুদ্ধে বিপক্ষতা চীনের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত হয়। গোবি মরুভূমির (Gōbi Desert) অন্তর্গত টিসুঙ্গখাই নামক স্থানে লো-পু নামক নেতার অধীনে এক বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। দুই লক্ষ লোক এই আন্দোলনে যোগদান করে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। কিন্তু এই বিদ্রোহাগ্নি শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হয়। ইহার পর সম্রাট্ হুকুম দেন যে, কোন মঠে তিনশত সন্ন্যাসীর বেশী থাকিতে পারিবে না এবং সন্ন্যাসীরা কোন প্রকার অস্ত্র রাখিতে পারিবে না।

ইহার চেয়েও বেশী প্রবল বিদ্রোহ হয় উনান, কোয়াই চউ ও সুচুয়ান প্রদেশসমূহে ১৭২৬ খৃঃ আদিম অধিবাসীদের মধ্যে। ইহারা করভারে প্রপীড়িত হইয়া বিদ্রোহ করে। ইহার ফলে সম্রাটের সাক্ষাৎভাবে শাসনভার আরও পূর্ণভাবে তাহাদের উপর স্থাপিত হয়। যদিচ চীনা সৈন্যদল ও সেনাপতিদের অতি কৌশল ও সাহসের সহিত এই বিদ্রোহ নির্ব্বাপিত করিতে হইয়াছিল; কিন্তু সেইজন্য যে সব মানবজীবন ও অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহা বৃথা যায়; কারণ ১৭৩৫ খৃঃ এই স্থলে বিদ্রোহাগ্নি আবার প্রজ্জ্বলিত হয়, এবং তাহা পরবর্ত্তী রাজত্বকালে দমন হয়।

এইসব সত্ত্বেও সম্রাট্ ইউঙ্গচেঙ্গ রাষ্ট্রে অনেক সংস্কার সাধন করে। প্রাচীনকাল হইতে যে সব সামাজিক বৈষম্য চলিয়া আসিতেছিল, এই সম্রাট্ তাহার অনেক নিরাকরণ করেন এবং দাসত্বপ্রথার অনেক খারাপ অংশ রদ করেন। ইনি একটি আইন প্রণয়ন করেন যে, সম্রাট্ নিজে কেবল একটি প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা সহি করিতে পারিবে। এইসব ব্যতীত, তিনি কৃষিকর্ম্মের উন্নতির জন্য আর একটি আইন প্রণয়ন করিলেন যে, ভবিষ্যতে ভূমির কর প্রজার নিকট হইতে আদায় না করিয়া ভূস্বামীর নিকট হইতে আদায় করা হইবে। ১৭৩২ খৃঃ একটি হুকুম প্রদান করেন যে, ভবিষ্যতে সহরের গভর্ণরকে (শাসনকর্ত্তা) যে কৃষক সর্ব্বাপেক্ষা ভালরূপে জমির চাষ করিয়াছে, নিজের গোষ্ঠীর একতা রক্ষা করিতে পারিয়াছে এবং মিতব্যয়ী ও মাদক-দ্রব্যাদি না খাইয়া সংযমী জীবন যাপন করিতে পারিয়াছে, বৎসরান্তে তাহার নাম সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। এই আদর্শ কৃষকদের অষ্টম শ্রেণীর ম্যাণ্ডারীন পদে উন্নীত করার ব্যবস্থা হয়; ইহারা ম্যাণ্ডারীনের পোষাকপরিবার, গভর্ণরের সম্মুখে বসিবার ও তাহার সঙ্গে চা-পান করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি চরম সম্মানপ্রদর্শনের নিদর্শনস্বরূপ পূর্ব্বপুরুষদের গৃহে (Hall of Ancestors) তাহাদের নাম লিখিত হয়।

চীনের সামাজিক সংঘর্ষের ইতিহাস এখনও বৈদেশিকদের দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে যে-সব সংবাদ আমরা পাই, তদ্দ্বারা এইরূপ অনুমিত হয় যে, চীনের সমাজের উপরের শ্রেণীর লোকেরা মাঞ্চু শাসকদের সহিত নিজেদের স্বার্থ মিশাইয়া

---

১। Stanton, William—"The Triod Society or Heaven and Earth Association" এবং A. Maybon: "Mercure de France"—June, 1912 প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দিয়াছিল; শোষিত ও অসন্তুষ্ট গণসমূহ এই উপরের স্তরের লোকদের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বহুবার সশস্ত্র বিদ্রোহ করিয়াছিল। উপরোক্ত বিদ্রোহসমূহ গণশ্রেণীসমূহ দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল; তাহা না হইলে গোবি মরুভূমিতে প্রায় দুই লক্ষ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও দক্ষিণের পার্ব্বত্য দরিদ্র আদিম জাতীয় কৃষকদের অস্ত্রধারণ করিবার সংবাদ ইতিহাসে পাওয়া যাইত না। ইহা যে মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর চীনাদের দ্বারা সংঘটিত হয় নাই, তাহার আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ—চীনের জাতীয় সেনাপতিরা এবং তাহাদের সৈন্যেরা এই বিদ্রোহ ভীষণ রক্তপাতের দ্বারা দমন করে। শ্রেণীস্বার্থের বিভিন্নতার জন্য চীনের সেনাপতিরা ও তাহাদের কর্ম্মচারীরা স্বজাতীয় গণশ্রেণীর বিদ্রোহীদের নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া বিজাতীয় শাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়াছে (১)। এই বিদ্রোহ যে গণশ্রেণীর বিদ্রোহ তাহার তৃতীয় প্রমাণ সম্রাট্ ইউঙ্গচেঙ্গ বাধ্য হইয়া অনেক সংস্কার সাধন করেন। সামাজিক বৈষম্য, কৃষকদের প্রতি সুনজর ইত্যাদি গণশ্রেণীর বিদ্রোহের প্রমাণ।

যাহা হউক, চীনের অত্যাচারিত ও শোষিত গণসমূহের মুক্তির প্রচেষ্টা রক্তের স্রোতে ভাসিয়া যায়। বিজাতীয় ও স্বজাতীয় উপরের স্তরের লোকেরা একত্র হইয়া তাহাদের শোষণ করিতে থাকে। কিন্তু পরবর্ত্তী সম্রাট্ চিয়েনলুঙ্গের (১৭৩৬-১৭৯৬ খৃঃ) রাজত্বের শেষকালে গুপ্তসমিতিগুলি আবার মাথা তুলিয়া উঠে, এবং ১৭৯৩ খৃঃ সম্রাট্ তাহাদের দমনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এতদ্দ্বারা বিদ্রোহীদের কর্ম্মতৎপরতা দক্ষিণে আরও বাড়িয়া যায়।

পশ্চিম নদীর সমস্ত উপত্যকাভূমি বহু বৎসর ধরিয়া রাজনৈতিক ও ধর্ম্মের অশান্তির কেন্দ্র হইয়া উঠিল। এই স্থলে, 'শ্বেতপদ্ম', 'ত্রিমূর্ত্তি', এবং 'স্বর্গীয়যুক্তি' সমিতিগুলি গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষতাচরণ করিতেছিল। ১৮০১ খৃঃ সম্রাট্ হুকুম দেন যে, যে সব সমিতির লোক লুঠ-তরাজ করিবে তাহারা ধৃত হইলেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। ১৮১০ খৃঃ ফুকিয়েন প্রদেশের লোকদের এই মর্ম্মে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় যে, যদি তাহারা ত্রিমূর্ত্তি আন্দোলনে সাহায্যতা করে, তাহা হইলে তাহাদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইবে। ইহাতে গভর্ণমেণ্টের দশ কোটি টেল মুদ্রা ব্যয় হয়; একটা প্রদেশেই বিশ হইতে ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করা হয়। এই সময়ে দশ হাজার কয়েদী জেলে ছিল, এবং গভর্ণমেণ্ট এতটা শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পাঁচজনের অধিক লোকের মিলনকে রাজদ্রোহ বলিয়া ঘোষিত হইল (২)।

১৮১৩ খৃঃ ষড়যন্ত্র আরও ভয়ানক এবং বিপজ্জনক হইয়া উঠে। উত্তরের হোনান ও চিলি প্রদেশে 'স্বর্গীয় যুক্তি' ও 'শ্বেতপদ্ম' সমিতিদ্বয় পরিচালিত বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ইহারা অনেক সহর দখল করে, এমন কি দিবাভাগে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া সম্রাট্‌কে গলা টিপিয়া ধরে। রাজকুমার মিয়েনলিঙ্গ পশ্চাৎ হইতে আততায়ীদের হত্যা করিয়া সম্রাটের প্রাণ রক্ষা করেন।

অতঃপর, চীনে ইউরোপীয়দের ক্রমে ক্রমে পাকা আড্ডা স্থাপিত হয়, ইংলণ্ডের সহিত "আফিং-যুদ্ধ" (Opium War); হয়, বড় বড় ইউরোপীয় জাতি ও আমেরিকার সংযুক্তরাষ্ট্রের সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়। এতদ্দ্বারা বৈদেশিকের চীনের দেশীয় আইন দ্বারা চীনে আর বিচার হইতে পারিবে না; খৃষ্টীয় মিশনারীদের চীনে অবাধে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ইউরোপীয় রাজকর্ম্মচারীরা চীনা গভর্ণমেণ্টের সহিত সমানভাবে রাজকীয় কার্য্যের আদান প্রদানের ক্ষমতা পায়।

এই সব আন্তর্জ্জাতিক ঘটনার পর সম্রাট্ হিসিয়েন ফেঙ্গের (১৮৫০—১৮৬৪ খৃঃ) রাজত্বকালে টাইপিং (T'aiping) বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। একজন চীনা ঐতিহাসিকের ভাষায় এই বিদ্রোহ "পনের বৎসরব্যাপী ছিল, ষোলটি প্রদেশকে ছারখার করে, ছয় শত সহরকে নষ্ট করে"। এই বিদ্রোহে অন্ততঃ দুই কোটি নর-নারীর জীবন নষ্ট হয়। চীনে তাৎকালীন খৃষ্টীয় বিশপ জর্জ্জ স্মিথ তাঁহার একটি পুস্তিকায় লিখিয়াছেন, "চীন এতদিন স্থাণুবৎ ছিল। এখন সাধারণ পরিবর্ত্তনের আইন মানিবার তাহার পালা আসিয়াছে। রাজবংশ ও সিংহাসন গুঁড়া হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে (৩)। বস্তুতঃ টাইপিং বিদ্রোহের সময়ে মাঞ্চুবংশ সৌভাগ্যবশতঃ বাঁচিয়া গিয়াছিল, যদিচ ইহা মাঞ্চুরাজবংশের বিপক্ষে প্রথমে সৃষ্ট হয় নাই। যে সব গুপ্তসমিতি সেই সময়ে "চীঙ্গদের (মাঞ্চু) ধ্বংস কর, মিঙ্গদের পুনঃ স্থাপিত কর" বলিয়া রব তুলিতেছিল, তাহাদের সহিত টাইপিং আন্দোলন কখনও সহযোগিতা করে নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে যে মাঞ্চু-বিদ্বেষ ছিল, তাহা এই বিদ্রোহের ইন্ধন যোগাইতে থাকে। অবশ্য এই সঙ্গে আরও অনেক ঘটনা সংযোজিত হয়। সমস্ত সাম্রাজ্যপদ্ধতি যে টলটলায়মান ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে, তাহা সেই সময়ের ইংলণ্ডের সহিত "আফিং-যুদ্ধের" দ্বারা প্রমাণিত হয়। হংকং সহর বৈদেশিকেরা অধিকার করায়, পিকিং-এর কর্ত্তাদের উপর জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়। ১৮৩৪ খৃঃ হইতে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ এবং ১৮৩৪ খৃঃ হুনানে ভীষণ

---

১। ভারতে মোগল শাসকদের হিন্দু কর্ম্মচারী ও সেনাপতিদের role এই প্রকারেরই ছিল।

২। দক্ষিণের কৃষকদের ও পার্ব্বত্য লোকদের ভূম্যধিকারী এবং শোষকদের বিপক্ষে বিদ্রোহের সংবাদ আমরা মাঞ্চুশাসন হইতে আজ পর্য্যন্ত শুনিতে পাই। এইস্থানের কৃষক ও পার্ব্বত্য অঞ্চলের লোকেরা আজ সাম্যবাদী কম্যুনিজমের কেন্দ্র হইয়া ধনতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী চীনশাসনের বিপক্ষে বিপক্ষতাচরণ করিতেছে।

৩। George Smith—"China, Her Future and Her Past". 1853.

ভূমিকম্প, সুচুয়ানে ১৮৩৯ হইতে ১৮৪১ খৃঃ ভীষণ দুর্ভিক্ষ—এই সমস্তই বিদ্রোহ সৃষ্টি করিতে কার্য্যকরী হয় (১)।

হাকা জাতীয়, কুয়াংটুং স্থানের অধিবাসী হং হিসইয়ু-চু'য়ান নামে একজন সাহিত্যিক এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন। ইনি চীনকে একটি নূতন ধর্ম্ম ও নূতন রাজবংশ প্রায় দিয়াছিলেন। এই প্রতিভাসম্পন্ন লোক অন্ততঃ তিন বার পরীক্ষা দিবার চেষ্টা করেন, বিভিন্ন দর্শন শাস্ত্র ও ধর্ম্মগ্রন্থ এবং খৃষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধে অধ্যয়ন করেন। একটা খুব ব্যারাম হওয়া পর্য্যন্ত তিনি নামে মাত্র বৌদ্ধ ছিল। এই ব্যারামের সময়ে এক সম্মোহন (trance) অবস্থায় তিনি দেখিতে পান যে বৃদ্ধ লোকের আকৃতিতে ঈশ্বর তাহার কাছে আসিয়া তাহার হৃদয় বাহির করেন এবং উহা পরিষ্কার করিয়া তাহা আবার যথাস্থানে রাখিয়া দেন; তারপর তাঁহাকে একখানি তরবারি দিয়া পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আদেশ দেন। আরোগ্যলাভের পর, চীন খৃষ্টীয় প্রচারক লিয়াং আ-ফা লিখিত পুস্তিকা—"Good words to export the Age" (যুগকে পরামর্শ দিবার জন্য ভাল কথা) তাহার হাতে পড়ে। ইহাতে তিনি তাঁহার অলৌকিক দর্শনের ভগবানকে খৃষ্টীয় ভগবান বলিয়া চিনিতে পারেন। তৎপর ক্যান্টনের ব্যাপ্টিষ্ট ধর্ম্মযাজক ইসাগের রবার্টের নিকট ১৮৪৬ খৃঃ তিনি খৃষ্ট ধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করেন; কিন্তু হুঙের খৃষ্টীয় ধর্ম্মভাব ও নৈতিক বিষয়ে বড়ই অমার্জ্জিত ও অসম্পূর্ণ ছিল। যাহা হউক, তিনি পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়া নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন এবং তাঁহার অনেক উৎসাহী ও খাঁটী শিষ্য জুটে। তাহাদের নিয়া ইনি "সাংটি হুয়ি" (ঈশ্বরের সমাজ বা সভা) স্থাপন করেন এবং নিজেকে "যীশুখৃষ্টের কনিষ্ঠ ভ্রাতা" বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন।

১৮৫০ খৃঃ হুঙের কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে কোন রাজনীতি ছিল না। কিন্তু পরে "হুয়ি" (সমিতি বা সভা) নাম নিয়া গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাঁহার প্রথম সংঘর্ষ হয়; কারণ এই নাম ব্যবহারের দ্বারা এই আন্দোলন নিষিদ্ধ সমিতিগুলির মধ্যে পড়ে। তাৎপর, ইহারা প্রাচীন দেশীয় প্রথায় মাথায় বেণীর বদলে লম্বা চুল রাখিতে আরম্ভ করে। এতদ্বারা ইহাই বুঝায় যে, তাহারা মাঞ্চু শাসনের বিপক্ষে। কিন্তু নির্য্যাতনের সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তীব্রতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার পর হং নিজেকে টি'য়েন ওয়াং (স্বর্গীয় রাজা) এই নামে প্রচার করেন, এবং যে রাজবংশ স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহার নাম রাখেন টাইপিং জয় (মহাশান্তি) (২)।

এই প্রকারে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সহরের পর সহর টাইপিঙ্গেরা দখল করিতে থাকে; মাঞ্চুরাও ভয় পায় যে, তাহাদের শেষদিন আসিয়াছে। অবশেষে ১৮৫৩ খৃঃ টাইপিঙ্গেরা নানকিন সহর দখল করিয়া বিশ হাজার মাঞ্চুদের হত্যা করে। এইস্থলে হং তাঁহার দরবার স্থাপন করেন এবং ভোগ ও আলস্যে দিন কাটান।

এই বিদ্রোহের প্রথম অবস্থায় বৈদেশিকেরা বুঝিতে পারে নাই যে, তাহারা টাইপিংদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে। এই আন্দোলনের খৃষ্টীয় রঙ দেখিয়া অনেকে ইহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেছিলেন, এমন কি প্রশংসা পর্য্যন্ত করিতেছিলেন। বিশপ স্মিথ তাহাদের তাম্বুতে ধর্ম্মোপাসনা, ক্রমওয়েলের মতন প্রচার আর প্রতিমা ভাঙ্গিবার কথা উল্লেখ করেন। ইহারা বৈদেশিকদের সহিত সদ্ভাবে থাকিতে চাইত। এইসব ব্যাপারে খৃষ্টান পাদরীরা আশাজনক ভবিষ্যতের চিহ্ন দেখিতে পান। কিন্তু যাঁহারা টাইপিঙ্গদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন, তাঁহারা দেখিলেন যে, টাইপিঙ্গেরা বহু বিবাহ বন্ধ করে নাই। যদি বাইবেল পঠিত হইত, তাহার কেবল যুদ্ধবিষয়ক ও নিম্নভাবপূর্ণ অংশই পাঠ করা হইত।

অবশেষে, নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর, ১৮৬৫ খৃঃ নানকিন আবার মাঞ্চুদের হাতে আসে। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে টাইপিং-নেতা বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করেন। অন্যদিকে বিজয়ী মাঞ্চুরা "স্বর্গীয় রাজা" হুঙের কবর খুঁড়িয়া তাঁহার মৃত দেহের উপর অপমানজনক ব্যবহার করে। এইরূপে চৌদ্দ বৎসরের রক্তপাতের পর, এই আন্দোলন বিধ্বস্ত হয়; কিন্তু এই আন্দোলন ভবিষ্যতে মাঞ্চু রাজত্বের পতনের পক্ষে খুব সহায়ক হইয়াছিল, কারণ ইহাই ভালভাবে বিপদের সময়ে মাঞ্চুশাসনের দুর্ব্বলতা ধরাইয়া দেয়।

এই টাইপিঙ্গ আন্দোলন একটা জাতীয় ভাবে প্রণোদিত আন্দোলন হইলেও, ইহাকে মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে চীন জাতির উত্থান বলা যায় না। মাঞ্চুদের রাজত্ব বজায় রাখিবার জন্য চীন কর্ম্মচারীরাই সদলবলে এই আন্দোলনকে দমন করে। যদিচ টাইপিঙ্গদের শেষ উদ্দেশ্য হইয়াছিল মাঞ্চু-শাসন ধ্বংস করা এবং মিঙ্গদের আমলের অনেক প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, তত্রাচ এই আন্দোলন দেশের অভিজাত ও বুর্জোয়াদের সাহায্য ও সহানুভূতি পায় নাই। ব্যবসায়ীদের গিল্ডগুলি ইহাদের বিপক্ষে যাওয়ার ফলে ইহাদের পতনের সূত্রপাত হয়। মধ্য ইয়াংসি প্রদেশে ব্যবসায়ী গিল্ডগুলি স্বেচ্ছায় "লিকিন" নামে একটা মাল চালানের কর (Transport Tax) দেয়। এই আয় হইতে সম্রাটের সেনাপতি টসেঙ্গকুও-ফ্যাঙ্গ ও তথাকার আন্দোলন নষ্ট করিতে পারে। সাংহাইতে ব্যবসায়ীরা খরচ দিয়া ফ্রেডেরিক ওয়ার্ড নামে একজন আমেরিকানের অধীনে এক সৈন্যদল গঠন ও পোষণ করে। এই সৈন্যদলকে "চিরবিজয়ী সৈন্যদল" বলা হইত। ১৮৬০ খৃঃ যখন এই সেনাদল রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তখন হইতে মাঞ্চুদের পক্ষে যুদ্ধের সুরাহা হয়। পরে, লিহাংচাং যখন বিদ্রোহীদের বিপক্ষে সৈন্য-পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হন, তখন তিনি চার্লস গর্ডন* নামক

১। Gowen and Hall—p p 259—260

২। টাইপিং বিদ্রোহের প্রথম অবস্থার বর্ণনা Callery and Yvan—"L'Insurrection in Chine" Paris 1855 দ্রষ্টব্য।

* ইনি পরে Gordon of Khartoum নামে বিখ্যাত হন।

একজন ইংরেজকে আমেরিকান বার্গেভিনের বদলে নিযুক্ত করেন। ১৮৬৪ খৃঃ টাইপিঙ্গ বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমিত হয় এবং ১৮৬৫ খৃঃ নানকিন অধিকৃত হইলে মাঞ্চু-রাজত্ব টাইপিঙ্গ আন্দোলন বিমুক্ত হয়।

ইতিহাসের এই তথ্য হইতে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, টাইপিঙ্গ আন্দোলন ধর্ম্ম ও জাতীয়ভাবের সংমিশ্রণে এক প্রকারের গণ-আন্দোলন। যেমন প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে ধর্ম্মের সহিত রাজনীতির সংমিশ্রণে অত্যাচারিত ও শোষিত গণশ্রেণীর আন্দোলনের সৃষ্টি হইত, চীনের মধ্যযুগের রাষ্ট্র ও সমাজে এই টাইপিঙ্গ আন্দোলনও সেই প্রকারের একটি আন্দোলন। এই আন্দোলনের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীসমূহের লোক ছিল না। তাহারা বরং ইহার বিরুদ্ধাচরণই করিয়াছিল। টাইপিঙ্গ আন্দোলন খৃষ্টান ধর্ম্ম হইতে কিছু ভাব ও চং গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা গণসমূহকে উত্তেজিত করিয়া এক নূতন ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র-সংস্থাপনার্থ চেষ্টা করিয়াছিল। ইউরোপীয়েরা প্রথমে ধারণা করিয়াছিল যে, এই আন্দোলন খাঁটি পাশ্চাত্য খৃষ্টান-ধর্ম্মানুযায়ী হইলে, চীন খৃষ্টান রাষ্ট্র হইবে। কিন্তু ফলতঃ তাহা হয় নাই। সেইজন্য ইউরোপীয় বনিয়াদী স্বার্থের দল ইহাকে বিনাশ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। এইরূপে স্বদেশের স্বজাতীয় ও বৈদেশিক বনিয়াদী শ্রেণীর স্বার্থের যূপকাষ্ঠে চীনের গণশ্রেণীর টাইপিঙ্গ আন্দোলনকে রক্তস্রোতে বিনষ্ট করা হয়।

(ক্রমশঃ)

---

# সাহিত্যে সমালোচনার স্থান

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম. এ., বি. এল.

বঙ্গসাহিত্যে সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা বুঝিবার সময় আসিয়াছে। সমালোচনা সাহিত্যেরই একটী অঙ্গ। অঙ্গ বলিলে বোধ হয় ঠিক হয় না—একটী বিশিষ্ট ও অপরিহার্য্য অঙ্গ। ইহাকে বাদ দিয়া সাহিত্যের উন্নতি অসম্ভব। বস্তুতঃ সাহিত্যের উন্নতির ইহা অন্যতম কারণ। কিরূপে সমালোচনা সাহিত্যের উন্নতির কারণ হইতে পারে তাহাই এই প্রবন্ধের বিষয়।

সাহিত্য কি? হিতের সহিত যাহা বর্ত্তমান তাহা 'সহিত'; সহিতের ভাব 'সাহিত্য'। 'সাহিত্য' শব্দের ইহাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। পাশ্চাত্য লেখকদিগের একটী দল আছে যাঁহারা সাহিত্যের এই অর্থকে অনুদার ও সঙ্কীর্ণ বলিয়া উপেক্ষা করিবেন। যাহা হউক, হিতের সহিত বর্ত্তমান রচনামাত্রই সাহিত্য নয়। কারণ, তাহা হইলে কথামালাকেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলিতে হয়। সেইজন্য সাহিত্যের ব্যাখ্যা করিতে হইলে, আরও একটু বলিতে হইবে। হিতের সহিত বর্ত্তমান যে রচনা, তাহা সত্য ও সুন্দর। সত্য, সুন্দর ও শিবের যে রচনায় আহ্বান ও পূজা হয়, তাহাই 'সাহিত্য'। কিন্তু পূজা ভিন্ন ভিন্ন পূজারী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করেন, যদিও মূলতঃ সবই এক। সেইজন্য সাহিত্যের আর একটী বৈশিষ্ট্য হইতেছে—সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। এই ব্যক্তিত্ব ব্যতীত সাহিত্য হইতে পারে না। সেই কারণেই কথামালার শৃগাল ও দ্রাক্ষাফলের গল্প সাহিত্য নয়। কারণ, হিতের সহিত বর্ত্তমান হইলেও, ইহাদের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিত্বের কোনও আভাষ নাই। গ্যেটেও ব্যক্তিত্বকেই কলা ও কবিতার সর্ব্বস্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সমালোচনার স্থান সাহিত্যে কোথায় এবং কেন—এই দুই প্রশ্নের সমাধানকল্পে সাহিত্যের লক্ষণের কথা বলা হইল। সত্য, শিব ও সুন্দরের স্বরূপ নির্ণয় করিতে ও সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বকে নির্দ্দেশ করিতে সমালোচকের প্রয়োজন। সমালোচক সাহিত্যস্রষ্টা অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহেন। সমালোচনার মধ্যেও যথেষ্ট মৌলিকত্ব থাকিতে পারে। কারণ সমালোচক যদি উপযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি নিজে সত্য, শিব ও সুন্দরকে উপলব্ধি করিবেন। যথার্থ সাহিত্যের মধ্যে যেমন সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রকাশ দেখা যায়, যথার্থ সমালোচনার মধ্যেও সেই সত্য, শিব ও সুন্দরের রূপ আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়। সমালোচক না থাকিলে, সাহিত্য-সৃষ্টিই ব্যর্থ। কারণ, রসানুভূতির অভাব সাধারণের মধ্যে যথেষ্ট। সে অনুভূতি সমালোচকের মধ্যেই সম্ভব।

তিনি সেই অনুভূতি সাহায্যে সকলকে সাহিত্যের মর্ম্ম বুঝাইতে সক্ষম হন। সমালোচক না থাকিলে, কোন্ সাহিত্য সৎ বা অসৎ, তাহা নির্ণয় কে করিবে? কারণ, সাধারণ চক্ষে অনেক সময়েই অসত্যকেই সত্য, অহিতকে হিত ও অসুন্দরকে সুন্দর প্রতিভাত হয়। আপাতঃ রমণীয় যাহা, তাহাই সাধারণ নরনারীর নিকট প্রীতিপ্রদ। সাধারণ বস্তুজগতের ন্যায় সাহিত্যজগতেও এই একই নিয়ম। তজ্জন্য সাহিত্যে পথপ্রদর্শকের আবশ্যক। সমালোচকই সাহিত্যে পথপ্রদর্শক। তিনিই সাধারণ পাঠকবর্গকে সুন্দরের নিকট লইয়া যান। তিনিই সাধারণকে সাহিত্যক্ষেত্রে মরীচিকার হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। সেইজন্য দেখা যায়, যে সাহিত্যে যত অধিক ভাল সমালোচক আছেন, সেই সাহিত্যই তত উন্নতিশীল ও মার্জ্জিত।

ইংরাজি-সাহিত্যের বিখ্যাত সমালোচক ও কবি, ম্যাথ্ আর্নল্ড তাঁহার একটী প্রবন্ধে এই সমালোচনার অভাবকেই তাঁহার সমসাময়িক ইংরাজি-সাহিত্যের গতিহীনতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতে সমালোচনার চর্চ্চা অধিক ছিল বলিয়াই আর্নল্ডের মতে ঐ দুই দেশের তদানীন্তন সাহিত্য সজীবতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। কারণ, সমালোচনা অনেক সময়েই সাহিত্যের উপাদান সৃষ্টি করে। ভাবধারা সাহিত্যের উপাদান। সাহিত্য এই ভাবধারাকে বিশ্লেষণ বা আবিষ্কার করে না—ইহাদিগকে সংযোজন ও ব্যাখ্যা করে। অতএব সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে এই ভাবধারার একান্ত প্রয়োজন। সত্য, শিব ও সুন্দরের নব নব বিকাশেই নূতন নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি। সেই বিকাশের ভাব সকল সময়ে সকল দেশে বর্ত্তমান থাকে না। কোনও বিশিষ্ট আন্দোলন, যাহা দেশের মনকে রীতিমত আলোড়িত করিতে পারে, তাহাই এই ভাবধারাকে সৃষ্টি করে। য়ুরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে এইরূপ এক আন্দোলন হইয়াছিল। ইহারই ফলে তথায় সাহিত্যের এক নবজীবন বা নবযুগের সূচনা হয়। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সমসাময়িক বিখ্যাত সাহিত্য ইহারই ফল। এই সাহিত্যেই সেক্সপীয়রের আবির্ভাব হয়। ভারতবর্ষেও বহু বার এইরূপ আন্দোলন আসিয়াছে। হিন্দুশাসনকালে অশোকের রাজত্বে ও চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়ে এইরূপ ভাবসৃজনকারী বহু ঘটনা ঘটে। ভারতবর্ষের তদানীন্তন সাহিত্যও সেইজন্যই অপূর্ব্ব ভাবপূর্ণ ও সজীব। মুসলমান রাজত্বেও শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপ আন্দোলন আনিয়াছেন, যাহার ফলে সাহিত্যে বহু নব ভাবের প্রকাশ ঘটে। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে দেশের মনোজগতে এইরূপ আর একটী ভাববিপ্লব আসে। এক দৃঢ় ও সজীব জাতির সহিত সাহচর্য্যে দেশের মধ্যে বহু নব নব ভাবের প্রকাশ হয়। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত এই সব ভাবধারাই সাহিত্যের উপাদান রূপে গৃহীত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভা ও সৃজনীশক্তি ছিল বলিয়াই ঐ সব পুরাতন ভাবধারাকে নূতনভাবে ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন। মধুসূদনের ইহাই ঘটিয়াছিল। বহু সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া মধুসূদন ভাবের অভাব বোধ করেন নাই। কিন্তু সকল সময়ে বঙ্কিম বা মধুসূদনের ন্যায় অসামান্য প্রতিভা আশা করা যায় না। সেই সময়ে ভাবের অভাব স্পষ্টতর রূপে বোধ হয়। বঙ্কিমের সমসাময়িক প্রতিভাশালী লেখকদের দেখিলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হয়। অবশ্য একথা সত্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন এমন এক পরিবেষ্টন সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহা অনেকাংশে ভাবের অভাব পূর্ণ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র ভিন্ন অন্যান্য লেখকদিগের সহিত পরিচয় হইলে, এই ভাবধারার অভাব স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে শক্তিশালী লেখকের অভাব নাই; কিন্তু অভাব হইতেছে ভাবধারার, যাহা সাহিত্যের প্রাণ। এই কারণেই বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে বহু লেখকের মধ্যে শক্তির প্রাচুর্য্য থাকিলেও, প্রাণবান্ সজীব সাহিত্যের সৃষ্টি খুব কমই হইতেছে। আজ অধিকাংশ বাংলা সাহিত্যিককেই উপাদান বা ভাবধারা যোগাইতেছে বিদেশী সাহিত্য। বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে যে বস্তুর সৃষ্টি হইতেছে তাহা সত্যকার সাহিত্য কিনা, তাহা বিচার্য্য। কারণ, অনুকরণ কখনও উপলব্ধি নয়। যে সাহিত্য চিরস্থায়ী, সে কখনও অনুকরণ-প্রসূত হইতে পারে না। একমাত্র উপলব্ধিই কেবল সে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারে।

কোনও বিশিষ্ট আন্দোলন যেমন এই ভাবধারা সৃষ্টি করিতে পারে, সেইরূপ সমালোচনাও এই ভাব সৃজন করিতে সক্ষম। সমালোচনা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাবগুলিকে সমাজের মধ্যে ছড়াইয়া দেয়। সমাজদেহে একটী স্পন্দন জাগিয়া উঠে এবং তাহা হইতেই সাহিত্যিকগণ উপাদান সংগ্রহ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন একদিন এই কাজ করিয়াছিল।

মনীষিরা যে ভাবগুলি জানেন বা চিন্তা করেন, পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেই ভাব সকলকে শিক্ষা দিবার ও বিস্তার করিবার নিরপেক্ষ চেষ্টাই সমালোচনা। ম্যাথু আর্নল্ড এই ভাবেই সমালোচনার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ সমালোচনার ইহাই অর্থ, যদিও অনেকে ইহাকে ব্যাপক বলিয়া বর্জ্জন করেন। কোনও রচনা হইতে নিরপেক্ষভাবে লেখকের ভাবগুলি বাহির করিবার চেষ্টা করিলেই রচনার দোষগুণ সবই বাহির হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিষয়ের অবতারণা করা যায়। সেই সব প্রাসঙ্গিক বিষয়ের মধ্য দিয়া সমালোচক তাঁহার মৌলিক চিন্তাধারা প্রচারের যথেষ্ট অবকাশ পান। সমালোচক যদি সত্যই দ্রষ্টা হন, তাহা হইলে সেইসব চিন্তাধারা সমাজে নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করে। দেশের মধ্যে এক নূতন আবর্ত্ত সৃষ্টি হয় এবং ইহারই মধ্যে লেখক তাঁহার উপাদান সংগ্রহ করেন। সেই জন্যই দেখা যায় যে, যথার্থ সমালোচক কেবল লেখার দোষগুণ বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন না, পরন্তু বহু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা দ্বারা নিজের চিন্তাধারার পরিচয় দেন। অতএব সমালোচক লেখক অপেক্ষা কোনও অংশে সাহিত্যের দরবারে হীন নহেন। পরন্তু তিনি সাহিত্যসৃষ্টির এক প্রধান নিদান ও প্রোৎসাহদাতা।

নিরপেক্ষ সমালোচনার আরও কয়েকটী গুণ দেখা যায়। ইহা অকপট ও সরলভাবে সমস্ত বিচার করে। এই দুইটী গুণবিশিষ্ট না হইলে সমালোচনা সাহিত্যের হিত না করিয়া অহিতই করিয়া থাকে। কপট সমালোচনার ন্যায় ক্ষতিকর সাহিত্য আর নাই। কিন্তু এইরূপ সমালোচনাই অধিক। বাংলা সাহিত্যে শুধু নয়, বিদেশী সাহিত্যেও এই কপট সমালোচনার আধিক্য কম নয়। কীট্‌সের ন্যায় কবিকেও এইরূপ সমালোচকের কবলে পড়িতে হইয়াছিল। কার্লাইলের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'সার্টার রেষার্টাস্' প্রথমে কেহই সুচক্ষে দেখেন নাই। ইমার্সনের ন্যায় দ্রষ্টা না থাকিলে বোধ হয় জগৎ এই অমূল্য গ্রন্থের রস হইতে চিরবঞ্চিত থাকিত। ইমার্সন লোকমত অগ্রাহ্য করিয়া এই গ্রন্থের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। ইহাই যথার্থ সমালোচকের কার্য্য। 'একজন ভাল বলিয়াছে, অতএব ভাল'—এই বৃত্তি লইয়া যাঁহারা সমালোচনা করেন, তাঁহারা সমালোচক নামের অযোগ্য। কারণ, সমালোচকের দায়িত্ব লেখকের অপেক্ষা তো কম নয়ই, বরং অধিক। সেই হিসাবে সমালোচক লেখকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সমালোচকই এক এক যুগের লেখার ধারা চালিত করেন। তিনিই দেখাইয়া দেন—লেখার ধারা কোন্ দিকে চালিত হইলে, তাহার ফল কিরূপ হইবে। ইংরাজি সাহিত্যে ডাক্তার জনসনের নাম এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে।

সত্য সমালোচকের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। সত্যের পরিচয় যে সমালোচনা দিতে না পারে, সে সমালোচনার স্থান সাহিত্যে নাই। সেইজন্যই সমালোচনার মধ্যে অনেক সময়ে আদর্শবাদের অবতারণা সম্ভব। বাস্তবের মধ্যে কি ভালমন্দ আছে, দেখাইলেই সমালোচনার কার্য্য শেষ হয় না—যথার্থ ভাল'র কি রূপ, তাহা দেখাইয়া দেওয়াও সমালোচনার কার্য্য। অনেক সমালোচক কেবল রচনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়া ক্ষান্ত হন। কিন্তু সেইখানেই সমালোচকের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। পরন্তু তাঁহারই রচনার পরিপূর্ণতা ও সম্পূর্ণতার নির্দ্দেশ করা উচিত। সেইজন্য সমালোচকই সাহিত্যে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের গ্রন্থি। তিনিই সাহিত্যের গতিনির্ণয় করিবার যথার্থ অধিকারী।

# চা

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

চা বলিতে চায়ের উপকার-অপকার বা দোষ গুণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না, কারণ আমি নিজে একজন চা-পিয়াসী। সে বিচারের ভার পাঠক জুরীর উপর চাপাইয়া চা-শিল্প বিশেষ করিয়া আসাম ও বঙ্গের চা-শিল্প সম্বন্ধে কিছু লিখিব। পাট এবং চা এই দুইটী ভারত-উৎপাদন দ্রব্য, পূর্ব ভারতের একচেটিয়া বলিলেও ভুল হইবে না। পাট ত ভারতবর্ষের অন্য কোথাও হয়ই না, বরঞ্চ চা পঞ্জাবের কাংরা ভ্যালি, মুসুরি, দেরাদুন, দক্ষিণ ভারতে কুর্গ, নীলগিরি, (Ootacamond), মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে কিছু কিছু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চায়ের প্রাচীন ইতিহাস বলিতে কিছুই নাই—ভারতে ইহার প্রসার মাত্র একশত বৎসর। তবে আমাদের দেশে ইহার আবিষ্কার সম্বন্ধে ভারী চমৎকার এক কিম্বদন্তী আছে। কথিত আছে, তাপস (মহাপুরুষ) বোধিধর্ম মোক্ষ লাভের জন্য সুদীর্ঘ নয় বৎসর কাল বিনিদ্র অবস্থায় তপস্যা করিতেছিলেন। কিন্তু সাধনার অষ্টম বৎসরে তাঁর নিদ্রালু নয়ন যখন জুড়াইবার জন্য কোন বাধাই মানিতেছিল না, সেই সময়ে তাপস বোধিধর্ম সহসা নিকটস্থ কোন এক তরুপুঞ্জ হইতে কয়েকটি পাতা ছিঁড়িয়া চর্বণ করিতে থাকেন। আশ্চর্যের বিষয়, ইহাতে তাঁহার নিদ্রাভাব দূর হয়—জড়তা পরিহরণে পুনরায় সাধনায় বসেন। এই পত্র চর্বণ করিয়াই নাকি তিনি তাঁহার তপস্যা পূর্ণ করিতে সমর্থ হন। এই কিম্বদন্তীর যুক্তিতে একটী দৃঢ় প্রমাণ আছে যে, বহুদিন ধরিয়া চীন, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি বৌদ্ধ দেশে চা-গাছের উৎপাদন এবং চা-পানের রেওয়াজ রহিয়াছে। চা-পাতার রসকে গরম জলে সিদ্ধ করিয়া উত্তাপক, উত্তেজক এবং জড়তাবর্জক হিসাবে ইহার ব্যবহার আপনা হইতেই হইয়া থাকিবে।

চা-ক্ষেত্রে লাগাইবার জন্য নার্সারী হইতে চায়ের চারা লওয়া হইতেছে

প্রকৃত পক্ষে চায়ের নেশা বিলাতী সিগারেটের ন্যায় আমাদের ইংরাজরাই ধরাইয়া দিয়াছে। চীনাদের সবুজ চা যে আমাদের দেশে তিব্বত ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত হইতে প্রবেশ করিয়াছে, এমন কোন প্রমাণ নাই। জাপানের চায়ের উৎসবের কোন ছোঁয়াচও লাগে নাই, নিঃসন্দেহে বলা যায়। অবশ্য কতদিন ধরিয়া জাপানীরা এই উৎসব করিতেছে তা তাহারাই জানে। নেশা ধরাইবার সঙ্গে অবশ্য এই শিল্পটী আমাদের দেশে প্রচলিত হইলেও তাহারই ফলে পৃথিবীর মধ্যে এ-দেশ চা উৎপাদন হিসাবে অগ্রণী হইয়াছে।

তিব্বত হইতে উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্তস্থিত

কয়েকটী আদিম জাতিদের বাসস্থানে চায়ের গাছ দৃষ্ট হইত এবং বহুদিন পূর্ব হইতে সিংপো, মিস্‌মি, আবর, নাগা প্রভৃতি আদিম জাতিদের মধ্যে চা পানের প্রচলন ছিল। মণিপুর রাজ্যে চা-শিল্পের অস্তিত্ব এবং চা-ব্যবহারের কথা বৃটীশ ভারতের শতবর্ষ মাত্র ইতিহাসের চেয়েও বহু পুরাতন।

কিন্তু বৃটেনে বা ইউরোপে চায়ের প্রচলন না ঘটিলে এবং ইংরাজ বণিকসম্প্রদায়ের কোন স্বার্থ না থাকিলে, বোধ হয় আসাম, দার্জিলিং বা সমগ্র ভারতে এই শিল্পের প্রসার ঘটিত না। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে ইউরোপে চা অজ্ঞাত ছিল। কফিরই প্রচলন ঐ সময়ে অধিক ছিল। কিন্তু পৃথিবী পরিক্রমণে—দেশ বিদেশে উপনিবেশ করিয়াই হউক, ব্যবসা-বাণিজ্য পাতিয়াই হউক, ডাচ বা ওলন্দাজরা চায়ের স্বাদ গ্রহণ করিয়া এতদূর তৃপ্ত হইয়াছিল যে, তাহারাই এই মৃদু মাদক পানীয়টীকে সারা ইউরোপে প্রবর্তন করে। কিছুকাল পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায় চীন হইতে চা ক্রয় করিয়া ইংলণ্ডে চালান দিয়া মস্ত ব্যবসা ফাঁদিয়া বসে। সে সময় চায়ের যা মূল্য এখন তাহা স্বপ্ন মাত্র। কফি একটু উগ্র এবং তিক্ত বলিয়া প্রাচ্যের এই 'অদ্ভুত' সুস্বাদু পানীয়ের প্রতি সকলেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া হইতেই চা ইংলণ্ডের সুধী-সমাজ ও ধনী পরিবারে আদর লাভ করিতে থাকে।

চা-পাতা তুলার দৃশ্য

কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই চীনের সঙ্গে এই সকল বিদেশী চা-ব্যবসায়ীর গণ্ডগোল বাধিল—তাহারা সেজন্য পূর্বের মত ইউরোপে চা আমদানী করিতে পারিল না। ওলন্দাজদেরও ইউরোপে চা চালান দেওয়া মুস্কিলে দাঁড়াইল। এই হইল বৃটীশ জমিদারী ভারতবর্ষে, লঙ্কাদ্বীপে এবং ডাচ্ জমিদারী যবদ্বীপে চা-শিল্পের প্রবেশ লাভের সূত্রপাত।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের আগ্রহে ভারতবর্ষে বা উত্তর বাংলা ও আসামে চা-গাছের চাষ সম্বন্ধে সরকার পক্ষ মনোযোগ দেন। ইহার পূর্বে আসামে সদিয়া, দিব্রুগড় অঞ্চলে ব্রুস নামে কোন ইংরাজ চায়ের চাষ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আসামে চা-গাছ পূর্ব হইতেই জন্মাইত, ইহা জানা ছিল না বলিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া হইতে চীন হইতে চায়ের বীজ আনিয়া বাংলার মাটীতে চা-গাছের চাষ সম্ভব কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা চলিয়াছিল। প্রথমে চীনের বীজ লইয়া কাজ আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু চীনের চা-গাছকে এদেশের আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত করিবার প্রয়াস বিফল হওয়ায় শেষ পর্যন্ত আসামের মূল গাছের বীজ লইয়া tea plantation ও চাষ (regular cultivation) আরম্ভ হয়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আসামের সরকারী চা বাগান হইতে প্রথম ইংলণ্ডে ভারতীয় চায়ের রপ্তানী করা হয়। আসামের লখিমপুর জেলায় বৃটীশ বণিকের একটী দল চা বাগানের সূত্রপাত করে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে—এইটেই আসাম টি কোম্পানী—বর্তমানে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এটী পূর্বে সরকারের সামান্য একটী গবেষণামূলক ক্ষুদ্র উদ্যান ছিল মাত্র। ক্রমে ক্রমে আসামের প্রায় সমস্ত জেলাতে চা-চাষের প্রসার বাড়িতে থাকে, ইহার পরে বহু ভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া

উঠিয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে সমগ্র আসামে ২৪ কোটী পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়:

| | | | |
|---|---|---|---|
| লখিমপুর— | ৭ কোটি | ৩৮ লক্ষ | পাউণ্ড |
| শিবসাগর— | ৫ ,, | ৩৯ | |
| শ্রীহট্ট— | ৪ ,, | ৪৩ ,, | |
| দরং— | ৩ | ৬৩ ,, | |
| কাছাড়— | ২ | ২৮ ,, | |
| নওগাঁ— | | ৫৭ ,, | |
| গোয়ালপাড়া— | | ২১ ,, | |
| কামরূপ— | | ১৮ ,, | |

কাছাড় শ্রীহট্ট এবং ব্রহ্মপুত্র ও সুর্মা উপত্যকায় চায়ের চাষ সুরু হয় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে। এই সময়েই প্রায় টেরাই, ডুয়ার্স এবং দার্জিলিঙে চাষ আরম্ভ হয়। দার্জিলিঙে গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছিল, চীন ও আসামী চা-গাছ মিশ্রণের ফলপ্রসূত যে শঙ্কর জাতীয় গাছের সৃষ্টি তাহা হিমালয়ের তিন হাজার হইতে ছয় হাজার ফুট উচ্চস্থিত শৃঙ্গবক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। পৃথিবীর মধ্যে ইহাই উত্তম চা। দার্জিলিঙ জেলায় ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে মোট ২ কোটী ২৩ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। জলপাইগুড়ি জেলায় হইয়াছিল ৮ কোটী ২৪ লক্ষ পাউণ্ড।

ভারতের মোট যত জমিতে চায়ের চাষ হয় তাহার শতকরা ৮৫ ভাগ আসাম ও বাংলায় অবস্থিত। ইহার পরেই দক্ষিণ ভারত—যেখান হইতে ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ৩৫,৪১৫,০২৩—তিন কোটী ৫৪ লক্ষ পাউণ্ড উৎপন্ন হয়। বেশীর ভাগ হয় নীলগিরি (মহীশূর উটকামণ্ড) এবং কইম্বাটোরে—১ কোটী ৫১ লক্ষ এবং ১ কোটী ৩৭ লক্ষ, মালাবারে গড়ে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড উৎপন্ন হয়।

উত্তর ভারতে কাংরা এবং আলমোড়া, গাড়োয়াল ও দেরাদুনে সর্বশুদ্ধ (৩৪৭, ২৮৫+৫১৯, ৫৮৫) গড়ে ৮৬ লক্ষ পাউণ্ড পাইয়া থাকি। বিহারে পূর্ণিয়া, রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলায় চায়ের চাষ হয়। হিমালয় পাদদেশে পূর্ণিয়াতেই বেশী, রাঁচি হাজারীবাগেও কিছু কিছু হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই ছোট নাগপুরের মালভূমিতে ঝিরঝিরে বৃষ্টি এবং চা গাছের উপযোগী আবহাওয়া কিছু কিছু বর্তমান। ওদিকে ত্রিপুরা এবং ত্রিবাঙ্কুর করদরাজ্য দুটীতে বহুল পরিমাণে চায়ের চাষ হয়।

চায়ের প্রস্তুত প্রণালী খুব সংক্ষেপে এইরূপ:

চা-গাছ ক্যামেলিয়া জাতীয়। ইহার উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের দেওয়া নাম ক্যামেলিয়া থিফেরা (Theifera)। উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তের ইন্দোচীন আদিম জাতিদের নিকট এই জাতীয় বৃক্ষ বহুদিনের পরিচিত। কলিকাতায় Camelia Theifera-র প্রথম আগমন ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে—শিবপুর কোম্পানী বাগানে ক্যান্টন হইতে কয়েকটী চারা আনাইয়া রবার্ট কিড্ পরীক্ষা করেন। এই চা বৃক্ষের পাতায় আমাদের পানীয় কালো চা (Black tea) প্রস্তুত হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ভারতবর্ষে কেন—চীন, জাপান ভিন্ন পৃথিবীর সর্বস্থানেই এক প্রকার কালো চা ব্যবহৃত হয়। সবুজ বা কাঁচা চা (কড়া) নামমাত্র এখানে প্রস্তুত হয়। আমি উহা পান করিয়া দেখিয়াছি, কফি হইতে স্বাদু না হউক, মাদকতায় কড়া।

কাঁচা চা-পাতির শ্রেণী-বিভাগ

চায়ের ভালমন্দ নির্ভর করে কতকগুলি জিনিষের উপর। প্রথমতঃ উত্তম চা-বীজ, উপযুক্ত উর্বরক্ষেত্র এবং আবহাওয়া। দ্বিতীয়তঃ কতখানি পর্যন্ত বাড়িতে দিলে ভাল পাতা পাওয়া যাইবে তাহার সঠিক নির্ণয়। তৃতীয়তঃ পাতা তোলা (fine plucking produces the best tea)। পাতা তোলা একটা আর্ট—খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন। সেজন্য এই কাজটা সাধারণতঃ মেয়ে কুলিদের দেওয়া হয়। ঠিক ফ্লাসিং-এর (flushing) অর্থাৎ নূতন কচি জোড়া পাতার মুখে কুঁড়ি ফুটিবার মুখে দুটী সরু আঙুলে সবশুদ্ধ তুলিয়া লইতে হইবে। আজকাল বাজারে অনেক খারাপ চায়ের ভেজাল চলে। উহা আর কিছুই নয়, ঠিক এইরূপ পাতা হইতে প্রস্তুত নয়। ফ্লাসিং ৮।১০ দিন অন্তর সাধারণতঃ হয়।

নূতন জমিতে চা গাছ বসাইতে হইলে প্রথমে নার্সারিতে বীজ বপন করাইয়া চারা গজাইয়া কিছুকাল পরীক্ষাধীনে রাখিতে হইবে। নার্সারি হইতে শিকড় সমেত ও মাটী সমেত (টব্‌টীকে মাত্র খসাইয়া) আনিয়া ক্ষেত্রে পুঁতিয়া দিতে হইবে। ইহার পূর্বে ক্ষেত্রের জমিকে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। চা গাছ স্বভাবতঃ খুব বড় হইতে পারে বলিয়া প্লান্টিং-এর পর উহার বৃদ্ধি বন্ধ করিবার জন্য প্রতি বছর বর্ষার পূর্বে ডাল কাটিয়া বা মাথা ছাটিয়া ঝোপাল (bushy) করিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে Prunning বলে—প্রুণিং না করিলে চা গাছের ফ্লাসিং-এ এক সঙ্গে অনেকগুলি পাতা পাওয়া যায় না। ডালপালা যত হইবে, তত নূতন শাখা হওয়ায় মুখের পাতা ও কুঁড়ি পাওয়া যাইবে।

পাতাগুলি ফ্যাক্টরীতে কুলিদের দ্বারা আহৃত যাইবার পর, সেগুলিকে প্রথমে ঠাণ্ডা জায়গায় থাক্ থাক্ মেজে বা জালের উপর একদিন কিম্বা দেড়দিনের জন্য বিছাইয়া রাখা হয়। ইহাতে পাতাগুলি নেতাইয়া ভিজা ভিজা হইয়া যায় (এই stageকে withering বলে)। উইদারিং সম্পূর্ণ হইতে ১০ ঘণ্টা হইতে ৪০ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লাগে।

এই অবস্থায় পাতাগুলি রোলিং মেশিনে আনিয়া অল্প অল্প গোছে গুটানো হয়। আলতো ভাবে টুইষ্ট্ করিবার জন্য দুইটী ষ্টীল পাত এই মেশিনে নড়িতে থাকে। গুটানো পাতাগুলি নীচে জড় হয় নিতান্ত শপ্‌শপে ভিজা অবস্থায়, ইহাতে ভিতরকার রস কিছু নিঙড়াইয়া আসে।

পাকান রসসিক্ত পাতাগুলি পুনরায় থাক্ থাক্ সীমেণ্টের সেল্‌ফে বিছাইয়া দেওয়া হয় ফারমেণ্ট করিতে। fermentation-এ চা পাতার রস এমন একটা কষা (oxidised) ভাব ধারণ করে যে, এই সময় পাতার সুগন্ধ নিসৃত হইতে থাকে এবং পাতার রং ক্রমশঃ কালো কটা বর্ণ ধারণ করে। এই সময়টীতে খুব সযত্ন লক্ষ্য চাই যাহাতে বেশী ফারমেণ্টেড (ভাপান) না হয়। ঠিক মাপ সই করিয়া শীঘ্র শুষ্ক করিবার জন্য firing বা drying মেশিনে ঢালিয়া উত্তপ্ত হাওয়া যোগে পাতাগুলি শুষ্ক করা হয়। এই প্রক্রিয়া চায়ের তীক্ষ্ণ ক্ষারধর্ম কমাইয়া দেয়।

এই শীর্ণ শুষ্ক গুটানো পাতাগুলিকে ছাঁটাই কলে ছাঁটিয়া Grading বা Sifting মেশিনে কোয়ালিটী অনুযায়ী ভাগ করা হয়। এই কলে দোলান (rocking) চালুনি থাকে, তাহারই সাহায্যে রকম রকম গ্রেডের চা ভাগ করিয়া লওয়া হয়। পাতার মুখাগ্রভাগ সর্বাপেক্ষা উত্তম, ইহাই অরেঞ্জ পিকো, তাহার পরের ভাগ পিকো, তাহার পরে পিকো সুচোং, শেষ ভাগ সুচোং।

এর পর বাছাই এবং প্যাকিং—প্যাক করা চা দিনকতক গরম চেম্বারে রাখা হয়। দার্জিলিঙের হ্যাপিভ্যালি চা কারখানায় দেখিয়াছি, এই Hot chamber-এ চায়ের flavour খুব সুন্দর থাকে।

বৃটীশাধীন দেশসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষ, লঙ্কাদ্বীপ (Ceylon) আফ্রিকার নায়সাল্যাণ্ড এবং নেটাল এই ক স্থানে চায়ের চাষ হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে চীন, জাপান, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, ফরমোসা এই ক স্থানে খুব বেশী রকম চা উৎপাদন করা হয়। ক্ষুদ্রায়তনে এই শিল্প ফরাসী ইন্দোচীন এবং জর্জিয়ার ককেসাস (ridge) রিজে কিছু বর্তমান আছে। পৃথিবীতে মোট যত চা উৎপন্ন হয় ভারতবর্ষে তাহার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী উৎপন্ন হইয়া থাকে। গড়ে ভারতবর্ষ দেখা যাইতেছে, বিগত কয় বৎসর ৪০।৪২ কোটী পাউণ্ড চা উৎপাদন করিয়াছে। চা-কৃষির উৎকর্ষ এই জন্যই বাড়িয়াছে। মাত্র ৮ কোটী ভারতবাসীর ব্যবহারে লাগিয়া বাকী

সমস্তই দেশবিদেশে রপ্তানী হয়—বেশী ক্রয় করে যুক্তরাজ্য (United Kingdom)।

### ১৯৩৭-৩৮এ রপ্তানীর হার

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| যুক্তরাজ্য— | ২৮ | কোটী | ৮৪ | লক্ষ | পাউণ্ড |
| য়ুরোপ— | ৬ | " | ২৬ | " | " |
| সোভিয়েট— | ৬ | " | ৪৪ | " | " |
| আফ্রিকা— | | | ৪৬ | " | " |
| আমেরিকা— | ২ | " | ১৮ | " | " |

উক্ত বৎসর কলিকাতা বন্দর হইতে ২০,৩৫,৪০ হাজার এবং চট্টগ্রাম বন্দর হইতে ৭,৯১,৭৫ হাজার পাউণ্ড চা রপ্তানী হয়।

চায়ের প্রচলনের জন্য এবং চা-শিল্পের উন্নতিবিধান কল্পে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে Tea Cess Committee গঠিত হয়। প্রথমে পাউণ্ড প্রতি ¼ পাই বা বার পাউণ্ড চা-এ একপয়সা ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ২ পয়সা সেস্ বা কর বসে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শত পাউণ্ড চা পিছু ছয় আনা কর ধার্য আছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এই কর বার আনা হইয়া বাড়িতে বাড়িতে এই বৎসরের প্রথম হইতে ১৸০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। এই কর হইতে ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ৪১ লক্ষ, ৬৮ হাজার টাকা আদায় হইয়াছিল। সরকার এই অর্থের দ্বারা Indian Tea Cess Committeeর সহিত Tea market Expansion Board গঠন করেন।

চাএর প্রগতির ইতিহাসে আন্তর্জাতিক Tea Restriction স্কীম্ একটী স্মরণীয় ঘটনা—চা উৎপাদন এত বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং মূল্য ও কোয়ালিটীর এত হ্রাসপ্রাপ্তি হয় যে, কালে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। ইহার ফলে ভারতে Tea Control Act পাশ হইয়া যায় এবং চা বাগানের লাইসেন্স লইবার বন্দোবস্ত হয়। এই স্কীম অনুযায়ী প্রতি চা বাগানে quota বাঁধিয়া দেওয়া হইতেছে, এই কোটার বেশী

ফ্যাক্টরীতে পাতা গুটানো (Rolling) হইতেছে

কাহাকেও চাষ করিতে দেওয়া হয় না। ইহা ছাড়া বাজে চা নষ্ট করিবার বন্দোবস্তও হইয়াছে।

দুঃখের বিষয়, এই ভারতীয় চা-শিল্পটি এখনও অনেকাংশ বিদেশীর দ্বারা পরিচালিত। এদেশবাসীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণীয়।

## মিলন-সুর

শ্রীমতী কনকপ্রভা দেব সরকার, বি.এ.

মিলন ছন্দে কি গান তোমার মনে আসে বারে বারে;
প্রাণ-মাতান সুর-হারান আপন ভোলা মধুর তারে।

স্বপন ভরা করুণ তানে, সে সুর তুমি গাহিলে গানে,
মন-হারান প্রাণ কাঁদান নীরব ব্যথায় বিরহ স্বরে;
তোমার তরে মন যে আমার দিবস রাত্তি কেমন করে।

সকল কথা সকল কাজে, থাকবে তুমি আমার মাঝে,
আমার মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলবে তোমার সুরে;
মনের মাঝে প্রেমের মিলন ভাসবে স্মৃতিপুরে।

# সাধক কবি ভুজঙ্গধর

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

সুকবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিবহাটীর বিখ্যাত রায় চৌধুরী (বঙ্গজ কায়স্থ, জমিদার ঘোষ বংশ) বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৺শশধর রায় চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে পিতার কর্ম্মস্থল মেদিনীপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার বাল্য ও ছাত্র জীবন অতিবাহিত হয় পুরীর সমুদ্রতটে, দিগন্তপ্রসারিত নীল জলের অসীম পরিব্যাপ্তির ক্রোড়ে। সমুদ্রের অশ্রান্ত কল্লোল-বিলাস সকলের অলক্ষিতে তাঁহার শিশুচিত্তে কবিতার অমূল্য বীজ বপন করিয়া গেল—তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র বারো বৎসর।

কলেজ জীবনে শেলী, কীট্‌স্, বায়রণ প্রভৃতি ইংরাজ কবিদিগের গ্রন্থের মধ্যে তিনি নিজেকে ডুবাইয়া দিলেন। গ্রন্থ পাঠে তাঁহার এই অভূতপূর্ব্ব অনুরাগ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। স্বভাবকবি ভুজঙ্গধর ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার স্বপ্নময় দৃষ্টি বাস্তবের কঠিন প্রাচীরে ব্যাহত হইয়া তাঁহার কোমল কবিচিত্তে গভীরভাবে রেখাপাত করিয়া গেল। মুমূর্ষু, বুভুক্ষু, আর্ত্ত নরনারীর অশান্ত ক্রন্দন তাঁহাকে বহির্জগতে টানিয়া আনিল। কলিকাতার সে-সময়কার সেবা-প্রতিষ্ঠান 'রিলিফ ফ্রেটারনিটি'-র অন্যতম প্রধান কর্ম্মীরূপে আর্ত্ত-সেবায় তিনি সানন্দে আত্মনিয়োগ করেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দুঃস্থ, ক্ষুধাতুর, রোগপীড়িতের সেবার মধ্য দিয়া কবি ভুজঙ্গধর প্রমুখ যুবকগণ তখনকার দিনে জনগণের মনে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

৺ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

১৮৯৪ সালে এম্, এ, ও ১৮৯৭ সালে বি, এল, পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ভুজঙ্গধর জলপাইগুড়িতে তিন বৎসরকাল ওকালতি করেন। সাহিত্যিক মানুষটী কিন্তু কোনদিনই তাঁহার মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িবার অবকাশ পায় নাই। জলপাইগুড়িতে অবস্থান কালে শ্রীযুক্ত শশিকুমার নিয়োগী, এম্, এ, বি, এল, মহাশয়ের সহযোগিতায় তিনি "ত্রিস্রোতা" নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা কৃতিত্বের সহিত সম্পাদনা করেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি হাজারিবাগ যান এবং মাত্র তিন মাসকাল তথায় ওকালতি করিয়া ১৯০১ সালে বসিরহাটে ফিরিয়া আসেন। সেই সময় হইতে মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পর্য্যন্ত দেশের মায়া তিনি ছাড়িতে পারেন নাই।

বসিরহাটে ফিরিয়া তিনি ওকালতি আরম্ভ করেন এবং নিজ কৃতিত্বের ফলে সরকারী উকিলের পদে নিযুক্ত হন। কাব্যচর্চ্চার সহিত ওকালতি জীবনের কোন সঙ্গতি খুঁজিয়া না পাইয়া পরে তিনি ওকালতি ত্যাগ করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কাব্য ও সাহিত্য-চর্চ্চাই ছিল তাঁহার প্রধান অবলম্বন ও আনন্দ। ৺বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'প্রচার' পত্রিকায় কবির অনেক কবিতা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। সে-যুগের 'নারায়ণী', 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' প্রভৃতি এবং এ যুগের বহু মাসিক পত্রিকায় তাঁহার বহু কবিতা সাদরে প্রকাশিত হইয়াছে।

তাঁহার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'মঞ্জীর', 'রাকা', 'ছায়াপথ', 'গোধূলি', প্রভৃতি সুধীসমাজে যেমনি বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে তেমনি 'শিশির', 'পল্লী সমাধি

গাথা' প্রভৃতি তাঁহাকে শিশু সাহিত্যে অক্ষয় ও অমর করিয়া রাখিবে।

অনুবাদ কার্য্যেও কবি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। শেক্স্‌পীয়রের 'ওথেলো', 'ম্যাক্‌বেথ', 'কিং লীয়ার', প্যালগ্রেভের 'গোল্ডেন ট্রেজারী', কালিদাসের 'মেঘদুত', 'শকুন্তলা', প্রভৃতি নাটক ও কাব্য সহজ বাংলায় তিনি অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, হিন্দু শাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য দখল ছিল। কঠিন সংস্কৃত সাহিত্যের বেড়াজাল ভাঙ্গিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যের জন্য যে অমৃত আহরণ করিয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। গীতাকাব্য; চণ্ডী কাব্য; ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের কাব্যানুবাদ, ব্রহ্ম সূত্রের ভাব ব্যাখ্যা, ভাষ্য-টীকা ও টিপ্পনী; ভাগবতের স্থল বিশেষের ( যথা ধ্রুব চরিত্র, রাসপঞ্চাধ্যায়, সতী চরিত্র প্রভৃতি ) কাব্যানুবাদ; শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকর্ণামৃতের ও পঞ্চদশীর সহজ অনুবাদ প্রভৃতি তাঁহার শেষ জীবনের কঠোর পরিশ্রম ও ঐকান্তিক সাধনার ফল। দুঃখের বিষয়, ইহার মধ্যে একমাত্র 'গীতাকাব্য' ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ প্রকাশ করিবার সুযোগ তিনি জীবনে লাভ করেন নাই।

গভীরতায় ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যে ভুজঙ্গধরের কাব্য বিশেষত্বমণ্ডিত। ভাবগাম্ভীর্য্যে তাঁহার কাব্যাবলী মাইকেলের কাব্য স্মরণ করাইয়া দেয়। হাল্‌কা কবিতায় চিরদিনই তাঁহার অরুচি ছিল। দর্শনের সহিত কবিতার অচ্ছেদ্য যোগাযোগ তিনি বিশ্বাস করিতেন। ৺ভুজঙ্গধরের কবিতায় দার্শনিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত প্রকৃত কবি চিত্তের এক অপরূপ সমন্বয় ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত স্বল্প সংখ্যক কবির মধ্যে ভুজঙ্গধর অন্যতম।

শুধু সাহিত্য সেবা করিয়াই তিনি জীবন কাটান নাই। দেশ ও জাতির সেবার যখনই প্রয়োজন তখনই তিনি অকুণ্ঠে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। প্রথমে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁহার বাগ্মীতায় স্যার ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হিন্দু মহাসভায় যোগদান করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি ইহার শাখা সম্পাদকের পদে কার্য্য করিয়াছেন। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলনের সহিতও তিনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। বসিরহাট বাণী সম্মিলনীর তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। বসিরহাট হইতে "পল্লীবাণী" নামক একখানি মাসিক পত্রিকাও তিনি অনেক দিন যাবৎ সম্পাদনা করিয়া গিয়াছেন।

মানুষ হিসাবেও ভুজঙ্গধর ছিলেন স্বকীয় মহিমায় গৌরবান্বিত। শান্ত, ধীর, স্থির ভুজঙ্গধরকে কোনও বিপর্য্যয়ের মধ্যে কখনও বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। নিজেকে প্রকাশ করিবার কুণ্ঠা তিনি কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেন না। ৩৮ বৎসর বয়সে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে; ইহার পর হইতেই তিনি নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার, আত্মসমাহিত যোগীর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন সত্যকার বেদান্তের মানুষ।

অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনার ফলে ইদানীং তিনি দুরারোগ্য মস্তিষ্কের পীড়ায় শয্যাশায়ী হন। বিগত ১৫ই সেপ্টেম্বর প্রাতে তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতা রায় বাহাদুর মুরলীধর রায় চৌধুরীর কলিকাতাস্থ বাস ভবনে ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। নীরব কবি ও কর্ম্মী ভুজঙ্গধর আর নাই, কিন্তু তিনি রাখিয়া গিয়াছেন অর্থ নহে, বিত্ত নহে, সারা জীবনের সাহিত্য সাধনার দান আর কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক শাস্ত্রগ্রন্থের সহজ সরল কাব্যানুবাদ। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কবির এই অনুবাদগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে, শুধু যে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারেরই অক্ষয় সম্পদ্ ও সঞ্চয় হইবে তাহা নয়, পরন্তু বর্ত্তমান অরাজক ভাব ও চিন্তার বিশুদ্ধতা সম্পাদনেও সহায়ক হইবে। আশা করি, সাধক কবি ভুজঙ্গধরের এই অসম্পূর্ণ কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া গৌরবার্জ্জন করিবার মত দরদীর অভাব বাংলা দেশে হইবে না।

# শেষ কোথায়?

শ্রীক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য্য, এম. এ.

বিগত ১৯১৪-১৮ সালে মহাযুদ্ধের রুদ্র হুঙ্কারে যে ধ্বংসের লীলা আরম্ভ হইয়াছে, সে লীলা বর্ত্তমান সময়ের মধ্য দিয়া বিশ্বমানবের চিরন্তন প্রথাগুলির উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ইহা শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেই অবরুদ্ধ নহে—আমাদের জীবনের সকল স্তরেই অনুভূত হইতেছে। জগতের ইতিহাসে যুগে যুগে এই লীলা দেখা যায়, এবং ধ্বংসের মধ্যেই সৃষ্টির বীজ নিহিত থাকে। ফ্রান্সের রক্তবিপ্লবের বীভৎস আর্ত্তনাদের মধ্যেও ভ্রাতৃত্ব, সমতা ও প্রেমের আশ্বাস-বাণী মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করিয়াছিল। সেই বাণী অন্তস্পর্শী সুর বিশ্বরাজ্যে এক নবজাগরণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল—তাহার আদর্শ হইল, ব্যষ্টির স্বাধীনতা ও প্রতিষ্ঠা। সেই ভাববন্যার বেগবান্ প্রবাহ বিগত মহাযুদ্ধের সমাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ-প্রাণীকে ভাসাইয়া দিয়াছে। এই ভাবস্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হইয়াই লেনিন সমগ্র রাশিয়াকে স্বীয় মোক্ষ-মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন ও তাহারই সাধনায় বলশেভিক রাশিয়া সিদ্ধ সমৃদ্ধ হইয়াছে। মুস্তাফা কেমালের দেশাত্মবোধও এই শিক্ষারই পরিণতি। বিনাশের চণ্ডলীলাই বিশ্বের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাকে আবার স্নিগ্ধ-শান্তিময় গঠনকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিল, তাই বোধ হয় "শিব-প্রধান" অর্থাৎ ধ্বংস মঙ্গলময়—তাই সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বযুগে ধ্বংসেই সৃষ্টির প্রারব্ধি।

কিন্তু বিগত মহাসমরে যে ধ্বংসের লীলা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার নিবৃত্তি কোথায়? আজিও তাহা হইতে কোনও গঠন কার্য্যের উদ্ভব হয় নাই। ফ্রান্সের বিপ্লব-লীলার প্রেরক ছিল—শান্তি ও সাম্য; এই বর্ত্তমান যুগের উচ্ছৃঙ্খলতার পরিসমাপ্তি কোথায় তাহা কেহই বলিতে পারে না। সকল আদর্শেরই মূল-আকর্ষণ-অন্তর্নিহিত সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান যুগাদর্শের পশ্চাতে সেই সত্যের আকর্ষণ নাই—আদর্শ শক্তিহীন, তাই এত মতবাদ ও দ্বন্দ্ব।—পাশ্চাত্যের প্রাণপ্রিয় গণতন্ত্রও তাই আজ ফেসিজিম্ ও নাজীজিমের ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় পতিত। তবে কি ব্যক্তিত্ব বীরপূজায় আত্মোৎসর্গ করিবে? না আত্মবীর্য্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে? এ দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তির শেষ অঙ্ক কোথায় এবং কতদিনে—তাহা সঠিক নির্ণয় করিবার কোন পন্থাই এখনও দৃষ্টিগোচর হয় না।

অন্যদিকে প্রাচী তার আত্মিক বৈশিষ্ট্য লইয়া মাঝে মাঝে পাশ্চাত্যের বস্তুতন্ত্রের প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষ করিয়া বলিতেছে—"শান্তি বস্তুতে নাই, ইহা আত্মার ধর্ম্ম, অতএব আত্মার উৎকর্ষই শান্তির প্রচারক।" প্রকৃত জয় বৈজ্ঞানিকের নব আবিষ্কৃত যুদ্ধসম্ভারের দ্বারা হইবে না—আত্মোৎকর্ষের বলে করিতে হইবে। এই মন্ত্রে ভারত-মহাত্মা বিশ্বকে প্রণোদিত করিতে প্রয়াসী; কিন্তু কর্ম্মী যতদিন আদর্শে সন্দিহান থাকে, এবং আদর্শের সত্য বাণী তাহার মর্ম্মস্পর্শ না করে, ততদিন তাহার প্রাণে কর্ম্মের তীব্র প্রেরণা আসিবার সম্ভাবনা নাই। এখন কি আমাদের কর্ত্তব্য, কাহাকে অবলম্বন করিব ও কি মন্ত্রে দীক্ষিত হইব, ইহাই সমস্যা। সন্দেহের তীব্র আন্দোলনে চিত্ত আমাদের বিক্ষিপ্ত। শুধু তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে বিধ্বস্ত হইতেছে—পুরাতন যাহা কিছু ভাঙ্গিয়াই চলিতেছে, হয়ত নূতন কিছু কোনদিন গড়িব এই আশায়; কিন্তু সে সত্য-সুন্দর করে, কতদিনে আবির্ভূত হইবে? শুধু অন্ধের মত ধ্বংসের নেশায় ছুটিয়া চলিতেছে। বিশ্বময় যদিও দ্বন্দ্বের ঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছে, অন্যান্য জাতিসকল কিন্তু এই ধ্বংসের মধ্যেও যৌবনের তীব্র আবেগ লইয়া তাহাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যকে প্রাণস্পর্শীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আর আমরা আপন বৈশিষ্ট্যকেও ধ্বংস করিয়া খরস্রোতে নাবিকহীন তরীর মত আত্মশক্তি হারাইয়া বিনাশের দিকে ছুটিয়া যাইতেছি! নাজী, ফেসিষ্ট, ডেমোক্রাট সোস্যালিষ্ট্ বা মুস্‌লিম্—কাহারও মত গড়িবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাদের নাই।

আমাদের সমাজ, ধর্ম্ম এবং শিক্ষায়ও সেই একই মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি। ধ্বংসের আহ্বানে প্রাণ আমাদের নাচিয়া ওঠে—কিন্তু গড়িব যে কি তাহা জানি না। ভাঙ্গিতে বিচার করি না—গড়িবার শক্তি নাই। সমাজকে ধ্বংস করিয়া তাহার মৃত কঙ্কালের উপর উৎসব-নৃত্য করিতেছি—ধর্ম্মকে উৎসন্নে দিয়া তাহার প্রেতাত্মাকে ব্যঙ্গ করিতেছি—হিন্দুকে হিন্দু বলিয়া চিনি না—মাতৃজাতিকে পাশ্চাত্য সম্মান দেখাইতেছি বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য বীর্য্যে তাঁদের সম্মান রক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই। যৌবনের সৃষ্টিকারিণী শক্তি আজ আদর্শহীন, ধর্ম্মহীন ও কর্ম্মহীন বিপ্লবের মধ্যে পড়িয়া ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইতেছে। এখনও উপযুক্ত বৈদ্যের আবির্ভাব হইলে, এই মরণোন্মুখ জাতির পুনঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে। সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে—যাহাতে পূর্ণমাত্রায় ধর্ম্ম, জ্ঞান ও কর্ম্মের বহ্নি উদ্দীপ্ত হয়, যাহাতে প্রত্যেক বালকবালিকা, যুবক-যুবতী তাহার নিজস্বতাকে দেখিতে ও চিনিতে পারে এবং কর্ম্মস্পৃহায় উদ্দীপ্ত হইয়া স্বকীয় শক্তির উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা করিতে পারে—নতুবা শেষ কোথায়?

# মত্ত মধুপ

শ্রীজনরঞ্জন রায়

হাসি হাসি হাসি—গমকে গমকে সে হাসিতেছে। কড়াই ভরা ফুটন্ত দুধ টগ্‌বগ্ করিয়া যেমন উথলিয়া পড়ে, কমলাও শেষে হাসিতে হাসিতে তেমনি উথলিয়া পড়িল। সে চেয়ারের সম্মুখের টেবিলের উপর হাত দুইটি আছড়াইয়া ফেলিয়া, তাহার মধ্যে ঘাড় গুঁজিয়া হাসিতে লাগিল।

হঠাৎ কলিং-বেল্‌টা বাজিয়া উঠিল। পর্দ্দার বাহির হইতে কে বলিল—মে আই কম্ ইন্?

একটু যেন বিরক্তির স্বরে কমলা বলিল—নো!

তাহার পর আবার কি ভাবিয়া বলিল—মিঃ চৌধুরী? আসুন।

টুপি খুলিয়া ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে চৌধুরী বলিল—কি সুন্দর হাস্‌ছিলেন আপনি, কি রিদিম্! কিন্তু এই শীতের সকালে কিসে প্রাণটা এত উচ্ছল হয়ে উঠল?

কমলা।—উচ্ছল হবে না? সদ্য বেড্-টি খাচ্ছি, এমন সময়ে রাসবিহারী ঠাকুরের উদয়। একবার কলিং-বেল্‌টাও বাজালেন না, আর্লি মর্ণিংএ একেবারে বেড্-রুমে এসে হাজির। এসে বললেন—তিনি ঠিক করে' ফেলেছেন আমাকে চণ্ডীদাস পড়াবেন। তা' সকালে, দুপুরে, রাত্তিরে যখন ইচ্ছে···

চৌধুরী।—দেখবেন কিন্তু লোকটা ভারি বেয়াড়া। হলে কি হয় সাহিত্যিক, আরো অনেক কথা শুনি···

কমলা।—তিনি রাফ্, এ কথা শুনেছি, আদব-কায়দা রাখেন না, তাও দেখলাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে একটা কল্‌চারেল্ এফিনিটি হওয়া অসম্ভব না হতে পারে। যেমন আপনাদের সঙ্গেও ঐ একটা সাংস্কৃতিক মিল রয়েছে।—ওঃ ইংরিজী কথার বাংলা করা কি শক্ত! আরও ভাবছি, ওঁর কাছে একটু বাংলা শেখাও হবে। আজন্ম বিলেতে কাটলো। বাংলায় লেক্‌চার দিতে পারি না যে!

চৌধুরী।—তা' আপনার স্বামী কি এলাউ করবেন? তিনি তো রাজনীতিই পছন্দ করেন। সাহিত্য-টাহিত্য···

কমলা।—তবে, আপনারা আসেন কি করে'? আপনি, বামনজী, ডাঃ নন্দী, আমার অক্সফোর্ড ফ্রেণ্ড ডক্টর চিদম্বরম্? কেউ ব্যাঙ্কার, কেউ বিজ্‌নেস্ ম্যাগ্‌নেট্, কেউ হার্ট-স্পেশালিষ্ট, কেউ ফিলজফার? আপনারা পলিটিক্‌সের ছায়া মাড়াতেই তো ভয় পান!

চৌধুরী চুপ করিয়া থাকিল। কমলা আবার বলিতে লাগিল—আপনাদের সমাজে এমন মিলমিশ করাটা ভারি বাধে। যখন তা' বাধে, তখন আমার সঙ্গে মেশেন কোন মেণ্টালিটি নিয়ে?

এমন সময়ে বয় একটা ট্রেতে করিয়া দুই পেয়ালা চা আনিল। উভয়ে এক এক পেয়ালা নামাইয়া লইল।

চা খাইতে খাইতে কমলা বলিতে লাগিল—আমাদের ম্যারেজও আপনাদের মত হয়েছে। অর্থাৎ ঠিক লভ্-ম্যারেজ নয়। তখন একটা মনের মিল হয়েছিল। ভেতরের জীবনে আমাদের ফুল্ ফ্রীডম্। তবে সমাজে আমরা স্বামী-স্ত্রী নিশ্চয়। প্রোফেসার দত্ত'র সঙ্গ-ছাড়া হয়ে কোন সোশ্যালে আপনি আমায় যেতে দেখবেন না। তবে তিনি একজন কাওয়ার্ড—আমাকেই শুধু পলিটিক্‌সে ঠেলে দিচ্ছেন। তা' আপনি ত ইভ্‌নিং-এ আসেন, আজ ভোরেই যে সেজেগুজে—বিদেশে নাকি? কৈ কাল তো বলেননি কিছু! ওঃ আপনাকে একটা পোচ্ দিয়ে গেল না। বয়—বয়—

চৌধুরী।—না না, তার জন্যে ব্যস্ত হবেন না। নতুন শীতে শুধু চাই ভাল। বাড়ীতে আজ কোন কাজ নেই, হাত-পা যেন জড়িয়ে আসতে লাগল! তাই ভাবলাম আপনার সঙ্গে বন্যাত্রাণ সমিতির সম্বন্ধে একটু 'টক্' করে' যাই। আপনি হয়তো আমার কারে লেক্‌টাও ঘুরে আসতে পারেন।

কমলা।—নো থ্যাঙ্ক ইউ। মনে কিছু করবেন না, রোজ সকালে সাড়ে আটটায় বামনজী আসেন। তাঁর কারেই বেড়াতে যাই। আজ থেকে বিকেলে আপনার সঙ্গে যাব'খন।

এই বলিয়া কমলা স্নানাগারে যাইতেছিল।

চৌধুরী বলিয়া উঠিল,—ওঃ সরি সরি, আপনি এখনও

স্লীপিং ড্রেসে! (নিজের হাত-ঘড়ির দিকে চাহিয়া) ওঃ এখনও সাতটা বাজেনি যে—আমি বড্ড আর্লি এসেছি।

এই বলিয়া চৌধুরী হ্যাট্ লইয়া উঠিতেছিল।

কমলা বলিল, বসুন না। তত ক্ষণ ইকনমিক্‌সের একটা কোন বই নিয়ে পড়ুন। প্রায় সব ষ্ট্যাণ্ডার্ড বইই তো রয়েছে। ব্যাঙ্কার লোক!

কমলা চলিয়া গেল। সে বে-টাইমে আসিয়াছে দেখিয়া চৌধুরী লজ্জিত হইল। টেবিলের উপর হইতে কমলার ডায়রীখানা তুলিয়া লইয়া সে দেখিতে লাগিল। তাহাতে লেখা আছে—সকালে সাতটা হইতে সাড়ে আটটা ডক্টর চিদম্বরম্—তাহা কাটিয়া লেখা আছে বক্তৃতা প্রস্তুতি, সাড়ে আটটা বামনজীর সঙ্গে তাঁহার মিলে ধর্ম্মঘট মীমাংসার জন্য যাইতে হইবে, সাড়ে দশটায় বাড়ীতে মেজর ডাঃ নন্দীর সঙ্গে ব্যায়ামসমিতির বিষয়ে আলোচনা, বারটা হইতে চারটা স্বামীর সঙ্গে দাদুর বাড়ীতে ডিনার সারিয়া নারীমঙ্গল সমিতির সভা, সাড়ে চারটা থেকে সাড়ে পাঁচটা কংগ্রেস-কমিটী, সাড়ে পাঁচটা থেকে সাতটা মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে বন্যাত্রাণ সমিতির বিষয়ে আলোচনা, সাতটা থেকে সাড়ে আটটা হুইর্ল-উইণ্ড ক্লাবের সম্পাদিকা—তাহা কাটিয়া লেখা আছে রাসবিহারীবাবুর সঙ্গে চণ্ডীদাস পদাবলী আলোচনা।

কলেজে পড়াইতে যাওয়া নাই। নতুবা দ্বিপ্রহরে দেখাশুনা থাকিত না। আজ রবিবার।

কমলা নিজে শিক্ষকতা করিয়া নিজের সব কিছু চালায়। তাহার স্বামীর অল্প আয়, আর তাহার উপর সে নির্ভরও করে না; তাহাদের কোন ছেলেপুলে না থাকায়, সুবিধাও হইয়াছে।

চৌধুরী মনে মনে বলিল, বাইরের বাঁধাবাঁধি তো কম নেই। কিন্তু এত স্মার্ট আর বেহায়া! পুরুষের কাছে স্লীপিং গাউনে রয়েছে, কোন সঙ্কোচই নেই। স্বামীর খোঁজ-খবর নিতে একদিনও দেখলাম না। খাওয়া-দাওয়া প্রায়ই তো পাঁউরুটি টোষ্ট, ডিমের মামলেট্ আর এক পেয়ালা দুধ। তার ওপর খুব জোর বাজারের মিষ্টি, রাধাবল্লভী আর আলুর দম। ভাত, কারী মাসে বোধ হয় একদিনও হয় না। সমস্ত দিন হৈ-চৈ, উৎকট পলিটিকস্, ঐ একটা ব্লাউজ, সাড়ী আর স্যাণ্ডেল পরে'। নেহাৎ কলেজ না করলে নয়, তাই শুধু যায়। বিলেত-ফেরতা মেয়েদের সঙ্গে সে অনেক মিশেছে। কিন্তু অক্সন্ কমলা যেন একটা হেঁয়ালী—একটা পজল্।

এমন সময়ে নীচে একটা ভারি গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—গুড্ মর্নিং লর্ড কমলেকামিনী, লেডী কমলেকামিনী কোথায়?

প্রোঃ দত্ত।—মর্নিং দাদু, আপনি তো ঠিক এসেছেন। লেডি টএলেটিং-এ বোধ হয়।

দাদু।—বোধ হয়? খোঁজ রাখ না! তাই তো আমরা পাঁচ ভূতে লুটে খাবার যো পাচ্ছি। তুমি না'কে কাঁদলে শুনছে কে? তা' ওপরে যাই। এই যে কলিং-বেল্…

দাদু মিত্তির কলিং-বেল টিপিয়া উপরে উঠিতেছেন। উঠিতে উঠিতে গুণ্ গুণ্ করিয়া সুর ভাঁজিতে লাগিলেন—

এস চঞ্চল চরণে
কেন টএলেট্ ভবনে!

কমলার শুইবার ঘরের সম্মুখে ছোট একটু বারান্দা। তাহার মাঝে দেওয়াল ঘেঁসিয়া একটি অর্গান, তাহাতে বসিবার একখানি টুল, দু' পাশে একখানি করিয়া চেয়ার ও একটি করিয়া টবে পাম্ গাছ সাজানো। শুইবার ঘরের দরজায় পর্দ্দা ফেলা থাকে।

দাদু সরাসর গিয়া টুলে বসিলেন ও অর্গানের চাবী টিপিয়া গান ধরিয়া দিলেন—

কি কাজ বল প্রসাধনে—
এস চঞ্চল চরণে!
অঙ্গ যাহার আপন শোভায় আপনি উঠে গো মুঞ্জরি'
(ঢল-ঢল-ঢল যৌবনে যার আপনি উঠেছে মুঞ্জরি')
যার চরণসরোজে ফুটে রে কমল, ভ্রমর উঠে গুঞ্জরি'
(মেজর ডাক্তার ফিলজফার চরণেতে পড়ে গুঞ্জরি'),
সে কেন সায়ক আঁকিছে নয়নে
(কাজল আঁকিছে নয়নে)!
বধিতে কাহারে জীবনে
(মারিতে কাহারে জীবনে!!)

বল ব'ল কোন ছলে—
কুন্দ-কুসুম-কুন্তলে ( সেণ্টেড-তেল-কুন্তলে )
দাও নলিনী পরাগ বদনে
( লিলি পাউডার বয়নে ! )
নিকট করিতে মরণে
(কহে অনুগত দীন অধীনে !! )

—কমলা তাড়াতাড়ি বাথ-রুমের দরজা খুলিয়া বলিল—দাদু করেন কি, করেন কি !

দাদুর গান শুনিয়া তাহার গাল দুইটি আধ-রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। বেশবিন্যাস মোটেই সারা হয় নাই। সাড়ীখানি পরিতে পরিতেই সে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

কমলা বলিল, আজ অসময়ে নাগরের ডাকাডাকিতে পাড়ার সতীনরা যে সব জেগে উঠল! লোকে শুনে কি ভাবছে বলুন তো ?

দাদু।—ভাবছে শেষে বুড়ো ডি, ডি, মিত্তিরকে নিয়ে প্রসিদ্ধ কুহকিনী কমলা দত্ত আজ সকালে ভেল্কি নাচাচ্ছে।

কমলা এক ঝলক হাসিল, তাহার পর বলিল—

তা' সে সব ভেল্কি তো আপনার বাড়ীতে দুপুরের জন্য তোলা ছিল। এখন তো এন্‌গেজ্‌মেণ্ট ছিল না।

দাদু।—মনে করে' দিতে এলাম। কমলেকামিনী যুগলে আজ দুপুরে আমার বাড়ীতে ডিনার করে', নিভাননী নারীমঙ্গল সমিতির গার্ল স্কুলে প্রাইজ দিতে যাবেন। তাতে তুমি প্রেসিডেণ্ট। কার্ড পেয়েছ নিশ্চয়।

কমলা ইতিমধ্যে পর্দাটি গুটাইয়া ঘরের ভিতরে গিয়া চুল আঁচড়াইতেছিল। সে বলিল, দাদু ?

দাদু।—কি দিদিমণি ?

কমলা।—আপনি কি শুধু নেমন্তন্নটা মনে ক'রে দিতেই এলেন ?

দাদু।—আরও কিছু যেন বল্‌ব বল্‌ব ভাবছিলাম···

কমলা।—পাকা কৌঁসুলী তবে কিসে ? পেটের কথা ধরে' ফেল্লাম ! এই বলিয়া সে আবার এক ঝলক হাসি হাসিল। এবার হাসির লহরটা কিছু বেশী ঢেউ-খেলানো।

দাদু।—দেখো মেয়েমানুষের সবটাই মেক্-আপ—ছলা-কলা-ভরা। কিন্তু বেচারা স্বামীগুলো করে কি ? তাদের তো একটা ক'রে শয্যাসঙ্গিনী চাই ! তা' তোমাদের মত রেজেষ্টারী-মার্কাই হোক, কি আমাদের মত উদ্বাহ-মার্কাই হোক। এই মার্কা ট্যাম্পার হবার ভয় পেলেই তাদের প্রাণ হাঁপিয়ে শুকিয়ে ওঠে। এর জন্যে লর্ড কমলে-কামিনীর সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে জানবে।

কমলা।—খুব হয়েছে, ব্রীফ্ পেলে আর জ্ঞানগম্য থাকে না তো! বসুন, চণ্ডীদাস কি উত্তর দেন শুনুন···

এই বলিয়া কমলা অর্গানে বসিয়া গান ধরিল—

কি মোহিনী জান বন্ধু, কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু, তোমার পিরীতি ॥
কোন বিধি সিরজিল স্রোতের সেয়লি।
এমন বেথিত নাই ডাকে রাধা বলি ॥
তুমি মোরে যদি প্রভু, নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে, দাঁড়াইয়া রও ॥
চণ্ডীদাস কহে, এই বাশুলী কৃপায়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয় ॥

দাদু।—চমৎকার, চমৎকার! উত্তর পেলাম—আপন পর হয় না। তা'হলে চণ্ডীদাস পড়ছ তুমি ওর কাছে। লর্ড সাহেব কিন্তু ওকেও দারুণ সন্দেহের চোখে দেখে। ওর গরগরে কাব্যিক ভাব, কন্দর্পের মত চেহারা, ওসব নাকি······

কমলা।—লর্ডশিপের বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টি······

দাদু সস্বরে বলিতে বলিতে সিঁড়ি নামিতে লাগিলেন—

না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর!

সেই সুরেই কমলা জবাব দিল—

ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর!

কমলা দাদু মিত্রের সঙ্গে সিঁড়িতে কিছু দূর প্রত্যুদ্গমন করিয়া বলিল, কুঞ্জভঙ্গের পরেও আজ কিস্‌টা তো দিলেন না! এই বলিয়া কমলা ডান হাতটি বাড়াইয়া দিল। হাতের উপর দাদু চুমু খাইলেন।

দাদু।—সঙ্গে আসছ কেন? যাও জামাটামা পরাই তো হয়নি তোমার মিঃ লেডি।

হাঁ যাই—বলিয়া কমলা খুব হাল্‌কা মনে উপরে আসিতে লাগিল।

দাদু মিত্তিরও খুব হাল্‌কা মনে সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে লাগিলেন। তিনি আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন, মেয়েটার যেন স্পৃহ', শঙ্কা বা দ্বিধা বলিয়া কোনও কিছু নাই। চোখে মুখে জীবনের যেন উদ্দাম প্রবাহ। হঠাৎ কোনদিন ধাক্কা খাইয়া রেসের ঘোড়ার মত বিকল হইয়া না পড়ে। সারাদিন কাজের মধ্যেই বা ডুবিয়া থাকে কেন? কাজের মধ্যে ভুলিয়া থাকাই কি ওর জীবনের ধর্ম্ম? হাঁপাইয়া পড়ে, তা'ও তো দেখি। নিশ্চিন্ত কর্ম্মশক্তি মানুষের আসিতে পারে না। স্বামীর গণ্ডী-রেখায় সে কি বাঁধা থাকিতে পারে! কিন্তু মেয়ে-পুরুষের ভালবাসা, তাহা কে কবে চাপা দিয়া রাখিতে পারিয়াছে? হঠাৎ মনে পড়িয়া যায় তাঁহার মৃতা স্ত্রী নিভাননীর কথা। তাঁহারই স্মৃতি জাগরূক রাখিতে দাদু নারীমঙ্গল সমিতি স্থাপন করিয়াছেন।

প্রবীণ ব্যারিষ্টার দীনদয়াল মিত্র লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র। তবে ষষ্ঠীর কৃপায় বঞ্চিত। তিনি কমলার মায়ের মাতুল। সুতরাং দাদু-সম্পর্ক-সৃষ্টি হইয়াছে। কামিনীমোহন দত্ত ও কমলাকে তিনি লর্ড কমলেকামিনী ও লেডি কমলেকামিনী—এই আদরের নামকরণ করিয়াছেন। এদের ছাড়াছাড়া ভাবটা তাঁহার কাছে নূতন ঠেকে। নিজের জীবনে তাঁহারা স্বামীস্ত্রীতে গাঁটছড়া বাঁধিয়া থাকিতেন, সেটা মনে পড়ে। বাঁধন যদি আলগা হইয়া থাকে, তিনি তাহা ব্যাকুলতায় কশিয়া দিতে আসিয়াছিলেন। বাড়ীটা স্বামীস্ত্রী দুই নামে কিনিয়াছে। কিন্তু এক অংশে থাকে কমলা, অন্য অংশে থাকে কামিনী। দুইজনে আলাদা আলাদা রোজগার করে, আলাদা আলাদা খায়। এটাকে তিনি আত্ম-নির্ভরশীলতা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তবে কি বিলিতী শিক্ষা? একটু ভারি মন নিয়াই তিনি কারে উঠিলেন।

হঠাৎ কমলার মনে পড়িয়া গেল চৌধুরীর কথা। ভদ্রলোক দাদুর গণ্ডগোলে কখন যে চলিয়া গিয়াছে, জানা যায় নাই। প্রায় এক ঘণ্টা হইয়া গেল। ভারি অন্যায় হইল। কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া কমলা দেখিল—একটা চেয়ারে বসিয়া চৌধুরী গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছে।

কমলাকে একলা আসিতে দেখিয়া চৌধুরী বলিল মিত্তির সাহেব বোধ হয় চলে' গেলেন।

কমলা।—হাঁ, তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এলাম। ওঃ, আপনি ভারি ঘেমে গেছেন! আমার ঘরে একটা ফ্যান্‌ও নেই। তা' আপনি এতক্ষণ চুপ ক'রে বসেছিলেন, আমরা তো বুঝতেই পারি নি! এত নিরাবিল লোক আপনি, তা'তো জানতাম না।

চৌধুরী।—বলেন কি মিসেস্ দত্ত? ঐ দীনু মিত্তির মশাইকে আমরা বাঘের মত ভয় করি। সবাইকেই তিনি চাবুক হাঁকড়ে' চলেন। আমাদের কাউকে দেখতে পেলে একেবারে ষ্টুপিড্ বানিয়ে ছাড়তেন। না দেখতে পেয়েও কি কম বাক্যবাণ ঝাড়লেন? যাক্, আমি তবে এখন উঠি—বামনজীর আসবার সময় হ'ল বোধ হয়?

এমন সময়ে রাস্তায় একটা হর্ণ শোনা গেল।

কমলা।—ও নো-নো। আপনি একটু কোকো আর কিছু না খেয়ে যেতে পাবেন না। আর আপনি থাকলে ভালই তো হবে, বামনজীর কন্‌সার্ণে লেবার-ষ্ট্রাইক্ হয়েছে। আপনারা দু'জনেই তো বিজ্‌নেস্ মেন্—কি উপায়ে তা মেটানো যায়, ঠিক করুন না।

কলিং-বেল্ বাজিয়া উঠিল। কমলা বলিল, কম্ ইন্।

মাথায় পাগড়ী, স্থূলকায়, চোখে চশমা বামনজী খেমকার প্রবেশ করিয়া বলিল—রাম্ রাম্। পরে চৌধুরীকে দেখিয়া বলিল—গুড্ মর্ণিং।

চৌধুরী।—গুড্ মর্ণিং। আমাকে মিসেস্ দত্ত আপনার জন্যেই ওয়েট করতে বললেন।

বামনজী।—ওঃ ভেরি ভেরি ট্রবল্ড ওয়াটার! লেবার লীডার মুকুেশ ও সালেম সেখানে জমায়েৎ হয়েছে। এখন মিসেস্ দত্ত যদি সিচুয়েশনটা সেভ্ করতে পারেন।

চৌধুরী।—মুকুেশ, সালেম ওরা তো সবই মিসেস্ দত্তেরই দলের লোক। উনি গেলে চাই কি আজই

অবস্থাটা ঘুরে যেতে পারে। তবে আপনার কারে কি উনি যাবেন? বরং আমার কারে উনি যান। আপনার কারে আমরা দু'জনে কিছু পরে গিয়ে পৌঁছব।

বামনজী।—তারিফ, তারিফ—বাঙ্গালীর বুদ্ধি! কিন্তু একটা ফোন্ করতে হবে যে। মিসেস্ দত্ত'র এখানে ও সব কোন কিছুই তো নেই। ম্যানেজার প্রতি সেকেণ্ডে খবর না পেলে হাল ছেড়ে দিয়ে বসছে। তা' চলুন মিঃ চৌধুরী, এই কাছে আপনার ঐ ব্রাঞ্চ-আফিসটা থেকে ফোন্ করে দিয়ে যাই।

এমন সময়ে বয় কাষ্ঠাধারে ছোট হাজরী লইয়া আসিল। যে যাহা ইচ্ছা, উঠাইয়া লইল। ব্যস্ততার সহিত সকলেই আহার সমাধা করিল।

বামনজী বলিল, মিসেস্ দত্ত কি রেডি?

কমলা।—ওঃ ইয়েস্ এভার রেডি!

এই বলিয়া সে তরল হাসির তরঙ্গ তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সকলে নীচে নামিয়া গেল।

যাইতে যাইতে বামনজী কমলাকে ষ্ট্রাইক্ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ কথাগুলি বলিতে লাগিল। অবস্থার গুরুত্ব যতই থাক না কেন, মজুরদের দাবীর বহরও বড় কম নয়—ইত্যাদি।

* * * *

কমলা বারান্দায় বসিয়া একদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রাসবিহারীবাবুর সহিত সে কবিতা লইয়া আলোচনা করিতেছে।

রাসবিহারী।—কবিতার ওপর আপনার এতটা অনুরাগ কেন?

কমলা।—অনেকেই এ কথা নিয়ে অনেক কিছু ভাবছেন। তা' আমি মনে করি—ফিলজফারের চেয়ে পোয়েটের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ঢের বেশী। দার্শনিক কোমতের কথাটাই ভাবুন। এক সময়ে তিনি য়ুরোপের প্রধান ফিলজফার। সব দার্শনিকদের কাছ থেকে তিনি কর চেয়েছিলেন। সবিস্ময়ে একদিন তিনি দেখলেন কি? দেখলেন যে, কতদিন আগে যখন সভ্যতার ধারণা আব্‌ছায়ার মত মানুষের মধ্যে এসেছে মাত্র, তখন কবি দান্তে যা' বলে গেছেন, আজ তিনি দার্শনিক শ্রেষ্ঠ কোমৎ তাই বলছেন মাত্র।

কমলা আবার বলিতে লাগিল, কবিতা আমি অনেক পড়েছি, তবে মহাজন পদাবলীর দিকে এগুতে কিছু সঙ্কোচ ছিল। এখন কিন্তু আমার মনে হয় এতে শুধু আদিরসই নেই। সেই চিরসুন্দরকে পাবার—তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাবার একটা সাধনায় এঁরা সিদ্ধ মহাজন। সেই সাধনার ধারা এঁরা প্রকাশ করে' গেছেন এই অমৃতময় পদগুলিতে যার প্রত্যেক কথাটা সত্য, অন্তর দিয়ে পরখ-করা জিনিষ! কি নিখুঁত—কি অপরূপ!

স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় কমলা অর্গানের সঙ্গে গাহিতে লাগিল।

সখি, কহবি কানুর পায়।
সে সুখ-সায়র দৈবে শুখায়ল
তিয়াসে পরাণ যায়॥
সখি, যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে করিনু ভাবনে
বিহি সে করিলে বাদ॥
সখি, হাম সে অবলা তায়।
বিরহ আগুন দহয়ে দ্বিগুণ
সহনে নাহিক যায়॥

গাহিতে গাহিতে তরুণী কমলার চোখ দুইটি যেন আবেশে বুজিয়া আসিল। স্থলপদ্মে যেমন ধীরে ধীরে লালিমা জাগিয়া ওঠে, তেমনি তাহার মুখের শুভ্র রঙটি রক্তাভ হইয়া উঠিল। তাহার রক্তঘন ঠোঁট দুইটি কাঁপিতে লাগিল। সে আর গাহিতে পারিল না।

রসপিপাসু দৃষ্টিতে রাসবিহারী সেই মুখখানির পানে চাহিতে চাহিতে মুগ্ধ হইয়া গেল।

রাসবিহারী।—কিন্তু আপনি তো মনুষ্যত্বের আরাধনাকেই বড় দেখেছেন।

কমলা।—কিন্তু মানুষ সেখানে দেখতে পেলাম কই? সেখানে শুধু স্বার্থের লড়াই। দাবীদাওয়ার বিবাদ। স্ত্রী-পুরুষ, রাজা-প্রজা, সবল-দুর্ব্বল—এদের চিরন্তন বিবাদ। প্রাণ শুকিয়ে গেল তার সঙ্গে ছুটে ছুটে। জীবনের কোন

খোরাক তাতে পেলাম না। ভক্তি-ভালবাসার নামগন্ধ তাতে নেই।

এই বলিয়া সে তাহার কুহকময় হাসির তরঙ্গ তুলিল। হঠাৎ যেন তাহার চমক্ ভাঙ্গিল। সে ডাকিল—বয়, বয়! কিন্তু তাহার সাড়া পাইল না।

রাসবিহারী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, রাত অনেক, ট্রাম-বাস সব বন্ধ হয়ে গেছে। আমি তবে উঠি। যেতেও তো হবে খানিক দূরে।

কমলা।—আজ যাবেন না ভেবেছিলাম, তাই এত রাত পর্য্যন্ত গল্প করছিলাম। অনেক খাবারও তো নিয়ে এসেছিলেন। সব ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেল এতক্ষণ।

কমলার সান্নিধ্যে তাহাকে রসোন্মাদ বায়ু ভাল রকমেই পাইয়া বসিয়াছে, রাসবিহারী তাহা কি বুঝিতে পারিতেছে না? সেইজন্য আজ তৃতীয় দিন এখানে তাহার রাত্রি কাটিল।

কমলা পাশের ঘরে উঠিয়া গিয়া দেখিল, তাহার বৃদ্ধ বয়টি পাগড়িটাকে উপাধান করিয়া দারুণ নিদ্রায় অভিভূত। সে নিজেই টিফিন-কেরিয়ারটি লইয়া আসিল। টেবিলের উপর একটা প্লেটে খাবারগুলি বাহির করিয়া সাজাইল। পরে রাসবিহারীকে বলিল, হাত ধুয়ে ফেলুন।

রাসবিহারী।—আপনি?

কমলা।—আমিও বসছি।

উভয়েই আহার শেষ করিল।

কমলা।—এইবার আপনি আমার বিছানাটায় শুয়ে পড়ুন; আমি শোফায় শোব'খন।

নিশুতি রাত্রি, নীরন্ধ্র অন্ধকার। রাসবিহারীর নিদ্রা আসিতেছে না। সে কেবলই ভাবিতেছে—এই নিঃশঙ্ক যুবতী তাহারই খাটের পাশে শোফাটায় কেমন অবলীলাক্রমে ঘুমাইতেছে। ঘরদ্বার সব উন্মুক্ত! এ কি বিলাতী শিক্ষার ফল? এই তন্বীটি কি অতনুর কোন খোঁজই রাখে না!

* * *

সর্পিল খানিকটা কুয়াশার আবরণ হইতে মাথা তুলিতেছে যেন নূতন দিবস। যেন বিগত দিনের ঐ মসীলেখা সূর্য্যদেবকে ম্লান করিয়া রাখিয়াছে।

কমলার চোখ-মুখে আজ যেন কোন প্রভাতী স্বপ্নের আবেশ নাই। কাল বৈকালে তাহার স্বামী চিদম্বরমের কারে কিছুতেই আর্ট-একজিবিসনে গেলেন না। বরং অভদ্র ইঙ্গিত করলেন যথেষ্ট। বাস্তব জগতের আঘাত পাইয়া আজ সে তাহার হৃদয়ের সঙ্গে নৈসর্গিক দৃশ্যের তুলনা করিতেছে।

বাড়ীর অন্য অংশ হইতে সদ্য ঘুম ভাঙ্গিয়া ওঠা শিশুর ক্রন্দন তাহার কাণে গেল। তাহার স্বামীর টেবিল-মেড্ শিশুটিকে ভুলাইতেছে। এই পরিচারিকাটি গত একমাস তাহার স্বামীর বাড়ী হইতে কোথায় গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিল এই শিশুটিকে কোলে লইয়া। নারীবুদ্ধিতে কমলা বুঝিল—এই নবজাত শিশুর পিতা কে? কিন্তু সে তো তাহার স্বামীকে কোনও দিন কটুকথা বলে নাই। চিদম্বরম্ বলে বটে। বোধ হয় ঈর্ষ্যাতে সে বলে। স্কাউণ্ড্রেল্, পশু—এই রকম সব আজও বলে। বিলাতে এই চিদম্বরমের সঙ্গেই তাহার কোর্টশিপ্ হইয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্বক্ষণে তাহার পিতামাতা বাধা দেন। আর তাঁহারাই জিদ্ করিয়া কামিনীমোহন দত্ত'র সঙ্গে তাহার বিবাহ দেন। তখন এক বার ব্যারিষ্টারী ফেল্ করিয়া কামিনী দ্বিতীয় বার পড়িতেছিল। কিন্তু বিবাহিত জীবনে সে কি পাইল?

কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে—শরীর ও মনের অবসাদ ঘুচাইতে স্নানাগারে চলিয়া যায়।

সে চিদম্বরমের কথাই ভাবিতে ভাবিতে স্নানাগারে গেল। চিদম্বরম এখন একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। কিন্তু বিবাহ করে নাই। কেন করে নাই? আজ সকালেই তাহার আসিবার কথা আছে।

চিদম্বরম আসিল। সঙ্গে লাল গোলাপের প্রকাণ্ড স্তবক, বহুবিধ ফল, কেক্ প্রভৃতি। আজ যে কমলার জন্মদিন। কমলা তাহা বুঝি ভুলিয়া গিয়াছিল। চিদম্বরম ভুলে নাই। চিদম্বরম শেষে বাহির করিল রাধাকৃষ্ণের একটি যুগল মূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণের নীল অঙ্গে পীতবর্ণ রাধা জড়াইয়া রহিয়াছে। এই মূর্ত্তির কথাই কমলা অনেক বার চিদম্বরকে বলিয়াছে। আজ তাহার জন্মদিনে সে উহা উপহার আনিয়াছে।

কমলা তখন অপলক দৃষ্টিতে পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। তাহার মনে প্রাণে আজ যে অবসাদ জমিয়া উঠিয়াছে, স্নানের পরেও তাহা কাটে নাই। উপহারগুলি তাহার মনে খানিকটা সজীবতা আনিল। আবার সে একবার সূর্য্যের দিকে তাহার দৃষ্টি ফিরাইল।

চিদম্বরম জিজ্ঞাসা করিল—আজ আপনার খঞ্জন-গঞ্জন চোখে একটা ধোঁয়ার স্বপ্ন কি জন্য মিসেস্ দত্ত? কি দেখছেন ওদিকে?

কমলা।—ভাবছিলাম আমাদের চোখ ঐ সান্-লাইট্ রে'র উপযুক্ত কিনা?

চিদম্বরম।—ওঃ লাইট-থিওরির কথা ভাবছিলেন? ঐ যে ব্রড্‌কাস্ট্ রে বা সম্প্রচার রশ্মি, তা' থেকে কস্‌মিক্ রে বা বিশ্বরশ্মি পর্য্যন্ত মোট সাতটা রে আছে। সূর্য্যরশ্মি তার মধ্যে তৃতীয়। আমাদের চোখে সূর্য্যরশ্মির বেশী কোন রে ধরতে পারে না।

কমলা।—কস্‌মিক্-রে ধরতে পারে না?

চিদম্বরম।—বুঝি পারে না। পৃথিবীর জীবের জীবনের সঙ্গে সূর্য্যের আলোর সম্বন্ধ বেশী। কারণ আমরা সব ডেনিজিন্স্-অফ্-আর্থ—পৃথিবীর সন্তান।

কমলা।—আমার মনে হয় এই কসমিক্ রে নিত্যই আমাদের দেহ-মনকে বদ্‌লে দিচ্ছে। আমাদের মনই যেন এই কসমিক্ রে—এই বিশ্ব-রশ্মি। এই কসমিক্ রে থেকেই ফুটে ওঠে সোহং-জ্ঞান—পরা জ্ঞান। এই সব রশ্মি আমাদের মনের এক একটা অবস্থার রূপ। সোহং-জ্ঞানের রূপ সাদা, যখন সব এক হয়ে যায়······

চিদম্বরম এই রহস্যময়ী নারীর মধ্যে সেই অক্সফোর্ডের সহপাঠী দার্শনিক কমলার ভস্মাচ্ছাদিত মূর্ত্তিটিকে দেখিতে পাইল। উভয়ের এইরূপ আলোচনা ও সল্লাপের মধ্যেই তাহাদের প্রথম প্রণয়ের সূচনা হয়। যে সম্বন্ধ ভাঙিয়া যাওয়ায়, আজ তাহার জীবন বিফল। চিদম্বরম চুপ করিয়া রহিল।

কমলা আবার বলিতে লাগিল, আচ্ছা, আমাদের এই দেহটা কি ডিজিজ্‌ড্ রোগগ্রস্ত ম্যাটার দিয়ে তৈরী নয়? বিশ্বের শক্তিশালী আলো তাতে লাগলে, আমরা মরে' যাব। জ্ঞানের ভিগারস্ লাইটের স্পর্শ পেলেই আমাদের মৃত্যু হবে......মৃত্যু হবে নিশ্চিত।

চিদম্বরম।—আজ যদি সুস্থ মনে না করেন, তবে পড়াতে যাবেন না। আজ আমরা বিলাতের সেই কলেজ-জীবনের কথা আলোচনা করব। সেই সব কথাই বোধ হয় আপনার মনে হচ্ছে।

কমলা।—দেখুন না কেমন সিম্বল্—শিবের রং সাদা করেছি, তিনি জ্ঞানী, ধ্বংস করেন। শ্রীকৃষ্ণ নীল, ভালবাসার মূর্ত্তি—ক্রিয়েটিভ্!

এই বলিয়া সে আপন মনে হাসিল। তাহার সেই অকারণ হাসির দীর্ঘ লহর কক্ষের আকাশে বাতাসে যেন একটা মোহ-মদিরা ছড়াইয়া দিল।

সে গোলাপ ফুলের তোড়াটি একটি ফুলদানীতে বসাইয়া দিল। যুগল মূর্ত্তিটিকে লইয়া, অর্গানের সম্মুখে পাথরের তাকে উঠাইয়া রাখিল। তাহার পর সুরের তরঙ্গ তুলিয়া অর্গানের সঙ্গে গাহিতে লাগিল—

নিতুই নূতন পীরিতি দুজন
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়।
ঠাঁই নাহি পায় তথাপি বাঢ়য়
পরিণামে নাহি যায়॥
সখি, অদভুত দুহুঁ প্রেম।
এতদিন ঠাঁই অবধি না পাই
ইথে কি করিল হেম॥
চণ্ডীদাস কহে দুহুঁ সম নহে
এথানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে হেন কোন জনে
শুনি না দরবে চিত॥

গানের রেশ তখনও মিলাইয়া যায় নাই। কমলা আনমনে রাধাকৃষ্ণের সেই যুগল মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া বসিয়া আছে। কখন যে ধীরে ধীরে দাদু আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন, সে তাহা জানিতে পারে নাই।

অতি কোমল কণ্ঠে দাদু বলিলেন, দারুণ আঘাত পেয়েছ কমলা। না পাবার কথা তো নয়। কিন্তু আমিও দীনু মিত্তির—কমলার পাতানো দাদু নই। সহজে আমি

ছাড়ব না ঐ রাস্কেলকে। তোমার প্রাণেও যে ব্যথা, আমার প্রাণেও তাই। তুমি সব শুনেছ তা'হলে···

কমলা যেন অভ্যস্তের মত বাহুটি বাড়াইয়া দিল। দাদু অতি স্নেহের সঙ্গে হাতটিতে চুম্বন করিলেন।

চিদম্বরম ঘরের ভিতরেই বসিয়াছিল। সে বারান্দায় আসিয়া মিত্র মহাশয়কে প্রাতরভিবাদন করিল। মিত্র মহাশয় চিদম্বরমকে দেখিয়া যেন একটু আশ্বস্ত বোধ করিলেন। কমলাকে দুঃসম্বাদটি দিতে তিনি দ্বিধা করিতেছিলেন। তবুও একটা লোক আছে, যে সহানুভূতি দেখাইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া এইবার কথাটা বলিতে উদ্যোগ করিলেন।

চিদম্বরম বলিল, আজ মিসেস্ দত্ত'র জন্মদিন। তাই সকালেই দেখা করতে এলাম। কিন্তু আজ ওঁকে ভারি দুর্ব্বল আর বিমর্ষ দেখছি। কারণ জিজ্ঞাসা করতে সাহস করি নি।

দাদু:—ওঃ কারণ জানেন না? এত বড় দুঃসম্বাদ শুনেও যে ধৈর্য্য ধরে আছে, এই যথেষ্ট। দত্ত যে কমলার নামে ডিভোর্স স্যুট্ এনেছে···আর তাতে অকথ্য সব কলঙ্কের কথা লিখেছে। এই যে কাগজে সব লিখেছে...

এই বলিয়া দাদু কাগজখানি চিদম্বরমকে দিলেন।

কিন্তু চিদম্বরম বা কমলা, কেহই এ খবর জানে না। কারণ কেহই এ পর্য্যন্ত খবরের কাগজ পড়ে নাই।

দেখা গেল—কমলার মুখখানি পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার সর্ব্ব শরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। দাদু তাড়াতাড়ি তাহাকে জড়াইয়া না ধরিলে, সে পড়িয়া যাইত।

* * *

বড়দিনের দীর্ঘ অবকাশে কোথাও একদিনের জন্যও কমলা বাহির হইল না। দাদু তাহাকে আসিয়া সান্ত্বনা দেন। তাঁহার কোনও সন্তান নাই—সব কিছু কমলার নামে উইল করিয়াছেন, তাহা বারে বারে শোনান। কিন্তু কমলার চোখের জল থামে না।

নিঃসঙ্গ এক বর্ষার দিনে টুল্‌টিতে বসিয়া, অর্গানটার উপর মাথা গুঁজিয়া সে কাঁদিতেছে। চারটা বাজিয়া গেল—তবু আকাশের অন্ধকার কাটিতেছে না। সদ্য বর্ষণের শেষে উন্মুক্ত জানালার পাখী সকল বাহিয়া জলের বিন্দুগুলি গড়াইয়া পড়িতেছে।

কমলা ধীরে ধীরে মাথা তুলিল। তাকের উপরে মাল্যভূষিত যুগল মূর্ত্তিটির দিকে আর্ত্ত দৃষ্টিতে চাহিল। মূর্ত্তিটিকে আনিয়া সযত্নে অর্গানের উপরে বসাইল। উষ্ণ অশ্রু-ধারায় যেন চোখে কিছুই দেখিতে পাইতেছে না। সে ব্যাকুলতায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যুগল মূর্ত্তিটিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ফুঁপাইতে লাগিল। মূর্ত্তিটিকে আবার যথাস্থানে উঠাইয়া রাখিয়া, তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিল। কি ভাবিয়া আবার সে হাসিল। আবেশময় ভগ্নকণ্ঠে সে গাহিতে লাগিল—

সই, মনে অই ভয় উঠে।
শ্যাম বন্ধুর পীরিতিখানি তিলেক নাহি টুটে॥
গঢ়ন ভাঙ্গিতে বন্ধু আছে কত জন।
ভাঙ্গিলে গঢ়িতে পারে সে বড় সুজন॥
যথা তথা যাই, আমি যত দূর পাই।
চাঁদমুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই॥
এমন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গিবে।
অবলা রাধার বধ তাহারে লাগিবে॥

তাহার এ ব্যাকুল আবেদন কিন্তু শেষ হইল না। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাইয়া সে চুপ করিয়া গেল। মেজর নন্দীর সঙ্গে মিসেস্ সুচিন্তা কুণ্ডু আসিতেছেন। বিলাতী বি-এড্ পাস মিসেস্ সুচিন্তা কুণ্ডু বর্ষীয়সী—শুক্‌নো চেহারা ও রুক্ষ স্বভাব। কমলার কলেজের তিনি প্রিন্সিপ্যাল। কমলা তাঁহাদের নমস্কার করিয়া ঘরে লইয়া গেল। কিন্তু মিসেস্ সুচিন্তা বসিলেন না বা কোন মুখবন্ধও করিলেন না, ক্ষুরধার রসনায় তিনি বলিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন—যে চার্জ্জ দিয়া তাহার স্বামী বিবাহবিচ্ছেদের নালিস করিয়াছেন, তাহার পর কমলাকে কলেজের ছায়া মাড়াইতে তিনি দিতে চান না। তবে তিনি এই জিনিষ কলেজ কাউন্সিলকে জানাবার আগে কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট মেজর নন্দীর পরামর্শমত বলছেন—কমলা এই কাজে ইস্তফা দিক। রিমুভ হওয়ার চেয়ে রিজাইন দেওয়া ভাল, শেষে কোন টিউশনি জুটতে পারে।

এমন করলে যদি খানিকটা ইজ্জৎ বাঁচে, সে দেখতে পারে।

হাঃ—হাঃ—হাঃ শব্দে হাসির তীক্ষ্ণ শেল বর্ষণ করিতে করিতে তিনি যেন একটা পূতিগন্ধময় স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার ভঙ্গীতে চলিয়া গেলেন। মেজর নন্দীও সঙ্গে যাইতেছিলেন। কিন্তু ঘরের মধ্যে একটা আর্ত্তনাদ ও পতনের শব্দ শুনিয়া তিনি দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিলেন। কমলা বিছানার উপর পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে।

সেই যে কমলা শুইয়াছে, আর উঠিতে পারিল না। সে ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। ডাঃ নন্দী বলিলেন—তাহার জ্ঞান আর সবল নাই। ঔষধে বিশেষ কাজ হইতেছে না। কমলা বলিতে আরম্ভ করিল—আমি অন্ধ হয়ে গেছি—দেখতে পাচ্ছি না তো···

ঐ বাঁশীর শব্দ শোনা গেল—চোখে আমার আলো লেগেছে—ঐ যে বৃন্দাবন, ঐ যে গোপীরা—কদম ফুলের গন্ধ আসছে—ময়ূর নাচছে পাখা তুলে'!···

দাদু।—ডাঃ নন্দী ওর জ্ঞান কি ফিরে আসছে? বেশ কথা বলছে যে!

ডাঃ নন্দী।—ওর মন-গড়া জগৎ-সৃষ্টির একটা থিওরী! অজ্ঞান হবার সময়ে এই ভাবটাই ওর মনে দম্ ধ'রে ছিল বোধ হয়—এটা তারই ইফিউশন্। মৃত্যুর আগে এমনতর জ্ঞান হয়—শেষ কথা বলার জন্যে।

কমলা আবার বলিতে লাগিল—ঐ যে ভোগের মূর্ত্তি নীল, তার পাশেই প্রীতির মূর্ত্তি হলদে। নীলকে নৈলে প্রকাশ করত কে?

এই বলিয়া কমলা গান গাহিতে লাগিল—

পিরীতি-সাধন বড়ই কঠিন<br>
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।<br>
দুই ঘুচাইয়া এক-অঙ্গ হও<br>
থাকিলে পিরীতি আশ॥

গান গাহিতে গাহিতে কমলার স্বর পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি গিয়া ডাঃ নন্দী তাহার হাত দেখিলেন—বুকে যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলেন।

ডাঃ নন্দী।—এইবার বুঝি দম্ ফুরিয়ে এল। হার্টের অবস্থা খুব খারাপ। হঠাৎ কোন উত্তেজনায় হার্ট ফেল করা সম্ভব।

দাদু।—এই খেয়ালী দামাল মেয়েটার মধ্যে ছিল অতৃপ্ত ভালবাসা—রোমান্স তাকে পেয়ে বসেছিল। শেষে সেই রোমান্স নিয়েই সে চলে যাচ্ছে। মনের মানুষ খুঁজে' পেলে না।

এই বলিয়া দাদু মিত্তির কাঁদিতে লাগিলেন। কমলার অনেক বন্ধুবান্ধব কাছে বাসিয়া আছে।

হঠাৎ চড়াৎ করিয়া একটা মেঘ-গর্জ্জন হইল। যেন আকাশ ফাটিয়া একটা আগুনের দলা নিকটে পড়িল। সকলের চোখ ঝলসাইয়া গেল। সেই আলোয় দেখা গেল—প্রবল বৃষ্টিতে ছুটিয়া আসিতেছে চিদম্বরম্।

এইবার কমলার চক্ষুতারকা নীথর নিশ্চল হইয়া আসিল।

# ক্ষুদ্রের শক্তি

শ্রীকমলেন্দু চক্রবর্ত্তী

কর্ম্ম কভু তুচ্ছ, ঘৃণ্য, অকর্ম্মণ্য নহে<br>
তারো মাঝে রুদ্রশক্তি সুপ্ত হয়ে রহে।<br>
সামান্য সূচের যেথা বড় প্রয়োজন<br>
শাণিত অসির তথা ব্যর্থ পরাক্রম।

ছয়বার যে নৃপতি সংগ্রামে হারিল<br>
ঊর্ণনাভ জয়পন্থা তারে প্রদর্শিল।<br>
দুস্তর জলধি বাঁধে শক্তি আছে কার<br>
কাঠবিড়ালেরা যদি নিত না সে ভার?

# শক্তি-তত্ত্ব

( অপ্রকাশিত রচনা )

৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

পদ্মপুরাণ বলিতেছে—

আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবীং শিবং যথাক্রমম্।
নারায়ণং বিশুদ্ধাখ্যং...... ইত্যাদি ॥

অর্থাৎ—আদিত্য, গণনাথ, দেবী, শিব ও নারায়ণ, ইঁহারা পঞ্চদেবতা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের গণেশখণ্ডে এই পঞ্চদেবতা-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

নারায়ণে গণে শিবেঽম্বিকায়াং ভাস্করে তথা।
ভেদাভেদো ন কর্তব্যঃ পঞ্চদেবসমুস্তবে ॥

তন্ত্রে পঞ্চদেবতাদের সকলেই স্বয়ংসিদ্ধ। দেবীও অনন্যাপেক্ষীভাবে স্বয়ংসিদ্ধা। দেবী স্বয়ং পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও মায়া উভয়ই। তাঁহাকে শুধু শিবশক্তি বলিলে, তাঁহাতে যেন সাংখ্যকথিত প্রকৃতিভাব; পক্ষান্তরে শিবে পুরুষের ভাব আরোপিত করা হয়। দেবীমাহাত্ম্যে বিশেষভাবেই দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি স্বয়ংসিদ্ধা, অর্থাৎ তিনি পুরুষও যেমন, প্রকৃতিও তেমনি। তাঁহার সম্বন্ধে কেবল হিমালয়-দুহিতা পার্বতী, উমা বা দাক্ষায়ণী বা ঈশানী বলিয়া ধারণা করিলে, তাঁহার একটী দিক্ মাত্র দেখা হয়। দেবী ভাগবতের প্রথম স্কন্দের সপ্তমাধ্যায়ে (২৩) মধুকৈটভবধের পূর্বে ব্রহ্মাকৃত স্তোত্রে আছে—

অহং বিষ্ণুস্তথা শম্ভুঃ সাবিত্রী চ রমাপ্যুমা।
সর্বে বয়ং বশেঽপ্যস্তাঃ নাত্র কিঞ্চিদ্বিচারণা ॥

এখানে দেখি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শম্ভু এবং তাঁহাদের শক্তিগণ ক্রমান্বয়ে সাবিত্রী, রমা এবং উমা—ইঁহারা সকলেই দেবীর বশ; সুতরাং হিমাচলসুতা ঐ উমা বা পার্বতী দেবী দুর্গা নহেন। কথিতা দুর্গা দেবী মাহেশ্বরীও ঠিক নহেন। 'চণ্ডী'তে রক্তবীজ-বধের বর্ণনায় আছে—

ব্রহ্মেশগুহ-বিষ্ণূনাং তথেন্দ্রস্ত চ শক্তয়ঃ।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈঃ চণ্ডিকাং যযুঃ ॥
যস্ত দেবস্ত যদ্রূপং যথাভূষণ-বাহনম্।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ ॥
হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে ॥

মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূল-বর-ধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা ॥

*   *   *

তথৈব বৈষ্ণবী শক্তির্গরুড়োপরি সংস্থিতা।
শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-খড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ ॥

অর্থাৎ—রণক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ সকল দেবতাশক্তি চণ্ডিকার নিকট আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ত্রিমূর্তিসকলের শক্তি, অর্থাৎ ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুর শক্তি গরুড়স্থা বৈষ্ণবী এবং ত্রিশূল-সর্পার্ধচন্দ্রধারিণী বৃষভারূঢ়া মাহেশ্বরীও আসিলেন। কিন্তু দেবী দুর্গা এই শ্লোকোক্তা মাহেশ্বরী নন। 'চণ্ডী'র প্রতিপাদ্য দেবতা ঐ মাহেশ্বরী হইতে অন্যা এবং বিশদভাবে তদপেক্ষা প্রধানা হইবেন। ঐ প্রধানা দেবী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের প্রসবিত্রী। কোন এক শিবের ( শিব বহু আছেন ) শক্তি হইতেছেন, উদ্ধৃত শ্লোকের কথিত মাহেশ্বরী। 'চণ্ডী'তে ব্রহ্মাকৃত স্তবে আছে—

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহ-মীশান এব চ।
কারিতাস্তেযতোঽতাস্ত্বং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, 'বিষ্ণুকে, আমাকে এবং মহেশ্বরকে যে তুমি দেহ দান করিয়াছ, সেই তোমাকে কে স্তব করিতে পারে?' সুতরাং মহেশ্বরের শক্তি ঐ মাহেশ্বরী দুর্গার অংশভূতামাত্র। তিনি দুর্গার একটী মহতী বিভূতি। মাহেশ্বরীর নিজের তো কথাই নাই—জগতে স্থূল, সূক্ষ্ম, ছোট-বড় যাহা যেখানে আছে, সবই মা দুর্গার অভিব্যক্তি বলা যায়। তাই ব্রহ্মা ঐ স্তবকালে আরও বলিয়াছেন—

যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্ত সর্বস্ত যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা ॥

অর্থাৎ, হে অখিলাত্মিকে! যাহা কিছু সৎ এবং অসৎ বলিয়া আছে, তুমিই সে-সকলের শক্তিরূপিণী অর্থাৎ প্রাণময়ী; অতএব তোমার স্তব কি আমি করিতে পারি?

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, দেবীর সহিত তুলনায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সকলেই হইতেছেন ক্ষুদ্র প্রাণী। তবে

তাঁহারা সকলে দেবীর প্রধান বিভূতি বলিয়া মানুষের অপেক্ষা এত বড় যে, আমরা তাহার ধারণা করিতে পারি না। তন্ত্র বলেন—দেবীর শক্তিতেই ত্রিমূর্তি ব্রহ্মাদি শক্তিমান্; অতএব ব্রহ্মা প্রভৃতি নগণ্য, যেহেতু শক্তিহীন হইলে তাঁহারা সকলেই শববৎ—

ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং ন তু ব্রহ্মা কদাচন।
অতএব মহেশানি ব্রহ্মাপ্রেতো ন সংশয়ঃ॥

ঠিক ঐরূপ কথাই বিষ্ণু-শিব-সম্বন্ধেও আছে। আবার—

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
এতে সর্বে ক্ষুরাঃ প্রোক্তাঃ ফলকন্তু পরঃ শিবঃ॥

অর্থাৎ, পঞ্চপ্রেত—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বর ইহারা চারি কোণে চারি জন ও মধ্যস্থলে সদাশিব যেন দেবীর আসনের পাঁচটী খুঁটি ও তদুপরি দেবী স্বয়ং আসীনা।

এখানে রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ও পরমশিব এই কয়টী শিবের নাম উক্ত হইয়াছে। উমা, ঈশ্বরী, মাহেশ্বরী প্রভৃতি ঐ সকল শিবের শক্তি; উঁহারা সকলেই দেবীরই অংশভূতা।

পুরাণে আছে (মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৯০ অঃ ২ শ্লোক)—শুম্ভের সহিত দেবীর যুদ্ধকালে শুম্ভ দেবীকে বলিয়াছিলেন—

বলাবলেপদুষ্টে! ত্বং মা দুর্গে! গর্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী॥

অর্থাৎ—দুর্গে, তোমার নিজস্ব তো নাই, তুমি অন্য দেবশক্তিদিগের বল আশ্রয় করিয়া, তাহারই গর্বে যুদ্ধ করিতেছ। ইহা শুনিয়া দেবী উত্তর করিলেন—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতাং দুষ্ট! ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥—ঐ, ৩।

অর্থাৎ—এই জগতে একমাত্র আমিই আছি। আমার তুল্য দ্বিতীয় আর কে আছে? এই দেবশক্তিগণ, ইহারা আমার ব্যষ্টিভাবের বিভূতিমাত্র। ইহারা সকলেই আমার দেহে প্রবেশ করিতেছে। তাহাই ঘটিল; তখন যুদ্ধক্ষেত্রে দেবী সর্বদেবশক্তির সমষ্টিভাবে একাকিনী রহিলেন।

সুতরাং যাহা কিছু সবই দেবীর ব্যষ্টিভাব, আর দেবী স্বয়ং সর্বসমষ্টি। এক কথায় বলা যায়, একাধারে দেবী ব্যষ্টিও যেমন, সমষ্টিও তেমনি। রক্তবীজের যুদ্ধে আগতা যে মাহেশ্বরীর বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী কথা বলা হইয়াছে, তিনি মার অসংখ্য বিভূতির—বিশেষতঃ প্রধানা অষ্টশক্তির অন্যতমা। এখন বেশ বুঝা যাইবে যে, মা ঠিক ঐ মাহেশ্বরী প্রভৃতি কেহ নহেন। আবার, যখন ঐ সকল বিভূতি তাঁহার নিজেরই, তখন স্থূলভাবে বলিতে গেলে আমাদের পূর্ব কথামত তিনি মাহেশ্বরীও বটেন।

মহাপূজাকালে দেবীর স্তবে আছে—

দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াম্।
সর্বলোক-প্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদা উমাম্॥

অর্থাৎ দেবী ব্রহ্মার শক্তি 'ব্রহ্মাণী' ও ত্রিমূর্তির অন্যতম শিবের শক্তি 'উমা'।

এই স্তবেরই অন্যত্র তাঁহাকে বিন্ধ্যনিবাসিনী বলা হইয়াছে। এই বিন্ধ্যস্থা দেবীও দুর্গা দেবীর অংশমাত্র—দুর্বাসা মুনির বিবাহিতা। বিন্ধ্যস্থা দেবী যেমন ভগবতী দুর্গার অংশ, দুর্বাসাও তেমনি শিবের অংশ (বিষ্ণুপুরাণ)। বিন্ধ্যস্থা দেবী দুর্গা দেবীর ভবিষ্যদবতারগণের অন্যতমা বলিয়া কথিতা হইয়াছেন। যামলতন্ত্রে ঐ কথা আরও বিশদভাবে বুঝান আছে। সুতরাং ইহা স্বীকার্য যে, অবতারসকল মৌলিক বস্তু নহেন, তাঁহার অংশ, অংশাংশ, এইরূপ কিছু। দেবী নিজেই বলিয়াছেন—'দ্বিতীয়া কা মমাপরা'। এই কারণেই কি 'চণ্ডী' দেবী দুর্গার পর পূর্ণভাবে আর কাহাকেও স্বীকার করেন নাই; 'চণ্ডী'র মতে দেবী ব্রহ্মের ন্যায়, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। তন্ত্রেরও সেই কথা।

আমরা জানি, প্রকৃতি জড়া, পুরুষ চিৎ। কিন্তু দুর্গা দেবী উভয়ই, আবার তিনি ব্রহ্মবস্তুও। সপ্তশতী-পাঠের পূর্বে পাঠ্য বৈদিক দেবীসূক্তে ঐ সকল কথার উল্লেখ আছে। মূল 'চণ্ডী'তেও সে-সব কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। যেমন—ব্যক্তা ও অব্যক্তা, এই উভয় প্রকার প্রকৃতি—বিদ্যা ও অবিদ্যা একাধারে মহামায়া। দেবী সকল ভূতেরই চেতনাস্বরূপা। মা এক দিকে নির্বিকল্পা, অপর দিকে সবিকল্পাও। কিন্তু চেতনা বা চৈতন্য কি ঠিক চিদ্বস্তু নহে, উহা কি চিত্তের ভাবমাত্র? ইহার উত্তর 'চণ্ডী'তে আছে—

চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।

অর্থাৎ দেবী স্বয়ং চিৎ। কারণ, ন্যায়দর্শনের মতে 'চিতি' অর্থে নিত্যজ্ঞানবান্ পরমাত্মা এবং এই পরমাত্মাই পরমব্রহ্ম —একমেবাদ্বিতীয় ভগবান্। সুতরাং দেবী পরমাত্মারই পর্য্যায়ভুক্তা। আবার—চণ্ডীর টীকাকার নাগোজীর মতে 'চিতিঃ চিচ্ছক্তিঃ'। এক্ষেত্রে, দেবী শক্তিরূপিণী পরমা-প্রকৃতি, এবং তিনিই ব্রহ্মের সহিত অভিন্না।

এই দেবী দুর্গাই অজা। দেবগণের ইচ্ছাশক্তির, প্রকারান্তরে তাঁহার নিজেরই ইচ্ছাশক্তির আকর্ষণে দিগন্ত-ব্যাপিনী জ্বালার মধ্যে তিনি রূপপরিগ্রহ করেন। কারণ—

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥

দেবী পূর্ণভাবেই স্বয়ংসিদ্ধা। তবে প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা কথা বলিব। 'চণ্ডী'তে আছে, শুম্ভনিশুম্ভ-বধের জন্য দেবতারা হিমালয়ে তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তপস্যায় পার্বতী সেখানে আসেন। তখন পার্বতীর দেহ-কোষ হইতে দেবী কৌষিকী বা শিবা নির্গতা হন। তাঁহারই সহিত শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধের সময়ে ঐ দেবীর ললাট-ফলক হইতে রক্তবীজ-বধকারিণী চামুণ্ডা কালিকার এবং দেহ হইতে শিবদূতীর আবির্ভাব হয়। কৌষিকী শুম্ভ-নিশুম্ভের বিনাশসাধন করেন।

এখানে হয়তো এইরূপ কথা উঠিতে পারে যে, এই দেবী দুর্গা যদি হিমালয়ের কন্যা না হইবেন, তবে দেবতাদের হিমালয়ে তপশ্চর্যার কারণ কি এবং পার্বতী যিনি দেবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন তিনিই বা কে? ইহার উত্তর এই যে, 'পার্বতী হইতেছেন হিমালয়ের কন্যা সেই উমা, এছাড়াও তিনি দেবী দুর্গার অবতার বা খুব বড় রকমের বিভূতি। মূল বস্তু হইতে যাঁহারা অবতরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে মূল বস্তুর অংশ কাষ্ঠকলাদি-হিসাবে বিভিন্নতা থাকে।' পার্বতী, শিবদূতী, কৌষিকী, চামুণ্ডাদির মধ্যেও ঐরূপ বিভিন্নতা বুঝিতে হইবে। হিমালয় তপশ্চরণের উপযুক্ত স্থান বলিয়া দেবগণ তথায় দেবী দুর্গার আরাধনা করিলে, তাহারই ফলে দেবীর অবতাররূপা পার্বতী সেখানে যান। যেখানে অবতারীর প্রয়োজন, সেখানে স্বয়ং অবতারীরই আবির্ভাব হয়, নচেৎ তাঁহার দেহভূত অবতারবিশেষ কেহ আসেন।

'চণ্ডী'তে মধুকৈটভ-বধ, মহিষাসুর-বধ ও শুম্ভনিশুম্ভ-বধ, এই তিনটী অসুরবধের আখ্যান আছে। স্বয়ং দেবী দুর্গা হইয়া মহিষাসুর বধ করিয়াছিলেন; কারণ শিব জম্ভাসুরের পুত্র মহিষাসুররূপে জন্ম-পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অসুরদেহ ঘুচান অবতারের কার্য নহে বলিয়া দেবী স্বয়ং উহা করিয়াছিলেন, মধুকৈটভ-বধের হেতুভূতা হইতেছেন দেবী দুর্গার অংশভূতা মহাকালী; শুম্ভ-নিশুম্ভবধকারিণী কৌষিকীও ঐরূপ অংশরূপা।

মহাকালী বা কৌষিকী যে স্বয়ং পরাদেবী ভগবতী দুর্গা নহেন, ইহার প্রমাণ যামলতন্ত্রান্তর্গত 'চণ্ডী'র রহস্যত্রয়ের অন্যতম প্রাধানিক' ও 'বৈকৃতিক' রহস্যেও বিশেষ ও বিশদভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। এই দুই 'রহস্যে' দেবী-প্রসঙ্গের অবতারণায় এইরূপ বলা হইয়াছে যে, ত্রিগুণময়ী পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী হইতেছেন সকল অবতারের আদি; তিনি ব্যক্তভাবে ও অব্যক্তভাবে জগন্ময়ী; তিনি সৃষ্টির আদিতে জগৎ শূন্য দেখিয়া কেবল তমোগুণাবলম্বনে মূর্ত্ত্যন্তর ধারণ করিলেন; সেই তামসী নারীশ্রেষ্ঠা মহালক্ষ্মীকে বলিলেন, 'মা, আমার নামকরণ কর এবং আমার কর্ম কি বল, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।' তখন মহালক্ষ্মী সেই নারীশ্রেষ্ঠা তমোময়ীকে বলিলেন, 'তোমার নাম মহামায়া, মহাকালী, মহামারী, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, একবীরা এবং দুরতিক্রমা কালরাত্রি; এই নামসকল তোমার কর্ম সূচিত করিতেছে।' তাঁহাকে এই বলিয়া মহালক্ষ্মী অতি শুদ্ধসত্ত্বগুণদ্বারা চন্দ্রদীপ্তিধারিণী অন্য এক মূর্তি ধারণ করিলেন এবং তাঁহার নামাদি বলিলেন। ঐ তমোগুণাত্মিকা মহাকালী হইতেছেন হরির যোগনিদ্রা। মধুকৈটভ-নাশার্থ কমলাসন ব্রহ্মা ইহার স্তব করিয়াছিলেন। সর্বদেবতার শরীর হইতে যে অমিত-প্রভাবতী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন সেই ত্রিগুণাত্মিকা মহালক্ষ্মী—সাক্ষাৎ মহিষমর্দিনী। এই ঈশ্বরীই সর্বদেবময়ী, সত্ত্বগুণশালিনী।

মহালক্ষ্মীর দেহ হইতে উৎপন্না মধুকৈটভহন্ত্রী মহাকালী এবং শুম্ভবিনাশিনী সরস্বতী উভয়েই অবতারমাত্র।

নাগোজীও তাহাই বলেন। মহাকালী দেবী দুর্গাকে মাতৃ-সম্বোধন ও পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়াছেন। স্বয়ংসিদ্ধ অবতারী ও অবতারের এইরূপ সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। এখন কথা হইতে পারে, যদি শুম্ভাসুরঘাতিনী দেবী দুর্গার অবতারই হইবেন, তবে তিনি শুম্ভকে 'দ্বিতীয়া কা মমাপরা' কিরূপে বলিতে পারেন, কারণ দুর্গা দেবীকেই তো আদি বা আদ্যা বলি। জগতে জীবগণের মধ্যে দেহধারী অবতারগণই শ্রেষ্ঠ, কাজেই ঐ প্রকার 'দ্বিতীয়া কা' কথা বলা অসঙ্গত বোধ হয় না। তদ্ভিন্ন অবতারগণ মূল বস্তুর এত নিকট যে, তাঁহারা সকলে ঐ মূল বস্তুর প্রেরণাবশে একরূপ তদ্ভাবেই ভাবিত। নচেৎ হয় তো তাঁহাদের কার্য করা অসম্ভব হয়।

# নদীয়ার হোলবোল

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

পৌষ মাসের শস্যোৎসব উপলক্ষে বাংলার সর্ব্বত্র কৃষকেরা যে আনন্দ-গান করিয়া থাকে, হোলবোল তাহার অন্তর্গত। হোলবোল দেশজ শব্দ—ইহার অর্থ গোলমাল। প্রাকৃতে আমরা ইহার রূপ পাই "হল্লবোল।" সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে যে আনন্দোৎসবের প্রচলন আছে, তাহার মধ্যে গোলমালের ভাগই বেশী। কাঁসর-ঘণ্টা বাজাইয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াসও সে জন্য। চৈত্র মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্বে যে গাজন-উৎসব হয়, তাহা গর্জ্জনেরই নামান্তর মাত্র। এ গর্জ্জন সৃষ্টির আদিতে উদ্ভূত হইয়াছিল কিনা, তাহা দার্শনিকেরা বিচার করিবেন। আমরা কিন্তু দেখিতে পাই, হৈ-চৈ না করিলে সাধারণের আমোদ-প্রমোদ জমাট বাঁধে না।

হোলবোলের ছড়া বলিয়া নদীয়া অঞ্চলের গ্রাম্য কৃষকেরা পৌষ মাসের সন্ধ্যায় ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাহারা "হোল-বোল" শব্দ করিয়া নানাবিধ ছড়া বলিয়া থাকে। আমরা এরূপ রীতি উত্তরবঙ্গে, দক্ষিণবঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে দেখিয়াছি। উত্তর বঙ্গে শস্যোৎসবের ছড়াগুলিতে শস্য-দেবতা সোণা রায়ের নামই বেশী—হিন্দুরাই সাধারণতঃ সোণা রায়ের নাম করিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে। মুসলমানেরা করিয়া থাকে সোণাপীর ও মাণিকপীরের গান। সোণা রায়কে আবার ব্যাঘ্র-দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। আমরা উত্তরবঙ্গে সোণা রায়ের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাহাতে তিনি ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত আছেন। পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায়ও আমরা সোণা রায়ের গানের নিদর্শন পাই। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, সোণা রায়ের ছড়া-গান উত্তরবঙ্গের ও পূর্ব্ববঙ্গের অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাহাকে কাল্পনিক বলিয়া বিচার করিবার পূর্ব্বে সূক্ষ্ম দৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের মনে হয়, সোণা রায় নামে কোন শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন, যিনি নিজের ক্ষমতাবলে কতকটা দেবত্বের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গে যেমন আমরা সোণা রায়ের নাম পাই, দক্ষিণ বঙ্গের পল্লী অঞ্চলেও সেইরূপ দক্ষিণ রায়ের নাম পরিচিত। কবি কৃষ্ণরাম দাসের "রায় মঙ্গল" গ্রন্থে দক্ষিণ রায়ের উল্লেখ আছে। ইনি সুন্দরবনবাসী দেবতা—ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে চড়িয়া বেড়াইতেন। দক্ষিণবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে শস্যোৎসব উপলক্ষে দক্ষিণ রায়ের মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিবার রীতি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। গ্রাম্য কৃষকেরা বাঘের মূর্ত্তি লইয়া গৃহস্থের বাড়ী ঘুরিয়া শস্যোৎসবের ছড়া বলিয়া বেড়াইত। দক্ষিণ বঙ্গের পল্লী হইতে আমরা "ধলাই গান" নামে কতকগুলি ছড়া উদ্ধার করিয়াছি। মোটের উপর শস্যোৎসবের ছড়াগুলি এমন এক সময়ের স্মৃতি বহন করিয়া আনে, যে-সময় বাংলাদেশ অরণ্যাকীর্ণ ছিল। তখন ব্যাঘ্র-ভীতি বিশেষভাবে দেখা দিয়াছিল। সে কারণ ব্যাঘ্রদেবতা কল্পনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। ফরিদপুরে যে "অরণ-গান" প্রচলিত, তাহা অরণ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহার মধ্যে ভুট্টা, গমের ছাতুর কথা থাকিলে, হিন্দুস্থানী প্রভাব বলিয়া

ধরিবার কারণ নাই। বাঙ্গালী গৃহস্থ অনেক দিন হইতে ছাতুর গঠনপ্রণালী অবগত আছে; সে জন্যই তাহা শস্যোৎসবের ছড়াগুলির মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

যাই হউক, শস্যসম্পদ্‌কে উপলক্ষ্য করিয়া নদীয়ার পল্লী অঞ্চলে যে সব ছড়া প্রচলিত, তাহাই আমাদের আলোচনার প্রধান বিষয় বস্তু। শস্যোৎসবের ছড়ার সঙ্গে কতকগুলি অবান্তর ছড়া আবৃত্তি করিতে শোনা যায়। গৃহস্থের মনোরঞ্জন করিবার জন্যই যে সে সব ছড়া বলা হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অনেক সময়ে গ্রাম্য কোন কৃপণ লোককে লক্ষ্য করিয়া কৃষক-বালকেরা উপস্থিত মতে ছড়া বাঁধিয়া বাড়ী-বাড়ী ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়—তাহা বিশেষ উপভোগ্য হইয়া থাকে। নদীয়া জেলা হইতে সংগৃহীত কতকগুলি শস্যোৎসব সম্বন্ধীয় "হোলবোল" ছড়া এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে—

হোলবোল বল্লে
লক্ষ্মী ঠাকুর কল্লে
লক্ষ্মী ঠাকুর দিল বর।
ধান চাল বের কর॥
ধান থাকৃতে দিল কড়ি
তার দুয়োরে সোণার দড়ি॥
সোণার দড়ি পাক-পাড়া।
তিনশ আঠার ঘোড়া॥
ঘোড়ার ঘোড়ায় বুঝ্‌ব।
চাল কাঠা দুই কুটব॥
চাল করে আগ্নি গুঁজি।
সোণার লাঙ্গল পেড়ে গুঁজি॥
খো-খো-খো লাঙ্গল খো।
গাড়ুর জলে হাত-পা ধো॥
কেটে আনগে মানের পাত।
তাতে দেব অম্বল ভাত॥
অম্বল ভাতে নাইক নুন।
শত্রুর মুখে কালি চুণ॥
(হোলবোল)

যে দেবে মুঠো মুঠো
তার হবে হাত ঠুটো॥
যে দেবে কুলো কুলো।
তা হবে বুক খুলো॥
যে দেবে পালি পালি
তার হবে গোলাবাড়ী॥
যে দেবে কাঠায় কাঠা
তার হবে সাত বেটা॥
এক কাঠা চাল ন'টা বড়ি
খেয়ে-দেয়ে আনন্দ করি॥

এইরূপ আনন্দ করিবার প্রথা বাঙ্গালীর নিজস্ব। বাঙ্গালী বার মাস এইরূপ আনন্দ-গানে মাতিয়া থাকিতে পারে—ঘরে অন্ন-বস্ত্রের অভাব না হইলে, তাহার আনন্দ-গানের বিরাম হয় না। বার মাসের পার্ব্বণাদির কথা হোলবোল ছড়ার মধ্যে স্থান পাইয়াছে—

আশ্বিনে অম্বিকে পুজো, পড়ে মোষ পাঠা।
কার্ত্তিক মাসে কালী পুজো ভাই-দ্বিতীয়ার ফোঁটা॥
অগ্রাণ্ মাসে নবান্ন আমন ধান কেটে।
পৌষ মাসে পৌষ বাউরি বাড়ী-বাড়ী পিঠে॥
মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী ছেলের হাতেখড়ি।
ফাল্গুন মাসে দোল-পূর্ণিমা ফাগ-ছড়াছড়ি॥
চোত্ মাসে সন্ন্যাসীরা দেয় গাজনের সাড়া।
বৈশাখ মাসে পুণ্যি করে গাছে বেঁধে ঝোরা॥
জ্যৈষ্ঠি মাসে ষষ্ঠী পুজো জামাই আনাআনি।
আষাঢ় মাসে রথের দড়া করে টানাটানি॥
শ্রাবণ মাসে মা গঙ্গা গর্ভে দিলেন স্থল।
ভাদ্র মাসে মা গঙ্গা করিলেন রসাতল॥

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, পৌষ মাসের শস্যোৎসব উপলক্ষে অনেক রঙ্গ-রসের ছড়া আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। শ্লীলতা রক্ষা করিয়া রঙ্গরসের উল্লেখ করিবার ক্ষমতা পল্লীবাসীর যথেষ্ট আছে। সভ্যতার কাষ্ঠহাসি সেখানে নাই, সেখানে আছে পল্লীবাসীর স্বভাবসরল রসঘন মনের পূর্ণ অভিব্যক্তি। হোলবোল ছড়ার মধ্যেও আমরা তাহার নিদর্শন পাই। "শিশুপাল রাজার গান" এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। শিশুপাল রাজা ঘটা করিয়া রুক্মিণীকে বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ঘাটের পথে রুক্মিণীকে পাইয়া তাঁহাকে লইয়া অন্তর্দ্ধান করেন। শিশুপাল নারদের প্ররোচনা-বলে "ডুলি শয্যা" করিয়া বাড়ী পৌঁছিলে, নূতন বউ দেখিবার কৌতূহলে সকলে বাহিরে আসিয়া দেখে "গোঁফ-আলা" বউ বসিয়া আছে।

*　　*　　*

পঞ্চম বৎসর কন্যার হইল যখন।
সসাগরা পৃথিবী করিল নিমন্ত্রণ॥
পৃথিবীর রাজা এল অদ্ভুত অদ্ভুত।
শিশুপাল রাজা এল হাতে বেঁধে সুত॥
মনে মনে যুক্তি করে নারদ তপোধন।
মকঃস্বলে পত্র পাঠায় দ্বারকাভুবন।
সেই পত্র পাইলেন কৃষ্ণ তপোধন।
কৃষ্ণ তপোধন তখন সৈন্যপথে রয়॥
রুক্মিণীকে চান করিতে ঘাটে ল'য়ে যায়।
একা পেয়ে রুক্মিণীকে রথে তুলে নেয়॥
ঘন ঘন বাড়ি মারে অষ্ট ঘোড়ার গায়।
শিশুপাল বাড়ী যাবে ভাবে মনে মনে॥
রুক্মিণী হ'ল না আমার যাইব কেমনে।
নারদের কথা—শিশুপাল তাহে দিল সাই।
ডুলিশয্যা করে (চলে) যাও, কেউ না দেখতে পায়॥
শিশুপালকে পিছে রেখে নারদ আগে গেল।
বিয়ে ক'রে আস্‌ছে শিশুপাল এই কথা কহিল।
আজ শুভদিন, শিশুপাল বা আস্‌ছে বিয়ে ক'রে॥
ডগর কাড়ার বাদ্য বাজাও নগরে নগরে।
শিশুপালের ভগ্নী এল দিয়ে লাফ-লোফ॥
ডুলির কাপড় তুলে দেখে বৌএর মুখে গোঁফ।
আঃ ছিঃ ছিঃ, হল কি, মরি লাজে লাজে॥
গোঁফ-আলা বৌ কি আজি দাদার আমার সাজে।
রুক্মিণীকে হরে নিল উঠল এই কথা।
মধ্যে মধ্যে নারদ বলে খুব বাজা, খুব বাজা।
(হোলবোল)॥

আর একটি ছড়ার মধ্যে আছে তামাক লইয়া শাশুড়ী-বৌএর দ্বন্দ্বের কথা। ইহা পরবর্ত্তীকালের। এই ছড়ায় স্ত্রী-সভ্যতার উপর কটাক্ষ করা হইয়াছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে মেয়েরা যেন আর পুরুষকে মানিতে চাহে নাই। শাশুড়ীর দাপটে তাহারা আর গ্রাহ্য করে নাই।

শুন সবে কলিতে আশ্চর্য্য কাণ্ড হ'ল।
তামাক নয়ে শাউড়ি-বৌএ দ্বন্দ্ব বেধে গেল॥
দূরে যাক্ সে সব দ্বন্দ্ব, পয়ারের ছন্দ, শুন, একটু বলি।
মেয়েলোকে তামাক পোড়ায় তাও জানো সকলি॥
একদিন বৈকালেতে হাটে যেতে পয়সা নিচ্ছে গুণে।
বৌটি বল্‌ছে—"ঠাক্‌রুণ গো, তামাক যেন কেনে॥
আগে তাই মনে করে—ঘরে পোড়া তামাক নাই।
দাঁত শূলে মরে গেলাম, ভাত খাব কি ছাই॥
কাল সকালে বিছানাতে দিয়েছিলাম দাঁতে।
দাঁত শূলে মরে গেলাম ইচ্ছা নাইকো ভাতে॥"

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত করিয়া বলিবার পরও তাহার তামাক আসে নাই। তখন যে অবস্থা হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। স্বামী হয়ত তামাক না আনিবার অপরাধের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়াছে। বৌ তখন বলে—

"কোথায় গ্যাছে পোড়ামুখো, আসুক আজি বাড়ী।
রাঁধাবাড়ার পোড়া কপাল, ভেঙ্গে গেছে হাঁড়ি॥"

তখন পাড়াশুদ্ধ লোক সেই ব্যাপার লইয়া টিপ্পনী করিতে লাগিল। তাহারা নারীপ্রগতির উপর কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। ইহাই তামাকের ছড়ার বিষয়বস্তু।

মেয়েটি সুবোধ ভাল, জানা গেল, লক্ষণযুক্ত আছে।
তামাকের বর্ণনা হ'ল পাড়া শুদ্ধ জুটে।
কেউ বলে হেংলি ভাল, দেখতে কালো, পাতা পরিপাটি।
পূর্ব্ব দেশের কচড়া তামাক—তাতে বড় মাটি॥
কেউ বলে সত্যি দিদি, যে অবধি ভুটেন তামাক এল।
পশ্চিমেতে হনুমান জটা পরে দেখা গেল॥
পান-বুট, বিষকুট বলব কত আর।
লজ্জা রক্ষা করলে দিদি এসে মতিহার॥
মুল্লুকের কর্ত্তা যিনি মহারাণী তিনি মেয়ের রাজা।
এখন গুষ্টিশুদ্ধো দেখতে পাই সবাই তাঁহার প্রজা॥
মহারাণীর সহায় পেয়ে বৌ সকলে সেই মতেতে চলে।
শাউড়ি কিছু বল্‌লে শাসায়—আসুক তোমার ছেলে॥
আমি কি পড়েছিলাম জলে, তাই এনেছ তুলে
নইলে যেতাম ভেসে।
শাউড়ি-বৌএর দ্বন্দ্ব শুনে বাঁচি নাকো হেসে॥

# গান ও স্বরলিপি

## ভজন

( মীরাবাই )

এস গো প্রিয়ের ঘরে
মধুর-ভাষী গো—
স্বরগের চেয়ে বেশী সুখ পাই
তুমি কাছে এলে পরে!
এস তুমি নিঃশঙ্ক,
একা আমি নিঃসঙ্গ,
তনু-মন-ধন, যাহা কিছু মম
সবি দিব পায়ে ধ'রে।

বড়ই আতুর আমি—
—আর বিলম্ব সহে না,
তুমি এলে পরে পুরে যে রঙ্গ
চিত্ত-দহন রহে না।
তোমারি কারণে সব ত্যজিয়াছি
সব সুখ সব সজ্জা—
মীরা তব দাসী জনম জনম
চেয়ে আছে আশাভরে।

কথা—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি. এল., বাণীকণ্ঠ

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী নীলিমা ঘোষ

II সা গা গা | গা গা গা | মগা -রগা -া | পা -া -া I
এ স গো | প্রি য়ে র | ঘ০ ০০ ০ | রে ০ ০

*I সা গা গরা | ররা -গা রা | সা -া -া | -া -া -া I
ম ধু র০ | ভা০ ০ ষী | গো ০ ০ | ০ ০ ০

I সা রা রা | -রা রা গা | সা রগা গা | -গা গা -গা I
স্ব র গে | র্ চে য়ে | বে শী০ সু | খ্ পা ই

I মা ধা পা | মা গা রগপা | মা গা -া | -া -া -রসা I
তু মি কা | ছে এ লে০০ | প রে ০ | ০ ০ ০০

I সা গা গা | ররা -গা রা | সা -া -া | -া -া -া II
ম ধু র | ভা০ ০ ষী | গো ০ ০ | ০ ০ ০

II গা পা পা | পা পা -া | মপা -ধা পা | -া -া -া I
এ স তু | মি নিঃ ০ | শ০ ০ ব্দ | ০ ০ ০

I ধা র্সা র্সা | র্সা র্সা -া | নর্সা -র্রা র্সা | -া -া -া I
এ কা আ | মি নিঃ ০ | স০ ০ ঙ্গ | ০ ০ ০

I পা ধা র্সা | র্সা র্সা র্সা | না র্রা র্সা | না ধা না I
ত নু ম | ন ধ ন | যা হা কি | ছু ম ম

I পা -ধা পা | মা গা রগপা | মা গা -া | -া -া -রসা I
সব্‌ ই দি | ব পা য়ে০০ | ধ রে ০ | ০ ০ ০০

* I "মধুর ভাষী গো" II পূর্ব্বের মত

II প্‌া ধ্‌া সা | সা সা সা | ন্‌সা -রা -া | সা -া -া I
ব ড় ই | আ তু র | আ০ ০ ০ | মি ০ ০

I সা -রা রা | রা -া রা | সা রগা রা | -রগা -া -া I
আ র্‌ বি | ল ০ ম্ব | স হে০ না | ০ ০ ০

I গা মা পা | পা পা ধা | ধা র্সা না | ধা -পা পা I
তু মি এ | লে প রে | প রে যে | র ০ ঙ্গ

I পা -ধা পা | মা গা গা | সরা সরগা রা | -রসা -া -া II
চি ০ ত্ত | দ হ ন | র০ হে০০ না | ০ ০ ০

II গা পা পা | পা পা পা | পা পা পা | পা পা পা I
তো মা রি | কা র ণে | স ব ত্য | জি য়া ছি

I পা ধা র্সা | -র্সা র্সা র্সা | নর্সা -র্রা র্সা | -া -া -া I
স ব সু | খ্‌ স ব | স০ ০ জ্জা | ০ ০ ০

I পা ধা র্সা | র্সা র্সা র্সা | না র্রা র্সা | না ধা পা I
মী রা ত | ব দা সী | জ ন ম | জ ন ম

I পা ধা পা | মা গা রগপা | মা গা -া | -া -া -রসা I
চে য়ে আ | ছে আ শা০০ | ভ রে ০ | ০ ০ ০০

* I "মধুর ভাষী গো" II পূর্ব্বের মত

# বন্দী

শ্রীপঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আর ক'দিন পরেই নিজণীতে বড় মেলা বসবে। রাস্তার সর্ব্বত্র যেন প্রাণের সাড়া পড়ে গেছে। দেশ-দেশান্তরের লোক আসে তাদের পশরা নিয়ে এখানে। ইভ্যান আসকিয়নভ্ ও ঠিক করেছে, সেও গিয়ে দোকান খুলবে মেলায়।

ইভ্যানের বয়স তিরিশের ভেতর। বেশ সুদর্শন যুবক—মাথায় এক মাথা কোঁকড়া চুল—ভারী আমুদে—হাসি যেন মুখে লেগেই আছে। গ্রামের ভেতর ভাল গাইয়ে ব'লে একটু নামও যে না আছে এমন নয়। অবস্থা তার ভাল—গ্রামের মধ্যেই তার দু'খানা বড় দোকান আর পৈতৃক বাড়ী সে ত আছেই। বয়েসকালে নেশা-ভাঙ্ সে করত, কিন্তু বিয়ের পর ও বদ্অভ্যাসটা সে কাটিয়ে উঠেছিল; তবে পাল-পার্ব্বণে একটু আধটু নেশা যে সে না করত, একথা বল্লে মিথ্যে কথা বলা হ'বে।

সেদিন তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে ইভ্যান উঠে পড়ল। আজই তাকে বেরুতে হ'বে, এখনও জিনিষপত্র গোছান বাকী। তার বৌ এসে বল্লে—"ওগো, আজ গিয়ে কাজ নেই। কাল রাত্রে একটা বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি।"

ইভ্যান হাসতে লাগল। "বুঝেছি, তোমার ভয়—আমি সেখানে স্ফূর্ত্তি ক'রে বেড়াব। সে ভাবনা করো না।"

"লক্ষ্মীটি! আমার কেমন মন সরছে না। আমি কি স্বপ্ন দেখেছি জান? দেখলাম—তুমি মেলা থেকে ফিরে এসেছ আর তোমার মাথায় এক মাথা শনের মত পাকা চুল।"

"এত খুব শুভ লক্ষণ। তুমি দেখে নিও—এবার আমার দু'পয়সা লাভ হ'বে। আর সত্যি বলছি—মেলা থেকে তোমাদের জন্যে অনেক ভাল-ভাল জিনিষ কিনে' আনব।"

*　　*　　*

সন্ধ্যার সময়ে ইভ্যান এসে পৌঁছল একটা সরাইখানায়। তার চেনা একজন সওদাগরের সঙ্গে দেখা হ'ল সেখানে। খাওয়া-দাওয়ার পর তারা আশ্রয় নিলে পাশাপাশি দু'টো ঘরে। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাবে মনে ক'রে সরাইখানার হিসাব-পত্র চুকিয়ে ভোরের আগেই ইভ্যান বেরিয়ে পড়ল। মাইল পঁচিশেক যাবার পর ঘোড়াদের খাওয়াবার জন্যে সে গাড়ী থামাল একটা সরাইখানায়। নিজের জন্যেও কিছু খাবার দিতে বলে সে তার বেহালাটায় মন দিলে।

একটু পরেই একজন পুলিস-ইন্সপেক্টর দু'টো পাহারা-ওয়ালা সঙ্গে ক'রে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং ইভ্যানকে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। "মশাই, কাল রাত্তিরটা কোথায় কাটিয়েছিলেন? আর একজন সওদাগর কি আপনার সঙ্গে ছিল? ভোর হ'বার আগেই বা পালিয়ে এলেন কেন?"

ইভান বুঝতে পারলে না এ সব অভদ্র প্রশ্নের মানে, সে ঝেঁঝে উত্তর দিলে "আমি ত চোরও নই, ডাকাতও নই—আমি নিজের কাজে চলেছি। আমায় কেন মিছি-মিছি বিরক্ত করছেন?"

"রাগ করবেন না। সেই সওদাগরকে গলাকাটা অবস্থায় তার ঘরে পাওয়া গেছে। আপনার মালপত্র আমাকে খানাতল্লাস করতে হ'বে।"

ইভ্যানের ব্যাগের ভেতর থেকে একখানা রক্তমাখা ছোরা বার করে' ইন্সপেক্টর বল্লে "এখানা নিশ্চয়ই আপনার?" সে হতভম্ব হ'য়ে গেল, গলা দিয়ে তার আওয়াজ বেরুল না—"আমি—আমি জানি না। এ ছোরা আমার নয়।"

কিন্তু কে শুনবে তার কাকুতি মিনতি, জলজ্যান্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে। তার হাতে পড়ল হাতকড়া, তাকে বন্ধ করা হ'ল হাজতে।

ইভ্যানের স্ত্রী এই দুঃসংবাদ পেয়ে মুষড়ে পড়ল। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। দু'টি ছোট শিশুকে নিয়ে সে এল স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু স্বামীকে কয়েদীর পোষাকে চোর-ডাকাতের সঙ্গে দেখে সে নিজেকে সামলাতে পারলে না—অজ্ঞান হয়ে পড়ল। জ্ঞান ফিরে

পেয়ে সে ইভ্যানের পায়ে লুটিয়ে পড়ল, বল্লে—"কি হবে গো? কেন এমন হ'ল? সত্যিই কি তুমি……?"

"তুমি—তুমিও আমায় অবিশ্বাস করো?" ইভ্যান ছোট ছেলের মত কেঁদে উঠল।

* * *

বিচারে ইভ্যানের দণ্ড হ'ল চিরজীবনের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন। তারপর ২৬ বৎসর কেটে গেছে। ইভ্যানকে দেখলে চেনা যায় না। বার্দ্ধক্য প্রভাব বিস্তার করেছে তার সর্ব্বাঙ্গে। একগাছি চুলও তার কালো নেই, পাকা দাড়িতে মুখ ভরে' গেছে। হাসি তার মুখ থেকে নিয়েছে চির বিদায়। সাধু-সন্ন্যাসীর জীবনী পড়ে', প্রার্থনা করে' ইভ্যানের দিন কাটে। রবিবার জেলের গির্জ্জায় সে সকলের সঙ্গে গানে যোগ দেয়—গলা এখনও তার মন্দ নয়। তার নম্র স্বভাবের জন্যে অন্য কয়েদীরা তাকে খাতির করত। কর্ম্মচারীদের কাছেও বিনয়ী ও ধর্ম্মভীরু বলে' ছিল তার সুখ্যাতি।

দেশের খবর সে কিছু পায় না। মনে পড়ে তার ছেলে দু'টির কথা। হয়ত তারা কত বড় হয়েছে,—তারাও শুনেছে তাদের বাপের অপরাধের কথা—হয়ত তারাও তাকে ঘৃণা করে। তা করতে পারে, তাদের ত কোন দোষ দেওয়া যায় না! আর তার অভাগিনী স্ত্রী? সেকি আজও বেঁচে আছে? সে কি কোনদিনও তাদের দেখতে পাবে? না, মৃত্যুই এখন তার একমাত্র কাম্য।

কিছুদিন পরে নূতন একদল কয়েদী আসে। পুরাতন কয়েদীরা তাদের ঘিরে বসে, জিজ্ঞেস করে কে কোন গ্রাম থেকে এসেছে, কার কি অপরাধ। ইভ্যান চুপটি করে' বসে থাকে একধারে।

একজন নূতন কয়েদী বল্লে—"দেখ দিকিনি ভাই, একটা ঘোড়া-চুরি করেছিলাম বলে' আমার এই সাজা। কিন্তু যখন সত্যিই আমার এখানে আসা উচিত ছিল, তখন কেউ আমায় ধরতে পারলে না। হ্যাঁ বাড়ী? ভ্লাডিমির; আর নাম আমার মাকার, সেমিয়নিচ বলে'ও ডাকে।"

ইভ্যানের মুখ উজ্জল হয়ে উঠে, সে শুধোয়—"আচ্ছা আস্কিয়নভ্‌দের কি তুমি চেন? তারা কি বেঁচে আছে?"

"চিনব না কেন? তারা ত বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। কিন্তু কি দোষে জানি না, তাদের বাপ আমারই মত সাইবেরিয়ায়। আপনি কি করে' এলেন এখানে?"

ইভ্যান চুপ করে থাকে। অন্য কয়েদীরা বলে তার দুঃখের কাহিনী—কেমন করে বিনা দোষে খুনের দায়ে তার এই দীর্ঘ নির্ব্বাসন।

"আশ্চর্য্য! তুমি—তুমি এত বুড়ো হয়ে গেছ!"

সকলে অবাক্ হয়ে যায় তার কথা শুনে, ইভ্যানও। সে তাকে চেনে নাকি?

ইভ্যান জিজ্ঞেস করে—'তুমি কি সেই খুনের ব্যাপারটা জান, না আমায় কোথাও দেখেছ?"

"না জেনে যাব কোথায়? কিন্তু অনেকদিনের কথা—সব মনে নেই।"

"বোধ হয় কে খুন করেছিল, তাও শুনে থাকবে!" ইভ্যান জিজ্ঞেস করে।

সেমিয়নিচ হেসে উঠে, বলে—"যা'র ব্যাগ থেকে ছোরা পাওয়া গেছে সেই নিশ্চয়। আর অন্য কেউ যদি সেটা সেখানে লুকিয়ে রাখত তা'হলেও, কেননা সেত আর ধরা পড়েনি। কিন্তু তাইবা হবে কেমন করে'? তোমার ঘুম ভাঙল না, তোমার মাথার নীচে ব্যাগে ছোরা এল কেমন করে'?"

ইভ্যানের বুঝতে বাকী রইল না কে খুনী। সে রাত্রি সে ঘুমাতে পারলে না। মনে ভেসে উঠল তার ২৬ বছর আগেকার কথা। কি সুখেই না তাদের দিন কাটত! সন্ধ্যের সময়ে কাজ থেকে ফিরে সে বসত তার বেহালাটা নিয়ে, কাছে বসত তার স্ত্রী, কোলে তার তখন ক্ষুদ্র একটী শিশু। আজও মনে পড়ছে—তার বড় ছেলে রঙীন জামা পরে' তার সামনে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। তারপর হ'ল বিনা দোষে তার নির্ব্বাসন—সুদীর্ঘ ২৬ বৎসরের অভিশপ্ত জীবনের কথা তার মনে নূতন করে' ভেসে উঠে। উঃ—এই হতভাগাটার জন্যেই না তার এই দুঃখের জীবন! প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি জেগে উঠে তার বুকে।

* * *

পনের দিন পরের কথা—রাত্রি তখন অনেক। ইভ্যানের চোখে ঘুম নেই, সে পায়চারী করে' বেড়াচ্ছে, হঠাৎ টুক্‌টুক্ একটা আওয়াজ তার কাণে এল। খানিকটা

থমকে দাঁড়িয়ে সে এগিয়ে গেল শব্দটাকে লক্ষ্য করে' দেখতে পেলে—মাকার দেওয়ালের ধারে বসে কি করছে। তাকে সামনে দেখে মাকার তার হাত দু'টো জড়িয়ে ধরে বল্লে "কাউকে বলো না, আমি দেওয়ালে একটা গর্ত্ত করছি। আমরা দু'জনেই পালাব। যদি ধরা পড়ি, চাব্‌কে আর আস্ত রাখবো না, কিন্তু তার আগে তোমায় খুন করতেও আমি ছাড়ব না।"

ইভ্যানের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। তাকে কিনা মৃত্যুভয় সে দেখায়—যে মৃত্যুকে সে এত কাল কামনা করে' এসেছে। মৃত্যু—যা' তার এখন একমাত্র কাম্য।

"আমি কিছুই বলব না, কিন্তু আমি পালাতে চাই না। সেমিয়নিচ, আমায় আর মারতে হবে না—বহুকাল আগেই তুমি আমায় মেরে রেখেছ।"

কেমন ক'রে পরদিনই প্রহরীর চোখে সেই সুড়ঙ্গটা পড়ে' গেল। জেলের সব কয়েদীদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—এ কাজ কার? সকলেই বল্লে—জানে না। তখন ডাক পড়ল বৃদ্ধ ইভ্যানের।

"ইভ্যান তোমায় ধর্ম্মভীরু বলে জানি। সত্যি করে' বল এ কাজ কার?"

ইভ্যানের মনে তখন তুমুল আন্দোলন সুরু হয়েছে। কেন কেন, সে অপরাধীর নাম করবে না? কিসের দয়া? তার জন্যেই না তার এই অভিশপ্ত জীবন। কিন্তু তা'হলে ওরা ত সেমিয়নিচকে আস্ত রাখবে না। আর তার নিজের কি লাভ আছে এতে, তার জীবন ত শেষ হ'তে চলেছে। "দেখুন, আমি জানি না।"

* * *

ইভ্যান তখন ঝিমুচ্ছে, কে যেন এসে তার বিছানায় বসল। অন্ধকারেও সে সেমিয়নিচ্‌কে চিনতে পারলে। "তুমি—তুমি আমার কাছে আর কি চাও?"

তার পা দু'টো জড়িয়ে ধ'রে মাকার বলে' উঠল—"তুমি আমায় ক্ষমা কর, ইভ্যান। আমি সেই সওদাগরকে খুন করেছিলাম, তোমাকেও করতাম। কিন্তু বাইরে একটা শব্দ হওয়ায়, তোমার ব্যাগের ভেতর ছোরা রেখে জানালা দিয়ে আমি পালিয়ে যাই। আমি ঠিক করেছি অপরাধ স্বীকার করব, তুমি আবার বাড়ী ফিরে যেতে পারবে। তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

"ওকথা বলা আজ মিথ্যে। তোমার জন্যেই এই দীর্ঘ ২৬ বৎসর কেটেছে আমার কারাগারে। কোথায় যাব আমি? আমার স্ত্রী আজ ইহজগতে নেই, আমার ছেলেরা আমায় চেনে না।"

"ইভ্যান, আমায় ক্ষমা কর। কষাঘাতও আমাকে এত কষ্ট দেয়নি, যা' আজ আমি পাচ্ছি তোমায় দেখে।"—সেমিয়নিচ্‌ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ইভ্যানের চোখ দিয়েও গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা জল—"ভগবান তোমাকে ক্ষমা করুন।" সে আজ নিজেকে হাল্কা বোধ করতে লাগল, বাড়ী ফিরে যাবার কোন ইচ্ছে আজ তার নেই, সে শুধু বসে' আছে অন্তিমের প্রতীক্ষায়।

* * * *

মাকার কোন কথা শুনলে না—সে স্বীকার করলে তার অপরাধ। কিন্তু ইভ্যানের মুক্তির আদেশ এসে যখন পৌঁছল, তখন সে চলে' গেছে সব বন্ধনের বাইরে।*

* টলষ্টয়ের "The Long Exile" গল্পের অবলম্বনে।

# বিশ্বসম্রাট্ নারায়ণপালদেব ও রাজা আলফ্রেড দি গ্রেট

শ্রীভবানীপ্রসাদ নিয়োগী

বার বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত "বাঙ্গালী নামের অর্থ কি ?" নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে[১]: "সম্রাট্ দেবপাল বলেন, উত্তরে হিমালয়, এলবার্জ্জ, ককেশাস, Carpathian ও Erzeberge পর্ব্বত এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য, Koh Rud, Pindus, Aventure ও Pignenees পর্ব্বত, পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর ও পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর—ইহার মধ্যস্থ সমস্ত ভূমিভাগ তাঁহার অধীন ছিল এবং Taurus পর্ব্বতের নিকটস্থ Taracanগণ (তরিক), Gaud (গৌড়)-এর অধিপতিগণ (Charlemagne, Louis the pious, Louis II) ও Rome (মালব)-এর অধিপতিগণ (Leo V, Michael II, Theophilus, Michael III) তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব রুশিয়ার অধিবাসী Cossack-গণ ( খশা ), Tartar ( হূণ ) ও Celts ( কুলিকগণ ) তাঁহার অধীন ছিল। তিনি ধর্ম্মদ্বেষী Saracen রাজা (Al Mamun)-কে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাঁহার ৪০টি দুর্গ নষ্ট করিয়াছিলেন এবং Cambodia ( কাম্বোজ ), Java ( কলিঙ্গ ) ও সুমাত্রা ( পূর্ব্ব বরেন্দ্র ) তাঁহার অধীন ছিল।

Alexander ও Darius-এর দিগ্বিজয় কাহিনীতে এতদিন কাণ ঝালাপালা হইতেছিল, এখন বৈবস্বত মনু[২] ও ইক্ষ্বাকু, অম্বরীষ ও মান্ধাতা, সগর ও যুধিষ্ঠির, অশোক ও সমুদ্রগুপ্ত, ধর্ম্মপাল ও দেবপালের দিগ্বিজয়ের কল্পিত কাহিনীই না হয় বাঙ্গালী সুধীবর্গ কিছুদিন আলোচনা করুন। খোস-খবরের ঝুটাও তো ভাল। ইন্দুস্থানের এই সব সম্রাট্ যে রাজ্যের অধিকারী ছিলেন বলিয়া প্রকাশ করেন, তাহার তুলনায় Alexander ও Darius-এর রাজ্য তো সাগরের তুলনায় পুকুর। আর গ্রীক ভাষায় লিখিত Alexander-এর দিগ্বিজয়কাহিনী যদি কাল্পনিক বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ না থাকে, তবে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ইন্দুস্থানের সম্রাট্গণের দিগ্বিজয়-কাহিনীই বা বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবে, কাল্পনিক বলিয়া সাব্যস্ত হইবে কেন ?"

## ইতিহাসে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ

আজ পালরাজবংশের পঞ্চম রাজা নারায়ণপালদেবের কথা বলিব। ইনি উপর্য্যোক্ত দেবপালদেবের পৌত্র।

পালরাজগণ যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হইতেছে এই যে, তাঁহারা নিজেদের "গৌড়েশ্বর" বলিয়া পরিচয় দিতেন, আর গৌড়দেশ বাঙ্গালাদেশ—গৌড়নগর বাঙ্গালাদেশের অন্তর্গত মালদহ জেলায়।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের বাঙ্গালীবিদ্বেষ সুবিদিত। তাই তাঁহাদের গ্রন্থে পালরাজগণের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত-সারেরও সংক্ষিপ্তসার এবং তাহাতে পালরাজগণের সময়ের নির্ঘণ্ট নাই। বাঙ্গালীর লেখা দুইখানি ইতিহাস প্রচলিত আছে—রমাপ্রসাদবাবুর "গৌড়রাজমালা" এবং রাখাল-বাবুর "বাঙ্গালার ইতিহাস"। এই দুইখানি গ্রন্থেও ইউরোপীয়দের অনুকরণে গৌড়েশ্বর-বিদ্বেষ প্রকটিত হইয়াছে—রাজপুতনার মরুভূমির বা রাষ্ট্রকূট রাজ্যের বা চেদি রাজ্যের কোন বিদ্রোহী সামন্ত রাজা সমসাময়িক গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে কি কি কথা বলিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন—পালরাজগণের সময়ের নির্ঘণ্টও তাঁহাদের ইতিহাসে নাই।

## সময়ের নির্ঘণ্ট

আমি পালরাজগণের যে সময়ের নির্ঘণ্ট মানিয়া লইয়াছি, তাহা গোড়াতেই উপস্থিত করিতেছি[৩]। আশা করি, সুধীবর্গ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

গোপাল ১—৭৭৩। ধর্ম্মপাল—৭৭৮। দেবপাল—৮১১। বিগ্রহপাল১ (নামান্তর শূরপাল)—৮৫১। নারায়ণ পাল—৮৫৬। রাজ্যপাল—৯১১। গোপাল ২—৯৩৬। বিগ্রহপাল ২—৯৬২। মহীপাল ১—৯৭৮। নয়পাল—১০২৬। বিগ্রহপাল ৩—১০৪১। মহীপাল ২—১০৬৭। শূরপাল ২—১০৭০। রামপাল—১০৭২। কুমারপাল—১১২০। গোপাল ৩—১১২৫। মদনপাল—১১৩০। গোবিন্দপাল—১১৬১।

যে গৌড়রাজগণের কথা আজ বলিব নিম্নে তাঁহাদের সমসাময়িক ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজগণের সময়ের নির্ঘণ্টও গৌড়ীয় রাজত্বের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির সময়ের নির্ঘণ্ট দেখান হইল :

(১) বাঙ্গালী নামের অর্থ কি ? ,২য় খণ্ড, ৩।৶০ পৃঃ।

(২) বাঙ্গালী নামের অর্থ কি ? ২য় খণ্ড ৩৴০ হইতে ৩।৶০ পৃঃ।

(৩) বর্ত্তমান সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সর্ব্বপ্রথমে পালরাজগণের নিজেদের প্রশস্তিসমূহ হইতে তাঁহাদের সময়ের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করেন। অবশ্য কোন কোন স্থানে তাঁহার সহিত আমার মতভেদ হইয়াছে।

| গৌড় | গুর্জ্জর প্রতিহার | রাষ্ট্রকূট | চেদি |
|---|---|---|---|
| **জীবিত গুপ্ত** ৬৯৫ | ১ম নাগভট | | |
| বিদ্রোহী সামন্ত খলিফা আবদুল মালেকের সহিত যুদ্ধ। খলিফার পরাজয় ও বশ্যতাস্বীকার ৬৯৯—৭০৪ | (খলিফার সহিত যুদ্ধে জীবিত গুপ্তের সহায়তা করিয়াছিলেন) | | |
| বিদ্রোহী কনৌজের সামন্ত যশোবর্ম্মার সহিত যুদ্ধে মৃত্যু ৭৩০ | কক্কুক<br>দেবশক্তি | | |
| | | দন্তিদুর্গ ৭৫৩ | |
| অরাজকতা বা মাৎস্যন্যায় | | প্রথম কৃষ্ণ<br>(**শরবল**) ৭৬০ | |
| **১। গোপাল** ৭৭৩ | বৎসরাজ ৭৬৬ | | |
| পুত্রের সহিত প্রথম কৃষ্ণের কন্যা রন্না দেবীর বিবাহ ৭৭৪ | | ২য় গোবিন্দ ৭৭৫ | |
| **২। ধর্ম্মপাল** ৭৭৮ | | | |
| ধ্রুব রাজের সাহায্যে বৎসরাজের বিদ্রোহদমন ও গৌড়ীয় রাজচ্ছত্র উদ্ধার ৭৮৬ | | ধ্রুবধারা বর্ষ ৭৮০ | |
| বিদ্রোহী কনৌজের সামন্ত ইন্দ্রায়ুধকে রাজ্যচ্যুত করিয়া চক্রায়ুধের অভিষেক ৭৯০ | | | |
| তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্যে পুনরায় বৎসরাজের বিদ্রোহদমন ৮০৬ | | তৃতীয় গোবিন্দ ৭৯৩ | |
| **৩। দেবপাল** ৮১১ | | | |
| সামন্ত খলিফা অলমামুনের বিদ্রোহদমন আরম্ভ ৮১৩ | ২য় নাগভট ৮১৩ | | |
| তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্যে ২য় নাগভটের বিদ্রোহদমন ৮১৪ | | অমোঘ বর্ষ ৮১৫<br>(**নৃপতুঙ্গ**) | গুণাম্ভোধি ৮২০ |
| গুণাম্ভোধির বিদ্রোহদমন ও তাঁহার কন্যা লজ্জাদেবীর সহিত পুত্রের বিবাহ ৮২৭ | রামভদ্র ৮২৫ | | |
| দ্রবিড়পতি অমোঘবর্ষের দর্পচূর্ণ ৮৪০ | মিহিরভোজ ৮৪০ | | |
| মিহিরভোজের বিদ্রোহদমন ৮৪৮ | (কনৌজ জয়) ৮৪২ | | |
| **৪। প্রথম বিগ্রহপাল** ৮৫১ | | | |
| **৫। নারায়ণপাল** ৮৫৬ | | | |
| অমোঘবর্ষের কন্যা ভাগ্যদেবীর সহিত পুত্রের বিবাহ ৮৬৫ | | | কোকল্ল ৮৬৮ |
| মিহিরভোজ ২য় কৃষ্ণ ও কোকল্লের বিদ্রোহদমন ৮৮৪ | (গয়া ও তীরভুক্তি আক্রমণ ৮৮১ | ২য় কৃষ্ণ ৮৮০ | |
| Received mission from king Alfred the Great ৮৯৮ | মহেন্দ্রপাল ৮৯১ | | |
| | ২য় ভোজ ৯০৮ | | |
| **৬। রাজ্যপাল** ৯১১ | মহীপাল ৯১০ | তৃতীয় ইন্দ্র ৯১২ | |

## গৌড়ে অরাজকতা বা "মাৎস্যন্যায়"

শেষ গুপ্তসম্রাট্ ২য় জীবিতগুপ্ত (Zunbil)[৪] খলিফা-দিগের ইতিহাসে "The great king beyond Sijistan" অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের সম্রাট্ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁহার বিজয়বাহিনী দামাস্কাস পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল এবং পাঁচ বৎসরের যুদ্ধের পরে (৬৯৯-৭০৪) খলিফা আবদুল মালেককে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিল। ইহার পরে মহম্মদ বিন্ কাশিম নামক খলিফার একজন নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী খলিফার অজ্ঞাতসারে সিন্ধুদেশে একখানি তরীতে অল্প-সংখ্যক অনুচর লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল (৭১২ খৃঃ)। তখনও সম্রাট্ জীবিতগুপ্ত জীবিত ছিলেন; তাঁহার সাম্রাজ্য-মধ্যে এই দস্যুবৃত্তির- অপরাধে খলিফা সোলেমান (৭১৪ খৃঃ) তাহার প্রাণদণ্ড করেন। এই প্রবল পরাক্রান্ত মগধনাথ গৌড়পতি জীবিতগুপ্তের বিরুদ্ধে তাঁহার কনৌজের সামন্ত যশোবর্ম্মা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। গৌড়পতি স্বয়ং তাঁহার বিদ্রোহ দমন করিতে যুদ্ধ যাত্রা করেন; কিন্তু তিনি ঐ যুদ্ধে নিহত হন এবং যশোবর্ম্মা নিজকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন। এই ঘটনার তারিখ অনুমান ৭৩০ খৃষ্টাব্দ।

যশোবর্ম্মা সম্রাট্ নাম গ্রহণ করিলেন বটে; কিন্তু সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল গৌড়দেশে কোনও শাসন স্থাপন করিতে পারিলেন না। কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য যশোবর্ম্মাকে তাঁহার নিজ রাজ্যে পরাজিত করিয়া গৌড়-দেশে অভিযান লইয়া আসিলেন। তারপর কাশ্মীর হইতে দ্বিতীয় বার গৌড়ে অভিযানের কথা এবং প্রাগ্-জ্যোতিষপতি ভগদত্তবংশীয় এক রাজার গৌড়াভিযানের কথা আছে। এই রাজাদের মধ্যে কেহই গৌড়দেশে শাসন স্থাপন করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মপালের তাম্র-শাসনে এই অরাজকতা বা interregnum 'মাৎস্য ন্যায়' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

## গোপালদেব

প্রায় ৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত এই অরাজকতা চলে; তারপর গৌড়ীয় প্রজাপুঞ্জ এবং সম্ভবতঃ সামন্তচক্রের নির্ব্বাচন-বলে অনুমান ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে গোপালদেব গৌড়পতি অর্থাৎ ভারতসম্রাট্-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। সামন্তচক্রের নির্ব্বাচনের কথা বলিবার কারণ এই যে, গৌড়পতি জীবিতগুপ্ত যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইবার পরেও তাঁহার সামন্ত নৃপতিগণ যশোবর্ম্মার সহিত প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন—এই কথা "গড়ুরবহ" নামক কাব্যে পাওয়া যায়। গোপালদেবকে সম্রাট্-পদ লাভ করিয়া কোনও যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয় নাই; বরং পাইতেছি **রাষ্ট্রকূট-রাজ্যের শিরোভূষণ নরপতি পরবল** গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালকে কন্যা দান করিয়াছিলেন। ইহা বশ্যতা-স্বীকারেরই লক্ষণ। এই সময়ের রাষ্ট্রকূটরাজ প্রায় সমস্ত দাক্ষিণাত্যের অধিপতি ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

(৪) আরবী বর্ণমালায় লিখিলে জুন বিল ও জীবিত কথার মধ্যে পার্থক্য ভগবতে ও ভগবতে কথার পার্থক্যের মত কয়েকটি উপরের ও নীচের বিন্দু লইয়া—যাহা অনেক সময়ে লেখা হয় না।

---

# অকৃতজ্ঞ

শ্রীবিপদভঞ্জন মুখোপাধ্যায়

আকাশের ঘুড়ি কয় নীচের সুতারে
কোন্ মুখে কথা ক'স্ পদতলে পড়ে!
সুতা কহে যবে আমি ছিঁড়ে যাবো ভাই,
তোমার কি গতি হবে শুনিবারে চাই?

# স্বপ্ন

শ্রীদেবব্রত ঘটক

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রাজকুমার হালদারের স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য বাংলা দেশে মাত্র একজন মেয়েরই হয়, এবং সে মেয়ের নাম রাণী।

স্বামীর বয়স আর কতই বা! ত্রিশের বেশী? তবু এরই মধ্যে পেয়েছে সে অজস্র সম্মান, নব প্রকাশিত উপন্যাসগুলি তার সাহিত্যের রত্নমুকুট এনে দেয় উজ্জ্বল মণি-মাণিক্য, প্রতিভার তীব্র দ্যুতিতে শিক্ষিত সমাজ বিস্ময়-মুগ্ধ। আসে পাঠকের অভিনন্দন, প্রতি প্রত্যূষে ডাক্-হরকরা এনে দেয় ভক্তের উচ্ছ্বাস-লিপি, কোন্ বিরহিনী তার "স্বামী-হারা" উপন্যাসে নিজের হুবহু চরিত্র আবিষ্কার করে তৃপ্তি পেয়েছে ইত্যাদি পত্রপাঠে রাজকুমার একটু পুলকিতই হোয়ে উঠে। চিঠিগুলো সে রাণীকে দেখায়,—স্ত্রীর কাছে তার কিছু গোপনীয় নেই। কে বলে সাহিত্যিকরা ভালবাসতে পারে না? রাণীর প্রতি তার এই আচরণই কি প্রেমের যথেষ্ট নিদর্শন নয়?

রাণী গর্বে ফুলে ওঠে। এত বড় লেখকের ভালবাসা পাওয়া যে কোনও নারীর সৌভাগ্য। তাই প্রত্যেকদিন বিকেলে স্বামীকে নিয়ে রাণী যখন বেনারসী পরে মোটর চালিয়ে অনেক, অনেক দূর চলে যায়—চৌরঙ্গী দিয়ে শ্যামবাজার ছাড়িয়ে কাশীপুরের ভিতর দিয়ে সহর ছেড়ে দূরে চলে যায়, পথের জনতা দ্রুতগামী মোটরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তার সঙ্গীকে কি বলে রাণী তা জানে। কি বলে রাণী তা শুনতে পারে না যদিও, কিন্তু বুঝতে পারে তারা বলছে—"ওই, ওই যে আদ্দির পাঞ্জাবী পরে চুরুট টানছেন, হ্যাঁ উনিই রাজকুমার হালদার; আর ঐ যিনি মোটর চালাচ্ছেন উনি তাঁর স্ত্রী।"

ভাবতে রাণীর আনন্দ হয়, মেয়েরা তার সৌভাগ্যে কেমন ঈর্ষ্যায় ছটফট্ করে। তারা ভাবে, নিশ্চয় ভাবে: হায়, রাণীর মত যদি, আমার রূপ হ'ত!

তা রাণীর রূপ সত্যিই অপূর্ব। সুগঠিত দেহের প্রতি ভাঁজে শাড়ীখানা রেখায়িত হোয়ে মাথার ঘোমটায় এসে থমকে যায় যেন। টানা টানা চোখের উপর সূক্ষ্ম ভুরু দুটি কপালের প্রান্তে এসে মিশিয়ে গেছে। হাসিতে তার মসৃণ দাঁতগুলি ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে, গালে খায় টোল। রূপকথার রাজকন্যের মত তার কুঁচবরণ দেহ আর মেঘবরণ চুল। চুল তো নয় যেন চুলের অরণ্য। খোঁপা না বাঁধলে সাপের মত কালো হিলহিলে চুল তার বুকে, পিঠে ছড়িয়ে পড়ে প্রায় জানু অবধি। চুলের গন্ধে তার নিজের মাথাই ঝিম্‌ঝিম্ করে।

রাত প্রায় বারোটা। কলমের খস্ খস্ শব্দ রাণীর কাণে আসে। জানালা দিয়ে রাণী দেখতে পেল, ও এখনও মুখ গুঁজে লিখ্‌ছে। রাজকুমারের চুল অবিন্যস্ত, অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দুটো চোখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কলমের মুখের প্রতি তাকিয়ে আছে। টেবিলের ওপর কতকগুলো বই আর খোলা কাগজ এলোমেলো হয়ে আছে। বারোটা যে বেজে গেছে, তা ওর খেয়াল নেই। এখন রাত না দিন, হয়তো তাই ও জানে না। এখন সে সব ভুলে গেছে। এমন কি রাণীকেও।

সাধনা-ব্যস্ত স্বামীর ধ্যান ভাঙ্গাবার অধিকার স্ত্রীর নেই। হয়তো এই লেখাই স্বামীকে এনে দেবে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সিংহাসন। হয়তো এই উপন্যাসই রাণীকে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-সম্রাটের স্ত্রী বলে' অমর করে রাখবে। স্বামীর গৌরবই তার কাম্য।

কিন্তু রাণী বিরক্ত হয়ে উঠল, সে কি এতই তুচ্ছ? রাণীর চেয়ে সাহিত্যই হ'ল তার কাছে বড়? সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত বারোটার মধ্যে একবারও কি রাণীর সঙ্গে তার কথা বলার সময় হ'ল না? স্বামীর গৌরব সে অন্তর দিয়ে কামনা করে, কিন্তু এ অবহেলা অসহ্য!

সাবানের ফেনার মত নরম বিছানা,—রাণী ক্রোড়ে এলিয়ে পড়ে আর বালিশে বিছানায় তার চুল রাশীকৃত

হয়ে ভেঙে পড়ে। পরনে তার সেই বেনারসী শাড়ী, ইতিপূর্বে যা বহুবার আদায় করেছে রাজকুমারের সপ্রশংস দৃষ্টি। কিন্তু আজ রাজকুমারের সেদিকে দৃষ্টি দেবার অবসর নেই। অভিমানে বুকের ভেতরটা ফুলে ফুলে ওঠে, রাণীর সুন্দর চোখে অশ্রু ঘনিয়ে আসে। তবু সে বালিশে মুখ গুঁজে একটা বলিষ্ঠ হস্তের পরশ কামনা করে।

স্লিপারের শব্দে রাণী দৃঢ় হয়ে চোখ বন্ধ করে। বিছানার একপাশে বসে রাজকুমার রাণীর মাথায় হাত বুলিয়ে ডাকে—"রাণি!"

এতক্ষণে সময় হ'ল বাবুর। তোমার ডাকে সাড়া দেবে না রাণী। তুমি লেখো, সারা রাত ভরে' লেখো, রাণী তোমার ধ্যান ভাঙ্গতে চায় না। রাণীকে তুমি ডেকো না। তোমার "স্বামী-হারা"র নায়িকার দুঃখে পাঠকের চোখে জল আসুক, সভা ডেকে তোমার বন্দনা করুক তারা, সকলের মন জুড়ে তুমি চির-প্রতিষ্ঠিত থাকো। রাণীকে তোমার প্রয়োজন নেই.—রাণী তো তোমার সব নয়। তার দুঃখ, তার অভিমান বুঝে তোমার কাজ নেই।

রাজকুমার কাণের কাছে মুখ নিয়ে সুর করে ডাকে—"রাণি, রিণি, রিনা।"

—না, না, রাণী কথা কইবে না। তোমার সঙ্গে তার আড়ি। কিন্তু তুমি অমন করে ডেকো না লক্ষ্মীটি!

—"একটীবার আমার মুখের পানে চাও রাণি, চাও"—বলে' সে জোর করে রাণীর মুখ ফিরালো, আর আশ্চর্য্য, রাণী ঝর্‌ঝর্ করে কেঁদে ফেল্‌ল।

অনেকক্ষণ পরে চোখ মুছে রাণী বলল—"তোমার লেখা শেষ হয়ে গেছে?"

—"হ্যাঁ! সত্যি, উপন্যাসটা ভারী চমৎকার হয়েছে। কাল তোমায় সমস্তটা পড়ে শোনাবো।"

—"তা না হয় শুনিয়ো। কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠুর আমার সমালোচনা। স্বামী বলে' তোষামোদ পাবে না।" হাসিমুখে রাণী বলে—"আর যদি ভাল হয় আমার মুখ থেকে ভাল জিনিষই পাবে।"

রাজকুমার উজ্জ্বল হয়ে বলে—"সেই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। পেশাদার সমালোচকের প্রশংসায় আমি খুশী হই না। তোমার মুখে আমার লেখা কবিতার আবৃত্তি মানপত্রের চেয়ে আমাকে বেশী স্পর্শ করে।"

আনন্দে ঝলমল করে ওঠে রাণী—"সত্যি?"

—"সত্যি। তুমি যদি খুশী হও ভাবি, আমার লেখা সার্থক হয়েছে।"

রাণী একেবারে ছেলেমানুষ। স্বামীর গলা জড়িয়ে আদুরে সুরে বলে—"বলো না গো, এত সুন্দর আমি কেমন করে হ'লাম?"

—"কেমন করে? ব্যারেট যেমন ব্রাউনিংকে ভালবেসে সুস্থ হল, আমি তেমনি আমার প্রেম দিয়ে তোমায় সুন্দর করে তুলেছি।" রাজকুমার অন্যমনস্কের মত বলে—"যে ভালবাসে আর যে ভালবাসা পায়, সে কখনও কুৎসিৎ হয় না।"

তা' বটে। এই যেমন রাণীকেই ধরো না। কিই বা তার এমন রূপ? রাজকুমারকে সে ভালবাসতে পেরেছে আর এই প্রেমের পরশেই তো সে এত সুন্দর হয়েছে। রাণী তা জানে, তবু যাকে ভালবাসা যায়, তার মুখ থেকে এ কথা শুনতে ভাল লাগে।

স্বামীর হাত ধরে, ভ্রূ বাঁকিয়ে রাণী একসময় প্রশ্ন করে—"বলতে পারো, তোমার ওই লাইব্রেরীতে কি আছে? দিন নেই, রাত নেই ও-ঘরে গিয়ে তুমি কি কর?"

রাজকুমার হেসে বলে—"আমি যে প্রেমে পড়েছি।"

রাণীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়—এত তার শক্তি? দাঁতে দাঁত চেপে কোনক্রমে বলে—"কে সে হতভাগী?"

—"হতভাগী নয়, সেও রাণী" রাজকুমার তেমনি হাসিমুখে বলে,—"আমার সাহিত্য-রাণী।"

তর্জ্জনী তুলে রাণী শাসন করে—"আমি মরে গেলে ওকে নিয়ে যা খুসী তাই কোরো। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে কিছুতেই তুমি ওর সঙ্গে রাত কাটাতে পারবে না। রাতে তুমি আমার একার, তখন তুমি আর কারও নও।"

শাসন তো নয়, এ যেন এক ধরণের চুমু। রাজকুমার এই শাসন আমরণ কামনা করবে। রাণীর বাঁকা চোখের কটাক্ষ তার মনে মায়া জাগায়। বলে—"কিন্তু শোন,

রাত্তিরে ও আমাকে যে কত কথা বলে, কত আদর করে, কত গান শোনায়—রাতে যদি ওর কাছে না যাই, ও যে রাগ করবে।"

—"ও। আর আমার রাগ বুঝি কিছুই নয়। না, দিনের বেলায় তুমি যত খুশী লিখো, কিন্তু রাত দশটার পরে কিছুতেই তুমি জাগতে পারবে না। খেটে খেটে তোমার শরীর কি হয়ে গেছে।"

—"কিন্তু এই বয়সে না লিখ্‌লে আর কবে লিখবো।" রাজকুমার অনুনয় করে—"তুমি যে আমার যশোমতী। তা' ছাড়া কত টাকা পাওয়া যায় বলো তো? বাংলা দেশে শুধু এই লিখে মাসে পাঁচ'শ টাকা আয় করতে আর কেউ পারেনি। এই তেতলা বাড়ী, সামনে ফুলের বাগান, গ্যারেজে উল্‌স্‌লী, ঠাকুর-চাকর-মালী-শোফার—এত সম্মান, এত স্বাচ্ছন্দ্য তুমি ছাড়তে বলো?"

রাণী ফ্যালফ্যাল করে' চেয়ে থাকে। ক্ষীণকণ্ঠে বলে—"তুমি 'স্বামীর ভিটে'য় বলেছ: টাকা-পয়সায় সুখ নেই। আনন্দ কুঁড়ে ঘরে, নিশ্চিন্ত জীবনে—অট্টালিকার কোলাহলে নয়। তা হলে সে মিছে কথা?"

—"তার উল্টো কথাও বলেছি আমি 'চোখ গেল' গল্পে।" রাজকুমার হাত নেড়ে বলে—"আমি চাই উদার সম্ভ্রান্ত জীবন, অজস্র অর্থ, বিপুল সম্মান, প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্য আর তোমার সাহচর্য্য।"

কোথায় গেল রাণীর সন্দেহ আর কোথাই বা রইল তার সেই অনুভূতি। রাজকুমারের শেষের কথায় আবার সে ছেলেমানুষ হয়ে গেল যেন। বল্‌ল—"তোমায় আমায় খুব মিল, না? মনে, রূপে এমন কি নামেও আমাদের মিল—"

—"বলি ও রাজরাণি, আজ সারা সকাল ঘুমিয়েই কাটাবে নাকি?" সুভাষিণী সঝঙ্কারে তাকে ঠেলা দিয়ে জাগান—"উনুনে কয়লা দেওয়া, রাতের এঁটো বাসন মাজা সব যে অমনিই পড়ে' আছে। মটকা মেরে পড়ে থাকলেই তো চলবে না বাছা, আমার ঘরে দু'শো, চারশো দাস-দাসী নেই।"

রাণী ধড়মড় করে' উঠে বসল। অর্থহীন নেত্রে সে মায়ের পানে চেয়ে থাকে। সুভাষিণী ভেংচি কেটে বলেন—"অমন ফ্যালফ্যাল করে' চেয়ে আছ যে? ঘুম ভাঙিয়ে আমি একটা মহাপাপ করেছি নাকি?"

সকালের আলো তখন ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। রাণী লজ্জিত হয়ে যায়। সত্যি, এত বেলা অবধি ঘুমনো তার উচিত হয়নি। কিন্তু এতক্ষণ সে কি দেখছিল? স্বপ্ন?

দিনের আলোয় এবার আমরা রাণীকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। রাণী নয় তার নাম খেঁদি।

তা এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, এমন কত আশ্চর্য্য জিনিষ পৃথিবীতে নিত্য ঘটছে। যেমন ধরো, যার নাম রাজেন্দ্র, সে হয়তো মার্চেণ্ট অফিসে ত্রিশ টাকার কেরাণী। যার নাম ভীমচন্দ্র, সে হয়তো বছরের মধ্যে নয় মাস ম্যালেরিয়ায় ভোগে। আর যার নাম সুভাষিণী, কার সাধ্য তার মুখের সামনে দাঁড়ায়। তবু এতে কেউ আশ্চর্য্য হয় না। বিধাতার এই ভুলের পৃথিবীতে সবই হয়তো অর্থহীন; কিন্তু খেঁদি নামের অর্থ আছে। সে খেঁদি, কারণ তার নাক চ্যাপ্টা। শুধু নাকই নয়, একটা চোখ তার আবার কাণা। তুমি যদি তার সামনে দাঁড়াও, মনে হবে একটা বেঁটে কালো মোষ কুৎসিৎ ভাবে তোমার দিকে চেয়ে আছে। সুভাষিণী তাই ক্ষিপ্ত হয়ে যান—"অমন করে' তাকিয়ে আছ যে? কাজকর্ম্ম নেই নাকি?"

বিনা বাক্যে নীচে নেমে খেঁদি উনুনে ফুঁ দিয়ে চোখ লাল করে। কড়া চাপিয়ে তারপর সে একটু নিশ্বাস টানবার অবসর পেল। পাশের ঘর থেকে মা বাবার দাম্পত্য আলোচনাটুকু তখন তার কাণে আসে।

মাথায় হাত দিয়ে মা নিশ্চয় বসে পড়েছেন—"বলো কি, এখানেও হ'ল না?"

বাবা বল্লেন—"যে তোমার রূপসী মেয়ে, ওকে কেউ সাধ করে' বিয়ে করবে ভেবেছ? খাঁদা নাক, কাণা চোখ, জুতোর কালির মত রং, তবু যদি মাথায় একটু চুল থাকত"—

—"তা' বটে, মেয়েমানুষের মাথায় যে টাক পড়ে এমন কখনও দেখিনি বাপু! তা এই পাত্তোরটী কিন্তু ভালই ছিল যাই বল।"

বাবা যেন আশ্চর্য্য হয়ে যান—"ভাল নয়? তুমি বলছ

কি? হাওড়ার পাটকলে পনের টাকা মাইনের চাকরী করে। আজকালকার দিনে চারটীখানি কথা নয়। বয়েস তো সবে চুয়ান্ন বছর, সাতটী মাত্র ছেলেমেয়ে। তা তাদের সব বিয়ে হয়ে গেছে। দোজপক্ষের হলে কি হয়, ছেলেটী বড় সচ্চরিত্র। কিন্তু যা তোমার মেয়ের রূপ! দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে সে। তোমার মেয়ের কপালে বিয়ে লেখা নেই তো আমি কি করব?"

—"এ মেয়ে মরেও না!" মা কপালে করাঘাত হেনে বলেন—"আমার পাঁচ-পাঁচটী মেয়ে তরে গেল, কিন্তু এ মেয়ের জন্য যে আমি পাগল হয়ে উঠ্‌লাম।"

আর শোনা খেঁদি আবশ্যক মনে করে না। পরের বিশেষণগুলোকে সে ভাল করেই জানে। আস্তে আস্তে সে তাই বারান্দায় চলে' গেল।

রাস্তার ওপাশে ঐ যে বিখ্যাত সাহিত্যিক রাজকুমার হালদারের বাড়ী। ছোট বাড়ী,—সে যে পরিমাণ যশঃ অর্জ্জন করেছে, সেই অনুপাতে অর্থ অর্জ্জন করতে পারেনি। তা' নাই বা পারল, পাঠকের মনে যে আসন সে পেয়েছে তার তুলনায় আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ। ছোট বাড়ী, এই বাড়ীতে যে এতবড় সাহিত্যিক থাকতে পারে, বাইরে থেকে তা' বোঝা যায় না। তবু সাহিত্যিক রুচির পরিচয় পাওয়া যায় ঐ ছাদে—কতকগুলো টবে দেশী-বিলিতি ফুল ফুটে আছে। খেঁদি সেইদিকে চেয়ে রইল। ইচ্ছে হয়—ঐ ফুলগুলো সে বুকে চেপে ধরে। স্পর্শ করতে; আঘ্রাণ করতে; সব রস শুষে নিতে একটা তীব্র কামনা তার বুক তোলপাড় করে। খেঁদি চমকে উঠ্‌ল, রাজকুমার টবের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে! এক সময়ে খেঁদির উপর চোখ পড়তেই রাজকুমার ছুটে নীচে নেমে গেল। তার কথা খেঁদি স্পষ্ট শুনতে পেল—"এমন রূপও কারও হয়।"

খেঁদি রাগ করল না। একথা শুধু রাজকুমার কেন, পাড়া প্রতিবেশী বলে, তার বাবা বলেন, মা বলেন। তবে মা বলেই ক্ষান্ত হন না, উপরন্তু তার চুলের গোছা ধরেন। কিন্তু সুবিধে করতে পারেন না—হাতের মুঠি হাতেই থাকে; অনায়াসে চুল বাঁচিয়ে খেঁদি কলতলায় চলে' যায়। তাই রাজকুমারের উপর খেঁদির অভিমান হয় না।

খেঁদি না হয়ে যদি সে রাণী হয়, তাতে কার কি এসে যায়?

খেঁদি আবার রান্নাঘরে ঢুকল। হ্যাঁ, খেঁদি রান্না করে' সবাইকে খাওয়াক; যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে ইচ্ছে করলে সে খেতে পারে; এঁটো বাসন মেজে, হেঁসেল পরিস্কার করে' দুপুরে সে ছেঁড়া কাপড় রিপু করুক,—নিজের কাপড়ের দিকে নাই বা সে তাকাল। বিকেলে ঘর-ঝাঁট দিয়ে শুকোন কাপড় কুঁচিয়ে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখুক, সন্ধ্যেবেলা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে আবার সে রান্নাঘরে ঢুকুক, রাত বারোটার পরে সমস্ত কাজ চুকিয়ে দাঁত বার করা স্যাঁৎসেতে মেঝের উপর সে ঘুমিয়ে পড়ুক।

কিন্তু রাণী?

না, না, তাকে তোমরা স্বপ্ন দেখতে দাও।

---

# গান

শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

যে অতিথি আস্‌বে দ্বারে
গহন রাতে,
তারি লাগি আসনখানি
বিছাও হাতে।

উঠবে যখন সন্ধ্যাতারা
শান্ত ধরায় আনবে সাড়া,
ঐ গগনের নিবিড় নীলিম
আঙ্গিনাতে।

দুয়ারখানি দিও খুলে,
আসনখানি বিছাও ধূলে
প্রেমের মালা আনবে সে গো
আপন সাথে।

# ইউরোপের কুরুক্ষেত্র

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

ফ্রান্সের পতনের পর ইংলণ্ডের উপর জার্ম্মাণীর বিরাট বিমান আক্রমণ ভয়াবহ ও নিষ্ঠুরতার দিক্ দিয়ে একটা ইতিহাস রচনা করেছে। আজও সমস্ত মহাদেশব্যাপী শীতের এই কুজ্ঝটিকা ভেদ করে জার্ম্মাণ বোমারু বিমান বাহিনীর অভিযানের বিরতি নেই। দিবসের কর্ম্মব্যস্ততা, রাত্রির প্রগাঢ় সুষুপ্তি ও প্রভাতের স্নিগ্ধ মধুর আবেদন—স্বভাবের এই চিরাচরিত দাবী এই জাতির কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে। সময়ের শ্রেণীবিভাগ আজ ধুয়ে মুছে একাকার করে বৃটিশজাতি ঊর্দ্ধগগনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আকাশের দূর প্রান্তসীমায় বিন্দুর মত অভিযানকারী শত্রুবিমানের আগমনপ্রতীক্ষায়। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও সাহসের এত বড় পরিচয় গত ইউরোপীয় যুদ্ধেও বৃটেন দিতে পারেনি। যতদূর মনে হয়, অগ্রগামী শীতের প্রচণ্ডতায় জার্ম্মাণ বিমান আক্রমণ স্তিমিত হয়ে আসবে এবং ইউরোপের সমরপরিস্থিতি ভূমধ্য-সাগরের জটিল পরিস্থিতিকে আশ্রয় করে আবর্ত্তিত হবে; হয়েছেও তাই, গ্রীসের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই এই পরিবর্ত্তন সুরু হয়েছে। ইতিপূর্ব্বেই ইটালী বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড অধিকার করে বসে আছে এবং উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন

অগ্নিবর্ষী আধুনিক বোমারু বিমান

স্থানেও ইটালীয় আক্রমণের কথা শোনা যাচ্ছে। যদিও গ্রীসের আক্রমণের পর ইটালীর আফ্রিকা অভিযান আপাততঃ স্থগিত রয়েছে বলা যেতে পারে। গত অক্টোবরে হিটলার-লাভাল ও হিটলার-ফ্রাঙ্কো সাক্ষাৎকারের পরই ভূমধ্যসাগরের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে ধরে নেওয়া যায়।

বর্ত্তমানে গ্রীস ও ইটালীর যুদ্ধে ইটালীর পশ্চাদপসরণ সাধারণের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। বিশেষ করে গত কয়েক বৎসর ইটালী কি বিমান বহর, কি নৌবহর,

কি স্থল সৈন্য—মহাসমরের যাবতীয় উপকরণে জাতিকে সজ্জিত করেছিল। তা' ছাড়া সামরিক সংস্থানের দিক্ দিয়েও ইটালীর অবস্থা ছিল বিশেষ সুবিধাজনক। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত পোর্ট সৈয়দ ও দোদেকানিজ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ব্যবধান চারশো মাইলেরও কম, সুতরাং ইতালীয় বিমান ঘাটির নিকট পাল্লার মধ্যে উহা অবস্থিত। ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম দিকে এলে দেখা যায়—ক্রীট ও লিবিয়ার মধ্যস্থিত যে দুইশত মাইল চ্যানেল বর্ত্তমান, তাও ইটালীর টোবার্কস্থিত বিমান ঘাঁটির দুইশত মাইলের মধ্যে। মাল্টা সিসিলির উপকূল ভাগ থেকে মাত্র আশী মাইলের পথ এবং আফ্রিকার টিউনিস থেকে নব্বই মাইলেরও বেশী নয়। সুতরাং সামরিক সংস্থানের দিক্ দিয়ে বিচার করলে ভূমধ্যসাগরে ইটালীর অবস্থা অত্যন্ত সুবিধাজনক বলা যেতে পারে।

সামরিক সংস্থানের এই সব সুবিধা সত্ত্বেও গ্রীসের হাতে ইটালীর এই পরাজয় ইউরোপীয় যুদ্ধের অন্যতম বিস্ময় সন্দেহ নেই। তবে ইটালী কর্ত্তৃক গ্রীস আক্রমণের বহু পূর্ব্ব থেকেই ভূমধ্যসাগরে বৃটেনের তোড়জোড়ের অন্ত ছিল না। ইটালী বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড অধিকার করবার ফলে বৃটেনের সামরিক মহলে গভীর আশঙ্কার ছায়াপাত হয়েছিল এবং মধ্য প্রাচ্যের ও ভূমধ্যসাগরের গুরুতর সমস্যা সমাধান করবার জন্য এণ্টনি ইডেনকে অবিশ্রান্ত জার্ম্মাণ গোলাবর্ষণের মধ্যেও মিশরযাত্রা করতে হয়েছিল। ইটালীর গ্রীস আক্রমণ আকস্মিক নয়, কারণ গত কয় মাসে জার্ম্মাণ বিমান আক্রমণ ইংলণ্ডের উপর শুধু বিভীষিকার রাজত্বই সৃষ্টি করেছে, সমুদ্র পার হয়ে ইংলণ্ড আক্রমণের স্বপ্ন জার্ম্মাণীর কাছে আজও স্বপ্নই রয়ে গেছে। সুতরাং এই অবিশ্রান্ত বিমান আক্রমণ দ্বারা যে সমরনীতির সুরু হয়েছিল, আজ তার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। ইংলণ্ড তথা বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপর আঘাত দিতে হলে রণক্ষেত্রকে শুধু একটি বিশেষ কেন্দ্রেই আবদ্ধ রাখলে চলবে না, বিভিন্ন কেন্দ্রে বিদ্যুৎ-গতিতে অভিযান করা আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহর-সজ্জার তোড়জোড়

সমুদ্র পার হয়ে ইংলণ্ড আক্রমণের ব্যর্থতা আজ জার্ম্মাণ রাষ্ট্রপতিকে শুধু বিচলিত করেছে তাই নয়, তাঁকে বাধ্য করেছে সমর নীতির পরিবর্ত্তন করতে। মধ্য প্রাচ্য ও নিকট প্রাচ্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ

পরিচালনা করবার উদ্যোগ আয়োজন জার্ম্মাণী গত কয়েক মাসে করেছে এবং এখনও এই আয়োজনের অলক্ষ্য প্রচেষ্টা ইউরোপীয় রাজনীতিতে সক্রিয় রয়েছে, এ কথা বলা যায়। জার্ম্মাণ সমরবিশারদগণ ইটালীর নেতৃত্বে মধ্য প্রাচ্যে অভিযান চালাবার আশা অন্তরে পোষণ করেন। এই সম্পর্কে আগে জার্ম্মাণ সমরনায়ক মার্শাল গোয়েরিং যে সদম্ভ উক্তি করেছিলেন, তা উল্লেখযোগ্য।

"Italy is to be Germany's bridge-head for an advance through Africa to the oceans beyond." এই বিরাট্ সামরিক পরিকল্পনায় স্পেনের প্রয়োজন অপরিহার্য্য, ফ্রান্স ও ইটালীর কথা বাদ দিলেও। বর্ত্তমানে প্রকাশ্যভাবে স্পেন জার্ম্মাণীকে কতটুকু সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে তা জানা যায়নি। স্পেনের অধিনায়ক ফ্রাঙ্কো অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছেন। গৃহ-যুদ্ধে বিচ্ছিন্ন স্পেনের যুদ্ধ করবার মত বিলাসিতাও এখন নেই। এসব সত্ত্বেও হিটলারের অদম্য আকাঙ্ক্ষার যূপ-কাষ্ঠে স্পেনকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কারণ মধ্য প্রাচ্য ও নিকট প্রাচ্যের চাবিকাঠি স্পেনের হাতে, এখনও স্পেনের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ফ্রাঙ্কোর বিরোধী একাধিক দল বর্ত্তমান এবং হিটলার কর্ত্তৃক এই দলগুলিকে ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করবার যে সম্ভাবনা, সেদিকেও ফ্রাঙ্কোর দৃষ্টি আছে। সুতরাং সিনর সুনারের বার্লিন গমনের পশ্চাতে জার্ম্মাণ রাষ্ট্রপতির কোন চাতুর্য্য বর্ত্তমান, তার একটা অস্পষ্ট আভাষ হয়তো এ থেকে পাওয়া যেতে পারে। এটা ঘটা মোটেই আশ্চর্য্য নয় যে, ফ্রাঙ্কোর অতি সাবধানী নীতির পরিণামে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হবে এবং রুমানিয়ার রাজা ক্যারলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে' হয়তো তাঁকে ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের অন্তরালে আত্মগোপন করতে হবে। স্পেনের ভাগ্যনিয়ন্তারূপে সিনর সুনারের আবির্ভাবও সে ক্ষেত্রে মোটেই বিস্ময়ের উদ্রেক করবে না।

বর্ত্তমানে গ্রীস ও তুর্কীর রাষ্ট্রনীতিতে ইংরাজের প্রভাব অপ্রতিহত। অথচ মধ্য প্রাচ্যে অগ্রসর হতে হলে ইটালীর গ্রীসীয় দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি ঘাঁটি অধিকার করা প্রয়োজন। ইটালীয় মহল থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, সম্প্রতি বৃটেন গ্রীসের কয়েকটি বন্দর সামরিক ঘাঁটিরূপে দখল করেছে, অবশ্য গ্রীসের সম্মতি নিয়েই। ভূমধ্যসাগরে ক্রীট্ দ্বীপের অবস্থান সামরিক দিক্ দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাসন্ন নৌযুদ্ধে বৃটেন ও ইটালীর যে ভাগ্যপরীক্ষা সুরু হবে, তাতে বৃটেন গ্রীসের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটির সুযোগ পুরো মাত্রায় নিবে সন্দেহ নেই। সুতরাং এই দিক্ দিয়ে বিচার করলে ইটালীর প্রতিবাদের কারণ থাকা স্বাভাবিক। সম্প্রতি বৃটেন কর্ত্তৃক গ্রীসের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করায় বিরুদ্ধে ইটালী যে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, সেনাপতি মেটাক্সাস তার কোনও জবাব দেননি। এই ব্যাপারটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ইটালী কর্ত্তৃক গ্রীস আক্রমণ সমর্থন করা যেতে পারে, নীতিশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে আমরা যাহাই বলি না কেন। উপরোক্ত ঘটনা থেকে বেশ বোঝা যায়, গ্রীস বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির খেলার পুতুলস্বরূপ ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে ঘিরে কূটনীতির যে অদ্ভুত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া চলছে, তার ফলে এই গ্রীসীয় যুদ্ধের গতি কোন দিকে প্রসারিত হবে, তা' সারা জগৎ উৎকণ্ঠার সহিত লক্ষ্য করছে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে জার্ম্মাণী বল্কান অঞ্চলের ভাঙা-গড়ায় অত্যধিক মনোনিবেশ করেছে। বল্কানে জার্ম্মাণ-হস্তক্ষেপের ফলে এ্যাক্সিস মিলনে এ পর্য্যন্ত ছয়টি রাষ্ট্র যোগদান করেছে। সর্ব্বশেষ হাঙ্গারী, রুমানিয়া ও শ্লোভাকিয়া এ্যাক্সিসে যোগ দিয়াছে। যুগোশ্লাভিয়া ও বুলগেরিয়ার যোগদানের সম্ভাবনাও এখনও দূর হয়নি। বল্কান অঞ্চলে জার্ম্মাণীর প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠ করে হিটলার গ্রীস যুদ্ধে ইটালীর সাহায্যে অগ্রসর হবেন, আশা করা যায়। এখানে উল্লেখ করা চলে—নেপোলিয়ন ফ্রান্সের কর্ত্তৃত্বে সমস্ত ইউরোপে ইংলণ্ড বিরোধী একটি অখণ্ড ব্লক সৃষ্টি করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। বর্ত্তমানে হিটলার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহায়তায় সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে চান। বৃটানিয়া নেপোলিয়নের সেই স্বপ্ন ধূলিসাৎ করেছিল। হিটলারের বিরুদ্ধে তার এই আধুনিক প্রচেষ্টা কত দূর ফলবতী হবে, কেবল মাত্র ভবিষ্যৎই তা' বলতে পারে।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে বার্লিনে অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত হিটলার-মলটোভ সাক্ষাৎকার হয়ে গেল। এই সাক্ষাৎকার এ বৎসরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মলোটোভ অবশ্য ঘোষণা করিয়াছেন হের ফন রিবেনট্রপের মস্কোয় নিমন্ত্রণ-রক্ষার পাল্টা সৌজন্য হিসেবে তাকে বার্লিনে আসতে হয়েছে। বিশেষজ্ঞমহলে মঁসিয়ে মলোটোভের এই উক্তি নেহাৎ সাধারণ অজুহাত বলেই গণ্য হবে।

কারণ সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বত্রিশ জন মন্ত্রী ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও জাপানের মন্ত্রীর একত্র উপস্থিতিতে সম্প্রতি যে বৈঠক হয়ে গেল, তার ফলাফল বর্ত্তমান যুদ্ধের গতি নির্ণয়ে প্রভাব বিস্তার করবে। বার্লিনের এই বৈঠকে দু'টো বিষয় আলোচনা হয়েছে বলে' মনে হয়। প্রথমতঃ এ্যাক্সিস্ শক্তিপুঞ্জ ও রাশিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিকও রাষ্ট্রনৈতিক সহযোগিতা; বিশেষ করে' রুষ-জাপান মৈত্রীর সম্ভাবনা, দ্বিতীয়তঃ রুষ জার্ম্মাণ প্যাক্টের সর্ত্তগুলি বিশেষভাবে পুনঃ-বিবেচনা করা। এই বৈঠকের ফলাফল কি হয়েছে জানা যায় নি। কিন্তু ইতিমধ্যে রুষ-জাপান মৈত্রী যে সম্ভবপর হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। চীন ও জাপানের যুদ্ধ আবার পূর্ণোদ্যমে অগ্রসর হয়েছে। ফলে জাপান নিরুপায় হয়ে চংকিং গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ওাঁবেদার নানকিং গবর্ণমেন্টকে স্বীকার করে নিয়েছে। প্রাচ্যে জাপানের 'নবনীতি' প্রবর্ত্তন করবার পূর্ব্বে রাশিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রয়োজন। সুতরাং সুদূর প্রাচ্যের ব্যাপারে জাপান যে এখনও কিছু স্থির করে উঠতে পারেন নি, তা' বুঝতে কষ্ট হয় না। পূর্ব্বপ্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের জাপানের শক্তিবৃদ্ধির উপর হিটলারের নিকট-প্রাচ্য ও মধ্য-প্রাচ্য অভিযানের সাফল্য বহু পরিমাণে নির্ভর করে। এই দিক্ দিয়ে জার্ম্মাণ রাষ্ট্রনায়কের প্রচেষ্টা কত দূর ফলবতী হয়েছে তা জানা যায় নি।

সম্প্রতি ইউরোপে দানিয়ুব কমিশন কন্‌ফারেন্স ব্যাপারে হিটলার ও ষ্ট্যালিনের যোগাযোগ লক্ষ্য করবার বিষয়। বৃটিশ রাজদূতরূপে মস্কোয় স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স-এর নিয়োগের পর ইঙ্গ-রুষ সম্বন্ধের কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা গেছিল। সম্প্রতি এই দানিয়ুব সম্মেলন ব্যাপার নিয়ে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিয়েছে। রুষের এই সম্মেলনে যোগদানে বৃটিশ রাজদূত যে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, সম্প্রতি রুষ তার কড়া জবাব দিয়েছে। রাশিয়া বলেছে, গত মহাযুদ্ধের পর ভার্সেলের সন্ধিতে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর যে অবিচার করা হয়েছিল, তার সংশোধনের জন্য এই সম্মেলনের প্রয়োজন, তাছাড়া দানিয়ুবের ব্যাপারে বৃটিশের হস্তক্ষেপের কোন কারণই নেই।

দূরপাল্লার ভয়ঙ্করা অগ্নিনালিকা

গত নবেম্বর মাসের প্রথমে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে নির্ব্বাচন হয়ে গেল তার গুরুত্ব এ বৎসরের রাজনীতিক

ইতিহাসকে স্মরণীয় করে রাখবে। প্রতিদ্বন্দ্বী উইল্‌কীর বিরুদ্ধে রুজভেল্টের এই নির্ব্বাচনী সাফল্য সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রনীতিক মহলে অভূতপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করেছে। এই নির্ব্বাচনের ফলে জাপানের সুদূরপ্রসারী রাজ্যলিপ্সা বর্ত্তমানে কিছু পরিমাণে সংযত হবে, আশা করা যায়। রুজভেল্টের এই জয়লাভে বৃটেনের মনেও যথেষ্ট আশার সঞ্চার হয়েছে, কারণ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নেতৃত্বে ধনশালী আমেরিকার সাহায্যলাভ বৃটেনের এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় একান্ত কাম্য, সন্দেহ নেই।

বর্ত্তমানে ইটালী ও গ্রীসের যুদ্ধে কোরিট্‌জার পতনের পর ইতালীতে যে উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে, তার ফলে ইটালীয় রণনীতির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। মার্শাল ব্যাডোগ্‌লিও-এর বার্লিন থেকে প্রত্যাবর্ত্তন ও সঙ্গে সঙ্গে ইটালীয় বাহিনীর প্রতি সামরিক শাস্তিদানের ব্যবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। ইটালীর গ্রীস অভিযান ভবিষ্যতে কোন্ পথ অবলম্বন করবে, সারা জগৎ তা' আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করবে।

উপরে আমরা গত দু'মাসের ঘটনাবলী আলোচনা করেছি, ঘটনা-বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে এই সময়ে বিশেষ চমকপ্রদ না হলেও, কূটনীতিক গুরুত্বপূর্ণ বহু ঘটনা গত দু'মাসে ঘটে গেছে। যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে সাময়িক নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অলক্ষ্যে কূটনীতির যে খেলা চলে, তার স্বরূপ সত্য কোন দিন উদ্ঘাটিত হলে দেখা যাবে তার বৈচিত্র্যও বড় কম নয়। আগামী কয়েক মাসে ইউরোপীয় যুদ্ধের কোলাহল হয়তো ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসবে, এবং এই সুযোগে ইউরোপের পূর্ণ দৃষ্টি পড়বে প্রাচ্যের দিকে। কাজেই আগামী কয়েক মাসে ভূমধ্যসাগর ও নিকট প্রাচ্যের পরিস্থিতিতে গুরুতর পরিবর্ত্তন আশঙ্কা করা স্বাভাবিক। সমবেত জার্ম্মাণ ও ইতালীয় রণনীতি ভূমধ্যসাগরে কোন পথ অবলম্বন করে তা লক্ষ্য করবার বিষয়। সুদূর প্রাচ্যেও জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সা প্রশান্ত মহাসাগরে কি বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে ভারতবাসী তা' আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার সহিত লক্ষ্য ক'রবে।

# পদাবলী

### শ্রীকালিদাস রায়

পড়িতে পড়িতে আজ পদাবলী-সংগ্রহের পুঁথি,
মাঝে মাঝে দ্বিধা জাগে, বার বারই হয় স্বরচ্যুতি,
কভু ছন্দোভঙ্গ ঘটে, কোথাও বা হয় দুরান্বয়।
অবাঞ্ছিত শব্দ এসে কোথা দেখি জুড়ে ব'সে রয়
ঘটাইয়া অর্থকৃচ্ছ্র। রবীন্দ্র-যুগের আমি কবি
পারিপাট্য-পক্ষপাতী, রসাস্বাদে অধিকার লভি',
ভাবিতেছি যত মূর্খ লিপিকার কীর্ত্তনীয়া দল,
কবির অনিন্দ্য পদে শ্রীমাধুরী সচ্ছল কৌশল
কলঙ্কে করেছে ক্ষুণ্ণ। রসভঙ্গ হয় ক্ষণে ক্ষণে,
অঙ্গহানি দুষ্ট মিল অস্বস্তির সৃষ্টি করে মনে।

পরক্ষণে ভেবে দেখি লজ্জা পাই, আঁখি যায় খুলে,
তাহারা হৃদয়-পুটে যত্ন ভরে পদরত্নগুলি
যদি না করিত রক্ষা যক্ষ সম, মুছাইয়া ধূলি;
কোথা পাইতাম এই দেবজন-দুর্ল্লভ বৈভব,
নিঃসম্বল প্রভাতের দুঃসময়ে যা নিয়ে গৌরব?
ও-সব কলঙ্ক নয়,—অশ্রুচিহ্ন, ভক্ত ছিল তারা,
ঢালিয়াছে যুগে যুগে এর 'পরে প্রেম-অশ্রু-ধারা।
মুকুতা ছিদ্রিত বটে, সুর-সূত্র পরাইয়া তায়,
তাহারা গেঁথেছে মালা তাই রাধাশ্যামের গলায়
দুলিতেছে, জ্বলিতেছে। অভক্তই ছিদ্র তার খুঁজে,
কৃতজ্ঞতা-ভরে মোর এ বোধনে আঁখি আসে বুজে।

# প্রবর্ত্তক রজত-জয়ন্তী

### অষ্টম মাসিক অনুষ্ঠান

### [ আশ্রমী ]

গত ১৭ই নভেম্বর রবিবার চট্টগ্রাম যাত্রামোহন সেন হলে প্রবর্ত্তক রজত জয়ন্তী উৎসবের অষ্টম অনুষ্ঠান মহোৎসাহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্বামী অমৃতানন্দ প্রশস্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিবার পর, সঙ্ঘের ভক্তচারণ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সুললিত কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত গান করেন। ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজের অবসর-প্রাপ্ত অধ্যক্ষ আজীবন শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। চট্টগ্রামের বহু বিশিষ্ট নাগরিক ও পদস্থ রাজকর্ম্মচারী এবং কয়েক শত তরুণ-তরুণী সভায় উপস্থিত ছিলেন। হলে তিলধারণের স্থান ছিল না।

'প্রবর্ত্তক'-সম্পাদক শ্রীমতিলাল রায় তাঁর স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় তাঁর মর্ম্মবাণী ব্যক্ত করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁর বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—"যে বাঙ্গালা দেশ গত শতাব্দীতে ভারতের জাতীয়ভাব ও আদর্শের অগ্রদূতরূপে ভারতের নেতৃত্ব করিয়াছে, এবার সেই বাঙ্গালা শুধু ভারতের কাছে নয়, সমগ্র জগতের কাছে একটা নূতন বাণী ঘোষণা করিবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যে নূতন একটী আদর্শের জন্ম আজ সংগ্রাম-রত—বাঙ্গালার নূতন বাণী এই নূতন আদর্শকেই একটা শক্তিমান্ অবদানে পরিপুষ্ট করিবে। ব্যক্তি ও জাতির চেতনা যে পর্য্যন্ত একটী অধ্যাত্মপরিবর্ত্তন না আনে, সে পর্য্যন্ত জগতে এই নূতন আদর্শপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। এই রকম আদর্শপ্রতিষ্ঠার জন্ম অজয় ও ভাগীরথীর তীরে, নান্নুর, নবদ্বীপ, হালিসহর ও দক্ষিণেশ্বরে যুগে যুগে এই বাঙ্গালা দেশে শক্তিমান্ অধ্যাত্মনায়কগণের আবির্ভাব হইয়াছে। এই অধ্যাত্মপ্রকাশের ইতিহাসরচনায় বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান উভয়েরই আপন আপন অবদান জোগাইয়াছে। কিন্তু একটা বিরাট্ আদর্শকে যাহারা প্রতিষ্ঠা দিবে, তারা হিন্দুই হউক বা মুসলমান হউক—প্রত্যেককে তার স্ব স্ব ধর্ম্মের মূল নীতিকে জীবনে উপলব্ধি করিতে হইবে। ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিবার আমার অধিকার নাই। যেদিন সে অধিকার লাভ করিব, সেদিন ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধেও বলিব। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার বলিবার আছে। আমি একজন খাঁটি হিন্দু হিসাবে বাঙ্গালার সওয়া দুই কোটি হিন্দুকে বলিব—হিন্দু, তুমি বেদবিশ্বাসী হও। উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র এবং গীতা—শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায় এই তিন প্রস্থানে বেদের যে মর্ম্মপ্রকাশ হইয়াছে—কোন ভাষ্যকারের টীকার উপর নির্ভর না করিয়া ঋষিদের কথা উপলব্ধি কর। শুধু প্রচারক নয়—যাদের জীবনে ধর্ম্মের মূলনীতি মূর্ত্ত হইয়াছে আজ বাঙালায় এমন একদল উৎসর্গীকৃতপ্রাণ নেতার প্রয়োজন হইয়াছে। "প্রবর্ত্তক" আজ এমন একদল শক্তিশালী নায়ককে আহ্বান করিতেছে।"

শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত

তারপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করেন :

"সর্ব্বপ্রথমে সত্য-পুরুষকে অভিবাদন করিতেছি—যাঁহার 'পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি'—যাঁর এক পাদ বা চতুর্থাংশ মাত্র এই প্রাকৃত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অধিকার করিয়া রহিয়াছে, "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" যাঁর ত্রিপাৎ বা তিন চতুর্থাংশ অপ্রাকৃত, নিখিল বিশ্বের ঊর্দ্ধে মানবের জ্ঞানভূমির অতীত অমৃতলোকে বিরাজিত। সেই পুরুষোত্তম নিত্য নূতন প্রেরণার দ্বারা এই বিশ্বকে তরুণ করিতেছেন। সেই সহস্রশিরা, বিশ্বতশ্চক্ষু সত্য-পুরুষকে অভিবাদন করিতেছি।

এই সত্যপুরুষের প্রেরণা যিনি বঙ্গদেশের সংখ্যাতীত তরুণতরুণীর মনে বহন করিয়া আনিয়াছেন, যাঁহার লোকাতীত স্পর্শে জাগ্রত নব

জাতিগঠনের ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে, আমাদের সেই বরেণ্য সঙ্ঘ-গুরুকেও আজ আমাদের সমবেত অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

পশু-শক্তির পীড়নে যখন পৃথিবী পীড়িত হইয়া উঠে, মানবচিত্ত যখন অপ্রাকৃত জগতের দিকে বিমুখ হইয়া পড়ে, জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ ঐহিক স্বার্থের অভিঘাতে যখন জীবের কল্যাণ ও নিঃশ্রেয়সের পথ অবরুদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকে, তখনই সঙ্ঘ-পুরুষের কল্যাণ-শক্তি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার সময় হয়। আমরা এখন এই যুগসন্ধিতেই দাঁড়াইয়াছি। আপনারা আজ সেই সঙ্ঘ-দেবতার অবতরণের জন্য জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করিতেছেন।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের রজতজয়ন্তীর এই অষ্টম অধিবেশনে পৌরোহিত্য করিবার কোন যোগ্যতা আমার নাই। আপনাদের অসীম স্নেহই এই অযোগ্যকে এই স্থানে টানিয়া আনিয়াছে। সেই জন্য আপনারা আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

মনে পড়ে প্রায় ২২ বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামের দুইটি যুবক সঙ্ঘগুরুর পার্শ্বে অনুপ্রাণিত হইয়া এদেশের কোন নিভৃত পল্লীকেন্দ্রে নিজেদের ছোট একটি কর্ম্মভূমি গড়িবার উদ্দেশ্যে আমার নিকট এসেছিলেন। তাঁহাদিগকে তখন কি বলিয়া আমি অভিনন্দন করেছিলাম, স্মরণ নাই। তাঁদের কেউ কেউ হয়তো আজও এখানে উপস্থিত আছেন। শাকপুরা গ্রামে তাঁদের সেই ক্ষুদ্র আরম্ভের সঙ্গে যখন সঙ্ঘের বর্ত্তমান কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রসারতা ও গভীরতার বিষয় তুলনা করি, তখন আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি।

এই পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বাংলার বুকে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ এই যে নূতন প্লাবন এনেছেন, উহা সঙ্ঘগুরু ও সঙ্ঘ-জননীর অপূর্ব্ব ত্যাগ ও তপস্থার ফল। ইঁহাদের তপস্তাপূত পাবন স্পর্শে বাংলার তরুণ ভগীরথেরা এক নব ভাবের মন্দাকিনীস্রোতে বাংলার মনে অপূর্ব্ব শ্যামলতা এনেছেন। বহু পূর্ব্বে এক ভগীরথের তপস্যায় ষাট হাজার মৃতদেহের প্রাণ সঞ্চার হয়েছিল, কিন্তু আমাদের সঙ্ঘসেবকদের সহিত আমরাও আশা করি তাঁদের নিষ্কাম সাধন-বলে ৩৬ কোটি ভারতবাসীর প্রাণে শুদ্ধা ভাগবতী চেতনার প্রতিষ্ঠা হবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে এই ভারতভূমিতে নব জাতির অভ্যুদয় হবে, যেখানে মানব-প্রেমই 'জীবকে আত্মসমর্পণে প্রেরণা দিবে, নরনারীর বুকে সকলের সেবাবুদ্ধি জাগ্রত রাখিবে—যেখানে যুগোচিত নব সন্ন্যাসের সাধনা এবং নীরব আত্মদান সঙ্ঘ-শক্তিকে নব-জাতীয়-জীবনগঠনের পথ নির্দ্দেশ করিবে, যেখানে নূতন নূতন সঙ্ঘট সংহতিকে বলীয়ান্ ও বরণীয় করিয়া তুলিবে—যেখানে সেই অখণ্ড অদ্বিতীয় সঙ্ঘপুরুষের কল্যাণ-শক্তি শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতে নরনারীর মধ্যে অপূর্ব্ব ঐক্য স্থাপন করিবে।

এই মহাজাতিগঠনের স্বপ্নে বিভোর বাংলার কতিপয় যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ মিলিয়া এই আট মাস ধরিয়া বাংলার ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘকেন্দ্রে জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, যেখানে যেখানে সঙ্ঘের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানেই উৎসবের আনন্দ-বারি বর্ষিত হইতেছে। সঙ্ঘ-সাধকদিগের সংযম, নীরব আত্মত্যাগ, অকুণ্ঠিত দেশাত্মবোধ এবং গোপন অধ্যাত্মসাধনা সঙ্ঘশক্তিকে জাতীয় জীবনের নানা অনুষ্ঠানকে দিন দিন নব নব রূপ দান করিতেছে। সঙ্ঘের গঠন-শক্তি চট্টগ্রামের প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠে কিরূপে রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে তা' আপনারা স্বচক্ষেই দর্শন করুন, আমার এই অনুরোধ।

সঙ্ঘের বাহিরের এই ঐশ্বর্য্য-রূপ—অর্থাৎ তাহার শিক্ষায়তনসমূহ, তাহার অর্থপ্রতিষ্ঠান, তাহার পল্লীসংগঠনপ্রচেষ্টার প্রসার ও গভীরতা দেখিয়াই যদি আপনারা মুগ্ধ হন, তবে এই তরুণ উপচীয়মান সঙ্ঘ-শক্তির যথাযথ পরিচয় হইবে না। উহার প্রাণকেন্দ্র বিপুল, গহন ও গম্ভীর।

এই শক্তিকেন্দ্রে সঙ্ঘসেবকদিগের নীরব প্রেমের ঐকান্তিক সাধনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। উহা লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত নিত্যই প্রবহমান। হরিদ্বারের গঙ্গাধারার মত অহরহ নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে এক মুখে নবজাতিগঠনের দিকে অজস্র প্রবাহিত। উহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, চলার আনন্দেই এই কর্ম্মের স্রোতঃ শিলাসংঘাত উপেক্ষা করিয়াই চলিয়াছে।

দিব্য প্রকৃতির প্রেরণার প্রভাবে ইঁহারা ধর্ম্মকে, কর্ম্মকে এবং অন্তরাত্মাকে শুদ্ধ ও অমৃতায়িত করেন বলিয়াই ইহাদের শক্তিসম্পদ্ বাঙালীর নিকট এত বরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্ঘের এই সাধন-কেন্দ্রেই ত্রিপাদূর্দ্ধ পুরুষের বিশ্বমুখী কল্যাণশক্তির অবতরণ, উহাই সঙ্ঘের দৈবীশক্তির উৎস-ভূমি। উহাতেই সঙ্ঘসাধকেরা অবগাহন করিতে সচেষ্ট। সঙ্ঘের প্রাণাধিপের বাস ওখানে। সঙ্ঘশিষ্যেরা কর্ম্মের দ্বারা এই শক্তিপীঠে সাধনা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁরা

"জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্"

সর্ব্বভূতের মধ্যে শিবরূপ সেই প্রাণাধিপকে জানিতে পারিয়া জাতি, জন্ম, যৌবন, বিদ্যা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের মৃত্যুপাশ ছেদন করিবার প্রয়াসী। এই সকল সঙ্ঘসাধকদিগের হৃদয়ে সঙ্ঘগুরুর শক্তিমন্ত্র ক্রিয়াশীল হইয়া অল্পদিনেই শিক্ষাব্যাপারে, অর্থপ্রতিষ্ঠানে, সামাজিক জীবনে সেবাপরায়ণ আত্মত্যাগে কি এক অপূর্ব্ব অপরূপ সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিতেছে।

নব-জাতি গঠনে লোক-শিক্ষার দিক্ হতে এই ২২ বৎসর প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ চট্টগ্রামে কি কি কাজ করিয়াছেন, তাহা তাঁদের মুদ্রিত কার্য্য-বিবরণী হ'তে আপনারা অবগত হইবেন। তাহার পুনরুক্তি আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আজকাল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শ নিয়া যে সমস্যা ও সংঘর্ষ দেখা দিয়াছে, তাহার দিকে অতি সংক্ষেপে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহা দ্বারা আমাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও গতিপথ স্পষ্ট হইতে পারে।

নানা দেশের বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার আদর্শ ও ধারা-লক্ষ্য

করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন, সকল প্রতিষ্ঠানগুলিকে আমরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি।

(ক) রুষিয়া, জার্ম্মাণী, ইতালী, তুরস্ক, বলকান রাজ্যসমূহ এবং জাপানের শিক্ষাতন্ত্রে দেখিতে পাইবেন, সকল বিদ্যালয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য—

রাষ্ট্রগত অতীত সংস্কৃতির রক্ষণ—যেন তদ্দ্বারা রাষ্ট্রের প্রত্যেক লোক জাতীয় অতীত সাধনালব্ধ জ্ঞান, কলাকৌশল, ভাবপ্রবাহের অধিকারী হইয়া সমাজের মধ্যে আপন আপন স্থান পরিগ্রহ করিয়া লইতে পারে এবং প্রত্যেক মানুষ রাষ্ট্রনির্দ্দিষ্ট একটি typical মানুষরূপে পরিণত ও সংহত হইয়া নির্ব্বিচারে রাষ্ট্রের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারে।

এই সকল রাষ্ট্রে বিদ্যালয়গুলির একমাত্র কার্য্য—"Conservation and perpetuation of existing forms." এই সকল রাষ্ট্রে প্রজাগণ নিরীহ যন্ত্ররূপে রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং প্রজার মনে রাষ্ট্রে এবং ভোগভূমিতে অতিবিশ্বাস, অন্ধতা, গতানুগতিকতা, সর্ব্বভাবে রাষ্ট্রের আদেশানুবর্ত্তিতাদি লক্ষণ হইয়া উঠে।

জনসাধারণের প্রতি রাষ্ট্রপতিদের মনোভাব এই কয়টি উক্তি হ'তে আপনারা অনুমান করিবেন

"Any one may grumble or criticise, if he is not afraid to go into a concentration camp."

যদি বন্দীশালায় বাস করার ভয় না থাকে, তোমরা যে কেহ গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে সমালোচনা বা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পার।

মুসোলিনী বলেন—"Everything must be for the State, nothing outside the State, nothing against the State."

রাষ্ট্রের জন্যই সব, রাষ্ট্রের বাহিরে কিছুই থাকিবে না। রাষ্ট্রের প্রতিকূলে কিছু থাকিতেই পারে না।

রুষিয়া সম্বন্ধেও তাই—

"In U. S. S. R. everybody knows beforehand, once and for all that on any subjeot there can be only one opinion. Every morning the Pravada teaches them what they should know, think and believe."

রুষিয়াতে প্রত্যেক প্রজা পূর্ব্ব-হইতেই জানিয়া রাখে—প্রত্যেক বিষয়ে কেবলমাত্র একটি মাত্র মত থাকবে। প্রত্যেক প্রাতে রুষিয়া সরকারের মুখপত্র "প্রভাদা" বলিয়া দেয়—প্রত্যেক প্রজার কি কি জানতে হবে, কি কি ভাবতে হবে, আর কি বিশ্বাস করতে হবে।

জাপানের কথা বেশী উল্লেখ করিলাম না। আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন—জাপানের কর্ত্তৃপক্ষেরা "A Bureau of Thought Suspension" স্থাপনা করেছেন।

এই সকল রাষ্ট্রে শিক্ষাতন্ত্রের কাজ সরল; মনিবের আদেশ মেনে চলা; ফ্যাক্টরীতে যেমন কলে একই রকমের আসবাব তৈয়ারি হয়, ঐ সকল দেশে তেমনি একই প্যাটার্ণ-এর নানা furnitureএর মত লোক তৈয়ারি করার জন্য শিক্ষায়তনের দায়িত্ব রহিয়াছে।

(খ) শিক্ষার আদর্শ ও নীতির দিক্ হ'তে, দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি প্রধান।

এই রাষ্ট্রগুলির ভিত্তি গণমতের স্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষায়তনগুলিতেও প্রত্যেক ব্যক্তির যাহা জন্মগত অধিকার—তাহা আত্মগত চিন্তা, আদর্শ ও বৃত্তিগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা, তাহার বিশিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাবপ্রকাশের কৌশলের উৎকর্ষসাধন এবং ঐগুলির জন্য অকুণ্ঠিত চেষ্টা। কাজেই ঐ সকল বিদ্যাভবনের দায়িত্বও অনেক। ইহাদের লক্ষ্য "Promotion of Growth beyond the Type; Preparation for Leadership." এই সকল রাষ্ট্রের শিক্ষাভবনগুলিতে যুবকদিগের এমন শিক্ষা দিবার প্রয়াস চলিতেছে, যাহাতে শিক্ষিত যুবকেরা দেশের পূর্ব্বতন সংস্কৃতির কেবলমাত্র বাহন হইবেন না, উঁহারা সেই সংস্কৃতিকে পুষ্ট, পরিবর্দ্ধিত এবং প্রবুদ্ধ করিয়া দেশের সমাজের নায়কত্ব গ্রহণ করিবেন।

দুঃখের বিষয়, এদেশের শিক্ষায়তনগুলি এতদিন ধরিয়া হয় আমাদের পূর্ব্বতন আদর্শগুলিকে হুবহু বর্ত্তমানে টানিয়া আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, নয় পাশ্চাত্য দেশের আদর্শগুলিকে এদেশের বুকে চাপাইবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছে। শিক্ষা সেইজন্য ফলবতীও হয় নাই এবং আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড গঠিত হয় নাই। শিক্ষা এ যাবৎ সুখসম্পদ্ বা অর্থার্জ্জনের উপায়রূপেই লোকেরা দেখিয়াছে, যেখানে ঐ তিনটির কোনটিই শিক্ষাদ্বারা লব্ধ হয় নাই, সেখানে শিক্ষা বন্ধ্যা বলিয়া লোকেরা শিক্ষক, শিক্ষায়তন এবং শিক্ষিত সমাজকে উপহাস করিয়াছে।

সৌভাগ্যের বিষয় এবং আমাদের সকলের গৌরবের বিষয়, চট্টগ্রামের প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ শিক্ষা যে মানবজীবনের সার্ব্বাঙ্গীন বিকাশের একমাত্র উপকরণ—এই আদর্শের কথঞ্চিৎ প্রেরণা উপলব্ধি করিয়াছেন; উঁহারা যে বিদ্যাপীঠের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা দ্বারা আশা করি, শিক্ষিতের অধ্যাত্মচেতনা জাগ্রত হইবে—যাহা সকল পার্থিব শক্তিসম্পদের একমাত্র উৎস-ভূমি, যাহার আলোকে বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানাদির শ্রেষ্ঠ সম্পদ নূতন জীবনগঠনে নিয়োজিত হইতে পারে। সঙ্ঘের বিদ্যাপীঠ শিক্ষিতদিগের কেবল শিক্ষালাভের ক্ষেত্র নয়। উহাদের অধ্যাত্মশক্তিলাভের সাধনস্থান, উহাদের একাধারে পিতৃভূমি, কর্ম্মভূমি এবং সেবাকেন্দ্র। এই পীঠ হইতে আমার আশা আছে—নূতন নূতন সাধক বাহির হইয়া হিন্দুর জরাজীর্ণ সমাজদেহে প্রাণের তরুণ রস সঞ্চারিত করিবে। সঙ্ঘের অন্যান্য শুভকার্য্যের মধ্যে ইহাই

জাতীয় জীবনের প্রথম ও প্রধান সৃষ্টির কাজ বলিয়া আমার মনে হয়। সর্ব্বশেষে, বরণীয় সঙ্ঘসেবকদিগের সহিত আমি ঋগ্বেদের এই সূক্তটি উচ্চারণ করিতেছি—

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব
উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

যিনি আত্মদা—চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদন করেন, যিনি বলদা—বল বিধান করেন, সকল প্রাণী ও দেবগণ যাঁহার অনুশাসনে বিধৃত। অমরত্ব এবং মৃত্যু যাঁহার কল্যাণহস্তের ছায়া, সেই পরম সুখরূপী বাক্‌মনের অতীত অরূপ দেবতাকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধারূপ হবিঃ নিবেদন করিতেছি।

নিম্নলিখিত এবং অন্যান্য বহু সহরের বিশিষ্ট ভদ্রলোক ঐ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন—শ্রীযুত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, শ্রীযুত উপেন্দ্রমোহন রক্ষিত, শ্রীযুত মণীন্দ্রভূষণ দত্ত, খান বাহাদুর আবদুল সত্তার, অধ্যাপক আবু হেনা, অধ্যাপক এফ্‌ রহমান, অধ্যাপক মনসুরুদ্দিন, অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ, অধ্যাপক শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ, অধ্যাপক জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক কালীহর চক্রবর্ত্তী, মৌলবী এক্রামল হক, শ্রীযুত নগেন্দ্রলাল দাস, শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র বসু, পাঞ্চজন্য, যুগধর্ম্ম, দেশপ্রিয় এবং গণশক্তির সম্পাদকবৃন্দ, ডাঃ পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, ডাঃ বঙ্কিমচন্দ্র দাস, ডাঃ বিনয়শেখর দত্ত, শ্রীযুত ভীমজি নারায়ণজি প্রভৃতি।

# ব্রহ্মসূত্র

## ( তৃতীয় পাদ )

শ্রীমতিলাল রায়

প্রথম ও দ্বিতীয় পাদের ন্যায় তৃতীয় পাদেও পরমেশ্বর-বাচক শ্রুত্যুক্ত শব্দগুলি প্রকৃতি বা জীবাদি-প্রতিপাদক নহে, তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন মণ্ডূক শ্রুতি বলিয়াছেন "যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈস্তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথহ-মৃতস্যৈষ সেতুরিতি" অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্তরীক্ষ এবং মন, প্রাণ ও সর্ব্বেন্দ্রিয় সহিত যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই এক আত্মাকে অবগত হও, অন্য কথা ছাড়, ইনি অমৃতের সেতু। শ্রুতির এই উক্তি হইতে সংশয় হইতে পারে যে, এই চরাচর যাহাতে ওতঃপ্রোতঃ ভাবে প্রতিষ্ঠিত, সেই অমৃতের সেতু কে? জীব না প্রকৃতি? কেন না, প্রকৃতিও যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের কারণ। তাহাতেও তো এই সকল আশ্রিত হইতে পারে। অমৃতের সেতু বলায় ইহার অন্যথাও হয় না; কেন না, সাংখ্যবাদিরাও পুরুষের মুক্তি-হেতু প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, একথাও স্পষ্ট করিয়া বলেন। অন্যপক্ষে জীব যখন ভোক্তা এবং জীবও যখন মনপ্রাণাদিসম্পন্ন, তখন জীবেও তো স্বর্গাদি অধিষ্ঠিত হইতে পারে। ইহার মীমাংসার জন্য ব্যাসদেব তৃতীয় পাদের প্রথম সূত্র উচ্চারণ করিতেছেন

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ

দ্যুভ্বাদি—স্বর্গ, পৃথিবী প্রভৃতি আয়তনং আধার—ব্রহ্ম। কেন? স্ব-শব্দাৎ—স্বশব্দ, আত্মশব্দেরই প্রতিবাক্য হেতু অর্থাৎ শ্রুতি আত্মশব্দের মুখ্য অর্থ পরমাত্মাই বলিয়াছেন। যিনি পরমাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম।

পূর্ব্ব পক্ষ বলিতে পারেন—যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মকে সেতু বলা হয় কেন? সেতু শব্দের অর্থ এমন এক সসীম বস্তু, যাহা দ্বারা নদ্যাদি পার হওয়া যায়। ব্রহ্ম কি সেতু নামে বিশেষিত হইতে পারেন? শ্রুতি কোথাও তো ব্রহ্মকে সসীম বলেন নাই। ব্রহ্ম অনন্ত। অতএব উক্ত মণ্ডূক শ্রুতিতে যে আত্মার কথা উক্ত আছে, তাহার পর্য্যায়-শব্দ যখন সেতু, তখন ঐ শ্রুত্যুক্ত আত্মা পরমব্রহ্ম হইতেই পারেন না।

ইহার উত্তরে বলা যায় যে, সেতু শব্দের অর্থ সর্ব্বদা বন্ধনার্থ নাও হইতে পারে। সি ধাতুর মুখ্য অর্থ বিধরণ। শ্রুতির সেতু শব্দের এই ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থই গ্রহণীয়। যে শ্রুতি বলিয়াছেন—এই সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই অমৃত, তাহা বন্ধনার্থে কাষ্ঠমৃত্তিকাদি-নির্ম্মিত সেতু হইতেই পারে না। আত্মশব্দের দ্বারা ব্রহ্মকে জগদায়তন বলায়, উহা বিধরণ অর্থাৎ সব ধারণ করিয়া আছে, এই অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়াই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই ভাবার্থ সেতু-শব্দে প্রযুজ্য।

শ্রুতি ব্রহ্মকে এক অখণ্ডরস বলায়, মায়াবাদীরা জগৎ-প্রপঞ্চ-লয়ের সন্ধান পাইয়াছেন। শ্রুতিও বলেন—যে ব্যক্তি অখণ্ডৈক রসের নানাত্ব দর্শন করে, ভেদ অনুভব করে, সে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। শ্রুতি আবার বলিয়াছেন—"সর্ব্বং ব্রহ্মেতি"—এই সমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ও এই সমস্ত, ইহা বলায় একটা ভেদ বিবক্ষিত হইতেছে। ভেদদর্শী মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, এমন শ্রুতিবচনও রহিয়াছে। ইহাতে প্রপঞ্চময় সমস্ত লয় করিয়া ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু দেখার নিষেধই স্বীকৃত হইতেছে। এ ব্যাখ্যা মায়াবাদীর। জগৎ-প্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম—ভাব-ভেদ, মূলতঃ বস্তু-ভেদ নহে। কেন না, "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি"—ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু নাই। প্রপঞ্চের সহিত ব্রহ্মের অভেদ উক্তিও শ্রুতিতে আছে—যথা, "স নৈন্ধব-ঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব এবং বা অরেঽয়-মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব।" লবণখণ্ড যেমন অন্তরে বাহিরে এক-রস, রসান্তর-শূন্য, সেইরূপ এই আত্মা অন্তরে বাহিরে প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ পূর্ণ। এই কথার পর প্রপঞ্চ-লয়ের কথা আর আসিতেই পারে না। বরং প্রপঞ্চের সহিত ব্রহ্মের ভেদদর্শীর অবস্থা মৃত্যুতুল্যই বলা হইয়াছে। গীতাও এই কথা প্রমাণ করে—সে ধীর, যাহার সুখ-দুঃখ সমান, লোষ্ট্র-কাঞ্চন সমান, প্রিয়াপ্রিয় সমান এবং সেই ব্যক্তিই শাশ্বত সুখ প্রাপ্ত হয়, সেই "গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।" এই গুণ অতিক্রম করার কথা নির্গুণ ব্রহ্ম হেতু নহে। উপনিষদ্ গুণময় ব্রহ্মের ঋকই উচ্চারণ করিয়াছেন। গুণ-ভেদ-দর্শনের মোহ বর্জ্জন করিলেই অনন্ত গুণের আস্বাদ ব্রহ্মে ও জগৎপ্রপঞ্চে হইয়া থাকে। জীব যে "মমৈবাংশঃ", সে এক ভাব। আর ব্রহ্ম "জীবভূতঃ", সে অন্য ভাব। ইহাতে বস্তুভেদ হইতেছে না। এই ভেদদর্শীর শান্তির কথাই শ্রুতি বলিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রপঞ্চের লয়বার্ত্তা নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ॥২॥

মুক্ত—মুক্ত পুরুষের দ্বারা, উপসৃপ্য—প্রাপ্য, ব্যপ-দেশাৎ এইরূপ কথিত থাকার হেতু। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রথম সূত্র দ্যুভাদির আয়তন ব্রহ্ম ভিন্ন আর অন্য কিছু নহে; কেননা, মুক্ত পুরুষেরা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি হইতে পারেন?

মুক্ত অর্থে—অহং বা আমি, এইরূপ জ্ঞানের লয় হেতু যে অবস্থা, তাহাই মুক্ত পুরুষের আখ্যা। শ্রুতি বলিয়াছেন "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।" অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ে যে কামগ্রন্থি, তাহা যখন ছিন্ন হইয়া যায়, তখন সে অমর্ত্ত্য হয়, অমৃত হয় এবং ব্রহ্মলাভ করে। অতএব পূর্ব্বোক্ত আয়তন যে ব্রহ্ম, ইহা সুনিশ্চয় হইল।

নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ॥৩॥

ন অনুমানম্—সাংখ্যপরিকল্পিত প্রধান নহে। অ-তৎ-শব্দাৎ—অচেতন-প্রধান-বাচক শব্দের অভাব হেতু।

প্রকৃতিবাচক শব্দের উল্লেখ এখানে নাই। অতএব শ্রুত্যুক্ত এই আয়তন শব্দ ব্রহ্মবাচক ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। প্রত্যুত শ্রুতিতে এইরূপ বাক্যই আছে "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি।

প্রাণভৃচ্চ ॥৪॥

যাহার প্রাণ আছে, সে জীব। তাহাও নহে।

সূত্রকার তৃতীয় সূত্রের সহিত এই সূত্রটীকে একসঙ্গেই বলিতে চাহিয়াছেন; তাই 'ন' শব্দটী এই ক্ষেত্রে ব্যাখ্যায় গৃহীত হইল।

জীবের প্রাণ আছে, আত্মাও চেতন। জীব উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু জীবের সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ হওয়া অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত আয়তন শব্দে জীব তাই বোধ্য হইতে পারে না।

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥৫॥

ভেদ কথিত হওয়া হেতু।

শ্রুতি বলিয়াছেন—জীব আত্মাকে জানিবে। এই কথায় ইহাই স্পষ্ট হয় যে, জীব জ্ঞাতা, আত্মা জ্ঞেয়; অতএব জীবের যাহা জ্ঞেয়, তাহা জীব হইতে ভিন্ন। এই হেতু দ্যুলোকাদির আয়তন পরমাত্মা বলিয়াই গ্রহণীয়।

প্রকরণাৎ ॥৬॥

প্রোক্ত শ্রুতিবাক্য আয়তন জীব যে নহে, তাহা প্রকরণ-বলেই জানা যায়। অর্থাৎ আয়তন-শ্রুতির প্রস্তাবে যে প্রকরণ, তাহা পরমাত্মারই প্রকরণ; কেন না, প্রারম্ভ-বাক্যে এই কথাই আছে "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি"—হে ভগবন্, কোন্ বস্তু জানিলে এই সমস্ত জানা হয়? এইরূপ গীতাও বলিয়াছেন "যজ্জ্ঞাত্বা নেহভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে"। জীব উপাধি-পরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বাত্মক নহে। এই হেতু জীব-জ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান কেমন করিয়া হইতে পারে? জীব সর্ব্বলোকাশ্রয় নহে, তাহার অন্য হেতুও ঋষি বলিতেছেন।

স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥৭॥

স্থিতি-অবস্থিতি, অদনভ্যাম্ চ—ও ভক্ষণের দ্বারা উল্লেখ। বিশদর্থ শ্রুতিতে আছে "দ্বা সুপর্ণা সুযুজা সখায়াঃ সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে" ইত্যাদি। এই সূত্রে এক বৃক্ষে দুই পক্ষীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। উভয়েই উভয়ের সখা ও সহযোগী। তারপরেই বলা হইতেছে—একের স্থিতি, অন্যের ওদন অর্থাৎ একজন কেবল মাত্র উদাসীন-ভাবে অবস্থিত, অন্যটী ফলভোক্তা। এইরূপ বলার উদ্দেশ্য—এই শ্রুতি একটীকে জীব বলিয়াছেন, অপরটীকে ঈশ্বররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। জীব বুদ্ধিসংশ্লিষ্ট; তাই সে—আমি ভোগ করি, আমি জীবিত আছি, এইরূপ বোধ করে। অন্যটী শরীরাদি উপাধি ব্যতিরেকে জীবেরই সহযোগী রূপে পরমাত্মা। জীব ও ব্রহ্মের এই ভেদ-বিবক্ষা শ্রুতির সর্ব্বত্র কথিত আছে। পরের সূত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে।

ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥৮॥

ভূমা—পরমাত্মা, সম্প্রসাদাৎ—সুষুপ্তি হইতে অধিক কিনা শ্রেষ্ঠ, এইরূপ উপদেশ করায়।

শ্রুতিতে প্রাণের অপর নাম সম্প্রসাদ বলা হইয়াছে। কেননা, সুষুপ্তি অবস্থায় প্রাণবৃত্তি জাগ্রত থাকার কথা শ্রুতিতে আছে। ভূমা প্রাণ হইতে শ্রেষ্ঠ। ছান্দোগ্য উপনিষদে ভূমাকে জানার কথা আছে। নারদ সনৎ-কুমারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—সুখ কি? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন—যাহা অল্প, যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা সুখ নহে, পরন্তু "যো বৈ ভূমা তৎসুখং"; অর্থাৎ যাহা ভূমা, তাহাই সুখ। ভূমা শব্দের অর্থ বহু; যাহা বহু, তাহা অনেক। ভূমা শব্দে বহু বুঝায় বলিয়া যেখানে বহু, সেইখানেই ভূমা, এইরূপ সংশয় হওয়া স্বাভাবিক—যেমন শ্রুত্যুক্ত এই কথা "প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্" অর্থাৎ প্রাণ আশা অপেক্ষা বহু। সনৎকুমার তবে কি প্রাণকেই ভূমা বলিলেন? আরও সংশয় ঘনীভূত হয়, যখন দেখি—শ্রুতিতে ইহার পরেই বলা হইয়াছে—যদি কেহ প্রাণবিদ্‌কে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি অতিবাদী? প্রত্যুত্তরে তিনি বলিবেন, আমি অতিবাদী। ইহাতে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপাদিত হয়। অতএব প্রাণই ভূমা। শ্রুতিতে আছে, "যে অবস্থায় অন্য কিছু দেখা যায় না, শুনা যায় না, তাহাই ভূমা।" সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ প্রাণে লয় পাইলে, এই অবস্থা উপস্থিত হয়। শ্রুতি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—সুষুপ্তির অবস্থায় দেহপুরে প্রাণরূপ অগ্নিরাই জাগ্রত থাকে। ভূমাই সুখ, ভূমাই অমৃত, প্রাণপক্ষেই তাহা সঙ্গত; কেন না, শ্রুতি প্রাণকে অমৃতই বলিয়াছেন। প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রুতিতে অনেক স্থলে কথিত হইয়াছে। অতএব ভূমা প্রাণ না হইবে কেন?

এইরূপ সংশয় দূর করার জন্য পূর্ব্বোক্ত সূত্রের অবতারণা। শ্রুতি সুষুপ্তির উপরে ভূমার উপদেশ করেন। সুষুপ্তি সম্প্রসাদ শব্দের বাক্যান্তর। জীবের সম্যক্ প্রসন্নতা যে অবস্থায়, তাহারই নাম সম্প্রসাদ। সম্প্রসাদ-কালে প্রাণ জাগ্রত থাকে—এই যে শ্রুতিবচন, উহা ভূমার অভিপ্রায়ে কেমন করিয়া হইতে পারে, যখন ভূমাকে সম্প্রসাদের উর্দ্ধে বলা হইতেছে? অতএব যাহা ভূমা, তাহা প্রাণ হইতে ভিন্ন।

কিন্তু কথা হইতেছে—শ্রুতিতে প্রাণ হইতে বড় কিছুর উপদেশ নাই। বরং আছে—প্রাণবিৎ অতিবাদী হয়। এই হেতু প্রাণের উর্দ্ধে ভূমার উপদেশ সঙ্গত হয় না। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—প্রাণই পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী

ও আচার্য্য, প্রাণই ব্রহ্ম। ইহাতে কি প্রাণকেই ভূমা বলা অসঙ্গত হয়?

ইহার উত্তরে বলা যায়, ঐ অতিবাদিত্ব প্রাণ বিষয়ে প্রযুজ্য নহে। প্রাণবিদ্ আমি অতিবাদী, এরূপ বলিবেন; সঙ্গে সঙ্গে উক্ত স্থানে শ্রুতির এই বিশেষ উক্তিও আছে—সত্যের দ্বারা অতিবাদী হইবে। এই বিশেষ উক্তি দ্বারা প্রাণের অতিবাদিত্ব প্রকরণচ্ছলে বলা ব্যতীত অন্য হেতু নাই, এইরূপ বুঝা যাইতেছে। ইনি অতিবাদী, যিনি সত্য বলেন—এইরূপ স্থলে সত্যকথনের দ্বারা অতিবাদিত্ব গুণ-প্রাপ্তি হয় না। অতিবাদী হইলে, তবেই অতিবাদিত্ব সিদ্ধ হয়। প্রকরণবশে প্রাণবিজ্ঞানের সহিত যে অতিবাদিতার প্রতীতি, তাহা গ্রহণীয় নহে—যদি শ্রুতির চরম উপদেশ উহাতে গৃহীত না হয়। প্রকরণের অপেক্ষা শ্রুতির বল অধিক, এই ন্যায়ের দ্বারা প্রাণের অতিবাদিত্ব স্বীকার্য্য নহে। কেন না, "এষ তু সত্যস্ত"—এইরূপ 'তু' শব্দযুক্ত বাক্যপ্রয়োগ হওয়ায়, প্রাণ অপেক্ষা বিশেষ বস্তুর বোধই প্রকাশ করিতেছে। যেমন একবেদী ব্রাহ্মণের প্রশংসা করিয়া পশ্চাৎ চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণকে যদি অতিব্রাহ্মণ বলা যায়, তাহা হইলে একবেদী ব্রাহ্মণ হইতে চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। পূর্ব্বের অতিবাদী বাক্য সেইরূপ প্রাণ হইতে ভিন্ন বস্তু বুঝাইয়াছে।

শ্রুতি যে প্রাণকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তাহাও প্রকরণ-বশে। প্রস্তাবের সমাপ্তি পর্য্যন্ত ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রাণই যদি চরম হইত, তদূর্দ্ধে ব্রহ্মোপদেশ থাকিত না। শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন—পরমাত্মা হইতে প্রাণ। অতএব ভূমা প্রাণ নহে, ইহা ব্রহ্মেরই উদ্দেশ্যে কথিত হইয়াছে। পরম বৈপুল্য ব্রহ্মে প্রযুজ্য, অন্য কিছুতে নহে।

### ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥৯॥

ধর্ম্মঃ—সত্যত্বাদি বা সর্ব্বগতত্বাদি ধর্ম্ম, উপপত্তেঃ—যুক্তিত্ব হেতু।

ভূমা উপদেশ করিয়া শ্রুতি যে সকল পরিচয় প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ যে সকল গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সমস্ত ধর্ম্ম পরম ব্রহ্মেই প্রযুক্ত হয়; এই হেতু ভূমা শব্দ পরম ব্রহ্ম। শ্রুতিতে আছে—"নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা।" অর্থাৎ দর্শনাদি ব্যবহার নাই, এরূপ ধর্ম্ম—এ পরমাত্মা ভিন্ন আর কিসে হইবে? প্রতিবাদী বলিতে পারেন—সুষুপ্ত অবস্থাতেও ব্যবহার ভাবের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। হাঁ, একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু এরূপ স্থলে প্রাণ-স্বভাব বিবক্ষিত করার জন্য ঐরূপ বলা হয় নাই। উহা পরমাত্ম-প্রকরণ হেতুই বলা হইয়াছে। শ্রুতি এরূপ বলিয়াছেন—সুষুপ্তিতে সুখ আছে; আবার বলিতেছেন যাহা ভূমা, তাহাই সুখ। এইরূপ প্রকরণে সহজেই বুঝা যায়—শ্রুতি পরম কারণই বুঝাইতেছেন। সত্যত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব—এ সকল ধর্ম্ম পরমাত্মাতেই সঙ্গত। ভূমাই পরমাত্মা।

### অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥১০॥

অক্ষরম্-ব্রহ্ম, (কেন) অম্বরান্ত—আকাশ পর্য্যন্ত, ধৃতেঃ—ধরিয়াছেন, তাই।

বৃহদারণ্যকে—গার্গীর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, আকাশ অক্ষরে ওতঃপ্রোতঃ। পূর্ব্বপক্ষ বলিবেন, শ্রুতি একথাও বলিয়াছেন—এ সমস্তই ওঁকার। অতএব অক্ষর-শব্দের অর্থ যখন বর্ণ হয়, তখন যে বর্ণে যে অর্থ রূঢ়, তাহার প্রসিদ্ধি ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত নহে। কিন্তু তাহা নহে। শ্রুতি অক্ষরকে পৃথিব্যাদি অম্বরান্ত পদার্থের বিধারক বলিয়াছেন। শ্রুতি যদিও ওঁকারকে "এবেদং সর্ব্বমিতি" বলিয়া ওঁ-অক্ষরের সর্ব্বাত্মতা করিয়াছেন; কিন্তু উহা পবিত্র ওঁকার অক্ষরের স্তুতিমাত্র। গীতাও বলিয়াছেন—"বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ"। অক্ষর শব্দের যথার্থ অর্থ "ন ক্ষরতি অশ্নুতে চ"। যিনি ক্ষরিত হন না, যিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনিই অক্ষর। বর্ণের এরূপ ধর্ম্ম নহে। প্রতিপক্ষ আরও বলিতে পারেন—শ্রুত্যুক্ত এই অক্ষর যদি আকাশান্ত পদার্থের বিধারক, তাহা হইলে আকাশাদি জন্য-দ্রব্য কারণ-দ্রব্যের অধীন হইবে। কারণকে কার্য্যের বিধারকও তো বলা যায়? যেমন ঘটের বিধারক মৃত্তিকা। এই যুক্তিতে অক্ষর প্রকৃতি কেন না হইবে? ইহার উত্তর ব্যাসদেব পর-সূত্রে দিতেছেন।

### সা চ প্রশাসনাৎ ॥১১॥

সা—অম্বরান্ত-ধারণশক্তি, প্রশাসনাৎ—শাসনপূর্ব্বক হওয়া হেতু।

প্রকৃতি বা জীব বিকারী পদার্থের কারণ ও ভোগ্য জড় বস্তুর আশ্রয়—এই উভয়কেই অক্ষর বলা যায় না; যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলিতেছেন, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে" ইত্যাদি। অর্থাৎ হে গার্গি, সূর্য্য, চন্দ্র, নিখিল জগৎ অক্ষরের আজ্ঞাতে বিধৃত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে। প্রকৃতি জড়স্বভাব; জীবের বন্ধন ও মুক্তি আছে। প্রশাসন এই উভয় ক্ষেত্রে সম্ভব নহে। মৃত্তিকা ঘটের কারণ বটে, জড়স্বভাবা মৃত্তিকা ঘটের শাসন করে না। এই হেতু অক্ষর পরম-ব্রহ্ম বাচক।

অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥১২॥

অন্যভাব—ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম, ব্যাবৃত্তেঃ চ—পৃথক্‌ত্বের দ্বারা ব্যবস্থাপিত হওয়া হেতু।

অর্থাৎ অক্ষরের অচেতন ভাব বা প্রকৃতিভাব গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতত্র অক্ষর প্রধান হইতে পারে না। অচেতন ভাব—অন্যভাব; ব্যাবৃত্তি বিশেষণের দ্বারা অক্ষরের অচেতনত্ব নিবারিত হইয়াছে। আরও বিশদ করিয়া বলিতে হয়—অক্ষরকে বিশেষিত করার শ্রুত্যুক্ত বাণী অক্ষরের অচেতনত্ব নিবারিত করে। যথা, হে গার্গি! সেই এই অক্ষর, যিনি অদৃষ্ট, অশ্রুত, অমত, অবিজ্ঞাত; অথচ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বিজ্ঞাতা। প্রকৃতিতে এই সকল ধর্ম্ম সম্ভব নহে। অক্ষর অচক্ষুঃ, অশ্রোত্র। জীবের শরীরাদি উপাধি আছে, ব্রহ্মের নাই। অন্য-ভাব-ব্যাবৃত্তি হেতু অক্ষর ব্রহ্মই হইলেন।

ঈক্ষতি কর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ ॥১৩॥

সঃ—সেই পুরুষ, ব্রহ্ম। (কেন) ঈক্ষতি কর্ম্ম-ব্যপদেশাৎ। দর্শনবিষয় ব্যপদিষ্ট হওয়া হেতু।

প্রশ্নোপনিষদে সত্যকাম কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ঋষি পিপ্পলাদ বলিয়াছিলেন—যিনি ওঁকার, তিনি পর ও অপর ব্রহ্ম প্রভৃতি। পরিশেষে বলিয়াছিলেন,—যে ব্যক্তি এই ত্রিমাত্র ওঁকারের পর পুরুষ ধ্যান করে, সে "পরম্ পুরুষমভিধ্যায়িতে" সে পরম পুরুষকেই ধ্যান করিয়া থাকে। এবং "তত্র পরমিদং ব্রহ্মেতি প্রাপ্তম্" এই পরম ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়। এই সকল কথায় প্রথম ধ্যানের কথা থাকায় ও পরে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তির কথা থাকায়, ঋষি পরম ব্রহ্ম কি অপর ব্রহ্ম, এই দুইটীর কোনটীর কথা বলিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। মনে হইতে পারে—ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি পরিচ্ছিন্ন ফল, এই হেতু ঋষি অপর ব্রহ্মের ধ্যানোপদেশ করিয়াছেন। আবার পরব্রহ্ম জানার কথা থাকায়, এই সংশয় হয়—পরব্রহ্ম তো অপরিচ্ছিন্ন, তৎপ্রাপ্তিরই ফল তো অপরিচ্ছিন্ন হইবে। অপর ব্রহ্ম বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়া, পরব্রহ্ম নাকচ করাও চলে না। ইহার উত্তরে বলা যায়—ঐ শ্রুতির শেষ বাক্য এইরূপ আছে 'স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরুষম্ পুরিশয়ম্ ঈক্ষতে'—সেই অর্থাৎ উপাসক জীবঘন হইতে পরাৎপর পুরিশয় পুরুষ দেখে।' বস্তু যতক্ষণ মনঃকল্পিত এবং তাহা সত্যই কল্পনার বস্তু, তখন তাহার সাক্ষাৎকার সম্ভব নহে; কিন্তু যাহা সম্যক্ ধ্যানের বিষয় ও যথার্থ অকল্পিত বস্তু, তাহারই সাক্ষাৎকার হয়। শ্রুতিতে যখন সাক্ষাৎকারের কথা রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে—ধ্যানের ও ধ্যান-ফলের বিষয়-বস্তু একই। ধ্যান একের হইবে, জ্ঞান অন্যরূপ হইবে—ইহা সঙ্গত কথা নহে। অকল্পিত বস্তুর ধ্যানের পরিপাকেই সেই বস্তুর অবগতি হয়। এখানে জিজ্ঞাস্য—এই জীবঘন বস্তুটী কি? ঘন শব্দে বস্তুর নিবিড়তা বুঝায়। ব্রহ্ম কি এইরূপ খিল্য-ভাবাপন্ন যে, উহাকে নিবিড় অর্থাৎ ঘন করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? না, তাহা নহে। পূর্ব্বাপর বাক্য অনুধাবন করিলে দেখা যায়, জীবঘন শব্দ ব্রহ্মলোকেরই বাক্যান্তর। সমষ্টিলিঙ্গ, শরীরাভিমানী, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকেও জীবঘন বলা যাইতে পারে। হিরণ্যগর্ভের স্রষ্টাভিমান আছে। এই ব্রহ্ম জীবঘন। তাহা হইতে পরাৎপর—সেই পরমাত্মাই ঈক্ষণের বিষয়। পুরম্ পুরুষম্ পরমাত্মাতেই প্রযুক্ত হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ"—পুরুষের পর আর কিছু নাই; পুরুষই পরাকাষ্ঠা এবং প্রাপ্যতার চরম। ওঁকারের পর ও অপর-দুই দ্বিধা-বিভক্ত স্বরূপ দেখাইয়া, অতঃপর ত্রিমাত্র ওঁকারে পর-পুরুষের ধ্যানের কথা ও তাঁহার প্রাপ্তির কথা উপদিষ্ট হওয়ায় উহাতে পরমব্রহ্মই প্রমাণিত হয়। ব্রহ্মলোক বলিতে কোন এক পরিচ্ছিন্ন দেশ ধারণা করা সঙ্গত নহে। ধ্যানের পর ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি কথার অর্থ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার

ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এইখানে ক্রমমুক্তি হিসাবে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে। তারপর, পরম-পুরুষ-প্রাপ্তির কথা থাকায়, এই পরিচ্ছিন্ন ফল দোষের হয় না। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের গতিপথে এই পরিচয় ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তির অনিবার্য্য লক্ষণ।

দহরঃ উত্তরেভ্যঃ ॥১৪॥

উত্তরেভ্যঃ—বাক্য-শেষের দ্বারা, দহরঃ—আকাশব্রহ্ম প্রতিপাদিত হয়।

অর্থাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদে ভূমা-বিদ্যা উপদেশ করিয়া এইরূপ কথিত হইয়াছে "অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরম্ পুণ্ডরীকম্ বেশ্ম" ইত্যাদি এই সূত্রের অর্থ এই ব্রহ্মপুরে দহর পদ্মগৃহ আছে অর্থাৎ হৃৎপদ্মরূপ গৃহ আছে। এ গৃহমধ্যে যে দহর অর্থাৎ অল্প অবকাশরূপ আকাশ, তাহাই জান, অন্বেষণ কর। এই দহর ভূতাকাশ না জীব অথবা পরমাত্মা? ব্রহ্মপুর শব্দের অর্থ কি? আকাশ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম হয়, ভূতাকাশও হয়। এই দহরাকাশ তবে কি ভূতাকাশ? ব্রহ্মপুর শরীররূপ পুরীও তো হইতে পারে? শ্রুতি পুর-স্বামী বলিতে কি বলিয়াছেন? আকাশ শব্দের রূঢ়ার্থ ভূতাকাশ হয়। হৃদয়পদ্মে অল্প আকাশ থাকিতেও পারে। শ্রুতি ইহাকেই কি দহর বলিয়াছেন? কেননা এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে "যবোন্ বা অয়মাকাশঃ স্তাবান্ এযো হস্তহৃদয় আকাশ ইতি" এই আকাশ যদ্রূপ, হৃদয়াস্তর্বর্ত্তী আকাশও তদ্রূপ হয়। অতএব এই আকাশ হৃদয়াকাশ কেন না হইবে? আর এক কথা, ব্রহ্মপুর শব্দ জীবের বাসস্থানও বলা যায়। জীব ব্রহ্মগুণের অধিকারী। ব্রহ্ম-সম্পর্ক জীবে বিদ্যমান আছে। জীবকে তাই ব্রহ্ম বলা যায়। অতএব দহর হৃদয়াস্তর্গত আকাশ অর্থে গ্রহণ সঙ্গত। যদিও ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্য অর্থ পরম ব্রহ্ম, কিন্তু এখানে ব্রহ্মের গৌণার্থগ্রহণের প্রয়োজন। কারণ যেহেতু পরমব্রহ্ম অসঙ্গ-স্বভাব, সেইহেতু ব্রহ্মপুরের সহিত তাহার স্বামিত্ব-সম্বন্ধ থাকিতেই পারে না। এই দহর শব্দের অর্থ মুখ্য ব্রহ্ম না হইয়া, গৌণার্থে জীবই হইবে। শ্রুতি দহরের অন্বেষণ বা দহরের স্বরূপ বিচার না করিয়া যে অন্তরে অবস্থিত, তাহাকেই জানা ও অন্বেষণ করার কথা বলিয়াছেন। অতএব শ্রুত্যুক্ত দহর জীবেরই হৃদয়াকাশ এবং জীবকেই অন্বেষণ করার কথা এইক্ষেত্রে সঙ্গত।

এই সংশয়নিরাকরণের জন্য পূর্ব্বপক্ষের কথা উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করা যায়—এই দহর ভূতাকাশ নহে। যখন বলা হইতেছে—আকাশ যদ্রূপ, হৃদয়স্থ দহরাকাশও তদ্রূপ, দ্যাবা-পৃথিবী ইহার অন্তরেই সমাহিত, তখন উহা যে ভূতাকাশ নহে, তাহা প্রমাণিত হয়। আকাশ-শব্দের রূঢ়ার্থ ভূতাকাশ। কিন্তু নিজে নিজের দ্বারা তুলিত হওয়া অসঙ্গত, কাজেই দহরাকাশ আকাশ নহে, ব্রহ্ম। আকাশতুল্য সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাধার ব্রহ্ম-বস্তুই দহরাকাশ শব্দে বোধ্য। ভিন্ন বস্তুর দ্বারা ভিন্ন বস্তুর তুলনা হয়, নিজের দ্বারা তাহা হয় না। এই কারণে এখানে দহরাকাশ ব্রহ্মেরই নামান্তর। পূর্ব্বপক্ষ বলিবেন—বাহ্যাকাশ ও অন্তরাকাশ একই আকাশের এই দ্বৈবিধ্য কল্পনা করিয়া বাহ্যাকাশের সহিত অন্তরাকাশের তুলনা হইতে পারে। গত্যন্তর না থাকিলে এরূপ হইয়া থাকে বটে; কিন্তু এই ক্ষেত্রে বস্তুর কাল্পনিক ভেদ গ্রহণ করিলেও, অল্প পরিমিত অন্তরাকাশের সহিত অতি বৃহৎ ভূতাকাশের তুলনা সঙ্গত হয় না। ইহার উত্তরে বলা যায়, শ্রুতিতে এ কথাও আছে—পরমেশ্বর আকাশ অপেক্ষা বড়। অন্য শ্রুতি আবার বলেন—ব্রহ্ম আকাশের তুল্য। এইরূপ বিরুদ্ধ বাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়? এইখানে ব্রহ্মের পরিমাণ প্রতিপাদন করার জন্য এইরূপ কথা বলা হয় নাই। অনাদি পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণনাই করা হইয়াছে। ভূতাকাশের সহিত পরমেশ্বরের এইরূপ উপমায় উপমিত হওয়ায় দহরকাশও ভূতাকাশ হইবে, এমন কোন কথা নাই। হৃৎপদ্মবেষ্টিত আকাশাংশে দ্যাবা-পৃথিবীর স্থান নাই; সুতরাং জীব দহরাকাশ, এ আশঙ্কা নিরর্থক। যদি বল ব্রহ্মই জীব, অতএব জীবেরও সর্ব্বব্যাপিত্ব আছে। ব্রহ্ম-শব্দের এইরূপ গৌণার্থ যুক্তিসিদ্ধ নহে। ব্রহ্মপুর বলায় ইহা জীবের বাসপুরী, এইরূপ কথার প্রত্যুত্তরে ইহা বলা যায় যে, ব্রহ্মের মুখ্যার্থই গ্রহণীয়। মুখ্যার্থ ত্যাগ করার কি কারণ আছে? এই শরীরে ব্রহ্মোপলব্ধি হয়, দেহপুরে ব্রহ্মের অস্তিত্ব শ্রুতিতে বর্ণিত আছে। "অথ বা জীবপুর এবাস্মিন্ ব্রহ্ম সন্নিহিত-

মুপলভ্যতে”—এই ব্রহ্ম জীবপুরে সন্নিহিত আছেন, তাঁহাকে লাভ করা যায়। সুতরাং এখানে ব্রহ্মপুর জীবপুর বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। শ্রুতি দহরের বিচার করিতে বলেন নাই, দহরস্থিত ব্রহ্মকেই জানিতে বলিয়াছেন। এই দহরাকাশ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কিছু হইতেই পারে না।

গতিশব্দাভ্যাং তথাহি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ॥১৫॥

গতি শব্দাভ্যাং—গতি ও শব্দ দ্বারা, হি—যেহেতু, তথা—ঐরূপ গতি, দৃষ্টং—শ্রুতিতে উল্লিখিত দেখা যায়, সেই হেতু দহর, লিঙ্গ—ব্রহ্ম-সঙ্কেত।

অর্থাৎ দহর পরমেশ্বর, কারণ উক্ত শ্রুতি-প্রস্তাবের অন্তে পরমেশ্বরপ্রতিপাদক গতি ও শব্দ আছে। যথা—“ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহ গচ্ছন্ত এতং ব্রহ্মলোকং, ন বিন্দন্তি।” এই সকল প্রজা প্রত্যহ ব্রহ্মলোক গমন করে, অথচ তাঁহাকে জানে না। এই ব্রহ্মলোকই দহর। প্রজা শব্দ জীববাচক, গতিশব্দের অর্থ প্রাপ্তি বা পাওয়া। জীব প্রত্যহ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, শ্রুতি এই কথাই বলিতেছেন। প্রত্যহ প্রাপ্ত হয় কেমন করিয়া? “লোকেঽপি কিল গাঢ়সুষুপ্তমাচক্ষতে ব্রহ্মীভূতো ব্রহ্মতাম্ গতঃ।” অর্থাৎ গাঢ় সুষুপ্তিকালে কোন পুরুষকে দেখিলে এ ব্রহ্ম হইয়াছে, এ ব্রহ্ম পাইয়াছে, এইরূপ বলা হইয়া থাকে। এই শ্রুতি-প্রমাণে দহর যে জীব নহে, ব্রহ্ম যে জীবপুর নহে, তাহা প্রমাণিত হইল। ব্রহ্মলোক পদের অর্থ সত্যলোক হইতে পারিত; কিন্তু শ্রুতি একথা স্পষ্টই বলিয়াছেন “তথা হি সত্য সৌম্য! তদা সম্পন্নো ভবতি।”—হে সৌম্য শ্বেতকেতো! জীব সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মে লীন হয়। সুষুপ্তিকাল জীবের প্রাত্যহিক ঘটনা। অহরহ সত্যলোক অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার লোক, এমন হইতে পারে না। অর্থাৎ প্রত্যহ ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি, এরূপ কল্পনা অযোগ্য। দহর পরম ব্রহ্মই, প্রমাণিত হইল। জীবের গতি এবং জীব উহাকে বিদিত হইতে সমর্থ হয় না, এই ‘উহাকে’ শব্দের দ্বারাই দহর ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না।

ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥১৬॥

ধৃতেঃ চ—ধারণ করিয়া আছে এই উক্তি, অস্মিন্—অন্যান্যঃ শ্রুতি, অস্য মহিম্নঃ—জগৎধারণরূপ মহিমা, উপলব্ধেঃ—লিখিত হইয়াছে।

দহর কর্ত্তৃক জগৎ বিধৃত, অন্যান্য শ্রুতিতে এই জগৎ-বিধারণ পরমেশ্বরেরই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, অন্যের নহে। এইহেতু দহর ব্রহ্মই।

ধৃতি অর্থাৎ ধারণ। জগৎ-ধারণ হেতু দহর পরমেশ্বর। শ্রুতি বলেন—সেই এই আত্মাই বিধৃত। বিধৃতি অর্থে বিধারক। আত্মাই বিধারক, কেন না যাহা আলের ন্যায় এক ক্ষেত্রের জল অন্য ক্ষেত্রে নিবারণ করে, তাহার লৌকিক নাম যেমন সেতু, তদ্রূপ আত্মাই বিধারক, যিনি যদৃচ্ছা গতি নিরোধ করিয়া জাগতিক নিয়ম শৃঙ্খলিত করিতেছেন। ইনি লোকেশ্বর, ভূতাধিপতি, যথা,—“এতস্য বাঽক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ” ইত্যাদি। হে গার্গি, এই অক্ষরে প্রশাসনে চন্দ্র-সূর্য্য-বিধৃত আছে—নতুবা যাদৃচ্ছিক গতিতে একে অন্যের সংঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। সৃষ্টির বিশৃঙ্খলানিবারণের বিধারক পরমাত্মা—ইঁহাকেই আধার, দহর প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আরও হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রসিদ্ধেশ্চ ॥১৪॥

প্রসিদ্ধেশ্চ—এইরূপ প্রসিদ্ধি হেতু।

অর্থাৎ শাস্ত্রে আকাশ শব্দে পরমেশ্বর অর্থ প্রসিদ্ধি হেতু।

শ্রুতির কোথাও জীবের শব্দান্তর আকাশ বলিয়া উক্ত হয় নাই। উপমান-উপমেয় ভাবের সঙ্গতি হেতু আকাশ ভূতাকাশ অর্থে গ্রহণ বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব দহর-আকাশ পরমেশ্বর।

ইতরপরমর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥১৮॥

ইতরঃ—জীব, পরামর্শাৎ—উল্লিখিত হওয়ায়, সঃ—সেই দহরাকাশ জীব, ইতি—একথা, চেৎ—যদি বলা যায়, ন—না, তাহা বলিতে পার না। কেন বলিতে পার না, অসম্ভবাৎ—জীবের সহিত আকাশের তুলনা সম্ভব নহে।

পূর্ব্বপক্ষের কথা। শ্রুতিতে আছে “অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন

রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতিহোবাচেতি।" অর্থাৎ যিনি এই সম্প্রসাদ হইতে শরীর উত্থিত করিয়া, পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হন, তিনি এই আত্মা। শরীর হইতে উত্থিত হওয়ার কথায় শরীরাশ্রিত জীবের উত্থান গ্রহণ করাই বিধেয়। শরীর হইতে উত্থিত হওয়া অর্থে শরীরাভিমান ত্যাগ করা। শরীরাশ্রিত জীবেরই পক্ষে এ কথা প্রজুয্য হয়। যদি বলা যায়—লোক-ব্যবহারে বা শ্রুতিতে আকাশ শব্দে পরমেশ্বর কোথাও বলা হয় না! কিন্তু শাস্ত্রে আকাশ নামরূপাত্মক জগতের নির্ব্বাহক, একথা পাওয়া যায়। ঐশ্বরিক ধর্ম্মের সঙ্গে শাস্ত্রে যেমন আকাশ-শব্দের পাঠ আছে, তদ্রূপ জীবধর্ম্মের সহপাঠে জীব অর্থ কেন গৃহীত হইবে না? সূত্রকার বলিতেছেন—একথা অতিশয় অসঙ্গত। জীব ও পরমেশ্বর, দুইয়ের ধর্ম্ম এক নহে। জীব দেহাভিমানী, পরিচ্ছিন্ন। ঈশ্বর অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বত্র। আকাশের সহিত জীবের উপমা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? উপাধিধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়াই সে জীব। জীবে আকাশাদি ধর্ম্ম উপমিত হইতে পারে না। এরূপ হইলে উহাকে আর জীব বলা চলে না; ব্রহ্মই বলিতে হয়। জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্যের কথা এ যাবৎ বলা হইয়াছে। তবুও জীব ও ব্রহ্মের দ্বন্দ্ব-নিবারণের জন্য ব্যাসদেব পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

উত্তরাচ্চেদাবির্ভাবস্বরূপস্তু ॥১৯॥

উত্তরাৎ—প্রস্তাবের শেষাংশে জীববর্ণনা হেতু, চেৎ—যদি বলি দহরাকাশ জীব, তু—এই শঙ্কানিবারণের জন্য 'তু' শব্দের ব্যবহার হওয়ায়, এই অর্থ প্রকাশ করিতেছে—না, তুমি তাহা বলিতে পার না। কেন বলিতে পার না?—"আবির্ভাবস্বরূপঃ"—উহার উদ্দেশ্য প্রকৃত স্বরূপের আবির্ভাব, এই জন্য।

অর্থাৎ আকাশের দৃষ্টান্তে দহরকে জীব বলিয়া ভ্রান্তি হওয়া সমীচিন নহে। বাক্যের তাৎপর্য্য ব্রহ্ম, জীব নহে। স্বরূপাবির্ভাব ব্রহ্মই, জীবের এইরূপ স্বরূপ-প্রাপ্তি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। এই হেতু দহর জীবকে বুঝায় না, ব্রহ্মই প্রতিপাদন করে। প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—আত্মা নিষ্পাপ, নির্লেপ, তিনি অন্বেষণীয় এবং বিজ্ঞাতব্য। তারপর বলিয়াছিলেন—চক্ষুতে এই যে পুরুষ, ইনিই তোমার আত্মা। ইহা জাগ্রত অবস্থার কথা। জীবই ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন। সেই আত্মাকে উল্লেখ করিয়া প্রজাপতি পুনরায় বলিয়াছেন—ইনি "স্বপ্নে মহীয়-মানশ্চরতি" অর্থাৎ পূজিত হন। তারপর আবার বলিতেছেন—আবার ঐ সুপ্ত পুরুষ যখন জাগ্রত হন, তখন এই ইন্দ্রিয়াতীত আত্মা স্বপ্নকেও জানেন না। পুনরায় বলিয়াছেন, ইনি অমর, অভয় ও ব্রহ্ম "অমৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেতি"। ইন্দ্রের এই সকল কথায় সম্যক্ প্রত্যয় হয় নাই। সুষুপ্তিকালে কোন জ্ঞান না থাকার কথায় তিনি ভাবিয়াছিলেন, এই আত্মা কিরূপে আমার স্বরূপ হইবে? প্রজাপতি ইন্দ্রের সংশয় দূর করার জন্য আত্মাতিরিক্ত কিছু নাই, বুঝাইবার জন্য বলিয়াছিলেন, শরীর হইতে উত্থিত পর-জ্যোতিঃ-সম্পন্ন স্বরূপ-প্রাপ্ত "স উত্তমঃ পুরুষঃ", তিনি উত্তম পুরুষ। এই সকল কথায় পূর্ব্বোক্ত দহরাকাশ প্রকরণের ভিতর দিয়া জীবই ব্রহ্মত্বের শঙ্কাস্তর হইয়া পড়ে। সূত্রকার 'তু'-শব্দে এই শঙ্কা নিবারণ করিয়া প্রজাপতির বাক্যার্থ জীবে প্রযুজ্য নহে, পরন্তু ব্রহ্মে, এই কথাই স্বরূপাবির্ভাব শব্দের দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। প্রজাপতি শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি যে আত্মা নহে, পূর্ব্বোক্ত বাক্যে তাহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—অবস্থাত্রয় হইতে আত্মাকে বিবিক্ত করিয়া, তিনি জীবের অনুপাধিক রূপই বুঝাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। জীব-ভাব উপাধিযুক্ত। জীব-ভাবে নিষ্পাপত্বাদি ধর্ম্ম কল্পনা করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা সত্য নহে। তাই "পরম্ জ্যোতিরূপসম্পদ্য" এই কথায় নির্লেপ ব্রহ্মনির্দ্দেশই করা হইয়াছে। স্থাণুতে মনুষ্যবোধ সত্য নহে, জীবে ব্রহ্মবোধও তদ্রূপ কল্পনা। যে বস্তু যাহা, সে বস্তুকে তাহা হইতে অন্যরূপ দেখা মিথ্যা-প্রত্যয়-রূপ আত্মপ্রতারণা। জীবের জীবত্ব যতদিন, ব্রহ্ম ততদিন তাহার অনুভব্য, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জীবের স্বরূপ ব্রহ্ম; কিন্তু ব্রহ্ম জীব হইয়াছেন, সেও একটী স্বরূপের রূপ এবং এইরূপ হওয়ার মৌলিক ইচ্ছা ব্রহ্মেরই। সে ইচ্ছা দেহাভিমানী অহংয়ের অস্বীকার করার উপায় নাই। জীব বলিতে বুঝি দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান, এই চতুর্ন্ন কর্ণবিশিষ্ট সত্তার এক অবস্থা। যেখানে

জীব, সেথানে এই ধর্ম্ম। জীবের ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের জন্যই প্রজাপতি উক্তরূপ শরীর হইতে চৈতন্যের উত্থানের উপমা দিয়াছেন। জীবের যে আত্মভ্রান্তি, তাহা ব্রহ্মেরই জীবস্বরূপপ্রাপ্তি হেতু। এইজন্য বেদ আত্মাকে সশরীর ও অশরীর, দুই আখ্যা দিয়াছেন, গীতাও বলিয়াছেন, "শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতি"—শরীরোপলক্ষিত আত্মা কিছুই করেন না, কিছুতে লিপ্তও হন না। অতএব উক্ত শক্তিচতুষ্টয় হইতে পরিচ্ছিন্ন যে চৈতন্য, তাহা আবির্ভাবস্বরূপ ব্রহ্মকে বুঝাইবার কৌশল মাত্র। ব্রহ্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতে পারে না। তিনি নিত্য এবং সর্ব্বব্যাপী। জীব ও ব্রহ্ম, দুইয়ের মধ্যে ভেদ ও অভেদ লইয়া বহুতর্ক ভাষ্যকারগণের মধ্যেও থাকিয়া গিয়াছে। শারীরক সূত্রে ইহার নিরাকরণ হইয়াছে। ঈশ্বর এক, নিত্য; কিন্তু মায়ার দ্বারা তিনি বহু রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। পরমেশ্বরবোধক বাক্যে জীববোধকত্ব সূত্রকার পুনঃপুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। জীব বলিলেই তাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বুঝিতে হইবে। যেরূপ হইলে জীব ব্রহ্ম হয়, সেরূপ প্রকরণ-বাক্য শ্রুতিতে আছে, তাহা ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্যই; পরন্তু জীবের ব্রহ্মত্বলাভ হেতু নহে। জীব জীবই; জীব যদি ব্রহ্ম হন, তাহা ব্রহ্মই। জীব আদৌ ব্রহ্ম হইতে পারে কিনা, একথা এখন নহে। শাস্ত্র জীব হইতে ব্রহ্মের পার্থক্য দেখাইয়া ব্রহ্মভাব প্রতিপাদন করিতেছেন। জীব ব্রহ্মের যখন অনুবাদ, তখন জীবভাবের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। যাহা প্রতিপাদ্য, তাহা পুনরনুবাদ হইলে জীব ব্রহ্মেই পুনরাবর্ত্তিত হয়। জীবের এই অনুবৃত্তির কথা আমাদের কল্পিত। উপনিষদে তাহা নাই, ব্রহ্মসূত্রেও আমরা একথা এখনও পাই নাই। ব্যাসপ্রণীত স্মৃতি অর্থাৎ গীতাশাস্ত্রে এইরূপ কথা আছে "ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি" অর্থাৎ দেহী শরীরাভিমান পরিত্যাগ করিলে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। জীব তখন "মামেতি" হয়। অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান জীব-লক্ষণ হইতে মুক্তি লইয়া ব্রহ্মে লয় পায়। ব্রহ্মই লয়-স্থান কিনা, এ বিষয়ে সংশয় আছে। যাহা লয়ের ক্ষেত্র, তাহার গুণ ও ক্রিয়াশক্তি থাকে না। যাহা লইয়া জীব, তাহার লয় অর্থে সেইগুলিকে কোন এক ক্ষেত্রে নিষ্পন্ন করিয়া ফুরাইয়া দেওয়া। গীতা ইহাকেই অক্ষর নাম দিয়াছেন। উপনিষদে আমরা পাইতেছি ব্রহ্ম "অক্ষরাৎ পরতোপরঃ"—সেই উপনিষদের ব্রহ্ম কি জীবের লয়স্থান? তাহা হইতেই পারে না। যেহেতু জীব ক্ষরচৈতন্য আর জীবঘন অক্ষরচৈতন্য। এই ঘন শব্দের অর্থ জীবের সমষ্টিভূত চৈতন্য, যে চৈতন্যে পরিচ্ছিন্ন জীব অপরিচ্ছিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাই যদি সৃষ্টির শেষ নিষ্পত্তি হইত, আমরা জীবকে কল্পিত অথবা অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতাম। একাত্মবিজ্ঞান অথবা সম্যক্‌জ্ঞান অকল্পিত বাস্তব বহুত্বের জ্ঞানে মলিন হইতেই পারে না। যাহা সত্য, তাহা যদি বৈচিত্র্যময় হয়, সে বৈচিত্র্যের বিজ্ঞান একাত্মজ্ঞানের পথে বাধা হয় না। এককেই বস্তুতঃ অনেকরূপে দেখিলেও, একের জ্ঞান অব্যাহত থাকিতে পারে। একত্ব ও বহুত্ব একের বৈচিত্র্য-মূর্ত্তির প্রকরণ। এই প্রকরণ সবিজ্ঞান অবগত হওয়াই জীব-ধর্ম্ম। জীব জীব থাকিতে ব্রহ্ম হইবে না। জীবলক্ষণ পরিহার করিয়া ব্রহ্ম হওয়ার তাহার যে আকৃতি, তাহা জীব-স্বভাবে নাই। সে যে তবু তাহার স্বভাব ও স্বরূপ অতিক্রম করিতে চাহে, তাহা তাহার কল্পনা। জীবভাব বুঝাইবার উদ্দেশ্যে শাস্ত্ররচনা নহে, সে ভাব জীবের সহজবোধ্য। জীব যাহা জানে না, অর্থাৎ যাহা তাহার অজানিত তাহাকে জানাইবার প্রয়াসই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। জীব ব্রহ্মজ্ঞানী হইবে, ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবে, ব্রহ্মগতি লাভ করিবে; ব্রহ্ম হইবে না। এই সহজ কথাটা আমরা বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই আমাদের জীবধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যে জীবধর্ম্মে উদাসীন, কল্পনার কুহকে যাহার বিজ্ঞান আচ্ছন্ন, সে একপ্রকার চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। অর্ব্বাচীন যুগের ভারতধর্ম্ম আমাদের অন্ধই করিয়াছে। যাহা সত্য, যাহা অনিবার্য্য, শাশ্বত তাহা স্বীকার করিতে দেয় নাই।

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥২০॥

পরামর্শঃ—জীব-পরামর্শ অর্থাৎ দহরবাক্যে যে জীবভাবের বর্ণনা, চ অন্যার্থঃ—তাহার অন্য অর্থ আছে। অর্থাৎ তাহা পরমেশ্বরত্বপ্রতিপাদনের জন্যই প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রজাপতি জীবের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। এই জীব-পরামর্শ অর্থাৎ ঐরূপ জীবের অবস্থাবর্ণনা জীবভাব প্রতিপাদন করে না, উহা পরমেশ্বর-ভাবই জ্ঞাপন করে। ভেদজ্ঞান জীবভাব। অন্বয় ও ব্যতিরেক সাহায্যে বস্তু-বিশেষ বুঝাইবার জন্য জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত অবস্থায় দেহাদি-জ্ঞান বিরহিত হইলে, যে অনুপাধিক চৈতন্যের অনুভূতি হয়, তাহাই জীবের উপাস্য। দহরাকাশ পরমেশ্বরবাচক—জীব-পরামর্শ নহে;—ইহাই প্রমাণিত করার চেষ্টা হইয়াছে।

অল্পশ্রুতেরিতি চেত্তদুক্তম্ ॥২১॥

অল্পশ্রুতেঃ—শ্রুতিতে অল্প শব্দ আছে, ইতি—এই অল্প শব্দ, চেৎ—যদি দহরাকাশ না হয়, তৎ উক্তম্—এই আপত্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে সপ্তম সূত্রে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে—হৃৎপদ্মের মধ্যে দহরাকাশের অল্পত্ব-কথন উপাসনাহেতু। এই জন্য উহা জীবপক্ষে সঙ্গত না হইয়া অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরেই সঙ্গত হইবে। (ক্রমশঃ)

১৯

ধ্যান ভাঙিতে শিবের গান গাহিতেছি না। আমার জীবনসঙ্গিনীর কথাই লিখিতেছি। যুক্ত জীবনের যে অংশ অনির্ব্বচনীয় অভাবনীয়, তাহা ভাষায় ও ভাবে প্রকাশ হয় অপরাংশের অভিব্যক্তিতে। আমি এই নীতিই অনুসরণ করিয়াছি; নতুবা আমার বিপুল অন্তরালে অন্তঃপুরচারিণীর নিঃশব্দ পদ-সঙ্কেতের চিহ্ন আঁকিয়া দেখাইবার নহে; সে জীবনগতির কথা এত সূক্ষ্ম, বাক্যে তাহা প্রকাশ পায় না; সে প্রচেষ্টা করিলে কথার আবর্জ্জনায় তাঁহার দৈনন্দিন স্থূল কর্ম্মের অবতারণাই করিব। আমি তাঁর এরূপ জীবনকথা লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই।

বিবাহকাল হইতে তাঁহার শেষ দিন পর্য্যন্ত উভয়ের জীবনরঙ্গ লিখিতে হইলে আত্মকথাই ব্যক্ত করিতে হয়। এই আত্মপ্রকাশের তলে তলে তিনি অলক্ষ্যে ফল্গুধারার ন্যায় বহিতেছিলেন, এই পরিচয় যাঁহারা পাইবেন, জীবন-সঙ্গিনীর প্রকৃত কাহিনীর তাঁহারাই হইবেন সত্য রসগ্রাহী। জীবনের এই এক দিক্, নিঃশব্দ প্রবাহে আমার জীবন সচল সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল, আর একদিক্, সীমাহীন রূপের নীল সমুদ্র—যে আকর্ষণে জীবন ছুটিয়াছিল প্রবল ঝঞ্ঝার মত—সে ছিল শ্রীঅরবিন্দ। এই যুগের ইতিহাস প্রকাশ হইতে পারে আত্মচরিত-চিত্রণে। আমি নির্দ্বন্দ্বে এই পথই আশ্রয় করিয়াছি।

পণ্ডিচারীর ডাক অস্বীকার করার নয়। ইহা আমি আজিও ঘোষণা করিতে পারি। স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই, ইহার কোন মতে ব্যত্যয় হইতে পারে; কিন্তু অন্য দিকে আর এক নীরব আহ্বান ছিল। শিবের বিষাণ সে অনাহত করুণ রাগিণী শুনিতে দেয় নাই। অন্তর্য্যামী এই অজ্ঞাত মর্ম্মকথা জানিতেন, তাই ভবিষ্যতে এই দুই দিকের সামঞ্জস্যবিধানের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। উহা কতটা সিদ্ধ হইয়াছে তাহা কালই সপ্রমাণ করিবে। তাহার দীর্ঘ প্রতীক্ষায় আমি অধীর নহি।

শ্রীঅরবিন্দ কিছু ইতস্ততঃ করিয়া এবার আমায় ডাক দিয়াছিলেন। তাঁর জীবনেরও পট-পরিবর্ত্তন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন "I had thought to delay it (your visit) for a short time, until I saw my way more clearly on certain important matters, but I now believe that is not necessary and it will be as well for you to come as soon it as may be :—"আমি ভাবিয়াছিলাম কয়েকটী অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের স্পষ্টতা না দেখা পর্য্যন্ত তোমার আমার সাক্ষাৎ বিলম্ব করিতে হইবে। কিন্তু এখন আমার বিশ্বাস যে, তাহার প্রয়োজন নাই; তোমার সুবিধামত যত শীঘ্র আসিতে পার।" সেদিন এই আহ্বানের মধ্যে যেটুকু ইতস্ততঃ ভাব ছিল, তাহার স্থূল কারণ আমরা উভয়েই জানিতাম। কিন্তু তাহাও ছিল আপাত উপলক্ষ্য। মুখ্য কারণ উভয়ের অজ্ঞাতেই এক দিন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। জীবনের এই অধ্যায়টী আমার কাছেই বলিব বড় করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। উহার প্রকাশে ভাষা আড়ষ্ট হয়, মনের জড়তা ছাড়াইয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু তবুও যথাসম্ভব উহা আমায় বলিতে হইবে; জীবনের এই করুণ ইতিহাস একেবারে অলিখিত থাকিলে শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার বিযুক্তি ভবিষ্যত হয়তো কল্পনার রঞ্জনে বিকৃত মসীময় করিয়া তুলিবে। ইহাতে সত্য ক্ষুণ্ণই হইবে।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর জীবনপরিবর্ত্তনের অতি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে আমায় ডাকিয়াছিলেন। তাঁর অন্তর্জ্জগতে শক্তির তরঙ্গ সেদিন উছলিয়া উঠিতেছিল। বাংলায় বারীন্দ্র-কুমার প্রভৃতি দেশকর্ম্মিগণের মুক্তি ও ইউরোপের মহাসংগ্রাম শেষ হওয়ায়, দেশের পরিস্থিতি অতিক্রত পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। বিশেষ করিয়া এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের কর্ম্ম-সমস্যাও যেন একটু ভিন্নমুখী হইয়া পড়িতেছিল। তিনি তাই স্পষ্টতার জন্য আমাকে এক

দীর্ঘ পত্র দিয়াছিলেন। এই অপ্রকাশিত পত্রখানিতে কাজের নির্দ্দেশের যে সনাতন নীতি প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার মনীষার পরিচয়। বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতির কর্ম্মপ্রচেষ্টার সহিত আমার কর্ম্মের ভেদ প্রদর্শন করিয়া যাহাতে আমি আত্মস্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখিয়া চলি, তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ ইহাতে তিনি দিয়াছিলেন। সেই কর্ম্মনীতি আজও আমার অক্ষুন্ন আছে। তিনি দেশের প্রচলিত নানা কর্ম্মধারা ও বারীন্দ্রকুমারের কর্ম্মপ্রচেষ্টা প্রভৃতির বিশদ ব্যাখ্যার পর আমায় লিখিয়াছিলেন "Our whole principle is different and you have to insist on our principle in all that you say or do. Moreover, you have got a clear form for your work in association and that form as well as the spirit you must maintain, any loosing of it or compromise would mean confusion and an impiaring of the force that is working in your Samgha."

অর্থাৎ "আমাদের মূল তত্ত্ব অন্য হইতে পৃথক্। তুমি যাহা বলিবে এবং করিবে, তাহা এই মূল তত্ত্ব বলবৎ রাখিয়াই তোমায় করিতে হইবে। অধিকন্তু তুমি ইহার জন্য সঙ্ঘরূপ স্বচ্ছ বিগ্রহ পাইয়াছ, এই সংস্থা ও এই তত্ত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। ইহা কোনরূপে যদি শিথিল হয় অথবা কিছুর সহিত আপোষ করিতে হয়, গোলযোগ বাধিবে ও যে শক্তি তোমার সঙ্ঘে লীলায়িত হইতেছে, তাহা ক্ষুন্ন হইয়া পড়িবে।"

তিনি চন্দননগর সঙ্ঘকে কতখানি আপন করিয়া দেখিতেন, আর দুই এক ছত্র লেখা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব—

"The Samgha at Chandernagore is a thing that has grown up with my power behind and you at the centre and it has assumed a body and temperament, which is the result of this organisation."

"চন্দননগরের সঙ্ঘ তোমাকে কেন্দ্র করিয়া আমার শক্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই সংহতির ফলে উহার একটা আকৃতি এবং প্রকৃতিও গড়িয়া উঠিয়াছে।"

তাঁহার এই দীর্ঘ পত্রখানির অধিক প্রকাশ করিয়া অতীতকে টানিয়া আনার প্রয়োজন নাই। তাঁহার দরদী হৃদয়ের অপার্থিব স্পর্শানুভূতির যতটুকু প্রকাশ করিলে আমার জীবনের এই অধ্যায়টী সুস্পষ্ট হইতে পারে, আমি ততটুকুই প্রকাশ করিলাম। তিনি কি উৎসাহে ও আনন্দে, কি আকুলতার সহিত আমায় যে আহ্বান দিয়াছিলেন, তাহা পত্রখানির ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি চন্দননগরের কর্ম্ম-ব্যস্ততার ভার যথারীতি অন্যের উপর ন্যস্ত করিয়া দীর্ঘ দিনের জন্য আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার পত্রের এই শেষ ছত্র দুইটী আমায় উন্মাদের ন্যায় ছুটাইল পণ্ডিচারীর পথে—"Meanwhile your visit may help to get things into preparatory line both in the motor-power and the outward determiation."

"ইতিমধ্যে তোমার উপস্থিতি অন্তরের যন্ত্রশক্তি এবং বাহিরের সঙ্কল্পনিরূপণের বিষয়গুলিকে প্রস্তুতির পথে আনিতে সাহায্য করিতে পারে।" এই সঙ্গে বারীন্দ্রকুমারও শ্রীঅরবিন্দের এক পত্র পাইয়াছিলেন। উহার যে অংশে আমার কথা ছিল, তিনি সেই ব্যক্তিগত কথাগুলি বাদ দিয়া 'নারায়ণ' পত্রিকায় উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পরিত্যক্ত অংশটুকু উপেনদা স্বহস্তে উদ্ধৃত করিয়া অতি আনন্দের সহিত আমার নিকট লইয়া আসিয়াছিলেন। আমি ইহার জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। এই অংশটুকু আমার খ্যাতিপত্র। উহা চিরদিন অপ্রকাশ থাকিবে। আমি শুধু "প্রবর্ত্তকের" প্রশংসার অংশটুকুই গ্রহণ করিয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ "প্রবর্ত্তকের" পৃষ্ঠায় উহা প্রকাশের সম্মতি দিয়াছিলেন। ১৩২৭ সালের "প্রবর্ত্তকের" প্রচ্ছদপটে লেখা থাকিত "প্রবর্ত্তক আমাদেরই কাগজ। আমি স্বহস্তে লিখি বা না লিখি আমারই through দিয়ে ভগবান মতিকে শক্তি দিয়ে লেখাচ্ছেন, spiritual হিসাবে আমারই লেখা।"

আমার সম্বন্ধে আন্দামান হইতে সদ্য প্রত্যাগত বারীন্দ্রকুমারের ধারণাগত প্রশ্নের উত্তরেই তিনি এই পত্র দিয়াছিলেন। উপেনদার নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুলিপিতে শ্রীঅরবিন্দের আমার প্রতি প্রেমের যে পরিচয় ছিল, তাহা জগতের অজ্ঞাতে থাকাই শ্রেয়ঃ হইয়াছে। তাঁহার সে অনুভূতি একদিন সত্য হইবে; কেননা, তাহা মিথ্যা হইবে

কি জন্য? বাহিরের জগতে আজিকার এই স্বাতন্ত্র্য অন্তর-জগতের চিরন্তন ঐক্যের সাক্ষ্যরূপেই স্মৃতি-মন্দিরে অঙ্কিত থাকিবে। শক্তি-সাধকের সেই সঙ্গীতই এই ক্ষেত্রে সার্থক হয়—সে প্রেমের অবদান—

"তুই দেখ আর আমি দেখি
অন্যে যেন না দেখে।"

এই সঙ্গে সে যুগের শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা তাঁহার নামে আমার কথায় প্রকাশ না করিলেও চলিবে। তাঁহার নিজের কথাই ইহার পক্ষে যথেষ্ট। আমি ইহার যৎসামান্য উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে অনেক অন্ধ দৃষ্টি পাইবে। উক্ত পত্রে বারীনদাদাকে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার এই কয়টী কথা বাঙ্গালীর অনুধাবনীয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের তাঁর এই কথাগুলি বাঙ্গালী জীবনে সাধন করিতে পারিলে, দেশ নূতন মূর্ত্তি ধরিত। যোগসিদ্ধির জন্য পণ্ডিচারীই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থল বলিয়া তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন। যোগের একাঙ্গ কর্ম্ম—উহার জন্য বঙ্গদেশ—ইহা শ্রীঅরবিন্দের কথা। শ্রীঅরবিন্দ ভারতের মায়াবাদকে প্রশ্রয় দেন নাই। অধ্যাত্মের সহিত জীবনের সামঞ্জস্য পুরাতন যোগে সম্ভব হয় নাই। জগৎকে মায়া ও অনিত্য লীলা বলিয়া তাই এ জাতি উড়াইয়া দিয়াছে। তিনি এই জন্যই ভারতের অবনতি ও জীবনী-শক্তির হ্রাস হইয়াছে মনে করেন। তিনি ব্যক্তিগত সিদ্ধি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন। যথা, "কয়েকজন সন্ন্যাসী ও বৈরাগী সাধু সিদ্ধ মুক্ত হয়ে যাবে, কয়েকজন ভক্ত প্রেমে, ভাবে, আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করবে আর সমস্ত জাতি প্রাণহীন বুদ্ধিহীন হয়ে ঘোর তমোঘোরে ডুবে যাবে—"

তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এ কিরূপ অধ্যাত্মসিদ্ধি?" সাধনার অপূর্ব্ব নির্দ্দেশ সম্বন্ধে তাঁহার মুখের কথাই উদ্ধৃত করি—"মনের ক্ষেত্রে যত খণ্ড অনুভূতি পেয়ে মনকে অধ্যাত্মরসাপ্লুত, অধ্যাত্মের আলোকে আলোকিত করতে হবে। তারপর উপরে উঠা।" এই উপর অর্থে তিনি বিজ্ঞানের কথাই বলিয়াছিলেন। "যেখানে আত্মা ও জগৎ, অধ্যাত্ম ও জীবন দ্বন্দ্বময় নয়।" এই অবস্থায় সাধক "জগৎকে আর মায়া বলিয়া দেখে না, জগৎ হয় ভগবানের সনাতন লীলা, আত্মার অভিব্যক্তি।"

সঙ্ঘ সম্বন্ধে বারীনদার হয়তো প্রশ্ন ছিল। তদুত্তরে তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা মনোজগতের কুহেলিকা বিদীর্ণ করিয়া ভারতের সনাতন ধর্ম্মই ভাস্বর মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রসঙ্গচ্ছলে আমি তাঁর সে যুগের ব্যাখ্যা অতি আনন্দের সহিত উপস্থাপন করিতেছি—

"আত্মপ্রতিষ্ঠ আত্মার ঐক্যমূর্ত্তিই সঙ্ঘ।" সংশয়ীর উত্তরও সঙ্গে সঙ্গেই দিয়াছেন। "যাঁহারা বলিবেন সঙ্ঘের দরকার কি? সব একাকার হবে, মুক্ত সর্ব্ব ঘটে থাকবে ইত্যাদি সত্যের ইহা একটী দিক্ মাত্র। তারপর সুস্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন "জগতের কারবার শুধু নিরাকার আত্মা নিয়ে নয়, জীবনকেও চালাতে হবে। মূর্ত্তি ভিন্ন জীবনের Effective গতি নাই। অরূপ মূর্ত্ত হয়। নাম-রূপ-গ্রহণ মায়ার খেয়াল নয়। রূপের নিতান্ত প্রয়োজন আছে, তাই রূপ-গ্রহণ?" শ্রীঅরবিন্দ আরও বলিয়াছেন "আমরা জগতের কোন কাজই বাদ দিতে চাই না। রাজনীতি, বাণিজ্য, সমাজ, কাব্য, শিল্পকলা, সাহিত্য সবই থাকবে, দিতে হবে এই সকলের নূতন আকার, নূতন প্রাণ।

কর্ম্মবাদী ভারতের ধর্ম্মকে তিনি এক বিন্দু ক্ষুণ্ণ করেন নাই। তিনি জোর করিয়া বলিয়াছেন "ভারতের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্মবোধের বা ধর্ম্মের অভাব নয়, ভারতের চিন্তাশক্তির হ্রাস হইয়াছে।" তিনি ইহার নাম দিয়াছেন "চিন্তা-ফোবিয়া।" তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন "যে বেশী চিন্তা করে, অন্বেষণ করে, পরিশ্রম করে, সে বিশ্বের সত্য শিখে, তার শক্তি বাড়ে।" বাংলাদেশকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "দুর্ব্বলতার চরম অবস্থা এইখানে; বাঙ্গালীর ক্ষিপ্রতা আছে,—ভাবের capacity আছে, Intuition আছে। কিন্তু চিন্তার গভীরতা নাই।" তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন "বাঙ্গালী চায় চিন্তা না করে' জ্ঞান। পরিশ্রম না করে' ফল। বাঙ্গালী খেতে পায় না, পরবার কাপড় পায় না, চারিদিকে হাহাকার। ধন-দৌলত, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমি-চাষ সবই পরের হাতে যায়। শক্তি-সাধনা বাঙ্গালী ছেড়েছে। প্রেমের সাধনা করে, যেখানে জ্ঞান নাই, শক্তি

নাই, সেখানে প্রেম নাই।" তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন "বঙ্গদেশে প্রেম কোথায়? ঝগড়া, মনোমালিন্য, ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, দলাদলি, এ দেশে যত এমন আর কোন দেশে নাই।" তিনি ইহার প্রতিকারের জন্য লাখ লাখ শিষ্য চান নাই, আমিত্বশূন্য একশত পুরা মানুষ ভগবানের যন্ত্র চাহিয়াছিলেন এবং এখানেও কোন অহমিকা রাখেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার স্পর্শে বা অপরের স্পর্শে কোথাও যদি সুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ হয়, মানুষ যদি ভাগবত জীবন লাভ করে, তাদের দ্বারাই দেশ উঠবে।"

এই অরবিন্দ বিগত ১১ বৎসর আমার ধ্যান মূর্ত্তি ছিলেন। তাঁহার আহ্বানে ৭ বৎসরের গৃহবন্দী জীবন মুক্তি পাইয়া ছুটিল পিছনের সব টান ছিঁড়িয়া। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ছদ্মবেশে রাষ্ট্রষড়যন্ত্র মাথায় লইয়া ছুটিয়াছিলাম রাজস অহঙ্কারীর বোঝা নামাইয়া আসিতে, আজ মুক্তির সন্ধানে উদ্বুদ্ধ প্রাণ উর্দ্ধশ্বাসে নূতন পথের সন্ধানে কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া চলিল।

একবার আমার গৃহদেবীর প্রতি ফিরিয়া তাকাইলাম। গত বার অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য যাত্রাকালে এক মূর্ত্তি দেখিয়াছি, আজ দেখিলাম অন্য রূপ। সে দিন ছিল সঙ্কল্পদৃঢ় ওষ্ঠপুট, সুদূর চিন্তাভারে কুঞ্চিত ললাট। আজ প্রসন্নময়ী হাসিমুখেই আমায় বিদায় দিলেন। আজ জয়গর্ব্বে লাবণ্যময়ী প্রতিমার ন্যায় আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন; আমি বলিলাম "আসি।" ঠিক এই সময়ে নির্ম্মল আকাশে অকস্মাৎ এক খণ্ড মেঘ ঘনাইয়া বর্ষণধারার ন্যায় তাঁহার চক্ষু ঝাপ্‌সা হইল। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে ছিল যে দৃষ্টিবিনিময়ের সুধা-সিঞ্চন, ছিল অক্লান্ত কর্ম্ম-প্রেরণায় উভয়ের অন্তরযুক্তির সুবিমল আনন্দ, ছিল সব চেয়ে বড় আমার সেবায় দিবারাত্রি তাঁর তন্ময়তা; প্রাতঃকাল হইতে শয়নকাল, শয়নে, ভোজনে, জীবনের প্রতি ঘটনায় তাঁর সচেতন সাড়া, অকস্মাৎ আনিয়া দিল সেই অপার্থিব যুক্ত জীবন-ধারার মধ্যে বিচ্ছেদের একটা সাময়িক যবনিকা। এই অবস্থাটাকে তিনি অন্তরে অন্তরে সামলাইয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু তবুও দীর্ঘ বিচ্ছেদের আরম্ভ মুহূর্ত্তটীতে অসামাল হইয়া পড়িলেন। নয়নকোণে বেদনার অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। কিন্তু আমায় এমন কত ব্যথার শিহরণ সহিয়া লক্ষ্য-পথে আগাইতে হইবে। নীরবে তাঁহার বেদনার ভার হৃদয়ে লইয়া বিদায় লইলাম। তিনি প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। সতীর্থগণের সহিত উল্লাসে আনন্দে ঘর ছাড়িয়া প্রাঙ্গণে, প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া বহির্দ্বারে, তারপর তাঁর সজল চোখের কাতর চাহনী হৃদয়ে আঁকিয়া তীর্থ যাত্রা করিলাম। ৭ বৎসর পরে, জ্যৈষ্ঠের নিদাঘ-দগ্ধ উদার পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি পড়িল।

স্নায়ুগুলি সঙ্কীর্ণ স্থানে পরিচিত জনের আবেষ্টনে যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, অকস্মাৎ তাহার অন্যথা হওয়ায়, আমার সর্ব্ব শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। লোহার রেলপথ সমান্তরালে দূরে দূরে ছুটিয়া চলিয়াছে, জ্যৈষ্ঠের প্রখর রৌদ্র-কিরণে প্রচণ্ড অগ্নিশিখার ন্যায় যেন আমার নয়ন ঝলসিয়া দেয়। বিপুল ট্রেণটা যেন মনে হইল—একটা প্রকাণ্ড দৈত্যের মত আমাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। হাওড়ায় আসিয়া এক প্রকার অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িলাম। এত লোক, এত কোলাহল আমার সহ্য হইল না। মনে মনে হাসিলাম; অবস্থাবিশেষে ভাব এমনই হয় বটে। আমার বিবর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া এক বন্ধু অবস্থাটা অনুমান করিয়াছিলেন। আমাকে বিশ্রামাগারে লইয়া গিয়া এই শারীরিক দৌর্ব্বল্য অপনোদনের তিনি সাহায্য করিলেন। একা চলিয়াছি। অতি আপন জনের দিবারাত্রি সঙ্গ নিত্য কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া হৃদয় মন্দ মন্দ মোচড় দিয়া উঠিতেছিল; এক বন্ধু শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার সঙ্গী হইতে চাহিলেন, আমি অস্বীকার করিলাম। জানিতাম স-মন দেহ-যন্ত্রটা আমার চির বিশ্বস্ত ভৃত্য, উহার এই সাময়িক দৌর্ব্বল্য শীঘ্রই দূর হইবে। হইলও তাহাই। ট্রেণ ছুটিয়াছে উল্কাবেগে। দুই পাশে বনভূমি, কৃষিক্ষেত্র; পাক খাইতে খাইতে যেন পশ্চাতে অপসারিত হইতেছে। গাড়ীর চাকায় সুস্পষ্ট শব্দ উঠিতেছে—অরবিন্দ, অরবিন্দ। আর সূর্য্যাস্তের রক্তকিরণে দিগন্ত রক্তরঞ্জিত হইয়াছে। সান্ধ্য সমীরণে দেহভৃত্য অনাগত অবস্থার জন্য অনতিবিলম্বেই প্রস্তুত হইয়া উঠিল। দীর্ঘদিন প্রচ্ছন্ন জীবনযাপনের ফলে জগৎটা আমার

কাছে বড় ক্ষুদ্র হইয়া পড়িতেছিল; পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর প্রথম মুক্তিপণ যেমন অড়ষ্টতাময় হয়, আমারও সেই অবস্থা হইয়াছিল। বাংলা ছাড়িয়া উড়িষ্যায়, উড়িষ্যা অতিক্রম করিয়া মাদ্রাজ বিভাগে গাড়ী আসিয়া উপনীত হইল। লোকের বিচিত্র আকৃতি-প্রকৃতির দিকে চিত্তের আকর্ষণ আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্যে ভবিষ্যৎ কর্ম্মনীতি সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া লওয়ার অগ্নি-আকাঙ্ক্ষায় আমার সবখানির পরিবর্ত্তন আনিল। শরীর-মন সবল ও সুস্থ হইয়া উঠিল। শ্রীঅরবিন্দ আমার হৃদয় ও চরিত্র ভালভাবেই জানিতেন। তিনি ছিলেন স্নেহের ক্ষেত্রে আমার পিতা, রুজরহস্তে অকৃপণ-চিত্ত সুহৃদ। পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, প্রভুত্বের সহিত ঈশ্বরত্বের প্রতিষ্ঠাও এইখানেই স্থির হইয়াছিল। একদিকে কোমল করপল্লবের স্নেহপ্রলেপে আমার মানস জগৎ যেমন পুষ্টি পাইত অন্যদিকে শ্রীঅরবিন্দের বরপ্রদ দক্ষিণ হস্তের সঙ্কেত আমায় অভিষিক্ত করিয়া দেবহিত আয়ুঃ দিতে প্রতীক্ষা করিত—পৃথিবীতে এতবড় সৌভাগ্য চিরস্থায়ী হয় না। মর্ত্ত্য অমৃতের সন্ধান দেয়, অমৃতের তপস্যাই বুঝি মর্ত্ত্য ধর্ম্ম। অমর্ত্ত্য অমৃতাহরণের কর্ম্মভূমি জগৎ। ভারত তার সুনির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র। পথ তাই ফুরায় না। আমারও অক্লান্ত গতি।

মাদ্রাজ ষ্টেশনে নামিয়াই দেখিলাম—শ্রীঅরবিন্দের অনুগ্রহপ্রসাদ ধারণ করিয়া আমাদের বন্ধু পণ্ডিচারীর জননায়ক মিষ্টার জোসেফ ডেভিড দণ্ডায়মান। চক্ষের অদৃশ্য অশ্রু কৃতজ্ঞতায় নহে, অপার্থিব সম্বন্ধের অনুভূতিতে বিগলিত হইয়া যেন দুকূল ভাসাইয়া দিতে চাহিল। শ্রীঅরবিন্দের অখণ্ড হৃদয়ানুরাগের পরিচয় এই প্রথম নহে। আমার তনু, মন, প্রাণ লুটাইয়া দিতে বাধিত না শুধু এইখানেই; ইহা কথা নহে, জীবনের ঘটনায় তাহা প্রমাণ হইয়াছে বহুবার।

মাননীয় বন্ধুর আতিথ্যের প্রাচুর্য্যে আমি অস্থির হইয়াছিলাম। কৃতজ্ঞতার সহিত সব কিছুই গ্রহণ করিতে হইল, বন্ধু তবুও তৃপ্তি পাইলেন না; তাঁহার অবদান সর্ব্বতোভাবে গ্রহণের সামর্থ্য আমার ছিল না। যথাসময়ে বন্ধুর নিকট বিদায় লইলাম; পণ্ডিচারীতে উপনীত হইলাম। নয়নানন্দ নলিনীর সৌম্যশান্ত মূর্ত্তি হৃদয়ে তৃপ্তি দিল; আর ছিল এক অকৃত্রিম সুহৃৎ অমৃত। অবাঙ্গালী মাদ্রাজী হইলেও, হৃদয়ের ভেদ এইখানে ছিল না; আমরা সেদিন এক হইয়া গিয়াছিলাম।

শ্রীঅরবিন্দভবনে উপনীত হইয়া শ্রীঅরবিন্দকে দেখিলাম। আমাদের চির পরিচিত সেই জীর্ণ টেব্‌ল-খানির একপার্শ্বে ভাঙ্গা-চোরা চেয়ারখানিতে কোঁচার খোঁট গায়ে দিয়া তিনি বসিয়াছিলেন। দৃষ্টিবিনিময়ে দূরত্বের ব্যথা দূর হইল, হৃদয় পুলকনৃত্য জুড়িয়া দিল। তারপর, দিন যায় দিন আসে, কত কথা, কত হাসি—অপ্রত্যক্ষে অন্তরের শোধন সাধন চলিতে লাগিল।

দেখিলাম—শ্রীঅরবিন্দের তনুখানি এবার আরও শীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার বক্ষপঞ্জর বাহির হইয়া গিয়াছে। সেদিকে তাঁহার আদৌ ভ্রুক্ষেপ নাই। তিনি প্রাতে উঠিয়া দীর্ঘ বারান্দায় দুই চারিবার পদচারণা করেন, তার পর সেই অতি অকৃত্রিম টেব্‌লখানির একপাশে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করেন, সকলের ন্যায় তিনিও এক কাপ চা, দুই টুকরা রুটি চিবাইয়া প্রাতরাশ সমাপন করেন। মধ্যাহ্নে নীচে নামিয়া রুক্ষ স্নানসমাপনের পর দেওয়ালে ঝুলান একটা ক্ষুদ্র ভাঙ্গা আর্শীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, দাড়াভাঙ্গা চিরুণীতে মাথার লম্বা চুলগুলি একবার আঁচড়াইয়া লন; তারপর ভোজনের পালা। তিনি সকলের শেষে ভোজন করিতে আসিতেন, কাজেই চতুর্দ্দিকে ভুক্ত উচ্ছিষ্ট অন্নব্যঞ্জনের সহিত ভোজনপাত্রগুলি পড়িয়া থাকিত, আর তাঁর জন্য বাড়া ভাতে অবাধে একরাশ মাছি ছাঁকিয়া বসিয়া থাকিত; তিনি বাঁ হাত নাড়িয়া সেগুলিকে উড়াইয়া দিয়া, দুই-দশ গ্রাস অন্ন গলাধঃকরণ করিয়া উঠিয়া পড়িতেন। অপরাহ্নে ভোজনের ব্যবস্থা কিছুই ছিল না। রাত্রেও মধ্যাহ্নের ন্যায় অন্নগ্রহণের ব্যবস্থা। দুঃখব্রতী শ্রীঅরবিন্দের দিন ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসেও এই ভাবেই কাটিয়াছে। তাঁহার সেবার অভাব হইতেছে, ইহা বুঝিয়াও আমাদের কিছু করার ছিল না; তিনি যেন কোন এক মূর্ত্তিমতী শক্তির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাতা মৃণালিনীর মহাপ্রয়াণ হইয়াছে, তাঁহার হৃদয়ে সে শোকচিহ্ন বুঝি বিশেষ স্পর্শ করে নাই।

দেবী মৃণালিণীর কথা একদিন পাড়িয়াছিলাম ; তিনি ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে সঙ্কেতে যাহা জানাইয়াছিলেন, সেদিন তাহা বুঝি-বুঝি করিয়াও বুঝিতে চাহি নাই ; সৌরীনের মুখে শুনিয়াছিলাম—দেবীর অন্তর্দ্ধান-সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িয়াছিলেন, মুখে তাঁর একটী মাত্র অস্ফুট শব্দ বাহির হইয়াছিল।

তাঁর এই সময়ের অবস্থার কথা পত্রের মধ্য দিয়াই অবগত ছিলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন "the work of the Arya has fallen into arrears and I have to spend just now the greater part of my energy in catching up and the rest of my time, in the evening, is taken up by the daily visit of the Richards."

"আর্য্য" বাকি পড়ায় অধিকাংশ শক্তি তাহার জন্য যায়, অপরাহ্নের অবশিষ্ট সময় রিশারদম্পতির প্রাত্যহিক সাক্ষাৎকারেই অতিবাহিত হয়।" আসিয়া তাহাই দেখিলাম।

সারাদিন ঠক্-ঠক্ করিয়া টাইপ-রাইটিং মেশিনে তিনি "আর্য্য" লিখেন, তাঁর শরীর আড়ষ্ট ও ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়া উঠে। ক্লান্তি দূর করার জন্য তিনি বাহিরের বারান্দায় অপরাহ্নে চা-পানের জন্য আসিয়া বসেন, এই সময়ে আমরাও টেব্‌লের চারিদিকে অর্দ্ধভগ্ন চেয়ারগুলি টানিয়া উপবেশন করি; কিছু পরে, মাদাম রিশার আসিয়া উপস্থিত হন ; তারপর আসেন দীর্ঘকায়, লম্বিত-শ্মশ্রু, গৌরকান্তি মিষ্টার রিশার। আসর আমাদের বেশ জম্‌কাইয়া উঠে। ইহার মধ্যে আবার মিষ্টার রিশারের ফরাসীর গ্রন্থ হইতে ইংরাজীর অনুবাদ চলিতে থাকে "আর্য্যের" জন্য। শ্রীঅরবিন্দের ক্লান্তি বর্ণনা করা যায় না।

আমি থাকিতে থাকিতেই অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখা দিল। "আর্য্য" লেখা তিনি শেষ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই এই সময়ে প্রতি রবিবার সান্ধ্যভোজনের জন্য তিনি মিষ্টার রিশারের ভবনে নিমন্ত্রিত হইতেন, আমরাও তাঁহার সঙ্গে যাইতাম। এই দম্পতির মধ্যে বসিয়া তিনি ভোজন করিতেন, নানা প্রসঙ্গে এই ভোজ সমাপন হইত। শ্রীঅরবিন্দকে এই সময়ে কোন এক গভীর সমস্যার সমাধানে আত্মনিবিষ্ট দেখিয়াছি। আমি যত শীঘ্র নিজের সাধনার দিক্‌টা গুছাইয়া লওয়ার আশা করিয়াছিলাম, তাহা সম্ভব নহে বুঝিয়া অবস্থার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। এই জন্য আমি প্রস্তুতও ছিলাম ; কেন না তিনি এবার আমায় দীর্ঘ দিনের জন্য ডাকিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের কৃশকায় শরীর লইয়া মাদাম রিশারের সহিত অনেক আলোচনা হইত। ইঁহাদের নিকট শ্রীঅরবিন্দ আমার সম্বন্ধে সকল কথাই বলিয়াছিলেন ; তাঁহারা উভয়েই আমায় নিরতিশয় অনুরাগের সহিত দেখিতেন। মাদাম মীরার সহিত শ্রীঅরবিন্দ ও আমি এক সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন ধ্যান করিতাম। মাদাম মীরা এই ধ্যানফল ধ্যানশেষে ব্যক্ত করিতেন। শ্রীঅরবিন্দের মুখ প্রফুল্ল মূর্ত্তি ধরিত। আমিও এই বিদেশিনীর অত্যদ্ভুত অতীন্দ্রিয় দর্শনশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। তিনি দেখিতেন শ্রীঅরবিন্দের অন্তরলোকের অপার্থিব দৃশ্য। আমি দেখিতাম হিরণ্ময়-শ্মশ্রু জ্যোতির্ম্ময় অরবিন্দকে। মাদাম মীরার কথা শুনিতাম—বিস্মিত হইতাম ; পুলকিত হইতাম।

সে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। আমি বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। শ্রীঅরবিন্দ ধ্যানে বসিতেন কিন্তু নয়ন তাঁর নিমীলিত হইত না। আমরা দুই জনে নয়ন নিমীলিত করিয়া ধ্যান করিতাম। সে দিন অন্তরের মণিকোটায় এক অপার্থিব আনন্দের অনুভূতি পাইয়া চক্ষু উন্মীলিত করিলাম, দেখিলাম—মাদাম মীরা তখনও ধ্যাননিমগ্না। শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টি ঊর্দ্ধলোকে। বায়ুমণ্ডল যেন অতিশয় লঘু হইয়া গিয়াছে। একটা বৈদ্যুতিক শক্তি অনুভূত হইতেছে। আমার নয়ন বিগলিত হইল। কিছুক্ষণ পরে তিনজনই পরস্পরের প্রতি চাহিয়া অনিন্দ্য সুখ অনুভব করিলাম। বিস্মৃতির প্রলেপে অরবিন্দের সে অমৃতস্নিগ্ধ বাণী আমি ভুলিতে পারিব না। তিনি করুণাশীতল কণ্ঠে বলিলেন, "মতি, তুমি আমি আর এই"—সম্মুখে মাদাম মীরার দিকে তাঁর হস্ত প্রসারিত হইল। এখনও সেই বাণীর মূর্চ্ছনা কাণে বাজিতেছে "আমরা তিন জনে সঙ্ঘ।" আমার মাথা শ্রদ্ধাবনত হইল। মীরা দেবী হাসিলেন। শ্রীঅরবিন্দ আবার শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সেদিন অপরাহ্নের এই বাণী ও অনুভূতি আমার চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই দিন হইতে আমি মাদামের নিকট

ভাবনীররূপে আপনার হইলাম, তাঁহার প্রতিও আমার শ্রদ্ধানুরাগ স্বতঃই হৃদয়ে তরঙ্গ সৃষ্টি করিল।

মাদামের সঙ্গে কথা হয়। মিষ্টার রিশার আসেন অপরাহ্নশেষে সন্ধ্যার আলো জ্বলিলে। তাহার পূর্ব্বে আমাদের অনেক কথা শেষ হইয়া যায়। উচ্চ অধ্যাত্মকথার আলোচনা হইতে সৌরীনের ব্যবসার কথাও উঠে। সৌরীন পণ্ডিচারীতে ব্যবসা সুরু করিয়াছিল। আমি মাদামের অনুরোধে এক দিন সৌরীনের ব্যবসাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের পরে চাকুরী ছাড়িয়া, ছোট-বড় ব্যবসা অনেক করিয়াছি। ব্যবসার প্রধান বিষয় হিসাবের খাতা। যে খাতার প্রতিদিন কৈফিয়ৎ কাটা হয় না, বুঝিতে হইবে সেই ব্যবসার মূল্য নাই। সৌরীনের ব্যবসার পরিণাম সম্বন্ধে আমার ধারণা ভাল হইল না। আমার নির্ভুল অভিমত মীরাদেবীকে বলিয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দও জানিলেন। শ্রীঅরবিন্দের হৃদয়-মন মর্ত্ত্যের উপাদানে রচিত নহে; তিনি একবার যাহা বিশ্বাস করিতেন, তাহার অন্যথা হওয়া সহজে সম্ভব হইত না। তিনি বলিলেন—সৌরীন সব ঠিক করিয়া লইবে—চিন্তা নাই। শ্রীঅরবিন্দের প্রতিভা অসাধারণ, তাঁহার অন্তরও সুন্দর ও সরল। প্রত্যয়ের সীমাহীন বারিধি সহজে টলে না; সংশয়ের আবর্জ্জনা সেখানে সহজে স্থান পায় না। তিনি আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। আমার মনে অন্য কোনরূপ সংশয় উদয় হয় নাই—যেমনটী হইলে ব্যবসার শ্রী থাকে, উন্নতি হয়, তেমনটী সৌরীনের ব্যবসায় ছিল না। আমি শ্রীঅরবিন্দকে জোর করিয়া বলিলাম—ব্যবসা ভাল করিয়া করিতে হইলে, ব্যবস্থান্তর করিতে হইবে।

শ্রীঅরবিন্দের স্বাস্থ্য এই সময়ে ভাঙ্গিতেছিল, মীরা দেবী ইহার জন্য বেশ চিন্তা করিতেন। শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তাঁর অন্তরের অসামান্য দরদ এক অতি সামান্য কথায় আমায় মুগ্ধ করিয়াছিল; তখনই বুঝিয়াছিলাম—শ্রীঅরবিন্দের কায়ার তপস্যা শেষ হইয়াছে। যে মহালক্ষ্মীর আবির্ভাব-প্রতীক্ষায় তাঁহার এই কঠোর তপস্যা, উহার সিদ্ধিকাল অতি আসন্ন। শ্রীমতী মীরা বলিলেন "শ্রীঅরবিন্দের স্বাস্থ্য দিন দিন দ্রুত ভাঙ্গিতেছে, ইহার কারণ—শরীর-ধারণের উপযোগী আহার তিনি গ্রহণ করেন না। আমার আর এক সংশয় হয়, আপনি কিন্তু তাঁহাকে এ কথা বলিবেন না।"

আমি বলিলাম "না। কি বলুন।" উত্তরের প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে উৎকণ্ঠিত হইয়া চাহিয়া রহিলাম। তিনি করুণার্দ্র কণ্ঠে বলেলিন "আমার ভয় হয়—ঐ যে গরুর দুধ তাঁহার জন্য লওয়া হয়, ঐ গরুর ক্ষয়রোগ থাকিতে পারে, গরু পরিবর্ত্তন আপনারা করুন।" এই কথা বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই। পর দিন সকালে তিনি আমাদের বাড়ী আসিয়া, শ্রীঅরবিন্দের খাদ্যাদি পর্য্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। শ্রীঅরবিন্দের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা আমাদের থাকিলেও, কার্য্যতঃ কিছু করা সাধ্যে কুলাইত না। যে কয়দিন পণ্ডিচারীতে ছিলাম, ভোজনকক্ষে তাঁহার না আসা পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া তাঁহার অন্নপাত্রের মাছি তাড়াইতাম মাত্র। শ্রীঅরবিন্দের স্বাস্থ্যরক্ষায় মাদাম মীরা বিশেষ ভাবেই মনোযোগী হইলেন। তাঁহার এই ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অনুরাগ আমায় চমৎকৃত করিত। তাঁহাকে শ্রীঅরবিন্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়া মনে হইল। নিজে তলাইয়া গেলাম—সশ্রদ্ধায় সহতীর্থ ভাবিয়া সিষ্টার নিবেদিতার ন্যায় তাঁহাকে ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করিলাম। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভগ্নী নয়, আমি মাতা হইতে চাহি।" কথাটা সেদিন তলাইয়া বুঝি নাই। কিন্তু এই কথায় আমার অন্তরের কিছু ভাবান্তর হইয়াছিল। আমিও পূর্ব্বের ন্যায় শ্রীঅরবিন্দের যেন নাগাল পাইতে-ছিলাম না। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। আমার সহতীর্থগণের মধ্যেও এ নূতন পরিবর্ত্তন-যুগ লইয়া নানা প্রকার আলোচনা হইত। সে সকল কথা অপ্রাসঙ্গিক। আমারও লক্ষ্য শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর সমস্ত হৃদয়ের স্পর্শানুভূতি ব্যবহারতঃ কিছু না থাকিলেও, আমার অধ্যাত্মসত্তা তাঁহারই অনুরাগে অভিষিক্ত হইয়া থাকিত। আমি পুরুষ। মীরাদেবী নারী। তাঁর নিষ্ঠাভক্তির আতিশয্য এই হেতু অধিকতররূপে প্রকাশ পাইবে, ইহা কিছু বিচিত্র কথা নহে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে এমন কোন ব্যবধান যদি আসিয়া পড়ে, যাহার জন্য আমাকে দূরে পড়িয়া থাকিতে হইবে, সেই সুদূর চিন্তায় আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। মনের জগতে যে বিপ্লব বাধিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিতাম না। কিন্তু অন্য দিক্ দিয়া এইরূপ একটা ব্যবধানের প্রসঙ্গ হঠাৎ শ্রীঅরবিন্দের মুখ দিয়া বাহির হওয়ায়, আমার বিক্ষুব্ধ চিত্ত অতি অল্পক্ষণের জন্য সংক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; সে কথা আজিও স্মরণে রাখিয়াছি। সেদিন শ্রীঅরবিন্দ যাহা সারিয়া লইয়াছিলেন, অনতিকাল মধ্যেই সে তালি খসিয়া পড়িল; যাহা ভবিতব্য, অকাট্য বিধানে তাহাই ঘটিল। সে কথা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বলিতেছি।

(ক্রমশঃ)

# সমালোচনা

**বাংলার ধর্ম্মগুরু**—১ম খণ্ড। রায় সাহেব শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ, সঙ্কলিত। মূল্য ২৲ টাকা।

রাজেন্দ্রবাবুর বিরচিত যে কয়খানি সুপাঠ্য ও প্রয়োজনীয় পুস্তক আমরা পাঠ করিয়াছি, তন্মধ্যে এই বইখানিও অন্যতম রূপে তাঁহার কল্যাণকর্মী লেখনীর গৌরব রক্ষা করিয়াছে। গ্রন্থোক্ত অধিকাংশ চরিতই বাংলার সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য ও মহাপুরুষগণের পুণ্য জীবন-কাহিনী—অন্য যাঁহারা, তাঁহারাও বাঙালীর পরম পূজনীয়। যাঁহাদের চিত্র পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের চিত্রও ইহাতে সন্নিবেশিত হওয়ায়, স্মৃতি-মাহাত্ম্য আরও বাড়িয়াছে। সাধুসঙ্গ হিসাবে এই বইখানি ধর্ম্মপিপাসু মাত্রেরই তো সমাদরণীয় হইবেই, তদ্ভিন্ন ইহা বাংলার বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র-ছাত্রীগণের গৃহপাঠ্য ও উপহার-গ্রন্থ রূপে নির্ব্বাচিত হইবে বলিয়া আশা করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষা-সম্পর্কিত সুধীজনের দৃষ্টি এই সকল গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হইলে, আমরা সুখী হইব।

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

**মরু-ছায়া**—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। দীপালী গ্রন্থশালা, ১২৩।১নং আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

বর্ত্তমান যুগের বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের আসর আজ বহু শক্তিশালী শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকটি সাহিত্যের এই বহুপদচিহ্নিত বিভাগে নিজস্ব যোগ্যতায় স্থান পাইবে, আশা করা যায়। আটটি ছোট গল্পের সমষ্টি। লেখকের গল্প বলিবার সহজ ভঙ্গী পাঠকের মন সহজেই আকর্ষণ করে। গ্রন্থকারের ভাষা সহজ, সরল ও বলিষ্ঠ। যথেষ্ট আনন্দ ও সাহিত্য রসের খোরাক বইখানিতে মিটিবে। বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট চমৎকার।

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

**মুক্তির সন্ধানে ভারত**—শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র বাগল প্রণীত। প্রকাশক—মেসার্স এস, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২, নারিকেলবাগান লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪৮৪। মূল্য আড়াই টাকা।

ইংরেজ-রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতবাসীর মনে এখনকার মত এমন দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয় নাই। প্রদেশগুলি ছিল পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সে সময় ভারতের এখানে ওখানে একজন নৃপতি একটি রাজপরিবার বা কোন ভূস্বামী স্বীয় প্রদেশকে পরাধীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র, তাঁহার অধীন প্রজাবৃন্দকে সর্ব্ব দিকে—সমাজে, রাষ্ট্রে—উন্নতিশীল বলিষ্ঠ জাতি হিসাবে দেখিতে চাহেন নাই। তখনকার মুক্তির সংগ্রাম ছিল রাজায় রাজায়।

কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠায় ভারতে এক নবযুগের উদয় হয়। ইংরেজী শিক্ষা ভারতবাসীর সম্মুখে মুক্তিপথের সন্ধান দেয়। ভারতের প্রদেশগুলির মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান, ভাষার বৈচিত্র্য, আচার-ব্যবহার পরস্পরের মিলনের-পথে এখন আর বাধাস্বরূপ নাই। সমগ্র ভারতেই জনসাধারণের মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইয়াছে। কোন্ সময় হইতে ও কিভাবে এই জাগরণের সূত্রপাত হইল, জাতীয় জীবনের কোন্ কোন্ স্তরে ইহার প্রসার হইয়াছে এবং যাঁহারা মুক্তিযজ্ঞের হোতা যোগেশ বাবু তাঁহাদের সকলের কর্ম্মপরিচয় এই গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থখানি সর্ব্বসাধারণের জন্য রচিত হইয়াছে। এরূপ তথ্যপূর্ণ সুন্দর একখানি গ্রন্থের বিশেষ অভাব আমাদের সাহিত্যে ছিল। কিন্তু ইহা প্রণয়নে আবশ্যক অক্লান্ত পরিশ্রম, অটুট ধৈর্য্য ও গভীর অধ্যয়ন। যোগেশবাবু তাহাও অস্বীকার করিয়া যে আমাদের অভাবটি দূর করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থখানি মুদ্রণ ও সজ্জার দিক দিয়াও হইয়াছে সুন্দর। বইয়ের কলেবর বিবেচনায় মূল্য সস্তাই বলিতে হয়।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

**আগামী কাল**—শ্রীনীতিশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। ছায়াপথ পাবলিশিং হাউস, ৪ নং ভুবন সরকার লেন, কলিকাতা। দাম বারো আনা।

একাঙ্কিকা নাটিকা 'আগামী কাল' উদীয়মান সাহিত্যিক নীতিশ মজুমদারের প্রথম সৃষ্টি হইলেও, ভাবী সাফল্যের সম্ভাব্য বহন করে। সমাজ-জীবনে বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যাপারটি কিরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে পারে, তাহারই একটা কল্পচিত্র লেখক সরস কুশলতার সহিত আঁকিয়াছেন। ভাষা, সজ্জা ও টেক্‌নিকের দক্ষতাজনিত নাটিকাখানি অভিনয়োপযোগী হইয়াছে।

**অগ্নিবীণা**—ত্রৈমাসিক হস্তলিখিত পত্রিকা। সম্পাদক—শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। তত্রকালীন কয়েকজন উৎসাহী তরুণের প্রচেষ্টায় পত্রিকাখানির যে চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, রুচির ও পরিচ্ছন্নতার দিক্ দিয়া তাহা প্রশংসনীয়। ভাবী সাহিত্যিকের অনুশীলনক্ষেত্ররূপে পত্রিকাখানিকে ভবিষ্যতে দেখিলে আমরা খুশী হইব।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
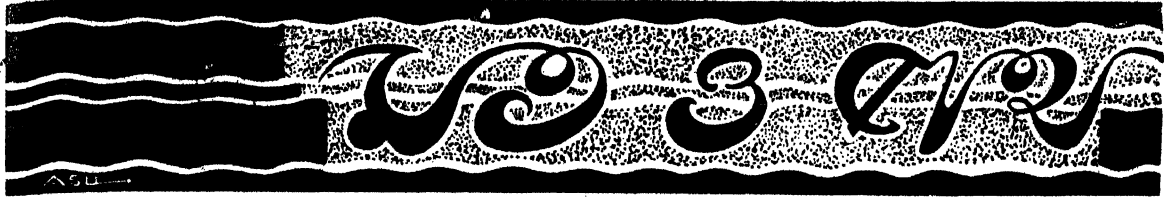
## কৃষ্ণায়ন

৪ঠা নভেম্বরের পর ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতা তথা ২৪ পরগণা, হুগলী ও হাওড়া জেলায় সরকারী Black out বা কৃষ্ণায়নের ব্যবস্থা সর্ব্বত্র সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শত্রুর অনলবর্ষী ব্রহ্মাস্ত্র হইতে আত্মরক্ষার জন্য নাগরিক চেতনাকে এইরূপ উপায়ে সতর্ক ও শিক্ষিত করার প্রয়োজন আজ সকল জাতিই অনুভব করে। তাই ইহা যেন আমরা আতঙ্কের হেতু বলিয়া গ্রহণ না করি। পৌরবুদ্ধি যত দিক্ দিয়া জাগে, জাতির মধ্যে সংহতিমূলক শিক্ষা ও অভ্যাসের প্রবর্ত্তন হয়, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকা উচিত নহে। পরাধীন না হইয়া, স্বাধীন রাষ্ট্র হইলেও, আমাদের এরূপ বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন থাকিবে। যাহারা বিমুখ হইবে, সে সকল জাতি যুগের সঙ্কেতে চলিবার জন্য প্রস্তুত নহে বুঝিতে হইবে—আবিসিনিয়ার ন্যায় তাহাদের দুর্দ্দশা অসম্ভব নহে। কৃষ্ণায়ন বা ব্ল্যাক-আউটের দ্বারা লণ্ডনের ন্যায় সুরক্ষিত মহানগরীকেও শত্রুর মারণাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা করা সম্ভবপর হইতেছে না, তখন ভারতের ন্যায় একান্ত অরক্ষিত ও অসহায় অবস্থায় এই নিষ্প্রদীপীকরণের ব্যবস্থা কতটুকু বস্তুতঃ কার্য্যকরী হইবে, এ চিন্তা এই প্রসঙ্গে অনাবশ্যক। কৃষ্ণায়নের নৈতিক শিক্ষাই এখানে গ্রহণীয়। সমষ্টিহিসাবে বাঁচিবার জন্য সমষ্টিমূলক পৌরচেতনা নৈতিক শিক্ষায় প্রবুদ্ধ ও প্রস্তুত হওয়ার আমাদেরই অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। নহিলে পৃথিবীর বীরজাতিদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্যকেন্দ্র· ভারতবর্ষের দুর্গতির সীমা আবিসিনিয়ার চেয়ে শোচনীয় হওয়ারই সম্ভাবনা।

## মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের প্রতিবাদ আন্দোলন

মাধ্যমিক শিক্ষাবিলটীকে আমরা ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্যুশেল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। যে বিলের প্রস্তাবানুসারে বাংলার শিক্ষানিয়ন্ত্রণের ভার এমন একটী বোর্ডের উপর অর্পিত হইবে, যাহার ৫০ জন সদস্যের মধ্যে ১৯ জন মুসলমান, সভাপতি সহ ৪ জন সরকারী কর্ম্মচারী, ৮ জন মনোনীত হিন্দু ও ১ জন ইউরোপীয়ান, তাহাতে ৩২টী সভ্যের সংখ্যাধিক্য গভর্ণমেণ্টেরই কর্ত্তৃত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে কায়েমী করিয়া তুলিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের রাষ্ট্র সত্যই জাতির প্রতিনিধিমূলক হইলে, ইহাতেও আশঙ্কার কারণ থাকিত না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায়, এরূপ ব্যবস্থার ফলে সাধারণভাবে শিক্ষার প্রসার-সঙ্কোচ ও বিশেষভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষা-সুযোগের নিরোধই অনিবার্য্য পরিণাম বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। এমন শিক্ষানীতি দুর্নীতি বলিয়াই আমরা অভিহিত করিব। অসঙ্গত ভোটের সংখ্যাধিক্যে এমন দুর্নীতিমূলক প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত না হয়, তজ্জন্য মন্ত্রি-পরিষৎ অবহিত না হইলে, আমরা মাননীয় গভর্ণর বাহাদুরকেই ইহা স্বীয় বিশেষ ক্ষমতায় নাকচ করিতে অনুরোধ করিব। শিক্ষিত বাঙালীর কণ্ঠরোধে অন্ততঃ তাঁহার সম্মত হওয়া উচিত নহে।

## মণ্টেসোরী আন্তর্জ্জাতিক সমিতি

ডাঃ মণ্টেসোরী শিশুশিক্ষার নববিধান প্রবর্ত্তনে আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। এই প্রতিভা-শালিনী মহিলা সম্প্রতি এইরূপ শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করিতে ভারতবর্ষে স্বয়ং আসিয়াছেন ও নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া এ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আর একবার ভারতে আসিয়া তাঁহার উদ্ভাবিত শিশুশিক্ষা-প্রণালীর ব্যাখ্যা ও তাহা শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে বার প্রায় ৩০০ শত শিক্ষক ভারতের নানা স্থান হইতে গিয়া তাঁহার নিকট এই শিক্ষাপ্রণালী অধিগত করেন ও ইহাদের কেহ কেহ এখন স্বয়ং শিশু-স্কুল বা শিশু-শিক্ষা-ক্লাস খুলিয়া এই ধরণের শিক্ষাদানে ব্রতী হইয়াছেন—অন্যেরা প্রতিষ্ঠিত

বিদ্যালয়সমূহে এই ভাবের শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ শিক্ষক-রূপে নিয়োগ লাভ করিয়াছেন।

ডাঃ মণ্টেসোরী তাঁহার বর্ত্তমান পরিভ্রমণ-কালেও দ্বিতীয় বার ট্রেনিং-কোর্স খুলিয়া, তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর প্রাথমিক বিভাগে অর্থাৎ ষড় বর্ষের বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের জীবনগঠনের জন্য নবপদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষকগণকে শিক্ষাদান করিবেন। ডাঃ মণ্টেসোরীর প্রণালীতে ভারতীয় ভাববীর্য্য সঞ্চার করার কিছু সুযোগ আছে কি না, তাহা আমাদের জানা নাই। শিশু মাত্রেই সহজ ভাবে মানবশিশু হইলেও, জাতীয় ভাব ও সাধনার বীজও তাহার ধমনীর রক্তে ও চেতনার মর্ম্মে মর্ম্মে নিহিত আছে। ইহাই আমাদের বিশ্বাস। ডাঃ মণ্টেসোরীর ন্যায় জগদ্বিশ্রুতা শিক্ষানেত্রী শিশুর প্রকৃতিবিচারে এই মৌলিক তত্ত্বকে উপযুক্ত স্থান দান করিলে, আমরা তাঁহার প্রণালীতে আপত্তি করিব না। নহিলে আন্তর্জ্জাতিকতার নামে যে বৈশিষ্ট্যের প্রতিক্রিয়া আমরা প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, তাহাই নূতন আকারে কেহ পরিবেশন করিতে আসিলে আমরা স্বতঃই একটু আতঙ্কিত হইয়া উঠি। এ বিষয়ে যাঁহারা সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা সম্পাদক, সেকেণ্ড মণ্টেসোরী ট্রেনিং কোর্স, অলকট গার্ডেন্‌স, আডিয়ার, মাদ্রাজ, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলেই সকল বিষয় অবগত হইবেন। আমরা আশা করি, ডাঃ মণ্টেসোরী বা তাঁহার অনুরাগী বিশেষজ্ঞগণ আমাদের উত্থাপিত প্রশ্নের উপর যথাযোগ্য আলোকপাত করিয়া, ভারতবাসীকে আশ্বস্ত করিবেন।

## সভ্যতার বীজ-রক্ষা

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার অগলথর্প বিশ্ববিদ্যালয় মানব-সভ্যতার মূল উপাদানগুলির বীজ-রক্ষার জন্য এক বিচিত্র পরিকল্পনা স্থির করেন। তাঁহারা বর্ত্তমান মানুষের চিন্তা ও সাধনাপ্রসূত যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তথ্য, তাহার সূক্ষ্মতম সংক্ষিপ্তসার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুরক্ষিত পেটিকায় পূরিয়া, গভীর ভূগর্ভ মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিতে মনঃস্থ করেন ও তদনুযায়ী এই কয় বৎসর অসাধারণ শ্রমে ও যত্নে বিরাট্ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে এই পেটিকাগুলি শীলরুদ্ধ করিয়া ভূ-প্রোথিত করা হইয়াছে। উদ্যোগিগণ আশা করেন যে, এই ভাবে রক্ষিত গুহ্যসম্পদগুলি অন্ততঃ ৬০০০ বর্ষ আত্ম-গোপন করিয়াও সভ্যতার সাক্ষ্য দান করিতে পারিবে।

আমরা অবগত হইলাম—ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক কতিপয় শাস্ত্রগ্রন্থ এই ভাবে রক্ষিত হওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমেরিকায় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ পরামর্শমণ্ডলীরই পরামর্শক্রমে বোম্বাই যোগ ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে প্রকাশিত ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন-গ্রন্থই ইহার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে। উহার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা মাইক্রো-ফিল্মে সূক্ষ্মীকৃত হইয়া "crypt of civilisation"এর অন্যতম সম্পদরূপে ৮১১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভূগর্ভে গোপনে থাকিবে—ভারত-সভ্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করিবে।

পাশ্চাত্য মনীষিগণের পরিকল্পনা বিস্ময়কর!

## ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রভাব

ইউরোপীয় যুদ্ধ আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সকলেরই চিন্তার কারণ হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের সুযোগে আমেরিকা ও জাপানের ন্যায় প্রায় নিরপেক্ষ দেশ প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধে জাপান অন্য ব্যাপারে লিপ্ত; কিন্তু আমেরিকা একা সম্পূর্ণভাবে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতে ছাড়িতেছে না। ভারতে যুদ্ধোপকরণ-সৃষ্টির যে সরকারী পরিকল্পনা, তাহা শোচনীয় শ্লথ গতিতে অগ্রসর হইলেও, তাহাতে এদেশীয় যন্ত্রশিল্পের কথঞ্চিৎ উন্নতি ও শিল্পীদের বেকার-সমস্যার যৎকিঞ্চিৎ সমাধান হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি।

দেশীয় প্রধান শিল্প ও ব্যবসায়গুলির উপর যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারে আলোচনা করা যাইতে পারে। বস্ত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে, ভারত-গবর্ণমেণ্ট তুলার উপর আমদানী শুল্ক বর্দ্ধিত করায় এবং ইঙ্গ-ভারতীয়-বাণিজ্য-চুক্তির প্রতিকূল ব্যবস্থায় বাংলার কাপড়ের কলগুলির অবস্থা একেই ভাল যাইতেছিল না, তাহার উপর যুদ্ধের সুযোগে জাপানের প্রতিযোগিতা প্রবলতর হওয়ায় আমরা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। চট-শিল্পের

ক্ষেত্রে ইহার অন্যথা লক্ষিত হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় চট-কলসমূহে ১২ লক্ষ ২১ হাজার ৪৮২ টন ওজনের চট ও থলে উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে সেই স্থলে ১২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯০৯ টন ওজনের থলে ও চট প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে এপ্রিল হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ১০ মাসে ৮ লক্ষ ৩ হাজার ২০৬ টন চট ও থলে রপ্তানী হইয়াছিল, ১৯৩৯-৪০-এ সেই স্থলে রপ্তানী উপরোক্ত ১০ মাসে ৯ লক্ষ ১৮ হাজার ৮৮৪ টন থলে ও চটের কাটতি হইয়াছে দেখিতে পাই। ইহা যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া বলা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে জাহাজ-চলাচলের বিঘ্ন ঘটায়, এই শ্রীবৃদ্ধির স্রোতঃ যথেষ্ট প্রতিহত হইবে, ইহা আশঙ্কা হয়।

ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের দিক্ হইতে দেখা যায় যে, যুদ্ধের ফলে যে ক্ষতির আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা ভিত্তিহীন। ১৯৪০ সালের (সেপ্টেম্বর-জুলাই) রিপোর্টে আমরা পাই—ভারতের সিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলির চলতি আমানত-হিসাবে ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ১৪১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা এবং স্থায়ী আমানত ১০৬ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা জমা ছিল; গত ১৯শে জুলাই তারিখে এই ব্যাঙ্কগুলিতে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর আমানত যথাক্রমে ১৫১ কোটি ৩৭ লক্ষ এবং ১০৬ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। এই সব ব্যাঙ্কের হাতে এই কয় মাসে নগদ টাকাও ৭ কোটি ২৯ লক্ষ হইতে ৮ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। অন্যান্য বাবদেও টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর গত ১১ মাসে সাধারণের আমানতী টাকা, ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুদ ও নগদ টাকাও বাড়িয়াছে। ফলতঃ, যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির সমষ্টিগত আর্থিক ভিত্তি দৃঢ়তর হইয়াছে, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। ইহাতে মনে হয়, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মূল নীতি প্রতিকূল না হইলে, ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি আরও অধিক সুপরিচালিত হইতে পারিত ও ফলে বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতেই সমধিক শ্রী ও উন্নতি লাভ করিতে পারিত। ভারতের কাঁচা মাল ও যন্ত্রজাত শিল্প পণ্যের অফুরন্ত উৎপাদিকা শক্তি সুব্যবহৃত হইলে, একা ভারত বৃটেনের দুর্দ্দিনে পরম সহায়তা করিয়া নিজে ঋদ্ধি-সিদ্ধির কল্প-নিকেতনে পরিণত হইতে পারে, ইহা কল্পনা নয়, অমোঘ বস্তুতান্ত্রিক সত্য।

# সাময়িকী

## সঙ্ঘকেন্দ্র পরিদর্শনে—মেলেন্দহ প্রবর্ত্তক আশ্রমে

গত ১২ই নভেম্বর সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায় মহাশয় মৈমনসিংহ জেলার মেলেন্দহ প্রবর্ত্তক আশ্রম পরিদর্শনে গমন করেন। ১৩ই নভেম্বর একটী বিরাট্ জনসভা হয়। তাহাতে বহু স্থানীয় হিন্দু ভদ্রলোক ও প্রায় ২০০ শতাধিক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সঙ্ঘগুরুর প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় সকলেই নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন। রাত্রে পূর্ণিমা-সম্মিলনীও সুন্দর হৃদ্যতাপূর্ণ হইয়াছিল।

## চট্টল-সঙ্ঘ-কেন্দ্রে

১৫ই নভেম্বর সঙ্ঘ-সভাপতি সদলবলে চট্টল-কেন্দ্রে উপস্থিত হইলে, সঙ্ঘ-সভ্য ও ছাত্রমণ্ডলী প্রায় শত সংখ্যক জন জয়ধ্বনিপূর্ব্বক তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। ১৭ই নভেম্বর যাত্রামোহন সেন হলে প্রিন্সিপ্যাল গঙ্গাচরণ দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে প্রবর্ত্তক জয়ন্তী উৎসব ৮ম মাসিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। ১৮ই প্রাতঃকালে স্থানীয় কার্য্যনির্ব্বাহকমণ্ডলীর অধিবেশন হয় ও তৎপরে সঙ্ঘগুরু সঙ্ঘ-বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। ২০শে নভেম্বর শাকপুরা পল্লীকেন্দ্রে নবগঠিত উপাসনা-মন্দিরের উদ্বোধনোৎসব হয়। তৎপরে বিপুল জনসভায় সঙ্ঘগুরু ওজোময়ী ধর্ম্মবাণী পল্লীপ্রাণে নবীন অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে। ২১শে চট্টল সহরের আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাপীঠে শ্রদ্ধেয় সঙ্ঘগুরু আমন্ত্রিত হন ও তথায় প্রীতি-সম্মেলনে তিনি সুমধুর অভিভাষণ প্রদান করেন। ২২শে প্রাতঃকালে গোলপাহাড়ে স্থানীয় সঙ্ঘের সাধারণ বার্ষিক সভার অধিবেশন ও অপরাহ্নে শিক্ষকসম্মেলন হয়। ২৩শে চট্টল প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠের পারিতোষিক বিতরণোৎসব হয়। শতাধিক অভিভাবকের সমাগমে গভীর উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় ও ছাত্রদের উপাসনা, খাদি পরিধান, শুশ্রূষা প্রভৃতির জন্য নানা নূতন রকমের পুরস্কার বিতরিত হয়। ২৪শে সঙ্ঘগুরুর অধ্যাত্ম উপদেশ এবং ২৫শে প্রাতঃকালে বিগত সঙ্ঘাত্মা হেমচন্দ্রের স্মৃতি-তর্পণ অনুষ্ঠান ও ছাত্রদের কুস্তিসম্মেলন সম্পন্ন হইয়াছিল। অতঃপর, সঙ্ঘের নব অধিকৃত গোলপাহাড়-সংলগ্ন উচ্চ পাহাড়টীতে ছাত্রগণের উৎসাহপূর্ণ রণসঙ্গীত সহকারে উঠিয়া সঙ্ঘ-সভাপতির পৌরোহিত্যে গৈরিক পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৭শে নভেম্বর সঙ্ঘগুরু চন্দননগরে রওনা হন।

## চন্দননগরে সঙ্ঘজননীর তিরোভাব মহোৎসব ও হিন্দু-সম্মেলন

২২শে অগ্রহায়ণ সঙ্ঘের পুণ্যময়ী অধ্যাত্ম-জননী শ্রীশ্রী৺রাধারাণী দেবীর ১১শ বার্ষিক তিরোভাব মহোৎসব গভীর আন্তরিকতার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে সুসজ্জিত আশ্রম-প্রাঙ্গণে সঙ্ঘের সন্তান-মণ্ডলীর সমবেত কণ্ঠে উপাসনার ধ্বনি, নগর-কীর্ত্তনে মাতৃ-সঙ্গীত, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত হোমানলের সম্মুখে দলে দলে নারী-পুরুষের কণ্ঠে অনাহত মাতৃমন্ত্র-জপ ও সঙ্গে সঙ্গে একদিকে সঙ্ঘাচার্য্য পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ সাংখ্যকাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক চণ্ডী পাঠ ও আহুতি এবং অন্যদিকে সঙ্ঘসুহৃদ্ শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই-সি-এস কর্ত্তৃক অষ্টাদশাধ্যায় গীতাপাঠ—অপূর্ব্ব মন্ত্রমুখরিত মহাযজ্ঞ অতি সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় পর প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনকলানিধি শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সুমধুর লীলাকীর্ত্তন ও পরদিন আবার ভক্তিমন্ত্র মহাশয়ের

রসকীর্ত্তন এবং তৎপরদিন স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিরাট্ হিন্দু-সম্মেলনের অধিবেশন হয়।

হিন্দু সভায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে স্যার নৃপেন্দ্রনাথকে একখানি অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। সঙ্ঘসম্পাদক শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত সঙ্ঘের আদর্শ ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা বিবৃত করেন। উপাসনার প্রবর্ত্তন, হিন্দু সংগঠনের উদ্দেশ্যে একটী শক্তিশালী মণ্ডলীগঠন, মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদ ও তৎপ্রতিরোধ কল্পে স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা, সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারার উচ্ছেদ ও আদমসুমারীর গণনায় হিন্দু-করিয়া বলেন—পাশ্চাত্ত্যের মোহ-প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে যদি তাহার গৌরবোজ্জ্বল আসনে আমরা প্রতিষ্ঠিত রাখি এবং পশ্চিমের বিজ্ঞানকে উহার অপব্যবহার হইতে মুক্ত করিয়া সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে গ্রহণ করি, তবেই আমরা আবার জগতে সম্মানের আসন অধিকার করিতে পারিব। তিনি এতৎপ্রসঙ্গে ত্রিবাঙ্কুর হিন্দুরাজ্যে তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা অতি সরলভাবে উল্লেখ করিয়া বলেন—সেখানে সুশিক্ষিত নারী-পুরুষগণ তাহাদের অধ্যাত্মক্ষেত্রে পাশ্চাত্য আলোক পড়িতে দেয় নাই,

চন্দননগরে সঙ্ঘজননীর তিরোভাবোৎসব উপলক্ষে হিন্দু-সম্মেলনের সভাপতি স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার

নামে হিন্দুর পরিচয়—এই মর্ম্মে কয়েকটী প্রস্তাব সম্মেলনে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়।

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায় তাঁর বক্তৃতায় হিন্দুকে জীবনবেদের সাধনায় উদ্বুদ্ধ করেন—স্বেচ্ছাচারমূলক প্রগতির গতি-পরিবর্ত্তন এবং সত্য, সংযম ও সঙ্ঘের সাধনায় তরুণদের ব্রতী হইয়া বাংলায় হিন্দু জাতিকে শক্তিশালী ও জগজ্জয়ী করার সঙ্কেত প্রদান করেন।

সভাপতি শ্রদ্ধেয় সরকার ভারতীয় ও পাশ্চাত্য-আদর্শের বিশ্লেষণ কিন্তু পার্থিব বিষয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘেও এই আদর্শের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দপ্রকাশ ও তাহার চির-জয় কামনা করেন। অতঃপর শ্রীচারু-চন্দ্র দত্ত আই-সি-এস কর্ত্তৃক সভাপতিকে ধন্যবাদান্তে সভাভঙ্গ হয়। সভায় প্রচুর ও বিশিষ্ট লোকসমাগম হইয়াছিল।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

পরিচালক ও প্রকাশক: শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বসন্তের পূর্ব্বাভাষ

শিল্পী :
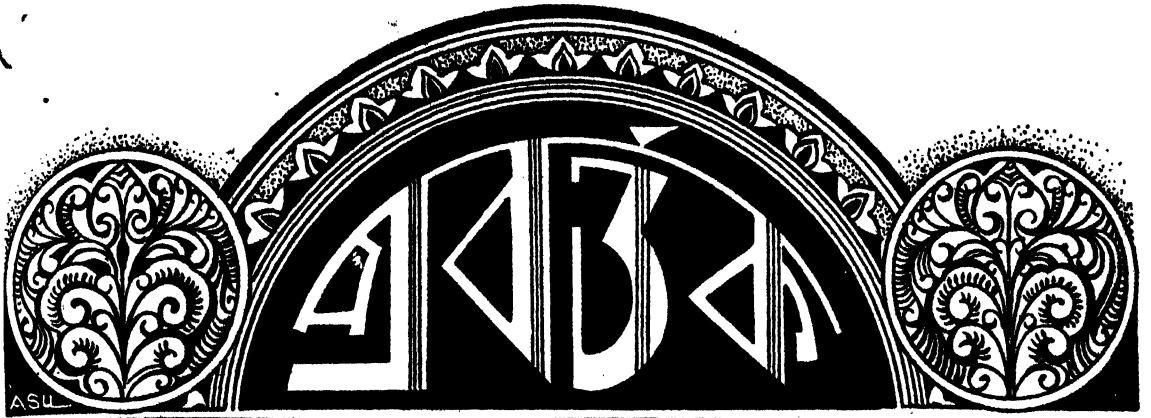
# রজত-জয়ন্তী

## হিন্দুজাতি গঠনের মূল সংস্কৃতি বেদ

যখন আমরা ধর্ম্মের ভিত্তির উপর জাতি গড়ার কথা বলি, তখন ধর্ম্মকে কোন এক বিশেষ ধর্ম্মের পর্য্যায়ভুক্ত করি। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মানুষ লইয়া জাতি গড়ার কথা তাই এই ক্ষেত্রে আসিতেই পারে না। এই অবস্থায় ধর্ম্ম লইয়া জাতি আমাদের দেশে গড়িয়া উঠিতে পারে কি না, এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে।

রাষ্ট্রই যাহাদের লক্ষ্য তাহাদের এই সমস্যা নাই ; কিন্তু কার্য্যতঃ এই সমস্যা নাই কি না, বলা চলে না। সেজন্য বিভিন্ন ধর্ম্ম লইয়া কংগ্রেসের রাষ্ট্র সাধনায় এই সমস্যার মীমাংসা হয় নাই। আমরা এই হেতু গোড়া হইতে এই বিষয়ের স্পষ্টতা লইয়া জাতিগঠনে অগ্রসর হইব। যে শক্তির সাহায্যে জাতি ও রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবে, সেই শক্তির উৎস কি, তাহাই বিচার্য্য। প্রথমেই মনে হইবে—যাহা হইতে মানুষের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য, মানব জীবনের তৃপ্তি ও পূর্ত্তি, তাহাই শক্তির কেন্দ্রক্ষেত্র। ইহা সত্য। এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় কোন গোল নাই। কিন্তু এই শক্তির মৌলিক ক্ষেত্রটাকে বস্তুতন্ত্র করিয়া লোকগ্রাহ্য করিতে হইলে, এই ব্যাখ্যায় খুসী হওয়া যায় না। তখন বলিতে হয়, জাতির কল্যাণকামনার উৎস তাহার সংস্কৃতি ও তাহার ধর্ম্ম এবং সেই সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের উপরে জাতির অমিশ্র প্রত্যয়। এরূপ হইলে কোন এক জাতি সর্ব্ব-শ্রেণীর লোকের জন্য সমছন্দে কল্যাণের হেতু হইতে পারে না। এক জাতির যাহা কল্যাণকরী তাহা অন্য জাতির জন্য সর্ব্বতোভাবে কার্য্যকরী হয় না। জগতে এমন জাতি আজিও দেখা যায় নাই, যে জাতি নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্ব জাতির লোকের কল্যাণ-সাধনে সমর্থ হইয়াছে। জাতীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রে এই হেতু জটিল সমস্যার সমাধান হইতেছে না। বিশেষ আমাদের দেশে বিচিত্র সংস্কৃতি-মূলক প্রত্যয় বিদ্যমান থাকায়, এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নহে। অতএব আমরা এই বিষয়ের সমাধান ভবিষ্যতের হাতে ছাড়িয়া দিয়া একটা বিশেষ জাতি বর্ত্তমান অবস্থায় যতদূর সম্ভব আগাইয়া যাইতে পারে, তাহাই শ্রেয়ঃ করিয়াছি।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ—হিন্দু-সংহতি। হিন্দু-সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম আমাদের শক্তি-উৎস। হিন্দুর মধ্যেও সংস্কৃতি ও ধর্ম্মগত যে অনৈক্য, তাহা কোথাও কাল্পনিক, কোথাও বা অজ্ঞতা। অথবা অজ্ঞতার উপর কল্পিত ধর্ম্মের ভিত্তিতে একই জাতি

ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি লইয়া ধর্ম্মভেদ সৃষ্টি করিয়াছে—আবার কোথাও বা ঘটনার আবর্ত্তনে একই সংস্কৃতির বিকৃতিতে ধর্ম্মভেদ সৃজন করিয়া প্রবল বিরুদ্ধ জাতিও গড়িয়া উঠিয়াছে। আশার কথা এই—মূলের সংস্কৃতি ইহাতে নষ্ট হয় নাই, অমিশ্র ধর্ম্মের প্রচণ্ড গতি পথে মৌলিক সত্যই আবিষ্কৃত হইবে। তবুও কল্পিত ও বিকৃত সংস্কৃতির যে ক্ষীণ অস্তিত্ব থাকিয়া যাইবে, তাহা গণনার মধ্যেই আসিবে না—মৌলিক সংস্কৃতির ঔজ্জ্বল্যে সূর্য্যোদয়ে গ্রহ নক্ষত্রের ন্যায় ঐ সকল ধর্ম্মমূর্ত্তি অভিভূত হইয়া পড়িবে।

জাতির মৌলিক সংস্কৃতি যতদিন না পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে এবং ঐ সংস্কৃতির ভিত্তির উপর যতদিন না একটা প্রবল সমষ্টি গড়িয়া উঠে, ততদিন সেই সংস্কৃতির শক্তি জাতিতে পরিণত হয় না এবং রাষ্ট্রেও অভিব্যক্ত হয় না। যাঁহারা স্বাধীনতার লক্ষ্যে সমষ্টিবদ্ধ হইতে চাহেন অথচ জাতির সংস্কৃতির সন্ধান রাখেন না, তাঁহাদের গতি কিছুদূর গিয়াই শেষ হইবে। স্বাধীনতা জাতির ফল; জাতি না গড়িয়া উঠিলে ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই—প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ তাই সংস্কৃতির ও ধর্ম্মের উপরেই সর্ব্বপ্রথম জাতিসৃষ্টির প্রেরণায় সাধনরত হইয়াছে। জাতি ছিল আর আজ নাই, এমন হইতে পারে না। জাতি ছিল, তাই তার রাষ্ট্রও ছিল—যাহা কোনদিন ছিল না, তাহা কে সৃষ্টি করিবে? এমন যে পৃথিবী তাহারও পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি, প্রলয়ে তাহার অস্তিত্ব লুপ্ত হয় না বলিয়াই সম্ভব হয়। এইরূপ আমাদের জাতি ও জাতীয় রাষ্ট্র আছে। উহার পুনরাবিষ্কার চাই। নূতন কিছু করার চিন্তা আমাদের নাই।

জাতি আবিষ্কারের মূলশক্তি সংস্কৃতি। সংস্কৃতির উদ্ধারেই জাতিও আবির্ভূত হইবে; সংস্কৃতির কথাই এই জন্য আজ বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়। সৃষ্টির ধর্ম্ম ভেদে বা বৈষম্যে। বস্তুগত ধর্ম্ম লইয়া তাই সংহতি গড়ে না। ধর্ম্মভাব সিদ্ধ করিতে পারিলে অসংখ্য বৈচিত্র্যকে, সংহতিবদ্ধ করা যায়। ভাব দুর্নিরীক্ষ ও অনির্ব্বচনীয়। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই সৃষ্টির শতদল বিকশিত হইবে। অব্যক্ত অলক্ষ্য ভাব ধ্যানমন্ত্রে ধীরে ধীরে বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিবে। উহার উপরে উপাধি ও আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া জাতি প্রত্যক্ষ হইবে। এই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান আশ্রয় করিয়া হিন্দুজাতি গড়িয়া উঠিতে কত দীর্ঘ দিন যে অতিবাহিত হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহা আমরা পাইয়াছি, তাহা ঘটনার আবর্ত্তে লুপ্তপ্রায় মনে হইতেছে, তাহারই পুনঃ প্রাপ্তি কিন্তু যত সহজ, কোন নূতন ভাব-সংস্কৃতির সৃষ্টিতে অন্য এক জাতি সৃষ্টি তত সহজ নহে, এই জন্য আমরা হিন্দুজাতির অভ্যুত্থান চাহিতেছি।

হিন্দু সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিলেই যত কিছু কল্পিত বা বিকৃত সংস্কৃতির ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জাতি গড়ার স্বপ্ন দূর হইবে। সমস্যা অন্তহীন, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের বিচলিত হইলে চলিবে না; অমিশ্র আত্মপ্রত্যয় লইয়া তাই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকে বলিতে হইবে, আমাদের হিন্দুজাতিই গড়িতে হইবে। এই জাতির ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বেদমূলক। তারপর একদা এই অতি প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতির উপর, জ্ঞানে-অজ্ঞানে বিচ্ছিন্ন-বিভক্ত জাতি-সমূহকে ঐক্যসূত্রে অখণ্ড মূর্ত্তিতে পরিণত করার প্রয়োজন হইবে। দিন দিন যদৃচ্ছ গতিতে জাতি চলিবার অবকাশ পাইয়া বিশেষ কোন এক নীতি ও বিধির অনুবর্ত্তী হওয়ার শক্তি নষ্ট করিয়াছে। কি ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম, যদৃচ্ছ চলিলে তদনুযায়ী স্বভাব হইয়া যায়—কোন এক ক্ষেত্রে উহাদের আর সন্নিবদ্ধ করা সহজ হয় না। এক্ষণে দেখিতে হইবে, কোন ব্যক্তির প্রভাবে নয়—জাতির সংস্কৃতি ও বিধির ভিত্তিতে জাতির যে অংশ ঠাঁই লইতে পারে, সেই অংশকে লইয়া ধীরে ধীরে আমাদের ব্যাপ্তির পথে চলা সম্ভব কি না। বাহিরের দিক্ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইলেও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে নিরাশ হইলে চলিবে না। বাহিরের হিসাব প্রায় সর্ব্বসময়েই মারাত্মক হয়। আমাদের প্রত্যয়ের মূল্য যেমন যেমন হইবে, তদনুরূপ কার্য্য সিদ্ধির পরিমাণও হইবে। হিন্দুর অংশ বিশেষকে আজ বলিতে হইবে "আমি বেদ-বিশ্বাসী। বেদ-সংস্কৃতিই আমার জীবনের ভিত্তি—আমার কর্ম্মশক্তির মূল উৎস।" যদি প্রশ্ন উঠে—তুমি বেদ পড়িয়াছ কি? বেদাধিকার তোমার আছে কি? তদুত্তরে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ বলিবে—অধ্যয়ন তৎপর হইতে হইলে, বেদাধিকার লাভ করিতে হইলে, জাতির চিত্তে সর্ব্বপ্রথমে উহার প্রয়োজনের কথাটাই জাগাইয়া তুলিতে হইবে। বেদ-ধর্ম্মে জাতি গড়ার প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইবে। শুধু আন্দোলনে বা

আলোচনায় কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। মৌলিক সংস্কৃতির উপর প্রত্যয়ের বেদী দৃঢ় করার প্রয়োজন, বিশ্বাস ইহার জন্য মূলধন।

এই কর্ম্মপথে ভিন্ন ধর্ম্মী বা ভিন্ন রাজ-শক্তি অন্তরায় হইবে না। স্বজাতি সর্ব্বাপেক্ষা বিঘ্ন সৃজন করিবে। জাতি মুমূর্ষু। রাষ্ট্রশক্তি তাহার নাই। এই হেতু যদৃচ্ছ ধর্ম্মপ্রচার করার ফলে যে অহঙ্কৃত স্বভাব গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা স্বজাতিকে সংহতিবদ্ধ হইতে দিবে না। শাসন শক্তির উপর জাতির অধিকার নাই, অধর্ম্মেও জাতি প্রতিষ্ঠা পায় না—অতএব ধর্ম্মের নামে আত্ম-প্রতিষ্ঠার অহমিকা আমাদের প্রতিদিন খণ্ড খণ্ড করিয়া ধ্বংসের পথে লইয়া চলিবে। ইহার প্রতিরোধ করার সম্ভাবনা নাই। আর এইরূপে শক্তি ও সময়ের অযথা ব্যয়ও বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের সিদ্ধান্তে যে শ্রেণীর মানুষ সংযুক্তি চাহে, তাহাদের ঐক্যবদ্ধ সংহতির প্রভাব বিস্তার করিয়া চলার নীতিই আশ্রয়ণীয় হইবে। আমাদের বার বার বলিতে হইবে—বেদ আমাদের ধর্ম্ম ও সংহতির বেদী, ব্যাসদেব আমাদের ধর্ম্মগুরু; অতএব বেদোক্ত ধর্ম্ম যাহা যুক্তি প্রমাণে সিদ্ধ হইয়াছে ব্রহ্মসূত্রে, যাহা সদৃষ্টান্তে প্রতিভাত হইয়াছে মহাভারতে, যাহার প্রকরণ গীতায়, বাংলার নবজাতিকে এই শাস্ত্রে একনিষ্ঠ করিয়া সংহতি-বদ্ধ করিতে হইবে। সংগঠনপন্থীর ইহাই প্রধান কর্ম্ম। যাহা বেদে উপনিষদে নাই, যাহা ব্রহ্মসূত্রে, মহাভারতে, গীতায় নাই, তাহা কোথাও নাই। এই কথার প্রমাণ স্বরূপ যে জীবন, তাহা লইয়াই সংহতি এবং তাহাই নূতন জাতির আকৃতি লইবে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ এই প্রেরণাই বহন করিয়া চলিয়াছে। এই একবুদ্ধি তাহার কোন মতেই যেন বিচলিত না হয়।

হিন্দুর এই প্রাচীন সংস্কৃতি ভারতের শাশ্বত শক্তি রক্ষা করে নাই, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভারতের বর্ত্তমান পতিত অবস্থা। ভারত সংস্কৃতির আশ্রয় পরিত্যাগ করার যুক্তি তাই সমধিক কার্য্যকরী, কিন্তু সংস্কৃতির শক্তিহীনতা ইহাতে প্রমাণ হয় না—ইহার অন্য কারণ আছে, সে কথা এখানে নহে। উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের তাই মানুষ গড়ার কাজই ইহার জন্ত প্রয়োজন।

দেশের সর্ব্বত্র যে সকল কর্ম্মস্রোত বহিতেছে—তাহার মূলীভূত কারণ অমিশ্র নহে, ঘটনার সংঘাতে আপোষে ও নানারূপ সামঞ্জস্যে উহা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে।

বাহিরের তাগিদ আমরা বড় করিব না—ভারত সংস্কৃতির আদি অকৃত্রিম প্রেরণাই হইবে আমাদের শক্তি-উৎস। ইহা আজও নাকচ করার কারণ ঘটে নাই।

বাংলায় প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের ন্যায় কোথাও কোথাও এই-রূপ আদর্শ লক্ষ্যে রাখিয়া সংগঠন প্রচেষ্টা হইতে পারে, কিন্তু কর্ম্মনীতির যদি পার্থক্য থাকে, আমরা উহার সহিত অভিন্ন হইতে পারিব না। বিশেষতঃ প্রায় সর্ব্বত্র ভারতের সনাতন সংস্কৃতিকে পশ্চাতে রাখিয়া ব্যক্তি বা সংহতির মৌলিকতা ঘোষণা করার পক্ষপাতিত্বও লক্ষ্যে পড়িবে, কোথাও বা দেখা যাইবে মধ্য-যুগের ধর্ম্মাংশ লইয়া, হিন্দুজাতি-গঠনের প্রয়াস হইতেছে, ইহাতে জাতি পূর্ণশক্তি ও পূর্ণ মেধা লাভ করিবে না; এইরূপ কর্ম্মপ্রচেষ্টা অর্দ্ধপথে লয় হইয়া যাইবে।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের সংস্কৃতিগত উদ্দেশ্য ও প্রেরণা লইয়া ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সংহতি যদি কর্ম্মরত হয়—এই সকল ক্ষেত্রে আমাদের সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। যাহাতে এই সকল সংহতির সহিত কোথাও আমাদের সংঘর্ষ না উপস্থিত হয়। এতদ্ভিন্ন দেশের রাষ্ট্রসংহতিও আছে, রাষ্ট্রের আদর্শ লইয়া অধুনা হিন্দু সংগঠনের প্রয়াসও দেখা যাইতেছে—এই সবই কালে ভারতের মৌলিক সংস্কৃতি ও প্রেরণার অঙ্গপুষ্ট করিবে।

এইজন্য 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ' তাহার অনুভূত ভারত-সংস্কৃতির ভিত্তিতে স্বতন্ত্র গতিচ্ছন্দে চলিবে। আজিকার অনুভূতি এই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের সহায়েই ক্রমে পূর্ণ মূর্ত্তি ধরিবে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘকে আমি উপস্থিত পর পর চারিটী স্তরে কর্ম্মরত রাখিতে চাই।

প্রথম—বেদ উপনিষদাদি ধর্ম্মে, ব্রহ্মসূত্র ও গীতার যুক্তি ও অনুভূতিতে সবখানি পূর্ণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত জীবনের ক্ষেত্র গড়া।

দ্বিতীয়—যাঁহারা এই ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত ও আকৃষ্টচিত্ত হইবেন, জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে থাকিয়াও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবেন—তাঁহাদের সংহতিভুক্ত করিয়া লওয়া।

তৃতীয়—ভারতের মৌলিক আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে জাগ্রত-চিত্ত না হইলেও, ভারতের অভ্যুদয় ও মুক্তি-কামনায় একান্ত চিত্তে এই সংগঠন-নীতি যাঁহারা স্বীকার করিয়া লইবেন, তাঁহাদের নিকট সঙ্ঘের প্রচার ও তাহাদের সহিত সংযোগ রক্ষা করা।

চতুর্থতঃ—দেশের মনীষী, প্রতিভাশালী, অর্থে ও প্রতিপত্তিতে শক্তিশালী সমাজপুরুষগণকে এই নূতনপথের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহাদেরও জীবন-ক্ষেত্রে জাতি-সৃষ্টির এই শুভ-শঙ্খ নিরন্তর বাজাইয়া চলা।

নিখিল জাতির জীবন-তন্ত্র ভারতের সর্ব্বজনস্বীকৃত নাও হইতে পারে, কিন্তু এই ধর্ম্ম প্রত্যেক ভারতবাসীর কাম্য, ইহা অবধারিত। এইজন্য সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে ব্যক্তি বা সংহতির নানাবিধ উপধর্ম্মের প্রভাব দূর করার জন্য বেদসংস্কৃতিসিদ্ধ গুরুমূর্ত্তি, মহামতি ব্যাসের পূজা-প্রবর্ত্তন ও তাঁহার পরিবেশিত অমৃত অবাধে বিতরণ করিতে হইবে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘকে আশ্রয় করিয়া ভারতের ঋষি, মহর্ষি ও রাজর্ষি মূর্ত্ত ও বিগ্রহান্বিত হইতে চাহিতেছে। ভারতের রক্তধারায় অমিশ্র হিন্দু-ধর্ম্মই অভিব্যক্ত হইতে চাহে। এই গুরু দায়িত্ব প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের উপর ধীরে ধীরে ন্যস্ত হইতেছে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘকে তাই জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে প্রমাণ করিতে হইবে—বেদ-বাণী অক্ষর নহে, ভারতের ঋষিলোক, পিতৃলোক এমন কি গুরুবাদ অবজ্ঞার বিষয় নহে। পিতা-মাতা, পতি-পত্নী, গুরু-শিষ্য প্রভৃতির সম্বন্ধ একান্ত প্রাকৃত নহে; আর ভারতের দেব-দেবী, প্রতিমার আকৃতি খেয়াল বা কল্পনার বিষয় নহে; ভারত সত্তার আবির্ভাব আমরা এই সকলের মধ্য দিয়াই উপলব্ধিগম্য করিব। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য বাংলা হইবে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র। বাঙ্গালী জাতি হইবে আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র। শাস্ত্র হইবে বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র, পুরাণ, ব্রহ্মসূত্র ও মহাভারত। আর সব অন্ধ অনুসরণ। হিন্দু ধর্ম্ম চাহে না, ধর্ম্মের আশ্রয় চাহে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘকে এই কর্ম্মে অগ্রসর হইতে বলি।

---

# পথহারা তীর্থযাত্রী আমি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মর্ম্মরিত বসন্তের গন্ধভরা ব্যাকুল বাতাস
এ পথে এলোনা আজো, বিহঙ্গেরা ভুলেছে এ পথ,
একবিন্দু অশ্রু মোরে দিলনাক উদার আকাশ;
শুনিতে চাহি না, চিত্ত ভুলভরা তোরি অভিমত।
আনন্দ গিয়াছে কোথা? তার কাছে কিবা অপরাধ
করিয়াছি কোন্ দিনে! ভাবি তাই,—মোরে এইখানে
পলাতক আত্মা সম অগোচরে দিয়া অবসাদ,
রেখেছেন ব্যর্থতার শ্রান্তি মাঝে, সে যে অভিমানে।
রিক্তরাজী আমি আজ, দিশারীর পাই না সন্ধান,
কত রথ এই পথে যাত্রী নিয়া দ্রুত গেছে চলে;
নিশীথের অন্ধকার হিমাচ্ছন্ন কাঁদে ভগ্নপ্রাণ,
দিবসের তপ্তবালু আমারে যে দগ্ধ করে' তোলে।
বাজাইয়া মর্ম্মবেণু এ'ল নাক কোন দরবেশ,
বিস্তীর্ণ প্রান্তর 'পরে। মৃতপ্রায় অন্তর আবেগ;
তাহারে বাঁচাতে আর পারিনাক। সব হ'ল শেষ,
প্রবল ঝটিকা কত বয়ে গেল,—নভে নাহি মেঘ।
চলার পাথেয় মোর হরিয়াছে স্বর্ণ্য যাযাবর,
তৃষ্ণাতুর শঙ্কাতুর পথ চলি দীর্ঘ দিবাযামী।
ধূ ধূ করে প্রতিদিন সীমাহীন বালুকা সাগর,
এ দুস্তর মরুভূমে পথহারা তীর্থযাত্রী আমি!
সত্যের আসনে যেথা বসে আছে আরাধ্য দেবতা,
ওরে চিত্ত, চল মোর রেখে দিয়ে বিভ্রমের কথা।

---

## ধর্ম্ম আচারহীন হইলে ব্যর্থ হইবে

হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস জাতীয়শক্তিকে প্রবল করিতে পারে। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, হিন্দুধর্ম্ম নানা উপধর্ম্মে বিভক্ত হইয়াছে। হিন্দুর বিশালতা তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, কিন্তু হিন্দু তাহাতে শক্তিহীন হয় নাই। উপধর্ম্ম সৃষ্টির কারণ হিন্দু ধর্ম্মাচার গ্রহণে ক্রমে ক্রমে অসমর্থ হইয়াছে—ধর্ম্ম বিনা আচারে এবং বিনা পালনে কার্য্যকরী হয় না।

অবস্থার দায়ে ভারতের বিশাল হিন্দু জাতি জাতীয় শিক্ষা বঞ্চিত হইয়া হিন্দুর আচার গ্রহণ ও পালন অনর্থক শক্তি ও সময়ের অপব্যয় মনে করিয়াছিল। যাহার জন্য জাতির অধিকাংশ ক্ষেত্র বিশ্বাসহীন হইয়াছে। একনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম্মী তাই বড় দেখা যায় না। নানা উপধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া হিন্দুর নাম রক্ষা হইতেছে।

জাতির ধর্ম্মবিশ্বাস বিনষ্টপ্রায় হওয়ায় রাষ্ট্রক্ষেত্রে একদল লোককে উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে দেখি। মূলে বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় না হওয়ায় রাষ্ট্র সাধনা ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে। এবং ধর্ম্মের ভিত্তি যতই অদৃঢ় হইয়া উঠিতেছে, ততই আমরা লঘু চরিত্র হইয়া উঠিতেছি। জীবনের উন্নতির জন্য যে শাসনশৃঙ্খলা তাহা অকারণ মনে হইতেছে, বন্ধন বলিয়া আমরা তাহার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেছি। এই অবস্থায় দেশের উদীয়মান শক্তি জাতির মুক্তি কামনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথটীকে ধর্ম্মের কুহক বলিয়া অতিশয় লঘুপন্থাই অবলম্বন করিতেছে।

আমাদের দেশে শাস্ত্রবিধি অপেক্ষা ব্যক্তির প্রভাব উক্ত কারণে অধিক কার্য্যকরী হইয়া উঠিতেছে এবং এই কারণে পরমুখাপেক্ষীর সংখ্যাই বাড়িতেছে। ব্যক্তি-প্রাধান্য যতদিন ততদিন সংস্থার আত্মপ্রকাশ সহজ হয়। ব্যক্তি নিত্য নয়। ব্যক্তির তিরোধানে প্রায় সকল সংস্থাই ম্লান ও শক্তিহীন হয়। এই অবস্থায় আমরা জাতিকে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার জন্য বলিতে পারি—ধর্ম্মাচার গ্রহণ ও পালন করার ব্যবস্থা করিতে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে এক এক আচার প্রবর্ত্তন করিবে এবং এই আচার মানুষের অল্প সাধ্যের উপযোগী করা হইবে, ইহাতে মানুষের সাধ্য ও শক্তি বৃদ্ধি পাইবে না। যতদিন যাইবে দেখা যাইবে, ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াও কর্ম্মক্ষেত্রে জাতিটা ক্রমেই অসহায় হইয়া পড়িতেছে। সংগ্রামশীল জীবনের যে সাধনা তাহা হইতে নিজের সাধ্যের মাপকাঠিতে ধর্ম্মাচারের নূতন সংস্কারে মানুষ বুদ্ধিতে বৃহস্পতি হইলেও, শক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে একটী আস্ত ক্লীব ভিন্ন অন্য কিছু হইবে না। জাতি দার্শনিকতার আদর্শে বেশ উদ্বুদ্ধ দেখা যায়। রক্ত মাংসের উপর কোন চাপ না দিয়া ঈশ্বরের পথে চলার আশা তাহাকে বেশ ভুলায়, এবং নিজেকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর বলিয়াও মনে হয়, কিন্তু ধর্ম্ম কি মানুষকে কর্ম্মে জীবনের সর্ব্বপ্রকার অভিব্যক্তি হইতে বিমুখ করে? ভারতের বহু উপধর্ম্মে ইহার সমর্থন থাকিলেও আমরা ভারতের সনাতন ধর্ম্মে নিজের সাধ্যানুযায়ী কোন মনগড়া মানুষের বিধির সমর্থন পাই না। বরং দেখি ধর্ম্মাচার পালন করিতে হইলে প্রতি রক্তবিন্দুর তপস্যা আছে। প্রতি মাংস-পেশীর কৃচ্ছ্রতা আছে। অর্থাৎ ধর্ম্মনীতি পালন করিতে হইলে দেহাত্মবোধটাই ত্যাগ করিতে হয়। ধর্ম্মে যে অভ্যুত্থান ও মুক্তি তাহা আত্মার পক্ষেই প্রযুজ্য। দেহকে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্ম নহে। আত্মাই ধর্ম্মের লক্ষ্য। আত্মা যত ভাস্বর পরিচ্ছন্ন হইবে—আশ্রয়স্বরূপ এই দেহ ততই সুস্থ ও সুন্দর হইবে। বিষয় আশ্রয় করিয়া, বা বিষয়ের ভালমন্দ বোধ রাখিয়া, এ জাতি ধর্ম্মাচার প্রবর্ত্তন করে

নাই। বিষয়ীকে লক্ষ্যে রাখিয়া আত্মশক্তির সহায়েই সে ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছে। ইহাই ভারতে ধর্ম্মের সত্যরূপ। ইহা ব্যতীত সবই উপধর্ম্ম। আমরা আজ সমস্ত উপধর্ম্ম হইতে জাতির মুক্তিপ্রার্থী। আচার যাঁহারা বুদ্ধিহীনের মনে করেন, তাঁহারা ধর্ম্মের মহিমা অবধারণ করেন নাই। ধর্ম্মকে বুদ্ধি-গ্রাহ্য করিয়াই নিজের মনের মত সাধ্যের সঙ্কুলানে তাঁহারা ধর্ম্মাচার প্রবর্ত্তন করেন। আবার কেহ কেহ বলেন—আচারের গোলকধাঁধায় শক্তি থাকে না। আচার ধর্ম্মের আকৃতি। আকৃতির আশ্রয় না লইলে ধর্ম্মই প্রকাশ হয় না—ভিতর হইতে শক্তিহীন হইলেই আকৃতি ক্ষীণ ও নির্জ্জীব হয়। এইহেতু আমাদের ধর্ম্মনীতি কোনদিন শক্তিহীন নহে। শক্তিকে আমরা ছাড়িয়া দিয়াছি, তাই শক্তির আশ্রয় নীতি ও বিধি শক্তিহীন হওয়ার কারণ বলিয়া আমরা ভারতের শাস্ত্রীয় আচার অস্বীকার করিতেছি।

শুধু জাতি কেন, ব্যক্তিও যদি ঐহিক ও পারত্রিক দুইয়ের কল্যাণ-প্রার্থী হয়, ধর্ম্মবাণী তাহার একমাত্র আশ্রয় হইবে না, ধর্ম্মের প্রকরণও তাহাকে মৃত্যুপণে পালন করিতে হইবে। শ্রবণ মস্তিষ্ক দেয়। প্রকরণ শক্তি দেয়। যে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়াই ধার্ম্মিক সে মস্তিষ্ক পাইতে পারে। কিন্তু প্রকরণ গ্রহণ না করায় সে মস্তিষ্ক কোন কাজের হয় না। যাহা ইহ জীবনে প্রযুজ্য হইল না, তাহা কোন জীবনেই ফলপ্রসূ হইবে না।

আমরা ধর্ম্মের ভিত্তি বলিতেই বুঝিব ধর্ম্মের বাণী এবং ধর্ম্মের আচার দুইই গ্রহণ এবং মরণ পণে তাহা পালন করা। আমাদের ধর্ম্ম ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করার আচার দেয়। ইহা প্রকরণ। কিন্তু আরাম শয়ন যার অপরিহার্য্য হইয়াছে, সে বলিবে ঐ নিয়ম পালন না করিলে যে ধর্ম্ম হয় না তাহা নহে। অর্থাৎ তাহার প্রকৃত অভ্যাসের অনুকূলে যে প্রকরণ সম্ভব তাহাই সে আচার বলিয়া গ্রহণ করে। ইহাতে শাস্ত্র বিধি ব্যক্তিগত অক্ষমতা হেতু অস্বীকৃত হয়। জাতি গড়ার পথে ইহাই আজ বড় অন্তরায়।

আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিব, হিন্দুধর্ম্ম আমাদের যে আচার দিয়াছে তাহা যত সংখ্যক লোকে তুল্য ভাবে গ্রহণ ও পালন করিবে তত সংখ্যক লোকের মধ্যে সংহতিবোধ জাগ্রত হইবে। আচারপরায়ণ জাতি মাত্রই বিশ্বজয়ী হইতে পারে। পরাধীন এই হিন্দু-জাতির ১২ রাজপুতের ১৩ হাড়ীর ন্যায় নীতিভেদ আমাদের উৎসন্নের পথ প্রশস্ত করে; আমরা নিরুদ্বেগে সেই পথেরই যাত্রী।

যে সঙ্কট যুগ আমাদের সম্মুখে তাহার দিকে মুক্তিকামী জাতি অটল পদে দাঁড়াইয়া সুদিনের প্রত্যাশা করিতে পারে, যদি সে জগতে জন্মকাল হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সম আচারপরায়ণ হয়। প্রতিপক্ষ রূপে কেহ কেহ বলিতে পারেন, এরূপ হওয়া সম্ভব না হইলে জাতির কি মুক্তি নাই? অথবা ভারতের অন্য কোন জাতি না হউক ব্রাহ্মণ জাতি তো সম আচারপরায়ণ ছিল, তাহার অধঃপতন হইল কেন?

উত্তরে বলিব, জাতির অংশ বিশেষও যদি সম আচারপরায়ণ হয়, সে জাতি রক্ষা পাইবে। আর ব্রাহ্মণ যতদিন আচারপরায়ণ ছিল জাতির এরূপ অধঃপতন হয় নাই। ব্রাহ্মণ সত্য ছাড়িয়াছে, আচার দায়ের হইয়াছে, জাতি রক্ষার জন্য তাহার আচার, এ বিষয়ে তার বিস্মৃতি আসিয়াছে। আচারের সঙ্গে যদি ভূমার দৃষ্টি না থাকে—আচার থাকিলে উহার আয়তন সঙ্কীর্ণ হইবে। এই দুই কারণেই জাতিটা আজ উৎসন্নের পথে।

সংহতি যদি জাতিগঠনের ভিত্তি হয়, সংহতির প্রতি ব্যষ্টি জাতীয় সংস্কৃতির ধ্যান ও ধারণা ব্যতীত তাহার কার্য্যতঃ অনুশীলন জীবন দিয়া করিবে, এবং একই নীতির ভিতর দিয়া প্রত্যেকের জীবনপ্রবাহ বহিবে। এই ক্ষেত্রে আমরা যদি উদাসীন হই, ধর্ম্মগ্রন্থে দেশ ছাইয়া যাইবে, কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ আমরা পাইব না। দর্শন আমাদের জ্ঞান দিবে। প্রকরণ আমাদের শক্তি দিবে, একথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি। চাই সম দর্শন, সম প্রকরণ। যে কোন সমষ্টিপক্ষে এই তপস্যা ও কৃচ্ছ্রতামূলক প্রকরণ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়। এখানে আপোষ নাই, যোগ্যতার বিচার নাই।

## হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যকেন্দ্র

হিন্দুকে বলিতে হইবে আমি বেদবিশ্বাসী, বৈদিক সংস্কৃতি আমার লক্ষ্য ও আদর্শ। সেইরূপ মুসলমানকে বলিতে হইবে কোরাণ ও বাইবেল আমাদের ধর্মগ্রন্থ—কোরাণ ও বাইবেলের সংস্কৃতি আমাদের আদর্শ। হিন্দু, মুসলমান অথবা খৃষ্টান নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ স্বীকার করিয়াই বিশেষ বিশেষ ধর্মে আখ্যা লইয়াছে। যে বেদবিশ্বাসী নহে, কোরাণ ও বাইবেলবিশ্বাসী নহে, সে নিজেকে হিন্দু, মুসলমান অথবা খৃষ্টান বলিতেই পারে না।

এই অবস্থায় বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মী যদি তাহার নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রচার করেন, সাম্প্রদায়িকতার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়াই যে এইরূপ করা হয়, বলিলে ভুল বলা হইবে। আমরা হিন্দু, হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম বলিতে পারি এবং উদাত্ত কণ্ঠে তাহা বলিতেও হইবে। হিন্দু, মুসলমান অথবা খৃষ্টান হউক, ধর্ম্মই যদি তাহাদের লক্ষ্য হয়, নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রচারে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি হইবে না, প্রবর্ত্তকের জয়ন্তী উৎসবে আমি ময়মনসিংহে ও চট্টগ্রামে তাহার পরিচয় পাইয়াছি।

বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান, দুই জাতি। হিন্দু যদি চাহে মুসলমানকে নস্যাৎ করিতে অথবা মুসলমান যদি হিন্দুকে গ্রাস করিয়া একাধিপত্যের দুরাকাঙ্ক্ষা রাখে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তবেই সংঘর্ষ সৃষ্টি অনিবার্য্য হইবে।

আমরা হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মমতের পার্থক্যের কথা অবগত আছি। ধর্ম্মের আপোষ নাই। যে ধর্ম্মমতের উপর যাহার প্রতিষ্ঠা, সেই মতনিষ্ঠা প্রত্যেক ধর্ম্মীর সতত রক্ষণীয়। হিন্দু বেদবিশ্বাসী, পরলোকবাদী, কর্ম্মবাদী। হিন্দু বিধি ও নিষেধের অনুযায়ী হইয়া গুরুকে ভগবানের স্থান দিয়াছে; বেদ-মন্ত্রের আকৃতি দিয়াছে ও প্রতিমাকে ঈশ্বরে পরিণত করিয়াছে। হিন্দুর গুরু, মন্ত্র ও প্রতিমা রক্ত-মাংসের মানুষ নয়, অক্ষর মাত্র নয়; ইষ্টক, প্রস্তর, মৃত্তিকা নয়। হিন্দুর সর্ব্বেতৎ ব্রহ্ম। সর্ব্বত্র তাহার অনুবাদ ধর্ম্ম সাধনার পরিচয় দেয়। হিন্দুও একেশ্বরবাদী। কিন্তু তাহার একই বহু হইয়াছে শুধুই রূপে নয়, শব্দে, স্পর্শে অনুভূতিতে। হিন্দুর ধর্ম্ম-বিশ্বাস স্বার্থসিদ্ধির হেতু আপোষে নষ্ট হইতে পারে না; তাহা যদি হইত হিন্দুর অস্তিত্ব বহু পূর্ব্বে নিশ্চিহ্ন হইত।

মুসলমানও একেশ্বরবাদী। ঈশ্বর তাহার শুধুই নিরাকার, অনির্ব্বচনীয়। মন্ত্র সেখানে স্তব্ধ। রূপ সেখানে স্বপ্ন। তাই ইসলামের ধর্ম্ম-মন্দির গভীর স্তব্ধতার প্রতীক। সেখানে ধ্বনি নাই, কলরব নাই, গীতবাদ্য নাই। এই ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও নিষ্ঠা মুসলমান কোথাও ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না।

কেহ কাহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস যখন ক্ষুণ্ণ করিতে চাহে, তখনই বুঝিতে হইবে সে নিজেই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ নহে। যে যে বিষয়ের দরদী নহে, সে অন্যের কোন বিষয়ে দরদের মূল্য দিতে পারে না। হিন্দু যদি খাঁটী হিন্দু হয়, মুসলমানেরও ধর্ম্ম-বিশ্বাস যদি বিশুদ্ধ নির্ম্মল হয়, তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-বিরোধ তাহা হইতেই পারে না। হিন্দুও তখন মুসলমানের মস্‌জিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া কোনরূপ কোলাহল সৃষ্টি করিবে না, মুসলমানও হিন্দুধর্ম্মীর প্রতিমা ভাঙ্গিবে না, গোরক্তে হিন্দু মন্দির কলুষিত করিবে না। আমরা স্ব স্ব ধর্ম্ম-ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্য ও প্রেম প্রতিষ্ঠা করিতে পারি। আমরা ইহারই পক্ষপাতী।

ময়মনসিংহে প্রবর্ত্তকের এক সভায় কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান উপস্থিত হইয়াছিলেন। চট্টলের জয়ন্তী সভায় নগরের বিশিষ্ট মুসলমান অনেকেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি হিন্দুধর্ম্মই ব্যক্ত করিয়াছি। আমার মুসলমান শ্রোতৃবর্গ এই উভয় ক্ষেত্রে আমায় হৃদয় দিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। চট্টলের সর্ব্বপ্রধান মুসলমান নেতা মির আবদুল সত্তর ডায়াসের উপর উঠিয়া আমায় প্রকাশ্যে আলিঙ্গন দিয়া বলিয়াছিলেন, "হিন্দুধর্ম্মের এই যদি ব্যাখ্যা হয়, কোন মুসলমান ইহাতে আপত্তি করিবে না।" বলা বাহুল্য, আমি ভারতের শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়ের অনুভূতি ভিত্তি করিয়া ভারতের ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম।

আমার চট্টল সঙ্ঘে মিঃ আব্দুল সত্তর মহোদয় যে

সহৃদয় পত্র পাঠাইয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এইখানে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। হিন্দু মুসলমানের মিলন সূত্র ইহার মধ্যেই নিহিত আছে। * * I was very much impressed by what he said. His mode of organisation being solely based on religion—appealed to me all the more.

I fully agree with him that our young men should first learn to know and respect the creater and then all the rest.

I am sure the organisation of his line of action is pursued will surely be a very powerful and gigantic organisation.

অর্থাৎ তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা আমার চিত্তে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার 'সঙ্ঘ' ধর্ম্মের ভিত্তির উপর গড়িয়া তোলার নীতি আমায় অতিশয় মুগ্ধ করিয়াছে। আমি তাঁহার সহিত এ বিষয় এক মত যে, আমাদের তরুণেরা সকল কর্ম্মের পূর্ব্বে স্রষ্টাকে যেন জানে এবং শ্রদ্ধা করিতে শিখে। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাঁহার সঙ্ঘ, তাঁহার কর্ম্মনীতি ধরিয়া যদি পরিচালিত হয়, নিশ্চয় ইহা খুব শক্তিশালী ও বৃহত্তর সংহতিতে পরিণত হইবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটী অতি সামান্য ঘটনার উল্লেখ করিব। ঘটনাটী তুচ্ছ হইলেও ইহার মধ্যে যে অনুভূতি লাভ করিয়াছি তাহার মূল্য কম নহে। জামালপুর হইতে দাগীর পথে সুবিস্তীর্ণ ব্রহ্মনদের উপর রেলপথের সেতুর উপর দিয়া অতি সতর্ক চরণে অগ্রসর হইতেছিলাম। নিম্নে সুগভীর নদীপ্রবাহ। পুলের দুর্গম পথে দেড় ফুট ব্যবধানে এক একটী কাষ্ঠখণ্ড মাত্র। অর্দ্ধ পথে আমার গতিশক্তি অতি ক্লান্তিতে নিঃশেষ প্রায় হইলে এক বলিষ্ঠ ইসলামধর্ম্মী প্রৌঢ় পুরুষ আমায় নিরাপদে পার করিয়া দিল। এই নিরক্ষর দরিদ্র কৃষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইতে আমি যখন তাহার হস্তে কিছু অর্থ দিতে চাহিলাম তখন তাহার মুখে ঈশ্বর বিশ্বাসের লাবণ্য দেখিয়া হস্ত আমার সঙ্কুচিত হইয়াছিল। উহা আর ভুলিবার নহে। আমার বেশভূষা ফকিরের। আমাকে সাধু মনে করিয়া, হই আমি হিন্দু, সে যে খোদার নিকট হইতে অপার্থিব সন্তোষ লাভ করিয়াছে, তুচ্ছ অর্থের বিনিময়ে তাহা সে বিকাইয়া দিল না। হিন্দু এবং মুসলমানের ঐক্য ও প্রেমের ভিত্তি ভগবান ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ধর্ম্মনীতির পার্থক্যে এইখানে যে ঐক্য তাহা ব্যর্থ হইবে না। আমরা হিন্দু মুসলমানের দৃষ্টি এই দিকেই আকর্ষণ করিতেছি।

## প্রশ্নোত্তর

'প্রবর্ত্তকের' এক অন্তরঙ্গ বন্ধু দুইটী প্রশ্ন করিয়াছেন। সেই প্রশ্ন দুইটী এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—

১। পৌষের প্রবর্ত্তকে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে "বাঙ্গালী বৈদিক সংস্কৃতি জীবনে ফলাইবার জন্য প্রেমঘন মূর্ত্তি ধরিয়াছে নবদ্বীপে, শক্তির সন্ধান পাইয়াছে হালিসহরে, আর আত্মসমর্পণের বিগ্রহ দর্শন করিয়াছে দক্ষিণেশ্বরে।"

প্রেম যেখানে মূর্ত্তি লইয়াছে, শক্তি সাধনা যে ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ বিকশিত হইয়াছে তার পেছনে আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদনের সাধনা ত থাকবেই। এই ভাবে পরিপূর্ণ সমর্পণের মধ্য দিয়াই মানুষ প্রেমের বিগ্রহ হইয়া উঠে বা শক্তি সাধনা তার মধ্যে মূর্ত্ত হয়। বিশেষভাবে আত্ম-সমর্পণের মন্ত্র দক্ষিণেশ্বরে কিরূপে সিদ্ধ হইল? আত্ম-সমর্পণের সাধনা পরিপূর্ণ হইলে মানুষের মধ্যে একাধারে জ্ঞান, প্রেম, শক্তি ও সেবা এই চতুরঙ্গ সাধনাই বিকাশ প্রাপ্ত হবে, ইহাই কি আপনার কথার মর্ম্ম?

সমর্পণের মধ্য দিয়াই শ্রীচৈতন্যের জীবনে প্রেম রূপ লইয়াছে—ইহা বিশ্বশক্তির ইচ্ছা। তেমনি এই যুগে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া সব গুণই মানুষের মধ্যে বিকশিত হবে, অথবা কোন আংশিক গুণের লীলা হবে, ইহা কিরূপে অবধারণ করা যাবে? ইহা কি বিশ্বশক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না? সাধক ত শুধু আপনাকে নিবেদন করে

চলবে বিশ্বশক্তির ইচ্ছা জীবনে প্রকাশিত হওয়ার জন্য— তা ছাড়া সাধকের আর কি করণীয় আছে।

২। "সদাচার ধর্ম্ম। জাতিকে সম আচারপরায়ণ করে ধর্ম্ম। জাতির জন্মকাল হইতে মরণকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেকে যদি ভিন্ন ভিন্ন পথচারী হয়, স্বার্থ তাদের সম হইলেও উহা সাধন করিবার সময়ে শক্তিপ্রয়োগ কালে দেখা যাইবে, তাহারা এমন যথেচ্ছাচারী হইয়াছে যে, জগন্নাথের রথ পথ হইতে নানা মতপ্রভাবে উহা বিপথেই লইয়া চলিবে, লক্ষ্যস্থানে জাতির জীবন-তরী কোন দিন পৌঁছাইবে না। ধর্ম্ম আমাদের এক মতাশ্রয়ী করে।

আমাদের দেশে বহু ধর্ম্মসংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। এই সকল সংস্থার মানুষ স্ব স্ব ইষ্ট বা শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মাচার অনুসরণ করিয়া থাকে। এক সংস্থা বা সম্প্রদায়ের সহিত অপরের আচার ও শীলের সব ক্ষেত্রে যে সমতা আছে, তাহা নয়। প্রত্যেকেই কিন্তু ধর্ম্মাচার অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। প্রত্যেক মানুষের স্বভাব স্বধর্ম্ম স্বতন্ত্র নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী ইষ্টাশ্রয়ী হইয়া সাধন আচার গ্রহণ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় ধর্ম্ম প্রত্যেক মানবকে সম আচারপরায়ণ করিবে কি প্রকারে?"

প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। ধর্ম্ম সাধনার ভিত্তি বিশ্বাস। বিশ্বাস শাস্ত্রে, গুরুতে ও আত্মশক্তিতে। জগতে এই একটা জাতি আছে, যে জাতি শাস্ত্র অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করে। এই স্বীকৃতি যুক্তিহীন নয়। শাস্ত্র যদি মানুষের হইত, তাহার দ্বারা শাস্ত্র রচয়েতার গুণের পরিচয় মিলিত। প্রশ্ন উঠে ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য মাত্র হইলে তাহা হইতে শব্দাকৃতি শাস্ত্রের উদ্ভব কিরূপে হইতে পারে? হাঁ, শব্দ যে উচ্চারিত অক্ষর মাত্র নহে, ইহার প্রমাণ শব্দশাস্ত্র দিয়াছে, কিন্তু এ কথা এখানে নহে। শব্দ—আকৃতি বিশেষের নির্দ্দেশক। এই আকৃতি—নশ্বর নহে। সৃষ্টিও তাই প্রলয় পয়োধিজলে অদৃশ্য হইলেও ইহার অবিনশ্বর আকৃতি হওয়ায় পৃথিবীর পুনরুদ্ধার আমাদের শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ কথা। যাহা নশ্বর নহে—নিত্য, তাহা অপৌরুষেয় বলিলে দোষের হয় না। বেদবাণীর জন্ম তারিখ কেহ নিরূপণ করে নাই, ইহার বিনাশও কেহ দেখিবে না। আমরা এই হেতু শব্দকে ব্রহ্ম আখ্যা দিয়াছি। নিরাকৃতি চৈতন্য আকৃতির উদ্ভব, আমাদের জাতি বিশ্বাস করে না। তত্ত্বকে আমরা তুরীয় বলিয়া দেখি নাই, মূর্ত্তিই গোড়ার কথা এবং চিরদিন এই বিশ্বমূর্ত্তি নশ্বর ও অবিনশ্বর ভাব-তরঙ্গে লীলায়ত।

জন্মাদির আদি যে তত্ত্ব, তাহাই মূর্ত্তি লয় জগৎরূপে। মর্ত্ত্যজীব তাহারই প্রতিমা। আদি মূর্ত্তি বিরাট্ বিভু। জীব অনুমূর্ত্তি। জাত জীবে আকৃতির সহিত গুণ ও কর্ম্মের প্রকাশ হইয়া থাকে। জাত মূর্ত্তির নানা পর্য্যায় আছে। মানুষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পর্য্যায়ের দৃষ্টান্ত। আমরা জাত ব্রাহ্মণ প্রতিমায় ঈশ্বরের গুণ গরিমা দেখিয়া ব্রাহ্মণকেই 'ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি' বলিয়া পূজা করিয়াছি। গুণহীন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মের পূর্ণ প্রতিমা নহে। গুণ ও জাতি লইয়া অনুচৈতন্যের পূর্ণতা সম্ভব হয়। অনুর মধ্যে এই চৈতন্যের দ্যোতনাই সাধনরূপে ব্যক্ত হয়। অনুজীব পাইয়াছে জড় দেহ, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি অন্তরযন্ত্র রূপে। অনুর মধ্যে বিরাটের মুক্ত লীলা জ্ঞানে, বীর্য্যে, প্রেমে ও সেবায়। ভারতের চাতুর্ব্বর্ণ একাঙ্গীভূত করিলে ভারত সাধনার আদর্শবিগ্রহ কল্পনা করা যায়।

যুগ যুগ ধরিয়া অনুর মধ্যে বিভু চৈতন্যের পূর্ণলীলার আনন্দ ঈশ্বরেরই। ঈশ্বরপ্রসাদ গুরুমূর্ত্তি ধরিয়া জীব-চৈতন্য উদ্বুদ্ধ করে, জীবত্বে আস্থাবান মানুষই ইহা অবধারণ করে। এই সাধনার ক্রম ভারতের অধ্যাত্ম-ইতিহাসে সুস্পষ্ট। ভারতের ঋষি একদিন দুর্নিরীক্ষ ব্রহ্ম চৈতন্যের ধ্যানমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই ধ্যানই সৃষ্টি-ক্রমে ঘনীভূত হইয়া পার্থ-কৃষ্ণ রূপে কুরুক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। বৃন্দাবনেও ভক্ত ও ভগবানের যে লীলা-বিলাস তাহাও ব্রহ্ম ও ঋষির ক্রম পরিণতি। আমি সমস্ত মধ্য-যুগের ইতিহাস ছাড়িয়া দিয়া দেখাইব, পর্য্যায়ক্রমে বর্ণাশ্রম একাধারে চতুরঙ্গ লীলা মূর্ত্তি সিদ্ধ না হওয়ায়, জাতিকে নূতন নির্দ্দেশ দিতেই শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। জ্ঞানে বাসুদেব ইহা বিরাটের সংহতি মূর্ত্তি। প্রেমঘন প্রদ্যুম্ন মূর্ত্তি ভগবানের প্রকাশ মূর্ত্তি। সঙ্কর্ষণ ও অনিরুদ্ধকে লইয়া এই চতুরঙ্গ গুণঘনরূপ নবদ্বীপ-লীলার পর বাংলায় রূপ লইতেছে। প্রেমঘন শ্রীচৈতন্যের ন্যায় শক্তিঘন বিগ্রহ সৃষ্টি না হইলে, হালিসহরে সিদ্ধ শক্তিমন্ত্র কর্ণগোচর হইত না।

অসুর মধ্যে যে অহঙ্কার তাহার লয় ঈশ্বর প্রসাদেই হয়। বাঙ্গালী এখনও তাহার বিগ্রহ দেখে নাই। তাহার পর ঈশ্বরের গুণ ও কর্ম্ম মানব জীবনে মূর্ত্তি ধরে দক্ষিণেশ্বরে। গুরুমূর্ত্তি পরমহংসদেবের চরণে জীবব্রহ্ম নরেন্দ্রের আত্মসমর্পণে অহং লয়ের আভাষ পাওয়া যায়। তারপর বাঙ্গালী জাতির জীবন লইয়া সাধনার ভীমাবর্ত্ত চলিয়াছে; এখানে মানুষের করণীয় কিছু নাই। অসংখ্য আধার লইয়া আত্মসমর্পণের সমুদ্র মন্থন চলিয়াছে, সুধাভাণ্ড বাঙ্গালীর জীবনেই সমুত্থিত হইবে, এইরূপ আলো পাইয়াছি।

সাধকের পূর্ণ আত্মসমর্পণ করণীয়। কর্ম্মই এই পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কিন্তু কর্ম্মহীন হইয়া নৈষ্কর্ম্ম নিছক কাল্পনিকতা। কর্ম্মবিচার গীতায় আছে, আমি তাহা করিব না। হৃদয় বুদ্ধি, প্রাণ ও দেহ লইয়া সমান ভাবে নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম ক্রিয়া যেখানে সম্ভব হয়, সেখানেই অকল্পিত সাধন মন্থন চলিয়াছে বুঝা যায়। এই কর্ম্ম প্রাক্তন ক্ষয় নহে। আত্মসমর্পিত যোগীর জীবনে ঈশ্বর অভিব্যক্তির গর্ভ-বেদনা। অতঃপর এই চতুরঙ্গ ঈশ্বর-গুণ প্রকাশের ক্ষেত্র-স্বরূপ চিহ্নিত জীবের কি করণীয় তাহা সহজেই উপলব্ধি-গম্য হইবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর। জাতি বিশেষের বিশেষ ধর্ম্ম থাকে। এক ধর্ম্মে নিখিল জাতি আশ্রিত হইলে তাহার শক্তি ও সমৃদ্ধি সমধিক হইবে, এ কথা না বলিলেও চলে। ধর্ম্ম বলিতে কেবলই আধ্যাত্মিকতা নহে, ভৌতিক ব্যাপারও আছে। আধ্যাত্মিকতা লইয়া আমাদের জীবন নহে। দেহাদি ব্যাপারের সহিত আধ্যাত্মিকতার সংযুক্তি মর্ত্ত্য-জীবন। ভারতের ভগবান তাই কেবল আধ্যাত্মিক ব্যাপার লইয়া নহে। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনে অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে যুগোপযোগী ঐহিক কর্ম্ম পরিদৃষ্ট হয়। কাশীর উলঙ্গ স্থবির আত্ম-সমাহিত হরিহর বাবা, অথবা নবদ্বীপের মৌনী শ্রীবংশীদাস বাবাজী হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ নহে, অসাধারণ মানস পরিবর্ত্তনে জীবনের বহিরঙ্গ প্রকাশ ইঁহাদের রুদ্ধ হইয়াছে। হরিদ্বারে দেখিয়াছি, শিবের বাহন বৃষত্ব লাভের সাধনায় মানুষকে চার পায়ে হাঁটিতে। ভারতের অসংখ্য নরনারী ইঁহাদের পূজা দিলেও ভারতধর্ম্মে এইরূপ চরিত্র সৃষ্টির কথা কোথাও নাই। জ্ঞান প্রকাশই একমাত্র ঈশ্বর প্রকাশ নহে, জীবনের সবখানিতে ঈশ্বর প্রকাশের আদর্শ ভারত পাইয়াছিল। আমরা তাই প্রিয়ব্রত মনু হইতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত সম্রাটের আসনে ভগবানকে মূর্ত্ত হইতে দেখিতে চাহিয়াছি। এই এক হিন্দুধর্ম্মের বিধি নিষেধ শাস্ত্রাদিতে আছে, তাহার অনুশাসন স্বীকার করিয়া যাঁহারা চলিবেন তাঁহারাই সম আচারপরায়ণ একমতাশ্রয়ী জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ভিন্ন ভিন্ন ইষ্ট হইলেও আপত্তি ছিল না, যদি একই শাস্ত্র নির্দ্দেশ প্রত্যেকের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া জাতিকে সম আচারপরায়ণ করিত। একই ধর্ম্মাচার শাসিত জাতির ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব বশতঃ আচার পালনের ইতর বিশেষ হইতে পারে, কিন্তু প্রধানতঃ সকলে একই আচারাধীন হইলে জাতির ভিত্তি ইহাতে দৃঢ় হইতে পারে। যেখানেই জাতি-বৈশিষ্ট্য সেইখানেই অল্পাধিক একই আচারের প্রবর্ত্তন দেখা যায়।

আমাদের দেশে বহু ধর্ম্ম গড়িয়া উঠায় এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে যদৃচ্ছ আচার প্রবর্ত্তিত হওয়ায় জাতির সংহতিশক্তি খর্ব্ব হইয়াছে, ইহা অবধারিত। অতএব জাতি গড়িতে হইলে, সম আচারপরায়ণ লোক-সমষ্টির প্রয়োজন, এ বিষয়ে আর সংশয় নাই। প্রত্যেক মানবকে সম আচারপরায়ণ করা যাইবে না। আমি বাঙ্গালীর মধ্যে জাতি সৃজনের কথাই বলিতেছি। প্রত্যেক বাঙ্গালীও এক আচার আশ্রয় করিবে না। কিন্তু এক আচার বিশিষ্ট এমন একটা সমষ্টি চাই, যে সমষ্টির পরিমাণ ও প্রভাব এমন হইবে, যাহাতে ঐ সমষ্টি জাতিরূপে খণ্ড খণ্ড আচার আশ্রয়ে খণ্ড খণ্ড সমষ্টিকে অভিভূত করিয়া জাতি-চক্রের পরিধি বিস্তার করিতে পারে।

বাংলায় জাতিগঠনপরায়ণ শক্তিশালী পুরুষ যদি জন্মিয়া থাকেন, তাঁহাকে বিচার করিয়া লইতে হইবে, এখন যে ধর্ম্মাচারে অনুরাগী লোকের সংখ্যাধিক্য, যে ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া একটী বিশেষ সমষ্টি বিদ্যমান, সেই ধর্ম্ম ও তাহার আচার বরণীয় অথবা এই পুরাতনকে বর্জ্জন করিয়া অভিনব ধর্ম্ম ও আচার প্রবর্ত্তনে একটা নূতন জাতির নামকরণ কর্ত্তব্য। এই কথার উত্তর আমি দিব না।

আমি বলিব, জাতি গড়িতে হইলে তাহার মধ্যে সম আচার প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। হিন্দু জাতির পুনরুদ্ধারই যদি প্রেরণা হয়, তবে হিন্দুশাস্ত্রের অনুবর্ত্তী বিধিনিষেধের সমর্থনই বাঞ্ছনীয়। একই ধর্ম্মনীতির অনুসরণ সকলে করিবে না এবং তাহা সম্ভবও নহে। বাংলায় শক্তিশালী জাতি যদি গড়িতে হয়, সম আচার গ্রহণ করিতে হইবে। ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়িতে হইলে, সমান আচার গ্রহণ ও জীবনে পালন করিতে হইবে। সম আচারই সম প্রাণ সৃষ্টি করে, সম আচার শক্তির উৎসও সংহতির প্রাণস্বরূপ। ইহার ব্যত্যয় যেখানে হয়, সে সংহতি হউক বা জাতি হউক, তাহার ভাঙ্গন ধরিয়াছে বুঝিতে হইবে।

## সুন্দরবন অধিবেশন

বিগত ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর কলিকাতা হইতে শত মাইল দক্ষিণে সাগরবক্ষে ফ্রেজারগঞ্জ দ্বীপে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ৭ম অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গীয় পূর্ত্ত বিভাগের মন্ত্রী মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী অধিবেশনের উদ্বোধন-বাণী উচ্চারণ করেন এবং ইহার সংলগ্ন একটী কৃষ্টি ও সংস্কৃতিমূলক প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন। অধিবেশনের ক্ষেত্রে বহু বিপনী-শ্রেণী খোলা হইয়াছিল। এই নীরব পল্লীপ্রাণে অধিবেশনের সাড়া কিরূপ উঠিয়াছিল তাহা বর্ণনার নহে। এই অধিবেশনে প্রায় ১০০জন প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের পুরুষ ও মহিলা প্রতিনিধিস্বরূপ যোগ দিয়াছিলেন।

অধিবেশন ও প্রদর্শনীর বিবরণ স্থানান্তরে দেওয়া হইল। আমার অনুভূতির কথাই বলিতেছি। এই হিংস্র পশ্বাদি পরিপূর্ণ অরণ্য মধ্যে ২২ বৎসর পূর্ব্বে সঙ্ঘ অন্নক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা অভিযান করে। তখন সমগ্র ফ্রেজারগঞ্জে ২৯ ঘর প্রজা ছিল। আজ সেই স্থানে ৬ হাজার প্রজা বসিয়াছে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সংগঠন বাণী শুধু ঘোষণায় পরিণত হয় নাই, কার্য্যকরী হইয়াছে। সঙ্ঘের শ্রম, শক্তি ও অর্থব্যয় যে সার্থক হইয়াছে ইহাই আমাদের আনন্দ।

আমরা পূর্ব্বে মহারাজ মণীন্দ্র নন্দীর ষ্টেটের বিশেষ সহানুভূতি পাই নাই। গভর্ণমেণ্টও বিরূপ ছিলেন। এই অবস্থায় বাংলা হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এই ক্ষুদ্র দ্বীপটীর উপর নবজীবন আনয়নের যে কি কঠোর তপস্যা তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। সম্প্রতি আমরা মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দীর আমলে ষ্টেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছি। অতঃপর এই ক্ষেত্রে আমাদের জাতি-গঠন-যজ্ঞ দ্রুতবেগে সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। সঙ্ঘের অধিবেশনে সহস্র সহস্র গ্রামবাসী যোগ দিয়াছিল। ৬ দিন প্রদর্শনীর দ্বার মুক্ত ছিল। চতুর্দ্দিক হইতে অন্যূন ৫০ হাজার লোক সঙ্ঘের সংস্কৃতিমূলক প্রদর্শনী এবং অনুষ্ঠিত ছায়াচিত্র, বক্তৃতা অভিনয়াদির মধ্য দিয়া নূতন জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছে।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ এই অধিবেশনে মাত্র ৮টী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। উহার মধ্যে একটী পণ্ডিত ৺অমূল্যচরণ বিদ্যা-ভূষণ ও ৺পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয়ের শোক প্রস্তাব আর একটী প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ আত্মনিষ্ঠা ভগবদ্বিশ্বাস ও কর্ম্মবাদের উপর ভিত্তি করিয়া জাতি গড়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। অবশিষ্ট ৬টী প্রস্তাব জাতির সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের পরিচায়ক। অসাম্প্রদায়িক জাতীয় ভিত্তির উপর শিক্ষার ব্যবস্থা সঙ্ঘ স্বীকার করে। সাম্প্রদায়িক মনোভাব লইয়া যে নূতন মাধ্যমিক বিলের প্রস্তাব তাহা শিক্ষা বিস্তারের বিরোধী ও অনিষ্টজনক হইবে, সঙ্ঘের ইহাই ধারণা। সত্যই যদি এমনই হয়, তবে হিন্দুর কৃষ্টি-রক্ষার জন্য শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থাই সঙ্ঘ বাঞ্ছনীয় মনে করে।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ জাতির সামরিক শক্তি জাগ্রত করার জন্য বর্ত্তমান যুদ্ধে বাঙ্গালী জাতিকে অগ্রসর হইতেই উৎসাহ দিয়াছে। বাংলার উপকূলরক্ষী বাহিনী ও গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করায় সম্মিলন আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। আদম সুমারীর গণনায় হিন্দুকে হিন্দু বলিয়া এবং মুসলমানকে মুসলমান বলিয়া নির্ভুলরূপে যাহাতে গণিত হয়, সেইদিকে জাতির সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

এই অধিবেশনে সঙ্ঘ সমাজ ব্যবস্থার দিকেও দৃষ্টি

দিতে ভুলে নাই। অধিক বয়স পর্য্যন্ত তরুণ-তরুণীর অবিবাহিত থাকা সমাজের স্বাস্থ্য নহে। এই জন্য এই সম্মিলন বালিকার ১৬ বৎসর বয়সে ও তরুণের ২৫ বৎসর বয়সের মধ্যে পরিণীত করার জন্য অভিভাবকদের অনুরোধ জানাইয়াছে।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বিহার প্রদেশান্তর্গত মানভূম, সিংহভূম, ধলভূম, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা ও আসামের শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জিলাগুলিকে বাংলার অন্তর্গত করিতে চাহিয়াছে।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের চেষ্টায় ফ্রেজারগঞ্জে অনেকগুলি বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। ষ্টেটের সহিত সহযোগিতায় পোষ্ট অফিস ও একটী ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সম্মিলনে ফ্রেজারগঞ্জে একাধিক ফসলের ব্যবস্থা, পানীয় জলের জন্য নলকূপ, একটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়, একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও কাকদ্বীপ হইতে ফ্রেজারগঞ্জ পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তার ব্যবস্থা যাহাতে হয়, এই সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। নানাবিধ কুটীর-শিল্প প্রচারের সঙ্কল্প সম্মিলন গ্রহণ করিয়াছে। প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সম্মিলন দায়িত্ব ভার মাথায় লইয়াছে। ফ্রেজারগঞ্জের উন্নতির জন্য মহারাজ শ্রীশচন্দ্র প্রমুখ লাটের কর্ত্তৃপক্ষগণের সহযোগিতা পাওয়ার আশা আমরা রাখি। বাংলায় জাতিগঠনের জন্য আমরা জননারায়ণের সাহায্য ও সহানুভূতি চাই। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৮ম অধিবেশন কলিকাতায় হওয়ার জন্য স্থির হইয়াছে। এই অধিবেশনে সঙ্ঘ, সর্ব্বসাধারণের সহিত সম্মিলিত হইয়া কি ভাবে কার্য্য করিতে পারে, তাহা স্থিরীকৃত হইবে। আমরা সংগঠন-কামী প্রত্যেক ভাইবোনদের সঙ্ঘের সহিত সংযুক্ত হইতে অনুরোধ করি।

## যুদ্ধ প্রসঙ্গ

হিটলারের কূট রাজনীতি স্পেনে ও বলকানে কার্য্যকরী না হওয়ায়, ইউরোপের সংগ্রাম ভিন্নমুখী হইয়া বৃটনের জয়াশা জাগাইতেছে। সম্প্রতি রুশের সহিত জার্ম্মানীর বাণিজ্য চুক্তি চিন্তার কারণ হইলেও মুসলিনীর সামরিক শক্তির পরিচয় গ্রীক অভিযানে পাওয়ায়, ইজিপ্ট ও লিবিয়ায় ইতালীয় সৈন্যদের আশা ভঙ্গে সদ্য পরাভূত আবিসিনিয়াও মাথা তোলার উপক্রম করিতেছে। পরাজিত ফরাসী জাতিও হিটলারের হুকুম তামিলে তেমন সম্মত নয়। আমেরিকার পরিপূর্ণ সাহায্য প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতিও বৃটন পাইয়াছে। ভারতের অর্থশক্তি, লোকবল ও কাঁচা মালের প্রাচুর্য্যে বৃটন প্রতিদিন শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। এই অবস্থায় বৃটনের দুশ্চিন্তা অধিক নহে। নবযুগের শিখণ্ডী গ্রীক যেমন ইতালীর দর্পচূর্ণ করিতে সক্ষম হইল, সুদূর প্রাচ্যে দুই শিখণ্ডীর লড়াইয়ে জাপও নীরব হইতে পারে। আমাদের প্রতিবাসী শ্যাম শিখণ্ডী ইন্দোচীনের উপর ক্রমেই চড়াও হইতেছে। চীনের কণ্ঠেও জয়ধ্বনি উঠিতেছে। জাপান রুশের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত। হাওয়া কোন মুখে সহজেই অনুমেয়।

এই অবস্থায় জার্ম্মানী বৃটনের উপর উড়োজাহাজের ভীম আক্রমণ ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারিতেছে না। সম্প্রতি ডাঃ গোয়েবল্‌স্ প্রচার করিয়াছেন, আলস্তার হইতে শীঘ্রই বৃটন আয়ার আক্রমণ করিবে। অর্থাৎ জার্ম্মানীকে অতঃপর নরওয়ে ও বেলজিয়ামের উপর যে নীতি লইতে হইয়াছিল তাহার প্রয়োজনে অগ্রসর হইতে হইবে; কিন্তু গত বৎসর নরওয়ে ও বেলজিয়ম আক্রমণকালে বৃটনের যে অবস্থা ছিল, এখন তাহার অনেক উন্নতি হইয়াছে। যে কারণে জার্ম্মানীর বৃটন আক্রমণ আজিও সফল হয় নাই, সেই কারণেই জার্ম্মানীর আয়ার আক্রমণের প্রচেষ্টা প্রতিহত হইবে। বিমান যুদ্ধে বৃটনের ক্ষতির সম্ভাবনা যতদূর হইতে পারে, তাহার বাকী নাই। এখন যতটুকু বাকী আছে, সম্ভবতঃ তাহাও থাকিবে না। বৃটন তাহার জন্য চিত্ত স্থির করিয়া লইয়াছে। বৃটনের গৌরব রক্ষায় বৃটনবাসী যে অসাধারণ ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছে এবং আরও দিবে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়। অতএব বিমান পোতের দ্বারাই বৃটনের মনোভঙ্গের আশা দুরাশা হইবে। জলযুদ্ধে বৃটনের সমকক্ষ জার্ম্মানী নহে। স্থলযুদ্ধেও জার্ম্মানী বৃটনের এখনও সম্মুখীন হয় নাই;

এইরূপ হইলে ফল কি দাঁড়াইবে, তাহা বলা বড় সহজ নহে।

১৯১৪—১৮ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীর যে অবস্থা ছিল এবার যুদ্ধে তাহার সে অবস্থা নয়। হিটলার ইউরোপের সামরিক ঘাঁটিগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দখল করিয়া রাখিয়াছেন। কাজেই জার্ম্মাণীর আসন্ন পরাজয়ও সম্ভব হইবে না। যদি স্থলে ও জলে জার্ম্মাণীর সহিত শক্তি-পরীক্ষার সুযোগ না আসে তবে ফল কি দাঁড়াইবে তাহা বলা যায় না। ইতালীর পরাজয় দেখিয়াও জার্ম্মাণী যখন সে সুযোগ লইতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে, অজগর যে শীকার গলঃধকরণ করিয়াছে তাহা পরিপাক না করা পর্য্যন্ত বিমানপোতের আস্ফালন রক্ষা করা ছাড়া বর্ত্তমানে তাহার আর অন্য উপায় নাই।

হিটলারের সঙ্কেতে ইতালীর গ্রীক-আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ায়, হিটলারবন্ধু জাপান কুচকাওয়াজ লইয়াই ব্যস্ত থাকিবে। আর জার্ম্মাণীর শিষ্য স্পেন মুখ বুজিয়াই থাকিবে। হিটলারের পরিচয় রুষের অজ্ঞাত নয়; রুষ যাহা কিছু করিতেছে নিজের সুবিধাই তাহার মধ্যে থাকিবে। অতএব জার্ম্মাণী ইউরোপের যে বিপুল অংশ অধিকারে আনিয়াছে তাহা স্বাধিকারে রাখিতেই ক্রমে ব্যস্ত হইয়া পড়িবে। বৃটনের আকাশে তাহার উড়োযানের আওয়াজ বন্ধ হইলেই বর্ত্তমান সংগ্রামের অর্দ্ধ যবনিকা ঝুলিয়া পড়িবে। ভূমধ্যসাগরে বৃটনের প্রতিপত্তি ক্ষুন্ন করার চক্রান্ত সফল হয় নাই। মুসলিনী মাপ চাহিয়া ঘর সামলাইতে ব্যস্ত হইবে কি হিটলারের শরণ লইবে, এ সমস্যাও আছে। জাপান ধরি মাছ না ছুঁই পানি অবস্থায় আছে। আমরা ভাবিতেছি, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে এই প্রাণঘাতী সংগ্রাম না স-সে-মিরে অবস্থায় শুরু হয়। যাহাই হউক, আগামী ছয় মাসের মধ্যেই দুষ্টগ্রহ কাহার ভাগ্যে কালী মাখাইয়া দেয় তাহা দেখিতে পাইব। অথবা সমানে সমানে কোলাকুলীও যদি হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় রুশকে নখদন্ত শানাইয়া রাখিতে হইবে। স্ট্যালিন মহাশয় এ দিকেও দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

বৃটনের ভাগ্যে এত বড় বিপদ কোনদিন আসে নাই। বিপদের দিনে তাহার অধ্যবসায় ও আত্মপ্রত্যয় দেখিয়া সমগ্র বিশ্বের সহিত ভারতও বিস্মিত হইয়াছে। এই সংগ্রামে ভারতের যে অংশ বৃটনের দুঃখের অংশ বরণ করিয়া লইয়াছে, জয়লক্ষ্মী বৃটনের করতলগত হইলে জাতির সেই অংশ শ্রীমণ্ডিত হইবে। বৃটিশের জয় অথবা পরাজয় কোন অবস্থায় বৃটনের বিরুদ্ধবাদীর শুভ হইবে না। বৃটন স্বাধীনতার উপাসক বলিয়া ভারতের ন্যায় পরাজিত জাতির প্রতি অন্য সব দিকে সহানুভূতিপরায়ণ হউক, স্বাধীনতা দানের দরদ তাহার হইবে না। স্বাধীনতার দাবী বৃটনের সহকারিতায় শনৈঃ শনৈঃ পূরণ হইতে পারে। এই হেতু মুক্তিকামী ভারতের বর্ত্তমান সংগ্রামে বৃটনের পক্ষ অবলম্বনই শ্রেয়ঃ ছিল। হিন্দুসভার নেতা শ্রীযুক্ত সাভারকার এই মতেরই পক্ষপাতী। আমরা হিন্দু-ভারতের প্রাণশক্তি বৃটনের জয়কামনায় উদ্বুদ্ধ দেখিলে ভারতের মুক্তির পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া মনে করি।

# গানের মর্য্যাদা

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

একটী বুনো আর রঙীন পাখী
গান গাহে যবে রাতে নরম সুরে,
না জানি সে পাইনের আড়ালে থাকি—
কি ভাব আনিয়া দেয় মরম-পুরে!
আমারও দয়িতা গায় কত না গীতি,
আমারে করিতে খুসী অধীর স্বরে,
তবু তাঁর কণ্ঠেতে করুণ স্মৃতি—
নাই বলে' সুর বুঝি বৃথাই মরে!

গাহিলেই গান যদি হতই গাওয়া
তবে আর জগতে কি ভাবনা ছিল?
বায়সেরও কাছে গান যেতই পাওয়া,
ঝঙ্কারে বহে যেত মন্দানিল।

ওস্তাদে পৃথিবী তো হয়েছে মেকী,
ছাত্রই মেলা ভার এখন দেখি!

# পণ্ডিত ৺বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব

শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার

বহুবিধ সম্পদ্ ও সৌন্দর্য্যের বিচিত্র লীলাভূমি, নব নব প্রতিভার জননী প্রবীণা এই পৃথিবী এবং বহু কৃষ্টি ও সাধনার সিদ্ধিস্বরূপ এই মানবসভ্যতা। বৈদিক মহাবাণীর আবির্ভাবের প্রভাত হইতে মানবসভ্যতা যুগের পর যুগ ধরিয়া পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংস্কৃত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন কৃষ্টি প্রতিভাবান্ অধিকারীর অভাবে ভ্রান্তিক্লিষ্ট ও ম্লানজ্যোতিঃ হইয়া পড়ে। তাহাকে পুনরুজ্জ্বল করিবার জন্য নূতন প্রতিভার স্পর্শমণির স্পর্শের প্রয়োজন হয়। পণ্ডিত-প্রবর ৺বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব মহাশয় সেইরূপ একটী স্পর্শমণি ছিলেন। তিনি তাঁহার জ্ঞান-যোগী সাধকজীবনের সুকঠোর সাধনায় স্মৃতি, জ্যোতিষাদি প্রাচীন কৃষ্টিকে নব ভাবে উদ্দীপ্ত এবং বঙ্গসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

পণ্ডিত ৺বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব

ইনি নবদ্বীপের স্বনামধন্য পণ্ডিত কমলাকর রায়ের বংশাবতংস, বাক্‌সিদ্ধ পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের ৯ই নবেম্বর তারিখে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত খালকুলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিত বিশ্বম্ভর বাল্যকালে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া বাণাটনিবাসী রামচন্দ্র তর্কভূষণের নিকট কলাপ ব্যাকরণ এবং কোঁড়কদীনিবাসী কৈলাসচন্দ্র তর্করত্নের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার পিতার নিকট জ্যোতিষশাস্ত্রও অধ্যয়ন করিতেন। ছাত্রাবস্থাতেই ইঁহার অসামান্য গণিত-প্রতিভা প্রকাশ পাইতে থাকে। ইনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সূর্য্য-সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত-শিরোমণি, সিদ্ধান্ত-রহস্য, গ্রহলাঘব, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, মনোরমা প্রভৃতি কঠিন কঠিন গণিত গ্রন্থ আয়ত্ত করেন এবং জাতকালঙ্কার, জাতকাভরণ, বৃহজ্জাতক, জৈমিনি সূত্র, পরাশর সংহিতা, গর্গ সংহিতা, জ্যোতির্নির্বন্ধ, সারাবলী প্রভৃতি ফলিত জ্যোতিষের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

তাঁহার অসাধারণ মেধাশক্তি ছিল। তিনি তাঁহার অধ্যাপক কৈলাসচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে একখানি স্মৃতির পুঁথি কয়েক-দিনের জন্য চাহিয়াছিলেন, কিন্তু উহা অতি দুর্লভ বলিয়া অধ্যাপক মহাশয় তাঁহাকে উহা গৃহে লইয়া যাইবার জন্য অনুমতি দিলেন না। কয়েক-দিন পরে পুঁথিখানি রৌদ্রে দেওয়া হইলে, তিনি উহার পার্শ্বে বসিয়া সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই কণ্ঠস্থ করিয়া লইলেন এবং গৃহে আসিয়া আদ্যোপান্ত অবিকল-ভাবে লিখিয়া ফেলিলেন। পরে এ বিষয় অধ্যাপক মহাশয়ের গোচরীভূত হইলে, তিনি অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হন এবং তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া স্বীকার করেন এবং স্মৃতি-শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ তাঁহাকে শিক্ষা দেন।
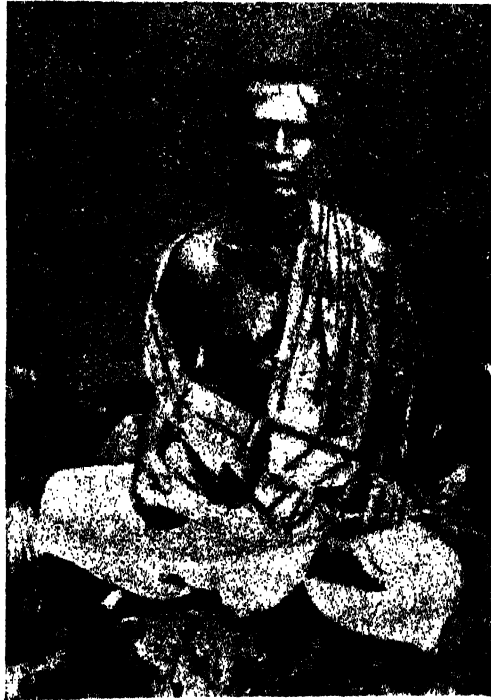
১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে, নাবালক ভ্রাতৃগণের লালনপালনের সমগ্র ভার তাঁহার উপর পতিত হয়। তিনি অসামান্য যত্ন এবং অধ্যবসায়ের গুণে ভ্রাতৃগণকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম ভ্রাতা অধ্যাপক শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। দ্বিতীয় ভ্রাতা মহামহোপাধ্যায় ডক্টর সতীশচন্দ্র

বিদ্যাভূষণ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রভূষণ আচার্য্য আবগারী বিভাগের ইন্সপেক্টর ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র হুগলী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র শাস্ত্রী নবদ্বীপের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত।

নদীয়াধিপতি মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায় মহোদয় জ্যোতিষার্ণব মহাশয়কে সভাপণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে মহারাজ সংস্কৃত শাস্ত্রানুশীলনের সুবিধার জন্য একটি টোল স্থাপন করেন। এই টোলে তিন জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জ্যোতিষার্ণব মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। নবদ্বীপের পণ্ডিত দুর্গাদাস বিদ্যারত্নের মৃত্যুর পর, তিনি নবদ্বীপের প্রধান জ্যোতির্ব্বিদের পদ অলঙ্কৃত করেন এবং নদীয়ার জজ সাহেব ও মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্ট তাঁহাকে গভর্ণমেণ্টের প্রধান পঞ্জিকাকারের পদে মনোনীত করেন। পরে বাংলা ও আসামের গভর্ণরগণ তাঁহার নিকট হইতে পঞ্জিকা লইতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার গণনা ও ব্যবস্থানুসারে সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালিত হইতে থাকে। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার প্রতিষ্ঠাতা দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয় তাঁহাকে গুপ্তপ্রেসের প্রধান পঞ্জিকাকারের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি আটত্রিশ বৎসর কাল এই পঞ্জিকার গণনা ও সম্পাদন কার্য্য করিয়াছিলেন। জ্যোতিষার্ণব মহাশয় দিনকৌমুদীর সম্পাদন করিয়াছিলেন। তদনুসারেই গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা গণনা করিতেন। অল্প সময়ে বিশুদ্ধ গণিতক্রিয়া সম্পাদন করা গাণিতিকের একটী বিশেষ গুণ। জ্যোতিষার্ণব মহাশয় এই বিশেষ গুণে সমলঙ্কৃত ছিলেন। জ্যোতিষার্ণব মহাশয় গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার সম্পাদনকার্য্যে নিযুক্ত হইবার পর বিষয়গৌরবে পুষ্ট হইয়া এই পঞ্জিকা বঙ্গদেশে প্রচলিত অন্যান্য পঞ্জিকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হয় এবং তাৎকালীন প্রচলিত অন্য পঞ্জিকাসকল প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। তিনি ঔদয়িক স্ফুট গণনাপ্রণালী এবং তিথ্যাদি গণনায় 'চর' সংস্কারের নব প্রণালী আবিষ্কার করিয়া বঙ্গদেশে ইহার প্রচলন করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার যশঃ ও প্রতিভা সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এদিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গণিত জ্যোতিষের সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা তুমুল বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং হিন্দু গণিত-জ্যোতিষের পঞ্জিকা সংস্কার করা অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। এই জন্য দ্বারকামঠের শ্রীমৎ জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য মহারাজের উৎসাহে ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাই নগরে ভারতবর্ষের পণ্ডিতমণ্ডলীর এক বিরাট্ অধিবেশন হয়। এই সভার বরোদাধিপতি মহারাজ গায়কোয়াড় প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি এই সভায় বঙ্গদেশের জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রতিনিধিস্বরূপ নিমন্ত্রিত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় পঞ্জিকাসংস্কার সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং হিন্দু জ্যোতিষের সূক্ষ্ম গণনা পৃথিবীর অন্যান্য গণনা অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ, তাহা সগৌরবে প্রমাণ করেন।

পরে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর অনুরোধে 'রবি-সিদ্ধান্ত মঞ্জরী' 'দিনকৌমুদী' ও 'বিদগ্ধতোষণী' নামক তিনখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ সম্পাদন করেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে 'বিশ্বহিত' ও 'রাত্রি-দিনোজ্জ্বল' নামক অপ্রচলিত করণ গ্রন্থের প্রকাশ করিয়া করণ গ্রন্থেও বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর মাসিক পঁচিশ টাকা হিসাবে তাঁহাকে একটী 'সাহিত্যিক বৃত্তি' প্রদান করেন। ভারতবর্ষের প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই বৃত্তি লাভ করেন। তিনি কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত এসোসিয়েশনের সদস্য ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের পরীক্ষক এবং প্রশ্নপ্রস্তুতকারক ছিলেন। নবদ্বীপ বঙ্গ বিবুধজননী সভা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতি বহু অন্যান্য সংসদের সদস্যপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কেবল বঙ্গদেশের নহে, অন্যান্য দেশের ছাত্রগণও তাঁহার টোলে অধ্যয়ন করিতেন। ব্রজবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দামোদরলাল গোস্বামী শাস্ত্রী তাঁহার একজন বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। ইনি বহু ছাত্রকে নানা প্রকার উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব ইঁহার নিকট হইতেই 'জ্যোতিষার্ণব' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি শিশুর ন্যায় সরল ছিলেন এবং ইঁহার ব্যবহার এরূপ মধুর ছিল যে, যিনি একবার ইঁহার সংস্রবে আসিতেন, তিনি আর ইঁহাকে ভুলিতে পারিতেন না। ইঁহার দানশীলতা

অতীব প্রশংসার বিষয় ছিল। ১৩০৪ সালে বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সেই সময়ে ফরিদপুর জেলার কয়েকখানি গ্রামের দুর্ভিক্ষপীড়িত সমস্ত অধিবাসীদিগকে অন্নবস্ত্র দ্বারা এবং নিজের পরিশ্রম দ্বারা তিনি যে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা ফরিদপুরবাসী এখনও ভুলে নাই। সেই সময় তাঁহার নিজ বাটীতে মাসাধিক কাল অন্নসত্র হইতে আমি দেখিয়াছি। বহু দরিদ্র ছাত্র এবং দুঃস্থ পরিবার প্রতি মাসে ইঁহার সাহায্য লাভ করিত। ইনি একজন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন। ইঁহার ন্যায় নানাগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংখ্যা অতি বিরল ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তৎকালে বঙ্গদেশে জ্যোতিষশাস্ত্রসংক্রান্ত বিষয়ে ইঁহার মীমাংসাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইত। স্মৃতিশাস্ত্রেও ইঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। ১৯:২ খ্রীঃ অব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে প্রাতঃকালে বঙ্গের খ্যাতনামা স্মার্ত্ত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি একটী স্মৃতির জটিল বিষয়ের মীমাংসার জন্য নবদ্বীপে ইঁহার ভবনে আসিয়া অতিথি হন। মীমাংসা লিখিয়া দিবার কয়েক ঘণ্টা পরেই ইনি সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন।

সুদীর্ঘ ও সুকঠোর সাধনায় এই কর্ম্মবীর শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্ম্মীরূপে আপনার প্রতিভাকে এমন ভাবেই সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার কথা মনে করিলেই তাঁহার প্রতিভা আসিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়ায় এবং কর্ম্ম ও প্রতিভার অন্তরালে ব্যক্তিগত মানুষটি যেন নেপথ্যেই থাকিয়া যায়। কিন্তু কীর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা এবং সংস্থিতির জন্য সংগ্রামই ত মানবের সবটুকু নহে। পারিবারিক জীবনের অনাবৃত মানুষটির অনবহিত জীবনও মনুষ্যত্বের একটা দিক্। কর্ম্মজীবনে সব্যসাচী, প্রতিভার প্রতিমূর্ত্তি এই মানুষটিকে পারিবারিক আবেষ্টনীতে সম্পূর্ণ অন্য বলিয়া মনে হইত। গণিত ও ফলিত জ্যোতিষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, স্মৃতির অতি কূট তথ্য প্রভৃতি যদিও তাঁহার সহিত অতি পরিচিত ঘনিষ্ঠতা রাখিত, তাঁহার অনাড়ম্বর স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণজীবনে সরল সারলীল উদারতার অভাব ছিল না। তিনি নিজে ছিলেন একজন আদর্শ বৈষ্ণব এবং চৈতন্যদেব যেমন প্রেমবন্যায় সমস্ত যুক্তিতর্ককে ডুবাইয়া ভাসাইয়া দূরে সরাইয়া দিয়াছিলেন, তদ্রূপ এই মহাপুরুষ দৈনন্দিন জীবনের প্রেম-উদ্বেলিত করুণায়, সহানুভূতিতে এবং সুমিষ্ট ব্যবহারে পারিপার্শ্বিকগণের হৃদয় আপ্লুত করিয়া তুলিয়াছিলেন। জ্যোতিষে তাঁহার দান অপরিসীম। হিন্দু জ্যোতিষে তিনি যে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছেন, বিগত দুই শত বৎসরের মধ্যে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। তাঁহার দুঃখী দরিদ্রকে দান, বিপন্নকে সাহায্যদান, ব্যথিতকে সান্ত্বনাদান প্রভৃতি জীবনব্যাপী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নামহীন দান তাঁহার সুমধুর অন্তরের পরিচয় দিয়া যাইত। কি জ্যোতিষ-ক্ষেত্রে, কি স্মৃতি-ক্ষেত্রে, কি পারিবারিক জীবনে সর্ব্বত্রই তিনি পুরাতন সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে পিতৃপুরুষের আদেশ মনে করিয়া সশ্রদ্ধভাবে পালন করিয়াছেন। আজ আমি এই স্বর্গত মহাত্মার উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

# বিশ্বম্ভর প্রশস্তি

শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী, কাব্যতীর্থ, সাহিত্যশেখর

আকাশের আলোছায়া নিয়ে
ঘোরে নিজ নিজ কক্ষ পথে
নীহারিকা কেন্দ্র করি' জাগে
গগন-সবিতা সম ঘেরা
নব্যযুগ শুভ সূচনায়
অতীতের ইতিকথা ধরি'
বারিধি সম জ্ঞানরাশি
'বিশ্বম্ভর' মনীষা গাথা

গ্রহতারা চলে দলে দলে
সমুদিত মহাব্যোম জ্যোতিঃ
সৃষ্টিধারা প্রতি পলে পলে
শঙ্কাহীন জীবনের গতি।
'নবদ্বীপ' রহে সচেতন
অগণন গৌরব সংহতি
ছিল যার শুধু আজীবন
সুশোভন বর্ষ পূজা-স্মৃতি।

প্রতিভার বিজলী ছটায়
এসেছিলে এই বঙ্গভূমে
যে সাধনা ছিল প্রাণ সম
নদীয়ার পুরবাসী কভু
জীবনের অভিপ্রায় সুখ
তোমা' মাঝে লভিয়াছে রূপ
লহ পূত শ্রদ্ধাঞ্জলি মম,
নিরলস কর্মস্রোত তব

আচার্য, ওগো মাননীয়!
স্বরগের সুর বার্তাবহ
দিয়ে গেছ আনন্দ অমিয়
ভোলেনি সে কালের প্রবাহ।
ক্ষয়হীন সাধনার দান
নদীয়ার কীর্ত্তি অনুপম
স্মরণীয় ওগো মহাপ্রাণ!
ভাসে আজি মুগ্ধ স্মৃতি সম। *

* ভারতপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় বিশ্বম্ভর আচার্য্য জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের মৃত্যুস্মৃতি-বার্ষিকী সভায় পঠিত।

# এ জন্মের ইতিহাস

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

অগ্রহায়ণের শেষে একটা দিনের সকালবেলায় মতির মা নাতিটিকে লইয়া বারান্দায় রোদে বসিয়া ছিল। নাতির নাম মণি। মণি উলঙ্গ আর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে মাটীতেই, আর, মুখ তুলিয়া তাকাইয়া আছে সম্মুখের টিনের ঘরের মট্‌কার দিকে—মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরাইয়া বাঁ দিকে লক্ষ্য করিতেছে সম্ভবতঃ তিন্তিড়ী বৃক্ষটিকে, আর ডান দিকে বাপের হুঁকাটিকে। মতির মায়ের ডান হাত রহিয়াছে মণির পিঠের উপর; অন্য দিকে তাকাইয়াও সে মণির দেহের গতি অনুভব আর নিয়ন্ত্রিত করিবে হাতের চাপে—মণি সরিতে সরিতে একেবারে ধারে যাইয়া সেদিনকার মতো নীচেয় না পড়ে···

বাঁ হাতে মতির মা নাক খুঁটিতেছে—মাছি তাড়াইতেছে; আর, উঠানে শায়িত খোঁড়া আর রুগ্ন কুকুরটাকে উদ্দেশ করিয়া খানিক্ পর পর অকারণেই বলিতেছে, দূর, দূর···

ছেলেরা সকালবেলাকার জলপান খাওয়া শেষ করিয়া যার-যার আড্ডায় চলিয়া গেছে—মতির বাবা গেছে গ্রামান্তরে, একটা সামাজিক ব্যাপারের সালিস হইয়া; আর, মণির মা গেছে নদীতে, জল আনিতে...

এম্‌নি যখন প্রচুর অবসর, আর, চারিদিকেই নিরিবিলি শান্ত ভাব—দূরে একটি গোবৎসের হাম্বারব ছাড়া পৃথিবীর কোথাও বিক্ষোভ নাই, তখনই ওদিক্ হইতে আসিয়া একটা খবর দিয়া দাঁড়াইল কাতুর মা—খবর এই যে, ভোরবেলা হইতে কেষ্ট ঘোষের মায়ের শ্বাস

খবর দিয়া কাতুর মা উৎসাহের সহিত বলিল,—চল্, মতির মা, দেখে আসি।

শুনিয়াই ঘটনা দেখিতে যাওয়ার ইচ্ছা মতির মায়ের মনেও খুব প্রবল হইয়া উঠিল; বলিল,—যাবো। উঠে বোস্। মণির মা গেছে ঘাটে। আসুক সে। তুই গিয়েছিলি?

কাতুর মা উঠিয়া বসিল—

বলিল, না—শুনেই তোকে বল্‌তে এলাম।

—কেষ্ট এসেছে।

—এখনই এল শুন্‌লাম।

—বড় মেয়ে আর ছোট মেয়েও আগেই এসেছে শুনেছিলাম।

কাতুর মা বলিল, হুঁ।

—বড় মেয়ের বাড়ী থেকেই ত' রোগ নিয়ে এল···

—হুঁ। রোগ ত' ধরতে গেলে তেমন কিছুই নয়। দু'বার মাস্তর জ্বর হয়েছিল—তা'-ও তিন চারদিনের বেশি থাকে নাই। কিন্তু সে-দেশের জলেরই কেমন দোষ আছে—হঠাৎ পা উঠ্‌ল জলে ফুলে'···

মতির মা বলিল, সে-দেশেও ত' লোক আছে। সকলেই মরে' বসে' নাই। এখান থেকে যখন মেয়ের বাড়ী যায় তখনই শরীরে কিছু ছিল না—রং দেখ্‌তাম একেবারে ফ্যাকাশে'।

—এখানেও পেটের অসুখে প্রায়ই ভুগ্‌ত। ওষুদ পত্তর খাওয়া কি চিকিচ্ছে তেমন কিছুই হয় নাই।

—কেষ্ট থাকে বিদেশে···

—কিন্তু বউ ত ছিল।

—বউ বেচারা নাচার; শাশুড়ীকে নিয়ে তার পারা হ'ত ভার। ওষুদ পত্তি দিতে গেলে বল্‌ত, আমাকে বাঁচাবার তোমার এত গরজ কি বাপু! আমি দুখিনী মানুষ; মর্‌লেই আমি বাঁচি, তা' কি জানো না! আবার দিতে দেরী হ'লে বল্‌ত, আমি মরি এটা তুমি কেন চাও বলো ত'! বলে কেবল খ্যাকাতো।

এই কথায়, অর্থাৎ শাশুড়ী কেমন করিয়া বধূকে পুনঃ পুনঃ সঙ্কটে ফেলিত তাহাই উপলব্ধি করিয়া উভয়েই হাসিতে লাগিল। মতির মা বলিল,—আমার বউ ঘাটে সেই গেছে ত গেছেই। বলিয়া ঘাটের পথের দিকে তাকাইয়া বলিল,—জল নেমে গেছে সেই কোথায়!

বেলার দিকে চাহিয়া কাতুর মা বলিল,—হ্যাঁ। শীতের নদী যে! কিন্তু বেলা বেশ বেড়েছে। কাজ কিছুই সারা হয় নাই আমার। শীতের বেলা যেন ধরা যায় না, যেন দৌড়য়।

কিন্তু মনের কথা এই যে, কাজ সারিবার তাড়া এখন এদের নাই; দুপুরের রান্না চাপে দুপুরেই; এবং দুপুরের এখনো দেরী আছে। এখন তাড়াতাড়ি এই জন্য যে, যাইয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই যদি কেষ্টর মায়ের শ্বাস বন্ধ হইয়া যায় তবে টান দেখার যে ইচ্ছাটা প্রভাবসম্পন্ন হইয়া দেখা দিয়াছে তাহা পূর্ণ হইবে না—একটা দুঃখ থাকিয়া যাইবে। সুতরাং বিলম্বে পৌঁছিয়া কিছুই না দেখিতে পাওয়ার একটা আশঙ্কারই যেন উদয় হইয়াছে।

কিন্তু ওদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন—প্রায় তখনই মণির মা তাদের ছুটি দিল—ঘড়ায় জল লইয়া সে ঘাট হইতে ফিরিল।

কাতুর মা তৎক্ষণাৎ নামিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—আয়, ওঠ্; মণিকে দে তার মায়ের কাছে।

দ্রুতগতি তাহাই করা হইল—মণির মা ঘড়া নামাইতে না নামাইতে মণিকে তাহার হাতে অর্পণ করা হইল—মতির মা উঠিল—তারপর উভয়ে গল্প করিতে করিতে কেষ্টর মায়ের নাভিশ্বাস দেখিতে রওনা হইয়া গেল···

কেষ্টর উঠানের প্রান্তে যখন উহারা পৌঁছিল, দেখা গেল, তখন উল্লেখযোগ্য কেহ বাহিরে নাই—উলঙ্গ অথচ কোট গায়ে একটি ছেলে, এবং ফ্রক্ পরা একটি মেয়ে একটা দিকে তাকাইয়া ঢেঁকি চালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে—.

ছেলেটি বলিল, কাণ নাড়্ছে···

কথাটা কাণে যাইয়া মতির মা বলিল, কে রে?

—বেড়ালটা। আয় যাই। বলিয়া ছেলেটা মেয়েটার হাত ধরিল।

কাতুর মা জিজ্ঞাসা করিল, তোর কি হয় রে ও?

—বোন্। বলিয়া ছেলেটা বোনের হাত ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া গেল।

এদের বাড়ীঘর আনাচকানাচ মতির মায়ের খুবই পরিচিত। কেষ্টর মায়ের ঘরও তারা চেনে—ঘরখানা ওদিকে, বাড়ীর কোণে; এখান হইতে তার উত্তরের চালের খানিকটা দেখা যাইতেছে। ভিতর বাহির একেবারে নিঃশব্দ। উহারা দেখিতে আসিয়াছে নাভিশ্বাস—তাহাতে শব্দ থাকার কথাই নয়; কিন্তু কোথাও শব্দ না থাকায় ওরা যেন কেমন অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—

খানিক্ কাণ পাতিয়া থাকিয়া মতির মা কাতুর মায়ের কাণে কাণে বলিল, চল্ যাই। কেমন যেন লাগ্‌ছে।

—দাঁড়া, দেখি। বলিয়া মতির মা, এবং তার সঙ্গে কাতুর মা-ও, আগাইয়া আসিতেই দেখিল, কেষ্টর মায়ের বড় মেয়ে মালঞ্চ সেই ঘরের চৌকাঠ ডিঙাইতেছে···

উহাদের দেখিয়াই মালঞ্চ তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল, বলিল, আসুন মাসীমা।

—এখন কেমন? কাতুর মা অর্থহীনভাবে জানিতে চাহিল।

যা, ওরা দেখিতে আসিয়াছে সেই সংবাদই মালঞ্চ দিল; বলিল, টান চলছেই।

একেবারে আচম্বিতে মুমূর্ষুর কাছে যাইয়া উঠিতে তারা মনে মনে বাধা অনুভব করিতেছিল—মালঞ্চ দরদীদ্বয়কে তার মায়ের অবস্থা দেখিবার জন্য আহ্বান করিতেই কাজটা অত্যন্ত সহজ হইয়া যেন কর্ত্তব্যেই দাঁড়াইয়া গেল···

মালঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া উভয়ে দরজায় দাঁড়াইল—তারপর ভিতরে গেল; দেখিল, মেঝেয় মাদুর পাতিয়া রোগীকে শোয়ানো হইয়াছে—মাথার নীচে ছোট একটা অপরিষ্কার বালিশ, এবং গায়ে একটা আধময়লা চাদরের আবরণ—শ্বাস সেই আবরণটিকে বুকের উপর ধীরে ধীরে স্পন্দিত করিতেছে···আর কোথাও তিলমাত্র স্পন্দন নাই।

কেষ্ট তার মায়ের ডান দিকে মাথার কাছে বসিয়া আছে—ছোট মেয়ে দুলালী তার ডান দিকে, মায়ের বুকের কাছে পুনঃ পুনঃ চোখের জল মুছিতেছে; কেষ্টর ছেলে আর মেয়ে রোগীর, তাদের দিদিমার পায়ের কাছে

বসিয়া আছে নানাদিকে মুখ করিয়া; এবং আরো দর্শক সেখানে আছে—সবাই স্ত্রীলোক, আর, সবাই দাঁড়াইয়া আছে যথোচিত দূরত্ব বজায় রাখিয়া—সবারই দৃষ্টি নিবদ্ধ মুমূর্ষুর মুখের উপর…

তার চক্ষু নিমীলিত; মুখমণ্ডল এমন পাণ্ডুর যে, মনে হয়, সূচ ফুটাইলে দুধের রঙের জল বাহির হইবে; নাসিকার মধ্যস্থলটি যেন ঠেলিয়া উঠিয়াছে, এম্‌নি তার খাড়া চেহারা; কিন্তু অগ্রভাগ ভাঙিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে; অধরোষ্ঠ ঈষৎ বাঁকিয়া আছে।

কাতুর মা খুব বিস্মিত হইল ইহাই হৃদয়ঙ্গম করিয়া যে, এই মানুষকে সেই মানুষ বলিয়া এখনো চেনা যাইতেছে! কাতুর মায়ের একটা নিঃশ্বাস পড়িল—মনে হইল, এই মরণোন্মুখির সমস্তটা সত্য যেন একটা অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণার ভিতর দিয়া তিলে তিলে অতিবাহিত হইতেছে…

কাহারো আহ্বানে কি আকর্ষণে দেহ পরিত্যাগ করিয়া এ মৃত্যু ক্ষেপে শেষের দিকে চলিয়াছে কি না তাহা কাতুর মায়ের মনে হইল না; ভগবান্ ইহাকে গ্রহণ করিতেছেন কি না তাহাও সে চিন্তা করিতে পারিল না; পরলোক, নিয়তি, প্রাকৃতিক নিয়ম প্রভৃতির চিন্তাও তার মাথায় আসিল না…

তার কেবল মনে হইল, ঐ শ্বাসটুকু, শ্বাসের চরম ক্ষীণ তন্তুটি, এই সুবৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে উহাকে এখনো সংযুক্ত রাখিয়াছে। যাহারা রহিল তাহাদের অস্তিত্ব ও অনুভব করিতে পারিতেছে, কি পারিতেছে না! কাতুর মায়ের মনে হইল, বোধ হয় পারিতেছে—চিরদিনের অভ্যাসের বশে এখনও পারিতেছে; নতুবা দু'টি চোখের প্রান্তে দু'টি বিন্দু জল আসিয়াছে কেন! পৃথিবীকে উহার শেষ দান ঐ দু'টি জলবিন্দু! এম্‌নি একটা দিন তাহারও আসিবে; কিন্তু সে চিন্তা চাপা দিয়া কাতুর মায়ের ভারি অনুকম্পা জন্মিল…

কিন্তু খুব অল্প সময়ের জন্য; মতির মায়ের গতিক কি দেখিবার জন্য তখনই মতির মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া কাতুর মা দেখিল, তাঁহার চক্ষু নিষ্পলক আর ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া কেষ্টর মাকে নিরীক্ষণ করিতেছে…

কাতুর মা সে দৃষ্টির অর্থ অনুমান করিতে পারিল না—অবাক্ হইয়া ভাবিল, আঁটকুড়ীটা অমন গিলিবার মতো করিয়া দেখিতেছে কী!…কিন্তু মতির মায়ের তখন মনে হইতেছে, আহা, কী অপরূপ স্নিগ্ধ বিরাম, যেন নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—প্রতি মুহূর্ত্তে নিদ্রা গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে! এম্‌নি একটা দিন তাহারও আসিবে যেদিন কাজ থাকিবে না, চিন্তা থাকিবে না, দৈন্যের পীড়নে প্রতিটি নিমেষব্যাপী অসাধ্য সাধনের আর উৎকণ্ঠার কণ্টক-যন্ত্রণা থাকিবে না। তারপর তার মনে হইল, সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার আকাঙ্ক্ষা তার যত প্রবল হয়, মুহুর্মুহুঃ উৎক্ষিপ্ত করিয়া কলহ সংঘর্ষ ততই বাড়িয়া চলে…

কাজেই কেষ্টর মায়ের এই অন্তিম শয়ন আর স্তিমিততম অসাড়তা ভারি লোভনীয় নিষ্কৃতি বলিয়া মতির মায়ের মনে হইল। ইহার হাড় জুড়াইয়াছে।

তারপর তার মনে হইল, কিন্তু শেষ এত ধীরে ধীরে আসিতেছে কেন! যে মরিতেছে, আর বাহিরে যার সাড়া নাই, অবসানের এই মন্থরতা তাহারই চেতনার কোথাও বুঝি অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে…ভাবিতে ভাবিতে মতির মায়েরই যেন কেমন অসহ্য হইয়া উঠিল।

মতির মায়ের একটি ছেলে বড়ো আস্তে আস্তে খায়—এত আস্তে যে, সেই দীর্ঘসূত্রতার দিকে তাকাইয়া থাকাই তার মত সহিষ্ণু লোকেরও কষ্টকর হইয়া ওঠে। এ-ও যেন কতকটা তেম্‌নি। এই আসে, এই আসে করিয়া প্রতীক্ষা করিতে করিতে ধৈর্য্যের সীমা আসিয়া গেলে যেমন একটা উত্তেজনা দেখা দেয়, মরণাপন্ন কেষ্টর মায়ের শ্বাস-প্রবাহের দিকে তাকাইয়া অকস্মাৎ তেম্‌নি একটা কষ্টকর উত্তেজনা দেখা দিল মতির মায়ের মনে…অনর্থক বিলম্ব করিতেছে কেন!

দাঁড়াইয়া থাকিয়া লাভ নাই—শেষ হইতে দেরী আছে। তারপর বেলার দিকে চাহিয়া মতির মায়ের চেষ্টা হইল কাতুর মায়ের সঙ্গে চোখ মিলাইবার…অবিলম্বেই সে-সুযোগ ঘটিল—মতির মা চোখের ইসারা করিল—উভয়ে নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল…

মতির মা ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল,—দেরী আছে।

কাতুর মা বলিল,—হুঁ। নাম শোনাচ্ছে না কেন!

নাম শুনানো হইতেছে না কেন তাহা মতির মা জানে না, সে-বিষয়ে সে কিছু বলিলও না; বলিল, নিজের কথাঃ বড্ড বেলা হ'য়ে গেছে। গিয়ে হয়তো দেখ্‌ব, বৌ হাত পা কোলে করে' বসে' আছে—কাজ কিছুই হয় নাই। কাঠ কুড়বো আমিই। খিচ্‌খিচ্‌ না কর্‌লে কোন কাজ হবে না—আমি যা' না দেখ্‌ব' তা-ই পণ্ড হ'য়ে বসে' আছে। পারিনে বাবা। বলিয়া মতির মা জোরে হাঁটিতে শুরু করিল···আসন্ন মৃত্যুর দিকে চাহিয়া ইহ সংসারের যে-ক্লান্তি সহসা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল, তাহার অনুপস্থিতির দরুণ গৃহস্থালির কাজ পণ্ড হইতেছে মনে হইতেই সে-ক্লান্তি সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়া গেল···

কাতুর মা পিছন হইতে বলিল,—পুণ্যিবান্‌ যারা হয় তারাই মরে খুব শীগ্‌গির—একটুও ভোগে না, কষ্ট পায় না—দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাস্‌, নিঃশ্বেস বন্ধ···

পুণ্যবানের এই ত্বরিত-মরণের আনন্দের প্রতিবাদ মতির মা করিল; বলিল,—তা'ও বড়ো ভালো না; আপনার লোকের মুখগুলোকে একবার শেষ দেখা দেখে' যায় না; সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তারা মরে—আবার আস্‌তে হয়।

—কেষ্টর মাকেও আবার আস্‌তে হবে। মনটা ত' তার ভালো ছিল না—জ্বালিয়েছে অনেককেই। আবার ওদিক্‌কার একটা বদ্‌নামও ছিল।

মতির মা বদ্‌নামেরও প্রতিবাদ করিল; বলিল,—উহুঁ, মিছে কথা। বয়সে খুব চালাক চতুর হাসিখুশি লোক ছিল বলে' কেউ কেউ নানান্‌ রকম বল্‌ত'। যারা বল্‌ত' তারাই ছিল কু—মিন্‌সেরাই বেশী।

—তা' হবে। বিইয়েছেও ঢের, ছেলেমেয়েতে তেরো চোদ্দটা।

—হুঁ। শোকও পেয়েছে খুব। মোটে চারটি ত' বর্ত্তমান। তবু ভালই গেল; ভাত-কাপড়ের কষ্ট কেবল শুরু হয়েছিল···

বলিতে বলিতেই শুনা গেল, কেষ্টর বাড়ীর দিক্‌ হইতে একটা শব্দ আসিতেছে—মায়ের কর্ণে কেষ্ট উচ্চকণ্ঠে হরিনাম দিতেছে,—তারপর সহসা কণ্ঠ নিঃশব্দ হইয়া গেল, এবং তারপরই উঠিল ক্রন্দনের রোল···

মতির মা বলিল,—শেষ হ'ল।

কাতুর মা বলিল,—হ্যাঁ। বাঁচ্‌লাম যেন। বলিয়া সে হঠাৎ হাসিয়া উঠিল; বলিল,—কেমন যেন সচ্ছিলো না। যেয়েও যায় না, এ বড় বালাই···

কথাটা সত্য—

খাদ্যের শেষ গ্রাস মুখে, আর পানীয়ে শেষ চুমুক দিতে না পাইলে যেমন অতৃপ্তি আর অসন্তোষ থাকিয়া যায়, কেষ্টর মায়ের টান শেষ না হইতেই চলিয়া আসিতে বাধ্য হওয়া ওদের অবস্থা হইয়াছিল ঠিক্‌ তেম্‌নি। শেষ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া সেই অতৃপ্তি আর অসন্তোষ দূরীভূত হইল।

সুতরাং মতির মাও হাসিল; বলিল,—দূর আবাগী!

ততক্ষণে তারা কাতুর মায়ের বাড়ীর কাছে পৌঁছিয়া গেছে—

"আমি আসি, মতির মা"। বলিয়া কাতুর মা নিজের বাড়ীর পথ ধরিল।
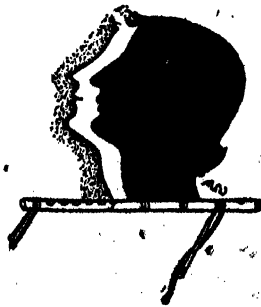
# শক্তি-তত্ত্ব

(অপ্রকাশিত রচনা)

(পূর্বানুবৃত্তি)

৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

তন্ত্রোল্লিখিত ভগবান্ বিষ্ণুর চতুর্ব্যূহের প্রত্যেকেই এক এক জন বিষ্ণু। এই চারি জন বিষ্ণুর, অর্থাৎ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের মধ্যে অনিরুদ্ধ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু। তাঁহার যোগনিদ্রা—মহাকালী। এই মহাকালীই তাঁহার দেহ হইতে উদ্ভূতা এবং মধুকৈটভ-বধের কারণ-স্বরূপা। 'চণ্ডী'র মতে সর্পশয্যাশায়িনী নারায়ণের মূর্তি রজোগুণের আধার এবং তিনিই সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু নারায়ণের সহিত শিবশক্তি মহাকালীর সম্পর্ক আসিল কি করিয়া! মধুকৈটভনাশিনী মহাকালীকে তো আমরা জানি তিনি আদ্যা মহালক্ষ্মী মহিষমর্দিনী দুর্গার অংশরূপা, পক্ষান্তরে তিনিই পরাপ্রকৃতি দুর্গা। সুতরাং এই পরা-প্রকৃতির সহিত পরমপুরুষের সম্পর্ক চিন্তা করিলে অন্যায় হইবে না। শিবতত্ত্বেও শিবের প্রতি এই সমবধারণা খাটে।' অধিকন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ইঁহারা যে সকলেই ভগবান্, ইঁহারা তিনেই এক ও একেই তিন, একথা আমাদের শাস্ত্রেও খুঁজিয়া পাই। সুতরাং উক্ত মহাকালী যে ভগবানের পরাপ্রকৃতি শক্তি তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। তিনিই বিষ্ণুমায়া, নারায়ণী—'বৈষ্ণবীশক্তি-রনন্তবীর্যা'—তিনিই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী, 'সম্মোহন'-তন্ত্রে শিববাক্যে যাঁহাকে বলা হইয়াছে—'ত্বমেব পরমেশানি অস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা'। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখি, শ্রীকৃষ্ণের একই চিচ্ছক্তি তিন অংশে প্রকটিতা; আনন্দাংশে হ্লাদিনী, চিদংশে সন্ধিনী এবং সদংশে সম্বিৎ। তিনটী অংশ হইলেও ইঁহারা মূলতঃ এক। কিন্তু এই চিচ্ছক্তিই তো মহালক্ষ্মী দুর্গা, কারণ বারাহী-তন্ত্রে তাঁহাকে বলা হইয়াছে 'কৃষ্ণপ্রাণাধি দেবী ত্বং গোলোকে রাধিকা স্বয়ম্'। আবার রাসমঞ্চে শ্রীরাধার পূজায় দেখি—'ত্বং দেবী জগতাং মাতর্বিষ্ণুমায়া সনাতনী'। সুতরাং রাধা ও দুর্গা একই বস্তু—পৃথক্ বলিবার উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণ যে 'যোগমায়ামুপাশ্রিত' হইয়া রাস করিয়াছিলেন এ কথা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে (রাস-পঞ্চাধ্যায়, ১) দেখিতে পাই। এই যোগমায়া কে? দেবী দুর্গা নন কি? সনাতন গোস্বামীও তো শ্রীরাধাকে যোগমায়া বলিয়াছেন। রাসেও তিনি 'যোগিনাকোটী-পরিবৃতা'। তিনি যদি যোগমায়া দুর্গাই না হইবেন তো যোগিনীপরিবৃতা হইবেন কেন? আর রাসমঞ্চের পূজারী পূজারম্ভে 'ওঁ মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রৈ দুর্গায়ৈ নমঃ' বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন কেন? এখানে রাধা যে দুর্গা, তাহার সমবধারণা বেশ পরিষ্কার করিয়াই করা হইয়াছে। তিনিই রুদ্র-যামলের—

> "নারায়ণ-শ্লোকরূপা চণ্ডিকাহ্লাদরূপিণী।
> তৎকুক্ষিপ্রভবা দেবী তদ্গুহ্যপরিবাদিনী॥"

—তিনিই শক্তিরূপা নারায়ণী—নারায়ণের প্রকৃতি, হ্লাদিনী শ্রীরাধা, ব্রহ্মবিদ্যা। রুদ্রযামল তো তাঁহাকে একেবারে 'কৃষ্ণা কৃষ্ণস্বরূপা সা' বলিয়া ছাড়িয়াছেন, অর্থাৎ পরমা প্রকৃতি পরমব্রহ্ম-কৃষ্ণস্বরূপা। আবার ব্রহ্মযামলতন্ত্রে বলা হইয়াছে—'বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা।' এই দুর্গাই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আপনাকে বলিয়াছেন—'অহঞ্চ হরিণা সার্ধং কল্পে কল্পে স্থিরা সদা'।

তন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন—

ব্রহ্মা স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম হইলেও আপনিই নারায়ণমূর্তি-পরিগ্রহে জননী সাজিয়া তাঁহারই নাভিব্যূহের কমলকোষে স্বয়ং লীলাজন্ম পরিগ্রহ করিয়া সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি আদি জীব সাজিয়াছেন; নিজ আবির্ভাব-সময়ে তিনি যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছেন, সুরাসুর-কিন্নর-নর-প্রমুখ জীব-জগতের সৃষ্টিবিধানেও তাঁহার সেই প্রক্রিয়াই চির

প্রবাহিত। নারায়ণ তাঁহার জননী-স্থানীয়, ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার গর্ভভূত, মায়া সেই গর্ভের উল্ব ( জরায়ুকোষ ), কারণ সমুদ্র সেই জরায়ুর মধ্যবর্তী জলরাশি। ভগবন্নাভি-নির্গত মৃণাল মাতার নাড়ীস্থানীয়, সহস্রদল রক্তকমল সেই মৃণালের অগ্রবর্তী কুসুমস্থানীয় এবং জগৎপিতামহ ব্রহ্মা ফলরূপে সন্তানস্বরূপে স্বয়ং সেই কমলে অধিষ্ঠিত। ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী নারায়ণরূপা স্থিতিশক্তি পরে জগদ্ধাত্রী সাজিলেও প্রথমে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডগর্ভ নিজ কুক্ষিতে রক্ষা করিয়াই ব্রহ্মার জননী হইয়াছেন। গর্ভস্থ শিশু যেমন চেতনা লাভ করিয়া জন্মান্তরীণ ঘটনাসমূহের অনুস্মরণ করিতে থাকে, ব্রহ্মাণ্ড তদ্রূপ ব্রহ্মময়ীর গর্ভে এই ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে চৈতন্যময়ী শক্তির আপ্লাবনে অন্যান্য কল্প-কল্পান্তের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারময় ঘটনারাশির অনুস্মরণ করিতে লাগিলেন।

দেবী-উপনিষৎ জগদম্বাকে ব্রহ্মস্বরূপিণী বলিয়াছেন। তিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্রী, পালয়িত্রী ও সংহর্ত্রী।

> "বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
> তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥"

তন্ত্র বলেন, শিব নির্গুণ ব্রহ্ম—শক্তি সগুণ ব্রহ্ম।

আর শক্তিখচিত ব্রহ্মই দুর্গা।—'অনন্ত-শক্তিখচিতং ব্রহ্ম সর্বেশ্বরেশ্বরম্।'

শ্বেতাশ্বতর-উপনিষৎ আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য বলিয়াছেন—শক্তিস্বরূপিণী দেবী দুর্গা জ্ঞানশক্তি, বলশক্তি ( ইচ্ছাশক্তি ) ও ক্রিয়াশক্তি ভেদে ত্রিবিধা।

> "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
> স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥"

পঞ্চরাত্রে এই কথাই অন্যভাবে বলা হইয়াছে। পৌরুষী রাত্রির অষ্টম এবং শেষ অংশে বিষ্ণুর মহাশক্তি যেন তাঁহার আদেশে উদ্বুদ্ধ হইয়া চক্ষু উন্মীলিত করিলেন। চক্ষুর এই উন্মেষকে অহির্বুধ্ন্যসংহিতা আকাশে বিদ্যুৎ-ক্রীড়ার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। এ পর্যন্ত শক্তি ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন ছিলেন, তাঁহাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিবার উপায় ছিল না, শক্তি অন্ধকার বা শূন্যাকারে যে ছিলেন, তারপর হঠাৎ 'কস্মাচ্চিৎ স্বাতন্ত্র্যাৎ' স্ফুলিঙ্গের মত তাঁহার স্ব-সত্তার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশে ক্রিয়া (acting force) এবং ভূতি (matter বা becoming) এই দুই ভাবে বিকসিত হইয়া উঠিলেন।

ক্রিয়াশক্তি হইল 'লক্ষ্ম্যাঃ সুদর্শনী কলা'; বিষ্ণুর সুদর্শন বা চক্র তাহার প্রতীক। এই সুদর্শন দেশ ও কালের অধীন নয়। 'ন দেশকালাদিকা ব্যাপ্তিস্তস্য'। ইহাকে ভাগ করা যায় না—তাই নিষ্কল। কিন্তু ভূতিশক্তি 'নানা ভেদবতী'। মুক্তার সহিত শুক্তির যে সম্বন্ধ, ভূতির সহিত ক্রিয়ার সেই সম্বন্ধ। ভূতি-শক্তির 'কোটি-অংশ'। সুতরাং ক্রিয়ার সঙ্গে ভূতির তুলনাই হয় না। সুদর্শন যখন বিষ্ণুর প্রহরণ, আমরা বলিতে পারি বিষ্ণু নিমিত্ত-কারণ (efficient cause), ক্রিয়াশক্তি instrumental cause এবং ভূতি শক্তি সমচারী বা উপাদান কারণ (material cause)।

বৈষ্ণবগণ এই দিক্ দিয়া শক্তির বিচার করিয়াছেন। কিন্তু বেদান্ত মহাবিদ্যা দুর্গা দেবীকে পরমেশ্বরী, পরাবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়া সূত্র করিয়াছেন—'সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ'—২. ১. ৩০।

## বিভিন্ন স্থানে দুর্গার বিভিন্ন নাম

পৌরাণিক যুগে দুর্গাপূজা-পদ্ধতিতে 'দেশবাসিনী পূজা' নামে একটী অধ্যায় প্রচলিত ছিল। দুর্গা দেবীর বিভিন্ন নাম—

বারাণসী—বিশালাক্ষী; প্রভাস—প্রতিমাবাসিনী; নৈমিষ—পাপরাক্ষসী; কেদার—মহাগৌরী; উজ্জয়িনী—বাগীশ্বরী; অযোধ্যা—সর্বমঙ্গলা; কিষ্কিন্ধ্যা—কাত্যায়নী; হস্তিনাপুর—ইন্দ্রাণী; কান্যকুব্জ—রেবতী; কাশ্মীর—সরস্বতী; হরিদ্বার—বারাহী; শ্বেতদ্বীপ—তারিণী; গোষ্ঠ—কপিলা; মধ্যদেশ—ক্ষেমঙ্করী; কামরূপ—কামাখ্যা; যমুনাতট—কপালিনী; কুরুক্ষেত্র—কালরাত্রি; সিংহল—শুভঙ্করী; লঙ্কা—মহাভুজা; সেতুবন্ধ—তারিণী।

রুদ্রযামলে: ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মাণী; বৈকুণ্ঠ—সর্বমঙ্গলা; অমরাবতী—ইন্দ্রাণী; বরুণালয়—অম্বিকা; যমালয়—কালরূপা; কুবেরালয়—শুভা; পাতাল—বৈষ্ণবীদেবী; সিংহল—দেবমোহিনী; মণিদ্বীপ—সুরমা; লঙ্কা—ভদ্রকালিকা; সেতুবন্ধ—রামেশ্বরী; পুরুষোত্তম

( শ্রীক্ষেত্র পুরীতে )—বিমলা; ঔড্রদেশ—বিরজা; নীলপর্বত ( কামরূপ )—কামাখ্যা; বঙ্গদেশ—কালিকা; অযোধ্যা—মহেশ্বরী।

নর্মদার উৎপত্তিস্থান অমরকণ্টক — অপরাজিতা; আবুরাজ—অবরাদেবী; ত্রিহুত—উগ্রতারা; ভাগলপুর ঋষ্যশৃঙ্গাশ্রম—শৃঙ্গেশ্বরী; উদয়পুর—একলিঙ্গেশ্বর শিবের শক্তি; খাণ্ডোয়ার নিকট—ওঙ্কারেশ্বরী; হরিদ্বার কন্খলে দক্ষরাজপুরে সতী-মন্দির পাঠানকোটের নিকট—কাঙড়াদেবী; কচ্ছপ্রদেশের রাজধানী ভোজের নিকট সমুদ্রতীরে—কোটেশ্বরী; হরিদ্বারের ক্রোশমাত্র পূর্বদিকে চণ্ডীর পাহাড়, পঞ্জাবে হোসিয়ারপুর — ছিন্নমস্তা (জ্বালামুখী); বীরভূম—তারাপীঠ; ত্রিপুরায় মেহার—মেহাকালী; মেদিনীপুর—রঙ্কিণী; বর্ধমান চাকদীঘি পরগণা—রঙ্কিণী; বরোদা— বিশালাক্ষী; নৈনীতাল পর্বতে—নয়নাদেবী; আলমোড়া পাহাড়—নন্দাদেবী; বোম্বাই পুণা শহরের দক্ষিণে সহ্যপর্বত—স্বর্ণময়ী পার্বতী; বিন্ধ্যাচল — শুম্ভ-নিশুম্ভঘাতিনী অষ্টভুজা; বোম্বাই শহরের অধিষ্ঠাত্রী—মুম্বাদেবী; কাশ্মীরে বিতস্তা ও সিন্ধুনদের শাখা তীরবর্তী স্থান—ক্ষীরভবানী।

### শাস্ত্রীয় গ্রন্থপঞ্জী

শুক্লযজুর্বেদোক্ত—অম্বিকাদেবী; কেনোপনিষদুল্লিখিত—উমা হৈমবতী ব্রহ্মবিদ্যা; দেব্যুপনিষৎ; বহ্বৃচোপনিষৎ; মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী; শিবপুরাণ, ১০ম অঃ; মৎস্যপুরাণ, ২৬০ অঃ; গরুড়পুরাণ, পূর্ব খণ্ড, ১৩৪ অঃ; অগ্নিপুরাণ, ৫০ অঃ; দেবীপুরাণ, ৫০ অঃ, ৩৭ অঃ; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ২ অঃ, ৫৭; মহানির্বাণ-তন্ত্র, ৪ উল্লাস ১০; কূর্মপুরাণ, পূর্ব, ১২ অঃ; ব্রহ্মপুরাণ, ৩৬ অঃ ২৫; কালিকাপুরাণ; বরাহপুরাণ; ৯-২৫ অঃ; মহাভাগবতপুরাণ; বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পূর্ব, ২১ অঃ ২২; দেবীভাগবত ৩য় স্কন্ধ ২৫ অঃ, ৩০ অঃ; রঘুনন্দন; তিথিতত্ত্ব; হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র, আনন্দলহরী, ৯-১০; ষট্চক্র-নিরূপণ ৫২, ৫৫।

সমাপ্ত

# স্কুল-মাষ্টার

বসু

আধখানা চাঁদ জাগে কি মাথার পরে?
রূপালি জ্যোছনা গলে পড়ে চারিদিকে।
ঝাউ শাখে দোলা দখিনা বাতাস কাঁপে:
মাদুর বিছিয়ে খোলা ছাদে শুয়ে পড়ি।

এখানে আমাকে ডেকো না এখন কেউ,
করোনাকো যেন ভাত খেতে অনুনয়;
আমার মনের কবিতা যায়নি মরে,
এতটুকু দাও বিলাসের অবসর!

বাড়ীওলা এলে জানিয়ো বাড়ীতে নেই—
কাবুলীর ঋণ ভুলে' যেতে চাই আজ;
ছোট খুকীটার জ্বরের কথাটা থাক:
চাল নেই, সেটা তুলো না এখন কানে!

পাশের বাড়ীতে শাঁখ বাজে—বউ এলো;
আমার ছেলেটা পাশ করে' বসে' আছে।
প্রতিবেশিনীর গয়না হয়েছে কারো,—
তারি ঢেউ আসে গৃহিণীর মারফতে।
বড় মেয়েটার বয়স বাইশ হ'ল,
মেঝ শালাটির পড়ার খরচ চাই,—
অল্প টাকার মাষ্টারি করা বিড়ম্বনা:
'ভাবছি এবার আফিঙ্ খেয়েই সারি'।

* * *

কবিতা-পাখীটি হাঁফিয়ে গিয়েছে বড়,
ঘোলাটে চাঁদের জমকালো রূপ কই?
বনের আড়ালে পাপিয়া ভুলেছে গান:
মনের কবিতা মনেই ঘুমায়ে পড়ে।

# ব্রসেল্স্-এর পথে

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

এন্তোয়ার্প হ'তে ব্রসেল্স বেশী দূর নয়। আমাদের লোক ভাবে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এ সকল দেশ নিশ্চয়ই বড় হবে, নতুবা তাদের নাম-ধাম, তাদের কাজকর্ম্মের তালিকা এত বের হয় কেন? তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহে লোকের মাথা ঘামে কেন? তাদের দেশ ছোট হ'লেও তাতে মানুষ বাস করে বলেই তাদের নাম, তাদের কর্ম্মতালিকা আমাদের চোখে পড়ে। সে সংবাদ শুনেই আমাদের চক্ষু স্থির হয়।

ব্রসেল্স-এর পথে অনেক ছোট ছোট গ্রাম পড়্‌তে লাগ্‌ল। তাতে নানারূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে। একটা প্রদর্শনী হবে, তার বিজ্ঞাপন বেশ ভালভাবেই দেওয়া হয়েছে। একখানি ছবিতে একটা খাঁচার ভিতর একটা মানুষকে বসিয়ে অঙ্কন করা হয়েছে। লোকটার রং কালো, আমারও রং কালো তাই আকৃষ্ট হ'লাম তাতে ভাল করেই। এদিকের লোক আবার ফরাসী ভাষা বলে। জার্ম্মেণী ভাষার সঙ্গে ইংরেজীর সম্বন্ধ বেশী, কি, ফরাসী ভাষার সঙ্গে ইংরেজীর সম্বন্ধ অধিক, আমি তা ধরতে পারতাম না। এক গ্রামের এক ফরাসী ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে বল্লেন, "এই ত বিপদ, ফরাসী জানেন না অথচ ইংরেজী ইংরেজের মতই বল্‌তে পারেন। এর চেয়ে কিছু না বলাই ভাল।" বুঝলাম, ফরাসী ভদ্রলোকের কথা। সেদিন হ'তে সকলের সঙ্গেই বাংলাতে কথা বল্‌তে আরম্ভ করলাম। দেখ্‌লাম, বাঙালা ফরাসী এবং ফরাসী ভাষাভাষী বেলজিক বুঝে বেশ ভালই। যে হোটেলে পনর ফ্রাঙ্ক দিয়ে শুতে হ'ত সেই হোটেলে দশ ফ্রাঙ্ক দিয়ে শোয়া যায়। লোক দয়া দেখায়, এমন কি অনেকে দুষ্প্রাপ্য দুধ বিনা পয়সায় খেতে দেয়। আম্‌লেট যা কল্‌কাতায় মাম্‌লেট হয়েছে তাও এনে দেয়। আমার নিজের ভাষা জিনিসের এবং বাসস্থানের মহার্ঘতা হ'তে বাঁচিয়ে দিল। ইংলণ্ডে যেখানে চটপট্ ইংরেজী বলেছি, সেখানেও সহানুভূতি পাই নাই, কিন্তু যেখানেই ইংলিশ জানিনা বলে' ভাণ করেছি সেখানেই বেশ সহানুভূতি পেয়েছি।

বেলজিক এবং ফরাসী কৃষকদের বাড়ীঘর তত পরিষ্কার বলে' মনে হ'ল না। এদিকে বৃটিশ-কৃষক জার্ম্মাণ-কৃষকদের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে বলেই মনে হ'ল। বেলজিক-কৃষকদের একই ঘরে গাধা এবং ঘরের মাঝে বেড়া দিয়ে অপর অংশে মজুরদের থাক্‌তে দেখেছি। এন্তোয়ার্প-এর পর হ'তেই ফরাসী প্রভাব, তাই আর কালোর বার নেই বল্লেও চলে। বেলজিক-কৃষকের বাড়ীতে তাদের মজুরদের এক সঙ্গে অনেক দিন একই বিছানায় শুয়েছি। এক বিছানায় শোবার বন্দোবস্ত অন্য রকমের। বিছানার বিপরীত দিকে উভয়ের মাথা থাকে। তাতে একজনের শ্বাস অন্য জনের মুখে পড়ে না। তবে একের পায়ের পচা গন্ধ অন্যের নাকে সহজেই পৌঁছে। সেটি আমার মোটেই সহ্য হ'ত না। এই পচা গন্ধ যাতে না লাগে তার জন্য একটা ঔষধ আমি আবিষ্কার করেছি। যেদিন হ'তে সেই ঔষধ আমি পেয়ে গেছি, সেদিন হ'তেই আর আমার পায়ে পচা গন্ধ হয় না। আমেরিকা ভ্রমণে সেই ঔষধের সন্ধান দিব। কারণ, ঔষধটার আবিষ্কার আমেরিকাতেই করেছিলাম।

প্রথম প্রথম এই কৃষকদের সঙ্গে একত্র শুতে ভয় হ'ত, কি ঘৃণা হ'ত তা বল্‌তে পারি না; তবে ভয়ের দিক্‌টাই ছিল বেশী। এরাও ত সাহেব। ছোট বেলা হ'তে আমাদের প্রাণে মা-বাপ হ'তে আরম্ভ করে' কলেজের লেজ বিশিষ্ট প্রফেসর অথবা আচার্য্য মহাশয়গণ যে ভীতি প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন তা যায় কি করে'? কিন্তু এবার ফরাসীদের কাছে এসে পড়েছি। এদের মাঝে নানারূপ বিশিষ্ট লোকের সাক্ষাৎ হয়েছে, এবং এরাই অনেকটা আমাকে শুধ্‌রিয়ে দিয়েছে। বুলগেরিয়া, যুগশ্লাভিয়া, মাঝার, অষ্ট্রিচ, চেক, ডাচ, এ সকল লোক

যদিও আমার সাহায্য করেছে, শিখিয়েছে, কিন্তু সকলের মাঝেই যেন একটা খাপছাড়া ভাব ছিল। কথা হচ্ছে, খাওয়া হচ্ছে, বিয়ার চল্‌ছে, কিন্তু তাতে আন্তরিকতা নেই। ফরাসীদের তা নয়—এস, খাও, বস; ইচ্ছা হয় বিছানায় শুয়ে পড়, যেমন আমাদের দেশের কলকাতার মেস এবং বোর্ডিংগুলিতে হয়ে থাকে। তারপর মন যায় খুলে, এমন ভাবে সেই মন খুলে যায় যে, সহস্র বোতল মদের নেশায়ও সেরূপ খুল্‌তে পারে না। যাঁরা আমার যুগোশ্লাভিয়া ভ্রমণ পাঠ করবেন, তাঁরা দেখ্‌বেন যুগোশ্লাভিয়ার মেয়েলোক পর্য্যন্ত আমাকে কত রকমে সাহায্য করেছে। কিন্তু আমার মনও খোলে নাই, তাদের মনও খোলে নাই, অথচ আন্তরিকতা হয়েছে।

ব্রসেল্স্-এর পথে এক পাঞ্জাবী শিখের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সেই শিখ কতকগুলি জাপানী নেক্‌টাই এবং নানারূপ রুমাল 'ভারতে প্রস্তুত' ছাপ দিয়ে গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করছে। এদিকে ভারতবাসীর বেশ সুনাম আছে। ভারতবাসী এই অঞ্চলে কত মরেছে তার ঠিক নেই। তার বদলে ভারতবাসী সামান্য সহানুভূতি হ'তে বঞ্চিত হচ্ছে না। ঐ শিখ ভদ্রলোক আমাকে কতকগুলি উপদেশ দিলেন, তার মধ্যে একটির প্রতি আমার মন বেশ আকৃষ্ট হ'ল। মনে মনে ভাবলাম, ব্রসেল্স্এ গিয়ে তার প্রতিশোধ নেব। ইউরোপ-ফের্‌তা বাঙ্গালী যদি কল্‌কাতায় কেউ থাকেন এবং তাঁর প্রতিই যদি সেই অত্যাচার হয়ে থাকে, তবে তাঁর সান্ত্বনার জন্য বল্‌ছি, প্রতিশোধ কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে' এসেছি। শিক্ষিত ভদ্রলোকের দ্বারা যা হয়ে ওঠে না, তা হ'তে পারে আমার মত অপগণ্ড, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য লোকের দ্বারাই। কারণ, আমি দুটো চড় খেতেও পারি আর তিনটা চড় লাগাতেও পারি। আমার আত্মসম্মান বলে কিছু নেই; কারণ আমি দরিদ্র—আমার ঘরে বাইরে সমান। আমার আত্মসম্মান আমার শরীরে, মনে নয়। শরীরে দুঃখ পেলেই হাত আপনা হ'তে তার প্রতিকারের জন্য অস্থির হয়। তাতে ভালমন্দের ঠিক থাকে না।

ব্রসেল্স্-এ যেন সত্বর পৌঁছাতে পারছি না বলেই মনে হ'ল। কখন ব্রসেল্স্-এ পৌঁছাবো তার জন্য মনটা বিচলিত হ'ল। পথ যেন ফুরাতে চায় না। তা বলে কি হবে, পথ কাউকে ভয় করে না। পথের দূরত্ব পথ রাখবেই। একদিন পথে বসে পথের দূরত্বের কথা ভাবছি, আর ভাবছি, যদি আমার পায়ে হাতির পায়ের মত শক্তি থাকৃত তবে কি সুখের হ'ত! ক্রমাগত চালিয়ে যেতাম। উল্টা বাতাস আমাকে কষ্ট দিত না। সুখের স্বপ্ন একটা জার্ম্মাণ ভিখারী ভেঙ্গে দিল। সে এসে আমার কাছে বস্‌ল এবং বিনা মাখনে রুটি খেতে লাগ্‌ল। মাঝে মাঝে জল পান কর্‌ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম Belgique? অর্থাৎ তুমি কি বেলজিয়মের বাসিন্দা? সে মাথা নেড়ে বল্ল, "দচ" অর্থাৎ জার্ম্মাণ। আমি বল্লাম, "দচ ব্রদ মিরগারেণ, এম্‌ত্তিন, নিক্স বুতার, নিক্স ব্রদ্ হুয়াই। এর মানে—জার্ম্মাণীতে প্রচুর রুটি এবং প্রচুর মারগেরীন আছে, তোমার তা নাই কেন? লোকটি বল্ল, "তোউর দু মন্দে" অর্থাৎ সে ভূপর্য্যটক। আমি ভাবলাম, অন্য কথা। এত বড় শরীর, এত সুন্দর পোষাক অথচ খাবারের বেলা শুধু রুটি এবং জল। যাক্‌গে, এসব লোকের কথা ভেবে দরকার নেই। এদের রাষ্ট্রনীতি এরা ভাবুক, আমাদের সঙ্গে এদের সম্বন্ধ কি? যখন শরীর দুর্ব্বল হয়, মাথা তখন ঠিক থাকে না; ভবিষ্যৎ ভাবতে পারে না—তাই এরূপ ভাবনা আসে। একটু বিশ্রাম করেই আবার ব্রসেল্স্-এর দিকে রওনা হ'লাম।

পথের ছোট ছোট পাহাড় যেন ঢেউ উঠিয়ে এগিয়ে চলেছে। কোথাও তাতে সাজানো পাইন গাছ, কোথাও যবের ক্ষেত, কোথাও সামান্য আঙ্গুর, কোথাও বনফুল ঢেউ তুলেছে পাহাড়ের গায়ে। দেখ্‌তে বেশ সুন্দর! ভাবের প্রেরণায়, নিজের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বল্‌তাম, দেখে নে চোখ, দেখ কত সুন্দর! তোদের দুটোকে সন্তুষ্ট করাতে পা' দুটো কত কষ্ট পায়, মুখে শ্বাস বয়, বুক কাঁপে, পেটে দারুণ ক্ষুধা হয়; বস্‌লে উঠ্‌তে ইচ্ছে করে না। আসল কথা এ দুনিয়ার বিচিত্র বাস্তবতাকে আমার দুটো চোখ দেখে না। বাস্তবিক, এ সকলই হ'ল ভাবপ্রবণতা। যাদের মাঝে ভাবপ্রবণতা রয়েছে, তারা দেশের, জাতের কোনও-রূপ সাহায্য করতে পারে না। হাল্‌কা ভাবপ্রবণতা ভক্তির দ্বিতীয় অঙ্ক; অধঃপাতের দ্বিতীয় স্তর। কতবার এই ভক্তি এবং ভাবপ্রবণতাকে তাড়াতে চেয়েছি, কিন্তু

হয়ে উঠে না। পেছন থেকে চণ্ডীদাস গায় "ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা" আর আমি বলি ভক্তি এবং ভাবপ্রবণতা কাছে এস না।

ব্রসেল্‌স্‌-এর সৌধমালা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। উপনগরে এসে পৌছেছি। কোথায় থাকব তাই ভাবছি। শরীর নেতিয়ে পড়ছে। পা চল্‌তে চায় না, অথচ নূতন আমাকে টেনে নিয়ে চল্‌ছে। সহরটি উঁচু নীচু, তবুও অতি কষ্টে একটা সেলভেশন আর্মির বাড়ীতে এসে থাক্‌বার বন্দোবস্ত করলাম। এই অঞ্চলে সেলভেশন আর্মির বাড়ীগুলো লোকে ভর্ত্তি। আমাকে স্থান পেতে একটু কষ্ট পেতে হ'ল। দেরী আমার সহ্য হয় না। একদিন থেকেই সেখান হ'তে বিদায় নিয়ে একটা ছোট রুম ভাড়া করলাম। দৈনিক পনর ফ্রাঙ্ক। অতি সস্তা। এসব ঘরকে লজমেণ্টও বলা হয়। সারি দিয়ে বিছানা। তারই মাঝে একটা আমার জন্য ঠিক হ'ল। খাবার জন্য সেলভেশন আর্মির অর্দ্ধ-দাতব্য হোটেলে যেতে হ'ত। আমার কাছে অর্থ প্রচুর অথচ হোটেলে যাচ্ছি না; এর মানে হ'ল, আমাদের দেশের ধনীরা প্যারী নগরীর সৌন্দর্য্য, ব্রসেল্‌স্‌-এর সৌন্দর্য্য অনেক বলেছেন, খারাপ দিকটা দেখ্‌বার ইচ্ছা তাঁদের হয়ে ওঠে নি। পকেটে টাকা, দেশের জমিদার, রাজার অথবা বড়লোকের ছেলে, তাঁদের কি করে পোষায় এসব স্থানে যাওয়া এবং এদের সঙ্গে মেশা? আমি গরীব তাই আমার বৈদেশিক গরীব ভাইদেরে দেখ্‌তে এসেছি। হোক তারা সাম্রাজ্যবাদী, ফ্যাসিষ্ট, নাজি, কমিউনিষ্ট তবুও তারা গরীব। গরীব গরীবের কথা ভাবে না—ভাবে নামজাদাদের কথা, ধনীদের কথা—তাই লাথি খায়, ধ্বংস হয়, চুরমার হয়ে যায়, কুকুর বিড়ালের মত পথে ঘাটে পড়ে মরে। আমি সেই ধাতের গরীব নই।

বেলজিয়াম সরকার জার্ম্মেণীদের কাছ হ'তে লড়াইএর ক্ষতিপূরণ বাবদ কতকটা জমি আফ্রিকাতে পেয়েছেন। নগদ টাকা কিছু পেয়েছেন কিনা জানি না, তবে বেল্‌জিকরা কারবারে বিদেশে মিশনারী প্রেরণে বড়ই চটুপটু। আমাদের দেশে কত বেলজিক মিশনারী আছেন কে জানে, কিন্তু তাদের দেশে এত দুর্দ্দশা কেন, তাত আমার চিন্তার অতীত। আমাদের দেশের লোককে চোর বল, ছেঁচর বল তাতে বড় আসে যায় না। সেদিন মেট্রোর বাড়ীতে সর্ব্বনিম্ন আসনের পেছনে দেখলাম "আইস ট্রে"গুলি উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। একজন মন্তব্য করলেন, আমরা কি মানুষ মহাশয়, তাই আমাদের এই দুর্দ্দশা। কিন্তু সভ্যদেশের ব্রসেল্‌স্‌ সহরে হোটেলে খেতে বস্‌লে কাঁটা চামচের জন্য খাবার পূর্ব্বে কিছু টাকা জমা রাখতে হয় নতুবা কাঁটা চামচ দেওয়া হয় না। সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে কেন? কাঁটা চামচ পর্য্যন্ত চুরি হয়। সানফ্রান্‌সিস্‌কোতে দেখ্‌লাম এক "লাইট হাউস্‌ কিপিং" গৃহে এক ইটালীয়ান Frying pan চুরি করে পালিয়েছে। এতে আমি কারও দোষ দিই না। অভাবই হ'ল এই মামুলী চুরির কারণ। অভাব দূর হয়ে যাক, আর চুরি হবে না।

একটা হোটেলে খেতে বসেছি। আলুসিদ্ধ, কতকটা মাখন, সব্‌জী, একখানা ছোট আম্‌লেট আর এক গ্লাস বিয়ার আমার সাম্‌নে টেবিলে দেওয়া হয়েছে। কাগজ দিয়ে কাঁটা এবং চামচ পরিষ্কার করছি, হঠাৎ কি কারণে পেছনে দৃষ্টি গেল। দেখ্‌লাম একজন ক্ষুধার্ত্ত স্ত্রীলোক আমার খাদ্যের দিকে চেয়ে রয়েছে। আমার তত ক্ষুধা ছিল না। স্ত্রীলোকটিকে ইঙ্গিত করে বল্লাম, আমার কাছে এসে বস্‌তে। তখন প্রেম করা জান্‌তাম না। স্ত্রীলোকটি হয় ত ভেবেছিল, আমি তার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু তার লোলুপ দৃষ্টি আমার পেটের ক্ষুধা লোপ করেছিল, তাই তাকে ডেকেছিলাম। আমার কাছে আসামাত্র সেই স্ত্রীলোককে আপন চেয়ার ছেড়ে দিয়ে, সেই চেয়ারে তাকে বসালাম, এবং মুখের খাদ্য-তাকে দিয়ে বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। বেলজিয়াম ধনীর দেশ। প্যারীর পরেই হ'ল ব্রসেল্‌স্‌-এর স্থান, সেই সহরে এত গরীব কেন তার কারণ খুঁজে পাওয়া একটু কষ্টকর।

এসব গরীব পুরুষ রমণী, যুবক যুবতী চায় কি? তারা চায় কাজ, তার পরিবর্ত্তে চায় মাথা রাখবার স্থান এবং সামান্য খাদ্য, পেটের ক্ষুধা নিবারণ করতে। এর মধ্যেই এক বৃদ্ধ জুটেছে। সে চায় শুধু পেট ভরে দু'বেলা খেতে, তার পরিবর্ত্তে সে চায় আমাকে ব্রসেল্‌স্‌ সহর দেখাতে

আমি তাতেই রাজি হলাম। তাই সে আমার সঙ্গে চলেছে। খাবার ত্যাগ করেছি দেখে সাথী ভাবল হয়ত খাদ্য আমার মনোমত হয় নাই, তাই চল্‌ল ব্রসেল্‌সের বালিগঞ্জের দিকে খেতে—যেখানে জজ্‌, লাট-বেলাট থাকে এবং বড় বড় হোটেলে খায়। তারপর তাদের মোটরগাড়ী, তাদের পরণের পরিচ্ছদ, ফ্যাসান, পাম্‌সো চশমা, কথা বলার কায়দা ইত্যাদি দেখাতে। আমাদের ট্রাম ধরতে হ'ল। প্রায় তিন ফ্রাঙ্ক খরচ করে একটা ময়দানে এসে পৌছলাম। তারই পাশেই বেশ সুন্দর বাগান। এই বাগানের দৃশ্য, চীনের সীমান্তে সাইবিরিয়ার কাছে হারবিন সহরে আমার নয়ন পথে এসেছিল। একটা বাড়ীর বারান্দার রকে বসে পড়লাম সেই দৃশ্য দেখ্‌তে, কিন্তু বস্‌তে পারলাম না ঠাণ্ডার জন্য। বৃদ্ধ বল্লেন, একটু কাগজ নীচে রেখে বসুন তবে ঠাণ্ডা লাগ্‌বে না। আমার কাছে কাগজ থাকৃত না, সংবাদ পত্র পাঠ কর্‌তে পারতাম না বলেই কিন্‌তাম না। দাঁড়ালাম, হাটতে লাগ্‌লাম। এক রুমেনিয়ান্ সুন্দরী আমাদের পেছন নিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের দেশও দ্বিতীয় বেলজিয়াম নাকি, নতুবা শরীর বিক্রয় করতে এত লালায়িত কেন? সুন্দরী বল্লেন, তাই মহাশয়, তাই। তৈল, লৌহ, তামাক, চিনি, যব আমাদের প্রচুর আছে কিন্তু খেতে পাই না। মেয়েলোকের শরীর বিক্রয় ছাড়া আর কি আছে ব্যবসার capital. আমার মাথার অবস্থা তখন কি হয়েছিল এখন আর তা অনুভবে আসে না। আমি বলেছিলাম, দরিদ্রের, দুর্ব্বলের ভগবানকে প্রার্থনা করুন। আমাদের কেন দুনিয়ার কবি বলেছেন তাই প্রার্থনা করুন। স্ত্রীলোকটি তৎক্ষণাৎ বল্লেন, তবে সেই কবি ষ্ট্যালিনের লোক নিশ্চয়ই, নতুবা এমন কথা বল্‌বেন কেন? আমি বল্লাম, তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন। মেয়েটি আমাকে পেয়ে বস্‌ল'আর কি? বার বার বল্‌তে লাগ্‌ল, আপনাদের দেশে এমন লোক আছে যে বল্‌তে পারে "গরীবের, দুর্ব্বলের ভগবান, সেই লোকটির নাম?" নাম বল্লাম, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"। ওহো সেই গীতাঞ্জলির লেখক, সে কি করে এমন সত্য কথা বল্‌তে পারে, কই গীতাঞ্জলিতে সেরূপ কবিতা নাই "গরীবের, দুর্ব্বলের ভগবান"। আমি বল্লাম, আমি তাঁরই ভাষায় লিখি এবং পাঠ করি, আমরা একই শাখা জাতের লোক কিনা, তাই বুঝ্‌তে পারি, তবে হয়ত লেখক যা লিখেছেন, তিনি তার সেই অর্থ করেন না, হাজার হউক লেখক ধনী— তাই হয়ত লিখেছেন "দরিদ্রের, দুর্ব্বলের ভগবান"। এখন আমরা তিন জন। এই তিন জনের খরচ আমাকে বহন করতে হবে। হাজার ফ্রাঙ্ক এখনও খরচ হয় নাই।

অনেক বেড়ালাম। পায়ে এখনও ব্যথা হয় নাই, হবার কারণও নাই। আমরা তিনজনই গরীব, দুর্ব্বল, এবং নিরীহ, আমাদের পায়ে ব্যথা হবার কোনও কারণ নাই। আমি প্রস্তাব করলাম, যদি ঐ অভিজাতদের হোটেলে গিয়ে তিনজনে পেট ভরে' খাই তবে ত খরচ হবে? স্ত্রীলোকটি শিউরে উঠ্‌ল এবং বল্‌ল, এতে অন্ততঃ পক্ষে একশত ফ্রাঙ্ক লাগ্‌বে আধপেটা করে' খেতে, তিনজনের তার চেয়ে চলুন আমরা সহরে গিয়ে সাধারণ হোটেলে খাই, দশ ফ্রাঙ্কে তিন জনের পেট ভরা হবে। অনর্থক খরচ করে' এদের সংবাদ নিয়ে লাভ নাই, এরা এরাই, এদের কাছ হ'তে জান্‌বার কিছুই নাই।

সহরের দিকে রওনা হবার পূর্ব্বে স্ত্রীলোকটির কাছে একটী প্রস্তাব করলাম। তিনি আমার প্রস্তাব শুনে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। বৃদ্ধ ভাবল, আমরা অন্য কথা কিছু বা বল্‌ছি, তাই মুখ ফিরিয়ে রইল। ইউরোপ, তোমার বুকের উপর কত বিপদ আপদ বয়ে চল্‌ছে, কিন্তু তাতে কি হয়, তোমার সন্তান নর এবং নারী যেরূপ অপরের দোষ সহ্য করতে পারে, তেমনটি অন্যত্র দেখি নাই। তোমার সন্তান এখন আর ধর্ম্মের বিষোদ্গারণ করে না, সকল ধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলে মনে করে। সমাজের বন্ধন অনেক শিথিল হয়েছে। ভবিষ্যতে হয়ত যেটুকু আছে তারও উচ্ছেদ হবে। অতএব তোমাকে নমস্কার।

# সংগঠন

শ্রীমতিলাল রায়

আমরা বাঙ্গালী। ৮০ হাজার বর্গ মাইল জুড়িয়া আমাদের বাসভূমি। আমাদের লোকসংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। আমাদের প্রতিবাসী বাংলা-ভাষাভাষী আসাম ও বিহারের অন্তর্গত শ্রীহট্ট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া ও মানভূম, সিংহভূম, ধলভূম প্রভৃতি জিলাগুলি যদি এক অখণ্ড বঙ্গভূমিরূপে গড়িয়া উঠে, ১ লক্ষ বর্গ মাইলেরও অধিক ভূমি এবং প্রায় ৬ কোটী লোক লইয়া বাঙ্গালী জাতি মাথা তুলিতে পারে। অখণ্ড ভারতরাজ্য-গঠনের স্বপ্ন এখনও বহু দূরে। প্রাদেশিক স্বাধীন রাষ্ট্র বস্তুতন্ত্র করার পক্ষে এই দিকেই আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীও ইহার অনুসরণে ভারতের ভাষা ও আচারগত যে মৌলিক পার্থক্য, তাহা বজায় রাখিয়া প্রত্যেক প্রদেশেই পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ভবিষ্যতে এক বিরাট্ রাষ্ট্রচক্র গড়িয়া তুলিতে পারিবে। অবশ্য বাঙ্গালী আজ বড় বিপন্ন--বিশেষ হিন্দু-বাঙ্গালী। মর্ম্মে আজ তার যে সকল ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়, তাহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করিয়া যে শ্রেণীর বাঙ্গালী দেশ-মুক্তির সাধনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ত্যাগ ও দুঃখ স্বীকার করিয়াছে, সেই শ্রেণীর বাঙ্গালীই ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসনসংস্কারে অধিকতর বঞ্চিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যেই দারিদ্র্যের বীভৎস মূর্ত্তি ও বেকার সমস্যা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর এই জাতির ন্যায্য অধিকার স্খলিত হইয়া পড়ার আশঙ্কা হইয়াছে। ইহার উপর আবার এই শ্রেণীর লোকেই বৈদেশিক আদর্শবাদের ঘূর্ণাবর্ত্তে নিপীড়িত হইতেছে। এই হিন্দু বাঙ্গালীর সমাজজীবন আজ শৃঙ্খলাহীন হইয়া পড়িতেছে। আমাদের তরুণ-তরুণীরাই আচার ও নীতিভ্রষ্ট হইয়া, যদৃচ্ছাপথে চলিয়া অশান্তি ও উদ্বেগের মাত্রা বাড়াইতেছে। অসংখ্য সমস্যার মধ্যে হিন্দু-সমাজে বৈধব্যের চেয়ে অবিবাহিত নারীর সংখ্যাবৃদ্ধিও বড় সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার কংগ্রেসও দলাদলির আবর্ত্তে সমস্যাই ঘনীভূত করিতেছে।

মুসলমানের মধ্যে বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শ্রমিক-কৃষক, জমিদার-গভর্ণমেণ্ট প্রভৃতির মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম বাধাইবার প্রয়াস—আমরা যেন ছন্নছাড়া হইতে বসিয়াছি। কোথাও স্বস্তি নাই, শান্তি নাই। আবার ইউরোপে মহাসংগ্রাম আরম্ভ হওয়ায় আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যও বিনষ্ট-প্রায়। নৈরাশ্যের অন্ধকারে আমাদের চারিদিক্ আচ্ছন্ন। সমস্যার অন্ত নাই। তবুও আমরা এই সমুদ্রতটে পল্লীরাণীর ছায়াশীতল কোলে বসিয়া আশার গান গাহিব; সংগঠনের মন্ত্র শুনাইব।

সংগঠন আমাদের মন্ত্র। সংগঠন অর্থে ভিতর হইতে গড়িয়া উঠা, জাতির পরিচ্ছন্ন প্রাণ-শক্তিকে জাগাইয়া তোলা। প্রতিবাদের কণ্ঠ সেখানে নাই—আত্মশক্তির উদ্বোধনে পথের বাধা অপসারিত করিয়া চলাই সংগঠনবাদীর অভিনব গতি। আমরা এই পথে জাতিকে আহ্বান করিতেছি।

উপরে যে সকল সমস্যার কথা বলা হইয়াছে, ঐগুলি বাহির হইতে আসে নাই; আমাদের অন্তরের গ্লানিই সমস্যারূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ভিতরের গ্লানি দূর হইলে, গ্লানির লক্ষণস্বরূপ

সমস্যাগুলিও অপসৃত হইবে; এই হেতু সকল সমস্যার নিরাকরণ করার জন্য আত্মগঠনের শক্তিই ইহার ব্রহ্মাস্ত্র মনে করি।

এই গঠনের ভিত্তি—ধর্ম্ম। যদৃচ্ছা ধর্ম্মে সমস্যা সমধিক জটিল হয়। হিন্দু-মুসলমান-ভেদের চেয়ে যদৃচ্ছা-ধর্ম্ম হিন্দু জাতিকে বহুধা বিভক্ত করিয়াছে। এই ধর্ম্ম শুভ দেয় নাই; সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। সংগঠনের প্রথম কথা তাই ধর্ম্মের স্বেচ্ছাচার নিবারণ করা—যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, তাহা বিশুদ্ধ করা।

আমরা হিন্দু। হিন্দুর ধর্ম্মই আমাদের আচরণীয়। হিন্দুধর্ম্ম কি? এক কথায় বলিব—বেদ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্ম। যাহা বেদ-বিরহিত, তাহা ধর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্ম নহে। বেদ—কর্ম্ম ও জ্ঞানের সন্ধান দেয়। অতএব আমরা স্পষ্টই বলিব—যাহারা বেদ-বিশ্বাসী, যাহারা কর্ম্মবাদী ও যাহারা জন্মান্তরবাদী, তাহারাই হিন্দু। এই তিন অস্বীকার করিলেই আমরা ছত্রভঙ্গ হইব। সংগঠন-ব্রতী আমরা, এইখানে কেন্দ্রবিন্দু স্থির করিয়া রাষ্ট্রে, সমাজে, সর্ব্বত্র শক্তি বিস্তার করিতে ছুটিয়াছি। ভারতের হিন্দু ঈশ্বরবিশ্বাসী, বেদাদি গ্রন্থ তার শাস্ত্র। কর্ম্মবাদী হিন্দু, ব্রহ্মবিৎ জন তার পূজ্য। জন্মান্তরবাদী হিন্দু সৎ এবং সতী তার আদর্শ।

হিন্দুর ঈশ্বর সর্ব্বভূতে। তাই হিন্দু অবিদ্বেষী, অপ্রতিবাদী। কেহ তার প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। এই অনুভূতির উপর দাঁড়াইয়া মধ্যযুগের ভারত জগৎকর্ম্ম অসম্ভব মনে করিয়াছিল। বেদব্যাখ্যায় ইহবিমুখ ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল; তাহার মোড় ফিরাইয়া দেন ভারতের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ। ভাব ও অনুভূতির রাজ্যেই তাঁহারা কার্য্য করিয়াছেন। আজ ভাব—বস্তুরূপে, অনুভূতি কর্ম্মে অনুবাদ করার দিন আসিয়াছে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ তাহারই অগ্রণী।

আমরা এই কর্ম্মের জন্য কয়েক শত লোকই যথেষ্ট মনে করি। ইঁহারাই হইবেন ভবিষ্যৎ জাতির মৌলিক ভিত্তি। তারপর সুবিশাল সমাজ-জীবনের কথা। ঈশ্বরবিশ্বাসী বাঙ্গালী, কর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদী বাঙ্গালী—রাজপ্রাসাদ হইতে ঐ পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত গৃহসংসার পাতিয়াছে ধর্ম্মসাধন হেতু। কিছুই তার অপ্রসিদ্ধ, অপ্রাপ্ত বা কল্পিত নহে। পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র, প্রভু, ভৃত্য সবই ধর্ম্মবিগ্রহ। নারীর বৈধব্য পতির অমরাত্মার প্রতি শ্রদ্ধারক্ষার মহাব্রত। আমাদের কর্ম্মও অনন্ত, জীবনও অনন্ত। পুরুষোত্তমকে ঘিরিয়া আমাদের জীবনযাত্রা। এই ধর্ম্মবিধৃত বাঙ্গালী শ্রী, সম্পদ্ ও বীর্য্যহীন হইতে পারে না। গীতায় এই বাণীই আছে—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধর।
তত্র শ্রীর্বিজয়োর্ভূতির্ধ্রুবানীতির্মতির্মম॥"

—প্রচণ্ড সূর্য্যকে হাতের আড়াল দিয়া দিয়াই আমরা অন্ধ সাজিব কত দিন? স্বেচ্ছাকৃত স্বভাব ত্যাগ করিলেই মরণপথ হইতে আমরা জীবনের পথে উন্নীত হইতে পারিব।

ধর্ম্মচেতনার উপর যে সচেতন সমাজ, তাহার কোন সমস্যাই নাই। সচেতন সমাজজীবন চিন্তায় জ্ঞান, শ্রমে সিদ্ধি ও অন্বেষণতৎপর হইয়া সত্য আবিষ্কার করে। ধর্ম্ম হারাইয়া আমাদের দুর্গতি। রোগ-লক্ষণের নিরসনপ্রবৃত্তি সমস্যাই বাড়ায়। রোগের নিদান ধরিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। জাতির অভ্যুদয়ের জন্য তাই স্বধর্ম্মনিষ্ঠার প্রয়োজন। এই ফ্রেজারগঞ্জের উন্নতিকামনায় আমরা অতি সুন্দর পরিকল্পনা

করিতে পারি; কিন্তু তাহা কার্য্যকরী করিতে হইলে এই ধর্ম্মপ্রবৃত্তির জাগরণ চাই। ইন্দ্রজালের ন্যায় সহসা কিছু হয় না। শ্রী ও উন্নতি বাহির হইতে আসে না, অন্তরের দিক্ হইতেই উহা ফুটাইয়া তুলিতে হয়। ছয় হাজার ফ্রেজারগঞ্জের অধিবাসীদের এই দিকেই আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।

ইহার জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন ধর্ম্মের দিকে দৃঢ়চিত্ত হওয়া; তারপর সমাজজীবনের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। প্রতিদিন শয্যাত্যাগের পর ঈশ্বরবিশ্বাস দৃঢ় করিবার জন্য তাহাদের কণ্ঠে বেদস্তুতির উদ্গান উঠিবে। জন্ম হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত তাহাদের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্মই ব্রহ্ম। সমাজ হইবে নিরলস কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান। তবেই জাতির আত্মশক্তি জাগ্রত হইবে। ইহার, উহার, তাহার ভিতর দিয়া শ্রেয়োলাভের প্রতীক্ষা করিতে হইবে না; নিজেদের মধ্য দিয়া অথবা একান্ত অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্র হইতেই ঈশ্বরপ্রসাদ নামিয়া জাতিকে ধন্য করিবে। আমাদের ক্ষেত্র শস্যশালী হইবে। গ্রামোন্নয়ন সমিতি গড়িয়া উঠিবে। ঘরে ঘরে মহালক্ষ্মীর চরণ নূপুর-ধ্বনি তুলিবে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের এই পরীক্ষাসিদ্ধ নীতি নিঃসংশয়ে গ্রামবাসীকে গ্রহণ করিতে বলিব। মহারাজ ৺মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত এই ফ্রেজারগঞ্জে এখনও যেটুকু উন্নতি ও শ্রী দেখা দিয়াছে, তাহার মূলে আছে এই প্রেরণারই অতি অস্পষ্ট ক্ষীণ প্রবাহ। জাতি যদি এইখানে সংযুক্ত হয়, তবে পল্লীর পর পল্লী সেই গীতার বাণীই সফল করিবে। অনপেক্ষ, শুচি ও দক্ষ—এই দিব্যচরিত্রের গুণে আমরা অপরাজেয় হইব।

সংগঠন—জাতির অভ্যুত্থান ও মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। আমাদের গতি আজও শ্লথ, অক্রুত। কিন্তু এই পথেই আমরা জাতির অভ্যুত্থান ও মুক্তি অনিবার্য্য মনে করি।

পরিচ্ছন্ন জীবনের জন্য ধর্ম্ম ও সমাজের ন্যায় আমাদের রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন আছে। এইখানে আমাদের অশুদ্ধ সংহতির প্রচেষ্টা বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই; আমরা নিজেরা যতটা গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছি, তদনুযায়ী রাষ্ট্রশক্তির অধিকার অর্জ্জন করিয়াছি। মর্লি-মিণ্টো শাসনসংস্কার আমাদের সীমা হইতে পারে নাই। আমরা মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কারেও বাঁধা পড়ি নাই; ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আংশিক অধিকারও অতিক্রম করিয়া ক্রমে পূর্ণ ঔপনিবেশিক শাসনশক্তির অধিকারী হইতে চলিয়াছি। বাদ-প্রতিবাদ, উত্তেজনাসৃষ্টির প্রয়োজন ক্রমেই শেষ হইয়া আসিবে। দলশক্তির প্রভাব স্বার্থকলুষিত হইলে, দিব্য ব্যক্তিত্বের শক্তিই জাতিকে এই রাষ্ট্রাধিকারের পথে আগাইয়া লইয়া চলিবে। আত্মপ্রতিষ্ঠিত আত্মার স্বভাব ও স্বধর্ম্মই আমাদের নির্ম্মল ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করিতে পারে। এইরূপ দিব্য ব্যক্তিত্বের সংহতিশক্তি গড়িয়া যদি উঠে, তবে তাহা অভিনব বিধানে দেশের রাষ্ট্রশক্তিলাভ আসন্ন করিয়া তুলিবে। সে যুগ বহু দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয় না। অন্তরের দিক্ হইতে যতই দেশ ও ভগবানের জন্য আমরা সংস্কারগত স্বার্থ ও অহঙ্কার ত্যাগ করিব, ততই আমাদের সংহতি-শক্তির অভিব্যক্তিই রাষ্ট্রস্বাধীনতায় পরিণত হইবে। জগতের অন্যান্য জাতির পদচিহ্ন বা ইতিহাস আমাদের অনুবর্ত্তনীয় নহে। আমাদের অভ্যুত্থান ও মুক্তির পথ আমাদের নিজস্ব, উহাই শাশ্বত ও সনাতন। সেই পরম গতিই আপাত সুখ ও প্রেয়ঃ ছাড়িয়া দীর্ঘায়ু শ্রেয়ঃকে বরণ করিয়া লইবে।

নিখিল বিশ্বে আজ রণদেবতার তাণ্ডব নৃত্য লক্ষ্যে পড়ে; সে নৃত্যচ্ছন্দের তালে তালে বিশ্ব-রাষ্ট্রের নবনীতি গড়িয়া উঠিতেছে। এইখানে দরের যাচাই করিতে গিয়া নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিব না; ইহার মধ্যে আমাদের প্রাপ্য যাহা আছে, তাহা আমাদের পুরাপুরি গ্রহণ করিতে হইবে। ইউরোপের সংগ্রাম ক্রমেই দেখা যায়—পশ্চিম সীমা হইতে এক দিকে মধ্য এসিয়ায়, অন্য দিকে অদূর পূর্ব্ব সীমান্তে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে। ১৯০৫ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালী জাতির চরিত্র আজও ধরিয়া রাখিলে আমাদের প্রস্তুতির সুযোগ চলিয়া যাইবে। বর্ত্তমান শক্তির পুষ্টিবিধানের জন্য আমাদের জীবন উদ্যত হইলে, যে শক্তি এতদিন বাধার আবর্ত্তে কার্য্যকরী হইতেছিল না, উহাই গঙ্গোত্রী ধারার ন্যায় উচ্ছ্বসিত ঋজু প্রবাহে স্বদেশ ও স্বজাতির অভীষ্ট সিদ্ধ করিবে। তাই আজ দর কসাকসির হিসাব ছাড়িতে হইবে, আত্মরক্ষার সঙ্গে আত্ম-শক্তি জাগাইতে হইবে। শক্তি যদি জাগে, তাহাকে সৌভাগ্য বঞ্চিত কে করিবে? প্রতিপক্ষ বলিবেন—বিগত মহাযুদ্ধে ভারতের দান সম্পূর্ণ-রূপে উপেক্ষিত হইয়াছে; আমরা বলিব অতীতের সেই দান জাতির জাগ্রত চৈতন্যের নহে। হাওয়ায় খৈ উড়িলে গোবিন্দ পূজার দাবীর ন্যায় এই দাবী অক্ষমের। আত্মশক্তি স্ফুরণের সুদিন যদি আসে, দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ আমরা না ভাগ্য দেবতাকে বিমুখ করি।

আরও এক নির্ঘাত প্রশ্ন আছে। বাঙ্গালী জাতি মুক্তি সাধনায় যে শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল তাহার বিনিময়ে জাতি পাইয়াছে জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী সাম্প্রদায়িক কূট ভাগ-বাটোয়ারা। আমরা বলিব, ঈশ্বরেচ্ছার নিগূঢ় উদ্দেশ্য ইহার মধ্যেও আছে। মানুষ উপলক্ষ্য বৈ ত নয়, বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান দুইয়ের সম্মিলিত প্রাণ শক্তিই জাতি। একা হিন্দুর প্রাধান্য তবে কিরূপে সম্ভব হইবে। হিন্দুর শক্তি-সাহায্যেই মুসলমানের অধিকার লাভ, ইহাতে তাহারা হিন্দুর সহিত অনেকটা সমকক্ষ হইয়া উঠিবে। জাতির একাংশ হেয় থাকিতে জাতীয় উন্নতি সম্ভব নহে। হিন্দুর এমন অনুদার ভাব কোনদিন ছিল না। সহযোগীকে সমতুল্য করিয়া লওয়ার ঔদার্য্যযুগে আমরা অসহিষ্ণু হইব না। আমরা এই সময় আত্মসংস্কৃতি ও সংহতি বিশুদ্ধ ও দৃঢ়বদ্ধ করিয়া তুলিব। স্বার্থ নাশের আশঙ্কায় প্রতিপক্ষের সহিত বিবাদে আমাদের গঠন শক্তি হ্রাস হইবে। যে সঙ্কেত দিয়া ঈশ্বর আমাদের দুর্দ্দিন দিয়াছেন, তাহার সুযোগ লইতে অযথা বিলম্ব হইবে। হিন্দু বাঙ্গালী আজ গঠনের যুগে। ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, শিল্প বাণিজ্য এমন কি সামরিক জীবন গড়িয়া তোলার ডাক আমরা কোন অছিলায় উপেক্ষা করিব না। শাসন যন্ত্র পরিচালনের শিক্ষা লইতে হইলে ক্ষোভ অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। ইহা না করিলে নিজেরাই দুর্ব্বল হইব। বিগত ৩৫ বৎসর কাল রাষ্ট্র সাধনায় আমরা যে মস্তিষ্ক ও চিত্তবৃত্তি গড়িয়াছি, তাহার আমূল পরিবর্ত্তন আজ বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। জাতির তমসাচ্ছন্ন জীবনের জাগরণ কল্পে রাজস উত্তেজনার প্রয়োজন হইয়াছিল তাহার অঙ্কপাত হইয়াছে, এখন উহার অনুবর্ত্তন শুভ দিবে না। দলাদলি বাড়িবে, পরশ্রীকাতরতার মসী মাখিয়া আমরা স্বজাতিদ্রোহী হইব। আমাদের মস্তিষ্ক হইবে সবল ও সুস্থ ধীরপন্থীর; প্রাণ হইবে প্রচণ্ড প্রগতিশীল সৃষ্টি-শক্তিপূত। আত্মা জাগিলে গড়ার প্রসন্ন নীতি জাতিকে ঘুমাইতে দিবে না, আমরা ক্রমে অচল

হিমাদ্রির ন্যায় জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণসামর্থ্য লাভ করিব। এই সাম্প্রদায়িক ছায়াবাজী সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় তখন স্বতঃই অপসৃত হইবে।

বাংলার নারী-প্রগতির কথা কিছু বলা প্রয়োজন। আমরা পুরুষের মত নারীকেও সর্ব্বত্র তুল্য স্থান দিব; পুরুষের মতই জাতিগত ক্ষেত্রে তাহাদের তুল্য দায়িত্ব দিব। নারীসংহতি গঠনের নীতি বিধি নারীই ঠিক করিয়া লইবে। জাতির কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নারী বলিয়া কোথাও সে উপেক্ষিত হইবে না। বিবাহ-বন্ধন তাহার জীবনের অভিব্যক্তির বাধা সৃজন করিবে না; এমন কি সমাজ সংগঠনে, অর্থ-প্রতিষ্ঠানে নারীর কর্ম্ম-শক্তি ও সৃষ্টি-শক্তি অব্যাহত রাখিব কিন্তু নারীকে গড়িয়া উঠিতে হইবে অনাঘ্রাত ফুলের ন্যায় সুন্দর ও পবিত্ররূপে। পিতা যখন কন্যা সম্প্রদান করিবেন, অনাঘ্রাত ফুলের ন্যায় তিনি যেন তনয়াকে পাত্রস্থ করিতে পারেন। প্রগতির নামে নারীর যৌবন যুগ যদৃচ্ছা আচরণে যদি বিচলিত হয়, ব্যভিচার-পীড়িত হয়, জাতির এই পবিত্র জন্মক্ষেত্র ভবিষ্যৎ বীর সন্তান প্রসবের ক্ষেত্র হইবে না। আমরা নারীকে সুমাতা করিতে চাই, এই হেতু প্রথম বসন্ত-সঞ্চারে অন্ততঃ ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বেই দেশের ভবিষ্য-প্রসূতি যাহাতে পাত্রস্থ হয় তাহার আয়োজন করিব। অনধিক একবিংশতি বর্ষের যুবকও অবিবাহিত থাকিবে না। ইহার জন্য সমাজে যদি প্রচণ্ড আন্দোলন সৃষ্টিই করিতে হয় তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। পণ-প্রথা যদি ইহার পরিপন্থী হয়, তাহা বিদূরিত করিতে হইবে। বাংলার কুমারী-কন্যা যথাকালে পাত্রস্থ হয় না, বিধবার সমস্যা লইয়া দুর্ভাবনা নিরর্থক। তবে বিপত্নীকেরা বিধবাদের দুর্দ্দশা দূর করিতে পারেন যদি নারী পূর্ব্ব পতির স্মৃতি রক্ষায় অসমর্থ হন—তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই।

হিন্দুধর্ম্মে অস্পৃশ্যতা নাই। আকৃতি মানুষের—কিন্তু প্রকৃতি যদি কোথাও পশুর হয়, এমন অবস্থায় শ্রেণী-বিশেষকে আমরা একদিন সমাজের দূরে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। চাতুর্বর্ণ মানবের গুণ। জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, সেবা নিখিল মানব-ধর্ম্ম। অস্পৃশ্যকে কোন একটি গুণে উন্নীত করিয়া লওয়াই হিন্দুর প্রেরণা। আমরা তাই হরিজন বলিয়া অথবা জলচল বলিয়া প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে শ্রেণীভেদের পক্ষপাতী নহি। যে দেশে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব, শক্তি-সাধনার সিদ্ধ-পীঠ দক্ষিণেশ্বর, সে দেশে বর্ণভেদে জাতির মধ্যে ভেদ-সৃষ্টি অবাঞ্ছনীয়। মানুষ সর্ব্ববর্ণের বিগ্রহ অথবা যে কোন একটি গুণধর্ম্মে অন্বিত হউক, মানব বলিয়া তাহাকেই আমরা মানব সমাজের অন্তর্ভুক্ত মনে করিব।

শিক্ষা-ক্ষেত্র সমস্যাসমাকুল। বিদেশীর শাসন, জাতির হস্তে ন্যস্ত হইলেও সম্প্রদায়-ভেদ থাকিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রদায়বিশেষের জন্য শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যবস্থা যদি না হয়, তাহা হইলে আমরা সম্প্রদায় ভেদে শিক্ষার ব্যবস্থা করিব। ইহাতে যদি ভেদ নীতি প্রশ্রয় পায়, আমরা বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষা-ক্ষেত্ররূপে দেখিয়া, প্রত্যেক সম্প্রদায় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি শিক্ষার ক্ষেত্র বাধ্যতা-মূলক করিয়া নিজ নিজ দায়িত্বে গড়িয়া লইব।

জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথ কোথাও রুদ্ধ নহে। প্রতিবাদীর প্রতিক্রিয়া আছে, অপ্রতি-বাদীর কর্ম্মনীতি স্বচ্ছ, অবাধ। বিনা সংঘর্ষে বিনা প্রতিবাদে পরস্পর বিরুদ্ধ স্বার্থসঙ্কুল কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতির পথ কেমন করিয়া সম্ভব হইতে

পারে, এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা কোন কল্পিত আদর্শ প্রচার করিতেছি না। সংগঠনের পথে দীর্ঘদিন চলিয়া আমরা এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, পথের বাধা নিজেদেরই অন্তর-মালিন্য। হিমালয় শীর্ষ হইতে যে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী অবতরণ করেন, তাহার সম্মুখে স্বয়ং হিমাদ্রি. বাধা-স্বরূপ হয়, কত কানন, প্রান্তর, মরুভূমি তাহার পথ আগুলিয়া ধরে; জাহ্নবীর লক্ষ্য বাধার সহিত সংগ্রাম নহে, সাগর সঙ্গমে মুক্তির আনন্দেই তাহাকে লইয়া চলে—তীর্য্যক, ঋজু, মন্থর, কখন বা প্রচণ্ড বেগে। বাধা পড়িয়া থাকে পশ্চাতে একান্ত অকৃতার্থ হইয়া। আজ আমাদের জাতির জীবন অভ্যুত্থান ও নিঃশ্রেয়স্ লক্ষ্যে ছুটিবে বিদ্যুদ্বেগে। বাধা ঐরূপ পড়িয়া থাকিবে আমাদের পশ্চাতে। আমরা বাধার সহিত সংগ্রাম করিতে গিয়া সময় ও শক্তির অপচয় করিব না। বাধা জীবনী-স্রোতের সবখানি আড়াল করিতে পারে না; সে বৃহৎ. নয়। জীবনের গতি যদি পরম হয় সেখানে আছে বৃহতের প্রেরণা, তাই বাধাকে আমরা আমলে আনিব না।

এ জাতি মধ্যযুগের বিকৃত ধর্ম্মপ্রভাবে কর্ম্মকে বন্ধন মনে করিয়া প্রতি পদে সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে কপটাচারী হয়। প্রয়োজনের পূজা দিতে এই কার্পণ্য তাহাকে ধনসম্পদের ক্ষেত্রে ক্রমেই পঙ্গু করিয়াছে। আমরা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষের অধ্যাত্ম ব্যাখ্যাকে মাথার উপর রাখিয়া, ইহার বস্তুতন্ত্র অর্থবাদ গ্রহণ করিব। ধর্ম্মের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আমরা ধর্ম্মের জন্যই পৃথিবী আকর্ষণ করিয়া ধন সঞ্চয় করিব। শিল্প-কৃষি-বাণিজ্য বিমুখ হইলেই ধর্ম্মের নিশান উড়ে এমন নয়, আমাদের দেশে রাজর্ষি জনকও ভূমি কর্ষণ করিয়াছেন। আমাদের দেশের সম্রাটেরাই ধর্ম্মগুরু। অন্ত্যজ ধর্ম্মব্যাধ স্ববৃত্তিতে থাকিয়াই বেদবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন। এ জাতি অর্থকে আর অনর্থ মনে করিবে না, অর্থহীন সন্ন্যাসীও নহে। অন্যের অর্থ শোষণ অথবা শ্রদ্ধারূপে দান লইয়া তাঁহারও সংস্থা গড়িয়া উঠে; অর্থের ভিত্তি যেমন ধর্ম্ম, সবল সুস্থ সমাজের অর্থই তেমনই বনিয়াদ। তবেই আমরা রাষ্ট্রে বিজয়ী হইতে পারিব। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ জীবনেরই সম্পদ্।

শ্রেণী সংগ্রাম কর্ম্মবাদী হিন্দুদের নহে, কেননা বৈষম্য—কর্ম্মফল। এই আত্মকৃত ভাগ্য অস্বীকার করিয়া যে বিদ্রোহ, তাহা ঈশ্বর-বিদ্রোহীর কর্ম্ম—আমরা শ্রমিক ও কৃষকদের দুঃখ দুর্দ্দশায় সমব্যথী হইব, তাহাদের ভাগ্যচক্র উন্নীত হওয়ার জন্য পরস্পর সাহায্য করিব। কিন্তু ধন-সাম্যের পক্ষপাতী হইব না, উহা আমাদের ধর্ম্ম নহে।

উপসংহারে বলিব—হে ভারত! ঈশ্বর বিশ্বাসী তুমি; বেদ তাই তোমার শাস্ত্র। কর্ম্মবাদী তুমি, কর্ম্ম-ব্রহ্মের উপাসনাশক্তি যে ব্রহ্মণ্যবীর্য্য তাহাই তোমার সাধ্য। জন্মান্তরবাদী তুমি তাই তোমার সমাজে সৎ ও সতীর সৃষ্টি। এই চৈতন্য জাগাইয়া রাখার জন্য তোমরা সত্য আশ্রয় কর, সংযত হও, উপাসনার মন্ত্রে নগর-পল্লী মুখরিত কর। আবার ভারতের বনভূমি বেদধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলুক—নদীকূলে, মন্দিরে, আশ্রমে শ্রীভগবানের মহিম্নস্তুতির উদ্‌গান উঠুক, ভারত নব-জন্ম লাভ করিয়া জগতে বরণীয় হউক।*

* ২৫শে ডিসেম্বর ফ্রেজারগঞ্জে ( সুন্দরবন ) অনুষ্ঠিত নিঃ বঃ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ সম্মেলনের সপ্তম সাম্বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণের সারাংশ।

# ছাপাখানার ক্রমবিবর্তনের ধারা

শ্রীঅজিত ঘোষ

আজকাল ছাপাখানার আবির্ভাবে গ্রন্থপ্রচারের যেরূপ সুবিধা হইয়াছে, এরূপ আর কখনও হয় নাই। প্রাচীনকালে যখন ছাপাখানা ছিল না বা বই ছাপাইবার কোনরূপ সরঞ্জাম অথবা ব্যবস্থা ছিল না, তখন হস্তলিখিত পুথির সাহায্য গ্রহণ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। ছাত্র বা যে কোন শিক্ষার্থীকে সাধারণতঃ তাঁহার পাঠ্য গ্রন্থের পুথির অনুলিপি গ্রহণ করিতে হইত। এ ছাড়া প্রয়োজন বোধ করিলে গ্রন্থসংগ্রাহক পুথির অনুলিপি লইতে

ব্যবসায়ে উন্নতির চরম অবস্থায় গুটেন্‌বার্গের মহাজন সাউথ জনের হাতে টাকা দিয়া ব্যবসা রক্ষা করিবার চেষ্টা

পারিতেন। এ যুগে ছাপাখানার সাহায্যে যেমন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অনুলিপি অল্পকালের মধ্যেই গ্রহণ করা যাইতে পারে, সে যুগে সেরূপ সুবিধা ছিল না; হস্তলিখিত পুথিই ছিল তখন একমাত্র বই। প্রাচীনকালে গ্রন্থ যেমন খুব কম ও দুষ্প্রাপ ছিল এবং সেগুলির অনুলিপি লওয়া যেমন আয়াসসাধ্য ছিল, ছাপাখানার আবির্ভাবে সে কষ্টস্বীকারের প্রয়োজন হয় না। সেযুগে অবশ্য পুথি ছাড়া অন্যান্য লিপিরও সাহায্য গ্রহণ করা হইত। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য সুপ্রাচীন দেশগুলিতে তাম্রলিপি, প্রস্তরলিপি, ইষ্টকলিপি, কাষ্ঠলিপি, চিত্রলিপি প্রভৃতি রাখা হইত—এগুলি সাধারণতঃ প্রশস্তি ও অনুশাসনের জন্যই করিবার রীতি ছিল। অতি প্রাচীন কালে আসীরীয়গণ ইষ্টকের উপর সাঙ্কেতিক লিপি ও মূর্তি ছাপিত। মিশরের ইষ্টকেও এইরূপ দেখা যায়। তথাকার কতকগুলি আবিষ্কৃত মোহর হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সেই মোহরগুলি খ্রীস্টপূর্ব ৩৭৫০ অব্দে নির্মিত হওয়া সম্ভব। এই মোহরে ছাপার কাজ হইত। এ ছাড়া, ছাপমারা যে সকল ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে সেগুলি খ্রীস্টপূর্ব ৫০০০ বৎসর পূর্বের বলিয়া অনুমান করা হয়।

যাহা হউক, ছাপাখানার প্রসারে বর্তমানে রাশি রাশি বই ছাপা হইতেছে। শুধু যে বইই ছাপা হইতেছে তাহা নহে, যেগুলিকে আমরা 'জবে'র কাজ বলি—অর্থাৎ বই ছাড়া যে কোন ছাপার কাজ, এমন কি ছবি পর্যন্ত ছাপা হইতেছে; ছাপাখানার আবির্ভাবেই অবশ্য এগুলিরও আবির্ভাব হইয়াছে। এই ছাপাখানার আবির্ভাবে সংবাদপত্রেরও আবির্ভাব হইয়াছে এবং প্রত্যেক দিন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সংখ্যা ছাপা হইয়া প্রচারিত হইতেছে। ছাপাখানার ক্রমবিকাশের পূর্বে সংবাদপত্রের কোন অস্তিত্বই ছিল না।

ছাপিবার পদ্ধতি প্রথম অঙ্কুরিত হয় চীন হইতেই। প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে চীনারা কাঠের উপর কুঁদিয়া 'ব্লক' তৈয়ারী করিয়া পাতলা কাগজের উপর তাহা ছাপিত। ইহার ফলে সুএ-বংশের প্রতিষ্ঠাতার উদ্যোগে প্রাচীন চীনের কয়েকটী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ছাপা হয়। তদনন্তর ৭৬৪ হইতে ৭৭০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এই কৌশল জাপানেও গৃহীত হয়। তদানীন্তন জাপ-সম্রাজ্ঞী শিয়াতোকুর ইচ্ছানুযায়ী জাপদিগের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে এক লক্ষ কাগজে 'বৌদ্ধ ধারণী' এই কাঠের ব্লকে ছাপা হইয়াছিল। খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ

ভাগে পি-সিঙ্ নামক জনৈক চীনা কর্মকার প্রথম ধাতু-নির্মিত অক্ষর প্রস্তুত করিয়া ছাপা পুস্তকের প্রচলন করেন। অবশ্য ইহা পূর্বতন কাঠের হরপে মুদ্রণ-পদ্ধতির অনুরূপ ফল দিতে পারে নাই, কারণ কাঠের 'ব্লকে' খরচ পড়িত কম এবং শ্রমও হইত অল্প। বিশেষতঃ চীনা অক্ষর যেরূপ কদর্য তাহার অনুরূপ অক্ষর প্রস্তুত করা অপেক্ষা 'ব্লকে' ছাপা সুবিধা হইত। কিন্তু পরে আবার দশম শতকের শেষ ভাগে চীন ও জাপানে কাঠের 'ব্লক' ছাড়িয়া ধাতুনির্মিত অক্ষরের ব্যবহার আরম্ভ হয়। ইহার কয়েক শত বৎসর পরে ১৩৩৭ খ্রীস্টাব্দে কোরিয়ায় চীন ও জাপানের অনুরূপ ধাতুনির্মিত অক্ষরে ছাপার কাজ আরম্ভ হয়। কোরিয়ার প্রথম ছাপা বইখানি ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

প্রাচীন রোমানগণকে আমরা 'স্ট্যাম্প' অর্থাৎ ছাঁচ ব্যবহার করিতে দেখি। তাহারা বিশেষতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য-বিষয়ক ব্যাপারে ইহার ব্যবহার করিত। ইউরোপে কাঠের 'ব্লকে' ছাপার প্রথম প্রচলন হয় ত্রয়োদশ শতকে। তখনকার ছাপাইবার পদ্ধতির আমরা সম্যক্ পরিচয় পাই আবিষ্কৃত খেলিবার তাস হইতে। তাস চতুর্দশ শতকে প্রথম প্রচলিত হয়। মূর্তিচিত্রের বইই ইউরোপের প্রথম গ্রন্থ —চীনাদের অনুকরণে উহা মুদ্রিত হইয়াছিল; উহার প্রতি পৃষ্ঠা একটীমাত্র 'ব্লকে' ছাপা হইত

ধাতু ঢালাই করিয়া ছাঁচে অক্ষর প্রস্তুত করিবার প্রয়াস বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হার্লেমের লরেন্স কশ্‌টার ও মেনজের জন গুটেন্‌বার্গই ইহার প্রথম প্রচলন করেন। অনেকের মতে, লরেন্স কশ্‌টার ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কাঠের অক্ষর তৈয়ারী করিয়া ছাপিতেন। কিন্তু ইহার যথাযথ প্রমাণ আমরা পাই না। কশ্‌টারের গ্রন্থাবলী ডেনমার্কের প্রাচীনতম ছাপার পরিচয় দেয়। কেম্ব্রিজের ডক্টর হেসেল্‌সের মতে, হার্লেমই ছাপার কাজের জন্মস্থান এবং কশ্‌টারই ইহার জন্মদাতা, কিন্তু যাঁরা গুটেন্‌বার্গের পক্ষপাতী তাঁদের লেখায় কশ্‌টারের এই সৌভাগ্যের পক্ষে কোন যৌক্তিকতা পাওয়া যায় না; জর্মানীর ডক্টর ভ্যান্ ডার লিণ্ডের পুস্তকে গুটেন্‌বার্গের পক্ষেই বিশেষভাবে ওকালতী করা হইয়াছে।

অবশ্য মতদ্বৈধ যতই থাকুক না কেন, এক দিক্ দিয়া গুটেন্‌বার্গের আবিষ্কার কেহই অস্বীকার করিবেন না, ইহা মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার এবং ইহাই গুটেন্‌বার্গের অমর কীর্তি। তাঁহার পূর্বে এই মুদ্রণযন্ত্রের একান্ত অভাব ছিল। মেন্‌জ শহরে তিনি এই ছাপাকলের প্রতিষ্ঠা করেন, মুদ্রণযন্ত্রের ইহাই প্রথম কথা।

প্রায় ১৪০০ খ্রীস্টাব্দে (কাহারও কাহারও মতে ১৪১০ খ্রীস্টাব্দে) গুটেন্‌বার্গ মেন্‌জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গান্সফ্লেজ। গান্সফ্লেজ ছিলেন জর্মানীর এক জন অভিজাত ধনী ব্যক্তি। গুটেন্‌বার্গের বয়স যখন মাত্র দশ বৎসর তখন জর্মানীতে পুঁজিবাদী ধনীদের সঙ্গে সাধারণের বিরোধ উপস্থিত হয়। তখন এই অল্প বয়সেই তিনি স্ট্রাস্‌বুর্গ নামক স্থানে পলায়ন করেন। ১৫ বৎসর বয়ক্রম হইতেই তাঁহার অসামান্য আবিষ্কার-প্রতিভার বিকাশ পাইতে থাকে। এই সময় তিনি ড্রিট্‌জেন নামে এক জন ব্যক্তির সহযোগে একটী ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ১৫ বৎসর ব্যবসাটী বেশ চলিল, কিন্তু তার পর ভীষণ লোকসানের পালা আরম্ভ হইল। তখন তিনি এই ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া ছাপার কাজে হাত দিলেন এবং ইহাতে তাঁর পুরানো সহকর্মী ও বন্ধু ড্রিট্‌জেন ও আর দুই জনকে সহকর্মী করিয়া তিনি কার্য করিতে আরম্ভ
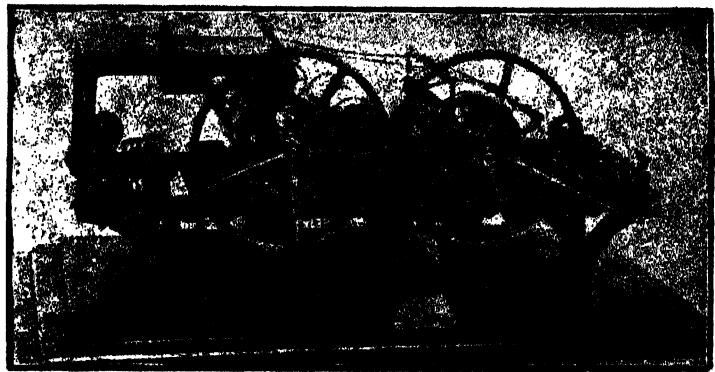
১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের আবিষ্কৃত মুদ্রণযন্ত্র—ইহাতে ১৫০০ বার ছাপ দেওয়া যায়

করিলেন। এই নূতন ব্যবসা কিছুকাল চলিবার পর ড্রিট্‌জেনের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার এক ভ্রাতা ড্রিট্‌জেনের অংশ দাবী করিয়া গুটেন্‌বার্গের নামে মামলা করেন। গুটেন্‌বার্গ ইহাতে জয়লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ছাপাখানার ক্রমোৎকর্ষের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি স্ট্রাস্‌বুর্গ পরিত্যাগ করিয়া জন্মস্থান মেন্‌জে আগমন করিলেন এবং নূতন করিয়া ছাপাখানার কাজ আরম্ভ করিলেন। ইহার জন্য তাঁর অর্থেরও খুব প্রয়োজন হয়। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি জন ফাস্ট নামে একজন ধনী সওদাগরের সংস্রবে আসেন।

ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের ছাপাখানায় ক্যাক্সটন
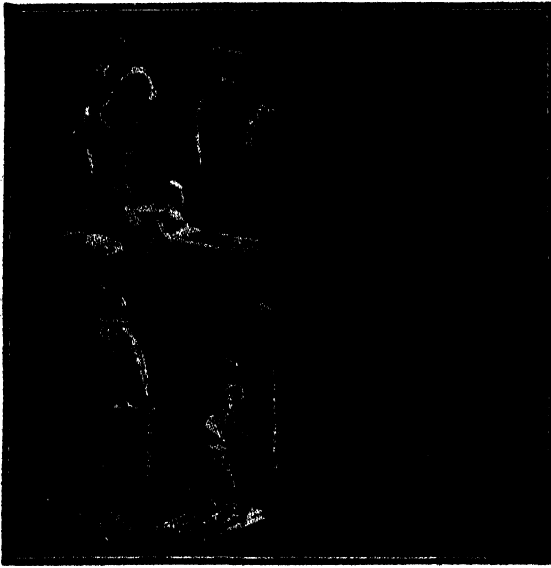
ফাস্টের কাছে তিনি তাঁর ছাপাখানার যাবতীয় জিনিস বন্ধক রাখিয়া কিছু অর্থ ধার করিলেন এবং তাহাদ্বারা ছাপার হরপ তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিলেন।

ফাস্টের সহায়তা লাভ করিবার পর হইতেই গুটেন্‌বার্গের ব্যবসায় নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তিনি পূর্বাপেক্ষা অক্ষরের কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধন করিলেন। প্রথম দিকে তাঁহাকে বই ছাপাইতে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। তাঁর বিশেষ অসুবিধা হইল অক্ষর লইয়া, কারণ কাঠের অক্ষর শীঘ্রই ক্ষয় হয়। তাই তিনি প্রথমেই ধাতু-নির্মিত অক্ষর প্রস্তুত করিবার প্রয়াস পান এবং অবশেষে কৃতকার্যও হন। যাহা হউক, অক্ষর নির্মিত হইবার পর প্রথমে তিনি 'বাইবেল' ছাপাইতে মনস্থ করিলেন এবং বহু কষ্টে জন ফাস্ট ও শফেএর নামক আর এক ব্যক্তির সহযোগিতায় ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এক খণ্ড এবং ১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আর এক খণ্ড লাটিন ভাষায় ছাপিলেন। ইহাতে তাঁর মুদ্রণযন্ত্র-আবিষ্কারের সকল পরিশ্রম সার্থক হইল। কিন্তু এই সময় আবার একটা অনর্থ আসিয়া জুটিল। গুটেন্‌বার্গ সওদাগরদিগের নিকট হইতে যে অর্থ ধার করিয়াছিলেন, তাহা শোধ করিতে না পারায় উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। এখানে সওদাগরদিগেরও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল; তাঁরা ছাপাকলটীকে হস্তগত করিবার জন্য ঋণদত্ত টাকার দাবী করিলেন। গুটেন্‌বার্গ মুদ্রণযন্ত্র রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে অ্যাডলফ ফন নাসাউ নামে এক ব্যক্তি মেন্‌জের মুদ্রণযন্ত্র হস্তগত করিয়া তথাকার শ্রমিকদের তাড়াইয়া দেন এবং দূরদেশে উহার প্রসারকল্পে উহা তুলিয়া লইয়া যান। যে মুদ্রণযন্ত্র ও ছাপার কাজের জন্য গুটেন্‌বার্গ তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় একান্তভাবে অধ্যবসায় করিয়াছিলেন, তারই সার্থকতার ফলস্বরূপ তাঁর আবিষ্কৃত মুদ্রণযন্ত্র এইভাবে হাত-ছাড়া হওয়ায় তিনি মর্মান্তিক আঘাত পাইলেন। এই কষ্ট তাঁকে বেশী দিন ভোগ করিতে হইল না, ১৪৬৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কিছুকাল ধরিয়া গুটেন্‌বার্গের প্রতি জর্মান জনসাধারণের কোন কৃতজ্ঞতার নিদর্শন পাওয়া গেল না। কিন্তু দীর্ঘ চারি শত বর্ষ পরে যখন দেখা গেল, গুটেন্‌বার্গের স্বপ্ন জগতকে এমন একটা দান দিয়াছে যাহাতে জগতের সভ্যতা দ্রুত বিবর্তনের পথে চলিবার সাহায্য পাইতেছে, তখনই জর্মানগণ তাঁর শুভসূচনার জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া ওঠে এবং মেন্‌জ শহরে তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁর একটী মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে।

গুটেন্‌বার্গের হাতেই মেন্‌জ শহরে ছাপাখানার প্রথম প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মেন্‌জের পরে প্রথমে স্ট্র্যাসবুর্গ ও তার পরে ১৪৬১ খ্রীস্টাব্দে বামবুর্গে ফিস্‌টার-কর্তৃক ছাপা-কলের প্রতিষ্ঠা হয়। শীঘ্রই উহা ইউরোপের নানা দেশে

ছড়াইয়া পড়ে। ১৪৬৫ খ্রীস্টাব্দে কন্‌রাড স্বেন্‌হেইম ও আর্নল্ড পানার্স নামে দুই জন জর্মান-কর্তৃক ইটালীর সুবিয়াকো নামক স্থানে, ১৪৭০ খ্রীস্টাব্দে মার্টিন, উল্‌রিক গেরিঙ ও মাইকেল ফিবুর্গের নামে তিন জন জর্মান-কর্তৃক ফ্রান্সের পারী শহরে, ১৪৭৩ খ্রীস্টাব্দে নিকোলাস কেটেলের ও গেরার্ড ডে-লেম্প্‌ট-কর্তৃক নিম্ন দেশগুলিতে অতঃপর টিএরী মার্টিন্‌স-কর্তৃক উট্রেখ্‌ট ও অলোস্ট নামক স্থানে, ১৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি-কর্তৃক স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ায়, ১৪৮২ খ্রীস্টাব্দে জন স্নেল-কর্তৃক ডেন্‌মার্কের অডেস নামক স্থানে, ১৪৮৯ খ্রীস্টাব্দে লর্বা ও এলীজার-কর্তৃক পর্তুগালের লিস্‌বন শহরে এবং ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে জন ফেব্রি-কর্তৃক সুইডেনের স্টক্‌হল্‌মে মুদ্রণযন্ত্র প্রচলিত হয়।

গ্রীক অক্ষরের প্রথম প্রচলন হয় মেন্‌জ শহরেই ১৪৬৫ খ্রীস্টাব্দে। জন ফাস্ট ও শফেএর সিসারো গ্রন্থ 'সিসারো-ডে-অফীজ' নামে মুদ্রিত করেন। গ্রীক অক্ষরের ইহা প্রথম মুদ্রিত পুস্তক হইলেও সম্পূর্ণ গ্রীক ভাষার প্রথম বই ছাপা হয় মিলানে ১৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে। ১৪৭৫ খ্রীস্টাব্দে উর্টেম্‌বর্গের এস্‌লীন্‌জেন নামক স্থানে ফাইনার প্রথম হিব্রু অক্ষরের প্রচলন করেন। জর্মানীর একটী ইহুদী-পরিবারের চেষ্টায় সমগ্র বাইবেল হিব্রু অক্ষরে ছাপা হয় ১৪৮৮ খ্রীস্টাব্দে। ১৪৯১ খ্রীস্টাব্দে ক্র্যাকো শহরে প্রথম স্লাভনিক অক্ষরের প্রচলন হয়। এছাড়া—১৫১৪ খ্রীস্টাব্দে ইটালীতে প্রথম আরবী অক্ষরের প্রচলন হয়—ইহাতে ১৫১৮ খ্রীস্টাব্দে ভেনিস শহরে প্রথম কোরান ছাপা হইয়াছিল, ১৫১৭-১৯ খ্রীস্টাব্দে প্রাগ শহরে রাশিয়ান ভাষায় প্রথম বাইবেলের কতকাংশ ছাপা হইল, ১৫১৩ খ্রীস্টাব্দে রোম শহরে ইথিওপীয়ান ভাষায় প্রথম বই ছাপা হয়, প্রথম সিরীয় ভাষার প্রচলন হয় ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে পারী নগরীতে, ১৫৩৫ খ্রীস্টাব্দে রোম শহরে আর্মেনিয়ার কয়েকটী স্তব ছাপা হয়, ১৫৬৭ খ্রীস্টাব্দে জোন ডে প্রথম অ্যাঙলো-স্যাক্সন হরপের প্রচলন করেন, রুনিক হরপের প্রথম প্রচলন হয় ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে স্টক্‌হল্‌ম শহরে, কপ্‌টিক ও সামারিটন হরপ প্রচলিত হয় ১৬৩৬ খ্রীস্টাব্দে, ১৬৭৭ খ্রীস্টাব্দে হল্যাণ্ডে ফ্রান্সিস জুলিয়াস প্রথম গথিক ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান অক্ষরের প্রচলন করেন এবং ১৭৩৩ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়াম ক্যাশ্‌টন-কর্তৃক প্রথম অ্যাট্‌স্কান হরপ প্রচলিত হয়।

ইংলণ্ডে ছাপার প্রবর্তন করেন উইলিয়ম ক্যাক্সটন। ক্যাক্সটন কেনটে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথমে লণ্ডনে বিদ্যাশিক্ষা করেন। তৎপরে তিনি নিম্ন দেশসমূহে গমন করেন—সেখানে তিনি ত্রিশ বর্ষ যাপন করিয়াছিলেন। অতঃপর ইংলণ্ডের রাজভগিনী ও বার্গাণ্ডীর চার্লস দি বোল্ডের স্ত্রী মার্গারেটের আদেশে ট্রয়-ধ্বংসের কাহিনী ইংরাজীতে অনুবাদ করেন এবং বার্গেসের কল্‌রাড ম্যান্‌সান নামক মুদ্রাকরকে উহা ছাপাইতে দেন। ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'রিকুএল্‌ অফ্‌ দি হিস্‌টরিস্‌ অফ্‌ ট্রয়' নামে এই পুস্তক মুদ্রিত হয়—ইহাই ইংরেজী ভাষার সর্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। অতঃপর ফরাসী হইতে অনূদিত 'গেম্‌ এণ্ড প্লে অফ দি চেজ' তাঁর

বামে—ফ্রেডরিক কোনিগ, ওট্‌মার্‌ মের্গেন্থেলার, এল্ডো মানুজিও ;
মধ্যে—জন গুটেন্‌বার্গ ; দক্ষিণে—রিচার্ড মার্চ হো, উইলিয়ম ক্যাক্সটন, জন ফাষ্ট

দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয় এবং ইহাই ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত দ্বিতীয় পুস্তক। ক্যাক্সটনের পরে নর্মাণ্ডীর রিচার্ড পীন্‌সন ১৫১৮ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম রোমান অক্ষরের প্রচলন করেন। পীন্‌সনের আগে উইল্‌কেন-ডে-ওয়ার্ডে মুদ্রাকর-হিসাবে বেশ নাম করিয়াছিলেন। এল্‌ডো মেন্থুজিও ইটালীর এক জন বিখ্যাত মুদ্রাকর। ১৪৪৬ খ্রীস্টাব্দে ইনি ভেনিস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও প্রথম ১৫০১ খ্রীস্টাব্দে ভেনিস শহরে ইটালিক অক্ষরে ভার্জিলের একখানি বই ছাপেন।
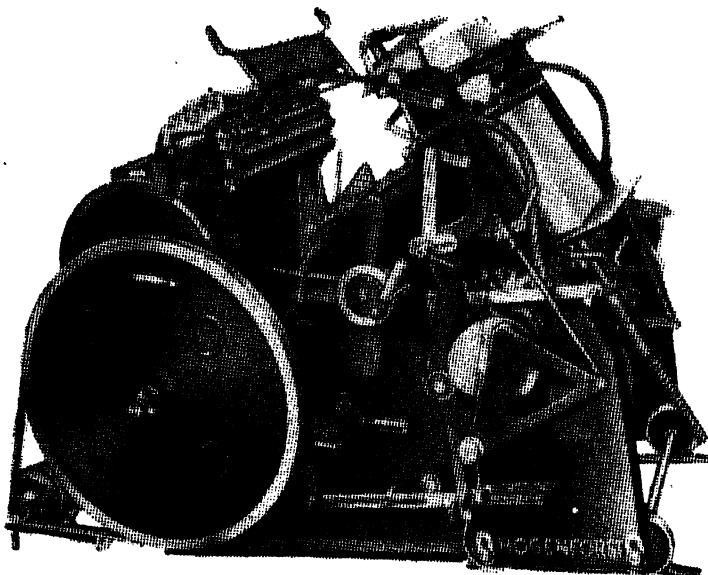
আধুনিক মডেলের 'অটো প্লাটেন' ['প্রবর্ত্তক মেসিনারী'র সৌজন্যে]

স্কট্‌লণ্ডে মুদ্রণযন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় ১৫০৮ খ্রীস্টাব্দে। এণ্ড্রু মিলার এডিনবরার 'সাউথ গেট'এ এই মুদ্রালয়ের উদ্বোধন করেন। এই সময় ফ্রান্স ও স্কট্‌লণ্ডে ব্যবসাসূত্র খুব প্রবল ছিল। এই সুযোগে মিলার রুএনে যান এবং মুদ্রাক্ষরের একটা ছাঁচ কিনিয়া এডিনবরায় ফিরিয়া আসেন। স্কট্‌লণ্ডের পর মুদ্রণতত্ত্ব প্রসারিত হয় আয়ার্লণ্ডে। ১৫৫১ খ্রীস্টাব্দে হাম্‌ফ্রে পাওয়েল ডব্‌লিনে 'কমন্ প্রেয়ার' নামে তাঁর প্রথম বই ছাপেন—আইরিশ প্রেসের মুদ্রিত ইহাই প্রথম পুস্তক। অবশ্য ১৫৭১ খ্রীস্টাব্দে মহারাণী এলিজাবেথের সময়ে আইরিশ হরপের প্রথম প্রচলন হইয়াছিল।

আমেরিকায় প্রথম মুদ্রণযন্ত্র আমদানী হয় ১৫৩৫ খ্রীস্টাব্দে। এক জন স্পেনদেশীয় ব্যক্তি মেক্সিকোয় ইহা আমদানী করেন। ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার প্রথম ইংরেজী বই ছাপা হয়—হার্ভার্ড কলেজের (বর্তমান হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়) জন্য এই বইটী ছাপা হইয়াছিল।

সম্পূর্ণভাবে সর্বপ্রথম 'টাইটেল' পৃষ্ঠাসহ বই ছাপেন ১৪৮৭ খ্রীস্টাব্দে স্ট্র্যাসবুর্গে মার্টিন ফ্যাচ্ নামক এক ব্যক্তি। এল্‌ডাস মান্থুসাস প্রথম ছাত্রদের সুবিধার জন্য নূতনভাবে পুস্তক প্রকাশ করেন। গ্রন্থে পৃষ্ঠা-নম্বর দিবার প্রচলন করেন কোলন্ নামক স্থানে হোর্লেন। ছাপিবার তারিখ দিয়া প্রথম বই প্রকাশ করা হয় ১৪৫৭ খ্রীস্টাব্দে শফেএরের 'সামোরাম্ কোডেক্স' নামক পুস্তকে। ফ্রান্সে ১৪৭০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম চিহ্ন-প্রকরণ ব্যবহৃত হয়। ১৪৭৮ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম ধর্মসম্বন্ধীয় চিত্রগ্রন্থ 'ইমেজেস্ অফ্ পিটি' প্রকাশিত হয়, তবে ইহার পূর্বে ক্যাক্সটন ১৪৭৭ খ্রীস্টাব্দে ওয়েস্টমিনিস্টারে 'দি ডিক্‌টেস্ এণ্ড সেইংস অফ্ ফিলজফার্স' নামে একখানি বই ছাপিয়াছিলেন।

ঠিকভাবে বলিতে গেলে ভারতবর্ষে ছাপাখানার পত্তন হয় ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে। এই সময় সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার নামে এক জন পর্তুগীজ পাদ্রে গোয়াতে একটী মুদ্রণযন্ত্র সংস্থাপন করেন। ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দের ৬ই মে জেভিয়ার গোয়াতে অবতরণ করেন এবং অতঃপর এই শহরে তাঁহার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গোয়া ছিল ভারতে পর্তুগীজ-দিগের উপনিবেশ ও ভারতের সহিত বাণিজ্যের কেন্দ্র। এখানে পাদ্রেগণ তাঁদের দীর্ঘ, শ্রমসাধ্য ও বিপদসঙ্কুল ভ্রমণের অবসানে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। কলেজ, বিদ্যালয় ও খ্রীস্টধর্মীদিগের সুবিধার জন্য প্রধান প্রধান পাদ্রেগণ এখানে একটী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বিবেচনা করেন। এই প্রয়োজনের বশবর্তী হইয়া পাদ্রে জুয়ান্-দে-বুশ্‌তামাতে ইউরোপ হইতে ছাপাকল ও 'টাইপ' লইয়া আসেন—ইহাই ভারতে ছাপাখানার প্রথম

১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে গোয়াতে ছাপাখানার সরঞ্জাম লইয়া পৌঁছিয়াই অচিরে ছাপার কার্য আরম্ভ করা হয়।

আবিসিনীয়ার হাবসী পাদ্রেগণও কয়েকবার নিজেদের একটী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতকের শেষভাগে তাঁরা রোমের আবিসিনীয় প্রচার-সমিতির কার্ডিনাল প্রোটেক্টরের নিকট পুস্তক ছাপাইবার জন্য একটী মুদ্রণযন্ত্র, ইথিওপীয় অক্ষর ও কার্যক্ষম দু'এক জন লোক চাহিয়া এক আবেদন করেন। এই আবেদন যথাযথভাবে গ্রাহ্য না হওয়ায় ১৬২৮ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জুলাই পেট্রিয়ার্ক আল্‌ফোন্সো মেন্‌ডেজের পুনরাবেদনে ইহার অনুমতি পাওয়া যায়, কিন্তু ইথিওপিয়ার ইতিহাসে ফাদার মানুএল-দে-আল্‌মেদা, পেড্রো পায়েজ, মানুএল বারাডাস ও আল্‌ফোন্সো মেন্‌ডেজ প্রভৃতি যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁদের এই মিশনের মুদ্রণযন্ত্রের উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হাবসী পাদ্রেগণের এই অভাব পূরণের জন্য পর্তুগীজ পাদ্রেগণ তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে থাকেন এবং পর্তুগীজ ভাষায় তাঁদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় পুস্তকাবলী ছাপাইয়া দেন।

অতঃপর ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে আমরা মিঃ বোল্ট্‌সের পরিচয় পাই। তিনি সংবাদপত্র-হিসাবে প্রত্যহ একপ্রস্থ কাগজ ছাপাইয়া টাঙ্গাইয়া দিতেন; সুতরাং তাঁর ছাপাখানা থাকাই সম্ভব। ইহার পরে ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই শহরেও একটী ছাপাখানা খোলা হয়। ঠিক ঐ সময়ে বাঙলাদেশে হুগলীতে চার্লস উইল্‌কিন্স পঞ্চানন কর্মকার নামে এক মিস্ত্রীকে নিজে মুদ্রণবিদ্যা শিক্ষা দিয়া তাঁর সাহায্যে বাঙলা অক্ষর প্রস্তুত করেন। অক্ষরগুলি কাঠের তৈয়ারী হয়। উইল্‌কিন্স স্বহস্তে অক্ষর তৈয়ারী করিয়া সর্বপ্রথম হাল্‌হেডের বাঙলা ব্যাকরণ ছাপাইয়াছিলেন।

অতঃপর পঞ্চানন কাজের অনুসন্ধানে শ্রীরামপুরে গমন করেন। এই সময় কেরী তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণের জন্য দেবনাগরী অক্ষর প্রস্তুতের চেষ্টা করিতেছিলেন। পঞ্চাননকে পাইয়া তিনি কৃতকার্যের পথ পান। তিনি পঞ্চাননের দ্বারা দেবনাগরী অক্ষর ও অন্যান্য নানা ভাষার অক্ষর প্রস্তুত করেন। পঞ্চাননের পর তাঁর শিক্ষানবীশ মনোহর কর্মকার শ্রীরামপুর-মিশনের প্রচারের এবং সাহিত্য ও খ্রীস্টীয় সভ্যতার ক্রমোৎকর্ষের জন্য সর্বপ্রকার ভাষার সুন্দর সুন্দর মুদ্রাক্ষরের সাট প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতে থাকে। চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল সে এই কার্য করিয়াছিল। খ্রীস্টধর্মের প্রচারে সাহায্য করিলেও মনোহর হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে নাই। পঞ্চাননকেও তাঁর স্বধর্ম হইতে বিচ্যুত হইতে দেখা যায় নাই। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে যুবক পাদ্রে রেভারেণ্ড জেম্‌স কেনেডি যখন ভারতে আসেন তখন তিনি বৃদ্ধ পঞ্চাননকে হিন্দু দেববিগ্রহের তলে আসন গ্রহণ করিয়া 'বাইবেলে'র জন্য অক্ষর ও ছাঁচ তৈয়ারী করিতে দেখিয়াছিলেন।
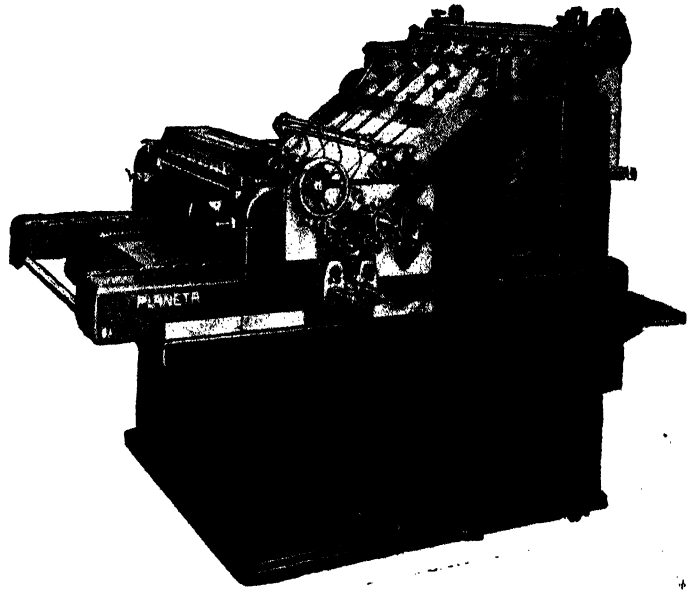
'অটো প্লেনেটা': আধুনিকতম উন্নততর ছাপাই যন্ত্র

['প্রবর্তক মেসিনারী'র সৌজন্যে]

১৮০০ খ্রীস্টাব্দে পাদ্রে ওয়ার্ড শ্রীরামপুর ছাপাখানায়

মুদ্রাকর হইয়া আসেন। তিনিই প্রথম বাঙলা 'নিউ টেস্টামেণ্ট' ছাপান। কেরী স্বয়ংই ইহা মূল গ্রীক হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দ হইতে তিনি ইহা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং রাম বসু-প্রমুখ তৎকালীন সুধীবর্গ ও সর্বজাতীয় পণ্ডিতগণের সাহায্যে মূল গ্রীকের সহিত মিল রাখিয়া চারি বার ইহার সংশোধন করেন। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এই গ্রন্থের মাত্র দুই হাজার সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ইহাতে খরচ হইয়াছিল ৬১২ পাউণ্ড এবং ইহা ছাপিতে সময় লাগিয়াছিল ৯ মাস।
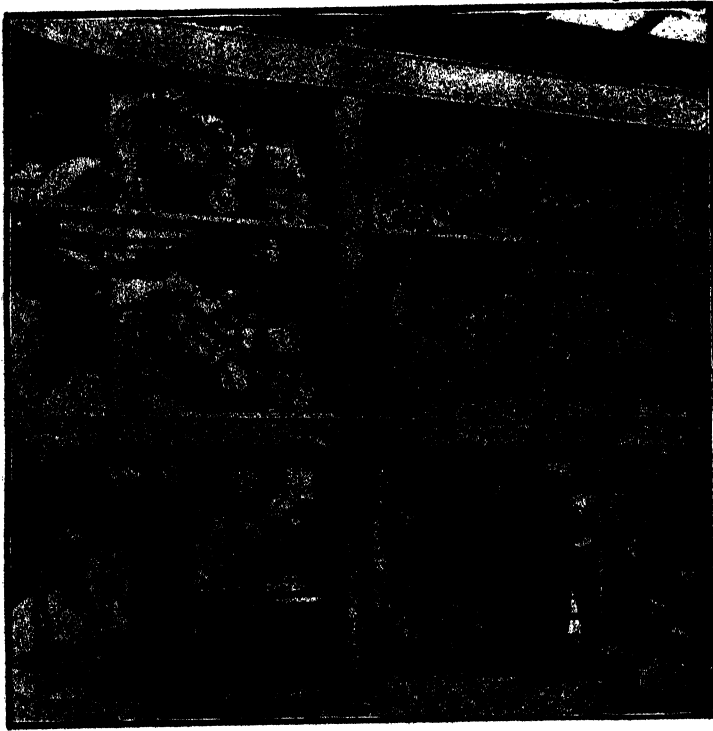
আধুনিক বিরাট্ ছাপাকল—ইহাতে ঘণ্টায় ১,২০,০০০ বার ছাপ দেওয়া যায়

কেরীর পুত্র ফিলিক্স ও ওয়ার্ড স্বহস্তে ইহার অক্ষর সাজাইয়াছিলেন।

ডক্টর জন মার্শম্যান তাঁর 'লাইফ্ এণ্ড টাইম্স্ অফ্ দি থি' নামক পুস্তকে বলিয়াছেন—শ্রীরামপুরের এই কারখানা মাত্র এক শত পাউণ্ড অর্থে যে পরিমাণ দেবনাগরী অক্ষর নির্মাণ করিতে সমর্থ হইত, লণ্ডনের তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ ছাপার কারখানা 'ক্যাই এণ্ড ফিজিক্স' সাত শত পাউণ্ড অর্থে তার অর্ধেকও পারিত না। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে মার্শম্যান ধাতুনির্মিত অক্ষরে চীনা ধর্ম-কাহিনী মুদ্রিত করেন। চীনের কাঠের তৈরী অক্ষরে মুদ্রণতন্ত্রের সহস্রাধিক বর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম ধাতু-নির্মিত অক্ষরে চীনা গ্রন্থ মুদ্রিত হইল। চীনা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা এক স্মরণীয় ঘটনা।

১৮১২ খ্রীস্টাব্দের ১১ই মার্চ শ্রীরামপুর প্রেসের এক স্মরণীয় দিন। ঐদিন সন্ধ্যাকালে সবেমাত্র কারখানার কাজ শেষ হইয়াছে, এমন সময় কারখানায় আগুন লাগিল। ওয়ার্ড ও মার্শম্যান উভয়ে তখন উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আগুন নিবাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কেরী তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না, তিনি তখন কলিকাতার কলেজে সাপ্তাহিক কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। পর দিবস সকালেই মার্শম্যান কেরীর নিকট এই শোচনীয় সংবাদ বহন করিয়া আনিলেন। কেরী এই মর্মান্তিক সংবাদে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না—মার্শম্যানের চোখেও জল আসিয়াছিল। কেরী যখন ঐ দিন সন্ধ্যায় শ্রীরামপুরে পৌছিলেন, তখনও তাঁর এই সাধের কারখানার ভগ্নস্তূপে ধূমোদ্গীরণ হইতেছিল। তাঁর প্রিয় পুঁথিপত্রাদি তখন প্রায়ই সব নিঃশেষ হইয়াছে। ওয়ার্ড ইতিমধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রমে মুদ্রাক্ষরের ছাঁচ ও সাটগুলি ভগ্নস্তূপের ভিতর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ ছাপাকলটীর কোন ক্ষতি হয় নাই।

যাহা হউক, আবার উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া প্রেসের কাজ শুরু হইল এবং অক্ষর নির্মাণও আরম্ভ হইল। ইহার পর ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীরামপুরের কারখানা প্রাচ্যে সর্বপ্রধান ছাপাখানা বলিয়া পরিগণিত ছিল। ইতিমধ্যে ভারতের নানাস্থানে ছাপাখানার প্রসার হইতে থাকে এবং অল্প-বিস্তর বহু ছাপাখানার উদ্ভব হয়। তারপর পৃথিবীতে ছাপাখানার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ও বাঙলায়ও ছাপার কাজের অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছে।

বর্তমান ভারতে বিশেষতঃ বাঙলায় ছাপাখানার যেরূপ পরিণতি হইয়াছে, তাহা একরূপ সর্বজনবিদিত—এক্ষেত্রে উহার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র।

এবার, গুটেন্‌বার্গের পরে ছাপাকলগুলির কি ভাবে ক্রমবিকাশ হইল তাহা বলিব। গুটেন্‌বার্গের ব্যবহৃত ছাপার কল পরবর্তী কালের উন্নত প্রণালীর মুদ্রণযন্ত্র অপেক্ষা অনেকাংশে হীন ছিল। উহা ছিল অনেকটা মাখন-তৈয়ারীর যন্ত্রের মত। ইহাতে অক্ষর ভাঙ্গিয়া যাইত খুব এবং অসুবিধাও হইত অনেক। যাহা হউক, পরে নানারূপ উন্নত যন্ত্রের আবির্ভাব হইতে থাকে। প্রায় ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে স্ট্যান্‌হোপের ৩য় আর্ল চার্লস মাহ্‌ন প্রথম সুবৃহৎ মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার করেন। পূর্বের মুদ্রণযন্ত্র-গুলি কাঠের হইত, কিন্তু মাহ্‌নের এই যন্ত্রের অবয়ব হইল লৌহ-নির্মিত। ইহার পর এডিনবরার জন রুড্‌ভেন আরও কিছু উন্নতি সাধন করেন। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে ফিলাডেল্‌ফিয়ার জি. ক্লাইমার কলম্বীয় মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে গ্রেট বৃটেনে তাহা প্রচলিত করেন। ইহার পর ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে 'আল্‌বীয়ন' যন্ত্রের আবিষ্কার হয়—ইহার আবিষ্কারক আর. ডব্লিউ. কোপ্ নামক লণ্ডনের এক জন ইঞ্জিনীয়ার।

এইরূপে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ হইতে ছাপাকলের উৎকর্ষ হইতে থাকে। রুড্‌ভেন, ক্লাইমার, কোপ্ প্রভৃতি নূতন নূতন যন্ত্র বাহির করিলেও প্রকৃতপক্ষে ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়ম নিকল্‌সন এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী হন। উন্নত ধরণের যন্ত্র নির্মাণের জন্য ইনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার প্রায় দশ বৎসর পরে ফ্রেডারিক কনিগ্ নামে জার্মানীর একজন মুদ্রাকর ছাপাকলের উন্নতি করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বদেশে সাহায্য লাভের অভাব হওয়ায় তিনি ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে আসিয়া একটা যন্ত্রের উদ্ভাবন করিলেন। ফ্রেডারিকের এই যন্ত্র অনেকটা নিকল্‌সনের যন্ত্রের অনুরূপ। অতঃপর টমাস বেন্‌স্‌লি এক জন সুযোগ্য মুদ্রাকরের সাহায্য পাইয়া কনিগের যন্ত্রে ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে কয়েকটী পুস্তক ছাপিতে সমর্থ হন।

১৮১৪ খ্রীস্টাব্দেই প্রথম বাষ্পচালিত যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। 'টাইম্‌স' পত্রিকার মিঃ জন ওয়াল্‌টার তাঁর সংবাদপত্র ছাপিবার জন্য কনিগের আবিষ্কৃত একটী যন্ত্র চাহিয়া পাঠান। কিন্তু ঐ বর্ষের ২৯এ নবেম্বর তিনি খবর পাইলেন যে, একটী নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বাষ্পে চালিত হইতে পারে। এই যন্ত্রটী ঘণ্টায় ১৮০০ বার ছাপ দিতে পারিত। এই যন্ত্রই ওয়াল্‌টার তাঁর ছাপার কাজের জন্য গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহাও টাইম্‌স-এর পক্ষে সুবিধাজনক হইল না, কারণ এই পত্রটীর চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। এজন্য টাইম্‌সের কর্তৃপক্ষ অধিকতর দ্রুত ছাপ দিবার জন্য যন্ত্রের উদ্ভাবন করিতে যত্নশীল হইলেন। ফলে ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে অগস্টাস্ আপ্লেগাথ্ নামক এক ব্যক্তির দ্বারা একটী যন্ত্রের আবিষ্কার করা হয়—এই যন্ত্রটী ঘণ্টায় ১০,০০০ বার ছাপ দিতে পারিত।

টাইম্‌সের এই যন্ত্রের পর 'দি টাইপ রিভল্‌ভিং ফাস্ট প্রিন্টিং মেশিন' ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়; নিউ ইয়র্ক ও লণ্ডনের মেসার্স হো এণ্ড কোম্পানী ইহার উদ্ভাবন করেন এবং রিচার্ড মার্চ হো ছিলেন ইহার স্বত্বাধিকারী। এই যন্ত্রে ঘণ্টায় ২০,০০০ বার ছাপ দেওয়া যাইত। অতঃপর ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পেন্‌সিল্‌ভানিয়ার উইলিয়ম বুলক্ একটী যন্ত্রের আবিষ্কার করেন, উহার নাম —'বুলক্ মেশিন'—যন্ত্রটী লণ্ডনে টাইম্‌সের কারখানাতেই নির্মিত হইয়াছিল। ইহাতে ৮০০ পাউণ্ড ওজনের চার মাইল লম্বা রোল-করা কাগজ ব্যবহৃত হইত। একটী ছুরিকাও ইহাতে থাকিত—ছাপার সঙ্গে সঙ্গে তাহা নির্দিষ্ট খাপে কাগজ কাটিয়া ঠিক করিয়া রাখিত। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে লিভারপুলের জর্জ ডান্‌কান্ ও আলেক্‌জাণ্ডার উইল্‌সন আর একটী যন্ত্র আবিষ্কার করেন, উহার নাম 'ভিক্টরী'। ইহার পর ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে প্রসিদ্ধ 'রোটারী মেশিন' আবিষ্কৃত হয়। 'রোটারী' নির্মাণ করেন মেসার্স ফশ্‌টার এণ্ড সন্স।

প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রমশঃ নিত্য নানা উন্নত ছাপার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। মেসার্স হো এণ্ড কোম্পানী আর একটী নূতন যন্ত্র তৈয়ারীর জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁহারা একটী নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন; এই যন্ত্রটী

ছাপাখানার ইতিহাসে অদ্ভুত যন্ত্র। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইঞ্জিনীয়ারগণ-কর্তৃক নানারূপে ইহার অধিকতর উন্নতি করিবার চেষ্টা চলে। ইহাতে দুইটী মেশিন সরলভাবে একসঙ্গে বসাইয়া একটী যন্ত্র করা হয় এবং ফলে উহা একটী বিরাট্ যন্ত্রে পরিণত হয়। এই যন্ত্রটী ঘণ্টায় আট পাতার ফর্মায় ৯৬,০০০ ছাপ, ১৬ পাতার ফর্মায় ৪৮,০০০ ছাপ ও ২৪ পাতার ফর্মায় ২৪,০০০ ছাপ দিতে সক্ষম হইল।

বর্তমান যুগে মুদ্রণযন্ত্রের এরূপ উন্নতি হইয়াছে যে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আজকালকার ইলেক্ট্রিক-চালিত যন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং জগতে বিশেষ আসন পাইয়াছে। সর্বাপেক্ষা দ্রুতচালনশক্তিসম্পন্ন যে যন্ত্রের আমরা খবর পাই তাহা ঘণ্টায় ১,২০,০০০ বার ছাপ দিতে পারে। এ ছাড়া আরও নানা রকম মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। ছবি, লিথো প্রভৃতি ছাপার, নানা রকম 'জবে'র কাজের যে কত রকম যন্ত্রের উদ্ভাবন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

ছাপাকলের মধ্যে 'লাইনো-টাইপ' যন্ত্রের উপযোগিতা খুব বেশী। মনো-টাইপ যন্ত্রের আবিষ্কার করেন ট্যাল্‌বো ল্যাম্‌স্টন নামে আমেরিকার এক জন বৈজ্ঞানিক। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকাবাসী জর্মান যন্ত্রশিল্পী ওট্‌মার মের্গেন্থেলার লাইনো-টাইপ যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। এ পর্যন্ত ছাপার অক্ষরগুলি হাতের সাহায্যে একটী একটী করিয়া লইয়া সাজাইতে হইত, তাহাতে সময়ও লাগিত যথেষ্ট। কিন্তু এই যন্ত্র দুইটীর আবিষ্কারে সেই অসুবিধা দূর হইল। ইহাতে কম্পোজিটর 'টাইপ-রাইটারের' মত চাবি টিপিয়া অনায়াসে অতিশীঘ্র কাজ করিতে পারে। ইহাতে ভুল হইবার সম্ভাবনাও কম। তবে ইহার কাজে কম্পোজিটর একটু শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। বাঙলায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র জন্য শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে বাঙলা লাইনো-টাইপ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই যন্ত্র অবশ্য এখনও সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হইতে পারে নাই। ইহা না হওয়ার যথেষ্ট কারণও আছে, কারণ বাঙলায় এত বেশী অক্ষর (যুক্তাক্ষর সমূহ স্বরবর্ণযুক্ত অক্ষর সমূহ লইয়া) যে, সহজে ইহা কার্যকরী করা সম্ভব নহে। তবে সুরেশবাবু এই অসুবিধার জন্য একটী নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই নূতন পদ্ধতিতে বাঙলা লাইনো-টাইপে 'আনন্দবাজার পত্রিকার' একটী অংশ প্রত্যহ ছাপা হইতেছে।

'টাইপরাইটার' ঠিক ছাপাখানার অন্তর্ভুক্ত না হইলেও ছাপার নীতি ইহাতে ব্যাহত হয় না। এজন্য ছাপাখানার প্রসঙ্গে ইহাকে ছাড়িয়া যাওয়া চলে না। ১৭১৪ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের রাণী আনার রাজ্যকালে হেন্‌রি মিল টাইপ-রাইটার নির্মাণের সর্বপ্রথম চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় চেষ্টা ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সে ও তৃতীয় চেষ্টা ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায় হয়। আবার ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকান চার্লস আর্থার চেষ্টা করেন। অতঃপর ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে জোন প্র্যাটের যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর মার্কিন বৈজ্ঞানিক ক্রিস্টোফার শোল্‌সের পরিকল্পনায় কার্যকরী টাইপরাইটার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়; ইহাই রেমিংটন কোম্পানীর টাইপ-রাইটার যন্ত্র। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে এফ, ওয়াগনার আর একটী নূতন পদ্ধতির টাইপরাইটার আবিষ্কার করেন—এই যন্ত্রটী আণ্ডারউড কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত হয়। টাইপরাইটার যন্ত্র অফিসের কাজে, চিঠিপত্র লেখা ও পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী করিবার পক্ষে বর্তমান কালে খুব উপযোগী। ইংরেজীর ন্যায় বাঙলা টাইপরাইটারও বর্তমানে পাওয়া যায় কিন্তু উহা এখনও অনেক উন্নতি সাপেক্ষ।

# ফাঁসীর আসামী

( খণ্ডচিত্র )

শ্রীসত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

আমি বন্দী। বিচারে আমার প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়েছে। ফাঁসী কবে হবে তা জানি না। প্রতিটি দিন মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণার মধ্যে কাট্‌ছে। রোজ সকাল বেলা যখন ঘুম ভাঙ্গে, চোখ বুজে উৎকর্ণ হ'য়ে পড়ে থাকি। মনে হয়, ঐ বুঝি কারা আস্‌ছে। তারা আমার কক্ষের দোর খুলে যেন বাইরে ডাকছে ফাঁসী দেবার জন্য। তার কিছুক্ষণ পরেই ভয়ে ভয়ে চোখ খুলি; দোরের দিকে তাকিয়ে দেখি, না—দোর তেমনি বন্ধ। আমি যা মনে করেছিলাম তা' স্বপ্নও নয়, সত্যও নয়—বিকার।

প্রথম যেদিন ফাঁসীর হুকুম নিয়ে এ ঘরে আমি এসেছিলাম, সেদিন হ'তেই মরণের বিভীষিকা আমার রাত্রের সুনিদ্রা কেড়ে নিয়েছে। ঘুম ত হয়ই না, একটু তন্দ্রার মত এলেই দুনিয়ার যত দুঃস্বপ্ন এসে মনের দোরে ভীড় জমায়। জেগেও শান্তি নাই, দুশ্চিন্তা মাথায় বাসা বেঁধেছে।

এ ঘরটিতে আমি দু'মাসের উপর বন্দী আছি। এখানে আসার সময় গাড়ীর ফাঁকে পৃথিবীকে দেখেছিলাম আলো ছায়ার খেলায় ও বাতাসের দোলায়। তারপর পৃথিবীর বাহ্যিক রূপ আর দেখিনি, এ চোখে আর দেখতে পাব বলে আশাও নাই।

পাঁচটা প্রায় বাজে। বাইরের আকাশে এখন হয়ত মেঘ-রৌদ্রে সোহাগের মান অভিমান চলেছে। তাই দেখে লজ্জায় বাতাসের গতি হয়েছে মন্দ। আমার পৃথিবীতে কিন্তু ওসব বালাই নেই। সর্ব্বনিম্ন শক্তির এক বিজলী বাতি—নেবেও না, জলার মত জলেও না, যেন দিবারাত্র আমাকে পাহারা দেয়।

বসে ভাবছিলাম। কি যে ভাবছিলাম তার কিছু মাথা মুণ্ড নাই। মনে পড়ল মা বাবার কথা। সন্তান হ'য়ে তাঁদের আমি কতই না কষ্ট দিচ্ছি। বৃদ্ধা মা হয়ত আমার শোকে কেঁদে কেঁদে চোখ দু'টি হারিয়েছেন। আর বাবা? এতদিনে তিনি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছেন। উলঙ্গ হয়ে রাস্তার পাশের আবর্জ্জনায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁর চির আদরের খোকাকে। ওই যে—পাড়ার বদমাস্ ছেলেগুলি তাঁকে ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে। তারা কি ভেবেছে যে আমি মরে গেছি! উঃ কালো ছোঁড়াটি কি রাস্কেল—ইট ছুঁড়ে বাবার মাথা ফাটিয়ে দিল? আর আমি চুপ করে থাক্‌তে পারলাম না, চেঁচিয়ে গালাগাল দিয়ে উঠলাম। বন্দুকের নল জানালার ফাঁকে বাড়িয়ে মাথায় একটা গুতো দিয়ে প্রহরী বলল—"এঃ—চুপ কর।"

সম্বিৎ আবার ফিরে এল। চুপ করে মাথায় হাত বুলাতে লাগলাম। কিন্তু বেশীক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকতে পারলাম না। মনে পড়ল আমার ছোট সংসারের তৃতীয় প্রাণীটির কথা। কোমল লতিকার মত সে ছিল আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলা। আমারই উপর নির্ভর করে সে গরীবের কুঁড়েতে রচেছিল স্বর্গের নন্দন। এখন আমি তার কাছে নেই; সে কোমল লতিকা হয়ত লুটিয়ে পড়েছে ধরার বুকে। দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে হয়ত সে শুকিয়ে গেছে। ভিক্ষা করেও দিনান্তে এক বেলা অন্ন হয়তো জোটে না। পরার কাপড়খানা ছিঁড়ে গেছে; হয়ত বা পথিকের দয়ার উপর নির্ভর করছে তার লজ্জা রক্ষা।

আর আমার আদরের খোকা? তাকে যে পুরো একটি বছরের দেখে এসেছি। যেদিন পুলিশ আমায় ধরে নিয়ে আসে সেদিন সে সুকোমল ছোট বাহু দু'খানি দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আধ আধ স্বরে খুলে দিয়েছিল তার ছোট অন্তরখানি। হয়ত সে হতভাগার অন্তর জেনেছিল, পিতা পুত্রের সেখানেই শেষ সাক্ষাৎ, তাই সে আরও কিছুক্ষণ চেয়েছিল আমার বুকে থাক্‌তে। সে সাধও পূর্ণ হ'তে পারে নি, এক রকম জোর করেই তাকে আমার কোল হ'তে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। হাটখোলার মোড় পর্য্যন্ত আমি তার আর্ত্তনাদ শুনেছিলাম। ঐ যে, ঐ যে

সে আস্‌ছে, সে যে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে। ওরে—ওরে—আমি যাচ্ছি। আর এরা আমায় ধরে রাখতে পারবে না, ঘনিয়ে এসেছে আমার মুক্তির দিন।

চোখের জলে বুক ভিজে গেল। মাথায় বজ্রের মত একটা আঘাত আমায় দেয়ালের উপর ছিটকে ফেলে দিল। চেয়ে দেখি, জানালায় প্রহরীর চোখ দু'টি আগুনের মত জল্‌ছে; মুখে গালি বর্ষিত হ'চ্ছে যেন শ্রাবণের ধারা। আমি তেমনি ভাবেই পড়ে রইলাম। মনে হ'ল, আমার তাপিত বুকের উপর খোকা তার পেলব হাত দু'খানা রেখে দাঁড়াতে অভ্যাস করছে। কাণে আবার বেজে উঠল পরিচিত সুর—"বা...বা...বা...।" ইস্, খোকন কত শুকিয়ে গেছে। দুধ সে আর খেতে পায় না। তার মা ভিক্ষের চাউল হ'তে দু'টো দু'টো তাকে পিটুলী গোলা তৈরী করে খাওয়ায়। সে তা খেতে চাইবে কেন, কেঁদে কেঁদে আমায় ডাকে। তখন তার মাও আর প্রকৃতিস্থ থাকতে পারে না। তারা মা ছেলে দু'জনেই কাঁদতে থাকে। মা বাবা তাদের সান্ত্বনা দিতে ছুটে আসেন; সান্ত্বনা দেওয়া তাঁদের আর হ'য়ে উঠে না। তাঁরাও তাদের সঙ্গে কান্নার সুর মিলায়।

আজ কয় দিন হ'তেই আমি চিন্তার সংলগ্নতা যেন হারিয়ে ফেল্‌ছি। হঠাৎ মনে পড়ল সেই রক্তচোষা ষণ্ডী বুড়োর কথা। কর্জ্জ নিয়েছিলাম এক শত টাকা, তার সুদ দিয়েছি দেড় শত টাকার উপর—তবুও বুড়োর চাহিদার কমতি নাই। কেঁদে কেটে বললাম, চাকরি নাই, মা বাবার মুখে দু'বেলা দু'মুঠো দিতে পারি না, সুদ কোত্থেকে দেব? আমার কোনও কথা শুনলে না, কোন অনুরোধই মানলে না, নালিশ করে আমার ভিটে মাটি উচ্ছন্ন করল। আমার উগ্র রক্ত সইতে পারল না মানুষের এত অবিচার। সেই-দিনই পদ্মা দিঘীর পাড়ে বাজার হ'তে ফেরার পথে সকল অবিচারের অবসান করে দিলাম। আমিও হয়ত সে অপরাধে মরতে যাচ্ছি; কিন্তু তার অসংখ্য দেনাদার আর যারা বেঁচে রইল—তাদের আশীর্ব্বাদ ঝরে পড়ছে আমার শিরে। সে গেছে মানুষের অভিশাপ কুড়িয়ে আর আমি যাচ্ছি তাদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে। পরপারে দেখা হ'লে এই কথাটাই তাকে বলব।

ঘড় ঘড় করে আমার দোর খুলে গেল। আচম্‌কা আওয়াজে আমার চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। সশস্ত্র দু'জন প্রহরী দু'পাশে নিয়ে 'জেলর' আমার ঘরে ঢুকল। আমি জেলরকে বললাম,—"এ সন্ধ্যেবেলাই—!" আমার ক্ষীণ কণ্ঠ সে পুরুষ-সিংহের কর্ণগহ্বরে প্রবেশ করল কিনা বুঝতে পারলাম না। জেলর বল্‌ল—বাইরে কারা আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আমাকে তারা নিয়ে চলল। যেতে যেতে আমাকে সাবধান করে দেওয়া হ'ল যেন কান্নাকাটি না করি। আমারও ইচ্ছা ছিল—যারাই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসুক না কেন তাদের সামনে আমি দেখাব না বিন্দু-মাত্রও দুর্ব্বলতা, বরং তাদের বুঝিয়ে দেব—আমি যা করেছি তা ঠিকই করেছি।

মোটা লোহার গরাদ দেওয়া একটা দোরের কাছে তারা আমাকে নিয়ে গেল। এতক্ষণ একখানা কালো পর্দ্দায় দোরটা ঢাকা ছিল, আমার যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পর্দ্দা-খানা উঠে গেল। দেখলাম, সামনা-সামনি একখানা বেঞ্চিতে মা, বাবা, ঊষা ও খোকা বসে আছে। পূর্ব্বে আমি প্রত্যাশা করতে পারিনি যে, আমার পরিবারবর্গই দর্শনেচ্ছু। প্রথম তাঁদের দেখেই একটা প্রবল রক্তস্রোত যেন মস্তিষ্কে গিয়ে আমায় আঘাত করল, পরক্ষণেই তা আমি সামলে নিলাম।

পর্দ্দা উঠার সঙ্গে সঙ্গেই মা আর্ত্তনাদ করে আমার দিকে ছুটে আসছিলেন; কিন্তু দু'তিন পায়ের বেশী এগুতে পারলেন না। আবেগের আতিশয্যে অভাগিনী পড়েই যাচ্ছিলেন কাঁপতে কাঁপতে, একজন গুর্খা তাঁর পতনোন্মুখ কঙ্কালখানা ধরে ফেলল এবং বেঞ্চিতে শুইয়ে দিল তাঁর জ্ঞানহীন দেহ। মায়ের চোখ হ'তে ঝরে পড়ছিল অশ্রু, তার প্রতিটি ফোঁটা আমার অন্তরে যেন অগ্নিস্পর্শ দিয়ে যাচ্ছিল। লোহার গরাদ দু'হাতে শক্ত করে ধরলাম।

বাবা আমাকে দেখেই চোখে চাদর চাপা দিয়ে ছোট ছেলের মত কাঁদতে লাগলেন। আমি বাবাকে কাছে ডাকলাম। তিনি গরাদের কাছে এলেন। আমি নীচু হ'য়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বললাম—"তোমার খোকাকে

তুমি আশীর্ব্বাদ কর বাবা! তোমার আশীর্ব্বাদ আমার ইহজীবনের অমূল্য সম্পদ, পারের কড়ি।"

বাবা আমার মাথায় হাত রাখলেন। হাতখানা তাঁর কাঁপছিল। চোখ তুলে জীবনের শেষ দেখা বাবার মুখের দিকে চাইলাম। এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল আমার মুখের উপর। বাবা আর দাঁড়াতে পারলেন না, এক রকম ছুটেই বেরিয়ে গেলেন।

উষা বাবার পাশেই দেয়াল ধরে এসে দাঁড়িয়েছিল। বাবা চলে যেতেই উষা ডুকরে কেঁদে উঠল। খোকা এতক্ষণ বেঞ্চি ধরে দাঁড়াতে চেষ্টা করছিল। সে অভাগা এতক্ষণ আমাকে খেয়ালই করেনি। উষার কান্নার শব্দ তার কাণে যেতেই সে এদিকে ফিরল। আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ সে যেন কি ভাবল, তারপর সেও কেঁদে উঠল। আমি উষাকে বললাম—"উষা, খোকাকে শান্ত কর।"

উষার তখন বাহ্যিক অনুভূতি কিছু ছিল কিনা, বোঝা গেল না। সে তখন গরাদের পাশে মাটিতে বসে ধৈর্য্যের সমস্ত বাঁধন যেন শিথিল করে দিয়েছে। খোকা হামা দিয়ে উষার কাছে এসে বসল। অশ্রু-ভিজা চোখ দু'টি মেলে আমার দিকে আবার তাকাল। এতক্ষণে সে হতভাগা তার অপরাধী পিতাকে চিনল। আঁচল টেনে খোকা বললে—"ম্যোঃ-মোঃ! বা—বাঃ, বা—বাঃ।"

বাদলা রাতের মেঘচোরা জ্যোৎস্নার মত খোকা এক ঝলক হেসে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমার সামনা-সামনি গরাদ ধরে উঠে দাঁড়াল যেন একখানা শিশু কঙ্কাল। উষাকে আমি বললাম—"আর কেঁদোনা উষা, মিছে কেঁদে আমায় দুর্ব্বল করে দিওনা। এখনো সারা জীবন কাঁদতে হবে, অশ্রুর অপব্যয় করোনা। বুকের রক্ত দিয়েও যদি পার, আমার খোকাকে বাঁচিয়ে রেখো। তোমার অশ্রু মোছাতে এ জগতে খোকা ছাড়া আর কেউ পারবে না। এ অভাগাই রইল আমার শেষ স্মৃতি।"

চোখের কোল আমার ভিজে উঠেছে। আর কিছু বল্‌তে পারলাম না। বলবার ইচ্ছা ছিল অনেক কিছু; আর একটি কথা বলতে চেষ্টা করলেই হয়ত আমার ধৈর্য্যের বাঁধও টুটে যেত। এদিকে খোকা বায়না ধরল—"বা-বাঃ, কো—।"

খোকা কোলে উঠতে চায়। আমারও তপ্ত অন্তর যেন সেই প্রত্যাশাই করছিল। জেলার বলল—"আর সময় নেই।"

উষা আমার পায়ের ধূলা নিল। জেলারের কথা সে শুনতে পেয়েছে। রোদনের বেগ তার চরমে উঠল, এমন কি সে আমায় শেষ সম্বোধন পর্য্যন্ত করতে পারল না। খোকাও কোলে উঠতে কাঁদতে লাগল। আমি জেলারের পায়ের উপর আছড়ে পড়ে বললাম—"জেলার! তুমিও তো সন্তানের পিতা। আমার খোকা শেষবারের মত একবার আমার কোলে আসতে চায়। তোমার পায়ে ধরি, একবার তাকে আমার কাছে এনে দাও। একবার—শুধু একবার—।"

গরাদের উপর নেমে এল কালো পর্দ্দা। মনে হ'ল খোকা যেন মাটিতে আছড়ে পড়ে আর্ত্তনাদ করতে লাগল। আমার মনে তপ্ত শীশার মত প্রবেশ করল তার ডাক—"বা—বা—বা—।"

দু'জন প্রহরী এসে দু'দিক হ'তে আমায় ধরল। আমি কাকুতি করে বললাম—"আমার যে এখনো খোকাকে চুমু খাওয়া হয়নি। আমায় তোমরা নিয়ে যেওনা—নিয়ে যেওনা। আর একটিবার খোকাকে দেখতে দাও—।"

শুনলে না। আমার কোনও অনুরোধই তারা শুনলে না। আবার তারা আমাকে নিয়ে চলল আমার পুরাতন কক্ষের দিকে। আমার সংযমের সমস্ত বাঁধন টুটে গেল—। কাঁদতে কাঁদতে জেলরকে বললাম—"আর আমার একতিলও বেঁচে থাকতে সাধ নেই। আমাকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের ত কোনও লাভ নেই। যত শীঘ্র পার আমায় শেষ করে দাও।"

আবার মরণের প্রতীক্ষা ও শত বিভীষিকার মধ্যে এসেছি। জেলার তালা বন্ধ করে চলে গেল। তথাকার কণ্ঠ তখনও যেন কক্ষের পাষাণ-প্রাচীরে প্রতিঘাত খেয়ে আমার অন্তরের দ্বারে আছড়ে পড়ছিল—তাতে কত কাকুতি! আমি মেঝেতে পড়ে কাঁদতে লাগলাম। আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছিল।

কতক্ষণ কেঁদেছি জানিনা। কাঁদতে কাঁদতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তাও জানি না। স্বপ্ন দেখলাম,—খোকা আমার পাশে বসে আছে। তাকে কাছে ডাকতেই সে

পাথর কুঁচি সরু দাঁতগুলি বের করে কেবলই সরে যাচ্ছে দূরে। হঠাৎ পাষাণ-প্রাচীর ফেটে গেল। ফাটলের ফাঁকে জমাট অন্ধকার। অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়ে এল এক মাংসাশী বিকট দর্শন দানব। খোকার নধর মাংসে লোভে তার জিভ্ লক্লক্ করে উঠল। আমি ছুটে গিয়ে খোকাকে বুকের তলায় চেপে ধরলাম। দানব আমাকে মাটিতে ফেলে বুকের উপর চেপে বসল। ক্ষণেকের জন্য সর্ব্বাঙ্গে অভূতপূর্ব্ব বেদনা অনুভব করলাম।

হঠাৎ আমার মনে হ'ল যেন আর আমার কোন কষ্ট হ'চ্ছে না। দানবও নেই, আর আমি বন্দীও নয়। জেলের উঠান পার হ'য়ে সোজা গিয়ে রাস্তায় পড়লাম। জেল ফটকের একটু দূরেই মা, বাবা, উষা ও খোকা যেন আমারই জন্য অপেক্ষা করছে। ছুটে গিয়ে খোকাকে কোলে নিতে চাইলাম। সে আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। মা বাবাকে ডাকলাম, তাঁরা আমার ডাকে সাড়াই দিলে না, উষাকে ধরতে গেলাম; কিন্তু তাকে যেন আর ধরতে পারি না—কোনও স্পর্শই আমার কাছে অনুভূত হয় কিনা, নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখতে গেলাম; কিন্তু কি অদ্ভুত আমার দেহ বলে কোনও জিনিষই নেই। এমনি সময় গলায় ফাঁসীর দড়ি ঝোলান আমার অতি পরিচিত একটা মৃতদেহ জেল গেট্ দিয়ে বাইরে নিয়ে এল। মা, বাবা ও উষা সেই মৃতদেহকে আঁকড়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। আমার বড় কষ্ট হ'ল যে, যাদের নিতান্ত আপন বলেই জানতাম, তারা আজ আমাকে চেনে না, একটা মরা মানুষ নিয়ে কাঁদছে।

* * *

ঘড় ঘড় করে দোর খুলে গেল। আমি চম্কে উঠে বসলাম। জেলার কালো এক অদ্ভুত পোষাক পরে আমার দোরে দাঁড়িয়ে বলল—"বাইরে এস।" স্বপ্নের আবেশ তখনও আমার কাটেনি। দু'হাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাইরে এলাম। একজন রক্ষী আমার মাথায় একটা কালো থলে পরিয়ে দিল। তাদেরই কে একজন আমার হাত ধরে নিয়ে চলল। আমি পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে যাত্রা করলাম এক অজ্ঞাত দেশের পথে।

---

# ভূমা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

তুচ্ছ দুঃখ সুখের গুচ্ছ জীবনের উপাদান
গতানুগতিক প্রতি মানবের দিবসে দুইটী বেলা,
রহি হাসিমুখে তুষাগ্নি বুকে ধিকিধিকি দহে প্রাণ
তবু এ জীবন সচলায়তন করিবার নহে হেলা।

ছোটখাটো যাহা আসে যায় তাহা, এ উহারে দেয় বাঁটি'
মহান্ দুঃখ ভূমার সৌখ্য তা' ব'লে সুলভ নয়,
বিষাদ যোগের অগ্রদিশারী সে দুঃখ হয় খাঁটি
ভোগবতী ভূমা জননীর চুমা নিবিড় পুলকময়।

# প্রাচীন চীনের সমাজ-পদ্ধতির ক্রমবিকাশ

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ., পিএইচ. ডি

## সংস্কার ও প্রতিক্রিয়ার যুগ

১৮৭৫ খৃঃ সম্রাট্ কুয়াং হসু সিংহাসনে আরোহণ করে। এই সময়ে সম্রাট্-পত্নী ট'জু হসি সম্রাটের নামে যথেচ্ছভাবে শাসন পরিচালনা করে। এই শাসন সময়ে চীনে প্রথম বাষ্পীয় রেলওয়ে নির্ম্মিত হয় (১)। কিন্তু তদ্দারা চীনের সর্ব্বত্র একটা বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। সাধারণ লোক তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের সমাধিস্থলের জন্য ভীত হয়, নৌকাবাহকেরা এতদ্দারা তাহাদের পেশার প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব দেখিতে পায়, "ফেংসু"তে বিশ্বাসীরা (২) ভয় পায় যে, এতদ্দারা দেশের ভাগ্যবিপর্য্যয় হইতে পারে। এইজন্য ১৮৭৬ খৃঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী রেলগাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে, চীনারা ইহাকে চিরকালের জন্য অকেজো করিয়া দিবার জন্য মনস্থ করে। এই প্রতিবন্ধককারীরা দেশে এমন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে যে, ১৮৭৭ খৃঃ গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া রেল লাইন ক্রয় করিয়া তুলিয়া ফেলে এবং ইঞ্জিনসমূহকে জলে ফেলিয়া দেয়। ইহার পর ১৮৮১ খৃঃ পর্য্যন্ত চীনে রেলওয়ে নির্ম্মাণের আর কোন প্রকার চেষ্টা হয় নাই। ১৮৯৪ খৃঃ চীন-জাপান যুদ্ধ হয়। ইহাতে চীন গভর্ণমেণ্ট ভীষণভাবে পরাজিত হয়। ইহার ফলে মাঞ্চু গভর্ণমেণ্টের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় এবং সংস্কারকেরা সংস্কারের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন ও ব্যগ্র হইয়া পড়ে। যুদ্ধের এই পরাজয়ের ফলে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ বিশেষভাবে আক্রমণশীল হইয়া চীনে নিজেদের সুবিধা আদায় করিতে থাকে। এই সময়ে নানাশক্তির সমবায়ে নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হয়।

এই পরিবর্ত্তন প্রচেষ্টার মূলে এই সময়ে বিভিন্ন শক্তিসমূহ কার্য্য করিতেছিল। পূর্ব্বে যেসব গুপ্ত-সমিতি রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করিত তাহাদের একটা ধোঁয়াটে কার্য্যতালিকা ছিল— "চীঙ্গদের (মাঞ্চুদের) ধ্বংশ কর, মিঙ্গদের প্রতিষ্ঠিত কর"। কিন্তু এই সময় হইতে নূতন ভাব দেশে প্রচলিত হয়। তাহারা বুঝিতে পারিল যে, জাপান পাশ্চাত্য-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া বিগত যুদ্ধে কৃতকার্য্য হয়। তৎপর খৃষ্টীয় মিশনারীদের প্রচার ও অন্যান্য লোকদের কার্য্যের ফলে, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসার লাভ করায় তাহার কার্য্যের ফল প্রদান করে।

ইহাপেক্ষা কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কর্ম্ম সর্ব্বোপরি কার্য্যকরী হয়। ইহার মধ্যে একজন হইতেছেন হুপে প্রদেশের গভর্ণর চাং চিটুং। তিনি **"চীনের একমাত্র আশা"** নামক একটি পুস্তক লেখেন। অনেকের মতে আধুনিক অন্য যে কোন সাহিত্য অপেক্ষা এই পুস্তক অত্যল্পকাল মধ্যে এক বিরাট্ ইতিহাস সৃষ্টি করে। এই পুস্তক হরিদ্রা বর্ণের পত্রে সম্রাট্-কর্ত্তৃক লিখিত পরিচয় পত্র সহ বিজ্ঞাপিত হইয়া ইহা একটা রাজত্বকে আশ্চর্য্যান্বিত করে এবং একটি সাম্রাজ্যকে তোলপাড় করিয়া যুদ্ধ উপস্থিত করে। এই পুস্তক কোন চরমপন্থীর দ্বারা লিখিত হয় নাই। চাং পার্লামেণ্ট প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন না, বিদেশী শিক্ষকদের আমদানী করারও পক্ষে তিনি ছিলেন না। কিন্তু তিনি কতকগুলি গঠনমূলক কার্য্যের নির্দ্দেশ করেন। আফিংয়ের সম্বন্ধে তিনি বলেন, "এই বিষ ফেলে দাও।" শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেন, "ওই আট-পায়ে প্রবন্ধ (Eight-legged Essay) উঠাইয়া দাও"— এবং যে দুই ধর্ম্মে তিনি বিশ্বাস করিতেন না সেই দুই ধর্ম্মের ধর্ম্ম-মন্দিরগুলিকে স্কুলে পরিণত করিতে বলেন।

শেষে তিনি জাতিকে (Race) সিংহাসন ও কনফুসীয় মতবাদের উপর অটল অচল ভক্তি বিশ্বাস রাখিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই সংস্কারকার্য্যে সম্রাট্ নিজে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি বলেন, "আমাদের বুদ্ধিমান বা প্রতিভাসম্পন্ন লোকের অভাব নাই; তাহারা শিক্ষা করিতে এবং যাহা ইচ্ছা কর্ম্ম করিতে পারে, কিন্তু পুরাতন সংস্কার তাহাদের আটকাইয়া রাখিতেছে"। সংস্কার সাধনের জন্য তিনি ১৮৯৮ খৃঃ সাতাশটী অনুশাসন ঘোষণা করেন। এতদ্দারা পেকিংএ নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষা বিভাগে সর্ব্বজনীন সংস্কার সাধন, রেল লাইনের বিস্তার ও প্রসার, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, কৃষিকার্য্য। যেসব কার্য্য সাম্রাজ্যের অগ্রগামী শক্তিকে আটকাইয়া রাখিতেছিল সেই সব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানকে তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া দিবার হুকুম দেওয়া হয়।

এই সংস্কার প্রচেষ্টা হইতে ইহাই প্রতীত হয় যে, চীনের অভিজাতীয় শাসকশ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত ছিলেন, তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করেন যে, জাপানের শাসকশ্রেণী পাশ্চাত্য-পদ্ধতি ও বর্ত্তমান জগতের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তন করিয়াও স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখিয়াছে এবং তদ্দারা প্রবল শক্তিশালী হইয়াছে। সেই উপায় চীনেও প্রবর্ত্তিত ও গৃহীত হইলে চীনও শক্তিশালী হইবে এবং নূতন সংস্কার দ্বারা নিজেদের বনিয়াদী স্বার্থের ক্ষতি হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই। তবুও যদি কোন সংস্কারক মাঞ্চু রাজবংশ ও চীনের অভিজাত স্বার্থের

---

(১) "Vicounte, d' ollone In Forbidden China", নামক পুস্তকে ২০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে তিব্বতের সীমানায় ফুটপাথের পাথরের উপর লাইন করিয়া ঠেলা গাড়ী চালান হয়। ইহাকে তিনি প্রথম "রেলওয়ে" বলেন এবং চীনাদের ইহার উদ্ভাবনকর্ত্তা বলেন।

(২) যাহারা বাতাস-জলের আধ্যাত্মিক শক্তির উপর বিশ্বাস করে।

বিপক্ষতাচরণ করে সেইজন্য সিংহাসন ও কনফুসীয় মতবাদের প্রতি অটুট ভক্তি রাখার উপদেশ ওই **"চীনের একমাত্র আশা"** নামক পুস্তকে দেওয়া হইয়াছিল।

কিন্তু প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই আরম্ভ হয়। পরলোকগত সম্রাটের পত্নী এই আন্দোলনে ভয় পান। তিনি নিজের ও নিজের বন্ধুদের জন্য ভীত হইয়া পড়েন। এবং মনে মনে ভাবিতেন ইউরোপীয় শক্তিগুলি চীনকে ভাগ করিয়া নিবার জন্য সতত উদ্গ্রীব হইয়াই রহিয়াছে, ইউরোপীয় শক্তিবর্গ, পাশ্চাত্য বস্তুতন্ত্রবাদের প্রতি এই উৎসাহকে তাহাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিতে পারে। এইজন্য তিনি Coup d'e'tat (সামরিক শক্তি প্রয়োগ) করিয়া সংস্কারকদের আটক করেন এবং অনেককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সংস্কারক কাং-উ-ওয়াই পলায়ন করেন, তরুণ সম্রাট্ একরকম কয়েদী ও সিংহাসনচ্যুত হন। আধুনিক সংস্কারকেরা বলেন য়ুয়ানসিকাই যিনি বিপ্লবের পরে প্রথম সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সভাপতি হন, তিনিই সম্রাটের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বৃদ্ধা রাণীর অধীনে স্বীয় সৈন্যদলকে নিয়োজিত করেন।

১৮৯৮ খৃঃ ২২শে সেপ্টেম্বর বৃদ্ধা রাণী সামরিক শক্তির প্রয়োগ দ্বারা স্বীয় ক্ষমতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সম্রাটকে বন্দী করেন। তাঁহার এই কার্য্য সম্পূর্ণ স্বার্থপ্রণোদিত নয় বলিয়াও অনুমিত হয় (১)। তাঁহার একটি ঘোষণাপত্রে তিনি বৈদেশিক আক্রমণকারীদের বিপক্ষে চীনবাসীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে বলেন। এই কর্ম্মের জন্য হাতের কাছে যন্ত্রও প্রস্তুত ছিল। ই-হো-চু'ন (ন্যায়পরায়ণ একতামুষ্টি) নামে পূর্ব্ব হইতেই একটি মাঞ্চু-বিরুদ্ধবাদী দল ছিল। তিনি উহাকে মাঞ্চু রাজবংশের প্রতি বিদ্বেষকে বৈদেশিক বিদ্বেষে পরিচালনার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। তাহারাও এই কাজ ধর্ম্মান্ধতার সহিত গ্রহণ করে। এই দলই বিদেশে Boxers (মুষ্টিযোদ্ধা) নামে পরিচিত হয়।

বক্সারদের ক্রোধ প্রথমে মিশনারীদের (২) ও তাহাদের শিষ্যদের উপর পতিত হয়। কারণ মিশনারীদের বৈদেশিক শাসনের অগ্রদূত এবং চীনা খৃষ্টানদের জাতীয় আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলিয়া জনসাধারণ মনে করিত। অবশেষে পিকিং-এর বৈদেশিক রাজদূতদের বাস বিভাগ (Legation quarter) বক্সারদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। তখন বৈদেশিক শক্তিরা একত্রিত হইয়া রাজদূতদের উদ্ধার করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন এবং পিকিং বিজয়ের পর তাহাদের উদ্ধার সাধন হয়। কিন্তু বক্সারদের অত্যাচার ও নৃশংসতাকে বৈদেশিক সৈন্যদল অতিক্রম করিয়াছিল। এই বিষয়ে গাওয়েন ও হল নামক ঐতিহাসিকদ্বয় বলেন—"An unhappy incident of the relief of the legations was the wanton and savage destruction, with which the foreign troops avenged the savagery of their foes. (রাজদূতদের উদ্ধার চেষ্টায় যে বৃথা ও বর্ব্বর ধ্বংস প্রণালীতে বৈদেশিক সৈন্যদল তাহাদের শত্রুদের বর্ব্বরতা জয় করিয়াছিল তাহা এক দুঃখময় ঘটনা)। বৈদেশিক বর্ব্বরতার নমুনা টুঙচৌ সহরের ঘটনাতে প্রকাশ পায়। এই সহর বৈদেশিক সৈন্যের গতিরোধ করে নাই এবং তথায় কোন যুদ্ধও হয় নাই। তত্রাচ বৈদেশিকদের নিকট হইতে যে অপমান ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহার পর মরাও শ্রেয়ঃ বলিয়া পাঁচ শত তিরানব্বই জন উচ্চশ্রেণীর চীনা মহিলা আত্মহত্যা করেন (১)। ইহার পর লুণ্ঠতরাজ অল্প দোষ বলেই অনুমিত হয়। এই জন্যই উক্ত ঐতিহাসিকদ্বয় বলেন, "The civilization of which we boast at times often proves on an emergency to be little else than a veneer". যে সভ্যতার আমরা অহঙ্কার করি তাহা কার্য্যের বেলা কেবল একটা আবরণ বলে প্রতীত হয়। অবশেষে অত্যধিক পরিমাণে খেসারৎ প্রদান ও জার্ম্মাণী এবং জাপানের নিকট মাপ চাহিবার জন্য মিশন প্রেরণ প্রভৃতি ব্যবস্থার পর সন্ধি হয়। এই **বক্সার আন্দোলনের** ফলে বৈদেশিক শক্তিরা চীনের ঘাড়ে আরও শক্ত হইয়া বসে। কেবল আমেরিকার সংযুক্ত রাষ্ট্র বক্সার Indemnity Fund আমেরিকায় চীন ছাত্রদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবার উদ্দেশ্যে চীনকে প্রত্যর্পণ করে।

এই যুদ্ধের অবসানের পর বৃদ্ধা রাণী হিসি (Hisi) ক্রমে ক্রমে সংস্কারের পক্ষপাতী হন। কিন্তু ১৯০৮ খৃঃ তিনিও বন্দী হন এবং সম্রাট্ পরলোক গমন করেন। ইতিহাস এই সম্রাটকেই শেষ স্বর্গের পুত্র (Son of Heaven) বলে (২)। ইহার পর, পরলোকগত সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র পুই* হুয়ানটুং নাম ধারণ করিয়া সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে সংস্কার সাধন চলিতে থাকে; রেলওয়ে বৃদ্ধি হইতে লাগিল, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা (assembly) সমূহের গঠনপ্রণালী (constitution) ১৯০৯ খৃঃ রচিত হয়, এবং পর বৎসর একটি সিনেট সৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত, মাঞ্চু বংশের শেষ কার্য্য ছিল গোলামী প্রথা উঠাইয়া দেওয়া। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু পূর্ব্বে চীন "নিম্ন জাতিদের কেনা-বেচার কার্য্য (trafic in inferior races) বন্ধ করিয়া দিয়াছিল (৩)। ১৯১০ খৃঃ সর্ব্বপ্রকারের দাসত্ব নিষিদ্ধ হয়।

কিন্তু এইসব সংস্কার সত্ত্বেও অন্য শক্তিসমূহ সমাজ শরীরে অন্তঃসলিলারূপে কার্য্য করিতেছিল। পর বৎসর ১৯১১ খৃঃ অক্টোবর মাসে জাতীয় বিপ্লব সংসাধিত হয়। চীনা জাতির মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে এই জাতীয় উত্থানের (Rising) সময় মাঞ্চুরাজবংশের উহার প্রতিরোধ

১। Gowen and Hall—p. 302.

২। চীনে মিশনারী সমস্যা সম্পর্কে Chester Holcome-এর "The Real Chinese Question" দ্রষ্টব্য।

১। Gowen and Hall p. 306—307.

২। Gowen and Hall—P 313.

৩। Gowen and Hall—P 313.

করিবার শক্তি অতি অল্পই ছিল। ১৯১২ খৃঃ ১২ই ফেব্রুয়ারী টা চিং বংশের দুই শত সাতষট্টি বৎসরের রাজত্ব বালক সম্রাটের শেষ অনুশাসনের সঙ্গে অবসান হয়। এই অনুশাসনে বলা হয়—"অদ্য সমগ্র সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা সাধারণতন্ত্র চায়। ভগবানের হুকুম বড় পরিষ্কার এবং জনসাধারণের ইচ্ছাও অতি সুস্পষ্ট। একটা বংশের গৌরবের জন্য আমি কি প্রকারে কোটি কোটি লোকের ইচ্ছার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারি? এই জন্য আমি স্থির করিয়াছি যে, চীনের গভর্ণমেণ্ট নিয়মতান্ত্রিক সাধারণ তন্ত্র হইবে। যাঁহারা সিংহাসনকে সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া মনে করিতেন ইহা সেই সব প্রাচীন মনিষীদের মতানুযায়ীই হইবে (১)।

ঐতিহাসিকেরা বলেন, বৃদ্ধা রাণীর মৃত্যুর পর মাঞ্চু সিংহাসন তিন বৎসর টিকিয়া থাকিলেও সেই সময় হইতে ইহার ধ্বংস অনিবার্য্য হয়। নূতন আন্দোলনের স্রোত হইতে রাজবংশকে বাঁচাইবার জন্য শাসক কৌমের (মাঞ্চু) মধ্যে কাহারও ক্ষমতা ছিল না। ফ্রান্স ও রুশিয়ার সিংহাসনের ন্যায় দুইটি কারণ সম্মিলিত হইয়া ইহাকে অপসারিত করে। প্রথম কারণ, নিজের দুর্ব্বলতা; দ্বিতীয় কারণ, বৈদেশিক চর্চ্চা ও রাজনৈতিক প্রভাব (২)।

## চীন বিপ্লব

চীনবিপ্লবে মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে চীনের জাতীয় উত্থান হইয়াছিল, চীনের জাতীয়তাবাদীরা মাঞ্চুদের বৈদেশিক বলিত যদিচ ধর্ম্মে, কৃষ্টিতে, আচার ও ব্যবহারে তাহারা সম্পূর্ণ চীনবাসীদের ন্যায় ছিল। কেবল বিবাহ ব্যাপারে তাহারা স্বতন্ত্র থাকিয়া একটা জাতি (caste) সৃষ্টি করিয়াছিল। আড়াই শত বৎসর চীনে বাস করিয়া, কনফুসীয় মতবাদ দ্বারা নিজেদের জীবন পরিচালনা করা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতি সৃষ্টির জন্য মাঞ্চুশাসক জাতি ও চীনা শাসিতদের মধ্যে স্বার্থ ও মনের মিল হয় নাই। ওই শাসক শ্রেণী যে বিভিন্ন মুলজাতীর লোক তাহা চীনবাসীরা অন্ততঃ জাতীয়তাবাদীরা ভুলিয়া যায় নাই। তৎপর, চীন জাপান যুদ্ধ হইতে বৈদেশিকদের হাতে ক্রমাগত পরাজিত হওয়ায় চীনের স্বদেশ-প্রেমিকদের মনে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। চীনারা দেখিল, এই মাঞ্চুদের চীনের উন্নতি বা সুনামের দিকে লক্ষ্য নাই, কেবল শোষণ করিয়া নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধি হইলেই যথেষ্ট;—মাঞ্চুদের এই মনোভাব হইতে তাহারা উপলব্ধি করিলেন যে মাঞ্চুশাসন যতদিন চীনে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ততদিন চীনের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও আশা-ভরসা সুদূর পরাহত। অবশেষে বৃদ্ধা রাণীর মৃত্যুর পর হইতে চীনের সরকারী বড় বড় পদগুলি মাঞ্চু দ্বারা ভর্ত্তি করা হয় (১)। ১৯১১ খৃঃ যখন প্রিন্স চিং প্রধান রাজমন্ত্রী হন তখন তিনি তাঁহার ক্যাবিনেট (সদস্যদল সভা) প্রায়ই সমস্ত মাঞ্চু দ্বারা পরিপূর্ণ করেন। রাজবংশের কুমার ও মাঞ্চু অভিজাতেরা যেন টেক্কা দিয়া ধন সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করে, পিকিং যেন একটা বিক্রয় করিবার দোকান ঘর হইয়া উঠে। সেখানে সাম্রাজ্যের বড় বড় লাভজনক পদগুলি বেশী দরে ক্রেতার নিকট বিক্রীত হইতে লাগিল। চীন ঐতিহাসিকদের মত এই যে, যে প্রকারে প্রিন্স চিন এবং রিজেণ্টের দুই ভাই ধনী হইবার জন্য সাতিশয় আগ্রহ দেখাইতে লাগিল, তাহাতে মনে হয় তাহারা যেন বুঝিয়াছিল যে তাহাদের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। (২)

চীনবিপ্লবের পর যখন ডাঃ সুন ইয়াট্ সেনের বৈপ্লবিক দল মাঞ্চুদের বৈদেশিক বলিয়া সিংহাসনচ্যুত করে, তখন আমেরিকার কোন কোন মিশনারী তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—মাঞ্চুরা কয়েক শতাব্দী যাবত চীনে বাস করিয়া "চীনা" হইয়া গিয়াছে; কাজেই তাহাদের বৈদেশিক বলা অন্যায়। কিন্তু তাহারা চীনাদের সঙ্গে যৌন সম্বন্ধ স্থাপন না করায় এবং নিজেদের একটা স্বতন্ত্র জাতিরূপে পৃথক সত্ত্বা বজায় রাখায় চীনবাসীদের সহিত একীভূত হইতে পারে নাই। বোধ হয় তাহারা শাসক মাঞ্চু জাতীয় লোক—এই কথা তাহারা ভুলিতে পারে নাই। সেই জন্য শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের স্বার্থও পৃথক রাখিয়াছিল (২)। এমতাবস্থায় চীনবাসীরাও তাহাদিগকে পৃথক জাতি বলিয়া গণ্য করিলে অসঙ্গত হইবে না, এবং সেই মনোভাব চীনাদের বরাবরই ছিল।

চীনবিপ্লব বেশীর ভাগ পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত লোকদের দ্বারাই সৃষ্ট হয়। ফ্রান্স ও জাপানে যাহারা শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তাহারাই স্বদেশে প্রথমতঃ তাহাদের মতকে খাটাইবার জন্য চেষ্টা করে (৩)। এই কাজ করিতে হইলে, মাঞ্চুরাজ বংশ ধ্বংস করা একান্ত প্রয়োজন। বৃদ্ধা রাণী কর্ত্তৃক কাংউওয়াই ও লিয়াং চিচাও দ্বয়ের জীবন নাশের চেষ্টায় ইহারা বুঝিয়াছিলেন যে শাসক কৌমের হৃদয় পরিবর্ত্তনের কথায় আস্থা স্থাপন করা যায় না। তাহারা আরও বুঝিতে পারিল যে, স্থিতিশীল সংস্কার রাজসিংহাসনের মতই তাহাদের পথের কণ্টকস্বরূপ।

এই বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের নেতা ছিলেন সুন ইয়াট সেন। ইনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিদেশস্থিত চীনাদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করেন। অনেক ধনী ব্যবসায়ী, অবসর প্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাহার দলে যোগদান করেন। এমন কি স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত এই ষড়যন্ত্রে প্রধান প্রধান

১। Gowen and Hall—P 315.

২। ইনি এখন জাপানীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মাঞ্চুকুয়ো রাজ্যের রাজা।

১। Li Ung Bing—Outlines of Chinese History, P 631

২। আমেরিকায় আমি একজন চীনা ছাত্রকে দেখিয়াছি যে তিনি "মাঞ্চু" হইয়াও বিপ্লবের সমর্থন করিয়াছিলেন।

৩। Gowen and Hall—P 319-320.

পদ পান (১)। কুমারী সোফিয়া চাং নামে সাংহাইয়ের স্কুলের একটি যুবতী শিক্ষয়িত্রী রুষ-সাহিত্য পড়িয়া অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হন এবং পরে এই গুপ্ত সমিতির সভ্যা হন (২)।

এই সময়ে মাণ্ডারীন (Mandarin) শ্রেণী দুষ্কর্ম্ম ও ঘুষ লওয়ার অভিযোগে বিশেষভাবে কুখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিল। এই শ্রেণীর অসাধুতা এই সময়ে চরমে উঠে। পূর্ব্বে যাহারা একটা নূতন রাজবংশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা সকলেই মাণ্ডারীন শ্রেণীকে হাতে রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। টাং বংশের সময় হইতেই প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষা দ্বারা শাসক শ্রেণীতে লোক নিয়োগ করিবার প্রথা বিধিবদ্ধ থাকায় দেশের বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ এই চাকুরীতে ঢুকিয়া প্রচলিত অবস্থাকে স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করিত। কিন্তু মাঞ্চুদের সময় অসাধুতার পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিতদের দলের সম্মানের লাঘব হয়। ইহাদের মধ্যে মাণ্ডারীন শ্রেণীর লোকেরাই খুব কর্ম্মঠ দল ছিল। অতঃপর সম্রাট্ কুয়াং হসুর সংস্কার কার্য্যের তালিকা দ্বারা মাণ্ডারীন শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। এই কার্য্য-সূচীতে প্রাচীন প্রথায় শিক্ষিত লোকদের পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের রাজকার্য্যে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই ভাঙ্গনের প্রাক্কালে বৈদেশিক মিত্রশক্তির সন্ধিসর্ত্ত ছিল—যে-সকল জেলা বক্সারদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছে, সেখানে কয়েক বৎসর পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে না। ইহার উপর ১৯০৫ খৃঃ পুরাতন পরীক্ষা প্রথা রদ করিবার জন্য সম্রাটের নিকট হইতে হুকুম আসে। এই সময় হইতে ক্লাসিকসে শিক্ষিত অভিজাতদের ধ্বংস সুনিশ্চিত হয়। আবার, বিপ্লবীরা নিজেদের দল হইতে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার মতলব আঁটে। এই সময়ে সাধারণ লোকে মাণ্ডারীন শ্রেণীর উপর বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট ছিল।

ঐতিহাসিকেরা বলেন, জাপানের বিপ্লব (মৈজী যুগ প্রবর্ত্তন) ও চীনের বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জাপানের শ্রেণী-জ্ঞান-সম্পন্ন দলটি অধিকতর ক্ষমতার পদে উন্নীত হয়। ইহারাই বরাবর শাসন করিয়া আসিতেছিল। আর চীনে শাসক শ্রেণীর লোকেরা সম্পূর্ণভাবে চরিত্রভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল।

এইসব অনুষ্ঠানের সহিত সস্তার ডাক, টেলিগ্রাফ, রেলরাস্তা, সংবাদপত্র বিপ্লবকে আরও অগ্রগামী করিয়া দেয়। সংবাদপত্র সর্ব্বত্র রাজসিংহাসনের অকর্ম্মণ্যতা, মাণ্ডারীনদের অসাধুতা ও বৈদেশিকদের আক্রমণশীলতার সংবাদ প্রচার করিয়া লোকের মন উদ্বুদ্ধ করিয়া দেয়।

বিপ্লব ঘটিলে বৈপ্লবিকেরা ডাঃ উটিং ফ্যাংকে(১) তাহাদের সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও মাঞ্চু শাসনের বিরুদ্ধে চীনের মুখপাত্র করিয়া একটা অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করে। ইনি বিপ্লবের সংবাদাদি প্রচারের এজেণ্ট রূপে আমেরিকার লোকদের নিকট বোধগম্য করিবার জন্য চীনের সকল প্রকার দুর্ভাগ্য, দারিদ্র্য উন্নতির অভাব, কুসংস্কার এবং বর্ব্বর প্রথার জন্য মাঞ্চুদের দোষী করিলেন; চীনের এই বিপ্লব আন্দোলনকে আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সহিত তুলনা করেন; এবং সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য উহার স্বপক্ষে আন্দোলন ও প্রচার কার্য্য চালান। কিন্তু আমেরিকার এই প্রকারের প্রচার সম্পর্কে ম্যাক কর্মিক নামে জনৈক সাংবাদিক সে সময়ে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "আমার মনে হয়, চীনের সমস্ত দুঃখের দায়িত্ব মাঞ্চুদের ঘাড়ে চাপিয়া দেওয়া বিদ্রোহের একটা প্রথম ভুল হইয়াছিল, ইহার জন্য ভবিষ্যতে হয়ত সাধারণতন্ত্রকে বেশী মূল্য দিতে হইবে...ইতিহাস অবশ্য দেখাইবে উটিং ফ্যাং যে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে মাঞ্চু বলিয়া অভিহিত করিতেছেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে চীনা ছিল" (২)।

আসল কথা এই যে, চীনের শাসক শ্রেণীতে বেশীর ভাগ চীনা জাতীয় লোক ছিল। মাণ্ডারীনেরা সবই চীনা ছিল এবং স্বীয় শ্রেণী-স্বার্থের জন্য প্রচলিত পদ্ধতি ও দেশের অবস্থা অটুট রাখিতে চাহিত। বিপ্লবের সময়ও ইউয়ানসিকাই নামক একজন মাঞ্চুদের বিশ্বস্ত উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী মাঞ্চু সম্রাট্ বংশের জন্য লড়িতেছিলেন, এমন কি যাহাতে সম্রাট্ একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসকরূপে অধিষ্ঠিত থাকে তজ্জন্য বৈপ্লবিকদের কাছে কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন (৩)। কিন্তু চীনের নূতন সভ্যতার ফলে উত্থিত বুর্জোয়া শ্রেণী অভিজাত (মাঞ্চু ও চীন) শ্রেণীদের বিরুদ্ধে "জাতীয় সংগ্রাম" নামে অভিহিত করিয়া স্বীয় শ্রেণী স্বার্থ আচ্ছাদিত করে। চীনের ভবিষ্যতের ইতিহাস তাহার জলন্ত প্রমাণ। পাশ্চাত্য দেশসমূহে শিক্ষিত যুবকদের মতই বলবৎ হয়। ১৯১২ খৃঃ ১লা জানুয়ারী সুন ইয়াট্ সেন চীন সাধারণতন্ত্রের প্রথম সভাপতিরূপে শপথ গ্রহণ করেন। মাঞ্চুবংশ সিংহাসন থেকে ইস্তফা দিবার পর, ইউয়ান সিকাইকে দলে নিবার জন্য সুন ইয়াৎ সেন স্বীয় পদ তাহাকে প্রদান করেন। এতদ্দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ চীন একত্রিত হইয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। (ক্রমশঃ)

১। Margaret E. Burton—Notable Women of Modern China, 1912.

২। Cowen and Hall—P 321

৩। Gowen and Hall—P 321

১। ইনি আমেরিকায় শিক্ষা লাভ করেন এবং কিছুদিন তথাকার চীনরাজদূতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে ইনি আমেরিকায় বিশেষ সমাদৃত হন। খুব কম লোকই ইঁহার মত সুন্দর ইংরাজীতে কথা কহিতে পারিতেন।

২। Mc. Cormick—"The Flowery Republic" Ch. 20.

৩। Gowen and Hall—P. 340—347.

# আলো না আঁধার ?

শ্রীশান্তিচরণ মুখোপাধ্যায়

দশরথবাবু দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী শ্যামনগর হইতে বাকী খাজনার তাগাদা করিয়া মধ্যাহ্ন কালে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। দাওয়ায় বসিয়া স্কন্ধের উপরিস্থিত অর্দ্ধছিন্ন পাঞ্জাবীটি লইয়া বাতাস খাইতে লাগিলেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ফিরিতে দেখিয়া নীলমোহনবাবু প্রশ্ন করিলেন, "কিছু আদায় হ'ল ?"

দশরথবাবু বলিলেন, "না ভাই! কেউ কিছু দিতে পারলে না। সবাই বল্লে,—'কেমন করে দেবো বাবু! এবারকার দুর্বৎসরে নিজেরাই খেতে পাচ্ছিনে'।"

—"আর অমনি বুঝি তুমি তাদের কথা ঋষিবাক্য ব'লে মেনে নিলে। বলিহারী যাই তোমার আক্কেল দেখে। জুতো দেখালেই অমনি সবাই টাকা ফেলে দিত, তা জান ?"

—"সবই জানি ভাই! সবই বুঝি! পারলাম না তাদের ক্ষুধার্থ সন্তানগুলির সাম্‌নে জোর ক'রে টাকা আদায় ক'রতে। অক্ষম পিতামাতার চোখের জলের কাছে আমার সব সঙ্কল্পই ভেঙ্গে গেল, ভাই!"

—"তা আমি আগেই জানি। ভাইয়ের টাকায় নির্ব্বিবাদে খাওয়া-পরা চলে যাচ্ছে, কে অত হেঙ্গামে যায়। ফোঁড় ত আর গুনছো না,—কত ধানে কত চা'ল। আর সত্যিই ত, পরের রোজগারের টাকা, দরদই বা আসবে কোথা থেকে ?"

ঠিক্ এই রকমই হইয়া থাকে। দশরথবাবুও একদিন চাকুরী করিতেন। আগড়তলা এষ্টেটের ম্যানেজার। ছোট ভাইকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য কতই না ঐকান্তিক ইচ্ছা তাঁহার ছিল। পিতামাতার কাছে থাকিলে আদরে ভবিষ্যৎ নষ্ট হইয়া যাইবে মনে করিয়া তাহাকে নিজের কাছে রাখিয়া কত যত্নে মানুষ করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! যে ভাইয়ের জন্য নিজের জীবন পর্য্যন্তও বিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহার অসময়ে সেই প্রাণের ভা'য়ের মুখে আজ একি কথা ? দশরথবাবুর দুইটি চক্ষু অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

পিতা রাজমোহন রায় ইহলোক পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বের বৎসর তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নীলমোহন রায়কে তাহারই চাকুরীর সব ইন্‌স্পেক্টর অব পুলিসের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলন এবং সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক করিয়া গেলেন তাহাকেই। দশরথবাবু তখনও চাকুরীতেই বহাল আছেন। তিনি কনিষ্ঠের সৌভাগ্যে একটুও দুঃখিত হইলেন না বরং একটু আনন্দিতই হইলেন। স্নেহ এমনই জিনিষ।

সহসা কালনেমির ঘূর্ণায়মান চক্র বিপরীত দিকে ঘুরিতে লাগিল। পিতার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে দশরথবাবুর চাকুরী চলিয়া গেল। স্ত্রী সুহাসিনী, পুত্র নীহার ও কন্যা নীলিমাকে লইয়া তিনি বাড়ী চলিয়া আসিলেন। তখন সবেমাত্র পাঁচ মাস হইল কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলমোহনবাবু নিজের গ্রামেই বদলি হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার আগমনে ভ্রাতৃবধূ মুখ বাঁকাইলেন; ভাইয়ের মুখেও অসন্তোষের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। গৃহে স্থান পাইলেন বটে—তবে তাহা যে সাদরে নয় তাহা সেই বিকৃত মুখের ভঙ্গী দ্বারাই সহজে অনুমেয়।

দুই বৎসর পরের কথা। ভ্রাতৃগৃহে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্থান পাইলেন নগণ্য ভৃত্যের স্থানে, আর তাঁহার পরিবারবর্গের স্থান উল্লেখ না করিলেও অনুমান করা কঠিন নয়।

তায় তাগাদা, হাট বাজার, গরু বাছুরের তদারক প্রভৃতি সমস্ত ভারই ক্রমে ক্রমে জ্যেষ্ঠের উপর আসিয়া পড়িল। কাজে একটু ত্রুটি হইলেই আর রক্ষা থাকিত না;—'এত ভাত আসে কোথা থেকে ? এই যে মণকে মণ চা'ল উপে যাচ্ছে, এ ভাতের কি দরদ নেই ? বুদ্ধি আর কবে হবে ?... ...... ইত্যাদি'। নীরবে সহ্য ছাড়া ত আর অন্য কোন উপায় ছিল না। তিনি যে ভিক্ষুকের চেয়েও অধম।

ছোট বউ বিরজা দেবী ঝঙ্কার দিয়া বলেন,—"বলি চোখের মাথা কি খেয়েছ দিদি!" নিজের কনিষ্ঠ সন্তানকে দেখাইয়া বলিলেন,—"ছোঁড়াটা একেবারে হেগে মুতে মেখে বসে আছে। ও রকম পরের সংসার মনে ক'রে কাজ করলে ত আর হয় না। দু'বেলা ভাত যোগাতে ত এদিকে আমাদের মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যায়। কিন্তু কাজের বেলা কি ও পাড়ার হরির মা আসবে?"

সুহাসিনী দেবী রান্না করিতেছিলেন। সহ্য করিয়া করিয়া সহ্য করিবার ক্ষমতাও অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি নীরবে অশ্রু মুছিতে মুছিতে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলেন,—"হে ভগবান! স্বামীর আমার একটা উপায় ক'রে দাও। দাও প্রভু! আমায় মৃত্যু; কিন্তু সেই আপন ভোলার দিকে একবার ফিরে চাও—"

ছোট বউয়ের ঝঙ্কার শুনা গেল। "বলি, কথা কি কাণে যাচ্ছে না;—নাকি বাঁদি ব'লে গেরাহ্যি হ'চ্ছে না। এত তেজটা কিসে তাই শুনি? যার স্বোয়ামীর এক পয়সার ক্ষমতা নেই, তার আবার দর্প। দিতে হয় দূর ক'রে তাড়িয়ে।"

সুহাসিনী দেবী শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"যাচ্ছি ভাই! মাছ ভাজাটা পুড়ে যাবার ভয়ে একটু দেরী হ'য়ে গেল।"

কাকীমার সুউচ্চ কণ্ঠের আওয়াজ শুনিতে পাইয়া দশরথবাবুর ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্যা নীলিমা ত্রস্তে আসিয়া খোকার হাত ধরিতেই ছোট বউ চীৎকারে আকাশ ফাটাইয়া দিয়া বলিলেন,—"থাক, আর কাজ নেই। কাপড়-খানায় যে ময়লা লেগে যাবে। আচ্ছা ধীঙ্গি মেয়ে হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। বলি, কোন্ জমিদারের সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা হ'য়ে গেছে।"

নীলিমার চক্ষু হইতে কয়েক ফোঁটা অশ্রু টপ্ টপ্ করিয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়িল। তেমনি মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—"ওর গু মুতের কাঁথাগুলো কাচ্‌তেই আমি ঘাটে গিয়েছিলাম কাকীমা!"

একেবারে মুখটিকে তিন বাঁকা করিয়া ছোট বউ বলিলেন,—"ওঃ, কৃতার্থ ক'রেছেন আর কি। আবার কান্না হ'চ্ছে। এই এলো ব'লে—সাত সমুদ্দুর তের নদীর পার থেকে রাজপুত্তুর চোখের জল মুছিয়ে দিতে; গিয়েছিলে না হয় বুঝলাম, কিন্তু এত দেরী হয় কিসের জন্যে? ঘাটে কি কেউ.........."

কাকীমার এই হীন ইঙ্গিতটি বুঝিতে নীলিমার একটুও বিলম্ব হইল না। তাই মুখের কথা শেষ না হইতেই কাকীমার মুখের প্রতি অগ্নি দৃষ্টি হানিয়া দৃঢ়স্বরে ডাকিল—"কাকিমা!"

সেই দৃষ্টির সম্মুখে বিরজা দেবীর দৃষ্টি নত হইয়া গেল। কিন্তু তিনি হটিবার পাত্রী নন। পর মুহূর্ত্তেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,—"কেন, মারবি নাকি?"

—"না; মারবার কোন কথা ত নয়, আমার তেমন প্রগল্‌ভতাও নেই। কিন্তু—"

—"কিন্তু; মানে?"

—"হ্যাঁ; মানে একটা আছে বৈকি। আজ আমায় যে ইঙ্গিতটি ক'রতে ছাড়লেন না, মনে রাখবেন সে ইঙ্গিত থেকে আপনারও নিষ্কৃতি পাবার সময় আসেনি।"

—"বটে; যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা—জানিস কার সঙ্গে কথা ব'লছিস্? হাড় ভেঙ্গে গুড়িয়ে ফেলবো না"—বলিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া নীলিমার গালে এমন নিষ্ঠুর ভাবে একটি চড় মারিলেন যে, নীলিমা 'উঃ' করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহার গালে পাঁচটি আঙ্গুল ফাটিয়া বসিয়া গেল।

সুহাসিনী দেবী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। কন্যার নির্য্যাতনে একেবারে জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। রান্নাঘর হইতে কন্যার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—"তোর কি মরণ হবে না, পোড়ারমুখী" বলিয়া পিঠের উপর আরও কয়েকটি কীল মারিলেন।

ছোট বউ মুখ ঘুরাইয়া থিয়েটারী ভঙ্গীতে বলিলেন,—"আমার ওপোর রাগ ফলান হ'চ্ছে? এই রাগটা এমনিই থাকে তবে ত বুঝি। এতই যদি রাগ দেখাবার সাহস হ'য়ে থাকে, যাও না স্বোয়ামী নিয়ে এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে। গলায় দড়িও জোটে না!"

সুহাসিনী দেবী আর কোন কথা না বলিয়া পুনরায় রন্ধন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

এই ত গেল পরিচয়।

তাহার পর দ্বিপ্রহরে দশরথবাবু খাজনার তাগাদা হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং আসিয়াই কনিষ্ঠ ভ্রাতার কাছে যেরূপ লাঞ্ছিত হইলেন, তাহা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। রাত্রিতে স্ত্রীর কাছে তাহার ও কন্যার পূর্ব্বাহ্নের লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া, সেইদিনই তিনি প্রথম বিচলিত হইয়াছিলেন। সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল এবং দেখা গেল কয়েক ফোঁটা অশ্রু চোখের কোণ বহিয়া বিছানার উপর ঝরিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন,—"সবই বুঝি বড় বউ! শুধু এইটেই বুঝি না,—কি অপরাধে ভগবান আমাদের এত শাস্তি দিচ্ছেন।"

তাঁহার ভাঙ্গর ভোলা জীবনের পর্দ্দায় আজ আর একটি চিত্র প্রতিফলিত হইল। মুখে ফুটিয়া উঠিল চিন্তা রেখার সঙ্গে সঙ্গে কি যেন এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রতিবিম্ব।

দশরথবাবু রাত্রি চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত একেবারেই ঘুমাইতে পারিলেন না। কত কি এলোমেলো চিন্তা করিলেন,—বোধ হয় তাঁহার চাকুরী জীবনের ঘটনাবলী। ঘটিকা-যন্ত্রের চারিটি ঘণ্টা যখন পার্শ্বের বাড়ী হইতে শোনা গেল, দশরথবাবু নিদ্রিত স্ত্রী ও সন্তানের দিকে কয়েক মিনিট অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। ছিন্ন পাঞ্জাবীটিকে স্কন্ধের উপর রাখিয়া, ঊর্দ্ধে সেই অনাথের নাথ ভগবানকে করযোড়ে ডাকিয়া বলিলেন,—"প্রভু! তোমার পায়েই এদের রেখে যাচ্ছি! তুমি এদের দেখো ঠাকুর!"

চোখের জল মুছিতে মুছিতে সাড়ে চারি ঘটিকার ট্রেণখানি ধরিবার জন্য অর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী স্টেশনের দিকে দ্রুত রওনা হইলেন।

* * * *

তৎপর একটি বৎসর কাটিয়া গেল। স্বামীর কোনরূপ সংবাদ পর্য্যন্ত না পাইয়া সুহাসিনী দেবী পাগলের মত হইয়া গেলেন। নিজের উপর এবং পুত্র কন্যার উপরে দেবর ও ভাজের অত্যাচার সীমা ছাড়াইয়া গেল। পুত্র ঠিক পিতার অনুরূপ, সুতরাং তাহাদের কোন অত্যাচারই তাহার শান্ত প্রকৃতির ধৈর্য্যের বাঁধ স্খলন করিতে পারিত না। শুধু মেয়েটি সময় সময় বিপদ বাধাইয়া দিত। কোনরূপ অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ করিয়া বসে এবং সেই জন্য তাহার অংশের লাঞ্ছনার পরিমাণটাও একটু বেশী। কখনও কখনও ছোট বউ বড় বউকে বৈধব্যের ইঙ্গিত করিতেও ছাড়েন না। তখন বড় বউ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়েন। তাহার মনে হয় ইহা কি সম্ভব? তাহার সেই অরুণ-কিরণ-মণ্ডিত, পবিত্র গঙ্গোদক স্বরূপ, অতি সরল, অতি শুভ্র দেব প্রতীক যে কোনদিন তাঁহারই আদরিণী স্ত্রী এবং স্নেহের ধন পুত্র কন্যাকে বিষধর অজগরের মুখে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিতে পারেন, ইহা যেন সুহাসিনী দেবীর কাছে হেঁয়ালির মতই দুর্জ্ঞেয় বলিয়া মনে হইল। ঘরের নিভৃত কোণে বসিয়া স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—'ওগো! শুনে যাও ওরা কি বলে। দেখে যাও,—আমরা কি অবস্থায় আছি। ব'লে যাও দেব! আমরা আর কি আশায় বেঁচে থাকবো! তুমি ত নিষ্ঠুর ছিলে না। না ব'লে চ'লে গেলে,—তা হয়ত ভালই ক'রেছ। সে সময় হয় তোমায় একা একা কোথাও ছেড়ে দিতে পারতাম না। কিন্তু এই এক বছরের মধ্যে একটা খবরও কি দিতে নেই। ওগো, আমার আরাধ্য দেবতা! একবার শুধু দেখা দিয়ে তোমার জীবিতাবস্থার প্রমাণ দিয়ে যাও,—নতুবা শুধু একখানা পত্র'। সুহাসিনী দেবী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বোধ হয় তাঁহার করুণ প্রার্থনা সেই মানব দেবতার কর্ণে পৌছিল। কয়েক দিবস পরে দশরথবাবু ফিরিয়া আসিলেন। তিনি রেঙ্গুনে কোন এক নামজাদা কাষ্ঠ ব্যবসায়ীর ফার্ম্মের ম্যানেজারের পদ পাইয়াছেন। মাহিয়ানা ৮০৲ টাকা স্ত্রী পুত্রদের লইয়া যাইতেই ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সংবাদ শুনিয়া নীলমোহন বাবু ও বিরজা দেবী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। এমন বিনা মাহিনার চাকর চাকরাণী ত আর পাওয়া যাইবে না।

পরদিন স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে লইয়া দশরথবাবু চাকুরী স্থলে চলিয়া গেলেন। কিন্তু—

—ভগবানের উপর হাত ঘুরাইবার কাহারও সাধ্য নাই। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। যাহাদের জন্ম শুধু দুঃখ ভোগ করিবার জন্য, তাহাদের সুখ সহিবে কেন! তাই ভগবান মুখ ফিরাইলেন। পুত্র কন্যা ও স্ত্রীর কান্না ও

করুণ প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া দশরথবাবু চাকুরীর তৃতীয় বৎসরে হঠাৎ নিমুনিয়া রোগে ইহ সংসার ত্যাগ করিলেন। হায়রে অদৃষ্ট! যে কূল ভাঙ্গিতে ধরে, তাহার প্রতিরোধ কি সহজে সম্ভব হয়? পুনরায় চির দুঃখকে বরণ করিয়া দেবরের গৃহে বড় বউ আশ্রয় লইলেন। ছোট বউ কপালে দুই চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"সেকি; ফিরে এলে যে বড়? রাজেন্দ্রাণীর কি এই কুঁড়ে ঘর সহ্য হবে? যাবার সময় ত খুব দেমাক দেখিয়ে গেলে, কিন্তু শেষরক্ষা ক'রতে পারলে না?"

নীলমোহনবাবুর সেই প্রথম দুর্ব্বলতা, কিম্বা কূটনীতির আর এক দফা, তাহা ঠিক জানিনা, বলিলেন,—"ছোট বউ! তোমার স্পর্দ্ধার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তা ব'লে রাখছি। সাবধান, এরকম কথা কখনও যেন তোমার মুখ থেকে আর শুনতে না পাই।"

মানুষ এমন করিয়াই পরের সর্ব্বনাশ করিতে ক্রমে অগ্রসর হয়। বড় বউ দেবরের এ হেন আচরণে প্রথমে কয়েক দিন বেশ একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। পরে 'ভ্রাতার শোক, রক্তের সম্বন্ধ' প্রভৃতি মনে করিয়া এ বিষয়ে আর বিশেষ কোন মনোযোগ দিলেন না। হায়রে সরল নারী জাতি! তোমরা কেমন করিয়া পুরুষের কূটনীতির অনুসন্ধান করিবে।

এক মাস, দুই মাস করিয়া ছয়টি মাস কাটিয়া গেল। দেবর ঠিক সেইরূপই সদয় ব্যবহার করিয়া চলিয়াছেন এবং ছোট বধূরও আর জিহ্বায় সে ক্ষুরধারের কোন প্রমাণ পাইলেন না। পরন্তু একটু একটু শান্তির আভাসই তাহার কথায় পাওয়া যাইত।

ইহার পর এক দিবস সুহাসিনী দেবী কন্যার কেশ বিন্যাশ করিয়া দিতেছিলেন, নীলমোহনবাবু ধীরে ধীরে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমতা আমতা করিয়া বলিলেন,—"বৌদি, একটা বিশেষ কথা ছিল?'

—"বেশ ত; কি কথা আছে বলুন।"

—"এই ব'লছিলাম কি, শ্যামনগরের তালুকটা নীলাম হ'য়ে যাচ্ছে। তোমার দিব্যি ক'রে ব'লছি বৌদি! আমার হাতে একটি পয়সাও নেই; অথচ এমন আয়ের সম্পত্তিটা হাতছাড়া হ'য়ে যাবে—"

—"তা আমায় কি ক'রতে হবে বলুন?"

—"বলছিলাম কি, এই সময় যদি দাদার লাইফ্ ইন্‌সিওরের ঐ এক হাজার টাকাটা দাও, তবে খুবই উপকার হয়। তা ছাড়া টাকাটা ত রেখেছ নীলিমার বিয়ের জন্যেই। তা আমি কি আর ওর বিয়ে দেবো না। আমার কি একটা কর্ত্তব্যও নেই?'

দেবরের শুষ্ক মুখ এবং বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া সুহাসিনী দেবীর মনে কোন 'কিন্তুর' উদয় হইল না। তিনি মনে করিলেন,—"সত্যই হয়ত তিনি বিপদে পড়িয়াছেন"। ইহা সত্য কথা যে সম্পত্তিটি হাতছাড়া হইলে ক্ষতি সবারই,—তাহার একার নয় এবং হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ইহা হাত ছাড়া হইলে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইবে।

কু-দিকটাকে পরিত্যাগ করিয়া, বিষয়টিকে অনেক প্রকারে ভাবিয়া সমস্ত টাকা বড় বউ দেবরের হাতে তুলিয়া দিলেন।

নীলমোহনবাবু মস্ত বড় একটি বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন এমন ভাব দেখাইয়া বলিলেন,—"আঃ, বাঁচালে বৌদি! তুমি যে আমায় কত বড় চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিলে, তা আর এক মুখে কত ব'লবো।"

তাহার পর হইতেই আরম্ভ হইল পূর্ব্ব নির্য্যাতনের সূচনা। তখন সুহাসিনী দেবী বুঝিতে পারিলেন, নীলমোহনবাবু কেন এত সুনজরে দেখিয়াছেন।

হায়রে মানুষ! তুমি স্বার্থের জন্য কি না করিতে পার।

একদিন নীলমোহনবাবু সুহাসিনী দেবীর অর্থ পুনঃ প্রাপ্তির প্রশ্নোত্তরে স্পষ্টই বলিয়া দিলেন,—"এত কারো বাপের বাড়ীর টাকা নয় যে ফিরিয়ে দিতে হবে। কেন, খেতে প'রতে বুঝি টাকার দরকার হয় না? তা ছাড়া দাদা আমার কাছ থেকে এক হাজার টাকা ধারও নিয়েছিলেন।"

কুচক্রীদের কুচক্রের মাপকাঠি এখনও প্রস্তুত হয় নাই। এ রকম মিথ্যা ত দূরের কথা—

একে স্বামীর শোক, তাহার উপর শেষ সম্বল হৃত হওয়ায় তাঁহার শরীর ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। শেষে জ্বরে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল এবং একদিন নিশির শেষ ভাগে

পুত্র কন্যার মস্তকে হাত রাখিয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইতে পরপারে চলিয়া গেলেন।

এখানে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, নীলমোহনবাবুর কন্যা মাধুরী দশরথবাবুর কন্যা নীলিমা হইতে বড়, এবং নীলিমা নীলমোহনবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা গৌরী হইতে বড়। দশরথবাবুর পুত্র নীহার ভ্রাতাভগ্নীদের মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। কন্যাদের মধ্যে নীলিমা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী এবং যে সকল গুণাবলী থাকিলে সাধারণ গৃহস্থ ঘরের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচ্য হয়, নীলিমার ভিতরে তাহার প্রত্যেকটিই বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু নীলমোহনবাবুর কন্যাদ্বয় অকর্ম্মণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার উপর মাধুরীর অঙ্গাভ কিঞ্চিৎ কৃষ্ণাভ। মাধুরী, নীলিমা ও গৌরীর যথাক্রমে আঠার, সতের ও পনের বৎসর বয়স।

নীলিমার বিবাহ দিবার ইচ্ছা নীলমোহনবাবুর তখন ছিল কিম্বা ছিল না, তাহা সঠিক জানিনা;—তবে উভয় কন্যা মাধুরী ও নীলিমাকে বর পক্ষ হইতে অনেকে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত বর পক্ষ হইতে চিঠি আসিত,—'যদি আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দেন, তবেই আপনার সঙ্গে এ কাজ করা সম্ভব। নতুবা আমরা অসমর্থ—'

নীহার সংবাদটি শুনিয়া খুল্লতাতকে বলিল,—"কাকা! পাপ যত বিদায় হয়, তাই কি ভাল নয়? ওদের যখন নীলিমাকেই পছন্দ,—তা ওকে বিদেয় ক'রেই দিন না কেন?'

নীলমোহনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন,—"বড় থাক্‌তে ছোটর আগে বিয়ে হ'তে পারে?"

ইহার পর হইতে কেহ পাত্রী দেখিতে আসিলে, একমাত্র মাধুরীকেই দেখান হইত। কারণ নীলিমাকে দেখিয়া কেহ আর মাধুরীকে পছন্দ করিতেন না।

যাহা হউক একদিন মহা ধুম-ধাম করিয়া মাধুরীর বিবাহ হইয়া গেল। ঘর এবং বর সম্বন্ধে আমাদের আলোচনার প্রয়োজন নাই।

তৎপর বিবাহের বাকি রহিল নীলিমা ও গৌরী। পাত্র অন্বেষণ চলিতে লাগিল এবং পাত্র পক্ষ হইতে দুই একজন দেখিয়াও যাইতে লাগিলেন। কিন্তু কেই বা জানে কুটিলের কূটনীতি কত বক্র,—কত দ্রুত গতিতে স্বকার্য্য সাধনে কৃতকার্য্যতা লাভ করে। তাহাদের প্রবৃত্তি কত হীন,—কত নীচ উপাদান লইয়া তাহাদের হৃদয় গঠিত।

নীহার বিবাহের কথা কিছুই জানিতে পারে না। কারণ বিবাহের আলোচনা তাহার সহিত করা নীলমোহনবাবু মোটেই উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন না।

নীহার প্রতিবেশী মাধব ঘোষালের কাছে যে সংবাদ পাইল, তাহাতে তাহার মনে হইল যেন চোখের সম্মুখে সমস্ত জগৎখানা কুম্ভচক্রের মত ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতেছে। সংবাদটি এইরূপ: নীলমোহনবাবু নিজের কন্যা গৌরীর বিবাহের সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। সম্মুখের ১৫ই মাঘেই বিবাহ।

নীহার আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। সে বরাবর বাড়ী চলিয়া আসিল এবং প্রবেশ পথেই খুল্লতাতকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কাকা! শুন্‌তে পেলাম, গৌরীর নাকি বিয়ে?"

কিছুই হয় নাই, এমনি ভাবে একটু হাসিয়া নীলমোহনবাবু বলিলেন,—"তোকে কে ব'ল্লে?"

—"যিনি ব'ল্লেন, তিনি মিথ্যে কথা ব'লবার লোক নন। আপনি নিজে মাধব দাদামহাশয়ের কাছে ব'লে এসেছেন গৌরীর ১৫ তারিখ বিয়ে।"

—"হ্যাঁ, তা ঐ রকম একটা কথা ব'লেছিলাম বটে। ওই, ওরা গৌরীকেই পছন্দ ক'রে গেল কিনা,—আর এও ব'লে গেল ১৫ তারিখই ওদের পক্ষে একটু সুবিধে।"

নীলিমাকে যে তাহাদের পছন্দ হয় নাই, ইহা নীহারের বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। সে নিশ্চয় বুঝিল ইহার মধ্যে ষড়যন্ত্র আছে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে নীলিমার—"

—"হ্যাঁ, দিতে হবে বৈকি। এর আগেই আমি একটা কিছু ঠিক করবই। বড় থাক্‌তে ত আর ছোটর হ'তে পারে না।—"

ক্রমশঃ বিবাহের দিন ১৫ই তারিখ আসিয়া দ্বারপ্রান্তে

আঘাত করিতে লাগিল। নীলিমার বিবাহের কিছুই হয় নাই বা চেষ্টাও হয় নাই।

জানি না, ভগবানের এমন এক একটি সৃজনের কি বিশেষত্ব আছে।

বিবাহের দিন সকাল বেলা হইতে নীহারকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। গ্রামের সৎলোকে বলিলেন,—"ছেলে ত বটে! আর কত সইবে।" কু-লোকে বলিলেন,—"হতচ্ছাড়া, নেহাৎ হতচ্ছাড়া;—নইলে বোনের বিয়েতে কেউ হিংসে করে।"…ইত্যাদি।

দিবসের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদির শেষে ক্রমে বিবাহের গোধূলি লগ্ন উপস্থিত হইল। শানাইয়ের সুমধুর সুর বিবাহের শুভ-সংবাদ ঘোষণা করিতে লাগিল। পুরললনা-গণের হুলুধ্বনি সকলের কর্ণ-কুহর পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণ বিবাহের আনন্দ উৎসবে যোগদান করিতে দলে দলে আসিতে লাগিলেন। সকলেই পূর্ণ আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন।

পুরোহিত আসনে বসিয়া মন্ত্র পড়াইয়া চলিলেন। বিবাহ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় বিবাহ সভার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল নীহার। তাহার লম্বা লম্বা চুল বিদ্রোহ প্রকাশ করিয়া চারিদিকে রুক্ষভাবে ঝুলিয়া পড়িয়াছে; চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ,—মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ, অথচ ভ্রূকুটির এক দৃঢ়ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার সেই পাংশু মুখমণ্ডলে।

সে উপস্থিত জনমণ্ডলীর প্রতি হাতজোড় করিয়া বলিল,—আজ আপনাদের কাছে আমার একটি নিবেদন আছে। আশা করি, আপনারা সবাই মনোযোগ দিয়ে শুন্‌বেন। আপনারা সবাই হয়ত জানেন, আমরা কাকা কাকীমার কাছ থেকে কেমন ব্যবহার পেয়ে আসছি। বাবা যে নির্য্যাতন সহ্য ক'রতে না পেরে দেশত্যাগী হ'য়ে অবশেষে মারা গেলেন। মাও সহ্য ক'রতে না পেরে বাবার পথই অনুসরণ ক'রলেন। আর হয়ত এও জানেন, কেমন ক'রে আমাদের একহাজার টাকা ফাঁকি দিয়ে তিনি নিয়েছেন্। সে সবই নীরবে সহ্য ক'রেছিলাম। কিন্তু পারলাম না শুধু আজকের ব্যবহার। এতদিন শুনে এসেছি "বড় থাক্‌তে ছোটর বিয়ে হ'তে পারে না; তাই জান্‌তে চাই, সে নীতির আজ এ রকম ব্যবহার কেন?"

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মাধব ঘোষালই ছিলেন বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানী। তিনি নীহারকে বলিলেন,—"আজকের দিনে আর ও-রকম ক'রতে নেই, ভাই! সে যা হয় বিয়ের পর ক'রলেই হবে।"

—"নাঃ দাদামশাই! অনেক সহ্য ক'রেছি, কিন্তু আর পারছিনে। আজ আমি এর কৈফিয়ৎ চাই-ই এবং এর প্রতিবিধান আজই আপনাদের ক'রতে হবে।"

মাধব ঘোষাল ব্যাপার ভাল নয় দেখিয়া এক রকম জোর পূর্ব্বক নীহারকে সে স্থান হইতে লইয়া গেলেন এবং অনেক উপদেশাদি দিয়া এ সময় বাড়ীতে থাকিতে নিষেধ করিয়া পাড়ায় পাঠাইয়া দিলেন। সে চলিয়াই গেল বটে, কিন্তু পড়ায় কি অন্য কোথাও গেল, তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না।

মিনিট পনের পরে সকলে বহির্বাটী হইতে শুনিতে পাইলেন, নীহার চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—"বল, কেন, কেন, আমি তোর জন্যে এত অত্যাচার সহ্য ক'রবো? মা, বাবা, সবাই স'রে গেলেন, আর তুই পারলিনে হতভাগিনী? বল্ কিসের জন্যে তুই আমায় এত শাস্তি দিবি।"

চীৎকারে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া ভিতর বাটিতে গেলেন। গিয়া দেখিলেন,—নীলিমা অদূরে মাটিতে পড়িয়া আছে। তাহার বক্ষদেশ হইতে ভলকে ভলকে রক্ত উঠিতেছে। আর সেই হতভাগ্য নীহার ততক্ষণে নিজের বুকেও ছোরাখানাকে আমূল বসাইয়া দিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে দুইটি অমূল্য জীবন শেষ হইয়া গেল। যাঁহারা আসিয়াছিলেন বিবাহে আনন্দ করিতে ফিরিলেন, চোখের কোণ দুইটি অশ্রুতে পরিপূর্ণ করিয়া।

# সঙ্ঘে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

ভারতের প্রতিভা অমর। জাতির ঘোরতর দুর্দ্দশার মধ্যেও এই অনির্ব্বাণ প্রতিভার আলো আমাদের অন্তরে দেয় আশা, দেয় সান্ত্বনা। যুগের অসংখ্য আদর্শ-সংঘাতে উদীয়মান জাতি কোন্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চলিবে? কি লক্ষ্য করিবে তাহার জীবন-নিয়ন্ত্রণ? এখানেই প্রশ্ন উঠে, উঠে জিজ্ঞাসা—চিন্তাযন্ত্র ঘটিকার দোলাযন্ত্রের মত কখনও এক দিকে, কখনও বা ঠিক তার বিপরীতে উত্তরের অন্বেষণে করে সঞ্চরণ। সমস্যার সুমীমাংসা কে আনিবে? কে পারে আনিতে? সেই জন্যই ত প্রতিভার দিগ্দর্শন!

যুগসঙ্কটে বাঙালী আজ চাহিয়া আছে—এমনই কয়জন প্রতিভাশালী শক্তিমান্ পুরুষের দিকে—তাহার বিভ্রান্ত বুদ্ধিকে সুপথে পরিচালিত করার জন্য। বাঙালী দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছে—আদর্শের খণ্ডতায় মুক্তি নাই। একরোখা বুদ্ধি উগ্র আন্দোলন করিয়া বিষ সৃষ্টি করিতে অবশ্যই পারে—পারে এক আদর্শ ছাড়িয়া আর এক আদর্শ-গ্রহণের মত্ত লোলুপতায় একটা ছন্নছাড়া, মূলহারা পরিস্থিতির উদ্ভব করিতে, ইহাতেও সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা তো সুস্থ মনোবৃত্তির পরিচয় নহে। তাই এমন চলার পথে গতির সবেগ বিপরীতের প্রতিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে হয় মন্দীভূত—তার পর একদিন নিজেরই অক্ষমতার, ব্যর্থতায় স্তম্ভিত নীরব হইয়া পড়ে। এই অচল অবস্থার প্রতিকারের জন্যই চাই চিন্তার প্রসার, দৃষ্টি-ভঙ্গীর উদার ও সুদূরগামী পরিক্রমণ। যিনি বা যাঁহারা জাতির এই বুদ্ধিযোগে উৎসাহ দেন, সহায়তা করেন, সে ব্যক্তি ও সমষ্টি সমগ্র জাতির বরেণ্য।

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ বাংলার তথা ভারতের এমনি একজন ধীরচেতাঃ, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন জাতীয় চিন্তানেতা, এ কথা বলিলে বোধ করি অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার সহিত একদিনের পরিচয়ে আমাদের এই ধারণাই জন্মিয়াছে। দীর্ঘতর পরিচয়ে এই ধারণা আরও ঘনীভূত হইতে পারে—কিন্তু সে কথা এখন নয়। আমি শুধু একদিনের সাক্ষাৎ-পরিচিতিটুকুই এখানে দিব।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ হিন্দু সম্মেলন উপলক্ষে এই পরিচয়। স্যার নৃপেন্দ্রনাথের নিকট আমরা আগেও দুই একবার বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষ করিয়া গিয়াছি; কিন্তু সে একান্ত বাহিরের পরিচয়। সঙ্ঘের অকৃত্রিম সুহৃদ্ ও অন্তরঙ্গ আত্মীয়স্বরূপ ভূতপূর্ব্ব সেশন-জজ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত আই-সি-এস মহাশয়ই এবার উদ্যোগী হইয়া বাহিরের পরিচয়কে অন্তরের মণিসূত্রে গাঁথিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—ইহার জন্য তাঁহাকেই আমরা সর্ব্বাগ্রে ধন্যবাদ দিব। কিন্তু সে কথা থাক্—স্যার সরকারের কথাটুকুই বলি।

রজত-জয়ন্তী বর্ষের "প্রবর্ত্তকে"র অগ্রহায়ণ সংখ্যাখানি

তাঁহার হাতে দিয়া সহতীর্থ নলিনচন্দ্র ও আমি তাঁকে যেদিন প্রাতে আমাদের হিন্দু সভার পৌরোহিত্য গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলাম, সেদিন আসিবার জন্য দুই একটী কার্য্যকরী কথা ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। স্যার সরকার সঙ্ঘে আসিবার ইচ্ছা জানাইলেন বটে, কিন্তু পৌরোহিত্যেই আপত্তি। সঙ্কোচের হেতু খণ্ডন করিলেন শ্রদ্ধেয় চারুবাবু। স্যার সরকারের কোনও আপত্তিই টিকিল না।

২৪শে অগ্রহায়ণ অপরাহ্ন ৩॥০ টায় তাঁহার মোটর-যান চন্দননগরের, আশ্রমের তোরণ-পথে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রবর্ত্তক নারী মন্দিরের সম্পাদিকা শ্রীমতী অমিয়প্রসূন দত্ত ব্যাকরণ-তীর্থা আশ্রম-কুমারীমণ্ডলীসহ তাঁহাকে সচন্দন-তিলক-চর্চ্চিত করিয়া অভিনন্দন করিলেন। সঙ্ঘের ছাত্র-বাহিনী শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহার অনুগমন করিয়া চলিল। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের শ্রীমন্দির দুয়ারে স্বয়ং সঙ্ঘগুরু স্বজনগণকে লইয়া তাঁহাকে মাল্যবিভূষিত করিলেন। তারপর অর্দ্ধঘণ্টা নিভৃত আলাপ। জলযোগান্তে সভা। এইটুকুই একদিনের সাহচর্য্য ও পরিচয়। বাহিরে এইমাত্র, কিন্তু ভিতরে অনেকখানিই।

স্যার নৃপেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ মর্ম্মগ্রাহী দৃষ্টি সঙ্ঘগুরুর হৃদয়ের ভাষা যেন অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে চিন্তাপাঠ নয়, মর্ম্ম দিয়াই অনুধাবন করিয়া লইল। মুখে কোনও ভাবোচ্ছ্বাস্ নাই; কিন্তু অন্তঃশীলা অবগাহন-শক্তি সঙ্ঘের লক্ষ্য ও জীবন-ধারার গতি ও সুর স্পর্শ করিল। সঙ্ঘের জীবন-ধর্ম্ম যে উচ্চতম সুরগ্রামে বাঁধা, তাহার মর্ম্ম তিনি এক মুহূর্ত্তেই যে ধরিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পরে পাইয়াছি। সেদিন সভাক্ষেত্রে তিনি আদর্শের বিচার শুধু করিলেন—সরল, অনাড়ম্বর, বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায়। বুঝিলাম—ভাষা লইয়া তাঁহার যে সঙ্কোচ ও শঙ্কা, তাহা অমূলক। বাংলার ধীর, স্থির, সুস্থ ও প্রশান্ত মস্তিষ্কের অনাবিল আত্মপ্রকাশ। বাঙালীর মনোজগতে ভাব-বিপ্লব—আবেগে ও তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত; কিন্তু বাংলার মেধা আজও স্বচ্ছ ও সমুজ্জ্বল ক্ষেত্রে স্থিরাসীন। চরম্-পন্থীর উদ্দীপ্ত প্রাণশক্তির সহিত চাই আজ ধীর, স্থির, বিশুদ্ধ মেধা ও মস্তিষ্কেরই শুভ সংযুক্তি।

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন—কোন ক্ষেত্রেই চরম বাদ (Extremism) নিরাপদ্ নহে—কেন না, উহা সত্যের অর্দ্ধখণ্ড দেয় মাত্র। অর্দ্ধ সত্যে আদর্শের ও জীবনের পূর্ণতা কোথায়? "প্রবর্ত্তক" হইতে লেখা উদ্ধৃত করিয়া তিনি সঙ্কেত করিলেন—ভারতের আধ্যাত্মিকতা পরম সম্পদ্। এই সম্পদ্ উপেক্ষণীয় নহে। স্থির কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন তুলিলেন—ভারতের এই মৌলিক আধ্যাত্মিক-তার সহিত কি আধুনিক জগতের জড়বিজ্ঞান ও পার্থিব জীবনধারার একান্ত বিরোধ আছে? তারপর, বিখ্যাত পাশ্চাত্য মনীষীর উক্তি তুলিয়া তিনি ঘুরাইয়া আবার প্রশ্ন করিলেন—ইউরোপ কি শুধুই জড়বাদী, তাহার বিপুল জড়বিজ্ঞান ও জটিল শিল্প-বাণিজ্য-নীতি কি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা-বর্জ্জিত? উত্তরের প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ জন-সঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া তিনি কহিলেন—"এ সম্বন্ধে আমি যাহা ভাবিয়াছি, তাহা স্থির সিদ্ধান্ত রূপে কাহারও মাথায় চাপাইতে আমি প্রস্তুত নহি। প্রত্যেকেই গভীর ও স্বাধীন চিন্তায় ইহার সদুত্তরে উপনীত হউন—ইহাই আমার ইচ্ছা।" অর্ব্বাচীন বাঙালীর অগভীর, চিন্তাহীন মনে গভীর চিন্তাশীলতার উদ্বোধন যে কত প্রয়োজনীয়, তাহা স্যার নৃপেন্দ্র তীব্রভাবেই অনুভব করেন, তাহা বুঝা গেল। তিনি এই চিন্তা-ক্ষেত্রেই বাঙালীকে সহায়তা করিতে তাঁহার অভিজ্ঞতার দুই একটী দৃষ্টান্তচিত্র অতঃপর শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে পরিবেশন করিলেন।

ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন—"সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। ভারতের শেষ প্রান্তে, কুমারী কন্যার সেই নীলাম্বুচুম্বিত শ্যামাঞ্চল যেখানে বিছাইয়া আছে, সেখানে গিয়া কি দেখিয়াছি? ভারতের মৌলিক প্রতিভা কোনদিনই যে একদেশদর্শী খণ্ড সত্যের উপাসক নহে, দক্ষিণ ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনের সমগ্র পরিবেশেই তাহা আজও পরিস্ফুট। একটা সুগভীর আত্মনিষ্ঠা অথচ উন্নতিমুখী গতিশীলতা পরস্পর কেমন সহজ সামঞ্জস্যে ছন্দিত হইয়াই সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে! বিশেষভাবে প্রাচীন হিন্দুরাজ্য ত্রিবাঙ্কুরে পরিক্রমণ করিলে দেখা যায়—এখানে হিন্দু-ভারত তাহার আপন সংস্কৃতি

ও বৈশিষ্ট্য এতটুকুও হারায় নাই ; নিজস্ব যাহা, তাহার উপর সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াই ত্রিবাঙ্কুর যুগের শিক্ষা ও বিজ্ঞান বরণ করিয়াছে—ইহাতে ত অসামঞ্জস্য কোথাও নাই! জড়বিজ্ঞান বলিতেই যে তাহা শুধু অধ্যাত্মবিরোধী অনর্থ সৃষ্টি করিবেই, ইহা সত্য নয়। ইউরোপের বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক সংগঠন-নীতি তাহাদের বর্ত্তমান অপব্যবহার-মুক্ত করিয়াও সুপ্রয়োগ করা যায়—ত্রিবাঙ্কুর এই পথেই আজ চলিয়াছে। পশ্চিমের আধুনিকতম শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ ত্রিবাঙ্কুর রাজশক্তি এই হিন্দুরাষ্ট্রে প্রবর্ত্তন করিয়াছে—বোধ হয় বর্ত্তমান ভারতের সকল প্রদেশ—এমন কি খাস বৃটিশ ভারতের চেয়েও ইংরাজী সুশিক্ষিত নরনারীর আনুপাতিক সংখ্যা এই ত্রিবাঙ্কুরেই গরিষ্ঠ—কিন্তু তাহার ফলে হিন্দুর শাশ্বত ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও সামাজিক স্থিরভূমি একবিন্দু বিচলিত হয় নাই।"

চিত্রময়ী প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁহার পরিদর্শনের আলিপনা টানিয়া, স্যার নৃপেন শ্রোতৃবৃন্দকে যেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ ভারত ঘুরাইয়া দেখাইয়া চলিলেন—যেখানে যুগ-শিক্ষায় সুশিক্ষিতা হিন্দু মহিলা গৃহাঙ্গনে স্নেহের নীড় পাতিয়া অনাদিকালের ন্যায় পতি-পুত্র-স্বজনকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করাইয়া তৃপ্তি পাইতেছে, পশ্চিমের উচ্চশিক্ষা তাহাদের গৃহকর্ম্মে বিমুখ বা সেবাধর্ম্মে বিন্দুমাত্র আস্থাহীন করে নাই—যেখানে হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ বিচার-পতি চীফ-জাষ্টিস পবিত্র জাতীয় বেশে, নগ্নপদে, নিঃসঙ্কোচে পথে হাটিয়া চলিয়াছেন—পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাসবহুল বাহ্যাড়ম্বর তাঁহাদের সহজ, সরল, স্বাভাবিক ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কোনই ব্যতিক্রম বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিতে পারে নাই—যেখানে উন্নত বিদ্যুচ্চালিত যন্ত্রশিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর কুটীরশিল্পে অনুরাগ এখনও যায় নাই—যেখানে স্বয়ং ত্রিবাঙ্কুরেশ্বর যুগ-শিক্ষায় সুপণ্ডিত হইয়াও হিন্দু-রাজধর্ম্মের চিরন্তন নীতি ও অনুপ্রেরণা অনুসরণ করিয়া আপনাকে রাজ্যের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা শ্রীশ্রীপদ্মনাভের ভক্ত সেবক-কিঙ্কর মাত্র গণ্য করিয়া প্রতিদিন দেবপ্রসাদ-গ্রহণেই রাজকার্য্য আরম্ভ করেন ও এই ভাবে দেবতার কিঙ্কর রূপেই রাজ্যশাসন ও প্রজা পালন করেন—হিন্দু ভারতের সমন্বয়ময়ী জীবন প্রতিভার এমন উজ্জ্বল ও অকাট্য নিদর্শন দেখিয়া কে অস্বীকার করিবে—খণ্ড সত্যের আদর্শ নহে, পরিপূর্ণ জীবনধর্ম্মের অনুসরণই ভারতের চিরন্তন লক্ষ্য ও সাধনা? ইহাই আমাদের সনাতন জাতীয় আদর্শ—নবজাতির সম্মুখে এই পরিপূর্ণ লক্ষ্যই আজ স্থাপন করিতে হইবে। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সেদিনের বক্তৃতায় এই দিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের কর্ম্ম ও সাধনায় এমনই পূর্ণাঙ্গ জীবন-ধর্ম্মের যে পরিচয় তিনি পাইয়াছেন, তাহার প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা-বাণী জ্ঞাপন করিয়া তিনি সেদিনের সভা সমাপন করিলেন।

কিন্তু স্যার নৃপেন্দ্রনাথের মর্ম্মময়ী চিন্তা আরও নিগূঢ় ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে সঙ্ঘের সংগঠনশক্তিকে উদ্দীপিত ও আলোকিত করিয়া তুলিতেছে। আদর্শের সমুচ্চ সুরকে দেশের রাষ্ট্রীয় চিন্তা, কর্ম্ম ও পরিস্থিতির সহিত কোন্ গ্রামে মিলাইয়া, কিরূপে সমধিক ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত ও সুফলপ্রসূ করিয়া তোলা যায়, তাহার জন্য তাঁহার বিশাল প্রতিভা আজ গভীরেই চিন্তারত। বাংলার হিন্দু সমাজ ও জাতি আজ সনাতন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া কেমন করিয়া সুসংহত ও সংগঠিত হইয়া উঠে, ইহাই আজ হিন্দু বাঙালীর জীবন-মরণ প্রশ্ন বলিলে অত্যুক্তি হয় না—এ প্রশ্নের সমাধানে স্যার নৃপেন্দ্রনাথের ন্যায় ভারতবিশ্রুত মনস্বী মনীষীর দেয় অবদান শুধু চিন্তাক্ষেত্রে নহে, কর্ম্মক্ষেত্রেও যে কতখানি, তাহা তাঁহার সহিত একদিনের সংস্পর্শে আসিয়া সঙ্ঘ গভীরভাবেই উপলব্ধি করিয়াছে। পরিচয়ের নিবিড়তায় অন্তরের সম্বন্ধ যতই গাঢ়তর হইবে, বাংলার সংগঠন-বীর্য্য ততই সমুচ্চ ও অভিনব প্রতিভার আলোকে উদ্দীপিত ও জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিবে—এই ধ্রুব বিশ্বাস ও প্রত্যয় পাইয়াছি—শ্রীভগবানই বাঙালী জাতির অন্তর্নিহিত মর্ম্মাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ করিবেন। আমরা স্যার নৃপেন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবন এবং অনাহত মানসিক, শারীরিক, সার্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য প্রার্থনাই বারম্বার করিতেছি।

নবদ্বীপ প্রবর্ত্তক রজত-জয়ন্তী উৎসব-সভায় বিপুল জনতার একাংশের দৃশ্য

# প্রবর্ত্তক রজত জয়ন্তী ঃ নবদ্বীপ

( নবম মাসিক অনুষ্ঠান )

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

একটানা ঝিঁঝিঁর তান ছাড়া অমাঘোর সান্ধ্য প্রকৃতির আর কোথাও এতটুকু বিক্ষোভ নাই। দুর্জ্জয় লিঙ্গের এক জনবিরল প্রত্যন্ত। সামনে বিরাট গিরিগহ্বরে যমপুরীর বিভীষিকা। উইওসর লজের নিরালা প্রকোষ্ঠে নীরবে বসিয়া আমি, স্বামিজী আর সঙ্ঘগুরু। সান্ধ্য উপাসনান্তে পূজনীয় সবেমাত্র ত্রিরাত্রির মৌন ভাঙ্গিয়াছেন। সৃজনের উন্মাদনা তাঁর মুখচোখে উপচিত। সদ্য জয়ন্তী উৎসব-সাফল্যে উৎফুল্ল অমৃতানন্দজী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কথা উঠাইলেন: ১লা পৌষ প্রবর্ত্তকের নবম জয়ন্তী নবদ্বীপে রমণ ভাই করুক। তাহলে আমার পূর্ণ সহযোগিতা আছে। বিষয়টা আজই স্থির হয়ে যাক্।

কোন চাপ না পড়ে এমনি সহাস্য সহজতায় প্রভু মন্তব্য করিলেন: হ্যাঁ, নবদ্বীপ শুধু নদীয়ার নহে—বাংলার একমাত্র তীর্থ। জয়ন্তীর অধ্যাত্ম-প্রবাহ অনুধাবনীয়। মাতৃশক্তি অলক্ষ্যে কাজ করছেন।

জয়ন্তীর কেন্দ্র পুরুষের অভিপ্রায় বুঝিয়া একরূপ স্বীকারই করিলাম: আচ্ছা নবদ্বীপেই হবে।

কুষ্টিয়া আর নবদ্বীপের মাঝে তখনও মনটা দোল খাইতেছিল।

দৈনন্দিন কাজের চাপে ব্যাপারটার উপর যবনিকা পড়িল। অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি একবার টনক নড়িতেই নবদ্বীপ যাত্রা করিলাম। নবদ্বীপের তীর্থ মহিমা স্মরণ করিয়া বুকে বড় আশা জাগিল। কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ে বুঝিলাম, স্থান-মাহাত্ম্য যুগপ্রভাবে কোন্ ঠাসা হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বত্রের মত নবদ্বীপও বাদ-বিসম্বাদে বহুধা বিভক্ত। বাহিরের ভাবতরঙ্গ এখানেও আবিল আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছে। অধিকন্তু রাজনৈতিক-ঘূর্ণির ভক্ত পাকে শাক্ত-বৈষ্ণব-মোহান্তের মনেও রং ধরিয়াছে। যুগধর্ম্মে জীবিকার প্রয়োজন বড় হইয়া এখানেও গোল পাকাইয়াছে। প্রথম প্রচেষ্টায় কোথাও কোথাও প্রাচীনতার দোহাই দিবার মানুষ মিলিল বটে, কিন্তু কার্য্যকারী দরদী প্রাণের বেশী সন্ধান পাইলাম না। তবুও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলাম এই আশায় যে, যদি বা একটু আশ্রয়ের ঠাঁই মিলে।

অতিব্যস্ত ডাক্তারমহলের যে সমর্থন পাইলাম তা অনেকটা আসন্ন ট্রেণ ধরিবার পথে আলাপের মত। পর্দ্দার আড়াল হইতে সম্পূর্ণ সহানুভূতির প্রতিশ্রুতিও অনেক সুবিজ্ঞ প্রৌঢ়ের নিকট পাইলাম। জাতীয়-সংস্কৃতি-সঙ্ঘের উদীয়মান তরুণ সভ্যদের সহিত আলাপ হইল। কর্ত্তৃপক্ষ-স্থানীয় একজন বলিলেন: আপনাদের ভাব ও আদর্শ জানতে পারলে তবেই কি ভাবে আমরা সাহায্য করতে পারি, ভেবে দেখতে পারি।

বলিলাম: সংক্ষেপে বলা চলে, ধর্ম্ম এবং ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে আমরা জাতিগঠন করতে চাই।

—মধ্য যুগের ধর্ম্মই জাতিটাকে বহুধা বিভক্ত করেছে, এ যুগেও এর অন্যথা হবে না। বন্ধু মন্তব্য করিলেন।

—হ্যাঁ, তা ঠিক, কিন্তু ধর্ম্মের নামে সেটা ছিল বিকৃতি। ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের যদৃচ্ছা ব্যাখ্যা, টিকা-টিপ্পনীর কবলে পড়ে ধর্ম্ম বহুরূপী হয়ে পড়েছে। অন্যথায় হিন্দুর ধর্ম্ম—মানবতার ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম যথাযথ আচরিত হলে শুধু হিন্দুর কেন, বিশ্বের শ্রেয় ও অভ্যুত্থান আনবে।

গম্ভীরভাবে তরুণ বন্ধুটি প্রশ্ন করিলেন: ধর্ম্ম বলতে আপনারা কি mean করেন?

-তেমন গুরুতর কিছুই নয়—জীবন ও জগতের দর্শন ধর্ম্ম—সৃজনের মূল principle; বেদ ইহার ভিত্তি। বেদ অর্থে জ্ঞান। হিন্দুর শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায় ইহার সমর্থক। এই বেদাদি শাস্ত্র জীব ও সৃষ্টির জ্ঞান,

কর্ম্ম তথা জন্মান্তরের সন্ধান দিয়াছে। এই ত্রয়ী নীতির উপর ভিত্তি করে একটা সম আচারশীল ঐক্যমতাবলম্বী সমষ্টি চাহিয়াছে ধর্ম্ম, অর্থ, সমাজ ও রাষ্ট্রে জাগরণ এবং প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্য এখানে স্বীকৃত হয়নি বলেই এই নৈর্ব্যক্তিক নীতি সর্ব্বজনগ্রাহ্য এবং অপ্রতিবাদী।

বন্ধু বলিলেন: খটমট বিষয়—তর্কের অনেক কিছু আছে। আমি বলি, ধর্ম্মকে বাদ দিলেই বা এমন কি এসে যায়। এই মানুষই তো পথ চল্‌তে চল্‌তে আজকে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে ধর্ম্মকে না ধরেও তারা অর্থ, সমাজ, রাষ্ট্রের ভিত্তি পত্তন করেছে। পাশ্চাত্য দেশে যা সম্ভব, তা এ দেশেই বা হবে না কেন?

—ভিত্তি-পত্তনের সূচনা-পর্ব্বেই ও-দেশেই তার তুমুল প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে। কালের উদ্বর্ত্তনে কি দাঁড়ায়, তার জন্য দীর্ঘ শতাব্দী অপেক্ষা করতে হবে: হেসে উত্তর দিলাম: আর আপনার কথা মেনে নিলেও দেশের মাটি, জল, আব্‌হাওয়া ও রক্তের বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা যায় কি করে? পরকীয় আদর্শ ও পন্থায় অর্জ্জিত ব্যবস্থা এবং স্বাধীনতা তো এই দেশের রক্তপুষ্ট ভাবানুকুল স্বাধীনতা হবে না। সেটা পরাজয়েরই নামান্তর আমি বলিব। আর ধর্ম্মবিহীন সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ কতকাল কতটুকু তৃপ্তি পেতে পারে, তার শেষ কথা বলার সময় এখনও হয়নি।

—স্বাধীনতা লাভের পন্থা ও প্রোগ্রাম কি আপনাদের? বন্ধুর সশ্রদ্ধ প্রশ্ন।

বলিলাম: ছোট্ট একটি কথা—সংগঠন। হিংসা, দ্বেষ, আন্দোলন, প্রতিবাদ নয়, শুধু অন্তর্গঠনের মধ্য দিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টির পরিচ্ছন্ন মেধা ও প্রাণের জাগরণ।

দু'জন তরুণই যুগপৎ প্রশ্ন করিলেন: তা আন্দোলন ভিন্ন সংগঠনই বা কি করে হয়?

কেনই বা হবে না, বন্ধু: সসম্ভ্রমে বলিলাম: এ তো কিছুকে ভাঙ্গা বা ধ্বংস করা নয়। একটা চিন্তা, ভাব এবং গোটাকতক positive principle-এর জীবনে নিত্য অনুশীলন ও আচরণ। অবশ্য একটু সময় সাপেক্ষ এবং সেই হেতুই এর স্থায়িত্বও দীর্ঘ। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মত ও পথ সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা জয়ন্তী সভায় বিশদভাবে বলবেন। আশা করি, আপনাদের সহযোগিতা পাব।

কথায় কথায় অনেক রাত্রি হইল। তরুণ বন্ধুদ্বয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন: আমাদের সংস্কৃতি সঙ্ঘ তো ধর্ম্ম মানে না। তাই সঙ্ঘ হিসাবে এই সভার সহযোগিতা সম্ভব নয়! তবে ব্যক্তিগতভাবে আপনি যা চাইবেন, তা সানন্দে করব।

—ধন্যবাদ, নমস্কার: বলিলাম: ধর্ম্ম ছাড়া সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও চেহারা আমরা কল্পনাই করতে পারি না। আচ্ছা, প্রয়োজন হ'লে নিশ্চয়ই জানাবো।

পরদিন। বাকী সাক্ষাৎ, সভাপতি ও সভার স্থান, এই একটা দিনের মধ্যেই শেষ করিতে হইবে। প্রথম প্রভাতেই আঘাত পাইলাম। সভার কথা উঠিতেই প্রবীণ ভদ্রলোক বলিলেন: মতিবাবু আস্‌ছেন, সভা হচ্ছে তাতে আমার মাথা ব্যথা কি? প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ দেশের জন্য এমন কি করেছে?

অনর্থক এ উত্তেজনা। হয়তো বা কোন হেতু আছে।

বিনম্র কণ্ঠে বলিলাম: আহ্বান করাটা আমার কর্ত্তব্য এবং যাওয়াটা আপনার বিবেচ্য। সঙ্ঘ কি করেছে তার তালিকা দিবার এ সময় নয়, আর আপনারও তা জানবার আগ্রহ অনুভব করছি না।

প্রায় অর্দ্ধ অবনত নমস্কার জানিয়ে বিদায় লইলাম। দুই তিন স্থান ঘুরিয়া একটা নব নির্ম্মিত প্রকাণ্ড বাড়ী দেখিয়া ধীর সন্তর্পণে প্রবেশ করিলাম। ধব্‌ধবে ফরাসে বিশিষ্ট গুটি তিনেক ভদ্রলোক বসিয়া। পাশের ঘরে আসন, ধূপ, দীপ প্রভৃতি পূজার উপচার দেখিয়া একটু ভরসা হইল। সবিনয়ে সভার কথা উত্থাপন করিলাম। হাসির লহরী তুলিয়া একজন উত্তর করিলেন: হাঃ—হাঃ আমি কোন সভা সমিতির মধ্যে নেই মশায়। অবসর জীবনটা সুখে শান্তিতে বাস করবো বলে এই গৌর-গঙ্গার তীর্থে বাসা বেঁধেছিলাম, কিন্তু দলাদলির ঠেলায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। দু'দণ্ড বসে ধর্ম্মকথা কইবার ঠাঁইও নেই। এর চেয়ে স্বগ্রামের ভিটেতে বাসা বাঁধা ছিল ঢের ভাল।

আমার মুখের কথা কাড়িয়া সঙ্গী তুলসীদা দৃপ্তকণ্ঠে

উত্তর করিলেন : প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ সকল দলাদলির উপরে। এদের সাহায্য আপনার করতেই হবে।

কথা না বাড়াইয়া বলিলাম : আর কিছু করেন আর না করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক সবান্ধব জয়ন্তী উৎসবে যোগদান করে পূজনীয় মতিবাবুর বক্তৃতাটা কিন্তু শুনবেনই।

মধ্যাহ্ন গড়াইয়া গিয়াছে। তুলসীদাকে বিদায় দিয়া বাসায় ফিরিলাম। মাঝপথে মাসীমার বাসায় উঠিলাম। ভদ্রলোকের কথাটা বোধহয় মনে ধরিয়াছিল, তাই অজ্ঞাতসারেই মাসীমাকে উপলক্ষ করিয়া কথাটার পুনরুক্তি করিয়া ফেলিলাম : নবদ্বীপে যে দলাদলি—গৌর-গঙ্গার মাহাত্ম্য আর নেই, কি বলেন মাসীমা?

কে বললে তোকে : ব্যথিত কণ্ঠেই যেন মাসীমা উত্তর করিলেন : নিত্য পাঠ-কীর্ত্তন, গৌর-দর্শন আর গঙ্গাস্নান, এ আর কোথায় মিলবে? অত দরজায় দরজায় না ঘুরে গৌরের উপর নির্ভর কর, তোর কাজ ঠিক হয়ে যাবে।

মাসীমার বিশ্বাসপূত বাক্যে ইষ্ট নির্ভরতা যেন ফিরিয়া পাইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মনটার উপর থেকে যেন একটা গুরুভার অপসারিত হইল।

বৈকালে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। বন্ধুরা ভরসা দিলেন : কিচ্ছু আটকাবে না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

দেশের আত্মিক আবহাওয়া ফিরাইয়া আনা জয়ন্তী উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই নবদ্বীপের সর্ব্বজনমান্য শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চণ্ডীচরণ তর্কতীর্থ মহোদয়কে সভাপতিত্বে বৃত করার ইচ্ছা থাকিলেও, তাহা সফল হইল না। ব্রাহ্মণ্যপ্রতিভা আজ অনড় শাস্ত্রনিষ্ঠায় পর্য্যবসিত। কার্য্য সৌকর্য্যার্থে কালোপযোগী যে সম্প্রসারণশীলতার প্রয়োজন তাহা না থাকায়, লক্ষ্য করিলাম, নবদ্বীপের এতগুলি সচল টোল ও একদা বরণীয় বিপুল পণ্ডিতসমাজের প্রভাব আজ ক্ষীণপ্রভ এবং সাধারণের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিতে অসমর্থ। নবদ্বীপ পত্রিকার সম্পাদক লোকপ্রিয় শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহোদয়ও পণ্ডিতসমাজের নূতনকে মানাইয়া লইবার কর্ম্মকৌশলহীনতার উল্লেখ করিয়া, উৎসবে আন্তরিক সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন।

সভার স্থান 'বড় আখড়া' ঠিক করার ভার রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাণস্বরূপ শ্রীযুত তুলসীদাস রায়ের উপর দিয়া কলিকাতায় ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে ঈশ্বরপ্রসাদের মতই অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীযুত জনরঞ্জন রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ। নবদ্বীপের কেন্দ্রস্থল পোড়ামাতলার উপর তাঁর বিরাট্‌ ভবনের পাশ দিয়া অনেকবার যাতায়াত করিয়াছি, কিন্তু এই নিরালা পুরী হইতে তাঁকে ডাকিয়া বাহির করিয়া আলাপ করিবার মত সূত্র খুঁজিয়া পাই নাই। নবদ্বীপে সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুত রায়ের মত অমন সুযোগ্য অতিথির অযাচিত আগমনে তিনি নিজেদের ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিলেন এবং তাঁর যথাসাধ্য সেবার ভরসা দিলেন।

সঙ্ঘশক্তির অনুকূল হস্তের সুস্পষ্ট নিদর্শন পাইয়া কলিকাতা ফিরিবার পথে বেশ একটা প্রসন্ন নিশ্চিন্ততা বোধ করিতে লাগিলাম।

ব্যাপক নিত্য কর্ম্মব্যস্ততার মাঝে দেখিতে দেখিতে গোণা দিন কাটিয়া গেল। উৎসবের মাত্র তিন দিন বাকী। এখনও সভার সরকারী অনুমতি পাই নাই। দুর্ভাবনা লইয়াই নবদ্বীপ রওনা হইলাম। সঙ্গে বিশ্বনাথ। নবদ্বীপে পৌছিয়াই জনদাকে সঙ্গে লইয়া তখনই কৃষ্ণনগর রওনা হওয়া গেল। আর একটুখানি বিলম্ব হইলেই সব মাটি হইত। দেখি, সদর মহকুমার হাকিম আমার দরখাস্তের উপর হুকুম দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। পুলিসের প্রতিকূল রিপোর্টের উপর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট অনুকূল মন্তব্য করিতে পারেন না বলিয়া জানাইলেন এবং বলিলেন যে, তিনি একবার হুকুম দিলে কমিশনারের আদেশ ব্যতীত আর গত্যন্তর রহিবে না।

সময় সন্নিকট। বিশ হাত জলের নীচে যেন ডুবিলাম। সভার উদ্দেশ্য হাকিমকে বুঝাইলাম। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন যে, যদি পুলিশ রিপোর্ট সংশোধন করাইতে পারি তবে তাঁর কোন আপত্তি নাই।

দরখাস্তখানা ফিরাইয়া লইলাম বটে, কিন্তু স্থানীয়

ইন্সপেক্টরবাবুও কিছু করিতে পারেন না নবদ্বীপ থানার অফিসারের বিনা সম্মতিতে। সেটাও সময় সাপেক্ষ। অথচ সময়ের সঙ্গে ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। কি আর করি! কূলহীন নিরুপায়তার মাঝে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত উন্মুখ করিয়া ধরিলাম মাতৃশক্তির উদ্দেশ্যে। স্মরণ হইল পূজনীয় সঙ্ঘগুরুর কথা, "এ উৎসবের পশ্চাতে মাতৃশক্তি অলক্ষ্যে কাজ করছেন।"

আবেশ ভাঙ্গিল জনদার বিস্মিত কণ্ঠের সোল্লাস ধ্বনিতে। অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দেখাইয়া বলিলেন: ভালই হল, ঐ যে নবদ্বীপের দারোগাবাবু সাইকেল থেকে নামছেন।

ঘটনার এমন আকস্মিক ও অনুকূল সমাবেশে অন্তর আমার চমকিত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, আত্মশুদ্ধির জন্য সাধকের কর্ম্ম, কিন্তু তার সময় ও ছন্দ রক্ষায় সাধকের সতর্ক হওয়া উচিত।

ব্যাপারটা তেমন মারাত্মক কিছুই ছিল না। অপ্রত্যাশিত সহজভাবেই অনুমতি মিলিল।

পরদিনই রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে অফিস বসিল। দিবারাত্র কাজ চলিয়াছে। বন্ধুবর শচীন্দ্রনাথ নন্দী সমস্ত কাজের বিধিব্যবস্থা ছকিয়া বণ্টন করিয়া দিলেন। দেশপ্রাণ শ্রীযুত বীরেশ্বর বসু, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ গোস্বামী, ভাইস্ চেয়ারম্যান বন্ধুবর শ্রীযুত নিরঞ্জন মোদক প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণ কাজের তত্ত্বতালাসি করিতে লাগিলেন। সুহৃদ্বর শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী, শ্রীমান সৌরীন্দ্রনাথ আচার্য্য ও শ্রীমান বৈদ্যনাথ দত্তের নীরব সহৃদয় সহযোগিতা কর্ম্মপ্রবাহকে পুষ্ট করিল। ভক্তিপ্রাণ শ্রীযুত তুলসীদাস রায়, শ্রীযুত জগবন্ধু সান্যাল, ডাক্তার আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, সোদরপ্রতিম শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী, শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত, শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত, শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ও স্কুল অব্ ফিজিক্যাল কালচার এবং বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের তরুণ সভ্যবৃন্দ উৎসবকে সার্ব্বজনীন সফল করিয়া তুলিবার জন্য অবিরাম আপ্রাণ শ্রম ঢালিতে লাগিলেন। তরুণ বন্ধুদের উৎসাহের অন্ত নাই। ব্যাণ্ডবাদ্য, ফ্লাগবিল, পোষ্টার প্রভৃতি বিবিধ উপকরণের মধ্য দিয়া উৎসবের আগমনী বিঘোষিত হইল। ষ্টেশন হইতে সহরের প্রবেশ মুখে, মধ্যস্থল পোড়ামাতলায় এবং সভাস্থল 'বড় আখড়ায়' যাইবার প্রবেশ পথে তিনটি তোরণ নির্ম্মিত হইল। বস্তুতঃ এই রাজকীয় সমারোহ সারা সহরটিকে সরগরম করিয়া তুলিল। সমগ্র নদীয়া নগরীর চিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিল আসন্ন উৎসবক্ষণটীর জন্য।

১৫ই ডিসেম্বর নদীয়াবাসীর পক্ষে সঙ্ঘগুরুকে সম্বর্দ্ধনার বিপুল আয়োজন দেখিয়া আমার প্রাথমিক আশঙ্কা ও ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন হইল। মর্ম্ম দিয়া বুঝিলাম, প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই পুণ্যভূমি নবদ্বীপের অধিবাসী আধুনিক কালের ভেদ-বিভেদপূর্ণ বিষময় আব্-হাওয়ার মধ্যেও গুণীকে যোগ্য সমাদর দিবার মহত্ত্ব হারায় নাই।

অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় ই, আই, রেলপথের নবদ্বীপধাম ষ্টেশনে সপারিষদ শ্রীযুক্ত রায় পৌঁছিলে প্রথমেই ভারতীয় প্রথায় বঙ্গবাণী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীবৃন্দ তাঁহাকে চন্দনচর্চ্চিত করিয়া শঙ্খধ্বনি, পুষ্প ও লাজ বর্ষণের মধ্যে অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীযুক্তা ইন্দুবালা রায় মহিলাদিগের পক্ষে তাঁহাকে মাল্য বিভূষিত করিলেন। তারপর নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে চেয়ারম্যান শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ গোস্বামী, হিন্দুসভার পক্ষে সম্পাদক শ্রীযুত সূর্য্যকান্ত ভট্টাচার্য্য, ইঙ্গ-সংস্কৃত লাইবেরীর পক্ষে সম্পাদক শ্রীযুত জনরঞ্জন রায়, পূর্ণিমা সাহিত্য সম্মিলনীর পক্ষে সম্পাদক শ্রীযুত সৌরীন্দ্রমোহন আচার্য্য, স্কুল অব্ ফিজিক্যাল কালচার-এর পক্ষে সম্পাদক শ্রীযুত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির পক্ষে সম্পাদক শ্রীযুত তুলসীদাস রায়, সারস্বত মন্দিরের পক্ষে প্রধান আচার্য্য শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ নন্দী সঙ্ঘগুরুকে মাল্যদান করিলেন। ইহার পর বিজলী ক্লাব, স্কুল অব্ ফিজিক্যাল কালচার এবং বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের সভ্যগণ কর্তৃক সামরিক কুচকাওয়াজ ও মিলিটারী ব্যাণ্ডবাদ্যসহ বিপুল শোভাযাত্রা সহকারে প্রায় দুই ঘণ্টাধিক নদীয়ার প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমণ করিয়া শ্রীযুক্ত রায়কে তীর্থ-দেবতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে এবং তথা হইতে গোকুলানন্দ ঘাটের 'মতি ভবনে' লইয়া যাওয়া হইল।

স্থানীয় কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের মোটর শ্রীযুত রায়ের ব্যবহারার্থে প্রদত্ত হইয়াছিল। উৎসব উপলক্ষে বিংশাধিক সঙ্ঘ-সভ্যও উপস্থিত হইলেন। অভ্যাগতগণের পরিচর্য্যা ও যাবতীয় ব্যবস্থার ভার মাতৃমন্দিরের পরিচালিকা সেবা-পরায়ণা নলিনী দেবী ও সেবা-সমিতির ডাক্তার বলাই বাবুর তত্ত্বাবধানে সমিতির সেবকবৃন্দ শেষ পর্য্যন্ত সাতিশয় নিষ্ঠার সহিত বহন করিলেন। এই উৎসবে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বাগচী ও বাসুদেব মোহান্তজীর সহযোগিতাও উল্লেখযোগ্য।

১৬ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে সভাপতি শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় আসিয়া পৌঁছিলেন এবং মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীযুত তিনকড়ি বাগচী মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তিনকড়িবাবুর আদর-আপ্যায়নের সীমা নাই। সভাপতি আসিয়া পৌঁছানোয় সকলেই আশ্বস্ত হইল। এজন্য আগাগোড়া কেষ্টদার সযত্ন-তৎপরতাই দায়ী। স্থানীয় বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সাদর আহ্বান রক্ষার্থে সারাটি দিন তুষারবাবুকে ব্যস্ত হইয়াই থাকিতে হইল।

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায়

অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকায় শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষের পৌরোহিত্যে বহু প্রত্যাশিত জয়ন্তী উৎসব আরম্ভ হইল। ইহা প্রবর্ত্তক মাসিক পত্রিকার নবম মাসিক অনুষ্ঠান ৫।৬ হাজার উৎসুক নরনারীর ভীড়। বড় আখড়ার প্রশস্ত হলঘর ভর্ত্তি হইয়াও রাস্তায় দর্শকবৃন্দ দাঁড়াইয়া। স্থানাভাবে অনেকে ফিরিলেন। সভাপতি আজই সন্ধ্যা ৭টার গাড়ীতে ফিরিবেন। সভার প্রারম্ভেই সমাপ্তির তাড়া সুষ্ঠু শৃঙ্খলাকে খিতাইবার অবসর দিল না। অধ্যাত্ম আবহাওয়া-সৃজনানুকূল স্বামী অমৃতানন্দজীর মধুবর্ষী কণ্ঠের গম্ভীর বৈদিক প্রণতি কলরবের মাঝে তলাইয়া গেল। সঙ্ঘ-সম্পাদক শ্রীযুত অরুণচন্দ্র দত্ত সভাপতিকে এবং শ্রীযুত তুলসীদাস রায় সঙ্ঘগুরুকে পুষ্পমাল্য দ্বারা বরণ করিলে পর, সঙ্ঘচারণ প্রফুল্লদার দরাজ কণ্ঠের উদ্বোধন সঙ্গীত বিদ্যুৎ চমকের মতই মুহূর্ত্তের জন্য একটা স্তম্ভন সৃষ্টি করিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই বিক্ষোভের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল কার্য্যসূচীর কাট-ছাঁট লইয়া। একা সঙ্ঘগুরুর উদ্দেশ্যে রচিত আটখানা অভিনন্দনের মধ্যে পাঁচখানাকেই সময়াভাবে বাধ্য হইয়া বাদ দিতে হইল। প্রথমেই নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে চেয়ারম্যান শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ গোস্বামী মহাশয় শ্রীযুত রায়কে নিম্নলিখিত মানপত্রের দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিলেন :—

মহোদয়েষু—

হে মনস্বী, নবদ্বীপ পৌরসভার পক্ষ হইতে আমি আজ আপনাকে অভিনন্দিত করিবার অধিকার লাভ করিয়া নিজেকে শুধু ধন্য মনে করিতেছি না, আনন্দিতও বোধ করিতেছি। হে মহাপ্রাণ, আপনি স্বাগত, সুস্বাগত।

আমরা শুনিয়াছি প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মূলমর্মে বাংলার জাতীয় জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তির সন্ধান নিহিত রহিয়াছে। এই সঙ্ঘ সংগঠনে আপনার আজীবন নিষ্ঠা, সাধনা ও আদর্শ যে সকল কর্ম্মবীজ ভবিষ্য-সম্ভাবনার বিপুল ইঙ্গিত বহন করিতেছে তাহা বাঙালীর একান্ত গৌরবের। তাই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বলিতে আজ জাতীয় সমবায় শক্তির উৎস বুঝায়—ব্যাঙ্ক, জীবন বীমা, বিদ্যায়তন, শ্রমশিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য।

সর্ব্বোপরি কর্ম্ম শৃঙ্খলার মধ্যে আপনি জ্ঞান, বৈরাগ্য, সাধনা, শ্রী, কর্ম্ম ও আদর্শ রূপায়িত করিয়া প্রতিষ্ঠান-শক্তিকে যে অধ্যাত্ম-মহিমা দান করিয়াছেন তজ্জন্য আপনি দেশবরণীয় ও সর্ব্বজন মান্য।

বাঙলার ঠাকুর প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান ও লীলাভূমি জাহ্নবী সেবিত এই নবদ্বীপের প্রতি তীর্থধূলি সেই মহামানবের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত। হে সৌম্য, আপনাকে আজ অতিথিরূপে সম্বর্দ্ধনা ও স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া আমি দেশের সেই ঐতিহ্যকেই মাত্র স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

আশা করি, নবদ্বীপের নাগরিকবৃন্দ ও পৌরজনগণ আপনার আদর্শে প্রাণবন্ত হইয়া উঠুক। আর, লাভ করুক আপনার জ্ঞান সাধনা

সমুন্নত কর্ম্মময় ভোগমুক্ত এক একটা উদার মহত্তর শুদ্ধসত্ত্ব প্রাণ। হে বরেণ্য, আপনি আমাদের সকলের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি-নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

১লা পৌষ, ১৩৪৭
নবদ্বীপ।

ভবদীয়—
শ্রীসতীন্দ্রনাথ গোস্বামী,
এম্, এস্‌সি, বি-এল্।
চেয়ারম্যান নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটি।

নবদ্বীপ সাহিত্য-সভা পূর্ণিমা সম্মেলনের পক্ষ হইতে বন্ধুবর দেবনারায়ণ গোস্বামী শ্রীযুত রায়কে যে মানপত্রের দ্বারা অভিনন্দিত করিলেন তাহা এই :—

সুচরিতেষু,

হে বরেণ্য অতিথি, তুমি শুধু আজ আমাদের অভ্যাগত নও, আমাদেরই একজন। নবদ্বীপ সমাজের সংস্কৃতি—বাংলার তথা ভারতের সমগ্র পরিচিত। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম, আগমবাগীশের তন্ত্র ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান—এই নবদ্বীপ, বাংলার আর্য সংস্কৃতি, নব্য ন্যায়, নব্য স্মৃতির পীঠভূমি। হে গুণি, তোমার আজীবন প্রবর্তিত সঙ্ঘপ্রাণ, জনসংগঠন কার্য, অর্থনীতি, সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা ও প্রাণপ্রাচুর্য সমগ্র বাংলার ধর্ম ও কর্মমনীষাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে—তোমাকে পাইয়া তাই আমরা আজ ধন্য।

হে লোকোত্তম ধীমান্! ভারতের এই বিপর্যয় মুহূর্তে, জাতীয়-জীবনের দুর্বল দৈন্যে তোমাকে আত্মসচেতন করিয়া যে শক্তি, পৌরুষ, ওজস্বিতা ও প্রচণ্ড আদর্শ কর্মপ্রেরণা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তুমি তারই পথ-প্রদর্শক মূর্তিমান প্রবর্তক।

হে দেশব্রতি! তোমার মেঘ-মন্দ্র কণ্ঠের জাগৃতির আহ্বান-মন্ত্রের পাঞ্চজন্য নাদ ভারতের প্রতি কর্মক্ষেত্র মর্যাদাময় জীবনস্পন্দনে সঞ্জীবিত করুক্। বাঙালী তোমার অধ্যাত্ম-আলোকে সমুদ্দীপ্ত হইয়া আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হউক।

হে মনস্বি! তুমি শুধু প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা নও—উহা তোমার আত্মর একটা উৎস মাত্র। ধর্ম ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে, সমাজে ও রাষ্ট্রে, বিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে, শিল্পে ও সাহিত্যে তোমার আদর্শ প্রেরণা বাংলার তারুণ্যকে উজ্জীবিত করিয়া তুলুক।

ওগো অনুপম কর্মযোগি! জ্ঞান, বৈরাগ্য, বীর্য, শ্রী ও সাধনার তুমি যুগধর্মের নব বার্তাবহ। তুমি শুধু প্রবর্তক সঙ্ঘেরই নও—আমাদেরও পরমাত্মীয়।

নবদ্বীপ পূর্ণিমা-সম্মেলনের সাহিত্য-সভার পক্ষে বর্ষীয়ান সাহিত্য-সেবিগণ তোমার অলোকসামান্য প্রতিভা ও শক্তির পরিচয়ে একান্ত মুগ্ধ হইয়াছে। তাহাদের সমবেত শ্রদ্ধা ও প্রীতি তুমি গ্রহণ কর। আমরা অকুণ্ঠভাবে তোমাকে সকলে সসম্ভ্রম নমস্কার ও অভিনন্দন জানাইতেছি—"তুমি দীর্ঘজীবি হও"। ইতি—

নবদ্বীপ পূর্ণিমা সম্মেলন
সাহিত্য সভা
১লা পৌষ, ১৩৪৭।

তোমার গুণমুগ্ধ
নবদ্বীপ পূর্ণিমা সম্মেলনের সভ্যবৃন্দ।

অতঃপর ইঙ্গ-সংস্কৃত লাইব্রেরী ও রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতির পক্ষ হইতে সভাপতি শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষকে মানপত্র প্রদান করা হইলে পর, 'বড় আখড়ার' দিক হইতে সভাপতি ও শ্রীযুত রায় গোস্বামী ও মোহান্ত সমাজ কর্তৃক মানপত্র দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইলেন।

আয়োজনের প্রাচুর্য্য আসল বস্তুকে যেন আড়াল করিয়া ফেলিল। এক দিকে এত বড় জনতার পক্ষে বসিবার ও বক্তৃতা শুনিবার সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাব, অপর দিকে শ্রীযুত রায়ের উদ্দেশ্যে রচিত স্কুল অব্ ফিজিক্যাল কালচার্-এর মানপত্র পরিহৃত হওয়ায় তরুণ সভ্যগণের অসন্তুষ্টি। এ অপরিহার্য্য অনিচ্ছাকৃত ঘটনার জন্য আমার 'ত্রুটি স্বীকার' তরুণ বন্ধুগণের সুস্থ বুদ্ধির নিকট আবেদন জানাইতে পারিল না। তরল মনের মুহুর্ত্তের হঠকারিতার ফলে যে অপ্রিয় লঘু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল, তাহা নবদ্বীপ জয়ন্তীর শুভ্র প্রবাহকে কথঞ্চিৎ আবিল করিয়া তুলিল। শ্রীযুত রায়ের ঘনায়মান মর্ম্মাবেগ মাঝপথে বাধা পাইয়া মন্দীভূত হইল। বাংলার অধ্যাত্ম-ধারার ক্রমপুষ্টি, হিন্দু সংগঠনের সিদ্ধ প্রেরণা এবং ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া একটা সার্ব্বাঙ্গীন জাতির শ্রেয়ঃ ও অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত দিয়া তিনি কোন প্রকারে বক্তৃতা শেষ করিলেন। তবুও যেন বলিবার অনেক কিছু রহিয়া গেল। এই অসমাপ্তিজনিত অতৃপ্তি শ্রদ্ধাবান্ শ্রোতৃবৃন্দকে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত করিল।

সংক্ষিপ্ত অথচ হৃদয়গ্রাহী এক পরিচ্ছন্ন বক্তৃতায় সভাপতি তাঁর মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিলেন। নবদ্বীপের প্রতি তাঁর আন্তরিক প্রীতি ও সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁর স্বর্গত পিতৃদেবের সেই স্মরণীয় বাক্য উদ্ধৃত করিলেন, "নদীয়ার লুপ্ত গৌরব পুনরুজ্জীবিত হউক এবং সমগ্র ভারতবর্ষকে তাহার চিন্তা ও ভাবধারায় পুনরায় প্লাবিত করুক।" জীবে দয়া অর্থাৎ জীবের সেবাই মানুষের

প্রধান ধর্ম্ম, শ্রীগৌরাঙ্গের এই শিক্ষা প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াই এই গৌর-গঙ্গার তীর্থ জয়ন্তী উৎসবের জন্য সজ্ঞ নির্ব্বাচন করিয়াছে বলিয়া সভাপতি উল্লেখ করিলেন।

শ্রীযুত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় সভাপতিকে ও নবদ্বীপ-বাসীকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর সভা ভঙ্গ হইল।

সভায় নবদ্বীপের সর্ব্বশ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোগদান করেন। অধিকন্তু কাল্না, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, মহেশগঞ্জ প্রভৃতি বহু দূর-দূরান্তর হইতে বহু ছাত্র, অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণও আগমন করিয়াছিলেন। এইরূপ বিশিষ্ট সভা দীর্ঘ দিন এ অঞ্চলে হয় নাই বলিয়া সকলেই একবাক্যে অভিমত প্রকাশ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে স্থানীয় সপ্তম এডওয়ার্ড এ্যাংলো সংস্কৃত লাইব্রেরী হলে শ্রীযুত রায়কে বিশেষ আন্তরিকতার সহিত সম্বর্দ্ধিত করা হইল। সম্পাদক শ্রীযুক্ত জনরঞ্জন রায় লাইব্রেরীর ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়া লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীযুত রায়কে একখানি মানপত্র প্রদান করিলেন:

হে মহাত্মন্,

আপনার হস্তে ভারতের ধর্ম্ম বীর্য্যবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুস্থানের অমর কৃষ্টি ও সংস্কৃতি আপনার দ্বারা এই বঙ্গদেশে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ আপনার মত ব্যক্তিকে আমাদের মধ্যে পাইয়া আমরা আত্মশ্লাঘা অনুভব করিতেছি।

আপনি এই সন্দেহাকুল দেশে হতাশার যুগে আমাদের মুক্তির পথ দেখাইতে প্রবর্ত্তকের পতাকা লইয়া অগ্রগামী হইয়াছেন। আপনার প্রদত্ত ধর্ম্মের ইঙ্গিত বঙ্গের শত শত নরনারীকে শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়ের প্রত্যক্ষ পরিণতির পথে পরিচালিত করুক। আমরা তাঁহাদের সহিত আত্মিক পরিচয় লাভে উন্মুখ রহিলাম।

ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা না করিলে জাতি বাঁচে না—আপনি শুধু ইহা বলিয়াই নিবৃত্ত হন নাই। আপনি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা কি বঙ্গবাসীর কম গৌরবের কথা? জাতিগঠনের যে দেশাত্মবোধ, যে সিদ্ধপথ ও সিদ্ধমন্ত্র নিগূঢ় ছিল, আপনি তাহা পরিচিত করিলেন—মুক্ত করিলেন। আপনার মত মহাপুরুষের "দেশাত্মা" নাম সার্থক হইয়াছে।

কতরূপে যে আপনি বঙ্গসমাজের উপকার সাধন করিতেছেন তাহা বলিয়া শেষ করা অসম্ভব। শুধু ব্রহ্মচারী দল গঠন, নিষ্কাম সেবাব্রতী সঙ্ঘ স্থাপন দ্বারা নয়—শুধু শিল্পোৎপাদন, ব্যাঙ্ক-মিল প্রতিষ্ঠা করা নয়—শুধু শিক্ষায়তন স্থাপন, পত্রিকা প্রকাশ বা অনাবিল সাহিত্যিক অবদান দ্বারা নয়, আপনি কর্ম্মকে জ্ঞানে উন্নীত করিয়াছেন, আপনি গভীর চিন্তাশীলতার সহিত প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তির সমন্বয় সাধন করিবার পথপ্রদর্শক। ত্যাগ, নিষ্ঠা, উৎসর্গের দিব্য মূর্ত্তি সংহতি জীবনে প্রকাশ করিয়া জাতিগঠনের অভিনব প্রণালী আবিষ্কার ও তাহা কার্য্যতঃ প্রয়োগের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। আর আপনার সেই সঙ্ঘ মধ্যে আকুণ্ঠিত ভাবে নরনারীর সমানাধিকার ও মর্য্যাদারক্ষার নীতি অনুসরণের যে প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা সর্ব্বাংশে আপনার সংঘকে উজ্জ্বল করিয়াছে। আপনি তাই দেশ ও জাতির প্রাণের দ্যোতনার নব বাহকের মহৎ সম্মান পাইবার যোগ্য।

উৎসব-সভাপতি শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ

আমরা কি দিয়া আপনাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে পারি। 'মীরসামাজ্য' এই নবদ্বীপ এখনও ধর্ম্ম ও বিদ্যার আকরভূমি। এই সাধারণ পাঠাগার আপনার অমরতার স্পর্শ পাইয়া নবজীবনের অনুভূতি লাভ করিল। আজ শুধু 'প্রবর্ত্তকের' রজত-জয়ন্তী নয়—ইহা বাঙ্গলার এক নবযুগ প্রবর্ত্তনের রজত-জয়ন্তী। ইহার হীরক-জয়ন্তী উৎসবে আমরা যেন আপনার নির্ম্মাণদক্ষ হস্তে বঙ্গভূমিকে ভারতের গৌরব-স্তম্ভ স্বরূপ হইয়া গড়িয়া উঠিতে দেখি। আমরা সেই প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতি—

গুণমুগ্ধ—

| | |
|---|---|
| ১লা পৌষ, ১৩৪৭<br>নবদ্বীপ | নবদ্বীপ সপ্তম এডওয়ার্ড এংলো-সংস্কৃত<br>লাইব্রেরীর পক্ষে<br>শ্রীজনরঞ্জন রায় |

শ্রীযুত রায়ের নবদ্বীপ আগমন উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা স্নেহভাজন শ্রীমান সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য পাঠ করিলেন এবং অকপট শ্রদ্ধাঞ্জলীস্বরূপ সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধাইয়া তাঁহাকে উহা উপহার দিলেন। কবিতাটি এই :

মোদের পুণ্য দেশের কোলে ফুটিয়াছ তুমি ফুল,
সবাকার সেরা সৌরভে ভরা তোমার নাহিক তুল।
নয়নে তোমার বিমল জ্যোতিঃ অধরে অমিয়া-হাসি,
তাপস-মেধার আলোকে মহান আলোগো আলোকরাশি।
তরুণের তুমি প্রেরণা-উৎস আলোকের বার্ত্তাবহ,
জ্ঞান-গরিমার শুচিস্মিত লহগো শ্রদ্ধা লহ।
বেদময় বাণী পুণ্যময়ী ভারতের ইতিকথা,
দিয়েছ তাদের সাধন-মর্ম্ম বাঙালীর সভ্যতা।
কণ্ঠে তোমার আর্য্য-মহিমা বহিয়া এনেছে ঋক্,
ভারতের যুগ বিপর্য্যয়ে এস ওগো নির্ভীক।
রজত শুভ্র তব জয়ন্তী আলোকে ভরিয়া যাক্,
সভ্য জাতির পুণ্য গরিমা তোমা' মাঝে রূপ পা'ক।
এস মাননীয়, এস হে মহান্, এস ওগো মহামতি।
লহ নদীয়ার মুক্ত আশীষ তরুণ দলের প্রণতি।

উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে পূজনীয় সঙ্ঘগুরু পূর্ণ একঘণ্টাকাল তাঁহার মর্ম্মবাণী পরিবেশন করিলেন। ভারতীয় অবিচ্ছিন্ন অধ্যাত্ম ক্রমসূত্র, বর্ণাশ্রমের নিগূঢ় অভিপ্রায়, শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায় ও শাস্ত্রগুরু বেদব্যাসকে কেন্দ্র করিয়া একমতাবলম্বী ও সম আচারশীল হিন্দু জাতির নিঃশ্রেয়স্ অভ্যুত্থান কি করিয়া সম্ভব এবং ব্যাপক বিশ্ব-মানবতার ক্ষেত্রে ইহার সার্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণকারিতা সম্বন্ধে তিনি নূতন আলোকপাত করিলেন। তাঁহার দরদী প্রাণের এই জাতি-নির্ম্মাণমূলক আকুতি উপস্থিত সকলকেই মুগ্ধ করিল।

পণ্ডিত অমরনাথ তর্কতীর্থ মহোদয় বিশেষ প্রীত হইয়া শ্রীযুত রায়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং পণ্ডিত গোপেন্দু-ভূষণ সাংখ্যকাব্যতীর্থ মহাশয় এক দীর্ঘ বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুত রায়ের জ্ঞানগর্ভ উক্তির সমর্থন করিয়া ধন্যবাদ দিলেন। বন্ধুবর ধীরেনবাবুর কোকিলকণ্ঠের উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত সকলেরই অন্তর স্পর্শ করিল।

বেলা প্রায় সাড়ে দশ ঘটিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সমিতির পক্ষে সম্পাদক শ্রীযুত তুলসীদাস রায় পূজনীয় সঙ্ঘগুরুকে নিম্নলিখিত মানপত্র দ্বারা অভিনন্দিত করিলেন :

হে সেবাব্রতী, আপনার জীবনব্যাপী স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের জন্য অভূতপূর্ব্ব সেবা আপনাকে আদর্শ সেবাব্রতীরূপে সেবক সমাজে বরণীয় করিয়া তুলিয়াছে। এই ক্ষুদ্র সেবা-সমিতির সেবকবৃন্দ আপনাকে তাহাদের মধ্যে পাইয়া ধন্য হইয়াছে। আপনি তাহাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

হে কর্ম্মবীর, নানা কর্ম্মের ভিতর দিয়া আপনার অনন্যসাধারণ সংগঠন শক্তি বিশ্বক্ষেত্রে সেবাধর্ম্মের যে জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছে, আমরা তাহা সন্দর্শনে আপনার নিতান্ত গুণমুগ্ধ ও একান্ত অনুরাগী হইয়াছি। জীবসেবায় যে পবিত্র বাণী প্রায় অর্দ্ধ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই নবদ্বীপে নিমাইকণ্ঠে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল এবং অর্দ্ধ শত বৎসর পূর্ব্বেও যে বাণী শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কণ্ঠ নিঃসরিত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম্মোন্মাদনার ভিতর দিয়া প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই উদাত্ত বাণী আপনাকে আশ্রয় করিয়াই সেই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে এখন এক বিরাট সঙ্ঘে পরিণত হইয়াছে, ধর্ম্ম যাহাতে কর্ম্মকুণ্ঠ পঙ্গু হইতে পায় নাই—আবার কর্ম্মও সেখানে ধর্ম্মহীন উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে নাই। ধর্ম্ম ও কর্ম্মের এই অপূর্ব্ব সমন্বয়ে পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে আপনার সেবানিষ্ঠ চিত্তের সেই অনুপম সাধন-মূর্ত্তি প্রবর্ত্তকের এই রজত জয়ন্তী উৎসব নবদ্বীপে যেন সার্থক হয়। আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ জানাইতেছি—আপনার আদর্শে আমাদের সেবাব্রত যেন সার্থক হয়, ইহাই প্রার্থনা।

ইতি—বিনীত

নবদ্বীপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সমিতির
১লা পৌষ '৪৭ সেবকবৃন্দ

সুনির্ব্বাচিত একটি বৈঠকে অভিনন্দনের উত্তরপ্রসঙ্গে যুত রায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তত্ত্বের নিগূঢ় মর্ম্ম ও জাতিগঠনে তাহার দান ও স্থান এবং সেবাধর্ম্মের সত্যকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় শ্রীযুত রায় সারস্বত মন্দির পরিদর্শন করেন। এই বিদ্যালয়টির পশ্চাতে যে উচ্চ আদর্শ, উৎকর্ষ ও গঠনমূলক পরিকল্পনা আছে তাহার পরিচয় পাইয়া তিনি বিশেষ প্রীত ও আশান্বিত হইলেন। একরূপ তপস্যার মধ্য দিয়াই সুনিপুণ শৃঙ্খলার সহিত সারস্বত মন্দির কর্ত্তৃক যে তাঁত, হোসিয়ারী, সাবান প্রস্তুত প্রভৃতি কুটির শিল্প পরিচালিত হইতেছে, তাহার পরিচয় পাইয়া শ্রীযুত রায় প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ধীর স্থির

অনাড়ম্বর তরুণ প্রধান আচার্য্য শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ নন্দী এবং তাঁর সহকর্ম্মিগণের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

এই দিন অপরাহ্নের গাড়ীতেই সঙ্ঘ-গুরুর চন্দননগর প্রত্যাগমন করিবার সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের অবসান হইল। তাঁর নবদ্বীপ অবস্থিতির কয়টা দিন যে সুউচ্চ গ্রামে সুর বাঁধিয়া চিত্ত-মন বিভোর ছিল তাহা সহসা যেন ছিন্ন হইয়া গেল। সঙ্ঘগুরুকে বিদায় দিয়া দেহ-মনে একটা অব্যক্ত অবসাদ লইয়া ষ্টেশন হইতে ফিরিলাম। পথে বিশ্বনাথ মুখ ফুটিয়াই বলিল, "মামা, চলুন কালই কলকাতায় ফিরে যাই, এ ভাঙ্গা হাটে আর মন লাগছে না।"

বলিলাম, "আচ্ছা, তাই হবে।"

পথিমধ্যে গাড়ী ছাড়িয়া দিয়া শ্রদ্ধেয়া ভক্তিমতী ইন্দুবালা রায়ের বাসায় উঠিলাম। আশা, যদি একটু সান্ত্বনা পাই। দেখি, ইন্দুদি স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। সম্মুখে মেজেতে সঙ্ঘগুরু ও সঙ্ঘ-জননীর ছবি। আমাকে দেখিয়াই আর্দ্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দু' দিনের জন্ম কেন প্রভুকে এনেছিলে? বুঝি না-আনাই ছিল ভাল। এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য করতে পারি না, রাধারমণ।"

উদ্গাত অশ্রুর বান কোনরকমে নিবারণ করিয়া উত্তর করিলাম, "কায়াটাকে কেন এত বড় করে' ধরছেন। ধ্যানে, চেতনায় ইষ্টের চিন্ময় স্বরূপকে সদা জাগিয়ে রাখার অভ্যাস করুন।"

—"অত বড় যে আজও হতে পারিনি ভাই। মাটির মানুষ, এই দু'হাতে তাঁর অমৃত স্পর্শ চাই—চাই সেবার তৃপ্তি। প্রভুর এ উদ্ধার বেগ আমার অসহ্য। জান, প্রাণের এই কথাই আমি অভিনন্দনে নিবেদন করেছিলুম, কিন্তু তোমাদের গতিময় কাজের ভীড়ে তা অব্যক্তই রয়ে গেল।" ইন্দুদির কান্নাজড়িত কণ্ঠ।

—"তা যাক। যদি আপনার চাওয়া সত্য হয় তো তাঁর অন্তর স্পর্শ করবেই।" বলিয়াই উঠিলাম।

বিশিষ্ট সাধক জ্ঞানানন্দ স্বামীজীর সহিত নিরালা ঘণ্টাখানেক ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিয়া গভীর রাত্রে বাসায় ফিরিলাম। চিত্ত-মন অনেকটা প্রকৃতিস্থ বোধ করিতে লাগিলাম।

পরদিনই কলিকাতায় রওনা হইয়া আসিলাম। গতানুগতিক কাজের চাপে নবদ্বীপের স্মৃতি ক্রমশঃই অতীতের দিগন্তে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। বিলীয়মান সে স্মৃতি আবার জাগ্রত করিয়া ধরিল শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জনরঞ্জন রায়ের ২৬শে ডিসেম্বরের অপ্রত্যাশিত পত্র। তিনি লিখিয়াছেন :—

"প্রিয় রাধারমণ ভায়া,

প্রচুর পরিশ্রমের পরে নিশ্চয় বিশ্রাম নিচ্ছেন। এরূপ আনন্দ অনেক দিন পাই নাই। আপনি আমাকে এই পরিণত বয়সে যে মহাত্মার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন তাহাতে আমার কি লাভ হইল, তাহা না বলিলে বুঝি কৃতঘ্নতা হয়। আজ তাহা বলিবার জন্যই এই পত্র লিখিতেছি। আপনি আমার লক্ষ্যহীন মনকে একটা লক্ষ্যের সন্ধান দিয়াছেন—যে সত্য বস্তুর নাগাল পাইয়াও তাহার কাছে যাইতে পারি নাই, আবার তাহার কাছে যাইতে প্রবল ইচ্ছা জাগাইয়া দিয়াছেন—আমার অন্তরের খোরাক আনিয়া দিয়াছেন। জীবনে একদিন যোগাচার্য্য জ্ঞানানন্দ অবধূতের আশ্রয় পাইয়াছিলাম। মনোহরপুকুরে তাঁহার কাছে যে পথের সন্ধান পাই তাঁহার তিরোধানের পর সে পথ ছাড়িয়া দিয়া কত দিন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম। আবার সেই পথে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিলেন মহাত্মা রায়। পরম তৃপ্তি দান করিয়াছেন তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচয় দিয়া। শুধু আমাকে নয় নবদ্বীপকে।"

কয়দিন পরেই আবার তুলসীদার অনুরূপ পত্র পাইলাম।

উৎসব-সভায় সঙ্ঘগুরু তাঁর অধ্যাত্ম প্রেরণা মনের মত পরিবেশন করিবার অবসর পাই নাই ভাবিয়া যে অতৃপ্তি ও আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া থাকিয়া আমার অন্তর পীড়িত করিতেছিল তাহা সত্যই নিরাময় হইল। পত্রে নবদ্বীপের শ্রদ্ধালু চিত্তের ছবি মুকুরিত দেখিয়া এতদিনে অনুভব করিলাম, নবদ্বীপে জয়ন্তী-উৎসব সত্যই সার্থক হইয়াছে।

# নিখিল-বঙ্গ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ সম্মেলন

সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন

—শ্রীরমণ—

কলিকাতা হইতে প্রায় একশো মাইল দূরে বাংলার দক্ষিণ প্রান্তসীমায় অবস্থিত দিগন্তবিস্তৃত নিলাম্বুবিধৌত ফ্রেজারগঞ্জ দ্বীপে নিখিল-বঙ্গ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সপ্তম সাম্বাৎসরিক অধিবেশন বিগত ২৫শে ডিসেম্বর অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে কৃষ্টি ও সংস্কৃতিমূলক একটি শিক্ষাপ্রদ প্রদর্শনীরও আয়োজন

মাননীয় মহারাজা শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী

করা হইয়াছিল। কাশিমবাজারাধিপতি মাননীয় মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী মহোদয় সভা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং শ্রীমতিলাল রায় অধিবেশনের পৌরোহিত্য করেন।

স্বামী অমৃতানন্দজী বৈদিক প্রশস্তি উদ্গান করেন। প্রবর্ত্তক নারী মন্দিরের সভ্যাগণ কর্ত্তৃক বন্দেমাতরম সঙ্গীত গীত হইবার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত প্রভাতকুমার আচার্য্যের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুত অনিলকুমার রায় চৌধুরী এক অভিভাষণে মহারাজ, সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুত রায় ও সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং সম্মেলন ও প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। অতঃপর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ ও ফ্রেজারগঞ্জবাসীর পক্ষে স্থানীয় শাখা-সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীনারায়ণচন্দ্র দত্ত মহারাজ বাহাদুরকে একখানি মানপত্র প্রদান করেন।

মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী মহোদয় এক পরিচ্ছন্ন সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে সঙ্ঘের উচ্চ জীবন্ত আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন পূর্ব্বক বলেন যে, সকলের আন্তরিক সহযোগিতা থাকিলে সঙ্ঘের গঠনমূলক কার্য্য দেশের প্রভূত কল্যাণসাধন করিতে পারিবে। তিনি বলেন, মানুষ জন্মে ও মরে, কিন্তু জীবনের সত্য সুরটি অনেক সময়েই সে খুঁজিয়া পায় না। শুধু ব্যক্তির নয়, সমাজ ও জাতির এই সুর যে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ খুঁজিয়া পাইয়াছে, তাহা সঙ্ঘের কার্য্যাবলীর মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া যায়। বহু অর্থব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়া সঙ্ঘ এই সুদূর সভ্যতাবিচ্ছিন্ন নিরক্ষর পল্লীতে সভা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠান করিয়া জনচেতনা জাগরণের যে সুযোগ দিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। দেশবাসীর সহানুভূতি, সমর্থন ও সহযোগিতা পাইলে আশা করা যায়, সঙ্ঘের ধর্ম্ম, জ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের সুমহান্ ব্রত উদ্‌যাপিত হইতে বিলম্ব হইবে না। মহারাজ বাহাদুর বলেন, ব্যক্তির মত জাতির জীবনের লক্ষ্য ও গতি নির্ণীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্ঘ এই জাতীয় লক্ষ্য সিদ্ধ করিতেই ব্রতী হইয়াছে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের আছে ত্যাগ ও তপস্যা এবং তাহাদের কর্ম্ম প্রচেষ্টার অন্তরালে কোনও স্বার্থপরতা বা সঙ্কীর্ণতা নাই। জনসেবা ও সমাজগঠনের গুরুদায়িত্ব সঙ্ঘ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে। মহারাজবাহাদুর সঙ্ঘের সাফল্য কামনা করিয়া বলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানের নির্ম্মাণমূলক আদর্শ সিদ্ধ হইলে, সমগ্র মানব জাতি তথা সারা বিশ্বের কল্যাণ হইবে।

ইহার পর, সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত অরুণচন্দ্র দত্ত সঙ্ঘের যে ষষ্ঠ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন তাহাতে সঙ্ঘের অর্থ, শিক্ষা প্রভৃতি বহুমুখী কর্ম্ম-প্রচেষ্টার বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়। অতঃপর সভাপতি শ্রীমতিলাল রায় যে সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করেন তাহা বর্ত্তমান সংখ্যা প্রবর্ত্তকে অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার এন. এন. সরকার, বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজ, মহারাজ মৈমনসিংহ, শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিয়া, সম্মেলনের সাফল্য ও শুভেচ্ছা-জ্ঞাপক যে সকল পত্র প্রেরণ করেন তাহা সভায় পঠিত হয়।

অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্দ্ধে শ্রীযুত নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী সমাজ, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও সংস্কৃতিমূলক প্রদর্শনীর পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক মহারাজা বাহাদুরকে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিতে অনুরোধ করেন। মহারাজ বাহাদুর সাগর-সৈকতে এই সুদূর দরিদ্র ও অক্ষরহীন পল্লী অঞ্চলে এইরূপ শিক্ষাপ্রদ প্রদর্শনীর প্রভূত প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, চাষীর উন্নতির সঙ্গে দেশের শ্রীবৃদ্ধি ওতঃপ্রোত সংযোজিত, একাধিক ফসলের চাষ, কুটির শিল্পের প্রবর্ত্তন প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে কৃষক-কুলের প্রচুর অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করার প্রতি তিনি উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কৃষি, কুটির-শিল্প ও কারখানা-শিল্পের মধ্যে সংযুক্তি সাধন করার মহনীয় প্রচেষ্টাকে এবং ক্রেজারগঞ্জের উন্নতি-কল্পে সঙ্ঘের বহুমুখী প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা মহারাজ বাহাদুর করেন।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী মহারাজ বাহাদুর ও সমাগত দর্শক ও অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর, প্রথম দিনের অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

সভা ও প্রদর্শনী ক্ষেত্রে প্রায় চারি হাজার লোকের সমাগম হয়। সভ্যতার কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপাঞ্চলে এইরূপ অনুষ্ঠান ইহাই প্রথম বলিয়া কৃষক ও শ্রমিক নরনারীর মধ্যে বিশেষ কৌতূহল ও উৎসাহের সঞ্চার করে। গবর্ণমেণ্টের ইণ্ডাষ্ট্রিজ বিভাগ এবং কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়মের প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়া নানাবিধ উপায়ে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় শতাধিক প্রতিনিধি এই সভায় যোগদান করেন।

২৩শে ডিসেম্বর মাননীয় মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী মহোদয় ক্রেজারগঞ্জে আগমন করেন এবং অপরাহ্ণে তিনি কাছারী প্রাঙ্গণে ক্রেজারগঞ্জবাসী কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। ২৪শে ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় নৌকাযোগে পৌঁছিলে ক্রেজারগঞ্জের সুদূরবিসারী বেলাভূমে পুষ্পবৃষ্টি ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে তিনি বিপুলভাবে অভিনন্দিত হন। অতঃপর ব্যাণ্ডবাদ্যের সহিত শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে স্থানীয় সঙ্ঘকেন্দ্রে লইয়া যাওয়া হয়। পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীযুত রায় প্রবর্ত্তক আশ্রম-প্রাঙ্গণে নূতন উপাসনা-মন্দিরের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে সঙ্ঘের আহ্বানে সপারিষদ মহারাজ বাহাদুর যোগদান করেন। শ্রীযুত রায় ভারতীয় অধ্যাত্ম-ধারার ক্রমবিকাশ এবং তাহাতে বাংলার দান ও স্থান, সঙ্ঘের ভাব ও আদর্শ এবং গঠনমূলক পঞ্চাঙ্গ সাধনা সম্বন্ধে অভিব্যক্ত দেন। মহারাজ বাহাদুর হিন্দুর সনাতন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সার্ব্বজনীন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের গঠন পরিকল্পনার প্রশংসা করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেন।

আশ্রমপ্রাঙ্গণে উপাসনা-মন্দিরোদ্বোধন সভা:
মহারাজ বাহাদুর বক্তৃতা করিতেছেন

## দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন

অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান ২৬শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে একটি সুবৃহৎ মণ্ডপ (১০০'×৬০') রচিত ও সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রবেশ পথেই ভারতমাতার মূর্ত্তি এবং এই বিগ্রহের পুরোভাগে জ্ঞান, প্রেম, শক্তি ও সেবার প্রতীক চিহ্ন সমন্বিত শ্বেত, নীল, রক্ত ও পীত বর্ণ লাঞ্ছিত পতাকা উড়িতেছিল। ২৬শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় এই পতাকা উত্তোলন করেন। ইহার পরে প্রেম ও সেবার ব্রতরূপে 'রাখীবন্ধন' উৎসব সম্পন্ন হয়। তারপর বেলা ১২টা পর্য্যন্ত বিষয়-নির্ব্বাচনী সভাতে আগামী বর্ষের জন্য

দেশগঠনমূলক পরিকল্পনাদি আলোচিত ও গৃহীত হয়। অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় নিখিল-বঙ্গ প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের প্রকাশ্য অধিবেশন বৈদিক প্রশস্তি ও উদ্বোধন সঙ্গীতের সহিত আরম্ভ হয়। প্রথমেই নব নির্ব্বাচিত অন্যতম সম্পাদক

সঙ্ঘ-পতাকা উত্তোলনের পর রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান : পশ্চাতে চতুর্বর্ণ লাঞ্ছিত পতাকা দেখা যাইতেছে

স্বামী অমৃতানন্দজী নববর্ষের সংশোধিত সঙ্ঘের বিধিতন্ত্র পাঠ করেন। অতঃপর সভায় জাতীয় জীবনের বিবিধ সমস্যামূলক কয়েকটি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়। ইহার পর সমাপ্তি বক্তৃতা প্রসঙ্গে সভাপতি শ্রীমতিলাল রায় উচ্ছ্বসিত আবেগের সহিত জনমনের বোধগম্য ভাষায় ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে প্রায় এক ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। সঙ্ঘগুরু শ্রীযুত রায়ের বক্তৃতা সমাপ্তির পর উপাসনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

সভা এবং প্রদর্শনী ছাড়াও শিক্ষা ও জ্ঞান প্রচারের এবং বিমল আনন্দ বিধানের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা হইয়াছিল। ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা, প্রফেসর হারাধন ব্যানার্জ্জির যাদুবিদ্যা, প্রবর্ত্তক নারীমন্দির কর্ত্তৃক 'প্রভাস' নাট্যাভিনয় এবং সতীশ অপেরাপার্টি কর্ত্তৃক ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর পৌরাণিক যাত্রাভিনয় এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দত্ত, শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী, কাশিমবাজার ষ্টেটের কর্ম্মিবৃন্দ এবং স্থানীয় অধিবাসিগণের আপ্রাণ আন্তরিক প্রচেষ্টা এই বিরাট্ আয়োজনকে সহস্র অসুবিধার মধ্যেও সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল। প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেডের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার জাপানের কৃষি ও কুটিরশিল্প সম্পর্কীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে ফ্রেজারগঞ্জে একাধিক ফসলের চাষ এবং বিবিধ কুটির-শিল্প প্রবর্ত্তনের বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই সম্পর্কীয় 'পোষ্টারগুলি' ও 'আমাদের পল্লীরাণী' শীর্ষক পুস্তিকাগুলি এবারকার অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। শ্রীমান বিশ্বনাথ দত্তের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকগণ অবিরাম অকাতর শ্রম ঢালিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা-রক্ষণ এবং সম্পূর্ণতা বিধান করে। ব্যাণ্ডমাষ্টার শ্রীমান কামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য অল্পদিনের মধ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ব্যাণ্ডবাদ্য শিক্ষা দিয়া উৎসবের

সাগর সৈকতে শ্রীযুত রায়ের অভিনন্দন দৃশ্য

সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। প্রবর্ত্তক নারীমন্দির কর্ত্তৃক প্রায় ত্রিশত ব্যক্তির রান্না খাওয়া প্রভৃতির ব্যবস্থা সাতিশয় নৈপুণ্যের সহিত পরিচালিত হয়। বস্তুতঃ এবারকার অনুষ্ঠান সঙ্ঘের সৃষ্টিকরী শক্তির জ্বলন্ত উদাহরণ বলা যাইতে পারে।*

* প্রবন্ধের ছবিগুলি স্বামী অমৃতানন্দজী কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো হইতে।

# ব্রহ্মসূত্র

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীমতিলাল রায়

অনুকৃতেস্তস্য চ ।২২

অনুকৃতেঃ ( অনুকরণ করে ) তস্য চ ( সেই স্বপ্রকাশ স্বভাব আত্মার )।

এখানেও অনুকরণ শব্দটী ব্যবহৃত হওয়ায়, উহা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ প্রমাণ করিতেছে। গমনকারীর পশ্চাৎ অনুসরণ করার নাম অনুগমন। গন্তা ও অনুসরণকারী এক নহে; পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য আছে। যে যাহার অনুগমন করে, সে তাহার তুল্য নহে। শ্রুতি বলিতেছেন "অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি অনুভাত", অর্থাৎ ব্রহ্মজ্যোতিঃ হেতু ইহাদের জ্যোতির্ম্ময়ত্ব উদ্ভূত হইয়াছে, কিন্তু "ন তত্র সূর্য্যোভাতি" অর্থাৎ সেখানে সূর্য্য প্রভাব বিস্তার করে না। অতএব ব্রহ্ম ও জগৎ অপৃথক্ নহে। ব্রহ্মজ্যোতিঃ শব্দ উক্ত হওয়ায়, প্রশ্ন উঠিতে পারে—ব্রহ্ম কি সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃ-স্বরূপ? শ্রুতিও বলিয়াছেন "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতমিতি" অর্থাৎ দেবতারাও সেই জ্যোতির জ্যোতিকে আয়ুঃ ও অমৃতরূপে উপাসনা করেন। এইরূপ হইলে, তেজঃ তেজের দ্বারা কখনও অনুভাত হয় না, বরং প্রতিহতই হয়। যেমন সূর্য্যপ্রকাশকালে অন্যান্য তেজোময় নক্ষত্রাদি অভিভূত হয়। ব্রহ্ম এইরূপ তেজঃস্বরূপ হইলে, তিনি প্রকাশস্বরূপ না হইয়া সূর্য্যাদির প্রভাব অভিভূত করিয়াই রাখিতেন; এবং তাঁহারও অন্য কোন তেজোময় পদার্থ দ্বারা প্রতিহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত; এই জন্য শ্রুতি তাঁহাকে জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া পরেই বলিতেছেন, "তিনি এইরূপ তেজঃ নহেন; তিনিই প্রাজ্ঞ, স্বপ্রকাশ ও সর্ব্বপ্রকাশক। তিনি স্বয়ং-জ্যোতিঃ বলিয়াই সূর্য্যাদি তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; পরন্তু সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ তাঁহা হইতেই অনুভাত ও অনুপ্রকাশিত হইতেছে।" আরও

অপি চ স্মর্য্যতে ॥২৩

স্মৃতিও ইহা সমর্থন করিতেছে।

উপনিষৎ যেমন শ্রুতি, গীতা তেমনি স্মৃতি নামে প্রসিদ্ধ; তাই আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ এই কথা সপ্রমাণ করার জন্য গীতার এই দুইটী শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজোবিদ্ধি মামকম্ ॥

অর্থাৎ "সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি কেহই সে বস্তু প্রকাশ করে না। যাহাতে গমন করিলে, পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম। যে তেজের দ্বারা সূর্য্য বিশ্ব-প্রকাশ করে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজঃ, উহা আমারই, ইহা জানিও।" পূর্ব্বসূত্রের অনুকৃতি শব্দ গীতার এই শ্লোকের দৃষ্টান্তে সমস্বভাবযুক্ত বস্তুর মধ্যেই প্রযুজ্য মনে হয়; যেহেতু যে স্থানে অনুগমন করিয়া পৌছিলে বস্তুর পুনরাগমন প্রভৃতি রহিত হয়, গীতাকার তাহাই পরম ধাম বলিয়াছেন। এক অন্য হইতে অপৃথক্ হইলে, পরস্পর পৃথক্ অবস্থিতির হেতু অনেক কিছু থাকিতে পারে; কিন্তু উভয়ের সত্তা একই। বিষম স্বভাব ও বিজাতীয় বস্তু কোন কালেই সম হয় না। ইহাতে জীবের ব্রহ্মে লয়-সাধনের প্রসিদ্ধিই প্রমাণিত হয়। জীব এবং ব্রহ্ম ভাবতঃ তুল্য এবং জীবের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ যে ব্রহ্ম, ইহাও উক্ত হইয়াছে; এই জন্য জীবের ব্রহ্মগতির পূর্ণ পরিণাম অবশ্যই পৃথক্, এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে। এই পার্থক্যের মূল ঈশ্বরেচ্ছা। জীবের লয়-সম্ভাবনা ভিত্তিহীন কল্পনা নহে; কিন্তু লয় এই হেতু নাই, যে হেতু ব্রহ্মের মূলগত ইচ্ছাবশেই জীব ও ব্রহ্ম পরস্পর পৃথক্ স্বরূপ-বিশিষ্ট। তবে ব্রহ্মানুকরণে বস্তুর পুনরাগম-নিবৃত্তির কথা পরম পরিণামের দিগ্‌দর্শন মাত্র। আচার্য্য বলদেব শ্রুত্যুক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" অর্থাৎ নিরঞ্জন হইয়া পরম সাম্য-প্রাপ্তি হয়। ইহা অন্য কিছু নহে—"দৃশ্যতে চ মুক্তস্য

ব্রহ্মানুকারঃ" অর্থাৎ মুক্ত জীবের ব্রহ্মানুকরণের ইহা দৃষ্টান্ত মাত্র।

### শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥২৪

প্রমিতঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ) শব্দাৎ (শব্দাদি উক্ত হওয়া হেতু) এব অর্থাৎ জীব-ব্যবচ্ছেদের অর্থও অবধারণ করাইতেছে।

কঠোপনিষদে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি কি জীব? না। কেন নয়? তাঁহাকে শ্রুতিতেই ঈশান শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

যিনি অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষ, ধূমহীন অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, তিনিই ঈশান। অতএব পরিমাণের উপদেশ আছে বলিয়া এই পুরুষ জীব হইতে পৃথক্ বস্তু, এরূপ ধারণা করার হেতু কি? পূর্ব্বপক্ষের এই কথার উত্তরে বলা যায়—ব্রহ্মকে জানিতে চাহিলে, ঋষি বলিয়াছিলেন, "যিনি ভূত-ভবিষ্যতের ঈশান; যিনি আজও আছেন, কালও থাকিবেন—তিনি এই।" অতএব এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ নহেন।

প্রতিপক্ষ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী ভগবানকে এইরূপ পরিমিত করিয়া দেখার উদ্দেশ্য কি? তদুত্তরে পরবর্ত্তী সূত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

### হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥২৫

হৃদ্যপেক্ষয়া (হৃদয়ের পরিমাণ অপেক্ষায়) মনুষ্যাধিকারত্বাৎ মনুষ্যদিগের অধিকার থাকা হেতু।

যদি কেহ মনে করেন যে, আত্মা সর্ব্বভূতে, তবে কেবল মনুষ্যের হৃদয়ের পরিমাপানুসারে আত্মার পরিমিত রূপ কল্পিত হইল কেন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে—মনুষ্যেরই শাস্ত্রার্থ-গ্রহণের অধিকার আছে; পূর্ব্বমীমাংসায় অধিকার-নির্ণয় প্রসঙ্গে এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। মনুষ্য-শরীরে হৃদযন্ত্র নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে। অন্য প্রাণীর এরূপ নহে। জীবের হৃদ্দেশে তাই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পরমাত্মার ধারণা ব্রহ্মধ্যানের পক্ষে খুবই কার্য্যকরী, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ জীবের ব্রহ্মত্ব-প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ব্রহ্ম-কল্পনা নিরর্থক। অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ব্রহ্ম বলায় পাছে কেহ ব্রহ্মকে সঙ্কীর্ণ মনে করে, ঈশান শব্দে এই সংশয় দূর করা হইয়াছে।

### তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥২৬

বাদরায়ণঃ (আচার্য্য বাদরায়ণ বলেন) তদুপরি (তাহাদের উপরও অর্থাৎ মনুষ্যলোকের ঊর্দ্ধে) অপি (যে সমস্ত প্রাণী আছে, তাঁহাদেরও) সম্ভবাৎ (ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারের কারণীভূত অর্থিত্ব থাকার সম্ভাবনা হেতু)।

মনুষ্যলোকের ঊর্দ্ধে দেবলোক, ঋষিলোক আছে, তাহারাও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। যেহেতু ইতিহাস, পুরাণ, বেদ-মন্ত্রাদিতে জানা যায়, দেবতাদেরও শরীরাদি ধর্ম্ম আছে, তাহা হইলে তাহাদেরও কামনাপূরণের সামর্থ্য আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট শত বর্ষ ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়াছিলেন। ভৃগু বরুণের নিকট জ্ঞানার্থী হইয়া উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দেহ মনুষ্যদিগের অনুরূপ না হইতে পারে; তাই বলিয়া দেবতাদের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি নাই, ইহা বলা যায় না; তাই দেব-দেহাদি থাকা প্রমাণিত হইলে, তদনুযায়ী সামর্থ্য ও অর্থিত্ব তাহাদেরও থাকিবে। এই হেতু স্মৃতি বলেন "ন কেবলম্ নরকে দুঃখপদ্ধতিঃ স্বর্গেঽপি যাত ভীতস্য" প্রভৃতি অর্থাৎ নরকেই কেবল দুঃখপদ্ধতি আছে এমন নহে; স্বর্গেও সুখক্ষয়ের আতঙ্ক আছে। গীতাকারও বলেন—

> ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা-
> যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
> তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
> মশ্নন্তি-দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥
> তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
> ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
> এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপপন্না-
> গতাগতং কামকামা লভন্তে॥

বেদত্রয়ের যজ্ঞাদি দ্বারা আমার পূজার সোমপানান্তে নিষ্পাপ হইয়া যাহারা স্বর্গ প্রার্থনা করে, তাহারা পুণ্যফলরূপ সুর ও ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগ্য বিষয় ভোগ করেন, ভোগান্তে সেই দিব্য স্বর্গলোক হইতে

পুণ্যের জন্য মর্ত্ত্যভূমিতে পুনঃ প্রবেশ করেন; এবং এইরূপ ত্রয়ীধর্ম্মপরায়ণ হইয়া কামকামিগণ স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে যাতায়াত করেন।

বিষ্ণুপুরাণেও আছে—

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে-
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥

দেবগণ এইরূপ গান করেন—যাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষ-প্রাপ্তির পথস্বরূপ ভারতভূমিতে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা অধিক ধন্য। এই সকল শ্রুতি ও পুরাণ-বচনের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, মর্ত্ত্যের ন্যায় অন্য লোকও আছে, দেহাদির উপাদান ভিন্ন হইলেও দেবতা ও ঋষিগণের দেহাদি আছে; অতএব তাঁহাদের দেহানুপাতে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ আত্মাও হৃদ্দেশে বিরাজ করিতেছেন—কিন্তু এরূপ কল্পনা যে কারণে অসঙ্গত মনে হয়, সেই কারণ-নিরসনের জন্য পরবর্ত্তী শ্লোকে অবতারণা করা হইতেছে।

বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ ॥২৭

কর্ম্মণি (যজ্ঞাদিতে) বিরোধঃ (এক দেহধারী দেবতা বহু স্থানে একই সময়ে উপস্থিত থাকায় বিরোধ-সম্ভাবনা আছে) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল) ন (না, একথা বলিতে পার না) অনেকপ্রতিপত্তিঃ (দেবতাদের একই সময়ে অনেক শরীরধারণের সামর্থ্য আছে) দর্শনাৎ (শ্রুত্যাদিতে এইরূপ দেখা যায়, এই হেতু)।

বৈদিক যজ্ঞ সকল একই সময়ে বহু ক্ষেত্রে বহু জন করিয়া থাকে। দেবতারা সর্ব্বত্র এক সময়ে উপস্থিত থাকা অসম্ভব হয়, অতএব হয় বলিতে হইবে—যজ্ঞক্ষেত্রের সর্ব্বত্র দেবতারা উপনীত হন না অথবা দেবতাদের শরীরকল্পনা অমূলক। উত্তরে শ্রুতির কথাই অবধারণীয়। শ্রুতি জিজ্ঞাসা করিতেছেন "কতি দেবাঃ" অর্থাৎ দেবতার সংখ্যা কত? উত্তর দিতেছেন "ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতাত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি" তিন তিন, তিন শত ও তিন সহস্র। তারপর আবার প্রশ্ন করা হইয়াছে, ইহাদের স্বরূপ কি? তদুত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন "মহিমান্ এবৈষামেতে ত্রয়স্ত্রিংশত্ত্বেব দেবাঃ" ৩৩টী দেবতা পূর্ব্বোক্ত দেবতাদিগের মহিমাস্বরূপ। সেই ৩৩টী দেবতা অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি। শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন "একৈকস্য দেবতাত্মনো যুগপদনেকরূপতাম্"—এক দেবতার অনেক প্রকার রূপ আছে। আবার এই ৩৩ দেবতা নিম্নোক্ত ৬ দেবতার অন্তর্গত—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, ও দিক্। এই ছয় আবার লোকত্রয়ের অন্তর্গত। লোকত্রয় আবার অন্ন ও প্রাণের অন্তর্গত। এই দুই দেবতা আবার প্রাণদেবতারই বিভূতি। সুতরাং প্রাণই সর্ব্বদেবতা হইলেন। এই যুক্তির দ্বারা দেবতারা প্রাণস্বরূপ। অতএব একই কালে দেবতারা প্রাণশরীর না লইয়া বহু ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারেন, ইহা অসঙ্গত কেন হইবে? পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে পারে—দেবতাদের শরীর যে উপাদানের হউক, উহা যখন দৃষ্ট, তখন তার বিনাশও থাকিবে, ইহা অস্বীকার্য্য নহে। ইন্দ্রাদির উৎপত্তি ও বিনাশ শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণপ্রসিদ্ধ কথা। এরূপ হইলে, অবশ্যই বলিতে হইবে—দেবতাদের সহিত যজ্ঞাদিও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যে দেবতার উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞবিধান, সে দেবতার পতনে সে যজ্ঞের বিলোপ হইবে। শ্রুতির নিত্য যজ্ঞের ফলে ইহাতে ব্যত্যয় হইল। শরীরী দেবতাগণের শরীরনাশের সঙ্গে সঙ্গে কেবল যজ্ঞাদি নহে, তদভিধেয় শব্দেরও লোপ হইবে—দেবতাদের উদ্দেশ্যে বেদ-শব্দাদির নিত্যত্ব এই হেতু কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তদুত্তরে বলা হইতেছে—

শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ॥২৮

শব্দ (শব্দপ্রামাণ্যবিরুদ্ধ) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি?) ন (না, তাহা বলিতে পার না) অতঃ (যে হেতু) প্রভবাৎ (শব্দ হইতেই সবের উৎপত্তি) প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং (প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা জানা যাইতেছে)।

পূর্ব্ব মীমাংসায় শব্দের সহিত অর্থের নিত্য-সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে। শব্দ ও তদ্বোধ্য অর্থ উভয়ের সম্বন্ধ নিত্য। ব্যাসদেব বলিতেছেন—দেবতাদের শরীরকল্পনা সিদ্ধ হইলে এবং উক্ত শরীরের জন্ম-মৃত্যু স্বীকার করিলেও, বেদবাণীর নিত্যত্ব ক্ষুণ্ণ হইতেছে না। বৈদিক শব্দ ও

তদর্থ নিত্যই হইবে। বসু, আদিত্য, রুদ্রাদি দেবতার শরীর আছে; এই হেতু তাঁহাদের জন্ম-মরণও আছে। কিন্তু শব্দ ও অর্থ আদিত্যাদি দেবতাবিশেষের বোধক নহে; গো, মনুষ্যাদির মৃত্যু হইলেও যেমন ইহাদের আকৃতির মৃত্যু হইল না বলা যায়, তদ্রূপ রুদ্রাদি দেবতাগণের আকৃতি নিত্য। ঐ সকল আকৃতিবিশিষ্ট সত্তার উৎক্রমণ হয়। দ্রব্যগুণক্রিয়াসমষ্টির নামই মৃত্যু। দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়াসমষ্টির যে আকৃতি হয়, তাহার শব্দ ও তদনুযায়ী অর্থ বেদমন্ত্রে আছে। গো, মনুষ্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ—মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি আকৃতির নাম; ঐ আকৃতি হইতে মুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু যদি হয়, গো-মনুষ্যাদির মৃত্যু হইল বলা যায় কি? অতএব দেবতাদের শরীর থাকা ও জন্ম-মরণাদি বিহিত হওয়ায়, বৈদিক ইন্দ্রাদি দেবতাবাচক শব্দও অনিত্য হইল না। প্রতিপক্ষ বলিবেন—শব্দ কি ব্রহ্মের ন্যায় আকৃতি-সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ? তদুত্তরে বেদব্যাস প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ—শ্রুতি; ইহাই নিরপেক্ষ প্রমাণ। কেন না ইহা অন্যের প্রতীক্ষা করে না। অতএব ইহা প্রত্যক্ষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অনুমান প্রমাণের মূলে আছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ; অনুমান স্মৃতিমূলক; অতএব স্মৃতিও শ্রুতির অনুসারী হইবে। এই স্মৃতি ও শ্রুতিতে সৃষ্টির মূলে শব্দের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। যথা:—"এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দ্দেবানসৃজতাসৃগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৃংস্তিরঃ-পবিত্রমিতি গ্রহানাসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতিশস্ত্রমভিসৌভগেত্যন্যাঃ প্রজা ইতি শ্রুতিঃ।" অর্থাৎ শ্রুতি বলিতেছেন প্রজাপতি 'এতে' এই শব্দ স্মরণ করিয়া দেবতাঃ 'অসৃগ্রম' 'ইন্দবঃ' 'তিরঃ' 'পবিত্রম্' 'আসবঃ' 'বিশ্বান্' ও 'অভিসৌভাগ' শব্দ উল্লেখ করিয়া মনুষ্য, পিতৃগণ, গ্রহগণ, স্তোত্র, শাস্ত্র ও অন্যান্য প্রজা সৃষ্টি করিলেন। আরও আছে 'স মনসা বাচং মিথুনং সমভবাদিত্যাদীনাম্ তত্র তত্র শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টিঃ শ্রাব্যতে।" মন ও বাক্যের মিথুন। বেদবাক্যই তাহার অর্থ। এই শব্দের দ্বারা তিনি সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব সবই শব্দ-প্রভব, ইহা সিদ্ধ হইল। দেবতাদির জন্ম-মরণে শব্দের নিত্যত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। শব্দই সৃষ্টিশক্তি। এই হেতু শব্দ ও ব্রহ্ম একার্থবাচক। বেদান্তের গোড়ায় "জন্মাদস্য যতঃ", ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ বলা হইয়াছে। বেদাদি শাস্ত্র ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন। ব্রহ্মের স্বরূপ জানার শাস্ত্রই উপায়। ব্রহ্ম সৃষ্টি ও অসৃষ্টি দুই-ই। সৃষ্টির আদিতে শব্দ মূল; কেন না, পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে শব্দ স্মরণ করিয়াই নাম, রূপ, কর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। স্মৃতিশাস্ত্র বলেন—"বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে।" বেদশব্দ হইতে আদৌ এই সকলের পৃথক্ সংস্থা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

অতএব চ নিত্যত্বং ॥২৯

চ অতএব (আর এই জন্য) নিত্যত্বং (বেদের নিত্যত্ব) প্রমাণিত হইল।

বেদের রচয়িতা নাই। এই হেতু বেদও নিত্য। বেদ নিত্য হইলে, বেদশব্দও নিত্য। দেবতা ও জগতের নিত্য আকৃতি ইহাতে সিদ্ধ হয়। কিন্তু আবার শ্রুতিতে এই কথাও শুনা যায় যে, আকৃতিরও ধ্বংস আছে। আত্যন্তিক প্রলয়ের কথা সর্ব্বজনবিদিত। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি এই হেতু শ্রুতিবিরুদ্ধ হয়; ইহার জন্য পুনরায় ৩০ সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে।

সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥৩০॥

আবৃত্তৌ অপি (প্রলয়ের পর পুনঃসৃষ্টিতে) সমান-নাম-রূপত্বাৎ (সমান নামরূপ হয়, এই হেতু) অবিরোধ চ (বেদশব্দে বিরোধ নাই) দর্শনাৎ (প্রত্যক্ষ শ্রুতিপ্রমাণ হেতু) স্মৃতেঃ চ (স্মৃতিও এই কথা বলেন)।

মহাপ্রলয়ে সবেরই লয় হয়। ইহা সত্য; কিন্তু নূতন সৃষ্টির উল্লেখও শ্রুতি স্মৃতিতে আছে। এই সৃষ্টির তুল্য নামরূপ লইয়াই পুনঃ সৃষ্টি। এক মন্বন্তরে যে সকল দেবতা, ঋষি ও নরপতি বিদ্যমান থাকেন, পরবর্ত্তী মন্বন্তরে তাঁহাদেরই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। ইহাতে সংসারের অনাদিত্বই প্রমাণিত হইতেছে। স্বপ্নের পর জাগ্রতে যেমন পূর্ব্বানুরূপ সৃষ্টি অব্যাহত থাকে, এক কল্পের পর অন্য কল্পের সৃষ্টিও তদনুরূপ হইবে। দৈনন্দিন প্রলয়ে ও মহাপ্রলয়ে বস্তুর আত্যন্তিক ধ্বংস হয় না; বীজভাব প্রাপ্ত

হইয়া বস্তু সমগ্র সংস্কার লইয়া অবস্থান করে। শ্রুতিও বলেন—সুপ্ত পুরুষ কিছুই দেখেন না, বাক্যের সহিত নাম, দৃষ্টির সহিত রূপ, শ্রুতির সহিত শব্দ, মনের সহিত ধ্যান—সবই লয় প্রাপ্ত হয়। পুরুষের পুনঃ জাগরণে প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নিতুল্য স্ফুলিঙ্গের ন্যায় হিরণ্যগর্ভ হইতে দেবতা এবং দেবতা হইতে লোকসকল উৎপন্ন হয়। মনু এই জন্যই বলিতেছেন—যে জীব যে কর্ম্ম প্রাপ্ত হয় বা অর্জ্জন করে, সে জীব পুনঃ পুনঃ তদনুযায়ী হইয়া থাকে; আমরা এই হেতু জীবের রুচি দেখিয়া জীবের স্বভাব নির্দ্ধারণ করিতে পারি। জগৎ-লয়েও এই বীজ-ধর্ম্ম নষ্ট হয় না। পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম আকস্মিক অকারণ নহে। সবই কর্ম্মবশে হইয়া থাকে। বস্তুর আত্যন্তিক বিনাশ না হওয়ায়, দেবতা, ঋষি, মনুষ্যাদি জগতের যাবতীয় বস্তুর আকৃতি সংরক্ষিত হয়।

মধ্বাদিষসম্ভবাদনধিকারঃ জৈমিনিঃ ॥৩১

জৈমিনিঃ (জৈমিনির মতে) অনধিকারঃ (ব্রহ্ম-বিদ্যায় দেবতাদের অধিকার নাই। (যেহেতু) মধ্বাদিষসম্ভবাৎ (দেবতাদিগের পক্ষে মধুবিদ্যা অসম্ভব হওয়া হেতু।)

ছান্দোগ্যোপনিষদে মধুবিদ্যার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেন—ঐ আদিত্যদেব মধুদেবগণের আস্বাদ। এ কথা মনুষ্যগণের পক্ষেই প্রযুজ্য হয়। আদিত্য দেবতা হইয়া দেবতার উপাসনা আবার কেন করিবেন? অতএব পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে দেবতারাও ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী, জৈমিনির মতে তাহা আবার নাকচ হইয়া যায়। দেবতাগণ যখন উপাস্য, তখন তাঁহারা আবার উপাসক হইবেন কি প্রকারে? মধুবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা তুল্যার্থবোধক। আরও হেতু আছে।

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥৩২॥

জ্যোতিষি (জ্যোতিঃপিণ্ডের) ভাবাৎ চ (সত্তাবিশিষ্ট এই হেতু)

দেবতাদেরও শরীর আছে; কিন্তু সে শরীর আদিত্য, চন্দ্র, সূর্য্য, প্রভৃতির ন্যায় জ্যোতিঃপিণ্ডমাত্র। জ্যোতিষাদি জড়, জড়ের মধুবিদ্যায়-অধিকার থাকিতে পারে না।

কিন্তু আচার্য্য বাদরায়ণ বলিতেছেন—

ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ॥৩৩॥

তু (কিন্তু) বাদরায়ণঃ (ঋষি বাদরায়ণ বলেন) ভাবম্ (দেবতাদেরও অধিকার আছে) কি হেতু আছে? হি (যে হেতু) অস্তি (যাহা থাকিলে অধিকার থাকে, তাহা দেবতাদেরও আছে)।

দেবতাদেরও শরীর প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, শ্রুতিসিদ্ধ। শ্রুতির প্রত্যক্ষতা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—শ্রুতি প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। সব কিছুই প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয় না—তাই শ্রুতিপ্রমাণ গ্রহণীয়। ভারতের সার্ব্বভৌম রাজা নাই; কিন্তু কোনকালেই ছিল না, এ কথা কেহ বলিতে পারে না। দেবতারা প্রত্যক্ষ নহেন; কিন্তু বৈদিক ঋষিরা দেবতাদের দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রুতি স্পষ্টই বলেন—"ইন্দ্র মেষ হইয়া মেধাতিথিকে হরণ করিয়াছিলেন।" মহাভারতে আছে, "সূর্য্য কুন্তীতে উপগত হইয়াছিলেন।" এই সকল প্রমাণে দেবতাদের আকৃতি আছে ও তাঁহারা যদৃচ্ছা শরীরও ধারণ করিতে পারেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

সূর্য্যাদি দেবতা ভৌতিক জ্যোতিঃপিণ্ডের ন্যায় প্রতীত হইলেও, উহাতে চেতন দেবতার অধিষ্ঠান নাই, ইহা বলা যায় না। শ্রুতি বলেন—"মৃদব্রবীদাপোঽব্রুবন্নিত্যাদি" মৃত্তিকা বলিল, জল বলিল ইত্যাদি—ইহার অর্থ, ভৌতিক বস্তুর মধ্যে চেতন আত্মা অধিষ্ঠিত আছেন। জ্যোতিঃপিণ্ড সূর্য্যাদি দেবতার শরীর হইতে পারে; কিন্তু শরীরাধিষ্ঠিত দেবতা অবশ্যই আছেন। আচার্য্য জৈমিনি বলিয়াছেন "মধুবিদ্যায় দেবতাদের অধিকার নাই।" এই কথার অর্থ—কোন বিদ্যাই দেবতাদের অধিকারে থাকিবে না, এরূপ নহে। ছান্দোগ্যোপনিষদে—মধুবিদ্যার উপাসনা-প্রণালী আছে; মধুবিদ্যা সূর্য্যদেবতার উপাসনা। আদিত্যের উপাসনা আদিত্যের পক্ষে নিষিদ্ধ হইতে পারে—তাই বলিয়া অন্য অধিকার নিষিদ্ধ হইবে, এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্ব্ব পক্ষ বলিবেন—মধুবিদ্যা বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যাও বিদ্যা—এখন মধুবিদ্যায় দেবতাদের অধিকার নাই বলায় ব্রহ্ম-বিদ্যাতেও তাঁহাদের অধিকার থাকিবে না, এইরূপ যুক্তি অনুচিত হইবে কেন? উত্তরে বলা যায়—রাজসূয় যজ্ঞও

যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র যজ্ঞাদিও যজ্ঞ; ব্রাহ্মণদের রাজসূয় যজ্ঞ করিতে নাই, এই নিষেধ-বাক্যে কি ব্রাহ্মণদের পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ রহিত হইবে? বাদরায়ণ শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি সহকারে প্রমাণ করিলেন, যে দেবতারা শরীরী এবং তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে একই কালে বহু আকৃতিবিশিষ্ট হইতে পারেন এবং তাঁহাদের বেদাধিকারও আছে। দেবতারাও বলিয়া থাকেন—আত্মার অন্বেষণ করিব। তাহা হইলে বলিতে হইবে—সকল লোকেই ব্রহ্মবিদ্যার প্রবর্ত্তন আছে। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রকে, অসুরদের মধ্যে বিরোচনকেও আমরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে দেখি। দেবতাদের শরীর থাকা হেতু তাঁহাদের মুক্তিকামনা রহিত হয় না। মুক্তিকামী বলিয়া তাঁহাদেরও বেদাধিকার যুক্তিযুক্ত হইল।

শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রাবণাৎ
সূচ্যতে হি ॥৩৪

হি (যেহেতু) সূচ্যতে (সূচনা করা হইয়াছে। কি সূচনা করা হইয়াছে?) তদনাদরশ্রবণাৎ (সেই হংসরূপী ঋষির অনাদর-বাক্য শ্রবণ করিয়া) অস্য (ইহার) শুক্ (খেদ হইয়াছিল) তদাদ্রবণাৎ (শোকে অভিগমন করিয়াছিলেন)।

ইহার বিশদার্থ ছান্দোগ্য শ্রুতির এই আখ্যায়িকা হইতে পাওয়া যাইবে। জনশ্রুতি নামক কোন এক রাজা বহু সদ্‌গুণান্বিত ছিলেন। দেবতা ও ঋষিরা একদা হংসাকৃতি গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রাসাদের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিলেন। রাজাকে সেইখানে শয়ান দেখিয়া পশ্চাদ্গামী হংস বলিলেন—জনশ্রুতির তেজোদীপ্ত শরীর লঙ্ঘন করিলে, তাহা আমাদের দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। অগ্রগামী হংস বলিলেন—কি দুঃখের কথা! এই অতি সামান্য প্রাণী জনশ্রুতিকে ভগবান 'রৈক্কের' তুল্য মনে করিতেছ! জনশ্রুতি এই কথা শ্রবণ করিয়া নিজেকে অপদার্থ জ্ঞানে বহু অন্বেষণের পর রৈক্কের নিকট উপনীত হইলেন। জনশ্রুতি গবাদি উপহার প্রদান করিয়া, রৈক্কের নিকট তত্ত্বজ্ঞান জানিতে চাহিলেন। রৈক্ক বলিলেন—হে শূদ্র, তোমার এই সব উপহার লইয়া আমি কি করিব? ইহা তোমারই থাক। পরে রাজাকে তিনি সম্বর্গ নামক বিদ্যাদান করিয়াছিলেন।

রৈক্ক মুনি রাজাকে শূদ্র সম্বোধন করায়, সন্দেহ হইতে পারে যে, দেবতাদিগের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট প্রত্যেক মানুষেরই বেদাধিকার আছে। পূর্ব্ব সূত্রে হংসদের অনাদর-বাণী শ্রবণ করিয়া শোকগ্রস্ত রাজাই রৈক্কের নিকট অভিগমন করিয়াছিলেন, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। রাজাকে সম্বর্গ বিদ্যা দেওয়ায় এবং রাজা শূদ্র নামে অভিহিত হওয়ায়, শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার সমর্থিত হইতেছে। দ্বিজাতি ব্যতীত প্রাচীনকালে অনাদৃত শূদ্র জাতিও ছিল। বেদে শূদ্রের বেদাধিকার নাই, এমন নিষেধ দৃষ্ট হয় না; শূদ্রকে কেবল যজ্ঞাধিকারী করা হয় নাই। কিন্তু তজ্জন্য ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার থাকিবে না—শূদ্রও মানুষ, কিন্তু তাহার ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকার নাকচ হইবে, এই যুক্তি অসঙ্গত এবং মনুষ্যত্বের অপমান। উপরোক্ত আখ্যায়িকায় শূদ্রের বেদাধিকার আছে, ইহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু জ্ঞানার্জ্জন—সামর্থ্যসাপেক্ষ। শূদ্রের সে সামর্থ্য ছিল না। আচার্য্য বাদরায়ণ নতুবা এই সূত্র প্রণয়ন করিবেন কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মানুষের আকৃতি হইলেই মানুষ হয় না; মুক্তিকামনা মার্জ্জিত মনোবৃত্তির লক্ষণ। বেদব্যাসের যুগে যে শ্রেণীর মানুষের শাস্ত্রীয় সামর্থ্য ছিল না, শাস্ত্রবিদ্যা যাহাদের দুর্ব্বোধ্য ছিল, সেরূপ মনুষ্যজাতি পৃথিবীতে আজিও যে নাই তাহা নহে। এই শ্রেণীর লোককেই হয়তো শূদ্রশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল। নতুবা শূদ্র বলিতে কোন জাতির শাস্ত্রজ্ঞানলাভে সামর্থ্য যদি বর্ত্তমান যুগে দেখা যায়, এ নিষেধ তাহাদের পক্ষে প্রযুজ্য হইবে কি প্রকারে? হয় তাহাদের দ্বি-জাতি মধ্যে গণ্য করিতে হইবে, নয় এই শ্রেণীর শূদ্রের বেদাধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুতি যে যুক্তির অনুযায়ী শূদ্রের যজ্ঞাধিকার নিষেধ করিয়াছেন—আচার্য্য শঙ্কর বলেন, সেই যুক্তিতেই শূদ্রের বেদাধিকার নিষিদ্ধ হইবে। আমরা বলিব—যে বিধিতে রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ের অধিকার, ব্রাহ্মণের নহে বলা হইয়াছে, সেই বিধি যখন ব্রাহ্মণের জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ নিষেধ করে না, তখন শূদ্রের যজ্ঞাদি কর্ম্মে অধিকার বেদে নিষিদ্ধ হইলেও, তাহার বেদাধিকার

থাকিবে। বেদ স্বর্গ ও মর্ত্ত্য লোকের পরমা বিদ্যা। মানুষের মুক্তি-কামনা একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে; এই হেতু ঋষি রৈক জনশ্রুতিকে শূদ্র নামে অভিহিত করিয়াও সম্বর্গবিদ্যা দান করিয়াছিলেন। জনশ্রুতির অকপট মুক্তি-কামনাই তাঁহাকে এই অধিকার দিয়াছিল। মধ্যযুগে সম্ভবতঃ শূদ্রজাতির বেদাধিকার নিষিদ্ধ ছিল; তাহা না হইলে বেদব্যাস পরবর্ত্তী সূত্র প্রণয়ন করিয়া স্পষ্টই দেখাইবেন কেন যে, জনশ্রুতি শূদ্র নামে অভিহিত হইলেও, তিনি শূদ্র ছিলেন না? ইহা তাৎকালীন সমাজপরিস্থিতির পরিচয়মূলক ইতিহাস। শূদ্রের অগ্নিগ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ আছে। ইহা বৃত্তিভেদ। একের বৃত্তি অন্যে গ্রহণ করিলে, সমাজ-শৃঙ্খলা-রক্ষা হয় না। তাই বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের পথ বন্ধ করা সমীচীন নহে। স্মৃতি ও যুক্তি যদি এ পথে পরিপন্থী হয়, আমরা শ্রুতিই অধিক বলবতী বলিয়া মুক্তিকামী মানব মাত্রেরই ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, বলিতে কুণ্ঠা করিব না। শ্রুতিতে কোনও শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই, ইহা বলা হয় নাই—ব্যাসদেব জনশ্রুতির শূদ্রত্ব পরবর্ত্তী সূত্রে খণ্ডন করিতেছেন।

ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোত্তরত্র
চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥৩৫

উত্তরত্র (পরবর্ত্তী বাক্যে অর্থবাদ-রূপে) চৈত্ররথেন (চৈত্ররথের সহিত) লিঙ্গাৎ (সমভিব্যাহার হওয়া হেতু) ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেঃ (জনশ্রুতি ক্ষত্রিয়, ইহা অবগত হওয়া যায়)।

উক্ত আখ্যায়িকার শেষ ভাগে চিত্ররথবংশীয় অভিপ্রতারী নামক ক্ষত্রিয়ের পরিপাটি লক্ষ্যে পড়ে। ইহারা দুই জনে এক সঙ্গে ভোজন করিয়াছিলেন। এক ব্রাহ্মণ এই সময়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন যুগে ব্রহ্মচারী শূদ্রের নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী হইত না। গোদানাদি ধর্ম্ম শূদ্র-ধর্ম্মও নহে। অতএব জনশ্রুতি ক্ষত্রিয়, শূদ্র নহে। ব্রহ্মসূত্রে শূদ্রের বেদাধিকার এই যুক্তির দ্বারা রহিত হইল।

সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥৩৬॥

সংস্কারপরামর্শাৎ (উপনয়নাদি সংস্কারের) উল্লেখ থাকা হেতু) চ (এবং) তদভাবাভিলাপাচ্চ (সেই সংস্কারের অভাব অভিহিত হওয়া হেতু শূদ্রের বেদাধিকার নাই)।

প্রাচীন ভারত শূদ্রকে সমজাতি বলিয়া স্বীকার করিত না। কেননা, এক জাতি হইতে হইলে তাহার শাস্ত্র এক হইবে, আচার ও সংস্কার এক হইবে। তাই জন্মকাল হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত তুল্য সংস্কার দ্বিজাতির ছিল শূদ্র চতুর্থ বর্ণ। উহারা আর্য্যজাতি হইতে ভিন্ন উহাদের জন্ম বৈদিক-সংস্কারাদি-প্রসূত নহে। আর্য্যস্মৃতি বলেন—শূদ্রের অভক্ষ্য-ভক্ষণে, অনাচারে পাপ হয় না; তাহাদের উপনয়নাদি সংস্কারও নাই; বৈদিক আর্য্যজাতি তালি দিয়া অসংস্কৃত মনুষ্যজাতি লইয়া বড় হইতে চাহেন নাই। এই সূত্রগুলি তাহারই পরিচয় দেয়। পরবর্ত্তী সূত্রেও একথা আছে।

তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥৩৭॥

চ (আরও) তদভাব (তাহার অভাব; অর্থাৎ শূদ্র নয়, ইহা নির্দ্ধারিত হইলে) প্রবৃত্তেঃ (বিদ্যাদানের প্রবৃত্তি দেখিতে পাই)।

জাবাল কোন জাতি, তাহার স্থিরতা ছিল না। গৌতম ঋষি তাহার সত্যবাক্যের জন্য তাহাকে অশূদ্র মনে করিয়াছিলেন। জাবাল আত্মপরিচয় দিতে গিয়া নির্ম্মল সত্যই বলিয়াছিলেন "আমি গোত্র জানি না, আমার মাতাও জানেন না; আমি জবালার পুত্র।" ঋষি এই কথায় বুঝিলেন—যে ব্রাহ্মণ নহে, সে এমন নির্ম্মল সত্য বলিতে পারে না। গৌতম ঋষি জাবালকে উপনীত করিয়াছিলেন। (এখানে সত্যই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পরিচয় দেয়। সত্যপ্রতিষ্ঠিত জাতিই ভারতের কাম্য ছিল।)

শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ ॥৩৮

স্মৃতেশ্চ (স্মৃতিতেও) অন্য (দ্বিজাতি ব্যতীত অন্যের) শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ (বেদশ্রবণ ও অধ্যয়ন অর্থবোধ-প্রতিষেধ হওয়া হেতু)।

জ্ঞানপ্রতিষ্ঠ আর্য্যসমাজের মধ্যে অনধিকারী যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার জন্য আর্য্যসংস্কৃতি আর্য্যেতর জাতিকে দেওয়ার বিধি ছিল না। শ্রুতি দ্বিজাতির জন্য। ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া স্মৃতির কঠোর

অনুশাসন এক শ্রেণীর মানুষের প্রতি অসম্মান ও বিজাতীয় ঘৃণাই প্রকাশ করে। বেদ-শ্রবণ করিলে শূদ্রের কর্ণছিদ্র সীসা দিয়া, জতু দিয়া পূর্ণ করার কথা স্মৃতিতে আছে। শূদ্র সঞ্চরিষ্ণু শ্মশান বলিয়া কথিত হয়। তৎসমীপে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। শূদ্র যদি বেদবাণী উচ্চারণ করে, বেদোক্ত ধর্ম্ম ধারণ করে, তাহার জিহ্বাচ্ছেদ ও শরীরভেদ করার নির্দ্দেশ স্মৃতিকার দিয়াছেন।

কিন্তু অন্য দিকে দেখি—বিদুর বা ধর্ম্মব্যাধ ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছিলেন। বেদব্যাস এইজন্য ইতিহাস ও পুরাণ শূদ্রদের জন্য শ্রাব্য ও শ্রোতব্য, এই বিধি প্রবর্ত্তন করেন।

বিদুর কিন্তু জাবালের মতই ব্রাহ্মণের ঔরসজাত। অতএব এ ক্ষেত্রেও ব্রহ্মজ্ঞান ব্রাহ্মণের পক্ষেই সম্ভব, দৃষ্টান্ত-চ্ছলে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ধর্ম্মব্যাধের কুলপঞ্জী বাহির করিলে হয়তো এইরূপ কিছু পাওয়া যাইতে পারে। শূদ্রের প্রতি অতীত ভারতের এইরূপ শাস্ত্রবদ্ধ অশ্রদ্ধা ভারতের এক বিশাল জাতিকে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী করিয়াছে। কিন্তু আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে—ভারতের যে জনসমষ্টি এক সুমহতী সংস্কৃতি লইয়া মাথা তুলিতে প্রেরণা পাইয়াছিল, তাহারা শিক্ষা-সভ্যতা নিজেদের মধ্যেই সংগোপন রাখিয়া শক্তিশালী জাতিরূপে গড়িয়া উঠার প্রয়াস করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য একই রক্তধারায় বৃত্তিভেদে তিন ভাগে বিভক্ত হয়; পরে চতুর্থ বর্ণের উৎপত্তি। শূদ্র জাতিকে একই সংস্কৃতির অধীনে আনয়ন করার সুদিন আসিতে না আসিতেই ভারতের দুর্দ্দিন দেখা দিয়াছিল। বৃত্তিভেদ দোষের নহে; কেননা কোন এক বর্ণ ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষের জন্য বিহিত হইতে পারে। যোদ্ধার ধর্ম্ম ব্যবসায়ীর নহে, তাই বলিয়া ব্যবসায়ী যোদ্ধার অপেক্ষা হেয় হয় না; জ্ঞানের পথ তাহা রুদ্ধ হইতে পারে না। তদ্রূপ বেদোক্ত কর্ম্ম একের পক্ষে প্রযুজ্য, অন্যের পক্ষে নিষিদ্ধ হউক, কিন্তু বেদবিদ্যায় দেবলোক হইতে মনুষ্য-লোক পর্য্যন্ত সকলেই অধিকারী হইবে। তাই গীতায় জাতিকে ব্যাপকভাবে গড়ার ক্ষীণ প্রয়াস দেখা যায়। গুণ-কর্ম্মে চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিচার গীতার শ্লোকে দেখিতে পাই—সে গুণ ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের বীর্য্য, বৈশ্যের প্রেম, শূদ্রের সেবা। এই চতুর্গুণ ঈশ্বরগুণ, ব্রহ্মানন্দই আধার-ভেদে বিচিত্র রূপে ও রঙে প্রকাশ পাইয়াছে।

আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম পাদের তৃতীয় অধ্যায় শ্রুত্যুক্ত ঈশ্বরবাচক বাক্য প্রমাণ করার জন্য রচিত হওয়ার কথা—মধ্য হইতে বেদাধিকার প্রসঙ্গ লইয়া দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকের বর্ণবিচার কি হেতু করা হইল, তাহাই বিচার্য্য। যে বেদব্যাস গীতায় গুণকর্ম্মে চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করিয়াছেন, তিনি কি হেতু এই ক্ষেত্রে জাত-বর্ণাদির বিচার করিয়া ব্রাহ্মণেতর জাতিকে হেয় প্রতিপাদন করার জন্য পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলি প্রণয়ন করিলেন? আমাদের মনে হয়—মধ্য-যুগে আর্য্যসংস্কৃতির দায় বড় হইয়া উঠিলে, ব্রহ্মসূত্রে এই সূত্রগুলি কমঠব্রতী আর্য্য মনীষীরা প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন।

কেননা পরবর্ত্তী সূত্র পূর্ব্ব প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বাক্যার্থবিচারে প্রবৃত্ত দেখা যায়, যথা—

কম্পনাৎ ॥৩৯॥

কম্পনের আশ্রয় হেতু।

কঠ শ্রুতিতে আছে "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি" ইত্যাদি অর্থাৎ এই যে কিছু জগৎ, সমস্তেই প্রাণ এজিত। এজ্ ধাতু কম্পনার্থে ব্যবহৃত হয়। উক্ত বাক্যের অর্থ—সমস্ত জগৎ প্রাণাশ্রিত থাকিয়া কম্পিত হইতেছে অর্থাৎ সতত চেষ্টমান হইতেছে। এই প্রাণ—বায়ু কি না, এই বিচার নিরর্থক। শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন

জীব প্রাণ অথবা অপান দ্বারা জীবিত থাকে না, তিনি "প্রাণস্য প্রাণম্"; অতএব এই প্রাণ পরমেশ্বর।

জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ ॥৪০॥

জ্যোতিঃ (পরমাত্মা) দর্শনাৎ (এইরূপ শ্রুত্যুক্তি থাকা হেতু)।

ছান্দোগ্যোপনিষদে কথিত আছে "এষ সম্প্র-সাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ" ইত্যাদি; অর্থাৎ "এই সুষুপ্ত পুরুষ শরীর হইতে উত্থিত হন। তারপর পর-জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া" ইত্যাদি। এই জ্যোতিঃ তমোনাশক

তেজঃ কিনা, এই বিচার আসিয়া পড়ে। এই শ্লোকে পর-জ্যোতিঃর কথা আছে। এই পর-জ্যোতিঃ উত্তম পুরুষ; অতএব ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি এই সূত্রের লক্ষ্য, আদিত্যাদি কোন তেজোমণ্ডল ইহার লক্ষ্য নহে।

আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥৪১

আকাশঃ (আকাশ শব্দ) অর্থান্তরত্বাদি ব্যপদেশাৎ নাম-রূপের নির্ব্বাহক হইতে অন্য অর্থে অভিহিত করা হইয়াছে, এই হেতু।

কারণ ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলেন—আকাশ নাম-রূপের নির্ব্বাহক। "তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম"; আবার যাহা ব্রহ্ম, তাহা অমৃত ও আত্মা। এই আকাশ ভূতাকাশ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু তাহা নহে। "তে যদন্তরা"—নাম ও রূপ যাহার অন্তরে। আকাশের নাম-রূপ-কর্ত্তৃত্ব নাই; ব্রহ্মেরই আছে। আকাশ নাম-রূপের নির্ব্বাহক বলায়, তাহাই ব্রহ্ম। আত্মা ও অমৃত বলায়, এই আকাশ পরমাত্মাই।

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥৪২

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্তঃ (সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি, এই দুই অবস্থাতে) ভেদেন (জীব হইতে পরমেশ্বরের পৃথক্ করার নির্দ্দেশ আছে)।

আরণ্যক উপনিষদে জনক জিজ্ঞাসা করিতেছেন—আত্মা কি? যাজ্ঞবল্ক্য অনেক কথার পর বলিয়াছেন—বিজ্ঞানময় পুরুষ প্রাণ সকলের মধ্যে হৃদয়ে জ্যোতিঃ-রূপে বিরাজ করেন, যিনি ইহলোক ও পরলোকে সমান ভাবে বিচরণশীল। সুষুপ্তি ও মৃত্যু—জীবের এই দুই অবস্থা ব্রহ্ম হইতে ভেদ-ব্যপদিষ্ট। সুষুপ্তিকালে জীব আত্মার সহিত মিলিত হইয়া অন্তর ও বাহ্য কিছু জানিতে পারে না; মৃত্যুকালেও অঘোর অবস্থায় জীব শরীর ত্যাগ করে। জীব এই উভয় অবস্থায় আত্মার সহিত ভিন্ন, কেননা তাহার সর্ব্বজ্ঞতার অভাব পরিদৃষ্ট হয়। অতএব জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ব্যপদিষ্ট হইল।

পত্যাদি শব্দেভ্যঃ ॥৪৩॥

শ্রুতিতে পতি, অধিপতি, ঈশান আত্মার বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব শ্রুতির প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই। "ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়" ইত্যর্থক শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্ম-সাদৃশ্যলাভের কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে। বদ্ধ জীব অথবা মুক্ত জীব—উভয় অবস্থার জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদই প্রদর্শিত হইয়াছে। নাম-রূপের নির্ব্বাহক আকাশ শব্দ জীব নহে, পরমাত্মারই বোধক। ইহাই শ্রুতিসিদ্ধ কথা।

ইতি ১ম অধ্যায় তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

# শরৎ-স্মরণে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাহা

এ বিশাল পৃথ্বীমাঝে আসে যায় কত না জীবন,
কত ভাঙ্গা গড়া,
অনাদি এ মর্ত্ত্যলোকে চলিয়াছে লয় ও সৃজন
নাহি যায় ধরা।
একদিন অজ্ঞাত আঁধারে
প্রকৃতির স্বপ্ন পারাবারে
তোমারে লভিল বঙ্গের
শ্যাম বসুন্ধরা।

সাহিত্যের সুনীল আকাশে তুমি ছিলে শরতের চাঁদ
তব চন্দ্রালোকে—
মানব-মানবী কত লভিয়াছে অমৃত আস্বাদ
বিস্ময়-পুলকে।
মর্ত্ত্যলোকে তুমি আজ নাই
কীর্ত্তি তব লভিয়াছে ঠাঁই;—
দুঃখের হে দরদী কবি,
জাগো মনোলোকে।

# জীবন-সঙ্গিনী

শ্রীমতিলাল রায়

২০

পণ্ডীচেরীতে সে এক রাত্রির কথা। আষাঢ়ের নীল জলধর এই সুদূর দক্ষিণের শূন্য ছাইয়া কুহেলী সৃষ্টি করে না, অজস্র ধারাবর্ষণে চিত্তে ভাবাবেশ ঘনাইয়া তুলে না; বাংলার ন্যায় আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝিলিক এখানে দেখা যায় নাই। তবে সে রাত্রিতে এমনই একটা প্রাবৃটের ঘনঘটা আমাদের মাথার উপর ঘনাইয়া উঠিয়াছিল। সমুদ্রের বক্ষ হইতে কুণ্ডলী পাকাইয়া ঝট্‌কা বাতাসে প্রাণ উদাস করিয়া দিতেছিল। বুকের মধ্যে থম্‌থমে অন্ধকার অকারণে জমিয়া উঠিতেছিল, স্বস্তি পাইতেছিলাম না। ঠিক এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেদিন আকাশের দুর্য্যোগ-লক্ষণ দেখিয়া তিনি নিম্নতলের একখানি প্রশস্ত গৃহে ভাঙ্গা টেব্‌লটার এক পাশে আসন পাতিয়া বসিয়া ছিলেন। আমাদের সাধন-চক্র চিরদিনই দ্বিতলের খোলা বারান্দায় অনুষ্ঠিত হইত। আজ এই অমার্জ্জিত উপেক্ষিত নিম্নের ঘরখানিতে শ্রীঅরবিন্দকে এই প্রথম উপবেশন করিতে দেখা গেল। এই সময়ে প্রতি ঘটনার পশ্চাতেই আধ্যাত্মিক ভাবানুগতির সন্ধান করিতাম। অতি তুচ্ছ ঘটনাও গুরুত্বপূর্ণ করিয়া দেখার স্বভাব আমার গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ আমার সমস্ত জীবনটাই অসংখ্য প্রকার সাধনার আবর্ত্ত ভেদ করিয়া চলায়, অতি সহজ সাধারণ ঘটনাও আমার চক্ষে অসাধারণ নিগূঢ় রহস্যময় বলিয়া প্রতীত হইত। আমার মনে হইল, শ্রীঅরবিন্দের অধিরোহণ-পর্ব্বের পর অবতরণের পালা সুরু হইয়াছে। নিম্নতলে সাধনচক্রের এই অনুষ্ঠান তাহারই লক্ষণ।

সন্ধ্যার পর এইখানে বসিয়া নানা আলোচনা চলিল। শ্রীঅরবিন্দ স্বপ্রতিভায় কত অতীতকে ডাকিয়া আনিয়া কত অলৌকিক প্রসঙ্গের অবতারণা যে করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কখনও তিনি রাজা রামমোহনের আত্মাকে ডাকিয়া আনিয়া ভাবাবেশে রাজার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিশদ করিতেন। "যৌগিক সাধন" ইংরাজীতে যাহা তিনি একদিন টাইপ করিয়া আমার হাতে দিয়াছিলেন, তাহাও নাকি রাজা রামমোহনের আত্মার প্রেরণায় লিখিত হইয়াছিল। রামমোহনের আত্মা ব্যতীত আর এক জন অতীত পুরুষের আত্মাকে তিনি বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তিনি ছিলেন সাহিত্যসম্রাট্‌ বঙ্কিমচন্দ্র। বাংলার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে তিনিই ঋষি বঙ্কিম নামে প্রথম অভিহিত করিয়াছেন। ভাবাবেশে বঙ্কিমের প্রেরণা তিনি বলিতেন, আমরা শুনিতাম। আবার কখনও বা তিনি অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতে করিতে নভোমণ্ডলের অপূর্ব্ব রহস্য-কথা অনর্গল বলিয়া যাইতেন। পরলোক-তত্ত্বের অজ্ঞাত কাহিনী এমন নিপুণ ভাষায় তিনি চিত্রিত করিতেন যে, শুনিতে শুনিতে আমরাও সেই অশরীরী জগতে তাঁর সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। তাঁহার অসামান্য প্রতিভার অগ্নিস্ফুলিঙ্গে চারিদিক্‌ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। আমরা মর্ত্ত্য হইতে অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া অধ্যাত্মজগতের তোরণ-দ্বারে গিয়া দাঁড়াইতাম। মাটীর জগৎ হইতে আমাদের চৈতন্য উর্দ্ধে বিচরণ করিত। শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া এমনই আনন্দে আমাদের দিন অতিবাহিত হইত।

অসংখ্য প্রকার আলোচনার পর রাত্রি তখন বেশ ঘন হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আমাদের নামের অধ্যাত্মব্যাখ্যা দিতে সুরু করিলেন। নলিনীকান্ত, সুরেশচন্দ্র, অমৃতকে ছাড়িয়া, অতঃপর তিনি আমার দিকে চাহিলেন। আমার কথাটাই স্পষ্ট মনে রাখিয়াছি। অন্যের ব্যাখ্যা তেমন স্মরণে নাই, তাই ইহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন "মতি—মতি—বিশুদ্ধতার—পিউরিটির প্রতীক। লাল সংগ্রামসূচক শব্দ। রায় অর্থাৎ লীডার—নেতা। অতএব বলা যায়, মতিলাল বিশুদ্ধ সংগ্রামের নেতা।" এমনই রঙ্গ-রহস্য ছিল আমাদের আলাপ-আলোচনার বিষয়। বেদোপনিষদের চর্চ্চা হইতে যোগ-

জীবনের পরিচয় দিতে তাঁর চক্ষে অসামান্য প্রতিভার আগুন ঝিলিক দিয়া উঠিত, আবার হাস্যকৌতুকের রঙ্গে তাঁহার ওষ্ঠপুটে অপরূপ লাবণ্য প্রকাশ পাইত। কথার অন্ত ছিল না।

এই বার বিজ্ঞানের কথা উঠিল। অন্নময় প্রাণময়, মনোময় কোষের উপর বিজ্ঞানের চেতনায় উঠিয়া জাতির সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনীতিক পরিবর্ত্তন আনার ব্যবস্থা যে আমাদের করিতে হইবে, সে কথা অতি উৎসাহের সহিত তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন। বিজ্ঞানের কথাগুলি আমার চিত্তে জ্বলন্ত প্রেরণার রেখা টানিয়াছিল। তিনি আত্ম-সমর্পণযোগের কথা বুঝাইতে নিজের হাতখানি প্রসারিত করিয়া যেমন বলিতেন, "এই কর্ম্মটীও আমার নহে, ভগবানের শক্তিই করিতেছে", তেমনই দক্ষিণ হস্তটী মাথার উপর উঠাইয়া বলিলেন—"এই উপর হইতেই কর্ম্মসৃষ্টি হইবে। এই মাথার উপরই বিজ্ঞানের সমুদ্র বহিতেছে। যোগ যেমন স্বীকার করিয়া লওয়ায় জীবনে উহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, বিজ্ঞানলাভেরও এই একই পন্থা। চাই স্বীকৃতি ও বিশ্বাস, আর সর্ব্বদা স্মরণ।"

তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে আমার অতীত জীবনের আনুষ্ঠানিক সাধনার ঘুমন্ত বীজগুলি অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। সেই যে মেরুদণ্ডের সর্ব্বনিম্নভাগে গুল্‌ফের আঘাত দিয়া মূলাধার হইতে অধিষ্ঠান, তার পর মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ চক্র ভেদ করিয়া দ্বিদলে কুণ্ডলিনীকে স্থির রাখার চেষ্টা করিতাম, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্কেতে সেই সাধন-স্মৃতি রূপান্তরিত হইয়া উঠিল। দ্বিদলের উর্দ্ধে যে আত্ম-চৈতন্য, তাহাই ইন্দ্রিয়াতীত; শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন, "এই-খানেই তোমার আসল স্বরূপ। শরীর লইয়া যেটুকু তুমি, তাহা ছায়া, সত্য নয়। আসল মানুষ পিছনেও নয়, সম্মুখেও নয়, ভিতরেও নয়—একেবারে উপরে। এইখানেই সত্যের প্রতিষ্ঠা যদি হয়, তবেই অন্তরে হইবে প্রকাশ, বাহিরে হইবে তার খেলা। যোগের সিদ্ধি বিজ্ঞানে; এইখানেই কর্ম্ম, জ্ঞান সবই থরে থরে সজ্জিত আছে। বিজ্ঞানে উঠিলে আর চেষ্টা করিতে হইবে না। মহাকাল সব প্রকাশ করিয়া দিবেন।"

কথা শুনিতে শুনিতে উৎসাহে চিত্ত পুলকিত হইল। আত্মসমর্পণের সাধনায় সাধক যখন বিজ্ঞানের সিংহদ্বারে পৌঁছায়, তখনই ভগবানকে না জানিয়া, না পাইয়া চলার সমাপ্তি; আর এইখানেই ভগবানের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি। তাই আত্মসমর্পণের তপস্যা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

শ্রীঅরবিন্দ বিজ্ঞানেরও ঊর্দ্ধে সচ্চিদানন্দের কথা বলিতে বলিতে নীরব হইলেন। আমরা এই অমৃত-বাণী আস্বাদ করিয়া ধন্য হইলাম। শ্রীঅরবিন্দের চিঠি ও কথা আমায় পাগল করিয়াছিল, তাহার সামান্য পরিচয় দুই এক কথায় দিলাম। শ্রীঅরবিন্দের সাধন ব্যক্ত করার বিধান আমার নহে, অন্যের। এ বিষয়ে আমি আর অধিক দূর আগাইব না।

এই সকল কথার পর এইবার তিনি হঠাৎ একটী মর্ম্মঘাতী উক্তি প্রকাশ করিলেন—বলিলেন "মতিলালের সাধন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু he puts a wall between him and me" অর্থাৎ সে আমার ও তার মধ্যে একটী প্রাচীর তুলিয়া দিতেছে।

নেশা বেশ জমিয়া উঠিতেছিল। চক্ষে স্বর্গের দীপ্তি। কর্ণে অমৃতের অনুভূতি। শক্ত পৃথিবীটা দ্রবণীয় মনে হইতেছিল। অকস্মাৎ নিষ্ঠুর বজ্রধ্বনির ন্যায় শ্রীঅরবিন্দের এই কথাটা আমায় উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। প্রথম মনে হইল, কথাটা জানালার বাহিরে ঐ যে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ, ঐখান হইতে কোন অজ্ঞাত পথিকের পরুষ পরিহাস হইবে। আমি শ্রীঅরবিন্দের দিকে চাহিলাম। কিন্তু না, এই নিষ্ঠুর আঘাত শ্রীঅরবিন্দের কণ্ঠনির্গতই বটে। আমার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। শ্রীঅরবিন্দ আর আমি, ইহার মধ্যে অন্ধকার-সৃষ্টির স্বপ্নও কোন দিন দেখি নাই। আত্ম-সমর্পণের মন্ত্রধ্বনি শত সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতেরই আকাশে বাতাসে যে অমৃত বর্ষণ করিয়াছে, তাহাতে অভিষিক্ত হওয়ার সাধেই তন্ত্র-মন্ত্র-উপাসনার রসে অভিভূত হইয়া কত পথ ঘুরিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে গড়াগড়ি দিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মিলন-বার্ত্তার নিগূঢ় অর্থ বুঝিবার কত প্রচেষ্টাই না করিয়াছি! শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎকার পাওয়ার পূর্ব্বের উৎসর্গমন্ত্রের মহিমস্তুতি গাহিতে গিয়াই আমার সর্ব্বপ্রথম সাহিত্য-সৃষ্টি 'উদ্বোধন' নাটক। আত্মসমর্পণের আকুলতায়

যাত্রার করুণ কণ্ঠ বোধ হয় পার্থ-সারথির কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, এই জন্যই না শ্রীঅরবিন্দ তপস্বীর মূর্ত্তি ধরিয়া এ দীনের দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন? একাদশ বর্ষ পরে, যখন শ্রীঅরবিন্দের প্রেমামৃতে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া এখানে আসিয়াছি, সে অন্তরের নিগূঢ় সত্যকে এমন করিয়া নিষ্ঠুর আঘাত দিবার প্রেরণা কেমন করিয়া আসিল? কোন্ দিক্ দিয়া এই অধ্যাত্মমিলনকে ব্যাহত করার রাক্ষসী শক্তি আসন্ন মহাযুগের পরিপন্থী হইল? শ্রীঅরবিন্দ স্থির ধীর কণ্ঠেই তাঁর মর্ম্মানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাণীতে ছিল সতর্কতা। কথাগুলিও ছিল স্নেহবিজড়িত। কিন্তু আমার চিত্ত তাহাতে শেলবিদ্ধ হইল। মনে হইল, এই ১১ বৎসর ধরিয়া নিয়ত শ্রম ও সাধনায় যে সৃষ্টি গড়িয়াছি, তাহার মূল্য একটি কপর্দ্দকও নহে। শ্রীঅরবিন্দের নিকট আমার আত্মনিবেদনের মূলে কোন কামনাই ছিল না। আকস্মিক ঘটনায় তাঁর আগমন। শ্রীঅরবিন্দের প্রয়োজনে আমার এই ১১ বৎসরের জীবন নিঃশেষ করিতেও বাধে নাই। এই ১১ বৎসরের জীবন-গতিও স্বপ্ন বা কল্পনা নহে। তার একটা বস্তুতন্ত্র ইতিহাস দীর্ঘায়ত হইয়া আমার সহিত অনুস্যূত। রাষ্ট্রে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে গিয়া, আমি মৃত্যুঞ্জয়ী। আসক্তির রসায়ণে সংসাররচনায় ব্যর্থ হইয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছি। আমার বলিতে এই মুহূর্ত্তে কিছুই খুঁজিয়া পাই না। শ্রীঅরবিন্দের মুখে এমন কটু কথা কে বাহির করিল; কেন এমন কথা তিনি আমায় বলিলেন? আপনাকে দেখার কিছুই ছিল না; বিষধর সর্পের দংশনে প্রাণী যেমন এক মুহূর্ত্তে আয়ুঃহীন হয়, আমার সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেন পুড়িয়া ছাই হওয়ার উপক্রম হইলাম। মরণের আর্ত্তনাদে ঘর হইতে প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণ হইতে সমস্ত বায়ুমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। আমি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে, বিকৃত স্বরে কেবলই প্রশ্ন করিতে লাগিলাম—কেন, কেন, তিনি এমন কথা উচ্চারণ করিলেন? এমন প্রাণঘাতী ধারণা কেমন করিয়া তাঁর হইল? বিদ্যুদ্বেগে আমায় কে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিল, সান্ত্বনাবাণীর প্রতীক্ষা করিতে দিল না। টেবলের উপর কটীকাটা একখানি ছুরিকা পড়িয়াছিল, তাহা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিলাম; তারপর রুদ্ধ কণ্ঠে কত কি যে বলিয়াছি, তাহা আমার স্মরণে নাই। সে ঘটনা যদি ভবিষ্যতের সূচনাপর্ব্ব না হইত, আমার এই উন্মত্ততা ভাবপ্রবণতার অভিব্যক্তি বলিয়া বাজে খাতে খরচ লিখিয়া রাখিতাম। কিন্তু সে দিনের সেই দৈবী সঙ্কেত সত্যই কঠোর বজ্রের ন্যায়ই আমার জীবনের অতি নিষ্ঠুর সত্যকেই মূর্ত্তি দিয়াছে; আমি ছিলাম প্রলাপমুখর কণ্ঠ উন্মত্তের ন্যায় অধীর, বিক্ষিপ্তচিত্ত, নিদারুণ ব্যথিত। সহতীর্থগণ ছিলেন নিরপেক্ষ দর্শক। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের নয়ন স্নেহার্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সুধাসিঞ্চনে বজ্রাহত ব্যথিত ধীরে ধীরে শান্ত-সমাহিত হইল। মাংসপেশী শিথিল, ধমনীর রক্তস্রোতঃ মন্থর, শিরা উপশিরা আপনা হইতেই নিস্তেজ হইয়া পড়িল। মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত নীথর স্তব্ধতায় আমাদের অতিবাহিত হইল; তারপর নীরবেই আমরা সে কক্ষ ত্যাগ করিলাম। সে দুর্যোগময়ী রাত্রির সে দুর্ঘটনার কাহিনী আমার হৃদয়ে চির-ক্ষত সৃষ্টি করিয়া রাখিল।

ইহার পর তিন দিন আর শ্রীঅরবিন্দের সহিত বাক্যালাপ রহিল না। একটী অতি তুচ্ছ কথা হৃদয়-ভেদ সৃষ্টি করিল। অনুভব করিতে লাগিলাম, শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া গিয়াছে। তিনি একদিন বলিয়াছেন, তোমার যোগ তোমার জন্য নয়—নিখিল মানবজাতির জন্য; তোমায় যোগে লয় নাই, মোক্ষ নাই, আছে অনন্ত ভাগবত জীবন। এমন অনেক কথাই হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তেমনই তাঁহার মুখে সেদিন এই প্রাচীর তোলার কথাটী আমার বুক ভাঙ্গিয়া দিল। এই তিন দিনের আকুল প্রতীক্ষাও কার্য্যকরী হইল না। তিনি যথানিয়মে দৈনন্দিন কর্ম্ম করিয়া চলেন—সংবাদপত্র পাঠ করেন, স্নান, আহার, হাস্যপরিহাস করেন; আমি দূরে দূরে ঘুরিয়া বেড়াই। এক বার ডাকিলেই হৃদয়ের ক্ষত নিরাময় হয়, কিন্তু সে পাত্র শ্রীঅরবিন্দ নহেন। তিনি আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনের ন্যায় রহিলেন। আমার হৃদয় পুড়িয়া যাইতে লাগিল। হৃদয়ের আগুন মাথায় উঠিল। সে কি ভীষণ যন্ত্রণা, আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। শ্রীঅরবিন্দ আকাশ পানে স্থিরদৃষ্টিতে একা তখন বসিয়া ছিলেন। অভিমানবিজড়িত কণ্ঠে গিয়া জানাইলাম অসহ্য যন্ত্রণার—

কথা। রুদ্ধ স্নেহের উৎস আমায় অভিষিক্ত করিয়া দিল। তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন "এত শীঘ্র মাথার যন্ত্রণা হইবে, তাহা মনে করি নাই ; ভয় নাই, শীঘ্রই সারিয়া যাইবে।"

সন্ধ্যার পর শয্যায় আসিয়া বসিলাম। সে রাত্রে ভোজনের স্পৃহা ছিল না। আমি থাকিতাম শ্রীঅরবিন্দের বাসভবনের এক প্রান্তের একটী ক্ষুদ্র গৃহে। হৃদয় বলিয়া বস্তুর সন্ধান আমাদের মধ্যে পাওয়া যাইত না। যে কয় জন আমরা একত্র থাকিতাম, নিজ নিজ তালেই চলা হইত। কেহ কাহারও খবর লওয়ার বালাই ছিল না। আমি বিনিদ্র হইয়া কত রাত্রি পর্য্যন্ত যে এই ভাবে বসিয়াছিলাম, তাহা জানি না। হঠাৎ মনে হইল, আমি দেহ ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি ; আর সে কি এক অপূর্ব্ব ভাবময় আত্মচৈতন্ত আমার এই শরীরটার উর্দ্ধে একটা জ্যোতি-র্ম্মণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে। সে এক অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি—ভাষায় তাহা প্রকাশ করিবার নয়। অতি প্রত্যূষে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়া, আবার আমার সবখানিকে লইয়া আমি পূর্ব্বের ন্যায় জাগিয়া উঠিলাম। স্বপ্নটীর কথা স্পষ্টই স্মরণে আছে। দেখিলাম, আমার শরীরের ভিতর হইতে এক অতি প্রাচীনা নারীমূর্ত্তি বাহির হইয়া যাইতেছে। তাহার উভয় করে দড়ি-বাঁধা একটী প্রকাণ্ড কুম্ভীর আর একটী গর্দ্দভ তাহার অনুসরণ করিতেছে। স্বপ্নভঙ্গে শয্যায় উঠিয়া বসিলাম। সমস্ত শরীর অসম্ভব রকমের লঘু মনে হইল। মাথাটাও খালি হইয়া গিয়াছে, যন্ত্রণাও নাই। চিত্ত প্রফুল্ল হইল। তিন দিন পরে শ্রীঅরবিন্দের নিকটে গিয়া ঘটনা জানাইলাম। সাধনার কথা তিনি অতিশয় আকৃষ্টচিত্ত হইয়া শুনিতেন। সব কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন "তোমার মনের দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানের জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, পুরাতন প্রকৃতি তার অন্ধতা ও ক্রূরতা লইয়া বিদায় হইয়া গিয়াছে, আরও অনেক কিছু হইবে।"

আমার আনন্দের সীমা রহিল না। শ্রীঅরবিন্দকে আবার অতি নিকটেই পাইলাম ; অন্তরে অত্যদ্ভুত শক্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। এই সময়ে পণ্ডিচারীর কয়েক জন যুবককে লইয়া প্রতিদিন অপরাহ্নে একটা যৌগিক ক্লাস খুলিয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দের ইহাতে পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। মিষ্টার রিশারও এই ক্লাসে যোগদান করিতেন।

দিন অতি স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। শ্রীঅরবিন্দ আর আমি। একদিন মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সহাস্যে একখানি ডাকের চিঠি আমার হস্তে দিলেন, বলিলেন "মতিদা, এ নিশ্চয় বৌদিদির পত্র ?" সত্যই তাই। নলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌদিদি কি লিখিয়াছেন ?" সুদূর প্রবাসে দীর্ঘদিনের পর স্ত্রীর পত্র যে রসানুভূতির সৃষ্টি করে, এই পত্রে তাহার কিছুই ছিল না। এই পত্রখানি অন্যের কাছে প্রকাশ করিতেও লজ্জা হয়। পত্রে স্বামীর প্রতি কোন সম্বোধন নাই। একবিন্দু ভাবের রং লেখার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মুখের কথা যেমন তাঁর প্রস্তরকঠিন ওষ্ঠপুটে জমাট বাঁধিয়া থাকিত, ব্যক্ত হইত না, এই পত্রেও তেমনি তাঁহার লেখনী বোধহয় দুই একটা আঁচড় কাটিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। পত্রে দুই ছত্র আঁকা বাঁকা করিয়া লেখা "আপনি কেমন আছেন জানাবেন। মন কেমন করে, অনেক দিন দেখি নাই।" পত্রে আর কিছু নাই। স্ত্রীর পত্র দেখাইবার মত নহে। আমার ভাব দেখিয়া নলিনী নিরাশ হইলেন। কিন্তু তাঁহার এই বড় বড় দুই ছত্র লেখা আমার মানসপটে তাঁর শুষ্ক-গম্ভীর মূর্ত্তিখানি ফুটাইয়া তুলিল। আমার অদর্শনে সে হিয়া যে দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে, অতিশয় অতিষ্ঠ হইয়াই যে এই পত্রখানি তাঁর হৃদয়ের আকুলতা প্রকাশ করিয়াছে, তাহা সুবিস্তৃত হইয়া আমার অন্তর ছাইয়া ফেলিল। এ ডাকও যেন উপেক্ষার নহে। আমি বুঝিলাম—একূল ওকূল, দুকূল লইয়া জীবন চলে না। হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সুদূর চন্দননগরের স্মৃতি পরিহার করিলাম।

তার পরদিনই দেখি—মীরা দেবী আমার ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। সেই যে এক মাস পূর্ব্বে শয্যা পাতিয়াছি, তাহা আর তুলি নাই। যত সংবাদপত্র পাঠ করিয়াছি, তাহা জড় হইয়া শয্যাটী ঢাকিয়া দিয়াছে ; স্নানান্তে সিক্ত বস্ত্রখানি মেঝের এক পাশে পড়িয়া কতক শুকাইয়াছে, কতক ভিজা আছে। গ্লাস, ডিশ, কুঁজা, ঘটি, বাল্‌তি ঘরের চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। মীরা দেবীর দৃষ্টির ভঙ্গীতে আমাকেও বুঝিয়া লইতে হইল—এটা মানুষের ঘর নহে, একটা

পাগলের। তিনি বলিলেন "বাল্যবিবাহের পরিচয় আপনার এই ঘরখানি। আপনার জন্য আপনার স্ত্রীকে যে কতখানি খাটিতে হয়, তাহা বুঝিলাম।"

আমার লজ্জার সীমা রহিল না। সেদিন হইতে স্বহস্তে নিজের প্রয়োজনীয় কর্ম্ম যত দূর সম্ভব পরিপাটী করার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কাপড় নিঙড়ান স্বভাবে নাই। কোনদিন গামছা নিঙড়াইয়া মাথা মুছি নাই। নিজের মাথাটা আঁচড়াইবারও শক্তি চর্চ্চা করি নাই। অতি শিশুকালের পরিচর্য্যা জননীর স্নেহে হইয়াছে। বাল্যে সহোদরাপ্রতিমা এক ধাত্রী সম্পন্ন করিয়াছেন। কৈশোরেও মহিলা বন্ধুর অভাব হয় নাই। যৌবনের প্রথম প্রভাত হইতেই গৃহলক্ষ্মী প্রতিদিনের জীবনযাত্রার প্রয়োজন মিটাইয়াছেন। আমি খাইতে শুইতে এখানে অসহায়ের মতই দিন গণিয়াছি। কিন্তু এটুকু ক্লেশও আমায় আর সহিতে দিবে না বলিয়া চন্দননগর হইতেই সেবার অধিকার লইয়া আমার দুই জন শিষ্যবন্ধু আসিয়া পণ্ডিচারীতে উপস্থিত হইল। তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অরুণ-চন্দ্র সোমের নাম আজিও উল্লেখযোগ্য। আমি দেখিলাম, আমার শয্যাধার আর মলিন বিশৃঙ্খল নহে। গৃহের আসবাবপত্র যথাস্থানে সন্নিবেশিত। আমি অতি সন্তর্পণেই রহিলাম। এই অবস্থায় মীরা দেবী যদি ঘরে আসেন, তিনি নিশ্চয় বুঝিবেন যে, আমি নিজের জীবন লইয়া কতটা পরমুখাপেক্ষী। আমি তো তাঁহাকে বুঝাইতে পারিব না; আমার এই আপেক্ষিকতার জন্য আমি দায়ী নহি, আমার কল্পবিধৃত ইহাই সত্য; আজও যে শয়ন, ভোজন, জীবন-যাপনের প্রতি কর্ম্ম অন্যের বিনা আনুকূল্যে সম্পন্ন হয় না, সে দিনের শরীরিণী শক্তি আজ অশরীরিণী হইয়াও এই সত্যই রক্ষা করিতেছে, ইহা কেমন করিয়া বুঝাইব। আমি শক্তির পরিপূর্ণ অধীন, শুধু অধ্যাত্মক্ষেত্রে নহে, জীবনের দৈনন্দিন কর্ম্মে; এমন কি শরীরধারণের প্রতি ব্যাপারেও শক্তি আজও আমায় স্বাধীনতা দেন নাই।

ভাবের কথা ছাড়িয়া দিয়া কাজের কথা বলি। পণ্ডিচারীতেও দীর্ঘদিন থাকা আমার ইচ্ছাধীন হইল না। চাকা ঘুরিয়া গেল। চন্দননগরের ডাক লইয়া যাহারা আসিল, তাহারা আমার অনুগত সখা, সুহৃৎ ও শিষ্য। কিন্তু ইহাদের আশ্রয় করিয়া অলক্ষ্যে যে শক্তি আমায় আকর্ষণ করিল, তাহা উপেক্ষা করা গেল না। শ্রীঅরবিন্দও শ্রেয়ঃকে কোনদিন অস্বীকার করেন নাই, সে পরিচয় পরে দিব। তিনি আমার স্ত্রীর ছায়াচিত্রখানি অতি মনোযোগের সহিত দেখিয়া বলিতেন "আমি তোমার স্ত্রীকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এই ছবি তারই পরিণতি। ইনি তোমার অনিষ্ট করিবেন না—মাতৃমূর্ত্তি, দেবীমূর্ত্তি।" আনন্দে আমার হৃদয় ফুলিয়া উঠিল। পতিপত্নীর দৃঢ় সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইল। আমার ফেরার হাওয়া বহিল। সম্মুখে ১৫ই আগষ্টের আর একটী মাস বাকী; মিষ্টার রিশার বলিলেন "এবার ১৫ই আগষ্ট এইখানে করিতে হইবে।" আমি শ্রীঅরবিন্দের অভিপ্রায় জানিবার জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি আমার চক্ষের দৃষ্টিতে অব্যক্ত আকূতি অনুভব করিয়াই বলিলেন "না, ১৫ই আগষ্টের বিপুল আয়োজন চন্দননগরেই হইতেছে। মতিকে ফিরিতে হইবে।"

শ্রীঅরবিন্দ আমার ইচ্ছাকেই জয়যুক্ত করিলেন। পৃথিবীতে এই এক অপার্থিব সম্বন্ধ। জীবনের সমুচ্চে শ্রীঅরবিন্দের স্থান। কর্ম্মক্ষেত্র চন্দননগর। যোগজ হৃদয় কেন্দ্র করিয়া এই কর্ম্মব্যাপ্তি। ইহা আসক্তিমূলক কল্পনা নহে—ঈশ্বরবিধান। পণ্ডিচারী হইতে এবার বিদায় লইলাম।

অন্তরজগতের দুয়ার খুলিয়া গিয়াছিল। বাহিরের কর্ম্মতালিকার আর প্রয়োজন হইল না। শ্রীঅরবিন্দ তাহা বহু বার জানাইয়াছেন। তাঁহার স্বহস্তলিখিত এই কথা কয়টী আমার যথেষ্ট হইয়াছিল "As you well know I am identifying myself with only one kind of work or propaganda as regards India, the endeavour to reconstitute her cultural, social and economic life within larger and truer lines than the past on a spiritual basis."

অর্থাৎ তুমি ভালরূপেই জান—ভারতে আমার একমাত্র কাজ, একমাত্র ব্রতানুষ্ঠানে আমি অখণ্ডভাবে আপনাকে ঢালিয়া চলিয়াছি—সে কাজ, সে ব্রত—অতীতের চেয়ে আরও উদার, আরও অবাধ ধারায় ভারতবর্ষের সাধনা, সমাজ এবং অর্থপ্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন করিতে হইবে এবং

অধ্যাত্ম ভিত্তির উপরেই এই নূতন সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

আমার অন্তর বাহির সুনির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। চিন্তার আবর্ত্তে আমার শক্তি কোন দিন স্তম্ভিত নহে। কাজ আমার নহে, ঈশ্বরের। পথ তাই চিরদিন মুক্ত অবাধ আমার সম্মুখে। কচর্ম্মাঞ্চল্য দেহের ও মনের। দেহ-মন কর্ম্ম করিলেই স্পন্দিত হইবে। আত্মা শান্ত সমাহিত, এ অনুভূতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কর্ম্ম কোন দিনই আমার ভার হয় নাই। কর্ম্ম শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় সাবলীল-স্বচ্ছন্দ-গতিতে বহিয়াছে। কর্ম্মের বৃহত্তর ক্ষেত্ররচনার প্রেরণায় আমি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলাম। "প্রবর্ত্তক" বাংলায় কর্ম্মক্ষেত্রসৃজনের উপযোগী হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণায় তাহা ভারতব্যাপী করার প্রবৃত্তি হইল। ইহার জন্য আমি একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক বাহির করার প্রস্তাব করিলাম। শ্রীঅরবিন্দ সম্মত হইলেন। গোল বাধিল নাম লইয়া। সুরেশ ও নলিনী নাম স্থির করিল "Path-finder"; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ হঠাৎ বলিলেন "প্রবর্ত্তক"-এর অনুরূপ ইংরাজী "Standard bearer"। এই নাম লইয়াই বিজয়ী বীরের ন্যায় শ্রীঅরবিন্দের পদবন্দনা করিয়া তাঁহার সম্মুখে স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়াইলাম। সেই বিস্তৃত বারান্দায় তখন শুধু তিনি আর আমি। তিনি প্রসারিত বাহুযুগলে আমার হৃদয়ে লইয়া শিরশ্চুম্বন করিলেন। এ স্পর্শ মর্ত্ত্যের নহে, অমৃতের। তাঁর গদগদ কণ্ঠবাণী আজিও কর্ণে মধুবর্ষণ করে। সে আশীর্ব্বাণী কোন দিক্ দিয়া সার্থক হয়, এ মর্ত্ত্য মনে তাহা অবধৃত হইবে না। শ্রীঅরবিন্দের বাংলা ভাষা তেজোদৃপ্ত, কিন্তু সংক্ষিপ্ত; শ্রুতিতে গাঁথিয়া রহিয়াছে তাঁহার অমর কণ্ঠ "মতি, তোমার কাজ আমার কাজ। আমার কাজ তোমার কাজ"।

মিষ্টার ও মাদাম রিশার সে সন্ধ্যায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, আমায় বিদায় সম্ভাষণ দিতে নিয়েই অপেক্ষা করিতেছিলেন। মিষ্টার রিশারের সহিত আলিঙ্গন করিয়া, মীরা দেবীর করপুট ধারণ করিয়া বিদায় লইলাম। তাঁহারা উভয়ই গৃহদ্বারে আসিয়া, সাদরে বিদায়াভিনন্দন দিলেন। মীরা দেবীর সমস্যা মাথায় লইয়াই চন্দননগরে ফিরিলাম। আসিবার সময়ে তাঁহার জীবনের লক্ষ্য কি, তৎসম্বন্ধে তাহার হস্তলিখিত নাতিক্ষুদ্র বিবরণী সঙ্গে লইয়াছিলাম। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের এই মহীয়সী বিদেশিনী মহিলার আত্মানুভূতি আজিও আমি স্মরণে রাখিয়াছি। তাহার অনুলিপি আমি এইখানে সংযুক্ত করিলাম :—

"When and how did I become conscious of a mission, which I was to fulfil on earth? And when and how I met A. G.?

These two questions you have asked me and I promised a short reply.

For the knowledge of the mission, it is difficult to say when it came to me. It is as though I was born with it, and following the growth of the mind and brain, the precision and completeness of this consciousness grew also.

Between 11 and 13 a series of psychic and spiritual experiences revealed to me not only the existence of God but man's possibility of meeting with Him, of revealing Him integrally in consciousness and action, of manifesting Him upon earth in a life divine. This along with a practical discipline for its fulfilment, was given to me, during my body's sleep, by several teachers some of whom I met afterwards on the physical plane. Later on, as the interior and exterior development proceeded, the spiritual and physical relation with one of these beings became more and more clear and pregnant, and although I knew little of the Indian philosophies and religions at that time, I was led to call him Krishna and henceforth I was aware that it was with him (whom I know I should neet on earth one day) that the divine work was to be done.

In the year 1910, my husband came alone to Pondichery where under very interesting and peculiar circumstances, she made the acquiantance of A. G. Since then we both

strongly wished to return to India, the country which I had always cherished as my true mother-country and in 1914 this day was granted to us.

As soon as I saw A. G., I recognised him as the well-known being whom I used to call Krishna.........and this is enough to explain why I am fully convinced that my place and my work are near him in India.

—Mira Richard.

অর্থাৎ পৃথিবীতে আমি যে একটা কাজের ভার লইয়া আসিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কবে ও কি ভাবে হইল? কখন ও কি ভাবে শ্রীঅরবিন্দের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার হয়?

এই দুইটী প্রশ্ন আপনি আমাকে করিয়াছেন, সংক্ষেপে উত্তর দিব, প্রতিশ্রুতি আমি দিয়াছি।

কাজটী সম্বন্ধে জ্ঞান যে আমার কবে হয়, তাহা বলা কঠিন। এটা যেন মনে হয় জন্মেরই সাথে পাইয়াছি, বয়সের সঙ্গে মনোবুদ্ধির সামর্থ্য যেমন বাড়িয়াছে, এই চেতনাটিও তেমনই স্পষ্টতর ও পূর্ণতর হইয়া উঠিয়াছে।

এগার হইতে তের বৎসর বয়সের মধ্যে আমি সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক জগতের ধারাবাহিক কতকগুলি উপলব্ধির ফলে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান পাই; আরও জানিতে পারি যে, মানুষ ভগবানের সাথে মিলিত হইতে পারে, জ্ঞান ও কর্ম্মে তাঁহাকে পূর্ণভাবে ধরিতে পারে, একটা দিব্য জীবনে তাঁহাকে এই পৃথিবীতেই প্রকট করিতে পারে। এই জিনিষটি আর ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটী সাধনা আমার শরীরের সুপ্তিকালে কয়েক জন উপদেশকের কাছে আমি পাই—তাঁহাদের কয়েক জনের সাথে পরে স্থূলজগতেও আমার সাক্ষাৎকার হয়। তারপর বাহিরে ও ভিতরে যেমন বাড়িয়া উঠিয়াছি, ইহাদের এক জনের সঙ্গে আমার সম্বন্ধও তেমনই স্পষ্ট ও ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে। তখন ভারতের দর্শন বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা ছিল না, কিন্তু ইহাকে আমি কৃষ্ণ নাম দিই। তবে তখনই আমি জানিতে পারি যে, ইহার সাথে স্থূলজগতে আমার একদিন দেখা হইবে, ইহারই সাথে মিলিয়া ভগবানের কাজটী আমাকে করিতে হইবে।

১৯১০ সালে আমার স্বামী একাকী পণ্ডিচারীতে আসিয়াছিলেন। তখন এক কৌতূহলকর ও অদ্ভুত ঘটনাচক্রে শ্রীঅরবিন্দের সাথে তাঁহার পরিচয় হয়, আর তখন হইতে আমরা স্বামী-স্ত্রীতে দুই জনেই ভারতবর্ষে ফিরিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হই—আমি ত ভারতবর্ষকে চিরদিনই আমার প্রকৃত মাতৃভূমি বলিয়া ভালবাসিয়া আসিয়াছি। ১৯১৪ সালে এই সৌভাগ্য আমাদের হয়।

শ্রীঅরবিন্দকে যখনই আমি চাক্ষুষ দেখিলাম, তখনই চিনিতে পারিলাম যে, তিনি হইতেছেন সেই, যাঁহাকে আমি কৃষ্ণ নাম দিয়াছিলাম।.........

এই টুকুতেই আপনি বেশ বুঝিতে পারিবেন—কেন আমার দৃঢ় ধারণা যে, আমার স্থান ও কর্ম্ম তাঁহারই পাশে, ভারতবর্ষে।

ক্রমশঃ

## ভ্রম সংশোধন

| প্রবর্ত্তক পৌষ '৪৭ | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|
| ২৭০ পৃষ্ঠা ১ম কলাম ১৫শ লাইন | পার্শ্বে | স্পর্শে |
| ২য় কলাম ১১শ লাইন | গম্ভীর | গভীর |
| ২৫১ পৃষ্ঠা ১ম কলাম শেষ লাইন | Suspension | Supervision. |

# উলার মন্দির-শিল্প

শ্রীভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোট্ট গ্রাম অতীত যৌবনা নারীর মত বিগত জীবনের সুখস্মৃতিটুকু বুকে নিয়ে অপেক্ষা করছে কবে মহাকালের ডাক শুনতে পাবে—কবে তার সমস্ত অভিজ্ঞান নিয়ে ধ্বংসের পায়ে নিজেকে বিলীন করে দেবে চির তরে।

প্রথমেই চোখে পড়ে 'গ্রাম ছাড়া রাঙা মাটির পথ'। গভীর বনের শ্যামলিমার বুক চিরে রাঙা টকটকে পথ চলে গেছে গাঁয়ের মধ্য দিয়ে—ঠিক যেন তরুণীর আয়তির শুভ লক্ষণ সিন্দুর শোভিত সীমন্তনী। রাস্তার দুধারে মঞ্জরিত শাল সেগুণ তাদের বিরাট শ্যামল রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে উদার নীল আকাশ সমতল ক্ষেত্রের সঙ্গে এসে মিশেছে—দিগন্তের নীল আকাশ মাটির মায়ের পরশ নিতে নেমেছে। এই সমস্ত মিলিয়ে মনের মধ্যে সাঁওতাল পরগণার কথা মনে করে দেয়—এই হচ্ছে গ্রামটীর পরিচয়। ইহা কলিকাতা থেকে ৫১ মাইল দূরে অবস্থিত। এর এক নাম বীরনগর। উলা বীরনগর এক সময়ে বাংলার অন্যতম সমৃদ্ধশালী গ্রাম ছিল।

কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এখানকার মন্দির-শিল্প। এখানকার মন্দিরসমূহ বাংলার মন্দির-শিল্পের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেছে। বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বাংলার মন্দির-শিল্পের তথা স্থাপত্যের যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ও পরিকর্ষণমূলক সংস্কৃতি হয়েছে, তার সব নিদর্শনই এই ছোট্ট গাঁয়ের মন্দিরগুলির মধ্যে বিরাজমান। এখানকার মন্দিরগুলির একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিষ হচ্ছে এর স্থাপত্যরীতি। উহা কোন একটা নির্দ্দিষ্ট কালের বা ধর্ম্মের বা সংস্কৃতির পরিকর্ষণে প্রস্তুত নয়। প্রত্যেক মন্দিরের মধ্যে বিভিন্নমুখী স্থাপত্যপ্রতিভার সংমিশ্রণ হয়েছে। মোগলযুগের স্থাপত্য-কলা গৌড়ীয় বৈষ্ণবযুগের হিন্দু স্থাপত্যের সহিত মিশে একটা অনবদ্য শ্রী ধারণ করেছে। এই মন্দির-শিল্পের মধ্য দিয়ে হিন্দু মুসলমানের ভাবধারার মিলন মূর্ত্ত হ'য়ে ফুটে উঠেছে। এক একটা মন্দির যেন এক একটা ছন্দোবদ্ধ কবিতা। সম্পূর্ণ বাংলার আবহাওয়ার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে, বাংলার নিজস্ব শিল্পকলার ভাবধারার মধ্যেও আমরা মোগল স্থাপত্যের চরম নিদর্শন পেয়েছি—বাংলার একান্ত নিজস্ব দোলমঞ্চের পাশেই বিজাপুর স্থাপত্যের নমুনা দেখতে পাই।

একটা পুরাতন দর্গা তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এর মধ্যে প্রধানতঃ দুটী স্থাপত্য ধারার মিশ্রণ দেখা যায়—বিজাপুরের বিখ্যাত গোলগম্বুজ মসজিদ ও গৌড়ের সোণা মসজিদের ঘনীভূত শিল্পধারা এই মসজিদটীর মধ্যে বিরাজিত এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে, ঐ গম্বুজের মধ্যে মীনারাকৃতি অংশটীর নির্ম্মাণ-পদ্ধতি হিন্দু যুগীয় স্থাপত্যানুসারে হিন্দু দোল মঞ্চের রীতিতে নির্ম্মিত। উপরের গম্বুজ ও ভিতরের অংশটীকে বিভিন্ন ভাবে দেখা যায়, তা'হলে এই জিনিষটাই চোখে পড়ে যে, গম্বুজটীর সম্পূর্ণ কাকতীয় স্থাপত্যে নির্ম্মিত ও ভিতরের মঞ্চটী সাধারণ হিন্দু দোল বা নাটমঞ্চের ধরণে নির্ম্মিত।

এই স্থাপত্যের মধ্য দিয়ে বাংলায় একদিন হিন্দু মুসলমানের মিলন ঘটেছিল। তাই আমরা আজ একসঙ্গে মন্দির ও মসজিদের মিলিতরূপ দেখতে পাই ঐ কবর স্মৃতির মধ্যে।

অতীতে এখানকার মৃৎশিল্প কিরূপ সুন্দর ও সুষ্ঠু ছিল, তার নিদর্শন এখানকার মন্দিরে মন্দিরে অবস্থিত। ক্ষোদিত ইট তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানকার প্রত্যেক মন্দিরের বহির্ভাগ ক্ষোদিত ইটে নির্ম্মিত। প্রত্যেক ইটে একখানি সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত। কতকগুলি ইটে সাধারণ ভাবে ফুল অঙ্কিত, তার বিষয় কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। সেই রকম ইট বাংলার প্রত্যেক মন্দিরেই দেখা যায়। কিন্তু যে ইটগুলো প্রথম দৃষ্টিক্ষেপেই দর্শকের অনুসন্ধিৎসা ও বিস্ময় জাগায় সেগুলি হচ্ছে আনুমানিক ১৫"×৭"×২" আয়তনে নির্ম্মিত ইটসমূহের উপর অঙ্কিত চিত্রাবলী। এইরূপ ইট সাধারণতঃ দেখা যায় না। ঐ

বিশেষ আকারে নির্ম্মিত ইটসমূহে প্রাচীন বাংলার সমুদ্র যাত্রার কাহিনী অমর ছন্দে গ্রথিত আছে।

বাংলার লুপ্তপ্রায় পালতোলা ময়ুরপঙ্খী নৌকা সারি সারি দাঁড় বেয়ে চলেছে। নৌকা মধ্যে দু'চার জন যাত্রী। এই সকল ইট আমাদের অতীত গৌরবকে আবার চোখের সম্মুখে ফিরিয়ে আনে। আবার মনে করে দেয়, সেই 'একদা যাহার বিজয় সেনানী'। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের পুরাকাহিনীর ইতিহাস আলোচনায় জানা যায়—বৃহত্তর ভারতের উপনিবেশ আনাম, কম্বোডিয়ার বরবদুর, প্রাম্বানানের মন্দির গাত্রে প্রাচীন ভারতের যে নৌ বাহিনীর ও নৌ-বাণিজ্যের অঙ্কিত নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাও এইরূপ। বৃহত্তর ভারতের উপনিবেশ-মন্দিরসমূহের গাত্রচিত্রে—বিশেষত বরবুদুর মন্দিরগাত্রে সাগরবন্ধনের যে চিত্রাবলী পাওয়া যায়, তাহারই সংক্ষিপ্ত ও অর্দ্ধবিকৃত চিত্রাঙ্কনযুক্ত ইটও দুই একটী মন্দিরে দেখা যায়। বানরসমূহ মস্তকে করে প্রস্তর বহন করছে ও তাহা নিক্ষেপ করছে। এইরূপ ভঙ্গিমায় অঙ্কিত ইটও প্রচুর আছে। ইহা ছাড়া সরোবরের পদ্মবনে রাজহংস বিচরণ করছে এবং পেখম-মেলা ময়ুরের ছবিও আছে।

কিন্তু এই সব দৃশ্যাবলীর মধ্যে দাক্ষিণাত্যের নিজস্ব রীতিতে অঙ্কিত নৃত্যপরা গণেশের মূর্ত্তিযুক্ত ইট দেখলে, সত্যই বিস্ময় জাগে না কি?

দাক্ষিণাত্যের সীমাচলম, বেলুর প্রভৃতি স্থানে যে নৃত্যোৎসুক গণেশের চিত্র দেখা যায়, সে ধরণের চিত্রও এখানে পাওয়া যায়। অবশ্য উহা নিখুঁত দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ্য গাণপত্য রীতিতে অঙ্কিত নহে। এইরূপ একই স্থানে পূর্ব্বের বরবুদ্ আনামের চিত্রাবলীর এবং দক্ষিণের কেরল রীতির আভাষের সংমিশ্রণ বোধ হয় বাঙ্গালায় খুব কম মন্দিরেই দেখা যায়। আনুমানিক দেড়শত হ'তে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বাংলা দেশের স্থাপত্যরীতির একটা ঘনীভূত ইতিহাস ঐ সকল মন্দির হ'তে মেলে।

এখনকার মন্দিরসমূহের মধ্যে যে কেবল হিন্দু কৃষ্টিই পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে—মোগল যুগের" মুসলমানীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত লতাপাতাযুক্ত নক্সা যা প্রায় সব মসজিদ ও মোগল আমলের অট্টালিকাতে দেখিতে পাওয়া যায়; তারও নমুনা এখানে কিছু কিছু মিলে। স্থানীয় জমিদারের এক ভগ্ন ও পরিত্যক্ত প্রাসাদে এবং একটী মন্দির মধ্যে সম্পূর্ণ মোগল রীতিতে অঙ্কিত নক্সাও আছে। এই মন্দির সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহান্বিত হ'তে হয়। নদীয়া জেলার মধ্যে বাঁকুড়া জেলার জোড়বাংলা মন্দির দেখলে আশ্চর্য্য হ'তে হয় বৈ কি! এই মন্দিরটি ও তার সহিত দ্বাদশটী শিব ও অন্য একটী মন্দির প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী লোকচক্ষুর অন্তরালে অজ্ঞাতবাসে থাকার পর, কয়েক বৎসর হল আবিষ্কৃত ও সংস্কৃত হয়েছে। এই দ্বাদশটী শিব মন্দির ও একটী জোড়বাংলা মন্দির এবং অন্য একটী দোলমন্দির, এই চতুর্দ্দশটী মন্দিরের গঠনপ্রনালী মোটামুটি তিনটী রীতিতে। শিবমন্দিরগুলি অতি সাধারণ ও সচরাচর দৃষ্ট শিব মন্দিরের ন্যায়। প্রধান মন্দিরটী বাঁকুড়া জেলার সুলভ জোড়বাংলা মন্দিরের স্থাপত্যে নির্ম্মিত। তৃতীয়টী সাধারণ দেউল ও নাটমঞ্চের সম্মিলিত রীতিতে নির্ম্মিত। বর্দ্ধমান জেলার চতুস্পার্শস্থ স্থানসমূহে যে সকল দেউল মন্দির দেখা যায়, তাহার সহিত এই দেউলের পার্থক্য আছে। মন্দিরে উঠিবার জন্য অপরিসর সিঁড়িও আছে; কিন্তু মন্দিরগহ্বরের ভিতর দ্বিতলের চিহ্ন দেখা যায় না। মন্দিরটীর নির্ম্মাণ সাল ১২১২ সন। এই মন্দিরগাত্রেও জোড়বাংলা মন্দিরের গর্ভগৃহের খিলানে লাল রঙ্গে প্লাষ্টার জাতীয় জিনিষের উপর ক্ষোদিত নক্সার চিহ্ন আছে। তাহা যে বর্ণচিত্রিত বেশ বুঝা যায়, কিন্তু সেই যুগে ঐরূপ ভাবে জমাট বাঁধানর উপায় জানা ছিল কি?

এইবার আমরা এখানকার দারুশিল্পের বিষয় আলোচনা করব। এখানকার মস্তোফীগণের একটী সম্পূর্ণ কাষ্ঠনির্ম্মিত চণ্ডীমণ্ডপ আছে। উহার প্রতি স্তম্ভে অলিন্দ্যে, ছাদের অবলম্বন দণ্ডগুলিতে সূক্ষ্ম কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে বালখিল্য নাড়ুগোপাল মূর্ত্তি, পরী মূর্ত্তি, উড্ডীয়মান পক্ষীর ভঙ্গিমা, অন্যান্য জীব-জন্তুর দেহ ও বিচিত্র লতাপাতা অতি নিখুঁতভাবে ক্ষোদিত। উহা যে অতি দক্ষ ও কুশলী শিল্পীর বহু সাধনার ফল, তাহা বেশ বুঝা যায়। শুনা যায় যে, এইরূপ চণ্ডী-

মণ্ডপের তুল্য নিদর্শন বঙ্গদেশে আর নাই। উহা দেখলে তাহা অবিশ্বাস করতেও ইতস্ততঃ করতে হয়। কালের প্রকোপে এই সুন্দর মণ্ডপটী ধ্বংসপ্রায়, হয় তো আর কিছুকালের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সুধু যে এই চণ্ডীমণ্ডপটাই কাষ্ঠশিল্পের একমাত্র নিদর্শন তাহা নহে, বহুদিনের পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ প্রাসাদ সমূহেও পুরাকালের দারুশিল্পের বহুবিধ নমুনা পাওয়া যায়। খোদিত কড়িকাষ্ঠ তাহার নিদর্শন—কড়িকাষ্ঠের নিম্নদিকটীতে যে সকল নক্সা ও বাহিরের অংশে যে সকল মূর্ত্তি খোদিত আছে তাহা প্রায় দেড়শত বৎসরের পুরাতন এবং প্রায় পঞ্চাশ বৎসর উন্মুক্ত ও অবহেলিত অবস্থায় সর্ব্বদা প্রকৃতির সর্ব্বধ্বংসী স্বভাবের সহিত সংগ্রাম করে আজিও টিকে আছে। তাহার দুই চারিটী নিদর্শন আমি বহু কষ্টে সংগ্রহ করেছি। ঐ সকল কাষ্ঠখণ্ড যদিও কত দীর্ঘ বৎসর ধরে প্রখর রৌদ্র ও বর্ষার প্রকোপ সয়েছে, তবুও তা ফেটে বিকৃত হয় নি—খোদিত নক্সাগুলি আজও অবিকৃত অটুট আছে। মনে হয় একবার পালিশ করলেই নূতনের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হবে।

অধুনা নগণ্য খ্যাতিহীন এই উলা গ্রামের মধ্যে—প্রকৃতির নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে এত ঐশ্বর্য্য; এত রসঘন বস্তুর প্রাচুর্য্য দেখে সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত ও উৎফুল্ল হতে হয়। বর্ত্তমানে কেবল অতীত গৌরবের ধ্বংসাবশেষ লইয়া পল্লীটী অবস্থিত। যে দিকে তাকান যায় কেবল জনহীন পরিত্যক্ত বৃহৎ অট্টালিকাসমূহ তাহাদের বহু সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, মূক বাণী ও বেদনা লইয়া, ইহাদের অনিন্দ্য সুন্দর গঠনসৌন্দর্য্য নিয়ে ধ্বংসের সহিত যুদ্ধ করছে। উলা জনহীন ব্যাঘ্রের আবাসস্থল হ'লেও মানুষের সুকুমার বৃত্তির পরিচয় আজও দিচ্ছে। বহু গৃহের ছাদ, কড়ি, বরগা কিছুই নাই, কিন্তু তবুও নগ্ন দেয়ালগুলির পঙ্কের কাজ দেখে মনে হয় না যে, তাহা বহুদিনের পরিত্যক্ত প্রাসাদ। দেওয়ালগুলি সুন্দর মসৃণ, কোনও স্থানে এতটুকু বিকৃত বা নষ্ট হয় নি। বিগত ৩০।৩৫ বৎসর চুণকাম করা হয় নি, এইরূপ বসতবাটীর দেওয়ালও দেখেছি তাতে একটুও লোণা ধরে নি বা উহা মলিন হয় নি।

কলিকাতা হতে মাত্র ৬০ মাইল দূরে প্রকৃতির গহনকন্দরে সোণার বাংলার যে অতীত ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত রয়েছে—গ্রামবাসীদের অনাদরে ও নষ্ট করবার প্রবৃত্তির খেয়ালে আজ তা লুপ্তপ্রায়। বাংলার এই অমূল্য সম্পদগুলিকে রক্ষার জন্য বাংলার পুরাকীর্ত্তি-সংরক্ষিণী সমিতিগুলির ও বাংলার রসজ্ঞ কলাশিল্পী স্থপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁরা যেন এই অতীত গৌরবকে চির বিলুপ্ত হতে না দেন, অন্ততঃ ভবিষ্যত বাংলার জন্য এদের যেন রক্ষা করেন। সত্যই উদীয়মান বাঙালী জাতির ইহা গৌরবের সামগ্রী।

# মৃত্যু

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হেরিলাম হে পৃথিবী সে মহামৃত্যুরে,
শ্রান্ত ক্লান্ত পায়ে যেন নেমে আসে ধীরে,
আমাদের জীবনের চোখের পাতায়
সোণালী স্বপন সব সহসা মিলায়
আঁধারের অন্তরালে। চেয়ে দেখি বেশ,
নিথর নয়নে আর পড়ে না নিমেষ—
চির-ঘুম নেমে আসে সারা দেহ ভ'রে,
প'ড়ে থাকে একা। যেন ঝটিকার পরে
ছিন্ন ভিন্ন বিপর্য্যস্ত শান্ত তপোবন!
আজি আমি হেরিলাম সে মহামরণ—
নীরবে কেমনে নামে দেহের সীমায়
যেখানে মনের মাঝে কামনা ঝিমায়
কেবলি সুখের;—আর তারি তীরে তীরে
আজি আমি হেরিলাম সে মহা-মৃত্যুরে!
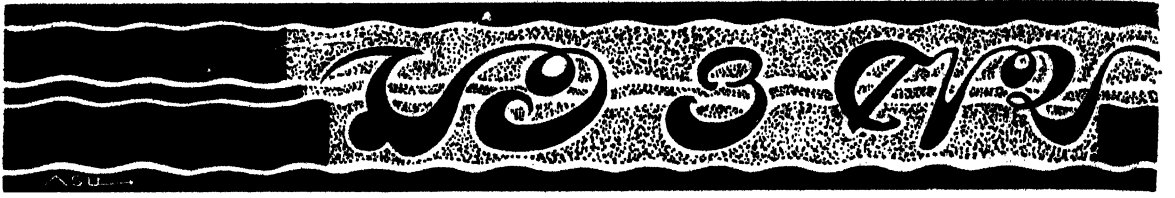
## মত-সৃষ্টি

গণশক্তি জনমতের উপর নির্ভর করে। কিন্তু জনমত গড়ে লোকশিক্ষায়। অতএব জনশিক্ষাই গণশক্তির মৌলিক উপাদান। আমরা জনশিক্ষা বলিতে শুধু লিখন-পঠন-ক্ষমতাটুকুই বুঝিব না। অবশ্য লিখন-পঠনের যোগ্যতাও চাই, ইহা ব্যতীত বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন সম্ভব হয় না। কিন্তু লিখন-পঠনের চেয়ে বড় প্রয়োজনীয় জিনিষ—মত ও বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা। "যার যেমন ভাব, তেমন লাভ, মূল সে প্রত্যয়"—ইহা শুধু সাধনজগতের সত্য নহে, কর্ম্মজগতেরও। জনসমষ্টির হৃদয়ে আত্মপ্রত্যয়ের জাগরণ চাই—ইহা সর্ব্বপ্রথম বটে; কিন্তু ইহাই সবখানি নহে। আত্মপ্রত্যয় অসম্পূর্ণ থাকে, ভগবৎপ্রত্যয় বিনা। কাজেই জনশিক্ষায় আত্মপ্রত্যয়-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে চাই ভগবদ্বিশ্বাসের সাধনা এবং এই উভয় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—জীবন-নিয়ন্ত্রণের উপযোগী মহাশক্তি। উহাই কর্ম্মশক্তি। আত্মবিশ্বাস, ভগবদ্বিশ্বাস ও কর্ম্মশক্তিই লোকশিক্ষানীতির মূল তিনটী উপাদান বা মহাসূত্র। জাতিগঠনের সাধনায় এই প্রত্যয়ত্রয় জনহৃদয়ে সঞ্চারিত ও সংক্রামিত করার রীতিমত ও ধারাবাহিক সুব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপে শক্তিশালী জনমত সত্য সত্য যখন সৃষ্ট হইবে, তখনই জনমতের নিয়ন্ত্রণে গণশক্তি যথার্থ কার্য্যকরী হইতে পারিবে—নতুবা শুধু শূন্যগর্ভ আন্দোলন বায়ুগর্ভে সামান্য তরঙ্গ তুলিয়াই নিঃশেষ হইবে, বস্তুতন্ত্র কোনও সুফলই মিলিবে না।

## সঙ্ঘের জাতিগঠননীতি

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ এই আত্মনিষ্ঠা, ভগবদ্বিশ্বাস ও কর্ম্মবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই জাতিগঠনে প্রয়াসী। এইজন্যই তাহার সংগঠন কৃষ্টি ও সংস্কৃতিমূলক বলিয়া অভিহিত হয়। এই কৃষ্টি ভারতীয় কৃষ্টি—সংস্কৃতি ভারতের সনাতন শীল ও সাধনার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আর্য্য ভারতের শাশ্বত জীবনস্রোতঃ এই তিনটী খাত বাহিয়াই চিরদিন বহিয়া আসিয়াছে। ভারতের শাস্ত্র-সংহিতা—শ্রুতি-স্মৃতি—তন্ত্র-পুরাণ সবই এই ত্রিতত্ত্বে কুণ্ডলীকৃত হইয়া উদাত্ত বাণী ঘোষণা করে। "আত্মানং বিদ্ধি"—"শক্ত্যাং ভগবতি চ শ্রদ্ধা"—জনমতগঠনেরই মহাবাণী। আপনাকে জানিবার জন্য যে শিক্ষা, তাহাই ধর্ম্মশিক্ষা। সে আত্মা অমর। দেহ হইতে দেহান্তরে গমনাগমন করিলেও, জীবাত্মারও ধ্বংস নাই। সকল জীবাত্মার সমাহার—এক, অদ্বিতীয় ও অনন্ত পরমাত্মা। ইনিই শ্রীভগবান। যাহার আত্ম-সত্তায় অটুট প্রত্যয় জন্মিয়াছে, সেই প্রত্যয় যুক্ত করিয়াছে যে ভগবানে—তাহার অন্তরে অফুরন্ত শক্তি উচ্ছ্বসিত প্রবাহে উৎসরিত হইবেই, ইহা অবধারিত। কারণ, জীব ও ভগবানের যুক্তিতেই সম্মিলিত দেবজীবন। ভারতের জাতি—দেবমানবজাতি হওয়ার লক্ষ্যপথেই গোড়া হইতে চালিত ও ধাবিত। এই মিশন শ্রীভগবানই তাহার অন্তরে সনাতন বীজরূপে রোপণ করিয়া দিয়াছেন—ভারতের ধর্ম্ম ও জাতীয়তা তাই সনাতন। সঙ্ঘের জাতিগঠন এমনই অমর নীতি আশ্রয় করিয়া চলিয়াছে বলিয়াই সেই সংগঠনের মার নাই। এরূপ সংগঠনই স্বয়ং-সিদ্ধ হইয়া অনায়াসে অসংখ্য কর্ম্ম সম্পাদন করার শক্তি ধারণ করে। ক্ষুদ্র আরম্ভ হইলেও, দিন দিন কর্ম্মব্যাপ্তি তাই অনাহত—অবধারিত।

## পঞ্চধারা সংগঠন

সংগঠন পঞ্চবিধ। শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, অর্থ ও রাষ্ট্র। ধর্ম্ম এই সমুদয়েরই মূলভিত্তি, তাই ধর্ম্মের স্বতন্ত্র উল্লেখ করা গেল না। সঙ্ঘ এই পঞ্চধারায় কর্ম্মসূচী অঙ্কন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাহার গতিনির্দ্দেশ অসাধারণ, অভিনব। অসাধারণত্ব সঙ্ঘেরই বৈভব-বৈশিষ্ট্য নহে, ইহা ভারত-কৃষ্টি ও সংস্কৃতিরই বৈশিষ্ট্য। ভারতের ধর্ম্ম সনাতন হইলেও, তাহা অসাধারণ ধর্ম্ম। অপ্রাকৃত অলৌকিক তত্ত্বই ভারতের প্রাণ। জীবে ব্রহ্ম যে অলৌকিক সংযোগ, তাহাই ভারত-ধর্ম্মের

অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। ভারতের অধ্যাত্মেতিহাস এই সংযুক্তিকে কেন্দ্র করিয়াই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। ভারত-সাধনা অমরত্বেরই সাধনা। শিক্ষার লক্ষ্য—এই সাধনার যোগ্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। সমাজ—ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির পরিচয়ে সম্বন্ধের অমর বন্ধন সৃজন করে। সাহিত্য—এই সৃষ্টিরই প্রকাশ, তাহার বাণীযন্ত্র। অর্থপ্রতিষ্ঠান—শিল্পব্যবসায়-বাণিজ্যের মধ্য দিয়া সংগঠনেরই দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে। রাষ্ট্র-তন্ত্রে গণশক্তি বস্তুতন্ত্র রূপান্বিত হয়। এই পঞ্চ ক্রমে জাতির অভ্যুত্থান সম্পূর্ণ হইতে দেখা যায়। সঙ্ঘকে একে একে পঞ্চ ক্রম অতিক্রম করিয়া তার কর্ম্মসূচী পূর্ণাঙ্গ করিতে হইবে—তবেই জাতি-সংগঠন সিদ্ধ হইবে। জাতীয় জীবনের অসংখ্য সমস্যা—একমাত্র সংগঠনের পথেই উহাদের পূরণাত্মক সুমীমাংসা ও স্থায়ীভাবে সমাধান হইতে পারে; অন্যথা সমস্যা লইয়া চিন্তা ও চেষ্টা শূন্যে তরবারি-সঞ্চালনার ন্যায় মনের প্রস্তুতি ছাড়া কার্য্যতঃ বিশেষ কিছু দাঁড়ায় না। অভাব লইয়া সংগ্রাম অনেকখানি কাল ও শক্তির অপব্যয় মাত্র। ভারতের পন্থা—ভিতরের পূর্ণতা দিয়াই বাহিরকে পূর্ণ করা—অন্তরের সৃজনশক্তি বিকশিত করিয়াই স্থান ও কালকে ছাইয়া ফেলা। এই ভিতর হইতে আপূরণই জীব ও জাতির স্বাস্থ্য, সম্পদ্, সৌভাগ্য, গৌরব, মুক্তি—সকল কিছুই অর্জ্জন করার স্বভাব-সিদ্ধ প্রাকৃতিক বিধান। স্বয়ং ধরিত্রী ও বিশ্বপ্রকৃতি এই ভাবেই নিত্য আপনার ক্ষয় পূরণ করিয়া জীবজগৎকে সঞ্জীবিত, রসায়িত ও রূপায়িত করিয়া চলেন। ভাবেরই রূপান্তর সৃষ্টি ও সংগঠন। অভাব লইয়া সাধনা সম্পূর্ণ নেতিমূলক। এই শূন্যবাদ ভারতের আত্মা অস্বীকার ও পরিবর্জ্জন করিয়াছে। ভারত হইতে বিরাট্ বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাসন ইহার অন্যতম ঐতিহাসিক প্রমাণ। আজিকার গান্ধীবাদ যদি রাষ্ট্রক্ষেত্রে সেই নেতিবাদের পুনঃ পরীক্ষা করিতে চাহে, তাহাও ভারতাত্মা যথাকালে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করিয়া দাঁড়াইবে, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। ভারতের জাতি-নির্ম্মাণ সংগঠনের শুদ্ধ ও সিদ্ধ পথেই অচিরাৎ পুনর্নিয়ন্ত্রিত হইবে। এইখানেই বাঙালী-প্রতিভার মৌলিক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান। বাঙালীর চিন্তা ও কর্ম্ম আজ এই সনাতন জীবনপ্রতিভারই অনুসরণে সর্ব্বত্র সংগঠনশীল হইয়া উঠুক—শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, অর্থ ও রাষ্ট্র, এই পঞ্চ ক্রমে বাঙালী আত্মজীবনে সৃজনের অবদানে সকল অভাব ভাবময় করিয়া তুলুক। সূর্য্যোদয়ে জমাট অন্ধকার অপগত হওয়ার ন্যায় জাতি-জীবনের সমুদয় জটিল ও দুর্ভেদ্য সমস্যা স্বতঃ উদ্ভিন্ন হইয়া স্বচ্ছ ও স্বস্থ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে—জীবনের সবদিকই সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

## শিক্ষিত বেকার

শিক্ষিতের বেকার সমস্যা লইয়া অভিজ্ঞ অর্থনৈতিক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ও যুক্ত প্রদেশে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি দুইটী বক্তৃতায় যে কথাগুলি আলোচনা করিয়াছেন, তাহা কর্ত্তৃপক্ষ ও দেশবাসী সকলেরই চিন্তনীয়। এ দেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিতগণের বেকারসমস্যা আদৌ কেন? ভারতের তুলনায় বর্ত্তমান রুশিয়ার শিক্ষিতের হার ঢের বেশী—প্রায় ৫০ গুণ; কিন্তু সে দেশে একজন বৈজ্ঞানিকও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া বৃত্তিহীন থাকে না। কর্ম্মক্ষেত্র এত বিস্তৃতি যে, প্রতি বৎসর হাজার হাজার শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক পাওয়া গেলেও, তাহাদের কর্ম্মলাভের অসুবিধা হয় না। শিক্ষিত মাত্রেরই সেখানে সুযোগ আছে—আর আমাদের দেশ রুশিয়ার চেয়ে কম বিস্তৃত না হইয়াও, এখানে এক মুঠা শিক্ষিত যুবকও কোন বিষয়েই শ্রম ও প্রতিভা-নিয়োগের ক্ষেত্র পায় না কেন? ইহার চেয়ে আশ্চর্য্য আর কিছুই নাই। আসলে অন্যান্য দেশের তুলনায় আজ পর্য্যন্ত ভারতের ন্যায় সুবিশাল মহাদেশে ১৮টা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া উচ্চ শিক্ষার প্রসার হইয়াছেই বা কতটুকু? ইহা একান্ত নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তাহাদিগকে নিয়োগ করিবার মতও প্রয়োজনের ক্ষেত্র সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হইতেছে না। ইহার কারণ, শ্রম-শিল্প, কুটীর-শিল্প ও যন্ত্র-শিল্প যেভাবে বৈজ্ঞানিক নীতি ধরিয়া পরস্পর সহযোগী ও সমঞ্জসীকৃত করিয়া সংগঠিত ও পরিচালিত হওয়া উচিত, তাহার দিকে শাসনকর্ত্তৃপক্ষ কোনদিনই মনোযোগ দেন নাই। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন বলিয়াছেন—"শিক্ষা ও বৃত্তির এই অসামঞ্জস্যে হতাশ হওয়ার কারণ নাই, বরং ইহাতে এই সঙ্কেতই স্পষ্ট হইতেছে যে, এদেশে বৃত্তির ক্ষেত্র এখনও যথেষ্ট সম্প্রসারিত

হওয়ার প্রতীক্ষা রাখে। প্রধানতঃ শাসনকর্তৃপক্ষগণ ও অংশতঃ শিল্প-ব্যবসায়ের কর্ণধারমণ্ডলী এই প্রতীক্ষা পূর্ণ করিতে সামর্থ্যবান্। সম্প্রতি যুদ্ধ-চেষ্টায় ভারতের অর্থশক্তি ও বস্তুশক্তি নিয়োগ করার যে প্রয়োজন অনুভব করিয়া ভারত-গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় শিল্প-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একটা নূতন উদ্দীপনার প্রবাহ আনিয়াছেন, ইহাতে কিন্তু আমরা খুব বেশী আশার লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না। কেননা, এই প্রচেষ্টায় শুধু যুদ্ধবিষয়ক কয়েকটী শিল্পেই উৎসাহ দেওয়া হইতেছে—আর তাহা শুধু কাঁচা মাল লইয়া প্রাথমিক ব্যবহার এবং তাহাও বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণের আংশিক সরবরাহের জন্য। এই একই ইউরোপীয় যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ—যথা কাণাডা ও অষ্ট্রেলিয়া—নব নব পূর্ণাঙ্গ সমর-শিল্পের কারখানা-প্রতিষ্ঠার যে সুযোগ পাইয়াছে, ভারত তাহা এখনও পায় নাই। জাহাজ-শিল্পে উৎসাহ দেওয়ার জন্য যে ১০০০ জন ভারতীয় নক্সরকে বিলাতে লইয়া গিয়া বৃটিশ সহকর্ম্মীর সমতুল্য বেতনে ও জীবনযাপনের মানদণ্ডে শিক্ষিত করার আশা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধি দূরে থাক, আমাদের আশঙ্কা হয়, আর্থিক অসামঞ্জস্য-বৈষম্য ও ফলতঃ মনঃপীড়া ও অসন্তোষবৃদ্ধিরই কারণ ঘটিবে। যুদ্ধ-শিল্প আরও পূর্ণতরভাবে পরিপুষ্ট ও উৎসাহ-প্রাপ্ত হউক, তাহাতে আমরা সুখীই হইব; কিন্তু উহা ছাড়া অন্যবিধ শিল্প ও ব্যবসায়ের দিকেও শাসনকর্তৃপক্ষকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন ও ডাঃ শ্যামা-প্রসাদের সহিত আমরা বলিব—ভারতে, তথা বাংলায় আজ উচ্চশিক্ষা ও বিশেষতঃ শিল্প-বিজ্ঞান-বিষয়ক উচ্চ-শিক্ষার ক্রমাগত সম্প্রসারণ করিয়া চলিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে সমান তাল রাখিয়া শিল্প-বাণিজ্যাদি বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রগুলিতে শত-সহস্র মুখে শিক্ষিত তরুণগণের শ্রম ও প্রতিভানিয়োগের সুযোগ খুলিয়া দিতে হইবে। এ বিষয়ে ঔদাসীন্য অন্ধতারই পরিচয়। তাই রাজশক্তি যেন বিশেষভাবে অবধান করিয়া দেখেন। দেশবাসীকেও এই লক্ষ্যেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি-পরিবর্ত্তনে মনোযোগী হইতে হইবে।

## হিন্দু মহাসভার বাণী

হিন্দু-মহাসভার ২২শ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ একাধিক দিক্ দিয়া আমাদের মনোযোগ ও সমর্থন আকর্ষণ করিয়াছে—মনে হয়, খাঁটী হিন্দু মাত্রেরই ইহা করিবে। ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনা ও পরিকল্পনায় আজ একটা যুগ-পরিবর্ত্তনেরই সন্ধিমুহূর্ত্ত উপস্থিত। মিঃ সাভারকর এই পরিবর্ত্তনের প্রেরণা অনেকখানিই ঠিকভাবে অবধারণ করিতে পারিয়াছেন—ইহাতে আমরা আশান্বিত। মহাত্মা গান্ধীজির অহিংস অসহযোগবাদের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে বলিয়াই তাঁহার ধারণা ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। এই স্পষ্টতার অভিব্যক্তি তাঁহার অভিভাষণকে কিছু তীব্রতর করিলেও, তাহা সময়োচিত বলিয়া অস্বীকার করা যায় না। মিঃ সাভারকর দেখাইয়াছেন—পূর্ব্বে সেনাবিভাগে মুসলমানের সংখ্যা যেখানে শতকরা ৭৫% ছিল—নূতন সেনাসংগ্রহকালে দেখা যায় সেখানে হিন্দুর সংখ্যা লক্ষের মধ্যে ৭০,০০০ ও মুসলমান ৩০,০০০ মাত্র। বিমান-শক্তিতে হিন্দুগণ বিশেষ উৎসাহী ও দলে দলে যোগ দিতেছেন—অনেকেই বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতাসঞ্চয়ের সুযোগ পাইয়াছেন। কিন্তু নৌবহরে খুব কম হিন্দুই যোগ দিয়াছে—এখানে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৭৫%। হিন্দু-মহাসভার অনুরোধে গভর্ণমেণ্ট বৈষম্য উঠাইয়া হিন্দু নক্সরগ্রহণে সম্মত হওয়ায়, অবশ্য সম্প্রতি এদিকে হিন্দুদের উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু মিঃ সাভারকর জোর করিয়াই বলেন—ভারত-গভর্ণমেণ্ট এইবার যে পাঁচ লক্ষ ভারতীয় সেনা সংগ্রহ করিবার পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুজাতি যেন বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করিতে উদাসীন না হন। এই সঙ্গে সেনাবিভাগের উচ্চতর নেতৃত্বগ্রহণেও তাহারা সুযোগ লাভ করিবে। পূর্ণাঙ্গ সুসজ্জিত আধুনিক যান্ত্রিকবাহিনীগঠনের জন্য অসংখ্য শিল্পী, কর্ম্মীরও প্রয়োজন হইবে। ইহাতে ক্ষাত্রবৃত্তির সহিত ভারতীয় শিল্প-ব্যবসায়েরও প্রসার হইবে। তাই সাভারকর বলেন—আজ ব্যর্থ অসহযোগ নীতি পরিহার করিয়া "the militarisation and industrialisation of Hindus must constitute our immediate objective under the war conditions"—আমরা এই নীতির সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

# সাময়িকী

## চট্টল প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে মনস্বী মনীষী

গত ১১ই ডিসেম্বর বুধবার অপরাহ্নে স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সপেক্টর এবং অধ্যাপক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র রায় চট্টগ্রাম প্রবর্ত্তক আশ্রম পরিদর্শন করিতে আগমন করেন। সঙ্ঘের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে মানপত্র দেওয়া হয়। স্যার রাধাকৃষ্ণণ মানপত্রের উত্তরে বলেন—

সঙ্ঘ যে অধ্যাত্ম ভিত্তির উপর জাতি গড়ার আয়োজন করিতেছে উহাই জাতিগঠনের সত্য পথ। মহাভারত-বর্ণিত কেশ-বিধৃতা দ্রৌপদীর "দিব্য প্রেরণায় মহান্ কুলে যার জন্ম, কেশাকর্ষণ রূপ অপমানের চেয়ে তার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ," এই খেদোক্তিটী সে যুগের দ্রৌপদীর কথামাত্র নহে, এ যুগের ক্রন্দসী ভারতমাতারই উহা মর্ম্মকথা। ভারতের একটা সুমহান্ অতীত আছে, ভাগবত ইচ্ছা সিদ্ধ করার জন্যই তাহার জন্ম। বর্ত্তমানের অধঃপতিত অবস্থার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। গ্রীস, রোম প্রভৃতি সাম্রাজ্য ও সভ্যতার উত্থান ও পতন আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। ঐসব সভ্যতার মূল কথা ছিল Individual prosperity and Public distinction; কিন্তু চীন এবং ভারতবর্ষ—যাদের সংস্কৃতি এবং সভ্যতার পিছনে অধ্যাত্ম-ভিত্তি রহিয়াছে, যাদের মূলকথা tolerance and welfare of mankind, সেই দুইটী দেশেরই সভ্যতা এখনও বহু ঝঞ্ঝা-বাত্যার মধ্যেও বাঁচিয়া রহিয়াছে। ৪০ কোটী বৎসরের পর আজও ভারতের সংস্কৃতি আত্মরক্ষা করিতেছে। তাই ভারতের জাতীয় জাগরণকে অধ্যাত্ম-ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত করা বাঞ্ছনীয়।"

সতীশবাবু এবং নিবারণবাবু তাঁহাদের ভাষণে বলেন, বাঙ্গালী জাতীর মধ্যে শক্তির জাগরণ প্রয়োজন—জাতির মধ্যে খাঁটী মনুষ্যত্ব, সিংহতেজ বা stener virtues of life জাগিয়া উঠুক। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ জাতীয় জীবনে এই শক্তি সঞ্চারেরই আয়োজন করিতেছে। বাংলার তরুণদের ইহা অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া তাঁহারা উল্লেখ করেন।

## বাইশে পৌষ

২২শে পৌষ প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ তথা বাঙালীর জাতীয় জীবনে স্মরণীয় পুণ্য তিথি। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ উদীয়মান জাতিরই রূপমূর্ত্তি। হিন্দুর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়-এর মৌলিক নীতি ও সত্য কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের দ্বারা বিশেষিত নহে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ আত্মজীবনে ইহা অনুশীলন ও আচরণ করিয়া জাতীয় জীবনকে আলোকিত, সঞ্জীবিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে। ইহাতে সম আচারপরায়ণ একমতাবলম্বী হিন্দু জাতির শ্রেয়ঃ এবং অভ্যুত্থান অবধারিত। ভারতীয় সংস্কৃতিসম্মত জাতির প্রতীক এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় মহোদয়ের জন্মতিথি ২২শে পৌষ তারিখটি সঙ্ঘের মূলকেন্দ্র চন্দননগর এবং অন্যান্য শাখাকেন্দ্রে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত প্রতিপালিত হইয়া থাকে। সঙ্ঘজননীর মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবার সঙ্ঘগুরুর ৫৯তম জন্মোৎসব তারিখে সম্পন্ন হওয়াই, বাইশে পৌষের অধ্যাত্ম-মহিমা সঙ্ঘজীবনে বিশেষভাবে বৃদ্ধি

সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রী৺রাধারাণী দেবীর নব-নির্ম্মিত প্রতিমা

পাইল। সঙ্ঘজননীর মর্ত্ত্যলীলা তিরোভাবের পর আজ দীর্ঘ এগার বৎসর সঙ্ঘ তাঁর মানুষী স্মৃতির পূজা করিয়া আসিতেছিল। এখন হইতে মায়ের এই প্রতিমাশ্রয়ে নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বশক্তির চিন্ময়ী রূপ সঙ্ঘে সম্পূজিত হইবে। শক্তিসাধক বাঙালীর নিকট এই মাতৃপীঠ রচনার পুণ্যতিথি ভাবীকালে অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে চিরদিন স্মরণীয় হইয়া রহিবে।

এই উপলক্ষে ২১শে পৌষ অধিবাস উদযাপিত হয়। ২২শে পৌষ সারাদিন সমবেত উপাসনা, হবন, দীক্ষাযজ্ঞ, পূজা, ভোগারতি প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়। শত শত কুমারী, বিবাহিতা

ও বিধবা এই সতীতীর্থে শ্রদ্ধাঞ্জলী দিল। প্রায় এক হাজার ব্যক্তি ঐদিন প্রসাদ পান। অপরাহ্ন সাড়ে চারি ঘটিকায় ভারতাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় হরিদাস

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

সিদ্ধান্তবাগীশের পৌরোহিত্যে এক বিরাট সভা হয়। স্বামী অমৃতানন্দজী কর্ত্তৃক বৈদিক প্রশস্তি এবং নারীমন্দির কর্ত্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীতের পর, সভা আরম্ভ হয়। শ্রীযুত অরুণচন্দ্র দত্ত সভাপতিকে মাল্যদান প্রসঙ্গে বাইশে পৌষ তিথির নিগূঢ় মর্ম্ম ব্যক্ত করেন। অতঃপর সঙ্ঘগুরু একঘণ্টাকাল তাঁর মর্ম্মবাণীর অভিব্যক্তি দেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জাতীয় জীবনের গতি ও প্রকৃতির কথা উল্লেখ করিয়া, প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ সংগঠনের মধ্য দিয়া কি ভাবে এক অখণ্ড জাতি নির্ম্মাণ করিতে চাহে তাহার ইঙ্গিত দেন। তিনি বলেন, শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায় যেমন হিন্দুর ভিত্তি তেমনি গুরু, শব্দ (বেদ) এবং শিলা (প্রতিমা) তার বিশ্বাস। এই শাশ্বত বিজ্ঞান সম্মত সত্যকে কোন খাঁটী হিন্দুই উপেক্ষা করিতে পারে না—করিলে ব্যভিচার করা হয়।

সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে বলেন, সাধনার তিনটি বিষয় জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি আজ মাতা, মন্দির ও সাধকের জন্মতিথির সম্মেলনের মধ্য দিয়া সমন্বিত হইয়াছে। তিনি বলেন, সঙ্ঘগুরু যুক্তির অবতারণা করিয়া হিন্দুধর্ম্মের যে সারমর্ম্ম উপদেশ করিলেন তাহা আমি সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করি। হিন্দুর আচার ও করণীয় বিষয় সম্বন্ধে তিনি এক বিস্তৃত বক্তৃতা দেন।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ সাংখ্যকাব্যতীর্থ ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর সভা ভঙ্গ হয়। কলিকাতার বিশ্বনাথ স্মৃতিসম্মিলনী কর্ত্তৃক গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত কালীকীর্ত্তন গীত হয়।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

পরিচালক ও প্রকাশক : শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
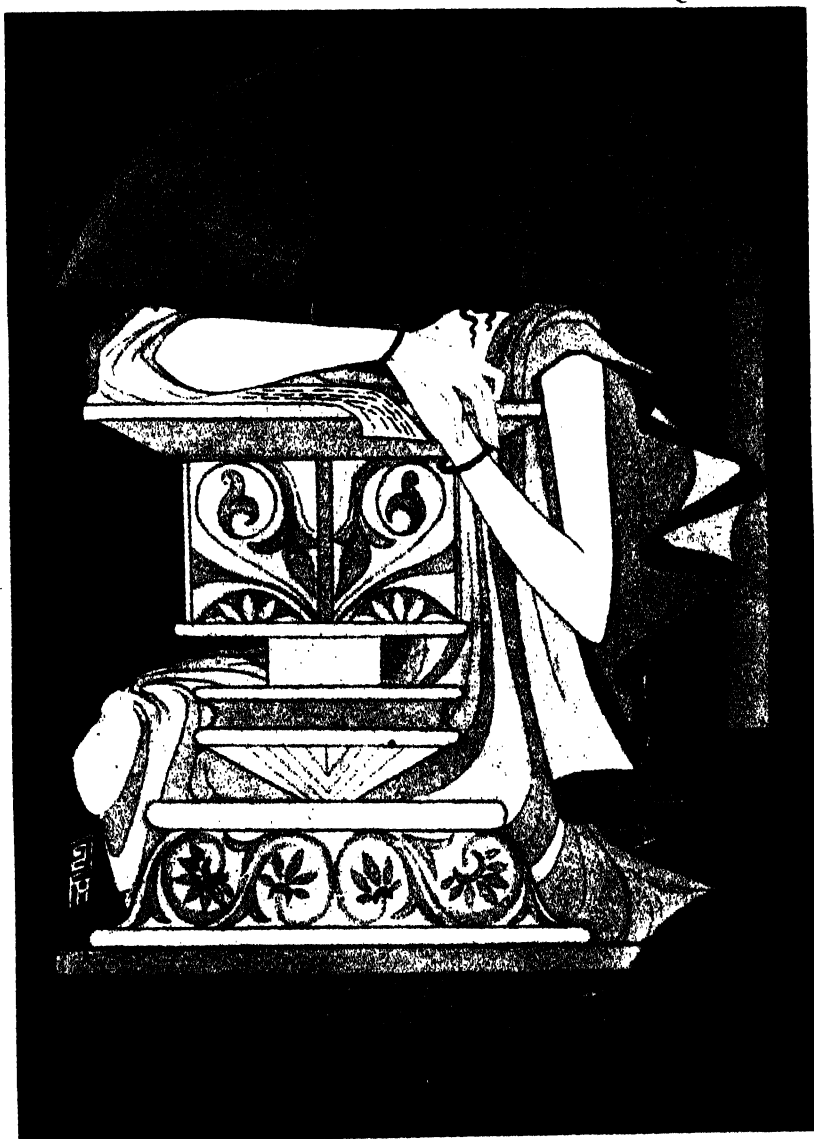
নয়নের নভে তব হয়তো এবার নব বাষ্প-মেঘ বাঁধিয়াছে বাসা,
পল্লব অধরে বুঝি নিঃশব্দে স্ফুরিছে কোনো অর্দ্ধস্ফুট লাজ-ভীরু-বাণী,
পাষাণ শিলার 'পরে ফুটিয়া উঠেছে মোর ছন্দোময়ী চতুর্দ্দশীখানি,
অন্তরের অন্তঃপুরে লুকায়ে কাঁদিছে রিক্তা বিরহিণী বালিকা নিরাশা।

'চতুর্দ্দশী'

—ক্ষেত্রমোহন

শিল্পী : শ্রীহাসিরাশি দেবী ]

# রজত-জয়ন্তী
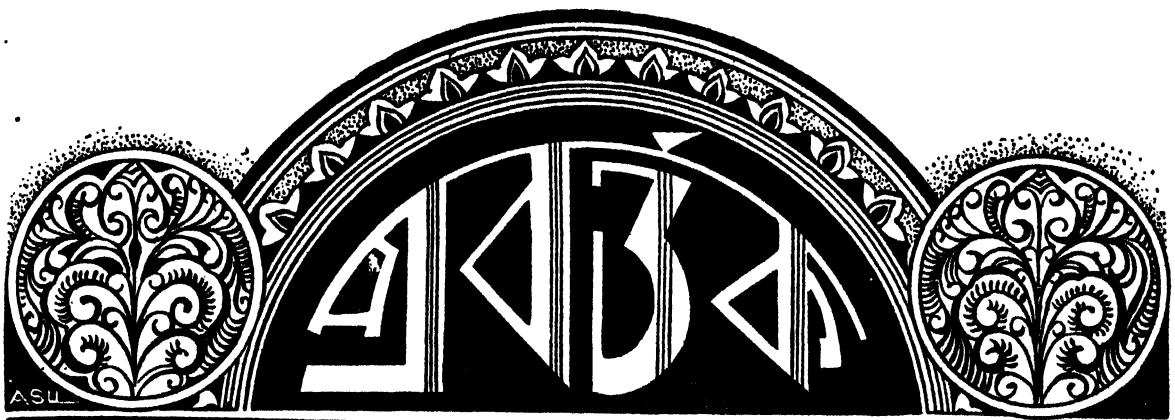
## প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের দর্শন ও প্রকরণ

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ যখন হিন্দুধর্ম্মী, আর হিন্দুজাতি লইয়াই যখন প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কারবার তখন সমধর্ম্মী ও স্বজাতির কণ্ঠেই সর্ব্বপ্রথম প্রশ্ন উঠিবে এইরূপ মনোবৃত্তি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বলিয়া গণ্য হইবে কিনা? আরও কথা, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ যখন বলিতেছে বাংলাই তাহার কর্ম্মক্ষেত্র তখন সমগ্র ভারত-চৈতন্য হইতে সে বিযুক্ত হইয়া পড়িতেছে কি না? ইহার উপর বাংলার চতুঃসীমায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কর্ম্মশক্তি নিবদ্ধ থাকার ফলে ঐ কর্ম্ম যেমন ভারতের নহে, তেমনই জগতেরও নহে এবং ভূমারও নহে, অতএব যাহা অল্প, সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ, তাহা দীর্ঘায়ুঃ কেমন করিয়া হইবে?

ইহার উত্তর দিতেছি—

সত্যের দুই দিক আছে। এক দর্শন, অন্য প্রকরণ। দর্শন—ভাব, ভাষা, সাহিত্য। প্রকরণ—নিয়ম, সংযম, কর্ম্মশৃঙ্খলা প্রভৃতি।

ভাব, ভাষা ও সাহিত্যে আমরা অনুভূতি পাই, অসীম বিভু ও বিরাটকে উপলব্ধি করি। নিয়ম, সংযম ও কর্ম্মশৃঙ্খলায় আমাদের উপলব্ধ জ্ঞানকে বস্তুতন্ত্র করি, জানি ও পাই। দর্শন-বিজ্ঞানে মস্তিষ্কের অনুশীলন হয়। কর্ম্মবিজ্ঞানে শক্তিস্ফুরণ হইয়া থাকে। ভাব বস্তুতন্ত্র হয় শক্তি প্রয়োগে। অনন্তকে অসীমকে ভাবগত করিয়া রাখে দর্শন। উহাকে জীবনগত করার শক্তি দেয় প্রকরণ।

হিন্দু বলিয়া পরিচয় ও আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র বাংলা বলায় প্রকরণ হিসাবেই উহা গ্রহণীয়। ভাবকে বস্তুতন্ত্র করিতে হইলে, এইরূপ প্রকরণ অনিবার্য্য হয়।

আমাদের বিচার্য্য, দেশ ও জাতির সীমা প্রকরণরূপে আশ্রয় করিয়া আমরা বৃহতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছি কি না? ইহার উত্তরে নিঃসংশয়ে বলা যায়, আমাদের লক্ষ্য ভূমাই। ভূমা—সীমা নহে, অনেক। ভূমার লক্ষ্যে সীমা প্রকরণহিসাবে গ্রহণীয় হওয়ায়, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি অথবা সঙ্কীর্ণতা থাকিতে পারে না।

আমি হিন্দু। আমার দেশ বাংলা। জাতি সংখ্যা এখানে ত্রিংশ কোটী নহে, সপ্ত কোটী। কেহ বলিবেন, এই সপ্ত কোটী সংখ্যাও কল্পিত। সত্য কথা। কিন্তু মানুষের প্রতিভায় অকল্পিত স্বপ্ন অপৌরুষেয় বাণীরূপে ফুটিয়া উঠে। মাতৃমন্ত্র উচ্চারণের সহিত ঋষির কণ্ঠে সপ্তকোটী সংখ্যা উচ্চারিত হইয়াছে। প্রকরণপন্থী পদার্থ নির্দ্দেশের অব্যর্থ সঙ্কেত ধরিয়া চলার নীতির ন্যায় এই ফরমুলা ধরিয়াই বাঙ্গালী জাতিকে সপ্তকোটী সংখ্যায় পূরণ করিবে। আমরা এই

জন্য বঙ্গভাষাভাষী দেশগুলিকে একত্র করিয়া বাংলাকে অখণ্ড আকারে গড়িতে চাহিয়াছি।

ইহার পরও প্রশ্ন আছে। এই সপ্তকোটী নরনারী সকলেই হিন্দু নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রকরণ লক্ষ্য নহে, আশ্রয় মাত্র। লক্ষ্য যখন ভূমা তখন আমার প্রকরণরূপ আশ্রয়ের ব্যাপ্তিতে অসংখ্যধর্মী বাঙ্গালীকে এক অখণ্ড জাতীয়তার ছত্রতলে আনয়ন করা অসম্ভব হইবে না। দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতাই সৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ মূর্ত্তি দেয়। বস্তুতন্ত্র রক্তের আশ্রয়ে আমি হিন্দু, আমার জন্মভূমি বাংলা; এই সূত্র ধরিয়া ভূমার পথে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা স্থান পাইবে না।

এইবার কর্ম্মের কথা। কর্ম্ম—শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, অর্থ ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে। কর্ম্মভাব কার্য্যকরী হয় না, উহা স্বপ্নই সৃষ্টি করে। বস্তুর জন্য চাই ভাব ও কর্ম্ম এই দুইয়ের শক্তি। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে ভাব ও কর্ম্মের স্তর পার্থক্য আছে। বস্তু প্রকরণ নিষ্পাদ্য। ভাবের ধর্ম্ম দর্শন ও নিরাসক্ত বস্তুর ধর্ম্ম কর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্য। বস্তু যদি কর্ম্মময় ঐশ্বর্য্যময় না হয়, সে বস্তু বস্তুই নহে। আবার যে ভাব ভূমার স্বপ্ন এবং কর্ম্মে অনাসক্তি রক্ষা করে না, সে ভাবও ভাব নয়। সঙ্ঘসাধকদের এই আত্মবিজ্ঞান সর্ব্বদা সুস্পষ্ট রাখিতে হইবে। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলিব। মানুষ শুধুই ভাব নহে; আবার শুধুই বস্তুও নহে। এই দুই স্তরের দ্বিবিধ ধর্ম্ম লইয়া তাহার গতি। ভাব ও বস্তুশক্তি মানুষকে কর্ম্মসিদ্ধি দেয়। এই দুই শক্তিসিদ্ধ মানুষ কেন্দ্রস্বরূপ হইতে পারে। এইরূপ মানুষকে আশ্রয় করিয়াই একটী কর্ম্মীসংহতি গড়িয়া উঠে। কর্ম্ম বন্ধনের বলিয়া কেহ ভাবের মানুষ আর তদপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ কর্ম্মী, এইরূপ মনোভাব পোষণ করে অক্ষম। আমরা অক্ষমের কথায় কাণ দিব না। আত্মদর্শন ও বস্তুতন্ত্র প্রকরণ লইয়া যতক্ষণ জীবন ততক্ষণ ভাগবত কর্ম্মভাবে অবহিত থাকিব।

আমাদের দেশে কেবল ভাবের মানুষ বা কেবল কর্ম্মের মানুষ—দুজনের কেহই পূজা পায় নাই। পূজা পাইয়াছেন, মনু, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। ইঁহাদের আমরা ঈশ্বরের বিগ্রহরূপে স্বীকার করিয়াছি। ভারতের শাস্ত্রবিধির ইঁহারা মূর্ত্ত প্রতীক বলিয়া এই ব্যক্তিতন্ত্বকে আশ্রয় করিয়া জাতির ইতিহাস সৃষ্টি হইয়াছে। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। আমরা এক্ষণে বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের কথাই বলিব।

ভাব ও প্রকরণ, এই দুইয়ের সমন্বয়ে যে জীবন তাহা সৃষ্টিশক্তিধর বলা যায়। এইরূপ সৃষ্টিশক্তিধরকে কেন্দ্র করিয়া যদি সংহতি গড়িয়া উঠে, তবে সেই সঙ্ঘ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাঙ্গ সাধন সিদ্ধ করার জন্য যে প্রকারে শক্তি প্রকাশ করে তাহাই বলিব।

কেন্দ্রের ভাব ও প্রকরণ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণসামর্থ্য যাঁহাদের তাঁহারাই সঙ্ঘের প্রাণপুরুষ। ইঁহারাই সঙ্ঘের ধনবল ও জনবল বৃদ্ধি করিতে পারেন। জাতির সবখানি এইরূপ কোন এক সংহতির ভাব ও প্রকরণ একেবারে গ্রহণ করে না। কিন্তু নিরাসক্ত নিষ্কাম কর্ম্মজীবনে যে ভাব ও প্রকরণ আবির্ভূত হয় তাহা লোককল্যাণহেতু হওয়ায়, ধীরে ধীরে বহু লোক ইহাতে আকৃষ্টচিত্ত হয়। ভাব ও প্রকরণ সমভাবে গ্রহণ ও পালন এককালে সকলের পক্ষে সম্ভব না হইলেও, এমন একটা সময় আসে যখন এই নিয়মে সমজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ এমন বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠে, যাহার স্বচ্ছজীবনের অভিব্যক্তিতে জাতির শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি ধরে।

ভাব ও প্রকরণের সম-আচার আশ্রয়ে সমষ্টিচক্র অতি বৃহৎ হইলে উহা কর্ম্মস্বাতন্ত্র্যে আবার খণ্ড খণ্ড আকারে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সময় মণ্ডলীর মধ্যে একটী অখণ্ড ভাবকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। ভাব অনেকের আশ্রয়, কেননা উহা অনেক বা ভূমার প্রতিশব্দ, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইজন্য বহুমুখী কর্ম্মশক্তিকে কেন্দ্রমুখী করিয়া রাখে এই ভাবসঙ্ঘ। কর্ম্মপ্রসারতার সহিত এই ভাবকেন্দ্রের নীতি বিধিও বস্তুতন্ত্র হইয়া বিপুল সমষ্টিকে কেন্দ্রবিন্দুর একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যেই আবর্ত্তিত করে। সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টি মূলের বীর্য্যময় ভাবের প্রভাবে এই আবর্ত্তনের ফলে কোন কারণে কেন্দ্রচ্যুত হয় না, বরং কেন্দ্রকে ঘিরিয়া মণ্ডলের বিস্তৃতি আনয়ন করে।

সঙ্ঘের ভাব অথবা কর্ম্ম আশ্রয় করিয়া প্রত্যেক ব্যষ্টি এক একটী সৃষ্টিচক্র গড়িয়া তুলে। ভাব ও

কর্ম্ম পরস্পর প্রাধান্য বশতঃ যুগপৎ দুইটীরই অস্তিত্ব সর্ব্বক্ষেত্রে স্বতন্ত্র রাখিয়া চলে। মূল ভাবকেন্দ্র ভাবতঃ এই সকল অসংখ্য কর্ম্মচক্রকে সমভাবে এক অলৌকিক প্রকরণের সাহায্যে টানিয়া রাখিবে। অথচ কর্ম্মতঃ কাহাকেও ক্ষুণ্ন করিবে না। ভাব ও কর্ম্ম প্রকরণের মধ্য দিয়া প্রচারিত হয় এবং ভাবই পরস্পর বিরোধী কর্ম্ম ও ভাবচক্রগুলিকে সংহতিবদ্ধ করিয়া রাখে। সঙ্ঘ যখন শিক্ষা, সাহিত্য, রাষ্ট্র প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মে যুগবৎ সঞ্চরণ করে, তখন এই সঞ্চরণ নীতির পশ্চাতে যে একটী শক্তিশালী ভাবকেন্দ্র গড়িয়া উঠে উহা আবার ভাব ও প্রকরণের সূত্রে নিজেও অধীন হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত কর্ম্ম ও ভাবচক্রগুলিকেও অনধীন থাকিতে দেয় না। নিয়মতন্ত্রমূলক এই সঙ্ঘের স্বকৃত বিধিতন্ত্র কাহাকেও অনপেক্ষ থাকিতে দেয় না। কেন্দ্র-বিন্দু ধরিয়া প্রধানের সহিত চক্রস্থিত একটী ক্ষুদ্র বিন্দুও পরস্পর আপেক্ষিকতা রাখিয়া শক্তিকে বস্তুতন্ত্র করিয়া তুলে। অর্থাৎ সঙ্ঘে স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই থাকে না; কেহই অনধীন নহে। প্রতিজনের অপেক্ষা রাখিয়াই প্রতিজনকে ভাব ও কর্ম্ম প্রকাশ করিতে হয়। এই স্বভাব জীবের মৌলিক ভাবেরই অভিব্যক্তি। এই মৌলিক ভাব হইতে বিচ্যুত হইলে মানুষের ভাব ও কর্ম্ম দুইই চেষ্টা ও অধ্যবসায় সত্ত্বেও সতত ব্যর্থ হয়। এই জন্যই মৌলিক ভাবের প্রকাশমূর্ত্তি হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে যোগাশ্রয়ী হইতেই আমরা মানুষকে আহ্বান করিয়াছি। যোগীই আত্মচৈতন্যে অভিষিক্ত হইতে পারে, এবং এই ভাবঘন আত্মচৈতন্যই জগৎ কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় অহং ত্যাগে প্রবুদ্ধ হইয়া মানুষকে জাতি-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলার সাহায্য করে। দুষ্টবুদ্ধি ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে চাহিবে না। আমি প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকে বলিব সৃষ্টির মৌলিক সংস্কৃতি যদি মানুষের ভিত্তি হয় তবে ইহাই জীবনের শাশ্বতঃ ঋতময় পথ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহার সাধন করিতে হইবে। বেদের পঞ্চ দেবতার ন্যায় পঞ্চশক্তিও লীলায়ত হয় জীবনে। শিক্ষায়—সাবিত্রী। সাহিত্যে—সরস্বতী। অর্থে — লক্ষ্মী। রাষ্ট্রে — দুর্গা। সমাজে—রাধা। এই পঞ্চশক্তি ভিন্ন ষষ্ঠ শক্তি নাই। মানুষের গতিও এই পঞ্চশক্তির অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। মানুষের করণগুলি যতক্ষণ শক্তির আশ্রয়, ততক্ষণ এই শক্তি পঞ্চধারূপ প্রকাশের পথ অন্বেষণ করে। যেখানে অপ্রকাশ সেখানে বদ্ধতা! যোগে জীবন স্বচ্ছ প্রণালীস্বরূপ হয়। শক্তি সেইখানে প্রহর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, স্বাধীনতা ও সুস্থচিত্ততা প্রকাশ করে। শক্তির এই সাবলীল মূর্ত্তি প্রকাশ যে মানুষে, যে জাতির মধ্যে সম্ভব না হয়, সে জাতি মরিয়াছে বুঝিতে হইবে; আর সেই জাতির মধ্যে দেখিবে ধর্ম্মের নামে বিস্ময়কর ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হইতেছে। অহমিকা-দুষ্ট মনোবৃত্তি বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় বিবিধ রূপ সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্ম সাধনায় হিজিবিজি কাটিতেছে। কেহ দেখিতেছে কালী। কেহ দেখিতেছে বাঁশরী-বয়ান শ্রীকৃষ্ণ। কেহ দেখিতেছে ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিচিত্র বর্ণ। যে পরাৎপর ব্রহ্ম সর্ব্বসৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, যিনি অনন্ত সৃষ্টির মূল উৎস, তাঁহারই অনুমূর্ত্তি এই জীব অহংকৃত মনোবৃত্তির সাহায্যে এইরূপ ইন্দ্রজাল সৃষ্টি যে সহজেই করিবে, ইহা কিছু বিচিত্র কথা নহে। কিন্তু ভারতের বৈদিক সভ্যতা ইহা নহে। জীবধর্ম্ম ভাব ও কর্ম্মময়। সে মহান্ বুদ্ধিতে ভূমাকে অবধারণ করিবে। মনাদি ইন্দ্রিয় সমন্বিত আধারে কল্পান্ত কাল ধরিয়া ভূমার অভিব্যক্তি প্রকাশ করিবে স্ব প্রণালীতে। এই দিব্য জীবন প্রকাশের কেন্দ্র-তীর্থ ভারতবর্ষ। বাংলা এই মহাভারতের হৃদপিণ্ড। বাঙ্গালী এই হৃদয় শতদলের অপার্থিব মকরন্দ। মানব সভ্যতার বীজমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া সাবিত্রী শক্তির প্রকাশে বেদের ঋত্মন্ত্র পুনরুচ্চারণ কর। বাণীর আরাধনায় নব নব শাস্ত্র, সাহিত্য, সংহিতা রচনা করিয়া জাতিকে সত্যের সন্ধান দাও। কমলার জ্যোতির্ম্ময় রূপকে ছন্দিত করিয়া কুবেরের ভাণ্ডার মর্ত্ত্যে নামাইয়া আন। দশভুজার আরাধনায় জীবনতন্ত্রে রাষ্ট্র স্বাধীনতার বিষাণ বাজাও। শ্রীরাধার প্রেম-সিন্ধুতে অবগাহিত হইয়া দিব্য সমাজ গড়িয়া তোল। জীবধর্ম্মের পূর্ণতা আসিলে আমাদের মর্ত্ত্যলীলার হয়তো অন্ত আসিবে। অন্তরীক্ষে সৃষ্টির পর সৃষ্টি আমাদের অনন্ত জীবন গতি কল্পান্ত কাল স্থায়ী থাকিবে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকে তাই নিজের রক্ত আশ্রয় করিয়াই প্রকরণের পর প্রকরণে অনন্ত পথের যাত্রী হইতে বলিতেছি।

## কৃষ্টি ও সংস্কৃতির জন্য রাষ্ট্রশক্তি ও স্বাধীনতা প্রয়োজন

ইউরোপের কোন এক বীরকর্ম্মী বলিয়াছেন "Cultural importance of a nation is almost always dependant on its political freedom and independance. Political freedom is a prerequisite condition for the existence or rather the creation of great cultural undertaking:—অর্থাৎ একটা জাতির সংস্কৃতিগৌরব রাষ্ট্রীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার উপর সর্ব্বদা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই জাতির অস্তিত্বের জন্য অধিকন্তু বৃহত্তর সংস্কৃতি সৃষ্টির পক্ষে সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন।

কথাটা শুধু ইউরোপের নহে, ভারতের পক্ষেও প্রযুজ্য ছিল। ব্রহ্মণ্য সভ্যতা রক্ষা করার জন্য ক্ষাত্র-শক্তির পূজা আমরা এই জন্যই করিয়াছি। দেশের রাষ্ট্রশক্তি ও জাতির স্বাধীনতা না থাকিলে তাহার সংস্কৃতির ভিত্তি ক্ষয় হইয়া কালে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, ভারত তাহার প্রমাণ।

ইউরোপের ইতিহাসেও দেখা যায়, প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা রাষ্ট্রশক্তি ও স্বাধীনতার প্রতি উদাসীন হওয়ায়, পারসিকদের সহিত সংঘর্ষে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় কেমন করিয়া অসমর্থ হইয়াছিল, পরে এই দিকে সচেতন হওয়ায় কতকটা নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষায় গ্রীক জাতি সক্ষম হয়। রোম সাম্রাজ্যেরও সংস্কৃতির গৌরব তখনই মাথা তুলিয়াছে যখন তাহারা পিউনিক যুদ্ধে বীরের মত দাঁড়াইয়াছে। জাতি যে সংগ্রাম-শক্তির জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয়ের দিকে কুণ্ঠাহীন হয় স্বজাতির সংস্কৃতি রক্ষাই তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ। সামরিকশক্তি রাষ্ট্র, মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। জাতি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও যদি বিজয়ী হয়, তবে তাহার সংস্কৃতি সামরিক ব্যয় বাহুল্যে কালে হীনপ্রভ হইয়া পড়িলেও, সুদিনে তাহা শতগুণে প্রকাশ হইয়া পড়ে। কোন স্বাধীন জাতি যখন সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রচুর ব্যয় করিতে থাকে, তখন বুঝিতে হইবে সেই জাতির প্রাণ আছে, এবং তাহার সংস্কৃতি রক্ষার জন্য দরদ আছে। আমরা দীর্ঘ দিনের পরাধীন জাতি এ কথা বুঝিতে পারিব না।

জগতে আজ যে দুইটী প্রবল জাতি পরস্পর ভীষণ সংঘর্ষে প্রাণপণ করিতেছে ইহার মধ্যে নিজ নিজ সংস্কৃতি রক্ষার দায়ই আছে। জীবনের বীর্য্যই ইহার জন্য দায়ী। যাঁহারা এই কুরুক্ষেত্রে ইউরোপ ধ্বংস হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা আমরা করি না। আমরা কেবল দেখি জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি কতখানি গভীর অনুভূতি ও দরদ থাকিলে তাহার জন্য ধন, প্রাণ এমন করিয়া উৎসর্গ করা যায়। বৃটন অসাধারণ রাষ্ট্রশক্তিসম্পন্ন ও স্বাধীনতার জয়-মাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া জাতির আভিজাত্য ও সংস্কৃতি জগন্ময় ছড়াইয়া দিয়াছে। বৃটেনের রাষ্ট্রশক্তি সমগ্র ইউরোপকে অভিভূত করিয়া জগতে তার সংস্কৃতিরই জয়ছত্র উড়াইয়াছে। সংস্কৃতি রক্ষা ও তাহার প্রচারে বৃটন যেমন উদ্যত ইউরোপের কোন জাতি তেমন ভাবে মাথা তুলিতে পারে নাই। সম্প্রতি জার্ম্মাণী তারও একটা সংস্কৃতি-বৈশিষ্ট্য লইয়া প্রাণপণ করায় ভীষণ সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার ফলে নিজ নিজ সংস্কৃতি রক্ষায় যাহার দেয় অধিক গুরুত্বপূর্ণ হইবে সেই বিশ্বজয়ী বলিয়া সংস্কৃতির রাজটীকা ললাটে পরিবে। দুই বা ততোধিক জাতি যদি স্ব স্ব কৃষ্টি রক্ষায় সমকক্ষ বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে বসুন্ধরা কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হইয়া বীরজাতিগণের কুক্ষিভূত থাকিবে। আজ যে নব বিধানের বাণী উঠিয়াছে উহার মূলে আছে এইরূপ জাতীয় সংস্কৃতি। ইউরোপে বৃটন ও জার্ম্মাণী, এসিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে জাপান, ভূপৃষ্ঠের অপরার্দ্ধে আমেরিকা, স্ব স্ব সংস্কৃতির দায়েই সর্ব্বস্ব পণ করিতে পদে পদে অগ্রসর হইতেছে। আমরা উদীয়মান বাঙ্গালী জাতিকে ইহার মধ্যে যে শিক্ষা তাহাই গ্রহণ করিতে বলি।

জার্ম্মাণী যেমন আফ্রিকা, এসিয়া ও চীনকে দাসজাতি বলিয়া ঘোষণা করে, আমাদের শাসক বৃটেন ইহাদের তদপেক্ষা অধিক কিছু মনে করেন না। জাপান ও আমেরিকার পক্ষে এই একই কথা। আমাদের অতীত গর্ব্ব দুর্লঙ্ঘ্য গিরিশৃঙ্গের ন্যায় যতই সমুন্নত হউক বিগত সহস্র বৎসরের ইতিহাস যে মসীচিহ্নে আমাদের দাসজাতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। আমরা যে অবস্থায় সে অবস্থা ছাড়া উচ্চ অথবা নিম্ন যে কোন অবস্থাই স্বীকার করি তাহা মিথ্যা বলিয়া আমরা পুনরভ্যুদয়ের শক্তি তাহাতে লাভ করিব না। আমাদের যথার্থ অবস্থাটীকে স্বীকার করিয়াই অভ্যুত্থানের পথ আবিষ্কার করিতে হইবে। একদিন হয়তো আমরা ব্রহ্মণ্য শক্তির অধিকারী ছিলাম। আমাদের রাষ্ট্রবল ও ধনবল তুলনাহীন ছিল। এবং আমাদের সংস্কৃতিও সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া প্রচার করিয়াছিলাম। আজ সে সাধ্য নাই। সংস্কৃতির উপর জাতীয় দরদ একদিন ছিল তাই সেদিন রাষ্ট্রশক্তি রক্ষায়, স্বাধীনতা রক্ষায় আমরা প্রতি রক্ত-বিন্দুটি পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়াছি। নিঃস্ব হইয়াও সংস্কৃতির গৌরব রাখিয়াছি। সে দরদ বহুদিন হইল নষ্ট হইয়াছে। সংস্কৃতি রক্ষার জন্য জগতের বীরজাতিদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা আমাদের যেন এই সত্য দৃষ্টি দান করে। এই সংগ্রাম আসুরিক, পৈশাচিক বলিয়া আমরা যেন আজ ক্লীবের ধর্ম্ম প্রশ্রয় না করি। যুগে যুগে ভারত স্বধর্ম্ম ও আত্ম সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যাহা করিয়াছে ও করিতে পারিয়াছিল বলিয়া আজও তার আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা হইতেছে, সর্ব্ব জগতে তাহারই পুনরাভিনয় হইতেছে। বিজয়ী জাতি আত্ম সংস্কৃতির প্রভাবেই জগজ্জয়ী হইবে; ভারত থাকিবে যে তিমিরে সেই তিমিরেই, তাহার রাষ্ট্রশক্তি নাই; তাহার স্বাধীনতা নাই।

এইবার প্রশ্ন—যাহা নাই বলিয়া সে দাসজাতি রূপে গণ্য, তাহা পুনঃপ্রাপ্তির সাধনা কি? উপায় কি? নেতিমূলক সাহিত্য জাতির প্রাণে আশা ও উৎসাহ দেয় না। শাস্ত্র শুধুই নিষেধমূলক হয় না। শাস্ত্র বিধিও দিয়া থাকে—এইজন্যই শাস্ত্র স্বীকার্য্য ও পূজ্য। আমাদেরও একটী নিঃসন্দিগ্ধ বিধিবদ্ধ দিগ্‌দর্শন করিতে হইবে। কেননা নৈরাশ্যের গান গাহিয়া লাভ কি? ভারত একটী মহাদেশ। এই পরাভূত জাতির ঘুমন্ত মস্তিষ্কের যে ক্ষুদ্র অংশে জাগরণের তরঙ্গ উঠিয়াছে তাহা ভারতের সবখানিতে অবধৃত হইলেও উহা কার্য্যকরী করার জন্য আমি আমার বাংলা দেশকেই কর্ম্মক্ষেত্ররূপে বরণ করিয়া লইয়াছি। বাঙ্গালী জাতির রাষ্ট্রশক্তি ও স্বাধীনতা লাভের আকুতিই কার্য্যসিদ্ধির অনুকূল হইবে বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছি।

রাষ্ট্রশক্তির উপরই জাতির স্বাধীনতা নির্ভর করে। রাষ্ট্রশক্তি ও স্বাধীনতা জাতির সংস্কৃতি রক্ষার জন্য প্রয়োজন। অতএব মুক্তিকামী বাঙ্গালীকে দেখিতে হইবে স্বাধীনতার সাধনায় আমরা সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার চাহি অথবা স্বাধীন জাতির বাহিরের আড়ম্বর-পূর্ণ স্বার্থ, শক্তি ও ভোগের লোলুপতায় আমরা উদ্বুদ্ধ? স্বাধীন জাতির আকৃতিগত অভিব্যক্তি লোভের বস্তু হইলে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বিপথগামী হইবে। বিকৃতপন্থীর নিরলস প্রচণ্ড গতিও যথাকালে প্রতিক্রিয়ায় স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। বাংলার রাষ্ট্রসাধনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনেতাদের এই অধঃপতনের ইতিহাস আমাদের নিকট সুস্পষ্ট। মুক্তিকামীর স্বচ্ছ গতি তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন লক্ষ্য তার সংস্কৃতির দিকে হয়। অতএব রাষ্ট্রীয় শক্তির ও স্বাধীনতার পথের যাত্রীদের স্বজাতির অমিশ্র সংস্কৃতির দিকে সর্ব্বপ্রথমেই অবহিত হইতে হইবে। ইহার জন্য প্রথম উদ্যমে, কালের আবর্ত্তে আমাদের মিশ্র সংস্কৃতিকে বিশুদ্ধরূপে গ্রহণ ও তাহার পালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে—দ্বিতীয় কর্ম্ম—সংস্কৃতির শক্তি অনুভূত হইলে তাহার প্রচার এবং এই অমিশ্র সংস্কৃতির ভিত্তির উপর বিপুল সংহতি রচনা করিতে হইবে।

ইহার পর এই সংহতি লইয়া রাষ্ট্রসাধনার দুইটী পথ পরিদৃষ্ট হয়। একটী পথ সর্ব্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ; আমি সেই পথটীর কথাই সর্ব্বাগ্রে বলিব। দেশের রাষ্ট্রীয় শক্তি ও স্বাধীনতা অপহৃত হইয়াছে অথবা ইহাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে যাহা তাহা নিরসন করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা অবস্থা ভেদে হিংস ও অহিংস

দুইই হইতে পারে। এই পথ দীর্ঘদিনের অভ্যাসে ধারাবাহিক ভাবে আচরিত হওয়ায় ইহা এতই সুস্পষ্ট যে, এই বিষয় লইয়া লেখনী ব্যয় আমি সঙ্গত মনে করি না; এই পথ অসিদ্ধ অথবা মিথ্যা তাহা আমরা বলিব না। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ এক নূতন পথের সন্ধানে অভিযান করিয়াছে, সেই কথাটী বলিবার জন্যই এতখানি ভূমিকার অবতারণা করা হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত পথটী ধ্বংসের। অর্থাৎ জাতির মুক্তি পথ আগুলিয়া ধরিয়াছে যে শক্তি তাহার বিনাশসাধন তাহার লক্ষ্য। পথ সশস্ত্র অথবা অসহযোগ যাহাই হোক। আমরা যে পথে চলিতেছি তাহা এইরূপ ধ্বংসের নহে, পরন্তু নির্ম্মাণের, সংগঠনের। এ পথ অভিনব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেননা এ পথে মুক্তিকামী কোন-দিন চলার স্বপ্নও দেখে নাই।

সংগঠনের প্রথম উদ্যমে যে অমিশ্র সংস্কৃতি আবিষ্কৃত হইবে, সেই সংস্কৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের প্রাণপণ করিতে হইবে। আমাদের জাতি, গোত্র, ধন, প্রাণ, বল, আয়ুঃ, সবই তদুদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতে হইবে; মুক্তিকামী যদি এই পরীক্ষায় জয়যুক্ত হয়, তারপর সেই ব্যক্তি বা সমষ্টি এই পথের যাত্রীর সহিত সংযুক্ত চিত্তে এই একই নীতি আশ্রয় করিয়া উৎসর্গের আহুতি প্রবল করিয়া তুলিবে। অতঃপর এই আহুতির অর্থবোধ হেতু এই সংহতির প্রচার শক্তি জাগ্রত মূর্ত্তি ধরিতে পারে কিনা তাহার পরীক্ষা করিতে হইবে। যদি পর পর এই তিনটী স্তরে মুক্তিকামী সফলকাম হয় তাহা হইলে সংস্কৃতির জয়মূর্ত্তি গড়ার যে সকল মন্ত্র বা ফরমুলা সাধন লব্ধ হয় সেইগুলি জীবনে ফলাইয়া কার্য্যকরী শক্তি জাগ্রত হয় কিনা তাহাই বিচারণীয় হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিব জাতীয় সংস্কৃতির অনেক অমোঘ নির্দ্দেশের মধ্যে একটী যেমন 'ঈশাবাস্যমিদং' অর্থাৎ এই সবই ঈশ্বরের বাসভূমি। এই মন্ত্রমর্য্যাদা যথারীতি রাখিয়া আমার পক্ষে কিছুকে বাধা বলিয়া তাহা অপসারণ করার জন্য দৈহিক অথবা নৈতিক বল প্রয়োগ সম্ভব হয় কিনা? যদি এইরূপ করিতে গিয়া মন্ত্রগৌরব ক্ষুণ্ণ হয় আমার পক্ষে বাধার অপসারণ প্রচেষ্টা সম্ভব হইবে না। এই অবস্থায় জাতির রাষ্ট্রশক্তি ও স্বাধীনতার জন্য আমায় ভিন্ন পথ অন্বেষণ করিতে হইবে। সংগঠনের নীতিই এই সমস্যার সমাধান। সংস্কৃতি যেমন গড়ার অপেক্ষা রাখে না অর্থাৎ উহা স্বতঃসিদ্ধ অপৌরুষেয় বেদমন্ত্রের ন্যায় নিত্য, উহা পাওয়ার প্রতীক্ষায় আমাকে অভাবী করিয়া রাখে, সংস্কৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত স্বাধীনতার বিমলশ্রী ও তদ্রূপ বিকশিত হইবে, উহা নূতন করিয়া নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইবে না। আমার অভাবী মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন করিয়া পূরণাত্মক ভাবে চিত্ত গড়ার উপর উহা নির্ভর করে। অতএব জাতির রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমি হারাইয়াছি আমারই বোধের অভাবে। এই বোধের সম্পূরণে বিলুপ্ত স্বাধীনতার উপলক্ষ্য স্বরূপ যে বাধা, তাহা স্বতঃই অপসারিত হইবে। ইহার জন্য একটা ঘটনার সৃষ্টি আছে বটে কিন্তু তাহা আমার কর্ত্তৃত্ব-জনিত নহে, আমার অন্তর গঠনে স্বতঃই উহা অভিব্যক্ত হইবে।

সংগঠনের শক্তিই বিশ্বের মৌলিক শক্তি। আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধ্বংসের যে কালানল তাহা খণ্ড মনের অনুভূতি। আসলে উহা নব নব সৃষ্টির প্রকরণ মাত্র। আমরা সৃষ্টির বীর্য্যই দেখিয়াছি। ধ্বংসের বীর্য্য দেখি নাই। যাহা দেখিয়াছি তাহা আকস্মিক ও সাময়িক। সংস্কৃতির আদি মন্ত্র "অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়ঃ সৃজনের সুরেই এই জগৎ উদ্ভাসিত, সৃজনের সুরেই জাতির সংস্কৃতি রাষ্ট্রশক্তি ও স্বাধীনতা পুনরাবিষ্কৃত হইবে। তত্ত্ববিদ্ ইহা না বলিতে পারেন না।

এক্ষণে কথা হইতেছে—এ সবই যদি মানস ব্যাপার হয়, তবে তাহা কথায় পর্য্যবসিত হইবে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ কথা কহে নাই, এই পথে ধারাবাহিক গতি প্রকাশ করিয়াছে। ইহাতে কি প্রমাণ হয় না, এই তত্ত্ব কেবল মানস ব্যাপার নহে, ইহার মূলে বস্তুতন্ত্র সত্যবীর্য্যই আছে। আমরা ধূর্জ্জটীর রচনায় যেমন গঙ্গোত্রীর আবিষ্কার করিয়াছি, ঋষি ও দেবতামণ্ডলীর সুরসৃষ্টিতে যেমন ক্ষীরোদ সাগরে শয়ান বিরাট্‌কে মূর্ত্তি দিয়াছি মর্ত্ত্যে; সেদিনও যেমন আচার্য্য অদ্বৈতের আহ্বানে শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ গড়িয়া উঠিয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণের কাতর কণ্ঠধ্বনি নব্য ভারতের বিগ্রহ রচনা করিয়াছে, সাধনার ঘনিমায় জাতির অমিশ্র সংস্কৃতির

আবিষ্কারের সহিত তেমনই রাষ্ট্রীয় শক্তি ও স্বাধীনতা আবির্ভূত হইবে। এই কর্ম্মের জন্য আর কয়েক মুঠা বীজের প্রয়োজন। শস্য সঞ্চয় যথারীতি হইলে ভোজের উৎসব তদনুযায়ী হইবে। এই সঙ্কেত মুক্তিকামী জাতি নিশ্চয় অবধারণ করিবে, এই অমোঘ বিশ্বাসে আজিও প্রবর্ত্তকের পাঞ্চজন্যে ফুৎকার দিতেছি।

## কর্ম্ম কোন অবস্থায় বন্ধন নহে—ইহা শাশ্বত ধর্ম্ম

ধর্ম্ম কি তাহা আমি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বহুবার বলিয়াছি। কেহ কেহ বলেন এই ধর্ম্মব্যাখ্যা আমার নিজস্ব অভিমত, আমি তাহা অস্বীকার করি। শব্দার্থ যেমন অভিধানের অনুগত হয়, আমি তদ্রূপ শাস্ত্রগত ধর্ম্মার্থই বলিয়াছি, এবং তাহা জীবনেও উপলব্ধি করিয়াছি।

ধর্ম্ম বিষয়টা মনাদি ব্যাপার, তাই উহা সর্ব্বদা ক্রিয়া নিষ্পাদ্য। যাহা মনাদি, তাহা করণ। অন্তর ও বাহির এই দুই করণসমূহের দ্বারা যে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় তাহা ধর্ম্ম। উহা দ্বিবিধ। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। ধর্ম্ম—ঈশ্বর-প্রীতি কামনায় কর্ম্মের বিষয়। অধর্ম্ম—ইহার বিপরীত। এই হেতু ভৌতিক কর্ম্ম উপাসনায় পরিণত হইলে আমরা ধর্ম্ম করিতেছি বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি।

বেদের যজ্ঞ কর্ম্মবাচক। গীতায় বৈদিক যজ্ঞের নাম হইয়াছে ব্রহ্মকর্ম্ম। অধুনা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে কর্ম্মের নামান্তর সেবায় পরিলক্ষিত হয়, কেহ কেহ ইহাকে উপাসনাও বলেন। পরন্তু যাহা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে কর্ম্ম—তাহাই ধর্ম্ম; আর যাহা আত্মপ্রীতি-কামনায় কর্ম্ম—তাহাই অধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়।

মনের উপরেও আর একটী করণ আছে। মন ভাবোৎপাদক। ভালমন্দ ধর্ম্মাধর্ম্ম এই সব ভাব-বিচার মনের। মনের উপরে বুদ্ধি, উহা নিশ্চয়তা-বিধায়িনী শক্তি। বুদ্ধির উপরে আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব শাস্ত্রাদিতে কথিত হইলেও, বুদ্ধিকে জীবের আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা নাই। এই বুদ্ধিকে আত্মনায়িকাও বলা হইয়াছে। বুদ্ধির বিকৃতি মন বলিলেও ভুল হয় না। অতএব ধর্ম্ম মনের বিচারে যদি গৃহীত হয় ধর্ম্মাধর্ম্ম লইয়া গোল বাধিবে। এই হেতু সাবধানী লোকেরা কর্ম্ম প্রবৃত্তিমূলক বলেন। অতএব জীব ইহাতে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়। নৈষ্কর্ম্ম নিবৃত্তি লক্ষণ; এই হেতু ইহা মোক্ষমূলক। জ্ঞানবান্ জনেরা নদীজলপায়ী ব্যক্তিকে কূপোদক পানের ন্যায় কর্ম্মের তাই প্রশংসা করেন না। এ দৃষ্টান্ত মধ্যযুগের ধর্ম্মেতিহাসে বিরল নহে।

ইহার পর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ ধর্ম্মের নামে বিপুল কর্ম্মতৎপর দেখিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব-নিপুণ বুদ্ধিমান্ জনেরা আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতার অন্ত দেখার জন্য যে সোৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবেন, এই বিষয়ে আমি নিঃসংশয়। আমি এই সকল বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মসাধকদের নিম্নোক্ত বিষয়টীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। দীর্ঘদিনের পরাধীনতায় ও জাতীয় শিক্ষার অভাবে আমরা মস্তিষ্ক হারাইয়াছি। ধর্ম্মের স্মৃতিটী মুছিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইতাম। ধর্ম্মক্ষেত্রে তাই অজ্ঞতা বশতঃ একদল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে দেখি যাহারা ধর্ম্মের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেন না। ধর্ম্মের নামে জীবের মৌলিক সংস্কৃতি ইহারাই নষ্ট করিতেছেন। কেন তাহা বলিতেছি। আমার এমন কোন কর্ম্ম নাই যাহা আত্মার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল নহে। আত্মাকে যাহা প্রবৃদ্ধ করে না, সে কর্ম্ম কর্ম্মই নয়। অকর্ম্মেই আমরা আত্মঘাতী হই। আমাদের শরীর পর্য্যন্ত ইহাতে ধ্বংস হয়। কর্ম্ম যদি ঈশ্বরোদ্দেশ্যেই হয়, তাহাকেই যদি যজ্ঞ অথবা উপাসনা বলা যায়, তবে আমি যে খাই তাহাও যজ্ঞ, কেননা উহা দ্বারা আমার আত্মপুষ্টি হয়। গীতার 'যদশ্নসি যৎকরোষি' মন্ত্র ইহা সমর্থন করিবে। হালিসহরে এই বাণীর প্রতিধ্বনি উঠিয়াছিল "আহার করি মনে করি আহুতি দিই শ্যামা মায়ে"। আত্মার আনন্দ বিধায়ক কর্ম্মই ধর্ম্ম। যাহা আপনার শ্রেয়ঃ সাধন করে না, তাহা কর্ম্মই নহে, অতএব অধর্ম্ম।

বুদ্ধিমান্ প্রশ্ন করিবেন—প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ যখন শ্রুতির অনুসারী তখন শ্রুতি-বচন 'কুরু কর্ম্মত্যজেতিচ' কর্ম্ম কর, এবং কর্ম্ম ত্যাগ কর, এই অবস্থায় এই পরস্পর প্রতিকূল বিধির সামঞ্জস্য সঙ্ঘ কেমন করিয়া করিবে?

বেদশাস্ত্র শুধু জীবের জন্যই নহে। জীব মর্ত্ত্যের

স্বর্গের দেবতারাও বেদ আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মরত। অতএব বেদ বাণী আমরা অবশ্যই স্বীকার করিব।

বস্তুর সংজ্ঞা দুই কারণে হয়। ভাব ও রূপ। এই দুইয়ের মিলনে বস্তু সৃষ্টি। রূপ কর্ম্মময়। ভাব বিদ্যাময়। কর্ম্ম কর আর কর্ম্ম ত্যাগ কর—এই দুই উক্তির মধ্যেই কর্ম্মকেই স্বীকার করা হইতেছে। ত্যাগ কর বলার অর্থ কর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া উহার নিষেধে কর্ম্মের অব্যক্ত অবস্থা প্রতিপাদন করিতেছে। অশ্বডিম্বের ন্যায় এই শ্রুতি-বচন কর্ম্মের অসত্তা বুঝায় না। অব্যক্ত কালে ব্যক্ত হয়। কর্ম্ম ছিল না পরে হইল, এতদ্দ্বারা ইহা বুঝাইতেছে না, কর্ম্ম ত্যাগ কর বলিলেও কর্ম্মের নৈরন্তর্য্য রহিয়া যাইতেছে।

যদি বলি নিদ্রা যাও, আবার যদি বলি নিদ্রা যাইও না; এই উভয় প্রতিকূল বিধির সামঞ্জস্য কি ইহাই নহে, যে অবস্থা বিশেষে কখন নিদ্রিত, কখন বিনিদ্র থাকিতে বলা হইতেছে। এখানে গ্রহণ ও ত্যাগ এই দুই প্রতিকূল বিধির তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট।

আমরা ভাব ও রূপ লইয়া জীব। ভাবকে অক্ষর, রূপকে ক্ষর বলিতে আপত্তি নাই। ক্ষরভাবে কর্ম্ম। এই ক্ষর বিষয়াদি হইতে ইন্দ্রিয়াদি, ইন্দ্রিয়াদি হইতে মন; মন হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত চৈতন্য। এই চৈতন্যে অনাহত কর্ম্ম-প্রবাহ চলাই ধর্ম্ম। আর ধর্ম্মে এই চৈতন্যের অভ্যুত্থান। ঐশ্বর্য্য, যশাদি এই আত্মচৈতন্যের অভিব্যক্তি, ভাব অক্ষর, অব্যক্ত তত্ত্ব। বিদ্যা ইহার লক্ষণ। এখানে ধর্ম্ম নাই, ঐশ্বর্য্য নাই, আছে নিরাসক্তি ও চিচ্ছক্তি। উপনিষদ এক নিঃশ্বাসেই বলিয়াছেন—ক্ষরের জন্য 'এজতি', অক্ষরের জন্য 'ন এজতি'। শ্রুতির এইরূপ অসংখ্য প্রতিকূল বিধির সামঞ্জস্য শিক্ষায় সাধনায় মিলে। চিন্তাকীট এ তত্ত্ব অবধারণ করে না বলিয়া প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের জীবন-বিজ্ঞান আর স্তম্ভিত হইবে না। আমরা জাতিকে কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও কর্ম্মনিবৃত্তির যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অভিনব জীবনযাত্রায় অভিযান করিতে বলি।

## নারীর প্রগতি তার আত্মসংস্কৃতি রক্ষায়

ভারতের অভ্যুত্থান যদি কোনদিন সত্য হয় তবে দেখা যাইবে ভারতের নারীজাতির জাগরণ হওয়ায় ইহা সম্ভব হইল। প্রবর্ত্তক কাল্‌চার কলেজের উদ্বোধন-সভার পৌরোহিত্য করিতে গিয়া ডাঃ কালীদাস নাগ মহাশয় বলিয়াছিলেন "বৈদিক যুগে দেবতাদেরই নাম প্রচারিত দেখা যায়; দেবীদের পরিচয় তেমন মিলে না। আজ পর্য্যন্ত পুরুষ জাতি রাষ্ট্রে, সমাজে, শিক্ষায়, মারামারী, কাটাকাটী দ্বন্দ্বযুদ্ধেই অতিবাহিত করিল, জাতির মধ্যে অতঃপর নারীশক্তির জাগরণ বাঞ্ছনীয়।" আমরাও ইহার পক্ষপাতী। জাতির নারীশক্তির অভ্যুত্থান কামনা আমরা করি।

নারী ও পুরুষ দুইই মানুষ, এই বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে গুণভেদ কর্ম্মভেদ যথেষ্ট আছে, এই ভেদের মৌলিক কারণ অস্বীকার করিয়া নারী যদি পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে হানা দেয় তাহা হইলে কিন্তু বিপরীত হইবে। উভয়ের মধ্যে কর্ম্মগুণাদির ভেদের আলোচনা আমরা করিব না। জাতির অভ্যুত্থান-কল্পে নারী জাগরণের প্রয়োজন আছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিয়া জাগরণের লক্ষণ কিরূপ হইবে তাহাই আমাদের বিচার্য্য। নারী কি পুরুষের মত বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিগ্রীগুলিতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া নারী জাগরণের পরিচয় দিবেন, অথবা জাতির মুক্তি কামনায় পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়া তাহারাও কারাবরণ করিয়া অভ্যুত্থানের লক্ষণ প্রকাশ করিবেন; কিম্বা পুরুষের মত তাঁহারাও অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকিবেন, কলেজের অধ্যাপনা করিবেন, ওকালতী করিবেন, অফিসের কেরাণী হইবেন; পুরুষের সর্ব্বপ্রকার কাজেই প্রতিযোগিতা করিয়া তাঁহারা নারী জাগরণের সাড়া তুলিবেন? ইহাই আমাদের বিচার্য্য। নারী স্বয়ম্বরা হইয়া পরিণীতা হইবেন, স্বামী অপছন্দক হইলে তাহা নাকচ করিয়া গত্যন্তর গ্রহণ করিবেন অথবা স্বতন্ত্র একক জীবন যাপন করিবেন। নারী সন্তানপ্রসবে বিমুখ হইবেন, বৈধব্য অস্বীকার করিবেন; জাতির ধর্ম্মাচার অসত্য বলিয়া মুখ ফিরাইবেন, নারী নিজ বেশভূষা

পরিত্যাগ করিয়া নূতন পরিচ্ছদে হকি, টেনিস, ফুটবল খেলিবেন, হোটেলে ডিনার খাইবেন, সিনেমায় যাতায়াত করিবেন, রেডিওতে গান দিবেন, অভিনয় করিবেন, প্রভৃতি জাগরণের যুগ লক্ষণ প্রকাশ করিয়াই কি তাঁহারা প্রগতির পথের পরিচয় দিবেন ?

পুরুষেরা কি করিবেন—এ প্রশ্ন এইক্ষেত্রে অবান্তর। আমি নারী জাতির কথাই বলিতেছি। জাতীয় জাগরণ যুগে তাঁহাদের আচরণ ও জীবন কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইবে। নারী সমাজবন্ধন হইতে মুক্তি লইয়া যেরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন তাহাই কি নারী জাগরণের সত্য পরিচয়? অভিভাবকের দল এক বাক্যে না না বলিয়া কর্ণ বধির করিতেছেন। নারী জাতির মধ্যেও যাঁহারা উপরোক্ত প্রকাশ লক্ষণে সন্ত্রস্ত, তাঁহারা হয়তো যুগ প্রগতির সংবাদ রাখেন না। আমরা প্রগতির পথের যাত্রী যে সকল নারী তাঁহাদের নিকটে এই প্রশ্ন করিতেছি, উত্তর পাইলে সুখী হইব।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ নারীকে সর্ব্বত্র তুল্য স্থানে দিতে চাহে। জাতিগত কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় নারী তুল্য দায়িত্ব গ্রহণ করুন, নারী সংহতিগঠনের নীতি-বিধি নারীই ঠিক করিয়া লউন।

নারী বলিয়া কোথাও তাঁহারা যেন উপেক্ষিতা না হন; বিবাহ বন্ধনেও তাঁহাদের জীবনের অভিব্যক্তি বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সমাজ সংগঠনে অর্থপ্রতিষ্ঠানে নারীর কর্ম্মশক্তি ও সৃষ্টিশক্তি অব্যাহত থাকুক, এই সকলই আমাদের চাওয়া। কিন্তু আমরা চাহি নারীর অনাঘ্রাত ফুলের ন্যায় সুন্দর ও পবিত্র মূর্ত্তি। নারী জাগরণের যুগে জাতীয় এই স্বার্থ আমরা একবিন্দু ক্ষুণ্ণ হউক, ইহা দেখিতে চাহি না।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে প্রাচীন যুগে স্ত্রীজাতিকে কোনদিন স্বাধীন অবস্থায় অবস্থান করিতে দেওয়া হইত না। অনিষিদ্ধ আমোদে প্রমোদে সতত তাহাদিগকে প্রসক্ত রাখিয়া স্ববশে রাখার চেষ্টা হইত। কৌমার অবস্থায় পিতার অধীনে, যৌবনে ভর্ত্তা ও স্থবীরা নারী পুত্রের রক্ষণীয় হইতেন। প্রাচীন ভারত তাঁহাদের কন্যাকাল মধ্যে পাত্রস্থ করিতে চাহিয়াছে। স্ত্রীজাতির রক্ষণধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। এইরূপ করার কারণ স্ত্রীজাতির চরিত্রই জাতি, বংশ, কুল ও ধর্ম্মরক্ষার একমাত্র উপায়। পুরুষ পতিরূপে নারী-গর্ভেই পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া বংশ, কুল ও জাতির গৌরব রক্ষা করে। বীরজাতি নারীর বিশুদ্ধ ক্ষেত্রেই জন্মিতে পারে। জোর করিয়া আমরা নারীচরিত্র রক্ষা করিতে পারি নাই ইহা সত্য, কিন্তু এই হেতু এই বিষয়ে আমরা আজও নিরাশ নহি। কুসুমের সৌরভ, জলের শীতলতা জীবের আয়ুর ন্যায় স্ত্রীজাতি সমাজের অমৃতস্বরূপা। নারীজাতির এই মর্য্যাদা রক্ষার মহত্ত্ব নারী যদি অনুভব করে তবে কিছুতেই তাঁহারাও অসৎ সংসর্গ, যদৃচ্ছ ভ্রমণ, মদ্যাদি পান, স্বামী সঙ্গহীন হইয়া থাকিতে, অকাল নিদ্রা ও পরগৃহবাস করিতে নিজেরাই প্রস্তুত হইবেন না। এই সকল অবস্থায় নারী-চরিত্রে যে সকল স্বভাব-দুর্ব্বলতা আছে তাহা বারণ মানে না, জীবন কলুষিত হয়। নারী চরিত্রের দুর্ব্বলতা নারীজাতি স্মরণে রাখিলে আমাদের আকৃতির মর্ম্ম তাঁহারা বুঝিবেন—নারী পুরুষের সৌন্দর্য্য বিচার করে না; তাহার বিজ্ঞান আছে, সে কথা এখানে নহে—এই কারণে বয়ঃ বিশেষের আস্থাও তাহাদের নাই। পুরুষ-সান্নিধ্যে স্বভাবতঃ তাহাদের চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। স্ত্রী-চরিত্র স্বভাবতঃই শয়ন আসন-শীলতাপূর্ণ। কাম, ক্রোধ, হিংসা ও কৌটিল্য এবং কুৎসিৎ আচার নারী চরিত্রে অতি সহজে সমুদ্ভুত হয়। অথচ নারীই সমাজের একমাত্র শ্রী ও সম্পদ। সন্তান ধারণ, পালন, লোকযাত্রার সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করার শক্তি তাঁহাদেরই আছে। ধর্ম্মকার্য্যে শুশ্রূষায় জাতির আয়ুঃ ও যশ রক্ষায় নারীই আমাদের সহায়। পুরুষ বীজস্বরূপ। ক্ষেত্ররূপা নারী। ক্ষেত্র ও বীজ উভয়ই উৎকৃষ্ট হইলে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সে সন্তান সন্ততি কোন কারণে অবনত হয় না। এ জাতি এই হেতু নারীর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে এতটা সতর্ক হইয়াছিল। নারীর বিশুদ্ধতা যদি নষ্ট হয়, জাতির অভ্যুত্থান শত প্রচেষ্টায় সার্থক হইবে না। নারীর কৌমার্য্য বিশুদ্ধ না থাকিলে তাহাকে পাত্রস্থ করার কোনই মূল্য নাই। নারী সতী না হইলে পতির শ্রেয়ঃ নাই; পুত্রেরও ভবিষ্যৎ নাই। নারীর বৈধব্য মন্দ ভাগ্যের পরিচয় দেয় না; পতির

অমরাত্মা স্মরণের যোগ্য পরিচ্ছদ জাতির অমৃতত্বই ঘোষণা করে। শিখা সূত্র ব্রাহ্মণের লক্ষণ স্বরূপ নারীর বৈধব্য বেশ পতির অবিনাশী আত্মার স্মারক চিহ্ন। জাতির সংস্কৃতির বৈজয়ন্তী যদি কোথাও আকাশ জুড়িয়া উড়ে, সে জাতির নারীমূর্ত্তির শুভ্রতা রক্ষায় হইতে পারে। পুরুষের পতন দেখিয়া যে নারী অভিমানে আত্মঘাতী হয়, সে পুরুষকে পতন হইতে উত্থানে আনার কল্যাণময়ী নারীমূর্ত্তি নহে। সে নারী নিজের শ্রেয়ঃ বিনষ্ট করে। এত বড় খ্যাতি ও মর্য্যাদা এ জাতি নারীকেই দিয়াছে। এই সকল কথা নারীর অলীক প্রশংসা হেতু নহে। পরন্তু নারী নিখিল মানবজাতির অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রস্বরূপা। নারীকে পুরুষ রক্ষা করিতে চাহে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য। নারী স্বরূপরক্ষায় জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি ধরে। নারী এই মহত্তর কল্যাণের জন্যই আত্মরক্ষায় সতত সচেতন থাকিবে। এই প্রেম, এই স্নেহ, এই অপার্থিব লোকহিতৈষণা নারীর কাছেই ভারত দাবী করিয়াছে, এ দাবী আর কোথাও নাই। ভারতের এই দাবী পীড়ন নহে, জাতির রক্ষা হেতু। আমরা স্ত্রীজাতির দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করি—প্রকৃষ্টতর গতির পথে তাঁহাদের অভিযান জাতির অভ্যুত্থান আনয়ন করুক।

## বৈদিক সভ্যতার কাল গণনা লইয়া প্রশ্নোত্তর

আজমীঢ় হইতে শ্রীকিশোরীমোহন দাস মহাশয় আষাঢ়ের প্রবর্ত্তকে ব্রহ্মসূত্রের উপক্রমণিকার "কিছু ভ্রমাত্মক বিষয় দৃষ্টিগোচর করিয়া" আমাকে দুইটী প্রশ্ন করিয়াছেন। আমি একে একে ইহার উত্তর দিতেছি। তিনি প্রথমে বলিতেছেন "ব্রহ্মসূত্রের রচনাকালের তুলনাত্মক হিসাবে এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম আধুনিক বলিলে অত্যুক্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্ম আংশিকভাবে ব্রহ্মসূত্রের আধারভূত এটা মান্য, পরন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমস্ত প্রণালীই যে ব্রহ্মসূত্রের অনুযায়ী তাহা মান্য নহে, কারণ—ব্রহ্মসূত্র সার্ব্বজনিক, আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক, কাজেই ব্রহ্মসূত্রের সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের সম্পূর্ণ সমন্বয় হওয়া কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা বিশেষরূপে বিবেচ্য।"

এই কথার উত্তরে নিঃসংশয়ে বলা যায়, কিশোরীমোহন, বাবু আমার প্রবন্ধটী আর একবার ভাল করিয়া পড়িলে দেখিবেন, বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমস্ত প্রণালীই যে ব্রহ্মসূত্রের অনুযায়ী তাহা উক্ত প্রবন্ধে বলি নাই। আমি বলিয়াছি "ভারত ধর্ম্ম রক্ষায় সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ব্যতীত আর এক শ্রেণীর ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। এই সম্প্রদায় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়া কথিত।" আরও বলিয়াছি "জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভেদ হইলে এই দুইয়ের মধ্যে একটা নিত্য ভেদ আছে, রূপ বৈচিত্র্য আছে, লীলা বিলাস আছে······বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্যগণ বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।"

আর এক স্থানে লেখা হইয়াছে "আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মবাদ নাকচ করার দুর্দ্দমনীয় প্রচেষ্টা নিবারণকল্পে ব্রহ্মসূত্র অবলম্বন করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় ভাষায় ও যুক্তিতে তাহা খণ্ডন করিয়াছিলেন তাহা যেমন অনবদ্য, তেমনই চিত্তাকর্ষক। সেই ভাষ্য বৌদ্ধবাদমণ্ডলের ব্রহ্মাস্ত্র হইয়াছিল যে যুগে, সে যুগান্তে চিরনিঃসৃত জীবব্রহ্মের লীলামৃত পুনরুদ্ভূত হইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণের লেখনীমুখে অপরূপ ভাষ্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।"

অতএব আমার কথা কিশোরীমোহনবাবুর প্রথম প্রশ্নে কোথাও ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতীত হইল না। পরন্তু তিনি ভ্রমাত্মক বলিয়া যে প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন তাহা আমার লেখার একদিক দিয়া সমর্থনই করে। শুধু বৈষ্ণবধর্ম্ম কেন ভারতের সকল ধর্ম্মই শ্রুতিরই আশ্রিত। অংশ পরিমাণের অল্পাধিক্য আছে। ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্র শ্রুতিকেই ন্যায়তঃ প্রতিষ্ঠা দিয়াছে।

এইবার তাঁর দ্বিতীয় কথা উদ্ধৃত করিতেছি। "ব্রহ্মসূত্র লেখে লিখিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান কালের ৫০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে বৈদিক সভ্যতার সূত্রপাত হইয়াছিল; (পৃষ্ঠা ২৫১) ইহা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক তাহা ব্রাহ্মণ গ্রন্থ উপনিষদ ইত্যাদি আর্য্য গ্রন্থ পাঠে স্পষ্টই জ্ঞাত হওয়া যায়, আর ভ্রমাত্মক ধারণার কারণও আছে—শঙ্করাচার্য্যের পরে মহীধর ও সায়নাচার্য্যেরই বেদভাষ্য

দেশে প্রচলিত ছিল, আর সেই বেদভাষ্য অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থের পঠনপাঠনের অভাব বশতঃই বেদের শব্দের প্রকৃত অর্থ বোধগম্য না হওয়াতে ভাষ্য বিশেষরূপে কলুষিত হইয়া পড়ে, অথচ সেই বেদভাষ্যের প্রণালী অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বেদভাষ্য করিতে প্রয়াস পান, তারপরে আধুনিক ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলীরও (অবশ্য সকলেই নন) বেদভাষ্য উক্ত মহীধর, সায়নাচার্য্য বা পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর ভাষ্যের প্রণালী অনুসারে রচিত হইতেছে; কাজেই বৈদিক সভ্যতার সম্বন্ধে ভুল ধারণা উৎপন্ন হইবারই সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, উপনিষদ ইত্যাদি অন্যান্য আর্য্যগ্রন্থ পাঠে যাহা দৃষ্টিগোচর হয় তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক সভ্যতা ৫০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে (আর্য্যাবর্ত্তে) পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল, কারণ সৃষ্টির আরম্ভ হইতেই বৈদিক সভ্যতার সূত্রপাত, আর বর্ত্তমানে সৃষ্টির আয়ুঃ সৃষ্টাব্দ ১৯৭২৯৩৯০৪০; কিন্তু মহাভারত তো ন্যূনাধিক ৫০০০ হাজার বৎসরের কথা।

কিশোরীমোহনবাবু আমার ভ্রম দেখাইতে গিয়া নিজেই ভ্রমে পড়িয়াছেন। বৈদিক সভ্যতার তথাকথিত ভাবে কাল গণনার ব্যর্থ প্রচেষ্টাকে খণ্ডন করিতে গিয়াই আমি লিখিয়াছি।.........অনুমানের আশ্রয় না লইয়া মন্বন্তর হিসাবে অতি কম করিয়াই ভারত সভ্যতার প্রাচীনত্বের বয়স যদি কিঞ্চিদল্প ৫০০০০ হাজার বৎসর বলি, তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৬।৭ হাজার বৎসরের বৈদিক সভ্যতা বলিয়া যাঁহারা প্রচার করেন তাহার প্রতিবাদে উপরোক্ত কথাগুলি যে বলা হইয়াছে তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলিবে। কিশোরীমোহনবাবু বলেন "সৃষ্টির আরম্ভ হইতেই বৈদিক সভ্যতার সূত্রপাত।" তিনি পঞ্জিকা হইতে সৃষ্টির আয়ুষ্কাল উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতার ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছিল। নীহারিকাপুঞ্জ হইতে আমাদের এই বর্ত্তমান পৃথিবী মৃন্ময় মূর্ত্তি ধারণ করিতেই ১ কোটি ৭০ লক্ষ বৎসরের উপর অতিবাহিত হইয়াছিল। ইহার শাস্ত্র প্রমাণ আছে। এই মৃন্ময়ী বসুন্ধরা একদিনেই মানুষের আবাসভূমি হয় নাই। মৃত্তিকা সৃষ্টির পর বিবিধ পাদপ, অতিকায় সরীসৃপ ও তীর্য্যকজাতির যুগও কত লক্ষ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। পুরাণের মতেও দেখা যায়, বরাহ কল্পের সন্ধ্যাকাল অতীত হইলে প্রথম মানুষ আবির্ভূত হয়। ইহাও অন্যূন বিশ্বসৃষ্টির প্রায় ১০০ কোটী বৎসরের উপর হইবে। এই বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার বৎসর পূর্ব্বের মানুষের পদচিহ্ন ও তাহাদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদির আবিষ্কার হইয়াছে। প্রায় ৪ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের মানুষের চোয়ালও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাস ঠিক কবে হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। জগৎ সৃষ্টির কাল-নির্ণয়ের জন্য মন্বন্তরাদি গণনার নীতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রায় ২০০ কোটী বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীসৃষ্টির কথা আজ কেহ অস্বীকার করেন না। মানব সভ্যতার ইতিহাস ঠিক কোনদিন হইতে আরম্ভ হইল তাহা নির্ভুলভাবে গ্রহণ করা খুবই দুঃসাধ্য। আমি কম করিয়া ৫০ হাজার বৎসর বলিয়াছি। ইহা ৫০ লক্ষ অথবা ৫০ কোটী বলিতেও আপত্তি নাই। সর্ব্বপল্লী রাধাকিষণ ভারত সভ্যতার কাল গণনায়—৪০ কোটী পর্য্যন্ত উঠিয়াছেন। মানব সভ্যতার কাল ভারতের ঋষি প্রণীত গ্রন্থাদি হইতে বর্ত্তমান যুগ হইতে ১০০ কোটী বৎসরের ঊর্দ্ধে যাওয়া সম্ভব নহে। মানব সৃষ্টি শতকোটীর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হইয়াছে, এই কথার প্রমাণ আমাদের পুরাণে মিলে। আর্য্য সভ্যতার উন্মেষ হইতে যে আরও কয়েক কোটী বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে সংশয় করিবার কিছু নাই। বেদের অর্থ যদি সৃষ্টির ঋত হয় তবে তাহা অনাদি। তবে বৈদিক সভ্যতার কাল-গণনা করিলে সৃষ্টির কাল-গণনার সহিত তুল্য মনে করা অবৈজ্ঞানিক হইবে। আমি অতি কম করিয়া ভারত সভ্যতার কাল-গণনা ৫০ হাজার বৎসর বলিয়াছি। উহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কাল-গণনার প্রতিবাদ মাত্র। আমার ভাষাই তাহা প্রমাণ করে। কিশোরীমোহনবাবু প্রবন্ধটী আর একবার পড়িলে আমার কথা বুঝিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

## য়ুরোপের সংগ্রাম পরিচয়

ইউরোপের মহাযুদ্ধের অবসান খুবই আকস্মিক ভাবে হইবে এইরূপ মনে হইতেছে। ইউরোপের বীরজাতি বলিতে বৃটন ও জার্ম্মাণীকে গণ্য করা যায়। ফরাসীর গৌরব-সূর্য্য দীর্ঘদিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছে। ফরাসী-গণতন্ত্র জাতিজীবনে শক্তি সঞ্চার না করিয়া আত্ম-বিদ্রোহের কারণ হইয়াছে। বিগত সংগ্রামকালেও ফরাসী মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে ঐক্যবল পরিলক্ষিত হয় নাই ব্যক্তি বিশেষের গর্ব্বই ফরাসী জাতিকে সেদিনও পরাজয়ের পথে লইয়া চলিয়াছিল। ফরাসী বীরবৃন্দের আন্তরিকতায় এবং মার্কিনের সহায়তায় এবং ততোধিক জার্ম্মাণজাতির মধ্যে গৃহ-কলহ উপস্থিত হওয়ায় ফরাসীর জয় সেদিন সম্ভব হইয়াছিল। ১৯৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসীর ভাগ্যদেবতা পূর্ব্বের ন্যায় সদয় হইলেন না। ইউরোপের একটা বীর-জাতির দুই তৃতীয়াংশ ভূমিখণ্ড জার্ম্মাণীর পদানত। অপরাংশও ফরাসীর আধিপত্য বিজয়ী জার্ম্মাণীর ইচ্ছাতেই রক্ষিত হইতেছে। ফ্রান্সের বাহিরে দেশপ্রেমিক ফরাসী-জাতির মধ্যে জেনারল দে গলের কণ্ঠে আশার বাণীও আর তেমন সুস্পষ্ট নহে। ফরাসীর এক শ্রেণীর রাষ্ট্রবিদ্ হিটলারের অনুগ্রহপ্রার্থী। মঁসিয়ে লাভাল ও মঁসিয়ে পেতাঁর সংবাদ তাহার প্রমাণ। মার্শাল পেতাঁ জার্ম্মাণ-নায়ক হিটলার ও মঁসিয়ে লাভালের নিকট হইতে যে চরম পত্র পাইয়াছেন তাহার ইঙ্গিত আর অন্য কিছু নহে। সমগ্র ফরাসী রাষ্ট্রকে একসিস্ শক্তির সহিত সংযুক্ত করিয়া লওয়া। ফ্লান্দার যুদ্ধে ফরাসীর নতি-স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই এই ভবিষ্যৎ সূচিত হইয়াছে। অতএব এই ঘটনা বর্ত্তমান যুদ্ধের দিগ্‌দর্শনের হিসাবে ফরাসীর অবস্থা গণনার মধ্যে না আনিলেও চলিবে।

নব্য জার্ম্মাণীর কর্ণধার হের হিটলার ইউরোপ মহাদেশের উপর একছত্র আধিপত্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। স্বজাতিকে ইহার জন্য প্রস্তুতও করিয়াছেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বাধা দিবার মত শক্তি ছিল তিনটী—রুশ, ফ্রান্স আর বৃটন। ফিনল্যাণ্ড অভিযানে রুশের সহিত অনাক্রমণ চুক্তিতে জার্ম্মাণী এই দিক হইতে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, তারপর দৈব প্রতিকূলে ফ্রান্সের পরাজয়। একমাত্র বৃটনকে সে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিবে মনে করিয়াছিল কিন্তু বৃটনের প্রাণ-শক্তি ক্রমে অজেয় মনে হইতেছে। ইংলণ্ডকে উড়োজাহাজ হইতে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণে ব্যর্থ করিতে না পারিয়া হিটলার এইবার বৃটন আক্রমণ করার হুমকি দেখাইতেছেন। বৃটন এই হুমকীর মূল্য অত্যধিক করিয়া দেখিয়াও তাহার প্রতিপক্ষে আত্মশক্তিকে ততোধিক মাত্রায় পূর্ণ করিয়া অতি সহজ ভাবেই জার্ম্মাণীকে শক্তিপরীক্ষায় আহ্বান করিতেছে। যদি বৃটন ও জার্ম্মাণীর শক্তি পরীক্ষাই হয়, স্বয়ং বিধাতাও এই দুইয়ের মধ্যে কোন একটীকে জয়ের কোটায় তুলিয়া লইতে ইতস্ততঃ করিবেন। সুতরাং এই মহাসংগ্রামের অন্তকালে পরাজয়ের হিসাব কষিয়া কোন এক পক্ষের জয় কামনা সহজ কথা নহে

জার্ম্মাণী রুমানিয়ার বিদ্রোহ দমন করিয়া যে আধিপত্য অর্জ্জন করিল, তাহাতে বলকান রাজ্যে তাহার পরিপন্থী হইতে কেহ আর ভরসা করিবে না। তুর্কের একটা পদাঙ্গুষ্ঠ মাত্র ইউরোপ স্পর্শ করিয়া আছে। খৃষ্টীয় সভ্যতার প্রভাবে তুর্কের ইসলাম সভ্যতা এসিয়ার পথে পূর্ব্ব হইতেই পিছাইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইখানে সে বীরের ন্যায় দাঁড়াইবে। বাকী রহিল গ্রীস। ইটালীকে দিয়া গ্রীসের পতন সম্ভব হইল না। জার্ম্মাণীর নব জাতীয়তার ইতিহাসে ইটালীর খ্যাতি পত্র নাই। মুসোলিনীর সহিত হিটলারের যে সখ্যতা তাহা ইটালীকে জার্ম্মাণীর কুক্ষিগত করার কৌশল মাত্র। গ্রীস ও ইটালীর সংঘর্ষে ইটালীর পরাজয়ে হিটলার নিরুৎসাহ হন নাই ; বরং এই অবকাশে ইটালীকে স্ববশে আনয়ন করার সুষ্ঠু পথই তিনি আবিষ্কার করিতেছেন। স্পেনের কথা আর বলিতে হইবে না। রুশ রাজ্য ব্যতীত ইউরোপ মহাদেশ হিটলারের শাসনা-ধীনে। সংগ্রামের আর প্রয়োজন কি ?

আসন্ন বসন্তে বৃটন জার্ম্মাণীর আক্রমণে বিপন্ন যদি না হয়, আফ্রিকায় ইটালীর উপনিবেশসমূহ স্বীয় ভুজবলে আনিয়া ইউরোপ ব্যতীত বিশাল ভূখণ্ডের উপর তাহার আধিপত্য চির অক্ষুন্ন থাকিবে। ইটালীর শক্তি-বীর্য্যের

পরিচয় আমরা যথেষ্ট পাইলাম। অতঃপর জার্ম্মাণী যুদ্ধ ক্লান্ত হইলেই আমরা উপস্থিত স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িতে পারি।

সুদূর প্রাচ্যে শ্যাম রাজ্যের সহিত ইন্দো-চীনের সন্ধি সংস্থাপিত হওয়ায়, জাপান উদ্ধত চীনকে শাসনে আনিয়া প্রশান্ত সমুদ্রতটে নব বিধান প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টা করিবে। ইউরোপের রণক্ষেত্র হইতে আফ্রিকায় যে বৃটনের রণোন্মত্ততা তাহা যদি কোন ইন্দ্রজাল প্রভাবে শান্ত হয়, বৃটন ও আমেরিকার চাপে, সোভিয়েটের কূট কৌশলে জাপানকেও কিছুদিনের জন্য স্থির হইতে হইবে। বর্ত্তমান সংগ্রামে আমেরিকার লাভ অর্থপুষ্টিতে, আর রুশের বাণিজ্য বিস্তার ও প্রতিপত্তি অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। আমরা অতঃপর দুইটী বীরজাতিকে বিশাল ভূখণ্ড দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ভোগ করিতে দেখিলে বিস্মিত হইব না। আমরা অন্ধ—দিবারাত্রি দুইই আমাদের তুল্য; তবে আফ্রিকা মহাদেশের ন্যায় ভারত বৃটেনের ভাগ্যে গ্রথিত থাকিলেই আমরা নিরাপদে নিজেদের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা করিতে পারিব। জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি তাহারাই যাহারা বীর্য্যে, শৌর্য্যে ও জাতীয় গর্ব্বে আত্মদানে কার্পণ্য করে না। সে জাতির মধ্যে বৃটন গণ্য হইতে পারে। ভারতের ন্যায় এই পতিত জাতিটা যদি কোন দিন জাতে উঠিতে পারে, তাহার সুযোগ বৃটনের জয়েই সম্ভব হইতে পারে। বর্ত্তমান সংগ্রামের পর বিজয়ী বৃটন আমাদের সেবার মূল্য দিতে কার্পণ্য করিবেন না—এ বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়।

# প্রবর্ত্তক কলেজ অব্ কালচার

শ্রীমতিলাল রায়

১৯২১ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীতে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে নব বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সূত্র ধরিয়া দেশবন্ধু ছাত্রদের বিজাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে বাহির হইয়া আসিতে বলেন। সেদিন দেশের তরুণ দলে দলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তুচ্ছ করিয়া তাঁহার ডাকে সাড়া দেয়। ঠিক এই সময়েই নিঃসম্বল প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ গঠনের প্রেরণায় চন্দননগরে এই সকল ছাত্রদের ডাক দিয়াছিল। প্রায় অর্দ্ধশত বিদ্যালয়ের ছাত্র এই বিদ্যাপীঠে যোগদান করে। গঙ্গাতীরে জঙ্গলাকীর্ণ একখণ্ড ভূমির উপর দাঁড়াইয়া বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়। ছাত্রদের তখন আবাস-গৃহ ছিল না, অধ্যাপনা করার ঘরও ছিল না, অশথ বটের তলে বসিয়া তরুলতা প্রভৃতি বনাকীর্ণ কুঞ্জে বসিয়া দিনের পর দিন ভারতের দর্শন ও উপনিষদ লইয়া আলোচনা চলিত। এই শিক্ষা প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা বলিয়া আজ প্রমাণিত হইয়াছে। এই সকল ছাত্রের মধ্যে অনেকেই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মেরুদণ্ড স্বরূপ হইয়া সঙ্ঘকে শিক্ষায় ও অর্থে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। যে সকল ছাত্র সঙ্ঘে আত্মদান করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহারাও সৃষ্টিশক্তিধর হইয়া মানুষের মত সমাজ-ধর্ম্ম পালন করিতেছে ইহা একবিন্দু অত্যুক্তি নহে।

সেদিন 'নবসঙ্ঘে' লিখিয়াছিলাম—"এই গঙ্গাতীরে তোমার (মায়ের) মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেছি। এই মন্দির বাংলায় বিদ্যাপীঠ হইবে। ইহা একদিন বিশ্ব-বিদ্যার দিব্য আলয়ে পরিণত হইবে।......বিদ্যার্থী আসিবে ব্রতনিষ্ঠ সেবকের মত; বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, বাক্য, বর্ণ, অধ্যাত্ম যোগ, ছাত্রদের কর্ণকুহরে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলিবে।" সেদিন এই বিদ্যাপীঠের চারিপাশে বিচিত্র কর্ম্মশালা সৃষ্টি করার স্বপ্নের কথাও লিখিয়াছিলাম। লিখিয়াছিলাম—"আমরা স্বহস্তে ঘানি চালাইব, সরিষা পিষিয়া খাঁটী তৈল বাহির করিব। যাঁতায় গম পিষিব, ধান ভানিব, বাংলার সন্তান শ্রমকাতর হইয়াছে। শ্রমের অর্ঘ্যেই মাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিব। একদিকে শ্রুতির উদ্গান উঠিবে। অন্যদিকে শিল্পশালার গুঞ্জনে বিদ্যাপীঠ মুখরিত হইবে। এই বিদ্যাপীঠ মাতৃপীঠে পরিণত করিয়া বাংলার ভবিষ্য জাতিগঠনের কেন্দ্র-তীর্থ হইবে।"

সেদিন ইহা ছিল স্বপ্ন। একদা যে অলক্ষ্য শক্তির প্রেরণায় যে কথা ঘোষণা করিয়াছিলাম, আজ তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

বিপ্লবযুগের তরুণ এই বিদ্যাপীঠের শিক্ষানিকেতনে নবজীবনের সন্ধান পাইয়া নবঋক প্রচারে আমার সহায় হইয়াছে।

অসহযোগ আন্দোলনের তরুণ এই বিদ্যাপীঠে শিক্ষালাভ করিয়া বাংলার সর্ব্বত্র শিক্ষা ও অর্থপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া

ডক্টর কালিদাস নাগ

তুলিয়াছে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, মধ্য ও উচ্চ ইংরাজী স্কুলসমূহে আজ সহস্র সহস্র বাঙ্গালীর ছেলেরা নূতন আবহাওয়ায় শিক্ষালাভ করিতেছে, সঙ্ঘ-সাধকদের সেবায় তৈল, ঘৃত, চাউল প্রভৃতি বিশুদ্ধ খাদ্যাদি দেশময় সরবরাহ হইতেছে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা স্বাবলম্বনের সাধনায় দেশে বর্ত্তমান যুগোপযোগী ব্যাঙ্ক, বীমা, কল কারখানা, প্রেস, হোসিয়ারী, কৃষি শিল্প আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে আগাইয়া দাঁড়াইয়াছে। সঙ্ঘের নারীশিক্ষাও বিশেষভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে। সঙ্ঘের মহিলারা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পরিচালন করিতেছে। চারুশিল্পে, তাঁতে, ঢেঁকির কাজে, ছাপাখানায়, গৃহকর্ম্মে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া সঙ্ঘের শ্রীবিধান করিয়াছে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কর্ম্ম নিত্য যজ্ঞ স্বরূপ। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে রাত্রির প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত মন্ত্রধ্বনিতে সঙ্ঘের সমস্ত প্রতিষ্ঠান মুখরিত। আমরা আজ নিঃসংশয়েই বলিতে পারি—আমাদের বিদ্যাপীঠে মানুষ গড়িয়াছে। ঈশ্বর আমাদের ধন্য করিয়াছেন।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যাপীঠ পুনরায় নবমূর্ত্তি ধারণ করিল। সেদিন বনাকীর্ণ স্থানে বিদ্যার্থীদের আহ্বান করিয়া প্রকৃতির কোলে বসাইয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। আজ সেই বনভূমির উপর কয়েকটী অনাড়ম্বর ভবনে বর্ত্তমান যুগের তরুণদের ডাকিয়া যুগ-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছি। গত শ্রীপঞ্চমীর পুণ্য তিথিতে মনীষী ডক্টর কালিদাস নাগের পৌরোহিত্যে নব বিদ্যা-পীঠের দ্বার উন্মোচিত করা হইয়াছে। বসন্তের পদসঞ্চারে গঙ্গাসীকর-সম্পৃক্ত বনকুসুমের সুরভি সৌগন্ধে উন্নতচূড় রৌদ্রকরোজ্জ্বল নব-নির্ম্মিত মাতৃমন্দির সম্মুখে রাখিয়া প্রবর্ত্তক কালচারাল্ কলেজের এই যে শুভ সূচনা হইল, ইহার সাফল্যের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় আর আমার ব্যক্তিত্বই দায়ী নহে, সঙ্ঘশক্তির অমৃত অভিষিক্ত হইয়া নব-জাতির আর একদল অগ্রণী জাতিগঠনের নবশিক্ষা অর্জ্জন করিবে। সৃজনীশক্তির বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া দেশে দেশে শিক্ষা ও অর্থ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবে। আমাদের এই অনাড়ম্বর কলেজের অধ্যক্ষ পদে সঙ্ঘের প্রথম ও প্রধান বরপুত্র শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্তই নিয়োজিত হইয়াছেন। যোগ্য সহকারীগণের সঙ্গে, দেশের মনীষীবর্গের আনুকূল্যে ও তাহার সুপরিচালনায় এই বিদ্যাপীঠও অচিরে জয়শ্রী-মণ্ডিত হইবে, এই বিশ্বাস আমার আছে। ধর্ম্ম ও ভাগবত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া জাতি জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করুক। এই পথে উদীয়মান তরুণই বিজয়ী হইতে পারে, সৈনিকের ন্যায় দলে দলে তাহাদের এই শিক্ষার্থী ভবনে যোগদানের জন্য আহ্বান করিতেছি।

# চন্দননগর—১৬৭৩ হইতে ১৯৪০

শ্রীহরিহর শেঠ

[ বিগত দুই শতাব্দীর মধ্যে ভারতে যে সকল ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তন্মধ্যে ক্ষুদ্র চন্দননগরের স্থান উল্লেখযোগ্য। চন্দননগর এক সময় বাণিজ্য ও রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল। উহার সে পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য-সমৃদ্ধি ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব বর্ত্তমানে না থাকিলেও, অতীতের গৌরব-স্মৃতি বহন করিয়াই জাতির ইতিহাসে চন্দননগর চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। স্মারক হিসাবে সময়ানুক্রমিক প্রায় তিন শত বৎসরের ঘটনাবলী সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ এই প্রবন্ধে সঙ্কলিত করিয়া ভাবী ইতিহাসরচনার সুদৃঢ় বনীয়াদই রচনা করিয়াছেন। আমরা উহা "প্রবর্ত্তকে" সাদরে প্রকাশ করিলাম। অন্যান্য ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানসমূহেরও অনুরূপ সঙ্কলন প্রকাশার্থ পাইলে, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। প্রঃ পঃ ]

[ ফরাসীদের চন্দননগরে আগমনের পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জ্ঞাতব্য ঘটনাদি কোন্ বৎসর কি ঘটিয়াছে, যথাসম্ভব এই তালিকায় সন্নিবেশিত করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা না হইলেও, সময় সম্বন্ধে স্থির করিতে না পারায়, বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বাদ দিতে হইয়াছে।—লেখক। ]

১৬৭৩—ফরাসীরা প্রথম চন্দননগর তথা বাঙ্গলায় আগমন করেন। দুপ্লেসি (Du Plessis) নামক এক ব্যক্তি নবাব ইব্রাহিম খাঁর নিকট হইতে অনুমতি লইয়া বোড় কিষ্ণপুরে ৪০১৲ টাকা মূল্যে কুড়ি আরপাঁ (arpents)* জমি সংগ্রহ করেন।

১৬৭৬—ইংরাজ কোম্পানির প্রতিনিধি (যিনি পরে মান্দ্রাজের গভর্ণর হন) ষ্ট্রেণ্শাম্ মাষ্টার (Streynsham Master) ১৩ই সেপ্টেম্বর এই স্থান পরিদর্শন করেন।

এই বৎসর উহা পরিখাবেষ্টিত করা হয়। সাধারণ বিশ্বাস এই বৎসরেই প্রথম ফরাসীরা এখানে আসেন।

১৬৮৬—পণ্ডিচারীর ফরাসী কোম্পানীর কর্ত্তা মার্টিন্ তথা হইতে দেলটর্ (Deltor) নামক এক ব্যক্তিকে ৪০০০০ এস্থ (ecu)† মুদ্রা সমেত চন্দননগরে মালপত্র খরিদ করিবার জন্য প্রেরণ করেন।

১৬৮৮—দ্বিতীয় বার ফরাসী কোম্পানী এখানে আইসেন। এই বৎসরই মোগল সম্রাট্ আরঙজেবের নিকট হইতে ৯৪২ হেক্টর্ ‡ জমি ৪০০০০ টাকায় খরিদ করা হয় এবং তাঁহার নিকট হইতে কুঠি স্থাপনের অনুমতি পাওয়া যায়।

—এই বৎসর আগষ্টিনীয় সম্প্রদায় একটী উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

১৬৯০—প্রথম ফরাসী সন্তান ফ্রান্সিস্ লুই বুরো দেলান্দে জন্মগ্রহণ করে।

ঢাকার নবাব ইব্রাহিম খাঁর সাতগাঁর অধীনস্থ বোড় পরগণার রাজধানী বোড় কিষ্ণপুরের কর্ম্মচারীকে লিখিত ২৯শে মের পরওয়ানায় ফরাসী কোম্পানীর ডিরেক্টরের ৬১ বিঘা জমি খরিদের কথা পাওয়া যায়।

১৬৯১—বুরো দেলান্দে (Boureau Deslandes) এখানকার অধিনায়ক নিযুক্ত হন।

জেস্থট্ দুসাট্ (Dutchetz) নামক এক স্থপতির দ্বারা কুঠি, গুদাম, বাড়ী, প্রাচীর প্রভৃতির নক্সা প্রস্তুত হয় এবং ২৬০০০৲ টাকা ব্যয়ে উহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া পর বৎসর সমাপ্ত হয়।

১৬৯৩—বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার অবাধ বাণিজ্যের অনুমতি বিষয়ক মোগল বাদসার ফরমান জানুয়ারী মাসে (১৪ই শফর) পাওয়া যায়। এই সময় হইতেই আইনসঙ্গতরূপে ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চন্দননগরে মালিকত্ব সত্ত্ব জন্মে এবং ইহাই ফরাসী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম ভিত্তি।

১৬৯৪—মঁসিয়ে মার্টিন্ ১০ই ফেব্রুয়ারী চন্দননগরে তাঁহার জামাতা মঁসিয়ে দেলান্দের নিকট আইসেন।

১৬৯৬—ইংরাজ ও ওলন্দাজরা যেমন শোভা সিংহের বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া কলিকাতায় ও চুঁচুড়ায় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তেমনি ফরাসীরাও চন্দননগরে ফোর্ট দর্লেয়াঁ (D'orleans) নামক দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। এই সময় গির্জ্জা ও এই দুর্গ ভিন্ন ইষ্টক নির্ম্মিত অন্য বাটী বোধ হয় এখানে ছিল না।

যতদূর জানা যায় মার্টিন (Martin) দেলান্দ (Andre Boureau Deslande) এবং পেল্এ (Pelle') স্বাক্ষরিত তদানীন্তন ডিরেক্টরকে ২১শে নভেম্বর লিখিত এক পত্রে 'চন্দননগর' এই নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৬৯৭—দুর্গ নির্ম্মাণ শেষ হইয়া উপনিবেশটি সুরক্ষিত করা হয়।

১৬৯৮—মার্টিন্ চন্দননগর ত্যাগ করিয়া যান।

বাঙ্গলার নবাব জাফর খাঁ নসিরির সময় হুগলী, পিপলি, বালেশ্বর, ইংলি প্রভৃতি স্থানে ফরাসী কোম্পানী জাহাজ নোঙ্গর করিবার যে অনুমতি পায় তাহা আওরঙ্গজেবের অষ্টত্রিংশ বৎসর রাজত্বকালে রজবের ৮ই তারিখে সম্রাট্ পুত্র কর্ত্তৃক নিশান খিশান * দ্বারা ঐ আদেশ পুনর্বিকৃত হয়।

* ফ্রান্সের জমি সংক্রান্ত এক প্রকার মাপ।

† তখনকার দিনে এক এস্থ অর্দ্ধ ক্রাউন মুদ্রার সমান ছিল।

‡ এক হেক্টর ৮ বিঘা ১৩ কাঠার সমান।

* সম্রাটের যেমন ফরমান্, নবাব ও দেওয়ানের যেমন পরওয়ানা, ইহাও তেমনই সম্রাট্ পুত্রের স্বাক্ষরিত সনন্দ বা আদেশপত্র।

১৬৯৯—এই সময় হইতে বৈদেশিক মিশনারী নিয়োগ নিষিদ্ধ হয় এবং তৎপরিবর্তে কাপুচিন্‌দিগকে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হয়।

১৭০০—ফেলিপো (Phelypeaus) নামক জাহাজে চন্দননগর হইতে ১৫০ গাঁইট বস্ত্র রপ্তানি হয়।

১৭০১—মঁসিয়ে দেলান্দে মঁসিয়ে ডুলিভারকে (Pierre Dulivier) কার্য্যভার অর্পণ করিয়া যান।

এই সময় হইতে চন্দননগর পণ্ডিচারীর অধীন হয়।

১৭০৫—ফিনিক্সদর নামক ওলন্দাজ জাহাজ কাড়িয়া লওয়া উপলক্ষ করিয়া ওলন্দাজদের সহিত ফরাসীদের সংঘর্ষ হয়।

১৭০৬—এই সময় হইতে চন্দননগর দেলাবার (Jean Samuel Delabat) কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে।

পরিব্রাজক হ্যামিলটন চন্দননগর পরিদর্শন করেন।

১৭০৮—ফাকুর (Francios de Flacourt) ডিরেক্টর জেনারেলের পদে অভিষিক্ত থাকেন।

১৭০৯—রিপা (Abbate D. Matteo Ripa) চন্দননগর পরিদর্শন করেন। একটী জেসুইট্‌ ভজনালয় ও আশ্রমের কথা জানা যায়।

১৭১১—হারদানকুর্‌ (Claude Boivind' Hardancourt) এ সময় ডিরেক্টর জেনারেল থাকেন।

১৭১৩—গভর্ণর রসেলের পত্নী এবং গভর্ণর আয়ারের ভগ্নী রেবেকা রসেল্‌ (Mrs. Rebecca Russell) ১৪ই এপ্রেল এখানে মারা যান। গভর্ণর রসেল্‌ রোগমুক্ত হইলে ২৯শে মে চন্দননগর হইতে চলিয়া যান।

১৭১৫—হারদানকুর্‌ ও ব্রঁাসলিয়ের নামে ১৫০১ টাকায় বোড় কিষ্ণপুর নামক পল্লী খরিদের দলিল প্রস্তুত হয়, ১লা মার্চ্চ।

১৭১৭—হারদানকুরের চন্দননগরে মৃত্যু হয়।

১৭২০—দেলাবা (J. S. Delabat) ডিরেক্টর জেনারেল পদ প্রাপ্ত হন।

কনভেণ্ট সংলগ্ন গির্জ্জাটী তিব্বত মিশনের রোম্যান্‌ ক্যাথলিক যাজকগণ দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

১৭২১—বুয়েকসিয়ের একুইয়ে (Francois de la Bouexiere, Ecuyer) ডিরেক্টর্‌ জেনারেল পদে নিযুক্ত হন।

১৭২২—দেলাবার ডিরেক্টর্‌ জেনারেলের পদে পুনর্নিয়োগ।

১৭২৩—ডিরেক্টর জেনারেল পদে ব্রঁাচোওয়ের (De la Blanchetiere) নাম পাওয়া যায়।

১৭২৪—দেলাবার চন্দননগরে মৃত্যু হয়।

১৭২৬—ইটালিয়ন্‌ মিশনের ধর্ম্ম মন্দির—যেখানে প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক মারকাস্‌ (Friar Marcus) বহুদিন বাস করিয়াছিলেন এবং যে স্থানে বর্ত্তমানে সেণ্ট মেরির কনভেণ্ট অবস্থিত, তাহা নির্ম্মিত হয়।

১৭২৮—ব্রঁাসেওয়ের (F. D. de la Blanchetiere) ডিরেক্টর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

এই বৎসর মানকুণ্ডু নামক পল্লীতে শিশুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়।

১৭২৯—দে লা ব্রঁাসওয়ের চন্দননগরে মৃত্যু হয়।

” গুইয়োম গুইয়ানদে (Guillaume Guillandeu) এখানকার কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হন।

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী পণ্ডিচারীতে এক জাহাজ চাউল ও অন্যান্য দ্রব্য পাঠান।

১৭৩০—দিরোয়া (Francois Dirois) ডিরেক্টর জেনারেল হন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম সমগ্র স্থানটিকে গড়বন্দি করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

প্রসাদপুর ও তৎসংলগ্ন পল্লীটি খরিদ করার প্রস্তাব ১০ই ফেব্রুয়ারীর কাউন্সিলে গৃহীত হয় এবং পরে ১১২৫ সিক্কা টাকায় রাম রাম চৌধুরীর নিকট হইতে কোম্পানী ক্রয় করেন।

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কোম্পানীর দালাল (Conrtier) নিযুক্ত হন।

১৭৩১—ডুপ্লেক্স (Joseph Francois Dupleix) ইনটেণ্ডেণ্ট বা গভর্ণর পদে নিযুক্ত হন।

১৭৩২—সাবিনাড়া নামক পল্লীটি (৮ বিঘা ১৫ কাটা) ১২ই সেপ্টেম্বর কোম্পানী রামচরণ সুরের নিকট হইতে ৩৪৮৲ টাকায় খরিদ করেন।

বাৎসরিক ১২০০০৲ টাকা কর ধার্য্যে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে প্রথম চন্দননগর ইজারা দেওয়া হয়।

১৭৩৪—বাৎসরিক কর বর্দ্ধিত হইয়া ১৪০০০৲ ধার্য্য হয়।

কবিওয়ালা রাসু্র গোন্দলপাড়ার এক ভদ্র কায়স্থ বংশে জন্ম হয়।

১৭৩৫—ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ফ্রান্সের রাজার নিকট হইতে একটী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

১৭৩৬—বাৎসরিক খাজনার ইজারার হার বর্দ্ধিত হইয়া ১৫০০০৲ টাকা ধার্য্য হয়।

১৭৩৭—ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র জগন্নাথপ্রসাদকে ১৫০০০৲ টাকা বাৎসরিক খাজনায় চন্দননগর ইজারা দেওয়া হয়।

১৭৩৮—কবিওয়ালা রাসুর সহোদর কবিওয়ালা নৃসিংহের জন্ম হয়।

১৭৪০—ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীনন্দদুলালের মন্দির রচিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবতঃ এই সময়েই বা পূর্ব্ব বৎসর একটী অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করেন।

১৭৪১—১৭ই এপ্রেল জেনি আলবার্টের (Jeanne Albert) সহিত ডুপ্লেক্সের চন্দননগরেই বিবাহ হয়। তাহাকে জোনা বেগম বলিত। ডুপ্লেক্স পণ্ডিচারীতে গভর্ণররূপে প্রেরিত হন এবং দেলেরি (Duval de Leyrit) তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হন। (ক্রমশঃ)

# ছায়াময়ী

৺কর্ম্মযোগী রায়

ঘন ঘেঁটু বনের মাঝ দিয়ে অসমতল একটা পায়ে-চলা পথ। এই পথ দিয়েই কৃপানাথ প্রতিদিন যাওয়া আসা করে। আজও সে চলেছে তার কর্ম্মক্লান্ত হেলে-পড়া দেহটা টেনে নিয়ে। কোটরাগত দুটি চোখে স্পষ্টই দেখা যায় অমীমাংসিত প্রশ্নের ক্লান্তি। মুখে শ্লথ দৃঢ়তা!

নাচন গ্রামে সে অতি-নবাগত না হইলেও, নবাগত বলা চলে। এ গ্রামের অভিজ্ঞতা তার ছ'মাসের। দু'একখানা গ্রামের ওপারে একটি ছোট ষ্টেশনে সে চাকরী গ্রহণ করে' এসেছে। অত্যন্ত সাধারণ কাজ। পঁচিশ টাকা মাহিনার কেরাণী। ষ্টেশন্-মাষ্টার হরপ্রসাদ কৃপানাথকে ভালবাসে। তার কর্ম্মদক্ষতায় সে মুগ্ধ। যে কোন শক্ত কাজ অল্প সময়ে সহজ করে ফেলার কৃতিত্বটা যেন তার একচেটিয়া।

কৃপানাথ কথা বলে কম, কাজ করে তার বিশগুণ।

হরপ্রসাদ একটি রহস্য এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি, সেটা হ'ল: কাজের অবসরে কৃপানাথ অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে। নিষ্প্রভ ক্লান্ত দুটী চোখের মণি নিবদ্ধ থাকে দূরে, অতি দূরে, কত গ্রামের ওপারে, কত মাঠ, কত গাছের সারি, কত নদীর শেষ সীমানায়।

মনে হয় যেন পৃথিবীর অজস্র সমস্যা, লক্ষ প্রশ্ন সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে' ভীড় করে' দাঁড়িয়েছে তার দৃষ্টির শেষ সীমানাতে। প্রশ্নের অতিরিক্ততায় তারা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কেউ আবার রুগ্ন মুখের অপরূপ ভঙ্গিমায় তাকে শাসিয়ে ওঠে। কৃপানাথ চমকে উঠে সহজ ভাবে কাজে মন দেয়।

হরপ্রসাদ জিজ্ঞেস করেছে কৃপানাথকে: সত্যি করে বল ত কৃপানাথ,—জীবনের কোন গোপন রহস্য তুমি লুকিয়ে রেখেছ কিনা? পাছে নিজেকে প্রকাশ করে' ফেল, তাই প্রতি মুহূর্ত্তে তুমি সতর্ক থাক।

কৃপানাথ অপরিবর্ত্তিত মুখে বলে: কই কিছু নয়। অকম্পিত কণ্ঠের স্বর।

কৃপানাথ ছোট একতলা একটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। নিজের মনে আজ সে হেসে উঠল। সজোরে দরজা খুলে সে ভিতরে ঢুকে গেল। উঠান পার হয়ে একটা ছোট ঘরে প্রবেশ করল। পকেট থেকে দেশলাই বের করে লণ্ঠন জ্বেলে ইজি চেয়ারে সে বসে' পড়ল। একটি ছোট খাট, তার উপর পরিচ্ছন্ন চাদর পাতা। তাকের উপর কয়েকখানা মোটা মোটা বই। ঘরের মাঝে একটি জীর্ণ গোল টেবিল, দু'খানা বিবর্ণ চেয়ার, অপর কোণে একটি ষ্টোভ্, কয়েকখানা বাসন।

নিজের মনে সে আবার হাসল। তারপরই হঠাৎ সে কপালের দু'পাশ চেপে ধরে', যন্ত্রণায় অস্ফুট শব্দ করে' চেয়ারে এলিয়ে পড়ল।

কত ক্ষণ এ ভাবে সে ছিল, তার মনে নেই। যখন তার জ্ঞান হ'ল, তখন সে দেখল—স্বল্প-আলোকিত ঘরে খাটের উপর সে শুয়ে আছে। চোখ খুলে সে চাইল। দূরে অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্ত্তি;—হ্যাঁ, ছায়ামূর্ত্তিই তো!

নীলাম্বরী শাড়ী পরে', কৃষ্ণ কেশরাশি এলায়িত, ঠোঁটের কোলে অনুচ্চারিত সহানুভূতি। ঐ তো এগিয়ে আসছে তারই দিকে। জোর করে' সে চোখ বন্ধ করল। মাথার ভেতর তেমনি যন্ত্রণা। আবার সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

ভাবানীপুরে একটি সুরম্য অট্টালিকার দ্বিতল কক্ষে সোফার উপর এলিয়ে পড়ে', কৃপানাথ ঠোঁটের কোলে হাসি টেনে বলল: আমার ঐশ্বর্য্য, যশ আর আমার এই সুন্দর চেহারার বিনিময়ে তোমাকে চাওয়াটা কি আমার নিতান্ত অশোভনীয় হবে? রিটায়ার্ড সিভিলিয়ানের গর্ব্বিতা

মেয়ে তুমি। তোমার মনের তীর্থদ্বারে অগণ্য যাত্রীর কোলাহল—নির্ম্মম দেবীর মত তুমি তাদের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর! কিন্তু আমার নৈবেদ্য স্বতন্ত্র! আমি জানতে চাই, তুমি এ নৈবেদ্য গ্রহণ করবে কি না সুমিত্রা!

শুভ্র গ্রীবাহেলনে সুমিত্রা বলল: জবাবটা কি খুব জরুরি!

কৃপানাথ দৃঢ়স্বরে বলল: অনেকটা তাই!

সুমিত্রা উঠে জানালার সামনে দাঁড়াল। বাইরে ঘোলাটে আকাশ। মাটীর বুকে থম্‌থমে ভাব। জানালার পর্দ্দাটা টেনে দিয়ে সুমিত্রা কৃপানাথের পাশে এসে বসল।

ঘাড় ঈষৎ কাৎ করে সুমিত্রা স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল: ভাববার সময় কি একটু দেবেন না কৃপানাথবাবু? আর তা' ছাড়া প্রভাংশু হয়তো এখুনি এসে পড়বে। মিঃ ভোঁসের বাড়ীতে আজ নৈশ-ভোজের আয়োজন। আমাকে সেখানে যেতেই হ'বে—তা'ছাড়া প্রভাংশুর আজ সঙ্গিনী হ'বার প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি। এই অল্প সময়ের মধ্যে আপনার চাহিদার চূড়ান্ত সমাধান করা কি সম্ভবপর?

অবসন্ন-কণ্ঠে কৃপানাথ বলল: আজ-কাল করে' বহুদিন কেটে গেছে। নানা ভাবে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌ছ তুমি, আমার এই সহজ প্রশ্নের মীমাংসা করতে। একদিন যে প্রশ্নটা ছিল অত্যন্ত সহজ, আজ সেই প্রশ্নটাই হয়ে উঠেছে জটিল। তোমার বিচিত্র খেয়ালের ধারায় আমিও খেই হারাতে বসেছি। কিন্তু আজ আমি এর নিষ্পত্তি চাই! তোমার মত আমায় বলতেই হবে সুমিত্রা!

বাইরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। সুমিত্রা দাঁড়িয়ে উঠে বলল: এর পর বসে বিলম্ব করে' আপনার কথার জবাব দেওয়াটা কি প্রভাংশুর কাছে অসৌজন্য বলে' মনে হবে না? দু'একদিনের ভেতরেই আপনার কথার জবাব আমিই দেব।

কৃপানাথের কপালের কয়েকটি রেখা স্পষ্ট হয়ে তখনই মিলিয়ে গেল।

এর পর দুটো বছর কেটে গেছে। একদিন যে প্রশ্ন কৃপানাথের কাছে জটিল ছিল, আজ তার কাছে আবার সেটা সহজ ও স্বাভাবিক হ'য়েছে।

কৃপানাথ রচনা করেছে স্বতন্ত্র পৃথিবী। দ্বন্দ্ব, অভিযোগ নেই তার কিছুই,—সহজ, সুন্দর, তার জীবনের গতি। অবসর আজ প্রচুর। প্রত্যেক মুহূর্ত্তটাই তার কাছে আজ জীবন্ত, বর্ণ-সমারোহে ভরা।

যে নীড় আজ নিপুণতার সঙ্গে সে রচনা করেছে, তাতে প্রাণী আছে মাত্র দুটি। কৃপানাথ আর সুমিত্রা!

কত বড় ভ্রান্ত ধারণাই না ছিল তার একদিন, যে দিন সে ভেবেছিল, রিটায়ার্ড সিভিলিয়ানের দাম্ভিকা মেয়ে সুমিত্রা! অসাধারণ সুমিত্রা নয়—সাধারণ নারীরূপিণী সুমিত্রা! চটক্ তার কৃষ্টির দ্যুতিতে, কথা বলার ভঙ্গী হয়তো ছিল ঈষৎ চোখা ধরণের, কিন্তু সেটা নিতান্ত বেমানান নয়। সুমিত্রা যে রীতিমত শিক্ষিতা, তাই সে স্পষ্টবাদিনী।

বিবাহের দশদিন আগে সুমিত্রা জান্‌ল—তার রিটায়ার্ড সিভিলিয়ান পিতার সমস্ত সম্পত্তি ভোজবাজীর মত উড়ে গেছে। ফট্‌কার বাজারে মিঃ মিটারের নাকি নিয়মিত যাতায়াত ছিল।

এর পরে সুমিত্রাকে সাধারণ মেয়ের পর্য্যায়ে ফেলা চলে। প্রভাংশু গেছে বিলেতে। কেউ বলে—সে ফিরে এসেছে ব্যারিষ্টার হ'য়ে; কিন্তু পেশা গ্রহণ করেছে সে স্বদেশী। সুমিত্রা প্রভাংশু সম্বন্ধে কৃপানাথের কাছে আর কোনরূপ আলোচনা করে না। সুমিত্রা বেশ সুখেই আছে।

শীত-পাংশু সন্ধ্যা। কৃপানাথ সন্ধ্যার ট্রেণে মধুপুর থেকে কলকাতায় ফির্‌ল। বিশেষ কাজে দশ দিনের জন্যে সে বাইরে গিয়েছিল। দশটা দিন ত নয়, যেন গতিহীন অবসন্ন বর্ণহীন দশটা যুগ।

তার সমস্ত দেহ-মন ঘিরে আছে সুমিত্রা। সুমিত্রা সঙ্গে থাকলে দশটা দিন কেন, দশটা বছর হয়তো সে ওখানে কাটাতে পারত। প্রত্যেক মুহূর্ত্তটাই বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় রঙীন হ'য়ে উঠত।

দালান পার হ'য়ে সে যখন সুমিত্রার ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ভাবছে—কেমন ভাবে প্রবেশ করে, সে

প্রতীক্ষমাণ। সুমিত্রাকে বিস্মিত করবে, ঠিক ঐ সময়ে ঘরের ভেতর থেকে সুমিত্রার উচ্চ হাস্যধ্বনি তার কাণে এল। ক্ষণকাল পরেই পুরুষেরও কণ্ঠধ্বনি। প্রভাংশু আর সুমিত্রা!

কৃপানাথের কপালের রেখাগুলি স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। এতদিনের সুখ-সম্ভারের মাঝে একখণ্ড অপ্রীতিকর কালো মেঘ ঘনিয়ে ওঠার সম্ভাবনায় সে ঈষৎ কেঁপে উঠল। দৃঢ় পদে মনের অবসন্নতা দূর করে' সে ঘরের ভেতর ঢুকল।

ধারণা তার নির্ভুল। সুমিত্রা আর প্রভাংশু বসে আছে সামনা-সামনি। কি বিস্ময়কর পরিবর্ত্তনই না হ'য়েছে প্রভাংশুর। গায়ে গলাবন্ধ মোটা খদ্দরের কোট, পরণে নরুণ-পাড় খদ্দরের ধুতি। মাথার চুল ছোট ছোট করে' ছাঁটা।

কৃপানাথ বিস্মিত নয়নে প্রভাংশুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। আনন্দোজ্জ্বল সুমিত্রার দুটি চোখ প্রভাংশুর মুখে নিবদ্ধ।

কৃপানাথ কিছু বলার পূর্ব্বেই সুমিত্রা বলল: প্রভাংশু-দা তুমি যাওয়ার পরদিনেই হিজলী জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এখানে এসেছে। প্রভাংশু-দা না থাকলে, দশটা দিন কি কষ্টে না কাটত!

কৃপানাথ জড়িত স্বরে বলল: ধন্যবাদ তার জন্যে প্রভাংশুবাবু!

প্রভাংশু সহজ কণ্ঠে বলল: এ আপনার এক তরফা বলা হ'চ্ছে কৃপানাথ-দা; দীর্ঘ কারাবাসের পর, অবসন্ন মনটা যে কত দূর সুমিত্রা চাঙ্গা করে' তুলেছে, তা' মুখে বলা যায় না। কত নূতন প্রেরণা সে আমার ভেতর সঞ্চারিত করেছে। তার জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আমিও জানাচ্ছি সুমিত্রা দেবীর কাছে। অতিথিকে আপ্যায়ন করার কৃতিত্বের জন্যে সুমিত্রা দেবীর কম প্রশংসা করা যায় না। বাংলা দেশে সুমিত্রা দেবীর মত মেয়ে লাখে একটা।

সুমিত্রার সারা মুখখানা রাঙা হ'য়ে উঠল লজ্জায়।

কৃপানাথের দিকে চেয়ে সুমিত্রা বলল: আমি প্রভাংশু-দা'র কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি—তুমি এলে, তোমার মত নিয়ে আমিও খদ্দর পরব।

তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কৃপানাথের দিকে চেয়ে সুমিত্রা বলল: তোমার মত আছে ত?

অন্যমনস্কভাবে কৃপানাথ বলল: তুমি যদি সুখী হও সুমিত্রা, আমার তাতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

ক্ষিপ্রপদে কৃপানাথ বাথ-রুমের দিকে অগ্রসর হ'ল।

সুমিত্রা স্মিতহাস্যে প্রভাংশুকে বলল: কালই মার্কেটে গিয়ে খদ্দরের শাড়ী আমাকে কিনে দিতে হবে প্রভাংশু দা। তারপর আমাদের 'প্রজেক্ট' সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে, কি বল?

সুমিত্রা কৃপানাথকে সাহায্য করবার জন্যে বাথ-রুমের দিকে অগ্রসর হ'ল।

প্রভাংশু জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হিজলীর জেলেতে সে ছ'মাস কাটিয়েছে। এই উদার বিস্তৃত আকাশ প্রতিদিনই তার সামনে প্রসারিত থাকত। চন্দ্রমাকরোজ্জ্বল নীলিমা কোন দিন তার মনে ভাবের সঞ্চার করেনি। কিন্তু আজকের এই ঘোলাটে শীত-পাংশু আকাশ তার কাছে স্বপ্নময় মনে হ'চ্ছে। কত রহস্য, কত সান্ত্বনা, কত প্রেরণা ঐ পাতলা বিবর্ণ আকাশের অন্তরালে না লুক্কায়িত আছে!

সুমিত্রা আজ তার প্রাণে সৃষ্টি করেছে নবীন পৃথিবীর সম্ভাবনা, মধুময় স্বপ্নের জাল নিপুণ হাতে সুমিত্রা তার মনে বুনে দিয়েছে।

জীবন-সঙ্গিনী রূপে সে আর সুমিত্রাকে পেতে পারে না। কিন্তু বান্ধবী ভাবে সে যদি তার বিরাট্ কর্ম্মময় জীবনে সুমিত্রাকে পায়—তবে নিশ্চয় সে অদম্য উৎসাহে দেশের কাজে লেগে যেতে পারে। কর্ম্মী বলে' সে খ্যাতি অর্জ্জন করেছে। এর চেয়ে অনেক খ্যাতি সে অর্জ্জন করবে, যদি সুমিত্রা শক্তিরূপিণী মূর্ত্তিতে তার পাশে পাশে থাকে।

সুমিত্রার সমর্থন সে পেয়েছে। কিন্তু কৃপানাথ-দা! এতে তার ক্ষতি কি? গৌরব তারও কিছু কম হ'বে না, যখন অগণ্য জনগণ সুমিত্রা দেবীর নাম শ্রদ্ধা ও উল্লাসের সঙ্গে জয়ধ্বনি করবে।

রঙ্গমঞ্চের পট-পরিবর্ত্তনের মত কৃপানাথের জীবন-দৃশ্য

সহসা পরিবর্ত্তিত হ'ল। এত অকস্মাৎ যে তার জীবনের রূপ বদ্‌লাবে, তার জন্তে মোটেই সে প্রস্তুত ছিল না। কি রূঢ় রূপান্তর!

ক্লাব থেকে ফিরে আসতে তার হয়েছিল সে দিন রাত দশটা। সুমিত্রার ঘরের হাল্‌কা নীল আলোটা তখন জ্বালান ছিল না। অন্ধকার ঘরখানা দেখে কৃপানাথ আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। অহেতুক একটা লজ্জা বা আশঙ্কায় তার মনটা মুহূর্ত্তের জন্য চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

দৃঢ়চিত্ত কৃপানাথের মন দুর্ব্বলতায় ভরে' উঠল। তার আজ সাহস হ'ল না নির্ভীক ভাবে ঘরের ভেতর প্রবেশ করতে।

কম্পিত ও আশঙ্কার স্বরে কৃপানাথ সুমিত্রার নাম ধরে' ডাক্‌ল, সাড়া পেল না।

কৃপানাথের মনে হ'ল, এওতো হ'তে পারে, সুমিত্রা অসুস্থা, হয়তো তাই সে ঘুমিয়ে পড়েছে! কিন্তু……।

দরজায় সে কাণ পেতে রইল। এতো তার নিজেরই দ্রুত নিশ্বাসের আওয়াজ। সর্ব্বাঙ্গ তার ঘেমে উঠেছে। আবার সে ডাকল—সুমিত্রা! নিরুত্তর।

কোন মুহূর্ত্তে সে যে ঘরে প্রবেশ করল, তা' সে নিজেই জানে না। সুমিত্রার শয্যা শূন্য। একখানা মোটা লেপাফা সাদা চাদরের উপর পড়ে' আছে। উপরে তারই নাম লেখা।

অত্যন্ত অনাড়ম্বর তিনটে লাইন:—"দেশমাতার আহ্বানে আমি প্রভাংশু দার সঙ্গে গেলাম। কাজ ফুরালেই চলে' আসব। ভেবো না লক্ষীটি।"

তলায় সুমিত্রার সই।

কত মোহময় স্বপ্ন! সুখ-সমৃদ্ধির কত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা! শ্যামল ছায়া-ঢাকা বনানীর স্নিগ্ধতা যা' তার সারা মন ও দেহকে ঘিরে, পরমায়ুঃ বৃদ্ধি করে' তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল—সব কি অবসানের কালো পর্দ্দায় ঢাকা পড়ল! তার আত্মা কি অসাড় নিদ্রাতুর হ'য়ে তার দেহ-পিঞ্জরে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর অবরুদ্ধ থাকবে!

তারপর নির্ভীক ধৈর্য্যশালী কৃপানাথের জীবন কিরূপ ?

কৃপানাথ বদ্ধ পাগল হয়নি বা সন্ন্যাস-ব্রতও গ্রহণ করে নি। নাচন গ্রামের ছোট ষ্টেশনে যে পঁচিশ টাকা মাহিনার কেরাণীটি কাজ করে, তার নাম কৃপানাথ। কি অসম্ভব জীবনের পরিবর্ত্তনই না মানুষের হয়! কৃপানাথ তার একটা জীবন্ত উদাহরণ।

এক বছর, দু'বছর করে' পাঁচটা বছর কেটে গেছে। নানা দেশ কৃপানাথ ঘুরে' এসেছে। কোথাও একমাসের অধিক কাল সে অবস্থান করেনি।

তার জীবনে তাল, লয় ও সুরের আর যোগসূত্র নেই। নির্ব্বিবাদে ফাঁকে সোম পড়ে যায়। কিছু মাত্র তাতে সে বিচলিত হয় না। অটল নির্ভীক সেই কৃপানাথ।

দু'মাস হ'ল তার মাথায় এক রকম অসম্ভব যন্ত্রণার সূচনা হ'য়েছে। কি রোগ, কেন হ'য়েছে, কে তাকে জিজ্ঞেস করবে! আরোগ্যের জন্য কৃপানাথও ব্যস্ত নয়। তীব্র যন্ত্রণার পর যে অচৈতন্য অবস্থা, সেটাও তার কাছে নেহাৎ মন্দ লাগে না। তার কর্ম্মক্লান্ত ইন্দ্রিয়গুলো ত ক্ষণকাল অসাড় ভাবে বিশ্রাম পায়। গত রাত্রের যাতনা যেন অন্যদিন অপেক্ষা বেশী। অচৈতন্য অবস্থাটাও ছিল দীর্ঘকালব্যাপী। তাই আজ সকালে তার সমস্ত দেহটায় অত্যন্ত বেদনা অনুভব করছিল।

শয্যা ছেড়ে' উঠবার আগ্রহ যেন আজ তার নেই।

বেলা আটটার সময়ে ষ্টেশনের অস্পষ্ট বাঁশীর আওয়াজ সে শুনতে পেল। কৃপানাথ শয্যা ছেড়ে' উঠে পড়ল। আশ্চর্য্য! তার কাপড় জামা পরিপাটি করে' আলনায় সাজান। ঘরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মাথার কাছে একটা 'ফ্লাস্ক্'। একি অসম্ভব ব্যাপার! তাকে সেবা করবার মত পরিচিত সহৃদয় ব্যক্তি এ গ্রামে কেউ আছে বলে'ত তার মনে পড়ে না। একজন আছে, সে গোবিন্দ গয়লা। মাঝে মাঝে কৃপানাথের খোঁজ-খবর নেয়, এটা-সেটা ফাই-ফরমাজ সে নিজেই মাথায় তুলে' নেয়, বাধা দিলে গ্রাহ্য করে না। হয়তো গোবিন্দর কীর্ত্তি এটা! কিন্তু এত নিপুণতার সঙ্গে কাজ করবার মত বুদ্ধি ত তার মাথায় নেই।

অন্যমনস্ক ভাবে 'ফ্লাস্ক্'টা সে খুলে' ফেলল,—উষ্ণ চা!

গোবিন্দ 'ফ্লাস্ক্' পেলে কোথা! চা-টুকু সে এক নিঃশ্বাসে পান করে' ফেলল। কিছুক্ষণ পর সে বেশ সুস্থ অনুভব করল।

এ সব যদি গোবিন্দ না করে' থাকে—তবে নিশ্চয়ই সেই অশরীরিণী ছায়াময়ীর দৃষ্টি তার উপর পড়েছে।

কোথা যাবে সে এবার! না-না, গোবিন্দকে সে জিজ্ঞেস করবে—এখানে পূর্ব্বে কোন নারী আত্মহত্যা করেছে কিনা। কাঁধে কোর্টটা ফেলে কৃপানাথ ষ্টেশনের অভিমুখে রওনা হ'ল। পথে গোবিন্দের সঙ্গে কৃপানাথের দেখা।

অন্যমনস্ক ভাবে কৃপানাথ বলল: সন্ধ্যে বেলা আমার সঙ্গে দেখা করিস্ গোবিন্দ। তুই 'ফ্লাস্ক্' যোগাড় করলি কোথা থেকে? এই নে চাবীটা নিয়ে ঘর খুলে 'ফ্লাস্ক্'টা নিস্

কৃপানাথ উত্তরের অপেক্ষা না করে' সোজা ষ্টেশনের দিকে দ্রুতপদে চলতে সুরু করল।

ষ্টেশনমাষ্টার হরপ্রসাদ প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' বলল: কৃপানাথ, তোমার শরীর রুগ্ন হ'য়ে যাচ্ছে, চোখ-মুখ বসে গেছে। স্বাস্থ্যটা একবার হারাণ ডাক্তারকে দেখাও। দেহের ভেতর কোন রোগ জন্মাচ্ছে কিনা!

কৃপানাথের মুখে হরপ্রসাদ কোন দিন হাসি দেখেনি। আজ প্রথম সে দেখল, কৃপানাথ হো-হো করে' হেসে উঠল। তারপর বলল: অসুখ! আমি'ত বেশ সুস্থ আছি। আর স্বাস্থ্য! এর চেয়ে'ত আমি বলিষ্ঠ কোন দিন ছিলাম না। একটু থেমে সে আবার বলল: আজ আমায় এমন কাজ দিন হরপ্রসাদ বাবু, যাতে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম না পাই।

সহানুভূতির স্বরে হরপ্রসাদ বলল: কাজ আর কাজ? একদিনও কি তোমার ছুটি নিতে ইচ্ছে করে না কৃপানাথ?

ক্ষীণ হেসে কৃপানাথ বলল: ছুটি নিয়ে কি করব হরপ্রসাদ বাবু! যাদের জীবনে স্বপ্নের বৈচিত্র্য, ছুটির প্রয়োজন তাদেরই।

ষ্টেশনের পাশে একটি ছোট রেলকোম্পানীর ইয়ার্ড আছে। কৃপানাথের ডিউটি পড়েছে সেখানে। কুলিদের সঙ্গে কৃপানাথও মাল তোলার কাজে যোগ দিয়েছে।

ঘর্ম্মাক্ত দেহ, মালকোচা করে' কাপড় পরা, গায়ে একটা ছিন্ন গেঞ্জি, তাও লোহার দাগে দাগে বিবর্ণ হ'য়ে গেছে।

বেলা পাঁচটার সময়ে একটা ভারী লোহার চাকা কৃপানাথ একা তোলবার চেষ্টা করতে লাগল। কৃপানাথের হাতে যেন আর পূর্ব্বেকার জোর নেই, তবু সে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। বুক পর্য্যন্ত সে টেনে তুলেছে, সহসা তার মাথাটা ঘুরে গেল, সশব্দে চাকাটা মাটীতে পড়ল। কৃপানাথ বেঁচে গেছে। কিন্তু এ যে সেই দুরারোগ্য যন্ত্রণা! সারা দুনিয়াটা তার চোখের সামনে বোঁ-বোঁ করে' আবর্ত্তিত হ'চ্ছে। সেই জীর্ণ বস্ত্রেই কৃপানাথ ছুটল তার বাড়ীর দিকে। কত দূর যে সে অগ্রসর হয়েছে, তা' সে জানে না—কখন যে সে মূর্চ্ছা গেছে, সে খেয়ালও তার নেই।

সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা ও ব্যথা নিয়ে যখন তার জ্ঞান হ'ল, অন্ধকার তখন গাঢ়তর হ'য়ে উঠেছে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'ল। বাড়ী থেকে খানিকটা দূরে যখন সে, হঠাৎ তার নজরে পড়ল—অস্পষ্ট সেই ছায়ামূর্ত্তি! তারই ঘর থেকে বের হয়ে চ'লে যাচ্ছে পুকুরের ধার দিয়ে আমবাগানের ভিতর।

কৃপানাথ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে ঐ ছায়াময়ীকে আজ সে ধরবেই। কি গাঢ় রহস্যের জাল সে তার চারপাশে সৃষ্টি করেছে। অচঞ্চল নির্ভীক কৃপানাথকে ঐ ছায়াময়ী করে' তুলেছে চঞ্চল, ভয়াতুর।

দেহ তখনও তার দুর্ব্বল, তবু সে ছুটল আমবাগানের ভিতর। খানিক দূর অগ্রসর হ'তেই সে অস্পষ্ট মূর্ত্তি যেন থমকে দাঁড়াল। তারপর দ্রুতপদে কৃপানাথকে তার দিকে আসতে দেখে সেও ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হ'তে লাগল।

মরিয়া কৃপানাথের কোন দিকেই ভ্রুক্ষেপ নেই। সে অস্পষ্ট ছায়াময়ীর দিকে দৃষ্টি রেখে ছুটে চলেছে। একটা পোড়ো একতলা বাড়ীর সামনে থমকে দাঁড়াল। সজোরে দরজা খোলার শব্দ কৃপানাথের কাণে গেল।

ক্ষণকালের জন্যে কৃপানাথ ভাবল, এ ছায়াময়ীটি কে! তবে কি মানবী!

পোড়ো বাড়ীর সামনে যখন সে দাঁড়াল, দরজা তখন ভিতর থেকে অর্গলবদ্ধ। নিস্তব্ধ বাড়ীখানা যেন অন্ধকারে আরও রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে।

মন্থর কম্পিত পদে কৃপানাথ ফিরে' গেল তার বাড়ীতে। আজ তার ভয় অনেক কমে গেছে।

সুন্দর পরিপাটি করে' তার ঘরখানা সাজান। বিছানার পাশে খাবার ও এক গ্লাস জল।

কৃপানাথ তিল মাত্র বিস্মিত হ'ল না। হোক সে অশরীরিণী, কিন্তু তার' ত কোন ক্ষতি সে করছে না। কৃপানাথ নিশ্চিন্ত মনে আহার শেষ করে' অবসন্ন দেহ বিছানায় এলিয়ে দিল।

* * *

দু'দিন কেটে গেছে। ছায়াময়ীর রহস্য আজও অনাবিষ্কৃত। নিঃশব্দে সে মূর্ত্তি তার ঘরে চলাফেরা করে। কৃপানাথ সাহস করে' চাইবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু চোখ দুটো আপনি বুজে আসে।

এ অদ্ভুত রহস্য কারও কাছে সে ব্যক্ত করেনি।

সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

কিন্তু এখনও কৃপানাথ তার কর্ম্ম থেকে অবসর পায়নি। কাজের চাপ অন্যদিন অপেক্ষা আজ অনেক বেশী।

রাত তখন নটা। হঠাৎ লাইনের ধার থেকে হরপ্রসাদের আর্ত্ত কণ্ঠস্বর শ্রুত হ'ল। চীৎকার করে' সে বলল: কৃপানাথ! আপ্-ডাউন দু'খানা ট্রেণ এসে পড়েছে…কিন্তু পয়েন্টস্‌ম্যান্ কই! শীগ্‌গির লাইন খোলবার ব্যবস্থা করো…না হ'লে আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই …আবার কম্পিত আর্ত্তকণ্ঠ স্বর—কৃপানাথ!

নির্ভীক কৃপানাথ। কয়েক মুহূর্ত্ত একবার চারপাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। কাছাকাছি পয়েন্টস্‌ম্যানের কোন সন্ধান নেই।

গাঢ় তমিস্রা ভেদ করে', ক্ষুধাতুর দানবের মত দু'পাশ থেকে দু'খানা ট্রেণ হু হু করে ছুটে' আসছে। কয়েক মিনিটের অপেক্ষা…তারপর কি অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহ রোমাঞ্চকর দুর্ঘটনা!

লোহার হাতলটা নিয়ে কৃপানাথ ছুটল পাথরের ঢিপি, লাইনের পর লাইন পার হয়ে। আর কয়েক পা বাকি। তার দু'পাশে দুটো জীবন্ত দানবের ক্ষুধিত হুঙ্কার।

উন্মাদ কৃপানাথ! সমস্ত শক্তি-প্রয়োগে সে হাতল দিয়ে দুটো লাইন আলাদা করে' দিল। তারপর কি হ'ল, তার স্মরণ নেই।

দুটো দানব নির্ব্বিবাদে সে স্থান পার হয়ে গেছে।

অন্ধকার-ঢাকা পরিত্যক্ত শুব্ধ ষ্টেশন্।

ক্ষত-বিক্ষত কৃপানাথ লাইনের পর লাইন পার হয়ে তার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

কৃপানাথের সঙ্গে ও কে! ছায়াময়ী!

ঘোলাটে দৃষ্টি, সূচিভেদ্য অন্ধকারে সঠিক নির্ণয়ে অক্ষম!

তবু কৃপানাথের মনে হ'ল নিতান্ত অপরিচিতার স্পর্শ এ নয়। জীবনে হয়তো সে এমনই স্পর্শে অভ্যস্ত ছিল। চলনের ভঙ্গিমা অনেকটা মিলে' যায়।

নিজের মনেই সে হেসে উঠল। সে উন্মাদ হ'য়ে গেছে। তা' নইলে গগনভেদী স্বরে সে কখনও চীৎকার করে' ওঠে: সুমিত্রা! সুমিত্রা! দৃঢ় আলিঙ্গনে ছায়াময়ী তাকে লাইনের পর লাইন পার করে' অগ্রসর হ'তে লাগল।

কৃপানাথের চারপাশে তার নিজেরই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে…সুমিত্রা! সুমিত্রা!

# বাংলার প্রাচীন গীতিনাট্যে বাৎসল্য-চিত্র

শ্রীভুজঙ্গভূষণ রায়

অধুনাতন বঙ্গ-সাহিত্যে নিখুঁত বাৎসল্যের চিত্র অঙ্কন করিতে অতি অল্প লেখককেই দেখা যায়। অনেক বৎসর পূর্বে চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতিরূপে স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বড়ই আক্ষেপ-সহকারে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুকেও তিনি এক সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে যশোদা বা মেনকার চিত্র অঙ্কন করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই অক্ষয়চন্দ্র এখন স্বর্গে। অপর কাহারও মুখে এ প্রসঙ্গে আর বিশেষ শুনিতে পাওয়া যায় না।

প্রাচীন-সাহিত্যে পিতৃস্নেহের করুণ মূর্তি রাজা দশরথ, রাজর্ষি জনক, গোপরাজ নন্দ এবং মাতৃস্নেহের সজীব আলেখ্য যশোদা, মেনকা, কয়াধু, কৌশল্যা প্রভৃতির কথা ভারতবাসীর প্রাণে স্বতঃই গাথা রহিয়াছে। তাঁহাদের সেই অপরিসীম অপত্য-প্রীতির আখ্যায়িকাগুলির অল্পাধিক আলোচনায় যে প্রকৃত আনন্দ লাভ হয়, ইহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আধুনিক কথা-সাহিত্যে ঐ সকল পবিত্র চিত্রসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন যে প্রকৃতপক্ষে করা হইতেছে না—ইহা একপ্রকার নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

দেশের বা সমাজের যে কোন সময়ের প্রকৃত অবস্থা তাহার সাহিত্যের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য সাহিত্যকে সমাজের এক প্রকার আলোক-চিত্র বলা চলে। একালের ঐহিক-সর্বস্ব-ভাবের শিক্ষার প্রভাবে আমাদের বর্তমান সমাজ ও সাহিত্যে দিন দিন রাজসিক ভাবেরই পরিস্ফুরণ হইতেছে। এখন আর শিবি বা দধীচির ন্যায় আত্মত্যাগীর, হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সত্যসন্ধের অথবা দিলীপ বা একলব্যের মত ত্যাগশীল শিষ্যের আদর্শ পাই না। ধর্মতত্ত্ব-প্রচারই যে দেশের সাহিত্য ও সংগীতের চরম লক্ষ্য ছিল—ত্যাগ এবং সত্যের জয়-ঘোষণা করিয়া মঙ্গলকে বরণ করাই যাহার মূল ভিত্তি ছিল, তাহার অঙ্গ-বৈকল্য দেখিলে প্রত্যেক দেশাত্ম-বোধ-সম্পন্ন ব্যক্তিরই দুঃখ উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক। যাঁহারা পার্থিব ঐশ্বর্য-সমূহকে তুচ্ছ ভাবিয়া কেবল জ্ঞান, ভক্তি, সত্য এবং কৈবল্যকেই উচ্চাসন দিতে উন্মুখ ছিলেন, সেই আর্যগণের সাহিত্যেই শত সহস্র বিপদ্-আপদ্, মোহ-ভয় প্রভৃতিকে পদদলিত করিয়া শুধু সত্য-ধর্ম রক্ষার জন্য রাজার ছেলের বনে যাওয়া সম্ভব হয় অথবা যুবরাজের চিরজীবন কৌমার্য বা জরাগ্রহণ শোভা পায়। বর্তমান বিকৃত সভ্যতার কবলে পড়িয়া আমরা সাহিত্যের ভিতর আর ঐ সকল ঔদার্য খুঁজিয়া পাই না। মনে হয়, সে-কালে ভীষ্মের ন্যায় সংযমী, দধীচির ন্যায় আত্মত্যাগী অথবা সীতা ও সাবিত্রীর ন্যায় আদর্শ সতীর অভাব ছিল না। পুরাণের ঐ সকল পুণ্যশ্লোক নামগুলির সহিত তাঁহাদের চরিত্ত-কথা মিশিয়া রহিয়াছে। ব্যক্তিগত ইতিহাস লিখিবার প্রথা প্রাচীন যুগের সাহিত্যে ছিল না।

অপ্রাসঙ্গিক ঐ সকল কথার আলোচনায় কোন ফল নাই। বহুকাল হইতে আমাদের দেশে 'কালীয়-দমন' বা 'ব্রজলীলা'-যাত্রায় এবং শারদীয়া আগমনী-সঙ্গীতগুলিতে বাৎসল্য-রসের প্রস্রবণ দ্বারা বাঙালীর প্রাণ কিরূপ পরিতৃপ্ত হইয়া আসিতেছে, এই প্রসঙ্গে তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা করা যাউক।

সর্বাগ্রে ব্রজলীলা-গানের কথাই বলি। রাঢ়ের সুগায়ক ৺নীলকণ্ঠের দ্বারা ইহার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হয়। তাঁহার রচিত পদাবলী বড়ই মধুর। কবিত্বশক্তিও তাঁহার সামান্য ছিল না। স্বরচিত পদাবলী ভিন্ন অন্যের রচিত পদ তিনি আসরে প্রায়ই গাহিতেন না। অধুনা তাঁহার শিষ্যবর্গ তাঁহারই রচিত 'কলঙ্ক-ভঞ্জন', 'মান', 'মাথুর-লীলা', 'প্রভাস-যজ্ঞ' প্রভৃতি পালা গাহিয়া থাকেন। রুচির বৈচিত্র্য হেতু 'কৃষ্ণ-যাত্রা' এখন সমাজে সেরূপ আদৃত হয় না, তথাপি উহা হইতে এস্থলে বাৎসল্য-রসের দুইটি চিত্রে সহৃদয় পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

১

মথুরার রাজা কংস ভগিনী ও ভগিনীপতিকে নির্ম্মমভাবে কারারুদ্ধ করিয়াও যখন জীবন-বিনষ্টির আশঙ্কা দূর করিতে পারিলেন না, তখন স্বকল্পিত ধনুর্যজ্ঞে রাম-কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া স্বগৃহেই উভয়কে বধ করিবার কৌশল অবলম্বন করিলেন। রাজাদেশে অক্রূরকে নিমন্ত্রণ-পত্র লইয়া বৃন্দাবনে যাইতে হইল।

কংসের যজ্ঞে নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া গোপরাজ নন্দ ত একেবারেই বিস্মিত! নিমন্ত্রণ-পত্রে আবার কৃষ্ণ-বলরামকেই সঙ্গে লইয়া যাইবার বিশেষ অনুরোধ? এ নিমন্ত্রণ যে তাঁহার পক্ষে আদৌ শুভ নয়—ইহা ভাবিতে নন্দের বিলম্ব হইল না। কিন্তু পরমহিতৈষী অক্রূর যখন স্বয়ং নিমন্ত্রণের কার্যে আসিয়াছেন, তখন তাঁহাকে ত প্রত্যাখ্যান করাও চলে না। গোপরাজ ভাবিতে লাগিলেন—একি উভয় সঙ্কটে তাঁহার সকাশে সহসা উপস্থিত! তিনি যে পরমধন কৃষ্ণ-বলরামকে একদণ্ডও কাছ-ছাড়া করিতে পারেন না।

নন্দ অক্রূরকে নানা কথায় বুঝাইতে প্রয়াসী হইলেন যে, কৃষ্ণকে যজ্ঞস্থলে পাঠানো সুবিবেচনার কার্য নহে। কৃষ্ণ যে তাঁহার বড়ই চপল ছেলে। কেহ কোন দেবারাধনায় রত হইলে তাঁহার গোপাল যে সকলের অজ্ঞাতসারেই তথায় উপস্থিত হইয়া দেবাগ্রভাগ অপহরণ করিয়া থাকে। এরূপ দুরন্ত ছেলেকে যজ্ঞস্থলে পাঠানো কি সঙ্গত? গোপালের জন্য এখন আর গোপরাজের নিজ অভীষ্টদেবের পূজাটি পর্যন্তও হইতে পারিতেছে না। তিনি যখনই পূজার আয়োজনে ব্যাপৃত হন, অমনি তাঁহার গোপাল কোথা হইতে অলক্ষ্যে চুপি চুপি আসিয়া তথায় পদ বাড়াইয়া দেয় এবং পূজোপকরণ আত্মসাৎ করে। কাহারও সাধ্য নাই যে, তাহা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করে! যে দেবাসনে চপল কৃষ্ণ পদার্পণ করেন, সে পদ সরাইয়া দিবার সাধ্য যে কাহারও নাই! গোপরাজ তাই বলিতেছেন—

"কার সাধ্য বাধ্য ক'রে পা সরায়—
কৃষ্ণপদ দৃষ্ট হ'লে ইষ্টপদ পাসরায়—"

কৃষ্ণের চাপল্যবর্ণনায় এস্থলে কেমন এক অপূর্ব্ব ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। গোপরাজ যে পরমাত্মা কৃষ্ণকে নিজ তনয়রূপেই লাভ করিয়াছেন। মায়া-প্রভাবেই হউক—আর বাৎসল্য-বশেই হউক, পুত্ররূপী শ্রীভগবান্‌কে পাইয়া গৃহী ব্যক্তির ইষ্টমন্ত্রটি পর্যন্ত বিস্মরণ হওয়া বিচিত্র নহে। যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য উপাসকের উপাসনা, সেই পরম সাধনার ধন যাঁহার করায়ত্ত, তাঁহার আবার বাহ্য সাধনার প্রয়োজন কি? গোপরাজ কৃষ্ণপদ সরাইয়া আর কোন্ ইষ্টদেবের পূজা করিবেন? তাঁহার পূজার সার্থকতা যে অগ্রেই ঘটিয়া গিয়াছে; শুধু স্নেহের আবরণে তিনি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। অপর পক্ষে দর্পী কংসের যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃষ্ণ ত যজ্ঞাংশভাগী নহেন; সে যজ্ঞ যে ভক্তিহীন—কাপট্যে পরিপূর্ণ!

* * * *

কংস-বধের পর কৃষ্ণ এখন মথুরার রাজাসনে সমাসীন। বৃন্দাবনের আর সে নিত্য উৎসব নাই। গোকুলমণ্ডলী শীর্ণপ্রায়; পশুকুল শোকাকুল হইয়া শষ্পভক্ষণে বিরত হইয়াছে; তথায় শিখিগণের নর্তন আর দৃষ্ট হয় না। পুত্র-বিরহে যশোমতীর অনুক্ষণ অশ্রু ক্ষরিত হইতেছে—সর্বদা 'হা-কৃষ্ণ'! 'হা-কৃষ্ণ'! বলিয়াই উন্মাদিনী। গোপরাজ নন্দও কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধপ্রায় হইয়াছেন। যদি স্বপ্নে কোনদিন গোপালের দর্শনলাভ ঘটিয়া যায়, তবে রাণীর শোকের প্রবাহ আরও প্রবল হয়—হৃদয়-সিন্ধু উথলিয়া উঠে। তখন উন্মাদ-দশায় স্বামীকে বলিতে থাকেন—

"শুন ব্রজরাজ! স্বপনেতে আজ
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকালে?
যেন সে চঞ্চল চাঁদে, অঞ্চল ধরিয়া কাঁদে
জননি! দে ননী,-দে ননী বলে—"

গৌরী কৈলাসে গেলে তনয়া-বিরহিনী রাণী মেনকারও একদিন ঠিক এই দশা হইয়াছিল। কন্যাকে স্বপ্নে দেখিয়া স্বামী নগেন্দ্রকে সে কথা বলিতে বলিতে তাঁহার হৃদয়টুকু যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইত, কবি দাশরথি তাহার বেশ একটু আভাস দিয়াছেন—

"গিরি! গৌরী আমার এসেছিল,
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল?"

অপত্য-চিন্তায় বিনিদ্র-রজনী যাপন করিয়া স্নেহময়ী মাতার পক্ষে এরূপে স্নেহের ধনটীর দর্শন-লাভ—এও প্রেমময় বিধাতার এক অপূর্ব বিধান। স্বপ্ন ও জাগরণ—উভয় অবস্থাতেই মাতা অপত্যকে হৃদয়গত করিয়া তাহার ধ্যানধারণায় তন্ময় হইয়া রহিতেছেন। এই অপত্য-প্রেম শ্রীভগবানেরই অপূর্ব প্রকাশ—তিনি যে স্বয়ং

প্রভাস-তীর্থে কৃষ্ণ একটী যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন। অশেষ শিল্পী বিশ্বকর্মা তাহাতে রাজোচিত বিচিত্র প্রাসাদ ও উপবনাদি রচিত করিয়া দিয়াছেন। ত্রিভুবনে নিমন্ত্রণ করিবার ভার দেবর্ষি নারদের হস্তে সমর্পিত। নারদ যখন বৃন্দাবন-নিমন্ত্রণার্থ যাত্রা করিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের নির্দেশের অপেক্ষা করিতেছিলেন, কৃষ্ণের প্রাণ তখন বৃন্দাবনের পূর্ব-লীলা স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। যেন কোন এক শাশ্বত আকর্ষণের বশে তাঁহার হৃদয়-সিন্ধু মথিত হইতে চলিয়াছে। গদ্‌গদ্ স্বরে নিমন্ত্রণের পাত্র-পাত্রীদের কথা নারদকে বলিয়া দিতে গিয়া তাঁহার প্রেমাশ্রু ক্ষরিত হইতেছে—কণ্ঠ যেন স্বতঃই রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে! কৃষ্ণ বলিতেছেন—

"যাও হে যাও, আমায় আর কি শুধাও
নারদ তপোধন!
সুখময় বৃন্দাবনে দিতে নিমন্ত্রণ—
কি ভ্রমর, কি ভ্রমরী,
কি ময়ূর, কি ময়ূরী
চকোর চকোরী।
নিমন্ত্রিবে শুক-শারী, গোপ-গোপী, গোধন।
যাও হে যাও—"

বৃন্দাবনের গোপ-গোপী, পশু-পক্ষী—সবার সঙ্গেই কৃষ্ণের মধুরতম সম্বন্ধ। ব্রজে তাঁহার নিত্য বিহার। তথাপি ব্রজের সর্ব প্রাণীর নিমন্ত্রণের নির্দেশ করিয়াও কৃষ্ণ নন্দ-যশোদার নিমন্ত্রণের কথা উল্লেখ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা যে কৃষ্ণাত্মা—কৃষ্ণ ছাড়া ত তাঁহারা নহেন, এই অভেদটুকুই যেন দেখাইবার জন্য তিনি মাতাপিতার নিমন্ত্রণে নিষেধ জানাইতেছিলেন। পুত্রের কৃত উৎসবে মাতাপিতা নিমন্ত্রণের পাত্রপাত্রীও নহেন। নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের গৃহে আনিলে এ অভিন্নতাটি অতিক্রম করিয়া যায়। প্রাণের আকর্ষণেই তাঁহাদের আগমনই স্বাভাবিক। মাতাপিতা হইতে পুত্রের স্বাতন্ত্র্য থাকিতে নাই অথবা কৃষ্ণ কোন্ প্রাণেই বা মাতাপিতার কাছে স্বীয় রাজৈশ্বর্যব্যঞ্জক যজ্ঞের নিমন্ত্রণ পাঠাইবেন?

নারদ ব্রজে গিয়া উন্মাদ-দশা-প্রাপ্তা যশোমতী ও নন্দের নিকট কৃষ্ণ-সন্দেশ জ্ঞাপন করিলেন। রাণীর তখন পুত্র-বিরহে দেহ বিবর্ণ, কেশপাশ জটাবদ্ধ! আহার-নিদ্রার চেষ্টা নাই; মুখে কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য বাণী নাই। প্রাণবায়ু বহির্গত হইতে আর বিলম্ব নাই—এইরূপ 'দশমী দশা'য় উপনীতা। কৌশলী নারদ তখন কৃষ্ণকে শ্রীভগবান-রূপে তাঁহার ধ্যানগম্য করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু কৃষ্ণ যে রাণীর ধ্যানের ধন আগেই হইয়া পড়িয়াছেন—বাহ্যতঃ তাঁহার সে-বোধ নাই বটে।

নারদ বলিলেন, মাগো! সমাহিত হইয়া এক "কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ" বলিয়া ধ্যান করিলেই মানসচক্ষে আপনি আপনার গোপালকে দেখিতে পাইবেন। পুত্র-স্নেহাতুরা জননীর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া প্রণাম করার সামর্থ্য তাঁহার হইল না।

" 'নমো নমঃ' বলা হল না মুনি,"—বলিয়া রাণী তখন কাঁদিয়া ফেলিলেন। আবার তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হইল। পুত্র যে তাঁহার ঈশ্বর, এ ধারণা তিনি হৃদয়ে ধারণ করিতে একান্তই অক্ষম। মাতার প্রাণ পুত্রকে ছোট করিয়াই দেখিতে চায়। সে অবাঙ্‌মানসগোচর পরমপুরুষকে যিনি যেভাবেই ভজনা করুন না কেন, তিনি ভক্তকে সেই ভাবেই ভজনা করিয়া থাকেন। বিশ্বরূপ দর্শনান্তে ভীত অর্জুন সেই বিরাট্ বিশ্বব্যাপীকে সখারূপে পাইবার কামনা জানাইয়াছিলেন। কশ্যপপত্নী অদিতিও হ্রস্বকায় বামন-রূপে তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিতে চাহিয়াছিলেন। এখানে মা যশোদাও সেই অনন্ত অসীমকে পুত্রত্বের সীমায় আনিয়া একেবারে নিজস্ব করিয়া ফেলিয়াছেন। আজ মায়ের বিরহক্লিষ্ট বিদীর্যমান প্রাণটুকু চায় কেবল তাঁর বাছাকে দেখিতে। পুত্র-সন্দর্শনেই মাতৃহৃদয়ের চরম সুখ। জননীর সেই চূড়া-বাঁধা, ধটী-পরাণো, নয়নে অঞ্জন-লেপন—সবই

যে মনে পড়ে! 'নমো নমঃ' বলিয়া প্রণাম করিলে যে তাঁহার প্রাণধন গোপালের সঙ্গে সম্বন্ধ অন্যরূপ হইয়া যায়। তিনি যে মা, মা হইয়া পুত্রকে ত আর প্রণাম করা চলে না—মায়ের 'বাছার' যে তাহাতে অকল্যাণ ঘটিয়া যায়!

আর নন্দ মহারাজের তখন দশা কিরূপ? মুনির মুখে 'মহারাজ' সম্বোধন শুনিয়া তাঁহার হৃদয় শেল-বিদ্ধের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। দারুণ ক্ষতে ক্ষার পড়ার মতই সে যন্ত্রণা! কৃষ্ণবিহীন রাজ্য-সম্পদ্ তাঁহার সুখের কারণ ত নহেই, বরং তাহা এখন বিদ্রূপের হেতু বলিয়া মনে হইতেছে। তাই পরম খেদে বলিতেছেন—

" 'মহারাজ' আর সাজ্‌বে কেন?
সে সাজ আমার ফুরায়েছে—
যে দিন হ'তে জীবনকৃষ্ণ
এ বৃন্দাবন ছেড়ে গেছে।
ছিলাম কৃষ্ণ-ধনের ধনী
সে ধন আমার নীলমণি,
হারায়ে প্রাণ-গোবিন্দ
নন্দতে কি নন্দ আছে?

পার্থিব ঐশ্বর্য গোপরাজের এখন অকিঞ্চিৎকর। কৃষ্ণই তাঁহার পরম ধন। সে-ধনের অভাবেই গৃহ শূন্য। কৃষ্ণ-চন্দ্রের অদর্শনে ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার অন্ধকারময়। নয়নমণির অভাবে তিনিও যে অন্ধ!

এইবার মেনকার সকরুণ চিত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাউক। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল' এবং রাঢ়ের কবি গঙ্গানারায়ণের 'ভবানী-মঙ্গল' তখন উৎসবাদিতে গীত হইত। মেনকা রাণীকে ঐ কাব্য দুইখানিতে বাৎসল্য-রসের জীবন্ত মূর্তি করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। বাংলায় প্রচলিত 'আগমনী' গীতগুলিও মেনকা রাণীর কন্যা-বাৎসল্যের নিদর্শন। কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া উহার সৌন্দর্যোপলব্ধির চেষ্টা করিতেছি। কবি রামপ্রসাদের গীতিকাব্যেও হিমালয়-মেনকার বাৎসল্যের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

মেনকা গিরিরাজ হিমালয়ের মহিষী। কন্যা উমা তাঁহার বড়ই আদরের ধন। মায়ের যত কিছু আনন্দ-সুখ সবই এই মেয়েটিকে লইয়া। মেয়ে আকাশের চাঁদ লইবার 'বায়না' ধরিলেও মায়ের প্রাণ ব্যাকুল হয়। উমা কাঁদিলে, রাণী স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি মনে করেন—'এক চাঁদ গগনে, কোটী চাঁদ উমার নখের কোণে।' কিন্তু স্নেহের পুতলী মেয়েটীর সান্ত্বনা যখন চাঁদ না দিলে হইবার উপায় নাই, তখন মাতাপিতা একযোগে তাহার উপায় স্থির করেন—উমার কোটি-চন্দ্র-বিনিন্দিত মুখখানির প্রতিবিম্ব দর্পণে দেখাইবার প্রয়াস তাঁহাদিগকে করিতে হয়, যথা—

গিরিবর! আর আমি পারি না হে
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান নাহি করে স্তন্যপান,
নাহি খায় ক্ষীর-ননী-সরে!
অতি অবশেষে নিশি গগনে উদয় শশী
বলে উমা 'ধরে' দে উহারে।'
কাঁদিয়ে ফুলায় আঁখি মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে?
"আয় আয়, মা মা!" বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়?
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।"
উঠে বসি গিরিবর করি' বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
আনন্দে কহিছে হাসি, "ধর মা, এই লও শশী"
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।
শ্রীরামপ্রসাদে কয় শত শত পুণ্যচয়
জগৎ-জননী যার ঘরে।

* * * *

অনন্তর নব-যৌবনসম্পন্না উমা যখন কৈলাসে গিয়া হর-গেহিনী হইয়াছেন, তখন তাহাকে না দেখিয়া মাতার

প্রাণ দিন দিন একান্তই অধীর হইয়া পড়িয়াছে। গৃহধর্মে তাঁহার তখন আর মন উঠিতেছে না। মনের ভিতর এক দারুণ অবসাদ দেখা দিয়াছে। কত দুঃখের মেয়েটি তাঁর বৎসরে একটি বার মাত্র ঘরে আইসে, আবার তিন দিন থাকিয়াই চলিয়া যায়? মায়ের প্রাণে এ ব্যথা যে একান্তই মর্মান্তিক! মাতা যে সারাটি বছর ধরিয়া দিন গণিয়া পথের পানে উদাস-নয়নে চাহিয়া কাটায়! কখন বা মনের কথা প্রকাশ করিয়া স্বামীকে বলিতে থাকেন—

"আমার কিসের ঘরকন্না,
বৎসরের পর আসে গৌরী—
তিন দিন বই রয় না।"

কখনও বা একান্ত অধীর হইয়া বলিতে থাকেন—

"কবে যাবে হে গিরিবর!
আনিতে মোর উমা-ধনে,
না দেখিয়া মুখশশী
চেয়ে আছি হে পথপানে।"

এ হেন বুকফাটা হৃদয়ের ব্যথা ত গোপন করিবার নয়। যখন কন্যা-বিরহে রাণীর প্রাণবায়ু নিঃশেষ হইবার উপক্রম হয়, তখন তিনি উমাকে গৃহে আনিবার জন্য গিরিরাজকে গঞ্জনা দিতে থাকেন। যথা, ভবানী-মঙ্গলে—

"মেনকা মলিন বড়, গৌরী নাহি ঘরে।
গিরিরে গঞ্জনা রাণী প্রতিদিন করে॥"

* * * *

যদি মোরে রক্ষা চাহ গৌরী আনি শীঘ্র দেহ
নহিলে আমার অবসান।"

তখন গিরিরাজ বলেন—

"তুমি মোরে কহ গৌরী আনিবার তরে,
আর কি আসিবে গৌরী অভাগার ঘরে।

* * * *

শঙ্কর কহিলা গৌরী না পাঠাব তথা।
করেছে অনেক রাণী অপমান যথা।"

মাতা যে 'সিদ্ধিতে নিপুণ' জামাতার গুণের কত কথাই না শুনেছেন। মেয়ে নাকি তাঁর বড়ই দুঃখে আছে; জামাই তাঁর শ্মশানবাসী দিগম্বর। দিবারাত্র মেয়ের কথা ভাবিয়াই রাণী আকুল। স্বপ্ন-যোগে মেয়েকে মুহূর্ত মাত্র দেখিয়া চিত্ত তাঁহার ঔদাস্যে ভরিয়া উঠে। সংসার কর্মে তাঁহার মন নাই—কোন সুখও তাঁর নাই। অহরহ কেবল মেয়ের দুঃখের কথাই স্বামীকে শুনাইতে থাকেন—

বলেছিল নারদ আমায়
উমা তোমার রাজরাণী;
এখন অন্যের মুখে শুনি—
মা মোর অন্নের কাঙালিনী।
সুখী হব শ্মশান-বাসে,
উপবাস সে ভালবাসে;
মা থাকে তার গৃহবাসে
উপবাসে কৃশাঙ্গিনী।
থাকিতে অমূল্য রতন
অস্থিমালা উমার ভূষণ;
থাকিতে অতুল্য ভবন
উমা বিল্ব-মূলবাসিনী।
বল্‌তে গিরি বুক ফেটে যায়
জলাঞ্জলি দিয়ে লজ্জায়
গিরীশ নাকি যোগীর সজ্জায়
গিরিজায় সাজায় যোগিনী।
যেতে নাকি মহোৎসবে
মা নাকি বৃষভে শোভে—
অন্য দেবনারী সবে
চতুর্দোলে যায় হে শুনি।

(আগমনী)

এত যাঁহার ভাবনা, সে মাতার মনের স্থৈর্য কোথায়? যদি উমাকে একটি বার ঘরে আনিতে পারেন, তবে তিনি আর তাঁহাকে শীঘ্র কৈলাসে যাইতে দিবেন না। জামাতার সঙ্গে ঝগড়া যদি হয়, রাণী তাহাতেও কুণ্ঠিতা নহেন। অদম্য আবেগে মেনকা এমনি কত কি যে ভাবিতেছেন, তাহার সীমা-নাই! ঘটকালির সময়ে নারদ ঋষির মুখে উমার ভাবী সুখের নানা কথা শুনিয়া মাতা কত আনন্দই না পাইয়াছিলেন, এখন আবার তাহার সংসার-ক্লেশের দারুণ কথা শুনিয়া, চিত্তে নিদারুণ যাতনা পাইতেছেন। তাঁহার সদ্যঃপাতী হৃদয়খানি আর প্রবোধ মানিতেছে না। কন্যা দীর্ঘকাল পিত্রালয়ে থাকিলে যে লৌকিক নিন্দাবাদ

শুনিতে হয়, মাতা তাহাকেও উপেক্ষা করিতে চাহেন। তিনি চাহেন শুধু কন্যাকে একটীবারের মত ঘরে আনিয়া সুখী করিতে; তাই সখেদে বলিতেছেন—

"এবার আমার উমা এলে
আর আমি পাঠাব না;
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ,
কারো কথা শুন্‌বো না।
অমি শুনেছি নারদের মুখে
উমা আমার থাকে দুখে;
শিব শ্মশানে মশানে থাকে
ঘরের ভাবনা ভাবে না।
যদি আসেন মৃত্যুঞ্জয়,
উমায় নেবার কথা হয়;
(তখন) মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া
জামাই ব'লে মান্‌বো না।"
(আগমনী)

আহা মাতৃস্নেহের কি অপূর্ব চিত্র! এরূপ চিত্রাবলী আমাদের প্রাচীন সাহিত্যকে অশেষ প্রকারে উজ্জল করিয়া রহিয়াছে। বাঙালীর দুর্গোৎসব এই ভাবেরই দ্যোতক। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ চৈতন্য-ভাগবতে নিত্যানন্দ-মাতা পদ্মাবতী এবং চৈতন্য-জননী শচী দেবীর, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যে খুল্লনার, ভাগবত পুরাণে দক্ষ-মহিষী প্রসূতির বা প্রহ্লাদজননী কয়াধু প্রভৃতির সন্তান-বাৎসল্যের চিত্রগুলি মিলাইয়া লউন। ভারতীয় জননীবর্গের ইহাই নিখুঁত আলেখ্য। ভারতে জনকজননী এই ভাবেই বিভোর। ইহার অনুপ্রেরণায় তাঁহারা স্বীয় ইষ্টনাম লইয়া স্ব স্ব সন্তানের নামকরণ করিয়া থাকেন। পুত্র-কন্যার বিবাহে নীচ অর্থসমস্যা আনিয়া দিয়া সমাজ এই সনাতন মধুর ভাবটীকে খর্ব করিতেছে। আবার আমাদের নব্য-সাহিত্যে এমন পবিত্র মাতৃমূর্তি ও স্নেহময় পিতৃমূর্তি কবে প্রকটিত হইতে দেখিব? সে দিন কবে আসিবে?

# চাষীর মেয়ে

শ্রীসুধীরকুমার দেব

রাখাল ছেলে গান গেয়ে যায় মাঠের পথে সকাল সাঁঝে।
চাষীর মেয়ে আন্‌মনা হয় খুঁটিনাটী সকল কাজে।
ধানের ক্ষেতের আলে আলে গরু চরে পালে পালে
চাষীর মেয়ে চোখ মেলে চায় গান গেয়ে সে কোথায় গেলো,
রাখাল ছেলের গান শুনে হায় চাষীর মেয়ে পাগল হ'লো।

আঁকা-বাঁকা মাঠের পথে বাব্‌লা গাছের ছায়ে।
গান গেয়ে যায় রাখাল ছেলে আপন মনে আল্‌গা গায়ে।
বাঁকের শেষে থম্‌কে এসে দাঁড়িয়ে দেখে মুচ্‌কি হেসে।
চাষীর মেয়ে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে ভরা যোল।
রাখাল ছেলের গান শুনে তার ঘরে থাকা কি দায় হ'লো।

যৌবনে তার বান ডেকেছে রূপের বাহার উপচে পড়ে,
গা বেয়ে তার বিজ্‌লি ঝলে বসন উড়ে পাগলা ঝড়ে।
আড় চোখে সে চাউনি হানে, কি মায়া তায় সেই সে জানে।
কাজ করা তার ভুল হ'য়ে যায় রাখাল ছেলে পথের মাঝে।
দাঁড়িয়ে ভাবে কি আজ হ'লো পরাণে তার কি সুর বাজে।

শিমুল গাছের ওপারে ওই শ্যামলা ধানের ক্ষেত পেরিয়ে,
আম বাগানের ঝোপের মাঝে দিনের আলো যায় ফুরিয়ে।
সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসে মাঠের বুকের আশে পাশে
পাখীর গানে চাষীর মেয়ে আঁৎকে উঠে—ওই সে এলো
রাখাল ছেলের গানের তানে কুল-মান তার সবই গেলো।

নিঝুম রাতে একলা শুয়ে-স্বপন দেখে চাষীর মেয়ে—
রাখাল ছেলে পথ চলে যায় আপন মনে কি গান গেয়ে।
সামনে এসে চোখ ইসারায় ডাক দিয়ে কয় আয় যাবি আয়
কাজ ফেলে সে পাগল হ'য়ে আল্‌গা বুকে ছুটল পিছু।
রাখাল ছেলের গান শুনে হায় ভুলল আপন সবই কিছু।

আঁকড়ে বুকে রাখাল ছেলে চলল ছুটে কোন সুদূরে!
মিলল সেথা দু'জন তারা স্বপনপুরীর সে রাজপুরে।
(ও তার) চুমিয়ে দিল রাঙা ঠোঁটে আঁৎকে উঠে স্বপন টুটে
হাতড়ে মরে একলা ঘরে লজ্জা ঢাকে আঁধার বুকে।
রাখাল ছেলের গান শুনে সে পাগল হ'লো কে আর রুখে।

# খোজা গ্রেগরী বনাম গুরগণ খাঁ

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় এম. এ., বি. এল.

বঙ্কিমের লেখনী-প্রসাদে বাঙালীর নিকট গুরগণ খাঁ অতি পরিচিত, কারণ চন্দ্রশেখরে বর্ণিত গুরগণ খাঁ উচ্চাভিলাষ দুরভিসন্ধির প্রতীক। এই আর্ম্মাণী বীর-পুরুষের সম্বন্ধে বঙ্কিম্ লিখিয়াছেন "এই সময়ে বাঙ্গলায় যে সকল রাজপুরুষ নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে গুরগণ খাঁ একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু জাতিতে আরমাণি। ইস্পাহান তাঁহার জন্মস্থান। কথিত আছে, তিনি পূর্ব্বে বস্ত্রবিক্রেতা ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ গুণবিশিষ্ট ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি অল্পকাল মধ্যেই প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন।"

ইহাই বঙ্কিম-লেখনী-নিঃসৃত গুরগণ খাঁ। খুব গুরুতর গরমিল না থাকিলেও, ইতিহাসের গুরগণ খাঁ ঠিক বঙ্কিমের গুরগণ খাঁ নহে। ঔপন্যাসিক বঙ্কিম ইতিহাস রচনা করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে দোষ দেওয়া চলে না। তবে বঙ্কিম-চিত্রিত মহম্মদ তকি খাঁ অথবা জেব উন্নিসার চরিত্র ইতিহাস হইতে যত দূরে, গুরগণ খাঁ হয়ত তত দূরে নহে। বঙ্কিমের গুরগণ খাঁর ঘৃণ্য মনোবৃত্তির চরম প্রকাশ দেখা যায়, যখন গুরগণ খাঁ নিজ উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য ভগ্নী দলনীর বৈধব্যকামনা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। "স্বামী কাহারও চিরকাল থাকে না। এক স্বামী গেলে আর এক স্বামী হইতে পারে। আমার ভরসা আছে তুমি একদিন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নুরজাহান হইবে"—দলনীর প্রতি বঙ্কিম-বর্ণিত গুরগণ খাঁর এই উক্তি গুরগণ খাঁর প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না। অবশ্য দলনী ঐতিহাসিক চরিত্র নহে। দলনী বঙ্কিমের মানস-কন্যা, মীর-কাশিমের অপূর্ব্ব সুন্দরী ইস্পাহানী বেগম।

ইতিহাসের গুরগণ-চরিত্র আলোচনার কালে ভারতবর্ষ ও আর্ম্মেনীয়ার পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন—দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও আর্ম্মাণীয়ার সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগ বর্ত্তমান ছিল। কথিত আছে, খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪৯ শতকে কনৌজ হইতে দুইজন রাজকুমার আর্ম্মেণীয়ায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। গত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া আর্ম্মেনিয়ার সহিত ভারতবর্ষের এই যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি নানা বিষয় উপলক্ষ করিয়া এই নাড়ীর যোগ হিন্দু ও মুসলমান যুগে জীবিত ছিল এবং ইংরেজ আমলেও মরিয়া যায় নাই। মুঘলসম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে মিরজা জুন কোয়ার নিন বনাম আলেকজাণ্ডার রোজকে মুঘলদরবারে আমরা প্রতিপত্তি-শালী ওমরাহ্‌রূপে দেখিতে পাই। তিনি কাশ্মীরী আর্ম্মেণীয়ান্ ছিলেন—জাতিতে আর্ম্মাণী, বসতি কাশ্মীরে। সম্রাট্ আকবরের বিচারালয়ের মীর আদিল অথবা প্রধান বিচারপতিও ছিলেন আর্ম্মাণী। তাঁহার নাম ছিল আবদুল হাই। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে মুঘলসম্রাট্ ফররুখিয়ারের নিকট হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যফার্ম্মান আদায় ব্যাপারে বাংলার আর্ম্মাণী বণিক্ খোজা ইসরেলই কোম্পানীর দূত হিসাবে রাজনৈতিক দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে খোজা পেট্রাস আরাটুন, যিনি "আর্ম্মাণী পেট্রাস" নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন, নবাব সিরাজোদ্দৌলার পতন ঘটাইবার জন্য তিনিই মীরজাফর ও ইংরেজদিগের মধ্যে বিনিময়-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই "আর্ম্মাণী পেট্রাস" অতি চতুর স্বার্থ-সর্ব্বস্ব ব্যক্তি ছিলেন। খোজা গ্রেগরী বনাম গুরগণ খাঁ এই আর্ম্মাণী পেট্রাসেরই ভ্রাতা। কিন্তু দুই ভ্রাতার মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য অত্যন্ত অধিক ছিল। ইতিহাসের গুরগণ খাঁ শৌর্য্য, বীর্য্য ও দক্ষতার আধার। মীর কাশিমের প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতাও অপরিসীম। কিন্তু আর্ম্মাণী পেট্রাস নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এমন কোন হীন কার্য্য নাই, যাহা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন।

খোজা গ্রেগরী বনাম গুরগণ খাঁ প্রথম জীবনে হুগলীতে কাপড় বেচিতেন। সুতরাং বঙ্কিমের গুরগণ খাঁর মুখ-

নিঃস্বত "গজে মাপিয়া কাপড় বেচিতাম" ঐতিহাসিক সত্য। কেরাণী ক্লাইভ কলম ছাড়িয়া তরবারি ধরিয়াছিলেন। গুরগণ খাঁও কাপড়বিক্রেতার গজকাঠি ছাড়িয়া সুদক্ষ সৈনিকে পরিণত হইয়াছিলেন। গুরগণ খাঁ মীর কাশিমকে নানা বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া মীর কাশিম তাঁহাকে সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতিপদে বরণ করেন। কিন্তু গুরগণ খাঁর যুদ্ধ-বিষয়ক কুশলতার বিশদ বিবরণ আমরা আজও পাই নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে "বিশ্বাসঘাতক" আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকগণের এই মানদণ্ড নির্ভুল না হইবার অনেক কারণ আছে। গুরগণ খাঁ যদি গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত না হইতেন, তাহা হইলে আধুনিক কালের মুস্তাফা কেমাল পাশা অথবা রেজা খাঁ পল্‌হবীর ন্যায় কীর্ত্তি অর্জ্জন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল বলিয়া আর্ম্মাণী ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন। হয়ত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবীও তাঁহার করায়ত্ত হইত এবং বাংলায় স্বাধীন আর্ম্মাণী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইত; কিন্তু আর্ম্মাণী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হইলেও তিনিই, অনেকাংশে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিন বৎসর পূর্ব্বে বাংলার প্রকৃত শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

ঐতিহাসিক মার্শম্যান মীর কাশিমের শাসনদক্ষতাকে প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন "মীরকাশিম অত্যন্ত বীরত্বের সহিত তাঁহার বিপদ্‌গুলির সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তিনি দরবারের অমিতব্যয়িতা অনেক কমাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি 'রাম অফিস' 'এ্যান্টিলোপ অফিস' এবং 'নাইটেংগেল অফিস'গুলির উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন। তিনি রাজস্বের আয়-ব্যয়ের হিসাবগুলিরও খুঁটিনাটি পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং কর্ম্মচারীদিগকে লুণ্ঠনলব্ধ ধনরত্ন ফিরাইয়া দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি বকেয়া রাজস্বও অত্যন্ত কঠোরতার সহিত আদায় করিয়াছিলেন এবং বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের বার্ষিক মুনাফা এক কোটী টাকা বাড়াইয়াছিলেন। এই অর্থ দ্বারা তিনি ইংরাজদিগের সহিত যে সকল সর্ত্ত করিয়াছিলেন—সেগুলি যথাযথ পালন করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি ইংরাজ কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার সাধনায় সুবার স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় তাঁহার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেন এবং তাঁহার রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন।"

বস্তুতঃ রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করিয়া তিনি মুর্শিদাবাদ প্রাসাদ হইতে হাতী, ঘোড়া, স্বর্ণ-রৌপ্যের বহুমূল্য আসবাবগুলিও মুঙ্গেরে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি মুঙ্গের দুর্গের অভ্যন্তরে একটি সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। গুরগণ খাঁ এই স্থানে অস্ত্রাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া কামান, বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রনির্ম্মাণের কারখানা খোলেন। মুঙ্গেরে পীরপাহাড় নামক পর্ব্বতের উপরে গুরগণ খাঁ একটি অতি সুন্দর বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। এই গৃহে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তদানীন্তন গভর্ণর ভ্যান্‌সিটার্টকে সম্বর্দ্ধনায় আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

এই গৃহটি মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের সম্পত্তি, তিনি এখানে একটি স্মৃতি-ফলক স্থাপন করিয়াছেন। সে স্মৃতি-ফলকে লিখিত আছে "বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ নবাব নাজিম মীর কাশিমের আর্ম্মাণী-সেনাপতি ও মন্ত্রী গুরগণ খাঁ এই গৃহে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাস করেন। এই গৃহেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর ভ্যান্‌সিটার্ট ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে মীর কাশিমের সহিত সাক্ষাৎ করেন।"

মুঙ্গের কলিকাতা হইতে তিনশত কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, নবাব মীর কাশিমের মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার উদ্দেশ্য—লোকচক্ষুর অন্তরালে শক্তি সঞ্চয় করা। কারণ, মীর কাশিম জানিতেন যে, ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য। তিন বৎসরের মধ্যেই মীর কাশিম এত সামরিক শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন যে, তিনি প্রবল শক্তি ইংরেজকে সমরে আহ্বান করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। এই অতি দ্রুত শক্তিসঞ্চয় ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য তিনি ইস্পাহানী সেনাপতি গুরগণ খাঁর নিকট ঋণী। তিন বৎসরের পূর্ব্বেই গুরগণ খাঁ পনেরো হাজার দক্ষ অশ্বারোহী সেনা এবং পঁচিশ হাজার সুশিক্ষিত পদাতিক তৈয়ারী করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া

বন্দুক প্রভৃতি উন্নত ধরণের আগ্নেয় অস্ত্রও বহুল পরিমাণে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এগুলি য়ুরোপীয় আগ্নেয় অস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। বিশ্রুতকীর্ত্তি আলীবর্দ্দী খাঁ অপেক্ষাও মীর কাশিম যাহাতে শক্তিশালী হইতে পারেন, ইহাই গুরগণ খাঁর ইচ্ছা ছিল। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শুধু আর দু'চার বছরের নিরুপদ্রব শান্তির প্রয়োজন ছিল, যাহাতে শক্তি আরও অধিকমাত্রায় করায়ত্ত হয়।

অন্ধকূপহত্যার কাহিনী যাঁহার উর্ব্বর-মস্তিষ্ক-প্রসূত সেই অতিচতুর হলওয়েল লিখিয়াছেন, "খোজা গ্রেগরী অতিমাত্রায় নবাবের প্রিয়পাত্র ও অনুগত। আর্ম্মাণীগণ তাঁহার মারফৎ এদেশে স্বাধীনভাবে খুঁটি গাড়িতেছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য এরূপ ভাবে চালাইতেছে, যাহা এদেশে সর্ব্বত্রই আমাদিগের স্বার্থের প্রতিকূল।" গুরগণ খাঁর কৃতিত্বে ও আর্ম্মাণী প্রতিপত্তিবৃদ্ধিতে হলওয়েলের মনোবেদনা পরিস্ফুট। কারণ হলওয়েল শ্যেনদৃষ্টিতে আর্ম্মাণীদিগের প্রতিপত্তি ও প্রভুত্বের ক্রমপ্রতিষ্ঠা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। পাটনা কুঠীর তদানীন্তন অধ্যক্ষ এলিসের নাম স্থায়ীভাবে ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে; কারণ পরবর্ত্তীকালে সমরু কর্ত্তৃক যাঁহারা নিহত হইয়াছিলেন মিঃ এলিস তাঁহাদের মধ্যে একজন। মিঃ এলিস ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী কলিকাতায় সপারিষদ গভর্ণরকে লিখিয়াছিলেন "কিছুকাল হইতে আমাদিগের (ইংরেজদিগের) ব্যবসা-বাণিজ্য যে কারণে প্রতিহত হইতেছে, আপনার অবগতির জন্য তাহার কারণ লিখিতে হইলে আপনাকে জানাইতে হয় যে, ইংরেজশক্তির উপর সমগ্র দেশব্যাপী অশ্রদ্ধাই ইহার কারণ এবং এই অশ্রদ্ধা সেই সকল স্থানেই বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়, যেখানে আর্ম্মাণীগণের প্রতিপত্তি বেশী।" মিঃ এলিস ইহার পর তাঁহার পত্রে কোন্ কোন্ স্থানে ইংরেজ ক্ষমতা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের সবিস্তার বর্ণনা দাখিল করিয়াছেন। এই সময়ে কয়েকটি ঘটনা উপলক্ষ করিয়া আর্ম্মাণীদিগের প্রতি ইংরেজদিগের বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া ওঠে। খোজা এ্যানটুন নামক একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন আর্ম্মাণীকে অপরাধীর ভয়ে প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় নবাব মীর কাশিমের নিকট ইংরেজগণ পাঠাইয়াছিলেন, কারণ লবণ ব্যবসা সম্বন্ধে খোজা এ্যানটুন নাকি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদেশ অমান্য করিয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখনও বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সনন্দ লাভ করেন নাই। শাসন ও বিচারের ভারও কোম্পানীর উপর ছিল না। সে ক্ষেত্রে কোনও সম্ভ্রমশালী আর্ম্মাণীকে ঐরূপভাবে অপদস্থ করিবার অধিকার কোম্পানীর ছিল না বলিয়াই নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের ধারণা। কলিকাতাস্থ গভর্ণরকে লিখিত মিঃ এলিসের ১৩ই ফেব্রুয়ারীর (১৭৬২ খৃঃ) পত্রে জানা যায় যে, কতিপয় পলাতক সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ইংরেজগণ মুঙ্গের দুর্গের নিকটবর্ত্তী হন। ইংরেজগণের এই বিশ্বাস ছিল যে, কতিপয় সৈন্য ইংরেজদল ত্যাগ করিয়া মুঙ্গের দুর্গে আত্মগোপন করিয়া আছে। সামরিক আইন পলাতক সৈন্যকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া থাকে। কিন্তু মুঙ্গের দুর্গের নিকটবর্ত্তী হওয়া মাত্র খোজা গ্রেগরীর সহকারী সুজন সিং ইংরেজগণকে দুর্গ হইতে দূরে অবস্থান করিতে বলেন এবং দুর্গের নিকট আসিলেই তিনি গুলি চালাইবেন জানাইয়া দেন। ইংরেজগণ বাধ্য হইয়া সুজন সিংহের কথা মানিয়া দুর্গ হইতে দূরে অবস্থান করেন; কারণ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইবার আদেশ ইংরেজ সৈন্যের ছিল না। সুজন সিং এই সময়ে আদেশ করেন, কোনও প্রকার আহার্য্য দ্রব্যই যেন ইংরেজদিগকে কেহ বিক্রয় না করে। মিঃ এলিস সুজন সিংহের এই আদেশকে "আর্ম্মাণী ঔদ্ধত্যের" আর একটি নিদর্শনরূপে তাঁহার ১৩ই ফেব্রুয়ারীর পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া নবাব কলিকাতাস্থ গভর্ণরকে ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৭৬২ খৃঃ) যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নবাব লিখিতেছেন "আজ রজব মাসের ১৯ তারিখ। আমি সুজন সিংহের এক পত্রে জানিতে পারিলাম যে, কোম্পানীর দুই অথবা তিন দল সৈন্য পাটনা কুঠীর অধ্যক্ষ মিঃ এলিস কর্ত্তৃক মুঙ্গের দুর্গের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া, দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া দুর্গদ্বার বন্ধ দেখিয়া দুর্গ ঘেরিয়া ফেলে। * * ইহা আমার ধারণার অতীত যে, সন্ধি-সর্ত্তের অবমাননা করিয়া আপনারা কেন আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন এবং আমার দুর্গের এবং আমার কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে

অভিযান করিতেছেন * * এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া আমার আধিপত্য যেরূপভাবে অপমানিত হইয়াছে তাহা বর্ণনার অতীত।"

এই সময়ে রাজা রাজবল্লভও নবাবকে একখানি পত্র লেখেন। অত্যল্পকালস্থায়ী শাসনকাল হইলেও, মীর কাশিমের শাসনদক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এ সকল কৃতিত্বের জন্য তাঁহার প্রধান সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রী গুরগণ খাঁই অনেকাংশে দায়ী। বোধ হয়, ভারত-ইতিহাসে কোনও শাসনকর্ত্তা তিন বৎসরের মধ্যে এরূপ প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করিয়া ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সাহস অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। কারণ তিন বৎসর পূর্ব্বে মীর কাশিম সুবে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার একজন নগণ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং মসনদ হইতেও দূরে ছিলেন। কিন্তু অতি দ্রুত উত্থান অনেক সময়েই দ্রুত পতনে পর্য্যবসিত হয়। মীর কাশিম ও গুরগণ খাঁর জীবনী ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। মীর কাশিমের এই দ্রুত পতন অবশ্য ইরেজগণই ঘটাইয়াছিলেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে, কলিকাতাস্থ সদস্যসভার গর্হিত আচরণই মীর কাশিমের সহিত ইংরেজগণের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। মীর কাশিম ইহার জন্য বিশেষ দায়ী নহেন। ঐতিহাসিক মার্শম্যান লিখিতেছেন, "কলিকাতাস্থ সদস্য সভার নীতি-বিগর্হিত কাজই মীর কাশিম ও ইংরেজদিগের মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়াছিল এবং কতকগুলি যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়াছিল। পরিণামে মীর কাশিম রাজ্য হারাইয়াছিলেন। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত দুই পক্ষ যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে ঘেরিয়াই শেষ যুদ্ধ। ইহা ২রা আগষ্ট ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল।"

স্মরণীয় যুদ্ধ ঘেরিয়ার এক সপ্তাহ পরেই গুরগণ খাঁ এক অজ্ঞাত আততায়ীর হস্তে নিহত হন। রঙ্গমঞ্চের গুরগণ খাঁকে গুলীতে নিহত হইতে দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা হয় নাই। ইহাও অনেকে অনুমান করেন যে, মীর কাশিমের দ্বারা নিযুক্ত হইয়াই অজ্ঞাত আততায়ী তাঁহাকে হত্যা করে। ঐতিহাসিক মার্শম্যান গুরগণ খাঁর হত্যা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "তিন চারি জন মুঘল সেনানী গুরগণ খাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের বাকী বেতন দাবী করে; কিন্তু গুরগণ খাঁর দ্বারা বহিষ্কৃত হইবার আদেশে তাহারা তাঁহাকে হত্যা করে। প্রকৃতপক্ষে কোনও বেতনই বাকী ছিল না। ঘটনা যাহাই হউক না—ইহা নিশ্চিত যে, তাহারা গুরগণ খাঁকে হত্যা করিবার জন্য কাশীম আলি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল।" অনুগত বিশ্বস্ত প্রধান সেনাপতির প্রতি মীর কাশিমের এই আচরণ-প্রসঙ্গে মার্শম্যান লিখিয়াছেন যে, গুরগণ খাঁর ভ্রাতা খোজা পেট্রাস (ক্লাইভের "আর্ম্মাণী পেট্রাস") কলিকাতায় থাকিতেন এবং গভর্ণর ভ্যান্‌সিটার্ট ও হেষ্টিংসের সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। খোজা পেট্রাস স্বীয় ভ্রাতা খোজা গ্রেগরী (গুরগণ খাঁ)-কে মীর কাশিমের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ইংরেজপক্ষে যোগ দিবার জন্য লিখিয়াছিলেন এবং সম্ভব হইলে মীর কাশিমকে বন্দী করিয়া ইংরেজ হস্তে সমর্পণ করিবার হীন প্রস্তাবও চিঠিতে ছিল। নবাবের গুপ্তচর এ সংবাদ জানিতে পারিয়া রাত্রি একটার সময়ে নবাব মীর কাশিমকে এই গুহ্য খবর জানাইয়াছিল এবং ইহার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই গুরগণ খাঁ নিহত হন। সত্যই যদি গুরগণ খাঁর হত্যা নবাব মীর কাশিমের প্ররোচনায় বা ইঙ্গিতে হইয়া থাকে, যদিও তাহার বিচারসহ কোনও প্রমাণ নাই, তাহা হইলেও মীর কাশিমকে ইহার জন্য খুব দায়ী করা যায় না। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার আকাশ বাতাস তখন, বিশ্বাসঘাতকদিগের বিষ-নিঃশ্বাসপূর্ণ ছিল। তাহাদের হস্তে সিরাজের পরিণাম মীর কাশিম নিজ চোখেই দেখিয়াছিলেন। এস্থলে গুপ্তচর-বর্ণিত সংবাদে উত্তেজিত হইয়া আত্মরক্ষায় যদি নবাব গুরগণ খাঁকে সরাইয়া ফেলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া চলে না। দোষ হইতেছে সেই ঘৃণিত নীতি অথবা কার্য্যের, যাহার ফলে গুরগণ খাঁ সম্বন্ধে অহেতুক সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল। এ সন্দেহের মূল কারণ গুরগণ খাঁকে খোজা পেট্রাস-লিখিত গোপন চিঠি এবং ইংরেজ পক্ষে যোগ দিবার জন্য গুরগণ খাঁকে গোপন অনুরোধজ্ঞাপন। খোজা পেট্রাস নিশ্চয়ই নিজ হইতে উপযাচক হইয়া এইরূপ চিঠি নবাবের প্রধান মন্ত্রীকে লেখেন নাই। পরন্তু কোম্পানীর গভর্ণরও কর্ত্তৃপক্ষের গোপন পরামর্শানুসারেই লিখিয়াছিলেন। কারণ, ইংরেজ

জানিতেন যে, গুরগণ খাঁকে হাত করিতে পারিলে মীর কাশিমকে ধ্বংস করিতে বেশী বেগ পাইতে হইবে না। সুতরাং গুরগণ খাঁ যদি নবাব মীর কাশিমের প্ররোচনায় নিহত হইয়া থাকেন তাহাতে নবাব মীর কাশিমকে "সন্দেহের অবকাশ" দিতে হইবে। যাঁহারা দূর হইতে এ ঘটনার ইন্ধন যোগাইতেছিলেন তাঁহারাই প্রত্যক্ষ দায়ী। কিন্তু গুরগণ খাঁ কোনও সময়ে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহার ভ্রাতা ইংরেজ-পক্ষাবলম্বী খোজা পেট্রাসের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। টমাস খোজামল একজন সমসাময়িক আর্ম্মাণী। তিনি বলেন, গুরগণ খাঁ ইংরেজদিগের অনুরোধে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাদিগকে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য এবং নবাবের প্রধান সেনাপতির মর্য্যাদার উপযুক্ত। গুরগণ খাঁ প্রস্তাবের উত্তরে লিখিয়াছিলেন "আমি একজন নগণ্য ব্যক্তি ছিলাম। কাশিম আলি খাঁ আমাকে বিশ্বাস করিয়াছেন এবং সম্মানের উচ্চ আসনে তিনি আমাকে বসাইয়াছেন। আমি সেইজন্য আপনাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না, আমার প্রভুকে ধরাইয়া দিব ইহা তো দূরের কথা। কারণ আর্ম্মাণী জাতির এই এক বৈশিষ্ট্য যে, তাহারা তাহাদিগের প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না, পরন্তু বিশ্বস্তভাবে প্রভুর সেবা করে। প্রভুর অনুগত থাকাই তাহাদিগের ধর্ম্ম।"

টমাস খোজামলের এই বর্ণনা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে গুরগণ খাঁকে উচ্চে মনুষ্যত্বের অধিকারী বলিতে ঐতিহাসিকের কোনও বাধা নাই। তবে যিনি এই বিবৃতি দিতেছেন তিনিও একজন আর্ম্মাণী, সেইজন্য তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া মনে হইতে পারে। যাহা হউক গুপ্ত আততায়ীর হস্তে গুরগণ খাঁ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট মৃত্যুমুখে পতিত হন। আর্ম্মাণী লেখকের এই বিবরণ ছাড়াও সম্ভ্রান্ত মুসলমান লেখকের বিবরণ আছে। এই লেখকের নাম সৈয়দুল্লা খাঁ। ইনি পাটনার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা মেহেদী আলি খাঁর ভ্রাতা। সৈয়দুল্লা খাঁ লিখিতেছেন, "আমাদিগের বন্ধু গুরগণ খাঁ অনেকের শত্রু হইয়াছিলেন। তাঁহার শত্রুরা তাঁহার বিরুদ্ধে এত কথা লাগাইয়াছিলেন যে, তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া নবাব হয়ত উত্তেজিত হইয়াছিলেন। ** গুরগণ খাঁ বিশ্বাসঘাতক ছিলেন বলিয়া বলা হইয়াছিল। কি মর্ম্মান্তিক মিথ্যা দুর্নাম। তিনি ইংরেজদিগের প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।"

[ আগামীবারে সমাপ্য

# গান

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

একলা পথে চ'ল্‌তে গিয়ে
ভাব্‌না কিরে?
দেবতা তোর জাগ্‌বে নিতি
হৃদয় ঘিরে।
আঁধারে তোর আলোর বীণা
বাজ্‌বে যে রে শঙ্কাহীনা,
আশীষ তিনি ক'রবে তোরে
মুক্ত শিরে।
একলা পথে চ'ল্‌তে গিয়ে
ভাব্‌না কিরে?

দুখের মাঝে পড়্‌বি নুয়ে
কিসের লাজে?
সুখের তারা আবার নভে
ফুটবে সাঁঝে।
হৃদয়ে তোর বিশ্বজনে
মাত্‌বে নব গুঞ্জরণে,
প'ড়বি বাঁধা আবার যে রে
গানের ভীড়ে।
একলা পথে চ'ল্‌তে গিয়ে
ভাব্‌না কি রে?

# স্মৃতির পটে নারায়ণীতলা

চৌধুরী

নারায়ণীতলা কলিকাতার দক্ষিণতম সীমান্তবর্তী দ্বীপ। দ্বীপ তো নয়, যেন মূর্তিমান্ একখণ্ড কাব্য। পশ্চাতে উন্নতশির নারিকেল বৃক্ষ সারি সারি পাহারারত। সম্মুখে অনন্তবিস্তৃত বারিধি। তীরে তীরে বীচিমালার অফুরন্ত লীলা-চাঞ্চল্য। দেখিয়া—বার বার দেখিয়াও দেখার আশ মিটে না। অবাধ দৃষ্টির দৌড় নিঃশেষে নিজেকে হারিয়ে ফেলে ঐ সুদূরে—যেখানে নীলাকাশ আর নিলাম্বুধি মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। দিগন্তের আনত পট-ভূমিকায় বিচিত্র রঙের আলিপনা।

অপরূপ অনির্ব্বচনীয় এ পরিবেশ! অসীম শূন্যে এতদিন যাহা ছিল নিরলম্ব তাহাই সৌন্দর্য্যলিপ্সু এতগুলি চিত্তের আলম্বনে হইয়া উঠিল জীবন্ত। রূপ ও প্রতিরূপের মিলনে অন্তর হইল আবেগপ্লুত। বিরহী আত্মার প্রতিবিম্ব-প্রসেক জড়ের সুপ্ত গ্রহীষ্ণুতাকে যেন সজাগ করিয়া তুলিল। হিয়া ও মনের এই অসাধারণ স্ফূর্ত্তি মগ্নচৈতন্য মথিত করিয়া ভিতর-বাহিরে যে রস-নির্ঝর ছুটাইল, তাহারই পরিপ্রেক্ষণে প্রকৃতি যেন তার মর্ম্ম বিছাইয়া ধরিল—আকাশে বাতাসে নির্ব্বাক্ তার বাণী গুঞ্জন তুলিল। সব কিছুই অপূর্ব্ব সুশ্রী আর সুন্দর! অননুভূত এ উপলব্ধি!

নিসর্গরাণী অকস্মাৎ যেন তার রূপ-মঞ্জুষার মায়া-কবাট উন্মুক্ত করিয়া ধরিল।
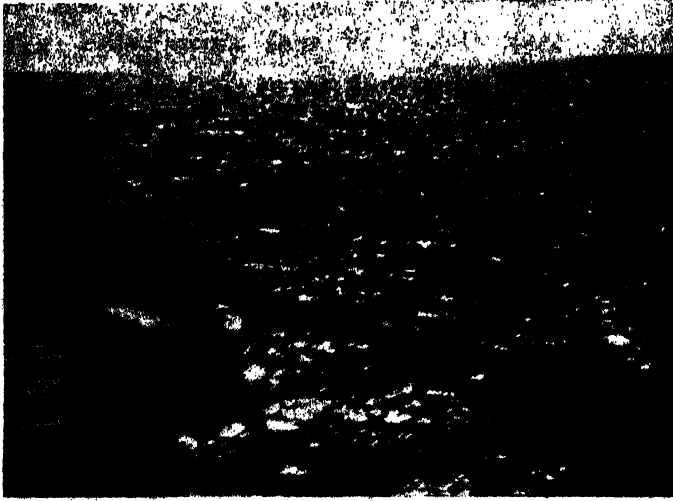
বহুধা-বিভক্ত ভাগিরথী-মোহনার একটি ধারার শেষ বাঁক ঘুরিতেই সহসা দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি নয়ন অভিনন্দন করিল। বিপুল পুলকে অন্তর নৃত্য জুড়িয়া দিল। অনন্ত অবকাশের মাঝে দেহ-মনের এ উদার মুক্তি শুধু অনুভব্য। বুঝিলাম কবির সত্য অনুভব: With an eye made quiet by the deep power of joy we see into the life of things.

নারায়ণীতলার নিকটবর্ত্তী গঙ্গার-সাগর-সঙ্গম

মৌশনির প্রত্যন্ত বনানী পশ্চাতে ফেলিয়া সাগর-সঙ্গমের সাত মাইল বারিবিস্তার পাড়ি দিয়া পর পর তিনখানি নৌকা নারায়ণীতলার সাগরসৈকতে ভিড়িল। দীর্ঘ নদীপথে দিবারাত্রি চলার শেষে ভূমিস্পর্শ করিয়া আশ্বস্ত হইলাম।

অর্দ্ধশতাধিক নরনারীর কল-কোলাহলে বিশাল বালুবেলা মুখর হইয়া উঠিল। নিঃসঙ্গ একখানি অর্ণবযান অদূরে দাঁড়াইয়া অলসভরে কিকে ধোঁয়া শূন্যে ছড়াইতেছিল। দূরে স্বপ্নপুরীর মত অস্পষ্ট জম্বুদ্বীপ। আরও দূরে দিগন্তের গায়ে মায়াঞ্জন বুলাইয়া সাগর-দ্বীপ মোহ সৃষ্টি করিতেছিল।

ভাববিহ্বল হইয়া পথ ধরিলাম। পল্লীর উপান্ত অতিক্রম করিতেই স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের অভিনন্দন। সুসংগত না হইলেও ব্যাণ্ড বাদ্যের সহিত হৃদয়ার্ঘ্য বর্ষিত হইল। জননেতা শ্রীমতিলাল রায়ের আগমনে ইতিমধ্যেই সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পথিপার্শ্বে কৃষককুলের অকপট শ্রদ্ধানতি আর গৃহস্থবধূর শঙ্খধ্বনি। হেথা হোথা গৃহাঙ্গনে সদ্য সংগৃহীত ধানের মড়াই জীর্ণ-শীর্ণ কুটিরগুলিকে আবডাল করিয়া শোভমান্। নির্ব্বাক জনতার মুখে বাক্যচ্ছটা নাই—না আছে আদব-কায়দার বালাই। মৌন নীরব অন্তরের এ আলান-প্রদান ভারী ভাল লাগিল। বুঝিবা ইহা শহরে সত্যই দুষ্প্রাপ্য!

মাইলখানেক দূরে স্থানীয় প্রবর্ত্তক আশ্রম। নিখিল-বঙ্গ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ৭ম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে শতাধিক প্রতিনিধির আগমন আশ্রম-পরিবেশকে সরগরম করিয়া তুলিল। সাময়িকভাবে বাসস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরু বিচালীর গদির উপর ঢালা বিছানা। সাময়িক এ ক্যাম্প-লাইফ সকলকেই স্ফূর্তিযুক্ত করিয়া তুলিল। সম্মুখের খোলা মাঠে সম্মেলন-মণ্ডপ ও প্রদর্শনী গৃহ নির্ম্মাণে শতাধিক শ্রমিক দিবারাত্রি কর্ম্মরত। ভারতীয় ধরণে নির্ম্মিত প্রকাণ্ড তোরণদ্বার অনুষ্ঠানের বিরাটত্ব সূচিত করিতেছিল। রান্না খাওয়া প্রভৃতি সহস্র রকম ব্যাপার মিলাইয়া যেন রাজসূয় যজ্ঞের ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

বড়দিনের অবকাশে সর্ব্বত্রই সভা-সমিতির মরসুম লাগিয়া যায়। জাতীয় কল্যাণ কামনায় শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতির আলাপ-আলোচনা এই সব সভায় সাধারণতঃ হইয়া থাকে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘও গঠন-নীতির আশ্রয়ে জাতিকে বিশেষভাবে বাংলা ও বাঙালীকে সংগঠিত করিয়া তুলিতে চাহে। সঙ্ঘ-জীবনে এই সাম্বৎসরিক সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা তাই প্রচুর। সঙ্ঘের বিধিতন্ত্রের রচনা, বাৎসরিক কার্য্যের পর্য্যালোচনা, আগামী বর্ষের জন্য নূতন কর্ম্ম পরিকল্পনা প্রভৃতি এই সময়েই গৃহীত হইয়া থাকে। এত বড় দুরূহ ব্যাপারের জন্য এই দুর্গম দ্বীপ নির্ব্বাচিত হওয়ার নিগূঢ় অভিপ্রায় কি, সেই কথাটাই বার বার মনে হইতে লাগিল।

গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের মিলনে যে সব দ্বীপের জন্ম ইহা তাহার অন্যতম। সরকারী নাম ফ্রেজারগঞ্জ, লোকে বলিয়া থাকে নারায়ণীতলা। উত্তুঙ্গ হিমগিরি শিখর হইতে নির্গলিত হইয়া কত কানন কান্তার আর সুশ্যাম প্রান্তর ঘুরিয়া ফিরিয়া এই এখানেই অসীম সাগর-সঙ্গমে পুণ্যতোয়া ভাগিরথী আত্মহারা হইয়াছে। ভারত তথা বাংলার তীর্থরেণুর পলি পড়িয়া নারায়ণীতলা রচিত। জলধির তল হইতে পৃথিবীর আলো বাতাসে মাথা তুলিয়া দাঁড়ানোর পর, বোধহয় শতাব্দীও অতিক্রান্ত হয় নাই। হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় বনানী-বেষ্টিত এই দ্বীপটির সত্যকার ইতিহাস আরম্ভ হয় মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন মিঃ স্যাণ্ডার্স'ন এখানে আসিয়া প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করেন। তদানীন্তন লেফ্‌টন্যাণ্ট গবর্ণর স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারের নামানুসারে সেই সময় হইতেই দ্বীপটি ফ্রেজারগঞ্জ নামে অভিহিত হইতে থাকে। ইহার বছর সাতেক পরে প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা

নারায়ণীতলার সুদূরবিসারী সাগর-সৈকতে

৺মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সমগ্র দ্বীপটির বন্দোবস্ত লইয়া ক্রমশঃ ইহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দেন। বিশ বৎসর পূর্ব্বে জাতিগঠনের প্রেরণা লইয়াই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ এখানে প্রথম অভিযান করে এবং সেই হইতে কাশিমবাজার ষ্টেটের সহযোগিতায় এই সভ্যতাবিচ্ছিন্ন অবজ্ঞাত স্থানটিকে মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য সঙ্ঘ প্রাণপাত শ্রম ও অজস্র অর্থব্যয় করিয়া আসিতেছে। দ্বীপটি পূর্ব্ব ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিম ও উত্তরে নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। বর্ত্তমান জনসংখ্যা ৬৫০০ এবং জমির পরিমাণ ২৮০০০ বিঘা। এমন মনোরম পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যকর স্থান সমগ্র বাংলায় বুঝি সুদুর্লভ। নারায়ণীতলা কলিকাতা হইতে মাত্র একশ মাইল দূরে। যাতায়াতের সুবিধা থাকিলে ইহার সম্পদ শতগুণ বৃদ্ধি পাইত।

নবাগত অধিবাসীদের শিক্ষা-দীক্ষার আলো নাই, কোনও গভীর সমাজবন্ধন নাই, না আছে ইহাদের কোন বিশিষ্ট নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা অথবা সুষ্ঠু উন্নত আচার-আচরণ। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বুঝিয়াছিল, পল্লীজীবন সর্ব্বাঙ্গীন সংগঠিত করিতে হইলে, তাহার সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, শিল্প-বাণিজ্যের প্রাথমিক সুব্যবস্থার প্রয়োজন। ধর্ম্মমূলক আচার-অনুষ্ঠান ও চেতনার উদ্বোধনের মধ্য দিয়া এখানকার অধিবাসিদের অন্তরকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য একাদিক্রমে দীর্ঘ বিশ বৎসর নিয়মিত উপাসনার ধারা সঙ্ঘ এখানে অনির্ব্বাণ রাখিয়াছে। জনসাধারণের সহিত আন্তরিক সংযুক্তির

বিরাট্ মণ্ডপে অধিবেশনের দৃশ্য

নিবিড় আস্বাদের উপর ভিত্তি করিয়াই সঙ্ঘ এখানে অনুকল্পস্বরূপ জাতিগঠনরূপ বৃহৎ কর্ম্ম সিদ্ধ করিতে প্রয়াসী। উত্তরে হিমালয় আর দক্ষিণে এই সাগরসঙ্গম তীর্থে হিন্দুর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির দুর্গ রচনা করিয়া সারা বাংলাকে সুদৃঢ় বন্ধনে আলিঙ্গিয়া ধরিবার সঙ্কেতই বুঝিবা সঙ্ঘের সুন্দরবন-অভিযান সূচিত করে। আর কে জানে, ভাবী-কালে নবদ্বীপ, হালিসহর, চন্দননগর, দক্ষিণেশ্বরের আত্মিক জাতি-সাধনার স্রোত পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে তীরে বহিয়া একদিন এই গঙ্গাসাগর তীর্থভূমিতেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করিবে কি না?

নারায়ণীতলায় সঙ্ঘের এবারকার বিরাট্ অনুষ্ঠানের আয়োজন দেখিয়া, এ বিশ্বাস সত্যই দৃঢ়তর হইল। বৃথা বাক্যব্যয় নাই, অনর্থক আলোচনা-আন্দোলন নয়, সাড়ম্বর কতকগুলি প্রস্তাবের সমর্থন-গ্রহণ নয়, পরন্তু সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় দশ বৎসরের মধ্যে জাতিকে সংগঠিত করিয়া তুলিবার আকুলতায় কার্য্যকরী পরিকল্পনার বস্তুতন্ত্র খসড়াও যেমন দিলেন, তেমন উহা কার্য্যে পরিণত করিবার কর্ম্মপদ্ধতিরও নির্দ্দেশ দিলেন। অধিবেশনের দুইটী দিন যেরূপ গভীর গাম্ভীর্য্যের মধ্য দিয়া তিনি অতিবাহিত করিলেন, সেরূপ ইতিপূর্ব্বে কখনও তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ হিন্দুর ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মৌলিক সংজ্ঞা এবং উদার অসাম্প্রদায়িক নীতির উপর জাতি বিশেষ করিয়া হিন্দু-সংগঠনের এইরূপ সঙ্কেত আর কোথাও প্রদত্ত হয় নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহোদয় সম্মেলন ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। মহারাজার জমিদারী নারায়ণী-তলায় সঙ্ঘের এই সম্মেলন উপলক্ষে ইহাই তাঁহার প্রথম আগমন। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের গঠননীতি, সুষ্ঠু কর্ম্মপদ্ধতি ও কার্য্যকুশলতার পরিচয় পাইয়া সঙ্ঘের ভাবী-সাফল্য সম্বন্ধে তিনিও বিশেষ আশান্বিত হয়েন।

সম্মেলনে শ্রীযুত রায়ের অভিভাষণ ও বক্তৃতা এবং বিষয়নির্ব্বাচনী সভার আলোচনাদি হইতে এবার খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি তথা প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ কি তত্ত্ব, নীতি ও ধারায় জাতিগঠন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তিনি যে সংহতি সৃষ্টির স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র ভাসাভাসা ভাবে কতকগুলি ব্যক্তির মিলন বা বিরোধী

আদর্শবাদী দলের ও আমিল নয়। ভাব ও আদর্শের পার্থক্য সত্বেও সাময়িক প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তথাকথিত রাজনৈতিক দলের যেনতেন প্রকারের প্যাক্ট বা মিতালীর পক্ষপাতী তিনি নহেন। শ্রীযুত রায়ের ধারণা, আগে রাষ্ট্র স্বাধীনতা নয়, পরন্তু জাতি আগে। স্বাধীনতা, স্বাধীনতা করিয়া শুধু চীৎকার করা নয়, স্বাধীনতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখাইলেন, কোন্ জাতীয় স্বাধীনতা ভারতের মাটি-জলের অনুকূল ও কল্যাণকর হইবে। বর্ত্তমান পরাধীনতা-পাশবদ্ধ অবস্থায়ও জাতি নির্ম্মাণে সুষ্ঠু সংগঠনের উপযোগিতা যে কতখানি তাহা তিনি বস্তুতন্ত্র কর্ম্মপদ্ধতির মধ্য দিয়া দেখাইলেন। তাঁর গঠনমূলক জাতীয়তায় কোন ভেজালের প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। হিন্দুর শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সম আদর্শ, নীতি ও আচরণের অনুসরণে ব্যষ্টি সমষ্টিবদ্ধ হইবে। ভারতীয় তত্ত্ব ও জীবননীতিকে ভিত্তি করিয়া বহুকে ঐক্যবদ্ধ করার যে ব্যবহার-সৌকর্য্য বা কৌশল তাহাই সংগঠন। শ্রীযুত রায়ের মতে, আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী বাহিরের সমস্যা যতটা নয়, তাহাপেক্ষা অধিক দায়ী আমাদের অন্তরের গ্লানি। অমিশ্র সংগঠন-নীতি বলিতে আত্মশক্তির উদ্বোধন করিয়া অন্তরের মালিন্য দূর করা। শ্রীযুত রায় যে সংগঠন চাহেন তাহার ভিত্তি হইতেছে ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বলিতে মত-ভেদের যে অবকাশ, তাহা দূর করিতে তিনি খুবই স্পষ্টভাবে এবার হিন্দুর শাস্ত্রসম্মত ধর্ম্মের সংজ্ঞাও দিলেন। সৃষ্টির মৌলিক প্রেরণাই হইল একের বহুত্বের দিকে সম্প্রসারণ-প্রবণতা। প্রকৃতি তাই বহুবাদিনী। মনন-ক্রিয়ার দ্বারা মানুষের এই আত্মবিস্তৃতি সম্ভব হয়। আত্মকেন্দ্রিক যে মনন। তাহা মানুষের পরিমণ্ডলকে সঙ্কুচিত করে বলিয়াই অধর্ম্ম। ধর্ম্ম এই মনাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপার হইলেও, উহা আত্মার অভ্যুদয় ও জীবত্বের মুক্তিবিধায়ক এই হেতু যে, তাহা বহুর কল্যাণে, ভূমার লক্ষ্যে নিয়োজিত। মুক্তি জীবন হইতে নয়, পরন্তু জীব-সংস্কার হইতে। ব্রহ্ম এবং জগৎ সম্বন্ধীয় এই দ্বিমুখী মানসিকতা মানুষ তথা জাগতিক ব্যবস্থাকে পূর্ণতা দিতে পারে। শ্রীযুত রায় ইহার নূতন 'কইনিং' (coining) করিয়াছেন 'ভাব' ও 'প্রকরণ'। ভাব ও প্রকরণের উপর ভিত্তি করিয়া পূর্ণাঙ্গ জীবনবাদের বিশদ ব্যাখ্যাও তিনি দিলেন।

শ্রীযুত রায় বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখাইলেন, বিশ্বসৃষ্টির এই মৌলিক বিজ্ঞান হিন্দুর আধ্যাত্মিক দর্পণে মুকুরিত হইয়াছে। হিন্দুর জাতীয়তা তাই অধ্যাত্ম-মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই হেতুই ইহা শাশ্বত, সনাতন ও সার্ব্বজনীন। সৃষ্টিবিজ্ঞানসম্মত ভূমার ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দুর মতবাদ সঙ্কীর্ণতা দোষদুষ্ট নয়। সঙ্ঘনেতা শ্রীমতিলাল রায় উচ্চকণ্ঠে এই সকল অভিমত সম্মেলনে উপস্থিত জনমণ্ডলীর সামনে ঘোষণা করিলেন।

প্রদর্শনী ও মণ্ডপের সম্মুখে দর্শনার্থীর ভীড়: প্রবেশ-পথের তোরণ দেখা যাইতেছে

হিন্দুর এই অধ্যাত্ম মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই শ্রীযুত রায় জাতিগঠনের ইঙ্গিত দিলেন। সমস্ত কুহেলিকা ও ভেদ-বৈষম্যের নিরাকরণার্থ তিনি অমিশ্র বেদধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানেরই প্রয়াসী। হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ বেদের প্রস্থান শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়ানুশাসিত হইয়াই হিন্দুর জাতীয়তা নিয়ন্ত্রিত হইবে। কোন ভাষ্যকার বা অবতার-বাদের প্রশ্রয় দিতেও তিনি নারাজ এই জন্য যে, নানারকম বিকৃত টীকাটিপ্পনীর ফলে জাতীয় জীবনে বৈষম্য আনার সম্ভাবনীয়তা উহাতে বর্ত্তমান। জাতীয় দেবতা হিসাবে এক-মাত্র বেদব্যাস পূজা পাইবার যোগ্য অধিকারী বলিয়া শ্রীযুত রায় বারবার উল্লেখ করিলেন। বেদব্যাসকে ভারতজাতির ডিক্টেটর করিতে তিনি অকুণ্ঠভাবেই সুপারিশ করিলেন।

সঙ্ঘের এবারকার সুন্দরবন অধিবেশনে জাতিগঠনের ভিত্তি ও উপাদান হিসাবে যে সকল আলোচনা হইল তাহা বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটি এইরূপ দাঁড়ায়:

(১) বেদ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদ।

(২) শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়ানুশাসিত সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান।

(৩) স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও রক্তধারায় বিশ্বাস।

(৪) সংগঠন ও সংহতি সৃষ্টি।

সঙ্ঘনেতার পরিকল্পিত জাতিগঠনের এই সুনির্দ্দিষ্ট কাঠামোর কথা ভাবিয়া স্বভাবতঃই মনে হইল, আজিকার দিনে মতবৈচিত্র্য, ভাবের অরাজকতা ও চিন্তার

বিষয়-নির্ব্বাচনী সভার সভাপতি ও সঙ্ঘ-সম্পাদক

ঘাত-প্রতিঘাত যেরূপ অবাধে চলিয়াছে, তাহাতে কোন কিছুর পক্ষে সহজে থিতাইয়া রূপায়িত হইয়া উঠা শক্ত। বিশেষ করিয়া বুদ্ধিপ্রধান বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে মানুষের স্বাধীন মননার অবকাশ এত অপ্রতিহত যে, কোন নির্দ্দিষ্ট ধরা-বাঁধা খাতে একটা সমষ্টিকে দীর্ঘদিন আটক রাখা সম্ভব নয়। মানুষে মানুষে, দলে-দলে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, জাতিতে-জাতিতে যে অনৈক্য ও বিসম্বাদ তারও মূলে আছে ভাব, আদর্শ ও চিন্তার পার্থক্য। মানুষ তার মননশীলতার অভিব্যক্তির পথে এত দীর্ঘ দূর চলিয়া আসিয়াছে যে, আধুনিক সমষ্টি মনকে একটা যান্ত্রিক বা সামরিক শক্তির চাপেও দীর্ঘকাল বশ্যতায় রাখা যেন আর কল্পনা করা চলে না। তেমনটি হইলে বুদ্ধিতে হইবে মানব সভ্যতার মৃত্যু অবধারিত। যেহেতু ভেদ-বৈষম্য, ভাঙা-গড়া, ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্যে প্রাণধর্ম্মেরই অনাহত প্রকাশ দেখিতে পাই। এবং এমনি বক্র ও ঋজু রেখায়ই সৃষ্টির স্বকীয় বৃত্তি পুষ্টি ও পুষ্টি পাইতে পাইতে মহাকালের পথে অন্তহীন গতিতে চলিয়াছে। ভাবিলাম, ব্যক্তির চিন্তার স্বাধীনতাই যদি না রহিল তবে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বা সৃষ্টির নব নব বিকাশই বা কি করিয়া সম্ভব?

এমনি বিরোধী কত চিন্তার তরঙ্গ মস্তিষ্ক কোষকে আঘাত করিয়া যাইতে লাগিল, যখন সঙ্ঘনেতা নারায়ণীতলার নিভৃত আশ্রমছায়ে বসিয়া অন্তরঙ্গদিগের সহিত জাতি-গঠনের তত্ত্ব ও কর্ম্মপদ্ধতি লইয়া গভীর আলোচনা করিতে লাগিলেন। কত শত প্রশ্ন মনে উঠিতে লাগিল। কতকের উত্তর পাইলাম, কতকের বা পাইলামও না। আশা রহিল, ক্রমশঃ তিনি যখন ইহার সবিশদ আলোচনা করিবেন তখন নিশ্চয়ই উহার সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত মিলিবে। বুঝিলাম, ভারতের সেই চিরসনাতন ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের মৌলিক বীর্য্য সঙ্ঘনেতাকে আশ্রয় করিয়া পুনরভ্যুদয় চাহিতেছে। এইজন্যই বোধ হয় তাই হিন্দুকে লইয়াই বর্ত্তমানে তিনি তাঁর পরিকল্পিত গঠনের ভিত্তি রচনা করিতে চাহিতেছেন। তাই বলিয়া তিনি তথাকথিত অনড় সনাতনীও নহেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রচণ্ড গতিশীলতা ঝড়ের বেগে তাঁহাকে অগ্রবহ করিয়া লইয়া চলিয়াছে। ভারতের মাটি-জল-বায়ুর বিশিষ্ট অবদান এই ব্রহ্মণ্য সভ্যতা। শ্রীযুত রায়ের দৃঢ় বিশ্বাস ও দর্শন এই যে, ভারতীয় সত্তার ব্যক্তরূপ এই ব্রহ্মণ্য কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিরোধী আর কোন চিন্তা, দর্শন বা মতবাদের ঠাঁই ভারতে পাইতে পারে না। ব্রহ্মণ্য সভ্যতার অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপ যে চতুর্ব্বর্ণাশ্রম তাহারও তিনি অভিনব ব্যাখ্যা করিলেন। জ্ঞান, প্রেম শক্তি ও সেবা রূপে ইহার একাধারেই প্রকাশ সম্ভব। এই গুণচতুষ্টয়ের প্রতীক চিহ্ন সমন্বিত শ্বেত, নীল, রক্ত ও পীতবর্ণ লাঞ্ছিত পতাকাও এইবার এই সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে জাতীয় পতাকা হিসাবে গৃহীত হইয়াছে এবং মণ্ডপের পুরোভাগে এই পতাকা উত্তোলন উৎসবও মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল।

নানাবিধ উপায়ে একটা সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠবপূর্ণ জাতিগঠন করিতে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ যে কার্য্যকরীভাবে চেষ্টা করিতেছে তাহা এই সম্মেলনের সংশ্লিষ্ট বিরাট্ প্রদর্শনী হইতেও বেশ বুঝিলাম। সঙ্ঘের সম্পূর্ণ ভাবানুগত কৃষ্টি ও অনুশীলনমূলক চার্ট, মডেল প্রভৃতি দ্রষ্টব্য সম্ভারে প্রদর্শনীটিকে সজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রবেশমুখেই সৃষ্টিময়ী সংগঠন-সাধনার ভাবরূপিণী "ভারতমাতার" বিগ্রহ। মূর্ত্তির চতুর্হস্তে শিক্ষা, দীক্ষা, অন্ন ও বস্ত্র। তারপর বামদিক হইতে প্রথমেই পড়ে ফ্রেজারগঞ্জের পরিচয় "আমাদের পল্লীরাণী"! অতঃপর মৃন্ময় মডেলে "পতিতের ভগবান"-এ দেখান হইয়াছিল পুরুষোত্তম শ্রীভগবান

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী পরিবেষ্টিত সভাপতি শ্রীমতিলাল রায়

এই পুণ্যভূমি ভারতে যুগে যুগে নরতনু আশ্রয় করিয়া কত রূপে দেশ ও জাতিকে সার্থক ও ধন্য করিয়াছেন। "সমাজ চিত্রে" সমাজের দুই দিক্—ভাল ও মন্দ, সৎ ও অসৎ ভাবের পরিণাম কি তাহা মূর্ত্তি ও চার্ট সহযোগে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে "গীতার শিক্ষা", "স্বাস্থ্য বিভাগ", "আয়ুর্ব্বেদের উপাদান" "ধর্ম্মের কুসংস্কার" প্রভৃতি বিভাগে ব্যষ্টি ও সামাজিক জীবন-গঠনের প্রচুর উপাদান উপস্থিত করা হইয়াছিল।

একটি স্থানে সঙ্ঘের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছিল। কৃষিজাত দ্রব্যের দ্রষ্টব্যগুলি কৃষকপ্রধান দর্শকের অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। সঙ্ঘের নারীমন্দির পরিচালিত "আনন্দবাজার" অবাক জনতার সকৌতুক দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

এইরূপ উচ্চাঙ্গের প্রদর্শনীর মর্ম্ম অবধারণ করিবার মত তেমন শিক্ষা-দীক্ষা এই অজ পাড়াগাঁয়ের নিরক্ষর জনসাধারণের নাই এবং আশাও করা যায় না। মনে হইল, যদি সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় ইহা বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে প্রদর্শনীর অভিপ্রায় অধিকতর সিদ্ধ হইত। এ অঞ্চলে এরূপ সাড়ম্বরপূর্ণ বিরাট্ সম্মেলন ও প্রদর্শনী ইহাই প্রথম। বেশ লক্ষ্য করিলাম, একটা প্রাথমিক সঙ্কোচ জনসাধারণের অবাধ মিলামিশার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিল। অন্তরের যোগাযোগ থাকিলেও, বাহ্যতঃ তাই মনে হইল, সমগ্র ব্যাপারটা যেন একতরফাই ঘটিয়া গেল। সঙ্ঘের জাতীয় কল্যাণেচ্ছা এবং গণদেবতাকে আত্ম-সচেতন করিয়া তুলিবার কর্ম্মপদ্ধতি, আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ফ্রেজারগঞ্জবাসীকে সঙ্ঘের পরিমণ্ডলে টানিয়া আনিতে সক্ষম হইবে।

দ্বিতীয় দিনের প্রকাশ্য সাধারণ অধিবেশনে আমার এ আশা যে অর্থহীন নয়, তাহা ভাল করিয়াই বুঝিলাম। অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় সভা আরম্ভ হইল। প্রথমেই সঙ্ঘের বিধিতন্ত্র পঠিত ও গৃহীত হইল। তারপর অবান্তর অনেকগুলি প্রস্তাবের মধ্যে জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান সমস্যামূলক মাত্র আটটি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হইল।

সভাপতি শ্রীযুত রায় সাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় সরলভাবে প্রস্তাবগুলি আলোচনা করিতে প্রস্তাবক ও সমর্থকদিগকে পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ দিলেন এবং অসীম ধৈর্য্যের সহিত এই সকল আলোচনা তিনি শুনিতে লাগিলেন। তিন ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা চলিল। হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সাগ্রহে বক্তাদের কথা যে হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিল, তাহা বেশ অনুভব করিলাম। অন্ততঃ কৃষক ও শ্রমিক শ্রোতৃবৃন্দ অন্তরে এইটুকু উপলব্ধি করিল যে, প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ সার্ব্বজনীন ভাবে সকলের শ্রেয়ঃ ও অভ্যুদয়কামী।

সর্ব্বশেষে সঙ্ঘনেতা শ্রীযুত রায় প্রায় এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। খুব সহজ সরল ভাষায় জনমনের বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া জাতীয় জীবনের জটিল সমস্যাগুলির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ব্যাখ্যা ও উহার সুষ্ঠু সমাধানের নির্দ্দেশ তিনি দিলেন। আশ্চর্য্য, চুম্বকের আকর্ষণে যেন আকৃষ্ট হইয়া ভ্রাম্যমান্ যে যেখানে ছিল, সকলেই আসিয়া নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া সঙ্ঘনেতার বাণী অসীম ধৈর্য্যের সহিত শেষ পর্য্যন্ত শুনিল। শ্রোতৃবৃন্দের চোখে মুখে অন্তরের তৃপ্তি ও সান্ত্বনার ছাপ সুস্পষ্ট হইয়া ধরা দিল। মানুষকে ঈশ্বরচেতনায় উন্নীত করিতে তাঁহার আকুল

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর নেতা শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত ও ব্যাণ্ডমাষ্টার শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

আকৃতি প্রতি এবং প্রত্যেকের গভীর সত্তায় গিয়া স্পর্শ দিল। বক্তৃতা সমাপ্তিমুখে তিনি ভাববিহ্বল অবস্থায় বলিলেন, ঈশ্বর অমৃতস্বরূপ। ঈশ্বরকে পাইলে ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ধন্য হইত এবং অফুরন্ত শক্তির অধিকারী হইত। এই ভাগবৎ প্রেমের উদ্বোধনকল্পেই তিনি নগরে—পল্লীতে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিতেছেন। আবেগপ্লুত কণ্ঠে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তিনি যখন বলিলেন, ভাগবৎ মণ্ডলীর সম্মুখে ভগবান আমার মুখ দিয়া কথা বলাইতেছেন, তখন অপার্থিব ভাবের প্রেরণায় বিশাল জনতার মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কেন্দ্রাভিগ একটা দিব্যশক্তির বিস্ফুরণ অনুভবের পর্দায় কম্পন তুলিল। ব্যাকুল বিহ্বলতার মাঝে তিনি বসিয়া পড়িলেন। বুঝিলাম, একটি মুহূর্ত্তে সঙ্ঘনেতা ধর্ম্মগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠা পাইলেন।

বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাক্রমে সঙ্ঘের-নির্দ্দিষ্ট উপাসনার সময় ঠিক ৭টা বাজায়, উপস্থিত সকলের সহিত সঙ্ঘসভ্যগণ সমবেত উপাসনা করিলেন। এই উপাসনার মধ্য দিয়া যেমন আত্মীয়তা ও অন্তরের বন্ধন নিবিড় হইল তেমনি সম্মেলনেরও হইল চরম এবং পরম সার্থকতা।

বড়দিন আর আজ মাঘী-পূর্ণিমা! দীর্ঘ দেড়টি মাস অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের উত্তেজনা আর মনের আকাশে যে ঝড় উঠিয়াছিল তাহাও প্রশমিত হইয়াছে। শুধু স্মৃতির পটে নারায়ণীতলার তিনটি দিনের মরম-লেখা এতটুকুও ম্লান হয় নাই। সম্মেলনে আলোচিত সঙ্ঘনেতার জাতি-সাধনামূলক গভীর তত্ত্ব ও দর্শন সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ্ হইয়া থাকিবে। এখনও চোখে চোখে দেখি, পৌষের দুরন্ত শীতে উৎসুক নরনারী একরূপ পরিচ্ছদবিহীন অবস্থায় গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত মুক্ত ময়দানের মধ্যে সভা ও প্রদর্শনীক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মৌন মূক ভাষাহীন এই গণদেবতার অন্তরের অব্যক্ত আবেদন যেন তাদের চোখেমুখে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা চাহে শিক্ষার আলো, দীক্ষার সঙ্কেত, ক্ষুধায় অন্ন—চাহে মানুষের অধিকার। তাহাদের অসহায় দৃষ্টি সঙ্ঘের প্রতি নিবদ্ধ। সঙ্ঘনেতার আশার বাণী তাহাদের অন্তরে ভরসা জাগাইয়াছে। তাই ভাবি, সঙ্ঘের স্থানীয় কেন্দ্র যদি স্থায়ীভাবে অবস্থিত হয়, তবেই এই বিরাট্ আয়োজন-অনুষ্ঠান এই দীন দরিদ্রনারায়ণকে আলোকিত, সঞ্জীবিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে। নচেৎ বিদ্যুচ্চমকের মতই ক্ষণিক আলো দিয়া আবার যে তিমির সেই তিমিরই ঘিরিয়া ধরিবে। শুধু জাগিয়া রহিবে ঝড়ের মত যাওয়া ও আসার মধ্যেকার দিব্য উপলব্ধি আর তারই পাশে সর্ব্বহারাদের বেদনাময় স্মৃতিচিহ্ন।

# ছোট জাতের মেয়ে

শ্রীঅবনী রায়

আচ্ছা রকম ঝাঁটাপেটা করিয়া নকড়ি পাঁচমাস পেটে বৌটাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিল। গ্রামের লোক বলাবলি করিল—এসব কি ছোটলোকের কাণ্ড, ম্লেচ্ছের ব্যবহার ভদ্রলোকের পাড়ায়! ধর্ম্মে সইবে না রে, ধর্ম্মে সইবে না। একবারে উচ্ছন্ন যেতে হবে।

বৌটিরও তেজ কম নয়। যাবার বেলা নকড়ির বুকে বিষদন্তে ছোবল মারিয়া বলিয়া গেল, সে তার প্রতিশোধ নেবে, নেবে—তবে তার নাম লক্ষ্মী। এ বাড়ীতে পা ধুতেও সে আর ফিরবে না; পা' ধ'রে সাধাসাধি করলেও না। এমন বাপের মেয়ে সে নয়।

গোকুল চৌধুরী বড়লোক, সমাজপতি। গ্রামের ধর্ম্ম-রক্ষার ভাবনা-চিন্তাও তাহাকেই করিতে হয়। তা' ছাড়া তার গৃহিণী বাতরোগগ্রস্ত আজ বহুদিন। সুতরাং গৃহস্থালীর ফাই-ফরমাস, ছোট-বড় দশটা কাজে লক্ষ্মীকে তাহার বড় প্রয়োজন। নকড়ি চৌধুরী মহাশয়েরই আশ্রিত। তিনি নকড়িকে ডাকিয়া বলিলেন—কাজটা খুব খারাপ হ'ল রে নকড়ে! বংশের দুলাল ঐ পেটে, শেষটায় তার অভিশাপ কুড়িয়ে গ্রামের অকল্যাণ করিস্‌নে যেন। গিয়ে একবার সেধে আয়। ঘরের লক্ষ্মী, বংশের প্রদীপ—কিচ্ছু অপমান হবে না তোর।

নকড়ি হাসিয়া জবাব দিল; বলিল, সে.কি বুঝি নে কর্ত্তাবাবু! আমারি তো ছেলে-বৌ। দু'চার দিন সবুর করুন, গিয়ে সাধ্‌তে হবে না। আপনি আসবে, যখন পেটে ভাত থাকবে না। তার ভাই তাকে ক'দিন খাওয়াবে? কি আছে তার?

কিন্তু নকড়ির আশায় ছাই পড়িল। পাঁচ মাস যায়, সাত মাস যায়, লক্ষ্মীর তেজ কমিবার আশাটি নাই। নকড়ি সংবাদ পায়, লক্ষ্মীর ছেলে হইয়াছে, বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা। নাক, মুখ, চোখ—সব তার বাপের মত।

লক্ষ্মী তার ছেলে নিয়া আছে বেশ। কিন্তু নকড়ি আজকাল বড় একা। আহা! ছেলেটিকে যদি এক নজরও দেখিতে পাইত সে! তার দিন আর কাটে না। চৌধুরী মহাশয়ের সংসারও প্রায় অচল। রক্তচক্ষু চৌধুরী আসিয়া সেদিন তাড়া দিয়া গেলেন—হাঁরে নকড়ে! কেমন আক্কেল তোর? ছোট লোক ম্লেচ্ছ কোথাকার? কি বুঝ্‌বি তুই ভদ্রের ব্যবহার! তোদের শরীরে দয়ামায়া না আছে, নাই আছে—তা' ব'লে একের পাপে গ্রামের অকল্যাণ করতেও তো দেওয়া চলে না? এ ভদ্রলোকের গ্রাম জানিস্? হপ্তাখানেক তোর সময়, এর ভিতর ভেবে চিন্তে যা' করতে হয় কর্।

নকড়িও তার ভুল বুঝিতে পারিয়াছে; ইচ্ছাও হয় যাইয়া সপুত্র লক্ষ্মীকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনে। কিন্তু সেখানে যাবার তার সাহস নাই; পাছে তার ভাইরা তার অপমান করে। যে গোঁয়ার-গোবিন্দ ভাইরা সব তার। লক্ষ্মীর বাপের বাড়ী বেশী দূরেও নয়। ইদানীং লোকমুখে সে সংবাদও পাইয়াছে, লক্ষ্মীর ভাইরা নাকি নকড়িকে লক্ষ্য করিয়া শাসাইয়াছে—একবার বাগে পেলে হয়, জ্যান্ত পুঁতে ফেল্‌বো না?

সেদিন নকড়ি লক্ষ্মীদের ঘাটের অদূরে বাঁশ-ঝাড়ে ওৎ পাতিয়া বসিয়া রহিল। যদি কখনও লক্ষ্মীকে একাকী পাওয়া যায়। হঠাৎ সে সুযোগ সমুপস্থিত। লক্ষ্মী এক গাদা এঁটো বাসন হাতে করিয়া ঘাটে উপস্থিত। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। সে বাঁশঝাড় হইতে বাহির হইয়া আসিল;—ডাকিল—লক্ষ্মি।

সন্ধ্যার অন্ধকারেও নকড়িকে চিনিতে লক্ষ্মীর অসুবিধা হইল না। সে হঠাৎ মাথায় কাপড় টানিয়া, ঘৃণায় অপমানে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

নকড়ি সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া মিনতির সুরে কহিল—ঘাট্ মানচি লক্ষ্মি, আর তোকে অনাদর করব না।

লক্ষ্মী নীরব।

—লক্ষ্মি, অজ্ঞানে করেছি কাজ। কত যে অনুতাপ হচ্ছে!

লক্ষ্মী পূর্ব্ববৎ।

—ঘর আমার আঁধার রে লক্ষ্মি! কত কষ্টে যে দিন কাট্‌ছে! বংশের প্রদীপ তোর কোলে। একবার নিয়ে চল্‌। আমার আঁধার ঘরে বাতি জ্বলুক।

লক্ষ্মী অধোবদনে কি ভাবিতে লাগিল।… কিন্তু নকড়ির যে বিলম্ব সয় না। সে খপ্‌ করিয়া লক্ষ্মীর হাত দুইটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া কহিল—ধ'রে দেখ্‌ লক্ষ্মি! কি ঝড় বইছে এখানটায়। আঁধার ঘরে এই ঝড়ের নর্ত্তনে বুক বুঝি ভেঙ্গে যায়! কি ক'রে দেখাবো তোকে? বল্‌ লক্ষ্মি, বল্‌,—আমি যাব, খোকাকে নিয়ে যাব, তোমার খোকাকে নিয়ে যাব। অমত করিস্‌…

এমন সময়ে কোথা হইতে হঠাৎ—তবে রে…!

—ও বাবা গো, মেরে ফেল্‌লে গো!

দুম্‌, দুম্‌, দুম্‌…ধপাস্‌।

—ও মা গো! বলিয়া নকড়ি ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল।

—একি কর্‌লে দাদা, রক্ষা কর, ক্ষমা কর! তোমার পায়ে পড়ি, বলিয়া লক্ষ্মী আততায়ীর লাঠীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

পাড়ার লোকে জিজ্ঞাসা করিল—হাঁরে, কি করে' কি হ'ল?

নকড়ি জবাব দিল—কাঠ কাট্‌তে গিয়েছিলুম, হঠাৎ ডাল ভেঙ্গে,—

উ-হু-হু-হু,‥ মাগো!…

গোকুল চৌধুরী বলিলেন,—ডাক্তার ডাক্‌, নকড়ে।… …এভাবে বিনা চিকিৎসায় আত্মহত্যা করিস্‌ নে।

নকড়ির মুখে হাসি ফোটে; বেদনার হাসি। বলে, —এ কি ভদ্দর লোকের প্রাণ বাবু? পাথরের মত শক্ত প্রাণ, এ প্রাণ সহজে যাবার নয়। এ আঘাত সামান্য, দু'দিনেই সেরে যাবে, দেখ্‌বেন। কি হবে ডাক্তার ডেকে?

আসলে আঘাত খুব গুরুতর। তায় অপমান, আশা-ভঙ্গ। তার অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপের দিকে চলিয়াছে।

এদিকে লক্ষ্মীর প্রাণেও অশান্তির তুফান। সে সামনে না থাকূলে লোকটাকে খুন ক'রে ফেল্‌তো? ভাই তো নয়, মহাশত্রু।…দিন যায়। একদিন সে সংবাদ পাইল, —নকড়ির সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। ওষুধ নাই, ডাক্তার নাই, দেখিবার মত একটা লোক পর্য্যন্ত কাছে নাই। সে সংবাদ পাইল, লোকটা রোগের ঝোঁকে প্রলাপ বকে, লক্ষ্মীকে খোঁজে, আঁধার ঘরের মাণিক ছেলেকে ডাকে। সে সইতে পারিল না। হাজার হোক্‌, স্বামী তো? ইচ্ছা হইল, তখনই ছুটিয়া যায়। কিন্তু তার ভাইরা তাকে যাইতে দিল না, বলিল,—প্রত্যক্ষে কি পরোক্ষে এ বাড়ীর যে কেহ ঐ ছোট লোকটার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, তাকেই সে দেখে নেবে।…এক উপায় পলায়ন। পরিশেষে লক্ষ্মী তা-ই করিল।

রজনী প্রভাতকল্প। আলুথালুকুন্তলা, পাগলপারা লক্ষ্মী ছেলে কোলে লইয়া গৃহে উপস্থিত। ঘরে আলো নাই, জল নাই, ঘরে দ্বিতীয় লোকটী পর্য্যন্ত নাই। লক্ষ্মী লক্ষ্য করিয়া দেখিল—স্বামী ভূমিতলে লুটাইতেছে। বিছানাপত্র নাই, গায়ে একখানা কাপড় পর্য্যন্ত দেখা যায় না।

লক্ষ্মী ডাকিল—ওগো, আমি এসেছি, চেয়ে দেখো, আমি এসেছি।

কিন্তু কোন উত্তর নাই।

লক্ষ্মী স্বামীর কণ্ঠে হাত দিয়া দেখিল। ঠাহর করিতে পারিল না, মরা নদীর স্রোতের ন্যায় কণ্ঠের শিরা নড়ে কি নড়ে না।

লক্ষ্মী উচ্চৈঃস্বরে আবার ডাকিল—কথা কও; ওগো, চেয়ে দেখো, তোমার খোকা এসেছে; আঁধার ঘরে আলো জ্বলেছে।

তবু কোন কথা নাই।

—ওগো, খোকাকে কোলে নাও। তোমার ছেলে, দেখো কি সুন্দর!

অন্ধকারে হাতড়াইয়া লক্ষ্মী জল খুঁজিয়া আনিল। আনিয়া স্বামীর মুখে জল দিল। আঁচল ঘুরাইয়া বাতাস করিল; কিন্তু কেহ কথা কহিল না।

প্রভাতের পাখী গান গাহিয়া লক্ষ্মীর দগ্ধ অদৃষ্টকে বিদ্রূপ করিল। লক্ষ্মী নকড়ির নাকের ডগায় হাত রাখিয়া

দেখিল, তখনও শ্বাস বহে। ... লক্ষ্মীর প্রাণে আশার সঞ্চার হইল।

লক্ষ্মী রজনীপ্রভাতে গোকুল চৌধুরীর পায়ে লুটাইয়া বলিল—আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিন কর্ত্তাবাবু। আমার যথাসর্ব্বস্ব দিচ্ছি। বলিয়া লক্ষ্মী কাণের মাকৃড়ি, হাতের বালা, পায়ের মল চৌধুরী মহাশয়ের পায়ের কাছে রাখিল।

গোকুল এ সমুদয়ের বিনিময়ে ডাক্তার ও পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন। ডাক্তার আসিল, পথ্য জুটিল, শুশ্রূষাও হইল, কিন্তু রোগী বাঁচিল না।

চৌধুরী মহাশয় লক্ষ্মীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—যা' হবার হয়ে গেছে। সবই কপালের লিখন, কি হবে কেঁদে কেটে! এবার চল্ আমার বাড়ী।

লক্ষ্মী শান্তস্বরে জবাব দিল—কোথাও যাব না কর্ত্তাবাবু! একবার চ'লে গিয়ে একজনকে হারিয়েছি, আবার ভুল ক'রে স্বামীর শেষ চিহ্ন ছেলেকে হারাতে পারব না। এ আমার ইহকালের তীর্থক্ষেত্র, পরকালের স্বর্গ। আমরণ এ বাড়ীর মাটিতেই প'ড়ে থাকব। ছেড়ে গেলে আমার ছেলে বাঁচবে না।

—কিন্তু ভেবে দেখেছিস্, আপদে বিপদে কে দেখ্‌বে তোকে জনমানবহীন এই নিঃশব্দ পুরীতে?

—দেখ্‌বে আমার ছেলে।

গোকুল হাসিলেন, বলিলেন—দেখ্‌বে, না? যে বীরপুরুষ তোর এই ছ' মাসের ছেলে!

লক্ষ্মী সবিনয়ে বলিল—বিদ্রূপ করবেন না, কর্ত্তাবাবু, যে ছেলে এত দুঃখের পরেও পোড়াকপালী মাকে আত্মহত্যা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সে ছেলে যে মার চক্ষে কত বড় বীর, তা' আপনারা বুঝ্‌বেন না।

—ইঃ, তেজ দেখ! চৌধুরী মহাশয় সত্য সত্যই বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, এ তো ভাল কথা নয়, বাছা! আর কোন ভয় না থাক্, পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্মের ভয় তো আছে। যে লম্পটের পাড়া! তোদের এতে কিছু যায় আসে না বটে, কিন্তু এ ভদ্রলোকের গ্রাম, ভুলে গেলে চল্‌বে কেন? আর কিছু না থাক্, তোর রূপ আছে, যৌবন আছে, এ সব কি ক'রে ঢাকা দিবি শুনি?

লক্ষ্মী চঞ্চল হইল; বলিল, আপনার পায়ে পড়ি কর্ত্তাবাবু, এসব কথা ব'লে আমায় ভয় দেখাবেন না। এই বলিয়া লক্ষ্মী সজোরে ছেলেকে বুকে চাপিয়া ধরিল। কহিল, এ আমার সাক্ষাৎ স্বর্গ। স্বর্গেও কি রূপ-যৌবনের দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না, কর্ত্তাবাবু?

কিছুতেই লক্ষ্মীর সঙ্কল্প টলিল না। অগত্যা চৌধুরী মহাশয় লক্ষ্মীকে শেষ সাবধান করিয়া ইঙ্গিতে বলিয়া গেলেন—সব বুঝি, বাছা, এসব দেখে দেখেই চুল পাকালাম। গ্রামের কোণে একলা ঘরে একাকী থাকৃতে হয় থাকো, আপত্তি নাই, কিন্তু ভদ্রলোকের পাড়ায় চলাচলিটা একটু কম ক'রে কোরো।

ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথ অবলম্বন করিয়া প্লাবনদিনের জলস্রোত যেমন হু-হু করিয়া বাহির হইয়া আসে এবং বিপুল বাঁধ ভাসাইয়া, ধ্বসাইয়া পথ করিয়া চলিয়া যায়, ঠিক তেমনি ভাবে ভাঙ্গা কপালের ছিদ্রপথে দুর্ভাগ্যরাশি প্রবেশ করিয়া সকলের অলক্ষ্যে একান্ত অজ্ঞাতে কি প্রকারে কখন যে মানুষের সুখ-সৌভাগ্য ধুইয়া মুছিয়া ফেলে, তাহা বলিবার ক্ষমতা বুঝি স্বয়ং বিধাতা পুরুষেরও নাই। লক্ষ্মীর দগ্ধ অদৃষ্ট ছেলের সৌভাগ্য সইতে পারিল না। চার পাঁচদিনের বেহুঁষ জ্বরে ভুগিয়া ছেলেটিও মারা গেল। দিগন্তপ্রসারিত জমাটবাঁধা অন্ধকার লক্ষ্মীর কপাল জুড়িয়া বসিল।

লক্ষ্মী মিথ্যা বলে নাই। মার চক্ষে সন্তান—সে যত বড় শিশুই হউক, সে কত বড় বীর, তাহা অন্যের বুঝিবার সাধ্যই নাই। লক্ষ্মীর দীর্ণ বক্ষে বজ্রের শক্তি আর বাত্যার সাহস সঞ্চারিত করিয়া এই বীরপুঙ্গবের লাবণ্যঢল বদনমণ্ডলে যখন স্বর্গের সুষমা খেলিয়া যাইত, লক্ষ্মী হৃদয়ে তখন মত্ত হস্তীর বল পাইত। আর সে বলে সে শতেক বিপদ্, সহস্রেক প্রলোভন অবলীলাক্রমে জয় করিবার সামর্থ্য রাখিত। কিন্তু পুত্রের মৃত্যুতে রাতারাতি তাহার সমস্ত জোর-বল, শক্তি-সাহস কোথায় যে অন্তর্হিত হইল!

এই বিপদ্‌বার্ত্তা অবগত হইয়া লক্ষ্মীর ভাই তাহাকে লইতে আসিয়াছিল, কিন্তু সে এই বলিয়া তাহাকে দূর

হইতেই তাড়াইয়া দিয়াছে—সাবধান বল্‌চি; আমার বাড়ী ঢুকো না, ভাই নয়, শত্রু, তুমি আমার যম।

পরিশেষে গোকুল চৌধুরীর বাড়ীতেই তাহার আশ্রয় মিলিল।

আবার দুর্দ্দৈব; গোকুল চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী হঠাৎ গতাসু হইলেন। এখন লক্ষ্মীকেই তাহার ঘর-সংসার সব দেখিতে হয়। সে পেটে খায়, আর গতরে খাটে। বাসন মাজা, ঘর নিকানো, উঠান ঝাঁট্—সব তার করণীয়।

দিন যায়। লক্ষ্মী ও গোকুলের দিনও কাটে। পুরুষ-মানুষের রান্নাবাড়া গোকুলের ভাল লাগে না। লক্ষ্মীকে কাছে ডাকিয়া বলেন—এ সব রান্না আর যে খেতে পারিনে, লক্ষ্মি! আজকের রান্নাবাড়াটা—

লক্ষ্মীর মুখ মলিন হইয়া উঠে; বলে, কি যে বলেন বাবু! কেন আমাকে অপরাধী করেন, আমি যে ছোট জাত!

গোকুলের মুখে কাষ্ঠ হাসি; বলে, কেন তুই নিজকে এত ছোট ভাবিস্ বল্‌ত? যে ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই যে তোদেরও সৃষ্টি করেছেন রে!

লক্ষ্মী নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া কি ভাবে।

চৌধুরী মহাশয়ের গৃহিণীর মৃত্যু আজ নূতন নহে। এবারের মৃত্যু তার চরম মৃত্যু মাত্র। নইলে, বাতব্যাধিতে পঙ্গু তিনি আজ আট বৎসর, মরারই সামিল। এই মরার সেবা-যত্নের জন্যই গোকুলের জন্মধারণ। কোনদিন কোথাও তার কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটে নাই। গাড়ী-জোড়া ঘোড়ার ন্যায় কর্ত্তব্যের কঠোর পথে অবিরাম গতিতে তাহাকে এতদিন চলিতে হইয়াছিল। অন্যদিকে চোখ ফিরাইবার সময়ও তাহার ছিল না, সুযোগও মিলে নাই। আজ এতদিন পরে বিধাতার নিষ্ঠুর অনুগ্রহে সব বাধা-বন্ধন মুক্ত হইয়া ছাড়া-পাওয়া ঘোড়ার ন্যায় তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালিত করিবার সুযোগ পাইলেন। সুদূর অতীতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, দাম্পত্যজীবনের একটা দিক্ তাহার তখনও অপূর্ণ। কবে—কোন্ অতীতে তাহার চরিতার্থতা সম্পন্ন হইয়াছিল, আজ বড় মনে পড়ে না।

বেলা দ্বিপ্রহর। গোকুল কোথায় কি কাজ সারিয়া ঘর্ম্মাপ্লুত কলেবরে বাড়ী ফিরিয়াছেন। বারান্দায় দাঁড়াইয়া তিনি ডাকিলেন—লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী কুশাসন, গামছা ও পাখা হাতে করিয়া উপস্থিত। গোকুল উপবেশন করিলেন। লক্ষ্মী পাশে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে লাগিল। গোকুলের সুদীর্ঘ জীবনে এমন ঘটনা নূতন। তিনি বিমুগ্ধ হইলেন। একদৃষ্টে লক্ষ্মীর যৌবন-তরল বদনপানে চাহিয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন। হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন—এত ভাল তুই আমায় বাসিস্ লক্ষ্মি!

সলজ্জ হাসি হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল—আমার আর কে আছে, কর্ত্তাবাবু!

গোকুল শুনিলেন, কিন্তু ভুল বুঝিলেন; বলিলেন, তোকে এ বেশে দেখ্‌লে বড় কষ্ট হয় লক্ষ্মি! এ বয়স—এ রূপ—

আপনার পায়ে পড়ি, কর্ত্তাবাবু! আমি বিধবা।

—বিধবাদের বড় কষ্ট। নারে লক্ষ্মি! কিন্তু জানিস্, আজকাল অনেক বিধবার বিয়ে পর্য্যন্ত—

কথাটা শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার ধৈর্য্য লক্ষ্মীর রইল না, সে পাখা রাখিয়া পলাইল।

নিঝুম নিশুতি রাতি।

পৃথিবীর বুকে শ্রাবণধারা নামিয়া আসিল—ঝম্-ঝম্-ঝম্। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুচ্চমক আর কড়কাধ্বনি।... দক্ষিণে-বামে, সম্মুখে-পশ্চাতে শুধু জমাট-বাঁধা অন্ধকার আর বাত্যার শন্-শন্।

খাটের উপর চৌধুরী মহাশয়। অদূর ঘরের কোণে লক্ষ্মী মাদুরের উপরে শুইয়া। লক্ষ্মীর বুক জুড়িয়া কত যে চিন্তা। গোকুলের কথাবার্ত্তা, হাবভাব আজকাল তার কাছে বড় ভাল ঠেকে না। দমকা হাওয়ায় কেরোসিনের ডিবা হঠাৎ নিবিয়া গেল। ভিতর বাহির একাকার।

গোকুল ডাকিলেন—লক্ষ্মি!

—ডাক্‌চেন বাবু?

—চেয়ে দেখ্, লক্ষ্মি!

—দেখ্‌চি তো, বাবু!

—কিছু বুঝ্‌তে পারছিস্?

—আঁধার কেটে যাচ্ছে—এবার ঝড় থাম্‌বে।

গোকুলের বুকে দীর্ঘশ্বাস, বড় করুণ। বলিলেন—বৃথা

আশা রে, লক্ষ্মি! এ আঁধারের শেষ নাই। এ আঁধার কাট্‌বে সেদিন, যেদিন সব শেষ।

লক্ষ্মী শিহরিল—বাবু কি বলে?

গোকুল খাট হইতে নামিয়া আসিলেন; বলিলেন, এখানটায় চেয়ে দেখ, লক্ষ্মি! কতদিনের অন্ধকার জমা হ'য়ে আছে এ বুকের ভিতরটায়। গোকুল অন্ধকারে একটু আগাইলেন।

লক্ষ্মী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল; বলিল, কাছে ঘেসো না বল্‌চি ঠাকুর; চামার কোথাকার! তুমি না বামুন? একটা অসহায়া মেয়ে-মানুষকে আশ্রয় দেবার ছলে নিজের পশুবৃত্তি চরিতার্থ কর্‌তে লজ্জা করে না তোমার?

গোকুলের মুখে পৈশাচিক হাসি, হা-হা-হা…

তারপর সজোরে দরজা খোলার শব্দ।

লক্ষ্মী পথে নামিল।

গোকুলের তখন খুন চাপিয়া গিয়াছে। তিনিও লক্ষ্মীর পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। কিন্তু এ ঝড়-বাদল মাথায় করিয়া "ছোট লোকের মেয়েটা" কোথায় লুকাইল?

# হিন্দু-ধর্ম্ম—মানব-ধর্ম্ম

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

কাল দুরতিক্রম। কালের প্রভাবে নানাবিধ সমস্যার উদয় হইয়াছে। এমন দুরূহ, জ্ঞানবৃদ্ধেরা হতবুদ্ধি হইয়াছেন। নৈরাশ্য, নিরুদ্যম হিন্দুসমাজকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।

মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ—বহুজন যে পথে গিয়াছে, সেই পথ। এমন নীতিগর্ভ উপদেশ আর হইতে পারে না। যে পথে বহুলোক গিয়াছে, বুঝিতেছি সে পথে বিঘ্ন নাই! বিঘ্ন থাকিলে সে পথে যাইতে পারিত না, প্রত্যাবৃত্ত হইত। অতএব সে পথে নিঃসঙ্কচিত্তে চলিয়া যাইতে পারি, গন্তব্য স্থানে অবশ্য পঁহুছিব।

কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রচণ্ড আঘাতে সে পথ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। কালচক্র সুদিন না আনিয়া দুর্দিন আনিয়াছে। অবস্থা-বিপর্যয়ে জনে জনে এক এক পথে চলিয়াছে। 'প্রগতি' এই শব্দ শুনিতেছি। কিন্তু কোন্ দিকে? লক্ষ্য স্থির নাই, কেন চলিয়াছে জানে না। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। তদ্দ্বারা আমার অভিপ্রায় স্পষ্ট হইবে।

যাহারা গুরুজনের অনুগত ছিল, তাহারা ভয় প্রদর্শন করিয়া নূতন নূতন অধিকার প্রার্থনা করিতেছে। তাহারা 'প্রার্থনা' বলে না, বলে 'দাবী'। কলেজের ছাত্র অধিকারীকে বলিতেছে, আমাদিগকে এই অধিকার দাও, নচেৎ আমরা ধর্মঘট করিব, কলেজ যাইব না। অর্থাৎ যাহাদের বিচার-শক্তি পাকে নাই, তাহারা অধিকার বিচার করিতেছে।

কভু কভু হোষ্টেলবাসী ছাত্রেরা বলে, আমাদের দাবী মেটাও, নচেৎ আমরা ধর্মঘট করিব, আমরা না খাইয়া আত্মহত্যা করিব। সে হত্যা-পাপে তুমি নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে। —এমন করুণ ও হাস্যরসের অপূর্ব মিশ্রণ আর দেখা যায় না। স্নেহ ও করুণাপ্রার্থনার সহিত ভয়প্রদর্শন বিরুদ্ধ সংযোগ। "হত্যা দেওয়া" বহুকালের পুরাতন। বোধ হয় অস্ত্রটি নারী-জাতির আবিষ্কার। এই অস্ত্রচালনা দ্বারা মানিনী মানরক্ষা করিতেছে। শক্তিমান্ আত্মহত্যা করিতে চায় না। কৃত্রিম ভয়-প্রদর্শনও করে না।

পুত্র চোখ রাঙাইয়া পিতাকে বলিতেছে, আমি কি করি, কি না করি, সে চর্চায় তোমার অধিকার নাই। পত্নী পতিকে বলিতেছেন, আমার অধিকারে হাত দিও না। আমি আছি বলিয়া এই গৃহ, নচেৎ অরণ্য।

গ্রামে যাই—ঈর্ষ্যা, দ্বেষ ও দলাদলি। আমাকে গ্রামের অধিকারী কর। নগরেও সেই কথা—আমাকে অধিকারী

কর, তোমাকে শাসন করিতে দাও। যে আপনাকে বশে আনিতে পারে নাই, সে পরকে বশীভূত করিতে চায়।

দেশ-সেবার অধিকার লইয়াও কলহ। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হইতে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও আইনসভার মেম্বর, মুানসিপালটির কমিশনার, সকলেই দেশ-সেবার অধিকারলাভের জন্য লালায়িত। উৎকণ্ঠার শেষ নাই, অর্থব্যয় ও ছুটাছুটির অন্ত নাই; ছাপায়, বক্তৃতায় কাতর প্রার্থনা—আমায় সেবাকর্মে অধিকার দিন। কিন্তু সেবাধর্ম-পালন অতিশয় কঠিন, আত্মোৎসর্গ ইহার মূল।

কবি নিরঙ্কুশ অধিকার দাবী করিতেছেন। তাঁহার 'প্রেরণায়' বাধা পড়িলে, তিনি জীবন্ত সাহিত্যরচনা করিতে পারিবেন না। চিত্রশিল্পী বলিতেছেন, কলাতেই কলার সার্থকতা। তাঁহার 'প্রেরণা' হয়, তিনি চিত্র লেখেন। তাঁহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিছুই নাই। গ্রাম্যজন 'প্রেরণা' বুঝে না। বুঝে, দেবতার ভর হয়। আর যে যে দেবতার আরাধনা করে, তাহার স্কন্ধে সে দেবতার ভর হয়। অপদেবতার ভর হইলে লোকে 'ত্রাহি, ত্রাহি' করিতে থাকে। যিনি সমাজের ইষ্ট না দেখিয়া কামোপভোগের চিত্র লিখিতে উৎসাহী, তিনি সেই সমাজের কাছে ধন ও মান দাবী করেন।

পূর্বে বিবাহে কন্যাপণ-গ্রহণ প্রচলিত ছিল। সারদা আইন সত্ত্বেও কন্যাপণ কমে নাই। কন্যাপণ কন্যার যৌতুকস্বরূপ গৃহীত হইলে, সমাজের মঙ্গল হইত। কিন্তু কন্যার পিতা সে পণ আত্মসাৎ করিয়া কন্যাকে বিক্রয় করিতেছে। ৭।৮।৯ বৎসর অতিক্রম করিতে না করিতে কন্যার বিবাহ হয়, আর ৩০।৪০ বৎসরের বর ঘরে লইয়া যায়। ফলে বহু কন্যা বাল-বিধবা হয়। অর্থাভাবে বহু পুরুষের বিবাহ হয় না।

অন্যদিকে ইংরেজী-শিক্ষিত বরের মূল্য ক্রমে ক্রমে এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, বহু কন্যার বিবাহ হইতেছে না। অনূঢ়া অবস্থায় তাহাদের যৌবন অতিক্রান্ত হইতেছে। কন্যাকে যৌতুক-প্রদান পিতার কর্তব্য। কিন্তু বরের মূল্য-দান নূতন। এই সমস্যার উপর আর এক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। ইংরেজী-শিক্ষিত যুবা দারগ্রহণে অনিচ্ছুক। কেহ বলে, তাহার অর্থ নাই, পুত্র-কলত্র-পোষণ করিতে পারিবে না। কেহ বলে, স্বাধীনতার তুল্য সুখ নাই।

নব্যেরা বলিতেছেন, হিন্দু-সমাজ জরাজীর্ণ হইয়াছে। ইহাকে ভাঙ্গিয়া নূতন সমাজ গড়িতে হইবে। এখন কর্ণধারহীন নৌকার তুল্য কেহ ঘূর্ণাবর্তে নিমজ্জিত হইবে, কেহ চড়ায় ঠেকিয়া বিদীর্ণ হইবে, কেহ-বা অকূল সমুদ্রে অদৃশ্য হইবে। আগে চল, আগে চল।

কিন্তু এখানে বুদ্ধি ও জ্ঞানযোগে সমাজনির্মাণের লক্ষণ কোথায়? আর, যাহারা অন্ধভাবে কালের স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়, তাহারা কিরূপে অন্যকে পথপ্রদর্শন করিবে? আগে চল—কোন্ দিকে চলিব?

কেহ বলে, আমি যাহা সত্য বলিয়া অনুভব করি, আমি তাহা অবশ্য পালন করিব। অপরিণতবুদ্ধি যুবাও বলে, সে সত্য অনুভব করিয়াছে, বুঝে না—সত্য আপেক্ষিক, জ্ঞানানুসারে ইহার প্রভেদ হয়। আর যে ইন্দ্রিয়গ্রাম বশীভূত করিতে পারে নাই, যাহার মন সংযত হয় নাই, তাহার মুখে সত্যের মহিমা-ঘোষণা কটু শোনায়।

কেহ বলে, আত্মপ্রসাদ তাহার কর্মের সাক্ষী। কিন্তু এই সাক্ষী সামাজিক শিক্ষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে। দেবীর সম্মুখে পশুবলি হইতেছে। শাক্ত উল্লসিত, কিন্তু বৈষ্ণবের চক্ষু মুদিত। ইয়োরোপের বর্তমান মহাযুদ্ধে হতাহত নরনারীর আর্ত্তনাদ গগন ভেদিয়া উঠিতেছে। জেতার হর্ষের উল্লাসও ধ্বনিত হইতেছে। আত্মার প্রসন্নতায় আদি-মানবের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি স্মরণ হইতেছে না।

অর্থনীতিবিৎ বলিতেছেন, অর্থনীতিকে মূল করিয়া নূতন হিন্দুসমাজ গড়িতে হইবে। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে এই নীতিতে কলহ উৎপন্ন হইয়াছে, শান্তি আসে নাই। সমাজতত্ত্ববেত্তা বলিতেছেন, তিনি নানা সমাজের উৎপত্তি, উন্নতি, অবনতি অবগত আছেন। তিনি নূতন হিন্দু-সমাজ গড়িতে পারিবেন। নানা ধর্মশাস্ত্রবেত্তা বলিতেছেন তিনি ধর্মের মর্ম বুঝিয়াছেন, সার্বজনীন ধর্ম নূতন হিন্দু-সমাজের মূল করিতে হইবে। কিন্তু ইহারা জনে জনে সমাজ-সৌধের এক অঙ্গনির্মাণের কল্পনা করিতেছেন। কেহ সর্বাঙ্গসুন্দর পরিপূর্ণ সৌধের প্রতিমা দেখাইতে

পারেন নাই। পরধর্ম ভয়াবহ, ইহা বালকের উক্তি নয়। মূল ছিন্ন হইলে শাখা-পল্লব শুষ্ক হয়।

হিন্দু-ধর্ম মানব-ধর্ম। এই কারণে ইহা সার্বজনিক। কোন দেবতা এই ধর্ম প্রেরণ করেন নাই, কোন ঋষি প্রতিষ্ঠা করেন নাই। অপর প্রাকৃতিক পদার্থের মত ইহা প্রাকৃতিক। এই হেতু ইহা সনাতন। ঋগ্বেদে আছে, মনুর শাসন ঔষধের তুল্য হিতকর। এক সমিতি আর্য-সমাজের ব্যবস্থাপক ছিলেন। সে সমিতিতে কয়েক জন ঋষি, রাজা ও সেনাপতি ও অপর কয়েক জন মান্য লোক থাকিতেন। সে সমিতির অধিপতির নাম মনু ছিল। সমিতি সমাজের সুখ ও শান্তির ব্যবস্থা করিতেন। সেই ব্যবস্থাই মনুর শাসন। আর্য-সমাজ কত কালের পুরাতন, কেহ বলিতে পারে না। এত পুরাতন যে, অনাদি বলিলেও চলে। এক মনু বৈবস্বত মনু নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন। পরবর্তী কালের আরও কয়েক জনের নাম ঋগ্বেদে পাওয়া যায়।

আচার ও ব্যবহার দ্বারা সমাজ ব্যবস্থিত হয়। এই অতিশয় দীর্ঘকালে আচার ও ব্যবহারের পরিবর্তন ও পরিবর্জন হইয়াছে। কত নূতন নূতন ব্যবস্থার যোজনা হইয়াছে, কিন্তু ধারাভঙ্গ হয় নাই। সেই ধারার দুইটি লক্ষণ চিরদিন বর্তমান আছে। সকল মানুষ সমান নয়, নর-নারী সমান নয়। ইহা প্রত্যক্ষ। যদি নয়, তাহার কারণ অবশ্য আছে। আধুনিক বিজ্ঞান তাহার কারণ বলিতে পারে না। অভিব্যক্তি-বাদ নিরুত্তর। এক পিতা-মাতার সন্তান সকলে সমান হয় না। ইহা প্রত্যক্ষ। যাহা কার্যের পূর্ববর্তী, তাহাই কারণ। অতএব পূর্বজন্ম স্বীকার করিতে হইতেছে। তৎসহ সুকর্ম-কুকর্ম, সুকৃতি-দুষ্কৃতি আসিতেছে। কর্মের ফলের ধ্বংস নাই। এই জন্মের কৃতকর্মের ফলের ধ্বংসও নাই। অতএব পরজন্ম স্বীকার করিতে হইতেছে। কাল অনন্ত। ইহার আদি নাই, অন্তও নাই। মানুষের জীবৎকাল সেই অনন্ত-কালের নিমেষের কোটির কোটি অংশও নয়। তাহার সম্মুখে অনন্তকাল পড়িয়া আছে। তাহার সুখভোগের নিমিত্ত ত্বরাও নাই। যাহারা মনে করে এই জীবৎকালেই ভোগের পরিসমাপ্তি, তাহারাই ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। পাশ্চাত্যদেশে এই অবস্থা চলিতেছে। সে দেশে দেহের পূজা যত বাড়িতেছে, দেহী তত দূরে চলিয়া যাইতেছে। এই যে অবিরাম ছুটাছুটি—কিসের জন্য? দ্রুতগতিই কি কাম্য?

সকল মানুষ সমান নয়। অতএব সকলের অধিকারও সমান হইতে পারে না। এইটি স্বীকার করিয়া লইলে, কলহ থাকে না। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও পরীক্ষা, এই তিন উপায় দ্বারা এক হইতে অন্যকে প্রভেদ করিয়া থাকি। যদ্দ্বারা যাহাকে বিশেষ করি, তাহাই তাহার ধর্ম। এই কারণে হিন্দু-ধর্মের আচারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। সদাচার ও শিষ্টাচার-বর্জিত লোক হিন্দু হইতে পারে না।

শৌচ ও বিনয়, ইহার প্রধান লক্ষণ। শুধু বাহ্য শৌচ নয়, নিজের দেহ, ভোগ্য, পানীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার, গৃহ-প্রাঙ্গণ, প্রতিবেশ শুচি হইলেই সদাচারী হইতে পারা যায় না। আভ্যন্তর শৌচ, মনের পবিত্রতা, সৎকর্মে উৎসাহ, কুৎসিৎ কর্মে নিবৃত্তি, কাম, ক্রোধ, লোভের দমন ইত্যাদি দ্বারা আভ্যন্তর শৌচ নিষ্পন্ন হয়। এইজন্য দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হয়। অভীষ্টদেবের শরণদ্বারা দেবঋণ, জ্ঞান-আলোচনাদ্বারা ঋষিঋণ ও পিতৃমাতৃগণের তর্পণদ্বারা পিতৃ-ঋণ পরিশোধিত হয়। তর্পণ শব্দের অর্থে সতিল জলাঞ্জলিপ্রদান নয়। পিতামাতা পুত্রের অভ্যুদয় কামনা করেন। পুত্র তাঁহাদের কামনা সিদ্ধ করিলেই তাঁহারা তৃপ্ত হন। তাহাতে পুত্রের মঙ্গল, তাঁহাদের নয়। গার্হস্থ্য আশ্রমে এই ঋণ পরিশোধ করিতে পারা যায়। সে আশ্রমে থাকিলে ধর্ম, অর্থ কাম, এই ত্রিবর্গ সাধিত হয়।

অধিকারিভেদ স্বীকার করাতে হিন্দুসমাজের সাজাত্য হয় নাই। একদিকে ইহার দ্বারা হিন্দুসমাজ দুর্বল হইয়াছে, অন্যদিকে গুণের উৎকর্ষের পথ মুক্ত হইয়াছে। তুমি গুণী হও, বিদ্বান্ হও, সদাচারী হও, জ্ঞানবান্ হও, তোমার অধিকার আপনই আসিবে। যে বাহ্যাভ্যন্তরে শুচি, তাহার আসন সর্বত্র সমান। এই শৌচ-লাভের জন্য তপস্যার অনুষ্ঠান চাই। দেবদেবীর পূজায় সে অনুষ্ঠান।

উপবাস, ইন্দ্রিয়সংযম ও অভীষ্টলাভের সঙ্কল্প তপস্যার প্রথম সোপান। শৈশব হইতে অভ্যাস করাইলে বালক-বালিকার দৃঢ়চিত্ততা হয়। বড় হইলে তাহারা বলিতে পারে, "না এ কর্ম করিব না।" যে ধর্মে থাকিয়া ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা টলে নাই, লক্ষ্মণের দাস্যভাব শিথিল হয় নাই, যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ পার্থের সারথি হইয়াছিলেন, কর্ণের তুল্য দাতা ছিল না—সে ধর্মের জয় নিশ্চিত। যে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত, তিনি বাঙ্গালী ছিলেন।

মানুষ প্রথমে পশু ছিল। কাম, ক্রোধ, লোভ, প্রতিহিংসা পশুর প্রকৃতি। ক্রমে ক্রমে কাহারও হৃদয়ে সে সব প্রবৃত্তি প্রচ্ছন্ন হইল। কাহারও হৃদয়ে রূপান্তরিত হইয়া ক্ষমা, তিতিক্ষা, দয়া, কারুণ্য আকারে প্রকাশ পাইল। তিনি উচ্চভূমিতে দেখিলেন, "তোমাতে আমি আছি, তুমি আমি এক, তোমার দুঃখ নয়, আমার দুঃখ। আমার জন্যই দেবালয়, জলাশয়, বিদ্যালয়, বৃক্ষ, আরাম প্রতিষ্ঠা করিতেছি। তোমার উপকার না, আমার উপকার। তোমাতে আমাকে দেখি বলিয়াই পুণ্যানুষ্ঠান করি।" আরও উর্দ্ধে উঠিয়া দেখিলেন, সর্বভূতেই আমি। আমি ছাড়া কিছুই নাই। জড়বিজ্ঞান নূতন নূতন আবিষ্কার করিতেছে, কিন্তু শান্তির সন্ধান পায় নাই।

প্রবর্তক-সঙ্ঘ এই শিক্ষাপ্রচারে নিযুক্ত হইয়াছেন। যে বিনয়-শিক্ষা স্কুল, কলেজে হয় না, আমাদের ঘরেও হয় না, সে শিক্ষা প্রবর্তন করিয়া দেশে দান্ত, শান্ত, কর্মবীরের উদ্ভব করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। সঙ্ঘের উদ্যম জয়যুক্ত হউক।*

* ১লা মাঘ বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত প্রবর্ত্তক রজত-জয়ন্তী উৎসব-সভার সভাপতির অভিভাষণ।

# বাণী-বন্দনা

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

জননী আমার এস হৃদয়ের পদ্মবনে।
মন-মৌমাছি মুখরিত মৃদু গুঞ্জরণে।
উৎসবহীন মন্দিরতল,
নাহি জনতার কল-কোলাহল;
শীতের কুহেলি সরমে রঙীন নভাঙ্গনে,
বন-বুলবুল বন্দনা গায় ফুল-কাননে।

অশ্রু-শিশিরে মঙ্গলঘট রেখেছি ভরে'।
বক্ষ নিঙাড়ি' তপ্ত শোণিতে সিক্ত করে'।
আঁখির তারায় আরতির আলা,
গোপন হিয়ায় বরণের মালা,
অর্ঘ্য-থালিকা রেখেছি সাজায়ে থরে বিথরে-
উৎসব মোর ব্যথার নদীর বিজন চরে।

সোণালী-মরাল মেলিয়াছে পাখা স্বপন-গাঙ্গে;
দুকুল উছলি' তরঙ্গ তার বিফলে ভাঙ্গে।
নাহি কূল দিশা সুদূর বেলায়,
পথহারা কাঁদে স্বপন-ভেলায়,
আঁধার রজনী বাঁধিছে ধরারে ব্যাকুল ডোরে—
সোণালী স্বপন মিলাবে রাতের অন্ধকারে।

বিশ্ব-ভুবন বন্দিতা ওগো সরস্বতি,
লহ প্রণতার অঞ্জলী নত নীরব নতি।
কুয়াসা-মলিন অন্তরালোক,
তব করুণায় উজ্জ্বল হোক,
আশীষে তোমার চেতনা লভুক বিরাট্ জাতি;
সাম্যের গানে নিখিল জগৎ উঠুক মাতি'।

আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী

আবির্ভাব : ১৮৯৬ খৃঃ অঃ
(মাঘী পূর্ণিমা)

তিরোভাব : ৮ই জানুয়ারী
১৯৪১ খৃঃ অঃ (শুক্লা দ্বাদশী)
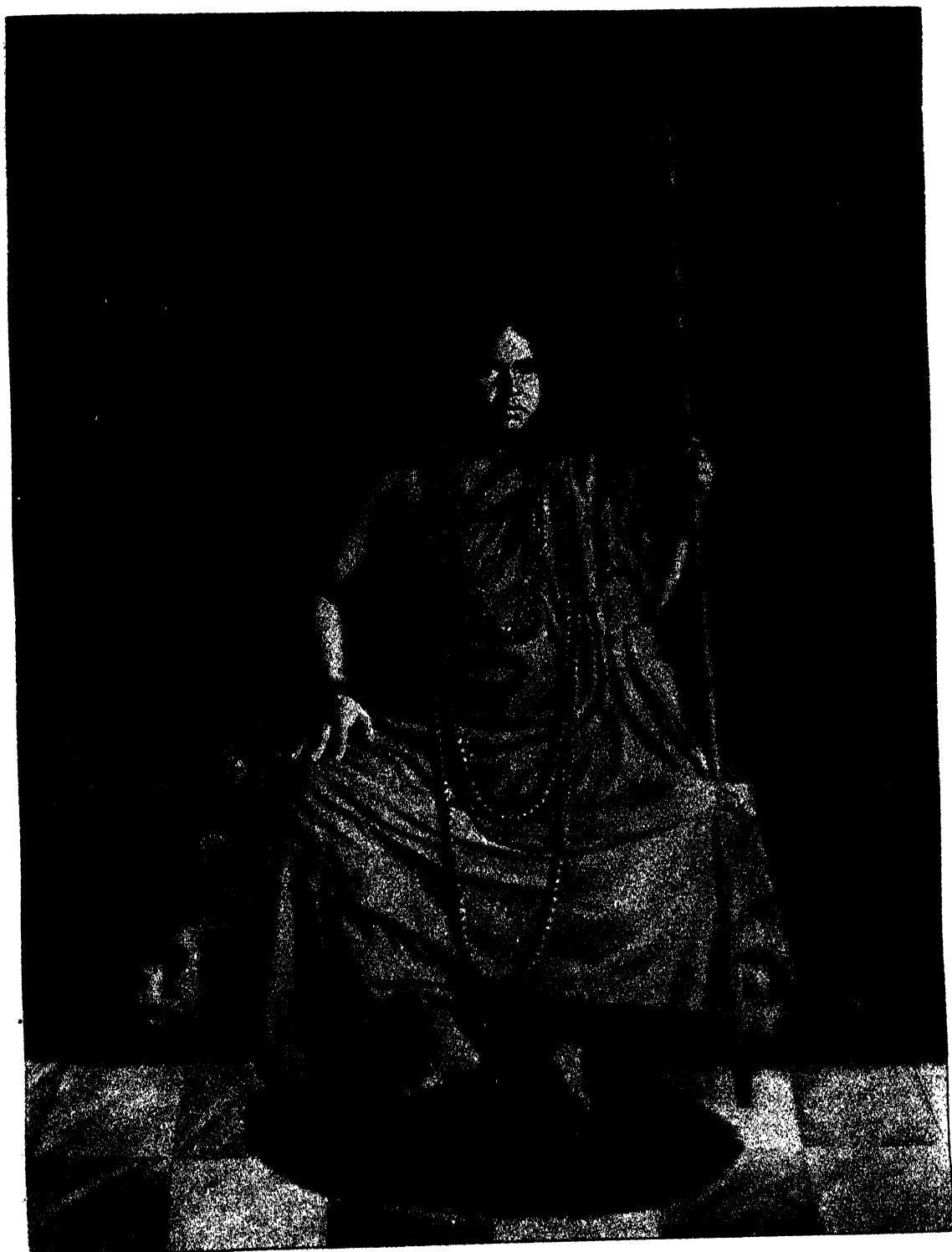
# ভারতের রাষ্ট্রভাষার বর্ণমালা

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানী (হিন্দী ও উর্দ্দু মিলিত) ভাষা প্রস্তাবিত হইয়াছে। বর্ণমালা হিসাবে হিন্দুর জন্য দেবনাগরী ও মুসলমানদিগের জন্য উর্দ্দু বর্ণমালা ব্যবস্থা হইয়াছে। তবে আজিও এই আলোচনার শেষ হয় নাই। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানীকে মর্য্যাদা দান ঠিক হইয়াছে। কিন্তু বর্ণমালা সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। বর্ণমালা হইতেছে ভাষার বাহন। ভারতের রাষ্ট্রভাষার যদি দুই বর্ণমালা হয়, তাহাতে অসুবিধা এই যে:—

(১) হিন্দু-মুসলমানের মিলন-গ্রন্থি শিথিল ভাবে বাধা হইবে।

(২) ষ্টেট কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তক বা পুস্তিকা দুই বর্ণমালাতেই প্রকাশ করিতে হইবে ও ব্যয়-বহুল হইবে।

(৩) অধিকাংশ লোককেই প্রায় দুই বর্ণমালা শিখিতে হইবে।

যদি ভারতের রাষ্ট্রভাষার জন্য কেবল একটী মাত্র বর্ণমালা নির্দ্দিষ্ট হয়, তবে এই অসুবিধা অতি-সহজেই অতিক্রম করা যায়। এখন প্রশ্ন হইতেছে, কোন বর্ণমালাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষার বর্ণমালা করা হইবে? ভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানী (হিন্দি ও উর্দ্দু মিলিত) করা হইয়াছে; কারণ দেখান হইয়াছে, ইহা হিন্দু-মুসলমানের সহানুভূতি পাইয়াছে ও এই ভাষার ব্যবহার বেশী। সেইরূপ এমন একটী বর্ণমালাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষার বর্ণমালা করা উচিত, যে বর্ণমালা আদ্যোপান্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত ও সুবিন্যস্ত এবং হিন্দু-মুসলমানের সহানুভূতি পাইয়াছে এবং যাহার ব্যবহার বেশী।

অনেকে রোমান বর্ণমালার কথা বলিতেছেন, কিন্তু তাহা হইতেই পারে না। ভারতবর্ষের নিজস্ব বহু প্রকার সুন্দর ও সুষ্ঠু বর্ণমালা থাকিতেও কি রোমান বর্ণমালার সাহায্য লইতে হইবে? তাহার উপর যাহা সমগ্র ভারতের জন্য গ্রহণ করা হইবে, তাহা যেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে কিছু সাহায্য করে, সে দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রোমান বর্ণমালা হাতে লেখা ও ছাপার বড় ও ছোট অক্ষরভেদে চারি প্রকার, এইজন্য ইহা শিখিতে চারি দফা পরিশ্রম করিতে হইবে। এ কথা জোর করিয়া বলা যায় যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ও সম্প্রদায়ের লোক তাহা সহজে গ্রহণ করিতে পারিবে না। রোমান বর্ণমালা যদিও টাইপ প্রভৃতি কার্য্যে সুবিধাজনক; তথাপি ইহা ঠিক যে, ভাষার জন্য টাইপ, কিন্তু টাইপের জন্য ভাষা নয়।

ভারতের রাষ্ট্রভাষার বর্ণমালার স্থান বাংলা বর্ণমালা দখল করিতে পারে। কেননা তাহার তিনটী প্রধান গুণই আছে। বাংলা বর্ণমালা আদ্যোপান্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধ্বনিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ও সুবিন্যস্ত এবং বাংলা বর্ণমালা সংস্কৃত বর্ণমালাবলম্বী হওয়ায় বাংলা ভাষাতে ধ্বনিতত্ত্ব-ঘটিত অসামঞ্জস্য খুব বেশী নাই।

ভারতবর্ষের যত প্রকার বর্ণমালা আছে, তাহাদের সহিত দেবনাগরী বর্ণমালার কিছু না কিছু সাদৃশ্য আছে। বাংলা বর্ণমালা যখন সংস্কৃত বর্ণমালাবলম্বী ও বিশেষ করিয়া সন্ধান লইলে জানা যাইবে যে, বাংলা লিপি অন্ততঃ নাগরী হইতে নূতন নয়, তখন বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুরা কিছু সহজে গ্রহণ করিবে। বাংলার মুসলমান লোক-সংখ্যা—যাহা সমগ্র ভারতের মুসলমান লোক-সংখ্যার প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ ও বাংলায় যাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, বাংলা তাহাদের মাতৃভাষা। বাংলাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার পক্ষে বাংলা ও আসামের মুখপাত্রগণ মত দিয়াছেন। যখন তাঁহারা বাংলা ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার পক্ষে, তখন তাঁহারা বাংলা বর্ণমালাকে ভারতের রাষ্ট্র-ভাষার বর্ণমালা করিবার কথাও মানিয়া লইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

তার পরের প্রশ্ন—বহুলোকের দ্বারা ব্যবহার। মিথিলার, আসামের ও বাংলার বর্ণমালা এক। আসামীয় বর্ণমালায়

বেশীর মধ্যে আছে কেবল পেটকাটা 'ব'। এই পেটকাটা 'ব' তাঁহারা 'র' হিসাবে ব্যবহার করেন। মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা ও তাঁহার পুত্র এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার ডাঃ অমরনাথ ঝা স্বীকার করিয়াছেন যে, মৈথিলী-লিপি বাংলা-লিপিরই অনুরূপ, কেবল 'ব'এর তফাৎ। ভারতের রাষ্ট্রভাষার বর্ণমালায় না হয় পেটকাটা 'ব' ব্যবহার করিয়া 'র'-এর কাজ করা যাইতে পারে। এই উপায় দ্বারা বাংলা, আসাম ও মিথিলায় হিন্দুস্থানীপ্রচার সহজ হইবে। হিন্দুস্থানী যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের ভাষা, তেমনি এই 'সাধারণ বাংলা' বর্ণমালা সংখ্যা-গরিষ্ঠ লোকের বর্ণমালা। প্রমাণ—যদিও ভারতবর্ষের শতকরা দশ জনের অধিক লোকের অক্ষর-জ্ঞান নাই, তথাপি ইহা স্বাভাবিক যে, বাংলাভাষাভাষী বাংলা বর্ণমালার প্রতি আকৃষ্ট, আসমীয় ভাইরা আসমীয় বর্ণমালা চায় ও মৈথিলিরাও একই নিয়মে আবদ্ধ। বাংলাভাষাভাষী লোকসংখ্যা এবং মৈথিলীভাষী প্রায় দুই কোটী ও আসমীয় ভাষাভাষী, এই তিন ভাষাভাষী লোক একত্র এই 'সাধারণ বাংলা' বর্ণমালার প্রতি সহানুভূতিশীল লোকের সংখ্যা ভারতের যে কোন বর্ণমালার প্রতি সহানুভূতিশীল লোকের সংখ্যা ছাড়াইয়া যাইবে।

তাহা হইলে সমগ্র উত্তর-ভারতে হিন্দুস্থানী চলিল। এখন দক্ষিণ-ভারতের আর হিন্দুস্থানী 'চাই না', ইহা বলিবার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ নাই। এ কথা সর্ব্বজনস্বীকৃত যে, ভারতের একটী নিজস্ব রাষ্ট্রভাষা চাই। এই রাষ্ট্রভাষা কোন প্রাদেশিক ভাষা নয় যে, অন্য প্রদেশের উপর চাপাইয়া দিলে রাগ করিবে। ইহা একটী সম্পূর্ণ নূতন ভাষা, যাহা ভারতের রাষ্ট্রভাষার সম্মান পাইয়াছে। তাহার বিচারের মাপকাটি হইয়াছে—বহু লোকের ব্যবহার ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের রাষ্ট্রভাষার বর্ণমালার সহজ শিক্ষণীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"Any script, will do, provided it is simple and easy." বাংলা বর্ণমালা হিন্দি ও উর্দ্দু বর্ণমালা অপেক্ষা আরও সহজ ও সরল।

এখন আমাদের প্রস্তাব মত রাষ্ট্রভাষা কি প্রকার ভাষা হইল, দেখা যাউক। ভাষা হইল হিন্দুস্থানী ( হিন্দি ও উর্দ্দু মিলিত ) ও বর্ণমালা হইল 'সাধারণ বাংলা' ( বাংলা, আসামী ও মৈথিলী মিলিত )—তাহা হইলে হিন্দুস্থানী হিসাবে হিন্দু-মুসলমানের ও বর্ণমালা 'সাধারণ বাংলা' হিসাবে হিন্দু-মুসলমানের সহানুভূতি পাইবে।

আর একটী কথা, ভারতবর্ষের এমন কোন বর্ণমালা নাই, যাহা এত অধিক সংখ্যক মুসলমানদের সহানুভূতি পাইয়াছে।

# গান

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

আমার দুখের প্রদীপ জ্বালাই যদি,
জ্বালাই তোমার দ্বারে,
নিঠুর, ওগো নিঠুর! তুমি
নিভিয়ো নাক' তারে।
আমার বেদন-কুসুম ভূমে
লুটবে তোমার চরণ চুমে,
আমার ভীরু দীপের শিখা
কাঁপবে বারে বারে।

পড়বে ঢাকা আমার-ব্যথা
ধূপের ধোঁয়ার তলে,
অশ্রুধারার মালা আমার
দুলবে তোমার গলে।
সাঙ্গ হবে বেদনা-গান,
হবে আমার পূজাবসান,
বুকে জমা সব অভিমান
ঝরবে নয়নধারে।

# স্মৃতির দংশন

শ্রীপঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়

কন্‌কনে ঠাণ্ডা। দেওয়াল ঘড়িটায় ঠং-ঠং করে ৬টা বেজে গেল। ভোরের ম্লান আলো সবে পৃথিবীর বুকে ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছে। সূর্য্যদেব যেন শীতে কাবু হ'য়ে পড়েছেন—আর কতই বা পারে বেচারা! তিনশ পঁয়ষট্টি দিন কি ঘড়ি ধরে ওঠা যায়? তিনিও যেন চোখ রগড়ে উঠতে গড়িমসি করছেন। নিস্তব্ধ পৃথিবীর বুকে প্রথম প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে পাখীদের কোলাহল।

লেপ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। চাকরটা এসে বল্লে—"বাবু, একটী ভদ্রলোক এসেছেন। বিশেষ জরুরী দরকার।" তাঁকে বসাতে বলে তাড়াতাড়ি পোষাকটা চড়িয়ে বসবার ঘরে নামলাম।

ভদ্রলোকের বয়স ত্রিশের ভিতর, চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে। মুখখানা ফ্যাকাসে—বেদনার ছায়া সুস্পষ্ট। ডাণ হাতখানা রুমাল দিয়ে গলা থেকে ঝুলানো। বাঁ হাতে ছোট্ট একটা নমস্কার করে বল্লেন—"আপনাকে এই ভোরে বিরক্ত করলাম, তার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু বড় বিপদে পড়েই আপনার কাছে এসেছি। সাত দিন ধরে আমার চোখে ঘুম নেই। হাতটায় কি যে হয়েছে বুঝতে পারছি না—জ্বলে যাচ্ছে। প্রথম অতটা খেয়াল করিনি, কিন্তু এখন আর সহ্য করতে পারছি না। বোধ হয় এই জায়গাটা কেটে বাদ দিলে আমি শান্তি পাই। ডাক্তারবাবু, এই দেখুন এইখানটায় যন্ত্রণা। একটু লাল বলে' মনে হচ্ছে না?"—এই বলে' ডাণ হাতের বুড়ো আঙুলের পাশে একটা জায়গা দেখিয়ে দিলে।

হাতখানা দেখলাম। কোনখানে একটু ফোলাও নেই, একটু বিবর্ণও নয়। ঠিক সুস্থ হাতেরই মত।

"দেখুন—আপনার অপারেশনের কোন দরকার নেই। আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছি, আপনি ভাল হ'য়ে যাবেন।"

"না—ডাক্তারবাবু, ও জায়গাটা আপনি কেটে বাদ দিন। আর খানিকক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হ'লে আমি পাগল হয়ে যাব।"

মনে ভাবলাম—কি বিপদেই না পড়েছি। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে পকেট থেকে ক'খানা একশ টাকার নোট বার করে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বল্লে—"আপনি বোধ হয় আমায় পাগল ভেবেছেন, কিন্তু আমি তা নই। দয়া করে অপারেশন করুন—আমি যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি।" তার স্বর ভারী।

"মাপ করবেন। অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে আমায় এ কাজ করাতে পারবেন না; কেননা আপনার হাতে অপারেশন করবার মত কিছুই হয়নি। লোকের দুর্ব্বলতার সুবিধে নিয়ে অর্থ উপার্জ্জন করা আমার পেশা নয়।"

"তা হলে আপনি করবেন না? বেশ, আমি নিজেই তবে কাটব। আপনাকে কিন্তু ড্রেস করে দিতে হবে।"

পকেট থেকে একটা পেন্সিলকাটা ছুরি বার করে লোকটা সত্যিই জায়গাটা কাট্‌তে সুরু করে দিল। ভয় হ'ল পাছে কোন শির কেটে ফেলে।

"দাঁড়ান। কি করছেন আপনি? টেব্‌লএ শুয়ে পড়ুন। আমি অপারেশন করে দিচ্ছি। এদিকে কিন্তু চাইবেন না।"

"না—না—আমি দেখিয়ে দিই কতটা কাটতে হবে।"

অপারেশনের সময়ে লোকটা একটু উ-আও করলে না। সমস্ত সহ্য করলে নীরবে স্থিরভাবে, যেন ছুরির ঘা তার কাছে যন্ত্রণার প্রলেপের মত। ড্রেস হ'য়ে গেলে তার মুখ হ'য়ে উঠল প্রফুল্ল, সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলে।

হপ্তাকয়েকের মধ্যেই আস্তে আস্তে ঘা শুকিয়ে গেল। ভদ্রলোক ফিরে গেলেন তাঁর গ্রামে—নিজের জমিদারীতে।

একমাস পরের কথা। বৈঠকখানায় বসে একখানা মাসিকপত্রের পাতা উলটাচ্ছি—দেখি সেই ভদ্রলোকটি এসে হাজির। তাঁর মুখখানা যেন আরও শুকিয়ে গেছে,

কপালের রেখাগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ডাণ হাতখানা ঝুলছে গলা থেকে তেমনি।

"ডাক্তারবাবু, আপনি বোধহয় সে বার বেশ গভীর ক'রে কাটেননি। আবার আমার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে। এবার আগের চেয়েও বেশী। আবার আপনাকে অপারেশন করতে হ'বে।"

যদিও কিছুই দেখতে পেলাম না, তবু অপারেশন করতে হ'ল। ভদ্রলোকের যন্ত্রণার উপশম হ'ল; কিন্তু তাঁর মুখে হাসি ফুটল না পূর্ব্বের মত।

"ধন্যবাদ, হয়ত মাসখানেক বাদেই আবার আপনাকে বিরক্ত করতে আসব। কিছু মনে করবেন না।"

"না—না, সে কি কথা। আপনি ওসব ভাববেন না।"

একটু ম্লান হেসে সে বেরিয়ে গেল।

কিছুদিন পরে একখানা চিঠি এল। খামের ওপর হাতের লেখা দেখে বুঝতে বাকী রইল না, এ সেই ভদ্রলোকের চিঠি।

"যাক্, নিশ্চয়ই তিনি ভাল আছেন"—আগ্রহের সঙ্গে চিঠিটা খুলে পড়তে বসলাম।

* * *

"মাননীয় ডাক্তারবাবু,

আপনি বোধ হয় আমার রোগের কারণ এখনও বুঝতে পারেননি। পারবেনই বা কি করে? আমি আপনাকে আমার রোগের সব বৃত্তান্ত জানাচ্ছি—নিজের মনের ভেতর লুকিয়ে রেখে তুষের আগুনে পুড়ে মরতে আমি আর পারছি না।

আপনার কাছ থেকে চলে আসবার পর আরও তিন তিন বার অসহ্য যন্ত্রণায় আমি কষ্ট পেয়েছি। জীবন আমার দুবিসহ হয়ে উঠেছে। এখনও আমার হাতে যেন আগুন জলছে। যাক্‌গে সে সব কথা।

ছ'মাস আগেও আমি ছিলাম খুব সুখী। পয়সার অভাব আমার কখন ছিল না, এখনও নেই। বছরখানেক আগে আমি বিয়ে করি আমার গ্রামেরই একটা মেয়েকে। সে ছিল অসামান্যা সুন্দরী আর তার গভীর প্রেম ছিল আমার গর্ব্বের বিষয়। কিন্তু সন্দেহের বিষ আমার জীবনটাকে নষ্ট করে দিলে। সুখের সাগরে সাঁতার কেটেও মানুষ নিজেকে ভাবে অসুখী। আমিও নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলাম। নিজের হাতে ভেঙ্গে দিলাম আমাদের প্রেমের স্বর্গ—কেন জানিনা আমার মনে হত অনিতার এই ভালবাসা লোক-দেখান, এর ভেতর আন্তরিকতা নেই।

এই সন্দেহ বদ্ধমূল হ'য়ে উঠল একটা ব্যাপারে। অনিতার যে হাতবাক্সটা ছিল সেটায় সে সর্ব্বদা চাবী দিয়ে রাখত আর চাবীটাও নিজের হাতছাড়া করত না। আমার ধারণা হ'ল—নিশ্চয় ওর ভেতর এমন কিছু আছে, যা অনিতা আমার কাছে গোপন করে। একদিন অনিতার বাল্য-সখী নন্দিতা এসে ওকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল। এই সুযোগ! দেখতে হবে কি আছে ওই বাক্সে।

এক গোছা চাবী নিয়ে বাক্সটা খুলতে বসলাম, একটা চাবী লেগেও গেল। বাক্সটার ভেতর অনেক জিনিষের মাঝখানে রয়েছে লাল ফিতে বাঁধা এক তাড়া চিঠি- বুঝতে বাকী রইল না সেগুলো কি।

একটার পর একটা পড়ে যেতে লাগলাম। চিঠিগুলোয় লেখকের নাম সই নেই, কেবল নামের আদ্যাক্ষর লেখা এবং কাকে চিঠি দেওয়া হয়েছে তা বোঝা যায় না। সব কিছুই লুকান হয়েছে। কত দরদ দিয়ে লেখা চিঠিগুলো! কত অনুনয় করা হয়েছে গোপন রাখার জন্য! কত উপদেশে ভর্ত্তি, কি রকম অভিনয় করে স্বামীর চোখে ধূলো দিতে হয়! মাথায় আমার আগুন জলে উঠল, চোখের সামনে ভাসতে লাগল অনিতার ভালবাসার অভিনয়। প্রতিহিংসার আগুন জলে' উঠল আমার বুকে।

চিঠিগুলো ঠিকমত বাক্সবন্দী করে বেরিয়ে পড়লাম নদীর দিকে মনটাকে ঠিক করে নিতে। বাড়ী ফিরে অনিতার সঙ্গে দেখা হ'ল; কিন্তু তাকে কোন ভাবান্তরই বুঝতে দিলাম না।

গভীর রাত। অনিতা গভীর নিদ্রায় মগ্ন, অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানিতে হাসির রেখা তখনও ফুটে রয়েছে। অনেক ভুলেছি তোমার অভিনয়ে অনিতা, কিন্তু আর নয়! আমার মাথায় তখন খুন চেপেছে। আস্তে আস্তে ডাণ হাত দিয়ে প্রাণপণে তার গলা চেপে ধরলাম। সে নড়লে

না চড়লে না, একবার খালি চাইলে আমার পানে। একটী কথাও সে বলে যেতে পারলে না। শুধু কয় ফোঁটা রক্ত তার মুখ থেকে এসে পড়ল আমার হাতে, সে জায়গাটা হল রাঙ্গা, আপনি ত জানেন সেই জায়গাটা।

একটুও অনুশোচনা আমার হ'ল না বাইরের লোকে জানলে আমার স্ত্রী মারা গেছে হঠাৎ হার্টফেল ক'রে। নন্দিতাও এল এই দুঃসংবাদ শুনে। অনেক সান্ত্বনাই সে আমায় দিলে, যদিও তার প্রয়োজন আমার ছিল না।

ক'দিন পরের কথা। নন্দিতা এসে বল্লে—'দেখুন, অনুর কাছে কতকগুলো চিঠি আমি রাখতে দিয়েছিলাম। সেগুলো যদি দয়া করে ফিরিয়ে দেন ?'

'কি চিঠি ? কোথায় আছে সেগুলো ?'

'অনুর হাত বাক্সে। খান ৩০ চিঠি একটা লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা। কোন কষ্ট হবে না আপনার খুঁজে পেতে।'

আমার পায়ের নীচে মাটি যেন সরে যেতে লাগল, কোম রকমে নিজেকে সামলে নিলাম।

চিঠিগুলো নিয়ে নন্দিতা চলে গেল.

দিন সাতেক পর থেকে সেই যেখানে রক্তের ফোঁটা পড়েছিল সেখানটায় যন্ত্রণা সুরু হ'ল। তারপর সবইত আপনি জানেন। আপনি হয়ত ভাববেন এ আমার মনের দুর্ব্বলতা। কিন্তু সত্যই জলে পুড়ে মরছি। জানি আমার কাজের তুলনায় এ শাস্তি কিছুই নয়। আর আমি এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। অনিতার হাত দু'খানি ধরে ক্ষমা ভিক্ষা না করলে আমার এ জ্বালা জুড়াবে না। শীঘ্রই আমি অনিতার সঙ্গে মিলিত হতে চলেছি। আমি জানি সে আমায় ক্ষমা করবে—আমি জানি সে তার প্রিয়তমকে দূরে রাখতে পারবে না। এ চিঠি যখন আপনার কাছে পৌছুবে, তখন আমি চলে গেছি এই নিষ্ঠুর সন্দেহময় পৃথিবীর নাগালের বাইরে—আমারই প্রিয়তমার পাশে। *

Karaly Kisfaludi-র গল্পের অবলম্বনে।

# হোলি

শ্রীসুরেশ ঘোষ

ভুবন দুলিছে যাঁর চরণ-দোলায়,
সেই নটবর দোলে হৃদয়-দোলায়।
আবীর কুঙ্কুমে পিয়া হ'য়ে লালে লাল,
দুলিছে মোহন রূপে আনন্দদুলাল।

শঙ্খ-মৃদঙ্গ বাজে অনহদ 'তূরে',
প্রেম-রঙ্গরস কিবা ঘটে ঘটে ঝুরে!
মায়া-মোহ-ধূলি সব যাইছে উড়িয়া,
প্রেমরসে ভিজি' হোলি খেলে 'সুরতিয়া'।

কোকিল-পাপিয়া গায়, পিয়ে প্রেমরস,
ঢলিয়া পড়িছে অলি প্রেমেতে অবশ।
প্রেমরসে উছলিত, নদী বহে যায়,
প্রেমের পরাগ মাখি' বহে মৃদুবায়।

কোমল লতিকা নাচে মজি' প্রেমরসে,
প্রেমের ফোয়ারা কিবা ছোটে দশদিশে।

# ব্রহ্মসূত্র

## ( চতুর্থ পাদ )

শ্রীমতিলাল রায়

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে "ঈক্ষতে নাশব্দম্" সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্কর ঈক্ষণ যে প্রধানের নহে, তাহা প্রমাণ করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন। আমরা ইহা লইয়া পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। আচার্য্য শঙ্কর গোড়া হইতেই শ্রুতিতে প্রধানের সমর্থন-বাক্য নাই, এই ভিত্তির উপর উক্ত সূত্রের ভাষ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে যদিও প্রধানের নাম আছে, কিন্তু ঐ প্রধান সাংখ্যোক্ত প্রধান নহে, একথা আমরাও প্রমাণ করিয়াছি। এক্ষণে ব্যাসদেব স্বয়ং শ্রুত্যুক্ত প্রধান শব্দ যেন কপিলাদি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত প্রধানের প্রতিপাদক বলিয়া কেহ না মনে করেন, তাহার জন্য চতুর্থ পাদের অবতারণা করিতেছেন ; যথা—

**আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপক-**
**বিন্যস্ত গৃহীতের্দর্শয়তি চ ॥১॥**

আনুমানিকমপি (অনুমাননিরূপিত প্রধানও) একেষাম্ (কোন কোন শাখায়) ইতি চেৎ (উল্লিখিত হইয়াছে, এইরূপ যদি বল) ন (না, তাহা বলিতে পার না। কেন বলিতে পার না?) শরীররূপকবিন্যস্ত (যেহেতু শরীর-সম্বন্ধীয় রূপক-বর্ণনার নিমিত্তই উহা কথিত হইয়াছে)। গৃহীতেঃ (এইরূপ অর্থই গ্রহণ করা উচিত অর্থাৎ উহা সাংখ্যপ্রসিদ্ধ ত্রিগুণাত্মক প্রধান নহে। কেন নহে?) দর্শয়তি চ (শ্রুতিতে তাহা স্পষ্টরূপে বিশ্লেষিত হইয়াছে)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই জগৎকারণ ও জগতের উপাদান। সাংখ্যের প্রধান এই হেতু বেদের বিষয় নহে। কিন্তু কোন কোন শ্রুতিতে প্রধানবোধক শব্দের উল্লেখ আছে। এইজন্য কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগণের প্রধান শব্দ বেদমূলক, এইরূপ পাছে কেহ মনে করেন, ব্যাসদেব সে ভ্রম নিরসন করিতেছেন। কঠ শ্রুতিতে পঠিত হয় 'মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পর ইতি' অর্থাৎ "মহতের পর অব্যক্ত। অব্যক্তের পর পরম পুরুষ।" সাংখ্যে মহৎ, অব্যক্ত, পুরুষ এই ক্রম পরিলক্ষিত হয়। সাংখ্যের অব্যক্ত শব্দ শ্রুতির এই অব্যক্ত শব্দের সহিত যদি অভিন্ন হয়, তাহা অবৈদিক বলার হেতু কি আছে? ব্যাসদেব বলিতেছেন—সাংখ্যের অব্যক্ত ও শ্রুতির অব্যক্ত এক নহে। কঠ শ্রুতির অব্যক্ত সাংখ্যের অব্যক্তের অনুরূপ নহে। শ্রুতির সহিত সাংখ্যের নামের ও ক্রমের তুল্যতা দেখিয়া তুল্য অর্থ নিরূপণ করা যুক্তিযুক্ত নহে, সমস্ত প্রকরণটী দেখিয়া অর্থবিচার করিতে হইবে। কঠ শ্রুতির অব্যক্ত-শব্দোল্লেখের পূর্ব্ব প্রকরণ অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, সাংখ্য যেমন মহতের পর অব্যক্ত, তৎপরে পুরুষ বলিয়াছেন, শ্রুতিতেও তদ্রূপ এই তিনটী শব্দ যথাক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে বটে ; কিন্তু প্রকরণ দেখিয়া অর্থ গ্রহণ করিলে এই অব্যক্ত শব্দ সাংখ্যকল্পিত প্রধানের অর্থবোধক হইবে না ; যথা—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্ব্বিষয়াং স্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥

অর্থাৎ "আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে লাগাম, ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব, শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় ভ্রমণক্ষেত্র বলিয়া জানিবে। মনীষীরা আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত বিষয়ের নাম দিয়াছেন ভোক্তা।" ঐ সকল ইন্দ্রিয়াদি যদি সংযত না হয়, তবে 'সংসারমধিগচ্ছতি' অর্থাৎ জীব সংসারে নিপতিত হয়। সংযত-মন হইলে, পথের পার "তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্ পদমাপ্নোতি" বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়। এই পরম পদের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ॥
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতি॥

ইন্দ্রিয়ের পর অর্থ। তারপর মন। মনের পর বুদ্ধি। বুদ্ধির পর মহান্ আত্মা। মহতের পর অব্যক্ত। অব্যক্তের পর পুরুষ। পুরুষের শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। তিনিই পরম গতি, পথের সীমা।

পূর্ব্বে আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ প্রভৃতি বলিয়া যে রূপকের বর্ণনা হইয়াছে—পর শ্লোকে তাহারই পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি তুল্যার্থেই উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মাই মহান্। এই আত্মা শব্দের অর্থ কি? কেননা পূর্ব্ব শ্লোকে আত্মাকে রথী বলা হইয়াছে আর এই শ্লোকে মহান্ আত্মার পর অব্যক্ত, তারপর পুরুষের স্থান দেওয়া হইয়াছে– অতএব এই শ্লোকে আত্মা-শব্দের অর্থ প্রণিধান-যোগ্য। স্মৃতি শাস্ত্রে এই মহান্ আত্মাকে বুদ্ধি, স্মৃতি, চিতি প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই মহান্ আত্মা তাহা হইলে বুদ্ধির নামান্তর হইল। এই বুদ্ধিই অস্মদাদির বুদ্ধির মূলভূমি। ইহাই এই ক্ষেত্রে মহান্ আত্মা। অস্মদাদির বুদ্ধির উপর এই বুদ্ধিকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। অস্মদাদি বুদ্ধি অপেক্ষা তদীয় বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব ইহাতে প্রতিপাদিত হইতেছে। এই বুদ্ধির উপর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পুরুষের কথা। আত্মায় ও পরমাত্মায় বস্তুতঃ ভেদ কিছুই নাই। পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত পরবর্ত্তী শ্লোকের শব্দ-ক্রমের বাহুল্য ও শব্দার্থের কিঞ্চিৎ ভেদ পরিদৃষ্ট হয়। মহতের পর যে অব্যক্তের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই কর্ম্মবীজ বা সৃষ্টি-সংস্কার। অব্যক্তের পর পুরুষ। এই অব্যক্ত হইতে মহদাদি করণের উৎপত্তি। ইহাতে সাংখ্যের অব্যক্তও শ্রুতির অব্যক্ত যে একই, ইহাই প্রমাণিত হইল। সৃষ্টিবীজ বা সৃষ্টিসংস্কারকে যদি শ্রুতি অব্যক্ত বলেন, উহা সাংখ্যের প্রধানেরই নামান্তর হয়। এই অব্যক্ত জগতের যে পূর্ব্বাবস্থা, সাংখ্যবাদীরাও তাহা স্বীকার করেন। ব্যাসদেব ইহার উত্তরে বলিয়াছেন—না। শ্রুতির এই অব্যক্ত সাংখ্যের প্রধান নহে। ইহা শরীর-সম্বন্ধীয় রূপক-বর্ণনার জন্য কথিত হইয়াছে। উপরোক্ত পূর্ব্ব শ্লোকগুলির সহিত পরবর্ত্তী শ্লোকগুলির বিচার করিলে দেখা যাইবে, মনকে লাগাম বলিয়া ইন্দ্রিয়সকলকে অশ্ব বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের পর মন, মনের উপর বুদ্ধিই সারথি। পরবর্ত্তী শ্লোকে দেখা যায়—ইন্দ্রিয়ের পর বিষয়। অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়। তাহার পর মন এই মনের পর বুদ্ধি। পূর্ব্ব শ্লোকে বুদ্ধির সারথ্য মাত্র স্বীকার করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী শ্লোকে বুদ্ধির উপরে যে মহান্ আত্মার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহা হিরণ্যগর্ভরূপ ভোগের দ্বারস্বরূপ—যাহার ভিতর দিয়া ভগবান্ আনন্দ ভোগ করেন। তদূর্দ্ধে অব্যক্ত-শব্দটী পরমাত্মা ও মহান্ আত্মার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। শ্রুতির এই অব্যক্ত সাংখ্যের অব্যক্ত নহে, পরন্তু পরমাত্মার সূক্ষ্ম তনু। কেননা পরবর্ত্তী শ্লোকে পূর্ব্ব শ্লোকের সকল প্রকরণ নিহিত আছে। কেবল শরীরপ্রকরণের উল্লেখ নাই। ঈশ্বরের ভোক্তৃত্ব যদি থাকে, তবে তাহার একটী ভোগ-তনুও থাকিবে। এই হেতু এই অব্যক্ত পুরুষের সান্ত মূর্ত্তির কল্পনা। "পুরুষঃ পর" তিনি যে সূক্ষ্ম দেহে সৃষ্টির ভর্ত্তা ও ভোক্তা। শ্রুতির অব্যক্তে তাহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। অতএব সাংখ্যের প্রধান শ্রুত্যুক্ত অব্যক্তের সহিত তুল্য নহে।

সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ ॥২॥

তু (আশঙ্কানিষেধার্থে এই তু শব্দ ব্যবহৃত হইল। কিসের আশঙ্কা? অব্যক্ত অর্থে শরীর বুঝাইলে, যাহা অভিব্যক্ত, তাহা অব্যক্ত হয় কি প্রকারে? তাই বলা হইতেছে) সূক্ষ্মম্ (অর্থাৎ এই শরীর কারণ-শরীর) তদর্হত্বাৎ (অব্যক্ত এইরূপ সূক্ষ্ম-শব্দের প্রয়োগযোগ্য হওয়া হেতু) (অর্থাৎ স্থূল শরীর ব্যক্ত। সূক্ষ্ম কারণ শরীর অব্যক্ত শব্দের যোগ্য। শ্রুতিতে এইরূপ শব্দার্থ বহুক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। পুরুষের কারণশরীর সৃষ্টি-বীজ। ইহা স্থূলের ন্যায় ব্যক্ত অবস্থা নহে।) শ্রুতিতে আছে 'তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ' অর্থাৎ সেই সময়ে এই সকল অব্যাকৃত ছিল।

কি অব্যাকৃত ছিল? বীজশক্তি। সৃষ্টির নাম-রূপ না থাকা রূপ যে সৃষ্টির কারণ-তত্ত্ব, তাহাকে অব্যক্ত বলা যায়। শ্রুতির অব্যক্ত তাই সাংখ্যের প্রধান নহে।

তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥৩॥

তদধীনত্বাৎ (পরম কারণ ব্রহ্মের অধীনত্ব হেতু) অর্থবৎ (অব্যক্ত শব্দের এই অর্থ স্বীকৃত হয়)।

সাংখ্যের প্রধান পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু শ্রুতির অব্যক্ত পরম কারণ ব্রহ্মের অধীন। অতএব শ্রুতির প্রধানবাদ সাংখ্যের প্রধান হইতে ভিন্ন হইল।

উপনিষদুক্ত পূর্ব্ব শ্লোক দুটীতে দ্বিবিধ শরীরের কথা আছে। এক স্থূল, অন্য সূক্ষ্ম। স্থূল শরীরকে রথ বলা হইয়াছে। পর-শ্লোকে শরীরের শব্দান্তর অব্যক্ত বলায়, উহা সূক্ষ্ম শরীররূপেই গ্রহণযোগ্য। আরও হেতু প্রদর্শিত হইতেছে—

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥৪॥

জ্ঞেয়ত্ব (অব্যক্ত শব্দ জানার কথা) অবচনাৎ চ (বলেন নাই)।

এই হেতুও সাংখ্যের অব্যক্ত যে প্রধান, শ্রুতির অব্যক্ত তাহা নহে।

সাংখ্যবাদীদের মতে পুরুষ-প্রকৃতির বিবেক হইতে জীবের মুক্তি, অতএব সাংখ্যের প্রধান জ্ঞেয়। অর্থাৎ কৈবল্যলাভের হেতু প্রধানকে জানিতে হইবে। শ্রুতির অব্যক্ত জ্ঞেয় অথবা উপাসিতব্য নহে। পরমপদপ্রদর্শনের প্রকরণ হিসাবে প্রথমে রথরূপ স্থূল শরীর, পরে সূক্ষ্ম শরীরের অবতারণা করা হইয়াছে। এই হেতু স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রুতির অব্যক্তের সহিত সাংখ্যের অব্যক্ত তুল্য অর্থে আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে।

বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥৫॥

বদতি (শ্রুতিতে অব্যক্তকে জানার কথা বলা হইয়াছে) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলা হয়) ন (না, এইরূপ বলা হয় নাই) হি (যেহেতু) প্রাজ্ঞঃ (পরমেশ্বর) প্রকরণাৎ (প্রতিপাদ্য বস্তুরূপে শ্রুতিতে আলোচিত হওয়া হেতু)।

শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। 'সা কাষ্ঠা, সা পরাগতি'। অধিকতর স্পষ্ট করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽহাত্মা নো প্রকাশতে" ইনি সকল ভূতে গুপ্তভাবে বিদ্যমান, এই আত্মা তাই স্পষ্ট প্রতিভাত হন না।

আত্মা দুর্জ্ঞেয়, তাই তাঁহাকে জানিতে হইবে। সংযমাদির বিধান এইহেতু। অব্যক্তকে জানিবার কথা শ্রুতিসিদ্ধ নহে। অতএব শ্রুতিকথিত অব্যক্ত প্রধানও নহে, জ্ঞেয়ও নহে। আরও হেতু প্রদর্শিত হইতেছে—

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥৬॥

ত্রয়াণাম্ (তিনটী বিষয়ের) এব (এইরূপ) প্রশ্নঃ এবম্ চ উপন্যাসঃ (প্রত্যুত্তর আছে)।

কঠবল্লী উপনিষদে নচিকেতার সংবাদে এই কথাগুলি আছে। নচিকেতা বলিলেন—"স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো! প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যং" অর্থাৎ "হে মৃত্যু! তুমি যদি স্বর্গসাধন অগ্নির কথা জান, তাহা তুমি শ্রদ্ধান্বিত আমাকে বল।" পুনরায় বলিলেন—"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে ইত্যাদি" অর্থাৎ মানুষ মরার পর তার অস্তিত্ব থাকে কি না, এই সন্দেহ আমার দূর হউক। আরও প্রশ্ন করিলেন—

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ ॥

অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অতীত, কার্য্য ও কারণ হইতে পৃথক্ এবং অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান হইতে ভিন্ন আপনি যে বস্তু জানেন, তাহা আমাকে বলুন। নচিকেতার এই প্রশ্নের মধ্যে প্রধানের প্রশ্ন নাই। প্রথম প্রশ্ন অগ্নিবিষয়ক। দ্বিতীয় জীববিষয়ক। পরে পরমাত্মা-বিষয়ক প্রশ্নই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। জ্ঞেয়রূপে এই তিনের প্রশ্নোত্তরে কঠোপনিষদে যে অব্যক্তের কথা আছে, তাহা কেমন করিয়া সাংখ্যের প্রধান রূপে বেদ্য হইবে? এই হেতু 'মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।' এই শ্রুত্যুক্ত অব্যক্ত সাংখ্যের প্রধান নহেন, ইহাই প্রমাণিত হইল।

মহদ্বচ্চ ॥৭॥

চ (আরও) মহদ্বৎ (মহৎ শব্দের ন্যায়)।

অর্থাৎ শ্রুতির মহৎ-শব্দ যেমন সাংখ্যের তত্ত্ববোধক নহে, তদ্রূপ শ্রুতির অব্যক্ত-শব্দও সাংখ্যাভিমত প্রধান-তত্ত্বের বোধক নহে। শ্রুতিতে আছে—"বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ, মহান্তং বিভুমাত্মানং, বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্", প্রভৃতি অর্থাৎ "বুদ্ধির অপেক্ষা মহান্ শ্রেষ্ঠ। আত্মা মহান্ ও

বিভু। আমি এই মহান পুরুষকে জানি।" মহৎ-শব্দের সহিত আত্মা ও পুরুষ শব্দ প্রযুক্ত থাকায়, সাংখ্যের মহৎ-শব্দ হইতে ইহা পৃথক্ বুঝিতে যেমন বিলম্ব হয় না, তেমনি বৈদিক অব্যক্ত শব্দ সাংখ্যের অব্যক্ত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নই বুঝিতে হইবে।

চমসবদবিশেষাৎ ॥৮॥

অবিশেষাৎ (বিশেষের অবধারণ কারণের অভাব হেতু।) (যথা) চমসবৎ (চমস শব্দের ন্যায়)।

সাংখ্যবাদী বলিতে পারেন—প্রধানকে অবৈদিক বলার এই প্রচেষ্টা নিরর্থক। অব্যক্ত ও প্রধান শব্দের ব্যাখ্যায় সাংখ্যের প্রকৃতিবাদেরই খণ্ডন হইলেও, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে আছে—

অজামেকাং লোহিত-কৃষ্ণশুক্লাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥

অর্থাৎ "কোন কোন অজ লোহিত-কৃষ্ণ-শুক্লবর্ণা ও স্ব-সদৃশ বহু-সন্তানা অজার প্রতি প্রীতিপরায়ণ হইয়া তাহারই অনুরূপ হইয়া আছে। অন্য অজ তাহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করিতেছে।" সাংখ্যবাদী বলেন—মন্ত্রে যে লোহিত-কৃষ্ণ-শুক্লবর্ণ, উহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণেরই প্রতিবাক্য। অজা এক। অদ্বিতীয়া। ইহা মূল প্রকৃতি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? নিত্যজন্মরহিত প্রধানকেই শ্রুতি অজা বলিয়াছেন। অজ অর্থাৎ জন্মরহিত নিত্যপুরুষ প্রকৃতির সেবায় তদনুরূপ হইয়া আছে, ইহাই পুরুষের অজ্ঞানতা। আবার অন্য অজও ভোগান্তে অজাকে পরিত্যাগ করিতেছে; ইহার অর্থ প্রকৃতি হইতে পুরুষের মুক্তি। সাংখ্যের যে প্রধান, তাহারও কি এই লক্ষণ নহে? ব্যাসদেব বলিতেছেন—'অবিশেষাৎ' এই অজা শব্দ কোন বিশিষ্ট মত সমর্থন করিতেছে না। ইহার অন্য অর্থ গ্রহণ করিলেও, তাহার ব্যুৎপত্তি-গত অর্থের অপলাপ হয় না। এই অবস্থায় কিরূপে বলা যায় যে, এই অজা-শব্দ সাংখ্যের প্রকৃতি অর্থেই উল্লিখিত হইয়াছে? চমস শব্দ ইহার দৃষ্টান্ত।

বৃহদারণ্যকে 'চমস' শব্দের উল্লেখ আছে। 'অর্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্ন' অর্থাৎ অধোগভীর ও ঊর্দ্ধে উচ্চ যাহা, তাহাই চমস। ইহাতে কি কোন বস্তুবিশেষকে চমন বলা যায়? অধোগভীর ও ঊর্দ্ধে উচ্চ এমন অনেক বস্তুই পৃথিবীতে আছে। অজা শব্দের এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে, উহা সাংখ্যের প্রকৃতি হইবেই, এমন নিশ্চয়তা কিছু নাই।

বেদের চমস মন্ত্রের শেষে যে বাক্য থাকায় উহার নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের প্রতীতি সিদ্ধ হয়, তেমনি অজা শব্দের প্রকৃতার্থ নির্ণয় করিতে হইলে তাহার শেষ মন্ত্রের বাক্যান্তর গ্রাহ্য করিতে হইবে। চমস মন্ত্রের শেষে আছে—'তত্র ত্বিদং তচ্ছির এষ হ্যর্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্ন"—অর্থাৎ "এই তাহার মস্তক, ইহার অধঃ খনিত, উপরিভাগ উচ্চ।" অতএব ইহা চমস। সেইরূপ অজা শব্দের প্রকৃতার্থনির্ণয়ের শেষ বাক্যে কি বুঝায়, তাহাই গ্রহীতব্য। উহা কি? তাহার জন্যই নবম সূত্রের অবতারণা।

জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হ্যধীয়ত একে ॥৯॥

তু (কিন্তু) জ্যোতিরুপক্রমা (ব্রহ্মরূপপ্রবর্ত্তন-কারণ যাহা, তাহাই অজা শব্দে কথিত হইয়াছে) হি (যে হেতু) একে (কোন কোন শ্রুতিতে) তথা (ঐরূপ) অধীয়তে পঠিত হইয়া থাকে)।

আচার্য্য শঙ্কর জ্যোতিরুপক্রমা-শব্দের ভাষ্যে বলিয়াছেন, পরমেশ্বর হইতে জাত তেজঃ, অপ ও অন্ন, এই তিন ভূতসূক্ষ্ম জীবদেহের উপাদান। ছান্দোগ্যোপনিষদে এই কথা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে—"যদগ্নেরোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য ইতি।" অর্থাৎ "অগ্নির রক্ত-রূপ তেজেরই প্রকাশ। শুক্ল-রূপ জলের। কৃষ্ণ-রূপ অন্নের। লোহিত-শুক্ল কৃষ্ণ-রঞ্জিত অজা শব্দে ইহাকেই অভিহিত করা হইয়াছে। ব্রহ্মবাদী জিজ্ঞাসা করেন—'কিম্ কারণং ব্রহ্ম'—ব্রহ্ম কোন কারণবিশিষ্ট? এই প্রশ্নের পর ঋষি ধ্যানযোগে দেখিয়াছেন—"দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি।" অর্থাৎ "দেবাত্মশক্তি স্বগুণের দ্বারা আবৃত।" এই বাক্যে অজা ব্রহ্মশক্তিই বুঝায়। এই গুণময়ী প্রকৃতি মায়া নামে কথিত। পরমেশ্বরই ইহার অধিষ্ঠাতা। বেদের ব্রহ্মশব্দ ত্রিগুণাবস্থা প্রকৃতি রূপেও

প্রতিপাদিত হন। বেদপ্রসিদ্ধ এই সকল বাক্যে অব্যক্ত, প্রধান, অজা প্রভৃতি শব্দে পরমেশ্বরের বীজরূপা সৃষ্টিশক্তিকেই বুঝায়। অজা ত্রিগুণা। অজ তদনুযায়ী ত্রয়ীরূপ্য ধারণ করেন, গুণের সাম্যাবস্থা জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থারও আদি অবস্থা—উহা নির্ব্বিকারতত্ত্ব কল্পনা মাত্র। তবে, তেজঃ, অপ ও অন্ন পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন বলিলে, উহাকে অজা বলা যায় না। কেননা যাহা নিত্য জন্মরহিত, তাহাই অজ। এই আপত্তির নিরসন পরবর্ত্তী সূত্রে হইতেছে।

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥১০

অবিরোধঃ (কোন বিরোধ হয় না) কল্পনোপদেশাৎ (কল্পনার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে, এই হেতু যেমন) মধ্বাদিবৎ (সূর্য্যাদি মধু নহে) উপাসনার জন্য মধু প্রভৃতি রূপে কল্পনা করা হয়।

অর্থাৎ উপরোক্ত অজা-শব্দ পরমেশ্বরোৎপন্ন জ্যোতিঃর কল্পনা মাত্র। তেজঃ, অপ ও অন্নের সমবায়ে চতুর্ব্বিধ জীবসৃষ্টি—এই সমবায়কে ছাগী বলা হইয়াছে। ইনি বহু-সন্তানপ্রসবিনী। প্রকৃতির অজাত্ব এবং ব্রহ্ম হইতে ইহার উৎপন্নত্ব পরস্পরবিরোধী অর্থযুক্ত নহে। কেননা সৃষ্টি "যথাপূর্ব্বমকল্পয়দিতি প্রয়োগাৎ" প্রভৃতি বাক্যে পূর্ব্বের সৃষ্টি পুনরায় প্রকাশ করিলেন, এইরূপ বুঝায়—নূতন সৃষ্টি হইল না। শ্রুতি বলেন—তমো নামে অভিহিত, সূক্ষ্ম, নিত্য বিরাজমান শক্তি ব্রহ্মে চির অনুস্যূত। "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে' অর্থাৎ "আদিতে তমই ছিল। এই জগৎ তমতেই গূঢ় অর্থাৎ আচ্ছন্ন ছিল। সৃষ্টিকালে এই তমোনাম্নী শক্তি লীলান্বিতা হন। ইনি ব্রহ্মে একীভূতা হইয়া বিলীন হন না, কেবল প্রকাশবিরতা হইয়া থাকেন; এই হেতু ব্রহ্ম হইতে ত্রিগুণাত্মক শক্তির অভ্যুদয়ে তাঁহাকে অজা বলিলে দোষের হয় না। শ্রুতি বলিতেছেন—কোন ছাগ ছাগীর প্রতি সমাসক্ত হইয়া তদনুরূপতা প্রাপ্ত হয়; আবার অন্য ছাগ তাহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করে। মায়াবাদী ভাষ্যকারেরা এই প্রসঙ্গে অজ্ঞানীর আসক্তি-বন্ধন ও জ্ঞানীর মুক্তি কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এক জীব ভোগ করে, অন্য জীব ত্যাগ করে। ইহাতে নানা জীবই প্রতিপাদিত হয়। এইরূপ অর্থে সাঙ্খ্যবাদীর নানা জীববাদই প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু জীব এক, ইহাই বেদপ্রসিদ্ধ কথা; তবে আবার একের ভোগ, অন্যের ত্যাগ কিরূপে সম্ভব? আচার্য্য শঙ্কর বলেন—শ্রুতির নানা জীববাদসমর্থনের হেতু এই মন্ত্র নহে। জীবের বন্ধ ও মোক্ষ ব্যবস্থার প্রদর্শন করাই ইহার অভিপ্রায়। জীব এক হইলেও, জীবত্বজনক অজ্ঞান নানা। কিন্তু অজ্ঞান নানা হইলেই জীব নানা হইবে, এমন কথা সঙ্গত নহে। শ্রুতিও বলেন "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" অর্থাৎ "একই আত্মা সর্ব্বভূতে গূঢ়—সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা।" এই এক কখনও প্রকৃতিগত, কখনও প্রকৃতি হইতে মুক্ত, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? আচার্য্য শঙ্কর বলেন—তত্ত্বতঃ জীবের নানাত্ব না থাকিলেও, ঔপাধিক ভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু আমরা বলিব—ঔপাধিক যে ভেদ, তাহা জীবের ভেদ নহে, একেরই ঔপাধিক বৈচিত্র্য। তাহা হইলে বন্ধ ও মোক্ষ ব্যবস্থা কি? ঔপাধিক জীব যখন অহং-চৈতন্যের অভিনিবেশে বিভু-চৈতন্য হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র মনে করেন, তখনই তাহা জীবের বন্ধনদশা। আর যখন জীব আত্ম-চৈতন্যে উন্নীত হইয়া বিভুর অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সর্ব্বাসক্তি-পরিশূন্য হইয়া লীলানন্দে বিচরণ করেন, তাহাই জীবের মুক্তাবস্থা। এ সকল কথা পরে আসিবে। জীবের এক রূপ সৃষ্টিরত, মায়াশক্তি আশ্রয় করিয়া বহুতে পরিণত হয়। অন্য স্বরূপ কল্পান্তে প্রকাশশীলা প্রকৃতিকে সংহৃত করিয়া কূটস্থ চৈতন্যে পর্য্যবসিত। ইহাই শ্রুত্যুক্ত উভয় ছাগের রূপক-মর্ম্ম। ছাগ ও ছাগী অভিন্ন। দ্বিবিধ রূপকল্পনা সৃষ্টি ও লয়ের অবস্থা বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে।

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ॥১১॥

সংখ্যোপসংগ্রহাদপি (পঞ্চ-পঞ্চজন, এইরূপ সংখ্যাশব্দের প্রয়োগ থাকায়, ইহা সাংখ্যের ২৫ তত্ত্ব, এ কথা বলিলেও) ন (তাহা প্রমাণসিদ্ধ হইবে না। কেন?) নানাভাবাৎ (সাংখ্যের তত্ত্ব বহু) চ (আরও) অতিরেকাৎ (উক্ত মন্ত্রে ২৫ সংখ্যা অতিক্রম হয়) অর্থাৎ (সাংখ্যের যে প্রসিদ্ধ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, বৃহদারণ্যকোপনিষদের অস্মিন্ 'পঞ্চ-পঞ্চজনাঃ আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিত" অর্থে পাঁচ পাঁচে ২৫

করিলেও আকাশ একটী অতিরিক্ত হইয়া উহা ২৬শে পরিণত হয়। অতএব ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত শ্লোকার্থ সাঙ্খ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সমর্থক নহে।

প্রধান, অব্যক্ত, অজা, শ্রুত্যুক্ত এই শব্দগুলি সাঙ্খ্য-মতানুবর্ত্তী বলিয়া যে যুক্তি, তাহা খণ্ডিত হইলেও, শ্রুত্যুক্ত পঞ্চ-পঞ্চজন শব্দ সাঙ্খ্যমতেরই অনুবর্ত্তী বলিয়া মনে হইতে পারে। কেননা সাঙ্খ্যের মূল প্রকৃতি, প্রকৃতিবিকৃতিভাবাপন্ন মহদাদি ৭, কেবল বিকৃতি ১৮ এবং পুরুষ আত্মা এক, এই লইয়া ২৫ হয়। শ্রুতির উক্ত শব্দমন্ত্রে পঞ্চ-পঞ্চজন থাকায় সাঙ্খ্যের মতবাদ শ্রুতিমূলক বলিয়া ধারণা হওয়া অসঙ্গত নহে। ব্যাসদেব এই সূত্রে তাহার নিরাকরণ করিতেছেন। পঞ্চ-পঞ্চজন শব্দে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বৃহদারণ্যক উপনিষদের লক্ষ্য নহে। কেননা পূর্ব্বের পঞ্চশব্দ ও পরের পঞ্চজন-শব্দ এক পদ অথবা বিভক্তি নহে। পঞ্চশব্দের সহিত বীপ্সাপ্রয়োগ অসিদ্ধ হইয়াছে, বীপ্সাপ্রয়োগ না হইলে পাঁচ গুণান্বিত হইয়া২৫ হইতেই পারে না। যদি বলা যায়—পূর্ব্বের পঞ্চ পরের পঞ্চসঙ্খ্যার বিশেষণ; কিন্তু 'উপসর্জ্জনস্য বিশেষণেনাসংযোগাৎ' অর্থাৎ অপ্রধানের সহিত অপ্রধানের সংযোগ হইতে পারে না। এই নীতি অবশ্যই স্বীকার্য্য। বিশেষ্যের সহিতই বিশেষণের সম্বন্ধ-নীতি যদি অবলম্বিত হয়, পঞ্চজনের পঞ্চসঙ্খ্যার দ্বারা বিশেষিত হইলে পঞ্চবিংশতি সঙ্খ্যা পূরণ হয়। কিন্তু এ যুক্তিও সমীচিন নহে—কেননা পঞ্চজন সমাহার অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হয় নাই। পূর্ব্ব হইতেই সমাসসিদ্ধ পঞ্চজন-শব্দ সপ্তর্ষি শব্দের ন্যায় সংজ্ঞাবাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব এই পঞ্চ-পঞ্চজন পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব নহে। ইহাই প্রমাণিত হইল। আরও হেতু আছে। বাক্যশেষে আছে—"তমেবমন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্" সেই অমৃতস্বরূপ অবিনাশী আত্মাকে অবগত হইয়া অমৃত হও। আবার পঞ্চ-পঞ্চজনের সহিত আকাশ-শব্দের উল্লেখ আছে; অতএব পঞ্চ-পঞ্চ ২৫ ধরিলেও, আকাশ ও আত্মাকে ধরিয়া ২৭ হইয়া পড়ে। কাজেই "অতিরেকাৎ" ২৫শের অতিরিক্ত তত্ত্ব হওয়া হেতু এই পঞ্চ-পঞ্চজনা সাঙ্খ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের বোধক কিরূপে হইতে পারে? এইবার প্রশ্ন হইতে পারে, এই পঞ্চজন নামক সংজ্ঞাটি তবে কোন পদার্থবোধক? সূত্রকারের পরবর্ত্তী শ্লোকটী তাহার উত্তর দিবে।

### প্রাণাদয়োবাক্যশেষাৎ ॥ ১২ ॥

বাক্যশেষাৎ (বাক্যশেষ হইতে) প্রাণাদয়ঃ (জানা যায় ঐ পঞ্চজন প্রাণাদি)।

শ্রুতি বলিতেছেন—'যাহাতে পাঁচ পাঁচজন প্রতিষ্ঠিত' —তার পরই উক্ত হইয়াছে "প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুঃ ইতি", অর্থাৎ "যে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন ও মনের মনকে জানে" ইত্যাদি—এতন্মন্ত্রস্থ প্রাণাদি পঞ্চজন বিবক্ষিত হইতেছে। প্রাণাদিতে জন-শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত কিনা এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। শ্রুতিপ্রমাণ আছে। "এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ" "প্রাণহোপিতা প্রাণহোমাতা" এই নিদর্শনবাক্য প্রাণাদিতে পঞ্চজন শব্দের অর্থ সমর্থন করে। আরও এক আপত্তি আছে। বেদধ্যায়ীদের মধ্যে মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ীরা পঞ্চজন-শব্দে প্রাণাদি পঞ্চ গ্রহণ করেন। কিন্তু কাণ্বশাখীরা প্রাণাদির মধ্যে অন্ন-মন্ত্র তো পাঠ করেন না? এই প্রশ্নের মীমাংসা পরবর্ত্তী সূত্রে হইতেছে—

### জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥১৩॥

একেষাম্ (কাণ্বশাখীদের) অন্নে অসতি (অন্ন শব্দ অবিদ্যমান থাকিলেও) জ্যোতিষা (জ্যোতিঃ-শব্দের দ্বারা পাঁচ সংখ্যার পূরণ)।

কাণ্বশাখীরা এইরূপ পাঠ করেন—'তদ্দেবাজ্যোতিষাং জ্যোতিঃ'—দেবগণ সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ। জ্যোতিঃ-শব্দের দ্বারা পঞ্চ-সংখ্যার পূরণ হইল। কিন্তু তবুও প্রশ্ন—এক শাখায় জ্যোতিঃ-শব্দ পঞ্চসংখ্যাপূরণের কারণ হওয়ায়, অন্য শাখায় তাহা পঠিত হইলেও পঞ্চসংখ্যাপূরণের হেতু নহে—এ কিরূপ কথা? ইহার উত্তরে বলা যায়—এই উভয় শাখার মধ্যে অপেক্ষাভেদাদি আছে। মাধ্যন্দিন অর্থাৎ যজুর্ব্বেদীয় শাখাবিশেষের অনুসরণ করেন যাঁহারা, তাঁহারা প্রাণাদি পঞ্চকপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাখেন। কাণ্বশাখীরা এই বিষয়ে নিরাকাঙ্ক্ষ। কিন্তু তাঁহাদের জ্যোতিঃর অপেক্ষা আছে। তাই এক শাখায় যাহার গ্রহণ,

অন্য শাখায় তাহার অগ্রহণ হইয়াছে। যেমন অতিরাত্র যজ্ঞ সকল শাখায় সমান হইলেও, বচনভেদ হেতু ষোড়শ পাত্রের গ্রহণ ও অগ্রহণ, দুইই হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রেও তদনুরূপ অপেক্ষাভেদে পাঠান্তর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে সাংখ্যের প্রধান শ্রুতিপ্রসিদ্ধ হয় নাই। বরং শ্রুতিতে প্রধানের প্রতিপাদন-বাক্যই নাই, ইহাই প্রমাণিত হইল।

(ক্রমশঃ)

# উড়িয়া সাহিত্যিক ফকিরমোহন

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল

আমাদের এই বাংলা দেশে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমবাবুকে যেরূপে তাঁহার উপন্যাসের জন্য সম্মান দেওয়া হইয়া থাকে, উড়িষ্যাবাসিবৃন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমসাময়িক লেখক ফকিরমোহনকেও ঠিক সেইরূপই সম্মান দিয়া থাকে। তবে বঙ্কিমের প্রতিভা যেরূপ সর্ব্বতোমুখী ছিল—তাঁহার প্রতিভা ঠিক বঙ্কিমের তুলনায় সর্ব্বতোমুখী না হইলেও, উপন্যাসরচনায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল, স্বীকার করিতে হয়। উৎকল-ঔপন্যাসিক ফকিরমোহনের লেখনী ধারণ করিবার পূর্ব্বে—রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি লেখকবৃন্দের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাংলা ভাষার মত, উড়িষ্যা-ভাষা কেবল রাধাকৃষ্ণের গীত, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ প্রভৃতি কয়েকটী বিশিষ্ট বিষয়ে নিবদ্ধ ছিল। আপন ঘরের কথা, আপন মনের কথা বলিতে তাহাদের কোন আগ্রহই ছিল না। আগ্রহ থাকিলেও, তাহাদের সেই সকল মনোভাবকে প্রকাশ করিবার জন্য কোনরূপ গদ্যভাষার রীতিও তেমন প্রচলিত হইয়া উঠে নাই।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষের ফলে উড়িষ্যা লেখক-বৃন্দের সেই চিরকাল গতানুগতিকতার পথ ত্যাগ করিয়া গদ্য ভাষার অনুশীলন করিতে মন দিলেন। এই গদ্য ভাষার যথার্থ রূপে অনুশীলন ও পরিণতি আমরা ফকির-মোহনে দেখিতে পাই। বর্ত্তমান যুগের উড়িয়া প্রধান লেখক তিন জন—রাধানাথ রায়, মধুসূদন রাও এবং ফকির-মোহন। এই ত্রয়টী আধুনিক উড়িষ্যা-সাহিত্যের নব-ভাবধারা এবং নব-রচনার প্রথম প্রবর্ত্তক—এই ত্রয়ীর লেখা যখন প্রকাশিত হয়, তখন সাধারণে তাহা সর্ব্বান্তঃ-করণে গ্রহণ করিতে পারে নাই। কেহ কেহ এই ত্রয়ী লেখকের বিরুদ্ধে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন—রাধানাথ, ফকিরমোহন এবং মধুসূদনের প্রভৃতি আধুনিক লেখকের লেখায় উপেন্দ্র-যুগীয় চাতুরী অর্থাৎ শব্দঝঙ্কার নাই বলিয়া সাধারণের নিকট এই সকল লেখক প্রীতিকর হইয়া উঠে নাই। তবে এই উক্তি ফকিরমোহনকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই বলিয়া মনে হয়—ফকিরমোহন সেনাপতি অবিসংবাদিত ভাবে সরল উড়িয়া রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেন।

তাঁহার লেখা পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের ন্যায় অলঙ্কার বা সংস্কৃত শব্দ দ্বারা অযথা পীড়িত নহে; তাঁহার ভাষা যেমন সরল, তেমনি স্বচ্ছন্দ গতি। তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকগণ তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া অনেক অনেক সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়া সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। ফকিরমোহন উপন্যাস রচনায় যে প্রথম প্রবর্ত্তক ও শ্রেষ্ঠ রচয়িতা, তাহা বর্ত্তমানে উড়িষ্যাবাসী পাঠকবৃন্দ স্বীকার করিয়া থাকেন। উপন্যাস-রচয়িতা হিসাবে তিনি উড়িষ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও, তাঁহার সাহিত্যজীবন আরম্ভ হয়—পদ্য রচনায়। আপনার পরিণতি বয়সে তিনি আপনার ভুল বুঝিতে পারেন ও তিনি আপনার লেখনীর মুখ ফিরাইয়া উপন্যাস-রচনায় মন দিলেন। কবিবর রাধানাথকে তিনি আপনার ভ্রমের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন—"দেখ, রাধানাধ, মু কবিতা লেখুছি, এ মোর ভুল। তুম্ভেন লেখুছ, এ তোমার ভুল"। রাধানাথ ফকির-

মোহনের কথায় অনুরুদ্ধ হইয়া পদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন এবং তিনি যে এ পদ্য রচনায় কত বিশেষ অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা চিলিকা, উষা মহাযাত্রা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায়।

উপরি উক্ত ক্ষুদ্র ঘটনাটি লক্ষ্য করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, ফকিরমোহন সেনাপতি যেমন আপনার কোথায় দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিতেন, তেমনি অপরের কোথায় সাহিত্য-প্রতিভা লুক্কায়িত আছে, তাহারও অনুসন্ধান রাখিতেন।

ফকিরমোহনের প্রথম সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ হয় রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদে। কবির দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত সন্তান মারা যাইবার পর, তাঁহাকে সাতিশয় শোকাকুল ও দুঃখিত চিত্ত দেখিয়া কবি ফকিরমোহন পুরাণ পাণ্ডাকে দিয়া তাঁহার শোকাবেগ উপশম করিবার হেতু শারলা মহাভারত শুনাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু পুরাণ পাণ্ডা এমন গড় গড় করিয়া মহাভারত আবৃত্তি করিয়া যাইতেন যে, তাঁহার পত্নী কেন, তিনিও উহার কোন কথাই সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেন না।

তখন তিনি সহধর্ম্মিণীর সন্তোষবিধান বাসনায় নিজেই এক এক অধ্যায় করিয়া রামায়ণ অনুবাদ করিতেন ও তাহা আপন স্ত্রীকে শুনাইতেন। তাঁহার স্ত্রী ফকির-মোহনের সরল রচনায় বিশেষ মুগ্ধ হইয়া গেলেন—তাঁহাকে কহিলেন—আমার আর পুত্র কে? এই রামায়ণই আমার পুত্র।

কবি তাঁহার পত্নীর এরূপ উক্তিতে অতি সন্তুষ্ট হইয়া সমগ্র রামায়ণ অনুবাদ শেষ করেন। ইহার পর ছামু পট্টনায়ক উপাধি বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি তাঁহাকে মহাভারত অনুবাদ করিবার জন্য অনুরোধ করেন—ঢেঙ্কানালে থাকিবার সময়ে ফকিরমোহন মহাভারতের আদি পর্ব্ব শেষ করেন। সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করিতে তাঁহার নয় বৎসর সময় লাগিয়াছিল। তবে এই মহাভারত কিয়দংশ মুদ্রিত হইয়াছে, সমগ্র মুদ্রিত হয় নাই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ কাব্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন :—(১) সম্ভ্রান্ত কবিতা, (২) সাধারণী কবিতা। প্রথমোক্ত শ্রেণীর কাব্যতে বিখ্যাত ঘটনা, প্রখ্যাত বীর, শক্তিশালী রাজা, গুণবান্ রাজপুত্র, রূপলাবণ্যবতী রাজকন্যা,—প্রভৃতি বিষয় বস্তু লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। (২) দ্বিতীয় প্রকার কাব্যতে সাধারণ দৈনন্দিন বিষয়, দরিদ্র কৃষক, ভিক্ষুক, গৃহস্থ—প্রভৃতি জনসাধারণের বিষয়-বস্তু গৃহীত হইয়া থাকে।

মার্কিণ-দেশীয় কবি হুইট্‌ম্যান্ ও আমাদের উৎকল কবি ফকিরমোহন শেষোক্ত শ্রেণীর কবি। সেনাপতি মহাশয়ের "নেতগাই", "বেঙ্গভাই", "সারিয়া তন্তিআনী", "গোবিন্দপুর দাস্ত"—প্রভৃতি গ্রন্থের বিষয় জনসাধারণকে অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। সেনাপতি মহাশয় যে, জনসাধারণের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন—তাহা তাঁহার উক্ত কাব্যগ্রন্থে যথেষ্ট প্রকাশ পাইলেও, উপন্যাসের ভিতরে তাহার বিশেষ স্ফূর্ত্তি লইয়াছে—তাহা আমরা "ছয়মাণ আঠগুণ্ঠ", "প্রায়শ্চিত্য" প্রভৃতি গ্রন্থে লক্ষ্য করিতে পারি। কটকে তিন বৎসর অবস্থান করিবার সময়ে কবি ফকিরমোহনের "ছয়মাণ আঠগুণ্ঠ"—প্রভৃতি উপন্যাস খণ্ড খণ্ড ভাবে উৎকল-সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। উৎকল-সাহিত্যের দ্বিতীয় খণ্ডে—সেনাপতি মহাশয়ের "ছয়মাণ আঠগুণ্ঠ" বিখ্যাত উপন্যাস প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কয়েক বৎসর বাদে "ছয়মাণ আঠগুণ্ঠ" স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া পাঠকসমাজের হস্তগত হয়। এই উপন্যাস লিখিয়া তিনি জনসাধারণের নিকট বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠেন; এবং সেনাপতি মহাশয়ের যথার্থ সাহিত্যিক প্রতিভা বিকশিত হইতে আরম্ভ হয়। "ছয়মাণ আঠগুণ্ঠ" প্রকাশিত হইবার পর "রেবতী" নামক ক্ষুদ্র গল্প এবং "অপূর্ব্ব মিলন" নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৪ বৎসর বাদে "অপূর্ব্ব মিলন" নামক উপন্যাসটী "লছমা" নামক স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কয়েকটী উপন্যাস বাদে—"যোগশাস্ত্র", "ভূত ভবিষ্যত", "চৈতন্যদেব চরিত" প্রভৃতি গুটিকয়েক প্রবন্ধ উৎকল-সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে ফকিরমোহন সেনাপতি গল্প, উপন্যাস ও ব্যঙ্গ কবিতা লেখায় উৎকল-সাহিত্যের পাঠকসমাজের নিকট ধূর্জ্জটী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

স্কন্দ পুরাণ অন্তর্গত উৎকল-খণ্ড "হরিবংশ", "বিষ্ণুপর্ব্ব" ও "ভবিষ্যপর্ব্ব" পদ্যানুবাদ করিয়া একত্র "খিল হরিবংশ" নামে পুস্তকরূপে উৎকল-সাহিত্য-যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহার পর কতকগুলি উপনিষদের পদ্যানুবাদ সঙ্কলন করিয়া "উপনিষৎসংগ্রহ" নামক পুস্তক মুদ্রিত হয়। এই সংগ্রহ গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার পর, তাহার 'উৎকল-ভ্রমণ' নামক পুস্তক মুদ্রিত হয়। এই ভ্রমণ-কাহিনী মাসিক পত্রিকায় পহিলা-গন্ত নামে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল।

এইরূপে উৎকলে তিন বৎসর সম্পন্ন করিয়া তিনি বালেশ্বরে নির্জ্জন মল্লিকাশপুরে আসিয়া একটী বাগান-বাড়ী নির্ম্মাণ করেন এবং এই বাগান-বাড়ীর নাম দেন, "শান্তি-কাননে"। বালেশ্বরে মল্লিকাশপুরে সেনাপতি মহাশয় ১৫ বৎসর অতিবাহিত করেন। এই স্থানে থাকিবার সময়ে তিনি অধিকতর উৎসাহের সহিত সাহিত্যচর্চ্চায় মন দিলেন। কটকের প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র উৎকল-সাহিত্য ও মুকুর পত্রিকা তাঁহার লেখনীপ্রসূত গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত। "পুনর্মূষিকোভব", "কবিত্ব-বিসর্জ্জন", "সভ্য জমিদার" প্রভৃতি ক্ষুদ্র গল্প ঐ দুই মাসিক পত্রিকায় বাহির হয়। পশ্চাৎ ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প একত্র করিয়া "গল্প-সল্প" নাম দিয়া সেনাপতি মহাশয় একটী ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত করেন। "ছয়মাণ আঠগুণ্ঠ" ও "অপূর্ব্ব-মিলন" নামক দুইটি উপন্যাস মুদ্রিত হইবার পর কবি-লেখনীপ্রসূত কোন উপন্যাস বহুদিন বাহির হয় নাই। বালেশ্বরে আসিয়া তিনি "মামু" ও "পশ্চাৎ প্রায়শ্চিত্ত" নামক দুইটী গার্হস্থ্য উপন্যাস লেখা সম্পন্ন করেন।

এই সকল উপন্যাস লিখিয়া যে লোক-খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন—তাহার মূলে আছে তাঁহার বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন ও সরল ভাষা। বর্ণিত কাহিনীগুলিকে জীবন্ত-ভাবে পরিস্ফুট করিবার জন্য গ্রন্থকার সাধারণ অপভ্রষ্ট শব্দ উবাস, মনস প্রভৃতি শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। মুসলমান রাজত্বকালে ভারতের সর্ব্বত্র পারশী ভাষা ব্যবহৃত হইত, বহু শতাব্দীর অন্তরঙ্গতার ফলে এই সব পারশী ভাষা উড়িয়া ভাষার সহিত এরূপ অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল যে, উড়িয়া সাহিত্য হইতে এই সব শব্দগুলি দূরীভূত করা যে সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেওয়া হয় তাহা নহে, বরং সাহিত্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও সজীবতা নষ্ট হইয়া যায়। ফকিরমোহন সেনাপতি ভাষার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও সজীবতা রক্ষণ করিবার জন্য যাবনিক শব্দের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশীয় ভাষার প্রবচনগুলি ফকির-মোহনের পূর্ব্বে কেহই সাহিত্যে তাহা প্রকাশ করেন নাই। ফকিরমোহন সেনাপতি তাঁহার উপন্যাস "ছয়মাণ আঠগুণ্ঠ" প্রভৃতিতে পিতা গুণরে পুতা (like father like son) প্রভৃতি প্রবচন প্রয়োগ করিয়া ভাষাকে সজীব ও অধিকতর কার্য্যকরী করিয়া তোলেন।

এই বালেশ্বরে বসিয়া তিনি "বৌদ্ধাবতার" নামে এক কাব্য প্রকাশ করেন; কিন্তু কাব্য হিসাবে "বৌদ্ধাবতার" মোটেই সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে কবিকে দোষীভুক্ত করা সমীচিন বলিয়া বোধ হয় না, ইহার কারণ বৌদ্ধাবতার কাব্যের বিষয়বস্তু তাঁহার এক প্রকার নষ্টোদ্ধার মাত্র। এই শান্তিকাননে "অবসর-বাসরে" নামক একটি কবিতা পুস্তক লেখেন। "অবসর-বাসরে" লিখিবার পর "প্রার্থনা", "পূজাফুল", "ধূলি" প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক রচনা করিয়া পাঠকসমাজকে মুগ্ধ করেন।

কবির শেষ জীবন এই বালেশ্বরে "শান্তিকাননে" অতিবাহিত হয়। বৃদ্ধাবস্থায় বৈশেষিক ও "ভগবদ্গীতা" প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠ ও চর্চ্চা করিতেন; সেই সময়ে বালেশ্বরে কবির সহিত কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, কবি তাহার সহিত "ভগবদ্গীতা" ও বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন।

# প্রাচীন চীনের সামাজিক ভিত্তি

(৭)

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম.এ., পিএইচ. ডি.

## বিপ্লবের অর্থ

চীন-বিপ্লব স্বাধীনতার নামে স্বীয় জাতীয়পতাকা উড্ডীন করে। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর 'পঞ্চবর্ণের পতাকা ইহার জাতীয় পতাকা বলিয়া গৃহীত হয়। বিপ্লব চীনসাম্রাজ্যে একজাতীয়ত্ব (Nationality) আনয়নের চেষ্টা করে; সেইজন্য এই পঞ্চবর্ণ চীন, মাঞ্চু, মোঙ্গল, তিব্বতীয়, মুসলমান এই পঞ্চজাতির সম্মিলনের প্রতীকরূপে গৃহীত হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া লোকের মনে প্রাচীন পদ্ধতির বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ-বহ্নি ধূমায়মান হইতেছিল, রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার অগ্ন্যুৎপাতকে চীনবিপ্লব বলা হয়। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই ইহার ক্রিয়া দেখা যায়*। লোকের পোষাক, মাঞ্চুদের দ্বারা অধিষ্ঠিত মাথার লম্বা বেণী কাটা, স্কুলের পাঠ্যপুস্তক, চিকিৎসাশাস্ত্র, হিসাব রাখার প্রাচীন পদ্ধতি প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে থাকে। প্রাচীন কনফুসীয় পদ্ধতির পরিবর্ত্তে লোকে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবী করে। জাতীয় সমিতি কুয়মিঙ্গটঙ্গের অনেক বিশিষ্ট নেতা সোসালিষ্ট মতাবলম্বী ছিলেন। অস্থায়ী গঠনতন্ত্রের (constitution) উদ্দেশ্য ছিল—"a preparation for the introduction of Socialism...to develop the resources of the country for the benefit of the whole people" (১) (সমাজতন্ত্র প্রবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হওয়া, দেশের সমস্ত সম্পদ সমস্ত লোকের উপকারার্থ উন্নতি সাধন)। এই উদ্দেশ্য নিয়া বৈপ্লবিকেরা গঠনমূলক কার্য্যে অবতীর্ণ হন। প্রাচীন শিল্প, ব্যবসায় ও পেশা ও গিল্ডগুলি এই উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল নয় বলিয়া নূতন ভিত্তিতে নিজেদের গঠনকার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত লোকদের উদ্দেশ্য ছিল যে, তাহাদের শ্রেণীই শাসনকার্য্যাদি পরিচালনা করিবে; এইজন্য ভোটাধিকার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

কিন্তু ইউয়ানসিকাই সাধারণতন্ত্রের কর্ণধার থাকায় ক্রমে প্রতিক্রিয়া বলবৎ হয়। অবশেষে সুন ইয়াৎ সেনের দলের সহিত তাহার বিবাদ উপস্থিত হয়। সেন জাপানে পলায়ন করেন। ইউয়ান সম্রাট্ হইবার জন্য চেষ্টা করে এবং রাজমুকুট পরিধান করিবারও উদ্যোগ করে। কিন্তু হঠাৎ তাহার মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে পৃথিবীব্যাপী মহাসমর আরম্ভ হয়। জার্ম্মাণ অধিকৃত সাংটু নামক চীনের স্থানটি জাপান দখল করে; চীনও অবশেষে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু ভার্সাই সন্ধির সময় চীনকে জাপানের সাংটুং সম্বন্ধে জাপানের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বলা হয়।

চীনে এই সংবাদ পৌঁছিলে ছাত্রসমাজ ভীষণভাবে উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তাহারা পিকিং-এ বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করিয়া নিজেদের মনোভাব জ্ঞাপন করে।

## নূতন স্রোতঃ

কিন্তু ছাত্র আন্দোলন আনফু গভর্ণমেণ্ট নামক জাপানীদের ভাড়াটে চীন গভর্ণমেণ্টকে পরাস্ত ও অপমানিত করিয়া ধ্বংসের পথে প্রেরণ করে। ছাত্র আন্দোলন দ্বারা চীনের জাতীয়তাবাদ নূতন স্রোতে গা ভাসায়। এই আন্দোলনকে বৈদেশিকদের অধীনে দাসত্বের বিরুদ্ধে **দ্বিতীয় জাতীয় আন্দোলন** বলা হয় (প্রথমটি বক্সার আন্দোলন)। ছাত্র আন্দোলনের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শক্তি ও উহার বিপুলতা দেখিয়া আক্রমণশীল বৈদেশিক শক্তিদের সাবধান হইতে হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা গিয়াছিল যে, চীন এখন নূতন পথে চলিতেছে।

এই সঙ্গে আর এক শক্তির প্রভাব প্রকাশ পায়—প্রাচীন ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের সঙ্ঘসমূহের শক্তি। ছাত্র ও ছাত্রীরা বিদেশীয়দের বিপক্ষে তাহাদের আন্দোলনে ঐ সকল সঙ্ঘের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। তাহাদের কৃতকার্য্যতার মূলে ছিল এইসব ব্যবসায়ী সঙ্ঘের টাকা। আর্থিক মন্ত্রীবিভাগের (Ministry of Finance) উপর ব্যাঙ্কার গিল্ডের প্রভাব, গিল্ড ও স্বদেশপ্রেমিক সমিতিগুলির প্রতিনিধিগণের পিকিংএ থাকিয়া প্রত্যেক সঙ্কট সময়ে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করা, "জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গের ওয়াশিংটন কনফারেন্সে গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের কার্য্যের উপর নজর রাখা, কিয়াংসুর গভর্ণরের চেম্বার অফ কমার্সের অধীনতা স্বীকার করা প্রভৃতি কার্য্যাবলী হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, চীনের নূতন স্রোতঃ কোনদিকে বহিতেছিল। এতদ্দ্বারা সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের লোকদের উৎপাতও চরমপন্থীদের নূতন প্রস্তাবের পশ্চাতে ব্যবসায়ীশ্রেণীর প্রভাব অন্তঃসলিলারূপে প্রবাহিত হইতে দেখা যায় (১)।

---

* A. I. Brown—"New Forces in Old China"; "Chinese Revolution" এবং G. H. Blakesby—"Recent Development in China".

(১) Gowen and Hall—P 363. এবং Yunyat Sen—"International Development of China," 1922.

১। Gowen and Hall—Pp. 418.

এই প্রকারে যে-বিপ্লব সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তির উপর রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনের পথ প্রশস্ত ও সুগম করিতেছিল এবং জাতীয় সম্পদ সকলের ভোগের অধিকারের আদর্শ নিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা এখন ব্যবসায়ীদের হস্তের ক্রীড়নক হইয়া পড়ে। মাঞ্চু অভিজাতদের তাড়াইবার নামে বিপ্লব ঘটাইয়া ব্যবসায়ী বুর্জ্জোয়াশ্রেণী শাসনযন্ত্র ক্রমশঃ করায়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। বর্ত্তমান সভ্যতার আলোক চীনে প্রবেশ করায় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে **"নূতন চীনের"** অভ্যুদয় হয়; কিন্তু সেই **"নূতন চীন"** এখন সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের করায়ত্ত নয়। উহা ব্যবসায়ীদের হস্তের পুত্তলিকা হয়। জাগ্রত চীনের শিক্ষিত লোকেরা এই নবোত্থিত বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর মুখপাত্র হয়।

যুদ্ধের পর হইতে চীনে শ্রম-শিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে স্থাপিত হয়। চীনে Industrialism প্রবেশ করে। ১৯২৫ খৃঃ অঃ সাংহাই জেলায় ত্রিশ লক্ষ মাকুর (spindle) তুলার কারখানা স্থাপিত হয়; ইহার সংখ্যা লঙ্কাসায়ারের চেয়েও বেশী (১)। ইহার মধ্যে অর্দ্ধেকেরও অধিক কারখানাগুলি চীনাদের সম্পত্তি। এইসব কারখানায় (factory) শ্রমিকদের অবস্থার ইতিহাস শ্রমশিল্পের দাসত্বেরই ইতিহাস।

মেয়ে ও বালকদের শ্রমিকের কার্য্যে নিয়োগ করা হইত—দৈনিক খাটুনি ১২ হইতে ১৪ ঘণ্টা খাটুনি এবং দৈনিক বেতন আমেরিকান মুদ্রায় ৬—১০ সেণ্ট কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের সময়ে ছাত্রেরা কারখানার এই শ্রমিক এমন কি রিক্‌শাওয়ালাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে। ইহার ফলে কতগুলি ধর্ম্মঘট হওয়ায় শ্রমিকদের সঙ্ঘ ও তাহাদের জীবিকার উন্নতির আবশ্যকতা মালিকদের দ্বারা স্বীকৃত হয়। চীনা মূলধনীরা গিল্ডপদ্ধতির সহিত তিন হাজার বৎসর ধরিয়া পরিচিত থাকায় তাহারা এই নূতন প্রচেষ্টায় ভয় পায় নাই, শ্রমিকদের কথায় কর্ণপাত করে। কিন্তু বিদেশী ধনীদের সঙ্গেই চীনা শ্রমিকদের বেশী সংঘর্ষ হয় (২)। কিন্তু এস্থলেও তাহারা জয়ী হয়।

অন্যদিকে চীনা ব্যবসায়ীরা আর বিদেশীর মধ্যবর্ত্তী লোকদ্বারা কারবার না করিয়া নিজেরাই বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায়-সম্বন্ধ স্থাপন করে। এতদ্দ্বারা চীনা কারবারীরা বিশেষ লাভবান্ হয়। ফলে প্রচলিত "Compradore" (৩) পদ্ধতিও উঠিয়া যায়। ১৯২৪ খৃঃ অঃ Maritime Customs Reportএ চীনের বৈদেশিক ব্যবসায় যে তাহার পূর্ব্ব বৎসর হইতে বেশী বাড়িয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর উত্থানের সঙ্গে চীনের রাজনীতিক পট ঘন ঘন পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। নানাপ্রকারের সামরিক adventurers উত্থিত হয়, দেশে অন্তঃযুদ্ধ ক্রমাগত চলিতে থাকে। ইহার মধ্যে চীনের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বিজয় হইতেছে সোভিয়েট রুশের সঙ্গে পুনঃ বন্ধুত্ব স্থাপন (১)। সোভিয়েট রুশ সর্ত্ত করে যে বক্সার-খেসারতের বখরা চীনকে চীনের লোকদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে হইবে। পুরাতন জারের শাসনকালের অধিকার ও দাবীসমূহ সোভিয়েট রুশ ত্যাগ করিবে, চীনে বৈদেশিকদের আলাদা ব্যবস্থা ও সুবিধা (extraterritorial privileges) রুশ দাবী করিবে না এবং চীনে রাজদূত (ambassador) প্রেরণ করিবে। এই প্রকারের সর্ত্ত কোন বৈদেশিক শক্তি চীনের সঙ্গে করে নাই। চীনকে রুশ সমানভাবে গ্রহণ করে।

পরে সুন-ইয়াৎ সেন কাণ্টনে পৃথক গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিবার পর সোভিয়েট রুষের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে। তাহার ফলে চীনে একদল রুশ বিশেষজ্ঞ (experts) প্রেরিত হয় (২)। এই সময়ে চীনে সাম্যবাদীয় কম্যুনিষ্টদল সৃষ্টি হইয়াছে। সুন তাহাদের কুওমিঙ্গট্যাংএ সভ্যরূপে গ্রহণ করেন। ১৯২৫ খৃঃ অঃ ১২ই মার্চ্চ সুনের মৃত্যুর পর কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ মিলিত হইয়া চাঙ্গসোলিঙ্গকে পরাজিত করিবার পর, চীনা জাতীয়তাবাদীরা (Nationalist) কম্যুনিষ্টদের স্বীয় পদ্ধতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সন্দেহ করিয়া সাংহাই প্রভৃতি স্থানে তাহাদের হত্যা করেন। কম্যুনিষ্টরাও একটা বিপ্লব করিবার চেষ্টা করে কিন্তু অকৃতকার্য্য হয়। এই সময় হইতে চীনের বিখ্যাত শ্বাশস্থালিষ্ট নেতা হন সুনের শিষ্য চাঙ্গকাইচেক। ইনি বুর্জ্জোয়া চীনের প্রতীক, উজ্জ্বল অর্থনীতিক সাম্যবাদের শত্রুতাচরণ করেন।

যেদিন হইতে সাম্যবাদীরা কুমিঙ্গটঙ্গে প্রবেশ লাভ করে সেইদিন হইতে চীনে আর একটি শ্রেণীর স্বর রাজনীতিতে প্রবেশ করে—ইহারা শ্রমিক ও কৃষকদের দল। সাম্যবাদীরা শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করিতে থাকে। প্রথমে জাতীয়তাবাদীরা (Nationalist) ইহাতে বাধা প্রদান করে নাই, কারণ বুর্জ্জোয়াশ্রেণী ভাবিয়াছিল যে, ইহাদের নিজের কার্য্যে লাগাইতে পারে। ইহা সত্য যে, এইসব কৃষকদের সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিয়া চাঙ্গ-সোলিনের বিরুদ্ধে অভিযান করা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু যখনই তাহারা শ্রেণী-জ্ঞানে (Class consciousness) প্রবুদ্ধ হইয়া নিজেদের অধিকার স্থাপনে প্রয়াস পায় তখন হইতে তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ হয়।

এই অত্যাচারের ফলে শ্রেণী-সংগ্রাম ভীষণভাবে চলিতেছে; চীন

---

১। Gowen and Hall—Pp. 426; Christian Science Monitor: August—1925. G. S. Eddy—"New World of Labour" Doran, 1925.

২। Gowen and Hall—Pp. 427—428

৩। চীনদেশে ইউরোপীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কারবারের সুবিধার্থে দেশীয় (Native) লোক রাখা হইত। তাহাদের মধ্যে যিনি প্রধান তাঁহাকে Compradore বলা হইত।

---

১। Gowen and Hall Pp. 454—461

২। Liang-Li—Inner History of Chinese Revolution.

এখন আর বিভিন্ন War-lords বা উত্তর ও দক্ষিণের গভর্ণমেণ্টে বিভক্ত নয়—চীন এখন বুর্জোয়া ও প্রলেটারিয়েট শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। নানকিন গভর্ণমেণ্ট, বুর্জোয়াদের গভর্ণমেণ্ট এবং চীনে শ্রমিক ও কৃষকদের সোভিয়েট পৃথকভাবে স্থাপিত হইয়াছে। চীনের সোভিয়েট পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টের অধীনে পাঁচটি প্রদেশ ও এক কোটি অধিবাসী দখলীকৃত আছে। কিন্তু চাঙকাইচেকের অধীনে নানকিং গভর্ণমেণ্ট ক্রমাগত ইহাকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছে,—অথচ আজ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হয় নাই।

চীনের বিপ্লব মানুষের বিপক্ষে ও জনসাধারণের নামে ঘোষিত হয়। শেষে গভর্ণমেণ্ট বুর্জোয়াদের করায়ত্ত হয় এবং বুর্জোয়ারা পুরাতন অভিজাতশ্রেণী জমিদার প্রভৃতিদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে। জাতীয় সম্পদকে জনসাধারণের ভোগাধিকারের জন্য নিয়োজিত করিবার পরিবর্ত্তে তাহা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া জনকতকের ভোগার্থে নিয়োজিত হইতেছে। চীনেও ফ্রান্সের ন্যায় সাম্য ও স্বাধীনতার নামে বিপ্লবের পতাকা উড্ডীন হয়। তাহার ফল শেষে মুষ্টিমেয়ের করায়ত্ত হইয়াছে। সমাজতন্ত্রের নামে বিপ্লব আরম্ভ করিয়া বুর্জোয়াদের ব্যক্তিস্বাদে ঠেকিয়াছে। কিন্তু চির-অত্যাচারিত, শোষিত ও লুণ্ঠিত গণশ্রেণীসমূহ এখন জাগ্রত হইয়াছে, নিদ্রিত চীন এখন জাগরিত হইয়াছে। এইজন্যই শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্ররূপ ধারণ করিয়াছে। চীন এখনও নূতন ভিত্তিতে একজাতীয়তা ( Nationality ) প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই।*

* লেখক ১৯২৯-৩০ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশসমূহের সমাজ-বিবর্ত্তনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণয়ন করেন। কিন্তু বিবিধ কারণ বশতঃ উহা সেই সময় প্রকাশিত হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান সময়ে সেই সকল রচনা বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধটি উক্ত পুস্তকেরই একটি অধ্যায়।—পঃ 'প্রবর্ত্তক'।

# প্রবর্ত্তক রজত-জয়ন্তী : বাঁকুড়া

( দশম অনুষ্ঠান )

স্বামী অমৃতানন্দ

যে ভাব ও আদর্শ এবং যে জীবন-নীতি প্রবর্ত্তকের মধ্য দিয়া এই দীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল অনাহতভাবে বাঙালী জাতির নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হইতেছে, প্রবর্ত্তক রজত-জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠানে তাহাই সার্থক হইতে চলিয়াছে। সঙ্ঘনেতা প্রত্যক্ষ বাণীমূর্ত্তির দ্বারা বাংলার জনসাধারণের নিকট তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত জীবন-সাধনার মর্ম্মকথা ও বাঙলায় জাতিগঠনের নীতি ও কর্ম্মধারা প্রকাশ করিতেছেন। প্রবর্ত্তক এতদিন ধরিয়া প্রবন্ধ, কাহিনী প্রভৃতির মধ্য দিয়া বাঙালী জাতির নিকট যে জীবনবাণীর অভিব্যক্তি দিয়াছে, তাহাই যে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতৃ পুরুষের কণ্ঠনিঃসৃত তাঁহার সাহায্যে দেশবাসীকে জানাইবার আয়োজন চলিয়াছে, ইহা না বুঝিলে প্রবর্ত্তক রজত-জয়ন্তীর প্রেরণা ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হইবে না। একখানি সাহিত্য পত্রিকার রজত-জয়ন্তী লইয়া এতখানি আন্দোলন করিবার কোনই সার্থকতা ছিল না—২৫ বর্ষ পূর্ণ হওয়ার পর একদিন সাহিত্যিক ও সুধীমণ্ডলীকে আমন্ত্রণ করিয়া পানভোজনে পরিতুষ্ট করিলেই যথেষ্ট হইত—কিন্তু প্রবর্ত্তক, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ভাববাহী মুখপত্র। যে আদর্শ ও জীবন-নীতির সাধনা জাতিসংগঠনকল্পে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সাধকগোষ্ঠী এই দীর্ঘকাল ধরিয়া সাধিয়া চলিয়াছে, তাহাই প্রবর্ত্তকের স্তম্ভে প্রকাশ করিয়া সমগ্র দেশ ও জাতির নিকট পৌঁছাইয়া দিবার প্রয়াস করা হইয়াছে।

কেমন করিয়া এতদিনের এই বুদ্ধিমান জাতি তার বর্ত্তমান দুরবস্থাকে অতিক্রম করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে, আজিকার সমস্যাময় জীবনে এই প্রশ্নই সকলের মনে উঠিয়াছে—সমস্যা যখন কেবলমাত্র কোন একটী ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে তখন দুর্ভাবনা থাকে না। কেবল শক্তি প্রয়োগের কৌশল আবিষ্কৃত হইলেই তার সমাধানের পথ প্রশস্ত হয়; কিন্তু যখন জীবনের প্রতি পর্ব্বে সমস্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসে এবং আত্মবিশ্বাস পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া যায়, তখন সেই দিশাহারা অবস্থায় ভাগ্যের উপর

দোহাই দিয়া নিরুপায় হওয়া ছাড়া গত্যান্তর থাকে না, জীবনের প্রতিদিনকার প্রয়োজন মিটাইয়া জীবনমূলে যে ক্ষয় ধরিয়াছে তাহা নিবারণের অবসরও মিলে না। তখন জাতিরই সত্তা, জাতিরই মূল ইচ্ছাশক্তি কতকগুলি লোককে কেন্দ্রীভূত করিয়া একই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধপ্রাণ সমষ্টি ও মণ্ডলীকে এইভাবে পরিচালিত করেন, ফলে মৃতপ্রায় জাতির মধ্য হইতেই সিদ্ধ জীবননীতির আবিষ্কার হয়—অশেষ আত্মত্যাগ ও সাধনার বলে। বাহিরের কোন মতবাদ আশ্রয় করিয়া হয়তো সাময়িক কোন বিপর্য্যয় হইতে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু একটি উন্নত জাতির অভ্যুদয় নির্ভর করে যুগোপযোগী জীবননীতির আবিষ্কার ও সাধনার উপর। এইদিক দিয়া প্রবর্ত্তক রজত-জয়ন্তীর অনুষ্ঠানের যে কি এবং কতখানি প্রয়োজন তাহা বুঝা সম্ভব হইবে।

বাঙ্‌লাদেশ ও বাঙালী জাতিকে লইয়াই কথা। বাঙ্‌লার পতনযুগ বহুকাল হইল সুরু হইয়াছে—এতদিন আমরা রাষ্ট্রক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সমস্যা লইয়া ব্যস্ত ছিলাম। নিশ্চিন্ত ছিলাম যে, আমাদের সমাজ ও ব্যষ্টিজীবন অটল ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠ আছে। কিন্তু সদ্য মোহমুক্ত ব্যক্তির মত দেখিতেছি, আমাদের কি ব্যষ্টি-জীবন, কি পারিবারিক জীবন, কি সমাজ জীবন, জীবনের সকল স্তরেই বিপর্য্যয়ের ঘনঘটা আসিয়াছে। মনে হইতেছে, অতর্কিতে ইহা আসিয়াছে; কিন্তু বাঙ্‌লার অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের ত্রুটী দেখিতে পাইব—বিগত যুগের নেতৃ পুরুষগণ ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেন নাই। করিলে তৎকালীন সমস্যা মোচনের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের সমস্যা ও তাহার সমাধানের জন্য অভয়-বাণী শুনাইয়া তাঁহারা জাতিকে সতর্ক করিয়া যাইতেন। এখন সমস্যার কথা শুনিতে শুনিতে আমরা ক্রমশঃ অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছি। কি সেই অমোঘবাণী, কি সেই ঋজু ও অভ্রান্ত পথ? জাতিকে নূতন করিয়া সৃষ্টি ও সংগঠিত করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া কোথায় সেই ঋষিকল্প নেতৃ পুরুষ—যিনি এই পতিত, দরিদ্র, অনশনক্লিষ্ট, আত্মবিশ্বাস-হীন লোকসমষ্টির মধ্য হইতে তাঁর প্রেরণাময়ী বাণীর দ্বারা জাতির অভ্যুদয় আনিবেন। বাঙ্‌লাদেশ নেতা চায়, নীতি চায়, চায় অনাহত গতি। গতিহীন জাতির মধ্যে যে পঙ্কিলতা, আবর্জ্জনা, নীচতা, শঠতা তাহা বর্ত্তমানে আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে।

প্রবর্ত্তক রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে সঙ্ঘনেতার সহিত বঙ্গদেশ পরিক্রমণ কালে একই প্রশ্ন ও সমস্যার কথা বিভিন্ন স্থানে শুনিতেছি। সুদূর চট্টগ্রামে, সুউচ্চ দারজ্জিলিংএ যাহা শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি, সমতলভূমি নবদ্বীপে ও বর্দ্ধমানে তাহারই প্রতিধ্বনি কর্ণগোচর হইয়াছে। একদা উন্নত বাঙালীর সমাজের পঙ্কিলতা ও দুরবস্থার বর্ণনা শ্রবণে সঙ্ঘনেতার ভ্রূ কুঞ্চিত হইতে দেখিয়াছি। ব্যথার কাহিনী তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত করিয়া চক্ষু সজল করিয়াছে—আমরা তাঁর ধ্যানমূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। তাই বলিতেছিলাম, প্রবর্ত্তক রজত-জয়ন্তী এই জাতিকে সচেতন করার একটা প্রেরণামাত্র। অতঃপর সুনির্দ্দিষ্ট পন্থানুসরণ করিয়া জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করিতে হইবে। আজ প্রতি ব্যক্তিকে কর্ম্মশীল হইতে হইবে। জাতিগঠনে উপেক্ষা, উদাসীনতা ও অবহেলা করিলে চিরলাঞ্ছিত য়ীহুদীদের মত আমরা পরভৃতিক জীবন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইব। আমরা একটী সমাজের অন্তর্গত, কিন্তু আমরা যে একটী জাতি, এই চেতনা আমাদের সর্ব্ব কর্ম্মে সদাপ্রতিষ্ঠা লাভ করিলে, কল্যাণময় জীবন কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমরা লাভ করিতে পারিব।

বাঁকুড়ায় প্রবর্ত্তক রজত-জয়ন্তীর উৎসবায়োজনের কথা লিখিতে গিয়া প্রথমেই বাংলার সুসন্তান রায়বাহাদুর শ্রীহরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কথা স্মরণে আসিল। সঙ্ঘের নানাবিধ কর্ম্ম প্রচেষ্টার সহিত রায়বাহাদুর শ্রীহরিপ্রসাদ দীর্ঘদিন হইতে সংযুক্ত আছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর প্রীতি ও পৃষ্ঠপোষকতা অতুলনীয়; বাঙালী সমাজের উন্নতিও শ্রীবৃদ্ধির জন্য তাঁহাকে অশেষ নির্য্যাতন ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। তিনি বাঁকুড়ায় তাঁর নিজের জেলায় প্রবর্ত্তকের উৎসবের কথা শুনিয়া সমধিক উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আর মনে পড়িল সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির স্নেহের স্পর্শের কথা। ছয় বৎসর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তক-এর পৃষ্ঠায় যখন বাংলার বিভিন্ন জেলাগুলির বিবরণ

ও পরিচয় প্রকাশ করা হইতেছিল, তখন বর্ত্তমান বাঁকুড়া সম্বন্ধে লিখিবার জন্য তাঁর নিকট উপনীত হইয়াছিলাম। এই ঋষিকল্প মনীষীর সেদিনকার প্রেম ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের কথা দীর্ঘদিন পরেও চিত্তপটে জাগ্রত আছে। তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক এবং বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন বলিয়া বৈজ্ঞানিকও বটে। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির ভিতর দিয়া ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির যে মূল্য নির্দ্ধারণ ও বিচার করিয়াছেন, তাহা বহু আধুনিক বিজ্ঞজনের তথাকথিত সমালোচনা স্তব্ধ করে।

বাঁকুড়া জয়ন্তী উৎসবের প্রাক্কালে সঙ্ঘের প্রতি অনুরাগী ইঁহাদের কথা স্মৃতিপটে উদিত হওয়ায় আশান্বিত হইলাম। বর্দ্ধমান রাজ এষ্টেটের প্রবীণ কর্ম্মাধ্যক্ষ রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রনাথ সেন মহোদয়ের পরিচয় পত্র লইয়া একেবারে বাঁকুড়া বর্দ্ধমান-রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। বাঁকুড়া সঙ্ঘের মূল কেন্দ্র চন্দননগর হইতে বহুদূরে না হইলেও, যে কোন কারণেই হউক, বাঁকুড়ায় সঙ্ঘের কোনও কেন্দ্র বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। ইতিপূর্ব্বে বাঁকুড়ার কয়েকজন মনীষী ও পণ্ডিতের সহিত পরিচয় করিয়া ধন্য হইয়াছি ও স্নেহ লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু বাঁকুড়ায় গিয়া সেখানকার অধিবাসীগণের সহিত পরিচিত হইবার অবসর কখনও হয় নাই। পরে যখন বাঁকুড়া গিয়াছি তখন অনেকেই অনুযোগ করিয়াছেন যে, বাঁকুড়া দরিদ্র ও অবজ্ঞাত জিলা বলিয়াই কি আপনারা এতদিন এই জিলায় কর্ম্ম বিস্তার করেন নাই? প্রীতিসিক্ত এই অভিযোগের কোনও উত্তর দিতে পারি নাই।
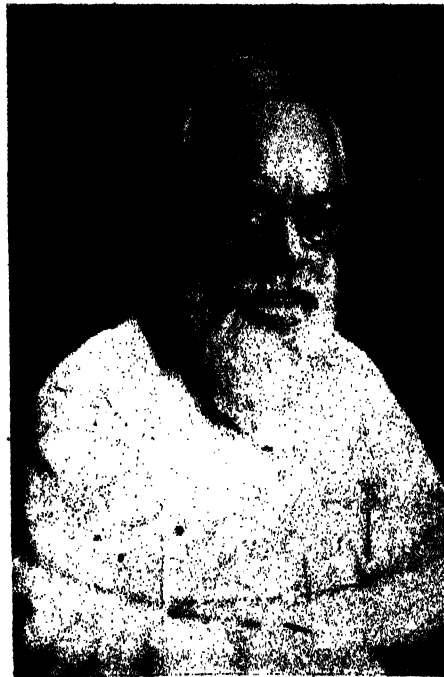
সত্যই পশ্চিম বঙ্গের প্রান্তবর্ত্তী এই জিলাটী প্রাকৃতিক ও অন্য কারণে যেরূপ দরিদ্র ও দুর্ভিক্ষপীড়িত তেমনি অকারণেই অবজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে। অথচ এই জিলার মোট লোক সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ১১ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে এক লক্ষের উপর ব্রাহ্মণ আছেন—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থের মোট সংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজার এবং হিন্দু কিঞ্চিদধিক ১০ লক্ষ ৫০ হাজার। মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা ৫০ হাজার ও খৃষ্টান প্রায় দেড় হাজার হইবে। এই জিলায় শিক্ষার প্রসারও কম নহে। সমগ্র জিলায় মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৬২২ তন্মধ্যে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৮। একটী উচ্চ শ্রেণীর কলেজও এখানে আছে।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

তথাপি বাঁকুড়া বাংলার অন্যান্য অনগ্রসর জিলাগুলির মধ্যে অন্যতম কেন, ইহা বিচার করিতে হইবে। জাতির জীবনকে সুগঠিত করিতে হইলে আজ এই বিষয়গুলি ভাবিবার দিন আসিয়াছে। ১৩৪১ সালে প্রবর্ত্তকে বর্ত্তমান বাঁকুড়া সম্বন্ধে এই পরিচয়মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় লেখক শ্রীযুক্ত রামানুজ কর মহাশয় বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া উহা লিখিয়াছিলেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে বাঁকুড়া জেলার মোট লোক সংখ্যা ১৪ লক্ষের উপর ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া উহা ১১ লক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের সংখ্যা খুব বেশী করিয়া ধরিলেও ২ লক্ষের উপর হয় না—বাকী ৮।০ লক্ষ হিন্দু জনসাধারণের জীবিকা নির্ব্বাহের অবলম্বন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা কি, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। এক সময়ে নানাবিধ শিল্পে অগ্রণী বলিয়া বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। এখন ঐ সকল শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্র হইতে কি এই জেলার অধিবাসীরা পুষ্টিলাভ করিতে পারিতেছে না? অথবা অর্থনৈতিক কারণ ব্যতীত এই

পতনের অন্য কারণ কিছু আছে? বাঁকুড়া জেলা অল্পদিনের সৃষ্টি; বিষ্ণুপুরের কোন প্রাচীন রাজা বঙ্কু রায়ের নাম হইতে বাঙ্কুড়া বা বাঁকুড়া নামকরণ হইয়াছে। যাহা একদা মল্লভূম নামে বিখ্যাত স্বাধীন রাজ্য ছিল তাহার রাজধানীর নামানুসারে জিলার নাম বিষ্ণুপুর হইলেই বোধ হয় সঙ্গত হইত। দেশ ও জাতির ঐতিহাসিক সংস্কৃতি ও নামরূপ জাতীয়তা বোধকে দৃঢ় করে। এইরূপ বিক্ষিপ্ত ও পারম্পর্য্য-হীন ভাবনা ও চিন্তা লইয়া ১লা মাঘ প্রবর্ত্তক রজত-জয়ন্তীর ১০ম অধিবেশনের আয়োজন করিবার জন্য বাঁকুড়া যাত্রা করিলাম।

বাঁকুড়ার প্রবীণ উকিল শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত কুমুদকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার বর্দ্ধমান রাজ এষ্টেটের স্থানীয় ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অকৃত্রিম সুহৃদ ও অনুরাগীজনের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া বাঁকুড়ার রজত-জয়ন্তী উৎসব সফলতার সহিত সম্পাদন করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইল। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি ও শ্রীজগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক এবং প্রায় ৪৬ জন স্থানীয় অধিবাসীকে লইয়া একটী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইল। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বিনয়বাবু, শ্রীযুক্ত জগদীশ বাবু, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথবাবু, শ্রীযুক্ত শশাঙ্কবাবু এবং শ্রীযুক্ত কুমুদবাবুর যে আন্তরিক সহযোগিতা পাইয়াছি তাহা কখনই ভুলিবার নহে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ ও সঙ্ঘগুরুর প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম অনুরাগ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

আবার সেই প্রশ্ন—ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ দৈন্য পীড়িত, পতিত, অবনমিত, ধ্বংসোন্মুখ! সঞ্চিত প্রাণশক্তি যেন নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। এই কুৎসিত দৈন্য হইতে মুক্তি চাই। পারিপার্শ্বিকতার পীড়নে এই স্থূল মুক্তি আকাঙ্ক্ষাও তীব্র হইতে পারিতেছে না, একাগ্র হইয়া উঠিতেছে না। একটা আত্মিক পরাজয়ের গ্লানি সর্ব্বাঙ্গে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। লুপ্ত আত্মাভিমান সময়ে সময়ে গোপন আপোষে ত্রুটি ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া শীর্ণ সমাজ-সংহতিকে আরও শীর্ণ ও দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছে। শান্তি ও আনন্দের আকাঙ্ক্ষা কেবলই বাক্যচ্ছটায় শেষ হয়। ভাবপ্রবণতায় জাতির ক্লান্তি আসিয়াছে! কে দিবে শান্তি ও আনন্দ—ব্যক্তিকে—পরিবারে পরিবারে, সমাজের সর্ব্বস্তরে? কে গড়িবে জাতির স্বর্ণ দেউল? এইরূপ কত প্রশ্ন! নীতি ও বিধির প্রতি বিরাগী ব্যক্তি, ও পরিবারকে কি উত্তর দিতে পারা যায়? ব্যক্তি পরিবার ও সমাজকে নূতন করিয়া গড়িবার সাধনায় সিদ্ধ

শ্রীযুত অক্ষয় দত্তের বিষ্ণুমন্দির

সংহতি ও সঙ্ঘগুরুরই ইহার উত্তর দিবেন। বাঁকুড়ার অধিবাসীগণের সহিত আলাপ পরিচয়ে এমনই কত শত প্রশ্ন ও সমস্যার কথা শুনিয়াছি।

এই বাঁকুড়া জিলারই অন্তর্গত ছাতনা গ্রামে (পূর্ব্বে নাকি ইহার নাম ব্রাহ্মণ্যপুর ছিল, পরে ছত্রিনা হইতে এখন ছাতনা হইয়াছে) প্রেমের কবি চণ্ডীদাস জন্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন এবং সিদ্ধ কণ্ঠে মানুষেরই জয় গান গাহিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাসের স্মৃতিমন্দির গড়িবার আয়োজন হইতেছে। বাঁকুড়া

সহরেই এই স্মৃতি সৌধ প্রতিষ্ঠিত হইবে। একটি প্রাণবান জাতিই তাহার ঐতিহাসিক পুরুষগণের স্মৃতি রক্ষা করে—নানা রূপে। কেবলমাত্র মৃতের পূজার জন্যই কি স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা? অথবা যে প্রেরণার বিগ্রহরূপে সেই পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই প্রেরণাকেই হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবার ইহা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা? চণ্ডীদাস মানুষের মধ্যে প্রেম ও ঐক্য এবং ভাগবত সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন মধুময় ছন্দে—সঙ্গীতে। তাহার

শ্রীযুত অজয় দত্তের অষ্টধাতুর শ্রীদুর্গামূর্ত্তি

সাধনা কি জাতি গ্রহণ করিল না? অবহেলা করিল? প্রেমের নামে—ঐক্যের পরিবর্ত্তে, প্রবঞ্চনা, কপটতা ও নীচতা এবং অন্তর্দ্রোহকেই প্রশ্রয় দিল?

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ প্রতিজনের মধ্যে ভগবানকে জাগ্রত করিবার সাধনা গ্রহণ করিয়া যে অপূর্ব্ব সমাজ-সাধন নীতি জাতির সম্মুখে ধরিয়াছে, তাহাই সঙ্ঘের জয়ন্তী উৎসবে সঙ্ঘ গুরু বাঁকুড়াবাসীর নিকট ব্যক্ত করিবেন। আকুল প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার উত্তরে ইহা বলিয়া কত জনকে নিরস্ত করিয়াছি।

পৌষ সংক্রান্তির সন্ধ্যায় বাঁকুড়ায় আসিয়া সঙ্ঘগুরু পৌঁছিলেন। উৎসাহদীপ্ত হৃদয়ে বাঁকুড়ার জনসাধারণ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। বাঁকুড়ার কর্ম্মবীর শ্রীনরেন্দ্র দত্ত ও শ্রীঅজয় দত্তের কর্ম্ম পরিচালনায় সকল ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

১লা মাঘ, মঙ্গলবার অপরাহ্নে "প্রবর্ত্তক" পত্রিকার জয়ন্তী উৎসবের দশম মাসিক অনুষ্ঠান 'বাসন্তী-সিনেমা' হলে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইল। প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় উৎসব-সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বাঁকুড়া সহরের প্রতিষ্ঠাশালী জন নায়ক এবং রাজপুরুষগণ প্রায় সকলেই শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে সভাক্ষেত্রে যোগদান করিয়াছিলেন—বিরাট্ হলে তিলধারণের আর স্থান ছিল না।

বৈদিক প্রশস্তি মন্ত্র ও সঙ্ঘচারণ প্রফুল্লচন্দ্রের উদাত্ত উদ্বোধন সঙ্গীতের পর, বাঁকুড়াবাসীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্ঘ-গুরু ও প্রবর্ত্তক সম্পাদক মহাশয়কে নিম্নের মানপত্র প্রদান করেন :—

হে পূজ্যপাদ, এ জেলা আপনার পদার্পণে ধন্য। কৃতাঞ্জলীপুটে আমরা আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি। আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

হে প্রাজ্ঞ, আপনার দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে জগতের সত্যস্বরূপ অপাবৃত হইয়াছে, আপনি সত্যদ্রষ্টা। আপনাকে নমস্কার।

আপনার মহতী অনুভূতি অখিল জগতকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, অনন্ত সত্তার সহিত অভিন্ন একাত্মতা আপনি অহরহ উপলব্ধি করিতেছেন। আপনাকে নমস্কার।

হে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, ভূমার সহিত গভীর পরিচয়ের ফলে আপনি প্রচার করিয়াছেন সমাজের এবং রাষ্ট্রের সুমহান্ আদর্শ, "প্রতি পৃথগাত্মায় ভগবৎ-সত্তার পূর্ণ বিকাশ সাধন।" মানবের সমষ্টিগত জীবনে ইহলোকে আপনি অমৃতলোক প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী। আপনার সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনায় জাতি সে মহান্ আদর্শের পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। হে প্রবর্ত্তক, আপনাকে নমস্কার।

হে সঙ্ঘগুরু, আপনার সুদক্ষ পরিচালনায় আপনার প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ শিক্ষা, স্বাবলম্বন, বিশুদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্রশক্তির রূপান্তরের পথে জাতির কর্ম্মধারাকে সে আদর্শের অভিমুখে সুনিশ্চিতভাবে প্রবাহিত করিতেছে।

হে মহাকর্ম্মি, আজিকার এ শুভ উপস্থিতি আপনার আদর্শে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করুক। আপনার শুভ আশীর্ব্বাদ আমাদের

কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করুক। ভূয়োভূয়ঃ আপনাকে আমরা নমস্কার করিতেছি।

বাঁকুড়ার জজ শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় আই, সি, এস্, আগ্রহভরে সঙ্ঘের সম্বন্ধে সুন্দর পরিচয় প্রদান করেন। তৎপরে রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি মহাশয় যে চিন্তাপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান করেন তাহা বর্ত্তমান সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত হইল। অতঃপর শ্রীমতিলাল রায় তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় বিপুল জনতাকে সম্বোধন করিয়া ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মর্ম্মময় ইতিহাস, বেদ-বিশ্বাস, জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জীবনধারা, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ জীবনের লক্ষ্য ও অবদান
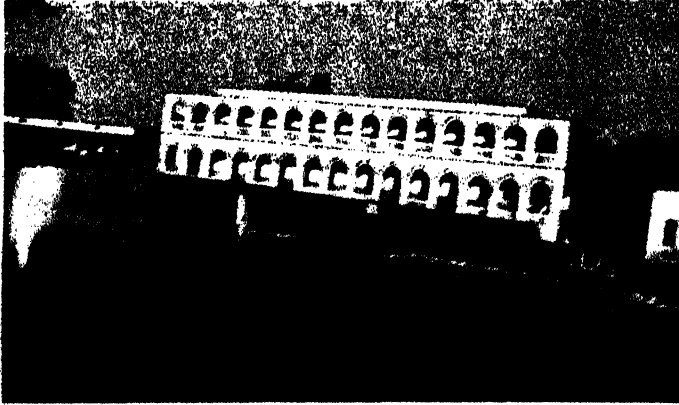
বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুল

এবং প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সংগঠনমূলক আদর্শ ও কর্ম্মধারা সম্বন্ধে সুগভীর অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন —তাঁহার সিদ্ধান্ত দীর্ঘ ২০ বৎসরের জীবনপরীক্ষায় লব্ধ অভিজ্ঞতার ফল, সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দলাদলি নির্ব্বিশেষে খাঁটী দেশকর্ম্মী মাত্রকেই এই জাতি-গঠনের মৌলিক তত্ত্ব প্রণিধান ও আয়ত্ত করিতে হইবে।

অতঃপর শ্রীকুমুদকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক যথারীতি ধন্যবাদ এবং সঙ্ঘ-চারণের আর একখানি প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীঅজয় দত্ত, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, অধ্যাপক শশাঙ্ক ব্যানার্জ্জী, রায় বাহাদুর এস্, সি, মজুমদার, রায় বাহাদুর সত্যকিঙ্কর সাহানা, রায় সাহেব শ্রীশ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক রামশরণ ঘোষ, ডাঃ রামগতি ব্যানার্জ্জী, ডাঃ কালীপদ ব্যানার্জ্জী, শ্রীযুক্তা উমা গুহ, শ্রীমতী বীণা চৌধুরী প্রমুখ সহরের প্রায় সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত হন।

বাঁকুড়ায় প্রবর্ত্তক রজত জয়ন্তী সভা আশাতীতরূপে সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় উদ্যোক্তৃগণ আনন্দিত হইলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ অতিশয় আন্তরিকতার সহিত সকল কার্য্য সুন্দরভাবে সম্পাদন করিয়াছেন। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বিনয়বাবুর আতিথেয়তা ও প্রেমপ্রীতি ভুলিবার নহে। তিনি সকল সময়ে আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন, সকল কাজে সহযোগী হইয়াছেন। প্রতিদিন কর্ম্মশেষে দীর্ঘরাত্রি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান বাংলা ও বাঙালী সমাজের সামাজিক উন্নতির নানা কথা আলোচনা করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিতাম। সপ্তাহকাল তাঁর গৃহে অবস্থান করিয়া তাঁর জাতি ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া পুলকিত হইয়াছি। যৌবনপ্রদীপ্ত মুখে যখন এই তরুণ বন্ধু বলিতেন, এইবার প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কাজের পালা আসিয়াছে—আমরা এমন সময়ের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলাম তখন তাঁর মুখে আশার প্রতিচ্ছবি দেখিয়া গৌরব অনুভব করিতাম।

জয়ন্তী উপলক্ষে বাঁকুড়ায় গিয়া একটী জিনিষ লক্ষ্য করিলাম। জয়ন্তীর কথা লইয়া যাঁর নিকটই গিয়াছি তাঁরই নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়াছি। বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার মিঃ এস, কে, হালদার, জিলাজজ শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় আই, সি, এস, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা, রায় বাহাদুর শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, রায় সাহেব শ্রীশ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ সকলেই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতি অশেষ প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। তরুণদের মধ্য হইতে বিশেষভাবে প্রীতিভাজন ফণীন্দ্রনাথ, দেবসিং ঠাকুর, শ্রীমান্ প্রণব প্রভৃতির আন্তরিক সহযোগীতা স্মরণযোগ্য। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কাজে দলাদলি বা মতবিরোধ নাই, রাজা প্রজা, ধনী-

নির্ধন উচ্চনীচ বিদ্বান্ মূর্খ প্রভৃতির বিচার নাই। মানুষ মাত্রেরই চেতনার সহিত প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ যুক্ত।

সভার পরদিন সঙ্ঘগুরু ও সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের সহিত অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা হইল। তাঁহাদের দুইজনের অন্তরঙ্গ পরিচয় আমার কাম্য ছিল। তারপর ভক্তপ্রাণ শ্রীঅজয় দত্তের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁর বাড়ীতে অষ্টধাতু নির্ম্মিত দুর্গামূর্ত্তি দর্শন করিতে সঙ্ঘগুরু গমন করিলেন। পবিত্র আবহাওয়ায় অজয়বাবুর পূজা-মণ্ডপ, মন্দির ও বাসস্থান ঘিরিয়া রহিয়াছে। সঙ্ঘগুরু অজয়বাবুর বিনয় ও ভক্তি দর্শন করিয়া প্রীত হইলেন এবং অজয়বাবুর পরিবারমণ্ডলীর সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বাকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুলের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ডাঃ রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্কুলে শিক্ষার্থীগণকে উপদেশ দিবার জন্য সঙ্ঘগুরুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন পূর্ব্বদিন সভাক্ষেত্রেই। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় মেডিক্যাল স্কুলের প্রায় ২০০ শতাধিক ছাত্র, শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতির সম্মুখে পূজনীয় সঙ্ঘগুরু প্রায় এক ঘণ্টা কাল ভারতের সংস্কৃতি ও জীবন সাধনা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে তাঁকে হাসপাতালের বিভিন্ন অংশ ডাঃ রামগতি বাবু পরিদর্শন করাইয়া দেখাইলেন। এই বিদ্যালয় ও হাসপাতাল বাঁকুড়াবাসীর একটী গৌরবময় কীর্ত্তি।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় আই, সি, এস মহোদয়ের ভবনে আমন্ত্রিত হইয়া সঙ্ঘগুরুর সহিত আমরা উপস্থিত হইলাম। প্রায় একঘণ্টা কাল গভীর আলাপ আলোচনার পর বিদায় গ্রহণ করা হইল। আমাদের আবাস ভবনে সহরের বহু অনুরাগী বন্ধু প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধ, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বাঁকুড়ায় কার্য্য আরম্ভ করুক। তাঁহাদের সেই আন্তরিকতাপূর্ণ অনুরোধ সঙ্ঘগুরু গ্রহণ করিলেন বলিয়া মনে হইল।

এতবড় একটা প্রাচীনজাতি, তার এতদিনের প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি—আমাদের মিলনভূমি এইখানে। তাই এত আত্মীয়তা, এত আকুলতা, এত অনুরোধ! দেহের, মনের ও চারি পার্শ্বের—ধর্ম্মের ও আচারের ছুঁৎমার্গ ও কুসংস্কার ও আবর্জ্জনা দূর করিতে পারিলেই প্রেম, ঐক্য সহজলভ্য হইবে, ভবিষ্যতের আলো দেখা যাইবে। এই আশায় এত শ্রম। এত তপস্যা।

শীতের রাত্রে বাঁকুড়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। ষ্টেশনে শ্রীনগেন্দ্র দত্ত ও শ্রীঅজয় দত্ত আসিয়াছেন বিদায় দিতে। রাত্রি প্রায় ১২ টায় ট্রেণ আসিল। প্রফুল্লমূর্ত্তি অজয়বাবুর কত আশা। কি প্রাণশক্তি! বাঁকুড়ার সকল কাজেই শ্রীনগেন্দ্র দত্ত ও শ্রীঅজয় দত্ত আছেন। নগেন্দ্রবাবু বাঁকুড়ার বিশ্বকর্ম্মা। তাঁহাদের বিশ্রাম নাই—নিরলস কর্ম্মী—পরহিতব্রতী।

উত্তরের হিমশীতল বায়ুর স্পর্শ,—জ্যোৎস্নাময় রাত্রির পরিবেশ,—পশ্চাতে বিলীয়মান বাঁকুড়ার অপূর্ব্বশ্রী··· রুক্ষ, দরিদ্র বাঁকুড়া আকর্ষণ করে।

# ঔষধ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

অপ্রমত্ত আনন্দের
পরিশ্রম বিশ্রামের যোগে
দূরে যায় দুঃখ রোগ
শতগুণ হর্ষ বাড়ে ভোগে;

শতজীব স্বাস্থ্যরূপ
সজীব চঞ্চল দেহ মন
স্বচ্ছন্দে নন্দিত দিবা
নিরুদ্বেগে রজনী রঞ্জন।

# সমালোচনা

**ক্রান্তি**—প্রকাশক : ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক-সংঘ, ৫০।১, নারিন্দিয়া রোড, উয়ারী, ঢাকা। কলিকাতায় প্রাপ্তিস্থান : বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস। ১৪০ পৃষ্ঠা, দাম : আট আনা।

'ক্রান্তি'—সঙ্কলন গ্রন্থ। বইখানির বেশীর ভাগ লেখকরাই সাধারণের অপরিচিত হইলেও অনেকের রচনাই আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

শ্রীযুত সোমেন চন্দ লিখিত 'বনস্পতি' নিঃসন্দেহে একটি শ্রেষ্ঠ গল্প হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে।

প্রবন্ধের মধ্যে রণেশকুমার দাশগুপ্তের "নূতন দৃষ্টিতে উপন্যাস" এবং অচ্যুত গোস্বামীর "বাংলা কাব্যের গতি" উল্লেখযোগ্য। রণেশ-বাবুর প্রবন্ধটি আমাদের ভালো লাগিয়াছে। তবে এ কথাও আমাদের মনে হইয়াছে, যাহা তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা যেন সম্পূর্ণ বলা হয় নাই, হঠাৎ শেষ হইয়া গিয়াছে যেন। শ্রীযুত অচ্যুত গোস্বামীর "বাংলা কাব্যের গতি"ও আমরা উপভোগ করিয়াছি। বর্ত্তমানে বাংলা সাহিত্যে কবিতায় যে স্বৈরাচার চলিয়াছে, পাঠকের কাঁধে সমস্ত দোষ চাপাইয়া এবং 'ডিকাডেন্সের' নাম করিয়া যে এক ধরণের অদ্ভুত দুর্বোধ্য সাহিত্য সৃষ্ট হইতেছে, সে সম্বন্ধে অচ্যুতবাবুর এই তীব্র সমালোচনামূলক প্রবন্ধ খুবই মূল্যবান বলিয়া মনে হয়।

কবিতা-প্রসঙ্গে—কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের নাম পাঠকমহলে অবিদিত নাই। তাঁহার "শেষ মুক্তি" আর "বেলা শেষের গান" ভাল হইয়াছে। তা'ছাড়া তাঁহার সি, এইচ, নিউম্যানের "ফ্যাক্টরী পেটে লোকটার" অনুবাদ চমৎকার। অমৃতকুমার দত্ত কর্ত্তৃক অনূদিত নিউম্যানের "বেকার" কবিতাটি ভাল। এছাড়া অন্যান্য কবিতার মধ্যে গৌরপ্রিয় দাশগুপ্তের "মরেছিল এক মানুষ" সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

—শ্রীনির্ম্মলকুমার ঘোষ

**সাহিত্যে বিপ্লব**—বীরেন দাশ।

সাহিত্যের সঙ্গে জনমনের সম্পর্ক তখনই হয় যখন জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। আমাদের সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে লইয়া যথেষ্ট লেখা হইয়াছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীকে—মজুর ও কৃষক ইত্যাদিকে লইয়া সাহিত্য সৃষ্টি তেমন হয় নাই। গণসাহিত্য কি, এই প্রকার সাহিত্য সৃষ্টি করিতে কি কি মালমশলার প্রয়োজন এবং সাহিত্যিক কোন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিরীক্ষণ করিবেন তাহাই বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। পুস্তকখানি সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিক ও সমাজ-সংস্কারক, সকলের অবশ্য পাঠ্য।

—রামেন্দ্র দেশমুখ্য

**শ্রীচৈতন্যদেব**—শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত। মূল্য ১৷০। গৌড়ীয়-গৌরব গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত। ৬৫ খানি চিত্র সংযুক্ত।

নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পুণ্য জীবন-লীলা স্বতঃই অমৃতময়। যেমন "সর্ব্ববর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ", তেমনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-কথা যিনি যেমন ভাবেই কীর্ত্তন ও প্রকাশ করুন, তাহা পাঠকপাঠিকাকে ভগবৎ-কৃপালাভেরই সহায়তা করিবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার উপর আলোচ্য গ্রন্থখানি মহাপ্রভুর আদ্যন্ত-মধ্য জীবন-লীলার অতি সুনিপুণ সার-সঙ্কলন হওয়ায়, সমধিক উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। ভক্ত মাত্রেই ভক্তি-পূর্ণ চিত্তে ইহার রসাস্বাদে তো ধন্য হইবেই, তাহা ছাড়া সুকুমারমতি বালকবালিকাদের পক্ষেও ইহা একখানি কল্যাণকর সুপাঠ্য হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

বইখানির ছাপাই ও বাঁধাই মনোহর এবং উপহার-গ্রন্থের ইহা সম্পূর্ণ উপযোগী। গ্রন্থশেষে মহাপ্রভু-বিরচিত "শ্রীশিক্ষাষ্টক" সব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হইয়াছে ও তাঁহার উপদিষ্ট শিক্ষার মূল সূত্রগুলিও সঙ্কলিত হইয়াছে।

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

**মহাপুরুষ চরিত** (২য় সংস্করণ)—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-ভবন, বজবজ, দাম আট আনা।

পরমহংসদেব, গোস্বামী প্রভু, কাঠিয়া বাবা, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ স্বামী, শ্রীচৈতন্যদেব ও বুদ্ধের জীবন-কথা ও উপদেশামৃত 'মহাপুরুষ চরিতে' পরিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে স্মৃতির উপদেশ সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থখানি সম্পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। গ্রন্থকারের ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ের অনুরাগরঞ্জিত হইয়া মধুময় চরিত আরও সুমধুর হইয়াছে। এ অমৃত পাঠক যত পান করিবেন ততই উপকৃত হইবেন।

**জ্ঞানের আলো** (২য় ভাগ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মজুমদার এম-এ, বি-টি. কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক—শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী। নারায়ণ লাইব্রেরী, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা। মূল্য আট আনা।

প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য 'জ্ঞানের আলো'র প্রথম ভাগ এবং উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য উহার দ্বিতীয় ভাগ মুখ্যতঃ প্রকাশিত হইলেও সাধারণ জ্ঞাতব্যের মোটামুটি জ্ঞানার্জ্জনের দিক বিবেচনায় বইখানি আধুনিক কালের সকলেরই পাঠ্য। 'রেফারেন্স' পুস্তক হিসাবেও ইহার উপযোগিতা যথেষ্ট। দুই বৎসরের মধ্যে বইখানির তিনটি সংস্করণ হইয়াছে, ইহাই বাংলাদেশে 'জ্ঞানের আলোর' মস্তবড় 'সার্টিফিকেট'।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

# বিদুষী

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সাহা

পারুলের চোখের সম্মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল—ক্ষুধিত যৌবনের একান্ত বাসনা-মণ্ডিত রঙীন স্বপ্ন গোলাপ ফুলের পাপড়ির মত অত্যন্ত অকস্মাৎ নিঃশেষে ঝরিয়া পড়িল।

একি! এই তাহার স্বামী—এই কদর্য্য অক্ষর তাহারই স্বামীর লেখা!

পারুলের চোখ ফাটিয়া জল আসিল। বুকের এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত বেদনায় বিষাইয়া উঠিল।

কালই সন্ধ্যায় সে বন্ধুদের সহিত তর্ক করিয়া আসিয়াছে। স্বামী বিদ্বান্ না হইতে পারেন—কিন্তু যতটুকু জানেন তাহা ভাল করিয়াই জানেন, সংসারের পক্ষে ওই ঢের। আর তাঁর মত স্বাস্থ্যবান্ সুপুরুষই বা কয় জন আছে!

হায় রূপ! রূপ লইয়া সে কি করিবে? বন্ধু-মহলে কি করিয়া এই হাতের লেখা দেখাইবে? এর চেয়ে যে···

শুধু কি লেখাই খারাপ? বর্ণাশুদ্ধিই বা কত? এই সুদীর্ঘ পত্রের অজস্র হিজিবিজি অক্ষরগুলির একটাও কি তাহার সীমাহীন তৃষ্ণায় একটু বারিও সিঞ্চন করিতে পারিয়াছে?

অথচ বিবাহের পর হইতে ইহারই আশায় কত না স্বপ্নজালই সে বুনিতেছে—রৌদ্র-দগ্ধা ধরিত্রীর অগ্নিময় আকাশের দিকে দৃষ্টি-নিবদ্ধা চাতকিনীর ন্যায় কি আকুল পিপাসা লইয়াই না সে ইহারই অপেক্ষায় দিন গণিতেছে!

এই সেই চিঠি!

রাগে, দুঃখে, অভিমানে, লজ্জায় নিজের উপরই তাহার বিজাতীয় ঘৃণা হইতে লাগিল। হায় অধম নারী! অবলা—সত্যই তুমি অবলা! বিবাহের আগে তাহার হাতের লেখা দশবার করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল অথচ পারুল অথবা পারুলের পক্ষ হইতে কেহই হস্তাক্ষর ত' দূরের কথা, ভুল করিয়া এর বিদ্যার কথাও জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে নাই!

পাছে সম্বন্ধ ভাঙিয়া যায়···

ঘৃণায় পারুল পত্রখানি কুটি-কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া, জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিয়া সেইখানে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বাহিরে তখন শ্রাবণের আকাশ ভাঙিয়া অবিশ্রান্ত বর্ষণ সুরু হইয়াছে। পারুলের মনে হইল—ঐ আকাশের মত আকুল হইয়া, প্রাণ ঢালিয়া সেও যদি একবার কাঁদিতে পারিত!

মা বলিলেন, পারু, নলিনী কাল আস্‌ছে।

পারুল মুখ কাল করিয়া কহিল, তা'র আমি কি করব?

বিস্মিতকণ্ঠে মা বলিলেন, শোন্ কথা, তুই কি কর্‌বি কেমন······পরক্ষণেই চকিতে কন্যার ম্লান বেদনাতুর মুখের দিকে চাহিতেই তাঁহার মুখে আর কথা সরিল না। কন্যার অন্তরের গোপন ব্যথা তাঁহার আশঙ্কা-দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তবুও প্রাণপণে উহা নিছক কল্পনা বলিয়াই তিনি তাঁহার উৎকণ্ঠিত মনকে নিয়তই সান্ত্বনা দিয়া আসিতেছিলেন। বিপুল স্নেহে অন্ধ হইয়া সেদিন যে সত্য চোখে পড়ে নাই, কন্যার শুষ্ক বিষণ্ণ মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই আজ যেন তাহা জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। অত্যন্ত মর্ম্মবেদনায় আজই সর্ব্বপ্রথম বুঝিলেন, জামাতা ঐশ্বর্য্যবান্, রূপবান্ হইতে পারে; কিন্তু কন্যার মনোমত হয় নাই।

তবুও জোর করিয়াই বলিলেন, ওকে অনাদর করিস্‌নে পারু, সংসারে লেখাপড়াই সব নয়···

মাতা কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। পারুল সেইখানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল!

এখন সে কি করিবে? যদি তিনি আসেনই! পারুল ওষ্ঠ দংশন করিল। গর্ব্ব করিয়া চিঠি লিখিতে পারিলেন—আর আসার খবরটা দিতে পারিলেন না? তা' হ'লেই

বা সে কি করিত ?……নিশ্চয় সে আসিতে নিষেধ করিয়া লিখিত। কিন্তু এখন আর উপায় নাই! পারুল অধীর হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল, সে কেমন করিয়া ঐ মূর্খের সঙ্গে…

না, না, পারুল তাহা পারিবে না ··

যদি লইয়া যাইতে চায় ?…বিশ্বসংসার দুলিয়া উঠিল। পারুলের মুখ কাল হইয়া আসিল।…না না—অসম্ভব! সে যাইবে না—তাঁর ঘর করা…

সত্যই নলিনী আসিল। মা ছাড়িলেন না। পারুলকে স্বামীর সহিত দেখা করিতে হইল।

পারুলের শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া নলিনী আবেগের সহিত ডাকিল, পারুল!

পারুলের দুই কাণের ভিতর দিয়া সে শব্দ গিয়া তাহার মর্ম্ম স্পর্শ করিল এক অজানা সুরে—সেই সুরের রেশ সহস্র পুলকধারায় তাহার সর্ব্বেন্দ্রিয় রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিল। নব কিশলয়গুলি যেমন বসন্তপ্রভাতে ভোরের পাগল-করা বাতাসের সাথে অজানা পুলকে নাচিয়া উঠে, এও বুঝি তেমনি! পারুল মন্ত্রমুগ্ধের স্থায় বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নলিনী আগাইয়া আসিল। পত্নীর আনত মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল। কেরাসিনের স্বল্প আলোয় পারুলের রাগ-রাঙা মুখখানি অনিন্দ্যসুন্দর—মায়াময় বলিয়া বোধ হইতেছিল। নলিনী মুগ্ধ হইল। সে বিহ্বলের স্থায় পারুলের চিবুক ধরিয়া, মুখখানি তুলিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিয়া মধুর কণ্ঠে কহিল, এরই জন্মে ছুটে এসেছি পারুল! কিন্তু তোমার ও……

পারুলের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার লজ্জা, বিপুল মোহ, সবই মুহূর্ত্তে উড়িয়া গিয়া সমস্ত অন্তর আবার ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত অন্তর উদ্বেলিত করিয়া শুধু এই কথাই জাগিতে লাগিল, তাহার এত বিদ্যা সে কি এই মূর্খের সন্তোষলাভের জন্য? ইহারই মুখের এক কণা হাসি পাইবার জন্যই কি তাহার এই একান্ত প্রেম জীবন? অন্তর যাহা চায় না—যাহাকে সে ভক্তি করিতে পারিবে না, মিথ্যা অভিনয় করিয়া, নীচতার কলুষ আনিয়া, সমস্ত শরীরের বিনিময়ে তাহারই প্রসন্নতা লাভ করিতে হইবে? ছিঃ ছিঃ…পারুল ঝাঁকি দিয়া হাত সরাইয়া দিয়া, একধারে সরিয়া গেল।

নলিনী স্নিগ্ধ হাসিল। কহিল, লজ্জা অমন সবারই হয় পারুল, কিছু একটা কথাও কি কইবে না? বলিয়া স্ত্রীর দিকে আগাইয়া চলিল।

পারুল তীব্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া তিক্তস্বরে কহিল, আগে যোগ্যতা অর্জ্জন কর—তারপর…পারুল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

নলিনী শুষ্ক বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল—পারুলের এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত উগ্র তাচ্ছিল্যভরা ব্যবহার তাহার সমস্ত স্বপ্নকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল।…আলোভরা পৃথিবী নলিনীর চোখের সামনে যেন অন্ধকার নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল।

৩

আমি যাব না মা।

মা আদর করিয়া কহিলেন, না গেলে কি হয় মা, নলিনী নিজে এসেছে।

তা' আসুক—আমি যাব না।

মা ঈষৎ ঝাঁঝের সহিত কহিলেন, কেন যাবি নে'?

পারুল মা'র বুকে মাথা লুকাইয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, তোমায় ছেড়ে যেতে পারব না যে…

স্নেহ-গর্ব্বে মাতার হৃদয় ভরিয়া গেল। কন্যাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া, কপালের চূর্ণ কুন্তলগুচ্ছ সরাইয়া দিতে দিতে মধুর কণ্ঠে তিনি কহিলেন, পাগলি! এখন ওই যে তোর সবার চেয়ে বড় আদরের হবে যে!

পারুল অধীর হইয়া কহিল, তা' হোক্, আমি কিন্তু কিছুতেই যাব না মা!

মাতা ক্ষুণ্ণ হইলেন। কহিলেন, কি যে বলিস্ বাপু? জামাই নতুন এসেছে, তা'কে আমি ফিরাতে পারবো না। বলিয়া তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

পারুল নিরুপায় হইয়া ভাবিতে লাগিল।

ট্রেণের সময় ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। সকল দিকেই তাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পারুলের নিস্তার নাই।

মাতার আদেশে যাইতে হইল, বেশভূষা করিতে হইল—কিন্তু অবাধ্য মন নিয়তই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে লাগিল।

যাত্রার আর বিলম্ব নাই। পার্শ্বের কক্ষে নলিনী অস্থিরচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ পারুল ঝড়ের মত কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, শোন…

নলিনী চকিত হইয়া দাঁড়াইল। কহিল, কি?

পারুল নতমুখে স্পষ্ট করিয়া কহিল, আমি যাব না।

নলিনীর বিস্ময় সীমাহীন হইয়া উঠিল। কহিল, কেন?

পারুল ভাবিল। অবশেষে কহিল, কারণ তোমায় বল্‌তে পারব না, কিন্তু আমি যাব না।

নলিনী বিস্ময়ে, বেদনায় কিয়ৎকাল পত্নীর দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। পলকে একটা দীর্ঘশ্বাস নাসা-পথে নিঃশব্দে নামিয়া আসিল। ম্লান কণ্ঠে নলিনী কহিল, কিন্তু আমি যে বড় আশা করেই এসেছিলাম পারুল…

পারুল নিষ্করুণ কণ্ঠে কহিল, তোমার সে আশা আমি পুরাতে পারব না। আমায় মাপ্ কর—আমায় মুক্তি দাও…আমি তোমাকে চাই না…

নলিনীর মুখ কঠিন আঘাতে মড়ার মত সাদা হইয়া গেল। ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, আমায় চাও না—কিন্তু কেন?

পারুল দৃপ্তস্বরে কহিল, কেন, সে তুমিই জান। তুমি কি মনে কর শুধু পুরুষেরই পছন্দ আছে, তার হৃদয় আছে …পৃথিবীর আনন্দ উপভোগ করবার মত বৃত্তি আছে—আর মেয়েদের নেই? বাবা আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, তাঁর হীন অবস্থার সুযোগ নিয়ে তুমি আমাকে কিনেচ। কিন্তু তা'রই জোরে কি মনে কর তোমার মত মূর্খ—অশিক্ষিতের পদসেবা করব আমি?…বিশ্বসংসারে আমার লজ্জা করার যদি কিছু থাকে, তবে সে তোমার স্ত্রী ব'লে পরিচয় দেওয়ার। ভুল বাবার খুবই হ'য়েছে, কিন্তু আমায় মাপ্ কর…আমি তোমায় ঘৃণা…

নলিনী ধৈর্য্য হারাইতে বসিয়াও নিজেকে শান্ত সংযত করিয়া লইল। শান্ত কণ্ঠেই কহিল, ঐশ্বর্য্য দিয়ে কেনবার মত হীন প্রবৃত্তি আমার কোন দিন হয়নি। ঈশ্বর জানেন—শুধু তোমায় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেম। ভেবেছিলেম… একটা আর্দ্র বাষ্পোচ্ছ্বাস নলিনীর কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। উচ্ছ্বসিত আবেগে সে কহিল, মানুষ অনেকই ভাবে…যাক্, তুমি মুক্তি চাচ্ছিলে না—আমি তোমায় মুক্তি দিয়ে গেলাম। যদি মনের এমন জোর কোনদিন করতে পার, আবার বিয়ে ক'রতে পার, তা'তেও আমি… …তুমি সুখী হও পারুল!

নলিনী ধীরে ধীরে গিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ীর কঠিন কর্কশ ঘর্ঘর শব্দ পারুলের কাণে কি মধু-বর্ষণ করিতে লাগিল?

৪

এবার পূজা পড়িয়াছিল, কার্ত্তিকের প্রথমে।

আশ্বিনের মাঝামাঝি, কিন্তু ইহারই মধ্যে বাংলার সহর হইতে পল্লীভবন পর্য্যন্ত পূজার ধূমে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ছেলেমেয়েদের কাপড়-জামা হইতে কন্যা-জামাতার তত্ত্ব-তাবাসের সমালোচনায় সর্ব্বত্র মুখরিত।

সেদিন অপরাহ্নে পারুল রায়দের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিল। রায়দের ছোট মেয়ে উৎপলের বিবাহ এই সেদিন হইয়াছে। মেয়ের ও নূতন জামাইয়ের জামা-কাপড় লইয়াই রায়গৃহিণী ও তাহার পুত্রের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। পারুল যাইতেই রায়গৃহিণী কহিলেন, আয় পারুল, বোস্।

পারুল বসিল।

পুত্র মাতাকে কহিল, আমি ত' আর দেরী কর্‌তে পারছিনে মা, তোমার মত যা হয় তাই বল না।

মাতা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা, তুই বল সমীর, নূতন জামাইকে কি দেওয়া যায়? লোকে কি বল্‌বে বল্‌ত? পারুল দেখ্‌ত মা, আমি কি অন্যায় বলেছি—বল্‌ত' ওকে। বলিয়া কতকগুলি দামী কাপড়-জামা পারুলের দিকে আগাইয়া দিলেন।

পারুল হাসিয়া কহিল, আচ্ছা সমঝদার পেলে পিসীমা! আমি ওই সব বুঝি, না চিনি?—তুমিই বল না সমীর দা'?

সমীর বিরক্তির সহিত কহিল, আমি কি বলব? তোরাই হচ্ছিস্ আজকাল সব পছন্দের ওস্তাদ! কিসে তোদের চাই, তা' স্বয়ং ভগবানও জানেন কিনা সন্দেহ…নাও মা, না হয় তুমিই চল আমার সাথে।

মা হাসিয়া কহিলেন, তাই না হয় চল্—দেখে শুনে ভাল জিনিস না দিলে যে তোরই নিন্দে হবে সমীর। পরে পারুলকে কহিলেন, দিদি নলিনীকে কি কাপড় দিচ্ছে রে পারুল? সেত' আস্ছে,—না?

পারুলের মুখে কে যেন কালি লেপিয়া দিয়া গেল। বুকের ভিতর অকস্মাৎ কি একটা ব্যথা দুরু-দুরু করিয়া উঠিল। আনত মুখে শুষ্ক কণ্ঠে সে কহিল, আমি দেখিনি পিসীমা!

সমীরের মাতা বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, বলিস্ কি? অবাক্ করলি যে! দেখিস্ নি, না তোর পছন্দ হয়নি রে পারুল?

পারুল বিব্রত হইয়া পড়িল। সে যে ইহার কিছুই জানে না। অনাবশ্যক ও অপ্রীতিকর বলিয়া এদিকের কোন খবরই রাখে নি সে। এ লইয়া তাহাকে কেহ যে কোন দিন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে, এ ধারণাই তাহার হয়নি। এখন কি বলিবে? বিপুল অস্বস্তিতে তাহার অন্তর ভরিয়া গেল। সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। উঠিতে পারিলেই যেন পরিত্রাণ পায়!

সমীরের মাতা হাসিয়া কহিলেন, কই বল্লি নে? লজ্জা কি রে!

পারুল অস্ফুট বিব্রত কণ্ঠে কহিল, সত্যি জানি নে পিসীমা! পারুল উঠিয়া পড়িল। মনে করিয়াছিল—একবার উৎপলের সহিত দেখা করিয়া যাইবে, কিন্তু তাহার সহিত দেখা আর করিতে পারিল না। অকস্মাৎ বুকের মধ্যে যেন কাল-বৈশাখীর ঝড় নামিয়া আসিল। এতদিন পারুল যাহা অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহাই যেন তাহার নিকট বিরাট্—দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া উঠিল; আজ আর সে তাহা উপেক্ষা করিতে পারিল না। মানুষের অনুকম্পার দৃষ্টি বহিয়া প্রতিনিয়ত যে স্নেহ-করুণা অজস্র ধারায় তাহার উপর বর্ষিত হইতেছিল, আজ তাহাই তাহাকে নিতান্ত অসহায় করিয়া তুলিল। এতদিন যাহাকে দূরে রাখিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে মনে সে গৌরব অনুভব করিয়াছে—আজ সেই হইয়া উঠিয়াছে কিনা তাহার বিপুল লজ্জা! এদিক্‌টা সে কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। আজ সর্ব্বপ্রথম এই দিকে দৃষ্টি পড়িতেই, তাহার লজ্জা-বিবর্ণ মুখখানি জগতের অপ্রার্থিত সদয় দৃষ্টি হইতে লুকাইবার জন্ত পারুল যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

বাড়ী ফিরিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া পারুল মনে মনে ইহাই ভাবিতেছিল। শত-সহস্র রূপে ভাবিয়াও কাল চিন্তার হাত হইতে নিস্তার পাইতেছিল না। লোকের অহেতুকী কৌতূহলের উপর বিরক্ত হইয়া যতই সে নলিনীকে দূরে ঠেলিয়া দিতে চাহিতেছিল, পূজার দিনে জামা-কাপড় পাইবার উন্মত্ত আশায় অস্থির বালক-বালকাদের স্তায় নলিনীর উজ্জ্বল প্রশান্ত মুখখানি ততই যেন তাহার মনের দ্বারে ভীড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেছিল। অনুমান নহে—সত্যই পারুল বুঝিল, ভুলিতে গিয়া কুগ্রহের মত নলিনীর স্মৃতি তাহার মাংস-মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে। লোকের দোষ কি? এত বড় ঘৃণার পাত্র বলিয়া জানিয়া শুনিয়া সেই যখন···পারুল শিহরিয়া উঠিল।

কাছেই একখানা খোলা রামায়ণ পড়িয়াছিল—বোধ হয় মাতাঠাকুরাণী পড়িতে পড়িতে রাখিয়া কোথায় গিয়াছেন। ইহারই মধ্যে বুকের জ্বালা লুকাইবার জন্ত আন্‌মনে পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একখানা খামের চিঠি দেখিয়া পারুল বিস্মিত হইল। বিদ্যুৎক্রিয়ার স্তায় একটী তীব্র অনুভূতি পলকে তাহার সারা দেহের উপর দিয়া সজোরে বহিয়া গেল। এই তাহার চিঠি! এই সেই কদর্য্য লেখা!···না জানি মা'র কাছে আবার কি হীন আত্ম-নিবেদন জানাইয়াছে! অস্পষ্ট অমূলক আশঙ্কায় পারুল চঞ্চল হইয়া উঠিল। বার দুই চিঠিখানা নাড়িয়া চাড়িয়া আবার রাখিয়া দিল। কিন্তু অদম্য কৌতূহল তাহাকে নিবৃত্ত হইতে দিল না। যন্ত্রচালিতের স্তায় সে চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল।

"শ্রীচরণে শত কোটী প্রণামান্তে নিবেদন, মা আপনার আশীর্ব্বাদী পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। পূজার সময়ে আপনি যাইবার জন্ত আদেশ করিয়াছেন, মাতৃহীন আমি, মা'র চরণ বন্দনা করা আমার যে কি লোভ তা' অন্তর্য্যামীই জানেন। কিন্তু নানা কারণে আপনার আদেশ প্রতিপালন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি আপনার অধম

সন্তান, সন্তানের অপরাধ সর্ব্বদাই ক্ষমার্হ। আমায় ক্ষমা করিবেন। আমার শরীর ভাল নয়—মাঝে মাঝে জ্বরে ভুগিতেছি। ইতি— সেবক—নলিনী।

ক্ষুদ্র পত্র, সেই কদর্য্য অক্ষর—বর্ণাশুদ্ধিরও অভাব নাই! কিন্তু ইহারই প্রতিটি অক্ষর আজ যেন পারুলের বুকের ভিতর দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল। কৈ কোথাও ত' হীন আত্মনিবেদন নাই…স্বামিত্বের দোহাই দিয়া তিনি কোথাও ত' তাহার উপর অধিকারস্থাপনের চেষ্টা করেন নাই! পারুল বিমনা হইল। বুকের ভিতর কি একটা ভাষাহীন ভাব সহসা গুমরিয়া উঠিল।…কেন, আসিলে কি ক্ষতি হইত? মান যাইত?…স্ত্রীই না হয় নিষেধ করিয়াছে, কিন্তু তিনি ত' স্বামী? অবাধ্য গর্ব্বী স্ত্রীকে কি জোর করিয়া…পারুল শিহরিয়া উঠিল! ছিঃ ছিঃ! এ কি ভাবিতে বসিয়াছে! এত দুর্ব্বল তাহার মন!…জ্বর…মাঝে মাঝে জ্বর হইতেছে…কেন…এমন জ্বর কেন হয়?…কি জ্বর, তাহা লিখিলে দোষ কি হইত? সে দেশে ডাক্তার নাই? ঔষধ খাওয়াতেও কি দোষ?… বায়ুপরিবর্ত্তনে যাইলে জমিদারী কি ডুবিয়া যাইত? এ দেখ্‌ছি চোরের উপর রাগ করিয়া মাটীতে ভাত খাওয়া! কেন বাপু, নিজের শরীর ত'?…না এও তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে?…বাড়ীতে ত' কেহ নাই—এই জ্বরের সময়ে কেই বা দেখিতেছে—কেই বা তাঁহার জ্বরতপ্ত দেহে হাত বুলাইয়া দিতেছে? পিপাসার সময়ে এক ফোঁটা জল চাহিয়াও সময়-মত হয় ত,…বেদনায় পারুল দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিল। অকস্মাৎ কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু পারুলকে চমকিত করিয়া দিয়া গালের উপর গড়াইয়া পড়িল। পারুল শিহরিয়া ত্রস্তে উঠিয়া বসিল। একি, সে পাগল হইল নাকি! ঐ মূর্খ—অশিক্ষিতের জন্য সে কাঁদিতে বসিয়াছে! ছিঃ, ছিঃ…

৫

পারুলের বড় বোন মল্লিকা পূজার কয়েক দিন আগে পিতৃগৃহে আসিল। মা'র নিকট সব শুনিয়া ভগ্নীকে একান্তে ডাকিয়া কহিল, এ তোর কি খেয়াল পারুল?

হাসি টানিয়া পারুল কহিল, খেয়াল কি রকম?

খেয়াল নয়? অমন জামাই, কত বড় জমিদারী—রাজার তুল্য…

রূপে কন্দর্পকান্তি, বল, বল! পারুল টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

মল্লিকা বিরক্তির সহিত কহিল, নয় ত' কি? অমন সুপুরুষ কয়টা দেখেছিস্ বল ত'? লেখাপড়া কম জানে বলে' তোর কাছে সে একেবারে মানুষই না?

পারুল মুখ কালো করিয়া কহিল, কম জানে? আকাট্ মূর্খ—ক লিখ্‌তে কলম ভাঙ্গে! আহা কি লেখা, যদি দেখ্‌তে!

মল্লিকা তিরস্কারপূর্ণ স্বরে কহিল, দু'পাতা লেখাপড়া শিখে মাথাটা খেয়েছিস্ আর কি!

পারুল ঝাঁঝের সহিত কহিল, আমারই অন্যায় হ'য়েছে তবে! এত লেখাপড়া শিখিয়ে অমন অকাট মূর্খের সাথে বিয়ে দিলে, জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে কিছু?…দেশে কি গরীব বিদ্বান্ পাত্রের অভাব ছিল…

মল্লিকা চমকিয়া উঠিল। কঠিন স্বরে কহিল, পারুল!

কেন, কি হ'য়েছে? ওকে যদি আমি সম্মান না কর্‌তে পারি—কি করবে তোমরা?

পারুলের জন্য মল্লিকার ভারি দুঃখ হইল। ভারাক্রান্ত কণ্ঠে সে কহিল, পারুল, মনকে আঁখিঠার দিয়ে সব সময়ে জেতা যায় না রে! আয়নার কাছে চেহারাটা একবার দেখ্ গিয়ে! অত তেজ থাক্‌বে না ভাই—ওই মূর্খের পা ধরে' কাঁদতে দিশে পাবি নে একদিন, তা' বলে দিচ্ছি!

পারুল ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল, বয়ে গেছে!

মল্লিকা তিক্তকণ্ঠে কহিল, মুখে সবাই এমন বলে রে, কিন্তু কাজের বেলায়…

পারুল রাগিয়া কহিল, থাম দিদি, যদি তেমন দিন আসে, তোমায় সে দৃশ্য দেখ্‌বার জন্যে নিমন্ত্রণ পাঠাব! পারুল হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল।

মল্লিকা কি ভাবিল। ভাবিয়া নলিনীকে লিখিল—

"এস। মা'র আদেশ রাখনি, কিন্তু আমার অনুরোধ অমান্য করো না। এস, নইলে সারা জীবন কাঁদতে হ'বে। এলে তোমার শিকল-কাটা পাখী খাঁচায় পুরে' দিবো। ভুলো না যেন। ইতি—

শুভার্থিনী তোমার দিদি—মল্লিকা।

৬

নলিনী আসিল। ভয়ে ভয়ে মল্লিকাকে সে জিজ্ঞাসা করিল, এমন লিখ্‌লে কেন দিদি?

মল্লিকা হাসিয়া কহিল, কি লিখ্‌ব? পুরুষ যদি ভেড়া হয়, মেয়েরা কি করবে?

নলিনী হাসিয়া কহিল, আমরা বুঝি ভেড়া!

মল্লিকা কহিল, তারও অধম—নিজের স্ত্রীকে বশ করতে পার না?

নলিনীর মুখ ম্লান হইয়া গেল। ব্যথাভরা কণ্ঠে কহিল, জোর ক'রে যে হৃদয় জয় করা যায় না দিদি! আমার অধিকারের বলে তার দেহটা বাড়ী নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু তা'কে ত' পাব না দিদি···

মল্লিকা নলিনীকে এমন করিয়া কোনদিন দেখে নাই। তাহার রূপ, তাহার সরস স্নিগ্ধ কথা, তাহার বুক-ভরা ব্যথার পরিচয় পাইয়া মল্লিকা আর্দ্র হইয়া উঠিল। ভগ্নীর জন্ত তাহার বড় দুঃখ হইল। এমন মানুষের উপরও পারুল বিরূপ হইল? নাইবা জানিল লেখাপড়া···যা'র এত গুণ, তা'র ওটুকু জানা না থাকিলেই বা কি? অদৃষ্ট!

আর্দ্রকণ্ঠে মল্লিকা কহিল, আমায় মাপ্‌ কর ভাই—তোমায় বুঝ্‌তে পারিনি। একটু থামিয়া কহিল, কিন্তু অত ভয় কর্‌লে ত' চল্‌বে না ভাই! বনের পশু বশ কর্‌তে উদার হ'লে চলে না···শাসনও চাই!

নলিনী কহিল, সে যদি না চায়···

আচম্‌কা পারুল ঘরে ঢুকিল। ডাকিল, দিদি—' কিন্তু পলকে নলিনীর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই ভয়ত্রস্তা হরিণীর ন্যায় সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

নলিনী মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মল্লিকা উভয়ের ভাব দেখিয়া হাসিয়া কহিল, তোমাকে ও অত ভয় করে কেন বল্‌তে পার ভাই?

নলিনী ম্লান কণ্ঠে কহিল, ভয় নয় দিদি···ঘৃণা!

মল্লিকা ব্যথিতা হইল। বিক্ষুব্ধ স্বরে কহিল, ওটা ওর মনের কথা নয় ভাই,—শিক্ষার মিথ্যে দেমাক! কল্পিত লজ্জাই হ'য়েছে ওর কাল···

নলিনী আনমনে কহিল, হ'বেও বা!

মল্লিকা কহিল, কিন্তু···

বাধা দিয়া দুঃখভারা কণ্ঠে নলিনী কহিল, কিন্তু নয় দিদি, লেখাপড়া জানি নে, মূর্খ···অত বড় পণ্ডিত কি আর···

মল্লিকা মৃদু হাসিয়া কহিল, শিখাতেও ত' পারে···. ওরই যখন, ফেলে ত' আর দিতে পারবে না!

তাই দেখো না দিদি! তা' হ'লেও ত' একটা গতি হয়! কিন্তু শেখাবার ভার আপ্‌নি নেবেন তো? নলিনীর সরল উচ্চ হাসিতে কক্ষতল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

মল্লিকা হাসিয়া কহিল, থাকতো ভাই দুটো দিন,—দেখি হাতের গুণটা!

৭

সন্ধ্যার দিকে পারুল একা তাহার ঘরে বিছানায় শুইয়াছিল।

পণ্ডিতমশাই!—নলিনী আসিয়া ভিতরে দাঁড়াইল। হাসিয়া কৌতুক করিয়া কহিল, আমায় একটু পড়িয়ে দিতেন যদি···

একি! ভূমিকম্প! সব কাঁপে কেন? পারুল সভয়ে বিছানার মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল।

নলিনী হাসিল! বলিল, শুনেছি পণ্ডিতমশাই নাকি বিদ্বান্‌, দেখ্‌ছি সে মিথ্যে! মূর্খ ত' বটেই—এখন দেখ্‌ছি আস্ত বোবাও!

লজ্জা—লজ্জা—অপরিসীম লজ্জা! সে আরও অগ্রসর হইবে নাকি? তাহাকে স্পর্শ করিবে না ত'? কি নির্লজ্জ! নিজে মূর্খ, অথচ পরিহাস করিতেও মুখে বাধে না! ছিঃ, ছিঃ···কিন্তু একেবারে দরজা জুড়িয়া দাঁড়াইয়া যে! চলিয়া যাইবার উপায়ও নেই···

নলিনী হাসিয়া আরও আগাইয়া আসিয়া, পারুলের কাঁধে হাত রাখিল। স্নেহমধুর কণ্ঠে কহিল, শুন্‌ছেন পণ্ডিতমশাই। ও···

পারুল ঝাঁকি দিয়া হাত সরাইয়া দিয়া, ছুটিয়া চলিয়া গেল। নলিনীর মুখভরা হাসি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া, সমস্ত মুখ অমানিশার মত কালো হইয়া উঠিল।

আর কেন?

মল্লিকা অন্য দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া হাসিয়া কহিল, পারলে না ভাই?

নলিনী হাসিতে পারিল না। ব্যথা আজ দুর্ব্বার হইয়া

তাহার বুক-ভরা প্রেম পত্নীর হীন নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে, আজ যেন তীব্র উপহাসের মত ফিরিয়া আসিয়া তাহারই মর্মমূল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া গিয়াছে।

নলিনী শুষ্ক স্বরে কহিল, দরকার কি দিদি!

মল্লিকার বুক চিরিয়া দীর্ঘশ্বাস নামিয়া আসিল।

নলিনী কহিল, আজই বিদায় দাও দিদি···

মল্লিকার চোখে জল ভরিয়া গেল। আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, আমাদেরও কি পর ক'রে দিলে!

নলিনী নত হইয়া মল্লিকার পায়ের ধূলা লইয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে কহিল, তোমাদের ভুলতে পারব না দিদি—আমার যে কেউ নেই···

মল্লিকার অশ্রু উথলিয়া উঠিল। সজল কণ্ঠে কহিল, এনে আমিই কষ্ট দিলেম ভাই!

মল্লিকা ধরিয়া বসিল, পারু, যাবি ভাই আমাদের ওখানে?

পারুল কহিল, কেন?

মল্লিকা স্নিগ্ধ হাসিয়া কহিল, বোনের বাড়ী বেড়াতে যাবি তো?

পারুল মুখ ফিরাইয়া একটু থামিয়া কহিল, না।

মল্লিকা ক্ষুব্ধ হইল। সদুঃখে কহিল, যাবি নে? দিদি বলে'ও কি একটু মায়াও তোর নেই রে পারু।

পারুল মৃদু হাসিয়া কহিল, আছে বলেই ত' যাব না দিদি।

মানে?

পারুল গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, তোমার মনস্কামনা এখানে পূর্ণ করতে পার নি দিদি, সেইটেই পূরণ করতে চাও তো?

মল্লিকার চোখে মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, কহিল, লাভটুকু তা'তে আমার না তোর? বলে যা'র জন্যে চুরি চুরি সেই বলে চোর!

পারুল কহিল, যা'র জন্যেই চুরি কর, সাধু কেউ বলবে না।

না হলুক, যাবি কিনা তুই তাই বল্?

না।

মল্লিকা পারুলের হাত দুইখানি কোলের উপর টানিয়া লইয়া স্নেহ ছল্-ছল্ চোখে কহিল, যাবি নে পারুল তোর দিদির ওখানে?···গরীব ব'লেই তো যাবি নে!

পারুল বিব্রত হইল। একটু ভাবিয়া কহিল, যাব,—ওকে কিন্তু আবার লিখ্তে পারবে না!

মল্লিকা বুঝিয়াও না বুঝিবার ভান করিয়া কহিল, কা'কে রে?

জানিনে যাও! পারুল দ্রুত উঠিয়া চলিয়া গেল।

মল্লিকার চোখে মুখে একই সঙ্গে আনন্দ ও বিষাদ গঙ্গাযমুনার মত পাশাপাশি বহিয়া গেল।

দার্জ্জিলিং মেলে সেদিন ভীড়ের অন্ত ছিল না। মল্লিকারাও এই গাড়ীতে কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ঈশ্বরদী ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল।

মল্লিকার স্বামী ধীরেনবাবু বার পাঁচেক ট্রেণের এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিয়াও যখন কোন গাড়ীতে উঠিতে পারিলেন না, তখন গাড়ী ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। প্রতি মুহূর্ত্তে ট্রেণ ফেল করিবার প্রবল আশঙ্কা আতঙ্কের সহিত চোখে মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে ধীরেনবাবু মরিয়া হইয়া যখন একটা কামরায় স্ত্রীপুত্রকে উঠাইয়া দিয়া নিজে উঠিয়া পড়িলেন, তখন গাড়ী ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা পড়িল। গাড়ী বাঁশী বাজাইয়া এইবার চলে আর কি! কিন্তু একি! পারুল ভীড়ের চাপে পড়িয়া তখনও উঠিতে পারে নাই! গাড়ী দুলিয়া উঠিয়া মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল। উৎকণ্ঠিত ধীরেনবাবু নামিয়া পড়িবার জন্য গাড়ীর দরজার নিকট ছুটিয়া আসিলেন—ঠিক সেই সময় ভীড়ের হাত এড়াইয়া পারুল গাড়ীর হাতলে ধরিয়া পা-দানির উপর এক পা বাড়াইয়া দিয়াছে। গাড়ী তখন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত বেগে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সর্ব্বনাশ! ধীরেনবাবু আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। পিছনে ভীড়ের চাপে, সম্মুখে গাড়ী প্রবল আকর্ষণে অকস্মাৎ পারুলের পা ফস্কাইয়া গেল···ঝুল সামলাইতে না পারিয়া হাত খুলিয়া গিয়া গড়াইয়া পড়িল···বুঝি বা···

ভয়ে আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিয়া ধীরেনবাবু চোখ বুঁজিলেন। কি যে করিবেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ট্রেণে হৈচৈ কান্নাকাটি লাগিয়া গেল। পাশের কোন এক ভদ্রলোক প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধিতে ডেঞ্জার-সিগ্‌ন্যাল টানিয়া দিলেন। একটা ঝাঁকি দিয়া কিছু দূরে গিয়া গাড়ী থামিয়া গেল—সব যেন চোখের পলকে ছায়াবাজির ছবির মত ঘটিয়া গেল!

কিন্তু পারুল গড়াইয়া পড়িল না বা আঘাতও পাইল না। যে মুহূর্ত্তে তাহার হাত ফস্‌কাইয়া গেল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পিছনের ভীড় হইতে দুইখানি প্রসারিত ব্যগ্র বলিষ্ঠ হাত তাহাকে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া কোলের দিকে টানিয়া লইল। পারুলের মাথা ঘুরিয়া উঠিল—মৃত্যু-বিভীষিকায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া সে তাহার বুকের উপর ঢলিয়া পড়িল।

পারুল!

পারুল চমকিয়া উঠিল। অপরিচিত পুরুষের মুখে নিজের নাম শুনিয়া বিস্ময়ে চোখ মেলিয়া চাহিতেই পলকে তাহার মুখ মড়ার ন্যায় সাদা হইয়া গেল। তাহার ভয়ত্রস্ত কণ্ঠ হইতে ক্ষীণ আর্ত্তনাদ করুণ হইয়া ফাটিয়া পড়িল।

এ সেই—তাহার জীবনের একমাত্র লজ্জা—তাহার স্বামী নলিনী!

নলিনী ম্লান হইয়া উঠিল। পারুলের কাণের কাছে মুখ লইয়া চাপা ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল, এখনও কি ক্ষমা করতে পারনি পারুল?

কম্পিত হস্তে পারুল নিজকে আবৃত করিয়া লইয়া অন্তে সরিয়া দাঁড়াইল।

নলিনী ব্যথিত হইল। ক্ষুদ্র একটী নিশ্বাস যেন তাহার অগোচরেই ঝরিয়া পড়িল। ভগ্ন কণ্ঠে নলিনী কহিল, ভয় নেই পারুল, তোমার অমতে আমি তোমায় চাইব না। যদি কোনদিন স্বেচ্ছায় আস···আমার ক্ষুদ্র গৃহ তোমার জন্যে সব সময়েই খোলা থাক্‌বে পারুল!··· সেদিন আমার বড় সৌভাগ্য পারুল!

পারুলের বুকের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল। তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে—সম্মুখে জল, অথচ কে যেন তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিয়াছে! পারুল কথা কহিতে পারিল না।

পারুলের আনত নির্ব্বাক্ পাংশু মুখের দিকে চাহিয়া নলিনী একটা কঠিন উচ্ছ্বাস চাপিয়া গেল। মর্ম্মাহত কণ্ঠে কহিল, ভয় নেই পারুল! তোমার অনিচ্ছাই যদি থাকে, আমি আর ওদের কাছে নিজেকে জাহির করতে চাই নে। কাটিহার যাচ্ছি—ওধারে গাড়ী ছাড়বারও আর বেশী দেরী নেই। ওই যে ওরা এসে পড়ল···তা'হলে···নলিনী দ্রুত অদৃশ্য হইল।

পারুলের অসহায় শুষ্ক আঁখি-পল্লব বহিয়া অবুঝ অশ্রু আজ যেন অকস্মাৎ বাধাহীন হইয়া মাতিয়া উঠিল।

## ১০

কলিকাতায় 'শ্রী' চিত্রগৃহে সেদিন অভাবনীয় ভাবে বাল্যসখী রেণুর সহিত পারুলের দেখা হইয়া গেল। কখন তাহারা আসিয়া পাশাপাশি বসিয়াছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই—'বিশ্রাম-কালে'র আলো জ্বলিয়া উঠিলে, হঠাৎ চোখাচোখি হইতেই উভয় সখী একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

রেণু পারুলের হাত টানিয়া লইয়া আনন্দোজ্জ্বল কণ্ঠে কহিল, 'আবর্ত্তন' আজ সত্যিকার সার্থক হ'য়ে উঠ্‌ল আমাদের জীবনে পারুল!

রেণুর হাতে মৃদু চাপ দিয়া পারুল হাসিয়া কহিল, মিছে নয়! কোথায় তুই, আর কোথায় আমি—দু'শো মাইল দূরে থেকেও ঠিক্ সময়ে আজ কেমন দেখা হ'য়ে গেল!

তারপর দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত কথার আবেগে বোধ করি, সম্মুখের ছবির কথা দু'জনেই ভুলিয়া গেল।

রেণু ছাড়িল না। পরদিন আসিয়া পারুলকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল।

পারুলকে লইয়া রেণু সমস্ত বাড়ী-ঘর দেখাইয়া তাহাদের বসিবার ছোট সজ্জিত কক্ষ মধ্যে আসিয়া স্মিত-হাস্যে কহিল, বোস্ পারুল।

পারুল হাসিয়া কহিল, বোস্ ভাই, আমি ছবিগুলি দেখি। বাড়ীময় ত' কেবল ছবি দেখছি—কর্ত্তা বুঝি একজন চিত্রশিল্পী?

রেণু হাসিয়া উত্তর দিল, শত্রুতেও সে অপবাদ দেয় না। তবে ছবি কেনার বাতিক আছে বটে।

পারুল স্মিত হাসিয়া দেওয়ালে বিলম্বিত ছবিগুলি

দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ একখানা ছবির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই সর্পদৃষ্টের ন্যায় চমকিয়া উঠিল। তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখ ছাইয়ের মত পাংশু হইয়া উঠিল চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল।

পারুল চেয়ার ধরিয়া কোন রকমে পতনোন্মুখ দেহের ভার রক্ষা করিয়া নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে ঐ একান্ত অপ্রত্যাশিত ছবির দিকে চাহিয়া রহিয়া কাঁপিতে লাগিল।

রেণু ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ত্বরিত পদে উঠিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে সে পারুলকে কহিল, ওকে জানিস্ নাকি ভাই?

পারুলের কণ্ঠ শুকাইয়া আসিল। ঢোঁক গিলিয়া মৃদু স্বরে কহিল, না,—অমনি দেখ্‌ছিলেম!

রেণু কহিল, ও ভাই তোর দোষ নয়—ও ওর অভিশপ্ত জীবনেরই দোষ! সবাই দেখে, সহানুভূতি জানায়—ওর দুঃখে অশ্রু ফেলে, অথচ ওর বিরাট্ দুঃখ যায় না!

পারুল চমকিয়া উঠিল। অজ্ঞাত ভগ্নকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইল, কেন?

রেণু কহিল, সে অনেক কথা। বোস্ বল্‌ছি।

পারুল কাঁপিতে কাঁপিতে পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িল। এ যেন নিজের কাণে নিজের দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করা।

রেণু কহিল, উনি আমার স্বামীর বন্ধু। ওনার মুখেই শুনেছি ওঁর স্ত্রী নাকি বিদুষী—অথচ ওঁর বিদ্যে থার্ড্ক্লাশ! মেয়েটীকে দেখে তিনি মুগ্ধ হ'য়েছিলেন। ওঁদের যেমন অবস্থা, ইচ্ছে করলেই ওঁর চেয়ে বড় ঘরের, ওর চেয়েও ভাল মেয়ে আন্‌তে পার্‌তেন। কিন্তু ভালবাসা এমনি জিনিস, ওকেই তিনি বিয়ে কর্‌লেন। আশা কিন্তু ওঁর সফল হ'ল না। স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনাও হ'ল না। বিদুষী স্ত্রী ওঁর রূপ ও ঐশ্বর্য্যে মোহিত হ'য়ে স্বামীর ঘর কর্‌তে এলো না। শিক্ষার মিথ্যে দেমাক নিয়ে স্বামীকে কটূক্তি ক'রে ফিরিয়ে দিতেও ইতস্ততঃ কর্‌লে না। হয়ত' এতে ওঁর খুব লেগেছিলো—কিন্তু সার্থক ওঁর ভালবাসা—আর ধন্য ঐ গর্ব্বিতা মেয়েটী! তিনি আর বিয়ে কর্‌লেন না বা তাঁর এই অনাবিল অন্তর মেয়েটীর উপর বিরূপও হ'ল না। ঐ মেয়েটির দিকে চেয়ে আজও তিনি বসে আছেন। তাঁর বিশ্বাস সেই গর্ব্বিতা মেয়েটী নাকি এক দিন আস্‌বেই—তাঁর এই অনাবিল একনিষ্ঠ ভালবাসার পুষ্পাঞ্জলি সে নেবেই! আমি শুনে হেসে বলেছিলেম, যদি নাই নেয়? উত্তরে তাঁর সহাস্যময় মুখ একটু কালো হ'য়েছিলো। কিন্তু তখনই তিনি তাঁর স্বভাব-সুলভ হাসি হেসে উত্তর ক'রেছিলেন, নাই যদি নেয় রেণু,—তা' হ'লে স্মৃতি নিয়ে বিদায় নেবো। হিন্দু আমরা—জন্মান্তরেও কি তা'কে পাব না? আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে চম্‌কে উঠেছিলেম। সে কি গভীর বিশ্বাসের দৃঢ় ছায়া! আমার যা' দুঃখ হ'য়েছিলো—সংসারে এমন মেয়েও থাকে, যে ছাই পড়ার গর্ব্ব নিয়ে এমন ভালবাসাকে ঘৃণা করে!···

রেণু আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ইহারই এক একটা কথা কেমন করিয়া পারুলের সহ্য করিবার অসীম শক্তি একে একে হরণ করিয়া লইয়া তাহাকে অচৈতন্যপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সে আবেগের ঝোঁকে লক্ষ্য করে নাই, এইবার পারুলের মৃতপ্রায় কঠিন মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই রেণু ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, পারুল—পারুল!···

পারুল চমকিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল।

রেণু ভয়ে ভয়ে কহিল, অমন কর্‌ছিলি কেন ভাই?

পারুল অতি কষ্টে ম্লান হাসিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, ও অমন মাঝে মাঝে হয়! [ আগামীবারে সমাপ্য ]

# গান

শ্রীনির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

*ভালবাস, ভালবাস, ভালবাস ওরে প্রাণ—*
দু'দিনের এ জীবন, দু'দিনেতে অবসান।
যদি দু'দিনের বাঁধা ঘর, কেন বা আপন পর,
দু'দিনের এই খেলা, হাসি, বাঁশী, আলো, গান।

*দু'দিনের মুসাফির তুই এই ধরণীর*
ফুলে ফুলে ভরা এই শ্যামলিমা-বরণীর।
যদি দু'দিনের সবই তোর, কেন অহমিকা ঘোর?
কেন দূরে স'রে থাকা, কেন ওরে অভিমান!

২১

চন্দননগরে ফিরিলাম। আমার জীবনপর্ব্বে প্রতি দ্বাদশ বর্ষে এক যুগান্তকরী ঘটনার সমাবেশ লক্ষ্য করিয়াছি। একাদশ বর্ষ পূর্ণ হইলেই, সমস্ত দ্বাদশ বর্ষটী কোন একটী বিশেষ সাধনা লইয়া অতিবাহিত হইয়াছে। দ্বাদশ বর্ষে যুগ, এ কথা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ সমাপ্ত হইলে, শ্রীঅরবিন্দের বাংলাত্যাগের যুগান্ত হইবে। আমার ও শ্রীঅরবিন্দের যোগসম্বন্ধের দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইবে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসেই ১৯২১ খৃষ্টাব্দের গুরুত্ব আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইলে, তিনি বাংলায় পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন কি না? তিনি সম্মতিসূচক উত্তর দিয়াছিলেন এবং তিনি যে চন্দননগরেই আসন পাতিবেন, এ প্রত্যয় আমার দৃঢ় হইয়াছিল। ইহার প্রস্তুতির জন্য এবার চন্দননগরে ফিরিয়া আমার কর্ম্মপ্রবাহ মহাপ্লাবন সৃষ্টি করিল। তাহার কিছু পরিচয় পরে দিব।

বাড়ী ফিরিলাম। সেই বসিবার ঘর। সুপরিষ্কৃত প্রাঙ্গণ, সুপরিষ্কৃত দালান, সেই শয়নকক্ষ, রন্ধনশালা। সুমার্জ্জিত পরিচ্ছন্ন মূর্ত্তিতে আমায় সাদরে অভিনন্দন জানাইল। এই সঙ্গে সহতীর্থগণের পুলকোজ্জ্বল নয়নের দৃষ্টি, তাহাদের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠের সোৎসুক প্রশ্ন আর প্রাঙ্গণ-প্রান্তে দরজার আড়ালে জীবন-সঙ্গিনীর অস্পষ্ট অনিন্দ্য রূপশ্রী আমায় যেন নূতন করিয়া বরণ করিয়া লইল। আমি যেন এই কয় মাসের মধ্যেই একেবারে অভিনব হইয়া ফিরিয়াছি। প্রত্যেকের আচার-আচরণে তাহাই যেন ঘোষিত হইতেছিল।

চণ্ডীদাসে পড়িয়াছিলাম 'পরকে আপন করিতে পারিলে, পিরীতি মিলয়ে তারে'; আজ এই পিরীতিনগরে পিরীতি-পড়সীর মধ্যে আপনার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া গেল, এক অখণ্ড হৃদয়ানুভূতিতে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বহিপ্রাঙ্গণে বসিয়া পরস্পরের মধ্যে আলাপালোচনায় কাটাইয়া দিলাম। গৃহ-লক্ষ্মী আমায় তিনটী অপবাদ দিয়াছিলেন—পথ পাইলে চলা, কালী-কলম-কাগজ পাইলে লেখা, আর লোক পাইলে কথা বলা। এ রোগের একমাত্র ঔষধ ছিল গৃহদেবীর অকস্মাৎ বাধা দেওয়া। এ ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হইল না। দীর্ঘ দিনের পর প্রবাস হইতে ফিরিয়া, সহকর্ম্মীদের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথাবার্ত্তা তিনি ধৈর্য্যের সহিত অনেক ক্ষণ সহিলেন। তার পর ডাকের পর ডাক দিয়া আমায় বাড়ীর মধ্যে লইয়া আসিলেন। তৃপ্তিতে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল। আমার আগমনপ্রতীক্ষায় প্রতি গৃহসামগ্রীটীর সহিত গৃহতলের প্রতি ধূলিকণাটীও যেন উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠিত হইয়া আমার পরশ চাহিতেছিল। গৃহ-পরিবেশের মধ্যে এই চাওয়ার স্নিগ্ধ শান্ত আকুলতা একটী সজীব প্রাণের অমৃতস্পর্শেরই আকর্ষণ, ইহা আর বুঝিতে বাকী রহিল না। বহু দূর হইতে কোন এক ক্লান্ত অতিথি অশেষ পরিতৃপ্তির সহিত পরম আশ্রয় পাইল। আনন্দের আতিশয্যে আমি [illegible]ৃষ্টিতে তন্বীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। সজল নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টি পুলকে উছলিয়া উঠিতেছিল—এ কি অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি, বাক্যে তাহার প্রকাশ হয় না!

কনককান্তি অঙ্গে। নয়নে দীপ্তি। ওষ্ঠে, গণ্ডে রক্তোৎপল শোভা। কিন্তু এ কি বেশ? পরিধানে ছিন্ন অর্দ্ধমলিন বস্ত্র। কেশপাশ রুক্ষ, গ্রন্থিল। সীমন্তে কিন্তু নবারুণরঞ্জিত সমুজ্জ্বল সিন্দূররেখা। নিদাঘের চাতক—প্রাবৃটের প্রথম বর্ষণে হিয়া শীতল করিল; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলাম—আজও কি পরিধানের বস্ত্রাভাব ঘটিয়াছে? অনটনের মাত্রা কি এতই বাড়িয়াছে যে, মাথায় এক বিন্দু তৈল জুটে না? এ দৈন্যমূর্ত্তি কেন?

ওষ্ঠপুটে বিদ্যুৎ ঠিকরিয়া পড়িল। অভিমানবিজড়িত স্বরে সুগভীর প্রণয়স্পর্শে দাবীর কণ্ঠ চিত্তপ্রাণ শীতল করিল, "আমার দুঃখে দরদ তোমায় দেখাইতে হইবে না;

ক্লান্তিও তো নাই তোমার, স্নানাহার সারিয়া একটু ঠাণ্ডা হইয়া কথা কহিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা? বাবা রে বাবা, কথা আর ফুরায় না?"।

বহুদিন পরে সুকোমল করপল্লবে শরীর আমার শিহরিয়া উঠিল। গায়ের চাদরখানা টান দিয়া তিনি খুলিয়া লইলেন, জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "সেখানে তো আর বিনা মাহিনার দাসী নাই, বসিয়া খাওয়াইবে; এ কি হইয়া গিয়াছ? কণ্ঠার হাড় যে বাহির হইয়া গিয়াছে!"

আমি একবার নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে চাহিয়া বলিলাম "কৈ, না, বেশ তো গোলগাল নধর, আগের চেয়ে বরং ভালই হয়েছে মনে হয়।"

তিনি ঠোঁট দুখানি ভেঁঙচি কাটার ন্যায় একটু বাঁকাইয়া ফুলাইয়া বলিলেন, "নিজের দিকে যদি তোমার সে দৃষ্টি থাকিবে, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? সকালে কি খেতে শুনি? তিন দিন গাড়ীতে কি খেয়েছ বলত?"

লঘু প্রশ্নের লঘু উত্তর। হাস্যকৌতুক ব্যঙ্গ-পরিহাস, স্নানাহার, শয়নকাল পর্য্যন্ত সমানে চলিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের নিকট মৎস্য-মাংস-ভোজনের দমন-প্রবৃত্তি মুক্তি পাইয়া সর্ব্বভুক্ হইয়াছিলাম; কাজেই ট্রেণের যাত্রী কেলনার, স্পেন্‌সার প্রভৃতি হোটেলওয়ালাদের অনুগ্রহে ভোজনাদি ব্যাপারে কোন কষ্টই পাই নাই; তবে শ্রীঅরবিন্দের ভবনে পূর্ব্বে ছিল রাবণের অশোক-কাননের চেড়ীর অবতার ভাগ্যমের হাতে আহারের প্রচুর নির্য্যাতন। এবার এক মাদ্রাজী লেডী সৈরিন্ধ্রীমূর্ত্তির হাতে কিছুটা শোধিত হইলেও, ভোজনাদির দুর্দ্দশাটার যে তাহাতে বিন্দু মাত্র উপশম হয় নাই, এ কথা মুক্ত কণ্ঠেই স্বীকার করিলাম। তিনি সকালে আপাম খাওয়ার কথা শুনিয়া হাসিয়াই আকুল। তার পর মধ্যাহ্নে হাতাখানেক মটন-কারীর সহিত কয়েক গ্রাস অন্নভোজনের কথা বলিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "অপরাহ্নে?"

বলিলাম, "খাওয়ার একচেটিয়া দাবী লইয়া শ্রীঅরবিন্দ-মন্দিরে তো উপস্থিত হই নাই!" রাত্রে খলিসাজাতীয় একপ্রকার সমুদ্রমৎস্যের ঝোল-ভাত খাওয়ার কথা বলিতেই, তিনি বলিলেন, "রুটি-লুচি বুঝি হয় না?"

আমি বলিলাম, "হরের ঘরে সিদ্ধির ঝুলি আছে বটে, কিন্তু তাহা শূন্য হইয়াই বাতাসে উড়ে; অন্নপূর্ণার উদয় কিন্তু আসন্ন। এইবার যখন যাব, হয় তো তুমিও সঙ্গী হবে।"

এই ভবিষ্যদ্বাণী সেদিন মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল, পরবর্ত্তী ঘটনায় তাহা সমর্থিত হওয়ার স্মৃতিটা আজও মুছে নাই।

মীরাদেবীর কথাও উঠিল। নারী—নারীর কথা যেমন খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করে, কোন পুরুষে তেমন পারে না। মীরাদেবীর ছবিখানি আমি সঙ্গে আনিয়া-ছিলাম; অতিশয় মনোযোগের সহিত তাহা তিনি নিরীক্ষণ করিলেন, বলিলেন "মেয়েরা বেশ সুন্দরী হয়, না?"

আমি বলিলাম "ছবি দেখিয়া তাহা বুঝা যায় কি?"

তিনি বলিলেন "বয়স হইয়াছে, কিন্তু শ্রী আছে। প্রফুল্লতাময়ী মূর্ত্তি।"

আমি মীরাদেবীর আচার-আচরণ, আমার গৃহের বিশৃঙ্খলা দেখিয়া তাঁর অভিমত এবং প্রতি সপ্তাহে তাঁর নিমন্ত্রণের কথা যথাযথ বলিলাম।

তিনি হঠাৎ বলিলেন "আচ্ছা, তাঁহাকে এক জোড়া ফরাসডাঙ্গার শাড়ী পাঠাইলে হয় না?"

সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম।

তিনি বলিলেন "সুন্দর দেখাইবে।"

ভবিষ্যতে তাঁহার এ কল্পনাও রূপ লইয়াছিল বলিয়াই কথাগুলি স্পষ্টই মানসপটে আঁকিয়া রহিয়াছে।

আবার তাঁর সুবিন্যস্ত কেশপাশ শ্লথ কবরীতে মুখশ্রী বর্দ্ধিত করিল। মলিন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তিনি পরিচ্ছন্ন শাড়ী পরিধান করিলেন। কর্ণযুগলে আবার মুক্তাখচিত স্বর্ণালঙ্কার শোভা পাইল। মণিবন্ধে, কণ্ঠে কনকালঙ্কার ঝলমল করিয়া উঠিল। সূর্য্যোদয়ে কমল-বনের শতদলশোভায় আমার গৃহমন্দির সমুজ্জ্বল হইল। জানিলাম —আমার প্রবাসকালে তিনি অঙ্গ হইতে স্বর্ণালঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, সতত অর্দ্ধমলিন বস্ত্র ব্যবহার করিতেন, কেশপাশ বিনা প্রসাধনে জট পাকাইয়া গিয়াছিল; কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় সীঁথির সিন্দুর তিনি সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। স্বামিসোহাগিনী সতীর ইহা

যোগ্য চরিত্রেরই পরিচয়। আজও আমি মনে মনে এই গানই গাহি—

"দেবী আমার, সাধনা আমার
ধ্রুবজ্যোতিঃ তুমি জীবনে।"

সে একদিন—মধ্যাহ্নে হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি—তিনি একাগ্রচিত্তে আমার একখানি ফটো লইয়া সন্দর্শন করিতেছেন। আমি পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলাম; তিনি তন্ময়। ছবির সহিত কি নিবিড় পরিচয়! ছবিখানি বাঁধান নহে, একখানি কার্ডের উপর সংলগ্ন ছিল। দেখিলাম—মূর্ত্তিটি অস্পষ্ট না হইলেও, উহা এমনই ভাবে তৈলচর্চ্চিত হইয়া গিয়াছে যে, নিঙ্ড়াইলে বোধ হয় দুই এক বিন্দু তৈল নিষ্কাশিত হইবে। আমার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আমার অদর্শনকালে এই ছবিই ছিল তাঁহার আশ্রয়। এই ছবিখানিকে তিনি হৃদয়ের মধ্যে চাপিয়া নিশি যাপন করিতেন। শরীরের ঘর্ম্মে, তৈলে ছবি অভিষিক্ত হইয়াও তাঁহার নিকট প্রাণের সাড়া দিয়াছে; তাহা না হইলে, উহা লইয়া এমন নিবিষ্টচিত্ত মানুষ কেমন করিয়া হইতে পারে? আমি ধীরে ধীরে তাঁহার নয়নপল্লব উভয় হস্তে চাপিয়া ধরিলাম। কিন্তু একি! নয়ন-নির্ঝরে আমার করপুট অভিষিক্ত হইল। আমার মুখে কথা সরিল না। তিনি তাড়াতাড়ি চক্ষু মার্জ্জন করিয়া ছবিখানি গোপন করার চেষ্টা করিলেন; আমি তাহাতে বাদ সাধিলাম। ফলে কাড়াকাড়ি, প্রণয়ের মল্লযুদ্ধ সুরু হইল। "নাম-পরশনে যার ঐছন করিল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়!" কবির এই প্রশ্নের উত্তর পাইয়া ধন্য হইলাম। রক্ত-মাংসের উর্দ্ধে প্রণয়ের ডালি সাজাইয়া যে তপস্বিনী স্বামীর নিত্যরূপের উপাসিকা, তাঁকে বুকে ধরিয়া যে অমৃতস্পর্শ, সে কথার প্রকাশের ভাষা চিরদিন মূক হইয়া থাকিবে।

নারী ও পুরুষ সমাজের ভিত্তি। নারী ও পুরুষের অনাবিল সম্বন্ধই সমাজের শ্রী ও ঐশ্বর্য্য। স্ত্রী—স্বামীর শুধুই শয্যাসঙ্গিনী নয়, ধর্ম্মপত্নী। প্রথম উভয়ের মধ্যে সম্ভোগলালসা দূর করার সূচনাকালে উভয়ের মধ্যে ভেদের ব্যবধান হয় তো বাড়িয়া যাইবে, এই আতঙ্ক বড় হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ হইতে যতই আমরা মুক্তি পাইতেছিলাম, ততই হৃদয়-গ্রন্থি দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল। আনন্দ ও আলোর রাজ্যে দুইজনে হাত-ধরাধরি করিয়া অতি উল্লাসেই আমাদের দিন কাটিতেছিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দটী ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতে লাগিল; আমার আকুলতার সীমা রহিল না। শ্রীঅরবিন্দের কর্ম্মক্ষেত্র-রচনায় আমিই একমাত্র দায়ী, এইরূপ মনে করিতাম। শ্রীঅরবিন্দও বলিতেন "মতির শ্রমের অন্ত নাই"। এ কথা তাঁর মর্ম্মের—বর্ণে বর্ণে সত্য। শ্রমই আমার সাধনার অঙ্গ চিরদিন।

অন্তরের মণিকোটায় ছিল অনির্ব্বাণ দীপশিখা। অন্তরের দৈন্য প্রতি মুহূর্ত্তে দূর করিয়া হৃদয়ে উৎসাহানলে নিয়ত ইন্ধন যোগাইতেন আমার ধর্ম্মপত্নী। কর্ম্মক্লান্তি অবসন্নতার কারণ হইত না।

সম্মুখে ১৫ই আগষ্ট। এবার উৎসব শ্রাবণের ঘনান্ধকারে চুপে চুপে নিষ্পন্ন হইবে না, বারীনদা সসঙ্গী উৎসবে যোগদান করিবেন। সহরে উৎসবঘোষণা প্রচারিত হইল। সহরের সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা এই উৎসবে যোগ দিবেন। সে মহাড়ম্বরে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সহায় আমার গৃহদেবী। আমাদের আনন্দের পশ্চাতে সব কিছু অনুষ্ঠানের ভার তাঁহারই। লোক-জনের সম্মানরক্ষার দায়িত্ব তাঁহারই উপর নির্ভর করে। তাঁর চির সহকারিণী মেজ-বৌ আসিয়া কোমর বাঁধিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট কেবল আমাদের প্রাণকেই উদ্বুদ্ধ করে নাই, সারা সহরে নূতন প্রাণসঞ্চার করিয়াছিল।

২৯শে শ্রাবণের বারীনদার পত্রাংশ হইতেই বুঝা যাইবে—এই উৎসবের তোড়জোড়ে তাঁর প্রাণেও কতখানি উৎসাহের আগুন জ্বলিয়াছিল। তিনি লিখিতেছেন—"কাল…কাছে গিয়াছিলাম, তাদের বাড়ী সব অসুখ, তবুও দুই তিন জন মেয়ে, ৬।৭ জন পুরুষ যাবেন। দিদি (সরোজিনী) ও অবি'র (অবিনাশের) ব'ন টুনী যাবে। মেজ দাদার এক মেয়ে যেতে পারে। হেমন্ত, সমরেন্দ্র, কীর্ত্তি যাবে।……তার স্বামীও যেতে পারে। ইতালী থেকে একদল অনুকূল ঠাকুরের পার্টি যাবার জন্যে ধরেছে। ঠাকুর দয়ানন্দের দলও ছাড়বে না। কয়েকখানা গাড়ী ৬টার ট্রেণের জন্য রেখো, আর একজন পথপ্রদর্শক। আমি বেজায় হিসাব-ভোলা, পথ চিনতে পারব না" ইত্যাদি।

১৫ই আগষ্টের প্রথম প্রহর বেলার মধ্যেই উৎসবপ্রাঙ্গণ লোকপূর্ণ হইয়া উঠিল। বারীনদা বন্দীজীবন হইতে মুক্তি পাইয়া রুদ্ধ প্রাণের আগুন ছড়াইয়া দিতেছিলেন। বাংলার যত ধর্ম্ম ও কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান ছিল, বারীনদার পরিদর্শন কোথাও বাদ যায় নাই। তিনি দুই হাতে সমস্ত বাংলাটাকে এই উৎসবে জড় করিয়াছিলেন। অলিন্দে, ছাদে, প্রাঙ্গণে সোৎসুক নারীপুরুষের চঞ্চল দৃষ্টি নবযুগপ্রভাতের জ্যোতির্ম্ময় কিরণদর্শনে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল। উৎসবক্ষেত্রটী উৎসাহ ও আনন্দোচ্ছ্বাসে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই দিনই 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড-বেয়ারারের' প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। সভাক্ষেত্রে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড বেয়ারার'-বিতরণের ধুম পড়িয়া গেল। বাংলার সকল ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে বারীনদা সেদিন যে বিরাট্ ঐক্যপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা আমার চিরদিন স্মরণে থাকিবে।

'ষ্ট্যাণ্ডার্ড-বেয়ারারের' আদর্শ সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধে লেখা হইয়াছিল—"Our ideal is not the spirituality that with-draws from life but the conquest of life by the power of the spirit. It is to accept the world as an effort of manifestation of the Divine but also to transform humanity by a greater effort of manifestation than has yet been accomplished……"

অর্থাৎ "জীবনবিমুখ হওয়া আমাদের আধ্যাত্মিকতার আদর্শ নয়, আমরা অধ্যাত্মশক্তির দ্বারা জীবনজয়ী হইতেই চাহি। জগৎকে আমরা ঈশ্বরের প্রকাশ-মূর্ত্তিরূপেই শুধু স্বীকার করিব না, পরন্তু মানবতাকে রূপান্তরিত করিব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রকাশের তপস্যায়।" এই প্রথম প্রবন্ধটী শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং লিখিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন জীব ও ভগবানের মধ্যে ব্যবধান দূর করিতে। তিনি দিব্য মানবজীবনের জন্য পৃথিবীতে সত্যে ও আলোয় এবং আত্মার শক্তিতে সিদ্ধ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি আরও লিখিয়াছিলেন—"Our first object shall be to declare this ideal; insist on the spiritual change as the first necessity and group together all who accept it and are ready to strive sincerely to fulfil it. Our second shall be to build up not only an individual but a communal life on this principle."

অর্থাৎ "আমাদের প্রথম কর্ম্ম হইবে এই আদর্শের ঘোষণা করা। অধ্যাত্মপরিবর্ত্তনের উপর জোর দিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে এবং যাহারা অকপটে ইহা স্বীকার করিবে এবং ইহার জন্য তপস্যা করিবে, তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। আমাদের দ্বিতীয় কর্ম্ম—এই নীতির উপর শুধু ব্যক্তিজীবন গড়িয়া তোলা নয়, একটা সঙ্ঘজীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে।"

তিনি ইহার জন্য অধ্যাত্মসাধনার সহিত সমাজ, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই জীবনগতির ক্রম ব্যক্তি ও সংহতি, প্রদেশ ও জাতি এবং নিখিল মানবকে আশ্রয় করিবে, এ কথা তিনি সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তা মানবতার জন্যই। তিনি বলিয়াছিলেন—"It is with a confident trust in the spirit that inspires us that we take our place among the standard-bearers of the new humanity that is struggling to be born amidst the chaos of a world in dissolution and of the future India, the greater India of the rebirth, that is to rejuvenate the mighty outworn body of the ancient Mother."

"যে ভাব আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, তাহার উপরেই সুদৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করিয়া আমরা সেই নূতন মানবজাতির পতাকাবাহিদের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিতেছি, যে জাতি একটা বিলীয়মান জগতের ধ্বংস-কোলাহলের মধ্যে নবজন্মের তপস্যা করিতেছে; আর সেই ভবিষ্য ভারত, যে বৃহত্তর ভারতের নবজন্মে আমাদের এই প্রাচীন দেশমাতৃকার জীর্ণ দেহ নব মূর্ত্তি ধারণ করিবে, তাহারও প্রবর্ত্তকদের মধ্যে আমাদের স্থান হইবে।"

লক্ষ্য সিদ্ধ হয় বাঁধাধরা কল্পিত পথে নয়। কবি রজনীকান্ত সত্যই বলিয়াছিলেন—

"করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে,
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া এনেছ তোমারি দুয়ারে।"

দিব্যশক্তি এমনই এক অকল্পিত পথে আমায় ছুটাইতেছিলেন। অনেকেই আমার জীবনপ্রবাহ লঘু ভাবপ্রবণ

বলিয়া অভিযোগের সুর তুলিয়াছিলেন, আমার মধ্যে এই গুরুতর কর্ম্মবহনের অশক্তিও হয়ত লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আজ ভাবি—এই বিশ বৎসর পরে তাঁহাদের অনেকেই পথহারা। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ আজিও সেই দুর্গম পথেরই যাত্রী। "প্রবর্ত্তকের" বুকে শ্রীঅরবিন্দ তাই বাণী দিয়াছিলেন "প্রবর্ত্তক আমাদেরই কাগজ"; আর "ষ্ট্যাণ্ডার্ড-বেয়ারারের" প্রচ্ছদপটেও "Under the inspriation Sri-Aurabinda Ghose" লেখা থাকিত—"শ্রীঅরবিন্দের অনুপ্রেরণা ইহার জীবন।"

অরবিন্দ আসিবেন ১৯২২ খৃষ্টাব্দে—তিনি একথা ভাসাভাসা ভাবেই বলিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা আমি বেদের ন্যায় সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই জন্য গঙ্গাতীরে প্রশস্ত ভূমিখণ্ড সংগ্রহ করারও তিনি আদেশ দিয়াছিলেন। আমার অস্থিরতার সীমা রহিল না। "ষ্ট্যাণ্ডার্ড-বেয়ারার" বাহির করার সঙ্গে সঙ্গেই সব কাজ এক সঙ্গে করার বিপুল প্রাণশক্তি জাগিয়া উঠিল। আত্মার উৎসর্গে শিক্ষা-সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনীতিকে ক্ষেত্ররচনায় তাঁর প্রেরণা আমায় উন্মাদ করিয়াছিল। আমি এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারি নাই। স্থির থাকা যায় না বলিয়াই অস্থির হইতাম—ইহাতে অনেকে আমায় ধৈর্য্যহীন বলিত। ফলে বাহিরে এমন এক বিরুদ্ধ আব্‌হাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহা শ্রীঅরবিন্দকেও সাময়িক ভাবে বিচলিত করিত। আমি যে নিরুপায়, এ কথা সেদিনও তাঁহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারি নাই। তিনি আমার প্রতি স্নেহ-বশতঃ বার বার জানাইলেন, "You are going too fast"—"তুমি অতি দ্রুত চলিতেছ!" কিন্তু আমি যে অসহায়! শ্রীঅরবিন্দই যখন তাহা বুঝেন নাই, আর কাহাকে বুঝাইব? জীবনসঙ্গিনীও শ্রীঅরবিন্দের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেন "তিনি তো ঠিকই বলিতেছেন—একটা সম্পূর্ণ কর, তারপর অন্য কাজ। এমন অস্থির হও কেন?"

আমি বেশ বুঝিতেছিলাম—এইবার লোকে আমায় উন্মাদ বলিবে। আমার মস্তিষ্ক হইতে প্রতি স্নায়ু, রক্ত-বিন্দুটি পর্য্যন্ত এমন এক শক্তির হাতে গিয়া পড়িয়াছে, যাহাতে আমার পক্ষে স্থির থাকা তখন সম্ভব নহে। শুনিয়াছি দীর্ঘ দিন অনিদ্র থাকিলে, মানুষ উন্মাদরোগ-গ্রস্ত হয়; আর উন্মাদ প্রচুর শক্তি প্রকাশ করে। আমারও নিদ্রাত্যাগ হইয়াছিল। দিবারাত্রি শ্রমেও শরীরের ক্লান্তি ছিল না। জীবনের ছন্দঃ তবুও সুনির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার কারণ ঈশ্বরপ্রসাদরূপিণী সহধর্ম্মিণীর সানুরাগ-দৃষ্টি আমার সহায় ছিল। আমি খাওয়া ভুলিতাম, তিনি খাওয়াইতে ছাড়িতেন না। আমার দিবারাত্রি এক হইয়া যাইত; তিনি কাছে ডাকিয়া বিশ্রাম করাইতেন। সারা রাত্রি গৃহময় পায়চারী করিতাম; ইনি স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বিনিদ্র থাকিতেন। চক্ষের অদর্শনে কোথায় হয়তো উপুড় হইয়া চেতনা হারাইব, এই আতঙ্কে অলক্ষ্যে তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিতেন। নিকটে থাকিলে তিনি সুখী হইতেন। দৃষ্টির বাহিরে যাইলে, তিনি হাতে কাজ করিতেন, মন আমার সঙ্গেই ছুটিত। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে, পরে বলিব।

"ষ্ট্যাণ্ডার্ড-বেয়ারার" বাহির করার পর আবার এক নূতন প্রেরণা পাইলাম। আমার কোন প্রেরণাই কল্পনা নয়, কেন না কোনটী নিষ্ফল হয় নাই। ঘটনার পর ঘটনায় এই বিষয়ে আমি নিসংশয় হইয়াছি। এই পথে এক্ষণে আর কোন সুহৃদের বিচার বা ভাল-মন্দ দিগ্‌দর্শন আমায় নিরস্ত করিতে পারে না। ঈশ্বর-কর্ম্ম ভাল-মন্দের হিসাব রাখে না। উহা হইবেই। সুখ, প্রশংসা, ঐশ্বর্য্য অথবা দুঃখ, দৈন্য, শ্রান্তি কর্ম্মভেদে যাহাই ঘটুক, ঈশ্বরের কিছুতে আপত্তি নাই। যাঁহারা বলেন—কর্ম্ম সহজ ও অবলীলাক্রমে সুখের তরঙ্গ তুলিয়া প্রবাহিত হয়, তাঁহাদের সহিত আমি একমত নহি। বরং শরীর ও মনের তৃপ্তিজনক যে কর্ম্ম, তাহা প্রকৃত কর্ম্মই নহে, অকর্ম্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শরীর-মন যাহা চাহে, তাহা অনেক সময়ে ঈশ্বরেচ্ছা নহে—আমার জীবনে এমন কর্ম্ম একটিও ঘটে নাই। শরীর-মনের কৃচ্ছ তা দুঃখ-দৈন্যের কারণ যদি হয়, তাহা চিরদিন উপেক্ষা করিয়াছি। আমার শরীর-মন ইহাতে ধন্যই হইয়াছে। যাঁহার কর্ম্ম, তিনিই শরীর-মন আশ্রয় করিয়া চলেন—এই দুইটীর উপর কোন দিনই তাঁর দরদ নাই; বরং কর্ম্মের তপস্যায় শরীর-মন বিশুদ্ধ ও শক্তিশালীই হইয়া উঠে।

শ্রীঅরবিন্দ আদেশের কথা বলিতেন। তিনি আদেশ

পাইয়াছিলেন—চন্দননগরে যাওয়ার। এই আদেশ অমান্য করার অধিকার তাঁহার শরীর-মন-বুদ্ধির ছিল না। তিনি আবার আদেশ পাইয়াছিলেন—পণ্ডিচারী যাওয়ার। কল্পনা নহে, উহা অনিবার্য্য হইয়া ঘটিয়াছিল। তিনি ইহার জন্য কম দুঃখ পান নাই—সে ইতিহাস আমি জানি। যে কর্ম্ম প্রেয়ঃ, তাহা শরীর-মনের ধর্ম্ম। যাহা শ্রেয়ঃ, তাহাই ঈশ্বর-কর্ম্ম। শরীর-মনের একটা প্রকৃতিগত ধর্ম্ম আছে। উহারা তাই প্রকৃতির অধীনেই প্রেয়ের বশবর্ত্তী হয়। কিন্তু তাহাতে উহারা রক্ষা পায় না, তবুও ঈশ্বরের হাতে নিজেদের ছাড়িতে চাহে না। ইহাই জীবত্বের বদ্ধ সংস্কার।

প্রেরণাও এক প্রকার আদেশেরই নামান্তর। অনেকে আদেশ পান—বাণীমূর্ত্তির। আমি অপ্রাকৃত বাণী শুনি নাই, কিন্তু মস্তিষ্কযন্ত্র হইতে হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত এক প্রকার অনুভূতির সাড়া পাই। সেই সাড়ার অর্থ বোধ করে আমার বুদ্ধিবৃত্তি। ব্যবহারিক জীবনক্ষেত্রে সব সময়ে ভাল আদেশই যে আসে, তাহা নহে; যাহা অবধারিত হইবে, তাহাই অনুভূত হয়। অনেক দুর্ঘটনার খবর আমি এই ভাবেই পাইয়াছি। আত্মসমর্পণযোগীর জীবনে এমন কাজ হয় না, যাহা প্রেরণামূলক নহে। এইবার পণ্ডিচারী হইতে ফিরিয়া এই দিকটা অতিশয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক দুর্গম পথেও এই প্রেরণা-বশেই চলিয়াছি। পূর্ব্বেও এইরূপ হইত; কিন্তু তাহা আমার অজ্ঞাত ক্ষেত্র হইতে আমায় পরিচালিত করিত। এই সময় হইতে স্বেচ্ছায়, শরীর-প্রাণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, অন্তর-প্রেরণার সঙ্কেতে নির্ব্বিচারে সকল কর্ম্মই করিয়া চলিতাম। কর্ম্মসঙ্কেতের সহিত বস্তুতন্ত্র ঘটনাও আবির্ভূত হইত; কখনও বা ঘটনা পূর্ব্বে উপস্থিত হইত; কখনও বা কোন এক সিদ্ধান্তের সঙ্কেত পূর্ব্বে পাইতাম, ঘটনা পরে আসিত।

"ষ্ট্যাণ্ডার্ড-বেয়ারার" বাহির হওয়ার পর এমনই এক সামাজিক ঘটনার সম্মুখে আমায় উপস্থিত হইতে হইল। সঙ্কেতের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম; শ্রীঅরবিন্দকে তাহা জানাইলাম।

আমাকে ঘিরিয়া অতর্কিতে যে সংহতি-চক্র গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা কি মূর্ত্তি ধরিবে, সে বিষয়ে আমার কোন কল্পনাই ছিল না। একে একে সঙ্ঘের মানুষ যারা, তারা একই অন্নক্ষেত্র সৃজন করিয়া একটী দিব্য পরিবার গড়িয়া তুলিতেছিল। গভর্ণমেণ্টের কড়া শাসনে কাঠের কারবারটীতে যেদিন আমাদের অনেকেরই চন্দননগর হইতে বাহির হওয়ার অসুবিধায় ব্যবসাপরিচালন অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল, সেদিন সঙ্ঘের অন্যতম কর্ম্মী শ্রীমান্ খগেন্দ্রনাথ বসুর হস্তে এই কর্ম্মভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম।

পৃথিবীতে কাম ও কাঞ্চনের আসক্তি দিব্য জীবনের পথে ঘোরতর অন্তরায় বলিয়া দক্ষিণেশ্বরে মহাবাণী ঘোষিত হয়। ধর্ম্মপ্রাণ জাগ্রত করার আকাঙ্খায় দক্ষিণেশ্বরের ধূলি স্পর্শ করিয়া জীবন আমার সেই বাণীমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। তারপর নানা সাধনার আবর্ত্তে শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে জীবনবাদী হইয়া "প্রবর্ত্তকে" নূতন মন্ত্র প্রচার করিতেছিলাম। ধর্ম্মের লক্ষ্য লয় নয়, মোক্ষ নয়; পরন্তু দিব্য-জীবন। কাম-কাঞ্চন তাই ত্যাগের বস্তু না হইয়া শোধনের হেতু হইল। আসক্তিই বন্ধন। অনাসক্ত নিষ্কাম কর্ম্মে নিজেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, বন্ধুদেরও এই পথেই লইয়া চলিতেছিলাম। স্বীয় পত্নীর প্রতি আসক্তিত্যাগের আকাঙ্ক্ষায় সম্ভোগপ্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু সতীহারা হইতে পারি নাই। অর্থ-সম্পদ্ লইয়া ব্যবসাবাণিজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম, অর্থের প্রতি আসক্তি ও অর্থভোগের ইচ্ছায় নয়, অর্থের শোধনই ছিল আমার লক্ষ্য। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে কাম ও কাঞ্চনের প্রতি আসক্তিবর্জ্জনের কথাই আলোচিত হইত, কাম-কাঞ্চন-বর্জ্জনের প্রসঙ্গ উঠিত না—কামের শোধনে দিব্য মাতৃত্ব, কাঞ্চনের শোধনে পুরুষের ঐশ্বর্য্য জীবনে নামিবে, এই ছিল তপস্যার লক্ষ্য। এই আদর্শে আমি নিজের স্ত্রীকেই শুধু ব্রহ্মচর্য্যসাধনায় দীক্ষা দিই নাই, এই সময়ে যে সকল কুলমহিলা আমার প্রতি অনুরাগিনী হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরও এই তপস্যার মধ্য দিয়া আত্মশোধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এই পথে মেজ-বৌ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। দীর্ঘ আট বৎসর এই সাধনায় জীবন অবহিত করিয়া, তিনি পরলোক গমন করেন।

এইরূপ দার্শনিক মনোবৃত্তি আমার সহতীর্থ বন্ধুদের নূতন চরিত্রগঠনের সহায় হইয়াছিল। শ্রীমান্ খগেন্দ্রনাথ

সর্ব্বপ্রথমে ধনসম্পদ্ হাতে পাইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনে রমণীসঙ্গস্পৃহাও জাগিয়া উঠিল। কাম ও কাঞ্চন যখন ত্যাগের বস্তু নহে, শোধনের, তখন সে ভরসা করিয়া আমার এক পরিচিতা ভগ্নীস্থানীয়ার কুমারী কন্যার পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইল।

দার্শনিকতার সীমা পৃথিবী ছাড়াইয়া গগনচুম্বী হইলেও আপত্তির কারণ হয় না; কিন্তু উহা যখন প্রকরণ-ছন্দে অভিব্যক্ত হইতে চাহে, পরিবেষ্টনীর মধ্যে তখনই বেশ একটু অস্বস্তি ও গোলযোগের আভাস পরিলক্ষিত হয়। খগেন্দ্রনাথের এই প্রস্তাব সঙ্ঘের মানুষদের মধ্যে প্রতিবাদের সাড়া তুলিল। নব সমাজগঠনের সাঙ্কেতিক প্রেরণা অনুভূত হইতেছিল; কিন্তু পারিপার্শ্বিকতার বিপরীত প্রভাব অতিক্রম করার পথ পাইতেছিলাম না। এই প্রসঙ্গ লইয়া সঙ্ঘে আন্দোলন আলোচনার ঝড় উঠিল। গৃহদেবীর অভিমত জানিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন "ভাবনার বিষয় কি আছে? ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত যখন কিছু হয় না, তখন এ বিষয়েও তুমি নিশ্চিন্ত হও, তবে—"

"তবে কি?" তাঁহার মুখপানে উত্তরের প্রতীক্ষায় চাহিলাম।

তিনি বলিলেন "তোমার মত সবাই সাধু নয়। নারী-পুরুষ দু'জনেরই যৌবন; তোমার এই সৃষ্টির মধ্যে উহাদের স্থান হবে কি?"

এই দিক্‌টা তলাইয়া বুঝি নাই। একবার মনে হইল—বিবাহের পর খগেন্দ্রনাথ স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে অথবা অন্যত্র থাকিবে; অতএব আপত্তির কি আছে? কিন্তু অন্তর সায় দিল না। কাম-কাঞ্চনের টানে যদি কেহ ভাসিয়া যায়, তবে তাহারা একদিন স্বজন, স্বগৃহ ছাড়িয়া আমার নিকট আসিল কেন? এ সমস্যার সমাধান হইল খগেন্দ্রের কথায়। সে বলিল "সম্ভোগলালসায় আমার পরিণয় নহে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে অধ্যাত্ম-সম্বন্ধস্থাপনই এই পরিণয়ের লক্ষ্য।"

জীবনের তিনটী সম্পদ্ স্বীকার করিয়াছি—ধৈর্য্য, বিশ্বাস ও সাহস। হিমালয়ের মত বাধায় তাই কোনদিন ধৈর্য্যহীন হই নাই। প্রতিপদে মৃত্যুর করাল আক্রমণ অমানুষিক নির্য্যাতনের রুদ্রমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়াও সাহস হারাই নাই; আর ঈশ্বরবিশ্বাসের অগ্নিশিখা বুকে জ্বালাইয়া নিজের উপর যেমন দৃঢ় প্রত্যয়, তেমনি আপনার বলিয়া যাহাদের দেখি, তাহাদের প্রতিও বিশ্বাস রক্ষা করি প্রাণ-পণে। খগেন্দ্রের কথায়ও বিশ্বাস করিলাম—শ্রীঅরবিন্দকেও সকল কথাই জানাইলাম। উত্তরে তাঁর কয়েক ছত্র লেখা উদ্ধৃত করিতেছি। আমার এই নব সমাজসংগঠনের নব পর্ব্ব কিরূপে সুরু হইল, তাহার পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। আর গৃহদেবীর তপোমূর্ত্তি এই নিরতিশয় কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যায় কতখানি সহায় হইয়াছিল, তাহাও আমার চিরস্মৃতি হইয়া থাকিবে।

শ্রীঅরবিন্দ জানাইলেন "What you say about the commune and the married couple is quite right as our ideal or rather as one side of our ideal, but there is here a question of time and tactics."

অর্থাৎ "সঙ্ঘ সম্বন্ধে ও নব দম্পতি সম্বন্ধে আমাদের আদর্শ অথবা আমাদের আদর্শের একাঙ্গ হিসাবে উহা ঠিকই, কিন্তু একটী প্রশ্ন এখানে উঠিবে—সময় ও কৌশলের দিক্ দিয়া।" ইহার পর তিনি আরও বলিয়াছিলেন "বিশেষতঃ আমাদের কাজ এখনও আরম্ভ মাত্র, অভিজ্ঞতা-অর্জ্জনেরই অবস্থা। শুধুই অধ্যাত্মতপস্যা নহে, আমাদের সাবধানতা ও সুব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রশ্ন—ইহার কি প্রয়োজনীয়তা অথবা বুদ্ধিমত্তার দিক্ দিয়া ইহা কতখানি পরামর্শসিদ্ধ, তাহাই বিবেচ্য। কেননা আমাদের এই অবস্থায় সমাজের মধ্যে এইরূপ সংগ্রাম—একপক্ষে ইহা প্রাণ-সম্বন্ধীয় হইলেও, অন্যদিকে কিন্তু আমাদের নিকট ইহা অপ্রধান।" তিনি এইরূপ কার্য্যে দুইটী স্তরের উল্লেখ করিয়াছিলেন; "Our first business is to establish our communal system on a firm spiritual, secondly on a firm commercial foundation and to spread it wide; but the complete social change can only come, as the result of the other two. It must come first in spirit, after-wards in form."

অর্থাৎ "প্রথম আমাদের সঙ্ঘবিধান দৃঢ় অধ্যাত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, তারপর অর্থনীতির ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইবে এবং ইহার বিশাল ব্যাপ্তি আনিতে

হইবে। সমাজের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঐ দুইটির ফলস্বরূপ আসিবে। প্রথম ভাব, তারপর আকৃতি।" এই সম্বন্ধে তাঁর বিস্তৃত পত্র উদ্ধৃত করিলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে। তাঁর অভিমত—সমাজজীবনগঠনের প্রচেষ্টা সফল হইলে, ইহা যেন স্বতন্ত্র হইয়া না পড়ে—সঙ্ঘের অঙ্গ হিসাবেই যেন

এই বিবাহ অসবর্ণ নহে বলিয়া শ্রীঅরবিন্দ কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। তিনি এক প্রকার এই কর্ম্মে উপস্থিত বিরত থাকিতেই আমায় বলিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজ অথবা দয়ানন্দের পথে আমি যাহাতে না চলি, তাহার জন্য তিনি সতর্কও করিয়াছিলেন। এইরূপ কর্ম্মে সঙ্ঘের গতি অকারণ বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে, এ আশঙ্কাও তাঁর ছিল। তিনি এই সম্বন্ধে তাঁর যে দীর্ঘ অভিমত দিয়াছিলেন, তাহা হইতে আমি বুঝিয়াছিলাম—সঙ্ঘ-সৃজনের সূচনাপর্ব্বেই যদি এইরূপ অভিনব পরিণয়প্রথার প্রবর্ত্তন করি, তাহা হইলে আমাকে যে বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহাতে আমাদের কর্ম্ম পিছাইয়া পড়িবে। এইজন্য তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন "I should myself prefer to have it after I reached the proper stage in my yoga and after I return to Bengal." অর্থাৎ "আমার যোগের যোগ্য ক্ষেত্রে পৌঁছিলে এবং বাংলায় আমার প্রত্যাবর্ত্তন হইলে, ইহা হওয়া আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।"

তাঁহার পত্র পাইলাম ২রা সেপ্টেম্বর ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। নবসমাজপ্রতিষ্ঠার মূলতত্ত্বসম্বন্ধীয় এই দীর্ঘ পত্রখানি আমি জপমালা করিয়া রাখিলাম। তাই ঘটনার দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়াই অন্যান্য কার্য্যে মনোযোগী হইলাম।

"ষ্ট্যাণ্ডার্ড-বেয়ারার" লইয়াও ক্রমে বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। শ্রীঅরবিন্দ এই সময় হইতেই আমার কর্ম্মের তাল খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। বারীনদাও কেমন একটু বিরক্ত হইতেছিলেন। তিনি লিখিলেন "আমি ভগবানের প্রেরণায় কীট, বুঝি তোমার আনন্দের সাথী হইতে পারিলাম না।" বেশ অনুভব করিতেছিলাম, আমি যেমন আমারও নহি, কাহারও হইতে পারিতেছি না। গৃহদেবীও আমায় যেন সামলাইতে পারেন না। এক প্রকার ক্ষিপ্তের ন্যায় যখন যাহা মাথায় আসে, তখনই তাহা করি, নিরঙ্কুশ মাতঙ্গের ন্যায় ছুটিয়া চলি। সুপথ-কুপথ কিছুই জ্ঞান নাই। এই সঙ্গে আবার একখানা সাপ্তাহিক 'নবসঙ্ঘ' বাহির করিলাম। একদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য, সংবাদপত্র; অন্যদিকে শ্রীঅরবিন্দের সতর্কবাণী, বারীনদার কর্ম্মস্রোতের সহিত এক হইতেও পারি না; একটা বিশৃঙ্খল কর্ম্মের আবর্ত্তে লাট খাইতে লাগিলাম। পূজা আসিল। প্রতি বৎসরের ন্যায় পণ্ডিচারী হইতে অমৃতেরও পত্র পাইলাম। বারীনদাও স্নেহ করিয়া লিখিলেন, "দাদা, মীরার জন্য কাপড় পাঠিও, বেচারীর বড় কষ্ট, সে আর দেশী পোষাক ছাড়া কিছু পরে না ·····। ভাল দেশী ও ভাল পাড়ের দামী কাপড় পাঠান ভাল। সে আমাদের যে জিনিষ, সাজাতে ইচ্ছা করে।"

বারীনদার পত্রের শেষে আরও যে দুই একটা ছত্র ছিল, তাহা আনন্দের সহিত যন্ত্রণাই সৃজন করিল। তিনি লিখিয়াছিলেন "আমার সব ওলটপালট হয়ে গেল। কত দূরে ঘাট কিছু জানি নে; বোধ হয় না জানাই এ ঘাটের পরম জানা। তোমার সৃষ্টির মুখ চেয়ে অরো বসে' আছে, দেখো দাদা, সৃষ্টি যেন নিখুঁৎ হয়। তোমার উপর প্রকাণ্ড ভার।"

অগ্নিপ্রেরণায় আমি অস্থির উন্মাদ, শ্রীঅরবিন্দের আকৃতির অনুভূতি, বারীনদাকে আপনার করারও বড় সাধ; আর চন্দননগরে তরুণমণ্ডলীর মধ্যে যোগের বীজ-বপন; তার উপর অর্থসৃষ্টির চিন্তা। সৃজনের সহস্রধারা মাথা পাতিয়া ধরার দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা—সে অবস্থা অনুমেয়।

নলিনী, সুরেশ, সৌরীন প্রভৃতি পরিহাস করিয়া কত অশ্লীল ছবি আঁকিয়া আমায় বুঝাইত—"শীঘ্রই বস্ত্র পাঠাইতে হইবে, নতুবা অবস্থার নিদর্শন পত্রেই বুঝিয়া লইবেন।" এত আপনার জন আত্মীয়স্বজন হয় নাই। পূজার কাপড় যথারীতি পাঠাইলাম। ফরাসডাঙ্গার লালবাগানের ধুতি-চাদর শ্রীঅরবিন্দের জন্য বরাদ্দ ছিল। মীরাদেবীকেও লালবাগানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাড়ী পাঠাইলাম—আমার স্ত্রীই ইহা পছন্দ করিয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে বৎসর শেষ হইয়া আসিল। অন্তরে কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় শান্তি পাইতেছিলাম না। আত্মসমর্পণ-মন্ত্র সিদ্ধ হওয়ার পথে কেবলই দেখিয়া চলিতাম—

আত্মপূর্ত্তি অথবা আত্মদানের পথ প্রশস্ত হইতেছে? অন্তর-দৃষ্টি চিরদিন সুনির্ম্মল ছিল। বুদ্ধির দুয়ার মুক্ত হওয়ায় জ্ঞানঘন শুভ্র জ্যোতিঃ মাথার উপর ঘনাইয়া উঠিত। বৈরাগ্যের তিলকই ললাটে ফুটিয়া উঠিত। কে যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া আমায় নূতন দেশে লইয়া যাইতে চাহিত। আত্মসমর্পণের সূত্র ধরিয়া ধর্ম্মসাধনার নানা প্রকরণ আমার মনে নূতন ভাবনার সৃজন করিত, সঙ্গে সঙ্গে মহালক্ষ্মীর চরণনূপুর শুনিয়া চমকিয়া দেখিতাম—গৃহপ্রাঙ্গণে শতদল-শোভা বিস্তার করিয়া গৃহলক্ষ্মী ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

ঠিক এই সময়ে পরলোকগত দেশপ্রেমিক কুমার কৃষ্ণ মিত্রের রিখিয়ায় নিমন্ত্রণ পাইলাম। কর্ম্মচক্র হইতে দূরে অনাবর্ত্ত জীবনক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সুবিশাল তীর্থরচনার জন্য গৃহদেবীকে লইয়া কয়েক দিন প্রবাসে থাকাই শ্রেয়ঃ করিলাম। কিন্তু ভাগ্যদেবী চির দিন যেমন প্রসন্ন, এক্ষেত্রেও তাহার ব্যত্যয় হইল না। বিশ্রামের আশা দুরাশা হইল। বুঝিলাম—কর্ম্মময় জীবন যার অমোঘ বিধান, তাহা এক দিনও রুদ্ধ থাকিবে কেন? রিখিয়ায় গিয়াই সংবাদ পাইলাম—মিষ্টার পল রিশার পণ্ডিচারী হইতে চন্দননগরে আসিয়াছেন, শীঘ্র আসুন। পত্নী যার ছায়া, কায়ার অনুগমনে তাহার বাধে না; যেমন হাসি-মুখে তিনি আসিয়াছিলেন রিখিয়ায়, তেমনি হাসি-মুখেই ফিরিলেন স্বধামে।

(ক্রমশঃ)

---

# অবসাদ

ডাঃ শুভদর্শন দত্ত

অবসাদ, তোর আয়েস নিয়ে
যাস্ নে যেন কাজের কাছে,
কর্ম্মনাশা মরণ-কাটি
তোর পরাণে লুকিয়ে আছে।

ঢুলবে যখন নয়ন দুটী
কাজের শেষে সুপ্তিমাখা
চোখের কাল কাজল হয়ে,
দিন দু'একের বাসা নিয়ো।

প্রয়াস যখন সিদ্ধি নিয়ে,
উজল হয়ে দিবে দেখা,
হাসির মাঝে প্রীতি হয়ে,
এগিয়ে তুমি তখন যেয়ো।

আপন ছোট মাথা তুলে'
উঠ্‌বে যখন ছোট চারা,
আশা যখন মারবে উঁকি
চারিধারের বৈরী মাঝে।

প্রাণের যত শক্তি নিয়ে
তুই যদি তায় দিস্‌রে তাড়া,
জোরের এত ধাক্কা খেয়ে
কেমন করে' সাধন বাঁচে!
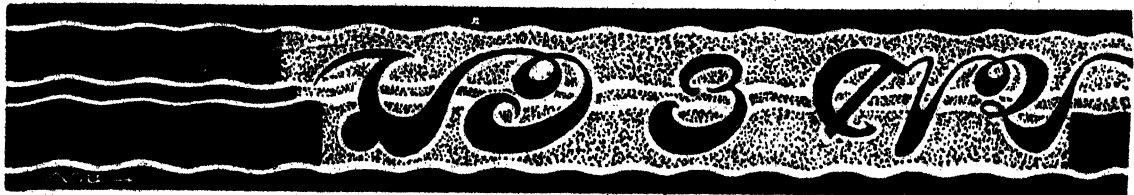
## সুভাষচন্দ্রের অন্তর্দ্ধান

২৭শে জানুয়ারীর প্রভাতে দেশবাসী সবিস্ময়ে শুনিল—বাংলার অগ্রগামী রাষ্ট্রনেতা গৃহে নাই, কোথায় তিনি গিয়াছেন কেহই জানে না, কোথাও তাঁর খোঁজও পাওয়া যাইতেছে না। এই আকস্মিক ঘটনায় সকলেই স্তম্ভিত, মর্ম্মাহত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ হইতে মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তে তারযোগে উদ্বেগ ও সহানুভূতিপূর্ণ প্রশ্নবার্ত্তার চলাচলে সকলেই উপলব্ধি করিল—সমগ্র ভারতের হৃদয়ে এই বাঙালী রাষ্ট্রবীর কতখানি প্রীতি ও দরদের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। যেরূপ নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে এই অন্তর্দ্ধান-ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বসাধারণের চিত্তে ঘটনার কারণ ও পরিণাম লইয়া নানা ধরণের নানা চিন্তারই যে উদয় হইবে, ইহা অনিবার্য্য। তবে এই সব চিন্তাই যে আনুমানিক জল্পনা-কল্পনা মাত্র, তাহা না বলিলেও চলে।

রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে যে কারণেই হউক, সুভাষচন্দ্র যখন আত্মগোপন করিয়াছেন, তাহাতে বাঙালীর রাষ্ট্রসাধনার মেরুদণ্ড যে লোকমান্য তিলক বা মহাত্মা গান্ধীজির মত ততখানি শক্ত ও নির্ভরযোগ্য নহে, এরূপ মনে হইলে বাঙালী ছাড়া অন্য প্রদেশবাসীর পক্ষে তাহা খুব দোষাবহ বলা যাইবে না। একদিন শ্রীঅরবিন্দও এমনি রাষ্ট্রপ্রধান কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অকস্মাৎ সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—বৃহত্তর ভূমারই আকর্ষণে, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু তত্রাপি তাহাতে বাঙালীর রাষ্ট্রীয় ধাতুর উপর আস্থাহানি যে সম্ভব হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। সুভাষচন্দ্রও হয় এমনই ভূমা ও অনন্তের আহ্বানে—তাঁহারই কথায় "হিমালয়ের চিরন্তন ডাকে" সাড়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন—না হয় গভর্ণমেণ্ট ও স্বদেশবাসীর চক্ষে ধূলি দিয়া তিনি কোনও নিগূঢ় রাষ্ট্রীয় কারণেই সহসা দূরে বা নিকটে গোপনচারী হইয়া অজ্ঞাতবাস বরণ করিয়াছেন। সঠিক খবর না পাওয়া পর্য্যন্ত—তিনি বাঙালী জাতিরই প্রতিনিধিস্বরূপ একজন খ্যাতনামা প্রধান বাঙালী বলিয়া, ইহাতে অবাঙালী ধুরন্ধর রাষ্ট্রসাধকদের তুলনায় বাঙালীর রাষ্ট্রীয় চরিত্রের সঙ্গতিশীলতা ও ধারাবাহিকতার কথঞ্চিৎ অপলাপ রটিবে, আমাদের এ আশঙ্কা দূর হইতেছে না।

সুভাষচন্দ্র যেভাবে যেখানেই থাকুন, শ্রীভগবান এই কর্ম্মবীর ও দেশমাতৃকার সুসন্তানকে সুস্থ ও নিরাপদ্ রাখুন—আমরা এই প্রার্থনাই সর্ব্বান্তঃকরণে করিতেছি।

## ডাঃ সাহার উক্তি

চুঁচুড়ায় শিক্ষাসপ্তাহ উপলক্ষে এক জনসভায় স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা বক্তৃতায় বলেন—"পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাওয়ার আন্দোলন খারাপ এবং খাদি আন্দোলন ততোধিক খারাপ।" অবশ্য আমরা কথাটা যেরূপ শুনিয়াছি, সেইরূপই লিখিলাম। ডাঃ সাহা এই কথা সত্যই বলিয়া থাকিলে, তাহাতে দেশবাসী অনেকেই ক্ষুণ্ণ হইবেন, ইহাই আমাদের ধারণা। ডাঃ সাহা খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক এবং তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা যেমন আমাদের আদর ও গৌরবের সামগ্রী, তেমনি তাঁহার নানাবিষয়ক মতামতগুলিও শ্রদ্ধা ও অভিনিবেশের সহিত প্রণিধানযোগ্য বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা জানি—যুগের সাধনায় বিজ্ঞানের সহায়তা ও আশ্রয় আমাদের লইতেই হইবে—ইহার অভাবে আমরা তথাকথিত সভ্যজাতির প্রতিযোগিতায় শুধু বিপন্ন নয়, জীবনসংগ্রামে সম্পূর্ণ হারিয়া যাইব। ডাঃ সাহা তাই কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এ দেশ ও জাতিকে যুগোচিত বৈজ্ঞানিক শক্তি ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। তাঁহার এই আহ্বান আমরা দৃঢ়কণ্ঠেই সমর্থন করি। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বিশ্বাস করি যে, ভারতের ন্যায় বিপুলায়তন ও জনবহুল দেশে শুধুই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্প ও তাহার পীঠভূমি নাগরিক পরিস্থিতি বরণ করা শুভজনক হইবে না। জাপান

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্পের একনিষ্ঠ পূজারী, এমন কি ইহাতে পাশ্চাত্য সকল সভ্যজাতির সমকক্ষ হইয়াও, প্রাচ্যের স্বভাব-সিদ্ধ উটজ শ্রমশিল্পগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে নাই। সেখানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্প ও কুটীরশিল্প পরস্পর প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হয় নাই, পরন্তু পরস্পর পূরণই করিয়াছে। যাহা জাপানে সম্ভবপর ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহা ভারতে কেন অসম্ভব ও বর্জ্জনীয় হইবে, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। বরঞ্চ আমাদের সকল দিক্ চিন্তা করিয়া ইহাই ধারণা হয় যে, এদেশে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সহিত কুটীরজাত শ্রমশিল্পের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যবিধান আরও অধিক প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয়।

এই সব কারণে আমরা ডাঃ সাহার ন্যায় একজন দায়িত্বশীল মনীষী ও চিন্তানেতার মুখে পূর্ব্বোক্ত পল্লীজীবন ও খাদি-শিল্পের সরাসরি প্রতিবাদ ও নিন্দোক্তি সম্পূর্ণ সমীচিন ও সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না।

## মাধ্যমিক শিক্ষাবিল

মাধ্যমিক শিক্ষাবিল যতদিন বিভীষিকার মত বাঙালীর মাথায় ঝুলিবে, ততদিন এই বহু-সমালোচিত ও তিক্তায়িত প্রসঙ্গ লইয়া চিন্তা ও কথারও শেষ হইবে না। সম্প্রতি এই সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কমিটীর রিপোর্ট উক্ত সিণ্ডিকেটের সভায় বিতর্কের পর বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, মাধ্যমিক শিক্ষাবিল সব দিক্ দিয়া অনিষ্টজনক এবং উহার প্রত্যাহার করাই উচিত। ইতিপূর্ব্বে বাংলার শিক্ষিত জনসাধারণ ও প্রতিনিধিস্থানীয় মনীষিগণ তীব্র ও গভীর কণ্ঠে গভর্ণমেণ্টের এই সঙ্কীর্ণতাদুষ্ট শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট-সভাও প্রায় অখণ্ড কণ্ঠে তাঁহাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত জানাইলেন। মাধ্যমিক বিলটীর প্রবর্ত্তনে মন্ত্রিসভার উদ্দেশ্য যাহাই হউক—তাহা যদি আরোপিত সাম্প্রদায়িকতাভাবে দূষিত না হইয়া সত্যই কোনও মহত্তর উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিতও হয়, তত্রাপি দেশবাসীর সুশিক্ষিত মত যে ইহার অনুকূলে নহে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। মন্ত্রিমণ্ডলী কি তবুও যান্ত্রিক ভোটাধিক্যের জোরে এই সকল মতামত পদবিদলিত করিয়া, উক্ত বিলটী দেশবাসীর স্কন্ধে চাপাইবার জিদ্ রক্ষা করিতে চাহিবেন? ইচ্ছার বিরুদ্ধে অতি উপাদেয় বস্তুও গলাধঃকরণ করাইতে চাহিলে তাহা তিক্ততম হইয়া উঠে—বাংলার মন্ত্রিমণ্ডল কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটেরও গলায় পা দিয়া তাঁহাদের পরিকল্পিত ঔষধ সেবন করাইবেন? এতখানি জবরদস্তি না করিলেই শুভ বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইবে।

## লোক-গণনা

লোক-গণনা আসন্ন। এবার এ সম্বন্ধে হিন্দু বাঙালী তথা হিন্দু ভারতের চিন্তানায়ক ও প্রতিনিধিগণ যেরূপ সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে আশা করা যায় যে, হিন্দুর সংখ্যাগণনায় ভুল বা যথেচ্ছচারিতা সহজে প্রশ্রয় পাইবে না। আমরা এই ব্যাপারে হিন্দু মিশন ও বিশেষভাবে হিন্দু মহাসভার প্রচেষ্টা ও অবলম্বিত কার্য্যপদ্ধতি সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছি। হিন্দু যাহাতে হিন্দু বলিয়াই নাম লিখায়, উপজাতীয়, প্রেতপূজক ও অস্পৃশ্য নামে অভিহিত যাহারা, তাহাদের কেহ যাহাতে অহিন্দু বলিয়া ভুলক্রমে গণ্য না হয়—এই দিকে তাঁহারা যে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের প্রচারিত ইস্তাহারগুলি হইতে স্পষ্টভাবেই জানা যায়। এই সঙ্গে আমাদের অনুরোধ, হিন্দুগণকে যেন শুধু হিন্দু বলিয়া নাম লিখিতে দেওয়া হয়, কোনও বর্ণ বা উপজাতি বলিয়া নাম উল্লেখ করিতে বাধ্য করা না হয়—যেমন মুসলমান বা খৃষ্টান শুধু মুসলমান বা খৃষ্টান বলিয়াই নাম উল্লেখ করিবে—তদন্তর্গত কোনও উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া নাম লিখাইতে তাহাদের উপর দাবী করা হইবে না—এই ভাবেই গভর্ণমেণ্টের গণনা-লিপির ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেন না, গণনা-লিপিতে যদি বর্ণ বা উপজাতির সংজ্ঞা দেওয়া থাকে, গণকগণ তাহা পূর্ণ করিবার জন্য উক্ত উপশ্রেণীর উল্লেখও করাইয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন এবং তাহা না করিলে, সেই নাম গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে না। এইরূপ হইলে, হিন্দুদের মধ্যে ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় দিয়া গূঢ়ভাবে হিন্দুসমাজের ক্ষতি করা

হইবে। বিশেষভাবে, বাংলার রাষ্ট্রনীতির উপর এই বিভেদযুক্ত হিন্দু-সংখ্যা-গণনার প্রভাব ভবিষ্যতে শুভাবহ হইবে না। আমরা হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দকে দূরদৃষ্টিযোগে এই ব্যবস্থার পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন ও এ বিষয়ে যোগ্যভাবে প্রতিকারোদ্যত হইতে সোদ্বেগে নিবেদন জানাইতেছি। নিখিল বঙ্গ প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের গত সপ্তম বার্ষিক সম্মেলনে এই মর্ম্মেই একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আমরা সেই প্রস্তাবটী সময়োচিত বলিয়াই তৎপ্রতি হিন্দু সমাজ ও জননায়কগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

### বিক্রয়-কর

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষৎ পর পর যে বিলগুলি প্রসব করিয়া চলিয়াছে, তাহা লইয়া নিরীহ হিন্দু-মুসলমান দেশবাসী কি যে করিবে, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। এরূপ আর একটী সুপ্রসব বিক্রয়-কর বিল। সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুই কোটী টাকা আদায়ের বরাদ্দ দেখাইয়া বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের অর্থসচিব মহাশয় ইহার উত্থাপন করেন এবং উত্থাপন করা মাত্র শুধু কংগ্রেস পক্ষ নহে, স্বতন্ত্র দল, কৃষক প্রজা-দল, এমন কি ইউরোপীয়ান দল হইতেও সমকণ্ঠে তীব্র আপত্তি ও প্রতিবাদের ধ্বনি উঠে। যে সময়ে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধের অজুহাতে খাম, টেলিগ্রাম ও অন্যান্য ডাকমাশুলের হারবৃদ্ধি করিয়াছেন এবং আরও নানাপ্রকারে করভার বৃদ্ধি পাওয়ার নিরন্তর আশঙ্কা জাগিতেছে, সে সময়ে বাংলা গভর্ণমেণ্ট এই নূতন কর স্থাপন করিয়া দরিদ্র জাতির নিকট হইতে দুই কোটী টাকা ছিনাইয়া লইতে কেন এমন আগ্রহান্বিত হইলেন, তাহা কোনও অর্থনীতিকই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। অর্থশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বাংলার ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার মিঃ সুরাবর্দ্দীর যুক্তি নাকচ করিয়া স্পষ্ট করিয়াই দেখাইয়াছেন—এই বিক্রয়-করের ফলে শুধু দরিদ্র জনসাধারণই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না, কলিকাতার বহু ব্যবসায় বাংলার বাহিরে চলিয়া যাইবে। আইনের ফাঁকি আশ্রয় করিয়াই এই সকল ব্যবসায় বৃটিশ রাজ্যের এলাকার বাহিরে যাইবে। ইহাতে স্থানীয় ব্যবসায়ের বিপর্য্যয় ঘটিবে। তাহা ছাড়া, শুল্কবৃদ্ধিতে পণ্যদ্রব্যের কাটতি কমিবে, ইহাতেও ব্যবসায়িগণের ক্ষতি হইবে। সর্ব্বোপরি, শ্রীযুক্ত সরকার দেখাইয়াছেন—বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান অবস্থায় এই অতিরিক্ত কর চাপাইবার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং এরূপ ক্ষেত্রে সেই অতিরিক্ত অর্থের যে সদ্ব্যয় হইবে, ইহাও আশা করা যায় না। পরিষদের ইউরোপীয়ান সদস্য মিঃ সেম্সনের বক্তৃতাতেও সরকারের এই যুক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। মিঃ সুরাবর্দ্দী তাঁহার সে কথার কোনই সদুত্তর দেন নাই। বাংলার জনসাধারণ বঙ্গীয় মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য অপপ্রসবগুলির ন্যায় এই বিক্রয়-কর বিলটীরও গুরুতর প্রতিবাদ জানাইতেছেন। কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডল সে কথায় কর্ণপাত করিবেন, এমন কোন লক্ষণই এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

## গান

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

এখনও আসেনি বন্ধু আমার শূন্য কুটীর দ্বারে,
এখনও বাঁধিনি বেদন রাগিণী হৃদয়-বীণার তারে
এমন গোধূলি ক্ষণে
বিজন কুঞ্জ বনে
এখনও ফোটেনি রজনীগন্ধা
মধুর গন্ধ-ভারে।

রাতের আকাশে যখন হাসিবে উজল তারা
গানে গানে মোর ঝরিবে তখন নয়ন-ধারা।
তখন বাহুর পাশে
রহিব সুরভি শ্বাসে
রচিব দু'জনে সোনার স্বপন
মিলন সিন্ধুপারে।

# সাময়িকী

### প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

বিগত ২০শে জানুয়ারী অপরাহ্ণে প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চন্দননগর-শাখার উদ্বোধন-কার্য্য চন্দননগরের মাননীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর্ মঁসিয়ে জ্যাক্ মাসুতিয়ে কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মিঃ বি, এন, নন্দীর প্রাসাদোপম অট্টালিকাসংলগ্ন মনোরম গোলাপ-বাগিচার অভ্যন্তরে সুসজ্জিত মণ্ডপতলে যে অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে বঙ্গীয় শিল্পবিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র মহোদয় পৌরোহিত্য করেন। বৈদিক প্রশস্তি ও বন্দেমাতরম সঙ্গীত সমগ্র আব্‌হাওয়াকে পূতপবিত্র করিয়া তুলে। প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের গোড়ার কথা, জাতীয় জীবনে অর্থপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে ছোট ছোট ব্যাঙ্কের স্থান এবং চন্দননগরে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের ও স্থানীয় উন্নতির প্রচুর সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ফরাসী আইনানুযায়ী চন্দননগরে এতদিন কোন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে পারে নাই। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর মঁসিয়ে বার মহোদয় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ তথা প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের আদর্শ ও কর্ম্মধারায় প্রীত হইয়া প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠার এইরূপ সুপারিশ করিয়া যান: "Prabartak Bank Ltd. is a very sound banking organisation, founded in 1929. The names of the personalities composing the Directorate are a guarantee of a good gesture and the Prabartak Bank Ltd. has a perfect reputation in Calcutta. The population of Chandernagore will be much benefited, if a branch of this bank is established here." শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের আদর্শ সম্বন্ধে বলেন যে, ইহা ধনিকের মনোবৃত্তি লইয়া গঠিত নহে, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের জাতিগঠনসাধনারই ইহা অন্যতম অঙ্গ।

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের চন্দননগর শাখার উদ্বোধন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভার দৃশ্য। সভাপতি মিঃ মিত্র বক্তৃতা করিতেছেন

অতঃপর সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা পূজনীয় শ্রীমতিলাল রায় এই নব প্রতিষ্ঠানকে আশীর্ব্বাদ প্রসঙ্গে বলেন, "ভগবানের আশীষপূত হইয়া সঙ্ঘ জাতিগঠনের পথে চলিয়াছে। ইহার মূলমন্ত্র ত্যাগ ও তপস্যা। বৈদিক সভ্যতায় অর্থ

অনর্থ নহে। জাতির চাই জয়, শ্রী, মাধুর্য্য এবং কুবেরের ঐশ্বর্য্য। এই পথে হিংসা-দ্বেষ নাই; পরন্তু আছে ভাগবত মৈত্রী। প্রেম ও ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত জাতি ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া তাহার শিক্ষা, সমাজ ও অর্থপ্রতিষ্ঠান গড়িবে এবং তাহাই হইবে জাতির সত্যকার মুক্তি। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ এইরূপ সুসংহত সংহতির রচনা করিতেই চাহিতেছে। ইহার পন্থা ধ্বংস নয়, পরন্তু সংগঠন। প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের পরম সার্থকতাও এইখানেই।" ইহার পর রাখিয়া ধীর স্থিরভাবে বিশেষ হিসাব করিয়া ব্যাঙ্ক-ব্যবসা পরিচালিত হইবে। সঙ্ঘের বিপুল ত্যাগ ও সততা প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ককে ক্রমে সাফল্যের পথে লইয়া যাইবে বলিয়া সভাপতি উল্লেখ করেন। স্থানীয় এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর বাহাদুর বলেন যে, প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার দ্বারা চন্দননগরের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীযুক্ত তুলসীদাস রায় ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর, শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সমাপ্তিসঙ্গীত গীত

হিন্দুস্থান রবার ওয়ার্কস লিমিটেডের দ্বারোদ্‌ঘাটন দৃশ্য

শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীযুত মাখনলাল সেন, শ্রীযুত হরিহর শেঠ এবং আনন্দবাজারের বাণিজ্যসম্পাদক শুভেচ্ছাজ্ঞাপক প্রদান করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন, প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার দ্বারা চন্দননগর ও তাহার আশপাশ স্থানে শিল্পোন্নতির পথ সুগম হইবে। মনুষ্য-শরীরে হৃৎপিণ্ডের যে স্থান, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কেরও সেই স্থান। শুধু টাকার লেনদেন করা ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য নয় বা রাতারাতি বড়লোক হইবার উদ্দেশ্যও ব্যাঙ্কের পশ্চাতে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত সম্পর্ক হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। সভায় চন্দননগরের প্রায় বিশিষ্ট সকলেই যোগদান করেন। প্রচুর জলযোগ দ্বারা উপস্থিত সকলকে আপ্যায়িত করা হয়।

## হিন্দুস্থান রবার ওয়ার্কস্‌ লিমিটেড

গত ১২ই জানুয়ারী বালিগঞ্জ কসবা রোডে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় হিন্দুস্থান রবার ওয়ার্কসের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন এবং এই উপলক্ষে যে সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার সভাপতিত্ব করেন।

মিঃ পি, সি, বসু এই প্রচেষ্টার যে ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন তাহা বাণিজ্যশিল্পেচ্ছু মনে আশা ও ভরসার সঞ্চার করে। জাপান-প্রবাসী শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আন্তরিক উৎসাহ ও সহযোগিতায় মিঃ এ, কে, সেন দীর্ঘদিন জাপানে থাকিয়া রবার টেক্‌নলজি সম্বন্ধে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া আসেন। ইঁহারা উভয়েই বর্ত্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন।

সভাপতি শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার মহোদয় এই প্রতিষ্ঠোৎসবে যে সুচিন্তিত ও সারগর্ভ বক্তৃতা দেন, তাহা খুবই সময়োপযোগী এবং বাঙালী মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন :

আজকাল আমরা ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক পিছনে আছি। সেজন্ত মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের কাজের কোন সুযোগ নাই; আবার দেশের অন্ন-সমস্তাও ক্রমশঃই জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এর সমাধানের উপায় দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। এতকাল আমরা এদিকে বিশেষ মন দেই নাই; তাই নিজের দেশে, নিজের ঘরে আমাদেরই যা করার দরকার ছিল তা' অন্তে করিয়াছে; এবং তার মধ্য দিয়া নিজেদের স্থান করিয়া লইয়াছে। যেমন বাঙ্গলা দেশের ব্যবসা-গুলির মধ্যে যা প্রধান—চা, কয়লা, পাট প্রভৃতি ব্যবসায়ে আমাদের স্থান অত্যন্ত নগণ্য—নাই বলিলেই চলে। কিন্তু আমরা তো অনুপযুক্ত নই; আমরা বাঙ্গালী—সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, ডাক্তারীতে, আইনে, শিল্পে, রাজনীতিতে সবদিকে প্রথম আলোক দেখিয়াছি, আমাদের রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রাসবিহারী ঘোষ, নীলরতন প্রভৃতি বাঙ্গালীর গৌরব নিজ নিজ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল এবং অম্লান রাখিয়াছেন। শুধু পারি নাই আমরা একটি ক্ষেত্রে—যেখানে দশজনে মিলিয়া কাজ করা প্রয়োজন, সেইখানেই আমরা ব্যর্থ হইয়াছি, যেখানে অপরে সাফল্যলাভ করে, আমরা পারি না, সেখানে ধরিয়া লইতে হইবে যে, আমাদের নিজেদের মধ্যেই ত্রুটি রহিয়াছে। মধ্য শ্রেণীর বাঙ্গালীর মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অতি প্রবল; এই আত্মকেন্দ্রিক মনোবৃত্তি মিলেমিশে কাজ করার প্রবল অন্তরায়। রবীন্দ্রনাথও বারংবার তারস্বরে বলিয়াছেন—এই ঈর্ষারূপ জাতীয় ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিলে যৌথ প্রতিষ্ঠানপরিচালনায় আমরা বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিব না।

দেশে যাদের ধন আছে, তাদের আমি একটি কথা বলিতে চাই যে, অর্থ দেশের অন্নসৃষ্টির ও কর্ম্মসৃষ্টির কোন কাজে লাগে না, সে অর্থের কোনও সার্থকতা নাই। যেদিন আসিতেছে, তাহা ঐ শ্রেণীর সঞ্চিত বিত্তের পক্ষে নিরাপদ নয়। যক্ষের ধন লইয়া প্রাচীন জগতে মাথা গুঁজিয়া লুকাইয়া থাকিবার নিরাপদ গৃহকোণকে ধ্বংস করার যে নূতন হাওয়া আসিতেছে, তাহার সম্বন্ধে আমাদের দেশের ধনীদের কোন ধারণা বা চেতনা নাই দেখিয়া দুঃখ হয়। ধন উৎপাদন ও সৃষ্টির কার্য্যে নিয়োজিত না করিয়া যাঁহারা কেবল ধনবান্ বলিয়া গৌরববোধ করিতে চান, বর্ত্তমান যুগে তাঁদের আচরণ সমাজকল্যাণবিরোধী এবং তাঁদের এই সমাজদ্রোহিতা বিপদ্ ডাকিয়া আনিবে। ১৯০৫ থেকে ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশে প্রায় ২২০০ কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে, তাতে বাঙ্গালীর ৪০ কোটি টাকা নষ্ট হইয়াছে। এ বড়লোকের টাকা নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কষ্টার্জ্জিত টাকা। তাহা ছাড়া প্রায় ১০।১২ কোটি টাকাও শোচনীয় অবস্থায় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসে আবদ্ধ। এর ফল যে অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে, তা বলাই বাহুল্য। যাঁরা কোম্পানী চালান, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, তাঁরা সমস্ত বাঙ্গালী জাতির প্রতিনিধি; তাঁরা ব্যর্থ হইলে সবাই সমগ্র বাঙ্গালী-জাতিকে আঙ্গুল দিয়াই দেখাইয়া দিবে, আর credit পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে একশো বছর লাগিবে।"

এদেশে রবার ব্যবসায়ের বিপুল সম্ভাবনা বর্ত্তমান, বিশেষ যুদ্ধের জন্ত ইহার ক্ষেত্র প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা আশা করি, বহু অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান মেসার্স কমলালয় (এক্সপোর্টস্) লিমিটেডের সুযোগ্য পরিচালনাধীনে এই ক্ষুদ্রারম্ভ অদূর ভবিষ্যতে সাফল্যের মধ্যাহ্নে উপনীত হইবে। বাংলা ও বাঙালীর সমবেত কল্যাণেচ্ছা ইহার সঙ্গে যুক্ত হউক, ইহাই কামনা করি।

## আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী

বিগত ৮ই জানুয়ারী রাত্রি ১২-৪৫ মিঃ দশমী ও একাদশীর সন্ধিক্ষণে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নেতা ও মুকুটমণি এবং হিন্দু বাঙালীর অতি বড় আশা-ভরসার কেন্দ্র পুরুষপ্রবর আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁর বিচিত্র সাধন ও কর্ম্মজীবনের-পরিচয় আগামীবারে প্রকাশ করিব।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

পরিচালক ও প্রকাশক : শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ, প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রসাধন

শিল্পী : সুবল পাল
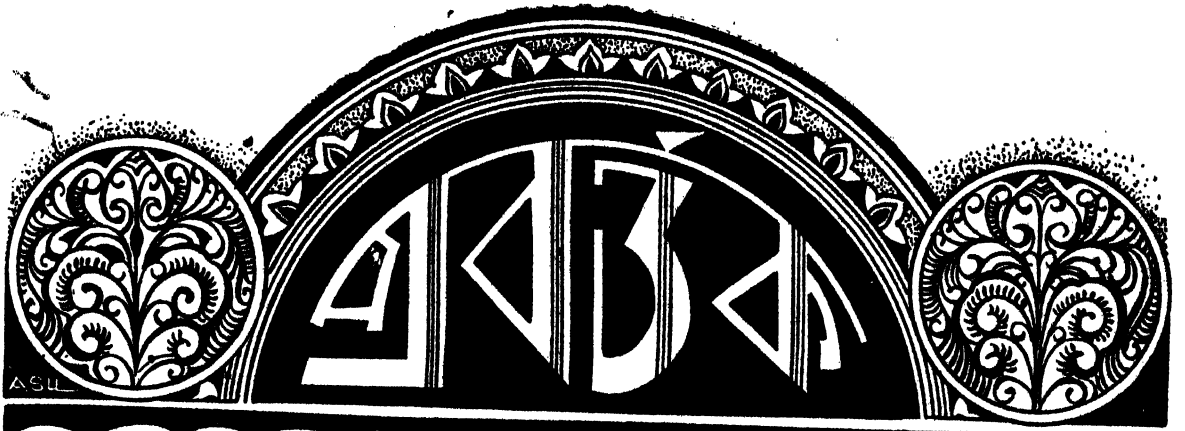
পঞ্চবিংশ বর্ষ
১৩৪৭ সাল

চৈত্র

দ্বিতীয় খণ্ড
৬ষ্ঠ সংখ্যা

# প্রবর্ত্তক রজত-জয়ন্তী

## আমার উপসংহার বাক্য

পরমেশ্বর বিভু। জীব অণু। পরমেশ্বর অদ্বয়, অখণ্ড। জীব—দেহাভিমানী খণ্ড ও বিচিত্র। জীব—ভাবে ব্রহ্ম। কর্ম্মে—জীবই, ইহার অধিক নহে; ভারত সংস্কৃতির এই অবিসংবাদী সিদ্ধান্ত প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

জীবের উপাদান পরমেশ্বর। ঘটের উপাদান যেমন মৃত্তিকা। জীবের পরমেশ্বর কিন্তু ঠিক এইরূপ উপাদান নহেন। জীবের উপাদান ও জীবের জন্ম কারণ—দুইই ঈশ্বর। জীব ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধির যন্ত্র। জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই, কর্ম্মও নাই। ঈশ্বরের সঙ্কেতই জীব-ধর্ম্ম। যন্ত্রীর প্রশাসনে যন্ত্রের পরিচালন ব্যাপারের ন্যায় জীবের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়, এই জ্ঞানই জীবের মুক্তি ও আনন্দের হেতু।

সৃষ্টি অনাদি। জীব লইয়াই সৃষ্টি-লীলা। জীবও অনাদি। জীবের মোক্ষ নাই। আছে বিনাশের মধ্য দিয়া বার বার মৃত্যুকে অতিক্রম করা, আর ব্রহ্ম উপাদান এই জ্ঞান-ঘন চৈতন্যে অমৃত আস্বাদন। ইহাই জীবের পরম ভাব ও দিব্য স্থিতি।

স্থান, কাল, অবস্থা জীবের বৈচিত্র্য রক্ষার দিব্য ছন্দ। এই ছন্দত্রয় জীবের অনতিক্রমণীয়—যেমন বায়ু বর্ণের যথাযথ উচ্চারণ স্থান প্রাপ্ত হইলে, তাহা বাক্যে পরিণত হয়, তেমনই স্থান, কাল, পাত্রের যথাযথ পরিবেশে সৃষ্টি-বৈচিত্র্য রক্ষা হয়, এবং এই সঙ্গে জীবের আয়ুঃ ও ভাগ্য সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। জীবত্বের এই মৌলিক বিজ্ঞান অস্বীকার করে হঠকারী। ভারতের মৌলিক সংস্কৃতি লাভ করিলেই এই সত্য প্রত্যেককেই স্বীকার করিতে হইবে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ তাই মোক্ষবাদী নহে, জীবনবাদী। এইরূপ ঋষি-বাক্য আজিও কর্ণগোচর হয়—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"

প্রথম স্থানের কথা। স্থান ভেদে কাল ও অবস্থার বৈচিত্র্য ঘটে। স্থান, কাল ও অবস্থা বিশেষে ধর্ম্মলক্ষণও ভিন্ন ভিন্ন হইবে। ধর্ম্ম—কর্ম্ম বিশেষ। সৃষ্ট বস্তুর গতি লক্ষণরূপ যে স্পন্দন তাহাই কর্ম্ম। স্পন্দন ছন্দভঙ্গ হইলে তাহা বিকৃত কর্ম্ম। স্পন্দন শূন্যতা নৈষ্কর্ম্ম। যথাযথ সৃষ্টির যে স্পন্দন তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" গীতার এই উক্তি এইজন্যই সার্থক হইয়াছে। সৃষ্টি-স্বধর্ম্মের ভিতর দিয়াই পুনঃ পুনঃ নিধন প্রাপ্ত হয়, ইহাই তাহার চির গতি। অতএব স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির এই চৈতন্য অম্লান থাকে। উপনিষদের "অবিদ্যয়া মৃত্যুম্ তীর্ত্বা" এই কথা স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিই উপলব্ধি করে।

স্থানভেদে ধর্ম্মভেদের কথা বলিয়াছি। ধর্ম্ম—কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে, ইহাও পুনঃ পুনঃ কথিত

হইয়াছে। স্থান বিচার করিলে আমরা দেখিব, যে দেশের উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সমুদ্র, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কিরাত ও ম্লেচ্ছগণের বাস, সে দেশের যে ধর্ম্ম, আর যে দেশ সমুদ্রবেষ্টিত, অথবা যাহার উত্তরে সমুদ্র, দক্ষিণে পর্ব্বতমালা, এই দেশের ধর্ম্ম—পূর্ব্বোক্ত দেশের সহিত তুল্য হইবে না। জীবের ভাব ব্যাপকতা আছে, কিন্তু তাহার কর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা থাকিবে। ভাবে আমরা সকলেই তুল্য হইতে পারি, এইখানে একের সহিত অন্যের পার্থক্য নাও থাকিতে পারে। কিন্তু দেশভেদে আমাদের কর্ম্মের ভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন, কর্ম্মের ব্যাপ্তি সর্ব্বত্র তুল্য, কিন্তু কর্ম্মের প্রকার-ভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য। স্থানভেদে এইরূপ ঘটে ইহা বলাই বাহুল্য। ভারতের আচার ব্যবহার শিক্ষা ও সাধনা ইউরোপের তুল্য হইবে না। এমন কি প্রতিবাসী ব্রহ্ম ও চীনের সহিত একও হইতে পারে না। ধর্ম্মে একাচার প্রবর্ত্তনের প্রয়াস বুদ্ধির বিকৃতি বশতঃই হয়। বুদ্ধি-বিপ্লবই অনাচার ডাকিয়া আনে। ভারতবাসী মোগলাই সভ্যতার অনুকরণ করিয়া অথবা ইংরাজের আচার আশ্রয় করিয়া মোগল অথবা ইংরাজের সমতুল্য হইতে পারে নাই। নীল শৃগালের ন্যায় ইহাতে সে স্বজাতি ও ভিন্ন জাতির নিকট কৌতুক সৃষ্টিই করিয়াছে।

স্থানভেদ বশতঃ কালভেদ অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্ম-বৈগুণ্যে ভেদ সৃষ্টি হয়। ইহার দৃষ্টান্ত যুক্তিতর্কে প্রমাণ করিতে হইবে না। যে কালে এক দেশবাসী সূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণীতে এক প্রকার মনোবৃত্তি লইয়া বিচরণ করে, ঠিক সেই কালে হয়তো প্রথম উষা সঞ্চারে অথবা গভীর রজনীর অন্ধকারে অন্য মনোবৃত্তি লইয়া লোকে ভিন্ন ভঙ্গীতে সময় অতিবাহন করে। ঋতু-বিপর্য্যয়ও ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত এক দেশে যখন মানুষের প্রতিভায় আগুন ধরিয়া যায়, অন্য দেশের মস্তিষ্কবৃত্তি অবসন্ন হইয়া ঘুমায়। এই হেতু দেখা যায় কোন এক দেশের হৃদয়বৃত্তি অন্য দেশের সহিত এক প্রকারের হয় না। এরূপ হওয়াটা অস্বাভাবিক সৃষ্টি বলিতে হয়। ভারতের ষড় ঋতুর ন্যায় চতুর্যুগের কথাও প্রসিদ্ধ। ভারতের ঋতময় জীবনযুগে সুদূর জাপান হয়তো তমসাচ্ছন্ন ছিল। প্রতিবাদী বলিতে পারেন, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে অতিদূর অতিসন্নিহিত হওয়ায় এই কথা আর খাটে না। আমরা বলিব, জীবনে একথা এখনও প্রমাণসিদ্ধ হয় নাই। বিজ্ঞানপ্রভাবে দূরকে আমরা অতি নিকটে পাইয়াছি বটে, ইহাতে মানুষের প্রাণ-শক্তির স্পন্দন সংখ্যাই বাড়িয়াছে—দেশগত, কালগত ধর্ম্মরক্ষার দায়ই বড় হইয়া উঠিয়াছে। এই বিজ্ঞানের যুগেই স্বাধীন জাতির মধ্যে স্ব স্ব সংস্কৃতি রক্ষার যে চাতুর্য্য ও সতর্কতার পরিচয় পাইতেছি, তাহাই আমাদের উপরোক্ত প্রতিজ্ঞার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

যাঁহারা বলেন, সব মানুষই মানুষ। সকলেই তুল্য প্রভাববিশিষ্ট ও ঐক্যবদ্ধ, ইহা আমরা সুস্থ মস্তিষ্কের সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। স্নায়বিক দুর্ব্বলতার ইহা ভিত্তিহীন কল্পনা। একই দেশ ও একই জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট মানুষের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও জাতির মানুষের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত এমন বিশাল ভেদ আছে, যাহা দূর করার আদৌ সম্ভাবনা নাই। বৈষম্যই সৃষ্টি বিধান—এই সত্য সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়াইয়া আমাদের জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া উচিৎ।

স্থান ও কালের ভিন্নতা হেতু অবস্থা ভেদও অনিবার্য্য হয়। এমন যে শস্যশ্যামলা বাংলা, কালবিপর্য্যয়ে তদ্দেশ-বাসীগণের তবুও কি অসম্ভব রকমের দুরবস্থা, তাহা না বলিলেও চলিবে। সেই ধান্যক্ষেত্রের উপরে মণিমরকত আজিও ঢেউ খেলিয়া যায়। ফলে ফুলে মাতৃভূমি আজও উর্ব্বরা। কালপ্রভাব এমনই চমৎকার, জাতির শোচনীয় অবস্থা তবুও অনিবার্য্য হইয়াছে। বিজ্ঞানের কৃপায় আমরা বহু দূরকে নিকটে আনিয়াছি বটে, কিন্তু স্থান, কাল, অবস্থার প্রভাবে আমরা কতটা অন্য হইতে বিচিত্র স্বভাববিশিষ্ট, উহা সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য যাহাই হউক এক হইতে অন্যের এই যে স্বাতন্ত্র্য ইহার বিন্দুমাত্র কি অন্যথা হইয়াছে? বৈষম্যই সৃষ্টি নীতি; স্থান, কাল অবস্থা ভেদে তাই বিচিত্র স্বাতন্ত্র্য মুছিয়া যাইবার নহে। প্রশ্ন করিতে পার, এইরূপ হইলে মানবের সহিত মানবের সাম্যের যে আদর্শ প্রচারিত হয়, তাহা কি একেবারেই

ভিত্তিহীন? উচ্ছে ভাজিতে বসিয়া পটল ভাজিতেছি এই মিথ্যা গৌরব হইতে মুক্তি পাইলেই নিঃসঙ্কোচে সকলেই বলিবে ভাব-সাম্য আমরা যে অনুভূতির স্তরে উপলব্ধি করি বস্তুসাম্য ঠিক সেই স্তরেই দেখার আশা দুরাশা মাত্র। এক দেশ ও এক জাতি হইতে অন্য দেশ ও অন্য জাতির পার্থক্য এমনই সুস্পষ্ট যে, আমরা কে চীনা, কে হাবসী, কে রুষ, কে ফরাসী অনায়াসেই বলিয়া দিতে পারি। একই দেশ ও জাতির মধ্যেই এই সনাতন পার্থক্য আছে বলিয়াই কে রাম, কে শ্যাম চিনিয়া লইতে একটুও বিলম্ব হয় না। এমন কি কাহার কি রুচি, অভিজ্ঞ জনেরা আকৃতি দেখিবামাত্র তাহাও বলিয়া দিতে পারেন। সত্যদর্শীর সর্ব্বপ্রধান চরিত্রগুণ হইতেছে যে, তাহারা যে বস্তু যাহা সেই বস্তুকে তদনুরূপ দেখিয়া থাকেন। সাম্যের নামে ঐক্যের আদর্শে জাতিসমন্বয় বা ধর্ম্মসমন্বয় প্রভৃতি যে মানুষের কল্পনা বিলাস—সত্যদর্শী তাহা অনায়াসেই বুঝিবেন। অনেকেই বলিতে পারেন, যাহা মিথ্যা তাহাও তবে গতি পায়, প্রাণ পায় কেমন করিয়া? ইহার উত্তর ভারতই সদম্ভে দিতে পারে। একজন ভারতবাসী পূজার অর্ঘ্য হাতে লইয়া নির্দ্বন্দ্বে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া বলে "ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ"। এ পৃথিবী শুধু ধর্ম্মের নহে, শুধু আলোর নহে, শুধু সত্যের নহে; স্থান, কাল ও অবস্থার বৈচিত্র্যে জাতি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ন্যায় ধর্ম্মের জীব, অধর্ম্মের জীব, আলো, অন্ধকার, সত্য ও অসত্য এই সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন জীবও চির বিদ্যমান আছে। আলোর জগতে এক শ্রেণীর জীব যেমন জাগিয়া থাকিতে পারে, অন্ধকার জগতেও তদ্রূপ অন্য এক প্রকার জীবের জাগরণ অসম্ভব হইবে কেন? উভয় ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট জীব আছে। ধর্ম্মের মানুষও আছে, অধর্ম্মের মানুষও আছে—সবকে সমান করিয়া দেখার ঔদার্য্য ভারতে কোনদিনই ছিল না। ভারত নির্ভয়ে বলিয়াছে, অনৃত্য ও অধর্ম্মের মানুষ চির যুগ অসত্য ও অধর্ম্মই প্রকাশ করে—কপট বিশ্বাসঘাতকের বীজ নিত্য শাশ্বত; সৎ ও সরল জীববীর্য্যের ন্যায় ইহারাও সৃষ্টিকাল হইতে অনাহত গতি পাইয়াছে। গতি-পার্থক্য দেখিয়া বিচক্ষণেরা পরস্পর ভেদ দর্শন করেন। যে যাহা তাহাকে তদনুরূপ দেখাই সত্য দৃষ্টি।

কেহ বলিবেন, পাষণ্ড উদ্ধারের কথা কি তবে মিথ্যা কাহিনী? দস্যু রত্নাকর, এ যুগের জগাই মাধাই, তাহাদের পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় কেমন করিয়া? বড় কথায় বলিব—সৃষ্টিলীলার ইহা অভিনয় চাতুর্য্য, একজন আর একজনের মহিমা বাড়াইবার সাজ সজ্জা প্রেক্ষাগৃহে এমন করিয়াই করে। বাহিরে তাহা প্রকাশ করিয়া পরস্পর পরস্পরের অভীষ্ট সিদ্ধ করে, কিন্তু সহজ কথাটা এই, কাপট্যের মৌলিক বীজ রূপান্তরিত হয় না, কাপট্যের আরোপ ঘটনার আবর্ত্তে নিরাকৃত হয়। যেমন নীল শৃগালের বর্ণপরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে, যাহার যে স্ববর্ণ তাহা রঞ্জনের দ্বারা ভিন্ন বর্ণ ধারণ করিলে, উহা পুনঃ প্রক্ষালণে দূর হয়, ইহা অসঙ্গত কথা কে বলিবে?

এত কথা বলার উদ্দেশ্য ভাবকে ভাব এবং বস্তুকে বস্তু বলিয়া জীবনের যে সদ্গতি ভারত তাহারই আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে। ভারতের বৈদিক সভ্যতার যুগে, তাই এই কথা জোর গলায় প্রচারিত হইত যে স্থান, কাল, পাত্র লইয়া কল্প সৃষ্টির গোড়ায় যে স্বভাব তাহা কল্পান্ত-কাল স্থায়ী। ইহার উপর বুদ্ধি-প্রসূত সুবর্ণজাল যতই বেষ্টিত হউক, এই মৌলিক সত্যকে আমরা কোনদিন হারাই নাই। ইতিহাস চিরযুগ পুনরুক্তি করিয়াই চলিয়াছে। শীতের পর বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষাদি কাল-ধর্ম্মের আবর্ত্তে, আবার শীত, বসন্ত, প্রাদুর্ভূত হয়। জগতের ইতিহাস অকাট্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—ভারতের শাস্ত্র তাহা সুপ্রমাণিত, উহা যুক্তিসঙ্গত এবং অনুভূতিমূলক।

এই কথাগুলি আমি সৃষ্টিবিজ্ঞানের দরদীর নিকটই বলিতেছি। সত্যই আমাদের আশ্রয়নীয়। আমি সত্যের মানুষ, আলোর মানুষই চাহি। এই মানুষেরই সংহতি ও জাতি চাই, এই জাতির স্বরাষ্ট্র থাকিবে। তাই বলিয়া অন্য জাতি থাকিবে না তাহা আমি বলি না—সে জাতিরও সংহতি আছে, সে জাতিরও স্বরাষ্ট্র আছে, ইহা স্বীকার করিয়াই আমার জাতির প্রতিষ্ঠা আমি চাহিতেছি। আমার প্রতিকূল যাহা তাহাকে অস্বীকার না করিয়া, সব

কিছুরই সম্ভাবনীয়তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই, এই আলোর জাতিটাকেও স্থান, কাল ও অবস্থার গাঢ় স্তর বিদীর্ণ করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে এই কথাই বলিতেছি। মিশ্রবুদ্ধির মানুষ আমার এই আকুতি প্রকাশের ভাষা দুর্ব্বোধ্য মনে করিবেন। কিন্তু যে যুগের স্বপ্ন সার্থক করার জন্য যে মানুষ জন্মিয়াছে, আমার কথা তাঁহারা বুঝিবেন—ইহা আমি প্রত্যয় করি।

দেশ আমার স্থান। বর্ত্তমান যুগ আমার কাল। দুর্দ্দিন আমার অবস্থা। তবুও আমি দেশের বুকে, যুগের জ্যোতির্ম্ময় আলোকোদয়ের সম্ভাবনা দেখিতেছি। দুরবস্থার অবসান লক্ষ্য করিতেছি। যুগশঙ্খে ফুৎকার দিয়া তাই বলি—স্থান, কাল, অবস্থা ভেদে আমরা যখন বাঙ্গালী, তখন বাংলাই আমাদের মাতৃভূমি। বাঙ্গালী জাতিই এই দেশের যথার্থ অধিকারী। এই দেশ ও কালের মধ্যে আবার প্রকৃতি ভেদে, শ্রেণী-স্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু যে শ্রেণীর মানুষ অভ্যুত্থানের প্রেরণা পাইয়াছে সেই শ্রেণীর মানুষই জাগরণের পথে চলিবে। সত্য জাগরণস্পৃহা লইয়া যখন কোন এক শ্রেণীর মানুষ মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, সর্ব্ব-শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই তখন সংঘাতের স্পর্শে একটা জাগরণ-চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হয়, জাগরণ যুগ যাহাদের তাহাদেরই জীবনে নব বিধান প্রবর্ত্তিত হয়, অন্যের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার কোলাহল ও গণ্ডগোলই উঠে, কালপ্রভাবে তাহারা পুনঃ ঘুমাইয়া পড়ে। যুগের মানুষই জাগে, জয় তাহাদের অমোঘ অব্যর্থ হয়।

এখানে তাই কোন আপোষ নিষ্পত্তির প্রয়োজন হয় না, কোন শ্রেণীর প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ প্রয়োজনও হয় না। এই জাতি বেদাশ্রয়ী, ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মী। বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। আধার ভেদে বর্ণাদির ইতরবিশেষ হয়। বেদজ্ঞানের আধিক্যে ব্রাহ্মণ, পৃথিবী জয়ের শক্তিতে ক্ষত্রিয়, সম্পদ-সৃষ্টির প্রাবল্যে বৈশ্য, সুখাধিক্যে শূদ্র। এই একাধারেই চতুর্গুণের ইতর বিশেষ দেখা যায়। এই ভাগবত বিভূতির সমতা যেখানে সেখানেই দেবত্ব। সে সম্ভাবনাও এই জাতির আছে। এই জাতিকে আর্য্য বলিতে পার, হিন্দু বলিতে পার।

এই জাতির ভাগ্যে এমন একদিন আসিয়াছিল, যে-দিন তাহাদের কর্ম্মবশে বাক্য ও মন দুঃখপীড়িত হইয়া দীর্ঘদিন নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হয়। ইহার পর মধ্যযুগে দুঃখ হইতে মুক্তিপথের বিচার করিতে গিয়া আত্মদোষ দর্শনে এই জাতি বৈরাগ্য লাভ করে, ধীরে ধীরে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া পতনযুগের যে সকল শাস্ত্রবাদ আকার ও সংস্কার, জীবনের পরিপন্থী বলিয়া মনে হইয়াছে আজ তাহা বর্জ্জন করিয়া আবার নূতন হেতু শাস্ত্র রচনায় তাহারা প্রবৃত্ত হইয়াছে, বিধর্ম্ম ধ্বংসের আয়োজনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, মৌলিক বৈদিক সভ্যতাকে আশ্রয় করিতে জীবন চাহিয়াছে।

ষড়্দর্শনের জ্ঞান-গরিমায় মধ্যযুগের এই জাতিই একদিন আদ্যোপাদানের হেতু পরমাণু, প্রকৃতি, শূন্য বা ব্রহ্ম বলিয়াছিল, যোগদর্শনে এই জাতি আবার কখন বা চাহিয়াছিল—জীবন হইতে মুক্তি। সাংখ্য-দর্শনের প্রভাবে সে আত্যন্তিক লয়ের সাধনায় প্রবুদ্ধ হইয়াছিল, বৈশেষিকের মতে সে জড়বাদী, হেতুবাদী হইয়াছিল। কিন্তু এই জাতির মৌলিক জীবনবাদ ব্রহ্মবাদের উপরই যে প্রতিষ্ঠিত; ব্রহ্মশক্তি যে তাহার জীবনের নিয়ামক; ব্রহ্মজ্ঞানই তাহার মস্তিষ্ক-কোষের রচনা, ব্রহ্মতেজ প্রকাশেই তাহার হৃদয়কমল প্রস্ফুটিত, ব্রহ্মশক্তি তাহার স্বাধিষ্ঠানে অবস্থিত হইয়া সৃজনের প্রেরণা দেয়, ব্রহ্ম-বিগ্রহই তাহার স্থূল শরীর একথা তবুও বিস্মরিত হইতে পারে নাই; তাই আজ জ্ঞান, বীর্য্য, প্রেম ও সেবাই তার জীবন-ধর্ম্ম হইয়াছে। এই জীবন-বিজ্ঞান উপলব্ধিগম্য করিয়া এই জাতি আপনাকে বর্ণাশ্রমী বলিয়া পুনঃ গর্ব্ব করিতেছে। তাহাদের ইতিহাস ও বিজ্ঞান সার্ব্বজনীন বলিয়া নিজেকে হিন্দু বলিতে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার দোষ দর্শন করিতেছে না। স্থান, কাল ও অবস্থার ছন্দেই তার এই সুমহান্ জীবনের পুনঃ অভ্যুত্থান এই জাতি আর কোন মতে অস্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে।

সাধনায় সে একদিন যে অষ্টসিদ্ধির সন্ধান পাইয়াছিল, অনিমা, লঘিমা, মহিমাদি তাহাও কাল্পনিক দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। জীবনবাদের বিপরীত যাহা তাহা এ পথের পাথেয় নহে, তাই আজ তাহারা আর এক অভিনব অষ্ট-সিদ্ধির সন্ধান পাইয়াছে,—ঈশ্বর-বিশ্বাসের উপর জীবনের ভিত্তি দৃঢ় হওয়ায় সে পাইয়াছে অসাধারণ তপস্যা। ইহাই তার প্রথম সিদ্ধি। এই তপস্যার ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া

যে জীবন-যজ্ঞের সন্ধান তাহারা পাইয়াছে তাহাই নিষ্কাম কর্ম্মরূপে তার দ্বিতীয় সিদ্ধি। ইহার পর তৃতীয় সিদ্ধি যশঃ। সত্য প্রকাশ চতুর্থ সিদ্ধি। পঞ্চম সিদ্ধি অব্যয় সত্তার অনুভূতি। ইহার উপর ষষ্ঠ সিদ্ধি অমৃত। এই অমৃতের ঘনীভূত সপ্তম সিদ্ধি শুক্র। এইখানেই নবজন্মের পরম ভিত্তি। ইহার পরে অষ্টম সর্ব্বার্থ সিদ্ধি। এই অষ্টম সিদ্ধির সহায়ে এ জাতি জ্ঞানে, জয়ে, সম্পদে ও সুখে জীবনে চাতুর্ব্বর্ণের পূর্ণতা বিকাশ করিবে। এই নূতন সাধন-সঙ্কেত হয়তো সকলের পক্ষে নহে, বাংলার সর্ব্বত্র চিহ্নিত নব জাতির প্রতিনিধি রূপে যাঁহারা জন্মিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। এইরূপ ভাবকেন্দ্র সৃজন করিয়া সংহতিবদ্ধ হইবেন ও পূর্ব্বোক্ত অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া জাতির শ্রেয়ঃ মূর্ত্তি প্রকাশ করিবেন।

এক অপার্থিব সংস্কৃতির ভিত্তির উপরেই জাতির অভ্যুত্থান হয়। অভাবের তাড়নায় আমরা মুক্তিপ্রার্থী হইলে, যে জন্মকারণ মুক্তির মূলে থাকিয়া যায়, সেই ভিত্তির ধর্ম্মই পুনঃ পুনঃ জাতিকে নিপাতিত করে। একটা নিশ্চল ঋতময় প্রদীপ্ত যুগ আনয়নের অগ্রণী বলিয়া যাহারা দিব্য পরিচয় দিবে, মানবের ইতিহাসে যাহাদের কাহিনী লিপিবদ্ধ থাকিবে—তাহাদের এই দিব্য সঙ্কেত অবধারণ করিতে হইবে। এই জাতির রক্তধারার মূল উৎস ভারতের বৈদিক সভ্যতা। গঙ্গোত্রীধারার উৎপত্তি-স্থান যেমন অনন্ত তুষার স্তূপ, ইহাই তাহার অনাহত স্রোতঃ চিরযুগ রক্ষা করিতেছে, তেমনই এই জাতিটার মৌলিক সংস্কৃতি তাহার মৃত্যু আনিতে দেয় না। আমরা যুগে যুগে এই জন্যই আত্মচেতনা ফিরিয়া পাই, আমরা যুগে যুগে ব্রাহ্মণ্য প্রতিভার জন্ম দিয়া শিবের বিষাণ বাজাইয়া বলি, "ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

জীবনের যখন লয় নাই, তখন জীবনের ছন্দ নিত্য, এবং ইহাই চাতুর্ব্বর্ণে লীলায়ত, চতুঃশক্তি পূত। শক্তিই জীবনের বীর্য্য। অদীক্ষিত অসংস্কৃত জীবনবীর্য্য লক্ষ্যহীন গতি পথে বিচরণ করে। এই বিশৃঙ্খল জীবনের আবর্ত্ত ভেদ করিয়া এক প্রদীপ্ত দীপ্তিশালী ব্রহ্মণ্যশক্তি ভারতে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছে—রাজর্ষি, মহর্ষি প্রভৃতি জীবনের ঐশ্বর্য্যে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইয়াছে, ভারত-ভূমিকে কেন্দ্র করিয়া এই মহাজাতির আবার জন্ম মৃত্যু আছে, তাই ভারতের উত্থান ও পতন লক্ষ্যে পড়ে। উত্থান যুগের ইতিহাসই অনুধাবনীয়। উত্থান যুগে সসাগরা-ধরার অধীশ্বর একদিন ভারতবাসীর মধ্য হইতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সে উজ্জ্বল জীবন-বৃত্তান্ত মহাকালও মুছিতে পারেন নাই। যে বিশেষ সংস্কৃতির উপর ভারতের এই জীবন-যুগ সে যুগের অবসানে ভারত-সত্তা গভীর সুপ্তিতে তন্দ্রামগ্ন হইলে তাহা পুনঃ লুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু ইহার পর এই সংস্কৃতিই তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া নানা ভাবে জগতে ছড়াইয়া পড়ে, কালে ইহা বিকৃত হইয়া পড়িলে ইহার অতিশয় কদর্য্য মূর্ত্তি জগৎকে পীড়িত ও বিধ্বস্ত করিয়া তুলিলে তখন তন্দ্রাতুর ভারত আবার জাগরণের সুর তুলিয়া আত্মচৈতন্যে উদ্বুদ্ধ হয়, সমগ্র বিশ্বে অজস্র কিরণ বিস্তার করিয়া দুষ্কৃতির বিস্তৃতি হ্রাস করে। আজ এইরূপ জাগরণের যুগসন্ধি সমাগত এবং অতীতের অধ্যাত্ম-ইতিহাস আলোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, এ নবযুগ সূচনার মহাসঙ্গীত সুরু করার দায়িত্ব এবার বাঙ্গালী জাতির উপরই ন্যস্ত হইয়াছে। কেন তাহা বলিতেছি—যে জাতির কণ্ঠে একদিন অপৌরুষেয় বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, যে জাতি গাহিয়াছিল—তুমি আর আমির নব ঋক রচনা করিয়াছিল, অস্মদ ও যুস্মদের নব সূত্র প্রণয়ন করিয়াছিল। জীব ও ব্রহ্মের নিত্য ভেদ দর্শন করিয়া যে জাতি মন্ত্র-সংহিতায় সমগ্র জগৎ পূর্ণ করিয়াছিল। জীব ও ব্রহ্মের ভাব ভেদ দূর করিয়া যে জাতি উভয় তত্ত্বকে বিগ্রহান্বিত করার সাধনায় ঋষিমূর্ত্তি ধরিয়া জাহ্নবী, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, কাবেরীর তীরে, গভীর তপোবনে শুভ্র-মন্ত্র ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রশব্দই ঘনীভূত হইয়া ভারতের নেতারূপে নরপতি মূর্ত্তি ধারণ করে, এ জাতির নিকট ভারতসম্রাট্ তাই বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজা পাইয়াছে। চক্র রথ, মণি, ভার্য্যা, নিধি, অশ্ব ও গজ, সেনানী প্রভৃতি রত্ন প্রকাশ করিয়া ভারতের রাজ-চক্রবর্ত্তীরূপে মূর্ত্ত ঈশ্বর নিখিল জাতির পূজা লইয়াছে। প্রিয়ব্রত মনু হইতে পৃথু, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ইহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সে ছিল ভারতের জাগ্রত-যুগের ইতিহাস, তারপর ভারতের উত্থানযুগের অবসানে সুপ্ত

ভারত ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, সত্যের নামে অসত্যের পূজা দিয়া আত্মবিস্মৃতির তমোঘোরে আচ্ছন্ন হইয়াছে। ভারতের ধর্ম্মবীর্য্য হারাইয়া ক্লীবত্ব ধর্ম্ম লক্ষণ বলিয়া হৃতসর্ব্বস্বরূপে দৈন্যের পূজারী হইয়াছে। বেদের ব্রহ্ম ভারতের জাগরণ-যুগে রাজচক্রবর্ত্তী বিগ্রহ ধরিয়াছিল। মধ্যযুগে আমরা দারিদ্র্যের মধ্যে নারায়ণ দেখিতে গিয়া অসংখ্য কৌপীনধারী রিক্ত সন্ন্যাসীর পূজা দিয়াছি। আমাদের সত্যদৃষ্টি ম্লান হইয়াছে। জীবনের পঞ্চপ্রাণের ন্যায় পঞ্চগতির সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া আমরা কর্ম্ম বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, তপস্যা ও জ্ঞান পৃথকরূপে আশ্রয় করিয়া কর্ম্মে ঐশ্বর্য্য, তপস্যায় সিদ্ধি, সন্ন্যাসে অক্ষর ব্রহ্ম, বৈরাগ্যে লয় ও জ্ঞানে কৈবল্য লাভ করিয়াছি। মতভেদে গতিভেদ হওয়ায় গতি স্বাতন্ত্র্যে, জাতি স্বাতন্ত্র্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া আমরা ক্রমে পরস্পর হইতে পরস্পর বিভিন্ন বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছি। এই অবস্থায় বাংলার অম্বরপটে বর্ণমাতৃকা, সাবিত্রীদেবী আবির্ভূত হইলেন। বাংলার সাধক এই বর্ণমাতৃকাকে সর্ব্বপ্রথম বরণ করিয়া ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় বহুদিন পরে, পুনরায় বলিলেন—"ব্রহ্মিষ্ঠানাং বলং বিদ্ধি বিদ্যাতত্ত্বার্থ দর্শনম্" ব্রহ্মিষ্ঠাদিগের শক্তি বিদ্যাতত্ত্বার্থ দর্শন ভিন্ন আর কিছু নহে। আর "কামাশ্চার্থেন সম্বন্ধস্তেনার্থং" অর্থাৎ এই অর্থের সহিত কামের সম্বন্ধ আছে। অতএব আমি কামনাই করি ইত্যাদি। বাংলার কবির কণ্ঠে কামগায়ত্রী পুনরুত্থিত হইল। জাতি চাহিল রিক্ত মূর্ত্তি ভগবান নহে, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মের যাজ্ঞাই নূতন বেদমন্ত্রে বাংলায় ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলিল, এই পুরুষোত্তমকে আহ্বান করিতে হয় সেই মৌলিক কামমন্ত্রে যাহা জীবের হৃদয়ে প্রেমের পারিজাত বিকশিত করে। তাই প্রাচীন ভারতের প্রেম-যমুনা গঙ্গোত্রীপ্রবাহে পরিণত হইল। আমরা দেখিলাম, শ্রীনবদ্বীপে প্রেমঘনরূপ শ্রীগৌরচন্দ্রের নরতনুতে। এই প্রেমের সাধনায় শক্তির শতদল প্রস্ফুটিত করার তন্ত্র, মন্ত্রে মন্ত্রে ভাগীরথীর কূলে কূলে প্রতিধ্বনি তুলিল হালিসহরের সাধনায়। তারপর দক্ষিণেশ্বরে প্রেমশক্তির ঘনিমায় ব্রহ্ম ও কালীর নবলীলা, জীবতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বের অপরূপ সাধনা প্রবর্ত্তিত হইয়া বাঙ্গালীকে দিল নবজাতি গঠনের প্রেরণা। বাণীর বীণায় ইহার পরেই অপূর্ব্ব সাহিত্যের ঝরণা ঝরিল। সে অমৃতে অভিষিক্ত হইয়া বাঙ্গালী জাতি সর্ব্বপ্রথমে রাষ্ট্রজাতি গঠনের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হইয়া আত্মাহুতি-দিতে কুণ্ঠা করিল না। অনুরাগের প্লাবনে জীবন ছন্দ বাঙ্গালী ঠিক রাখিতে পারে নাই। বাণীর দেউল গড়ার প্রচেষ্টা শ্রীঅরবিন্দ করিলেন বটে কিন্তু তাহা রাষ্ট্রপ্লাবনের ভীমাবর্ত্তে কার্য্যকরী হইল না, মন্ত্রসাধনার পর শিক্ষা ও সাহিত্যের বিগ্রহ মূর্ত্তি ভারতীর মন্দির যে জাতি গড়িতে অসমর্থ হয়, সে জাতির ছন্দপতন অনিবার্য্য। শক্তি-সাধনার ক্রম অনুসারে সাবিত্রীর পর সরস্বতী। তারপর কমলার প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া দশভুজার আরাধনায় জাতি রাষ্ট্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। এই দিব্য রাষ্ট্রের ভিত্তির উপর প্রেমস্বরূপিনী শ্রীরাধা। একনিষ্ঠ ঈশ্বর-প্রেমের অধিকারী না হইলে দিব্য সমাজজীবন সম্ভব হয় না। যেখানে পতি পত্নী, পিতা পুত্র, সখা সুহৃৎ, প্রভু ভৃত্য, ভক্ত ভগবান পঞ্চরসের উজান তুলিয়া জগৎ মধুময় করে, সে সমাজজীবন শ্রীরাধারাণীর প্রসাদে হয়। জীবনে সর্ব্বসমস্যা সমাধানের এই অপার্থিব পথ বিস্মৃত হইয়া জাতি বৈশিষ্ট্য যে অস্বীকার করিয়া চলে, সে লক্ষ্যভ্রষ্ট, মহাভ্রান্ত। জাতির সুপ্ত জগজ্জয়ী বীর্য্য এইখানে সহায় হয় না। এই পথের যাত্রীকে আমরা তাই বিপথগামী বলিয়া প্রচার করি।

আমাদের জাতি স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিবিজ্ঞান-সম্মত, উহাকে অস্বীকার করিয়া যে জাগরণ প্রচেষ্টা তাহা নিরর্থক হইবে বলিয়াই আমরা সর্ব্বপ্রথমে জীবনবাদের মন্ত্রই উচ্চারণ করিয়াছি। এই মন্ত্রদীক্ষিত নরনারীকে লইয়া নব শিক্ষা-নিকেতনের-অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতীর স্তুতি করিয়া কমলার স্বর্ণ-সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছি। সঙ্ঘজীবনের নিরাপদ সঙ্কীর্ণ স্থানে দীর্ঘদিনের এই সাধনা আজ জাতি জীবনে সঞ্চারিত করিয়া এক অভাবনীয় সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত সর্ব্বমঙ্গলা দেবী দুর্গার প্রসাদে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে নব রাষ্ট্রসাধনার প্রেরণা আমাদের আকুল করিয়াছে। এখানে আনুগত্যের দায়ে নেতা অভিভূত হইবে না। নেতার অমোঘ সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া জাতি শনৈঃ শনৈঃ নবরাষ্ট্র-সাধনায় ধীর পদে অগ্রসর হইবে। নেতার অভিমতের সহিত জাতির

অন্তরযোগ শক্তিসাধনায় সুসিদ্ধ হওয়ায় মতবিরোধের বিতণ্ডায় এ গতি তীর্য্যক পথ আশ্রয় করিবে না। সহকর্ম্মীদের চিত্ত-বিকৃতিতে অভিভূত হইয়া নেতা সহতীর্থদের মন রাখার জন্য ঈশ্বরের নির্দ্দেশ অমান্য করিবে না, এই নব জাতির অগ্রপুরোহিত মনের ধর্ম্মে জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে না। ভারতের ভগবান সত্য হইতে সত্যের পথেই জাতিকে অগ্রগতি দিবার জন্য নেতারূপে আধার আশ্রয় করিবেন। তাই বাংলার জনজাগরণের নেতা স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারেন না।

ভারতের রাষ্ট্র-সাধনা ভারতের কাল ও অবস্থানুগত পাত্রকে আশ্রয় করিয়া সিদ্ধ হইতে পারে। এই জাতি, পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মীর মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠার জন্য সময় ও শক্তির অপব্যয় করিবে না—ঐক্যসিদ্ধ করার জন্য লক্ষ্য তাহার স্থির থাকিবে বিষয়ের দিকে নহে, পরন্তু বিষয়ীর দিকে। এই বিষয়ী জগতের যন্ত্রী ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। এই যন্ত্রী ভারতের কণ্ঠে শ্রীভগবান বলিয়া কীর্ত্তিত। এই শ্রীভগবানচন্দ্রকে শ্রুতির সঙ্কেতে আমরা দেখিতে পাই "সর্ব্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি" অতএব আমাদের উপায় নাই কাহাকেও আঘাত করিয়া কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করিয়া জাতির শ্রেয়ঃ পথ অন্বেষণ করা। অথচ আমরা আত্মবৈশিষ্ট্যের অতীতকে মুছিতে পারি না। আমরা দাসজাতিরূপে বাঁচিয়া থাকিতে কোন মতে সমর্থ নহি। আমরা নারায়ণের জাতি। ব্রহ্মণ্য-প্রতিভা আমাদের ললাটে বিদ্যুদ্বর্ণে বিকশিত হয়, আমাদের বুকে দিগ্বিজয়ের দুন্দুভি ধ্বনি প্রবল ক্ষাত্রশক্তি প্রকাশ করিতে চাহে। আমাদের নাভিকুণ্ডলে প্রচণ্ড বৈশ্বানরের উজ্জ্বল কান্তি বিশ্ব ঝলসিয়া বিপুল শক্তি প্রয়োগে ধরণীর সম্পদ আহরণে প্রবৃত্তি দেয়। সর্ব্বশরীরে সুখের শিহরণ তুলিয়া সেবার আকুতি গ্রহণ করে শূদ্র বর্ণের দ্যোতনায়। আমাদের মাথা নত করিয়া থাকিবার উপায় নাই। কল্পনান্তেও আমাদের বেদ লয় পাইল না, শাস্ত্র যে আজও আমাদের কর্ণ বধির করিয়া বলে—তোমরা ঈশ্বরধাতুর উপাদানে সৃষ্ট হইয়াছ, তোমরা অমর, অমৃত, কর্ম্মবীর নিজের ভাগ্য নিজে রচনা কর, তোমাদের মধ্যে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ দেহযন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শক্তি প্রকাশ করিতে চাহে। আমরা অতি নিরুপায় ও অসহায় হইয়া বলিতে বাধ্য হই, আমরা বর্ণাশ্রমী হিন্দু। আমরা জ্ঞান চাই, রাষ্ট্র চাই, রয়ি চাই, সুখ চাই—এ কণ্ঠ রুদ্রও রুদ্ধ করিতে পারে না। পৃথিবীর শক্তিও এখানে পরাজয় স্বীকার করিবে।

বিভিন্ন লক্ষ্য ও বিভিন্ন পথে একদেশবাসী ও একধর্ম্মী হইলেই জাতি হয় না। যে দেশের অতীত মাহাত্ম্য নাই, ধর্ম্ম বিজ্ঞান সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, সেইরূপ অমার্জ্জিত, অসংস্কৃত দেশ ও জাতির মধ্যে কোন এক আপাত স্বার্থকেন্দ্র লক্ষ্য রাখিয়া জাতীয় বীর্য্য ঘনীভূত হইয়া রাষ্ট্রশক্তিপূত হইতে পারে, এইরূপ দেশ কিন্তু ভারতবর্ষ নহে। ভারত বলিতে সেই বৈবস্বত স্বায়ম্ভুব মনু হইতে আমাদের প্রত্যেকের ধমনীতে একটা অচ্ছিন্ন রক্তধারার শিহরণ উঠে। পিতা, পিতামহ, বৃদ্ধ পিতামহ সূত্রশেষে অতীতের বিস্মৃতি বিদীর্ণ করিয়া আজও আমাদের স্মৃতি ঝলসিয়া গোত্রগৌরব জাগিয়া উঠে, আমরা ঋষির বংশধর—তাই যে কোন শুভকর্ম্মে কাশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, ধন্বন্তরি প্রভৃতি গোত্রপুরুষের অনুসরণে হৃদয় উদ্বুদ্ধ হয়। আমার হিমগিরি, নীলগিরি, বিন্ধ্য, পুণ্যগিরি, জাহ্নবী, যমুনা, সিন্ধু কাবেরী পূত-প্রবাহিনী; অযোধ্যা, হস্তিনাপুর, কাশী, মিথিলা, গৌরবভূমি এই বিশিষ্ট জাতিটার আভিজাত্যই রক্ষা করে। আমরা কাহারও অনুকরণে শ্রেয়ঃ পাইব না; আমাদের রক্তের সংস্কৃতির উপর দাঁড়াইয়াই আমরা জাতি সৃষ্টি করিব।

আমাদের জাতি বিগ্রহ বহুদিন হইল বিলুপ্ত হইয়াছে, আছে ভাবের অমর বীর্য্য ও সুমহান্ সংস্কৃতি। ইহার উপরই নূতন আকৃতিতে জাতি গড়ার বৃহৎ কর্ম্ম আমাদের সম্মুখে। বাংলার বীরপুত্র এ ভার অস্বীকার করিবেন না। দক্ষিণেশ্বরের পর ততঃ কিম্ বলিয়া যে প্রশ্ন স্বভাবতঃই কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, তাহার উত্তর ভারতে এই দিব্য ভাব ও সংস্কৃতির উপর নব জাতীয়তার উদ্বোধন।

পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, জীবন শুধু ভাব লইয়া নহে—বস্তু চাই। তাই ভাবকে কর্ম্মে অনুবাদিত করিয়া

ধর্ম্মের ভিত্তি রচনা, ধর্ম্মের ভিত্তিতে অর্থ সৃষ্টির প্রেরণা সফল করিয়া নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে কাম বীজের সাধনা; তাহার পর মুক্তির পতাকা রাষ্ট্র-সাধনায় জয়চিহ্নরূপে গগন আলোড়িত করিয়া উড়িবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ। সাধনার ইহা নূতন ব্যাখ্যা নহে; হিন্দু ভারতের ইহাই ছিল লক্ষ্য।

কর্ম্মবিমুখ হইয়া যে মানুষ ধর্ম্মপ্রত্যাশী হয়, সে এই প্রত্যক্ষ জীবনধর্ম্মের বিপরীত পথের যাত্রী। প্রাচীন ভারতের যজ্ঞকর্ম্মের প্রতিবাদেও এক শ্রেণীর মানুষ এইরূপ নৈষ্কর্ম্মকে স্থান দিতে পুনঃ পুনঃ চাহিয়াছে কিন্তু ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রভাব কোন যুগে তাহাতে ম্লান হয় নাই। মধ্যযুগের অবসন্ন ভারত নৈষ্কর্ম্মের দায়ে পড়িয়া দীর্ঘদিন কালহরণ করিয়াছে। নবযুগ সমাগমে কর্ম্ম-ব্রহ্মের প্রেরণায় জাতি উদ্বুদ্ধ, এ জলতরঙ্গ রুদ্ধ হইবার নহে।

জাতির সকলেই নববিধানের সন্ধান এককালে পায় না, জাগরণ-যুগ-প্রভাতে একদল অগ্রপুরোহিতের আবির্ভাবই লক্ষ্যে পড়ে, তাহারা সমলক্ষ্যে নিজ প্রকৃতি স্থানে স্থানে অগ্রসর হইতে থাকে। কেন্দ্রতত্ত্বের অভিন্নতা হেতু এই সকল যুগযাত্রীর মধ্যে এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দৃঢ়তর হয়। তারপর এই ঐক্যবদ্ধ সমষ্টিচৈতন্য গতিছন্দে বিশাল লোকসমষ্টি সৃষ্টি করিয়া জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। জাতি হইলে রাষ্ট্রের দাবী অনিবার্য্য। জাতির বাস্তবতা যত ঘনিমাময় হয়, রাষ্ট্রশক্তির অবতরণ ততই আসন্ন হইয়া উঠে। পররাষ্ট্রের সহিত সংঘর্ষের ঘোষণায় এই জাতিসংহতি শক্তি সঞ্চয় করে না, জাতি চৈতন্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত। অমৃতই জাতিকে পুষ্টি দেয়, প্রবৃদ্ধ করে। সৌরভ বুকে লইয়া পুষ্পের বিকাশ সদৃশ জাতিবীর্য্য—জাতির শিক্ষা, রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থ একে একে প্রকাশ করিয়া চলে। এই অপূর্ব্ব জাতি জীবনের গতির পরিচয় এখনও অজ্ঞাত স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাংলায় ঈশ্বরচেতনার উপর এমনই একটা জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি অতিশয় আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

এই জাতি প্রতিবাদী হইয়া দাবীর পর দাবী করিয়া বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংঘাত সৃষ্টি করিবে না, তাহাকে আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে বর্ত্তমান যুগের ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, প্রচলিত জীবননীতির সহিত সহযোগীতায় জাতির শাসনশৃঙ্খলার জন্য যে শিক্ষা, জাতির আত্মরক্ষার জন্য যে অস্ত্রবলের সাধনা সে সকলই শিক্ষার উপর নির্ভর করে। শিক্ষার্থী উদ্ধত মূর্ত্তিতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে কোনদিনই সমর্থ নহে। আমাদের দেশে বরণীয় অনেক কৃতিবান্ পুরুষকে দেখা যায়, যাঁহারা এই পথে চলিয়াই ধনবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ হইয়াছেন, দেশের শাসনশৃঙ্খলা রক্ষায় সুনিপুণ হইয়াছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। নবোত্থিত জাতি অতীতের অন্ধকায় পরিহার করিয়া জাতিগঠনের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও সাধনা পররাষ্ট্র বলিয়া উহার আধীন্য স্বীকার করিতে বিমুখ হইবে না। অসহযোগিতাই স্বাধীনতার একমাত্র ঘোষণা নহে, ইহার অন্য প্রকার অভিব্যক্তি দিবার পন্থা আছে, আমরা রাষ্ট্রীয় মুক্তি চাই, এই ঘোষণা সহযোগিতার মধ্যেও বজায় রাখিতে পারি। জাতির বীর্য্য যদি সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে সাধনার নীতি সুপরিস্ফুট হইলেই কোন অবস্থা বিশেষ স্বাধীনতার চৈতন্য রক্ষার হেতু হয় না। যুগধর্ম্মে অবস্থার পরিবর্ত্তনই শুধু বাঞ্ছনীয় নহে, অনিবার্য্য হইবে।

জাতি হিসাবে আমাদের বাঁচিতে হইবে। জাতীয় সংস্কৃতির বীজমন্ত্র অম্লান রাখার জন্য চাই যেমন সুনিবিড় তপস্যা, জাতীয় মস্তিষ্ক গড়ার জন্য চাই তেমনই জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উপর আমাদের পরিপূর্ণ অধিকার। জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির জন্য বর্ত্তমান অর্থবিজ্ঞানের নীতি আমাদের আয়ত্তে আনিতে হইবে। চাই জাতির হস্তে রাষ্ট্রশাসনের শক্তি। ইহার জন্য কচের শুক্র গৃহে নতি সাধনার দৃষ্টান্তে যুগশক্তির সহিত আমাদের পরিপূর্ণ ঐক্য। অকপটে যুগশক্তির সেবা ও আনুগত্য সর্ব্বতোভাবেই যোগ্যতা অর্জ্জনের প্রশস্ত পথ। অভীষ্ট পূর্ত্তির জন্যই এই নতি। ভিত্তিহীন জাতীয় গর্ব্ব আমাদের শ্রেয়ঃ দিবে না।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া যদি কেহ আত্মশক্তিকে উপলব্ধি না করিয়া জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে পরমুখাপেক্ষিতার জন্য তাহাকে পুনঃ

পুনঃ স্বপথ পরিত্যাগ করিয়া পর-সহায়-প্রত্যাশায় পরের মন যোগাইতে গিয়া অনেক সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি, আমি যদি স্বজাতি সৃষ্টি করিতে না পারি অথচ আমি আত্মমতাবলম্বী হই, তাহা হইলে প্রতিপদে আমাকে অন্যের সহিত আপোষ করিয়া আত্মমতের মর্য্যাদা নষ্ট করিতেই হইবে। যেমন প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের একটা সামান্য খাদির কথাই বলি। এই কার্য্যে সঙ্ঘের সময় ও অর্থব্যয় ব্যর্থই হইত, যদি তাহার স্বজাতি-সংস্থা এমন না হইত, যাহা সঙ্ঘের নির্ম্মিত খাদি-ব্যবহারের ক্ষেত্রস্বরূপ। তাহা হইলে হয় তাহার খাদিব্রত পরিত্যাগ করিতে হইত অথবা অন্যমতাবলম্বীর সহিত আপোষ করিয়া শুধু খাদিই চলিত, খাদির কাজের যে প্রাণ, তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক, তাহার মর্য্যাদা-রক্ষা হইত না। সমগ্র দেশ ও জাতি যাহা চাহে না, তাহাই যদি অন্তর্য্যামীর সত্য প্রেরণা হয়, তাহার মধ্যেই অমৃত থাকিবে। আর তাহা যদি শুধুই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় জিদ বা অভিমানপ্রসূত হয়, তাহা কোন মতেই শ্রেয়ঃ দিবে না। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অন্তরাত্মা যদি জাতির মুক্তিপ্রেরণায় অমোঘ সত্যের সন্ধান পাইয়া থাকে জাতির অতি বৃহদংশ যদি তাহার অনুকূল না হয়, তবে তাহার অতি ক্ষুদ্র স্বজাতির মধ্যেই সেই সত্যকে লইয়া গতির পথ খুঁজিতে হইবে। পথের বাধা সর্ব্বসময়ে পররাষ্ট্র নহে, ভিন্ন মত ও পথের যাত্রী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাধা সৃষ্টি করে। বাধা ভয়ের হেতু নহে। সত্যের পরীক্ষা চাই, সে পরীক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মে আত্মসমর্পণে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ এইখানে যদি নিঃসংশয় হয়, তবে তাহাকে স্বজাতি-সৃষ্টির সাধনায় অতঃপর অধিকতর ভাবে প্রবৃদ্ধ হইতে হইবে।

সর্ব্বপ্রথমেই আমাদের রক্তের বিচার চাই। হিন্দুর রক্তপ্রবাহে মুক্তিপ্রেরণা যদি সত্য হয়, হিন্দুজাতির উত্থান অবশ্যম্ভাবী। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ হিন্দু, অতএব হিন্দু জাতি তাহার লক্ষ্য। এই হিন্দুত্ব ক্ষুদ্রত্ব নহে; কেননা হিন্দু চিরদিনই বলিয়া আসিয়াছে—অল্পের জন্য সে নহে, যাহা ভূমা, তাহাই তাহার লক্ষ্য। হিন্দুরক্ত বলিয়া সে হিন্দু সংস্কৃতিকে পুরোভাগে ধরিবে, তাহার জীবন হইবে ভূমার জন্য, মানবতার জন্য; সর্ব্ব জাতির শুভ কামনাই সে চিরদিন লক্ষ্য করিবে। তার মন্ত্র 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং'।

হিন্দু জাতি মোক্ষবাদী নয়—জীবন-বাদী। তাই তাহাকে বর্ণাশ্রমী হইতে হইয়াছে। কত শক্ত মানুষ হইলে বর্ণধর্ম্মে স্বীকৃতি সম্ভব, খাঁটী হিন্দু তাহা বুঝে। এইজন্য তাহাকে আজ সর্ব্বপ্রকার মিশ্রধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হইবে। দেশের অতীত ও বর্ত্তমান মনীষী ও অবতার-পুরুষগণ যদি কোথাও এমন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন যাহাতে বেদবিশ্বাসী হিন্দুর, কর্ম্মবাদী হিন্দুর, বর্ণাশ্রমী হিন্দুর স্বধর্ম্মনিষ্ঠা মলিন হয়, তবে তাহা অতিশয় নির্ম্মমতার সহিত নাকচ ধরিয়া আমাদের দাঁড়াইতে হইবে। আমাদের কণ্ঠে বেদান্তের কেশরীগর্জ্জন তুলিবে। বেদ-প্রত্যয়ী হিন্দু কেমন করিয়া অস্বীকার করিতে পারে যাহা জানিলে আর কিছু জানার অবশেষ থাকে না, সেই পরাৎপর পুরুষকে? এখান-সেখান হইতে জ্ঞান আহরণ করিবে মধ্য ও বর্ত্তমান যুগের পরাভূত পঙ্গু। ইহার তাহার জ্ঞানের বৈষম্যদর্শনের অনুশীলন করুক সেই, বুদ্ধিকীট, যাহার মস্তিষ্ককোষকে অভিভূত করিয়াছে। আমাদের হইবে একনিষ্ঠ জ্ঞান। আমাদের মস্তিষ্ককে গড়িয়া তুলিতে হইবে এক অখণ্ড চৈতন্যে। বাংলা দেশের এক সহস্র মানুষের মস্তিষ্ক যদি এমন ভাবে গড়িয়া তোলা যায়, যেখানে মতভেদের আবর্ত্ত সৃষ্টি হয় না, আমরা দেখিব—অস্ত্রবলের অপেক্ষা এই ব্রহ্মণ্যশক্তির মহিমায় আবার একটা জাতির শিরে মুক্তি-জাহ্নবী সবেগে অবতরণ করিতেছে।

তরুণ বাঙ্গালী, প্রথম মন্ত্র তোমাদের—যাহা তুমি, তাহা জোর করিয়া বল। বল তুমি হিন্দু। সম্মুখে হিমালয়ের ন্যায় বাধা যদিও থাকে, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। বাধা বাধাই থাকিবে। তাহার সহিত তোমার সম্পর্ক কি? তোমার দ্বিতীয়—মন্ত্র সংগঠন। বিশৃঙ্খল মস্তিষ্ককে সুগঠিত করাই সংগঠন-মন্ত্রের সিদ্ধি—ইহার জন্য এক অব্যর্থ প্রকরণ আমি দিব।

দেওয়ার বস্তু নূতন নহে, অখণ্ড মস্তিষ্ক গড়ার জন্য চাই আমাদের নব বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়ের পঠন ও পাঠন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় সর্ব্বাগ্রে একটা

জাতির রক্তধারার সংস্কৃতির অনুযায়ী মস্তিষ্কের খোরাক দিতে হইবে। যথেচ্ছ রুচি একবুদ্ধি সৃষ্টি করিতে দেয় না। ইহার জন্য এক অদ্বয় ভগবানের ন্যায় এক অখণ্ড গুরুমূর্ত্তিই বরণীয়—সে গুরু হিন্দু ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। বেদকে দুর্ব্বোধ্য বলিয়া পরিহার করিলে চলিবে না। বেদের মন্ত্র-সংহিতা-ভাগ নবজাতি-গঠনের আয়ত্তে আনিতে হইবে। ব্যাসের ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত এই নূতন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্যপাঠ্য হইবে; আমরা এই মৌলিক ভারত-সংস্কৃতিকে অধিগত করিয়া ভারতীয় মস্তিষ্কের বিশুদ্ধি চাই সর্ব্বাগ্রে। মস্তিষ্ক যদি ভারতীয় হয়, সমস্ত অন্তঃকরণ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তদনুকূলে কর্ম্ম করিবে। এই সংহতিবদ্ধ একবুদ্ধিবিশিষ্ট জাতি-সমষ্টি যতই ক্ষুদ্র হোক, নিন্দায় ও খ্যাতিতে, সম্পদে ও দারিদ্র্যে, সাফল্যে ও বিঘ্নে অকাতর হইয়া জাতির জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী বীরের ন্যায় অবিশ্রাম কর্ম্ম করিয়া চলিবে।

বাংলা তাহাদের হইবে সর্ব্বপ্রথম কর্ম্মক্ষেত্র। তাহারা সংহতির পর সংহতি সৃষ্টি করিবে—ভারতসংস্কৃতির উপাদান শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়ের বিদ্যালয়ের সঙ্গে কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থকরী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া চলিবে। অধিকার ও যোগ্যতার পরিমাপে এই জাতি রাষ্ট্রশক্তির দাবী করিবে। তাহার প্রতিবাদী হওয়ার প্রয়োজন নাই। শক্তি যদি সিদ্ধ হয়, সুফল কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। স্বপক্ষ ও বিপক্ষ দুইই যন্ত্র। যন্ত্রীর কাছেই এই জাতির দাবী। যোগ্যতার দাবী বিশ্বনিয়মে কোথাও অস্বীকৃত হইবে না।

উপসংহারে আমি জাতিকে বলিব—আমরা মরিতে পারিব না, স্বাধীনতা আমাদের মুখ্য লক্ষ্য নহে। আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সদাচার, আমাদের সনাতন ধর্ম্মই আমাদের মুখ্য লক্ষ্য। ইহার জন্য জাতিকে দিতে হইবে আরও এক শত সর্ব্বত্যাগী ঈশ্বরপ্রাণ নারীপুরুষ। এই নবযুগের অগ্নিহোতৃদের ঘিরিয়া ঈশ্বর ও বেদ-বিশ্বাসী, কর্ম্মবাদী, বর্ণাশ্রমী হিন্দুদের মণ্ডলীবদ্ধ হইতে হইবে। সহস্র সহস্র হিন্দু এই সংগঠন-যজ্ঞে যথাসাধ্য অর্থ দান করিয়া সর্ব্বপ্রথম জাতীয় মস্তিষ্ক গড়ার পাঁচটী সুবৃহৎ শিক্ষা-নিকেতন গড়িয়া তুলিবে। ইহার মধ্যে একটী হইবে ভারতীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির, যেখানে নবজাতির শিক্ষার্থিগণ চরম সমাবর্ত্তনের সিদ্ধটীকা ললাটে আঁকিয়া হিন্দুসমাজের শক্তি বৃদ্ধি করিবে।

সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর "প্রবর্ত্তকে" জাতিগঠনের মন্ত্র অনাহত পাঞ্চজন্যে জাতিকে শুনাইয়াছি, অসংখ্য কর্ম্মের মাঝে এই প্রচারব্রত একদিনও ভঙ্গ করি নাই—তাহার জন্য ঈশ্বরপ্রসাদই দায়ী। এই অপার্থিব প্রেরণা "প্রবর্ত্তকের" এই দুর্ব্বোধ্য সাহিত্য সমস্ত বিশ্বের নিকট অনাদৃত হইলেও, আমার বস্তুতন্ত্র গর্ব্ব তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না; কেননা "প্রবর্ত্তকের" মন্ত্রই জাতি-রচনার শক্ত বেদী সঙ্ঘকে গড়িয়া তুলিয়াছে। সঙ্ঘব্রতী নরনারীর মর্ম্ম আকর্ষণ করিয়া "প্রবর্ত্তকই" তার ভাব ও প্রতিজ্ঞাকে বস্তুতন্ত্র করিয়াছে, সুদৃষ্টান্তে প্রমাণ করিয়াছে।

এই "প্রবর্ত্তক" হইতে আমি আজ ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নমিত শিরে বিদায় লইতেছি। এই ২৫ বৎসর "প্রবর্ত্তকের" দক্ষিণ হস্তস্বরূপ শ্রীমান্ অরুণচন্দ্রকে "প্রবর্ত্তকের" মন্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষার ভার দিতেছি। সঙ্ঘের একনিষ্ঠ সাধক "প্রবর্ত্তকের" সুযোগ্য পরিচালক শ্রীমান্ রাধারমণ প্রবর্ত্তকের তন্ত্রধারণের অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে। আর আছে প্রবর্ত্তকের মন্ত্র-দীক্ষিত সঙ্ঘের নারী-পুরুষ। "প্রবর্ত্তকের" জয়যাত্রা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গৌরবের সহিত হইবে, এ আশা বিন্দুমাত্র অনির্ম্মল নহে।

"প্রবর্ত্তক" হিন্দু-সংগঠনের ফলপ্রসূ একমাত্র মুখপত্র হইলেও আমার স্বদেশবাসী ইস্‌লাম বন্ধুদের ধর্ম্মে, আচারে ইহা কোনদিন আঘাত সৃষ্টি করিবে না। "প্রবর্ত্তক" ইস্‌লামধর্ম্মীর আজান ও নমাজ, মস্‌জিদ ও পয়গম্বরের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাদেরও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হওয়ার প্রেরণা দিয়াছে, ইহার জন্য আমি গৌরব অনুভব করি।

"প্রবর্ত্তক" রাষ্ট্র-স্বাধীনতা চাহিলেও, প্রচলিত রাষ্ট্রশক্তি দানরূপে বিধাতা যে জাতির উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, সেই রাজকর্ত্তৃপক্ষীয়গণ "প্রবর্ত্তকের" ভাব ও ভাষা লইয়া যদি কিছু মতদ্বন্দ্বে পড়িয়া থাকেন, সে অস্পষ্টতার জন্য তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণাই দায়ী। "প্রবর্ত্তক" বিক্ষোভ ও বিদ্বেষ পোষণ না করিয়াই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার স্বাধীনতার দাবী জানাইয়া গিয়াছে। কোথাও শাসন-শৃঙ্খলার ক্ষুণ্ণতা

আনে নাই। জাতি-বিরোধের আগুন সে জ্বালে নাই। ঘৃণায় মসীলিপ্ত করিয়া রাজশক্তিকে সে কলঙ্কিত করে নাই। "প্রবর্ত্তকের" এ গৌরব সামান্য নহে।

"প্রবর্ত্তক" নারীকে স্বাধীনতা দিতে চাহিয়াছে সত্য, কিন্তু প্রগতি অর্থে তাহাদের প্রকৃষ্টতর গতিই চাহিয়াছে। কুসুমের সৌরভের ন্যায় নারী সমাজ-গৌরব। তাই নারীকে "প্রবর্ত্তক" চাহিয়াছে অনাঘ্রাত ফুলের ন্যায় গড়িয়া তুলিতে। "প্রবর্ত্তকের" সাহিত্যে এমন অপূর্ব্ব নারী-চরিত্রের সংহতিও গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহাও আমার বড় কম আনন্দের কথা নহে।

"প্রবর্ত্তকের" পাঠকপাঠিকা, অনুরাগী বন্ধুগণ, ক্ষুদ্র দুই ফর্ম্মার পাক্ষিক হইতে বর্ত্তমান মাসিকের শ্রী ও শালীনতা আপনাদেরই স্নেহ ও অনুরাগে সম্ভব হইয়াছে। ২৫ বৎসর পরে, নিজের অক্ষমতার জন্য নহে, ভবিষ্যৎকে অবাধ কর্ম্মক্ষেত্রে দিতে আমি সসম্মানে বিদায়-প্রার্থী। নিজের জীবন নিঙড়াইয়া যাহাদের জাতিসেবায় দীক্ষা দিয়াছি, তাহারা আজ সর্ব্বক্ষেত্রেই পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইবে। আমি তাহাদের সেবা করিব, অনুসরণ করিব; ইহা বিদায়-বেলার একমাত্র কাম্য। আমি নিশ্চয় আশা করিব, চিরদিনের জন্য সকলেই "প্রবর্ত্তকের" এই নব অভিযানের সহায় হইবেন নবীন যাত্রীদের সাদরে বরণ করিয়া লইবেন।

"প্রবর্ত্তক" চিরদিন চাহিবে—জাতির নবজন্ম।" প্রবর্ত্তক" চাহিবে—নবজাতিকে ভারতীয় শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে গড়িয়া তুলিতে। "প্রবর্ত্তক" চাহিবে--জাতির প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া স্বাবলম্বনের সাধনায় সিদ্ধি দিতে "প্রবর্ত্তক" চাহিবে—জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতা। "প্রবর্ত্তক" চাহিবে—প্রাচীন সমাজ-জীবনের সুসংস্কার; সত্য, সংযম ও ঈশ্বর-সম্বন্ধের উপর হিন্দু সমাজের সুপ্রতিষ্ঠা।

আমার অকৃত্রিম সুহৃদ্ হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান বন্ধুগণ "প্রবর্ত্তকের" সূত্রেই অনেকের সহিত ভাব-বিনিময়ের সুযোগ পাইয়াছি; সেই প্রবর্ত্তক হইতে ইহার অধিকতর উন্নতি কামনায় আমি সকলের নিকটই শুভেচ্ছা প্রার্থনা করিয়া করপুটে যাচ্ঞা করিতেছি—বিদায়—ওঁ শান্তি, ওঁ হরি ওঁ।

---

# দু'দিনের এ পৃথিবী

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

আকাশেরে ভালবাসি, সেতো মোর ন্যায্য অধিকার,
বাতাসের লাগি আছে আইনতঃ জন্মগত দাবী,
আলোক আমার ভৃত্য, মোর তরে চন্দ্র সূর্য্য ওঠে;
বঞ্চিত কোরো না মোরে, হে ঈশ্বর, হবে অবিচার।
তুমি তো নির্দ্দয় নহ, বৃথা কেন এই কথা ভাবি!
তোমারই স্নেহের স্পর্শে অজ্ঞতার ঘুমঘোর টোটে।

তাই আমি বেঁচে আছি, বুক ভ'রে নিতেছি নিঃশ্বাস;
আকণ্ঠ করি যে পান ধরণীর স্তনের অমৃত;
নয়নে জ্বলিছে শিখা প্রদীপ্ত ভানুর সহচর।
আমারই লাগিয়া পৃথ্বী, এ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস,
ধনধান্যে পরিপূর্ণ, ফলে ফুলে রূপে রসে স্ফীত।
মোর লাগি' নিশিদিন মহাকাল গণিছে প্রহর।

নিজেরে ঘেরিয়া কেন বৃথা রচি মোহ-কারাগার!
দু'দিনের এ-পৃথিবী, বসন্তের পাতার বাহার।

# ইউরোপের কুরুক্ষেত্র

—শ্রীরমণ—

কুরুক্ষেত্রের সহিত একটা মহা আহবের স্মৃতি বিজড়িত। কুরুক্ষেত্র নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তপটে ভেসে উঠে একটা ভয়াবহ সমর-ক্ষেত্র, ধ্বংসের বীভৎস চিত্র, শ্মশান-ছবি, মৃত্যুর হুল্লোড় আর শৃগাল-শকুনি-চিলের উচ্ছৃঙ্খল-বিচরণ। কাণে যেন গুঞ্জন তুলে যায় প্রিয়হারার বুকফাটা আর্ত্তনাদ আর পরাজিতের করুণ বিলাপ। একদিকে মরণের নগ্নরূপ অপরদিকে জীবনের বিজয়োল্লাস। কালের চলস্রোতে ঘটনা তীব্রতা হারিয়ে আজ স্মৃতিতে পর্য্যবসিত হয়েছে। কিন্তু জীবনের এই আলো-অন্ধকারের দ্বন্দ্বসমন্বয়ী তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যে অমর গীতাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তা চিরযুগ আর্ত্ত অসহায় মানুষের অন্তরে আলো ও আশার দীপ অনির্ব্বাণ রেখেছে। কুরুপাণ্ডবের বিরোধকে কেন্দ্র করে সমসাময়িক একটা মস্তবড় কালাতীত মন যে জীবন-দর্শন দিয়ে গেছেন, তা সত্যই মানবতার অমূল্য সম্পদ ও সান্ত্বনা। কুরুক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্রে বলে অভিহিত করে মহামানব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যুদ্ধকে ধর্ম্মে উন্নীত করেছেন এবং ইহারই মাঝে তাঁহার অখণ্ড দার্শনিকতার নিগূঢ় মর্ম্মও নিহিত। এই আলোকেই বলা চলে যে, ইউরোপের কুরুক্ষেত্রও একটা ধর্ম্মক্ষেত্র। একে অসভ্য বর্ব্বরতার হিংস্র তাণ্ডব নৃত্য বলায় সত্যের, সৃজন-বিজ্ঞানের একদেশ দর্শনেরই পরিচয় দেয়। এ দৃষ্টিভঙ্গী হিন্দুর—আর্য্য ভারতীয় দর্শনসম্মত নয়।

তত্ত্ব ও বস্তু ( subject and object ), প্রাণ ও জড় ( spirit and matter ), জীবন ও মরণ, ভাল-মন্দ সকল দ্বন্দ্বকে পাশাপাশি রেখে যে অখণ্ড দৃষ্টি তাহাই হিন্দুর দার্শনিক দৃষ্টি। একটাকে বাদ দিয়ে একান্তভাবে আর একটাকে আঁকড়ে ধরায় সত্যের সবখানি মিলে না। যুদ্ধের হিংসাকে পরিহার করে শুধু মাত্র অহিংসাকে কল্পনা করা চলে না। অহিংসার মধ্যেই হিংসা আছে। নির্ব্বিশেষ অহিংসা যে নির্লিপ্ততা আনে তা জীবনের লক্ষণ নয়। এইরূপ অপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ব্যষ্টি বা সমষ্টি জীবনকে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করতে পারে না। বৌদ্ধযুগ হতে ক্রমাগত এইরূপ খণ্ড দৃষ্টি প্রশ্রয় পাওয়ার ফলেই ভারতের অধঃপতন সম্ভব হয়েছে।

জাগতিক অন্য সব ব্যাপারের মতই যুদ্ধও আকস্মিক ( accident ) কিছু নয়, পরন্তু ইহাও একটা ঘটনা ( incident ) যার পশ্চাতে নিবিড় কার্য্য-কারণরূপ শৃঙ্খলা আছে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরও তাই প্রাকৃতিক খামখেয়ালির বশে আকস্মিক সংঘটিত হয় নাই। একটা কার্য্য-কারণের (cause and effect ) বিস্তৃত পটভূমির উপর এই দাবানল প্রজ্জলিত হয়েছে। বস্তুতঃ এর পেছনের তত্ত্ব খুবই গভীর। এত গভীর যে একে আধ্যাত্মিকতার রং দিলেও তত্ত্বজ্ঞ দৃষ্টিতে আপত্তিকর হবে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সোপেনহারের প্রকরণবাদমূলক শক্তি-সাধনার ( will to power ) সঙ্কেত ইউরোপীয় চিন্তাক্ষেত্রে যে কর্ম্মচাঞ্চল্য ( activism ) এনেছিল তাইই পরবর্ত্তী শতাব্দীতে নীটশের অতিমানুষ (supermen) পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলে। বিংশ শতকে ফ্যাসিজম্ তথা একনায়কতন্ত্রের ( dictatorship ) প্রতিষ্ঠা ইহারই রূপায়ন মাত্র। পশ্চিমের মানসক্ষেত্রে একদা যাহা ছিল ভাব ( theory বা logy ) আজ তাহাই বিবিধ প্রকরণের ( ism ) মধ্যে প্রকট মূর্ত্তি ধরেছে। হেগেলীয় তত্ত্ব-নিরূপণ ও ডায়ালেকটিক্ বিচারপদ্ধতি উনবিংশ শতকের শেষাশেষি ইউরোপীয় চিন্তাধারাকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে। মোটামুটি বলা চলে, ও-দেশের ব্যতিরেকী দৃষ্টিভঙ্গীকে ( antethesis ) পুষ্টি করেছে হেগেল। মার্কস্-এঙ্গেলের দার্শনিক ও সমাজ-তান্ত্রিক মতবাদ তথা লেনিন, বুখারিন প্রভৃতির টিকাটিপ্পনি সমসাময়িক সমস্যার নিরাকরণোদ্দেশ্যে একটি পদ্ধতিবিশেষ। এ যেন সাগরগামী স্রোতস্বিনীর একটা পয়োনালী। হেগেলীয় সমগ্র-দৃষ্টির সম্পূর্ণতা এতে নাই। বিশেষ স্থানকালের প্রয়োজন এতে মিটলেও, অখণ্ড জীবন-প্রাচুর্য্যের প্রবাহে ভেসে অসীমে পৌছানো চলে না। হেগেলীয় ডায়ালেকটিক্ এবং মার্ক্সীয় বৈজ্ঞানিক জড়বাদ কতখানি

যুক্তিসহ সে বিচার না করেও, এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো যায় যে, এই সকল মতবাদের সম্মিলিত ফলে ইউরোপের জাতিসমূহ নেতিবাদের (antethesis) আশ্রয় নিয়ে একটা তুমুল সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়েছে। জার্ম্মাণজাতি নিজেকে ঈশ্বর প্রেরিত বলেই মনে করে—মনে করে সে ফ্রান্স নয়, রাশিয়া নয়, ব্রিটিশ বা অন্য কিছু নয়। সে জার্ম্মাণ জাতি—জগতে তার বিশেষ 'মিশন' আছে। ফ্রান্স, ইতালী, ব্রিটিশ প্রভৃতির বেলাও অনুরূপ কথাই খাটে। ইউরোপীয় জাতিসমূহের স্বকীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে এই একান্ত (exclusive) মনোবৃত্তি কোনরূপ সমন্বয়ের (synthesis) বা আপোষের অবসর দেয় না। প্রত্যেকটি জাতির বিশিষ্টতা এরূপ সুস্পষ্ট যে, পশ্চিমাকাশ আজ ইন্দ্রধনুর বিচিত্র রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতি-সমন্বয় (cultural fusion) হলে আর রঙের বাহার থাকে না। সর্ব্ব রং মিলেমিশে আকাশ সাদা হয়ে যায়। হয়তো বা ইহা স্রজনেরও অভিপ্রায় নহে। সৃষ্টির বিচিত্র সার্থকতা এতে থাকে না। ভাব, আদর্শ ও চিন্তাক্ষেত্রে জাতিনিচয়ের পারস্পরিক মনন-বৈশিষ্ট্য ইউরোপের বিরোধ অনিবার্য্য করে তুলেছে। এই বিরোধ ও সংঘর্ষের মাঝে বীরের মত বেঁচে থাকার গৌরববোধ তাদের দিয়েছে গতি ও শক্তি। আর চিন্তার এই বিশেষ ভঙ্গীই প্রাচ্য-বাইবেলের বৈরাগ্যবাদকে বর্জ্জন করে মৃত্যুর মধ্যে নবজন্মের স্বীকৃতিটুকু গ্রহণ করবার কারণ হয়েছে। এক গালে চড় খেলে আর এক গাল পেতে দিবার উপদেশ ওদেশবাসীর মনে কোন আবেদন জানাতে পারেনি। খৃষ্টের মৃত্যু (crusification) ও পুনর্জন্ম (resurrection) তাদের নিকট সহজভাবেই গৃহীত হয়েছে। জীবনের জন্যই মৃত্যুর (cross) তারা উপাসক বলে মরণের সম্মুখীন হতে ইউরোপীয়দের এতটুকু হৃদয় কাঁপে না। এদেশ মৃত্যুকে স্বীকার করেনি। মৃত্যু যেন ছিন্নবস্ত্র পরিত্যাগ। অনন্ত জীবনের উপাসক হিন্দু ভারত। দীর্ঘ পরাধীনতায় এবং বহু বিচিত্র বাদের আওতায় তত্ত্ব-দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে পড়ায় হিন্দু-সন্তানের নিকট আত্ম-মরণ আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছে। জীবন ও জাতীয় 'মিশন' হারানোরই ইহা কুফল।

ঘটনা পারম্পর্য্যের আশ্রয়ে ভাব প্রকরণের মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠে। মানুষের ইতিহাস রচিত হয় এমনি ভাবেই। অসীম কালের কোলে অসংখ্য রূপ-পরিবর্ত্তনের মধ্যে স্থিতি গতি পায় অথবা গতির স্থায় প্রতিভাত হয়। দেশ, কাল, ভৌগোলিক অবস্থান প্রভৃতি জাতির কৃষ্টি, সংস্কৃতি, উৎকর্ষ ও সভ্যতার বৈচিত্র্য দান করে। জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু পার্থিব জড় স্থূল বস্তুর অপরিহার্য্য পরিণতি। জাতীয় ভাব ও তত্ত্ব যখন সম্প্রসারণ তথা সংঘর্ষের প্রবণতা হারায় তখন তার আসে মৃত্যু। সৃষ্টির স্বভাবধর্ম্মেই এই সংবেগ সুগুপ্ত। ব্যষ্টির মত সমষ্টি জীবনেরও বাঁচার নির্দ্দিষ্ট পরিমিত কাল আছে। কালোপযোগী ভঙ্গী গ্রহণে ভাব বা তত্ত্ব বহু এবং বিচিত্র পরিবর্ত্তনের মধ্যেও সঞ্জীবিত থাকে। কিন্তু বাঁচা ও বৃদ্ধির দ্যোতনার হ্রাসে বস্তুর রূপের আসে মৃত্যু। ব্যষ্টির মতই জাতির ইতিহাসও যুগে যুগে সৃষ্টির এই শাশ্বত নিয়মেরই অন্তর্ভুক্ত। অস্তির বিলুপ্তি নাস্তির মধ্যে সম্ভব নয়, পরন্তু একটা পট-পরিবর্ত্তনের মতই আর একটা নবতর পর্য্যায়ের দরজা খুলে ধরে। ইউরোপীয় মহাসমর তাই একটা নবজন্মেরই গর্ভবেদনা। যত নির্ম্মম নৃশংস এর চেহারাই আপাততঃ হোক না কেন, উহা অনন্ত সৃষ্টির চলচ্চিত্রের একটা ভয়াবহ দৃশ্য মাত্র।

এই তাত্ত্বিক পটভূমির উপরই ইউরোপের কুরুক্ষেত্রের বিচার করে ব্যষ্টির বা জাতির কর্ত্তব্য নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়। পার্থিব সুখভোগ, সাম্রাজ্যলিপ্সা, অথবা কেবলমাত্র অর্থ-নৈতিক কারণে একটা জাতি দীর্ঘকাল স্থায়ীত্বের অধিকার অর্জ্জন করতে পারে না। তার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, সত্যের ও তত্ত্বের গভীরতা এবং জগৎ ও জীবন-ব্যাপারে অখণ্ড পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী জাতিকে জয়, ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যমণ্ডিত করে। ভূমা বা বৃহতের পটভূমির উপর জাতীয় উৎকর্ষ ও অনুশীলন যেখানে নিয়ন্ত্রিত হবে, সেখানে বিজয় অবধারিত। আজকের দিনে সাত সমুদ্র মন্থিত হয়ে যে গরল উঠেছে, তা পান করে কোন ভাগ্যবান জাতি নীলকণ্ঠ হবে তা ভাবীকালই নির্ণয় করবে। তবুও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জাতীয় জীবনের প্রতিজ্ঞা (premises) যে জাতির যত অমোঘ ও সত্যপূত কালচক্রে সেই জাতিই প্রমাণ করবে তার বেঁচে থাকার পরম সার্থকতা। যেহেতু জাতি বাঁচে আদৌ তার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দায়ে।

# জীবন-সঙ্গিনী

শ্রীমতিলাল রায়

## ২২

রিখিয়া হইতে ফিরিয়া দেখিলাম—মসিয়ে রিশার সশরীরে বিদ্যমান। তিনি চিরদিনের জন্য পণ্ডিচারী ছাড়িয়া আসিয়াছেন। তদীয় পত্নী মীরাদেবী শ্রীঅরবিন্দের নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। মসিয়ে রিশার শূন্যহৃদয় লইয়া কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের ন্যায় আমার ভবনে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

গৃহদেবীর কাজ বাড়িল। সাহেবের প্রয়োজন-পূরণের উৎকণ্ঠায় তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মিষ্টার রিশার নির্ব্বিকার চিত্তেই আমাদের আচার-ব্যবহারের সহিত একাত্ম হইয়া অতি সহজ ভাবেই দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্য নূতন ব্যবস্থার প্রয়োজন হইল না। ঘণ্টার তালে তালে জলযোগ, মধ্যাহ্নভোজন, নৈশাহার, সবই নির্ব্বিবাদে চলিল। দুই-চারি দিন পরেই ২২শে পৌষের উৎসব। মসিয়ে রিশারকে লইয়া এইবারের উৎসব-আয়োজনের আড়ম্বর কিছু বাড়িল। তাঁহার সঙ্গে দুইজন—মিসেস বেসান্টের শিষ্যও আসিয়াছিলেন। পণ্ডিচারী হইতে নলিনীকান্ত ও সুরেশচন্দ্র এই উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৫ই আগষ্টের ন্যায় ২২শে পৌষের উৎসব এবার বেশ জাঁকাইয়া উঠিয়াছিল। চন্দননগরের বিশিষ্ট কয়েক জন ভদ্রলোকও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই সভায় আমি সঙ্ঘের মধ্যে নব সমাজ-প্রবর্ত্তনের সূচনা-স্বরূপ শ্রীমান্ খগেন্দ্রনাথের সহিত শ্রীমতী অমিয়বালা বসুর বিবাহ-প্রস্তাব ঘোষণা করি। এই নব দম্পতীর মধ্যে সম্ভোগ-স্পৃহা না রাখার জন্য দ্বাদশ বৎসর উভয়কে ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষা করিতে বলি। এই প্রেরণা আমার নিজেরই; ইহার বহনসামর্থ্য নব দম্পতীর কতখানি আছে, সে বিচার করার অবকাশ সেদিন আমার ছিল না। রক্ত-মাংসের ক্ষুধার চেয়ে অন্তরের প্রেম ও ঐক্য আমার কাছে তখন বাস্তব মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছিল। আমার সংসর্গে যে কেহই আসিত, রক্ত-মাংসের ঊর্দ্ধেই তাহাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে উপদেশ দিতাম, সাহস দিতাম, সকল প্রকার সাহায্য করিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না। এবার ২২শে পৌষের উৎসব-পর্ব্ব এই ঘটনায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইয়াছিল।

বাংলার স্বদেশী যুগের পর ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এক নবযুগ-পর্ব্ব দেখা দিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর শক্তি ও প্রভাব নিখিল ভারত-জাতিকে নূতন আশায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। জালিওয়ানাবাগের নৃশংস ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া মহাত্মা গান্ধি ভারতে স্বরাজ-আন্দোলনের অগ্নিপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাংলার দেশপ্রাণ চিত্তরঞ্জন মহাত্মার রাষ্ট্রনীতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইলেন। অসহযোগ আন্দোলনের এই অগ্রপুরোহিতের পাঞ্চজন্য-ফুৎকারে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নবপ্রাণ অনুভব করিল। অসংখ্য ব্যবহারজীবী, কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিলেন। তারপর তাঁর কণ্ঠে ভৈরববিষাণ গর্জ্জিয়া উঠিল। সে আরাবে তরুণ ছাত্রজীবন ঝটিকাবর্ত্তে সমুদ্রবক্ষের ন্যায় বিপুল আলোড়ন তুলিল। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বাধীনতা লক্ষ্যে রাখিয়া দলে দলে ছাত্রগণ পথে আসিয়া দাঁড়াইল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন অপেক্ষা ১৯২১ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতার এই ভীম আবর্ত্ত অধিকতর ব্যাপক হইয়া উঠিল। বাংলায় দেশবন্ধু দেশের এই অপূর্ব্ব সাড়া পাইয়া উন্মাদ হইলেন; জাতির এই মহাশক্তিকে যথারীতি নিয়ন্ত্রিত করার জন্য তাঁর সেই প্রাণপণ প্রচেষ্টার কথা আমরা ভুলিতে পারি না।

দেশের জাতীয় জীবনের এই ভীম প্রবাহ আমাদেরও চিত্ত আকর্ষণ করিল। কিন্তু কেন্দ্র লক্ষ্য এমনই সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে, সে স্থান হইতে একটী মুহূর্ত্তের জন্য আমরা বিচলিত হইলাম না। শ্রীঅরবিন্দ যে নব বিধানের জন্য আমাকে কেন্দ্র করিয়া একটী সংহতি-সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করিতেছিলেন, তাহাতে জাতীয়তামূলক নব নব আন্দোলন আমাদের কর্ম্মসাফল্যের সুযোগই দিত, তাহার মধ্যে নিজেদের সন্নিবিষ্ট করিয়া দিবার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ উপলব্ধি হইত না। এই সকল ঘটনার সম্মুখে তর্জ্জনী সঙ্কেত করিয়া তিনি বলিতেন—

"It is a chaos and not a new order and it is essential that we should throw our spirit and idea upon this fermentation and draw what is best among its personalities and forces to the side and service of our ideal so as to get a hold and a greater means of effectuation for it in the near future."

অর্থাৎ ইহা নব বিধান নহে, একটী গণ্ডগোল। প্রয়োজন—আমাদের ভাব ও আদর্শ এই আবর্ত্তের উপর প্রয়োগ করা এবং ইহার মধ্যে যে সকল ব্যক্তি ও শক্তি আছে, তাহার উত্তমাংশকে আমাদের আদর্শবাদের অনুকূলে টানিয়া আনা, যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হয়, এবং ইহাকে কার্য্যকরী করার জন্য অধিকতর সহায়তা লাভ করি।" শ্রীঅরবিন্দের সঙ্কেত সেদিন মৃত্তিকা-গর্ভে বীজের ন্যায় অদৃশ্য হইয়াই থাকিত; কিন্তু তদনুযায়ী কার্য্য স্বভাবতঃই প্রকাশ হইয়া পড়িত। প্রতিজ্ঞাকে সম্মুখে রাখিয়া তদনুযায়ী দৃষ্টান্ত-সৃষ্টির জন্য মানুষের যে কসরৎ, তাহা আমাদের ছিল না। তিনি যাহা বলিবেন, তাহা শাশ্বতবাণী এবং উৎসর্গমন্ত্র সিদ্ধ হইলে, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু হইতেই পারে না—এই বিশ্বাসেই আমার সমস্ত কর্ম্মশক্তি পূত হইত। এই অন্তর-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই মহাত্মা গান্ধির চরকা ও খাদি আন্দোলনের বহু পূর্ব্বেই আমি স্বদেশী-বস্ত্র বয়ন আন্দোলন নিজেদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম। "মৃণালিনী বস্ত্রবয়ন কার্য্যালয়" তাহার দৃষ্টান্ত। এবার দেশব্যাপী এই ছাত্র-আন্দোলনের জাতীয় প্রেরণা আমায় এক অভিনব পথে আকর্ষণ করিল। বিদ্যা-বুদ্ধি, অর্থ-সামর্থ্য হিসাব করিয়া যাঁহারা কর্ম্মে অগ্রসর হন, তাঁহাদের প্রকৃতি প্রশংসার্হ, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার ভাগ্যলেখা বিধাতার বরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। সন্তরণ শিখিয়া জলে নামার নীতি সর্ব্বজন হিতকর; আমি কিন্তু সন্তরণপটু না হইয়াও, ঈশ্বরেচ্ছায় নির্ভর করিয়াই জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম। জীবন মরণ তৃতীয় শক্তির হস্তেই নির্ভর করিয়াছে চিরদিন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ছাত্র-আন্দোলন সহায়সম্পদ্‌হীন হইয়াও ঘরে ডাকিয়া আনিলাম বিনা সঙ্কোচে। সে কথা পরে বলিতেছি।

মসিয়ে রিশার আমার নিকট আগমন করিলে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার বিষয়ে জানিবার জন্য কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মসিয়ে রিশারের অন্তরের কথা জানিবার জন্য স্বভাবতঃ আমিও কিছু ব্যগ্র হইয়াছিলাম; কিন্তু কোন কথাই তিনি ব্যক্ত করিতেন না। কেবলই বলিতেন—শ্রীঅরবিন্দকে আমি অতি-মানবের ক্ষেত্রে স্থান দিয়া প্রতারণা করিয়াছি, এই সত্য আমি আর রক্ষা করিতে পারি না, ইহাই দুঃখ; আমার এই দৃষ্টিভ্রান্তি নিজের জীবনকে বিষাক্ত করিয়াছে। আমি যাহা ছাড়িয়া চলিয়াছি, তাহার দিকে আর চাহিব না, ফিরিব না—ইহাই আমার সঙ্কল্প।"

অতিশয় ব্যথিত ও আর্ত্তের ন্যায় মসিয়ে রিশার তপ্ত দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন। জ্যোৎস্নারাত্রিতে গঙ্গাতীরে সারারাত্রি বসিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতাম—তাঁহার মর্ম্মব্যথার মূল কারণটী খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য। মনের অন্তরালে সে কারণের অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি যে না ভাসিত, তাহা নহে; কিন্তু তাহা আমলে আনিতে বাধিত। মসিয়ে রিশারের মুখ হইতে তাই তাঁর ব্যথার সূত্রটী বাহির করার চেষ্টা করিতাম। এই ফরাসী পুরুষের মহত্বের কথা না বলিলে, তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। তাঁহার মুখে কোন দিন তাঁহার নিদারুণ মর্ম্মযন্ত্রণার সত্য ইতিহাস কেহ শুনে নাই। বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় বক্ষ চাপিয়া আর্ত্তকণ্ঠে তিনি বলিতেন—"আমি রক্ত নহি, মাংস নহি, নশ্বর হৃৎপিণ্ড নহি। আমি আত্মা, শাশ্বত সনাতন"—বলিতে বলিতে এক শুভ্র-চেতনায় তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া হৃদয়-ভার লঘু করিতেন।

মসিয়ে রিশারের প্রসঙ্গ লইয়া গৃহদেবীর সহিত নানা প্রসঙ্গে বহু তর্ক করিয়াছি। এই বিদেশীর অব্যক্ত বেদনার পরশ যেন তিনিও বুকে লইয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিতেন—'ঐ ব্যক্তির দুঃখের কথা তোমরা বুঝিবে না, আমি কিন্তু বলিতে পারি, ঐ বিষণ্ণ মূর্ত্তির মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথার রাগিণীর অর্থ কি?'

আমি এই অপ্রিয় প্রসঙ্গের বিশদ চিত্র আঁকিব না। তবে মানুষ কোন গুরুতর, অপ্রিয়সত্য, সহিষ্ণুতা, আত্মমর্য্যাদা ও মহত্বের প্রেরণায় চাপিয়া চলার চেষ্টা করিলেও, জীবনের কোন না কোন ঘটনায় তাহার অভিব্যক্তি প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। মসিয়ে রিশার দিনের পর দিন উদয়াস্ত হাসি-কথায়, অধ্যয়নে, অধ্যাপনায় জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যমূর্ত্তি অম্লান রাখার যতই চেষ্টা করুন না কেন, থাকিয়া থাকিয়া কালবৈশাখীর ঝড়ে কোথা হইতে মেঘ আসিয়া তাঁহার মুখখানির উপর কালী ঢালিয়া দিত, শত সতর্কতা সত্বেও তাঁহার সে ভীষণ মূর্ত্তি মাঝে মাঝে আমাদের সন্ত্রস্ত করিত। একদিন ইহার চরম হইল; সেই ঘটনাতেই মসিয়ে রিশারের বর্ম্মাবৃত হৃদয়ের দুঃখ গলিত লৌহের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

এক সন্ধ্যায় শ্রীঅরবিন্দের সাধনপ্রসঙ্গ লইয়া আমাদের আলোচনা চলিতেছিল। কথায় কথায় মনে হইল—মসিয়ে রিশার শ্রীঅরবিন্দের প্রতি আমার শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের গভীরতা মাপিয়া দেখার চেষ্টা করিতেছেন। সেদিন তাঁহার কথা তাই আমার কাণে যেন বেসুরা বাজিতেছিল। আত্মসমর্পণের সাধনা ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া সম্ভব হয় কি না, এইরূপ তর্ক প্রসঙ্গে মসিয়ে রিশার সমর্পণের কেন্দ্র অপৌরুষেয় অনন্ত সত্তাই হইতে পারেন, এই তত্ত্বই প্রমাণ করিতেছিলেন। প্রাণভৃৎ দেহীর আত্মসমর্পণ অব্যক্তকে আশ্রয় করিয়া সম্ভব হয় না, ইহাই ছিল আমার কথা। কথায় কথায় কণ্ঠ আমাদের উচ্চগ্রামে উঠিয়াছিল। ব্যক্ত পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ শ্রেয়ঃ, ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ

আমি মাদাম রিশারের কথা উত্থাপন গোপন করিলাম এবং মাদাম রিশারের অভিমত প্রমাণ-স্বরূপ দেখাইবার জন্য "প্রবর্ত্তকের" যে সংখ্যায় মীরাদেবীর সচিত্র উক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সংখ্যাটী তাঁহার নিকট ধরিলাম। তিনি অতি দ্রুত "প্রবর্ত্তকে"র পাতাগুলি উল্টাইয়া মীরাদেবীর ইংরাজী উক্তিটী পড়িয়া লইলেন; তারপর যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন তাঁহার চক্ষে ও মুখে প্রকাশিত হইল, ভাষায় তাহার প্রকাশ হয় না।

লেখাটী পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেতসপত্রের ন্যায় তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, তারপর "প্রবর্ত্তকটী" দৃঢ়-মুষ্টিতে উঠাইয়া আমার উপরে তিনি তাহা সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। পরে সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ পুরুষ বজ্রমুষ্টি উদ্যত করিয়া আমার দিকে ধাবিত হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার এই ভীমমূর্ত্তি আমায় বিচলিত করিল। তাঁহার ঘূর্ণায়মান রক্ত চক্ষু দেখিয়া মনে হইল—তিনি উন্মাদ হইয়াছেন। গৃহমধ্যে একা তাঁহার নিকট অবস্থান করা নিরাপদ্ মনে হইল না; ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্যের সাহায্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার ব্যবস্থার জন্য আমার বন্ধুদের অন্বেষণ করিলাম। তাহাদের দুই চারি জনকে লইয়া যখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম—মসিয়ে রিশার নাই, ঘরে তাঁর যে সামান্য আসবাব-পত্র ছিল মুহূর্ত্তের মধ্যে সেগুলি লইয়াই তিনি প্রস্থান করিয়াছেন। নানা স্থানে খোঁজ করিয়া যখন তাঁহাকে পাওয়া গেল না, নিরাশ হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। গৃহলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন—"লোকটী গেলেন কোথায়? আত্মহত্যা করিবেন না তো?"

প্রকৃত অবস্থাটী তখনও তলাইয়া বুঝিতে পারি নাই। ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনিয়া আমার স্ত্রী বলিলেন—"তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই নাই। পুরুষ-মানুষ যাহা সহিতে পারে না, সেইখানে আঘাত দিয়া তুমি ভাল কর নাই।"

এই ঘটনায় নানা দ্বন্দ্ব-সংশয়ে আমার হৃদয়ে ঝড় বহিতে লাগিল। স্ত্রীর সহিত এই প্রসঙ্গ লইয়া অনেক আলোচনা চলিল। মসিয়ে রিশারের আচরণ যতই বুদ্ধিহীনতার লক্ষণ বলিয়া আমি প্রমাণ করিতে চাহিলাম, ততই তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ইহা হয় না। নারীর আত্মসমর্পণ স্বামীর কাছেই; স্বামী যাহার নাই তাহার কথা বলিতেছি না।" আমি বলিলাম—"স্বামীর কাছেই যে নারীর আত্মসমর্পণ হইবে, এমন কথা বেদবাণী নহে।"

তিনি বলিলেন, "তাহা না হইতে পারে, কিন্তু স্বামীর সম্মতি তাহাতে থাকা চাই।"

আমি বলিলাম, "স্বামী যদি সম্মতি না দেন, নারীও মানুষ, সে কি তার সত্যকে এই জন্য অস্বীকার করিবে?"

তিনি বলিলেন, "সত্য-মিথ্যার বিচার-বুদ্ধি আমার নাই। স্বামীও সত্য। এক সত্যকে অস্বীকার করিয়া আর এক সত্য মিলিতে পারে, ইহা আমি স্বীকার করি না। আমাদের ঘটে যে বুদ্ধিটুকু আছে, তাহা দিয়াই তোমায় বুঝাই—তোমাকে ছাড়িয়া আমি যদি মহত্তর সত্যে আশ্রয় লই, তোমার মন কি তাহাতে সান্ত্বনা পাইবে?"

বলিলাম বটে, কোন মহত্তর সত্য পাইলে, আমার আপত্তি তাহাতে কেন হইবে; কিন্তু বস্তুতঃ ঘটনা এইরূপ হইলে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা আমায় ভাবিতে হইয়াছিল।

জাগতিক সম্বন্ধের সহিত অধ্যাত্মক্ষেত্রে সামঞ্জস্য লইয়া আমার মনে তীব্র আন্দোলন চলিয়াছিল; সংস্কার অথবা ভারতের ইতিহাস যে মনোবৃত্তি আমার গড়িয়া দিয়াছে, তাহাতে এই বিষয়টী স্বচ্ছন্দ ভাবে গ্রহণ করিতে আমার বাধিয়াছিল, এ কথা স্বীকার না করিলে মিথ্যা প্রশ্রয় পায়।

মানুষ সত্য হইতে সত্যের আশ্রয় চলিয়াছে অথবা মিথ্যা হইতে সত্যে আশ্রয় লইতেছে, এ কথার উত্তর কে দিবে? যাহা শ্রেয়ঃ, তাহা গ্রহণ করিতে যদি বাধা দাঁড়ায় স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, যশঃ-খ্যাতি, তবে তাহা বিসর্জ্জন দিয়াই চলিতে হইবে। মীরাদেবীর আজীবন-স্বপ্ন সফল হওয়ার শুভ সুযোগ যেখানে, সেখানে তাঁহার সমস্ত অতীতটাকে বিসর্জ্জন দেওয়াই তো তাঁর সৎ সাহস ও সত্যানুরাগের পরিচয়। মীরাদেবী যাহা করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার অধ্যাত্ম-ধর্ম্ম। মসিয়ে রিশার সে ধর্ম্ম স্বীকার করিতে পারেন নাই; কাজেই তাঁহাকে পত্নীত্যাগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু ব্যথা তাঁহার সঙ্গী হওয়ায়, ভদ্রলোক শান্তিহীন; জীবন তাঁর মরুভূমি হইয়াছে। আত্মসমর্পণের কষ্টি-পাথরে আপনপর হয়, পর আপন হয়; এ রহস্য চিরাচরিত। এই ক্ষেত্রে মাতা পুত্রহারা হয়, পত্নী পতি হারাইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে; সংসারে এমন ঘটনা বিরল নহে। যার যে-আপন, সে তার নিত্যসঙ্গী। এই জীবন-মরণ সম্বন্ধ অধ্যাত্ম-জীবনসাধনায় মিলিতে পারে; জাগতিক সম্বন্ধও যদি নিত্য হয়, তবে তাহা শ্রেয়ঃকে ক্ষুন্ন করিবে না। বুঝিলাম—মসিয়ে রিশারের আশ্রয় মীরাদেবীর নিত্য আশ্রয় নয়, শ্রীঅরবিন্দই তাঁহার আপন জন। এইখানে আত্মনিবেদন করিতে গিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব-পণ আত্মোৎসর্গের যোগ্য দক্ষিণা। মসিয়ে রিশার বিপরীত-ধর্ম্মী, অতএব তাঁহাকে চিরবিদায় লইতে হইল। মসিয়ে রিশারের উদ্দেশ্যে অশ্রু তর্পণ করিয়া রিশার সম্পর্কিত ঘটনার যবনিকাপাত হইল।

(ক্রমশঃ)

# "টু লেট"

## শ্রীহাসিরাশি দেবী

"টু লেট"

লেখা পিজ্‌বোর্ডখানা ছাদের কার্ণিশ থেকে একটা সরু দড়ি বাঁধা অবস্থায় পথের ওপোর ঝুলতে দেখে যে লোকটা সোজাসুজি মহেশ্বরের সামনে এসে দাঁড়ালো, তার বয়স কত তা ঠিক ধরা চলেনা, তবে তরুণ বলা চলে। সুস্থ সবল চেহারা তার, লম্বা দাড়ী আর গোঁফে মুখমণ্ডল ঢাকা, পরণে খদ্দর, পায়ে স্যাণ্ডেল।

মহেশ্বরের সামনে কতকগুলি ঠিকুজি কুষ্টি ছড়ানো; এক পাশে একটা পুরাতন, মরচে ধরা গুড়গুড়ি।

মহেশ্বর একহাতে গুড়গুড়ির নলটা মুখে ধরে অনবরত টানতে টানতে চোখের দড়ি-বাঁধা চশমার সাহায্যে কাগজগুলি পরীক্ষাই করছিল বোধ হয়।

সম্মুখ দিয়ে, এই সময়েই আগন্তুক মানুষটিকে অসঙ্কোচে ভেতরের দিকে যেতে দেখে প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল, তারপর নাকের চশমাটা কপালের ওপোর তুলে ডাকলো—"বলি ওহে, ও—, শোনো, শোনো।"

আগন্তুক ফিরলো।

মহেশ্বর প্রশ্ন করলো—"কে হে তুমি ছোকরা? নাম কি তোমার—যাচ্ছিলে কোথায়?"

প্রশ্ন শুনে সে হাসিমুখে জবাব দিলে—"ঘর ভাড়া খুঁজতে বাড়ীওয়ালার সন্ধান করছিলাম মশায়; আমার নাম—অবিনাশ সরকার। মশায়ই কি বাড়ীর মালিক?"

যেন বুঝবার চেষ্টা করলে, তারপর জবাব দিলে—"হ্যাঁ, আমিই বাড়ীওয়ালা।"

—"মহাশয়ের নাম?"

—"মহেশ্বর আচার্য্য।"

মহেশ্বরের সম্মুখে ছড়ানো ঠিকুজি-কুষ্টিগুলোর ওপোর একবার বক্র দৃষ্টিপাত করে অবিনাশ বললে—"মহাশয়ের দেখছি এসব চর্চ্চাও করা হয়—" ব'লে ইঙ্গিতে কাগজগুলো দেখিয়ে সে সেইখানেই উঁচু হ'য়ে ব'সলো।

যে কথার জন্যে সে এ বাড়ীতে প্রবেশ ক'রেছিল, সে কথা ভুলে পাড়লো অন্য কথা—"দেখুন মশায়, এই ঠিকুজি-কুষ্টির ওপোর আমারও দারুণ বিশ্বাস; কিন্তু কি ব'লবো, আমার ঠিকুজি কুষ্টিই নেই; পাঁচ জায়গায় পাঁচজনকে হাত দেখিয়েও কোন ফল পাইনে। হাত দেখে যে যা বলে, কার্য্যকালে ঠিক তার উল্টো ফল পেয়ে মন যায় খারাপ হ'য়ে। ভাবি, দুত্তোর ছাই, আর ওদিক্ মাড়াচ্ছিনে। কিন্তু মনটা এমন সংস্কারাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছে মশায়—যে মাটির পুতুল পুজো হ'তে দেখলেই মাথাটা যেমন অজ্ঞাতে নীচু হ'য়ে পড়ে, আর তেমনি কাউকে হাত গুণতে দেখলেই হাতখানা কেমন যেন আপনি চ'লে যায় সামনের দিকে।"

মহেশ্বর বোধ হয় বিস্মিত চোখেই চেয়েছিল ওর দিকে, এইবার প্রশ্ন ক'রলে—"মশায়ের নিবাস?"

ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন আপনি, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এর জন্যে। আজ্ঞে, নিবাস আমার যেখানে সেখানে, আর সেইটার তাগাদাতেই আপনার বাড়ী অনধিকার-প্রবেশ।"

মহেশ্বর একটু গম্ভীর হ'য়ে প'ড়লো।

ঠিকুজি কুষ্টিগুলো একপাশে সরিয়ে রাখতে রাখতে প্রশ্ন ক'রলো—"ঘর কি আপনি ভাড়া নিতে চান?"

অবিনাশ উত্তর দিলে—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"কি কাজ করেন আপনি?"

—"বলেছি তো, কাজ বিশেষ কিছুই করিনে; তবে তা না করলেও ভাড়াটা আপনি নিয়মিতই পাবেন; সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।"

এক ফালি তীক্ষ্ণ হাসি তার ঠোঁটের ওপর ভেসে উঠ্‌ল ধীরে ধীরে।

অবিনাশ যে ঘরটা ভাড়া নিলে, সে ঘরটা ঠিক মহেশ্বরের শোবার ঘরের ওপরে।

সামনে ছোট একফালি বারান্দা, চওড়ায় ছোট, লম্বায় হাত তিনেক। এখানে থেকে দেখা যায় নীচের কলতলা,

মহেশ্বরের রান্নাঘরের খানিকটা, আর সামনেই লাহাদের বাগানের মধ্যে ঘন করে পোতা কলাগাছগুলো।

নিশীথ রাতের হাওয়ায় ঐ পাতাগুলো নড়ার শব্দ কাণের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে; পোষা পাখীগুলোরও ডাক শোনা যায়।

অবিনাশ এই ঘরটায় এসে উঠলো।

তৈজস-পত্রের ভার সামান্যই, নেই ব'ললেও চলে; তবু, তাই এধারে ওধারে ছড়িয়ে ফেলে তার মধ্যে একটু সতরঞ্চি পেতে সে সটান শুয়ে প'ড়লো হাত-পা মেলে।

গত রাত্রে ঘুম হয়নি, এখন যেন দুই চোখ বুজে ঘুম আসছে।

—"আঃ"। অবিনাশ শুয়ে পড়লো।

কাণে এলো একটা দমকা হাওয়ায় কলাপাতা নড়ার পত্‌ পত্‌ শব্দ, পাখীর ডাক—।

নীচে থেকে মহেশ্বরের কণ্ঠস্বরও ভেসে এলো সেই সঙ্গে—"ওরে পেঁচো, তামাক দিয়ে যা, আর এক ছিলিম।"

অবিনাশের চোখ বুজে এলো।

কতক্ষণ কেটে গেছে সে জানে না, হঠাৎ বারান্দায় কার চঞ্চল পায়ের দুপ দাপ্‌ শব্দ শুনে সে উঠে ব'সলো।

—"ওখানে কে ও?" উত্তর নাই। আবার সে প্রশ্ন ক'রলো—"ওখানে কে?"

এবারও কোন উত্তর এল না, কিন্তু বেশ বোঝা গেল—বারান্দায় দরজার পাশ ঘেঁষে কে যেন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে নিজেকে গোপন করবার চেষ্টায়।—বিপরীত দিক্‌কার আলোয় তার ছায়া এসে পড়েছিলো দরজার ওপরে। সেই ছায়া লক্ষ্য ক'রে অবিনাশ উঠে পড়লো; দরজার ওপর দাঁড়িয়ে দেখলে—অপরাধী বিশেষ কেউ নয়, একটি কিশোর। বয়স বড় জোর দশ কি এগারো, চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা কোমলতার সঙ্গে দুষ্টুমী মাখানো।

একে সারাদিনের ক্লান্তি, তাতে বাসা তুলবার দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অনাহারে সারাদিন থাকার জন্যে অবিনাশের মেজাজ হ'য়ে উঠেছিল তিক্ত, বিরক্ত; কঠিন স্বরে সে প্রশ্ন ক'রলে—"কি চাও?"

ছেলেটি বোধ হয় ভয় পেয়েই চোখ-দুটো বড় বড় ক'রে মৃদু কম্পিত স্বরে উত্তর দিলো—"কিছু না।"

—"তবে এখানে কেন?"

—"এখানে?"

একটু থেমে সে উত্তর দিলে—"এমনি।"

"এমনি? চালাকী পেয়েছো? চারিদিকে সব জিনিসপত্র ছড়ানো, আর তুমি ঘর পার হ'য়ে বারান্দায় এসেছো এমনি? পাজী ছেলে! কাণ ম'লে লাল ক'রে দেব আবার এধারে এলে। যাও বলছি এখান থেকে, যাও—"

বিদায়-বারতা পেয়ে ছেলেটি যেন এত অপমান সত্বেও বেঁচে গেল। একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে অবিনাশের মুখের দিকে তাকিয়ে দ্রুত পায়ে ঘর পার হ'য়ে গেল। অবিনাশ ডাকলে: "এই—"

সে মুখ ফিরালো।

এগিয়ে এসে অবিনাশ প্রশ্ন ক'রলো—"তোর নাম কিরে?"

—"পাঁচু।"

আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে পাঁচু বোধ হয় তিন লম্ফেই অদৃশ্য হ'লো সেখান থেকে।

নীচেয় যেন রাম-রাবণের যুদ্ধ আরম্ভ হ' যুদ্ধটা বাক্যের। নারী কণ্ঠে হচ্ছিল—"যাবিনে! আলবৎ যাবি। আমি ব'লছি তোর যেতে হবে।"

পাঁচুর উত্তর শোনা গেল—"এঃ—উনি আমার লাটসায়েব কি না, তাই ওনার হুকুম মেনে চ'লতে হবে আমাকে। দায় প'ড়েছে আমার। আমি কক্ষণো যাব না ইস্কুলে।"

—"বটে!"

বারান্দায় এসে রেলিংয়ের ওপরে ঝুঁকে প'ড়ে অবিনাশ দেখলে, মহেশ্বরের রন্ধনগৃহ থেকে রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে হাতে খুন্তি নিয়ে আবির্ভূতা হ'লেন এক নারী-মূর্ত্তি; দারুণ ক্রোধে তাঁর মুখমণ্ডল আরক্ত, সদ্যস্নাত চুলগুলো মাথার তালুতে উঁচু করে বাঁধা।

কণ্ঠস্বর আর একপর্দ্দা চড়িয়ে সে ব'ললে—"তা যাবে কেন? বাড়ী ব'সে ভগ্নিপ'তের অন্ন ধ্বংস ক'রবে আর ছাতে ছাতে ঘুড়ি উড়িয়ে বেড়াবে, কেমন? হারামজাদা, পাজী কাঁহাকা! আসুক আজ বাড়ীতে—জুতোর বাড়ীতে খাল খিঁচে যদি না ছাড়ি তো আমার নামই—"

হঠাৎ ওপর দিকে দৃষ্টি পড়তে রণরঙ্গিনী নারী লজ্জানতা বধূর মত সঙ্কুচিত অবস্থায় আবার রন্ধনগৃহে প্রবেশ করলেন। অবিনাশও নিজের ঘরে এসে বসলো একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে, কিন্তু তারপরে সে সারাক্ষণ উৎসুক হ'য়ে থেকেও জুতোর ঘায়ে পাঁচুর অঙ্গসেবার কোনও লক্ষণই শুনতে পেলেনা; বরঞ্চ নীচের তলায় বেশ শান্তিই বিরাজ ক'রছে ব'লে মনে হ'ল। শুনলো মহেশ্বর গুণগুণিয়ে গাইছে—

"তারা তারা তারা ব'লে আমার কবে যাবে দিন—"

দিন হয়তো ধীরে ধীরে সত্যই কেটে যাচ্ছিল ঠিকুজী কুষ্ঠি মিলিয়ে, বেশ নিরুদ্বিগ্ন ভাবে; কিন্তু মহেশ্বরকেও বিচলিত করে তুললো পাড়া-পড়শী শুভার্থীদের কথা—"নতুন আসা ছোঁড়াটা তো সারা দিনরাত ঘরেই থাকে দেখি, কাজ করে কখন?"

মহেশ্বর ব'লল—"কাজ ও করে না।"

—"কাজ করে না, অথচ মাসে মাসে ভাড়া দেয়; আজকালকার দিনে এ আবার কি উৎকট সখ, ছোঁড়া স্বদেশী নয়তো?"

—"স্বদেশী?"

দুনিয়ায় ঐ জিনিষটাকেই বোধ হয় মহেশ্বর ভয় করে বেশী।

"স্বদেশী" কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে হাতকড়া, লাল পাগড়ী, আর চাবুকের ঘা।

—"ও বাবা!" মহেশ্বর চ'মকে ওঠে। লোকে বলে কিন্তু ভাড়া যতক্ষণ দিয়েছে—ততক্ষণ আর তাকে জোর করে ওঠাতে পাচ্ছ না বাছাধন,—সেই আইন নেই আজকাল।

মহেশ্বর আর একবার চমকে ওঠে।

কয়েকদিন ধ'রেই মহেশ্বরের মুখের ওপর যেন গাম্ভীর্য্যের একখানা ঘন মেঘ ভেসে উঠেছে বলে অবিনাশের মনে হয়।

শারীরিক কুশল প্রশ্নও সে তাকে অনেকবার করেছে, কিন্তু মহেশ্বর বলে—ভালই আছে সে।

অগত্যা অবিনাশ ভেবে নিলে—এ নিশ্চয় পারিবারিক কলহ, পাঁচুর দিদির সঙ্গে নিশ্চয় ঝগড়া হয়েছে। কিন্তু কই?—দিন রাতের মধ্যে তারও তো একটা আভাষ পাওয়া যেত! বরঞ্চ মনে হয় ওরা সকলেই যেন তাকেই দিনরাত লক্ষ্যের মধ্যে রেখেছে।

মেসে খেতে যাচ্ছিল অবিনাশ।

সামনের ঘর থেকে মহেশ্বর ডাকলে: "শুনুন—"

অবিনাশ থমকে দাঁড়ালো: "আমাকে বলছেন?"

—"হ্যাঁ—"

ঠিকুজী কুষ্ঠির তাড়া সামনে থেকে এক পাশে ঠেলে রেখে মহেশ্বর উঠে এলো। "বলছিলাম কি—"

—"কি, বলুন।"

"ঐ দোতলার ঘরটার ছাদের কোণে জল জমছে কিছুদিন ধ'রে—ওটাকে মেরামত করা শীগ্‌গিরই দরকার, কারণ—সামনেই আবার বর্ষা আসছে। তাই বলছিলাম, যদি আপনি কিছুদিনের মত অন্য কোথাও—"

কথাটা অবিনাশকে বেশী ক'রে বোঝাতে হ'লো না। ব'ললে: "সে কি মশায়? ঘর যখন ভাড়া দেন, তখন তো এ কথা বলেননি; এখন হুট্ ব'লতে ঘর ছেড়ে যাব কোথায়?"

মহেশ্বর বিপদে পড়লো। "না, না, সে রকম তো কিছু ব'লছি না—তবে কিনা ছাতটা মেরামত—"

অবিনাশ আর দাঁড়ালো না, হাতঘড়িটার ওপর একবার দৃষ্টিপাত ক'রে চ'লতে চ'লতে ব'ললে: "বেশ তো, মেরামত করাতে চান, করান না, তাতে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি কিসের? তবে যদি দরকার হয় তো রাজমিস্ত্রী আমার ঘরেও লাগাতে পারেন।"

চারিদিক স্যাণ্ডালের শব্দে মুখরিত ক'রে সে চ'লে গেল।

দরজায় দাঁড়িয়ে মহেশ্বর ওর স্ত্রীকে ডাকলো: "ওগো, শুনছো!"

ডাক শুনে সরস্বতী ঘর ছেড়ে বার হ'য়ে এলো: "কি, ব'লছো কি?—চেঁচাচ্ছ কেন গাঁ গাঁ ক'রে?"

মহেশ্বর চোখ মট্‌কে বললে—"হট্ টেম্পার দেখ্‌ছি যে,—ব্যাপার কি?"

—"ব্যাপার আবার কি?—সারাদিন খাটাখাটুনীর শরীর, শুলেই যদি একটু চোখ্ বুজে আসে—তাও তোমার সহ্য হয় না।"

মহেশ্বরের চোখে মুখে একটা নিষ্ঠুর বিদ্রূপ ফুটে উঠলো—"সহ্য হয় না। আমার ডাকটাও সহ্য হয় না, ঘুমের ব্যাঘাত হয়। আর দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জেগেও যখন ভাইয়ের জন্যে সোয়েটার বোনা হয়,—জামা তৈরী হয়—তখন চোখ বোজে না।"

সরস্বতীর মনে পড়লো সম্প্রতি সে মহেশ্বরের কথামত রাত জেগে কাঁটায় বুনে পাঁচুর জন্যে একটা সোয়েটার শেষ করেছে বটে, তা'ছাড়া গোটাকতক হাফ্‌প্যাণ্ট, বেনিয়ানেও মনোনিবেশ ক'রেছে। কিন্তু তা হ'লেও মহেশ্বরের কথা শুনে তার সমস্ত মনটা অসহ্য রাগে রি রি করে জ্বলে উঠলো। কঠিন স্বরে সেও জবাব দিল: "বেশ করেছি,—বুনেছি,—অন্য কারো তো বুনতে যাইনি, নিজের ভাইয়ের জন্যেই বুনেছি।"

বিদ্রূপের হাসি হেসে মহেশ্বর ব'ললে: "ও,—তবু যদি সৎ-ভাই না হ'তো।"

সরস্বতী রাগে, দুঃখে বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক তীব্র দৃষ্টিতে মহেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপরে গিয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়।

—পাঁচু তখন কোথায় যেন খেলতে গেছে।

দিন তিনেক পরের কথা।

সকাল বেলা; অবিনাশ সবেমাত্র ষ্টোভ নিভিয়ে গরম জলে চা ভিজাচ্ছে। এমন সময়ে দরজার বাইরে দেখা গেল পাঁচুকে। ব্যাগে তার একখানা ভাঙ্গা শ্লেট, খান দুই ছেঁড়া বই। অবিনাশ ডাকলো তাকে—"এই, কি চাস্ রে?"

এগিয়ে এসে পাঁচু সসঙ্কোচে উত্তর দিলে: "কিছু নয়।"

—"তবে ওখানে দাঁড়িয়েছিল যে?"

—"দিদি পাঠিয়ে দিলে।"

—"দিদি পাঠালে! কেন?"

অবিনাশ একটু সচকিত, একটু শঙ্কিতও হ'য়ে উঠলো বোধ হয়। পাঁচু ওর খাপে ভরা শ্লেটপেন্সিলটার একটা দিক দাঁতের চাপে নরম ক'রতে ক'রতে ব'ললে: "আমার পড়াটা যদি একবার ধ'রে ঠিক ক'রে দেন, তাই; নইলে—"

—"নইলে কি?"

—"নইলে আজ স্কুলে গেলে চাঁদু মাষ্টার আর আমায় আস্ত রাখবে না।" ওর কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হ'য়ে এলো, চোখ দুটোও জলে চিক্ চিক্ ক'রছে ব'লে মনে হ'লো অবিনাশের।

চা তৈরী হ'য়ে গিয়েছিল।—খাওয়া শেষ ক'রে সে ব'ললে: "কই, কোথায় তোমার পড়া, দেখি।"

পাঁচু বার ক'রলে একখানা দ্বিতীয় ভাগ, আর ছেঁড়া ধারাপাত; ব'ললে: "পড়া এইখানে, এই বুড়কের পঞ্চাশ বুড়ি,—আর দ্বিতীয় ভাগের কুজ্ঝটিকা পর্য্যন্ত—"

"বানান করো—ঝঞ্ঝাট।"

"ঝঞ্ঝাট! ঝঞ্ঝাট!"

কয়েকবার মাথা চুলকে,—ঢোক গিলে পাঁচু ব'ললে: "এই গিয়ে ব'বৃগিয়—য—আর গিয়ে—এই গিয়ে—" সে আবার ঢোক গিলতে সুরু করলে। অবিনাশের বুঝতে বিলম্ব হ'লো না,—ছাত্র কতদূর মেধাবী! বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টে রেখে সে ব'ললে: "তোমার দিদিকে ব'লো যেন তোমায় স্কুলে দিয়ে আর মিছামিছি পয়সা খরচ না করেন; তোমার লেখাপড়া হবে না।" পাঁচু তবু সেখান ছেড়ে উঠে না দেখে অবিনাশ প্রশ্ন ক'রলো,—"মহেশ্বরবাবু তাহ'লে তোমার ভগ্নীপতি হন?"

—"আজ্ঞে হাঁ—।"

—"বাপ মা ছেড়ে তুমি যে বড় এখানে থাক?"

একটু হেসে পাঁচু ব'ললে—"আমার মা বাপ তো নেই—অনেকদিন আগে কলেরায় মারা গেছেন, সেই থেকে দিদির কাছে থাকি।"

—"এঁরা বুঝি তোমায় খুব ভালোবাসেন?"

—"দিদি বাসেন, কিন্তু দাদাবাবু বড় বকাবকি করেন, পা টেপান, আর তামাক সাজান।"

ক্ষীণ সহানুভূতি উঁকি মারলো অবিনাশের মনের মধ্যে। পাঁচু আপন মনেই ব'লে চ'ললো—"দিদির কাছে শুনেছি—আমাদের বাড়ী ছিল ঐ লোহাপটীর পাশে; দিদি স্কুলে যেত রোজ আমায় নিয়ে—তারপরে দাদাবাবুর সঙ্গে দিদির বিয়ে হ'য়ে গেল, আমরা এখানে চ'লে এলাম দাদাবাবুর বাড়ীতে।"

সে কি ভাবতে লাগলো; অবিনাশ সে ভাবনায় বাধা দিলে না; কিছুক্ষণ পরে ব'ললে: "আমি এখন বার হব,—তুমি নীচে যাও।"

পাঁচু একথা শুনে এমন করুণ অসহায় দৃষ্টিপাত ক'রলো অবিনাশের মুখের দিকে, যে সে সত্যই সে দৃষ্টিকে অবহেলা ক'রতে পারলো না।

কৌটো থেকে খানকয়েক বিস্কুট বের ক'রে তার হাতে দিয়ে ব'ললে "চল, আমি তোমার দিদিকে ব'লে যাচ্ছি।"

অবিনাশের কথামত সত্যই পাঁচুর স্কুলে নাম কাটানো হ'য়ে গেল,—তার বদলে তাকে প্রতিদিন বই শ্লেট নিয়ে বসতে হয় অবিনাশের কাছে। অবিনাশ তাকে বিনা পয়সাতেই পড়ায়,—প্রতিদানে তাকে দিয়ে করিয়ে নিতে হয়—ঘরের ছোটখাটো কাজ, ফায়-ফরমাস।

অবশ্য পাঁচু এজন্য লাভও করে প্রচুর, যেমন লাল্ নীল পেন্সিল, লজেন্স, বিস্কুট, লাটাই, টল্ প্রভৃতি।

পাঁচু তাই পেয়েই খুশী, আর তার চেয়েও খুশী হ'য়ে উঠে তার দিদি—সরস্বতী। ভাবে, এতদিনে হয়তো ভাইটার একটা ভবিষ্যতের উপায় হ'ল।

কি একটা বিষয় নিয়ে ভাইবোনে আবার বোধ হয় দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের অবতারণা হ'চ্ছে দেখে ওপর থেকে অবিনাশ ডাকলে: "পাঁচু—"

কাঁদতে কাঁদতে পাঁচু ওপরে উঠে এলো। শীর্ণ শির-ওঠা দুই হাত চোখের ওপোর চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠে ব'ললে: "দিদি আমায় চোর ব'লে লাগিয়েছে দাদাবাবুর কাছে, আর দাদাবাবু—"

—"দাদাবাবু কি করেছে?"

—"মেরেছে জুতোর বাড়ি।—"

পাঁচু ওর পিঠের ছেঁড়া জামাটা উঁচু ক'রে তুলতেই অবিনাশের চোখের সম্মুখে মহেশ্বরের চটি জুতোর দাগ স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে প্রশ্ন ক'রলে: "কি চুরী ক'রেছিলে, সত্যি বল আমার কাছে। মিথ্যে ব'লতে নেই, জানিস্‌তো আমি তোর মাষ্টার-মশাই হই।"

যেন নিজের অজ্ঞাতেই ওর হাতখানা অজস্র স্নেহ নিয়ে এসে স্পর্শ ক'রলো পাঁচুর পিঠের ওপর। পাঁচু ব'ললে: "দুধের সর,—একটু, এতটুকু খেয়েছিলাম ব'লে,—তাই।"

অবিনাশ ওর মাথায়, মুখে, পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলাতে লাগলো।

—"তুই কি খেতে ভালোবাসিস?—"

—"সন্দেশ।"

—"খাবি?"

কান্না ভুলে পাঁচু কিছুক্ষণ অবিনাশের দিকে চেয়ে রইল। অবিনাশ আবার প্রশ্ন ক'রলে: "খাবি?"

এবার পাঁচু যেন কতকটা স্পষ্ট ও অস্পষ্টতার মধ্যে দিয়ে ব'লে উঠলো: "খাবো।"

পকেট থেকে একটা আধুলী বার ক'রে ওর হাতে দিয়ে অবিনাশ জিজ্ঞাসা ক'রলে: "দোকান চিনিস তো? খাবারের দোকান? সেইখান থেকে কিনে খা গিয়ে যা।"

পাঁচু আধুলীটা বার কয়েক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো,—চোখের জল মুছে সেটা

আঁচলের খুঁটে বেঁধে আর একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো অবিনাশের দিকে, তারপরে নির্ব্বাক্ নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

বেশীক্ষণ নয় মাত্র কুড়ি-পচিশ মিনিট কেটেছে হঠাৎ সদর দরজায় অসম্ভব ভীড় আর কড়া নাড়ানাড়ির শব্দে অবিনাশ বার হ'য়ে এলো। বারান্দার রেলিংয়ের ওপর থেকে উঁকি মেরে দেখলে বাইরে দাঁড়িয়ে কয়েকজন লাল পাগড়ীধারীর সঙ্গে আশপাশের কয়েকজন বাসিন্দা।

অবিনাশ চমকে উঠলো।

—"কে ওঁরা? কি চায়?"

কড়া নাড়ার শব্দে মহেশ্বর এসে দরজা খুলেই চমকে উঠেছিল; একটু পরেই তার ভয়কম্পিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল: "অবিনাশবাবু, অবিনাশবাবু, একটু সাহায্য ক'রবেন আমায়! বড় বিপদে পড়েছি— ।"

অবিনাশ নেমে আসতে সে দু' হাতে ওর হাত দু'খানা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌ল—"পাঁচু নাকি গাড়ী চাপা প'ড়ে মারা গেছে; সেজন্য এরা আমায় দিক্‌দারী ক'রতে এসেছে—"

ব'লে সে সমবেত জনতার দিকে দেখিয়ে দিতেই অবিনাশ ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিলে মহেশ্বরের হাত থেকে; কাণেও তার আর কোন কথা এলো না,—স্তম্ভিতের মত শুধু দাঁড়িয়ে রইল ওদের দিকে চেয়ে।

আবার বাসা বদ্‌লাবার পালা।

পাঁচুর মৃত্যুর পর কিছুদিন চ'লে গেছে,—তার দাঙ্গা হাঙ্গামাও মিটে গেছে একে একে, মহেশ্বর এখন—বেঁচেছে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে।...

জিনিষপত্র আবার একটা কুলীর মাথায় উঠিয়ে অবিনাশ ধীরে ধীরে চ'লে যাচ্ছিল, এমন সময়ে দরজার পাশে দেখা গেল পাঁচুর দিদিকে।

আজ তার মাথায় ঘোমটা নেই, সঙ্কুচিত ভাবও মুছে গেছে মন থেকে।

এগিয়ে এসে নীচু হ'য়ে সে মাটিতে মাথা ঠেকালে:

"মাষ্টার মশায়,—পাঁচু আজ বেঁচে নেই, তাইকি আপনিও আমাদের ফেলে যাচ্ছেন!"

কয়েক ফোঁটা চোখের জল সেখানে ঝ'রে প'ড়তে অবিনাশের মনে প'ড়লো—এইখানে, এইভাবে পাঁচুরও চোখের জল ঝ'রে পড়েছিল তার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেই। সে নেই,—তার চোখের জলও শুকিয়ে গেছে হাওয়ায়,—তবু অবিনাশের আজ সেই কথাই মনে পড়লো বেশী ক'রে।

সরস্বতীর কথার উত্তর সে দিতে পারলো না,—শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বিদায় নিলে।

পরের দিন মহেশ্বর আবার বাড়ীর সামনে লিখে রাখলে:

"টু লেট্।"

## দুর্জ্ঞেয়

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

হে দেবতা! তুমি সাধুরে যেমন বর দাও,
ভণ্ডও যেন পায় তাই;
কারণ এখানে কে যে ভণ্ড ও সাধু ঠিক
সে তো দুর্জ্ঞেয়—জানা নাই।

# পাট-শিল্পে বাঙালীর স্থান

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী

বাঙালী প্রতিভার বরপুত্র। বাংলার সরস মাটি-জলেরই যেন ইহা গুণ। শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানে বাঙালীর অবদান গৌরব করিবার মত। জ্ঞান-গবেষণায় বিশ্বের দরবারে বাঙালী সম্মানের আসন অধিকার করিয়া আছে। অধ্যাত্ম-গরিমায় বাঙালীর বুঝি তুলনা আর কোথাও মিলে না। আইন ও রাজনীতিতে বাঙালী প্রথম আলোক দেখিয়াছে এবং সমগ্র ভারতকে দেখাইয়াছে। কিন্তু পারে নাই জীবনের অতি বড় প্রাথমিক প্রয়োজনীয় একটি ক্ষেত্রে। ব্যবসা-বাণিজ্যে আমরা বাঙালী পিছনে পড়িয়া আছি। এ দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা ললাটে লেপিয়া আমরা দিনের পর দিন জীবন-সংগ্রামে পশ্চাৎ হটিয়াই চলিয়াছি। একটা নিরুপায় অসহায়তার মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে মুখে এ লজ্জাস্কর পরাজয়ের কাহিনী একরূপ প্রবাদ-বাক্যে গিয়া ঠেকিয়াছে। ভয় হয়, বুঝি বা ইহা আমাদের মানসিকতাকে পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসে!

এজন্য আমরা কাহাকেও দোষ দিব না। আমরা স্বখাত সলিলেই ডুবিয়া মরিতে বসিয়াছি। দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া আমরা যাহা করি নাই, করিতে পারি নাই—অন্যে আসিয়া এই বাংলার বুকে বসিয়া তাহাই করিয়াছে। একদা যাহা ছিল সহজ, আজ তাহা ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। সুতীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়াই এ পথে মাত্র সাম্প্রতিক যাঁহারা পা বাড়াইয়াছেন বা বাড়াইতে চাহেন, তাঁহাদের আত্মসংগঠনের তপস্যার মধ্য দিয়াই সতর্ক চরণে চলিতে হইবে। দেশের সমষ্টিভূত জাগ্রত চেতনা যদি এই নবাগতদের পৃষ্ঠরক্ষকরূপে আনুকূল্য করে, তবে শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রেও অদূর ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠালাভ বাঙালীর পক্ষে অসম্ভব নয়।

তবুও আশঙ্কা হয়, যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকিলে প্রলোভনময় অর্থক্ষেত্রে দশজনে মিলিয়া মিশিয়া সাফল্য-মণ্ডিত হইতে পারে, তাহা বুঝি বাঙালী হারাইয়াছে। অন্ততঃ উহা এখনও অর্জ্জনসাপেক্ষ। ভাবে ও চিন্তায় বুদ্ধিপ্রধান বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যমূলক প্রবণতা প্রায়শঃই লক্ষ্য করা যায়। গবেষণা বা মনীষার ক্ষেত্রে এই চিন্তা-স্বতন্ত্রতার অবদান বহুর কল্যাণে পরিবেশিত হইতে বাধা থাকে না। কিন্তু গভীর কোন তত্ত্ব বা নীতিকে কেন্দ্র না করিয়া যে ভাসা ভাসা ভেদ-বৈষম্য তাহা আজ জাতির সর্ব্বাঙ্গ বিষাইয়া তুলিয়াছে। বিশেষ করিয়া বাঙালীর আত্ম-কেন্দ্রিক মনোবৃত্তি বস্তুতন্ত্র অর্থ-সাধনার ক্ষেত্রে আজিকার বড় অন্তরায়, নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বৃহৎ যৌথ-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মত যোগ্য অভিজ্ঞতা হয় তো এখনও আমাদের তেমন নাই, কিন্তু সাধু ও সদিচ্ছা থাকিলে, উহা অর্জ্জন করিতে মেধাবী বাঙালীর বেশী বিলম্ব হইবে না। আমরা সকলেই অনুভব করি, জাতীয় জীবনের বহু বিচিত্র সমস্যা বিশেষ করিয়া বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য দূর করিয়া দেশকে শ্রী ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে, শিল্প-বাণিজ্যের প্রচুর প্রসার চাই। বাংলায় বড়লোকের সংখ্যা করাঙ্গুলিতে গণিয়া শেষ করা যায়। বোম্বাই বা গুজরাটের মত এমন ধনী এদেশে খুব কমই আছেন, যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে চটকলের মত বৃহদাকার প্রতিষ্ঠান স্বকীয়ভাবেই গড়িতে পারেন। এরূপ অবস্থায় বহুর কড়ি একত্র করিয়াই আমাদের এই সব বৃহৎ ব্যাপারকে সিদ্ধ করিতে হইবে। এবং এই জন্য আজ বাঙালীচরিত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে কার্য্য করিবার অভ্যাস অর্জ্জনের প্রয়োজনও যেমন অধিক, তেমনি যৌথ-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীরও দায়ীত্ব ততোধিক।

শুধু রাষ্ট্রক্ষেত্রেই আমরা নিজ বাসভূমে পরবাসী নয়, এই সুজলা সুফলা বাংলা দেশের বিচিত্র আর অফুরন্ত প্রাচুর্য্যের মাঝেও আমরা পরমুখাপেক্ষী। অন্য অনেক ছোট ছোট দ্রব্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বিশ্বের আর্থিক বাজারে অর্থাগমের অন্যতম প্রধান যে পাট, চা ও কয়লা তাহা এই বাংলার—অন্ততঃ বৃহত্তর বাংলার—একরূপ একচেটিয়া সম্পদ্। অথচ আমরা এতই আত্মবিস্মৃত যে, এই সম্পদের নিয়ন্ত্রণ আমরা আমাদের আনুকূল্যে করিতে

পারি নাই। ইহার মধ্যে পাটের কথাই আমরা এখানে বলিতেছি।

এদেশে পাট-উৎপাদন বহুদিন হইতে চলিয়া আসিলেও, উহার দ্বারা গৃহস্থের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন মিটান ছাড়া, ব্যাপক অর্থকরী পণ্যসৃষ্টির পরিকল্পনা বিজ্ঞানের কৃপায় কারখানা-শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সম্ভব হয়। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের নৌবিভাগের জন্য ২০০০ টন পাট রপ্তানীর পর হইতেই দুনিয়ার কৌতূহলী দৃষ্টি এই দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। ইহার প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে রিষ্‌ড়ায় প্রথম চটকলের সৃষ্টি। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বাংলায় মাত্র তিনটি চটকলের প্রতিষ্ঠা হয় এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ৪৩শে দাঁড়ায়। চলতি বর্ষে সমগ্র ভারতবর্ষে সর্ব্বমোট ১১২টি চটকল চলিতেছে। তন্মধ্যে একমাত্র বাংলা দেশেই একশতটী এবং বাকী ১২টির মধ্যে বিহারে ৪টি, মাদ্রাজে ৪টি, যুক্তপ্রদেশে ৩টি এবং মধ্যপ্রদেশে ১টি।

১১২টি চটকলের মধ্যে ৪টি বাঙালী, ২৫টি ভারতীয় অন্যান্য প্রদেশবাসীর এবং ৮৩টি বিদেশী বিশেষ করিয়া ইংরাজ বণিকদিগের পরিচালনাধীনে।

এই চটকলগুলিতে চট ও থলে উৎপাদনের জন্য ৬৮৫০০ তাঁত এবং অন্যান্য পাটজাত দ্রব্যের জন্য ১৬০০ তাঁত সর্ব্বসমেত ৭০,১০০ তাঁত চলিতেছে। তন্মধ্যে কিঞ্চিদধিক এক হাজার তাঁত বাঙালী-পরিচালিত চারিটি কলের এবং ১৩১৮৭ তাঁত ভারতীয় অন্যান্য প্রদেশ-বাসীর কলগুলির অন্তর্গত। অবশিষ্ট প্রায় ৫৫৯০০ খানি তাঁত বিদেশী বণিকদের আয়ত্তাধীন।

মূলধনের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, চটকলগুলিতে যে ২৭ কোটি টাকার মূলধন খাটিতেছে তন্মধ্যে বাংলার ও বাঙালীর নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদের তুল্য। গত ১৩৩৯ সালে চটকলে যে সকল মাল উৎপন্ন হইয়াছে তাহার মূল্যও ২৬ কোটি টাকা অর্থাৎ মূলধনের প্রায় সমান এবং সমগ্র রপ্তানী বাণিজ্যের প্রায় এক অষ্টমাংশ। ভাগিরথীর উভয় তীরে আজ যতগুলি চটকল চলে, তাহাতে প্রায় তিন লক্ষ শ্রমজীবি জীবিকার্জ্জনের সুযোগ পাইয়া থাকে। পাট চাষীরাও গড়ে বার্ষিক ২০ কোটি টাকা পাটের মূল্য বাবদে অর্জ্জন করিবার সুযোগ পায়।

এখানে অতি সংক্ষেপে বাংলার একান্ত নিজস্ব পাট-সম্পর্কীয় সংক্ষিপ্ত যে বিবরণ উপস্থাপিত করা হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, পাটশিল্পের এই বিপুল সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে বাঙালীর কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব অতি কম, একরূপ নাই বলিলেও চলে। চা এবং কয়লা-শিল্প সম্বন্ধেও এ কথা সম্পূর্ণ খাটে। যে কোন আত্মসচেতন জাতির মনে ইহার হেতু সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

শুনিতে রোমাঞ্চকর কাহিনীর মত শুনায় যে, আমাদের এই বাংলা দেশে বৎসরে যে পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয়, তাহা লম্বালম্বি রেখাকারে পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী দূরত্বের প্রায় ছয়গুণ অর্থাৎ ৬,৬০০ কোটি মাইল দীর্ঘ হইতে পারে। দুঃখ হয়, এইরূপ একটি আয়কর অর্থসম্পদের শুধু কাঁচা মাল যোগাইয়াই আমরা এতদিন সন্তুষ্ট ছিলাম। জাতীয় জীবনের এই ঔদাসীন্য অমার্জ্জনীয় বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

এই পাট-শিল্পকে কেন্দ্র করিয়াই বাংলার আর্থিক পরিস্থিতিকে অনেকখানি সংগঠিত করিয়া তোলা সম্ভব। বার্ষিক মোট উৎপন্ন গড়ে এক কোটি বেল কাঁচা পাটের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ বিদেশে রপ্তানী হয় এবং বাকী অর্দ্ধেক স্থানীয় কলগুলিতে পাকা মালে (finished goods) পরিণত হইয়া থাকে। এই কাঁচা পাটের রপ্তানীর দরুণ বর্ত্তমানে যে প্রায় চার কোটী টাকা শুল্ক হিসাবে বাহিরে যায়, তাহা অনুকূল প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইলে আমরা পাট-শিল্প, পাট চাষ ও বাংলার সাধারণ উন্নতির কাজে লাগাইতে পারি। অধিকন্তু এই পাট-শিল্পের আনুষঙ্গিক বহু এবং বিচিত্র অনুশিল্প সংগঠনের মধ্য দিয়া আমরা এ দেশের চাহিদাও যেমন মিটাইতে পারি, তেমনি অর্থাগমেরও উপায় করিতে পারি। দুঃখের বিষয়, এদিকে আমাদের চেতনা যতটুকু জাগা উচিত ছিল তাহা জাগে নাই বা এই জীবন-মরণ সমস্যা লইয়া এতদিন আমরা তেমন আলোচনা আন্দোলন করারও আবশ্যকতা বোধ করি নাই। বস্তুতঃ রাষ্ট্রীয় অধিকারের প্রাথমিক অত্যাবশ্যকতা অস্বীকার না করিয়াও, ইহা অনায়াসে

বলা চলে যে, স্বাধীনতা লাভের জন্য বাঙালী যতখানি মত্ত হইয়াছে, ত্যাগস্বীকার ও হৈ-চৈ করিয়াছে, তাহার শতাংশের একাংশও যদি আমরা আমাদের আর্থিক সংস্থানকে সুগঠিত করিয়া তুলিবার দিকে মনোযোগ দিতাম, তাহা হইলে বাংলার এ বর্ত্তমান দৈন্য-পীড়িত চেহারা আজ অন্যরূপ হইত।

ইংরাজ রাজত্বের প্রথম সূচনা হইতেই বাঙালী-সমাজ শিক্ষা ও ভূমিসম্পদের উপর ভিত্তি রচনা করিয়া বর্ত্তমান শতাব্দীর কিছুকাল আগে পর্য্যন্তও একরূপ নিরাপদে কাটাইয়া আসিতেছিল। সৌভাগ্যবান উচ্চ শ্রেণী তাঁদের অর্থসম্পদ হয় সামান্য ব্যাঙ্ক-মুনাফায় সঞ্চয় করিয়াছে, নয়তো জমিতে নিয়োগ করিয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী কিছুটা জমির উপর এবং কিছুটা ইংরাজী শিক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া তখনকার দিনের সহজলভ্য চাকুরী গ্রহণ করতঃ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন গুজরাণ করিয়াছে। নিম্নশ্রেণী প্রধানতঃ চাষের উপর নির্ভর করিয়া একরূপভাবে জীবনের স্বল্প প্রয়োজন মিটাইয়াছে। ইদানীং অতিক্রান্ত কৃষির উপর নির্ভরশীল বাঙালীর সমাজ-কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে বলিয়াই আমাদের সমাজ-জীবনে আজিকার দুর্য্যোগ ও বিপর্য্যয় ঘনাইয়া আসিয়াছে। ইহার জন্য অন্য প্রদেশবাসী বা অপর কাহাকেও ঈর্ষ্যা বা দোষারোপ করা আমাদের অন্তর্দৌর্ব্বল্যেরই পরিচয় দিবে। প্রতিক্রিয়ায় আমরা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইব। নিজেদের অন্তরের গ্লানি দেখিয়া তাহা নিরাময় করতঃ আমাদের সামাজিক স্বাস্থ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কালের গতির সঙ্গে আমরা যদি তাল রাখিয়া না চলিতে পারি, তবে আমরা মানুষের মত বীরের মর্য্যাদা লইয়া বাঁচিবার অধিকার হারাইব। পূর্ব্বতন, বিগত আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার পুনরাবর্ত্তন করার প্রচেষ্টা ব্যর্থই হইবে। যুগের প্রেরণা বরণ করিয়া লইয়াই আমাদের শিল্প-বাণিজ্যে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। ইহাতে একদিকে জাতীয় অর্থের নির্গম যেমন রুদ্ধ হইবে, তেমনি উৎকট বেকার-সমস্যারও অনেকাংশে সমাধান হইবে। দেশের অর্থসম্পদ বৃদ্ধি হইয়া জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িবে। তাহাতে মরণোন্মুখ শিল্পগুলিও পুনরুজ্জীবিত হইবার অবসর পাইবে। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমাদের এই স্বয়ংপূর্ণ বাংলায় কাঁচা মালেরও যেমন কম্‌তি নাই, তেমনি প্রস্তুত দ্রব্য কাটানোরও অভাব হইবে না। এ জন্য দেশের সর্ব্বশ্রেণীর সমাজ ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়। এ সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদ্ শ্রদ্ধেয় সরকারের কথার প্রতিধ্বনি করিয়াই বলি, "যে অর্থ দেশের অন্নসৃষ্টির ও কর্ম্মসৃষ্টির কোন কাজে লাগে না, সে অর্থের কোনও সার্থকতা নাই। যে দিন আসিতেছে, তাহা ঐ শ্রেণীর সঞ্চিত বিত্তের পক্ষে নিরাপদ নয়। যক্ষের ধন লইয়া প্রাচীন জগতে মাথা গুঁজিয়া লুকাইয়া থাকিবার নিরাপদ গৃহকোণকে ধ্বংস করার যে নূতন হাওয়া আসিতেছে, তাহার সম্বন্ধে আমাদের দেশের ধনীদের কোন ধারণা বা চেতনা নাই দেখিয়া দুঃখ হয়। ধন উৎপাদন ও সৃষ্টির কার্য্যে নিয়োজিত না করিয়া যাঁহারা কেবল ধনবান্ বলিয়া গৌরব বোধ করিতে চান, বর্ত্তমান যুগে তাঁহাদের আচরণ সমাজকল্যাণবিরোধী এবং তাঁহাদের এই সমাজদ্রোহিতা বিপদ ডাকিয়া আনিবে।"

বাঙালী শ্রমবিমুখ, এ অশ্রদ্ধেয় মন্তব্য আমরা স্বীকার করি না। একদিন এমন অনুকূল সামাজিক পরিবেশ ছিল, যেদিন মধ্যবিত্তের শ্রম করার প্রয়োজনই তেমন হইত না। সেদিন আর নাই। না থাকিলেও বাঙালী তরুণের অন্তরের সৃজন-বীর্য্য মরে নাই। মরে যে নাই তার প্রমাণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী শিক্ষা, সমাজ, অর্থ, রাষ্ট্র, জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে দিয়াছে। সুযোগ পাইলে একান্ত কৃষি-নির্ভরশীল তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর কিছু অংশ নানাবিধ শ্রমের ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিয়া কুশলতার যে পরিচয় দিতে পারে, তাহার পরিচয়ও আমরা পাইয়াছি। আমাদের এই নব নির্ম্মিত চটকলে বহু বাঙালী শ্রমিক ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিভাগে কাজের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। এই সব বিবেচনায় অর্থক্ষেত্রের ভয়াবহ প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা নিরাশ নহি। আমরা শুধু আশা করি, আর্থিক সংগঠনের বস্তুতন্ত্র পরিকল্পনা লইয়া বাস্তব ক্ষেত্রে কেহ অগ্রসর হইলে দেশের বিত্তবানের সহযোগিতার যেন অভাব না হয়।

শ্রী ও মাধুর্য্যে জাতীয় জীবনকে শতদল পদ্মের মত

বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ সংগঠন-নীতি আশ্রয় করিয়াছে। নেতিবাদ বা ধ্বংস আমাদের নীতি নয়, পরন্তু আমরা ইতিবাদী—যাহা আছে তাহাকে সুগঠিত করিয়া তোলা। গঠনের মূলমন্ত্র তাই আত্মশক্তির উদ্বোধন। ব্যষ্টি ও জাতির অন্তরের গ্লানি দূর করিতে পারিলেই সে অফুরন্ত সৃষ্টিকরী শক্তির অধিকারী হইতে পারে। আত্ম-সংগঠনের মধ্য দিয়াই সঙ্ঘ ধীর পদসঞ্চারে এতদিন শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থ প্রভৃতি ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বুঝিয়াছিল, আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে এ জাতির ভদ্রস্থতা নাই। অর্থসৃষ্টির পথে সঙ্ঘের অর্থ-সাধনার কেন্দ্র প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেডের পরিচালনাধীনে যখন অনেকগুলি স্বাবলম্বী অর্থপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল, তখন সঙ্ঘ অনুভব করিল, মধ্যস্থতামূলক ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থের হাত বদলান সম্ভব হয় বটে, কিন্তু সত্যকার জাতীয় সম্পদ্ ইহাতে সৃষ্টি হয় না। সেই প্রেরণায়ই প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিঃ ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক কলকব্জার ব্যবসায় এবং জুট মিল নির্ম্মাণে ক্রমশঃ অগ্রগামী হয়। সঙ্ঘ-স্রষ্টা পূজনীয় শ্রীমতিলাল রায়ের অগ্নি-প্রেরণার অনুসরণ করিয়া সঙ্ঘের অর্থসাধনার অগ্রপুরোহিত স্বর্গীয় স্বামী চিদানন্দজীর মনেই জুট মিল স্থাপনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। কিন্তু অকালমৃত্যুজনিত তিনি ইহার বাস্তব রূপ দিয়া যাইতে পারেন নাই। না পারিলেও তাঁহার অমোঘ সঙ্কল্প ব্যর্থ হয় নাই। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রবর্ত্তক জুট মিল রেজিষ্ট্রীকৃত হয়। তারপর এই অর্দ্ধযুগ অসংখ্য বাধা-বিপত্তি বিদীর্ণ করিয়া আজ উহা সিদ্ধির দ্বারে আসিয়া পৌছিয়াছে। ইতিমধ্যে ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় জুট মিলের যন্ত্রপাতি আমদানী করিতেও বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। সামান্য তাঁত লইয়া আরম্ভেরও ইহাই অন্যতম হেতু। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কেন্দ্র-পুরুষ, এই জুট মিলেরও সভাপতি পূজনীয় শ্রীমতিলাল রায় মহোদয়ের সৃষ্টিকরী প্রতিভার অমোঘ বীর্য্য ও প্রেরণা ইহার পশ্চাতে না থাকিলে, নিঃসম্বল সঙ্ঘের পক্ষে সহস্র প্রাথমিক বিঘ্নের মধ্যে এই মিলের আরম্ভ হয়তো আজও সম্ভব হইত না। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ কোন ব্যষ্টির প্রতিষ্ঠান নয়, ইহা অমিশ্র জাতীয়তারই সাধন-ক্ষেত্র। প্রবর্ত্তক জুট মিলকে জাতীয় শিক্ষা, দীক্ষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আদর্শ পীঠে পরিণত করাই সঙ্ঘের সর্ব্বত্যাগী মিশনারীদের অন্তরের আকূতি। আমাদের ভরসা, দেশমাতৃকার অনাহত কল্যাণদৃষ্টি এই শুভদৃষ্টির পশ্চাতে অবশ্যই আছে। এই উপলব্ধিই আমাদের প্রাণে বল দিয়াছে। *

* বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ তারিখে মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতি স্যার বিজয়চাঁদ্ মহাতাব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রবর্ত্তক জুট মিলের যে উদ্বোধন-[illegible] অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে ম্যানেজিং এজেণ্ট দি প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেড-এর পক্ষে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চৌধুরীর প্রদত্ত অভিভাষণ।

# হোলি

( মীরাবাঈ )

শ্রীমমতা ঘোষ

থাকুক সখি, হোলি খেলা—লাগে না মন আজ,
প্রিয় বিনা এ ঘরে মোর নাই আনন্দ সাজ।
প্রবাসে যে রইল বঁধু—কি হবে দীপ জ্বেলে?
ঘুম আসে না নিঝুম রাতে—রই গো আঁখি মেলে।
শয্যা আমার শূন্য থাকে, লাগে বিষের মত,
বিষ শুষে মোর প্রাণ-কুসুমে হ'ল বিষম ক্ষত।
কত দিন যে কাটল আমার চেয়ে পথের পানে,
দিবস নিশি বিরহ-ভার বেদনা দেয় প্রাণে।

বলব কি আর, মুখে আমার আসে না হায় কথা,
হৃদয় জুড়ে আছে কেবল গভীর ব্যাকুলতা।
কবে প্রিয় দেবেন দেখা তাঁহার সেবিকায়,
এমন কেহ নাই কি যে তাঁর খবর দিয়ে যায়?
বল্ গো তোরা ভাগ্যে আমার তেমন দিন কি হবে
যেদিন প্রভু হেসে আমায় কাছে ডেকে লবে?
সে শুভদিন আসবে কবে যেদিন আমার বঁধু
মীরার সাথে খেলবে হোলি—দেবে হিয়ার মধু।

# ইউরোপের পথে পথে

( ব্রসেলস্ )

ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রসেল্সের "নেটিভ কোয়াটার্স"-এর দিকে চলেছি। সঙ্গে দু'জন সঙ্গী। নেটিভ শব্দটা ব্যবহার না করে পারলাম না, কারণ যাদের ধন আছে তাদের মতে দরিদ্র—অসভ্য, অতএব "নেটিভ"। নেটিভ কোয়াটার সর্ব্বদাই লোকে ভর্ত্তি। সস্তা জায়গায় থাকতে হলেই একটু স্থানাভাব অনুভব করতে হয়। পথে ট্রাম চলেছে, মোটর চলেছে, ঘোড়ায় টানা গাড়ী চলেছে, দু'দিকের ফুটপাথগুলি সেজন্যই সঙ্কুচিত হয়েছে। দু'জন লোক এক সঙ্গে চলাও কঠিন। সেজন্যই আমরা একের পর এক করে লাইন বেঁধে চল্‌তে লাগ্‌লাম। এতে কথা বল্‌তে বড়ই অসুবিধা হয়। মাইলখানেক হেঁটেই সর্ব্বাগ্রের রুমেনীয়া সুন্দরী "হল্ট" করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম "কিছু বল্‌তে চান"?—"হাঁ, ঐ দেখুন একটি কাফের দোকান, একটু কাফে খেয়ে নিই চলুন।"

ইউরোপীয়ান নারীকে সঙ্গে করে চলা মহা মুস্কিল। তাদের বাসনা পূরণ করতে পুরুষের সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দোকানে প্রবেশ করলাম। অনেকক্ষণ বস্‌লাম কিন্তু কাফে আস্‌ল না। বস্তুতঃ এটা কাফেরই দোকান নয়—এটা একটা আড্ডা। এরূপ আড্ডা আমাদের দেশে এখনও গড়ে উঠে নি, উঠ্‌বে না বলেই মনে হয়। এরূপ আড্ডা গড়ে উঠবে কেন? সকলেই তার কারণ অবগত আছে, পুলিশ চোখে দেখ্‌ছে কিন্তু কি প্রতিবাদ করবে? কাজ চাইলে কাজ পায় না, খাবার চাইলে খাবার পায় না, অতএব আইন বজায় রেখে যা ইচ্ছা তাই করি। আড্ডাঘরটি দেখেই তিনজনে মিলে একজিবিশনে চল্লাম।

আমাদের দেশে যে সকল একজিবিশন হয়, ইউরোপের একজিবিশন সেরূপ নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজ বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি যেমন দেখিয়ে থাকে, তেমনি করে তাদের বিদেশের কলোনী হতে প্রাপ্ত জিনিষপত্রের এবং সেই সকল দেশের লোকের আচার ব্যবহার চিত্রে দেখিয়ে থাকে। আমার এখনও মনে আছে, একটি ভারতীয় চিত্রের কথা। সেই চিত্রটি কিন্তু বৃটিশ একজিবিশনে স্থান পায় নি। সেই চিত্রটি রাখা হয়েছিল ওলন্দাজদের একজিবিশনে। তাতে দেখান হয়েছিল—বঙ্গদেশের একটি বীভৎস দৃশ্য। বাঙ্গালীকে জাভানীদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল। বঙ্গদেশে যেমন ভাবে লোকের ঘন বাস তেমনটি আছে একমাত্র জাভায়, পৃথিবীর অন্যত্র তেমনটি নেই। কিন্তু বীভৎস দৃশ্যটির সঙ্গে জাভানীদের সম্বন্ধ নেই।

জাভানীরা প্রায়ই মলমূত্র জলেতেই পরিত্যাগ করে। কিরূপে জলশৌচ করে সেই দৃশ্য দেখান হয়েছে। সেরূপ দৃশ্য যদি বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে দেখান হতো তবে আমি কিছুই মনে করতাম না। দেখান হয়েছে—একটা ঝিলের ধারে বসে একটি লুঙ্গি-পরা লোক মলমূত্র ত্যাগ করছে, তারই কাছে দাঁড়িয়ে একটি লোক পচা পাটকাঠি হতে পাট ওঠাচ্ছে, এবং কাছেই সাড়ী পরা একটি মেয়েলোক কলসীতে জল ভরছে। পাটের চাষ জাভাতে হয় না, হয় আমাদের বঙ্গদেশে। এ চিত্রটা কি করে ওলন্দাজদের প্রদর্শনীতে দেখান হলো তার কিছুই আমি বুঝ্‌তে পারলাম না। যে প্রকারেই হউক আমাদের খাটো করানোই হলো এই চিত্রের উদ্দেশ্য।

হল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যবাদ অন্য রকমের। মুখে বেশ মিষ্টি কথা, অন্তরে একের নম্বরের শোষণ ও শাসনের ব্যবস্থা। বেলজিকরাও সেদিকে কম নয়। তাদের শাসিত কঙ্গোতে এখনও নানারূপ ব্যভিচার চলে তা শুনেছি, এবং ভারতীয় বণিকদের উপর যে অত্যাচার হয় তার প্রতিধ্বনি কেনিয়ার ভারতীয় সংবাদ পত্রে প্রায়ই শুনা যায়। এরূপ ছবি দেখে আমার যেমন রাগ হলো, তেমনি দুঃখও হলো। প্রতিকার করার মত আমার শক্তি ছিল না, কারণ আমি একা। মজার কথা হলো, ইউরোপীয়ান কমিউনিষ্ট হোক, লেবার হোক আর উদারনৈতিক হোক, তাদের মাঝে যেমন কলোনী-প্রীতি রয়েছে তেমনটি আর কারো নেই। সঙ্গের কমরেডগণ একজন হলেন বেলজিক, অপরজন হলেন রুমেনিয়ান, উভয়েরই মুখে বড় বড় কথা, কিন্তু হলে কি হয়,

রঙের প্রীতি বড়ই ভয়ানক ভাবে তাদের মাঝে রয়েছে। আমি কম্‌রেড নারীকে জিজ্ঞাসা করলাম "তবে কি রাশিয়ানরাও সাদা কালো মেনে চলে?" কমরেড রমণী বল্লেন, "তা কি করে হয়, তবে কিনা আমাদের সোসিয়েলিজম আমাদের মাঝেই আবদ্ধ, এর বেশী নয়।" কথাটা শুনে আমার হাসি পেল, মনে হলো "সোসিয়েলিজম যারা না বুঝে তারাই এরূপ বলে।" কোনরূপে মনের ভাব গোপন রেখে প্রদর্শনী হতে বেরিয়ে পড়লাম, এবং সঙ্গের দু'জনকে যথাসাধ্য সাহায্য করে রুমে এসে শুয়ে পড়লাম।

মনে যখন অবসাদ আসে, শরীর তখন নেতিয়ে পড়ে। আমার মনে অবসাদ এসেছিল। রুমে গিয়ে ম্যাপটা বেশ ভাল করে দেখে স্থির করলাম আগামী কল্যই এখান হতে চলে যাওয়া চাই। তারপর নিদ্রা, বাস্তবিক নিদ্রা শান্তি এনে দেয়। অভাবে যাদের মন সকল সময় অস্থির থাকে, তারা অনেক সময় ভাবে নিদ্রা যেন অফুরন্ত হয়। কারণ সাদা, কালো, পীত, ব্রাউন, সকলেই অভাবের তাড়নায় একের রক্ত অন্যে শোষণ করছে। একে অন্যকে যমালয়ে পাঠাবার বন্দোবস্ত করছে, অথচ মুখে মুখে বল্‌ছে শান্তি চাই। আমি পর্য্যটক, আমার কাছে শরীর ও চাম্‌ড়ার রঙের জন্য মানুষে মানুষে পার্থক্য মোটেই নেই, তাই বুঝ্‌তে পারি সকলের সুখ দুঃখের কথা। সেদিন বিকালে আর বের হইনি, পরদিন প্রাতে যখন উঠলাম, সর্ব্বপ্রথমই পূর্ব্বপরিচিত মহিলা এবং বৃদ্ধ এসে আমাকে নমস্কার জানালেন। তাঁদের মুখ দেখে আমার বেশ ভালই লাগ্‌ল। একটু পর তাঁদের নিয়ে রেস্তোঁরায় গিয়ে বস্‌লাম। পূর্ব্ব-পরিচিত মহিলা আমাকে নানা কথা বল্লেন। তিনি বল্‌লেন গতকল্যের কথা ঠিক নয়, শুধু আমাকে পরমুখাপেক্ষী না হবার জন্যই এরূপ বলেছেন। কালো লোক যদি সাদা লোকের দাসত্ব করে, সেজন্য কালো লোকই দায়ী, সাদা নয়। কালোদের মাঝে জাগরণ আসা চাই, তাদের মাঝে শক্তি অর্জ্জন করার চিন্তা আসা চাই, তারপর যে শক্তি তাদেরে দাসত্বে বেঁধে রেখেছে তার উচ্ছেদ আপনা আপনিই আস্‌বে। কারো সাহায্যে কেউ বড় হতে পারে না। নিজের পায়ে দাঁড়াবার যার শক্তি নেই তাকে দাঁড়া করে দিলেও সে বসে পড়ে।

তাঁদের কথায় প্রতিবাদ করিনি। আবার ব্রসেলস্‌এ থাকবার প্রবৃত্তি জেগে উঠ্‌ল। আবার কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে ইচ্ছা হল। অর্থ সংগ্রহ মানেই হলো ব্রসেলস্‌-এ ঘুরে ঘুরে লোকের সঙ্গে কথা বলা। কিন্তু তিনজনে মিলে কি তা সম্ভব হয়? সেজন্য রুমেনিয়ান্‌ রমণীকে বিকালে আস্‌তে বলে বৃদ্ধকে নিয়ে বের হয়ে পড়লাম।

সর্ব্বপ্রথমই আমরা কতকগুলি সংবাদপত্র আফিসে গিয়ে হানা দিলাম। এক একটি সংবাদপত্র আফিস যেন বিরাট্‌ একটি কর্ম্মক্ষেত্র। এরূপ সংবাদপত্র অফিস ভারতে একটিও দেখিনি। ইংরেজদের ফ্লিট ষ্ট্রীটও যেন তার কাছে হার মানে। নানা রকমের এডিটোরিয়েল বিভাগ আছে। আমরা গেলাম পর্য্যটক বিভাগে। তথায় আমার আদর-যত্ন বেশ হলো। মামুলী ভাবে এক একটা বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমাকে তৎক্ষণাৎ একখানা চেক দেওয়া হলো। সেই চেকের দাম আমাদের দেশের তের টাকা। এরূপ করে আমরা সেদিন অনেক সংবাদপত্র আফিস ভ্রমণ করে বেশ দু' পয়সা অর্জ্জন করলাম। মনে হলো ভারতের ধনী সংবাদপত্রের মালিকদের কথা। তাদের অভাবই যায় না। ভারতের সংবাদপত্রের মালিক কোটীপতি হলেও তাদের অভাব যাবে না যদি না স্বভাব বদলায়। আসলে দেবার প্রবৃত্তি থাকা চাই। আমেরিকার সংবাদপত্রের মালিকদেরে শাসন করবার ভার গুণ্ডারা নিয়েছে। ইউরোপেও সেরূপ কিছু আছে। সংবাদপত্র সমাজের শত্রু কি মিত্র, সমাজই বেশ ভাল করে বুঝে এবং শাসন করে।

রবিনহুড একজন গুণ্ডা ছিলেন, আমাদের দেশে চোর ছেঁচরদেরে গুণ্ডা বলা হয়। গুণ্ডার অনুগ্রহেই লণ্ডনের ফ্লিট্‌ ষ্ট্রীটে সংবাদপত্রের মালিকগণ আজকাল অনেকটা সায়েস্তা হয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের যাঁরা ইউরোপে শিক্ষালাভার্থে যান, তাঁরা দেশে এসে এসব কথা বল্‌তে রাজি হন না। তারপর এসব কথা বলেই বা লাভ কি? প্রকৃত শক্তিমান্‌ হবার সাধনা ত বেশী নেই, শক্তি আছে শুধু বড়কে ছোট করবার।

বেশ কিছু টাকার মালিক হয়ে তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। পথে চল্‌তে চল্‌তে আমাকে বৃদ্ধ দেখিয়ে

দিলেন, কোন্ কোন্ হোটেলে বৈদেশিকদের উপর অনর্থক অত্যাচার হয়। দু' একটাতে গিয়ে বস্‌লাম, নানারূপ অন্যায় কাজ করলাম, তারপর যখন গোল বেধে উঠ্‌ল তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বলে দিলাম, তোমরা এরূপ করেছ, ভবিষ্যতে আরও করবে—সেজন্যই এরূপ ব্যবহার করেছি। বাস্তবিক মহিলা এবং বৃদ্ধ যদি আমাকে ভাষা দিয়ে সাহায্য না করতেন তবে আমি বোকার মত চলে আস্‌তাম। তারপর এরূপ গণ্ডগোল করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না যদি হোটেলের মালিকদের সাধারণ বুদ্ধি না থাক্‌ত। ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেখলাম তাদের বুঝবার শক্তি আছে।

প্যারী, লণ্ডন, বার্লিন এসব সহরে দেখার মত অনেক আছে সত্যই, কিন্তু চোখের ভয়ানক অভাব। চোখ না থাক্‌লে দেখ্‌বে কি করে? সারাদিন যদি মিউজিয়াম এবং লাইব্রেরীতে বসেই সময় কাটান যায়, তবে দেখবার এবং শোন্‌বার সুবিধা হয়ে ওঠে না। যারা এতবড় লাইব্রেরী, এতবড় মিউজিয়ম গড়ে তুলেছে তাদের সঙ্গেও কথা বলা দরকার। যাঁরা গণ্যমান্য তাঁরা সকল সময়ই ওজন করে কথা বলেন। তাঁদের কাছ থেকে প্রকৃত সংবাদ পাবার উপায় নেই জেনেই সে সকল লোকের সঙ্গে কথা বলে সময় ক্ষেপণ করতে আমার মোটেই ইচ্ছা হ'ত না। আমি সাধারণতঃ মদের দোকানে, কাফেতে এবং অন্যান্য সাধারণ স্থানে গিয়ে যে সব সংবাদ সংগ্রহ করতাম তার দু' একটার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমরা সাধারণ লোক বল্‌লে বুঝি নিরক্ষর কৃষক বা মজুর। কিন্তু সেই কথাটা একেবারে ভুল। ইউরোপে সাধারণ লোকও পৃথিবীর অনেক খবর রাখে। তাদের সংবাদ পাবার প্রবৃত্তি আছে এবং সুযোগ পেলেই তারা সংবাদের প্রমাণ লাভ করতে কসুর করে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে সংবাদের যেমন অভাব, সংবাদ প্রত্যক্ষ করারও তেমনি প্রবৃত্তির পার্থক্য দেখা যায়। পূর্ব্বেই বলেছি ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে বসে ধারণার অবতারণা করা যেতে পারে কিন্তু উপলব্ধি হয় না। যে পর্য্যন্ত ধারণার পর উপলব্ধি না হয়, সে পর্য্যন্ত শিক্ষার অসম্পূর্ণতাই থেকে যায়।

পরদিন প্রাতে ভাবলাম আজ কয়েকজন সংবাদপত্রসেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা চাই, তাই সঙ্গীদেরে নিয়ে একটি সংবাদপত্রসেবীর চক্রে গিয়ে হাজির হ'লাম। মাত্র দু'জন ভদ্রলোক সেখানে বসেছিলেন। তাঁরা আমাকে দেখেই তাঁদের কাগজ পত্র গুটিয়ে ফেল্লেন দেখে মনে হলো—কি জানি আমরা যদি তাঁদের লেখা কিছু দেখে ফেলি। সঙ্গের রুমেনিয়ান্ মহিলা বল্লেন, আমি ফ্রেঞ্চ মোটেই অবগত নই। কথাটা শুনে তাঁদের বেশ শান্তি হ'ল। তারপর যখন জান্‌লেন—আমি "আবিসিনী" নই—হিন্দু, তখন তাঁরা আমার মন পরীক্ষা করতে লাগ্‌লেন। আমিও ক্রমাগত আবিসিনিয়ার এমন কি সমুদয় নিগ্রো জাতের বিরুদ্ধেই কথা বল্‌তে লাগ্‌লাম। সংবাদপত্রসেবীরা যখন বুঝলেন যে, আমি একজন নিগ্রোদ্রোহী তখন তাঁদের হৃদয়-দ্বার খুলে দিলেন। তাঁদের কথার ইঙ্গিতে বুঝ্‌লাম, ইউরোপে যত "কলোনিয়েল" দেশ আছে, তাঁদের সকলেরই ইচ্ছা আবিসিনিয়া ইতালী দখল করে। আফ্রিকার শেষ কালো রাজা চিরতরে বিদায় নেয়।

মানুষ অনেকক্ষণ আপন মনের ভাব লুকিয়ে রাখতে পারে না, যারা যতটুকু আপন মনের ভাব অধিকক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পারে তারাই ততটুকু কূটনীতিজ্ঞ এবং শক্তিশালী হয়। আমি দুর্ব্বল, তাই জিজ্ঞাসা করলাম "স্পেনের মধ্যে যে রাজদ্রোহ আরম্ভ হয়েছে তার মূলে কি অন্য কোনও ইউরোপীয়ান শক্তি চালবাজী করছে? উত্তর পেলাম, সুরু হতেই বৈদেশিক শক্তি স্পেনের মধ্যে গণ্ডগোলের কারণ হয়েছে। সেই সব কারণ হয়ত অনেক লেখক অনেক মতে লিখেছেন, কিন্তু লোকমুখের কথা অন্যরূপ। সোভিয়েট রাশিয়ার তাতে কোন হাত ছিল না, ছিল অন্য শক্তির। পরে সোভিয়েট রাশিয়া স্পেন রিপাব্‌লিকান পার্টিকে সাহায্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ রাষ্ট্রনীতির কথা যে ভাবে ভাবি, ইউরোপের লোক সেরূপ ভাবে ভাবে না। তারা দাবার মত চাল দিয়ে মাথা অনেকক্ষণ ঘামিয়ে তারপর একটা কথা বলে। কারণ তারা বেশ ভাল করেই অবগত আছে, বাজে কথার ফল কিছুই হয় না, মুখ নষ্ট এবং শক্তি নষ্ট হয় মাত্র।

সংবাদপত্রসেবীদের কাছে অনেকক্ষণ বসেছিলাম। তাঁদের চক্রে যে সকল বই, মানচিত্র ইত্যাদি দেখা যায় আমাদের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান আফিসে তার সব আছে কিনা সন্দেহ। যে সংবাদ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান দেন সম্পাদকীয় বিভাগে—সেই রকম সংবাদ কম ভারতীয় সম্পাদক দিতেই সক্ষম হন তাই ষ্টেট্‌স্‌ম্যান হ'লেন আমাদের "নেই মামার কানা মামা"। ধরে নিলাম মুখ খুলে কথা বলার আমাদের অধিকার নেই, লেখবার আমাদের অধিকার নেই, কিন্তু বিদেশে গিয়ে জানবার অধিকার এখনও লোপ হয় নি, হবেও না। কিন্তু আমাদের দেশের ক'জন সংবাদপত্রসেবী বিদেশে গিয়ে মামুলী সংবাদপত্রসেবীর বাড়ী খুঁজে গিয়ে দেখা করতে চান? "সবজান্তা" ভেবে যেমন ঘরে বসে আছেন, বিদেশ হ'তে ফেরবার বেলা তেমনি রিক্ত হাতেই ফিরে আসেন।

আমরা ইউরোপের রাষ্ট্রনীতির সম্বন্ধে অনেক কথা বল্লাম, যদিও আমার সেদিকে বিশেষ জ্ঞান নেই অথবা সোজা কথায় বল্‌ব রাষ্ট্রনীতি মোটেই বুঝ্‌তে পারি না। তবুও জানার একটা চেষ্টা আমার ছিল। লোকের সঙ্গে মিশবার আমার মনে শক্তি ছিল, যখন যা বুঝ্‌তাম না অম্‌নি তা জিজ্ঞাসা করবার আমার অধিকার ছিল। জান্‌লাম ভবিষ্যতের যুদ্ধ আসন্ন, তার পরিণাম বোধ হয় কেউ আজ পর্য্যন্ত বলেননি, কিন্তু মেজিনো লাইন, মেনারহাম লাইন যে ভূয়া তা সকলেই বুঝেছিল। এই অভিজ্ঞতা আমি মামুলী দু'জন সংবাদপত্রসেবীর কাছ হ'তে পেয়েছিলাম। তবে কেন এসব কথা গোপন করে রাখা হয়েছিল? যা ভূয়া, বাজে, তার রূপ সুন্দর; কিন্তু যেই কাছে যাওয়া—অম্‌নি ভূতের ভয়ের মত, জলবুদ্বুদের ক্ষণস্থায়িত্বের মত বুঝ্‌তে পারা যায়, সকল ধাঁধার অবসান হয়। ইউরোপের প্রায় দেশের লোকেই বুঝ্‌তে পেরেছে, আমরা তোমার হয়ে মরতে আর রাজি নই, যতক্ষণ তোমাদের বন্দুকের সঙ্গীন উঁচু থাক্‌বে, ততদিন আমরা মাথা নত করে থাক্‌ব। কিন্তু কথা হ'ল—মানুষ ভুলে বড় সহজে। মানুষের মাথায় নূতন কিছু প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায় সহজে; সেটা হ'ল—ধর্ম্মকে বাঁচিয়ে রাখা, জাতিকে বাঁচিয়ে রাখা। এর বেশি কিছু নয়—কিন্তু সে কথার অর্থের মায়া কাটাতে আবার বেশিক্ষণ লাগে না।

# ফাল্গুন সন্ধ্যায়

শ্রীইন্দু গুপ্ত

আজ ফাগুনে সাঁঝের বেলায় রঙের খেলা
জামরুল আর মেহেদীর বেড়া ঘিরে,—
ম্লান গগনে শ্রান্ত পাখীর ভাঙ্‌ল মেলা
কানন শাখায় তারা এসে ভিড়ে।

কুঞ্জকুলায় আলয় রচি' ঝিমায় পাখী
নিদ্রা নামে নয়ন দু'টী জুড়ে
অলক্ষ্যে কোন অলস মায়া যায় রে মাখি'
সবুজ পরী ধূসর হ'ল দূরে।

শুষ্ক গাছের গা ঘেষে ঐ ফিরুছে গরু
ফির্‌ছে তারা সবুজ জমিন্‌ পথে,
ফাগুন সাঁঝে বাতাস ছড়ায় নতুন তরু
অলস পথিক ফির্‌ছে কোন মতে।

গ্রামটি আমার যেন রে ঠিক স্বপ্ন সম
বকুল ফুলের সুবাস-ধারা ঢালে,
চতুর্দ্দশীর চাঁদ যে ওঠে মনোরম
একলা কবি ছন্দ রচে তালে।

# উল্কা

অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়

উল্কাপিণ্ড (meteorite) বা উল্কাপাতের কথা অনেকেই বোধ হয় শুনিয়াছেন ও যাদুঘরে কাঁচের আধারে সংরক্ষিত বিভিন্ন প্রকারের উল্কাপিণ্ড কেহ কেহ দেখিয়া থাকিবেন। উল্কাপাতের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এরূপ লোক আমাদের দেশে হয়ত অনেক কম। যদিচ কেহ কেহ এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ কোন পত্রিকায় লিপিবদ্ধ না থাকায় জনসাধারণ এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জ্ঞান অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন না। তবে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে যে সকল উল্কাপিণ্ড ও তৎসম্বন্ধে যতটুকু সংবাদ সংগ্রহ করা গিয়াছে তাহা যাদুঘরের কর্ত্তৃপক্ষগণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে উল্কা ও উল্কাপাত সম্বন্ধে দু'চার কথা বলিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

উল্কা যে শূন্যমার্গ হইতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় ও ইহা আমাদের পৃথিবীজাত কোন পদার্থ নহে, এ ধারণা বর্ত্তমানে হয়ত অনেকের হইয়াছে। এই জন্যই বোধ হয় পূর্ব্বে অনেকে উল্কাশিলাকে ভক্তিভরে পূজা করিত। বর্ত্তমান যুগেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে উল্কা প্রস্তর অনেক আদরের বস্তু। অনেকে আবার উল্কাপিণ্ডকে বজ্রপাতের নিদর্শন বলিয়া মনে করিতেন। এরূপ ধারণা পোষণ করা বিচিত্র নহে, কারণ উল্কাপাতের সময় বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় শব্দ উত্থিত হয় ও এই জন্যই বোধ হয় "বিনা মেঘে বজ্রপাত" প্রবাদ চলিত হইয়াছে। যাঁহারা জনপ্রবাদ ও কিম্বদন্তী বিষয়ে আলোচনা করেন তাঁহারা এ সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করিয়া সঠিক তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

উল্কা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকে, যথা :— (ক) লৌহশ্রেণীভুক্ত উল্কা—ইহা প্রধানতঃ লৌহ ও নিকেল ধাতু দ্বারা গঠিত ও (খ) প্রস্তরশ্রেণীভুক্ত উল্কা।

উল্কার উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন সময়ে নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। সে বিষয়ে অতি সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। পৃথিবীর অন্তর্গত কোন আগ্নেয়গিরি হইতে সবেগে উত্থিত হইয়া প্রস্তর খণ্ড দূরদেশে উল্কারূপে ভূপতিত হইয়া থাকিবে এরূপ ধারণা পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক মহলে কোথাও প্রচলিত ছিল। আবার কেহ কেহ মনে করিতেন যে, আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্রে অবস্থিত কোন আগ্নেয়গিরি হইতে বহির্গত শিলাখণ্ডই বোধ হয় সবেগে ধাবিত হইয়া আমাদের গ্রহের উপর পতিত হইয়া উল্কাপাতের সৃষ্টি করিয়া থাকে। পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি হইতে কোনও কঠিন প্রস্তর খণ্ড যে সবেগে উত্থিত হইয়া পৃথিবীর আকর্ষণের বহির্ভূত হইয়া যাইতে পারে ও পুনরায় ভূপৃষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উল্কাপাতের সৃষ্টি করিতে পারে, এ ধারণা বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ একেবারেই পোষণ করেন না ও এ সকল মত যে ভ্রান্ত তাহাও পণ্ডিতগণ নানা প্রকারে প্রমাণিত করিয়াছেন। তাহাদের সবিশেষ আলোচনা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের সৌরজগতের অন্তর্গত অনেক ধূমকেতুর সন্ধান মিলিয়াছে ও বহু যুগ অন্তর কখনও কখনও তাহাদের আবির্ভাব হয় ও কতকগুলি আবার জলন্ত গোলক বিশেষ ও বিভিন্ন আকারের দীর্ঘপুচ্ছ বিশিষ্ট। পুচ্ছবিহীন ধূমকেতুও সময়ে সময়ে দৃষ্ট হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের সপুচ্ছ হ্যালীর ধূমকেতু হয় ত অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন ও তাহার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আর একটী পুচ্ছবিহীন ধূমকেতুও দেখা গিয়াছিল। বৈজ্ঞানিকগণ অনেকেই গবেষণা করিয়া এই সকল ধূমকেতুর অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন যে, ধূমকেতুর পুচ্ছটি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলন্ত অংশ বা কণার দ্বারা গঠিত বলিয়াই সূর্য্যের প্রভাবে ইহার (সূর্য্যের) বিপরীত দিকে সহজেই বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ধূমকেতুর গোলাকার মস্তকটী কিছু বৃহদাকার জলন্ত খণ্ডসমূহের সমষ্টি মাত্র। পণ্ডিতগণ গবেষণা দ্বারা কতকগুলি উল্কাপিণ্ডের ও

ধূমকেতুর জলন্ত গোলকের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ও সেই কারণে তাঁহারা অনুমান করেন যে, হয় ত ধূমকেতুর জলন্ত গোলক হইতে কতকাংশ কোনও কারণ বশতঃ বিচ্যুত হইয়া ভূপৃষ্ঠে মধ্যে মধ্যে উল্কাপাতের সৃষ্টি করিয়া থাকে। তবে ইহাও তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, ভূপৃষ্ঠে পতিত উল্কার মধ্যে অধিকাংশই ধূমকেতু হইতে উদ্ভূত নহে। বরং বিশ্বপরিবারের অন্য কোন স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আমাদের পৃথিবী পৃষ্ঠে উপস্থিত হয়।

অনেকে হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, কখনও কখনও অন্ধকার রাত্রিতে তারকামণ্ডিত পরিষ্কার আকাশে হঠাৎ একটী বা কতকগুলি ক্ষুদ্র তারকা বিচ্যুত হইয়া দ্রুত ধাবিত হয় ও এরূপ তারকা বিচ্যুতির সময় দীর্ঘ জলন্ত শিখাও দৃষ্টিগোচর হয় ও অল্প কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ঐরূপ জলন্ত ও ধাবমান তারকা শূন্যে বিলীন হইয়া যায় বা সময় সময় আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়ে। ইহাকেই ইংরাজীতে shooting star বলা হয়। আসলে ইহারা প্রকৃত তারকাশ্রেণীভুক্ত নহে। ইহারা আমাদের সৌরজগতের মধ্যেই ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ বিশেষ। এই ধাবমান "তারকার" জলন্ত শিখার উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে, জলন্ত পদার্থ ব্যতীত তড়িৎ নিঃসরণের হেতুও এই প্রকার প্রদীপ্ত বা প্রভাযুক্ত শিখার উদ্ভব হইতে পারে। তাঁহাদের ধারণা যে এ গুলির অধিকাংশই পৃথিবীর বহিস্থিত ও আকারে ইহারা অতি ক্ষুদ্র হয়। এ সকল পদার্থের নানা বিষয়ের সবিশেষ সন্ধান পাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ নানারূপ গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। এবং তাঁহাদের গবেষণার ফলে আমাদের জ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে এরূপ আশা হয়। অনেকের ধারণা যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবস্থায় ইহারা meteor রূপে পরিচিত ও সেই কারণেই বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রজ্বলিত হইয়া নিঃশেষিত হয়, তবে কিঞ্চিৎ বৃহদাকার সম্পন্ন হইলে এবং ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলে উল্কারূপে পরিগণিত হয়। এই মতানুসারে meteor ও উল্কার মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই।

বৎসরের কোন্ কোন্ মাসে বা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোন্ কোন্ সময়ে এরূপ "তারকা" বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে ও কোন্ কোন্ সময়েই বা পৃথিবীর নানা স্থানে উল্কাপাত হইয়াছে তাহাদের যথাসম্ভব সঠিক হিসাব লইয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে, বৎসরের মধ্যে মে ও জুন মাসে এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বৈকাল ৩ টার সময় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক উল্কাপাত হইয়াছে। তবে প্রায় দ্বিপ্রহর ও প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়ও উল্কাপাতের আধিক্য দৃষ্ট হয়। আগষ্ট ও নভেম্বর মাসেই আকাশমার্গে অধিকাংশ 'তারকা বিচ্যুতি' ঘটিতে দেখা যায়। সুতরাং তারকা-বিচ্যুতি (star shower) ও উল্কাপাতের মধ্যে যে বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই তাহা এই আলোচনা হইতেই অনেকটা প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে মেক্সিকো অন্তর্গত Mazapil নামক স্থানে যে উভয় শ্রেণীর পতন একই সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল তাহাও জানিতে পারা গিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত তারকা বিচ্যুতি ও উল্কাপাতের সময় ও অপরাপর যাবতীয় বিষয়ে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে এই দুই পদার্থের মধ্যে যে পার্থক্য ও প্রভেদ আছে এবং এই দুই শ্রেণী যে বিভিন্ন পর্য্যায়ভুক্ত, সেই মতই ক্রমশঃ অনেকে সমর্থন করিতেছেন। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের আরও অধিক অনুসন্ধান ও গবেষণা নিয়োজিত হইলে, এ বিষয়ের সম্যক্ সমাধান হইতে পারে।

বর্ত্তমান যুগে মধ্যে মধ্যে উল্কাপাত দেখিতে পাই বা উল্কাপাতের বিবরণ পাই ও বিভিন্ন স্থানে উল্কাখণ্ড পড়িয়া আছে সে সংবাদও মধ্যে মধ্যে আমাদের নিকট আসে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠে মানবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে প্রাচীনকালে উল্কাপাত হইত কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সংবাদ এখনও ভূতত্ত্ববিদগণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তবে কানাডার অন্তর্গত Klondyke নামক স্থানে ২০।২৫ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে Pliocene যুগের স্তর হইতে একটী লৌহ উল্কা উদ্ধার করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন স্থানের পুরাকালের স্তর হইতে কোনও উল্কাখণ্ড সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। ভূতত্ত্ববিদ্গণ এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিলে হয়ত কিছু নূতন সংবাদ পাওয়া যাইবে। উল্কাপাত সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে তাহা

হইতে পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, আমাদের সৌরজগতের অন্তর্গত এবং পৃথিবীর বহিস্থিত অপর কোন ক্ষুদ্র গ্রহ বা উপগ্রহ জাতীয় পদার্থ নানা কারণে বিদীর্ণ হইয়া উহার কতক ভগ্নাংশ সবেগে শূন্যমার্গে ধাবিত হইতে থাকে ও ক্রমশঃ আমাদের পৃথিবীর আকর্ষণের মধ্যে আসিয়া পড়ায় সজোরে ভূপৃষ্ঠে উল্কারূপে পতিত হয়। আমাদের পৃথিবীর বহিরাবরণ বা বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া ধাবিত হইবার সময়ে উল্কার খণ্ডগুলি যথেষ্ট উত্তপ্ত হয় ও সময়ে সময়ে ক্ষুদ্রাংশগুলি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উজ্জ্বল আলোকের সৃষ্টি করে বলিয়া রাত্রিকালে আকাশমার্গের অনেকাংশ আলোকিত হইয়া থাকে। আমাদের সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত শনি-গ্রহের চতুর্দ্দিকে যে প্রদীপ্ত বলয় দৃষ্ট হয়, তাহা যে অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলন্ত পদার্থের সমষ্টি মাত্র তাহা জানিতে পারা গিয়াছে ও planetoid গ্রহের মধ্যে যে ঐরূপ অসংখ্য পদার্থ বিদ্যমান, তাহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, পৃথিবীর বহিস্থিত এরূপ কোনও পদার্থ হইতে উহার ভগ্নাংশ কখনও কখনও স্থানচ্যুত হইয়া ভূপৃষ্ঠে উল্কারূপে পতিত হইতে পারে।

ভূপৃষ্ঠে যে সমস্ত উল্কাপিণ্ডের পতন হইয়াছে, তাহাদের বয়সনির্ণয় সম্বন্ধে পণ্ডিতসমাজে পূর্ব্বে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। তবে বর্ত্তমান যুগে Radio-activity শীর্ষক গবেষণা কার্য্যে যে যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের একটী অভিনব দান। এই নূতন পদ্ধতিতে গবেষণা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, আমাদের সৌর জগতের সৃষ্টি ও পৃথিবীর জন্ম প্রায় ২৫০,৩০০ কোটী বৎসর পূর্ব্বে সম্ভব হইয়াছিল। এইরূপ গবেষণা দ্বারা উল্কাপিণ্ডেরও বয়স নির্ণয় করা যাইতে পারে এবং আজ পর্য্যন্ত যেগুলি লৌহ উল্কাশ্রেণীভুক্ত উল্কাপিণ্ডের বয়ঃক্রম নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, তাহাদের কোনটীর বয়সই আমাদের পৃথিবীর বয়স অপেক্ষা অধিকতর নহে। এই কারণেই পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, উল্কাপিণ্ড আমাদের সৌরজগতেরই অন্তর্ভুক্ত কোন পদার্থের ভগ্নাংশ মাত্র এবং ইহারা আমাদের সৌরজগতের বহিস্থিত সুদূর কোনও ব্রহ্মাণ্ডের অংশীভূত নহে। আমাদের পৃথিবীর বাহিরে যে বিরাট ও অসীম বিশ্ব রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে কিছু সংবাদ আমরা এই সকল উল্কাপিণ্ড হইতে আহরণ করিতে পারি বলিয়া ইহা বৈজ্ঞানিকের নিকট অতীব মূল্যবান্ বস্তু। ইহা যে বিরল ও দুষ্প্রাপ্য, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ও ইহাদের গঠন ও উপাদানের অনেক সংবাদ আজ ভূতত্ত্ববিদ্গণ সংগ্রহ করিয়াছেন ও এই সকল উপাদানের বিশেষত্ব প্রণিধানযোগ্য। সুতরাং আমাদের দেশে কোথাও উল্কাপাত হইলে, তাহাদের সবিশেষ সংবাদ ও উল্কাপিণ্ডের খণ্ডগুলি যত্নসহকারে সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার যাদুঘরের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দিলে, ইহাদের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধি করিবে, সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমাদের দেশবাসীর ও জনসাধারণের আরও অধিক সচেতন ও অনুসন্ধিৎসু হওয়া কর্ত্তব্য।

উল্কা পৃথিবীর বহিরাচ্ছাদন বা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া, বহুধা বিচ্ছিন্ন হইয়া ছোট বড় আকারের নানা খণ্ডে কিছু স্থান ব্যাপিয়া বিক্ষিপ্ত হয় ও ইহাকেই "উল্কা-বৃষ্টি" বলা হয়। তবে সকল উল্কাপাতের সময়েই যে উল্কাবৃষ্টি সম্ভব হয় নাই তাহাও দেখা গিয়াছে ও উল্কাবৃষ্টি কতকগুলি কারণের উপর নির্ভর করে। এ সকল বিষয়ের অনেক সংবাদ আজ আমাদের হস্তগত হইয়াছে ও সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে, এ প্রবন্ধের আকার অতি-মাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে। তবে উল্কাবৃষ্টির মধ্যে প্রস্তর-শ্রেণীভুক্ত উল্কাই সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়। লৌহশ্রেণীর উল্কা-বৃষ্টি এ পর্য্যন্ত অতীব বিরল। পৃথিবীর নানা দেশ হইতে উল্কাবৃষ্টির দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে কয়েক স্থানের উল্কাবৃষ্টির কথা, এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রাজপুতনার সাহাপুর ষ্টেট অন্তর্গত সামেলিয়া মৌজায় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ২০শে মে বেলা ৫৷০ ঘটিকার সময়ে লৌহ-উল্কার বৃষ্টি হইয়াছিল। পাঞ্জাবের বাহালপুর ষ্টেট অন্তর্গত খয়েরপুর নামক স্থানে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ২৩শে সেপ্টেম্বর ভোর ৫টার সময়ে প্রায় ৪৮ বর্গ মাইল (১৬ মাইল × ৩ মাইল) ব্যাপী প্রস্তর-উল্কার বৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত এলাহাবাদ জিলায় মেরুয়া ও চাইল এবং দক্ষিণ ভারতে মালাবার জিলার কুটীপুরম অঞ্চলের প্রস্তর-উল্কাবৃষ্টির কথা

এ স্থানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল স্থানে উল্কাপাতের সময়ে বজ্রপাতের ন্যায় প্রচণ্ড শব্দ উত্থিত হইয়াছিল। এ প্রসঙ্গে বাংলা দেশের উল্কাবৃষ্টির দুই একটী দৃষ্টান্তও দেওয়া যাইতে পারে। ময়মনসিংহ জেলাস্থিত মুরাদ গ্রামে ইং ১৯২৪ সালে ৭ই আগষ্ট বেলা ২॥০টার সময়ে প্রস্তর উল্কাপাত হয় ও একই উল্কাপিণ্ডের দুইটী খণ্ড এক মাইল ব্যবধান দুইটী স্থান হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ১৪ই মে তারিখে রাত্রি ১১টার সময়ে ত্রিপুরা জেলা অন্তর্গত পারপেটী অঞ্চলে প্রায় ১৫ বর্গ মাইলব্যাপী প্রস্তর-উল্কার বৃষ্টি হইয়াছিল। এই উল্কাপাতের সময়ে উল্কাপিণ্ড বহুধা বিচ্ছিন্ন হওয়া কালীন যে শব্দ উত্থিত হয়, তাহাও অনেকের কর্ণগোচর হইয়াছিল ও সমস্ত আকাশ প্রজ্জ্বলিত বা প্রদীপ্ত উল্কাপিণ্ডের দ্বারা আলোকিত হইতে দেখা গিয়াছিল। ঢাকা জিলার দোকাচী গ্রামের আশে পাশে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ২২শে অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টার সময়ে আকাশে একটী জ্বলন্ত গোলকের আবির্ভাব হয় ও ভীষণ শব্দ উত্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে গোলকটী বহুধা বিচ্ছিন্ন হইয়া ৬ মাইলব্যাপী স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ত্রিপুরা জেলার পাটওয়ার গ্রামাঞ্চলে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুলাই বৈকাল বেলা লৌহ-প্রস্তর (Siderolite) উল্কাবৃষ্টি হইয়াছিল। এ প্রসঙ্গে ইহাও বলা উচিত যে, লৌহশ্রেণীভুক্ত উল্কার পতন দৃষ্টিগোচর করার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত অল্প পাওয়া গিয়াছে। প্রায় সমস্ত লৌহ-উল্কা ভূতত্ত্ববিদগণ নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন দেশের যাদুঘরে সংরক্ষিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রস্তর উল্কাপাতের দৃশ্য ও বিবরণ অনেকের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। এবং এই সকল উল্কাপাতের সময়ে কিরূপ শব্দ উত্থিত হইয়াছিল ও আকাশমার্গ কি ভাবে আলোকিত হইয়াছিল, তাহার সবিশেষ বর্ণনাও অনেকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সে সকল বিবরণপাঠে প্রাণে বেশ আনন্দ ও আগ্রহের সঞ্চার হয়। উল্কাপাতকালীন সময়ে সময়ে বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় যে ভীষণ শব্দ উত্থিত হয়, তাহা নিম্নোক্ত দুই একটী দৃষ্টান্ত হইতে অতি সহজেই অনুমিত হইবে।

পাঞ্জাবের পাতিয়ালা ষ্টেটের দুরালা নামক স্থানে প্রস্তর-উল্কাপাতের সময় যে শব্দ উত্থিত হইয়াছিল, তাহা ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল এবং উল্কাপাতের ফলে ভূপৃষ্ঠে পাঁচ ফুট গভীর গর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছিল। যোধপুর অন্তর্গত রুজালা নামক স্থানে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর বেলা ১০টার সময়ে প্রস্তর-উল্কাপাতের শব্দ প্রায় ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানেও পৌঁছাইয়াছিল ও উল্কাপাতের ফলে ৩।৪ ফুট গভীর গর্ত্ত হইয়াছিল ও অনেকগুলি খণ্ড চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭টার সময়ে ভিজাগ্ জেলার নেদাগোলা উল্কা সমস্ত আকাশ আলোকিত করিয়াছিল ও কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বিকট শব্দসহকারে বিদীর্ণ হইয়া প্রায় ৫ সের ওজনের উল্কা ভূতলে পতিত হইয়া প্রায় ২ ফুট গর্ত্তের সৃষ্টি করে। যে সকল উল্কাপাত সন্ধ্যার পর ঘটে, তাহারা প্রায়ই আকাশমার্গে জ্বলন্ত গোলকের ন্যায় আবির্ভূত হইয়া চারিদিক আলোকিত করিয়া থাকে ও সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। আজ পর্য্যন্ত যত বিবরণ পাঠ করা হইয়াছে ও যত দূর সংবাদ সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, উল্কাপিণ্ডের আঘাত দ্বারা কোনও লোকের প্রাণহানি হয় নাই। তবে এ বিষয়ে কিছু সংবাদও যে পাওয়া গিয়াছে, তাহা একটী ভারতীয় দৃষ্টান্ত হইতে জানা যাইবে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট বা সেপ্টেম্বর মাসের কোন সময়ে যুক্তপ্রদেশস্থিত বস্তী জেলায় "হারায়া" প্রস্তর উল্কাপাতের ফলে ও সম্ভবতঃ উল্কাপিণ্ডের আঘাতে চাষ-কার্য্যে নিযুক্ত তিন জনের মধ্যে দুই ব্যক্তি অচেতন হইয়া পড়ে ও তৃতীয় ব্যক্তি (স্ত্রীলোক) দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই মৃত স্ত্রীলোকটির নিকটবর্ত্তী স্থানে ৫ ফুট গভীর গর্ত্ত হইতে প্রায় এক সের ওজনের প্রস্তর উল্কাখণ্ডের উদ্ধার করা হয়। তবে এরূপ প্রাণহানির সংবাদ পৃথিবীর সকল দেশেই অতীব বিরল।

উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর গাত্রে বা ভূপৃষ্ঠে পতনের ফলে যে গর্ত্তের সৃষ্টি করে, তাহা সাধারণতঃ অগভীর। তবে ৪।৫ ফুট গর্ত্ত হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত ভারতের অনেক স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে ও এ বিষয়ে পূর্ব্বেই কিছু উল্লেখ করা

হইয়াছে। সময়ে সময়ে বৃহদাকার উল্কাপাত হেতু সুগভীর গর্ত্তেরও সৃষ্টি হয়, তাহাও জানিতে পারা গিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অন্তর্গত আরিজোনা প্রদেশে Canon Diablo নামক স্থানে ৫৭০ ফুট গভীর ও ৪০০০ ফুট ব্যাসের আয়তন যুক্ত একটী বিশাল গর্ত্তের সৃষ্টি যে কতকগুলি বিরাট্ লৌহ উল্কাপাতের পর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে হইয়াছে, সেই ধারণাই আজ পণ্ডিতগণ পোষণ করেন। এই উল্কাপিণ্ডের কিছু অংশ কলিকাতার যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

উল্কাপিণ্ড কিরূপ দ্রুতগতিতে ধাবিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, সে বিষয়েও বৈজ্ঞানিকগণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন এবং গবেষণা ও গণনার ফলে তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন যে, বেলা দ্বিপ্রহর হইতে মধ্যরাত্রির মধ্যে যে সমস্ত উল্কাপাত হয় তাহারা প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৮ মাইল বেগে ধাবিত হইয়া আসে। পৃথিবী নিজের পথে যে দিকে ধাবিত হয়, সেই দিকেই উল্কাগুলি চালিত হয় বলিয়াই ইহাদের গতির বেগ এইরূপ অল্প বলিয়া মনে হয়। পরন্তু যে সকল উল্কা মধ্যরাত্রি হইতে দ্বিপ্রহরের মধ্যে পতিত হয় তাহাদের অধিকাংশই পৃথিবীর গতির বিপরীত দিকে ধাবিত হয় ও সেইজন্যই তাহাদের গতিও অত্যধিক অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৪৭ মাইল।

আজ পর্য্যন্ত ভূপৃষ্ঠ হইতে যতগুলি উল্কাপিণ্ড সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত হোবা স্থানের লৌহ-উল্কাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ইহার ওজন ৫৪ টন অর্থাৎ প্রায় দেড় হাজার মণ। তদপেক্ষা কম ওজনের লৌহ উল্কা অনেক পাওয়া গিয়াছে ও তাহাদের মধ্যে কয়েকটীর নাম ও ওজন এস্থলে দেওয়া হইল।

১। গ্রীনল্যাণ্ড অন্তর্গত "কেপ-ইয়র্ক" হইতে প্রাপ্ত লৌহ-উল্কা ওজন ৩৬৷৷০ টন।

২। মেক্সিকোর অন্তর্গত "ব্যাকুবিরিটো" হইতে প্রাপ্ত লৌহ-উল্কা ওজন ২৭ টন।

৩। মেক্সিকোর অন্তর্গত "চুপাডেরস্" হইতে প্রাপ্ত দুই খণ্ড লৌহ উল্কা একত্র ওজন ২৮ টন।

৪। আমেরিকার অরিগণ অন্তর্গত "উইলামেট" হইতে প্রাপ্ত লৌহ উল্কা ওজন ১৫৷৷০ টন। (১ নং চিত্র)

৫। মেক্সিকোর অন্তর্গত "এলমোরিটো" হইতে প্রাপ্ত লৌহ উল্কা ওজন ১১ টন।

উপরোক্ত লৌহ উল্কাগুলি বহুকাল যাবত ঐ সকল অঞ্চলে পতিত অবস্থায় ছিল ও জলবায়ুর প্রকোপে ইহাদের কতকগুলি যে বিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা ১নং চিত্র হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। এই সকল অতিকায় লৌহ-উল্কাপাত কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। স্থানীয় অধিবাসীরা ইহাদের সন্ধান ও সংবাদ দেওয়ায় অবশেষে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও এগুলি তাহাদের

১ নং চিত্র

হস্তগত হয় এবং বিভিন্ন স্থানের যাদুঘরে স্থাপিত হইয়া জনসাধারণের কৌতুহল চরিতার্থ ও জ্ঞান বর্দ্ধন করিতেছে। প্রস্তর-উল্কা ভঙ্গপ্রবণ বলিয়া সহজেই বিদীর্ণ হইয়া শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; কিন্তু লৌহ উল্কা লৌহ ও নিকেল ধাতুর সংমিশ্রণে এত কঠিন ও দৃঢ়সম্বদ্ধ যে সহজে বিভক্ত হয় না ও সেই কারণেই বৃহদাকারসম্পন্ন লৌহ-নিকেল উল্কা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের 'কানসাস্' প্রদেশ অন্তর্গত Long Islahd নামক স্থান হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রস্তর-উল্কা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইহার ওজন ১২৭৫ পাউণ্ড বা প্রায় ১৬ মণ।

উল্কা সাধারণতঃ

হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তবে এই দুই প্রকার পদার্থ সময়ে সময়ে অল্পাধিক মিশ্রিত থাকে বলিয়া আরও নানা শ্রেণীর উল্লেখ বৈজ্ঞানিকগণ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যেক উল্কাপিণ্ড অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ও রাসায়নিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা

২ নং চিত্র

করা হয় ও এই ভাবে ইহাদের নানা তথ্য সংগৃহীত হয় ও অবশেষে যথাযথ শ্রেণী বা পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া উল্কাগুলি যাদুঘরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষিত হইয়া থাকে।

উল্কাপিণ্ড নানা আকারের দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মোচাকৃতি বা coneএর ন্যায় (২নং চিত্র) অতি সাধারণ এবং বায়ুমণ্ডলে দ্রুত গতিতে ধাবিত হয় বলিয়াই উল্কার বহিরাবরণ সহজেই রন্ধ্রবিশিষ্ট হয় (২নং ও ৩নং চিত্র)। সময়ে সময়ে ইহারা নাসপাতির আকার ধারণ করে (pear-shaped) (৪নং চিত্র) ও কতকগুলি আবার চক্রাকার বা বলয়াকার এবং কোন কোনটী লম্বা পটোলাকৃতি অবস্থায় পাওয়া যায়।

লৌহশ্রেণীভুক্ত উল্কার মধ্যে লৌহ ও নিকেল ধাতু যে নানা ভাগে মিশ্রিত আছে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে ও এই লৌহ-উল্কা পালিশ করিয়া তাহাতে নাইট্রিক এসিড প্রয়োগ করিলে, ত্রিকোণাকার নানারূপ চিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠে ও ইহা লৌহ-উল্কার একটী প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। Widmanstatten নামক একজন বৈজ্ঞানিক ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া এইরূপ চিত্র Widmanstatten নক্সা (৫নং চিত্র) নামে বিজ্ঞান-সমাজে প্রচলিত। নিকেলের ভাগ শতকরা ৭—১৪ হইলে, এইরূপ চিত্র বেশ পরিস্ফুট হয় ও সাড়ে ছয় ভাগের কম হইলে, এরূপ চিত্র পরিলক্ষিত হয় না। এ বিষয়ে অনেক গবেষণা হইয়া গিয়াছে ও Widmanstatten নক্সা ব্যতীত Rinne নক্সা ও Neumann নক্সাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। মোট কথা, লৌহ ও নিকেল ধাতুর বিভিন্ন পরিমাণে সংমিশ্রণ হেতু নানা প্রকার ভেদাভেদ দৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা এ প্রবন্ধে করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। এই সকল উপায়ে লৌহ ও নিকেল মিশ্রিত খণ্ড যে উল্কাশ্রেণীভুক্ত, তাহা সঠিক নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হইয়াছে। নকল বা কৃত্রিম পৃথিবীজাত লৌহ-নিকেল মিশ্রিত পদার্থে এসিড্ প্রয়োগের ফলে এরূপ চিত্র পরিস্ফুট হয় না। উল্কার মধ্যে লৌহ ও নিকেল বিভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত অবস্থায় দৃষ্ট হয় ও Kamacite, Taenite ও Plessite ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে ও তাহাদের সবিশেষ পরিচয় বৈজ্ঞানিকগণ লাভ করিয়াছেন।

৩ নং চিত্র

প্রস্তর-উল্কার অতি স্বচ্ছ ফালি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে

পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, উহাদের মধ্যে নানা জাতীয় ধাতু ও মনিক্ (mineral) বর্ত্তমান থাকে ; যথা হীরক, গ্রাফাইট, প্লাটিনাম, রেডিয়াম, লৌহ+নিকেল, quartz magnetite, chromite, felspar, pyroxene, apatite, *oldhamite, daubreelite, schreibersite, moissanite, maskelynite, weinbergite*, ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে শেষোল্লিখিত ছয়টী মনিক কেবল মাত্র প্রস্তর-উল্কার মধ্য হইতেই আবিষ্কার করা হইয়াছে ও পৃথিবীর অন্তর্গত কোনও প্রস্তরখণ্ডে আজ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই। পাঞ্জাব প্রদেশের ধরমশালা প্রস্তর-উল্কার মধ্যে সামান্য রেডিয়াম পাওয়া গিয়াছে।
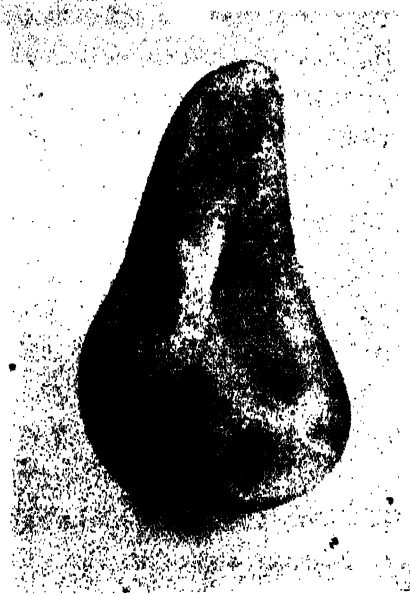
৪ নং চিত্র

যে সমস্ত উল্কাপিণ্ড ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকের বহিরাবরণ বা ত্বক্ কিঞ্চিৎ দগ্ধ ও দ্রবীভূত অবস্থায় দেখা যায় এবং বায়ুমণ্ডলের মধ্যে সবেগে ধাবিত হওয়া কালীন বায়ুর আঘাতে তাহাদের দগ্ধ ও কিঞ্চিৎ গলিত ত্বকে নানা প্রকারের চিহ্ন বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্তের সৃষ্টি হয়। ৩ নং চিত্রে গোয়ালপাড়া (আসাম) প্রস্তর উল্কাখণ্ডের বহিরাবরণ বা ত্বক্ হইতে ইহা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। এরূপ রন্ধ্র বিশিষ্ট ত্বক্ পৃথিবীজাত কোন প্রস্তরখণ্ডে পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রস্তর-উল্কার স্বচ্ছ ফালি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে, উহার মধ্যে বিভিন্ন মনিকের নানারূপ বিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দু' এক প্রকার অভিনব বিন্যাস ও (chondritic structure, ৬ নং চিত্র) দৃষ্ট হয় ও আমাদের ভূপৃষ্ঠের কোনও প্রস্তরখণ্ডে আজ পর্য্যন্ত ইহা আবিষ্কৃত হয় নাই। এইরূপ নানা প্রকার পরীক্ষা দ্বারা ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ আজ উল্কার স্বরূপ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন ও বিভিন্ন উল্কার নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায় বা শ্রেণী নির্ণয় সহজেই করিতে পারেন।

ভারতবর্ষে পতিত উল্কার মধ্যে কয়েকটীর নাম নিম্নে উল্লেখ করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।*

১। মেরুয়া (এলাহাবাদ)—প্রস্তর-উল্কা।

এলাহাবাদ জিলায় মেরুয়া নামক স্থানে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ৩০শে আগষ্ট বেলা ১১॥০টার সময় বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় শব্দোত্থিত হওয়ার পরই প্রস্তর
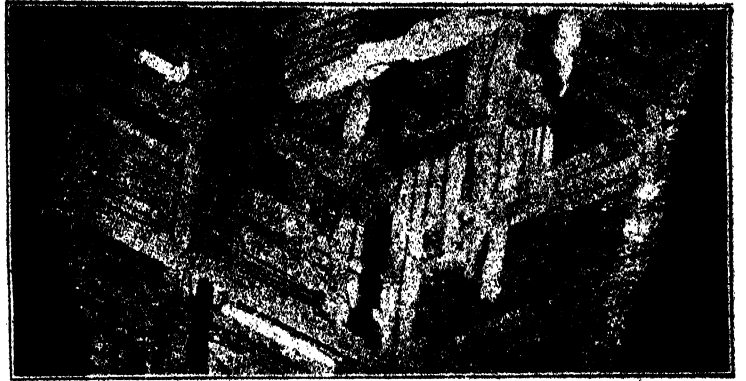
৫ নং চিত্র

উল্কা বৃষ্টি হইয়াছিল। ছয় খণ্ড উল্কা উদ্ধার করা গিয়াছে ও ভূপৃষ্ঠে প্রায় দেড় ফুট গভীর গর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত উল্কাপিণ্ডগুলির ওজন প্রায় দুই মণ হইবে ও ইহাই ভারতে প্রাপ্ত উল্কার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।

২। কুটীপুরম (মাদ্রাজ)—প্রস্তর-উল্কা।

মাদ্রাজে মালাবার জেলার অন্তর্গত কুটীপুরম অঞ্চলে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল সকাল ৭টার সময়ে আকাশমার্গে গভীর শব্দোত্থিত হওয়ার

* ভারত সরকারের ভূতত্ত্ব বিভাগের গ্রন্থাবলী হইতে কিয়দংশ গৃহীত।

সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তর-উল্কাবৃষ্টি হইয়াছিল। তিন চারি খণ্ড উল্কা পাওয়া গিয়াছে ও তাহাদের সর্ব্বসমেত ওজন প্রায় এক মণ হইবে। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ খণ্ডটী প্রায় ৩৫ সের হইবে। ইহাই ভারতে প্রাপ্ত উল্কার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

৩। পাটোয়ার (ত্রিপুরা)—লৌহ-প্রস্তর মিশ্রিত উল্কা।

ত্রিপুরা জেলার পাটোয়ার গ্রামাঞ্চলে ইং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুলাই বেলা ২টা ২০ মিনিটের সময়ে গগনভেদী শব্দোত্থিত হইয়া উল্কাবৃষ্টি হইয়াছিল ও ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া প্রায় তিন ফুট গর্ত্তের সৃষ্টি হয়। পাঁচটী খণ্ড সংগ্রহ করা হইয়াছে ও উহাদের সর্ব্বসমেত ওজন হইবে প্রায় এক মণ। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ খণ্ডটীর ওজন প্রায় ২৫ সের হইবে।

৬নং চিত্র

৪। ধরমশালা (পাঞ্জাব)—প্রস্তর-উ

পাঞ্জাবে কাংড়া জিলা অন্তর্গত ধরমশালা নামক স্থানে ইং ১৮৬০ খৃঃ অঃ ১৪ই জুলাই বেলা ২টা ১৫ মিনিটের সময় প্রস্তর-উল্কাবৃষ্টি হয়। যে কয়টী খণ্ড সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাদের ওজন হইবে প্রায় ৩০ সের।

৫। পারপেটী (ত্রিপুরা)—প্রস্তর-উল্কা।

ইং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ১৪ই মে তারিখে রাত্রি ১১টার সময়ে ত্রিপুরা জেলায় পারপেটী, পিলগিরি, ভাটেশ্বর, কৃষ্ণপুর, বড়পাড়া, বার্গী প্রভৃতি গ্রামের উপর এই উল্কার আবির্ভাব হওয়ায় আকাশমার্গ যথেষ্ট আলোকিত হইয়াছিল ও গভীর শব্দোত্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উল্কা-পিণ্ডটী বিদীর্ণ হইয়া বহু খণ্ডে পরিণত হয় ও প্রায় ১৫ বর্গ মাইলব্যাপী এই সকল গ্রামের উপর উল্কাবৃষ্টি হইয়াছিল। যে সকল উল্কাখণ্ডগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে, তাহাদের মোট ওজন প্রায় ২৫ সের হইবে ও তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ খণ্ডটীর ওজন প্রায় ৭½ সের হইবে।

৬। কোদাই কানাল (মাদ্রাজ)—লৌহ-উল্কা।

ইং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১৮ সের ওজনের এই উল্কাপিণ্ডটী সংগ্রহ করা হয়। ইহার পতনের সঠিক সময় ও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কোদাই কানালের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী বৃহৎ উল্কার আবির্ভাব ও বিদীর্ণ হইবার সংবাদও পাওয়া গিয়াছে।

৭। ইয়াটুর, নেলোর জিলা (মাদ্রাজ)—প্রস্তর-উল্কা।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী বৈকাল ৪॥০টার সময়ে মুক্ত আকাশে হঠাৎ সশব্দে একটী প্রায় ১৫ সের ওজনের উল্কাপাত হয় ও ঐ স্থানে প্রায় এক হাত পরিমাণ গভীর গর্ত্তের সৃষ্টি করে।

৮। দুরালা, পাতিয়ালা রাজ্য (পাঞ্জাব)—প্রস্তর-উল্কা।

ইং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী বেলা দ্বিপ্রহরে একটী ১৩।১৪ সের ওজনের উল্কা গভীর নিনাদ উত্থিত করিয়া ভূতলে পতিত হয় ও প্রায় ৫ ফুট ভূগর্ভে প্রোথিত হয়। উহা যখন উদ্ধার করা হয়, তখনও কিছু উত্তপ্ত ছিল। যে গভীর শব্দ উত্থিত হইয়াছিল, তাহা ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে শ্রুতিগোচর হইয়াছিল।

৯। বাজোই, মোরাদাবাদ জিলা (যুক্ত প্রদেশ)—লৌহ উল্কা।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জুলাই রাত্রি ৯॥০ ঘটিকার সময়ে একটী প্রদীপ্ত উল্কাপাতের দৃশ্য অনেকে লক্ষ্য করেন ও তাহার দুইদিন পর রাখাল বালকেরা উহা সংগ্রহ করে। ইহার ওজন প্রায় ১১½ সের হইবে।

১০। বোরি, বেতুল জিলা (মধ্য প্রদেশ)—প্রস্তর-উল্কা।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ৯ই মে বৈকাল ৪টার সময়ে মেঘমুক্ত আকাশে একটী জ্বলন্ত গোলক দৃষ্ট হয় ও বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় শব্দোত্থিত হইয়া ভূতলে পতিত হয়। ইহার ওজন প্রায় ৯½ সের হইবে।

১১। সেগৌলী, চাম্পারাণ জিলা (বিহার)—প্রস্তর-উল্কা।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা মার্চ্চ বেলা দ্বিপ্রহর সময়ে ঐ স্থানে উল্কাপাত হয় ও প্রায় ৩০টী খণ্ড সংগ্রহ করা হইয়াছে। অনেকগুলির ওজন প্রায় ২ হইতে ৭ সের হইবে।

১২। নেদাগোলা, ভিজাগ জিলা (মাদ্রাজ)—লৌহ উল্কা।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭টার সময়ে আকাশমার্গে একটী উজ্জ্বল গোলকের আবির্ভাব হয় ও ভীষণ গর্জ্জন সহকারে উহা ভূতলে পতিত হইয়া প্রায় ২০ ইঞ্চ ভূগর্ভে প্রোথিত হয়। ইহার ওজন প্রায় ৫ সের হইবে।

১৩। দোকাচী ( ঢাকা )—প্রস্তর-উল্কা।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ২২শে অক্টোবর সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে আকাশে একটী জলন্ত গোলকের আবির্ভাব হয় ও সশব্দে উহা বিদীর্ণ হয় ও বহুধা বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রায় ছয় মাইলব্যাপী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। প্রস্তরখণ্ডগুলি কলিকাতার যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে ও উহাদের ওজন প্রায় ৪½ সের হইবে।

১৪। শালকা ( বাঁকুড়া জিলা )—প্রস্তর-উল্কা।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৩০শে নভেম্বর বৈকাল ৪॥০ টার সময়ে শালকা গ্রামের উপর মুক্ত আকাশে একটী বিরাট উল্কার আবির্ভাব হয় ও গভীর নিনাদ উত্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা বিদীর্ণ হইয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তাহাদের মধ্য হইতে প্রায় ৪ সের ওজনের উল্কা সংগ্রহ করা হইয়াছে।

১৫। রঙ্গালা, যোধপুর ( রাজপুতানা )—প্রস্তর-উল্কা।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ২৯শে ডিসেম্বর বেলা ১০ ঘটিকার সময়ে ভীষণ গর্জ্জন উত্থিত হইবার পর উল্কাপাত হয়। এই গভীর শব্দ প্রায় ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানেও পৌঁছাইয়াছিল এবং ভূপৃষ্ঠে প্রায় ৩।৪ ফুট গর্ত্তের মধ্য হইতে উল্কাখণ্ডগুলি উদ্ধার করিতে হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত ওজন প্রায় ৩½ সের হইবে।

১৬। শীতল ( ময়মনসিংহ জিলা )—প্রস্তর-উল্কা।

ঢাকার প্রায় ৪০ মাইল উত্তরে "মধুপুর জঙ্গল" নামক স্থানে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ১১ই আগষ্ট বেলা ১১॥০টার সময়ে প্রায় ৪ সের ওজনের একটী উল্কার আবির্ভাব হয় ও সশব্দে ভূতলে পতিত হইয়া ভূগর্ভে প্রায় এক ফুট প্রোথিত হইয়া যায়। প্রায় ৩½ সের উল্কা উদ্ধার করিয়া যাদুঘরে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৭। গোয়ালপাড়া ( আসাম )—প্রস্তর-উল্কা।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে গোয়ালপাড়া হইতে প্রাপ্ত। ওজন প্রায় তিন সের। ( ৩নং চিত্র )।

১৮। মুর্‌য়াদ ( ময়মনসিংহ জিলা )—প্রস্তর-উল্কা।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ৭ই আগষ্ট বৈকাল ২॥০টার সময়ে আকাশে একটী জলন্ত গোলকের আবির্ভাব হয় ও তিনবার গম্ভীর নিনাদের পর অনেকগুলি উল্কাপাত হয়। মুর্‌য়াদ গ্রাম হইতে প্রায় তিন সের ওজনের একটী খণ্ড ও মানতালা গ্রাম হইতে প্রায় দুই সের ওজনের আর একটী খণ্ড সংগ্রহ করা হইয়াছে।

১৯। মানভূম ( বিহার )—প্রস্তর-উল্কা।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ২২শে ডিসেম্বর প্রাতে ৯ ঘটিকার সময়ে গম্ভীর শব্দ উত্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ হইতে অনেকগুলি উল্কাপাত হয় ও পুরুলিয়ার নিকটবর্ত্তী গোবিন্দপুর, পাত্রা, কাশীপুর ও মানবাজার প্রভৃতি গ্রাম হইতে অনেকগুলি উল্কাখণ্ড সংগ্রহ করা হইয়াছে। তাহাদের সর্ব্বসমেত ওজন অন্যাধিক দুই সের হইবে। কলিকাতার যাদুঘরে এগুলি সংরক্ষিত আছে।

২০। বস্তী, গোরক্ষপুর জিলা ( যুক্ত প্রদেশ )—প্রস্তর-উল্কা।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ২রা ডিসেম্বর বেলা ১০টা ১০ মিনিটের সময়ে প্রায় দেড় সের ওজনের উল্কাপাত হয়। ইহা লণ্ডনের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

২১। নাওকি ( নিজাম রাজ্য )—প্রস্তর-উল্কা।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ২৯শে সেপ্টেম্বর বৈকাল ৫টার সময়ে কয়েক খণ্ড উল্কাপাত হয়। সর্ব্বসমেত ওজন প্রায় ১৭ সের হইবে।

উল্কাপিণ্ড শূন্য হইতে মধ্যে মধ্যে আমাদের আকাশ-মার্গে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয় ও ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের তথা বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। তবে উহাদের উৎপত্তি যে বাস্তবিক কোথায় ও সঠিক কি কারণে ও কি অবস্থায় যে তাহারা নিজ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আমাদের পৃথিবীর আকর্ষণের মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং তাহাদের গতিবিধিই বা সঠিক কিরূপ, এ সকল বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের সবিশেষ অনুসন্ধান করা উচিত। তাঁহাদের চেষ্টা ও গবেষণা সুফল প্রদান করিলে, একটি জটীল সমস্যার সমাধান হইবে ও সর্ব্ব-সাধারণের কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া আমাদের সৌর-জগৎ সম্বন্ধে আরও অধিক জ্ঞান বর্দ্ধন করিবে, সন্দেহ নাই।

## রাজর্ষি

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

অমিত ঐশ্বর্য্য তব রিক্ততায় চিত্ত পরিপূর<br>
কাঞ্চনে ও মৃত্তিকায় ব্যবধান করিয়াছ দূর,<br>
সমগ্র মিথিলাপুরী ভস্মসাৎ হয় যদি কভু<br>
নির্ব্বিকার নিরুদ্বেগ কিছু নাহি আসে যায় তবু।

## প্রেমের সাধনা

শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়

"Shadow, I adore thee.
Substance, I abhor thee."

রহো দূরে প্রিয়তমা
লয়ে তব অঙ্গের সুষমা,—
কাজ কি মলিন মিলন নিয়ে ?

এ নহে তৃষার তৃপ্তি,
এ নহে প্রেমের দীপ্তি
হিয়াপরে হিয়া রেখে দিয়ে ॥

* * *

প্রাণ মম সদা চায়
কাছে কাছে তোমা রাখি,
রেখে মোর কাছে কাছে
ভরিব তৃষিত আঁখি ;—
দেখিতে দেখিতে অনিমেষ চোখে
ল'য়ে চ'লে যাব মোর প্রাণলোকে।

তব মধু মুখছবি
নিন্দি' কোটি শশী রবি
আমার সাধনা মাঝে
আমারে করিল কবি।
তারপর অনন্তে ভাসাইতে মোরে
ছিন্ন করি দিলে দু'টী বাহুডোরে।

তুচ্ছ ভাবি, জন্ম মৃত্যু
স্বর্গেরে ভাবিনু তুচ্ছ
তুচ্ছ ভাবি ইন্দ্রালয়
জীবন-কামনা-গুচ্ছ।
তখন রবেনা বিরহ ভাবনা
তনুর পরশে এ তনু পাবনা।

## স্বাগত

( ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পঞ্চচামর ছন্দের অনুকরণে )

শ্রীমতী প্রতিভা দেবী

সুনীল নভের কাজল বারিদ
বরুক তোমার প্রেমের যে নীর ;
মনের বনের ফুটুক কদম
আশায় তোমার অভয়-বাণীর।
উদাস তুমি, মহান্ তুমি
হৃদয় তোমার অসীম গগন ;
ঢাল্‌ছে আকাশ পূজার সলিল
হে বন্ধু, ঐ আসায় লগন।
বাজেরে আবার স্বাগত ভাষণ
পথের প্রদীপ তড়িৎ চমক্।
কলস্বিনীর উতল তালেও
বিরাট্ নাচের মধুর ঠমক্।
ঈশান বাজায় প্রলয় বিষাণ
রসভ ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতে ;
আসুন অলক ত্রিতাপ হরণ
তিমির ভরণ দুঃখ রাতে।
কঠোর কুলিশ পড়ুক মাথায়
যে হয় নিঠুর কলুষ কুজন ;
অহং যাদের শিরায় শিরায়
তাদের তরেই শাসন-সৃজন।
আজও যে ঐ কংসকারায়
কাঁদছে ব্যথায় দৈবকী মা,
অত্যাচারীর নিঠুর পীড়ন
ছাড়ায় উপল-সহন সীমা।
জীবন-বেলায় বহাও নিঝর
কারার নিগড় ঘুচাও হে বীর ;
সমর সাজেই আসবে এবার
শঙ্খ তোমার বাজুক গভীর।
উড়াও তোমার বিজয়-কেতন
চেতন লভুক অবোধ হিয়া ;
জ্বালাও আবার আশার প্রদীপ
গহীন গহন আঁধার নিয়া।

# খোজা গ্রেগরী বনাম গুরগণ খাঁ

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় এম. এ., বি. এল.

গুরগণ খাঁ ধর্ম্মনিষ্ঠ খৃষ্টান ছিলেন। আততায়ীর হস্তে আহত হইয়া, মৃত্যু আসন্ন জানিয়া তিনি আর্ম্মাণী ধর্ম্মযাজককে আহ্বান করেন এবং অত্যন্ত দীনভাবে তাঁহার কাছে খৃষ্টধর্ম্মানুযায়ী পূর্ব্বকৃত পাপগুলি স্বীকার ("confession") করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের সহিত আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃতদেহ অত্যন্ত সম্মান ও সামরিক আড়ম্বরের সহিত লইয়া ঝাড়গ্রামে সমাহিত করা হয়। এই ঝাড়গ্রামেই বিধর্ম্মী সমরু ছাউনি ফেলিয়াছিল। নবাব মীর কাশিমের মনে গুরগণ খাঁর বিরুদ্ধে আর একটি কারণে সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে। সেটি হইতেছে—পাটনা কুঠীর দুইশত বন্দী যাহারা মীর কাশিমের আদেশে সমরু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল, গুরগণ খাঁ নবাবের আদেশে এই নিরস্ত্র বন্দীদিগকে হত্যা করিতে রাজী হন নাই। যাহা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক, তাহাকে মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়া অত্যধিক ইংরেজপ্রীতি নাম দিয়া নবাবের মনে আগুন ধরাইয়া দেওয়াও শত্রুগণের পক্ষে আশ্চর্য্য নয়, বিশেষতঃ তাঁহার ভ্রাতা খোজা পেট্রাস তখন ইংরেজশিবিরে। গুরগণ খাঁ নাকি এই সকল বন্দীকে মুক্তি দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু মুক্তি দেওয়া তাঁহার সাধ্যাতীত ছিল, কারণ তাহা হইলে প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করিতে হয়। এই সময়েই গুরগণ খাঁর শত্রুগণ নবাবকে ক্রমাগত স্মরণ করাইয়া দিতে থাকে যে, গুরগণ খাঁ তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প। গুরগণ খাঁ যে তাঁহার বিরুদ্ধে এই সকল ষড়যন্ত্রের অভিযান অবগত ছিলেন, তাহা একটি ঘটনায় প্রতীয়মান হয়।

মিঃ জেন্টিল নামক একজন ফরাসী সেনাপতি একদা গুরগণ খাঁর জন্য নবাব-প্রেরিত কতকগুলি আহার্য্য গুরগণ খাঁকে জিজ্ঞাসা না করিয়া গ্রহণ করিতেছিলেন, গুরগণ খাঁ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে এই মর্ম্মে সাবধান করিয়া দেন যে, আহার্য্যে বিষ মিশ্রিত থাকিতে পারে, সুতরাং আহার্য্যগ্রহণের পূর্ব্বে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। সুতরাং গুরগণ খাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, ইহা যে তিনি অবগত ছিলেন, এইরূপ মনে করা অন্যায় হইবে না। মিঃ জেন্টিলের প্রদত্ত বিবরণ হইতে ইহাও জানা যায় যে, পাটনা ও মুঙ্গেরের মধ্যবর্ত্তী একটি স্থানে ইতিপূর্ব্বেই গুরগণ খাঁকে হত্যা করিবার একটি চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু গুরগণ খাঁর তাঁবুর বাহিরে মিঃ জেন্টিল শয্যা রচনা করিতেছিলেন বলিয়া হত্যাকারিগণ ব্যর্থমনোরথ হয়। ইহার পরদিনই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। মিঃ জেন্টিল-বর্ণিত হত্যাকাণ্ডটি এইরূপঃ "পরদিন আহারের পর অত্যন্ত গরম বোধ হওয়াতে গুরগণ খাঁ অপেক্ষাকৃত শীতল মনে করিয়া নিজ তাঁবু হইতে বকশীর তাঁবুতে যান। তিনি যখন মুঘলসেনানীদিগের ছাউনির মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, তখন একজন সেনানী গুরগণ খাঁর সম্মুখীন হইয়া কিছু অর্থ দাবী করে এবং বলে যে, জিনিসপত্রের দুর্ম্মূল্যতার জন্য সে অর্থে ব্যয় কুলাইতে পারে নাই। বস্তুতঃ এই সেনানীর কোনও প্রাপ্যই ছিল না। তাহার অহেতুক দাবীতে গুরগণ খাঁ রাগান্বিত হইয়া তাঁহার অনুচরবৃন্দকে ডাকেন। ইহাতে সেই সেনানী সরিয়া পড়িবার উপক্রম করে। আমি (মিঃ জেন্টিল) ত্রিশ পা অগ্রসর হইয়াছি মাত্র, গুরগণ খাঁকে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া চীৎকার করিতে শুনিয়া ফিরিয়া দেখি যে, সেই সেনানীটি গুরগণ খাঁকে অস্ত্রাঘাত করিতেছে।

গুরগণ খাঁর অনুচরগুলির হস্তে তখন অস্ত্র ছিল না। গুরগণ খাঁও অতি সূক্ষ্ম মসলিন পোষাকে ছিলেন, এইজন্যই আঘাত গুরুতর হইয়াছিল। কোনও সাহায্যই তৎক্ষণাৎ দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই এবং আততায়ী এই সকল অস্ত্রাঘাত বিদ্যুদ্বেগেই করিয়াছিল; ইহাতে গুরগণ খাঁর ঘাড়ের অর্দ্ধেক ও কণ্ঠের হাড় কাটিয়া যায়। উরুদেশেও গভীর ক্ষত ছিল। ইহার পর তাঁহাকে পালকী করিয়া তাঁহার তাঁবুতে আনা হয়। তিনি ইসারায় জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু জল পান করিলে কর্ত্তিত কণ্ঠনালী দিয়া তাহা বাহির হইয়া আসে। আততায়ী আঘাতের

পর সেখান হইতে সরিয়া পড়ে। ইহার পর মুঘল সেনানীবৃন্দ একত্র হয় এবং গুরগণ খাঁর অধীনস্থ আর্ম্মাণীদিগকে হত্যা করিবে বলিয়া ভয় দেখায়। এইজন্য প্রধান মন্ত্রীর তাঁবুর চারিপাশে জবরদস্ত দেহরক্ষীগুলি মোতায়ান রাখিতে হইয়াছিল। ইহার পর মুঘল সেনানীবৃন্দ গুরগণ খাঁ তথা আর্ম্মাণীদিগের তাঁবু তোপের মুখে উড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প করে এবং এক ব্যক্তি তোপে আগুন দিতে যাইবে, এই সময়ে তাহাকে গুলী করিয়া মারা হয়।" নবাব এই সকল বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, ইংরেজগণ বোধ হয় গুরগণ খাঁর শিবির আক্রমণ করিয়াছে। গুরগণ খাঁর এই শোচনীয় মৃত্যুর পর মিঃ জেন্টিল সোজা মীর কাশিমের নিকট উপস্থিত হইয়া এই ঘটনা বর্ণনা করেন। নবাব উত্তরে বলেন "আমি গুরগণ খাঁকে একা বাহিরে যাইতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছিলাম। যাক, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তুমি তোমার শিবিরে ফিরিয়া যাও। "কেয়ার এ সল্লা" অর্থাৎ ভালই হইয়াছে।" নবাবের এই উক্তিগুলির মধ্যে মিঃ জেন্টিল দুঃখ অপেক্ষা সন্তুষ্টির ভাব অধিক লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি রণকুশল গুরগণ খাঁর আততায়ীর হস্তে এইরূপ শোচনীয় মৃত্যু নবাবকে যেরূপ বিচলিত করা উচিত ছিল, হত্যাকারীকে ধরিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করা উচিত ছিল এবং যে দুঃখ-ক্ষোভের ভাব তাঁহার কথায় ও আচরণে প্রকাশ পাওয়া উচিত ছিল, তাহা কিছুই লক্ষিত হয় নাই।

এইজন্য মিঃ জেন্টিল অনুমান করেন যে, গুরগণ খাঁর মনে যে সন্দেহের বীজ দেখা গিয়াছিল, তাহা অহেতুক নয়। তিনি জানিতেন যে, নবাব তাঁহার বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেছিলেন। মিঃ জেন্টিল গুরগণ খাঁকে একজন প্রকৃত বীরধর্ম্মী পুরুষ বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহার সহিত জীবদ্দশায় সৌহার্দ্দ্য স্মরণ করিয়া প্রত্যহ তাঁহার কবরে ফুল দিতেন। কিন্তু সৈয়র-উল-মুতক্ষরীণ-প্রণেতা সৈয়দ গোলাম হোসেন গুরগণ খাঁকে, অকারণ মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন অথচ ইহার কারণ কিছুই দেখাইতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন "এই হতভাগ্য ব্যক্তিটি তাহার কদর্য্য মনোবৃত্তির পুরস্কারস্বরূপ খুব অত্যল্পকাল মধ্যেই জীবনের পরপারে প্রেরিত হইয়াছিল।" এইরূপ উক্তি ঐতিহাসিকের উক্তি নয়।

সৈয়র-উল-মুতক্ষরীণের দ্বিতীয় খণ্ডের পদলিপিতে গুরগণ খাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু বিবরণ মঁসিয়ে রেমণ্ড নামক একজন ফরাসী লেখক, যিনি পরে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হাজী মুস্তাফা নাম গ্রহণ করিয়া ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক মূল্য বেশী নহে। জেন্টিল-প্রদত্ত বিবরণই অনেকাংশে সত্য ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয়। জেন্টিলের এ সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতাও খুব বেশী ছিল। তিনি এ দেশের সমসাময়িক নানা রাজনৈতিক উত্থান-পতনে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। জেন্টিল একদা ডুপ্লে, বুসী, লালী প্রভৃতি ফরাসী ধুরন্ধরগণের অধীনে কার্য্য করিয়াছেন এবং চন্দননগর-পতনের পর তিনি নবাব মীর কাশিমের সহিত যোগ দিয়াছিলেন এবং মীর কাশিমের পতনের পর অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লার অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন। জেন্টিল সুপ্রসিদ্ধ বক্সার যুদ্ধে (১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে) উপস্থিত ছিলেন। বক্সারে সুজাউদ্দৌল্লার পরাজয়ের পর তিনি নিজ দেশ ফ্রান্সে গমন করেন এবং তাঁহার জন্মভূমি বেগন্যাল নামক স্থানে ইহলোক ত্যাগ করেন। জেন্টিল লিখিয়াছেন যে, রাজমহলের যুদ্ধের পর কাশীম আলি খাঁ তাঁহার শিবির হইতে ইংরেজ সেনাপতি মেজর টমাস এ্যাডাম্‌স্‌কে লিখিয়া জানাইলেন যে, যদি ইংরেজ সেনাপতি সৈন্যসহ আর অগ্রসর হন, তাহা হইলে মীর কাশিম কোরাণ ছুঁইয়া শপথ করিতেছেন যে, তিনি তাঁহার সমস্ত ইংরেজ বন্দীদিগকে হত্যা করিবেন। মেজর এ্যাডাম্‌স্ মনে করিতেছিলেন যে, নবাব তাঁহার অগ্রসরে বাধা দিবার জন্য ঐরূপ ফাঁকা ভয় প্রদর্শন করিতেছেন, সেইজন্য তিনি তাঁহার অগ্রগতি থামান নাই। নবাব অতঃপর মুঙ্গের হইতে তাঁহার ধনরত্ন ও অন্যান্য জিনিসপত্র পাটনায় পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজেও পাটনার অভিমুখে রওনা হইলেন। পাটনার পথে মীর কাশিমের বন্দী জগৎ শেঠ ভ্রাতৃদ্বয় জেন্টিলকে খবর পাঠাইয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করেন যে, মিঃ জেন্টিল যেন গুরগণ খাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন। সম্ভবতঃ মিঃ জেন্টিল

গুরগণ খাঁর নিকট তাঁহাদিগের মুক্তির প্রস্তাব তুলিয়াছিলেন ; কিন্তু গুরগণ খাঁ তাঁহাকে এই কার্য্যে বিরত হইতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহাতে মিঃ জেন্টিলের কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই, পরন্তু এই সকল কার্য্য দ্বারা তিনি বন্দীদিগের কলঙ্কের সহিত জড়িত হইয়া পড়িবেন। এই সকল বন্দীদিগের মধ্যে মিঃ এলিস, মিঃ হে, মিঃ ল্যাসিংটনও ছিলেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর এই সকল বন্দীদিগকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকার্য্যে সমরু বিশেষভাবে লিপ্ত ছিলেন, ইহা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। এই হত্যাকাণ্ডের দুইদিন আগে (৩রা অক্টোবর, ১৭৬৩) উদয়নালাবিজয়ী মেজর এ্যাডাম্‌স্ কলিকাতায় কোম্পানীর গভর্ণর ভ্যান্‌সিটার্টকে যে চিঠি লেখেন, তাহা নানা কারণে গুরুত্ব-পূর্ণ। তাঁহার চিঠিখানি এইরূপ :—

"আমরা গতকল্য এই সংবাদ পাইয়াছি যে, খোজা গ্রেগরী (গুরগণ খাঁ) কয়েক দিন পূর্ব্বে কতিপয় মুঘল অশ্বারোহী সৈনিক কর্ত্তৃক সুরযগড় ও নবাবগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আহত হইয়াছিলেন। এই সৈনিকগণ নাকি বাকী বেতনের জন্য বিদ্রোহ করিয়াছিল। কল্যকার সংবাদ এইমাত্র সংবাদবাহক দ্বারা সমর্থিত হইল। এই সংবাদ-বাহক শত্রুপক্ষ হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া এইমাত্র আসিয়া পৌছিয়াছে। গতকল্য যাহা জানা গিয়াছিল, তাহার উপর সংবাদবাহকের নিকট হইতে এখন যাহা জানা গেল, তাহা এই যে, আহত হইবার পরদিনই গুরগণ খাঁর মৃত্যু হয় এবং ইহার পর চল্লিশজন প্রধান ব্যক্তিকে—যাহাদিগকে এই হত্যাকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, হত্যা করা হয়। যদিও ইহা অনুমিত হয় যে, মুঘল সৈনিকগণ কাশিম আলি খাঁ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার পরিচয় দিয়াছে। গুরগণ খাঁ ইংরেজদিগের প্রতি সদয় ছিলেন বলিয়া কাশিম আলি খাঁর প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন। গুরগণ খাঁর মৃত্যু-সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে গুরগণ খাঁর ভ্রাতা খোজা পেট্রাস আমাদিগের আর কোনও কাজেই লাগিবে না। আমি সেইজন্য খোজা পেট্রাসকে কলিকাতায় পাঠান উচিত মনে করি এবং এ বিষয়ে বোর্ডের নির্দ্দেশ অপেক্ষা করিতেছি। আমি ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য যে, গুরগণ খাঁর মৃত্যুসংবাদে আমি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি, কারণ আমাদিগের দলের প্রতি তিনি অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করিতেন এবং এই জন্যই তিনি কাশিম আলি খাঁর কোপদৃষ্টিতে পতিত হন। যদি গুরগণ খাঁ বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগের বন্দীদিগের পলায়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। তাঁহার দ্বারাই আমাদিগের বন্দী ও শেঠ (সম্ভবত জগৎ শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়)-দিগের জীবন রক্ষা হইতে পারিত, ইহাই লোকে বলাবলি করিতেছে।"

কি কারণে গুরগণ খাঁ রাজরোষে পতিত হইয়া জীবন হারাইয়াছিলেন, এ্যাডাম্‌সের লেখনীমুখে তাহা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তবে তিনি বাঁচিয়া থাকিলে ইংরেজ বন্দীদিগের ও শেঠ ভ্রাতাদিগের পলায়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন অর্থাৎ মীর কাশিমের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইতেন, ইহা এ্যাডাম্‌সের অনুমান মাত্র। তবে গুরগণ খাঁ হয়ত নিরস্ত্র সেনানী অথবা কুঠীয়ালকে হত্যা করা কাপুরুষতা মনে করিয়া হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন ; কিন্তু মীর কাশিমের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না।

গুরগণ খাঁর নিহত হইবার তারিখ সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে এই গরমিলগুলি চোখে পড়ে :—

(১) ঐতিহাসিক মার্শম্যান বলেন যে, ঘেরিয়া যুদ্ধের এক সপ্তাহ পরে, এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। ঘেরিয়া যুদ্ধ ২রা অক্টোবর (১৭৬৩ খৃঃ) হয়।

(২) টমাস খোজামল বলেন যে, এই হত্যাকাণ্ড ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ তিনি মার্শম্যানের প্রদত্ত তারিখই সমর্থন করিয়াছেন।

(৩) কিন্তু এ্যাডাম্‌স্ বলেন, তিনি ২রা ডিসেম্বর (১৭৬৩) ইহা শ্রবণ করেন। অর্থাৎ মার্শম্যান ও টমাস খোজামল প্রদত্ত তারিখ হইতে দুই মাস পরে ইহা এ্যাডাম্‌সের কর্ণগোচর হয়।

আমাদের মনে হয়—এ্যাডাম্‌স্ তাঁহার বিবরণে হত্যা-কাণ্ডের তারিখ সম্বন্ধে নির্ভুল হইবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি দুই মাস পরে "শুনিয়াছেন" যে "কয়েক দিবস পূর্ব্বে" এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। কত দিন পূর্ব্বে ইহা তিনি

বলেন নাই। এ ক্ষেত্রে মার্শম্যান ও টমাস খোজামলের বিবরণ জানিয়া লইতে বিশেষ বাধা নাই।

রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিতে তারিখ-ই-মুজাফরই নামক হস্ত লিখিত পারসী গ্রন্থ আছে। গ্রন্থকার মহম্মদ হিদায়েতুল্লা এই গ্রন্থে লিখিয়াছেন "যখন উদয়নালার পরাজয়ের সংবাদ কাশীম আলি খাঁর নিকটে পৌছিল, তখন তিনি দুঃখে ক্ষোভে অভিভূত হইয়া পড়েন এবং গুরগণ খাঁর কোনও পরামর্শ না লইয়াই মুঙের ত্যাগ করেন। তিনি গুরগণ খাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারী ইরাত আলি খাঁকে মুঙেরের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দুইশত সেনানী সহ পাটনা যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি যাইবার সময়ে মিঃ এলিস, হে, ল্যামিংটনকে সঙ্গে লইয়া অধ্না নদী পার হইয়া সুলেমান-আবাদ নামক স্থানে ছাউনি ফেলেন। গুরগণ খাঁ রীতি অনুযায়ী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া শিবিরে প্রবেশ করেন। ইতিমধ্যে গুরগণ খাঁর অধীনস্থ কয়েক জন তুর্কী অশ্বারোহী সৈনিক উপস্থিত হইয়া বেতন দাবী করে। গুরগণ খাঁ তাহাদিগকে রূঢ় উত্তর দেন; কিন্তু তাহারা নিরস্ত হয় না। গুরগণ খাঁ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দেন। কিন্তু তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা যায় না, তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিয়া অশ্বারোহণে পলায়ন করে।"

আর্ম্মাণী ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, গুরগণ খাঁর মৃত্যু কতকটা রহস্যাবৃত। কিন্তু ইহা সকল ঐতিহাসিকই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি অজ্ঞাত আততায়ীর হস্তে নিহত হন। সকল ঐতিহাসিকই আততায়ীকে "মুঘল সৈনিক" বলিয়াছেন শুধু তারিখ-ই-মুজাফরই গ্রন্থে আততায়ীকে "তুর্কী—অশ্বারোহী" বলা হইয়াছে। ইংরেজগণ খোজা পেট্রাস নামক বড়শীর সাহায্যে যে গুরগণ খাঁকে গাঁথিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা মেজর এ্যাডামসের চিঠিতেই স্বীকৃত হইয়াছে। রেমগুও ইহা সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন যে, খোজা পেট্রাসের দ্বারা গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ও মিঃ ওয়ারেণ হেষ্টিংস গুরগণ খাঁকে ইংরেজ পক্ষে আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং তিনি যাহাতে তাঁহার প্রভু নবাব মীর কাশিমকে ধরাইয়া দেন, এ চেষ্টার ত্রুটিও ইংরেজ তরফ হইতে হয় নাই। এজন্য নবাবের সন্দেহভাজন গুরগণ খাঁ যদি প্রাণ হারান, তাহা হইলে নবাবকে দোষ দেওয়া অনুচিত হইবে। ইহা ছাড়া আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। বাংলায় আর্ম্মাণীপ্রাধান্য ইংরেজদিগের চক্ষুশূল ছিল, তাহা একটি স্বতন্ত্র বিবরণে প্রকাশ পাইয়াছে। আর্ম্মাণীদিগের প্রতি ইংরেজবিদ্বেষ ছাড়াও দেশীয় সৈনিকদিগের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল। সম্ভবতঃ সম্ভ্রান্ত মুঘল সৈনিক ও সেনাপতিগণ ফিরিঙ্গী আর্ম্মাণী প্রধান সেনাপতির হুকুম তামিল করা মর্য্যাদাহানিকর মনে করিতেন। এই আভিজাত্যবোধ তখনকার সৈনিকজীবনে খুব লক্ষিত হইত। মুঘল আততায়িগণ সেই অসন্তুষ্ট মুঘল সেনানী-দিগের প্রতিনিধিস্বরূপ গুরগণ খাঁর হত্যা সম্পাদন করিয়াছে কিনা কে বলিবে? হয়ত মীর কাশিমের ইহাতে কোনও হাতই ছিল না। গুরগণ খাঁ নিহত হইবার পর সৈন্যগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। কাশিম আলি খাঁ ইহার পর উক্ত স্থান ত্যাগ করিয়া বাড় নামক স্থানে ছাউনি ফেলেন এবং জগৎ শেঠ, রাজা মহাতাব রায়, রাজা স্বরূপচাঁদ প্রভৃতিকে হত্যা করিবার আদেশ দেন। নবাবের আদেশ অবিলম্বে পালিত হয়।

গুরগণ খাঁ যে শক্তিশালী আর্ম্মাণী বেষ্টনী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা টমাস খোজামলও লিখিয়া গিয়াছেন প্রায় একশত আর্ম্মাণী বীরপুরুষদিগকে তিনি ফৌজের দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। টমাস খোজামল কতকগুলি আর্ম্মাণী সেনাপতির নাম দিয়াছেন। যথা—

(১) মার্গার জোহানেস কালানার, ইনি জুলফার অধিবাসী।
(২) আরাটুন মার্গার। ইনিও জুলফার অধিবাসী।
(৩) গ্রেগরী নাহানিট অরভাজ। ইনিও জুলফাবাসী।
(৪) পেট্রাস এ্যাষ্টওয়াট সটুর। ইনি আর্ম্মেণীয়ার অন্তর্গত এনিয়াস নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।
(৫) লেজার জ্যাকব। ইনি পারস্যের অন্তর্গত খোবা নামক স্থানের অধিবাসী।
(৬) মার্টিরোজ গ্রেগরী। ইনিও পারস্যের অধিবাসী।
(৭) সুকিয়াস এ্যাভিটিক, পারস্যের অন্তর্গত টেবিজ নামক স্থানের অধিবাসী।
(৮) জোহানেস মেজারস। ইনিও পারস্যের অন্তর্গত টেবিজের অধিবাসী ছিলেন।

ইহাদিগের মধ্যে প্রথমোক্ত মার্গার জোহানেস বিশেষ বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। তিনি পাটনাধিকারের সময়ে গুরগণ খাঁর অধীনে খুব বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বাকী সাত জন 'কর্ণেল' ছিলেন। ইহা ছাড়া টমাস খোজামল ম্যাকারটিচ জ্যাকেরিয়া, ম্যালকল্‌ম্‌, নিকোলাস, জ্যাকব গ্রেগরী প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষের নামও করিয়াছেন।

স্যার রিচার্ড টেম্পল (ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকুয়ারি নবেম্বর ১৯১৮) গুরগণ খাঁর লিখিত দুইখানি চিঠির প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। একটিতে গুরগণ খাঁর স্বাক্ষর আছে। চিঠি দুইখানি আর্ম্মাণী হরফে লেখা। যে খানিতে স্বাক্ষর নাই, তাহা উমিচাঁদের তরফ হইতে গুরগণ খাঁ খোজা পেট্রাসকে লিখিয়াছিলেন। গুরগণ খাঁর কোনও চিত্র পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ গুরগণ খাঁর পারস্যবেশে চিত্র দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহা আজ পর্য্যন্ত উদ্ধার করা যায় নাই। কিন্তু রেমণ্ডের সুন্দর ছবি পাওয়া গিয়াছে। রেমণ্ড গুরগণ খাঁর দৈহিক গঠন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, গুরগণ খাঁ সাধারণ মানুষ অপেক্ষা দেখিতে উচ্চ ছিলেন। রং অত্যন্ত ফরসা ছিল। তাঁহার নাসিকা তীক্ষ্ণ এবং চক্ষুদ্বয় বৃহৎ ছিল। চক্ষুতারকাও কৃষ্ণবর্ণ ছিল। সর্ব্ব অবয়ব প্রতিভাব্যঞ্জক ছিল। মৃত্যুকালে গুরগণ খাঁর বয়স মাত্র তেত্রিশ বৎসর হইয়াছিল।

(শেষ)

---

# বিদুষী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সাহা

## ১১

সেদিন কি একটা উৎসবোপলক্ষে রেণুর বাড়ীতে গীতবাদ্যের আয়োজন ছিল। সন্ধ্যা হইতেই বসিবার ঘরটা বন্ধুবান্ধবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল এবং হাস্য-পরিহাসে ও গীতবাদ্যে সারা বাড়ীখানি আনন্দ ঝল্‌মল্‌ করিতেছিল।

রেণু পারুলকে সকলের সহিত পরিচিত করিয়া দিতেই সকলে পারুলকে গাহিবার জন্য ধরিয়া বসিল।

রেণুর মৃদু আপত্তি টিকিল না। রেণু গাহিল:

মম মন্দিরে এলে কে তুমি?
তব পুষ্পধূমে লুকায়ে আজি
আমারে পূজিলে ওগো কে তুমি?...

সপ্রশংস কোলাহলের মধ্যে গীত পরিসমাপ্ত হইল। সেই আনন্দকোলাহল কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে, বোধ করি, আর একখানা গানের জন্য অনেকেই তাহাকে ফরমায়েস্‌ করিতে যাইতেছিল। ঠিক এমনি সময়ে রেণু কলকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, বাঃ! অসীম সৌভাগ্য! ভুল করে আসেন নি তো? আসুন, আসুন......এবং বোধ করি, ঐ একটী মাত্র লোকের আগমনে সমস্ত সভাটীও আনন্দ-কোলাহল করিয়া উঠিল।

নূতন কোন বন্ধু বা বান্ধবী আসিয়াছে মনে করিয়া এই-দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই পারুল কাঠ হইয়া গেল। এর চেয়ে ভূমিকম্প বা বজ্রপাত হইলেও, বোধ করি, সে এমন দিশাহারা হইয়া পড়িত না। অথচ ঐ লোকটীর আগমন এমনি অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর যে, দুইটী চোখের সহজ দৃষ্টি দিয়াও পারুল বিশ্বাস করিতে চাহিতেছিল না। সে বিপন্ন হইয়া উঠিল। কি করিয়া যে সে নিজেকে গোপন করিবে—ঐ নির্লজ্জ, একান্ত দুঃসাহসী লোকটীর দুইটী চোখের অভ্রান্ত দৃষ্টি হইতে কেমন করিয়া যে নিজের এই একান্ত অসহায় মুখখানি লুকাইয়া ফেলিবে, ইহা ভাবিয়া সে দিশাহারা হইয়া পড়িল। দেখিতে পাইলে সে যে একটু ইতস্ততঃ করিবে না, এ বিষয়ে পারুল নিশ্চিত ছিল।

এমন কি এই রেণুরই সম্মুখে হয়ত' এমন একটা কিছু কেলেঙ্কারী করিয়া বসিবে, শুদ্ধমাত্র যাহার কল্পনা করিয়াই শিহরিয়া উঠিয়া গভীর আশঙ্কায় পারুল চক্ষু মুদিল।

নলিনী ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া সকলকে যথাযোগ্য নমস্কার করিয়া সহাস্য মুখে কহিল, সৌজন্যই বটে! কিন্তু ব্যাপার কি বৌঠান—একবারে আনন্দের হাট বসিয়েছেন যে! বলি, দাদার আমার ··· বলিয়া রেণুর স্বামী কুমুদের দিকে চাহিয়া নলিনী টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

কুমুদ বাধা দিয়া হাসিয়া কহিল, আহা! আবার আমায় টানা কেন বাপু? ওসব যাদের কাজ, সে তোর বৌদি···তা'র চেয়ে ঐখানে বসে দুটো গান কর্, শোনা যাক্। বলিয়া অদুরের হার্ম্মোনিয়ামটা নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন।

নলিনীর গলা ছিল এবং পরিচিত মহলে গায়ক বলিয়া যথেষ্ট সুনামও ছিল। যাহারা জানিত এবং যাহারা জানিত না, গান গাহিবার প্রস্তাবে সকলে এত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল যে, সেই কোলাহলে তাহার ক্ষীণ প্রতিবাদ ডুবিয়া গেল।

অগত্যা নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া নলিনী কহিল, এ অপমান করার চেষ্টা কেবল তোরই কুমুদ···

কুমুদ হাসিয়া কহিল, তা' হোক! ওদের কাছে অপমান হওয়াতেও গৌরব আছে!

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অগত্যা নলিনী গাহিল—

আমার পরাণ যারে চায়
তা'রে নাহি পায়;
ওগো নিশিতে আসিলে কাছে
ছুটিয়া পালায়।··· ···

সেই গানের এক একটা কলি তাহার অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনার স্পর্শে ধীরে ধীরে পারুলের সহজ জ্ঞানটুকু বিলুপ্ত করিয়া দিল। উজ্জ্বল দীপালোক, অপরিমিত হাস্যপরিহাস, মুখর উৎসবকক্ষ—সমস্ত গ্রাস করিয়া অস্পষ্ট অন্ধকার ক্রমে ক্রমে গাঢ় হইয়া পারুলের দৃষ্টিপথ আবৃত করিয়া ফেলিল। দীর্ঘকাল হইতে যে তেজটুকু তাহার দর্পকে অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিল, এইবার যেন তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইল। পারুল আপনাকে আর সামলাইতে পারিল না। সকলের অগোচরে তাহার মাথাটা ধীরে ধীরে টেবিলের ওপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

সেই কক্ষের আনন্দোৎসব যেমন চলিতেছিল, বাধাহীন হইয়া তেমনি অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল—মানুষের মনের এই দুজ্ঞেয় রহস্যের কণা মাত্র ছায়ার আভাসও উৎসব-মত্ত নরনারীর চোখে পড়িল না।

দীর্ঘকাল পরে যখন পারুলের সহজ জ্ঞানটুকু আবার ফিরিয়া আসিল, সে দেখিল তখনও নলিনী আপনভোলা হইয়া গাহিতেছে—

শূন্যে এ বুকে পাখী মোর আয়
ফিরে আয়, ফিরে আয়,
তোরে না হেরিলে সকালের ফুল
অকালে ঝরিয়া যায়।······

পারুলের চোখ ফাটিয়া অশ্রু উথলিয়া উঠিল। এই তাহার স্বামী—এত সুন্দর!···ওগো তুমি ঘৃণা করিতে পারিলে না—এতে যে অপমান, এত কটূক্তি, এতেও কি তোমার উন্মাদ ভালবাসা লজ্জিত হইল না? হায় অবুঝ! কোন পাষাণের কাছে এক ফোঁটা জলের জন্য এ বেদনা জানাইতেছ?··

উৎসবান্তে একে একে সকলে চলিয়া গেল। রেণু কলকণ্ঠে নলিনীকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া কহিল, আজকের দিনটে চিরদিন মনে থাকবে নলিনী বাবু!

নলিনী হাসিয়া কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, এই দিকে দৃষ্টি পড়িতেই চমকিয়া উঠিল। ভূত দেখিলেও, বোধ করি, সে অতখানি বিচলিত হইত না। কিন্তু পরক্ষণে স্বভাবসিদ্ধ অসীম ধৈর্য্যবলে নিজেকে সম্বৃত করিয়া লইয়া কহিল, সৌভাগ্য! তারপর একটু আগাইয়া আসিয়া পারুলের অবনত বিবর্ণ মুখের দিকে 'চকিত দৃষ্টি' নিক্ষেপ করিয়া কৌতুক-কণ্ঠে কহিল, ইনি—এঁকে ত' কখন দেখেছি বলে' মনে হয় না বৌঠান?

রেণু হাসিয়া পরিচয় করিয়া দিল, আমার বাল্যসখী পারুল—চমৎকার গায়!

বটে! দুর্ভাগ্য যে, ওঁর গান শোনার সৌভাগ্য হ'ল না!

রেণু কহিল, আজ হ'ল না—কাল হ'বে। কিন্তু হেরে যাবেন নলিনীবাবু ওর গান শুনলে—আর গাইতে চাইবেন না!

সীতাদেবী কি নিদারুণ লজ্জায় ও কঠিন অপমানে মাতা বসুন্ধরার বক্ষে আশ্রয় লইয়াছিল, মনে প্রাণে তাঁহা পারুল আজ নিমেষে অনুভব করিল এবং অসহায়া সীতার মতই নিজেও মনে মনে ধরিত্রীর কোলে আশ্রয় ভিক্ষা করিতে লাগিল।

নলিনীর চোখ দুইটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হাসিয়া কহিল, ধন্য হ'লেম বৌঠান! মনে মনে আমি আগামী দিনটীর শুভ আগমনই কামনা কর্‌ছি—কামনা কর্‌ছি, যদি কখন হারি, সে যেন আপনাদের কাছেই হারি।

রেণু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

পারুল মরিয়া হইয়া কহিল, গাড়ীটা ডেকে দে ভাই···

রেণু কহিল, দাঁড়া, খেয়ে তবে ত' যাবি।

পারুল মাথা নাড়িয়া কহিল, না ভাই, বড় গা কেমন করছে—খাব না, তা'র চেয়ে তুই···

রেণু ধমক দিয়া কহিল, ক্ষেপেছিস্! না খেয়ে যাবি—ভাল! আয়!··· আসুন নলিনীবাবু!

পারুল প্রবল আপত্তি তুলিয়া কহিল—সে কিছুতেই যাইবে না। রেণু নিরুপায় হইয়া ক্ষুণ্ণকণ্ঠে স্বামীকে কহিল, যাও, রেখেই এস তা' হ'লে!

কুমুদ গাড়ীর খোঁজে যাইতে উদ্যত হইল।

নলিনী পারুলের মুখের উপর চঞ্চল দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া হঠাৎ বলিল, আমিই ত' যাচ্ছি কুমুদ—ওঁদের বাসা পর্য্যন্ত বেশ পৌঁছে দিতে পারবো······অবশ্য বৌঠানের সখী যদি অমত না করেন! বলিয়া কৌতুক-ভরা চোখ দুইটী এমন করিয়া পারুলের মুখের উপর তুলিয়া ধরিল যে, চোখাচোখি হইতেই সে কালো হইয়া উঠিল। এতক্ষণ ধরিয়া এমনি কি একটা আশঙ্কা সভয়ে সে করিয়া আসিতেছিল। পারুল শিহরিয়া উঠিল। ঐ নির্লজ্জ, কাণ্ডজ্ঞানবিহীন লোকটীর অসাধ্য বোধ করি, কিছুই নাই! এবং সেই অসতর্ক মুহূর্ত্তটীর অতর্কিত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার আশায় পারুল এক রকম চোখ বুজিয়া মরিয়া হইয়াই উচ্চারণ করিল, বেশ ত' চলুন না! তাহার গা কাঁপিতেছিল, পা টলিতেছিল—দুইটী চোখের দৃষ্টিপথ জুড়িয়া তরল অন্ধকার পাক খাইয়া খাইয়া জমিয়া উঠিতেছিল। ইহা টের পাইয়াই রেণুর দিকে শুধু একটা সস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, একটা বিশ্রী আশঙ্কার বিপুল তাড়নায় এক রকম জোর করিয়াই তাহার অস্থির পা দুইটীকে টানিয়া লইয়া, কোন রকমে গিয়া সে নলিনীর গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

## ১২

গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

কয়েক ঘণ্টা আগেও বোধ করি, পারুল ইহার কল্পনাকেও বিশ্বাস করিতে পারিত না অথচ গাড়ীর অন্ধকার গহ্বরে বসিয়া উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর এই সংঘটন নিষ্ঠুর তিক্ততায় শরীরের সমস্ত স্নায়ু দিয়া সে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল।

তথাপি সমস্ত বিক্ষোভ, অন্তরের তিক্ত বিদ্রোহ ছাপাইয়া কি এক অজানা অনুভূতি তাহার সারা দেহ-মনের উপর সুখের স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া যাইতেছিল। ইহা নূতন, ইহা অভাবনীয়। তাহার অন্ধ দুইটী চোখের দৃষ্টি আজ যেন সহসা ফিরিয়া আসিয়াছে—জগতের সহস্র আলোর ঝরণা আজ তাহার দুইটী চোখে উদ্ভাসিত! আজ মনে পড়িল, মায়ের সেই সেদিনের কথা—সংসারে লেখাপড়াই সব নয়। পারুলের বুক ভরিয়া উঠিল। এতদিন ধরিয়া জীবনে যে জ্বালা, যে দাহ, যে অভাব, যে বেদনা সে অনুভব করিয়া আসিতেছে, দেবতার আশীর্ব্বাদের মত মায়ের সেই স্নেহোপদেশ আজ মুহূর্ত্তে যেন মূর্ত্ত হইয়া সব মুছিয়া লইল। আজ জীবনে সে প্রথম অনুভব করিল—সত্যই সংসারে লেখাপড়া সব নয়। কাল হয়ত' সে ইহা বিশ্বাস করিত না—আমরণ হয়ত' ইহা তাহার হৃদয়ে স্থান পাইত না, কিন্তু আজ তাহার সংশয় মিটিয়াছে, আজ সত্যই সে সমস্ত জীবন দিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছে—লেখাপড়া কম জানিয়াও মানুষ কেমন করিয়া সকলের শ্রদ্ধা, সম্মান, যশঃ অর্জ্জন করিতে পারে।

পারুলের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। দুইটী পোড়া

চোখের কাণায় কাণায় অজস্র অশ্রু টলটল্ করিতে লাগিল। সব মিথ্যা! আজিকার এই জ্ঞানলাভ আজ তাহার কাছে একটী ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস মাত্র! কোন লাভ নাই! ভুল করিয়া একদিন যে পথে সে চলিয়াছে, পথ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন করিয়া আজ আর কোন পথে চলিবার শক্তি ও সাহস তাহার নাই!

কুণ্ঠা, অপরিসীম লজ্জা, পাহাড়প্রমাণ মিথ্যা মর্য্যাদার গর্ব্ব তাহার টুঁটী চাপিয়া ধরিয়াছে। তাহার তৃষ্ণা, তাহার অন্তরের কামনা, তাহার কর্ত্তব্য······পারুল একান্ত কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিল। নিজের দৌর্ব্বল্য টের পাইয়া নিজেই লজ্জায় সে মরিয়া গেল। না জানি, ঐ সর্ব্বংসহ লোকটী বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছে······

এতক্ষণ ইহার কথা মনেই ছিল না, এইবার নলিনীর উপর দৃষ্টি পড়িতেই সর্ব্বশরীর তাহার কাঁটা দিয়া উঠিল। অকস্মাৎ নিদারুণ পরাজয়ের তিক্ত গ্লানি এই গভীর অন্ধকারেও তাহার মুখের উপর আর এক পোঁচ কালি মাখাইয়া দিয়া গেল। বিবাহের দিন হইতে এই লোকটী কুগ্রহের মত তাহার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যতই ইহাকে সে এড়াইয়া চলিতে চাহিতেছে, ততই ভগবান তাহাকে কেমন করিয়া কাছে আনিয়া দিতেছেন। ভগবানের একি নিষ্ঠুর পরিহাস! কি ক্ষতি হইত, যদি এই লোকটী তাহার উপর বিরূপ হইত? যেমন করিয়া সে উপেক্ষা করে, অপমান করিয়া ফিরাইয়া দেয়, তেমনি করিয়া এই লোকটীও কি পারুলকে ঘৃণা করিতে পারিল না? কেন পারে না? কি করিয়াছে সে? কি আছে তাহার, কাহার জন্য নলিনী এমন উন্মাদ—সমস্ত অপমান, নিদারুণ লজ্জা সহিতে পারিয়াছে, তবুও তাহাকে ভুলে নাই। ইহাই কি ভালবাসা······নিঃশব্দ রোদনের ধারা তাহার দুইটী গাল ভাসাইয়া নীরবে নামিয়া আসিতে লাগিল।

নলিনী বোধ করি, স্বপ্ন দেখিতেছিল। জীবনে এমন করিয়া পারুলকে আবার এত নিকটে পাইবে, এ কল্পনা সে কখন করে নাই। অপ্রত্যাশিত এই সাক্ষাৎকারে তাই শুধু সে বিস্মিত নয়, উদ্বেলিতও হইয়াছিল। মনের কোণে একদা যে স্বপ্ন অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কলরোল করিয়া আজ আবার সহসা তাহা জাগিয়া উঠিল। বিচিত্র সুখের স্পর্শে আকাশ-বাতাস রঙীন হইয়া উঠিল। সে সচকিত হইয়া উঠিল—আজিকার এই মুহূর্ত্তটী সে আর নষ্ট হইতে দিবে না! পরক্ষণেই একটা ক্ষীণ বেদনা তীব্র হতাশায় তাহার বুকের উপর এলাইয়া পড়িল। হয়ত' একটী আঘাতেই এ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। পারুল, নিষ্ঠুর পারুল হয়ত তীব্র অপমান করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিবে। নলিনী ম্লান হইয়া উঠিল। বলিবার তাহার অনেকই ছিল; কিন্তু সম্মুখের ঐ পাষাণপ্রতিমার মত প্রাণহীন পারুলের দিকে চাহিয়া সীমাহীন ব্যথায় নলিনী শুধু আর একটী নিঃশ্বাস অত্যন্ত নিঃশব্দে গোপন করিল।

গাড়ী আসিয়া মল্লিকাদের গেটের সামনে দাঁড়াইল। নলিনী দরজা খুলিয়া নামিয়া এক পাশে দাঁড়াইল। পারুল কম্পিত পদে অতি সন্তর্পণে নামিয়া গেটের ভিতর চলিয়া গেল।

নলিনীর বুক চিরিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ঝরিয়া পড়িল। দীর্ঘকাল যে আশা, যে বেদনা সে বহিয়া বেড়াইয়াছে, আজ নিতান্ত বেদনায় নলিনীর মনে পড়িল তাহা বিড়ম্বনা মাত্র! পারুলের নিষ্ঠুরা, পাষাণী হৃদয় কিছুতেই গলিবে না!······

পারুলের তন্বী তনুখানি ধীরে ধীরে গেটের লতা-কুঞ্জের গাঢ় অন্ধকারে মিশাইয়া যাইতে লাগিল।

নির্ণিমেষ নয়নে এই দিকে চাহিয়া, রহিয়া রহিয়া নলিনী মনে মনে যেন সাহস সংগ্রহ করিল। একবার ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু পরক্ষণেই করুণ গম্ভীর কণ্ঠে সে ডাকিল, পারুল!

একটী তীক্ষ্ণ আঘাতে পারুলের দুইটী পা যেন অসাড় হইয়া গেল।

নলিনী আবেগের সহিত কহিল, আসবে না পারুল—আমার ঘরে আসবে না? আমার অক্ষমতাটুকুই কি তোমার কাছে বড় হ'য়ে রইবে—আমার প্রার্থনা, আমার বেদনা কি তোমার একটু দয়াও পাবে না?···

পারুলের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত থর্-থর্ করিয়া

কাঁপিয়া উঠিল। দুর্ব্বল কম্পিত পা দুইখানি আর কিছুতেই ঠিক কড়া হইয়া থাকিতে পারে না। পারুল পড়িয়া যাইতেছিল। পাশের রেলিংয়ের উপর শরীর এলাইয়া দিয়া কোন রকমে সে তাল সামলাইয়া লইল।

নলিনী ক্ষুদ্র একটা উচ্ছ্বাস গোপন করিয়া আবার কহিল, পারুল……

পারুল শিহরিয়া উঠিল। মানুষের স্বরও কি এত বেদনাময়, শুষ্ক ও হতাশাপূর্ণ হয়। পারুলের বিক্ষুব্ধ অন্তর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। মুখের রেখায় রেখায় বেদনা যেন নীল হইয়া উঠিল। লজ্জা, ভয় ও পরাজয়ের গ্লানি উপেক্ষা করিয়া সে বলিতে চাহিল…… কিন্তু তাহার অবাধ্য কণ্ঠ হইতে তীব্র উপহাসের মতই সহসা নির্গত হইল, আমায় মাপ্ কর……

অতি দুঃখেও নলিনী পাগলের মত হাসিয়া উঠিল। মাপ, তাই হোক পারুল! বিধাতা যে ভুল করেছেন তা'র যন্ত্রণা বয়ে যেন আমাদের বেড়াতে না হয়। এই নিশাবসানেই যেন আমাদের এই নিষ্ঠুর অভিনয়ের শেষ হয়……আসি পারুল, তুমি সুখী হও!

পারুল অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, মাগো!

নলিনীর কাণে সে স্বর গেল। সে চঞ্চল হইল। ভাবিল হয়ত' ভ্রম হইয়াছে—কিম্বা হয় নাই। একটু ভাবিল। পরক্ষণেই নিতান্ত অপ্রয়োজন বোধে সমস্ত উপেক্ষা করিয়া ধীর পদে গিয়া সে গাড়ীতে উঠিল।

## ১৩

পারুল বাড়ী ফিরিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িল। মল্লিকা কহিল, থাক্ না আর দু'দিন।

—না, ভাল লাগ্‌ছে না।

মল্লিকা হাসিয়া কহিল, কাকেরে? দিদিকে—না তা'র আদর-যত্নকে?

পারুল ঠোঁট বাঁকাইয়া কহিল, বলেছি কখন?

পারুল কহিল, সত্যি ভাল লাগ্‌ছে না।

মল্লিকা ঠাট্টা করিয়া কহিল, তা' লাগ্‌বে কেন? মনের সঙ্গে যত্ন করে সুখী কি কখন হওয়া যায়—বুকেওত' তা' বুঝবি নে পারুল। আমি বলি……

—ভ্রূ কুঁচকাইয়া পারুল কহিল, আবার?

অবশেষে যাওয়াই স্থির হইল।

রেণুর নিকট বিদায় লইতে গিয়া পারুলের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। রেণু কহিল, দুটো দিন যা কাট্‌ল—উঃ! মনে করলে এখনো গা শিউরে উঠে!

পারুল উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল, কেন কুমুদবাবুর অসুখ নাকি?

ক্লান্তকণ্ঠে রেণু কহিল, না ভাই, নলিনীবাবুর! তোকে রাখ্‌তে গিয়ে ফিরবার পথে কোথায় যে কি করে আঘাত পেলেন…কাল পর্য্যন্ত ত' জীবনের আশাই ছিল না!

পারুল কাঁপিয়া উঠিল। নলিনীর শেষ কথাগুলি কাঁটার মত তাহার মনে পড়িয়া গেল। তবে কি……

অস্ফুট ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে পারুল কহিল, কি হয়েছিল?

রেণু কহিল, কি ক'রে জানব' বল? ভোরের দিকে খবর পেয়ে গিয়ে দেখি, রক্তসিক্ত অচৈতন্য দেহটা নলিনী-বাবুর পড়ে আছে। বেঁচে আছে কিনা বোঝা যায় না! ভয়ে চীৎকার করে উঠ্‌লেম। জীবনে এমন বীভৎস কাণ্ড কখনও দেখিনি। আত্মীয়স্বজন নেই, বন্ধুবান্ধব নেই, কি যে ওকে নিয়ে করি। জীবনমরণের ঝড় বয়ে যেতে লাগ্‌ল। দু'দিন পরে কাল সন্ধ্যের দিকে জ্ঞান ফিরলে তবে একটু শান্তি পাই।

পারুলের হৃৎপিণ্ড নিষ্ক্রিয় হইয়া আসিল—সমস্ত স্নায়ুগুলি অকস্মাৎ রক্তহীন শিথিল হইয়া পড়িল। পারুলের দুইটী চোখের সামনে ধোঁয়ার মত অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া নাসাপথে প্রবেশ করিয়া যেন তাহার দম বন্ধ করিয়া আনিতে লাগিল। কতখানি অপমান, কতখানি বেদনায়, কতখানি ঘৃণায় যে ঐ অসীম ধৈর্য্যশালী লোকটী নিজ হাতে নিজের জীবন দিতে উদ্যত হয়েছিল, নিমেষে বুঝিতে পারিয়া পারুলের আর অনুতাপের সীমা রহিল না। কিন্তু নিরুপায়, নিজের হাতে সে গণ্ডী টানিয়া গিয়াছে। আহা করিবার যো নাই, দুঃখ করিবার উপায় নাই, আর্ত্তনাদ করিবার সাহস নাই—বুক ফাটিয়া গেলেও, এক ফোঁটা অশ্রু ফেলিবার উপায় নাই। এমন করিয়া যে সব মীমাংসা করিয়া দিতে পারে, বোধ করি, ভুল করিয়াও তাহার জন্য একটা শুষ্ক দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার যো নাই।

পারুলের অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল। সমস্ত পাপের শাস্তি ভগবান বুঝি এমনি করিয়াই তিলে তিলে ফিরাইয়া দেন। পারুল শিহরিয়া উঠিল। কত আর সে সহিবে? হাসিয়া, সহস্র মিথ্যা লোকাচারের পায়ে এমনি করিয়া নিজকে বলি দিয়া, অন্তরের নিরুদ্ধ ক্রন্দন আর সে কত কাল গোপন করিয়া রাখিবে? আর পারে না! ভগবান! তোমার নির্ম্মম হস্তে কি শুধু শাস্তিই আছে—ক্ষমা নাই? মৃত্যু কি শুধু সুখীদের জন্যই, দুঃখীর জন্য ভুলিয়াও কি তাহা দিতে পার না?

প্রাণপণ শক্তিতে পারুল কহিল, এখন কেমন আছেন?

ভাল! হয়ত এ যাত্রা বেঁচে যাবেন।······কিন্তু ওঁর হয়ত' মরণই ভাল। ওঁকে ফিরে পাওয়ার জন্যে আমার আনন্দ হচ্ছে না পারুল। মারা গেলে কষ্ট পেতাম সত্যি, কিন্তু যে ভূতের বোঝা ও বয়ে বেড়াচ্ছে, তা'র যন্ত্রণা থেকে যে তিনি মুক্তি পেতেন, এই ভেবে হয়ত' শান্তিও কম পেতাম না! রেণুর চোখ দুইটী করুণায় ভিজিয়া উঠিল।

পারুলের দুই কাণের ভিতর কে যেন তপ্ত গলিত সীসা গালাইয়া ঢালিয়া দিল।

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া রেণু কহিল, যাওয়ার কথা কি বল্‌ছিলি?

পারুল চমকিয়াই উঠিল। এতক্ষণ এ খবর ভুলিয়াই গিয়াছিল। শান্তকণ্ঠে পারুল কহিল, আর কতদিন থাক্‌ব'······কাল পরশু হয়ত' যেতে পারি······

রেণু কহিল, থাক্ ভাই, যেয়েই বা কি কর্‌বি······ছুটী না পেলে কর্ত্তা ত' আর বাড়ী আস্‌বেন না! শূন্য ঘর আগ্‌লে কি সুখ পাবি বলত?

প্রত্যুত্তরে পারুল হাসিতে গেল; কিন্তু তাহার দুইটী চোখ ভরিয়া অকস্মাৎ অশ্রুর বান ডাকিয়া গেল।

## ১৪

পারুল স্বহস্তে জ্বালা বেড়া আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল। কাহাকেও কিছু বলিবার উপায় নাই—কোন কৌতুহল প্রকাশ করিবার যো নাই; নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া এ মৃত্যুযন্ত্রণা উপভোগ করিতে হইবে।

শেষে কি সে পাগল হইয়া যাইবে নাকি?

কল্পচক্ষে নামিয়া আসিল সেই নিষ্ঠুর সত্য—প্রতি মুহূর্ত্ত যাহার আশঙ্কাকে সে দুই হাত দিয়া ঠেলিয়া দূরে দিতে চাহিয়াছে। একান্ত নিষ্ঠুর দিনের সেই মর্ম্মান্তিক ক্ষণটী। নলিনীর জীবন-দীপ ধীরে ধীরে নিভিয়া আসিতেছে—রেণুর উদ্বেগের সীমা নাই, কুমুদের দুর্ভাবনার অন্ত নাই ······কিন্তু নিষ্ঠুর মৃত্যু নিঃশব্দে পদবিক্ষেপে আগাইয়া আসিতেছে। অবজ্ঞাত নলিনী, এতদিন যাহা চাহিয়া আসিয়াছে—তাহাই আসন্ন। এইবার তাহার সকল জ্বালার শান্তি হইবে। কিন্তু চোখে জল কেন? বুকের ও ব্যাকুলতা কিসের? হে অনন্ত পথের যাত্রী, তুমি ত' অন্ধকারকে, ভয়ানককে, চিরবিস্মৃতিকেই চাহিয়াছ—ঈশ্বরের বিধান বলিয়া একটা নারীর বিভ্রমকে, মিথ্যা গর্ব্বকে মাথায় করিয়া লইয়াছ, তা'র দুঃসহ ভার বহিয়া শেষে জীবন দিতে চাহিয়াছ, তবুও জোর করিয়া তাহাকে চাহ নাই······তবে কাঁদ কেন?

পারুল সমস্ত ঘরময় দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আঁধার করিয়া রজনী নামিয়া আসিল। দীর্ঘ নিশা জাগিয়া জাগিয়া এক সময়ে সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। আবার এক সময়ে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। যেন সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল—মরণাহত কণ্ঠে নলিনী বলিতেছে, আসি পারুল, সুখী হও। সে স্বর পারুল সহ্য করিতে পারিল না। উন্মাদের মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, আমায় ক্ষমা কর, মাপ্ কর। আমার সব অপরাধ ভুলে আমায় টেনে নাও···।

সমস্ত যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধে সে নিজের সত্যকে উপলব্ধি করিল এবং ভোরের সাথে সাথেই শুধু যেন এই সত্যটুকুর জোরেই নিজের অচল দেহটাকে টানিয়া লইয়া গিয়া রেণুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

রেণু তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া পরম উৎকণ্ঠার সহিত কহিল, তোর অসুখ করেছে নাকি রে পারুল!

পারুলের বুক ঢিপ্-ঢিপ্ করিতে লাগিল। এতক্ষণ ধরিয়া যে সাহস সঞ্চয় করিতেছিল, কাজের বেলায় দেখিল, সে কিছুই নয়! তথাপি এই জ্ঞানটুকু পাছে লোপ পায়, এই ভয়ে—এক রকম জোর করিয়াই সে বলিল,

না। ভাল ঘুম হয়নি রাতে, যে গরম! তারপর একটু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে সে কহিল, নলিনীবাবু কাল কেমন ছিলেন রেণু?

রেণু কহিল, ভাল। ওখানেই ত' যাচ্ছি—যাবি একবার দেখ্‌তে। কাল তোর কথা বল্‌ছিলেন।

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে পারুল কহিল, কি বল্‌ছিলেন……

কেমন আছেন—কবে যাবেন।…যাবি পারুল?

মন্ত্রমুগ্ধের মত পারুল কহিল, যাব।

## ১৫

বোধ করি, তখন নলিনী ঘুমাইতেছিল।

রেণু কহিল, তুই এখানে বস্, আমি পথ্যটার খোঁজ নিয়ে আসি, বলিয়া রেণু চলিয়া গেল।

বুকের মধ্যে এতদিন যে কান্নার সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, এইবার তাহা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। নিরালা ঘরের একান্ত নির্জ্জনতায় নলিনীর সান্নিধ্য অনুভব করিয়া পারুল ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিল।

একি করিয়া বসিল সে! কি করিয়া আজ সে নিজেকে গোপন করিবে……এতদিন নিজেকে ভুলাইয়াছে, অপরকে ভুলাইয়াছে; কিন্তু আজ যখন ঐ লোকটী ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া বিস্মিত হইবে, হয়ত' বা আগের দিনের মতই ডাকিবে, পারুল……দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া পারুল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

না, না, আজ আর তাহার সে শক্তি নাই। অনেক ভুলই সে করিয়াছে, হে ভগবান, আজকার দিনটায় যেন সে আর নূতন করিয়া ভুল করিয়া না বসে। আজকার দিনে সে যেন সত্যিকার পরিচয় দিতে পারে……

কিন্তু যতক্ষণ ঐ লোকটী ঘুমাইবে? এ ঘুম কি ভাঙ্গিবে না?……মুখখানিও যদি একটু দেখা যাইত! সেই মুখখানি আজ একবার প্রাণভরিয়া নির্জ্জনে একান্ত ভাবে দেখিতে ইচ্ছা করে…সেই সুন্দর মুখখানি—কৈশোরের সেই একান্ত নির্ব্বিকার একনিষ্ঠ প্রেমময় মুখখানি! আজও কি তেমনি আছে?…মুখের কাপড়টা কি করিয়া সরান যায়? মুখ ঢাকিয়া কি করিয়াই যে ঘুমায়—কাপড় আটকায় না?……পারুল উঠিয়া বিছানার কাছে গেল। কম্পিত দেহের অক্ষমতা যেন তাহার হাতে হাতে ধরা পড়িয়া গেল। পারুল শিহরিয়া উঠিল। ছিঃ, ছিঃ! রেণু যদি আসিয়া পড়ে? দেখিলে কি ভাবিবে? উনিই বা কি মনে করিবেন? এই পারুল? এই তাহার দর্প—এই তাহার গর্ব্ব?

পারুলের পা থামিয়া গেল। গভীর লজ্জায় তাহার দেহ-মন ছিঃ-ছিঃ করিয়া উঠিল। একটা অপরাধ ধরা পড়িয়াছে মনে করিয়া সে যেন মাটীর সাথে মিশিয়া গেল। না, না, একি ভাল! কি মনে করিবে…এতদিন পারিয়াছ আর আজ পারিবে না? ছিঃ, পারুল……

ওকি পড়িল না কি?

পারুলের বুকের মধ্যে ধ্বক্ করিয়া উঠিল—মনে হইল অকস্মাৎ যেন হৃৎপিণ্ডের গতিটা থামিয়া গেল।

নলিনী স্বপ্নঘোরে অস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আসি পারুল, তুমি সুখী হও……

পারুল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ওগো, কে সুখী হইবে? কা'কে সুখী হইতে বলিতেছ? পারুল—সে পারুল নাই, মরিয়া গিয়াছে—সে হতভাগিনী আত্মহত্যা করিয়াছে! এ আসিয়াছে—এও পারুল…কিন্তু সে পারুল নয়! এ আমি—আমি—তোমার দা—সী!……একটুও কি পায়ে স্থান দেবে না?

নলিনীর স্বপ্নাচ্ছন্ন কণ্ঠ হইতে আবার স্খলিত হইল, পারুল…

পারুল রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে করিল—বুঝি তাহার ডাক পৌঁছিয়াছে—তাহার আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে। পারুল উন্মাদের মত ছুটিয়া গেল। গিয়া নলিনীর মুখের কাপড় সরাইয়া দিয়া পাগলের মত কহিল, ওগো, দেখো—দেখো তোমার পারুল এসেছে! কিন্তু পরক্ষণেই নলিনীর পাণ্ডুর বিকৃত মুখের দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টি পড়িতেই পারুল চীৎকার করিয়া নলিনীর বুকের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

নলিনী ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিল। উঠিয়া বিস্মিত হইল। প্রথমে সে কিছুই বুঝিতে পারিল না—ধারণাও করিতে পারিল না যে কে! কিন্তু পরক্ষণেই নিজের রুগ্ন

শীর্ণ হাত দিয়া পারুলের অশ্রুলিপ্ত মূর্চ্ছিত মুখখানি চোখের উপর তুলিয়া ধরিতেই নলিনী আনন্দবিহ্বল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, পারুল—পারুল……

চেঁচামিচি শুনিয়া ঠিক এই সময়ে রেণু আসিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল।

এই দিকে দৃষ্টি পড়িতেই পলকে নলিনী সমস্ত বুঝাইয়া বলিল, ভয় নেই রেণু, যার ভাবনা সে বুঝে নিয়েছে। আজ আমি নিশ্চিন্ত। পারুল আমার এসেছে!

রেণু আনন্দে কলরোল করিয়া উঠিল, এই পারুল আপনার বৌ! বারে! আচ্ছা মানুষ ত' আপনারা! সেদিন কি অভিনয়ই করলেন—যেন কেউ কাউকে জানেনও না, চিনেনও না! ধন্যি আপনাদের মান-অভিমান ……পারুল—এই পারু……তারপর ছুটিয়া গিয়া পারুলকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দ-উদ্বেল কণ্ঠে রেণু ডাকিল, মর পোড়ামুখি! মূর্চ্ছা যাবার আর সময় পেলি নে!…

(শেষ)

# নবান্ন

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়

নবান্ন উৎসবের গোড়াকার কথাটা হইল, ফসল উৎসব। এই উৎসবের ঘটা দেখিতে পাওয়া যায় কৃষিপ্রধান দেশে, এবং তাহাও বিশেষ ভাবে কৃষিজীবী বা ভূমির উপসত্ত্ব-ভোগীদের মধ্যেই। যে দেশের যাহা প্রধান ফসল, তাহা শস্যক্ষেত্র হইতে ঘরে তুলিয়া আনিবার পর এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। তাই প্রকৃতি ও জাতিগত সংস্কার ও রুচি-ভেদে, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে রসে এই উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইয়োরোপের কৃষিপ্রধান দেশেও এই উৎসবের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা যন্ত্রশিল্পপ্রধান দেশ হইতে অধুনা লোপ পাইয়া গিয়াছে।

যত দূর জানি, বাংলাদেশে নবান্ন পর্ব্বের যে অনুষ্ঠান হয়, তাহার ঘটা দেখিতে পাওয়া যায় সাধারণতঃ পশ্চিম বঙ্গে, বিশেষভাবে বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলেই। পূর্ব্ব বঙ্গের মধ্যে বরিশাল জেলাতেই এই অনুষ্ঠানের ঘটা অনেকটা হইয়া থাকে। নবান্ন উৎসবটি সমগ্র বাংলায় অন্যান্য অনুষ্ঠানের মত তিথি, নক্ষত্র বা বিশেষ কোন বিধি বা ব্যবস্থানুযায়ী অনুষ্ঠিত হয় না; পরন্তু গণমতের প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। জাতি, বর্ণ, ধনী, দরিদ্র, সকলের সমবেত সম্মতিক্রমে এই অনুষ্ঠানের দিন ধার্য্য হইয়া থাকে। তিথি-নক্ষত্রের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। কার্ত্তিক হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত, দিনের পর দিন, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলে এই উৎসবের আনন্দ ও উল্লাসের হিল্লোল।

গ্রাম বা পাড়ার সকলে মিলিয়া সকলের সুবিধামত একটা দিন স্থির করে, ইহার মধ্যে যদি কোন গৃহস্থের অশৌচাদি বা অন্য কোন প্রতিবন্ধকে সকলের সঙ্গে ধার্য্য দিনে যোগ দিয়া উঠিতে না পারে, তবে পরে যে কোন দিন স্বতন্ত্রভাবে সে নবান্ন পর্ব্ব নির্ব্বাহ করে। মোটের উপর, নূতন অন্ন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এই উৎসবটি করাই রীতি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। মাতৃস্তনের মত বসুন্ধরার বুক চিরিয়া যে রস গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ সম্ভব হয়, গৃহস্থ সেই অন্ন প্রথম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে পিতৃপুরুষ, ঋষি, দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিয়া থাকেন। অতিথি অভ্যাগত, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবাসীকে লইয়া প্রথম অন্ন গ্রহণ করিবার মধ্য দিয়া সম্বন্ধের ভিত্তি দৃঢ় ও মধুর হয়। দৃশ্যাদৃশ্য জগতের মধ্যে একটা ঐক্যানুভূতি এই উৎসবের মর্ম্মকথা।

নূতন ফসলের অন্ন, নূতন শাক-সব্জি, ফল-মূলের রকমারী ব্যঞ্জনবৈচিত্র্যে এই অনুষ্ঠান প্রীতিকর থাকে। দেশভেদে কোথাও কোথাও উৎসবে মাছ বা মাংসেরও প্রচলন দেখা যায়। মোটের উপর, উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া পরস্পরের মধ্যে মিলামিশার সুযোগ হইয়া থাকে।

সমাজবিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তক মনীষী মহাপুরুষদের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ও সৃষ্টি অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ম্মব্যবসায়ীদের হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়াছে। ইহা যে কেবল আমাদের দেশেই তাহা নহে, জগতের সর্ব্বত্রই। পূজা-পার্ব্বণের সহজ সরল আনন্দের স্থানে মন্ত্র-তন্ত্র-শাস্ত্র, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরকের শাসন আসিয়া ব্যাপারটাকে কৃত্রিম করিয়া তুলিয়াছে। ক্রিয়া-কলাপ, দ্রব্য-নৈবেদ্যের ত্রুটি-বিচ্যুতিতে মন থাকে সদা সন্দিগ্ধ—তাহার ফলে উৎসব অনুষ্ঠান সব হইয়া উঠিয়াছে এক মাত্র শুষ্ক নীরস কর্ত্তব্য। যেন চলতি-চাকার গতি—যুক্তিবিচারের মাপকাঠিতে তাহার অনেক কিছুরই নাগাল পাওয়া যায় না। তাই ভিতর-বাড়ীর অনেক ব্রত বা পূজার প্রভাব বাহির বাড়ীতে মেলে না।

ধর্ম্ম ও কর্ম্মের মূল প্রেরণাই হইল ভাব-রস-আনন্দ হইতে। ইহাতে ভয়-ভীতি-সন্দিগ্ধ চিত্তের কিছুই নাই। আমাদের অনেক পূজাপর্ব্ব এই রাহুর কবলে পড়িয়া বিবর্ণ মলিন হইয়া উঠিতেছে বলিয়া উহা আমাদের মনে প্রাণে আর তেমন সাড়া-প্রেরণা দেয় না। ফলে আমাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী হইয়া উঠিয়াছে একঘেয়ে গতানুগতিক। সমাজজীবনকে বিচিত্র রসে আনন্দে ভরাইয়া তুলিবার জন্যই সমাজনিয়ন্তারা নানাবিধ উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া গিয়াছেন। সহজতার দিক্ দিয়া এই নবান্ন পর্ব্বের তুলনা নাই বলিলেও চলে। মন্ত্র-তন্ত্র-তিথি-বিধি-মুক্ত এই অনুষ্ঠানে বয়োজ্যেষ্ঠের অনুমতি মাত্র লইয়া ছোট বড় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে সমান ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। বাঙালীর সমাজজীবনে এইরূপ সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক পর্ব্ব অপর বোধ হয় দ্বিতীয়টি নাই।

# মাধবী দেবী

শ্রীঅজিতকুমার বসু

শ্রীচৈতন্যের যুগে বাংলা দেশে যে সকল পদাবলী রচয়িতা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, মাধবী দেবী তন্মধ্যে অন্যতমা। মাধবী দেবী শ্রীচৈতন্যের অনুরাগিণী ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য যখন নীলাচলে গিয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করেন, মাধবী দেবীও তাঁহার ভ্রাতা শিখি মাহিতীর সহিত চৈতন্যদেবের অনুগমন করেন। মাধবী দেবীর অবশিষ্ট জীবন সেখানেই অতিবাহিত হয়। তিনি অত্যন্ত শুদ্ধাচারিণী ছিলেন এবং কৃষ্ণচিন্তায় দিন কাটাইতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন :

> শিখি মাহিতীর ভগিনী নাম মাধবী দেবী।
> বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ আরও বলেন, চৈতন্যদেবের প্রকৃত কৃপালাভ করিয়াছিলেন মাত্র সাড়ে তিন জন; মাধবী দেবী তাঁহাদের আধ জন :

> প্রভু কৃপা করে যারে রাধিকার গণ।
> জগতের মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন জন॥
> স্বরূপ গোঁসাঞি আর রায় রামানন্দ।
> শিখি মাহিতী তিন তাঁর ভগিনী আধজন॥

কিন্তু মাধবী দেবী চৈতন্যদেবের অর্দ্ধজন কৃপাপাত্রী হইলেও, শ্রীচৈতন্য কখনও তাঁহার মুখ দেখেন নাই, কারণ সন্ন্যাসগ্রহণের পর তিনি আর নারী-মুখ দেখিতেন না।

একদা নীলাচলবাসী ভগবান আচার্য্য শ্রীচৈতন্যকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু গৃহে শুক্ল চাউলের অভাব হওয়ায় প্রভুর অন্যতম প্রধান ভক্ত ছোট হরিদাসকে ডাকিয়া বলিলেন :

> মোর নামে মাধবী দেবীর স্থানে গিয়া।
> শুক্ল চালু এক মন আনহ মাগিয়া॥

ছোট হরিদাস তাহাই করিলেন। কিন্তু ফল হইল বিপরীত।—গৌরাঙ্গ যখন জানিতে পারিলেন, ছোট হরিদাস মাধবী দেবীর নিকট ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল, তিনি গোবিন্দদাসকে ডাকিয়া বলিলেন :

> আজি হইতে এই মোর আজ্ঞা জানিবা।
> ছোট হরিদাসে ইঁহা আসিতে না দিবা॥

কারণ—

> যে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
> দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥

এ সংবাদ পাইয়া মাধবী দেবী অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন, তাঁহার জন্য ছোট হরিদাসের এমন শাস্তি হইল! কিন্তু তাই বলিয়া প্রভুর প্রতি তাঁহার ভক্তি একটুও ম্লান হয় নাই।

মাধবীর রচিত যে কয়টি পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা বেশী নহে, কিন্তু এই কয়টির মধ্যেই তাঁহার কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পদগুলির ভাষা বেশ প্রাঞ্জল। শ্রীগৌরাঙ্গের গৌরকান্তি দেখিয়া মাধবী লিখিয়াছেন :

প্রতপ্ত কাঞ্চন-কান্তি অরুণ বসন।
প্রেমছলছল দুটি অরুণ নয়ন॥
আজানুলম্বিত ভুজ চন্দনে ভূষিত।
উন্নত নাসিকা ঊর্দ্ধ তিলক শোভিত॥
গোপীনাথ বাণীনাথ সার্ব্বভৌম কাশী।
গোরারূপ দেখি যত নীলাচলবাসী॥
যে দেখয়ে গোরা মুখ সেই প্রেমে ভাসে।
মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম্মদোষে॥

অথবা—

সিংহদুয়ারে গিয়া মরমে বেদনা পাইয়া
দাঁড়াইল নিত্যানন্দ রায়।
হরে কৃষ্ণ হরি বলে দেখিয়াছ সন্ন্যাসীরে
নীলাচল বাসীরে সোধায়॥
জাম্বুনদ-হেম জিনি গৌর-বরণ খানি
অরুণ বসন শোভে গায়।
প্রেমভরে গর গর আঁখিযুগ ঝরঝর
হরি-হরি বোল বলি ধায়॥
ছাড়ি নাগরালি বেশে ভ্রমে বহু দেশে দেশে
এবে ভেল সন্ন্যাসীর বেশ।
মাধবী দাসী যে কয় অপরূপ গোরা রায়
ভট্টগৃহে করল প্রবেশ॥

সার্ব্বভৌমগৃহে ভক্ত পরিবেষ্টিত গোরাচাঁদকে দেখিয়া :

নিত্যানন্দ সঙ্গতি মুকুন্দ গদাধর।
দেখিলাম গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌম ঘর॥
দক্ষিণে নিতাই বসি বামে গদাধর।
মিলিয়াছে গোরাচাঁদের যত অনুচর॥

গৌরাঙ্গ যখন ভক্তগণের সহিত খোল-করতাল বাজাইয়া হরিনামে মত্ত :

আনন্দে নাচত সঙ্গে ভকত
গৌরকিশোররাজ।
কাণ্ড উঝালি করে কেলাকেলি
নীলাচলপুরী মাঝ॥
শুনিয়া নাগরী প্রেমেতে আগরি
আসিয়া সকলি দেখে।
হেরিয়া গোরে পড়িয়া কাঁপয়ে
বদন চাহিয়া থাকে॥
দু' বাহু তুলিয়া বেড়ায় নাচিয়া
ভকতগণের সঙ্গ।
নীলাচলবাসী মনে অভিলাষী
কৌতুকে দেখায় রঙ্গ॥
বাজে করতাল খোলো তাল তাল
আর বাজে তাহে খোল।
মাধবী দাস মনেতে উল্লাস
সদা বলে হরিবোল॥

গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, তাঁহার বিরহে পশুপক্ষী, তরুলতা পর্য্যন্ত শোককাতর হইয়াছিল, এমন কি সূর্য্যের কিরণ পর্য্যন্ত কিরূপ ম্লান হইয়া গিয়াছিল তাহার বর্ণনা বড় সুন্দর :

তরুলতা যত দেখে শত শত
অকালে ঝরিছে পাতা।
রবির কিরণ না হয় স্ফুটন
মেঘগণ দেখে রাতা॥
ডালে বসি পাখী মুদি দুটি আঁখি
ফুলদল তেয়াগিয়া।
কান্দয়ে ফুকরি ডুকরি ডুকরি
গোরাচাঁদ নাম লৈয়া॥
ধেনু যুথে যুথে দাঁড়াইয়া পথে
কাঁরো মুখে নাহি রা।
মাধবী দাসীর পণ্ডিত ঠাকুর
পড়িল আছাড়ে গা॥

এইগুলি ছাড়া মাধবী দেবীর আরও কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেগুলির সংখ্যা বেশী নহে। তাহার অধিকাংশই চৈতন্য-লীলা লইয়া লিখিত। রাধাকৃষ্ণলীলা লইয়া রচিত দু'একটি পদও দেখিতে পাওয়া যায়। মাধবী দেবীর সমুদয় পদাবলী এখনও পাওয়া যায় নাই; তবে অনুমান হয়, তাঁহার সমস্ত পদাবলী আবিষ্কৃত হইলে, হয়ত তিনি বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবেন।

# চন্দননগর—১৬৭৩ হইতে ১৯৪৭

শ্রীহরিহর শেঠ

## ২

১৭৪২—ডুপ্লেক্স শেষ বার চন্দননগর পরিদর্শনে আইসেন।

১৭৪৪—চন্দননগর উন্নতির উচ্চ সীমায় আরোহণ করে। এই সময়ে ইহা কলিকাতার অপেক্ষাও বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।

১৭৪৮—মহারাষ্ট্রবর্গীদের দ্বারা সহরের কোন কোন অট্টালিকা বিধ্বস্ত হয়।

১৭৪৯—মোল্লাহাজির বাগানের প্রসিদ্ধ মসজিদটী মোল্লাহাজির দ্বারা এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুশে (Mouchet) অর্লেয়া দুর্গ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের একটী নক্সা প্রস্তুত করেন।

১৭৫১—নিতি বৈরাগী বা নিতে বৈষ্ণব (নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী) কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের গৃহে জন্মগ্রহণ করে।

১৭৫২—ডাচেদের সহিত ফরাসীদের একটী চুক্তি সম্পন্ন হয়।

১৭৫৩—জেস্যুইটদের হাসপাতাল ও অনাথাশ্রমের উল্লেখ দেখা যায়। এ সময়ে ক্যাথলিক অধিবাসীর সংখ্যা ছিল চারি সহস্র।

১৭৫৫—দিনেমাররা গোন্দলপাড়া হইতে শ্রীরামপুরে যায় এবং সম্ভবতঃ এই সময়ে ফরাসীরা উহা পত্তনী লয়।

১৭৫৬—রেনো (Renault de St. Germain) গভর্ণর নিযুক্ত হন।

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মৃত্যু হয়।

কলিকাতা হইতে আগত ৩০০০ পর্ত্তুগীজ স্ত্রীপুরুষ ও বালক-বালিকাদের আশ্রয় দান করিয়া ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তাহাদের ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করেন।

১৭৫৭—ইংরাজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ হয় এবং ইংরাজরা চন্দননগর দখল করে। ক্লাইভ (Robert Clive) স্থলপথে এবং ওয়াটসন্ (Admiral Watson) জলপথে আক্রমণ করে। ১৮ই মার্চ্চ ওয়াটসনের অধিনায়কত্বে ব্রিজওয়াটার, কিংফিশার, টাইগার, কেণ্ট ও স্যালিসবারি কাউগাছি হইতে গোন্দলপাড়ার নিকট পৌছে। ২৩শে মার্চ্চ চন্দননগর বৃটীশদের হস্তগত হয়।

ক্লাইভ ৩০শে মার্চ্চ নবাবকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে চন্দননগর নামের পরিবর্ত্তে 'ফ্রান্সডঙ্গা' নাম ব্যবহার করেন।

বৃটিশদের এই সেপ্টেম্বরের কনসল্টেশন্ বহি হইতে জানা যায়, যে 'চন্দননগরের দুর্গ ও সরকারী সৌধাদি বিনষ্ট করিবার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা সরবরাহ করিবার জন্য বক্সিকে ম্যানজুর করিবার আদেশ দেওয়া হয়।

১৭৬৩—প্যারিসের সন্ধির সর্ত্তানুসারে চন্দননগর পুনরায় ফরাসীদের প্রত্যর্পিত হয়।

১৭৬৫—ফরাসী কোম্পানী জেস্যুইটদিগকে জমি দান করেন।

১৭৬৯—প্রথম ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লোপ পায়।

শ্যেভালিয়ে (M. Chevalier) চন্দননগরের প্রধান নিযুক্ত হন।

তাঁহার আদেশে সমগ্র সহরটি পরিখাবেষ্টিত করা হয় এবং সহরের একটী নক্সা প্রস্তুত করান হয়।

১৭৭৭—ভারতে প্রথম নীলব্যবসায়িদের অন্যতম লুই বোনো (Louis Bonnaud) এই বৎসরে চন্দননগরে আগমন করেন এবং নীলের ব্যবসা আরম্ভ করেন।

অসামান্যা সুন্দরী কুমারী ক্যাথরীণ্ ভার্লির (Miss Noel Catherine Verle'e) গ্র্যাণ্ডের (George Francis Grand) সহিত ১০ই জুলাই বিবাহ হয়।

১৭৭৮—ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত ১৮ই মার্চ্চ যুদ্ধ বাধে। ৬ই জুলাই কলিকাতায় এই সংবাদ পৌছিলে ইংরাজরা ১০ই জুলাই বিনা বাধায় পুনরায় চন্দননগর অধিকার করেন।

১৭৭৯—সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার সুপ্রিম্ কোর্টের জজ স্যার রবার্ট চেম্বার (Sir Robert Chambers) চুঁচুড়া ও চন্দননগরের একজন বিশেষ বিচারক নিযুক্ত হন।

১৭৮৩—চন্দননগর পুনরায় ফরাসী অধিকারে আইসে। ভার্সেই সন্ধির সর্ত্তানুসারে গড় কাটা হয়।

১৭৮৪—এই সময়ে (১১৯১ সাল) রামকানাই সরকার সরকার বাগানে রামমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৭৮৫—আনুমানিক একবিংশতি বর্ষীয়া এক ব্রাহ্মণ যুবতী স্বামীর সহিত সহমৃতা হন।

১৭৮৭—দাঁজেরো (Dangereaux) এখানকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন।

এখানে এক ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়।

১৭৮৮—নিকোলা (F. Nicolas) এখানকার গভর্ণর অথবা এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

১৭৮৯—মন্টিনী (Montigny) গভর্ণর নিযুক্ত হন।

১৭ই সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে একটী বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় যে, চন্দননগরের গভর্ণর মন্টিনী ঘোষণা করিয়াছেন যে, তথাকার দাস-ব্যবসায় রহিত করা হইল।

বিখ্যাত পর্য্যটক গ্র'াপি (Grandpee) চন্দননগর পরিদর্শনে আইসেন।

১৭৯০—২৯শে জুলাই একজন মুসলমান স্ত্রীলোক মৃত স্বামীর সহিত কবরস্থ হইয়া সহমৃতা হন।

১৭৯১—আইন দ্বারা পূর্ব্বেকার আরপাঁ (arpent) মাপ তুলিয়া দেওয়া হয়।

১৭৯২—ফুমের' (Fumeron) এখানকার গভর্ণর নিযুক্ত হন।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের প্রসিদ্ধ ফরাসী বিদ্রোহের অনুকরণে এখানে একটী বিদ্রোহ হয়। একজন আইনব্যবসায়ীর প্ররোচনায় লোকেরা গভর্ণরের উপর চড়াও হওয়ায়, রাজা ষোড়শ লুই যেমন ভার্সাইয়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন, ইনিও তেমনি গরুটীর পল্লীনিবাসে পলায়ন করেন। প্যারিসের উত্তেজিত জনতা যেমন আড়ম্বরের সহিত রাজা ও রাণী মারী আনতোয়ানেত্‌কে (Marie Antoinette) ফিরাইয়া লইয়া আইসে, এখানেও সেইরূপ গভর্ণরকে চন্দননগরে লইয়া আসা হয়। শেষ পর্য্যন্ত পাছে লুইয়ের দশা প্রাপ্ত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় গভর্ণর ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহারা একদল সৈন্য প্রেরণ করায় সকল গোলযোগের অবসান হয়।

১৭৯৩—৮ই ফেব্রুয়ারী ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে যুদ্ধ বাধিলেও এখানে সংবাদ আসিয়া পৌঁছিলে, জুন মাসে পুনরায় চন্দননগর বৃটিশদের হস্তগত হয়।

এই সময়ে রিচার্ড বার্চ্চ (Richard Birch) কলিকাতার সপারিষদ্ গভর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক চন্দননগরের অধ্যক্ষ, জজ্‌ এবং ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং দে ব্রেত্তাল্‌ (De Bretal) সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

এই সময়ে চন্দননগরে ফরাসী সরকারের যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি মায় গভর্ণরের পাল্‌কিখানি পর্য্যন্ত ইংরাজ সরকার কর্ত্তৃক বিক্রীত হয়।

১৭৯৮—যাদবেন্দু ঘোষ (যাদু ঘোষ) দ্বারা ১১৯৫ সালের ১৭ই ফাল্গুন গোপীনাথের আখড়াবাটী প্রতিষ্ঠা হয়।

১৭৯৯—এখানে অহিফেন প্রস্তুত নিষিদ্ধ হয়।

১৮০২—এমিএমের সন্ধি অনুসারে চন্দননগর বৃটিশশাসনমুক্ত হওয়ার কয়েক মাস পরেই পুনরায় উভয় রাজ্যে যুদ্ধ বাধায় ইহা ইংরাজ অধিকারে যায়।

১৮০৭—মহাভারত পাল কর্ত্তৃক পালপাড়ার শিবমন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কবিওয়ালা রাসু মৃত্যু হয়।

১৮০৮—৯০ বৎসর বয়স্কা কায়স্থ পরিবারের এক বৃদ্ধা ১লা সেপ্টেম্বর সহমৃতা হন। ইহাই চন্দননগরে শেষ সহমরণ।

শিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হয়।

লাভোকা (L' Avocat) নামক একখানি ফরাসী নাটক বাঙ্গালা ভাষায় অনুদিত হইয়া এখানে অভিনীত হয়।

গোস্বামীঘাটের নবচূড় নবরত্নের মন্দির—যাহা ক'নে বৌয়ের মন্দির নামে খ্যাত এবং যাহাতে এখন প্রবর্ত্তকের ওঁকার-ঘট প্রতিষ্ঠিত আছে, উহা দেবীচরণ সরকার মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৈদ্যনাথ সরকারের স্ত্রী বালবিধবা গৌরমণি দাসীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮০৯—কবিওয়ালা নৃসিংহের মৃত্যু হয়।

১৮১৪—লোকগণনা হয় ৪১৩৭৭ জন।

১৮১৬—বৃটিশদের নিকট হইতে চন্দননগর ফরাসীদের পুনঃপ্রাপ্তি। ফ্রান্সের রাজা অষ্টাদশ লুইয়ের পক্ষে নিয়োজিত কমিশনর বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে মিঃ গর্ডন্‌ ও কর্ণেল্‌ লভ্‌ডে' (Colonel Loveday)র নিকট হইতে ৪ঠা ডিসেম্বর গ্রহণ করেন।

রাভিয়ে (M. Ravier) শেফ্‌ দে সার্ভিস্‌ নিযুক্ত হন।

ফরাসীদের হস্তে আসিবার সময়ে চুক্তি হয় বাৎসরিক মোট ৩০০ বাক্স অহিফেন ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কলিকাতার বিক্রীর গড়পড়তা পাওয়া যাইবে।

১৮১৭—প্রেমনারায়ণ বসু শ্রীশ্রীরাধা মদনমোহন জীউর রাসমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮১৯—দায়ও (M. Dayot) শেফ্‌ দে সার্ভিস নিযুক্ত হন।

১৮২১—রাভিয়ে (Ravier) পুনরায় শেফ্‌ দে সার্ভিস হন।

১৮২২—কর দিয়ে (Cordier) এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

১৮২৩—বিশপ্‌ হিবার (Bishop Reginald Heber) চন্দননগর পরিদর্শনে আইসেন এবং কর্ম্মকোলাহলহীন আশ্চর্য্য রকম নিস্তব্ধতা ও শূন্যতার দৃশ্য লক্ষ্য করেন।

পেলিসিয়ে (Pellissier) এখানকার প্রধান নিযুক্ত হন।

১৮২৬—করদিয়ে (Cordier) আড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

১৮২৮—কাশীনাথ কুণ্ডু শিবমন্দির চতুষ্টয় প্রতিষ্ঠা করেন।

ক্রোকে (Crocquet) অস্থায়ী ভাবে শেফ্‌ দে সার্ভিস নিযুক্ত হন।

১৮২৯—করদিয়ে (Cordier) তৃতীয়বার এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর হন।

১৮৩২—দুঃস্থ ও আতুরদের সাহায্যার্থ কমিতেদে বিয়ে খেসাস্‌ (Comite' de Bienfaisance) প্রতিষ্ঠা হয়। একপ্রকার প্রবল জ্বরের আবির্ভাব হয়।

১৮৩৩—নিয়েল (Neil) অস্থায়ীভাবে প্রধান নিযুক্ত হন। বেদিয়ে (Bedier) শেফ্‌ দে সার্ভিস পদে নিযুক্ত হন। এই বৎসর লোকগণনা হয় ৩১২৩৫ তন্মধ্যে ২১৩ জন ইউরোপীয়ের বাস ছিল।

বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তক 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ফাদার গেঁরা (Father J. F. M. Juerin) কর্ত্তৃক পুনর্লিখিত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহা দ্বিতীয় সংস্করণ ও ইহার সহিত ১৮৩৩ হইতে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গ্রহণ গণনা সন্নিবেশিত হয়।

১৮৩৭—নিয়েল পুনরায় অস্থায়ীভাবে প্রধানের কার্য্য করেন।

(ক্রমশঃ)

# ব্রহ্মসূত্র

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

শ্রীমতিলাল রায়

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥১৪॥

আকাশাদিষু (আকাশ প্রভৃতি সৃষ্টি বিষয়ে) কারণত্বেন ( ব্রহ্মই বিশ্বসৃষ্টির হেতু ) যথা ব্যপদিষ্টঃ ( শ্রুতিতে এই-রূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। চ শব্দ শঙ্কাচ্ছেদের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

অর্থাৎ আশঙ্কার কথা—সাঙ্খ্যের প্রধান বেদপ্রতিপাদ্য নহে, ইহা প্রমাণ্রিত হইলেও, বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, এ সিদ্ধান্তও যে সত্য তাহা নাও হইতে পারে; তাহার কারণ—এই ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে সৃষ্ট্যাদির ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণের কথা উক্ত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মই জগৎ-সৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান কারণ কেমন করিয়া হইতে পারেন? এক শ্রুতি বলিতেছেন—"আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ"; অন্যে বলিতেছেন—"তত্তেজোহসৃজতেতি"; আবার কোন শ্রুতি বলিতেছেন—তিনি প্রাণসৃষ্টি করিলেন, তার পর "প্রাণাৎ শ্রদ্ধা" অর্থাৎ প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইল। কোন কোন শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে অভাবাত্মক বোধের কথাও বলা হইয়াছে। "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" অর্থাৎ কিছুই ছিল না, সবই অসৎ ছিল। শ্রুতি পুনরায় সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভব হইবে? অভাব হইতে ভাব কোনদিন কেহ কল্পনাও করিতে পারিবে না, অতএব "সজ্জায়েত" অর্থাৎ সৎ হইতেই সকল হইয়াছে; তবে পূর্ব্বে যাহা অব্যাকৃত ছিল, পরে তাহা ব্যাকৃত হইয়াছে মাত্র। শ্রুতিতে যখন এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্য পরিলক্ষিত হয়, তখন জগৎ-কারণ যে ব্রহ্ম, বেদান্তে ইহা প্রমাণিত হইল তাহা বলা যায় না।

ব্যাসদেব এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন, বেদান্তে সৃষ্টিক্রমের পরস্পর-বিরুদ্ধ আলোচনা থাকিলেও, স্রষ্টা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ-বাদ কোথাও নাই। ব্রহ্মকেই সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত বলিয়া সকল শ্রুতিই স্বীকার করিয়াছেন এবং এই ব্রহ্মই সৃষ্টি কামনা করিলেন, এই কথা বলিয়া ব্রহ্ম যে চেতন পদার্থ, তাহাও শ্রুত্যাদিতে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্ম পর-প্রযোজ্যও নহেন, ইহার দ্বারা সৃষ্টির কারণবাদ যে ঈশ্বর, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রুতি স্পষ্টই বলিতেছেন—"ইদম্ সর্ব্বমসৃজত যদিদংকিঞ্চ", এই যাহা কিছু সমস্ত তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎকারণের স্বরূপনির্ণায়ক শ্রুতির সকল বাক্যই পরস্পর অবিরুদ্ধ। কার্য্যপ্রতিপাদন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উপদেশ ব্রহ্মকারণবাদের বিরোধী নহে। কার্য্য বিভিন্ন হইলেই যে কারণ বিভিন্ন হইবে, ইহা যুক্তি-বিরোধী কথা, এবং ঐরূপ উক্তি অতিপ্রসঙ্গ-দোষদুষ্ট। শ্রুতির লক্ষ্য সৃষ্টি-প্রতিপাদন নহে। সৃষ্টি-জ্ঞানে পুরুষার্থ নাই। শ্রুতি এ প্রচেষ্টা প্রধানতঃ করেন নাই। প্রত্যেক শ্রুতির উপক্রমণিকা হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত সমস্ত বাক্যের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্যই শ্রুতিতে সৃষ্টির বর্ণনা করা হইয়াছে। মৃত্তিকার সহিত কুম্ভের অর্থাৎ কারণের সহিত কার্য্যের অভেদপ্রদর্শনচ্ছলে শ্রুতিতে সৃষ্টি-প্রপঞ্চের অবতারণা। মৃত্তিকা-রূপ কারণ হইতে হাঁড়ী, কলসী, প্রদীপ প্রভৃতি বিবিধ রূপ কার্য্য হয়। কার্য্যবৈচিত্র্য কারণকে অবশ্যই ভিন্ন করে না। অতএব শ্রুতি কারণ বিষয়ে অবিরোধী মতবাদই প্রদর্শন করিয়াছেন।

সমাকর্ষাৎ ॥১৫॥

অর্থাৎ জগৎ কারণ সম্বন্ধে সমাকর্ষণ থাকা হেতু। তৈত্তিরীয় উপনিষদে সৃষ্টির পূর্ব্বে এ জগৎ অসৎ ছিল, এইরূপ বলা হইয়াছে। ঐ বাক্যের পূর্ব্ব উক্তি—"সোহকাময়ত"। অতএব এই 'স' শব্দ নেতি-বাচক নহে, বস্তু-বাচক। জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা অসৎ ছিল, ইহার অর্থ নাম-রূপ বিভাগ-সৃষ্টির পূর্ব্বে না থাকা, সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মে উহার অব্যাকৃত অবস্থাকেই অসৎ বলা হইয়াছে। সৃষ্টি বিস্পষ্ট হইলে, শ্রুতি বলিতেছেন—"সএব ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ" অর্থাৎ তিনি ইহার ( এই সৃষ্টির ) নখাগ্র পর্য্যন্ত, অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে প্রবিষ্ট হইলেন। এই শ্রুতিবাক্য

পূর্ব্বের অব্যাকৃত অসৎকে আকর্ষণ করিতেছে। অসৎই যদি সৃষ্ট্যাদির পূর্ব্বের সত্য অবস্থা হয়, তাহা হইলে কে কাহাকে আকর্ষণ করিবে? এই হেতু অসৎ শব্দে অত্যন্তাভাব অর্থে গ্রহণ না করিয়া, সৃষ্টির পূর্ব্ব অবস্থার বর্ণনাচ্ছলেই উহা উক্ত হইয়াছে, ইহাই গ্রহণ করিতে হইবে। কর্ত্তৃশূন্য সৃষ্টি বাতুলের পক্ষেই কল্পনা করা সম্ভব। সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সবই সৎ ছিল। সেই সৎ আলোচনা করিলেন—'আমি জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম-রূপের বিকাশ করিব।' অতএব জগৎ-কারণ প্রতিপাদক ব্রহ্মই শ্রুতির সকল বাক্যকেই সমাকর্ষণ করিতেছে, ইহাই প্রমাণিত হইল।

জগদ্বাচিত্বাৎ ॥১৬॥

জগৎ-বাচিকত্ব হেতু।

অর্থাৎ জগৎ ও ব্রহ্মশব্দ অপৃথক্। ব্রহ্মই সমগ্র জগতের কর্ত্তা। তিনিই সৃষ্টির কারণ। কৌশিতকী উপনিষদে বালাকি-অজাতশত্রু সংবাদ নামক এক সন্দর্ভ আছে। "বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা, যস্তবৈতৎ কর্ম্ম, স বৈ বেদিতব্য"—"হে বালাকে, যিনি এই সকল পুরুষের কর্ত্তা এবং ইহা যাঁহার কার্য্য, তাঁহাকেই অবগত হইবে।"

গল্পটী হইতেছে—বলাকার এক পুত্র অজাতশত্রুকে ব্রহ্মের কথা বলিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। বালাকি যথাক্রমে আদিত্যাদি ষোড়শ পুরুষকে ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু তৎশ্রবণে বলিয়াছিলেন "বালাকে, মিথ্যা বলিও না, ব্রহ্মই বল, অব্রহ্ম বলিও না।" "এই কথার পর তিনি উপরোক্ত কথা বলিয়া বলিলেন— "ঐ সকল পুরুষের কর্ত্তা অন্য কেহই নহেন; স্বয়ং পরমেশ্বর।" যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। অতএব কর্ম্মশব্দে জগৎই বুঝায়। বালাকি যে ষোড়শ পুরুষকে ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা জগতেরই অন্তর্বর্ত্তী। তাহা ব্রহ্মকার্য্য; কর্ত্তা নহে। অজাতশত্রু এই সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মকেই জানিবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। বালাকি যে বলিয়াছিলেন আদিত্যাদি ষোড়শ-পুরুষ ব্রহ্ম, তাহার কারণ ঐ সকল পুরুষের কর্ত্তাই পরম ব্রহ্ম, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ঐরূপ কথন প্রকরণ মাত্র। আদিত্যাদি ষোড়শ পুরুষ, এই সমুদয় জগৎ, সবই যাঁহার কার্য্য, এই জগতের যিনি কর্ত্তা, তিনি সর্ব্বকারণ-স্বরূপ পরমেশ্বর; শ্রুত্যুক্ত শ্লোকে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতম্ ।১৭

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ (জীববোধক ও প্রাণবোধক কথা থাকা হেতু) ন (কৌশিতকী শ্রুতির কথিত কর্ত্তা ব্রহ্ম নহে) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি), তৎ (এরূপ বলিতে পার না। কেননা ঐরূপ আপত্তি) ব্যাখ্যাতম্ (পূর্ব্বেই মীমাংসিত হইয়াছে)।

কৌশিতকী উপনিষদে বালাকি - অজাতশত্রু উপাখ্যানের উপসংহারে প্রাণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যথা, "সেই সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় মুখ্যপ্রাণে একত্ব প্রাপ্ত হয়"। অতএব বালাকির আদিত্যপুরুষাদির কর্ত্তা প্রাণও হইতে পারে। কেননা ইহার শ্রুতি প্রমাণও আছে। "কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে"—সে সকলের মধ্যে কোন দেব প্রধান, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে, 'প্রাণেতি' প্রাণই প্রধান। প্রাণ ব্রহ্ম নামে কথিত হন। এই হেতু অজাতশত্রু এই সকল পুরুষের কর্ত্তা বলিয়া যে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি প্রাণ কেন না হইবেন? কৌশিতকী শ্রুতিতে জীবকে জানার কথাও বলা হইয়াছে। জীব ভোক্তা। জগদাদি ভোগের উপকরণ। অতএব রাজা অজাতশত্রু যে বলিলেন, কর্ত্তাই জ্ঞেয়, তাহা জীববোধক। জীব প্রাণভৃৎ। অতএব এই শ্রুতির নির্দ্দেশ মুখ্যপ্রাণ-রূপেই গ্রহণীয় ব্যাসদেব বলিতেছেন, "না, তাহা হইবে না; প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে ৩১ সূত্রে এ বিষয়ের মীমাংসা হইয়াছে।" জীব, প্রাণ ও পরমেশ্বর, এই তিনের একবাক্যে উপাসনার বিধান যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; ইহা ব্যতীত শ্রুতির আরম্ভ ও শেষবাক্যে ব্রহ্মোপাসনার বিধানই দেওয়া হইয়াছে, জীব বা প্রাণের উপাসনার কথা উল্লিখিত হয় নাই। "যস্য বৈ তৎ কর্ম্ম" অর্থাৎ এই সব যাহার কর্ম্ম, এই কথার শ্রুতির লক্ষ্য জীব বা মুখ্যপ্রাণ নহে, ইহাই প্রতিপাদিত হয়। ব্রহ্ম অর্থে প্রাণ-শব্দের প্রয়োগ শ্রুতিতে আছে বটে; উপক্রমে ও উপসংহারে, ব্রহ্মবিষয়তা প্রতিপাদিত হওয়ায় ঐ সকল কথা যে অর্থের অভেদ অভিপ্রায়েই উক্ত হইয়াছে, এ বিষয় আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি
চৈবমেকে ॥১৮

জৈমিনিঃ অন্যার্থম্ ( অন্য উদ্দেশ্যে ) প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাম্ ( প্রশ্নপ্রত্যুত্তরে জীব নহে, পরন্তু ব্রহ্মকে বুঝান হইয়াছে ) অপি চ ( যার ও ) একে ( কেহ কেহ ) এবং ( এইরূপই ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিয়াছেন )।

বিশদার্থ :— জৈমিনি মুনি কৌশিতকী - বাক্যের প্রশ্নোত্তরের ক্রম দেখিয়া বলিয়াছেন—উক্ত শ্রুতিতে জীব-বোধক যে কথা আছে, তাহা উহার অধিকরণ ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্যই কথিত হইয়াছে। অজাতশত্রুর কথায় বালাকি যখন পুরুষাদির কর্ত্তাকে বিশদরূপে বুঝিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, রাজা তখন কোন এক নিদ্রিত পুরুষকে আহ্বান করিলেন। সুপ্ত ব্যক্তি কোন সাড়া দিল না; তিনি তখন তাঁহাকে প্রহার করিলেন। নিদ্রিত ব্যক্তির চেতনা ফিরিয়া আসিল, রাজার আহ্বান সে কর্ণগোচর করিল। এই কর্ম্মের দ্বারা রাজা বালাকিকে বুঝাইলেন, প্রাণ ছিল, কিন্তু সে কর্ত্তা নহে, এক অতিরিক্ত বস্তুই কর্ত্তা। ইহার পর জীববোধক অনেক বাক্য বলা হইয়াছে। পরিশেষে সেই জীব সুষুপ্তিকালে 'ব্রহ্মণা জীব একতাং গচ্ছতি'—ব্রহ্মে জীব এক হইয়া যায়, এইরূপ কথিত হইয়াছে।

জীবের সহিত ব্রহ্মের এই একত্ব নিত্য নহে; কেননা 'পরস্মাচ্চ ব্রহ্মণঃ প্রাণাদিকং জগজ্জায়ত'—পুনর্ব্বার সেই পরম ব্রহ্ম হইতে প্রাণ প্রভৃতি জগৎ জন্মগ্রহণ করে। যেমন সুপ্ত অবস্থায় জীব প্রাণে গিয়া বিশ্রাম লাভ করে, সেইরূপ সমাধিও জীবের ব্রাহ্মীস্থিতি। জীব ও ব্রহ্মের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রুতি সেই চরম স্থান পরমাত্মাকেই জানিতে বলিয়াছেন। প্রাণ, জীব ও পরমেশ্বরে পর্য্যায়ভেদ-দর্শনের নীতি অন্য শ্রুতিতেও পরিদৃষ্ট হয়। বাজসেনীয় শাখা বিজ্ঞানময় শব্দে জীবের নির্দ্দেশ দিয়া তদতিরিক্ত পরমাত্মার উপদেশ দিয়াছেন। যথা, "এই বিজ্ঞানময় পুরুষ স্বাপকালে কোথায় ছিলেন?" "কুত এতদাগাদিতি?"—কোথা হইতেই বা আসিলেন? উত্তরে বলা হইয়াছে "এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে।" এই যে হৃদয়ের অন্তরে আকাশ, ইহাতেই তিনি সুপ্ত ছিলেন। আকাশ ও পরমাত্মা যে একার্থ-বাচক, তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণ হইয়াছে। এই সকল আত্মা তাঁহা হইতেই আবির্ভূত হয়। এই সকল আত্মা সোপাধিক প্রাণাদি জগৎ। পরমাত্মাই তাহার মুখ্য কারণ। এই পরমাত্মা মুখ্য প্রাণ বা জীব নহে, এ বিষয়ে সংশয়ের কিছু নাই।

বাক্যান্বয়াৎ ॥১৯

মহাবাক্য-তাৎপর্য্যের নিশ্চয়কালে বাক্যের যোজনা হেতু। অর্থাৎ উদাহৃত বাক্য পরব্রহ্ম, জীবপর নহে।

আরণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীর কথোপকথন এইরূপ আছে। "স্ত্রী পতির কামনায়, পতির সুখের জন্য পতিপ্রিয়া নহে, কেননা কেহ কাহারও কামনাপূর্ত্তিতে প্রিয় হয় না। সকলেই আত্মকামনা হেতু প্রিয় হইয়া থাকে, অতএব আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য।" এই হেতু যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন "হে মৈত্রেয়ি, আত্মনোবা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্ ইতি" অর্থাৎ আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও আত্মবিজ্ঞান লাভ হইলে, সকলই বিজ্ঞাত হয়; জানিবার কিছুই অবশেষ থাকে না।

এই আত্মদর্শন পরমাত্মার দর্শন নাও হইতে পারে। প্রিয়-শব্দ সূচনা করিয়া ভোক্তৃ আত্মার কথার পর পর-মাত্মার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। পতিপুত্রাদি জাগতিক সুখ। উহা যখন 'আত্মভোগ্য, এই আত্মার দর্শন উপদেশ থাকায়, ইহা জীববিষয়ক বলিলে দোষের কি হইবে? অধিকন্তু শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—"মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্যসংজ্ঞাস্তীতি" অর্থাৎ এই মহা অদ্ভুত অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘন, ইনি কথিত ভূতসমূহ হইতে সমুত্থিত হইয়া তাঁহাতেই পুনরায় বিনষ্ট হন; বিনাশের পর আর সংজ্ঞা থাকে না। ইহা জীবাত্মারই কথা; জীবেরই জন্মমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। শ্রুতি যে আত্মবিজ্ঞান জানা হইলে সর্ব্ববিজ্ঞান জানার কথা বলিয়াছেন, তাহার লক্ষ্য জীবাত্মা, পরমাত্মা নহে।

উত্তরে বলা হইতেছে, তাহা নহে। পূর্ব্বাপর শ্লোকার্থ অবধারণ করিলে, দেখা যাইবে, সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার

জন্য যে আত্মবিজ্ঞানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহা পরমাত্মস্বরূপ পরমকারণজ্ঞান; মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট যখন শুনিলেন—ধনের দ্বারা অমৃতত্ব তথা শান্তির আশা নাই, তখনই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'যখন ধনে অমৃত নাই, তখন তাহা লইয়া আমার কি হইবে? যাহাতে অমৃত পাই, তাহাই আমায় বলুন।' এই প্রার্থনার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য আত্মবিজ্ঞানের কথাই উপদেশ করিলেন। এই আত্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশক্রমে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, এই আত্মজ্ঞান পূর্ণ প্রজ্ঞানঘন পরব্রহ্ম ব্যতীত আর অন্য কেহ নহেন; তাহা না হইলে এই কথাগুলি নিরর্থক হয় "ব্রহ্ম হইতে যিনি নিজেকে ভিন্ন দেখেন, তিনি ব্রহ্ম হইতে দূরে অপসৃত হন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আত্মাতিরিক্ত ও স্বতন্ত্র সৎ বলিয়া যিনি বিবেচনা করেন, মিথ্যা তাঁহাকে গ্রাস করিয়া থাকে।" শেষে আবার উক্ত হইয়াছে—"ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা"; অতএব আরণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য কথিত আত্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান।

### প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যং ॥২০

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ (সাধ্যনির্দ্দেশের প্রামাণ্য স্থাপনের) লিঙ্গম্ (উপায়সূচক) আশ্মরথ্যং (ইহা আশ্মরথ্য মুনির অভিমত)।

আচার্য্য আশ্মরথ্য বলেন—শ্রুতিতে প্রিয়-শব্দের দ্বারা "জগদাত্মার্থত্বয়া প্রিয়ং ভবতি"; ইহাতে জীবাত্মারই সূচনা হইয়াছে, সাধ্যনির্দ্দেশের ইহা বোধকস্বরূপ। আত্মজ্ঞান জন্মিলে, সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ হয়, এই প্রতিজ্ঞা জীবাত্মার উল্লেখে সিদ্ধ হওয়ায় জীবে ও ব্রহ্মে ভেদ নাই, ইহাই বিশদ হইতেছে। জীবতত্ত্ব অবগত হইলে, ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। ইহা সামান্য ও বিশেষ গ্রহণনীতি ধরিয়া জগৎকর্ত্তাকে জানিবার উপদেশ। ভারতবর্ষকে জানিতে হইলে, বাংলাকে জানিয়াই ভারতের জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে। বাংলা বিশেষ, ভারত সামান্য। আবার ভারতকে জানিলে বিশ্বকে জানা যায়—ইহা সামান্য-বিশেষ প্রকরণ-নীতিরই অনুসরণ। জীব ও ব্রহ্ম এক, জীবকে জানিয়া ব্রহ্মকে জানা এবং ব্রহ্মতত্ত্ব-জ্ঞানে জগৎতত্ত্ব জানার [illegible]-নীতি ধরিয়া শ্রুতিতে ঐরূপে কথিত হইয়াছে; ইহা আশ্মরথ্য মুনির অভিমত।

### উৎক্রমিষ্যত এবংভাবাদিত্যৌডুলোমিঃ ইতি ॥২১

ঔডুলোমিঃ (আচার্য্য ঔডুলোমি) ইতি (এইরূপ বলেন) —উৎক্রমিষ্যত (দেহাদি সংঘাত হইতে জীব যখন উত্থিত হয়) এবংভাবাৎ (এইরূপ অভেদ ভাব হেতু শ্রুতিতে জীবাত্মার উপদেশ কথিত হইয়াছে)।

জীব দেহাদি-পরিচ্ছিন্ন হইয়া অণুরূপে আনন্দ বৈচিত্র্য ভোগ করেন। দেহাদি হইতে উৎক্রান্ত আত্মা বিরাট্ ব্রহ্মভাব আস্বাদ করেন। জীব ও পরমাত্মার ঐক্যসিদ্ধি এইরূপেই হইয়া থাকে। দেহাদি চৈতন্যে আত্মা জীব-স্বরূপ। দেহাদি চৈতন্য হইতে বিযুক্ত আত্মা জীবভাবের অভাব হেতু পরম ভাব প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি তাই বলিয়াছেন —"এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরংজ্যোতিরূপ-সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি" অর্থাৎ এই সম্প্রসাদ শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরম্ জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইয়া থাকে। নাম ও রূপ জীবের। ব্রহ্ম হইতেই নাম ও রূপ লইয়া ব্রহ্মেরই জীবত্ব। এই কথা ব্রহ্মসূত্রে সুস্পষ্ট হইয়াছে। এই সাধ্য নির্দ্দেশ করিয়া ঔডুলোমি মুনি জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনীয়তার দিগ্-দর্শন করিয়াছেন।

### অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥২২

কাশকৃৎস্নঃ (আচার্য্য কাশকৃৎস্ন) ইতি (এইরূপ বলেন) অবস্থিতেঃ (পরমাত্মাই জীবভাবে অবস্থান করিতেছেন)।

আচার্য্য কাশকৃৎস্নের অভিমতে পরমাত্মাই জীব। আশ্মরথ্য মুনির মতে জীব ও পরমেশ্বর অভেদ হইলেও, উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণগত কিছু ভেদ আছে। আর ঔডুলোমি বলিয়াছেন—জীব পরমেশ্বর হইলেও, অবস্থার ভিন্নতা আছে। কাশকৃৎস্ন কার্য্যকারণ-অবস্থা স্বীকার করেন নাই; জোর করিয়া বলিয়াছেন—ব্রহ্মই জীব। এই কথার শ্রুতিরও সমর্থন আছে। কার্য্যকারণ অথবা অবস্থা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে যদি সত্য ভেদ সৃষ্টি করে, তাহা হইলে জীবজ্ঞানে ব্রহ্মজ্ঞান অক্ষুণ্ণ হইতে

পারে না। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন—আত্মা বিদিত হইলে, সমস্তই বিদিত হওয়া যায়। এই আত্মাই সমস্ত। কার্য্য-কারণ-অবস্থা এই 'সমস্ত' শব্দের অন্তর্গত। কার্য্যকারণঘটিত জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সিদ্ধ হইলে, ঐ কার্য্যকারণ নিরসনের অপেক্ষায় ব্রহ্ম হইতে জীব পৃথক্ হইয়া থাকিবে। আশ্মরথ্য মুনি জীব ও ব্রহ্ম অভেদ, এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ করিতে গিয়া ক্রমজ্ঞানের সাধনা আনয়ন করিয়াছেন। জীবজ্ঞানের পর ব্রহ্মজ্ঞান; ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগৎ-তত্ত্বের অবগতি। ঔড়ুলোমি মুনির মতে, জীব ও ব্রহ্ম অভেদ বটে, কিন্তু অবস্থাভেদ আছে। যে অবস্থায় জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদ, সেই অবস্থা হইতে জীবের উত্থান সম্ভব হইলে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দূর হয়; কিন্তু কাশকৃৎস্ন মুনি বলিতেছেন—পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন। কার্য্য, কারণ ও অবস্থা জীব ও পরমাত্মার মধ্যে বাধা নহে। জীবাবস্থার সমস্তই ব্রহ্মের নিমিত্ত এবং ব্রহ্মের উপাদানেই ঐ সকল রচিত; এই হেতু শ্রুতি সমুচ্চ কণ্ঠে বলিতেছেন—"সদেব সৌম্যেদমগ্রমাসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং", "আত্মৈবেদং সর্ব্বং", "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং", "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" প্রভৃতি। স্মৃতিও এই কথার সমর্থনে বলিতেছেন "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিদম্", "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্"। শ্রুতি-স্মৃতি সমকণ্ঠে বলিতেছেন—ব্রহ্ম এক বস্তু, জীব অন্য বস্তু—এইরূপ জ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান। যে এই সমস্তে ভেদ দর্শন করে, সে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক অভিন্ন হইলে, প্রতিবাদী বলিতে পারেন, নামেই তবে প্রভেদ, কার্য্যতঃ বস্তুভেদ নাই। যখন বস্তুভেদ নাই, তখন জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুই নাম লইয়া ব্রহ্মসূত্রের ব্রহ্মপ্রতিপাদনের আগ্রহ নিরর্থক বলিতে হইবে। কিন্তু কথাটা এরূপ নহে। আত্মা নামভেদে বহুধা অভিহিত হইয়াছে। তাহাতে বহুর একটা রূপসৃষ্টিই হইয়াছে। এই সৃষ্টিগুহাই ব্রহ্মের স্থান। গুহা বুদ্ধি। বেদান্তবর্ণিত জ্ঞানেরই ইহা নামান্তর। ব্রহ্মের সৃষ্টি। ব্রহ্মই ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট। ব্রহ্মই জীব, ব্রহ্মই জগৎ। কিছু হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিয়া দেখার প্রচেষ্টা বেদান্তার্থে বাধিত হয় এবং এইরূপ বদ্ধ অকৃতার্থ জনেরই মোক্ষের কল্পনা সম্ভব। আমরাও পূর্ব্বাচার্য্যগণের সহিত সমস্বরে বলিব "কৃতকমনিত্যঞ্চ মোক্ষং কল্পয়ন্তি ন্যায়েন চ ন সঙ্গচ্ছন্ত" অর্থাৎ ঐ সকল লোকেরা যে মোক্ষ উৎপাদ্য বলিয়া কল্পনা করেন, অর্থাৎ মোক্ষ অনিত্য মনে করেন তাঁহাদের মত ন্যায়বিরুদ্ধ। ইহার বিশদার্থ—ব্রহ্ম নিত্য, জীবও নিত্য, মোক্ষও নিত্য। যাহা সর্ব্বদা অবস্থিত, তাহার জন্য যে প্রয়াস তাহা অজ্ঞতা। লীলাময়ের ইহা একরূপ—ব্রহ্মরূপ; আর তাঁর নিত্যমুক্ত, নবজলধরকলেবর আর এক অন্য মূর্ত্তি, যেখানে জলদগর্জ্জনে পাঞ্চজন্য ফুকারিয়া বলিতেছে "সম্ভবামি যুগে যুগে।"

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ।২৩

চ (চ শব্দ সমুচ্চয়ার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে) প্রকৃতিঃ (অর্থাৎ উপাদানকারণ) প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্ত-অনুপরোধাৎ (যেহেতু শ্রুতিতে প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তে ব্রহ্ম বলায় কোনরূপ বাধিত হয় নাই)।

অর্থাৎ ব্রহ্ম সৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, দুইই। ব্রহ্মকে এই দ্বিবিধ কারণ বলায় সংশয় উপস্থিত হয় যে, তিনি যদি সৃষ্টিকর্ত্তা হন, কর্ত্তৃত্ব বশতঃ তিনি আবার উপাদান কারণ হইতে পারেন না। যেমন, কুম্ভকার ঘটাদির কর্ত্তা; স্বর্ণকার বলয়কুণ্ডলাদির কর্ত্তা। পরন্তু ঘট বা কুণ্ডলের উপাদান কারণ তাঁহারা নহেন। এই যুক্তি আদিকর্ত্তা ব্রহ্মে গ্রাহ্য না হইবে কেন? আরও দেখা যায়, ব্রহ্মকে শ্রুতি বলিয়াছেন "ব্রহ্ম নিষ্কলম্, নিষ্ক্রিয়ম্, নিরবদ্যম্, নিরঞ্জনম্" ইত্যাদি। এই ব্রহ্ম যদি উপাদান কারণ হন, তবে জগৎকার্য্য সাবয়ব হইবে কি প্রকারে, এই জন্য সাংখ্যবাদ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ, পরন্তু উপাদান কারণ নহেন। এই যুক্তি খণ্ডন করিবার জন্য ব্যাসদেব বলিতেছেন "শ্রুতির প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত অনুপরোধ হেতু" অর্থাৎ উপরুদ্ধ বা পরস্পর বাধিত হয় না, এহেতু সৃষ্টির দ্বিবিধ কারণ। শ্রুতি বলেন "যেনাশ্রুতং শ্রুতম্ ভবত্যমতং 'মতম্ বিজ্ঞাত বিজ্ঞাতম্' অর্থাৎ যাহা কর্ণগোচর হয় নাই, যদ্দ্বারা তাহা শ্রুত হয়, অমতও মত হয়, (অমত কিনা যাহা মননের বহির্ভূত) আর অজ্ঞাতও জ্ঞাত হয়, তাহাই ব্রহ্ম। এই কথায় বুঝা যায়—সে এক এমন বস্তু, যাহা জানিলে সমস্তই জানা যায়। শ্রুতির বিষয়বস্তু তাহাই। মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্রব্য জানিলে যদি

কুম্ভকারকে জানা যাইত অথবা অট্টালিকাকে জানিতে পারিলে যদি ইহার নির্ম্মাতাকে জানা যাইত, অপর দিক দিয়া মঠ, পট, প্রাসাদাদির বিষয় যদি নির্ম্মাতাদের জানিলেই অবগতির মধ্যে আসিত, তাহা হইলে সৃষ্টির নিমিত্তকারণ ব্রহ্মকে জানিলেই সকল কিছু জানার বাধা হইত না। এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান বিজ্ঞাত হয় এই কথাই শ্রুতিবাক্য ; এই হেতু ব্রহ্ম নিমিত্তকারণ অথবা উপাদান-কারণ, এই সকল বিচারের প্রয়োজন হইতেছে। কোন কার্য্যই উপাদান হইতে ভিন্ন নহে। শ্রুতিও বলিতেছেন মৃৎপিণ্ড জানিলে, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দ্রব্যও জানা যায়। "একেন লৌহমণিনা সর্ব্বং লৌহময়ং বিজ্ঞাতংস্যাৎ" অর্থাৎ লৌহমণি জানিলে, সমস্ত লৌহদ্রব্য জানা যায়। অক্ষর হইতে বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাই শ্রুতি বলিতেছেন, "আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতং" অর্থাৎ "রে মৈত্রেয়ি, আত্মা শ্রুত, দৃষ্ট, মত ও বিজ্ঞাত হইলে সমস্তই বিদিত হওয়া যায়। শ্রুতির এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় তখনই, যখনই আমরা সৃষ্টির উপাদান ব্রহ্মই, এই কথা স্বীকার করি। কার্য্য মাত্রই উপাদানে যখন অন্বিত, তখন এই জগৎকার্য্য ব্রহ্মেই অন্বিত। এই ব্রহ্মকে জানিলে জগতের যত জ্ঞান অবধারণ করা সম্ভব হইবে। শ্রুতি বলিতেছেন—'যতো বা ইমানি ভূতানি'। এই যতঃ শব্দ পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত ; অতএব ব্রহ্মই যে উপাদান কারণ, এ বিষয় আর সংশয় রহিল না।

প্রশ্ন হইতেছে—কার্য্যের উপাদান কারণ যাহা, তাহা নিমিত্ত কারণ হইবে, এমন তো কোন কথা নাই। ঘট-কুণ্ডলাদির উপাদান কারণ এক, নিমিত্ত কারণ অন্য— এক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হইবে কেন? ইহার উত্তরে বলা যায়, প্রথমতঃ বিশ্বকার্য্যের অন্য অধিষ্ঠাতার অভাব। দ্বিতীয়তঃ উপাদানের অতিরিক্ত কারণ যদি স্বীকারও করিতে হয়, শ্রুতির প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত দুইই ক্ষুণ্ণ হয় ; কেননা শ্রুতি বলিয়াছেন—একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান অবগত হওয়া যায়। ব্রহ্ম নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ না হইলে শ্রুতির এই প্রতিজ্ঞা ব্যাহত হয়। অতএব সিদ্ধান্ত স্থির হইল—যেহেতু সৃষ্টির পৃথক্ অধিষ্ঠাতা নাই, এই হেতু ব্রহ্মই নিমিত্ত কারণ ; আর ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য উপাদানে জগৎকার্য্য স্বীকার করিলে, একের জ্ঞানে সকল জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না, এই হেতু ব্রহ্মই জগৎকার্য্যের উপাদান কারণ। আরও এক হেতু আছে—

### অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥২৪॥

চ (আরও) অভিধ্যোপদেশাৎ (সৃষ্টিসম্বন্ধে উক্তি উপদিষ্ট থাকা হেতু)।

শ্রুতি বলিতেছেন—ব্রহ্ম কামনা করিলেন—আমি বহু হইব জন্মিব। এই কথায় ব্রহ্মের কর্ত্তৃভাব ও প্রকৃতি-ভাব, দুইই প্রকাশিত হইল। ব্রহ্ম যে উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ, ইহাতে তাহা অধিকতর সুস্পষ্ট হইল।

### সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥২৫॥

চ (আরও) সাক্ষাৎ (ব্রহ্মকেই) উভয়াম্নানাৎ। (উৎপত্তিপ্রলয়ের হেতু বলিয়া উপদিষ্ট হওয়া হেতুও) যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয় এবং পরিণামে যাহাতে পর্য্যবসিত হয়, তাহাই তাহার উপাদান। এ নিয়ম সর্ব্ববাদিসম্মত। অতএব ব্রহ্মই উপাদান-কারণ।

### আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥২৬॥

পরিণামাৎ (পরিণামসংগঠন হেতু) আত্মকৃতেঃ (আত্মসম্বন্ধীয় কর্ম্ম)

অর্থাৎ ব্রহ্ম আপনাকেই আপনি পরিণমিত করিলেন। সংশয় হইতে পারে—যে বস্তু সৎ অর্থাৎ যাহা আছে, কর্ত্তৃরূপে ব্যবস্থিত আছে, তাহার আবার ক্রিয়মাণ অবস্থা হয় কিরূপে? যাহা থাকে না, তাহাই কৃতির বিষয়। সৎ এরূপ নহে। উত্তরে বলা যায়—সৃষ্টির অন্য তাঁহার অপেক্ষা ছিল না, ইহা সত্য কথা। "তদাত্মানং স্বয়ং অকুরুত" এই স্বয়ং শব্দের দ্বারা তিনি নিজেই নিমিত্তকারণ হইয়াছেন। 'পরিণামাৎ' এই শব্দে মৃত্তিকা হইতে মৃত্তিকার পরিণাম ঘটাদির ন্যায়, এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যও তাঁহার স্বয়ং কৃত।

### যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥২৭॥

হি (যেহেতু) চ আরও যোনি (উৎপত্তিস্থান) গীয়তে (শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে)।

অতএব নিঃসংশয়ে এই সিদ্ধান্ত হইল—ব্রহ্মই সৃষ্টির উপাদান করেন।

ব্রহ্ম যোনি শব্দে কথিত হওয়ায় ইহা প্রকৃতিস্বরূপা হইতেও তো পারেন। স্ত্রীযোনি গর্ভের উপাদান কারণ, ইহা সর্ব্ববিদিত। অতএব ব্রহ্ম প্রকৃতি অর্থে গৃহীত না হন কেন? ইহার একটী মাত্র উত্তর আছে, শাস্ত্রের অর্থ মানুষের অনুমান বা দৃষ্টান্তানুসারী নহে। শাস্ত্রানুরূপ অর্থই গ্রহণীয়। শ্রুতি ঈক্ষিতা পুরুষকেই যোনি বলিয়াছেন; অতএব ব্রহ্মই শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়, সাংখ্যের প্রকৃতি নহে।

এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ॥২৮॥

এতেন (ইহার দ্বারা) সর্ব্বে (অন্যান্য বাদও) ব্যাখ্যাতা (নিরাকৃত হইল)।

দুইটী ব্যাখ্যাতা শব্দ অধ্যায়সমাপ্তিসূচক। 'ঈক্ষতের্নাশব্দং' প্রথম অধ্যায় চতুর্থ সূত্রের পর হইতে বর্ত্তমান অধ্যায় সাংখ্যের প্রধানবাদের প্রতিষেধ-সূত্র রচনা করিয়া ব্যাসদেব বলিতেছেন — ব্রহ্মকারণ বাদ ব্যতীত সৃষ্ট্যাদির অন্য কারণবাদ শ্রুতিবিরুদ্ধ। ব্যাসদেব বেদবাদী। তিনি দেবলাদিকৃত ধর্ম্মগ্রন্থ সাংখ্যবাদ, কণাদের পরমাণুবাদ বেদান্তবাদের বিরোধী বলিয়া যে সকল যুক্তির দ্বারা প্রধানবাদের খণ্ডন করিলেন, সেই সকল যুক্তির আশ্রয়েই অন্যান্য বাদ নিরাকৃত হইবে, উক্ত সূত্রে 'সর্ব্বে' শব্দের দ্বারা তাহাই বুঝাইলেন।

বেদ যদি কোন জাতির ভিত্তি হয়, সেই ভিত্তি শাশ্বত সনাতন বলিয়া যদি প্রমাণগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে যে জাতি বেদপ্রতিষ্ঠ, সে জাতির প্রধান কর্ত্তব্য বেদবিরুদ্ধ মতবাদ যুক্তি সহকারে নিরাকৃত করা। মহামতি ব্যাসদেব আর্য্যভারতের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগুরু। তিনি বেদপ্রচারের সঙ্গে বেদান্তবাক্য যে ব্রহ্মপর, তাহা যুক্তি সহকারে প্রমাণ করার সহিত অবৈদিক মতবাদকেও খণ্ডন করিয়াছেন; তাঁহার ব্রহ্মসূত্র এই হেতু যুক্তিশাস্ত্র। ভারতের প্রসিদ্ধ প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে ইহাকে তাই ন্যায়প্রস্থান বলিয়া আর্য্যভারত স্বীকার করিয়াছে।

ইতি তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

---

# বনফুল

শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘটক

লোকচক্ষু অন্তরালে লভি' জন্ম বন-আঙিনায়
হে বনকুসুম, সবারে বিলালে তুমি সুরভি মদির;
অজ্ঞাতে ঝরিলে, পুনঃ কবে কোন ঘন তমিস্রায়,—
বিন্দু মাত্র জানিল না কেহ তাহা এই পৃথিবীর।

নিঃশেষে বিলায়ে দিয়ে যাহা কিছু নিজের সঞ্চয়,
প্রতিদানে পেলে শুধু উপেক্ষা ও ঘৃণা সবাকার;
যাদের লাগিয়া তুমি তিলে তিলে নিজে হ'লে ক্ষয়,
ক্ষণ মাত্র দেখিল না তারা তোমা চাহি' একবার।

অনাদৃত বনফুল, অনাদরে গিয়াছ ঝরিয়া,
নিজ বক্ষে ল'য়ে শুধু লক্ষ শত বেদনার ভার,
আজি তব অতীতের সেই সব কাহিনী স্মরিয়া—
চিত্ত মোর দুলি' ওঠে, সিক্ত হয় আঁখি বার বার।
জানি তুমি উপেক্ষিতা, অনাদৃতা ওগো বনফুল,
তবু শুধু কর ক্ষমা, মানুষের অজ্ঞতার ভুল।

# গান ও স্বরলিপি

## ঝুমুর

শালবনের কাছে লো, বনকুমারী নাচে।
তার নাচের তালের হাওয়া লেগে
ফুল ফুটেছে গাছে ॥
পরণে তার জংলা শাড়ী, কাণে ফুলের দুল,
বাউরী হাওয়ায় ঢেউ খেলে যায় তার এলো চুল ;
(ও সে) হরিণ চোখে ফিরে তাকায়, রাখাল ছেলে বাঁশী থামায়
(তার ) হাতে দিয়ে সোণার বাঁশী ভালবাসা যাচে ॥
পাহাড় থেকে ঝর্ণা নামে সরষে ফুলের ক্ষেতে,
ঝর্ণা তালে পা ফেলে সে রয় গো নাচে মেতে।
পাহাড়পুরে মাদল বাজে, গন্ধঢালা চৈতী সাঁঝে
বনের হরিণ ছুটে এসে নাচে পাছে পাছে ॥

কথা—শ্রীনিত্যানন্দ দাস ( ঝুমুর-বিশারদ ) সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবৈদ্যনাথ দে

II ধা -া -ধা | ধা ণা -ধা I পা মপা -মা | গা -া -া I
শা ০ ল্ | ব নে র্ কা ছে০ ০ | লো ০ ০

ধ্া -ধ্া সা | রা গা -া I মগা -াঃ -রঃ | সা -া -া I
ব ন্ কু | মা রী ০ না ০০ ০ | চে ০ ০

-া -া -া | র্সা -া -সা I ধ্া -া সা | -সা ধ্া -া I
০ ০ ০ | তা ০ র্ না ০ চে | র্ তা ০

সা -া -গা | গা -গা রা I গা -া -মা | পা -া -া I
লে ০ র্ | হা ও য়া লে ০ ০ | গে ০ ০

-ণা -ধা -পা | -মা -গা -া I গা -গা মা | পা মা -া I
০ ০ ০ | ০ ০ ০ ফু ল্ ফু | টে ছে ০

গা রা -া | সা -ণ্া -া I ধ্া -া -া | -া -া -া II
গা ছে ০ | গা ০ ০ ছে ০ ০ | ০ ০ ০

বনকুমারী নাচে

।। না না -া | র্সা র্সা -র্সা I না -না না | র্সা র্সা -া I
প র ০ | গে তা র্ | জ ং লা | শা ড়ী ০
পা হা ড়্ | থে কে ০ | ঝ র্ ণা | না মে ০

না র্রা -া | র্সা র্রা -র্রা I না -র্সা -া | -া -া -া I
কা লে ০ | ফু লে র্ | দু ল্ ০ | ০ ০ ০
স বু যে | ফু লে র্ | ক্ষে তে ০ | ০ ০ ০

ধা র্রা র্রা | র্সা র্সা -র্সা I না র্সা না | ধা পা -পা I
বা উ রী | হাও য়া য়্ | ঢে উ খে | লে যা য়্
ঝ রু ণা | ভা লে ০ | পা ০ ফে | লে সে ০

পা -ধা -া | ণা ধা -া I পা -পা -া | পা পা -া I
তা র্ ০ | এ লো ০ | চু ল্ ০ | ও সে ০
র য়্ গো | না চে ০ | মে ০ ০ | তে ০ ০

গা পা -পা | পা পা -া I ধা ধা -ণা | ধা পা -পা I
হ রি ণ্ | চো খে ০ | ফি রে ০ | তা কা য়্
পা হা ড়্ | পু রে ০ | মা দ ল্ | বা জে ০

ধা ণা -ধা | পা মা -া I গা রা -সা | রা সা -সা I
রা খা ল্ | ছে লে ০ | বাঁ শী ০ | থা মা য়্
গ ন্ ধ | ঢা লা ০ | চৈ তী ০ | সাঁ ঝে ০

-া -া -া | সা সা -া I রা মা -া | রা সা -া I
০ ০ ০ | তা র ০ | হা তে ০ | দি য়ে ০
০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ব নে র্ | হ রি ণ

রা মা -মা | পা ধা -া I ধা ণা -ধা | পা মা -গা I
সো না র্ | বাঁ শী ০ | ভা ল ০ | বা সা ০
ছু টে ০ | এ সে ০ | না চে ০ | পা ছে ০

রা -সা -ণ্া | ধ্া -া -া II
যা ও ০ | চে ০ ০
পা ০ ০ | ছে ০ ০

বনকুমারী নাচে

# প্রবর্ত্তক জুট মিলের উদ্বোধন

শ্রীরবীন কর

বাঙালীর শিল্প-বাণিজ্য প্রচেষ্টার পথে প্রবর্ত্তক জুট মিলস্-এর প্রতিষ্ঠা বিশেষ পদচিহ্ন আঁকিয়া রাখিল। ইহা বাঙালী-পরিচালিত চতুর্থ জুট মিল। নিছক ব্যবসা-মনোবৃত্তি লইয়া এই চটকল স্থাপিত হয় নাই। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের গঠনোদ্যমের ইহা একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করিয়া উদীয়মান জাতির সর্ব্বতোমুখী আত্মপ্রকাশেরই ইহা লক্ষণ বলা চলে। সঙ্ঘের প্রাণপুরুষ শ্রীমতিলাল রায়কে কেন্দ্র করিয়া সর্ব্বত্যাগী একমুষ্টি নিষ্কাম তরুণ কর্ম্মনিষ্ঠামাত্র সম্বল করিয়া অর্থসাধনায় যতটুকু সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহা অবধারিত বাঙালীকে প্রেরণা দিবে। যৌথ কারবারের ভিত্তিতে জুট মিল প্রতিষ্ঠা করিয়া সঙ্ঘ জাতীয় জীবনক্ষেত্রে আত্ম-সম্প্রসারণই চাহে। এই বৃহত্তর আদর্শ লক্ষ্য রাখিয়াই সঙ্ঘের জাতিগঠন-মিশন সিদ্ধ করিতে বিগত ৩রা ফাল্গুন ১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার কলিকাতা শ্যামবাজার হইতে তিন মাইল দূরে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের পাশে বেলঘরিয়ায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমুপস্থিতিতে প্রবর্ত্তক জুট মিলের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন।

প্রবর্ত্তক নারী-মন্দিরের বালিকাগণ কর্ত্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইবার পর অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। তৎপর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বৈদিক-মন্ত্র আবৃত্তি করেন এবং শ্রীযুত প্রফুল্ল ভট্টাচার্য্য "বন্দেমাতরম্" গান করেন। শ্রীযুত অরুণচন্দ্র দত্ত সভাপতিকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাপ প্রবর্ত্তক জুট মিলের দ্বারোদ্ঘাটন করিতেছেন

অতঃপর প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেডের পক্ষে ট্রাষ্টের অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কর্ম্ম-সাধনা ও উক্ত জুট মিলের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া একটি অভিভাষণ প্রদান করেন।

প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা - সভাপতি শ্রীযুত মতিলাল রায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন: "ব্যবসায়ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জ্জন করিতে হইলে মূলধনই মুখ্য প্রয়োজনীয় বস্তু নহে—তদপেক্ষা বহুগুণে বেশী প্রয়োজন সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এবং সাধু উদ্দেশ্যের প্রেরণা। চাই কর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ম্ম-তৎপরতা। অহিংসার তুলনায় সংগঠনের শক্তি অধিক। গঠনের মধ্য দিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন সম্ভব। সংগঠনের মূলেও বিজ্ঞান আছে। মানুষের সভ্যতাকে যদি সত্যই সভ্যতা পদবাচ্য হইতে হয়, তবে তাহাকে অতি অবশ্য ধর্ম্মের ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। এই ধর্ম্মের মধ্যে গোঁড়ামী এবং মতবাদের সঙ্কীর্ণতায় কোন
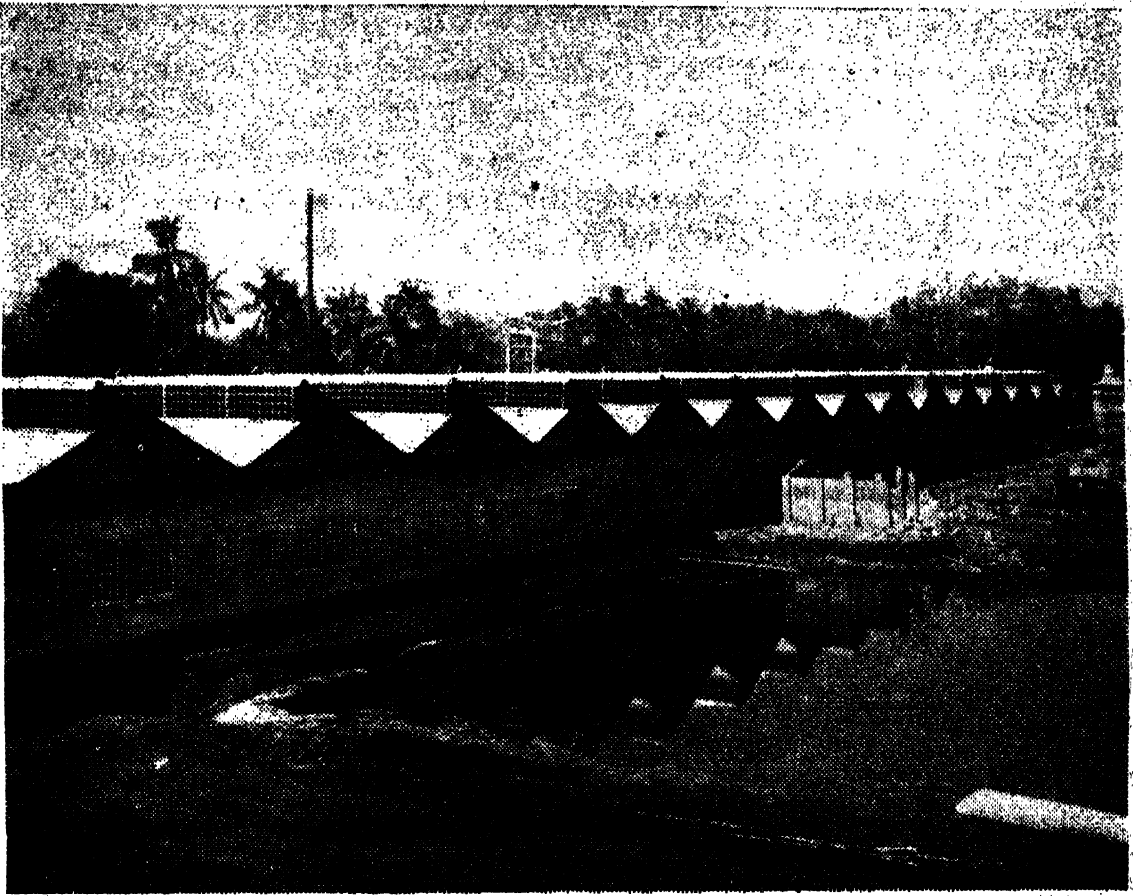
প্রবর্ত্তক জুট মিলের কারখানা গৃহ

স্থান থাকিবে না। এই ধর্ম্ম অবনত ও নিঃসহায়কে উন্নত করিবে এবং প্রকৃত জ্ঞানের আলোক বিস্তার করিয়া অজ্ঞতার অন্ধকারে পুঞ্জীভূত অনাচার দূরীভূত করিবে। ঈশ্বরপ্রীতি এবং অন্তরের সাহস অমলিন রাখিয়া সমগ্র বাঙালী জাতি যদি সাধনায় অগ্রসর হয়, তবে তাহাদিগের সাফল্যলাভে বাধা দিতে পারে এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে নাই। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বিস্তর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়িয়া কর্ম্মসাধনা করিয়া আসিতেছে এবং এই সঙ্ঘ কদাপি সাধনার পথে নিরুৎসাহ হয় নাই; কেননা, সঙ্ঘকর্মীদের জীবনের আদর্শ বৈদিক ধর্ম্মের প্রেরণায় গঠিত। কর্ম্মবাদের উপর বৈদিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত।”

শ্রীযুত মাখনলাল সেন প্রবর্ত্তক জুট মিলের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বলেন—যে, পাটসম্পদ্ বাঙ্গলার প্রতি প্রকৃতির বিশেষ দান। যদি উপযুক্ত রূপে পরিচালনা করা যায়, তবে পাট বাঙ্গলায় বিদেশ হইতে প্রভূত ধনসম্পদ্ আহরণ করিয়া আনিবে এবং জনসাধারণের দারিদ্র্য অনেকখানি বিদূরিত করিতে সমর্থ হইবে।

অতঃপর বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন:—“আমি আপনাদিগের মত একজন হিন্দু; কিন্তু অদ্য সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানে আমি যদি ইংরাজীতে আমার বক্তব্য নিবেদন করি, তাহা আপনারা নিশ্চয়ই ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন। যে একটিমাত্র কারণে আমার এই ইংরাজী ভাষার ব্যবহার আপনারা ক্ষমা করিতে পারেন, তাহা হইল যে, আপনারা যে বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহার বার্ত্তা বাঙ্গলার চতুঃসীমা অতিক্রম

করিয়া প্রতিধ্বনিত হওয়া উচিত। আমরা বিশ্বাস করি যে, এই প্রতিষ্ঠান সমগ্র ভারতের পক্ষে উৎসাহিত হইবার একটি বস্তু হইবে; ইহা মাতৃভূমির অন্যতম গর্ব্বের বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীযুত মতিলাল রায়ের প্রতি ভূয়সী শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বলেন, "আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুত মতিলাল রায়ের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ক্বচিৎ দেখা যায়। তিনি এককালে বিদ্রোহীরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহার চারিদিকের ঘটনা-প্রবাহ ও ক্রিয়াকলাপ যখন তাঁহার পক্ষে গ্লানিজনক বোধ হইয়াছে, তিনি তখনই সেখান হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সরাইয়া লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে অত্যুচ্চ কর্ম্মশক্তির উৎস আছে, তাহার বলেই তিনি তাঁহার আদর্শানুযায়ী এতগুলি সৃষ্টিকুশল প্রতিভাসম্পন্ন কর্ম্মী গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা আশা করি যে, তাঁহাদের প্রেরণায় এই জুট মিল শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও সহ-পরিচালকদিগের পরিচালনায় তাঁহার সুমহৎ লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে থাকিবে। আমরা বিশ্বাস করি, তাঁহার ব্যক্তিত্বে নিহিত এই শক্তির উৎস শুধু তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্তই সঙ্ঘকে অনুপ্রাণিত করিবে, তাহা নহে; এই নশ্বর ও ভঙ্গুর দেহের বন্ধন হইতে তিনি মুক্ত হইলেও তাঁহার প্রেরণা এই সঙ্ঘকে অনুপ্রাণিত করিতে থাকিবে। আমরা অদ্য যে প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনে সমুপস্থিত হইয়াছি, সেই ধরণের প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টির মূলে এইরূপ ব্যক্তিত্বের প্রেরণার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে।"

শ্রীমতিলাল রায়

কোম্পানীর উদ্যোক্তাদিগকে উদ্দেশ করিয়া মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বলেন যে, "অতি শুভক্ষণে তাঁহারা এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা করিয়াছেন। তাঁহারা স্কট্‌ল্যাণ্ডবাসীর মত নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় লইয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইবেন। এই স্কট্‌ল্যাণ্ডবাসিগণ পাটশিল্পকে শুধু বাঙ্গলার শিল্পে পরিণত করেন নাই; তাঁহারা ইহাকে নিজস্ব একটি শিল্প-ব্যবসায়রূপে পরিণত করিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতিকেও প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্কচজাতিরূপে বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে সাফল্যের অনুসরণ করিয়া আরও বহু জুট মিল স্থাপন করিতে হইবে। বৈদিক সঙ্গীত দ্বারা এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন-সূচনা করিয়া আপনারা উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন। আপনারা বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়াছেন এবং বন্ধুবর শ্রীযুত প্রফুল্ল ভট্টাচার্য্য বাঙ্গলার সেই মহিম্ন সঙ্গীত গান করিয়াছেন যাহা সকল সম্মেলন ক্ষেত্রে
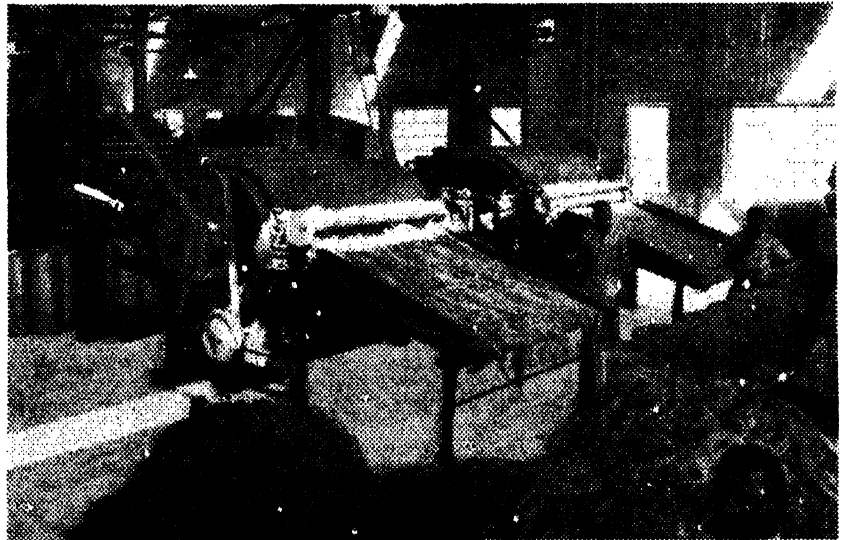
প্রবর্ত্তক জুট মিলের অভ্যন্তর ভাগের একাংশ

আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু এই সঙ্গে আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে আপনাদের একটি কর্ত্তব্য রহিয়াছে। আপনাদিগকে হাতেকলমে কর্ম্মকুশল হইতে হইবে। ভাবাবেগ সংযত করিয়া আপনাদিগকে কায়মনে সকল প্রতিভা ঢালিয়া সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে।"

"স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও আমি আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছি—একথা বলায় আপনাদের মহানুভবতাই প্রকাশ পাইয়াছে। তবে যাহা বলিয়াছেন, তাহা মোটেই অসঙ্গত নহে। বর্ত্তমানে আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা সত্যই এইরূপ আশঙ্কাজনক। সে যাহাই হউক না কেন, আপনাদের সঙ্গ লাভ করায় অদ্যকার এই অনুষ্ঠানে যোগদান করার সুযোগ লাভ করায় এবং ততোধিক বাঙ্গলার একটি প্রতিষ্ঠানের- ভারতের একটি প্রতিষ্ঠানের সংস্রবে আসিবার সুযোগ লাভ করায় আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি। আপনাদের ইচ্ছাশক্তি, আপনাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি এই প্রতিষ্ঠানটির পশ্চাতে রহিয়াছে। ভগবান প্রতিষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলুন, এই আমার কামনা। অদ্যকার সায়াহ্নের এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার জন্য আমাকে আহ্বান করায় আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। যথাসময়ে ইহার উদ্বোধনক্রিয়াও আমিই সম্পন্ন করিতেছি।"

ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ছিলেন:—মহারাজকুমার অভয়চাঁদ মহাতাপ, শ্রীযুত এন কে বসু, জে এন বসু, হরিহর শেঠ, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, ভুবনমোহন দাশ, প্রিয়নাথ সেন, গিরীন্দ্রনাথ মিত্র, মিঃ জি পি পেটী, মিঃ এইচ এইচ নিকল, ফেয়ারব্রেণ লসন, মিস পি বেলহার্ট এম-এল-এ, সত্যানন্দ বসু, তুষারকান্তি ঘোষ, ভূবনেশ্বর শ্রীমাণী, মিঃ এ এস বাউই, দেবেন্দ্রনাথ সরকার, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন, এস এন সেনগুপ্ত,
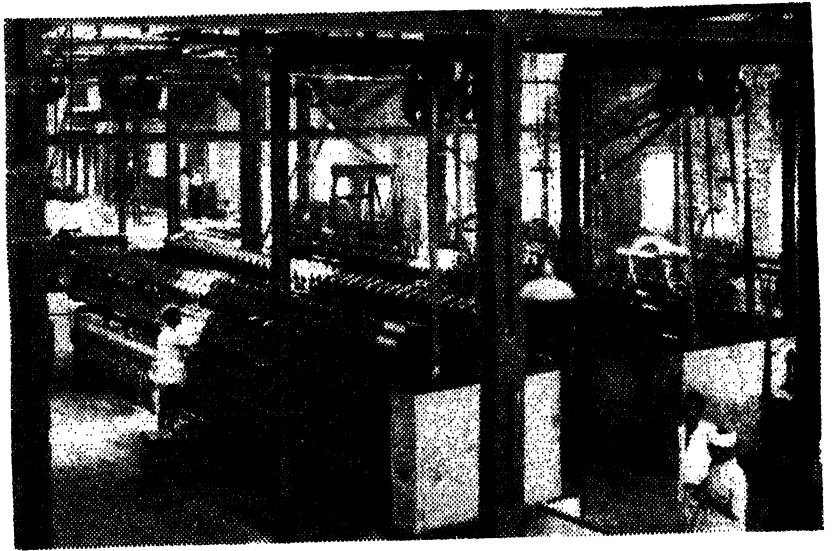
প্রবর্ত্তক জুট মিলের চট্-প্রস্তুত বিভাগ

ডাঃ এস এন ঘোষ, এম চ্যাটার্জ্জি, অধ্যাপক বিনয় ব্যানার্জ্জি, কবিরাজ অনাথনাথ রায়, সতীশচন্দ্র কর, বি কে ব্যানার্জ্জি, বিনোদবিহারী ঘোষ, সুকুমার মিত্র, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, এন গুঁই, ফণীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, ডাঃ মহেন্দ্রলাল রক্ষিত, ডাঃ জ্যোতিঃপ্রসাদ ঘোষ, ডাঃ সুবোধ রায়, অধ্যাপক নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জি এবং ডাঃ এস কে গাঙ্গুলী, তুলসীচরণ রায় প্রভৃতি।

# প্রবর্ত্তক রজত-জয়ন্তী ঃ ঢাকা

( একাদশ অনুষ্ঠান )

শ্রীইন্দুভূষণ রায়

ঢাকা পূর্ব্ব বাংলার প্রাচীন রাজধানী ও বর্ত্তমান বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম সহর। বাংলার বহু প্রাচীন ঐতিহ্য ঢাকার সহিত বিজড়িত। ঢাকায় প্রবর্ত্তকের একাদশ রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে গিয়া মধ্য ও আধুনিক যুগের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। শুধু বাহিরের চেহারায় নয়, ঢাকাবাসীর মনের গহনে এখনও এই দুইটি ধারার ফল্গু-প্রবাহ লক্ষ্য করিলাম। ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু সংশ্রব থাকিলেও, সঙ্ঘের প্রচার-কার্য্য এতদিন ঢাকায় একরূপ হয় নাই বলিলেও চলে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ভাব ও আদর্শের সহিত ঢাকাবাসীর বিশেষ পরিচয় না থাকায় জয়ন্তী-সভার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে প্রথমটা বেগ পাইতেই হইল। সৌভাগ্যক্রমে পূর্ব্ব পরিচিত সঙ্ঘের অনুরাগী সুহৃদ নলিনী-কিশোর গুহের সহৃদয় সহ-যোগিতায় এই প্রাথমিক কঠিনতা সহজেই বিদূরিত হইল। সভা সম্পর্কে ঢাকার ব্যবসায়ী, শিক্ষিত ও মনীষী প্রায় ৪৬ জনের স্বাক্ষরিত আবেদন বাহির হইল। আমি অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম।

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

১৩ই ফেব্রুয়ারী সভা। আগের দিন সপারিষদ সঙ্ঘগুরু ঢাকা আগমন করেন। পথিমধ্যে নারায়ণগঞ্জে অবতরণ করিলে শ্রীযুত অমৃতলাল হাজরা মহাশয় ও তাঁহার এথেলেটিক ক্লাবের সভ্যগণ এবং স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীযুত রায়কে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ভক্তপ্রাণ ডাক্তার মোহিনীমোহন দাসের আগ্রহে তিনি তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। মোহিনীবাবুর সহৃদয় আদর আপ্যায়নের সীমা রহিল না। পরের দিন সকালে পূজনীয় সঙ্ঘগুরু শ্রদ্ধেয়া চারুশীলা দেবীর আনন্দাশ্রম ও বিদ্যাপীঠ পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন। একজন মহিলার নিষ্ঠা ও তপস্যারই ইহা ফল। অপরাহ্ন ৬ ঘটিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পৌরোহিত্যে জয়ন্তী-সভা হইল। সভার শান্ত নিস্তব্ধ আবহাওয়ার মধ্যে শ্রীযুত রায়ের পৌরুষ বাণী ঢাকাবাসীর চিন্তাক্ষেত্রে যে তুমুল আলোড়ন তুলিতে সমর্থ হইল, তাহা প্রত্যেকের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা হইতেই অনুভব করা গেল। সভার পরে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মোহিনীবাবুর বাসায় জিজ্ঞাসু তরুণমণ্ডলী উপস্থিত হইয়া শ্রীযুত রায়ের সহিত জাতীয় জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিলেন। পরদিন সারা সকালটাও দেখা সাক্ষাৎ ও নানারূপ আলোচনায় কাটিল। বৈকালে অমৃতদার সাদর আহ্বানে সঙ্ঘগুরুর সহিত আমরা তাঁর নারায়ণগঞ্জস্থ বাটীতে গেলাম। তাঁর স্বজন-পরিজনের হৃদয়-নিঙড়ানো শ্রদ্ধার্ঘ্যের বুঝি তুলনা হয় না। তারপর রামকৃষ্ণ আশ্রম পরিদর্শন করিয়া অমৃতদার প্রতিষ্ঠিত হাজরা ফিজিক্যাল ইনষ্টিটিউটে উপস্থিত হওয়া গেল। ক্লাবের সভ্যগণ মিলিটারী ব্যাণ্ডের সহিত সামরিক কুচকাওয়াজ দ্বারা সঙ্ঘগুরুকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। উপস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর সম্মুখে শ্রীযুত রায় প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিলেন। ব্রহ্মচর্য্য, শরীর-চর্চ্চা ও ঈশ্বর-সম্বন্ধের যোগাযোগে যে পরিপূর্ণ জীবন তাহারই

ইঙ্গিত তিনি দিলেন। তারপর অমৃতদার সহযোগী সুধাংশুবাবুর গৃহে উপস্থিত স্থানীয় মহিলাবৃন্দকে কিছু উপদেশ দিয়া সঙ্ঘগুরু বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরদিন শনিবার। ফিরিবার তাড়া সত্বেও শ্রদ্ধেয় ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে শ্রীযুত রায় তাঁর বাসভবনে গমন করিলেন। ভারতীয় চিন্তা, দর্শন, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও বিবিধ জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ আলোচনা হইল। এই নিবিড় পরিচয়ের ভূমিকার উপর ভাবীকালে পুনর্মিলনের আলিপনা আঁকিয়া প্রসঙ্গ শেষ হইল। আমরা বিদায় লইলাম।

রওনা হইবার তাড়া। কিন্তু বাসায় ফিরিয়া দেখি কয়েকজন তরুণ সঙ্ঘগুরুর সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। সংক্ষেপে আলাপ শেষ করিয়া আমরা রওনা হইলাম। সঙ্ঘগুরুর সান্নিধ্য মোহিনীবাবুর পরিজন-বর্গকে যে কত প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে তার পরিচয় পাইলাম বিদায়-মুহূর্ত্তে। বিদায়-বেলার বিরহাশ্রু সমগ্র যাত্রাপথকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিল

ঢাকার রজত-জয়ন্তী সভার বিবরণটি 'সোণার বাংলা' হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :

"শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অন্যান্য বিশিষ্ট কর্ম্মিগণ সহ ১২ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা পদার্পণ করেন। তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আনিবার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঢাকা ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। ডাঃ মোহিনীবাবুর গৃহে তিনি অতিথি হন।

১লা ফাল্গুন, ১৩ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময়ে নর্থব্রুক হলে 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকার রজত-জয়ন্তী বর্ষোৎসবের একাদশ অনুষ্ঠান ও সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভারম্ভের পূর্ব্বেই রায় মহাশয়ের মর্ম্মবাণী শুনিবার জন্য ঢাকার শিক্ষাব্রতী, শিক্ষিত সম্প্রদায়, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী, যুবক ও ছাত্রগণ ও মহিলাবৃন্দের আগমনে হলটি ভরিয়া যায়। প্রশান্ত প্রদীপ্ত মূর্ত্তি শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয় হলে প্রবেশ করিলে সমাগত সুধীবৃন্দ সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন।

স্বামী অমৃতানন্দজীর অমৃত-নিস্যন্দনী কণ্ঠের বৈদিক-প্রশস্তি সমগ্র পরিবেশকে অধ্যাত্মপূত করিলে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত সভাপতি বরণ করেন। প্রবর্ত্তকের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষ্য করিয়া রায় মহাশয় যে বিভিন্ন জেলায় তাঁহার সাধনার কথা তথা প্রবর্ত্তকের আদর্শ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া ভাইস্-চ্যান্সেলার ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে তিনি মাল্যভূষিত করেন। অতঃপর সঙ্ঘের চারণ শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক তাঁহার কম্বুকণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' মহামন্ত্র গীত হয়। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ ও জয়ন্তী সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ সুন্দর পরিচয় প্রদান করেন এবং ঢাকাবাসীর পক্ষ হইতে আচার্য্য শ্রীমতিলাল রায় মহাশয়ের কণ্ঠে শ্রদ্ধার পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

অতঃপর সভার প্রধান বক্তা শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয় তাঁহার অপূর্ব্ব বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া রাখেন। রায় মহাশয়ের প্রত্যেকটি কথা যেন জলন্ত আগুন—প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে শক্তিপূত, সংশয়-দ্বিধাহীন সত্যের নির্দ্দেশ—যেন চরম সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া বলা হইতেছে, স এব, স এব, স এব,—হাঁ, ইহাই, ইহাই, এ-রূপই!

যে ভারতীয় বৈদিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপরে ভিত্তি করিয়া ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সাধনা সম্ভব, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ যে কৃষ্টির উপর ভিত্তি করিয়া জাতির আধ্যাত্মিক, আর্থিক, সামাজিক জীবন সংগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে,—'প্রবর্ত্তক' যে সাধনার কথা, ভাব ও কর্ম্মের কথা প্রকাশ করিতেছে, তাহার সুস্পষ্ট, সুনির্দ্দিষ্ট সূত্র ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা রায় মহাশয় তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠে অননুকরণীয় বিশেষ বীর্য্যশালিনী ভাষায় অকাট্য যুক্তির সঙ্গে বিবৃত করেন। ভারতের ধর্ম্ম জীবন দান করে, মানুষকে শক্তিদান করে, ঐশ্বর্য্য দান করে—মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ করে। চাতুর্বর্ণের সাধনায় মানুষ ও জাতি একই কালে সমৃদ্ধ হইবে। পূর্ণযোগ—পূর্ণ মানুষ, সমর্পণ যোগ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার উপলব্ধি,

সাধনা ও সাফল্যের কথা বলেন। (শ্রীযুক্ত রায়ের বক্তৃতা অন্যত্র প্রকাশিত হইল।) রায় মহাশয়ের প্রাণস্পর্শী প্রেরণামূলক বক্তৃতার পর ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এক বক্তৃতা করেন। (তাহা অন্যত্র প্রকাশিত হইল।)

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সভাপতি ও ঢাকাবাসীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

অতঃপর সঙ্ঘচারণ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্যের সমাপ্তি-সঙ্গীতের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই একবাক্যে বলেন—চমৎকার, এমন কথা এমন করিয়া কেহ বলেন নাই। কেহ বলেন—বহু পূর্ব্বে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের বক্তৃতা শুনিয়াছি—আর আজ এই শুনিলাম।

সভান্তে রাত্রিতে অনেকে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ নিরসন করেন।

রায় মহাশয়ের ঢাকা আগমনে ও অবস্থানে ঢাকায় একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল।"

# জীবনের রূপ

শ্রীত্রৈলোক্য বিশ্বাস

আমার প্রাণের পাত্রে স্বপ্নের মদিরা
রাত্রিদিন অবিশ্রাম পড়েছিল ঝরি',
পরিপূর্ণ হ'ল পাত্র কাণায় কাণায়
জীবনের যাত্রাপথে সে পাত্র পাথেয়
আতুর করেছে মোর সবুজ আত্মারে।

অজস্র যে অসঙ্গতি সংসারের মাঝে
পলে পলে মানুষের নিগূঢ় সত্তায়
রাত্রিদিন হেনে গেছে নির্ম্মম আঘাত
স্বপ্নের মদিরা তারে রঙীন ফেনায়
অভিনব রস দিয়ে করে অর্থময়,
ব্যর্থতা ও ব্যথা হ'ল কাব্যের বিষয়।
সৃষ্টির কোনও কক্ষে চক্রগতি নেই।
জীবনের প্রতিক্ষণ একান্ত নূতন।
জীবনের মহামঞ্চে অতীত আহুতি।

স্বপ্নরসে রসায়িত শত অসঙ্গতি
একদিন আপনার আত্মপরিচয়ে
নূতন সন্ধানী মোর সত্তার দুয়ারে
রিক্তসাজে প্রেত সম বীভৎস দু'হাতে
স্বপ্নের মদিরাপূর্ণ পাত্র দিল ভেঙ্গে।
বর্ত্তমান স্বপ্নহীন রুক্ষ রূঢ় বাণী,
অনভ্যস্ত কর্ণে মোর নিত্য দেয় আনি',
ভবিষ্যৎ মাঝে মাঝে অতীতের রসে
স্নান করি' আমার সম্মুখে এসে কাঁপে।
বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ দ্বন্দ্বপরায়ণ
নিভৃত হৃদয়ে মোর হানিছে আঘাত।

# পিচ্ছিল

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেশ কয়েকদিন আগের থেকেই অনুভা এ অভিযোগ ক'রেছিলো, বলেছিলো, "মা, কলতলার একটা ব্যবস্থা করা উচিত, যে রকম শ্যাওলা পড়েছে—কোন্ দিন প'ড়ে ট'ড়ে যাবে—আর দিন রাত যখন কলতলাতেই তোমার বেশী কাজ!"

সুহাসিনী ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, "অত যদি ভাবনাই থাকে, নিজেরই তো অমন হাতীর মতন গতর র'য়েছে, দিস্ না উঠিয়ে শ্যাওলাগুলো, এমন কিছু রোগা হ'বি না তাহলে!"

"আমি যদি পারতুম" অনুভা একটু থেমে নীচু গলায় উত্তর দিয়েছিলো, "তাহ'লে আর তোমাকে বলতে আসতাম না কোনো দিনো, ওদের বাড়ীর চাকরটাকে সামান্য কিছু দিলেই—"

"কি—কি বল্লি?" সুহাসিনীর গায়ে কে যেন বিষ ছিটিয়ে দিয়েছে, "বড়ো পয়সা দেখেছিস্ আমার নয়? দিনে দিনে হাতীর মতো সব ফুল্‌চো—জানো না তো কোথা দিয়ে পয়সা আসে, অনেক পাপ ক'রেছিলুম, তাই এই রকম সব কালশত্তুর পেটে ধ'রেছি।" একটু থেমে বল্লেন, "জানো না তো একটা লোক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কি ভাবে তোমাদের পিণ্ডির যোগাড় ক'রে আনে—"

অনুভা এ কথার আর উত্তর দেয় নি। উত্তর দেওয়াই অনুচিত। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আনা পিণ্ডিতে এখনও তার অংশ গ্রহণ করতে হয়। কাজেই অনুভা সেদিন মুখ নীচু ক'রেছিলো, বলেছিলো, "আচ্ছা—আমিই যতোটা পারি, উঠিয়ে দেবো—"

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উঠিয়ে দেওয়া আর হ'য়ে ওঠেনি, সমস্ত দিনের অবিরাম পরিশ্রমের পর আজ তিন চারদিন সে মোটে সময়ই পায় নি; আর আশ্চর্য্য!—আজ এই সন্ধ্যের একটু আগেই ঘট্‌লো সেই অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনা, অনুভা যা আশঙ্কা ক'রেছিলো—অনুভা যা মনে মনে কল্পনা ক'রে কিছুটা শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিলো।

এক রাশি বাসন নিয়ে যেই সে কলতলায় পা বাড়িয়েছে, অমনিই পা পিছ্‌লে গেল—তারপরেই হুমড়ী খেয়ে পড়লো অনুভা। বাসনের শব্দে সুহাসিনী ছুটে এলেন, বল্‌লেন, "মরেছো তো হতভাগী, হাত পা যেন তোমার কথা কয়; কেন, আস্তে আস্তে কাজ করতে কি ম'রে যাও?"

অনুভার পায়ে তখন লেগেছে। রীতিমত লেগেছে। কোন রকমে উঠে এসে রকের ওপরে বস্‌লো। মা এগিয়ে এলেন, পাটা একটু দেখলেন, বল্‌লেন, "ও এমন কিছু নয়, আর ব'সে ব'সে ঢং করতে হ'বে না, যাও ওঠো একটু ভিজে ন্যাকড়া জড়িয়ে রাখ পায়ে।"

—"যখন তখন ওকে তুই বড়ো মুখ করিস সুসী—" বিন্দুবাসিনী তাঁর ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলেন, "আহা, মেয়েটা অমন আছাড় খেলো আর তুই যা তা বলে গাল দিচ্ছিস্?—দেখ দিকিনি, কতখানি কেটে গেছে?"

—"আপনারা সকলেই তো আমার দোষ দেখেন" সুহাসিনী হাত নেড়ে আরও একটু ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "অথচ এই মেয়েকে আমারই তো পার করতে হ'বে মা; পরের ঘরে যাবে, সে যদি এই ভাবে চলে, তাহ'লে কথা যে আমাকেই শুনতে হ'বে; দেখুন না, এখন থেকেই যদি এই রকম চলন বলন হয়—" একটু থেমে বল্‌লেন, "তাও যে এ জন্মে বর জুটবে তাতো আমার মনে হয় না—আমার সর্ব্বনাশ করতে এসেছে ও—আমার সর্ব্বনাশ ক'রে তবে ও হতভাগী ছাড়বে।"

পাশেই ছোট একখানা ঘরে বিন্দুবাসিনী থাকেন। একটী ছেলে নিয়ে তিনি বিধবা হ'য়েছিলেন, বাড়ীওলার কি রকম দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। আজ চার মাস হ'ল ছেলেটী মারা গেছে।

প্রায়ই কাঁদেন। দুপুরবেলা যখন চারদিক নিঝ্‌ঝুম হ'য়ে আসে, এত বড় বাড়ীটার প্রত্যেক ঘরেই যখন কর্ম্ম-ক্লান্ত জীবনগুলির ওপরে কয়েক ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম পাখা মেলে, বড় রাস্তার ওপরে গাড়ীগুলির শব্দ যখন ক্রমশঃ

ক্ষীণায়মান, তখন, ঠিক সেই সময়ে বিন্দুবাসিনী বাক্স থেকে ছেলেটির ফটো বের ক'রে বসেন। পনেরো ষোলো বছর বয়সের তোলা ছবি। অপলক চোখে চেয়ে থাকেন অনেকক্ষণ, তারপর কাঁদেন, খুব আস্তে। সেই কান্নার শব্দ তাঁর ঘর থেকে সামান্য কিছুদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

অণুভা কতদিন দুপুর বেলা আস্তে আস্তে বিন্দু-বাসিনীর কাছে এসে ব'সেছে। চুপচাপ। মা যেন আবার না জানতে পারেন। চুপচাপ নিঃশব্দে বিন্দু-বাসিনীর ঘরে ঢুকে অণুভা সাম্‌নে এসে ব'সেছে। বলেছে, "কাঁদবেন না জ্যেঠাইমা, তাতে তাঁর অমঙ্গল হ'বে— আমার দাদামশাই বল্‌তেন, এ পৃথিবীতে যারা যত ছোটবেলায় মারা যায়, তারা ততই সুখী। যতদিন থাক্‌বেন, ততদিন দুঃখ—ততদিনই লাঞ্ছনা, ভগবান যাদের ভালবাসেন, তাদের তাড়াতাড়ি ডেকে নেন, নিজের পায়ে আশ্রয় দেন" বলতে বলতে অণুভার চোখ দুটো ছলছল ক'রে উঠতো।

বিন্দুবাসিনী অণুভাকে কোলের কাছে টেনে নিতেন, মাথায় হাত বুলোতেন। অনেক দিন আগের আর একটা ছবি তাঁর চোখের ওপরে ভেসে উঠতো। অনেক দিনের, অনেক অপরিচয়ের অন্ধকারে সে ছবি যেন ক্রমশঃ ম্লান হ'য়ে গিয়েছে। বিন্দুবাসিনীর মনে পড়ে, তাঁরো এই রকম একটি মেয়ে ছিলো—আজ থাক্‌লে হয়তো এত বড়টিই হ'য়ে উঠতো। ঠিক এত বড়। তখন আর কি তিনি এই রকম নির্লিপ্ত ভাবে জীবন কাটাতে পারতেন? আজ বড় হ'লে তার বিষয়ে কতো চিন্তাই করতে হ'ত; বিন্দুবাসিনী হয় তো এতদিনে বিয়েই দিয়ে দিতেন তার।

একেক সময়ে আস্তে আস্তে অণুভাকে তিনি কোলের কাছে টেনে নিতেন, "মা তোকে বড় বকে, নারে খুকী?"

এ রকম প্রশ্নে অণুভা মাথা নীচু করতো, তারপর বলতো, "মার দোষ নেই জ্যাঠাইমা, ওঁর শরীরটাই আজ-কাল বড় খারাপ—তারপরে ওই মিন্টু হওয়ার পর থেকেই শরীরটা ক্রমশঃ ভেঙে পড়েছে—তারপরে এই আমাদের ভাবনা—বাবার সামান্য আয়, কলকাতা সহরে বাড়ী ভাড়া করে থাকা আমাদের এই অসময়ে যে কি কষ্টকর—"

বিন্দুবাসিনী অণুভার মাথায় হাত বুলোতেন, "তোকে কেউ দেখতে পারে না, নারে? বাবাও নয়?"

অণুভার চোখ দুটো এবারে ছল ছল করে আস্‌তো, কথায় উত্তর দিতো না।

তারপরে আস্তে আস্তে সেখান থেকে উঠে পড়তো, বলতো, "যাই জ্যাঠাইমা—মা বোধ হয় এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠেছেন, আমাকে না দেখলে আবার—" কথা শেষ না করে'ই অণুভা বেরিয়ে পড়তো কোনোদিন।

এবারে বেশ শীত প'ড়েছে। বেলা প'ড়ে এলেই যেন হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি লাগে। অণুভা উনুনে আগুন দিচ্ছিলো। সকাল থেকে সুহাসিনীর শরীরটা ভালো নেই। বিকেলের দিকে কেমন জ্বর জ্বর মতো লাগছিলো, এখন সন্ধ্যের সময়ে তাঁর মনে হ'ল, বেশ জ্বর হ'য়েছে। পাশের ঘরে কাঁথা মুড়ি দিয়ে কোনো রকমে শুয়েছিলেন, চীৎকার ক'রে ডাক্‌লেন, "ওরে অ অনি হতভাগী, একবার ইদিকে আয় শীগ্‌গীর।

অণুভা উঠে এলো।

—"পিন্টু আর ঝিন্টুকে জামা পরিয়ে দিয়েছিস? এই তো সেদিন দুটোই ম্যালেরিয়া থেকে উঠলো—আবার ঠাণ্ডা লাগলে—"

—"ওরা তো নিজেই জামাটা পরে নিতে পারে মা, আমার এখন এই কয়লার হাতে—তোমরাই তো যত সব আস্‌কারা দিয়ে দিয়ে—"

"কি বল্‌লি—কি বল্‌লি হারামজাদী, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, আমরা আস্কারা দিয়ে দিয়ে ওদের সব্বনাশ ক'রেছি, এ্যাঁ?" রাগে-সুহাসিনী ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছেন, "বেরো আমার সাম্‌নে থেকে লক্ষ্মীছাড়ী কোথাকার—ওরা যদি নিজেই পারতো তা'হলে তোমার অপেক্ষায় বসে থাকতো হতভাগী? নিজে তো ধিঙ্গির মত দিব্যি দিনে দিনে রূপসী মরুবাসিনী হয়ে উঠ্‌ছো, সাজ-পোষাকের ঘটাও কিছু কম যাচ্ছে না—এদিকে তোমায় দেখে যে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়, সে খবর রাখো?" সুহাসিনী এবারে রীতিমত হাঁপাতে আরম্ভ করেছেন, "কি করে যে বিদেয় করবো, সেই

ভাবনাতেই আমি ম'রে আছি—বেরো, বেরো আমার সাম্‌নে থেকে—আমার চক্ষুর শূল—কালশত্তুর কোথাকার—এক গাছা দড়িও কি জোটে না, তা'হলেও যে বাঁচতুম নিঃশ্বেস ফেলে বল্‌তে পারতুম: আপদ গেছে—মেয়ে তো নয়, আমার জন্ম জন্মের কাল শত্তুর।"

অণুভা আস্তে আস্তে দরজা থেকে স'রে এলো, সুহাসিনী এতক্ষণে আর একবার দম নিতে পেরেছেন, রাগে আর একবার ঝিঁকিয়ে উঠলেন, "শোনো, আবার ঢং ক'রে ন'ড়ে যেতে হ'বে না। কাল,—কাল ওই বারান্দার ওপুরে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছিল কি? ওই শঙ্করা ছোঁড়ার সঙ্গে অত ঢলাঢলি কিসের শুনি? আমার মুখটাকে ভাল করে না পোড়ালে আর স্বোয়াস্তি নেই, নয়? হা-রা-ম-জা-দী, দূর হ আমার সাম্‌নে থেকে, ফের যদি দেখি তা'হলে মাটীতে মুখ কুটে রাখবো একেবারে।"

লজ্জায় অণুভা সারা শরীরে শিউরে উঠ্‌লো। আস্তে আস্তে সে স'রে গেল। মনে হ'ল: এখনি যদি সে ম'রে যেত। এখনি, এই মুহূর্তে, "হে ভগবান্‌", অণুভার ঠোঁট দুটো সামান্য একটু কাঁপলো, "আমায় তুমি দোষ করো"—অণুভার সারা শরীর থর থর ক'রে কাঁপছিলো।

বাইরে শীতজর্জর অন্ধকার সন্ধ্যা নেমেছে। অণুভা ধীরে ধীরে রান্নাঘরে ফিরে এলো। ক'দিন সে শঙ্করকে বারণ ক'রেছে। জানিয়েছে মা যখন এত রাগ করেন, তখন দরকার নেই। শঙ্কর যেন তার সঙ্গে আর কথা না বলে। সে বড়ো দুঃখিনী—সে বড়ো হতভাগিনী—তাকে যেন শঙ্কর এটুকু করুণা করে।

তারপরে একদিন। একদিন নির্জন ধূসর সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে অনুভা তার কাছেই গিয়েছিলো, মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে ব'লেছিল, "শঙ্কর দা, আমায় তুমি ক্ষমা করো, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় তুমি আর ডেকোনা,—আমাকে একলা থাকৃতে দিও।"

শঙ্কর অণুভার একটী হাত আস্তে নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়েছিলো সেদিন। তারপর ঠিক সেইভাবেই বলেছিলো, "কি দোষ, কি অন্যায় ক'রেছি অণু?"

অণুভা আর উত্তর দিতে পারেনি—কেমন একটা অবরুদ্ধ উচ্ছ্বাসে তার সমস্ত শরীর দুলে' উঠেছিলো। অতি ধীরে কান্নাকে চেপে নিঃশব্দে সে চ'লে এসেছিলো—নিরুত্তর নিষ্প্রাণ পাথরের মতো সে ফিরে এসেছিলো।

অথচ শঙ্কর যা চায়, তা কি সম্ভব? তা কি সম্ভব কখনো?—এত বড় তার বাড়ী, সে ধনী—তার বাবা তাকে বি-এ, পাশ করিয়েছেন—তার জন্যে—তার জন্যে কেন এই সন্ধ্যা-স্বপ্ন—অণুভা উনুনের লাল টক্‌টকে আগুনের দিকে চেয়ে রইলো, কেন এই সন্ধ্যা-বিলাস? শঙ্কর ভেসে যাক্—শঙ্কর মুছে যাক্; অণুভা চোখ তুলে ওপরের বারান্দায় আর তাকাবে না কোনোদিন!

—"ওরে অ অনি—" বাবা এসেছেন, "কোথায় গেলো হতচ্ছাড়ি, মরেছে নাকি একেবারে, বলি আলোটালোগুলো জ্বেলেছিস্—না—কি?" মস্ মস্ শব্দ ক'রে জগদীশবাবু এগিয়ে এলেন।

—"এই তো রেখেছিলুম এখানে বাবা—" অণুভা রান্নাঘর থেকে বারান্দায় নেমেছে, "কে নিলো আবার?"

—"রেখেছিলে তো হাওয়া হ'য়ে গেলো নাকি?" জগদীশবাবু মুখের একটা বিকৃত ভঙ্গী করলেন, "এই তো রেখেছিলুম ব্যা—ব্যা!"

অণুভা আস্তে আস্তে আবার রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালে। "বলি যাচ্ছো কোথা, গরম জল,—গরম জল ক'রেছো আমার?" বাবা গর্জন ক'রে উঠ্‌লেন।

—"না—এইতো সবে আঁচ উঠেছে উনুনে—"

"এই তো সবে আঁচ উঠেছে?—কেন?—কেন আঁচ ওঠে এত দেরীতে—পাঁচশ' বার বলেছি না, আমার আসার আগে জল টল সব রেডী ক'রে রাখ্‌বে—গ্রাহ্য হয় না কথা, না? হা-রা-ম-জা-দী—"

—"কি অত চেঁচাচ্ছ গাঁ গাঁ ক'রে", ঘরের থেকে সুহাসিনী ক্ষীণ স্বরে কথা কইলেন, "বলি এই তো ক'রেছে সব, কাঁহাতক আর পারে একলা—" সহানুভূতিতে সুহাসিনী একটু দুলে' উঠ্‌লেন।

—"একলা পারে না তো তুমি মড়ার মত প'ড়ে আছো কেন ওখানে—সর্ব্ব অঙ্গ গেছে নাকি?"

—"কি বল্‌লে" সুহাসিনী এবারে আগুনের মত জ্বলে' উঠেছেন, "মুখ সামলে কথা বল্‌বে বল্‌ছি, আমি প'ড়ে আছি সখ ক'রে?—ফ্যাসান করে? আমার আর মরবার

জায়গা নেই!—মুখে যা এলো অম্‌নি বল্‌লেই হ'ল—হে ভগবান, হে পরমেশ্বর, তুমি দেখো', সুহাসিনী এবারে ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলেছেন, "কতো মহাপাপ ক'রেছিলুম, তাই এই অধঃপেতের হাতে প'ড়ে আমার সব গেল—সব গেল—হে পরমেশ্বর!"

জগদীশবাবু আর দাঁড়ালেন না, আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লেন।

আবার সেই নিস্তব্ধ নিঝ্‌ঝুম দুপুর। দীর্ঘ শীত-রজনীর পর যেমন ভোরের উষ্ণ রৌদ্র—অণুভারো দুপুরটা তাই দীর্ঘ, অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এই শান্ত নিঝ্‌ঝুম দুপুর। মা ঘুমিয়ে প'ড়েছেন—মিণ্টু আর ঝিণ্টু দু'জনেই স্কুলে—মিন্টুটাও ঘুমচ্ছে। অণুভা আস্তে আস্তে বোনার কাঠী নিয়ে এসে জান্‌লার ধারে বস্‌লো। পিণ্টুর একটাও গরম জামা নেই—একটা সোয়েটার যদি অণুভা তাড়াতাড়ি বুনে দিতে পারে, তাহ'লে সে বাঁচবে এই শীতে—অণুভা অবশ্য সেইজন্যেই প্রাণপণে চেষ্টা করছে—যত তাড়াতাড়ি হয়।

যত তাড়াতাড়ি হয়—অণুভা জান্‌লায় হেলান দিয়ে বস্‌লো। বেচারী রোজ সন্ধ্যের পর ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপে, সকালে তো লেপের তলা থেকে বেরোতেই চায় না—ঝিণ্টুর জুতো জোড়াটাও ছিঁড়ে গেছে—এ মাসে কি আর হবে? যাক্, তবু—তবু সে বাবাকে একবার বলে দেখ্‌বে, ঝিণ্টুটা সেদিন বড় কান্নাকাটি করেছে, শেষ পর্য্যন্ত দিদিকেই অবশ্য ধ'রেছিলো। দিদি বল্‌লেই নাকি বাবা নিশ্চয়ই জুতো কিনে দেবেন।

অণুভার হাসি পেল—তাই যদি হ'ত! অণুভার কথাতেই যদি বাবা তাকে জুতো কিনে দিতেন, কি যে পাগল ছেলেটা! অণুভার সেদিনো ভারি হাসি পেয়েছিলো।

অণুভা লক্ষ্য ক'রেছে এই সময়টা বুন্‌তে বস্‌লেই যেমন সমস্ত শরীরটা শিথিল হ'য়ে প'ড়ে—চোখ দুটো যেন ঘুমে জড়িয়ে আস্‌তে চায়—কিন্তু,—কিন্তু অণুভা ভেবে ভেবে দেখেছে—সে যদি ঘুমোয়, তাহ'লে আর এটা শীগ্‌গীর শেষ হ'বে না কিছুতেই, ঝিণ্টু তাহ'লে কি করেই সে শীতটা কাটাবে!

আস্তে—অতি ধীরে ঘরের দরজাটা খুলে গেল। লঘু পায়ে শঙ্কর ঘরে ঢুক্‌লো। ঠোঁটের ওপরে আঙুল চেপে যেন সে বল্‌লে, "চুপ!"

অণুভা ততক্ষণে সোজা হ'য়ে উঠে ব'সেছে। বল্‌লে, "একি, তুমি—তুমি আবার এসেছো শঙ্কর দা?"

শঙ্কর সামান্য একটু হাস্‌লে, বল্‌লে, "ভারী চমৎকার একটা খবর আছে অণু, ভারী সুন্দর—বলো তুমি রাগ ক'রবেনা?" শঙ্কর অণুভার কাছাকাছি বস্‌লো, "বলো আগে—"

অণুভা হাস্‌লে, বল্‌লে "আজো তোমার ছেলেমানুষী গেলো না শঙ্কর দা—কি যে পাগলামী করো মাঝে মাঝে, জানোতো মা কতো রাগ করেন তোমাকে দেখ্‌লে?"

—"তা করুন" শঙ্কর সেই একই সুরে কথা বল্‌লে, "এবার আর কারুকে ভয় করবোনা আমরা দেখে নিও।"

বিস্ময়ে অণুভা কথা বল্‌তে পারলে না অনেকক্ষণ, তারপরে অতি ধীরে বল্‌লে, "সে কি ব্যাপার,—কি ঠিক করলে তুমি আবার?"

"একটা চাকরী পেয়েছি বম্বেতে—কালই যেতে হবে, ভাব্‌ছি তোমাকে নিয়েই সোজা পাড়ি দেবো—একেবারে ওখানে গিয়ে আমাদের বিয়ে—"

"ওমা!—" বিস্ময়ে অণুভা শব্দ ক'রে উঠ্‌লো। "কি বল্‌ছো তুমি এ-সব—মা আর বাবা কি ভাব্‌বেন—জ্যেঠামশাই, জ্যেঠীমা—"

শঙ্কর বাধা দিলো—বল্‌লে "জানি ওঁরা ভাব্‌বেন, কিন্তু অণু, তোমার এই দুঃখ—তোমার এই অমানুষিক নির্য্যাতন আর কতদিন দেখা যায় বলো? এই আমাদের শিক্ষা, এই আমাদের শাসন, তুমিও আমার মত এদের ঘৃণা করতে শেখো আজ থেকে।"

অণুভা মাথা নীচু ক'রে রইলো—তার সমস্ত বুকটা দুরদুর ক'রে কাঁপ্‌ছে—শঙ্কর একি দুঃসাহস নিয়ে এসেছে তার সামনে। একি বিজয়ী মূর্ত্তি শঙ্করের। অণুভা চেষ্টা ক'রে কথা বল্‌তে পারলো না।

শঙ্কর ততক্ষণে আবার কথা বল্‌তে আরম্ভ করেছে, "ধরো, আমরা সেই নির্জনে—সেই দূর দেশে আমাদের

নিজস্ব ঘরকে গড়ে তুল্‌তে পারবো অনু—সেখানে আর কেউ নেই—শুধু তুমি আর আমি; আমাদের অনন্ত সময় কাটবে, দু'জনে দু'জনের মধ্যে পূর্ণ হ'য়ে থাক্‌বো, তুমি হ'বে আমার প্রেরণা—আমার সমস্ত জীবনের কর্মশক্তি, আর আমি রচনা করবো—রচনা করবো শান্তির নীড়,—যেখানে দুঃখ নেই—যেখানে দুঃখ পদপাত করতে ভয় পাবে, সেই, আমাদের নূতন সৃষ্ট রাজ্যের রাণী হ'বে তুমি—অনু, কি ভালোই যে লাগে এসব, সত্যিই—কি ভালোই যে লাগে এসব ভাব্‌তে!"

অনুভা মাথা তুল্‌তে পারলো না—কি একটা অসহায় লজ্জা এসে তাকে আ-শরীর ঘিরে দাঁড়িয়েছে—ভারী সুন্দর স্পর্শসহ একটী মোহ, শুধু সমস্ত মন—সমস্ত আত্মা দিয়েই তা অনুভব করা যায় যেন!

শঙ্কর আরো কাছে এগিয়ে এলো—অনুভার একটী হাত কোলের কাছে টেনে নিলে, তারপর অতি ধীরে, অতি সাবধানে পাশে এসে বস্‌লো, বল্‌লে, "তুমি রাগ করলে অনু?"

অনুভা কি যে বল্‌বে ঠিক করতে পারলে না, শুধু একবার শঙ্করের দিকে চোখ তুলে চাইলে, তারপরে অসহ্য আনন্দে সে যেন ভেতর থেকে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌লো, চোখে তার খানিকটা জলের আভাষ, অনুভা মাথা নীচু করলে।

শঙ্কর আগের মতই সাবধানে মাথাটী নিজের বুকের ওপর টেনে নিলে, "তোমায় আর আমি একটুও দুঃখ পেতে দেবো না—এ তুমি দেখে নিও—এ তুমি দেখে নিও অনু।"

"ওমা—এই তোমার বোনার ছিরি?—ওরে ও হতভাগী, ওরে অ লক্ষ্মীছাড়ী—" সুহাসিনী জান্‌লার ওপরে দাঁড়িয়ে জ্বলে' উঠ্‌লেন।

অনুভা ততক্ষণে ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সেছে। ঈশ্‌ একেবারে বিকেল হ'য়ে গেছে যে—মাগো, ছি ছি, এই ভাবে সে ঘুমিয়ে প'ড়েছিলো এতক্ষণ?

শীতের ক্লান্ত বৈকাল যেন আকাশ থেকে পৃথিবীর ওপরে ঝুঁকে প'ড়েছে। ওপাশে বিন্দুবাসিনীর ঘর থেকে সেই চাপা কান্নার সুর ভেসে আস্‌ছে—তিনি তাঁর ছেলের ফটোটি সাম্‌নে ধ'রে ব'সে বোধ হয় অপলক চোখে চেয়ে আছেন, আর কাঁদছেন। উঠোনে পিণ্টু আর ঝিণ্টুর মধ্যে কি নিয়ে যেন ঝগড়া বেধেছে—শীতের উষ্ণ রৌদ্র-চকিত দুপুরের ক্লান্ত সমাপ্তির সুর চারিদিকে। খাবার জল আজ ঠিকমত গরম ক'রে রাখ্‌তেই হ'বে, অনুভা ভাল হ'য়ে উঠে বস্‌লো, আজ না রাখ্‌লে আর উপায় নেই।

—"কি ওম্‌নি ঢং করেই ব'সে থাকা হ'বে নাকি? আ:মর!—শীগ্‌গীর উঠে মুখ টুক ধুয়ে নাও না—" সুহাসিনী ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন, "তোমাকে দেখ্‌তে আস্‌বে যে আজ ওরা—একটু মানুষের মত হ'তে শেখো—হতচ্ছাড়ী কোথাকার—"

অনুভা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো, তারপরে বল্‌লে, "যাচ্ছি মা, তুমি যাও" তারপরে ধীরে, অতি সাবধানে সেই পিচ্ছিল কলতলার দিকে পা বাড়ালো—তার সমস্ত অতীত এবং ভবিষ্যৎ জীবনের মতই পিচ্ছিল সেই কলতলা—যে কোন মুহূর্তে, যে কোন মুহূর্তে অনুভা আবার আছাড় খেয়ে পড়তে পারে সেখানে।

---

## দশাভেদ

শ্রীবিপদভঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ভাসমান হিমশৈল জলে ডাকি' বলে,—
কুৎসিতে! সদা তুমি হাস কোন্‌ ছলে!
সহসাও কঠিনাঙ্গ জলে রূপ্‌ পায়,
কুল্‌ কল্‌ ছল্‌ ছল্‌ কালো জল ধায়

---

# ধর্ম্মনৈতিক জাতীয়তা

শ্রীমতিলাল রায়

১৯১০ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরের নির্দ্দেশ পেয়েছিলাম—সাধনা, যোগ, ধর্ম্ম ব্যক্তিগত জীবনের মুক্তি, মোক্ষের জন্য নয়, সাধনা মানবতার জন্য। আর ঈশ্বরযুক্তিলাভের জন্য কোনরূপ আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি সাধনার প্রয়োজন নাই, আত্মসমর্পণযোগই সাধনার শ্রেষ্ঠ পথ। জীবন পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরে সমর্পণ করলেই শ্রীভগবান মানুষের মধ্যে তাঁর শক্তি নিয়ে লীলায়িত হন। ১৯১০ খৃঃ পূর্ব্বে সাধনার নামে বহু প্রকার হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি কৃচ্ছ্রতামূলক আচার-অনুষ্ঠানের আশ্রয় নিয়েছিলুম—তারপর ১৯১০ খৃঃ সমস্ত কৃচ্ছ্রতামূলক অনুষ্ঠানাদি পরিত্যাগ করে' একমাত্র ঈশ্বরে সমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ পথ—এই নির্দ্দেশ যখন লাভ করলুম, তখন ভেবেছিলুম—এর চেয়ে সাধনার সহজ ও সরল পথ বুঝি আর নেই! ১৯১০—১৯৪১ খৃঃ পর্য্যন্ত "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—শ্রীকৃষ্ণের এই মহাবাণীকে অনুসরণ করতে গিয়ে কত ঝঞ্ঝা, বিপ্লব, উপদ্রব ও অসংখ্য বাধার সম্মুখীন হয়ে আমায় সমর্পণের অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে। এই মহাবাণীর অনুসরণ করতে করতে একদল তরুণকে আমি পেয়েছিলাম—যারা এই সমর্পণের সাধনাকেই জীবনে রূপ দিবার জন্য আকুল হয়ে আমার সঙ্গে অভিযান করেছিল।

এই আত্মসমর্পণ-মন্ত্র শুধু ভাব নয়, হিঁয়ালী নয়, ইহা বস্তুতন্ত্র সাধনা। এই দীর্ঘদিনের সাধনার মধ্য দিয়ে আমি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছি—সমর্পণের সাধনা কত দুরূহ ও জীবনে তা রূপায়িত করতে গিয়ে কত কঠোর ও বিপ্লবকারী অবস্থার সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে। এই মন্ত্রের অনুসরণে দিনের পর দিন তিলে তিলে আপনাকে নিবেদন করে'ই যে এই মহাবাণী সার্থক করতে হয়, তা আমি সমস্ত জীবনব্যাপী উপলব্ধি করছি। সাধনা শুধু বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তি নিয়ে নয়। বুদ্ধি, হৃদয়, প্রাণ ও দেহ সবই একে একে তাঁকে সমর্পণ করতে হয়। সকল বৃত্তির সমর্পণের ফলে বুদ্ধি দিয়ে শ্রীভগবানে চিন্তা করেন। বুদ্ধি দিয়ে যখন আমি চিন্তা করবো, বিচার করবো, সেটা হয়ে যাবে ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, যখন ঈশ্বরকে আমার বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করার জন্য বুদ্ধিবৃত্তি তাঁহাতে লয় করে দেবো, তখন বুদ্ধিতে ঈশ্বর-জ্ঞান প্রকাশ হবে—যে জ্ঞান মানুষকে অমৃত প্রদান করে, যাহা জানলে পৃথিবীর কোন জ্ঞান জানার অবশেষ থাকে না। হৃদয়বৃত্তিতে ভাগবত প্রেম বিকশিত হবে। আমাদের হৃদয়ের আকর্ষণে পিতা, পুত্র, পত্নী, বন্ধু সম্বন্ধ সৃজন করি; কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা খাঁটি প্রেমের সন্ধান পাই না, সেখানে থেকে যায় আত্মভোগ ও আত্মস্বার্থের আকাঙ্ক্ষা। তাই যখন ভগবান হৃদয়-মন্দিরে বিরাজ করেন, তখন রক্ত মাংসের সম্বন্ধ দূর হয়ে যায়, পিতা, পত্নী, বন্ধু সকলের মধ্যে ঈশ্বরকে সন্দর্শন করে' অখণ্ড প্রেমের আস্বাদ অনুভব করি। প্রত্যেকের সঙ্গে একটা অপ্রাকৃত সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়। এই কামনাহীন দিব্য সম্বন্ধে কোন দিন কোন অবস্থায় বিকৃত হয় না। পিতার সঙ্গে, পুত্রের সঙ্গে, পত্নীর সঙ্গে, বন্ধুর সঙ্গে এই নিত্য সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হলে তবেই যে সমাজের প্রতিষ্ঠা, উহাই ভাগবত সমাজ—তাহাই প্রীতি ও ঐক্যের নিকেতন।

তারপর প্রাণবৃত্তির কথা—প্রাণ শক্তির ক্ষেত্র। যখন "আমার" প্রাণ, "আমার" শক্তি বোধ থাকে, এই প্রাণই বাধা সৃষ্টি করে, বৃহতের শক্তি ধারণে অসমর্থ হয়; কিন্তু ইহা আবার ভাগবতপূত হলে, সমর্পিত হয়ে ঈশ্বরের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হলে, এই প্রাণেই ঈশ্বরের দুর্জ্জয় শক্তি অবতরণ করে, বিশুদ্ধ সৃষ্টির প্রবাহ নেমে আসে, সে সৃষ্টি অহংকৃত মনের উপর ভিত্তি করে' হয় না, স্বচ্ছ অনাবিল ধারায় সমস্ত বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে'ই আপনার প্রকৃষ্ট গতি নিয়ে চলে—পৃথিবীর কোন বাধায় এই দিব্য প্রাণের গতি রুদ্ধ হয় না।

তারপর দেহের কথা। দেহের ধর্ম্ম—সেবা দান করা। শ্রীভগবান স্বয়ং সেবার হস্ত নিয়ে আমার দেহে প্রকাশ হবেন, তখন আমার কোন কর্ম্মে বাধা নেই, বিচার নেই,

সেবার অফুরন্ত আনন্দে অভিষিক্ত হয়ে এই শরীর বিশ্বমানবের সেবায় সতত উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত থাকবে।

বুদ্ধি, হৃদয়, প্রাণ ও দেহ—এই চতুর্গুণ বিকাশ করার জন্যই ভারতে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—বুদ্ধিতে জ্ঞান প্রকাশ অর্থাৎ ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম, হৃদয়ে প্রেম-ধর্ম্ম, ক্ষাত্রশক্তি; প্রাণে কর্ম্মশক্তি অর্থাৎ বৈশ্যবৃত্তি ও দেহে সেবাবৃত্তি বা শূদ্রত্ব। আবার আর এক ভাষায় বলা যায়—ইহাই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ-বীর্য্য। ভারতের চাতুর্ব্বর্ণ্য-ধর্ম্মের কথা শুন্‌লেই বর্ত্তমান যুগে তাকে নাকচ করার চেষ্টা করি; কিন্তু চাতুর্ব্বর্ণ্য কোন মানবকে ছোট করার জন্য সৃষ্ট হয় নি। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন স্বভাব—সেই স্বভাব ও বৃত্তির অনুযায়ী প্রত্যেকের জীবনের প্রকাশ যাতে হয়, তারই জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটী বিশেষ নীতি। ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই সব গুণের বিকাশ তাঁরা চেয়েছিলেন; কিন্তু কালে ঈশ্বর-ভিত্তি শিথিল হয়ে যাওয়ায় জীবন-প্রকাশের গুণগুলিও বিকৃতরূপ দেখা দিয়েছে। তত্রাপি ইহার মূলে যে বৈজ্ঞানিক সত্য রয়েছে, যা আমরা কোনদিন অস্বীকার করতে পারবো না, যা অস্বীকার করলে প্রাচীন ভারতের সত্যকে ম্লান করে ফেলবো, সত্য ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়বে। প্রত্যেক মানবের মধ্যেই একাধারে চাতুর্ব্বর্ণ্যের গুণ রয়েছে। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের ভিতর দিয়েই ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্ব বিকশিত হবে। এই বিজ্ঞান, এই ইতিহাসকে যদি আমরা অস্বীকার করে' চলি, তাহলে যুগে যুগে ভারতের মহাপুরুষগণ দিব্য সমাজ-সৃষ্টির যে প্রেরণা দিয়ে গেছেন, তা কোনদিন আমরা সফল করতে পারবো না।

১৯১৪ খৃঃ একটা প্রেরণা পেয়েছিলাম—ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করে' একটা সমষ্টি সৃষ্টি করা, সেই সমষ্টিই জাতিরূপে পরিণত হবে। সেই প্রেরণা নিয়েই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম "প্রবর্ত্তক" বা'র করি। সেই জাতি-গড়ার প্রেরণা নিয়েই আমি চলেছি। একটা সমষ্টি যখন ঈশ্বরে তাদের জীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জ্জন দিয়ে তাঁরই যন্ত্র হয়ে চলার সাধনা গ্রহণ করবে, ঈশ্বর তাদের জীবন নিয়ে তাঁর শক্তি প্রকাশ করবেন। এইরূপ সমষ্টি যত বৃহৎ হবে, তার একটা volume হবে, উহার একটা momentum আছে, সেই momentumই জাতির মধ্যে ক্রিয়া করবে, জাতিকে একটা রূপান্তরের দিকে নিয়ে যাবে। আমি একটা সমষ্টির কথা বল্‌ছি; এই ঈশ্বর-পরায়ণ মানব-সমষ্টির যে ঐক্যবদ্ধ প্রাণ, তাহাই জাতি হবে। সংখ্যা-গণনায় তাদের শক্তি বিচার করা ভুল হবে। কারণ সমগ্র জাতি নিয়ে জাতি-সৃষ্টি হয় না, জাতির উপযোগী গুণ-বীর্য্যই জাতি-সৃষ্টি সম্ভব করে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখবেন—জাতির উত্থানের মুখে অল্পসংখ্যক মানবই জাতির সত্তাকে আশ্রয় করে' নিজেদের মধ্যে একটা volume গড়ে' নেয়, সেই volumeই জাতির মধ্যে কার্য্য করে। volume এমন শক্ত ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত হবে, যা কোন দিন কোন অবস্থায় ব্যাহত হবে না।

সৃষ্টিই ভারত-সভ্যতার মূলমন্ত্র। ভারতের বৈদিক সভ্যতা কোন দিন লয়, মোক্ষকে স্বীকার করে নি, প্রশ্রয় দেয়নি। এই সংস্কৃতির আদি মন্ত্র—"অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়"—। আমাদের জাতির অবতার মনু, ব্যাসদেব ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—এই সকল মহাপুরুষগণ জীবনের ধর্ম্মই আমাদের প্রদান করেছেন, জীবনকে অতিক্রম করে', জীবন হতে বিচ্যুত হয়ে যে ধর্ম্মাশ্রয় করা, তা কোন-দিন তাঁদের দ্বারা স্বীকৃত হয় নি।

আমাদের ধর্ম্মকে দু' ভাগে বিভক্ত করা যায়—spirit ও matter—ভাব ও বস্তু বা প্রকরণ। এই দু'য়ের সাধন চাই, একটাকে বর্জ্জন করে' আর একটা গ্রহণ অর্থে জীবনের অন্য দিক্‌টা অপ্রকাশ থাকে, পূর্ণাঙ্গ জীবন হয় না। মানুষ ভাব ও বস্তুর সমন্বিত বিগ্রহমূর্ত্তি। ভাবের সাধনায় আমরা পাই অনুভূতি, বিরাট্ ও অসীমকে উপলব্ধি করি। বস্তু বা প্রকরণের সাধনায় মানুষের জীবনে নিয়ম, সংযম ও কর্ম্ম শৃঙ্খলা আসে—যার দ্বারা উপলব্ধ জ্ঞানকে বস্তুরূপে জান্‌তে পারি। ভাব দ্বারা দর্শন-লাভ হয়। মস্তিষ্কের অনুশীলন হয়। জ্ঞান, বৈরাগ্য এর লক্ষণ। প্রকরণে অর্থাৎ কর্ম্ম-বিজ্ঞানে শক্তির বিকাশ হয়—শক্তির প্রয়োগেই ভাব বস্তুতন্ত্র রূপ নেয়। বস্তুর সাধনায় প্রকাশ হবে ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য। ধর্ম্ম সাধনা করে' মানুষের জীবনে, জ্ঞান, বৈরাগ্য, শ্রী, স্বাস্থ্য, বীর্য্যের প্রকাশ যদি না হয়, সে

ধর্ম্মকে আমরা স্বীকার করবো না। এইরূপ ধর্ম্মই আমাদের জীবনকে অধঃপতনের চরম সীমায় এনে দিয়েছে। এটা মধ্যযুগের ধর্ম্ম—ভারতের মৌলিক বৈদিক ধর্ম্ম নয়। মধ্যযুগের মায়াবাদ ধর্ম্মলাভের জন্য জীবনকে অস্বীকার করতে নির্দ্দেশ দিয়ে থাকতে পারে, আমাদের বৈদিক সভ্যতা কিন্তু জীবনকেই দিব্য ভাগবত করতে চেয়েছিল। বৈদিক ধর্ম্মের উপর দাঁড়িয়েই আমাদের সমাজ-জীবনকে উন্নত ও শ্রীমণ্ডিত করে' তুলতে হবে। ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করেই জাতির অভ্যুত্থান চাই। আমরা ভারতের নিজস্ব মতবাদ নিয়েই দাঁড়াব। ইহা সঙ্কীর্ণতায় নয়, ইহা বাঁচার কৌশল। আমাদের দেশের তরুণেরা বিজাতীয় মতবাদ নিয়ে, তাদের মস্তিষ্ককে সেই 'বাদ' দ্বারা গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। আমাদের সভ্যতার মধ্যে যে শক্তি, সাহস ও বীর্য্য আছে, তা আমরা ত অনুসরণ করে' দেখ্‌লুন না!

জাতির সেবা দিতে গিয়ে বিভিন্ন রকম পথ আমাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে; কিন্তু আজ যে পথ আমি অনুসরণ করে চলেছি, আমার অভিজ্ঞতা থেকে নিঃসংশয়ে তরুণ বন্ধুদের বল্‌তে পারি—ভারতের ধর্ম্মকে ভিত্তি করে' চললে ভারতীয় জাতীয়তা পরিপূর্ণ রক্ষা পাবে ও সেই ধর্ম্মই আমাদের অফুরন্ত কর্ম্ম-প্রেরণা দেবে, ইহাই মানুষের রাষ্ট্র-মুক্তি আনার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করবে। যে ধর্ম্ম মানুষকে পঙ্গু করে, নির্ব্বীর্য্য করে, সাহস দেয় না, যে ধর্ম্ম অনুসরণ করলে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব, কলহ, সঙ্কীর্ণতা আনে, জাতীয়তাবোধ নষ্ট করে, সে ধর্ম্মের কথা বল্‌ছি না, সে ধর্ম্ম আমরা উপেক্ষা করেই চলবো। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি—আমাদের বৈদিক ধর্ম্মই আমাদের জীবনকে প্রাণবন্ত করে' তুলবে, আমাদের মধ্যে বীর্য্য ও শক্তিকে জাগ্রত করবে। আমি তাই তরুণ বন্ধুদের বলি, আমাদের নিজস্ব 'ism'কে গ্রহণ করে' তাকে পরিপূর্ণ ভাবে পালন করে দেখো—তাতে তোমরা দেশ-সেবার শক্তি পাও কিনা! যদি আন্তরিকতার সহিত পালন করে'ও তোমাদের মধ্যে সে বীর্য্য, সাহস জাগ্রত না হয়, সে ধর্ম্মকে তোমরা দূরে নিক্ষেপ করো। তোমরা দেশ সেবার জন্য যাহা কিছুই কর না কেন, ভারতের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে অনুসরণ কর, তবেই সত্যিকার জাতির সেবা দান করা হবে। বিজাতীয় ভাব ও আদর্শ যদি আমাদের মস্তিষ্ক-কোষকে গড়ে' দেয় ও তদনুযায়ী আমরা হয়ে পড়ি, তবে জাতীয়তার নামে কি আমরা আত্ম-প্রবঞ্চনাই করব না?

আমাদের বৈদিক সভ্যতাকে স্বীকার করতে হলে, আমাদের বেদবিশ্বাসী, কর্ম্মবাদী ও জন্মান্তরবাদী হতে হবে। এই তিনকে স্বীকার কর্‌লেই হিন্দুর সভ্যতাকে স্বীকার করা হবে। বেদ-বিশ্বাস অর্থে বেদপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে অনুসরণ করা। ধর্ম্মবিশ্বাস রক্ষা করলেই বেদকেও স্বীকার করা হবে। ভারতীয় সভ্যতা নিত্যশক্তি বলে'ই স্বীকার করে কর্ম্মকে। জীবনের প্রারম্ভ থেকে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া পর্য্যন্ত অনাহত কর্ম্ম করে' যেতে হবে। মানুষের জীবন একটা জন্মেই শেষ হয়ে যায় না, দেহের বিনাশ হলেও আমার অস্তিত্ব থাকে, ইহা প্রত্যেক হিন্দুই বিশ্বাস করবে; জীবন তাই তারা বিশ্বাস করবে—অনন্ত পুনঃ পুনঃ তাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে, স্বভাব-সংস্কার দ্বারা যেরূপ কর্ম্ম সে করে, তদনুযায়ী স্বভাব ও সংস্কার নিয়েই সে পুনঃ জন্মগ্রহণ করবে। মানুষের দেহ-নাশ হ'লেই জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ হয় না, তার সঙ্গে একটা নিত্য সম্বন্ধ থাকে, জন্মান্তরের মধ্যে দিয়া সে সম্বন্ধকেও উপলব্ধি করবে। চাতুর্ব্বর্ণ্যকেও আমরা গ্রহণ করবো—চাতুর্ব্বণ্য অর্থে মানুষের মধ্যে চতুর্শক্তির বিকাশ হবে—তার বিষয়ে পূর্ব্বেই বলেছি।

আপনাদের মনে হ'তে পারে—এই বৈদিক সভ্যতার উপর ভিত্তি করে' চল্‌লে মানুষ একদিন ঝুঁকে পড়বে, দেশের সেবা কিছু করতে সক্ষম হবে না। আমার কথা যদি আপনারা বিশ্বাস করেন, তা'হলে আমি জোর করে'ই বল্‌ছি—ভারতীয় সাধন-তন্ত্রের উপরই ভিত্তি করে'ই প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ জুট মিল, ব্যাঙ্ক, বহির্বাণিজ্য ব্যবসা প্রভৃতি বহু রকম কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে—ইহা খুব ক্ষুদ্র বটে; কিন্তু ইহা একটা typal success বল্‌তে পারি। আমার ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ইহাতে কিছু নেই, ঈশ্বর আমার মধ্য দিয়ে যে ভাবে প্রকাশ করেছেন, সেই ভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয় কৃষ্টি-সাধনাকে আশ্রয়

করে' আমি উপলব্ধি করেছি—ইহার কি শক্তি ও প্রভাব!

আমাদের শক্তির পঞ্চবিধ প্রকাশ হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। শিক্ষায় সাবিত্রী, সাহিত্যে সরস্বতী, অর্থে লক্ষ্মী, রাষ্ট্রে দুর্গা ও সমাজে শ্রীরাধা। তাই পঞ্চশক্তি ভিন্ন ষষ্ঠ শক্তি নাই, মানুষের গতিও এই পঞ্চশক্তিকে আশ্রয় করে'ই ফুটে উঠ্‌বে। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেই, সাবিত্রীশক্তির প্রকাশে বর্ণমাতৃকার মন্ত্র জাতির মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। বাণীর আরাধনায় নূতন নূতন শাস্ত্র, সাহিত্য ও সংহিতা রচনা করে' জাতিকে সত্যের সন্ধান দিতে হবে। লক্ষ্মীর আরাধনায় জাতির মধ্যে কুবেরের ঐশ্বর্য্য নামিয়ে আন্‌তে হবে। মহারাধা প্রেম-শক্তি। এই প্রেম-সিন্ধুতে অবগাহিত না হলে, আমাদের মধ্যে দিব্যসমাজের স্বপ্ন কখনও সফলকাম হবে না। এই পবিত্র প্রেমের বন্ধনের উপর ভিত্তি করে'ই গোষ্ঠী-জীবন, সমাজ-জীবন গড়ে' তুলতে হবে —তবেই সে সমাজ-জীবন আবার শান্তি ও আনন্দের লীলাভূমি হবে। মহারাধার পর—মহাদুর্গা অর্থাৎ রাষ্ট্র-শক্তি। আমাদের সমাজ-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র-জীবন আস্‌বেই। তাই রাষ্ট্র-শক্তি কি ভাবে আমাদের মধ্যে প্রকাশ হবে, তারই আভাষ আমি দিচ্ছি। আমার জীবন শেষ হতে চলেছে, আমি বহুবিধ বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে চলে' আজ বার্দ্ধক্যের দ্বারে এসে পড়েছি, হয়ত আমাকে বিদায় নিতে হবে, আমার মধ্য দিয়ে এই রাষ্ট্র-শক্তি প্রকাশ হবে কিনা তা জানিনা, তবুও এর একটা আভাষ আপনাদের দিই।

ভারতীয় সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করলে রাষ্ট্র আস্‌তে বাধ্য। আমাদের সংস্কৃতি বলেছে—পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না; 'ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি'—হিংসা-বিদ্বেষ, বাদ-প্রতিবাদ না করে'ও আমাদের যা' পাওয়ার তা' লাভ করতে পারি। Creative energy-র একটা প্রভাব আছে, একটা স্বচ্ছ গতি আছে। হিমালয় থেকে প্রবাহ যেমন সমস্ত বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে'ও আপন মনে সাগর-সঙ্গমে গিয়ে মিশে, গতিটাই তার উদ্দেশ্য, বাধা সম্মুখে থাকলে সে তার গতি-রেখা টেনেই চলে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য, তদ্রূপ সংগঠনের সাধকরাও বাদ-প্রতিবাদের কণ্ঠ লয় করে' দিয়ে নিজস্ব গতি নিয়েই চল্‌বে। বন্ধুগণ, আপনারা বিশ্বাস করুন—সৃজনের একটা শক্তি আছে; আর এই শক্তিই নিত্য, ধ্বংসের শক্তি সাময়িক, ক্ষণিক। সৃষ্টিই, মানবের মৌলিক সংস্কৃতি। কিছু ছিল না, নূতন করে' গঠন করছি তা' নয়, আমাদের সবই ছিল, সাধনা তাকে উদ্ধার করার জন্যই। সংগঠনের শক্তিকেই আমাদের জাগ্রত করতে হবে—এই সংগঠনের মধ্য দিয়ে জাতির রাষ্ট্রও আস্‌বে। ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে জাতির শিক্ষা, সাহিত্য, অর্থ, সমাজ যেমন পুষ্টিলাভ করে, তেমনিই রাষ্ট্র-স্বাধীনতাও আসতে বাধ্য। রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে জাতি কখনও বৃহৎ হ'তে পারে না।

উপসংহারে পুনরায় বলি—আমাদের জাতিকে জাগ্রত করার জন্য ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনাকেই আশ্রয় করতে হবে। নবদ্বীপ, হালিসহর, দক্ষিণেশ্বর ধর্ম্মের যে প্রেরণা জাতিকে দান করে' গেছেন, তাকে সার্থক করতে হলে আমাদের আরও অধিক দূর অগ্রসর হয়েই তা সার্থক করতে হবে। একটা ঈশ্বরপরায়ণ সংহতিবদ্ধ জাতি সৃষ্টি হোক, সেই জাতির momentum-ই আমাদের মধ্যে একটা অধ্যাত্ম-চেতনার জাগরণ আনবে, আমাদের মধ্যে নব প্রাণের সঞ্চার করে', জাতির মুক্তির নূতন পথের সন্ধান দেবে, জাতি আবার তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেই শ্রী, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হয়ে স্বপ্রতিষ্ঠ হবে।*

* ঢাকা নর্থব্রুক হলে অনুষ্ঠিত প্রবর্ত্তক রজত-জয়ন্তীর একাদশ সভায় শ্রীমতিলাল রায়ের অভিভাষণ।
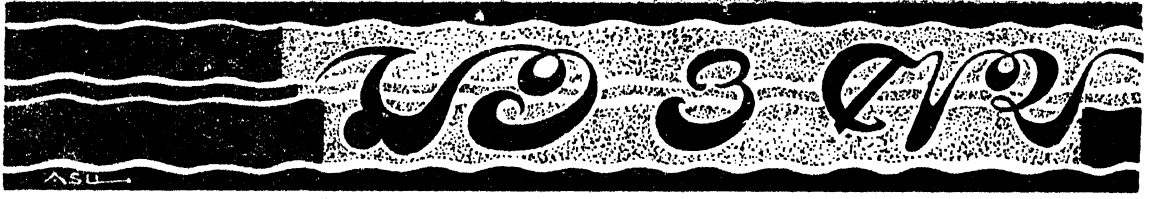
## বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি

বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া ভাল কি মন্দ, তাহা লইয়া মতামত প্রকাশ করা ধৃষ্টতা। মোটের উপর, এইটুকুই সহজভাবে বলা যায় যে, বর্ত্তমান রাষ্ট্রক্ষেত্রে আজ বহু রাজনৈতিক মতভেদ ও দলভেদ ঘটিয়াছে। কাজেই বাঙালী জাতির রাষ্ট্রনৈতিক মত ও সিদ্ধান্ত বলিয়া কিছু সরাসরি উপস্থাপন করা যায় না। বাংলার জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিও বিশেষভাবে এই সব ভিন্ন ভিন্ন মত ও দলের স্ব স্ব মনোদর্পণ মাত্র। কাজেই বাংলা-দেশের পত্রিকামুখে বাঙালীর জাতীয় রাষ্ট্রমত ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অভ্রান্ত জ্ঞান সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙালী আজ রাজনীতিক্ষেত্রে যেন মণিহারা ফণীর ন্যায় প্রতিভাহীন ম্লান চিত্তে কালহরণ করিতেছে। আমাদের রাষ্ট্রসাধনায় যেন সান্ধ্য গোধূলির ছায়া ধীরে ধীরে সবখানি ছাইয়া ফেলিতেছে। এ অবস্থা ভাল কি মন্দ, তাহা লইয়া বিচার করিতে আমাদের আগ্রহ নাই—কেন না, আমরা ভগবদ্বিশ্বাসী হিন্দু—সমস্ত ঘটনার পিছনে এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ কর্ত্তৃপুরুষের অব্যর্থ নিয়ন্ত্রণ-শক্তিই লক্ষ্য করিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি। বাঙালীর বর্ত্তমান অবস্থার মূলে শ্রীভগবানের মঙ্গলময়ী প্রেরণা নিশ্চয়ই নিহিত আছে। সে ইচ্ছা যতই নিগূঢ় ও আপাত দুর্ব্বোধ্য হউক, আমাদের মনুষ্যবুদ্ধি তাহা বুঝিতে ও ধরিতে না পারিলেও, শুভ বলিয়া মানিয়া চলিতে আমরা কুণ্ঠিত যেন না হই। দুর্দ্দিনে বুদ্ধিহারা না হইলে, আমরা একদিন অন্ধকারেই আলোর শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, দেখিতে পাইব।

## রাজনীতি ও অন্যনীতি

রাজনীতির ধার করা প্রদীপ আজ তেমন আলো না দিলেও, বাঙালীর জীবনগঠনের অন্যনীতি যে একেবারে নাই, তাহা আমরা স্বীকার করি না। বাংলার বাঁচার ইচ্ছা রাষ্ট্রক্ষেত্রে আজ হয়ত পথ হারাইয়াছে কিম্বা নূতন শক্তিময় পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না; এই অবস্থাটুকু স্বীকার করিয়াও আমরা জীবনের শক্তি-প্রয়োগের নানা ক্ষেত্র বাছিয়া লইতে পারি, ইহা কি সত্য নহে? বাঙালী যদি দশ বৎসর রাজনীতির একটী বর্ণও চর্চ্চা না করে অথচ আর সব ক্ষেত্রেই অথবা কোন একটী ক্ষেত্রেও তার বাঁচিবার প্রতিষ্ঠানটী সুদৃঢ়, অটল করিয়া তুলিতে পারে, আমরা বলিব—দুর্ভাবনার কোনই কারণ নাই। বাঙালী সেই ক্ষেত্রেই নূতন আশা ও সাধনার বীজ বপন করিয়া অভ্যুদয়ের শক্তি সংগ্রহ করিয়া লইবে। আমরা এমন একটী গঠনকর সঙ্কেতই "প্রবর্ত্তকে" বরাবর দিয়া আসিতেছি। ইহা জাতির জীবন-গঠনের সঙ্কেত। জীবন শুধু রাজনীতির আলোচনা ও আন্দোলনেই নিবদ্ধ নহে—জীবনের মূল, কাণ্ড ও পরিধি আরও দিগন্তবিস্তৃত, সীমাহীন। জীবন-সাধনার ভঙ্গীও বিচিত্র মূর্ত্তি লইয়া আবির্ভূত হইতে পারে। বাঙালীর সম্মুখে আজ সাময়িক কুজ্ঝটিকায় রাষ্ট্রীয় ভাগ্যাকাশ কিছু মলিন ও নৈরাশ্যকর হইলেও, বাংলার প্রাণশক্তি অন্য ক্ষেত্রে নানারূপে প্রদীপ্ত শিখায় ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে—কোথাও কোথাও ফুটিয়া উঠিতেছেও। সুতরাং বাঙালী অবস্থার পর্য্যালোচনায় হতবুদ্ধি না হইয়া, অন্তর্দ্দেবতার জাগ্রত সঙ্কেত ধরিয়াই ধীর স্থির মস্তিষ্কে নব নব কর্ম্মক্ষেত্রে পদসঞ্চার করিয়া অগ্রসর হইবে। বাঙালীর এই অগ্রগতি কেহই রুদ্ধ, প্রতিহত করিতে পারিবে না।

## উন্নতির নানা দিক্

আমাদের সম্মুখে উন্নতির নানা দিক্ই খোলা রহিয়াছে। বিশেষভাবে, কৃষি, শিক্ষা, সমাজ, শিল্প-বাণিজ্যের কথাই আমরা বলিব। বাঙালী এই সকল ক্ষেত্রেই এখনও তাহার বিধাতৃ-দত্ত অপূর্ব্ব প্রতিভা ও প্রেরণাশক্তি ঢালিয়া নূতন নূতন বিজয় লাভ করিতে

পারে। রাজনীতির জন্য রাজনীতির অনুশীলন করিতে গেলেই, উহা ক্রমশঃ স্বার্থমূলক সংঘাতকেই অধিক হইতে অধিকতর বড় করিয়া তুলে। পরন্তু স্ব-স্ব কৃষ্টি, শিক্ষা, সমাজ, শিল্প-বাণিজ্যের পরিকল্পনা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইলে, দেখা যাইবে, প্রাণশক্তির যদি অভাব না হয়, পথের বাধা ঠেলিয়া চলার শক্তি আপনিই স্ফুরিত হইতেছে। জীবনের ক্রিয়াশক্তি—তথা সৃষ্টিশক্তিকেই পুরোভাগে স্থাপন করিয়া চলিতে চলিতে গতির বেগই পথ সৃষ্টি করিয়া লয়—ইহা অভিজ্ঞতার কথা। শক্তি-প্রয়োগেই শক্তিবৃদ্ধি পায়। এইরূপে কার্য্যশক্তির ক্রমপ্রসারে প্রাতিকূল্য দূরীভূত হইয়া সুযোগ ও অবস্থার আনুকূল্যই সঞ্চারিত হয়। ইহা তপস্যার সঞ্চয়—কাজেই সে সুযোগ-সুবিধা কেহই হরণ করিতে পারে না। অবিশুদ্ধ তপস্যা যেখানে, সেইখানেই তাহার আহৃত ফল অন্যে আকর্ষণ করিয়া লয়—যজ্ঞের হবিঃ কুকুরে ভোজন করে। কিন্তু সত্য তপস্যার দান বিধাতার অভিপ্রায়-চ্যুত করিতে কেহই সমর্থ নহে। ইহা অকাট্য ঐতিহাসিক সত্য। যেখানে ইহার অন্যথা ঘটে, সেখানে তপস্যার বীর্য্যে গ্লানি ও অশুচিতা নিশ্চয়ই লক্ষ্যে পড়িবে।

বাংলার স্বদেশীযুগের প্রথম প্লাবনে যে শুদ্ধ প্রেরণাশক্তি জাতির জীবনে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা "Settled fact unsettled" করিয়া, সমগ্র জাতির সঙ্কল্পকেই বিজয়যুক্ত করিয়াছিল। বাংলার বিপ্লবযুগের রক্তময় তপস্যার সুফল বাঙালী হিন্দু আহরণ করে নাই—তাহার কারণ বৈপ্লবিক সাধনার প্রকৃতি-বিকৃতির মধ্যেই নিহিত ছিল। আজও হিন্দু-মুসলমানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় চেতনার ক্ষোভ ও বিকৃতিই পরিলক্ষ্য হয়। আমাদের আশা—বাঙালী জাতি চিন্তায় ও কর্ম্মে শুদ্ধ পবিত্র তপস্যাপরায়ণ হইবে। সেই বিশুদ্ধ প্রকৃতির তপস্যাই অবধারিত সকল ক্ষেত্রে কর্ম্মসিদ্ধি আনয়ন করিবে। জাতীয় জীবনের সমস্যাগুলি আমাদের এই আলোকেই নূতন চক্ষে দেখিতে হইবে।

## বাংলার তাঁত-শিল্প

সেদিন যন্ত্রশিল্প বনাম কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহার একদেশদর্শী অভিমতের আমরা মৃদু প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি বিশ্বভারতীর অর্থনৈতিক গবেষণাবিভাগের সম্পাদক ডাঃ সুধীর সেন কলিকাতা কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের এক বক্তৃতায় আমাদের অভিমতের সমর্থন করিয়াই বলিয়াছেন—দেশের কুটীর-শিল্পসমূহের নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রকে অব্যাহত রাখিয়াই যান্ত্রিক-শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা উচিত। তিনি বলেন—এতদিন দেশে কল-কারখানা গড়িবার চেষ্টায় এ বিষয়ে সুসঙ্গত নীতি রক্ষা করা হয় নাই। আমরা দেশের প্রচলিত পল্লীশিল্পগুলি—যাহা আশ্রয় করিয়া এখনও পল্লীবাসী শিল্পিগণ জীবিকার্জ্জন করিতেছে—তাহারই স্থলে যন্ত্রশালাপ্রতিষ্ঠায় জোর দিয়াছি; পরন্তু নূতন প্রয়োজনীয় শিল্পের জন্য কল-কারখানার সৃষ্টি করিতে তেমন আগ্রহান্বিত নহি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বক্তা তাঁত-শিল্পের বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, ভারতের কুটীরশিল্পগুলির মধ্যে তাঁত-শিল্পই সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু নানা প্রতিকূল অবস্থার সূচনায় এই শিল্পে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। বাংলায় গত ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তন্তুবায় ছিল ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তাহা কমিয়া ১ লক্ষ ৭২ জনে দাঁড়ায়। তাঁতীদের এই দুর্দ্দশার মূলে, যে সকল বিশেষ অসুবিধা আছে, তন্মধ্যে সূতা ও রঙের দুর্ম্মূল্যতা অন্যতম প্রধান কারণ। শ্রীযুক্ত সেনের মতে, আমরা কলে কম মূল্যে সূতা উৎপাদন ও তাহা করাইয়া যদি তাঁতীদের সরবরাহ করিতে পারি, তাহাতে তাঁত-শিল্পের গুরুতর সঙ্কট দূর হইয়া শিল্পটী সুরক্ষিত হয় ও বঙ্গের বস্ত্র সমস্যার সমাধানে কুটীর-শিল্প ও যন্ত্রশিল্প সঙ্গতভাবেই স্ব স্ব স্থান পরিগ্রহ করিতে পারে। আমরা এই নীতি যুক্তিপূর্ণ বলিয়াই মনে করি ও বঙ্গীয় কৃতী মনীষিগণের দৃষ্টি এই দিকেই আকর্ষণ করি।

## তাঁত-শিল্পের অন্য বিপদ্

এই তাঁত-শিল্প প্রসঙ্গে আমরা নিখিল-বঙ্গ কাটুনী সঙ্ঘের বঙ্গীয় শাখার সম্পাদক শ্রীঅন্নদাপ্রসন্ন চৌধুরীর বিবৃতিটুকুর এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। শ্রীযুক্ত চৌধুরী বলেন যে, ভারতে কৃষির পরেই তাঁত-শিল্পেই অধিক লোক জীবিকা-নির্ব্বাহ করে; কিন্তু কলের

প্রতিযোগিতায় ও অন্যান্য কারণে ইহার দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে। তিনিও দেখাইয়াছেন—১৯১১ খৃষ্টাব্দে বাংলায় যেখানে ২ লক্ষ ৯ হাজার ৪৫ জন তাঁতী ছিল, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সেইখানে তাহাদের সংখ্যা হইয়াছে ১ লক্ষ ৯২ হাজার ৪৪০ জন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এই একই প্রকার অবস্থা দেখা যায়। বোম্বাইএর কমার্স পত্রের প্রদত্ত সংখ্যা হইতে বুঝা যায় যে, গত ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতে তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ের পরিমাণ ছিল ১৯২ কোটী গজ; পরন্তু ১৯৩৯-৪০-এ উহা হ্রাস পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ১৮১ কোটী গজ। এই অবনতির স্রোতঃ প্রতিরোধ করার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহের তাহার দ্বিগুণিত পরিমাণ অর্থসাহায্যও কার্য্যকরী হইতেছে না। ইহার উপর, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট বিক্রয়-কর বসাইয়া তাঁত-শিল্পের আরও অধিক ক্ষতির পথ প্রশস্ত করিতেছেন—সত্যই ইহা গভীর ও গুরুতর পরিতাপের বিষয়।

বঙ্গীয় মন্ত্রিমণ্ডলের জানা উচিত যে, বোম্বাই ও মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট স্ব স্ব প্রদেশে প্রচলনীয় বিক্রয়-কর আইনে তাঁতশিল্পকে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়াই স্থির করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চৌধুরী হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাংলায় উৎপন্ন বার্ষিক ৫ কোটী ১১ লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্র—যাহা শতকরা ৭৫ ভাগই মহাজনগণের মারফৎ বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহার শতকরা ৫০ ভাগই বিক্রয়-করের খর্পরে পড়িবে ও মহাজনগণের কৌশলে করের বোঝা দরিদ্র তাঁতীদের উপরেই চাপিবে। সুতা-সরবরাহকারিগণও তাহাদের করের অংশ তাঁতীদেরই উপর ফেলিবে। ফলে বাংলার তাঁতী ও তাঁত-শিল্প যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

শ্রীযুক্ত চৌধুরীর মতে, এইভাবে আদায়ী করের আয় বার্ষিক মাত্র পৌনে চারি লক্ষ টাকার বেশী হইবে না। এই সামান্য লাভের লোভে বাংলা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে দেশের এই প্রাচীন শিল্পটীকে পীড়িত ও নষ্ট করা কোন-মতেই সমীচিন নহে। বিক্রয়-কর বহু দিক্ দিয়া অর্থ-নীতিজ্ঞগণের সমালোচনার ভাজন হইয়াছে। তাঁত-শিল্পের সর্ব্বনাশও আর একটী গুরুতর আপত্তিকর কারণ—শ্রীযুক্ত চৌধুরীর যুক্তি ও তথ্যে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। তবুও কি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এই অসতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হইবেন?

## মক্তব ও হিন্দুশিক্ষা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের প্রশ্নোত্তরে জানা গেল—বাংলার প্রত্যেক জেলাতেই মক্তবসমূহে হিন্দু ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণা, নোয়াখালি, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রঙ্গপুর, ফরিদপুর, বগুড়া ও রাজশাহীর মক্তবগুলিতে ৭৪৮, ৭৩১, ২৪৬২, ৮২৫, ৬৮৩, ২৭৩, ১৮৫৪, ৩৩০৬, ৯৬০, ১০০১, ৭৭৭ ও ৬৯৫ জন হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা যথাক্রমে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ২২১৯, ৩২১৬, ৭৩৮৮, ২৩১২, ১১৮৬, ৮২৯, ৯৫৭৬, ৬৫৬১, ১৫৬৯০, ২৫৩৬, ১৪৫৫ ও ১০১৭ সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে। একুনে ১৩৩৮ সালের ৩২,১৪৯ জন হিন্দু ছাত্র যেখানে মক্তবে পড়িত, সেখানে ১৩৩৯ সালে ৭৪৫০৬ জন পড়িয়াছে। এই ছাত্রবৃদ্ধির কারণ—স্থানীয় সাধারণ বিদ্যালয়ের অভাব। মক্তবে হিন্দু ছাত্র হিন্দু কৃষ্টিমূলক শিক্ষা নিশ্চয়ই পায় না—সাধারণ বিদ্যালয়ে যাহা পাইত, তাহাও পায় না। মক্তবের বিশেষত্ব কিছু আছে বলিয়াই তাহা মক্তব, সাধারণ বিদ্যালয় নহে—সুতরাং ইহাতে পড়িলে হিন্দু ছাত্রের কোন ক্ষতিবৃদ্ধির কারণ নাই, এইরূপ বলা চলে না। জাতীয় গভর্ণমেণ্ট হইলে, তাহা মক্তবের এইরূপ ছাত্রবৃদ্ধিতে, সাধারণ বিদ্যালয়ের অভাব বুঝিয়া, সাধারণ পাঠশালা ও স্কুলের সংখ্যা বাড়াইবার ব্যবস্থায় অবশ্যই অবহিত হইত। তাহা না করায় পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা আপনিই আসিয়া পড়ে। জাতীয় গভর্ণমেণ্টের অভাব যেখানে, সেখানে হিন্দুকে বাধ্য হইয়া হিন্দুর কৃষ্টিরক্ষা লক্ষ্য রাখিয়া স্বতন্ত্র সাধারণ বিদ্যালয় অথবা হিন্দু বিদ্যালয় খুলিতে হইবে। হিন্দুর প্রাণশক্তি এখনও যাহা আছে, তাহাতে ইহা অসম্ভব মনে হয় না। গ্রামে গ্রামে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীর প্রাথমিক শিক্ষায়তন প্রবর্ত্তন করা—আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন হিন্দুজাতির পক্ষে কোন মতেই দুঃসাধ্য মনে করা যায় না। হিন্দু-তরুণগণ দেশসেবার, স্বজাতি ও সমাজসেবার এই প্রকৃষ্ট সুযোগ গ্রহণ করেন না কেন?

### গণনায় গলদ

বর্ত্তমান লোক-গণনার ফলাফলের জন্য হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলকেই ধীর চিত্তে অপেক্ষা করিতে হইবে। এখনই অনুমান ও আশঙ্কামূলক নানা তথ্য উত্থাপন করিয়া পরস্পর আক্রমণ সুবুদ্ধির লক্ষণ নহে। কিন্তু অতীতের লোকগণনায় সংখ্যার ভুল কেহ যদি প্রদর্শন করেন, তাহা বিবেচনার বিষয় হয়। সংখ্যাতত্ত্ববিৎ শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত সহযোগী "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় এইরূপ একটি রহস্যময় ভুলের সন্ধান দিয়াছেন। ভুলটী বিস্ময়কর, সন্দেহ নাই। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ১ হইতে ৫ বৎসর বয়স্ক মুসলমান শিশুর সংখ্যা ছিল ১৭,২৫,১২৫ জন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সেন্সাসে দেখা যায়, ১১ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক মুসলমান বালকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৮,১৬,৫৪৯ জন। দশ বৎসরে একজন মুসলমান শিশুও যদি না মরিয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহাদের সংখ্যা সমান থাকিবে, বাড়িতে পারে না। কিন্তু দেখা যাইতেছে—মুসলমান শিশু প্রায় লক্ষাধিক বাড়িয়াছে। ইহা প্রহেলিকা নহে কি?

তারপর, ১৯২১-এর ১৫-২০ বয়স্ক ১১,৪৩,৯৯৬টী মুসলমান কিশোর ও ঠিক ১০ বৎসর পরে একজনও না মরিয়া, ১৯৩১-র সেন্সাসে দাঁড়াইয়াছে ১২,৪৭,৪৬১ অর্থাৎ ১,০৩,৪৬৫ জন বেশী। আশ্চর্য্য নহে কি? ঠিক একই ধারায়, ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২০-২৫ বর্ষীয় ৯,৬৬,৭৭৪ মুসলেম যুবক ১৯৩১-এ একজনও না কমিয়া ১১,৪৬,৫৩০ জন্ম পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ ১,৭৯,৭৫৬ জন বৃদ্ধি—তাজ্জব ব্যাপার, সন্দেহ নাই। কাজেই সরকারী একচুয়ারী মিঃ এইচ্, জি, ডবলিউ মেকিকিলকে মন্তব্য লিখিতে হয় —মিথ্যা গণনার হারটা মুসলমানের দিকেই বেশী 'generally the rates of mis-statement are greater amongst Mahommedans than amongst Hundus.'

এই সংখ্যার ফাঁকির উপর যদি কমিউন্যাল এওয়ার্ডের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে, তবে সে মিথ্যার বাঁধ সত্যের প্লাবনে একদিন ধ্বসিয়া যাইবেই। সুতরাং যে আদমসুমারীর নির্ভুল গণনার উপরে বাংলার রাজনীতিক কাঠামটাই নির্ভর করিতেছে, তৎসম্বন্ধে হিন্দু বাঙালী যে এবার কংগ্রেসী কুয়াশায় অবহেলা করেন নাই, ইহা খুবই সমীচিন হইয়াছে। আমাদের আশা—সত্যের প্রকাশই আমরা দেখিতে পাইব। সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।

### ভারতের ফরাসী ভাষা

যুক্ত প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ পাওয়েল প্রাইস বলিয়াছেন—"বাংলাকে আমি ভারতের ফরাসী বলিয়া মনে করি।" আমরাও জানিতাম—পৃথিবীর তিনটী মাত্র ভাষা ও সাহিত্য মিষ্টতায় ও রস-মাধুর্য্যে পরস্পর তুলনীয়—বাংলা, ফরাসী ও ফার্সী বা পার্শিয়ান। মিঃ পাওয়েল সত্য প্রশংসাই করিয়াছেন—তাঁহার গুণগ্রাহিতার আমরাও তাই প্রশংসা করিব।

কিন্তু এই অতুলনীয় ভাষা ও সাহিত্য তাঁহারই সরকারী শিক্ষাক্ষেত্রে যথাযোগ্য মর্য্যাদা পাওয়া দূরে থাক, উহা যাহাদের মাতৃভাষা ও মাতৃ-সাহিত্য, তাহারাই পড়িবার অধিকার পায় না কেন? এ অবিচারের প্রতিকার করিতে পারিলে, মিঃ পাওয়েল প্রাইসের শিরে আমরা পুষ্পচন্দনবৃষ্টিরই আবাহন করিব।

---

# শ্রীমতিলাল রায় ও প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

আজ (ঢাকা প্রবর্ত্তক রজত জয়ন্তী উৎসব-সভায়) মতিবাবু মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় যে ভাবে ভারতীয় সাধন-তত্ত্ব ও সঙ্ঘের উচ্চ ভাব ও আদর্শের কথা ব্যক্ত করলেন, তা' শুনে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের কার্য্যাবলীর বিষয় আমরা পূর্ব্বে কিছু কিছু শুনে থাকলেও, এমন সুনিপুণ ভাবে আদর্শের মূল-মন্ত্রের বিশ্লেষণ কখনও শ্রবণ করার সুযোগ হয় নাই। তাঁর প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে একটা আদর্শ আছে জানতুম, কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় আজিকার দিনের মত কখনও আমরা পাই নাই।

জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, এক একটা আদর্শের জন্য বহুলোক তাদের জীবনের সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করে' উহাকে সার্থক করে' তুলেছে। আপনারা মতিবাবুর মুখে শুনেছেন যে, ৩০ বৎসর পূর্ব্বে মানবের কল্যাণের জন্য

সেবা দিবার প্রেরণা তিনি লাভ করেন। এই দীর্ঘ ৩০ বৎসর বাংলা দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি জাতির নানা সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা করে' আস্‌ছেন। তিনি যে উচ্চ অধ্যাত্মস্তরে অবস্থান করছেন ও যে স্তর থেকে এই সব ধর্ম্মের তত্ত্ব-বিশ্লেষণ করে' আমাদের বুঝাবার প্রচেষ্টা করেছেন, সেই গভীর ও উচ্চ স্তরে না পৌঁছালে সাধারণ মানুষের পক্ষে এই সকল বাণী সম্যক্ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না, কিন্তু তবুও সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী যদি তাঁর বাণীকে মনের মধ্যে গ্রহণ করে', তার বিষয়ে চিন্তা করে' তাকে গ্রহণের চেষ্টা করেন তা'হলে আমার বিশ্বাস তাহা তাঁদের জীবনে কতকটা কার্য্যকরী করে' তুলতে পারবেন ও মতিবাবুর এখানে আসা ও অদ্যকার বক্তৃতা প্রদান করা কথঞ্চিৎ সার্থক হবে।

আপনারা শুনেছেন—তাঁর সকল কথার পশ্চাতে রয়েছে বৈদিক ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করে'ই জাতীয় জীবনকে সংগঠন করে' তোলা। সংগঠনের মূল ভিত্তি—বৈদিক ধর্ম্ম। এই সকল কথা শ্রবণ করে' অনেকের মনে খট্‌কা লাগ্‌তে পারে যে, ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করে' সংগঠনরূপ কাজ কি করে' সম্ভব হয়! কারণ আমরা জীবনটাকে খণ্ড খণ্ড ভাবেই দেখে আস্‌ছি। একটা করলে অপর দিক্‌টা থেকে আমরা দূরে পড়ে' যাই। সাধারণতঃ দেখা যায়, ধর্ম্মের সঙ্গে জীবনের সংযোগ খুব কমই রক্ষিত হয়। আপনারা নিয়তই লক্ষ্য করেছেন—আমাদের দেশে বহু লোক ধর্ম্মাচার অনুসরণ করে' চলে, ধর্ম্মের আচারপরায়ণতা ও তৎপ্রতি নিষ্ঠা বাইরের দিক্ থেকে দেখা যায়, কিন্তু তাদের জীবন-প্রকাশের ক্ষেত্রে, তাদের কর্ম্ম-জীবনে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ লক্ষ্যে পড়ে। ধর্ম্মের সঙ্গে তাদের কর্ম্মের আচার আচরণের কোন সামঞ্জস্য যে নেই, কর্ম্মটা একটা বাহ্যিক আচার মাত্র, তা' থেকে বোঝা যায়। আমরা জীবনটাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখ্‌তে শিখেছি—ধর্ম্মের সঙ্গে অখণ্ড জীবনের সামঞ্জস্য রক্ষা করে' চলাই যে জীবনের বড় সত্য তাহা আমরা ভুলে গেছি।

মতিবাবু তাঁর সমস্ত কথার মধ্যে একটা পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলেছেন,—কোন কিছুকে বর্জ্জন করে' নয়, সব কিছুকে গ্রহণ করে'ই আমাদের ধর্ম্মজীবন যাপন করতে হবে। আমাদের প্রাচীন ভারতের মহাপুরুষগণও জীবনকে বাদ দিয়ে ধর্ম্ম-জীবন স্বীকার করেন নি, সংসার-বৈরাগ্য, মোক্ষ তাঁদের জীবনের আদর্শ ছিল না, তাঁরা চেয়েছিলেন মানবের সকল বৃত্তিরই পরিপূর্ণ স্ফুরণ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলে' গেছেন—নিয়ত কর্ম্ম করবে; নৈষ্কর্ম্ম্যকে তিনি প্রশ্রয় দেননি—কিন্তু সকল কর্ম্মের মধ্যে থাকবে ভগবানে সমর্পণ। আমরা যা' কিছু কর্ম্ম করব, আমাদের জীবন দিয়ে যত বড় কর্ম্মই প্রকাশিত হোক্‌না কেন, তাহা ভগবানের দিকে মুখ করে'ই করতে হবে। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম—যাহাই প্রকাশ হবে কোনটাকেই, জীবনের প্রবৃত্তিকে নিরোধ করবে না। এক সময়ে বৌদ্ধবাদ এসেছিল—জীবনের সকল প্রবৃত্তিকে নিরোধ করে' শূন্য, লয়ের আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরেছিল—এই আদর্শবাদও পরবর্ত্তী যুগে তাহার প্রভাব আমাদের জাতির শ্রেয়ঃ বিধান করে নাই, জাতির পরিপূর্ণ বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। মতিবাবু যে অখণ্ড জীবনের আদর্শের কথা নূতন আলোপাত করে আমাদের বলেছেন—যাহার ভিত্তি আমাদের প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম, তাহাতে আমাদের মনে আশার সঞ্চার হবে। কারণ এইটা শুধু তাঁর বক্তৃতায় ধর্ম্মের বিশ্লেষণ করা নয়, তিনি তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়ে তাহা প্রমাণ করেছেন। তিনি ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করেই বহুবিধ অর্থ-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাকেন্দ্র ও বহুজনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।

আপনারা শুনেছেন—তিনি এই মাত্র উল্লেখ করেছেন ৩০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি প্রেরণা লাভ করেছিলেন—'আমার সাধনা শুধু আমার জন্য নয়, জাতির সেবার জন্য'। এই প্রেরণাকে আশ্রয় করে'ই তিনি জাতির সেবায় আত্মদান করে' আমাদের একটা নূতন এবং জীবন্ত পথ প্রদর্শন করতে সমর্থন হয়েছেন—যে জীবনের আদর্শ বৈরাগ্য ও ইহবিমুখ হবে না, সকল প্রবৃত্তিকে নিয়েই আমরা কার্য্য করব, কিন্তু সে কার্য্য হবে ঈশ্বরমুখী। মানুষ শুধু আত্মস্বার্থ, আত্মভোগ, নিয়ে সংসারে বসবাস করলে, জগতে প্রকৃত কল্যাণ ও শান্তি আস্‌তে পারে না। এই যে বিশ্ব-সংগ্রামের খবর আপনারা পাচ্ছেন—যাহার ভয়াবহ ধ্বংসলীলা আমাদের চক্ষের সম্মুখে ভেসে উঠে, তাহার শেষ কোথায়,

পরণতি কোথায়? একদিকে আমাদের দেশ ধর্ম্ম-সাধন করতে গিয়ে যেমন বৈরাগ্যকে আশ্রয় করেছে, ইহবিমুখ হয়েছে, আবার অন্যদিকে পাশ্চাত্য দেশ এমন ঘোরতর জড়বাদী হয়ে পড়ছে যে, পরস্পরের মধ্যে সংগ্রাম, বিরোধ অনিবার্য্যরূপে দেখা দিয়েছে। আমার মনে হয়—এই সমস্যার সমাধানের উপায়—অধ্যাত্ম-জীবন ও জড়-জীবনের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যবিধান। প্রকৃত অধ্যাত্ম-জীবনের উপর ভিত্তি করে' যদি জীবন অনুসৃত হয়, মানব যদি একান্ত আপনার দিকেই শুধু লক্ষ্য রেখে চলতে না শিখে, মানব-কল্যাণের দিকেও তার লক্ষ্য থাকে, তবেই বিশ্বের সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বের একটা অবসান আসবে।

পূর্ব্বেই বলেছি, প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ যে সব কর্ম্মসৃষ্টি করে' তুলেছেন, তাহা প্রাচীন বৈদিক কৃষ্টির উপর ভিত্তি করে'ই গড়ে' উঠেছে। যে মহান্ আদর্শে মতিবাবু তাঁর নিজস্ব ও সঙ্ঘের জীবন গড়ে' তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন ও দীর্ঘ দিন ধরে' সেই পথ অনুসরণ করে' একটা নূতন আলো ও সন্ধান দিতে পারছেন, তাহা আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই আদর্শ ও বাণী—গীতায় তাহা প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি তাহা জীবনে রূপ দিয়েছেন ও জাতিকে সেই পথে চলার নির্দ্দেশ দিতে দিতে চলেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী—ঈশ্বরের দিকে চেতনা রেখে আমাদের কর্ম্ম করে' যেতে হবে, জগতের সকল কর্ম্মই জীবন দিয়ে প্রকাশিত হবে, কিন্তু ভগবানের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি তাহা সম্পন্ন হয়, তাহা হলে ইহাই হবে পরম বৈরাগ্য।

মতিবাবু যে উচ্চ আদর্শের সম্ভাবনীয়তা তাঁর জীবনে সম্ভব ক'রে তুলেছেন, ধর্ম্ম ও কর্ম্মের মধ্যে যে সামঞ্জস্য সম্ভব তাহা প্রমাণিত করেছেন, তাহা আজ আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে না পারলেও, আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যৎ জাতি এই মহান্ আদর্শে অনেকখানি অনুপ্রেরণা পাবে। ইহা ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। একটা কোন আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করতে গেলেও তাহা মানুষের মধ্যে কার্য্যকরী করে' তুলতে সময়সাপেক্ষ, সন্দেহ নাই; কিন্তু এ সত্য আদর্শ কখনও অপ্রকাশ থাকে না, একদিন তাহা মানবজীবনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবেই। মতিবাবু আমাদের প্রাচীন আদর্শকে নূতনভাবে, নূতন আলোতে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উত্থাপিত করেছেন। প্রত্যেক বঙ্গবাসীর কর্ত্তব্য—তাঁর প্রদত্ত এই আদর্শ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করে' তাহা পরিপূর্ণ পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ হওয়া। যত অধিক লোক আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে, যত অধিক লোক সেইদিকে অগ্রসর হবে, ততই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা হবে। তিনি তাঁর বক্তৃতায় পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন—ধ্বংস নয়, সৃজন—সৃজনের একটা মহাশক্তি আছে, যাহার মধ্য দিয়া জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হবে। বিশ্বে আজ যে ঘোরতর সমস্যা দেখা দিয়েছে, যার সমাধান আমাদের চিন্তায় আসে না, আমার মনে হয়, যদি জাতি এই সৃজনের বাণী গ্রহণ করে ও সমস্ত সৃষ্টিকরী শক্তি মানবের কল্যাণে নিয়োজিত করে, তবে মতিবাবুর এই সংগঠন-মন্ত্র দ্বারা শুধু আমাদের দেশ প্রবুদ্ধ হবে না, পৃথিবীর ঘোর সমস্যার একটা সমাধান হবে।

তিনি বৃদ্ধ বয়সে এই বৎসর বাংলার ১২টী জিলায় ঘুরে তাঁর বাণী প্রচার করছেন, পরে তাঁর বাণী সমগ্র বাংলায় ও বাহিরে প্রচারিত হয়ে পড়বে। জীবনের অবসানে তিনি যে বীজ বপন করে' চলেছেন, আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস, ইহা একদিন বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়ে সমস্ত দেশকে পরিব্যাপ্ত করে তুলবে।*

* ঢাকা নর্থব্রুক হলে অনুষ্ঠিত প্রবর্ত্তক রজত-জয়ন্তী উৎসবের একাদশ অধিবেশনের সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অভিভাষণ।

# সমালোচনা
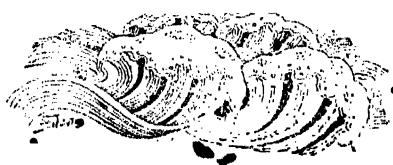
**ভালো নয় মন্দ নয়,** ( উপন্যাস ), **স্বামী নেই বাড়ী** ( গল্প সমষ্টি ) ও **ছোট আকাশ** ( উপন্যাস ) ; আশু চট্টোপাধ্যায় লিখিত এবং অগ্রগতি প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাব্‌লিশিং ওয়ার্কস্ পি, ৪০৯ মুদিয়ালি রোড্, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

আধুনিক গল্প ও উপন্যাস লেখকদের মধ্যে আশু চট্টোপাধ্যায় একটি বিশিষ্ট আসন করিয়া লইয়াছেন। সাম্প্রতিক ইয়োরোপীয় রচন-ভঙ্গী বাঙালী লেখকদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; তদুপরি ইয়োরোপীয় আদর্শে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাগুলিকে গল্পের কাঠামোর রূপান্তরণের একটা প্রয়াস পরিলক্ষিত হইতেছে। বাংলা সাহিত্যের পক্ষে ইহা ভালো কি মন্দ, তাহার বিচার করিবার উপযুক্ত সময় এখন নহে। তবে, পাশ্চাত্য ভাবধারা যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কায়েমী প্রতিষ্ঠা পাইতেছে, আশু চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় তাহার পরিচয় পাইয়া থাকি।

ফর্ম-এর দিক দিয়া, আশু চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের অনুবর্ত্তী। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন অপেক্ষা বর্ণিত চরিত্রগুলির পারস্পরিক ভাব-সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই, এবং মুখ্যতঃ কথোপকথনের সাহায্যে গল্পকে পরিণতিতে লইয়া যাওয়ার মধ্যে লেখকের যে একটি শিল্প-সম্মত নিরাসক্তি থাকা প্রয়োজন, আলোচ্য পুস্তকগুলিতে তাহা পাইয়া থাকি। সেইজন্যই, প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রই স্বতন্ত্র হইয়া উঠিতে পারিয়াছে।

লরেন্স-এর মত ব্যক্তিসর্ব্বস্বতার ও সামাজিক শুচিত্বের অপচয়ের বর্ণনা আশু চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। মার্ক্সীয় শাস্ত্রে তিনি শ্রদ্ধাবান্ নহেন ; সার্ব্বভৌম সমাজের সম্ভাবনায় তিনি সন্দিহান।

প্রগতিবাদী সাহিত্য বলিতে যাঁহারা সমাজগত শ্রেণীবিরোধের এবং প্রোলেটারিয়েটের জয়জয়কারকেই বুঝিয়া থাকেন, তাঁহারা আশু চট্টোপাধ্যায়কে প্রগতিবাদী বলিবেন না। স্বীয় পারিপার্শ্বিক সমাজের এবং সমাজজাত আদর্শের সম্পর্কে লেখক যেন হতাশাই পোষণ করেন।

রচনার সাবলীল ভঙ্গীর জন্যই, লে[illegible]মূলগত হতাশা পাঠককে বিশেষ পীড়া দেয় না। এবং অনাবশ্যক দার্শনিকতায় ভারাক্রান্ত না হওয়ায় নিছক গল্প হিসাবে রচনাগুলি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

**শ্রীনির্ম্মলকুমার ঘোষ**

**গীতা** ( পদ্যে বঙ্গানুবাদ )—মূল সংস্কৃত সহ—শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত। ৩১নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরণেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৪৬। পৃষ্ঠা ৪+২৫৬। কাপড়ে বাঁধাই, রূপালী জলে নাম লেখা—মূল্য ১।০

প্রাচীন আর্য-সম্প্রদায়-মতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বেদান্ত দর্শনের 'স্মৃতি-প্রস্থান'। 'শ্রুতি-প্রস্থান'—উপনিষৎ, 'স্মৃতি-প্রস্থান'—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ( উপনিষৎ ) ও 'তর্ক-প্রস্থান'—ব্রহ্মসূত্র—এই প্রস্থানত্রয়ের উপর ব্যাখ্যা রচনা ব্যতীত 'বেদান্তাচার্য্য' পদে উন্নীত হওয়া যায় না; সেই হেতু দ্বৈত-বিশিষ্ট-দ্বৈত-অদ্বৈত প্রভৃতি বেদান্তাচার্য্যগণ সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ানুসারে গীতার ভাষ্য-বৃত্তি টীকা-টিপ্পনী প্রভৃতি রচনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক ভারতীয় সুধীবৃন্দও তাঁহাদিগেরই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নানারূপ অনুবাদ ব্যাখ্যা প্রভৃতি রচনায় মনোনিবেশ করিয়া আসিতেছেন। ফলতঃ, এই অমূল্য গ্রন্থখানির নানাভাবে সাধারণ পাঠকসমাজে যতই প্রচার হয়, ততই মঙ্গল।

সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিবার রীতি প্রধানতঃ তিন প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে—(১) মূলের আক্ষরিক অনুবাদ, (২) ভাবানুবাদ ও (৩) ব্যাখ্যামুখে অনুবাদ। সাধারণতঃ মূল গ্রন্থ সরল ও সরস হইলেও, তাহার মধ্যে শ্লেষ প্রভৃতি বচোভঙ্গী না থাকিলে মূলের আক্ষরিক অনুবাদই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মূল সংস্কৃত যদি দুরূহ শব্দালঙ্কার-বহুল ভাষায় রচিত হয়, তাহা হইলে উহার ভাবানুবাদই প্রশস্ত। পক্ষান্তরে, যে স্থলে মূলের ভাষা প্রাঞ্জল ও আড়ম্বরবিহীন, অথচ উহার অর্থ অতি গভীর, সে স্থলে ব্যাখ্যামুখে অনুবাদ কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শেষোক্ত শ্রেণীর গ্রন্থ। উহার প্রসন্নগম্ভীর পদাবলী মধ্যে যে গভীর হইতে গভীরতর ভাবরাশি নিহিত আছে, তাহা কেবল আক্ষরিক অনুবাদের ( বিশেষতঃ সে অনুবাদ যদি আবার পদ্যানুবাদ হয় ) দ্বারা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিয়া দেওয়া অসম্ভব। এই কারণে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যামুখে যে অভিনব পদ্যানুবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাকে স্বাগতাভিনন্দন জানাইতেছি।

ব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত দিতে হইলে সমালোচনার কলেবর দীর্ঘ হইয়া উঠে। মোটের উপর বলা যায় যে, অনুবাদক মহাশয়ের রসবোধ আছে, ছন্দোবৈচিত্র্যে বিশিষ্ট অধিকার আছে, কাব্যরচনায় নৈপুণ্য আছে, শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রবিশ্বাসেরও অভাব নাই। পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের সমুচ্চয় কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য সামান্য অপূর্ণতা, পাদটীকার ন্যূনতা, বা মুদ্রাকর প্রমাদ-জনিত বর্ণাশুদ্ধি পাঠকের দৃষ্টিতে পড়িবে; কিন্তু সেগুলি বিশেষ মারাত্মক বা গ্রন্থ-সৌন্দর্য্যের হানিকর নহে। অচিরে গ্রন্থখানির সাধারণ পাঠকসমাজে বহুল প্রচার কামনীয়।

**—শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী**

**"দর্শন-পরিচয়"**—শ্রীগোপালচন্দ্র সেন বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক সঙ্কলিত এবং গৌরীসেন গ্রন্থ-মন্দির, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা।

আলোচ্য "দর্শন-পরিচয়" নামক গ্রন্থখানি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি। মাত্র আড়াই শত পৃষ্ঠার মধ্যে গ্রন্থকার বৈদিক দর্শন, ছয়টি আস্তিক দর্শন, বেদান্ত দর্শনের অন্তর্গত শঙ্কর-রামানুজ-মধ্ব-বলদেবের সম্প্রদায়, শৈব দর্শনের মধ্যস্থিত নকুলীশ পাশুপত দর্শন, প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন, ও রসেশ্বর দর্শন, পানিনি দর্শন, নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ান্তর্গত লৌকায়ত (চার্ব্বাক্) আর্হত ও বৌদ্ধ দর্শন ও পরিশেষে ভারতীয় ভাব দর্শন-সম্প্রদায়ভুক্ত নাথপন্থ, সিদ্ধাচার্য্য সম্প্রদায়, সহজিয় পন্থ, পদাবলী-ভাবসঙ্গীত, দোঁহা-গীতি-তত্ত্ব, তান্ত্রিক সাধক সম্প্রদায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রভৃতি নানা শ্রেণীর প্রাচীন ও নবীন চিন্তাশীল ঋষি মনীষিবর্গের বিচিত্র মতবাদ যেরূপ সুকৌশলে বিন্যস্ত করিয়াছেন, তাহা যথার্থই প্রশংসনীয়।

গ্রন্থকার বহুস্থলে আকর গ্রন্থ হইতে মূল সংস্কৃত ভাগ তুলিয়া তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝাইয়াছেন। আবার পাশ্চাত্য রীতিতে মৌলিক সমালোচনা করিতেও পরাঙ্মুখ হন নাই। কেবল দার্শনিক তত্ত্বোপন্যাস ব্যতীত তিনি বিবিধ দর্শন-সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক পটভূমিকাও যথাসম্ভব বিবৃত করিয়াছেন। গ্রন্থখানির ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও গ্রন্থকারের দুরূহ তত্ত্ব সহজবোধ্য করিবার ক্ষমতা আছে। তাঁহার গ্রন্থখানির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, পড়িলে স্পষ্টই বুঝা যায়—তিনি শাস্ত্রবিশ্বাসী ও নানা দার্শনিক তত্ত্ব সমন্বয়ে প্রযত্নবান্। গ্রন্থখানির প্রথমাংশ পূজ্যপাদ বিদ্যারণ্য স্বামীর "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের" আদর্শে লিখিত। আর দ্বিতীয়াংশ (ভারতীয় ভাবদর্শন বা Folk Philosophy-র অংশ) গ্রন্থকারের মৌলিক প্রযত্নের ফল। বাঙ্গালা ভাষায় এ জাতীয় মৌলিক গ্রন্থ এই প্রথম। এই কারণে ইহার কিছু কিছু ত্রুটী উপেক্ষা করিয়াই বঙ্গ-সাহিত্যের আসরে ইহাকে আমার স্বাগত অভিনন্দন জানাইতেছি।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

**বিজয়িনী**—সম্পাদিকা শ্রীজ্যোৎস্না চন্দ, বি-এ, শিলচর—কাছাড়।

'বিজয়িনী' মাসিক পত্রিকা। গত আশ্বিন হইতে বর্ষারম্ভ হইয়াছে। পত্রিকাখানি শিলচর 'নারী-কল্যাণ সমিতি'র উদ্যোগে ও সাহায্যে প্রকাশিত। উদ্দেশ্য—নারী সমাজের সেবা। পত্রিকার আর্থিক লাভ এই দুঃস্থ সমাজের কল্যাণার্থ ব্যয় করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

অজস্র শুভেচ্ছা সত্ত্বেও, কোন কিছুর সার্থক বাঁচা ও বৃদ্ধি নির্ভর করে তার অন্তর্নিহিত আত্ম-বিশ্বাস, তপোসম্পদ, প্রাণশক্তি এবং কালজয়ী সত্যের উপর। 'বিজয়িনী' স্বকীয় সঙ্কল্পনিষ্ঠায় ও সাধনায় উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করুক, ইহাই কামনা করি। সাধারণের জন্য ইহার বার্ষিক মূল্য পৌণে তিন টাকা এবং মাসিক মূল্য চারি আনা বেশী হইয়াছে।

**বঙ্গরবি আশুতোষ**—।৵০, **দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন**—।৵০, **দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ**—॥০ শ্রীপ্রসন্নকুমার রায় বি-এ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ বাইণ্ডার্স, ৩১।২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

আদর্শ জীবনী-শতক গ্রন্থাবলী সিরিজের ইহা যথাক্রমে এক, দুই এবং তিন নম্বর পুস্তক। গ্রন্থকারের এই মহদুদ্দেশ্য অতীব প্রশংসনীয়। জাতি-গঠনের ভিত্তি-রচনায় এই সকল জীবনের আদর্শ ও উপকরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পাশ্চাত্য দেশে "Men of Letters" ও "Action" সিরিজের পুস্তকের অভাব নাই। নাটক-নভেলের বাহুল্য থাকিলেও বাংলাভাষায় এই ধরণের গ্রন্থাবলীর একান্ত অভাব। প্রসন্নবাবুর এই উদ্যম সর্ব্বতোভাবে সাফল্য ও সমর্থন লাভ করুক, এই কামনাই করি।

**আকাশের হাত থেকে বাঁচো!**—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত। রূপকথা পাবলিশিং হাউস, ১০৫ নং রসা রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দাম ছয় আনা।

শিশু সাহিত্যে লেখকের যে দক্ষতা তাহা আলোচ্য বইখানিতে সুন্দর রূপেই বজায় আছে। বইখানি পাঁচটি গল্পের সমষ্টি। প্রথম গল্পের নামে বইয়ের নামকরণ করা হইয়াছে। সহজ, সরল, সাবলীল ভাষা। ত্রিবর্ণ প্রচ্ছদপট। মোটের উপর বইখানিতে ছেলেমেয়েদের কৌতূহল জাগাইবার উপাদান প্রচুরই বর্ত্তমান।

**সায়ন্তনী** (কাব্যগ্রন্থ)—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রকাশিকা—শ্রীভারতী নিয়োগী, সংহতি পাব্লিশিং হাউস, ৭ নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

'সায়ন্তনী'র গ্রন্থকার বাংলার কাব্যসাহিত্যে সুপরিচিত। ইতিপূর্ব্বে ইঁহার 'মধুচ্ছন্দা' এবং 'নীরাজন' নামক দুইখানি কাব্যগ্রন্থ পাঠক ও সমালোচক সমাজে আদৃত হইয়াছে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থখানির মধ্যে উনসত্তরটী কবিতা ও গাথা আছে। সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের ব্যথা বেদনার কথা, অভিজাত সমাজের চিত্র, যান্ত্রিক সভ্যতার নৃশংস নগ্নরূপ দক্ষ শিল্পীর মতই কবি মনস্তত্ত্বানুমোদিত প্রকাশভঙ্গিমায়, ছন্দ ও ভাষা-বৈচিত্র্যের মধ্যে সুপরিস্ফুট করিয়াছেন। গাথাগুলির সৃষ্টিমূলে জাতীয়তার প্রেরণা ও আবেগ পরিলক্ষিত হয়। সায়ন্তনীর কবি আদর্শবাদী এবং ভারতের সুপ্রাচীন আর্য্যসভ্যতার অনুরাগী। অপূর্ব্ববাবুর সৃষ্টির মধ্যে একটা শাশ্বত আবেদন আছে। কবি একস্থানে আর্য্যসভ্যতার বন্দনা-গীতি গাহিতে গিয়া বলিতেছেন—

"দুর্যোগ তিমির রাত্রে বর্ষণের ধারা নামে চিত্তক্ষুব্ধ ঝটিকার বেগে,
আমার অন্তর-আত্মা বিদ্যুৎ করিছে সৃষ্টি গগনের মসীকৃষ্ণ মেঘে।
দিগন্তের মোহাচ্ছন্ন মোহানার ধারে তার দীপ্তি জাগে মৃত্যুর নিঃশ্বাসে,
আমার অন্তর-আত্মা নবযুগ প্রভাতেরে খুঁজিতেছে অনন্ত আকাশে।

শাশ্বত কালের স্রষ্টা আমি কবি কহি আজ—নাহি ভয়, আসিতেছে দিন,
সাহিত্যে সঙ্গীতে কাব্যে এ জাতির আজিকার অবসাদ ক্লান্তি হবে লীন,
ধ্বংসের পশ্চাৎ হ'তে সৃষ্টির বিহঙ্গ নিয়া আসিতেছে ভবিষ্য জীবন,
মহাশক্তি বিরাজিবে, যে শক্তির করে গেনু শবাসনে ধ্যানে আবাহন।
(সায়ন্তনী—২৬ পৃষ্ঠা)

প্রেম ও পল্লীমূলক কবিতাগুলি অতীব সুন্দর হইয়াছে। দর্শন ও ভক্তিমূলক কবিতাগুলির ভিতর শুধু লিরিক সৌন্দর্য্য নাই, হৃদয়ের আবেগ ও ভাবের অভিব্যক্তি আছে। কতকগুলি কবিতা সন্ধ্যা-ভাষায় লিখিত। সেগুলির মধ্যে রসপ্রাচুর্য্যের পরিচয় পাওয়া গেল। কবির মনোভাবের পরিচয় 'সায়ন্তনী' পাঠ করিলে পাওয়া যায়। সায়ন্তনী বঙ্গভারতীর পাদপীঠে চিরদিন অম্লান থাকিবে। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় গ্রন্থের আঙ্গিক প্রসাধনে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আধুনিক রুচিসম্মত ছাপা ও বাঁধাই।

**তরুণ-তুর্কী**—ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ১০।৪এ মুসলমানপাড়া লেন, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

দুঃসাহসী বাঙালীর ছেলে ভূপর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাসের নাম আজ সুপরিচিত। আধুনিক তুরস্কের জীবনালেখ্য লেখকের অনন্ত প্রাণের ছোঁয়ায় গ্রন্থে জীবন্ত হইয়া ধরা দিয়াছে। তুর্কীর অলি-গলি, মাঠ-প্রান্তরের অবহেলিত সর্ব্বহারার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বইখানিতে লেখকের অনাড়ম্বর ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রচলিত গ্রন্থ সম্বন্ধে সচরাচর যাহা চোখে পড়ে না তাহাই আলোচ্য বইখানিতে মিলিবে। বাঙালী তরুণদের বিশেষ করিয়া তরুণ-তুর্কী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তুর্কীর সাম্প্রতিক পরিবর্ত্তন প্রচ্ছদপটে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়াছে।

**হিটলারের শত্রু**—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর প্রণীত। দেশপ্রিয় লাইব্রেরী, ১৯২।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

কিশোর ও তরুণদের সাহিত্যরচনায় শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের নাম পাঠকসমাজে পরিচিত। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে উপন্যাসাকারে লেখক আন্তর্জাতিক জটিল পরিস্থিতি সহজবোধ্য করিয়া তরুণ-মনের নিকট ধরিয়াছেন। গ্রন্থকারের কল্পনাশক্তি প্রশংসনীয়। কাল্পনিক নায়ক-নায়িকাকে উপস্থিত করিয়া ১৯৩৮শের মার্চ্চ মাসে জার্ম্মান ঝটিকা-বাহিনীর অষ্ট্রিয়া-অভিযানকে কেন্দ্র করিয়া গ্রন্থকার যে আখ্যায়িকার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। ভাষা সহজ ও সাবলীল। এ ধরণের পুস্তক যত অধিক প্রকাশিত হয় ততই ভাল। বিশ্বমানবতার ধূমল ভাবালুতার মাঝে যাহাতে জাতির উদীয়মান ভবিষ্যৎ তরুণের মন আচ্ছন্ন না হয়, সেদিকে গ্রন্থকারদের দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

**রোমাঞ্চক রাশিয়ায়**—ডক্টর সত্যনারায়ণ প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ২২।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৸০ টাকা।

পাঁচটি খণ্ডে আলোচ্য ৩৮৪ পৃষ্ঠার বইখানি বিভক্ত। মনোরম জ্যাকেট। ছাপা ও বাঁধাই রুচির পরিচয় দেয়। একরঙা ৯ খানি প্লেট আছে।

ডক্টর সত্যনারায়ণ জীবনের দীর্ঘ সময় ইউরোপ ও আফ্রিকায় কাটাইয়াছেন। তাঁর রাশিয়ায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা স্মৃতির পটে যে ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিল তাহাই মনের রঙ ফলাইয়া পরবর্ত্তীকালে রোমাঞ্চক রাশিয়ায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গাল্পিক দর্পণের পরিপ্রেক্ষণায় বাস্তব জীবন ও পরিবেশের যতটুকু মুকুরিত হইয়াছে তাহা সত্যই রসহিল্লোলিত। ভাষা সহজ হইলেও, বাক্যের বাঁধুনিতে কোথাও কোথাও আড়ষ্টতা লক্ষিত হয়। তবুও অবাঙালী লেখকের এই বাঙালা-অবদান পাঠকমাত্রেরই উপভোগ্য হইবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

**বাংলায় ভ্রমণ**—(১ম ও ২য় খণ্ড)

'বাংলায় ভ্রমণ' পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ আর্টপেপারে ছাপা। উভয় খণ্ডেই বহু চিত্র সংযোজিত হইয়াছে। সুবৃহৎ দুই খণ্ডের একত্রে মূল্য মাত্র দেড় টাকা। তীর্থমহিমার সাত্ত্বিকতা প্রচ্ছদপটে প্রকটিত। রেলপথের প্রচারোদ্দেশ্য হইলেও, বাংলার সত্যকার পরিচয় ও স্বরূপ পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় মুকুরিত হইয়াছে। বাংলায় ভ্রমণ পাঠে বাঙালী যেমন নিজেকে জানিবে তেমনি লিখিত স্থানগুলি ভ্রমণে সে নিজেকে চিনিবে। আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশে আমরা রেলপথের প্রচার বিভাগকে আন্তরিক অভিনন্দনই জানাইতেছি।

**ছায়া**—শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী প্রণীত। ফাইন আর্টস্ পাবলিশিং হাউস, ৬০ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দাম দেড় টাকা।

সহরের অভিজাত আধুনিকা তরুণী শোভনা আর পল্লীপ্রাণ তরুণ আদিত্যের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া লেখিকা রোমাঞ্চকর ঘটনা ও বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে সহর ও পল্লীমুখী দুইটি প্রবণতার যে চিত্র গ্রন্থমধ্যে আঁকিতে প্রয়াস করিয়াছেন তাহা সফল হইয়াছে। দ্বন্দ্বময় দাম্পত্য জীবনক্ষেত্রে শোভনা ও রক্তসম্পর্কহীন মৃণ্ময়ের ঘনিষ্ঠতা গ্রন্থকর্ত্রী যে সতর্ক সন্তর্পণতায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহাতে লেখিকার সুরুচিপূর্ণ শিল্প-পরিচয় মিলে। লেখিকার লিপিকুশলতায় গ্রন্থ বর্ণিত ঘর-গৃহস্থালীর ছবিগুলি নিখুঁতভাবে পাঠকের নয়ন সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। শোভনার নারী-হৃদয়ের পতিনিষ্ঠা বিচিত্র সংঘাতের মধ্য দিয়া শেষ পর্য্যন্ত স্বামীদেবতার বক্ষপুটে আশ্রয় পাইয়া যে শান্তি পাইল তাহাও খাঁটি হিন্দুর উৎকর্ষ ও সংস্কৃতিসম্মত। ভাষা ও ভঙ্গী সাবলীল—কোথাও এতটুকু আড়ষ্টতা নাই। ঘটনা-বিন্যাসেরও কসরৎ চোখে পড়িল না। নিঃসন্দেহে বলা চলে, প্রফুল্লময়ী দেবী বাংলা কথা-সাহিত্যে মহিলা লেখিকাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

# শেষ কোথায়?

শ্রীক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য্য, এম্. এ.

বিগত শতাধিক বৎসর ধরিয়া একটা ভাব-বিপ্লবের মধ্য দিয়া বাঙালী চলিয়াছে। ইহা ভাঙ্গনের যুগ। যেন সমুদ্রে নিপতিত মজ্জমান যাত্রীর মত নিঃস্ব জাতি যে কোনো আদর্শের হদিস্ পাইতেছিল, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই সে স্থিতিলাভ ও আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা করিতেছিল। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, জাতির প্রাণধারা বহুমুখী হইয়া বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছিল। গণতন্ত্র, ফ্যাসিজম, সোস্যালিজম, কমিউনিজম, সনাতনী, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন এদেশ ও ওদেশের বাদ-আশ্রয়ে জাতির জীবন-স্রোত প্রবাহিত হইবার প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাণবস্ত কথনও স্থিতিশীলতায় (static) তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। স্থিতিশীলতা জীবনধর্ম্মের বিরোধী বৃত্তি,—মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র। জাতির জীবন-গতি এক লক্ষ্যহীন আবেগে ছন্দহীন সুরের মত, অলক্ষ্যে বহিয়া চলিয়া সম্মুখে যাহা কিছু পাইতেছিল, নির্ব্বিচারে তাহাকেই জীবনে অবলম্বন করিয়া বাঁচিতে চাহিতেছিল। নব জাগরণের প্রথম ইতিহাসে লক্ষ্যহীন জাতির জীবনে তাই বহু মত ও পথের অস্থায়ী প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোনো বিজাতীয় আদর্শ বা মতবাদ সমগ্র জাতির প্রাণে ঐকাতানে জীবন-স্পন্দন জাগাইয়া তুলিতে পারিল না। আজ যাহা এক দলের নিকট মহান্ ও মঙ্গলময় বলিয়া সাগ্রহে আদৃত হইল, দু'দিন পরে তাহাই আবার তিক্ততায় পরিত্যক্ত হইতে লাগিল। বিজাতীয় বিশিষ্ট মতবাদ, ভাবধারা ও কৃষ্টির এইরূপে একে একে জাতীয় জীবনে গ্রহণ ও বর্জ্জনের পালা চলিল। ফলে, বিদেশীয় মতবাদ সমূহের ক্ষণিক আনুগত্য স্বীকার করিলেও, জাতির জীবন-ধর্ম্ম পরমুহূর্ত্তে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে লাগিল। জাতীয় জীবনে বিজাতীয় মতবাদ গ্রহণ ও বর্জ্জনের ইহাই হইল করুণ ইতিহাস। স্বভাবধর্ম্মে অস্বাভাবিকতা আপনা-আপনি দূরীভূত হইয়া যায়। অতএব দেখিতে হইবে—জাতীয় জীবন-ধর্ম্মের স্বরূপ কি, এবং আদর্শের কোন বিশিষ্ট আত্মীয়তা ঐ জীবনধারাকে অনুপ্রাণিত করিয়া স্বধর্ম্মে প্রবাহিত করিতে পারে!

আত্ম-বৈশিষ্ট্য জাতীয় জীবনের সঞ্জীবনী-শক্তি। এই বৈশিষ্ট্যে সুপ্রকাশিত হইয়া অনাদিকাল হইতে জাতি বাঁচিয়া আসিতেছে। যে জাতি যখন এই বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে, তখনই তাহার জীবনে মৃত্যুর আবির্ভাব হয়। ব্যক্তির সমষ্টি লইয়া সমাজ গড়িয়া উঠে এবং সমাজেরই বৃহত্তর রূপ জাতীয়তার মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়। ব্যক্তিগত মনের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে যে বিশিষ্ট মনের উদ্ভব হয়, তাহাই হইল সমাজ বা জাতীয় মন। সমাজ-মনের রূপ ব্যক্তি-মন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইলেও, ইহা সামাজিক ব্যষ্টি মনের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট। জাতীয় মনে ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হইয়া, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়। এই স্বাতন্ত্র্য জাতীয় মনের একটি বিশিষ্ট আত্মিক সম্পদ, ইহার লোপের সঙ্গে সঙ্গে জাতি মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইয়া থাকে। আত্মিক-স্বাতন্ত্র্য-বিলুপ্ত জাতি আপন অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে।

জীবনধর্ম্ম চির গতিশীল। আত্মিক-শক্তির অনুপ্রেরণায় উৎসারিত হইয়া জাতীয় জীবন চির প্রবাহিত হয়। আদর্শ এই অনুপ্রেরণার সঞ্জীবনী-শক্তি। বিজাতীয় আদর্শ যতই মহান্ হোক্ না কেন, আত্ম-বৈশিষ্ট্যের সন্ধান না পাওয়ায় জাতীয় প্রাণ তাহাকে আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। বিজাতীয় আদর্শের সংস্পর্শে জাতির প্রাণের স্বাভাবিক অনুপ্রেরণার অনুভূতি না জাগিয়া উঠায়, জাতি বিমুখ হইয়া রহিয়াছে। সেই নব জাগরণের দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তাই জাতির জীবন-ভিত্তি অস্থির হইয়া রহিয়াছে,—জীবনে আদর্শ গ্রহণ ও বর্জ্জনের পালা এখনও শেষ হয় নাই। একমাত্র বিশিষ্ট জাতীয় আদর্শবাদের আত্মিক-স্পর্শ ব্যতিরেকে জাতীয় জীবন সুস্থিরে কখনও সংগঠন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে না। অস্থিরতার আবেগে ভাঙ্গিয়াই চলিবে।

জাতীয় আদর্শ সর্ব্বদেশেই জাতীয় জীবন স্ফুরণের সহিত স্বাভাবিক নিয়মে উদ্ভূত হয়। যাত্রাপথে জাতি তাহার আপন আদর্শ সৃষ্টি করিয়া লয়। জাতীয় জীবনের সহিত জাতির আদর্শ তাই একাত্ম ও অন্তরঙ্গভাবে (Organic) সমদ্ভূত, পরিবর্দ্ধিত ও পরি-

মার্জ্জিত, হইয়া থাকে। বিশিষ্ট বিশিষ্ট জাতি, বিশিষ্ট বিশিষ্ট গতিধারা ও আত্মশক্তির অনুরূপ আপন আপন বিশিষ্ট আদর্শ এই স্বাভাবিক নিয়মে গড়িয়া তুলে। বিজাতীয় আদর্শ তাই, সে যত মহান্ হোক্ না কেন, কোন জাতি আত্মীয়তায় গ্রহণ করিতে পারে না ; করিলে, অস্বাভাবিকতায় আপনিই উহা বিষাক্ত হইয়া উঠে, জাতির প্রাণে কোনই অনুপ্রেরণা জোগাইতে পারে না। এই স্বাভাবিক নিয়মানুবর্ত্তনে আমরা দেখিতে পাই যে, বিগত শতাব্দীর নব জাগরণের পর, বাঙালী একে একে যত প্রকার আশু চিত্তাকর্ষক বিদেশীয় সমুন্নত আদর্শগুলি জীবনে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সবই বিফল হইয়াছে। আত্মীয়তায় কোনটিকেই জীবনে স্থান দিতে পারে নাই। ফলে, জীবন-ধর্ম্মের প্রেরণায় অস্থির হইয়া বন্যা-বিক্ষুব্ধ নদীর মত দুইকূল ভাঙ্গিয়াই চলিয়াছে। ভাঙ্গনের নেশায় গঠনের কথা ভুলিয়া রহিয়াছে। আত্মশক্তির প্রাচুর্য্যে আবার জাতি যতদিন তার বিশিষ্ট আদর্শ যুগধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিয়া জীবন-ধর্ম্মে গ্রহণ করিতে না পারিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত বাঙালীর এই অন্তর্বিক্ষোভ অবসানের কোনই সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যাইবে না। আত্মস্থ হইতে হইলে, তাহাকে আত্মিক-বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আদর্শকে জীবনে পুনরবলম্বন করিতে হইবে।

এই সম্পর্কে একদলকে বলিতে শোনা যায় যে, অতীতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করা হইবে মাত্র, কেননা, অতীত—প্রাণহীন, তাহার প্রাণ দিবার শক্তি কোথায়? এই মতাবলম্বিগণ তাই অতীতকে কবরিত করিয়া, নূতনের মধ্যে প্রাণের সন্ধানে ছুটিয়া হয়রাণ হইয়া থাকেন এবং পুরাতনের নামেই নাক সিঁট্কাইয়া থাকেন। অন্য দিকে, প্রাচীনের দল একমাত্র পুরাতনকেই অবলম্বন করিয়া স্থবিরের মত স্থাণু হইয়া থাকিতে চান। নূতনের ও পরিবর্ত্তনের নাম শুনিলেই, তাঁহারা আঁৎকাইয়া উঠেন। গলদ এইখানেই। পুরাতনের বক্ষেই যে নবীনের জন্ম, এবং নবীন যে পুরাতনের বিকশিত রূপ মাত্র, আপাতঃ দৃষ্টিতে আমরা এই চির সত্য ভুলিয়া যাই। গাছের ফুটন্ত ফুলটি যে তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য ও গন্ধ-সম্পদ লইয়া, যে-বীজ হইতে ঐ ফুলের গাছটি আঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহারই মধ্যে অপ্রকাশে লুপ্ত ছিল, ইহা আমাদের আপাতঃ বিচার-বুদ্ধিতে ধরা না পড়িলেও, অস্বীকার করিবার উপায় কোথায়! আবার ঐ ফুলের রেণুতে যে ভবিষ্যৎ গাছের পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। সেইরূপ, অতীত ও বর্ত্তমানকে নিরবচ্ছিন্ন পঙ্‌ক্তিতে বিভক্ত করা সম্ভব নহে। আজ বর্ত্তমানের যে রূপ, ধারা, লক্ষ্য ও শক্তি প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সে-সকলেরই পূর্ণ সম্ভাবনা অতীতের অন্ধকার-গর্ভে নিহিত ছিল। বর্ত্তমান তাই অতীতের নব রূপায়ন মাত্র। আলো, বাতাস ও সারালো জমির রসাহারে প্রস্ফুটিত ফুলের মত আবেষ্টন ও কাল-প্রবাহে অতীত বর্ত্তমানের রূপে সুবিকশিত হইয়াছে। ইহা চিরন্তন সত্য। অতএব, অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে সীমা-রেখার অঙ্কন চলে না। আলো ও ছায়ার মত, অতীত ও বর্ত্তমান নিরবচ্ছিন্ন ও ওতঃপ্রোত। বর্ত্তমান যে প্রকার প্রাচীনতার বক্ষে সুবিকশিত, প্রাচীন জাতিও সেইরূপ প্রাচীনতার নিত্য বিকাশে, কাল ও যুগধর্ম্মে নবীনতায় রূপান্তরিত হইতেছে মাত্র।

জাতির আদর্শ আকস্মিক সম্পদ নহে। ইহা অন্তরঙ্গ ও একান্ত আত্মিকরূপে জাতীয় জীবন বিকাশের সহিত জাতির আত্ম-বৈশিষ্ট্যে সমুদ্ভূত। জাতির জীবন-ধারা হইতে বাহিরে ইহার কোনো অস্তিত্ব নাই। অতএব, এই জাতীয় জীবন সত্যকে,—আদর্শকে কাল-প্রবাহে ও বর্ত্তমান যুগধর্ম্মে স্বাভাবিকতায় রূপায়িত করিয়া জাতির নবীন জীবনের নব সৌন্দর্য্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, উপায়ন্তর নাই। প্রাচীনতার বিকাশের মধ্য দিয়া যে প্রাচীন জাতি আজ এই নবীন যুগে পৌঁছিয়াছে, তাহার চির-জীবনসঙ্গী আদর্শকেও নবীনতার মাধুর্য্যে অনুপ্রাণিত করিয়া, নব সৌন্দর্য্য সম্পদে অলঙ্কৃত করিয়া জাতীয় জীবনে গ্রহণ করিতে হইবে। একমাত্র ইহাতেই জাতির আত্মতৃপ্তি ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার শক্তি জাগরিত হইবে। অন্যথায় আত্মহারা উশৃঙ্খল জাতি নিরবলম্বনে দিন দিন হীনবীর্য্য হইয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবে। বিলুপ্ত বহু প্রাচীন জাতির ইতিহাসই ইহার চরম সাক্ষ্য। এদিকে বাঙালীর বিশেষ অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

# সাময়িকী

## চট্টল প্রবর্ত্তক আশ্রমে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সকাল ১০॥০টার সময় মেজর পি, বর্দ্ধন এবং বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সম্পাদক মহোদয় সমভিব্যাহারে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্থানীয় প্রবর্ত্তক আশ্রম পরিদর্শনে গমন করেন। সঙ্ঘের সভ্য, শিক্ষক, ছাত্র এবং কর্ম্মিবৃন্দ তাঁহাদিগকে আশ্রমের তোরণদ্বারে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। আশ্রমের বিভিন্ন কর্ম্মবিভাগ পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা বিদ্যাপীঠে গমন করিলে তথায় সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রদ্ধেয় শ্যামাপ্রসাদবাবুকে একটি মানপত্র দেওয়া হয়। তাহার উত্তরে তিনি বলেন—"প্রবর্ত্তকের সাধকগণ সর্ব্বত্যাগী হইয়া নীরবে গঠনযজ্ঞে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। আজ চলার পথে তাঁহাদিগকে বহু দুঃখ দৈন্য এবং বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে হইতেছে। ভবিষ্যতে স্বাধীন বাংলার ইতিহাস যেদিন রচিত হইবে, সেদিন স্বর্ণাক্ষরে প্রবর্ত্তক-

আশ্রমের তোরণদ্বারে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সঙ্ঘের নাম তথায় লিখিত হইবে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘকে আমি জানি। আমি বাংলার সর্ব্বত্র সঙ্ঘের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত সংহতি-শক্তির অভ্যুত্থান এবং বিস্তৃতি কামনা করি। সর্ব্বকর্ম্মসিদ্ধির মূলে চাই খাঁটি মানুষ। শিক্ষা-ক্ষেত্রই মানুষ গড়ার যোগস্থান। সঙ্ঘ শিক্ষাক্ষেত্রে মানুষ গড়ার আয়োজন করিতেছে—তজ্জন্য সঙ্ঘকে আমি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। হিন্দু সংহতি গঠনের জন্য আমাদের আয়োজনের সহিত সৌভ্রাত্রের সহিত সহায়তা করিতে আমি সঙ্ঘকে সশ্রদ্ধ আহ্বান করিতেছি। অভিনন্দন-পত্রে বাংলার বহু সমস্যার কথাই উত্থাপিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এমন আবেষ্টনীর মধ্যে

চট্টল প্রবর্ত্তক আশ্রমে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

দাঁড়াইয়া বাংলার সমস্ত দ্বন্দ্ব কোলাহল আমি নিজে ভুলিতে চাহি এবং দ্বন্দ্ব হইতে জাতিরও মুক্তি কামনা করি। ক্ষেত্রান্তরে ঐ সব সমস্যা সম্বন্ধে আমি বিশদভাবে আলোচনা করিব।"

## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব

গত ১৬ই ফাল্গুন হইতে ১৮ই ফাল্গুন দিবসত্রয়ব্যাপী নবদ্বীপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতির উদ্যোগে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পূজা, পাঠ, হোম, ভজন, কীর্ত্তন, রামায়ণ গান, সুপণ্ডিত ও সুবক্তা স্বামী চৈতন্যগোবিন্দ ভারতীর সভাপতিত্বে এক ধর্ম্মসভার অধিবেশন এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জীবনাদর্শ সম্বন্ধে বিভিন্ন

বক্তাগণ কর্ত্তৃক সুললিত ও সুচিন্তিত বক্তৃতা, সহস্রাধিক দরিদ্রনারায়ণের সেবা এবং পত্রপুষ্প-মাল্য চন্দনাদি পরিশোভিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মনোরম চিত্রপটসহ বাদ্যভাণ্ড ও কীর্ত্তন সহকারে সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা ঘুরিয়া বিরাট মিছিল যথারীতি অনুষ্ঠিত হওয়ায় সমিতি ভবন এ তিনদিন আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইয়াছিল। সহরের সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু নরনারী এ উৎসবে যোগদান করায় উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

### শ্রমশিল্পে চারুকলা

বর্ম্মা শেল কোম্পানীর উদ্যোগে 'শ্রমশিল্পে চারুকলা' শীর্ষক একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনী সম্প্রতি কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে হইয়া গিয়াছে। এই ধরণের প্রদর্শনীর

শিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিনবত্ব ও উপযোগিতা অস্বীকার্য্য। ইহার অলঙ্কার-চিত্রণ বিভাগে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রায় আশীজন শিল্পী যোগদান করেন, তন্মধ্যে শিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম স্থানাধিকার করিয়া আড়াইশত টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। তাঁহার ছবিখানিও ৫০৲ মূল্যে 'বিক্রীত' হইয়াছে। শ্রীমান্ আশু বন্দ্যোপাধ্যায় বয়সে তরুণ হইলেও শিল্প নৈপুণ্যে অনেক প্রবীণকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে আশু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্ত্তকের শিল্পী হিসাবে নিযুক্ত আছেন।

### প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে ফরাসী ভারতের গবর্ণর

বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী শনিবার অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকায় ফরাসী ভারতের মাননীয় গবর্ণর মসিয়েঁ বঁভ্যাঁ, চন্দননগরের এ্যাড্মিনিষ্ট্রেটর মসিয়েঁ মাসুতিয়েঁ ও ফরাসী ভারতীয় অর্থ বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ মসিয়েঁ ভুইওম চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে আগমন করেন। প্রবর্ত্তক আশ্রম, স্কুল, প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের শাখা অফিস পরিদর্শন করেন এবং সঙ্ঘের গঠনমূলক কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। প্রবর্ত্তক নারী মন্দিরের সভ্যাগণ স্বগৃহে তৈয়ারী মিষ্টান্নাদির দ্বারা তাঁহাদের আপ্যায়িত করেন।

বৃহন্নলা নৃত্যে নৃত্যশিল্পী মণিবর্দ্ধন ও তাঁর সম্প্রদায়

### ভারতীয় নৃত্যকলা

নৃত্যকলার প্রসার ইদানীং ভারতের সর্ব্বত্রই বেশ লক্ষ্য করা যাইতেছে। অধুনা জীবিকার্জ্জনের একটি উপায়-স্বরূপ ইহা গৃহীত হইতেছে বলিয়া অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় বেকারের আধিক্যে নৃত্যের কলাকুশলতার হানি আশঙ্কা করা স্বাভাবিক। সহজবৃত্তির ছন্দপ্রকাশের একনিষ্ঠ সাধনা এ ক্ষেত্রেও শিল্পীকে সুনিপুণ করিয়া তুলে। এদিকে নৃত্যবিদগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

## নিও কেমিক্যালস্ লিঃ

বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী দুর্য্যোগের দিনে আমরা যে কি দৈন্যগ্রস্ত তাহা বৈদেশিক দ্রব্যাদির আমদানী বন্ধ হওয়ায় ভাল করিয়াই বুঝিতেছি। বুঝিয়াও কিন্তু প্রতিকারের উপায়ের জন্য দেশের প্রাণ তেমন জাগিতেছে না। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, সন্ট, শ্বেতসার, গ্লুকোজ প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য ... করিবার পরিকল্পনা ... লইয়া সম্প্রতি নিও কেমিক্যালস্ লিঃ নামক একটি প্রতিষ্ঠান কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চল স্থাপিত হইয়াছে। ঔষধের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত এই সদ্যজাত শিশু প্রতিষ্ঠানটি দেশবাসীর স্নেহ ও সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইবে না, ইহাই আমরা আশা করি।

পুণ্যশীলা স্বর্গীয়া ভুবনময়ী দেবী

ইনি সম্প্রতি ১০১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ আচারপরায়ণতা, নিয়ম ও সংযমই তাঁহার দীর্ঘজীবন লাভের হেতু। ভুবনময়ী দেবী সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর জননী।

## বঙ্গভাষা প্রচার

কলিকাতার মহানির্ব্বাণ রোডস্থ শ্রীগুরু সেবাশ্রমের সদস্যগণ দেশ ও জাতির সেবার জন্য যে সকল প্রচেষ্টা করিতেছেন তন্মধ্যে বঙ্গভাষা প্রচারমূলক আন্দোলনটি বিশেষ প্রশংসনীয়। বিগত ১৭ই ফাল্গুন অপরাহ্নে মহাবোধি সোসাইটি হলে রায় বাহাদুর শ্রীযুত ... মহোদয়ের পৌরোহিত্যে একটি সভা ... সভায় শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র ... করেন তাহা খুবই সু... মহোদয় যে প্রকাশের ই... চস্তিত। উহা বারান্তরে ... শিক্ষা রহিল। আমরা দরদী দেশবাসীর দৃষ্টি শ্রীগুরু সেবাশ্রমের সময়োপযোগী এই বঙ্গভাষা প্রচার কার্য্যের প্রতি আকর্ষণ করি।

## প্রবর্ত্তক কর্ম্মি-সঙ্ঘের প্রীতি সম্মেলন

গত ১৭ই ফাল্গুন অপরাহ্ন ৬ ঘটিকায় ব্যাপটিষ্ট মিশন হলে প্রবর্ত্তক কর্ম্মি-সঙ্ঘের প্রথম প্রীতি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং আনন্দবাজার সম্পাদক শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

কর্ম্মি-সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে মাল্যদান প্রসঙ্গে কর্ম্মি-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সংক্ষেপে ব্যক্ত করেন এবং শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রীতি-সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বলেন।

উৎসবের প্রধান অতিথি শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় প্রবর্ত্তক কর্ম্মিদের নিরলস ও নিষ্কাম কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কর্ম্মযোগী শ্রীমতিলাল রায় নিষ্কাম কর্ম্মের যে মহান্ আদর্শ দেশের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন ইহাপেক্ষা বড় আদর্শ আর নাই।

শ্রীমতিলাল রায় কর্ম্মবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, প্রীতি বা সামাজিক হাল্কা আনন্দই জীবনের সবখানি নয়, পরন্তু গভীরতার মধ্যে, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ভূমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির মধ্যে যে সুনিবিড় আনন্দ আছে তাহার কাছে আর সবই তুচ্ছ। কর্ম্মবিজ্ঞান, বৈদিক কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে তিনি প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী প্রধান অতিথিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। ইহার পরে উপস্থিত সকলকেই জলযোগ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীরঞ্জিত গুহের প্রযোজনায় ... সেন্টার অব্ দি ওরিয়েন্ট-এর শিল্পীগণ নৃত্য, গীত ও আবৃত্তি প্রভৃতির মধ্য দিয়া দর্শকমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ

। শিল্পীগণের সঙ্গীত ও নৃত্য-নৈপুণ্যে প্রবর্ত্তকের কর্ম্মি ছাড়াও সহরের বহু অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রীতি-অ... হইতে অসিতা বোস দর্শকমণ্ডলীর ম... নারায়ণ (নৃত্য) (গীত ও নৃত্য), অঞ্জলী সেন (আবৃত্তি), ... চ্যাটার্জ্জি বেলা সেন (নৃত্য), ছবি গুহ (নৃত্য), গৌরী ... (সঙ্গীত) কেতকী রায় (নৃত্য) ও প্রবর্ত্তক নারী মন্দিরের বিমলা ঘোষকে (গান) পদক প্রদত্ত হয়।

অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব বর্ত্তমানে জাতীয় উৎসবে পরিণত হইয়াছে। উনবিংশ বার্ষিক এই মহাযজ্ঞ আগামী ১৬ই বৈশাখ হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সঙ্ঘের ব্রহ্মবিদ্যা মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া পক্ষকাল যেমন একদিকে অধ্যাত্ম-প্রবাহ চলিবে তেমনি শিক্ষাপ্রদ মেলা, প্রদর্শনী ও বক্তৃতাদির মধ্য দিয়া জাতিগঠনের উপকরণ উপস্থাপিত হইবে। বিবিধ চিত্রে, রেখায় ও মৃন্ময় মূর্ত্তিতে রূপায়িত ভারতীয় ভাব ও আদর্শ উৎসবের শ্রী ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিবে। প্রদর্শনীতে যাঁহারা ষ্টল লইতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে আগামী ৩০শে চৈত্রের মধ্যে উৎসব কমিটির ... প্রধান ... জাতীয়-সম্পাদককে ... এই সুবৃহৎ যজ্ঞে দেশবাসীর সহৃদয় সহযোগিতা এবং সাহায্য ও কর্তৃপক্ষ আশা করেন।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

## আমাদের নিবেদন

চলিত চৈত্র মাসের সহিত প্রবর্ত্তকের পঁচিশ বর্ষ পূর্ণ হইল। প্রবর্ত্তকের দীর্ঘ ইতিহাসে ১৩৪৭ সাল স্মরণীয় বৎসর। বারো মাসে বাংলার বারোটি জেলায় প্রবর্ত্তকের জাতিগঠনমূলক ভাব, আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতির অভিব্যক্তি দিয়া প্রবর্ত্তক-সম্পাদক শ্রীমতিলাল রায় প্রবর্ত্তকের রজত-জয়ন্তী যজ্ঞ উদ্‌যাপন করিলেন। আগামী ১৩৪৮ সালের বৈশাখ হইতে প্রবর্ত্তকের নব পর্য্যায়ের সুরু।

বর্ত্তমানের মানসিক কুজ্ঝটিকা (mental complex) কাটাইয়া প্রবর্ত্তক পরিচ্ছন্ন গঠনের পথ পাইয়াছে। এই সুনির্দ্দিষ্ট পথের সঙ্কেত এবারকার "প্রবর্ত্তক রজত জয়ন্তী" শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধে মিলিবে। প্রবর্ত্তক পত্রিকার আদর্শ ও লক্ষ্য ইহাতে দিনের মত স্পষ্ট। আমরা প্রবর্ত্তকের পাঠক পাঠিকাকে উহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

যাঁহারা স্বকীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসবান, যাঁহারা বিশ্বাস করেন ভারতের অধ্যাত্মবাদ, ভারতীয় চিন্তা ও দর্শন, ভারত তথা বিশ্ব মানবের অভ্যুত্থান ও শ্রেয়ঃ বিধানে সমর্থ, আমরা জানি, প্রবর্ত্তক তাঁহাদের অপরিহার্য্য সঙ্গী। এই ঋতময় অগ্নিবিশ্বাস বুকে ধরিয়া প্রবর্ত্তক বহু বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে।

তাই আমাদের ভরসা চলিত বর্ষে যাঁহারা প্রবর্ত্তকের গ্রাহক ছিলেন তাঁহারা আগামী বর্ষেও গ্রাহক থাকিয়া আমাদের জাতিগঠন-তপস্যাকে সার্থক করিয়া তুলিবার সহযোগিতা করিবেন। অপরিহার্য্য কারণে গ্রাহক থাকিতে অসমর্থ হইলে, অনুগ্রহপূর্ব্বক ২০শে চৈত্রের মধ্যেই জানাইয়া দিবেন। অন্যথায় বৈশাখ সংখ্যার প্রবর্ত্তক যথারীতি ভিঃ পিঃ যোগে প্রেরিত হইবে। অনবধানতায় ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিলে, এই দুর্দ্দিনে আমাদের অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে; এদিকে আমরা সহৃদয় গ্রাহকগণের সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

গ্রাহক নম্বর সহ মনিঅর্ডারে টাকা পাঠানোই সুবিধা, ইহাতে ভিঃ পি-র দরুণ অনর্থক ডাক খরচও লাগে না, প্রবর্ত্তক পাইতেও গোলযোগ ঘটে না। নূতন কি পুরাতন গ্রাহক, ইহা উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। ডাকমাশুলসহ প্রবর্ত্তকের বার্ষিক মূল্য ৪৷৷০ টাকা, ষাণ্মাষিক ২।০ টাকা এবং প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা। ইতি

পরিচালক—প্রবর্ত্তক: ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরিচালক ও প্রকাশক: শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।